সাপ্তাহিক বসুমতী

কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী

১৩শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১লা আশ্বিন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 13, 18th Sept., 1

Cuk H05260-27-271841

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৭৭১
আজকের মানুষ		৭৭২
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৭৭৩
সুখ (কবিতা)	— সাধনা মুখোপাধ্যায়	৭৭৬
বই-বাছাই—বাংলা বইয়ের মেলা	— হরপ্রসাদ মিত্র	৭৭৭
হো চি মিন-কে নিবেদিত (চারটি কবিতা)		৭৮০
বঙ্গদর্শন		৭৮১
ভারতদর্শন		৭৮৪
আন্তর্জাতিক		৭৮৮
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	৭৯০
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	৭৯২
সাগর সংগমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	৭৯৬

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান
ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পাঠকমন		৮০০
উচ্চারিত ঃ অনুচ্চারিত (প্রবন্ধ)	রজত রায়চোধুরী	৮০১
গণতন্ত্রের পূজা ও পূজারী (প্রবন্ধ)	সুনীল ঘোষ	৮০৪
তিমিরপ্রান্ত ডয়ার্স	অগ্নিবর্ণ	৮০৭
আইন ও শৃংখলা ঃ		
পুলিশের ভূমিকা—কয়েকটি অভিমত	সাগর বিশ্বাস	৮১০
শহর কলকাতা	শহরদর্শী	৮১২
গোলাপের কান্না (গল্প)	সমীর দাশগুপ্ত	৮১৩
এ যুগের নৃত্য ভাবনা ঃএকটি খসড়া	শঙ্করনাথ মুখোপাধ্যায়	৮১৮
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিসালি	৮২০
রঙ্গজগৎ		৮২৩
গ্রন্থমেলা		৮২৭
খেলাধুলা	শান্তিপ্রিয়	৮২৮

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে !!—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার সিদ্ধহস্ত। এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বায়রনের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।...... বায়রনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।...... নবীনবাবুর যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাকাব

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ॥ কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮।

মূল্য মাত্র সাত টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৭৪ বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতি, ১লা আশ্বিন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 18th Sept., 1969

জাতীয় চরিত্র

সম্প্রতি পান্ডিচেরীতে নাগরিক সম্বর্ধনার উত্তরে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলার জন্য আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, বিশ বছরের অধিককাল ভারত স্বাধীন হলেও আজো জনগণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহের ব্যবস্থা হয় নি। ঐ প্রসঙ্গে তিনি জাতীয় শৃঙ্খলা, চরিত্র এবং সংহতি গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি জাতীয় চরিত্র গড়ে না ওঠার জন্য সরকারকে দোষারোপ করেন নি। জনসাধারণ জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলার জন্য আত্মোৎসর্গ না করার জন্য স্বাধীন ভারতে ঐ অবস্থা হয়েছে বলেই তিনি সম্ভবত মনে করেন।

রাষ্ট্রপতি জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলার জন্য যে আহবান জানিয়েছেন, আশা করা যায়, এখন তাতে জনসাধারণ সহজভাবেই সাড়া দেবেন।

আমাদের দেশে আগে জাতীয় চরিত্রের দৃঢ়তার কোনো রকম অভাব ছিল, তা কেউ বলবেন না। কারণ বলদৃপ্ত ইংরেজ সরকারকে এ দেশ থেকে বিদায় দেবার জন্য যে ধরণের তপশ্চর্যা প্রয়োজন ছিল—ভারতবাসী তা করেছিল; ভারতবাসীর নৈতিক শক্তি সে সময় ছিল অত্যন্ত প্রবল। সেই নৈতিক শক্তিতে প্রথম ভাঙন সৃষ্টি করলেন আমাদের দেশের নেতারা দেশ-ভাগাভাগির মাধ্যমে। এর পর নেতাদের একমাত্র কাজ হল, যে-কোনো জনস্বার্থবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ না করা এবং জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া। ইংরেজ আমলে সর্বাপেক্ষা ভীতিজনক ছিল আমলারা ও পুলিশবাহিনী,—ক্রমে ক্রমে এরা দেশটাকে ঘুষের রাজত্বে পরিণত করল। সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, এমন নেতৃবৃন্দের সৃষ্টি হল, যাঁরা কোনো রকম চক্ষুলজ্জার বালাই না রেখে দলরক্ষার স্বার্থে পারমিট বিতরণের দানছত্র খুললেন। আর অপর দিকের চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত; সেখানে অসহায়, নিরলম্ব, নিরুপায় ও অশিক্ষিত মানুষ ধর্মবোধে ভীত হয়েও কোনো মতে দুমুঠো খাদ্য সংগ্রহকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে মনে করলেন। একদিকে ব্যষ্টি মানুষের অর্থের পাহাড় জমতে লাগলো বাধাহীন অতি মুনাফায়, অন্যদিকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ও অর্ধাহারে থাকলো সাধারণ মানুষ। সুতরাং স্বাধীন ভারতে খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহের যথাযথ ব্যবস্থা না হওয়ার কারণটি এখন আর কারো অজ্ঞাত নয়—যদিও প্রায় বিশ বছর ধরে শিশুরাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে জনগণকে কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করতে নেতৃবৃন্দ প্রায় প্রত্যহই ধোঁকা দিয়েছিলেন এবং কালোবাজারীদের প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাই জাতীয় চরিত্রের অধঃপতনের মূলে আমাদের দেশের তথাকথিত নেতৃবৃন্দও কম দায়ী নন। জনগণের দোষ এই যে, তাঁরা কুণ্ঠাহীনভাবে ঐ সব নেতার ওপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের ঘোর কাটতে খুব বেশি সময় লাগে নি এবং সচেতন জনসাধারণ ভোট যন্ত্রের মাধ্যমে একের পর এক পুরাতন নেতাগুলিকে ধরাশায়ী করলে কারো কারো অবস্থা এমন হল যে, ধুলো ঝেড়ে ওঠার শক্তিও থাকল না।

এতদ্সত্ত্বেও এ কথা কি বলা ঠিক যে, জনগণ ঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন এবং তাঁদের জাতীয় চরিত্রে দৃঢ়তা ফিরে এসেছে; আমরা শুধু মনে করি, এখন তাঁরা সংগ্রামের পথে। গত বাইশ বছর ধরে জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির নামে যে সব বিদ্যালয়ে পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্তের জন্য চেষ্টা চলছে, সেই সব বিদ্যালয়ে তাঁরা শিক্ষা পান নি। শতকরা সিকি ভাগ সাক্ষরসম্পন্ন এই দেশে নিরক্ষর ব্যক্তিদের শিক্ষা ও দীক্ষা সুরু হয়েছে প্রচন্ড তিক্ততা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

অবশ্য এই জনসাধারণ যে একেবারেই উদাসীন নয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা বিগত দিনগুলিতে পেয়েছি। দেশ যখন বৈদেশিক শক্তির সম্মুখীন হয়েছিল, তখন এ দেশের দরিদ্র মানুষই দেখিয়েছিল, কি ভাবে আত্মোৎসর্গ করতে হয় এবং তখনই প্রমাণ পাওয়া গেছিল জাতীয় শৃঙ্খলা, চরিত্র ও সংহতির বাহক কারা।

সুতরাং বলা যেতে পারে, আমাদের দেশের জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থকেই সর্বাপেক্ষা বেশি বলে মনে করে এসেছেন। অন্যপক্ষে, এঁদের অর্ধনগ্ন ও অনাহারে রাখার জন্য ব্যক্তিগত মুনাফার পাহাড় বানিয়েছে এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশের স্বার্থ তারা জলাঞ্জলি দিয়েছে।

তাই এ কথা সত্য যে, আপাতত সমাজবাদের যে কথা উঠছে, তা জনসাধারণের সংগ্রামের গতি লক্ষ্য করেই উঠেছে। সে পথে বাধা সৃষ্টির চেষ্টাও কম হবে না। কিন্তু জাতীয় চরিত্রের যে উদ্বোধন সুরু হয়েছে, তাতে কোনো বিভ্রান্তি ও বাধার সৃষ্টি হলে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তবে জাতীয় চরিত্র সঠিক রাখার জন্য প্রথমে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ঐক্যবদ্ধতা। রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মালিকরা ন্যায়সঙ্গত শর্তে মানতে বাধ্য হবেন। আমরাও তা বিশ্বাস করি। তাই পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-শাসনের পর চটকল শ্রমিক ও চা-বাগানের শ্রমিকরা জয়ী হয়েছেন। সততা ও শৃঙ্খলার অভাব থাকলে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলে জয়লাভ সম্ভব হত না। শ্রমিকশ্রেণীর বিশিষ্ট নেতা হিসেবে রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি ভালোভাবেই জানেন যে, সততা, সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে আসলে কোন্ শ্রেণীর লোক; সেখানে জাতীয় চরিত্র একেবারেই বিনাশপ্রাপ্ত হয় নি, দীর্ঘকাল সুপ্ত ছিল শুধু একথাই বলা যেতে পারে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ধর্ম আর রাজনীতি—এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? এমন একদিন ছিল, যখন রাজাই ছিলেন প্রজাদের প্রকৃত ভাগ্য-নিয়ন্তা। তিনি দেশবাসীর শুধু জান-মালেরই মালিক ছিলেন না, তাদের ধর্ম-কর্মেরও নিয়ন্ত্রক ছিলেন। যিনি রাষ্ট্র-প্রধান, তিনিই স্বীয় ক্ষমতাবলে ধর্মপ্রধান। মধ্য যুগে রাজশক্তি ও ধর্মশক্তির মধ্যে দেখা দিয়েছিল প্রবল বিরোধ। দুটো শক্তি বিভক্ত হয়েছে, আপোষের ফলে রাষ্ট্রপ্রধান ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামান না, ধর্মগুরু রাষ্ট্রপরিচালনার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু একই ব্যক্তি যখন রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতির ব্যাপারে মাতব্বরি করতে চান, তখন তাঁর ইচ্ছে করবেই দুটো ক্ষেত্রেই শেষ কথা বলার মালিক হতে। ব্রহ্মদেশের উ নুরও যেন সেই অবস্থা আজ।

ব্রহ্মদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উ নু তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন—দেশে দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করাই ছিল তাঁর সফরের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মদেশের শহরে-শহরে তিনি এ ধর্ম অভিযান চালিয়ে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছেন। তারপর গিয়ে-ছেন সুদূর লণ্ডনে। সেখানে পোঁছেই উ নুর মধ্যে বিরাট, অভাবনীয় ভাবান্তর ঘটে গেল। তিনি মনে করলেন, তিনি বর্মার সাধারণ নাগরিকমাত্র নন, আসলে তিনিই দেশের প্রকৃত প্রধানমন্ত্রী, নে উইন হলেন বে-আইনী ফ্যাসিস্ট মন্ত্রিসভার নায়ক! উ নু লণ্ডনে ঘোষণা করেছেন যে, নে উইন সরকারের পেছনে আইনের সমর্থন নেই, তিনিই বর্মার প্রকৃত প্রধান-মন্ত্রী। এ গুজবও বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছে যে, উ নু শীগ্‌গিরই লণ্ডনে একটা নির্বাচিত সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন।

বুড়ো বয়সে উ নুকে এ-ভীমরতিতে ধরলো কেন, এ-প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে উঠবে। উ নু দীর্ঘ-কাল ক্ষমতা ভোগ করেছেন, তাই গদির মোহ তাঁকে এতখানি পেয়ে বসেছে যে, যেন তেন প্রকারেণ সে-গদি ফিরে পেতে চান তিনি। ক্ষমতার স্বাদ যিনি একবার পেয়েছেন, তিনি সহজে কি তা ছাড়তে রাজী হন, না ভুলতে পারেন? এমন মহানুভব ব্যক্তি বিশাল পৃথিবীতে ক'জন আছেন, যিনি নিজের ক্ষমতাচ্যুতিকে

উ নু

সহজভাবে নিতে পেরেছেন? ক্ষমতাচ্যুত ব্যক্তির মনোভাব বরং বনের হিংস্র পশুর মত হয় না কি? গদি হারিয়ে শ্রীমোরারজী দেশাই এখন কী করছেন?

দীর্ঘদিন ক্ষমতার আসনে থাকার দরুণই যেন উ নু মনে করতে সুরু করে-ছেন, সে-আসন তাঁর এখনো অটল রয়েছে। কিন্তু এ-উদ্ভট ধারণা মনে স্থান দেবার কারণে তাঁকে রাজনৈতিক ভাঁড় বলে চিত্রিত করা যাবে না। এ-সত্য অনস্বীকার্য যে, ব্রহ্মদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মাঝে দু'বার (১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৮-৬০) ক্ষমতায় না থাকলেও উ নু ১৯৪৭ সাল থেকেই বর্মার প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করে-ছেন। কাজেই গদির মায়া ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে শক্ত বৈকি।

ছাত্র বয়সেই রাজনীতিতে উ নু দীক্ষা নেন। জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশে ফ্যাসীবিরোধী লীগ গড়ে তোলার মূলে তিনিও ছিলেন আউঙ্গ সানের একজন বিশ্বস্ত সাথী। এই সংস্থাই শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা আদায় করেছিল। আউঙ্গ সান হত্যার পর উ নুই পেলেন রাষ্ট্রের নেতৃপদ। সেদিন তাঁর জনপ্রিয়তা যেমন ছিল প্রবল তেমনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

দেশে সমস্যা উ নুর প্রধানমন্ত্রিত্বে অবশ্যই ছিল এবং ছিল বলেই তিনি ক্ষমতা সামরিক কর্তাদের হাতে তুলে দিয়ে সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে-ছিলেন তিনি ১৯৫৮ সালে। জেনারেল নে উইন গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। কিন্তু দু' বছর বাদে উ নু যখন অসামরিক শাসন কায়েম করার জন্যে ক্ষমতা ফিরে চাইলেন রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ নে উইন বিনা দ্বিধায় উ নুকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিলেন। ১৯৬০ সাল থেকে উ নুই আবার প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ১৯৬২ সালে ইতিহাসের চাকা গেল ঘুরে। নির্বাচনে বিপুল জয়লাভও তাঁকে সহায়তা করে নি। সামরিক বাহিনী আবার ক্ষমতা হাতে নিল, উ নুকে গদিচ্যুত ও কারারুদ্ধ করা হলো, নে উইন হলেন আবার রাষ্ট্র-প্রধান।

বছর দুই আগে রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে, সেই থেকে উ নু আবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে যত্নবান হয়েছেন। জাতীয় আভ্যন্তরীণ ঐক্য উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি সরকারকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, নে উইন সরকার গ্রহণ না করায় তিনি চটে-মটে অসামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের দাবি তুলেছেন। কিন্তু নে উইন এখন অভিজ্ঞ রাজনীতিক, দাবি মানতে রাজী হলেন না তিনি। তারপর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বক্তৃতামালার মাধ্যমে জনপ্রিয়তা কুড়োলেন, সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেন। একই বিষয়ে বক্তৃতা দিতেই লণ্ডন গিয়েছিলেন উ নু, কিন্তু সেখানকার জলহাওয়ার দোষে কি না জানি না, ধর্ম ছেড়ে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের কথাই ইংরেজ সাহেবদের কাছে বলে বেড়াচ্ছেন।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(১০)

সুভাষচন্দ্র ও মেঘনাদ সাহা

মেঘনাদ সাহার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। ১৯১৩ সালে উভয়েই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। সুভাষচন্দ্রের দুই অগ্রজ কলেজে সাহার সহপাঠী ছিলেন।১

অধ্যাপক সাহা খুব আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন লক্ষ্য করেছেন, একথা তাঁর ষষ্ঠি-বর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ (*Professor Meghnad Saha : His Life, Work and Philosophy*) থেকে পেয়েছি। ডঃ সাহার পুত্র ডাঃ অজিতকুমার সাহা আমাদের ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছেন, ডঃ সাহার এলাহাবাদ থাকাকালে সুভাষচন্দ্র সেখানে গেলেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। সুভাষচন্দ্রের চরিত্র ও কার্যাবলী সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা এমনই প্রগাঢ় ছিল যে, প্রয়োজনে তাঁকে অর্থসাহায্যও করেছেন।২

রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে সুভাষচন্দ্র একবার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ডঃ সাহাকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। ১৯২২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর, নিখিল-বঙ্গ যুবক সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন; মূল সভাপতি ২৯ বৎসরের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী (যিনি ৩৪ বৎসর বয়সে এফ আর এস হবেন) মেঘনাদ সাহা, ডি এস সি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক; আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, দেশসেবার জন্য আই সি এস ত্যাগী, দেশবন্ধুর বাহিনীতে তরুণ সেনানী, ২৫ বৎসরের শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। এই সম্মিলনীর সংগঠক সুভাষচন্দ্রই, এই ধরণের যুব-সম্মিলনী বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রায় প্রথম, ৩ সম্মেলনস্থান কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের আর্য সমাজ হল, উপস্থিত দেশের বহু গুণীজ্ঞানী, এবং ত্যাগী যুবকও, তাঁদের মধ্যে আছেন আই এম এস-ত্যাগী ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং টাকশালের বড় চাকুরী-ত্যাগী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষও। যুব সম্মিলনীর উদ্দেশ্য—জীবনের নানা পর্যায়ে নানা প্রকারের কাজে নিযুক্ত যুবকদের আকর্ষণ করে দেশসংগঠনমূলক কার্যে অবিলম্বে তাদের প্রণোদিত করা।৪

বাংলা দেশের নানা স্থান থেকে বহুশত প্রতিনিধি

---

১ *Professor Meghnad Saha: His Life, Work and Philosophy* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। গ্রন্থ-সম্পাদক এস এন সেন।

২ "He was always ready to give monetary help to political sufferers secretly, whenever a leader of unimpeachable sincerity and integrity like Subhas Chandra Bose turned to him for such help." (ঐ গ্রন্থ)

৩ "এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের সংগঠনশক্তির পরিচায়ক একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে, বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে তাব উল্লেখ থাকা দরকার। আজিকার দিনে আমরা বাংলা দেশে যে, বিভিন্ন ছাত্র-আন্দোলন ও কংগ্রেসের কাজকর্মের সহায়ক বহু-প্রকার প্রচার ও সংগঠনমূলক কাজের বাস্তবরূপ দেখছি,...তার সূচনা হয় সুভাষচন্দ্রের হাতে। সেটি হচ্ছে 'নিখিল বঙ্গ যুব-সম্মিলনী।'" ("সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র"—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়)

৪ "The object of the Conference was to bring together youngmen of all sections engaged in all possible spheres of activity, and with their assistance to draw up a practical programme of constructive work to be put into immediate operation." (*Bengalee*, Sep, 17, 1922)

এই সম্মিলনীতে নীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মূল প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, কর্মীর অভাব নয়, সংগঠনের অভাবই দেশের দুরবস্থার মূলে। প্রস্তাবটি বেশ বড় করেই তিনি হাজির করেছিলেনঃ

"He thought it desirable that a permanent association to be called the All Bengal Young Men's Association should be formed to co-ordinate the social, educational and

সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শুধু ছাত্ররাই ছিলেন না, ব্যবসায়ী, খেলোয়াড় ও বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতি-মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত যুবকেরাও ছিলেন। সম্মেলনের শেষে যে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়, তার পৃষ্ঠপোষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়; সভাপতি ডঃ মেঘনাদ সাহা; সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (ঢাকা), মৌলবী এস এস মোয়াজ্জেম হোসেন (ময়মনসিংহ) ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু; সম্পাদকদ্বয়, অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার (সিটি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (বঙ্গবাসী কলেজ); কোষাধ্যক্ষ, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী (বঙ্গবাসী কলেজ)।

১৯২২ সালের এই সম্মেলনটির কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করছি এইজন্য যে, সম্মেলনের মূল লক্ষ্য জাতীয় আন্দোলন নয়, 'জাতীয় পুনর্গঠন'। পরবর্তীকালে জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পক্ষে যাঁরা প্রধান প্রবক্তা হবেন, তাঁদের দুইজন এই সম্মেলনে সভাপতি ও সংগঠকরূপে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সম্মেলনে তাঁরা যে বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন তার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য যথেষ্টই ছিল।

সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র যে ভাষণ দেন, তার মধ্যে হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাসকে নির্গলিত করে দিয়েছিলেন। এই ভাষণে তিনি ভাবপ্রবণ, নিশ্চয়ই, কিন্তু দুর্বলচিত্তের আবেগ তা নয়, তাড়িত মথিত করে অনুভূতির এমন প্রবল শক্তি তাতে ছিল। তাঁর ভাষণ ভাব, ভাষা, রচনারীতি এবং বাচনভঙ্গির জন্য প্রশংসিত হয়েছিল, একনিষ্ঠ কর্ম এবং ধীর সহিষ্ণুতার জন্য তাঁর আহ্বান দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিল;৫ কিন্তু একথা বলতেই হবে, তখনো তিনি দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ভাবনার মধ্যেই আবদ্ধ, তাকে অতিক্রম করে উঠতে পারেন নি।

ঐ ভাষণে সুভাষচন্দ্র অপরিসীম রিক্ততা ও অপরিমেয় ত্যাগের মধ্যে পথ করে নেবার জন্য আহ্বান করেছিলেন: "আমি আপনাদের আহ্বান করছি বাংলার আনন্দ-উৎসবের মধ্যে নয়, সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, বিত্তবানের মধ্যে নয়, শান্তিশৃঙ্খলার মধ্যে নয়, আমি আপনাদের আহ্বান করছি দুঃখ-দারিদ্র্য নির্যাতনের মধ্যে; অভাব অজ্ঞানতা অবসাদের মধ্যে; অত্যাচার অবিচার অনাচারের মধ্যে। ...অপরিসীম রিক্ততা আর অপরিমেয় ত্যাগের মধ্যে আমাদের নিজের পথ নিজে করে নিতে হবে।"

সুভাষচন্দ্র সুখের ও দুঃখের এই দুই বাংলার ছবি ফুটিয়েছিলেন মর্মস্পর্শী ভাষায়: "যেখানে জীবনের লীলা-খেলায় আনন্দের লহর উঠত, যেখানে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উৎসগুলি প্রাচুর্যে আমাদের ভাণ্ডারে উপচে পড়ত, যেখানে জলে সুধা, ফলে অমৃত, শস্যে অনন্ত দেশের অনন্ত প্রাণদায়িনী শক্তি ছিল—সেখানে আজ বিরাট শ্মশান খাঁ খাঁ করছে, প্রেতের ছায়া দেখে অর্ধমৃত প্রাণ শিউরে উঠছে, লক্ষ লক্ষ চুল্লি দাউদাউ করে জ্বলে যাচ্ছে—এক বিন্দু জল নাই, এতটুকু জীবন নাই।"

এই শ্মশানের মধ্যে তরুণ জীবন যেন নবসৃষ্টির প্রেরণা নিতে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, সুভাষচন্দ্র সেই আহ্বান জানিয়েছিলেন;—তরুণদের 'সেবাব্রত' গ্রহণ করতে হবে, 'মথিত নারায়ণের উদ্বোধন ঘটাতে' হবে, তা করবার জন্য অদৃষ্টবাদী, পরমুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে 'উৎসাহী কর্মীদলকে সংঘবদ্ধ করে নূতন কর্মপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।' এক্ষেত্রে প্রধান কর্তব্য সামাজিক প্রভেদ দূর করা, জনশিক্ষার প্রসার ঘটানো, নষ্টশিল্পের পুনরুদ্ধার করা।

সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণ শেষ করেছিলেন বুকের আবেগ সবটুকু ঢেলে দিয়ে—

"আজ পৃথিবীর সমস্ত আলো, সমস্ত বাতাস থেকে আমাদের প্রাণে সেই অফুরন্ত সঙ্গীতের আনন্দধ্বনি আসছে। ...এ কি উৎসাহ! এ কি আনন্দ! আমার মনে হয়, এই আনন্দই আমার জাতির আনন্দ, আমার নারায়ণের আনন্দ। তিনি কোন্ ওপার থেকে আনন্দে এক সোনার সুতায় কাটনা কেটে আসছেন, যা আজ রবির কিরণ হয়ে গাছের শ্যামলতায় চিকমিকিয়ে উঠছে, ভরা নদীর উচ্ছ্বসিত জলে শতধা বিভক্ত হয়ে আনন্দস্রোতে ভেসে চলেছে।...এই সুরের জাল যখন সমগ্র দেশকে বেড়ে ফেলবে, তখন আজকার এই পঙ্গু

---

other activities of the young men of Bengal and to devise for immediate execution of a programme of practical work embracing mass education, urban and rural organisation, spread of Swadeshi, promoting unity among different communities, removal of untouchability, prevention of early marriage, abolition of dowry, social service, moral discipline, and upholding truth and justice always and everywhere." (A. B. P. Sep. 20, 1922)

৫ অমৃতবাজার ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২২-এ লেখে:

"The Chairman of the Reception Committee Sj. Subhas Chandra Bose then delivered his address in Bengali. In thought and language, in style and delivery, it was worthy of the man from whom it came. With his usual keenness of insight he laid his finger on the exact spot of weakness in the character of young men of Bengal and with his usual vigour, he pleaded for a remedy—the remedy of sincere work and patient suffering."

দিনের ভরসায় কিরণসম্পাত আসন্ন ভবিষ্যতের সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে—আর তখন যিনি ওপারে দ্যুলোকে আকাশের চরকায় আলোকবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সহস্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছেন, এবং ভূলোকে কালের চরকায় কত বিভিন্ন জাতির বিচিত্র ইতিহাসের সুবর্ণসূত্রের সৃষ্টি করছেন—তাঁকে আমার পরম বিষ্ণু বলে নয়, জাতির ভাগ্যবিধাতা বলে বরণ করব।"৬

ভাবের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত ভাষণ। সুভাষচন্দ্রের দীপ্তসুন্দর আকার, মেঘধ্বনির মত কণ্ঠস্বর, বিচ্ছুরিত পবিত্রতা, আর ঐ ব্যাকুলায়িত ভাষণ, স্বপ্নস্বর্গের অভিমুখে যাত্রা করার আহ্বান যা জানাচ্ছে—একালে অভিভূত না হয়ে থাকা নিতান্ত অসম্ভব ছিল; মেঘনাদ সাহাও তা হয়েছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে স্বীকার্য, বিচলিত হলেও ভেসে না-যাওয়ার মত বিশ্বাসের দার্ঢ্য তাঁর ছিল। এর পরে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন—সুভাষচন্দ্রের উদ্দীপ্ত ভাবাবেগের পরে সাহার মনীষা ঝকঝক করে উঠেছিল ৭—তিনি যা বলেছিলেন, তার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের এবং তৎকালীন অনেকেরই ধারণার প্রতিবাদ ছিল, যদিও সূচনায় তিনি অকুণ্ঠে বয়সে কনিষ্ঠ সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।৮

জাতীয় পুনর্গঠন সম্বন্ধে মেঘনাদ সাহার দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা ইতিপূর্বে আমরা যথেষ্ট করেছি। তাঁর যেকালের মত উদ্ধৃত করেছি, তার বহুকাল আগে এই ১৯২২ সালেও আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, তাঁর মূল ধারণাগুলি গড়ে উঠেছিল। সুখ বা আয়াসের পথে জাতীয় উন্নতি ঘটানো যাবে না, তা তিনি সুভাষচন্দ্রের মতই স্বীকার করেছিলেন, কিভাবে তা ঘটানো যাবে সে বিষয়ে স্পষ্ট প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন এবং অনুরূপ স্পষ্টভাবে উত্তরও দিয়েছিলেন। প্রয়োজনে ত্যাগ করতে হবে, সেকথা সত্য, কিন্তু ত্যাগের জন্যই যেন ত্যাগ হয়ে না দাঁড়ায়। "দেশের দারিদ্র্য মোচন করতে হলে শুধু 'ত্যাগ' চলবে না। যে-ব্যক্তি সমর্থ, ত্যাগ তাহাকেই সাজে, অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ত্যাগ অযোগ্যতারই নামান্তর।" "আমাদের যুবক কর্মীদের শুধু দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করলেই কর্তব্য শেষ হল না, তাদের কর্তব্য আরম্ভ হল মাত্র।" ডঃ সাহা খোলাখুলি ভোগব্রত গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভোগ করতে হলে ভোগের উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। পাশ্চাত্ত্য দেশ কিভাবে ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করেছে, তা তিনি খুলে ধরেছিলেন। প্রকৃতিকে জয় করেই ইউরোপ সমৃদ্ধিশালী, সেখানে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য মানুষ সহজে পায় না বলে সংগ্রামী, অপরদিকে ভারতে বিশেষত বাংলাদেশে প্রকৃতির অকৃপণ দান এদেশীয় মানুষকে নিশ্চেষ্ট এবং সংগ্রামবিমুখ করে তুলেছে। ডঃ সাহা সাধারণভাবে ভারতবাসীর পরমুখাপেক্ষার কথা বললেও তাঁর আক্রমণের অধিক লক্ষ্য ছিল বাঙালীর স্বভাব, কারণ তাঁর চোখের সামনে তখন বাংলা দেশই ছিল। সপ্তদশ অশ্বারোহীর বাংলাদেশ জয় ব্যাপারটাকে তিনি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রতীক ঘটনার মত ধরেছিলেন। একদিকে বিদেশীরা বাংলাদেশকে অধিকার করেছে, অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য করায়ত্ত করে অবাঙালী ব্যবসায়ীরা বাংলার বৈষয়িক সম্পদ গ্রাস করেছে; বড় বড় বাঙালী ব্যবসায়ী পরিবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কৃপায় জমিদার হয়ে জড় বিলাসীতে রূপান্তরিত হয়েছে; আর মধ্যবিত্ত বাঙালী হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রীতদাস—দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের। ডঃ সাহা মধ্যবিত্ত বাঙালীর শোচনীয় চারিত্রিক অবনতি ও আর্থিক দুর্গতির কথা যথেষ্ট বলেছিলেন। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, গোটা ভারতবর্ষের দুর্গতির কথাও না বলে পারেন নি। দায়ী করেছিলেন ধর্ম ও কুসংস্কারকে বহুলাংশে এই অবস্থার জন্য। "আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মের সংরক্ষকগণ মনে করেছিলেন যে, আচার, ধর্ম ও কুসংস্কারের একটা চীনাপ্রাচীর তুলে ভারতের নিম্নবর্ণদিগকে চিরকাল পদতলে রাখবেন, কিন্তু তার ফল হল যে, হাজার বৎসর ধরে তাঁরা ফুটবলের মত একবার তুর্কী, একবার আফগান, মোগল বা ইংরাজদের পদতলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন।"

ডঃ সাহার তাই বক্তব্য—জীবনের এবং শিক্ষার আদর্শ যথাযথ করতে হবে। অসহযোগের ডাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগী ছাত্ররা জাতীয় বিদ্যালয়ে ঢুকেছিল, জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান সংগঠক সুভাষচন্দ্র সামনেই ছিলেন, ডাঃ সাহা জাতীয় বিদ্যালয়ের দ্বারা 'moral revolution'

৬ সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থে গোটা ভাষণটি পাওয়া যাবে। সেখান থেকেই উদ্ধৃত হয়েছে।

৭ *ABP*—The President Dr. Meghnad Saha....thereupon rose and delivered his address, which was partly written and partly extempore. He started with an analysis of the present situation. ....He then delt with the economic condition of the country and pointed out that the economic salvation of India lay in the introduction and development of modern large-scale industry. Throughout, the speech of the President was characterised by acuteness of analysis and precision of thought and was altogether an intellectual treat for the audience." (A.B.P. Sep. 20, 1922).

৮ "আজকার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মত, যাঁহারা 'লয়েড জর্জের লোহার কঙ্কালের (steel frame) স্ক্রুপ বা পেরেক' হতে অস্বীকার করে নিজের আত্মাকে মুক্তির পথে প্রবর্তিত করেছেন........।"

('জাতীয় উন্নতির উপায়'—মেঘনাদ রচনা সংকলন)

সুখ

সাধনা মুখোপাধ্যায়

সুখ! একেক সময় মনে হয় তোমার শরীর,
অনায়াসে ছুঁয়ে দিতে পারি ;
সন্ধ্যেবেলা ছাতে যবে করি পায়চারি,
দূরে দূরে নারিকেল সুপারির সারি,
জ্ঞানগর্ভ কালো মেঘ দূরে দেয় পাড়ি।
একতলা থেকে, শিশুদের কোলাহল খেলা ভাব আড়ি,
স্বর্গীয় গানের মতো ভেসে ভেসে আসে।
সব কিছু করণীয় সারা হয়ে গেলে,
কর্মক্লান্ত দিন শেষে বাড়ি ফিরে এলে,
খুশির মৌতাতটুকু সুখ হয়ে ভাসে।

কোন কিছু বাকি না রাখার,
কোন কিছু ফাঁকি দিয়ে নিজেকে ঢাকার,
কষ্ট নেই মনে মনে তখনই তো অনুভব হয়,
নিমেষে নিমেষ গেঁথে এই যে সময়,
টেনে টেনে দিয়ে চলি গুণ,
সেখানে শুধুই, ঘামের মূল্য দিয়ে পাওয়া যায় তৃপ্তির নুন।

আমার যেটুকু সাধ্য করেছি তো,
—এই ভেবে ভেবে ভরে ওঠে যবে সারা বুক,
শ্রান্তি জর জর দেহে মনে হয়,
ইতি দিয়ে ছুঁতে পারি যত কিছু সুখ।

হচ্ছে মেনে নিলেন, কারণ এই বিদ্যালয়ে যারা যোগদান করছে তাদের সরকারী চাকরীর প্রলোভন ছাড়তে হচ্ছে, বুঝতে হচ্ছে যে, স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা-নির্বাহ করতে হবে, 'এই নৈতিক আদর্শটা খুব বড়', সেকথা ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে যোগ করে দিলেন—'শুধু এই আদর্শেই চলবে না।' তিনি খোলাখুলি বিজ্ঞানমুখ্য শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করলেন, তার দ্বারা খোলাখুলি গান্ধী-জীবনাদর্শের বিরোধিতা করলেন। ১৯২২ সালে গান্ধীর নীতি যেভাবে দেশকে বুদ্ধিবৃত্তিকে ডুবিয়ে রেখেছিল, সেই পটভূমিকায় ডঃ সাহা রীতিমত বেপরোয়া হয়েই তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন; দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছিলেন—কিভাবে আমেরিকায় কলোরাডো নদীতে বাঁধ বেঁধে মানুষ অসীম সম্পদ অর্জন করেছে, এমন কি ভারতবর্ষেও দেওয়ান বাহাদুর বিশ্বেশ্বর রায় মহীশুরের কাবেরী নদীতেও বাঁধ দিয়ে অল্পাধিক পরিমাণে একই কাজ করিয়েছেন। ডঃ সাহা বললেন, দামোদরে বাঁধ বেঁধেও সেই কাজ করা যায়, যাতে অধিকন্তু হাজার হাজার মানুষের ধনপ্রাণ রক্ষা পাবে।

নদী নিয়ন্ত্রণ, তার দ্বারা বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, যন্ত্র-শিল্পায়ন, ডঃ সাহার প্রিয় বিষয়; ঐসব কাজে রাশিয়ার সাফল্যও শতমুখে বলতে ভালবাসেন। 'গ্রামে ফিরে যাও' নীতি অনুরূপভাবে তাঁর সানন্দ শিকারের লক্ষ্য। নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই দেখা যাবে, ১৯২২ সালেও তাঁর একই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল:

"বর্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞান। আমি পূর্বেই বলেছি যে, বেঁচে থাকতে হলে আমাদের প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে হবে, এবং প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে জয়ী হতে হলে আমাদের বিজ্ঞানের সেবা করতে হবে। ......আজ-কাল Back to Nature রব উঠেছে। কলকারখানা সব তুলে দাও, দৌলত (Capital) ও মেহনত-কে (Labour) একই পর্যায়ে আনো। অনেকেরই বিশ্বাস যে, বলশেভিক রাশিয়াতে সমস্ত কলকারখানা তুলে দেওয়া হয়েছে। একথা ঠিক নয়, রাশিয়াতে বরং বেশী উৎসাহে দেশময় কলকারখানা স্থাপন করা হচ্ছে, দেশের লোককে কলকারখানার ব্যবহারে শিক্ষিত করা হচ্ছে।

"রাশিয়ায় প্রায় অধিকাংশ রেলপথ তাড়িতশক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এবং লেনিনের জীবনে মস্ত একটা আকাঙ্ক্ষা যে, দেশের সমস্ত কাজ—কলকারখানা বা ঘানির কাজ, এমন কি চাষ-বাস পর্যন্ত তাড়িতশক্তিতে চালানো। বলশেভিকগণ শুধু যান্ত্রিক সভ্যতার অপব্যবহার—ধনী দরিদ্রের তারতম্য—উঠাইয়া দিয়াছেন। যান্ত্রিক সভ্যতার অপব্যবহারকে বিজ্ঞানচর্চার ফল বলে ধরে নেওয়া একটা মস্ত ভুল। আমরা যদি বর্তমানে Back to Nature এই নীতি অবলম্বন করে বৈদিক ঋষিদের মতন জীবন চালাতে আরম্ভ করি এবং যদি ইংরেজ গভর্নমেন্ট দয়া করে আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়ে দেশে ফিরে যান, এবং আমেরিকা জাপান যদি আমাদের দয়া করে আক্রমণ নাও করেন, তথাপি আমরা আমাদের স্বাধীনতা রাখতে পারবো না। দশ-পনেরো বৎসরের মধ্যে আফ্রিকার কাফ্রীগণ ক্রমে আমাদের প্রভু হয়ে বসবে।"[৯]

[ক্রমশ]

---

৯ ভারতীয় রাজনীতির অপার মহিমা—আরও ১৮ বছর পরে, যখন বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেছে ভারতের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, তখনো দেশরক্ষার অহিংসা চলবে কি না, তা নিয়ে কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের মধ্যে তুমুল লড়াই। সে এক আশ্চর্য ইতিহাস—যার বিস্তারিত আলোচনা পরে করব।

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

বোধ হয়, ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ভবানীচরণের 'নববিবিবিলাস' প্রথম ছাপা হয়। ১৩৪৪ সালে 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস' থেকে বইখানি পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই নতুন সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদনে জানানো হয়—"বহুস্থানে ইহা বর্তমানে রুচিবিগর্হিত বোধ হইবে বলিয়া ইহাকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করিলাম না। উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ইহা বিতরিত হইবে—বিক্রয় করা হইবে না।" এই বইয়ের মলাটেও সে সংকল্প ইংরেজিতে ছাপা হয়—For Private Circulation Not for Sale.

'শ্রীশ্রীদুর্গা—শরণং—' এই শিরোভূষণ মেনে নিয়েই বইয়ের নামটি ছাপা হয়েছিল। তার নীচে সেই নামটির ব্যাখ্যাসূত্রে লেখা হয়—

অর্থাৎ
কুলটাবর্ম্মে কুলকামিনীর দুঃখ প্রকাশ যথা
অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টনী সর্ব্বশেষে
সর্ব্বনাশে সারং ভবতি টুক্‌কনী।

এতদ্বৃত্তান্ত বিস্তৃত গ্রন্থ॥

অঙ্কুর ও পল্লব ও কুসুম ও ফল এই খণ্ড
চতুষ্টয়ে কুলটাগঞ্জন স্থলে কুলটার সন্দেহভঞ্জন
ও মনোরঞ্জন ও জ্ঞানাঞ্জন নিমিত্তে
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত।

আমি বললুম—দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে বইখানির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলে না,—ব্রজেন্দ্রনাথ এবং সজনীকান্তও সেই মূল্যই মেনেছেন। এ বইয়ের প্রথম বা দ্বিতীয় সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না। সম্পাদক তো জোগাড় করতে পারেন নি। আগ্রা যোগদা লাইব্রেরি থেকে বটতলা-সংস্করণ সংগ্রহ করে দিয়েছিল। সে-সংস্করণের তারিখ ছিল—১২৫৯, ২২এ ভাদ্র।

এ বইখানির আগে বেরিয়ে গেছে 'নববাবুবিলাস'; তাতে বাবু-সম্প্রদায়ের বিলাস এবং চরিত্রহীনতার নানা প্রসঙ্গ ছিল। সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। এ বইখানি সেই বাবু-বিবরণেরই বিবি-সংস্করণ। যখন বাবুরা পরস্ত্রী-সঙ্গে সুখী, তখন 'বিবি'-রাও কি প্রশান্ত থাকতে পারেন? আমাদের অন্তঃপুরও ভেঙে পড়ছিল তখন। এই পরিস্থিতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুলরমণীরা তাঁদের গোপন প্রণয়-চর্চায় ধরাও পড়তেন। সে রকম ঘটনা ঘটলে—

> অবশেষে স্বামীবাবু তাঁহার স্বকীয়া কামিনীকে প্রহার করেন; এবং যাহার সহিত ধরা পড়ে সে যদি দাসের মধ্যে কেহ হয় তবে তাহাকে এমত প্রহার করেন যে তৎক্ষণাৎ সে ধরায় পড়ে, একান্ত যদি উঠে তখনি ছুটে......

কিন্তু সেই গুপ্ত প্রণয়ী যদি স্বামীর স্নেহাশ্রিত কোনো একজন হতেন, তাহলে তাঁকে তো আর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হোতো না। সে-অবস্থায় স্ত্রীকেই তাঁর পিত্রালয়ে পাঠাতে হোতো। এইভাবে নির্বাসিতা হবার পরে—

> সেখানে কামিনী আপন মনের আবেশ অশেষ বিশেষে শেষ করিয়া পুনরায় আপন স্বামীর বাসে আইসেন; কেহ বা পিত্রালয়ে থাকিয়া ত্রিকুলের মান সমাধান করিয়া দরওয়ান সঙ্গে অনঙ্গ প্রসঙ্গে প্রতিদিন যামিনী সাঙ্গ করেন।

আনন্দ বললে—দ্যাখো 'অশেষ বিশেষ' প্রয়োগটা প্রমথ চৌধুরীকেও হার মানায়,—শব্দের খেলা কী নির্মম!

আমি বললুম—নববিবিবিলাসে এই রকম নানা বৃত্তান্ত আছে বটে, কিন্তু এইসব বর্ণনার উদ্দেশ্যটি লেখক একাধিকবার জানিয়ে দিতে ভোলেন নি—"ভরসা যে ইহা শ্রবণে কুলবধূগণ পূর্ব্বোক্ত কোন কারণে কুলের বাহির না হয়েন, যেহেতু অকুলে কেবল আকুল হইতে হয়।"

ভবানীচরণ যে সেকালের একজন বিশিষ্ট গদ্যলেখক ছিলেন, সে-কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। রামমোহনের সঙ্গেও তিনি কাজ করেছেন, আবার রামমোহনের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় তিনি পৃথক পত্রিকাও চালিয়েছেন। খ্রীস্টান মিশনারিদের পত্রিকা 'সমাচার-দর্পণে' তখন প্রায়ই হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে মতামত ছাপা হোতো। অথচ তার প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল। রামমোহন সেই কারণেই অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনার পরে, ১৮২১ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ সেই পত্রিকার প্রকাশক হন।

তারপর রামমোহনের সঙ্গে মতের গরমিল হওয়ায় 'সম্বাদ-কৌমুদী'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভবানীচরণ ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে 'সমাচার-চন্দ্রিকা' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা চালাতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকায়—'সরল ভাষায় ছোট ছোট উপদেশাত্মক আখ্যান ও শিক্ষামূলক বিবিধ প্রস্তাব' ছাপা হোতো। সুকুমারবাবু লিখেছেন—'এই

আখ্যান ও প্রস্তাবগুলির মত সহজ সরল ভাষা ইহার পূর্বে দেখা যায় নাই।' তিনি এই ভাষার নমুনা তুলে দিয়েছেন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ক্ষমাশীল পণ্ডিত' নামে একটি রচনা থেকে—এবং ভবানীচরণের মনমেজাজের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—'ভবানীচরণ ছিলেন অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী। সংস্কারপরায়ণ ইংরেজি শিক্ষিতদের প্রতি তাঁহার মনোভাব অনুকূল ছিল না।'৬

আনন্দ বললে—এ পর্যন্ত তাঁর যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তা থেকে তাঁকে কিন্তু 'অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী' বলবার কোনো হেতু পাওয়া যায় নি।

আমি বললুম—শোনো, তাঁর অন্যান্য রচনার খবর—সুকুমারবাবু লিখেছেন—'ভবানীচরণের অপর গদ্যরচনা হইতেছে হিতোপদেশের অনুবাদ (১২৩০) এবং মেটিরিয়া মেডিকার অনুবাদ 'রোগান্তক সার'।' তাছাড়া পুঁথির আকারে শ্রীমদ্‌ভাগবত, ভগবদ্‌গীতা, মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ছেপে বের করেছিলেন তিনি। তিনি যে একজন বিশেষ শক্তিমান লেখক ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস'-এ ভবানীচরণ সম্বন্ধে আলোচনা নেই,—কিন্তু থাকা উচিত ছিল।

আনন্দ বললে—নিশ্চয় উচিত ছিল। তাঁর গদ্যের বৈচিত্র্য ভোলবার নয়। সমাজ-সংস্কারের শুভবুদ্ধিই তাঁকে কলম ধরিয়েছিল। তবে সে-কাজে অনেক কাদা ঘাঁটতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর নববাবুবিলাস, নববিবিবিলাস, দূতীবিলাস ইত্যাদি। আনন্দ বললে—এইসব লেখার কায়দা দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে পড়লো আমাদের আজকের প্রবীণ লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রথম বাংলা বই 'বাঙালী জীবনে রমণী' বেরিয়েছে ১৩৭৪ সালে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৩০৩ সালে। অর্থাৎ তাঁর জন্মের প্রায় সত্তর-বাহাত্তর বছর আগে ভবানীচরণের 'নববিবিবিলাস' বেরোয় এবং তারও বছরসাতেক আগে বেরিয়েছে 'নববাবুবিলাস'। কিন্তু নীরদচন্দ্রের সঙ্গে ভবানীচরণের কি একেবারেই কোনো যোগ নেই ?

আমি বললুম—তাঁর প্রসঙ্গ এখন স্থগিত রাখা দরকার। আটামুটি একটা কালক্রম ধরে না চললে আলোচনা কেবলি ছড়িয়ে পড়বে।

—না, না,—নীরদচন্দ্রের কথা এখানে বিস্তৃতভাবে ওঠা উচিত নয়,—তাঁর ইংরেজি বইগুলির কথাসূত্রেও নয়,—কারণ, সে-সবও ১৯৫০-এর দশকের আগের জাতক নয়।৭ এখানে খুবই সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, যাঁরা ভবানীচরণের এইসব লেখা পড়েছেন,—তখনকার সমাজের অবস্থা যাঁদের পুরোপুরি অজানা নয়,—কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' যাঁদের পড়া আছে,—তাঁদের কাছে নীরদচন্দ্রের সাধুগদ্যের চাল এবং তাঁর মতামতের কুণ্ঠাহীন চলন,—কোনোটাই খুব একটা আকস্মিক ব্যাপার বলে মনে হবে না। এ চিন্তার ঐতিহ্য ছিল। —বোধ হয়, এ-কথা পুরোপুরি অমান্য নয়। তবে, অনেকদিন পরে আজ আবার ভবানীচরণ-কালীপ্রসন্ন উভয়ে একযোগে নীরদচন্দ্রের মধ্যে যদি ফিরেও এসে থাকেন, তাহলেও এ-কথা মানতে হবে যে, নীরদচন্দ্র তাঁদের বিলেত ঘুরিয়ে এনেছেন—এবং বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, ম্যাথু আর্নল্ড, ফ্লোবেয়ার, বার্নার্ড শ, শরৎচন্দ্র,—মাদাম দ্য লাফাইয়েৎ, ডি-এচ্‌ লরেন্স,—এমন কি কামিনী রায়ের কবিতা এবং প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর গল্প সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল করে এনেছেন। অর্থাৎ এ'দের কথা নীরদচন্দ্রের লেখাতে বিদ্যমান।

আনন্দ বললে—বেশ বলেছ। আমি এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তবে এই বৃদ্ধের যৌবনানুরাগের দিকটাও অভাবিতপূর্ব,—ভবানীচরণ, কালীপ্রসন্ন দুজনেই যৌবনে যুবজনের কথা লিখেছেন, কিন্তু নীরদচন্দ্র সত্তর বছর বয়সে খুবই খোলাখুলিভাবে প্রেম এবং কামের কথা লিখেছেন। তিনি দেশের পাপের খাতাও সেই সঙ্গে খুলে দেখিয়েছেন—নারী-ঘটিত, রাজনীতি-সম্পর্কিত যাবতীয় পাপই। অবলীলাক্রমে 'মাগী', 'মাগ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি,—'রূপ'-ধারিণী শব্দটি ব্যবহার করতে তাঁর একটুও বাধে নি—এবং ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাসে' যেসব ভ্রষ্টচরিত্রকে 'লুচ্চ' বলা হয়েছিল, তাদের কথাপ্রসঙ্গে ভবানীচরণের সেই ছত্রগুলি তুলে দিয়েছেন ঐ 'বাঙালী জীবনে রমণী'-র ৯৭ পৃষ্ঠায়।

—আরো একটি কথা মনে পড়ছে এই সূত্রে। দেশের সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত নানা অনাচারের কথাপ্রসঙ্গে তিনি বারাঙ্গনা-সংবাদ দিয়েছেন বেশ বিস্তৃতভাবে। সেকালের পারিবারিক সম্পর্কের কথাপ্রসঙ্গে খুবই খাঁটি-বাংলার এমন কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করেছেন—যা ভবানীচরণ বা কালীপ্রসন্নই ব্যবহার করতে পারতেন,—যেমন 'শাশুড়ে' এবং 'বৌও',—তাঁর বইয়ের ৯৫ পৃষ্ঠায় আছে ওসব। তাছাড়া তাঁর এতৎসংক্রান্ত নানা সংবাদসূত্রের মধ্যে যদিও তিনি বিশেষভাবে তাঁর বন্ধু জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নাম উল্লেখ করেছেন, তবু আমার মনে হয়—আমরা যে-কালের কথা এ-অধ্যায়ের আগেই উল্লেখ করে এসেছি, পাশ্চাত্য প্রভাব দেখা দেবার সেই পূর্ববর্তী অধ্যায় থেকেই তিনি অনাচারের মূলগুলি পেয়েছেন। সেসব অনাচার থেকে দেশ আজও যে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে, তা নয়। ভবানীচরণও সেই জগতের কথা দেখিয়ে গেছেন। নীরদচন্দ্রের একটি উক্তি শোনাতে চাই,—শোনো—

'বাঙালী সমাজে পাশ্চাত্য প্রভাব আসিবার আগে

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (৩য় সংস্করণ) জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ৪৮—৪৯ দ্রষ্টব্য।

৭ The Autobiography of an Unknown Indian : ১৯৫১ (লণ্ডন, নুয়-ইয়র্ক); ১৯৬৪ (বোম্বাই)
A Passage to England : ১৯৫৯/৬০ (লণ্ডন, নুয়-ইয়র্ক)
The Continent of Circe : ১৯৬৫ (লণ্ডন), ১৯৬৬ (নুয়-ইয়র্ক, বোম্বাই)
The Indian Intellectual : ১৯৬৭ (দিল্লি)

স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক লইয়া যে-সব ধ্যান-ধারণা জন-প্রচলিত ছিল, সে-সব কথাবার্তা চলিত তাহার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব মাধুর্য, বা সৌন্দর্যের অনুভূতি ছিল না। সবটাই যেমন রূঢ়, তেমনই অশালীন। পাশ্চাত্য ভাব আসিবার পরও যাহারা নূতন ধারণা গ্রহণ করে নাই, তাহাদের মুখে পুরাতন ভাষাই শোনা যাইত, তাহাদের মনে পুরাতন ভাবই আসিত। এই অনুবর্তন হইতেই আমি সেকালের হাবভাব ও কথাবার্তার স্বরূপ কি ছিল তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়াছি।'

আনন্দ বললে—দ্যাখো, ভবানীচরণের কথা বলতে গিয়ে আমরা যে নীরদচন্দ্র সম্বন্ধে এতো কথা বলতে বাধ্য হবো, তা আগে ভাবি নি। কিন্তু ভবানীচরণকে বোঝবার জন্যেই নীরদবাবুর টীকা-টিপ্পনীগুলি দেখা দরকার। নীরদবাবুর বয়স হয়েছে বলেই বোধ হয় মেয়ে-পুরুষের দৈহিক সংসর্গের কোনো প্রসঙ্গই তাঁর কলমে বেধে যায় না। কিন্তু এইসব কথার পরিশেষে যে ধিক্কার-অনুশোচনা-গ্লানিমোচনের ভঙ্গিটি তিনি দেখিয়েছেন, সে-ভঙ্গি ভবানীচরণের নয়,—সেইখানেই নীরদবাবুর মৌলিকতা। তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ কয়েকটি অনুচ্ছেদ এদিক থেকে বিশেষভাবে মনে পড়ে।

আমি বললুম—ভবানীচরণের প্রসঙ্গে ফেরা যাক্। অনুপ্রাস-যমক সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের রচনায় যেরকম ঝোঁক দেখা গেছে,—রামপ্রসাদের মধ্যেও তা ছিল,—আবার রাম বসু, হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী,—দাশু রায়, গোপাল উড়ে,—ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত—আমাদের লেখকদের মধ্যে সে-ঝোঁক টিকেছিল একইভাবে। এটা দেখেছ তো?

আনন্দ বললে—তা দেখেছি ঠিকই—আর, প্রমথ চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, যাযাবরও এই একই খেয়ালের মানুষ। দ্যাখো, আমরা যখন এই অধ্যায়ের নাম রাখলুম 'প্রবেশ-পথ', তখন তার পেছনে সত্যিই তো এই বিশেষ চিন্তা কাজ করেছে। গদ্যের দিক থেকে দেখলে, ১৮০০ থেকেই আমরা নতুন উদ্যমে প্রবেশ করলুম বলে মনে হয়,—কিন্তু কবিতার দিক থেকে দেখলে ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত পুরো পথটাই বোধ হয় 'প্রবেশ-পথ'।

—না, না, তা কেন? আধুনিকতায় প্রবেশ এবং প্রতিষ্ঠা—ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে দুই-ই কি পাই না? ভারতচন্দ্র তো মঙ্গলকাব্যের শেষ প্রতিভাধর কবি। তিনি মোটেই আধুনিক ছিলেন না।

—ঈশ্বর গুপ্তই কি প্রথম 'আধুনিক'?

—স্থানে-কালে চিহ্নিত পারিপার্শ্বিক জীবন-তরঙ্গ ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে অনেক বেশি;—তিনি দেখেছেন এবং বুঝেছেন।

—আধুনিকতা কি ঐটুকুতেই আশ্রিত? ঈশ্বর গুপ্ত কি সত্যিই আধুনিক হতে পেরেছিলেন?

আমি বললুম—আজ এ বিষয়ে আরো কথা বাড়ালে কিন্তু 'নববিবিবিলাস' পড়া শেষ হবে না। আগে এই বইয়ের কথা শেষ হোক্।

প্রায় সমার্থক,—কিংবা সমোচ্চার্য পৃথক পৃথক অর্থের ভিন্ন ভিন্ন শব্দের বাহাদুরি দেখানোর দিকে এঁদের সকলেরই বেশ ঝোঁক ছিল। তাছাড়া ভবানীচরণের 'নব-বিবিবিলাস'-এ অনুপ্রাসের খেয়ালে এমন কিছু কিছু শব্দও এসে গেছে যেগুলির প্রয়োগ এখন আর পাওয়া যায় না, যেমন—

তাহারা কদাচিৎ কখন নিজ ভবনে ভ্রমক্রমে উপস্থিত হইলে প্রায়ই বৈঠকখানায় আটক হইয়া দশজন চেটক ও ঘোটক ইয়ারলোক লইয়া গাঁজা চরস খান এবং সরস কুরস পান ও তান মান গান ইত্যাদিতেই মত্ত হয়েন...

'আটক'-এর আগে ছিল 'বৈঠকখানা'র 'বৈঠক',—পরে সেই টানেই এসে গেছে 'চেটক ও ঘোটক'। আবার আর একটি নমুনা শোনো—

স্ত্রীলোক স্বভাবতো বিজ্ঞান বলে অবলা, তাহাতে কুলবালা আরো ভোলা; অর্থাৎ অনায়াসে ভুলান যায়...

এই 'অবলা—কুলবালা—ভোলা'-র ধ্বনিপ্রকৃতি অনুভব করতে গেলেই ভারতচন্দ্রের অনুপ্রাসচ্ছটা, ঈশ্বর গুপ্তের শ্লেষ এবং কবিওয়ালাদের শ্লেষ, অনুপ্রাস, ব্যাজস্তুতি—সবই মনে পড়ে। 'নববিবিবিলাস'-এর 'অঙ্কুর' খণ্ড—শুরু হয়েছে এইভাবে—

'পরাৎপরের পরম পদার্থ পরমার্থ পথ প্রায় পারমার্থিকেরা পবিত্র লোচনে দেখিতে পান—

সে যাই হোক্, ভ্রষ্টচরিত্র অসতর্ক স্বামীর উপেক্ষায় এ গল্পে এক কিশোরী সতী ক্রমেই ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। নাপিতানীর দূতীবৃত্তি শুরু হয়। কুলরমণী সেই নাপিতানীকে বলেন—

চল্লিশ সেরেতে হয় পরিপূর্ণ মণ
সেই পরিমাণে নাথে সঁপেছিনু মন।
কিন্তু না পাইনু তার মনের একলা।
ফাঁকি দিয়ে আমারে সে দেখাইল কলা।

এইসব উক্তির মধ্যে শব্দঘটিত চমকের চেষ্টা ইতস্তত ছিটিয়ে আছে, যেমন—

(১) কে আছে সংসারে সখি অবলা বলদ
পতি যিনি হন তিনি কেবল বলদ॥
(২) যেমন সিংহে শীকার করিলে শৃগাল জলজল
চাহিয়া
দেখে তেমনি রাজভোগ্যা তুমি রাজার ভোগে
আইলে
অজার কি সাধ্য যে তোমার ছায়া মাড়ায়॥

'বলদ' কথাটার ওপর এই বিশেষ ঝোঁক,—'রাজা' আর 'অজা'—শব্দ দুটির উচ্চারণগত সাদৃশ্য এবং অর্থঘটিত বৈষম্য ভবানীচরণ উপযুক্ত কাজে লাগিয়ে গেছেন। তিনি মতামতের দিক থেকে খুব একটা প্রাচীনপন্থী ছিলেন বলে মনে হয় না, কিন্তু ভাষারীতিতে তিনি যে ভারতচন্দ্রের স্মারক, তাতে মতানৈক্যের সুযোগ নেই। [ক্রমশ]

হো চি মিন-কে নিবেদিত

বন্যায়

বীতশোক ভট্টাচার্য

কী আনন্দ মহানন্দা, থইথই মৃত্যু নাচে ; যেন মনে হয়
এ নদী কি কালিদহ নয় ঃ কালিন্দী যে আনাচে-কানাচে
দিগন্ত ভাসিয়ে ফেরে, যম—তার যোগ্য বোন, পরিচয়
কখন তরঙ্গে ওঠে উথলিয়ে ; সর্বনাশী গঙ্গার প্রশ্রয়
বেচে সোহাগের মতো—যে ধরণে পুত্রশোক মাছে
স্বাভাবিক স্মৃতি পায়, বিমাতা মাটির কাছে বরং নির্ভয়।

খল জল ছলভরা—তবু তাকে এতদিন সংমা সতীন
ভেবেছে মাটির জন্য, অন্য কিছু খুব বেশি সুলভে বাতিল
করে না সচরাচর, কেন না যা ভূমিকম্পে, অগ্নুৎপাতে মিল;
এ জল তো তারও বাড়া ঃ নাড়া দিয়ে আউশের প্রসন্ন আশ্বিন
কোথায় ছিনিয়ে নেয়, দু'ধারের পাড় ভাঙা তার গিলোটিন
রাঙায় বিপ্লবে যেন—শুধু সেইখানে পলি, ধূসর ফেনিল
স্বপ্নদের সর-পড়া, হয়ে-ওঠা বিরুদ্ধতা, তারই তিল তিল
সারাৎসার শুষে নিয়ে সে প্রয়োগে ভিয়েৎনামে সিদ্ধ হো চি মিন।

হো চি মিন

উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এ মৃত্যু মৃত্যুর অতীত
যায় কি কখনো জীবনের মহাযুদ্ধ সারা?
নিভেছে প্রদীপ তবু
জেগে থাকে মানবিক আলোর ইশারা।

বিপ্লব, বিপ্লবী উভয়ত
আদর্শের অভিন্ন শিবির ;
এপারেতে শায়িত তোমার তেজী মরদেহ
অন্যপারে নিত্য পৃথিবীর
অদেখা স্বরূপ
তোমার মিলনে হলো আপন-ই অরূপ।

হো চি মিনের স্বপ্ন ঃ জেলখানার কবিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শুভ্র যেন ওড়ে বলাকা সন্ধ্যায়
অন্ধকারে সোনা ছড়ায় নীলাকাশ,

বন্দী জীবনের স্বপ্ন চলে যায়
যেখানে মাথা তোলে হাজার ক্রীতদাস
রক্তেভাসা রাতশেষের কবিতায়......

শুভ্র যেন ভোরে পাখিরা গান গায়।

হো চি মিন

উমাপদ নাথ

বাতাসের বুকে বসে চুল ছিঁড়ে আগুন জ্বালিয়ে
তোমার উত্তপ্ত নাম লিখে রাখি যৌবনের খুনে।
বহ্নিমান আলো তুমি, আঁধারের জমাট তুষার
সূর্যের করাত দিয়ে কেটে তার গর্ভস্থ আগুনে
যন্ত্রণার বীজ দিলে।   তোমার নয়নে চোখ রেখে
অন্ধ চোখ পায় আলো ঃ তমিস্রার দাঁতের আড়ালে
যে যাদু হিংসায় হাসে তার বুক চমকে সন্ত্রাসে—
দু-চোখে দুপুর নিয়ে তুমি তার সমুখে দাঁড়ালে।

হিংসার স্বপন দেখে ক্লান্ত ঘুমে নিরেট মৃত্যুর
পদধ্বনি শ্রুত হলে অকস্মাৎ তোমার দর্পণে
জীবন-সমুদ্র-ঝড়ে উড়ে আসে প্রত্যয়ের ঘোড়া ঃ
জীবনের কবিগান মৃত্যুমুখে প্রাণান্ত অর্পণে।

রাতের কঠোর মুঠো প্রত্যয়ের পাঞ্জা কষে খুলে
চুরি-যাওয়া সূর্যশিশু নিয়ে এলে প্রত্যূষের দ্বারে ঃ
নয়নে আলোর জন্ম সেই হলো ঃ দিগন্ত নিস্রাবে
সংগ্রামের বৈজয়ন্তী তৈরি হলো লাঞ্ছনার পারে।

বঙ্গ দর্শন

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি কলকাতা সফর করে গেলেন। কলকাতায় তিনি অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা লাভ করেছেন একথা বলাই বাহুল্য। শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে দৃঢ়তা ও সাহস দেখিয়েছেন, তাতে তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা, প্রভাব ও জনপ্রিয়তা আজ শীর্ষস্থানে পৌঁচেছে। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসমাবেশ সেই ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তারই নিদর্শন। একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, সাধারণ মানুষ কংগ্রেসপ্রীতিতে বিভোর হয়ে ওই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্রীমতী গান্ধী ময়দানের বক্তৃতায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার কাজে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে আহ্বান জানিয়েছেন, কেন না ভারতের মত দেশে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে দরিদ্র মানুষের শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার করতে হলে সমাজতন্ত্র ছাড়া পথ নেই। কিন্তু এ-কাজটা কংগ্রেসের দ্বারা সাধিত হওয়া কোনদিনই সম্ভব ছিল না, আজও সম্ভব নয়, কোনদিন সম্ভব হবেও না, এবং কেন যে তা সম্ভব নয় তার অনেক কারণ আছে, যা বর্তমান নিবন্ধে বিশদ করে বলার কোন প্রয়োজন নেই। যে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে প্রধানমন্ত্রী দেশকে নিয়ে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন, তা একমাত্র যুক্তফ্রন্টের দ্বারাই সাধিত হতে পারে, কেন না যুক্তফ্রন্টই এই নীতির সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে দৃঢ় সমর্থক। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই-এ শ্রীমতী গান্ধী যে প্রথম দফায় জয়ী হয়েছেন, তার পটভূমিকা তৈরি করেছে কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ এবং সারা ভারতে বামপন্থী রাজনীতির শক্তি বৃদ্ধি।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ যতটা আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে, কার্যক্ষেত্রে তা কি রকম ফল প্রসব করবে সে-কথা বলা ঠিক এই মুহূর্তে সম্ভবপর নয়। এখনো পর্যন্ত এর মধ্যে প্রগতিশীলতা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু একটা প্রশ্নের বড় একটা সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ আইনে, নবপর্যায়ে ব্যাঙ্কগুলি কিভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রযুক্ত হবে তার কোন ইঙ্গিত নেই। ছোট শিল্পপতি, সাধারণ ব্যবসাদার, কৃষক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে কিভাবে ঋণ দেওয়া হবে সে-বিষয়ে আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। শুধু মালিকানাটা সরকারী হলেই যে ব্যাঙ্ক টাটা-বিড়লার সেবার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখবে তার কোন মানে নেই। শুধু জাতীয়করণের কথাটাই বড় নয়, কথা হচ্ছে তার ফলে সাধারণ মানুষের সত্যই কোন লাভ হচ্ছে কি না। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ আইনে ফাঁক বড় বেশি, কাজেই আশঙ্কা হয় এটা একটা মামুলি স্টান্ট কি না।

প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপ সত্যই প্রগতিশীল কি না তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে এবং শুধুমাত্র ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দ্বারাই তা প্রমাণিত হয় না। প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী কার্যক্রমই প্রমাণ করবে, সত্যই তিনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্তনে আগ্রহী কি না। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ দেশজোড়া যে আবেগের সৃষ্টি করেছে, তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সমাজতন্ত্রের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ কত আন্তরিক। দেশবাসীর এই আন্তরিক আগ্রহকে সত্যই রূপ দেওয়া হবে কি না, অথবা তা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ব্যবহৃত হবে সেটা বুঝতে আশা করি বেশি সময় লাগবে না।

স্বাস্থ্যদপ্তর—ননীবাবু—পদস্থ আমলা

রাইটার্স বিল্ডিংসে মদের আসরের সংবাদ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হবার পর স্বাস্থ্যদপ্তরের সুহৃদচক্রের নায়ক সেই পদস্থ আমলা নাকি গায়েব হয়েছেন। তাঁর নাকি বিশেষ ধরণের একটি পেটের রোগ হয়েছে। বেছে বেছে এই বিশেষ পেটের রোগটিকে পছন্দ করার কারণ যে-কোন ডাক্তারই বলতে পারেন। কয়েক ধরণের পেটের রোগ আছে, যা মাস-খানেক ধরে নির্দিষ্ট কয়েকটি লক্ষণ দেখিয়ে তারপর আবির্ভূত হয়। ননীবাবুকে সহজেই বোঝানো চলে যে, দেখুন স্যার, একমাস ধরে এই রোগটির নানা লক্ষণ ধাপে ধাপে প্রকাশ করে আমার দেহে ভর করছে এবং সেই লক্ষণগুলি বোঝার পর আমি কি আর মদ্যপান করতে পারি?

হাল্কা কথা থাক। গত সংখ্যার বঙ্গদর্শনে স্বাস্থ্যদপ্তর সংক্রান্ত আলোচনা রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে এবং তারই ফলে আরও অনেক প্রামাণ্য কাগজপত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে এবং আরও অনেক গুরুতর অভিযোগ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিশ্বস্ত সহকর্মী তথা সহকারী এবং ঐ সুহৃদচক্রের নায়ক—যিনি রাইটার্স বিল্ডিং-যুক্তফ্রন্টের আমলেও মধুচক্র চালানোর মত ক্ষমতার অধিকারী, একজন ডেপুটি ডিরেক্টর, একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর প্রভৃতির বিরুদ্ধে এসেছে। ফলে অবস্থাটা এমন হয়েছে যে, শুধুমাত্র স্বাস্থ্যদপ্তরের জন্যই আমাদের পৃথক একটি বিভাগ খুলতে হবে। আমরা বিনা প্রমাণে কোন কথা বলি না, আশা করি স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্তারা তথা ওই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ননীবাবু এটা বোঝেন। সত্য বলতে কি, অনাচারের শেষ সীমায় হেলথ ডিরেক্টরেট পৌঁচেছে এবং যদি অবিলম্বে দুর্নীতিপরায়ণ ঐ পদস্থ আমলা সুহৃদচক্রের নায়ককে অপসারিত না করা হয়, তাহলে অভিযোগগুলি সহ সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্রগুলি যুক্তফ্রন্টের বিবেচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পেশ করা প্রয়োজন। আমরা স্থির নিশ্চিত যে, নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা হলে উক্ত পদস্থ আমলাকে কোনক্রমেই রক্ষা করা যাবে না।

গত সপ্তাহে আমরা দুটি স্পেসিফিক অভিযোগ করেছিলাম এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যিনি মন্ত্রীর বিশ্বস্ত সহকারী, খোদ তাঁর দলেরই লোক। আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে এই প্রশ্ন করেছিলাম যে, তিনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে, সম্প্রতি তাঁর ওই বিশ্বস্ত সহকারীর প্ররোচনায় ডায়রেক্ট সাপ্লাই-এর কণ্ট্রাক্ট দেবার ব্যাপারে

একটা মোটা অঙ্কের টাকার অবৈধ লেন-দেন হয়েছিল? মোটা টাকার বিনিময়ে দুই ব্যক্তিকে ডায়েট সাপ্লাই-এর কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বিষয়টি পরে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এবং এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অভিযোগ যাবার পর শেষ পর্যন্ত ওই কন্ট্রাক্ট বাতিল করতে হয়। এই সংবাদের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যে নেই তা আমরা জানি এবং তা করতে গেলে ঝুলির ভেতর থেকে আরও অনেক বেড়াল বেরিয়ে পড়বে, যা সামলানো অসম্ভব হবে। তা তিনি ভাল করে জানেন এবং সেই কারণেই প্রতিবাদ না করে ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। অথচ এঁরাই গালভরা বুলি আওড়ান যে, স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করবেন। কিশোর বয়সের ছেলে যেমন কুসঙ্গে পড়ে উচ্ছন্নে যায়, হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথা যেমন কানে তোলে না, এঁদেরও সেই অবস্থা হয়েছে। এবং আমাদের পক্ষে এটা সত্যই খুব বেদনার কারণ যে, ননীবাবুর মত ভাল লোক এমন ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছেন, যা শেষ পর্যন্ত তাঁর ইমেজ বীভৎসভাবে নষ্ট করে দেবে।

কলকাতায় ইন্দিরাজী

আরও একটি বিশেষ অভিযোগ আমরা গত সপ্তাহে করেছিলাম এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে, তা প্রকাশিত হবার পরই বহু এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে ওই বক্তব্যের পক্ষে আরও তথ্য এসেছে। গত সংখ্যায় আমরা লিখেছিলাম, ননীবাবু কি অস্বীকার করতে পারেন যে, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে তাঁর উক্ত বিশ্বস্ত সহকারীটির প্ররোচনায় তাঁরই সম্পর্কিত ভ্রাতাকে একটি মেডিক্যাল কলেজে রাতারাতি বিভাগীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়েছিল? বিশ্বস্ত কর্মচারীর ঐ ভাগ্যবান সম্পর্কিত ভ্রাতাটি নীলরতন মেডিক্যাল কলেজের (কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নন) প্যাথোলজি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি নন-প্রাকটিশিং স্টাফ, কিন্তু বে-আইনীভাবে বিভাগের প্রধানের সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও প্রাকটিশ করতেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ঐ বিভাগকে ব্যবহার করতেন। তিনি তাঁর প্রাকটিশের যোগান পেতেন বিড়লা যাড়ুর অনেক চাকৎসকের কাছ থেকে—যিনি তাঁকে পরীক্ষার জন্য রক্ত ইত্যাদি নাকি নিয়মিত প্রেরণ করতেন। বিভাগীয় প্রধান সঙ্গতভাবে এই দুর্নীতিপূর্ণ কাজে আপত্তি করেন এবং এ বিষয়ে নীলরতন কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষের নিকট বিষয়টি জানান। অধ্যক্ষ এ-বিষয়ে প্রমাণপত্র চাইলে বিভাগীয় প্রধান সেগুলি তাঁকে দেন এবং অধ্যক্ষও সেগুলি স্বাস্থ্যদপ্তরের সেক্রেটারীর নিকট পাঠিয়ে দেন। এর পরেই শুরু হয় নেপথ্যের কার্যকলাপ। তার ফলে ওই কর্তব্যপরায়ণ বিভাগীয় অধ্যাপক বাঁকুড়ায় বদলীর আদেশ পান এবং তাঁর স্থানে উপরোক্ত সম্পর্কিত ভ্রাতা আসীন হন। এই ব্যাপারটি কি ননীবাবুর জ্ঞাতসারেই করা হয়েছিল? ভাইকে রক্ষা করতে দাদা, অথবা দাদাকে রক্ষা করতে ভাই (কে বড় আমরা জানি না) এগিয়ে আসেন এবং তাঁর হয়ে "আমাদের বহু কাহিনীর নায়ক, উক্ত সুহৃদচক্রের সরিৎধারার উৎস, আমাদের বহু আলোচিত পদস্থ আমলা, যিনি রাইটার্স বিল্ডিংস-কে জঘন্য নোংরামির কেন্দ্রে পরিণত করেছেন, এবং সম্প্রতি যিনি বিশেষ পেটের রোগজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন, ননীবাবুর সেই একান্ত আপনজন, যাকে তিনি নাকি নামের সঙ্গে দাদা না বলে সম্বোধন করেন না, সেই মহাপুরুষ" এগিয়ে আসেন। যুক্তফ্রন্টের আমল বলেই কি এটা দুর্নীতি নয়?

কে এই কানাইবাবু?

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য বর্ধমান রুর‍্যাল ট্রেনিং সেন্টারে একটি বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছিল। স্বাস্থ্য দপ্তরের কিছু কর্মী ও বাইরে থেকে আগত এক দল পরীক্ষার্থীর প্রচণ্ড বিক্ষোভের ফলে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা পণ্ড হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংসের হেলথ ডিরেক্টরেটের এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্রাঞ্চের (প্রশাসন শাখার) বহু আলোচিত দুর্নীতিবাজ সেই ক্লার্কের বিরুদ্ধে (যার বেপরোয়া দুর্নীতি ও অনাচারমূলক নানা অপকর্মের সুনির্দিষ্ট বিবরণ বার বার আমরা বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেছি।) গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না দেওয়া সত্ত্বেও, প্রচুর টাকা-পয়সার বিনিময়ে বর্ধমানের বাইরের বহু লোক নাকি উক্ত ক্লার্কের সহায়তায় স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে ইন্টারভিউ লেটার পেয়ে বর্ধমানে পরীক্ষা দিতে আসে এবং এই থেকেই বিক্ষোভের সূত্রপাত।

কলকাতা থেকে জনৈক কানাইবাবু ইন্টারভিউ-এর দিনে (১৩ই সেপ্টেম্বর) ফাইলপত্র নিয়ে বর্ধমানে উপস্থিত হয়ে ঐ সব বে-আইনী পরীক্ষার্থীর (যারা অবৈধ লেন-দেনের মাধ্যমে ইন্টারভিউ লেটার পেয়েছিল) খোঁজ-খবর নিতে যেয়ে লাঞ্ছিত হয়েছেন। কে এই কানাইবাবু, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী তা জানেন কি?

ইতিমধ্যেই সুহৃদচক্র আরও একটি খেলায় নেমেছে, যে বিষয়ে পাঠকদের এবং যাঁরা ডব্লিউ, বি, এইচ, এস-এ তথা বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত আছেন, তাঁদের কিছুটা অবহিত করা দরকার। সম্প্রতি বেশ কয়েকজন চিকিৎসককে প্রমোশন দেওয়া হবে এবং বলাই বাহুল্য, তার তালিকা তৈরি করছেন আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একান্ত আপনজন তাঁর বিশ্বস্ত সহকারীটি ঐ সুহৃদচক্রের নায়কের সংগে পরামর্শ করে। এর অর্থই হবে এই যে, কিছু দুর্নীতিপরায়ণ অযোগ্য ব্যক্তির বরাত খুলে দেওয়া এবং অসংখ্য সৎ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দেওয়া। যেহেতু এই তালিকা প্রণয়নকারী ব্যক্তিটি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন, এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাতে নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়, সেই জন্য বিষয়টিব প্রতি সামগ্রিকভাবে মন্ত্রিসভার দৃষ্টি দেওয়াই সংগত। আমরা এ-বিষয় যুক্তফ্রন্টের জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে অন্যায় সংঘটিত হতে চলেছে, সৎ ও বিবেকবান চিকিৎসকদের কর্তব্য তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা এবং ন্যায়ের পক্ষে জনমত গঠন করা।

সংগীত শিক্ষিকা-শিক্ষণ সংস্থা প্রসঙ্গে

কলকাতার কেয়াতলা লেনে অবস্থিত গভর্নমেন্ট-স্পনসর্ড সংগীত শিক্ষিকা-শিক্ষণ সংস্থার (ইনস্টিটিউশন ফর দি ট্রেনিং অফ মিউজিক টিচার্স—উইমেন) রবীন্দ্রসংগীত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস 'পাঠকমন'-এ প্রকাশের জন্য একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠির বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করা হলো। যুক্তফ্রন্ট সরকারের জনপ্রিয় শিক্ষা-মন্ত্রীর জরুরী দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হবে বলে আশা করি।

"সম্প্রতি সংগীত শিক্ষিকা শিক্ষণ সংস্থা তুলে দেওয়া হবে" এই সংবাদ পড়ে বিচলিত বোধ করছি। সরকার-স্পনসর্ড এই ধরণেব প্রতিষ্ঠান বাংলা-দেশে তথা ভারতে এই প্রথম। উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে, প্রকৃত গুণী অধ্যাপক ও অধ্যাপিকদের সহযোগিতায় ও শিক্ষকতায প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৭ সালের পয়লা ডিসেম্বর আরম্ভ হয়। ছাত্রীসংখ্যা হয় ১৩০ জন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৭১ জন ছাত্রী নির্দিষ্ট অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ডিপ্লোমা পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। গত ছয় বছরে ১২১ জন ছাত্রী পাস করেছেন। সরকারী মুখপাত্রের মতে, কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতাই প্রতিষ্ঠান বিনষ্ট হবার মূল কারণ। এখানে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সাতজন সদস্যের মধ্যে পাঁচজনই রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি। তার মধ্যে একজন প্রেসিডেণ্ট ও একজন সেক্রেটারি। এই দীর্ঘ বার বছর এই প্রতিষ্ঠানটির রূপায়ণে তাঁদের কি কোন দান আছে? বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ১১ জন কেন? এতদিনের মধ্যেও ছাত্রীদের ডিপ্লোমা দেওয়া হয় নি। কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদেব বৃত্তি দেওয়া হয় নি। তাদেব চাকরির সুব্যবস্থা হয় নি। অধ্যাপকরা আজ পর্যন্ত বর্ধিত হারে কোন দুর্মূল্য ভাতা পান নি। ১৯৫৭ সালের পয়লা ডিসেম্বর থেকে তাঁরা নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করে আসছেন, তাও নিয়মিতভাবে বেতন না পেয়ে। দীর্ঘ বার বছর প্রতিষ্ঠানের বাড়ি তৈরির জন্য বহুমূল্য জমি ও টাকা পড়ে আছে। কিন্তু বাড়ি হয় নি। এই দীর্ঘ সময় মাসিক ১,১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া বাবদ ব্যয় হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতা তো ছিলই, উপরন্তু এই বারো বছরের অভিজ্ঞতাতে প্রত্যেকেই সংগীতের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অমূল্য সম্পদ আহরণ করেছেন, তার মূল্য তাঁরা কতটুকু পেয়েছেন বা পাবেন? শিক্ষামন্ত্রী যদিও আশ্বাস দিয়েছেন যে, বিকল্প চাকরির ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু কোথায়? আমাদের জন্য বিকল্প চাকরির ব্যবস্থা করলেও তো রাজ্য সরকারের খরচ কমবে না। বরং বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। কারণ বিকল্প চাকরিতে গ্রেড মহার্ঘভাতা প্রভৃতি নিশ্চয় থাকবে। এই দীর্ঘদিন বর্ধিত হারে আমবা কোন দুর্মূল্য ভাতা পাই নি। ম্যানেজিং কমিটির এই খামখেয়ালি কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেবাব কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যুক্ত-ফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচী অনুযায়ী কি এই দীর্ঘ বার বছরের প্রতিষ্ঠানটি (যেখানে বর্তমানে ২৪ জন কর্মী নিযুক্ত আছেন) তুলে দেওয়া যায়? শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায়ের নিকট অনুরোধ, প্রতি-ষ্ঠানটির জন্য যে জমি ও অর্থ আছে সেখানে যথাশীঘ্র সম্ভব বাড়ি তৈরি করা এবং যোগ্য পরিচালকমণ্ডলীর হাতে এর রূপায়ণেব দায়িত্ব অর্পণ করা হোক। শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটির মূল্য অপরিসীম এবং এর সমকক্ষ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে তথা ভারতে দ্বিতীয়টি নেই বলা চলে। আমাদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে গড়া এই প্রতিষ্ঠানটি যাতে আবাব সজীব হয়ে ওঠে সে বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।"

কয়েকখানি বিখ্যাত বাংলা অনুবাদ

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

বেনোঁভ	—সৌরেন সেন	৩·০০
রূপান্তরের দুর্গম পথে	—হফার	১·০০

এশিয়া পাবলিশিং কোং

আমেরিকার কাহিনী (তিন খণ্ড)	—জনসন	২·৫০
বিশ্ববিধানের সন্ধানে	—গারডনার	৩·০০
ভিয়েৎকঙ	—ডগলাস পাইক	১·৫০
আজকার উত্তর ভিয়েৎনাম	—পি জে হনি	১·৫০
উপনিবেশবাদ থেকে কমিউনিজম	—হোয়াং ভ্যান চি	১·৫০
ভিয়েৎনামের যুদ্ধ কেন?	—এম্, শিবরাম	১·০০

হোমশিখা প্রকাশনী

পালিয়ে এলাম	—রবারট লো	১·৫০
মাটি, মানুষ আর ইতিহাস	—হেলফ্‌ম্যান	১·৫০
হিউবার্ট হোরেশিও হামফ্রী.	—গ্রিফিথ	১·৫০

বাক্-সাহিত্য

পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ	—বেগ্রল্ড	৬·৫০
মানব ও সমাজ বিজ্ঞান	—স্টুয়ার্ট চেজ	৩·০০
অর্থনীতি ও মানব কল্যাণ	—ক্রাবক	৪·০০
প্রশ্নোত্তরে আমেরিকা	—বিয়ার	৬·০০
এশিয়ার ধূমায়িত অগ্নিকোণ	—ক্রোজিয়ার	৬·০০

সাহিত্যায়ন

শান্তিযোদ্ধা মার্টিন লুথার কিং	—এড ক্লেটন	২·২৫
ইতিহাসের স্বর্ণস্বাক্ষর	—পিটি	৪·০০

নানা বিষয়ে আরো অনেক বই : পুস্তক বিক্রেতাদের উচ্চ কমিশন
তালিকা চেয়ে পাঠান : আজই অর্ডার দিন

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলি-১২

ভারত দর্শন

প্লি এক্স কমেক্স

দিল্লীতে 'প্লি এক্স কমেক্স' পার্টির উত্তেজনায় কমনওয়েলথ যুব উৎসবের শেষ রজনীতে রবীন্দ্র রঙ্গশালায় প্রচণ্ড মাতলামি হয়ে গেল। অবশ্য রমণীকুলের শ্লীলতাহানির ব্যাপারে দিল্লী এই প্রথম রেকর্ড করে নি। ইতিপূর্বে অর্থাৎ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর নিয়ে চের দচেতন উদ্বেগমূলক চিল চিৎকারেরও আগে, ১৯৬৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরও নারীর শ্লীলতাহানি ঘটেছিল রাজধানী দিল্লীর বুকে। আর সেই রাতটি ছিল বিদেশী লাল বণিকদের নিউ ইয়ারস ইভ। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ভারতীয় সভ্যতার 'সু'-কে পরিত্যাগ করে স্বাধীন (মনে পরাধীন) ভারতীয়রা যতকাল পশ্চিমের প্লি এক্স উত্তেজনাকে কোল দেবেন এবং 'নিউ ইয়ারস' ইভ করবেন যদের আড্ডার সামনে ফরওয়ার্ড মহিলাকুল পরিবৃত হয়ে, ততকাল এমন সব রোমহর্ষক প্লি এক্স ঘটনাও ঘটতে থাকবে। রবীন্দ্র রঙ্গশালায় বিটলে রঙ্গ নক-আউট বিট শো' শেষ হলে রঙ্গশালা যখন রমরমে, তখনই সেই লজ্জাজনক মাতলামি একদল যুবককে যুবতীদের পেছনে ধাওয়া করতে উৎসাহিত করে। আধ ঘণ্টা পূর্ণ স্বাধীন উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকতা, সোডার বোতল লুঠ ও বোতল ছোঁড়াছুড়ির পর দিল্লী প্রমাণ করে দেয়, রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনাবলী পশ্চিমবাঙলার একচেটিয়া নয়।

দেশের যুবসমাজকে উত্তেজক মাদকদ্রব্য, চলচ্চিত্র এবং সাহিত্য-নামক আজব চীজে ডুবিয়ে যারা মাতাল করছে; দেশের মেয়েদের মধ্যে যারা নিম্নমার্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী, তাদের রাতারাতি রীতা ফারিয়া বানাবার জন্য খোলা শরীর মেপে সুন্দরীর উষ্ণী পরাবার ব্যবস্থা করছে; ধনী খদ্দেরদের পরিতর্পণের জন্য যারা এরোপ্লেনের অফিসে সুন্দরী আপ্যায়নকারিণী নিযুক্ত করছে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জীবন্ত বিজ্ঞাপন হওয়ার জন্য যারা সুন্দরী এনকোয়ারী ক্লার্ক নিয়োগের ব্যাপারে আলট্রা মডার্ন সন্ধান করছে, প্লি এক্স 'রাম'-ভোগী সেই সমাজই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কমেক্স-৩-এর স্রষ্টা। এদের দলীয় পাণ্ডারা বুঝে ফেলেছে, নগ্না ও অর্ধনগ্নার দেহবল্লরীর বর্ণনা না করলে যেমন কাব্য সাহিত্য হয় না, তেমনি নগ্ন নারীর উত্তেজক চিত্র সাজিয়ে না ধরলে যথার্থ শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যায় না। দেশটা যেন ক্ষেপে গেছে পশ্চিমের আমিষী ভোজের প্রমোদভোগী হওয়ার জন্য। আর এ কারণে নানা জ্ঞানগর্ভ আলোচনার আর বিরাম নেই। বলা বাহুল্য, সমাজসচেতন আর একদল মানুষ তীব্র প্রতিবাদ করে যদিও চিৎকার করে মরছেন যে, এই জাতীয় অপসংস্কৃতির হুল্লোড় খতম কর; মানুষকে যারা চিরকাল চণ্ডু চরস আফিমে চুর চুর করে শোষণ করে এসেছে, তারা ততই তাড়াতাড়ি প্লি এক্স সংস্কৃতির বান ডাকাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠছে। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত বদ-খেয়ালের অভিপ্রেত ফলও ফলছে দিকে দিকে। আর তারই সঙ্গে দেশজোড়া হতাশা ও অবক্ষয় শোষকদের পরিকল্পিত ফাঁদে পা দিয়ে সেই প্লি এক্স সংস্কৃতিকে আলিঙ্গনও করছে চটপট।

তবু একথা বলতেই হবে যে, অন্ধ হলে যেমন প্রলয় বন্ধ থাকে না, দেশে প্লি এক্স সংস্কৃতির বান ডাকিয়েও তেমনি বিক্ষোভকে ঘুম পাড়াতে ফেরেববাজ ফন্দীবাজরা সফল হবে না। কমেক্স-৩-এর বিষফোড়া যতই পাকবে ফেরেববাজদের দিনও ততই ঘনিয়ে আসবে। কেন না শয়তান তার নিজের তৈরি প্রেতের হাতেই একদিন প্রাণ দিয়ে থাকে।

আমেন।

হাওয়া বদল?

দমদম বিমান ঘাঁটি থেকে রাজভবন পর্যন্ত পথে পথে কংগ্রেস নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সম্বর্ধনা কি পশ্চিমবঙ্গে নতুন হাওয়ার কাঁপন ধরালো? শ্রীমতী গান্ধীকে নিয়ে ভারত জুড়ে যেমন সাড়া জেগেছে, তাতে শ্রীমতী গান্ধী প্রায় বিপ্লবী অভিযাত্রীর অভিনন্দন কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন চতুর্দিকে, একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। যে পশ্চিমবঙ্গ লাল হয়ে গেছে বলে রটনা, সেখানেও শ্রীমতী ইন্দিরার আগমন পথে 'ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ' ধ্বনি কংগ্রেসসেবীদের মনে আত্মবল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু এই উচ্ছ্বাসের যথার্থ কারণ কি? সে কি কংগ্রেসের কোলে হাওয়া ঘোরা?

কলকাতার পূর্বাপর ইতিহাস যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা জানেন, এই শহর আশ্চর্য কৌতূহলী। এখানে কারণে অকারণেও শহর ভেঙে লোক জড় হয়। কিন্তু সে যুক্তি প্রধানমন্ত্রীর আগমনে জনসমাগমের ক্ষেত্রে খাটে না। যদিও শহরের কৌতূহলী চরিত্রেরও প্রতিনিধিত্ব যে পথ-সম্বর্ধনায় উপস্থিত না ছিল, এমন কথাও কেউ চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারেন না। বরং ছিল বিক্ষোভ মিছিল। ছিল কংগ্রেসীদের মধ্যে শরিকানী সংঘর্ষ।

তবুও শ্রীমতী গান্ধী হাওয়া বদল লক্ষ্য করেই সফরে বের হয়েছেন। রাজ্যে দ্বিতীয় দফা যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম তাঁর পশ্চিমবঙ্গ সফর। সফরে আসার আগে শ্রীমতী গান্ধীর কূটনীতি দেশের সমস্ত বামপন্থী ও বিপ্লবী দলগুলিকে দিয়ে তাঁর পক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থন আদায় করে নিয়েছিল। উচ্ছ্বাস ভারত-গগন-ভেদ করে মহাশূন্য স্পর্শ করেছে। বিপ্লবী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী মার্ক্সবাদীরাও তাঁকে সমর্থিত করেছিলেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে। এই বিপুল উচ্ছ্বাস প্রধানমন্ত্রীর যাত্রাপথকে তাই বর্তমানে অপ্রত্যাশিতভাবে কুসমাস্তীর্ণ করেছে অর্থাৎ বলতে গেলে, হাওয়া বস্তুতই আনুকূল্য করছে।

ইতিপূর্বে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে রাজ্যের বৃহত্তম দল মার্ক্সবাদী জনসভায় বিপুল শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে মার্ক্সবাদী নেতারা শোধনবাদী সি পি আই-কে নিয়ে যতটা মাথা ঘামিয়েছিলেন, দেশের পরিবর্তমান পরিস্থিতিকে ততদূর গুরুত্ব দান করেন নি। এ সমস্ত কারণও ১২ই সেপ্টেম্বরের বিপুল গণ-সম্বর্ধনার সহায়তায় এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী জনসমাবেশ লক্ষ্য করে অভিভূত হয়েছেন। কিন্তু এই গণ-উচ্ছ্বাস ছিল বস্তুতই প্রত্যাশিত। ভারতের সাধারণ মানুষ আর যাই হোন, অকৃতজ্ঞ নন। কেউ তাঁদের জন্য অন্তত দুটো মঙ্গলচিন্তা করছেন, এই খবর রটে গেলেই তাঁরা তাঁকে

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty
Snow
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

মাথায় তুলে নেন এবং একবার যাঁকে শিরোভূষণ করেন সহজে তাঁর স্থানচ্যুতিও ঘটে না। এদেশে জনমানস অন্তরে রক্ষণশীল, এঁদের সামান্য নাড়া দিতে পারলেই কাজ হয়। এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এইভাবে প্রধানমন্ত্রী যতদিন নাড়িয়ে যাবেন, ততদিন তাঁর পপুলারিটিও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে।

সুস্বাগতম্, স্বাগতম ইন্দিরাজী।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকো নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচূলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তর-তাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপাল-পূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয় কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অনন্তনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪'০০ টাকা।

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা :

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত।

প্রথম খণ্ড—৫'০০ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড—৪'০০ টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ :

(সমগ্র সপ্তকাণ্ড। কবির জীবনী-সম্বলিত)

আদি কবির মহাকাব্যের বাঙালীর সংস্করণ। সোনার বাংলার ভক্তি-অর্ঘ্য। পদানুসারে। রাজসংস্করণ। সচিত্র। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৮'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

পি এস পি'র বাসনা

কথায় বলে, গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল।

ভবতের প্রজা সোস্যালিস্ট (?) পার্টির আজ একই দুরবস্থা। এই দলটি দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে কিছুতেই আর পা ফেলতে পারছেন না। আর সে-কারণেই লম্ফঝম্ফ অবিরাম হয়ে উঠেছে। এ দলের প্রধান অসুবিধা সমাজতন্ত্রের ভার বহনের দায়িত্ব কাঁধে করে এঁরা হিমসিম খাচ্ছেন। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যাঁদের আদায় কাঁচকলা সম্পর্ক সেই জনসঙ্ঘ আর স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে জুটিবন্ধ হয়ে দেশমুখ সাহেবকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তৃতীয় প্রার্থী খাড়া করার উদ্যোগ-আয়োজন করেছিলেন এঁরাই, পরে রাজনৈতিক হাওয়ার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে দিশেহারা হয়ে পড়লেন এবং মিনমিন করে বললেন (যেহেতু এঁরা কস্মিনকালেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অক্ষম), যাকে হোক ভোট দাও, গিরি কিম্বা দেশমুখ।

সাধারণের সামনে এ দলের একমাত্র ভূমিকা হ'ল কংগ্রেস-বিরোধিতা (যেমন এস-এস-পি'র)। অনধিক আলোকিত সমাজে এঁদের ফলাও বক্তৃতা হয়। সমাজতন্ত্র (সমাজতন্ত্র বলতে ভারতে আজ কোন্ পার্টি কি ভাবছেন, জনসাধারণের কাছে তা-ই সঠিক হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। অবস্থা এমন, আগামীকাল জনসঙ্ঘ-স্বতন্ত্রও সমাজতন্ত্রসেবক হ'লে বিস্ময়ের কারণ ঘটবে না। কারণ ভারতে আজ সবাই সমাজ-তন্ত্রসেবী। দুঃখের বিষয় তা সত্ত্বেও দেশটা আজও প্রকৃত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের চেহারাই গ্রহণ করতে পারে নি। রাজনৈতিক ভাঁওতা একেই বলে। যাই হোক...)। যাই হোক, পি-এস-পি'র অন্তরের বাসনা-কংগ্রেস ভেঙে তার ক্যাম্পে যোগ দিক, এস-এস-পি'ও অনুরূপ উচ্চাশায় অভ্যস্ত। কিন্তু সে গুড়ে বালি। অথচ তাই বলেই তো পি-এস-পি পিছিয়ে থাকতে পারে না। বিশেষত যখন দেশে আজ কম্যুনিস্ট-ভীতি প্রবল হয়ে উঠছে। তাই পি-এস-পি'র নিরন্তর চেষ্টা পাতিল সাহেবের মতো 'লাইক মাইণ্ডেড' বা 'সমমনোভাবাপন্ন' দল শিকার ও তাদের নিয়ে মোর্চা গঠন করে কম্যুনিস্ট প্লাবন থেকে মহান ভারতভূমিকে রক্ষা করা।

এহেন পবিত্র দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে (গিরির জয় এবং শ্রীমতী গান্ধীর বাস্তবিক পক্ষে কয়েকটা বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণের ধাক্কা খাওয়ার পর) পি-এস-পি কলকাতায় একটা ঘোষণা ছেড়ে বসেছেন। শোষক দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রেম ভাসিন। গণতন্ত্র ও সমাজবাদে বিশ্বাসী (পি-এস-পি'র ধারণায়) দলগুলির কাছে চিঠিও পাঠানো হ'য়ে গেছে। এই সমস্ত সমাজ-বাদীরা হলেন, অবশ্যই এস-এস-পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস এবং এমন কি ক্রান্তি দল, ডি-এম-কে, লোকতান্ত্রিক কংগ্রেস (শোষিত দলই বা বাদ কেন?) জনতা পক্ষ এবং কৃষক-শ্রমিক দল। বলা বাহুল্য, এই সব দলগুলির কোনটিই (এস-এস-পি ছাড়া) সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মাঝারি পার্টিও নয়। স্থানীয় গোষ্ঠী সমর্থনে কম্পমান অস্তিত্বের ওপর এদের প্রতিষ্ঠা (ডি-এম-কে'কে সরিয়ে রাখছি)। যাই হোক পি-এস-পি যে স্বতন্ত্র জন-সঙ্ঘকেও ডেকে বসে নি এই যথেষ্ট।

ভালো। এখন গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র নিয়ে কী ধরণের জয়যাত্রার আকাঙ্ক্ষা ভাসিন সাহেবকে অনুপ্রাণিত করছে? তিনি বলছেন: কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে এখন আর সমস্ত অ-কংগ্রেসী নিয়ে বা যুক্ত বাম মোর্চা গঠন করে কোনো ফল হবে না। কেবল আর পশ্চিমবাঙলায় শরিকী কলহ যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তায় ইতি টেনেছে (বাপস রে, এতোবড় রাজনীতি বুঝেও পি-এস-পি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালে স্পষ্টত দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ব্যাকুলভাবে স্বতন্ত্র-জনসঙ্ঘের হাত ধরেও ফাঁপরে পড়েছিল অবশেষে)। তবে শ্রীভাসিন বস্তুত একটা আশার আলোও দেখতে পেয়েছেন, তা হল, সি-পি-আই'-এর জাতীয় পরিষদের প্রস্তাব নাকি স্পষ্টতই যুক্তফ্রন্টকে কংগ্রেসের বিকল্পরূপে আর বিশ্বাস করছে না। (ভাসিনজী সি-পি-আই কেও চিঠি দিতে পারতেন)। ভাসিন বলছেন, সি-পি-আই কংগ্রেস ও শ্রীমতী গান্ধীর অনুকূলে কাজ করার কথাই বলছেন। (তবে আর দুঃখটা কোথায়? কংগ্রেসের কিছু মাতব্বর পি-এস-পি'তে ঢুকে ভাসিনজীকে বাধিত করছেন না, তাই?) সি-পি-এম সম্পর্কে ভাসিনের বক্তব্য: ও'রা আবার গণতন্ত্রের পক্ষে ভয়াবহ।

সি-পি-এম সম্পর্কে এ্যানালিসিসটা কি ঠিক হ'ল? অতি বিপ্লবীরা যে অন্য কথা বলে? সি-পি-এম'এর মধ্যেও এই নিয়ে বিতণ্ডার সৃষ্টি হচ্ছে বলেই তো সংবাদ। তাছাড়া তাঁরা তো দুটো রাজ্যে গণতন্ত্র বজায় রেখে দিব্যি মন্ত্রিত্ব করছেন। আসলে ভাসিনজীর দল এখনও রাজনৈতিক বিবর্তনের বিভ্রান্তিটুকু যথার্থ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। তবুও একটা ফ্রন্ট গঠনের নেতৃত্ব করার বাসনা তাঁদের বড়ই উত্তেজিত করে তুলছে থেকে থেকে।

সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র বাসনা।

চণ্ডীগড় :

একটি নয়া সমস্যা

চণ্ডীগড়কে নিয়ে পাঞ্জাবে শ্রীদর্শন সিং

ফেরুমান আর হরিয়ানার শ্রীউদে সিং মান অনশনের যে টাগ অব ওয়ার শুরু করেছেন, তাথার ভিত্তিতে পাঞ্জাব পুনর্গঠনের সময় এমন সম্ভাবনা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। হরিয়ানার নেতৃত্ব তখন চণ্ডীগড়কে নিয়ে এভাবে টানা-পোড়েন করেন নি। বরং চেয়েছিলেন ফিরোজপুর জেলার ফাজিলকা তহশীলকে হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত করে চণ্ডীগড়ের জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিয়ে নতুন রাজধানী শহর গড়ে তুলতে। হরিয়ানার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভগবৎ দয়ালও সেদিন সম্ভবত এই সমাধানকে সামনে রেখেই চণ্ডীগড় সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ মেনে নিয়েছিলেন মোটামুটিভাবে। কিন্তু কালক্রমে ভগবৎ দয়ালের মন্ত্রিসভা আর রইল না। রাও বীরেন্দর সিং এলেন যুক্তফ্রন্ট নিয়ে। ফলে চণ্ডীগড়কে আবার একটা ইস্যু করা হ'ল। হরিয়ানার মানুষকে ভাববার মতো একটা ইস্যু উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী রাও বীরেন্দর সিং। চমৎকারিণী চণ্ডীগড়কে নিয়ে চলল দাবি আর প্রতি-দাবি। বীরেন্দর সিং স্বপক্ষে যুক্তি দর্শালেনঃ শাহ সীমানা কমিশনের সুপারিশকে অগ্রাহ্য করে হরিয়ানার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে চণ্ডীগড়। রাজনৈতিক হাওয়া পরিবর্তিত হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। বিধানসভায় সর্বসম্মত পাশ হ'ল চণ্ডীগড় হরিয়ানার, চণ্ডীগড় চাই। সেই চণ্ডীগড় চাই, যার জন্য সন্ত ফতে সিং অনশন করেছিলেন এবং নিজেকে জীবন্ত দগ্ধ করার পণ নিয়েছিলেন। ফতে সিং চণ্ডীগড়কে পাঞ্জাবের সঙ্গেই রাখতে পেরেছিলেন।

এখন পুরনো ইতিহাসে নতুন রঙ ধরেছে। পাঞ্জাবে চণ্ডীগড় ইস্যু নিয়ে সন্ত ফতে সিং-এর জয়জয়কার হয়েছিল। আকালি নেতৃত্বে তিনি পেয়েছিলেন মহান প্রতিষ্ঠা। অতঃপর ফেরুমান এণ্ড কোম্পানী তাঁকে ম্লান করে দিয়ে পাঞ্জাব রাজনীতির আসর দখল করতে এগিয়ে এসেছেন। অন্যদিকে চণ্ডীগড় ইস্যু হরিয়ানার মন্ত্রিসভা ভাঙাগড়ার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সন্তের অন্তরালে মেঘের বাতাবরণ সৃষ্টি ও তার দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধিও সন্ত-বিরোধী ক্যাম্পের লক্ষ্য বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। তাঁরা, এমন কি পাঞ্জাব কংগ্রেসকেও এই চতুরালির অংশীদার বলে গণনা করছেন।

অর্থাৎ চণ্ডীগড় আজ একটি রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত, যার ওপর ধার দিয়ে যাচ্ছেন একাধারে সন্ত-বিরোধী আকালি-উপদল এবং কংগ্রেস। অন্যদিকে হরিয়ানার ক্ষমতালোভী নেতৃত্ব।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের এহেন যুক্তির সারবত্তা, ধীরভাবে চিন্তা করলে, বস্তুতই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু একই রাজনৈতিক কৌশলকলার জন্য কেন্দ্রও নীরব দর্শকের ভূমিকায় চণ্ডীগড় নিয়ে উত্তাপ বাড়তে দিচ্ছেন, যা দুই সীমান্ত রাজ্যের পক্ষে তো বটেই, সমগ্র দেশের শুভাশুভের ক্ষেত্রেও আতঙ্কের বীজ বপন করছে। চণ্ডীগড় সম্পর্কে সমগ্র ভারতের স্বার্থে সে জন্যই কেন্দ্রের তরফে অবিলম্বে নীতি ঘোষণার একান্ত প্রয়োজন, যা না হলে বিভেদ-সাম্প্রদায়িকতার বান আবার ডাকতে পারে। —১৩।৯।৬৯

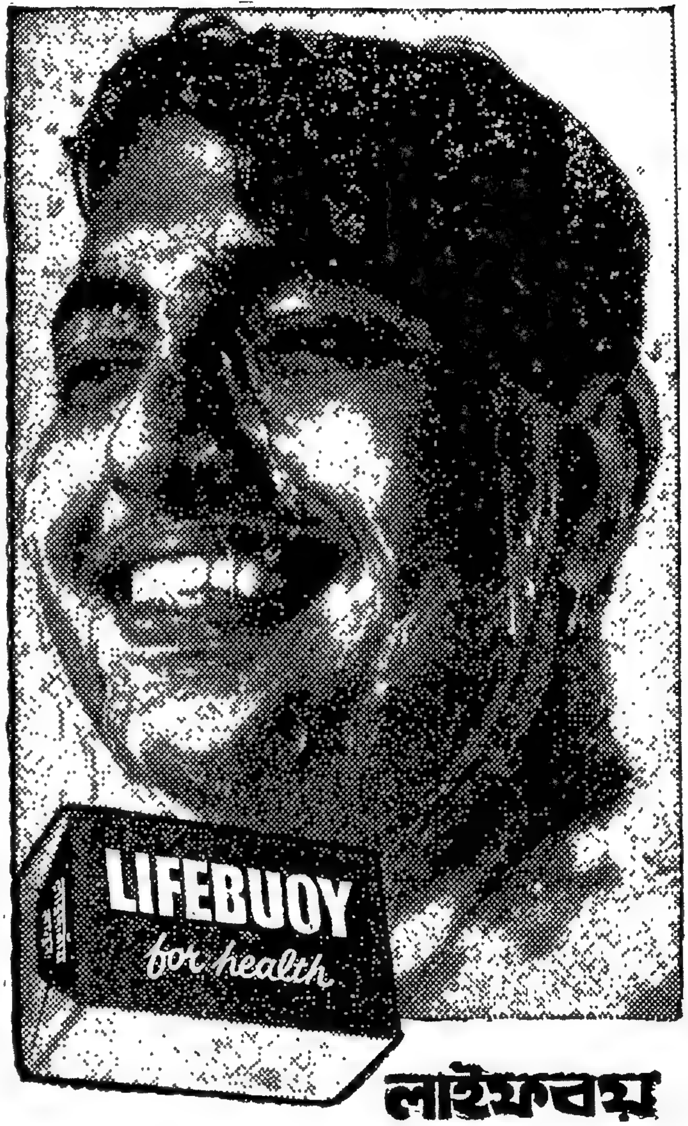

লাইফবয়

যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন।
এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভালো
সাবানের সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবয়ে
তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে।

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী।

আন্তর্জাতিক

মধ্যপ্রাচ্যে গুরুতর সংঘর্ষ

গত সপ্তাহে আরব-ইসরাইল সংঘর্ষ আবার বেশ গুরুতর আকার ধারণ করেছে। ১৪ই সেপ্টেম্বর ইসরাইলী জেট বিমান সুয়েজ উপসাগরের পশ্চিম তীরে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করেছে। রাস জোহারানা এলাকায় ৫০ মিনিট ধরে এই বোমাবর্ষণ চলে। এই নিয়ে এই সপ্তাহে ইসরাইল পাঁচ বার সুয়েজ উপসাগরে আক্রমণ চালালো। এর আগে ১৩ই সেপ্টেম্বর মিশরী বিমান সুয়েজ উপসাগরের পূর্ব উপকূলে এবং দক্ষিণ সিনাইতে ইসরাইলী লক্ষ্যবস্তুর ওপর বোমাবর্ষণ করেছিল বলে মিশরী মুখপাত্র এই ঘোষণা করেন কিন্তু ইসরাইলী মুখপাত্র এই আক্রমণের কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আকাশে মিশরীয় বিমান দেখা গিয়েছিল বটে, কিন্তু কোন বোমা পড়ে নি। অবে ইসরাইলী বিমান যথারীতি মিশরীয় ঘাঁটির ওপর বোমা ফেলে যাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে সাত-আটদিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে নানা ক্ষেত্রে এই ধরণের সংঘর্ষ চলেছে। ইসরাইলের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী জেনারেল মোসে ডায়ান বলেছেন যে, এই ধরণের আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে বলে তিনি মোটেই আশা করেন না।

ইসরাইল অধিকৃত এলাকায় আরবদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা তদন্তের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ সিংহল যুগোশ্লাভিয়া এবং সোমালিয়াকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন। ইসরাইলী মুখপাত্র বলে দিয়েছেন যে, তাঁরা ঐ কমিটির তদন্তের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করবেন না, তবে কমিটির সঙ্গে সহযোগিতাও করবেন না।

আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর রবটে মুসলিম শীর্ষ সম্মেলন হবার কথা। সৌদি আরবের রাজা ফৈজল তাতে যোগ দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এদিকে প্রেসিডেন্ট নাসের সেই সম্মেলন স্থগিত রাখবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি চিকিৎসার জন্য ২৩শে সেপ্টেম্বর মস্কোয় যাচ্ছেন। তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগছেন বলেই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা কিন্তু নাসেরের অনুরোধ রাখতে পারছেন না। মরক্কোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, নাসের না আসতে পারলেও যথাসময়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন স্থগিত রাখার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

ইরান-ইরাক সংঘর্ষ

ইরাক আর ইরানের সীমানা দিয়ে বয়ে গেছে সাট-আল-আরব নদী। আমাদের কবি নজরুল এই নদীর প্রশস্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বিখ্যাত একটি সংগীত রচনা করেছিলেন—"সাতিল আরব, সাতিল আরব, পূত যুগে যুগে তোমার তীর"। কিন্তু সেই সাট-আল-আরব নিয়েই আজ ইরান-ইরাক সশস্ত্র সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। এই নদীর জলে নৌ-চলাচলের অধিকার নিয়ে ১৯৩৭ সালে এক চুক্তি হয়েছিল। গত এপ্রিল মাসে ইরান একতরফাভাবে সেই চুক্তি বাতিল করে দেয়। তারপর থেকেই দুই দেশের মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর দুই দেশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ বেধে যায়। তাতে নাকি ৩০ জন ইরানী মারা গেছে এবং ১৪ জন হয়েছে বন্দী। এ ছাড়া বহু সাজ-সরঞ্জামও নাকি ইরাকী সীমান্তরক্ষীদের হস্তগত হয়েছে। ইরাক অভিযোগ করেছে যে, ইরানে ইহুদী প্রভাব প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। ইরাকী বেতারে ইরানের শা'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য সেদেশের অধিবাসীদের আহ্বান জানানো হয়েছে। ইরানে সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান বেশি, আর ইরাকে সুন্নী। উভয় দেশই পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, সেখানে সংখ্যালঘুদের ওপর পীড়ন করা হচ্ছে।

চৌ-কোসিগিন সাক্ষাৎকার

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন রাষ্ট্রপতি হো চি মিনের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে যোগদান সেরে হ্যানয় থেকে ফেরার পথে এক ঘণ্টার জন্য কলকাতায় নেমেছিলেন। এখান থেকে ফেরার পথে হঠাৎ তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে ১১ই সেপ্টেম্বর চীনের রাজধানী পিকিং-এ গিয়ে হাজির হন। সেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্টুশেভ। ইনি অন্যান্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েতের সম্পর্ক দেখাশোনা করে থাকেন। কোসিগিনের অপর সঙ্গী ছিলেন সুপ্রীম সোভিয়েত প্রিসিডিয়ামের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইকেল ইয়াসনভ। পিকিং-এর বিমান বন্দরের একটি কক্ষে কোসিগিনের দলের সঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এবং সহকারী প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন নিয়েন এবং সিয়ে ফুজির সঙ্গে দীর্ঘকাল আলোচনা হয়। সরকারিভাবে কোন পক্ষই আলোচনার বিষয়বস্তু প্রকাশ করেন নি। তবে চীনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে, যে আলোচনা উভয়পক্ষের ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয়েছে।

সম্প্রতিকালে বিশ্বের দুই বৃহত্তম কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত আর চীনের বিরোধ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিরোধ গোড়ায় গোড়ায় চাপা থাকলেও গত কয়েক বছর প্রকাশ্য বাক-বিতণ্ডায় তা আত্মপ্রকাশ করেছেই উপরন্তু বেশ কয়েকটি চীন-সোভিয়েত সীমান্ত বিরোধের ঘটনাও ঘটেছে। অর্থাৎ ঠাণ্ডা লড়াই গরম লড়াইয়ের রূপও নিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, চীন-সোভিয়েত বিরোধকে কেন্দ্র করে সারা দুনিয়ার কম্যুনিস্ট আন্দোলনও আজ দ্বিধাবিভক্ত। ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট পার্টিও সেই বিভেদের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

১৯৬৫ সালে শেষ চীন-সোভিয়েট শীর্ষ সম্মেলনের পর এই প্রথম আবার

কোসিগিন

চৌ এন লাই

নাটকীয়ভাবে দুই দেশের শীর্ষ সম্মেলন ঘটল। বে-সরকারীসূত্রের খবরে প্রকাশ, চীন-সোভিয়েত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য কোসিগিন চৌয়ের কাছে দুই দেশের একটি সম্মেলনের প্রস্তাব করেছিলেন। চীনের নেতারা নাকি তাতে রাজী হয়ে যান। তাঁরা নাকি শুধু সীমান্ত বিরোধে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে "সমগ্র আঞ্চলিক প্রশ্ন" নিয়েই আলোচনায় বসতে চেয়েছিলেন।

মনে হয়, এই আলোচনার প্রস্তুতি-পর্ব সমাধা করবার জন্যই চৌ এন লাই হো চি মিনের মৃত্যুর পর হ্যানয়ে আসা সত্ত্বেও তাঁর অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের আগেই পিকিং-এ ফিরে গিয়েছিলেন।

দিল্লীর রাজনৈতিক মহলের ধারণা, কোসিগিন চীন-সোভিয়েত সীমান্ত সংঘর্ষের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে চীনকে সজাগ করবার জন্যই পিকিং-এ গিয়েছিলেন। সোভিয়েত চীনের পারমাণবিক অস্ত্রাগার উড়িয়ে দিতে পারে বলে যে গুজব রটেছিল, সেটা যে ভিত্তিহীন, তাও নাকি তিনি চৌকে জানিয়ে দিয়েছেন।

ই...

পিকিং-এর রাজনৈতিক মহলের ধারণা, উত্তর ভিয়েতনামের উদ্যোগেই এই বৈঠক সম্ভব হয়েছে। হো চি মিন তাঁর উইলে বিশ্ব কম্যুনিস্ট সংহতির আবেদন জানিয়ে ভিয়েতনামী কম্যুনিস্ট পার্টিকে সে ব্যাপারে উদ্যোগী হতে বলে গেছেন। হো'র শেষ ইচ্ছা পূরণের দাবি অগ্রাহ্য করা সোভিয়েত অথবা চীনের পক্ষে বোধ হয় সম্ভব ছিল না।

ভারতের পররাষ্ট্রদপ্তরের মুখপাত্র চীন-সোভিয়েট শীর্ষ বৈঠকে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন যে, দুই দেশের বিরোধ মিটে গেলে তাঁরা সুখী হবেন। বর্তমান বৈঠকের কথা তাঁরা আগে না জানলেও রুশ নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ের আলোচনায় ভারতীয় নেতারা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে এই ধরণের চীন-সোভিয়েত বৈঠকের প্রস্তাব করেছেন।

চীন-সোভিয়েত বৈঠকের পর ভারত-চীন শীর্ষ বৈঠকের কোন সম্ভাবনা আছে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী বারংবার ঘোষণা করেছেন যে, ভারত চীনের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা করতে সব সময়ই প্রস্তুত কিন্তু চীনের দিক থেকে সে ব্যাপারে কোন সাড়া পাওয়া যায় নি।

সংবাদ ও সাহিত্যে অদ্বিতীয়

শারদীয়

সাপ্তাহিক বসুমতী

(১৩৭৬)

॥ বিদগ্ধ ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকার সর্বোৎকৃষ্ট আকর্ষণ ॥

বাংলাদেশের তিনজন দিকপাল ঔপন্যাসিকের সুবৃহৎ তিনটি উপন্যাস

শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের শ্রেষ্ঠ গল্প

গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর স্মৃতিচারণে এদেশে বিপ্লবের ভূমিকা ও বিপ্লবীযুগ

উদ্দীপ্ত হাসির ছটায় দীপ্ত গল্প

বহুখ্যাত লেখকদের অজ্ঞাতপূর্ব রোমাঞ্চকর অন্তরঙ্গ জীবন

একটি দুর্লভ কাব্যকাহিনী

তামিল বনাম সংস্কৃত ভাষার অভিভাবকত্ব নির্ধারণে বিশ্ববরেণ্য ভাষাবিদের (অপ্রকাশিত) তীক্ষ্ণ বিচার ও মৌলিক সিদ্ধান্ত

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি এবং যুগ-সমীক্ষায় সমাজ ও সংস্কৃতি

প্রচুর ছবিসহ বিশেষ আকর্ষণীয় বিবিধ রসাল নিবন্ধে নাটক ও নাট্যকার, অভিনয় জগৎ-অভিনেতা ও অভিনেত্রী, আর খেলাধূলো

সাংবাদিকের স্মৃতিকথায় তিক্তমধুর অভিজ্ঞতা

মহাকাশের চিকিৎসাবিধি

এছাড়া

পূর্ববঙ্গের কবি[illegible] অন্য কয়েকটি কবিতা

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তিন দিন কলকাতা সফর করে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর তিন দিন কলকাতা ভ্রমণ, তাঁর তিন দিনে বলা কথা, আর প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে রাজ্য কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব—সব মিলিয়ে এই তিনটি দিনের ইতিহাস রাজ্য রাজনীতিতে শুধু নয়, সারা ভারতের রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস রচনার ইঙ্গিত রেখে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা আগমনের অনেক আগে থেকেই সারা ভারতে যে রাজনীতির কঠিন প্রশ্নগুলি জনমনে সৃষ্টি হয়েছিল—তার সব জবাব প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় থেকে দিয়ে গেলেন। কিন্তু সারা ভারতের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আমরা রাজ্য কংগ্রেসের পরিস্থিতিটা একটু হিসেব করে দেখতে চাই।

প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সিণ্ডিকেটপন্থী ও সিণ্ডিকেট-বিরোধীরা যে যুদ্ধে নেমেছিল, সেই যুদ্ধের কি হল সেটাও একটু হিসাব করে দেখা দরকার। প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা আসবার আগেই রাজ্যের সিণ্ডিকেট বিরোধীরা স্পষ্ট নীতি হিসাবে নিয়েছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর আগমন, সম্বর্ধনা ও অন্যান্য কোন অনুষ্ঠান সংগঠনে সিণ্ডিকেটপন্থীদের আমল বা পাত্তা দেবেন না, তাই প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে উপলক্ষ করে গঠিত হয়েছিল এক অভ্যর্থনা সমিতি। এই অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে [illegible] দূরে রাখবার [illegible] দুটো [illegible] প্রক[illegible]

[illegible] ঘোষ ময়দানের সভায় ভাষণ দিতে পারবেন না, এমন কি মঞ্চের কাছেও যেতে পারবেন না। এই দুই চরম দুঃসাহসী প্রস্তাব একদা কল্পনার বাইরে ছিল অথবা এমন কোন রসনাধারীর কথা কল্পনা করা যেত না—যিনি পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই জাতীয় কথা উচ্চারণ করতে পারেন। কিন্তু দিনের পরিবর্তনে শুধু উচ্চারিতই হল না, দুঃসাহসী সর্ত প্রায় কাজে রূপও পেল।

প্রথমে ধরা যাক অধ্যাপক চন্দ্রের প্রসঙ্গ। অধ্যাপক চন্দ্র তাঁর [illegible] প্রত্যাহার না করলে সভাপতি [illegible]

যা বলেছেন, তার কিছুই সত্য নয়—তিনি কিছুই বলেন নি। কিন্তু শ্রীসিদ্ধার্থ রায়, শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা তবু যখন বাগে এলেন না, তখন শুরু হল সিণ্ডিকেটপন্থীদের চাপ। কংগ্রেস ভবনে বিক্ষোভ, অনশন, ঘেরাও—আরও কত কি? এমন কি অধ্যাপক চন্দ্র শেষ পর্যন্ত বলে দিলেন যে, তিনি শ্রীমতী গান্ধীর কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না। এই সবই ঘটতে শুরু করল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর আগমনের দু'দিন আগে। এই সাঁড়াশী আক্রমণ, এই বিক্ষোভ সবেরই মাধ্যমে একটা নগ্ন কাঙালপনা প্রকাশ পেল। সেটা হল ময়দানের সভায় অধ্যাপক চন্দ্রকে সভাপতি করতে হবে। কিন্তু একটু রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বা চক্ষুলজ্জা থাকলে সিণ্ডিকেটপন্থীরা অনায়াসে নিজেদের সতর্ক স্থানে রাখতে পারতেন—তার জন্য ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর পাশে বিরস বদনে বসে থাকবার জন্য এত বিক্ষোভ, এত ঘেরাও, কোন কিছুরই দরকার হতো না। কারণ প্রধানমন্ত্রী আসছেন এই সংবাদ শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কাছে শোনা মাত্রই তো অধ্যাপক চন্দ্র বলতে পারতেন, প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করার আগে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার ছিল—কাজেই এইভাবে রাজ্য কংগ্রেসের সঙ্গে কথা না বলে প্রধানমন্ত্রীর আগমন বা তাঁকে নিয়ে অনুষ্ঠান কোনটাতেই রাজ্য কংগ্রেস নেই। কিন্তু গাল বাড়িয়ে চড় খেয়েও সতর্ক [illegible] পরে অনেক জল [illegible] আসছেন [illegible] না

পশ্চিমবঙ্গে যাচ্ছ, কাজেই কর্মসূচী যা করার, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে করুন। এই পত্র পাবার পরও কি করে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন সেটা বোঝা ভার। যেমন বোঝা ভার—২৪ ঘণ্টা আগে প্রধানমন্ত্রীর কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করব না ঘোষণা করে, সেই যখন তাঁকে সভাপতি করা হবে বলা হ'ল, অমনি পাল্টে গেল মতটা!

সিণ্ডিকেটপন্থীদের সামনে দ্বিতীয় সর্ত রেখেছিলেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যে, শ্রীঅতুল্য ঘোষ ময়দানের কাছেও আসতে পারবেন না, ভাষণ দিতে পারবেন না। আমার প্রশ্ন—এত বড় অপমানকর কথা মেনে নিয়ে, হজম করে অধ্যাপক চন্দ্র ময়দানের সভায় সভাপতিত্ব করতে গেলেন কিভাবে। শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্পর্কে যে বক্তব্য, যে রাজনৈতিক অভিযোগ যারই থাকুক না কেন, শ্রীরায়ের এই কথা প্রত্যাহৃত হওয়া দূরে থাক, আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে জেনেও অধ্যাপক চন্দ্র ময়দানের সভায় সভাপতিত্ব করতে গেলেন, কংগ্রেস ভবনে নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন শেষ সময়েও কিছুটা শ্রীঅতুল্য ঘোষের ইজ্জৎ বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন। ১২ই সেপ্টেম্বর শ্রীমতী গান্ধীর আগমনের দিন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রথমে টেলিফোন করলেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে। শ্রীসেন বললেন—মানু, এইবার অতুল্যকে ময়দানের সভায় থাকতে অনুরোধ কর। সিদ্ধার্থ রায় সাফ জবাব দিলেন—সে হবে না, শ্রীঅতুল্য ঘোষ চলবে না, শ্রীঅতুল্য ঘোষের কোন ইমেজ নেই। ক্ষেপে গেলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, বললেন—অতুল্যর ইমেজ নেই, ইমেজ আছে তোমার, সাত ফুট লম্বা হলেই বুঝি ইমেজ হয়। তারপরই চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন—"তুমি যে অনুষ্ঠান সংগঠন করেছ, তার কোনটাতেই আমি যোগ দেব না, কারণ তোমার ব্যবহার ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও ডিক্টেটরসুলভ। শ্রীসেন তাঁর কথা রাখলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর মুখদর্শন করেন নি, আর শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় শ্রীসেনের এই পত্রখানির কোন জবাব দেওয়া দূরে থাক, কোন মূল্য দিয়েছেন এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি।

আমার দীর্ঘকালের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কোন একটি দৈনিক পত্রের রাজনৈতিক সংবাদদাতা এক দীর্ঘ নিবন্ধ লিখে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, সম্প্রতি রাজ্য কংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে যুদ্ধে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ভয়ানকভাবে হেরে গেছেন আর অধ্যাপক চন্দ্রের জয়জয়কার। রাতকানাদের সম্পর্কে একটা কথা হল, তারা শুধু রাতেই চোখে দেখে না। কিন্তু যারা দিনকানা, তারা রাতেও দেখে না—দিনেও দেখে না। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতিকে অপমান, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে অপমান, শ্রীঅতুল্য ঘোষকে অপমান—সব মাথায় করে ময়দানের সভায় সভাপতি হওয়া হ'ল জয়, আর নোড়া দিয়ে একটা একটা করে দাঁত ভেঙে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে বাংলাদেশ জয় করিয়ে নিয়ে গেলেন—সেটা হ'ল পরাজয়? তবে এর মধ্যে একজন মাত্র মানুষের কথা নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা যায়—তিনি অতুল্য ঘোষ, যিনি কলকাতায় ছিলেন সর্ব সময়ের জন্য, দেখেছেন, শুনেছেন সব, কিন্তু একটি কথা বলেও নিজের সম্মান বিপন্ন করেন নি। প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা ত্যাগের চার ঘণ্টা পর কলকাতা ত্যাগ করে গেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কলকাতা ভ্রমণের অপর তাৎপর্য হ'ল—প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি কথায় তিনি বাংলাদেশের মানুষ ও মনীষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়ে গেছেন আর সেই সঙ্গে একটি কথা খুবই জোর দিয়ে বলেছেন বারে বারে। সেই কথা হল—বাংলাদেশ অতীতে ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে, আজও পথ দেখাক। শ্রীমতী গান্ধী হলেন সেই নেত্রী, যিনি একদা কেরলের যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে ভেঙে ছিলেন আর আজ পশ্চিমবঙ্গে এসে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট রাজত্বে দাঁড়িয়ে বলেছেন—পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতকে পথ দেখাক। প্রধানমন্ত্রী তিন দিন থেকে কলকাতায় কংগ্রেস কংগ্রেস বলে যেমন হাঁক-ডাক ছাড়েন নি, তেমনি একবারও পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সরকার সম্পর্কে, আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে বা এই জাতীয় যে কথাগুলি সচরাচর বলা হয়, তার সম্পর্কে কোন কথা উচ্চারণ করেন নি। কম্যুনিস্ট বা যুক্তফ্রণ্ট প্রভৃতির বিরুদ্ধে কোন প্রকার জেহাদের কথা না বলে বরং প্রধানমন্ত্রী কি কংগ্রেস ভবন, কি রাজ ভবন, কি ময়দান সর্বত্রই বলেছেন—পশ্চিমবঙ্গকে তিনি সাহায্য করবেন, সহায়তা করবেন। সমালোচনা যদি তিনি কারো করে থাকেন, তা তিনি কংগ্রেসেরই করেছেন। ময়দানের সভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের আগে অধ্যাপক চন্দ্র বলেছিলেন—শুধু কয়েকটি ব্যাংক নয়, আরও অন্যান্য ব্যাংক জাতীয়করণ, রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিতে উঠে বলেন—কিছু কংগ্রেসী এখন আরও বেশি প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আওয়াজ তুলছেন—এ'রাই আবার ব্যাংক জাতীয়করণের সময় তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। অন্য আরও কয়েক স্থানে তিনি কংগ্রেসের এই অবক্ষয়মূলক ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী কলকাতা এসে কিন্তু একবারও বলেন নি—কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধ সব মিটিয়ে ফেলতে হবে, আপোষের পথে যেতে হবে। তিনি জানতেন রাজ্য কংগ্রেসের সংগে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের বিরোধ কোথায়—তিনি জানতেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কলকাতায় আছেন, কিন্তু একথাবও এই দুই নেতার নাম উচ্চারণ করেন নি; এমন কি মনে করিয়ে দিলেও না। প্রধানমন্ত্রী তিন দিনে অজস্র কাজ করেছেন, অনেকের সঙ্গে কথা বলেছেন, সর্বতোভাবে বাংলাদেশের মন জয়ের চেষ্টা করেছেন। শুধু করেন নি রাজ্যের সিণ্ডিকেটপন্থীদের সংগে আপোষের কোন চেষ্টা। প্রেস ক্লাবের ভিজিটার বুকে বাংলায় নিজের নাম লিখে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে এসে বাঙালীর সংগে নতুন করে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে গেছেন—যেটা প্রধানমন্ত্রীর বাংলা ভ্রমণের অন্যতম তাৎপর্য হয়ে রইল।

—১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

বসুমতীর
যাবতীয়
গ্রন্থ ও
গ্রন্থাবলীর
প্রাপ্তিস্থান
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২
এবং
সান্যাল এণ্ড কোং
১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

প্রীতিলতার শেষ বিবৃতি

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ সম্বন্ধে চট্টগ্রাম বিপ্লবী সংগঠনের পক্ষ হতে সংগৃহীত সমস্ত তথ্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। চট্টগ্রামে তখনকার দৈনিক 'পাঞ্চজন্য' থেকেও ঐ বিষয়ের উদ্ধৃতি প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের অবহিত থাকা উচিত যে, একই ঘটনা যখন বিভিন্ন ব্যক্তি বা পত্র-পত্রিকা মারফৎ প্রকাশিত হয়, তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে কিছু না কিছু ব্যতিক্রম দেখা দেবেই। আমি কিন্তু ঘটনার সত্যতা যাচাই করবার জন্য অ্যাক্‌শানে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের বর্ণনাকেই বরাবর অগ্রাধিকার দিয়েছি। যে সমস্ত পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতি প্রকাশিত হোল, তার সঙ্গে বর্ণনার কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও সেটা আমি উপেক্ষণীয় বলেই মনে করেছি।

হাইকোর্টে মাস্টারদাব বিচারের রায়ের সরকারী দলিলে যেসব ঘটনার বর্ণনা দেখা যায়, তার মধ্যে এখানে বিশেষ একটির উল্লেখ বাঞ্ছনীয় মনে হয়। মুদ্রিত জাজ্‌মেণ্ট বইএর ২৪১ পৃষ্ঠায় Mr. Batra-র সাক্ষ্য সম্বন্ধে হাই-কোর্টের মাননীয় বিচারপতিরা যা লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে দেখছি:

"....Mr. Batra has proved that there was a Whist Drive at the European Institute at Pahartali on 24.9.32 and, according to P.W. 29 there were about 40 Ladies and Gentlemen present. About 10 p.m. there was a sudden explosion in the Hall and the room was filled with smoke. Shots were heard and attempt was made to take cover. This witness saw someone firing a gun or rifle on the verandah, and heard reports of firing from other sides of the building. When the firing ceased he found Mr. Rosario and Mrs. MacDonald wounded and assisted in giving first-aid and taking them to hospital. On return he found that Mrs. Sullivan had been killed and saw two bombs."

এই উদ্ধৃতির বাংলা সংক্ষিপ্তসার "পাঞ্চজন্য" পত্রিকা থেকে আগেই লেখা হয়েছে।

আর একজন সাক্ষী যা বর্ণনা দিয়েছিলেন হাইকোর্টের জাজ্‌মেণ্টে আমরা তারও উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি। যথা:

"P.W. 86, the Officer-in-Charge, Double Moorings Thana, got news of the Raid about 11-30 p.m. and proceeded to the Institute. He found the dead body of Mrs. Sullivan and found the place in a state of disorder, with the walls, doors and furniture splintered. He found many fragments of bombs and some exploded bombs. He prepared a list of things found in presence of Mr. Nolan, P.W. 87."

এখানে আমরা বোমা বিস্ফোরণে ক্লাব-ঘরের ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা পাচ্ছি। তারপর Mr. Nolan যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তার সারমর্মও মাননীয় বিচারপতিরা নিম্নলিখিতভাবে তাঁদের জাজ্‌মেণ্টে লিপিবদ্ধ করেছেন:

"Mr. Nolan found two persons wounded infront of the Institute and the dead body of Mrs. Sullivan. He saw the damage caused to the walls, floor and furniture. He saw also the dead body of an Indian woman dressed in male attire about two yards from the Institute. He learnt later that she was Pritilata Waddader and he was present at the search of her person by P.W. 17."

Mr. Nolan-এর সাক্ষ্য থেকে বিস্ফোরণে মৃত প্রীতিলতার ও সুলিভানের বিবরণ পাচ্ছি। একজন সিভিল সার্জেন এবং আরও একজন ডাক্তার প্রীতিলতার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট যা দিয়েছেন সেই সম্বন্ধেও মাননীয় বিচারপতি লিখেছেন:

"P.W. 155 Capt. Sen Gupta who was acting as Civil Surgeon, assisted in an inquest on Mrs. Sullivan, whose death was due in his opinion to shock and hæmorrhage caused by gunshot wounds. This witness examined also 11 other persons, three Ladies and 8 Gentlemen, who had all injuries caused, in his opinion, by fragments of bombs or gunshot. A number of the injuries were dangerous in nature, whilst the large majority were severe.

"P.W. 34 held a postmortem examination on the dead body of Pritilata Waddader. The only injury found was....due to some blunt penetrating substance. An examination of the stomach and intestines indicated that death was due to poisoning and so the stomach and viscera were sent to the Chemical Examiner, whose report is Ex. 57. From this the witness has given his opinion that Pritilata's death was suicidal and caused by Cyanide of Potassium poisoning."

মাননীয় বিচারপতিদের জাজ্‌মেণ্টে আরও অন্যান্য সাক্ষীদের বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। সব বিবরণগুলিই মোটামুটি একই ধরণের। সেই জন্যই আমি অন্যান্যগুলি আর উল্লেখ করলাম না। প্রীতিলতার মৃতদেহের সঙ্গে প্রাপ্ত বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে প্রীতির নিজের হাতে লেখা একটি বিবৃতি ছিল। জাজ্‌মেণ্ট কপিতে দেখা যাচ্ছে:

"Lastly there was found a statement in manuscript Ex. 56 which we are satisfied from the evidence of P.Ws. 170 and 48 as well as by our personal comparison with the specimen writing Ex. 328 taken by P.W. 166 to be in the writing of Pritilata This statement appears to us of much importance that we quote it *in extenso* as follows."

প্রীতিলতার মৃতদেহ তল্লাসী করে পাওয়া বিবৃতিটির ওপর মাননীয় বিচারপতিরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে তাঁদের জাজ্‌মেণ্টে বিবৃতিটির পুরোপুরি উল্লেখ করেছেন। বিবৃতিটি অনুরূপ:

"'LONG LIVE THE REVOLUTION'.

"I solemnly declare I belong to the Chittagong Branch of the Indian Republican Army whose lofty ideal is to liberate my mother-country from the yoke of the tyranical exploiting and imperialistic British Government and to establish a Federated Indian Republic instead. This remarkable Chittagong party has captured the imagination of the youths and has given a new impetus to the Revolutionaries of Bengal, nay of the whole of India by its unprecedented display of the memorable 18th April, 1930, and its subsequent heroic achievements on the holy Jalalabad hill, at Samirpur, at Feni, at Chandannagar, at Chandpur, at Dacca, at Comilla and at Dhalghat. I feel proud that I have been thought fit to be a member of such a glorious party.

"We are fighting freedom's battle. To-day's action is one of the items of that continued fight. British people have snatched away our independence, have bled India white and have played havoc with the lives of millions of Indians both male and female. They are the sole cause of our complete ruin—moral, physical, political and economic—and thus have proved the worst enemy of our country the greatest obstacle in the way of recovering our independence. So we have been compelled to take up arms against the lives of any and every member of the British community, official or non-official, though it is not at all a pleasant thing to us to take the life of any human being. In a fight for freedom we must be

ready to remove, by any means whatsever every obstacle that stand in our way.

"When I was summoned by Great 'Masterda' the venerable leader of my party to join to-day's armed raid I felt myself fortunate enough seeing my long-felt hankering fulfilled at last and accepted the task with full sense of responsibility. But when I was asked by that exalted personality to lead the raid, I felt diffident and protested by saying why a sister should take the lead when so many able and experienced brothers were present. Masterda soon convinced me by his able arguments and I took my leader's command on my head and invoked the Almighty Father, whom I have adored since my childhood, to assist me in discharging my grave duty.

"I think I owe an explanation to my countrymen. Unfortunately there are still many among my countrymen who may be shocked to learn how a woman brought up in the best tradition of Indian womanhood has taken up such a horrible deed as to massacre human lives. I wonder why there should be any distinction between males and females in a fight for her cause (*sic*) why not the sisters? Instances are not rare that the Rajput ladies of hallowed memory fought bravely in the battle field and did not hesitate to kill their country's enemies. The pages of history are replete with high admiration for the heroic exploits of these distinguished ladies. Then why should we, the modern Indian women, be deprived of joining this noble fight to redeem our country from foreign domination. If sisters can stand side by side with the brothers in a Satyagraha movement, why are they not so entitled in a revolutionary movement? Is it because the method is different or because females are not fit to take part in it? As regards the method, i.e., armed rebellion it is not a novel method. It has been successfully adopted in many countries and the females have joined it in hundreds. Then why should India alone regard this method as an abominable one? As regards fitness, is it not sheer injustice to the females that they will always be thought less fit and weaker than the males in a fight for freedom? Time is come when this false notion must go. If they are yet less fit it is because they have been left behind.

"Females are determined that they will no more lag behind and stand side by side with their brothers in any activities however dangerous or difficult. I earnestly hope that my sisters will no more think themselves weaker and will get themselves ready to face all dangers and difficulties and join the revolutionary movement in their thousands.

"Now I shall briefly relate how I was drawn into the revolutionary organisation.

"When I was studying in the Matriculation class in the Dr. Khastagir's Girls' School, I got an idea of a revolutionary organisation in Chittagong and was told that there was a very powerful man, endowed with many qualities befitting a revolutionary leader, at the helm of this organisation.

"During the two years stay at Dacca for my Intermediate Course I was engaged in preparing myself as a fit comrade of the Great Masterda. However I did not neglect my study and in the year 1930, I passed the Intermediate Examination standing first among girls and fifth in the General Competition.

"It was the morning of the 19th April, 1930 when I came home after the examination and heard of the glorious activities (of the previous night) of the Chittagong heroes. My heart was filled with deep admiration for these great souls. But it

pained me much that I could not take part in much (such ?) heroic exploits and could not have a glimpse of 'Masterda' whom I have adored since I heard his name. The thought of Jalalabad Martyrs tinched my heart to its very depth. With such a state of mind I left for Calcutta for my B.A. Degree. The thought of my country was ever predominant in my mind. I saw the tears of mothers mourning the loss of their beloved sons who sacrificed their lives on the altar of freedom.

"With all these a new impetus came to me when I was asked by one of my brothers to visit Ramkrishnada in the Alipore Central Jail where in a solitary cell he was awaiting extreme penalty meted out to him by the British Law for his love of country. I passed for a cousin sister of Ramkrishnada and anyhow managed to see everyday this smart jolly young hero. I had about forty interviews with him before his execution. His dignified look, free conversation, calm surrender to death, sincere devotion to God, childlike simplicity, loving heart, sound knowledge and profound realisation impressed me very deeply and made me ten times more forward than what I have been. The association of this dying patriot made a great contribution to the advancement of my life towards perfection. After Ramkrishnada's execution my hankering after some practical revolutionary action grew more intense. However, I had to pass some 9 months more in Calcutta for my B.A. Examination. In the meantime I tried several times to have an interview with Masterda but failed.

"After my examination in 1932, I hurried towards home with a strong determination to interview Masterda anyhow. In a few days my long-cherished desire was fulfilled and I soon stood before Masterda and Nirmalda the two great personalities guiding the famous Chittagong Revolutionary Party.

"In my short interviews with Nirmalda I recognised his noble and beautiful heart in which staunch revolutionary principles and strong religious temperament so nicely combined. I am fortunate that I got opportunities to come in touch with such a great soul that silently passed away from the world without giving the countrymen any opportunity to know how great, how pure, how uncommon it was.

"Nirmalda's tragic end gave me a severe shock and I became more desperate. The result of my B.A. Examination was out by this time and I passed with Distinction. A few days after I plunged myself heart and soul into the revolutionary preparations leaving for good my beloved family.

"Firm faith in my Almighty Father and cordial devotion to Him have been the most valuable treasure to me since my childhood. I have carefully cherished this treasure in my bosom throughout my whole life and to-day when I have come finally prepared to embrace His feet, that I have so earnestly hankered, my treasure seems to me more precious, more pleasant and more illuminating. Had not my revolutionary ideal been thoroughly consistent with my devotion to the Almighty I would never been a revolutionary.

"With an invocation to Him, I launch to discharge my to-day's responsibility and pray to Him to purge me clean so that I may be worthy offering to Him."

(এই গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিটির বাংলা অনুবাদ আগামী সংখ্যায় লেখবার চেষ্টা করবো)।

[ক্রমশ]

[পূর্বানুবৃত্তি]

পরের দিন ভোররাত থেকে চরের মানুষ গিয়ে বৌমারির আবাদ তোলপাড় করে তুলল। কোথাও খুঁজে পেল না হারান মণ্ডলকে। ফিরে এল সবাই মুখ শুকনো করে।

শেষ চেষ্টা থানায় খোঁজ।

সুবলের মা বুড়িকে তালিম দিয়ে ঘি বেচতে পাঠাল ছোট মণ্ডল থানায়।

পসরা সাজিয়ে বুড়ি থানার গেটের সামনে গিয়ে হাঁক পাড়ল, "ঘি লিবেন গো—ভালো গাওয়া ঘি।"

জমাদার দীনদয়াল সিং ডাকল, "আও ইধর।"

বুড়ি গেট ঠেলে থানা কম্পাউণ্ডে ঢুকল।

ভিড় করে এল পশ্চিমা সেপাইরা—ঘিরে ধরল বুড়িকে। সবাই ঘি পরখ করবার জন্য ঝুঁকে পড়ল—মায় সিংজী পর্যন্ত। সেই ফাঁকে বুড়ি এদিক-ওদিক চোখ চারিয়ে চারদিক দেখে নিলে। কিছুই দেখতে পেল না।

বুড়ি বলল, "ঢের রাস্তা হেঁটে এসেছি বাবা—বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাব।"

বুড়িকে জল খাওয়াবার জন্য এক-জন সেপাই তাকে নিয়ে গেল থানার রসুইঘরের দিকে। হাজতখানা ওই দিকে।

না—সেখানেও কেউ নেই। হাজত-খানা আজ হা-হা করছে।

ঘি বেচে মুখ শুকনো করে বুড়িও ফিরে এল চরে।

হাবু কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, "তবে গেল কোথায়!"

ছোট মণ্ডল রাগ করে বলল, "সে তুই জানিস।"

হাবু মুখ নিচু করল। টস্‌টস্ করে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আপশোষ করে বললে, "দু'জন এক সঙ্গে থাকলে এমনটা হতো নি। কি কুক্ষণে আলাদা হয়ে গেলম।"

"তো আলাদা হলি কেন?" ছোট মণ্ডল খেঁকরে উঠল।

হাবু বললে, "যতো হোক বয়স হয়েছিল মামুর—ছুটতে পারছিল নি—পিছিয়ে পড়ছিল। তাই জলায় লুকিয়ে থাকতে বলেছিলম। আর এ-ও ভেবে-ছিলম—আমাকে দেখতে পেয়ে শালা মোর পিছনেই ছুটবে। মামু জলায় লুকিয়ে থাকবে।"

ছোট মণ্ডল আবার খেঁকরে উঠল, "তো দু'জন ছিলি তোরা—মোকাবিলা করতে পারলি নি!"

"মোদের দু'জনের খালি হাত—আর তার হাতে ছিল মস্ত চৌকিদারি লাঠি ছোট মণ্ডল।" হাবু বলল, "মোর সাহস হয় নি। মোকে গ্রহ ধরেছিল। আমি এ কী ভুল করে ফেললম ছোট মণ্ডল। মোকে দণ্ড দাও—মোকে দণ্ড দাও।"

ছোট মণ্ডল রাগ করে বলল, "এখন খোঁজ—খুঁজে দেখ চারদিক। ভিন গেরা-মের মানুষ, অজানা-অচেনা চর। কোথায় কোন দিকে চলে গেল—কে জানে!"

সাগরখুড়ি থুতনিতে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। বললে, "সেই মণ্ডলপাড়া থেকে তার নামে আবার হুলিয়া ছিল। হয়তো চৌকিদারের তাড়া খেয়ে ভয়ের তাড়সে চলে গেছে কোথাও। একেবারে তল্লাট ছেড়ে।"

"সব খবর পাওয়া যেতে পারে কালুর ব্যাটা ভলুর কাছে।" ছোট মণ্ডল বলল, "কিন্তু তাকে বলবে কে! ফেরারী লোকের কথা শুধায় কে?"

অপরাধীর মত হাবু বললে, "তবে?"

ছোট মণ্ডল বললে, "খোঁজ-খাঁজ করো চারদিকে। আর কি করবে। —তবে হ্যাঁ, ধরা পড়লে সুবলের মা আজ থানায় যেয়ে দেখতে পেত।"

চরে যেমন একদিন হুট্ করে এসে হাজির হয়েছিল হারান মণ্ডল—তেমনি হঠাৎ নিখোঁজও হয়ে গেল এক রাতে।

নতুন তাঁতঘরের দিকে তাকিয়ে গুম্ হয়ে বসে রইল সানো চৌধুরী। আর ডাক্তার রোগীদের ওপর সেদিন কথায় কথায় চটে উঠতে লাগল, "উদো চাষা—উদো চাষা ব্যাটারা, আবার ওষুধ খেয়ে বাঁচতে এসেছে। মরে যা—মরে যা।..."

এক ফাঁকে বড় দারোগার চোখ এড়িয়ে ভলু এসে হাজির হলো জমাদার সিংজীর কাছে। গামছায় বাঁধা সের পাঁচেক গোল আলু। সিংজীর পায়ের কাছে পুঁটলিটা রেখে দিয়ে ভলু বললে,

ছোটদের জুতো চাই
আজীবন
খুশি পায়ে চলতে
বাটার ছোটদের জুতো বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি। এমনই এদের নকশা ও নির্মাণ-বৈশিষ্ট্য যে হাঁটতে চলতে অবাধ সহজ। সামনে আঙুল মেলার বাড়তি জায়গা, খাপখাওয়ানো গোড়ালির গড়ন, আর এমন জুতোর তলি যা অনায়াসে পা সঞ্চালনের সহায়ক। টুকটুকে রঙ, বাহারে নকশা, আর আরামে পয়লা নম্বর—এমন জুতোই এখন মজুত বাটার দোকানে। আজই নিয়ে আসুন আপনার বাচ্চাদের, এদের খুশি পায়ে শুরু হোক শরতের শোভাযাত্রা।
হার ৬.৫০
ঝাপ্টি ৯.৫০
Bata
বেবি ৯.৫০
মোকাসিন ৪.৭৫—৫.৫০
জুটি ৯.৯৫

"মোর নতুন আলু উঠল সিংজী—ছ.বজম দিয়ে আসি পাঁচসের সিংজীকে।"

সিংজী একগাল হেসে বললে, "বহুৎ আচ্ছা ভলু। ইধার আলু বহুত মাংগা আছে। খাও শালা শুধু কচু আর ওল। খালি কচু আর ওল।"

আলু ক'টা যথাস্থানে রেখে সিংজী আবার চেয়ারে এসে বসল।

ভলু খপ্ করে সিংজীর পা চেপে ধরল।

সিংজী হেসে বললে, "কছু বোলাবি?"

ভলু বললে, "একটা আরজি আছে সিংজী।"

"তো বোল।"

"মোর হুদ্দা ফের বদল করে দাও।"

"কেন রে!"

ভলু চোখ পিট পিট করে বললে, "বড়বাবু গোসা হলো। তা ছাড়া ও হুদ্দায় থাকলে মোর বদনাম।"

সিংজী হেসে জিজ্ঞেস করলে, "সেই মুকুন্দ পাইকের জরু?"

ভলু ঘাড় হেঁট করে রইল।

সিংজী আবার জিজ্ঞেস করল, "যোমনা ঝুট বলেছে? হামার কাছে সাচ্ বাত্ কবুল করবি কিন্তু।"

কি ভেবে, ফোঁস করে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে ভলু বললে, "আপনার কাছে ঝুট বাত্ বলব নি সিংজী। মেয়্যাটা বলতে গেলে মোরই জরু।"

সিংজী বললে, "কেয়া তাজ্জব বাত্ ভলু!"

"তাজ্জব লয় সিংজী।" ভলু তার পুরাতন হিয়ার কথা পেড়ে বলল, "মেয়্যাটার সঙ্গে মোর সাদির কথা ছিল—সাদির আগে অকে পথে-ঘাটে দেখা হলে বৌ বলেই ডেকেছি। ই কথা গাঁয়ে মোর সব্বাই জানে। তার পর হঠাৎ একদিন সাদি হয়ে গেল ওই মুকুন্দ পাইকের সঙ্গে।"

"কি রকম!"

"মেয়্যার বাপকে পণের টাকা দিতে পারলম নি।"

"আহ্ হা!" সিংজী বললে, "তোর দুখ্ বুঝলম ভলু।" একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলে, "তুই সাদি করিস নি?"

"না সিংজী—আর সাদি কাকে করব!" আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভলু বললে, "মোর মনের কথা সব বললম সিংজী—ঝুট বাত্ একটাও বলি নাই।"

"বুঝলম—বুঝলম।" সিংজী সম-বেদনার সুরে বললে আস্তে আস্তে।

ভলু আবার পা চেপে ধরে বললে, "তাই বলছিলম সিংজী—চরের হুদ্দা থেকে মোকে মোর পুরাতন হুদ্দায় বদলি করে দিন। আর বদনামি হয়ে লাভ কি। আবার কখন কি হবে—বড়বাবু মোকে বিশ্বাস করবে নি।"

"দিব—সুবিধামত বদলি করে দিব।" বলে সিংজী ফের আলুর কথা পাড়ল। বললে, "তা কেতো আলু পেলি?"

"হবে—মণ তিনেক হবে।" ভলু আন্দাজে বলল।

"তবে?"—সিংজী হাসতে হাসতে বললে, "আর হামার জন্যে শুধু পাঁচ সের!"

"দিব—আরও পাঁচ সের দিব সিংজী।" ভলু বললে, "মোকে কিন্তু জল্দি বদ্লি করে দিতে হবে।"

"দিব।"

ব্যাপারটা যেন ভলুর মনের ওপরে পাথর চাপা হয়েছিল। নিঃশব্দে চরের হুদ্দার সওদা লেন-দেন চুকিয়ে হাল্কা মনে সে ঘরে ফিরে গেল।

॥ বারো ॥

চরের মানুষ হারান মণ্ডলের কথা ভুলতে না ভুলতে আরও একটা মানুষ উবে গেল চর থেকে। সে হলো গোল-বদনের বিধবা বোন সরমা। দু'দিন চেপে ছিল গোলবদন—তিন দিনের দিন কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাও গোল-বদনের মুখ থেকে নয়—মহেশ মণ্ডল কথাটা শুনে এল ভিন গ্রামের মানুষের মুখ থেকে।

মহেশ মণ্ডল অবাক হয়ে বলেছিল, "মোকে তো গোলবদন কিছু বলে নি!"

তারা অবাক হয়ে বলেছিল, "হাই দেখ, তুমিই জানো নি। কেমন মণ্ডল গো তুমি। ইদিকে তার মাসীর বাড়ি, পিসীর বাড়ি মেয়েটাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে!" বলে তারা হি হি করে হেসেছিল। আরও বলেছিল, "সবাই বলে—মণ্ডল তো মণ্ডল, চরের ছোট মণ্ডল। ভারি কড়া। আর তোমারই নাকের ডগায় একটা বিধবা একেবারে কার সঙ্গে না কার সঙ্গে পালাল!"

মহেশ মণ্ডল একেবারে বারুদ হয়ে ফিরে এল চরে। এসেই ডেকে পাঠাল সাগর খুড়িকে।

মহেশ মণ্ডলের মুখে ঘটনা শুনে সাগর খুড়ি যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, "আমি তো কিছু জানি নি।"

মহেশ মণ্ডল রুক্ষ গলায় বলল, "ভিন্ গেরামের মানুষের কাছে মোর মাথা কাটা গেছে। চরের বৌ-ঝিদের বদনাম চিরদিন শুনে এসেছি। সে যখন ছিল তখন ছিল। যেমন জঙ্গল ছিল—তেমন জংলি মানুষ ছিল। কিন্তু এখন?"

সাগর খুড়ি চুপ করে রইল। জঙ্গলের জীবন একদিন তার জীবনেও দাগ কেটে গেছে। সে কেউ না জানুক—তার মন জানে, তার নিপীড়িত নারী-দেহটা জানে।

মহেশ মণ্ডল বলল, "গ্রামের মানুষ মোদের চরের মানুষদের টিট্‌কারী দিবে—হাসবে, ঘর-গিরস্তি বৌ-ঝিদের নিয়ে ফষ্টি-নষ্টি করবে—সে মোর সহ্য হবে নি খুড়ি। অদের বুঝিয়ে দিতে হবে—মোরা জন্তু নয়, মানুষ। মোদের ঘর-সংসার, বৌ-ঝি অদের চেয়ে ছোট লয়। সে যারা ছিল চরের মাটির সঙ্গে তারা মাটি হয়ে গেছে।" মহেশ রাগে গর গর করতে লাগল।

সাগর খুড়ি বললে, "গোলবদনই সরমাকে বিগড়ে দিয়েছে ছোট মণ্ডল। একবার তার জন্যে মাথা কামালো পর্যন্ত।"

মহেশ মণ্ডল তেমনি গর গর করতে করতে বলল, "এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেছে—কারোকে বলে নি পর্যন্ত। চেপে আছে।"

সাগর খুড়ি বলল, "অকে ডেকে পাঠাও ছোট মণ্ডল।"

মহেশ বলল, "তুমি আগে যেয়ে ব্যাপারটা জেনে এস। তারপর চরের সকলের সামনে অর আমি বিচার করব। শালার আবার মাথা ন্যাড়া করব। দরকার হলে সেই যমুনা বোষ্টমীর মত অকে চর থেকে উপড়ে তুলে দিব।"

দেখতে দেখতে একটা বেলার মধ্যে সারা চরের ঘরে ঘরে গোলবদনের বোনের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। সবাই অবাক হয়ে বললে, "হাই দেখ—মোরা কেউ জানতম নি! কবে গেল—কখন পালাল!"

গোলবদন চোর। ধরা পড়া চোরের মত কোনোরকমে দিনটা কাটল তার। সন্ধ্যের দিকে সুবল গোলবদনকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল মহেশ মণ্ডলের কাছে।

গোলবদন ঘাড় হেঁট করে বসল।

মহেশ মণ্ডল জিজ্ঞেস করল, "সাগর খুড়ির কাছে যা শুনলম—তা সত্যি?"

গোলবদন বললে, "একটা কথাও মিথ্যা বলি নি ছোট মণ্ডল। ভোরবেলা উঠে দেখলম—সে ঘরে নাই। না বিশ্বাস হয়, মোর বৌকে ডেকে শুধাও।"

মহেশ বললে, "তোর কাকে সন্দেহ হয়—কার সঙ্গে গেছে?"

"আমি কিছু জানি নি ছোট মণ্ডল। তুমি বিচার কর"—

"বিচার সে কাল হবে—সকলের

সামনে।" মহেশ মণ্ডল বলল, "কাকে কাকে সন্দেহ হয় মোকে বললে আমি লোক পাঠিয়ে খোঁজ করতম।"

গোলবদন চুপ করে রইল। কোনো কথা বলতে সাহস হলো না তার। বিচার আজ হোক আর কাল হোক—সাগর খুড়ির মুখে শাস্তির বহর সে আগেই শুনে গেছে। এবং শুধু সে নয়—সারা চর। এক কান—দু'কান হতে হতে মায় যমুনা বোষ্টমীর কান পর্যন্ত। চরের কথার পাখা আছে।

পরের দিন ভোর থেকে আবার এদিক-ওদিক ছুটল গোলবদন—যদি কোথাও খোঁজ পায় বোনের। সড়কের ওপরে দেখা হয়ে গেল যমুনার সঙ্গে।

যমুনা জিজ্ঞেস করলে, "যা শুনছি—সত্যি?"

গোলবদন চটে গেল। বললে, "তুই কি শুনেছিস তার আমি কি জানি।"

"বলে—মাথা কামিয়ে চর থেকে তুলে দিবে?"

গোলবদন চটে গেল। বললে, মানুষের যা বিচার হয় করবে। মোর কি দোষ।"

যমুনার জ্বালা অন্যত্র। বললে, "তোমার দোষের কথা বলছি নি—বলছি তোমাদের ওই ছোট মণ্ডলের বিচারের কথা। তার বিচারের মুখে আমি মারি দাত ঝাঁটা। মোর কি দশা করল—দেখেছ তো?"

দেখেছে এবং কিছু শুনেছেও। কিন্তু গোলবদন কোনো কথা বলতে সাহস পেল না। কোথাকার কথা আবার কোথায় চলে যায়—কে জানে।

যমুনা বলল, "আজ তোমার বোনের জন্য ছোট মণ্ডল বিচার ডাকছে—কিন্তু মুকুন্দের কি হল? তার বৌ-এর যে অত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল—তার বেলা?"

দরদীর কথা কার না ভাল লাগে। গোলবদন বলল, "বুঝ তবে ছোট মণ্ডলের বিচার। মুকুন্দ যে তার স্যাঙাতের ব্যাটা।"

"সে আমি জানি।" যমুনা হাত-মুখ নেড়ে চাপা গলায় বলতে লাগল, "সেই বনের ধারে মুকুন্দের বৌয়ের যে কাণ্ডটা ঘটে গেল তার জন্যে ছোট মণ্ডল সারা চরের জোয়ান মন্দগুলানকে কোথায় না কোথায় ছুটাল—কোথায় নাঙ্গা সন্ন্যাসী আর কোথায় দরবেশ না ফকরে ভূত। কত জনে কত গপ্পো বানালে। মোর তো মনে হয়—আসল লোক চর দিয়ে নিত্যি হেসে-খেলে চলে যাচ্ছে—নিত্যি রাতে।"

গোলবদনের বিরস মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হলো—তার হারের হাতে একটা মোক্ষম তুরুপের তাস উঠেছে। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, "সে কে যমুনা?"

চোখ মটকে যমুনা বললে, "কেন—বিয়ের আগে নয়নের সঙ্গে যার আসনাই ছিল!"

"আসনাই ছিল!" গোলবদন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কার সঙ্গে যমুনা?"

"যার সঙ্গে নয়নের বিয়ের কথা ছিল আগে—সব ঠিকঠাক, তারপর ওই ছোট মণ্ডল পণের টাকা দিয়ে সে বিয়ে ভেস্তে দিয়ে এল।" যমুনা বললে, ভেস্তে দিলে হবে কি—সে নয়নকে ভুলে নি। ছোঁক ছোঁক করে সে ঢের দিন গেছে মুকুন্দের বাড়িতে।"

"বাড়িতেও গেছে!" গোলবদন চমকে প্রায় নেচে উঠল।

"আমি সাক্ষী।" বুকে আঙুল ঠেকিয়ে যমুনা বললে, "কতদিন কত কথাবার্তা হয়েছে—সে কেউ জানে?"

"কে সে যমুনা" গোলবদন অস্থির হয়ে বললে, "নাম বল। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে—তার কিছু হচ্ছে নি আর মোর বেলা দে শালার মাথা কামিয়ে!"

যমুনা রাগে গরগর করতে করতে বললে, "এই অদের বিচার!"

বিচার সভায় এক প্রশ্ন নড়ে যাবে গোলবদন—এতক্ষণে বুকে তার যেন সাহস ফিরে এসেছে। সে শুধু নামটা জানবার জন্যে আকুলি-ব্যাকুলি করতে লাগল। বললে, "নামটা মোকে বল যমুনা।"

"চৌকিদার ভলু মাঝি।" চোখ টেরচে যমুনা বললে ছোট্ট করে।

"বলিস কি যমুনা?"

যমুনা রাগে ফেটে পড়ল। বললে, "তাই বলছিলম—ঝাঁটা মারি তোমাদের ছোট মণ্ডলের বিচারের মুখে।" খানিক চুপ করে থেকে আবার বললে, "আরও সে ঢের কথা আছে।"

"আরও ঢের কথা!" গোলবদন নেচে উঠল, "বল সব মোকে—আমি বেয়ে সব ভাণ্ডা ফোড় করে দিব।"

ভলু মাঝির ওপরেও যমুনার রাগ কম ছিল না। তার যোগ-সাজসে থানা সেপাইয়ের কাছে তাকে কম হেনস্তা হতে হয় নি। সেই রাগে রাগে সে বললে, "হঠাৎ একদিন ছোট মণ্ডল আর মুকুন্দকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল কেন? সে-ও ওই লোচ্চার যোগ-সাজসে—তা জানো?"

গোলবদন লড়াইয়ের বুকভরা সাহস রইল।

যমুনা বললে, "লোচ্চাটা ভেবেছিল—সেই ফাঁকে নয়নকে চর থেক সরিয়ে ফেলবে।" একটু থেমে নিজের কথা চেপে গিয়ে বলল, "সে আর হলো নি। মুকুন্দ আর ছোট মণ্ডল থানা থেকে ছাড়া পেয়ে ঘরে এল। আর যতো রাগ যেয়ে পড়ল মোর ঘরটার উপরে। চর থেকে মোকে বার করে দিল।"

সেই যমুনার পুরাতন শোক। চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল এসে পড়েছিল। আঁচলে মুছল।

গোলবদন লড়াইয়ের বুক ভরা সাহস নিয়ে চরে ফিরে এল। ভোর ভোর বেরিয়েছিল সে ভয়ে ভয়ে—বিচারের আসামী। ফিরে এল তেরিয়া হয়ে।

তার বৌ জিজ্ঞেস করলে, "পেলে কোনো সন্ধান?"

তেরিয়া মেজাজে গোলবদন বললে, "আরে কার সন্ধান কে করে?" বলে যমুনার যত কথা শুনেছিল—সব খাবলা খাবলা করে বলে চেঁচিয়ে নেচে কুঁদে পাড়া মাৎ করে দিলে।

তা কেউ শুনল—কেউ শুনল না। গোলবদনের বৌ নতুন বিপদের সম্ভাবনায় ভয়ে-ডরে গোলবদনের মুখ চেপে ধরল। বললে, "হেই আবার কে শুনে ফেলবে। হেই থামো।"

সন্ধ্যের বিচার সভার জন্য গোলবদন ফুঁসতে লাগল। [ক্রমশ]

সদ্য প্রকাশিত হইল !
বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ
সায়ন মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত
বেদান্ত-গ্রন্থ

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ

বেদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ
অনুবাদক
পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ
১ম খণ্ড মূল্য চার টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ।। কলিকাতা-১২

পাঠক মন

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর রচনা "রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র" এবং বিশেষ কারণে নাম পরিবর্তনের পর "সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ" আমি অত্যন্ত যত্ন সহকারে এবং নিবিষ্ট মনে পাঠ করে থাকি। আমি নিজে একজন সুভাষভক্ত, সুতরাং সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধীয় যে কোন লেখার সন্ধান পেলে তা অবশ্যই সংগ্রহ করে পড়ি। নিজের কাজেও তাঁর লেখা এবং তাঁর সম্বন্ধীয় লেখা অনেক পুস্তকাদি সংগ্রহ করেছি। অতি উৎসাহী হয়ে অপরকে পড়াতে গিয়ে যা হয়ে থাকে, কিছু বই এমনিভাবে খুইয়েছি। নানা কারণেই তা পূরণ হয় নি। কিন্তু অকপটে এবং মুগ্ধচিত্তে বার বার করে বলতে ইচ্ছে করে সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদের সঙ্গে কর্মযজ্ঞের সামঞ্জস্য বিধান করে শ্রীবসু যে পূর্ণ মানুষটিকে তুলে ধরছেন, তা এককথায় বলা যায়, 'তুলনা তার নাই।'

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৭৪ বর্ষ ৯ম সংখ্যায় শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য ও লিলি ভট্টাচার্যের পত্রের কৈফিয়ৎ হিসেবে লেখক শ্রীবসু যা বলেছেন, তা পড়ে আরও ঔৎসুক্য জেগেছে মনে। আমি কিন্তু বরাবরই আমার পরিচিত মহলে বলে আসছি—এ লেখা প্রচলিত জীবনালেখ্য নয়, গভীর গবেষণামূলক এক অমূল্য গ্রন্থের সৃষ্টি হ'তে চলেছে।

শুনতে খারাপ লাগলেও একথা সত্য যে, সব লেখা সকলের জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য আছে ঠিকই, কিন্তু সব লেখা সবার জন্য নয়। শঙ্করীবাবুর লেখা সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই যুক্তি প্রযোজ্য। সুভাষচন্দ্রের adventures ও romantic কার্যকলাপ সাধারণ পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে ঠিকই, কিন্তু চিন্তাকে কার্যে পরিণত করতে গিয়ে মানুষটিকে যে কঠিন প্রস্তুতি নিতে হয়, তা অনুধাবন করা সাধারণের দুরধিগম্য ত' বটেই, বরং ধৈর্যের ক্ষেত্রে তাদের পলায়ন মনোবৃত্তিই প্রকট। একটা কথা শ্রীবসুর রচনার ক্ষেত্রে বলা চলে যে, কোন পাঠক, পাঠিকার যদি ইংরাজী জানা না থাকে, তাহ'লে সেসব বাদ দিয়েই পড়তে পারেন, তাতে তাঁর মূল বক্তব্যের কোন হেরফের হয় না। সে যাই হোক, ভবিষ্যতে যখন পুস্তকাকারে শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর রচনা প্রকাশিত হবে, তখনও উদ্ধৃতি, ফুটনোট প্রভৃতির সংক্ষিপ্তকরণ বা বিলোপসাধনের প্রয়োজনীয়তা নেই বলেই আমার বিশ্বাস, কারণ সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকার পাঠক বহির্ভূত অগণিত পাঠক/পাঠিকা হয়ত ভবিষ্যতে তাঁর বই পড়বেন এবং আরও গবেষণায় লিপ্ত থাকবেন, তাঁদেরও ত' প্রয়োজনে আসতে পারে। অবশ্য এ সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব দূরদর্শী সিদ্ধান্তই কার্যকরী হবে।

গবেষণামূলক পুস্তকে ফুটনোট, উদ্ধৃতি ও রেফারেন্সের প্রাবল্য থাকবেই। এর থেকে মুক্তি নেই। বিশেষত বর্তমান ভারতে, যেখানে ক্রমশ বিবদমান দুই শিবির তৈরি হ'তে চলেছে। বিগত দিনে, এমন কি বর্তমানেও কি কংগ্রেস, কি কম্যুনিস্ট উভয়পক্ষই এই মহাজীবনের ওপর কালিমা লেপনে একমত, সিদ্ধহস্ত ও বদ্ধপরিকর। কখনও প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে আপন আপন গোষ্ঠীর মধ্যে। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে ভাবাবেগের বক্তৃতার চেয়ে তথ্যনির্ভর ঐতিহাসিক উপাদান সশ্রদ্ধচিত্তে এই mystryman সম্বন্ধে অনাগত দিনের জন্য রেখে যাওয়া একান্তই প্রয়োজনরূপে দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত একটি কথা লেখক শ্রীবসুর গোচরে আনা দরকার মনে করলাম—এটা খানিকটা ধৃষ্টতা। তবু আমার এই ধৃষ্টতাকে একজন অনুরাগী পাঠকের একান্ত আকুলতা বলেই মনে করবেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ঘটনা অনেক আগেই শেষ করে এসেছেন, সুতরাং নতুন করে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন সম্ভব নয়—তবু যদি কোথাও নিম্নলিখিত বিষয়টি সংযোজন করা যায়, অনুগ্রহ করে ভেবে দেখবেন। বিষয়টি হ'লো :—

'কালি ও কলম' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ নবম সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় লিখিত 'ওটেন ও সুভাষচন্দ্র' প্রবন্ধের অংশবিশেষ। প্রধানত ওটেন সাহেবের সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে প্রশস্তিপূর্ণ কবিতাটি। শ্রীবসুর নজর এড়াবার নয় বিষয়টি। তবু তথ্য হিসেবে এটি একটি আশ্চর্য তথ্য বিবেচনা করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই লিখে ফেললাম।

পত্রের দৈর্ঘ্যের জন্য মার্জনা চাইছি, কত কথাই না ভিড় করে আসছে মনে। তবে সে মনের কথা ত' আগামী দীর্ঘদিন ধরে শ্রীবসুর লেখায় প্রতিফলিত দেখব, তাতেই সান্ত্বনা। অবাক হয়ে সেদিন ভাবছিলাম—'বল পড়ে ব্যাট নড়ে', 'আল বল লারউড', তারপর চলে গেলাম লোকমাতা নিবেদিতার কাছে ফিরে এলাম রাজনীতির রণাঙ্গনে 'সুভাষচন্দ্রে'র পাদপীঠে। সেই 'ইডেন শীতের দুপুর' থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সমানে চমকপ্রদ ও মনোরম ব্যাটিং এবং বোলিং সাহিত্যের আঙিনায় দেখিয়ে চলেছেন। যাকে চলতি ভাষায় বলা চলে—unbeaten.

—অনিলচন্দ্র নাগ
১/২৯৭, নাকতলা, কলকাতা-৪৭

'দুই বাংলা : একজন কবি' প্রসঙ্গে

'দুই বাংলা : একজন কবি' প্রসঙ্গে শ্রীনীলরতন কাইয়ার প্রতিবাদপত্রটি পড়লাম। আমি বিজয় সরকারের মৌলিক কবিপ্রতিভা সম্পর্কে আমার প্রবন্ধে কোনরূপ উক্তি করেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু কবি জসিমউদ্দীন যে বিজয় সরকারের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের কথাই তাঁর সম্বর্ধনা সভায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আমাদের কাছে উল্লেখ করেছিলেন, এ সম্পর্কে আমি মোটেই ভুল শুনি নি। তার ঐ বক্তৃতার টেপ রেকর্ড বোধ হয় আকাশবাণী অফিসে সযত্নে সংরক্ষিত আছে; শ্রীযুক্ত কাইয়া যদি প্রয়োজন বোধ করেন, এ সম্পর্কে সেখানে অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন।

আসলে কবি জসিমউদ্দীন বিজয় সরকারের মৌলিক কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সম্বর্ধনা সভায় এবং অন্য কোথাও একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন নি। তিনি কলকাতায় থাকাকালীন শুধু রবীন্দ্র সদনের সভায় নয়, অন্যান্য ঘরোয়া সভাতেও বিজয় সরকারের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার সম্পর্কে আমাদের কাছে বারবার প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছেন।

তিনি একথাও বারবার বলেছেন যে, বিজয় নিজে রবীন্দ্রসংগীতে সুর আরোপ করে গ্রামে গ্রামে ঐ সংগীতের প্রচার করেছেন।

শ্রীযুক্ত কাইয়ার একথা শুনেছেন এবং আমি অন্য কথা শুনেছি। এ নিয়ে বৃথা বাক্যালাপ করে লাভ নেই; কেন না আসল সত্য অর্থাৎ কবি জসিমউদ্দীনের কণ্ঠ নিশ্চয় সযত্নে সংরক্ষিত আছে। আপনারাও ইচ্ছে করলে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন।

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উচ্চারিত অনুচ্চারিত

রজত রায়চৌধুরী

'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সমাজনীতির ঊর্ধ্বে মানবমনের সহজ-স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষাকে ঘটনাক্রমের ভেতর দিয়ে ও চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করেছেন। মনে রাখা দরকার বিধবা বিনোদিনী, বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দ বা রোহিণীর মতন ঔপন্যাসিকের হাতে নীতির কশাঘাতে জর্জরিত হয় নি। এবং এখানেই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের নতুন ধারার সূচনা হয়েছে। তবে একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সমর্থন করেন এমন কোনো স্পষ্টোচ্চার ইংগিত কোথাও দেন নি—বরং বলা যেতে পারে তিনি সমাজনীতি বহির্ভূত এই প্রণয়াকাঙ্ক্ষা কেমন অন্তর্বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে তার শক্তির চিত্র অঙ্কন করেছেন—যদিও উপন্যাসের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ তাল রাখতে পারেন নি।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা সমাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতার বিরুদ্ধে তাঁর স্পষ্টোচ্চারিত বিদ্রোহের সুর অনেকখানি বিস্তৃত হতে দেখি। আসলে বাংলার মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ প্রেম-অপ্রেমের চিত্রাঙ্কনই শরৎচন্দ্রের একটি ধারায় বিধৃত। এবং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, এই জীবনচেতনায় হৃদয়-বিপ্লবের অন্তরালে তিনি নারীর শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অপরদিকে বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক বহুল-পরিচিত সমস্যাগুলোর ভেতর নারী-চরিত্রকে কেন্দ্রস্থ করে অনন্যসাধারণ মমত্বে ও সহানুভূতিতে এবং স্বীয় প্রখর অভিজ্ঞতার আলোকে রূপদান করেছেন অনেক উপন্যাস-গল্পেই। মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থার যে বিষময় ফলশ্রুতি সুদীর্ঘকাল বাংলার সমাজজীবনকে পঙ্গু করে ফেলেছিল এবং যার প্রভাব শরৎ-সাহিত্য রচনাকালে অনেকখানি অবসিত—তাকেও শরৎচন্দ্র বাহন করেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসের নারীচরিত্রে। স্বভাবতই এ ধারণা স্বীকৃত, নারীমনের অতলান্ত রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটনে শরৎচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। এবং সমাজব্যবস্থার দীর্ঘকাল-ব্যাপী এই সব অব্যবস্থার ও স্বার্থপরতার ফলে নিপীড়িত রমণীহৃদয় সর্বদাই সশঙ্কিত ও অবহেলিত হয়েও অনুচ্চারিত। শরৎচন্দ্র সেই মূক বেদনাকে সাহিত্যে এনেছেন। প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সমস্যাগুলোর প্রতি সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। দরদ দিয়ে এঁকেছেন।

শরৎচন্দ্র মনে করতেন, "ভাবে কাজে চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত' সাহিত্যের কাজ।" সমাজশক্তির বিরুদ্ধে মানবমনের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষের মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখতেই প্রচেষ্ট হয়েছেন। এবং এই যে সমাজশক্তি যা মূলত কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধার হাতিয়ার মাত্র, অথচ যা সংস্কারের মতন বহুদিন-ব্যাপী প্রচলিত—প্রকৃতপক্ষে যার কোন নির্দিষ্ট রূপও নেই অথচ প্রবহমাণ বলে একটা গতিবেগ প্রাপ্ত হয়েছে—সেই অমানবিক নীতির শাসনের বিরুদ্ধেই শরৎচন্দ্র সবচেয়ে বেশি উচ্চকণ্ঠ। শরৎচন্দ্র যেন সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করতে চেয়েছিলেন সমাজব্যবস্থার অমানবিক নীতিগুলোকে।

এইখানে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার কালে বাংলার গ্রাম-গঞ্জের অধিবাসীরা কি দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত ছিল না? অর্থনৈতিক হাহাকার কি তাদের জীবনে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে নি? কিংবা অর্থের অভাব মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার ওপর কি কোন প্রভাবই আনে নি?

অথচ বিগত শতকের শেষাংশ থেকেই মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য-জনিত পরিবেষ্টনী এবং তার সংঘাত সাহিত্যে উপজীব্য হয়েছে। অর্থের সঙ্গে মানুষের জীবনধারণের সম্বন্ধে সুনিবিড় এবং অচ্ছেদ্য। অতএব অর্থনৈতিক চিন্তাজাত সমস্যাই সাহিত্যে অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষের জীবনই সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়। মানুষ যে পরিবেশে বাস করে এবং যে অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনযাপন করে তার প্রতিফলন সাহিত্যে পড়তে বাধ্য। অতএব বিংশ শতকে যখন মানুষের জীবনযাত্রা অস্থির, জটিল ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়, যখন অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন হচ্ছে মানুষের জীবনেতিহাস, তখন শরৎচন্দ্র এই দিকটাকে তাঁর সাহিত্যে রূপদান করতে সর্বতোভাবে এগিয়ে এলেন না কেন?

কেন, তার উত্তর না দিয়ে বরং বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির পর যখন মানবমনের স্বাধীনতাকে সাহিত্যে আনার ব্যাপক প্রচেষ্টা সার্থকভাবে সুসম্পন্ন হল না—তখন শরৎচন্দ্রই সেই গুরুভার দায়িত্ব যেন তুলে নিলেন নিজের হাতে। আগে প্রয়োজন সমাজনীতির ক্রূর বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করার। এবং এর সঙ্গে অর্থনীতিভিত্তিক জীবনযাত্রাকে সংযুক্ত করারও কোন বাধা ছিল না। কিন্তু শরৎচন্দ্র সেদিকে তেমন নজর দেন নি। তাঁর প্রবান প্রধান উপন্যাসের প্রেম নামক মানবিক হৃদয়াধিকারকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমাজশক্তির বিষময় দিককে উদ্ঘাটিত করতে হয়েছে।

সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নরনারীর জীবনে যে সমস্যার উদ্ভব হয় শরৎচন্দ্র তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বড় গোছের ক্যানভাসই ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। সেই ক্যানভাসে দারিদ্র্যের কথা কখনো এসেছে বটে, তবে তা জীবনধারার জটিলতার আবর্তে ঘুরপাক খায় নি। শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, দত্তা, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, বিপ্রদাস প্রভৃতি উপন্যাসে মানবমনের গভীর গহন প্রদেশের ভেতর প্রবেশ করেছেন শরৎচন্দ্র। প্রচলিত ধর্ম ও নীতিবিজড়িত সংস্কারের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। কিন্তু দারিদ্র্যের কশাঘাতে মানবজীবনের বিপর্যয় কতখানি হতে পারে তার চিত্র প্রস্ফুটিত করবার পরিবেশ ও প্রয়োজন এ সব উপন্যাসে নেই।

কিন্তু শরৎসাহিত্যে একেবারে নেই একথা মনে করলে ভুল হবে। বরং

আমরা দেখতে পাই এমন কিছু গল্প উপন্যাস শরৎচন্দ্রের আছে যেখানে দারিদ্র্যের চিহ্ন প্রকটরূপে বর্তমান। শেষপ্রশ্নে কমলের দারিদ্র্যের বর্ণনা আছে। কিন্তু সে দারিদ্র্য কখনই পরিবেষ্টনী ও চরিত্রকে প্রভাবিত করে নি। সে দারিদ্র্যকে জয় করেছে। এমন কথা হরিলক্ষ্মীর মেজবৌয়ের ক্ষেত্রেও তোলা যেতে পারে। দারিদ্র্যের চিত্র এঁকেছেন নিপুণ হাতে কিন্তু তাতে অর্থনীতি-ভিত্তিক জীবনধারণের সঙ্গে অন্বিত করেন নি। উপন্যাসে উচ্চকণ্ঠ না হলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু কয়েকটি ছোট গল্পে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সামাজিক ভাঙনের সূত্রটি ধরে সমাজবিদ্রোহের কড়া সুর চড়া মেজাজে তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি নেমে এসেছেন একেবারে অনভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। স্বদেশ ও সাহিত্য গ্রন্থের একটি প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।" শরৎচন্দ্র কয়েকটি ক্ষেত্রে যে নিচের স্তরে নেমে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অভাগীর স্বর্গ গল্পে দেখা যায় দারিদ্র্য আগাগোড়া বর্তমান। জন্মাবধি অভাগী কাঙালীর মা নিজের উঠানের বেগুন তুলে হাটে বেচে ছেলেকে দুটো রেঁধে দেয়। কোনদিন তার দুটো ভাত জোটে, কোনদিন জোটে না। এ সব বাস্তব এবং মর্মান্তিক সত্য ঘটনা এ গল্পে আছে। ঘটি বাঁধা দিয়ে কোবরেজের কাছে ওষুধ চাইতে হয়, মড়া পোড়ানোর জন্য কাঠ জোটে না—জোটে তিরস্কার অপমান এবং গলাধাক্কা। সেই উচ্চবর্ণের, প্রবলের এবং সমাজপতিদের নির্বিচার অত্যাচারের কাহিনী। কিন্তু এতো অভাব, এত দারিদ্র্যে তবু গল্পের উদ্দেশ্য পৃথক। অভাগীর সাধ কল্পিত স্বর্গ যাত্রার। সতীসাধ্বী রমণীর চিরকালের আকাঙ্ক্ষাই এখানে বাঙ্ময় হয়েছে। কিন্তু বরাবরই বড় ক্যানভাস শরৎচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষিত। তাই সমাজশক্তির অন্যায় অত্যাচার ছোট ছোট তুলির টানেও বড় নির্মম সত্যে রূপায়িত। কিন্তু দারিদ্র্যের নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করলেও শরৎচন্দ্র অর্থনৈতিক সমস্যাজনিত ব্যক্তির জীবন-ধারণের সমস্যাগত প্রভাবকে আলোচনার বাইরেই রেখেছেন। তবু একথা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না, অন্ততঃ বাংলা ছোট গল্পে শরৎচন্দ্রই প্রথম শিল্পী যিনি দুলের ঘরের বৌ অভাগীর মত মেয়েকে কিংবা সর্বহারা নিরক্ষর কৃষক গফুরকে গল্পে এনেছেন। তাদের জীবনকে সহানুভূতির সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন। এর একদিকে আছে এই ঘুণধরা পচা সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি প্রবল ধিক্কার, অপরদিকে লাঞ্ছিত মানবাত্মার প্রতি অসীম মমত্ববোধ।

অবশ্য এমন এক একটা সংলাপ ব্যবহার করেছেন শরৎচন্দ্র যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। অভাগীর স্বর্গ গল্পে ঘটি বাঁধা দিয়ে কাঙালী যখন কোবরেজের কাছ থেকে অনেক চেয়ে-চিন্তে ক'টা বড়ি নিয়েছে, তখন অভাগী তা আগুনে ফেলে দিয়ে বলেছে, 'বাগ্দী-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না—'। এই ছোট্ট সংলাপটিই বাগ্দী-দুলের ঘরের অর্থনৈতিক চেহারাটা মুহূর্তে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। এই

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনভিজাত ব্যক্তিদের জীবনসংগ্রামকে বাংলা গল্পে শরৎচন্দ্রই সর্বপ্রথম এনেছেন। এবং বলা বাহুল্য, বাংলা ছোট গল্পের মোড় ঘুরিয়েছেন।

আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জীবন-বোধ বাঙালী জীবনে প্রবল আলোড়ন এনে দেয়। সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজের নিচুতলার মানুষেরা রাষ্ট্রশাসনের হাল ধরলেন। ভারতবর্ষের জনজীবনেও আর এক ধরণের সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য গ্রেট ব্রিটেনের চাহিদা জোটাতে গিয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটল এদেশে এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মুনাফা লোটার প্রতিযোগিতায় এদেশ হল দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর। যুদ্ধান্তে মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল। রাষ্ট্রীয় জীবনে সেদিন অসহযোগ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে এর একটি রূপ মূর্ত হয়েছিল, অপরটি সমাজজীবনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় চিহ্নিত। শরৎচন্দ্র মানুষকে দেখেছেন মানুষরূপে এবং মানুষের সমস্ত স্বাভাবিকতার মধ্যেই তাকে অঙ্কন করেছেন। প্রচলিত ভাবভাবনার ধ্যান-ধারণার ভাঙনপর্বে শরৎচন্দ্র সত্যকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। "সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—" শরৎসাহিত্যে কঠিন সত্যকে ভালোবাসবার কথাই উচ্চারিত।

স্বদেশ ও সাহিত্য গ্রন্থের অনেক জায়গাতেই শরৎচন্দ্রকে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "নমঃশূদ্র মালো, নট, রাজবংশীয়, পোদ এদের টেনে নিন, দেশের মধ্যে, দশের মধ্যে এদের একটা মর্যাদার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়ে এদের মানুষ করে তুলুন"—সাহিত্যেও এই নির্যাতিত অপমানিত মানুষদের এনেছেন শরৎচন্দ্র, তাদের বেদনাকে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত দরদের সঙ্গে। সমস্ত থেকেও এই বঞ্চিত, দুর্বল, উৎপীড়িত মানুষগুলো কেন কিছুই পেল না, কেন তাদের কোন কিছুতেই অধিকার নেই—এই ভাবনাই স্বীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গল্পে-উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে।

গ্রামের কৃষক হৃদয়হীন জমিদার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গর অমানুষিক অত্যাচারে চলে আসতে থাকে শহরে। শহরে তখন কলকারখানা গড়ে উঠেছে। সেই চটকলে বা সুতাকলে শ্রমিক হবার আশায় চাষীরা এল শহরে। দুটো ভাত একটু নুন-এর সঙ্গে যেমন জড়িত তেমন আর কিছু নয়। মহেশ গল্পে গফুর তো সব মান-অপমান বিসর্জন দিয়েই মেয়েকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। মধ্যযুগের ফুল্লরার দুঃখের জীবনযাত্রার সঙ্গে গফুরের জীবনযাত্রার কোন মৌল তফাৎ আছে কি? সেই বেদনাপীড়িত জীবন-ধারার একঘেয়ে প্রবাহ। তৃষ্ণার জল কেউ দয়া করে দিলে তবে জোটে। ঘরের চালের শেষ পর্যন্ত অপত্যস্নেহ যার প্রতি তার অসীম সেই মূক হাড়কঙ্কালসার দেহ মহেশকেও সে মেরে ফেলে। মানুষের ক্ষুধার জ্বালা যখন শেষ সীমাও অতিক্রম করে তখন তার অবস্থা হয় সম্ভবতঃ গফুরের মতন। দুটো ভাত একটু নুনের আশায় সে মেয়ের হাত ধরে শহরের দিকে যাত্রা করে। সেখানে সে শ্রমিক হবে। হয়ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এবার খেতে পাবে—এই আশায়।

মামলার ফল গল্পেও সমাজজীবনের 'এইরূপ ভাঙনের চিত্র এ'কেছেন শরৎচন্দ্র। শুধু আঁকা নয়, মোটা তুলিও ব্যবহার করেছেন তিনি। কারণ সামাজিক বিদ্রোহকে যিনি সাহিত্যে রূপায়িত করেন, তিনি তা একটু মোটা তুলিতেই আঁকেন।

গল্প লেখা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি। সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্যন্ত ছাড়িতে পারি না,' এই উদ্দেশ্য তাঁর উপন্যাসে যেরূপে প্রকাশিত, কতিপয় ছোট গল্পে তা ভিন্নভাবে ব্যবহৃত। বিদ্রোহের সুর প্রায় সর্বত্রই আছে। সমাজশক্তির নীচতা-দীনতা কদর্যতা অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, প্রচলিত প্রথা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কোথাও এরূই উচ্চারিত। আবার কোথাও কোথাও নিচুতলার মানুষদের, সর্বহারাদের জীবনচিত্রণ সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে।

শরৎচন্দ্র এই দুই ধারারই শিল্পী। এই যুগ্মসত্তার বিকাশ উপন্যাসে একভাবে উচ্চারিত এবং শেষপর্বে কয়েকটি ছোট গল্পে আরেকভাবে প্রকাশিত।

davp 69/106

গণতন্ত্রের পূজা ও পূজারী

সুনীল ঘোষ

জনগণের মঙ্গলের জন্য জনগণের দ্বারা গঠিত জনপ্রিয় সরকারকেই পাঠ্যপুস্তকে গণতান্ত্রিক সরকার বলে অভিহিত করা হয়। যে দেশে এই ধরনের গভর্নমেণ্ট গঠনের ব্যবস্থা আছে, সেই দেশকে বলা হয় গণতান্ত্রিক দেশ। গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। দেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারীও জনগণের অনুমোদন ছাড়া কোন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী নন। রাষ্ট্র পরিচালনার দৈনন্দিন কাজের সকল ব্যাপারে সরাসরি জনগণের মতামত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না বলে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে পার্লামেন্ট এবং আইনসভা গঠন করা হয়। সেই জনপ্রতিনিধিরা আবার মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং সেই মন্ত্রিসভা রাষ্ট্র পরিচালনার দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করেন। মন্ত্রিসভা এবং পার্লামেন্ট তাঁদের সমস্ত কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সেটাই গণতন্ত্রের বিধি।

যে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সে দেশের সমাজ ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত নিঃস্ব এবং ভিখারীদের নিয়ে গঠিত। ধনবৈষম্যমূলক সমাজে জীবনের সকল স্তরে ধনীর প্রাধান্য সর্বজনস্বীকৃত। যেমন ধরুন, ভারতবর্ষে জে-আর-ডি টাটা আর রামবিলাস বেয়ারা একই শ্রেণীর নাগরিক, কিন্তু দুজনে নিশ্চয়ই একই সুযোগ-সুবিধার অধিকারী নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিরাট বিষয় সম্পত্তির মালিক টাটা বিনা পরিশ্রমে এক ঘণ্টায় যে টাকা রোজগার করেন, রামবিলাস দিবারাত্রি পরিশ্রম করে সারা জীবনেও হয়ত সেই টাকা রোজগার করতে পারবে না। তার ফলে রামবিলাসকে সারা জীবন বস্তিতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে জীবন কাটাতে হবে। তার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার কোন সুযোগ পাবে না এবং সাবালক হতে না হতেই কাজেকর্মে লেগে বাবার মতই কঠোর জীবন সংগ্রামে ব্রতী হবে। টাটার ছেলে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাবে। মেধা থাকুক বা না থাকুক উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে, কারণ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে সে বিপুল ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছে। বড়লোকের সন্তান হিসাবে তার জন্ম এবং আরও বেশি বড়লোক হয়ে সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। কাজেই দেখতে পাচ্ছেন, ভারতবর্ষ যত বড়ই গণতন্ত্র হোক, এখানকার নাগরিক টাটা আর নাগরিক রামবিলাসের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। যদিও দুজনেই একটি করে ভোটের অধিকারী। ধনতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের এই গুরুতর অসঙ্গতি আমার আবিষ্কার নয়। পৃথিবীর বড় বড় মনীষী এবং চিন্তাবিদ বহুকাল আগেই এই অসঙ্গতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর প্রতিকারের পথ নির্দেশ করেছেন। সমাজে ধন-বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি বিলোপ না হওয়া পর্যন্ত সত্যিকারের গণতন্ত্র কায়েম হতে পারে না। যতদিন না টাটা আর রামবিলাস একই সমান্তরাল রেখা থেকে জীবন সুরু করতে পারছেন, ততদিন রামবিলাসের কাছে গণতন্ত্র অর্থহীন আপ্তবাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতা এবং প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনই ধন-বৈষম্যের প্রধান উৎস। টাটা বহু টাকার মালিকানা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। কাজেই তার পক্ষে পৈত্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ বাঁ হাতের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরদিকে রামবিলাস নিঃস্বের সন্তান। তাঁর কোন পুঁজি-পাটা নেই। ব্যবসা করে সে টাটার সমকক্ষ কোনকালেই হতে পারবে না। নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে সাবালক হবার সঙ্গে সঙ্গে তার একমাত্র মূলধন পরিশ্রম বেচবার জন্য তাকে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হবে। সুতরাং একথা বুঝতে কারও কষ্ট নেই যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

কিন্তু সম্প্রতি এদেশে টাটার আত্মীয় মাসানী, রাজাগোপালাচারী এবং অন্যান্য বহু বুদ্ধিজীবী রটাতে আরম্ভ করেছেন যে, Free enterprise (ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতা) ছাড়া গণতন্ত্র অচল। অর্থাৎ শিল্প এবং বাণিজ্যপতিদের অবাধ স্বাধীনতাই নাকি গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। জনগণের দাবিতে সেই স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের কোন প্রচেষ্টা হলেই মাসানী-রাজাগোপালাচারীরা গেল গেল রব তুলে আকাশ বাতাস ভারী করে তোলেন। সম্প্রতি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সঙ্গে সঙ্গে মাসানীরা গণতন্ত্র রসাতলে গেল বলে যে চিৎকার তুলেছেন, তাতে সাধারণ মানুষের কানের পর্দা ফাটবার উপক্রম হয়েছে। দস্যুর অবাধ লুণ্ঠনাধিকার কেড়ে নেওয়া হলে সে মনে করতে পারে যে, তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এবং তার ফলে গণতন্ত্রও বিপন্ন। কিন্তু জনগণ নিশ্চয়ই তার সঙ্গে একমত হতে পারবেন না। আমরা আজও পর্যন্ত এমন কোন পাঠ্যপুস্তক পাই নি যাতে লেখা আছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতা ছাড়া গণতন্ত্র অচল। গণতন্ত্রের কারবার মানুষ নিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে নয়। জনগণ যদি মনে করেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতাই জনগণের পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহলে বণিকদের সেই স্বাধীনতা প্রদান করতে তাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না। কিন্তু তাঁরা যদি দেখতে পান, বণিকের অবাধ স্বাধীনতা দেশের ক্ষতি ডেকে আনছে, তাহলে, সেই স্বাধীনতা কেড়ে নেবার সার্বভৌম অধিকার তাঁদের আছে। সেই অধিকারকে আজ যারা চ্যালেঞ্জ করছে, তারা আর যাই হোক, গণতন্ত্রের পূজারী নয় বরং গণতন্ত্রের ঘোরতর শত্রু। সেই নিরিখের বিচারে মাসানী এণ্ড কোংকে গণতন্ত্রের এবং জনগণের শত্রু আখ্যা দিলে কোন অন্যায় হবে বলে মনে হয় না।

মাসানী-রাজাগোপালাচারী এণ্ড কোং দেশের ধনিকশ্রেণীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন। তাঁরা গণতন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ কংগ্রেস দলের কয়েকজন নেতা যখন গণতন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যায় মুখর হয়ে ওঠেন, তখন অবাক না হয়ে উপায় থাকে না।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সঙ্গে সঙ্গে পাতিল গণতন্ত্রের "গঙ্গাযাত্রা"

দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলেন। সুচেতা কৃপালনী ইন্দিরা গান্ধীকে বর্ণচোরা কম্যুনিস্ট পদবীতে ভূষিত করেছিলেন আর তারকেশ্বরী সিংহ ইন্দিরাকে বলেছিলেন ফ্যাসিস্ট।

কম্যুনিস্টরা ধনবৈষম্যমূলক সমাজে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তারা মনে করে, একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজেই সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কম্যুনিস্টরা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবীশ্রেণীর একনায়কতা প্রতিষ্ঠার দ্বারা শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করতে চায়। ইন্দিরা গান্ধী ঐ ধরনের বিপ্লবের পক্ষপাতী নন। তিনি নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় প্রচলিত সংবিধানের আওতায় ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে যেতে চান। কম্যুনিস্ট পন্থার ভালমন্দ নিয়ে এখানে কোন আলোচনা করার ইচ্ছা আমার নেই। ইন্দিরা গান্ধীর পন্থার সংগে কম্যুনিস্টদের পন্থার পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, সেটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই ইন্দিরা গান্ধীকে কম্যুনিস্ট আখ্যা দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য যে জনগণকে বিভ্রান্ত করা, তা বুঝতে কারও কষ্ট হবার কথা নয়।

আর ফ্যাসিজম হচ্ছে দক্ষিণপন্থী একচেটিয়া কারবারীদের একনায়কতা। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ স্বাধীনতার ধুয়ো তুলে মাসানী-রাজাগোপালাচারী এন্ড কোং আসলে দেশকে সেই ফ্যাসিজমের পথেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। ইন্দিরা গান্ধী সেই পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছেন বলেই তাঁর ওপর মাসানীদের এত আক্রোশ। অথচ তাঁদের কংগ্রেসী অনুচররা ইন্দিরাকে ফ্যাসিস্ট আখ্যা দিয়ে বাজার গরমের চেষ্টা করছেন।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে এত উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে যে, কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের বর্ণচোরা নেতারা কেউ আর নিজের স্বরূপ গোপন করতে পারছেন না। আচার্য কৃপালনীর মত বয়োবৃদ্ধ নেতারাও নন।

আচার্য কৃপালনী সিন্ধুর অধিবাসী। কৃতী ছাত্র অধ্যাপনা দিয়ে জীবন সুরু করেছিলেন কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। একনাগাড়ে দীর্ঘকাল ধরে ইনি এ-আই-সি-সির সম্পাদক হিসাবে দেশবাসীর কাছে সুপরিচিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর স্থায়ী অফিস ছিল এলাহাবাদে। কৃপালনী বাঙলা দেশের জামাতা। তাঁর স্ত্রী সুচেতা বাঙালী পরিবারের সন্তান। সুচেতার এক দাদা ছিলেন আনন্দ আই-সি-এস। ডি-ভি-সির চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। আর এক দাদা ছিলেন মীরাটের গান্ধী আশ্রমের অধ্যক্ষ। সুচেতা নিজেও স্বামীর মত অধ্যাপনা দিয়ে জীবন সুরু করেছিলেন। তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল উত্তর প্রদেশে।

কৃপালনী নিজেকে গান্ধীবাদী বলে জাহির করেন। গান্ধীজী ভারতের একজন যুগপুরুষ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি কোন মৌলিক মতবাদের জনক বলে আমার জানা নেই। তিনি আদর্শবাদী এবং মানবদরদী জননায়ক হিসাবেই বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু তিনি মূলত ছিলেন রাজনীতিক। রাজনৈতিক জয়-পরাজয় তাঁর মনেও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ঢেউ তুলত। সেখানে তিনি অতিমানব হয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যেবার বিপুল ভোটাধিক্যে কংগ্রেসের সভাপতি হন, সেবার সচেতনভাবে কংগ্রেস অধিবেশন বয়কট করে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। প্যাটেল-পন্থ-কৃপালনী-রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ গান্ধীবাদী নেতারাও নেতার ব্যর্থতায় রুষ্ট হয়েছিলেন। তখন তাঁরা সুভাষবাবুকে জব্দ করবার জন্য ভোটের জোরে এই প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন যে, সুভাষচন্দ্র যেন গান্ধীজীর অনুমোদিত সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন। কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত সভাপতি কংগ্রেসের বাইরের (গান্ধীজী তখন কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না) একজন লোকের (তিনি যত বড়ই হোন) পরামর্শ ছাড়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারবেন না বলে যাঁরা ফতোয়া দিয়েছিলেন, তাঁরা আর যাই হোন গণতন্ত্রের পুজারী নন। কৃপালনী নিজেকে এখন যত বড় গণতন্ত্রবাদী বলেই জাহির করুন, তাঁর অতীত রেকর্ড সেই ধরনের কোন প্রমাণ আমাদের সামনে হাজির করতে পারছে না। বরং উল্টোটাই প্রমাণ করছে।

দেশের স্বাধীনতা লাভের পর বয়োবৃদ্ধ কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে একমাত্র কৃপালনীই কোন বড় পদ পান নি। তাঁর নিজের উক্তি থেকে জানা যায়, তথাকথিত লৌহমানব প্যাটেল তাঁকে পছন্দ করতেন না। নেহরুর সংগেও তাঁর বোধ হয় বিশেষ মনের মিল ছিল না। সেটা তাঁর অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে থাকতে পারে।

কংগ্রেস দলে নিজের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয় দেখে কৃপালনী দম্পতি কংগ্রেস ত্যাগ করে পি-এস-পিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু পি-এস-পি দলের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠায় তাঁরা উভয়েই সেই দলত্যাগ করেন। কৃপালনী তারপর থেকে নির্দল সদস্য হিসাবেই পার্লামেন্টে বিরাজ করছেন। কিন্তু তাঁর পত্নী সুচেতার বয়স অনেক কম। তিনি নিজের রাজনৈতিক কেরিয়ার সম্বন্ধে স্বামীর মত নিরাশ হন নি। তাই আবার কংগ্রেস দলে এসেই নাম লেখান। কংগ্রেস তাঁকে সাদরে বরণ করে নেয় এবং কামরাজ পরিকল্পনার পর উত্তর প্রদেশের পার্টি কম্ সি-বি-গুপ্তের আনুকূল্য লাভ করে তিনি ভারতের বৃহত্তম রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান।

ইদানীং দলত্যাগীরা আয়ারাম-গয়ারাম পদবী পেয়ে লোকের হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, কৃপালনীদের মত শ্রদ্ধেয় এবং প্রধান নেতারাই আয়ারাম-গয়ারামদের পূর্বসূরী।

কৃপালনী নিজে কংগ্রেসে ফিরে যান নি ঠিকই, কিন্তু কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করেই তিনি বরাবর পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছেন। ১৯৬২ সালে তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী কৃষ্ণমেননের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনেও মধ্যপ্রদেশের নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীর কাছে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। পরে গোয়ালিয়রের রাজমাতার

সমর্থনে একটি উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টে এসেছেন। অর্থাৎ কংগ্রেস যেবার তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছে, সেবার তিনি হেরে গেছেন আর যেবার কংগ্রেস তাঁকে সমর্থন করেছেন, সেবার তিনি নির্দল প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়েছেন।

কৃপালনী দম্পতি কোনকালেই প্রগতিশীল মতবাদের সমর্থক বলে পরিচিত নন। কংগ্রেসে তাঁরা চিরকালই আপোষকামী নেতৃত্বের অংশীদার। শ্রীকৃপালনী কংগ্রেসের বাইরে গিয়ে জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি এবং বণিকশ্রেণীর প্রার্থী হিসাবেই বোম্বাইয়ে মেননের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাদের সঙ্গেই তিনি ওঠাবসা করেন। সেই সূত্রে তিনি বাইরের লোক হয়েও কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াপন্থী সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক। সাম্প্রতিক ইন্দিরা-সিন্ডিকেট বিরোধে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী প্রকাশ্যেই সিন্ডিকেটের হয়ে ইন্দিরার বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নিজের মতামত প্রচারের অধিকার সকলেরই আছে। তাতে কারও কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু বড় বড় বাক্যজালের আড়ালে যাঁরা ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ করে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে টম ডিক আর হ্যারির পার্থক্য খুঁজে বার করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বৃদ্ধ কৃপালনী মশাই সম্প্রতি এক প্রবন্ধে ইন্দিরার বিরুদ্ধে সেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রচারের প্রয়াস পেয়েছেন। কংগ্রেস নেতাদের অধঃপতনের বিস্তারিত ব্যাখ্যার ছলে তিনি পরোক্ষে ইন্দিরা গান্ধীর আদ্যশ্রাদ্ধ করেছেন এবং কুকুরকে বদনাম দিয়ে ফাঁসীকাঠে ঝোলাবার নীতি অনুযায়ী তিনি ইন্দিরার বিরুদ্ধে অতি নিম্নস্তরের গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ আনতেও কুণ্ঠিত হন নি। তিনি বলেছেন, "Today, there is no person with any standing in political life, who is supposed to be in opposition to the Prime Minister, whose telephone is not tapped, whose letters are not opened and/or whose houses are not watched." এ অভিযোগ সত্য হলে দেশের অবস্থা খুব সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পরের লাইনেই কৃপালনী লিখেছেন, "It is difficult to prove these things." বামপন্থীরা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ প্রায়ই করে থাকেন। কিন্তু কৃপালনীর গণতন্ত্রবোধ সে অভিযোগে কখনও কান পাতবার প্রেরণা দেয় নি। কিন্তু আজ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি সেই অভিযোগ সামনে রেখেই ইন্দিরার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে সামিল হয়েছেন। একে গান্ধীবাদ বলে না, বলে expediency (সুবিধাবাদ)। নাগরিকদের ব্যক্তিগত গতিবিধির ওপর গোয়েন্দাগিরি সব সময়ই নিন্দনীয়। সেটা কৃপালনীর বেলায় নিন্দনীয় আর গোপালনের বেলায় প্রশংসনীয় হতে পারে না। কাজেই কৃপালনীর এই অভিযোগের সততা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে।

কৃপালনীরা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার বাসভবনের কাছেই অপর একটি বাড়িতে বাস করেন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা বেড়েছে। দিল্লী এবং আশপাশের খেটে-খাওয়া নর-নারীর দল রোজই তাঁর বাড়িতে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছেন। তাতে মোরারজী রাগ করে বলেছেন, রিক্সাওয়ালা ট্যাক্সিওয়ালারা ব্যাঙ্ক আর ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মর্ম কিছু বোঝে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের মতামতের কোন মূল্য নেই। যাদের ভোটে মোরারজী সবজান্তা হয়ে অর্থমন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হয়েছিলেন, তাদের সম্বন্ধে মোরারজীর কি নিদারুণ অশ্রদ্ধা! মুচি, মেথর, ধোপা, নাপিতদের মত তথাকথিত "ছোটলোক"দের সম্বন্ধে কৃপালনীও সেই অবজ্ঞাই পোষণ করেন। তাই ইন্দিরার গৃহে তাঁদের আনন্দমুখর সমাবেশ দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন। জনতার কোলাহলে জননায়ক কৃপালনীর ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর গুণগ্রাহীদের আহবান করে বলেছেন, "may one appeal to the generosity of the publicity and propaganda agents of the Prime Minister, who organise these rallies, to stop them?" প্রায় একশ বছর আগে বাঙলার রাজনৈতিক ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "হে ভারতবাসী, ভুলিও না, অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার ভাই।" কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবধারা সম্প্রসারণ করে বলেছিলেন, "অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।" দেখা যাচ্ছে কৃপালনীর গণতন্ত্রবোধ একশ বছরের অতীত ইতিহাসের স্বারদেশেও এসে উপনীত হয় নি। এটা তাঁর বার্ধক্যের বিভ্রম হতে পারে। সেক্ষেত্রে জনজীবন থেকে তাঁর অবসর গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয় নয় কি?

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রয়েজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন)

লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ তেত্রিশ ॥

আজ রাত্রে একটুকুও হাওয়া নেই। অবিকল আরেকটি মানুষের মনের এই ধারণা। কিন্তু তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। সে তনসুখলাল। তনসুখলাল আগরোয়াল। রোগজর্জর শীর্ণ চেহারা। বছরের মধ্যে বারোমাসই সে অসুখে ভোগে আর ওষুধ খায়। বাতব্যথা তার সারা জন্মের ব্যাধি। একটা পা এই বাতেই সারাজন্মের মত অকর্মণ্য পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। শীর্ণ প্যাঁকাটির মত চেহারা। গায়ে মাংসের লেশমাত্র নেই। শুধু হাড় আর হাড়। ছোট ছোট দুটি চোখ। গলায় হাতে অনেকগুলি তাগা আর মাদুলী-কবচ ঝোলান। কাৎ হয়ে একটা বালিশে ঠেস দিয়ে বসে থাকে গদিতে। সাধারণ বালিশ নয়, তাকিয়া। মোটা পুরু জাজিমের গদি। পুরনো ধাঁচের একটা আলমারী একদিকে।

মাঝে মাঝে একটা লোক ছোট একটা মাটির কল্কের কি যেন সেজে নিয়ে এসে তার সামনে ধরে দেয়। আর একটা ভিজে ন্যাকড়া জড়িয়ে তনসুখলাল বেশ করে সেটা টানে। একমনে প্রাণের সুখে টানতে থাকে। অনেক লম্বা একটা টান দিয়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া বার করে তারপর।

অনেক লোক বসে থাকে তার গদিতে। তারা নানা ব্যাপারেরই লোক। বলে, তনসুখলালজী, গাঁজা ধরলেন কবে?

ধরি নি। ধরতে হয়েছে। বাংলা বলে পরিষ্কার। দীর্ঘকাল বাংলাদেশে আছে বলে কোনো অসুবিধে হয় না। তনসুখলাল বলে, ধরতে কি আর ভাই এমনি এমনি হয়েছে। এক হেকিমের কথায় শেষটা বাধ্য হয়েই—বাকিটা শেষ না করেই থামে।

কি ব্যাপার? সেটা কি ব্যাপার?

একঘর লোক কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

আমার বাতের জন্যে এই ব্যবস্থা।

তা বলে এই গাঁজা? কেউ কেউ হাসে, শেষ পর্যন্ত ছোট কল্কে? লোকে যে গাঁজাখোর বলবে!

বলবে তো বলবে। আজ তিরিশ বছরের ওপর এই চালাচ্ছি। তনসুখলাল বলে, হনুমানজী কি কিরিয়া। আমি অনেক ভালো আছি। তবিয়ৎ বহুৎ আচ্ছা।

কি জানি। গাঁজায় বাত যায় কি-না কখনো শুনি নি।

কেউ হয়তো বলে, খেয়ে যখন উপকার পাচ্ছ শেঠজি। আসলে শরীরই হল গিয়ে আসল চীজ। শরীর খারাপ হলে আর কিছু নেই।

আটের ওপর বাতটা কিছু কমতি আছে। কল্কের ন্যাকড়াটা ঠিক করে জড়াতে থাকে।

কমতি আছে?

তা হবে না-ই বা কেন? একজন বলে, গাঁজা থেকে তৈরি হোমিওপ্যাথি ওষুধও আছে শুনেছি।

আরে ভাই। হাত বাড়িয়ে তনসুখলাল বিরুদ্ধবাদী লোকটার হাতখানা ধরে। বসে আছে তেমনি করে। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। জায়গা থেকে নড়ে না। ততক্ষণে আরো লম্বা একটা এবং ছোট টান পড়েছে কল্কেয়। টান দিয়ে ফিরিয়ে দেয় লোকটার হাতে। বলে, আমি নেশা করি না ভাই। নেশা হারাম আছে। তবে কিনা দ্রব্যগুণ একটা আছে তো ভাই। অতঃপর অন্য কথায় ফিরে যাওয়া। তনসুখলাল যাই বলুক, বাতের ব্যথা তার এ-ওষুধে সারুক-না-সারুক সেই পঙ্গু পা-টি দিনের পর দিন যেন আরো শুকিয়ে যাচ্ছে। সেই গদিতে সেই তাকিয়া আশ্রয় করেই তনসুখলালের দিন কাটে। সারা সকাল-দুপুর-বিকেল। লোকে বলে রাতেও তার ঘরে কেনাবেচা চলে।

কিন্তু তনসুখলালের মাথাব্যথা নেই তা নিয়ে। তনখা মানে টাকাতেই যে আসল সুখ এই কথাটা জানে সে। এবং তাইতেই লাল হবার মন্ত্রটি তার জানা। সেইদিক থেকে তার নামটির তাৎপর্য অসীম।

রাত দুপুরে নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কে যখন পাইচারী করছে কল্যাণ আর জানালা খুলে দাঁড়িয়ে বাতাসের খুবই অভাব অনুভব করছে, তখন দিব্যি গদিঘরের বারান্দায় একটা টিনের খুপরির মধ্যে, জানালাহীন অবস্থায় নিঃশব্দে তনসুখলাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছে ভবিষ্যৎ গণনা করে। নিজের ভবিষ্যৎ। চা-বাগানের শাহানশা হবার স্বপ্ন দেখছে সে। এককাল ছিল যখন সুদূর বিকানীরের এক গণ্ডগ্রাম থেকে পাট-তামাকের ব্যবসাসূত্রে কাকার সংগে রংপুর এসেছিল। প্রথমে নীলফামারিতে ব্যবসা। কাকার সংগে। কুড়িগ্রাম-গাইবান্ধা হয়ে লালমনিরহাট তারপর। একাকী ব্যবসা সেখানে।

মস্ত ব্যবসাকেন্দ্র ছিল লালমণিরহাট। সেখানে থাকতেই বাতের যন্ত্রণাটা শুরু হয়েছিল। ছোট ভাইকে দেশ থেকে আনিয়ে তারপর নিজের দেশে গিয়েছিল তনসুখলাল। জলবায়ুর পরিবর্তনে যদি ভালো হয় এই আশাতে। ঝাড়ফুঁক ওষুধ-বিষুধ কম হয় নি। দু' বছর কাটল এমনি করে। দেব-দেবতার কাছে হত্যে দিতেও বাকি থাকে নি। কিছুতেই কিছু হল না দেখে দু' বছর পরে আবার ফিরল লালমণিরহাট। তখন প্রায় পঁচিশ বছর বয়েস হয়ে গিয়েছে। পাট-তামাকের ব্যবসাতে লাভও হয়েছে প্রচুর। কিছু টাকা জমেছে। মোটামুটি ভালো টাকা। কিন্তু এ-সামান্য টাকায় মন ভরে না। টাকা চাই। আরো আরো টাকা। দশ-বিশ তলা প্রাসাদের বিলাস চাই। বড়খনির ঐশ্বর্য। রাজার ঐশ্বর্য পেতে চায় তনসুখলাল। পা-টা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা নিয়ে আর ভাবনা নয়। এই খোঁড়া পা নিয়েই বিশ্ববিজয় করতে হবে।

এমন সময় পার্টিশান। লালমণিরহাট থেকে প্রথমে কুচবিহার, পরে আলিপুরদুয়ার হয়ে ডুয়ার্স। সে-ও প্রায় অনেকদিন হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বয়েস বেড়েছে। অভিজ্ঞতা বেড়েছে তনসুখলালের। পুরনো ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে সে। অভিজ্ঞতা দুঃসাহসী করেছে তাকে। নামে-বেনামীতে অনেক ব্যবসা তার। ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স।

চারদিকে বাগান-ঘেরা এই অঞ্চলে আছে অনেকদিন। প্রায় বাইশ বছর হয়ে গেল। চোখের সামনে দেখছে বাগান। বাগান-বাবুদের সঙ্গে ওঠা-বসা। বাগানের ব্যবসার অনেককিছু জেনে গিয়েছে। এখন মনে মনে সে স্বপ্ন দেখছে চা-বাগানের। সুযোগ-সুবিধে মত বাগান কিনতে চায় সে। ছোটখাটো একটা বাগান। তারপর সে দেখাবে বাগান কেমন করে চালাতে হয়। কেমন করে রোজগার করতে হয় লাখো-লাখো টাকা।

ছোট খুপরিটার মধ্যে শুয়ে শুয়ে ভাবে সেই কথা। একটি ছোট্ট ঘুলঘুলির মত। জানলার প্রয়োজনসিদ্ধ করে ওটা। পঙ্গু পা-টাকে অদ্ভুত কায়দায় গুটিয়ে রেখে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে তনসুখলাল। ওতেই চোখে পড়ে বাইরের রাত্রিটাকে। জ্যোৎস্নায় দুনিয়া ভেসে গিয়েছে। রূপালী আলোর যেন বান ডেকেছে। কিন্তু একটা অদ্ভুত গরম। অদ্ভুত অস্বস্তি।

যদিও তা নিয়ে কোন ভাবনাই নেই তনসুখলালের। বাবুরা অনেকেই বাগান বিক্রি করে দিচ্ছে। চালাতে পারছে না আজকাল। তাদের স্বদেশীয়রা অনেক বাগান ইতিমধ্যে কিনে নিয়েছে। সাহেবদের হাত থেকে।

ওরকম একটা বাগান কিনতে পেলে আর কিছুই চায় না সে। অবশ্য দিনকাল কিছু খারাপ। চারদিকে গোলমাল—উত্তেজনা। হ র তা ল-আন্দোলন। কথায় কথায় ম্যানেজার ও বাবুদের ঘেরাও লেগেই আছে। ভীষণ গোলমাল—অনিশ্চয়তা। ঠিক নেই। কিছুরই ঠিক নেই। তা গন্ডগোল উত্তেজনা মারামারি-কাটাকাটি কিসে নেই। টাকা রোজগার করতে গেলে ঝামেলা সইতেই হবে। হুজ্জৎ-হাঙ্গামার মোকাবিলা করতেই হবে।

এজন্যে ভাবিত নয় তনসুখলাল। ক'দিনের জন্য গিয়েছিল নাগ্রাকাটায়। কাকার ভায়রা আছেন ওখানে। জলপাইগুড়িতেও আছেন তাঁদের গ্রামেরই এক বিত্তশালী ব্যবসাদার। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। তাঁদের সবারই এক কথা চা-বাগান তো ভালো কথা। কিন্তু সময়টার কথাও কিছু ভাবতে হবে।

কিসের সময়?

বলছি দেশ-কালের কথা। চারদিক-কার ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ভালো না।

দেশ-কালের অবস্থা কোন্‌দিনই বা ভালো ছিল। মনে মনে ওদের কথার সঙ্গে ঠিক সায় দিতে পারে না তনসুখলাল। সুর মেলে না ওদের সঙ্গে। চোর-ডাকাত কবে না ছিল দেশে। তাদের দেশেও বড় বড় বাড়িতে ডাকাতি হয়। হাঙ্গামা-হুজ্জতের ভয় থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলে ঝক্কি-ঝামেলা পোয়াতেই হবে। বড়-রকমের কাজে বড় ঝক্কি-ঝামেলা চাই। চা-বাগানগুলিতেও নানা সমস্যা আছে। থাকতে পারে। আর পারেই বা কেন। সে তো নিজের সামনেই দেখছে সব কিছু। তবে আসল কথা হল কী সবরকম বিপদ-আপদ থাকবেই। বিপদ-আপদের কথা ভেবেই কাজে নামতে হবে।

জলপাইগুড়ির আত্মীয়টি বলেন, আসলে দিনকাল যা তাতে বাগান থাকে কী যায়।

বুঝতে পারে নি তনসুখলাল।

লোকেরা চা-খাওয়া ছেড়ে দেবে এই কথা কি বলতে চান উনি? আর যদি তা না হয়, তবে তো বাগান উঠে যাবারও কোনো আশংকা থাকে না। একটা সময় ছিল যখন—আত্মীয়টি বলছিলেন।

যখন?

যখন এ-সব কাজে নামা চলত। এখন দিনকালই যাচ্ছে পাল্টে। আগেকার দিনে এত সব স্ট্রাইক-লক-আউট শ্রমিক-মালিকের অসন্তোষ ছিল না বললেই চলে। এখন কথায় কথায়—

কথাটা স্বীকার করে তনসুখলাল। দিনকাল মন্দ। খুবই খারাপ সময় যাচ্ছে। সে তো ব্যবসা পিটিয়েই রোজগার-পাতি করছে। সময়-অসময়ের কথা কিছু ভালো জানা আছে বৈকি।

বাগানের মালিকরাই এখন ভয় পাচ্ছে—যারা এ-সব কাজে পাকা, যাদের অনেককালের অভিজ্ঞতা।

তা ছাড়ছে বটে। তা অস্বীকার করে না তনসুখলাল।

এখন খাজনার চাইতে বাজনা বেশি। আত্মীয়টি বলছিলেন, এমন অবস্থা হয়েছে যাঁরা এতকাল চালাচ্ছিলেন তাঁরাই সব দোকান বিক্রি করে দিতে চাইছেন।

এ-সব মোটামুটি জানে। জেনেছে তনসুখলাল। তার চোখের সামনেই দেখলে অনেক বাগানের হস্তান্তর। তার স্বদেশীয়রা প্রথমে এ-সব ব্যবসাতে ছিলই না। তারা বুঝত না এ-সব। তাদের অন্য ব্যবসা ছিল। টাকা ছিল। টাকা খাটিয়ে রোজগার করত। এখন বড়ো বড়ো সাহেব কোম্পানীগুলির অনেকেই বাগান বেচে দিচ্ছে, দিয়েছেও। কিনছে তার স্বদেশীয়রা। জর্ডন হেন্ডার্সনের বাগান ছিল কত। ডেভিন্‌পোর্ট কোম্পানী। কত কোম্পানী। তাদের জায়গায় এসেছে বাজোড়িয়া-কনোড়িয়ার দল। চোখের সামনে ভাসে বাগানগুলি। সাঁওতালী, মাগঙ্গী, ভার্নাবাড়ি, বীচ, ছিল সাহেবদের বাগান। ভাত-খাওয়া টী এস্টেট—গারোপাড়াও বলে। ছিল ম্যাকলোড্‌ কোম্পানীর। শালবাড়ি টী এস্টেটও। যতদূর জানে এখন বাজোড়িয়াদের কর্তৃত্বে। কালচিনিও যতদূর জানে, ছিল শা'ওয়ালেসদেরই। এখন তাদের কর্তৃত্ব কমে গেছে অনেক। বাকিটা গেল প্যাটেল অ্যান্ড রায়-দের হাতে। ডিমা, কালচিনি, চিনচুলা, রায়মাটা, এইসব বাগানগুলি মূলত সাহেবদেরই হাতে তৈরি। জয়ন্তী-কুমারগ্রাম অঞ্চলে নবাবদের হাতে এখনো রয়ে গেছে রহিমাবাদ, চুনিয়াঝোরা। তুরতুরি চলে গেল কনোড়িয়াদের হাতে। আরো কত বাগান পাল্টাচ্ছে কে জানে।

তার অভিজ্ঞতা অবশ্য খুব বেশি নয়। যতটুকু তার চোখের সামনে, তত-টুকুই অভিজ্ঞতা। এই সব দেখেশুনে মনে মনে তনসুখলাল চঞ্চল হয়। চিরকালের ব্যবসা আর ভালো লাগে না। এ-কথা ঠিক যুগ-বদল হচ্ছে। যুগ তো বদল হবেই। চিরকালই এক জমানা থাকবে নাকি। রাতের অন্ধকারের পর দিনের আলো। তারপর আবার অন্ধকার আসবেই সৃষ্টির নিয়মে। পুরনো কি থেমে থাকতে পারে। একই জায়গায়? ভাঙবেই। পুরনোর জায়গায় নতুন আসবেই। আর নতুন আসতে গেলে কিছু বদল অবশ্যম্ভাবী।

কবে আবার তা না হয়েছে! চিরকাল হয়েছে। মুসলমানরা ছিল। তাদের আগে হিন্দুরা ছিল না কি? রামায়ণ-মহাভারতের আমলেও কি কম লোক মরেছে! আবার মুসলমানরা আসতে অনেক বদল হল। অনেক ভাঙাভাঙি হল। আবার ইংরাজ এল। এই তো সেদিনকার কথা। চোখের সামনেই দেখল রদ-বদল।

তাই এ-সব কথাকে মূল্য দিতে প্রস্তুত না তনসুখলাল। ব্যবসা-বাণিজ্য কোন্ আমলে না ছিল। চিরকাল ছিল। চিরকাল থাকবে। তা বলে ভয় করলে

চলবে নাকি? জীবনে যে বড় হতে চায় তাকে বড় ঝুঁকি নিতেই হবে। তার ধারণা এইসব কালেই সুযোগ আসে মানুষের সামনে। দিনকাল যদি না-পাল্টাত, সাহেব বা বাঙালী বাবুরা এ-সব ছেড়ে দিয়ে যেত? কোনদিন যেত না। পায়ের ওপর পা তুলে নবাবী করত।

দেখল তো চোখের সামনে। সাত রাজার ধন ঐশ্বর্য যদি কিছু থেকেই থাকে তো আছে এই চা-বাগানে। আজ এতগুলি বছর ধরে বলতে গেলে বাগানের মধ্যেই আছে সে। তার চোখে কিছুই এড়ায় নি। তনসুখলাল নিরালায় আপনমনে এইসব নিয়ে ভাবে। বড় বেশি চঞ্চল হয় মন। সে কি অন্তত ছোট-খাটো একটা বাগান কিনতে পারে না? পারে। খুবই পারে। তার সারাজীবনে যা উপার্জন তাইতেই পারে। তার সাহস আছে। দেখে শুনেই তার অভিজ্ঞতা হয়েছে কিছু কিছু। তবে সে লেখা-পড়া কিছু জানে না। লেখা-পড়া না জানলে অসুবিধা কিছু আছে বটে। কিন্তু সে তো তার চোখের সামনে বরদাবাবুকে দেখল। গুপ্ত-সাহেব বলত সবাই। জাঁদরেল চেহারা ছিল। নাম ছিল বরাদাকান্ত গুপ্ত। বরদাবাবু বাগানের ম্যানেজার ছিলেন। কিন্তু বলতে গেলে তাঁর লেখাপড়া ছিলই না। তিনি নামসই করতে জানতেন না পর্যন্ত। টিপসই দিয়ে হাজার হাজার টাকা রোজগার করতেন। দুই মেয়ের বিয়ে দিলেন। ম্যাজিস্টর জামাই আনলেন সে-যুগে। ছেলেকে বিলেত পাঠালেন। সেই ছেলে শুনছি নাকি মেমসাব বিয়ে করে এনেছে ও-দেশ থেকে। বরদাবাবু ছেলের কাছে মাদ্রাজে না কোথায় থাকেন।

এইসব ভাবে তনসুখলাল। তার একটা পা বাতে পঙ্গু। এইটে যা দুঃখ। যদি তার দু'টো পা থাকত, তাহলে এক-বার সে দেখাত কি করে লোক কোটি-কোটি টাকার মালিক হয়। আসলে এই এক পা নিয়েই সে বেশ অনেক লক্ষ টাকার মালিক হল। টাকার চিন্তা করে না সে। সে শুধু ভাবে সময়টা অনুকূল পড়েছে। বাগানের মালিকরা বাগান ছেড়ে দেবার জন্য ব্যস্ত। এই মওকা। বাংলাদেশে সব লালেব আতংকে ভুগছে। নইলে এত পুরুষের ব্যবসা ছাড়তে চায়।

কথাটা সে জিজ্ঞাসা করেছিল ইউনিয়নের এক নেতাকে। মনের ইচ্ছে গোপন রেখে শুধিয়েছিল, আচ্ছা, বাগানের কি খুবই খারাপ অবস্থা যাচ্ছে।

আরে দূর! শ্রমিক নেতাটি হেসে-ছিলেন, তুমিও কি বিশ্বাস কর এই কথা?

তবে?

ব্যাটারা গরিবের রক্ত শুষে কামাবার যা কামিয়ে নিয়েছে। এখন দিন আসছে। পালা বদলের দিনে পাছে জবাবদিহি দিতে হয় তাই ভয়ে আগেভাগে সরে পড়বার ব্যবস্থা।

মনে মনে একটা কথা ভেবেছিল তনসুখলাল। বলে নি আর। মনের মধ্যে চেপে গিয়েছিল। সেই কথাটা হচ্ছে, তোমরা বলো গরিবের রক্ত শুষে কামিয়েছে। আর কোনদিক কি নেই? এর জন্যে পুঁজি দিতে হয় নি, মেহনৎ দিতে হয় নি তাদের? দিনের পর দিন ঝুঁকি নিতে হয় নি? মদৎ জোগাতে হয় নি খেয়ে-না-খেয়ে। বড়ো হবার অনেক কামাবার সুযোগই যদি না-মিটল, তবে আর এত ঝামেলার দরকার কী! হ্যাঁ, তবে এক কথা বলতে পারো, শ্রমিকদের তারা আরো দিতে পারত। কুলিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিতে পারত? তা কেই বা দিয়েছে কবে কোথায় বলতে পারো। এমন ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরটা কে দেখেছে!

মনে মনে সে ভাবে, হাঁ তবে এদের হাতে রাখতে হবে। সন্তুষ্ট রাখতে হবে। তাতেই কাজ হবে। লাল-রাজ নাকি হবে শুনতে পাচ্ছে। সে এ-সব বিশ্বাস করে না। যেদিন হবে হোক। আপাতত মওকামত একটা বাগান পেলেই হয়। তনসুখলাল ভাবে। শুয়ে শুয়ে ভাবে খুপরিটার মধ্যে।

বাইরে চাঁদনী রাত্রি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কিন্তু গরম খুব। তনসুখ-লালের গা ঘামে জ্যাবজ্যাব করছে। তবে সে তা লক্ষ্যই করে না।

[ক্রমশ]

মুক্তার মত ঝকঝকে উজ্জ্বল...

আপনার দাঁত হবে সাদা ধবধবে, দাঁতের মাড়ী নীরোগ থাকবে আর মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে, আপনি শুধু ডেণ্টনিক দিয়ে দাঁত মাজা অভ্যাস করুন।

ক্লোরোফিল মিশ্রিত ডেণ্টনিক পাইওরিয়া সারাতে সাহায্য করে।

যাঁরা টুথ পাউডারের জায়গায় পেষ্ট ব্যবহার পছন্দ করেন তাঁদের জন্য জনপ্রিয় ডেণ্টনিকের সমস্ত গুণসম্পন্ন টুথ পেষ্ট বাজারে প্রচলন করা হইয়াছে। ধবধবে দাঁত আর মন-ভোলান হাসি যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরাই চান ডেণ্টনিক টুথ পেষ্ট।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

আইন ও শৃঙ্খলা : পুলিশের ভূমিকা —

কয়েকটি অভিমত

সাগর বিশ্বাস

শ্রীহীরেন সরকার, পুলিশের প্রাক্তন আই· জি।

—১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় "বিলাতের পুলিশ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেই সময় প্রবন্ধটি চারদিক থেকে প্রশংসা লাভ করেছিল। সেই প্রবন্ধে স্বাধীন ভারতের পুলিশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলাম যে, ইংরেজ আমলের ইংরেজী ধাঁচে গড়া পুলিশবাহিনী দিয়ে স্বাধীন ভারতের প্রয়োজন মিটতে পারে না। এমন কি তাদের পুলিশ করেও নয়। গোটা মেশিনারীটার একটা আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। আমার আশঙ্কা ছিল, অন্যথায় দেশকে এর জন্য কঠিন মূল্য দিতে হবে। আমার সারা জীবনের এ্যাসেস্‌মেন্ট যে ভুল ছিল না তা আজ বুঝতে পারছি। আজ পুলিশ জনসাধারণের কাছ থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে।

—কিন্তু কেন এমন হলো? আমি প্রশ্ন করলাম।

—কেন হলো সে ব্যাখ্যা অনেক ব্যাপক। অল্প কথায় তা বলাও সহজ নয়। তবে এটা ঠিক—পুলিশ সব সময় তার কর্তব্য যথাযথ পালন করে নি। সংগে সংগে এ কথাও ঠিক যে, জনসাধারণও সব সময় তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন নি। অনেক সময় পুলিশ তার কর্তব্য পালন করেও জনসাধারণের কাছে অপ্রিয়ভাজন হয়। এক কথায় স্বাধীনতার পরে পুলিশকে যেভাবে গঠন করবার প্রয়োজন ছিল ঠিক সেইভাবে তাদের গঠন করা হয় নি। জনসাধারণের সংগে ভাল সম্পর্ক গঠনে পুলিশের মধ্যে নিরক্ষরতা এবং পুলিশকে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পাঠানোর রীতিও অনেকক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—আপনার আমলে এই সকল অব্যবস্থা দূরীকরণের কোন চেষ্টা হয়েছিল কি?

—হয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টা যে পুরোপুরি ফলপ্রসূ হয়েছে, এ কথা আজ অন্তত বলা যায় না। যখন 'বিলেতের পুলিশ' লিখেছিলাম তখন আমি জানতাম যে, পুলিশ বিভাগকে ঢেলে সাজান দরকার। কিন্তু তা যে দু'-চার বছরে সম্ভব নয় তাও বুঝতাম। অবশ্য বাইশ বছর সেজন্য অনেক বেশি সময়। 'বিলেতের পুলিশ' যখন লিখেছি, তখন আমি একজন ডি· আই· জি। আই· জি· হলাম ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে। তখন লিটারারী কনস্টেবল বা সংক্ষেপে এল· সি· বলে পুলিশের মধ্যে এক ধরণের পদ ছিল। এই এল· সি-রা বস্তুত কেবল ডেস্ক-ওয়ার্ক করতেন। আমি এই পদগুলি তুলে দিতে চেয়েছিলাম। পুলিশবাহিনীর প্রসারণ আমি চাই নি। সবচেয়ে হৈ-চৈ হয়েছিল তখন, যখন আমি নন-বেংগলী প্রার্থী রিক্রুট্‌মেন্ট বন্ধ করেছিলাম। আমার ধারণা ছিল, ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীকে পুলিশ হিসাবে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সে ঠিকমত কাজ করতে পারে না। ভাষার পার্থক্যও তাকে পিছিয়ে রাখে। প্রাদেশিক মনোভাবে মাঝে মাঝে প্রভাবিত হয়ে সুযোগ পেলে অঘটন ঘটাতেও পারে।

—বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বলে কোন কোন মহল মনে করছেন। এমন কি একটা নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বলে তাঁরা দাবি করছেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

—এ সম্পর্কে আমি বিশেষ কোন মন্তব্য করতে চাই না। তবে নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি বললে যেমন বাড়িয়ে বলা হয়—আইন-শৃঙ্খলা ঠিকমত বজায় আছে বললেও বোধহয় তেমনি ঠিক বলা হয় না।

—ভারতের মত অংশত ফেডারেল প্রকৃতি বিশিষ্ট রাষ্ট্রে রাজ্যে রাজ্যে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ রাখার কোন অনিবার্য কারণ আছে কি?

—কোন জোরালো কারণ নেই। তবে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ থাকলেও প্রধানত তার রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে থাকা উচিত।

—সাধারণ পুলিশদের মধ্যে উচ্চপদস্থ অফিসারদের প্রতি বিক্ষোভ থাকে শুনেছি। এটা কতদূর সত্য?

—অন্তত পুরোপুরি অসত্য নয়। তবে অনেকক্ষেত্রে বিক্ষোভ অকারণও হয়। আজকাল কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল ক্যারেক্টার রোল তুলে দেবার দাবি শোনা যায়। তবে তুলে দেওয়াটা সংগত বলে আমার মনে হয় না।

—গত ৩১শে জুলাই তারিখে বিধানসভায় যা ঘটলো, তার পেছনে উচ্চপদস্থ অফিসারদের হাত থাকা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন কি?

—১৯৬০ সালে আমি রিটায়ার করেছি। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্র থেকে আমি এখন বহুদূরে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আমার জানবার কথা নয়। কাজেই আমি এ সম্পর্কে কিছুই বলতে চাই না।

*　　*　　*

শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়, রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা।

—পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতিকে নৈরাজ্যময় বলা চলে কি?

—হ্যাঁ, পরিপূর্ণ নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি।

—পুলিশ যুক্তফ্রন্টের একটি বিশেষ শরিক দলের হয়ে কাজ করছে একথা আপনি বিশ্বাস করেন কি?

—করি। এবং আরো স্পষ্ট করে বলতে পারি যে, তারা একটি বিশেষ দলের হয়েই কেবল কাজ করছে না, একটি বিশেষ দলের ভয়েও কাজ করছে।

—গত ৩১শে জুলাই তারিখে বিধানসভায় পুলিশের অনুপ্রবেশ এবং ক্রিয়াকলাপ কি এই সত্যকে সমর্থন করে?

—তা করে না। সেদিনের ঘটনা নিঃসন্দেহে খুবই দুঃখজনক, খুবই কলংকময়। কলংক সামগ্রিকভাবে পুলিশের—কলংক শাসকগোষ্ঠীর। কিন্তু ভুললে চলবে না সেটা পুলিশের একটি সামান্যতম অংশ। এ ধরণের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অবিলম্বে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সেদিক থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট তৎপরতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী আভা মাইতি, শ্রী নেপাল রায় তথা কংগ্রেসের ওপর যে দোষ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ

ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যমূলক। আমি চ্যালেঞ্জ করেছি আইনসভার বাইরে সরকারের এই মনোভাব প্রকাশ করতে। পুলিশের এই ধরণের একটি চরম মনোভাবের জন্য তাদের প্রতি বর্তমান সরকারের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ক্ষমতা সীমায়িত করবার মনোভাবই আসল কারণ।

—সরকার কি পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন বলে আপনার মনে হয়?

—নিশ্চয়ই। পুলিশকে আমি নিষ্ক্রিয়ই বলব। কারণ একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পরেই পুলিশ সাধারণত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হচ্ছে। কি ধরণের এ্যাকশন কোন দলের বিপক্ষে যাবে বা সপক্ষে যাবে, এসব সহসা বুঝতে পারা যায় না বলেই পুলিশ কোন ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

—স্বাধীনতার পরে পুলিশ কি তার কর্তব্য যথাযথ পালন করেছে বলে আপনার মনে হয়?

—কখনো করেছে, কখনো করে নি।

—এদেশে জনসাধারণের সংগে পুলিশের সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়। এর কারণ কি?

—নয় কি? জানি না।

—পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসারদের প্রতি সাধারণ পুলিশের মনে বেশ বিক্ষোভ আছে বলে মনে হয়। এর কারণ কি?

—আছে নাকি? জানি না ত'।

—পুলিশ ইউনিয়ন বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে পারে বলে আপনার মনে হয় কি?

—উচিত নয়। তেমন উদ্দেশ্যকে কঠোর হস্তে দমন করা উচিত। সম্প্রতি পুলিশের প্রতি সরকারের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে।

—ভারতের মতো একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশে রাজ্যে রাজ্যে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ মোতায়েন রাখার কোন অনিবার্যতা ছিল বলে কি আপনার মনে হয়?

—সি· আর· পি· কিংবা বি. এস. এফ রাখবার পটভূমিকাটুকু জানা থাকলে কারোরই এর যৌক্তিকতার প্রতি সন্দেহ থাকা উচিত না। সি· আর· পি· থাকার অর্থ এই নয় যে, তা সেন্ট্রাল থেকেই ডাইরেক্টেড্ হবে। রাজ্য সরকারই প্রয়োজনবোধে এই বাহিনী ব্যবহার করতে পারে। কাশীপুরে বা দুর্গাপুরের ঘটনা একটু অন্যরকম। তারা আসলে সেন্ট্রাল প্রপার্টি প্রোটেক্‌শন ফোর্স। এর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসারদের ওপরেই ন্যস্ত।

—একটি গণতান্ত্রিক এবং একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের পুলিশের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

—আপনি নিশ্চয়ই ডেমোক্রেটিক সোসালিস্ট এবং কমিউনিস্ট সোসালিস্ট দেশের কথা বলছেন। কমিউনিস্ট সোসালিস্ট দেশে পুলিশের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা কেউই করতে পারে না, আর ডেমোক্রেটিক্ সোসালিস্ট দেশে শুধু পুলিশের সমালোচনাই নয়—প্রয়োজন হলে মানুষ তাকে দু'ঘা বসিয়ে দিতেও পারে।

একজন কনস্টেবল—প শ্চি ম ব ঙ্গ পুলিশ।

—যেখানে পুলিশ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, সেখানে আইন-শৃঙ্খলা থাকতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গেও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। তবে যতটা প্রচার করা হচ্ছে ততটা নয়। পুলিশ অনেকক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না, কারণ রাজনৈতিক লোকেরা পুলিশকে বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাবান্বিত করবার চেষ্টা করেন। অনেক সময় আমাদের মতো সাধারণ পুলিশের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি ইউনিফর্ম পরে অনেক সময় বেরোতেই ভয় করে। এটা কেবল আমার কথাই নয়—এটা অনেকেরই মনের কথা। এমনই হয়েছে মানুষের সংগে পুলিশের সম্পর্ক!

এইবার আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু কেন এমন সম্পর্ক হলো?

—হবে না? কুড়ি-বাইশ বছর ধরে ত' পুলিশকে জনসাধারণের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে দেওয়া হয় নি। কেবল লাঠি, গুলী চালানোই ছিল তাদের কাজ। এইজন্যই ত' আপনাদের কে একজন রাজনৈতিক নেতা বলেছিলেন যে, দেশের সবচেয়ে বড় গুণ্ডার দল হলো পুলিশ। অবশ্য এটা খুব বেশি করে বলা হয়েছে। তবু সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের সংগে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে সম্পর্ক ভাল হবার কথা নয়। পদস্থ অফিসারদের ফিল্ডে যেতে হয় না—আমাদেরই যেতে হয়। তাঁরা কেবল অর্ডার দিয়েই খালাস! অনেক সময় দেখা যায় এমন অবস্থায় ফায়ারিং-এর অর্ডার এলো, যখন ফায়ারিং না হলেও চলে। কেবল লাঠিচার্জই যথেষ্ট। কিন্তু আমরা ত' হুকুমের গোলাম—জান-মান ত' তাঁদেরই হাতে।

—কিন্তু এই অবস্থার উন্নতি কিভাবে হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

—জানেন, পি· আর· বি· চেঞ্জ না করতে পারলে কিছুই হবে না। আর বড় বড় অফিসারদেরও নজর বদলাতে হবে। এ ভার গভর্নমেন্টের। এইসব অসুবিধার প্রতিকারের দাবি জানানো আমাদের নন্-গেজেটেড এ্যাসোসিয়েশনের কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। গত ৩১শে জুলাই কিছু পুলিশ বিধানসভায় উচ্ছৃংখলতা দেখিয়ে এ্যাসোসিয়েশনের এমন কি সমগ্র পুলিশসমাজের খুব ক্ষতি করলো।

—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় যে, সরকার পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে কিংবা কোনো কোনো দলের স্বার্থে ব্যবহার করছে?

—না, তা ত' মনে হয় না। আমরা কতটুকুই বা আসলে খোঁজখবর রাখি! অনবরত ত' এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হচ্ছে। বিরাম নেই। নিষ্ক্রিয় করে রাখলে বিরাম পাওয়া যেত।

শহর কলকাতা

শিয়ালদার মোড়/ফেরিঅলা

কলকাতায় ট্রাফিক জ্যাম হওয়ার কথাটা নতুন নয়। তার বহু প্রচলিত কতকগুলি কারণ আছে। যেমন, বৃষ্টি-পাত, সরকারী বাসগুলি ব্রেক ডাউন হওয়া, ট্রামগাড়ি লাইনচ্যুত হওয়া এবং মিছিল। এ কথাও ঠিক, প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তে ঐ সব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু শিয়ালদার মোড়ে ট্রাফিক জ্যাম প্রতি মুহূর্তেই হচ্ছে এবং অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে—এমন একদিন আসবে যখন আমাদেব আপিস থেকে শিয়ালদা স্টেশনে পায়ে হেঁটে যেতে ঘণ্টা কাবার হয়ে যাবে। এখনই তো পাঁচ মিনিটের পথ হেঁটে যেতে আধঘণ্টা লাগে।

আসলে বৌবাজারের মোড়ে পৌঁছতে কোনোদিকেই পথ বোধ হয় নেই। ফুটপাত এখন সম্পূর্ণরূপে ফেরি-অলাদের দখলে। আহা! বাছারা করে খাক—এই সুযোগে তারা রাজপথের অর্ধেকটার ওপর দখল করে বসেছে। বাকিটুকু দখল করে নেবে, সম্ভবত, আগামী পুজোর মধ্যেই। তবে একটা কথা শুনুন, এখন যারা ফেরী করে তাঁরা সবাই 'আহা'র দলের নয়। বড় বড় ফলের দোকানের ব্যাপারীরাও বুঝে-সুঝে দোকান পেতে বসেছে রাস্তার ওপর। রাস্তাটা যায় যাক, আমরা না হয় ততোদিন সাব-ওয়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকি। আর লাস্ট ট্রেন হাঁক ছেড়ে চলে যাক।

বাংলায় এম· এ·/বাংলায় ডি· লিট·

সাম্প্রতিককালে বাংলায় এম· এ·-দের নিয়ে কোনো কোনো পত্র-পত্রিকায় কখনো চোখের জল ঝরিয়েছেন কেউ কেউ, কেউ বা সহানুভূতিতে গলে গেছেন বাংলায় এম· এ·-দের প্রতি, কোনো নৈরাশ্যবাদী অকর্মণ্য ঝাড়ুদার হতে উপদেশ দিয়েছেন বাংলায় এম. এ.-দের, কেউ বঙ্কিম কটাক্ষে তিরস্কার করে মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ করেছেন।

না, মশাই, কোনো উপদেশামৃত আমাদের হাতে নেই, আছে একটি সুসংবাদ। বাংলায় এম· এ· পাশ যুবক-যুবতীগণ—অধৈর্য হবেন না। আমাদের পরামর্শটি গ্রহণ করুন। অচিরেই কামধেনু প্রাপ্ত হবেন।

উনবিংশ শতকের যে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী সংগ্রহ করুন। সাহিত্য সাধক চরিতমালা থেকে বট-তলার এডিসন পর্যন্ত। তারপর পর্বে পর্বে সেই বিখ্যাত ব্যক্তির চরিতকথা ব্যাখ্যা করুন। আপনার এই অভিনব ব্যাখ্যার জন্য আপনি নিশ্চয়ই বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট অব লিটারেচার ডিগ্রিতে বিভূষিত হবেন।

বাংলায় এম· এ· পাশ করে চাকরি পান নি, কিন্তু বাংলায় গবেষণা করে ডি· লিট· পেলে চাকরি আপনার দরজায় এসে হন্যে হয়ে পড়বে।

বাংলায় এম· এ· পাশ যুবক-যুবতীগণ এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না।

চুম্বন : নগ্নতা

খোসলা কমিটি একটি সুপারিশ করেছেন চলচ্চিত্রে চুম্বন আর নগ্নতা সম্বন্ধে। সে সুপারিশ আমার আপনার সবারই জানা হয়ে গেছে অনেকদিন। বলা যেতে পারে পুরনো হয়ে গেছে সে খবর।

কিন্তু কোনো কোনো খবর আছে যাকে নিয়ে ভালো বাণিজ্য করা যায়। চুম্বন আর নগ্নতা তেমনিই দুটি শব্দ। অতএব কোনো কোনো পত্র-পত্রিকা লুফে নিয়েছেন এই প্রসঙ্গটিকে। এবং সে কারণেই এখনও বড় বড় হেড লাইন মাঝে-মধ্যেই দেখা দিচ্ছে এ-পাতা ও-পাতা সে-পাতায়। সবচেয়ে নির্দোষ ভূমিকা চিঠিপত্রের। পাঠক-পাঠিকা যা খুশি লিখতে পারেন, তার মধ্যে যদি একই কথার পুনরাবৃত্তি থাকে, একই যুক্তির বারবার উল্লেখ থাকে, যুক্তির পরিবর্তে একই ধরণের আবেগ যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে—ক্ষতি কি! ক্ষতি যদি স্কুল-কলেজের সেই সব অপরিণত তরুণ-তরুণীর হয়—তা হোক। প্রয়ো-জন হলে সতীত্ব ও নারীত্ব রক্ষার জন্য শয়ে শয়ে চিঠি আবার এরাই চিঠি-পত্রের স্তম্ভে ছাপাবেন।

আমি আপনি মশাই, বেশ ভালো-ভাবেই বুঝি চুম্বন কি, আর নগ্নতাই বা কি। তবু পত্র-পত্রিকায় আরও দীর্ঘ-দিন ধরে বড় বড় হেড লাইন পড়বে চুম্বনের আর নগ্নতার।

কাগজের সেল বাড়াতে হবে তো।

ট্রামে-বাসে জরিমানা

জনৈক পত্রদাতা শহর কলকাতায় পত্রস্থ করার জন্য নিম্নোদ্ধৃত বিষয়টি পাঠিয়েছেন। আমরা অবিকল ছেপে দিলাম।

"সম্প্রতি ট্রামের আয় কমেছে বাসের চেয়ে ট্রামের ভাড়া বেশি হওয়ার জন্য। বাসের আয় আনুপাতিক হারে বেড়েছে সে রকম খবর কর্তাব্যক্তিরা দিতে পারেন নি। এমন হওয়ার কারণ—প্রাইভেট বাসগুলির ব্যবস্থাপনা। সেদিন ট্রামে চড়েছিলাম। ট্রামটি কিছু দূর গিয়ে আউট লাইন্ড্ হল। অর্থাৎ ট্রামে চড়ার জন্য নগদ আঠারো পয়সা জরিমানা দিতে হল। যা হোক, এই ঘটনার পর স্টেট বাসে কোনোমতে উঠলাম। টিকিটও কাটলাম। কিছু দূর যেতে-না-যেতেই বাসটি ব্রেক ডাউন হল। তারপর ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করেও পরবর্তী স্টেট বাসে উঠতে পারলাম না। সুতরাং সেখানেও নগদ পয়সা দণ্ড দিতে হল। পরে প্রাইভেট বাস-ই হল অগতির গতি। এবং নাকাল যাত্রীদের শেষ মন্তব্য : কালে-ভদ্রে প্রাইভেট বাস বিগড়ে গেলে, অন্তত গরীব যাত্রীদের হিসেব করা পয়সা মারা যায় না। অতএব আমার মনে হয়, এই কারণে বহু যাত্রী প্রাইভেট বাসকে শেষ অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং ট্রাম ও স্টেট বাসের যাত্রীসংখ্যা অপেক্ষা-কৃত কম।"

এ ব্যাপারে আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ট্রাম লাইনচ্যুত ও স্টেট বাস ব্রেক ডাউন হওয়া এখন নিত্য নিয়মিত ভীতিজনক ঘটনা। আইন যাই বলুক, গরীবদের মুখ চেয়ে, তাঁরাও একটা সুরাহা করতে পারবেন।

—শহরদর্শী

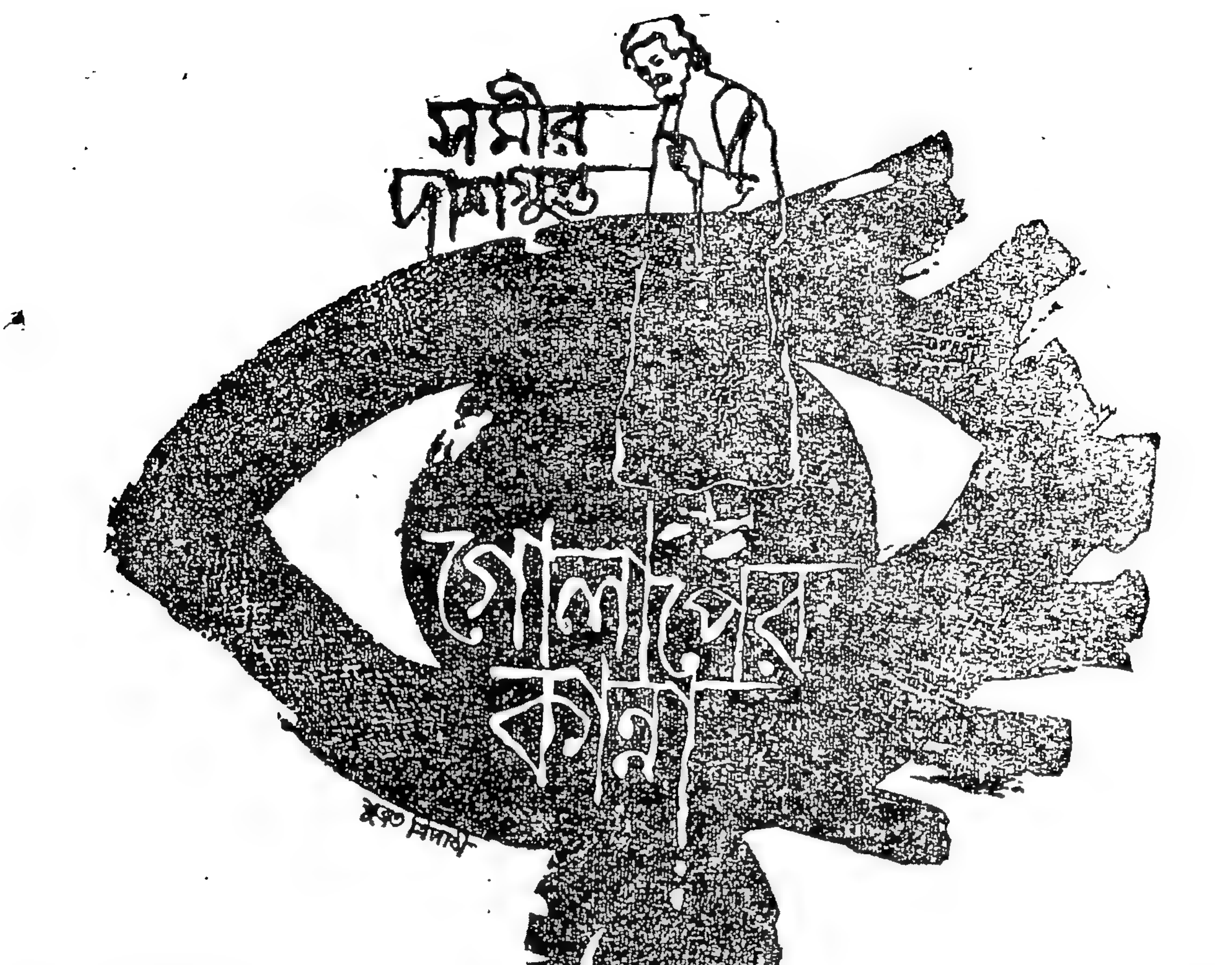

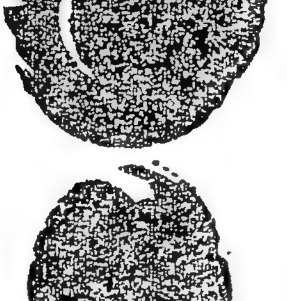

সত্যি গোলাপ আজ কাঁদছে—দীর্ঘ সাত বছর বাদে এই প্রথম চোখের জল পড়েছিল গোলাপের। তার আগে কেউ ওকে কাঁদতে দেখে নি। ওকে দেখে ফাদার জন বলেছিলেন—"সিস্টার—তুমি নিশ্চয়ই যীশুর এক মানসকন্যা, তাই তোমার দুঃখ নেই, শোক নেই, বেদনা নেই। সত্যি সিস্টার গোলাপফুলের মত তুমি হাস্যোজ্জ্বল—আনন্দিত তুমি সকালের সোনালী সূর্যের মত। আশীর্বাদ করি—জীবনে তুমি সুখী হও। আনন্দময়ী যে তার আবার দুঃখ কিসের—সে যে সকল বেদনার ঊর্ধ্বে—"May God bless you!"

"কি যে বলেন ফাদার! আমি যীশুর এক মানসকন্যা।"

কথাগুলো বলতে বলতে হাসিতে ফেটে পড়েছিল গোলাপ।

"আচ্ছা গোলাপ তুমি কি জীবনে সেদিন ছাড়া আর কখনো দুঃখে, বেদনায় কাঁদো নি?" জিজ্ঞাসা করেছিল হৃদয়-দরদী বন্ধু রেভারেন্ড অদৃশ।

উত্তরে বলেছিল গোলাপ—"No dear অদৃশ, জীবনে আমি কখনও কাঁদি নি অবশ্য immature age-এর কথা স্মরণ নেই। দুঃখ পেয়েছিলাম সেদিন যেদিন আমার বাবা আর মাকে একই সঙ্গে সৎকার করা হয়েছিল—চিতার সেই লেলিহান অগ্নিশিখার মত হৃদয়টাও জ্বলছিল দুঃখের আগুনে—আর বেদনা পেয়েছিলাম আর একদিন যেদিন ছোট্ট ভাই রিন্টু চারদিন না খেতে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে বলেছিল—'দিদিভাই আর যে পারি না—দে না দুটো খেতে।'

"সেদিনও কাঁদি নি, তবে হৃদয়টা বেদনার আঘাতে সেদিনেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তারপর. . ."

মুখ চেপে ধরেছিল অদৃশ। বলেছিল—"থাক্। আর শুনতে চাই না।"

সেই গোলাপের চোখে আজ জল। সে আজ কাঁদছে। পার্কসার্কাসের সমাধিস্থানের একটা সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে ও কাঁদছে। হাতে একটা চাঁপাফুলের তোড়া আর একগুচ্ছ শুভ্র রজনীগন্ধার স্তবক—ঠিক ওর হৃদয় অশ্রুর মতই শুভ্র, পবিত্র, শুচিস্নাত।

হাতের ফুলের তোড়াটা আর রজনীগন্ধার গাছটা সমাধির ওপর রাখে গোলাপ—হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নিচু করে প্রার্থনা করে আর সেই সঙ্গে চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু।

এই সেই গোলাপ। কলকাতার এক নোংরা বস্তি থেকে আবিষ্কার করেছিল এক খ্রীস্টান তরুণ অধ্যাপক রেভারেন্ড অদৃশ চট্টোপাধ্যায়। এই নোংরা সমাজের কিছু লোকের জৈবিক ক্ষুধা মেটাবার শিকার এই ফুলের মত নিষ্পাপ গোলাপকে। প্রথম দিনই অদৃশ দেখেছিল এক বিদ্যুৎ—দেখেছিল গোলাপের চোখের চাহনির মাঝে এক অদ্ভুত দিব্যজ্যোতি—দেখেছিল তার বেঁচে না বাঁচার অব্যক্ত বেদনা। সেই চোখ থেকে আজ অশ্রু ঝরছে বাঁধনহারা বন্যার মত। শীতকাল। খুব ভোর তখন. কুয়াশা কাটে নি। কম্বল কিংবা

ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে কুঁকড়ে পড়ে আছে রাস্তার মানুষগুলো—ওরা যে পথের মানুষ—পথে পথেই তো ওদের দিন কাটে। রাস্তায় জল দিতে আরম্ভ করেছে। প্রথম ট্রামটা যেন ঘুমন্ত চোখে তন্দ্রায় ঢুলতে ঢুলতে সর্পিল গতিতে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ঘন্টা বেজে উঠছে ঠন্‌ঠন্! ঠন্‌ঠন্! একটা ডবল ডেকার ঘুম থেকে জেগে ওঠা দৈত্যের মত গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেল। 'চাই! গরম চা' পিতলের কলসী নিয়ে ঘোরা-ফেরা করছে হিন্দুস্থানী চা-ওয়ালা। ফুটপাথের বিছানা গুটিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে সারাদিনের কর্মব্যস্ত কুলী-কামারীর দল—রিক্সাওয়ালার দল। নতুন সূর্য, নতুন দিন, তাই আবার নতুন কাজ আরম্ভ হবে নবোদ্যমে নতুন প্রেরণায়।

র‍্যাপারটা গায়ে ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়ে সমাধিস্থল থেকে বেরিয়ে আসে গোলাপ। উত্তরে হাওয়াটা হু হু করে বইছে। চার্চের ঘড়িতে তখন সবে ৬টা বেজে ১৫ মিনিট হয়েছে। ৭টায় আবার কলেজে Class নিতে হবে। বাড়ির দিকে না গিয়ে কলেজেই পা বাড়ালো গোলাপ।

* * *

"দিদি?" অনিন্দিতার ডাকে চমক ভাঙলো গোলাপের

ছিঃ ছিঃ ক্লাসে এসে চুপচাপ চেয়ারে এতক্ষণ বসেছিল সে! কি ভাবছিলো ও সব আবোল-তাবোল।

"দিদি! আপনার কি আজ শরীর খারাপ। তাহলে আজ আর আপনার Class নিতে হবে না"—বলল অনিন্দিতা।

ক্লাসের সকল ছাত্রী অনিন্দিতার কথায় সায় দিয়ে উঠল। ওরা যে বড় ভালোবাসে Philosophy-এর এই অধ্যাপিকা গোলাপ চ্যাটার্জীকে।

"না ভাই—ও কিছু নয়। যাক্ listen to me. দর্শনের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার তত্ত্বের ব্যাখ্যা বোঝাতে আরম্ভ করে গোলাপ। Class over হয়ে গেছে—সারা শরীরে সত্যি একটা ক্লান্তি আর অবসাদের ছায়া নেমে এসেছে। বাড়ির দিকে পা বাড়ায় গোলাপ। হঠাৎ শাড়ির আঁচলে একটু মৃদু টান পড়ল গোলাপের—চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল, অনিন্দিতা—যৌবনের এক বাঁধনহারা বন্যার প্লাবন, চাঁপা-ফুলের মত গায়ের রং, চোখে গভীর চাহনি, চোখের কালো তারায় জীবনের এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় অভিব্যক্তি। চলার ছন্দে বীণার সুমধুর নিক্বণ। মাথায় একরাশ কালো চুল—কপোলে সাগরতটের গভীর নিঃসীমতা।

"কি ব্যাপার অনিন্দিতা?"

"আপনার আজ নিশ্চয়ই শরীর খারাপ হয়েছে। চলুন বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না না দিতা তোমার আর কষ্ট করতে হবে না—যাও লক্ষ্মীটি ঘরে যাও। আমি একাই যেতে পারব।"

"দিদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

"একটা কেন দিতা যে কটা খুশি!"

"দিদি—আপনি বুঝি আজ সমাধি-ক্ষেত্রে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ দিতা, প্রার্থনা করতে গিয়েছিলাম। আজই তো তার মৃত্যুলগ্ন"—একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সাথে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল গোলাপের চোখ থেকে।

হৃদয়বেদনায় গুমরে ওঠে কিশোরী অনিন্দিতার সরল মনটি। হৃদয়ের চাপা বেদনা মনের মধ্যে অশ্রুর তুফান তোলে। ভাসাভাসা চোখে বেদনায় সিক্ত হয়ে বলে উঠল অনিন্দিতা, "দিদি—তুমি কাঁদছ!"

দিতার চুলগুলো আঙুল দিয়ে সরাতে সরাতে একটু মৃদু হেসে বলল গোলাপ—"যাও দিতা—আজ সাবধানে বাড়ি যাও। দিদির আদেশ ছোটবোনের অমান্য করতে নেই কিন্তু। তোমার বাবা হয়তো ভাবছেন। কাল কলেজ থেকে ফেরবার পথে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবো। কেমন—বাবাকে বলে আসবে।"

মৃদু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে একটু স্মিতহাসি হেসে বাড়ির উদ্দেশ্যে পা ফেলে অনিন্দিতা। B. A.-র প্রথম বর্ষের Philosophy-র ছাত্রী। ওর চলার পানে চেয়ে থাকে গোলাপ। বেচারী অনিন্দিতা—মা নেই, দিদি নেই, আছে শুধু বাবা আর ছোট্ট একটা ভাই। তাই ও অত স্নেহের কাঙাল। তাই গোলাপ ভীষণ ভালোবাসে এই মাতৃহারা কিশোরী অনিন্দিতাকে—ও যে ফুলের মতই স্নিগ্ধ, পবিত্র, নির্মল। অব্যক্ত বেদনার অভিব্যক্তিস্বরূপ একটু মৃদুহাসি তার হৃদয় থেকে ছিটকে পড়ে। ট্রামটা এসে পড়ে। ট্রামে উঠে পড়ে গোলাপ—জানালার পাশে গিয়ে বসে—হাওয়ায় চুলগুলো উড়তে থাকে—পরনে সাদা থান, হাতে দুগাছা বালা। আর একটা রিস্টওয়াচ। ট্রাম চলতে থাকে। চোখের সামনে থেকে সরে সরে যেতে থাকে শহরের চলমান মানুষের ছায়াছবি, সরে যায় কর্মব্যস্ত মানুষ, সরে যায় প্রাসাদ-সম অট্টালিকা—চোখে পড়ে নোংরা, বিষাক্ত, ঘৃণ্য আর কলুষিত বলে অখ্যাত বস্তিগুলো। ট্রামটা একটা stoppage-এ এসে থামে। একটা বস্তি-অঞ্চল। ভিতর থেকে ভেসে আসে অশ্রাব্য গালিগালাজ। ঝগড়া অশ্লীলতার চরম অভিব্যক্তি। রাস্তায় রোগা হাড় জিরজিরে উলঙ্গ ছেলে-গুলোর সহায়হীনতা, রিক্ততা আর দৈন্যতা আর তার সাথে কুকুরগুলোর আর্ত চিৎকার। সব মিশিয়ে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় বাতাস এখানে বিষাক্ত, নিশ্বাস এখানে রুদ্ধ। জীবন-চেতনায় এরা অন্ধ। মনে হয় বিকৃতির এরাই যেন স্রষ্টা। সমাজে বাস করেও এরা যেন সমাজ বহির্ভূত জীব। যাদের জীবনমৃত্যুর সমস্যা তাদের নিজেদের কাছে। যারা স্বাদ পেয়েছে বেঁচে থেকে না বাঁচার এক চরম তিক্ততা।

একটু হাসলো গোলাপ, কিন্তু হায় সমাজ আর তার পোষমানা মানুষগুলো! ওরা কি একটুও বোঝে না—একটু ভাবে না ওদের কথা! একটু তলিয়ে দেখলেই সে নিশানা পাবে যে অন্ধকারের মাঝেই আলো। চরম পাপের মধ্যেই তো পুণ্যের আত্মপ্রকাশ। বিকৃত অশ্লীলতা আর অশালীনতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে জীবনচেতনার বিদ্যুৎ-বিকাশ—মঙ্গলময় ঈশ্বরের আলোকবর্তিকা। ওরা তো মানুষ। ওদেরও তো আছে বাঁচবার অধিকার। ওরাও তো চায় সুস্থ শান্তি-ময় পরিবেশের মধ্যে নিষ্কলঙ্ক জীবন-যাপন করতে। ওদের হৃদয়েও তো চাপা আছে শিক্ষা-দীক্ষা আর জ্ঞানের আলোকে প্রকাশিত হবার আকুল বাসনা। তবে তারা বঞ্চিত কেন? কেন তারা রিক্ত নিঃস্ব সর্বহারা—কেন অরা কতিপয় মানুষের ভোগের সামগ্রী—অশ্লীলতা, অশালীনতা আর নোংরামি এগুলো তাদের হৃদয়ের আত্মপ্রকাশ না চাপা বেদনার একটা আর্তি! কে দেবে এই প্রশ্নের উত্তর।

ট্রামটা এসে পড়েছে, নেমে পড়ল গোলাপ।

* * *

'কি করছ রিন্টু?' বলল গোলাপ।

'প্রার্থনা করছি দিদি।'

'প্রার্থনা—কার কাছে?'

'কেন—ভগবান যীশুর কাছে। আচ্ছা দিদি ভগবান সবার কথা শোনেন?'

'কেন শুনবেন না! নিশ্চয়ই শোনেন। ভগবান তার সন্তানের ডাকে না সাড়া দিয়ে কি পারেন?'

'তবে দিদি গরীবের ডাক তো ভগবান শোনেন না। যদি শুনতেন তবে তারা অত দুঃখ পায় কেন দিদি—তারা খেতে পায় না কেন?'

কি উত্তর দেবে গোলাপ। এতটুকু বয়সের রিন্টু। অথচ কি তার স্বাভাবিক চেতনা—প্রশ্নের উত্তর দিতে অন্ধকারে হাতড়াতে হয় দিদিকে। উত্তর দেবার ভাষা নেই, খেই হারিয়ে ফেলেছে যেন। কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল গোলাপ—'এবার পড়তে বসো রিন্টু। তারপর খেতে দেব।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় রিন্টু। এই সেই রিন্টু—গোলাপের একমাত্র নয়নের মণি। আগে কতদিন অভুক্ত থেকেছে এই ছোট্ট ভাই রিন্টু। আজ ও সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। ক্লাসে first হয়। স্কুলে সে 'জুয়েল' নামেই অভিহিত। আর গোলাপ! সে আজ Philosophy-র অধ্যাপিকা। অথচ এসব কি সম্ভব হতো যদি না অদৃশের সঙ্গে তার দেখা না হতো। যদি না ফাদার জন পড়িয়ে শুনিয়ে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিতা করে তুলতেন। তাহলে আজও সেই কানাগলি—অন্ধকার দুর্বহ, দুঃসহ—মাতালের প্রলাপ রিক্সার ঠুং ঠাং শব্দ আর ব্যাভিচারিণীদের মত হৃদয়ের অসহ্য দুঃসহ পাথর চাপা বেদনা—ওঃ ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। কি নোংরা সেই লোকগুলো—দুষ্টক্ষত যেন সর্বাঙ্গে পাপের কীট যেন সারা শরীরে কিলবিল করে—হৃদয়টাও ক্লেদাক্ত পঙ্কিল আর জঘন্য—অথচ সমাজে এরাই সুপ্রতিষ্ঠিত আর যারা ভোগের উপকরণ যোগায়—তারা নিচ, ঘৃণ্য সমাজচ্যুত।

মিসেস ব্রাউনের কথায় চমক ভাঙলো গোলাপের।

"দিদিমণি—খাবেন না? ১২টা বেজে গেছে যে!"

"ও. হ্যাঁ—চল খেতে যাব।"

মিসেস ব্রাউন ওদের এই নিঃসম্বল সংসারের একটি দামী সম্পদ। বহুদিন আগেই অদৃশ ব্রাউনকে আয়া হিসাবে রেখেছিল। ভীষণ দুঃখী এই মিসেস ব্রাউন। মাতৃপিতৃহারা—স্বামী ওর অন্ধ। সারাক্ষণ চার্চেই থাকে।

খেয়ে-দেয়ে যখন বিছানায় গা এলিয়ে দেয় গোলাপ তখন বেলা দুটো বেজে গেছে। রিন্টুটা পাশে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। মিসেস ব্রাউনের নাক-ডাকার শব্দ শুনতে পেলো গোলাপ। সবাই কি সুন্দর ঘুমোচ্ছে। কিন্তু গোলাপের চোখের পাতা আর বোজে না। একটা অসহ্য বেদনা থেকে থেকে গুমরে উঠছে—সামনে টাঙানো অধ্যাপক রেভারেন্ড অদৃশ চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছবিটা—গোলাপের স্বামী এই অদৃশ চট্টোপাধ্যায়। ছবিটা আছে, কিন্তু আজ দু' বছর এই মানুষটা নেই—এই অসভ্য দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে যীশুর কোলে এখন ঘুমিয়ে আছে। ফটোটার দিকে চোখ পড়তেই গোলাপের চোখের মণি দুটো আটকে গেল—নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত বইতে সুরু করেছে। বুকের মধ্যে কি যেন একটা উদ্দামতা। ওয়ালক্লকটা টিকটিক করে বেজে চলেছে। আর সেই সঙ্গে খসে পড়ছে গোলাপ চ্যাটার্জীর অতীতের বেদনাবিধুর স্মৃতিগুলো......

খৃস্টান মিশনারী স্কুল থেকে কিছু খৃস্টান শিক্ষক সেবার দুধ, ফলমূল আর কিছু বইপত্র বিলি করতে এসেছিল চীৎপুরের কাছাকাছি একটি বস্তি অঞ্চলে। রিন্টুর বয়স তখন সবে ৫ বছর হয়তো হবে। মা-বাবাকে হারিয়ে রিন্টু তখন গোলাপের আদরের মণি, নয়নের ধন।

সেদিন হঠাৎ দেখে গোলাপ—রিন্টু ঘরে নেই। তবে গেল কোথায়? দু'দিন ছেলেটা প্রায় আধপেটা খেয়ে আছে। পাগলের মত খুঁজতে খুঁজতে রিন্টুকে আবিষ্কার করল সেইখানে যেইখানে ফলমূল ইত্যাদি দান করা হচ্ছে।

একজন খৃস্টান তরুণ রিন্টুর সঙ্গে কথাবার্তা বলছে আর মাঝে মাঝে হেসে উঠছে দুজনেই।

গোলাপ আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, "রিন্টু—তুমি না বলে রাস্তায় এসেছ কেন?

'বাঃ দিদি—আমার যে ভীষণ খিদে পেয়েছিল। তাই নাড় বলল—'রিন্টু চল আমার সাথে—দুধ খাবি ফল খাবি। জানো দিদি আমি দুধ খাই নি। ফল খেয়েছি। আর উনি না এই টফিগুলো আমায় দিলেন।'

'দারিদ্র্যের এই উলঙ্গ অভিব্যক্তি আর সহ্য করতে পারলো না গোলাপ। ঠাস করে রিন্টুর গালে একটা চড় বসিয়ে দিল চল—বাড়ি চল।'

"শুনুন—আপনি ওর অভিভাবিকা হতে পারেন, তবে এতটুকু নিষ্পাপ ফুলের মত শিশুকে মারা পাপ—অপরাধ—ও তো আর মিথ্যে কিছু বলে নি। তবে ওকে আপনি মিথ্যের আশ্রয় নেবার শিক্ষা দিচ্ছেন কেন?"

মেজাজটা একেই গরম ছিল গোলাপের—কারণ গতকাল তার কোন রোজগারই হয় নি। প্রচন্ড জ্বরের দরুণ খেতে দিতে পারে নি রিন্টুকে। তাই খৃস্টান যুবকের এই উপদেশ আর সহ্য হলো না গোলাপের। ও বলে ফেলল রাগে না ক্ষোভে না দুঃখে তা বলতে পারি না—তবে ও বলল, 'যান যান—অমন উপদেশ জীবনে ঢের শুনেছি।'

'সে কি! আপনার বয়সই বা কত? আর জীবন সম্বন্ধে কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা আছে আপনার।'

'অনেকের থেকে বেশি—খেতে যারা পায় না তাদের আবার শিক্ষা—তাদের আবার সম্মান-সম্ভ্রম। হৃদয় আমাদের মরে গেছে। আমরা আজ কিছু লোকের লোভ আর লালসার বিলাসসামগ্রী। যাদের কোন সত্তা নেই তাদের আবার আত্মজ্ঞান, আত্মবিশ্বাস।' অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন রেভারেন্ড অদৃশ চট্টোপাধ্যায় এই নোংরা জঘন্য কুৎসিত বলে অখ্যাত এক পতিতার কথা শুনে। চোখে যেন দেখেছিল আবরুর পিছনে লুকিয়ে থাকা এক দিব্যজ্যোতি। যা আকাশে ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল করছে। কথার মধ্যে যেন ও শুনতে পেয়েছিল মরমীয়া মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে ভগবান ওকে পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে। ওরা পতিতা হতে পারে। কিন্তু ওরা নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ ফুলের মতই স্নিগ্ধ সুন্দর ফুলকে যখন ভ্রমর বেষ্টন করে থাকে, তবে তা সত্যই নয়নবিমোহন। কিন্তু যখন কোন দুষ্ট কীট ফুলের ওপর বসে তখন ফুলটাকে বাইরে সুন্দর না দেখাতে পারে, কিন্তু ফুলের তো কোন অপরাধ নেই—ও তো অসহায়! দুষ্ট কীটের দংশনে ওর হৃদয়টা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ফুলের গন্ধের তো কোন পরিবর্তন হয় না—হবেই বা কেন—ও তো স্নিগ্ধ, নিষ্পাপ প্রকৃতির মানসকন্যা। ঠিক এরাও তাই, ফুলের মতই নির্মল চরিত্র নিষ্কলঙ্ক এদের অন্তর—কিন্তু দুষ্ট কীটের দংশনে ক্ষতবিক্ষত, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা আর অবহেলিতা।

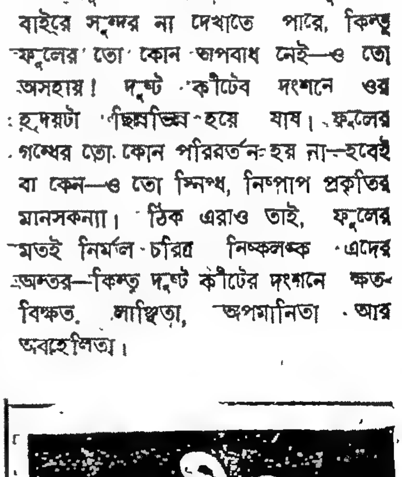

"আর কিছু বলবেন ?" জিজ্ঞাসা করেছিল গোলাপ।

"আপনি থাকেন কোথায় ?"

—কেন আপনার প্রয়োজন ? করুণা দেখাতে এসেছেন দরিদ্রের ওপর। করুণা দেখিয়ে যান—ভিখিরিকে মানুষ যেমন করুণা করে—আমাব বাড়ি কোথায় তা জেনে আপনাব প্রয়োজন ? আর আমাদের বাড়ি এলে আপনি অপবিত্র হবেন। আর তাছাড়া আমাদের বাড়িতে দিনে তো কেউ আসে না। আসে সব রাতে—গভীর রাতে। সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন আসে ঐ সব ভয়ানক বিভীষিকাময় নিশাচরের দল। আর কতকগুলো অসহায়া নীরবে চোখের জল ফেলে। তা আপনি এসে কি করবেন একটা নোংরা মেয়েব বাড়ি', বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল গোলাপ।

"আপনি কাঁদছেন! কাঁদুন আরও বেশি করে। দেখবেন যত চোখের জল পড়বে তত পৃথিবী থেকে পাপ দূর হয়ে যাবে। চলুন আপনাব বাড়ি যাবো। তবে, নিশাচরের ছদ্মবেশে নয়, পরম বন্ধু হয়ে। আমাকে আপনার এক পরম বন্ধু বলে মেনে নিতে পারেন। অবশ্য মনে যদি বিশ্বাস থাকে। খৃস্টান আমরা—ভগবান যীশুর করুণায়, তাঁর কৃপায় আমরা চাই মানুষের মঙ্গল—মানুষের কল্যাণ। হতভাগা মানুষ—অসহায়া নারীদের দিতে চাই মুক্তির ইঙ্গিত। আপনাকেও দিতে পারি মুক্তি পথের ইঙ্গিত। আসবেন আমাদেব চার্চে ? দেখবেন জীবন সেখানে সুন্দর—শান্ত—মন সেখানে পবিত্র।"

চোখের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলে যায় গোলাপের মুক্তির কথা শুনে—এই চরম ঘৃণ্য নোংরামির হাত থেকে সত্যই সে মুক্তি পাবে—সত্যই কি সে দেখবে পবিত্র মঙ্গলময় ঈশ্বরের আলোকবর্তিকা ?

'আমি রাজী। যাবেন আমাকে নিয়ে আপনাদের চার্চে? সারাদিন সেখানে থাকবো আমি। ছি ছি এ সব কি বলছি আমি। একটা পতিতা মেয়ে পাবে পবিত্র গীর্জায় স্থান। তবে যে ভগবান অপবিত্র হবেন।'

'কে বললো আপনাকে। ভগবান তো সবার। আপনার আমার রিন্টুর সবার। হৃদয়ের নৈবেদ্য সাজিয়ে, পবিত্র মন নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ান, দেখবেন হৃদয় থেকে এক দিব্যজ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছে। ফুলের স্নিগ্ধ সৌরভে নির্মল হয়ে উঠবে মন। অপবিত্রতার আবরণ খসে আবির্ভূত হবে নিষ্পাপ কোমল সত্তা।'

'তবে চলুন আজই যাব। আর ভালো লাগে না—অসহ্য, কিন্তু আমার রিন্টু ও থাকবে কোথায় খাবে কি?'

'যদি বলি আমাব কাছেই থাকবে?'

'আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ আমার কাছেই ও থাকবে। একটা ছোট্ট ভাই-এর প্রতীক্ষায় বসেছিলাম অনেকদিন ধরে। আজ আমি সেই মাণিক খুঁজে পেলাম। চলুন যাওয়া যাক।'

গোলাপের চোখ থেকে টস টস করে গড়িয়ে পড়ে দু' ফোঁটা আনন্দের অশ্রু। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যায় গোলাপ।

'না না ও সব করতে হবে না। ওতে আমার পাপেব বোঝা বেড়ে যাবে। তাছাড়া আপনি তো উদ্ধার কিংবা মুক্তি আমার জন্য পান নি, পেয়েছেন ভগবানের জন্য মিস...'

"গোলাপ সান্যাল।"

"ও আচ্ছা। আপনাব নামের সঙ্গে ফুলেরও বেশ মিল খুঁজে পাচ্ছি আমি।"

হো হো করে হেসে ওঠে দুজন।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার কানাগলিতে নেমে আসে। ধ্রুবতারাটা আজ যেন বেশ জ্বলজ্বল করছে। একফালি চাঁদও উঁকি মারছে আকাশেব কোল থেকে। ওরা পা চালায়।

* * *

সেই থেকে বিশপ ফাদার জনের কাছে রয়ে গেছে গোলাপ সান্যাল। নিজের মেয়ের মত ভালোবাসেন গোলাপকে। দুটি বছর কেটে গেছে। ফাদাব জনের উৎসাহে আর রেভারেন্ড অদৃশের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে গোলাপ। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এখন যেন ও শুনতে চায় নতুনের আবাহন সংগীত। চার্চের প্রার্থনায় যেন উপলব্ধি করতে পারে—ভগবান যীশুব বাণী—"পৃথিবীর গরীবের দরিদ্রেব আর অবহেলিতদের সেবা কর। ঘৃণা করিও না, দু' হাতে বুকে চাপিয়া ধব।"

গোলাপ শুনতে পায় সেই বেদনাতুর মানুষের অব্যক্ত কাতর ক্রন্দনধ্বনি—নাঃ এর প্রতিকার চাই-ই...।

"গোলাপ।"

"এই যে অদৃশ। কোথায় ছিলে বলত —সারাদিন তোমার কথা ভেবেই অস্থির।"

"তাহলে আমার কথাও ভাবো। আমি ভেবেছিলাম ফাদার আর রিন্টু ছাড়া তুমি আর কিছু জানো না। বোঝ না আর ভাবোও না।"

"যাক—আর বাজে কথা বলতে হবে না। অদৃশ এই দুদিন আসো নি যে

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ। সদ্য প্রকাশিত হইল !!

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত

রাজভাষা

(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ)

ইংরেজী ভাষা শিক্ষার অপূর্ব গ্রন্থ। যাঁহাবা কিছুমাত্র ইংরেজী জানেন না, তাঁহারাও 'রাজভাষা'র সাহায্যে কোন শিক্ষকের সহায়তা ব্যতিবেকে অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে ইংবেজী লিখিতে ও বলিতে পারিবেন। ইংরেজী ভাষার শিক্ষকদের পক্ষেও 'রাজভাষা' বিশেষ সাহায্যপ্রদ বলিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ স্বীকৃত। ইংবেজী ভাষা যাঁহাবা নিয়ত চর্চা করেন তাঁহারাও 'রাজভাষা' ব্যবহাবে উপকৃত হইবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম নির্মাতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী লিখিয়াছিলেন :—

"আমি রাজভাষাখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে প্রথম ইংরেজী শিক্ষাবিদ্‌দিগের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই পুস্তক যাঁহারা মনোযোগের সহিত সযত্নে পাঠ কবিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই যে ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

মূল্য মাত্র চার টাকা

বসুমতী (প্রা) লিঃ ।। কলিকাতা-১২

ঝড়।" অভিমানে ফেটে পড়ে গোলাপ। অভিমান করলে ভারী সুন্দর দেখায় গোলাপকে। গাল দুটো রাঙা হয়ে ওঠে—চোখের তারায় বিদ্যুৎ খেলে যায়—অধরে দেখা যায় একটু মৃদুহাসি।

"কলেজে কাজের চাপ একটু বেশি পড়েছিল গোলাপ। তাই ঠিক সময়......"

"কলেজই তোমার সব—আর আমি? আমি বুঝি তোমার কেউ না। আসতে বলবোও না।"

"এই দেখ একটু হলেই বাচ্চা মেয়ের মত রাগ আর অভিমান। ফাদারকে বলব?"

"ওরে বাবা! দোহাই তোমার। এই কান মললুম আর তোমার ওপর রাগও করবো না অভিমান তো নয়ই।"

"মনে থাকে যেন।" দুষ্ট হাসি হেসে বলল অদৃশ।

"অদৃশ।"

"বল।"

"চল না একটু বেড়িয়ে আসি। ভালো লাগছে না সেই সকাল থেকে।"

"চলো আজ তোমায় এক নতুন জায়গায় নিয়ে যাবো।" ওরা গিয়ে উঠলো পার্ক সার্কাসের সমাধিক্ষেত্রে। একটা সমাধির পাশে ধীরে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ায় অদৃশ। হাঁটু গেড়ে বসে—প্রার্থনা করে। বলে—"এই যে সমাধিটা দেখছো—এখানে আমার বাবাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। আর এই পাশেরটায় রয়েছেন আমার মা। বড় ভালোবাসতেন আমায়।"

চোখের কোণ দুটো ভিজে উঠলো অদৃশের।

"অদৃশ। তুমি কাঁদছো?"

রুমালটা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, অদৃশ—

"গোলাপ, ভগবানের কি ছলনা! রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেলাম এক ফুটন্ত স্নিগ্ধ রক্তগোলাপ। তারও মা নেই, বাবা নেই। গোলাপ তুমিই পারবে আমার শূন্য হৃদয় ভরিয়ে তুলতে। তুমি যে আমার সব।"

"অদৃশ—জীবনের কোন্ লগ্নে দেখা হয়েছিল তোমার সাথে জানি না—তবে সেদিন কেন জানি না হৃদয়ে ডেকেছিল নতুন জীবন পাওয়ার এক অশান্ত বান। মনের সংগোপনে বেঁধে ফেলেছিলাম তোমার হৃদয়টাকে। তাই তো তোমার সাথে এলাম। তোমায় ভালোবেসে আজ আমার কিছুই নেই অদৃশ। আজ আমি নিঃস্ব রিক্ত—হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা উজাড় করে তোমায় দিয়েছি। তুমি যে আমার দেবতা।"

"চলো গোলাপ, রাত হয়ে এলো। ফাদার আবার ভাববেন।"

"হ্যাঁ চলো। কাল আসবে কিন্তু।"

"আচ্ছা বাবা আচ্ছা—আসবোখন।"

এমনি করেই চলতে থাকে দুটো হৃদয়ের জীবন-সাগরের উন্দামতা। দুর্দম সাগরের অশান্ত ফেনিল জলোচ্ছ্বাস কখনো তীব্র আবার কখনো বা ছন্দোময়ী, লাস্যময়ী। হৃদয়স্রোতের বাঁধভাঙা ঢেউ আছড়ে পড়ে দুটি মনের গহন বাতায়নে। দুটি মন হারিয়ে যায় ঝর্ণার ছন্দের তালে তালে।

আর তার সাথে চলতে থাকে গোলাপের শিক্ষা। আজ গোলাপ অধ্যাপিকা—ফিলজফি-র অধ্যাপিকা। সেদিন ফাদার ডেকেছিলেন গোলাপ আর অদৃশকে। অদ্ভুত চরিত্র এই ফাদার জনের। প্রৌঢ়, একমুখ দাড়ি। শান্ত-সৌম্য-উদার—চোখে পুরু লেন্সের চশমা। জীবন চেতনায় সচেতন। মানবের দরদিয়া বন্ধু।

"আমাদের ডেকেছেন ফাদার।"

"হ্যাঁ, বোস। তোমাদের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই। অনেকদিন ধরেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। তবে বলি নি। কারণ, সিস্টার গোলাপকে মানুষ করে তুলতে হয়েছে—তোমাদের দু'জনের 'ম্যারেজ' আমি দেখে যেতে চাই অদৃশ। আর বেশিদিন হয়তো বাঁচবো না। যীশুর ডাক এসেছে যে।"

"এসব অমঙ্গল কথা থাক ফাদার।" বলেছিল অদৃশ। আর গোলাপ একটা আর্ত চীৎকার দিয়ে উঠেছিল—

"ফাদার! এসব কি বলছেন! তাহলে আমরা বাঁচবো কাকে নিয়ে ফাদার।"

"উতলা হোস নে 'সিস্টার'—আত্মাকে কেউ বেঁধে রাখতে পারে না গোলাপ। কেউ পারে না। যেখান থেকে তার উৎপত্তি সেখানেই তার পরিসমাপ্তি। 'নেক্সট' শুক্রবার তোমাদের 'ম্যারেজ' হোক এই আমার বাসনা।"

"ফাদার—একটা কথা বলবো।"

"বল—বল সিস্টার—একটা কেন—যত খুশি প্রশ্ন কর। সব উত্তর দিয়ে যাবো। জীবনে আর একবার আনন্দ পেলাম আজ।"

"ফাদার—আমাদের বিয়েতে আমার কয়েকজন বন্ধুকে. ..."

"নিশ্চয়ই বলবি—বলবি না তোকে কে বলেছে?"

"কিন্তু তারা যে পতিতা......"

"ওদেরই তো বলবি! ওরা যে ভগবানেরই সন্তান। ওদের সবাইকে 'ইনভাইট' করবি কেমন?"

"কি হে 'ইয়ং প্রফেসার'! কেমন লাগছে!"

"Life is really a bed of thorn but it bears a romantic adventure."

অদৃশ লজ্জায় মাথা নিচু করে।

"তোমরা তাহলে এখন যেতে পারো। অনেক রাত হয়ে গেছে।"

ঢং করে চার্চের ঘড়িতে সাড়ে ন'টা জানিয়ে দিল। গোলাপের কাছ থেকে পেয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো অদৃশ—

* * *

তারপরের ঘটনাগুলো যেমন বিক্ষিপ্ত তেমন বেদনাতুর। ওদের বিয়ের পর মারা যান ফাদার জন। তার শোকে পাগল হয়ে যান রেভারেন্ড অদৃশ। তারপর একদিন বিকৃত মস্তিষ্ক এই অদৃশ খেয়ালের বশে করে আত্মহত্যা। দিশেহারা হয়ে পড়ে গোলাপ। জীবনের বাঁধন ছাড়া গ্রন্থিগুলোর বন্ধন আবার ছিঁড়ে যায়। জানালায় বসে চেয়ে থাকে গোলাপ অদৃশের ঐ কফিনের পানে—দূরে অন্ধকার ঠিক ওর মনের গহন আঁধারের মতই জমাট বাঁধা। অদৃশের শেষ কথাটা বার বার করে মনে পড়ে—"গোলাপ। আমার স্নিগ্ধ গোলাপ।"

"Really you are charming like a rose—you are a daughter of Christ and to me you are a rose of paradise."

"অদৃশ!" একটা চাপা চীৎকার দিয়ে ওঠে গোলাপ। সেই সঙ্গে একটা কুকুরের বিশ্রী চীৎকারে তন্দ্রাটাও কেটে যায় গোলাপের। বেলা পড়ে এসেছে। অস্তগামী সূর্যের ম্লান আভায় রক্তিম হয়ে উঠেছে পশ্চিম দিগন্তটা। ধূসর ছায়ার একটা অবগুণ্ঠন নেমে আসছে। আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ যেন গোলাপের খণ্ডিত জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। গলিটার দিকে চাইল গোলাপ। গলিটা কিছু দূর গিয়ে একটা মোড় নিয়েছে। জীবনের বাঁকের সঙ্গে সত্যই ওর বেশ মিল আছে। নিঃসঙ্গ পথ। একা পড়ে থাকে। কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। শুধু পথচারী ওর বুকের ওপর পা ফেলে হেঁটে চলে।

সত্যি আজ গোলাপও নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব, রিক্ত। ফটোটার দিকে চাইল গোলাপ। অদৃশ হাসছে। গোলাপের কিন্তু তখন চোখে জল। সে তখন কাঁদছে।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

BAZA
৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।
HIND AGENCIES (67) KOLHAPUR ROAD DELHI-7

এ যুগের নৃত্য ভাবনা ঃ একটি খসড়া

শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়

গতানুগতিক চিন্তাধারার মধ্যে না গিয়ে নাচের সম্বন্ধে নতুন কিছু ভাবনা এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আগেই বলে রাখা ভাল যে, পাণ্ডিত্য প্রকাশ অথবা কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি কটাক্ষ করা আমার আদৌ অভিপ্রায় নয়। নৃত্যশিল্পকে আন্তরিকভাবে ভালবাসি বলে এবং দীর্ঘ দিন ধরে নৃত্যচর্চা করতে গিয়ে, বা নাচ শেখাতে গিয়ে যে অসুবিধা এবং অভাব অনুভব করেছি, তারই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরলাম মাত্র।

বর্তমানে আমাদের দেশে কোন শিক্ষাই ত্রুটিমুক্ত নয়। সুতরাং নাচের শিক্ষাধারাও যে ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়, তা একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে কষ্ট হবে না। কিন্তু তাই বলে এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার গলদগুলি তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এই প্রবন্ধে সমালোচনার নীতি অনুসারে আলোচনার সঙ্গে কিছু কিছু "সাজেশানস্"ও থাকছে। বিদগ্ধ পাঠক, নৃত্যশিল্পী, নৃত্যের ছাত্রছাত্রী, নৃত্য-শিক্ষক ও নৃত্য-গবেষকগণ এ-ব্যাপারে ভেবে দেখতে পারেন, এই অনুরোধ নিয়েই সবিনয়ে আমার বক্তব্যগুলি রাখছি।

প্রথমে আমার আলোচ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে প্রস্তাবাকারে রাখছি। তারপর ঐগুলি থেকে বেছে নিয়ে কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করবো।

আমাদের দেশে নৃত্যচর্চার ক্ষেত্রে যে কয়টি প্রধান বিষয়ের অভাব এবং ত্রুটি রয়েছে তা হলো মোটামুটি এই ঃ

প্রথমত—আমাদের দেশে আজও নৃত্য-লিপি বা Dance Notation তৈরি হয় নি। কিন্তু অবিলম্বে তৈরি করা দরকার। এবং কেন দরকার তা এই প্রবন্ধেই যথা সম্ভব আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এইটুকু বলতে চাই, আমাদের দেশে নাচের পাঠ্যক্রমে Choreography থাকলেও তাতে পড়াবার মতো বিশেষজ্ঞের অভাব। পাশ্চাত্ত্য দেশের Choreography বা Dance Notation-এর সঙ্গে আমাদের হয়তো পরিচয় নেই। তা ছাড়া আমাদের দেশে নাচের 'নোটেশন' তো এখনো তৈরিই হয় নি। সুতরাং এ বিষয়ে অনেকের ধারণাই নেই।

দ্বিতীয়ত—আমাদের দেশে নৃত্যতত্ত্ব বিষয়ে কোন কাজ হয় নি। এ ব্যাপারেও আলোচনা পরে করবো। কাজটি বিরাট। একার কাজ নয়। কাজেই বহুজনে মিলে এ কাজ সম্পাদন করতে হবে।

তৃতীয়ত—নৃত্যবিচারের কোন সঠিক, বিজ্ঞানভিত্তিক মানদণ্ড আজও তৈরি হয় নি। এখনো বিচারকদের ব্যক্তিগত ভাল লাগা মন্দ লাগার ওপরেই নাচের বিচার অনেকটা নির্ভর করছে। অর্থাৎ নাচের Theory বলতে এখনো আমরা শুধু নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পণের কতকগুলি করণ-প্রকরণকেই বুঝি। অথবা ভরত-নাট্যম, কথাকলি, কত্থক, মণিপুরী প্রভৃতি নাচ সম্বন্ধে যেটুকু জানি একমাত্র তার ওপরই নির্ভর করতে চাই। যদিও ভরতের নাট্যশাস্ত্র নৃত্য-জগতে প্রামাণ্য দলিল বলে গৃহীত, তবুও প্রাক্-ভরত যুগের নৃত্য-কল্পনা, ভরত যুগের নৃত্যভাবনা ও উত্তর-ভরত যুগের নৃত্য-বিকাশের মধ্যে পারম্পর্য রক্ষা করে আধুনিক-কাল পর্যন্ত টেনে এনে নৃত্যবিচারের বা নৃত্যের থিওরীর ওপর যতক্ষণ কোন মৌলিক চিন্তা চোখে পড়ছে না।

চতুর্থত—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আজও আমরা অগ্রসর হই নি। বিষয়টি হল ভারতীয় নৃত্যের বিজ্ঞান-ভিত্তিক ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা। এ বিষয়ে লেখক ইদানীং গবেষণা সুরু করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমার মনে হয়, নাচের ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য পাঠ্য হিসাবে Cultural History of India পড়ানো দরকার। নৃত্যশিক্ষার সর্বোচ্চস্তরে নান্দনিক বিষয়ের সঙ্গে সামগ্রিক-ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস, পাঠ্যক্রমে থাকা একান্ত দরকার।

পঞ্চমত—বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বা এ ধরণের দুটি-একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমাদের দেশে যে নৃত্যশিক্ষায়তনগুলি আছে, সেখানে প্রচলিত পাঠ্যক্রমে কোন Gradation নেই। একই নাচের Item প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত চলতে থাকলে স্বভাবতই সেই Subject-এর প্রতি কারুর সম্ভ্রম থাকার কথা নয়। এই Gradation-এর অভাবে প্রতিটি স্তরে নাচের Standard ঠিক থাকছে না। নাচের এই Gradation বিষয়ে ভবিষ্যতে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে রইল।

ষষ্ঠত—আমাদের দেশে বেশির ভাগ নৃত্য-শিক্ষায়তনগুলিতে যেভাবে নৃত্য-শিক্ষার আয়োজন রয়েছে, তার বেশির ভাগই চলছে imitative method-এ। অর্থাৎ শুধুমাত্র অনুকরণ করে। তাই নৃত্যশিক্ষা পদ্ধতিতে নতুন কোন Development দেখা যাচ্ছে না। সেই আলারিপু, যতিস্বরম, সেই কথককের ভাও, আমোদ প্রভৃতি Traditional ভাবে চলছে। তা চলুক তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু চিরকালই কি আমরা ঐ কয়টি Item-এর মধ্যেই ঘুরপাক খাবো? অবশ্য কোন কোন প্রতিষ্ঠান এই Traditional ধারাতে চর্চা করেও নাচের creative দিকে নজর দিয়েছেন বলে শুনছি। তাহলে সেটা খুবই আশার কথা।

যাই হোক এভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে দেখানো যেতে পারে যে আমাদের দেশে এখনো নাচের Practical দিক অপেক্ষা Theory দুর্বল। কথাটি অপ্রিয় হলেও সত্য।

॥ নৃত্যলিপি প্রসঙ্গ ॥

সুকুমার শিল্প বা ললিতকলার যে কোন একটি শাখার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ বিষয়ের আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। যে কোন শিল্পকলার তাত্ত্বিক, নান্দনিক ও ফলিত বিষয়ে চর্চা না হলে, সেই শিল্পের বিজ্ঞান-সম্মত নিজস্ব মানদণ্ড তৈরি হয় না। হতে পারে না।

ললিতকলার একটি মূল্যবান শাখা হল নৃত্যকলা। ইদানীং নৃত্যের প্রচার ও প্রসার বেড়েছে এতে সন্দেহের বিন্দু-মাত্র অবকাশ নেই। কিন্তু প্রচার ও প্রসারের জনপ্রিয়তাই শিল্পের একমাত্র মাপকাঠি নয়। শিল্পের নিজস্ব মানদণ্ড তৈরি হতে প্রচুর বিশ্লেষণী আলোচনা, অনুধ্যান, চর্চা ও গবেষণা দরকার।

সর্বভারতীয় নৃত্যচর্চার ক্ষেত্রে মার্গ ও দেশী পর্যায়ের নৃত্যের আঙ্গিকে, ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ অনুশীলনের প্রকরণগত বিশ্লেষণে একটি মস্ত বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই দুরূহ সমস্যাটি হলো নৃত্যলিপি তৈরি করা নিয়ে।

আগেই বলেছি, নৃত্যচর্চা করতে গিয়ে ও ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে গিয়ে বার বার যে বিষয়ে অভাব অনুভব করেছি—সেই অভাবটি হল নৃত্যলিপির। এই নৃত্যলিপির ওপরেই নির্ভর করছে নৃত্যের Systematic চর্চার।

কিন্তু নৃত্যবিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ এ-বিষয়ে তাঁদের ঔদাসীন্য এমন অতলস্পর্শী এবং সমস্যা এত ব্যাপক যে, শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে এই অভাজনকেই আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করতে হলো।

আজ পর্যন্ত কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত নিয়ে বাজারে অনেক বই বেরিয়েছে, কিছু গবেষণাও হয়েছে বা হচ্ছে, সাময়িক পত্রিকাতেও কিছু কিছু প্রবন্ধ বেরোয় মাঝে মাঝে। কিন্তু দেহসঙ্গীত বা নৃত্যকলা নিয়ে তেমন আলোচনা বা গবেষণা হয় নি। যেটুকু হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য। সেই যুগে হেমেন রায় "নাচঘর" পত্রিকার মাধ্যমে নাচের ঔপপত্তিক দিকের যেটুকু আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন তাও বর্তমানের ঔদাসীন্যে শুকিয়ে গেছে। দু'-একখানা নাচের বই (বিশেষ করে বাংলা ভাষায় লেখা) যা বেরিয়েছে তাও নৃত্যের ঔপপত্তিক বিষয়ে প্রাথমিক চাহিদা মেটালেও ক্রিয়াসিদ্ধ প্রকরণের তেমন কোন ইঙ্গিত বহন করে না। ওগুলির বেশির ভাগই হলো ভরতের নাট্যশাস্ত্র বা নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণের আঙ্গিক বা নৃত্যের বিষয়গুলি বাংলায় অনুবাদ করার মতো। অবশ্য ঔপপত্তিক ব্যাপারে এগুলির প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু নাচের ক্রিয়াসিদ্ধ রূপ কি হবে, তা নিয়ে কোন চিন্তাশীল প্রবন্ধ চোখে পড়ে না। নৃত্যলিপি তৈরি হওয়া দূরের কথা, এ বিষয়ে উচ্চাঙ্গের আলোচনারও প্রচণ্ড অভাব। এখনো অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় আলোচনার জগতে নৃত্য যেন উপেক্ষিত।

অথচ যত দূর জানি, ইউরোপখণ্ডে এবং আমেরিকায় নৃত্যলিপি বা Dance Notation-এর কাজ বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছে। ওদেশের নৃত্যবিশেষজ্ঞগণ মনে করেন নৃত্যলিপি প্রকরণের প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় মধ্যপ্রাচ্যের মিশরে। তারপর ঐ পদ্ধতি যে পরবর্তীকালে রোমদেশে অনুসৃত হয়েছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে স্পেনে পাওয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের দুটি পাণ্ডুলিপিতে। ১৬৬৬ খৃঃ Beanchamps তাঁর Dance Notation প্রথম প্রকাশ করেন। এর পর একে একে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রাশিয়া ও আমেরিকা এ বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। রাশিয়ায় Stepanov-পদ্ধতি, ফ্রান্সের Beanchamps-Fenillet পদ্ধতি, গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকায় Laban-পদ্ধতি, Arther Saint-Leon's পদ্ধতি, Albert Zorn-পদ্ধতি, Margaret Moris-পদ্ধতি প্রভৃতি ধীরে ধীরে গৃহীত হয়। Choreography-র ইতিহাসে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো Ann Hutchinson-এর লেখা Labanotation-পদ্ধতি এবং Benesh পদ্ধতি। কিছুদিন আগে নিউইয়র্কের "Dance Notation Bureau" এবং লণ্ডনের "Institute of choreology" এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার এবং যোগাযোগের মাধ্যমে এইটুকু জানা গেছে যে, এখন ঐ দুটি পদ্ধতি ওদের দেশে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী Dance Notation বলে পরিচিত। আমাদের দেশের নৃত্য গবেষকরা নিশ্চয়ই Labanotation ও Benesh Notation-এর কথা অবগত আছেন। ওদের দেশের নৃত্য গবেষকরা Choreography বা Notation of ballet Dancing-এর কাজ অনেক দূর অগ্রসর করে নিয়ে গেছেন। ব্যালে নৃত্যের প্রতিটি পদক্ষেপ ও অঙ্গভঙ্গির Notation বা লিপি ও'রা তৈরি করেছেন—তারপর ঐ সাংকেতিক চিহ্নে নাচ তৈরি করে সকলের শেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু যতদূর জানি, আমাদের দেশে এ ধরণের প্রচেষ্টা আজও হয় নি। কিন্তু হওয়া দরকার। কেন দরকার সে কথাই এখন বলবো।

ইদানীং প্রচুর পরিশ্রম করে কোন কোন নাট্যগবেষক নাটক বিচারের আধুনিক প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে সুসংবদ্ধ আলোচনা করেছেন—ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি হয়তো আর পরিশীলিত হয়ে একটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড তৈরির পথ প্রশস্ত করবে। কিন্তু নৃত্যবিচারের তেমন কোন মানদণ্ড আজও তৈরি হল না। এ নিয়ে আর আক্ষেপ করে লাভ নেই। যাতে নৃত্যলিপি তৈরি হয়ে নাচের মানদণ্ডের একটা দিক অন্তত পরিষ্কার হয়, সেদিকে নজর দেবার সময় এসেছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে নৃত্যলিপি ব্যাপারটা কি? আগে নৃত্যলিপি বলতে আমরা কি বুঝি তা বলে নিই। তারপর এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলবো।

আপনারা জানেন স্বরকে লিপিতে আবদ্ধ করার রীতিকে স্বরলিপি বলে। সঙ্গীতে স্বরগুলিকে সাংকেতিকচিহ্নে বেঁধে লিপি তৈরি করা হয়। এই স্বরলিপি পদ্ধতি জানা থাকায় গান শুনে আমরা সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি তৈরি করে ফেলতে পারি এবং একটু বাদেই আবার সেই স্বরলিপির সাহায্যে সেই গানকেই প্রায় অবিকৃতরূপে গাইতে পারি। নাচের ব্যাপারে কিন্তু তেমন সুবিধে নেই। একটা নাচ দেখতে দেখতে সেটাকে কতগুলি সাংকেতিক চিহ্নে ধরে রেখে, নাচটা শেষ হলে, আমরা সেই সাংকেতিক লিপি-চিহ্ন অনুযায়ী নাচ করে যাওয়া সম্ভব কিনা এ নিয়ে অনেকে হয়তো চিন্তা করেছেন, কিন্তু কিভাবে তা করা যেতে পারে তার প্রয়াস পান নি। অথবা ব্যাপারটা বিপুলায়তন ও জটিল ভেবে অনেকে এড়িয়ে গেছেন। তা ছাড়া গানকে ধরে রাখবার জন্য রেকর্ড, টেপরেকর্ড প্রভৃতি পদ্ধতি আছে। কিন্তু নাচকে বা দেহভঙ্গিকে ধরে রাখার তেমন কোন পদ্ধতি নেই। একমাত্র নাচকে ফিল্ম করে রাখা যায়। কিন্তু কত ফিল্ম করা যাবে? ভরতনাট্যম, কথাকলি, কথক, মণিপুরী মোহিনী আটাম (নাটাম নয়) কৃষ্ণনাট্যম প্রভৃতি ছাড়াও হাজার রকমের আঞ্চলিক লোকনৃত্য রয়েছে। সব নৃত্যের পদক্ষেপ ও অঙ্গভঙ্গিগুলি ফিল্ম করে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শেখানো সম্ভব নয়। নাচের একেকটা নমুনা হিসেবে ফিল্ম করে রাখা যায় মাত্র। তাছাড়া স্বরলিপির সাংকেতিক চিহ্নগুলিকে কণ্ঠের স্বরগ্রামে বসিয়ে বা হারমোনিয়ামের মাধ্যমে আবার নতুন করে পাওয়া যায়। কিন্তু নাচের ব্যাপারে সে ধরণের যান্ত্রিক সুবিধে পাবার আশা কম। সেজন্য এমন একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে, যে পদ্ধতিতে নাচের প্রতিটি পদক্ষেপ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গের গতিভঙ্গি, করণ, চারী, ভ্রমরী, পদকর্ম, মুদ্রা, নৃত্তহস্ত, শিরঃকর্ম প্রভৃতি নাচের যে Anatomy রয়েছে তাকে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নে বাঁধতে হবে, তারপর ধারাবাহিক গতিলিপি বা নৃত্যলিপি তৈরি করতে হবে। কাজটা অবশ্যি খুবই জটিল এবং সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। কিন্তু অসম্ভব নয়।

[আগামীবারে সমাপ্য]

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০, দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

ভূমিকাঃ হেন্‌রিক ইব্‌সেনের ‘এ ডল্‌স হাউস’ঃ ইওরোপের রঙ্গমঞ্চে আধুনিক যুগের শুরু হয় ইব্‌সেনের (১৮২৮—১৯০৬) থেকে। ডিকেন্সের মত ইব্‌সেনের লেখাতেও সমাজ-সংস্কারের একটা বিরাট এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে, আর “অন দি অরিজিন অভ্‌ স্পিসিজ” ১৮৫৯-এ। ফরাসী বিপ্লবের মূল আঘাত এসে পড়েছিল ‘ডিভাইন রাইট অভ্‌ কিংস’ এই ভ্রমাত্মক ধারণার ওপর। মার্কস এ বিষয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন। তিনি আক্রমণ করে বসলেন সম্পদের মালিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ‘ডিভাইন রাইট অভ্‌ পাওয়ার’কে। আর ডারউইনের থিওরিতে নস্যাৎ করে দেওয়া হল, এই অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিকে যে মানুষ ভগবানের দ্বারা বিশেষভাবে সৃষ্ট। এসবের ফলে নতুনভাবে নির্ধারণ করবার সময় এল, সমাজ এবং বিশ্বের পটভূমিকায় মানুষের আসল স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে। এতকাল বাইবেলের নির্দেশ অনুযায়ী সবাই মনে করতো যেন মানুষকে কেন্দ্র করেই এবং বিশেষভাবে মানুষের জনাই জগতের সৃষ্টি। এখন থেকে বেশির ভাগ চিন্তাশীল লোকই বুঝতে শিখল ও-ধরণের জগৎ-সৃষ্টির ব্যাখ্যার কোন অর্থই হয় না।। ‘এ্যাস্ট্রোনমার্স, জিওলজিস্টস এবং বায়োলজিস্টরা সেসব তথ্য আবিষ্কার করতে লাগলেন, তার ফলে মানুষ জানলো যে, বিশ্বজগৎ এন্‌থ্রোপসেন্ট্রিক নয়। ইতিহাসের অর্থনীতিক ভাষা সামাজিক-সংগঠন ব্যাপারটার ওপর নতুন আলোকপাত করলো এবং এটাও বোঝাতে শেখালো ‘কোন্‌ পরিবেশে মানুষ কিভাবে গড়ে ওঠে।’

অতীতের গ্রীকদের কাছে মানুষের পরিচয় ছিল বীরপুরুষ হিসাবে—সে যেন আধা-দেবতা, প্রায় অলিম্পিয়ান গড্‌সদের সমশ্রেণীর। এই অলিম্পিয়া পাহাড়ের দেবতারাই ছিলেন মানুষের ভাগ্যবিধাতা। মানুষের সামান্য ভুল-ত্রুটি এমন কি অজানিতভাবেও কোন নৈতিক নিয়মের কোন বিচ্যুতি ঘটলে ঐসব দেবতার কাছে তার কঠোর বিচার হোত—অবশ্য তখনকার গ্রীকরাই এই ধরণের মতবাদে বিশ্বাসী ছিল।

এলিজাবীথান আমলেও মানুষের বীরত্বব্যঞ্জক চেহারাটা বিশেষ পাল্টায় নি। তখন মানুষই যেন পৃথিবীর অধিকর্তা, গর্বোদ্ধত, প্রচণ্ড তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তার চাওয়ার এবং আশার কোন সীমানা নেই, তার ক্ষমতাও দুর্জয়।

উপরি-উক্ত ধারণার ওপর ভিত্তি করেই পেরিক্লিয়েন যুগের এ্যাথেন্সের নাটক এবং এলিজাবীথান যুগের নাটক রচিত। প্রধান চরিত্রগুলি সব সময়েই হোত অতিবাস্তব বা ‘লার্জার দ্যান লাইফ’—যেমন ঈডিপাশ, বা হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ প্রমুখ। এমন একটা মহাজাগতিক বিরাটত্ব এবং মাহাত্ম্যের পরিচয় এইসব চরিত্রে পাওয়া যেত যা পাঠক এবং দর্শকের মনে অদ্ভুত বিস্ময়ের সৃষ্টি করতো। তাদের জীবনের ভুল, ত্রুটি এবং অসাফল্যে গভীর এবং তীব্র করুণরসের সৃষ্টি হোত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিন্তু মানুষের চেহারা অনেক পাল্টে গেল। এপিক এবং এলিজাবীথান যুগের বিরাটত্ব কমিয়ে তাকে সাধারণ বাস্তবজীবনের চেহারায় নামিয়ে আনা হোল। নতুন সব তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে নতুন পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে এখন সাধারণ মানুষের মতই দেখা হতে লাগল, আর তাকে আগেকার মত প্রায় দেবতার অবতার বানাবার কোন প্রচেষ্টা দেখা গেল না।

নতুন আবিস্কৃত বিজ্ঞানসমূহের সঙ্গে যেমন মার্কস ও ডারউইনের নাম যুক্ত (এবং পরে ফ্রয়েড ও আইনস্টাইনের), তেমনি নতুন নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল নরওয়েজিয়ান নাট্যকার হেন্‌রিক ইব্‌সেনের নাম।. ইব্‌সেনিজম বলতে সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের নাট্যজগতের বিরাট বিপ্লবের কথাই সহজভাবে মনে আসে।

এই বিপ্লব শুধুমাত্র নাটের বিষয়-বস্তুর ওপরই আবদ্ধ নয়—নাটকের টেকনিক এবং স্টেজক্রাফ্‌ট্‌ও এই বৈপ্লবিক ওলোট-পালটের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

ইব্‌সেনের বিশ্ববিখ্যাত নাটক ‘এ ডল্‌স হাউসের’ বাংলায় অনুবাদ করে (আজকের দিনের অভিনয়ের জন্য আগের মত সময় দেওয়া যায় না—তাই নাটকটিকে সামান্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে) এইবার পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিচ্ছি। এ নাটকের বঙ্গীকরণ করলে রসহানি ঘটবে—কারণ ‘ডল্‌স হাউসের’ সমস্যা বিশেষভাবেই এক সময়ের ইওরোপীয়ান সমাজের ওপর আরোপ করা চলে না। সাহেবকে ধুতি-পাঞ্জাবী পরিয়ে যেমন বাঙালী করা যায় না, ‘ডল্‌স হাউস’ শ্রেণীর নাটককেও বঙ্গীকরণের মাধ্যমে বাংলা নাটকে পরিণত করা যায় না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

১৮৭৯ খৃস্টাব্দে ‘এ ডল্‌স হাউস’ প্রকাশিত হয়। এর ঠিক আগের বছরে ইব্‌সেন রোম-এ এই নাটকটি সম্বন্ধে যে নোট্‌স লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা নিচে তুলে দিচ্ছিঃ

There are two kinds of spiritual law, two kinds of conscience, one in man and another, altogether different, in women... The wife in the play ends by having no idea of what is right or wrong: natural feeling one the one hand and belief in authority on the other have altogether bewildered her.

A woman cannot be herself in the society of the present day, which is an exclusively masculine society, with laws framed by men and with a judicial system that judges feminine conduct from a masculine point of view.

She has committed forgery, and she is proud of it; for she did it out of love for her husband, to save his life. But this husband with his common place principles of honour is on the side of the law and regards the question with masculine eyes.

Spiritual conflicts. Oppressed and bewildered by the belief in authority, she loses faith in her moral right and ability to bring up her children ... Love of life, of home, of husband and children and family. Here and there a womanly shaking-off of her thoughts.

Sudden return of anxiety and terror. She must bear it all above. The catastrophe approaches, inexorably, inevitably. Despair, conflict and destruction.

Krogstad has acted dishonourably and thereby become well-to-do; now his

prosperity does not help him, he cannot recover his honour.

এইবার আসল নাটক শুরু করা যাক্—

হেন্‌রিক ইব্‌সেনের 'এ ডল্‌স হাউস'

চরিত্রঃ টরভ্যাল্ড হেল্‌মার
নোরা—টরভ্যাল্ড হেলমারের স্ত্রী
ডক্টর র‍্যাঙ্ক
মিসেস লিন্ড
নিলস্ ক্রগস্টাড্
হেক্টর—ভৃত্য (আসল নাটকের পরিচারিকা হেলেনকে বদলিয়ে হেক্টর করা হয়েছে।)

প্রথম অঙ্ক

[দৃশ্যঃ বসবার ঘর—বেশি আসবাব-পত্র দিয়ে ঘর ঠাসা হয় নি—কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা দরকার সেই মত ফার্নিচার আছে। ঘরের সজ্জা সুরুচি-পূর্ণ। নাটকের তিনটি অঙ্কের সব ঘটনাই এই ঘরে ঘটবে। কার্টেন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নোরা এবং হেক্টর ঘরে ঢুকবে—দুজনের হাতেই নানাধরণের প্যাকেট।]

নোরা—ক্রিসমাস ট্রীটা একটু লুকিয়ে রেখো হেক্টর। সন্ধ্যার সময় এটাকে সাজান হবে। তার আগে যেন ছেলে-মেয়েরা দেখতে না পায়। (চাকরের প্রতি) কত দিতে হবে?

হেক্টর—ছ' পেন্স—

নোরা—এই নাও একটা শিলিং—বাইরে পোর্টারকে দিও। আর বাকীটা তোমার বকশিষ।

হেক্টর—ধন্যবাদ ম্যাডাম—(প্রস্থান)।

নোরা—(উইংস-এর ধারে উঁকি দিয়ে) আরে! হেলমার দেখছি বাড়িতেই আছে? (গুনগুন করে টেবিলের কাছে যাবে)—

Sometimes I wish I had wings
Like a bird, sometimes I wish
I had never been born.

হেলমার—(উইংসের ধার থেকে) Is that my little lark twittering out there?

নোরা—(জিনিস খুলতে খুলতে) হুঁ—হুঁ—

হেলমার—Is that my little squirrel bustling about?

নোরা—হুঁ হুঁ।

হেলমার—When did my squirrel come home?

নোরা—এই এখুনি। টরভ্যাল্ড একবার এসে দেখে যাও কত কিছু কিনে এনেছি—

হেলমার—এখন আমি বড্ড ব্যস্ত (একটু পরে স্টেজে ঢুকবে) কই দেখি কি এনেছ—কি সর্বনাশ—এ যে বাজার উজাড় করে সব কিনে এনেছ। Has my little spendthrift been wasting money again?

নোরা—তা হোক—এ-বছর আমাদের অত টানাটানি নেই, এবারের ক্রিসমাসে আমরা খানিকটা খুশিমত খরচ করতে পারি।

হেলমার—কিন্তু ভেবে দেখো নোরা—অপ-ব্যয় করবার মত অর্থ কি আমাদের আছে?

নোরা—না টরভ্যাল্ড—সামান্য একটু বেশি খরচ করলে এ-বছরে কিছু এসে যাবে না। অল্প একটু অপব্যয়। You are going to have a big salary and earn lots and lots of money.

হেলমার—তা তো বুঝলাম। কিন্তু নতুন চাকরী তো শুরু হবে নতুন বছরের আরম্ভের পর। আর প্রথম মাসের মাইনেটা হাতে আসতেও তো খানিকটা সময় যাবে।

নোরা—তাতে কি এসে যায়। মাঝের ঐ ক'টা দিন মাত্র—সে আমরা ধার করে চালিয়ে নেব।

হেলমার—The same little feather-head! আচ্ছা ধরলাম, যেন আজ আমি তোমার কথামতই পঞ্চাশ পাউন্ড ধার করে আনলাম। আর ক্রিসমাস Week-এই তুমি তা নিঃশেষে উড়িয়ে দিলে। তারপর New Years' Eve-এ ঘটলো একটা এ্যাক্সিডেন্ট—আমি গেলাম মারা। তখন—তখন কি হবে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম
(বর্তমান প্রচার-সংখ্যা ১২,০০০)

0

বিজ্ঞাপনের হার

তৃতীয় প্রচ্ছদ	...	২০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	...	১২৫ "
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	...	৭৫ "

0

বিজ্ঞাপন প্রকাশের শর্তাবলী সম্পর্কে
নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

বিজনেস ম্যানেজার, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

নোরা—(তার মুখ চেপে ধরে) ছিঃ টরভ্যাল্ড। এসব বিশ্রী কথা মুখে আনতে নেই।

হেলমার—বেশ মুখে না হয় না-ই আনলাম—কিন্তু সত্যিই যদি এই ধরণের একটা কিছু হয়, তখন?

নোরা—সেক্ষেত্রে কার কাছে টাকা ধার আছে বা না আছে, সে-কথাকে আমি বড় করে ধরবো না—

হেলমার—কিন্তু যারা ধার দেবে তাদের কথাটা একটু ভেবে দেখো—

নোরা—তাদের কথা ভাববার মত মনের অবস্থা তখন আমার থাকবে না।

হেলমার—That's like a woman, কিন্তু আমার মত হলো—No debt, No borrowing, ঘরের শান্তি, শৃংখলা, সৌন্দর্য সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়, মানুষ যখন চায় ধার করে সংসার চালাতে। এতদিন এত কষ্ট সহ্য করে নির্ভীকভাবে যদি আমরা সোজা পথে চলে আসতে পারি, তবে এই সামান্য কয়েকদিনের জন্য struggle করতে পারব না?

নোরা—তুমি ভাল মনে করলে, তাই হবে।

হেলমার—থাক্ আর রাগ করতে হবে না—(পার্স বের করে) বল দেখি নোরা এর মধ্যে কি আছে?

নোরা—টাকা!

হেলমার—(পার্সটা দিয়ে) তুমি কি মনে কর নোরা যে আমি বুঝি না ক্রিসমাসের সময় সংসার খরচ কত বেড়ে যায়?

নোরা—(গুণতে গুণতে) দশ শিলিং...... এক পাউন্ড, দু' পাউন্ড, অনেক—অনেক ধন্যবাদ টরভ্যাল্ড, এই টাকাতে আমি অনেকদিন চালিয়ে নিতে পারব।

হেলমার—তা তো চালাতেই হবে।

নোরা—সেজন্য ভেবো না—কিন্তু দেখো কি সব এনেছি। আর কি সস্তা দামে। এই 'আইভারের' নতুন স্যুট, আর এই 'ববের' পুলোভার—এ্যানের খেলনা—ঝি, চাকরদের কিছু জামার কাপড়—জানলার পর্দা, টেবিল ক্লথ—

হেলমার—এই পার্শেলটায় কি?

নোরা—(চেঁচিয়ে উঠে) না, না, সন্ধ্যার আগে ওটা তুমি দেখতে পাবে না।

হেলমার—বেশ দেখবো না। কিন্তু বল দেখি আহ্লাদী মেয়ে, তোমার নিজের জন্য কি চাই?

নোরা—আমার—আমার কিছু দরকার নেই।

হেলমার—তবুও তোমাকে নিতেই হবে। এমন একটা কিছু বল—যা পেলে তুমি সত্যিই খুশি হও।

নোরা—কই আমি কিছুই ভাবতে পারছি না—অবশ্য যদি—

হেলমার—আহা, বলেই ফেল না।

নোরা—কিছু টাকা যদি আমায় দিতে—সামান্য যা তুমি afford করতে পার। পরে আমার পছন্দমত একটা কিছু কেনা যাবে তাই দিয়ে।

হেলমার—কিন্তু নোরা—

নোরা—Please টরভ্যাল্ড—আপত্তি কোরো না—ও-টাকা সোনালী কাগজে মুড়ে আমি ক্রিসমাস ট্রীতে ঝুলিয়ে রাখব —Wouldn't that be fun?

হেলমার—যেসব ছোট্ট ছেলেমেয়েরা এভাবে বাজে পয়সা নষ্ট করে, তাদের কি বলে?

নোরা—অপব্যয়ী—ও-কথা আর আমাকে নতুন করে বলতে হবে না। আগে আমি যা বলছি শোন—পরে ভেবে দেখা যাবে আমার সব থেকে বেশি দরকার কোন জিনিসের। কেমন রাজী?

হেলমার—হ্যাঁ রাজী, যদি সত্যিই ঐ টাকা দিয়ে তুমি নিজের জন্যই কিছু কেনো। কিন্তু টাকাটা যদি সংসার-খরচায় ঢেলে দাও বা কতকগুলো বাজে জিনিস কিনতে উড়িয়ে দাও...

নোরা—কিন্তু টরভ্যাল্ড—

হেলমার—আমার আহ্লাদী spend-thriftটি কি অস্বীকার করতে পারে যে, সে প্রচুর অপব্যয় করে থাকে? অথচ এ কেউ ধারণাতেও আনতে পারে না এই সব বাচ্ছা মেয়েদের কি সাংঘাতিক খরচের হাত—

নোরা—এ তোমার অন্যায় অভিযোগ। যতটা পারি আমি তো জমিয়েই রাখি।

হেলমার—(হাসতে হাসতে) খুব খাঁটি কথা বলেছ—যতটা পার, কিন্তু সত্যিকার পার না যে একটুও।

নোরা—(হাসিমুখে) এই সব skylark and squirrel-দের যে কত রকমের খরচা সে ধারণা তো তোমার নেই।

হেলমার—You are an odd little soul, ঠিক বাপের মত হয়েছ। মিষ্টি কথায়, নিত্য নতুন উপায়ে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিতে একেবারে সিদ্ধহস্ত—আর টাকাটা পেতে না পেতেই হাত দিয়ে গলে কোথায় যে বেরিয়ে যায় তারও পাত্তা পাওয়া ভার। অপব্যয় রয়েছে তোমার রক্তে—একেই বোধ হয় বলে পিতৃধারা—

নোরা—বাবার অন্য গুণগুলোও যদি সেই সঙ্গে পেতাম—

হেলমার—তুমি যা ঠিক সেইভাবেই অর্থাৎ as my sweet little skylark, তোমাকে আমার ভাল লাগে।

নোরা—আজ রাত্রে Dr. Rank-কে নেমন্তন্ন করবার কথা মনে ছিল তো?

হেলমার—বিশেষভাবে নেমন্তন্ন করবার কি কোনও দরকার ছিল? দেখবে প্রতিদিনের মত আজও সে ডিনারে আসবেই। যাই হোক সকালে এলে পর বলে দেব। জান নোরা আজকের সন্ধ্যাটার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছি।

নোরা—আমিও ঠিক তাই, ছেলেমেয়েদের আমোদের দিকটা ভাবতেই সবচেয়ে আনন্দ লাগে।

হেলমার—ভাল চাকরী—ভাল রোজগার—শান্তিপূর্ণ সংসার—ভাবতেও আরাম কি বল?

নোরা—It's wonderful.

হেলমার—গত বছর ক্রিসমাসের কথা মনে পড়ে নোরা? তিন সপ্তাহ আগে থেকে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ক্রিসমাস ট্রী কিভাবে সাজাবে—আর কি কি করবে, সেইসব কাজেই তুমি ব্যস্ত থাকতে। আমার জীবনে বোধ হয় এমন বিশ্রী তিনটে সপ্তাহ আর কখনও আসে নি।

নোরা—আমার কিন্তু বেশ কেটেছিল ঐ সময়টা।

হেলমার—(হাসতে হাসতে) ফলটা কি হয়েছিল মনে আছে তো?

নোরা—তার জন্য আমাকে ঠাট্টা করা তোমার ঠিক নয়। বেড়াল ঢুকে সব ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলল, আর আমি কি করতে পারি বল?

হেলমার—বেচারী! তোমার দোষ কি! তুমি তো আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলে আমাদের সবাইকে খুশি করতে—আর সেটাই হল আসল কথা—আমাদের সেই কষ্টের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

নোরা—সত্যিই তাই।

হেলমার—এ বছর আমারও একলা বসে বসে একঘেয়েভাবে সময় কাটাতে হবে না, আর তোমাকেও ঘর সাজাবার জন্য দিনরাত বসে বসে সেলাই করে কাটাতে হবে না।

নোরা—সত্যিই টরভ্যাল্ড, এবার আমাকে আর অত পরিশ্রম করতে হবে না—(ঘণ্টাধ্বনি) কেউ এসেছে—

হেক্টর—(দরজা থেকে নোরাকে) একজন মহিলা...আগে কখনও আসেন নি... আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

নোরা—আসতে বল—

হেক্টর—(হেলমারকে) Dr. Rank এসেছেন।

হেলমার—ডাক্তার কি আমার ঘরের দিকে গেছেন?

হেক্টর—হ্যাঁ—তাই গেলেন......

[ক্রমশ]

রংঢং

পি, আই, বি'র কাজের পদ্ধতি

সম্প্রতি কলকাতায় রুমানিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল। ভারত-রুমানিয়া সাংস্কৃতিক বিনিময়সূচী অনুসারে এই চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রিদপ্তর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সুতরাং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল পি, আই, বি'র (প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো) ওপর।

যখন সরকারী কোন দপ্তরের ওপর এরকম উৎসবের ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব থাকে, তখন আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠি। বিশেষ করে গত দু-তিন বছরের অভিজ্ঞতায় এই শঙ্কা দেখা দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ বলে থাকেন সরকারী ব্যবস্থার অপর নাম চূড়ান্ত অব্যবস্থা। এ ধারণা যে অমূলক নয়, পর পর কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসবের অভিজ্ঞতায় তা দেখা গেছে। রুমানিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে অবশ্য একদিক থেকে প্রশংসনীয় ব্যবস্থা হয়েছিল যে, বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটির মারফৎ কিছু টিকেট বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার ফলে ফিল্ম সোসাইটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ছবিগুলি দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এ ধরণের ছবির আসল সমঝদার ফিল্ম সোসাইটির সদস্যরা। ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবে এই ব্যবস্থা না হওয়ায় যৌনতাদর্শন লোভী বাজে দর্শকের ভিড়ে এক নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এবার সেদিক থেকে পি. আই, বি'র সিদ্ধান্ত ভাল হয়েছে।

কিন্তু কি কারণে জানি না, বিভিন্ন সংবাদপত্রে চলচ্চিত্র পর্যালোচনার ব্যাপারে পি. আই. বি অদ্ভুত এক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সংবাদপত্রে চলচ্চিত্র পর্যালোচনার জন্য নির্দিষ্টভাবে একজনের ওপর দায়িত্ব থাকে। তাঁকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও ওয়াকিবহাল মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু পি. আই, বি এবার চলচ্চিত্র পর্যালোচকদের আমন্ত্রণপত্রগুলি বি, এফ, জে, এ নামক একটি সংস্থার দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছে। সকল চলচ্চিত্র পর্যালোচক এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কিনা, এটা যথার্থ সাংবাদিকদের সংগঠন কিনা কোন খবরাখবর না নিয়ে পি, আই. বি এই সংস্থাকে ঠিকাদারী দিয়ে বসেছে।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

অথবা মনে করেছে এই সংস্থাকে আমন্ত্রণ করলেই বুঝি সকল সাংবাদিক উপস্থিত হবেন। শোনা যায় পি, আই, বি'র জনৈক সহকারী ইনফরমেশন অফিসার শ্রীবসু নাকি এ ব্যাপারে অতি উৎসাহী। কেবলমাত্র বি. এফ, জে, এ'কে আমন্ত্রণ করে তিনি পরিশ্রম লাঘব করতে চান—না অন্য কোন ব্যাপার এর মধ্যে আছে সেকথা অবশ্যই একসময় প্রকাশ হবে।

পি. আই, বি'র সম্পর্ক থাকা উচিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাগুলির সঙ্গে। সংবাদপত্রে খবর পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং সংবাদপত্রে যাতে যথাযথভাবে খবর ও পর্যালোচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি থাকে। কোন মধ্যবর্তী সংস্থাকে নিজেদের কাজের মাধ্যম করার কথা তাঁদের নয়। আর তা যদি করতে হয়, তবে ভারতীয় বার্তাজীবী সমিতি সকল সাংবাদিকদের একমাত্র প্রতিনিধি সংগঠন। পি, আই. বি ভারতীয় বার্তাজীবী সমিতির সহায়তা গ্রহণ করল না কেন ?

সব কাজ স্বাভাবিক রীতিতেই করা উচিত। মাঝখানে ঠিকাদার নিয়োগ করলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় মাত্র, কাজের সাহায্য হয় না। পি, আই. বি'র নতুন ডেপুটি চীফ ইনফরমেশন অফিসার এ বিষয়ে খোঁজখবর করলে ভবিষ্যতে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা থাকবে না। তিনি খোঁজখবর নিতে পারেন সকল সংবাদপত্র অফিসে আমন্ত্রণপত্র পৌঁচেছিল কি না, সব পত্রিকার চলচ্চিত্র পর্যালোচকরা 'শো'তে উপস্থিত ছিলেন কি না, সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট শো'তে কত ভাগ সাংবাদিক আর কত ভাগ অসাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এবং

সংবাদপত্র অফিসে চিঠিগুলি পৌঁছে দেবার পরিবর্তে কোন এক সংস্থার মাধ্যমে দেওয়া হল কেন? খোঁজখবর নিলে ভবিষ্যতে তাঁর অফিসের কাজের সুবিধা হবে—এবং সুনাম হতে পারে।

—সুজন

নাটকের কথা

লেনিন

থিয়েটর লাইবর-এর নাটক 'লেনিন' শহরের নাটক দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গত ৭ই সেপ্টেম্বর এই নাটকটি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অভিনীত হয়েছে। লেনিন জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন মঞ্চে 'লেনিন' অভিনীত হবে।

থিয়েটর লাইবর-এর 'লেনিন'-এর নাট্যকার ধূর্জটিপ্রসাদ ভট্টাচার্য। লেনিনের জীবনের ১৮৯৪ সাল থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত ঘটনাকালের মধ্যে নাটকটি সীমাবদ্ধ। এই সময়কাল লেনিনের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারা, সুবিধাবাদী ও সংকীর্ণ চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে লেনিন সর্বহারার বিপ্লবের ও নতুন সমাজ গঠনের পথপ্রদর্শকরূপে মার্ক্সবাদকে বিশ্লেষণ করেন। মার্ক্সবাদকে কি করে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বিপ্লবের হাতিয়ার—পার্টি গঠন করতে হয় সাংগঠনিক ক্ষেত্রে লেনিন তা প্রমাণ করেন। আবার এই সময়ে মহান রোমান্টিকতা ও সর্বহারার মানবতার প্রতীকরূপে দেখা যায় লেনিনকে। এদিক থেকে এই নাটককে উপভোগ্য ও শিক্ষণীয় করার সুযোগ রয়েছে। তবে মনে রাখা উচিত যে, লেনিন জীবনীর নাট্যরূপ বড় সহজ কথা নয়। তার জন্য বিশেষভাবে লেনিনকে পড়া যেমন প্রয়োজন, তাঁর জীবনের ঘটনাবলী ভাল করে জানা থাকাও প্রয়োজন। লেনিন নাটকে ভাবালুতা ও স্থূল হাস্যরসের পরিবর্তে এমন চরিত্র সংযোজন করার সুযোগ আছে যা নিজে থেকে হাসায়। সেগেই আইজেনস্টাইনের 'অক্টোবর' ছবির দর্শকরা জানেন—কেরেনস্কি চরিত্রটিকে কোন মন্তব্য না করেই

অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত 'মেঘ ও রৌদ্র' ছবিতে স্বরূপ দত্ত ও হাসু ব্যানার্জী

কিরূপ হাস্যকররূপে উপস্থিত করা হয়েছে।

লেনিনের জীবনের নাট্যরূপ দেবার প্রথম কৃতিত্ব থিয়েটর লাইবর-এর। পশ্চিমবঙ্গে কেবল নয়, সারা ভারতে এটি প্রথম উদ্যোগ। এজন্যে থিয়েটর লাইবর নাট্যজগতে ধন্যবাদভাজন। এঁদের পরে আই· টি· এ আর একটি নাট্যরূপ প্রযোজনা করেছে।

থিয়েটর লাইবর-এর 'লেনিন' প্রথম প্রযোজনা হিসাবে অভিনন্দনীয় হলেও—রাজনৈতিক বিশ্লেষণের দিক থেকে যথার্থ বলা যাবে কি না সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। ১৯০৫ সালে অস্ত্র সংগ্রহে লেনিনের আগ্রহ, ফাদার গ্যাপনের প্রতি লেনিনের ভক্তি-বিশ্বাস এবং শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের গাড়ি দখলের নামে মঞ্চে বোমা ফাটিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান ইত্যাদি লেনিনের রাজনৈতিক শিক্ষার সঙ্গে সম্ভবত সঙ্গতি রেখে চলে নি। লেনিনের কথায় ১৯০৫-এর বিপ্লব প্রচেষ্টা ছিল ১৯১৭-র ড্রেস রিহার্সাল। সে সময় সংগঠনের তুলনায় স্বতঃস্ফূর্তিতা বেশি ছিল। 'ব্যাটলসিপ পটেমকিন' ছবিটি সেই কালকে যথার্থভাবে প্রকাশ করেছে। নাটকের কাহিনী অংশের এই দিনগুলি ভেবে দেখার মত।

নাটকের পরিচালনা রীতিতেও থিয়েটর লাইবর এক্ষেত্রে ভিন্ন পথ নিয়েছে মনে হল। পীড়নের দৃশ্যকে দীর্ঘ করে দর্শকমনকে পীড়িত করে তোলার প্রয়োগরীতি এতদিন একটি বিশেষ থিয়েটারের 'বৈশিষ্ট্য' ছিল। থিয়েটর লাইবর অপ্রয়োজনীয়ভাবে সেই রীতি অনুকরণ করেছে।

অভিনয়ে মোটামুটি পরিচালকের নির্দেশকে সকলেই কার্যকরী রূপ দিয়ে-

ছেন। লেনিন বিরাট ব্যক্তিত্ব হলেও কালেকটিভ কাজের ওপর তিনি যে জোর দিতেন সে বোধটা তেমন প্রতিষ্ঠিত হয় না। লেনিন এখানে যতটা একক হয়ে উঠেছেন—ততটা ব্যক্তিত্বে ও মাধুর্যে আশানুরূপ উজ্বল নয়। লেনিনের চরিত্রে রূপদান করেছেন শরদিন্দু মুখার্জী। ক্রুপস্কায়ার চরিত্রে রূপ দিয়েছেন মিলি ভট্টাচার্য। তিলোত্তমা ভট্টাচার্য হয়েছেন ক্রুপস্কায়ার মা। পুলিশ ইন্সপেক্টরের ভূমিকায় ধূর্জটি ভট্টাচার্যের চরিত্রাভিনয় প্রশংসনীয়। অন্যান্য অভিনেতারা কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জানা না থাকায় নাম উল্লেখ করা গেল না।

নাটকটি সম্পর্কে শেষ কথা—নাটকটিকে আরো ঘনসন্নিবিষ্ট করা দরকার। তাতে গতিবৃদ্ধি হতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে, নাটকটিকে সার্থক করার জন্য ছায়ানাট্য, স্লাইড ইত্যাদির সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

সংবাদ কণা

ইউথ পাপেট থিয়েটার

ইউথ পাপেট থিয়েটার আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর সেন্ট লরেন্স হাই স্কুলে এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ৩৫০ জন ছেলেমেয়ে যোগ দিয়েছিল। তিনটি বিভাগে প্রতিযোগিতা বিভক্ত ছিল। অঙ্কন, কণ্ঠসংগীত ও রচনা। গান্ধী শতবার্ষিকীর পরিপ্রেক্ষিতে এবার গান্ধী জীবনীকে রচনার বিষয় করা হয়েছিল। ইউথ পাপেট থিয়েটারের ষষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিজয়ীরা অংশগ্রহণ করবে।

"রাজাসাব" হিন্দী ছবিতে নন্দা ও শশী কাপুর

নৃত্যে চন্দ্রজয়

মানুষের মহাকাশ অভিযান এবং চন্দ্রলোকে অবতরণকে নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক ছবি আঁকা হয়েছে। নাটকে এবং ফিল্মেও তা রূপায়িত হয়েছে। ব্যালে নৃত্যনাট্য রচিত হয়েছে। ব্যালে নাচের অবলম্বন পরী ও রাজপুত্র-রাজকন্যার কাহিনী থেকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় এসে পৌঁচেছে। আমাদের দেশেও তার প্রভাব স্পষ্ট। সম্প্রতি বিখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী গোপীকৃষ্ণ চন্দ্রবিজয় নামে এক ব্যালে নৃত্য রচনা করেছেন। বোম্বাইতে এক অনুষ্ঠানে নাচটি দেখান হয়েছে। পৃথিবী থেকে চন্দ্রে অভিযান, চাঁদ থেকে ফিরে আসা এই নাচে দেখান হয়েছে।

বৈতানিকের বিংশতি বর্ষ পূর্তি উৎসব

গত বছর আগস্ট মাসে বৈতানিকের বিংশতি বর্ষ পূর্তি উৎসব সুরু হলো

চারদিনের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ বছর ৩১শে আগস্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পাঁচদিনব্যাপী অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর মনোরম ঘরোয়া পরিবেশে তার সমাপ্তি।

৩১শে আগস্ট রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ সহযোগী ও বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের কর্ণধার ডঃ দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁর সভাপতির ভাষণে শুভেচ্ছার ডালি সাজালেন আর বৈতানিকের অগ্রগতির উল্লেখ করলেন। "বর্ষার গান" ও আবৃত্তি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠলো।

১লা সেপ্টেম্বর শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌরোহিত্যে উৎসবের দ্বিতীয় দিনে প্রধান অতিথি শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা পুরনো স্বরলিপি পরিবর্তনের অযৌক্তিকতা আর নতুন শিক্ষার্থীর অসুবিধার কথা উল্লেখ করলেন। সভাপতি মহাশয়ও দীনেন্দ্রনাথ-সুরেন্দ্রনাথ কৃত পুরনো স্বরলিপির পরিবর্তনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বিশ্বভারতীর যাঁরা পুরোধা, তাঁরা সুর বদল করেছেন বলে রবীন্দ্র-অনুরাগীর কাছ থেকে অসংখ্য প্রতিবাদপত্র প্রেরণের দাবি রাখেন।

২রা সেপ্টেম্বর শ্রীমন্মথ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি শ্রীশম্ভু মিত্র বলেন, রবীন্দ্র নাটক মঞ্চস্থ করার জন্যে গভীর নিষ্ঠার প্রয়োজন।

৩রা সেপ্টেম্বর অবনীন্দ্র জন্মোৎসবে নির্ধারিত সভাপতি শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর লিখিত মূল্যবান ভাষণটি পড়ে শোনানো হলো। ডঃ সুধীর নন্দী বিস্তৃত উপমার সাহায্যে নন্দনতত্ত্ব পরিবেশন করে শ্রোতৃবৃন্দকে নিয়ে গেলেন এক আনন্দলোকে।

শ্রীমতী নীলিমা বড়চৌধুরী হিজমাস্টার্স ভয়েস কোম্পানীতে গান রেকর্ড করেছেন। রেকর্ডিং-এর পরে শ্রীমতী বড় চৌধুরী, তবলা সংগত শ্যাম মুখার্জী, সুরকার নাচিকেতা ঘোষ এবং সন্তোষ সেনগুপ্ত।

'শিল্প ব্যক্তিনির্ভর' অবনীন্দ্রনাথের উক্তি তুলে ধরে তিনি আরও জানালেন, শিল্পীর আঙ্গিক সম্বন্ধে যে রীতিনীতি আছে তাকে অতিক্রম করতে হবে। আঙ্গিকের প্রয়োজন আছে, কিন্তু আঙ্গিকসর্বস্ব হলে শিল্পের মৃত্যু।

৪ঠা সেপ্টেম্বর বিংশ বর্ষ পূর্তি উৎসবের সমাপ্তি। সভাপতি ছিলেন অশীতিবর্ষ বয়স্ক শ্রদ্ধেয় শ্রীভূপতি মজুমদার।

সমাপ্তি সন্ধ্যায় প্রাক্তনী সমাবেশ। সর্বশ্রী সুমিত্রা সেন, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, আল্পনা মিত্র, অমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলেন ঘোষের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ। বৈতানিকের শিল্পিবৃন্দের সম্মিলিত কণ্ঠে "যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে", সমাপ্তি সংগীত এখনো কানে লেগে আছে।

বোকারোয় নজরুল এবং সুকান্ত জন্মজয়ন্তী পালন

ডি, ভি, সি বোকারো ক্লাবের সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং বিপ্লবী কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মজয়ন্তী বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করেন। ঐদিন দ্বিপ্রহরে এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার উৎসবে মনোজ্ঞ ভাষণ রাখেন কবি অধ্যাপক শ্রীতরুণ সান্যাল এবং শ্রীপ্রাণগোবিন্দ গুহ। অনুষ্ঠান শুরু হয় শ্রীসাধন দত্ত এবং শ্রীমতী তৃপ্তি করের নজরুলগীতির মাধ্যমে। নজরুল-কবিতা আবৃত্তি করেন কুমারী সীমন্তী চ্যাটার্জী। শ্রীগৌরীশঙ্কর রায়চৌধুরী সুকান্ত-প্রণাম জানান স্বরচিত কবিতা পাঠ করে। এরই পর শ্রীপ্রেমরঞ্জন কৃত 'সুকান্ত আলেখ্য' পরিবেশিত হয়। আলেখ্য পাঠ, সংগীত, আবৃত্তি, সংগত এবং রানার নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুনীল ভট্টাচার্য, সুবীর রায়, মণিকা ব্যানার্জী, মিতা ঠাকুর, বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুমিতা চৌধুরী, স্মৃতি গুপ্তা, জ্যোতিপ্রসাদ মিত্র, সমীর দেব এবং গোপালচন্দ্র দে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সংগীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

গ্রন্থমেলা

সুকান্ত সমগ্র : সুকান্ত ভট্টাচার্য। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৬, দাম : পনেরো টাকা।

বাংলা কবিতায় সুকান্ত নিজেই এক বিশেষ ধারার উৎস। শুধু ভঙ্গী সর্বস্ব বিদ্রোহ নয়,—সমাজজীবনে সংগ্রামের মধ্যে কবি-সত্তাকে মিলিয়ে আত্মানুসন্ধানের পথে সত্যের উপলব্ধি ও আবিষ্কার—সুকান্তের কবিতা তারই সার্থক ফলশ্রুতি। তাই সুকান্তর কবিতার বই সম্ভবত আজো বাংলা কবিতার জনপ্রিয় বইগুলির শীর্ষে। আলোচ্য "সুকান্ত সমগ্র"র কয়েক মাসের ভেতরে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ তারই প্রমাণ।

ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠে-কড়া, অভিযান, হরতাল, গীতিগুচ্ছ সব কটি বইয়ের সব কবিতাই "সুকান্ত সমগ্র" সংকলিত। তাছাড়াও সুকান্তর অপ্রচলিত কবিতা ও সুকান্তর পত্রাবলী এই সংকলনে যুক্ত হয়ে সুকান্ত গবেষকদের কাছে বইখানির মূল্য বৃদ্ধি করবে।

বইখানার একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যিনি সুকান্তর কাব্য-জীবনের সংগে বিশেষভাবে পরিচিত। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, সুকান্তর একটা নতুন দিক তার চিঠিপত্রে পাঠকের কাছে এই প্রথম ধরা পড়ে। সুকান্ত রক্ত-মাংসের মানুষ।

একটি ঘটনার প্রতি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সুকান্তর একটি চিঠিতে কবি অরুণাচলকে সুকান্ত লিখেছে "......একদিন ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে পি সি যোশির এক বক্তৃতা-সভায় সুভাষ নিজেই এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল এবং আমার "কোন বন্ধুর প্রতি" কবিতাটির প্রশংসা করে দুঃখের সঙ্গে জানায় কবিতাটি তার পকেট থেকে হারিয়ে গেছে নচেৎ তা ছাপা হত।......" অথচ ভূমিকায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন, "......আমার সন্দেহভঞ্জন করবার জন্যই বোধ হয় মনোজ একদিন কিশোর সুকান্তকে সেই চায়ের দোকানে এনে হাজির করেছিল।" সতর্ক পাঠকের কাছে এই ঘটনাটি বিভ্রান্তি আনতে পারে বলে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করবো, তিনি এ-সম্পর্কে আলোকপাত করুন!

চিঠিপত্রগুলি তারিখ অনুযায়ী সাজানো হলে সুকান্তর মানসিকতা ধরতে সুবিধা হতো। এ ব্যাপারে প্রকাশক পরবর্তী সংস্করণে যত্নবান হলে পাঠক উপকৃত হবেন।

পরিশেষে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরাও বলি : বাংলা সাহিত্যের একটি প্রিয়নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য, ঘরে ঘরে নিঃসন্দেহে একটি প্রিয়তম গ্রন্থ হবে "সুকান্ত সমগ্র"।

কারাগার (আগস্ট, ১৯৬৯) : কনক মুখোপাধ্যায়। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : চার টাকা।

এই কাব্যের সুর সম্পূর্ণ আলাদা। কাব্যের কবি মহিলা হলেও হাতে তুলে নিয়েছেন রুদ্রবীণা, অগ্নিঝরা তাঁর সুর, কবিতায় বজ্রের সঙ্কেত। নিজের এবং নিপীড়িত জনগণের মুক্তির স্বপ্নে রঙীন কারাগারের দিনগুলিকে নিয়ে এই কাব্য। জীবন সংগ্রামের একটি উজ্জ্বল আলেখ্য। কবির অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত মহান জীবনের মুক্তিসঙ্গীত। তাই নিপীড়িত, বুভুক্ষু, প্রতারিত সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষকে প্রেরণা যোগায়, নতুন দিনের শোষণহীন সমাজের কুশলবার্তা নিয়ে আসে; কারাগারে বন্দিনী কবির মর্মগাথা যখন সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে, তখন সমস্ত শৃঙ্খল, অত্যাচারীর সমস্ত খর্ব প্রত্যয়ের অমল আঘাতে খানখান হয়ে ভেঙে যায়।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, দেশকে ভালবাসলে জেলে যেতে হয়, বাঁচার সংগ্রামে নামলে দেশদ্রোহী বলে পরিচিত হতে হয়—

'পদানত মানুষের মিছিলের যাত্রী কোনো,/অপরাধী শোষিতের মহান ঘৃণার অপরাধে,/অপরাধী ভালবেসে আমার স্বদেশ ভূমি-/প্রতারক ক্লীব হিংস্র জল্লাদের দ্বারে।' (কারাগার)

কিন্তু কবি দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছেন, দিন বদলে যাচ্ছে। শোষণ আর শাসন যাদের ব্যবসা, যাদের লোলিহান লোভে—'মাটি এখনো বন্দী সহস্র মিথ্যে আর প্রতারণার জালে, তাদের দিন সমাগত—কারাগারে নিক্ষেপ করে তারা দমিয়ে রাখতে পারবে না মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসকে'—(গৃহবিবাদ)।

কবি অসঙ্কোচে 'একফালি রোদ্দুর' কবিতায় বলেছেন—

'আহা এস আমার সোনার রোদ্দুরটুকু
লোহার গরাদের ফাঁকে ফাঁকে এসে
গুঁড়িয়ে পড়—
নরম হাত দুটো রাখো আমার
ঠাণ্ডা হিম পাঁজরগুলোর উপর
এস আমার আলো।'

কবিতাগুলিতে সংবেদনশীল মনের অপরূপ এক অনুভূতি ক্রিয়াশীল। কতরকমেই না কবি বন্দীত্বকে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করেছেন! দেখেছেন 'ভোরের কারা', 'রাত্রির কারা'। কারাগারেই তাঁর কাছে এসেছে 'শ্রাবণী পূর্ণিমা', 'ফাল্গুন'। সব থেকে বড় কথা, জল্লাদের কাছ থেকে মুক্তি ভিক্ষা চান নি—চাইতে পারেন না—কারণ ওযে জীবনের অপমান ('মুক্তি ভিক্ষা')।

কবি আসন্ন ঝড়ের প্রতীক্ষায় দেখছেন নতুন যুগের জ্বালা, অগ্নির অশান্ত যন্ত্রণা।

সহবন্দিনী দার্জিলিং-এর চা শ্রমিক রণমায়া রাইনীর মৃত্যুতে উৎসর্গীকৃত যেমন 'ঝরণা ছিলাম' এবং 'কোন এক হিন্দু রাণীর জন্য', 'বুড়ি' প্রভৃতি কবিতায় মমতাময়ী নারীর হৃদয়বেদনা প্রতিফলিত দেখতে পাই। 'ওরা চারজন' কবিতায় কারাগারে চিঠি পাওয়ার সুন্দর ছবি এঁকেছেন।

কবিতাগুলি শুধু সুখপাঠ্যই নয়—সমাজ সচেতন মনে এক আশ্চর্য আবেগ জাগিয়ে দেয়। কোন তীব্রতম জ্বালা নয়—কিন্তু জীবন্ত একটা অনুভূতি।

হয়ত সাময়িকতা বা সাংবাদিকতার কথা এসে পড়তে পারে। কিন্তু জীবনের প্রয়োজন, বাঁচবার তাগিদকে কে অস্বীকার করবে? সুর ও ছন্দে জীবনসংগ্রাম তাই এখানে কাব্যরূপ নিয়েছে।

ভাষা জোরালো, ঋজু, ঝকঝকে। কতকগুলি কবিতায় লিরিকের ফল্গুস্রোত বয়ে গেছে—বিশেষ করে 'সন্ধ্যাতারা', 'ফুল হয়ে গেছে', 'কারার ফুল' প্রভৃতি কবিতাগুলি এদিক দিয়ে উল্লেখ্য।

কাব্যগ্রন্থটি শ্রদ্ধেয় মুজাফ্ফর আহ্মেদ মহাশয়কে উৎসর্গীকৃত। তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতাটিতে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অঙ্কিত হয়েছে। প্রচ্ছদ ও ছাপার কাজ উৎকৃষ্ট।

গর্জন

কথায় বলে, যতো গর্জায়, ততো বর্ষায় না। অর্থাৎ গর্জন আর বর্ষণের মধ্যে সমতা রক্ষা করা সব সময়ে সম্ভব হয় না। প্রবাদটা প্রাকৃতিক পরিস্থিতি কেন্দ্রিক হলেও, এই প্রবাদটাকে নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং করা হয়ও। আজ আমরা কলকাতা ময়দানের একটি ঐতিহ্যশালী দলের গর্জনকে কেন্দ্র করে বর্ষণের কথায় আসবো। আমাদের এ আলোচনা একটা বিশেষ ক্লাবকে নিয়ে হলেও, এই পর্যালোচনার বাইরে থাকতে পারবেন না কলকাতা ময়দানের কোন ক্লাব কিম্বা তার কর্মকর্তারা কিম্বা দর্শকগণ। আগেই বলে রাখি যে, আমাদের এই সমালোচনায় যদি কারো গায়ে জ্বালা ধরে তাহলে আমরা নাচার। কারণ, চিরকালই আমরা অন্যায়ের সমালোচনা করে এসেছি, দোষ আমরা সহজে ঢাকি না। আমাদের এ আলোচনার প্রধান বিষয় হলো কলকাতা ময়দানের তিন প্রধানের অন্যতম প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এ বছরের লীগ ফুটবলে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলায় মহামেডান স্পোর্টিং আর যাই করুন স্পোর্টিং মনোভাবের পরিচয় দিতে পারে নি। মহামেডানের খেলোয়াড়রা সেদিন মাঠে নেমেছিলেন, বোধহয় আগে থেকে ঠিক করেই যে ভালোভাবে খেলা চলতে তাঁরা দেবেনই না। তাই বল দূরে থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিলেন তাঁরা, মাঠের মধ্যে অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় তো বারবার দিচ্ছিলেনই, তার ওপর একসময় রেফারীকে পেছন থেকে ঘুষি মারতেও ইতস্তত করেন নি। ফলে রেফারী বাধ্য হয়েই গোলমালের নায়ক মহামেডানের অধিনায়ককে মাঠ ছেড়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রেফারীর সে নির্দেশ তিনি তো মানেন নি। বোধহয় তাঁর সেই আচরণের পেছনে ছিল ক্লাবেরও সমর্থন। তা না হলে ঐ ঘটনার পরে, ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কি করে মহামেডান ক্লাব কর্তৃপক্ষ অমনভাবে হুমকী দিয়ে শুধুমাত্র গর্জনই করলেন না, লীগের খেলাও তাঁরা বয়কট করলেন।

মহামেডান ক্লাবের তরফ থেকে সিংহ গর্জনে জানানো হয়েছিল যে, কলকাতার রেফারীদের পরিচালনায় তাঁরা আর খেলবেন না। কি সাংঘাতিক কথা! এ ধরণের আচরণ আর যার কাছ থেকেই হোক অন্তত মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় নি। শুধু তাই নয়, লীগের বাকী খেলাগুলোতে তাঁরা যোগও দিলেন না। দেবেন কি করে—কলকাতার রেফারীদের পরিচালনায় খেলতে হবে যে! কিন্তু আই এফ এ শীল্ডের খেলায় যোগ দিয়েছেন মহামেডান স্পোর্টিং। শুধু যোগই দেন নি—কলকাতার রেফারীদের পরিচালনায় তাঁদের খেলতেও হয়েছে। অর্থাৎ মহামেডান স্পোর্টিং-এর সেই গর্জনের আর কোন মূল্যই থাকলো না। ছিটে-ফোঁটা বর্ষণের আগেই গর্জন শান্ত। এই যদি মনে ছিল তবে অতো লাফালাফির কি বা প্রয়োজন ছিল? নাকি লীগের খেলার বারবার সঙ্গীন ফলাফলের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে মহামেডান স্পোর্টিং ধরেছিলেন ঐ পথ। কিন্তু এ ধরণের আচরণ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। আর এ রকম অস্থিরতারও কোন রকম যুক্তিসংগত কারণ আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য এ অস্থিরতা আজ আর শুধুমাত্র মহামেডান স্পোর্টিং-এর মধ্যেই নেই—দেখা যাচ্ছে ময়দানের প্রায় সব কটি দল আর তাদের সমর্থকদের মধ্যে। কিন্তু এই সব অস্বাভাবিক ঘটনা যদি দিনের পর দিন ঘটতে থাকে তাহলে অর যা হোক, ফুটবল খেলার বাংলাদেশের মান তো উন্নত হবে না, বরঞ্চ দিনে দিনে নেমে যাবে। আজ তাই কলকাতা ময়দানের প্রতিটি ক্লাব আর তাদের সমর্থকদের কাছে আমাদের আবেদন, গর্জন, বর্ষণের পালা চুকিয়ে ফেলে, এবার আপনারা এমন কিছু করুন যাতে বাংলাদেশের ফুটবল খেলার মান আরো উন্নত হয় আর ভারতের ফুটবল সভায় বাংলাদেশ শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

—শান্তিপ্রিয়

আই, এফ, এ শীল্ড প্রসংগে

আই· এফ· এ শীল্ডের খেলা থেকে বাইরের দলগুলো একে একে বিদায় নিলো। ভরা বর্ষায় কলকাতা ময়দানের যা হাল তাতে আর যাই হোক, বাইরের দলগুলোর পক্ষে তাদের স্বভাব অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করা একরকম অসম্ভবই। তাই কলকাতা তথা বাংলাদেশের ছোট ছোট দলগুলোর কাছে পর্যন্ত হেরে হেরে বিদায় নিয়েছে বাইরের দলগুলো।

জল-কাদায় ভরা মাঠে তারা মোটে দাঁড়াতেই পারে নি। শুকনো মাঠে খেলতে অভ্যস্ত খেলোয়াড়রা কি করেই অমন পেছল আর কাদার মাঠে খেলবে? জল-কাদার মাঠের জন্যেই বাইরের দলগুলোর কাছে আই· এফ· এ শীল্ডের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে।

তা ছাড়া বহিরাগত দলগুলোর সংগে আই· এফ· এ-র ব্যবহারও ভালো নয়। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই—রাজস্থান বনাম দিল্লী একাদশের খেলার কথাটাই না হয় ধরা যাক। আর্মড পুলিশ মাঠে খেলাটা হবে বলে ঠিক করেছিলেন আই· এফ· এ—বোধহয় মাঠ না দেখেই। খেলার দিন সকালে দিল্লী দলের ম্যানেজার মাঠ দেখতে গিয়ে থ। মাঠ ডুবে আছে জলে। ফলে খেলা একরকম অসম্ভবই।

কিন্তু আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষ দিল্লী দলের এই প্রতিবাদে কান দিলেন না। খেলার আগে দু' দল মাঠে গিয়ে দেখলো যে মাঠে জল তো জমে আছেই—তার ওপর আবার গোলপোস্টও পোঁতা নেই। অর্থাৎ খেলা যে মাঠে হবে সেই মাঠ সম্বন্ধে একটু যত্নবান হবার প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করেন না আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষ। শেষ পর্যন্ত রেফারী খেলাটা স্থগিত রেখে দেন। জানি না বহিরাগত দলগুলোর সংগে এই রকম ব্যবহার করে আই· এফ· এ-র সুনাম বাড়ে কি না।

তবে এ কথা ঠিক যে, একমাত্র সময় বদলানো ছাড়া আই· এফ· এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা আর কিছুতেই বহিরাগত দলগুলোর কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যাবে না।

তাই এখনই যা হোক একটা কিছু করা দরকার। অন্তত বাংলাদেশের ফুটবল এবং আই· এফ· এ শীল্ডের ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষের আরো বেশি তৎপর হয়ে, বর্তমান পরিস্থিতিতে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

চুম্বক

১৯৫২ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে লীডস টেস্টে ভারত তার প্রথম চারটি উইকেট হারিয়েছিল কোন রান করার আগেই অর্থাৎ শূন্য রানে। সেই ইনিংসে ভারত করেছিল ১৬৫ রান।

১৮৮৮ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যানচেস্টার টেস্টে অস্ট্রেলিয়া মাত্র ৭ রানের মধ্যে হারিয়েছিল তাদের প্রথম ছ'টি উইকেট। সেই ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া করেছিল ৭০ রান।

১৯৪৫-৪৬ সালে নিউজিল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়েলিংটনের টেস্ট খেলায় ৫ রানের মধ্যে হারিয়েছিল তাদের শেষ আটটি উইকেট। মাত্র ৪২ রানের মাথায় শেষ হয়ে গিয়েছিল নিউজিল্যাণ্ডের সেই ইনিংস।

আই· এফ· এ শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইন্যালে রাজস্থানের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের চতুর্থ ও শেষ গোলের দৃশ্য। গোলরক্ষক এ ব্যানার্জী ডাইভ দিয়েও বলটি ধরতে পারেন নি।

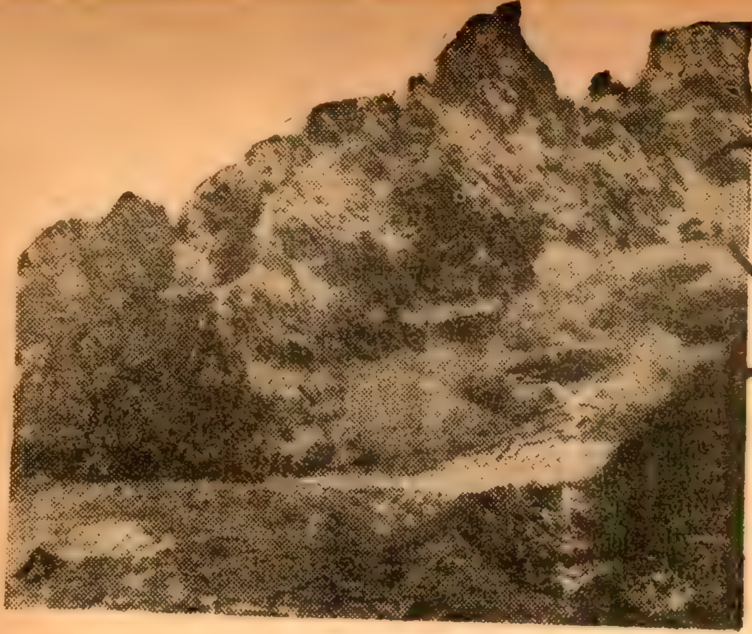

পর্বতাভিযান ও ট্রেলস গিরিপথ

প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

[ক্রীড়াজগতে পর্বতাভিযানের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা বর্তমান। কলকাতার হিমালয় লাভার্স এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে **শ্রীপ্রদীপ্ত চক্রবর্তীর** নেতৃত্বে একটি ন' জন সদস্যবিশিষ্ট অভিযাত্রী দল কুমায়ুন হিমালয়ের সুদুর্গম 'ট্রেলস গিরিপথে' (১৭,৭০০ ফুট) এই মাসে এক অভিযান চালাবেন। অভিযাত্রী দল ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন। এই উপলক্ষে দলনেতার পর্বতাভিযান ও ট্রেলস গিরিখাত প্রসঙ্গে বিশেষ নিবন্ধটি প্রকাশিত হলো॥

—ক্রীড়া সম্পাদক]

যদিও ভারতবর্ষের খেলাধুলোর জগতে পর্বতাভিযান খুবই অল্পদিন হলো নিজেই ঠাঁই করে নিয়েছে, কিন্তু পরম বিস্ময় হিমালয়ের অতুলনীয় সৌন্দর্যরাশি অনাদি অনন্তকাল ধরেই দেশ-বিদেশের মানুষকে কাছে টানছে। পর্বতপ্রেমী উৎসাহী হৃদয় এই আহবান উপেক্ষা করতে পারে নি কখনো—বার বার তাঁরা গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন সেই বিরাট প্রকৃতি পরিবেশে; কখনো তীর্থযাত্রী হিসেবে—কখনো বা ভ্রমণকারী, আর কখনো হাওয়া বদলের অজুহাতে।

১৯৫৩ সালের আগে পর্বতাভিযানে ছিল বিদেশীদের একাধিপত্য—ভারতীয়দের সেক্ষেত্রে ভূমিকা ছিল কখনো কুলি কিম্বা কখনো পথ প্রদর্শক হিসেবে। তবে প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যুগে দেশে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় তরুণদের সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়োজিত ছিল বিদেশী শাসকের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করা—ফলে হিমালয়ের অভিযান পরিকল্পনা কারো মনে তখন তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

হাওয়া বদল হয়েছে এভারেস্ট পর্বত শীর্ষে তেনজিং আর হিলারির বিজয় অভিযানের পর। তারপর মানুষ নতুন করে ভেবেছে হিমালয় সম্পর্কে—নিজের উৎসাহ সম্পর্কে। অজানাকে জানার, দুর্গমকে জয় করবার প্রেরণা সঞ্চয় করেছে হৃদয়ে, রক্তে। তারপর দেশের নানা স্থানে গড়ে উঠেছে পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য অসংখ্য সংস্থা। প্রতি বছরই বসন্ত আর শরৎকালে ছোট-বড় বহু অভিযাত্রীবাহিনী হিমালয়ে অজানার আহবানে সাড়া দিয়ে ছুটে যায় প্রকৃতির সেই অপূর্ব আনন্দনিকেতনে। যেখানে প্রতি দিনের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে এক বৈচিত্র্যময় জগতে জীবন-মৃত্যুর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দূরে ঠেলে তাঁরা এগিয়ে চলেন নিজেদের লক্ষ্যপথে।

পর্বত অভিযানের খরচ কত এক কথায় বলা সম্ভবপর নয়। তবে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়া যায়। মাঝারিগোছের ছয়-আটজন অভিযাত্রী দলের মাসখানেকের অভিযানে কমপক্ষে হাজার পনেরো টাকার প্রয়োজন হয়। এবং এ ছাড়াও দরকার অভিযাত্রীদের উপযুক্ত ট্রেনিং ও পূর্ব প্রস্তুতি!

বর্তমান কর্মব্যস্ত জগতে নিজেদের কাজকর্মের ফাঁকে যে প্রস্তুতি চালানো সবার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ হিমালয়ের আকর্ষণ দুর্নিবার। এবং যাদের কোনরকম ট্রেনিং নেই অথচ পাহাড়ে যাবার নেশা আছে—বাঁধা পথ ছেড়ে যারা অচেনা পথে পা রাখতে চায়, তাদের নিয়েই গড়ে উঠেছে কলকাতার 'হিমালয় লাভার্স এ্যাসোসিয়েশন'। ১৯৬২ সাল থেকে এই সংস্থা হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান সংগঠন করে আসছেন। এ বছর ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁদের ন'জন অভিযাত্রীর এক দল অমৃতসর মেলযোগে কলকাতা থেকে যাত্রা করছেন দুর্গম হিমালয়ের কুমায়ুন অঞ্চলের কুখ্যাত ট্রেলস গিরিপথ অভিযানে। কুমায়ুন হিমালয়ের যে গিরিশৃঙ্গটি পূর্বে নন্দাদেবী ও নন্দাকোট পর্বতকে সংযুক্ত করছে তার সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে মাত্র তিশো ফুট নিচে এই ট্রেলস গিরিপথ। ১৮২৭ সালে এই গিরিপথ প্রথম অতিক্রম করেন কুমায়ুনের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার জি· ডব্লু ট্রেলস। তাঁর নামেই এই গিরিপথের নামকরণ হয়। কিন্তু স্থানীয় লোকের ধারণা এই অঞ্চলে মানুষের পদার্পণ হলে নন্দাদেবী রুষ্টা হন। এবং তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে তাল রেখে ট্রেলস সাহেব তুষারক্ষতে আক্রান্ত হন। ১৮২৭-এর পর এই গিরিপথ ১৮৪৫, ১৮৬১, ১৮৯৮, ১৯১৩, ১৯২৬, ১৯৩৬ সালে অভিযাত্রীরা অতিক্রম করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে ট্রেলস অভিযানের কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় নি। ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ থেকে এক অভিযাত্রী দল গিয়েছিল ট্রেলস অভিযানে। ব্যর্থতার

সঙ্গে তাঁরা যখন ফিরে আসছিলেন সে সময় এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান বিখ্যাত মহিলা পর্বতারোহী অণিমা সেনগুপ্ত।

ট্রেলস পাস কুমায়ুন হিমালয়ের দুর্গমতম গিরিপথ। একদিকে পিণ্ডারী অপরদিকে মিলাম হিমবাহ। পিণ্ডারীর দিকে ভয়াবহ ফাটল ও মারাত্মক বরফের দেয়াল। আর মিলামের দিকে পিচ্ছিল বরফাবৃত অসমতল প্রান্তর। এই গিরিপথের (১৭,৭৭০ ফুট) অতিক্রম করা দূরের কথা, কখনো কখনো পথ খুঁজে পাওয়াও কঠিন। বছরের অধিকাংশ সময় বরফাবৃত এই গিরিপথ কপাল ভাল থাকলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

হিমালয় লাভার্স এ্যাসোসিয়েশনের ন'জন অভিযাত্রীর এই দল ঊনিশে সেপ্টেম্বর পিথোরাগোড়া জেলার তেজাম থেকে যাত্রা সুরু করে মার্তোলী বিঠলগোয়ার হয়ে ট্রেলস অতিক্রম করবার চেষ্টা করবেন, এবং পিণ্ডারী নদীপথ ধরে প্রত্যাবর্তন করবেন। অভিযান ছাড়াও, দলের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে দুই নদী উপত্যকার জীবনমানস সম্পর্কে এক সুষ্ঠু সমীক্ষা চালানো। আশা করা যায়, অভিযান সমাপনান্তে অভিযাত্রী দল আগামী ১৫ অক্টোবর নাগাদ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করবেন।

এই অভিযানের সদস্যবৃন্দ হলেন—সর্বশ্রী প্রদীপ্ত চক্রবর্তী (দলনেতা), আশিস দাশগুপ্ত (সহনেতা), বিশ্বপতি রায়, দিলীপ ভট্টাচার্য, সোমেন রায়, প্রভাত রায়, জ্ঞানরঞ্জন ঘোষ এবং নিমাই সাহা।

খেলার বই

অলিম্পিকের ইতিকথা ○ শান্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

(বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত, দাম—২৫ টাকা।)

অলিম্পিকের ইতিকথা বইটি অনেকটা গবেষণামূলক গ্রন্থ। তাই বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব জায়গাতেই পরিশ্রম ও গবেষণার ছাপ বর্তমান। সত্যি কথা বলতে কি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ক্রীড়া গ্রন্থের তালিকায় অলিম্পিকের ইতিকথা বইটিকে শুধুমাত্র অনন্য বললেই সবটা বলা হবে না বলতে হবে বাংলাদেশের খেলাধুলোর জগতে এই বইটি একটি অমূল্য সংযোজন।

অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্বন্ধে জানার আগ্রহ সমস্ত ক্রীড়ারসিকদেরই। চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এই বিশ্ব ক্রীড়ার মেলা আপন মহিমায় মহান। অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া যেমন ভাগ্যের কথা তেমনি ঐ প্রতিযোগিতার আসরে উপস্থিত হবার সুযোগ পাওয়াও আরাধনার বস্তু। সাধারণ ক্রীড়ারসিকদের কাছে ও স্বপ্ন চিরকাল স্বপ্নই থেকে যায়। কোনদিনও বাস্তবে রূপান্তরিত হয় না।

আমাদের সেই স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে আজ এসে দাঁড়িয়েছে অলিম্পিকের ইতিকথা বইটি। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার এমন অমূল্য সুযোগ এর আগে আর আমাদের হয় নি। অতীতের পৃষ্ঠা থেকে বর্তমানের কাঠামোয় উপনীত হবার পেছনের ঘটনাগুলো, প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত, ঘটনা বিন্যাস যেন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসে আমাদের সামনে সজীব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বইটির সার্থকতা বোধহয় সেইখানেই।

তবে বইটির জন্যে লেখককে যতো প্রশংসা করতে হয় তার চেয়ে এতটুকুও কম করা চলবে না প্রকাশককে। কারণ বাংলাদেশের কোন প্রকাশকের পক্ষে পঁচিশ টাকা দামের খেলার বই প্রকাশ করা আর যাই হোক সহজসাধ্য নয়। শুধু তাই নয় বইটির পেছনে প্রকাশকের আন্তরিকতার ছাপ স্পষ্ট। লাইনো টাইপে ঝকঝকে ছাপা বইটি, আর্ট পেপারে ছাপা শতাধিক অলিম্পিকের ছবি আমাদের অমূল্য সম্পদের মতো এসে দাঁড়িয়েছে।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সম্বন্ধে উৎসাহী প্রত্যেক ক্রীড়ারসিক এই বইটি খুঁজে পাবেন—তিনি যা চান, যা জানতে চান। তাই বাংলা ক্রীড়া-সাহিত্যে বৃহদাকার এই বইটি অমূল্য।

যাই হোক লেখক যদি ভাষায় আর একটু সংযত হতেন তাহলে সোনায় সোহাগা হতো তবে সে ত্রুটি শুধরে গেছে বইটির অলংকরণ এবং সাজানো-গোছানয়। তাই থেকে পরিশ্রম করে বইটি লেখার জন্যে যেমন লেখককে ধন্যবাদ জানাই তেমনি লোকসানের দিকে না তাকিয়ে এবং বইটির ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে প্রচুর খরচ করে বাংলাভাষায় যুগান্তর সৃষ্টিকারী এই বইটি প্রকাশ করার জনে প্রকাশককে জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮৩২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অরুণ রায়, তরুণ রায় (বেহালা, কলকাতা-৪৩)

প্রশ্ন : মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল এ পর্যন্ত কতবার আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স কাপ ও ডুরাণ্ড কাপ জিতেছে?

উত্তর : মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড জিতেছে—১৯১১, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬১, (যুগ্ম) ও ১৯৬২ সালে।

রোভার্স কাপ জিতেছে—১৯৫৫, ১৯৬৬ ও ১৯৬৮ সালে।

ডুরাণ্ড কাপ জিতেছে—১৯৫৩, ১৯৫৯, ১৯৬০ (যুগ্ম), ১৯৬৩, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে।

ইস্টবেঙ্গল আই এফ এ শীল্ড জিতেছে—১৯৪৩, ১৯৪৫, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫৮, ১৯৬১ (যুগ্ম), ১৯৬৫, ১৯৬৬ সালে।

রোভার্স কাপ জিতেছে—১৯৪৯, ১৯৬২ (যুগ্ম) ও ১৯৬৭ সালে।

ডুরাণ্ড কাপ জিতেছে—১৯৫১-৫২-৫৩, ১৯৬০ (যুগ্ম), ও ১৯৬৭ সালে।

সমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (শীলস গার্ডেন লেন, কলকাতা-২)

প্রশ্ন : ভারত কি বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে?

উত্তর : না।

প্রশ্ন উত্তর

রয়েছেন কে কে? কত কত রান, কোন সালে এবং কার বিরুদ্ধে?

উত্তর : ১১৮ রান লালা অমরনাথ বম্বে টেস্টে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩৩-৩৪ সাল। ১১০ রান দীপক সোধন কলকাতা টেস্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৫২-৫৩ সালে। ১০০* রান কৃপাল সিং হায়দ্রাবাদ টেস্টে-নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৫-৫৬ সালে। ১১২ রান আব্বাস আলি বেগ ম্যানচেস্টার টেস্টে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৯ সালে। ১০৫ রান হনুমন্ত সিং দিল্লী টেস্টে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৩-৬৪ সালে।

(শেষাংশ ৮৩১ পৃষ্ঠায়)

নিম্নোক্ত প্রশ্নকারীদের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করা হচ্ছে :

অশোক মুখার্জী (সাদিখান দেয়াড়, মুর্শিদাবাদ), **অসিতকুমার চৌধুরী** (ধুবা, টাকী), **অরুণ চক্রবর্তী** (ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি), **হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র** (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি), **অঞ্জন ব্যানার্জী** (টালিগঞ্জ, কলকাতা—৪১), **পরিতোষ নাগ** (প্রসন্ননগর, জলপাইগুড়ি), **শুকদেব মুখোপাধ্যায়** (মিলহাট, বৈদ্যপুর, বর্ধমান), **প্রদীপ পোদ্দার** (সাদিখান দেয়াড়, মুর্শিদাবাদ), **শঙ্কর মজুমদার** (পাণ্ডু, গৌহাটি), **সুধীরকুমার রায়** (পার্কসার্কাস, কলকাতা-১৭), **সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়** (গোলাবাড়ি, হালিশহর), **সুজয় গুপ্ত** (বিদ্যাসাগর, ন্যুকতলা, কলকাতা-৪৭), **বিমলেন্দু দাশ** (বংশীহারী, পঃ দিনাজপুর), **বিশ্বদেব চ্যাটার্জী** (পি· কে· রায় লেন, ঢাকুরিয়া), **অশোক, অশোক দে, দেবু, কিংকর ও দেব** (ইন্দা, খড়্গপুর), **অসিত, শংকর, শিবু, সমীর ও সুভাষ** (বারাসত, ২৪ পরগনা), **উৎপল ধর ও প্রদীপ দত্ত** (রাণাঘাট, নদীয়া), **বাবলু দত্ত ও হাবলু দত্ত** (পাটুলি, বাদকুল্লা, নদীয়া), **অঞ্জন ব্যানার্জী** (পুটিয়ারী, কলকাতা-৪১)।

দীপ্তিশ ভাদুড়ী (দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি)

উত্তর : জার্নাল সিং এখন পাতিয়ালায়। উনি নিজে আর খেলবেন না।

প্রবীর ঘোষ (বসিরহাট)

উত্তর : তোমার রিপ্লাই কার্ডে লেখা চিঠি আমি পেয়েছিলাম এবং তার উত্তরও দিয়েছি। কেন পেলে না জানি না।

নাণ্টু, মণ্টু ও বীণা দেব (লঙ্কা, নগাঁও, আসাম)

প্রশ্ন : টেস্ট খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরী

পাঠকের কলাম থেকে

অশোক ভ[illegible]

অদ্বিতীয় ওসুনা

মেক্সিকান টেনিসের অদ্বিতীয় পুরুষ র‍্যাফেল ওসুনা এক শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনায় কিছুদিন আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। ব্রেজিলে যেমন পেলে, অস্ট্রেলিয়ায় যেমন ডন ব্র্যাডম্যান তেমনি মেক্সিকোর ওসুনা এক এবং অনন্য।

টেনিস জগতে মেক্সিকোর তেমন নামডাক ছিল না বললেই চলে, কিন্তু ওসুনার একান্ত প্রচেষ্টায় মেক্সিকো বিশ্বের টেনিস আসরে কিছুটা সুনাম অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর খেলায় ছিল প্রচণ্ড গতি। তাঁর ভলিগুলি তাঁকে দুর্ধর্ষ করে তুলেছিল।

মাত্র দশ বছর বয়সে ওসুনা টেনিস র‍্যাকেট হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু কয়েক বছর খেলার পর তিনি হঠাৎ ফুটবলের অনুরাগী হয়ে উঠলেন। তাই টেনিস চর্চায় বাধা পড়লো। কয়েক বছর পরে ওসুনা পড়াশুনা করবার জন্য ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে গেলে সেখানে আবার টেনিস খেলতে আরম্ভ করলেন। সেখানে ওসুনা সহজেই টেনিস কোচ জর্জ টলির নজরে পড়লেন এবং তাঁর কাছেই টেনিস শিক্ষার পাঠ গ্রহণ আরম্ভ করেন। টলির পর ওসুনা বিশ্ববিখ্যাত দুই টেনিস খেলোয়াড় পাঞ্চো সেগুরা ও গঞ্জালেসের কাছেও কিছুকাল শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

১৯৬০ সালে ওসুনা উইম্বলেডনে প্রথম সাড়া জাগালেন। আমেরিকার ডেনিস রালস্টনের সঙ্গে খেলে পিত্রাঞ্জেলি জুটিকে পরাজিত করে উইম্বলেডনের ডাবলস বিজয়ী হলেন। ১৯৬২ সালে মেক্সিকো ডেভিস কাপের খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করে এক অঘটন ঘটাল, কারণ আমেরিকা ছিল এক দুর্ধর্ষ দল। চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় ডেভিস কাপে ওই একবারই মেক্সিকো খেলতে পেরেছে এবং তাও সম্ভব হয়েছে র‍্যাফেল ওসুনার অসামান্য ক্রীড়াচাতুর্যের জন্যে। ১৯৬৩ সালটা ওসুনার কাছে আরও গৌরবের। কারণ, ঐ বছর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের চ্যাম্পিয়ান হন। শুধু তাই নয়, ওই বছরই স্বদেশীয় খেলোয়াড় প্যালফক্সের সঙ্গে খেলে দ্বিতীয়বারের জন্য উইম্বলডনের ডাবলস বিজয়ী হন। গত কয়েক বছর যাবৎ ওসুনা টেনিস খেলা থেকে বিরত ছিলেন, কারণ আমেরিকার এক সিগারেট কোম্পানীতে তিনি চাকরি নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রীতি তাঁকে টেনিস খেলা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তাই মৃত্যুর কিছুদিন আগে ডেভিস কাপের আমেরিকান-জোনের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় তাঁরই প্রচেষ্টায় মেক্সিকো অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে। যুদ্ধোত্তরকালে অস্ট্রেলিয়া এই সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের আগে বিদায় নিল। তাই বলতে বাধা নেই যে, মেক্সিকান ক্রীড়াঙ্গনে র‍্যাফেল ওসুনার কীর্তি অবিনশ্বর।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। বিশুদ্ধ সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের সারাৎসার। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবন্মুক্তি, ষড়্‌জ, হংস, মঙ্কি, গীতাসার, পিতৃ, পৃথিবী, সপ্তশ্লোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, গর্ভ, পাণ্ডব, উত্তর রাম, শ্রীমদ্গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমাবেশ প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকা, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, চুলকা, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদনারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, শাট্যায়নীয়, যোগতত্ত্ব, প্রাণাগ্নিহোত্র, জাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতকী, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—প্রতি খণ্ড—৪-০০ টাকা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ :

সামবেদের তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ। শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ। তথ্যপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন :

মহর্ষি কপিলকৃত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈশেষিক দর্শন :

মহর্ষি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩-০০ টাকা।

জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনম্ :

॥ পরমর্ষি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও বঙ্গানুবাদ ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে—পারমর্ষ সূত্র, পূর্ব মীমাংসা, বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পর্বতন্ত্র, জৈমিনি সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবরস্বামীর ভাষ্যের ভাবার্থানুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের শ্লোকবার্তিক ও তন্ত্রবার্তিক টীকা-বিষয়ক পাদটীকা-সমন্বিত। পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থের দীর্ঘকালের সাধনায় অনূদিত, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য—প্রতি খণ্ড—৮-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব :

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পুরশ্চরণ প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম্, দীক্ষাপদ্ধতি, শ্রীগুরু, মন্ত্রার্থ প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা ব্রহ্মসংহিতা, অষ্টাবক্র সংহিতা, ষটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়পোক্ত যোগরহস্যম্, পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগ গ্রন্থের সমাবেশ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

...day, 18th Sept., 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regn. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "BASUMATI" Phone : 34—7771, 72, 73, 74

23 SEP 1969

সাপ্তাহিক
বসুমতী

পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের কার্যভার গ্রহণ

বর্ষ ঃ ১৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই আশ্বিন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 14, 25th Sep

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৮৩৫
আজকের মানুষ		৮৩৬
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শংকরীপ্রসাদ বসু	৮৩৭
বই-বছাই—বাংলা বইয়ের মেলা	— হরপ্রসাদ মিত্র	৮৩৯
অবেলার সিঁড়ি (কবিতা)	— বাসুদেব দেব	৮৪২
হংসপাতালে (কবিতা)	— পশুপতি শাসমল	৮৪২
রঙ্গদর্শন		৮৪৩
ভারতদর্শন		৮৪৬
আন্তর্জাতিক		৮৪৮
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	৮৫০
আর একবার (কবিতা)	— সুনন্দা দাশগুপ্ত	৮৫১
নদীর নাম পলাশবাড়ি (কবিতা)	— অর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য	৮৫১

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন ঃ ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব ছোট
এম. বি. সরকার

এ. সরকার এণ্ড সন্স
৭১/১এ রাসবিহারী এভিনিউ · কলিকাতা-২৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	শ্রীসর্বদর্শী	৮৫২
হে গান্ধী সীমানার বাইরে (প্রবন্ধ)	শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল	৮৫৪
গ্রন্থমেলা		৮৫৬
পত্রলেখক বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ)	সুখরঞ্জন চক্রবর্তী	৮৫৭
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	৮৬০
আইন ও শৃঙ্খলা : পুলিশের ভূমিকা—কয়েকটি অভিমত...	সাগর বিশ্বাস	৮৬৫
সাগর সংগমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল জানা	৮৬৮
খলেশ্বরীর গায়েন (গল্প)	শুদ্র বিশ্বাস	৮৭১
এ যুগের নৃত্য ভাবনা : একটি খসড়া....	শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়	৮৭৫
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	৮৮০
রূপজগৎ		৮৮৫
খবর বর্কান্তি	অভ্রবাহন	৮৯০
পাঠকমন		৮৯১
ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড : প্রথম টেস্ট প্রসঙ্গে	শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৯২
খেলাধুলা	শান্তিপ্রিয়	৮৯৪

সদ্য বেরিয়েছে ॥ বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ ॥ নামমাত্র মূল্য

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ ঃ নীলদর্পণ। জামাই বারিক। বিয়ে পাগলা বুড়ো। নবীন তপস্বিনী। কমলে কামিনী।
২য় ভাগ ঃ সধবার একাদশী। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। পোড়া মহেশ্বর। কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। লীলাবতী। সুরধুনী কাব্য। দ্বাদশ কবিতা। পদ্য সংগ্রহ। তৎসহ লেখকের জীবনী ও ভূমিকা।

(দুই ভাগে সম্পূর্ণ)

মূল্য প্রতি ভাগ চার টাকা।

বিদ্যারণ্য মুনি রচিত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ
মূল্য চার টাকা

স্তবকবচমালা
মূল্য আট টাকা

যোগশাস্ত্র
মূল্য পাঁচ টাকা

শিবায়ন
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

৭৪ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৮ই আশ্বিন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 25th Sept., 1969

পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত রাজ্যপাল

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের প্রথম শাসনকালে রাজ্যপালের ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বিগত বছরগুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির একদলীয় শাসনে রাজ্যপালরা কস্তুত ঐ পদটি লাভ করতেন উপঢৌকন হিসেবে। যুক্তফ্রন্ট সৃষ্টি হবার পর সেই যুক্তফ্রন্টের শাসনে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর প্রথম বাধার সম্মুখীন হন এবং তিনি যে ধরনের কার্যকলাপ গ্রহণের দ্বারা যুক্তফ্রন্টের বিরোধিতা করেছিলেন, তা রাজ্যপালের পদের পক্ষে, অনুপযুক্ত। অবশ্য সে সময় যুক্তফ্রন্টের শক্তি সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। পরে চাকা সম্পূর্ণ উল্টে যায়। মধ্যবর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যুক্তফ্রন্টের হাত প্রভূত শক্তিশালী করেন। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের চৈতন্যোদ্রেক হয়।

এরপর শ্রীধরমবীর নিজের অতীত কীর্তি স্মরণ করে জনসাধারণের ভোটে শক্তিশালী যুক্তফ্রন্টের দ্বিতীয়বারের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পদ থেকে বিদায় নেওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে প্রায় চার মাসের ছুটি নেন। সে সময় পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল নিযুক্ত হন কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ডি, এন, সিংহ। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী রাজ্যপাল হিসেবে শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত করা হলে কিছু ব্যক্তি (যারা পরিবর্তনশীল এই জগতে পরিবর্তনের সম্পূর্ণ বিরোধী) তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল মন্তব্য সুরু করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখন জানেন যে, বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে না চললে তাঁরাও পরিবর্তনের জোয়ারে ভেসে যাবেন, সুতরাং তাঁরা শ্রীধাওয়ানের নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে সুদৃঢ় থাকেন। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী রাজ্যপাল হিসেবে কর্মভার গ্রহণ করেছেন।

আমরা শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের মতো জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীকে স্বাগত জানাচ্ছি। শ্রীধাওয়ান রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় এ রাজ্যের জনসাধারণ খুশি।

শপথ গ্রহণের প্রথম দিনেই শ্রীধাওয়ান এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কংগ্রেসের একমাত্র বিকল্প যুক্তফ্রন্ট। সুতরাং এতোকাল কংগ্রেস ছাড়া অন্য দলের শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্তাদের যে ভীতি ছিল, শ্রীধাওয়ানের মনে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ নেই। তাছাড়া বেতারভাষণ ও সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য। আচার্য কৃপালনী প্রমুখ নেতারা কম্যুনিস্টদের দেশপ্রেম নেই বলে থাকেন, তিনি তার বিরুদ্ধে সৎসাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন যে, কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দের দেশাত্মবোধ তাঁদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় এবং তাঁদের দেশাত্মবোধে তাঁর আস্থা অনেক বেশি। সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, "বিলেতে বহু য়ুরোপীয় শিল্পপতি, ধনী, ব্যাঙ্কার বন্ধু আমার সঙ্গে আলোচনাকালে জ্যোতি বসুর প্রশংসা করেন"। শ্রীধাওয়ান প্রশ্ন করেন তাঁরা কি সবাই কম্যুনিস্ট? মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীধাওয়ানের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলে তিনি বলেন, "ইনি একমাত্র প্রবীণ জীবিত মুখ্যমন্ত্রী যিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে জড়িত ছিলেন।"

মোটকথা শ্রীধাওয়ান দেশের পরিবর্তিত অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ এবং রাজ্যপালের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হওয়ার পর তিনি বলেছেন যে, রাজ্যপাল হিসেবে তাঁর খুব বেশি কিছু করার নেই। সব কিছু নির্ভর করে মন্ত্রিসভার ওপর। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভাই জনগণের কাছে দায়ী হবেন। রাজ্যপাল হিসেবে অন্য কিছু করার অর্থ হবে তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে যাওয়া। তবে তাঁর নিজস্ব যে বক্তব্য আছে তা তিনি মন্ত্রিসভার কাছে রাখবেন। এই মন্তব্য থেকে এই ধারণাই হয় যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতায় তিনি বিশ্বাসী এবং রাজ্যপালের ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন—এতোদিন যে ক্ষমতা ও অধিকারের সীমা-পরিসীমা নিয়ে বিতর্কের অন্ত ছিল না। তাছাড়া শ্রীধাওয়ান শাসনতন্ত্রের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে, শাসনতন্ত্র অপরিবর্তিত কি না সে সম্বন্ধে বেতারভাষণে চমৎকার যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁর অভিমতে জনগণের মতামতই সর্বোচ্চ। তাঁরাই পরোক্ষে শাসনতন্ত্রের নির্মাতা, তাঁদের ওপরই সব কিছু নির্ভর করছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হওয়ায় বাংলাভাষা না জানার জন্য শ্রীধাওয়ান মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, বাংলাভাষা ও সাহিত্য তিনি আয়ত্ত করবেন। তাঁর এই কথা বলার মধ্যে এটাই প্রকাশ পায় যে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য তিনি তাঁদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে হৃদ্য যোগাযোগ রাখতে একান্ত উৎসুক।

শ্রীধাওয়ানের মন্তব্যসমূহ অনেকের কাছে গ্রহণ করা কঠিন হবে এবং তাঁরা নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করবেন। তবে নবনিযুক্ত রাজ্যপাল নিজেকে বিতর্কিত ব্যক্তি বলে আগেই উল্লেখ করে রেখেছেন। সুতরাং কোনো রকম বিতর্কের সৃষ্টি হলেও তিনি ভাবনামুক্ত। মোদ্দা কথা, দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় শ্রীধাওয়ানের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি রাজ্যপালের পদের পক্ষে যথোপযুক্ত। তাঁর নিযুক্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারও ধন্যবাদার্হ।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

চমকে দিয়েছেন ধাওয়ান শুরুতেই। খুশির বন্যা বইয়ে দিয়েছেন বাঙালীর মনে। বাংলাদেশের নতুন অতিথি ধাওয়ান। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন লণ্ডনস্থ ভারতের প্রাক্তন হাই কমিশনার শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান। বামপন্থী ভাবধারায় সঞ্জীবিত বাংলাদেশ চমকিত হয়েছে শ্রীধাওয়ানের একথা শুনে যে, আচার্য কৃপালনী প্রমুখ ব্যক্তিদের চেয়ে কমিউনিস্টদের দেশপ্রেমের ওপর তাঁর আস্থা বেশি। এত উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রশংসাপত্র কমিউনিস্টদের এর আগে কর্তৃপক্ষস্থানীয় কে দিয়েছেন? বাঙালী মনীষা, বাংলা ভাষা, বাংলাদেশের সংবাদপত্র সম্পর্কেই বা এমন দরাজকণ্ঠে বলেছেন আর ক'জন 'বিদেশী'?

শ্রীধাওয়ানকে পেয়ে বাংলাদেশের খুশি হবার বহু যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অতীত অভিজ্ঞতা করুণ, তিক্ত। রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর রাজনীতি-সচেতন বাঙালীর মনকে তছনছ করে দিয়েছিলেন। অবজ্ঞা এবং অনাদরের মধ্যে তাই তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের কাছে শ্রীধাওয়ান গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবার প্রধান কারণ বোধ হয় তাঁর বামপন্থী মানসিকতা। কংগ্রেস আমলেই তিনি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি করেছেন। তারও আগে বিলেতে ছাত্রবয়সে ফেবিয়ান সোস্যালিজম এবং মার্ক্সিজম-এ দীক্ষা নিয়েছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জন্ম; কিন্তু মানুষ হয়েছেন ধাওয়ান এলাহাবাদে। প্রাথমিক পাঠ শেষ করে ধাওয়ান গেলেন লাহোর কলেজে। সেখান থেকে ফর্মান খৃস্টান কলেজে। ইতিহাস এবং গণিতে ধাওয়ান ছিলেন সেরা ছাত্র। সমান কৃতিত্ব দেখালেন তিনি বিলেতে গিয়েও। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইম্যানুয়েল কলেজে ইতিহাস ও আইনে ট্রাইপোজ নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। শুধু বিদ্যার্জন নয়, জ্ঞানার্জনও চললো ধাওয়ানের এখানে। মানে ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শন।

বিলেতের তরুণদের কাছে তখন ফেবিয়ান সোস্যালিজমই ধ্যান-জ্ঞান সবকিছু। শ্রীধাওয়ান সংস্পর্শে এলেন ফেবিয়ান সোস্যালিস্টদের, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে আকৃষ্ট হলো তাঁর বুদ্ধিজীবী মন। পড়াশুনো করলেন মার্ক্সবাদ সম্পর্কেও। পড়া, লেখা আর কাজ। চিন্তামূলক রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন ধাওয়ান। আর ভবিষ্যতের কর্মজীবনের জন্যেও নিজেকে তৈরি করতে লাগলেন। কলেজের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভারতীয় ছাত্র শ্রীধাওয়ানই প্রথম ইম্যানুয়েল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যপদ পেলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্ট। খ্যাতি অর্জন করলেন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে।

যথাসময়ে মিডলটেম্পল ইন থেকে ধাওয়ান ব্যারিস্টারি পাশ করলেন। কিন্তু তবু

শ্রীধাওয়ান

যেন তাঁর জ্ঞানপিপাসা মেটে না। শ্রীধাওয়ান এর পরে গেলেন জার্মানীতে বন ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও ইতিহাসে উচ্চতর ডিগ্রি নেবার উদ্দেশ্যে। তা-ও হলো। এর পরে বিদেশ থেকে ফেরা।

কর্মজীবনও শুরু করলেন ধাওয়ান এলাহাবাদে। অবশ্যই আইনব্যবসা। কিন্তু এলাহাবাদের আকর্ষণ তখন মামলা-মোকদ্দমার চেয়েও রাজনৈতিক কার্যকলাপের কারণেই। ইতিপূর্বে বিদেশে আট বছর থাকাকালীনই তিনি ভারতের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন। একদিকে যখন সংবাদপত্রাদিতে ভারতের খবরের ওপর আগ্রহে ঝুঁকে পড়তেন, অপর দিকে জওহরলাল নেহরুর লেখা ও বক্তৃতার ছিলেন তিনি উৎসাহী পাঠক। ব্যারিস্টারি যেমন চলতে লাগলো তেমনি ধাওয়ান কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়লেন। বিলেতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত ধাওয়ান শীগ্‌গিরই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট গ্রুপের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন। এ-ব্যাপারে নেহরুর তদানীন্তন সেক্রেটারি এবং এ-আই-সি-সি'র পররাষ্ট্র-বিষয়ক সেক্রেটারি ডঃ রামমনোহর লোহিয়া, কংগ্রেসের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ কমিউনিস্ট সদস্য ডঃ কে এম আশ্রফ এবং অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা মহম্মদ জফ্‌ফার খান ইত্যাদি বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের সংস্পর্শে এসে শ্রীধাওয়ান পুরোদস্তুর বামপন্থী বনে গেলেন। এই বামপন্থার কারণেই হীরেন মুখার্জীরা যখন কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হলেন, তখন ধাওয়ানও কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেস সোস্যালিস্টদের দলে ভিড়ে গেলেন।

কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিতে ধাওয়ান আর বিশেষ অংশ নেন নি। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন তিনি ১৪ বছর। এর পর ডাক এলো উত্তরপ্রদেশ সরকারের সিনিয়র স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল পদ নিতে। তারপর আবার এলাহাবাদে। হাইকোর্টের জজিয়তি। বিচারকের আসন থেকে কয়েকটি জটিল মামলার রায় দিতে গিয়ে তিনি আইনের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এমন আলোকপাত করেন যে, এখনো আইনজীবীরা তার উল্লেখ করে থাকেন।

বিচারকের পদ থেকে কূটনীতিকের পদ জুটলো ধাওয়ানের ১৯৬৭ সালে এবং তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও যুক্তিবাদী মানসিকতার কারণে পেয়ে গেলেন একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ—বিলেতে ভারতের হাই কমিশনার। এ ছাড়াও এলাহাবাদ থাকাকালীন শ্রীধাওয়ান ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক সমিতি, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ওয়ার্ল্ড এ্যাফেয়ার্স-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

আশা করি, মিষ্টভাষী, সদালাপী, বিনয়ী এবং নিজের অধিকার ও সীমানা সম্পর্কে সচেতন রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান বাংলাদেশে অচিরে জনপ্রিয়তা অর্জন করবেন।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(১৬)

সুভাষচন্দ্র ও মেঘনাদ সাহা—(২)

মেঘনাদ সাহা যখন এই ভাষণ দিয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স ২৯; আর সুভাষচন্দ্রের ২৫।

জাতীয় পুনর্গঠনের বৈষয়িক দিকটি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে সুভাষচন্দ্রের যেমনোভাব দেখে এসেছি তা মোটামুটি বজায় ছিল আরও সাত-আট বছর। ১৯২০ সালে 'জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে' সভাপতির ভাষণে১০ তিনি অন্যান্য কথার সঙ্গে দেশের দারিদ্র্য-প্রসঙ্গও তুলেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ছিল: "বাঙালীকে যদি মানুষ করিতে হয় তবে শিল্প-সম্বন্ধীয় শিক্ষা দিয়া চাকুরিজীবী বাঙালীকে চাকুরির হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।" এই শিল্প কিন্তু গৃহশিল্প, অল্প মূলধন নিয়ে নিজের কর্তৃত্বে যা সম্পাদন করা যায়। গৃহশিল্পের ব্যাপারে তিনি অবশ্য বিশেষ বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছিলেন; স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে কিভাবে ঐসব শিল্পের প্রবর্তন করা যায় তার কিছু কার্যকর পরিকল্পনাও দিয়েছিলেন। যেমন, যেখানে আখের চাষ হয়, সেখানে চিনি তৈরি করার সহজ প্রণালী শিক্ষা, যেখানে রেশমের চাষ সেখানে রেশম শিল্পের উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টমে নক্সভমিকা গাছ হয়; সেখানে নক্সভমিকার নির্যাস তৈরি করার জন্য ছোট ছোট ল্যাবরেটরী স্থাপন করা দরকার। প্রতি গ্রামেই গো-ভাগাড় থাকে, সেখান থেকে গো-মহিষের হাড় বা শিং যোগাড় করে তা থেকে চিরুণী, বোতাম প্রভৃতি তৈরি করা দরকার। এসব করতে গেলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজপতি হয়ত 'রোষকষায়িত লোচনে' শাস্তি দিতে চাইবেন, কিন্তু 'এইসব অন্ধ বর্বরতাকে আমল দিলে চলিবে না।'

'Practical! training'-এর জোরালো সমর্থন করলেও ২৫ বছরের সুভাষচন্দ্র তাঁর ঐ ভাষণে বৃহৎ শিল্পের সমাদর করেন নি। যন্ত্রের বিষে মানুষের জীবন জর্জর হয়ে যায়—সমন্বিত জীবনবোধের পরিপন্থী কারখানার জীবন—বিশেষ জোরের সঙ্গে তা বলেছিলেন:

"......কিন্তু একথাও আমাকে বলিতে হইবে যে, practical training-এর দ্বারা ছাত্রদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিলেই জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কলিকাতার বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট; যেখানে ছেলেদের practical training হয়, এবং বেশ ভালই হয়, সেখান হইতে বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, বড় বড় মেকানিক হইয়া ছেলেরা বাহির হয়। কিন্তু তাহারা মানুষের বিভিন্ন দিকের সংস্কৃতিমূলক পাথেয় যে কতখানি সংগ্রহ করে তাহা ভাবিবার এখন সময় আসিয়াছে।

"এই যে শিক্ষা, ইহা তো কলের শিক্ষা। কিন্তু মানুষের জীবনটা তো মেশিন নয়—তাহার জীবন একটা organic whole; নানাদিকের বৃত্তিগুলি যদি কলের চাপে নিষ্পেষিত হইয়া পড়ে, মনের আশা আকাঙ্ক্ষা যদি কলের ধোঁয়ায় অঙ্কুরেই শুকাইয়া যায় তবে সে শিক্ষা যে আমাদের জীবনকে শুধু আংশিকভাবে ব্যর্থ করিবে তাহা নহে; আমরা তাহাতে বিশ্বের দরবারে চিরদিনই কাঙাল হইয়া থাকিব।......

"এই কলের শিক্ষায় মানুষ বড় বড় কল গড়িতে পারে, কিন্তু মানুষ গড়িতে পারে না। শিক্ষার্থী আপনার কৃতিত্বে বৃহদায়তন ফ্যাক্টরিতে কাজ করিতে পারে কিন্তু আমরা কি এই জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্ত্য যন্ত্র-জীবনের পুনরাভিনয় করিব? যে দুর্বহ 'যন্ত্রজীবন' হইতে মুক্তিলাভের জন্য আমরা শিক্ষাবিধানের আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়াছি, আমরা কি তাহাকেই আমাদের মাতৃপ্রেমে গ্রহণ করিব?

"এই ফ্যাক্টরি হইতে জীবনের যে হলাহল নিঃসৃত হইয়া বর্তমান সভ্য অভিমানী সম্প্রদায়কে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে—আমরা কি অহরহই আনন্দে আকণ্ঠ পান করিব?

"তাছাড়া আমাদের দেশে ফ্যাক্টরির সংখ্যা খুব অল্প। শত শত ছাত্র যদি ফ্যাক্টরির উপযোগী শিক্ষা পাইয়া শিক্ষা-মন্দির হইতে বাহির হয় তবে তাহারা কাজ পাইবে কোথায়? বহু ফ্যাক্টরি গঠন করা ব্যয়সাপেক্ষ, আমাদের দরিদ্র দেশে তাহা সম্ভবপর নহে। আর এক কথা, আমরা যদি ফ্যাক্টরির বিধিবদ্ধ কর্মপদ্ধতির নিকট আত্মবিক্রয় করি, সেই ঘড়ির কাঁটায় নিয়ন্ত্রিত সময়ের বন্ধনে দাসত্ব করি, ধনীদের কৃপাদত্ত

১০ উপাসনা, ১৩৩০ বৈশাখ। সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র গ্রন্থে উদ্ধৃত।

পুরস্কার এবং রোষদৃপ্ত বিরাগের কাছে আত্মসম্মান বিকাইয়া দিই, তবে আমাদের দাসভাব ঘুচিল কোথায়?"

পরবর্তী কয়েক বৎসরেও সুভাষচন্দ্রের ধারণা বদল হয় নি। 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থে মান্দালয় জেল থেকে লেখা (সম্ভবত ১৯২৫ সালে) কয়েকটি পত্রে তিনি "সমাজসেবা ও কুটীরশিল্প" সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেখানকার বক্তব্যও একই প্রকার।

অর্থাৎ একথা সহজেই বলা যায়, আলোচ্য পর্বে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য যন্ত্রশিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মেঘনাদ সাহা যখন স্থিরনিশ্চয়, সুভাষচন্দ্র তখনো কুটীরশিল্পের ধারণার মধ্যে আছেন। অবশ্য এখানে বলে নিতে হবে, সুভাষচন্দ্রের কুটীরশিল্প একেবারে নৈকষ্য খাদি নয়, কুটীরশিল্প বলতে তিনি আত্মকর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র শিল্পই বুঝেছেন এবং তার জন্য 'কাশিমবাজার পলিটেকনিক' প্রভৃতি স্থান থেকে শিক্ষা নেবার কথাও বলছেন। তা সত্ত্বেও প্রশ্ন জাগে, যে-সুভাষচন্দ্র প্রথমাবধি গান্ধীনীতির বিরোধী, পূর্ণস্বাধীনতার প্রশ্নে কোনোরকম আপোষরফার পক্ষপাতী নন, সামরিক শৃঙ্খলায় দল গঠনের চিন্তা করছেন, তিনি কুটীরশিল্পের ধারণার মধ্যে আবদ্ধ রইলেন কেন? গান্ধীজীর প্রভাবে? না, তা সত্য নয়। এখানে চিত্তরঞ্জনের প্রভাবই স্বীকার্য। দেশবন্ধুর ভাবানুভূতি যন্ত্রশিল্পের রূঢ়জীবনে আহত হত। সে ভাবানুভূতি সুভাষচন্দ্রের ছিল। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র যখন যন্ত্রশিল্পায়নের পক্ষে বড় সমর্থক, তখনো তিনি যন্ত্রজীবনকে নিশ্চয়ই মানবজীবনের পক্ষে শ্রেয় জীবন মনে করেন নি। জীবনে তিনি সমন্বয়পন্থী। কিন্তু সে সমন্বয় নিশ্চয় ভাবের সংগে অভাবের নয়, ভাবের সংগে ভাবেরই। যন্ত্রশিল্পায়নের সমৃদ্ধির সুযোগ যে পেল না, তার দোষ সে বুঝবেই বা কিভাবে এবং যদি না বোঝে দূর করবেই বা কিভাবে।

সুভাষচন্দ্রের বাস্তববুদ্ধিও এক্ষেত্রে অবস্থা কল্পনা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে। ভারতের যে অবস্থা তখন, তাতে সত্যই ব্যাপক আকারে যন্ত্রশিল্পায়ন সুদূরপরাহত ব্যাপার। তার চিন্তায় জনগণকে বৃথা উত্তেজিত করে লাভ নেই। তার থেকে যা সম্ভবপর, তারই প্রয়াসে তিনি উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এবং হয়ত মনে করেছেন, ছোট শিল্পে যদি দেশবাসী হাত দেয়, তাহলে তাদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদাবোধ জাগবে, আত্মবিশ্বাস আসবে, পুঁজি নাড়াচাড়া করবার অভ্যাস ঘটবে, যা পরবর্তীকালে বৃহৎ শিল্প স্থাপনের উপযোগী মানসিকতা দান করবে।

আরও বড় কথা, বিজ্ঞানীর সংগে রাজনৈতিক চিন্তাভেদ যেখানে—রাজনৈতিক আশু প্রয়োজনের কথা বড় করে ভাবতে হয়েছিল। কর্মী চাই—দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের জন্য। কেরানীগিরি ছেড়ে যদি দেশবাসী কারখানার মেকানিক হয়—কোনো সুদূরভবিষ্যতে সে হয়ত দেশ গঠনে কিছু বেশি দান দিতে পারবে, কিন্তু বর্তমানে তার কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে কি? অথচ কোনো উন্নতিই সম্ভব হবে না দেশ স্বাধীন না হলে। কুটীরশিল্পের দিকে ঝোঁক বাড়াবার কারণ, তার দ্বারা দাসজনোচিত কেরানী-মানসিকতা দূর হয়ে আত্মনির্ভরতা ও আত্মসম্মান যে-কোনো সময়ে তাকে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে আনবে। কিন্তু শিল্পায়ন মানে যদি বিদেশী ব্যবসায়ীর বদলে দেশীয় ব্যবসায়ীর দাসত্ব হয়, অবস্থা একই প্রকার থেকে যায়।

এইসব কারণেই সুভাষচন্দ্র আলোচ্য পর্বে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পায়নের পক্ষে প্রচারকাজে নেমে পড়েন নি। অথচ এসব বিষয়ে তাঁর পূর্বাবধি মানসিক সচেতনতার প্রমাণ আছে। রাজনীতিতে অবতরণের ঠিক আগে, আই সি এস ছেড়ে দিয়ে ১৯২১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী এবং তারপরে ২ মার্চ যে দুটি চিঠি কেমব্রিজ থেকে চিত্তরঞ্জনকে লিখেছিলেন, তার মধ্যে তিনি কংগ্রেসের আন্দোলননীতির মধ্যে অনেকগুলি ফাঁকের উল্লেখ করেন। ১৬ ফেব্রুয়ারীর পত্রে লিখেছিলেন—"কংগ্রেসের একটা স্থায়ী আড্ডা চাই। তার জন্য একটা বাড়ি করা চাই। সেখানে একদল research student থাকিবেন, যাঁহারা আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা লইয়া গবেষণা করিবেন। যতদূর জানি Indian Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও definite policy নাই।......

কংগ্রেসের একটা permanent staff রাখা দরকার। ইহারা এক একটি সমস্যা লইয়া গবেষণা করিবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে up-to-date facts and figures সংগ্রহ করিবে। এইসব facts and figures সংগৃহীত হইলে কংগ্রেস কমিটি প্রত্যেক বিষয়ে একটা policy formulate করিবে। আজ অনেক জাতীয় problem সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোনো definite policy নাই।" ('তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থ)।

২ মার্চের চিঠিতেও Currency and Exchange সম্বন্ধে কংগ্রেসের বিশিষ্ট পলিসি নেই বলার পরে যা লেখেন, তা আমাদের আলোচনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ:

"আপনি অবশ্য বলিতে পারেন যে কংগ্রেস এখন *existing Order* ভাঙিতে ব্যস্ত, সুতরাং ভাঙার কাজ সম্পূর্ণ না হইলে *constructive* কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙার সংগে সংগে নূতন করিয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের যে-কোনো সমস্যা সম্বন্ধে একটা পলিসি ঠিক করিতে গেলে অনেকদিনের চিন্তা এবং গবেষণা চাই। সুতরাং এখন থেকেই গবেষণা আরম্ভ করা দরকার। কংগ্রেস যদি *complete programme* প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে যেদিন আমরা স্বরাজ পাইব সেইদিন কোনো বিষয়ে কোনো *policy*-র জন্য আমাদের ভাবিতে হইবে না।" (স্থূলাক্ষর লেখক নির্দেশে)।

উদ্ধৃত অংশ থেকে নিঃসন্দেহে দেখা যাচ্ছে, ১৯৩৮ সালে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং-এর প্রবর্তক সুভাষচন্দ্রের মনের মধ্যে প্ল্যানিং বিষয়টি ১৯২১, কিংবা তারও পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল—যার প্রয়োগ তিনি ক্রমশ করেছেন সময়ের এবং বাস্তব অবস্থার কথা বিবেচনা করে।

[ক্রমশ]

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

আনন্দ বললে—আমাদের এই আলাপ-আলোচনার মধ্যে মনে পড়ছে কিছুদিন আগে,—মানে, বেশ কয়েক বছর আগে বেরিয়েছিল শ্রীযুক্ত নিখিল সেনের 'পুরোনো বই'। সেই ১৩৬৪ সালের বৈশাখ থেকে আজ প্রায় বারো বছর পেরিয়ে এসেছি আমরা। কলকাতার জাতীয় পাঠাগারে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে জীর্ণ, বিবর্ণ, কীটদষ্ট কিছু পুরোনো বাংলা বই থেকে নিখিলবাবু সেগুলির পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন তাঁর সেই আলোচনায়। ১৯৫৪-৫৫-তে যুগান্তর পত্রিকায় তাঁর সেই লেখাগুলি প্রথম ছাপা হয় ধারাবাহিকভাবে। সে বইখানিতে তিনি হ্যালহেডের ব্যাকরণ, কেরির 'কথোপকথন' আর 'ইতিহাস-মালা', ঈশ্বর গুপ্তের 'বোধেন্দু বিকাশ নাটক' এবং তাঁর সেই পুস্তিকাটি—'কবিবর 'ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত'—যেটি বেরিয়েছিল ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে,—রাম রাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' আর 'লিপিমালা',—রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' এবং 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ',—মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' আর 'রাজাবলি',—রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ইত্যাদি বইয়ের সঙ্গে ভবানীচরণের 'নব-বাবুবিলাস'-এর কথাও লিখেছিলেন। ২২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ তাঁর সেই বইখানির শেষ তিন পৃষ্ঠায় ১৭৭৮ থেকে ১৮৭৫-এর মধ্যে প্রকাশিত ৫০ খানি বইয়ের এক তালিকাও তিনি দিয়েছিলেন। সেই তালিকায় ভবানীচরণের 'দূতীবিলাস' (নাটক)-এরও উল্লেখ ছিল।

আমি বললুম—নিখিলবাবুর বইয়ে 'দূতীবিলাসে'র উল্লেখ ছিল, কিন্তু আলোচনা ছিল না। বোধ হয় বইখানার অশ্লীলতার জন্যেই নিখিলবাবু সে-কাহিনীর কোনো বিস্তৃত আলোচনায় নামেন নি। কিন্তু 'কবিবর 'ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত' সম্পর্কিত লেখাটির মধ্যে তিনি বিশেষভাবে ভারতচন্দ্রের একটি রচনায় 'কান্দোরফথ্' শব্দের ব্যবহার দেখিয়ে দেন।

ভবানীচরণের এইসব লেখা পড়তে পড়তে সেই লেখার সেই অংশটি আমার বার বার মনে আসে। মনে হয়, ভবানীচরণের কালীপ্রসন্নের সময় পর্যন্ত এদেশে সেই আদিরসের ভ্যাপ্‌সা ভাবটা টিঁকেই ছিল।

নিখিল সেনের 'পুরোনো বই'-এর ৫৯ পৃষ্ঠায় সেসব প্রসঙ্গ আছে। আমি পড়ে শোনালুম আনন্দকে। নিখিলবাবু লিখেছিলেন—

> ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ভারতচন্দ্রের রসঘন একটি কবিতা উৎকলন করা গেল। কবিতাটির নাম কাদোরফথ—শব্দটি ফারসী—মানে "কাহার দ্বারা একর্ম হইয়াছে এবং কে একর্ম করিয়া প্রস্থান করিল।" কবিতাটি হোল :
>
> পঞ্চপদী।
>
> "কামিনী যামিনী মধ্যে, নিদ্রাগতা শয়ে সদ্মে।
> ধীর শঠ তার মধ্যে, চুম্বিতে চুম্বন সধ্যে,
> ধীরে ধীরে কান্দোরফথ্।
> নিদ্রা হোতে উঠে নারী, অলসে অবশ ভাবি,
> আরসিতে মুখ হেরি, চুম্ব চিহ্ন দৃষ্টি করি
> ভাবে ভাল্ কান্দোরফথ্।"

আনন্দ বললে—এ যাঁরই রচনা হোক, এতে শুধু উৎকট শব্দপ্রদর্শনেরই সখ হয়েছিল লেখকের। একে আর যাই বলো—কবিতা বোলো না। ভবানীচরণ তাঁর লেখার মধ্যে যেসব পদ্য ছিটিয়ে গেছেন, তাতে কোথাও এরকম বাহাদুরির চিহ্ন নেই। ভারতচন্দ্রের দক্ষতা ছিল নানামুখী, কিন্তু তাঁর এই ধরনের তুচ্ছ উদ্যমের তুচ্ছতা অস্বীকার করতে বাধা কিসের? কোনো সত্যিকার গভীর বিস্ময়বোধ ছিল না সেকালে।

আমি বললুম—আমি তাঁর রুচির কথা বলছিলুম। আদিরসের খুবই স্থূল দিকটায় দেশের মন তখন বড়োই আবিষ্ট ছিল। ভারতচন্দ্রের শব্দশিল্প যেখানে সার্থক, সেদিকটাও যেমন স্বীকার্য, সেখানে তা এই ধরনের প্রদর্শনী মাত্র, সে-দিকটাও তেমনি। এসবই হোলো দেশ-কালের যৌগিক স্বাক্ষর। ভবানীচরণ-কালীপ্রসন্নের আমল পর্যন্ত আমাদের অনেকদিনের সেই কালির দাগ শুকোয়নি। সমাজের ছবিতে সেই কলঙ্ক বজায় ছিল।

আনন্দ হঠাৎ বললে—নীরদ চৌধুরী তাঁর 'বাঙালী জীবনে রমণী'-তে উনিশ-শতকের একেবারে শেষ প্রান্তের রচনা রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' গল্পটির চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়েছেন। আজকের আলোচনায় তোমার এইসব কথা শুনতে শুনতে আমার সেইকথা মনে এলো। দ্যাখো—ভারতচন্দ্র তো আঠারোর শতকের অবক্ষয়ের মানুষ। তারপর ইংরেজ এসে পড়ার ফলে, দেশে যখন নতুন হাওয়ার সূচনা ঘটেছে, তখনো সেই ভবানীচরণ-ঈশ্বরগুপ্ত-কালীপ্রসন্ন-রামনারায়ণের আমলেও সেই স্থূলতার ভাবটা কাটেনি। অথচ অতীতে বিশ্বাস,—নারীর প্রতি শত অত্যাচারেও নারীর

আপন মনে সতীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা তো আমাদের অনেকদিনের সামাজিক সত্য। নীরদ চৌধুরীর সেই চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে ভবানীচরণ প্রভৃতির এই ধরনের লেখা সত্যিই কেমন যেন কৃত্রিম মনে হয়। কেমন যেন এক বোধহীন অশ্লীল ব্যাপার।

—একটু বুঝিয়ে বলো।

আমার এই অনুরোধ শুনে আনন্দ বললে—'দৃষ্টিদান' গল্পটি সম্বন্ধে নীরদবাবু লিখেছেন—

"দৃষ্টিদান" গল্পের ভালবাসা আসলে বিদেশী অর্থাৎ ইউরোপীয় রোমান্টিক প্রেম। উহাকে বাঙালী জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে দেশী ছাঁচে ঢালিতে হইবে, একথা আমি আগেই বলিয়াছি। 'দৃষ্টিদানে' রবীন্দ্রনাথ এই সমন্বয় অতি নিবিড়ভাবে করিয়েছেন।"

কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কিত রচনাতে না ছিল এরকম কোনো বোধের আভাস, না ছিল প্রকাশের যথার্থ কলাজ্ঞান। সেসব অতি বাজে লেখা।

আমি বললুম—বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি লেখকরা যখন ছিলেন না,—তাঁরা যখন অনাগত,—ভবানীচরণ প্রভৃতি তো সেই সময়ের লেখক। তাঁদের নিজেদের কালে রেখেই তাঁদের দেখতে হবে। সেইভাবে দেখবার রুচি যদি না জাগে, তাহলে এ আলোচনা বন্ধ করাই ভাল।

আনন্দ বললে—রাগ করে আলোচনা বন্ধ করবে কেন! আমার যা বলবার সেটা বলতে দিতে হবে,—তোমার যা বক্তব্য তাও শুনছি।

—তুমি বলছো ভবানীচরণ মোটেই রবীন্দ্রনাথের মতন নন। কথাটা এতো সত্য যে, শুনে আমার হাসতে ইচ্ছে করছে। সত্যিই এটা হাসির কথা। সবাই জানেন একথা।

—নিশ্চয় হাসির কথা। কিন্তু ঐ কথার মধ্যেই ওসব লেখা পড়বার কাজে এখনকার পাঠকের দুঃখের কথাটাও বলা হয়েছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে একবার যখন আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে, তখন আর ওসব লেখা পড়া যায় না,—একালে ওসব পড়তে কষ্ট হয়। সজনীবাবুরা ঠিকই নাম দিয়েছিলেন—ওসব 'দুষ্প্রাপ্য' বই,—ওগুলির আকর্ষণ কেবল ঐ দুষ্প্রাপ্যতাই।

—আমি ঠিক এতোটা বলতে চাই না। ওগুলির ঐতিহাসিক এবং সামাজিক মূল্যও মানতে হয়। ভাল উপন্যাস বা ভাল গল্প কি কোনো দেশে হঠাৎ দেখা দেয়? আমাদের বঙ্কিম-আবির্ভাবের আগের পর্বে আমাদের সাহিত্যে বাস্তব সমাজ এবং ব্যক্তিমন পূর্ণ মহিমায় দেখা দেবার পূর্ব সূচনা হিসেবেও তো ওগুলি স্মরণযোগ্য। সেই কারণেই ঐসব দুষ্প্রাপ্য, পোকায়-কাটা, জীর্ণ বই মাঝে মাঝে আরো কেউ কেউ ছেপে বার করেছেন। পাঠকরা পড়েছেন—পড়ে থাকেন। এসব পড়ে দেখলে বোঝা যায় যে, আধুনিক কালেই আমাদের গদ্য-পদ্যের আড়ষ্টতা কেটে এসেছে আস্তে আস্তে। জীবনসত্যের পূর্ণতর উপলব্ধির প্রকাশ-পথ সাহিত্যে তো কেবলি তৈরী হচ্ছে। বর্তমানকে জানবার জন্যেই অতীতকে মনে রাখা চাই।

—সাধু, সাধু! তোমার এই কথা শুনে মনে পড়ছে, নিখিল সেনের 'পুরোনো বই' বেরুবার কয়েক বছর পরে,—১৯৬০ খৃস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট বেরোয় 'বঙ্গসাহিত্য সম্ভার' [প্রথম খণ্ড] নামে আর একখানি বই। সে-বইয়ের পরিকল্পনায় ছিল শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম,—আর, তার সম্পাদনায় ছিলেন একজন অধ্যাপক,—শ্রীপ্রতিভাকান্ত মৈত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই বইখানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটু 'পরিচিতি' দেন। তাতে তিনি লেখেন—

"জীবজগতের যে কোন প্রাণীর বিবর্তনের মতই সাহিত্যের বিবর্তন সমান চিত্তাকর্ষক, বিশেষ করে সে-বিবর্তন যদি বাংলা সাহিত্যের মত দ্রুত হয়। গবেষকের মন না নিয়ে শুধু সাধারণ পাঠক হিসেবেই সে-যুগের রচনায় অপূর্ব একটি কৌতূহলমিশ্রিত স্বাদ পাওয়া যায়।"

বইখানির 'মুখবন্ধে' অধ্যাপক মৈত্র লেখেন—'বঙ্গ সাহিত্য সম্ভার'-এর প্রথম খণ্ডে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামনারায়ণ তর্করত্ন ও ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—এই পাঁচজন আপাত-প্রাচীনপন্থী অথচ নূতন ভাব-পরিমণ্ডলের স্রষ্টার সাহিত্যকর্মের নিদর্শন উপস্থিত করা হয়েছে।'—এবং এই সূত্রেই এই সময়কার আদর্শের নির্যাস দিতে গিয়ে সেই মুখবন্ধে বলা হয়—

'পল্লীসভ্যতাকে পিছনে ফেলে নগরসভ্যতার যাত্রা সুরু, শিল্পবিস্তারের ফলে জীবনে সহজলভ্য সুখের আবিষ্কার মানুষকে প্রাচীন ও নবীনের মাঝখানে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছে। আলোচ্য শতকের প্রথমাংশের বাঙালীর চিন্তার ইতিহাস এই দ্বিধা ও বিরোধের ইতিহাস—সাহিত্যে তারই প্রতিফলন।'

আনন্দ বললে—ভারতচন্দ্রের সেই 'কাদর্দেরক্ষণ' যেরকম রুচির সঙ্গে জড়িত, ভবানীচরণ প্রভৃতির এইসব বিলাস-বিবরণীও সেইরকম রুচিরই ফল। বাংলার যথার্থ পল্লী-জীবনের সঙ্গে আমাদের এইসব সাহিত্যিকের লেখার যোগ কতোটুকু? ভারতচন্দ্র তাঁর রচনায় পল্লীবাংলা খুব যে অনুভব করে গেছেন, তা মনে হয় না; আর, ভবানীচরণও তা করেননি। এঁদের রচনায় প্রধানতঃ কেচ্ছা এবং আদি-রসের দিকেই আগ্রহ অনুভব করা যায়। সেই সঙ্গে শব্দাদি বিষয়ে ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের দিকটিও স্বীকার্য।

আমি বললুম—বোধ হয়, এ-তর্কের শেষ নেই, অধ্যাপকরা যাই বলুন, ভারতচন্দ্র মোটেই পল্লীসাহিত্যিক ছিলেন না। পল্লীসাহিত্যের মূল যেসব বিশ্বাসে, ভক্তিতে, সারল্যে থাকা উচিত ছিল, ভারতচন্দ্রের রচনায় বোধ হয়

১৪.৯৫—১৮.৯৫
১২.৯৫—১৪.৯৫
১১.৯৫—১৭.৯৫
দাপাদাপি, হুড়োহুড়ি…
সকল রকম ধকল
সইতেই তৈরি
বাটার ছোটদের জুতো
পায়ের আকারে ও জুতোর গঠনে যখন যথার্থ মিল
জুতো তখনই হয় আরামের আধার, আর
রীতিমতো টেকসই। বাটার ছোটদের জুতোর
যে নকশা তার মূলে আছে এই আরামনীতি।
তাই স্কুলের পথে বা খেলার মাঠে ছোটদের পায়ে
বাটার জুতো আজীবন খুশি পায়ে চলার সহায়।
সামনে আঙুল মেলার বাড়তি জায়গা,
খাপ খাওয়ানো গোড়ালির গড়ন, আর
ঘন নমনীয় তলি—বাটার জুতোর এইসব বৈশিষ্ট্যের
গুণেই সুঠাম গঠনে বেড়ে ওঠে ছোটদের পা।
চমৎকার বাহারে নকশার অসংখ্য জুতো এখন মজুত
বাটার দোকানে। আজই নিয়ে আসুন
আপনার বাচ্চাদের, ওদের খুশি পায়েই
শুরু হোক শরতের শোভাযাত্রা।
Bata
পিন্টু
৬.৮০—১২.৯৫
সুপারটাফ
১৫.৯৫—২২.৯৫

অবেলার সিঁড়ি

বাসুদেব দেব

অবেলার সিঁড়ি খড়্গের মত দুলে ওঠে ঠিক সামনে,
ফণিমনসার ঝোপের ভিতর ঢ্যাঙা সিগনাল কৈশোরকাল
মাথা নিচু করে বলে 'যাও যাও'
পায়ের কাছেই ঝরে পড়ে কার সিঁদুরমাখা মাটির স্পর্শ
কাঁটাতার, খাকি তীক্ষ্ম পোষাক, মানুষের নখ জ্যোৎস্নার গায়
অবেলার সিঁড়ি খড়্গের মত দুলে ওঠে ঠিক সামনে

বিবর্ণ ফটো বুকের গভীরে, দুঃখের দিন ঘোলা।
'সত্যিকারের স্বাধীনতা চাই', প্রাণ দিল যার জন্য
পঁচিশ বছর বয়সের নীলা—পথরেখা চাই সত্য।
ট্রেনের চাকায় বুক ভেঙে যায়, কৃষ্ণচূড়ার নিচে
বোনের চোখের নিষ্পাপ জল, পোড়োবাড়িটার সামনে
কৈশোরকাল আকন্দফুলে, ঢ্যাঙা সিগনাল, সিঁদুর মাখা
কানে কানে বলে 'যাও যাও...যাও'
অবেলার সিঁড়ি খড়্গের মত দুলে ওঠে ঠিক সামনে

হাসপাতালে

পদ্মপ্রাপ্তি শাসমল

মধ্যবিত্ত পরিবারে উপার্জনক্ষম আমি অদ্বিতীয়
অথচ ডাক্তারে নার্সে কেড়ে নেয় জীবনের সক্ষম প্রহর
স্বাভাবিক বরাদ্দের স্নানাহার খাদ্য ও পানীয় সব বরবাদ
দিন রাত একঘেয়ে ক্লান্তি, যেন বোঝা।

বিকেল চারটে বাজলে আরেকবার তাজা হয়ে ওঠা
পুরনো বন্ধুর মত বাইরের হাওয়া আর সুস্থ মানুষের
ঘ্রাণ পাই
চেনা মুখ বড়ই প্রার্থিত মনে হয়।

কেবল একান্তভাবে বন্ধুদের নাম জপ করি।
এসো এসো দেখা দাও জীর্ণ ক্লান্ত বেডের শিয়রে,
একটু সহানুভূতি মিথ্যুক সহানুভূতি ঢেলে দিয়ে স্নিগ্ধ
করে যাও
হায় হায় ছটা বাজে। শুধু এই দুটো ঘণ্টা এত দ্রুত
কেন।

সত্যিই সে সবের চিহ্ন নেই। তিনি ছিলেন রাজসভার কবি। শোনো এখন 'দূতীবিলাস'-এর কথা। 'দূতীবিলাস'-এর কথা। 'দূতীবিলাস'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় ভবানীচরণের 'নববিবিবিলাস' বইয়ের মধ্যেও। সেখানে তিনি লেখেন—

'কোন বাবু আপন আশার সুসারহেতু ঐ কামিনীর নিকট দূতী প্রেরণ করেন, সেই দূতী কামিনীকে যেরূপ রস দেখাইয়া বশ করে তাহা দূতীবিলাস গ্রন্থেই নির্যাস মতে প্রকাশ হইয়াছে, পুনরায় তাহা লিখন অপ্রয়োজন।' [পৃষ্ঠা ৬৮]

১২৫৩ সালের ৪ঠা চৈত্র 'দূতীবিলাস'-এর যে চতুর্থ মুদ্রণ বেরোয়, শাদা পাতলা তুলোটে ছাপা সেই ১১৭ পৃষ্ঠার বইখানির নামপত্র মনে পড়ে। তাতে স্পষ্ট লেখা ছিল—

গৌড়দেশ চলিত ভাষা ভাষিত
সুকোমল পয়ারাদি নানা ছন্দ রচিত
শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত
আদিরস ভক্তিরস ঘটিত

দূতীবিলাস

গুরু বন্দনা, গণেশ-বন্দনা,—সূর্য, দুর্গা, শিব, বিষ্ণু, সরস্বতীর-বন্দনা সে কাব্যেও উপস্থিত। সেখানে ভক্তিরস আর আদিরস দুটিকে মেলাবার চেষ্টা মোটেই আধ্যাত্মিক পদাবলীর ধারায় ঘটেনি। ভবানীচরণ যেন বাঘকে আর গোরুকে একই ঘাটে জলপানে আপ্যায়িত করেছেন।

আমার কথার সূত্র ধরেই আনন্দ বললে—কিন্তু ভক্তির গোরুটিকে আদিরসের বাঘ সম্পূর্ণ ভক্ষণ করেছে। বাংলা সাহিত্য-গ্রন্থ হিসেবে ও-বইয়ের কোনো দাম নেই। তবে হাঁ, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক মূল্য থাকতে পারে। অনেকক্ষণ এসব তর্ক চলছে। অতঃপর আর একজন লেখকের কথায় এগনো যেতে পারে।*

[ক্রমশ]

---

*পূর্ব সংখ্যার প্রথম বাক্যে ১৮০০-র পরিবর্তে ১৮৩০ পড়তে হবে।

বঙ্গদর্শন

শরিকী সংঘর্ষ পশ্চিমবঙ্গে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এজন্য যুক্তফ্রন্টের সকল শরিকই দায়ী, একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই। কদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, এই হানাহানিতে সরকারী কাজ ব্যাহত হতে চলেছে, উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ণ ব্যর্থ হতে চলেছে। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে শরিকী সংঘর্ষ নিয়ে আলোচনা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, এই সংঘর্ষের অবসান ঘটানো হবে। এই রকম ঘোষণার কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না, কেন না এ রকম ঘোষণা পূর্বেও করা হয়েছে, পূর্বেও অনেক সদিচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু ওই সদিচ্ছা কার্যকর করার কোন আন্তরিক প্রচেষ্টাই এতাবৎ হয় নি। বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষের অবসান ঘটানোর সংকল্প শুধুমাত্র সংকল্পই রয়ে যাবে। যে নেতা ফ্রন্টের সভায় ঐক্য এবং সহাবস্থানের পক্ষে বক্তৃতা দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবেন, বাইরে বেরিয়ে এসেই তিনি অপর দলের শ্রাদ্ধ করে সমর্থকদের হাততালি কুড়োবেন। কিছু কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদী জিগির তুলে যেমন নেতৃত্ব বজায় রাখার প্রবণতা বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়, ভারতের সকল রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই এই প্রবণতা আজ মারাত্মকভাবে দেখা গেছে। কিছুকাল আগে সাপ্তাহিক বসুমতীতে জনৈক লেখক বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা বড় মূল্যবান কথা বলেছিলেন। বামপন্থী বিভিন্ন দলগুলির পার্থক্যের মূলে রয়েছে নেতৃত্বের জন্য দ্বন্দ্ব, এর কারণ ব্যক্তিগত, আদর্শগত পার্থক্যের কথাটা একটা লোক দেখানো ব্যাপারমাত্র। নেতৃত্বের বিরোধকেই তাত্ত্বিক বিরোধ রূপে দেখানো হয়। ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে সামগ্রিকভাবে সকলেই লাভবান হয়। চটশিল্প ও চা-বাগানের ধর্মঘট যে সাফল্যের মুখ দেখেছিল, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। নেতারা যে এটা বোঝেন না তা নয়, কিন্তু নেতৃত্ব বজায় রাখার তাগিদে তাঁরা যুক্তির রাস্তায় না গিয়ে কর্মী ও সমর্থকদের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অংশের ওপর নির্ভর করেন, তাদের স্থূল ভাবাবেগগুলিকে উস্‌কে দিয়ে তাঁরা হাততালি কুড়োন, এবং নেতাদের গরম গরম বুলি ও প্ররোচনামূলক ইঙ্গিতগুলির ওপর নির্ভর করে যখন তারা একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে বসে, তখন তাদের রক্ষার জন্য প্রতিপক্ষকে আরও বেশি গালিগালাজ করেন—যেমন যত দোষ ওদেরই, আমার বাছারা নেহাতই ভালোমানুষ, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না, ওরা আক্রমণ করেছিল, তাই যা কিছু করা হয়েছে সবই আত্মরক্ষার্থে। প্রতিটি দলনেতারই আজ এই ভূমিকা। কাজেই কাগজে-কলমে যতই ঐক্য ও সহাবস্থানের কথা বলা হোক না কেন, শরিকী সংঘর্ষ চলছে, চলবে। কেন না তা ছাড়া যে বস্তাপচা নেতৃত্ব বর্তমান দলগুলির ঘাড়ে চেপে আছে তা টিকে থাকতে পারে না। তাই রাজনৈতিক চেতনার উচ্চস্তরে উত্তীর্ণ বহু সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কর্মীকেও আক্ষেপ করতে দেখা যায়, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত রাজনৈতিক দলগুলিকেও আজ উঠতি মস্তানদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, এবং উচ্চস্তরের নেতারা এদের ভাঙিয়েই নিজেদের রাজনৈতিক মূলধন সংগ্রহ করছেন।

রাজ্যপালের বেতারভাষণ

নবনিযুক্ত রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান প্রথম বেতারভাষণের মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রতিশ্রুতিবান হিসাবে প্রমাণ করেছেন। তাঁর প্রথম বেতারভাষণটি বক্তব্যের প্রাঞ্জলতায়, যুক্তিশীলতায় এবং বুদ্ধির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। ভাষণের প্রথম অংশে তিনি বাংলাদেশ ও বাংলাভাষা সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাবের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনি বলেছেন বাংলাভাষা শুধু সাহিত্যসম্পদেই শ্রেষ্ঠ নয়, নিছক ভাষাতাত্ত্বিক বিচারেই বাংলাভাষা এমন কতকগুলি গুণের অধিকারী যা পৃথিবীর খুব কম ভাষার মধ্যেই আছে। তিনি বলেছেন যে, তিনি নিজে এখানে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করবেন, এবং একথাও বলেছেন যে, অদূরভবিষ্যতেই তিনি তাঁর অনুশীলনের বাস্তব প্রমাণ দেবেন। তিনি বলেছেন যে, প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষেও, জ্ঞাতসারে না হোক অজ্ঞাতসারেও ভারতের সকল স্থানের মানুষকেই বাংলাভাষার আশ্রয় নিতে হয়, কেন না ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ভাষা বাংলাভাষাই।

ভাষণের দ্বিতীয় অংশে তিনি রাজ্যপাল হিসাবে তাঁর কর্তব্যের কথা বলেছেন। এ বিষয়ে সংবিধান যে নির্দেশ দিয়েছে তিনি তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন। এই বিষয়ে তিনি বলেছেন যে, সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের কর্তব্য মন্ত্রিসভার বক্তব্যকে অনুসরণ করা। মন্ত্রিসভার কাজের বিচারক তিনি নন, কেন না তাঁর মতে মন্ত্রিসভার কাজের বিচারক সংবিধান অনুযায়ী ভোটদাতা জনসাধারণ। সার্বভৌমত্ব বলতে কোন পদের সার্বভৌমত্ব বোঝায় না, সার্বভৌমত্ব বলতে বোঝায় জনগণের সার্বভৌমত্ব। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জনসাধারণের চাহিদানুযায়ী যুগানুসারী প্রগতিশীলতার দ্বারা চিহ্নিত হবে।

সংবিধান প্রসঙ্গেও তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার। প্রয়োজনে সংবিধানের পরিবর্তন করতে হবে, এবং তাকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। কেন না যে সময় সংবিধান রচিত হয়েছিল সেই যুগের সঙ্গে আজকের যুগের পার্থক্য অনেক, কাজেই সংবিধানকেও পরিবর্তনশীল হতে হবে। কিছুই শাশ্বত নয়, তাঁর নিজের ভাষায় "জগতে একমাত্র পরিবর্তনই শাশ্বত" কাজেই পরিবর্তনশীল যুগধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলাটাই প্রকৃত চলা। তিনি এই বিষয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন যুগ থেকেই একটি ধারণা বরাবরই প্রতিষ্ঠিত যে পরিবর্তনশীলতাই একমাত্র সত্য, এবং জনগণের স্বার্থে সামাজিক পরিবর্তন যত দ্রুত ঘটানো যায় ততই মঙ্গল।

শারদীয় সাপ্তাহিক বসুমতী ((১৩৭৬))

অসাধারণ তিনটি বৃহৎ উপন্যাস

সেই সকালে — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নতুন দিন — জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

স্বর্ণশিমুলের চরে — মনোরঞ্জন হাজরা

দুটি অনন্যসাধারণ লেখা লিখছেন :

সত্যেন বোস — প্রেমেন্দ্র মিত্র

বড় গল্প

আশাপূর্ণা দেবী

আমরা সাহিত্য পাঠ করি, কিন্তু ভাষার অন্তর্কাহিনী আজো পড়িনি। সেই কাহিনী এবার লিখছেন :

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — গোপাল হালদার

পর্দার পেছনে যে স্রষ্টা থাকেন, তাঁর জীবনী কল্পনাকেও হার মানায় চার্লস ডিকেন্সের এবার চাঞ্চল্যকর জীবনী লিখছেন : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

॥ গল্প লিখছেন ॥

মনোজ বসু, সুশীল রায়, লীলা মজুমদার, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুশীল জানা, শক্তিপদ রাজগুরু, আশা দেবী, সমীর মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, স্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র মিত্র, মানবেন্দ্র পাল, রঞ্জিত রায়চৌধুরী, সুভাষ সমাজদার ও আরো অনেকে।

কাব্যনাট্য

হরপ্রসাদ মিত্র

সাহিত্য, রাজনীতি, জাতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি, মহাকাশ-বিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান, সম্পাদকের দপ্তরে, নাটক, সিনেমা, খেলাধুলা ও অন্যান্য বহু চিত্তাকর্ষক বিচার। লিখছেন :

অন্নদাশঙ্কর রায়, অনন্ত সিংহ, অশোক সেন, অরবিন্দ পোদ্দার, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, প্রাণতোষ ঘটক, অমিয়কুমার হাটি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, কল্পতরু সেনগুপ্ত, অজয় বসু প্রমুখ।

শতবর্ষের আলোয় বহু অপ্রকাশিত তথ্যে সম্পূর্ণ এক বিস্ময়কর বৃহৎ প্রবন্ধ

বিবেকানন্দ ও গান্ধী

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

প্রবীণ বিপ্লবীর স্মৃতিকথায় এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে

বিপ্লবী জাতীয় আন্দোলন

সতীশ পাকড়াশী

এবং

দুই বঙ্গের প্রবীণ ও নবীন কবিদের সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ

[সম্পূর্ণ তালিকা ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

দামে সুলভ, বৃহদায়তন, এ বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ শারদ সংকলন

মূল্য : তিন টাকা

(বিমানে প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত চল্লিশ পয়সা)

রাজ্যপাল আরও একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি একটি মাত্রই সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিতে পারেন, এবং তা হচ্ছে এই যে তাঁর কাজ কখনোই ত্রুটিশূন্য হবে না। প্রত্যেকেই ভুল করে, তাঁরও ভুল হওয়া সম্ভবপর, একমাত্র জাগ্রত জনমতই তাঁর ভুলত্রুটিকে সংশোধন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, পৃথিবীর যে কোন জায়গার চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনমত অধিকতর সুসংগঠিত, পশ্চিমবঙ্গবাসীর রাজনৈতিক সচেতনতা সবচেয়ে বেশি।

আমরা রাজ্যপালকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং পশ্চিমবঙ্গের মত সমস্যাসঙ্কুল রাজ্যে তাঁর সাফল্য কামনা করছি। শপথ গ্রহণের পর রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান রাজভবনে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, রাজ্যের জনগণ একটি স্থায়ী সরকার চেয়েছেন। কংগ্রেস পরিত্যক্ত হয়েছে। অতএব কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে সুস্পষ্ট উত্তর হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট এবং যুক্তফ্রন্টের অন্তর্গত দলগুলি তাদের কর্মসূচী সফল করার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার একটি বিরাট পরীক্ষা। যাঁরা শ্রীধাওয়ানের বামপন্থী মনোভাবের জন্য তাঁর নিয়োগ বাতিল করার দাবি জানিয়েছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, ওই ব্যক্তিদের চেয়ে কমিউনিস্ট নেতাদের দেশপ্রেমে তাঁর অধিক আস্থা রয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র-ছাত্রীরা ক'দিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ঘেরাও করে তাঁকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ দিয়েছে, এবং কয়েকজন শিক্ষকও লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পান নি। প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরদিন "ধর্মঘট" করেন অর্থাৎ একদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন। খেলাটা জমেছে মন্দ নয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের, বিশেষ করে গণিত বিভাগের, কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে, যদিও তাদের অভিযোগ করার বা দাবি জানানোর এই ভঙ্গিকে কেউই সমর্থন করবে না। দল বেঁধে ঘিরে ধরে পাইকারীভাবে কুৎসিত ভাষায় যেভাবে গালিগালাজ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এক অন্যায় দিয়ে আর এক অন্যায়ের প্রতিকার করা যায় না।

কিন্তু ছাত্রদের এই ক্রিয়াকলাপ যতই নিন্দনীয় হোক না কেন, কয়েকটি প্রশ্ন

থেকে যায়। সারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের ছাত্র-আন্দোলন ঘটেছে, পরিণামে বহু বিশ্ববিদ্যালয় দিনের পর দিন বন্ধ থেকেছে। কিন্তু সে সকল আন্দোলনের সঙ্গে বাংলাদেশের ছাত্র-আন্দোলনের পার্থক্য মৌলিক। অবশ্য যারা সেদিন এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে তাদের পিছনে সকল ছাত্র ইউনিয়নেরই সমর্থন ছিল না, এবং অনেক ইউনিয়নই উক্ত ছাত্রদের এই ঘৃণ্য আচরণকে নিন্দা করেছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাদের বক্তব্য-গুলিকে কেউই অস্বীকার করে নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি? আসলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা পৌরসভার মতই একটি ঘুঘুর বাসায় পরিণত হতে চলেছে, প্রতিটি বিভাগেই স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতি বহুলভাবে প্রবেশ করেছে। পরীক্ষা ক্ষেত্রেও এই দুর্নীতি। কিছুদিন আগে দেখা গেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরীক্ষায় কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বিতরণ করা হয়েছে, এবং তাদের প্রথম শ্রেণী পাইয়ে দেবার পেছনে বিভিন্ন অধ্যাপকের সঙ্গে নগদে লেন-দেন হয়েছে।

আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার ক্ষেত্রে অধ্যাপক, প্রশ্নপত্র রচয়িতা এবং পরীক্ষক একই লোক হন, এবং এঁরা এককভাবে না হলেও কয়েকজনে দল পাকিয়ে যে কোন ছাত্রকে ওঠাতে বা নামাতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে এটাই হয়। এটা না হওয়া ভিন্ন উপায় নেই, কেন না এখানে যিনি যে বিষয় পড়ান তাঁকে সে বিষয়ে অথরিটি হিসাবে গণ্য করা হয়, এবং প্রশ্নপত্র রচনার ক্ষেত্রে বা উত্তরপত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা চলতে পারে না, চলা সম্ভবপরও নয়, চলা উচিতও নয়। অথচ সেই লোক যদি সৎ ও আদর্শ-চারী না হন তাহলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়, বর্তমানে যা হয়েছে।

আগেকার দিনে অধ্যাপকেরা নিজেদের পদের মর্যাদা সম্পর্কে রীতিমত সচেতন ছিলেন, কাজেই তাঁদের হাতে কোন দুর্নীতির কথা কল্পনাই করা যেত না। অবশ্য তখনো যে দুর্নীতি ছিল না তা নয়, কিন্তু পরিমাণের দিক থেকে তা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু সে যুগে যা ছিল ব্যতিক্রম আজ তা নিয়মে পরিণত হয়েছে, এবং প্রতিটি বিভাগেই এই দুর্নীতির শিকড় প্রোথিত হয়েছে, কোথাও কম কোথাও বেশি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্রদের অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন নয়, একমাত্র সেগুলির প্রতিকারের দ্বারাই সমস্যার সমাধান হতে পারে, পাল্টা স্ট্রাইক করে নয়।

সাপ্তাহিক বসুমতীর ভূত!

মৌচাকে এবার সত্যিই ঢিল পড়েছে। এমতাবস্থায় মৌমাছিরা যা করে, অর্থাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে সামনে যাকে পায়, তাকেই দংশন করে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননীবাবু এবং তাঁর দপ্তরের অবস্থাও হয়েছে তদ্রূপ। বিগত দুই সংখ্যার বক্রদর্শনে প্রকাশিত তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী (তাঁর দলের লোকও বটেন) কর্মচারীটির দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ সম্পর্কে দুটি গুরুতর অভিযোগের বিবরণ এবং তৎসহ "কানাইবাবু" ঘটিত সমাচারটি আর-এস-পি দলের কেউ কেউ, ননীবাবু ও তাঁর প্রিয় তথা আস্থাভাজন কিছু আমলাকে আপসেট করে দিয়েছে। তাঁদের অনেকেই ক্ষেপে গেছেন, মারমুখী হয়ে যাকে-তাকে আক্রমণ করছেন এবং যেখানে-সেখানে সাপ্তাহিক বসুমতীর ভূত দেখছেন। সেই ভূত দেখার প্রাবল্যে তাঁদের কেউ কেউ সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তার কোপ পড়েছে হেলথ ডিরেক্টরেটের কয়েকজনের ওপর, যাদের মধ্যে একজনকে ইতিমধ্যেই দেখে নেওয়া হবে বলে শাসানো হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীও নাকি একজন অফিসারকে সরাসরি বলেছেন—আপনিই সাপ্তাহিক বসুমতীতে তথ্য জুগিয়েছেন, জোগাচ্ছেন? সংশ্লিষ্ট সকলে জেনে রাখুন—এণ্টি ইউ. এফ বলে অপ-প্রচার করে যেমন সাপ্তাহিক বসুমতীকে জব্দ করা যায় নি, তেমনি অনাচারী, দুর্নীতি-বাজ সুরেশচন্দ্রের প্ররোচনায় একজন অফিসারকে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে বিদায় দিয়েই স্বাস্থ্যদপ্তরের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ সংক্রান্ত জঘন্য কার্যকলাপের অভিযোগকে চাপা দেওয়া যায় না, যাবেও না।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অবগতির জন্য জানাই যে, স্বাস্থ্যদপ্তরের পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাদের ঘর থেকে এক পাও বেরুতে হয় না, কোনো অফিসারের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, হয় নি, হবেও না। আগামী দিনে তার পরিচয় তিনি ভালভাবেই পাবেন।

নতুন স্বাস্থ্য অধিকর্তা?

স্বাস্থ্যদপ্তরে নতুন অধিকর্তা নিযুক্ত হচ্ছেন। সম্ভবত ১২ই অক্টোবর তিনি কার্যভার গ্রহণ করবেন। কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি এই পদে নিযুক্ত হতে চলেছেন, তার কিছু কিছু খবর আমরা পেয়েছি। যতদূর জানা গেছে, তাতে নীলরতন সরকার হাসপাতালের জনৈক পদস্থ ব্যক্তি যে নতুন স্বাস্থ্য অধিকর্তা হচ্ছেন, তা প্রায় অবধারিত (অবশ্য শেষ মুহূর্তে যুক্তফ্রণ্টের চাপের ফলে যদি সিদ্ধান্ত পাল্টাতে না হয়)।

আমাদের জিজ্ঞাস্য, কিসের ভিত্তিতে এই ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হচ্ছে—সিনিয়রিটি, এ্যাফিসিয়েন্সী, কাস্ট্ অথবা দলীয় স্বার্থ? ইনি ডিরেক্টর (স্বাস্থ্য অধিকর্তা) হলে দলের এবং দু'-একজন জাতভাই এম-এল-এ'র দারুণ সুবিধে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে শেষ রক্ষা করা যাবে কি এঁকে দিয়ে?

অতীতে আর একবার যখন স্বাস্থ্য অধিকর্তা নিয়োগের প্রশ্ন উঠেছিল, তখন এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে স্বাস্থ্য-দপ্তরের সচিব যে তীব্র মন্তব্য করেছিলেন, তা কারও অজানা নয়। ভদ্রলোকের পারফরম্যান্স সম্পর্কে যে অ্যাড্-ভার্স কমেণ্টস্ করেছিলেন স্বাস্থ্যসচিব সেদিন, তা এখনও সরকারী ফাইলে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

শোনা যায়, ভদ্রলোকের থার্ড ডিভিশনে পাশ-করা ছেলে এম· বি· বি· এস· পড়ছেন, তাও নাকি আবার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালে—অবশ্য পিতার ক্ষমতা ও চেষ্টায় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে নীলরতনে এসেছেন।

ভারত দর্শন

ক্ষমতাগ্রহের গ্রাসে সত্যাগ্রহ!

কংগ্রেস পরিষদীয় দলের ডেপুটি লীডার শ্রীবিভূতি মিশ্র অত্যন্ত সময়োচিত উক্তি করে সত্যাগ্রহের সমূহ সর্বনাশের পথ অবরোধ করে দাঁড়াতে চেয়েছেন। গান্ধীবাদের ধ্বজাধারীদের সত্যাগ্রহের প্রকৃত অর্থ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রকৃত গান্ধীভক্তদের শুভেচ্ছা কুড়োবেন তিনি, সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গটা উঠেছে শ্রীযুত মোরারজী দেশাই-এর সত্যাগ্রহ অবলম্বনের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে। দেশাই সাহেব রাজনৈতিকভাবে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে পরাভূত হওয়ার পর সত্যাগ্রহের চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন। সত্যাগ্রহ করে শ্রীমতী গান্ধীকে 'তথাকথিত' শৃঙ্খলা-রজ্জুতে বাঁধতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। জবাবে শ্রীমিশ্র সত্যাগ্রহের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন: আত্মশুদ্ধিই সত্যাগ্রহের লক্ষ্য, সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য নয় অবদমন।

তিনি দেশাই সাহেবকে কাদা ছোঁড়া-ছুড়ির পথ ত্যাগ করে সদুদ্দেশে সত্যাগ্রহ করবার জন্য আহ্বানও জানিয়েছেন।

দেশাই সাহেব ক্ষমতার লালসা পরিত্যাগ করে জীবন্ত হরিজন দাহ করার হিংস্র উত্তেজনা ও সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার পাগলামির অবসান ঘটানোর জন্য বরং সত্যাগ্রহ করুন এবং সত্যাগ্রহের মর্যাদা রক্ষা করুন, শ্রীমিশ্রের এই আহ্বান দেশাই সাহেবের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে কতদূর বারিসিঞ্চনে সফল হবে বলা কঠিন। কিন্তু শ্রীমিশ্র যে ক্ষমতা-উন্মাদ বাহাদুরে-মানসিকতার কিছু বিচক্ষণতার সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তা যথার্থই প্রশংসার্হ। পরন্তু শ্রীমিশ্র দেখিয়ে দিয়েছেন সর্বের মধ্যে কেমনভাবে ভূতের বাসা ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছিল। স্পষ্ট অভিযোগ উচ্চারণ করে মিশ্র বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, মোরারজী নিজে নেপথ্যে থেকে শ্রীঅশোক মেহতা, শ্রীমতী কৃপালনী প্রমুখ গোঁড়া দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী সদস্যা-সদস্যদের এগিয়ে দিয়েছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়া প্রশ্নে, সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতা করবার জন্য। তাঁরা সরকারের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। অথচ তখন সাংগঠনিক শৃঙ্খলার প্রশ্নকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেন মোরারজীভাই এগিয়ে যান নি পবিত্র শৃঙ্খলা রক্ষা করতে।

সত্যাগ্রহের মূলে আবশ্যিক হল, সত্যবাদিতা, সততা এবং বিষয়ের প্রতি অনুত্তেজিত মনোভাব।'—শ্রীমিশ্র সত্যাগ্রহের উপরোক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে দেশাই সাহেবকে ক্ষমতা-লালসা পরিত্যাগ করে প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব বিসর্জন দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

মোরারজীর প্রতি এহেন আবেদন বিভূতি মিশ্রের তরফে একক নয়। অনেকেই তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ দান তো করেইছেন, অনেকে প্রতিযোদ্ধার ভূমিকায়ও সোচ্চার হয়ে উঠছেন। মোরারজী-বিরোধী বিক্ষোভ দানা বাঁধছে বিভিন্ন কোণে। পাঞ্জাব, এমন কি গুজরাট থেকেও কতিপয় এম এল এ (কং) মোরারজীর প্রতি 'পহেলা নিজেকে সংশোধন করুন' এই মর্মে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই দেশাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, বাঙ্গালোর কংগ্রেসের প্রস্তাবকেই মোরারজী বিরোধিতা করছেন। শৃঙ্খল ভঙ্গকারী তিনিই স্বয়ং।

সামান্য ব্যাঙ্ক জাতীয়করণকে কেন্দ্র করে গোটা দেশে যে বাক্যাড়ম্বরের আয়োজন হয়েছে একমাত্র এ দেশেই তা শোভা পায়। সাধারণ মানুষের কতখানি এলো-গেলো, সে হিসেব হতে না হতেই শ্রীমতী গান্ধী মহান নেতৃরূপে জনগণের শিরোভূষণ হয়ে গেলেন, অন্যদিকে সিণ্ডিকেট এমনই লম্ফ ঝম্ফ শুরু করে দিলেন যেন রাত পোহালেই দেশটা লাল হয়ে যাবে। দেশে সমাজতন্ত্র বর্ষার বানের মতো যেন ফণা তুলে ধেয়ে আসবে। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষকে বোকা বানাবার এমন সহজ কূটনীতি অন্যত্র অবলম্বিত হলে মানুষ শুধু হাসতে হাসতেই দম ফেটে মরে যেত। ভারতের সৌভাগ্য, এ দেশের মানুষ শিশুর চেয়ে সরল এবং নেতারা 'হোয়াইট নাইটে'র চেয়ে প্রকাণ্ড বীরপুরুষ।

ঢের করা হয়েছে, আর নয়

ওদিকে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মতো একটা ভয়ঙ্কর বিপ্লবী কর্মসূচী ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং বলছেন: আর নয়, অনেকটা অগ্রগতি হয়ে গেছে দেশের; অতঃপর শ্বাসগ্রহণের সময়। অর্থাৎ আর কোন রকম বৈষয়িক কার্যসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে না, হবে না। এখন, যা কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে, তারই জন্য 'সঠিক পদক্ষেপ' খুব সাবধানে ও দৃঢ়ভাবে নিতে হবে যাতে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয়।'

এই পদক্ষেপ বলতে কী বোঝায়? চতুর্থ পরিকল্পনা কালেই কি অগ্রগতির সূত্রপাত হবে? সাংবাদিক সম্মেলনে এ প্রশ্নের প্রত্যাশিত জবাবই মিলছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন: বৈষয়িক পুনর্গঠন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন, সঠিক পথে তার রূপায়ণ। আর কোন কাজ যাতে পড়ে না থাকে তার জন্য ঠিক কাজে ঠিক লোকের নিয়োগ প্রয়োজন।

কিছু বুঝলেন?

আমি তো অনেক ভেবেও বুঝলাম না, আমাদের ঠিক কত ধানে কত চাল হবে।

তবে শুনতে পাচ্ছি, বৃহৎ ব্যবসায়ীদের লগ্নীর ক্ষেত্রে একটু 'টাইট' অবস্থা দেখা দেবে। অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যবসায়ীদের কিছু সুবিধা হবে। ব্যাঙ্ককর্মীদের সুবিধা হবে। কৃষির ক্ষেত্রে লগ্নী বাড়বে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারিত হবে কি? মুদ্রাস্ফীতির অনন্ত প্রসারণশীল যাযাবরীর ভয়াবহতার হাত থেকে আমরা মুক্তি পাব কি? কালো টাকা কমবে? জীবনধারণের মান বাড়বে? গুদামে মাল পচিয়ে দাম বাড়ানো বন্ধ হবে? শিক্ষা, আহার (দু বেলা দু মুঠো), বাসস্থান, চিকিৎসার বন্দোবস্ত হবে? একটি পরিবারের কর্তাকে আর একাধিক বেকার পোষণ করতে হবে না তো?

জবাব নেই।

তবুও সমাজতন্ত্র এসে গেছে! ইন্দিরা গান্ধী কম্যুনিস্ট! এবং সিণ্ডিকেটকে মাথার চুল ছিঁড়তে হবে!

মন্দ কি! গুছিয়ে রাজনীতি করতে হলে এমন খানকয়েক চাল দেশ কাল পাত্র বুঝে চাললেই যখন কিছু দূরদর্শী দ্রষ্টার চোখে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ডিক্টেটর পর্যন্ত হওয়ার

প্রকৃত সম্ভাবনা গজিয়ে ওঠে, তখন প্রকৃত কাজ নিয়ে মিথ্যে মাথা ঘামাবেন কে।

জগন্নাথের রথ গড়িয়েছে, ফের যে-পর্যন্ত না কাদায় পড়ছে গড়াবেও। আমরা পদপ্রলোভীরা একবার করে মিটিং-এ ময়দানে রথের রশি ছুঁয়ে আসার জন্য প্রাণপণ করব। ইহকাল পরকালে কাজ দেবে বস্তুত।

কেরলে বেকার ভাতা

আট লক্ষ বেকার কেরল রাজ্যে সরকারী সাহায্য পেতে চলেছেন। রাজ্য প্রধানমন্ত্রী ও পরিকল্পনামন্ত্রী পল্লী ও শহরাঞ্চলের আঠার থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সকল বেকারই এই পরিকল্পনার আওতার মধ্যে পড়বেন বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন।

এই পরিকল্পনার একটি অভিনব দিক হল, বেকার বীমা পরিকল্পনা এবং কলকারখানায় ছাঁটাই লে-অফকালীন বেকার ভাতা। ছাঁটাই বা লে-অফ হলে ছোট বা বড় শিল্পে, দোকানপাট বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে ছাঁটাই অথবা বসে-যাওয়া কর্মীরা বর্তমান সুযোগ সুবিধা ছাড়াও পাবেন বেকার ভাতা হিসেবে নিজেদের মাহিনার এক তৃতীয়াংশ। আর বেকার বীমার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের মোটা অংশই দিতে হবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদেরই।

উক্ত পরিকল্পনার জন্য সরকারের ব্যয় হবে প্রথম বছর দশ কোটি, তৃতীয় বছর ষোল কোটি এবং পঞ্চম বছর পঁচিশ কোটি টাকা।

কেরল সরকারের এই বৈপ্লবিক পরিকল্পনা দেশের একটি মূল সমস্যার প্রতি দৃষ্টিদানের নজির। দেশে চাকুরির সংস্থানে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে। আর বেওয়ারিশ প্রাণের মতো পচে মরছে সম্ভাবনাময় যুবসমাজ।

যে দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের পালনীয়, কেন্দ্রীয় সরকার সে দায়িত্ব পালনে বিমুখ হবে অগত্যা জনদরদী রাজ্য সরকারগুলিকেই সে দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। বলা বাহুল্য, কোন কোন রাজ্য সরকার দেশের মূল সমস্যাগুলির দিকে এইভাবে সুপরিকল্পিত উপায়ে যদি দৃষ্টি দিতে থাকেন, অচিরে কেন্দ্রীয় সরকারেরও টনক নড়বে। অকস্মাৎ কেন্দ্র বুঝতে পারবেন, দেশের ও দশের প্রতি এতাবৎকাল অবহেলা করে আসা হয়েছে, তার সংশোধন প্রয়োজন এবং সেই মুহূর্তে কোন কোন কেন্দ্রীয় নেতা দেশের লোকের কাছে বৈপ্লবিক নেতারূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে অভিনন্দনের হরির লুঠ কুড়াবেন। সেদিন আর একদল ঢাক প্রচারে নামবেন এই বলে যে, গোটা দেশই লাল বনে গেছে। ঐই প্রচারক সম্প্রদায় আসলে ব্যাজস্তুতিকার। নিন্দার ছলে জনসমক্ষে তাঁদের গোষ্ঠী প্রতিনিধিকে কূটকৌশলের দ্বারা জনপ্রিয় করে তোলেন। গণ-বিভ্রান্তি সৃষ্টির নানা পথের মধ্যে এও এক মোক্ষম পথ। মুমূর্ষু অবস্থায় রক্ষণশীলরা এইভাবেই তাঁদের চরম পরাজয়কে ধূম্রচ্ছাদিত বৈপ্লবিক জয়ের চেহারা দেন। স্বল্প ছাড়কে ভয়ানক অবদান বলে ঘোষণা করে জনগণকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে বিমূঢ় করে দেন তাঁরা। আর ততদিনে সাধারণের মনে সেই ঘোষিত কার্যের জন্য চাপ সৃষ্টিকারী কারণগুলির বিস্মরণ ঘটে।

কেবল সরকারের বৈপ্লবিক কার্যসূচীর অদূর ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় পর্যায়ে গৃহীত হবে, কারণ সেজন্য আওয়াজ উঠবেই; কিন্তু সেদিন উৎসের কথা আর তেমন করে মনে থাকবে না আমাদের।

আসামে তৈল শোধনাগার

আসামে দ্বিতীয় তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছিল, গৌহাটির ছাত্র নেতারা সাময়িকভাবে তা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পড়াশুনার যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্যই এই সিদ্ধান্ত। তবে ব্যাপক অর্থে আন্দোলন বন্ধ হচ্ছে না। আসাম সরকার আন্দোলনের পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রীর সফর বাতিল করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাবেন বলেও চিন্তা হচ্ছে। হাজারে হাজারে গ্রেপ্তার বরণ করে অসমীয়াগণ তাঁদের দাবিকে জোরদার করে চলেছেন।

আসামে শিল্পে অনগ্রসরতার প্রেক্ষাপটে তৈল শোধনাগার স্থাপনের দাবিটি বিবেচিত হতে পারে। রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদকে ভালভাবে কাজে লাগাতে প্রত্যেক রাজ্যবাসীই আগ্রহী হবেন এতে আর বিচিত্র কি।

গত মার্চ মাসে দ্বিতীয় শোধনাগারের দাবিতে আসাম মুখর হয়ে ওঠে। তখন রাজ্য বিধানসভায় একটি সর্বসম্মত প্রস্তাবও গৃহীত হয়। প্রস্তাবক ছিলেন স্বয়ং শিল্পমন্ত্রী শ্রীবিশ্বদেব শর্মা। তিনি হিসেব হাজির করে দেখিয়ে দেন যে, ১৯৭৫ সালের মধ্যেই রাজ্যের অপরিশোধিত তৈলের মোট বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে একষট্টি লক্ষ টনের মতো যা গৌহাটি-বারৌনির শোধনাগারের মাধ্যমে শোধন করে নেওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া বারৌনির শোধনাগারে আসামের তৈল শোধন করা হলে সেলস ট্যাক্স রাজকোষে নিয়ে যাবেন বিহার সরকার। আসাম সরকার এই কর বাবদ আয় করতে পারবেন না।

সুতরাং শোধনাগারের দাবির পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কি নেই, সে প্রশ্নে যাওয়ার আগে অসমীয়া দাবির পেছনে যে যুক্তি আছে, এবং যা মূলত অর্থনৈতিক, সেটাই বিচার্য হওয়া উচিত। অসমীয়াগণ তাঁদের রাজ্য অর্থনীতিকে সুষ্ঠুরূপ দিতে চান এই সাদা কথাটা অস্বীকার করার জন্য অন্য প্রশ্ন টেনে আনাই বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত —এমন কথা কেউ বললে তাই-ই বা অস্বীকার করা যাবে কি?

তবে ইতিমধ্যে ভারত সরকার এ বিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন, যার সুপারিশ বর্তমানে ডঃ ত্রিগুণা সেনের কাছে পেশ করাও আছে। কেন্দ্র আগে আসামের দাবি নাকচ করেই দিয়েছিলেন। পরে কমিটি গঠন করেন।

কমিটির সুপারিশ নাকি অসমীয়া দাবির পক্ষে যায় নি। তবে গৌহাটির শোধনাগারের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে তার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার পরামর্শ নাকি সুপারিশে আছে। শুধু তাই নয়, কমিটি রাজ্যে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প গঠনের ওপরও জোর দিয়েছেন, যে শিল্পে অসমীয়াগণের চাকুরির সংস্থান হতে পারে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে।

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সুপারিশ প্রকাশ ও তার পর্যালোচনার জন্য কিছু ধৈর্য ধারণ করলে একটি সুচিন্তিত সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সফরকালে শ্রীমতী গান্ধীও কিছু আশ্বাস দেবেন হয়ত। ২০।৯।৬৯

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠক ও নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ব্রহ্ম, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক); নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২.

আন্তর্জাতিক

সোভিয়েট য়ুনিয়ন ঃ

চৌ-কোসিগিন সাক্ষাৎকার এত অপ্রত্যাশিত যে কূটনৈতিক জগৎ বিস্ময়চকিত দৃষ্টিতে এখন একে বিশ্লেষণের চেষ্টা করছে। যাঁরা চীন-সোভিয়েট বিরোধের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল, তাঁদের ধারণা, এই নাটকীয় সাক্ষাৎকার ও আলোচনার ফলে দু' দেশের সম্পর্কের বিশেষ কোন পরিবর্তন হবে না। তবু মস্কো থেকে 'বিশ্বস্তসূত্রে' খবর বেরিয়েছে সেপ্টেম্বরের শেষে অথবা অক্টোবরের প্রথমে চীন ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের মধ্যে সহকারী মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক বসবে। মস্কোতেই এই বৈঠক হবে, আর আলোচনার বিষয় হবে—দুই দেশের সীমান্ত বিরোধ। সোভিয়েট য়ুনিয়নের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করবেন এম· পি· জিরিয়ানভ, এই খবরও জানা গেছে।

দু' পক্ষের মধ্যে আলোচনা সুরু করার ব্যাপারে সোভিয়েট য়ুনিয়নের আগ্রহই ছিল বেশি। ১৯৬৪ সালে ব্যাপকভাবে বিরোধ (যা প্রধানত রাজনৈতিক) সুরু হবার পর থেকেই সোভিয়েট য়ুনিয়ন চেষ্টা করছে পারস্পরিক আলোচনার মারফৎ একটা মীমাংসায় পৌঁছবার জন্য। ১৯৬৫ সালে হ্যানয় থেকে ফেরার পথে সেদিনও সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিন পিকিং গিয়েছিলেন চীনা নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য। মাও সে-তুং, চৌ এন-লাই প্রমুখের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। কিন্তু কোন মীমাংসা হয় নি, বরং বিরোধ বেড়েছে। তার পর থেকে বহুবার চেষ্টা হয়েছে আলোচনার জন্য। কিন্তু হয় নি।

এবার দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক সম্ভব হল। হো চি মিনের অন্তিম ইচ্ছা অবশ্যই এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। কমিউনিস্ট জগতে অন্তর্বিরোধে গভীর বেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন হো চি মিন, এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তাঁর 'অন্তিম ইচ্ছায়' আহ্বান জানিয়ে গেছেন। উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টিকে তিনি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে বলেছেন। চীনের পক্ষে হো চি মিনের এই আবেদন অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া হো চি মিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে হ্যানয়ে সমাগত অন্যান্য কয়েকটি দেশের কমিউনিস্ট নেতাও এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। শেষ পর্যন্ত কোসিগিন ও তাঁর সহযাত্রী অন্যান্য সোভিয়েট নেতারা পিকিং বিমান বন্দরে গিয়ে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই ও অন্যান্য চীনা নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে এই আলোচনার কোন বিবরণ কোন পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় নি। কেবল বলা হয়েছে, উভয়পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে 'খোলাখুলি আলোচনা' হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্র জল্পনা-কল্পনা চলছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, এবং আলোচনার ফলই বা কি?

মনে হচ্ছে, সীমান্ত বিরোধ ও বিরোধজনিত সংঘর্ষ নিয়ে চীন ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের একটা আলোচনা শীগ্গিরই সুরু হবে। এই আলোচনার সাফল্যের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। আলোচনা সামান্য সফল হলেও বৃহত্তর সব প্রশ্ন, বিশেষ করে রাজনৈতিক মতভেদ নিয়ে আরও কথাবার্তা সুরু হতে পারে।

উভয়পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও মন কষাকষি এখনও পুরো মাত্রায় রয়েছে। গত সপ্তাহেও সোভিয়েট সংবাদপত্রে মাও সে-তুংকে হিটলার এবং চীনের 'রেড গার্ডকে' নাৎসী গেস্টাপো বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করে কড়া গাল দেয়া হয়েছে। চীনের সংবাদপত্রও পেছিয়ে নেই। তারা সোভিয়েটের বর্তমান কমিউনিস্ট নেতাদের 'নয়া জার' বলে বর্ণনা করেছে।

তবু যদি বরফ একটু গলে, সামান্য আলোচনাও সুরু হয়, তার যথেষ্ট মূল্য আছে। ঠাণ্ডা লড়াই-এ এই জাতীয় আলোচনা থেকে সম্পর্ক পরিবর্তনের সূচনা হয়। তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট চৌ-কোসিগিন সাক্ষাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে নিক্সন-মাও সে-তুং সাক্ষাৎ সম্ভব হবে বলে উ থাণ্ট আশা প্রকাশ করেছেন। চীন-সোভিয়েট এবং চীন-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির ওপর বিশ্বশান্তি অনেকখানি নির্ভর করছে।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ঃ

আরব দেশগুলির ওপর, বিশেষ করে সুয়েজ খালের পার্শ্ববর্তী মিশরীয় এলাকায় ইজরায়েলী আক্রমণ বলতে গেলে কখনও থামে নি। তবে গত এক সপ্তাহের ওপর ধরে এখানে যা হচ্ছে, তা অতীতের সব রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। জুন যুদ্ধের (১৯৬৮) পর এত বড় আক্রমণ আর হয় নি।

বড় বড় ট্যাঙ্ক, মেসিনগান, মর্টার নিয়ে স্থলপথে ইজরায়েলীবাহিনী অতর্কিত আক্রমণ করে পঞ্চাশ মাইলের ওপর মিশরীয় এলাকা তছনছ করে দিয়েছে। বহু মিশরীয় সৈন্য হতাহত হয়েছে, অনেক ঘর-বাড়ি অস্ত্র-শস্ত্র

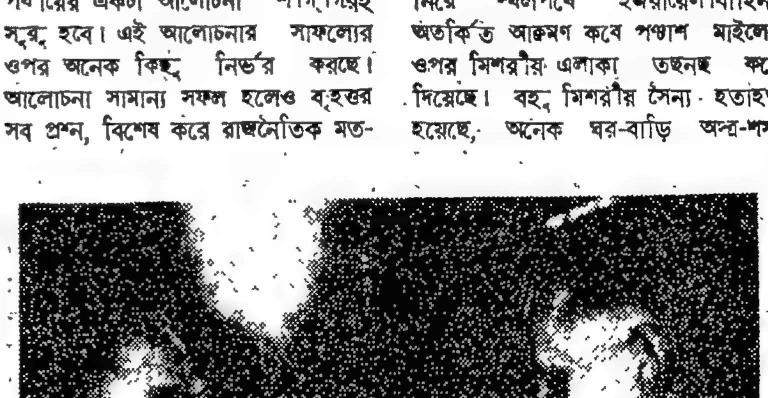

চৌ-কোসিগিন সাক্ষাৎকার

নষ্ট হয়েছে, রাডারকেন্দ্র ধ্বংস হয়েছে। বিমান থেকেও আক্রমণ চালানো হয়েছে।

আচমকা আক্রমণে মিশরীয়রা প্রথম দিকে হতভম্ব হয়ে পড়লেও দুদিন পরে তারাও পাল্টা আক্রমণ করে। তবে ইজরায়েলের তুলনায় এই আক্রমণের তীব্রতা অনেক কম ছিল, ইজরায়েলীদের ক্ষতিও কম হয়েছে।

ইজরায়েলীদের এভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্য কি? মাঝে মাঝেই বা হঠাৎ তার জোর বাড়ে কেন?

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ারের কথায় নাসেরকে একটু সতর্ক করে দেয়াই এই আক্রমণের উদ্দেশ্য। সম্প্রতি নাসের ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যাপক, কার্যকরী ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কথা বলেছেন। কিন্তু নাসের ও অন্যান্য আরব নেতারা যাই করুন না কেন, ইজরায়েলের সঙ্গে তাঁরা সামরিক শক্তিতে পেরে উঠবেন না। এ কথা তাঁদের মনে রাখা উচিত।

দ্বিতীয়ত, ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মশে ডায়ানের 'স্ট্র্যাটেজি'ই হল মাঝে মাঝে হঠাৎ অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালানো। এবং তিনি মনে করেন, এই-ভাবেই আরবদের শায়েস্তা করা যাবে।

তৃতীয়ত, সম্প্রতি আরব গেরিলা-দের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিম এশিয়া ছাড়িয়ে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। ব্রাসেলসে ইজরায়েলী বিমান প্রতিষ্ঠান 'এল আল'-এর অফিসে, এবং বন ও হেগের ইজরায়েলী দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। প্যালেস্টাইন গণ মুক্তিফ্রন্ট (পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন) স্বীকার করেছে, তাদের লোকেরাই এই কাজ করেছে। ব্রাসেলসে বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে যে দুজন আরব সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়েছে, তাদের বয়স মাত্র ১৩।১৪ বছর। এরা 'হো-চি মিন ব্রিগেড'-এর সদস্য, এবং 'বাঘের বাচ্চা' বলে পরিচিত। মুক্তিফ্রন্টের বক্তব্য, এই আক্রমণ সুরু মাত্র। যে-সব পশ্চিমী দেশ ইজরায়েলকে সাহায্য করবে, সব জায়গায় আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়া হবে। আরব জগৎ ও তার বাইরে এই সন্ত্রাস-বাদী আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চাপ সৃষ্টির জন্যই ইজরায়েল আক্রমণ চালাচ্ছে।

চতুর্থ, আর কয়েকমাসের মধ্যেই ইজরায়েলে সাধারণ নির্বাচন হবে। প্রধানমন্ত্রী এভি এসকলের মৃত্যুর পর গোল্ডা মেয়ারের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী-কালীন মন্ত্রিসভা বর্তমানে কাজ চালাচ্ছে। নতুন নির্বাচনে যাতে বর্তমান যুদ্ধবাদী শাসকেরাই জয়লাভ করতে পারেন, তার জন্য ইজরায়েলীদের যুদ্ধাতঙ্কের মধ্যে রাখা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই হামলা হচ্ছে।

পঞ্চমত, ইদানীংকালে আরব জগতে প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন বেশ শক্তিশালী হয়েছে। লিবিয়ায় পশ্চিমঘেঁষা রাজতন্ত্রের পতন ও তার পরিবর্তে একটি বামপন্থী প্রজা-তন্ত্রী শাসনের প্রতিষ্ঠা, এবং আরব জগতে প্রতিক্রিয়াশীলতার স্তম্ভ সৌদি আরবের রাজা ফয়জালের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টায় পশ্চিমী জগৎ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত বিচলিত। পশ্চিম এশিয়া থেকে এখনও মার্কিন, বৃটিশ, ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি তেল কোম্পানীগুলি কোটি কোটি ডলার লুটে নিয়ে যাচ্ছে। এদের লুণ্ঠনের স্বার্থে আজ আরব জাতীয়তাবাদকে রোখা দরকার। ইজরায়েলকে দিয়েই এ কাজ সবচেয়ে ভাল হয়। তাই অনে-কেরই ধারণা, পশ্চিমীদের, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উস্কানিতেই ইজরায়েল নতুন করে আক্রমণ সুরু করেছে। আরবরা আক্রমণ প্রতিরোধের কাজে ব্যস্ত থাকবে, তার জন্য অর্থ ব্যয় করবে, এবং পরিণামে প্রগতিশীল কাজকর্মের গতি মন্থর হবে।

কারণ যাই হোক, এবং সম্ভবত সবগুলি কারণই রয়েছে ইজরায়েলের বর্তমান মনোভাবের পেছনে, আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষ নতুন করে পশ্চিম এশিয়ার শান্তি বিপন্ন করছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

* * *

লণ্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় খবর ফলাও করে খবর বের হল—নাসেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার এক চক্রান্তকে শেষ মুহূর্তে ব্যর্থ করা হয়েছে। চক্রান্তের প্রধান নায়ক নাসেরের দক্ষিণহস্তরূপে পরিচিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আলি সাবরিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেনা-বাহিনীর প্রধান ও অন্যান্য কয়েকটি পদেও পরিবর্তন করা হয়েছে। আর এই চক্রান্তের পেছনে নাকি সোভিয়েট য়ুনিয়নেরও হাত ছিল।

এই সংবাদে আরও বলা হয়েছে, ইজরায়েলীদের সঙ্গে যুদ্ধে নাসের নেতৃত্বের ব্যর্থতার জন্য মিশরের বহু রাজনৈতিক নেতা ও সেনানায়কদের সঙ্গে নাসেরের মন কষাকষি সুরু হয়েছে। বর্তমান বিক্ষোভ ও চক্রান্তের চেষ্টার মূলেও রয়েছে এই ব্যাপার।

বেইরুটের একটি সূত্র থেকে নাকি এই সংবাদ দেয়া হয়েছে।

সরকারিভাবে সংযুক্ত আরব প্রজা-তন্ত্রের পক্ষ থেকে এই চক্রান্তের সংবাদ, এবং নাসের-আলি সাবরি মতভেদের কথা অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আলি সবরি সম্প্রতি একটি নতুন সরকারী কমিটির সভাপতি হয়েছেন, এবং আরব সোস্যালিস্ট য়ুনিয়নের কাজও তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন।

আরবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই এই অপপ্রচার করা হয়েছে।

তবে সেনাবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে জেনারেল মহম্মদ ইসমাইলকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মেজর জেনারেল মহম্মদ আমেদ সেডাককে নিয়োগ করা হয়েছে।

(২১।৯।৬৯)

সদ্য প্রকাশিত হইল।

বাঙলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরসিক

শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

(১) মনের মত বৌ
(২) মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি
(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো
(৪) প্রেমের বিচিত্র গতি
(৫) রক্তের টান
(৬) যখন তারা কথা বলবে

পৃষ্ঠা ২৪০

মূল্য মাত্র চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

সপ্তাহের কথা

কৃত্তিবাস ওঝা

রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি তৈরির করতে চেয়েছিলেন। নরলোক থেকে স্বর্গ যেতে কোন কষ্ট হবে না, কোন সাধ্য-সাধনা দরকার হবে না, সিঁড়ি বেয়ে উঠবে—সোজা স্বর্গলোকে চলে যাবে। এইভাবেই রাবণ দেবতাদের গর্ব খর্ব করতে চেয়েছিলেন নরলোক ও স্বর্গলোকের মধ্যে সিঁড়ি বেঁধে। কিন্তু সেই সিঁড়ি বাঁধা হল না, কারণ রাবণ কাল করবেন বলে কাজটি ফেলে রেখেছিলেন। অশুভস্য কালহরণম—রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি গাঁথা হল না। রাবণের কাহিনী কতটা সত্য জানি না; স্বর্গলোক আছে কি-না বা তার কোন সিঁড়ি হয় কি-না, সে-কথাও জানি না। কিন্তু একটা কথা এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি। সেটা হল, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট কালের কবলে পড়েছেন।

আমি কিন্তু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বা সরকারের কথা বলছি না, আমি যুক্তফ্রন্ট নামীয় প্রতিষ্ঠানের কথা বলছি। যে প্রতিষ্ঠান হল যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতি নিয়ামক বা যাদের হাতে—সরকার পরিচালনার স্টীয়ারিং। রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা আর যুক্তফ্রন্টকে এক করে দেখতে চাই না, কারণ যুক্তফ্রন্ট সরকার মানে যাঁরা মহাকরণে বসে কাজ করেন, আর যুক্তফ্রন্ট মানে যাঁরা কম্যুনিস্ট পার্টির দপ্তরে মাঝে মাঝে বসে ঝগড়া করেন ও সরকারী কাজে বাধা ও বাগড়া দেন। কথাটা যদি আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, তাহলে এই দাঁড়ায় যে, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীরা যখন টাট্টু ঘোড়ার মত এগিয়ে যান, তখন সেই মন্ত্রীরা যুক্তফ্রন্টের সভায় এসে যুক্তফ্রন্টের নেতারূপে বসে বেতো ঘোড়া বনে যান। বিগত কয়েক মাসে রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকার যে সকল জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন বা কাজের জন্য আইন পাশ করিয়েছেন, তার কোন তুলনা হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে বহু বৎসর পর এইবারই খাদ্য-সঙ্কট নেই বা খাদ্য নিয়ে কোন উদ্বেগ নেই। এতদিন জানতাম রাজ্যে খাদ্য-সঙ্কট না থাকলে কোন সঙ্কটই থাকবে না। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দীর্ঘ ২০।২২ বৎসরের মধ্যে এই ভাদ্র-আশ্বিন মাসে রাজ্যে খাদ্য-সঙ্কট নেই, খাদ্যাভাব নিয়ে কলকাতা-দিল্লী হল্লা নেই, সেই ক্রনিক খাদ্য-আন্দোলন নেই। কিন্তু দেখা গেল খাদ্য-সঙ্কট মিটে গেলেই সব সঙ্কট মিটে যায় না, এল ঘেরাও। 'ঘেরাও-ঘেরাও' শব্দে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেল, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখলেন—যুক্তফ্রন্টের যদি কোন বিপদ থাকে, তবে সেটা খাদ্য-সঙ্কট নয়, সেটা হল ঘেরাও। কিন্তু দেখা গেল ধীরে ধীরে সেই ঘেরাও-এর ধার কমে যাচ্ছে। আজকে আর কাগজ খুললেই হেড লাইনে ঘেরাও পড়তে হয় না, পড়তে হয় না ঘেরাও-এর ফলে কত শিল্পকারখানা অচল হয়ে যাচ্ছে, কত শিল্পকারখানা রাজ্য ছেড়ে যাচ্ছে। এই যে পুজা মরশুম এসেছে, পুজা বোনাস নিয়ে কত হাঙ্গামা হতে পারত এবং হবার আশঙ্কাও ছিল, কিন্তু কই ঘেরাও নিয়ে এমন কিছু আজ আর হচ্ছে না, যার দ্বারা মনে করা যেতে পারে সরকার গেল-গেল। কিন্তু মরেও মরে না অরি—ঘেরাও নেই, খাদ্য-সঙ্কট নেই, আছে আন্তঃপার্টি হানাহানি, আছে কুৎসিত শরিকী সংঘর্ষ, আছে একের বিরুদ্ধে অপরের কুৎসা, আছে পরস্পরের চরিত্র হননের চেষ্টা। আরও মজার ব্যাপার হল, মন্ত্রী হিসেবে যাঁরা যত সফল, যুক্তফ্রন্টে তাঁরাই তত ব্যর্থ। যেমন শ্রীসুধীন কুমার। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রীরূপে সুধীনবাবুর মত সফল ব্যক্তি কেউ নন, প্রকৃতপক্ষে শ্রীকুমারের মুখের পাইপ আর ইংরেজী বলার দক্ষতা খাদ্যদপ্তরের ঘুঘুদের বাসা ভেঙে দিয়েছে, বাবু জগজ্জীবন রামকে বশ করেছে। কিন্তু এই সুধীনবাবু যখন যুক্তফ্রন্টের আহবায়ক, তখন তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ বলা যায়। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার—তাঁর মত সফল মন্ত্রী স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে কেউ আসেন নি বলা যায়। কৃষক, ভূমিহীন কৃষক, রায়ত প্রভৃতির স্বার্থে শ্রীকোঙারের কাজ অতুলনীয়। একদা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বহুশত দেশীয় রাজ্যের রাজাকে বধ করে যে লৌহমানবের আখ্যা পেয়েছিলেন—ক্ষুদ্র সীমায় পশ্চিমবঙ্গে শ্রীকোঙার মহাশয়কেও সেইরকম সার্টিফিকেট দেওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের জোতদার, জমিদার, ভেড়ি মালিকদের তিনি যেভাবে টিট করেছেন, তার তুলনা হয় না। একইভাবে রাজ্যের আইনমন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডলের কথা বলা যায়। সিটি সিভিল কোর্টের এক্তিয়ার বৃদ্ধি, বিচার ও আইন বিভাগ পৃথকীকরণ, কোর্ট ফি আইন সংশোধন এবং সর্বশেষে শহরের সম্পত্তিসীমা নির্ধারণের চেষ্টা—এইসব কাজের তুলনা হতে পারে না, কিন্তু এই শ্রীকোঙার ও শ্রীমণ্ডল মশায় কিন্তু যুক্তফ্রন্টে মোটেই সফল ব্যক্তি নন। যুক্তফ্রন্ট আর যুক্তফ্রন্টের সভার মানে হল—কয়েকজন নেতা মধ্য কলকাতায় এক বাড়ির তিনতলার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসেন, মধ্যরাত্র পর্যন্ত বসে ঝগড়া করেন, তারপর বেরিয়ে যান। ঐই সভায় সকলেই বক্তা, শ্রোতা মাত্র একজন—তিনি সভার সভাপতি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরূপে কতটা সফল সেটা ভবিষ্যতে বিচার হবে, কিন্তু তিনি নীরব শ্রোতা হিসাবে যুক্তফ্রন্টের সভায় সভাপতিরূপে যে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই।

যা হোক, যে কথা বলছিলাম—যুক্তফ্রন্ট আজ পর্যন্ত কোন কাজই করতে পারল না, যে কাজ সরকার চলবার

আর একবার

সুনন্দা দাশগুপ্ত

আর একবার যদি ফিরে যেতে পারি
সবুজ মাঠের প্রান্তে
লাল কাঁকরের সেই পাহাড়িয়া পথখানি বেয়ে
উজ্জ্বল স্বপ্নের মায়া ঘেরা,
স্নিগ্ধ ভালোবাসা ভরা, ফেলে আসা ছোট খেলাঘরে—
অবোধ আনন্দে ছলোছল
অনেক অতীত পার হয়ে।
কবেকার ফেলে আসা, মুছে যাওয়া শৈশবের দিনে।

তিলে তিলে বেছে নেব জীবনের মধুর সঞ্চয়
দু'একটি স্মৃতির বিন্দুক,
অযত্নে যা হারিয়েছি অতীতের বালুকাবেলায়।

তারপর, খেলা শেষ হলে,
ধূসর প্রান্তর জুড়ে কল্পনার মঞ্জরী ফোটাব।
নিটোল মুক্তার শুভ্র কোমল সরল মাধুরীতে
জ্যোতলহরীর এক মালা গেঁথে গলায় দোলাব।

তুচ্ছ, তবু ছোট নয় দাবি! স্বপ্ন তাই ভাঙে অতর্কিতে,
চেয়ে দেখি, এ পথের কিছুই যে এখনো চিনিনে—
চোখের পলকপাতে, কখন চকিতে
জীবনের সবটুকু মহাকাল নিয়েছে যে কিনে।

নদীর নাম পলাশঝিরি

অর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য

নদীর নাম পলাশঝিরি
এখন শুধু নরম ঘাসে
মাথার উপর টুকরো আকাশ—নীলের কুচি
সবুজ শালের ঠান্ডা ছায়ায়
জমাট বাঁধা নীরবতা
পৃথিবীটার চেনা ঘ্রাণে
বারে বারে কারেই খুঁজি
শালের ফাঁকে—অনেক দূরে
অথবা এই ঝিমিয়ে আসা
ঘুণ-ধরা এই জীবনটাকে খাচ্ছে কুরে।
নদীর নাম পলাশঝিরি।

মনের জমি ওলট্ পালট্—আঁচড় কেটে
পাঁজর কেটে—বুকের ভিতর তলিয়ে দেখি
ফিনিক্ দিয়ে রক্ত ঝরে হদিশ কোথায়
বুকের খাতায় অংক কষা
যোগ বিয়োগের নিখুঁত মাপে
তবু যেন বারে বারে তারেই খুঁজি।

পাথর নুড়ির জট্‌লা জমা
হুমড়ি খাওয়া ঐ নদীটার রূপ দেখি
মাঝে মাঝে সেই ব্যথাটা
টন্‌টনিয়ে টন্‌টনিয়ে
নতুন ক'রে যন্ত্রণানীল।
মিছি মিছি কারেই খুঁজি
মিছি মিছি মনের ভিতর রক্ত ঝরা।
নদীর নাম পলাশঝিরি।

ক্ষতিকারক হতে পারে। যেমন ধরুন—ঘেরাও নিয়ে একটা কোড তৈরি করার কথা ছিল, কিন্তু সেই কোড আজ পর্যন্ত তৈরি শেষ হল না। কথা ছিল যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবে জেলায় বা সর্বস্তরে, কিন্তু এই সামান্য কাজটা আজ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি ৮।৯ মাসের মধ্যে। শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য একটা কমিটি হয়েছিল—সেই কমিটিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে শ্রীসত্যপ্রিয় রায় নিজের নীতি চালু করে চলেছেন। এমনি অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়, এর মধ্যে সর্বশেষ হল—সম্প্রতি বাসন্তী, পাথরপ্রতিমা, ইসলামপুর, হাড়োয়া প্রভৃতি এলাকায় সাম্প্রতিক সংঘর্ষ সম্পর্কে তদন্তের জন্য কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে মন্ত্রীরা গিয়েছিলেন। শুনে অবাক লাগবে—সেই রিপোর্টও একমত হয়ে যুক্তফ্রন্টের সভায় পেশ করা সম্ভব হয় নি। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষ নিয়ে কাব্য করে বলেছেন—এই সংঘর্ষ হল যুক্তফ্রন্টের বিউটি। কিন্তু শ্রীকোঙার শুধু বিউটি দেখেছেন, বিউটি স্পট দেখেন নি। শ্রীকোঙারকে আমি মাত্র দুটো জায়গায় নিয়ে যেতে চাই বিউটি স্পট দেখাতে। একটি হল নৈহাটী, যেখানে দুটি পাটকলে শ্রমিকরা সাম্প্রতিক আন্দোলনে খুবই লাভবান হয়েছেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের দৌলতে। সেখানে নদীয়া জুট মিল ও গৌরীপুর জুট মিলে ওয়ার্কস কমিটির নির্বাচনে নয়টি আসনের মধ্যে আটটি আসন কংগ্রেস দখল করেছে, কোনক্রমে একটি আসন যুক্তফ্রন্ট শরিকদল দখল করেছে। আর একটি ক্ষেত্র হল খড়্গপুর। খড়্গপুর কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ছাত্র পরিষদ ২৩টি আসনের মধ্যে ২২টি আসন পেয়েছেন, অবশিষ্ট আসনটি অমীমাংসিত রয়ে গেছে, ছাত্র ফেডারেশন একটি আসনও পায় নি।

আশা করি শ্রীকোঙার বুঝতে পারবেন যে, যুক্তফ্রন্টের বিউটি কোন্ পর্যায়ে পৌঁচেছে—যেখানে সরকার চটকল শ্রমিকদের ঐতিহাসিক জয়লাভ ঘটিয়েও শ্রমিকদের সমর্থন হারান, শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য সৃষ্টিতে তৎপর হয়েও কিভাবে ছাত্রসমাজের সমর্থন হারান। এই যে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে, এ হল ঐ যুক্তফ্রন্টের সব কাজ ফেলে রাখা আর ঝগড়া করে সময় কাটাবার পরিণতি। সরকার যত ভাল কাজই করুক না কেন, যুক্তফ্রন্ট শরিকদলের আচরণ সেই ভাল কাজের সব সৌন্দর্য নষ্ট করে দিচ্ছে। রাবণ যখন স্বর্গের সিঁড়ি কাণ করবেন বলে অপেক্ষা করছেন, তখন হনুমান এসে লঙ্কা দহন করে ফিরে যাচ্ছে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু

রাজ্যের সমবায় দপ্তর এবং সমবায় বিভাগের দুর্নীতি প্রবাদে পরিণত। এই জঞ্জালের পাহাড় ভাঙা সহজ নয়। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমবায় দপ্তরের দায়িত্ব যখন শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর হাতে পড়লো তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই অনেকের মতো আমরাও আশান্বিত হয়েছি। দুর্নীতির পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা সম্ভব না হলেও তার ভিতে ভাঙন ধরানো সম্ভব হবে।

একথা নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ স্বীকার করবেন দপ্তর হাতে নিয়ে শ্রীমতী যে তৎপরতা দেখাতে শুরু করেন, তাতে সৎ সমবায়ীরা আশ্বস্ত হয় আর সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে অসৎ সমবায়ীরা।

কায়েমী স্বার্থের কুক্ষিগত হওয়ায় সমবায়ের আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে সমবায় আন্দোলন অগ্রসর হতে পারে নি। এজন্য আমলাতন্ত্রও অনেকখানি দায়ী। আমলাতন্ত্র বরাবর কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে অগ্রসর হয়।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমবায়মন্ত্রী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী দপ্তর হাতে পেয়েই কায়েমী স্বার্থের ওপর আঘাত হানতে শুরু করেন। সমবায়ের নাম করে বাস্তুঘুঘুর দল নিজেদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিলো তাতে বাধা পড়ে, কিন্তু এই বিভাগটিকে আমলাতন্ত্রের যে সব নায়কেরা পঙ্কিলতায় পূর্ণ করে রেখেছিল তাদের গায়ে হাত পড়ে নি। যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়ানো হয়, সেই সর্ষের মধ্যে ভূতের অধিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। শ্রীমতী চক্রবর্তী সাধারণ কর্মীদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করেছেন, কিন্তু আমলাতন্ত্রের গায়ে আঘাত হানতে পারেন নি।

বরং আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি শ্রীমতী চক্রবর্তী এবং এই দপ্তরের সচিব বিদায় নেয়ার আগে এমন কয়েকজন অফিসারের পদোন্নতি ঘটিয়ে গেলেন, যাতে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তিনজন পদস্থ অফিসারের পদোন্নতি ঘটানো হয়েছে। তাদের দুজনের বিরুদ্ধেই পাওয়ারলুম তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যানের সুস্পষ্ট মন্তব্য আছে। আর এই পদোন্নতি ঘটেছে সিনিয়রিটির মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। শুধু তাই নয়, পদোন্নতির ব্যাপারে এমন কতকগুলো পন্থার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে যা থেকে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, পুরাতন ঘুণধরা ব্যবস্থার বদল তো হচ্ছেই না, বরং তাকেই আরো পাকাপোক্ত করার প্রয়াস চলছে।

সমগ্র ঘটনাটিই উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। ১৯৬৭-৬৮ সালের বিভিন্ন সময়ে সমবায় দপ্তরে আটটি স্থায়ী এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের পদ খালি হয়, কিন্তু বৎসরাধিককাল অনেক টালবাহানা করেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো না।

দীর্ঘদিন ধরে এই দপ্তরে প্রচলিত নিয়মানুসারে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে নিযুক্ত অস্থায়ী এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার এবং নিম্নতর পদ থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত অস্থায়ী এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের মধ্য থেকে সমহারে স্থায়ী করার প্রকল্প। স্থায়ী পদগুলি পূরণ করার আগে অর্থ দপ্তরের মতামত চাওয়া হলে পুরাতন পদ্ধতির পক্ষেই সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে পুরাতন পদ্ধতি এবং অর্থ দপ্তরের অভিমতকে অগ্রাহ্য করে সমবায় দপ্তরের তদানীন্তন সচিব এবং রেজিস্ট্রার উক্ত আটটি অস্থায়ী পদকেই স্থায়ী করলেন নিম্নতর পদ থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের। এই অবস্থায় বি সি এস পদ থেকে যাঁরা সরাসরি নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হলেন। মামলা চলতে থাকে। এই সময় বিভাগীয় সচিব অন্তত একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি মামলা বিচারাধীন থাকাকালে স্থায়ীকৃত এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারদের ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত করার বিষয়টি স্থগিত রাখলেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ইতোমধ্যে ক্ষমতায় এলেন। সমবায় বিভাগের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার এলেন বিভাগীয় সচিব পদে নিযুক্ত হয়ে। তাঁর রেজিস্ট্রার পদে থাকাকালে তাঁর সম্বন্ধে স্বজনপোষণের অনেক অভিযোগ শোনা যাচ্ছিলো। যাই হোক ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে সমহারে স্থায়ীকরণের প্রশ্ন সম্পর্কিত হাইকোর্টের মামলাটি অগ্রাধিকার পেয়ে শুনানীর তালিকায় স্থান পেলো। এই সময়েই ১৭-৭-৬৯ তারিখে নবনিযুক্ত সচিব মহাশয়ের ২৭০৯ নম্বর নির্দেশে আরও ২৩ জন অস্থায়ী এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার স্থায়ী হলেন। সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া এবার স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে সেই সমহার নীতি মেনে নেওয়া হোল। বলা বাহুল্য ব্যতিক্রম ঘটেছে তাঁদের ক্ষেত্রে, যাঁরা হাইকোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তবু মন্দের ভাল হিসেবে এ ব্যবস্থায় কোনো আপত্তি উঠলো না। কারণ রাজ্যপালের আমলের ব্যবস্থা নীতিগতভাবে পরিত্যক্ত হলো।

কিন্তু মাত্র মাসখানেকের মধ্যে এমন একটা নির্দেশ এলো, যাতে এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারদের মধ্যে বিক্ষোভ আরো দানা বেঁধে ওঠে। ১৮-৮-৬৯ তারিখে ৩৩২১নং নির্দেশে হাইকোর্টের বিবেচনাধীন স্থায়ীকৃত এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারদের মধ্য থেকে তিনজনকে ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত করা হলো।

আশ্চর্যের বিষয় কিছুদিন পূর্বে পরিত্যক্ত নীতিকে আবার যখন চালু করা হলো, তার মাত্র অল্পদিন পরেই বিভাগীয় সচিব আর দপ্তরের মন্ত্রী বিদায় নিলেন। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে, তাঁরা বিদায় নেওয়ার আগে কয়েকজন ভাগ্যবানের একটা সুরাহা করে গেলেন।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে অল্পদিন

সদ্য প্রকাশিত হইল!!
বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ
সায়ন-মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত
বেদান্ত-গ্রন্থ
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ
বেদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ
অনুবাদক
পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ
১ম খণ্ড মূল্য চার টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা ১২

পরেই যে প্রশ্নের ফয়সালা হাইকোর্ট থেকে হয়ে যাবে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা এক-তরফাভাবে তাড়াতাড়ি কেন করা হলো?

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, অনুরূপ আর একটি মামলা বিচারাধীন আছে বলে ইন্সপেক্টর থেকে এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত করার প্রশ্নটি স্থগিত আছে।

এ সবই মামলায় সুরাহা হওয়ার কথা। আমরা নিশ্চয়ই নিম্নতর পদ থেকে উর্দ্ধতন পদে যোগ্য ব্যক্তিদের প্রমোশনের নীতির সমর্থক। কিন্তু এখানে একটি মাত্র প্রশ্ন : আর কিছুদিন অপেক্ষা না করে এত তাড়াহুড়ো করা হলো কেন?

কিন্তু আমার আসল প্রশ্ন হলো : এই প্রমোশনের ক্ষেত্রেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের সুপারসেসন না করানোর নীতিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত তিনজনের মধ্যে দুজনেই অন্য বেশ কিছু সংখ্যক অফিসারদের সুপারসীড করে নতুন পদে নিযুক্ত হয়েছেন। যাঁরা সিনিয়র হয়েও পিছনে পড়ে রইলেন তাঁরা কি অযোগ্য : যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তাঁরা এখনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত আছেন কি করে?

এবার যে দুজন ভাগ্যবান ব্যক্তি অন্যদের অতিক্রম করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁদের পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। দপ্তরের সচিব মহাশয় জানাবেন কি এঁদের মধ্যে একজন যুক্তফ্রন্ট সরকার নিযুক্ত পাওয়ারলুম তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যানের রিপোর্ট অনুসারে ধিক্কৃত কি না। চেয়ারম্যানের কড়া মন্তব্যের পর অন্যকে সুপারসীড করে যদি তিনি প্রমোশন লাভ করেন, তাহলে কি বলতে হবে যুক্তফ্রন্ট সরকার কমিশনের রিপোর্টকে অস্বীকার করেছেন? কমিশনের চেয়ারম্যানের ওপর সরকারের কোন আস্থা নেই?

আর দ্বিতীয় ভাগ্যবান ব্যক্তি একাদিক্রমে ৭।৮ বৎসরকাল কংগ্রেসী আমলের এ্যাপেক্স এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির কুখ্যাত নেতৃবৃন্দের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন কি? উক্ত সমিতির কর্তৃপক্ষদের আশ্রয়ে থেকে কি তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি ভাতা পেতেন? এ্যাপেক্স সোসাইটির বিরুদ্ধে দুর্নীতির যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে সেগুলির সঙ্গে এই ভাগ্যবান ব্যক্তি কি আদৌ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না?

সমগ্র বিষয়টির তদন্তের দাবি উঠেছে। তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে, পদোন্নতি বা নিয়োগের ব্যাপারে প্রশাসকবর্গের বা বিশেষ কোনো প্রশাসকের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দই কার্যকরী হয়েছে, কিংবা [illegible] করার চেষ্টা করা হয়েছে তাহলে সেই প্রশাসক কি শাস্তি-যোগ্য নন!

সমবায়মন্ত্রী নিজে এই প্রমোশনের ঘটনাগুলো সম্পর্কে অবহিত ছিলেন কি-না জানি না। বিভাগীয় সচিব নিজের দায়িত্বে মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ না করেই এইসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি-না তাও আমাদের অজানা। শ্রীমতী চক্রবর্তীর দপ্তর এখন শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতে। শ্রীমুখোপাধ্যায়কে যুক্তফ্রন্টের নীতির কথা তো বটেই, এমন কি সরকারের গৃহীত একটি সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আশা করবো তিনি দ্রুত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সিদ্ধান্তটি নিম্নরূপ :

"All cases of erroneous promotion/appointment/confirmation should be viewed with serious concern and suitable disciplinary action should be taken against the officers who are responsible for such erroneous order...."

(অর্থ দপ্তরের মেমো নং ৩৭৪১—এফ)।

—শ্রীসর্বদর্শী

তিন ভূমিকায়--

যে গান্ধী সীমানার বাইরে

শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল

ইতিহাসের রোমাঞ্চে ম্লান করা কাবুল কান্দাহার। নব ভারতেও কাবুল পূত তীর্থ। একে আশ্রয় করে ভারত-পথিক সুভাষ বসু নিরুদ্দেশ যাত্রী। ছদ্ম পরিচয় ও অন্বেষিত চিন্তাধারা যে কোন মুহূর্তে ব্যর্থ হতে পারে। বিবিধ বিপদ-সঙ্কুল প্রথম পর্যায়ে কাবুল ও কাবুলিওয়ালা তার কাঁটাঘেরা মাথায় ছাতা ধরেছিল। মহান জীবনের গভীর সন্ধ্যাতে বাদশা খানও সেই ছাতার তলায়। একজন দেশের জন্য দেশছাড়া—আর একজনকে দেশের লোকই দেশছাড়া করেছে।

বাস্তুহারা আসছেন, আসছেন কি প্রত্যাগমনে? আসছেন কি পুনর্বাসনে?

তাঁর এই আসা সস্তা অনুভূতির খোরাক নিশ্চয়ই। কিন্তু এর পিছনে কতকগুলি পরিচ্ছন্ন প্রশ্ন মাথা তুলছে—তার মোকাবিলা হওয়া একান্ত দরকার।

মনে রাখা দরকার খান আবদুল গফ্ফর খানের—নিকটতম আত্মীয়বর্গ তাঁর এই অভিযানের স্পষ্ট বিরোধী। তবু তিনি আসছেন—কেন? বোধ হয় এখানকার আজকের মাটি নিজ হাতে ছুঁয়ে দেখতে চান ভারত জীবিত না মৃত, না জীবন্মৃত। তার সত্তাশক্তি বন্ধ্যা না নতুন দুনিয়া-সৃষ্টির সম্ভাবনাময়ী। আমরা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করব? ফিরে আসা আপনজন বলে, না প্রবাসের বন্ধু হিসাবে? প্রায় কোটি টাকা যখন তাঁর হাতে সম্মান নিদর্শন রাখা হবে থলির মধ্য থেকে ভারতের অন্তর্যামীর ব্যাকুল বিরত জিজ্ঞাসা উথলে উঠবে—এ কি আত্মীয়ের প্রতি আত্মীয়ের মর্যাদা না নিছক অতিথির আপ্যায়ন?

আজ থেকে বাইশ বছর পিছিয়ে যাচ্ছি। তারও কিছু বেশি, ১৯৪৭ সালের এপ্রিল। তারিখটা ঠিক মনে আসছে না। সেই সময়ের ডায়েরিটাও আমার হাতের কাছে নেই। স্বাধীনতার ব্যাস পরিধি ও রূপনির্ণয় নিয়ে কর্ম বা অপকর্ম ব্যস্ততায় দিল্লীর আসর সরগরম। সামনে জামাই ষষ্ঠীর উঠানে কে কিভাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ঘর-জামাই হবে, এ সব নিয়ে কষাকষির মহড়া চলেছে। বিকেলে কাছেই খোলা মাঠে প্রার্থনাসভা। ভাঙ্গি কলোনি থেকে আসছেন মহাত্মা গান্ধী। হাঁটছেন তার নিজস্ব প্রথামত এক মহিলার কাঁধে ভর করে। মহিলা আমার স্ত্রী—যাকে সোহাগ সম্মানে স্বর্গত শরৎ বসু বলতেন আমার ব্রাহ্মণী। পশ্চাতে যারা আসছে তার মধ্যে আমিও আছি। আমার পরিধানে তখন জামা নেই। সেই খদ্দরটা ভাঙ্গি কলোনির আশ্রমে সদ্য দেশ বিভাগের প্রতিবাদে ছেড়ে এসেছি। সে অনেক কথা—পরে অন্য প্রসঙ্গে অগোচরে আনব। মোটমাট অনেক তর্ক করেছি। প্রধানত আমি বক্তা—কখন তীব্র কখন তিক্ত—; গান্ধিজী শ্রোতা; সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (জীবিত নেই) ও মহিলা সাক্ষী। আমার অভিযোগ সুভাষ নেই, তাই বাংলাদেশকে কাটা হল আর মহাত্মা দাঁড়িয়ে দেখলেন। তিনিও বিক্ষুব্ধ। আমি চাইলাম, "রুখে দাঁড়ান"। তাঁর সাফাই—"নিজেদের মধ্যে বিভাগ-বিভেদ চাই না"—I don't want partition among ourselves. মঞ্চে উঠছেন—আলোকচিত্রের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমরাও আটক পড়ছি। বসলেন অপরিমেয় নিস্তব্ধতা বিছিয়ে। চারিদিক ছমছম। ভারতের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ জমাট বেঁধেছে—সবটাই জড় হয়ে মঞ্চের মুখোমুখি। জনমণ্ডলীর প্রতিটি প্রাণীই যেন মৌন হয়ে জন্মেছে—শুধুমাত্র বিভ্রান্ত শ্রোতা। আমার নিজস্ব ব্যর্থবোধ সকলের মুখে ছাপা,

"প্রাণের ভিতর হতে কি যেন গিয়েছে চলে
কি যেন করিতে এসে কি যেন করেছি ভুলে।"

নেতৃত্বের শিকল বাঁধা সমগ্র দেশ জাতির জনকের পায়ের তলায় আত্মহত্যার নিমন্ত্রণে হাজির। মায়ের আজ বলিদান—এইটাই ধ্রুব সত্য—আর সব ঝুটা হ্যায়।

এক কোণে নিস্পন্দ দীর্ঘ দেহ, প্রায় যোগাসনে। এত কাছে, তবু মনে হচ্ছে কত দূরে সরে গেছে। কোন নিপুণ ভাস্কর যেন বিশেষ ফরমাইসি ভঙ্গিমায় বসিয়েছে নিভিয়ে দেওয়া ভিসুভিয়াসের ছায়ারূপ বিন্যাসে। গান আরম্ভ হল। সুচেতা কৃপালনি ধরলেন, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে" রবীন্দ্রনাথের কল্পনাগণ্ডী ছাপিয়ে কল্পনাতীত আবেগ কাকে এই আশ্বাস নির্দেশ দিচ্ছে? মহাত্মাকে?—না; তিনি নিজেই ঐ ডাক দিতে পারতেন, সে ডাক শোনতে পারতেন; কিন্তু তা দেন নি। কেন? সে কথা এখন থাক। তবে কার উদ্দেশ্যে এই অভয়বাণী? নিঃসন্দেহ খান আবদুল গফ্ফর খান। ভাগ-বাঁটোয়ারার ক্ষুদ্র বেসাতি তাঁকে এড়িয়েই হয়েছে। তিনিই একাকী—নিঃসঙ্গ ১৯৪৭ সাল যারা দেখে নি, দেখে থাকলেও মনে থাকার কথা নয়, তারা এবং তৎপরবর্তী তাবৎকালের ইতিহাস আজ কয়েকটি ন্যূনতম প্রশ্নের জবাব চায়—

(১) একান্ত গান্ধীর পাশে যিনি সীমান্ত গান্ধী পরিচয়ে দ্বিতীয় গান্ধী হয়ে বসলেন এবং যাঁর নেতৃত্বে রক্তপায়ী রক্তক্ষয়ী খোদাইখেদমৎগীর লালকোর্তা বীর বিক্রমশালী সৈনিকের দল অসি ছেড়ে বাঁশী ধরেছিল। হাজারে হাজারে অহিংস অসহযোগের পতাকা উড়িয়ে কংগ্রেসকে শক্ত ও ইংরাজকে ত্রস্ত করেছিল, তাঁকে বাদ দিয়ে মাউন্টব্যাটেনের দোকানে বৃটিশের দাঁড়িপাল্লার ওজনে ছাঁটাই-কাটাই করা স্বাধীনতার সওদা কেন করা হল? মহাত্মা গান্ধী বা অন্যান্য নেতারা কি কংগ্রেসের এই মদৎ দেওয়া কর্ণধারের মত ও উপদেশ চেয়েছিলেন? আমি জানি চাওয়া হয় নি—কেন? পরে দরদস্তুর শেষ করে জানান হয়েছিল—কেন?

(২) প্রায় সর্বময় মুসলমান অধ্যুষিত বিস্তৃত উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ মুসলিম

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

BAZA
৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।
HIND AGENCIES (47) KOLHAPUR ROAD, DELHI-7

লীগকে একরকম এলাকা ছাড়া করেছিল, যাঁদের নেতৃত্বের চাপে জিন্না সাহেবের সম্ভাবিত নেতৃত্ব সুরুতেই সারা; যাঁর আদর্শবাদে সাম্প্রদায়িকতা বিধ্বস্ত হল, জাতীয়তাভিত্তিক গণতন্ত্র মর্যাদার আসনে ঠাঁই করে নিল; অতবড় মুসলমান এলাকা থেকে সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশক্তি পিছু হটল কোন্ যুক্তি বা ন্যায়-বিচারে সেই এলাকা ও তার দেবকান্তি অধিবাসীদের নেকড়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে?

(৩) কাটাকাটি, প্রজাধ্বংস, নারীধর্ষণ, সম্পত্তিলুণ্ঠন বিনাশ, ধর্মান্তরকরণ ইত্যাদি অশান্তি নিরসন আশায় দেশ ভাগ হল এবং সেই ভাগ মেনে নেওয়া হল—সত্যিই কি এসবের নিরসন হয়েছে? গণিতের হিসাব উল্টো কথা বলে।

(৪) বিভাগ বন্টনের মর্মকথা সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা শোধন। কিন্তু শোধন হয়েছে কি? এর কায়া ও ছায়া বহাল তবিয়তে মুঠি সবল করে আছে। ভাব বুনিয়াদ নতুন নতুন দানা বাঁধছে। ধনতন্ত্র উৎখাত না হলে এ ভূত ঘাড় থেকে নামবে না। স্বাধীন ভারতের সার্বিক শক্তি যাঁদের হাতে ছিল ও এখনও বহুলাংশে আছে, তাঁরা কি মূলে ঘা দিতে পেরেছেন না চেয়েছেন? বাদশা খানকে এ সম্বন্ধে কি বলা হবে?

(৫) সিংহপ্রতিম মানুষটি বৃটিশের হাতের লাঞ্ছনা যত হজম করেছেন তার চেয়েও বেশি হজম করেছেন তথাকথিত স্বাধীনতার অন্যতম প্রকোষ্ঠে—কেন? তিনি চেয়েছেন নিম্নতম মানুষকে উচ্চতম সম্ভাবনায় বসাতে। তিনি চেয়েছেন আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বুনিয়াদে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নির্ণয়ের স্বীকৃতি; তিনি চেয়েছেন ভৌগোলিক ব্যবধান অতিক্রমে সর্বজাতির মহাজাতি অঙ্গন। মাত্র লৌকিক সম্বর্ধনা তাঁর এই অভীপ্সাকে কতটুকু সক্রিয় সমর্থন দিতে পারে?

আরও কত প্রশ্ন আছে।

কালের প্রবাহে দীর্ঘ ২২ বছর বয়ে গেছে। এর মধ্যে কত নদী গেছে কত সাগরে। তটিনীর স্রোতে ও সাগরের তরঙ্গে যে সব প্রক্রিয়া ও অপক্রিয়া আজ মহাত্মা গান্ধীর দৌর্বল্য বাৎসল্য-সিঞ্চিত নেতৃগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগের মুখে

সীমান্ত গান্ধীর সাম্প্রতিক চিত্র

ইতিহাসের আদালতে ফেঁপে ফুলে উঠছে, তার পূর্বগামিনী ছায়া দেখেছিলাম সেই-দিন সেই পাঠানের কায়া ঘিরে। প্রস্তর-মূর্তির অবয়বে খোদাই করা অপ্রমেয় প্রজ্ঞাদীপ্ত চোখ ফেটে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা জল। আমি সেদিন চীৎকার করে কাঁদিতে চেয়েছিলাম—শিশুর মত নারীর মত। আর চেয়েছিলাম সমস্ত জাতি বিশেষ করে বাঙালী কেঁদে উঠুক। কেউ কাঁদে নি; আমার চোখে জল আসবার আগে বুকের মধ্যে শুকিয়ে গিয়েছিল। আসমুদ্র হিমাচল অখণ্ড দেশের পাথর ভেদ করে ভগীরথ নেমে এল বাদশাহের চোখের জলে।

মহাকালের নিক্ষিপ্ত শর তূণে ফিরে আসে না। খণ্ডিত ভারতের ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়ছে পড়বে—আদৌ থামবে কিনা কে জানে।

তবু এসবের পিছনে ইন্দ্রধনুর রঙে রঙীন হয়ে আর একটা ছোট্ট আশাপূর্ণ জিজ্ঞাসা উঁকি দিচ্ছে।

হারিয়ে যাওয়া একটা ছেলেকে কাবুল অন্তত কিছু দিনের জন্য মায়ের কোলে ফিরিয়ে আনছে। আর সেই দুলাল—কাবুলের বোবা কান্না—তার আসার কি সময় হয় নি?

দুই গান্ধীর সীমানায় প্রতিধ্বনিও সেই কথা বলছে।

গ্রন্থমেলা

পশ্চিমের প্রজাপতি : চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত : অগ্রগামী প্রকাশন, ২ সরিষাতুল্লা লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য : চার টাকা।

শংকরপ্রসাদ চ্যাটার্জী কলকাতা হাইকোর্টের জজ হয়েছেন দীর্ঘজীবন পথ পরিক্রমা করে। কৃতীছাত্র এবং নামকরা ব্যারিস্টার হিসাবে এটুকু তাঁর পাবারই কথা। কিন্তু এর চেয়েও অনেক বড় একটি জিনিস তিনি পেয়েছিলেন যার মূল্য ঠিক টাকার অঙ্কে নির্ধারণ করা যায় না। সে হল তাঁর পত্নী ইডিথের প্রেম ও ভালবাসা। একজন বিদেশিনী মহিলা তাঁকে ভালবেসে তাঁর জন্য কতখানি আত্মত্যাগ করেছিলেন সে কাহিনী বিস্ময়কর। আন্তরিকতার স্পর্শে লেখাটি মর্মস্পর্শী। কাহিনীটির অন্যান্য চরিত্রও চিত্তাকর্ষক।

তারার আলো (স্বাধীনতা দিবস, ১৩৬৭) সমর দত্ত। মণি প্রকাশনী, ৩১বি ডেন্ট মিশন রোড, কলকাতা-২৩। দাম : দু' টাকা।

'তারার আলো' কাব্যের কবি হতাশা ও আশা দুরকমের চিত্রই এঁকেছেন। মনে হয়, তাঁর বক্তব্য আরো স্পষ্ট হওয়া দরকার, যেহেতু তাঁর আবেগ ও আন্তরিকতা প্রশংসনীয়। চিন্তায় যে প্রগতির ছাপ আছে, তাকে মূলধন করে গড্ডালিকা প্রবাহে না চললে নিঃসন্দেহে তিনি সাফল্যলাভ করতে পারবেন। কয়েকটি চিত্রকল্প সুন্দর হয়েছে। ছন্দ ও মিলের ওপর তাঁকে আরও নজর দিতে হবে। আশাবরী, ঝড়, মানুষের অধিকারে, পালাবার পথ নেই, স্বাদ, তারায় আলো প্রভৃতি কবিতাগুলি ভাল লেগেছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের মন্তব্য মূল্যবান।

ছায়া ছায়া আলো (ভাদ্র, ১৩৭৫) দিলীপ মৌলিক। লিপিকা। ৩০/১, কলেজ রো। কলকাতা—৯। দাম দুই টাকা।

গোর্কীর "ওল্ড ম্যান" অবলম্বনে লিখিত অভিনয়োপযোগী নাটক।

দ্রৌপদী (জুন, ১৯৬৮) জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়। লিপিকা। ৩০/১, কলেজ রো। কলকাতা—৯। দাম তিন টাকা

মিলনান্তক এই আধুনিক নাটকে রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার মিঃ কে কীভাবে তাঁর নাতনী মলি সেনের স্তাবক বন্ধুদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত পাত্র বাছাই করেছেন, তার কাহিনী হয়েছে।

প্রতিবাদ (জুন, ১৯৬৮) রতন ঘোষ। লিপিকা। ৩০/১ কলেজ রো। কলকাতা—৯। দাম দুই টাকা।

অভিনয়োপযোগী একটি স্যাটায়ারধর্মী নাটক।

হোমিওপ্যাথি রত্নাকর (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৭)—ডাঃ সূর্যকান্ত ভট্টাচার্য। ১০৮, আনন্দ পালিত রোড, কলকাতা—১৪। দামঃ দু' টাকা পঁচিশ পয়সা।

ডাঃ সূর্যকান্ত ভট্টাচার্য পদ্যে সহজ করে মেটেরিয়ামেডিকা লিখেছেন। আমাদের দেশের হোমিওপ্যাথি ছাত্র ও চিকিৎসকদের কাছে নিশ্চয়ই এই বইটি সমাদর লাভ করেছে—দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে দেখে একথা বলা যায়। প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণ বইটির প্রশংসা করেছেন। অধিকাংশ অংশই সহজপাঠ্য ও সহজবোধ্য। তবে, কোন কোন জায়গায় বেশ আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। আশা করি হোমিওপ্যাথি ছাত্র ও চিকিৎসকবৃন্দ বইটি কাছে রাখলে উপকৃত হবেন।

ফোরাম (শ্রাবণ, ১৩৭৬, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদনা সঞ্জীব বসু।

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কৃত্যক সমিতির মুখপত্র হিসাবে ১৪টি বাংলা রচনা ও ৫টি ইংরাজী রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ সুদৃশ্য এই সংকলনটি আগ্রহী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্রথমেই নাম করতে হয় প্রমোদ সেনগুপ্তের প্রবন্ধ—'মহাবিদ্রোহ কি জাতীয় বিদ্রোহ ছিল?' চমৎকার বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে ডঃ রমেশ মজুমদার, অধ্যাপক সেন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির অসারতা প্রমাণ করে প্রথম জাতীয় সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। বিষ্ণু ঘোষ-এর প্রবন্ধ—'দুনিয়া বাঁচাও—বের্টোল্ট ব্রেশট' যেমন সরস ভঙ্গিতে লেখা, তেমনই তথ্যপূর্ণ। জসীমউদ্দীন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতা সংকলনটির গৌরব বাড়িয়েছে। শিহরণ ভট্টাচার্য, সুধীন দে ও হারাধন ভট্টাচার্যের ইংরাজী কবিতা তিনটি ভাল লাগল। দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কৃত্যক সমিতি সংবাদ পরিবেশন করেছেন। আমরা পরবর্তী সংখ্যাগুলির জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে রইলাম।

দি স্পুটনিক (১ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭৬)—সম্পাদক অশোক কুশারী, নববারাকপুর মাড়োয়ারী বাগান। দাম : ২০ পয়সা।

নববারাকপুর উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক এই পত্রিকাটির আমরা উচ্চ প্রশংসা করছি। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যে-কোন বিজ্ঞান পত্রিকার সঙ্গে সহজভাবে লেখা এই পত্রিকাটির তুলনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আধুনিকতম খবরগুলিও সকলে যাতে বুঝতে পারে, এইরকমভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন, অরুণকুমার সেন (ভুল করে বড় হওয়া) 'সন্ধানী' (বিজ্ঞানের খোশ খবর), পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় (জনশত্রু ও রক্ত), প্রশান্তকুমার ঘোষ (আলেয়া), মৃদুল সেন (প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বা 'না') সুজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (চাঁদে এর পর কি?) ও সুস্মিতা মজুমদার (চাঁদে ছবি তোলা কিভাবে সম্ভব হল)। একটি মাত্র কবিতা স্থান পেয়েছে, লিখেছেন পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা যত বেশি হয়, ততই মঙ্গল। মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকাটি সেই দুরূহ কর্তব্যভার পালন করতে অগ্রসর হয়েছে জেনে উদ্যোক্তাদের এই শুভ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ দিচ্ছি।

সুরেন্দ্র চক্রবর্তী ইনস্টিটিউশন সাময়িক পত্রিকা (বৈশাখ, ১৩৭৬) : সম্পাদক কালীপদ চক্রবর্তী। ৫৬-সি, গড়চা রোড, কলিকাতা-১৯।

গান্ধী শতবার্ষিকী সংখ্যারূপে 'সুরেন্দ্র চক্রবর্তী ইনস্টিটিউশন সাময়িক পত্রিকা'র একবিংশ সংখ্যাটি পড়ে ভাল লাগল। কয়েকটি রচনা তথ্যসমৃদ্ধ ও শিক্ষাপ্রদ।

পত্রলেখক বিদ্যাসাগর

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

একটি মানুষের অন্তরঙ্গ সত্তার পরিচয় পেতে গেলে তাঁর লেখা চিঠি-পত্র যত কার্যকরী হয়, এমন বোধহয় আর কোন কিছুই হয় না। একটি মানুষের জীবনে নানা প্রয়োজনে নানা জাতের পত্র রচনা করতে হয়;—সামাজিকতার খাতিরে, সাহিত্য সংস্কৃতির প্রয়োজনে, ব্যবসার তাগিদে এবং আত্মীয়তার সূত্রে। তা যে কারণেই হোক, একটি মানুষের যথার্থ পরিচিতি কিন্তু তাতেই লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। সবচেয়ে যে মানুষ দুর্গম, বাহিরের দেশ-কালে তাঁর পরিচয় পাওয়া কঠিন, কিন্তু তাঁর অন্তরতম সত্তার গহন ও নিবিড় পরিচয় মেলে ধরে তাঁর বিভিন্ন সময়ের লেখা পত্রাবলী। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে এগুলি মানুষের জীবনের গোপনদ্বার খুলে ফেলতে কুঞ্চিকার কাজ করে।

রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রাবলী তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন সময় ও কালের কথা আমাদের কাছে পরম সততার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছে। ছিন্নপত্র এবং ছিন্নপত্রাবলী থেকে আমরা রবীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-নিরাশা, দ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ জানতে পেরেছি। মাইকেল মধুসূদনের লেখা ইংরেজী চিঠিপত্র থেকেই তাঁর বঙ্গভাষা প্রীতি ও সমকালীন বঙ্গজীবন সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব আমাদের গোচরে এসেছে। বিবেকানন্দের লেখা পত্রাবলী তাঁর সুমহান মানবিকতা ও কবিহৃদয়ের নিভৃত কাকলিকে মেলে ধরেছে নানাস্থানে। এভাবে দেশ ও বিদেশের নানা মনীষীদের পত্রাবলী থেকেই আমরা বহু প্রয়োজনীয় প্রশ্নের মীমাংসা করতে পেরেছি। বিদ্যাসাগর লিখিত অসংখ্য পত্রাবলী থেকেও আশা করা যায়, অন্তরঙ্গ বিদ্যাসাগরকে জানতে আমরা কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করব না।

বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নানা সময় নানা জীবনীকার তাঁর জীবনী রচনা করেছেন। বিদ্যাসাগর নিজেও রচনা করেছেন তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী। কিন্তু এ-সব রচনা থেকেই সম্ভবত আমরা জানতে পেরেছি এক সংহতসত্তা নগাধিরাজ বিদ্যাসাগর— যাঁর সুনাম ব্যক্তিত্বের পাশে ম্লান হয়ে গেছে তাঁর অন্তরঙ্গ রূপ; বৈঠকখানার উজ্জ্বল বিজলীবাতির আলোয় ধরা পড়ে নি শোবারঘরের নীভু নীভু আলো।

৩১শে শ্রাবণ ১২৭৭ সালে বিদ্যাসাগর তাঁর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে যে চিঠিখানি লেখেন তা এখানে তুলে দেওয়া

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং

শুভাশিষ সন্তু—

২৭ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহারব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে

বিদ্যাসাগর

বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোন মতেই উচিত কর্ম হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি। এমনস্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী-বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ-প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সংকল্প। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহারব্যবহার পরিত্যাগ করিবে, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহারব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সেজন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবে, এরূপ বোধ হয় না, এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছু; অন্যদীয় ইচ্ছার অনুবর্তী বা অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া চলা

কাহারও উচিত নহে। ইতি ৩১শে শ্রাবণ [১২৭৭ সাল]।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

এই চিঠিখানি তিনি লিখেছিলেন ১২৭৭ সালের ২৭শে শ্রাবণ তাঁর নিজের ছেলে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করলে। বলাই বাহুল্য এ চিঠিখানি মানুষ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের স্বর্ণচম্পক দীপ্তিতে ভাস্বর। "কর্ম্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জ্জন" বলতে রবীন্দ্রনাথ যা বোঝাতে চেয়েছেন তারই এক আশ্চর্য দলিল রচিত হয়েছে যেন এই চিঠিখানিতে। লোকস্থিতির উর্দ্ধেই যে মানবিকতা ও চিত্তবৃত্তির স্থান—এ কথাই যেন ফুটে বেরিয়েছে এ চিঠির ছত্রে ছত্রে। যদিও সমাজ-কল্যাণই লক্ষ্য ছিল তাঁর, তথাপি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকেও যে তিনি উপেক্ষা করতেন না, তারও প্রমাণপত্র হিসেবে এ চিঠি-খানির মূল্য রয়েছে।

তারপর প্রগতিবাদী বিদ্যাসাগরের পরিচিতি হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে ১২৭২ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণ চন্দ্রমুখী বসুকে লেখা চিঠিটিকে। নারীশিক্ষা—এবং নারীজাতির উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে যে যুগে অধিকাংশ লোকই রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করতেন সে যুগে বাঙালী নারী চন্দ্রমুখী বসুর এম. এ. পাশ করাতে বিদ্যাসাগর গভীর আনন্দ অনুভব করেছিলেন এবং তার অভিব্যক্তিস্বরূপ তাঁকে সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী দান করেছিলেন। এই চিঠির শেষাংশ থেকে উদ্ধৃত করা গেল—

"এই সমভিব্যাহারে বর্ক্কীপিং উপহার (Shakespeare's Works) প্রেরিত হইয়াছে। পরিগৃহীত হইলে নিরতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইব।"...

মাসিক ১০. টাকার কিস্তিতে লাভ করুন
অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জেপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০., দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

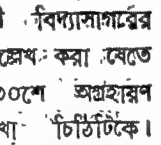

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁর স্বজাতিসোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্ব্বাসন ভোগ করিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথের এ বিশ্লেষণের যাথার্থ্য অনুভব করা যায় হাইকোর্টের উকিল দুর্গামোহন দাস বালিকা বিমাতার বিধবাবিবাহের প্রচেষ্টায় প্রথমবার বিফল হলে বিদ্যাসাগর তাঁকে যে সুদীর্ঘ চিঠি লেখেন তারই অংশ-বিশেষ থেকে।

"...সদাভিপ্রায়সঙ্কল্প সকল সময়ে সম্পন্ন হয়ে উঠে না। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" শুভকার্য্যে বহু বিঘ্ন।......কত বিষয়ে কত চেষ্টা ও কত উদ্যোগ করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে সকল সফল হইয়া উঠিবে না। তাহার প্রধান এই যে, যাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র।......"

তাছাড়াও এই "স্বজাতিসোদরের" ও "সমযোগ্য সহযোগী"র অভাববোধের বেদনা লক্ষ্য করা যায় ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠির এই নিম্নোক্ত অংশ থেকে—

"......আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে, আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হইতাম। দেশহিতৈষী সৎ কর্ম্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক কেহ ভুলিয়াও এ বিষয়ে সংবাদ লয়েন না।"...

তথাপি শেষ পর্যন্ত সৈনিকের মতনই লড়াই করে গেছেন বিদ্যাসাগর। সহযোগীর সান্নিধ্য বঞ্চিত হয়ে একাকীই লড়াই করে গেছেন। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। আবার তিনিই উদ্যোগী হয়ে বিলোপ সাধন করেছিলেন বহুবিবাহ প্রথার। ১৯শে পৌষ ১২৮২ সালে পরবঙ্গের অন্যতম সমাজপতি ভাওয়ালের জমিদার কালী-

মাতাকে লেখা চিঠিখানিতে তার যথেষ্ট নজির আছে।

এ ছাড়া মা, বাবা, স্ত্রী, পুত্র ও ভাইদের কাছে লেখা একাধিক চিঠিপত্রে বিদ্যাসাগরের আন্তর চরিত্রের প্রতিভাস রচিত হয়েছে।

কর্মযোগী এবং ঘোরতরভাবে সংসারী হয়েও বিদ্যাসাগরের মনে যে এক অসীম বৈরাগ্য দানা বেঁধে উঠেছিল তার নজির রয়েছে একাধিক চিঠিপত্রে।

১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সালে তিনি তাঁর মাকে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন তার অংশবিশেষ—

"নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই।......"

ঐ দিনই স্ত্রীকে লেখা চিঠির অংশ—

"আমার সাংসারিক সুখভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। আর আমার সে বিষয়ে অণুমাত্র স্পৃহা নাই।......এক্ষণে তোমার নিকটে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যদি কখন কোন দোষ বা অসন্তোষের কার্য্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে।......"

একই সময়ে দেশের বাড়ির অন্যতম পরিচারক গদাধর পালকে লেখা চিঠির অংশ—

"নানা কারণবশত স্থির করিয়াছি আমি আর বীরসিংহায় যাইব না।..."

২৫শে অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সালে পিতাকে লেখা সুদীর্ঘ চিঠির অংশ—

"......সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি। কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি, সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না। এই প্রাচীন কথা কোনক্রমেই অযথা নহে, সংসারী লোক যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের একজনেরও অন্তঃকরণে যে, আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। এরূপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত

থাকিয়া ক্লেশ ভোগ করা নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতার কর্ম্ম......"

এইসব চিঠিপত্র ছাড়াও যে সব চিঠিপত্র তিনি তাঁর পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে লিখেছেন, লিখেছেন পৌত্রী মৃণালিনী দেবীকে, পৌত্র প্যারীমোহনকে, বন্ধু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে. তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের নানাদিক আভাষিত হয়েছে। এদের প্রত্যেকের প্রতি তাঁর স্নেহ, মমতা ও কর্তব্যবোধ ফুটে উঠেছে দেখা যায়।

তারপর রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত চিঠিপত্রের মধ্যে বিদ্যাসাগর চরিত্রের একটি অতি উজ্জ্বল দিক ফুটে উঠেছে, তা হলো অকারণে অন্যকে বৈষয়িক ব্যাপারে নির্দেশ দান থেকে বিরত থাকা।

এ ছাড়াও অসংখ্য চিঠি লিখেছেন তিনি যথাক্রমে দুর্গামোহন দাস, মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী, যদুনাথ রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অভিরাম মন্ডল, মেজর জি· টি· মার্শাল, তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ হালদার, যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তৎকালীন বাংলাদেশ ও ভারতের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের।

এইসব চিঠিপত্রের মধ্য দিয়েই বিদ্যাসাগর চরিত্রের অন্তরঙ্গ স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

সাংসারিক জীবনে বিদ্যাসাগরের অনীহা, এ দেশের মানুষের প্রতি তাঁর মনোভাব, স্ত্রীলোকের বা ইতরজনের বাক্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা (স্ত্রীলোকের বা ইতরজনের বাক্যে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইবে না—শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত পত্রের অংশ)। মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, গৃহের প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি কর্তব্যবোধ ইত্যাদি বহু বিষয়ের সম্পর্কে পাকাপাকি ধারণা জন্মানোর পক্ষে তার বিভিন্ন সময়ের লেখা চিঠিপত্রগুলি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উপাদান।

একথা বলাই বাহুল্য যে, বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথের মতন কবি ছিলেন না। লেখক হিসেবে খ্যাতি তাঁর ভাগ্যে জুটলেও সাহিত্যিক হবার কোন আকাঙ্ক্ষা বা প্রচেষ্টা—কোনটাই তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন কর্মযোগী; প্রখর বাস্তববাদী ও সংস্কারক। তাই তাঁর লেখা চিঠিপত্রে কবি বা সাহিত্যিকের সুললিত ঢং-এর আশা করলে ব্যর্থ হতে হবে। তাঁর চিঠিপত্রের ভাষা সংযত এবং পরিশীলিত—প্রয়োজনের অতিরিক্ততা তাতে সামান্যও পরিলক্ষিত হয় না।

অধিকাংশ চিঠিপত্রই বৈষয়িক কারণে লিখিত। দু'-একখানি অনাবশ্যক চিঠিপত্রও তাই বৈষয়িক তট অতিক্রম করে অপ্রয়োজনের আনন্দের রঙ মেখে অভিনব হয়ে উঠতে পারে নি।

তা হোক্। তথাপি সংযত, সুমিতভাষণে সার্থক বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র থেকে পত্রলেখক বিদ্যাসাগরের আন্তরপ্রকৃতির এক পরিচ্ছন্ন প্রতিভাস খুঁজে পেতে আমাদের কোনই অসুবিধা হয় না।

দৃশ্যকাব্য-পরিচয়

সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়
দাম ঃ দশ টাকা

...লা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিককালের সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীর তুলাদণ্ডে বিচারিত। বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও নাট্যসমালোচক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বলেছেন ঃ— [illegible]

* * তথাকথিত জ্যেঠতাত জাতীয় অকালপক্ক এবং বিচারশক্তিহীন আত্মহারা ও প্রিয়ভাষী সমালোচকদের নিয়ে এতদিন বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিলুম। এতদিন পরে এই বিভাগে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রথমখানির কথা দৈনিক বসুমতীতে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়ে গেছে * * দ্বিতীয়খানির নাম 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়। বইখানির আকার বিপুল। বাংলা নাটক নিয়ে এমনভাবে মস্তিষ্কচালনা করবার মানুষ যে আমাদের দেশে আছেন, এ তথ্য আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সুদীর্ঘকালের সাধনা ছাড়া এমন গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারেন না। * * অথচ বাঙালীর সৃষ্ট নাট্যসাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস এতদিন কেউ রচনা করেন নি। হালে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু সেই চেষ্টা করেছেন, এবং দৃশ্যকাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সত্যজীবনবাবু অগ্রসর হয়েছেন অধিকতর। * * যাঁরা জ্যেঠতাতের ভূমিকায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক নন, এই পুস্তকখানি পাঠ করলে তাঁরা বাংলা দেশের সমগ্র নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে একটি বিশদ ধারণা করতে পারবেন। এত খুঁটিয়া খুঁটিয়া আর কোন লেখকই বাঙালীর নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে পারেন নি। এইটিই হচ্ছে আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান গৌরব। * * তাঁর সমালোচনাও পরম উপভোগ্য। সমালোচকের উপযোগী সূক্ষ্ম দৃষ্টি, নিরপেক্ষতা ও যুক্তিযুক্ত মনের পরিচয় দিয়ে তিনি আমাদের আনন্দিত করেছেন। তিনি কেবল গুণই দেখেন নি, দোষও দেখেছেন। কোথাও তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় ক'রে বক্তব্য-বিষয়কে ক'রে তোলেন নি ঘোরালো। * * যাঁরা বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবেন, এই গ্রন্থখানি তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। * * যাঁদের লাইব্রেরী আছে, এই বইখানি না থাকলে তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পতঞ্জলি ভট্টাচার্য এম-এ মহোদয় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—

* * বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় আর আছে কিনা জানি না, থাকিলেও খুব কমই আছে। গ্রন্থকার শুধু ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়াই তাঁহার আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার সমালোচনা-শক্তিরও পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের গুণাগুণ তিনি বিচার করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় নাট্যাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি এই বিচার করিয়াছেন। বইখানিতে যেমন তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, তেমন তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠ্য। অন্য সাহিত্য-পিপাসুরাও এই বই হইতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। ভাষা এই ধরণের বই-এর সম্পূর্ণ উপযোগী—গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান সম্পাদক, নাট্যশালার ইতিহাসলেখক ও নাটকীয় পরিসংখ্যানবিদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ—

"এই বিরাট গ্রন্থে বাংলা দৃশ্যকাব্যগুলির ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। কেবল জীবিত লেখকগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। * * সত্যজীবনবাবুর পক্ষে শ্লাঘার বিষয় এই যে, তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অভিনীত দৃশ্যকাব্যগুলির সমালোচনা একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। * * 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' বাস্তবিকই আমাদের একটা বহুদিনের অভাব বিদূরিত করিয়াছে। এজন্য লেখক সাহিত্যামোদিগণের কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।"

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নয়—সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

প্রীতিলতা পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে যাওয়ার আগে থেকেই সম্পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিল যে, সে আর কোনমতেই ফিরে আসবে না। ডাক্তারের পরীক্ষার রিপোর্টেও আমরা জানতে পারছি বোমার splinter-এর আঘাতে প্রীতির সর্বাংগ ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। এ থেকেই মনে হয় আত্মরক্ষার দিকে দ্রূক্ষেপ না করে বেপরোয়াভাবেই প্রীতি আক্রমণ চালিয়েছিল। স্বেচ্ছামৃত্যুবরণে স্থিরসঙ্কল্প হয়েই সে তার জীবনের শেষ বিবৃতিটি সংগে করে নিয়ে গিয়েছিল। এতদিন পরে সরকারী দলিল থেকে উদ্ধার করে প্রীতিলতার সেই শেষ বিবৃতিটি প্রকাশে সক্ষম হওয়াতে নিজেকে খুব উপকৃত মনে করছি। ক্লাব আক্রমণ ঘটনার সমকালে বা মাস্টারদার বিচার চলাকালীন সময়ে কঠোর সরকারী বিধিনিষেধের বেড়াজাল ভেঙে এই বিবৃতিটি সংবাদপত্র মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া সম্ভবপর হয়নি। সেই পূর্ণাংগ বিবৃতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমার মনে হয়েছে পাঠকবর্গের সুবিধার্থে বিবৃতিটির বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিত। সেইহেতু পূর্ণাংগ বিবৃতিটির বাংলা অনুবাদ আমি নিচে দিলাম:

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!"

"আমি গভীর নিষ্ঠার সংগে ঘোষণা করছি, আমি ভারতীয় গণতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার একজন সৈনিক; এই বাহিনীর উচ্চ আদর্শ আমাদের মাতৃভূমিকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকের অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্ত করে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র স্থাপন করা। চট্টগ্রাম শাখার অত্যাশ্চর্য সাফল্য বাংলাদেশের শুধু বাংলাদেশের নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের অবিস্মরণীয় ঘটনা, পবিত্র জালালাবাদ পাহাড়ের সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রাম এবং পরবর্তী সমীরপুর, ফেণী, চন্দননগর, চাঁদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা এবং ধলঘাটের খণ্ডযুদ্ধ সবই এদের প্রেরণা দিয়েছে। এইরূপ এক গৌরবোজ্জ্বল সংস্থার সভ্য হবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে আমি গর্ববোধ করছি।

"আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছি। আজকের সংঘর্ষ সেই ধারাবাহিক সংগ্রামের একটি অংশ। ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নরনারীর জীবন ধ্বংস করেছে, বহু বছর ধরে আমাদের রক্তশোষণ করেছে। এইভাবে নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং দৈহিক দিক থেকে আমাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার তারাই একমাত্র কারণ; কাজেই তারা আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথের সবচেয়ে বড় বাধা। এইজন্য আমরা আজ ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছি, সে ইংরেজ সরকারী কর্মচারী বা সাধারণ লোক যেই হোক না কেন। যদিও কোন মানুষের প্রাণ হরণ করা একেবারেই আনন্দের কাজ নয়, তবু স্বাধীনতাসংগ্রামে যে-কোন উপায়ে পথের সমস্ত বাধা অপসারণের জন্য আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

"আমাদের মহান নেতা মাস্টারদা যখন আজকের সশস্ত্র অভিযানে অংশ গ্রহণ করবার জন্য আমাকে আহবান জানালেন, আমি তখন আমার এতদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে দেখে নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করলাম এবং আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে এ-ভার গ্রহণ করলাম। কিন্তু সেই মহান নেতা যখন আমাকে এই আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে বললেন, তখন আমি

আমার নিজের শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করে বললাম, এত অভিজ্ঞ শক্তিমান দাদারা থাকতে আমার মত একটি বোনকে কেন এ দায়িত্ব দিতে চাইছেন? মাস্টারদা তাঁর অপূর্ব যুক্তির সাহায্যে শীঘ্রই আমার সন্দেহভঞ্জন করলেন এবং আমি আমার নেতার আদেশ মাথা পেতে নিলাম। যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে আমি ছোটবেলা থেকে পূজো করে এসেছি আজ এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলাম।

"আমার দেশবাসীর কাছে বোধহয় আমার কাজের একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় আজও আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যে লালিত-পালিত একটি মেয়ে নৃশংসভাবে নরহত্যা করেছে শুনলে চমকে উঠবেন। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই এই ভেবে যে, ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ কেন থাকবে? চিরস্মরণীয়া রাজপুত রমণীরা তো বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছেন এবং দেশের শত্রুদের বধ করতে একটুও দ্বিধা করেন নি। এই সমস্ত মহীয়সী নারীদের প্রশস্তিতে ইতিহাসের পাতা পূর্ণ হয়ে আছে। তবে কেন আমরা, আজকের যুগের মেয়েরা বিদেশী শাসন থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করার মহৎ কাজ থেকে বঞ্চিত হব? সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যদি ভাই-বোনেরা পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে, তবে বিপ্লবী আন্দোলনেই বা পারবে না কেন? এর কারণ কি এই যে, দুটো আন্দোলনের ধারা আলাদা, না মেয়েরা বিপ্লবী আন্দোলনের উপযুক্ত নয়? আন্দোলনের ধারা হিসেবে অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রাম বলে এ একটা নতুন কিছু নয়। বহু দেশেই এই সংগ্রাম সাফল্য লাভ করেছে। তবে কেন একমাত্র ভারতেই একে নিন্দার্হ বলে মনে করা হবে? সামর্থ্যের কথা যদি ধরা হয়, তবে স্বাধীনতাসংগ্রামে পুরুষদের চেয়ে নারীরা কম সক্ষম এ কথা মনে করা কি অন্যায় নয়? এই ভুল ধারণা দূর করবার সময় আজ এসেছে। মেয়েরা যে এখনও পিছিয়ে আছে তার কারণ তাদের পেছনে ফেলে রাখা হয়েছে।

"নারীরা এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, তারা আর পিছিয়ে থাকবে না, এবং সংগ্রাম যতই কঠিন ও বিপদসঙ্কুল হোক না কেন, ভায়েদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারাও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, আমার বোনেরা আর নিজেদের দুর্বল ভাববেন না এবং ভারতের বিপ্লবীসংগ্রামে হাজারে হাজারে যোগদান করে সমস্ত রকম বাধা এবং বিঘ্নের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হবেন।

"এখন, আমি কেমন করে বিপ্লবী সংগঠনের সংস্পর্শে এলাম, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব।

"ডাঃ খাস্তগীর হাইস্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে পড়ার সময় আমি চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠনের কথা জানতে পারি এবং শুনতে পাই যে, বিপ্লবী সংগঠনে নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত সর্বগুণসম্পন্ন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী একজন এই দলের নেতা। ঢাকায় দু' বছর ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় আমি নিজেকে মাস্টারদার উপযুক্ত সহকর্মী হিসেবে গড়ে তোলবার জন্য চেষ্টা করতে থাকি। অবশ্য লেখাপড়ায় আমি অবহেলা করি নি; ১৯৩০ সালে মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং সব মিলিয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করে আমি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করি।

"১৯৩০ সালের ১৯শে এপ্রিল আমি পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি ফিরে আসি এবং চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের (গত রাত্রের) গৌরবোজ্জ্বল কীর্তির কথা শুনতে পাই। এই মহান্ বীরদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার অন্তর ভরে ওঠে। কিন্তু এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে আমি কোন অংশ নিতে পারলাম না বলে এবং যে মাস্টারদার নাম শোনার পর থেকেই শ্রদ্ধা করে আসছি তাঁকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না বলে আমার মনে খুব দুঃখ হল। জালালাবাদের শহীদদের জন্য আমার অন্তরে তীব্র বেদনা অনুভব করলাম। মনের এই অবস্থায় আমি বি-এ পড়তে কলকাতায় চলে গেলাম। আমার স্বদেশের কথা তখন সর্বদাই আমার মনে জেগে থাকত। যে সন্তানেরা স্বাধীনতার বেদীমূলে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, সেই প্রিয় সন্তানবিচ্ছেদ-বিধুরা জননীদের শোকাশ্রু আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেতাম।

"মনের এইরকম অবস্থায় আমার এক দাদা আমাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। রামকৃষ্ণ তখন একটি নির্জন সেলে নিজের দেশকে ভালবাসার জন্য চরম দণ্ডের অপেক্ষা করছেন। এই সাক্ষাৎকার আমাকে নতুন উদ্দীপনা এনে দিল। আমি রামকৃষ্ণদার মাসতুতো বোন হিসেবে যেতাম এবং প্রায় প্রতিদিনই আমি এই সপ্রতিভ আনন্দোচ্ছল তরুণ বীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। প্রাণদণ্ডের আগে প্রায় চল্লিশ দিন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁর আত্মমর্যাদাপূর্ণ ভাব, সহজ কথাবার্তা, মৃত্যুর কাছে শান্ত আত্মসমর্পণ, অকপট ঈশ্বরভক্তি, শিশুসুলভ সরলতা, স্নেহপূর্ণ হৃদয়, গভীর জ্ঞান ও সুগভীর অনুভূতি আমাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং আগের চেয়ে দশগুণ প্রগতিশীল করে তুলেছিল। মৃত্যুপথযাত্রী দেশপ্রেমিকের সান্নিধ্য আমার জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিল। রামকৃষ্ণদার প্রাণদণ্ডের পরে কোন একটি বাস্তব বৈপ্লবিক অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। অবশ্য, আমাকে আমার বি-এ পরীক্ষার জন্য আরও ন'মাস কলকাতায় থাকতে হল। এর মধ্যে আমি কয়েকবার মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই।

"১৯৩২ সালে আমার পরীক্ষার পর যে-কোন উপায়ে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসি। অল্প ক'দিনের মধ্যেই আমার দীর্ঘদিনের আশা পূর্ণ হল, চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের দুই বিখ্যাত নেতা মাস্টারদা ও নির্মলদার সামনে আমি উপস্থিত হলাম।

"নির্মলদার সঙ্গে অল্প ক'দিনের সাক্ষাতেই আমি তাঁর চরিত্রে সুদৃঢ় নীতিবোধ এবং গভীর ধর্মবোধের সমন্বয় লক্ষ্য করেছি। আমার সৌভাগ্য যে, আমি এই মহাত্মার সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম, তাঁর দেশের লোক জানলো না কত বড়, কত পবিত্র, কী অসাধারণ এক মানুষ নিঃশব্দে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

"নির্মলদার শোচনীয় মৃত্যু আমাকে তীব্র আঘাত হানলো এবং আমি আরও মরিয়া হয়ে উঠলাম। এই সময় আমার বি-এ পরীক্ষার ফল বেরুলো এবং আমি ডিস্টিংশনে পাশ করলাম। এর কিছুকাল পরেই আমি আমার প্রিয় পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের চিরদিনের জন্য ছেড়ে এসে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে বৈপ্লবিক কাজে আত্মনিয়োগ করলাম।

"শৈশব থেকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে অখণ্ড বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তি আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদ আমি সারাজীবন সযত্নে রক্ষা করেছি এবং আজ যখন আমি তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করতে চলেছি তখন এই সম্পদ যেন আরও সুখকর, আরও মূল্যবান আরও দীপ্তিমান বলে মনে হচ্ছে। আমার বৈপ্লবিক আদর্শ যদি সর্বশক্তিমানের ভক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলে যেতে না পারতো, তাহলে বোধহয় আমি কখনই বিপ্লবী হতে পারতাম না।

"ঈশ্বরের প্রতি আবাহন জানিয়ে, আমি আজকের দায়িত্ব পালন করতে চলেছি এবং প্রার্থনা করছি তিনি যেন আজ আমাকে মলিনতামুক্ত করে পবিত্র করে তোলেন, যাতে আমি তাঁর চরণে স্থান পাবার উপযুক্ত হই।"

[প্রীতিলতার ইংরেজী বিবৃতিটির এই বাংলা অনুবাদটি করেছেন শ্রীমতী নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।]

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ সম্বন্ধে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারকগণ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার কিছুটা এখানে উল্লেখ করছি:

"The statements in Ex. 56 also indicate clearly that the Party responsible for the Pahartali Raid was the same Party responsible for the Armoury Raids of April, 1930, and other overt acts at Jalalabad, Feni, Chandernagore, Chandpur and Dhalghat, and afford strong confirmation of the belief that conspiracy for waging war was in active existance and that the Pahartali Raid, to quote the words of this document was one of the items of that continued fight."

—(Judgement of Surjya Sen passed by the Honourable High Court.—Page—244.)

মাননীয় বিচারপতিরা স্পষ্টভাষায় স্বীকার করেছেন যে, পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণও 'waging war'—অর্থাৎ, ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল এই ক্লাব আক্রমণ তারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সেই একই জাজমেণ্ট কপির ২৪৫ পৃষ্ঠায় আবার আমরা দেখতে পাই মাস্টারদার পক্ষ সমর্থনকারী মাননীয় ব্যারিস্টার মহোদয় argument করেছেন যে, পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণ সরকারের বিরুদ্ধে 'wage war' হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয় না—যেহেতু কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে সেই আক্রমণ চালানো হয় নি। বিচারপতিগণ আইনজ্ঞদের এইরূপ argument-এর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন নি; উপরন্তু জোর দিয়ে বলেছেন এই ক্লাব আক্রমণও His Majesty King Emperor-এর বিরুদ্ধে—'was undoubtedly an act of waging war'.

জজসাহেবরা তাঁদের জাজমেণ্টের সমর্থনে বিপ্লবীদের ইস্তাহারের উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন:

"....the yoke of the tyranical, exploiting, and imperialistic British Government :....."—হাইকোর্টের মাননীয় জজদের সিদ্ধান্তে আমরা দেখতে পাই, চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল 'imperialistic British Government'-এর বিরুদ্ধে ও তারা 'King Emperor-এর বিরুদ্ধে 'wage war', —অর্থাৎ, যুদ্ধ চালিয়েছে। এই সত্য বৃটিশ সরকার কোনমতেই অস্বীকার করতে পারেন নি।' তবু এত বড় একটা সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহকে 'চারুবিকাশ দত্ত প্রমুখ লেখকদের বইতে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' নামে অভিহিত করা হয়েছে দেখে খুবই আশ্চর্য মনে হয়।

এই সম্বন্ধে হাইকোর্টের মাননীয় ইংরেজ বিচারকদের জাজমেণ্টের খানিকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যা পড়ে সকলেরই মনে হবে যে, সকল লেখকেরা সজ্ঞানে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহকে বিকৃতভাবে 'অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাঁরা ইংরেজ জজের জাজমেণ্টের পরিপ্রেক্ষিতে কতখানি উপহাসের পাত্র হয়েছেন। জাজমেণ্টে আছে:

"At the time of argument it was contended that the Raid at Pahartali was not an act of waging war, and stress was laid on the fact that there is no evidence to show that Government servants were in the Institute at the time of the Raid. One of the persons present, Inspector MacDonald, was a Government servant but the question whether Government servants were present or not does not seem to us of any importance. On the clear admissions of Exs. 56, 51, 52 and 54 the outrage was a campaign against the lives of every member of the British Community, Official or non-official, with the avowed object of liberating India from 'the yoke of the tyranical, exploiting, and imperialistic British Government' and we are clearly of opinion that such a campaign against this portion of the subjects and the Government of His Majesty the King Emperor was undoubtedly an act of waging war. We are also satisfied that the persons committing this act of war were members of the

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

ধরুন, বাচ্চার সবে সর্দি লেগেছে;—নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়েছে—গলা খুস্ খুস্ করছে। তক্ষুনি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান্‌ধারা—নাক বন্ধ হয়ে, নিঃশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি—কিছু আর বাকি থাকবে না—অযথা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা।

সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, কোনো কষ্ট পেতে হয় না—বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।

আর একটা কথা। ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায়—যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,—যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।

খুবই সহজ কাজ। তেতো বড়ি বা, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না।

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে;— সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে—

১) 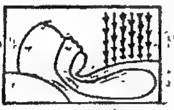
বাইরে থেকে গায়ে

২)
ভেতর থেকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে—

২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব—নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

সর্দি বসতে দেবেন না। সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

580C

same conspiracy which resulted in the Armoury Raids of April, 1930....".

—(Judgement of Surjya Sen passed by the Honourable High Court.—Page—245).

একই জাজমেণ্টের আরও দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সময় যে চারটি প্রচারপত্র ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির নামে প্রচারিত হয়েছিল, তার মধ্যে একটি প্রীতিলতার statement এবং আর একটি ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল যে বিবৃতিটি দেওয়া হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি। এই বিবৃতিটির উল্লেখ 'চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে পাওয়া যায়। অপর দুটি নতুন ধরণের ইস্তাহার দেওয়া হয়েছিল। সরকারী দলিল থেকে সে দুটির কপি নিম্নে দেওয়া হোল:

"In Ex. 52 is stated that 'The Indian Republican Army plunges to-day into this bloody revenge and lets the British Rulers know that, however weak and helpless, India will never tolerate these sorts of wanton barbarity with equanimity and silence', and further that 'The Indian Republican Army which had so long aimed at the official chamber alone, declares henceforward a general expedition against the European community and orders an indiscriminate massacre of European lives and seizere of their goods and property'."

—(Judgement of Surjya Sen passed by the Honourable High Court.—Page—245).

হাইকোর্টের, মাননীয় বিচারকেরা এই প্রচারপত্রটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁদের রায়দানের স্বপক্ষে ব্যবহার করেছেন। এতে তাঁরা বলেছেন, বিপ্লবীরা ইতিপূর্বে বৃটিশ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা নিয়েছিল বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে British Community-র সকলের বিরুদ্ধেই, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, প্রতিশোধ নিতে ও তাদের সর্বপ্রকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে এই প্রচারপত্রের মাধ্যমে আহবান জানিয়েছে।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের দিন হতে বিভিন্ন স্থানে পরাজিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গের সম্মান বজায় রাখা যতই সুকঠিন হয়ে উঠলো, ততই তারা হিংস্র আক্রোশে শান্তিপ্রিয় নিরীহ দেশবাসীর ওপর রক্তলোলুপ হায়নার মতই ঝাঁপিয়ে পড়লো—তাদের অত্যাচার নিপীড়নের মাত্রা পূর্ব ইতিহাসের গণ্ডিকেও ছাড়িয়ে গেল। সূর্য সেন বুঝেছিলেন ধর্মের কথায়; প্রেমের বাণীতে বৃটিশ দস্যুর হৃদয় পরিবর্তিত করা যাবে না—তাদের বোঝাতে হবে আমাদের দেশের মা-বোন-শিশুর প্রাণ তাদের মা-বোন ও শিশুদের প্রাণের চেয়ে কোন অংশেই কম মূল্যবান নয়। তাই ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখা এইরূপ প্রচারপত্রের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করেছিল।

অপর বিবৃতিটিও জাজমেণ্ট থেকে এখানে উদ্ধৃত করলাম:

"Ex. 54 is a declaration in the following terms:—

'In persuance of our declaration of the 1st April, 1930, we the soldiers of the Chittagong Branch of the Indian Republican Army launch to-day a campaign against the lives of the members of the British Community—be they official or non-official—merchants or peasants. They are the sole cause of our countries (country's!) ulter ruin. They are responsible for brutal repression on our countrymen, such as Chittagong, Hijli, Jallianwalabagh and other similar incidents. They are the worst enemy of our country.

'Our fight for country's freedom has begun long ago. To-days campaign is one of the links in the chain.

'May God bless us and assist us in our sacred campaign'."

—(Judgement of Surjya Sen passed by the Honourable High Court.—Page—245).

উপরোক্ত বিবৃতিটিও একই ধরণের। তবে এতে চট্টগ্রাম, হিজলী, জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রভৃতি স্থানে বৃটিশ অত্যাচারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু বছর পরে আজ এইসব প্রচারপত্র পড়ে কারও কারও হয়ত মনে হবে বিপ্লবীরা এতখানি "নিষ্ঠুর" না হলেও পারতেন। অন্তরে "আধা-নিষ্ঠুরতার" ভাব পোষণ করে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। সত্যিই যদি লড়াই করতে হয় তবে শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন ঘৃণা পোষণ করতেই হবে। তার জন্য মানসিক প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন। প্রীতিলতার মত মেয়ে এবং তারই মত শত শত ভাই-বোনের হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে "নিষ্ঠুর", "নির্দয়" ও "নির্মম" হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রীতিলতা তার শেষ বিবৃতিটিতে লিখেছে:

"So we have been compelled to take-up arms against the lives of any and every member of the British Community, official or non-official, *though it is not at all a pleasant thing to us to take the life of any human being....*"

—বিপ্লবীরা "নির্দয়" ও "নিষ্ঠুর" নয়। তাদেরও অন্তরে স্নেহ, মমতা ও প্রেম-ভালোবাসার ফল্গুধারা প্রবাহিত। মানুষকে ভালোবেসেছে বলেই তারা শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন অস্ত্র ধারণে পরাঙ্মুখ হয় নি। [ক্রমশ]

আইন ও শৃঙ্খলায় পুলিশের ভূমিকা —

কয়েকটি অভিমত

সাগর বিশ্বাস

শ্রীমাখন পাল, সম্পাদক,
আর এস পি

—একটি গণতান্ত্রিক দেশে পুলিশের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?

এক কথায় গণতান্ত্রিক দেশের পুলিশ হবে জনগণেরই সেবক। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশ কথাটাই বিতর্কমূলক। আমাদের দেশে যে ধরণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা—এর মধ্যে কিন্তু পুলিশের পক্ষে তার কর্তব্য পালন করা কষ্টকর। অর্থনৈতিক অসাম্য গণতন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেয়। আমাদের দেশে এই আর্থিক গণতন্ত্র না থাকার ফলে জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে মানুষকে এমন কতকগুলি কাজ করতে হয়—যার নাম দুর্নীতি। সমাজের সর্বস্তরে এই দুর্নীতির ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। এই দুর্নীতি একজন শিক্ষকের জীবনেও কি-ভাবে বাসা বাঁধে দেখুন। শিক্ষক সমাজের সর্বোত্তম বন্ধু। মানুষ গড়বার এক বিরাট দায়িত্ব তাঁর হাতে ন্যস্ত। সে দায়িত্বের কথা শিক্ষক বোঝেন। তবু তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ছাত্র কল্যাণে তথা দেশের কাজে নিয়োগ করতে পারেন না। পারেন না ঐ আর্থিক অসাম্যের জন্যই। প্রাইভেট টিউশনি কিংবা কোন ছোট ব্যবসায়ে নিয়োজিত থেকে তাঁকে আর্থিক ঘাটতি পূরণ করতে হয়। এর ফলে সমাজ এবং ছাত্র তাঁর কাছ থেকে যা পেতে পারতো—তার থেকে অনেক কম পায়। শিক্ষকের কর্তব্যে গাফিলতি হয়—স্বভাবে ও কর্মে দুর্নীতির সূত্রপাত হয়। বলা বাহুল্য, যে সমাজে একজন শিক্ষক দুর্নীতির শিকার হন সেখানে অন্যান্য স্তর দুর্নীতির অতলে তলিয়ে যেতে পারে। এই ধরণের অসুস্থ পরিবেশে বাইরের ও ভেতরের চাপে পুলিশেরও সদিচ্ছা নষ্ট হতে বাধ্য।

—ইংরেজ আমলে পুলিশের যে চরিত্র ছিল, স্বাধীনতার পরে তার চরিত্রগত কোন পরিবর্তন হয়েছে কি?

—ইংরেজ আমলে পুলিশ ছিল নিপীড়নের যন্ত্র বিশেষ। স্বাধীন দেশের পুলিশের নিশ্চয়ই সেই মনোভাব থাকতে পারে না। তাই এদেশের পুলিশও একটি সদিচ্ছা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ওই একই কারণে অর্থাৎ সুস্থ পরিবেশের অভাবে সকল ইচ্ছাই ব্যর্থ হয়েছে। আগে পুলিশ বিভাগে শিক্ষিত লোকের অভাব ছিল। আজকাল বহু শিক্ষিত লোক পুলিশে যাওয়াতে পুলিশের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। কিন্তু পরিবেশ তাঁদের কাজ করতে দিচ্ছে না। ধরা যাক একজন ডাক্তার। ডাক্তারী পড়বার আগে তার কল্পনায় ছিল ডাক্তার একজন সমাজবন্ধু। দারিদ্র্যপীড়িত এই দেশে তিনিও ডাক্তারী পাশ করে জনগণের সেবা করতে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু কার্যত তা আর হয় না। দুর্নীতির প্রবাহে সেই আদর্শবাদী ডাক্তারকেও একদিন গা এলিয়ে দিতে হয়। কাজেই আমার মনে হয়, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় পুলিশের পক্ষে তার যথাযথ কর্তব্য পালন অসম্ভব।

—আমাদের দেশে জনগণের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক দিন দিন তিক্ততর হচ্ছে কেন?

—এর মূল কারণ যদিও ওই অর্থ-নৈতিক অসাম্যের মধ্যে নিহিত, তথাপি যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জন-গণের মনে একটা দুর্নীতিবিরোধী চেতনা জেগে ওঠার ফলে অনেকক্ষেত্রে পুলিশের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। স্বভাবতই এতে জনগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটবে।

—৩১শে জুলাই বিধানসভার ঘটনা কি এই সম্পর্কের অবনতির ফলশ্রুতি হিসাবে আপনি মনে করেন?

—৩১শে জুলাই-এর ঘটনা একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসায় ব্যুরোক্রাট গোষ্ঠীর স্বার্থে আঘাত লাগাতেই এই চক্রান্ত।

—এভাবে পুলিশের ক্রিয়াকলাপ যুক্তফ্রন্টের ইমেজ নষ্ট করছে বলে আপনি মনে করেন কি?

—হয়তো সামান্য হচ্ছে। কিন্তু এদের মূল উদ্দেশ্য ইমেজ নষ্ট করা নয়। কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপকে সহজ ও ত্বরান্বিত করাই এদের উদ্দেশ্য।

—কোন কোন মহল থেকে অভিযোগ উঠছে যে, রাজ্যের পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

—যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচীতে স্পষ্টতই বলা হয়েছিল যে, 'জনসাধারণের অধিকার ও স্বার্থের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রয়োগ করা হবে না।' কিন্তু দুর্নীতি কিংবা বে-আইনী ক্রিয়া-কলাপের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রয়োগ করা হবে না এমন কথা বলা হয় নি। কাজে কাজেই পুলিশের ক্ষমতা কোথাও কোথাও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এদিক থেকে এ কথাই বলা চলে যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসভাবে পুলিশ কিছু নিষ্ক্রিয়।

—এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, পুলিশকে যুক্তফ্রন্টের কোন একটি দলের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে?

—সম্প্রতি এ ধরণের কিছু কিছু অভিযোগ উঠছে। এ অভিযোগ সত্য হলে নিঃসন্দেহে সেটা যুক্তফ্রন্টের সেই বিশেষ দলের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হবে। এবং এ ধরণের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তফ্রন্টে থাকলে প্রশাসন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। অনেক সময় নিচুতলার ক্যাডাররা সংকীর্ণ দলগত স্বার্থে পুলিশকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে বটে তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কিংবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এটা করেন বলে মনে হয় না।

* * *

শ্রীকালী মুখার্জী, সম্পাদক,
জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের
পশ্চিমবঙ্গ শাখা।

—একজন ট্রেড ইউনিয়নিস্ট-এর দৃষ্টিকোণ থেকে রাজ্যের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

—আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্প্রতি আমি চা-বাগান এলাকায় গেছিলাম। সেখানে দেখেছি বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলো টাঙি, বর্শা, তলোয়ারের খাপ, এমন কি তীরধনুকেও ঝাণ্ডা ব্যবহার করে। কয়লাখনি অঞ্চলেও এই ধরণ আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এক নতুন দিগ্‌দর্শন সৃষ্টি করেছে পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে। এর ফলে শ্রমিকেরা সর্বক্ষেত্রে জয়যুক্ত হয়েছেন। তবুও দলীয় রাজনীতির প্রভাবে আভ্যন্ত-

প্রাপ বিশৃঙ্খলা এবং খুন-খারাপির ফলে ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই নয়, শ্রমিকদের তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। শুধু ভীতি এবং সন্ত্রাস দিয়ে সাময়িকভাবে কোন দল বা কোন ট্রেড ইউনিয়ন জয়যুক্ত হতে পারে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এবং আন্দোলন সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও সংগঠনের কাছে আমাদের আবেদন এবং সতর্কবাণী এই যে, তাঁরা যদি অবিলম্বে এই ধরনের ভয়ংকর কার্যকলাপ বন্ধ করতে না পারেন তাহলে প্রগতির পথ একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যাবে। কি শ্রমিক আন্দোলন, কি কৃষক আন্দোলন, সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। এ ইতিহাস ভারতবর্ষের আশপাশের দেশে ঘটে গেছে। তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

—যুক্তফ্রন্টের একটি বিশেষ দলের স্বার্থে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে প্রায়ই একটা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

—কংগ্রেস আমলে দেখা গেছে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে পুলিশকে প্রায়শই ব্যবহার করা হয়েছে। আজ 'পুলিশরাজ' কংগ্রেসের পতন হয়েছে। সেখানে 'জনগণের' সরকার এসেছেন। কিন্তু ট্র্যাডিশন বদলালো কোথায়? খুব স্বাভাবিকভাবেই পুলিশকে আজও সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষ এবং ক্ষমতার টাগ অব ওয়ারের মাঝখানে পুলিশ যেন একটি বিকল মেসিনারী—অসহায়।

—৩১শে জুলাই বিধানসভার ঘটনা কি পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় বহন করে?

—৩১শে জুলাই যা ঘটেছিল তা অপ্রাসঙ্গিকভাবে পুলিশের ক্রিয়াকলাপ বলে ধরলে ভুল হবে। এটা পুলিশের একাংশের ঘটনা। পুলিশের এ ধরণের মনোভাব নিন্দনীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, পুলিশও মানুষ, তারও সহ্যের একটা সীমা আছে।

—স্বাধীনতার পরে পুলিশ কি তার কর্তব্য যথাযথ পালন করেছে?

—না করে নি। কংগ্রেস আমলেও করে নি—আজও করছে না। স্বাধীনতার পর এই 'rotten machinery'-টাকে যেভাবে সুস্থ করে তুলবার প্রয়োজন ছিল তা হয় নি। বৃটিশের হাতে সে ছিল একটা নিপীড়নের যন্ত্র—পরে তাকে প্রগতিশীল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার চেষ্টাও হলো না। তাই দেখা যায় যে, সাধারণের কাছ থেকে পুলিশ বরাবরই দূরে থেকে গেছে।

—পুলিশ ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়ন নিজেদের মাধ্যমে বিভিন্ন আন্দোলনের পথে ভবিষ্যতে সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারে বলে আশংকা করেন কি?

—করা উচিত নয়।

—ঘেরাও সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের নীতির কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন কি?

—হয়েছে, সরকার স্বীকার করুন আর নাই করুন। সরকার বর্তমানে ঘেরাওকে সমর্থন করেন না। অন্ততঃ শ্রমিকদের ঘেরাও-আন্দোলনকে তাঁরা নিরুৎসাহ করেছেন।

—সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সমাজবিরোধী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয়। পুলিশ এই সকল ক্রিয়াকলাপ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করেন কি?

—পুলিশ আসলে নিরুৎসাহ হয়ে গেছে। যুক্তফ্রন্টের দৈনন্দিন শরিকী সংঘর্ষের মধ্যে পুলিশ শুধু বিব্রত নয়—অসহায়ও বটে। পুলিশকে উৎসাহিত করবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু মন্ত্রিসভা কিংবা বিভাগীয় প্রধানের সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। এর ফলে এই মেসিনারীটাকে সফলভাবে কার্যকরী করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—পুলিশের ক্রিয়াকলাপ যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্তি ম্লান করছে বলে আপনি মনে করেন কি?

—হ্যাঁ। কিন্তু এর জন্য দায়ী প্রধানতঃ পুলিশমন্ত্রী এবং তাঁর দল। একটা গণতান্ত্রিক দেশে তাঁরা যদি নিজেদের দলীয় স্বার্থে পুলিশকে ব্যবহার করেন তাহলে জনগণের মনে তাঁদের তথা যুক্তফ্রন্টের ইমেজ নষ্ট হতে বাধ্য যেমন হয়েছিল কংগ্রেসের। কংগ্রেসও সংকীর্ণ স্বার্থে পুলিশকে ব্যবহার করেছে। ভরে একটা বোঝাপড়া করে নিন। সেদিক থেকে এঁরা অতীতের সমস্ত ইতিহাস ম্লান করেছেন। যদি কখনো যুক্তফ্রন্ট বিপন্ন হয়, তবে তার জন্য দায়ী হবেন এঁরাই।

* * *

শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন।

—ছাত্রসমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলুন।

—রাষ্ট্র কাঠামোই যেখানে বুর্জোয়া সেখানে স্বভাবতই ধনিক স্বার্থ ক্ষুন্ন হলেই আইন-শৃঙ্খলার অবনতির প্রশ্ন দেখা দেয়। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর এই প্রশ্ন উঠেছিলো। এবারে যুক্তফ্রন্ট পুনরায় ক্ষমতায় আসায় প্রশ্নটা আবার উঠেছে। আসলে একটা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আইন ও শৃঙ্খলা বলতে এতকালের পুরনো ধ্যানধারণার আজ নতুন মূল্যায়ন হতে চলেছে। এতকালের বঞ্চনা-বিক্ষুব্ধ কৃষক আজ যখন জমির জন্য সংগ্রামের সামিল হচ্ছে তখন যদি দেখে আদালতের ইনজাংশন তার বাঁচার দাবিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, তখন তথাকথিত আইন এবং শৃঙ্খলা সম্পর্কে তার ধারণা কেমন হবে? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯০৩ সালের আক্ট অনুযায়ী যে কোন মুহূর্তে যে-কোন ছাত্রকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা প্রিন্সিপালের ছিল। এবং এই অ্যাক্টকে হাতিয়ার করে আজ পর্যন্ত অনেক ছাত্র এর শিকার হয়েছে; এবং দুঃখের কথা এই যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেই শিকার হয়েছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কি ছাত্র, কি শ্রমিক, কি কৃষক, এক কথায় মানুষ তার অধিকার এবং বাঁচার সংগ্রামের প্রতিবন্ধক হিসেবেই তথাকথিত আইন-শৃঙ্খলাকে দেখতে অভ্যস্ত। এই প্রচলিতের

ওপর ভাঙন আসতে বাধ্য। এরই পথ ধরে আসতে বাধ্য সংবিধানের পরিবর্তন। আজ স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস সরকার পর্যন্ত ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, সম্পত্তির মালিকানার সীমা নির্ধারণ প্রভৃতি প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এর কারণ কি? কারণ হলো পুরনো ব্যবস্থায় আর চলছে না—চলতে পারে না। মোট কথা একটা রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়েছে। আমাদের পার্টি (সি পি এম) মনে করে এই সংকট অনিবার্য।

ছাত্রদের দিক থেকে অনেক সময় যে বাড়াবাড়ি হয় না তা নয়। এর কারণ বোধহয় ছাত্রদের মানসিকতা থাকে আদর্শপ্রবণ এবং ভাবাবেগপ্রধান। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভাবাবেগ আর উচ্ছৃঙ্খলতা এক জিনিষ নয়। আজ ছাত্র-সমাজের একাংশ যে উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয় নিয়েছে আমরা ছাত্র হিসেবেই তার নিন্দা করি। আমরা যেমন অকারণে অধ্যাপক, অধ্যক্ষকে ঘেরাও পছন্দ করি না, তেমনি পছন্দ করি না শিক্ষাক্ষেত্রে পুলিশী অনুপ্রবেশ। অথচ এরা শুধু এগুলি করবার চেষ্টাই করে না, ছাত্র-আন্দোলনের প্রতি নন্দচ্যবনজীদের বক্তব্য নজির হিসেবে উপস্থিত করে ছাত্র-আন্দোলনের মধ্যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। এই অতিবিপ্লবীদের গতিবিধি দৃষ্টে তাদের প্রতি সি আই এ এবং অনুরূপ বৈদেশিক শক্তির প্রভাবের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। কিন্তু এই ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রতিহত করতে না পারলে ছাত্র আন্দোলনের প্রতি মানুষের একটি বিরূপ ধারণা গড়ে উঠবে।

—আমাদের দেশে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক স্বাভাবিক নয় কেন?

—বৃটিশ আমল থেকেই পুলিশকে একটি নিপীড়নের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে জনতার প্রতি। স্বাধীনতার আগে ও পরে ছাত্র-সমাজ বহু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোভাগে অংশগ্রহণ করেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই ছাত্র ও পুলিশে পারস্পরিক বোঝাপড়ার পরিবেশ গড়ে ওঠে নি। সম্প্রতি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ছাত্র তথা জনগণের সঙ্গে পুলিশের মহিরঙ্গ সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে বলে মনে করি।

—পুলিশকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে—সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

—পুলিশ কোন দলের নয়। পুলিশ এতকাল বুর্জোয়া ধনিকশ্রেণীর স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার পুলিশের সেই রাশ টানবার চেষ্টা করছেন। এই অপপ্রচার নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

—আপনার কি মনে হয়, যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ কিছুটা অসহায়?

—পুলিশ এটা বলছে, যদিও অসহায় বোধ করবার প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

—সামগ্রিকভাবে পুলিশ সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে আপনার মনে হয় কি?

—সমাজবিরোধীরা বরাবরই সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। সম্প্রতি এরা যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলের আশ্রয় এবং প্রশ্রয়ে বাড়বার চেষ্টা করছে। উদাহরণস্বরূপ বরানগরের ঘটনার উল্লেখ করা যায়। এমন একজন লোককে এই পিকচারের মধ্যে দেখা যায় যিনি '৬৭ সালে পি ডি অ্যাক্টে আটক পড়েছিলেন। যুক্তফ্রন্টের একটি শরিকদলের তিনি সদস্য। এই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের পক্ষে কাজ করা খুব কষ্টসাধ্য হয়েছে।

—৩১ জুলাই-এর ঘটনার পরে একথা বলা চলে যে, পুলিশের একটা বেশ বড় অংশ যুক্তফ্রন্টের প্রতি শত্রুমনোভাবাপন্ন। গুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট এই সত্যের সমর্থন করে। ষড়যন্ত্রকারী পুলিশ অফিসারদের প্রতি সরকারের মনোভাব যথোপযুক্ত কঠোর বলে আপনার মনে হয় কি?

—এ ব্যাপারে আইনের কিছু বাধাবাধকতা আছে। যার ফলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। এদিক থেকে সরকারের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

(চলবে)

উপাসক-সম্প্রদায়। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

বহুকাল পরে

সদ্য প্রকাশিত হইল!

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত

বাঙলা ও ধর্ম-সাহিত্যের এই অদ্বিতীয় গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল। অনুসন্ধানীরা দীর্ঘকাল এর অভাব বোধ করছিলেন। সেই অভাব পূরণ করার জন্য অক্ষয়কুমারের বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের বিবরণ সম্পূর্ণ এক খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৭ ॥ মূল্য কুড়ি টাকা। মূল্যবান কাগজে লাইনো টাইপে ছাপা। প্রচুর চিত্র সম্বলিত। বোর্ড বাঁধাই।

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত

বসুমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

সান্যাল এণ্ড কোং ॥ কলিকাতা-৯

উপাসক-সম্প্রদায়। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিচারে এল না শুধু বুড়ো কুলিমদ্দি। পবনা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর মাথাটা কেমন গড়বিড় হয়ে গেছে। মুকুন্দ গিয়েছিল ডাকতে—বললে, "কার বিচার কে করে!" তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, "খোদা হাফেজ!"

মুকুন্দ ডাকতে গেছে গোলবদনকে। তা ছাড়া সবাই হাজির। চরের পুরুষরা। সেদিন সন্ধ্যের পরে ছোট মণ্ডলের দাওয়া জমজমাট। তামাক ঘুরছে হাতে হাতে। এবং এ চর থেকে কে কবে পালিয়েছে এবং কার সঙ্গে পালিয়েছে—তার হিসেব চলছে মুখে মুখে। বাধা-বন্ধনহীন সে এক অনাচারের ইতিহাস। বে-হাসিল জঙ্গল-জালপাইয়ের অন্ধকার ছায়া যেন পড়েছিল মানুষগুলোর জীবনেও। কে কার খোঁজ রাখে। অবাধ গতি জমিদারের পাইক-বরকন্দাজের।—সাঁজা বিলি জোত—খাজনা আদায়ের মরশুমে আমলারাই খোদ মালিক। সে এক দিন গেছে।

ছোট মণ্ডল একগাল তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, "হেই দেখ না—যমুনা। অর বাপ্ কে—কেউ জানে না।"

বুড়ো হরিদাস বললে, "তখন বিচার পঞ্চাৎ ছিল নি, দণ্ডও ছিল নি। কে কার বিচার করে!"—

মহেশ বলল, "সেদিন গেছে—তার কথা ভুলে যাও। গোলবদনের আমি বিচার করব—ফের শালার মাথা কামাব; দণ্ড দিব। না হলে চরের বৌ-ঝিরা উদলা হয়ে যাবে খুড়া। গ্রামদেশের লোক হাসবে।"

একজন বললে, "অর খোপা নাপিত বন্ধ করে দাও ছোট মণ্ডল। গ্রামদেশে এ রকম দণ্ড দেয়।"

হাবু বললে, "তো মোদের চরে কি খোপা আছে? যাদব সীট আছে ঢের দূরে, সেই সড়কের ওপাশে গেরামে। কাপড় কাচে শুধু এক চৌধুরী বাড়ির।"

সুবল দুঃখ করে বললে, "মোদের চরে একটা নাপিতও নাই ছোট মণ্ডল। থাকলে গোলবদনা জব্দ হতো।"

"আজ নাই—একদিন হবে।" তামাক খেতে খেতে মহেশ মণ্ডল যেন দূরের সেই এক অনাগত দিনের কথা ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে বললে, "এ চরও একদিন জমজমাট হয়ে উঠবে গ্রামের মত তোদের ঝি-ব্যাটাদের—নাতিপুতি-দের কালে। গাঙের ভাঙন থেমে গেছে ঢের কাল। আর ভয় নাই।"

না, সে ভয় আর ওদের নাই। হুগলী নদীর ভাঙন ধরা খাড়ি পাড় পলি জমে ঢালু হয়েছে, ট্যাঁকায় বাঁকে জমতে সুরু করেছে জোয়ারের সাগর ঠেলা বালি। অনিশ্চয়তা কেটে গেছে জীবনের। এখন তাকে নিয়মে বাঁধার পালা।

"তো মুকুন্দ গেছে ঢেরখন।" মহেশ মণ্ডল উদ্বিগ্ন গলায় বললে, "গোলবদন সটকে পড়ল নি তো!"

বলতে বলতে গোলবদন হাজির। পেছনে মুকুন্দ।

গোলবদন আর বসল না। এসেই সবার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললে, "তোমাদের সকলের কাছে ঘাট আমি মানছি। যে গেছে তার আমি আর কি করব বলো। মোকে দণ্ড দাও।"

বিচারে পাঁচরকম কথা উঠবে। পাঁচজনে পাঁচটা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তা না হলে বিচার পঞ্চায়েৎ কি! কিন্তু গোলবদন এসে নিজের অপরাধ কবুল করে—দণ্ড চেয়ে সকলের মুখ বন্ধ করে দিলে। সকলে যেন থতোমত খেয়ে চুপ করে রইল।

মহেশ মণ্ডল কি বলতে যাচ্ছিল—গোলবদন বললে, "কাল ভোর ভে যেয়ে আমি মাথা কামিয়ে আসব—হেই দিব্যি গেলে বললাম।"

মহেশ মণ্ডল কটমট করে চেয়ে চেয়ে গোলবদনের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছিল। গম্ভীর গলায় বলল, "এবার শুধু তোর মাথা কামালে চলবে নি—চরের পঞ্চাৎ মান্য দিতে হবে পাঁচ টাকা।"

"পঞ্চাৎ মান্য!" থতোমত খেয়ে গোলবদন বলল, "সে আবার কি ছোট মণ্ডল?"

চরের মানুষের কাছে কথাটা নতুন। এর আগে সে মান্য কেউ কারুর কাছে চায় নি—কেউ দেয়ও নি। গোলবদন বুঝতে না পেরে মহেশের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

মহেশ বললে, "তোর জন্য চরের মানুষের মাথা হেঁট হয়েছে। তার

দরুণ তোকে পাঁচ টাকা দণ্ড দিতে হবে।"

"এ আবার এক নতুন ফ্যাচাং বার করলে ছোট মণ্ডল!"

"তা না হলে তোর মত লোক শালার টিট্ হবে না।"

"হ্যাঁ, দেখ—পাঁ-চ পাঁ-চ টাকা! সে আমি পাব কোথা?" গোলবদন ব্যাকুল ভাবে বললে, "বরং পাঁচবার কেন—দশবার মাথা কামাতে পারি। কি পাঁচ রোজ আমি তোমার কাজেকম্মে বেগার খেটে দিয়ে যাব।"

মহেশ মণ্ডল চটে গেল। বললে, "কে চায় তোর বেগার খাট্নি। ও টাকা কি মোর কাজে লাগবে রে ছ্যাঁচড়া! তবে হ্যাঁ, ও টাকা মোর কাছে জমা থাকবে—দরকার হলে চরের পাঁচজনের কোনো ভালো কাজে লাগবে।"

গোলবদন কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, "ট্যাঁকে মোর পাঁচ গণ্ডা পয়সা নাই ছোট মণ্ডল—তা এ তো পাঁ-চ টা-কা। এমন জুলুম কোনো দিন ছিল নি।"...

"ছিল নি—এখন থেকে হলো।" মহেশ বললে, "ধরে লাও—তোদের ছোট মণ্ডলের কাল থেকে হলো।"

"হেই ছোট মণ্ডল।" ...ঝপ্ ক'রে পা জড়িয়ে ধরল গোলবদন।

"মনে নাই শালা ছ্যাঁচোড়—তোকে একবার সাবধান করা হয়েছিল!" মহেশ হাঁকড়ে উঠল।

বুড়ো হরিদাস গোলবদনের হয়ে বললে, "ছেড়ে দাও অকে এবারটা।"

মহেশ রোক ধরে বসল, "পঞ্চাৎ মান্য অকে দিতে হবে। হাটে-বাজারে অর জন্য লজ্জায় মুখ তুলে কথা বলতে পারি নি।"

লেগেছে।—বাইরের খোঁচাটা এই লোকটার একেবারে বুকে গিয়ে বিঁধে আছে। তার মাথা হেঁট হয়ে গেছে। "মোদের চরের লোকের মান নাই!"

শেষ পর্যন্ত বুড়ো হরিদাস বলে-কয়ে মাঝামাঝি একটা রফা করে দিলে—পাঁচ টাকা নয়, পাঁচ সিকে।

ভালয় ভালয় গোলবদনের বিচার শেষ হয়ে গেল। কেউ কেউ উঠে পড়ল। সভা ভাঙো ভাঙো।

এমন সময় গোলবদন সকলের সামনে আর একবার হাত জোড় করে দাঁড়াল। বললে, "মোর একটা কথা আছে। একটু শুনতে হবে।"

এবার তার পালা।

যারা উঠে দাঁড়িয়েছিল তারা আবার বসে পড়ল। চেয়ে রইল গোলবদনের দিকে।

গোলবদন বললে, "যত বিচারের ঝড়-ঝাপটা—সব কি মোর ওপর দিয়েই যাবে? আর কেউ যদি দোষ করে, তার বিচার হবে নি?"

হাবু জিজ্ঞেস করলে, "আবার কার বিচার!"

গোলবদন বললে, "ধরো—সে যদি ছোট মণ্ডলের ব্যাটার বিচার হয়?"

হাবু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। দাওয়ার মানুষ নীরব। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল গোলবদনের দিকে। লোকটা বলে কী!

মহেশ চটে গেল। গলা চড়িয়ে বললে, "ব্যাটা বলে চেপে যাব নি হে। বিচার করব। মোর ভুল হয়—চরের পঞ্চাৎ আছে। এতগুলোন লোক বসে আছে এখনো—বল তার কি অপরাধ।"

"অপরাধ তার নয় ছোট মণ্ডল—কথাটা এমনি বলছিলম।" গোলবদন চোখ পিট্ পিট্ করে বললে, "বলছিলম—এ চরে সকলের বিচার হয় না, লোক বেছে বেছে বিচার হয়—দণ্ড হয়।"

"কী! এত বড় কথা!" মহেশ ক্ষেপে গেল আরও।

গোলবদন বললে, "তুমি রাগ করছ, কিন্তু তুমিই বল—মুকুন্দের বৌয়ের অতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, তার কি বিচার হয়েছে? বলুক আর পাঁচজনে—কি বিচার তারা করেছে?"

সবাই চুপ।

হাবু কি বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল।

মহেশ বললে, "কি বলছিলি—বল না হাবু। ও সেই বনের ধারের ঘটনার কথা বলছে। তা তোরা তো চারদিকে খুঁজতে গিয়েছিলি—কি হয়েছিল বল।"

হাবু বললে, "সে তো মোরা চারদিক হাট্কে এসে তোমাকে বলেছি ছোট মণ্ডল। মোরা কোনো কিছুর হদিস করতে পারি নি। জঙ্গলের সে এক ভুতুড়িয়া কাণ্ড।"

যুগল বললে, "পরের দিন সন্ধ্যেবেলা কালিমন্দির ওপরে আবার ভর নামলো—বড়থানের ভর।"

"তবে?" গোলবদনের দিকে কটমট করে চেয়ে মহেশ বললে, "মুকুন্দের বৌয়ের দোষ কি! তা ছাড়া সে তো বলেছে—ইজ্জৎ তার যায় নি। কে এসে শুধু কাপড়টা"—

গোলবদন বলে উঠল, "আর তাই সকলকে বিশ্বাস করতে হবে?"

"তবে?"

গোলবদন বললে, "আমি যদি বলি—সে ভুতুড়িয়া কাণ্ডকারখানা নয়—মানুষের কাণ্ডকারখানা! তুমি ভাল করে খোঁজ করো নি।"

বলে কি লোকটা! সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে তার দিকে। মহেশ মণ্ডলকে তার ভয় নাই। মুখে মুখে কথা বলতে গলা তার একটুও কাঁপছে না।

গোলবদন মাথা ঝাঁকিয়ে জোর দিয়ে বললে, "তুমি ভালো করে খোঁজ করলে জানতে পারতে—সে ভুতুড়িয়া কাণ্ড নয়, চৌকিদার ভলু মাঝি আর মুকুন্দের বৌয়ের কাণ্ডকারখানা।" বড় জ্বালায় তার ভেতরটা জ্বলছিল। বললে, "তার বিচার তুমি চেপে যেতে চাও তো যাবে—তুমি মোদের বাড়ুয়া, মাতব্বর—সে তোমার ধর্ম। এ চরে ভলু মাঝিকে দিন নাই, রাত নাই—হটর হটর আসতে-যেতে কে না দেখেছে?"

সব ঘটনা গোলবদন উল্টে দিতে চায়। মহেশ প্রতিবাদ করে বললে, "সে তো চোরাই নুনের খোঁজ...স্বদেশী ধর-পাকড়!"—

"ভলু মাঝির সে সব ছল-ছুতো ছোট মণ্ডল। মোর সাক্ষী-প্রমাণ আছে।" গোলবদন বললে, "সে মেলা কথা। শোন তবে।" বলে যমুনার কাছে যতো কথা শুনেছিল—গড়গড় করে সব বলে গেল একে একে।

ছুঁচটি পড়লেও শোনা যাবে। দাওয়ায় সবাই উৎকর্ণ—স্তব্ধ। মায় মহেশ পর্যন্ত। মুখ তার কঠিন। ভুরুখানিটা কুঁচকে পড়েছে। সমস্ত কথাগুলো যেন তার এত তোড়জোড় করা বিচার-পঞ্চায়েতের ভূমিকাকে মুখের ওপরে পরিহাস করে চলে গেল।

শেষ ঘা দিয়ে গোলবদন বললে, "মুকুন্দের বৌ যে এখনও ঘর করছে এই ঢের। না হলে সেইদিন চলে যেত ছোটমণ্ডল—যেদিন তোমরা দুজন, তুমি আর মুকুন্দ ভাঙা হাত-পা নিয়ে থানা থেকে ঘুরে এলে। মনে পড়ে?

মনে পড়ে—অন্তত একজনের মনে পড়ে, সে মুকুন্দ। ঘরে এসে নয়নকে দেখতে পায় নি—দেখতে পেয়েছিল মাঠের আবাদের ভেতর থেকে ছুটে আসতে। ওদিকে দাউ দাউ করে তখন আগুন জ্বলছে যমুনার ঘরে। গোলবদনের কথায় তার বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। কি যেন বলেছিল একটা।...

আজ সব ঘটনা—সব কথা অন্য রূপ নিয়ে দেখা দিল।

"আমি বিচার করবো আমি সব কিছুর বিচার করবো।" থমথমে গলায় মহেশ মণ্ডল বললে, "মোদের মাথা হেঁট হবে—এমন কাজ আমি কিছুতেই সহ্য করবো নি। সব আমি খোঁজ করবো—তারপর আবার পঞ্চাৎ ডাকবো।"

সোদনের মত সভা ভাঙল।

খাওয়ার সময় হাবুকে ডেকে মহেশ বললে, "সাগরখুড়িকে একবার মোর সঙ্গে দেখা করতে বলবি।"

পরের দিন সাগরখুড়ি যখন মহেশের সঙ্গে দেখা করতে এল তখন সারা চরে ঢিঢিক্কার পড়ে গেছে। বিশেষ ক'রে মেয়ে-মহলে। গালে হাত দিয়ে, চোখ বড় বড় ক'রে, গলা নামিয়ে একটা কথাই বলছে সবাই সবাইকে:

"আই মা গ'—তলে তলে এত কান্ড!"

মহেশ জিজ্ঞেস করল সাগরখুড়িকে, "তুমি কিছু জানো?"

সাগরখুড়ি ভেবে ভেবে বললে, "সব কথা-টথা শুনে এখন মনে হচ্ছে—আমিও কিছু জানি।"

মহেশ বলল অবাক হয়ে, "আমাকে আগে কিছু তো বলে নি খুড়ি"!"

সাগরখুড়ি বললে, "তখন ঠিক বুঝতে পারি নি। ঘটনা একটা ঘটেছিল। তখন ভেবেছিলাম একরকম—এখন মনে হচ্ছে আর এক রকম।"

"কি ঘটনা!"

"সেই চোরাই নুন যখন ধরতে এসেছিল ওই চৌকিদাররা—ভলু মাঝির দল।"

সাগরখুড়ি সে ঘটনার বিবরণ দিলে। কথা ছিল—চৌকিদার এলে মেয়েরা চেঁচাবে। কিন্তু নয়ন চেঁচায় নি—অথচ ভলু মাঝি এসেছিল।

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী

বিদ্যাপতির সমগ্র পদ
মূল্য : চার টাকা

জ্ঞানদাসের সমগ্র পদ
মূল্য : দুই টাকা

গোবিন্দদাসের সমগ্র পদ
মূল্য : দুই টাকা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সান্যাল এণ্ড কোং
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

সাগরখুড়ি বললে, "ঘরের পিছনে খিড়কির দিকে দাঁড়িয়ে অরা কথা বলছিল। মোরা বেয়ে পড়তে নয়ন বোধ হয় ঝট্ করে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।"

"কথা বলছিল!" মহেশ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

"সে কথা ওই ভলু মাঝিই মোদের মুখের ওপরে বলে টংটং করে চলে গেল। মোরা আর জানব কি করে বলো।" সাগরখুড়ি বললে, "তখনি ওই ভলু মাঝি মোকে বলেছিল—সে নয়নের বাপের দেশের লোক। ছোটবেলা থেকেই তাদের জানাশোনা।"

"মুকুন্দের মা ছিল না?"

"ছিল। মোদের সঙ্গে ছিল। বৌ ছিল ঘরে—একলা।"

"হুম্"-করে মহেশ মন্ডল একেবারে চুপ ক'রে গেল।

সাগরখুড়ি বললে, "আরও একটা খবর আছে। তোমরা যেদিন থানা থেকে ছাড়া পেয়ে এলে সেদিন নয়ন ঘরে ছিল না। থানার কে না কে—তার সঙ্গে দেখা করতে গেছল। সঙ্গে ছিল যমুনা বোস্টমী।"

"লোকটা কে?—ভলু মাঝি?"

সাগরখুড়ি ঠোঁট উল্টে বললে, "আর কে হবে! বুঝে লাও।"

মহেশ গর্‌গর্ করে বললে, "এর মধ্যে ওই কুট্‌নী হারামজাদী যমুনা বোস্টমী নিশ্চয়ই আছে।"

"সঙ্গে সে তো ছিলই।"—

একটা সান্ত্বনা আজ মনে মনে পায় মহেশ—সেই যমুনাকে চর থেকে উৎখাত করে দিতে পেরেছে। তবু ভেতরে ভেতরে জ্বলুনির শেষ নেই তার।

"এত বড় ঘটনা মোর চোখকে ফাঁকি দিয়ে গেল সাগরখুড়ি!" ক্ষোভে ক্রোধে মহেশ ফুঁসতে লাগল। বললে, "এতগুলান লোকের সামনে গোলবদন মোর মাথা হেঁট করে দিয়ে গেল। একটা কথা বলতে পারলম নি! সেই যে কলিমদ্দি সেখ বলেছিল—"কার বিচার কে করে!" সেই কথা ফলে গেল।"

একে তার অন্তরের জ্বালা—তার ওপরে সাগরখুড়ি আবার বললে, "মুকুন্দের মা তো চেঁচিয়ে কেঁদে পাড়া মাৎ করে দিচ্ছে। বলছে ছোট মন্ডল কি বৌ এনে ঘরে ঢুকিয়ে দিল মোর।"

মহেশের চোখ লাল হয়ে উঠল—কপালের শিরা দপ্ দপ্ করতে লাগল। বললে, "কার ভিতরে কি আছে—আমি জানব কি ক'রে, খুড়ি। সে-ও তার ঘর সামলাতে পারে নি!" একটু থেমে আপন মনে বলতে লাগল,—"এ পাপের মাটিতে—অনেক অনাচারের মাটিতে ঘর বেঁধেছি মোরা—ই যেন মাটির ভিতর থেকে পাপ গজ্‌গজিয়ে উঠছে। তা তুমি যেয়ে মুকুন্দের বৌয়ের কাছ থেকে খবর জান—আমিও ওর বাপের বাড়ির গ্রাম থেকে খবর জোগাড় করছি। এর বিচার না করলে মোর শান্তি নাই খুড়ি—মোর মাথা হেঁট হয়ে যাবে।"

সাগরখুড়িকে বিদায় ক'রে দিয়ে সেই সকালে মহেশ মন্ডল বেরিয়ে পড়ল নয়নের বাপের বাড়ির গাঁয়ের দিকে। গায়ে ফতুয়া, বগলে শাদা কাপড়ে ছাওয়া পুরাতন একটি ছাতা। একটা গভীর উত্তেজনা যেন তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল। সে বাড়ুয়া। তাকে বিচার করতে হবে।

এমনি উত্তেজনা ছিল একদিন—নয়নের সেই বনের ধারের ঘটনার পর। কিন্তু তার কোনো উদ্দেশ করতে পারে নি সে। চরের মানুষের নানা ভুতুড়ে দৈব সংস্কারে—বিশ্বাসে প্রথমটায় তার মন সায় দেয় নি বটে—কিন্তু খোঁজখবর করেও সে কিছুই আবিষ্কার করে উঠতে পারে নি। সকলের সঙ্গে ধীরে ধীরে সে-ও মেনে নিয়েছে সংস্কারের বশে। তারপর চোখ আর মন ঘুরে গেছে অন্যদিকে। নানা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ এসে ভেঙে পড়েছে চরে। সকলে ভেসে গেছে সেই সঙ্গে—কেউ কোন প্রশ্নও তোলে নি। হঠাৎ গোলবদনের বিধবা বোনের অন্তর্ধান চরের সুস্থ-সরল একটা জীবনধারাকে যেন ঘুলিয়ে তুললে। পুরাতন কথা নতুন একটা বিশ্রী আকার নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। সেই বনের ধারের ঘটনা—যাকে চরের মানুষ একদিন ভুতুড়ে ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছিল—সেটাও এখন নতুনভাবে দেখতে শুরু করেছে। ভলু মাঝি নামক চৌকিদারটির ওপর এ চরের মানুষের—যত ঘৃণা ও অবিশ্বাস, এ চরে তার নানা কারণে আসা-যাওয়া, উৎপাত ও ক্ষয়-ক্ষতির জন্য যত রাগ—তার অনেকখানি গিয়ে পড়েছে মুকুন্দের বৌ-এর ওপরে। গোলবদনের বিবরণের পর সারা চর ঘুরে গেছে একদিকে। নীরবে সকলে একদৃষ্টে চেয়েছিল মহেশের দিকে সেই পঞ্চায়েৎ সভায়—পথ চলতে চলতে সে দৃষ্টির নীরব অথচ তীব্র একটা অর্থ যেন এখনও বিচলিত ক'রে তোলে। চরের বাড়ুয়া—তাকে বিচার করতে হবে। অপরাধের শাস্তি দিতে হবে।

[ক্রমশ]

ধলেশ্বরীর গায়েন

গুরু বিশ্বাস

টিপ টিপ বৃষ্টি সকাল থেকেই। ঝিম ঝিম অন্ধকার। সারা আকাশে মেঘ। নিকষ কালো মেঘ সারাদিন। মেঘে মেঘেই সন্ধ্যা। অথবা সন্ধ্যা হয়ত হয় নি তবু পথে পথে টুনির জোনাক বিজলীবাতির রোশনাই। আলোয় আলো ঘরও। সেসব বড়লোকেদের বড় বড় কোঠাবাড়ির ঘর। পূর্বপ্রবাহী কৃষ্ণপুর খালের তীরে জলায় মাটি ফেলে গড়ে তোলা জঙ্গলা কুঁড়েতে সে আলো নেই। টিমটিমে প্রদীপ আর দুষ্প্রাপ্য কেরোসিনের কৃপণ ডিবের আলো আলো অন্ধকার। সেটুকুও জ্বালেন নি আচমন দাস। মালতী জ্বালতে এসেছিল, বলেছেন, থাউক। অখন একটু আন্ধার থাকতে দে।

ক্যান বাবা ত্যাল তো আছে। আইজই আনছে তোমার জামাই—মালতী মন্দস্বরে বলল।

হেইয়ার লেইগা না। অখন তো সন্ধ্যা তো হয় নাই। ম্যাঘ দেইখ্যা আন্ধার হইছে।

বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আর কথা বলে নি মালতী। তারপর থেকেই অন্ধকার। অন্ধকার ঘরে। অন্ধকার পশ্চিমের প্রান্তরে। এক আশ্চর্য পরিবর্তনের প্রত্যক্ষদর্শী আচমন দাস বৃষ্টিঝরা অন্ধকারে সেই দূরে প্রসারিত বালির প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইলেন। বালি এখানে ছিল না। থই থই জলায় দিগন্ত জুড়ে কচুরীপানার ছিল রাজ্যপাট। মৌনী বক কোথাও কোন শক্ত পটভূমি পেয়ে স্থবির পায়ে দাঁড়িয়ে থাকত সমস্ত দিন। দু-একটা পরিচিত পাখী মাঝে মাঝে উড়ে উড়ে চলে যেত, মনে হত বুঝি দিগন্তের সন্ধানী। খালের ধারে ধারে কিছু উঁচু উঁচু জমিতে দু-চারটে বড় বড় গাছে বাসা বেঁধে থাকে শালিক, কাক চিল, দু-চার ঘর মাছরাঙাও। কাক-শালিকেরা ঘরের আঙিনায় এসে এখনও বসে। মাছরাঙারা একদিন জলে আকাশের ছায়া খুঁজে ফিরত, টুপ করে ডুব দিয়ে রুপোলী রঙ তুলবে বলে। বেকার আচমন দাস অনেকদিন লক্ষ্য করেছেন বকের জল ঠোকরানো, মাছরাঙার মাছ নিয়ে যাওয়া। লক্ষ্য করেছেন কচুরীপানার তলা থেকে বিস্মিত চোখ জলঢোঁড়া শিশুর আলোক আস্বাদন।

জামাই মানুষ ভাল। ভালই রোজগার। শ্বশুরের তামাক নিয়ে আসে প্রতি শনিবারে। সেই তামাক মিতব্যয়ীর পরিমাণে কল্কেয় সেজে নিয়ে হুঁকো হাতে বিকেলবেলায় ঘরের সামনে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় বসে দক্ষিণের জলসিঞ্চিত বাতাস খেয়েছেন অনেক কটি গ্রীষ্মে। দু বছরের ছোট্ট নাতিটিকে কতবার সামলাতে হয়েছে, ওইদিকে যাইস না। জল জল।—বড় নাতিটিকে বকতে হয়েছে, সহদেব! তরে কই না অগ নিয়া যাইস না। সামলাইতে পারস না হুড়ুৎ কইরা পইরা যাইব। জলের ধারে কিয়ের খ্যালন?—আজকাল আর বলতে হয় না। বলতে হয় না তখনকার ছোট নাতিরও অনেক ছোট তিন বছরের অতি দুরন্ত মালতীর কনিষ্ঠতম পুত্রটিকেও। কারণ সে জলাভূমি নেই। একদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন কোথা থেকে মোটা মোটা পাইপ এসে অনর্গল বালি ঢেলে মাঠ করে ফেলেছে সেই দিগন্তবিস্তৃত কচুরীপানার ভাসমান অরণ্যকে। সে মাঠ মরুভূমি। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বালি ধু-ধু বালি। সারাদিন জল পড়ে বালিগুলোও আর সাদা নেই। মেঘ মেঘ রঙ। তবু আজ এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জন্যে ভালো লাগছে। নইলে সেই জলা মজে যাওয়ার পর থেকে আর কিছুতেই তাঁর ভাল লাগছিল না। সজল শ্যামলিমার বদলে এই মরুভূমির রুক্ষতা—এ যেন অসহ্য। আজ আবার ভালো লাগছে। ভালো লাগছে শুধু জলের জন্যে। দেশের বাড়িটাকে বড্ডই বেশি করে মনে পড়ছে তাঁর। মাঠভরা জলের মধ্যে মধ্যে টিলায় টিলায় বাড়ি। এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি যাবার কোথাও এক চিলতে পথ

আছে নইলে যেতে হয় নৌকোয়। বর্ষায় যখন ধলেশ্বরীতে প্লাবন হয় তখন সেই জল থৈ-থৈ মাঠে তাঁদের মাটির ঘর-গুলো এক-একটা দ্বীপের মত জেগে থাকে আপন আপন অস্তিত্ব নিয়ে। এ-বাড়ির হরিদাস রাত-বিরেতে প্রয়োজনে ও-বাড়ির ডোরাকে ডেকে বলে, কিরে ডোরা ঘুমাস নিকি?

না গো হরিদাসদা একখান গান শুনতাছি—ডোরা যখন তার ঘরের মধ্যে থেকে জবাব দেয় তখন হয়ত ডোরার ঘরেব প্রায় সংলগ্ন নিজের ঘরে বসে আচমন দাস বাদলার গান জুড়েছেন একখানা। ডোরার কথা শুনে আচমন দাস বোঝেন এত রাত্রেও তাঁর গানের শ্রোতা আছে। কান পেতে আছে জলস্রোতের কলধ্বনির মধ্যেও। ও পাস থেকে হরিদাস হয়ত আবার চেঁচিয়ে ওঠে, জল ফাল দিয়া বাড়ে দেখি। নজর রাইখো।

আইচ্ছা—ডোরার জবাবের পরই ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয় ঘরের দরজা খোলার। আচমন দাস গানে মগ্ন থাকলে শুনতে পান না, গানটা শেষ হয়ে থাকলে শোনেন। প্রশ্ন করেন, ডোরায় জল দ্যাখস নি?

হ। ডাক শুইন্যা মনে হয় জল বাড়ুবো—

বাড়লে কইস্—।

কমুনে—।

আশ্বস্ত হয়ে দোতারাটা আপন সুরে বাজাতে থাকেন আচমন। জল ডাকছে কি বাড়ছে তাঁর সে খবর রাখবার প্রয়োজন নেই। দ্বীপে দ্বীপে যৌবন জেগে আছে। কাজিয়া তারা করে আবার বিপদে সংকেতও করে তারাই। তাছাড়া ঘর ছাড়বার মত বিপদ খুব কমই আসে, কদাচিৎ। তাই বলে গান গাইবেন না আচমন দাস? দিনের গানে প্রাণ থাকলেও অন্য আকর্ষণ থাকে বলে মন ভরে না তাতে। মনের গান আসে একা। সে আসে গভীর রাত্রে। আসে নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে। আর আশ্চর্য তাঁর দোতারা। গভীর রাত্রের একাকীত্বে সে যেন কথা বলে। আচমন যা বলেন সে বলে তারও বেশি, অনেক বেশি। সেই গভীর রাতের সুর শুনলে না জানি কি বলত মোল্লাজান।

আচমন দাস গায়েনের পরাণ সখা মোল্লাজান মাঝি। গঞ্জের নৌকা নিয়ে যে বন্দরে বন্দরে সুপারী আর পাট-পেঁয়াজের ব্যাপার করে বেড়ায়। সারাদিন অত-বড় নৌকার হাল ধরে থাকে শক্ত হাতে অথচ মাঝি গান যখন গায় মনে হয় গাঙ বুঝি ফুইল্যা ফুইল্যা উঠত্যাছে। নিজে গাইতে জানে বলে কদরও সে বোঝে। ঘাটে নৌকা রেখে ঘরে এলে বলে, এইবার আমার লগে চলেন বড় ভাই। একখান গান বানাইয়া নৌকা দিমু ছাইর‍্যা—।

ক্যান নৌকা ছারতে হইব ক্যান্—আচমন জানতে চান।

আরে গুণিন, আপনে হইলেন গিয়া অকূলে দরিয়ার নাও। হালও নাই, নোঙরও নাই। আপনের লগে গেলে কি আর রসি নেওন যায়?—আপন কথায় আপনি হাসে মোল্লাজান।

হেইয়া যা কইছ শ্যাখ—আচমন বলেন—বুড়াকালে চক্ষুতে সুর্মা দিলে কি আর ছানি কাটে ভাই? খালি জলই পড়ে। সেই কুন হকালে গানের গাঙে প্রাণের নৌকা ভাসাইয়া মেলা করলাম বন্দর পাইলাম না। কি করুম কও?

হয় হয়—একমুখ দাড়িসুদ্ধ টাক-মাথা বারংবার নাড়ে মোল্লাজান বলে, আল্লা আপনারে মুক্তি দিছে ভাই, আমাগো বন্ধন কাটে নাই। পাপ যে কাটে নাই।

মুক্তি—মনে মনে ভেবে নিলেন আচমন, ঠিকই বলেছে মোল্লাজান। স্ত্রী মুক্তি দিয়ে গেছে প্রায় আঠারো বছর আগে। তারপর ছেলেটি একদিন বাবাকে জানিয়েছে সে কলকাতা যাবে। সেখানে কাজ-কামের চেষ্টা করবে। ছেলে বউ নিয়ে চলে যাবার কিছুকাল পর মেয়েও চলে গেছে জামাই-এর সংগে। লক্ষ্য কলকাতা। মেয়ে বাবাকে সংগে নিতে চেয়েছিল, আচমন যান নি। শুনেছেন কলকাতা অনেক বড় জায়গা, একেবারেই অন্যরকম। তা এই বয়সে আর কোথায় যাবেন তিনি পৈত্রিক বাস্তুভিটা ছেড়ে? ছেলে-মেয়ে যায় যাক। তিনি এখানেই থাকবেন যতদিন না সেই অচিনপুরের মানুষ আসে নিতে। আর পাশের বাড়িগুলো ছেড়ে ছেড়ে প্রায় সবাই গেছে চলে। গ্রামে এখন নতুন বসতি। হালিপাড়ার বদরুদ্দিন মিয়া, হাসান শেখ, বরকত আলি নতুন গ্রামবাসী। বরকত আলির ছোট ছেলে আমজাদ বড় সুন্দর ভাটিয়ালী গায়। গলাও মিষ্টি। আচমনকে সে ফকির বলে ডাকে। বলে, ফকির আমারে একখান ভাল কইর‍্যা ভাওয়াইয়া শুনান নি। চ্যাষ্টা কইর‍্যা দেখি গাইতে নি পারি?

আমার লগে লগে গা—ছোকরার আগ্রহে আচমন বলেন

আপনের লগে! আরে তোবা তোবা, আপনি হইলেন গিয়া গুরু। আপনের লগে লগে চলতে পারি নিকি? পিছে পিছে স্যান চলন যায়।

ভাল লাগে আমজাদকে। আরও ভাল লাগে এইজন্যে যে, আচমন যেমন পথে পথে গান গেয়ে বেড়ান, আমজাদ বেড়ায় জলে জলে। আশ্বিন-কার্তিকে জমিতে জমিতে নৌকা নিয়ে ফসল কেটে বেড়ায় আমজাদ, আর উদাত্তকণ্ঠে ভরিয়ে রাখে আকাশ বাতাস, ভরায় গানের সুরে।

তবু শেষ পর্যন্ত বুড়া আচমন দাসকে চলে আসতে হয়েছে। ছেড়েছেন সেই গ্রাম, নিজের বাস্তু, পৈত্রিক ভিটা। মেয়ের আহ্বানে যে ব্যক্তি আসেন নি পড়শীদের সঙ্গ নিয়ে সেই মানুষকেই একদিন অন্ধকারে সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসতে হয়েছে। আমজাদই ব্যবস্থা করে দিয়েছে সীমানা পেরোনো দালাল-দের সংগে কথা বলে। আসবার সময় আচমন বারবার পেছন ফিরে তাকিয়ে বলেছেন, মোল্লাজান মিয়ার লগে দেখা হইল না।

সঙ্গীরা তাড়া দিয়ে বলেছে, আরে থোন আপনের মোল্লাজান। হালারা কোরবানি কইর‍্যা ফালাইব অখন আপন প্রাণডা বাঁচান।

না ঠিক প্রাণ বাঁচানোর জন্যে নয়, সবাই যাচ্ছে বলেই যাওয়া। সকলের সংগে মিশে যাওয়া। জলে জলে মিশে জলস্রোতের মত জনস্রোতে ভেসে যাওয়া। সেই স্রোতের মুখে বাঁধ দিতে পারত একজন—মোল্লাজান। দেয় নি। বরং বিমর্ষমুখে বলেছিল, যান গা গুণিন ভাই, যান গা। কি হইব এইখানে পইর‍্যা থাইক্যা? পোলার অখন আল্লার দোয়ায় নামযশ হইছে তার কাছে থাকেন গিয়া।

তার কাছে—নেতিবাচক মাথা নেড়েছেন আচমন। ছেলের কাছে তিনি যাবেন না। যে ছেলে বাপের খবর নেয় না সেই ছেলের কাছে যাবেন পিতৃত্বের অধিকারের দলিল দাখিল করতে? তিনি নিজেও লোকমুখে শুনেছেন তাঁর ছেলে নাকি বড় গাইয়ে হয়েছে; কলকাতায় বড় বড় জায়গায় গান গায়, গান গায় রেডিওতে। অনেক লোক নাকি সেই গান শোনে, মুখে মুখে গায়। তা তো হবেই। হাটে গঞ্জে তাঁর গান সুরু হলে কাতার দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে আর তাঁরই ছেলে যখন অতবড় জায়গায় গাইছে লোক তো সেখানে জমবেই।

চিঠি প্রথম প্রথম মেয়েও দেয় নি। বেশ কিছুদিন পর একটা আস্তানা জোগাড় করতে পেরেই লোকমুখে খবর দিয়েছে। অসুবিধে হলে তার কাছে চলে যেতে লিখেছে আরও কিছুদিন

পরে। মেয়ের চিঠি পেয়ে যুগপৎ আনন্দ বেদনা দুই-ই পেয়েছেন আচমন দাস। মেয়ের ব্যবহারের সুখ, দুঃখিত করেছে ছেলের ব্যবহারের জন্যে। আবার একবার মালতী চিঠি লিখেছে, এখানি দেশে খুব গোলমাল হইতেছে। তুমি সত্বর চলিয়া আসিও। একই চিঠিতে জামাইও লিখেছে দেশত্যাগী হতে। তারপরই তাঁর সেই জনস্রোতে গা ভাসানো।

অনেকদিন পর আজ আবার সেই সব পুরনো কথা স্পষ্ট মনে পড়ল আচমন দাস গায়েন-এর। মনে পড়াই শুধু নয়, কেমন একটা বেদনা—যে বেদনা কিছু-দিন ধরেই অনুভূত হচ্ছে। আজ আবার তীব্রভাবে বাজতে লাগল বুকে। তাঁর মাটির দেয়াল, খড়ের চালাটা হয়ত এখন আর দাঁড়িয়ে নেই। হরিদাস-এর বুড়া মা ছাড়া গ্রামে হিন্দু আর কেউই নেই হয়ত। তাতে তাঁর কি? সবাই তো

মানুষ। তাদের যেমন জানোয়ার আছে এদেরও তো হিংস্র। আবার ওখানেও তো আছে আমজাদ, আছে মোল্লাজান। শহীদুল্লাহ-ও তো আছেন। সবই যার সুন্দর সে ওই দেশ। সুন্দর তার মাটি, তার জল, তার গাছ-পালা। আর আছে সুন্দরী ধলেশ্বরী। এমনই সে দরিয়া যে তার ওপর নৌকা চাপলে গান আপনি ফোটে। সে এক গানের নদী।

ভাবতে ভাবতে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আচমন দাস-এর। মালতীর আচমকা ডাকে চোখ মেললেন। অন্ধকারে বাইরেটা বন্ধ। কেবলমাত্র টিপ টিপ বৃষ্টির অনুচ্চ শব্দ তিনি তখনও উপলব্ধি করতে পারলেন আপন হৃদয়ে। মালতী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার একহাতে একটা লণ্ঠন আর এক হাতে ছেঁড়া কাপড়ের ঢাকনায় ঢাকা রেডিওটা। বাবা চোখ খুলতে মালতী বলল, একটা কথা জিগামু বাবা?

কও—আচমন বললেন।

দাদার গান তো তুমি কুনোদিন শুনতে চাও না। দাদায় গায় ভালই। দ্যাশের গান গায়। তুমি যেই সব গান গাও হেইয়াই। আইজ খুব ভাল পোরোগ্রাম আছে—তোমার জামাই কইল বাবাকে শুনতে কও।

যে ছেলে পিতৃদত্ত নামটা পর্যন্ত বদল করে নিজের পছন্দমত নতুন নাম ধারণ করেছে, তার গান শুনতে ইচ্ছে হয় না আচমন গায়েন-এর। কোনদিন তিনি শোনেন নি। কিন্তু আজ জামাই বলেছে শুনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললেন, জামাই যখন কয়—

ব্যাস। মালতী আর না শুনলেও এটুকুই যথেষ্ট। অল্পদামী ট্র্যানজিস্টার রেডিওটা চালু করে দিল মালতী। যাবার সময় বলল, একটু বাদেই হইব।

লণ্ঠনের সলতেটাকে নিচু করে আলো কমিয়ে দিলেন আচমন। আলোটা এখন ভালই লাগছে, তবে মৃদু আলো। বাইরেটায় এখন আর কিছুই দেখা যায় না। দেশে থাকতে এমনি সময় কতদিন ধলেশ্বরীর পাড়ে বসে থেকেছেন, এমনি অন্ধকার মনে হয়েছে ধলেশ্বরীকেও। এখানে কেবল ওই দূরে, বহুদূরে কতকগুলো আলো দেখা যাচ্ছে তারার মত, দেশে তা দেখা যেত না। আলোগুলোকে তাই কেমন অস্বাভাবিক লাগে। আজ তবু বৃষ্টিতে আলোগুলো ঝাপসা। হঠাৎ আচমন চমকে উঠলেন, কি যেন বলল রেডিওতে? কে যেন পূর্ব-বাংলার পল্লীগীতি শোনাচ্ছে? কি যেন অদ্ভুত নাম? তবে কি এই? এই অদ্ভুত নাম নিয়েছে তাঁরই ছেলে, সেই লালচাঁদ? হ্যাঁ, গলায় স্বর শুনে বুঝলেন, সে-ই বটে। প্রথম টান মন্দ টানে নি, গলাও বেশ সাফ হয়েছে—আচমন গায়েন শুনতে লাগলেন ছেলের গান। কিন্তু এ কি? ওই গানের মধ্যে এসব কথা তো নেই! তাঁর গানই তো গাইছে লালচাঁদ—যে গান তিনি কুড়িয়ে পেয়েছেন ধলেশ্বরীর তীরে; যে রকম বহু গান পদ্মা-ধলেশ্বরী-আড়িয়ালখাঁর তীরে তীরে আপনি খুঁজে পায় গায়েন-মাঝি, আর ক্ষেত-খামারের খাটিয়েরা। কিন্তু কি বিকৃতি তার! সুর কি সেই সুর আছে? কথা? এসব কথা কোথায় পেল সে? কার কাছে শুনল? কে বানাল এসব জমিন ছাড়া কথা? ছি-ছি করেছে কি, লালচাঁদ? এটা কি হয়েছে? কিভাবে নষ্ট করেছে গান-টাকে? হায় হায়রে! বুড়ার বুকের মধ্যে যন্ত্রণার সমুদ্র উথালপাথাল। বন্ধ কর, বন্ধ কর মালতী, রেডিও বন্ধ কর—আচমন দাস আর্তনাদ করে উঠলেন। তিনি রেডিও বন্ধ করতে জানেন না, নিজের কানটাই বন্ধ করলেন দুই হাত চাপা দিয়ে। মালতী দৌড়ে এসে জানতে চাইল, কি হইছে বাবা?

এইটা কি গান হইতাছে! বন্ধ কর রেডিও, তরা এই গানেরে ভাল কস—!! এই গানেরে কস দ্যাশের গান?

মালতীর তো গানটা পাশের ঘর থেকে ভালই লাগছিল। বাবার অবস্থা দেখে তবু বন্ধ করে দিল। আচমন দাস তখন বিলাপ সুরু করেছেন; হায় হায় রে, গানটারে এক্কারে শ্যাষ কইর‍্যা ফালাইছে। অমন সুন্দর নিদান বাউলের গানখান।

থাউক তোমারে আর শুনতে হইব না—রেডিও নিয়ে চলে গেল মালতী। বুড়ার যেমন—ছেলেকে দেখতে পারে না তো গানও খারাপ। মালতী মনে মনে একটু বিরক্তই হল বাবার প্রতি। বুড়ো হলে মানুষের এমনিই হয়। একেই ভীমরতি বলে; মালতী ভাবল।

আচমন দাস অন্য ভাবনায় পড়লেন। এখানের মানুষেরা এইরকম রিক্ত গান শুনেই এমন হৈ-চৈ করে! তা তো করবেই, এখানে যে এ গান হয় না। এখানে অন্য নামের লালচাঁদ যে জগা-খিচুড়ি গান আপন মনগড়া সুরে গাইবে সেই গানই সুন্দর। গানের কি বোঝে এখানের মানুষ? মানুষ না, মানুষ না, মাটি। এইখানের মাটিতে এ গান নাই রেইখ্যা এইখানে যে মানুষ আসে তারাও সব গান ভুইল্যা যায়। আমার নিজের মাইয়া, সেও ভুইল্যা গেছে—হায়! ভগবান! নিজের মনেই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন আচমন দাস। বারংবার করলেন। তাঁর কেমন ভয় করতে লাগল। মনে হতে লাগল তিনিও বুঝি ভুলে যাবেন। সারা রাত আতংক জেগে রইল তাঁর মনে; তিনি প্রায় জেগেই রইলেন। শেষরাত্রে উঠে দেখলেন বৃষ্টি ধরেছে। আকাশ থেকে আলো নেমে প্রান্তরে আবার মরু-ভূমির আঙ্গিক করেছে রচনা। ভয়ে কেমন বুদ্ধি হারালেন আচমন। সেই লেগে থাকা আতংক অকস্মাৎ সজীব হয়ে উঠল। সব যেন ভুলে যাচ্ছেন। তিনি। কোন গানই তাঁর আর মনে থাকছে না—। তবে? তবে? ছটফট করে উঠলেন আচমন। বিছানার পাশে রাখা দোতরাটা তুলে নিয়ে ধলেশ্বরীর সুর আনবার চেষ্টা করলেন কণ্ঠে। না, মাঝির গান নয়, ফকিরের গান। আড়িয়ালখাঁ আর ধলেশ্বরীর তীরভূমির মানুষের ফসল কাটার গান। কিন্তু না ঠিক তেমনটি তো কই হচ্ছে না। তেমন করে কথা বলছে না তাঁরই সেই দোতারা! ব্যথিত আচমন দাস ভাওয়াইয়ার সুর আনবার চেষ্টা করলেন। এল মালতী। বলল, এত রাইতে মহল্লার লুকগুলিরে কি ঘুমাইতে দিবা না বাবা?

কন্যার হাতের লণ্ঠনের আলোয় তার মুখের বিরক্তি পাঠ করে নিমেষেই দোতারা নামিয়ে রাখলেন আচমন দাস। অপরাধীর ভীরু চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, না মা হইল না, হইল না। এইখানে হইব না মা—হাউ হাউ করে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধ। ব্যাকুলভাবে কাঁদতে লাগলেন।

আকাশে আলোর আভাস আসবার আগেই আচমন দাস দোতারাটা হাতে তুলে নিলেন। এখানে আর নয়। তিনি ফিরে যাবেন—সেই ধলেশ্বরীর তীরে, সেই মোল্লাজান-এর কুটিরের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পথ ধরে তার গাঙচিলি নৌকার পাটাতনে। জল ঘেঁষে ঘেঁষে ধলেশ্বরীর তীরে। ঢল নেমে যাওয়া পদ্মা-মেঘনার বালিযাড়ি চড়ায় জেগে-ওঠা তরুণ গ্রামের পথে, গঞ্জে, হাটে অথবা ভরা ধানের মাঠে গান। সেখানে অফুরন্ত কণ্ঠ সেখানে উদ্দাম—উধাও। সীমান্তের বন্দুকগুলোর দৃষ্টি এড়াতে হবে রাত্রে, তাই দিনে দিনে পথ চিনে তো সেখানে পৌঁছনো চাই—অনেকদিন পথ-না-চলা পায়ে পূব দিকের পথ ধরলেন আচমন দাস। সে পথ সূর্য ওঠার পথ—প্রাণ সূর্যের পথ।

এ যুগের নৃত্য ভাবনা ঃ একটি খসড়া

শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ভারতবর্ষে নৃত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, নৃত্যকলা খুবই প্রাচীন। সুপ্রাচীনকাল থেকেই যে ভারতবর্ষে নৃত্যের চর্চা হয়ে আসছে তার বলিষ্ঠ প্রমাণ দ্বিতীয়/তৃতীয় শতকের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ—নাট্যশাস্ত্র। মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রই প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত, নাটক ও নৃত্যের একটি প্রামাণ্য দলিল। ব্যক্তি হিসেবে ভরত ও তাঁর নাট্যশাস্ত্র প্রণয়নের সময় নিয়ে যদিও বিতর্ক আছে, তবু আমরা ঐ কচকচিতে না গিয়ে এটুকু বলতে পারি—ভরত যখন নাট্যশাস্ত্র প্রণয়ন করেন তারও আগে থেকে ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই উন্নতধরণের নাচের চর্চা ছিল। নইলে ভরত অত বড় উপপত্তিক বই লিখলেন কি করে?

প্রাক্-ভরত যুগ, ভরত যুগ ও উত্তর-ভরত যুগের পারম্পর্য রক্ষার্থে নন্দিকেশ্বরের "অভিনয় দর্পণ" ও খানকয়েক বই ছাড়া নাচের আর কোন উপকরণ খোঁজার চেষ্টা হয়েছে কিনা জানি না। সুতরাং নাট্যশাস্ত্রকে কেন্দ্র করে তৎসমসাময়িক নন্দিকেশ্বরের "অভিনয় দর্পণ" ও কোহল-মতঙ্গ সম্প্রদায়ের বইগুলি থেকে উপকরণ যা পাওয়া যায় তাতে নাচে ব্যবহৃত মুদ্রা, করণ, চারী, ভ্রমরী প্রভৃতির আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু কিভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ নাচ তৈরি হতো এবং সেই নাচকে কেন্দ্র করে যে ভাব ও রসের অভিব্যক্তি হতো তার কোন ব্যবহারিক বা ফলিত অনুশীলনী কিছু নেই, আছে শুধু বর্ণনা। এই বর্ণনা পড়ে কারুর পক্ষেই সম্ভব নয় একটি একক নৃত্য তৈরি করে প্রদর্শন করা। নৃত্যের প্রাণস্বরূপ ছন্দ ও লয়ের কোন উল্লেখ নেই। তা ছাড়া নাচের যেটা প্রধান ধর্ম অর্থাৎ গতিভঙ্গি, তারও কোন ইঙ্গিত নেই। ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণে নাচের আঙ্গিক বা প্রকরণ বিশ্লেষণ থাকলেও সব কিছু মিলিয়ে নাচ যে কিরূপ ছিল তা ধরে রাখবার কোন উপায়-পদ্ধতি তাতে নেই। তা ছাড়া কোন পূর্ণাঙ্গ একটি নৃত্যের কথাও পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র নাচে ব্যবহৃত অঙ্গহার, মুদ্রা ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং নৃত্যলিপি না থাকায় অতীতকালে নৃত্য কিরূপ ছিল তা আমরা ঠিক ঠিক ধরতে পারছি না। ঐ মুদ্রা, করণ প্রভৃতির মাধ্যমে অনুমান করতে পারি মাত্র। শুধুমাত্র অনুমান কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হতে পারে না।

কোন একটি নাচের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত যে গতিভঙ্গি নানা রকমারী নৃত্যের যোটক ও series চলছে তার কোন সুষ্ঠু প্রয়োগ বা প্রক্রিয়া নাট্যশাস্ত্রে নেই। এবং তা নেই বলেই নাট্যশাস্ত্রের যুগের আগে ও পরে কি ধরণের নাচ প্রচলিত ছিল তা সম্যকভাবে জানা যায় না। এ জন্য প্রয়োজন ছিল নৃত্যলিপির। কিন্তু তখন তা সৃষ্টি হয় নি। এবং হয় নি বলেই ঠিক কিভাবে নাচা হতো তার প্রমাণ নেই। এ কথা আগেই বলেছি। আর নেই বলেই এমন মূল্যবান নাচের কত আঙ্গিক-প্রকরণ হারিয়ে গেছে চিরতরে। সেই লুপ্ত ঐশ্বর্যকে উদ্ধার করার আর কোন উপায় এখন নেই। সুতরাং তার জন্য দুঃখ না করে বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে যে নৃত্যশিল্পের চর্চা

(1) BENESH — পদ্ধতি (HORIZONTA

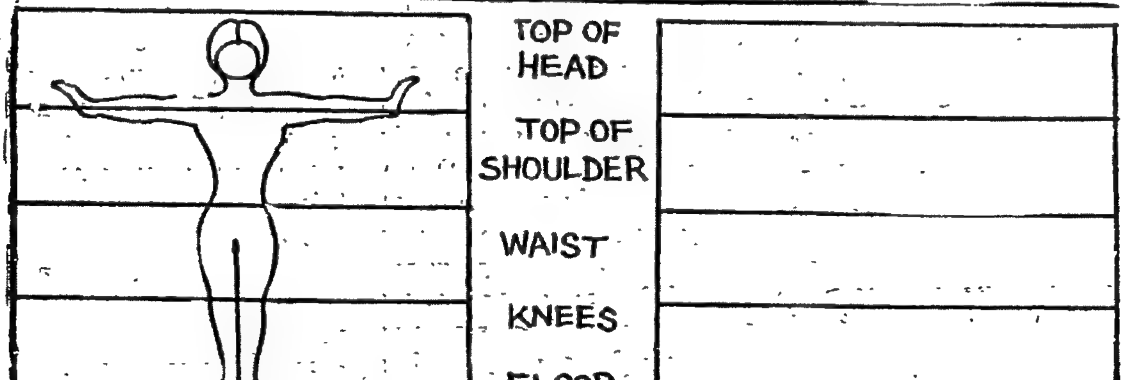

THE BASIC SYMBOLS —

	HANDS OR FEET	REBOWS OR KNEES (LIMBS BENT)
LEVEL (WITH THE BODY) =	—	+ (wide)
IN FRONT (OF THE BODY) =	|	+
BEHIND (THE BODY =	•	x

হচ্ছে তার প্রকৃত রূপকে ভবিষ্যতের জন্য ধরে রাখার প্রয়োজন আছে। না হলে যুগে যুগে অনুশীলিত হয়ে শিল্পের যে উৎকর্ষ সাধিত হয় তা ব্যাহত হবে এবং বহু শ্রমে উৎকর্ষিত রূপটি ভবিষ্যতের জন্য রেখে যাওয়া যাবে না। তা ছাড়া নৃত্যের নামে যে অরাজকতা চলেছে তাও রোধ করা যাবে না।

বর্তমান নৃত্যশিল্পীদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেই বলতে পারি যে, তাঁরা এখনো এ-বিষয়ে তেমন সচেতন হয়েছেন বলে মনে হয় না। নাচের প্রচার বেড়েছে এটা ঠিকই। এই শতাব্দীর পঞ্চমদশকেও কলকাতা বা আশেপাশে এত নৃত্য-শিক্ষায়তন বা প্রতিষ্ঠান ছিল না—যেমনটি এখন দেখা যায়। প্রতি উৎসব অনুষ্ঠানেই নাচের আয়োজন থাকে। নাচ ছাড়া কোন সঙ্গীতানুষ্ঠান সত্যিই অপূর্ণ থেকে যায়। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও নাচের এত প্রচলন ছিল না। নাচের চর্চা ছিল তখনো সীমাবদ্ধ। এর পর বিভিন্ন সঙ্গীত শিক্ষায়তনেও নাচের কোর্স চালু হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা কিভাবে শিখছে?

এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও গুটিকয়েক বিশিষ্ট সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য বেশির ভাগ সঙ্গীত বিদ্যালয়েই নাচের কোন সঠিক মানদণ্ড নেই। সেখানে যাঁরা নৃত্যগুরু বা শিক্ষক রয়েছেন তাঁরা তাঁদের নিজেদের শেখা বিষয়ের ওপরেই জোর দিন এবং সেই অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যতদূর জানি নাট্যশাস্ত্র বা অভিনয় দর্পণের নিয়মকানুনের ধার তাঁরা কমই ধারেন। প্রায় মর্জি মতোই অনেক জায়গায় ভরতনাট্যম, কথাকলি, কত্থক, মণিপুরী চর্চা হচ্ছে তা লক্ষ্য করেছি। প্রত্যেক নাচেরই কতকগুলি 'কমন আইটেম' আছে। যেমন ভরতনাট্যমে আলারিপু, যতিস্বরম, মণিপুরীতে রাস প্রভৃতি। অর্থাৎ নৃত্যগুরুরা যেমন-যেমন শিখেছেন সেটুকুই গিলিত চর্বণ করেন। এবং সেই গিলিত চর্বণও সব সময় প্রথাবদ্ধ কোন সুশৃঙ্খল নিয়ম বা ধারা মেনে বা কোন আদর্শ মানদণ্ডে হয় না।

প্রথম শিক্ষার্থীর নাচের উপযোগী দেহভঙ্গিমা প্রস্তুতকরণে কি কি পদকর্ম, হস্তকর্ম প্রভৃতি দরকার তারও কোন স্থায়ী তালিকা দেশের সব নৃত্যশিক্ষায়তন-গুলিতে নেই। সুতরাং যাব যেমন খুশি তেমনি তৈরি হচ্ছে বা চর্চা হচ্ছে। অথচ ইউরোপখণ্ডে ওদের ব্যালে নৃত্যের প্রতিটি হস্তকর্ম, পদকর্ম ছকে বাঁধা। এমন কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে হস্তপদ সঞ্চালন হয় তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভঙ্গিকেও ধরে রাখবার সাংকেতিক চিহ্ন আছে। এতে একটি সুবিধে এই যে, দলবদ্ধ নৃত্যেও চমৎকার শৃঙ্খলা দেখা যায়। একক নৃত্যেও ওদের ভঙ্গিমাগুলি ছকে বাঁধা। সুতরাং এলো-মেলো হবার উপায় নেই। সকলে একই ভাবে চর্চা করে, তারপর যার যেমন শিল্প-বোধ সে তেমন নাচকে ফুটিয়ে তোলে। এতে ধারাবাহিক প্রথাবদ্ধ পদ্ধতিতে শিখে তারপর শিল্পী নাচের স্বাধীনতা পায়। সে-জন্য ওদের দেশের যে কোন নৃত্য-শিক্ষায়তনে কতকগুলি পদক্ষেপ বা অঙ্গ-ভঙ্গি শিখতে হয় সকলকেই। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক প্রথায় ছকে বাঁধা পদ্ধতিতে তেমনভাবে চর্চার আয়োজন কম। আমাদের সারা দেশের জন্য একই ধরণের প্রথাবদ্ধ পদ্ধতি নেই বললেই চলে।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ওদের নাচের আঙ্গিক আলাদা এবং আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী নাচের মতো অত জটিল নয়। অত ভাব, রস ও তালের কচকচি ওদের নাচে নেই। কিন্তু তাহলেও বলবো—ওদের দেশে যদি Choreography বা Dance Notation তৈরি হতে পারে, তাহলে আমাদের এত উচ্চাঙ্গের নৃত্যসম্পদ থাকা সত্ত্বেও কেন নৃত্যলিপি তৈরি হবে না।

নৃত্যলিপি না থাকাতে আমাদের অনেক নৃত্যসম্পদ হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরা যাক—রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির কথা। চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নৃত্যনাট্যের প্রতিটি গান স্বরলিপিতে আবদ্ধ থাকায় কোনদিনই কোন শিল্পীর পক্ষে ঐ গানগুলিকে ঠিক রাবীন্দ্রিক গায়কীতে গাইতে অসুবিধে হবে না। (যদিও ইদানীং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি নিয়ে অনেক বাক্-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। তবু ঐ স্বরলিপি আছে বলেই গানের কাঠামোটা পাচ্ছি)। স্বরলিপি থেকে গান তোলার অভ্যেস যাঁদের আছে, তাঁরা গানগুলিকে কণ্ঠে তুলে কোনো বিশেষজ্ঞকে দিয়ে মার্জিত ও পরিশীলিত করে সুন্দরভাবে গাইতে পারবেন—এ উপায় আছে। কিন্তু নৃত্য-নাট্যের নাচগুলি যেভাবে ঐ সময় (রবীন্দ্র-নাথ বেঁচে থাকাকালীন) পরিকল্পিত হয়েছিল আজ তা সেভাবে পাচ্ছি কি? পক্ষান্তরে বলা যায়, গানের স্বরলিপি থাকায় গানগুলি অনেকটা অবিকৃতভাবেই পাওয়া যাচ্ছে। যদি নৃত্যলিপি থাকতো তাহলে ঐ গানগুলির সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-গুলিকেও সাংকেতিক লিপিতে আবদ্ধ করতে পারলে এখন ঐ লিপি দেখে নাচগুলিকে অবিকৃতভাবে পাওয়া যেত। কিন্তু তার উপায় নেই। শান্তিনিকেতনের পুরোনো শিক্ষকরা, যেমন শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ যতদিন আছেন, ততদিন তাঁরা হয়তো শুধরে দিতে পারবেন। কিন্তু এঁদের অবর্তমানে নাচগুলির কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। অথচ গুরু-দেব রবীন্দ্রনাথ যে নাচের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন তার বহু প্রমাণ আছে। গুরুদেবের নিজের ইচ্ছানুযায়ী পরি-কল্পিত নাচগুলিকে এখন আর অবিকৃত-ভাবে পাবার উপায় নেই। যদি নৃত্যলিপি থাকতো, তাহলে ঐ নৃত্যসম্পদও গানের স্বরলিপির মতো লিপিবদ্ধ করে রেখে দেওয়া যেত ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য। সিনেমায় ফটোগ্রাফির সঙ্গে যেমন শব্দ-যোজনার পদ্ধতি রয়েছে, তেমনি ঐ নৃত্য-নাট্যগুলিতে যদি পাশাপাশি স্বরলিপি ও নৃত্যলিপি থাকতো, তাহলে ঐগুলির রূপ দিতে বেগ পেতে হতো না।

এর পর ধরা যেতে পারে উদয়-শঙ্করের নৃত্যসম্পদ ও অন্যান্য ভারতীয় নৃত্যশিল্পীদের পরিকল্পিত নৃত্যের কথা। নৃত্যলিপির মাধ্যমে ঐ নৃত্য-প্রবাহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যেত। সুতরাং নানা দৃষ্টিকোণ থেকেই নৃত্য-লিপির আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বলা যেতে পারে।

নৃত্যের নিজস্ব ভাষাতত্ত্ব, বর্ণমালা, ব্যাকরণ সার্থকভাবে রূপায়িত করার সময় এসেছে। ব্যাকরণ কৌমুদি থেকে বাংলা ব্যাকরণকে অনেক দূর অগ্রসর করে দিয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পণের পর নাচের ব্যাকরণ আর অগ্রসর হতে পারছে না—এটা কোন গৌরবের কথা নয়।

নৃত্যলিপি থেকে নৃত্যকে দেহের ছন্দে রূপ দিতে হলে নৃত্যশিল্পীকে কিছু পরিশ্রম করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি অঙ্গভঙ্গির শাস্ত্রীয় পদ্ধতিকে যে চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করে লিপি তৈরি করা হবে,

সেই লিপি বা সাংকেতিক চিহ্নগুলির সঙ্গে আগে ভালভাবে পরিচিত হতে হবে। যেমন কোন ভাষা বা সাহিত্য পড়বার আগে সেই ভাষার বর্ণমালা, ব্যাকরণ জানতে হয়, তেমনি নৃত্যের বর্ণমালা ও ব্যাকরণ এবং লিপি প্রকরণের চিহ্নগুলিকে মুখস্থ করে ফেলতে হবে। এ ছাড়া নৃত্যের নিজস্ব পরিভাষা, ব্যাকরণ, অভিধান, মুদ্রাকোষ, লিপি প্রকরণ প্রভৃতি ব্যাপারে নজর দেবার সময় এসেছে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৃত্যশিক্ষাকে সর্বজনীন শিক্ষায় পরিণত করতে হলে এই নৃত্যলিপি তৈরি করা একান্ত দরকার। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা বলতে অনেকটা গুরুমুখী বিদ্যের কথাই বলা হচ্ছে। কারণ এ সকল বিদ্যা আগে ছিল গুরুমুখী। পঠন-পাঠন বা লিখনের তেমন কোন বালাই ছিল না। গুরু যা জানতেন, শিষ্যকে তাই শেখাতেন। এভাবেই বংশপরম্পরায় গিলিত চর্বণ হতো। আবার নতুন কিছুও সৃষ্টি হতো। সঠিক চর্চার অভাবে অনেক বিষয় অবক্ষয়িত হয়েছে। অথবা গুরু মারা যাবার পর সেই ধারা বা ঘরোয়ানা লুপ্ত হয়ে গেছে। অন্তত নাচের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথা স্বীকার করতেই হয়। এভাবে ভারতীয় নৃত্যের বহু মূল্যবান বিষয় হারিয়ে গেছে। কাজেই যতদিন পর্যন্ত না নৃত্যলিপি সৃষ্টি হয়ে একটা সর্বভারতীয় নৃত্যের মানদণ্ডে এই শিল্পকে পৌঁছে দিচ্ছে, ততদিন ভারতীয় নৃত্যের এই অবক্ষয়কে স্বীকার করে নিতেই হবে।

নৃত্যকলার ভবিষ্যৎ ভেবে আজ সকল নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য গবেষকদের কাছে তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিনীত আবেদন জানাই। অন্যথায় মহতী বিনষ্টি।

* * *

এবার নৃত্যলিপির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করে Benesh ও Laban-পদ্ধতির একটু দৃষ্টান্ত দেব। ভারতীয় নৃত্যলিপির সম্ভাব্য কাঠামোর একটু ইঙ্গিত এর সঙ্গে চিত্রাকারে থাকবে। পাঠকদের সুবিধার্থে এইটুকু যোগ করে দিলাম।

॥ নৃত্যলিপির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ॥

(A Brief History of Dance Notation)

আজ আমরা ভারতবর্ষে যে নৃত্যলিপির কথা ভাবছি, পাশ্চাত্যদেশে সেই নৃত্যলিপির সূত্রপাত হয় অনেকদিন আগে। ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের নৃত্যলিপির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বর্তমান নৃত্যলিপি পদ্ধতির মূলে রয়েছে প্রায় পাঁচ শত বছরের পরিশ্রম ও ক্রমবিবর্তন। অবশ্য নৃত্যলিপি-বিশেষজ্ঞদের মতে এই নৃত্যলিপির সূত্রপাত হয় প্রাচীন মিশরে, চিত্রধর্মী সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে। নৃত্যলিপির উদ্ভবের সময় ঈজিপ্টের নৃত্যভঙ্গিমাকে কতকগুলি চিত্রধর্মী সাংকেতিক বর্ণমালার মাধ্যমে চিহ্নিত করে রাখা হত।

পরে এই পদ্ধতির অনুসরণ বা অনুকরণে রোম দেশে আরেক ধরণের লিপিপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়, মিলিটারী কাজের সহায়ক হিসেবে। অর্থাৎ সৈনিকদের প্যারেড করার সময় কিভাবে হাত ও পায়ের সঞ্চালন হবে, তা কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে শেখানো হতো। সে যাই হোক, পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, স্পেনের অন্তর্গত cervera নামক জায়গায় মিউনিসিপ্যালিটির রেকর্ড ঘরে এখনো সেই মিশর ও রোমদেশীয় প্রাচীন লিপিপদ্ধতির দুটি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। ঐ পাণ্ডুলিপি দুইটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। উৎসাহী পাঠক বা গবেষক ইচ্ছে করলে উক্ত পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন।

সেই প্রাচীনকাল থেকে আরও কিছু লিপিপদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে পরবর্তীকালে। তার কিছু মহাকালের বুকে হারিয়ে গেছে চিরতরে, কিছু বা রয়েছে অবশিষ্ট। সেই অবশিষ্টাংশ নিয়ে যাঁরা করেছেন উত্তরসূরী নৃত্যলিপিকারগণ। কিন্তু সুসংবদ্ধ নৃত্যলিপি বা Dance Notation বলতে যা বোঝায়, তার সূত্রপাত আধুনিক যুগে।

(2) LABANOTATION - পদ্ধতি (VERTICAL)

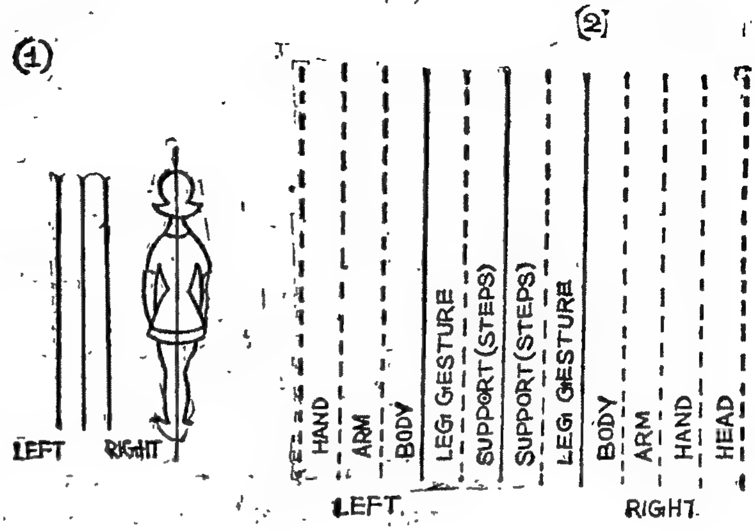

ইউরোপে স্বরলিপির সূত্রপাত হয় একাদশ শতাব্দীতে। অথচ ঐ স্বরলিপি সুষ্ঠুভাবে রূপ নিতে সুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে। সেই তুলনায় নৃত্যলিপির সূত্রপাত ও সুসংবদ্ধ রূপে পৌঁছনোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান যদিও কম, তবু চেষ্টা করতে হয়েছে প্রচুর। ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে খুবই পরিশ্রম করতে হয়েছে নৃত্যলিপিকারদের। তার কারণ গানের স্বরলিপি অপেক্ষা নাচের নৃত্যলিপি অনেক বেশি জটিল। সুতরাং সমস্যা কম নয়। তা ছাড়া নাচের যতই উন্নতি হতে থাকলো ততই ভঙ্গিমার বৈচিত্র্য দেখা দিতে লাগলো। এভাবে Dance Vocabulary বেড়েই চলল। এতে তিনটি সমস্যা দেখা দিল।

(১) জটিল নৃত্যভঙ্গিমার প্রতিটি অঙ্গবিক্ষেপের সার্থক রেকর্ড করা বা সাংকেতিক চিহ্নে সেগুলিকে আবদ্ধ করা।

(২) খুব কম সাংকেতিক চিহ্ন গ্রহণ করা, যাতে অল্প সময় ও অল্প পরিশ্রমে তা ব্যবহার করা যায়।

(৩) ঐ চিহ্ন ও লিপিকে সকলের জন্য বোধগম্য করে তোলা।

এভাবে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলল নৃত্যলিপি প্রস্তুতিকরণের কাজ।

প্রথম দিকে এক ধরণের নৃত্যলিপি তৈরি হয়েছিল পদক্ষেপের আদ্যক্ষরগুলি নিয়ে। যেমন Reverencia থেকে—R, Passo থেকে—P, Double থেকে De, Represa থেকে Re ইত্যাদি। কিন্তু এই পদ্ধতি ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ নাচের পদক্ষেপগুলিই এতে চিহ্নিত হতো।

কিন্তু নাচের অন্যান্য অঙ্গ বিক্ষেপ চিহ্নিত করা ঐ পদ্ধতিতে সম্ভব হল না।

এর পর নৃত্যকে দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে লিপির মাধ্যমে বর্ণনা করার জন্য THOINOT ARBEAU'S নামে এক ব্যক্তি "Orchesographic" নামে একটি বই প্রকাশ করেন ১৫৮৮ খৃঃ। তিনি যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা অত্যন্ত সরল। চীন দেশের চিত্রধর্মী লিপির মতো। নৃত্যে দাঁড়াবার ভঙ্গি, পদক্ষেপগুলি চিত্রের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করেছিলেন। এই নৃত্য-লিপিগুলি গানের স্বরলিপির পাশাপাশি লেখা হতো। এতেও অসুবিধা দেখা দিল। অর্থাৎ T. ARBEAU-র দীর্ঘ বর্ণনামূলক লিপিগুলি উপলব্ধি করে নাচ তুলতে অনেক সময় লেগে গেল।

বিখ্যাত কোরিওগ্রাফার মিঃ লাবান (যাঁর নামে, এ্যান হাচিনসান নামে এক ভদ্রমহিলা তাঁর নৃত্যলিপি গ্রন্থের নাম দিয়েছেন — LABANOTATION) নৃত্যলিপি প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন —প্রায় দুশো বছর আগে ফরাসী কোর্টে একজন লেখক এই বলে অভিযোগ করেছিলেন যে—আজকাল দেখা যাবে মহিলার খাতের টেবিলে বাইবেল অপেক্ষা কোরিওগ্রাফির বইয়ের সংখ্যা ও আদর বেশি। এ থেকেই অনুমান হয়, দুশো বছর আগেই ফরাসী মহিলারা নৃত্যলিপি বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁরা এ বিষয়ে চর্চাও করতেন। বেশির ভাগ মহিলারাই তখন Beauchamps-Feuillet-এর Dance Notation পড়তেন। শোনা যায় উক্ত মহিলারা নাকি স্বরলিপি বা সাধারণ লেখাপড়ার মতোই অতি দ্রুত নৃত্যলিপি পড়তে পারতেন। এভাবে ওদেশে নৃত্যলিপির চর্চা বেড়েছে এবং তাতে নৃত্যলিপির আলাদা একটি "লিটারেচার" গড়ে উঠেছে।

যে Beauchamps-এর কথা বলছিলাম, তিনি নৃত্যলিপির একজন উদ্ভাবক হিসেবে স্বীকৃতি পান ১৬৬৬ খৃঃ। এই স্বীকৃতি দেন ফ্রেন্স এ্যাক্ট অব পার্লিয়ামেন্ট। এর কয়েক দশক বাদে Feuillet ঐ নৃত্যলিপির ওপর বই প্রকাশ করেন। তাই Beauchamps ও Feuillet-এর নাম ফরাসী নৃত্যলিপির ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

এর পর চতুর্দশ লুইয়ের সময় থেকে পেশাদার নৃত্যের ক্ষেত্রে কিছু সাংকেতিক চিহ্নযুক্ত নৃত্যলিপি চালু হয়। এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে Feuillet তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি নিয়ে একখানা বই লেখেন। নাম "Choreography on l' Art de decrire la Danse." Feuillet-এর পদ্ধতিতে ওদের দেশের ক্ল্যাসিক্যাল ব্যালের পদক্ষেপগুলি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এটা অনেকটা "track drawing"-এর মতো। মনে হতো যেন নৃত্যশিল্পী তাঁর পায়ের বিচিত্র গতিভঙ্গিতে নৃত্যমঞ্চের ওপর একটি প্যাটার্ন তৈরি করতেন। Feuillet-র বই ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে ঐ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৮৫২ খৃঃ Arther Saint—Leon একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তার নাম হল—"Stenochoreographic". এই পদ্ধতিরই রূপান্তর করেন Albert Zorn—১৮৮৭ খৃঃ তিনি যে বইটি লেখেন তার নাম—"Grammar of the Art of Dancing."

এতক্ষণ আমরা দেখছিলাম যে, বেশির ভাগ কোরিওগ্রাফারই নাচের পদক্ষেপের ওপরেই জোর দিয়েছেন। দেহের অন্যান্য ভঙ্গিগুলি প্রায় অবহেলিত থেকেছে। দেহের প্রতিটি অঙ্গের গতিভঙ্গিকে সমদৃষ্টিতে দেখে নৃত্যলিপি তৈরির প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় Vladimir Stepanoff পদ্ধতিতে। ইনি ছিলেন সেন্ট-পিটার্সবার্গের বিখ্যাত ইম্পিরিয়াল মেরিনস্কি থিয়েটারের নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যশিক্ষক। তিনি ১৮৯১ খৃঃ যে

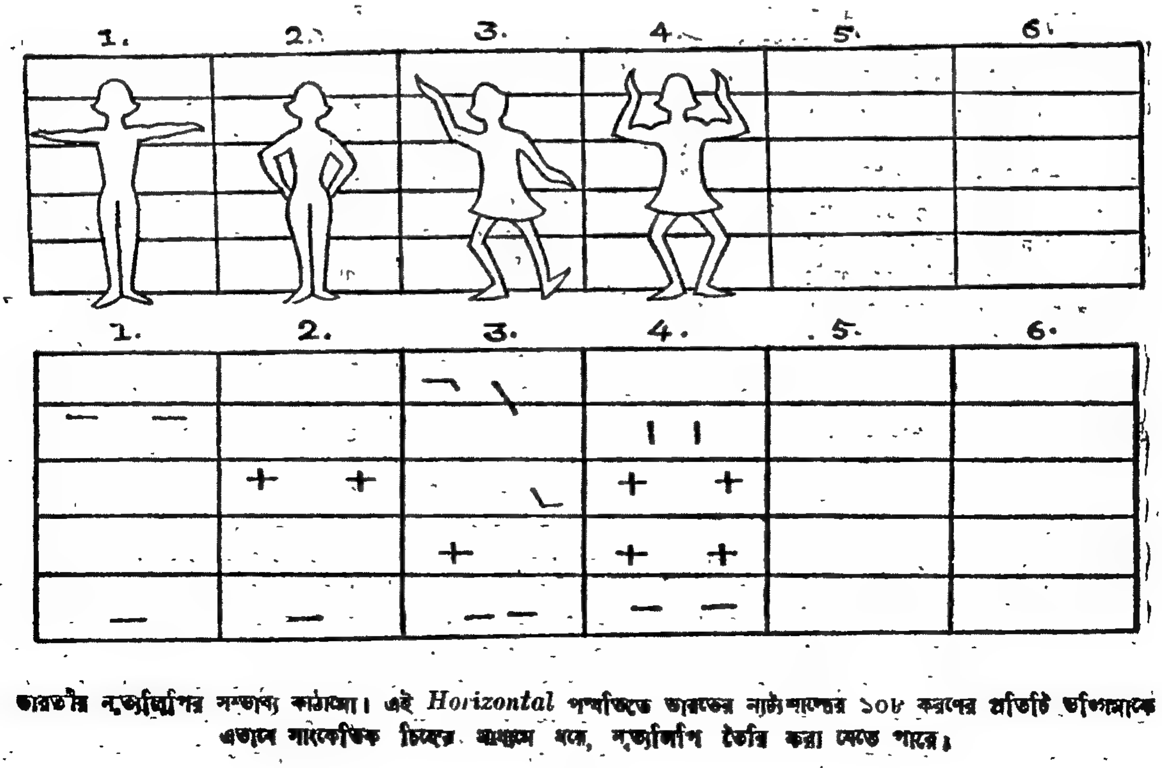

ভারতীয় নৃত্যলিপির সম্ভাব্য কাঠামো। এই *Horizontal* পদ্ধতিতে ভারতের নাট্যশাস্ত্রের ১০৮ করণের প্রতিটি ভঙ্গিমাকে এভাবে সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে ধরে, নৃত্যলিপি তৈরি করা যেতে পারে।

বইটি প্রকাশ করেন তার নাম—"Alphabet des Mouvements du Corps Humain." এই পদ্ধতি বেশির ভাগই ব্যবহৃত হতো ব্যালে নাচে। একক বা দ্বৈত নৃত্যে তেমন নয়।

এর পর Margaret Morris-এর লেখা "Notation of Movement." বইটি প্রকাশিত হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। এই বইয়ে ব্যবহৃত পদ্ধতিও ত্রুটিমুক্ত নয়। নৃত্যলিপির সুরু থেকে এ পর্যন্ত যত পদ্ধতি দেখা গেল তার সবটাই লেখা হতো horizontal system-এ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঐই পদ্ধতিতে লিখতে হতো। যে বছর মরিসের বই প্রকাশিত হয়, সেই ১৯২৮ খৃষ্টাব্দেই এক যুগান্তকারী নতুন নৃত্যলিপির উদ্ভাবন করেন Rudolf Laban. ইনিই প্রথম Vertical অর্থাৎ লম্বালম্বি পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এতে ওপর, নিচ, ডানদিক, বাঁদিক, সামনে, পেছনে সমস্ত রকম দৃষ্টিকোণ থেকেই নৃত্যশিল্পীর সমগ্র দেহভঙ্গির রূপটা ধরা পড়লো প্রথম। শুধু তাই নয়, পদক্ষেপ দ্রুত, কি বিলম্বিত হবে তাও চিহ্নিত হলো প্রথম। কাজে-কাজেই বর্তমানেও এই Laban-পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নৃত্যলিপি বলে আদৃত হচ্ছে। Laban এই পদ্ধতির নাম দেন "Kinetographic Laban."

Laban-এর এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তাকে আরও সহজগ্রাহ্য করে তোলেন এ-যুগের বিখ্যাত কোরিওগ্রাফার এ্যান হাচিনসন্। ইনি নিউইয়র্কের ডান্স নোটেশন ব্যুরোর প্রাক্তন সভানেত্রী। এ্যান হাচিনসনের তৈরি LABANOTATION পদ্ধতিই এখন ওদেশে খুব চালু।

এই Labanotation ছাড়া Horizontal আরেকটি পদ্ধতির পরিচয় কিছুদিন হলো পেয়েছি। এই পদ্ধতিকে বলা হয় Benesh পদ্ধতি। এটি লণ্ডনে খুব জনপ্রিয় পদ্ধতি। Benesh লেখা বইটির নাম—"An Introduction to Benesh Dance Notation."

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় চারশত বছরের ইতিহাস কখনো ছোট প্রবন্ধের পরিধিতে মাপা যায় না। অর্থাৎ সম্ভব নয়। তথাপি আমাদের দেশে নৃত্যলিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের প্রধান প্রধান কয়েকটি রীতি-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হল। উৎসুক পাঠকের এই সূত্র ধরে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

পাশ্চাত্য দেশের জনপ্রিয় নৃত্য-পদ্ধতির মধ্যে দুটি কাঠামো—Vertical ও Horizontal. আমার মনে হয় ভারতীয় নৃত্যলিপির সম্ভাব্য কাঠামো Horizontal হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ ভারতীয় স্বরলিপিও Horizontal. সুতরাং যদি Horizontal পদ্ধতিতে করা যায় তাহলে যে কোন নৃত্যনাট্যের গানের স্বরলিপি ও নৃত্যের নৃত্যলিপি একই লাইনে করা যাবে। অতএব দেখা যাচ্ছে Benesh পদ্ধতিই ভারতীয় নৃত্যলিপি প্রস্তুতিকরণে সহজ, সরল ও নিরাপদ পথ। অবশ্য গবেষকরা বিকল্পটাও ভেবে দেখতে পারেন।

এই তব শুভ আশীর্বাদ !

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে গান্ধিজী কথাপ্রসঙ্গে প্রিয় শিষ্য শ্রীসতীশ দাশগুপ্তকে বলেছিলেন, তাঁর বড় ইচ্ছে যে একটি সত্যিকারের ভালো স্বদেশী কালি তৈরী হয়। দেশের মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত দুই তরুণ "মৈত্র" ভ্রাতা তখন সবে জেল থেকে বেরিয়েছেন। সতীশ বাবু তাঁদের দুজনকে ডেকে এই মহৎ কাজের ভার দেন। সহায় সম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই, তবু শুধু নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেম সম্বল করেই তাঁরা দুজন এই দুঃসাধ্য ব্রতের ভার মাথায় তুলে নেন। আজকের বিশ্ববিখ্যাত সুলেখা ফাউন্টেন পেন কালির এই হল গোড়ার কথা।

সুলেখার আজ যে এই সুনাম ও সমাদর, এটা গ'ড়ে উঠতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে, নিরলস গবেষণা, কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সমর্থনে এই বিপুল সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

যাঁর প্রেরণা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু, সেই জাতির জনকের পুণ্য জন্মশতবর্ষে, তাঁর উদ্দেশ্যে বিনত নমস্কারে নিবেদন করি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

Progressive/SW-46

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

[পূর্ব—প্রকাশিতের পর]

ডলস হাউস

[হেলমারের প্রস্থান—মিসেস লিন্ডের প্রবেশ।]

মিসেস লিন্ড—চিনতে পারছ?

নোরা—(একটু সময় দিয়ে) আরে ক্রিস্টিন যে—কতদিন বাদে দেখা বলত? কি অদ্ভুতভাবে বদলে গেছ তুমি, প্রথমটায়......

মিসেস লিন্ড—ন'-দশ বছর বাদে দেখছ—তাই এই চেহারাটা চোখে লাগছে।

নোরা—এতদিন হয়ে গেল? —তা বটে। গত আট বছর আমার কিন্তু বেশ ভালই কেটেছে। যাক, কতদূর থেকে আবার এতদিন পরে শহরে এলে?

মিসেস লিন্ড—আজ সকালের স্টিমারেই এসে পৌঁছেছি।

নোরা—ক্রিসমাসটা এবার বেশ আনন্দে কাটবে। কি মজা! আজ সন্ধ্যাটায় একসঙ্গে বেশ হৈ-হৈ করা যাবে। এস বসা যাক—তুমি কিন্তু ভাই আগের থেকে রোগা হয়ে গেছ।

মিসেস লিন্ড—আর বয়সটাও যেন অনেকটা বেড়ে গেছে না?

নোরা—তেমন কিছু নয়—সামান্য। কিন্তু আমি কি বোকা দেখ—তুমি কিছু মনে কোরো না ক্রিস্টিন।

মিসেস লিন্ড—কেন বলতো?

নোরা—তোমার স্বামী মারা গিয়েছেন—আহা বেচারী ক্রিস্টিন!

মিসেস লিন্ড—হ্যাঁ তিন বছর আগে তিনি মারা গিয়েছেন—আমাকে প্রায় সর্বস্বান্ত করে দেউলিয়া করে।

নোরা—তার মানে?

মিসেস লিন্ড—না রেখে গেছেন কোন ছেলে-মেয়ে—না কোন টাকাপয়সা, না ভাববার মত সুখদুঃখের স্মৃতি।

নোরা—এও কি সম্ভব?

মিসেস লিন্ড—(ম্লান হেসে) মাঝে মাঝে এ রকম ঘটনাও জগতে ঘটে থাকে নোরা।

নোরা—তার মানে তুমি একেবারে একা? ভাবতেও ভয় লাগে...আমার তিনটি ছেলেমেয়ে—সত্যিই ভারি lovely—এখন নার্সের সঙ্গে বেড়াতে গেছে—পরে দেখাব। এবার কিন্তু তোমার কথা শুনবো।

মিসেস লিন্ড—আমি কিন্তু তোমার কথা শুনতেই উৎসুক।

নোরা—না, তুমিই সব বল—আজ আমি কোনরকম স্বার্থপরতা করব না—আজ শুধু তোমার কথাই আলোচনা করব। তবে একটা খবর তোমাকে না দিয়ে পারছি না—আজকে আমাদের একটা ভারি সুখবর এসেছে।

মিসেস লিন্ড—কি খবর?

নোরা—আমার স্বামী এখানকার সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

মিসেস লিন্ড—সত্যিই সুখবর।

নোরা—ব্যারিস্টারিতে রোজগারের কোন স্থিরতা নেই—তার ওপর হেলমার আবার কোন অন্যায় মামলা হাতে নেবে না। আমিও অবশ্য এ বিষয়ে তার সঙ্গে একমত। সুতরাং বুঝতেই পারছ—সে ক্ষেত্রে হেলমার এই চাকরিটা পাওয়াতে আমরা কি খুশিই না হয়েছি। নতুন বছরে 'ও' কাজে যোগ দেবে—ভাল মাহিনা, তার ওপর প্রচুর কমিশন। যাক, ভবিষ্যতে আর কষ্ট করে বুঝে-সুঝে চলতে হবে না—হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। সত্যিই ক্রিস্টিন, আজ যে কি relieved feel করছি—টাকার অভাব নেই—দুশ্চিন্তা নেই—

মিসেস লিন্ড—অর্থাভাব না থাকাটাই যে কত বড় আনন্দের কথা—

নোরা—অভাব তো থাকবেই না, বরং ইচ্ছামত খরচ করবার জন্য প্রচুর টাকা হাতে থাকবে।

মিসেস লিন্ড—(হাসতে হাসতে) বয়সের সঙ্গে বোধহয় বুদ্ধি একটুও পাকে নি—স্কুলে থাকতে যেমনটি ছিলে এখনও ঠিক সেই রকমই দু' হাতে পয়সা নষ্ট করতে ভালবাস।

নোরা—তা বৈকি! টরভ্যাল্ড অবশ্য তাই বলে। তাছাড়া এতদিন নষ্ট করবার মত পয়সাও আমাদের ছিল না। দুজনকেই যে আমাদের চাকরি করতে হয়েছে এতকাল।

মিসেস লিন্ড—তোমাকেও?

নোরা—হ্যাঁ, আমাকেও। বিয়ের পরই টরভ্যাল্ড তার চাকরি ছেড়ে দিল—ও চাকরিটার মাহিনাও ছিল কম আর ভবিষ্যতেও কিছু হবার মত আশা ছিল না। আমাদের দরকার টাকার। প্রথম বছরটায় টরভ্যাল্ডকে যে হাড়ভাঙা খাটুনী খাটতে হল, তার ফলে ও পড়ল মারাত্মক অসুখে। ডাক্তার বললে হাওয়া বদল না করলে ওর শরীর সারবে না।

মিসেস লিন্ড—তোমরা প্রায় বছরখানেক ইটালীতে কাটিয়ে এসেছিলে সে সময়—না?

নোরা—কত বাধা, কত বিপত্তি কাটিয়ে যে যেতে হয়েছিল কি বলব। তখন সবে আইভার জন্মেছে। যা হোক টরভ্যাল্ড তো সেরে উঠল—কিন্তু কি ভয়ানক খরচ লাগল সে শুধু আমি জানি—সব-শুদ্ধ প্রায় আড়াইশো পাউন্ড।

মিসেস লিন্ড—কিন্তু বিপদের সময় টাকাটা যে পেয়েছিলে সেটাও কম কথা নয়।

নোরা—তোমাকে বলতে বাধা নেই—ও টাকাটা বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

মিসেস লিন্ড—হ্যাঁ-হ্যাঁ—আর প্রায় সেই সময়েই উনি মারা যান—না?

নোরা—বাবার মৃত্যুর মাসখানেক বাদেই আমরা ইটালী যাই।

মিসেস লিন্ড—তোমার স্বামী তো এখন সম্পূর্ণ সুস্থ—তবে আবার ডাক্তার?

নোরা—ও ডাক্তার র‍্যাঙ্কের কথা বলছ? উনি আসেন পারিবারিক বন্ধু হিসাবে। (লাফিয়ে উঠে) সত্যি ক্রিস্টিন! সুস্থ জীবন কি আনন্দের। আচ্ছা ভাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—রাগ কোরো না—স্বামীকে কি তুমি একেবারেই ভালবাস নি? তাহলে তাকে বিয়ে করতে গেলে কেন?

মিসেস লিন্ড—তখন মা'র শরীর খুব খারাপ, ছোট ভাই দুটির ভারও আমার ওপর তাই ওকে বিয়ে করাই সব দিক দিয়ে ভাল হবে বলে মনে হয়েছিল।

নোরা—তার আর্থিক অবস্থা তো ভালই ছিল বলে শুনেছি।

মিসেস লিন্ড—আমাদেরও প্রথমটায় তাই ধারণা ছিল—কিন্তু আসলে তার ভেতরটা ছিল একেবারে ফাঁপা—তাই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেল। একটা পয়সাও ওখান থেকে পেলাম না।

নোরা—তারপর?

মিসেস লিন্ড—কি আর করি? এটা ওটা করে কিছুদিন কাটালাম। কয়েক দিন একটা ছোটদের স্কুলও চালিয়েছিলাম। শেষ তিন বছর আর বিশ্রাম করবারও সময় পাই নি। এবার ছুটি পেয়েছি। কিছুদিন আগে মা মারা গেলেন। ভাই দুটিও চাকরি পেয়ে চলে গেল।

নোরা—এবার তাহলে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে বল?

মিসেস লিন্ড—তা বটে। তবে সব কিছু কেমন

ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে। ওখানে আর মন টিকল না। ভাবলুম এখানে এসে যদি একটা কাজ জুটে যায়।

নোরা—কিন্তু চাকরি করা ব্যাপারটা যে কি ক্লান্তিকর—তার চেয়ে কিছুদিন বরং দেশভ্রমণ করে এস না।

মিসেস লিণ্ড—তাতে যে টাকা লাগে অনেক—আমার তো আর বাবা বেঁচে নেই যে তাঁর কাছ থেকে টাকা চেয়ে নেব! সব চেয়ে খারাপ লাগে কি জান? জীবনে আর করবার কিছু নেই। এ যেন নেহাৎ বাঁচতে হবে বলেই বাঁচা—থাক—তোমাদের সৌভাগ্যে আমারও বোধহয় কপাল ফিরল। তোমার স্বামীকে বলে আমার একটা কাজ জুটিয়ে দিতে হবে ভাই।

নোরা—নিশ্চয়ই—এ ওকে করতেই হবে—তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

মিসেস লিণ্ড—অনেক ধন্যবাদ। নিজে জীবনে দুঃখকষ্ট না পেয়েও অন্যের জন্য এ সহানুভূতি তোমার মনের উদারতার পরিচয় দেয় নোরা।

নোরা—আমি জীবনে দুঃখকষ্টের মূর্তি দেখি নি বলতে চাও?

মিসেস লিণ্ড—অর্থাৎ স্বামীর অসুখের সময় চিন্তাভাবনা করেছ এই তো?

নোরা—আসল কথাটাই তোমাকে বলি নি।

মিসেস লিণ্ড—সে আবার কি?

নোরা—মায়ের জন্য অনেক কষ্ট করেছ, ভাইদের মানুষ করেছ, এজন্য মনে মনে তোমার একটু গর্ব আছে নয় কি ক্রিস্টিন?

মিসেস লিণ্ড—গর্ব যদি থাকে—সেটা কি অন্যায়?

নোরা—না—তা বলছি না, তবে ও ধরনের গর্ব করবার মত ঘটনা আমার জীবনেও ঘটেছে।

মিসেস লিণ্ড—কিসের কথা বলছ বল দেখি?

নোরা—এ কথা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ জানে না। এমন কি টরভ্যাল্ডও না। এখন শুধু তোমাকেই বলছি।

মিসেস লিণ্ড—ব্যাপারটা কি?

নোরা—টরভ্যাল্ডের জীবন একরকম আমিই বাঁচিয়েছি।

মিসেস লিণ্ড—তার মানে?

নোরা—ইটালীতে হাওয়া বদলাবার কথা বললাম না—

মিসেস লিণ্ড—হ্যাঁ, তবে খরচের টাকাটা তো তোমার বাবাই সব দিয়েছিলেন।

নোরা—সবাই তাই জানে বটে, কিন্তু আসলে টাকাটা সব আমিই জোগাড় করেছিলাম। বাবার থেকে কিছুই পাই নি।

মিসেস লিণ্ড—টাকা পেলে কি করে? অত টাকা ধার পাওয়া তো মুস্কিল।

নোরা—ধারই যে করেছিলাম কে বললে? ধর না আমার কোন একজন admirer আমাকে টাকাটা দিয়েছে, চেহারাটা আমার attractive, সে কথা মান তো?

মিসেস লিণ্ড—একেবারে পাগল! কিন্তু একটু ছেলেমানুষী করে ফেল নি কি?

নোরা—স্বামীর জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করাটা বুঝি ছেলেমানুষী?

মিসেস লিণ্ড—না, না,—তাঁকে এই না জানানোর ব্যাপারটা—

নোরা—ওকে জানানো সম্ভব ছিল না। কারণ, ধার করবার কথা ওকে বলতে গেলে ও দারুণ চটে উঠতো, অথচ চেষ্টা না পেলে ওকে বাঁচানো যেত না হয়তো।

মিসেস লিণ্ড—তোমার স্বামী কি তোমার বাবার কাছ থেকেও শুনতে পান নি যে, টাকাটা তাঁর কাছ থেকে নাও নি?

নোরা—পাগল আর কি। ওর মত স্বাধীন প্রকৃতির স্বামীর পক্ষে এ কথা ভাবাও কষ্টকর যে, কোন কারণে উনি তাঁর স্ত্রীর কাছে ঋণী। কেমন? এখনও কি মনে কর যে, আমি ঠিক ছেলেমানুষটিই আছি? আমাকে দিয়ে কোন serious কাজ হতে পারে না? এসব নিয়ে একসময় যে কি দুশ্চিন্তায় দিন কেটেছে ক্রিস্টিন তা কি বলব তোমায়। সুদ আর নিয়মিত হারে ঋণশোধ, ও দুটো যে কি ভয়ানক ব্যাপার তা তুমি ভাবতেই পারবে না। সংসার খরচ থেকে বিশেষ কিছুই বাঁচাতে পারতুম না। টরভ্যাল্ড বা শিশুদের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সেটাও তো দেখতে হত।

মিসেস লিণ্ড—অতএব যা কিছু save করেছ নিজেকে বঞ্চিত করে। তাই নয় কি?

নোরা—উপায় কি বল? নিজের জন্য প্রয়োজন মত সবচেয়ে সস্তা দামে সাদাসিধে জিনিস কিনেছি। সব জামা-ই আমার গায়ে সুন্দর fit করে। টরভ্যাল্ডের চোখে তাই কখনও কিছু ধরা পড়ে নি। গত শীতের সময় কিছু copy করবার কাজ পেয়েছিলাম। তাতেও কিছু রোজগার করেছি।

মিসেস লিণ্ড—এভাবে কত টাকা শোধ করতে পেরেছ?

নোরা—তা ঠিক হিসাব করি নি। তবে এ কথাটাও বলতে পারি যে, যা বাঁচাতে পেরেছি তার প্রত্যেকটা পয়সা ঋণশোধের জন্যই দিয়েছি। (হাসতে হাসতে) জান ক্রিস্টিন, এ নিয়ে যখন মন খারাপ লাগত—তখন বসে বসে কল্পনা করতুম, এক টাকাপয়সাওয়ালা বুড়ো আমাকে ভালবেসে ফেলল—আর তার মৃত্যুর সময় তার সমস্ত সম্পত্তি উইল করে আমায় দিয়ে গেল।

মিসেস লিণ্ড—বল কি? লোকটা কে?

নোরা—(হাসির সঙ্গে) আরে এ তো সত্যি নয়—নিছক কল্পনা। (বাইরে কলিং-বেলের শব্দ)

মিসেস লিণ্ড—কেউ আসছে—আমি উঠি।

নোরা—আমার কাছে নয়। নিশ্চয় টরভ্যাল্ডের কাছে কেউ দেখা করতে এসেছে।

হেল্পার—(দরজা থেকে) এক ভদ্রলোক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান—কিন্তু সাহেবের ঘরে এখন ডক্টর র‍্যাঙ্ক আছেন।

ক্রগস্টাড—(দরজা থেকে) মিসেস হেলমার!

(নোরা চমকে উঠবে, ক্রিস্টিন জানালার দিকে সরে যাবে)

নোরা—(চাপা গলায়) আপনি এখানে? আমার স্বামীর কাছে কি কিছু দরকার?

ক্রগস্টাড—নেহাৎ নীরস ব্যাঙ্কের কাজে মিসেস হেলমার—আর কিছুর জন্য নয়—

নোরা—তাহলে ঐ ঘরে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করুন। (ক্রগস্টাডের প্রস্থান)

মিসেস লিণ্ড—ভদ্রলোকটি কে বলত?

নোরা—একজন ব্যারিস্টার, নাম ক্রগস্টাড।

মিসেস লিণ্ড—তাহলে সেই বটে।

নোরা—ওর সঙ্গে পরিচয় আছে নাকি?

মিসেস লিণ্ড—বহুকাল আগে আলাপ ছিল। এক সময় আমাদের শহরে প্র্যাকটিস

করতেন। কিন্তু চেহারা অনেক বদলে গেছে।

নোরা—ভদ্রলোক বিবাহিত জীবনে সুখী হন নি। স্ত্রী অবশ্য মারা গিয়েছেন। ছেলে-মেয়েও অনেকগুলি।

মিসেস লিন্ড—শোনা যায় ভদ্রলোক আজকাল নাকি অনেকরকম ব্যবসা করেন?

নোরা—তা হয়তো হবে—আমি ঠিক বলতে পারিনা।

(ডক্টর র‍্যাঙ্কের প্রবেশ)

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—ক্ষমা করবেন, আপনি ব্যস্ত আছেন জানলে বিরক্ত করতাম না—

নোরা—মোটেই ব্যস্ত নই— আসুন আলাপ করিয়ে দিই—ডক্টর র‍্যাঙ্ক—মিসেস লিন্ড।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—(মিসেস লিন্ডের প্রতি) আপনি বুঝি শহরে বেড়াতে এসেছেন?

মিসেস লিন্ড—কতকটা তাই বটে। তবে একটা চাকরি পেয়ে গেলে এখানেই settle করব ভাবছি।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—বেশ ভাল কথা, তাহলে তো আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হবে।

নোরা—হেলমারের ঘরে যে লোকটি গেল ওকে চেনেন নাকি ডক্টর র‍্যাঙ্ক?

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—ও একজন ব্যারিস্টার, নাম ক্রুগস্টাড। ব্যাঙ্কের ব্যাপারে হেলমারকে কি সব বলছিল।

নোরা—ওর আবার ব্যাঙ্কে কি কাজ পড়ল?

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—ক্রুগস্টাড ওখানেই চাকরি করে—

নোরা—আচ্ছা ডক্টর র‍্যাঙ্ক—ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মচারী এখন টরভাল্ডের সব আদেশ মেনে চলতে বাধ্য তো?

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—তা খানিকটা সেই রকম বটে।

(হেলমারের প্রবেশ)

নোরা—টরভাল্ড। ওই লোকটির হাত থেকে রেহাই পেলে?

হেলমার—হ্যাঁ, এই মাত্র গেল।

নোরা—এস আলাপ করিয়ে দিই। এই হল ক্রিস্টিন, সবে শহরে এসেছে।

হেলমার—ক্রিস্টিন! ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি তো ঠিক—

নোরা—মিসেস লিন্ড গো—ক্রিস্টিন লিন্ড।

হেলমার—বুঝেছি। আপনি নিশ্চয় আমার স্ত্রীর স্কুলের সহপাঠিনী।

মিসেস লিন্ড—ঠিকই ধরেছেন।

নোরা—জান টরভ্যাল্ড—ক্রিস্টিন অতদূর থেকে কেন শহরে এসেছে? শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

হেলমার—তার মানে?

নোরা—Book Keeping ব্যাপারটা ও বেশ ভাল জানে, তাই চায় তোমার মত পাকা লোকের সঙ্গে কাজ করে নিজেকে সব দিক থেকে perfect করে নিতে।

হেলমার—খুবই sensible কথা।

নোরা—ক্রিস্টিনের একটা ব্যবস্থা তোমাকে করে দিতেই হবে টরভ্যাল্ড।

হেলমার—বোধহয় ওঁর একটা ব্যবস্থা করা অসম্ভব হবে না।

নোরা—(হাততালি দিয়ে) তখনই বলেছিলুম না যে, টরভ্যাল্ড একটা কিছু করে দেবেই।

হেলমার—আপনি ঠিক সময়মত আসাতেই এই সুবিধাটা হয়েছে।

মিসেস লিন্ড—আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব।

হেলমার—তার কোন দরকার নেই। কিন্তু আজ আমায় মাফ করতে হবে। একটু বেরুব।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—আমিও যাব।

মিসেস লিন্ড—আমিও উঠি।

হেলমার—তাহলে চলুন এক সঙ্গেই বেরনো যাক।

নোরা—ক্রিস্টিন, ডক্টর র‍্যাঙ্ক। আজ সন্ধ্যায় আপনাদের আসতেই হবে।

মিসেস লিন্ড, ডক্টর র‍্যাঙ্ক—নিশ্চয়ই—

হেলমার—চলুন যাওয়া যাক (হেলমার, র‍্যাঙ্ক ও ক্রিস্টিনের প্রস্থান)

[নোরা ভেতরে চলে যাবে—কয়েক সেকেণ্ড স্টেজ খালি থাকবে—তারপর নোরা একটি ছবির অ্যালবাম হাতে নিয়ে এসে পাতা ওলটাবে। ক্রুগস্টাডের প্রবেশ]

ক্রুগস্টাড—ক্ষমা করবেন মিসেস হেলমার... (নোরা চমকে উঠবে) বাইরের দরজাটা খোলাই দেখলাম—বন্ধ করবার কথা বোধহয় কারো মনে ছিল না।

নোরা—হেলমার তো এখন বাড়িতে নেই মিঃ ক্রুগস্টাড।

ক্রুগস্টাড—তা জানি—

নোরা—তা হলে আপনি এখানে কি কারণে—

ক্রুগস্টাড—আপনার সঙ্গে একটা কথা বলবার দরকার।

নোরা—আমার সঙ্গে? কিন্তু মাসের প্রথমেই তো আপনার—আজ তো পয়লা নয়—

ক্রুগস্টাড—না আজ ক্রিসমাস—এবং এ ক্রিসমাসটা কি ভাবে কাটাবেন তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার নিজের ওপর।

নোরা—ঠিক কি বলতে চান আপনি?

ক্রুগস্টাড—আমি একটা রেস্তোরাঁয় বসে কফি পান করছিলাম—দেখলাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন আপনার স্বামী, সঙ্গে একটি মহিলা।

নোরা—তারপর?

ক্রুগস্টাড—জানতে পারি কি মহিলাটির নাম মিসেস লিন্ড কিনা?

নোরা—ঠিকই ধরেছেন।

ক্রুগস্টাড—উনি কবে শহরে এসেছেন?

নোরা—আজই।

ক্রুগস্টাড—আপনার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব বুঝি?

নোরা—হ্যাঁ। কিন্তু কেন বলুন তো?

ক্রুগস্টাড—একসময় আমার সঙ্গেও যথেষ্ট আলাপ ছিল।

নোরা—জানি।

ক্রুগস্টাড—ও সবই জানেন দেখছি। তাহলে স্পষ্টভাবেই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই ব্যাঙ্কে কি মিসেস লিন্ডকে চাকরি দেওয়া হচ্ছে?

নোরা—আপনার কাছে কি আমাকে এখন কৈফিয়ৎ দিতে হবে? ভুলে যাবেন না মিঃ ক্রুগস্টাড যে আপনি আমার স্বামীর একজন subordinate—কিন্তু জিজ্ঞাসাই যখন করছেন, বলি—হ্যাঁ মিসেস লিন্ডকে চাকরি দেওয়া হবে। আর আমিই হেলমারকে অনুরোধ করে এই ব্যবস্থা করেছি।

ক্রুগস্টাড—তা হলে দেখছি আমি যা ভেবেছিলাম, সেটাই ঠিক।

নোরা—মেয়েদেরও যে দু-এক সময় সামান্য ক্ষমতা বা প্রভাব থাকতে পারে দেখছেন তো? আর যারা Subordinate Position-এ থাকে তাদের উচিত নয় সমাজের উচ্চ-স্থানীয়দের offend করা।

ক্রুগস্টাড—ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা একটা অনুরোধ করছি মিসেস হেলমার, আপনার এই প্রভাব এবং ক্ষমতাটা আমার হয়ে একটু ব্যবহার করুন।

নোরা—অর্থাৎ? কি বলতে চান আপনি?

ক্রুগস্টাড—দয়া করে একটু দেখতে হবে ব্যাঙ্কে আমার চাকরিটা না খোয়া যায়, অনুগ্রহ করে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যাতে আমার এই চাকরিটা থেকে আমাকে বরখাস্ত না করা হয়।

নোরা—আপনি ঠিক কি বলতে চান? কে আপনার চাকরি নিতে চায়?

ক্রুগস্টাড—না বোঝবার ভান করবেন না। আমি জানি এর মূলে কে আছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি—আপনার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে আমার হয়ে চেষ্টা করবেন।

নোরা—কিন্তু বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমার কোনও ক্ষমতা নেই—

ক্রুগস্টাড—এই মাত্র নিজেই বললেন যে—

নোরা—সেটা ঠিক এই ধরনের ক্ষমতা নয়।

আপনি কি করে যে ভাবতে পারলেন আমার স্বামীর ওপর আমার ও-ধরনের প্রভাব থাকতে পারে বুঝি না।

ক্রগস্টাড—দেখুন ছেলেবেলা থেকেই আমরা সহপাঠী, সুতরাং আপনার স্বামীর আসল প্রকৃতি অন্য দশজন পুরুষের থেকে উন্নত তা আমি মনে করি না।

নোরা—আমার স্বামীর সম্বন্ধে সম্মান করে কথা না বললে আপনাকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে বলতে হবে।

ক্রগস্টাড—আপনার সাহসের প্রশংসা না করে পারলাম না মিসেস হেলমার।

নোরা—আর আমার আপনাকে ভয় কিসের? নতুন বছরে দিন কয়েককের মধ্যেই আপনার টাকা শোধ করে দেব।

ক্রগস্টাড—শুনুন মিসেস হেলমার—দরকার হলে ব্যাঙ্কের ঐ সামান্য চাকরিটুকুর জন্য আমি প্রাণপণ করে যুদ্ধ করব।

নোরা—সে আমি বুঝেছি।

ক্রগস্টাড—কিন্তু সেটা পয়সার জন্য নয়। আপনাকে বলতে বাধা নেই, আসল কথা হচ্ছে এক সময় জীবনে আর পাঁচজনের মতই একটা ভুল করে বসেছিলাম।

নোরা—আমিও ও-ধরনের কি একটা শুনেছিলাম বোধহয়।

ক্রগস্টাড—ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত অবশ্যই যায় নি। কিন্তু তারপরেই কোন দিকেই আর আমার কোন পথ রইল না। তাই যে ব্যবসা আমি শুরু করেছিলাম—তার কথা তো আপনার অজানা নয়। একটা কিছু তো করতেই হবে। কিন্তু এখন আমার এসব থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। ছেলেরা সব বড় হয়ে উঠেছে—তাদের খাতিরেও শহরে সুনামটা রাখতে হবে, ব্যাঙ্কের চাকরিটা ছিল সমাজে ওঠবার প্রথম ধাপ—আপনার স্বামী যদি এই সময় আমায় আবার নিচে ফেলে দিতে চান, সেটা আমি কিছুতেই হতে দেব না।

নোরা—কিন্তু বিশ্বাস করুন এ ব্যাপারে সত্যিকার সাহায্য করবার কোন ক্ষমতাই আমার নেই।

ক্রগস্টাড—আসলে আমাকে সাহায্য করবার ইচ্ছা আপনার নেই; কিন্তু এ ক্ষমতা আমার আছে যে আপনাকে আমি বাধ্য করতে পারি।

নোরা—অর্থাৎ আমার স্বামীকে এই ধারের কথাটা জানাবেন।

ক্রগস্টাড—ধরুন যদি তাই করি।

নোরা—বেশ করুন না। আপনার কিন্তু তাতে ভাল হবে না, আমার স্বামী তৎক্ষণাৎ আপনার টাকাটা চুকিয়ে দেবেন—ফলে আপনার চাকরিটাও নিশ্চয় যাবে।

ক্রগস্টাড—ব্যাপারটা অত সহজ নয় মিসেস

"ডলস হাউস"-এর একটি দৃশ্য—হেলমার, র‍্যাঙ্ক, নোরা

হেলমার। হয় আপনার স্মরণ-শক্তি খুব দুর্বল, নয় আপনি আইন সম্বন্ধে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। আপনাকে দু-একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই।

নোরা—বেশ তো বলুন না?

ক্রগস্টাড—যে দলিলটায় সই করে আপনি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন, সেটাতে আপনার সইয়ের তলায় কিছুটা জায়গা ছিল যেখানে আপনার বাবার সই করবার কথা।

নোরা—সেখানেই তিনি সই করেছিলেন।

ক্রগস্টাড—আপনার বাবা সেই সময় খুব অসুস্থ না?

নোরা—তাঁর তখন প্রায় শেষ অবস্থা।

ক্রগস্টাড—আচ্ছা তিনি ঠিক কবে মারা যান?

নোরা—২৯শে সেপ্টেম্বর।

ক্রগস্টাড—একেবারে ঠিক কথা। সে খবর আমিও পেয়েছি। কিন্তু সেইখানেই একটা গোলমাল বাধছে। (পকেট থেকে একটা দলিল বের করে) একথাটা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন কি—আপনার বাবার মৃত্যুর তিন দিন পরে দলিলটায় কি করে সই করলেন?

নোরা—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—আপনি কি বলতে চান।

ক্রগস্টাড—২৯শে সেপ্টেম্বর আপনার বাবা মারা যান অথচ সইয়ের তলায় তারিখ হচ্ছে ২রা অক্টোবর। এর মানে কি বলতে পারেন? আর সইটাও যে আপনার বাবার নয় সে আমি প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম। তাঁর হাতের লেখাও আমার অপরিচিত ছিল না।

নোরা—(একটু চুপ করে) আপনি ঠিকই বুঝেছেন, আমিই বাবার নাম সই করেছিলাম।

ক্রগস্টাড—একথা স্বীকার করার ফল কি ভয়ানক জানেন?

নোরা—ভয়ানক আবার কি? আপনার টাকা কয়েকদিনের মধ্যেই শোধ করে দেব।

ক্রগস্টাড—কাগজটা বাবাকে দিয়ে সই করান নি কেন?

নোরা—বাবার তখন শরীর খুব খারাপ। টাকার কথা শোনাতে গেলেই—তিনি জানতে পারতেন যে, হেলমারও মারাত্মক রকম অসুস্থ।

ক্রগস্টাড—সেক্ষেত্রে বাইরে না যাওয়াটাই উচিত ছিল।

নোরা—না গেলে হেলমারকে বাঁচান যেত না।

ক্রগস্টাড—কিন্তু আপনি যে আমার সঙ্গে fraud করছেন একথা মাথায় আসে নি আপনার?

নোরা—তখন সে কথা ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না।

ক্রগস্টাড—মিসেস হেলমার আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, অপরাধের গুরুত্ব আপনি বুঝতে চেষ্টা করছেন না। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই—অতীতে আমার যে স্খলনটুকু হয়েছিল তা আপনি যা করেছেন তার থেকে বোধহয় খুব বেশি মারাত্মক নয়।

নোরা—আপনি কি বলতে চান আমার মত মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই—

ক্রগস্টাড—আইন উদ্দেশ্যের কথা কমই তুলতে চায় না।

নোরা—তাহলে সে আইনের কোন মানেই হয় না।

ক্রগস্টাড—তা না হতে পারে —কিন্তু এই দলিলটা নিয়ে আদালতে গেলে আইন অনুসারেই আপনার বিচার হবে।

নোরা—আপনি কি বলতে চান—মেয়ের উচিত নয় মরণাপন্ন বাবাকে দুশ্চিন্তায় না ফেলা? স্ত্রীর উচিত নয় স্বামীর জীবন রক্ষা করা? এমন আইন নিশ্চয়ই আছে যাতে আমার নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে যাবে। আপনি নিজেও তো একজন আইনজ্ঞ। এমন কোন আইনের কথা জানা নেই আপনার? তাহলে আপনি নিশ্চয়ই অতি ছোট দরের ব্যারিস্টার।

ক্রগস্টাড—হয়তো তাই ঠিক। এ নিয়ে আর আমি বেশি কথা বলতে চাই না। শুধু এইটুকু আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, আমি যদি দ্বিতীয়বার পদচ্যুত হই তাহলে আপনাকেও আমি ছেড়ে কথা বলব না। আচ্ছা নমস্কার আমি চললাম। (প্রস্থান)

নোরা—(খানিক চিন্তা করে) ইস—আমাকে ভয় দেখানো? আমি যেন কচি খুকী—যা বোঝাবে তাই বুঝবো। লোকটার মাথা খারাপ—বলে কি না আমার কাজে আর ওর কাজে কোনই তফাৎ নেই—

[হেলমারের প্রবেশ]

হেলমার—এই যে নোরা, (নোরা চমকে উঠবে) আচ্ছা কেউ কি এখানে এসেছিল?

নোরা—কই না তো।

হেলমার—আশ্চর্য! আমার যেন মনে হল ক্রগস্টাডকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখলাম।

ভারতে এই প্রথম

৩৫ মিঃ মিঃ বাড়ীর জন্য সিনে প্রোজেক্টর বাড়ীতে বসিয়া আসল সিনেমা দেখার আনন্দ উপভোগ করুন। আপনার পছন্দমত চলচ্চিত্র সাধারণ ঘরের ভিতর পর্দায় টর্চ অথবা ইলেকট্রিক উভয়ের সাহায্যেই দেখিতে পারিবেন। আপনি যেরূপ সিনেমা হলে দেখেন সেইরূপ পুরা মাপের ছবি পর্দার উপর নড়িবে অভিনয় করিবে এবং নাচিবে। স্পেশাল কোয়ালিটি ৪০, টাকা বিনামূল্যে ১ রীল ফিল্ম, অতিরিক্ত ফিল্ম প্রতি মিটার ১ টাকা।

Rolex India (B. C.—44)
P. Box. 1574, Delhi-6.

নোরা—ও—হ্যাঁ হ্যাঁ—বলল একটু সময়ের জন্য এসেছিল।

হেলমার—তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আমার কাছে ওর হয়ে সুপারিশ করবার জন্য তোমায় ধরেছিল।

নোরা—তুমি কি করে বুঝলে?

হেলমার—এমনভাবে আমার কাছে ওর Caseটা Place করতে বলেছে যাতে মনে হয় তুমি নিজের থেকেই বলছ। ও যে এসেছিল সে কথাটা লুকিয়ে রাখতে অনুরোধ করেছিল কেমন?

নোরা—কিন্তু টরভাল্ড—

হেলমার—নোরা, তুমি যে এমন একজন নীচ প্রকৃতির লোকের হয়ে কথা বলতে পার বা তাকে কোন রকম প্রতিশ্রুতি দিতে পার, এ সত্যিই আমার ধারণার অতীত ছিল। এমন কি মিথ্যা কথা বলতে পর্যন্ত তোমার মুখে বাধল না?

নোরা—মিথ্যা কথা!

হেলমার—এইমাত্র আমাকে বললে না যে এখানে কেউ আসে নি? ভবিষ্যতে আমার 'মনের খুশি' আর যেন এ-রকমটা না করে। আমার ছোট্ট কোকিলটির কণ্ঠ থেকে যেন বেসুর কথা না বেরোয়। কেমন? রাজী তো? যাক গে—আজ কিন্তু বেশ সুন্দর গরম আবহাওয়া—চমৎকার লাগছে।

নোরা—টরভাল্ড!

হেলমার—কিছু বলতে চাও?

নোরা—পরশু স্টেনবর্গদের বাড়ির উৎসবে আমায় গাইতে হবে। কি গাইব বল?

হেলমার—ভাল কয়েকটা গান তৈরি করে রাখ।

নোরা—না তোমায় বেছে দিতে হবে।

হেলমার—আচ্ছা আমি পরে ভেবে বলব—এখন একটু কা

নোরা—কি কাজ?

হেলমার—ব্যাঙ্কের বিদায়ী ম্যানেজার—আমাকে দরকার মত কাজের এবং কর্মচারী অদল-বদল করবার অধিকার দিয়ে গেছেন। ক্রিসমাসের সপ্তাহটা এই কাজেই কাটাব—যতে করে কাজে যোগ দেবার আগে থেকেই এসব হাঙ্গামা চুকে যায়।

নোরা—সেই জন্যই ক্রগস্টাডকে সরাতে চাও?

হেলমার—ঠিক ধরেছ। আমি এবার একটু কাজ করি গিয়ে—

নোরা—তুমি এত ব্যস্ত না থাকলে তোমার কাছে একটা বড় জিনিষ চাইতাম।

হেলমার—বলেই ফেল না।

নোরা—আচ্ছা ক্রগস্টাড কি সত্যিই একটা মারাত্মক অপরাধ করেছিল?

হেলমার—একজনের সই জাল করেছিল। কত বড় অপরাধ বুঝতে পার?

নোরা—এমন তো হতে পারে অবস্থার বিপাকে পড়েই সে বাধ্য হয়েছিল একাজ করতে?

হেলমার—তেমন যে হয় না তা নয়। এবং সেক্ষেত্রে একটা মাত্র ভুলের জন্য কারোর সঙ্গে হৃদয়হীনের মত ব্যবহার করা উচিত নয়।

নোরা—এই ধরনের কথাই আমি তোমার মুখে থেকে আশা করেছিলাম।

হেলমার—এমন অনেক লোকও দেখা গেছে যারা অপরাধ করবার পরই অনুতপ্ত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নিজে থেকেই শাস্তি নিয়েছে। এর ফলে নিজেদের চরিত্রও তারা শুধরে নিতে পেরেছে।

নোরা—অপরাধ স্বীকার করেও শাস্তি পেয়েছে?

হেলমার—ক্রগস্টাড সেদিক দিয়েই যায় নি। সে অতি কূট প্যাঁচ লাগিয়ে আইনের চোখে ধুলো দিয়েছে, ফলে সে ক্রমাগতই নিজেকে অধঃপাতের পথে নিয়ে গেছে।

নোরা—তুমি কি মনে কর—

হেলমার—ওর মত অপরাধীরা সব সময় লোকের সঙ্গে ভণ্ডামী, প্রতারণা, মিথ্যা আচরণ না করে পারে না। নিজের অত্যন্ত প্রিয়জন, এমন কি স্ত্রী, ছেলে-মেয়ের কাছে পর্যন্ত নিজের আসল রূপটা ঢেকে রাখে। এতে করে সব চেয়ে বেশি ক্ষতি হয় অবশ্য ছেলে-মেয়েদেরই।

নোরা—কেন?

হেলমার—কারণ এ ধরনের মিথ্যা দিয়ে যে বাড়ির আবহাওয়া ভর্তি—সেখানে প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে শিশুরা যে বিষই আহরণ করে থাকে প্রতি মুহূর্তে।

নোরা—কি বলছ

হেলমার—আইনজ্ঞ হিসাবে বহু সময় এ ধরনের ঘটনা আমায় দেখতে হয়েছে। জীবনের আরম্ভে যারা কুপথে যায় তাদের চরিত্রের ওপর সব চেয়ে বেশি প্রভাব থাকে কাদের জানো? মায়েদের—

নোরা—খালি মায়েদেরই?

হেলমার—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মায়েদের। বাপ-বাপের প্রভাবও ভাল বলছি না। এই ক্রগস্টাডই এতদিন নিজের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে প্রতারণা করে এসেছে। এর জন্যই ওর চরিত্রের নৈতিক দিকটা একেবারে শেষ হয়ে গেছে। আর এই কারণেই আমি চাই না যে ওর হয়ে তুমি আমাকে কোনও অনুরোধ কর। (প্রস্থান)

নোরা—না, না, এ হতে পারে না। এ অসম্ভব—বাড়ির আবহাওয়া বিষিয়ে উঠবে—ছেলে-মেয়েদের কলুষিত করে ফেলবো—না, না, এ কখনই সত্যি হতে পারে না—এ অসম্ভব—

যবনিকা

প্রমোদকর রেহাই

সত্যজিৎ রায়ের ছবি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রমোদকর থেকে রেহাই দিয়েছেন। এই সংবাদে চলচ্চিত্র জগতে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সকলে প্রশংসা করছে। প্রমোদকর ছাড় দেবার ব্যাপারটা নতুন নয়। ইতিপূর্বেও পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন ছবি প্রমোদকর থেকে রেহাই পেয়েছে। তবে 'গুপী গাইন'-এর ব্যাপারে দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ বেশি দেখা যাচ্ছে। ছবিটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। বিশেষ করে কিশোরজগতে এই ছবির আকর্ষণ অত্যন্ত বেশি। 'গুপী গাইন'-এর গানগুলি ছেলে-মেয়েদের মুখে মুখে। কে কতবার দেখেছে তা নিয়ে আলোচনা, গুপী আর বাঘাকে নিয়ে তর্কাতর্কি হামেশাই শোনা যাচ্ছে। বড়রাও ছবিটি দেখে আনন্দলাভ করছে। শিশুদের উপযোগী এক কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে যুদ্ধকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বাস্তবিক আমাদের দেশের কিশোরদের উপযোগী ছবির মধ্যে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' অদ্বিতীয়। এই ছবিকে প্রমোদকর থেকে রেহাই দিয়ে সরকার ছবিটি সকল মানুষের দেখার আরো সুযোগ করে দিয়েছেন।

প্রমোদকর রেহাই দেওয়ায় টিকেট বিক্রয় থেকে সরকারের ঘরে যে টাকাটা আসত সেটা আসবে না। করমুক্ত টিকেট বিক্রয়ের টাকাটা পাবে প্রযোজক, পরিবেশক আর মোটা অংশ প্রদর্শক বা সিনেমা হাউস। সুতরাং ট্যাক্স রেহাই দেওয়ায় প্রযোজকদের লাভ সর্বাধিক বেশি। টিকেটের দাম কমে যাওয়ায় অনেক বেশি লোক ছবিটি দেখবেন এবং প্রযোজকের লাভের অংশ বাড়বে। একদিকে ভাল যে এর ফলে প্রযোজকরা এ-রকম ছবি করার জন্য উৎসাহ পাবেন।

কিন্তু ঘটনা কি সত্যি তাই! প্রযোজকরা এ ধরণের ছবি খুব ভেবে-চিন্তে করেন না। অধিকাংশক্ষেত্রে পরিচালকের উৎসাহ ও চিন্তাতেই এরূপ ছবি সৃষ্টি হয়। 'গুপী গাইন'-এর ঘটনা খুঁজলে এ কথার সাক্ষ্য মিলবে। কিন্তু লাভের অঙ্কটা প্রযোজকের ঘরে যায়; পরিচালক মজুরিটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হন। আমাদের দেশে ছবি তৈরির যে রীতি চলছে তাতে ভাল ছবির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র টাকা খাটানো ছাড়া প্রযোজকদের তেমন আর কোন ভূমিকা থাকে না। পরিচালককে চিত্রনাট্য তৈরি করে প্রযোজকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হয়, এমন কি অনেক সময় দালাল লাগিয়ে টাকা খাটাবার লোক যোগাড় করতে হয়। প্রযোজকরা চান এমন ছবি, যে ছবিতে ছমাসের মধ্যে লগ্নিকরা টাকা মুনাফা সহ ফিরে পাবে। নেহাৎ সমাজের বাহবা পাবার লোক, বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ইচ্ছা, চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার পাবার আকাঙ্ক্ষা এবং সে সুযোগ বিদেশে গিয়ে নিজের চলচ্চিত্র ব্যবসায়কে সম্প্রসারণের মতলব না থাকলে শিল্পরুচিসম্পন্ন ছবি করার জন্য টাকা খাটাবার লোক পাওয়া যায় না। এই ছবির প্রযোজক যদি বাংলা ছবিকে ভালবাসে অথবা বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার ইচ্ছায় 'গুপী গাইন' প্রযোজনা করতেন তা হলে নিজের সিনেমা 'প্রিয়া'-কে হিন্দী ছবির জন্য রিজার্ভ করে রাখতেন না। এ কারণে 'গুপী গাইন'-এর মত ছবি নেহাৎ আকস্মিক ব্যাপার!

উন্নতমান ও শিল্পরুচিসম্পন্ন ছবির জন্য আসলে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পরিচালকদেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। এরূপক্ষেত্রে প্রমোদকর ছাড় না দিয়ে নির্দিষ্ট ছবিটি থেকে প্রমোদকর বাবদ সরকারের আয়ের সম্পূর্ণ টাকাটা যদি সেই ছবির পরিচালককে বিনা সুদে ঋণ দেওয়া হয় তাহলে তিনি পরবর্তী আর একটি ভাল ছবি করার জন্য উৎসাহ পান। তাঁর হাতে সরকারের দেওয়া ঋণের টাকাটা থাকলে বাকি টাকা খাটাবার লোকের অভাব হয় না। এই-ভাবে পরিচালকদের উৎসাহ দেওয়া

ওয়াহিদা রহমান

যেতে পারে। আমাদের দেশে ব্যক্তিগত উৎসাহে ছবি হয়ে থাকে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত কোন উপদেষ্টা বোর্ডে ছবির বিষয়বস্তু ঠিক করা হয় না। সুতরাং ভাল ছবি পেতে হলে প্রতিভাবান ও প্রগতিশীল পরিচালকদের সাহায্য করা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা না থাকার জন্য আমাদের দেশে যাঁরা একটি ছবি করে প্রগতিশীল বলে অভিনন্দিত হন, তিনি দ্বিতীয় ছবি করার জন্য টাকা না পেয়ে বোম্বাইমার্কা ছবি করে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণই ভাল। তাতে ভাল ছবি করার দিকে ঝোঁক সৃষ্টি করা হবে। নতুবা প্রমোদকর রেহাই-এর দাবি এবং রেহাই দেওয়া নেহাৎ গতানুগতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এতে প্রযোজক পরিবেশকের লাভ হয় ছবির আসল স্রষ্টার তেমন লাভ হয় না। হ্রাসমূল্যে ছবিটা দেখতে পারে এই মাত্র সাধারণ মানুষের লাভ। কিন্তু উৎসাহ যোগান দরকার ছবির স্রষ্টার। —সুজন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবিতে স্বপন রায় ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

নাটকের কথা

আমি এ চাই নি

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা রূপকারের নতুন নাটকের নাম 'আমি এ চাই নি' মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয়ে গেল। যেরূপ দর্শক সমাগম হয়েছিল তাতে নাটকটি সম্পর্কে নাট্যরসিকদের ঔৎসুক্য অনুমান করা যায়। রূপকার গোষ্ঠীর নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্যের দরুণই এ-আকর্ষণ, এ-কথাটাও মনে রাখা দরকার। বিশেষ করে, সবিতাব্রত দত্তের জনপ্রিয়তা। 'আমি এ চাই নি' নাটকের লেখক সুধাংশু দাশগুপ্ত। ইতোপূর্বে লেখকের লেখা প্রত্নতত্ত্ব-নির্ভর নাটকটি বহুল অভিনীত হয়েছিল।

এই নাটকের প্রধান চরিত্র সন্তু লখনৌতে পড়ত। রাজনীতি সংশ্লিষ্ট এক যুবক। হঠকারী রাজনীতিতে সময়ের ভুলে এক মারাত্মক দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তার স্মৃতিভ্রম ঘটে। সব সময় তার মনে একটা বিভীষিকার স্মৃতি যেন উঁকি মারছে অথচ সম্পূর্ণ কথা সে মনে করতে পারছে না। মানসিক অসুস্থ অবস্থায় সে তার দাদার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। দাদা বড় চাকুরে। বৌদি অরু তাকে সেবায় ও গভীর প্রীতিতে ভাল করে তুলতে চেষ্টা করে।

কিন্তু সন্তুর ধারণায় অরু হয়ে গেছে নমিতা। যাকে সে ভালবাসে। সুতরাং অরুকে সর্বক্ষণ সন্তুর সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করতে হয়। এই অভিনয়ের মধ্যে অরুর মনেও জমে উঠেছে প্রেমের মেঘ, সে যে-কোন সময় বর্ষণের অপেক্ষায়। স্বামীর কাছে যে সঙ্গ, যে বন্ধুত্ব, যে প্রীতি ও পরস্পর নির্ভরতা সে পায় নি, এ কদিনে তার স্বাদ পেয়ে অরুর মনে জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের দাম্পত্য জীবনকে বিশ্লেষণ করে দেখার মত সাহস জেগেছে।

এদিকে মনোবিশ্লেষণের পদ্ধতিতে চিকিৎসা চলেছে। চিকিৎসক যখন সন্তুর সুস্থতার আশা করছেন সে-সময় বাড়িতে পুলিশের আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। পুলিশের উপস্থিতিতে সন্তুর মধ্যে স্মৃতি এবং বিস্মৃতির এক দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। যেন টুকরো টুকরো অতীতের কথা তার মনে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। এমন সময় পুলিশও নিঃসন্দেহ হয়েছে যে, এই সন্তু সেই ট্রেন দুর্ঘটনার আসামী। যাকে পুলিশ খুঁজছে। পুলিশের কাছ থেকে জানা গেল লখনৌর এক বিপ্লবী দল নির্দিষ্ট একটা ট্রেনকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে সময়ের ভুলে এক প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে চার্জ করেছিল। অসহায় মানুষগুলোর রক্তাক্ত খণ্ডবিখণ্ড দেহ দেখে ভুলের ভয়াবহ পরিণতি সন্তুকে স্মৃতিভ্রষ্ট ও মানসিক অসুস্থ করে তোলে। সন্তু যখন দাদা ও বৌদিকে চিনতে পেরেছে, স্মৃতি ফিরে পেয়েছে ঠিক সে সময় পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। কোনদিকে না দেখে সন্তু চলে গেল শাস্তি গ্রহণ করার জন্য। অরু পড়ে রইল আহত মনের বেদনা নিয়ে।

নাটকটি সর্বক্ষণ সাসপেন্স বজায় রেখে চলেছে। যদিও দর্শকদের কাছে সন্তুর পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তার অসুস্থতার কারণ জানা যায় তবু দর্শকমনে জিজ্ঞাসা ও পরিণতি দেখার প্রতীক্ষা জেগে থাকে। নাটকটিতে অপরাধমূলক নাটকের ঔৎসুক্য ও উদ্বেগ এবং মনস্তাত্ত্বিক নাটকের বিশ্লেষণ মিশ্রিত হয়ে একটা অতিরিক্ত কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। হঠকারী রাজনীতি এবং আঘাত করার ব্যাপারে সময়ের প্রশ্ন এনে সমসাময়িকতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। রাজনীতির কথাবার্তায় অপরাধমূলক নাটকের ছাপটা

রবীন্দ্র সদনে
৬ই অক্টোবর ৬॥টায়
তরুণ অপেরা কর্তৃক
শম্ভুবাগ রচিত
হিটলার
নির্দেশনায় — অমর ঘোষ
নাম ভূমিকায় — শক্তি গোপাল।
ফোন : ৫৫-৭১২১
(সি ২৯২০/৯৩২)

আড়াল করা হয়েছে। আর নমিতা নামের ব্যবহারে বৌদির সঙ্গে প্রেমের ঘটনাকে দর্শকদের কাছে মানিয়ে নেবার এবং কাহিনীতে রসসিঞ্চনের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এই প্রেমের অংশটি যতই উপভোগ্য হোক—একজন স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষের কাছে অরুর দাম্পত্য জীবনের অভাব ও অভিযোগ প্রকাশ করা স্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে অরুর মনে যে প্রেমের জন্ম—স্নেহ ও মমতাবোধ থেকে এবং গোপন করে রাখার মধ্যেই তার সৌন্দর্য ও গভীরতা। কারণ প্রেমের লোকটি অসুস্থ ও স্মৃতিভ্রষ্ট। নাটকটির স্থানে স্থানে আরো কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাটকটি দর্শকদের কৌতূহল রক্ষা করে—তার একমাত্র কারণ সবিতাব্রত দত্ত ও গীতা দত্তের সম্মিলিত অভিনয়। আমার সন্দেহ আছে, এ দুজনকে ছাড়া এই নাটক এভাবে কৌতূহল বজায় রাখতে পারবে কিনা!

'রূপকার' এ ধরণের নাটক ইতিপূর্বে মঞ্চস্থ করে নি। এখানে সবিতাব্রত দত্ত এবং গীতা দত্ত যে অভিনয় করেছেন তা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। এই দুজন শিল্পীর মানসিক বিশ্লেষণমূলক অভিনয়, অঙ্গ সঞ্চালন ও অভিব্যক্তি দক্ষতার পরিচায়ক। ভাব-ভঙ্গির পরিমিত জ্ঞান এবং সর্বোপরি প্রেমের অভিব্যক্তিতে স্বাভাবিকতা ও আশাবাদের সুর এবং মিলিতকণ্ঠের সঙ্গীতে নাটকটিকে দর্শনীয় করেছে। গীতা দত্তের 'অভিনয়নৈপুণ্য' এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্যদের অভিনয় দলগত দিক থেকে যথার্থ। তবে সন্তুর দাদার চরিত্রে বড় একজন চাকুরিয়া—যার বাড়িতে তকমা পরে বাবুর্চি খাটছে সেদিক থেকে আরো কেতাদুরস্ত হতে পারত।

তাপস সেনের আলোর কাজ এবং সুরেশ দত্তের মঞ্চসজ্জার কাজ শিল্পরুচি-সম্মত। সঙ্গীতে ভি. বালসারা নাটকের মূল সুরটি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। পরিচালনা কৃতিত্ব সবিতাব্রত দত্তের।

শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী পরিচালিত ছোটদের ছবি 'হীরের প্রজাপতি' ছবিতে শেখর চট্টোপাধ্যায় ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়।

দি গানস অব ইনেকরো' ছবিতে রোজা-লরানোর।

ফাঁস

ক্যাডবেরী ফ্রাই রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যাগণ গত ২রা সেপ্টেম্বর বিশ্বরূপা থিয়েটারে 'ফাঁস' নাটক অভিনয় করলেন। শৈলেশ গুহরায় লিখিত এই নাটকাভিনয়ে সদস্যারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন বিমানের ভূমিকায় দীপক বাগচী, কপিলের ভূমিকায় হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য ভূমিকায় তপন গাঙ্গুলী, দেবী মুখোপাধ্যায়, অনিল সেন, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, সমর সান্যাল এবং স্ত্রী চরিত্রে তৃপ্তি দাস। গীতা দে নাটকের তরলা চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

চিত্র আলোচনা

রিফ্লেকশনস ইন এ গোল্ডেন আই

এলিজাবেথ টেলর ও মার্লন ব্রান্ডো অভিনীত "দি স্টোরি অব রিফ্লেকশনস্ ইন এ গোল্ডেন আই" সম্প্রতি নিউ এম্পায়ার সিনেমায় মুক্তি পেয়েছে। প্রথমত এই দুজন চিত্রতারকার প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ এবং কাহিনীর ত্রিকোণ দ্বন্দ্বের সঙ্গে এক সৈনিকের অস্বাভাবিক মানসিকতার রহস্য ছবিটিতে যে নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে এতে ছবিটি দেখবার জন্য দর্শক সমাগম হবে মনে হয়। নীলনয়না এলিজাবেথ টেলরের উজ্জ্বল যৌবনের সেই দিনগুলি আর নেই। আর দেহে ভাঁটির চিহ্ন। তবু এলিজাবেথ

টেলর আজো আকর্ষণীয়—আগের মত মাদকতা নয়, এখন অভিনয়নৈপুণ্যে।

ছবিতে মার্লন ব্রাণ্ডো হয়েছেন মেজর পেন্ডারটন। এক মার্কিন দুর্গের অধিনায়ক। আর এলিজাবেথ টেলর হয়েছেন মেজরের স্ত্রী এলিনারা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শিথিল। স্ত্রী যদিও যৌবনা—কিন্তু স্বামীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। স্ত্রী নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্য লেফটেন্যান্ট লাংডনের সঙ্গসুখ অনুভব করে। বয়সে প্রবীণ হলেও ল্যাংডনের সঙ্গে তার কিছুটা রোমান্স জমে উঠেছে। ঘরে লাংডনের স্ত্রী রুগ্না এবং নিজেকে স্বামী উপেক্ষিতা মনে করে। মেজর পেন্ডারটনের দৃষ্টি সব সময় এলিনারা ও লাংডনের দিকে। সম্প্রতি এলিনারার ঘোড়ার রক্ষক এক সৈনিকের আচরণ তাকে আরো ভাবিয়ে তুলেছে। রাত্রির অন্ধকারে এই সৈনিক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এলিনারা ও পেন্ডারটনের আচরণ লক্ষ্য করে, একদা মেজর পেন্ডারটন এই সৈনিকটিকে আবিষ্কার করল গভীর বনের মধ্যে নগ্ন হয়ে সূর্যস্নান করা অবস্থায়। আর এই সৈনিকটিই এলিনারার ঘোড়াকে সেবায় যত্নে সুস্থ করে তোলে। মিসেস লাংডন তার স্বামীকে এলিনারার ঘরে রাত্রিবাস করেছে সন্দেহ করে বিস্মিত হয়ে দেখল এলিনারার শয্যাপাশে এই সৈনিকটি বসে আছে। তারপরে মেজর পেন্ডারটনের চোখে পড়ে গেল সে। এলিনারা অঘোরে ঘুমোচ্ছে আর লোকটি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার সৌন্দর্য উপভোগ করছে পায়ের কাছে বসে। মেজরের পিস্তলের গুলীতে এলিনারা জেগে উঠে বিস্মিত ও হতভম্ব।

ছবিটির এই নাটকীয়তা এবং ঘটনার প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি করে অগ্রসর হওয়া উপভোগ্য।

স্টুডিও খবর

"ত্রিনয়নী মা" ছবির সংগীত গ্রহণ

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ রূপসচি চিত্রমের সংগীত-বহুল ও ভক্তিমূলক ছবি "ত্রিনয়নী মা"-র কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। সংগীত পরিচালক অনিল বাগচীর সুরে গানগুলি গেয়েছেন—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও মানবেন্দ্র মুখার্জী। গান লিখেছেন—শ্যামল গুপ্ত। এ মাসের শেষ সপ্তাহে মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখার্জীর গলায় কয়েকটি গান রেকর্ড করা হবে। হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। পরিচালনা করছেন—পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে—রামানন্দ সেনগুপ্ত ও অমিয় মুখার্জী। ছবিটির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

'আনমোল মোতী' ছবিতে ববিতা

'অরণ্যকন্যা' ছবির সংগীত গ্রহণ

গত ৬ই সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ এস, এস, মুভিটনের প্রথম নিবেদন "অরণ্যকন্যা" ছবির কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। নবাগত সংগীত পরিচালক দিলীপ ঘটকের সুরে গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন—হেমন্তকুমার মুখার্জী ও বনশ্রী সেনগুপ্ত।

ক্যাডবেরী ফ্রাই রিক্রিয়েশন ক্লাব অভিনীত 'ফাঁস' নাটকে দীপক বাগচী, হীতেন রায় ও তপন গাঙ্গুলী।

গানগুলি লিখেছেন—শিবদাস ব্যানার্জী।

অরণ্যের পটভূমিকায় নতুন আঙ্গিকের এই ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্যরচনা ও পরিচালনা করেছেন—সুশীল ঘোষ। ছবিটিতে অনেক নতুন শিল্পীর সমাবেশ ঘটবে এবং বেশির ভাগ দৃশ্যই আউটডোরে গৃহীত হবে।

পরিচালক শ্রীঘোষ এ মাসের শেষ সপ্তাহে শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্যে রওনা হবেন।

সংবাদকনা

বুলগেরিয়ার জাতীয় দিবস

সিনে সেণ্ট্রাল-ক্যালকাটা বুলগেরিয়ার ২৫তম জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর সকালে সোসাইটি সিনেমা হলে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বুলগেরিয়ার কলকাতাস্থ ট্রেড কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। সমবেত সদস্যদের 'হোয়াইট রুস' ছবিটি দেখান হয়েছে।

'শিল্পী ও মাধবী' নৃত্যনাট্য

নটরাজ-এর উদ্যোগে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীশিক্ষায়তন হলে এক নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠান হয়েছে। 'শিল্পী ও মাধবী' নৃত্যনাট্যটি পরিবেশিত হয়। ভারতীয় রাগনৃত্য অবলম্বন করে নৃত্যনাট্যটি পরিকল্পিত।

কৃতী কত্থক নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী বেলা অর্ণব এই নৃত্যনাট্যটিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। পরিচালনা কৃতিত্বও তাঁর।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন আইনমন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ম্যাক্স-মূলার ভবনের জার্মান সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের ডঃ জি, লেচনার।

কুমারী রীতা সেনগুপ্ত দমদম কিশোর-মহল আয়োজিত নজরুলগীতি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

অহীন্দ্র সম্বর্ধনা

গত ৭ই সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনে তরুণ অপেরা নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীকে সম্বর্ধনা জানান। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীচৌধুরী বলেন—তাঁর অভিনয় জীবনের শুরু যাত্রাজগতে। তিনি সখের যাত্রায় যোগ দেন ১৯১২ সালে। পূর্ববাংলার সর্বত্রই অভিনয় করে প্রশংসা লাভ করেছেন। সর্বজনের ভালবাসা লাভ তাঁর শিল্পিজীবনের পাথেয়।

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে তরুণ অপেরা 'রাজা রামমোহন' যাত্রাপালা অভিনয় করে। এই নাটক লিখেছেন সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়-সার্থক এই যাত্রা-পালাটি দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন শান্তিগোপাল।

'রাজাসাব' হিন্দী ছবিতে শশী কাপুর ও নন্দা

খবর বলছি

অভ্রবাহন প্রায় মাসাধিক অনুপস্থিত ছিলেন। তার বাহনটি বেশ কিছুকাল বিগড়ে গেছিল। অভ্রবাহনের ধারণা ছিল, বোধ হয় শাপে বর হয়েছে। সেই এক-ঘেয়ে প্রোগ্রাম, অশিল্পীকে চেনাজানার সুযোগে শিল্পীর ছাড়পত্র দিয়ে তাঁর (অভ্রবাহনের) মতো বেচারা শ্রোতার কর্ণ-বিদারণ,—এ সব ব্যাপার থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। কিন্তু মুক্তি তাঁর কপালে নেই। তাই অভ্রবাহনের অনুপস্থিতির বিরুদ্ধে কিছু পাঠকের পত্রাঘাতে তাঁকে আবার খবর বলছি-তে মাথা গলাতে বাধ্য করা হল। বলা বাহুল্য, বাহনটি এখন তাঁর হাতের কাছেই। তার আগে নিবেদন করা যাক জনৈক পত্রদাতার আংশিক মতামত।

শ্রীঅজিতকুমার রায়, বাঁকুড়ার বক্তান কলেজ থেকে লিখেছিলেন :

...আকাশবাণী (কলকাতা)-র মান ক্রমশ নিচের দিকে যাচ্ছে। এখন ঐ কর্তৃপক্ষ মহাত্মা গান্ধীর দোহাই দিয়ে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে দিতে পারছেন। মহাত্মার নামে পাওনাদারদেরও ভিড় জমেছে আকাশবাণীতে। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব আছে বলে আমার মনে হয়। তবে হ্যাঁ সোমবার-সোমবার গান্ধীজীর জীবনের যে অনুবাদ শোনানো হয়, তা চমৎকার।

আমার মনে হয়, জনসাধারণকে গান্ধীজী সম্বন্ধে জানাবার উদ্দেশ্যে সে যুগের বিপ্লবীদেরও আহ্বান জানানো উচিত। একপক্ষ ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে গেলে যে অবস্থা হয় এখন গান্ধীজীর আলোচনাতেও তাই হচ্ছে।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ, গান্ধীজী যে আদর্শ অনুসরণ করার জন্য জাতিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা কেন অনুসৃত হল না এবং কিভাবে হওয়া সম্ভব বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সে-আলোচনা করানো যেতে পারে।

...আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের জনৈক সংবাদ পরিবেশক রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের খবর প্রকাশের দিন এমন সব শব্দ উচ্চারণ করছিলেন যা অত্যন্ত লজ্জা-জনক। আমি অন্তত একটি শব্দের নমুনা দিচ্ছি, সেটি হচ্ছে, "পঞ্জাব" শব্দটি। ঐ শব্দটি বহুবার সেদিন "পাঞ্জাব" বলে উচ্চারিত হয়েছে সংবাদ পরিবেশকের শ্রীমুখে। আকাশবাণীতে চাকরি করেও তিনি কি জানেন না—পঞ্জাব, না, পাঞ্জাব! প্রতিদিন আকাশবাণীর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্বে জাতীয় সংগীত শোনানো হয়। আমার অনুরোধ, সংবাদ পরিবেশক মহাশয় সেখানে পাঞ্জাব, না, পঞ্জাব বলা হয়, তা ভালো করে জেনে নিন।

পুনশ্চ : মারাঠা, না, মরাঠা হবে তাও যেন দয়া করে সেখান থেকেই জেনে নেন।...

পত্রলেখকের সঙ্গে আমাদের দ্বিমত নেই। দুর্ভাগ্যের কথা রেডিও শুনে বাড়ির ছেলেরাও ভুল উচ্চারণ করছে বলে অভিযোগ আসছে। এই তো সেদিন (১৭-৯-৬৯) রাত দশটার পর বাংলা খবরে জনৈক সংবাদ পরিবেশক বেশ বলে গেলেন—"ইতিহাসিক"! ঐ সংবাদ পরি-বেশক যখন নতুন সংবাদ পড়তে আরম্ভ করেন, তখন থেকেই কিছু কিছু অভি-যোগ আসছিল। আমরা নতুনের প্রতি সহানুভূতিবশতই সে সময় নীরব ছিলাম। এবার বলা দেওয়া প্রয়োজন, ঐ ঘোষকের উচিত এখন উচ্চারণে সাবধানতা অবলম্বন করা।

* * *

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮টা ৪০ মিনিটের সময় জনৈক বক্তা বললেন, "পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ পালনের তাৎপর্য" সম্পর্কে। বলা বাহুল্য, আকাশবাণীর পয়সা বেশি না হলে এ ধরণের বক্তা এনে পয়সা গলানো সম্ভব নয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিশব্দগুলির নির্ভুল উচ্চারণ করা সম্ভবত, তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। দ্বিতীয়ত তাঁর বলার ভঙ্গি এমন ধরণের যে, তাঁর বক্তৃতা শুনলে, পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ পালনের তাৎপর্য বোঝার আগেই শ্রোতার মনে হয়, ভগবান এ ধরণের চেঁচানি থেকে বাঁচান। অতঃপর রেডিওটা বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

উপরি-উক্ত বক্তার একটি রচনা বের হয়েছিল স্টেট ফ্যামিলি প্ল্যানিং ব্যুরোর মুখপত্র "দম্পতি"তে (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৬৮)। এমনই আশ্চর্য, ঐ রচনাটির হুবহু নকল দেখলাম, ১৯৬৯ সালে মার্চ মাসে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায়। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, ঐ রচনা লেখকের জীবনীর কিছুটা অংশও ঐ পত্রিকায় কলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে। এবং ঐ পত্রিকাটির মলাট তো বহু টাকার সরকারী বিজ্ঞাপনে ঝলসে উঠছে!

আমরা আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে শুধু অনুরোধ করি, আপনারাও কি জৌলসে ভুললেন? একটু কষ্ট করে পরখ করে দেখেন নি!

* * *

বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা-৩৪ থেকে অধ্যাপক সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: আপনাদের পত্রিকা মারফৎ নজরুল-সংগীত শিক্ষার আসর খোলার জন্য আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি। আমাদের এ অঞ্চলে নজরুল-সংগীত শিক্ষা দেবার মতো উপযুক্ত ব্যক্তিকে লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না। নিম্ন মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের পক্ষে এককভাবে কোনো সংগীত শিক্ষকও রাখা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। দু-একটি যে সংগীত বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, তাতে নাকি নজরুল-সংগীতের মূল্যায়ন হচ্ছে। না জানি এই অবস্থায় গ্রামের লোকগুলি কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে! নজরুল পল্লীবাংলার মানুষ। তাঁর গান শেখার জন্য গ্রামের বহু ব্যক্তি এখন উৎসাহবোধ করছেন। এ অবস্থায় আকাশবাণী (কলকাতা)-র কি কোনো কর্তব্যই নেই। ১৭ই সেপ্টেম্বর সুপ্রভা সরকার নজরুল-সংগীত শুনিয়ে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করেছেন। তান-লয়-সুর এমন নিখুঁত হতে পারে—কল্পনাও করা যায় না। এঁদের দিয়ে কি নজরুল-সংগীত শিক্ষার আসরের ব্যবস্থা আকাশ-বাণী কর্তৃপক্ষ করতে পারেন না—সাধারণ শ্রোতাদের মুখ চেয়ে?"

আশা করি, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

—অভ্রবাহন

বসুমতীর
যাবতীয়
গ্রন্থ ও
গ্রন্থাবলীর
প্রাপ্তিস্থান
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২
এবং
সান্যাল এণ্ড কোং
১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

পাঠক মন

'সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ' প্রসঙ্গে

গত ২১শে আগস্ট '৬৯ সালের "সাপ্তাহিক বসুমতী"তে "পাঠকমন" পর্যায়ে শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য ও লিলি ভট্টাচার্যের চিঠি ও লেখকের কৈফিয়ৎ দেখলাম। পত্রলেখিকাদের বক্তব্য যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও কতকগুলি কথা না লিখে পারলুম না।

প্রথমে লেখক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। বর্তমান যুগটি সস্তার যুগ। সব কিছু হাল্কা ও সস্তা। কোন কোন ক্ষেত্র ফাঁকি ও সর্টকাটের যুগও বলতে পারি। এইকালে গভীরতার কোন স্থান নেই। লেখক যে কাজ করছেন তা এই যুগে দেখা যায় না। তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা করা যায় না। মূর্তিমান নিষ্ঠার উদাহরণ হয়ে রইলেন লেখক নিজে। আজকের যুবসমাজ তাঁকে দেখে উৎসাহ পাবে, প্রেরণা পাবে। তিনি ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে নিজেই ইতিহাস হয়ে রইলেন। বাংলাদেশের যুব সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রণাম জানাই।

পত্রলেখিকাদের যে অসুবিধা তা সাধারণ পাঠকমাত্র সকলেরই অসুবিধা। কিন্তু যে রচনাটি পড়ছি, তা গবেষণা ছাড়া কিছুই নয়। তাই হোঁচট খেতেই হবে। এত প্রিয় বিষয় হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন সময় নীরস মনে হয়। কিন্তু এত প্রামাণিক তথ্য যেগুলি যুগ যুগ ধরে কত ছাত্র, শিক্ষার্থী, গবেষণাকারীদের কাজে লাগবে সে চিন্তা করে আমরা সব কিছু স্বীকার করতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রস্তুত নই লেখকের কতকগুলি প্রস্তাবে।

লেখক বলেছেন, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় উদ্ধৃতি বা উপাদান এবং ফুটনোট সংক্ষেপ বা আকার কমাবার চেষ্টা করব। এইখানে লেখককে আমার বিশেষ অনুরোধ যেন ঐ কাজ তিনি না করেন। কারণ বাংলাদেশে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে কিছু লোক যেমনভাবে নিজেদের ইচ্ছা মত ব্যবহার করেছেন এবং তথ্য বিকৃতি ঘটিয়েছেন (বিশেষ করে তার জীবন দর্শন নিয়ে), তা অন্য কোন মনীষীকে নিয়ে হয়েছে কি না সন্দেহ। সকলেই তাঁর (সুভাষচন্দ্রের) বন্ধু ও সহকর্মী এবং তাদের বক্তব্য এতই প্রামাণিক যে ইতিহাসের কোন প্রয়োজন নেই। এই যুগের ছেলেরা এর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। সুভাষচন্দ্রের জীবন অবলম্বনে অনেক গ্রন্থ থাকতে পারে, কিন্তু "সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষের" মত সামগ্রিক ব্যাপকতা ও বিস্তার কোন গ্রন্থের নেই, ভবিষ্যতে হবে কি না সন্দেহ। শুধু তাই নয় সকল বিভ্রান্তি ও বিকৃতির প্রতিবাদ স্বরূপ এই গ্রন্থটি বিবেচিত হোক। সুভাষচন্দ্র যে কোন ব্যক্তি বিশেষের মন্তব্য নির্ভর নয় সে কথা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ জানুক। এ দেশের যুবকরা সব কিছুকে যাচাই করে, বিচার করে দেখতে পারবে। যদি এ ধরণের একটি গ্রন্থ সামনে থাকে। তাই লেখককে আমার অনুরোধ "সাপ্তাহিক বসুমতীতে" প্রকাশিত সব কিছুই যেন তার প্রকাশিত গ্রন্থে থাকে। সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করতে পারলে সব দিক থেকেই ভাল হয়। এ গ্রন্থ সকল ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

—অমরনাথ বসু
১০/২, ডি গুপ্ত লেন
কলি-৫০

* * *

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীর জন্মলগ্ন থেকেই আমি তার পাঠক। পত্রিকাটি আপনগুণে পাঠকদের অন্তরে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। প্রচারের দিক থেকে দ্বিতীয় সর্বাধিক হলেও, সাহিত্য ও সাংবাদিক ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ ও নির্ভীকভাবে বিচার করলে 'প্রথমস্থান' দিতেই মন চায়। সম্পাদকীয় সময়োপযোগী, সরল ও সুস্থ চিন্তায় ভরপুর। 'আজকের মানুষ' সত্যই মূল্যবান। 'সপ্তাহের বোঝা' ও 'যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু' যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। কবিতাগুলির মান আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য তাহলেই ব্যবসাদারী চাল চালতে হয়। নতুনদের স্থান সীমিত করতে হয়।

এই আলোচনা আজ মূলত গৌরীশংকর চন্দ্রের 'বিহঙ্গ-জননী' গল্পটি সম্পর্কে। গৌরীবাবু কোথায় থাকেন জানি না,—যেখানেই তিনি থাকুন, আমার প্রাণভরা অভিনন্দন গ্রহণ করুন। (গল্পটি গত ১৮ই ভাদ্র প্রকাশিত) আজ যখন বাস্তবতা ও জীবনের সত্যকে অস্বীকার করে যৌনবিকৃতির সুযোগ নিয়ে আমরা সাহিত্যে বেলেল্লাপনার সৃষ্টি করে চলেছি। লেখক-প্রকাশক-পাঠক ও সমালোচক আপন-আপন কর্তব্য ভুলে গেছি অথবা ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে 'বিহঙ্গ-জননী' যথার্থই এক অবিস্মরণীয় উপহার। নিষ্ঠা ফলশ্রুতি এবং সৎ-শ্রমের পুরস্কারের যে ছবি লেখক এঁকেছেন—বেদনাক্রান্ত নিঃসহায় জীবনের তা বিরাট সম্বল। অবশ্য সে ছবিও চুরমার হয়ে গেছে, পানওয়ালী সর্বাণী নিষ্ঠা ও সততার ওপর ভর করে যে রতনকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছে, সেই রতন—উচ্চশিক্ষিত রতন অপমানের 'জুতা' ছুঁড়েছে সর্বাণীর মুখে। সর্বাণীর মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখছি,—অসংখ্য 'জননী' নীরবে, নিঃশব্দে, নিভৃতে বেদনার অশ্রু ঝরাচ্ছে এবং এও দেখছি আমাদেরই মধ্যে অজস্র রতন—বেইমান রতন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মুখোস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিছু না দিলেও,—নিষ্ঠা কোনদিন হারিয়ে যায় না। জগতের বুক থেকে মুছে যায় না সত্য ও সততার সাধনা। গৌরীবাবু আশ্চর্য অনুভূতিতে সে ছবিও এঁকেছেন,—দলে-দলে মানুষ গ্রহান্তরে পাড়ি দিচ্ছে, আর আসছে না ফিরে, মৌন ধরিত্রী একহাতে চোখ মুছছে, আর হাতে গুছিয়ে যাচ্ছে মানুষের গ্রহান্তর যাত্রার সব আয়োজন। 'বিহঙ্গ-জননী' সত্যই অনুপম।

—অনন্তদেব ভট্টাচার্য
আলমপুর হাই স্কুল, বর্ধমান

* * *

সাপ্তাহিক বসুমতীর পাতায় 'যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু' নিবন্ধটির আমি একজন নিয়মিত পাঠক। নিঃসন্দেহে আমার বিশ্বাস শ্রীসর্বদর্শীর নির্ভীক সমালোচনায় ফ্রন্ট সরকার নীতি নির্ধারণে নিশানা পায়। আর যদি তা না পেয়ে থাকে, তবে অদূর ভবিষ্যতে পাবে বলে আমার ধারণা।

বর্তমান ১১শ সংখ্যায় উক্ত নিবন্ধটির শেষের দিক হতে ৪র্থ অনুচ্ছেদে মাঝারি শিল্পের মালিকদের অভিযোগ বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তা সর্বাংশে সত্য। বিপদ হল এই যে, মাঝারি শিল্প সংস্থায় কর্মরত বহু ফ্রন্ট সরকার সমর্থক বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে, কেন না তাদের জীবিকা হারাতে হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কৃষি বিভাগের সার ব্যবসা সংক্রান্ত নির্দেশ সার বিক্রয়কারী সংস্থার বহু কর্মচারীকে ছাটাইয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং তাদের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজারের মত। সিদ্ধান্তটি "ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়"। মিশ্র সারে ভেজাল অজুহাতে মিশ্র সার বিক্রীর বন্ধের উক্ত নির্দেশ সার বিক্রয়কারী সংস্থার কর্মচারীদেরই যে বিপদে ফেলেছে তাই নয়, কৃষকদেরও ক্ষতি করেছে। অপরদিকে বহু কারবারীকে সাহায্য করেছে। অনুসন্ধান করে এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আপনার অনুরোধ জানাচ্ছি।

—শ্রীরাধানাথ ঘোষ
কলকাতা-৫

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড : প্রথম টেস্ট প্রসংগে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট দল থেকে জয়সীমার বাদ পড়া অপ্রত্যাশিত কি না জানি না, তবে এই ঘটনাটি অনেকের কাছেই বিস্ময়কর। কারণ বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কয়েকজন যাঁকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত করতে চেয়েছিলেন, তিনিই কি না শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ে গেলেন! সত্যিই অবাক হবার বিষয়ই বটে।

অবাক বোধহয় জয়সীমা নিজেও হয়েছেন। কারণ, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলার জন্যে তিনি যেভাবে বিনা অনুমতিতেই হঠাৎ ইংলন্ড থেকে ভারতে চলে এসেছিলেন, তার তুলনা মেলা ভার। কাউন্টি কর্তৃপক্ষ হয়তো জয়সীমার ভারতে আসার আবেদন মঞ্জুর করতেন। কিন্তু দেরি সহ্য হলো না জয়সীমার। ট্রায়াল ম্যাচ আর দলীপ ট্রফির খেলায় অংশ গ্রহণ করার জন্যে কাউকে কিছু না বলে জয়সীমা হঠাৎ ভারতে চলে এলেন।

তবু প্রথম টেস্ট দলে জয়সীমার স্থান হলো না। ভারতের অধিনায়ক পাতৌদির নবাবের সংগে জয়সীমার ঘনিষ্ঠতার কথা সবারই জানা। তাই মনে হয় অধিনায়কের পরামর্শ মতো নয়,

॥ জয়সীমা ॥

ইংলন্ড থেকে তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছিলেন, কিন্তু প্রথম টেস্ট দলে তাঁর স্থান হলো না।

নির্বাচকমণ্ডলীই জয়সীমাকে দল থেকে বাদ দিয়েছেন।

তবে এ কথা ঠিক যে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাকী দুটি টেস্টে দলে স্থান না পেলেও জয়সীমা নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে উপেক্ষিত হবেন না। কারণ, ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় জয়সীমার সেই উড়ে গিয়ে জুড়ে বসার কথা নিশ্চয়ই কেউ ভোলেন নি।

যাই হোক এবার শুধু জয়সীমা নন, ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন দিলীপ সরদেশাইও। সরদেশাই-এর বাদ পড়াটা খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সরদেশাই-এর সেই আগের খেলা এখন আর নেই। দলের সূচনাকারী ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি বার বার ব্যর্থ হয়েছেন।

॥ সুব্রত গুহ ॥

প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের ভাগ্য-পরীক্ষায় জয়ী হতে পারবেন তো?

তবে আমরা আশা করেছিলাম যে, ভারতীয় দলে এ বছর বেশ কয়েকজন নতুন খেলোয়াড়কে দেখা যাবে। দুজনকে অবশ্য নেওয়াও হয়েছে। তবে অশোক মানকাদ কিম্বা চৈতন্য চৌহান-এর মনোনয়ন নিঃসন্দেহে সকলকে খুশি করতে পারে নি।

অশোক মানকাদ কিম্বা চৈতন চৌহানের চেয়ে ভালো খেলোয়াড় নিশ্চয়ই আছেন। আর যেই থাকুন, আমরা বাংলাদেশের ক্রিকেটরসিকরা অন্তত আশা করেছিলাম যে, অম্বর রায় এবার টেস্ট খেলবেন। কিন্তু এর আগের কয়েকবারের মতো এবারও অম্বর রায়কে দ্বাদশ ব্যক্তিই থেকে যেতে হলো। জানি না কবে অম্বর রায় দ্বাদশ ব্যক্তির পদ ছেড়ে একাদশের তালিকার মধ্যে ঢুকতে পারবেন। তবে আশা করা যায় এ-বছরই নিউজিল্যান্ডর বিরুদ্ধে বাকী দুটি টেস্টের অন্তত একটিতেও অম্বর রায় ভারতীয় দলের পক্ষে খেলার সুযোগ পাবেন।

বম্বের অশোক মানকাদ কিম্বা পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৈতন চৌহানের মনোনয়ন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে নতুন খেলোয়াড়দের টেস্ট ক্যাপ দেবার জন্যে সিলেকশান কমিটির প্রশংসা করতেই হবে।

সেই সংগে প্রশংসা করতে হবে সিলেকশান কমিটির সাহসেরও। কারণ বোরদে, জয়সীমা, সরদেশাই, সুব্রহ্মনিয়ম, সাক্সেনা, চন্দ্রশেখর প্রমুখের মতো খেলোয়াড়দের বাদ দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবে নতুনদের স্থান দিতে পুরনোরা চিরকালই সরে যান। এ ক্ষেত্রেও অনেকটা সেই একই ব্যাপার হলেও বাংলার আর একজন খেলোয়াড়কেও পুরনোদের দলে পড়তে হয় কি না —সেইটাই এখন দেখার বিষয়।

ভারতীয় দলের পক্ষে খেলার জন্যে

॥ অম্বর রায় ॥

এবারও দ্বাদশ ব্যক্তি হয়েই থাকতে হলো অম্বরকে।

দশজন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাকী একজন হবেন হয় সুব্রত গুহ না হয় এ. পাই। এর আগে একটা টেস্ট খেললেও এবং ভারতীয় দলের সংগে ইংলণ্ড ভ্রমণ করে এলেও সুব্রত গুহ আজো নতুন খেলোয়াড়দের তালিকাতেই স্থান পাবেন। তবে অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে পাই-এর চেয়ে গুহ অনেক বেশি অভিজ্ঞ।

তবু ওঁদের ভাগ্য এখন পুরোপুরি-নির্ভর করছে ভারতীয় দলের অধিনায়ক পাতৌদির নবাবের ওপর। খেলার দিন সকালে পতৌদি এই দু'জনের মধ্যে থেকে একজনকে ঠিক করে নেবেন মাঠের আর পিচের অবস্থা দেখে।

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলছেন : পাতৌদির নবাব (অধিনায়ক), হনুমন্ত সিং, অজিত ওয়াদেকার, রুসি সুর্তি, ই· প্রসন্ন, এক·

॥ সরদেশাই ॥

সরদেশাই-এর দল থেকে বাদ পড়ায় হয়তো অবাক হবার বিশেষ কিছু নেই, তবু ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখার বিষয়ই বটে।

ইঞ্জিনিয়ার (উইকেটরক্ষক), বি· এস· বেদী, অশোক মানকাদ, চৈতন চৌহান, আবিদ আলি এবং সুব্রত গুহ ও অজিত পাই-এর মধ্যে একজন। অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে আছেন—অম্বর রায় ও ভেঙ্কটরাঘবন।

প্রথম টেস্টের খেলোয়াড় তালিকার দিকে তাকালে এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, দলটি মোটামুটিভাবে ব্যাটিং এবং বোলিং—দু'টি বিভাগেই বেশ শক্তিশালী। ব্যাটিং-এর দিক দিয়ে আমরা পাতৌদি, হনুমন্ত সিং, ওয়াদেকার, সুর্তি, ইঞ্জিনিয়ার ও আবিদ আলীর কাছে বেশ কিছু করে রান প্রত্যাশা করতে পারি। বলা যায় না প্রথম আবির্ভাবে অশোক মানকাদও বেশ কিছু রান করে ফেলতে পারেন।

॥ বেদী ॥

বেদীর বোলিং-এ পুরোন দিনের একজন খুব নামকরা বোলারের খেলার ধরণ আছে। আগের চেয়ে বেদী হয়তো এখন আরো ভালো বোলিং করেন।

বোলিং-এ প্রসন্ন, সুর্তি, বেদী, আবিদ আলী আর গুহ কিংবা পাইও নিউজিল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের যথেষ্ট বেগ দেবেন বলেই মনে হয়।

যাই হোক প্রথম টেস্টের পরে না হয় এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাবে। তার আগে আমরা বরঞ্চ একবার নিউজিল্যাণ্ড দলের খেলোয়াড়দের পরিচয় নিই :

গ্রাহাম ডাউলিং—দলের অধিনায়ক, বয়স বত্রিশ—ডান হাতের ওপনিং ব্যাটসম্যান।

ভিক্টর পোলার্ড—সহ-অধিনায়ক, তেইশ বছর—ব্যাটসম্যান ও অফ স্পিনার।

মারক জি বারজেস—চব্বিশ বছর—ব্যাটসম্যান।

রিচার্ড কোলিনজ—তেইশ বছর—ন্যাটা ফাস্ট বোলার।

বি· ই· কংডন—একত্রিশ বছর—ব্যাটসম্যান।

॥ ভেঙ্কট রাঘবন ॥

রবার্ট কানিশ—অটাশ বছর—মিডিয়াম পেস বোলার—স্পিনও করান।

ডি· হ্যাডলে—একুশ বছর—ফাস্ট বোলার ও ব্যাটসম্যান।

ব্রায়েন হেস্টিংস—উনত্রিশ বছর—ব্যাটসম্যান।

হেডলে জে· হাউওয়ার্থ—পঁচিশ বছর—ন্যাটা স্পিন বোলার।

বেরি ডি· মিলবার্ন—পঁচিশ বছর—উইকেটরক্ষক।

গ্লেন এম· টারনার—একুশ বছর—ওপনিং ব্যাটসম্যান।

ব্রুস এ· জি· মারে—আটাশ বছর—মিডিয়াম পেস বোলার, দু' হাতের ব্যাট করেন।

ব্রায়েন ডব্লিউ ইউল—সাতাশ বছর—ন্যাটা স্পিন বোলার।

কেন জে· ওয়াডসওয়ার্থ—একুশ বছর—উইকেটরক্ষক, ব্যাটসম্যান।

॥ অশোক মানকাদ ॥

প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়ে মানকাদ কি বিশেষ কিছু করতে পারবেন?

ডেভিড ট্রিসট—অলরাউণ্ডার।

গর্ডন সি বারজেস—দলের ম্যানেজার।

নিউজিল্যাণ্ড দল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব একটা স্পষ্ট নয়। দলের কয়েকজন ছাড়া বাকী খেলোয়াড়দের বিষয়ে আমরা খুব একটা বেশি কিছু জানি না। তবু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, নিউজিল্যাণ্ডের এই দলটি খুব একটা ফেলনা নয়। এদের বিরুদ্ধে ভারতকে প্রথম থেকেই একটু সজাগ হয়ে খেলতে হবে। তা না হলে হয়তো শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দলকে যথেষ্ট বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

যাই হোক প্রথম টেস্ট আরম্ভ হলো। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।

খেলাধুলা

সময় বদলাতে হবে

আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার সময় বদলানো দরকার। শুধু দরকার বললেই চলবে না—এখনই এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে এই দাবি আরো জোরদার হয়ে ওঠে। আর যাই হোক অন্তত কলকাতা তথা বংলদেশের ফুটবল খেলার মান-সম্মান এবং আই এফ এ শীল্ডের ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে এ দাবি যে আজ বাংলাদেশের ফুটবল রসিকদের করতেই হবে। কারণ আই এফ এ শীল্ডকে কেন্দ্র করে কলকাতা তথা বাংলাদেশের ফুটবলের মুখে চুনকালি পড়তে শুরু করেছে। আর সেই জন্যেই ভারতের সেরা এবং সব থেকে ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ড অন্য সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলোর সংগে ঠিক যেন পাল্লা দিতে পারছে না—পিছিয়ে পড়ছে। এর উদাহরণ দেবার জন্যে বেশি মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই। ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করলেই সব বোঝা যাবে। আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় বহিরাগত দলের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ভারতের নাম করা দলগুলো কলকাতায় খেলতে আসতে আর যেন ঠিক আগের মতো উৎসাহ পায় না। শুধু মাত্র উৎসাহ না পাওয়াই নয়—তারা তো আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা এক রকম ছেড়েই দিয়েছে। এ বছর আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বহিরাগত দলের তালিকার দিকে তাকালেই এ কথার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হবে। কিন্তু কেন? কেন তারা আসতে চাইছে না। আজ এ কথা যে ভাবার সময় এসেছে, আজ এ কথা যে আমাদের সকলকেই ভাবতে হবে।

কি কি কারণে বহিরাগত দলগুলো কলকাতায় আসছে না—একথা ভাবতে বসলে প্রথমেই যে কথা আমাদের মনে আসবে সেটি হলো খেলার সময়ের বিষয়। আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর যখন বসে তখন বাংলাদেশে ভরা বর্ষা। বৃষ্টির জন্যে মাঠের অবস্থা হয়ে ওঠে সঙ্গীন। পিছল আর কাদা-ভরা মাঠে বহিরাগত দলগুলো বিশেষ করে যারা শুকনো মাঠে খেলতে অভ্যস্ত তাদের অবস্থা একেবারেই কাহিল হয়ে পড়ে। হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও নামকরা খেলোয়াড়রা পারেন না তাঁদের স্বভাব-সুলভ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে। খেলতে নেমে খেলা ছাড়া আর সব কিছুই করতে হয় তাঁদের। ফলে স্থানীয় ছোট কিম্বা মেজো দলগুলোর কাছে পর্যন্ত অসহায়ের মতো হেরে যেতে হয় তাঁদের। তাই সবার আগে দরকার আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার সময় বদলানোর। পুজোর পরে এই প্রতিযোগিতার আসর বসালে ক্ষতি কি? এর পরেই আসবে বহিরাগত দলগুলোর সংগে আই এফ এ কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের প্রশ্ন—আই এফ এ কর্তৃপক্ষ সব সময় বহিরাগত দলগুলোর সংগে ভালো ব্যবহার করেন না—এ অভিযোগ অনেকদিনের। এবারও দিল্লী একাদশ দলের ম্যানেজার আর খেলোয়াড়দের সেই একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। খিদিরপুরের আর্মড পুলিশ মাঠে খেলা ছিল দিল্লী একাদশের সংগে রাজস্থানের। খেলার দিন সকালে জলে ভরা মাঠ দেখে দিল্লী দলের ম্যানেজার কমপ্লেন করলেন। কিন্তু সে অভিযোগ হলো অরণ্যে রোদনই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাঠে জল থাকায় এবং গোলপোস্ট না থাকায় রেফারী খেলা স্থগিত রেখেছিলেন। যাই হোক ও সব কথা না হয় এখন থাক। তবে একথা ঠিক যে, আজ সময় এসেছে এই বিষয়ে চিন্তা করার আর শুধু চিন্তাই বাংলাদেশের ও আই এফ এ শীল্ডের ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্যে দাবি জোরদার করে তোলার।

—[illegible]

ফুটবল—ফুটবল

কলকাতায় ফুটবলের আসর এ বছরের মতো মোটামুটিভাবে শেষ হয়ে গেল। আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ হবার সংগে সংগে সাঙ্গ হলো কলকাতার ফুটবলের আসর।

এবারও আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যালে উঠেছিল কলকাতার দুই প্রধান—লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান আর রানার্স আপ ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান ৫—২ গোলে মহামেডান স্পোর্টিংকে আর প্রথম দিন অমীমাংসিত থাকার পর দ্বিতীয় দিন ৪—০ গোলে ইস্টার্ন রেল দলকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব উঠেছিল আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যালে।

আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যালে কলকাতা তথা ভারতের সেরা এই দুই দলের মিলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের আবহাওয়াই গিয়েছিল পুরোপুরি পাল্টে।

চুম্বক

চারজন ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলাতেই সেঞ্চুরী করেছেন। এর মধ্যে তিনজন খেলেছিলেন ইংলন্ডের পক্ষে আর একজন ভারতের পক্ষে। ১৮৯৬ সালে রণজিৎ সিংজী ম্যানচেস্টারে তাঁর জীবনের প্রথম টেস্টে অপরাজিত থেকে করেছিলেন ১৫৪ রান। একই ভাবে ১৯৩০ সালে দলীপ সিংজী লর্ডস টেস্টে করলেন ১৭৩ রান আর ১৯৩২-৩৩ সালে পাতৌদির নবাব (বড়) সিডনী টেস্টে করেছিলেন ১০২ রান। পাতৌদির নবাব (ছোট) ১৯৬৪-৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম খেলাতেই অপরাজিতভাবে করলেন ১২৮ রান। পাতৌদি তখন ছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক।

খেলা দেখার টিকিটের জন্য ফুটবলরসিকদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল হাহাকার। এ হাহাকার নতুন নয়। ফুটবল খেলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সংগে সংগেই একটা টিকিটের আশায় মাথা খোঁড়া আরম্ভ হয়েছে আর সেই ট্রাডিসন আজো সমানে চলছে।

আর এই জন্যেই কলকাতায় একটা পূর্ণাঙ্গ ফুটবল স্টেডিয়ামের দাবি জানিয়ে আসছেন ক্রীড়ারসিকরা অনেকদিন ধরে। কিন্তু স্টেডিয়াম প্রসংগটি হচ্ছে 'হবেখন'-এর ফাইলে বাঁধা পড়ে আছে গত তেইশ বছর ধরে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী মুখে অনেক কিছুই বলেছিলেন, কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই করতে পারলেন না।

ফলে সেই একই হাহাকার থেকে গেলো। একটা টিকিটের জন্য মাথা খুঁড়ে মরা ছাড়া আর কোন উপায়ই রইলো না ফুটবলরসিকদের। আর খুবই সীমিত সংখ্যক দর্শকদের ভাগ্যে জুটলো বড় খেলা দেখার সুযোগ।

যাই হোক আকর্ষণীয় পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ বছরের আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যালে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে মোহনবাগান ৩—১ গোলের ব্যবধানে আর রানার্স আপ হয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

কালন গুহর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলাই দেকে বল আয়ত্তে আনতে দেখা যাচ্ছে

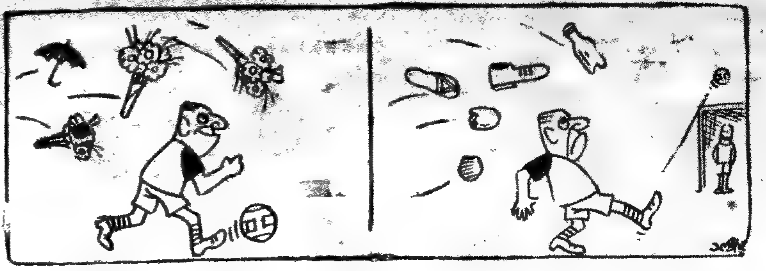

প্রশ্ন উত্তর

অসিত সরকার (ইন্দা হাই স্কুল, খড়্গপুর, মেদিনীপুর)

প্রশ্ন : জলন্ধরের লীডার্স ক্লাব, মফৎলাল, টাটা স্পোর্টস ও কেরালার আলিন্দ ক্লাবের ফুটবল অধিনায়কদের নাম জানতে চাই?

উত্তর : আমি জানি না। কেউ যদি জানেন এবং জানান তাহলে জানিয়ে দেবো।

এ পাল (আগরতলা, ত্রিপুরা)

উত্তর : ভারত প্রথম টেস্ট খেলেছিল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩২ সালে।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম উইকেটে খেলতে নেমে শেষ পর্যন্ত 'নট আউট' ছিলেন এমন কতোজন খেলোয়াড় আছেন তাঁদের নাম জানতে চাই। তাঁরা কতো করে রান করেছিলেন?

উত্তর :

বরুণ বাগচী ও চঞ্চল বাগচী (বানার-ঘাট, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : হ্যাঁ, থঙ্গরাজ এক সময় ফরোয়ার্ড লাইনে খেলতেন।

অমিতাভ ভদ্র (ন্যার পি এস এফ ৪ ব্যাটেলিয়ন, এন টি পি জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : ভারতের কোন মহিলা ফুটবল দল আছে কি? যদি থাকে সে দলের অধিনায়ক কে?

উত্তর : নেই।

পবিত্রকুমার মাঝি (উত্তরচড়া, তমলুক, মেদিনীপুর)

প্রশ্ন : একজন খেলোয়াড় বল মারল। বলটা ড্রপ খাবার সংগে সংগে গোল-রক্ষক ছুটে এসে লাফ দিয়ে বলটা ধরলো। তখন বিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড় বল মারার উদ্দেশ্যে গোলরক্ষককে ধাক্কা মারলো। গোল-রক্ষকের হাত থেকে বলটা ফসকে গিয়ে ঢুকলো গোলের মধ্যে। এক্ষেত্রে গোল হবে না ফাউল হবে?

উত্তর : ফাউল হবে।

কুনাল সরকার (কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা—৪)

প্রশ্ন : ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে কে কে, প্রথম আবির্ভাবে (টেস্ট খেলায়) শত রান করেছেন?

কত রান, কোনদেশের বিরুদ্ধে, কত সালে এবং কোথায়—জানতে চাই।

উত্তর :

১১৮ রান—অমরনাথ—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে, ১৯৩৩-৩৪ সালের বম্বে টেস্টে।

১১০ রান—দীপক সোধন—পাকি-স্তানের বিরুদ্ধে—১৯৫২-৫৩ সালের কলকাতা টেস্টে।

১০০* রান—কৃপাল সিং—নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে—১৯৫৫-৫৬ সালের হায়দ্রাবাদ টেস্টে।

১১২ রান—এ. বেগ—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে—১৯৫৯ সালের ম্যাঞ্চে-স্টার টেস্টে।

১০৫ রান—হনুমন্ত সিং—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে—১৯৬৩-৬৪ সালের দিল্লী টেস্টে।

২৬ * রান দলের রান ৪৭ এ ট্রানসার্ড, কেপটাউনে: সাউথ আফ্রিকা বনাম ইংলণ্ডের খেলায় ১৮৮৮-৮৯ সালে।
৬৭ * রান দলের রান ১৭৬ জে ব্যারেট, লর্ডস: অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ড: ১৮৯০।
১৩২ * রান দলের রান ৩০৭ আর এবেল, সিডনী: ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ১৮৯১-৯২।
১৩২ * রান দলের রান ২৩৭ পি ওয়ারনার, জোহানসবার্গ: ইংলণ্ড বনাম সাউথ আফ্রিকা—১৮৯৮-৯৯।
১৫৯ * রান দলের রান ৩০৯ ডবলিউ আর্মস্ট্রং, জোহানসবার্গ: অস্ট্রেলিয়া বনাম সাউথ আফ্রিকা—১৯০২-০৩।
৪৩ * রান দলের রান ১০৩ জে জুলচ, কেপ টাউন: সাউথ আফ্রিকা বনাম ইংলণ্ড—১৯০৯-১০।
১৯৩ * রান দলের রান ৩৮৩ ডবলিউ বার্ডস্লে, লর্ডস: অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ড—১৯২৬।
৩০ * রান দলের রান ৬৬ উডফুল, ব্রিসবেন: অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ড—১৯২৮-২৯।
৭৩ * রান দলের রান ১৯৩ উডফুল, এডিলেড: অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ড—১৯৩২-৩৩।
২০৬ * রান দলের রান ৪২২ ডবলিউ ব্রাউন, লর্ডস: অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ড—১৯৩৮।
২০২ রান দলের রান ৩৪৪ লেন হাটন, ওভাল: ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—১৯৫০।
১৫৬ * রান দলের রান ২৭২ লেন হাটন, এডিলেড: ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া—১৯৫০-৫১।
১২৪ * রান দলের রান ৩৩১ নজর মহম্মদ, লক্ষ্ণৌ: পাকিস্তান বনাম ভারত—১৯৫২-৫৩।
১৯১ * রান দলের রান ৩৭২ ফ্রাঙ্ক ওরেল, নটিংহাম: ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংলণ্ড—১৯৫৭।
৫৬ * রান দলের রান ৯৯ টি গডার্ড, কেপটাউন: সাউথ আফ্রিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া—১৯৫৭-৫৮।
৬০ রান দলের রান ১৩১ সি হাণ্ট, ত্রিনিদাদ: ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়া—১৯৬৪-৬৫।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

কালিদাস গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	২য়	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	৩য়	৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী	২য়	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)	১ম	৩-০০
" "	২য়	"
" "	৩য়	"
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)	১ম	৩-০০
" "	২য়	৩-০০
" "	৩য়	৩-০০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
" "	২য়	৬-০০
" "	৩য়	৮-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
মানিক গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-৩০
" "	২য়	৪-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	৪র্থ	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	৩য়	৪-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী—		৩-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী—		৫-০০
স্কট গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী—	৩য়	৩-০০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:—		৪-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—২য়	৪-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী—	৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ১ম	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ২য়	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—১ম	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—২য়	৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী—	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ১ম	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৩য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৪র্থ	৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী—	৪-০০
" " " —২য়	৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—	৬-০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী—	৪-০০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:—২য় ভাগ	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৩য়	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৫ম	৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—	৫-০০
কথাসরিৎসাগর—১ম ভাগ	৪-০০
" —২য়	৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী— ১ম, ২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড	৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড—	৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী—২য়	৪-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—	৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা—২য় ভাগ	৫-০০
অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী—২য়	৩-০০
" " " —৩য়	৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী—	৩-০০
নবীন সেনের গ্রন্থাবলী—	৭-০০

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস —২য় ভাগ	৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থা:—১ম	১০-০০
অরুণ বহ্নি—	৪-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী—	৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর—	৩-৫০
পরলোক—	৪-৫০
পরলোক রহস্য—	২-২৫
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব—	৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়—	১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা—	৩-০০
ভারত প্রতিভা—	৫-০০
প্রতাপাদিত্য—	৩-০০
সাধক কমলাকান্ত—	২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার—	৩-০০
নানার মা—	৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ—	৩-০০
বিক্রমাদিত্য—	৩-০০
বিসমার্ক—	২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী—	৩-০০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—	২-০০
মাধবীকঙ্কণ—	২-০০
শিবরাম গ্রন্থাবলী—	৪-০০
বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ—১ম	৪-০০
যৌন-মনোদর্শন	
৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ	৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া	৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ত-কালিকত্বের ব্যাপারসমূহ	৪-৫০
আশাপূর্ণা দেবী গ্রন্থাবলী—১ম	৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—২য়	৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী—	৮-০০
ANANDAMATH (শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)	৪-০০
DAVID HARE	৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

Thursday, 25th Sept., 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "BASUMATI" Phone : 34—7771, 72, 73, 74

সাপ্তাহিক বসুমতী

ভারতে গান্ধী জন্মশতবার্ষিক উৎসবে
সীমান্ত গান্ধী

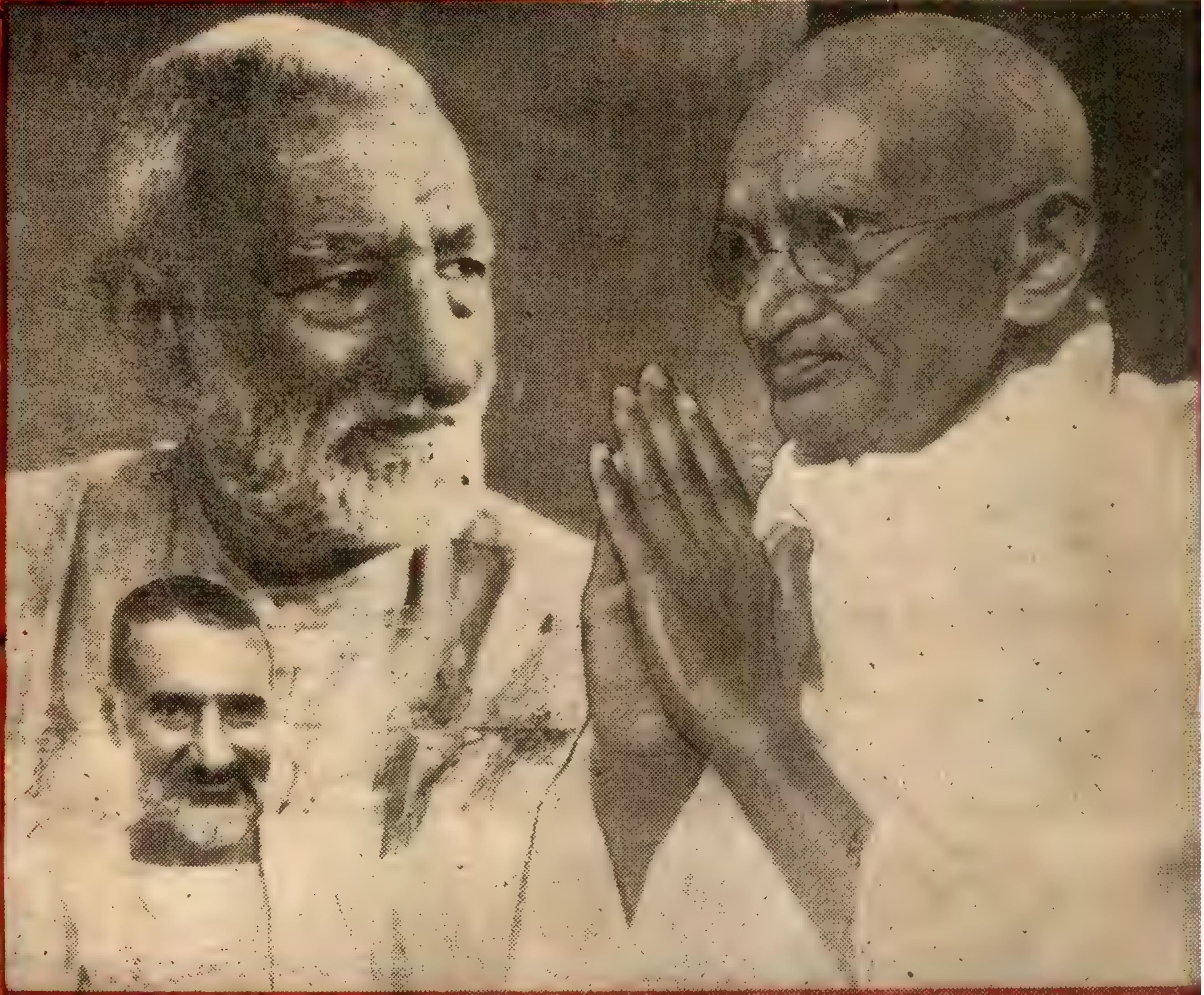

৭৪ বর্ষ ঃ ১৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই আশ্বিন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] ..DEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 15, 2nd Oct.,

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৮৯৯
আজকের মানুষ		৯০০
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৯০১
বই-বাছাই—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	৯০৫
বঙ্গদর্শন		৯০৭
ভারতদর্শন		৯১০
আন্তর্জাতিক		৯১২
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	৯১৪
মহাত্মা গান্ধী ও যুগযন্ত্র (প্রবন্ধ)	ভাস্কর ঘোষ	৯১৮
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	৯২১
মৃত আকাঙ্ক্ষার সহযাত্রী (কবিতা)	নন্দদুলাল সরকার	৯২৫

যে কোন

গয়না

আর

আসল

গ্রহরত্ন

কেনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যান্ড গ্র্যান্ডসন্স অব স্টেট

এস. বি. সরকার

৩৭/১৫ রাসবিহারী এভিনিউ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আইন ও শৃঙ্খলা ঃ		
পুলিশের ভূমিকা—কয়েকটি অভিমত ...	— সাগর বিশ্বাস	১২৬
মহানায়ক বাদশা খাঁ (প্রবন্ধ) ...	— চন্দ্র ঘোষ	১২৯
সীমান্ত গান্ধী (প্রবন্ধ) ...	— প্রমোদকুমার রায়	১৩২
শহর কলকাতা ...	— শহরদর্শী	১৩৪
গান্ধী-স্মারক (প্রবন্ধ) ...	— অলকশেখর সান্যাল	১৩৬
গ্রামবাংলার কথা ...	— অসীম মুখোপাধ্যায়	১৩৭
অমর সম্পদে (ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	— সুশীল জানা	১৪০
অন্ধ্যায়ের ব্যাধ (গল্প) ...	— অনিমেষ সেন	১৪৫
রঙ্গজগৎ ...	...	১৫১
খেলাধুলা ...	— শান্তিপ্রিয়	১৫৬

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ঃ প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ সিরাজউদ্দৌলা ; ম্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড ঃ পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড ঃ চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি-ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা ঃ শ্রীরমেন চৌধুরী

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

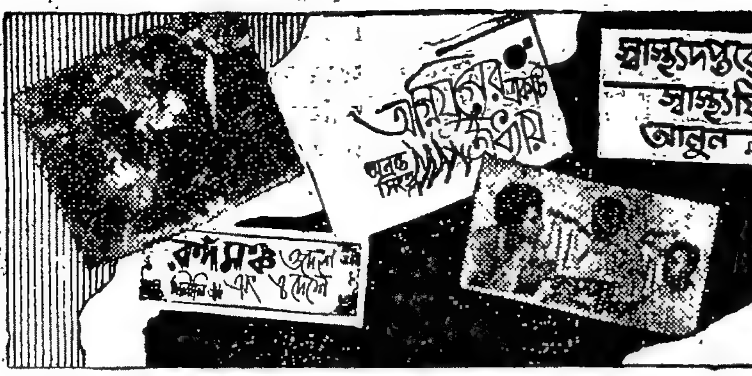

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা-জয়ন্তী সেন

৭৪ বর্ষ ঃ ১৫শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise

বৃহস্পতিবার, ১৫ই আশ্বিন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ | Thursday, 2nd October, 1969

CALCUTTA

মহাত্মাজীর জন্মশতবর্ষ পূর্তি

মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন বলেই গান্ধীজী যথার্থ মহাত্মা। তাঁর আদর্শবোধে সমগ্র জাতি আজ উদ্বুদ্ধ।

গান্ধীজীর একমাত্র সংকল্প শুধু ভারতবর্ষকে পরাধীনতা থেকে শৃঙ্খলমুক্ত করার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। তিনি শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষগুলিকে জাতীয়তার দীক্ষা দান করেছিলেন। কিন্তু স্বাবলম্বিতা ছাড়া স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন দেখেন নি মহাত্মাজী। তাই দরিদ্র ভারতবর্ষে প্রতিটি মানুষকে উদ্বোধনের প্রথমেই স্বাবলম্বী হবার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া ভারতবাসীদের পক্ষে এক জাতি ও এক প্রাণ হবার পক্ষে যে বাধা ছিল সে সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। সেই কারণে জাতিভেদ ধর্মভেদ, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন ; সেই সংগ্রামের পথে জনগণকে পরিচালিত করেছেন।

বস্তুত তাঁর সংগ্রাম ছিল দ্বিমুখী। এক, সংগ্রাম ছিল তাঁর সাম্রাজ্যবাদের পশুশক্তির বিরুদ্ধে শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, তাঁর এই সংগ্রাম অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল; দুই, তাঁর অন্যতম সংগ্রাম ছিল দেশের মানুষদের অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।

গান্ধীজীর জন্মশতবর্ষ পূর্তির দিনে, আমাদের এই কথা আজ মনে পড়ে যে, তিনি শতাধিক বছর বেঁচে থাকার বাসনা পোষণ করেছিলেন. কিন্তু সাধারণ মানুষের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত যাঁদের প্রাণ, তাঁদের সে-বাসনা অপূর্ণই থেকে যায়। গান্ধীজীও শতবর্ষ জীবিত থাকার আগেই প্রাণ দেন। কিন্তু তারপর দেশের মানুষ মহাত্মার আদর্শ কতটুকু রূপায়িত করতে পেরেছে সে প্রশ্ন আজ মনে জাগে।

গান্ধীজীর অনিচ্ছাতেই স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে দেশ বিভক্ত হয়েছিল। তারপর ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে যাঁরা আসীন হয়ে আসছেন, তাঁরা গান্ধীজীর অনুগত অনুচর। গান্ধীজীর জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে প্রায় বাইশ বছর স্বাধীনতা লাভের পর এই দেশ গান্ধীজীর সংকল্পিত পথে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে?

বাহ্যত গান্ধীজীর নামে আমরা অনুরাগ পোষণ করলেও আত্মসমালোচনার খাতিরে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, দলীয় স্বার্থটাই এ পর্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে আমরা সক্ষম হই নি, এদেশে ঐ ব্যাধি এখনো প্রকটভাবে বর্তমান। স্বার্থবুদ্ধির সফলতার উদ্দেশ্য একশ্রেণীর মানুষ আজো সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা রঞ্জিত হস্ত কলুষিত করছে। সুতরাং দেশ স্বাধীন হলেও দেশের সমগ্র মানুষ আজো জাগে নি। অথচ একথা কে অস্বীকার করবে যে, গান্ধীজী নির্দেশিত ভেদবুদ্ধিহীন সমাজই মানষকে সুখ ও শান্তি দিতে পারে।

গান্ধীজী বলেছিলেন, গ্রামে চলো। তিনি জানতেন এদেশের লক্ষ লক্ষ গ্রামে কোটি কোটি মানুষ বিরাজ করছে। তারাই দেশের সত্যিকারের প্রাণ। সেই প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, গ্রামগুলিকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথ দেখাতে হবে। অযাচিত উপদেশের দ্বারা তাদের কল্যাণ করার পরিবর্তে তাদের সাহচর্য গ্রহণ করে, তাদের স্বাবলম্বিতার পথ নির্দেশ করতে হবে।

দুঃখের কথা, গ্রামগুলিই বোধ হয় এখন সর্বাধিক দুর্ভাগ্যবিড়ম্বিত। শুধু ভোট আদায়ের মুহূর্তে নেতৃবৃন্দের মুখদর্শন লাভ করে উপেক্ষিত গ্রাম্য মানুষেরা।

এখনো অবশ্য একজন এমন ব্যক্তি আছেন, যিনি অশীতিপর বয়সে সাধারণ মানুষের সেবা করাকেই জীবনের ধর্ম বলে বিবেচনা করেন। সমস্ত রকম উৎপীড়নের মধ্যেও সেই মানুষটি কোনো রকম পার্থিব সুযোগ লাভের পথ গ্রহণ করেন নি। তিনি হচ্ছেন, খান আবদুল গফুর খান ; সীমান্ত গান্ধী এই প্রিয় নামেও তিনি পরিচিত। তাঁর পরিচালিত খুদাই খিদ্‌মৎগার কোনোদিনই বিপথে পরিচালিত হয় নি।

ভারত রাষ্ট্রে মহাত্মাজীর আদর্শে পুরোপুরি চালিত জননেতার অভাব আজ অত্যন্ত মনোবেদনাদায়ক। তবু তারি মধ্যে সান্ত্বনার কথা এই যে, গান্ধী জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে আমরা লাভ করছি সীমান্ত গান্ধীকে, যাঁর হৃদয় প্রতিনিয়ত জনগণের কল্যাণ-কর্মে উৎসর্গীকৃত। তাঁর উপস্থিতিতে ভারতচিত্ত যেমন উদ্বেল, তেমনি সার্থক হয়ে উঠুক মহাত্মাজীর জন্মশতবার্ষিক উৎসব। অন্তত একজনও আজো গান্ধীজীর পথের অনুসারী আছেন, এই সুস্পষ্ট চিত্রে উজ্জ্বল হোল মহাত্মার পুণ্য জন্মতিথি।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

অন্ধকার আফ্রিকা আলোকিত হচ্ছে। অনগ্রসর আফ্রিকার দ্রুত অগ্রগতি ঘটছে। মানুষ করার মত মা থাকলে অমানুষ থাকে আর কোন্ সন্তান? আঞ্জি ব্রুকস-কে গোটা আফ্রিকার না হলেও লাইবেরিয়ার জননী কি বলা যায় না? মা হতে চান তিনি বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মিলনতীর্থ রাষ্ট্রসঙ্ঘেরও। বিশ্ব সংগঠনে লাইবেরিয়ার প্রতিনিধি মিস ব্রুকস রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। মিস ব্রুকস লাইবেরিয়ার ৫৭টি ছেলেমেয়ের স্নেহশীলা জননী।

এতগুলি সন্তানের মা যিনি, তিনি মিস বা কুমারী কেন? আসলে ওই ছেলেমেয়েরা তাঁকে মাতৃজ্ঞান করে, মায়ের মত তাঁর কাছে আবদার করে, সোহাগ ভোগ করে। তবে ১৯টি সন্তানকে তিনি পোষ্য নিয়েছেন, তাদের পালন করে আসছেন। তাঁর নিজের সন্তানও আছে, দুটি সন্তানের তিনি গর্ভধারিণী। মিস ব্রুকস-এর একদিন, খুবই ছোটবেলায় বিয়েও হয়েছিল, স্বামী-সংসার নিয়ে ঘরও করেছিলেন। কিন্তু একদিন সে-বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটে। দুটি সন্তান নিয়ে আঞ্জি ব্রুকস নতুন করে বাঁচতে শুরু করলেন, মিসেস মুছে নামের আগে আবার লিখলেন মিস—কুমারী!

বাবা ছিলেন একজন পাদ্রী, কিন্তু নটা সন্তানকে খাওয়ানো-পরানোর মত ক্ষমতা ব্যাপটিস্ট পাদ্রীর ছিল না। বাধ্য হয়ে তাঁকে মেয়েকে দিতে হল এক বিধবা ধাত্রীর কাছে। সে-ই বা এ-মেয়েকে কদিন চালাতে পারে? আঞ্জির বয়স যখন মাত্র দশ, তখন তাকে বিয়ে দেওয়া হল। বেশ কয়েক বছর স্বামীর ঘর করলেন ব্রুকস। কিন্তু স্বামীসুখ বেশিদিন সইলো না আঞ্জির কপালে। দুটি সন্তান কোলে করে ফিরে এলেন ব্রুকস।

তারপর নতুন জীবন শুরু করলেন আঞ্জি। নতুন করে পড়াশুনো আরম্ভ করলেন। সে-কাজও অবশ্য সহজ হয় নি। কোনোরকমে মার্কিন মুলুকে গিয়ে পড়লেন, কিন্তু প্রাচুর্যের লীলাক্ষেত্রে গেলেই তো আর তাঁর জীবনে প্রাচুর্যের আশীর্বাদ নেমে এলো না। তবে হ্যাঁ, সুযোগ আঞ্জি পেয়েছিলেন। সাধারণ স্কুলে ভর্তি হতে পারলেন না তিনি, তাঁর গায়ের রঙ যে নিকষ কালো! তাছাড়া পড়ার খরচাও তো চাই। রেস্তোরাঁয় ডিস ধোবার কাজ নিলেন আঞ্জি, কখনো বা

মিস ব্রুকস

লন্ড্রীতে কাপড় ইস্ত্রি করার কাজ। তাই করে পড়ার খরচ যোগাতে লাগলেন, ভর্তি হলেন উত্তর ক্যারোলিনার ক্যালেতে 'শ' বিশ্ববিদ্যালয়ে—যেখানে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরই গায়ের চামড়া কালো রঙের।

একে মেধাবী তার ওপর জেদ নিয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করেছিলেন। কাজেই তর্ তর্ করে পরীক্ষা পাশে বেগ পেতে হলো না মিস ব্রুকসকে। 'শ' বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে মিস ব্রুকস গেলেন উইনকিনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে। এখানে তিনি পড়ার খরচ যোগাড় করলেন লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং নার্সের সাহায্যকারীর কাজ করে। আইন পড়া শেষ করে উচ্চাভিলাষী ব্রুকস গেলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে—এখানে আন্তর্জাতিক আইন পড়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক চুকোলেন।

এরপর শুরু হলো আঞ্জির কর্মজীবন। প্রথমে আইনব্যবসা। সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনে। শীগ্‌গিরই তিনি খ্যাতি অর্জন করলেন সংগঠক এবং সুবক্তা হিসেবে। দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার এবং উচ্চশিক্ষিতা ও অভিজ্ঞতা থাকার জন্যে তিনি লাইবেরিয়ার মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন। পররাষ্ট্র দপ্তরও পেলেন—সহকারী পররাষ্ট্রসচিব। এমন কি একবার রাষ্ট্রপ্রধানের শ্রেষ্ঠতম সম্মানও ব্রুকস পেয়েছিলেন যখন প্রেসিডেণ্ট এবং প্রধানমন্ত্রী দুজনেই বিদেশ সফর করছিলেন।

আঞ্জি ব্রুকস গত ১৫ বছর ধরে রাষ্ট্রসঙ্ঘে লাইবেরিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘে মহিলা প্রতিনিধি অন্য রাষ্ট্রেরও আছেন, কিন্তু তবুও যেন এখানে মিস ব্রুকস একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে তাঁর কণ্ঠে বার বার পদানত পরাধীন মুক্তিকামী আফ্রিকার দাবি ধ্বনিত হয়েছে। আফ্রিকার বহু উপনিবেশের স্বাধীনতা আদায়ের ব্যাপারে মিস ব্রুকস গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সকল সদস্যই—মতের অমিল হওয়া সত্ত্বেও এই ৪১ বছরের কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রমহিলার উদ্দেশে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন।

মধ্যস্থতা এবং বিরোধ মীমাংসায় মিস ব্রুকস-এর আশ্চর্য ক্ষমতা। লাইবেরিয়ার বিভিন্ন উপজাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য রক্ষায় যেমন তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তেমনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যেও। বস্তুত যিনি ১৯টি পোষ্য সন্তানকে মায়ের মত মানুষ করছেন তাঁর পক্ষে বাইরের বিবাদ-বিসম্বাদ মেটানোও খুব শক্ত নয়। মিস ব্রুকস যেন মাতৃত্বের এক উজ্জ্বল প্রতীক। আজ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেণ্ট হয়েও যেন তিনি এই বিশ্ব সংগঠনের কল্যাণময়ী মায়ের ভূমিকা নিলেন। আশা করা যায়, তাঁর এই শিশুটিরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(১২)

সুভাষচন্দ্র ও মেঘনাদ সাহা—৩

মেঘনাদ সাহার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ১৯২২ সালের শেষ ভাগে উভয়ে একই কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন দেখতে পাই। উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হয় ঐ বছরই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে বন্যাত্রাণ কমিটি গঠিত হয়েছিল। বন্যাপীড়িত অঞ্চলে গিয়ে সেবা-কাজ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্র। এ কাজে কী অসাধারণ সাংগঠনিক সাফল্য এবং মানবপ্রেমের পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, তা ইতিহাস হয়ে আছে। মেঘনাদ সাহা ঐ ত্রাণ কমিটির প্রচার-সম্পাদক ছিলেন। এই কাজে যুক্ত থাকার সময়ে তিনি মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় বন্যার কারণ ও প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। "নদী-গবেষণা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের সূত্রপাত এখান থেকেই।"১১

ডঃ সাহা ১৯২৩ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ নিয়ে চলে যান। ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পালিত অধ্যাপক'রূপে যোগদান করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এলাহাবাদেই ছিলেন। এই কালে সুভাষ-চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কিছুটা শিথিল হয়েছিলই। ১৯২৩ সাল থেকে সুভাষচন্দ্র স্বরাজ্য দলের প্রধান কর্মী। ১৯২৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার হবার পরে সেই কাজেই মনপ্রাণ-সমর্পিত। তারপরে ১৯২৪ সালের অক্টোবর থেকে ১৯২৭ সালের মে মাস পর্যন্ত বন্দিজীবন। ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৩১ সালের শেষ পর্যন্ত সাড়ে তিন বছর তিনি ভারতেই ছিলেন, তবে তার মধ্যে কয়েকবার গ্রেপ্তার ও কারাবাস। ১৯৩৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইউরোপ যাত্রা।

১৯৩৫ সালে সাহা ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে পত্রযোগে যোগাযোগের সংবাদ পেয়েছি।

১৯২৩ থেকে ১৯৩৫—এই ১২ বছরে মেঘনাদ সাহার জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে। ১৯২০সালেই তিনি তাঁর 'যুগান্তকারী' তাপ-আয়নতত্ত্বের দ্বারা বিশ্ব-বিজ্ঞানী। অতঃপর তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায়ে গবেষণা করে গেছেন, বহু পেপার প্রকাশ করেছেন, তার গুরুত্ব বিষয়ে কোনো উপযুক্ত ধারণা বর্তমান লেখকের নেই, কিন্তু এই সংবাদ পাচ্ছি, আর্থার এইচ কম্পটন নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করছেন এবং ১৯২৭ সালে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে ফেলো মনোনীত করছেন—যখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৪। ১৯২৫ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতিত্বও করেছেন।

ডঃ সাহা নিজে স্বীকার করেছেন ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি 'বিজ্ঞানের গজদন্ত মিনারে' বাস করেছিলেন। তার অর্থ, বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ তত্ত্বচিন্তা করেছেন, কিন্তু ঐ বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণের পক্ষে প্রয়োগের কাজে ব্রতী হন নি। ১৯৩১ সালে 'ইউ পি অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনে নতুন ভূমিকার সূত্রপাত হল। এর আগে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরী বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে উচ্চাঙ্গের ভাবে পুনর্গঠন করে এবং ছাত্র ও সহকর্মী-দের নিয়ে সত্যকার উৎসাহী ও দক্ষ ও একটি বিজ্ঞানগোষ্ঠী সৃষ্টি করে তিনি শিক্ষক ও সংগঠক হিসাবে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিলেন—সেই গঠনশক্তিকে তিনি আরও প্রসারিত করতে চাইলেন ইউ পি বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর প্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে। ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় নাম বর্জন করে নতুন নাম নেয়—"ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস, ইন্ডিয়া।" প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু নামত সর্বভারতীয় হলেও কার্যত তা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হয় নি। ১৯৩৫ সালে সেজন্য 'ন্যাশ-ন্যাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস'-এর প্রতিষ্ঠা ঘটালেন। প্রথমে কলকাতায় তার কার্যালয় ছিল, ১৯৪৪—৪৫ সালে ডঃ সাহার চেষ্টায় তা স্থানান্তরিত হয় দিল্লীতে।

মেঘনাদ সাহার কাছে বিজ্ঞান ছিল ধর্ম। এক্ষেত্রে তাঁকে ধার্মিক বলাই যথেষ্ট নয়—তিনি একেবারে ধর্মোন্মাদ। বিজ্ঞান নামক ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি ১৯৩৫ সাল 'সায়েন্স

---

১১ ***Professor Meghnad Saha*** গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অ্যান্ড কালচার' পত্রিকার প্রবর্তন করলেন। পত্রিকাটি, ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার 'সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনে'র সঙ্গে যুক্ত রইল।১২ 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকার অক্টোবর, ১৯৩৫ সংখ্যাতে সুভাষচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল যার সূচনাতে তিনি পত্রিকাটির আবির্ভাবকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

মেঘনাদ সাহা পত্রিকা প্রকাশমাত্রে সুভাষচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন ধরে নেওয়া যায়। একেবারে প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রস্তাবনায় ডঃ সাহা সভ্যতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের পর্যালোচনা করার পরে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে দিশী-বিদেশী পণ্ডিতদের মতের বিচার করেন এবং ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতীয় জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, তার আলোচনা করেন। সমকালীন দেশীয় সাহিত্যে প্রাচীনের জয়গানে ডঃ সাহা যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছিলেন। গান্ধী-নীতি বলেন, চরকা এবং গরুর গাড়ি ততদিনই রাখা চলে যতদিন না সরকার বেকার সমস্যা দূর করতে পারছেন। "মধ্যবর্তীকালে দেশের অর্থনৈতিক জীবন এবং শিল্পজীবনে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য ধারাবাহিক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং যখনি বেকারসমস্যা দূর হবার অবস্থা সৃষ্টি হবে তখনি ঐসব বস্তাপচা পুরনো পদ্ধতিকে একেবারে দূর করে দিতে হবে কোনো দীর্ঘশ্বাস না ফেলে বা একবিন্দু চোখের জল না ঝরিয়ে।"

সুভাষচন্দ্র পত্রিকা পড়ে খুব খুশি হয়ে লিখে পাঠালেন১৩—

"সায়েন্স অ্যান্ড কালচার পত্রিকার আবির্ভাব সাদরে অভ্যর্থিত হবে—বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে যাঁরা আগ্রহী শুধু তাঁদের দ্বারাই নয়, যাঁরা হাতে-কলমে জাতিগঠন কাজে ব্যাপৃত আছেন তাঁরাও অভিনন্দন জানাবেন। আমাদের প্রবীণতর 'জাতি-সংগঠকদের' মতামত যাই হোক না কেন, তরুণতর আমরা জাতিগঠনের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে চাই; আধুনিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি যে সকল জ্ঞান আমাদের দিয়েছে, তার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েই আমরা অগ্রসর হতে চাই। অবশ্য রাজনৈতিককর্মীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ধারণাদি সংগ্রহ করে নেওয়া সম্ভব নয়, রাজনীতির অফুরন্ত কাজে তাঁদের ব্যবস্থা থাকতে হয়; এক্ষেত্রে তাঁদের সাহায্যার্থে বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান-গবেষকদের এগিয়ে আসতে হবে।"

বৈজ্ঞানিক প্রস্তুত ছিলেন রাজনৈতিকের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য—শুধু 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকা প্রকাশ করেই নয়, অন্য ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেও—তার কথা অল্প পরে বলব—এখানে, কোন্ সুভাষচন্দ্র আবেদন জানিয়েছিলেন সে বিষয়ে কিছু বলে নেওয়া উচিত। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের চিন্তাভাবনা কুটীরশিল্পকে কেন্দ্র করেই তা আমরা দেখেছি। অন্য চিন্তা করার সামর্থ্য তাঁর ছিল, কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী অ করেন নি। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর দেহান্ত হয়—তার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অনুগত সৈনিক। ১৯২৮ সাল থেকে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীন নেতৃত্বের সূচনা। সূচনাতেই তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে গান্ধীজীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। সামরিক শৃঙ্খলায় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেও গান্ধী-ধারণার বিরোধিতা করেছেন। ১৯৩০ সালে আবার ব্যাপক স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ গান্ধী-নেতৃত্ব মেনে নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেখলেন গান্ধীর অপূর্ব নেতৃত্বকে, কিছু পরেই দেখলেন অপূর্ব ব্যর্থতাকেও। এবার একেবারে স্থির করে ফেললেন—গান্ধী-নেতৃত্ব দিয়ে আর চলবে না—ইউরোপ থেকে বিঠলভাইয়ের সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে তা খোলাখুলি জানালেন।

গান্ধী-নেতৃত্বের ব্যর্থতা থেকে নতুন নেতৃত্ব-চিন্তায় যখন গেছেন, তখন সে নেতৃত্বের প্রকৃতি নিয়েও তাঁকে গভীরভাবে ভাবতে হয়েছে। এই সময়েই সমাজতন্ত্র নিয়ে তিনি সক্রিয় চিন্তা শুরু করেন। সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, রাশিয়ার বিপ্লব প্রভৃতির উল্লেখ তাঁর কথায় বা লেখায় পূর্বেও দেখা গেছে, কিন্তু ওগুলিকে সত্যই ভারতীয় জীবনে নিয়ন্ত্রিত আকারে প্রবর্তন করার কথা ভেবেছেন কি না সন্দেহ। এখন যখন নেতৃত্বের দায়িত্ব নিজের মধ্যে বোধ করলেন, তখন ঐ সব চিন্তা তাঁকে করতে হলই। ইউরোপবাস সেই চিন্তার স্বাধীনতাকে উন্মোচন করে দিল। এই দ্বিতীয় ইউরোপবাস তাঁর জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তিনি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে ইউরোপীয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পর্যালোচনা করেছিলেন। জাতীয়

---

১২ 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' প্রথম বেরোয় ১৯৩৫-এর জুন মাসে। তিন সম্পাদক—অধ্যাপক এম এন সাহা, এলাহাবাদ; অধ্যাপক জে সি ঘোষ, ঢাকা; অধ্যাপক বি বি রায়, কলকাতা। পত্রিকার মূল চরিত্র : "A monthly journal of national and cultural sciences". পত্রিকাটি প্রকাশের পরে কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশেষ সাফল্যলাভ করে। প্রকাশের তিন বৎসর পরে ১৯৩৮ সালে সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অধ্যাপক এস কে মিত্র বার্ষিক সভায় বলেছিলেন—"The high standard which the journal has reached is evident from the fact that many scientists of international standing responded to our invitation to write for our journal. Such were Sir James H. Jeans, Sir Arthur Eddington, Dr. P. W. Aston, Prof. F. K. Morris, Prof. H. J. Fleure etc."

১৩ অক্টোবর, ১৯৩৫ সংখ্যায় লেখাটি বেরিয়েছিল নাম ছিল—*Some Problems of Nation-Building.*

জীবনের পরিকল্পিত পুনর্গঠনের রূপ তিনি দেখলেন ইউরোপে, বিশেষত রাশিয়ায়। কোন্ পথে ভারতের পুনর্গঠন করতে হবে, তার সিদ্ধান্ত করতে তাঁর দেরি হল না। ১৯৩০ সালে লাহোরে রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রেরিত সভাপতি-ভাষণে স্পষ্টই বললেন—ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবর্তন করতে হবে বৈজ্ঞানিক পথে। বৈজ্ঞানিক পথে যদি করতে হয়, অবশ্যই বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য চাই। পাওয়া যাবে কি? এমনই সন্ধিক্ষণে মেঘনাদ সাহার সায়েন্স অ্যান্ড কালচার পত্রিকা এসে পৌঁছল তাঁর কাছে। সুভাষচন্দ্র সাগ্রহে অভিনন্দনের হাত বাড়িয়ে দিলেন।

জাতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে মেঘনাদ সাহার চিন্তা ও প্রচেষ্টা কতখানি এগিয়েছিল, তার সবটুকু খবর সুভাষচন্দ্র রাখতেন না বলেই মনে হয়। ইউ পি অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স-এর প্রথম সভাপতিরূপে ডঃ সাহা যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে বিশেষ জোরের সঙ্গে দেখানো হয়েছিল, পৃথিবীর নানা দেশ কিভাবে দ্রুত অর্থনৈতিকভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। বিভিন্ন দেশ যদি সহযোগিতা করে, তাহলে পৃথিবীর সম্পদকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করে মানবজাতির অভাবিত উন্নতি করা সম্ভবপর। পৃথিবীর উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ডঃ সাহা এক সর্বজাতীয় সংস্থার প্রস্তাব করেছিলেন, সেই সঙ্গে নতুন শিক্ষানীতির, যা প্রস্তুত করবেন বার্গ সঁ, আইনস্টাইন, বারট্রান্ড রাসেল, স্মাটস, স্পেংলার-এর মত চিন্তাবিৎ ও বিজ্ঞানীরা।১৪

বিশ্ব উন্নয়ন পরিষদ দূরবর্তী ব্যাপার—সামনে ছিল ভারতীয় উন্নয়ন। আগেই বলেছি, যুক্তপ্রদেশ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী নিয়ে ডঃ সাহা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি, কারণ তাঁর মাথায় ঘুরছিল ইংলন্ডের 'রয়াল সোসাইটি', জার্মানীর 'প্রাসিয়ান অ্যাকাডেমী' রাশিয়ার 'অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস'-এর মত প্রতিষ্ঠানের কথা—সরকারকে বিজ্ঞান-বিষয়ে যে-প্রতিষ্ঠান পরামর্শ দেবে। ইউ-পি সায়েন্স অ্যাকাডেমীর নাম বদলে 'ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস' করলেই সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। ১৯৩৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিরূপে একটি সত্যকার সর্বভারতের জন্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (*Indian Academy of Science*) গঠনের প্রস্তাব করলেন:

"The Indian Academy will, therefore, be a Central Society, on which all branches of sciences will be represented; or to borrow a simile, it will form like the Royal Society in England, or the Prussian Academy in Germany, the apex of a pyramid of societies devoted to particular subjects."

এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত কর্মধারার মধ্যে জাতীয় কল্যাণ পরিকল্পনাও ছিল।

১৯৩৫ সাল থেকে 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকায় জাতীয় পুনর্গঠনে ও শিল্পায়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষে যেসব তথ্যমূলক রচনা প্রকাশিত হয়, ডঃ সাহার বিশ্বাস হয়েছিল, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে এ আই সি সি ওয়ার্ধায় জাতীয় পুনর্গঠন সম্বন্ধে প্রস্তাব নিয়েছিল—ডঃ

১৪ "But economic and scientific studies show that the world has resources enough for her whole population, and if there be a rational programme of production, and a programme of judicious and equitable distribution, nobody should suffer from hunger, privation, and can even afford to have much better amenities of life. But for this purpose, rivalry amongst nations and communities should give way to co-operative construction, and the politician should hand over many of his functions to an international board of trained scientific industrialists, economists, and engenists, who will think in terms of the whole world as a unit. . . The eugenists should devise means for assigning a fixed quota of population to each geographical unit, which it should not be allowed to exceed. It may seem to be a dream, but is feasible provided the educational programme of the coming generations is thoroughly revised. A new educational scheme should be devised by a World's Congress of foremost thinkers like Bergson, Einstein, Bertrand Russel, Smuts, Spenglers, and others, with the special objective of weeding out mediaeval passions from the minds of the coming generation and for training them up to a proper grasp and sufficient appreciation of the beauty and powers of Scien—" (*Professor Meghnad Saha* গ্রন্থ)

সাহা দাবি করলেন, তার মূলে 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচারে'র প্রবন্ধাবলী।১৫

কয়েকমাস পরে, ১৯৩৮ সালে (সম্ভবত গোড়ার দিকে) যুক্তপ্রদেশের 'ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস' বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ সম্বন্ধে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। জহরলাল নেহরু সভাপতিত্ব করেছিলেন। বিজ্ঞানীরা, বিশেষত ডঃ সাহা, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিদ্যুৎশক্তির ভূমিকার গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরেন এবং কংগ্রেসী সরকারকে সে বিষয়ে তৎপর হতে অনুরোধ জানান। বিজ্ঞানীদের উৎসাহের আগুনে পণ্ডিত নেহরু কিছু জলনিষেক করে বলেছিলেন—বিদ্যুৎশক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে কংগ্রেস সচেতন, কিন্তু গণতন্ত্রের অনেক ঝামেলা, আজে-বাজে কাজে মন্ত্রীদের বড্ড বেশি সময় দিতে হয়, রাজ্যের লোকের অভাব-অভিযোগ শুনতে শুনতে সময় কেটে যায়, যার ফলে বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করার ফুরসত থাকে না। বিজ্ঞানীদের বাস্তবতাহীন আকাশস্পর্শী পরিকল্পনাবিলাস সম্বন্ধেও পণ্ডিত নেহরু অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। সবশেষে তিনি অনুরোধ জানান, অ্যাকাডেমী যেন সত্যকার জাতীয় কল্যাণ হবে এমন স্পষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করে।১৬

পরিকল্পনার বাস্তবতা সম্বন্ধে ডঃ সাহার আগ্রহের পরিমাণ কারো চেয়ে কম ছিল না। তাই তিনি জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অন্ধ বাতিকগুলি বর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা তীক্ষ্ণভাবে উপস্থিত করেন। বাতিক বলতে গান্ধী-আন্দোলনের খাদি-বাতিককেই বুঝেছিলেন।

"The Congress having accepted office, were face to face with peace-time problems. It seemed to him that their work of national reconstruction was being handicapped by some fetishes which they raised, probably as a war-time measure. But no progress could be made unless they got rid of those fetishes and attacked the problems from a realistic point of view. And science was not science if it hesitated to call a fetish other than a fetish, of which there were too many in this country. They would probably agree that in the reconstruction of the nation, science was to play a very significant part."১৭

চমৎকার সংঘর্ষ। বৈজ্ঞানিকরা বাস্তববোধহীন—রাজনৈতিকের অভিযোগ। রাজনৈতিকেরা বাতিকগ্রস্ত—বৈজ্ঞানিকের উত্তর। যে খাদি ব্যাপারটি গান্ধীজীর কাছে শুধু আন্দোলনের নয়, জীবনেরও ধর্ম, তা মেঘনাদ সাহার কাছে যুদ্ধকালীন কার্যোদ্ধারের কৌশল ছাড়া কিছু নয়, যার বাড়াবাড়ি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'ফেটিশ।' বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে তদুপরি জহরলালের আত্মখণ্ডনের রূপও এক্ষেত্রে উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বৈজ্ঞানিক মনের মানুষ, অথচ ঘটা করে চরকা কাটেন। বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, বিজ্ঞান যদি 'ফেটিশ'-কে ফেটিশ না বলে, তাহলে তা বিজ্ঞানই নয়।

এই সভায় যে-সকল প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে জহরলাল-আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবদৃষ্টি ছিল। "বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ এবং শিল্পসমূহের প্রতিনিধি-দের নিয়ে কমিটি গঠন করতে সরকারকে অনুরোধ জানানো" হয়, কিভাবে ঐ কমিটি কার্যনির্বাহ করবে, তারও রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল।

[ক্রমশ]

---

১৫ ১৯৩৭, অক্টোবর সংখ্যার 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচা'র'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ *Indian National Reconstruction and the Soviet Example*-এর সূচনায় ডঃ সাহা লেখেন :

"When we started *Science and Culture* more than two years ago we wrote that our object was not only popularization of scientific knowledge but also to advocate the application of science to all problems of our national reconstruction. Our readers are already aware what we have done in this direction in the past. The Indian National Congress has now assumed office in seven important provinces and it is rumoured that they are contemplating schemes for national development. The All Indian Congress Committee meeting held at Wardha in the middle of August passed resolutions embodying many of the views which we have been advocating from time to time in these columns....We have reasons to believe that these resolutions (of the A.I.C.C. at Wardha) of the most important political party of our country were inspired by articles appearing in our journal."

১৬ *Professor Meghnad Saha* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৭ পূর্ব গ্রন্থ।

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস' থেকে প্রকাশিত 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-মালা'-র তৃতীয় বই ছিল রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। এই বইয়ের মধ্যেই ব্রজেন্দ্রনাথের লেখা রামরাম বসুর জীবনচরিত—অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত একটি জীবনী ছাপা হয়। 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র ষষ্ঠ পুস্তিকার নাম 'রামরাম বসু'; সেই পুস্তিকাতেও ব্রজেন্দ্র-নাথের লেখা এই জীবনীটি দেওয়া হয়েছে। ১৭৫৭ থেকে ১৮১০,—খ্রীস্টাব্দের হিসেবে এই ছাপ্পান্ন বছর ছিল তাঁর আয়ুষ্কাল। জন টমাস ছিলেন বাংলাদেশে আগন্তুক প্রথম ব্যাপটিস্ট মিশনারী। তাঁর কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম এদেশে এসেছিলেন। ১৭৮৪-তে বিলেতে ফিরে, আবার ১৭৮৬-তে তিনি বাংলাদেশে আসেন। সুপ্রিম কোর্টের ফারসী দোভাষী উইলিয়ম চেম্বার্স তাঁকে বাংলা শেখাবার জন্যে রামরাম বসুর নাম অনুমোদন করেন —এবং সি বি লিউইস সাহেবের লেখা টমাসের জীবনী থেকে জানা যায় যে, ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের ৮ই মার্চ রামরাম টমাস সাহেবের মুনশী নিযুক্ত হন। জুন মাসে টমাসের সঙ্গেই তিনি মালদহে পৌঁছোন।

এক বছরের মধ্যেই টমাসের বাংলা বিদ্যা যে বেশ এগিয়েছিল, তার প্রমাণ—টমাস বাংলায় খ্রীস্টধর্মের মহিমা প্রচার শুরু করে দেন। এইসব প্রচারের সময়ে রামরাম তাঁর কাছেই থাকতেন। ১৭৮৮ সালের জুন মাসে টমাসকে রামরাম জানান যে, খ্রীস্টের লোকোত্তর মহিমায় তিনি খুবই মুগ্ধ হয়েছেন। সেই জুন মাসেই রামরাম নিজে একটি খ্রীস্ট-বন্দনার কবিতা লিখেছিলেন। জন টমাসের জীবনী থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ সেটি তাঁর এই পুস্তিকায় উদ্ধৃত করেছেন। তারই কয়েক ছত্র এখানে একটু দেখা দরকার—

কে আর তরিতে পারে
লর্ড জিজস ক্রাইস্ট বিনা গো।
পাতক সাগর ঘোর
লর্ড জিজস ক্রাইস্ট বিনা গো।

আনন্দ বললে—থাক, থাক, ওসব ছত্র খুবই পরিচিত—ওতে যে রামরামের প্রাণ ছিল না, সেটা টমাস বুঝতে পারেন নি, টমাস তো সাহেব ছিলেন,—কিন্তু বাঙালী পাঠকের চোখে ধুলো দেওয়া রামরামের পক্ষে সম্ভব হোতো না।

—কেন ?

—কারণ,—'অতএব মন কর রে ভজন তাঁহাকে জানিয়া সার'—রামরামের এই ধরনের উক্তিতে কোনো যথার্থ ভক্তের নিবেদন বা সমর্পণের ভাব নেই। ওসব উক্তি নিতান্তই শুভ কর্তব্যের প্রতি মনোযোগী হবার নির্দেশ মাত্র,—ওতে কবিতার ঢেউ নেই।

—রামমোহনের গানগুলিও তো এই ধরনের। সে-সময়ের ভক্তি-গীতিকার রীতিই কি এইরকম ছিল না ?

—কৃত্রিমতা, আর আন্তরিকতা,—দুটি আলাদা কণ্ঠ,—এই দুই স্বরের ভেদ ধরে ফেলা শক্ত কাজ নয়। রামমোহন কোনোদিনই ভক্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন যুক্তি-তর্কের পথিক,—শুভবুদ্ধির প্রবক্তা। সে-কথা পরে হবে। এখন বলো রামরামের জীবনের পরবর্তী গতি কী রকম।

১৭৯২-এর ফেব্রুয়ারিতে টমাস এদেশ থেকে বিলেতে ফিরেছিলেন। তাঁর সেই যাত্রায় কলকাতায় এসে যাঁরা তাঁকে বিদায় জানিয়ে যান, তাঁদের মধ্যে রামরামও ছিলেন। ১৭৯৩ সালে টমাস যে কেরীর সঙ্গে এদেশে ফিরে আসেন, সে-কথাও আগেই বলা হয়েছে। রামরাম টমাসের কাছে আবার ফিরে এলেন, কিন্তু অবস্থাগতিতে রামরাম আবার হিন্দু আচার পালনের দিকেই ঝুঁকেছিলেন ইতিমধ্যে। টমাস তাতে ক্ষুণ্ণ হন। ১৭৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে কেরী রামরাম সম্বন্ধে তাঁর নিজেরও ব্যক্তিগত প্রশংসা জানিয়ে কয়েক ছত্র লিখে গেছেন। কিন্তু তার বছর দুয়েক পরে যা ঘটেছিল, সে-সব বড়োই অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক ঘটনা। ব্রজেন্দ্রনাথের লেখা থেকে সে-প্রসঙ্গের মূলকথা সংক্ষেপে পাওয়া যায়—

"মহীপালদীঘিতে টমাস একদিন লোকমুখে জানিতে পারিলেন যে, রামরাম বসু কিছুদিন হইতে একটি তরুণী বিধবার প্রতি আসক্ত এবং সেই বিধবার একটি সন্তান হওয়াতে শিশুটিকে গোপনে হত্যা করা হইয়াছে। ব্যাপারটা সত্য কি না, অবিলম্বে তদন্ত করিবার জন্য টমাস কেরীকে লিখিয়া পাঠাইলেন। অনুসন্ধানে সকলই প্রকাশ পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে রামরাম বসুও মদনাবাটী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।"

বাইবেল বঙ্গানুবাদের কাজে কেরী তখন রামরামের সাহায্য পাচ্ছিলেন। কিন্তু নীতির খাতিরেই রামরামকে চাকরি থেকে বিদায় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

এই ঘটনার বছর-চারেক পরে ১৮০০ সালের জানুয়ারি মাসে কেরী যখন তাঁর নতুন কর্মস্থল শ্রীরামপুরে এসে পৌঁছোন, তখন রামরাম আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কেরীর সঙ্গী পাদরি ওয়ার্ড সাহেবের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঐ বছর পঁচিশে মে তারিখে রামরাম দেখা করেন,

—এবং ২৯-এ জুনের আর-একটি খবর থেকে জানা যায় যে, সামান্য কিছু দক্ষিণার পরিবর্তে তিনি মিশনারীদের কাছেই পুনরায় কাজ আরম্ভ করেন।

রামরামের 'হরকরা' ('গসপেল মেসেঞ্জার') লেখা হয় ১৮০০ সালে। খ্রীস্টের বাণী সম্বন্ধে দেশীয় পাঠকদের সচেতন করবার উদ্দেশ্য ছিল এর মূলে। কিন্তু রামরাম নিজের প্রেরণাতেই যে এ কাজে নেমেছিলেন, তা নয়; কেরীর অনুরোধেই তিনি একশ' চরণের এই 'poetical tract' রচনা করেন। শুধু তাই নয় 'জ্ঞানোদয়' নামে রামরামের আরো একখানি 'কবিতা-পুস্তক' লেখা হয় সেই ১৮০০ খ্রীস্টাব্দেই। ওঁয়ার্ড সাহেব ভারি খুশি হয়ে লিখেছিলেন —এই হোলো হাজার হাজার বছরের মধ্যে হিন্দুর লেখা প্রথম বই, যাতে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু কথা আছে।

১৮০১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের এক চিঠিতে রামরাম জানান যে, তিনি তখন শ্রীরামপুরের সন্নিহিত রিষড়া গ্রামে বাস করতেন।

'১৮০২' খ্রীস্টাব্দে তিনি খ্রীস্ট-সম্পর্কিত যে দুটি ইংরেজি গানের বঙ্গানুবাদ করেন, সে-অনুবাদের নমুনাতেও সেই আগেকার স্তবের মতোই ভাষারীতি দেখা যায়।

পাদরি ওয়ার্ডের অনুরোধে 'খ্রীস্টবিবরণামৃতং' নামে কবিতায় এক খ্রীস্টচরিত লিখেছিলেন রামবাম—এরকম কথাও শোনা যায়। আবার "খ্রীস্টবিবরণামৃত' কাব্য যে রামবামের রচনা নয়, অধ্যাপক সুকুমার সেন তা জানাতে গিয়ে লিখেছেন—

> "মাতিন্ত আদি গ্রন্থ যেই পাচালি রচিল সেই ভিন্ন না ভাবিহ কোন নরে" এই ছত্রের ভুল অর্থের উপর এই অনুমানের প্রতিষ্ঠা। "যেই সেই" অর্থ "যাহা তাহা"—অর্থাৎ "মাতিন্ত আদি যে গ্রন্থ তাহাই পাঁচালিতে (অর্থাৎ ছন্দে) রচিত হইল, এই গ্রন্থকে ভিন্ন বলিয়া কেহ মনে করিও না।" ইহাই ছত্রটির প্রকৃত অর্থ।

সে যাই হোক, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে, কেরীর অধীনে চাকরি নেবার পরেই রামরামের 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' লেখা হয়। সুকুমারবাবুর মতে—

> কেরির সংশ্লিষ্ট লেখকদিগের মধ্যে রামরাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন প্রধানত অনুবাদকারী, মুন্শী রামরাম ছিলেন মৌলিক লেখক। সুতরাং সাহিত্যিক হিসাবে রামরামের দাবি মৃত্যুঞ্জয়ের আগে।

রামরামের রচনা-রীতির দোষ-গুণ সম্বন্ধে কতকটা বিস্তৃত লক্ষণ তালিকা দেওয়া হয়েছে সেন মশায়ের 'বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য' বইখানিতে। রামরাম সাধুভাষার অনুগত গদ্যই লিখেছিলেন বটে, কিন্তু তা—'কথকতার কথ্যরীতির অনুযায়ী'। লোকপ্রচলিত শব্দ, পদ ও ইডিয়মের ব্যবহার দেখা যায় তাঁর রচনায়। 'উৎপন্নীয়', 'বিলাপীয়', 'আশীর্ব্বাদীয়', 'দেশস্থীয়' ইত্যাদি যাবতীয় শব্দে 'য়'-প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ শব্দের ব্যবহারে তাঁর খুবই ঝোঁক ছিল। কিছু কিছু ব্যাকরণদুষ্ট শব্দও তিনি প্রয়োগ করেছেন। অনেক প্রাচীন রীতির প্রয়োগও তাঁর রচনায় পাওয়া যায়, যেমন—'সেবাতি' (ভৃত্য) ইত্যাদি। বাক্যরীতির দিক থেকে রামরামের লেখা অনেকক্ষেত্রেই কেমন যেন জটিল মনে হয়।

কিন্তু সে সব যাই হোক—ব্রজেন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি বিশেষভাবে মনে পড়ে যে,—"ইহাই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙালী-রচিত প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। [ক্রমশ]

মণিপুরী নৃত্যে নাটকীয় সংঘাত—

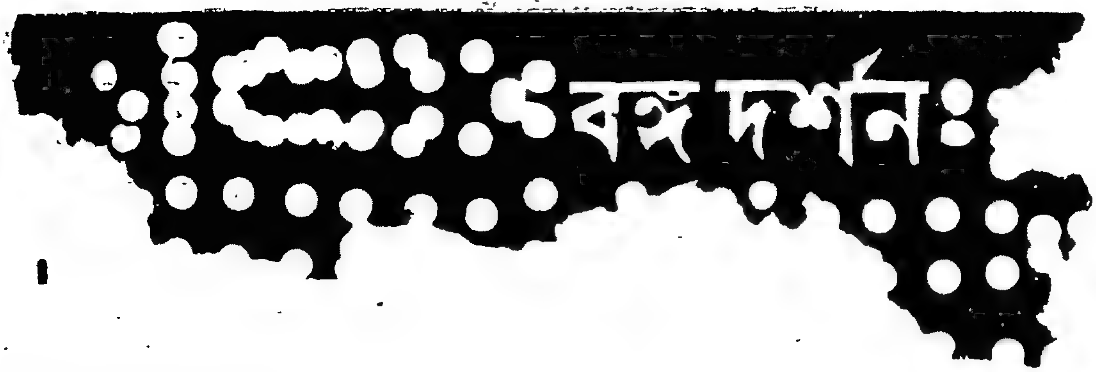

সরকারী কর্মচারীদের, বিশেষ করে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার প্রতি আমরা বরাবরই পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এসেছি। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও ফ্রন্ট সরকার তাঁদের জন্য যথাসাধ্য করেছেন এবং সুযোগ পেলে আরও কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এই রকম তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা, যাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন, যেমন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং অপরাপর প্রতিষ্ঠানে, তাঁরাও মোটের ওপর উপকৃত হয়েছেন, যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকার সুযোগে তাঁরাও তাঁদের সংগঠনগুলিকে দৃঢ় করতে পেরেছেন, স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁরাও সংগ্রাম করছেন, অনেকেই সাফল্যলাভ করেছেন, যাঁরা এখনও করেন নি তাঁদের সাফল্য আমরা কামনা করছি।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে এমন কয়েকটি কথা অনিবার্যভাবে চলে আসছে, যা হয়ত করণিক সম্প্রদায়ের খুব মনোমত হবে না। আশা করি "করণিক" বা "তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী" এই রকম কথায় তাঁরা কোন অপরাধ নেবেন না, কেন না নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তাঁরা সম্প্রতি এত বেশি সচেতন হয়েছেন যে, এই সব শব্দগুলির মধ্যেই তাঁরা হয়ত সাপ্তাহিক বসুমতীর 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'বিভেদসৃষ্টিমূলক' ইত্যাদি মতিগতি আবিষ্কার করে বসবেন। কাজেই পূর্বাহ্নেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি। প্রত্যেকেরই নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন, এবং সেই সঙ্গে জানা প্রয়োজন সেই অধিকারের সীমা কতটুকু। সম্প্রতি বিভিন্ন সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত অথচ প্রচণ্ড অধিকারবোধসম্পন্ন কিছু কর্মী যে কাণ্ডকারখানা শুরু করেছেন, তাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রগতিশীল মানুষেরা রীতিমত মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন।

আমাদের বক্তব্যটি খুব সহজ। সামগ্রিকভাবে করণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনসাবর্ডিনেশন ব্যাপকভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যার পরিণামে কোন অফিসেই আর কোন কাজ হয় না। ফ্রন্ট আমলে কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা কংগ্রেস আমলের চেয়ে বহুগুণে হ্রাস পেয়েছে, যার একমাত্র কারণ ইনসাবর্ডিনেশন, ওপরওয়ালাকে অগ্রাহ্য করার মনোবৃত্তি কর্মচারীদের সব জায়গাতেই পাওয়া যায়—ক্যান্টিনে, ইউনিয়নে, রাস্তার মিছিলে, ময়দানের সভায়—শুধু পাওয়া যায় না অফিসের টেবিলে। ওপরওয়ালাদের পক্ষে কিছু বলা মুশকিল, বলতে গেলেই তাঁকে ঘেরাও হতে হবে এবং কয়েক ঘণ্টা তাঁর ঊর্ধ্বতন পুরুষের শ্রাদ্ধ চলবে এমন সব চোখা চোখা শব্দ প্রয়োগে, যেগুলি একমাত্র ডিকনারী অফ স্ল্যাংস বা বিবর-মার্কা সাহিত্যিকদের রচনায় পাওয়া যায়।

কথাটার মধ্যে একটুও অত্যুক্তি নেই। আজকের প্রত্যেকটি সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা ওপরওয়ালাদের নির্দেশে চলে না, এখন ওপরওয়ালার স্থান গ্রহণ করেছে ইউনিয়ন। যদি কোন ওপরওয়ালা কদাপি কোন কর্মচারীর কর্তব্য অবহেলার জন্য ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন করেন, তৎক্ষণাৎ তা রুটি-রুজির লড়াইয়ে পরিণত হয়।

আমরা মোটেই ওপরওয়ালাদের সাফাই গাইছি না, তাঁরা যে ক্লীন স্লেট এ কথা কদাপি বলি না এবং একথাও সত্য যে, নিম্নস্তরের কর্মচারীরা পূর্ব ওপরওয়ালার কাছ থেকে সর্বক্ষেত্রে মানবিক

সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে কয়েকখানি তথ্যবহুল বই

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ		
কমিউনিজম ও বিপ্লব	—ব্ল্যাক ও থরনটন	৪.০০
যুবসমাজ ও কমিউনিজম	—কারনেল	২.০০
যুগান্তরের দুর্গম পথে	—হফার	১.০০
বাক্-সাহিত্য		
এশিয়ার ধূমায়িত অগ্নিকোণ	—কোজিয়ার	৩.০০
প্রশ্নোত্তরে আমেরিকা	—বিয়ার	৩.০০
পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ	—রেমন্ড	৩.৫০
অর্থনীতি ও মানব কল্যাণ	—ক্লারক	৪.০০
এশিয়া পাবলিশিং কোং		
বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধানে	—গারডনার	৩.০০
সাম্যবাদ, বিষয়বস্তু ও কার্যপদ্ধতি...	—স্প্রেলিংগার ও ব্রাস্টেন	[illegible]
উপনিবেশবাদ থেকে কমিউনিজম	—হোয়াং ভ্যান চি	[illegible]
ভিয়েৎকঙ	—ডগলাস পাইক	[illegible]
আজিকার উত্তর ভিয়েৎনাম	—হনি	[illegible]
অ্যাকাডেমিক পাবলিসার্স		
শিয়রে শত্রু ওঠে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি		১.৭৫
হোমশিখা প্রকাশনী		
পালিয়ে এলাম	—রবার্ট লো	১.৫০

নানা বিষয়ে আরো অনেক বই : পুস্তক বিক্রেতাদের উচ্চ কমিশন

তালিকা চেয়ে পাঠান : আজই অর্ডার দিন

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলি-১২

ব্যবহার পান নি; কিন্তু আজ সে যুগ বদলে গেছে বা যেতে চলেছে। সে তো একদা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ওপর প্রভুসুলভ ব্যবহার করতেন, চতুর্থ শ্রেণীরাও শুধু-মাত্র সরকারী তকমার জোরেই হাটে-বাজারে অধিকতর পশ্চাদপদ লোকেদের কাছ থেকে কলটা মুলোটা আদায় করতেন। হয়ত কোন কোন অফিসার আজও পর্যন্ত সেই পুরাতন আমলের প্রভুত্বের মনোভাব ত্যাগ করতে পারেন নি, কিন্তু এ মনোভাবের পরিবর্তনটা একটা সময়ের প্রশ্ন মাত্র। কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশেই এমন কোন বিভাগ নেই যেখানে ওপর-ওয়ালা নেই, এবং যেখানে কর্মচারীরা ওপরওয়ালাদের মেনে চলে না, এক পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া।

আসলে এই কর্মচারী সম্প্রদায় হীনমন্যতারূপ এক ব্যাধিতে ভুগছেন। হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেলে যেমন মানুষে ধরাকে সরাজ্ঞান করতে শুরু করে, কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার পেয়েই এঁরা সেই নিজেদের এক একটি হ্যাতি বসু ভাবতে শুরু করেছেন। ফলে, তাঁদের অনুকূল সরকার থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী আচরণ করছেন। প্রশাসনিক দক্ষতা না থাকলে অর্থাৎ কর্মচারীরা কাজকর্ম না করলে আখেরে যুক্তফ্রন্ট সরকারেরই ইমেজ নষ্ট হবে। ইতিমধ্যেই বা অনেক হয়েছে এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের ইমেজ নষ্ট হলে তার জায়গায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আগমন রোধ করার ক্ষমতা কারো নেই।

যুক্তফ্রন্টেরও ভেবে দেখা প্রয়োজন যারা এভাবে প্রাপ্ত অধিকারের অপব্যবহার করছে তাদের প্রশ্রয় দিয়ে যুক্তফ্রন্ট কিংবা ভাবী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কতটা লাভবান হবে। লালঝাণ্ডার তলায় আশ্রয় নিয়েছে বলেই এদের চরিত্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এ কথা মনে করার কোন কারণ আছে কি না। আমাদের চোখে তেমন কোন পরিবর্তন বা উন্নতির চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারী এক হও —এই শ্লোগান দিতে কোন হাঙ্গামা নেই, কিন্তু কার্যত তাঁরা সেই একাত্মতা বোধ করেন কি? সরকারী ও আধা-সরকারী অফিসগুলির কর্মচারী সমিতিগুলি দুর্নীতি ও উৎকোচ গ্রহণ করার জন্য, করণিকদের অধিকতর কর্তব্যপরায়ণ করার জন্য এ পর্যন্ত কি করেছে? ফ্রন্ট আমলের অফিসগুলির চেহারা কি কংগ্রেস আমলের চেয়ে বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয়েছে?

এ বিষয়ে সরকার কি ভাবছেন জানি না। তবে এ রকম অবস্থা যদি দীর্ঘকাল চলতে দেওয়া হয়, তবে তার পরিণাম খুবই বিষময় হবে। যে কোন প্রতি-ষ্ঠানই ডিসিপ্লিন ভিন্ন চলতে পারে না, কিন্তু যেটুকু শৃংখলাও বজায় ছিল তা যেন ভঙ্গ করার জন্যই উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এতে কার কি লাভ হচ্ছে জানি না, কিন্তু যাঁরা সত্যকারের কাজের লোক, অফিসারই হোন আর করণিকই হোন, ক্রমে নিস্পৃহ হয়ে উঠছেন; কেন না এখনো কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা হুল্লাবাজির চেয়ে কাজ করা বেশি পছন্দ করেন, যাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও যেমন তেল দেওয়া পছন্দ করেন না, ইউনিয়নের ছত্রচ্ছায়ায় বসে ফাঁকিবাজির সোজা রাস্তাটা চিনে নেবারও তোয়াক্কা করেন না।

কানাইবাবু ও সান্যালবাবু

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "কে এই কানাইবাবু?"-এর সন্ধান মিলেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রসঙ্গে কানাইবাবুর মুরুব্বি হেলথ ডিরেক্টরেটের দুর্নীতিবাজ ক্লার্কটি, জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টর ও মন্ত্রী মহাশয়ের জনৈক বিশ্বস্ত সহকারীর নানা কীর্তিকাহিনীর বিবরণও পাওয়া গেছে। বারান্তরে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

জলপাইগুড়ি শহরের জনৈক সান্যালবাবুর (অধুনা ইনি কলকাতাবাসী। কেউ কেউ বলে থাকেন—স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এঁর অন্তরঙ্গতা আছে বা ছিল।) কিছু সংবাদ আমরা পেয়েছি, যা অস্বাভাবিক ও ভয়ঙ্কর। আগামী সংখ্যায় এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করার ইচ্ছা আছে।

শরিকী সংঘর্ষ প্রসঙ্গে

অবশেষে যুক্তফ্রন্ট নেতারা বুঝতে পেরেছেন যে, যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষ তাঁদের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। কয়েকদিন পূর্বে শরিকী সংঘর্ষ রোধ ও তিক্ততা হ্রাসের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে একটি সমঝোতা হয়েছে। প্রথমে একটি এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে যা হচ্ছে কয়েক মাস পূর্বে রচিত পাঁচ পার্টির দলিল ব্যাপকভাবে সর্বত্র প্রচার করা হবে এবং যুক্তফ্রন্টের নেতারা দুটি শিল্পাঞ্চল এবং শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে কর্মী-সম্মেলন করবেন, যেখানে যুক্তফ্রন্টের সব শ্রেণীর কর্মীরা তৎসহ নেতা ও মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন এবং ঠিক অনুরূপ কর্মী সম্মেলন হবে দুটি কৃষক অঞ্চলে। শ্রমিক অঞ্চল হিসাবে স্থির হয়েছে আসানসোল ও বারাকপুর এবং কৃষক অঞ্চল হিসাবে স্থির হয়েছে কোচবিহার ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা। মূলত এই অঞ্চলগুলিই শরিকী সংঘর্ষের প্রধান কেন্দ্র।

শরিকী সংঘর্ষ রোধের দলিল কার্য-করী করার পথ হিসাবে সোমনাথ লাহিড়ী যে সূত্র রেখেছেন তা পয়লা অক্টোবরের যুক্তফ্রন্টের সভায় আলোচিত হয়ে গৃহীত হবে। শ্রীলাহিড়ী তাঁর সূত্রে পাঁচ পার্টি দলিল কার্যকর করার ক্ষেত্রে বৃত্তকগুলি ন্যূনতম ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংঘর্ষের সম্ভাবনা সংকুচিত করার কথা বলেছেন। ব্যবস্থাগুলি হচ্ছে এই: আগামী দু' মাসের জন্য কোন দলের বিরুদ্ধে অন্য দলের সমালোচনা ও কুৎসা প্রচার বন্ধ রাখতে হবে। দলীয় নীতি ব্যাখ্যা করতে হবে অন্য দলের সমালোচনা না করে। যে সব ইউনিয়নে একাধিক শরিক দল কাজ করেন সেখানে দু' মাস নির্বাচন বন্ধ রাখতে হবে। ইউনিয়ন নির্বাচন বা স্বীকৃতির প্রশ্নে সরকারের কোন বিশেষ ইউনিয়নের পক্ষে বা বিপক্ষে মত আসবে না। ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক যেখানে জমি দখল ক'রে আছে, তাকে দু' মাসের জন্য কেউ দখলচ্যুত করতে পারবেন না। এক স্তর পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট কমিটি গঠন করতে হবে। লাঠি, বল্লম, রড ইত্যাদি নিয়ে সশস্ত্র মিছিল বা সমাবেশ করা চলবে না। প্রশাসনিক যন্ত্রকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট স্তরের যুক্তফ্রন্ট কমিটিকে আলোচনা করে মীমাংসা করতে হবে। বিভিন্ন দলের গণসমাবেশে ও দলীয় কর্মীদের সভাতেও অন্যান্য দলের প্রতি-নিধিদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে একসঙ্গে প্রস্তাব আলোচনা ও যুক্তফ্রন্টের সংহতি বৃদ্ধির স্বপক্ষে ঐক্যবদ্ধ আবেদন করতে হবে।

শ্রীলাহিড়ীর সর্বশেষ প্রস্তাবটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। বিভিন্ন দলের গণসমাবেশে ও দলীয় কর্মীদের সভাতেও অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের যদি পর্য-বেক্ষক হিসাবে থাকার আমন্ত্রণ জানানো

ভারতী অপেরার
মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন
(মাষ্টার দা)
ফোন: ৫৫-২৩৫১

হয়, এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের মতামত বিনিময় করার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে অনেক সমস্যা শেষ পর্যন্ত আর সমস্যা থাকে না। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির অধিকাংশই মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী, সেই হিসাবে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বিভিন্ন দলের মধ্যে অতি সামান্যই। তত্ত্বের দিক ছাড়াও ব্যবহারিক দিকের বিচারেও পার্থক্য নেই বললেই চলে। ছোট-বড় প্রতিটি দলেরই দীর্ঘকালীন সংগ্রামী ঐতিহ্য রয়েছে। একটা বৃহৎ দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে মতপার্থক্য, এক্ষেত্রে একটি দলের সঙ্গে অপরের পার্থক্য তার চেয়ে বেশি নয়। আমাদের মনে হয় মার্ক্সবাদী বিভিন্ন দলগুলির সংযুক্তি মোটেই অসম্ভব ও অকল্পনীয় নয়, বরং খুব বেশিই সম্ভব, এবং নেতাদের জন্যই বোধ হয় এটা সম্ভব হচ্ছে না, কেন না বোধ হয় তাঁরা আশংকা করেন যে ওই রকম কোন অবস্থা ঘটলে তাঁদের প্রভুত্ব করার সুযোগ কমে যাবে।

অবাস্তব প্রস্তাব

জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ সম্প্রতি প্রস্তাব করেছেন যে, ভারতের অনুন্নত এলাকাগুলির উন্নয়নের প্রয়োজনে কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মেট্রোপলিটান এলাকার একশো মাইলের মধ্যে শিল্পের প্রসার বন্ধ রাখা হোক। এঁদের ধারণা উপরি-উক্ত চারটি শহরাঞ্চলে কলকারখানা খোলার সুযোগ না পেলে শিল্পপতিরা অনুন্নত এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হবেন; যার ফলে অনুন্নত এলাকাগুলিতে কলকারখানার আবির্ভাব হবে। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজের কথা জানি না; পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা উদ্ভট। কেন না কাগজে-কলমে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রসর রাজ্য হলেও বাস্তবে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ সবচেয়ে কম, কাজেই কৃষির বিচারে পশ্চিমবঙ্গ চিরকালই ঘাটতি এলাকা। মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম বলেই চাষের ওপর নির্ভরশীলতা ইতিমধ্যেই বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। দ্বিতীয়ত পাকিস্তান থেকে যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছেন শিল্প-বাণিজ্য ছাড়া আর কোথাও তাঁদের নিযুক্ত হবার সুযোগ নেই। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যাও বিপুল, তদুপরি আশেপাশের রাজ্যগুলি হতেও লক্ষ লক্ষ মানুষ রুজি-রোজগারের আশায় পশ্চিমবঙ্গে স্থায়িভাবে বাস করছেন। এই কারণেই এখানে শিক্ষিত ও অদক্ষ বেকারের সংখ্যা অন্য রাজ্য অপেক্ষা অনেক বেশি। কাজেই এই রাজ্যে শিল্প-বাণিজ্যের আরও ব্যাপক সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কলকাতার শিল্পায়ন এখনো চরম সীমায় পৌঁছয় নি, কলকাতার আশেপাশে শিল্প সম্প্রসারণের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পরিধি এত ছোট এবং সেই তুলনায় কলকাতার পরিধি এত বড় যে, কলকাতার একশো মাইলের মধ্যে শিল্পের প্রসার বন্ধ হলে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। তাছাড়া নির্মীয়মাণ হলদিয়া বন্দরকে কেন্দ্র করে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের পরিকল্পনাও বানচাল হয়ে যাবে। তাই মনে হয় জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ অনুন্নত এলাকা উন্নয়নের নামে বাংলা দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবার চেষ্টা করছেন।

কলগেট ব্যবহার করে মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন ও সারাদিন দন্তক্ষয় রোধ করুন!

কারণঃ একবার মাত্র কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলেই দুর্গন্ধ ও ক্ষয়ের জন্য দায়ী বীজাণুর শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গেই দূর করে দেয় এবং কলগেট প্রক্রিয়ায় খাওয়ার ঠিক পরেই দাঁত ব্রাশ করলে বেশীর ভাগ লোকের দন্তক্ষয় রোধ করা যায়—আজ পর্যন্ত দন্তচিকিৎসার ইতিহাসে যেমনটি আর কখনো দেখা যায়নি! আর একমাত্র কলগেট'এর সেই প্রমাণ আছে।

কী সুন্দর এর পিপারমেন্টের স্বাদ—তাই ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে ভালবাসে!

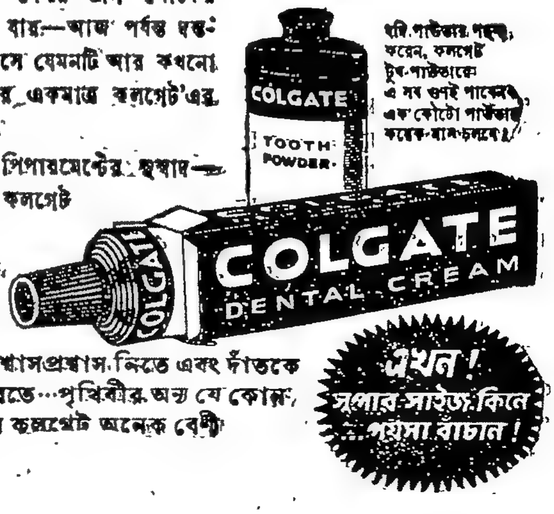

পরিষ্কার নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে এবং দাঁতকে উজ্জ্বল সাদা করতে…পৃথিবীর অন্য যে কোন টুথপেষ্টের চেয়ে কলগেট অনেক বেশী লোক কেনেন।

DCP-38 BN

// ভারত দর্শন //

গান্ধীজী ও আজকের ভারত

আমরা দেশব্যাপী গান্ধী-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি এমন এক সময়, যখন গান্ধীজীর উপদেশ অবমাননা করার দরুণ এবং তাঁর অভিপ্রেত পথে পা না-বাড়িয়ে অথচ তাঁকেই স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার করে জনগণকে ধোঁকা দিতে দিতে গান্ধীবাদী বলে কথিত কতিপয় স্বার্থান্বেষী সর্বৈবভাবে রাজনৈতিক ভরাডুবির সম্মুখীন হয়েছেন। অথচ এই ভরাডুবির কথা গান্ধীজী ঢের আগেই মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। সেদিন গান্ধীজীর পদতলে বসে যাঁরা দেশের ছোটবড় নেতা হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, গান্ধীজী তাঁদেরও চিনতেন দস্তুরমতই। তাই তাঁর দুর্ভাবনা ছিল গান্ধীটুপী মাথায় ঐ লোকগুলি বৃটিশের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ক্ষমতায় এলে তাদের ক্ষুধা সর্বগ্রাসী হয়ে যাবে। গান্ধীজীর তাই উপদেশ ছিল, কংগ্রেসকে বাঁচাতে হলে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কোনও কংগ্রেসীর সরকারী পদে বেতনভুক চাকুরিয়া হওয়া অনুচিত, হলে কংগ্রেস ছাড়া উচিত। বলা বাহুল্য তাঁর এই উপদেশ গ্রহণ করা তো দূরের কথা পদ ও আর্থিক কৌলীন্য লাভের জন্য হুড়োহুড়ি রেষারেষি করেই কংগ্রেস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দেশসেবক দেশ-শাসক হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করলেন, মেদ যে পরিমাণে বাড়ল, মগজ সেই পরিমাণেই খাটো হল। গান্ধীজী রইলেন ইতিহাসের পাতায়। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে। পার্ক স্ট্রীটের মতো কেতাদুরস্ত রাস্তার দিকে যষ্টি ও বাঁ পা বাড়িয়ে; কিন্তু গান্ধীবাদীদের অন্তর থেকে সাফসুফ তিনি সরে গেলেন।

সেই গান্ধীজীকে নিয়ে সাড়ম্বরে শত-বর্ষ পূর্তি উৎসব হতে চলেছে; স্ট্যাম্প আর টাকা ছাপা হচ্ছে। অর্থাৎ তাঁরই কৃপায় আজ যাঁরা গদীনসীন তাঁরা গান্ধী শতবর্ষের আয়োজন করে কিছু পাপস্খালন তো করছেনই, সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গান্ধীজীকে সামনে রেখে অনেকে নিজের নিজের স্বার্থও কিছু না কিছু গুছিয়ে নেওয়ারও সুযোগ খুঁজছেন।

কিন্তু এটাই সম্পূর্ণ চিত্র নয়। দেশে আজও কিছু প্রকৃত গান্ধীভক্ত আছেন। তাঁদের অনেকের মাথায় হয়ত গান্ধীটুপী আর নেই, পরনেও নেই খদ্দর, হয়ত পেটে সেই দানা এবং সুযোগ নেই কোনও উৎসবের কর্তাব্যক্তি বনবার। তবু গান্ধী শতবার্ষিকীতে তাঁরাই করবেন প্রকৃত তর্পণ। সেই সব অজ্ঞাত কুটীরেই হবে প্রকৃত উৎসব যা একান্ত নিজস্ব প্রেমভক্তি-শ্রদ্ধার পবিত্র হয়ে উঠবে।

অদৃষ্টের পরিহাস!

গান্ধী শতবার্ষিকী বর্ষে গান্ধীজীর গুজরাটেই আমেদাবাদসহ কয়েকটি শহরে অন্ধকারের জীবরা মাথা তুলল। জীবন ও সম্পত্তিনাশে তৎপর হল। সরকার ও পুলিশ সাক্ষীগোপাল দর্শক। কৈ ল' এন্ড অর্ডার প্রশ্নে দেশ 'গেল গেল' রব তো কেউ তুললেন না। কংগ্রেসী অথবা প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজত্বে বোধহয় 'ল' এন্ড অর্ডার' শুধু শাসকের গুণেই বজায় থাকে, তা সে রাজ্য গোল্লায় গেলেও থাকে, অসামরিক প্রশাসন ব্যর্থ হলেও থাকে। গুজরাটে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সৈন্য তলব করতে হয়েছিল, তবে গান্ধী শতবর্ষ মানুষ-কাটা উৎসব বেশ জাঁকিয়ে শুরু হলে তারপরই অপদার্থ প্রশাসনের চৈতন্যলাভ ঘটে। গুজরাটে যাঁরা ক্ষমতাসীন গান্ধীজীর কৃপায় তাঁরা টিকে আছেন। অথচ অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, সেখানেই সাবরমতী আশ্রমে মানুষের পূর্বপুরুষেরা দলবদ্ধভাবে নিরীহ গান্ধীভক্ত পরিবারের ওপর চড়াও হয়। সরকার তাঁদের রক্ষা করতে পারেন নি; সাধারণ মানুষ ছুটে গেছেন পরিবারটিকে রক্ষা করতে। এই পরিবারটির সৌভাগ্য এঁরা ছিলেন সাবরমতী আশ্রমের আশ্রমিক। তাই স্বয়ং রাজ্যপালও (ওঁদের প্রাণরক্ষা জনগণের সাহায্যে সম্ভব হলে) রাজভবনে এঁদের আশ্রয় দিতে চেয়েছেন। তবে আশ্রমিক এই করুণাটুকু প্রত্যাখ্যান করে প্রকৃত গান্ধীসেবীর লুপ্তাবশেষ যে আজও বেঁচে আছেন তারই পরিচয় দিয়েছেন। আশ্রমের বাইরে যে অগণিত পরিবার অপদার্থ একটি সরকারের জন্য মার খাচ্ছে গান্ধী আদর্শে বিশ্বাসী আশ্রমিক পরিবারটি নিশ্চয় তাঁদের কথা স্মরণ করেও রাজ্যপালের ঐ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে থাকবেন। এই সংখ্যালঘু গান্ধীবাদীকে অতঃপর গুজরাটবাসী যে মাথায় করে রাখবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সরকার গান্ধী শতবার্ষিকী বর্ষে গুজরাটে এই দাঙ্গা অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে ব্যর্থ হয়, জনসাধারণ সেই সরকার সম্পর্কে ভাববেন কি? কী ভাববেন সে রাজ্যের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল সম্পর্কে? গুজরাটে রক্ষণশীলতার শ্বাস বয় বটে, তবে গান্ধীজীর পর সাম্প্রদায়িকতার বিষনিশ্বাস সেখানে আগুন জ্বালে নি। বরং গান্ধীজীর ওপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ গুজরাটকে আরও বেশি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী করেছিল। আজ নতুন করে কি গুজরাট সাম্প্রদায়িকতার কবলে আত্মসমর্পণ করছে।

দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক আহ্বান করে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকে সাধারণ হাঙ্গামা থেকে পৃথক করে দেখবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। বলাই বাহুল্য সাধারণ দাঙ্গা আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় চারিত্রিক তফাৎ আসমান-জমিন। গুজরাট সরকারের ব্যর্থতায় যে হাঙ্গামা বিস্তার লাভের সুযোগ পেয়েছে তা সমগ্র দেশের মুখে চুন-কালি লেপন করল। প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে এই ব্যর্থতারও কঠোর সমালোচনা শোনা গেলে ভাবতে পারতাম, আমরা প্রকৃতই বেদনাহত ও শোকার্ত।

মণিপুরে ক্ষমতার লড়াই

গদী নিয়ে কংগ্রেসের উপদলীয় কোন্দল মণিপুরে দু' দুবার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতনের কারণ হয়েছে। গত সাধারণ নির্বাচনের পর কৈরেং সিং-ই মন্ত্রিসভা গঠন করেন, তবে আট মাসের অধিককাল সেই মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখতে পারেন নি। পরবর্তী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভারও ভাগ্যে স্থায়ী শাসকের সুনাম জোটে নি। ফের কৈরেং সিং ৩০ সদস্যের

সভার কংগ্রেস পক্ষে বাইশজনকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণ আগের মতই সোচ্চার থেকে যায়। তখন কলহ অবসানের জন্য দলের সাধারণ সম্পাদক সাদিক আলী ছুটে যান মণিপুরে। কৈরেং-বিরোধীরা নেতা বদল দাবি করেন, কিন্তু হাই কমাণ্ড সে দাবির ওপর গুরুত্ব দেন নি। সাদিক আলী সাহেব বায়ু পরিবর্তন করেই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ফল-যা হবার তাই হয়েছে। বিবেকানুসারে ভোট দেবার অধিকার সম্বল করে কংগ্রেসের ২২ সদস্যের দশজনই সরকারী প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়ে কৈরেং সিং-এর পতন অনিবার্য করেছেন। এঁরা চান, অন্য কারও নেতৃত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে এঁরা সেই মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করবেন।

কিন্তু সে পথে মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব কি না কংগ্রেসী নেতৃত্বকে তা গভীরভাবেই বিবেচনা করতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে নয়জন সদস্যের প্রতি শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ ও সে কারণে তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে।

সমস্যা হল মণিপুর নিয়ে বেশিদিন খেলবার সুযোগ কম। এটি সীমান্ত রাজ্য। পাশেই 'প্রবলেম ল্যাণ্ড' নাগা ল্যাণ্ড'। তাই শীঘ্রই মণিপুরের রাজনৈতিক সংকটের দুর্যোগ অপসারিত করতে হবে। দলবদলের খেলা খতম করে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসনই একটি সুস্থির অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, বিকল্প ব্যবস্থায় যেহেতু স্থায়িত্বের গ্যারান্টি নেই।

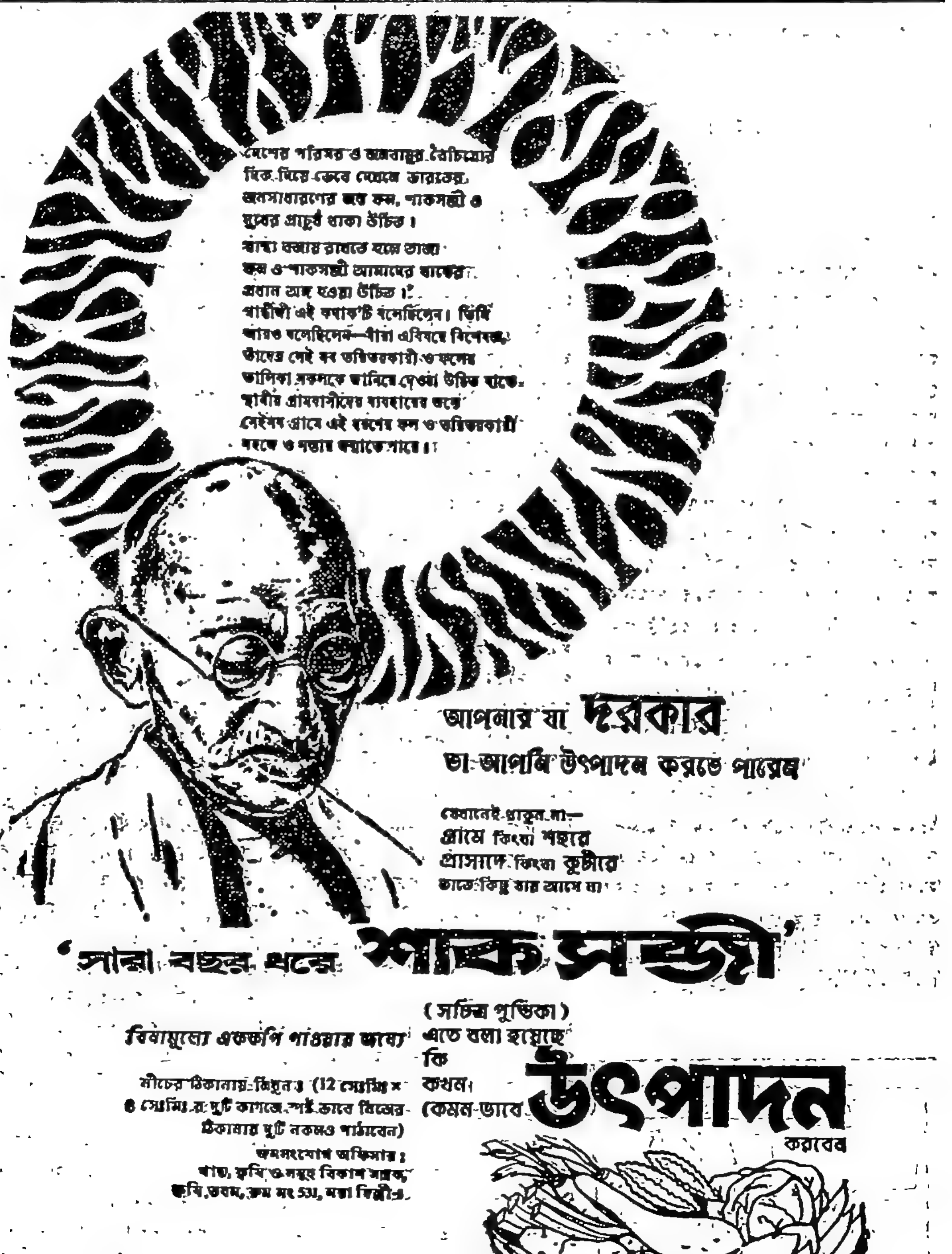

আন্তর্জাতিক

মরোক্কো:

বিশ্বের প্রথম ঐশ্লামিক শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে। ২২ থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর মরোক্কোর রাজধানী রাবাতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সৌদি আরবের রাজা ফয়জাল গত তিন বৎসর ধরে বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলনের জন্য চেষ্টা করে আসছেন। প্রধানত নাসেরের বাধায় এতদিন এটা সম্ভব হয় নি। এবার তা সম্ভব হল।

জেরুজালেমে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ 'আল আকসা' পুড়িয়ে দেবার প্রতিবাদেই ঐশ্লামিক শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। ৬টি মুসলিম রাষ্ট্র নিয়ে যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়, তারাই এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে। আরব লীগের উদ্যোগে আহূত রাষ্ট্রপ্রধানদের এক বৈঠকেও এই প্রস্তাব সমর্থিত হয়। ৩৫টি মুসলিম রাষ্ট্রকে সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তার মধ্যে ৫২টি দেশ (ভারতকে ধরলে ২৬) সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। যারা আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ইন্দোনেশিয়া, সিরিয়া, ইরাক।

শীর্ষ সম্মেলন শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইস্তাহারে আল আকসা মসজিদ পোড়ানোর তীব্র নিন্দা করা হয়েছে; এবং এর বিরুদ্ধে সমগ্র মুসলিম জগতের ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। আল আকসার ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষভাবে ইজরায়েলকে দায়ী করা না হলেও, ইস্তাহারে বলা হয়েছে, মসজিদের পবিত্রতা রক্ষায় ইজরায়েল সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

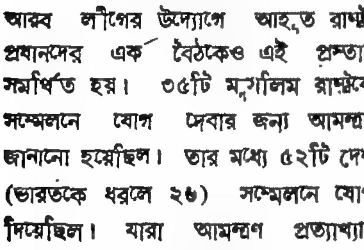

ইস্তাহারে প্যালেস্টাইনের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে। দখল করা আরব এলাকা ছেড়ে দেবার জন্য ইজরায়েলের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, জুন, ১৯৬৮-র পূর্বাবস্থায় না ফেরা পর্যন্ত কেউ শান্ত হবে না।

আগামী মাসে আবার সৌদি আরবের জেদ্দায় ঐশ্লামিক রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্র-মন্ত্রীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

যাঁরা ঐশ্লামিক শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা হলেন: সৌদি আরবের রাজা ফয়জাল, মরোক্কোর রাজা হোসেন, জর্ডানের রাজা হুসেন, ইরানের শাহ্ রেজা শাহ্ পহলভী, তুরস্কের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ইহসান সাব্রি চাগালায়াঙ্গিল, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি আনওয়ার সাদাত, আলজিরিয়ার রাষ্ট্রপতি হুয়ারি বুমেদিয়ান, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খাঁ প্রমুখ। প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলনের গেরিলা সংস্থা 'আল' ফাতা'-র নেতা ইয়াসের আরাফাতও সম্মেলনে যোগ দেন। অবশ্য তাঁর যোগদান নিয়ে সদস্যদের মধ্যে বেশ মতভেদ হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়।

ভারতের সম্মেলনে যোগদান নিয়ে এক মস্ত প্রহসন হয়ে গেল। সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে যাদের কাছে সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণলিপি পাঠানো হয়, তাদের মধ্যে ভারতের নাম ছিল না। এতে ভারত তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের পরেই সবচেয়ে বেশি মুসলমান ভারতে বাস করে। সুতরাং, ভারতকে এই সম্মেলনে যোগ দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত ২৩শে সেপ্টেম্বর শীর্ষ সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে ভারতকে আমন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত হয়। এমন সংবাদ প্রচারিত হয় যে, এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধি (যাঁরা তখন অন্য কার্যোপলক্ষে রাবাতে ছিলেন) সম্মেলনে হাজিরও হন, সম্মেলন মণ্ডপে ভারতীয় পতাকাও উত্তোলিত হয়। কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা শিল্পোন্নয়নমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহমেদ যখন রাবাতে গিয়ে পৌঁছন, তখন সম্মেলনের নেতারা তাঁকে বলেন, ভারতের যোগদান না করাই উচিত, এটাই সকলের ইচ্ছা বা 'কনসেনসাস'। অবশেষে ভারত সম্মেলনে যোগদান থেকে বিরত থাকে। এ অনেকটা নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাবার পর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া। ভারতকে যাতে সম্মেলনে যোগ দিতে দেওয়া না হয়, তার জন্য পাকিস্তান বিশেষভাবে চেষ্টা করে। ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ সম্মেলনমঞ্চে প্রবেশ করলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খাঁ সম্মেলন বর্জন করে চলে যাবেন বলে হুমকীও দেন। এ ব্যাপারে পাকিস্তানকে জোর সমর্থন করে জর্ডান, ইরান ও তুরস্ক। পেছন থেকে অবশ্য আরও অনেকে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। আর, ভারতের পক্ষে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন আলজিরিয়ার বুমেদিয়ান ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সাদাত।

ভারতকে শেষ পর্যন্ত সম্মেলনের বাইরে রাখতে পারায় এবং এই ব্যাপারকে উপলক্ষ করে ভারতকে অপমানিত ও লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ করায় পাকিস্তানের এক মস্ত কূটনৈতিক জয় হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। ভারতের মনোভাবও অনেকের কাছে দুর্বোধ্য। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তাহলে একটি ধর্মীয় সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য তার এই জিদ কেন? জিদের জন্য খেসারতও কম দিতে হল না!

ঐশ্লামিক শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব, এবং এক সঙ্গে এতগুলি দেশের জনসাধারণের (২৫টি দেশের মোট জনসংখ্যা ৪০ কোটি) ঐক্যবদ্ধ বক্তব্য নিশ্চয়ই ইজরায়েলের ওপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি করবে। এদিক দিয়ে সম্মেলনের সাফল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু এর ফলে কি আরব-ইজরায়েল সংঘাতের চরিত্র কিছুটা নষ্ট হল না? আরব জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি ধর্ম ছিল না, অন্তত নাসের ও বিভিন্ন আরব দেশের বাম সোস্যালিস্টদের চেষ্টায় ইজরায়েল-বিরোধী আরব সংগ্রাম ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও প্রগতিশীলতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। আরবদের সংগ্রামে মুসলমানদের পাশাপাশি অনেক ক্রিশ্চিয়ান, এমন কি কিছু ইহুদীও আছে। আরব গেরিলাদের প্রধান তিনজন নেতার মধ্যে একজন হলেন জর্জ হাবাস, তিনি ক্রিশ্চিয়ান। লেবাননের মত আরব দেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ ক্রিশ্চিয়ান। ইজরায়েল যেখানে ধর্মরাষ্ট্র, ইহুদী ছাড়া আর সবাই যেখানে অবাঞ্ছিত, আরবদের প্রস্তাবিত

ব্যবস্থায় মুসলমান, খ্রিশ্চিয়ান, ইহুদীর সম্মিলিত দেশ হবে জেরুজালেম-প্যালেস্টাইন।

ধর্মের জিগির তুলে এই জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছে। সৌদি আরবের রাজা ফয়জাল এই কাজে তাদের প্রধান দোসর। রাবাতের ঐশ্লামিক শীর্ষ সম্মেলন এই মতলবকে কিছুটা হাসিল করেছে। মসজিদের ব্যাপারটা উপলক্ষ হলেও সমগ্র আরব-ইজরায়েল বিরোধ প্রাধান্য পেয়েছে। এ যেন ইহুদীর বিরুদ্ধে মুসলমানের ধর্মীয় লড়াই। অথচ মজা হচ্ছে, এই সম্মেলনের অন্যতম প্রধান পাণ্ডা ইরান ও তুরস্ক এবং সেনেগাল ইজরায়েলের সঙ্গে এখনও কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। সম্মলনে প্রস্তাব করা হয়েছিল এই কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য। রাজী হয় নি এরা।

শোনা যাচ্ছে, রাবাত সম্মেলনের ব্যাপারে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র মোটেই খুশি নয়। নাসের নিজে সম্মেলনে যান নি। সম্মেলনের সিদ্ধান্তও তাঁদের পছন্দমত হয় নি। বিভিন্ন মিশরীয় সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হয়েছে, ইরান, তুরস্ক ও পাকিস্তান সম্মেলনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ইজরায়েল তথা পাশ্চমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্পের পরিবর্তে তাই সম্মেলন নিছক মসজিদ-আলোচনায় পর্যবসিত হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘ :

রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের (জেনারেল অ্যাসেম্বলী) ২৪তম অধিবেশন সুরু হয়েছে গত ১৭ই সেপ্টেম্বর। তেরো সপ্তাহ ধরে চলবে এই অধিবেশন। রাষ্ট্রসংঘের মোট ১২৬টি সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করছেন। নতুনতম সদস্য সোয়াজিল্যাণ্ডের প্রতিনিধি এই প্রথম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হলেন।

এবারের অধিবেশনের জন্য সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন লাইবেরিয়ার সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৪১ বৎসর বয়স্কা শ্রীমতী অ্যাঞ্জি এলিজাবেথ ব্রুকস্। সাধারণ পরিষদের সভাপতির পদ বিভিন্ন এলাকার রাষ্ট্রের ভাগে ঘুরে-ফিরে পড়ে। গতবার পড়েছিল লাতিন আমেরিকার ভাগে, আর এবার পড়েছে আফ্রিকার ভাগে। আফ্রিকার ৪১টি দেশের প্রতিনিধি সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের মধ্য থেকে শ্রীমতী ব্রুকসকে বেছেছেন।

শ্রীমতী ব্রুকস্ রাষ্ট্রসংঘে নতুন নন। ১৯৫৩ সাল থেকে তিনি রাষ্ট্রসংঘ ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিলের সদস্য, ১৯৬৬ সাল থেকে তার সভানেত্রী। আফ্রিকার প্রাচীনতম প্রজাতন্ত্র লাইবেরিয়ার প্রতিনিধি শ্রীমতী ব্রুকস্ রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় মহিলা সভানেত্রী, এর আগে ভারতের শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই বিশ্বসভার সভানেত্রী হয়েছিলেন। শ্রীমতী ব্রুকস্ বিবাহিত, স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে ঘর করেন, তবু তিনি তাঁর নামের আগে 'মিস্' লেখেন, 'মিসেস্' নয়।

সাধারণ পরিষদের অধিবেশন সুরু হবার দিন উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমতী ব্রুকস্ কয়েকটি কঠিন সত্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রসংঘের 'সাফল্যের ভ্রান্ত ধারণা' ত্যাগ করতে হবে। সদস্যদের মধ্যে বাস্তববোধের একান্ত অভাব। অধিকাংশ রাষ্ট্র দুমুখো সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করছে—এক নীতি দেশের জন্য, আর এক নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। যেভাবে চলছে, তাতে রাষ্ট্রসংঘের মর্যাদা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে এই সংস্থা। যদি সত্যিই একে কার্যকরী প্রতিষ্ঠানরূপে টিকিয়ে রাখতে হয়, তবে রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতির প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করে সততার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে।

অধিবেশন উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা একের পর এক সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিচ্ছেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন ও সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোর ভাষণে নতুন কোন কথা শোনা যায় নি। গ্রোমিকো আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্পর্কে সোভিয়েট ভাষ্য ব্যাখ্যা করেছেন, এবং ভিয়েতনাম থেকে অবিলম্বে সকল মার্কিন সৈন্য অপসারণের দাবি জানিয়েছেন। আর, নিকসন ভিয়েতনাম থেকে পর্যায়ক্রমে মার্কিন সৈন্য অপসারণ ও বোমাবর্ষণ বন্ধের নীতি বিশ্লেষণ করেছেন। নিকসন রাষ্ট্রপতিরূপে এই প্রথম রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দিলেন। তাঁর ভাষণ সম্পর্কে অনেকেরই প্রচুর প্রত্যাশা ছিল। তাঁরা হতাশ হয়েছেন। বক্তৃতা শেষে সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধানরা যেভাবে সম্বর্ধিত হন, নিকসন তা হন নি।

অধিবেশন উপলক্ষে নেতৃবৃন্দের আগমনের সুযোগে নানারকম কূটনৈতিক তৎপরতা চলে। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল উ থান্টের চেষ্টায় পশ্চিম এশিয়া সমস্যা পুনরায় আলোচনার জন্য চতুঃশক্তি বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়েছে। উ থান্ট সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স, বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল স্টুয়ার্ট ও ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট স্যুমানকে এক নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করেন। সেখানেই পশ্চিম এশিয়া নিয়ে কথা হয়, এবং ঠিক হয় এই প্রসঙ্গে যে চতুঃশক্তি আলোচনা চলছিল, তা আবার সুরু করা হবে। দশ সপ্তাহের ওপর এই আলোচনা বন্ধ আছে।

(২৮।৯।৬৯)

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

শিরে সর্পাঘাত হলে, হাতে পায়ে কোমরে তাগা বেঁধে কি কোন ফল হবে? পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে অনেকেই এখনো মমতাবশত হোক অথবা ভয়ে হোক যে কথা বলি বলি করেও বলছেন না, সেই কথাটা কিন্তু হল এই—শিরে সর্পাঘাত হয়েছে। সর্পাঘাতের যন্ত্রণাকাতরধ্বনি শুনে শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার ভেবেছেন—এই হল বিপ্লবের প্রসব বেদনা, শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী ভাবছেন—এ হল তাঁর পার্টি উৎখাত করার হুংকার, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ভাবছেন—এ হল শ্রেণীসংগ্রামের রণধ্বনি, শ্রীঅশোক ঘোষ বলছেন—এ হল দুর্বলকে গ্রাস করতে সবলের আসুরিক উল্লাস; শ্রীসুকুমার রায় ভাবছেন—সাপ ও ব্যাঙ দুইয়ের প্রতি একই মমতা রক্ষার দিন এবার শেষ হল।

এমনিভাবে শ্রীমাখন পাল, শ্রীনীহার মুখার্জী সকলেই কিছু কিছু ভাবছেন অর্থাৎ তাগা বাঁধছেন, আসলে মাথার বিষ ক্রমেই সর্বশরীরে নেমে আসছে। অবশ্য এই কথাটা বলার মধ্যেও অনেক ঝুঁকি আছে—কিছু বললেই আমাদের পাঁচুর মা ফোঁস করে উঠবেন। পাঁচুর মা'র পাঁচু সমস্ত দিন দৌরাত্ম্য করে বেড়াবে, আম-জাম-কাঁঠাল-পেয়ারা পরের গাছ থেকে চুরি করে খাবে, সময় সুযোগমত অন্যের মাথায় ঢিল মেরে লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেবে, সবরকম অত্যাচার করে লোককে অতিষ্ঠ করে দেবে—কিন্তু কিছু বলা যাবে না, কারণ বললেই পাঁচুর মা ভীমবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিবেশীকে আরো বেশি বিড়ম্বিত করবে। মেয়েলী ঝগড়া, গালাগালি, মুখ খারাপ করবে আরো অনেক প্রকারে। স্মরণ—পাঁচুর মা'র বক্তব্য হল—"আমার পাঁচু এ্যায়সে পাড়ার লোকে করে ক্যান।"—অর্থাৎ পাড়ার লোকের বলাই হবে দোষের। তাই অনেকেই কিছু না বলে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করছেন। কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে, কিছু দল ও তাঁর নেতাগণ মনে করতে শুরু করেছেন—কংগ্রেসকে হটিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার কায়েম করে জনগণ তো দেশের হক্‌দারী আমাদের দিয়েছে, কাজেই দেশের ভালমন্দ করা-না-করা—সে তো আমাদের হাতে, আমরা যা ভাল বুঝব তাই করব। অন্য যারা আছে, তাদের হিসাব করবার বা গ্রাহ্য করার কি কারণ থাকতে পারে? জনগণের নামে আমরা যা চালাব, তাই তো চলবে। কিন্তু এই কথা থাক—আমি আগে সর্পাঘাতের কথাটা বলে নিই, সর্পাঘাত ঘটেছে মন্ত্রীদের আচরণে। অবশ্য এর মধ্যে সব মন্ত্রীর কথা ধরতে চাই না, বলতেও চাই না।

নিশ্চিতভাবে বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকে এর মধ্য থেকে বাদ দিতে হবে। যেমন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়—কংগ্রেস আমল অথবা কংগ্রেস ত্যাগ করে একলা চলার জীবন এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর আমল—সর্বত্রই কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। সেই পুরাতন বেশ-বাস থেকে শুরু করে তাঁর জীবন যাপন, ব্যক্তিগত আচরণ, আলাপনের কোথাও এক তিল পরিবর্তন হয় নি, তমলুকের অজয় মুখুজ্জে সর্বপ্রকারে তমলুকের মানুষ রয়ে গেছেন, সেই হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, সেই হাতে কাচা জামা, সেই চপ্পল, সেই অনাহার-অর্ধাহারের জীবন। যেমন রয়েছেন শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার—সেই একই ফরম্। যিনি নিজের মেয়েটাকে পর্যন্ত কলকাতায় এনে নিজের কাছে রেখে পড়াশুনার সুযোগ দেন না, পাছে মন্ত্রীর মেয়ে বলে তার মনে ভাবান্তর ঘটে, মেয়েকে কালনায় রেখে হরেকেষ্টর মেয়ে বলেই মানুষ করছেন। সোজা কথা এখনও সোজাভাবে বলতে এতটুকু কুণ্ঠা নেই তাঁর। এই তো সেইদিন একজন উঁচু-দরের ব্যক্তি ঘরে এসে বেশ আমড়াগাছি করতে শুরু করেছিলেন, তিন মিনিট তাঁর কথা শুনে হরেকৃষ্ণবাবু বললেন—"আপনি একটি চোর, আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যান"—এমনভাবে কথা বলার স্পর্ধা আর কজনের আছে? পরিবর্তন হয় নি ডঃ কানাই ভট্টাচার্যের। মন্ত্রী হিসাবে ঘরের দরজা সব সময় খোলা, দরজা বন্ধ করে লাল বাতি জেলে কখনও নিজেকে আলাদা করে রাখেন না, অথবা তাঁর পি-এ, পি-এরা কখনও বলেন না—উনি বড় ব্যস্ত। কি অফিসার, কি দর্শনার্থী, কি সংবাদিক সকলের সঙ্গে একই-ভাবে কথা বলা। সেই নিষ্কলুষ ভদ্রলোকের অহংকার, নেই মন্ত্রীত্বের অহমিকা। ঠিক আছেন শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত। কখনও একটা বড় কথা মুখ দিয়ে বেরুবে না। হয়েছি মন্ত্রী, তাই বলে কি গান গাইব না। গাইতে পারি বা না পারি, গলায় সুর থাক বা না থাক, যখন শুনতে চাইছেন

আমার গান, শুনুন মা। তাই মন্ত্রিসভার বৈঠকে আর সাংবাদিকদের সামনে দিব্যি সুন্দর গেয়ে গেলেন—

ওঠরে চাষী জগম্বাসী ধর কষে
লাঙল
আমরা মরতে আছি ভাল করেই
মরবো এবার চল।

মোদের উঠান ভরা শস্য ছিল
হাস্যভরা দেশ,
ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে
লাঞ্ছনার নাই শেষ।
(ও) ভাই লক্ষ হাতে টানছে তারা
লক্ষ্মীমায়ের কেশ
আজ মা'র কাঁদনে লোনা হল
সাত সাগরের জল।

কিন্তু আর ক'জন মন্ত্রী আছেন, এমন করে গলা ছেড়ে গান গাইতে পারেন? ক'জন মন্ত্রী আছেন, যাঁরা রাইটার্স বিল্ডিংসে চলার পথে সিপাইকে দাঁড়িয়ে খটাস করে স্যালুট দিতে না দেখলে ক্ষমা করতে পারেন? ক'জন মন্ত্রী আছেন, যাঁরা নিজেদের মোটরের দরজা খুলে মোটরে ওঠেন বা উঠতে পারেন?

বিরাট কর্মযজ্ঞ চলেছে...

আর... ইউবিআই আছে তারই কেন্দ্রে

সমাজের সকল স্তরেই যাতে আর্থিক উন্নতি সম্ভব হয় তার সুযোগ করে দেওয়া প্রয়োজন। ছোট ছোট কারবার, শিল্পোদ্যোগ, চাষবাস, খুচরা দোকানদারী, পরিবহন পরিচালনা কিংবা জীবিকার্জনের অন্যান্য বৃত্তি —এ সবকেই উন্নত, সমৃদ্ধ হতে, সুযোগ দেওয়া দরকার।

১৮০টিরও বেশী শাখা অফিসের মাধ্যমে আর সেবাব্রতী কর্মিদের সহায়তায়, এ কাজে যেখানে যতটুকু অর্থানুকূল্য প্রয়োজন তা পূরণের জন্য ইউবিআই সর্বদা সচেষ্ট। আর্থিক প্রয়োজন বিষয়ে আলাপ আলোচনার জন্য আমাদের যে কোন শাখা অফিসে, চলে আসুন।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

হেড অফিস : ৪, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট) কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ১১৫টিরও অধিক শাখা অফিস আছে

ক'জন মন্ত্রী আছেন—অফিসারদের মুখে ন্যাকামো সুরে স্যার না শুনলে খুশি হন না? এমন কি অনেক অফিসার সময়-সুযোগ মত ম্যাডামদের খোঁজ নেন না। ক'জন মন্ত্রী আছেন—যাঁরা ক্যাল-কাটা ক্লাব থেকে সুরু করে বড় বড় ক্লাব আর হোটেলে গিয়ে অন্তত একটু শফট ড্রিংক খেয়েও সময় কাটাতে ভালবাসেন না? ক'জন আছেন—সময়-সুযোগ পেলে মিসেসকে নিয়ে কোন ফিল্মমের প্রিমিয়ার শো অথবা বিশেষ কোন দেশের ফিল্ম শোতে যেতে সময় পান না? ক'জন মন্ত্রী আছেন—যাঁদের কাপড়ের পাড়ের পরিবর্তন হয় নি? ক'জন মন্ত্রী আছেন—যাঁরা যুক্তফ্রন্টের বত্রিশ দফা কর্মসূচী এক নিশ্বাসে বলে যেতে পারেন?

কিন্তু এই সব কিছুই হয়ত চোখে পড়ত না, বড় হয়ে দেখা দিত না, যদি দেখা যেত—এ'রা কাজ করে চলেছেন। যুক্তফ্রন্ট কাজ করছে, অনেক কাজ করছে এবং এত ভাল অনেক কাজ করেছেন, যার তুলনা হয় না বা ২২ বৎসর কংগ্রেস শাসনে যা কল্পনা করা যায় নি। সেইরকম বহু কাজ করছেন। কিন্তু এক বালতি দুধে যেমন এক ফোঁটা গোমূত্র সমান—এই ক্ষেত্রে শরিকী সংঘর্ষ সেই গোমূত্রের কাজ করছে। গোমূত্র কোথায় কিভাবে কাজ করছে—সেইটা একটু কান পাতলেই শোনা যাবে। আমি যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে মনে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করি না। আমি জানি—যে ঘটনাই ঘটুক, যে রটনাই রটুক, যে নেতাই যে বলুন না কেন, যে সংকট বা জটিল পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হোক, সেটা কেটে যাবেই। কিন্তু বিপদ আসছে অন্য দিক থেকে। এর প্রথম দিক হল আস্থার সংকট—বিশ্বাসের অভাব। শত দৈন্যের মধ্যেও মন্ত্রী অথবা যুক্তফ্রন্ট যদি নিজেদের নিজেরা বিশ্বাস করতো—একে অপরকে অবিশ্বাস না করতো, তবে কোন বিপদ এ'দের স্পর্শ করতে পারত না। এই একে অপরকে

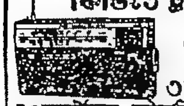
কিস্তিতে ট্রানজিস্টার
HAVA
৩ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।
HAVA SALES (34) SHAKTI NAGAR, DELHI-7

অবিশ্বাস করে, একে অপরের উদ্দেশ্যে কর্দম নিক্ষেপ করে ফল কি হয়েছে—একটু কান পাতলে শোনা যাবে। যেমন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় দিল্লীতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন, মধুদা তথা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের বাড়িতে আহার করলেন এবং জরুরী মামলার প্রয়োজনে শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায় দিল্লী গেলেন—ব্যস, এই তিনকে এক করে দাও, চলুক গবেষণা। একটি দল কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল-দের আলাদা করতে চায়—রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীকে সমর্থন করেছে, অতএব ওদের সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে জুড়ে দাও। বিধান-সভার বাজেট অধিবেশনকালে জনৈক আই সি এস পত্নী বিধানসভায় দুই দিন বাজেট বিতর্ক শুনতে এসেছিলেন, অতএব জুড়ে দাও, চলুক গল্প। একজন মন্ত্রী শিল্পপতিদের সঙ্গে নানা-ভাবে দেখাসাক্ষাৎ করে থাকেন—অতএব জুড়ে দাও গল্প, টাকা খাওয়ার গল্প। জনৈক অবিবাহিত মন্ত্রীর দপ্তরে বহু মহিলা যুক্ত আছেন—অতএব সেই মন্ত্রীকে আর কুমার বিবেচনা করা হবে না। চালাও গবেষণা। তাহলে আস্থা-বিশ্বাসের মৃত্যু হল, সকলে চরিত্র হননের শিকার হলেন আর সর্বোপরি সরকার ভাঙবার জন্য নানা চক্রান্তের গল্প তৈরি হল—এর পর আর বাকি রইল কি? এই সব চলবার পর এই সরকারকে কংগ্রেসের সঙ্গে আলাদা করে দেখবার আর কি কারণ থাকতে পারে? তফাৎ হল—কংগ্রেস জনগণের জন্য কোন কাজ করতে পারে নি—এ'রা কিছু কাজ করছেন। একটু কাজের তফাতে কোন মৌলিক তফাত কি বের করা যায়? আই. এফ. এ খেলার টিকিট যেভাবে রাইটার্স বিল্ডিংসে সম্প্রতি বিলি হল, এমন তো কংগ্রেস আমলেও হয় নি—এই সব অধঃপতন হচ্ছে। ফলে যুক্তফ্রন্টের যে মৌলিক বিশেষত্ব, সেটা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। কেন হারাচ্ছে তার অনেক কারণ আছে—কিন্তু একটি কারণ যার থেকে সব রোগের সৃষ্টি, সেটা হল শরিকী সংঘর্ষ। এই শরিকী সংঘর্ষ যখন সুরু হল, তখন শোনা গেল এর মধ্যে সি-আই-এ আছে, জোতদার, মজুতদার, কালোবাজারী আছে, আছে ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেস। তাই যখন এই শরিকী সংঘর্ষ রোধে প্রথম চেষ্টা সুরু হল, তখন শরিকী সংঘর্ষ রোধের দলিল তৈরি করে-ছিলেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত। শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর দলিলে অনেক ভাল ভাল কথা বলে দলিল রচনা করেন। আর সেই দলিলে সই করলেন শ্রীঅজয় মুখার্জী, শ্রীজ্যোতি বসু সহ সকলে। সেই দলিলে ছিলঃ

"All the constituents of the United Front in West Bengal have been very much perturbed at the incidents of conflicts and clashes that have been taking place between the local workers and supporters of different parties in various districts. Every party of the Front realises that these inter-party disputes, sometimes leading to clashes and murderous assaults, not only tarnish the glorious image of the Front, but also cause serious concern to the democratic and progressive forces in the country. Forces of right reaction, on the other hand, take advantage of such conflicts and clashes."....

"Reduced to a hopeless minority in the mid-term elections, 1969, in West Bengal the Congress realises that it is no more possible to topple the United Front Government by buying up a few unreliable elements from the United Front legislative block. They have changed their tactics. Now they harp on the differences and use the disputes within the Front in order to undermine the unity of the United Front. It is, therefore, all the more necessary for us to be constantly aware of the enemy's tactics and refuse to provide them with any opportunity.

The United Front is of the opinion that the following are component factors in the situation:—

(1) The Congress, some of the newspapers, and forces hostile to the United Front are fomenting and utilizing disputes and conflicts within the Front in their own interests.

(2) A section of Jotedars, Mahajans, and other vested interest has made it a point to pose as supporters of some parties of the United Front, and they foment clashes with the genuine fighters for the cause of workers and peasants.

(3) A section of top bureaucrats and police officials is tryping to utilise inter-party differences and disputes and sharpen the conflicts by playing one against the other party of the front.

(4) The anti-social elements thrived under the Congress regime during the last two decades. Now a section of them feel insecure with the Congress and try to get support of some parties of the Front. They help in developing inter-party clashes in different areas.

(5) C.I.A. and other imperialist agents, agents of big industrial magnates and reactionary parties and groups of the country are playing the game of disrupting the unity of the front."

কিন্তু পক্ষকাল পরে তাঁরাই আবিষ্কার করলেন—না, সি-আই-এ নয়, কেন্দ্রীয় সরকারও নয়, জোতদার-মহাজন-চোরাকারবারী -সমাজবিরোধী -সংবাদপত্র, কংগ্রেস কেউ নয়, শত্রু রয়েছে নিজেদের মধ্যে। তাই শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী নতুন সূত্র দিলেন শত্রু নিধনে। শ্রীলাহিড়ী তাঁর সূত্রে যা বললেন, তার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

"নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বহু শরিক দলের মধ্যে পরস্পরবিরোধী তিক্ততা সৃষ্টি হচ্ছে। সংঘর্ষ কমাতে হলে দলগুলির সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে থেকে তিক্ততা কমিয়ে আনতে হবে।"

"স্বাভাবিক অবস্থায় পরস্পরের রাজনৈতিক মতপার্থক্য বন্ধুভাবে সমালোচনা করা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তিক্ততার পরিস্থিতিতে কোন্ সমালোচনা বন্ধুত্বমূলক আর কোন্ সমালোচনা কুৎসামূলক, তা স্থির করা কঠিন। তিক্ততা কাটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য অন্তত সাময়িকভাবে সমালোচনা মুলতুবী রাখা যেতে পারে। সেজন্যে শুধু যুক্তফ্রন্টের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রচার আন্দোলন করুন এবং জেলায় জেলায় এই ভিত্তিতে সকল দল একসঙ্গে সভা সমাবেশ ইত্যাদি সংগঠিত করুন।"

"তিক্ততা ও সংঘর্ষের একটা বড় সূত্র ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে স্বীকৃতি সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা এবং একই ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে প্রাধান্যের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। স্বীকৃতি ও প্রাধান্যের প্রতিযোগিতা ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু তাকে শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করতে হবে। যেহেতু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা থেকে বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তার ফলে মারাত্মক সংঘর্ষ ঘটছে সেজন্যে প্রস্তাব করা হচ্ছে যে—

যে সব ইউনিয়নে একাধিক শরিক দল কাজ করেন সেখানে অন্তত আগামী ২ মাসের জন্যে সমস্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা হবে।

ইউনিয়ন নির্বাচন বা স্বীকৃতির প্রশ্নে সরকারের কোনও বিশেষ ইউনিয়নের পক্ষে বা বিপক্ষে মত আসবে না।

কৃষক অঞ্চলের ক্ষেত্রেও অন্তত সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক যে-যেখানে বেনামী বা খাস জমি দখল করে আছেন—তাঁদের অন্য কেউ দখলচ্যুত করতে পারবেন না। দখল বা ধান কাটা নিয়ে যে সব বিবাদ আছে বা আসবে, সেগুলি সংশ্লিষ্ট দলগুলির মধ্যে আলোচনার দ্বারা মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে। তাতে বিফল হলে জে-এল-আর-ও লেভেলে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে তার দ্বারা মীমাংসা করতে হবে। ঐ কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত ব্লক স্তরে যুক্তফ্রন্টের পার্টিগুলি বসে মীমাংসা করবে।

সাধারণভাবে ব্লক স্তর পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট কমিটি গঠন করা দরকার।

শহর, গ্রাম প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বিবাদ-বিসংবাদ যাতে সহজে মারাত্মক সংঘর্ষে পরিণত না হতে পারে, সেজন্য লাঠি রড বল্লম ইত্যাদি নিয়ে সশস্ত্র মিছিল বা সমাবেশ মানা করা হবে। প্রশাসনিক যন্ত্রকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা চলবে না।"

অর্থাৎ আজ দেখা যাচ্ছে, নিজেদের শোধন ও সংযমের মধ্যেই বাঁচবার পথ খোঁজা হচ্ছে। অর্থাৎ শত্রু বাইরে নয়, শত্রু ঘরে—বিলম্বে হলেও এটা আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তার পর?

[চলবে]

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনায় বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রয়েজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন)

লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

মহাত্মা গান্ধী ও যন্ত্রযুগ

॥ ভাস্কর ঘোষ ॥

২রা অক্টোবর (১৯৬৯) মহাত্মা **গান্ধীর** জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি গান্ধীজী তাঁর জীবিতকালেই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে তিনি এত সুপরিচিত যে, নতুন করে তাঁর পরিচয় দেবার কিছু নেই। ভারতের স্বাধীনতার দাবি তিনিই সর্বপ্রথম গণদাবিতে পরিণত করেছিলেন। শহরের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গঠিত কংগ্রেসকে তিনি গণ-সংগঠনে রূপান্তরিত করে ব্যাপক গণ-জাগরণের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন। আসমুদ্র হিমাচল ভারতের প্রতি প্রান্তের মানুষকে তিনি মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞ ভারতবাসী তাঁকে পিতার আসনে বসিয়ে "জাতির জনক" আখ্যা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মহাত্মার পদবী দিয়ে ভূষিত করেছিলেন।

গান্ধীজী ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন করে নতুন আদর্শে নব-ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। তাই তিনি নিজের শতায়ু কামনা করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন নি। কিন্তু সংকীর্ণচেতা আততায়ীর হিংস্র আগ্নেয়াস্ত্র অতি নির্মমভাবে তাঁর পরমায়ু কেড়ে নেয়। সাম্রাজ্যবাদের যে তীক্ষ্ণ ছুরিকা ভারতবর্ষকে কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করে, সেই বিষাক্ত ছুরিকাই গান্ধীজীর প্রাণ হনন করেছিল। আশু ক্ষমতা লাভের জন্য লালায়িত কংগ্রেস নেতারা যেদিন গান্ধীজীর সদুপদেশ অগ্রাহ্য করে ভারত বিভাগের শয়তানী প্রস্তাব মেনে নেন, সেইদিনই হতাশার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত গান্ধীজীর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে। আততায়ীর অগ্নিবর্ষণ সেই পদ্ধতিতে ত্বরান্বিত করে মাত্র।

ভারতের একচ্ছত্র এবং অবিসংবাদী জননায়ক মহাত্মা গান্ধী অসাধারণ জনপ্রিয়তায় পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস রচনা করলেও তাঁর নেতৃত্ব কোনদিনই বিতর্কের অতীত ছিল না। তাঁর অহিংসা, তাঁর সত্যাগ্রহ, তাঁর শিল্প ও সমাজতত্ত্ব, তাঁর চরকা, তকলী ও অর্থনীতি—সবই ছিল অভিনব এবং সবই বিতর্কমূলক আলোচ্য বস্তু। গান্ধীজী অহিংস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিলেন এবং সর্বোদয় সমাজের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে নতুনরূপে গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্পকাল পরেই তিনি মারা যান। তাই তাঁর কল্পনার ভারত রূপ পরিগ্রহের কোন অবকাশ পায় নি।

এ-যুগে কংগ্রেসের নেতারা প্রায় সকলেই গান্ধীজীর নামে প্রতিদিনই শ্রদ্ধার ফুল ও বিল্বপত্র উৎসর্গ করে থাকেন, কিন্তু সেটা নিছক আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। গান্ধীজীর মহত্ত্ব, উদারতা, সহনশীলতা, সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ এবং পরার্থে আত্মদানের সুবৃহৎ পটভূমিকায় এ-যুগের নায়কদের নিতান্তই বামনের মত দেখায় না কি?

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এদেশে যুগ-পুরুষ গান্ধীজীর বিরাটত্ব সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধতা নেই। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে গান্ধীজীর অবিস্মরণীয় অবদানের কথা নাম্বুদ্রিপাদ এবং হীরেন মুখার্জীর মত কম্যুনিস্ট নেতারাও স্বীকার না করে পারেন নি। কিন্তু গান্ধীবাদ সম্পর্কে দেশে গুরুতর মতভেদ বিদ্যমান।

গান্ধীজী কার্ল মার্কসের মত কোন সুসংবদ্ধ সামাজিক-অর্থনৈতিক তত্ত্বের উদ্গাতা নন। রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, মানুষ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনি যে সমস্ত মৌলিক বক্তব্য রেখেছেন, সেগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করে তাঁর অনুগামীরা গান্ধীবাদ দাঁড় করিয়েছেন।

এখানে গান্ধীবাদের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা সম্পর্কে গান্ধীজীর বক্তব্য কি ছিল, সেটা এখানে সংক্ষেপে পাঠকদের সামনে হাজিরের চেষ্টা করব।

গান্ধীজী তাঁর প্রথম দিকের লেখায় যন্ত্রের (machines) বিরোধিতা করেছিলেন। সে ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ 'নমঃ যন্ত্র' বলে যন্ত্রকে স্বাগত জানিয়েছেন। গান্ধীজী যন্ত্রযুগে যন্ত্রের বিরোধিতা করায় দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। গান্ধীজীর যন্ত্র-বিরোধিতা তত্ত্ব কি গোঁড়া হিন্দুর সর্বপ্রকার আধুনিকতা বিরোধী সহজাত সংস্কারের প্রকাশ? পশ্চিমী শিল্পসমাজ শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই কি গান্ধীজী যন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন? একথা ঠিক যে, গান্ধীজী গোড়ায় গোড়ায় যা লিখেছেন বা বলেছেন, তার মধ্যে কিছুটা নৈতিক এবং ধর্মীয় গোঁড়ামী লক্ষ্য করা যায়। তাতে আধুনিক ভাবাপন্ন মানুষ কিছুটা বিভ্রান্তবোধ করতে পারেন। গান্ধীবাদী অর্থনীতিবিদ দাঁতওয়ালা কিন্তু তাতে ঘাবড়ান নি। তিনি বলেছেন, ঋষির অন্তর্দৃষ্টিকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। তাতে যেসব জিনিস ধরা পড়ে তা বৈজ্ঞানিক মন নিয়েই পরীক্ষা করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে গান্ধীজী তাঁর যন্ত্র-বিরোধিতাকে যুক্তিযুক্ত এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন।

গান্ধীজী যন্ত্র ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন না। যন্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগে তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি যন্ত্রের আমূল উচ্ছেদ চান নি। তিনি যন্ত্রের ব্যবহার সংযত করতে চেয়েছিলেন।

অবশ্য গান্ধীজীর প্রথম দিককার রচনায় যন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধিতাই পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৮ সালে তিনি 'হিন্দ স্বরাজ' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "যন্ত্রের কোন সদ্গুণ আমি খুঁজে পাই না। কিন্তু যন্ত্রের অমঙ্গল সম্বন্ধে আমি একখানা পুরো বই লিখে ফেলতে পারি। একটি মৌলিক সত্য মনে রাখবেন। যন্ত্র হচ্ছে মস্ত পাপ। আমরা ক্রমে ক্রমে এই পাপের উচ্ছেদ করব।"

কিন্তু গান্ধীজীর পরবর্তীকালের লেখায় দেখা গেছে যে, তিনি যন্ত্রের আপোষহীন বিরোধিতার সামিল হতে রাজী নন।

১৯২১ সালে তিনি "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় লেখেন, "আমি সর্বপ্রকার যন্ত্রের ধ্বংস কামনা করি—একথা সত্য নয়। সেরকম কোন চেষ্টা আমি কখনও করি নি।"

১৯২৪ সালে তিনি 'নবজীবন' পত্রিকায় লেখেন, "যারা না জেনেশুনে বলে বেড়াচ্ছেন যে, আমি যন্ত্রের বিরোধী, তাঁরা আমাকে পথে বসাচ্ছেন।"

১৯২৪ সালে তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লেখেন, "আমি যন্ত্রের বিরোধী নই। যন্ত্র নিয়ে যে উন্মত্ততা দেখা

দিয়েছে, আমি তার বিরোধী। ...আমিও চাই যে, পণ্য উৎপাদনে সময় ও শ্রম হ্রাস পাক। কিন্তু তার সুফল যেন বিশেষ একটি শ্রেণীর ভোগে না লেগে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত হয়।"

১৯২৬ সালে তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লেখেন, "আমি কুটীরবাসী কোটি কোটি মানুষের শ্রম লাঘবের জন্য যন্ত্রকে স্বাগত জানাই।"

১৯৩৫ সালে 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী লিখেছিলেন, "যে যন্ত্র জনগণকে কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে না বরং প্রত্যেকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং যন্ত্রের দাস না হয়েও মানুষ যে যন্ত্র পরিচালনা করতে পারে, গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগে সেই সব যন্ত্রের স্থান থাকবে। যদি প্রত্যেক গ্রামে বিদ্যুৎশক্তি গিয়ে পৌঁছয়, তাহলে সেই বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা গ্রামের যন্ত্রপাতি পরিচালিত হলে, আমার কোন আপত্তি নেই।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোই প্রমাণ করছে যে, গান্ধীজী সব রকমের যন্ত্রের বিরোধিতা করেন নি। গান্ধীজী যন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন কেন, তা তিনি নিজের ভাষাতেই ব্যাখ্যা করে গেছেন।

"যন্ত্রে পরিশ্রম লঘু হয় ঠিকই, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানব কর্মচ্যুত হয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।"

—ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৩।১১।১৯২৪

১৯২৫ সালে তিনি 'নবজীবন' পত্রিকায় লেখেন, "মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে ধন ও ক্ষমতা একীভূত করবার জন্য যন্ত্রের ব্যবহার পাপ এবং অন্যায় বলেই আমি গণ্য করি।"

১৯৩৩ সালে 'হরিজন বন্ধু' পত্রিকায় তিনি লেখেন, "যে দেশে কোটি কোটি মানুষের কাজ নেই, সে দেশে মানুষের শ্রমশক্তি ছাড়া অপর কোন শক্তির প্রয়োগ বেকারের সংখ্যাই শুধু বাড়িয়ে দেয়।"

১৯৩৪ সালে তিনি 'হরিজন বন্ধু'তে লিখেছিলেন, "যে দেশে কাজের (চাকরী) চেয়ে লোক বেশি, সে দেশের পক্ষে যন্ত্রপাতির ব্যবহার ক্ষতিজনক।"

১৯৩৫ সালে একই পত্রিকায় তিনি লেখেন, "যে দেশে কাজের অভাবে কোটি কোটি মানুষ বেকার বসে আছে, সে দেশে শ্রম লাঘবের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কথা চিন্তা করে লাভ কি? ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামে যে জীবন্ত মেসিন (যন্ত্র) ছড়িয়ে আছে, তার জায়গায় প্রাণহীন কোন যন্ত্র নিয়োগের চেষ্টা আমাদের করা উচিত নয়। মানুষের শ্রম লঘু এবং সরলীকরণে যন্ত্রের ব্যবহার অবাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যন্ত্র আজ মুষ্টিমেয় মানুষের পকেট বিষয়-সম্পদে ভরে দেবার কাজেই শুধু ব্যবহৃত হচ্ছে। যে কোটি কোটি মানুষের রুজি-রোজগার যন্ত্র কেড়ে নিচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে সকলেই উদাসীন।"

১৯৩৮ সালে তিনি 'হরিজন বন্ধু' পত্রিকায় লেখেন, "৩ কোটি লোকের জায়গায় ৩০ হাজার লোক যদি দেশের সব সম্পদ উৎপন্ন করতে পারেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ তিন কোটি মানুষকে অলস এবং বেকার করা চলবে না।"

দেখা যাচ্ছে, দুটি আলাদা আলাদা কারণে গান্ধীজী যন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন। যন্ত্রভিত্তিক পুঁজিবাদী শোষণ তাঁর পছন্দ হয় নি। আর শিল্প-সভ্যতার বহুবিধ অভিশাপও তিনি বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। শেষেরটা আরও মৌলিক কারণ। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেভাবে যন্ত্রের ব্যবহার চালু করা হয়েছে, তাতে গান্ধীজীর প্রশ্নে আপত্তি তো ছিলই উপরন্তু তিনি মনে করতেন, যন্ত্রের অবাধ ব্যবহার স্বাধীন ও ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনের পরিপন্থী। শেষোক্ত বক্তব্যের জন্যই গান্ধীজী হাতুড়ে এবং প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা পেয়েছিলেন।

অপর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, গান্ধীজীর আপত্তি একদিকে অর্থনৈতিক এবং অপর দিকে সামাজিক। যন্ত্রের পুঁজিবাদী ব্যবহার সম্পর্কে গান্ধীজী ও সোস্যালিস্টদের মতের অমিল নেই। সম্প্রতিকালে কমুনিস্টদের অটোমেশন বিরোধী দেশব্যাপী আন্দোলন সেটা নতুন করে প্রমাণ করেছে। সুতরাং এ সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছু নেই।

"প্রকাশিত হল" সত্যানন্দ স্বামীর

হে অতীত কথা কও

।। প্রথম পর্ব ।।

১৯১৪ সাল থেকে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাস। পান্নালাল দাশগুপ্তের মূল্যবান ভূমিকা সহ সচিত্র দলিল গ্রন্থ।

প্রায় ৫৫০ পাতার বই, দাম ষোল টাকা মাত্র।

নির্মলচন্দ্র মৈত্র-এর দ্বিতীয় উপন্যাস

অন্তরাল ৫·৫০

ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে বিস্ময়কর উপন্যাস।

প্রগতিশীল বলিষ্ঠ লেখক সৌরি ঘটকের নতুন উপন্যাস

রক্ত রাঙা নগরী ৯·০০

সৌরীন সেন-এর তিনখানা অবিস্মরণীয় গ্রন্থ

ভিয়েতনাম ১৩·০০

সূর্যহারা (নাটক) ৩·০০

কঙ্গো থেকে ফেরা ৮·০০

চাণক্য সেন-এর

রাজপথ জনপথ ৭·৫০

সমুদ্র শিহর ৭·০০

ধীরে বহে নীল ১০·০০

বনফুল-এর উপন্যাস

রাত্রি ৪·০০

পারাবত-এর উপন্যাস

শতরূপে শতবার ৪·০০

বিজন চক্রবর্তীর উপন্যাস — বিন্যাস দর্পণের মালিনী ৭·০০

অচিন্ত্য সেনগুপ্তের উপন্যাস — আসমুদ্র ৫·০০

সুবোধ ঘোষ-এর „ — নবীন শাখী ২·৫০

বিনয় চৌধুরীর „ — পল্লবল ৩·০০

সলিল সেন-এর „ — স্বপন একটি নতুন নাম ১০·০০

॥ অনূদিত উপন্যাস ॥

পোর্ট্রেট — পার্লবাক ৮·০০

করুণা কোরোনা — স্টিফান জাইগ ৬·০০

থ্যাঙ্ক ইউ জীভ্‌স পি. জি. ওডহাউস ৪·০০

অজিত সেন-এর নতুন নাটক

বসুন্ধরা জাগো ২·৫০

নবভারতী ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

যন্ত্রের অসংযত ব্যবহার মানবজাতির মঙ্গলের পরিপন্থী বলে গান্ধীজী যে ধারণা পোষণ করতেন, তার ন্যায্যতা সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে।

যন্ত্রের ব্যবহার সংযত না হলে জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন অথবা কল-কারখানায় কাজের সময় হ্রাসের মধ্য দিয়ে দেশের সমস্ত সক্ষম মানুষের কাজের সংস্থান করা সম্ভব হবে না। হয় যন্ত্রের ব্যবহার সংযত করতে হবে, না হয় বহু সংখ্যক বেকার নিয়ে ঘর করতে হবে। এই কারণেই ট্রেড ইউনিয়নগুলো অটোমেশনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং কেরালায় বামপন্থী কম্যুনিস্টরা কৃষি-ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার চালু করতে রাজী হচ্ছেন না। তবে একদল অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়। তাতে ভোগের বাসনা বেড়ে যায়। চাহিদা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে নতুন নতুন চাকরি-বাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়। যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে বিশেষ একটি শিল্পে নিয়োগ সংকুচিত হলেও অন্যান্য শিল্পে ব্যাপক লোক নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বে দেখা গেছে, শিল্প সম্প্রসারণ হারের তুলনায় লোক নিয়োগের হার অনেক নিচুতে থাকে। শিল্প বিপ্লবের পর প্রথম পর্যায়ে নতুন নতুন উৎপাদনে পুরনো শিল্পের ছাটাই লোকেরা চাকরি পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বর্তমানে যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উৎপাদনী ব্যয় হ্রাসের চেষ্টা চলছে। তাতে দেখা যাচ্ছে শ্রমিকের সংখ্যা না বাড়িয়েই উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো মোটেই অসম্ভব নয়।

সোস্যালিস্টরা বলছেন, একদিকে দারিদ্র্য, অভাব, অনশন। অপরদিকে শ্রমিকদের হাড়ভাঙা পরিশ্রম। এই দুইয়ের পটভূমিকায় বাড়তি উৎপাদনজনিত বেকারীর আশঙ্কা অমূলক। জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকুক, আর সেই সঙ্গে কাজের ঘণ্টা ক্রমাগত হ্রাস পাক। কল-কারখানায় কাজের ঘণ্টা কমে গেলে শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে।

এই প্রশ্নটিকে আলোচনার শেষ পর্যায়ে নিয়ে গেলে দেখা যাবে যে, এটা আর অর্থনৈতিক প্রশ্ন না থেকে দার্শনিক প্রশ্নে দাঁড়িয়ে গেছে। মানুষের ভোগ-স্পৃহার কোন সীমা আছে কি? কাজের ঘণ্টা ক্রমাগত কমে গেলে মানুষ যে অফুরন্ত অবসর পাবে, তাতে সমাজের অধঃপতনের পথই প্রশস্ত হবে নাকি? সেটা কি তখন আর অর্থনৈতিক প্রশ্ন থাকবে?

স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে, কিন্তু তাতে বেকার সমস্যার কোন সমাধান হয় নি। পরিকল্পনা কমিশন নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। কাজেই একমাত্র বড় বড় কল-কারখানার প্রসারের মধ্য দিয়েই বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে—এ-ধারণা বাতুলতা মাত্র। দ্বিতীয়, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার যেভাবে যন্ত্রের প্রাধান্য বাড়িয়ে দিচ্ছে তাতে নতুন কল-কারখানায় লোক নিয়োগের সুযোগ সাংঘাতিকভাবে সীমিত হবার সম্ভাবনাই বেশি।

কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ভবিষ্যদৃষ্টি সঙ্কীর্ণ বলেই মনে হয়। জাতীয়করণের ফলে অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য রোগের নিরাময় হবে কি? গান্ধীবাদীদের পক্ষে জাতীয়করণ অনুমোদন না করে উপায় নেই ঠিকই, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, জাতীয়করণের ফলে চাকরি-বাকরির সংখ্যা বাড়তে পারে না। সেখানে আমাদের হোঁচট খেতেই হচ্ছে।

গান্ধীজী যখন যন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন, তখন কম্যুনিস্টরা তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা না দিয়ে পারেন নি। কিন্তু আজ যন্ত্রের প্রধান পুজারী সেই কম্যুনিস্টরাই (ভারতীয়) যন্ত্রদানবের হিংস্র এবং সর্বগ্রাসী রাক্ষসী মূর্তি দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠছেন। তাঁরা এখন কম্পিউটার আর অটোমেশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ক্ষেত-খামারে ট্র্যাক্টর দেখে তাঁদের মাথায় হাত পড়ছে। নাম্বুদ্রিপাদ এবং জ্যোতি বসুর এই যন্ত্রবিরোধিতার সঙ্গে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পূর্বের গান্ধীবাদী যন্ত্রবিরোধিতা তুলনীয় নয় কি? গান্ধীজী আদিম সমাজে ফিরে যাবার জন্য যন্ত্রের বিরোধিতা করেন নি। যন্ত্রদানবের হাত থেকে মানব-জাতিকে রক্ষার মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি যন্ত্রের সংযত ব্যবহারের সুপারিশ করেছিলেন।

পূর্ব জার্মানীতে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কম। সেখানে অটোমেশন অসাধ্য-সাধন করেছে। সেখানকার মানুষ তদ্দ্বারা সত্যিই উপকৃত হয়েছে। কিন্তু ভারতের কম্যুনিস্টরাই অনুভব করছেন যে, ভারতের মত জনবহুল ও বেকার সমস্যা জর্জরিত দেশে অটোমেশন আশীর্বাদ নয়, মস্ত অভিশাপ। গান্ধীজী এই ভারত-বর্ষের পটভূমিকাতেই যন্ত্রের সংযত ব্যবহারের প্রস্তাব করেছিলেন। অর্থাৎ কম্যুনিস্টরা বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ যে সত্য উপলব্ধি করছেন, পঞ্চাশ বছর আগে নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই গান্ধীজী সেই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। সুতরাং গান্ধীবাদকে অবৈজ্ঞানিক অথবা যুগের অনুপযোগী বলে নস্যাৎ করার উপায় নেই।

যন্ত্রযুগের মারাত্মক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গান্ধীজী যা অনুভব করেছিলেন, তা আজ সত্য বলেই প্রতিপন্ন হচ্ছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আবার রামায়ণ-মহাভারতের যুগে ফিরে গেলেই আমরা মোক্ষলাভ করব। মানুষের অগ্রগতি যখন স্তব্ধ হবার নয়, তখন অদূর ভবিষ্যতেই মানুষ এই বিরাট বাধা অতিক্রমের পথ খুঁজে নিতে পারবে বলেই আশা করা যায়। সেই সত্যানুসন্ধান প্রচেষ্টায় গান্ধী-বাদের প্রয়োগ সার্থক হোক বা না হোক, তিনি যে এই বৃহৎ প্রশ্নটিকে আমাদের সামনে এনে হাজির করেছিলেন। শুধু সেই জন্যই মানুষ চিরকাল তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

প্রকাশিত হল

বাংলার কৃষকদের গৌরবময় সংগ্রাম এবং কিভাবে কৃষকরা সঙ্ঘবদ্ধ হল তার এক প্রামাণিক গ্রন্থ।

মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল রচিত

কৃষক সভার ইতিহাস

দাম : দশ টাকা

শারদীয় উৎসবে কিশোর-কিশোরীদের উপহার দেবার মত বই।
মহাকাশ অভিযানের কথা।

কল্পতরু সেনগুপ্তের

চাঁদের দেশে মানুষ

দাম : সাড়ে তিন টাকা

নবজাতক প্রকাশন । দে বুক স্টোর্স

১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সূর্য সেনকে বন্দী করা চাই-ই !

প্রীতির জীবনের অন্তরস্পর্শী শেষ বিবৃতিটি মানুষের প্রতি তার প্রাণের অপরিসীম ভালবাসা ও মমতার সাক্ষ্য বহন করে। বিবৃতিটির ছত্রে ছত্রে দেশবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা, দরদ ও মানবজীবনের গভীর উপলব্ধির প্রকাশ।

নিরুপায়, নিরপরাধ দেশবাসীর প্রতি সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর নির্মম অত্যাচার উৎপীড়নে এই দরদী কোমল হৃদয় ক্ষমাহীন আক্রোশে ও সীমাহীন ঘৃণায় পরিপূর্ণ। শত্রুকে চরম আঘাতে পর্যুদস্ত করে তোলবার জন্য প্রীতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার জন্য চাই মানসিক প্রস্তুতি। সশস্ত্র সংগ্রামে শত্রুকে চরম আঘাত হানবার মানসিক প্রস্তুতির জন্য বৈপ্লবিক নিষ্ঠা, সততা ও সাধনার প্রয়োজন। প্রীতির চরিত্রে কোনটারই অভাব নেই। চরম মুহূর্তে চরম আত্মত্যাগের সংকল্পে প্রীতি দুর্জয় শক্তির অধিকারিণী। সামরিক শিক্ষাকে অবহেলা করে আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন প্রীতির হস্তধৃত রিভলভারের মুহুর্মুহু গর্জনে ক্লাব-গৃহ প্রকম্পিত। প্রীতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস নরমেধ যজ্ঞের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে কোনমতেই ফিরে আসা চলবে না।

প্রীতির কথা লিখতে গিয়ে আজ বিপ্লবী ফরাসী তরুণী যোয়ান অব আর্কের বিজয়গাথার কথা মনে পড়ছে। ১৪শ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে ফরাসী দেশের অরলিয়েন্স প্রদেশ হতে বৃটিশ প্রভুত্বের অবসানকল্পে যোয়ান অব আর্ক ফরাসীবাসীর অন্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন—তাদের ভগ্নোৎসাহ নির্জীব প্রাণ সজীব করে এই বিপ্লবী যুবতীর বিক্রম ও সাহস। ফরাসীবাসীদের স্বাধীনতার জন্য চরম আত্মত্যাগের সংকল্পে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ফরাসী জনগণ দুর্জয় শক্তি নিয়ে এই যুবতীর নেতৃত্বে বিশাল বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বৃটিশ শক্তি পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয় আর চার্লস Rheims-এর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী বিপ্লবী যোয়ান অব আর্কের নির্ভীক নেতৃত্ব ইতিহাসের পাতায় এক অমর গাথা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে সীমিত শক্তিতে প্রীতিলতার অভিযানের মূল্যায়ন সেই সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে হলেও, আমার মনে হয়, যোয়ান অব আর্কের অনুরূপ বৈপ্লবিক শক্তি নিয়েই প্রীতিলতাও বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছে।

এই প্রসঙ্গে আরও মনে করিয়ে দেয় চিতোরে "জহর ব্রতের" কথা। প্রায় পাঁচ মাস চিতোর অবরুদ্ধ। চিতোরের অবশ্যম্ভাবী পতনের আশঙ্কায় রাজপুত রমণীরা অনুষ্ঠানপূর্বক "জহর ব্রতের" আয়োজন করলেন এবং শত্রুর হাতে যাতে লাঞ্ছিতা হতে না হয় তার জন্য স্বেচ্ছায় আগুনে আত্মাহুতি দিতে গেলেন। ক্ষতবিক্ষত দেহে প্রীতিলতার স্বেচ্ছামৃত্যু বরণও যেন জহর ব্রতের প্রতিচ্ছবি বহন করে।

গড় কতঙ্গার নাবালক রাজার বিধবা মা—রাণী দুর্গাবতী আকবর সেনাপতি আসফ খাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হন। বীরাঙ্গনা রাণী দুর্গাবতী পরাজিত হয়ে অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজের বুকে শাণিত ছুরিকা বসিয়ে দিয়েছিলেন। এই বীরাঙ্গনার স্বেচ্ছামৃত্যুর আদর্শে শত্রুর বিজয়ী শক্তি বিজয়ের গৌরব সম্পূর্ণভাবে উপভোগে সক্ষম হয় নি। প্রীতিলতার মৃত্যু-নীল ভূলুণ্ঠিত নিশ্চল দেহও ইংরেজ শত্রুকে উপেক্ষা করেছে।

জোয়ান অব আর্কের অমর গাথা, রাজপুতে রমণীদের চির অবিস্মরণীয় জহর ব্রতের কাহিনী, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরাঙ্গনা রাণী দুর্গাবতীর স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ প্রভৃতি ইতিহাসের পাতায় যেরূপ অমর অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে, প্রীতিলতার বীরত্ব গাথাও স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের পাতায় সেইরূপ সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতবাসী ভুলবে না রাণী লক্ষ্মীবাঈকে—ভুলবে না প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে। ঝাসী রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। যুদ্ধে পরাজিতা লক্ষ্মীবাঈ সিপাহী বিদ্রোহের নেতা তাঁতিয়া টোপির সঙ্গে যোগ দিয়ে গোয়ালিয়র অধিকার করেন। গোয়ালিয়র দুর্গের সম্মুখে সমবেত বিশাল ইংরেজবাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্জয় শক্তি নিয়ে লক্ষ্মীবাঈ স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করেন। আমরা লক্ষ্মীবাঈয়ের পাশে প্রীতিলতাকে দেখতে পাই।

ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবীরা এত আকস্মিক ও এমন সুষ্ঠুভাবে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ সম্পন্ন করেছিলেন যে, ইংরেজ সরকারের পুলিশ ও মিলিটারী প্রাণপণ করেও শেষ পর্যন্ত প্রীতিলতা ভিন্ন আক্রমণে অংশগ্রহণকারী অন্য কারও সন্ধানলাভে সক্ষম হয় নি। স্যার চার্লস টেগার্ট ও মিঃ লোম্যানের সৃষ্ট ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টও তাদের সমস্ত বুদ্ধি খরচ করে এবং বিপ্লবী দলে নিযুক্ত নিজেদের এজেন্ট মারফত শত চেষ্টা করেও ক্লাব আক্রমণকারীদের পরিচয় বা নাম ঠিকানা জানতে পারলো না। মজার কথা—এই আক্রমণে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সুশীল দে, কালী দে ও শান্তি চক্রবর্তীকে অন্যান্য বিভিন্ন চার্জে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ষড়যন্ত্র বা আর্মস এ্যাক্ট অথবা বিস্ফোরক দ্রব্যের আইনের বিচারে দণ্ডিত হয়েই তারা আন্দামানে নির্বাসিত হয়। এদের মুখেই আমরা এই ক্লাব আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি। মহেন্দ্র চৌধুরী, বীরেশ্বর রায়, পান্না সেন ও প্রফুল্ল দাস প্রমুখেরাও অন্যান্য ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত মামলায় বা বিনা বিচারে আটক বন্দী হয়ে জেলে প্রেরিত হয়।

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারীরা সকলেই অন্যান্য বিভিন্ন চার্জে একে একে পুলিশের কবলে পড়লো—কারও সাজা হোল, কেউ দ্বীপান্তরে নির্বাসিত হোল আবার কেউ বা বিনা বিচারে জেলে আটক বন্দী হয়ে রইলো। এ ছাড়াও ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার অনেকেই পুলিশের হাতে বন্দী হোল। আমরা সকলেই জানি কোন একটা ঘটনার অনুসন্ধানে পুলিশ একসঙ্গে অনেককেই গ্রেফতার করে এবং প্রলোভন দেখিয়ে, নানা অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে ও নানাভাবের কথোপকথনের মাধ্যমে বন্দীদের কাছ থেকে ঘটনার মূল সূত্র ও রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে।

চট্টগ্রামে এইরূপ ব্যাপক ও অতন্দ্র পুলিশী ব্যবস্থা কায়েম থাকা সত্ত্বেও সূর্য সেনের নেতৃত্বে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রান্ত হওয়াতে Scottland-yard trained পুলিশদের পক্ষে এই শোচনীয় পরাজয় মেনে নেওয়া দুঃসহ হয়ে দাঁড়ালো। ইউরোপীয়ান ক্লাবের সদস্যদের এইরূপে নির্মমভাবে আক্রমণকারী সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের কি উপায়ে গ্রেপ্তার করা যায় তার জন্য পুলিশবাহিনী নতুন উদ্যম ব্যাপকভাবে জাল বিস্তার করলো। এইরূপ একটি ঘটনার পরে পুলিশের তৎপরতা যে সহস্রগুণ বেড়ে যাবে সে সম্বন্ধে মাস্টারদার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তাই সীমিত শক্তি নিয়েও তিনি এই পুলিশী তৎপরতাকে প্রতিহত করবার সকল প্রকার সম্ভাব্য চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না। দলে নতুন রিক্রুট সংগ্রহের ব্যাপারে যত রকম সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন বিভিন্ন সংগঠকদের কাছে মাস্টারদা তার নির্দেশ পাঠালেন। ক্লাব আক্রমণে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীরা এবং বিশেষ কর্তব্যভার নিয়ে সাহায্যকারীরা ব্যতীত কাদের দ্বারা ক্লাব আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল আর কেউ ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারলো না। অন্যান্য বিভিন্ন case-এ ক্লাব-আক্রমণকারীরা যখন ধরা পড়ে গেল তখন মাস্টারদা আরও কঠোর নির্দেশ দিলেন কারও মুখ থেকে ভুলেও যেন ক্লাব আক্রমণে অংশগ্রহণকারীদের নাম উচ্চারিত না হয়। এই নির্দেশ যে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছিল তাতে কোনই সন্দেহ নেই; কারণ, শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ক্লাব আক্রমণকারীদের কারও হদিশ পায় নি। জেল থেকে বেরিয়ে আমরা এদের নাম প্রকাশ করবার আগে পুলিশের পক্ষে এদের পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

আমরা কেউ যদি মনে করি মাস্টারদা সদস্যদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন—"এই আক্রমণ সংক্রান্ত ব্যাপারে তোমরা কেউ মুখ খুলবে না", আর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সেই নির্দেশ মেনে নিল—এটা অত সহজ ব্যাপার নয়। মাস্টারদা যাদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন এবং যারা এইরূপে কঠোর দায়িত্বপূর্ণ নির্দেশ পালন করেছিল, তাদের সকলকেই প্রথম সারির বিপ্লবী হিসেবে আগে থেকেই যদি শিক্ষিত ও প্রস্তুত করা না হোত তবে মাস্টারদা বা অন্য কোনও মহা বিপ্লবীর নির্দেশও নির্দেশই থেকে যেত—কখনই আর তা বাস্তবে রূপায়িত হোত না।

আন্দামানে থাকাকালে বিশ্ব মহানায়ক লেনিনের লেখা পড়ে জানতে পারি যে, তাঁর Central Committee-তে বিশ্বাসঘাতক মেলিনভস্কি সবার চোখে ধুলো দিয়ে বহুদিন সদস্য হিসেবে ছিলেন। তারপর আরও দেখি লেনিন লিখছেন—"...... that, Malinovsky could not do the greatest mischief because of efficient co-ordination of legal and ill-legal activities." সূর্য সেনের নেতৃত্বে জনসাধারণের সংগঠন বলতে যা ছিল তা ছাত্র-যুবক ও বিভিন্ন সমর্থকদের সংগঠন। এই আইনসম্মত সংগঠন বজায় রাখতে আমরা যেমন চেয়েছিলাম ঠিক তেমনি আবার বিপ্লবীদের নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক গোপন সংগঠনও প্রথম থেকেই আমাদের গড়ে তুলতে হয়েছে। সূর্য সেনের নেতৃত্বে এইরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর compact core of revolutionaries প্রথম থেকেই গড়ে উঠেছিল যারা ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুর্নোর আক্রমণ-

কারী কে এবং কুমিল্লার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ এলিশনও বা কার গুলীতে নিহত হয়েছিলেন আর কারাই বা ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেছিল—প্রাণপাত করেও এইসব তথ্যের সূত্র আবিষ্কার করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সূর্য সেনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যই হোল পুলিশ ইন্টেলিজেন্সের পরাজয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের সাফল্য।

কেবলমাত্র সংগঠনের কার্যকলাপ আরও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালনা করবার নির্দেশ দিয়েই মাস্টারদা ক্ষান্ত ছিলেন না। দলে যদি কোন বিভীষণ থাকে তবে প্রয়োজনের খাতিরে তাকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে হলেও—বিশ্বাসঘাতকের পরিত্রাণ নেই—দলের ভিতর এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আমাদের বিপ্লবী দলের একজন সদস্যের গতিবিধি অত্যন্ত সন্দেহজনক হয়ে উঠেছিল। তার অজান্তে তার ওপরে সজাগ দৃষ্টি রাখা হোল। হিমাংশু ভৌমিকের (ডাক নাম—রাজা) ওপর ওই সদস্যটির গতিবিধির সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহের এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তার প্রতি চরম দণ্ড বিধানেব ভাব ন্যস্ত হোল। বলিষ্ঠ দেহ হিমাংশু সকলেরই প্রিয়পাত্র এবং মাস্টারদার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন নিষ্ঠাবান কর্মী। সাথীদের কাছে হিমাংশু তার মনোভাব জানালো—"যদি প্রমাণ পাই এই সদস্যটি পুলিশের সঙ্গে গোপন সংযোগ রেখেছে ও বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে তবে তার আর নিষ্কৃতি নেই। আমি তাকে গলা টিপেই মেরে ফেলবো।"

আমাদের বিপ্লবী সাথীরা কিছুদিনের মধ্যেই সুনিশ্চিতভাবে জানলো যে, সেই সদস্যটি পুলিশের চর। হিমাংশুর হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হোল। তার সবল বাহু দুটি চঞ্চল হয়ে উঠলো—বিশ্বাসঘাতকের বেঁচে থাকবার অধিকার নেই—আর কালবিলম্ব নয়। একদিন অন্ধকার রাত্রে গ্রামের পথে হিমাংশুর হাতে প্রাণ দিয়ে তাকে বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হোল। এই ক্ষুদ্র প্রাণটি নিতে পিস্তলের একটি গুলীও খরচ হয় নি, শাণিত ছোরার ব্যবহার বা আঘাতের জন্য লোহার ডাণ্ডারও প্রয়োজন হয় নি—হিমাংশুর সবল হস্তের নিষ্পেষণেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ঐ বিশ্বাসঘাতক তার পুরস্কারের দৃষ্টান্ত রেখে পথের ধুলোয় নিথর নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলো।

ইংরেজ সরকারের পুলিশ বার বার এইভাবে অপদস্থ হয়ে অক্ষমতার গ্লানি ঢাকতে আরও মরিয়া হয়ে উঠলো। কারও ওপর একটু সন্দেহ হওয়া মাত্রই তাকে গ্রেফতার করতে লাগলো। যে সব থানায় ও গ্রামে বিপ্লবীদের আনাগোনা আছে বলে তাদের সন্দেহ হয়েছে সেই সব স্থানে ছাত্র-যুবক, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে সকলের ওপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে নানাভাবে তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে লাগলো। সকল কর্মকাণ্ডের হোতা সূর্য সেনকে গ্রেফতার করতে না পারলে কেবল ছাত্র ও যুবকদের ওপর আন্দাজে এইরূপ অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে গেলেই যে বিপ্লবী সংগঠনকে কোনমতেই খর্ব করা সম্ভব হবে না—এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মাস্টারদার মস্তকের মূল্য

অগ্নিযুগের বিপ্লবী অনন্ত সিংহের চাঞ্চল্যকর সচিত্রগ্রন্থ

১ম খণ্ড ৯'০০ টাকা **"চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ"** ২য় খণ্ড ১০'০০ টাকা

—— অভিমত ——

Amrita Bazar Patrika: "We read the two volumes as though we were plodding through a Tolstoy epic. But this epic with all its distinguishing traits is based entirely on facts."

আনন্দবাজার পত্রিকা: "রক্তস্নাত দিনের কাহিনী—লেখক অনন্ত সিংহ নিজে সেই ঘটনার অন্যতম নায়ক, ভাষার সাহায্যে তিনি সেই ঘটনাকে আবার সে-রকম জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী করে তুলতে পেরেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর।......পড়তে পড়তে শরীর নিশপিশ করে।"

যুগান্তর: "চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ মনে করিয়ে দেয়—হলদিঘাটের সেই যুদ্ধের কথা।......অনন্ত সিংহের এই বিপুল প্রয়াস সমগ্র জাতির অভিনন্দন পাবার যোগ্য।...... এ এক জ্বলন্ত ইতিহাস—বিপ্লবী বাঙলার অনবদ্য মূর্তি। আর বর্ণনার ব্যঞ্জনায় রক্তক্ষরা মহাকাব্য।"

সাপ্তাহিক বসুমতী: "বইখানি বাংলাভাষার গ্রন্থভাণ্ডারে এক অমূল্য সংযোজন। বইটির সাহিত্যমূল্য যতখানি, ইতিহাস মূল্যও ততখানি।"

দেশ: "অগ্নিঝরা বিদ্রোহের কাহিনী সুপরিকল্পিতভাবে এবং সুপ্রচুর নিষ্ঠা সহকারে লিপিবদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি ঐ বিদ্রোহের অন্যতম নেতা, শ্রীযুক্ত অনন্ত সিংহ।......লেখকের সরস ও প্রাণবান লেখনীস্পর্শে এই গ্রন্থদ্বয় যে কোন সৃষ্টিমূলক রচনার মতই প্রাণস্পর্শী।.....এ জাতীয় গ্রন্থের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা যতটা ব্যক্তিগত তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে জাতিগত।"

প্রকাশক: সেন এণ্ড কোং, শিবালয়, বরোদা এভিনিউ, গড়িয়া, ২৪-পরগণা; ফোন: ৪৬-৫৮৭০

প্রাপ্তিস্থান: সকল বিশিষ্ট পুস্তকালয়।

অনেক বেড়ে গেল। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত হোল—জীবিত বা মৃত যেভাবেই হোক সূর্য সেনকে চাই-ই—যে ধরিয়ে দিতে পারবে বৃটিশ সরকার তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে। কেবল এই নয়, গ্রামে গ্রামে ঢোল পিটিয়ে এই পুরস্কারের কথা প্রচারিত হোল। সূর্য সেনের ফটো সমেত সরকারী ঘোষণার প্রচারপত্রে বড় বড় গ্রাম, বাজার, রাস্তা, কোর্ট-কাছারী, রেল-স্টেশন, প্রভৃতি ছেয়ে গেল। এইরূপ ঘোষণাপত্রের প্রচারে জনসাধারণ খুবই আতঙ্কিত বোধ করতে লাগলো। কারণ, এই প্রলোভনের কাছে শেষ পর্যন্ত হয়ত কেউ আত্মবিক্রয় করতেও পারে। তাছাড়া সরকার অমানুষিক কঠোর দমন-নীতি চালিয়ে বিপ্লবীদের সমর্থকদের বহুবার হুঁশিয়ার করে দিয়েছে—যদি ফেরারী বিপ্লবীদের কেউ আশ্রয় দেয় তবে তাদের আর পরিত্রাণের কোন পথ থাকবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বহু সমর্থক ভিটে ছাড়া হয়ে হাজতবাসী হয়েছেন। কিন্তু সরকারের এইরূপ কঠোর দমন-নীতি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও মাস্টারদা সব সময়েই নতুন নতুন সমর্থক ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল লাভে সক্ষম হয়েছেন।

ভয়-ভাবনা ছেড়ে নিজের জীবন তুচ্ছ করে কত দরদী পরিবার যে মাস্টারদাদের আশ্রয় দিয়েছেন তার সীমা নেই। বড় বড় অক্ষরে সংবাদপত্রে নাম প্রকাশিত হওয়ার কোন কল্পনাই এইসব অগণিত দরদী সমর্থকদের মনে স্থান পায় নি। সেই সব মহৎ অনামী বিপ্লবীদের স্বার্থত্যাগ, সাহস ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের একনিষ্ঠ অবদানের কথা জানাও সম্ভব নয়। আমি তাঁদের সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি খুব সামান্য হলেও তা' এখানে প্রকাশ করা আমার একান্ত কর্তব্য বলেই মনে করছি। আমাদের নিজেদের ভেতর বিভিন্ন আশ্রয়স্থলগুলির বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৩ সাল থেকে আমাদের সাথী অর্ধেন্দু দস্ত ও তার পিতা ভারত দস্ত তাঁদের বাড়িটি বিপ্লবীদের ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণভাবেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাথী অর্ধেন্দু দস্ত সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমি "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" পুস্তকে লিখেছি। যুব-বিদ্রোহের পূর্বে জেল হতে এসে এই অর্ধেন্দু দস্তের সঙ্গেই আমি প্রথম সংযোগ স্থাপন করেছিলাম। অর্ধেন্দু দস্ত বিপ্লবী সাথী তারকেশ্বর দস্তিদারের বন্ধু ও সহপাঠী। ১৯২৪—২৮ সালে, আমরা জেলে থাকাকালীন তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দুর ওপরেই সংগঠন পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল। অর্ধেন্দু দস্তের হেফাজতেই আমাদের চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবী দলের অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষিত ছিল। স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাকালে একবার গোপনে অর্ধেন্দুর সঙ্গে তার বাড়িতেও আমি যাই। বোয়ালখালি থানার "বিদুগ্রামে" অর্ধেন্দুর পিতা ভারত দস্তের বাড়ি। ফেরারী অবস্থায় মাস্টারদা এই বাড়িটির নামকরণ করেছিলেন—"কেবিন।" মাস্টারদা এই "কেবিন" শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করেছিলেন।

আমাদের অপর একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল পটিয়া থানার "হাবিলাশ" দ্বীপের অন্তর্গত। সাথীদের কাছে এই আশ্রয়স্থলটি "Amiable Lodge" নামে পরিচিত। এই বাড়িটির মালিক রমণী চৌধুরী। তিনি বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে সরকার তাঁর বাড়িটি ভেঙে চুরমার করে ও তাঁকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। এই বাড়িটি ছিল পুলিশ থানার খুবই সন্নিকটে। থানার নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগে রাইফেলের গুলীতে আহত শান্তি চক্রবর্তীকে সেই বাড়িতেই রাখা এবং তাকে সেখানে সেবা-শুশ্রূষায় সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

হাবিলাশ দ্বীপের আর একটি বাড়িও মাস্টারদাদের নিরাপদ আস্তানা হিসেবে ব্যবহৃত হোত। মাস্টারদা সেই বাড়ির নাম দিয়েছিলেন—"Safety Shelter." এখানেও তিনি আত্মগোপন করে থাকতেন। পুলিশ থানা পটিয়ার অন্তর্গত "গৈরলা" গ্রামের শান্তি ঘোষের বাড়িও ফেরারী বিপ্লবী ফৌজের আশ্রয়স্থল ছিল। এই আস্তানাটির নাম দেওয়া হয়—"Happy Lodge" (বাড়ির সামনে কোন Name-plate-এ যে এইরূপ নাম লেখা থাকতো তা' নয়। মাস্টারদারা নিজেদের ভেতর এইরূপ নাম ব্যবহার করতেন)। এই 'Happy Lodge" আস্তানাতেই বোমায় ব্যবহৃত পিকরিক অ্যাসিড তৈরি করা হোত;

পুলিশ-স্টেশন পটিয়ার "ধলঘাট" গ্রামে "মাতাজীর আশ্রম" নাম দিয়ে আর একটি বাড়িও মাস্টারদারা আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করতেন। এই বাড়িটি ছিল সাবিত্রী মাসীমার। এখানেই পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের যুদ্ধে ক্যাপ্টেন ক্যেমারন, নির্মলদা ও অপূর্ব সেনের মৃত্যু হয় এবং মাস্টারদা ও প্রীতিলতা চতুর্দিকের পুলিশবেষ্টনী ভেদ করে উধাও হন এবং বোয়ালখালি পুলিশ স্টেশনের "জ্যৈষ্ঠপুরা" গ্রামের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন। এই বাড়িটির নামকরণ হয়—"কুটির"। একই আশ্রয়স্থলে বেশিদিন ফেরারী জীবন অতিবাহিত করা কোন সময়েই সুবিধাজনক নয়। কাজেই মাস্টারদাদেরও থাকবার জায়গা বদলের প্রয়োজন দেখা দিত একই গৃহে হয়ত বার বার মাস্টারদাদের ফিরে আসতে হয়েছে, কিন্তু একসঙ্গে একটানা বহুদিন এক স্থানে থাকা তাঁরা সমীচীন মনে করেন নি। আমাদের দরদী সমর্থকদের মধ্যে একজনের বাড়ি ছিল আনোয়ারা থানার "পরৈকোড়া" গ্রামে। গৃহস্বামীর নাম ছিল রমণী চক্রবর্তী। এই বাড়িটির নাম দেওয়া হয়েছিল—"কপালকুণ্ডলা।" কেন, কিসের জন্য বা কি ভেবে এইরূপ নামকরণ হোত এবং কেই বা প্রথম এইসব নাম দিতেন ও তারপর থেকে কেমন করে সেই নামগুলিই দলের সদস্যদের মধ্যে প্রচলিত হোত তার সবিশেষ বিবরণ আজ আর আমার মনে নেই। একটি বাড়ির নাম যেমন "কপালকুণ্ডলা" দেওয়া হয়েছিল তেমনি আবার "কালী মা" বলেও তাঁরা আর একটি আশ্রয়স্থলের নাম দিয়েছিলেন। শেষোক্ত আশ্রয়স্থলটির কর্ত্রী ছিলেন ক্ষীরোদবালা বিশ্বাস। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে অত্যন্ত 'কঠিন' ও 'ভয়ঙ্করা' মনে হোত, কিন্তু তাঁর স্নেহ-মমতা ও আতিথেয়তার তুলনা ছিল না। প্রথম দৃষ্টিতে সকলে তাঁকে ভয় পেত বলেই হয়ত এই বাড়িটির "কালী মা" নামে অভিহিত হয়। এইরূপ বহু বাড়ি মাস্টারদারা ব্যবহার করতে পেরেছেন। সেই সব দরদী বন্ধুরা নিজেদের জীবন বিপন্ন জেনেও বিপ্লবীদের সর্বতোভাবে কেবল যে সাহায্যই করেছিলেন তা নয়, এ

মৃত আকাঙ্ক্ষার সহযাত্রী

মমতাজ সরকার

তখন তার দিকে তাকাতে পারি না
কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হলে আলুথালু চুলের অরণ্য
নিস্তরঙ্গ দীঘির কিনারে ভেঙে গেলে অশান্ত শরীর
রাজহাঁসের গ্রীবা তার, নত মুখ
ছায়া জলে দীঘির বিষাদে
    যেন,—কতকাল স্তব্ধবাক তন্দ্র তট নিঃস্রোত নদীটি
    কতকাল পড়ে আছে জ্বরতপ্ত বেহুঁস প্রান্তর
তখন তার দিকে তাকান যায় না

আমি তার মৃত আকাঙ্ক্ষাকে কাঁধে তুলে
শ্মশানের দিকে এগোই

পথের দু'পাশে তার-ই আকাঙ্ক্ষার হলুদ পাতারা ঝরে পড়ে
পদভারে মর্মরিত মৃত শোক পত্রের মঞ্জীল
উত্থিত ঊর্ধ্বে রিক্ত শাখায় অশ্রান্ত পাখির বিলাপ
মাতাল হাওয়ারা টলে পড়ে পথে

আমি তার মৃত আকাঙ্ক্ষাকে চিতায় তুলে দি
......তারপর
অনেকদিন পরে, যখন
প্রথম বর্ষা নামে প্রান্তরে,
রিক্ত শাখা শিহরিত, শীর্ষে জলে সবুজ শিখায়
বৃষ্টির টাপুর টুপুর দীঘির কাজলে, প্রাঙ্গণে
হুল্লোড়ে মত্ত মুখর শিশুরা......
তখন, তোমরা
নতুন আকাঙ্ক্ষাগুলো তার বুকে তুলে দাও, তার
আলুথালু বিধ্বস্ত চুলে বিনুনী বেঁধে দাও
ফুলে, ফুলে পল্লবে
সে তখন ঊর্ধ্বমুখ, দৃপ্তগ্রীবা রাজহংসী
চোখে তার প্রশান্তির ঢেউ
সেদিন তোমরা এই পথের স্পর্ধিত পথিক
......আজ
আমি তার মৃত আকাঙ্ক্ষার সহযাত্রী মথিত প্রেমেরা

ছাড়াও এমন এমন অবস্থারও সম্মুখীন হয়েছেন যাতে পাড়াপ্রতিবেশীদের থেকে পরিত্রাণ পাওয়াও তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

একেই তো চতুর্দিকে বিপদ লেগেই আছে, তার ওপরেও আবার নতুন বিপদ এসে জুটলো। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী বীরেন দে মাস্টারদাদের দ্বারা সংগৃহীত একটি বাড়িতে ফেরারী জীবন অতিবাহিত করছিল। তার সঙ্গে দেখা করতে ও অস্ত্র শিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য মাঝে মাঝে নতুন সদস্যেরা এই বাড়িতে আসতো। প্রাথমিক অস্ত্র শিক্ষাকালে একজন সদস্য একটি দুর্ঘটনা ঘটায়—অসাবধানতাবশে রিভলভারটি হঠাৎ "ফায়ার" হয়ে যায় এবং বীরেন দে রিভলভারের গুলীতে দারুণভাবে আহত হয়। বীরেন দের জঙ্ঘার অস্থি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা তখন কোন-মতেই সম্ভব হয় নি। ফলে ক্ষতস্থানটি সেপটিক হয়ে তিন দিনের দিন বীরেন দের মৃত্যু হয়। বিপ্লবী শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর মৃতদেহ যেমন কাটলীর সমুদ্রতটে সমাহিত করা হয়েছিল ঠিক তেমনি বীরেন দের মৃতদেহও চট্টগ্রামের কোন এক নির্জন স্থানে সমাধিস্থ হোল। অসাবধানতাবশে আমাদের মধ্যে আরও একজনকে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, তার নাম—সুকুমার কানুনগো। তার মৃতদেহও অনুরূপভাবেই কোন এক নির্জন স্থানে সমাধিস্থ করা হয়।

এখন "স্যানাটোরিয়াম" নামক আশ্রয়স্থলের ছোট্ট একটি ঘটনার কথা বলি। এই আশ্রয়স্থলের গৃহস্বামী মহেন্দ্র বিশ্বাস—বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। মহেন্দ্রবাবুর দুটি ছেলে —দুটিকেই তিনি মাস্টারদার নেতৃত্বে স্বাধীনতার যুদ্ধে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর উদ্ভট কল্পনা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার কোন তুলনা ছিল না। মাস্টারদাকে চিরকাল আশ্রয় দেবার গৌরবের অধিকারী তিনি হবেন—এই ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা। উৎসাহভরে তিনি মাস্টারদা ও অন্যান্য বন্ধুদের বলতেন, মাস্টারদার ঘর থেকে একটা সুড়ঙ্গ কেটে তিনি সেই সুড়ঙ্গের অপর একটি মুখ বাইরের নিরাপদ রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে যাবেন এবং এইরূপ ব্যবস্থা করতে পারলে মাস্টারদাকে ধরা পুলিশের পক্ষে কঠিন হবে। তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার সুযোগ ও সুবিধা আমরা দিতে পারি নি। সেইরূপ সুবিধা যদি তাঁকে দেওয়া যেত তবে কে জানে হয়ত বা তাঁরই ব্যবস্থানু-যায়ী পুলিশবেষ্টনী ভেদ করে মাস্টারদা শেষ বারেও নিষ্কৃতি পেতেন। বোয়ালখালি থানার "কাদুরখিল" গ্রামে এই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি। এখানে কেবল মাস্টারদাই যে আত্মগোপন করে থাকতেন তা' নয়, অন্যান্য ফেরারী বিপ্লবী বন্ধুরাও সেখানে আশ্রয় নিতেন। মহেন্দ্রবাবুর দুই ছেলে —এক ছেলের নাম সুশীল বিশ্বাস, আরেকটির নাম আমার আজ আর মনে নেই। এই বাড়িতেই একদিন রাত্রে অতর্কিতে পুলিশ হানা দেয়। শান্তি সেন (বর্তমান ইতিহাসের অধ্যাপক), ধীরেন দাস ও যুব-বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী বিনোদ দত্ত সেইদিন রাত্রে সেই বাড়িতে উপস্থিত ছিল। পুলিশের এই অতর্কিত আক্রমণ ব্যর্থ করে বিনোদ দত্ত ও ধীরেন দাস পলায়নে সমর্থ হয়। দুই পক্ষেই গুলী চলে। পুলিশের গুলী বিনোদ ও ধীরেনকে স্পর্শ করে নি—অন্ধকারে তারা মিলিয়ে গিয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে শান্তি সেন পুলিশের হাতে বন্দী হয়। সেই সঙ্গে বন্দী হয়েছিলেন আমাদের দরদী বন্ধু গৃহস্বামী মহেন্দ্র বিশ্বাস ও তাঁর দুই ছেলে। পুলিশী বিক্রমে মহেন্দ্রবাবুর গৃহটি ধূলিসাৎ হয়ে গেল ও বিচারে তাঁর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হোল। চট্টগ্রাম জেলে জেল-শাসনের প্রতিবাদে মহেন্দ্রবাবু অনশনে মৃত্যুবরণ করলেন। বিপ্লবীরা কিভাবে এই মহান আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ইতিহাস-বিদেরা কিভাবে এই মহান বিপ্লবী চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ন করবেন, তা' আমার জানা নেই। তাঁর বিপ্লবী নিষ্ঠার প্রতি অন্তরের অসীম শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

আইন ও শৃঙ্খলা : পুলিশের ভূমিকা—

কয়েকটি অভিমত

সাগর বিশ্বাস

বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে বিতর্কিত রাজনৈতিক প্রশ্ন 'আইন ও শৃঙ্খলা : পুলিশের ভূমিকা' এই পর্যায়ে আমরা এ পর্যন্ত পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী সমেত ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনেতা প্রমুখ সমাজের বিভিন্ন স্তরের কিছু কিছু মানুষের অভিমত পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছি। বিভিন্ন মহল থেকে আমাদের এই প্রচেষ্টাকে 'সময়োপযোগী' বলে প্রশংসা করা হয়েছে। কোন কোন মহল থেকে সরকারের শিক্ষানীতির পরিপ্রেক্ষিতে এমনি করে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষানুরাগীদের চিন্তার প্রতিফলন দেখানোর আবেদনও এসেছে। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের পর শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একাদশ শ্রেণীর ব্যবস্থাকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করবার কথা ঘোষণা করবার সংগে সংগে বিধানসভার কিছু শিক্ষক সদস্যদের সামনে আমরা এই প্রশ্নটি রেখেছিলাম ('নির্বাচনের পর' পর্যায়ের রচনাগুলি স্মরণীয়)। বলা বাহুল্য, সেই সময় দ্বাদশ শ্রেণীর সপক্ষে (এমন কি একাদশ শ্রেণীর পক্ষেও) কেউই অভিমত রাখেন নি। প্রায় সকলেরই অভিমত ছিল এক্সপেরিমেন্টের মোহাধিক্য পরিত্যাগ করে পুরনো রাস্তায় ফিরে যাবার। এই পর্যায়ে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাদরদীদের অভিমত তুলে ধরবার আবেদন আপাতত বিবেচনাধীন রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আইন-শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে আমরা আরো কয়েকটি স্তরের অভিমত জানাবার চেষ্টা করব। কিন্তু যেহেতু অনির্দিষ্টকাল এই সাক্ষাৎকার চলতে পারে না, সেহেতু যথাসম্ভব সত্বর এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানবার চেষ্টা করব। প্রসঙ্গত, অত্যন্ত পরিতাপের সংগে লিখতে হচ্ছে যে, কখনও কখনও এই সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে বিশ্রী বাধার সম্মুখীন হতে হয়। বাধার সম্মুখীন হওয়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কোন অভিনব ব্যাপার নয়। তথাপি সে বাধা এমন দিক থেকে আসে, যে তা কংগ্রেসী আমলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সম্প্রতি রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্যের সংগে দেখা করতে গিয়ে মনে হয়েছিল আমি যেন কোন অপরাধীর তালিকায় পড়ে গেছি। স্বভাবতই মন্ত্রীমশায়ের বহুমূল্য সময় নষ্ট করে তাঁকে বিব্রত করবার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। তথাপি মন্ত্রী-সন্দর্শনে যাবার আগে যাঁদের কাছ থেকে পাসপোর্ট নিতে হয়, সেই 'একান্ত বিশ্বস্ত সহকারী' (পি· এ, সি· এ·, পি· এস, ইত্যাদি)-দের 'সাবধানতা'র বহর থেকে বিস্মিত ও শংকিত হয়েছিলাম। কি প্রয়োজন? আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে তথ্যমন্ত্রী কি বলবেন? এটা তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যাপার', 'জ্যোতি বসুর কাছেই যান না' ইত্যাদি নানা প্রশ্নে শ্রীমুখার্জী এবং শ্রীদাশগুপ্ত যখন আমাকে জেরা করে চলেছেন, তখন আমার মনে হয়েছিল আমি কোন আদালতে উকীলের সম্মুখীন হই নি তো! আর একজন মন্ত্রীর পি· এ· (যাঁদের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অফিসেও এই উদ্দেশ্যে দুদিন গেছি) কয়েকবার স্বভাবসুলভ 'ব্যস্ততার জন্য ভুলে যাবার' পর শ্রীচক্রবর্তী মহাকরণে বসে বললেন, 'কুড়ি তারিখে বেলা বারোটায় আপনার সংগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম।' বলে বেয়ারাকে দিয়ে মন্ত্রীমশায়ের ঘর থেকে তাঁর ডায়েরী আনিয়ে কি যেন খস্‌খস্‌ করে লিখে রাখলেন। কুড়ি তারিখে যথাসময় উপস্থিত হয়ে দেখলাম,—শ্রীচক্রবর্তী নেই, মন্ত্রীমশাইও নিজের ঘরে নেই এবং সবথেকে বিস্ময়ের ব্যাপার তাঁর ডায়েরীতে আমার সংগে তাঁর সাক্ষাৎকারের কোন ইংগিত পর্যন্ত নেই।

এ সব কথা লিখবার হয়তো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু লিখলাম এইজন্যই যে একটি আমলাতান্ত্রিক প্রভাব যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীদের ঘরে কেমন করে অনুপ্রবেশ করেছে, এগুলি তারই নিদর্শন। এই আবহাওয়া সম্পর্কে মন্ত্রীদের সাবধান থাকবার প্রয়োজন আছে। এই প্রাইভেট সেক্রেটারী বা পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টরা যে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের বিরত কিংবা প্রবঞ্চনা করলেন, তাঁরা যদি এগুলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নির্দেশ বলে ধরে নেন, তাহলে কি তাঁরা খুব অন্যায় করবেন? যুক্তফ্রন্ট সরকারের কোন মন্ত্রীদপ্তর থেকে এ ধরণের ব্যবহার কি অপ্রত্যাশিত ছিল না? যা হোক, এ ব্যাপারে মন্ত্রীমহাশয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আলোচ্য বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করছি।

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সংগে দেখা করলাম। ঘরে ঢুকতেই স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার বলুন। আমি বসতে বসতে বললাম, আলোচনার বিষয়বস্তুটা নিশ্চয়ই শ্রীবসুর (সেক্রেটারী) কাছে শুনেছেন। উনি বললেন, না, আপনার কাছেই শুনবো। আমি ব্যাপারটা বলতেই শ্রীমুখার্জী বললেন, আমাকে আর এ সব আইন-শৃঙ্খলার মধ্যে টানছেন কেন? হোম-মিনিস্টার স্বয়ং ইতিমধ্যে এ সব ব্যাপারে তো কিছু কিছু বিবৃতি দিয়েছেন।

আপনার যদি উল্লেখযোগ্য কোন পরিকল্পনা থাকে তাহলে আমরা আপনাকে অর্থ সাহায্য করব

আপনার যদি কোন সুদৃঢ় পরিকল্পনা, আবশ্যকীয় কারিগরী জ্ঞান এবং সাফল্যজনকভাবে কাজ চালাবার দক্ষতা থাকে, তাহলে আমাদের কাছে আসুন। আমরা আপনাকে আপনার নিজস্ব ক্ষুদ্র শিল্পের পত্তন করতে সাহায্য করবো।

সকলের সেবায় ষ্টেট ব্যাঙ্ক

—আমি তো আপনার কথা শুনতে এসেছি।

—বলুন।

—গত ৩১শে জুলাই তারিখে বিধানসভায় পুলিশী অভিযানের পর একথা প্রমাণের অবকাশ নেই যে, পুলিশের একাংশ যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি আনুগত্যহীন শুধু নয়, শত্রু-মনোভাবাপন্ন। এই অবস্থার মোকাবিলা করতে আপনার এবং আপনার সরকারের দৃষ্টিভংগি কি?

—এ ত' একটা অতি পুরনো ব্যাপার। সেদিনের ঘটনার ওপর রীতিমত এনকোয়ারী হচ্ছে—গুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। এরপর সরকারের দৃষ্টিভংগি তো ক্রমশই দেখতে পাবেন।

—সামগ্রিকভাবে স মা জ বি রো ধী ক্রিয়াকলাপ কিছুটা বেড়ে গেছে বলে অনেকের ধারণা। খুন, রাহাজানি, ছিনতাই ত' চলছেই। রেলওয়েতে ট্রাক্‌শনওয়ার থেফ্‌ট, ওয়াগন ব্রেকিং, আসবাবপত্র চুরি, বাইরে থেকে ইট-পাথর ছোড়ার ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পুলিশ এ সবের প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই করতে পারে নি। এই পরিস্থিতিতে জনতার সাহায্যে কোন প্রতিরোধবাহিনী বা অনুরূপ কিছু গঠন করবার কথা ভাবছেন কি?

—কারো ধারণা সম্পর্কে মন্তব্য করা চলে না। কিন্তু এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, কতকগুলি এ ধরণের ঘটনা এই ক'মাসের মধ্যে ঘটেছে এবং তার মধ্যে কতকগুলির প্রতিবিধান পুলিশ করেছে। তবে জনতার প্রতিরোধবাহিনী সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট সরকার এক্ষুণি কিছু ভাবছে না।

—কিছু কিছু রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্র যে সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে নারী নিগ্রহ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত অপপ্রচার চালিয়েছিল—এ কথা আজ বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। সম্প্রতি দিল্লীতে রবীন্দ্র রঙ্গালয়ের ঘটনার পর কিন্তু তারা নীরব। এইসব উদ্দেশ্যমূলক হীন প্রচার বন্ধ করবার জন্য সরকার কি কিছু ভেবেছেন?

—প্রেসগুলো সরকার নিয়ে নিতে পারলে হয়ত এর সুরাহা হয়। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়।

—রাজ্যে আইন-শৃংখলার চরম অবনতি হয়েছে বলে কোন কোন মহল দাবি করছেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

—এই দাবি ঠিক নয়।

* * *

শ্রীসুরেশ ব্যানার্জী,

সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র ব্লক।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে যখন ছাত্র ব্লকের অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন নির্ধারিত সময় হতে পাঁচ মিনিট বাকী ছিল। অফিসটি তালাবন্ধ দেখে আমার বিস্ময় কাটবার আগেই পাশ থেকে একজন এসে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আপনি সাগরবাবু নিশ্চয়ই। আপনার জন্যই আমি দাঁড়িয়ে আছি। সুরেশদার কাছে চাবি থাকায় ঘর খুলতে পারি নি। ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে।' কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওঁদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুরেশ ব্যানার্জীকে দেখা গেল। ঘর খোলা হলো। স্বল্প-পরিসর একটি ঘরের মধ্যে একটি টেবিল, কয়েকটি বেঞ্চি, কিছু কাগজপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম। কিন্তু দেখতে দেখতে সেই ঘরখানি মানুষে ভরে গেল। দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু হলো। আলোচনার মাধ্যমে বুঝলাম একটা সংযুক্ত বামপন্থী ছাত্র-ফ্রন্ট ওঁদের কাম্য ছিল। কিন্তু ওঁদের সে প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি। বর্তমান আইন-শৃংখলা প্রসংগে ওঁদের বক্তব্য হলো—

ধনবাদী সমাজে যা আইনসংগত তা ন্যায়সংগত না-ও হতে পারে। ন্যায়সংগত কিছু করতে গেলে বে-আইনী কিছু করতে হতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে শৃংখলা হয়ে দাঁড়ায় শৃংখল। এই শৃংখল যাঁরা ভাঙতে চান ছাত্র-ব্লক তাঁদের পেছনে আছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার মৌলিক আইন বদলাতে কিংবা সৃষ্টি করতে পারে না। তাই আপেক্ষিক কথায় এর দায়িত্বও সরকারের ওপর পড়ে না

সম্প্রতি যুক্তফ্রন্টের একটি বিশেষ দল পুলিশকে তাঁদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে বলে যে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে সে সম্পর্কে শ্রীব্যানার্জী বললেন।

পার্টির মূলকেন্দ্র থেকে পুলিশের প্রতি তাঁদের দলীয় স্বার্থে কাজ করবার কোন নির্দেশ থাকতে পারে না বলেই বিশ্বাস করি। আসলে পুলিশ আজ নিজের স্বার্থেই সি· পি· এম··-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতে চাইছে। সংগে সংগে অবশ্য এটাও বিশ্বাস করি যে, পার্টির লোকাল ইউনিটগুলি অনেক সময় পুলিশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁদের প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা করে থাকে। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত পার্টির সতর্ক হবার আশু প্রয়োজন। অন্যথায় সর্বহারার আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে।

—সাধারণভাবে সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ দমনে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করেন কি?

—বৈজ্ঞানিক দর্শন বলে পুলিশ, পুলিশমন্ত্রীর দেউলিয়া রাজনৈতিক দল এবং সমাজবিরোধী—এই ত্রি-শক্তি ধনবাদী সমাজব্যবস্থায় পরস্পরের পরিপূরক। ধনবাদী সমাজব্যবস্থায় পুলিশ দিয়ে সমাজবিরোধীর সংখ্যা হ্রাস করা যাবে না—এটা একটা বিজ্ঞান। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার সর্বদলীয় ঐক্যের ভিত্তিতে পুলিশের সংগে সমাজবিরোধীদের অলিখিত *adjustment* নষ্ট করার জন্য সাময়িকভাবে এগিয়ে আসতে পারে। জনগণের সঠিক রাজনৈতিক চেতনায় প্রতিরোধবাহিনীও গঠিত হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও একটা পারস্পরিক ঐক্যের প্রয়োজন আছে। কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের শক্তি বাড়ানোর কংগ্রেসী কায়দায় এ প্রচেষ্টাগুলি সার্থক হতে পারে না।

—অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এ দেশে ছাত্রসমাজ তথা জনগণের সংগে পুলিশের সম্পর্ক কখনই স্বাভাবিক ছিল না। সম্প্রতি বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেই সম্পর্কের কোন উন্নতি হয়েছে কি?

—ছাত্র বা জনগণের বিপুলতর অংশ মৌলিক চেতনার দিক থেকে বরাবরই বামপন্থী। পুলিশ যতদিন দক্ষিণপন্থীর অস্ত্র ছিল ততদিন সে বামপন্থীকে আঘাত করেছে। আজ সামগ্রিকভাবে সরকার বামপন্থী বলে এবং পুলিশ এই সরকারের অস্ত্র বলে বামপন্থীর ওপর আঘাত হানতে পারছে না। এই কারণে বামপন্থী ছাত্র এবং জনগণের সংগে পুলিশের বিরোধ কম। তবু দুর্গাপুরের ঘটনা ঘটে। এর কারণ পুলিশ এখনো অস্ত্রই আছে—সংগ্রামী রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে সে অনেক পেছনে। পুলিশকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলবার দায়িত্ব সরকারের পুলিশ বিভাগের।

[চলবে]

মহানায়ক বাদশা খাঁ

রেণু ঘোষ

জীব-জগৎ জন্ম-জীবনযাপন-মৃত্যুর অনাদি অনন্ত নিয়মে বাঁধা। মানুষ তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু মানুষ হল জীবশ্রেষ্ঠ। তার ওপর আর কিছু নেই। মানুষ সৃষ্টিকর্তা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সে সৃষ্টি করে নি ঠিকই, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আয়ত্ত করার দুরূহ সাধনায় ব্রতী মানুষ ক্রমবর্ধমান সাফল্যের গৌরবে মহীয়ান হয়ে উঠছে। মানুষ সৃষ্টি করেছে তার কলা, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সমাজ, সভ্যতা আর সংস্কৃতি, এমন কি সর্বশক্তিমান ভগবানের রূপ-কল্পও মানুষেরই অবদান।

লেজ কাটা বানর যেদিন দুই পায়ে ভর দিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে শিখেছে, সেদিন সে অর্জন করেছে মনুষ্যত্ব। তারপর হাজার হাজার বছরের দৈহিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে তার মস্তিষ্কের সীমাহীন এবং বহুমুখী প্রতিভা। মানুষ জীবনের সর্বব্যাপী সার্থকতার পথে অবিরাম এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তার অগ্রগতির পথ কোনদিনই নিষ্কণ্টক এবং কুসুমাস্তীর্ণ নয়। একদিকে বিরূপ প্রকৃতি সহস্র বাধা সৃষ্টি করে তার অগ্রগতি ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে। অপর দিকে মানুষ নিজেও সহস্র কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা এবং অমানুষিক নিয়মকানুনের প্রবর্তন করে নিজের পথে কাঁটা দেবার প্রয়াস পেয়েছে। সেই সব স্তব্ধগতি অচলায়তন ভেঙে যাঁরা মানুষকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছেন, তাঁরাই ইতিহাসের নায়ক হিসাবে মহামানবের মর্যাদা পেয়েছেন। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেই মহামানবের জয়ধ্বনি করে বলেছেন ঃ

ঐ মহামানব আসে।

* * *

জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

মানুষের মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা মহামানবদের নির্দেশিত পথে যাঁরা পৃথিবীর মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্রত উদযাপন করেন, তাঁরাও মানবসমাজে বরণীয় এবং স্মরণীয় জননায়কের মর্যাদা লাভ করেন। মানুষের হৃদয়ে তাঁরা চিরকাল শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে মহৎ প্রচেষ্টায় প্রেরণা দিয়ে থাকেন।

সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত বাদশা খাঁ তেমনি একজন অবিসম্বাদী এবং অবিস্মরণীয় জননায়ক। শৌর্যবীর্য ত্যাগ আত্মদান, সহনশীলতা এবং মহৎ আদর্শের প্রতি অটুট আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক খাঁ আবদুল গফুর খাঁ শুধু ভারত উপমহাদেশেই নয়, সারা দুনিয়ায় মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম সন্তান খাঁ আবদুর গফুর খাঁ স্বার্থপর এবং বিপথগামী রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজদের চক্রান্তে সুদূর আফগানিস্থানে নির্বাসিতের জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু নির্বাসন তাঁর সংগ্রামী জীবনে ছেদ টানতে পারে নি। জীবনের সায়াহ্নেও তিনি বিপুল বিক্রমে আদর্শের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁর সে সংগ্রামের সাফল্য যে অনিবার্য, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ তাঁর সংগ্রাম শাশ্বত এবং অবিনশ্বর সত্য এবং ন্যায়ের জন্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের এক সম্ভ্রান্ত পাঠান পরিবারে গফুর খাঁর জন্ম। সীমান্তের উপজাতিরা বন্দুক চালনায় সিদ্ধহস্ত। নিজেদের মধ্যে উপজাতীয় কলহে বন্দুক ধরতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না এবং কারও বশ্যতা তারা স্বীকার করতে রাজী নয়। বৃটিশ শাসকরা এই উপজাতিগুলোকে বলপ্রয়োগের দ্বারা দমনে রাখবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে তারা বিশেষ সফল হয় নি। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সেখানে সশস্ত্র বিদ্রোহের পতাকা সেখানে বরাবরই উড্ডীন ছিল। সেই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য পাকিস্তানী শাসকরাও এখনও সেখানে নিয়মিত বোমাবর্ষণ এবং বন্দুকবাজী করে থাকেন। এই সশস্ত্র বিদ্রোহের আবহাওয়ায় জন্মলাভ করে গফুর খাঁর অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ সত্যিই এক অভাবনীয় ঘটনা। অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান গফুর খাঁ উপযুক্ত বিদ্যাভ্যাসের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ইংরাজরা তাঁর প্রতিভার সন্ধান পেয়ে তাঁকে হাত করবার জন্য সেনাবাহিনীর অফিসার পদ দেবার প্রস্তাব করেন। প্রথম যৌবনে কিংস কমিশন লাভ করে অফিসার পদ পেলে বাকী জীবনটা যে তাঁর পরম আরাম আয়েসে কাটত তাতে কোন সন্দেহ নেই। যথাসময়ে তিনি নিশ্চয়ই পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি হতেন এবং আয়ুব খাঁর মত রাষ্ট্রের কর্ণধার হওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হত না। কিন্তু গফুর খাঁ ইতিহাসের ধারা পাল্টাবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই ইংরাজের লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে তাঁর এক মুহূর্তও দেরি লাগে নি। তার বদলে তিনি গ্রহণ করলেন বিদ্যাদানের ব্রত। নিজ গ্রাম উটমনজাইতে তিনি একটি স্কুল খুললেন এবং গ্রামে গ্রামে ঐক্যের বাণী প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন।

গ্রামে গ্রামে পাঠানদের বড় বড় জমায়েতে গফুর খাঁর ভাষণ নবজীবনের দিগন্ত উদ্ভাসিত করতে লাগল। পারস্পরিক ভেদাভেদ এবং দ্বন্দ্ব-কলহ ভুলে তারা গফুর খাঁর পেছনে এসে ভিড় করতে শুরু করল। প্রজাদের মধ্যে এইসব জাগরণ দেখে জায়গীরদাররা খুশি হলেন না। তাঁরা গফুর খাঁর বিরুদ্ধে নানা চক্রান্তে লিপ্ত হলেন, কিন্তু অনুপ্রাণিত গফুর খাঁর পথে কাঁটা দিতে পারলেন না। প্রকাশ্য সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হবার পর তিনি মসজিদে মসজিদে সভা করতে লাগলেন। ধর্মান্ধতার উস্কানী না দিয়ে তিনি সকলকে মিলনমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। সরলপ্রাণ পাঠানরা তাঁকে রাজার আসনে বসিয়ে বাদশা খাঁ (পাঠানদের রাজা) পদবীতে ভূষিত করল। তিনি নিরস্ত্র পাঠানদের নিয়ে খোদাইখিদমতগার (মানুষের সেবক) বাহিনী গড়ে তুললেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ পরিচালিত 'অল হিলাল' পত্রিকা সীমান্তের গ্রামে গ্রামে গিয়ে পৌঁছুতে লাগল।

১৯০৯ সালের শাসন সংস্কার আইন

সীমান্ত প্রদেশে প্রয়োগ করা হয় নি। ১৯১৯ সালের মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইনে ভারতে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ সেই সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। এমন কি পৌর নির্বাচনেও পাঠানদের ভোট ছিল না। তাতে সীমান্তবাসীর মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। বাদশা খাঁ মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে খিলাফৎ আন্দোলন এবং রাউলাট আইন বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সমস্ত দেশ যখন চরম ধিক্কারে মুখর হয়ে উঠল, তখন হরতাল, ধর্মঘট এবং সভা-সমিতি করে বাদশা খাঁ-ও তাতে অংশ গ্রহণ করলেন। পাঞ্জাবে দমননীতির নিন্দা করে জনগণের কাছে তিনি সেই দমননীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানালেন। ফলে তাঁর স্থান হল ইংরাজের কারাগারে। যে কড়া দিয়ে তাঁর হাত এবং যে বেড়ি দিয়ে তাঁর পা বাঁধা হয়েছিল, তা গফুর খাঁর হাত-পায়ের তুলনায় এত ছোট ছিল যে, তাতে তাঁর হাত-পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। কিন্তু তিনি হাসি-

গান্ধীর সঙ্গে বাদশা খাঁ (ফটোঃ ১৯৩৮)

মুখেই সে বেদনা সহ্য করেছিলেন। বৃটিশ ফৌজ গফ্ফুর খাঁর গ্রাম ঘেরাও করে গ্রামবাসীদের দলবদ্ধভাবে বেত্রাঘাত করে। এমন কি শিশুরাও তার হাত থেকে রেহাই পায় না গ্রামের ওপর ত্রিশ হাজার টাকা পিটুনি কর বসানো হয় এবং মাঠের ফসল সব ধ্বংস করা হয়।

মুক্তিলাভের পর গফ্ফুর খাঁ কাবুলে গিয়ে রাজা আমানুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফিরে এসে আবার নেমে পড়েন জনসেবার কাজে। ইংরাজরা তাঁর যে স্কুলগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল, সেগুলো আবার খোলা হয়।

বাদশা খাঁর খোদাইখিদমতগাররা লাল শার্ট পরিধান করত। কিন্তু তাদের হাতে কোন অস্ত্র থাকত না—এমন কি লাঠিও না। ইংরাজ সরকার এই সুশৃংখল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীটিকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। চীফ কমিশনার বাদশা খাঁর পিতা বেহ্‌রাম খাঁকে ডেকে পাঠিয়ে ছেলেকে শায়েস্তা করার হুকুম জারী করেন। পিতাও বাধ্য হয়ে ছেলেকে রাজনীতি থেকে সরে আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তখন বাদশা খাঁ জবাব দেন, "অমন অনুরোধ করবেন না, বাবা। আপনি কি আমার নামাজ পড়তে নিষেধ করতে পারেন?" একথার পর পিতা পুত্রকে আশীর্বাদ না করে পারেন নি।

পুলিশের নিয়মিত উৎপীড়নে লালকোর্তা বাহিনী ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। তাদের সংখ্যা পাঁচ হাজার থেকে আশি হাজারে গিয়ে পৌঁছলো।

লাহোর কংগ্রেসে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাশ হয়। বাদশা খাঁর নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশের নানা জায়গায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। কিসা খানি বাজারের কাছে পুলিশ বিনা প্ররোচনায় সত্যাগ্রহীদের ওপর বে-পরোয়া গুলীচালনা করে। তাতে ৩০০ জন নিহত এবং হাজার হাজার লোক আহত হন। আহতদের সেবা-শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা হয় নি। একটি গাড়ওয়ালী প্লেটুনকে পুনরায় গুলী চালনার আদেশ দিলে তারা সেই আদেশ অগ্রাহ্য করে। ফলে তারাও সামরিক আদালতে কঠোর শাস্তি লাভ করে।

মীরাটে জামিয়াত-উল-উলেমার এক সভায় বক্তৃতাকালে বাদশা খাঁ বলেন, "পাঠানরা কংগ্রেসেই থাকবে বলে স্থির করেছে। হয় ইংরাজরা এই দেশ ছেড়ে চলে যাবে, না হয় তাদের সঙ্গে লড়াই করে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই দু'য়ের মাঝামাঝি কোন জায়গা নেই।" তখন লালকোর্তার সংখ্যা লক্ষাধিক। বড়লাট গান্ধীজীর কাছে এক চিঠি লিখে জানান যে, লালকোর্তারা হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। বাদশা খাঁ সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীকে জানিয়ে দেন, কোন নিরপেক্ষ লোক দিয়ে এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয় করা হোক। সেকথা শুনে বড়লাট নীরব হয়ে যান। তখন গান্ধীজী বাদশা খাঁকে লেখেন, "আপনি সৎ পথেই আছেন। কাজকর্ম যেমন চলছে চলুক।"

১৯৩১ সালে বাদশা খাঁ আবার গ্রেপ্তার হন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খাঁ সাহেব গ্রেপ্তার হন সপরিবারে। বাদশা খাঁকে হাজারীবাগ জেলে আটক রাখা হয়। নির্জন কক্ষে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেটেছে তাঁর কারাজীবন। ছয় বছর তাঁকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে।" দেশে ফিরে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে দেশসেবায় নেমে পড়লেন। জওহরলাল নেহরু তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সফরে যান। সেখানে বাদশা খাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন, "এই প্রদেশে এমন একজন লোক জন্মেছেন, যাঁর জন্য সারা ভারত গর্ববোধ করে। তিনি তাঁর প্রদেশবাসীর মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করে সমস্ত আবহাওয়াই বদলে দিয়েছেন। তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। সীমান্তের অধিবাসীরা সারা ভারতের গৌরব। অদূর ভবিষ্যতে ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করবে, তখন স্বাধীন ভারতে সীমান্তবাসীর গৌরবপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।"

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, কিন্তু পাঠানরা আজও পরাধীন, কারণ বাদশা খাঁ যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বিশাল ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে। ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখবার জন্য সীমান্ত গান্ধী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি। কংগ্রেস নেতারা যখন দেশ বিভাগ মেনে নিলেন, তখন ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে বাদশা খাঁ মহাত্মা গান্ধীকে বলেছিলেন, "মহাত্মাজী, আপনি আমাদের নেকড়ের মুখে ছেড়ে দিলেন?" উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন, "আপনাদের প্রতি অবিচার হলে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করব। একথা সত্য যে, আমি অহিংসায় বিশ্বাসী। কিন্তু পাঠানদের সম্মান এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভে সহায়তা করবার জন্য গভর্নমেন্ট যে-কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।"

যে ধর্মপ্রাণ জননায়ক সারাজীবন উদ্‌যাপন করেছেন, সেই মানুষটি পাকিস্তান হবার পর উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী পাক রাষ্ট্রনায়কদের কাছে যে চরম শত্রু বলে গণ্য হবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাই পাকিস্তানে এই মহানায়ক চরম শারীরিক ও মানসিক উৎপীড়নের শিকার হলেন। পাঠানরা স্বায়ত্তশাসনাধিকার পেলেন না বরং তাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বৃটিশ আমলের চেয়ে বেড়ে গেল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ২২ বছরের মধ্যে ১৫ বছরই বাদশা খাঁর কেটেছে জেলখানায়। ১৯৬২ সালে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়ে। সারা দুনিয়ায় তাঁর মুক্তির জন্য আন্দোলন হয়। আয়ুব গভর্নমেন্ট তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং তখন তিনি চিকিৎসার জন্য লণ্ডনে চলে যান। সেখান থেকে বাদশা খাঁ আয়ুব খাঁকে লেখেন, "ইংরাজরা যেমন বলপ্রয়োগের দ্বারা ভারতে তাদের প্রভুত্ব কায়েম রাখতে পারে নি, তেমনি ইংরাজদের মত পাকিস্তানও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

পাকিস্তানের অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদের মত আয়ুব খাঁ ইতিমধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়েছেন। ইয়াহিয়া খাঁ-র পতনও আসন্ন। ইতিহাস তাদের ক্ষমা করে নি এবং করবেও না। কিন্তু বাদশা খাঁ মানুষের ইতিহাসে চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ চিরকাল মহান পথিকৃৎ হিসাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ধন্য হবে।

মাইকেলের ভাষায়ঃ

সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।

আবদুল গফ্ফুর খাঁ মানুষের মনের মন্দিরে নিত্য সেবা লাভ করে ধন্য হয়েছেন। সেটাই আজ ভারতবাসীর বড় সান্ত্বনা।

বর্ধমান সাধারণ নাট্য গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে "ভারতী" অপেরা কর্তৃক ৫ই কার্তিক "মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন" (মাস্টারদা)

"তরুণ" অপেরা কর্তৃক ৬ই কার্তিক "লেনিন" ৭ই কার্তিক "রাজা রামমোহন"

স্থান ঃ বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল চিলড্রেন পার্ক

(রাণী সায়ার উত্তর)

সীমান্ত গান্ধী

প্রদ্যোৎ কুমার রায়

১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে দ্বিতীয়বার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এই আন্দোলনের অংশীদার। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও পিছিয়ে ছিল না। সীমান্ত প্রদেশ পাঠানমুলুক হিসেবেই বেশি পরিচিত। এই প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ সব সম্প্রদায়ের লোকই ছিল, যেমন আজও আছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। তবে মুসলমানদের সংখ্যাই ছিল বেশি। অসহযোগ আন্দোলনের মূলনীতি অহিংসা। সত্যাগ্রহীদের সম্পূর্ণ অহিংস হতে হবে। রাজরোষ নেমে আসবে—অত্যাচার চলবে; তবু, হিংসার আশ্রয় নেওয়া চলবে না।

পাঠানদের জাতীয় চরিত্রে অহিংসার স্থান নেই বললেই চলে। এরা স্বাধীনচেতা। অপমান এরা সইতে পারে না। প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রবৃত্তি প্রবল। কথায় কথায় মানুষ খুন করতে এদের দ্বিধা নেই এতটুকু। এক উপজাতি অন্য উপজাতির সঙ্গে লড়ছে। বংশ যদি এর ফলে লোপ পেয়ে যায়, পরোয়া নেই। হত্যার বদলে হত্যা চাই। রক্তের বদলে রক্ত। অথচ মূলত সীমান্তের অধিবাসীরা সৎ, ধর্মপরায়ণ, বিশ্বাসী। পরস্পরবিরোধী গুণাবলীর অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে পাখতুনদের চরিত্রে। এদের মধ্যে অহিংসা নীতির প্রসার কি আদৌ সম্ভব?

১৯৩০ সালের পেশোয়ার। ২৩শে এপ্রিল। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের কারাগারে রুদ্ধ। সভা চলছে। ইংরেজ সৈন্যের এক বাহিনী এসে হাজির। জনতাকে সভা ভাঙতে তারা বলল না। তাদের হুঁশিয়ার করে দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। চলল গুলী। সভায় ছিল নারী, শিশু, বৃদ্ধ সর্বস্তরের মানুষ। মৃত ও আহতদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সত্যাগ্রহীরা। আবার আসছে নতুন দল সভা করতে। গুলী চলল আবার, আবার মৃত্যু। এমনি ঘটনা চলল বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এতটুকু চাঞ্চল্য নেই সত্যাগ্রহীদের মধ্যে। সত্যের প্রতীক সত্যাগ্রহী। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার স্পৃহা নেই। নেই ভয় মৃত্যুর। এ এক অপূর্ব বীরত্বের কাহিনী। অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কোন্ যাদুকর তাঁর যাদুস্পর্শে সমগ্র পাঠান জাতির চরিত্রকে এমনি করে পাল্টে দিল। হিংসা যাদের প্রতি রক্তকণিকায় বিদ্যমান—অহিংসাকে এমনি করে তাঁরা গ্রহণ করল কেমন করে? গান্ধীজী বলেছিলেন, প্রকৃত বীর না হলে কখনও ক্ষমা করা যায় না।

যে কথা বলছিলাম। পাঠানদের যিনি এই নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন—তিনি হলেন ভারতের প্রিয় নেতা সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান। গফফর খান গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর নেতাকে অনুসরণ করতে দ্বিধা করেন নি।

গফফর খান পিতা-মাতার পঞ্চম সন্তান। জন্ম ১৮৯০ সালে। পিতার মান-সম্মান আছে যথেষ্ট। খানদানী ঘরের ছেলে। বড় ভাই খান সাহেব বিলেতে গিয়েছেন ডাক্তারী পড়তে। পিতা চাইলেন, গফফর যাক বিলেতে ইঞ্জিনীয়ার হতে। জাহাজের টিকিট কাটা হল। সকলের কাছ থেকে এবার বিদায় নেবার পালা। গফফর মা'র কাছে হাজির হলেন। মায়ের চোখে জল। সবাই বিদেশ চলে গেলে তিনি ঘরে থাকেন কেমন করে? মায়ের ব্যথা সইতে পারলেন না গফফর। বিলেতে যাওয়া হল না। দেশে কত কাজ করার আছে। পাঠানদের মধ্যে অশিক্ষা, কুসংস্কার, হিংসা হানাহানি বিদ্যমান। ধর্মপ্রাণ এই মানুষটি মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করতে চাইলেন।

তৎকালীন অসহনীয় অবস্থা থেকে পাঠানদের মুক্ত করাই তাঁর ব্রত হল। একমাত্র শিক্ষাই মানুষকে আমূল পরিবর্তন করতে পারে। শিক্ষিত মানুষ গড়ে তুলতে পারলে সমাজও হবে সুন্দর। কাজেই জাতীয় বিদ্যালয় তৈরির কাজে মন দিলেন তিনি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে, তা না হলে তাদের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখের খবর পাওয়া সম্ভব নয়। পাঠান উপজাতীয়দের মধ্যে বসবাস করার সংকল্প গ্রহণ করলেন গফফর খান।

১৯১৯ সাল থেকেই কংগ্রেসের প্রতিটি আন্দোলনে বাদশা খান অংশগ্রহণ করেছিলেন। দেশপ্রেমের পুরস্কার হিসাবে বহুবার ইংরেজদের কারাগারে নিপীড়িত হয়েছেন। আবার গান্ধীজীর সঙ্গে বরদৌলি, ওয়ার্ধা ও সেবাগ্রামে মহানন্দে দিন কাটিয়েছেন। কোরাণ তাঁর কাছে যেমন প্রিয়, তেমনি প্রিয় গীতা বা গ্রন্থসাহেব। খাঁটি মুসলমান সকল ধর্মের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা জানাবে—এই তাঁর বিশ্বাস।

মুসলিম লীগ মূলত ইংরেজদের সৃষ্টি। ইংরেজদের স্বার্থরক্ষার তাগিদেই পাকিস্তান সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। ধর্মান্ধ মুসলমানদের এই প্রতিষ্ঠানটি ইংরেজ-বিরোধিতার পরিবর্তে ইংরেজ-তোষণকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল। লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বের বুলি আওড়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলল সর্বত্র। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতীয় সমাজ-জীবনে দুষ্ট ক্ষতের মত বেশ কিছুকাল ধরেই আছে। লীগের কার্যকলাপে এ-বিষ ছড়িয়ে পড়তে লাগল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। ১৯৪৬ সালের কথা বলি। অনেকেই এ সময়কার ঘটনার বীভৎসতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে কী বীভৎস রূপ নিয়েছিল—সে কথা স্মরণ করলে গা শিউরে ওঠে। গান্ধীজী ছুটলেন নোয়াখালিতে। গান্ধীজীর আহ্বানে বাদশা খান এলেন বিহারের দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে। দেশের করুণ চিত্র দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তবুও তিনি তাঁর আদর্শে অটল। দ্বিজাতিতত্ত্বে তাঁর বিশ্বাস নেই। মুখোপরে তিনি বললেন,

"I believe, India is inhabited by one single nation—Hindus and Muslims included."

সীমান্ত প্রদেশেও লীগ ধর্মবিদ্বেষ জাগিয়ে তুলল। বাদশা চললেন সীমান্তে। তাঁর দল, অর্থাৎ 'খোদাইখিদমদ্গার' দল নিজেদের আদর্শে অটল থেকে হিন্দু ও

শেষ পাখতুনদের জীবন মান রক্ষা করতে এগিয়ে এল। সাম্প্রদায়িক বিষ শ্বাসরোধকারী অবস্থার সৃষ্টি করেছিল এই সময়ে। হতাশার অন্ধকার নেমে আসছে সৎ নাগরিকদের মনে। বাদশা খান বলছেন, 'হতাশা নয়'। তাঁর বক্তব্য:

"Why do you despair of Hindu-Muslim Unity. No true effort is vain. Look at the fields over there. The grain sown therein has to remain in the earth for a certain time, then it sprouts and in due time yields hundreds of its kind. The same is the case with every effort in good cause."

দলের কর্মীরা উৎসাহিত হল। তারা ছুটল প্রদেশের সর্বত্র অধিবাসীদের শুভবুদ্ধি ফিরিয়ে আনতে।

দেশ বিভাগের পর্যায়ে কংগ্রেসের ইতিহাস এক সীমাহীন স্বার্থপরতার ইতিবৃত্ত ছাড়া কিছুই নয়। সর্দারজী, রাজাজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ভাবতে পারেন নি। স্বার্থপরতা তাঁদের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। এ কথা বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বিশ্বাস না করে পারেন না। এই শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপকে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। প্রতারণার মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় এল সাধারণের মঙ্গল তাদের লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু এ-সত্য কথাটিকে প্রতারকদের অপূর্ব প্রচার কৌশল দেশবাসীকে সহজে বুঝতে দেয় নি। কিন্তু আজ অনেকেই এ-কথা বুঝেছেন। এর ফলে ভারতীয় জীবনের সর্বস্তরে এক অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অস্থিরতা কখনও সামাজিক কখনও রাজনৈতিক, কখনও বা অর্থনৈতিক। অন্তরের বেশ কয়েকটি রাজ্য কংগ্রেসের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কাহিনী বড়ই করুণ। স্বার্থান্বেষী নেতাদের চক্রান্তের ফলে একটি সৎ ও মহৎ জাতি অন্ধকারের মধ্যে দিনযাপন করছে। তবে আশার কথা এই, পাখতুনদের নেতা সীমান্ত গান্ধী হতাশায় এখনও ভেঙে পড়েন নি। দীর্ঘকাল পাকিস্তানের স্বৈরাচারে নির্যাতিত হয়েও সত্যাশ্রয়ী এই মানুষটি জীবন সায়াহ্নে স্বাধীন পাখতুনিস্তান গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

দেশ বিভাগ কংগ্রেস মেনে নেবে না, এটাই ছিল কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি। শেষ পর্যায়ে এ-নীতি আর রইল না।

দেশ বিভাগ করার অনুমতি দিল। কিন্তু মুশকিল হল সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে। এখানে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দল ক্ষমতা পেয়েছিল। পঞ্চাশটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল বত্রিশটি। ডক্টর খানসাহেব সীমান্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কংগ্রেস শাসিত মুসলমান অধ্যুষিত এই প্রদেশটিকে সরাসরি পাকিস্তানের কবলে ঠেলে দেওয়া সহজসাধ্য ছিল না। দুষ্টের কৌশলের অভাব হয় না। অতএব রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত জানার ব্যবস্থা হল আবার অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোনটির সঙ্গে যুক্ত হবে তা ঠিক করাই এই রেফারেন্ডামের উদ্দেশ্য। এখানে স্মরণ করতে হবে যে, ১৯৪৬ সালেই ঐ প্রদেশবাসী কংগ্রেসকেই শাসনক্ষমতায় বসিয়েছিল। দুঃখের বিষয় কংগ্রেসী কর্তারা দেশ বিভাগ ও রেফারেন্ডাম—এই দুই-ই মেনে নিলেন বাদশা খানকে কিছু না জানিয়ে। পিয়ারীলাল (যাঁকে নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী বলে সকলেই মানবেন) ১৯৬৫ সালে কাবুলে সীমান্ত গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাদশা খানের অনেক কথা হয়েছে। দেশ বিভাগ ও রেফারেন্ডাম সম্পর্কে সীমান্ত গান্ধীর বক্তব্য:

Neither the issue of Partition nor of referendum in the N. W. F. P. was discussed with us. When refrendum was mentioned to us, we strongly objected to it as the 1946 election had specifically been held on this very issue, viz., the issue of India—vs—Pakistan. Gandhiji supported us and opposed partition. But

Sardar Patel and Rajaji pressed for it. Speaking to me with great excitement the Sardar said that we were worrying over nothing etc."

গফফর খান হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন নেতাদের এই বিস্ময়কর আচরণে। তিনি বলছেন ঃ

"We were stunned to find that the decision on both the issues had already been taken by the Congress High Command. After Working Committee's meetting, I said to Gandhiji, 'you have thrown us to the wolves'."

মৌলানা আজাদ 'India wins freedom' নামক গ্রন্থে এই সভার বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন, "He (Abdul Gaffar Khan) was completely stunned and for several minutes he could not utter a word."

ইংরেজ ও লীগ নেতাদের চেষ্টায় সীমান্ত প্রদেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। যেমন করেই হোক লীগ নেতাদের বাসনা চরিতার্থ করতেই হবে। খান ভ্রাতৃদ্বয় রেফারেন্ডাম মেনে নিলেন না। তাঁদের দল ভোটদানে বিরত রইলেন। সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল। দেশ বিভাগ মেনে নেওয়া ও পাঠানদের পাকিস্তানের কবলে নিক্ষেপ করা চরম প্রতারণা ছাড়া আর কি? আজাদ লিখছেন ঃ

"Gaffar Khan repeatedly said that the Frontier would regard it as an act of treachery."

এই সময়ে পণ্ডিত জহরলালের ভূমিকাও কম বিস্ময়কর ছিল না। বাদশা খান বলছেন ঃ

"Pandit Nehru never had any talk with us on the Frontier issue. How could he? He was a man with a conscience."

আর আজাদ? বাদশা খানকে ঐদিনের সভায় শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে মৌলানা আজাদ উপদেশ দিলেন ঃ

"You (Gaffar Khan) should now join the Muslim League."

চমৎকার! এরই নাম কমরেড! এরই নাম সহযোদ্ধা! বাদশা খান সম্পর্কে মৌলানা আজাদ তাঁর উল্লেখিত গ্রন্থে এমন দু-চারটি কথা বলেছেন যা না বললেই

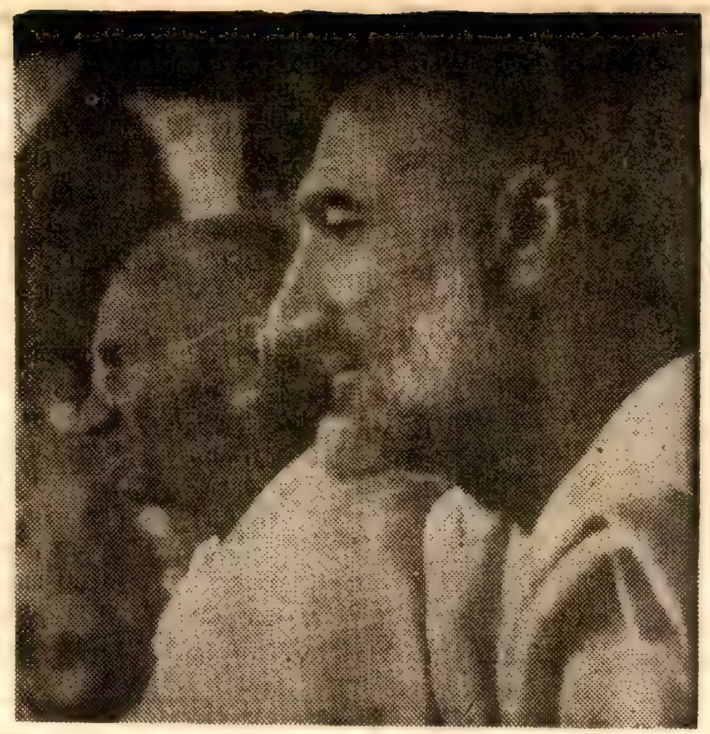

গান্ধীজীর সঙ্গে সীমান্ত গান্ধী গফফর খান

গফফর খান পাকিস্তানেই রইলেন। পাকিস্তানের জেলে দীর্ঘ ১৫ বছর কাটাতে হল তাঁকে। স্বাধীনতার যোদ্ধা বৃদ্ধ এই মানুষটির প্রতি সামান্যতম সহানুভূতিও পাকিস্তান সরকার দেখালেন না। অশেষ অত্যাচার সহ্য করে যখন মৃত্যু প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে তখন (১৯৬৪ সনে) পাক সরকার তাঁকে ইংলণ্ডে যাবার অনুমতি দিলেন। ইংলণ্ডের আবহাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় তিনি কাবুলে চলে আসেন।

কংগ্রেস বাদশা খান ও তাঁর সহযোদ্ধাদের প্রতি সুবিচার করেন নি। কিন্তু এখন এ-প্রশ্ন দ্বিতীয়বার ভেবে দেখা উচিত কি না প্রতিটি ভারতবাসীরই তা চিন্তা করা সম্ভবত নৈতিক কর্তব্য। পাঠান জাতি স্বাধীনতাপ্রিয়। স্বাধীনতার জন্য তারা অনেক দিয়েছে। ভারতের মাটি থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে পাঠানদের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সাধারণ ভারতবাসী আজও ভুলতে পারে না তাদের সহযোদ্ধা ঐ সীমান্তের বন্ধুদের। ভারত সরকার এ সম্বন্ধে কী ভাবছেন—তা আমরা জানি না। গান্ধীজীর শতবার্ষিকী উৎসবে সীমান্ত গান্ধী আসছেন—এ খবর জনগণ পেয়েছেন। জনসাধারণ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে পাখতুনদের বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানতে পারলে উপকৃত হবেন বলে মনে করি। বাদশা খান বলেছেন পাকিস্তানের মধ্যে থেকে পাখতুনরা কখনই

স্বতন্ত্র পাখতুনিস্তানের দাবি উঠেছে।

সীমান্ত গান্ধী ভারতে আসবেন কি না—এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, ভারত সরকার যদি পাখতুনদের দাবিকে কার্যে রূপায়িত করতে সাহায্য করেন তবেই তাঁর ভারতে যাওয়ার প্রশ্ন উঠবে। তিনি আরও বিশ্বাস করেন যে, আফগান ও ভারত সরকার তাঁদের সাহায্য করলে পাখতুনিস্তান প্রশ্নের সমাধান মিলবে। তাঁর মতে ভারতবর্ষের এ বিষয়ে নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকা উচিত।

বাদশা খানের ভারত সফরকে উপলক্ষ করে কিছু কিছু লোকের মধ্যে আশ্চর্য রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। তাঁকে কয়েক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে সংবাদ বেরিয়েছে। বণিকসুলভ মনোভাব থেকেই মনে হয় এ ধরণের চিন্তার উদ্ভব। পাখতুনদের প্রতি যদি যথার্থ কিছু দায়িত্ব বা কর্তব্য থেকে থাকে এবং অতীতের সহযোদ্ধা হিসাবে যদি আজও আমরা তাঁদের ভালবেসে থাকি, তবে সমগ্র বিষয়টিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন আছে। রাজনীতিতে ভাবাবেগের স্থান নেই কোথাও। যদি কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলি পাখতুনদের দাবির মধ্যে যথার্থ যুক্তি খুঁজে পান এবং এ-বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই কার্যকরী কিছু করা সম্ভব। সীমান্ত গান্ধী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষপাতী। তাঁর চিন্তার এই বিশেষ

শহর কলকাতা

ডায়মণ্ডহারবার রোড

নামেই ডায়মণ্ড'। কাদাভর্তি বেহালার রাস্তা দেখলেই বুঝতে পারবেন, কোথায় আছি। আমি একটি ঘটনা জানি। অবশ্য অনেকদিন আগেকার। বাঁকুড়া জেলায় পায়রাশোল নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামটির খ্যাতি ছিল কাদার জন্যে (এখনো সেই খ্যাতি আছে কি না জানি না)। এক রাতে ঐ গ্রামের একটি বাড়িতে চোর চুরি করার চেষ্টা করে। এমন সময় গৃহস্থ জেগে ওঠে। চোর চোর আওয়াজ তুলতেই হৈ-হল্লা সুরু হয়ে যায়। ধরা পড়ার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত চোরটি দিগ্‌-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকে। গ্রামবাসীদের একজন মুরুব্বিগোছের লোক জিজ্ঞেস করেন : 'চোরটা গেল কোথায়।' উত্তর এলো : উত্তর দিকে। মুরুব্বি বললেন : 'বেশ, এবার তবে বাড়ি চলো। কাল আবার দেখা যাবে।'

পরদিন গিয়ে এক কোমরের ওপর কাদা থেকে বাঁশের সাহায্যে তুলে আনা হয় চোরটিকে।

বেহালার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার রোডের অবস্থা তেমন বোধহয় আর হবার উপায় নেই।

ইতিমধ্যে শহর কলকাতায় প্রকাশিত দুটো লেখা নিশ্চয়ই পাঠকরা স্মরণ করতে পারেন। প্রথম লেখাটির বিষয়-বস্তু ছিল, চাঁদে যাওয়া যতো সহজ, বেহালায় যাওয়া ততো সহজ নয়। দ্বিতীয় লেখায় জনৈক পত্রদাতা লিখেছিলেন, ট্রামে-বাসে জরিমানার কথা। বোধহয়, তিনি বেহালাকে স্মরণ করেই লিখেছিলেন।

যা হোক, তারপর দক্ষিণাঞ্চলের শহরতলীর লোকেরা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে গত ২২শে সেপ্টেম্বর '৬৯ স্টেটবাস, ট্রাম, প্রাইভেট বাসের চলাচল সাময়িকভাবে (?) বন্ধ করে রেখেছিল।

অবশ্য আমরা মনে করি, প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হয়েছিল প্রাইভেট বাসগুলি। বাকি ট্রাম ও স্টেটবাস তো অচল অবস্থায় রয়েছে—সরকারী কর্মচারীদের একমাত্র কাজ—কাজের (ডিউটির) সময় প্রাত্যাহিক ছুটি উপভোগ করা। কারণ ৩৫নং ট্রাম তো প্রায় বারো ঘণ্টাই আউটলাইনড্‌। আর স্টেটবাস (৩এ, ১২ডি ৭, ১৪) বেহালার ভাগ্যে অতি অল্পসংখ্যক নির্ধারিত। তাই একটা বাসের পর অপর বাসটা কখন পাওয়া যাবে, বা তাতে ওঠা যাবে কি না, তা বোধহয় স্বয়ং ভগবানও জানেন না। অথচ অন্য রুটে যাওয়া-আসার অভিজ্ঞতা যাঁর আছে, তিনি ভালোভাবেই জানেন, এমন দুরবস্থা ও অবহেলা আর কোথাও নেই। সি, এস, টি, সি, কী ভিত্তিতে কোন্ অঞ্চলে কতো সংখ্যক গাড়ি নির্দিষ্ট করেন, তা শহরদর্শীর মতো পরিসংখ্যানে অপক্ক ব্যক্তির জানতে ভারি ইচ্ছে হয়।

বেহালার রাস্তা খারাপ তো বটেই, চওড়াও খুব কম। তবে প্রাইভেট বাসগুলি নিয়মিতভাবে, সময় ধরে, কাজ চালায় কি করে? ১২সি'র রুটটি প্রাইভেট বাসওলাদের হাতে যাওয়ার পর যাত্রীরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। বলা বাহুল্য, শহরদর্শী ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থাপনার পক্ষপাতী নন। কিন্তু সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা ভেবে মানবতার খাতিরে তাঁকে প্রাইভেট বাসের বৃদ্ধির জন্যও আবেদন করতে হয়। উপরি-উক্ত সরকারী বাসের রুটগুলিতে সি, এস, টি, সি-র কর্তৃপক্ষ কি গাড়ি বাড়াবেন, না তাঁরা এ সব রুটের দৈনিক স্টেটবাসযাত্রী হবেন? আমার ধারণা, তাতে তাঁদের কালঘাম ছুটে যাবে। বরং তাঁরা বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন এবং আমাদের জানান বিভিন্ন রুটে লোক-লস্কর, আপিস-কারখানা, পরিবর্ত গাড়ির শূন্যতার জন্য পৃথক পৃথক রুটে কতো স্টেটবাস প্রত্যহ গড়ে কলকাতায় চলে। তাছাড়া জানা দরকার, কতক্ষণ পর পর গাড়ি চলে এবং কোন্ রুটে প্রত্যহ কত সংখ্যক যাত্রী স্টেটবাসে আসা-যাওয়া করেন।

এর পর বিবেচনা করা হবে : প্রাইভেট বাস বৃদ্ধির কথা এবং যে রুটে স্টেটবাস দেওয়া সম্ভব নয়, সে রুটে প্রাইভেট বাস দিতেই হবে।

চক্রবেড় রেল এখনো বহুদূর, মনোরেল পরিকল্পনা শিকের ঝুলছে এবং ভূগর্ভস্থ রেল হয়তো চিরকাল গর্ভস্থই থাকবে; এমতাবস্থায় বাস রুটগুলির উন্নতিবিধানের জন্য করণীয় কি কিছু নেই? মাস-মাইনে সরকারী টাকাটা হাতে পেলে কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের (তাদের ইউনিয়নেরও) একমাত্র কাজ বোধহয় বহাল তবিয়তে চুপচাপ থাকা। কিন্তু জনতা ক্ষেপলে তখন কি আর রক্ষে থাকবে? সে যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সুপ্রীম কোর্ট।

এই দেখুন না, জনতার ইচ্ছে থাকলে কি না হয়। ২২শে সেপ্টেম্বর ডায়মণ্ডহারবার, কাশীপুর অঞ্চলে বিক্ষোভ হলো রাস্তা মেরামতের ব্যাপারে। বেহালায় প্রচণ্ড বিক্ষোভে সামাল দিতে হল মন্ত্রীদের। এলেন পরিবহনমন্ত্রী রসুল সাহেব, পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজের সময় যারা ফাঁকি দেয়, তখন তারা পলায়মান। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীদের পালিয়ে যাবার পথ কোথায়। রাস্তাই যে তাঁদের একমাত্র রাস্তা।

রসুল সাহেব স্টেটবাস বাড়াবার কথা দিলেন জনতাকে। জনতার কাছে এক চিঠিতে সুবোধবাবু জানালেন, ছত্রিশ লক্ষ টাকা বেহালাস্থ ডায়মণ্ড-হারবার রোডের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এবার আপনাদের পালা। মনঃস্থির করেছি, বেহালার ট্রাম ডিপোর কাছে রাস্তা বিশ ফুট চওড়া করা হবে। কিন্তু রাস্তা বাড়াতে গিয়ে আইনের জালেও তো জড়িয়ে পড়তে হবে। এখন রাস্তাকেই তো অনেকে বাড়ি করেছেন; এর পর রাস্তার পাশে ব্যক্তিগত মালিকানায় যাঁর বাড়ি আছে, তিনি কি ছেড়ে কথা বলবেন? সেখানে অনেক হৈ-হুজ্জত।

সুবোধবাবুকে নাকি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তিনি রাস্তা চওড়া করুন, রাস্তা মেরামত করুন, কোনো বাধাই আসবে না।

আমরা শুধু ভাবছি, বাস্তুঘুঘুরা কি অত সহজে ছেড়ে দেবে? তাহলে তো বহু আগেই রাস্তা তৈরি হয়ে যেত।

পরীক্ষার ফলাফল

পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মওকা সুরু হয় এক শ্রেণীর হকারের। তারা রাইটার্স বিল্ডিংস ও য়ুনিভার্সিটির গেটের কাছেই ডবল দামে বিক্রি করে পরীক্ষার ফলাফলের পুস্তিকা। বি, এ; বি, এসসি-র পার্ট টু পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার পর ঐ একই ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল আর অবস্থাচক্রে অনেককে ডবল দামে কিনতেও হোল। অবশ্য উল্টো ঘটনাও ঘটে। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার ফলাফল বের হয়েছে তখন। দেখলাম, হাজরার ফুটপাথে একজন হকার (অনেকেই তাঁকে নিয়মিত দেখে থাকবেন) পাশ-ফেলের খবর জানিয়ে দিচ্ছেন। তবে সর্ত এই, পাশ করলে চার আনা, ফেল করলে কিছুই না।

পরে জেনেছিলাম তাঁর রোজগার কম হয় নি, অন্তত বই বিক্রির চেয়ে বেশিই লাভ হয়েছিল। আর পাশকরা ছেলেদের কেউ কেউ পাশকরার আনন্দে দু'চার আনা বেশিই দিয়ে দিয়েছিল।

এমন হকার কজন হয়?

—শহরদর্শী

গান্ধী-স্মারক

শশাঙ্ক শেখর সান্যাল

নাথুরামের পিস্তলে মহান জীবনের বেদনাদায়ক অবসান। তার বহু আগে থেকেই মহাত্মার মাহাত্ম্য স্তাবকদের হাতে বন্দী। ছাঁচে ঢালা গান্ধীবাদ আসল মানুষকে বাদ দিয়ে অসার আঁকড়ে আছে। শতবার্ষিকী স্মারকমণ্ডে সেই নিছক মানুষটাকে অবতার মুক্ত করে মহাকালের আকাশের নিচে মুক্তি প্রতিষ্ঠা দিতে হবে।

হ্যাঁ, সেই মানুষটা। দেবতা নয়, অতিমানব নয়, এমন কি দুরন্ত সাঙ্কেতিক মহাত্মাও নয়। সেই অতি সাধারণ কাছের মানুষ; উলঙ্গ জাতির নগ্নসারথি। কাল-প্রবাহ ও প্রয়োজনের তাগিদ তাকে অসাধারণ ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ করেছিল—সেই যোগাযোগের যুগসৃষ্ট উপযুক্ত মানুষ।

"আত্মজীনীর" দর্পণেই দেখা যায় ষড়রিপু তাকে আর পাঁচ-দশ-হাজার-কোটি লোকের মতই কেমন করে আক্রমণ আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত এই বলিষ্ঠ মানুষটা পাঁকে পড়ে থাকে নি। মায়ের নির্দেশেই পথভ্রান্ত আবার পথ পেয়েছে।

গান্ধী নেতৃত্বে ভারতবর্ষ কি পেয়েছে: কি পেতে পারত—এসব খতিয়ান আগামী-কালের সুস্মারনবীশের নিরীক্ষণ অপেক্ষায়। দ্বিতীয় যুদ্ধের সুযোগে যদি তিনি সুভাষকে ডান পাশে টেনে নিতেন, তাহলে পরিস্থিতি কি হত এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনি পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে তাঁর পশ্চাৎসারির ক্লান্ত সেনাপতিরা দেশভাগে সম্মতি দিতে পারত কি না এসব সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন আপাতত প্রাসঙ্গিক না হতে পারে। আসমুদ্র হিমাচল নিদ্রিত জাতিকে ঘুম থেকে জাগিয়েছিলেন তিনি; আবার তাঁরই সামনে জাগ্রত দেশের বিভাগ মৃত্যু ঘটল। কেন? সে অন্য কথা।

বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় বসে দীর্ঘকাল যারা প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতার বেসাতি করেছে তারা এই লোকটার ছায়াই চেয়েছে ও পেয়েছে। তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ গভীরতা সম্ভ্রমে সাগ্রহে দেখেছে, অনুভব করেছে তারা যারা তাঁর একান্ত অনুগত বা বশংবদ ছিল না। ত্রাসপন্থীরা গান্ধীকে নেতা বলে বরণ করে নি; গান্ধীজীর কাছেও এরা আপনজন ছিল না। তবু, রণকৌশল দুইকে এক বন্ধনীতে টেনে এনেছিল। এটা গতিসঙ্গমের প্রাজ্ঞ বিনিয়োগ। সুচতুর বণিকের শৈল্পী বেণী-বিন্যাস।

অম্লানুরক্ত সুভাষকে অহিংসার সাইন-বোর্ড ঝুলান কংগ্রেসী সিংহাসনে বসান গান্ধীর ব্যক্তিগত উদারতা, বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ ও ক্ষাত্রবীর্যের কূটকুশলতার পরিচায়ক।

ত্রিপুরীতে সুভাষের কাছে সীতারামিয়ার পরাজয় নিজের মাথায় তুলে নিয়ে এবং "সুভাষ আর যাই হোক দেশের শত্রু ত' নয়" এইরূপ কার্পণ্যে কুণ্ঠায় গান্ধীজী উঁচু থেকে পিছলে নেমে এলেন।

১৯৪১-এর ৩রা জানুয়ারী। নিরুদ্দেশ পাড়ির কিছু আগে। এলগিন রোডে গান্ধী-সুভাষ পত্রাবলী দেখছি। দেখছি আমি ও মুকুন্দলাল সরকার (অধুনা মৃত)। গান্ধীজীকে লেখা সেই সময় শেষ পত্রে আমাদের দু'জনার কথাই সুভাষ লিখেছিলেন "আমার এক জোড়া বন্ধু"। দেখছি তখনই বিব্রত বৃটিশকে চরম আঘাত দেবার জন্য একপক্ষের অধীর চঞ্চলতা; অন্যদিকে সুযোগ-সন্ধির অপেক্ষায় সজাগ সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ। আরও দেখছি সেই সব পত্রের ফাঁকে ফাঁকে সুভাষের দিকে গান্ধীজীর নতুন করে ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ। আকুল মমতামাখান একখানি তারবার্তায় প্রচ্ছন্ন তিরস্কার বাণী আজও কানে বাজে, "আতসবাজি আপাতত থাক—আগে সুস্থ হও"—সুভাষ তখন সত্যিই অসুস্থ। উত্তরকালে নেতাজীর ভূমিকামঞ্চ থেকে তিনি গান্ধীজীকে যে আখ্যা দিয়েছিলেন সেই জাতির জনক ও জাতির সন্তান আবার মুখোমুখি। পুনর্মিলনের তুঙ্গ তরঙ্গের মাথায় গান্ধী আবার উঠছেন।

এর পর সুভাষ বাস্তুহারা।

আসন্ন স্বাদহীন স্বাধীনতার মুনাফা-লোভী পট্টবস্ত্রধারী কংগ্রেসী মোহান্তের দল সুভাষের চির নির্বাসন বা নিরুদ্দেশ সম্ভাবনায় নিশ্চিন্ত। বালির ঘরের নক্সা তৈরির স্বপ্নে ঠিকাদার নেতার দল বিভোর। কিন্তু নীরবে নিভৃতে বৃদ্ধের মাতৃহৃদয়ে সুভাষ প্রস্রবণ উৎসারিত হচ্ছে। এক-একটা ঘটনা কোহিমার কন্তার বেয়ে অদৃশ্য হিল্লোলে দিল্লী মুখে আসছে আর সাবাস আহ্বানে তিনি তাঁকে অভিবাদন করছেন অহিংসার পুরোহিত ব্যাকরণোত্তীর্ণ।

শ্রদ্ধেয় সত্যরঞ্জন বক্সী তখন লালকেল্লায় আটক। বাইরে থেকে আনা আজাদ হিন্দ ও অন্যান্য যুদ্ধবন্দীও আছে। তাদের কাছে গান্ধীজী সুভাষের কর্মকুশলতা ও আদর্শা-নুগত্যের কাহিনী বিবরণ শোনেন ও বলেন—সুভাষ শের কা বাচ্চা শের হ্যায়।

দিল্লী কুইনস্‌ওয়েতে আজাদ হিন্দ সর-কারের হোমরাচোমরা ব্যক্তিদের বৈঠক। কর্নেল হবিবুর রহমানের সঙ্গে মহাত্মাজীর মোলাকাতের ব্যবস্থা করেছি। কর্নেল বক্তা—মহাত্মা প্রধান শ্রোতা। কর্নেল নিপুণভাবে বিমান দুর্ঘটনা এঁকে দিলেন। নিবিড়ভাবে সবটা শুনে গান্ধীজী বললেন, "আউর কিয়া—বাতাও" কর্নেল চুপচাপ। সিংহ গর্জে উঠল। "আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না—সুভাষ মরতে পারে না"। মনে হল প্রবীণ নায়ক নিজ হাতে স্বাধীন ভারতের স্বর্ণমুকুট সুভাষের মাথায় পরিয়ে দিচ্ছেন। কি সে দীপ্তি। কি সে তৃপ্তি?

অনেক হিমালয়প্রমাণ প্রমাদ কালের রোকড়ে গান্ধীজীর হিসাবে জমা আছে। সব প্রমাদ হিমালয়ের পাথরের তলায় পড়ে অদৃশ্য হচ্ছে—হবে। মহাত্মা গান্ধী—সুভাষের ভারতের হিমালয় হয়েই থাকলেন।

অসিবাঁশীর ঐকতান

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

গ্রামবাংলার কথা

অসীম মুখোপাধ্যায়

কাদামাটির দুর্গ

ঐ তো! জলের বুকে, ঢেউয়ের দোলায় "বনের রাণী" দুলছে! আকাশ জোড়া রামধনু দেখে রাণী বুঝি আহ্লাদে আটখানা। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিকণা তার গা ধুয়ে নামছে।

"সারেং ভায়া। সিঁড়ি তুল না। আমরা এলুম বলে।"

কিন্তু আসব কোন্ পথে? পথ কি আর আছে? পথ এখানে গাস্তা। আর গাছে ...সেই কাদা। ঠাণ্ডা পেছল কাদার রাজ্য। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে, কোনওদিকেই শুকনো মাটি নেই। কেবল কাদার ফাঁদ। এ ফাঁদে পা দিলে নাকাল হতেই হবে। জামা-কাপড় তো যাবেই, দু-একটা হাড়-গোড়ও যেতে পারে। মানুষজন তাই ভীষণ হুঁশিয়ার। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলেছে। চোখজোড়া নিচের দিকে। ঠোঁট দুটোও বন্ধ। গুণে গুণে পা ফেলছে সবাই, ঠিক যেন সার্কাসের তাঁবুতে তারের ওপর হাঁটছে। দেড় মিনিটের পথ। দশ মিনিটের আগে পৌঁছবার আশা নেই! এমন যে জোয়ান মনিরুদ্দীন, সে-ও কি ভীষণ অসহায়! চলছে যা, টলছে তার বেশি! আর আমি? রেখে-ঢেকে লাভটা কি? খুলেই বলি। লজ্জার মাথা খেয়ে সেরেফ হামা-গুড়ি দিচ্ছি। এরপরে আর লঞ্চ নেই যে! সেই আবার কাল ভোরে। অতএব....।

ঘাটের কাছে আসতেই মনিরুদ্দীন বলল, "উঠুন।"

সামনে ওটা কি? লম্বা এক চিলতে তক্তা। তার গায়ে আড়াআড়ি কয়েকটা কাঠের ধাপ। ওর নাম সিঁড়ি! এত-খানি খাড়াই! ঐ বেয়ে উঠব!

"মনিরুদ্দীন ভায়া এবার ঠিক ধপাস।"

সেই কালো, বলিষ্ঠ হাতটা আবার এগিয়ে এল। ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো আবার দেখতে পেলুম। (মনিরুদ্দীন, শহরে তোমাকে খুঁজে পাই না কেন? সেখানে হাতগুলো সব কাদার মতই পেছল!)

লঞ্চের ছাদে আড্ডা জমে গেছে। হাত-পা ধুয়ে এসে তাসের প্যাকেট খুলেছে কেউ। কেউ সেখোর সাথে গাঁয়ের কথায় মেতেছে। আমি মনিরুদ্দীনের পাশে বসে কান খাড়া রাখলুম। ধান ভানতেই তো এসেছি। জল হোক আর ডাঙা হোক সেকথাটাই আসল।

"এবার জল কেমন হইয়েছে?"

"পরিপূন"

"ধান?"

"মোটামুটি।"

"আর কাদা?" এবারের প্রশ্নটা আমার।

"ভালই," পঞ্চানন ঘাড় দুলিয়ে জবাব দেয়।

"দু'নম্বর জেটির পথ ভাল হবে কবে?"

"সিণ্ডিকেট জানে।"

"পয়সা তো কম গোণে না।"

"সে আর বইলতে?"

"তবে সারায় না কেন?"

এবার সবাই চুপ। কথাটা ভাবার মতই বটে। বছর ভরে নিত্যিদিন কম মানুষের পা পড়ে না কি এই ঘাটে? তবুও পথ সেই যেমন কে তেমন! যাদের

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল

গিরিশ রচনাবলী

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমগ্র রচনা—নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, গান, স্বরলিপি, প্রবন্ধ, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে যা-কিছু পাওয়া সম্ভব সমস্তই আমরা সংগ্রহ করে চারখণ্ডে প্রকাশ করছি। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে [দাম কুড়ি টাকা] ; দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে বর্তমান বৎসরের শেষের দিকে এবং বাকি দুটি খণ্ড প্রকাশিত হবে ১৯৭০ সালের মধ্যে। উল্লেখযোগ্য গিরিশচন্দ্রের কিছু রচনা একদা বাজেয়াপ্ত ছিল এবং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল, আমরা তা বহু আয়াসে সংগ্রহ করে বিভিন্ন খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করছি। প্রথম খণ্ডের সম্পাদনা করেছেন ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য এবং এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট গিরিশচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যসাধনা আলোচনা করেছেন ডঃ ভট্টাচার্য। অন্য খণ্ডগুলিরও সম্পাদনা ও সাহিত্যসাধনা আলোচনা করবেন ডঃ ভট্টাচার্য। যাঁরা পরবর্তী খণ্ডগুলি পাওয়া সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে চান, তাঁদের নাম ঠিকানা আমাদের আপিসে পত্রদ্বারা জানাতে অনুরোধ করি, প্রকাশন-বিজ্ঞপ্তি তাঁদের পাঠান হবে।

প্রথম খণ্ডে —২১টি নাটক ও ৮টি প্রবন্ধ।
দ্বিতীয় খণ্ডে—২২টি নাটক, ২টি উপন্যাস, ৭টি গল্প, ১৬টি প্রবন্ধ ও ১টি কবিতাগ্রন্থ।
তৃতীয় খণ্ডে—২১টি নাটক, ১টি উপন্যাস, ৮টি প্রবন্ধ ও ১টি কবিতাগ্রন্থ।
চতুর্থ খণ্ডে —১৯টি নাটক, ৮টি গল্প, ২৫টি প্রবন্ধ ও ১টি কবিতাগ্রন্থ।

গিরিশ রচনাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা ও আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের তালিকার জন্য লিখুন।

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা-৯ ॥ ৩৫-৭৬৬৯

জন্যে তার হাত বাক্সে লক্ষ্মী বাঁধা,—সিণ্ডিকেট তাদের কথা ভেবেও দেখে না।

"ওরা কেবল পয়সা নিবার যম!"

"ঠিক।"

"ইবারে একটা কিছু কত্তি হবে।"

"হ্যাঁ।" সবাই বিড়ি ধরাল।

"তোমাদের ক্যানিং টাউনেরও তো একই অবস্থা!"

"হুঁ।" ঘাড় নাড়ল সবাই।

"বাজারের পথটা দেখেছ? ঘাটের পথে কাদা আছে, কিন্তু সেখানে ময়লা নেই। বাজারের অলিগলিতে বোধহয় সব রোগের বীজাণুই মিলেমিশে আছে!"

"তার চেয়ে ঢের খারাপ সিনিমার পথ!"

"ঠিক। ওদিকে তো হাঁটাই যায় না। গেছেন ওদিকে?"

"দু-একবার।"

"বুঝুন তবে। শহরের ভেতরেই এই—তো—ঘাট কেমন হবে?"

"এমন হবে কেন?"

সেইতো এমন হবে কেন? বিড়ি টানতে গিয়ে সবাই আনমনা। কেবল "বনের রাণী" আপন মনে সাঁতার কাটছে।

"আমরা বাদাবনের মানুষ! আমাদের কথা ভাবতিছি কে?"

"তা' বইলেছ ঠিক। আমরা চাষের ধান খাব। খানা-খোঁদলে হাইটব আর হেড়ো গলায় গাইব। ব্যাস! তার বেশি নয়!"

পঞ্চাননের সাথে সবাই হেসে উঠি।

"পথ-ঘাটের কথা বইলছেন? পথও ইখানে নেই, ঘাটও ইখানে নেই। ইখানে সবই পথ, সবই ঘাট। ইটা যে সুন্দরবন!"

"ইখানে সব চলে। চুরি, ডাকাতি, ক্ষিধেয় মরা, কাদায় ডোবা, বাঘের পেটে যাওয়া, সব।"

"হক কথা, হক কথা।" সবাই সায় দিল।

"কাদা ঠেলতে গিয়ে হয়রান, একটু বসে নি"

"যা দুরন্ত নদী! চোত-বোশেখে আর শ্রাবন ভাদ্দরে পাগলা হয়ে ওঠে। আমাদের পরাণটা তখন ঠিক উড়ো পাখির মত। কেবল ফলুক ফুলুক করে। এই বুঝি ওড়ে, এই বুঝি পালায়!"

"লঞ্চ বাড়াবে না?"

"কমিয়ে দিতে পারে, বাড়াবে না। তার ওপর নদী মজে আইসছে। কেবল জোয়ার-ভাটাই ভরসা। কাজেই লঞ্চ সিণ্ডিকেটের পোয়াবারো। নদীর দোহাই দে নিজের দায় লুকোচ্ছে।"

তবুও ক্যানিং, গোসাবা দুদিক থেকেই আরও কখানা লঞ্চ ছাড়া যায়।

যায় বৈকি। "তবে ছাড়ার মালিক তো আমরা না।"

সবাই ঘাড় নাড়ে।

"পার্টির বাবুদের বল। ওরা চাপ দেবে।"

"বইলেছি।"

"তারপর"

"হবে।"

"কবে?"

"সময় হোলে।"

"ও! তোমরা তা হলে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছ?"

"কি বইললেন?"

"নাঃ, কিছু না।" নিজেকে সামলে নিলুম।

হেড়ো ভাঙায় লঞ্চ থেমেছে। সেই চিলতে কাঠটা আবার সরসর করে নামল, মানে সেই সিঁড়িটা। সাবধানে ওঠা-নামা করল ক'জন মানুষ। ইঞ্জিন গর্জে উঠল আবার। একহাঁটু কাদা ভেঙে ছেলে-কোলে একটি বউ ছুটে আসছে। মুখে হাসি, চোখে উৎকণ্ঠা।

"আর হোল না! আবার কাল আইসবে।" কারা যেন সান্ত্বনা দিল। বউটির মুখে মেঘের ছায়া নেমেছে।

গোসাবায় আজ দুদিন ধরে আছি। ধনের কাছে-পিঠে এটাই বড় গঞ্জ। কিন্তু এহেন গোসাবায় চলার মত পথ একটাও নেই। বাঁধের ওপর দিয়ে সবাই আসা-যাওয়া করে। কিন্তু বর্ষায় সে বাঁধও মারাত্মক পেছল। গর্তের মধ্যে নেখ চুকিয়ে পা ফেলে সবাই। "গোষ্পদে আবগাহন" কথাটি দেখলুম নেহাৎ প্রবাদ নয়!

ঘাটের জেটিটা বেজায় নড়বড়ে। বুড়োর দাঁতের মত। গোসাবার হাইস্কুল তার ইজারা নিয়েছে,—বছরে তিনশ' টাকায়। কিন্তু লাভের অঙ্কটা এর অনেক বেশি। সামান্য একটু মেরামতে কিই বা খরচা পড়ে? তবুও হয় না কেন? স্কুল কর্তৃপক্ষ,— ঘাটওয়ালাদের মত পারের কড়ি গুণছে, ছবিটা ভাবতেও খারাপ লাগে।

এখানে আসার দিন বেশ মজা হয়েছিল। ডাঙায় উঠে ভারিক্কি চালে বললুম, "রিক্সা আছে?" আমার কথায় লোকগুলো সবাই হেসে অস্থির।

"রিক্সা চাইছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কোথেকে আইসছেন?"

"কলকাতা।"

আবার হাসি। এমন যে হিসেবী ঘাটের কেরানী সেও হাসতে গিয়ে সিকি রেখে আধুলি ফেরৎ দিল।

"কলকাতায় চলে মোটরগাড়ি, আর ইখানে?

"কি বলুন তো?"

"কি?"

"পা-গাড়ি।" হাসির দমকে নদীর ঘাট সরগরম হয়ে উঠল।

"রিক্সা ইখানে নেই। পথ থাকলে তো রিক্সা চলবে। ভেড়ির ওপর পাশাপাশি দু'জনও হাঁটিতি পারে না তো রিক্সা যাবে!"

কোনও মতে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলুম।

ঘাটের সেই লোকটি বাড়িয়ে বলে নি কিছু। এই দুর্গম কাদামাটির দেশে যেখানে মানুষজনই নির্ভাবনায় পা ফেলতে পারে না সেখানে রিক্সা চলার পথ কই? তবে যারা রুগ্ন, যারা অক্ষম তারা কি করে? তাদের খবর পেতেও দেরি হোল না।

দূর থেকে দেখছিলুম, ক'জন লোক ডুলি করে কিছু একটা বয়ে আনছে। কাছে আসতে বুঝলুম একটি বুড়ি, ছেঁড়া-খোঁড়া কাঁথার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে আছে। অসুখ না কি ওর?

"যাচ্ছ কোথায় তোমরা?"

"বর্মণ ডাক্তারের বাড়ি।"

"অসুখ না কি?"

"তবে আর যাচ্ছি কেন? হিক্কা উঠে গেছে!"

"বাড়ি কোথায় বুড়ির?"

"দুলাকির পাশে।" ওরা এগিয়ে গেল।

আড়াই মাইলেরও বেশি পথ এমনি করে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে এই বুড়ি। বর্মণের ওষুধ গলা দিয়ে নামবে কি না কে জানে? হয়ত ডুলিতেই শেষ হয়ে গেছে!

বাসন্তীর হাট দেখতে এসেছি। আজ বৃহস্পতিবার। দূর-দূরান্তের লোক আসছে হাটে। সাতজেলে, ঝড়খালি, ভরতগড়, আমলামেথি, মোল্লাখালি এমন কি বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জের ব্যাপারীরাও আসছে।

চায়ের দোকানের মালিকটি ভারি রসিক। বলে—"কাদার গল্প অনেক জানা আছে। ভীষণ মজার মজার।"

সাগ্রহে ঘাড় নাড়ি। "শুনব।"

"তবে আমার পাশে এসে বসুন।"

"কিছুদিন আগে এদিকে একগাঁয়ে বিয়ের নেমতন্ন ছিল। ব্যাপারটা সেখানেই ঘটে সন্ধ্যেবেলা। ভাদ্রের বৃষ্টি। থামছে, আবার পড়ছে। মেয়ের বাপ আর বড় ভাই বাইরে দাঁড়িয়ে। বর আসার সময় উৎরে গেছে। নদী-নালার দেশ, আতঙ্কটা তাই!

এমন সময় দূরে লণ্ঠনের আলো দেখা গেল। ওরা এসে পড়েছে। বাড়িতে খবর পৌঁছে গেল, বর আসছে। মহিলা-বাহিনী রেডি। শাশুড়ী-সেনাপতি বরণডালা বাগিয়ে ধরলেন। কিন্তু বরণ করবেন কাকে? আপাদ-মস্তক কাদা মেখে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। অগত্যা মেয়ের বাপ দারোগার মত জেরা শুরু করলেন।

"আপনি?"

"পুরুতঠাকুর।"

"আপনি?"

"নাপিত।"

"আপনি?"

"বরকর্তা।"

"নমস্কার। তা ছেলে কই আপনার?"

"ওরে তুই কোথায় গেলি?" বরকর্তা হাঁকলেন।

"এই যে, এই যে আমি।"

কন্যাকর্তা দেখলেন একটি বলিষ্ঠ যুবক বেতসপত্রের মত নুয়ে পড়ে গভীর আগ্রহে কোঁচার খুঁটে মুখ ঘসছে।*

গোসাবায় ভাঙা জেটির ফাঁদ

* আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

[পূর্বানুবৃত্তি]

তড়্বড়ান করে মহেশ মণ্ডল ঘরে এল সন্ধ্যেবেলা। থম্‌থম্ করছে মুখ-চোখ। এসে গুম্ হয়ে বসে রইল দাওয়ায়। নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগল একা বসে বসে।

সন্ধ্যের পরে এল সাগরখুড়ি। জিজ্ঞেস করল, "কিছু জানতে পারলে মোড়লমণ্ডল?"

"সব।" শুধু ছোট্ট একটু উত্তর দিল মহেশ।

"কথা খাঁটি?"

"সব।" মহেশ বললে, "নয়নের বাপ নিমাই মাঝিকে ভলু মাঝি দশ গণ্ডা টাকা পণ দিয়েছিল—বাকি পনেরো গণ্ডা টাকা রোজগারের জন্য চৌকিদারী থেকে ছুটি নিয়ে কোথায় পোতাবন্দির কাজে খাটতে গেছল।"

"তারপর?"

"তারপর ইদিকে বিয়ে-সাদি হয়ে গেল।" মহেশ বললে, "নিমাই মাঝি নাকি ভলুর পণের টাকা ফেরোৎ দিতে গেছল—লেয়নি। বলেছিল—ও টাকা আমি তোমার ঝিকে দিলম, চলে যাও।"

"তাহলে গোবরধন যে আসনাইয়ের কথা বলছে"—

মহেশ বলে উঠল, "গ্রামের লোক বললে—কথাটা মিথ্যা নয়।" তারপর মহেশ যেন মনোকষ্টপার আপন মনে বলে উঠল, "আমিই নগদা তিরিশ গণ্ডা টাকা হেঁকে মেয়েটাকে কোথা থেকে কোথায় তুলে আনলম গো। ভাবলম—ডাগর-ডেগর মেয়্যা, সংসারে এসে কাজ ঠেলবে!"...

সাগরখুড়ি নয়নের খবর দিয়ে বললে, "মুকুন্দের বৌ ইদিকে বলছে—সব মিছা কথা। ঐ চৌকিদার লোকটা খুব ডাহাপাড়া বদমাস। বলে—ঢের-দিন থেকে ওর পিছু লেগে আছে। ওর কোনো দোষ নাই।"

"তো সে কথা বলে নাই কেন এতদিন?" মহেশ বললে, "মুকুন্দকে বলতে পারত!"

"সে কি আমি বলি নি ভেবেছ?"

"তো কি বলে?"

"শুধু কাঁদে।"

"হুঁ।" মহেশ মণ্ডল নীরবে তামাক খেতে লাগল।

সাগরখুড়িও বসে রইল চুপচাপ।

বেশ খানিক বাদে মহেশ বললে, "আচ্ছা, সেই বনের ধারের ঘটনাটা কি? কে ওর শুধু কাপড়টা ঝটকা মেরে কেড়ে নিয়ে গেল? সেই নাঙ্গা, মাথায় বড় বড় চুল, গোঁফ-দাড়ি! ইয়া লম্বা।"...

সেটা যেন আজও রহস্য হয়ে আছে মহেশ মণ্ডলের কাছে। সব খবর জানার পরও সেইখানে যেন কেমন একটা খটকা।

সাগরখুড়ি বললে, "সবাই তো বলছে—ওসব গপ্প বানিয়েছে। ও সেই ভলুর কাণ্ড।"

"বুঝলম।" মহেশ বললে, "তো শুধু শাড়িটা কেড়ে নিয়ে গেল কেন?"

"বৌটাকে জব্দ করা।" সাগরখুড়ি বললে, "নিন্দা কেলেঙ্কারীতে যদি তোমরা ওকে তাড়িয়ে দাও।"...

কথাটা মনে ঠিক নিল না। আবার একটা 'হুম্' শব্দ করে মহেশ নিজের মনে নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগল।

সাগরখুড়ি বললে, "যমুনার সঙ্গে নয়ন ভলু মাঝির কাছে গেছল—মুকুন্দ এ খবর জানত। মাঝখানে যমুনার ঘরে আগুন লেগে যাওয়ায় ওদের আর দেখা হয় নি।" যমুনা ছুটে পালিয়েছিল সেদিন নিজের ঘরে আগুন দেখে নয়নকে মাঝরাস্তায় ফেলে। খুঁটিয়ে খবর জোগাড় করেছে সাগরখুড়ি।

মহেশ মুখ তুলে তাকাল—যেন চমকে খেয়ে। আস্তে আস্তে বললে, "মুকুন্দও মোকে বলে নি কথাটা!" একটু থেমে আবার বললে, "তুমি যাও খুড়ি—মুকুন্দকে একটু ডেকে আনো।"

সাগরখুড়ি গিয়ে মুকুন্দকে ডেকে আনলো।

মুকুন্দ এল মহা অপরাধীর মত।

মহেশ শুধু জিজ্ঞেস করলে, "তুই জানতিস?"

মুকুন্দ মিন্ মিন্ করে বললে, "যমুনার সঙ্গে গেছল—এইটুকু জানতাম।"

"তা কোথায় গেছল—তোর বৌকে জিজ্ঞেস করিস নি?"

"মোকে কারোর নাম বলে নি।" মুকুন্দ বললে, "শুধু বলেছিল—কাকে ধরে-করে মোদের নাকি থানা থেকে ছাড়াতে গেছল।"

"তা এ সব কথা মোকে বলিস নি কেন?"

মুকুন্দ চুপ।

মহেশ আবার বললে, “চুপ করে রইলি যে?”

মুকুন্দ বললো, “ভয়ে তোমাকে বলি নি ছোট মণ্ডল। এ কথা নিয়ে আবার পাঁচ মুখে ঘাঁটাঘাঁটি হবে—তাই।”

“তো এখন?” বলে মহেশ তীব্র দৃষ্টিতে মুকুন্দের দিকে চেয়ে রইল। বললে, “মনে পড়ে—আমায় ওই ভল্লু মাঝি তোর গলা চেপে মেরে ফেলার অবস্থা করেছিল!”

মুকুন্দ ঘাড় হেঁট করলো।

সাক্ষী-প্রমাণ—আরও ঢের কথা-উপকথা—সব মেয়েটার বিরুদ্ধে চলে গেছে। তার স্বপক্ষে আর কারুর কিছু বলার নেই। বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

মহেশ আস্তে আস্তে বললে, “মোকে বিচার করতে হবে মুকুন্দ—পঞ্চাতের সামনে গোলবদলের জবাব মোকে দিতে হবে।”

ঘাড় হেঁট করে মুকুন্দ চুপ করে বসে রইল।

মহেশ বললে, “শোন মুকুন্দ। ও বৌকে তোর ছাড়পত্র টিপ করে দিতে হবে। যার ঝি তার কাছে আবার ঘুরে চলে যাবে।”

মুকুন্দ তখনও চুপ।

“কি?” মহেশ জিজ্ঞেস করলে, “বলবি কিছু?”

মুকুন্দ ঘাড় হেঁট করেই বিষণ্ণ-গলায় বললে, “সেই যদি তোমার বিচার হয়”—

“আমি ঢের ভেবে দেখেছি মুকুন্দ, সকলের মনের কথাও জানতে পেরেছি।” মহেশ বললে, “এ চরে থাকতে হলে বৌকে তোর ছেড়ে দিতে হবে। নিমাই মাঝির ঝি মোদের সকলের মাথা হেঁট করে দিয়েছে।”

মুকুন্দ তেমনি ঘাড় হেঁট করে মুখ বুজে বসে রইল।

মহেশ বললে, “অন্য কোথাও চলে যেতে চাও—যেতে পারো। এ চরে ও বৌয়ের সঙ্গে ঘর করা চলবে নি। এই মোর শেষ কথা।”

শেষ কথা শোনার পরও মুকুন্দ চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর সুড় সুড় করে উঠে চলে গেল এক সময়ে।

বাঁধের ওপরে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে-ছিল মুকুন্দের স্যাঙাৎ হাবু। মুকুন্দ মুখ শুকনো করে ফিরে এল।

হাবু জিজ্ঞেস করল, “কি হলো? কি বললো ছোট মণ্ডল?”

“বিচারে যা হবে তাই বলে দিল।” বলে মুকুন্দ সংক্ষেপে ছোট মণ্ডলের কথাগুলো বললে।

হাবু শুধু চুপ করে শুনল—কোনো মন্তব্য করলে না।

না, কারুর আর কিছু বলার নেই। সব ঘটনা, খুঁটিনাটি সব কথা এখন ঘুরে গেছে মুকুন্দের বৌয়ের বিরুদ্ধে। তার স্বপক্ষে বলার একটা লোকও আর এ চরে নেই। মন ভেঙে গেছে মুকুন্দেরও।

অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে দাঁড়াল নদীর কিনার বাঁধের ওপরে। বসে পড়ল দুজন। আধখানা চাঁদের ঝিলমিলে আলো এসে পড়েছে সামনের বিস্তীর্ণ জলধারার ওপরে—কানে এসে লাগে ভাটির গাঙের একটানা ছল্ ছল্ কল্ কল্ শব্দ। সারা আবাদ নিঃসাড়। সবটা কেমন বিষণ্ণ—নিঝঝুম।

অনেকক্ষণ পরে হাবু জিজ্ঞেস করল, “তোর বৌ কি বলে?”

“বলে—সব মিছা কথা। ওই ভল্লু মাঝিই তার পিছনে লেগে আছে।”

“তোর কি মনে হয়?”

“মনে হয়—” মুকুন্দ থামল একটু। তারপর বলল, “মনে হয়—সে দোষ কিছু করে নি।”

“প্রমাণ?”

“প্রমাণ আর কি। কিছু নাই। তার কথা শুনে মোর মনে হয়েছে।”

হাবু যেন কি ভাবতে লাগল। তারপর বললে, “তার কথা সকলকে বিশ্বাস করাতে পারবি?”

“আজ আর কে বিশ্বাস করবে!” মুকুন্দ কোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আস্তে আস্তে বললে, “ধরো সেই বনের ধারের ঘটনা। তাকে তো আমিই পাঠিয়েছিলম। সে নিজে সাধ করে যায় নি।”

হাবুর মুখ দিয়ে হাঁ-না কোনো কিছুই বার হলো না।

বোধ করি মুকুন্দ নীরবে হাবুর কোনো একটা মন্তব্য শোনবার জন্য অপেক্ষা করে রইল। শেষ পর্যন্ত হাবুর কোনো সাড়া না পেয়ে সে নিজেও চুপ করে গেল।

চুপচাপ বসে রইল দুই স্যাঙাৎ বাঁধের ওপরে।

আস্তে আস্তে হাবু বলল, “চরটা যেন কেমন হয়ে গেল।” একটু থেমে, বোধ করি পুরনো কথা মনে করে করে হাবু আবার বললে, “কোথা থেকে হড়পা বানের মত সেই নুনের মিছিল এসে মোদের চরটাকে যেন ভাসিয়ে দিয়ে গেল কিসে! হেই পবনা খাঁ ফৌত হয়ে গেল! হেই পবনা, খাঁ ফৌত হয়ে গেল। তোর বাপ চালান হয়ে গেল... বুড়া ভিখন রাউৎ খুন হয়ে গেল...মোর বাবু কোথা থেকে এসে কোথায় চলে গেল।”

দেখতে দেখতে সব যেন কেমন ছত্রখান হয়ে গেল। কোথায় কোন থানী আবাদের মাঝখানে, অজ্ঞাত—নগণ্য একটা চর এতদিন সকলের চোখের আড়ালে তার তরঙ্গহীন গতানুগতিক জীবন-ধারায় বয়ে চলছিল। তার সকালে—মাটি মানুষ আর বলদে টানা পরিশ্রান্ত প্রহর। তার মধ্যাহ্নে—নিঃশব্দ বিশ্রাম। তার সন্ধ্যায়—শেয়াল ডাকা নির্জন অন্ধকার। সবটা যেন চনমনিয়ে উঠেছিল। তারই মাঝখানে একটা একটা করে সরে গেছে কখন চেনা মানুষগুলো—ভেঙে গেছে ঘর। আজ সবটার দিকে তাকিয়ে ওরা যেন নিজেরাই চমকে ওঠে।

মুকুন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, “এবার পালা মোর বৌয়ের। সে-ও যাবে।”...

হাবু কোনো কথা বললো না—একদৃষ্টে চেয়ে রইল সামনের সেই দ্রুত গতি অগাধ জলরাশির দিকে। বয়ে চলেছে। সামনের ঝিলমিলে আলো থেকে দূরের অস্পষ্ট অথৈ অন্ধকারের দিকে।

এক সময়ে হাবু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, “চল—ঘরে যাই। রাত হলো।”

মুকুন্দও উঠে দাঁড়াল—অনিচ্ছায়। বোধ করি—এমনি বসে ছিল, যেন বেশ ছিল। হাবুর পাশে পাশে যেতে যেতে হঠাৎ বললে, “হাবু।”

“বল।”

“যদি রাতটা তোর ঘরে থেকে যাই?”

হাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুকুন্দের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, “তা থাকিস। কিন্তু পরশু কেটেছে মঙ্গলের ঘরে, কাল গেছে সুবলের ঘরে। এমনি করে কদিন পালিয়ে বেড়াবি!”

মুকুন্দ বললে, “যদিন চলে।”

“তার পর?”

“কি জানি! ভেবে উঠতে পারি নি।” মুকুন্দ বললে, “ভাবতে গেলে সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়।” তারপর

রাণীধূপ
কাকার প্রডাক্টস,

একটু থেমে আস্তে আস্তে বললে, "এখন রাতকে মোর ভয় করে। তার সেই ফোঁপানী কান্না আমি সহ্য করতে পারি না।"

নয়নের ফোঁপানীর সামনে সে কেমন দিশেহারা হয়ে যায়।

হাবু বললে, "এখন মনকে তোর শক্ত করতে হবে। কন্যার বাপের অভাব নাই হে!"

তা নেই। ডাগর-ডোগর চেকন-চাকন মেয়ের অভাব নেই ভিন্ চরে—গ্রাম-দেশে। কিন্তু এই মেয়েটার মধ্যে কি আছে কে জানে! মুকুন্দ তার যাদু-স্পর্শ বুঝতে পারে শিরার উদ্দাম রক্ত-প্রবাহে, স্নায়ুতে, সর্বাঙ্গের উষ্ণ উত্তাপে; শুধু বলতে পারে না। অন্যকে সে বোঝাবে কেমন করে! তাই অন্য সবাই অবলীলায় যা বলে—সে বলতে পারে না, অন্য সবাই যেমন করে ভাবছে—সে তেমন ভাবতে পারে না। বরং আর সকলের কথা শুনে শুনে আর ভেবে ভেবে বাইশ বছরের নিরক্ষর, চরের এই যোয়ান ছোকারাটার বুকের ভেতরটা কেমন যেন মুচড়ে মুচড়ে ওঠে।

...তবু, চরে থাকতে হলে ছোট মণ্ডলের বিচার তাকে মানতে হবে।

॥ তের ॥

হাটে-বাজারে একদিন ঢোল শোহ-রৎ হয়ে গেল: কোথাও কোনো ভলাণ্টিয়ার থাকলে থানায় গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হবে। কেউ আশ্রয় দিয়ে থাকলে তার জেল-জরিমানা দুই-ই হবে।

থানা তো নয়—খোদ রাজদরবার। ঢালাও ক্ষমতা। নেমে এল ওপর থেকে।

বড় দারোগা গোঁফ চুমরে, দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে গর গর করে উঠল, "এইবার!—এইবার সব ব্যাটা বেরিয়ে পড়বে। দে আগুন শালার শেয়ালের গর্তে।"

কড়া হুকুম চলে গেল থানা থেকে চৌকিদার, ইউনিয়ন বোর্ড—প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ, গাঁ-গাঁউলির ক্ষুদে ক্ষুদে সরকারী দপ্তরখানায়। চৌকিদাররা খবর নিয়ে ছুটল হন্দায় হন্দায়। জমায়েৎ মিছিল সভা-সমিতি—তামাম আন্দোলন বে-আইনী। বরবাদ্।

ঢ্যাঁড়ার খবর শুনে সানো চৌধুরী বলতে বলতে ঢুকলো ডাক্তারখানায়, "শুনেছ ডাক্তার"—

আর বলতে হলো না—ডাক্তার সেদিনের কাগজটা ফেলে দিলে সানো চৌধুরীর সামনে। খবরটা বোধ করি কাগজেও বেরিয়ে থাকবে। ডাক্তার ফুট-কেটে বললে, "বিলাতে ম্যাঞ্চেস্টার বন্ধ হয়ে গেল।"—

ঠাট্টাটুকু হজম করে সানো চৌধুরী কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

নতুন বড়লাট। লর্ড উইলিংডন। নতুন হুকমৎ।

দেখতে দেখতে হাট-বাজারের মিছিল জমায়েৎ নির্বিচার লাঠির গুঁতোয় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। পড়ে রইল শুধু দলা দলা রক্তের দাগ। আবগারী দোকানের সামনে বন্ধ হয়ে গেল পিকেটিং—দলকে দল ধরেও করে পিটোতে পিটোতে টেনে নিয়ে গেল থানায়। রেজেস্টারী অফিসের সামনের অবস্থাও তথৈবচ। থেমে গেল বিলাতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব। বানের ঢল যেন ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এসে থমকে দাঁড়াল কঠিন পাথুরে বাঁধের সামনে।

দারোগা সদাপটে তার দলবল নিয়ে সকালে বিকালে কুচকাওয়াজ করে বেড়াতে লাগল গ্রামে—গ্রামান্তরে। চালান হয়ে গেল ভলাণ্টিয়ার—যারা ধরা পড়ল না তারা আড়াল হয়ে গেল রাতারাতি।

এমন দিনে একদিন সন্ধ্যার পরে ডাক্তারখানায় এসে হাজির হলো এক ভলাণ্টিয়ার। বললে, "গোবিন্দ পাইক আর পবন খাঁর জন্য উকিলবাবু কিছু টাকা পাঠিয়েছেন—দিতে এসেছি। ওদের ঘরটা কোনদিকে, আমায় যদি একটু দেখিয়ে দেন।"

ডাক্তার আর সানো চৌধুরী অবাক হয়ে চেয়ে রইল ছোকরার দিকে। রং কালো, মুখে বসন্তের দাগ। রোগা রোগা চেহারা—গায়ে ফতুয়া। বয়স বিশের বেশি হবে না। হাতে গরু তাড়ানো লাঠি।

ওদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ছোকরা যেন বিব্রত হয়ে উঠল। বললে, "উকিলবাবুর নাতিকে ওরা দুজন একদিন পুলিশের লাঠি থেকে বাঁচিয়ে-ছিল। এই চরে"—

সানো চৌধুরী সে দৃশ্য দেখে নি। জগৎ ডাক্তার দেখেছিল। চোখের সামনে ছবির মত ভাসছে। কিন্তু সে পবন খাঁ-ই বা কোথায় আর গোবিন্দই বা কোথায়! ডাক্তারের মুখটা থম্থম্ করতে লাগল।

সানো চৌধুরী উদ্বিগ্ন গলায় বললে, "তা জানি। কিন্তু এমন দিনে এলেন আপনি! এদিকে যে ঝেঁটিয়ে ধর-পাকড় হচ্ছে! ফেরীঘাটে ধরে নি?"

স্মিত মুখে ছোকরা বললে, ধরে নি—জিজ্ঞাসা-বাদ করেছিল একজন জমাদার। গরু বেচা-কেনা করি বলে ছাড়া পেয়েছি।" বলে নিঃশব্দে হাসল।

সানো চৌধুরী তাকে আপাদমস্তক আর একবার দেখে নিলে। চেহারাটা গরুর ব্যাপারীর মতই হয়েছে বটে।

ছেলেটি বললে, "এদিকের খবর আমরা পেয়েছি। তবু ঝুঁকি নিয়ে আসতে হয়েছে। উকিলবাবু মাত্র দিন সাতেক আগে জেল থেকে বেরিয়ে-ছিলেন—আজ সকালেই আবার ধরে নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় বার বার টাকাটার ব্যবস্থা করতে বলে গেলেন। বলে গেছেন—এই ডাক্তারখানাতে এলেই হদিস পেয়ে যাবো।"

"তা পাবেন। চলুন। এখানে আর আপনার থাকা ঠিক নয়।"

ডাক্তারখানার দিকে পুলিশের নজর বহুদিন আগে থেকেই। সানো চৌধুরী ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ডাক্তারখানা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নীরবে সড়ক পার হয়ে চরের ভেড়ি-বাঁধ দিয়ে যেতে যেতে সানো চৌধুরী জিজ্ঞেস করলে, "আপনার নামটি জানতে পারি কি?"

"বিজয় অধিকারী।"

"নিবাস?"

"আমি এই মহকুমার লোক।"

"এদিকে আগে কখনো আসা হয়েছে কি?"

"আজ্ঞে না—আসি নি।"

"তা হলে এই রাতের বেলা, আপনার তো ফিরতে অসুবিধা হবে!"

"আজ্ঞে গরুর ব্যাপারী, তার আর সুবিধা-অসুবিধা কি!" বলে অধিকারী হাসল।

বিমলের কথা মনে পড়ে সানো চৌধুরীর—তাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে নিয়ে গিয়ে তুলে দিয়েছিল প্রায় পুলিশের হাতে। সে অনুশোচনা আজও যন্ত্রণা দেয়। এ ছেলেটিকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে রাখতে তার সাহস হলো না। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল চরের দিকে। বললে, "বিমলকে চিনতেন—বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়?"

অধিকারী বললে, "খুব চিনি। আমাদের সহকর্মী—তিনি এসেছিলেন এদিকের ক্যাম্পে। এখন জেলে!"

"হ্যাঁ, এখানেই ধরা পড়েছিল।" ক্ষুণ্ণ ম্রিয়মাণ কণ্ঠে সানো চৌধুরী বললে, "কত কথা হলো—এমনি এক সন্ধ্যের পরে। আমাদের তাঁতের জন্যে তুলো দেবে—চরখা দেবে। তারপর"...

সানো চৌধুরী থেমে গেল। নীরবে পথ হাঁটতে লাগল।

অধিকারী জিজ্ঞেস করলে, "আপনা-দের তাঁত আছে?"

"ছিল। উদ্যোগ-আয়োজন চলছিল। হঠাৎ একদিন তাঁতীও গেল নিরুদ্দেশ হয়ে।" সানো চৌধুরী বললে, "তার-পর এই তো আবার নতুন করে সুরু হলো থানার জুলুম।"

"ওতে আমাদের এসব কাজ দমবেও না—থামবেও না।" বিজয় অধিকারী

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

বললে, "আপনি তুলো চল—আমি ফিরে গিয়ে ব্যবস্থা করবো।"

"কিন্তু তাঁতী ?"

"যদি বলেন সে-ও আমি পাঠাতে পারি। তবে মাসকয়েক থেকে কাজ-টাজ শিখিয়ে দিয়ে সে চলে যাবে।"

"তাতেই চলবে।" সানো চৌধুরী বাঁ-হাতি বাঁক নিলে—বললে, "আমরা এসে গেছি।"

হাতকয়েক এগিয়ে সামনে কুঁড়ে। দাওয়া অন্ধকার। শুধু কোথা থেকে ভেসে আসছে কড়া তামাকের গন্ধ।

সানো চৌধুরী গলা নামিয়ে ডাকল, "মহেশ!"

"কে!" মহেশ অন্ধকার দাওয়া থেকে উঁকি মারল। তারপর প্রায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল, "সানো কত্তা! কি খবর।"

আগন্তুকের বিবরণ ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়ে সানো চৌধুরী বললে, "ব্যবস্থা করো।"

সব শুনে মহেশ খানিক গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিরস গলায় বললে, "কি ব্যবস্থা করবো সানো কত্তা! পবন খাঁ কি বেঁচে আছে—না গোবিন্দ আর এ চরে আছে ?"

"কেউ নেই ?" আহত গলায় বলে উঠল বিজয়।

"আছে—গোবিন্দ আছে, যে উকিলবাবুর নাতিটিকে সেই মারমুখি লাঠির সামনে বুকে করে রক্ষা করেছিল।" মহেশের কথায় জ্বালা, বুকে দপ করে জ্বলে উঠেছে জ্বালার আগুন। কথায় সেই জ্বালা ছিটকে আসে। বললে, "তবে সে হয়তো এতদিনে গারদে।"

বিজয় সবিস্ময়ে বললে, "গারদে! তাকেও ধরেছে ?"

"সেই উকিলবাবুর সঙ্গে সঙ্গে প্রায়।"

"তা হলে উকিলবাবু জানতেন না।" বিজয় বললে।

মহেশ গর গর করে উঠল, "তিনি আর জানবেন কি করে! মোরা চরের জংলি মানুষ—চোর ছাঁচড় ডাকাত। দারোগা তাকে ডাকাতি মামলায় জড়িয়ে চালান করে দিয়েছে।"

মহেশের কথার ধার আর রাগ দেখে সানো চৌধুরী ব্যাপারটা বিজয়কে বুঝিয়ে দিলে।

মহেশ তেমনি গর গর করে বলতে লাগল, "সেই বর্ষার আগে কারা না কারা রোকা লিখে চরে খবর দিয়ে পাঠাল। তা মোদের না আছে টাকা-কড়ি, না জানি সেই কোর্ট-কাছারির রাস্তা। আজ ওনারা টাকা দিয়ে পাঠিয়েছেন! নিয়ে যান আপনাদের টাকা—মোদের চরের জংলি মানুষ ও টাকা ছোঁবে না। গোবিন্দ যে কাজ করেছে—টাকার লোভে করে নি।"

বিজয় অধিকারী সেই রাগের সামনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আস্তে আস্তে বললে, "উকিলবাবু এতদিন জেলে ছিলেন—তিনি কিছুই জানতেন না। তবে সদরে আমাদের উকিল আছে—তাঁকে আমি জানি। আমার সঙ্গে এ চরের কেউ চলুক—আমি ব্যবস্থা করে দিয়ে আসতে পারি।"

মহেশ ঝাঁকিয়ে উঠল, "মোদের টাকা-পয়সা নাই।"

বিজয় বললে, "টাকা লাগবে না। তিনি উকিলবাবুর বন্ধু। আমাদের সব মামলাই তিনি লড়ছেন। ফী লাগবে না।"

সানো চৌধুরী বললে, "এই তো ভালো ব্যবস্থা মহেশ। রাগ করে আর লাভ কি! গোবিন্দ যাতে খালাস হয় তার ব্যবস্থা কর।"

মহেশ চুপ করে রইল। বোধ হয় ভাবতে লাগল কথাটা।

সানো চৌধুরী বললে, "এখন উকিলবাবু যে টাকা পাঠিয়েছেন, তার ব্যবস্থা করে দে।"

"পবন খাঁর বাপ কালিমন্দী হয়তো টাকা নিতে পারে, কিন্তু মুকুন্দ বোধ করি ও টাকা ছোঁবে না সানো কত্তা।"

মহেশ বললে, "চরের এক বিচারে এমনিতে তার মন-মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। আবার বাপের কথা উঠলে কি না কি করে বসে।"

সানো চৌধুরী জিজ্ঞেস করলে, "তার আবার কি বিচার!"

"সে মোদের চরের কথা।" মহেশ ভাঙলে না। এ তার নিজের এলাকার কথা—ভালো-মন্দের কথা। সে কথা চেপে গিয়ে বললে, "আপনারা দাঁড়ান—আমি তাকে ডেকে পাঠাই।"

মহেশের এক ছেলে গিয়ে মুকুন্দকে ডেকে আনল।

কথাটা পাড়লে সানো চৌধুরী। বিজয় অধিকারীকে দেখিয়ে বললে, "এনার সঙ্গে তোকে সদরে যেতে হবে মুকুন্দ।"

ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে মুকুন্দ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

সানো চৌধুরী বললে, "ইনি গিয়ে তোর বাপের মামলার সব ব্যবস্থা করবেন। আর উকিলবাবু তোর বাপের দরুণ কি টাকা পাঠিয়েছেন যেন। কত টাকা বিজয়বাবু।"

বিজয় বললে, "পঁচিশ টাকা। আর পবন খাঁর জন্যেও পঁচিশ।" [ক্রমশ]

কিংবা, রোদ খুব নিপুণ হাতে শ্বাসরুদ্ধ করে ছায়াগুলো হত্যা করল। তারপর ছায়ার লাসগুলো সরিয়ে নিতেই, তীব্র ছায়াহীনতায় ভুগে ভুগে রোদ খুব দ্রুত ভয়ংকর এক দুপুর হয়ে উঠল। যেন, অভিশপ্ত কোন মরুপ্রান্তর, তপ্ত, রুক্ষ, তৃষ্ণার্ত।

কিছুক্ষণ বিমল দেখল। তারপর, চোখ সরিয়ে নিল। শৈশবের সেই স্মৃতি, কি এক চাপা উদ্বেগ, প্রতিটি পল ওকে অস্থির করে তুলছিল। হাত কাঁপছিল থরথর করে। বিমল হাতের মুঠো একবার খুলল, বন্ধ করল। দেখল, মধু তখনো টাইপ কাগজটা খুব খুঁটিয়ে, কি যেন দেখছে উল্টেপাল্টে। কি এত দেখছে মধু। কি আছে এত দেখার। এ তো জানা, কি থাকবে ডাক্তার কি পুলিশ রিপোর্টে, স্কুল কর্তৃপক্ষের নানা বিবৃতিতে। তবে? একটু নড়েচড়ে বসল বিমল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেট খুঁজল, পেল না। ভাবল; প্রশ্নটা করবে কি না। কিন্তু, একদা সহপাঠী মধুকে কাল কোট আর মোটা চশমায় কেমন গম্ভীর আর অপরিচিত লাগছিল। ভয় ভয় করছিল। একটু ইতস্তত করল বিমল। এলোমেলো চুল আঙুল চালিয়ে ঠিক করল ক'বার। মুখ মুছল কাপড়ের খুঁটে। শেষে, বলে ফেলল কথাটা।

মধু মুখ তুলল। সামনে বিমল। চোখ মুখ ক্লান্ত, কি এক বিষাদ। এলোমেলো চুল রুক্ষ, শুখনো থরথরে গাল, মলিন বেশবাস। ক' মুহূর্ত কি ভাবল মধু। নিচু স্বরে বলল, "কি বলি, বল। তুমি তো সব জান, বিমল।"

হ্যাঁ, বিমল জানে। সব ওর জানা। সব। এ এক অমোঘ নিয়তি, প্রতিকারহীন, অথচ, কি নিষ্ঠুর আর ভয়ংকর। তবু নিজেকে খুব অবসন্ন বোধ করল বিমল। হাসলও একটু। কিন্তু, কিছুই আর বলতে পারল না।

এর পর, আস্তে, চেয়ার ছাড়ল মধু। টেবিলের ওপর থেকে কলম, ছোট ডাইরী, ফাইল তুলে নিতে নিতে বলল, "তুমি এখানেই বসো। ডাক পড়লেই এসো কিন্তু, বুঝলে?"

বিমল চুপ। ওর দিকে তাকিয়ে। কি বলতে গেল, পারল না। ঠোঁট দুটো কাঁপল। ক্রাচ শক্ত মুঠোয় চেপে, যেন নিজেকে ঠিক রাখতে, ম্লান হাসল। বলল, "আমি কি তোমার সঙ্গে যাবো, মধু?"

"না না, কি দরকার—" মধু ওর কাছে সরে এল, "সময় হলেই তোমাকে ডাকবো।" মধু একটু ঝুঁকে, ওর পিঠে আলত হাত রাখল, যেন ওকে সান্ত্বনা দিতে চাইছে, মৃদুস্বরে বলল, "কিছু ভেবো না, বিমল। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।"

বিমলের হাতের মুঠোয় ক্রাচ ভীষণ কাঁপছিল। চোখে মুখে কি এক বিষণ্ণতা ঘনিয়ে উঠছিল দ্রুত। কিছু বলতে, উঠে দাঁড়াতে চাইল, "আচ্ছা মধু—একটা কথা—বলছিলাম—বলছিলাম—" কি বলতে গিয়ে, বিমল হারিয়ে ফেলল। কিছুতেই আর মনে করতে পারল না। শূন্য চোখ, একবার মধু, সাদা দেওয়াল, টেবিলের ওপর চোখ বুলিয়ে, চুপ করে গেল। কিন্তু, মধু আর দাঁড়াল না। বেরিয়ে গেল বার লাইব্রেরী থেকে।

কিছুক্ষণ বিমল বসে থাকল। তারপর, উঠে দাঁড়াল। এই একঘর ভিড়, নানা উঁচু নিচু কথা, মেকী হাসি, কাল কোট, উদাসীন গ্রস্ত ব্যস্ততা—ওর কেমন অসহ্য লাগছিল। দু' হাতে ক্রাচ চেপে ও বাইরে বেরিয়ে এল। সবাকিছু এড়িয়ে। যেন পালিয়ে। একা।

সামনে পিচ রাস্তা। ওপাশে লাল বিচারালয়। তার ঋজু তির্যক চূড়া অনেকটা শূন্যে—যেন ঝুলন্ত। কাছেই নিষ্পত্র বৃদ্ধ বট। রিক্ত শাখা-প্রশাখা যেন ভিক্ষুক কি প্রার্থনারত শীর্ণ কাঁপাকাঁপা কতকগুলো হাত। তার চার পাশে, অনেক নিচে, এলোমেলো জট পাকানো ভিড়। নানা ফেরিওয়ালা। চা খাবারের দোকান। জ্যোতিষী। সিঁদুরে উজ্জ্বল

মধ্যাহ্নের ব্যাধি

অনিমেষ সেন

কোন দেবদেবী হাতে পুরোহিত কি সাধু। সাদা পাদরী, গলায় ক্রুশ। এবং কিছুটা দূরে, লম্বা টানা বারান্দা। মাঝে মাঝে দরজা, প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর হাঁয়ের মত—অন্ধকার। বিমল অনুমান করল, ঐ সার সার দরজার কোন একটি থেকে মধুর হাতের ইশারা কি কোর্টের চাপরাশির ডাক ও শুনতে পাবে। যেন এই ডাকের ওপর ওর সব কিছু নির্ভর করছে, এমন সতর্কতায় ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। শেষে, বসে পড়ল কাছের বেঞ্চটায়। ক্রাচ পাশে শুইয়ে রাখল।

কিন্তু সময় ধীর, মন্থর, অন্তহীন। এ নিদাঘ দুপুর আরো প্রখর। ওকে ক্লান্ত বিবশ করে তুলল। ক্রমে ও অনুভব করল, ওর চোখ জ্বলছে। ফুসফুস ঝলসে যাচ্ছে প্রতিটি নিশ্বাসে। কেমন এক শ্বাসকষ্ট। কপাল, কপালের দু' পাশ, মাথার নিচটায় টিপটিপ যন্ত্রণা। তবু ও একটুও নড়ে নি। এ যেন জ্বালা, ঘড়ি স্পষ্ট, এই তাপ, দাহ কি জ্বালা নয়, এ ওর নিস্তারহীন নিয়তি; যা থেকে মুক্তি নেই কোন। মুক্তি। উঃ মুক্তি। কতবার ও ভেবেছে। কিন্তু বৃথা। সব বৃথা। পলকে অস্থির হয়ে উঠল বিমল। ক্রাচটা খুঁজতে গিয়ে, খুব ক্ষীণ, অস্পষ্ট, মিনতিকে মনে পড়ল হঠাৎ। আর সেই ভয়ংকর জ্বরতপ্ত অসুখ। যখন নিজেকে ওর সারাক্ষণ তপ্ত উষ্ণ এক দুপুর মনে হত। তারপর? বিমল স্মৃতি হাতড়ে দেখল, সেই অসুখের পর, শুধু হার আর হার। একে একে সব ও হারাল। আর? আর যেন কি! বিমল চোখ তুলল। দেখল, দুপুর। সামনে পিছনে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত দুপুর—হু হু রোদের চিতা হয়ে জ্বলছে। খুব সন্তর্পণে গ্রাস করে ফেলছে সবকিছু। সামনে, বৃত্তাকারে প্রসারিত নানা দৃশ্য, টুকরো চিত্র, এলোমেলো তপ্ত, রুক্ষ, ধূসর হাওয়ায় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হচ্ছে। রেণু রেণু হয়ে মিশে যাচ্ছে দুপুরে। হয়ে উঠছে ভয়ংকর এক দুপুর।

তারপর? তারপর যেন কি? বিমল ভাবতে চাইল ফের। কিন্তু দুপুর ওকে দ্রুত ক্ষয় করে ফেলছিল। এই তাপ, দাহ, জ্বালা—মুহূর্তে তপ্ত, রুক্ষ, ছায়াহীন এক দুপুরে, দুপুর করে তুলছিল। হ্যাঁ, তারপর সেই হার, শুধু হেরে যাওয়া। বিমলের মনে পড়ল। আর অনুভব করল, যেন এখনো, ওর দৃষ্টি থেকে খুব ধীরে, মুছে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে সব। সামনের একফালি পিচ রাস্তা, নিষ্পত্র বট, বিচারালয়, বারান্দা, সার সার দরজা, মধুর ডাক—সব; একের পর এক, সব ঝাপসা অস্পষ্ট। হারিয়ে যাচ্ছে যেন কোথায়। চকিতে বিমল, কি এক ত্রাস, শঙ্কায় দিক্‌ভ্রান্ত নাবিক, পথিক, কি অন্ধের মত শূন্যতা হাতড়ে মিনতি কি ক্রাচ, নাকি অন্য কিছু, আঁকড়ে ধরতে গিয়ে, ও কিছুটা তফাতে মধুকে দেখতে পেল। মধু ফিরে আসছে।

আরো কিছুটা এগিয়ে এসে, মধু হাসল। বলল, "আরে, এখানে কেন? এই রোদে? এসো কথা আছে—" একটু থেমে, কি ভেবে মধু বলল, "আচ্ছা চল, চা খাই একটু।"

বিমল নীরব। দু' হাতে ক্রাচ চেপে, পাশাপাশি হাঁটতে থাকল।

কোণের টেবিলে প্রথম মধু, তারপর ওর মুখোমুখি বিমল বসল। বসার আগে, মধু ওর ক্রাচ ধরল একটু, ফিরিয়ে দিল বসার পর। এক হাতে ক্রাচ ধরে রইল বিমল। হাতটা তখনো ওর কাঁপছিল।

চা শেষে, বিমল আশা করেছিল, মধু কিছু বলবে। কিন্তু মধু তখনি কিছু বলল না। হাতের ফাইল খুলে, ফাইলে চোখ রেখে, সিগারেট ধরাল শুধু।

দোকানটা ছোট আর চাপা। কেমন ছায়া ছায়া, একটু ঠাণ্ডা। দেয়ালে কয়েকটা ছবি, কিছুটা মলিন, বিবর্ণ। ওপাশে একটা ক্যালেণ্ডার। বিমল কমুহূর্ত দেখল, ছবিটা সুন্দর, নীল আর সবুজ, ওর রোদে জ্বলা চোখ দুটো পলকে জুড়িয়ে গেল, নিবিড় বন, সবুজ গাছপালা, নীল হ্রদ, আরো নীল আকাশ। ওর ইচ্ছা করল, ওখানে গিয়ে একটু দাঁড়ায়, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে। কিংবা ঢুকে পড়ে ছবির মধ্যে, নীলে আর সবুজে। কিন্তু—, ভেতর ভেতর কি এক কষ্ট, বেদনা, চাপা নিশ্বাস ফেলে ও চোখ সরিয়ে নিল। সামনের টেবিলে আরো কয়েকজন। শব্দ তুলে হাসছে, কথা বলছে। মুহূর্তে শেষ করছে চা সিগারেট। খুশিতে উজ্জ্বল, দীপ্ত চোখমুখ। নিটোল, নিখুঁত হাত পা, শরীর—বিচিত্র সুন্দর ভঙ্গী। ও কি পারে না? বিমল কেমন আনমনা হয়ে পড়ল, এভাবে হাসতে কথা বলতে, খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে! না, পারে না। ক্রাচটা একবার দেখল, আলতো হাত রাখল। না, তা আর হয় না। যেন বহুকাল কোন পরিত্যক্ত দ্বীপ, কি নির্জন মরু প্রান্তরে নির্বাসিত ছিল; এখন, হঠাৎ লোকালয়ে এসে ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ও হারিয়ে ফেলেছে সব। এতকাল নিঃসঙ্গতায় ভুগে ভুগে ও ভীষণ একা, নির্জন হয়ে গেছে। মাটি, পাথর কি কাঠের টুকরোর মত নিষ্প্রাণ। বুকের মধ্যে কি এক তীব্র, টনটনে যন্ত্রণা; বিমল চোখ সরাতে মধুর চোখে চোখ পড়ে গেল।

মধু হাসল। বলল, "একটা কথা বিমল", একটু থেমে, "দেখ, অপরাধের শাস্তি একটা আছে। তবে, বেশি আর কম—"

বিমল চুপ। ওর দিকে তাকিয়ে।

"একজন শিক্ষিকার পক্ষে, এটা সত্যি একটা গুরুতর অপরাধ, নিষ্ঠুরতা—" টেবিলের ওপর ঝুঁকে, নিচু স্বরে মধু বলল, "তুমি ভাবতে পার, বিমল, একটা নিরাপরাধ শিশুকে তুমি এমন শাস্তি দিলে যে,—উঃ, এ কল্পনা করা যায় না—"

"কিন্তু, এটা তো—"

যেন, মধুকে থামিয়ে দিতেই কিছু বলতে গেল বিমল, পারল না। শৈশবের সেই স্মৃতি, যা কদিন থেকে বেঁধা সূঁচের মত কষ্ট দিচ্ছে ওকে, মনে পড়ে গেল হঠাৎ; বন্ধ ঘরে ক্লান্ত হয়ে হয়ে সব দম ফুরিয়ে চড়াইটা মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। আর শৈশবের পৈশাচিক উল্লাসে ছুটে গিয়ে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরেছিল চড়াইটাকে। নরম বুকের ঢিব ঢিব ত্রাস কমুহূর্ত মাত্র অনুভব করেছিল। তারপর, আর না। নিস্তেজ হয়ে এসেছিল চড়াইটা।

"জানি, এটা ইচ্ছাকৃত নয়। আর, সব দোষ মিনতির একার, তাও নয়। স্কুলের প্রধান থেকে দরোয়ান, সকলেই কিছু না কিছু দোষী। কিন্তু, তা বলে কি মিনতি নির্দোষ? না, তা হয় না। কোর্টে এ যুক্তি অচল। তবে—"

শৈশবের সেই স্মৃতি তখনো বিমলকে শ্বাসরুদ্ধ যন্ত্রণায় বিবশ করে তুলছিল। তবু, বিমল দাঁতে দাঁতে চেপে, স্থির হয়ে রইল।

"তবে, কোন মানবিক দিক থেকে যদি ভাবা যায়—" ওর চোখে চোখ রেখে, কি ভাবল মধু। তারপর, "এই ধর—একজনের শাস্তি পাওয়া না পাওয়ার ওপর যদি আরো একজনের বাঁচা মরা, থাকা না থাকা নির্ভর করে—এমন একজন, যে পঙ্গু, অক্ষম, একেবারে অসহায় সম্বলহীন—" আরো কি বলতে গিয়ে মধু চুপ করে গেল, চেপে চেপে রুমালে মুখ মুছল। একটু যেন লজ্জিত, হাসল, "দেখ, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমারও মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কি সব বলছি!"

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, গলা শুকনো। ফিসফিস স্বরে বিমল বলল, "তাহলে, কি মিনতির কোন আশা নেই?"

"না, তা ঠিক নয়—"

"তা হলে, মধু, তা হলে—" চাপা উত্তেজনায় গলা কাঁপছে, মুঠোর মধ্যে ধরে থাকা ক্রাচ, বিমল বলল, "মিনতি কি—"

"আচ্ছা বিমল—" সামান্য ঝুঁকে মধু বলল, "তোমার ঠিক মনে আছে, সেই ঘটনার পর মিনতি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিল?"

"অপ্রকৃতিস্থ—" বিমল বিভ্রান্ত হল। কি এক আশঙ্কায় সারা শরীর

"কারো কারো তো হচ্ছে—" বিমল যেন বুঝতে চায় না, "প্রতিদিন কাগজে কত দুর্ঘটনার খবর থাকে। আর কি সব দুর্ঘটনা, যা কখনো কল্পনাও করা যায় না।"

"তা বলে কি কেউ ঘরে বসে আছে, বল?" মিনতি ওর কপালে, চুলে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দিয়েছে, "আচ্ছা, তুমি তো ভালো কিছুও ভাবতে পারো। এমন অনেক ভালো ঘটনাও ঘটে, যা ভাবা যায় না। ধরো, আমি একটা ভালো মাইনের কাজ পেয়ে গেলাম। আমাদের আর কোন অভাব নেই। খুব নামকরা এক স্পেশালিস্ট দেখিয়ে তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে আগের মত। এমন তো হতে পারে। পারে না, বল?"

একটু যেন শান্ত হত বিমল। কি এক আশায় জ্বলজ্বল করত চোখ-মুখ। কিন্তু পরমুহূর্তে ফের সেই অবিশ্বাস। সেই ভয় আর বিষণ্ণতা। ও বিড় বিড় করত, "কি জানি, মিনু আমি এসব ভাবতে পারি না!"

তাই, স্কুলের চিঠিটা যখন এল, বিমল নীরব থাকল। কোন উৎসাহবোধ করল না। এখনো সেই অবিশ্বাস। ভয়। এ কি সম্ভব, বিমল যেন কিছুতেই ভাবতে পারছিল না। কিন্তু, মিনতি হাসছিল। ক'বার পড়েছিল ও চিঠিটা। তারপর ছুটে এসেছিল, "দেখ বিমল, একটু দেখ," কি এক খুশি আর আবেগে দু' চোখে জল এসে গিয়েছিল মিনতির, "বল বিমল, বল, তুমি খুশি হয়েছ?"

বিমল তখনো মিনতির দিকে তাকিয়ে, মিনতির হাসি কি খুশি নয়, ওর চোখের কোলে ক্লান্তি, স্পষ্ট বলি-রেখা, দু' গালের শীর্ণতাই শুধু দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু, কাঁপাহাতে চিঠিটা চোখের সামনে তুলে ধরতে সত্যি খুশি হল বিমল। না হয়ে পারল না। হেসে তাকাল মিনতির দিকে। মৃদুস্বরে বলল, "উঃ মিনু, তোমার কথা যদি সত্যি হয়!"

হ্যাঁ, এরপর, বিমল আগে যা ভাবতে পারত না, তখন পারত। স্বপ্ন দেখত। ঠিক মিনতি যা দেখে, সেই সব স্বপ্ন। কিছু টাকা পেলেই ও বড় এক ডাক্তার দেখাবে। পৃথিবীতে কত অলৌকিক ঘটনা ঘটে। হয়তো একদিন সত্যি সত্যি ও ভাল হয়ে উঠবে। ঠিক আগের মত। বিমল সরু হয়ে আসতে থাকা পা দু' আঙুলে টিপে টিপে দেখত, আর ভাবত বিমল, হয় না? কেন হবে না। কত কিছু তো হয়, হচ্ছে। তবু কি এক ভয় আর অবিশ্বাস, হঠাৎ হঠাৎ ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। তখন নানা কথা বলত বিমল। ট্রাম বাস, রাস্তা, স্কুল, যখন যা মনে হোত, সেইসব বিপদ ও তার সাবধানতার কথা বলে যেত। মিনতি শুধু শুনত। কিছু বলত না। কিন্তু, মিনতির ফিরতে যদি একটুও দেরি হোত, বিমল আর ঘরে থাকতে পারত না। দু' হাতে ক্রাচ্ চেপে চলে আসত বাস রাস্তায়। অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করত। কতবার নিষেধ করেছে মিনতি। অনুযোগ দিয়েছে, "কেন এত কষ্ট করে আসো বিমল!"

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বিমল বলেছে, "একা একা ভাল লাগে না মিনু। এত দুশ্চিন্তা হয় যে, থাকতে পারি না।"

"কি এত ভয় তোমার—" কি এক দুঃখে, কষ্টে চোখে জল এসে গেছে মিনতির। নিচু স্বরে বলেছে, "কেন এত ভয় পাও বিমল। দেখো, আমাদের আর কোন বিপদ হবে না। বিপদ কখনো একসঙ্গে আসে না।"

"না, মিনু না—" বলবে না, বলবে না করেও বলে ফেলেছে বিমল, "বিপদ যখন আসে, তখন একা আসে না।"

হয়তো তাই। কিন্তু সেদিনটি যে এত নিকট, এত দ্রুত এগিয়ে আসবে, বিমল কল্পনাও করে নি কখনো। যখন বুঝল, হেসে উঠল পাগলের মত। তারপর, স্থির, স্তব্ধ হয়ে গেল একেবারে। থর থর কাঁপল। আর বার বার মনে হতে থাকল, মিনতি নয়, যেন ও নিজেই, ওর সেই ভয় আর অবিশ্বাস, মিনতির সব আশা, স্বপ্ন কঠিন হাতে ভেঙে দিল।

শুধু কি বিমল, প্রথমটা মিনতিও বুঝতে পারে নি কিছু।

ছোটদের নিচু একটা ক্লাশ বেশ সমস্যায় ফেলল। কিছুতেই কিছু শেখে না। সারাক্ষণ হৈ-চৈ, গোলমাল। আর নানা আবদার। পরীক্ষা এত খারাপ হল, সুধাদিও সাবধান করে দিল ওকে। ভয় পেল মিনতি। ও কি অযোগ্য! কত কষ্টে এ-কাজ পাওয়া, যদি চলে যায়! একটু শক্ত হল মিনতি। আপ্রাণ খাটল। তাতে ক্লাশের কিছুটা উন্নতি হলেও, সেই ছেলেটি ওকে ভাবিয়ে তুলল। কত চেষ্টা করল। তবু, এতদিন ধরে একটা অক্ষরও ওকে শেখাতে পারল না। ছেলেটিকে বকেছে, নীল-ডাউন করিয়েছে ক্লাশের বাইরে, পড়া না শেখার ভয় দেখিয়েছে নানা। কিন্তু সব বৃথা। ছটফটে চঞ্চল ছেলেটি উজ্জ্বল দৃষ্টি চোখে হেসেছে পিটপিট করে। কখনো স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়েছে ওর এলোমেলো চুলে। শান্তস্বরে আদরে বোঝাতে চেয়েছে, লজ্জা দিতে চেয়েছে, উল্টে ফস করে বলে ফেলেছে ছেলেটি, "আমি কিছুই পড়বো না দিদি। শুধু ইস্কুলে আসব।" মিনতি বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু না হেসেও পারে নি।

সেদিন মিনতি ভেবেছিল, একটু ভয়, একটা নতুন সামান্য কঠিন শাস্তি ওকে দেবে। স্কুল ছুটি হতে আর চল্লিশ মিনিট—নিচু ক্লাশগুলো ছুটি হয়ে গেল। একে একে বেরিয়ে গেল সব ছাত্র। শুধু সেই ছেলেটিকে যেতে দিল না মিনতি। ছেলেটি কিন্তু একটুও ভয় পেল না। ভ্রূক্ষেপ করল না মিনতির শাসন। খুশিতে উজ্জ্বল দুটি চোখ, হাততালি দিয়ে উঠল, "বারে, কি মজা—" দাঁতে ঠোঁট চেপে কতক্ষণ কি ভাবল মিনতি। তারপর আস্তে বেরিয়ে এল ক্লাশ থেকে। দরজা বন্ধ করে শিকলি তুলে দিল। ভেবেছিল, স্কুল ছুটির কিছু আগে ছেড়ে দেবে। কিন্তু সুধাদির ঘরে পা দিতে, ওর দিকে তাকিয়ে হাসল সুধাদি, "তুমি তো কনফার্ম হয়ে গেলে মিনতি। কি ভাগ্য তোমার!" হঠাৎ খুশিতে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল মিনতি, "কই, দেখি দেখি—" ক'বার পড়ল মিনতি চিঠিটা। কেমন এক চাপা উত্তেজনায় কিছুটা বুঝল কিছুটা বুঝল না। কিন্তু তখন আর এক মুহূর্তও স্কুলে থাকতে ভাল লাগল না। এখুনি বিমলকে খবরটা দিতে না পারলে যেন স্বস্তি নেই। ছুটি নিয়ে চলে এল। তারপর, কখন যে স্কুলের ছুটির ঘণ্টা পড়েছে, একে একে চলে গেছে সব। ক্রমে, স্কুলটা ফাঁকা শূন্য প্রাগৈতিহাসিক কোন জন্তুর হাঁয়ের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, মিনতি কিছুই জানে না। পরদিন সকালে, সুধাদি যখন হঠাৎ ওর বাড়িতে এল, তখনো ওর কিছুই মনে হয় নি। শুধু একটা প্রশ্ন করেছিল, "আজ তো ছুটি, সুধাদি।" "চল না, কাজ আছে—" তখন এ ছাড়া সুধাদির কাছে কিছুই শোনে নি। কিন্তু, স্কুলে পা দিতেই সব বুঝতে পেরে-ছিল মিনতি। সেই চল্লিশ মিনিট পর,

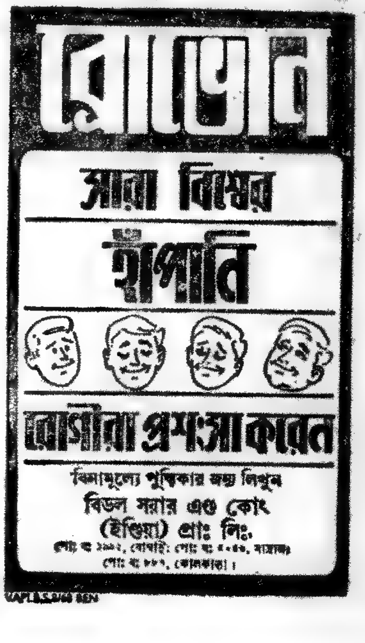

প্রতিটি ক্লাশ ছুটির ঘণ্টা শুনলেও একটি ক্লাশ শোনে নি। বন্ধ দরজায় মাথা ঠুকে মরেছে। আর সেই ক্লাশের চাল্লশটা মিনিটকে অনন্ত অপার করে তুলেছে। ভেঙে চুরে স্থির স্তব্ধ হয়ে গেছে সময়ের কাঁটা দুটো। মিনতির মাথা টলছিল, দুটি পা। যেন ও আর সহ্য করতে পারছে না, সেই উজ্জ্বল চোখ এখন ফ্যাকাশে, বিবর্ণ, ভয়বিহ্বল। ঠোঁট দুটি নীল, গালে কান্নার দাগ। ছোট হাত, আঙুলগুলো যেন কিছু আঁকড়ে ধরার অসহায় ভঙ্গিতে শক্ত, কঠিন। জামা ছেঁড়া, বই-খাতা মেঝেয় টুকরো টুকরো। চোখ বন্ধ করল মিনতি। তারপর, টলতে টলতে কাঁপা পায়ে ছুটে বেরিয়ে গেল স্কুল থেকে। ছুটতে ছুটতে চলে এল বুড়ো শিবতলার কানা গলিতে, "ওগো আমি—" রুদ্ধ কান্নায়, কষ্টে, যন্ত্রণায় ভেঙে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারে নি বিমল। তবু, কি এক অজানা ভয় আর আতঙ্কে কেমন বিচলিত হয়ে পড়ল। শেষে, সব ও শুনল। যদিও তা খুব সংক্ষিপ্ত, ছাড়া ছাড়া। কিন্তু পুরো ছবিটা কল্পনা করতে একটুও কষ্ট হল না। "জানি, আমি জানতাম—" বিমল হঠাৎ পাগলের মত হেসে উঠল। তারপর, আরো কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। পলকে মনে পড়ল শৈশবের সেই ভীষণ স্মৃতি। মাথা ঘুরছে, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। আর মনে হচ্ছে, যেন এখনো ও একটা প্রাণ তাড়া করে ফিরছে। ছিনিয়ে নিচ্ছে, সব দম আর আয়ু। না, মিনতি কিংবা রাতের শ্বাসরুদ্ধ ভয় নয়, যেন ও নিজে, সেই ক্ষীণ প্রাণ চড়াইয়ের মত, সেই-না-দেখা ছেলেটির সব আয়ু শক্ত হাতে ছিনিয়ে নিচ্ছে। বিহ্বল, শঙ্কিত বিমল, চোখের সামনে হাত দুটো খুলল, বন্ধ করল। আর খুব ধীরে, আচ্ছন্ন বিবশ চেতনায় অনুভব করল, পৃথিবীর সব হাওয়া ফুরিয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে এল।

আর মিনতি, চেতন-অচেতন এক দুঃস্বপ্নে আচ্ছন্ন। সেই দুঃস্বপ্নে, যা ওর সব, অথচ পাচ্ছে না, হারিয়ে ফেলেছে, যেন সেটা খুঁজতেই চলে এসেছে, প্রাচীন পরিত্যক্ত এক হল ঘরে। আস্তর খসা, ঝুল আর মাকড়সার জালে আকীর্ণ বড়ো বড়ো থামের পাশে। এক-একবার, খুব ঝাপসা, অস্পষ্ট, দেখতে পাচ্ছে, উজ্জ্বল দুটি চোখ। মিনতি ছুটছে, পড়ে যাচ্ছে মুখ থুবড়ে, মাথা ঠুকে যাচ্ছে বড়ো বড়ো থামে, ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই ওর নাগাল পাচ্ছে না। অথচ, কোথায় যেন ওর উপস্থিতি বুঝতে পারছে মিনতি শুনতে পাচ্ছে ওর হাসি, "উঃ কি মজা—" তখনো কচি গলায় ভয় পাওয়া কান্না, কাতর অনুনয়, "দিদি, আমি পড়া শিখব, দিদি—" না, মিনতি আর পারছে না, ক্লান্তি, ক্লান্তিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে থাকল মিনতি।

তারপর? হ্যাঁ, তারপর কারা কারা যেন এসেছিল। আর হেসে উঠেছিল মিনতি। কাঁদে নি, বিষণ্ণ হয় নি একটুও শুধু হেসেছে।

"বিমল—"

বিমল শুনল, কুয়াশার মত বিবর্ণ, ধূসর, সর্পিল স্মৃতির আবর্তে তলিয়ে যেতে যেতে, বিবশ আচ্ছন্ন চেতনায়, ক্ষীণ, অস্পষ্ট কার যেন ডাক, "বিমল—" কে যেন ডাকছে। কে, বিমল মুখ তুলল। অলস চোখে তাকাতে দূরে দেখল, কার যেন হাতের ইশারা। কে? এলোমেলো ভাবতে গিয়ে, চকিতে মনে পড়ল, সেই বহু প্রতীক্ষিত ডাক। পলকে, অস্থির হয়ে উঠল বিমল। দ্রুত কাঁপা হাতে তুলে নিল ক্রাচ। এতক্ষণ এই ডাকের প্রতীক্ষায় থেকেছে। কিন্তু এতক্ষণ কি এক কঠিন ক্লেশ, উদগ্রীব উৎকণ্ঠায় এতটা সময় পার হয়ে এসে, এই চূড়ান্ত মুহূর্তে, সেই ডাক যখন এল, কেমন বিহ্বল, দিশেহারা হয়ে পড়ল বিমল। তবু, শক্ত মুঠোয় ক্রাচ চেপে ও রাস্তায় নামল, হাঁটল, পার হল সামনের একফালি মাঠ, খানিকটা পিচ রাস্তা। বারান্দায় পা দিতে, কি এক অসহনীয় ক্লান্তি আর অবসাদ, যেন ও আর পারছে না। হাঁপিয়ে পড়ল। কাঁপতে থাকল থর থর করে। তারপর, সেই এক হর ভিড় আর সে ঘরের প্রাচীন, ভারী, ঠাণ্ডা ছায়া ছায়া অন্ধকারে চলে আসতেই, ওর সব অনুভূতি দপ করে নিভে গেল। তখন সবকিছু— নানা কথা, শব্দ, স্পর্শ, টুকরো ছবি, সব; মনে হতে থাকল ফাঁকা, শূন্য আর অর্থহীন। শুধু, কিছুটা তফাতে, একটু উঁচুতে, ম্লান, বিবর্ণ রঙ জ্বলা কোন গুহা চিত্রের মত মিনতিকে দেখতে পেল। তাও খুব স্পষ্ট নয়। সেদিকে স্থির চোখে তাকিয়ে, ওর সব চিন্তা, বোধ কেমন বিক্ষিপ্ত, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। চেনা-অচেনা, স্মৃতিবিস্মৃতিতে দুলছিল। কপাল, হাতের তালু ভিজে, শুকনো ঠোঁট দুটি কাঁপছিল শির শির করে। নিশ্বাস মৃদু, হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুক শব্দে ও ক্রমে টের পাচ্ছিল, সেই কি এক কষ্ট এখন আরো তীব্র, তীক্ষ্ণ হয়ে ওর দু চোখ কান্নায় ভরিয়ে তুলছে। আর ঠিক তখনি, আচমকা কতকগুলো শব্দের ধাক্কায়, ও সব বোধ চেতনা ফিরে পেল হঠাৎ। কে যেন বলছে, কার যেন স্বর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ভীষণ।

"আসামী......মানসিক অসুস্থ...... মুক্তি......"

"মুক্তি!"

বিমল শুনল ফের। আর চকিতে ছুটে গেল, ডান হাতের ক্রাচ ছিটকে পড়ল, ধাক্কা দিল যেন কাকে, মিনতির সামনে দাঁড়িয়ে, ওর হাত আঁকড়ে, বিমল চিৎকার করে উঠল, "মিনু, শুনছো মিনু, তুমি মুক্ত।" স্থির স্তব্ধ কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল মিনতি। তারপর, ঠিক সেই অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল, "খোঁজ, ভালোভাবে খোঁজ, একদিন না একদিন পাওয়া যাবেই—" বিমল আরো কি যেন বলতে গেল, কারা যেন নিয়ে গেল মিনতিকে। কে যেন হাত রাখল পিঠে, "এসো, বিমল, কথা আছে—" বিমল তাকাল, ঠিক চিনতে পারল না। ক্রাচটা যে এগিয়ে দিল, তাকেও ও চেনে না। চেনার চেষ্টাও করল না। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ফিরে এল, সেই রোদে, জ্বলন্ত দুপুরে।

রাস্তাটা সোজা, ফাঁকা আর শূন্য। কিছুদূর গিয়ে, এক বাঁক নিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ক'মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বিমল দেখল। বড় বেশি দীর্ঘ মনে হল। তারপর দেখল দুপুর। তপ্ত, রুক্ষ, তৃষ্ণার্ত, ছায়াহীন এক মরু-প্রান্তরের মত জ্বলছে। বিমল হাসল। গলা শুকিয়ে এল। মাথায় তীব্র যন্ত্রণায় ক্লান্ত বোধ করল। আর হাঁটতে হাঁটতে মনে হল বিমলের, শুধু এ পথটুকু নয়, যেন ও আজীবন, অন্তহীন এমন এক তপ্ত, রুক্ষ, ছায়াহীন মরুপ্রান্তর পার হয়ে যাচ্ছে। মাঝে, যেন ক'মুহূর্ত এক মরুদ্যানে জিরিয়ে আবার শুরু করেছে হাঁটতে। পার হয়ে যাচ্ছে উঁচুনিচু ঢেউয়ের মত এক-একটা বিরাট বিরাট বালির ঢিপি। আর, যতবার যতগুলো বিরাট বালির ঢিপি পার হয়েছে, ততবার সবুজ দিগন্ত দেখা দিয়েছে মিলিয়ে গেছে। হয়তো আরো যতগুলো ঢিপি ও পার হবে, ততবার, সেই সবুজ দিগন্ত দেখা দেবে আর মিলিয়ে যাবে। বিমল হাঁটছে ভাবছে, আর কি একটা হিসেব মনে মনে বিড় বিড় করছে, প্রথম ঘটনা আমার অসুখ, দ্বিতীয় তোমার চাকরি, তৃতীয় ছেলেটির মৃত্যু, চতুর্থ তোমার অসুস্থতা, পঞ্চম তোমার মুক্তি। মুক্তি, ক'বার বিড় বিড় করল বিমল। দ্রুত মনে পড়ল মিনতিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ওর ক্রাচটা নেই। হারিয়ে ফেলেছে। মাথা ঘুরছে, দৃষ্টি ঝাপসা, রাস্তাটা বেঁকেচুরে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তবুও বিমল হাঁটছে, কোন এক অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে, পেরিয়ে যাচ্ছে, অনেকটা তপ্ত, রুক্ষ, ছায়াহীন পথ। এক-একটা ঢিপি। হাঁটছে আর হাঁটছে।

অবোধ শিশু
কিন্তু আপনি মা!
আপনি তো জানেন,
সর্দি বসে গেলে
বাড়াবাড়ি হতে পারে!
সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।
আর একটা কথা। ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায়-যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,-যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।
খুবই সহজ কাজ! তেতো বড়ি না, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না।
ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে যাকে যাকে,— সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে —
বাইরে থেকে গায়ে
ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে
বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে-
গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে।
সব সময়ে মনে রাখবেন।
সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব— নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।
VICKS VapoRub
VICKS VapoRub
VAPORIZING OINTMENT
সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

শির শির করে উঠল, "কি জানি, কেমন যেন মনে হয়েছিল। তবে—"

"যাই হোক, তোমার কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ—" নিজেকে খুব ক্লান্ত, অবসন্ন লাগছিল, বিমল আস্তে মাথা নাড়ল।

"ঠিক আছে—" মধু সোজা হয়ে বসল, "আচ্ছা, আর একটা কথা—" একটু থেমে, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে, ধীর স্বরে বলল, "তুমি কিছু টাকা খরচ করতে পারবে, বিমল?"

"টাকা—কিন্তু—" জিব, গলা, তালু আরো শুকনো কষ্ট হচ্ছিল কথা বলতে, তবু বিমল বলল, জোর করে বলতে, ওর স্বর কেঁপে গেল, "তুমি তো জান মধু, আমি কি ভীষণ গরীব। সেই অসুখটার পর থেকে আমি যে, আমি যে—একেবারে—মধু—"

ক'মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারল না মধু। বিমলের হাতের মুঠোয় ক্লাচ ভীষণ কাঁপছিল, দেখল ক'বার। বলল, "তা হলে কি—"

"না, মধু, না; আমি তা বলছি না—"

"উঃ বিমল—" মধু এবার যেন বিরক্ত, "এতো শুধু মিনতির জীবন নয়, তোমার—"

"কিন্তু মধু—" কি বলতে গিয়েও বলতে পারল না বিমল। নাক, মুখ, কান ওর জ্বালা করছিল। টনটন করছিল মাথার দুপাশ, ঘাড়ের নিচটায়। তীব্র এক যন্ত্রণা কান্না হয়ে পাক খেয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আর, সারা শরীর কাঁপছিল থরথর করে।

"আচ্ছা—" কিছু সময় চুপ থেকে, মধু উঠে দাঁড়াল।

"শোন, মধু, শোন—" নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না বিমল। মধুর হাত শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল, "তুমি বাঁচাও, মধু। তুমি ধনী। তুমি আমার বন্ধু।"

"ছিঃ, বিমল, একি করছ—" নিচু হয়ে মধু, ক্লাচটা মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল, বিমলকে তুলে দিল। তারপর হাত রাখল বিমলের পিঠে, "শান্ত হও। ভাবো। সময় হলেই ডাকবো।"

স্থির, নিশ্চুপ বিমল বসে রইল। খুব ধীরে দেহমন ক্লান্ত বিবশ হয়ে আসছিল। আবিল, আচ্ছন্ন চেতনায় তপ্ত সিসের মত মধুর কথাগুলো ঝরছিল টুপ টুপ করে। আর সেই জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছিল এক বৃত্ত থেকে আরো একটা বৃত্তে।

কিন্তু বিমল, মধুকে যা বলতে পারল না, নিরুত্তর থাকল, বলতে পেরেছিল মিনতিকে। প্রথমটা, মিনতি স্বীকার না করলেও, এক সময়, ঠিক বিমলের মত, তাকেও স্বীকার করতে হয়েছিল, না করে পারে নি।

সেই যখন এক মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ, জ্বরের প্রচণ্ড উত্তাপে, কোষে কোষে, শিরায় শিরায় অসহ্য যন্ত্রণায়, বিমল যেন তখনি বুঝতে পেরেছিল সব। কিন্তু, মিনতিকে বলতে পেরেছিল আরো অনেক পরে। তখন জ্বর আর নেই, কোন যন্ত্রণা। শুধু শরীরের একদিক, একটা পা বিবশ অক্ষম হয়ে আসছিল দিন দিন। আর ততদিনে, একটা আচমকা ধস কিংবা জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মত ছিটকে এসে পড়েছিল, রসা রোড থেকে বুড়ো শিবতলার কানা গলিতে। সে সময়, কোন একদিন, উদ্‌ভ্রান্ত মিনতি কিছু করতে না পারায় তীব্র হতাশা নিয়ে ফিরে এসেছিল যেন কোথা থেকে। শেষে, নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে ভেঙে পড়েছিল আকুল অশ্রান্ত কান্নায় "বলো কি করি, আমি যে আর কিছুই ভাবতে পারছি না।"

ঠিক তখনি, এতদিন পর, মিনতিকে সব বলতে পেরেছিল বিমল।

"কিছু না, আমরা কিছুই করতে পারি না, মিনু।"

ধীর সংযত স্বরে বিমল বলে গিয়েছিল। ওর যতকিছু জ্ঞান, অভিজ্ঞতার নিপুণ ব্যাখ্যায় বোঝাতে চেয়েছিল মিনতিকে। রূপক হিসাবে সমুদ্রের উল্লেখ করেছিল। অনেকটা সেই ঢেউয়ের মত, অনর্গল বলে গিয়েছিল বিমল, ছোট-বড় ঘটনায় তোমার জীবন নির্ভর করছে। আপ্রাণ চেষ্টায় তুমি যে ঘটনার সৃষ্টি করলে, যে ঘটনার ঝুঁটি শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে তুমি বাঁচতে চাইলে, টিকিয়ে রাখতে চাইলে নিজেকে, এক সময় দেখবে, তোমার হাত ছুটে গিয়ে, সেই ঘটনা কোন্ অলক্ষ্যে, অমোঘ অনিবার্যভাবে তোমার ওপর খাড়া হয়ে ঝুলছে, সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেই তোমারই সৃষ্টি, অথচ তোমার হাতছুট ঘটনা। প্রচণ্ড আঘাতে কাঁচপাত্রের মত টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে তোমাকে, চতুর সুনির্দিষ্ট নিয়মে। এরপর, টুকরো টুকরো হবার পর, তুমি হয়তো কতকগুলো কার্য-কারণ খুঁজে পাবে, নিজের কতকগুলো ভুল-ত্রুটি অভাব—কিন্তু মিনু, বৃথা, সব মিথ্যা। তখন শুধু সম্বল কতকগুলো ঘটনার বঞ্চনা, অনিশ্চয়তা, আর যে-কোন মুহূর্তে অস্তিত্ব বিপন্ন কিংবা বিলোপের গ্রাস। যা কখনো বাঁচা নয়, মিনু, তিল তিল মৃত্যু।

এভাবে, বলতে বলতে বিমলের গলা কাঁপছিল, হাঁপিয়ে পড়েছিল। তবু দ্বিধাহীন স্পষ্ট উচ্চারণে কথাগুলো শেষ করেছিল বিমল।

"মিনু, একে তুমি ভাগ্য, নিয়তি, কর্মফল কি ঈশ্বর—যা খুশি বলতে পার। কিন্তু এটাই ঠিক, সত্য।"

কিছু সময় কোন কথা বলতে পারে নি মিনতি। ছলছল চোখে বিমলের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়েছিল। তারপর, সব কান্না মুছে ফেলেছিল দুহাতে। মৃদুস্বরে বলেছিল, "এসব আমি বুঝি না বিমল। শুধু বুঝি আমাদের বাঁচতে হবে। তা যেভাবেই হোক।" ম্লান, বিষণ্ণ হাসিতে বিমল হয়তো আরো কিছু বলত, মিনতি বাধা দিল। কাতর অনুনয়ে, ফিস্‌ফিস্ স্বরে বলল, "এভাবে তুমি বলো না, বিমল। আমার ভীষণ ভয় করে। আমি দুর্বল হয়ে পড়ি।"

হ্যাঁ, ভয়। কি এক অজানা ভয়। সারাক্ষণ ছায়ার মত আততায়ী হয়ে পিছু পিছু ঘুরত। তবু ও ভ্রূক্ষেপ করে নি। শক্ত করেছে নিজেকে। আপ্রাণ যুঝেছে। যে-কোন কাজ, অফিসে কি স্কুলে। ঘুরেছে নানাখানে। দরখাস্ত পাঠিয়েছে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে। পারলে নিজেও গিয়েছে কখনো। শহরের ইট-কাঠ-পাথরে তন্ন তন্ন খুঁজে বেড়িয়েছে একটু স্বস্তি, খানিক নিশ্চয়তা। আর প্রতিবার সেই হতাশা আর ক্লান্তিতে কখনো কিছুটা দিশেহারা হলেও আশা ছাড়ে নি, ভেঙে পড়ে নি।

কিন্তু বিমল, দিন দিন, সেই অসুখের পর থেকে, কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল। সারাক্ষণ চিন্তিত, কি এক আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। বাইরে কোথাও বার হবার সময় এটা যেন আরো বাড়তো। তখন আরো যেন অস্থির, বিচলিত হয়ে উঠত বিমল। ক্লাচ ছাড়া উঠতে পারত না, সারা বিছানায় একবার এখানে, একবার ওখানে সরে সরে যেত। কি সব বলে যেত উত্তেজিত স্বরে। দু' আঙুলের মাঝে সিগারেট কাঁপত শিরশির করে। কিছুটা বুঝত, কিছুটা বুঝত না। কিন্তু, মাঝে মাঝে কেমন অবাক লাগত মিনতির। নানা চিন্তায় মন ভারী হয়ে উঠত। শেষে কি পাগল হয়ে যাবে বিমল। না, না, তা কেন; সঙ্গে সঙ্গে সেসব চিন্তা মন থেকে সরিয়ে ফেলেছে মিনতি; এ সাময়িক, সেই অসুখের হঠাৎ আঘাত বিমল হয়তো এখনো সামলে উঠতে পারছে না। এক সময় ও যদি কোন কাজ পেয়ে যায় কখনো, স্থিতি আসে সংসারে, সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন এ-ভয় আর থাকবে না। বিমল ঠিক আগের মত সুস্থ হয়ে উঠবে। তবু কি এক দ্বিধায় দুলেছে মিনতি। চোখে জল এসে গেছে। বিমলের কাঁপাকাঁপা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বোঝাতে চেয়েছে বিমলকে।

"বারে, কত লোক তো বার হচ্ছে, তাই বলে কি সবার বিপদ হচ্ছে।"

রংঢং

মধু বসুর জীবনাবসান

ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ মধু বসুর মৃত্যুসংবাদ পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যদিও জানতাম যে তিনি অসুস্থ। একথাও শুনেছিলাম যে তাঁর রোগ আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, নিরাময় সম্ভাবনা নেই। তবু সংবাদটি পড়ে বড় অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছে। শোকে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। অত্যন্ত পরিচিত ও ঘনিষ্ঠজনের বিয়োগব্যথায় মন ভরে গেল। মধু বসু ছিলেন সকলের শ্রদ্ধেয়। তাঁর জীবনের শেষ কয়টি বছর আমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং সান্নিধ্যলাভ। চলচ্চিত্র কর্মীদের আন্দোলন, চলচ্চিত্র সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ, চলচ্চিত্র সমিতি সংগঠনে তাঁর আন্তরিকতা এবং বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে সভাপতিরূপে যখন কাছে পেয়েছি তখন তাঁর প্রগতিশীল মনের প্রকাশ আমাদের মুগ্ধ করেছে। চলচ্চিত্র কর্মী ও শিল্পীদের সমস্যার প্রশ্নে তিনি সব সময় কর্মী ও শিল্পীদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। নির্ভীকভাবে শ্রমিকদের পক্ষে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি ছিলেন শিল্পী ও শিল্পস্রষ্টা। রাজনীতির জগতের মানুষ তিনি কখনো ছিলেন না। কিন্তু প্রতিক্রিয়া, রক্ষণশীলতা, শোষণ ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সচেতন। যুক্তফ্রন্টের প্রথম জয়লাভে তিনি চলচ্চিত্র ও নাটকের কর্মী এবং শিল্পীদের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। প্রগতিশীল শিল্পীদের নিয়ে সংযুক্ত শিল্পী সংস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। তাঁর মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্প অতীতের সঙ্গে একটি যোগসূত্র হারাল। চলচ্চিত্র সমিতি আন্দোলনের ক্ষতি অপূরণীয়।

গত বছর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি সভাপতি ছিলেন। উৎসবের শেষ দিন প্রধান অতিথি দেবকী বসুর সঙ্গে একটা ছবি তোলার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। 'দু-জনে একই পথপরিক্রমা করেছি, স্মৃতি হয়ে থাক এই ছবি, কে কখন চলে যাই কে জানে।' তাঁর এই কথাগুলি আজ মনে পড়ছে। মধু বসু, দেবকী বসু ও মন্মথ রায়ের একসঙ্গে একটা ছবি তোলা হয়েছিল। তিনি বোধ হয় বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, আমরা চেয়েছিলাম তিনি আরো দীর্ঘজীবী হোন।

শ্রদ্ধেয় মধু বসু অনেক ছবি তৈরি করেছেন। তার মধ্যে আলিবাবা, কুমকুম দি ডান্সার, শেষের কবিতা আর মাইকেল মধুসূদন তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। কুমকুম হিন্দী ছবিতে তিনি শ্রমিকদের পক্ষে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন। ভারতে সম্ভবত 'কুমকুম' প্রথম ছবি যাতে শ্রমিক আন্দোলন সমর্থন করা হয়েছে। নাট্যমঞ্চে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর 'আলিবাবা' গীতি নৃত্যনাট্য দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এই নাটকে অনেক শিক্ষিতা মহিলা অংশগ্রহণ করে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। 'আলিবাবা'র অভিনয় এবং নৃত্যরীতি অভিনব ছিল। পরে মঞ্চের এই নৃত্যনাট্য চলচ্চিত্র রূপ লাভ করে। ১৯২৪ সালে ম্যাডান থিয়েটারের একটি ছবিতে তাঁর প্রথম অভিনয়। তারপরে হিমাংশু রায়ের 'লাইট অব এশিয়া' ছবিতে অভিনয় করেন। চলচ্চিত্রের ব্যাপারে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন এবং আলফ্রেড হিচকক, ভোঁর্তীমনিয়ার প্রমুখের সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলা ছবি নির্মাণে তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। একসময় তাঁর চিত্র নির্মাণরীতি অন্যদের কাছে অনুকরণীয় ছিল। অভিনেতা হিসাবেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর নির্মিত ছবির মধ্যে রাজনর্তকী, অভিনয়, রাখী, মহাকবি গিরিশচন্দ্র, শুভলগ্ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রখ্যাত ভূতাত্ত্বিক প্রমথনাথ বসুর তিনি কনিষ্ঠ পুত্র। টাটানগরে শিল্পপত্তনের গোড়ায় ছিলেন প্রমথনাথ বসু। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন মধু বসুর মাতামহ। তাঁর স্ত্রী সাধনা বসু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পৌত্রী। নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রীরূপে তাঁর পরিচিতি সারা ভারতে ব্যাপ্ত হয়েছিলেন। একসময়ে তিনি প্রচুর আয় করেছেন, তেমন ব্যয়ও করেছেন, কিন্তু জীবনের শেষকালে তাঁকে আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু কোনদিন তাঁর আর্থিক সংকটের কথা কারো কাছে প্রকাশ করেন নি।

বাংলার নাটক ও চলচ্চিত্রশিল্পের অন্যতম প্রয়োগকর্তা ও প্রেরণাদাতার প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। —সুজন।

মধু বসু

চিত্র আলোচনা

জাপানী ফিল্ম সেসন

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ এবং জাপানী দূতাবাসের যুক্ত উদ্যোগে কলকাতায় আবার জাপানী চলচ্চিত্র সেসন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই চলচ্চিত্র সেসনে বারোটি ফিল্ম সোসাইটির প্রায় বারো-তেরো হাজার সদস্য ছবিগুলি দেখেছেন। এই সদস্যদের ছবি দেখাবার জন্য রূপবাণী সিনেমা, একাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবন এবং সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হল—এই তিনটি জায়গায় প্রতিদিন তিনটি করে শো-র ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

এই সেসনে প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক আকিরা কুরোশাওয়ার দুটি ছবি 'রশোমন' এবং 'রেড বিয়ার্ড'। এ দুটি ছবি ইতিপূর্বে কলকাতায় প্রদর্শিত হয়েছিল। বিশ্বের চলচ্চিত্র আলোচনায় এ দুটি ছবি বার বার আলোচিত হয়েছে। যাঁরা আগে দেখেছেন তাঁরাও এই ছবি দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সর্বাধিক বেশি দর্শক এ দুটি ছবি দেখেছেন।

'রশোমন'-এর কাহিনীর পটভূমি প্রায় বারো 'শ' বছর আগের জাপান। কাহিনীর মূল চরিত্র তিনটিঃ ডাকাত তজোমারু, এক জাপানী অভিজাত এবং তাঁর সুন্দরী স্ত্রী। স্ত্রীকে নিয়ে বনের পথ ধরে যাবার সময় তারা তজোমারুর নজরে পড়ে। স্ত্রীর

সোভিয়েট ছবি 'অ্যামবাসাডার অব দি সোভিয়েট ইউনিয়ন'-এর একটি দৃশ্য

রূপে তজোমারু প্রলুব্ধ হয়। স্বামীকে লোভ দেখিয়ে পাহাড়ের ওপরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রেখে এসে স্ত্রীকে সে বলাৎকার করে।

এই কাহিনীর তিন উপনায়ক এক কাঠুরিয়া, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং পরিচারক। বর্ষার প্রবল ধারার মধ্যে এই তিনজন মানুষ এক পরিত্যক্ত শহর-তোরণে অপেক্ষা করছে। কাঠুরিয়ার মনে পড়ছে এক ভয়ঙ্কর স্মৃতিকথা। পরিচারকের পীড়াপীড়িতে সে বলল কিভাবে বনের মধ্যে এক অভিজাতের মৃতদেহ এবং এক রমণীর শির, আবরণ ইত্যাদি দেখতে পেয়ে ছুটে এসে শহর-কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়েছিল। তার কয়েক দিনের মধ্যে ডাকাত তজোমারু ধরা পড়ে। তখন শহর অধ্যক্ষের সামনে কাঠুরিয়া, ডাকাত তজোমারু এবং সেই নারী ঘটনা বিবৃত করে। প্রেতক্রিয়ার মাধ্যমে স্বামীর বক্তব্যও জানা যায়। দেখা যায়, তিনজনের মধ্যে কোন দুজনের বক্তব্য এক নয়, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কথার অমিল রয়েছে। তজোমারু বলল—অভিজাত লোকটিকে লোভ দেখিয়ে বেঁধে রেখে তার স্ত্রীকে সে বলাৎকার করে, কিন্তু স্ত্রী শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করে। তখন স্ত্রী বলল, তার এই বে-ইজ্জতির সাক্ষী রেখে সে বাঁচতে পারে না। দুজনের একজনকে মরতে হবে। তজোমারু দ্বৈত দ্বন্দ্বে তার স্বামীকে হত্যা করে। স্ত্রী বলল: তাকে বলাৎকার করার পর দস্যু নিজের পরিচয় জানিয়ে খোঁচা দেয়। দস্যু চলে গেলে সে স্বামীকে মুক্ত করে, কিন্তু স্বামী এমন উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে যে সে মূর্ছিতা হয়ে পড়ে। জ্ঞান হয়ে দেখে স্বামীর বুকে তারই ছুরি বিদ্ধ হয়ে আছে। স্বামীর প্রেতাত্মার কথায়: বলাৎকারের পরে দস্যু তার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, স্ত্রী তার স্বামীকে হত্যা করার কথা বলছিল। তখন দস্যু স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে তারা এই নারীকে হত্যা করবে কি-না। সে-কথা শুনে স্ত্রী পালিয়ে যায়, দস্যু তার পেছনে দৌড়ায়। এসময় লোকটি নিজেকে হত্যা করে। শেষে কাঠুরিয়া বলল: একটা মেয়েলোকের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করতে স্বামী রাজী ছিল না। তার কাছে স্ত্রী অপেক্ষা ঘোড়াটা হাঁকাবার জন্য আক্ষেপ বেশি ছিল। মহিলার তাড়নায় লোকটি দ্বৈত-দ্বন্দ্বে বাধ্য হয় এবং তাতে তার স্বামীর মৃত্যু ঘটে। প্রকাশ পেল যে, কাঠুরিয়া সেই মহিলার ছোরাটি চুরি করে রেখেছে—এই কথাটিও গোপন রেখেছে। ওদের গল্প বলা যখন শেষ হয়েছে তখন তোরণের অভ্যন্তরে একটা পরিত্যক্ত শিশু আবিষ্কার করা গেল। পরিচারক শিশুটির কাপড়-চোপড় নিয়ে চলে গেল। কাঠুরিয়া নিয়ে গেল শিশুটিকে। যদিও তার ছয়টি সন্তান এবং সে দরিদ্র, কিন্তু সে ভাবল ছয়জনের মধ্যে এ-শিশুটিও বাঁচবে।

ছবিটির সৌন্দর্য অঝোর বর্ষার দিনে গল্প বলার ভঙ্গিতে। গল্পটিকে ধীরে ধীরে তিন পর্যায়ে এমনভাবে বলা হয়েছে যাতে রহস্য ঘন হতে ঘনতর হয়ে ওঠে। একটা রহস্যের জাল বিস্তার করে পরিচালক দর্শকদের উৎসাহী করে তুলেছেন রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য। ঐ তিনটি লোকের চরিত্র এবং কে কোথায় গোপন করছে সেকথা উদ্ধার করার জন্য। এই রহস্যময়তা ছবিটির সৌন্দর্য। আর এরই মধ্যে লোকচরিত্রের বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত। তবে শেষ পর্যন্ত পরিচালক সাধারণ মানুষের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

ছবির প্রধান অভিনেতা দস্যু তজোমারুর ভূমিকায় তোসিরো মিফুন। মিফুন কত বড় অভিনেতা তা বোঝা গেছে 'রশোমন' এবং 'রেড বিয়ার্ড'-এ তাঁর অভিনয়ে। তাঁর অসাধারণ অভিনয়-কৃতিত্বে এই দুটি ছবিই পরম সার্থকতা লাভ করেছে। এই অভিনয়ের জন্য মিফুন আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ক্ষমতাবান অভিনেতা হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছেন। 'রেড বিয়ার্ড' সম্পর্কে আমরা নতুন করে আলোচনা করলাম না। এই ছবিটি তার মানবিক আবেদনের জন্য বিখ্যাত। ছবিটিতে গর্কির নিচের মহলের কিছুটা প্রভাব আছে মনে হয়।

এই সেসনে অপর দুটি ছবির মধ্যে রয়েছে পরিচালক ইচিকাওয়ার 'এলোন অন দি পেসিফিক'। একক অভিনয়ে আর চিত্রগ্রহণের বাহাদুরীতে এই ছবিটি দর্শনীয়। এক জাপানী তরুণ একা একটা ডিঙি ভাসিয়ে কি করে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়েছিল—তা নিয়ে এই ছবি। অপর ছবিটি 'তাইরা ক্ল্যান সাগা'।

মাসিক ১০৲ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০৲। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

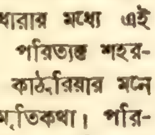

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

নাটকের কথা

দিল্লীতে রঙ্গশ্রীর অভিনয়

কলকাতার রঙ্গশ্রীগোষ্ঠী দিল্লীর চেনামহলগোষ্ঠীর আমন্ত্রণে স্থানীয় ফাইন আর্টস হলে 'বেনজু' ও 'আমেন' এবং 'এলেম নতুন দেশে' মঞ্চস্থ করলেন তিনদিনের এক নাট্যোৎসবে। বলতে দ্বিধা নেই প্রতিটি অভিনয়েই রঙ্গশ্রী-গোষ্ঠী দুর্লভ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে স্থানীয় নাট্যরসিকমহলের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে অভিনন্দিত হন। রঙ্গশ্রী-গোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্য নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতা র মে ন লাহিড়ীর এবং শিল্পীদের মধ্যে রেণু ঘোষ, সত্য চ্যাটার্জী, সন্ধ্যা পাল, শিশির চ্যাটার্জী, সুর্য দাস কেষ্ট দাস, দেবাশীষ চক্রবর্তী, প্রণব সিনহা, গোপাল ঘোষ, দিলীপ মুখার্জী, বিশ্বনাথ সাঁতরা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বিশ্বনাথ পালের আলোকসম্পাত ও অরুণ দাসের আবহসঙ্গীত সামগ্রিক প্রযোজনার মানোন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হয়। স্থানীয় নাট্যরসিকমহলে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত 'এলেম নতুন দেশে' এবং মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ 'বেনজু' নাটক দুটি ভাবগত ঐশ্বর্য ও রচনাশৈলীর জন্য বিশেষ সমাদর লাভ করে।

সাকী নাট্যগোষ্ঠী

পূর্ব কলকাতার সাকী নাট্যগোষ্ঠী শ্রীরাধাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় তাঁদের প্রথম নাট্যার্ঘ্য গঙ্গাপদ বসুর 'সত্য মারা গেছে' নিবেদন করেন গত ১০ই সেপ্টেম্বর নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট নাট্যমঞ্চে।

স্ব স্ব ভূমিকায় সকলেই মোটামুটি নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তবে এর মধ্যে যাঁদের অভিনয় সকলের প্রশংসা পেয়েছে তাঁরা হলেন পূর্ণিমা চক্রবর্তী (মিলি মিটার), চন্দ্রশেখর ভদ্র (জে· ডি· মিটার), অশোক ঘোষ (ক্যাবলা), নীলমণি সোম (দুলাল), বাবলু সেন (সুশোভন), দিলীপ বসু (গড়গড়ি), শাশ্বতী মুখার্জী (ডলি), দিলীপ মুখার্জী (বিষ্টুচরণ), সীতাংশু বসু (দেওয়ান), ইন্দ্রশেখর ভদ্র (মিঃ সোম), চিত্তরঞ্জন মিত্র (ইন্সপেক্টার), হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও দেবব্রত মিত্র। ছোট দুটি ভূমিকায় পার্থসারথি সোম (নায়ক) এবং মৃগাঙ্কশেখর বসুর (সূর্যনারায়ণ) অভিনয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

কয়েকটি ত্রুটির কথাও এ প্রসঙ্গে না উল্লেখ করে পারছি না। যেমন, নির্জন ঘরে বসে ক্যাবলার কান্নার দৃশ্যে তার চোখে এক ফোঁটা জল দেখা গেল না। প্রণয় দৃশ্যেও বড় নিষ্প্রভ মনে হল তাকে।

'অগ্নিযুগের কাহিনী' চিত্রে মাধবী মুখার্জী ও গীতা দে

করবীর 'নীচের মহল'

দমদম অঞ্চলের একটি নাট্য সংস্থার নাম করবী। পাড়ার ছেলেরা মিলে এই সংস্থাটি গঠন করেছে। অভিভাবকরা প্রায় সবাই পৃষ্ঠপোষক। যদিও সংস্থার বয়স এগার বছর, কিন্তু এক বছর সময়ের মধ্যে করবী বহু নাটকের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার নিয়ে এসেছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জীবনমৃত্যু, প্রস্তাবনা, অনির্বাণ প্রভৃতি নাটক অভিনয় করেছে।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারে করবীর একাদশ বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠান হয়েছে। বিকাল থেকে বৃষ্টি, তা সত্ত্বেও করবীর শুভানুধ্যায়ীরা সবাই উপস্থিত হয়েছেন প্রাকৃতিক বাধা অগ্রাহ্য করে। নাটকের প্রারম্ভে সভাপতি বরণ করে স্বল্পক্ষণের এক অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাংবাদিক শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত। তিনি করবীর প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে গর্কির নাটকের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন।

এই দিন করবীর অভিনীত নাটক ম্যাক্সিম গর্কির লোয়ার ডেপথ-এর বাংলা অনুবাদ 'নীচের মহল'। 'নীচের মহল' শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য অনূদিত। নীচের মহল-এর মত পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনয় করবীর পক্ষে দুঃসাহসের পরিচায়ক। কারণ যে জনবল ও অভিনয়ক্ষমতা প্রয়োজন, করবীর মত ছোট সংস্থার পক্ষে তা প্রায় সাধ্যাতীত। কিন্তু আনন্দের কথা করবীর সদস্যরা 'নীচের মহল' সার্থক অভিনয় করেছেন। যাঁরা ইতি-পূর্বে বিশিষ্ট কোন দলের 'নীচের মহল' অভিনয় দেখেছেন তাঁরা করবীর 'নীচের মহল' দেখে অবশ্যই প্রশংসা করবেন। যদিও প্রথম অংশের তুলনায় শেষাংশে স্পষ্টতা কম ছিল, তথাপি সামগ্রিকভাবে নাটকটি সুনির্দেশিত এবং দলগত অভিনয়ে সার্থক। অভিনয়ে নন্দিনীর ভূমিকায় কবিতা গাঙ্গুলী, রাণীর ভূমিকায় কেয়া রায়, লক্ষ্মীর ভূমিকায় ছবি ঘোষ এবং তুষার ভট্টাচার্য, হাবলু চৌধুরী, নৃপেন দেব, আনন্দ কানুনগো, মণিব্রত মুখার্জী প্রমুখ প্রশংসনীয়।

অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেছেন—সনৎ বসু, ছায়া দেব, প্রদীপ বসু, প্রভাত রায়, চন্দন কানুনগো, সবিতা রায়, সমর দাশগুপ্ত, প্রদীপ ভৌমিক প্রমুখ। নাটকটি পরিচালনা করেছেন নৃপেন দেব।

স্টুডিও খবর

"প্রতিজ্ঞা" ছবির শুভমহরৎ

দুপ্রতি ক্যালকাটা মুভিটোন

স্টুডিওতে নবগঠিত "জয়েন ফিল্মস"-এর প্রথম চিত্রপ্রয়াস "প্রতিজ্ঞা"-র শুভমহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সন্দেহ, সংশয় এবং রহস্যমূলক এক কাহিনীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এই "প্রতিজ্ঞা"। শ্রী আর, বি, মেহতা ক্ল্যাপস্টিক দিয়ে শুভ অনুষ্ঠান শুরু করেন। বাসবী নন্দী এবং তরুণকুমারকে নিয়ে ছবিটির প্রথম দৃশ্য গ্রহণ করেন পরিচালকগোষ্ঠী "চিত্রদূত"। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা এবং শিল্পনির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে সুনীল চক্রবর্তী, অমিয় মুখার্জী এবং বিজয় বসু।

বাসবী নন্দী, তরুণকুমার ছাড়া শ্যামল ঘোষাল, অমর মুখার্জী, নবাগতা তৃপ্তি কুমার এবং উপেন্দ্র ছবির অন্য দুই ভূমিকায় থাকবেন।

'শচী মা-র সংসার'-এর চিত্রগ্রহণ শুরু

পরিচালক ভূপেন রায়ের পরবর্তী ছবি "শচী মা-র সংসার"-এর চিত্রগ্রহণ গত ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। মালবিকা চিত্র নিবেদিত ছবিটির একটানা ২০ দিনের সুটিং-এ যাঁরা অংশ গ্রহণ করছেন তাঁরা হলেন—নিমাই—অসীমকুমার, নিতাই—দিলীপ রায়, শচীমাতা—সন্ধ্যারাণী, অদ্বৈতাচার্য—মিহির ভট্টাচার্য, শ্রীবাস—শঙ্করনারায়ণ, ঈশান—জহর রায়, মালিনী—সমিতা বিশ্বাস, হরি-মালী—তরুণকুমার, লক্ষ্মীপ্রিয়া—নবাগতা সংহিতা রায়। ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—অনন্ত চ্যাটার্জী। মানবেন্দ্র মুখার্জী ছবিটির সুরকার। সম্প্রতি গানগুলো রেকর্ড করা হয়েছে। গেয়েছেন—সন্ধ্যা মুখার্জী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা ব্যানার্জী, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শ্যামলী মুখার্জী, শুক্লা পালিত ও রত্না রায়।

চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে—ননী দাস ও অমিয় মুখার্জী।

এস, বি, ফিল্মস ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

আবিরে রাঙানো

সমস্ত নতুন শিল্পী নিয়ে পরিচালক অমল দত্তের চিত্র প্রচেষ্টা "আবিরে রাঙানো" তরুণ নাট্যকার মধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছোট্ট গল্প অবলম্বন করে এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক। মূল বক্তব্য আজকের সমাজে নাটকই পারে আবিরে রাঙানো আকাশের মত অন্ধকারের মাটি ও মানুষকে আলোয় ভরিয়ে দিতে। প্রগতি চিত্রমের পতাকাতলে ছবিটি তৈরি হবে। ছবিতে অংশ গ্রহণ করবেন সুচন্দ্রা পাল, অনিল মুখার্জী, নিপন গোস্বামী, নমিতা ঘোষ, বাপী ঘোষ, সৌজিৎ পাল, জগদীশ চক্রবর্তী, দেবপ্রসাদ কুণ্ডু, শ্রদ্ধানন্দ ব্যানার্জী, দীপক চ্যাটার্জী এবং নট-নটী নাট্যসংস্থার অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা। এ ছাড়া জ্ঞানেশ মুখার্জী, অরুণ মুখার্জী, নিরঞ্জন রায়, জহর রায়, গীতা দে, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, বেবী গুপ্তা। সঙ্গীত পরিচালক—মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিরণ্ময় সেন পরিচালিত 'বালক গদাধর' ছবিতে কুমারী চমকী।

'দীপ্সান' ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও মাঃ মলয়।

সংবাদ কনা

নতুন যাদুকর

যাদুকর পি, সি, সরকারের ছেলে প্রদীপ সরকার বিশেষ এক চমক সৃষ্টি করে যাদুখেলার জগতে প্রবেশ করলেন। পি, সি, সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেছেন। বিশ্বের বড় বড় শহরে খেলা দেখিয়ে ভারতীয় যাদুকররূপে সম্মান লাভ করেছেন। প্রদীপ সরকার এমন এক খেলা দেখালেন যা বাস্তবিক বিস্ময়কর। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ডায়মণ্ডহারবার থেকে পঁচিশ মাইল দূরে সাগরের মোহনায় একটি লঞ্চের মধ্যে প্রথমে একটি ক্যানভাসের থলেতে, তারপরে থলে সমেত বাক্সের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাক্সটি সাতটি তালাবন্ধ করা হয়। তখন জোয়ারে জল ফুলে উঠেছে। একটা কপিকলে করে বাক্সটি জলে নামান হয়। কথা ছিল বাক্সটি ডুবে গেলে তিনি বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু জলের স্রোতে বাক্সটি ডোবে না, ভেসে যেতে থাকে। বাক্সের নিচ দিয়ে প্রদীপ সরকার বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে এসে তিনি স্রোতের মুখে পড়েন, কিন্তু একটা লাইফবয়ের সাহায্যে লঞ্চে উঠে আসেন। জল থেকে উঠে প্রদীপ সরকার ঘোষণা করেন তিনি বেঁচে আছেন।

এই খেলা দেখার জন্য অনেক সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যাদুখেলার জগতে প্রদীপ সরকার—পি, সি, সরকার জুনিয়র নামে পরিচিত হবেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন তাঁর এই খেলা আমেরিকায় দেখাবার ইচ্ছা আছে।

যাদুকর পি, সি, সরকার জুনিয়রের সমুদ্রবক্ষে খেলা। (১) তাঁকে ক্যানভাসের থলিতে পোরা হচ্ছে (২) বাক্স বন্দী করে সমুদ্রে ফেলা হচ্ছে (৩) বাক্স থেকে বেরিয়ে লাইফবয় করে জাহাজে উঠছেন।

এরূপ খেলা ইতিপূর্বে ইউরোপে ও ভারতে প্রদর্শিত হয়েছে। যাদুর জগতে এরূপ খেলার কলাকৌশল জানা থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু সাহস করে এভাবে খেলা দেখাবার ঝুঁকি নেওয়া কম প্রশংসার কথা নয়। যাদু খেলার বৈশিষ্ট্য—খেলা দেখাবার রীতি ও পরিবেশ সৃষ্টিতে। পি, সি, সরকার জুনিয়র-এর আমরা আরো সাফল্য কামনা করি।

রবীন্দ্র সদনে হিটলার

আগামী ৬ই অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যা ৬॥টায় কলকাতার সর্বাধুনিক মঞ্চ রবীন্দ্র সদনে তরুণ অপেরার শিল্পীরা "হিটলার" পালা অভিনয় করবেন। তরুণ অপেরা দলের নিজস্ব প্রচেষ্টায় রবীন্দ্র সদনে এই অভিনয়।

জামশেদপুরে রঙ্গশ্রী

দিল্লীতে সফল নাট্য প্রয়োজনার পর রঙ্গশ্রীগোষ্ঠী জামশেদপুর মিলনীর আমন্ত্রণে স্থানীয় মিলনী মঞ্চে এলের নতুন দেশে ও আমেন এবং বেনজু ও মনোবিকলন মঞ্চস্থ করবেন ৪ঠা ও ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায়। নাটক ও নির্দেশনা রমেন লাহিড়ীর।

এই তব শুভ আশীর্বাদ !

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে গান্ধিজী কথাপ্রসঙ্গে প্রিয় শিষ্য শ্রীসতীশ দাশগুপ্তকে বলেছিলেন, তাঁর বড় ইচ্ছে যে একটি সত্যিকারের ভালো স্বদেশী কালি তৈরী হয়। দেশের মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত দুই তরুণ "মৈত্র" ভ্রাতা তখন সবে জেল থেকে বেরিয়েছেন। সতীশ বাবু তাঁদের দুজনকে ডেকে এই মহৎ কাজের ভার দেন। সহায় সম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই, তবু শুধু নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেম সম্বল করেই তাঁরা দুজন এই দুঃসাধ্য ব্রতের ভার মাথায় তুলে নেন। আজকের বিশ্ববিখ্যাত সুলেখা ফাউন্টেন পেন কালির এই হল গোড়ার কথা।

সুলেখার আজ যে এই সুনাম ও সমাদর, এটা গ'ড়ে উঠতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে, নিরলস গবেষণা, কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সমর্থনে এই বিপুল সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

যাঁর প্রেরণা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু, সেই জাতির জনকের পুণ্য জন্মশতবর্ষে, তাঁর উদ্দেশ্যে বিনত নমস্কারে নিবেদন করি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক, কলিকাতা৩২

Progressive/SW-46

খেলা ধুলা

অভিনন্দন

ফুটবল, হকি এবং ক্রিকেটে ডাবল লাভ করে মোহনবাগান এবার সৃষ্টি করেছে একটি ঐতিহাসিক রেকর্ড। ১৯১১ সনে গোরা দল ইস্ট ইয়র্ককে হারিয়ে মোহনবাগান ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের মন জয় করে পরিগণিত হয়েছিল জাতীয় দল হিসেবে। অনেক পথ পেরিয়ে এসে, অনেক উত্থান-পতন সত্ত্বেও মোহনবাগানের সেই ট্রাডিসন আজো সমানে বয়ে চলেছে। এক সময় ছিল যখন ট্রফি নয় খেলাই ছিল আসল। গোরা আর সাহেবী দলগুলোকে হারানোই ছিল সব থেকে বড় কথা। সে যুগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ময়দানী ফুটবলের লাইম লাইটে এসেছে নিজেদের মোহনবাগানের ছোট ভাই হিসেবে ঘোষণা করেই। তখন কি মধুর সম্পর্ক ছিল ক্লাবগুলোর মধ্যে। সকলে সমবেতভাবে চেষ্টা করতো ফুটবল খেলার মান উন্নত করার জন্যে। সেই দিনগুলোকে এখন কি আমরা ফিরে পেতে পারি না? তা যে পারি তার সব থেকে প্রমাণ হলো আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যালের পর ইস্টবেঙ্গলের দর্শকদের প্রশংসনীয় এবং খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দেবার কথা যদি মনে করি। মাঠে উপস্থিত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থকরা সেদিন মোহনবাগান ক্লাবকে আর ক্লাবের খেলোয়াড়দের ও কোচ শ্রীঅমল দত্তকে জানিয়েছিলেন তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। তাঁদের সংগে গলা মিলিয়ে আমরা মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়, কোচ এবং কর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক বসুমতী এবং তার অগণিত পাঠক-পাঠিকাদের তরফ থেকে বিজয়াভিনন্দন জানাই। —শান্তিপ্রিয়

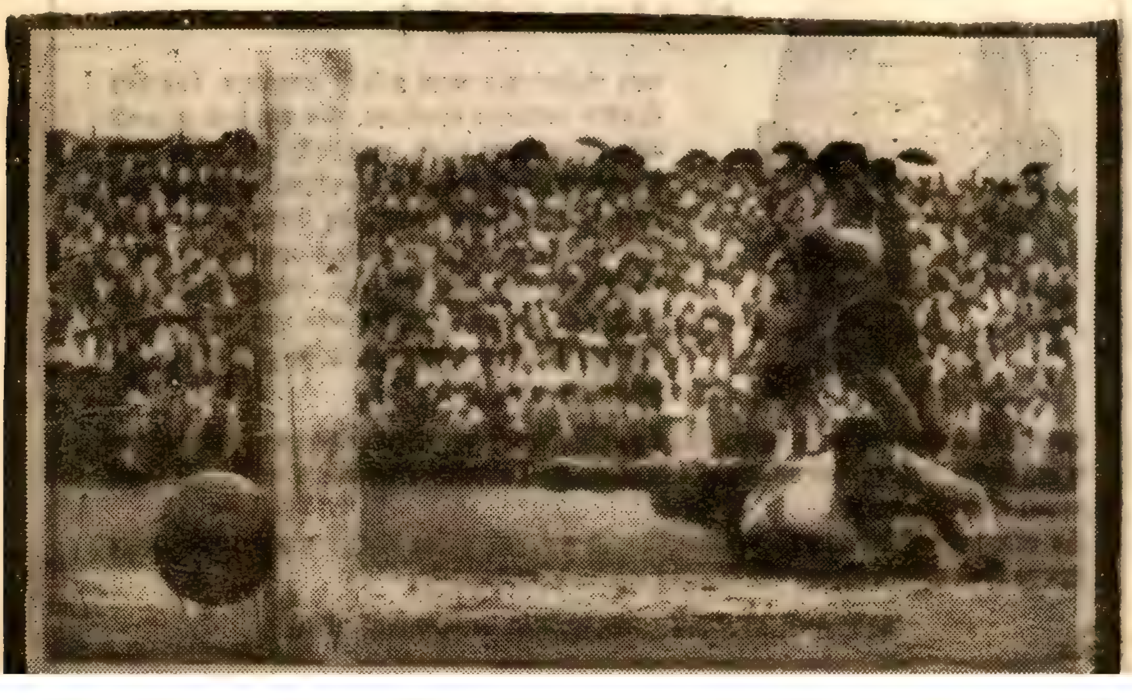

ফুটবল-ফুটবল

কলকাতার ফুটবলের আসর এবারের মতো শেষ হয়ে গেছে। বাকী যা থাকলো তা হলো ছোট-খাটো দু-চারটে প্রতিযোগিতার খেলা। এ বছরের ফুটবল খেলা বলতে বোধহয় বলতে হবে শুধু মাত্র মোহনবাগানের কথাই।

বেশ কয়েকবছর পরে মোহনবাগান আবার ঘরে তুলেছে লীগ আর শীল্ড। লীগের কথা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু শীল্ডের খেলার প্রথম থেকে মোহনবাগান যে দাপটে খেলেছে তাদের সেই খেলার ধারা অব্যাহত ছিল শেষ পর্যন্ত।

আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যালে মোহনবাগান দিয়েছিল ঠিক একই ধরণের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয়। একথা বললে বোধহয় সবটা বলা হবে না। বলতে হবে যে মোহনবাগান সেদিন খেলেছিল ঝড়ের গতিতে। সে গতির সামনে যেন দাঁড়াতেই পারেন নি ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা।

প্রথম গোলটা হবার আগে তবু তাঁরা কিছুটা খেলেছিলেন। কিন্তু প্রথম অর্ধের প্রথম দিকে মোহনবাগানের পি গাঙ্গুলী গোল দেবার পর খেলার ধারাই গেলো বদলে। মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের দাপটে তাঁরা যেন হঠাৎ চুপসে গেলেন। কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়লেন তাঁরা। খেলার ছন্দ ভুলে গিয়ে তাঁরা সৃষ্টি করতে লাগলেন বিরাট বিরাট গ্যাপ।

আর তার সুযোগ নিয়ে মোহনবাগানের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা বার বার বিপদ সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগকে ভেঙে তছনছ করে দিলেন। প্রথম অর্ধেই তাই মোহনবাগান দিয়ে বসলো তিন তিনটে গোল।

খেলার তখন আর কিছুই বাকী ছিল না। পি গাঙ্গুলীর দুটো আর সুকল্যাণের একটা গোলে মোহনবাগান তখন এক রকম পেয়েই গেছে আই এফ এ শীল্ড। দ্বিতীয় অর্ধে তাঁরা বোধহয় তাই একটু গা আলগা দিয়ে খেললেন।

কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা তাও কিছু করতে পারেন নি। দ্বিতীয় অর্ধে ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা যদি নতুন উদ্যমে খেলতে শুরু করতেন তাহলে চেহারাই যেত পাল্টে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে উঠতো খেলা। কিন্তু তা পারেন নি ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা।

চুম্বক

১৯৫৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কেপটাউনের টেস্ট খেলায় দলের শেষ ৩২ রানের মধ্যে হারিয়েছিল তাদের শেষ আটটি উইকেট। মাত্র ৯৯ রানের মাথায় শেষ হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সেই ইনিংস। দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রেভর গডার্ড একাই ৫৬ রান করে নট আউট ছিলেন, তিনি দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা ৬ মিনিট উইকেটে থেকে কৃতিত্বের স্বাক্ষর দেন।

* * *

১৯৫৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কেপটাউনের টেস্ট খেলায় ৫ রানের মধ্যে তাদের শেষ ৬টি উইকেট হারায়। মাত্র ৭২ রানের মাথায় শেষ হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সেই ইনিংস।

—হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র

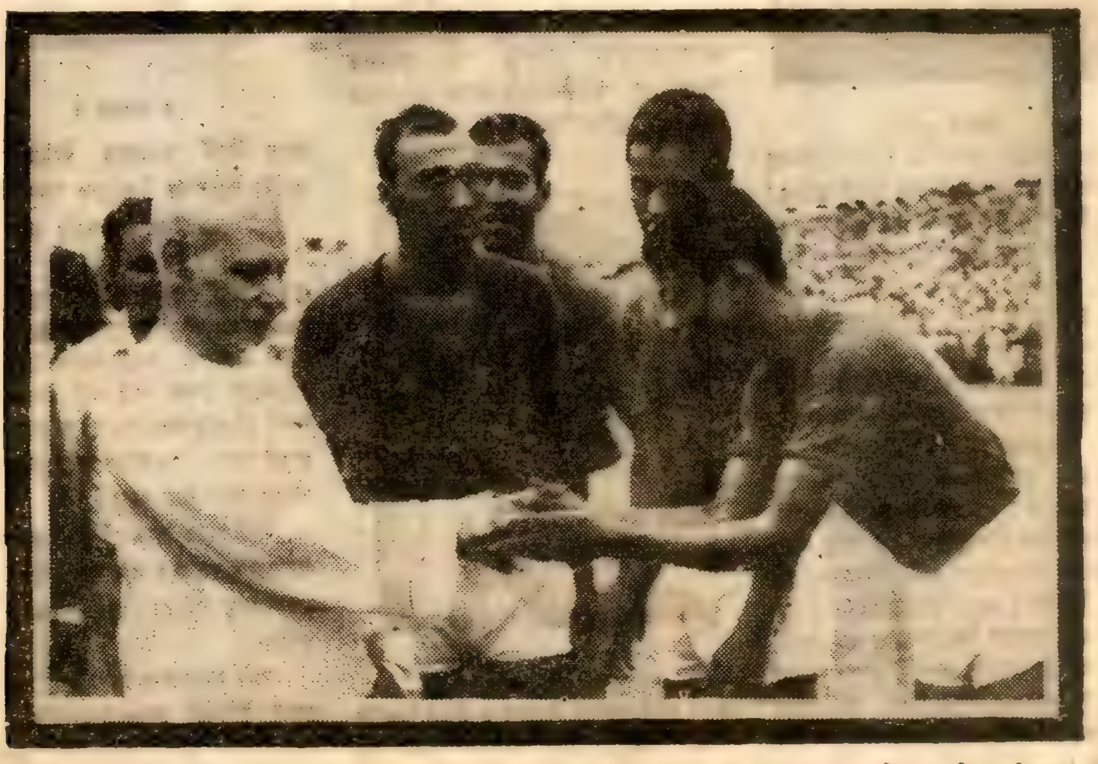

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সংগে মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন দলের

দ্বিতীয় অর্ধের আগেই তাঁরা যেন হার মেনে নিয়েছিলেন। তাই বোধহয় মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না তাঁদের। তবু তারই মধ্যে শোধ হয়ে গেলো একটা গোল।

কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়। তিন-এক গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে মোহনবাগান দু'বছরের অসমাপ্ত এবং পরিত্যক্ত থাকা আই এফ এ শীল্ডকে ঘরে তুললো।

এ বছর মোহনবাগান ক্লাবের জয় জয়াকার। তারা ক্রিকেটের লীগ চ্যাম্পিয়ান আর নক আউটেও লাভ করেছে চ্যাম্পিয়ানশীপ। হকিতে পেয়েছে লীগ আর বেটন কাপ। শেষ পর্যন্ত ফুটবলের লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করার পর তাঁরা ঘরে তুলেছেন আই এফ এ শীল্ড। এককথায় বলা যায় যে, কলকাতা ময়দানের সব ক'টি ট্রফিই এবার মোহনবাগান

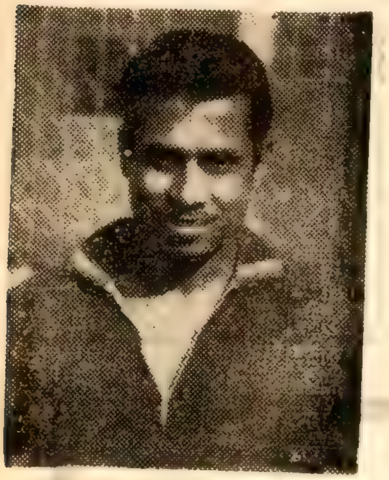

॥ অমল দত্ত ॥

মোহনবাগানের লীগ ও শীল্ড জয়ের পেছনে এঁর অবদানই সব চেয়ে বেশি। কোচ হিসেবে শ্রী দত্ত এবার তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আবার প্রমাণ করলেন।

ক্লাব ঘরে তুলে সৃষ্টি করেছে এক ঐতিহাসিক রেকর্ড।

মোহনবাগান ক্লাবের সমর্থকদের চোখ এখন রোভার্স আর ডুরান্ড কাপের ওপর। বম্বের রোভার্স আর দিল্লীর ডুরান্ডের ফলাফলের জন্যে তাঁরা আছেন সাগ্রহে অপেক্ষা করে। মোহনবাগানের কোচ শ্রীঅমল দত্তর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর আন্তরিক পরিশ্রমের ফলে মোহনবাগান ঐ দু'টি এখন ঘরে তুলতে পারে কিনা তাই এখন দেখার বিষয়। আর যাই হোক, মোহনবাগান ক্লাবের সামনে এবার আছে ত্রি-মুকুট লাভের সম্ভাবনা। সে চেষ্টা মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়রা নিশ্চয়ই করবেন।

॥ সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার ॥

আই· এফ· এ শীল্ডের ফাইন্যালে সুকল্যাণের গোলটি অনেকেরই প্রশংসা অর্জন করেছে।

ক্রিকেটের খবর

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের টেস্ট মরশুম শুরু হলো। শুধু শুরুই নয়, এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে ততদিনে প্রথম টেস্ট ম্যাচও শেষ হয়ে যাবে। প্রথম টেস্ট ম্যাচ হবার কথা ছিল আমেদাবাদে। কিন্তু আমেদাবাদের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জন্যে বম্বেতেই অনুষ্ঠিত হলো প্রথম টেস্ট ম্যাচটি।

॥ অশোক মানকাদ ॥

প্রথম টেস্ট খেলার সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে ভিনুর ছেলে অশোক মানকাদের ভবিষ্যৎ জীবন।

ভারত-নিউজিল্যান্ডের এটি চতুর্থ টেস্ট মরশুম। এর আগের তিনটি মরশুমেই ভারত রাবার দখল করেছে শুধু তাই নয় বিদেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট জেতা এবং রাবার জয়ের সম্মানও ভারত পেয়েছে নিউজিল্যান্ড ভ্রমণে গিয়ে।

১৯৫৯ সাল থেকে বসছে ভারত-নিউজিল্যান্ডের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটের আসর। এ পর্যন্ত দু'দলের মধ্যে মোট ১৩টা টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ভারত জিতেছে ৬টি টেস্টে আর নিউজিল্যান্ড একটিতে। বাকী টেস্ট ম্যাচগুলো শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে।

এবার ইংলন্ডের বিরুদ্ধে রাবার হারিয়ে দেশে ফেরার পথে নিউজিল্যান্ড এসেছে ভারতে। এবারের নিউজিল্যান্ড দল মোটামুটি শক্তিশালীই। দলে ভালো ব্যাটসম্যান আছেন, আছেন ক'য়েকজন স্পেস বোলার। তাই মনে হয় ভারতকে

॥ কংডন ॥

বম্বে টেস্টে কংডনের উন্নত ধরণের ব্যাটিং ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডকে অগ্রগামী করেছিল।

এবার নিউজিল্যান্ড দলকে হারাতে হলে অনেক সতর্ক হয়ে খেলতে হবে। যাই হোক এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে তখন আর যাই হোক অন্তত প্রথম টেস্টের ফলাফলের মীমাংসা তো হয়েই যাবে। তাই সে আলোচনা না হয় পরের বারে করা যাবে।

যাই হোক প্রথম টেস্ট দল থেকে শেষ পর্যন্ত সুব্রত গুহ বাদ পড়লেন। বম্বের খেলোয়াড় অজিত পাই দলে স্থান পেলেন।

পাই দলভুক্ত হওয়ায় ভারতের পক্ষে প্রথম টেস্টেই অশোক মানকাদ, চৈতন চৌহান আর অজিত পাই টেস্ট ক্যাপ লাভ করলেন।

॥ প্রসন্ন ॥

স্পিন বোলার হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি প্রসন্ন প্রথম টেস্টে আরো সুনিশ্চিত করেছেন।

শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত
একমাত্র পাক্ষিক
ময়দান
পড়ুন এবং অপরকে পড়তে বলুন
যোগাযোগের ঠিকানা :—
শ্রীহীরেন্দ্রমোহন ভদ্র
সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি

॥ ওয়াদেকার ॥

"এখন হিসেব নিকেশের পালা"

—পবিত্র সমাদ্দার—

বিগত দু' বছরের অনিশ্চয়তার ধুমসো-জ্বর কাটিয়ে এবারের কলকাতায় ফুটবল অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে লীগ ও শীল্ডের আসর। এক কথায় বলতে গেলে, এবারের মত ফুটবল কলকাতা মাঠ থেকে তার আসর গুটিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিগত শনিবারের শীল্ডের সেই চূড়ান্ততম খেলাটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এ বছরের ফুটবল মরশুমও শেষ হয়ে গেলো।

যাই হোক—বিদায়ের শেষে বর্তমান বছরের হয়ে যাওয়া ফুটবল খেলাগুলোর মধ্যে থেকে একবার ঘুরে আসা যাক।

লীগ ও শীল্ডের অনেকগুলো খেলাই তো হয়েছে। কিন্তু ভাল খেলা একটিও হয়েছে কি? আমার তো বিশ্বাস, খুব কমই হয়েছে। মন ভরানো, আনন্দদায়ক এবং যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলা এবারের কলকাতা মাঠের ফুটবল মরশুম আমাদের ধরতে গেলে উপহার দিতে পারে নি।

অপরদিকে পরিচ্ছন্ন, উন্নত ক্রীড়াধারা সমন্বিত প্রতিটি দলীয় খেলোয়াড়ের মধ্যে পারস্পারিক সুন্দর বোঝাবুঝি, কোন দলের মধ্যেই আমরা দেখি নি। (অবশ্য মাত্র দু-একটা খেলা এর ব্যতিক্রম রয়েছে। কিন্তু তা সংখ্যায় নিতান্তই নগণ্য। হিসেবের মধ্যে রাখলেও কোন সান্ত্বনা নেই।) সর্বোপরি যেটার সবচেয়ে অভাব ছিল—তা হল গোলে লক্ষ্যস্থিরতা। অবশ্য গোলের সামনে পৌঁছে লক্ষ্যহীন, এলোমেলোভাবে পোস্টের পাশ দিয়ে—নয়তো বারের ওপর দিয়ে ৯০টা বলই বাইরে পাঠানো ভারতীয় ফুটবলারদের চিরন্তন অভ্যাস।

যাই হোক—একটা প্রশ্ন ঘাড়ে চাপে যে, এবারের অনেক খেলাই (বিশেষ করে শীল্ডের প্রায় সব খেলাই) হয়েছে এমন এমন মাঠে যেখানে কি না ফুটবল নামে কোন খেলা, খেলা চলে না। জলে কাদায় একসা হয়েছে ফুটবল মাঠ। খেলোয়াড়রা দৌড়তে গিয়ে পা পিছলেছেন অহরহ, কাদা নির্মমভাবে বলকে আটকে দিয়েছে। এহেন অবস্থায়, ভালো খেলার আশা করাও যে অন্যায়!

কিন্তু; এমন অনেক খেলাও তো হয়েছে এমন এমন মাঠে যেখানে কি না ফুটবল খেলা এবং ভাল খেলার পক্ষে চরম অনুকূল পরিবেশ ছিল। ছোটখাট থেকে শুরু করে অনেক কীর্তিমান খেলোয়াড়রা খেলেছেনও। কিন্তু সেখানে কি দেখেছি?

যাই হোক—একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আগামী দিনে শীল্ডের আকর্ষণ বাইরের দলগুলোর কাছে আর বিন্দুমাত্রও থাকবে না। (এবং সেই আগামী দিন খুব সামনে)। আর, এর কারণও তো সুবিদিত। সেই কালসমস্যা!......

একেই ঘনবর্ষাকাল। তার ওপর ফাউ হিসেবে মাথার ওপর থেকে অবিরাম ধারায় বৃষ্টি হলে যে কোন ফুটবল মাঠের অবস্থাই সঙ্গীন হতে বাধ্য। অবশ্য ফুটবল ভেজা এবং শুকনো দু' রকম মাঠেরই খেলা। কিন্তু ভেজার একটা সীমা আছে তো? এমন অনেক সময় আসে যখন কি না জল-কাদায় মাঠে পা টিপে টিপে চলাটাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সর্বোপরি রয়েছে আই এফ এ কর্তৃপক্ষের ব্যবহার। দিল্লী একাদশ ও রাজস্থানের খেলাটিকে কেন্দ্র করে আই এফ এ কর্মকর্তাদের গাফিলতি—সকলেরই জানা।

বাইরের নাম-করা দলগুলোকে এবার আমরা শীল্ড-আসরে পাই নি। অথচ ঐতিহ্য ও গৌরবের মাপকাঠিতে আই এফ এ শীল্ডই হল ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা। এক্ষেত্রে আই এফ এ কর্তাব্যক্তিরা যদি শীল্ডের খেলাগুলোকে ঘ্যানঘ্যানে বর্ষাকালের আওতা থেকে টেনে বের করে নিয়ে পরে খেলাবার ব্যবস্থা করেন—তা হলে শুকনো মাঠে খেলতে অভ্যস্ত বাইরের দলগুলো হয়তো আবার নাম দেবে।

বর্তমান বছরে কলকাতার তিন প্রধান ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর দলগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মোহনবাগানের নাম। তিন দলের মধ্যে তাদের দলগত সংহতি ও পারস্পরিক বোঝা-

[শেষাংশ ৯৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন উত্তর

অমরকুমার ব্যানার্জী (আসানসোল)

প্রশ্ন : ঐতিহ্যের দিক দিয়ে কলকাতার তিন প্রধান—মোহনবাগান, ইস্ট-বেঙ্গল এবং মহামেডানের কার স্থান কোথায়?

উত্তর : কেউই কারো চেয়ে কম নয় বলেই তো মনে হয়।

বিশ্বদেব চ্যাটার্জী (পি· কে· রায় লেন, কলকাতা—৩১)

উত্তর : তোমার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগলো। আগ্রহ আর প্রচেষ্টা থাকলে তুমি নিশ্চয়ই ভালো খেলোয়াড় হতে পারবে। তাই শিক্ষা আর অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। যে ঠিকানায় চিঠি দিয়েছো ঐ ঠিকানাতে লিখলেই আমি পাবো।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : তোমার সমালোচনামূলক চিঠির জন্যে আমরা কিছু মনে করি নি। ঐরকম চিঠিরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

শিবপ্রসাদ দাশগুপ্ত (মনোহরপুর, জানকুনি)

উত্তর : চিঠি পেয়েছি। পুজোর পরে লিখবেন। তখন তো ক্রিকেট সিজিন আরম্ভ হবে। তখনই যা হোক করা যাবে।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিশহর, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : ১৯০০ খৃঃ অলিম্পিকের আসর কোথায় বসেছিল? কতগুলো দেশ সেই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে?

উত্তর : ১৯০০ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্যারীতে। সেবার মোট ২০টি দেশের ১০৬৬ (৬ জন মহিলা সহ) প্রতিযোগী সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

তড়িৎকুমার চৌধুরী (স্বামীজী ক্লাব, টাংলা, দরং, আসাম)

প্রশ্ন : ফুটবল খেলা প্রথম কে প্রবর্তন করেন? ফুটবল খেলায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল বর্তমানে কোনটি?

উত্তর : ভারতীয় ফুটবলের প্রবর্তক হিসেবে নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর নামই বলতে হবে। বিশ্ব কাপের বিজয়ী দল হিসেবে ইংলণ্ডই বর্তমান বিশ্বের সেরা ফুটবল দল।

মাণিক সরকার (বৈদ্যবাটি, মালির বাগান, হুগলী)

উত্তর : কর্নার কিক থেকে সরাসরি গোল হয়।

নীলকমল সরকার (মুনসেফডাঙা, পুরুলিয়া)

প্রশ্ন : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার গ্যারী সোবার্স—বর্তমানে তাঁর পরে কে?

উত্তর : আপনিই বলুন না।

অরুণ কর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

উত্তর : সুধীর কর্মকার C/o. ইস্টবেঙ্গল ক্লাব টেন্ট, কলকাতা ময়দান, কলকাতা—২১ এই ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন।

রামকিশোর ঘোষ (বারাসাত, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : ইস্টবেঙ্গল কোন্ কোন্ সালে আই· এফ· এ শীল্ডের ফাইন্যালে উঠেছে?

উত্তর : ইস্টবেঙ্গল ১৯৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭ ও ১৯৬৯ সালে আই· এফ· এ শীল্ডের ফাইন্যালে উঠেছে।

নিম্নোক্ত পত্র লেখকদের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করা হচ্ছে :

জয়ন্তকুমার, প্রশান্তকুমার ও দীপককুমার ব্যানার্জী (চাঁদনীপাড়া, শান্তিপুর), **অলোককুমার ও অশোককুমার ঘোষ** (কৃষ্ণপুর, শিবা নিবাস, নদীয়া), **বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য** (অনামিকা, গৌহাটি—১১), **অসিতকুমার চৌধুরী** (থুবা, টাকী), **প্রশান্ত বসু** (কল্যাণী ভবন, ইয়ং রোড, আসানসোল), **শুকদেব মুখোপাধ্যায়** (মিরহাট, বৈদ্যপুর, বর্ধমান), **জগন্নাথ মজুমদার** (বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ), **রবি নাগ** (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)।

অমলকুমার ত্রিবেদী (আদরা, পুরুলিয়া)

প্রশ্ন : মোহনবাগান ছাড়া কি অন্য কোন দল একই বছরে হকি, ক্রিকেট ও ফুটবলে ডাবলস লাভ করেছে?

উত্তর : না।

[৯৫৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বুঝি সুন্দর হয়েছে। কি আক্রমণভাগ আর রক্ষণভাগ দুটি বিভাগই ছিল শুদ্ধ আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ একটি সূতোয় গাঁথা। শীল্ড ফাইন্যালের খেলাটিকে তারা মরশুমের (তাদের) শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করতে পারে।

আমার চোখ ঐ তথ্যগুলো ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে খুঁজে পায় নি। কেমন যেন খাপছাড়া আর এলোমেলো মনে হয়েছে আক্রমণভাগকে। রক্ষণভাগ শেষ খেলাটি ছাড়া অন্যান্যগুলিতে ভাল খেলেছে। শীল্ডের দ্বিতীয় দফার সেমি-ফাইন্যালটিতে ইস্টবেঙ্গল খুব ভাল খেলেছে। আক্রমণ ও রক্ষণ দুটি বিভাগই উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য আর সেই সংগে বোঝাপড়া সুন্দর করেছে। এই খেলাটিতে তারা উচ্চপ্রশংসার দাবি করতে পারে।

মহঃ স্পোর্টিং-এর কথা বলতে গেলে এককথায় বলতে হয় যে, লীগের শোচনীয় হাল তারা শীল্ডে সামলে উঠতে পেরেছিল।

বর্তমান মরশুমে ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের দিক দিয়ে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে মোহনবাগানের ভবানী রায় ও ইস্টবেঙ্গলের সুধীর কর্মকারের খেলা। দুজনেই রাইট-ব্যাক। প্রতিপক্ষ আক্রমণভাগকে ঠিক সময় বাধা দেওয়া, আবার সময় বুঝে সতীর্থদের এগিয়ে গিয়ে বল যোগানো—দুজনেই অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তবে সুধীরের তুলনায় ভবানীকে কিছু বেশি সপ্রতিভ মনে হয়েছে।

আক্রমণভাগে ভাল লেগেছে প্রণব গাঙ্গুলী, পরিমল দে, হাবিব ও অশোক চ্যাটার্জীর খেলা। বিমান লাহিড়ী শীল্ডের খেলায় প্রশংসা পাবেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। বিশুদ্ধ সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—২·০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের সারাৎসার। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবন্মুক্তি, ষড়্‌জ, হংস, মঙ্কি, গীতাসার, পিতৃ, পৃথিবী, সপ্তশ্লোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, গর্ভ, পাণ্ডব, উত্তর রাস, শ্রীমদ্‌গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমাবেশ প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫·০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকা, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, চুলকা, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদনারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, শাঠ্যায়নীয়, যোগতত্ত্ব, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—প্রতি খণ্ড—৪·০০ টাকা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ :

সামবেদের তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ। শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ। তথ্যপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬·০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন :

মহর্ষি কপিলকৃত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য—২·০০ টাকা।

বৈশেষিক দর্শন :

মহর্ষি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩·০০ টাকা।

জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনম্ :

॥ পরমর্ষি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও বঙ্গানুবাদ ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে—পারমর্ষ সূত্র, পর্ব মীমাংসা, বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পর্বতন্ত্র, জৈমিনি সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবরস্বামীর ভাষ্যের ভাবার্থানুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের শ্লোকবার্তিক ও তন্ত্রবার্তিক টীকা-বিষয়ক পাদটীকা-সমন্বিত। পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থের দীর্ঘকালের সাধনায় অনূদিত, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য—প্রতি খণ্ড—৮·০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্ :

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পুরশ্চরণ প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম্, দীক্ষাপদ্ধতি, শ্রীগুরু, মন্ত্রমালা প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩·০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা, অষ্টাবক্র-সংহিতা, ষটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়োক্ত যোগরহস্যম্, পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগ গ্রন্থের সমাবেশ, কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫·০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩·০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

সে কি! তুমি এখনও ব্যবহার করনি?
কিন্তু কুকমী না হলে আমার রাঁধতে মন চায় না
কুকমী
গুঁড়া মশলা
স্বাদে গন্ধে বিশুদ্ধতায়
এর তুলনা হয় না!
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃলিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
পোস্তা • কলিকাতা-৭
মিল - কাশীপুর

সাপ্তাহিক বসুমতী

দেশের সর্বত্র গান্ধী জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠান

৪ বর্ষ ঃ ১৬শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২শে আশ্বিন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] J-DES. WEEKLY OF NI-TH INDIA [74 year, No. 16, 9th Oct.,

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৬৩
আজকের মানুষ		১৬৪
স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফেরাতে হবে গোটা ক্লটকে	মনোরঞ্জন হাজরা	১৬৫
কলকাতায় গান্ধীজীর প্রথম বক্তৃতা : গোখলের ধন্যবাদ ভাষণ	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১৬৭
বই-বাছাই—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	১৭২
বঙ্গদর্শন		১৭৪
ভারতদর্শন		১৭৬
আন্তর্জাতিক		১৭৮
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	১৮০
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	১৮৩

যে কোন
গয়না
আর
আ স ল
গ্র হ র ত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এ.সরকার এণ্ড সন্স
রাসবিহারী এভিনিউ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্মানিত অছি পরিষদের সদস্য	(কবিতা) বেণু দত্তরায়	৯৮৫
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	— শ্রীসর্বদর্শী	৯৮৬
আইন ও শৃঙ্খলা ঃ		
পুলিশের ভূমিকা—কয়েকটি অভিমত	— সাগর বিশ্বাস	৯৮৮
তিমিরগ্রস্ত ভূস্বর্গ	— অগ্নিবর্ণ	৯৯২
কবিতার ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)	— দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	৯৯৫
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	৯৯৭
কামার রকমফের (গল্প)	— নীলকৃষ্ণ পাল	১০০১
গ্রামবাংলার কথা	— অসীম মুখোপাধ্যায়	১০০৫
খবর বলছি	— অন্তবাহন	১০০৮
রূপমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলাদি	১০১০
রূপজগৎ		১০১৫
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	১০২০

সদ্য বেরিয়েছে ॥ বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ ॥ নামমাত্র মূল্য

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ ঃ নীলদর্পণ। জামাই বারিক। বিয়ে পাগলা বুড়ো। নবীন তপস্বিনী। কমলে কামিনী।
২য় ভাগ ঃ সধবার একাদশী। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। পোড়া মহেশ্বর। কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। লীলাবতী। সুরধুনী কাব্য। দ্বাদশ কবিতা। পদ্য সংগ্রহ। তৎসহ লেখকের জীবনী ও ভূমিকা।

(দুই ভাগে সম্পূর্ণ)

মূল্য প্রতি ভাগ চার টাকা।

বিদ্যারণ্য মুনি রচিত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ
মূল্য চার টাকা

—•—

স্তবকবচমালা
মূল্য আট টাকা

—•—

যোগশাস্ত্র
মূল্য পাঁচ টাকা

—•—

শিবায়ন
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

৭৪ বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ২২শে আশ্বিন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ | Thursday, 9th October, 1969

বিকৃত রুচির লেখা

বিকৃত রুচির লেখায় বাংলা সাহিত্য বিকৃত হয় না। ঐ সাহিত্য চিরন্তন মহিমায় বিরাজ করছে ও করবে এবং তার ধারাটি আজও গতিশীল। কিন্তু বাংলা ভাষায় বিকৃত রুচির লেখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রথম কারণ, ঐ লেখাকে সাহিত্য বলে চালানোর অপচেষ্টা চলছে, দ্বিতীয়, বিকৃত রুচির লেখার মাধ্যমে বাংলাদেশের হাওয়াকে বিষাক্ত করা হচ্ছে। তৃতীয়, সাধারণ সরল পাঠকদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, চতুর্থ কারণ এবং যা প্রগতিশীল দেশের পক্ষে ভয়ানক তা হচ্ছে এই যে, যুবশক্তিকে বিপথে পরিচালিত করার দুরভিসন্ধিমূলক ও জঘন্য প্রচেষ্টা গোপনে ও প্রকাশ্যে চলছে। অবশ্য প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করতে পারি, পশ্চিমবঙ্গের উপমুখ্যমন্ত্রী কিছুকাল আগে সরকারিভাবে বিকৃত রুচির লেখা প্রকাশ না করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

শারদোৎসবের প্রাক্কালে বহু পত্র-পত্রিকা পাঠকদের কাছে লোভনীয় করে প্রকাশ করা হয়। কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে, ভালো লেখার নাম করে যা প্রকাশ করা হয়, তা শুধু অপাঠ্যই নয়, রুচিহীন ও নোংরা বস্তুর শামিল। অবশ্য যারা ঐ সব প্রকাশ করে থাকে তাদের পক্ষে সুবিধার কথা এই যে, বিকৃত রুচির লেখক হিসেবে তারা এককালের কিছুটা-নাম-করা দুচার জন অর্থলোভী লেখক (লিখলে লেখক হতে বাধা নেই, সাহিত্যিক হন না) সংগ্রহ করতে পারে। যেমন, বিপ্লবী যুগে বিপ্লবীদের ধরার জন্য কিছু মেকী বিপ্লবী ও নরেন গোঁসাই-এর মতো দালালদের যোগাড় করা অসম্ভব হয় নি।

কিন্তু এক শ্রেণীর প্রকাশকের দুঃসাহস এমনই যে, তারা কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাঠকদের মধ্যে চমক সৃষ্টি করে বিকৃত রুচির লেখা প্রচারের চেষ্টা করে আসছে। ঐ ধরণের বিজ্ঞাপন নিশ্চয়ই চলচ্চিত্র জগতের সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল নায়ক-নায়িকারাও দেখে থাকবেন। উপরি উক্ত প্রকাশকরা নায়ক-নায়িকাদের জীবনের গোপন কাহিনী প্রকাশ করছে বলে ফলাও বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। আমরা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, তাদের বিজ্ঞাপনের বক্তব্য মিথ্যা হয় না। কিন্তু আমরা এই জেনে আশ্চর্য হই, চলচ্চিত্রের এক শ্রেণীর নায়ক-নায়িকা সামান্য অর্থের লোভে কিভাবে আত্মকথার নামে জঘন্য সব কথা বিশেষ প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন। সুস্থবোধসম্পন্ন ও সমাজ সচেতন নায়ক-নায়িকাদের উক্ত ঘটনার প্রবল প্রতিবাদের জন্য আমরা অনুরোধ করছি।

যা হোক, ইদানীং আমরা লক্ষ্য করছি যে, অনেক পত্র-পত্রিকা এবার শারদোৎসবের প্রাক্কালে বিকৃত রুচির লেখায় আসর জুড়ে বসেছে। একথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলবে, যে কোনো বুক স্টলের কাছে পা বাড়ালেই। ঐ সব পত্র-পত্রিকার মলাটের ছবিগুলিই শুধু ন্যক্কারজনক নয়, ওগুলির পাতায় পাতায় নগ্নছবি ও ইতরজাতীয় লেখা। পত্র-পত্রিকাগুলির আশে পাশে শোভা পায় আরো রোমহর্ষক (?) নগ্ন বা অর্ধনগ্ন ছবি (ফটো) ভর্তি মলাটের পুস্তিকা। কোনোটার নাম হয়তো ব্যভিচার, যা লেখার রাজ্যে প্রকাশক ও লেখকের ব্যভিচার ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না।

বিকৃত রুচির লেখার বিরুদ্ধে আদালতে ইতিপূর্বে মামলা হয়ে গেছে, লেখক ও প্রকাশক ক্ষেত্র বিশেষে দণ্ডিত হয়েছেন। বিচারালয়ের ঐ সঠিক রায়ের কথা জেনেও এক শ্রেণীর মুনাফালোভী প্রকাশক ও লেখক ব্যবসায়ী আজো ক্রিয়াশীল। হয়তো তাদের ধারণা, বিচারালয়ে 'কেস' উঠতে না উঠতে তারা বহু টাকা লুটে নেবে। উপরন্তু অন্য দিক দিয়েও নগদ টাকা আসবে। তা ছাড়া আদালতের দ্বারস্থ তো অনেককেই হতে হয় না। কারণ, খুব সৎসাহসসম্পন্ন ও আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ পাঠক সহজে বিকৃত রুচির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনতে সাহস পায় না। কারণ অভিযোগ এনেও ঝামেলা পোহাতে হয়। বিকৃত রুচির লেখার প্রচারকদের পয়সার অভাব নেই, মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেও, তাদের অর্থাভাবে পড়তে হয় না, আর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণিত না হলে—তাতেও তারা লাভবান হয়। সুতরাং সাধারণ পাঠকরা সব কিছু জেনে শুনেও নীরব থাকতে বাধ্য হন।

তবে তাদের ধারণা ছিল শ্রীজ্যোতি বসুর নির্দেশনামা প্রচারিত হবার পর বাড়িতে বাড়িতে তাদের ছেলে-মেয়েদের লুকিয়ে বিকৃত রুচির লেখা পড়তে দেখতে হবে না, স্টলে স্টলে মুখ বাড়ালেও লজ্জায় মুখ বিকৃত করতে হবে না।

তাদের ভাগ্য বোধ হয় অত্যন্ত মন্দ। তাই সরকারী প্রচার যতো জোরে শুরু হয়, সেই প্রচারের বিরুদ্ধে কেউ চোখের সামনে চক্রান্ত চালিয়ে গেলেও সরকারী যন্ত্রের পরোয়ানা সেখানে গিয়ে পৌঁছয় না।

পরোয়ানাটা পাঠাবেনই বা কে? এখন যে শরিকে শরিকে ভীষণ লড়াই। আজ কুচবিহারে না হয় কাল মথুরাপুরে কিংবা পরশু কোনো কালিয়াগঞ্জতে। কে কার গর্দান নেবে তাতেই ব্যস্ত। মুখে বলেন : এসব সমাজবিরোধীদের কাজ, কিন্তু পরস্পর খেউড় লেগেই আছে।

আমরা সবিনয়ে বলি : ও সব বন্ধ রাখুন। সমাজবিরোধীদের কথা যখন মুখে বলছেন, তখন তাদের ঝাঁটা মেরে বিদায় করুন।

সমাজবিরোধী তো বিকৃত রুচির লেখক ও প্রকাশকরাও। কই তাদের বিরুদ্ধে আপনারা তো টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে পারেন না। বিচারালয়কে যারা ভ্রূক্ষেপ করে না, জৌলুসে ও চাকচিক্যে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারণা করতে যারা সর্বদাই নিরত, তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের বীরত্ব কি একেবারেই ভোঁতা, না জনগণ আপনাদের ভোট দিয়ে জেতান নি, তাঁরাই জিতিয়েছেন, তাই তাদের সম্বন্ধে অচলাভক্তি?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

স্বপ্ন কম-বেশি সকলেই দেখেন। তবে কল্পনাবিলাসীর স্বপ্নের থেকে বাস্তববাদীর স্বপ্নের তফাৎ এখানে যে, মাটির দৃঢ় পৃথিবীর বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে প্রথমোক্ত ব্যক্তির স্বপ্নের কোনো মিল নেই। কিম্বা সে-স্বপ্ন সার্থক করে তোলার দিকে তার আন্তরিকতা ও ত্যাগ স্বীকারে আগ্রহ নেই। কিন্তু কল্পনাবিলাসী হোক আর বাস্তববাদী হোক—স্বপ্ন সফল হয় ক'জনের? ক'জন মানুষ জীবনে যা চান, তাই পান, যা হতে চান, তাই হতে পারেন? জার্মানীর উইলি ব্রান্ডট-এর ভাগ্য অত্যন্ত ভাল যে, তাঁর স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে, সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। জার্মানীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পথে তিনি এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। এবারকার পার্লামেন্টারী নির্বাচনে সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণে পশ্চিম জার্মানীতে এই দলের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার হতে চলেছে। আর উইলি ব্রান্ডট স্বয়ং সে-সরকারের প্রধান হচ্ছেন।

ব্রান্ডট-এর জীবনটাই একটা নাটক। জার্মানীতে হিটলার বা নাৎসীবাদের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দুঃসাহস যে-ক'জন তরুণ জার্মানের হয়েছিল তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধতাই শুধু নয়, উইলি ব্রান্ডট এখানে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হিটলারের বা তাঁর সহচর গোয়েবল্‌স-এর প্রচার চাতুরীর কাছে ব্রান্ডট-কে হার মানতে হল। অর্থাৎ নিজেকে নাৎসীবাদের শত্রু বলে জাহির করতে গিয়ে ব্রান্ডট ডেকে আনলেন চরম বিপদ ও বিপর্যয়। বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা আর যিনিই করুন, হিটলার সহ্য করবেন না। বাধ্য হয়ে তাই ব্রান্ডটকে দেশত্যাগ করতে হল।

আসল নাম অবশ্য হার্বার্ট ফ্রাম, তাই থেকে উইলি ব্রান্ডট-এ রূপান্তরিত হলেন কী করে, কে জানে? তবে একটা ছদ্মনাম গ্রহণ করা নিতান্ত নিরাপত্তার খাতিরেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল ফ্রাম-এর। জার্মানীর এক গরীব শ্রমিক রমণীর গর্ভে হার্বার্ট ফ্রামের জন্ম ১৯১৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর। ফ্রামের মা-কে চেনে সকলে, কিন্তু তার বাবা কে? পিতৃপরিচয় দিতে পারল না ফ্রাম, ফলে তাই নিয়ে বেচারাকে চূড়ান্ত অপমান, অপবাদ ও লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে। সেদিনের সেই অপমানই যেন ফ্রাম-এর মনে দৃঢ়তার, বড় হবার স্বপ্ন-বীজ রোপণ করেছিল। বাপের পরিচয়ে নয়, উইলি ব্রান্ডট নিজের পরিচয়ে পরিচিত হতে চান।

মাত্র সতের বছর বয়সে ফ্রাম সমাজতন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। ইয়োরোপে তখন গ্রেট ডিপ্রেসন বা মহা অর্থনৈতিক সংকট চলেছে। তরুণ ফ্রাম তার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে এ-সংকটের পেছনে ধনবাদী অর্থনীতির ব্যর্থতার কথা বললেন। প্রতিপক্ষ আরো মরিয়া হয়ে উঠলেন। তারপর ১৯৩৩ সালে চূড়ান্ত লড়াইয়ে—নির্বাচনে হিটলার দলের জয় হল। ফ্রামকে তৈরি হতে হল জীবনের পরবর্তী অনিশ্চিত অধ্যায়ের জন্যে।

শ্রাবণধারার মত ফ্রাম-এর ওপর অপমান লাঞ্ছনা বর্ষিত হচ্ছিল। তখন ফ্রাম

উইলি ব্রান্ডট

একবার নিজেকে খতম করে দিয়ে জ্বালা জুড়োতে উদ্যত হয়েছিলেন। স্নেহশীলা মা-র করুণ মুখের দিকে চেয়ে তাঁর আত্মহত্যা করা হল না। কিন্তু জার্মানীতে নিরুপদ্রবে বাস করাও ফ্রামের পক্ষে সম্ভব হল না। জেলে-নৌকো নিয়ে সকলের অজান্তে পাড়ি জমালেন তিনি নিরুদ্দেশের পথে।

নৌকো এসে ভিড়ল নরওয়ের সমুদ্রকূলে। কী করবেন এখানে বিশ বছরের তরুণটি? আপাতত অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা—ইতিহাস হল তাঁর বিষয়। কিন্তু মনের আগুন তাঁর নেভে নি, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে চলতে লাগল নাৎসী-বিরোধী আন্দোলনের সংগঠন। চলল সংবাদপত্রাদিতে উইলি ব্রান্ডট-এর নামে লেখা প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধল, তখন যুবক ব্রান্ডট যেন বিদেশে স্থির থাকতে পারলেন না, ছুটে গেলেন পিতৃভূমিতে। এলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। নরওয়ের ছাত্র হিসেবে। এখানেও সেই পুরনো ভূমিকা আবার, নাৎসী-বিরোধী আন্দোলন। অত্যন্ত সন্তর্পণে তাঁকে গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে হল, গোয়েবলস বা গেস্টাপো বাহিনীর লোকেরা তাঁর উপস্থিতির কথা জানতে পারলে অস্তিত্ব রাখবে না আর। কিন্তু স্বদেশে পরিত্রাণ পেলেও নরওয়েতে ফিরে এসে ১৯৪০ সালে সে-বিপদ তিনি এড়াতে পারলেন না। জার্মান ভায়েদের হাতে ধরা পড়লেন। কিন্তু ভাগ্যিস সেদিন ব্রান্ডট-এর প্রকৃত পরিচয় নাৎসী সৈন্যরা পায় নি, ভাগ্যিস তারা ব্রান্ডটকে আর পাঁচজন নরওয়েজিয়ান সৈন্য বলে ধরে নিয়েছিলেন, সেই কারণে তাঁকে ছেড়েও দেওয়া হল।

মুক্তি পেয়ে ব্রান্ডট আরেকবার দেশছাড়া হলেন, এবার ঠাঁই পেলেন সুইডেনে। যুদ্ধ শেষ হলে, নাৎসীবাদের পতন ঘটলে উইলি ব্রান্ডট ফিরে গেলেন বার্লিনে। যুদ্ধাপরাধীদের জন্যে নুরেমবার্গ বিচারালয়ের ঘটনার রিপোর্ট নিচ্ছেন নরওয়ের একজন সাংবাদিক, নরওয়ে দূতাবাসের প্রেস এ্যাটাচী উইলি ব্রান্ডটকে তখনো কেউ চিনতে পারে নি। কিন্তু সোস্যাল ডেমোক্রাটদের কাছে তাঁর পরিচয় গোপন রইল না। তাঁদেরই পরামর্শে তিনি দূতাবাসের কাজ ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তারপর থেকে উইলি ব্রান্ডট সোস্যাল ডেমোক্রাট দলের অন্যতম নেতা ও সংগঠক। চারটে ভাষায় সমান দক্ষতায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করতে পারেন। সে-বক্তৃতায় পশ্চিম জার্মানীর শ্রমিক মধ্যবিত্ত যেন পাগল হয়ে উঠল। প্রথম পার্লামেন্টে নির্বাচিত হলেন '৪৯ সনে। আদেনুয়ের এরহার্ড খৃস্টান ডেমোক্রেটিক ও খৃস্টান সোস্যাল ইউনিয়নের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে যেন উইলি ব্রান্ডট একাই একশো। জার্মান বুন্দেস্ট্যাগ (পার্লামেন্টের নিম্ন পরিষদ) কেঁপে উঠল এই একটি কণ্ঠের সিংহ-গর্জনে। ভেতরে-বাইরে তিনি খৃস্টান ডেমোক্রেটিক দলের রক্ষণশীল, মার্কিন-ঘেঁষা নীতির তীব্র সমালোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ব্রান্ডট বার্লিনের মেয়র হলেন '৫৭ সালে সবাইকে চমকে দিয়ে। '৬৪ সনে পার্টির চেয়ারম্যান হলেন তিনি। '৬৫ সালের নির্বাচনের শেষে খৃস্টান ডেমোক্রেটিক দল বাধ্য হল সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে গ্রাণ্ড কোয়ালিশন করতে, আর কিসিংগার সরকারের তিনি হলেন ভাইস-চ্যান্সেলর বা উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অবশেষে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব চ্যান্সেলরের পদে আজ উইলি ব্রান্ডট।

স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফেরাতে হবে গোটা ফ্রন্টকে

মনোরঞ্জন হাজরা

মহাকরণের সেই ত্রিতল। ইংরেজীতে যাকে বলে সেকেন্ড ফ্লোর। তারই পশ্চিমদিকের দক্ষিণ-অলিন্দে এসে আবার দাঁড়ালাম। দাঁড়ালাম পর পর কয়েকটা দিন। ঠিক আগেও যেমন দাঁড়াতাম। আমার সুবিধা এই আমি এখানে অপরিচিত, কারণ আমি ছিলাম বিরোধীদলে। বিরোধীদলের সদস্যদের আমলারা মানুষই মনে করত না। কাজেই পরিচয়ের ফ্যাসাদে আমাকে পড়তে হয় নি। তা না হলে গত বাইশটা বছর ধরে বারে বারে আমি এখানে এসেছি, দু-চারজন ছাড়া চট করে কেউ আমায় চিনতে পারেন নি। গত বাইশ বছর ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আমি শুনেছি রোগযন্ত্রণা-কাতর মানুষের আর্তনাদ, শুনেছি অত্যাচার আর অবিচারের অসংখ্য কাহিনী, শুনেছি এখানকার দুর্ভেদ্য অচলায়তনের রহস্যকে অনাবৃত করার অনেক অক্ষমতার কথা—এবারেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম সব। আশ্চর্য সবই ঠিক আছে, তেমনিভাবেই আছে, একেবারে অক্ষয় হয়ে, অটুট হয়ে। প্রথমটায় দুঃখবোধ করেছিলাম। দুঃখবোধ করবারই কথা। এক ঐশ্বর্যমণ্ডিত 'ইমেজ' নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন—তাই ভেবেছিলাম মহাকরণের এই অলিন্দের খোপে খোপে যে বীভৎস ও কুৎসিত পাপচক্র গড়ে উঠেছে, আর কিছু না হোক, অন্তত যুক্তফ্রন্টের সম্মার্জনীর প্রচণ্ড আঘাতে বেরিয়ে আসবে বাহুমুক্ত একটা নির্মল, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যদপ্তর। কিন্তু কি হল? তাই তো দুঃখ বোধ না করে পারি নি।

দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেসের হাতে পড়া ও গড়া যে কোন দপ্তর আমলাচক্র শাসিত না হয়ে পারে না এবং সে আমলাচক্র দুর্নীতিপরায়ণ হতে বাধ্য। যুক্তফ্রন্টের সকল দপ্তরকেই এর বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে, কিন্তু যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে আমি দেখছি স্বাস্থ্যদপ্তরে তার বিন্দুমাত্র চেষ্টা তো দূরের কথা, আমলাচক্রের একটা সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীর হাতে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমশাই আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তাঁদেরই সহযাত্রীরূপে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ঘিরে তাঁর পার্টির যে অংশ, সেই অংশটি পথ চলতে সুরু করেছেন।

সকালবেলায় সলতে পাকানো

প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ রেখে তারপর বক্তব্য রাখব। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচন শেষে যখন পশ্চিমবাংলার গান্ধী-সমতুল্য কোন কংগ্রেস মন্ত্রী আর ফিরে আসতে পারলেন না মহাকরণে, তখন তিনি 'ব্যাক ডেট' দিয়ে স্বরাষ্ট্র-প্রশাসনের তিনজন কানু আমলাকে প্রমোশন দিয়ে গিয়েছিলেন। সেকথা ইতিপূর্বে আমি লিখেওছি। এইরকম একটা অপরাধমূলক কাজকে যুক্তফ্রন্টের কেউই সমর্থন করবেন না। কিন্তু এর দশমাস পরে অনুরূপ এক ঘটনার প্রতি আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা সমগ্র যুক্তফ্রন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। স্মরণ করুন ১৯৬৭ সালের সেই বীভৎস পৈশাচিক হিংস্র তাণ্ডবের কলংকিত দিন ২১শে নভেম্বরের কথা। স্মরণ করুন পরদিন বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডের কথা আর সেই সঙ্গে সমগ্র পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি। পথে-প্রান্তরে অহিংস-ঠ্যাঙাড়েদের অভিযান চলেছে, রক্তে লাল হয়ে উঠছে বাংলাদেশ। কারফিউ আর একশো চুয়াল্লিশের বেড়াজালে অবরুদ্ধ মানুষ তবুও রুখে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তখন কোন্ মহৎ কাজে ব্যস্ত সেটা একবার বিচার করে দেখতে বলি, যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিক দলগুলিকে। ভাগাই-সন্ধি, হ্যাঁ অনেকটা সেইরকমই বলা যেতে পারে, এ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে বসে গোপনে এবং নিভৃতে স্বাস্থ্যদপ্তরের কোন পদস্থ আমলার সঙ্গে 'সন্ধি' করছেন তাঁকে 'ব্যাক ডেট' দিয়ে পদোন্নতির ছাড়পত্র উপহার দ্বারা। কংগ্রেস মন্ত্রী একাজ করলে অন্যায় হয়, কিন্তু যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী এরকম করলে অন্যায় হবে না কেন?

কিন্তু এটাই হচ্ছে সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালাবার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো। সলতে পাকিয়ে রাখা হয়েছিল প্রথম যুক্তফ্রন্টের শেষ অধ্যায়ে।

আমলাচক্রের সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠী

সেই ঘটনা আজ কোথায় এগিয়েছে তা একবার অনুধাবন করতে বলি। বিভিন্নসূত্রে মহাকরণ থেকে এমন কতকগুলি খবর আমি সংগ্রহ করেছি, যেগুলি আমার কথার স্বপক্ষে উল্লেখ করলে অনেকেই স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। তবে প্রথমেই বলে রাখি যে, ডি এইচ এস-কে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী একদা 'মোস্ট এফিসিয়েন্ট এ্যান্ড অনেস্ট অফিসার' বলে এবং ১২ই অক্টোবরের পরেও তাঁর ঐ পদে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য চেয়েছিলেন এবং পরে যাঁকে সরাবার পরিকল্পনা করেছেন, তিনি আমার এই খবরের সোর্স নন। ভদ্রলোককে আমি চিনিও না। এবং তিনি আমাকে চেনেন কি না তা আমি জানি না। আমি জিজ্ঞাসা করি (১) ডি এইচ এস কি প্রস্তাব করেছিলেন মাননীয় মন্ত্রীমশায়ের সঙ্গে বসে প্রতি সপ্তাহে পরবর্তী সপ্তাহের কাজকর্মগুলি সম্পন্ন করার (২) তিনি কি প্রস্তাব করেছিলেন, জেলা এবং কলকাতায় হাসপাতালগুলি মাননীয় মন্ত্রীমশায়ের সঙ্গে পরিদর্শন করার এবং এ সম্বন্ধে একটা পলিসি ঠিক করার (৩) স্বাস্থ্যদপ্তরের কোন প্রশাসনিক এবং টেকনিক্যাল ব্যাপারে যেমন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ঘটনা থেকে, সমাজ-বিরোধীদের দ্বারা চিকিৎসকদের প্রতি দুর্ব্যবহার, মেডিকেল স্টাফের অন্তর্বর্তী এ্যাকাডেমিক র‍্যাঙ্ক স্থির করা প্রভৃতি কোনও ব্যাপারে কি ডি এইচ এস-এর সঙ্গে কখনও কোন পরামর্শ করেছেন? (৪) ট্রান্সফার, প্রমোশন প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি কি কখনও ডি এইচ এস-এর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন? (৫) উত্তরবঙ্গে ওষুধের মোড়কে পাথর পাওয়া, কল্যাণী জওহরলাল নেহরু হাসপাতালের তদন্ত ব্যাপারে কেন ডিলেমি হচ্ছে, গোবরা মেন্টাল হাসপাতালের স্টাফ, পুরুলিয়া, নদীয়া প্রভৃতি হাসপাতালে যে-সব দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে, তার সম্বন্ধে কোন কথা এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কি আলোচনা করেছেন। ইনি তো একজন বিভাগীয় প্রধান ব্যক্তি? জিজ্ঞাসা করি বিভাগীয় প্রধানের কোন প্রস্তাবই যদি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী না শোনেন, যদি তাঁর সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেন, তবে কার সঙ্গে, কাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি স্বাস্থ্যবিভাগ পরিচালনা করেন?

মাননীয় মন্ত্রীমশাইকে এখানে কি জিজ্ঞাসা করব, সকালবেলায় সলতে পাকিয়েছিলেন সন্ধ্যাবেলায় যাকে দিয়ে দীপ জ্বালাবেন বলে, তাঁকে এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়েই কি তিনি তাহলে

স্বাস্থ্যদপ্তর পরিচালনা করছেন? হ্যাঁ, দিনের পর দিন তো মন্ত্রীমশায়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি দেখেছি জয়েণ্ট ডাইরেক্টর, ডেপুটি ডাইরেক্টর, এ্যাসিস্টাণ্ট ডাইরেক্টরেটের জনৈক ডাক্তারকে আপনার ঘরে অনবরত যেতে। ডি এইচ এস-কে তো আপনার ঘরে আসতেই দেখি নি বললে চলে! মাননীয় মন্ত্রীমশায়কে বলি আর-জি-করের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ মুখোপাধ্যায়, ন্যাশনালের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ রায়মশায় এবং বাঁকুড়ার ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ উপাধ্যায় প্রমুখকে দপ্তরে কোন প্রয়োজনীয় কাজ না থাকা সত্ত্বেও কেন বসিয়ে রেখেছেন—যখন ঐ তিনটি মেডিকেল কলেজে অস্থায়ী ব্যবস্থা এখনও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

এ বিষয়ে আমি কোন মতামত ব্যক্ত করতে চাই না। শুধু যুক্তফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দের সামনে এগুলি তুলে ধরতে চাই। আর মনে করিয়ে দিতে চাই কিভাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যুক্তফ্রণ্টের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করে আমলাচক্র গড়ে তুলেছেন।

আমলারাও যা করছেন মন্ত্রীও তাই করছেন

কিভাবে স্বাস্থ্যদপ্তরে ঘটনার পর ঘটনা ঘটে চলেছে তার কয়েকটি নিদর্শন আমি এখানে রাখব। প্রথমে ধরা যাক আর-জি-কর মেডিকেল কলেজের 'অবস্টেটিক এ্যান্ড গায়নাকোলেজি' বিভাগের কথা। এইখানে এক ভদ্রলোককে রীডার পদে পোস্টিং দিয়ে পরবর্তী সময়ে ঐ বিভাগের প্রধান করে দেওয়া হল। অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তাঁরই অধীনে তাঁর চেয়ে অনেক বেশি গুণসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ ডাক্তার রয়ে গেছেন। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাস্যঃ সিনিয়রিটির কি কোন মূল্য নেই? তাছাড়া আরও জিজ্ঞাস্য যে, ডাক্তার ভদ্রলোকটিকে এখানে বিভাগীয় প্রধান করলেন কোন্ গূঢ় কারণে? এবং তাঁর বাঁকুড়া বদলী স্থগিত হয়ে গেলই বা কেন? দ্বিতীয়ত নীলরতন মেডিকেল কলেজে মেডিসিনের লেকচারার করে যাঁকে আনা হল তাঁর চেয়ে অনেক সিনিয়র ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও শুধু তাঁকেই বা কেন আনা হল? মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে কি কেউ এ খবর পৌঁছে দেয় নি। এই ভদ্রলোক আর-পি থাকাকালে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়েছিল তিনি অর্থ নিয়ে রোগী ভর্তি করতেন? তৃতীয়ত কেন ঐ কলেজেরই প্যাথলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে হঠাৎ বদলী করে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিবের জনৈক নিকট আত্মীয়কে ঐ পদে নিয়োগ করা হয়েছিল? মাননীয় মন্ত্রীমশাই কি জানতেন না, তাঁর একান্ত সচিবের নিকট আত্মীয় ডাক্তারটি বিড়লাবাড়ির জনৈক ডাক্তারের সহযোগিতায় কলেজের উক্ত বিভাগটিকে ব্যবহার করে দু-পয়সা রোজগার করতেন এবং যাঁকে বদলী করা হল তিনি এর প্রতিবাদ করতেন বলে এই ব্যাপারটি ঘটেছিল? কেন এই ঘটনার তদন্ত করেন নি মন্ত্রীমশাই—তাঁর একান্ত সচিব ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িত বলে? চতুর্থত আমার জিজ্ঞাস্য এই একই কলেজে রেসিডেণ্ট ফিজিসিয়ান নিয়োগের সময় শুধু এম-বি-বিএস ডিগ্রীর ওপরই জোর দেওয়া হল কেন, যখন সেখানে ডাঃ দিলীপ ভট্টাচার্যের মত ডাক্তার যাঁর এম-ডি (ক্যাল) পি-এইচ-ডি (লণ্ডন) ডিগ্রী ছিল?

আরও উদাহরণ আমি দিতে পারি, কিন্তু আপাতত প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে আমি চাই না। যুক্তফ্রণ্টের স্বাস্থ্যদপ্তরের আমলারা এবং মাননীয় মন্ত্রীমশায় নিজে স্বাস্থ্যদপ্তরকে কতখানি সমৃদ্ধ করছেন সে বিচার করবেন যুক্তফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ। আমি শুধু ঘটনাগুলো তুলে ধরলাম। যদি কোনদিন তদন্ত হয়, তবে আরও অনেক ঘটনা জানাবার ইচ্ছা রইল।

স্বজনপোষণ ও মন্ত্রীর ইমেজ

সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন এবং এমন কি ছাত্রী ও মহিলাকর্মীদের লাঞ্ছিত করার অভিযোগও যাঁদের বিরুদ্ধে আছে, এমন তিনজন ডাক্তারের নাম ও তথ্য আমি সাধারণের কাছে প্রকাশ করতে পারি, যাদের মাননীয় মন্ত্রীমশাই তাঁর আমলাচক্রের সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীর মাধ্যমে অত্যন্ত ভাল ভাল জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন। এঁদের একজন আছেন পি-জিতে, একজন আছেন মেডিকেল কলেজে আর একজন আছেন এন-আর-এস'এ। বলতে বাধা নেই, এঁরা আজ মাননীয় মন্ত্রীমশাইয়ের পার্টির সংগঠক স্বাস্থ্যদপ্তরে। এঁদের সকলেই অন্তত যে পার্টি চাঁদা তোলেন ডাক্তারদের কাছ থেকে, একথা অবিদিত নেই। আমি অহেতুক কোন আক্রমণ করছি না। প্রমাণ আমার কাছে আছে বলেই বলছি।

এই সব কারণে প্রশাসন আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রীমশায়কে ভেবে দেখতে বলি। ধরুন ধুবুলিয়া টি বি হাসপাতালে গত মে মাসে যে ঘটনাটা ঘটল। রোগীদের খাবার চুরি করা যে একটা গর্হিত অপরাধ সেটা বলবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ডাঃ চক্রবর্তী যিনি একজন হৃদয়বান ডাক্তার—তিনি এর প্রতিবাদ এবং প্রতিকার করতে গেলে তাঁর অবস্থাটা কি হয়েছিল মন্ত্রীমশাই একবার কল্পনা করবেন শুধু। আর রোগীরা সেই ডাঃ চক্রবর্তীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল বলে তাদেরও কি অবস্থা হয়েছিল, সেটাও একবার এই সঙ্গে স্মরণ করবেন। দুদিন রোগীগুলিকে দরজা বন্ধ করে অনাহারে রাখা হয়েছিল এবং তাদের দুজন মারা গিয়েছিল। আর ডাঃ চক্রবর্তীকে এবং তাঁর ছেলেকেও মার খেতে হয়েছিল। স্বাস্থ্যদপ্তরের আমলারা এতটুকু অনুকম্পা পর্যন্ত দেখাতে পারেন নি তাঁকে—পক্ষান্তরে হাসপাতালে কায়েমী গোষ্ঠীকে বজায় রাখার জন্য তাঁরা ডঃ চক্রবর্তীকে ঝটিতি বদলী করে দিয়েছিলেন। এখন এই সমস্ত ঘটনাবলীর পিছনে মন্ত্রীমশাইয়ের নিজের দলের লোক ছিল, তদন্ত হলে একথা প্রমাণ করার মত মালমশলা আছে।

পরিশেষে মন্ত্রীমশাইয়ের নিজের ইমেজ কি ছিল আর কি হয়েছে, সেটাও একবার ভেবে দেখা দরকার। শুধু যে জয়েণ্ট ডাইরেক্টর ও তাঁর দলবলকে নিয়ে তিনি চলছেন কিংবা তিনি ডি এইচ এস-কে সরিয়ে ডাঃ সাহাকে ডি এইচ এস করতে চাইছেন কিংবা ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের ডাক্তারকে দিয়ে ঐ পদে অফিসিয়েট করাতে চাইছেন, এসব কথা আমি এ প্রসঙ্গে বলছি না।

মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি বুক ঠুকে অস্বীকার করতে পারেন এমন একজন লোককে নিয়ে গিয়ে তিনি দিল্লীর বঙ্গভবনে পর্যন্ত উঠেছিলেন যিনি তাঁর বন্ধু এবং যে বন্ধুকে পোষণ করতে গিয়ে তিনি এমন একটি কাজ করেছেন, যা তাঁর মত আসনে অধিষ্ঠিত মানুষের করা উচিত নয়।

মাননীয় মন্ত্রীমশায় স্মরণ করুন করুন সান্যাল বাবুর সেই 'Medicine করুন শংকর সেনের সেই 'Medicine in India' চিত্রটির কথা। মনে করুন তথ্যমন্ত্রী সোমনাথবাবু চিত্রটি কিনতে রাজী হন নি। মনে করুন সান্যাল বাবু আপনাকে দিয়েই সেটা কেনালেন—কেনালেন বিশ হাজার টাকা দিয়ে। কিন্তু ছবিটি এখন স্বাস্থ্যদপ্তরের অন্ধকার গুদামঘরে পড়ে। কোন চিত্রগৃহে তা দেখাবার মত ছবি নয়।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমি আপনার চেয়ে অনেক পুরনো বিধানসভা সদস্য। আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায় আর মনে হয়, এরই জন্য কি আমরা কংগ্রেসকে গদীচ্যুত করতে চেয়েছিলাম? আদর্শভ্রষ্টতার দায়ে মাননীয় মন্ত্রীকে দায়ী করে যুক্তফ্রণ্টের সকল শরিককে বলব, তিনি যে দলের মন্ত্রী সেই দলকে স্বাস্থ্যদপ্তরের ভার দিন আপনারা—কিন্তু বর্তমান মন্ত্রীকে আর নয়।

কলকাতায় গান্ধীজীর প্রথম বক্তৃতা

গোখলের ধন্যবাদ-ভাষণ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

ভূমিকা

॥ ১ ॥

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস উপলক্ষে কলকাতায় গান্ধীজী তৃতীয়বারের জন্য পদার্পণ করেন। এর আগে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পথে কলকাতার উপর দিয়েই স্বস্থানে গিয়েছিলেন। তারপরে ঐ বছরই কলকাতায় কিছু সময় থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে কলকাতার নেতৃবৃন্দকে সজাগ করতে সচেষ্ট হন। সে চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নি। কলকাতায় সভা আহ্বান করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। তা করতে পারার আগেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জরুরী আহ্বান পেয়ে তাঁকে চলে যেতে হয়। তারপরে কলকাতায় আবার আসেন ১৯০১ সালে। এই সময়ে কলকাতায় তিনি প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করতে পেরে-ছিলেন। তেমনি একটি বক্তৃতার অনুবাদ আমরা উপস্থিত করছি। সেই সঙ্গে গোপালকৃষ্ণ গোখলের ধন্যবাদ-ভাষণের অনুবাদও।

গান্ধীজীর জীবনীর ক্ষেত্রে, অন্তত কলকাতার সঙ্গে সম্পর্কের ইতিহাসের ক্ষেত্রে, তাঁর এই বক্তৃতার গুরুত্ব আছে। সংবাদপত্রে প্রথম প্রকাশের পরে বক্তৃতাটি আর কারো দৃষ্টিতে পর-বর্তীকালে পড়েছে বলে আমরা জানি না। "বিবেকানন্দ ইন ইণ্ডিয়ান নিউজপেপারস্‌" গ্রন্থের কাজ করবার সময়ে বন্ধুবর শ্রীসুনীল-বিহারী ঘোষ বক্তৃতাটির বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এটি ইণ্ডিয়ান মিরার কাগজে ২৬ জানুয়ারী, ১৯০২ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। মিরার-সম্পাদক এই বক্তৃতার উপর নির্ভর করে তিনটি সম্পাদকীয় লেখেন। সে বিষয়ে আলোচনা ইতিমধ্যে এক প্রবন্ধে আমরা করেছি, যেটি "বিবেকানন্দ ও গান্ধী" নামে সাপ্তাহিক বসুমতীর এ বৎসরের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। ঐ প্রবন্ধে ১৯০১ সালের গান্ধীজীর রাজনৈতিক ধারণা ইত্যাদির কথা আলোচনা করা আছে। সেখানে বর্তমান বক্তৃতাটির উল্লেখ করা হলেও বিষয়বস্তুর বিস্তারিত পরিচয় নেই; গোখলের বক্তৃতাও সেখানে দিই নি. অথচ গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে যখন তাঁর বিষয়ে গবেষণা চলেছে, ঐ সংবাদটি পুরোপুরি উপস্থিত করার প্রয়োজন বোধ করছি।

প্রয়োজন বোধ করার বিশেষ হেতু আছে। গান্ধীজীর আত্মজীবনী বা টেণ্ডুলকরকৃত গান্ধীজীর সুবিস্তৃত জীবনী "মহাত্মা"-র মধ্যে এই বক্তৃতাটির কোনো উল্লেখ নেই। গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে ১৮৯৬ ও ১৯০১-এর কলকাতাবাস সম্বন্ধে যথেষ্ট কিছু লিখেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, এই বক্তৃতাটি, যা মনে রাখার যোগ্য, তাঁর স্মৃতি এড়িয়ে গিয়েছিল।

আত্মজীবনীতে গান্ধীজী কিন্তু ১৯০১ সালে কলকাতায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমি একবার একটি সভায় বক্তৃতা করেছিলাম। তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ মল্লিক। বক্তৃতার বিষয় ছিল যুদ্ধের মধ্যে ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্স দলের কার্যকলাপ। ইংলিশম্যান কাগজের সঙ্গে আমার পূর্ব সম্পর্ক এক্ষেত্রে কাজে লেগেছিল। মিঃ স্যাণ্ডার্স তখন পীড়িত ছিলেন, কিন্তু তিনি ১৮৯৬ সালের মতই সাহায্য করেছিলেন। গোখলে আমার বক্তৃতা পছন্দ করেছিলেন, এবং ডাঃ রায় বক্তৃতার প্রশংসা করেছেন শুনে তিনি খুশি হয়েছিলেন।"

গান্ধীজীর এই রচনাংশ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক, ঐকালে তিনি কলকাতায় একটি বক্তৃতাই করেছিলেন। তা কিন্তু সত্য নয়। ১১ই জানুয়ারী, ১৯০২ তারিখে কলকাতায় স্বয়ং গোখলের উপস্থিতিতে তিনি একটি বক্তৃতা করেন, এবং সেই বক্তৃতার গোখলে প্রকাশ্যে গান্ধীজীর প্রশস্তি করেছিলেন। এই বক্তৃতাটির কথা গান্ধীজীর স্মরণে থাকা উচিত ছিল। গান্ধীজীর আত্মজীবনী থেকে বাংলা দেশ সম্বন্ধে এইকালে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাই বেশি জেনেছি, কিন্তু এই বক্তৃতা, যাতে যথেষ্ট সংখ্যায় বাঙালী সমবেত হয়েছিলেন, নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন, ধন্যবাদ-প্রস্তাব উঠিয়েছিলেন রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং ইণ্ডিয়ান মিরার এই সূত্রে তিনটি ধারাবাহিক সম্পাদকীয় রচনায় এমন মনোযোগ দিয়েছিল যা, পরবর্তীকালের বিচারেও সেগুলি আশ্চর্যজনক রচনা—এমন একটি বক্তৃতার কথা আত্মজীবনীতে না থাকায় ছবিটি সম্পূর্ণ হয় নি, এই কথা আমাদের বলতেই হয়।

বক্তৃতাটির অন্য গুরুত্বের আলোচনা করার আগে একটি প্রশ্ন করা যায়—এইটিই কি শিরোনামায় যা বলেছি—কলকাতায় গান্ধীজীর প্রথম বক্তৃতা? একেবারে নিশ্চিত উত্তর দিতে পারব না। তবে প্রায়-নিশ্চিত বলতে পারি, এইটিই কলকাতায় প্রথম বক্তৃতা এবং গান্ধীজী স্বয়ং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্স কোর-এর কার্যকলাপ বিষয়ে যে-বক্তৃতার উল্লেখ করেছেন সেটি এর পরে দেওয়া হয়। আমাদের আলোচ্য বক্তৃতাটি দেওয়া হয়েছিল ১১ জানুয়ারী তারিখে। অ্যাম্বুলেন্স কোর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয় ২৭শে জানুয়ারীতে। ইংলিশম্যান কাগজে ২৮ জানুয়ারীতে এই বক্তৃতার সুদীর্ঘ বিবরণ বেরোয়, তার প্রথম প্যারাগ্রাফ এই :

"Yesterday evening at the Albert Hall, Mr. M. K. Gandhi delivered the following interesting lecture on the work done during the war by the Indian Ambulance Corps. Professor Gokhale presided, and among those present were Professors P. K. Roy, P. C. Roy, and Messers. Bhupendra Basu, (J.) Chowdhury and

১৯০০ সালে জোহানেসবার্গে গান্ধী

Prithis Chandra Roy. Our readers will be familiar with the name of Mr. Gandhi in connections with the efforts made by him to ameliorate the condition of Indian immigrants of South Africa. The leaders of the community have already approached Mr. Chamberlain on the matter, and have received the reply that the Colonial Secretary would consider the question carefully and would confer with Lord Milner as to what relief could be given, more especially with reference to the Indian resident in the Transvaal and the Orange River Colony, who, as is well-known, were exceedingly harshly treated under the laws of the Late Republics."

গান্ধীজী এই বক্তৃতার সূচনাতে যা বলেছিলেন তা থেকেও মনে হয় অ্যালবার্ট হলে ১৯শে জানুয়ারীতেই কলকাতায় বক্তারূপে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। তিনি বলেছিলেন—

"Last Sunday week I had the honour to address you on my experiences in South Africa."

ইংলিশম্যান থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি, তা প্রমাণ করে গান্ধীজীর স্মৃতি কখনো কখনো তাঁকে প্রতারণা করেছে। আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন, অ্যাম্বুলেন্স কোর-এর সভায় সভাপতি ছিলেন ডাঃ শরৎ মল্লিক। তা সত্য নয়। গোখলেই সভাপতি হয়েছিলেন নির্ধারিত সভাপতি লালমোহন ঘোষের অনুপস্থিতিতে।

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রশ্নে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের সুবিচার এবং বাঙালী নেতাদের উদাসীনতার বিষয়টি গান্ধীজীর মনকে এমনই অধিকার করে বসেছিল যে তিনি, নিশ্চয়ই নিজের অজান্তে, ইণ্ডিয়ান মিরার বা বেঙ্গলী কাগজের প্রতি অবিচার করেছেন। ইণ্ডিয়ান মিরারের ভূমিকার কথা 'বিবেকানন্দ ও গান্ধী' প্রবন্ধে যথেষ্ট বলেছি। ঐ প্রবন্ধেই ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে বেঙ্গলীতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র অথচ আবেগপূর্ণ সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত আছে। আলোচ্য পর্বেও দেখতে পাই, বেঙ্গলী গান্ধীজীর ১৯শে জানুয়ারীর সভায় যোগদানের আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছে, এবং ২৭ জানুয়ারীর সভায় তিন কলমব্যাপী দীর্ঘ রিপোর্ট ছেপেছে। মনে হয়, মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড বা ইংলিশম্যানের সম্পাদক যেভাবে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে তাঁদের পত্রিকার 'কলম' গান্ধীজীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, বেঙ্গলী বা কলকাতার অন্যান্য সংবাদপত্র তা করতে রাজী হয় নি বলেই গান্ধীজী বাংলা দেশ থেকে প্রয়োজনীয় সাড়া পান নি মনে করেছেন।*

অ্যাম্বুলেন্স কোর সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তৃতা সভার বিবরণ বেঙ্গলীতেও ২৮ জানুয়ারী বেরিয়েছিল। তার সূচনাতে ছিল—

"There was a large gathering yesterday afternoon at 5 O'clock at the Albert Hall to listen to the interesting and instructive address by Mr. M. K. Gandhi, Barrister-at-Law, on the Indian Ambulance Corps. In the absence of Mr. Lal Mohan Ghose Mr. Gokhale was voted to the chair. The Chairman said, gentlemen, Mr. Gandhi is a gentleman who is already known to you. Many of you will remember that last week he was here, and therefore, without any remarks of introduction, I will call upon Mr. Gandhi to deliver his address to-day."

বেঙ্গলীর রিপোর্টে আরও পাই, ভূপেন্দ্রনাথ বসু ধন্যবাদ প্রস্তাব উঠিয়েছিলেন এবং জে চৌধুরী তা সমর্থন করেছিলেন।

॥ ২ ॥

এই বক্তৃতার আর একটি গুরুত্ব আছে। গান্ধীজীর রাজনৈতিক গুরু গোখলে 'সম্ভবত' কলকাতার এই সভাতেই তাঁর শিষ্যকে প্রথম প্রকাশ্যে অভিনন্দিত করেছিলেন। গান্ধীজীর আত্মজীবনী এবং টেণ্ডুলকরের গান্ধী-জীবনীতে পাই, ১৮৯৬

* ১৯০১ সালে ২৮ নভেম্বর *M. K. Gandhi's. Departure : Last Nights farewell at the Congress Hall* এই শিরোনামায় দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগকালে গান্ধীজীর সংবর্ধনার বিরাট বিবরণ ছেপেছিল।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

ধরুন, বাচ্চার সবে সর্দি লেগেছে;—নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়েছে—গলা খুস্ খুস্ করছে। তক্ষুনি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান্‌খানা–নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি–কিছু আর বাকি থাকবে না–অযথা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা।

সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, কোনো কষ্ট পেতে হয় না— বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।

আর একটা কথা! ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায়–যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,–যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।

খুবই সহজ কাজ! তেতো বড়ি বা, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না।

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,— সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে—

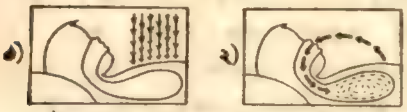

বাইরে থেকে গায়ে   ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে–
২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব— নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

ডারবানে গোখলের সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠানে গোখলের সঙ্গে গান্ধী। (বাঁ দিক থেকে উপবিষ্ট—গান্ধী চতুর্থজন এবং পঞ্চমজন গোখলে)

সালে গান্ধীজী পুনায় গোখলে ও তিলকের সমর্থনে, ডাঃ ভাণ্ডারকরের সভাপতিত্বে এক ছোটখাট সভা করতে পেরেছিলেন। ঐ সভাতে গোখলে কোনো বক্তৃতা করেছিলেন, এমন সংবাদ উক্ত দুই গ্রন্থে নেই। এই সময়ে গোখলে গান্ধীজীর প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জানালেও গান্ধীজীর বীরমহিমা তখনো প্রকাশিত হয় নি, কয়েক মাসের মধ্যেই তা হবে, যখন তিনি ডারবানে অবতরণ করে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হবেন ইউরোপীয়দের দ্বারা (যার সমসাময়িক বিবরণ দিয়েছি শারদীয় সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রকাশিতব্য প্রবন্ধে)—সেই কাহিনী ভারতে প্রচারিত হয়ে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। গোখলে গান্ধীজীর অপরিসীম মনের জোরে ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন, বিশেষ গর্বিতও। সেই মনোভাব প্রকাশ্য সভায় তিনি কোথায় প্রকাশ করেছিলেন? ১৮৯৬-এর পরে ১৯০১-এর ডিসেম্বরেই কলকাতায় গোখলের সাক্ষাৎ। সুতরাং এর অল্পদিন পরে, ১৯ জানুয়ারী, ১৯০২ তারিখে, কলকাতার অ্যালবার্ট হলের সভায় গোখলের গান্ধী-প্রশস্তিকেই আমরা গান্ধী বিষয়ে গোখলের প্রথম প্রকাশ্য অভিনন্দন বলতে পারি। টেণ্ডুলকরের জীবনীতে গান্ধী-বিষয়ে গোখলের যে সব উক্তি উদ্ধৃত আছে তার প্রথমটির সময় নভেম্বর, ১৯০৯। নিশ্চয় গোখলে এর পূর্বে প্রকাশ্য সভায় গান্ধীজীর বিষয়ে বলেছেন, যদিও কোথায় বলেছেন তা গান্ধী-জীবনী থেকে আমরা পাই না। অন্তত ১৯০২-এর ১৯শে জানুয়ারীর পূর্বে সেই ধরনের কিছু বলেছেন কি না তা প্রমাণসাপেক্ষ। বিষয়টি আমি গান্ধী-গবেষকদের কাছে তুলে ধরছি।

১৯ জানুয়ারী, ১৯০২-এর কলকাতা-সভায় গোখলে গান্ধীজীর বিষয়ে যা বলেছিলেন, পরবর্তীকালের বক্তব্যগুলিতে আর বিশেষ নতুন কিছু যোগ করেছেন কি না সন্দেহ। পরবর্তী বক্তব্যগুলির বিষয়ে বলা যায়, হয়ত তার মধ্যে তাঁর ভাবাবেগ আরও প্রবল হয়েছিল এবং কলকাতার আলোচ্য সভায় বলবার সময়ে যতখানি সাবধানতার সঙ্গে তাঁকে বলতে হয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশি প্রত্যয়ের সঙ্গে পরবর্তীকালে বলতে পেরেছিলেন, কারণ ইতিমধ্যে দেশবাসী গান্ধীমহিমার সঙ্গে ক্রমেই অধিক পরিচিত হয়েছে, কিন্তু একথা সহজেই বলা যায়, তাঁর মূল বক্তব্য একই থেকে গিয়েছিল। তাছাড়া ইণ্ডিয়ান মিরারের রিপোর্টের মধ্যে গোখলের বক্তৃতার সব কিছুই প্রকাশিত হয়েছিল, এমন নয়। যেখানে তিনি গান্ধীর ব্যক্তিচরিত্রের বিষয়ে বলেছিলেন, সেখানে রিপোর্টে ক্ষেত্রবিশেষে সারসংক্ষেপ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল মনে হয়। রিপোর্টের ভাষাতে তার ইঙ্গিত আছে, যেমন,

"After paying tribute to Mr. Gandhi's earnestness and moral work and his modest unassuming ways....", ইত্যাদি।

গান্ধী-বিষয়ে গোখলের পরবর্তী বক্তব্যের পাশে আলোচ্য কলকাতা-সভার বক্তব্য রাখলেই আমাদের কথার সত্যতা বোঝা যাবে।

১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে গোখলে বোম্বাইয়ে এক সভায় দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিবরণ দিতে গিয়ে গান্ধী প্রসঙ্গে বলেন—

"..The indomitable Gandhi, a man of tremendous spiritual power, one who is made of the stuff of which great heroes and martyrs

are made....Look at the splendid manner in which the whole movement has been managed.. Surely a man who can achieve this must represent a great moral force....I am sure, if any of us had been in the Transvaal during these days, should have been proud to range ourselves under Mr. Gandhi's banner and work with him and suffer with him in the great cause."

এই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সংগ্রামের উপর প্রস্তাব উত্থাপন করে গোখলে গান্ধী সম্বন্ধে তাঁর সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন:

"After the immortal part which Mr. Gandhi has played in the South African affair I must say it will not be possible for any Indian at any time, here or in any other assembly of Indians, to mention his name without deep emotion or pride. Gentlemen, it is one of the privileges of my life that I know Mr. Gandhi intimately and I can tell you that a purer, a nobler, a braver and a more exalted spirit has never moved on this earth.....He is a man who may be well described as a man among men, a hero among heroes, a patriot among patriots, and we may well say that in him Indian humanity at the present time has reallv reached its high watermark."

১৯১২ সালের শেষভাগে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণান্তে গোখলে বোম্বাইয়ে অবতরণ করে গান্ধীজী সম্বন্ধে বলেন—

"Only those who have come in personal contact with Mr. Gandhi as he is now, can realise the wonderful personality of the man. He is without doubt made of the stuff of which heroes and martyrs are made. Nay, more, he has in him the marvellous spiritual power to turn ordinary men around him into heroes and martyrs..One most striking fact about him is that though he has waged his great struggle so ceaselessly, his mind is absolutely free from all bitterness against Europeans. And in my tour nothing warmed my heart more than to see the universal esteem in which the European community holds Mr. Gandhi."

কলকাতা-ভাষণের পুরো অনুবাদ আমরা পরে দিয়েছি, এখন ইংরাজিতে মূল রিপোর্টের কিছু অংশ তুলনার জন্য তুলে ধরছি—

"The Hon'ble Mr. Gokhale said, that he met Mr. Gandhi in 1896....and he distinctly remembered the impression which Mr. Gandhi then made on his mind by his ability, earnestness, and tact and also by his manner at once so gentle and yet so firm....Since that time the speaker had followed Mr. Gandhi's career with the deepest interest and with profound admiration, and having studied every utterance of his and watched every movement in which he had any share, the speaker could say without any hesitation whatever, that Mr. Gandhi was a man made of the stuff of which heroes were made....The speaker here narrated at some length the deplorable incidetnts connected with Mr. Gandhi's landing in South Africa in 1896.. What Mr. Gokhale admired in this connection in Mr. Gandhi was the fact that inspite of such treatment..there was not a trace of bitterness in Mr. Gandhi's mind against the European community in Natal, but that on the contrary, he was ever anxious to express his just appreciation of their good qualities, and a generous help that he received from individual Englishmen....Mr. Gandhi had proved that the fireest opposition could be overcome and the bitterest misunderstanding removed if only we are true to ourselves and worked in an earnest, selfless and straight forward manner and refrained from returning insult for insult and abuse for abuse. Truly Mr. Gandhi had illustrated in a practical manner that love conquered hate. Then Mr. Gandhi has raised the estimation in which the Indian character was hailed by Englishmen....If only public workers in this country showed greater earnestness greater selflessness and greater sense of responsibility, ..they would be content and proud to serve under men like Mr. Gandhi, who brought to the discharge of their difficult duty those high qualities of truth, coneiliation and foresight which their friends had exhibited in so remarkable a manner in South Africa."

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

এইসব লেখক এবং বইয়ের প্রসঙ্গেই মন যখন বেশি নিযুক্ত থাকে, তখন চারদিকের অন্যান্য দৃশ্য বা ঘটনা যেন দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়!

এই মন্তব্যের সঙ্গে আনন্দের একটি দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

আমি তখন ব্রজেন্দ্রনাথের লেখা থেকে কেরির একখানি চিঠি পড়ে শোনাচ্ছিলুম,—১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই আগস্ট,—অর্থাৎ ৭ই আগস্ট রামরামের মৃত্যু ঘটে যাবার দিন-চারেক পরের সেই চিঠি—যাতে রামরামের ছেলে নরোত্তম বসুকে তাঁর পিতার পদেই নিয়োগের জন্যে অনুমোদন করেন কেরি-সাহেব। রামরাম যে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার পণ্ডিত ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

আনন্দর দীর্ঘশ্বাস শুনে বলতে হোলো—সে-সময়ে চারদিকের কোন্ কোন্ দৃশ্যের কথা মনে পড়া উচিত বলে তোমার মনে হচ্ছে?

—১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে রামরাম যখন টমাসের মুন্‌শী হন, তার বছর তিরিশ আগে পলাশীর যুদ্ধ হয়ে গেছে। কলকাতার লালবাজার আর চিৎপুর রোডের মোড়ে তখন এক জেলখানা ছিল। চন্দননগর দখল করার পরে সেখানকার ফরাসী সৈন্যদের ধরে এনে সেই জেলখানায় রাখা হয়েছিল। তারা সে-বাড়ির দেয়াল খুঁড়ে, পালিয়ে আত্ম-রক্ষা করে। রামরাম যখন প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত লেখেন, কলকাতার ঐ জায়গাটা তখন ছিল প্রকাশ্য বধ্যভূমি। ক্লাইভ স্ট্রীটের কাছাকাছি এক জায়গায় ছিল হামাম-গলি—সেখানে গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা ছিল। টেরিটি বাজারের কাছে ছিল ওয়েস্টন সাহেবের বাগান। শোনা যায়, এই দয়ালু সাহেবটি নিজের হাতে প্রতি মাসে গরিব-দুঃখীদের জন্যে তাঁর এক লক্ষ টাকার দান ছিল। বৈঠকখানায়—শেয়ালদার কাছে ছিল 'জকি-ক্লাব'—সেই বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতেন শিকারীরা—যাঁরা দমদম অঞ্চলে ব্যাঘ্র-বরাহ শিকার করতে যেতেন। গ্রামে দু'-চার দিন কাটিয়ে আসবার ইচ্ছে হলে সৌখীন সাহেবরা যেতেন কলকাতার মাইল দশেক দূরে বারাসাতে।

আমি বললুম—এসব অনেক আগেকার কথা বোধ হয়?

সে বললে—না, না, মোটেই অনেক আগেকার নয়। ১৭৫৭-তে সিরাজউদ্দৌলার হেড-কোয়ার্টার্স ছিল উমি-চাঁদের বাগানে,—মানে হালসিবাগানে। উমিচাঁদ ছিলেন কোটি কোটি টাকার মালিক,—মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর তাঁর অধিকার ছিল অপরিসীম। তা ছাড়া পুরো চল্লিশটি বছর তিনি কোম্পানির বৈষয়িক কাজ-কর্মের ঠিকাদার ছিলেন। পলাশীর বছর-সতেরো আগে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে মারাঠী বর্গীর দল বাংলা আক্রমণ করে। বালেশ্বর থেকে রাজমহল পর্যন্ত ধ্বংস করে দিয়ে, হুগলী অধিকার করে তারা। সুতানুটির উত্তর-প্রান্ত থেকে গোবিন্দপুর পর্যন্ত খাল কেটে কোম্পানির জমি ঘিরে রাখবার ব্যবস্থা হয়। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে সেই সাত মাইল লম্বা খাল কাটা শুরু হয় চিৎপুরের পুল থেকে। কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামার তেজ কমে যায় ইতিমধ্যে,—তাই পুরো-পুরি খালটা আর কাটা হয় নি। ১৭৫৭-তে মীরজাফর আলির সঙ্গে ইংরেজদের যে চুক্তি হয়, তাতে কলকাতার চারদিকে মারাঠা-খাল,—খালের সংলগ্ন দু'শ' গজ পরিমাণ, এবং দক্ষিণে কুলপী পর্যন্ত অঞ্চল ইংরেজ-কোম্পানির দখলে আসে। রামরাম যখন রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত লেখেন, তখন সেই খাল-বুজোনো জায়গায় সার্কুলার রোড দেখা দিয়েছে—সেখানে হাসিখুশি স্বভাবের ধনীরা বেড়াতে যেতেন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম আরো আগেকার ঘটনা। ১৬৯৮—৯৯ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম নামটা চালু হয়।

সে কি আগেকার ফোর্ট উইলিয়াম?

হাঁ,—পলাশীর পরে, ১৭৫৮-তে সেই পুরনো দুর্গের মাইলখানেক দক্ষিণে ক্লাইভ নতুন ফোর্ট-উইলিয়াম তৈরী শুরু করেন। ১৭৫৬-তে সিরাজউদ্দৌলা যখন কলকাতা দখল করেন, তখন চৌরিঙ্গিতে মাত্র সত্তরটি বাড়িতে ছিল ইংরেজদের বাস,—তার কিছুদিন আগেও ওটা ছিল অতি বাজে স্যাঁৎ-স্যাঁতে জলা জায়গা।

আমি বললুম—থাক্ ওসব খবর। রামরাম বসুর আমলের কলকাতা সম্বন্ধে আমাদের খুঁটিনাটি বৃত্তান্তের দরকার কী?

—দরকার শুধু সময়ের দূরত্বটুকু অনুভব করা। রাম-রামের বা মৃত্যুঞ্জয়ের বা রামমোহনের গদ্য সম্বন্ধে আলো-চনার সময়ে আমাদের নিকট কালের বেষ্টনী ছাড়িয়ে, সেই অন্যকালের দিকে নজর দেওয়া দরকার। রামরাম যখন তাঁর ঐ বইখানি লেখেন, তখন কলকাতা আয়তনে বাড়তে আরম্ভ করেছে। ১৭৫৮-র ডিসেম্বরে চন্দননগরে কত যে ঘর-বাড়ি বন্দর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কলকাতার

বাড়-বাড়ন্ত শুরু হয়েছিল তখন থেকেই। আর, ১৭৯৮ সালে এই শহরে মোট ঘর-বাড়ির সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৮,৭৫০,—কলকাতার লোকসংখ্যা তখন ছয় থেকে সাত লাখের মধ্যে। তারই কাছাকাছি সময়ে হঠাৎ এই রব উঠে যায় যে, ফরাসীরা ভারতবর্ষে এসে ইংরেজদের দখল-করা জমি-জায়গা সব আক্রমণ করতে পারে। কলকাতার ধনী, মানী বাঙালীরাও তখন—সেই ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২১-এ অগাস্ট তারিখের এক সভায় ইংরেজদের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ঘোষণা করে ইংরেজ-শক্তির সাহায্যকল্পে নগদ বিশ হাজার আট শ' টাকা চাঁদা তুলে দেন। গুরুচরণ মল্লিক, নিমাইচরণ মল্লিক, রামকৃষ্ণ মল্লিক, গোপীমোহন ঠাকুর, কালীচরণ হালদার, রসিকলাল দত্ত এবং গোকুলচাঁদ দত্ত ছিলেন সেই সভার আহবায়ক।

আমি বললুম—পুরোনো কলকাতার চেহারা আমাদের পুরোনো পুঁথিপত্রের মধ্যেই কতকটা বজায় আছে। এসব খবর শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু রামরাম বসুর সময়ে,—আঠারোর শতকের শেষ, আর, উনিশ শতকের সেই সূচনাসন্ধিতে আজকের কলকাতা ঠিক কী রকম ছিল, সে-খবরের চেয়ে এখন আমাদের রামরাম বসু, রামমোহন এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার,—এই তিনজনের লেখক-সত্তার একটু তুলনার দিকগুলি দেখে নিলে ভাল হোতো।

আনন্দ বললে—মৃত্যুঞ্জয় এবং রামমোহন সম্বন্ধে,—শুধু রামমোহন প্রসঙ্গেই বা কেন,—কোনো কোনো দিক থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে আরো পরবর্তী লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও তুলনা যে আমরা একেবারেই আলোচনা করি নি, তা বলা যায় না। এর আগেই সেই তুলনার দিকগুলি দেখা হয়েছে। এখন বরং রামরাম এবং রামমোহন সম্বন্ধে এই কথাগুলি দেখা যাক্—

এই বলে সে আরো কয়েকটি দিকের উল্লেখ করেছিল। আমি সংক্ষেপে সেই দিকগুলি লিখছি—প্রথম কথা—সময়ের দিক দিয়ে রামরাম যে এঁদের মধ্যে প্রথম লেখক, সেটা মনে রাখা উচিত। দ্বিতীয় কথা—মৃত্যুঞ্জয় অথবা রামমোহন, এঁদের দুজনের মধ্যে কেউই ঠিক রামরামের অবস্থায় পড়েন নি। মৃত্যুঞ্জয় এবং রামমোহন উভয়েই ছিলেন সোজাসুজি আত্মস্থ মানুষ। কিন্তু রামরাম যেন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের জন্যে খুবই আগ্রহী,—অন্তত তাঁর মনিবদের কাছে এইরকম ভাব দেখিয়েছিলেন। হয়তো, ধর্মযাজকদের কাছে চাকরিসূত্রে অন্ন আহরণের বিশেষ নিয়তিই তাঁকে দিয়ে এই ভূমিকার অভিনয় করিয়েছে। ১৮৭১ সালে ছাপা 'Memoirs of the Rev. John Thomas' বইখানিতে লেখা হয়েছিল—'Ram Basu was a clever man, with a pleasing address'। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই চাতুর্যের দিকটি সাহিত্যের যেসব বিশেষ রূপ-রীতির মধ্যে সার্থকভাবে ধরা দিতে পারতো, সে-সব রূপের তিনি চর্চা করেন নি বা চর্চার সুযোগই পান নি। তাঁর মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন কমলাকান্ত বাস করেছে বলে আমার মনে হয়। তৃতীয়ত খ্রীস্টান মনিবদের দলে থেকেই রামরাম হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছিলেন বটে,—কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করেন যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে রামরাম যখন চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন, উনিশ শতকের সেই প্রথম কয়েক বছরের কলকাতা শহরে রামমোহনের সঙ্গে রামরামের হয়তো আলাপ হয়,—এবং বাহ্যত হিন্দু-পৌত্তলিকতার নিন্দায় নামলেও ভেতরে ভেতরে হিন্দু একেশ্বরবাদের সত্য রামরামের উপলব্ধিতে পৌঁছেছিল। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'লিপিমালা'র ভূমিকায় তিনি 'পরম ব্রহ্মের' উদ্দেশে প্রণতি নিবেদন করে গেছেন। সে তো মোটেই হিন্দু-বিরোধিতা নয়।

আনন্দ বললে—শোনো ব্রজেন্দ্রনাথের কথা—

'মোটের উপর মনে হয়, রামরাম বসু ও রামমোহনের কার্যকলাপের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য থাকায় পরবর্তী যুগে দুইজনকে লইয়া একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, ও উহার ফলে রামরামের উপর রামমোহনের প্রভাব আরোপিত হয়। নহিলে হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্বন্ধে রামরাম বসু যে রামমোহনের অগ্রণী ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'

আমি বললুম—সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব এঁদের একজনেরও ছিল না।

সে বললে—সে তো আমি আগেই বলেছি। এঁরা কেউই সাহিত্যিক ছিলেন না।

—তাহলে এই বই-বাছাইয়ের কাজে এঁরা প্রত্যেকেই কি সমান শ্রদ্ধেয় এবং পরিত্যাজ্য?

—এঁদের সাহিত্য মানে প্রধানত ভাষারই চর্চা,—যে-ভাষা শিশুকালে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছিল, তাকে ক্রমশ কাঠিন্যে, নমনীয়তায়, গতিসামর্থ্যে সরস, সতেজ, পরিণত করে তোলবার কাজটুকুই এঁরা বিশেষভাবে করে গেছেন। ততোধিক কোনো রসসৃষ্টির দাবি এঁদের এইসব বই সম্বন্ধে গ্রাহ্য নয়।

—তাহলে, এই তিনজনের গদ্যের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যই কি শ্রেষ্ঠ?

আনন্দ হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে, হঠাৎ কিঞ্চিৎ বেশি জোর দিয়ে বললে—দ্যাখো, এরকম তুলনা ইস্কুল-কলেজেরই বিশেষ সংস্কার। রামরাম ক'বার 'সমিভ্যারে', 'প্রকষ্ঠ', 'বাহুড়িলেন', 'নিকটবর্তি' ইত্যাদি শব্দ লিখেছেন,—রামমোহন কোথায় লিখেছিলেন—'অপ্রেক্ষিত মৃত শশু খাদ্য নহে',—কে বা কারা তাঁকে 'দগ্ধান্তর্বাসী' নাম দিয়েছিলেন,—এসব কি সাহিত্যের কথা? তবে বই-বাছাইয়ের কাজ তো কেবলমাত্র সাহিত্যগুণ-নিরীক্ষা নয়। ভাষার ক্ষমতা বাড়িয়ে যাবার কাজে এঁরা সকলেই মনোযোগী ছিলেন। কাজেকাজেই আলাদা করে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র গুণগান না করলেও রামরাম বসুকে এই পর্বের অগ্রণীর একজন লেখকের সম্মান অবশ্যই দিতে হয়। উনিশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের এইসব লেখকদের মধ্যে একমাত্র ভবানীচরণকেই কতকটা সাহিত্যিক বলা যায়,—অন্যান্য যাঁরা, তাঁরা সকলেই ছিলেন ভাষাচর্চার কাজে। [ক্রমশ]

বঙ্গ দর্শন

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমি সংস্কারমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার এবং বিচারমন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের পূর্বে শ্রীকোঙার প্রধানমন্ত্রীকে একটি দীর্ঘ ব্যক্তিগত চিঠিতে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং সেই প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব করেছিলেন। শ্রীকোঙার তাঁর চিঠিতে বলেছেন, গত ষোল-সতের বছরে বিভিন্ন রাজ্যে বহু ভূমি-সংক্রান্ত আইন তৈরি হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য মোটেই সফল হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার সাতষট্টি সালের কয়েক মাসে এবং এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সত্ত্বেও ভূমি সংস্কারের নানা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীকোঙার প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে, নিছক সদিচ্ছা প্রকাশ করে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যাবে না। বড় বড় জমিদার-জোতদারশ্রেণী সাংবিধানিক আইনের আওতায় শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি লোকের হাতে জমি থাকার দরুণ খাদ্যে মজুতদারি ঘটছে, ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও খাদ্যসংকটের সমাধান হচ্ছে না। ভূমিসংক্রান্ত আইনে নানা রকম পাশ কাটাবার সুযোগ থাকার ফলে জোতদাররা জমি বেনামী করার সুযোগ পেয়েছে। আইন প্রণীত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকর না করার দরুণ জোতদারেরা আইনকে ফাঁকি দেবার ব্যবস্থা করার সুযোগ পেয়েছে। তদুপরি সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা প্রধানত জোতদার-ঘেঁষা হবার ফলে ভূমি সংস্কারের কোন বাস্তব প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত হতে পারে নি। এ ছাড়া শ্রীকোঙার আরও জানিয়েছেন যে, সরকারের হাতের জমিগুলি ইতিপূর্বে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয় নি, ভাগচাষী ও জমির ছোট মালিকদের উৎখাত বন্ধের কোন প্রচেষ্টাই হয় নি, এবং এই উৎখাতের অপরাধে কোন জমিদারই কখনো সাজা পায় নি। তাছাড়া সংগঠিত কৃষক আন্দোলনে ভূমি সংস্কার ব্যাপারে কোন সহায়তা লাভের চেষ্টা ইতিপূর্বে হয় নি।

ভূমি সংস্কারের তিনটি মূল উদ্দেশ্যের কথা শ্রীকোঙার প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। সেই তিনটি উদ্দেশ্য হল, সমস্ত মধ্যস্বত্ব লোপ, কয়েকটি লোকের হাতে ভূ-সম্পত্তি কেন্দ্রীকরণের অবসান এবং ভূমিহীন দরিদ্র চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বিতরণ। এই সঙ্গে ভাগচাষী ও বৈধ জমির মালিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রীকোঙার বলেছেন যে, অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ভূমি আইন প্রয়োগের ব্যাপারে বেশি চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় বিশ লক্ষ একর জমি আইন অনুযায়ী সরকারের হাতে এসেছে, এবং তার সাড়ে ষোল লক্ষ একরের মত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এখনো বহু বেনামী বেআইনী জমি উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নি, এবং প্রায় এক লক্ষ একর আবাদী জমির অধিকারের প্রশ্নে দীর্ঘ দেওয়ানী মামলা চলছে। বেনামী জমি খুঁজে বার করার ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জোতদারেরা তীব্র প্রতিরোধ করছে, এমন কি হিংসাত্মক অভিযানেও তারা পিছ-পা নয়। এই ব্যাপারে বিশেষ করে তারা আইনের আশ্রয় নিচ্ছে, বিভিন্ন দেওয়ানী আদালতে এবং হাইকোর্টে আর সরকারের বিরুদ্ধে তারা একতরফা ইনজাংসন আদায় করছে। ফলে হাজার হাজার এই ধরণের মামলা আদালতে জমে রয়েছে। এর ফলে প্রায় দুই লক্ষ একর আবাদী জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জোতদারগোষ্ঠীর বহুমুখী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত অসুস্থ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার কিছু কিছু আইন পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন, এবং আরও কিছু আইন পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে জোতদাররা আইনের ফাঁক না পায়। দরিদ্র কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য তিন একর পর্যন্ত জমির মালিকদের ভূমিরাজস্ব মকুব করা হয়েছে। এর পর শ্রীকোঙার প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন যে, যদি সত্যই ভূমি সংস্কার করতে হয় তাহলে সংবিধানের ৩১ (১) এবং ৩১ (২) ধারার সংশোধন এই মুহূর্তে করতে হবে, নতুবা সত্যিকারের কোন কাজ করাই সম্ভব হবে না।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে এই মিশনের কারণ হচ্ছে এই যে, কিছুদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। সংবাদে প্রকাশ যে, প্রধানমন্ত্রী বর্তমান আইন পরিবর্তন এবং ভূমি সংস্কার কার্যসূচী সত্বর কার্যকরী করার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন, এবং শ্রীকোঙারকে একথা জানিয়েছেন যে, ভূমি সংস্কার সম্পর্কে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন ডাকছেন। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার যে, এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই! কিছুকাল আগে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল যাতে অনেক সদিচ্ছার কথা ছিল, কিন্তু কাজের কথা একটিও ছিল না। কাজেই আশংকা হয় যে, শ্রীকোঙার তথা পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাধিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মোটেই বেশিদূর অগ্রসর হবেন না। তবে সম্প্রতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর একটি প্রগতিশীল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক প্রয়োজনেই এই ভাবমূর্তি তাঁর অম্লান রাখা দরকার, তার জন্য তাঁকে আরও কিছু প্রগতিশীল কাজকর্ম করতে হবে, শুধু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণেই হবে না। কাজেই হয়ত কিছু অদূর ভবিষ্যতে হতে পারে, কিন্তু সে আশায় অপেক্ষা করে না থেকে সারা ভারত জুড়ে ভূমি সংস্কারের বাস্তব আইন এবং সেই উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের অনুকূলে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করাই শ্রেয়।

সাধু সংকল্প

কিছুকাল যাবৎ শরিকী সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল, গত ১লা অক্টোবর যুক্তফ্রন্টের সভায় শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর প্রস্তাব থেকে কয়েকটি কর্মসূচী রূপায়ণের সিদ্ধান্তে সেই সংকটের অবসান হয়েছে বলা যায়। ওই সভায় শরিকী সংঘর্ষ রোধের জন্য সকলেই একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার বন্ধ করতে স্বীকৃত হয়েছেন, দরকার হলে শ্রমিক এলাকায় সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচন স্থগিত রাখতেও সম্মত হয়েছেন। এ ছাড়া ধান কাটার মরশুমে সর্বপ্রকার সংঘর্ষ বন্ধ করতে মহকুমা থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীর ভিত্তিতে মিলিতভাবে কাজ করতে তাঁরা রাজী হয়েছেন। এও স্থির করা হয়েছে যে, সর্বত্র যুক্ত সভা করা হবে, মন্ত্রীদের সব দপ্তর নিয়ে আলোচনা করা হবে। অস্ত্র বা লাঠি নিয়ে শোভাযাত্রা আপোষে বন্ধ করা হবে। ওপরতলার যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ কোনক্রমেই একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা করবেন না, নিচুস্তরের কর্মীরা জনসভা করে যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে জোরদার করবেন। যুক্তফ্রন্টের এই সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি, কেন না বিবাদ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতার যে চেহারা ফুটে উঠেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে। সব পার্টির ভেতরেই সমাজ-বিরোধীরা আড্ডা জমিয়েছে, এবং শরিকী পার্টিরা একে অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের কর্তব্য শেষ করছে। এর ফলে বামপন্থী দলগুলির প্রতি জনসাধারণের অশ্রদ্ধা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বাংলা দেশের মানুষ যুক্তফ্রন্টকেই কংগ্রেসের বিকল্প শক্তি হিসাবে দেখেছে এবং এখনো দেখে। সুতরাং ফ্রন্টকে শক্তিশালী করেই সব পার্টি তাদের শক্তি বাড়াতে পারবে, খুনোখুনি, মারামারি করে নয়। এই সোজা কথাটি বুঝতে এঁদের এত যে কেন সময় লাগল সেটাই সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝে উঠতে পারা যায় না। লেট আস হোপ ফর দি বেস্ট।

শিল্পনীতি

ওরিয়েন্টাল চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক সভার উদ্বোধন করতে গিয়ে উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু আর একবার জানিয়ে দিয়েছেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের প্রসার ও বিকাশ চান এবং তা ঘটাবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা ও শ্রমিকদের কল্যাণ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। এ কথা শ্রীবসু এই প্রথম বলছেন না, ইতিপূর্বে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ঠিক একই কথা বলেছেন। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই একশ্রেণীর মালিক তারস্বরে চীৎকার করতে শুরু করেছেন যে, এখানে নাকি কাজ-কারবার চালাবার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। কংগ্রেস আমলে শিল্পপতিরা যে সরকারের কাছ থেকে একতরফা সাহায্য ও সহযোগিতা, আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়ে এসেছেন, তার ফলে তাঁদের মোটা মুনাফা লুটতে কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু কংগ্রেস আমলে যখনই শ্রমিক অসন্তোষ ঘটেছে, ধর্মঘট হয়েছে, তখন সরকারের পুলিশবাহিনী শিল্পপতিদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, মালিকের নির্দেশে পুলিশ ধর্মঘটী শ্রমিকদের ঠেঙিয়েছে, ঘেরাও করে গুলী চালিয়েছে। তখন সংবাদপত্রগুলি আইন ও শৃংখলার কথা তোলে নি, এ সব মালিকের বৈধ অধিকার বলে মনে করা হয়েছে। ১৯৬৭-র আগে বৃহৎ সংবাদপত্রগুলিতে শ্রমিক আন্দোলনের কোন সংবাদ থাকত বলে মনে পড়ে না। যুক্তফ্রন্ট নেতারা একাধিকবার ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের পুলিশ শোষিত ও বঞ্চিত শ্রমিকদের ওপর উৎপীড়ন করবে না, তাদের যথাযথ সাহায্য করবে। শ্রীজ্যোতি বসুও ওরিয়েন্টাল চেম্বার অফ কমার্সের সভায় শিল্পপতিদের উদ্দেশ্য করে আর একবার ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের সরকার শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করে যাবেন। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ তা মালিকপক্ষও অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু সে ভূমিকা মুখে স্বীকার করলেই কর্তব্য শেষ হল না, তাদের ন্যায্য দাবিগুলির প্রতিও সহানুভূতি দেখানো দরকার। শ্রীবসু এই দাবি প্রতিষ্ঠার লড়াই-এ শ্রমিকদের সাহায্য দানের কথা বলেছেন। তবে এ ছাড়াও শিল্পের উন্নতির প্রতি সরকারের আরও যে সব কর্তব্য আছে সে কথাও উপ-মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন। তিনি এ কথা বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা সরকার করে যাচ্ছেন। শিল্পপতিরা অভিযোগ করেন যে, কারখানা গঠন বা চালাবার মত উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় মালমশলা তাঁরা পান না। ইতিপূর্বে শ্রীজ্যোতি বসু এ বাবদে তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, রাজ্যে শিল্পের প্রসার ঘটানোর জন্য, বেকারী কমাবার স্বার্থে, যুক্তফ্রন্ট সরকার শিল্পপতিদের হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যন্ত্রপাতি, অর্থ ঋণ ইত্যাদির জন্য দাবি পেশ করবেন। শ্রীবসু সে কথা রেখেছেন এবং ভবিষ্যতেও পশ্চিমবঙ্গে শিল্প সংগঠনের জন্য কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন। সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশন যে কলকাতার একশো মাইলের মধ্যে কোন নতুন শিল্প কারখানা গঠন বা সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও পরিকল্পনামন্ত্রী তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁদের বত্রিশ দফা কর্মসূচীতে প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েছেন। অতএব শিল্পপতিরা সরকারের কাছ থেকে সঙ্গত সাহায্য ও সহযোগিতা আশা করতে পারেন। বস্তুত শিল্প ও সরকারের মধ্যে বিরোধ জীইয়ে রেখে দেশের সমৃদ্ধি ঘটানো সম্ভবপর নয়। পক্ষান্তরে মালিক-শ্রমিক বিরোধ অমীমাংসিত রেখেও শিল্পের প্রসার করা শক্ত। বরং মালিকপক্ষ যদি শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি উদারভাবে মেনে নেন, যদি শ্রমিকদের সহযোগিতার ওপরে আস্থা স্থাপন করেন তাতে শুধু তাঁদেরই লাভ হবে না, গোটা রাজ্যেরই লাভ হবে। মালিক-শ্রমিক-সরকার সহযোগিতার মাধ্যমে দুরূহ শ্রমিক বিরোধেরও মীমাংসা সম্ভব, তার কয়েকটি জাজ্বল্য প্রমাণ চট-শিল্প চা-শিল্প এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে পাওয়া গেছে। শিল্পপতিরা অন্যান্য রাজ্যে যে রকম সুযোগ সুবিধা পান পশ্চিমবঙ্গেও সেই রকম দেবার প্রচেষ্টা যুক্তফ্রন্ট সরকার বরাবর করে যাচ্ছেন, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে শ্রমিকদের বেতন যে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের চেয়ে অনেক বেশি, এবং বস্তুত পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের ন্যায্য কারণ রয়েছে, আশা করি মালিকপক্ষের এটা বুঝতে কোন অসুবিধে নেই।

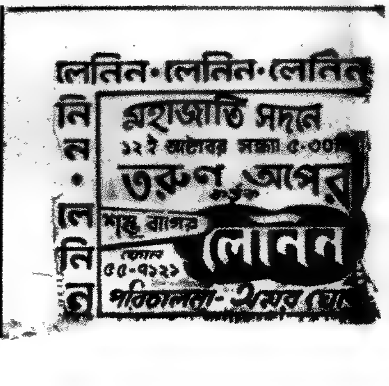

ভারত দর্শন

সীমান্ত গান্ধী

গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধনের অধিকার আজ যে কয়েকজন অংগুলিমেয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আছে, সীমান্ত গান্ধী তাঁদের শীর্ষস্থানীয়। সীমান্ত গান্ধীর ত্যাগ, তিতিক্ষা, দেশপ্রেম আর আদর্শনিষ্ঠা মানুষের ইতিহাসকে চমকিত করেছে।

এই দীর্ঘদেহী পাঠান নেতা উন-আশীটি পবিত্র বৎসর ধরে দেশপ্রেমের যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তা বাস্তবিকই বিরল-শ্রুত। এমনটি বড় একটা শোনা যায় না; অমন মানুষ জাতির ভাগ্যে গোটা দুই জন্মগ্রহণ করেন না।

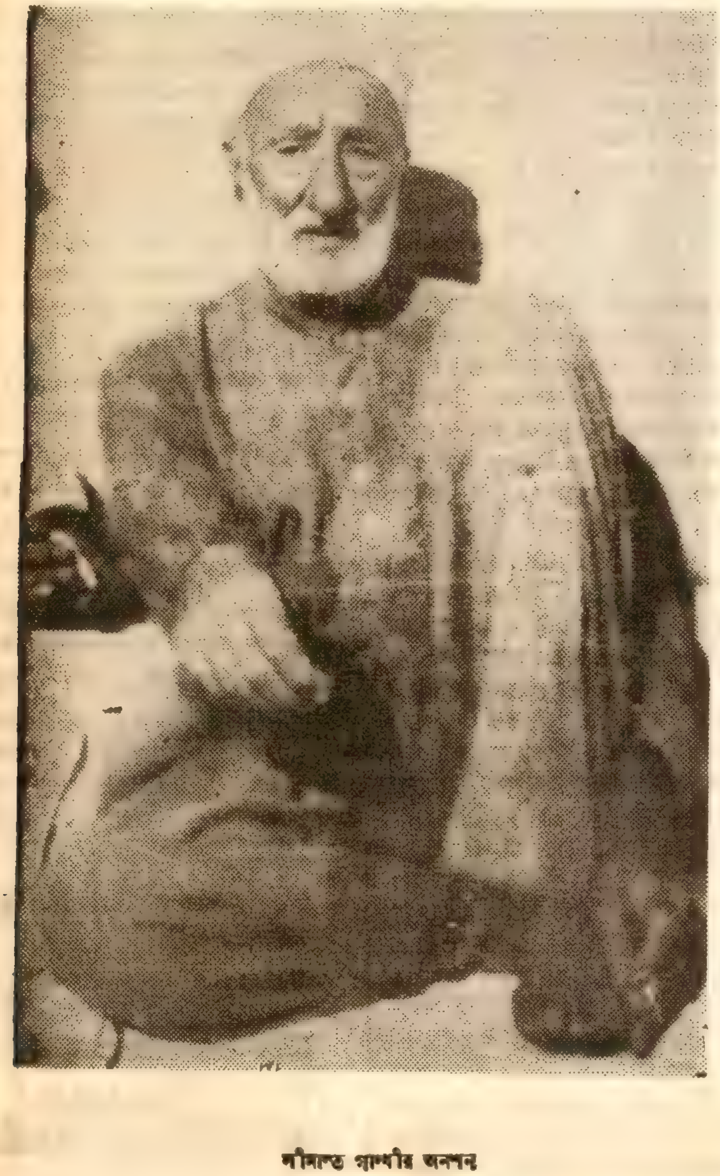

সীমান্ত গান্ধীর অনশন

দেশ ভাগ করে সেদিন যাঁরা তাড়াতাড়ি কাড়াকাড়ি করে শাসকের গদীতে গিয়ে বসেছিলেন বাদশা খান তাঁদের দলের নেতা নন। গদী তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল না, ভারতের আরও দু-একজন পুরুষসিংহের মতো সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফর খান চেয়েছিলেন নিশ্ছিদ্র স্বাধীনতা, অখণ্ডিত স্বাধীন ভারত। অন্তত যে ক্ষমতালোলুপতা পাকিস্তানের সৃষ্টি করল সেই পাকিস্তানে নিজেকে ও পাঠান জাতিকে তিনি একরকম নির্বাসিতই মনে করলেন।

বাদশা খান সজল চোখে অখণ্ড ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখলেন, ভারতের মান চিত্রের ওপর নিষ্ঠুর ছুরি চালান হল।

৩০শে জুলাই, ১৯৪৭ সাল। কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হল। স্বাধীনতার বিনিময়ে ভারত খণ্ডিতকরণের প্রস্তাব গৃহীত হলে ভগ্নহৃদয়ে পাঠাননেতা পাখতুনদের বাদশা খান নয়াদিল্লী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আপন জন্মভূমি সীমান্ত প্রদেশে। সেই যাওয়া আর এই আসার মধ্যে বাইশটা বছরের দীর্ঘ ব্যবধান ঘটেছে। ভালয়-মন্দে দুলতে দুলতে ভারতের ভাগ্যতরী বাইশটি ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ তরংগশ্রেণীর আঘাতে সামাল দিয়েছে।

এই দীর্ঘ বাইশ বছর কালের মধ্যে বাদশা খানের কাছে কৃচ্ছ্রসাধন ত্যাগ করে নেতা-নামক সুবিধাবাদী বনবার প্রস্তাব অনেকেই রেখেছিলেন। কিন্তু বাদশা খান জানেন অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসা যে ভোগ করার আনন্দ পেয়েছে, পার্থিব অন্যতর ভোগে তার আর প্রয়োজন নেই। বাদশা খান প্রকৃত নেতা, তাই নেতাগিরি করার লোভ তাঁর ছিল না। আয়ুব খান তো শেষে বিরক্তই হয়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধ সীমান্ত গান্ধীর আদর্শনিষ্ঠায়। কিন্তু বৃদ্ধ তাঁর ভোগ-বিলাসহীন কুটীরে রাজার রাজা সম্রাট হয়ে বসেছিলেন, বসে আছেন, এ খবরটা আয়ুবরা জানলেও কোনদিন উপলব্ধি করতে পারেন নি।

সীমান্ত গান্ধীই গান্ধী শতবার্ষিকী

উৎসবের পবিত্রতা রক্ষা করে উদ্বোধকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। ভারতের সৌভাগ্য, আজও অহিংসার সত্যকার পূজারী একজন আছেন যিনি তাঁর অস্ত্রগুরুর শত-বর্ষ পূর্তি উৎসবের উদ্বোধন করছেন পবিত্র দুই কর পদ্মের মত বিকশিত করে।

ইংরেজ আর পাক-প্রভুদের কারাগারে বাদশা খানের জীবনের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এই দীর্ঘকাল ধরে ভারত মায়ের আশীর্বাদ তাঁর ওপর অকুণ্ঠিতভাবে বর্ষিত হয়েছে। রাজনৈতিক জীবনে তিনি বাদশার আসন পেয়েছেন, মায়ের আশীর্বাদে তাঁর গায়ে কিন্তু কোনো কালিমা তার স্পর্শ রাখতে পারে নি। এমনটি ঘটা সত্যই বিচিত্র। রাজনৈতিক জীবনে এ সুনাম বড় একটা মানুষের ভাগ্যে জোটে না। সীমান্ত গান্ধীর ওপর সত্যই মায়ের আশীর্বাদ অক্ষয় হয়ে আছে।

তার একটা কারণও আছে, তিনি নিজে নেতা বনতে চান নি। তিনি ফকির গফ্ফর খান, সেবা-যাঁর ধর্ম। তাই আজও তাঁর মূর্তি পবিত্রতার অপর নাম হয়ে আছে।

ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে আজ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নেতৃত্বের অধিকারিণী। বাদশা খান সম্পর্কে তাঁর উক্তিঃ আমরা অন্ধকারে আলোর নিশানা পেতে চাই সীমান্ত গান্ধীর কাছ থেকে।

কিসের অন্ধকার?

একটি মহান জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের গুরুভার যিনি স্বহস্তে বজায় রাখতে উদগ্রীব তিনি কিসের অন্ধকারে আলোকশিখা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন?

এখানে প্রশ্ন, বস্তুতই কি অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে ভারতভূমি, বস্তুতই কি নেতৃত্ব এমনই দিশাহারা যে তমাম ভারত তার চোখের সামনে তমসাবৃতা; ব্যর্থ নেতৃত্ব পথ খুঁজে পাচ্ছে না? যদি সে কথাই স্বীকার করতে হয়, তবে সে লজ্জা গত বাইশ বছরের অক্ষমতারই ফসল। আর আজ তার থেকে মুক্তির উপায় হল, ভারতের রাজনৈতিক গগন থেকে সেই সব লোলচর্ম বৃদ্ধ জরদ্গব অক্ষম আত্মসুখীদের জোর করে হটিয়ে দেওয়া। কোন আত্মত্যাগের আহ্বান তাঁদের মধ্যে চৈতন্যের সঞ্চার করবে শ্রীমতী গান্ধী যদি তেমন আশা করে থাকেন, তবে তা হল যথার্থই ভাবের ঘরে চুরি।

সীমান্ত গান্ধী চিকিৎসকদের পরামর্শ অবহেলা করে তিন দিনব্যাপী অনশন শুরু করেছেন, উদ্দেশ্য হিংসা দ্বেষ জর্জরিত জাতির টনক নড়িয়ে দেওয়া গান্ধীজীর প্রদর্শিত আত্মনির্যাতনের পথে।

সীমান্ত গান্ধীর এহেন কীর্তি সমগ্র দুনিয়ায় এ কথাই ঘোষণা করবে যে, ভারত হিংসায় উন্মত্ত। গান্ধী শতবার্ষিকীতে এমনতর প্রচার শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের দুর্বলতাকে প্রকট করে তুলবে। তবে হ্যাঁ, বিশ্ববাসী বস্তুতই টের পাবেন, ভারত অন্ধকারেই আছে।

আর আলোতে আছে কোন জন? আর যদি ভারতে সত্যিই অন্ধকার জমে থাকে তবে সেই আহাম্মকের দায়িত্ব কার? গান্ধী শতবর্ষে জনগণের পক্ষ থেকে এই দাবি উঠলে, আড়ম্বরপ্রিয় নেতৃত্ব, যে নেতৃত্ব নিপুণ অভিনেতার মতো কথায় এক চোখের জল ফেলতে পারে সে নেতৃত্ব কী জবাব দেবে?

সে নেতৃত্ব কি এই স্বীকৃতি দিতে পারবে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আউড়ে বস্তুত পক্ষে হিংসার অবসান ঘটানো সম্ভব হয় নি। সরকারের তোষণনীতি আর রাজনীতি ব্যবসায়ীদের উস্কানি এই দুইটি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের অনুকূলে আবহাওয়া রচনার প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত সরকারের তোষণ-নীতি সম্প্রদায় বিশেষে এ শিক্ষা দিতে পারে নি যে, ভারতবাসীর একটিই মাত্র পরিচয় আছে, তা হল তারা ভারতবাসী,

---

অনিবার্য কারণবশত এই সংখ্যায় শংকরীপ্রসাদ বসুর ধারাবাহিক নিবন্ধ "সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ" প্রকাশ করা গেল না। এ-জন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদিকা, সা, ব

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় গণতন্ত্রের নাগরিক। অন্য পরিচয় ধরে কোনো বায়না বায়নাক্কা, যে তরফ থেকেই আসুক না কেন, তুলে ধরা হলে সেই মনোভাব চরমভাবে পর্যুদস্ত করা হবে। কোন খাতির, তুষ্টী-ভাব চলবে না। আর এই নীতির প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে ভারত সরকার কারও তোয়াক্কা রাখবেন না।

দুঃখের বিষয় সরকারী মহল তা পারেন নি। তাঁদের দুর্বল নীতি সাধু সাজতে গিয়ে সমগ্র জাতির মুখে বরং কলংকের ছাপ দিয়েছেন। অকারণে অবনত মস্তকে জাতিকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে বড় হিংসাহিংসি চলছে।

হিংসার তাণ্ডব মাঝে মধ্যে মাথা চাড়া দিয়েছে সত্য, কিন্তু তার নেপথ্যে যে রাজনৈতিক চক্রান্ত থেকে গেছে, ভারতীয় নেতৃত্ব কবে কোথায় সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন? কবে কোন নেতা বলতে পেরেছেন, দেশের সাধারণ মানুষ হিংসা ও বিদ্বেষকে ঘৃণা করে; কতক-গুলি কুচক্রী একটি বিদ্বেষের আবর্ত সৃষ্টি করে দেশবাসীকে সেই আবর্তের শিকারে পরিণত করে; আসল রোগ সেই-খানে। আসল শয়তান সাধারণ মানুষের বস্তু নিয়ে হোলি খেলে? না, একথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরে-ছেন আমাদের নেতারা?

সাধারণ মানুষ আজ গান্ধী শতবর্ষের মিঠে নেতৃবুলির পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয় এ জবাব চাইতে পারেন। বলতে পারেন: তোমরা জানো, তোমরা জানো বার বার কোন্ চক্রান্তকারীরা বিদ্বেষ আর হিংসার আগুন জ্বালে কয়েকটা ভাড়াটিয়া গুণ্ডা দিয়ে। তোমরা জানো, নিরীহ মানুষ কেবলমাত্র বাঁচার তাগিদে সেই গুণ্ডামির চক্রান্তে পড়ে সম্প্রদায়গতভাবে গোষ্ঠীগত-ভাবে জোট বাঁধতে বাধ্য হয়। ভারতের একটিও নাগরিক হিংসামত্ত নয়; কয়েকটি হিংস্র মানবশ্বাপদ ক্ষমতার লড়াই লড়তে গিয়ে সাধারণ মানুষকে নিয়ে এই খেলা খেলে আসছে। তোমরাও একথা জানো। তোমা-দের মুখেই পরস্পর এ সম্পর্কে বহুবার স্বীকৃতি শোনা গেছে। তোমরা যদি পার তো শক্ত হাতে সেই রক্তপিপাসু ক্ষমতা-লোভীদের শায়েস্তা কর! জগতের কাছে তামাম ভারতবাসীর মুখে চুনকালি লেপনের কোন অধিকার তোমাদের নেই। কারণ ভারতবাসী সহনশীল। বছরের পর বছর তাদের ওপর কলংকলেপন করে কয়েক-জন পার পেয়ে যাচ্ছে। এই খেলা বন্ধ কর।

বাদশা খানের অনশন যদি সেই কুচক্রী-দের মনে চেতনা সঞ্চার করতে পারে, তবেই সার্থক হবে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর এই আত্মনির্যাতন।

প্রার্থনা করি তিনি ভাল থাকুন।

-৪।১০।৬৯

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

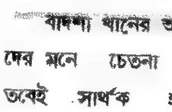

BAZA

৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড

পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।

HIND AGENCIES (67) KOLHAPUR ROAD, DELHI-7

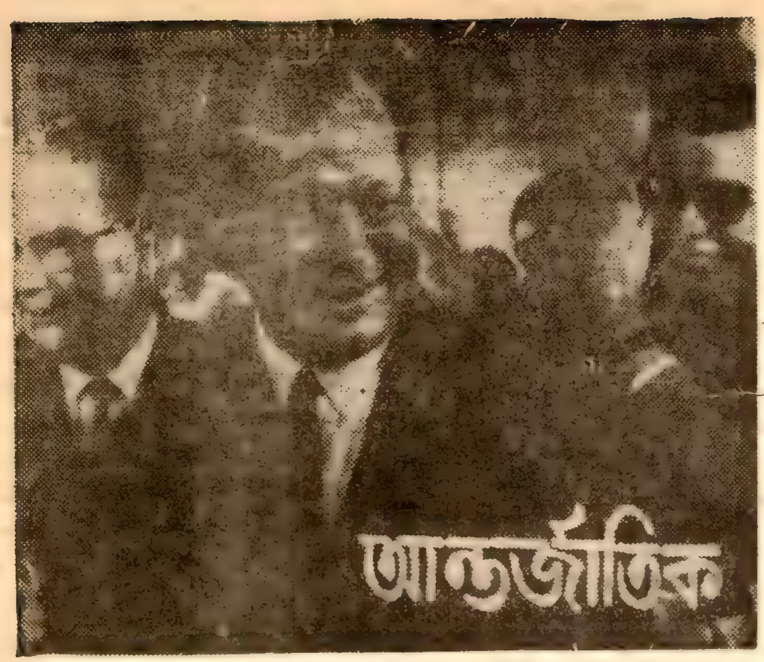

নির্বাচনে জয়লাভের পর উইলি ব্রান্ডট্

পশ্চিম জার্মানী ঃ

পশ্চিম জার্মানীর সাধারণ নির্বাচন ২৮শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্ত-রাষ্ট্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষ 'বাণ্ডেস্টাগের' মোট ৪৯৬টি আসনের জন্য নির্বাচন হয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর ভোটদাতার সংখ্যা ৩ কোটি ৮৬ লক্ষের মত।

পশ্চিম জার্মানীর ২০ বৎসরের ইতি-হাসে যে রাজনৈতিক দল একটানা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল (শেষ তেত্রিশ মাস অবশ্য সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন করে), সেই ক্রিশ্চিয়ান ডেমো-ক্রাটিক য়ুনিয়ন এবারের নির্বাচনের ফলে সরকার থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হল। অবশ্য এবারও একক দল হিসাবে 'বাণ্ডেস্টাগে' সব চেয়ে বেশি আসন পেয়েছে ক্রিশ্চিয়ান ডেমো-ক্রাটিক য়ুনিয়ন (সহযোগী ফ্রানৎস্ জোসেফ স্ট্রাস পরিচালিত ব্যাভেরিয়ার ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল য়ুনিয়ন সহ) : এই দল পেয়েছে ২৪১টি আসন, আর মোট প্রাপ্ত ভোটের শতকরা ৪৬·১ ভাগ। দ্বিতীয় স্থান অধি-কার করেছে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি, তারা পেয়েছে মোট ২২৫টি আসন ও শতকরা ৪২·৭ ভোট। তৃতীয় দল ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টি পেয়েছে ৩০টি আসন ও শতকরা ৫·৮ ভোট। ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টির ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। বিগত পার্লামেন্টে তাদের আসনসংখ্যা ছিল ৪৯, আর এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩০। প্রাক্তন নাৎসীদের সমর্থনপুষ্ট ও থ্যাডেনের নেতৃত্বে পরিচালিত। ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টি এবারেও একটিও আসন লাভ করতে পারে নি, পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় অন্ততঃ শতকরা ৫টি ভোটও তারা সংগ্রহ করতে পারে নি। তবে লক্ষণীয় যে, গত-বারের তুলনায় এন-পি-ডি ডবলেরও বেশি ভোট পেয়েছে।

ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক য়ুনিয়ন সব চেয়ে বেশি আসন পেলেও তাদের পক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয় নি। বিদায়ী চ্যান্সেলার ও সি-ডি-য়ু নেতা কুর্ট জর্জ কিসিঞ্জার ফ্রি ডেমোক্রাটদের সঙ্গে মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ফ্রি ডেমো-ক্রাটিক পার্টির নেতা ওয়ালটার শিল্ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফ্রি ডেমো-ক্রাটরা সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে একত্র সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ও ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টির মোট সদস্য সংখ্যা হল ২৫৫, অর্থাৎ ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক য়ুনিয়ন থেকে ১৪ জন বেশি। এস-ডি-পির নেতা বিদায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলি ব্রান্ডট্ হবেন নতুন চ্যান্সেলার।

পশ্চিম জার্মানীর বিশ বৎসরের জীবনে এই প্রথম, এবং অবিভক্ত জার্মানীর ইতি-হাসের দিক থেকেও বিবেচনা করলে দেখা যাবে, ১৯৩০-এর পর এই প্রথম একজন সোস্যাল ডেমোক্রাট চ্যান্সেলার হচ্ছেন, সর-কার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপতিও সোস্যাল ডেমোক্রাট দলভুক্ত, তিনি হলেন গুস্তাভ হাইনেমান। পশ্চিম জার্মানীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম সোস্যাল ডেমোক্রাট রাষ্ট্রপতি। তিনিও একজন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট প্রার্থীকে পরাজিত করে গত জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

গদি দখলের লড়াই-এ হেরে গিয়ে কিসিঞ্জার বলেছেন, সোস্যাল ডেমোক্রাট ও ফ্রি ডেমোক্রাটদের কোয়ালিশন সরকার অঙ্কের দিক দিয়ে সম্ভব হলেও, রাজনৈতিক বিচারে অসম্ভব। এই মন্তব্য নিতান্তই পরাজিতের ক্ষোভসঞ্জাত। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের সঙ্গে সোস্যাল ডেমোক্রাটদের 'গ্র্যান্ড কোয়ালিশন' যদি সম্ভব হয়ে থাকে, তবে সোস্যাল ডেমো-ক্রাট আর ফ্রি ডেমোক্রাটদের কোয়ালিশনই বা চলবে না কেন? আর সম্প্রতিকালে ফ্রি ডেমোক্রাটরা রক্ষণশীলতার পথ বর্জন করে অনেকটা উদারনৈতিক মনোভাব গ্রহণ করেছে। তবে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সরকার পক্ষের ভোটের ব্যবধান যেখানে মাত্র ১৪, সেখানে কিছুটা অনিশ্চয়তা ও দর কষাকষি থাকবে বৈ-কি।

পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান সমৃদ্ধির পেছনে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক য়ুনিয়ন ও তার নেতাদের অবদান অনেকখানি। তা সত্ত্বেও এই দল নির্বাচনে হেরে গেল কেন? কনার্ড আদেনাউরের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন না হলেও, কিসিঞ্জারের জনপ্রিয়তাও যথেষ্ট ছিল। তবু তারা হেরে গেল। কিসিঞ্জারের দুর্ভাগ্য, তাঁর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বা-চনেই দলকে হারতে হল।

পশ্চিম জার্মানীর জনসাধারণের মধ্যে পরিবর্তনের জন্য যে তাগিদ দেখা দিয়েছে, রক্ষণশীল সি-ডি-য়ু তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি নতুন পথসন্ধান নিয়ে ভোটদাতাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত, শ্রমিক কর্মচারী ও দেশের যুবসমাজের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে এই দল। দলের প্রধান নেতা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পশ্চিম বার্লিনের প্রাক্তন মেয়র উইলি ব্রান্ডট্ খুবই জনপ্রিয়,

বসুমতীর
যাবতীয়
গ্রন্থ ও
গ্রন্থাবলীর
প্রাপ্তিস্থান
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২
এবং
ন্যাশন্যাল এণ্ড কোং
৬/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

কিন্তু বর্তমানে তাঁর চেয়েও বেশি জনপ্রিয় দলের অপর নেতা অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক কার্ল শিলার। জার্মান ভোটদাতারা ব্র্যাণ্ড-শিলার নেতৃত্বের প্রতি তাদের আস্থা স্থাপন করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে এস-ডি-পি'র বক্তব্যও জার্মান ভোটদাতাদের কাছে সি-ডি-য়ু'র বক্তব্যের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এস-ডি-পি পূর্ব জার্মানীকে আংশিক স্বীকৃতি দিতে চায়, এবং সোভিয়েট য়ুনিয়ন সহ পূর্ব য়ুরোপের দেশগুলির সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চায়। শিলারের দীর্ঘদিনের দাবি, ডলারের হিসাবে জর্মান মার্কের মূল্য হ্রাস করতে হবে।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' পশ্চিম জার্মানীর নির্বাচন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছে, নির্বাচনের ফলে "অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।" এ কথা ঠিক, এস-ডি-পি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি, এবং অনেক ব্যাপারে সি-ডি-য়ু'র সঙ্গে তার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তবু ব্র্যাণ্ড-শিলার নেতৃত্ব ও এস-ডি-পি কর্মসূচীতে কিছু নতুনত্ব, কিছু প্রগতিশীলতার লক্ষণ আছে। সেটুকু উপেক্ষা করার মত নয়। তবে আর একটি যে মন্তব্য 'তাস' করেছে, তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টির ভোটসংখ্যা এবার দ্বিগুণ হয়েছে। এ নিশ্চয়ই চিন্তার কথা। জার্মান জীবন থেকে নাৎসীবাদের প্রভাব সম্পূর্ণ দূর করা যায় নি। এখনও এর অনেক সমর্থক রয়েছে।

বলিভিয়া :

লাতিন আমেরিকার সামরিক অভ্যুত্থান কোন নতুন খবর নয়। সামরিক অভ্যুত্থান এখানে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তাও আবার বলিভিয়ায়।

২৬শে সেপ্টেম্বর একটি সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি লুই অ্যাডলফো সাইলেস সাইলাস দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। সাইলেস এখন চিলিতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

এই নিয়ে বলিভিয়ার ১৪৪ বৎসরের ইতিহাসে ১৮৫ বার সরকার পরিবর্তন হল, এবং এর অধিকাংশই সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে।

সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক হলেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আলফ্রেডো ওভাণ্ডো কান্ডিয়া। ৫১ বৎসর বয়স্ক জেনারেল ওভাণ্ডো ১৯৬৪ সালের অভ্যুত্থানের সময়েও বারিয়েনটসের প্রধান সহযোগী ছিলেন। পরে বারিয়েনটস রাষ্ট্রপতি হন। গত এপ্রিল মাসে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় বারিয়েনটস নিহত হবার পর উপ-রাষ্ট্রপতি সাইলেস রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন।

আগামী বছর মে মাসে বলিভিয়ার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। ওভাণ্ডো নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য দাঁড়াবেন, এবং তিনি নির্বাচিত হবেন, অধিকাংশেরই এই ধারণা। ইতিমধ্যে ওভাণ্ডোর নেতৃত্বে এই সামরিক অভ্যুত্থান হল। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, লা পাজের মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ঘোষণা করায় নিজের সাফল্য সম্পর্কে চিন্তিত হয়েই ওভাণ্ডো এই অভ্যুত্থানের পথে গিয়েছেন। তাছাড়া, সেনাবাহিনীর অনেক তরুণ অফিসার এখনই একটা পরিবর্তনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

ওভাণ্ডো শাসনক্ষমতা হাতে নিয়েই কয়েকটি কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, বিপ্লবী সরকার ভূমি সংস্কারের কাজে হাত দেবে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হবে, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বামপন্থী নীতি অনুসরণ করবে। তাছাড়া বিদেশী তেল কোম্পানীগুলির একচেটিয়া কর্তৃত্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছেন।

ছ' মাস হল ৭১ বৎসরের বৃদ্ধা গোল্ডা

শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার

মেয়ার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু সরকারিভাবে এই তাঁর প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর। অবশ্য মার্কিন তাঁর কাছে মোটেই নতুন নয়। ইজরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে তিনি এখানে এসেছেন। তাছাড়া, ১৯২১ সালে স্থায়িভাবে জেরুজালেমে থাকার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলওয়াকি শহরে শ্রীমতী মেয়ার শিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

এবার কিছুটা দুশ্চিন্তা নিয়ে শ্রীমতী মেয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন যেভাবে সোভিয়েট য়ুনিয়নের সঙ্গে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করছেন, আর পশ্চিম এশিয়ার সংকট সমাধানে চতুঃশক্তি বৈঠকের জন্য যেরূপ উৎসাহ দেখাচ্ছেন, তাতে শেষ পর্যন্ত নিক্সন কি ইজরায়েলের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আরবদের সঙ্গে মীমাংসার জন্য চাপ দেবেন। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই যদি ইজরায়েলের পাশে না থাকে, তবে সে কার ভরসায় দাঁড়াবে?

না। শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ারের ভয় কেটে গেছে। হোয়াইট হাউসে গিয়ে নিক্সনের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা আলোচনার পর বেরিয়ে এসে স্মিতহাস্যে ইস্পাতকঠিন বৃদ্ধা ঘোষণা করেছেন, ইজরায়েলের অকৃত্রিম বন্ধু নিক্সন।

নিক্সনও কম যান না। গোল্ডা মেয়ারের উদ্দেশে তিনি বলেছেন : মেয়ার এমন একটি জাতির প্রধানমন্ত্রী, যারা পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি বজায় রাখার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ।

গোল্ডা মেয়ার নিক্সনের কাছে অনেককিছুর জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। ইজরায়েলের জন্য আরও যে-সব মার্কিন সামরিক সাহায্য চাই, তার মধ্যে আছে : ২৫টি ফ্যান্টম জেট বিমান (ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলকে ২০ কোটি ডলার মূল্যের ৫০টি ফ্যান্টম জেট দিয়েছে), এবং ৮০টি স্কাইহক জেট বিমান।

শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার নিশ্চয়ই ওয়াশিংটন থেকে খালি হাতে ফিরবেন না।

(৫।১০।৬৯)

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী

বিদ্যাপতির সমগ্র পদ
মূল্য : চার টাকা

জ্ঞানদাসের সমগ্র পদ
মূল্য : দুই টাকা

গোবিন্দদাসের সমগ্র পদ
মূল্য : দুই টাকা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সান্যাল এণ্ড কোং
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

বুধবার ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮টার পর রাজ্য সি-পি-আই দপ্তরে যুক্তফ্রন্টের সভার বাইরে একখানা নতুন দড়ির খাটিয়া, যা সাধারণত মৃতদেহ বহনের জন্য ব্যবহার করা হয়, রাখা ছিল, যুক্তফ্রন্টের সভা তখন ঘরের মধ্যে চলছে। একে একে শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী. শ্রীসুশীল ধাড়, শ্রীনির্মল বসু, শ্রীসুধীন কুমার—সুরাই ঘর থেকে বেরুলেন, তাঁদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করলাম—এই নতুন খাটিয়াটি কেন? জবাব সকলেই কিছু না কিছু দিয়েছিলেন। ১লা অক্টোবর যুক্তফ্রন্টের সভা থেকে শ্রীজ্যোতি বসু যখন বেরিয়ে এলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি চলে যাচ্ছেন? তিনি হেসে বললেন—খাটিয়াটিতে বসুন, আর একটু হেসে বললেন—খবর হবে। ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ১লা অক্টোবর পর্যন্ত তিন দিন যুক্তফ্রন্টের সভা হল—সভার একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল শরিকী সংঘর্ষ রোধ। ১লা অক্টোবর সত্যিই জ্যোতিবাবুর কথা সত্য হল। রাত্রি ১০টার পর দেখা গেল যুক্তফ্রন্ট নেতাদের মুখে একটু হাসি ফুটেছে. সে হাসি সেই দিন নিতান্তই ছিল আশাতীত। কারণ বিগত কয়েক দিনের দুই কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ও আচরণ ছিল যুক্তফ্রন্টকে ঐ নতুন খাটিয়ায় শুইয়ে দেওয়ার মত। মাঝে শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী যে দিন যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষ রোধে আশু কর্তব্য হিসেবে একটি দলিল যুক্তফ্রন্টের সভায় পেশ করলেন. (এই দলিলের কথা গত সংখ্যাতে তুলে ধরেছি). সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় যুক্তফ্রন্টের সভার কয়েক ঘন্টা আগে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন। কথাগুলো অভিনব বা নতুন নয়, তবে সেদিন যে সময়ে যুক্তফ্রন্টের সভায় শরিকী সংঘর্ষ রোধ ও দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা আপোষের শেষ চেষ্টা চলছে, ঠিক সেই দিন, সেই সময় শ্রীদাশগুপ্তের কথাগুলি বেশ কিছু তাৎপর্য বহন করে এনেছিল। শ্রীদাশগুপ্ত বলেন,—"সি-পি-আই হল অসৎ পার্টি, ওদের সঙ্গে আলোচনা করে কিছু হবে না, সি-পি-আই-এর নীতি হল কংগ্রেস সহ সকল দলকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা, তাই আজকে প্রধান কাজ হল ওদের মুখোশ খুলে ধরা। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের এই কথাগুলি সত্য বলে মেনে নিলে পশ্চিমবঙ্গে দুই কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব থাকা অর্থহীন। আর কোন সভায় বসে দুই কমিউনিস্ট পার্টির যে কোন আলাপ-আলোচনাও অর্থহীন হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার, এই দিন যুক্তফ্রন্টের সভা হল এবং সে শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর ফরমুলা নিয়ে, (যে ফরমুলাকে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা করেছিলেন) আলোচনাও হল। সভা শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বললেন—খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সভা হয়েছে। একই কথা বললেন শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। এখানে উল্লেখ করা দরকার, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যেমন সি-পি-আইকে অসৎ পার্টি বলেছেন, তেমন একইভাবে দুদিন আগে বিড়লা বাড়ির সামনে জ্যোতি বসুর নামে 'মুর্দাবাদ' ধ্বনি তোলা হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট দলের কোন মন্ত্রীর নামে, অপর শরিক দল থেকে মুর্দাবাদ ধ্বনি তোলা আগে কখনও হয় নি। যাহোক সভা থেকে বেরিয়ে সি-পি-আই-এর শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বললেন, সভার পরিবেশ খুব ভাল ছিল।

২৪ তারিখের সভায় ঠিক হল, শরিকী সংঘর্ষ রোধে চারটে কর্মসূচী রূপায়ণ করা হবে—তার মধ্যে ছিল, যুক্তফ্রন্টের সংঘর্ষ রোধে পূর্বে যে দলিল গৃহীত হয়েছে, সেই দলিল ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে, যুক্তফ্রন্টের নেতারা কয়েকটি এলাকায় গিয়ে যুক্তভাবে সভা-সমিতি করবেন, কোন দল কোন দলের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করবেন না। কিন্তু লাহিড়ী ফরমুলার প্রস্তাব এই দিন অসমাপ্ত থেকে গেছে বলে জানানো হল। ২৪ তারিখে সভার পর এক সপ্তাহে দেখা গেল যুক্তফ্রন্টের পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে গেছে। শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আরও কড়াভাবে একে অপরকে আক্রমণ করেছেন, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রীঅশোক ঘোষের বক্তব্য। দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আপোষ সৃষ্টিতে শ্রীসুকুমার রায় ও শ্রীঅশোক ঘোষ ছিলেন শান্তির দূত, কিন্তু সেই অশোক ঘোষ উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে এসে বললেন—সি-পি-এম তার দলীয় প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে পুলিশ, কংগ্রেসী ও সমাজবিরোধী তিনকে নিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টির পথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল থেকে ফিরে এসে শ্রীঘোষ বললেন—সি· পি· আই খনি এলাকায় অত্যাচারের রোলার চালাচ্ছে। কথায় বলে "দাদা ছিল দাঁড়ায়ে, সে দিল বাড়ায়ে"। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ২৬শে সেপ্টেম্বর বললেন—"ওরা বুর্জোয়াদের এজেন্ট, ওরা বুর্জোয়ার এজেন্ট হিসেবেই কাজ করছে। শোধনবাদীরা চিরকালই এইভাবে বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করে। শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী বললেন—আসলে ওরা মারধোর, খুন, জখম করে নিজেদের প্রভাব বাড়াতে চাইছে আর সেই

সেণ্ট্রাল পোল্ট্রী স্টোর্স

৩৩নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(মেডিকেল কলেজের সম্মুখে)

ফোন : ৩৪-২৩৬২

পোল্ট্রীর ডিম, মাংস, ঔষধ, খাদ্য, সরঞ্জাম, পুস্তক ও পত্রিকা এখানে পাওয়া যায়। পোল্ট্রী গ্রোয়ার্সদের নিকট হইতে ডিম ও মাংস ক্রয় করা হয়। অবিলম্বে উক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

উপহারের পক্ষে চমৎকার
ব্রিটানিয়া
কোহিনুর
অ্যাসর্টমেন্ট
BRITANNIA
ছেলেবুড়ে যাকে খুশী দিন! জন্মদিন কি পালাপার্বণ যে কোনো উপলক্ষে! উপহারের জন্যে আর মাথা ঘামাতে হবে না। সুদৃশ্য কাগজে মোড়া ব্রিটানিয়ার সুন্দর উপহার আপনার হাতের কাছে হাজির। নতুন অল্পদামের বিস্কুটের প্যাকেট। ব্রিটানিয়া কোহিনুর অ্যাসর্টমেন্ট। সত্যিই, চমক-লাগা উপহার!
ব্রিটানিয়া
মানেই সেরা বিস্কুট
BBC. 8406

কাজকে ঢাকতে চাইছে কিছু রাজনীতির কথা বলে। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর ফরমুলা সম্পর্কে বলেছিলেন—ওটা অপ্রয়োজনীয় ও বর্জনীয়। ২৭শে সেপ্টেম্বর 'গণশক্তিতে' 'যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষ বন্ধের প্রচেষ্টা' এই শিরোনাম দিয়ে এক দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করা হল। এই নিবন্ধে ২৪শে সেপ্টেম্বর যুক্তফ্রন্টের সভায় যে সমস্ত কথা সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করা হয় নি অথবা শ্রীসুধীন কুমার ব্রীফ করবার সময় যা বলেন, সেই সকল কথা হুবহু প্রকাশ করে দিলেন। অর্থাৎ এই কয়েক দিনে যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে দুই কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধ প্রায় এমন জায়গায় চলে গেল, সেখান থেকে আর ফেরা যায় না। কিন্তু ১লা অক্টোবর সভার পর দেখা গেল সকলেরই কেমন যেন একটা 'গুড বয় গুড বয়' ভাব। আগেই বলেছি শ্রীজ্যোতি বসু সভা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আমাকে খাটিয়ায় বসতে বলে বোধহয় এই কথাই বলে গেলেন যে, নতুন খাটিয়া যুক্তফ্রন্টের জন্য নয়, বোধহয় সাংবাদিকদের জন্য। প্রকৃত পক্ষে হলও তাই। সভায় কথা উঠেছিল—শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীর নামে এতদিন ধরে যা যা সংবাদপত্রে বেরিয়েছে, সব মিথ্যে। ওগুলো সবই হোল খবরের কাগজের ভুল সংবাদ। অতএব বোঝা গেল, নতুন খাটিয়া অন্য কারও জন্যে নয়, সাংবাদিকদের জন্যেই কেনা হয়েছিল।

১লা অক্টোবর সভা শেষে দেখা গেল, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর যে ফরমুলা অপ্রয়োজনীয় ও বর্জনীয় বলেছিলেন, সেই ফরমুলা থেকে বেশ কয়েকটি সূত্র গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, কোন দল কোন দলের বিরুদ্ধে কুৎসা করবে না, কোন প্রকার উত্তেজনা ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিলে ইউনিয়ন নির্বাচন বন্ধ রাখা হবে। জেলায় জেলায় ঘুরে যুক্তফ্রন্ট নেতারা যুক্তভাবে সভা-সমিতি করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সেটা হল, যে কোন কারণে হোক, ওপরতলার যুক্তফ্রন্টকে নিচু পর্যন্ত কোনক্রমে সম্প্রসারিত করা হয় নি। কথা ছিল জেলায় জেলায় যুক্তফ্রন্ট কমিটি হবে, কিন্তু সেটাও কার্যকরী হয় নি। ১লা অক্টোবরের সভায় ঠিক হল যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলিকে জেলা, মহকুমা, থানা ও ব্লক পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজে নামাবার নির্দেশ দেওয়া হবে। ধান কাটার মরশুমে ধানের বদলে শরিকী সংঘর্ষে যাতে চাষীদের মুন্ডু গড়াগড়ি না যায়, তার জন্য সকলে সক্রিয়ভাবে কাজে নামবেন। এককথায় বলা যায়—গত ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে ১লা অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলি যেভাবে বিভেদের বিষধর সাপকে শিরে তুলে নিয়ে আঘাত করবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, সেই সাপ যাতে বিষ ঢালতে না পাবে তার জন্য চেষ্টা শুরু করলেন। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প অবশ্য আমাকে শোনালেন আমাদেরই এক সাংবাদিক বন্ধু, যিনি শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের সাংবাদিকদের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র ডক্টরেট। সাংবাদিক বন্ধুর গল্পটি হল এই : "মুর্শিদাবাদ জেলায় এক রাত্রে কোন একটি কালীপুজো উপলক্ষে কয়েকশ' পাঁঠা বলি হয়. দুই ব্যক্তি যথেষ্ট পরিমাণ কারণবারি পান করে এই বলির কাজ সমাধা করেন। গভীর রাত্রে বলির পর বলিতে পাঁঠার মুন্ডুচ্ছেদ হচ্ছে, এমন সময় সেখানে এসে ঢুকলো একটা কুকুর। যিনি পাঁঠাগুলোকে ধরে হাঁড়িকাঠে ফেলছিলেন, কারণবারির গুণে পাঁঠা আর কুকুরের তফাৎ ভুলে গিয়ে পাঁঠার বদলে কুকুরকেই হাঁড়িকাঠে ফেললেন। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে যিনি বলি দিচ্ছিলেন, তিনি হঠাৎ বন্ধুকে বললেন—হ্যাঁরে, বলির পাঁঠা এরকম শব্দ করছে কেন? বন্ধু বললেন—ব্যাটা পাঁঠা বলির ভয়ে ব্যা বদলেছে।"

এখন যুক্তফ্রন্টের বিবদমান শরিক দলের এই 'রা' পাল্টানো কতখানি সত্যি অথবা এটা মাতালের হাতে পড়ে ছাগলের বদলে কুকুর বলির অবস্থা কিনা, সেটা একটু সময় পেলেই বোঝা যাবে। শিরে সর্পাঘাত হলে কেউ বাঁচে না সত্য, কিন্তু বেহুলার সাধনায় লখীন্দর বেঁচে উঠেছিল—এ কাহিনীও আমরা জানি।

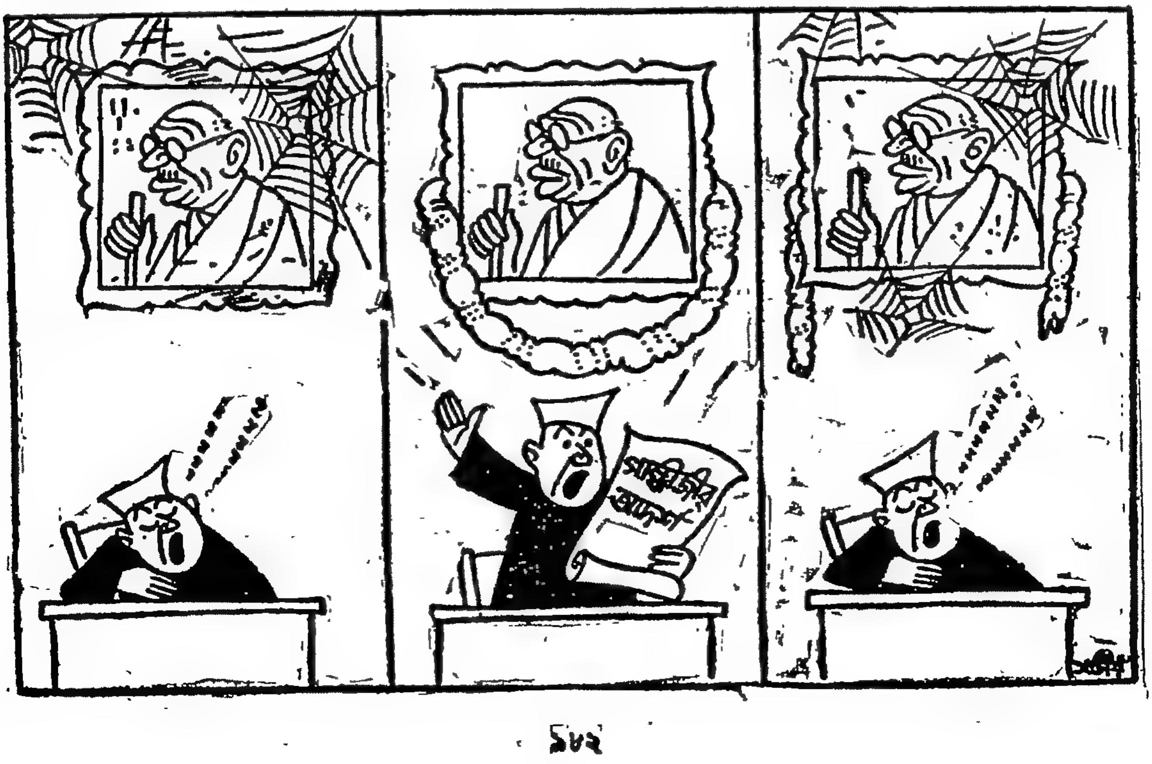

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

"বিপ্লবীদের প্রধান শত্রু— ভীরুতা"

চারিদিকে পুলিশ ও মিলিটারীর অতন্দ্র কড়া পাহারার মধ্যেও শ্বেতাঙ্গদের অন্যতম প্রমোদশালা পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবে এই দুঃসাহসিক আক্রমণে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর আত্মসম্মানে প্রচন্ড আঘাত লাগলো। তাঁরা হিংস্র আক্রোশে মরিয়া হয়ে রক্তলোলুপ হায়নার মত নিরপরাধ দেশবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ক্রমবর্ধমান হারে সূর্য সেনের মস্তকের মূল্য বেড়ে যেতে লাগলো। চতুর্দিকে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত হোল জীবিত বা মৃত সূর্য সেনকে বন্দী করা চাই-ই। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের প্রতিশোধ নিতেই হবে—সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যে-নগ্ন রূপ দু'শ বছরেরও অধিককাল ভারতবাসীকে উৎপীড়িত ও আতঙ্কিত করে রেখেছে সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ বিভীষিকাময় নির্যাতনের নিদর্শন স্থাপনে ইংরেজ সরকার আজ বদ্ধপরিকর—চট্টগ্রামবাসী তথা ভারতবাসী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যাতে আর কখনও মাথা তোলবার দুঃসাহস না করে!

ইংরেজ শাসকবর্গের দমননীতি ও অত্যাচারের মুখে বহু ছাত্র-যুবক ও দরদী পরিবারবর্গ লাঞ্ছিত উৎপীড়িত ও নির্যাতিত হতে লাগলেন। সেই নির্যাতনের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম জেলে বিপ্লবীদের বন্ধু ও আশ্রয়দাতা মহেন্দ্র বিশ্বাস অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

এদিকে অত্যাচার ও নির্যাতনে দেশবাসী বিপন্ন পর্যুদস্ত। সংগঠনের মধ্যেও বিভিন্ন ধরণের সমস্যা ও বিভ্রাটের অন্ত নেই, তার ওপর নিদারুণ দুর্ঘটনায় সাথী বীরেন দে ও সুকুমার কানুনগোর মৃত্যুতে অবস্থা আরও ঘোরালো হয়ে উঠলো। এইরূপ নিদারুণ পরিস্থিতিকে আরও সংকটময় করে তুললো সরকারের নতুন ঘোষণা—"জীবিত বা মৃত সূর্য সেনকে বন্দী করার সঠিক সূত্র সরকারকে যে দেবে তাকে নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।" এইরূপ নিদারুণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবী দলপতিদের সম্মুখে দু'টি পথ খোলা—হয় তাঁরা ভারতবর্ষের সুদূর সীমান্ত অতিক্রম করে জাপান, চীন, রুশ, ইংল্যান্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করে বিপ্লবী ঐতিহ্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকবেন, অথবা, নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে রণ-প্রাঙ্গণে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে বিপ্লবী সৈন্য-বাহিনী পরিচালিত করে যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করবেন। মহানায়ক বিপ্লবী সূর্য সেনের অন্তরে বিপ্লবী আগুন শত-সহস্র গুণ তীব্রতার সঙ্গে জ্বলে উঠলো। জাপান, চীন বা বিদেশের কোন রাজ্যই তাঁকে তাঁর নিরাপত্তার জন্য আকর্ষণ করলো না। শত বাধা সহস্র বিঘ্নেও ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে অন্ধকারের বুক চিরে বিপ্লবী মশাল হাতে নিয়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আঘাতের পর আঘাত হানতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অচল অটল ও নির্ভীক সূর্য সেন চট্টগ্রামের বিপ্লবী হেড-কোয়ার্টার পরিত্যাগ করলেন না। সূর্য সেন—তাই তুমি মহানায়ক।

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করার পর চট্টগ্রামের পরিস্থিতি একেবারে নতুন রূপ পরিগ্রহ করলো। বিপ্লবী তরুণী-প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারই বাংলার বুকে প্রথম নারী শহীদ। প্রীতিলতার আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার অমর কাহিনী বর্ণনায় আমরা যেমন গর্ব বোধ করি, ঠিক তেমনি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের প্রায় এক বছর আগে বাংলার দু'জন বিপ্লবী তরুণীর দুঃসাহসিক অভিযানের স্মৃতিও আমাদের মনে আজও অম্লান হয়ে আছে। এই দুই নির্ভীক তরুণী—শান্তি ও সুনীতির রিভলভারের অব্যর্থ নিশানায় কুমিল্লার জেলাশাসক মিঃ স্টিভেন্সকে প্রাণ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। সহাস্যবদনে বিচারের সম্মুখীন এই দুই বিপ্লবী তরুণীর নিম্ন-আদালতে ফাঁসির হুকুম হয়; কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়াতে হাইকোর্টের বিচারপতিরা তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন্ ও ভারত-লাট লর্ড আরউইনের পরিবর্তে যদি বড়লাট লর্ড উইলিংডন ও বাংলার গভর্নর স্যার জন এণ্ডারসনের আধিপত্যকালে শান্তি ও সুনীতির বিচার হোত তবে 'নাবালিকা' কেন, তাঁরা যদি

দুগ্ধপোষ্য শিশুও হতেন, আজ আমরা তাঁদের শহীদবেদীতেই ফুলের মালা দিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হতাম। শান্তি-সুনীতি প্রথম শহীদ নন্ সত্য কিন্তু বাংলার বিপ্লবী মেয়েদের মধ্যে প্রথম সার্থক সশস্ত্র পদক্ষেপ তাঁদেরই।

তারপর যদিও বীণা দাসের লক্ষ্যভ্রষ্ট রিভলভার কন্‌ভোকেশন অনুষ্ঠানে স্যার স্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন্‌কে বুকের রক্তে ভারতবাসীর রক্তঋণ পরিশোধের সুযোগ দিল না—সুনিশ্চিত মৃত্যু হতে তিনি পরিত্রাণ পেলেন, তবু সেদিনের বীণা দাসের বিপ্লবী ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। এই সকল অগ্রবর্তী বলিষ্ঠ আদর্শ অন্তরে বহন করেই প্রীতিলতা আজ দুঃসাহসিক ও চরম আত্মত্যাগের শীর্ষ-সোপানে অধিষ্ঠিতা।

প্রীতিলতার শৌর্য-বীর্যের অমর গাথা সীমিত গণ্ডির ব্যবধানে যোয়ান্ অব্ আর্ক, রাণী দুর্গাবতী, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সমকক্ষ বললে অত্যুক্তি হয় না। কঠোর ও আধা-মিলিটারী শাসনের মধ্যেও পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ কাহিনী গর্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহের সাফল্য ও ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ যুদ্ধজয়ের বর্ণনা দিতেও কুণ্ঠার কোন কারণ ঘটে নি এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুর্বলতা ও শিক্ষা, যতই মর্মান্তিক বা আমাদের পরিপন্থী হোক্ না কেন, তা' প্রকাশেও আমি পরাঙ্মুখ হই নি।

বরাবর এই লেখার ধারার সামঞ্জস্য বজায় রেখে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের বিপ্লবী সাফল্য ও নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধেও সঠিক মূল্যায়ন করতেই হবে। যাত্রার আসরে, থিয়েটারে, সিনেমার পর্দায় বা সভামঞ্চে যেভাবে Propaganda-র সুরে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়, বিপ্লবী ঐতিহ্যের কথা বলে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস দেখা যায়, সেই গণ্ডিতে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের বর্ণনা নিবদ্ধ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। "কাঁপাইয়া অম্বর কাঁপাইয়া রণস্থল উঠিল সে ধ্বনি।"—'মুহুর্মুহু কামান গর্জন আকাশ-বাতাস ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে তুললো—পনেরো মিনিট ধরে অবিরাম বোমা, মাস্কেট্রি ও রিভলভারের গুলী চললো এবং ইউরোপীয়ান ক্লাব গৃহে উপস্থিত ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষকে ক্ষত-বিক্ষত করে বিপ্লবী যুবকেরা অন্তর্হিত হোল—এইরূপ চমকপ্রদ বিবরণ দিয়ে গল্প শেষ করতে আমার কলম আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। আমি যেভাবে ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহের ঘটনার মূল্যায়ন করেছি ও তা' থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়েছি, সেই-ভাবে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ থেকেও বিপ্লবী শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করবো।

প্রায় মিলিটারী শাসিত চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে যে বিপ্লবী দল পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে গিয়েছিল ও আক্রমণ করেছিল, তার সঠিক মূল্যায়ন ও তা থেকে আমি যা শিক্ষা গ্রহণ করেছি সেই সম্বন্ধে কিছুটা লিখছি:—

(১) প্রথমবার ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্বভার বিপ্লবী শৈলেশ্বরের ওপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু 'জগতের কিছুই ভাল লাগে না'—এই প্রকার বিরাগী মনোভাব কোনমতেই একটি দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বাহিনীর নেতৃত্ব-ভার গ্রহণকারী নেতার উপযুক্ত নয়। দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে কখনও এইরূপ একটি দুঃসাহসিক কাজের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। এইরূপ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি এমন কি একজন সক্রিয় বিপ্লবী-সৈনিক হিসেবে নিজ দায়িত্বটুকু পালনেও সম্পূর্ণ অপারগ হয়। শৈলেশ্বর সেদিন এই আক্রমণের কর্ম-সূচী পরিত্যাগ করে বাড়ি ফিরে আত্ম-হত্যা করেছিল।

(২) সেই দিন ক্লাব-গৃহ আক্রমণ করা হোল না কেন? কি বাধা ছিল আক্রমণে? নিরস্ত্র ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ প্রতিদিন যেমন আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকে সেই দিনও ক্লাবের প্রমোদকক্ষে তারা সেই অবস্থাতেই ছিল। বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিপ্লবীরা তাদের আক্রমণ করবে—এই অবস্থায় আক্রমণে অসুবিধা বা বাধা কিসের? হঠাৎ কোন সৈন্যদল প্রহরায় মোতায়েন হলে বাস্তবে নিশ্চয়ই বাধার সৃষ্টি হোত, কিন্তু সেইরূপ কোন ঘটনাই তো সে-দিন সেখানে ঘটে নি। সব ব্যবস্থা ঠিক আছে বলে যার সাঙ্কেতিক নির্দেশ-দানের কথা ছিল সে সেই সঙ্কেতও সময়মত পাঠিয়েছিল।

(৩) ক্লাব আক্রমণে প্রত্যক্ষ অংশ-গ্রহণকারীদের সুস্পষ্ট অভিমত শুনেছি যে, তারা আতঙ্কিত ও দ্বিধাগ্রস্ত মনে সেই দিন বাড়ি ফিরে এসেছিল।

(৪) দ্বিতীয়বার সেই সাতজন বিপ্লবী প্রীতিলতার নেতৃত্বে ঐ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার জন্য এগিয়ে গেল। শত্রুর সম্মুখীন হতে প্রীতিলতার মনে ভয়-ভাবনার লেশমাত্র ছিল না। আমার নিজের মনের বিশ্বাস বুলেট ও বিস্ফোরণের মাঝে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণে আর শান্ত পরিস্থিতিতে নিজের শয্যায় শুয়ে মৃত্যুবরণে মানসিক বিপ্লবী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ ভয়ঙ্কর রূপ মৃত্যু-ভয়হীনা প্রীতির মনে শঙ্কা জাগাতে পারে নি। অসম সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই সংগ্রামী দলটিকে নিয়ে ক্লাব-গৃহ আক্রমণে প্রীতি এগিয়ে গেল। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব না থাকলে এইরূপ চরম আত্মত্যাগ ও দুঃসাহসিক কর্মসূচী নিয়ে বিপ্লবীরা বাস্তবে কখনও এগিয়ে যেতে পারতো না এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।

(৫) ক্লাব-গৃহ আক্রমণে বোমাও ফেটেছে এবং রিভলভার ও মাস্কেট্রি হতে গুলীও ছুটেছে। বন্ধ একটি ঘরের তিন দিক থেকে আকস্মিক আক্রমণ চলেছিল সত্যি, কিন্তু এর শেষ পরিণতিতে দেখতে পাই ইংরেজদের মধ্যে বোমার টুকরোর আঘাতে বা shock-এ একমাত্র মিসেস সুলিভানই প্রাণ দিয়েছেন। অন্যান্য দশ-বারোজন সামান্য আহত হয়েছেন—কাউকেই হাসপাতালে থাকতে হয় নি। দুটি তাজা বোমা বিস্ফোরিত হয় নি বলে সেই ঘরেই পড়েছিল। এই অবিশ্বাস্য ঘটনা যদিও কঠিন সত্য, তবু কেমন করে এটা সংঘটিত হোল?

(৬) কোনপ্রকার যুক্তির অবতারণা করে বা বিভিন্ন "কারণে" সাফাই গেয়ে এই বিপ্লবীদলের অযথাপক্ষ সমর্থন করা চলবে না। নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করতেই হবে—ভয়, আতঙ্ক ও মৃত্যু-বিভীষিকাই যে তাদের বিচলিত করেছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ভয়ে আমাদের হাত কেঁপেছিল—অন্তরের সাহস হারিয়েছিলাম—প্রাণ বাঁচাবার ইচ্ছেটাই যে প্রবল ও প্রধান স্থান অধিকার করেছিল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

(৭) যে প্ল্যান অতি সহজ, যাতে অবোধ্য কিছুই নেই—'বোমা-পিস্তল নিয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বো এবং দয়া-মায়া শূন্য নিষ্করুণচিত্তে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের হত্যা করবো'—এই প্ল্যান প্রথমবার

উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদীয় দাঁতের মাজন
দেব দশন
হাসিতে মুক্তো ঝরাবে
দেব কেমিক্যাল কোং কলি-৩২

সম্মানিত অছি পরিষদের সদস্য

দাশু দত্তরায়

অছি-পরিষদের সদস্য
সম্মানিত
আমি এক জবরদস্ত নেতাই অবশ্য

জরির নাগরাই ইয়া ভাগড়াই ভুঁড়ির ভিতর
লম্বা-লম্বা লোম নাকে হাওয়া নেই-
সর্বক্ষণ দরজা খোলা আস কিংবা যাও—
আমমাজা গোঁফে
কিংবা কানে আতরের তুলো,
মনও বেজায় তুলো,
তা দেবার কেউ নেই ম্যাংতামোড়া ডিমে—

মধুমাসে মন বড়ো উচাটন হয়—
চুড়িদার পাঞ্জাবী ও পাতলুন,
অথবা দোনলা প্যান্ট ম্যাটিনী শোয়ের গুনগুন
বুকপকেটেও কী নির্ভীক সুন্দরী যুবতী খুন।
বেমক্কা মালের লাস ভুয়ো পাশপোর্টহীন-ঘরে
বেমালুম খুন ও গায়েব খুব ঘনঘন
অদৃশ্য পাচার হচ্ছে হামেশাই—
ঘণ্টায়-ঘণ্টায় শ্রীমন্দিরের দ্বার খোলা
আমাদের এণ্টারো কুইনস—কিন্তু
মুখের ফেকো চাকতে জুড়ি নেই।

ছাপ্পন্ন প্রহর নাম-গান, বুকে
গিল্টিমারা আছে ভবং দর্শন।

কার্যে পরিণত না হওয়া ও দ্বিতীয়বার সফল হওয়া সত্ত্বেও ক্লাবে সমবেত ইংরেজ নর-নারীর নরমেধ-যজ্ঞে সেই অভিযানের সমাপ্তি ঘটলো না কেন? এর একমাত্র উত্তর—অন্তরে মৃত্যু-ভীতি পোষণ করে আমরা আক্রমণ করতে গিয়েছিলাম; তাই প্রোগ্রাম সমাপ্ত হোক বা না হোক প্রাণ নিয়ে ফিরে আসাটাই শ্রেয় মনে করেছিলাম।

(৮) এই আক্রমণে প্রথম বোমা নিক্ষেপকারী বিপ্লবী শান্তি চক্রবর্তী অত্যন্ত রসিক প্রকৃতির ছিল। আন্দামানে একত্রে থাকাকালীন তার নির্ভীকচিত্তের যেমন বহু পরিচয় পেয়েছি তেমনি আবার তাকে আত্মপ্রবঞ্চনা হতে অনেক ঊর্ধ্বে থাকতেও দেখেছি। চট্টগ্রামের ভাষায় সে আমাকে যে মৌখিক বর্ণনা দিয়েছিল তার সারমর্মটুকু এখানে উদ্ধৃত করছি—"......আঁরা ত বাইয়ারে বোমা-গুলী চলাই দি। আর তারা সাব-মেমহলে প'ওনর ডোইল্যা কেটলী, ট্রে, চা-র কাপ-পেলেইট, মদর বোতল, সদার বোতল, চেয়ার—হাতব কাছে যা পাইয়ে পাগাই মাইত্তো আছিল......আঁরার এম্বারে হোঁগে থিয়াই-য়ারে তারা যে মইম্যা পাওনর নান জিনিষ-পত্র মেলা মাইত্তো আছিল আঁরা বেয়াগুন ধাই আসিয্য যে আরি!"—(আমরা আক্রমণ করলে সাহেব-মেমেরা হাতের কাছে যে যা পেয়েছে—কেটলী, ট্রে, চায়ের কাপ-প্লেট, মদের বোতল, সোডার বোতল, চেয়ার, ইত্যাদি নিয়ে যেভাবে ছুড়ে মারতে শুরু করলো তাতে আমরা পালিয়ে এসেছি)।

(৯) এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, Revolutionary Master Strategists Danton বিপ্লবের সাফল্যের জন্য যে রণনীতি নির্ধারিত করেছেন তা অনুসৃত হয় নি বলেই ক্লাব আক্রমণের পরিণতি সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নি। মনীষী কার্ল-মার্ক্স বৃটিশ মিউজিয়ামে স্তূপীকৃত পুস্তকরাশির মধ্যে আত্মমগ্ন হয়ে অর্থ-নীতি ও সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় গভীর-ভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি সশস্ত্র শ্রেণী-সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী বৈপ্লবিক অভ্যু-ত্থানের কথা—Armed Insurrection-এর নির্ভুল নিয়ম, কৌশল ও নীতি সম্বন্ধে লিখেছেন। মনীষী মার্ক্স মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বুঝেছিলেন বলেই Master Strategist দাঁতোর বিপ্লবী Strategy উদ্ধৃত করেছেন—"Be daring, still more daring, be daring always!" —বিপ্লবী সংগ্রামের মূল Strategy-ই হোল এই তিনটি। এই তিনটি নির্দেশ ভিন্ন কোন সার্থক বৈপ্লবিক Strategy কেউ-ই গ্রহণ করতে পারে না।

(১০) নরেশ, বিধু, রজত, মনা ও টেগরাকে আজ মনে পড়ে। মনে পড়ে প্রমোদ চক্রবর্তী, গোপীনাথ সাহা ও হরিপদ ভট্টাচার্যের সাহস ও বিক্রমের কাহিনী। বারে বারে মনে পড়ে বিনয়, বাদল ও দীনেশের কথা। এইসব বিপ্লবীরা যদি ক্লাব-গৃহ আক্রমণ করতো তবে কি একজন ইংরেজও সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হোত? প্রাণের আকুল আবেগে অন্তরে আজ ঝড়ের তোলপাড়—১৮ই এপ্রিল পুলিশ-লাইনে যদি বিনয়, বাদল, দীনেশ উপস্থিত থাকতো তবে কি আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরে যেতাম? কোন প্ল্যান ছাড়া, জল, রসদ, দূরবীণ, কম্পাস—কিছু ছাড়া পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ বানচাল করে দিয়ে চার-দিন কি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতাম? তাই অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছি বিপ্লবের Master Strategy—"Odausity! Odausity! Yet again Odausity!" অর্থাৎ, বিনয়, বাদল, দীনেশ, টেগরা, গোপীনাথ, নরেশ, বিধু, রজত, মনা, অমরেন্দ্র—এইরূপ নির্ভীক মরণজয়ী বিপ্লবী ছাড়া বৈপ্লবিক কোন পরিকল্পনা কখনও সুসম্পন্ন হতে পারে না। ক্লাব আক্রমণে দ্বিধাগ্রস্ত মনের অসম্পূর্ণ পরিণতির কারণই হচ্ছে প্রত্যক্ষ আক্রমণকারীদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী নির্ভীক বিপ্লবী চরিত্রের অভাব।

[ক্রমশ]

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

অনেক অধ্যাপক বন্ধু সেদিন বলছিলেন : আমরা বেতনবৃদ্ধিতে যতটা আগ্রহশীল, তার তুলনায় বর্তমান হারের বেতন নিয়মিত প্রাপ্তির ব্যাপারেই অনেক বেশি আগ্রহশীল। একটু আলাপ করেই বুঝতে পারলাম কথাটা তিনি হাল্কা সুরে বলেন নি।

জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, স্পনসরড্ বাদে অন্যান্য বে-সরকারী কলেজের একজন অধ্যাপকের মূল বেতন মাসিক তিন শত টাকা ; সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা ১১০ টাকা, কলেজ থেকে প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা সাড়ে সতেরো টাকা থেকে একশো কুড়ি টাকা। অর্থাৎ বে-সরকারী কলেজের একজন অধ্যাপকের ন্যূনতম বেতন ৪২৭ টাকা ৫০ পয়সা।

আর তিনি মাসে কত বেতন পান জানেন কি? কলেজ থেকে তিনি ১২৫ থেকে ১৫০ টাকা আর কলেজের দেয় মহার্ঘ ভাতা ১৭ টাকা ৫০ পয়সা নিয়ে ঘরে ফেরেন। অর্থাৎ মাসে যেখানে তাঁর প্রাপ্য ৪২৭ টাকা ৫০ পয়সা সেখানে প্রতি মাসে তাঁর হাতে আসে মাত্র ১৪২ টাকা ৫০ পয়সা।

এঁদের তুলনায় স্পনসরড্ কলেজের অধ্যাপকদের বরাত ভাল। তাঁরা মূল বেতন তিনশো টাকার মধ্যে মাসে, দুশো টাকা, সরকারের দেয় মহার্ঘ ভাতা ১১০ টাকা আর কলেজের দেয় মহার্ঘ ভাতা ১৭ টাকা ৫০ পয়সা পেয়ে থাকেন।

আরো জানেন কি যে, তাঁরা তাঁদের বারো মাসের বেতন পান বাইশটি কিস্তিতে।

কেউ কেউ নাকি যুক্তি দেখান তাঁদের প্রাপ্য টাকা তো মারা যাচ্ছে না। একদিন না একদিন তো তাঁরা পারেনই। তাঁদের টাকা তো জমছে। তবে এত ক্ষোভ কেন?

এ বক্তব্য যে কতটা অসার তা কাকেও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। আজকের দিনে মাসের টাকাটা হাতে না পেলে ধার-কর্জ করে চলা ছাড়া উপায় থাকে না। আর ধার করতে গেলেই খরচ বেশি হয়। একবারে টাকাটা পেলে তা দিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে একটা ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করা যায়, না পেলে নিরুপায়।

তারপর কিস্তিতে টাকা পেলে প্রতি বৎসরেরই বকেয়া জমা হতে থাকে। সেই সব মিলিয়ে টাকা পেতে পেতে অবসর গ্রহণের সময় হয়ে যায়।

এই তো গেল কলেজ-শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাল। এবার মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা যদি ধরেন, তাহলে একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে।

বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর তো কোন কথাই অজানা নয়। তিনি শিক্ষক সমিতির একজন বিশিষ্ট নেতা। অন্যান্য দাবির সঙ্গে নিয়মিত বেতন প্রাপ্তির দাবিতে গত বিশ বৎসরে তাঁকে বহু আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে দেখেছি। রাজভবনের সামনে রাজপথ অবরোধ করে শিক্ষকগণ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। শুধু শিক্ষকদের কণ্ঠেই নয়, তাঁদের সমর্থন জানিয়ে ছাত্র যুবক, সরকারী-বে-সরকারী কর্মচারী, এমন কি শ্রমিকশ্রেণীও মিছিল করে ধ্বনি তুলেছেন : শিক্ষকসমাজ পথে কেন—কংগ্রেস সরকার জবাব দাও।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে বেতন হার নির্দিষ্ট আছে, সেই হারে পশ্চিম বাংলার যে কটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসে মাসে বেতন দেওয়া হয় তার সংখ্যা হাতে গোনা যায়। গ্রামাঞ্চলে এখনো বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষককে কম টাকা নিয়ে 'বুঝিয়া পাইলাম' লিখে দিতে হয়। সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা কখন আসবে দেবতারাও বলতে পারেন না। এভাবে কংগ্রেস আমলের বকেয়া হিসাবে কয়েক কোটি টাকা রাজ্য সরকারের কাছে শিক্ষকদের বাকী পড়ে আছে। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন বকেয়া টাকা। আর এই কিস্তির টাকা আদায় করতে স্কুল-কমিটি ও শিক্ষকদের যে পরিমাণ তদ্বির-তদারকী করতে হয়, তা অন্যের অজানা থাকলেও শিক্ষামন্ত্রীর অজানা নয়।

এবার আসুন প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশ্নে। প্রাথমিক শিক্ষকদের তো বেতন প্রাপ্তির ব্যাপারে সমস্যার অন্ত নেই। কত রকমের শিক্ষালয় আছে তার হিসেব করা মুস্কিল। জেলা পর্ষৎ পরিচালিত, স্পনসরড্ বিদ্যালয়, সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত, পৌরসভা পরিচালিত প্রভৃতি হরেক রকমের বিদ্যালয়। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন রকম সার্কুলারের ফলে বিভ্রান্তির অন্ত নেই। আজ পর্যন্ত কোন পর্যায়ের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কত বেতন হবে তার-ই একটা সঠিক নীতি নির্ধারিত হলো না। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষোভ বাড়ছে। বিভ্রান্তিমূলক সার্কুলারের ফলে কেউ ভাবছেন তাঁদের আরো বেশি প্রাপ্য—সংশ্লিষ্ট পরিচালকদের গাফিলতির ফলে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। আবার কেউ ভাবছেন একই শিক্ষা-ব্যবস্থায় একই পদে সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের বেতন হারে তারতম্য হবে কেন?

এসব গোলমেলে সমস্যা নিয়ে আলোচনা না হয় বাদ রাখলাম। যে প্রশ্নটি গোড়ায় করেছি তাই আবার স্মরণ করতে চাই।

প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন প্রাপ্তি রীতিমত লটারীর টিকিটে টাকা পাওয়ার মত বরাতের ওপর নির্ভর করে। শিক্ষামন্ত্রী জানেন কি এখন পর্যন্ত অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জুলাই মাসের বেতন-ও পান নি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ডাকঘরে ধর্না দিতে হয় প্রতিমাসে। কিন্তু বেতন আসে না। পুজোর সময় রেশনের থলি নিয়ে ডাকঘরের দরজায় শিক্ষকদের ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য সকলেরই নজরে পড়ার কথা। এবার শুনছি পুজো উপলক্ষে সেপ্টেম্বর অক্টোবরের বেতন এবং এক মাসের বেতন অগ্রিম ঋণ হিসাবে দেয়া হবে। কিন্তু সে টাকা পুজোর আগে শিক্ষকদের হাতে পৌঁছবে কি না কেউ তা বলতে পারেন না।

হালে আবার একটা নতুন ফ্যাকড়া দেখা গেছে। কেন জানি না প্রাথমিক শিক্ষকদের মূল বেতন আর মহার্ঘ ভাতার পৃথক বিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশঙ্কা হচ্ছে যে, আগামী মাস থেকে এক মাসের বেতন আবার কিস্তিতে না আসতে সুরু করে।

এই অবস্থায় সরকার আগামী বৎসরের জানুয়ারী মাস থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ানোর ব্যবস্থা করছেন। বর্তমানের বেতন দেওয়ার পদ্ধতি চালু থাকলে এবং রাজ্যের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি না করা হলে, অবস্থাটা যে কি হবে ভাবতেও ভয় লাগে। মাধ্যমিক বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে যে বেতন পাওয়া যাবে, তা দিয়ে একটা বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের তিন ভাগের এক ভাগের বেতনও দেওয়া যাবে না। সরকারের সাহায্যের ওপর সবটাই নির্ভর করবে। এখন থেকে সমস্ত ব্যবস্থা ঢেলে না

সাজালে প্রথম দুই-তিন মাসের মধ্যেই একটা চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এখনকার হারেও মাসে কেউ বেতন পাবেন না।

যুক্তফ্রন্টের গত সাত মাসের আমলে শিক্ষাদপ্তরের ব্যবস্থার এমন কোন পরিবর্তন ঘটে নি, যা থেকে আশা করা যায় যে বর্তমান শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। বরং দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে লালফিতার বাঁধন আদৌ কমে নি।

তাই আপাতত বড় বড় পরিকল্পনা বাদ দিয়ে নেহাৎ যেটুকু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এখন পাওয়ার কথা সেটুকু দেওয়ার ব্যবস্থাটা করুন। মুখে না বললেও তাতেই মনে মনে শিক্ষক ও তাদের পরিবারের মানুষেরা সরকারকে আশীর্বাদ জানাবে। —শ্রীসর্বদর্শী

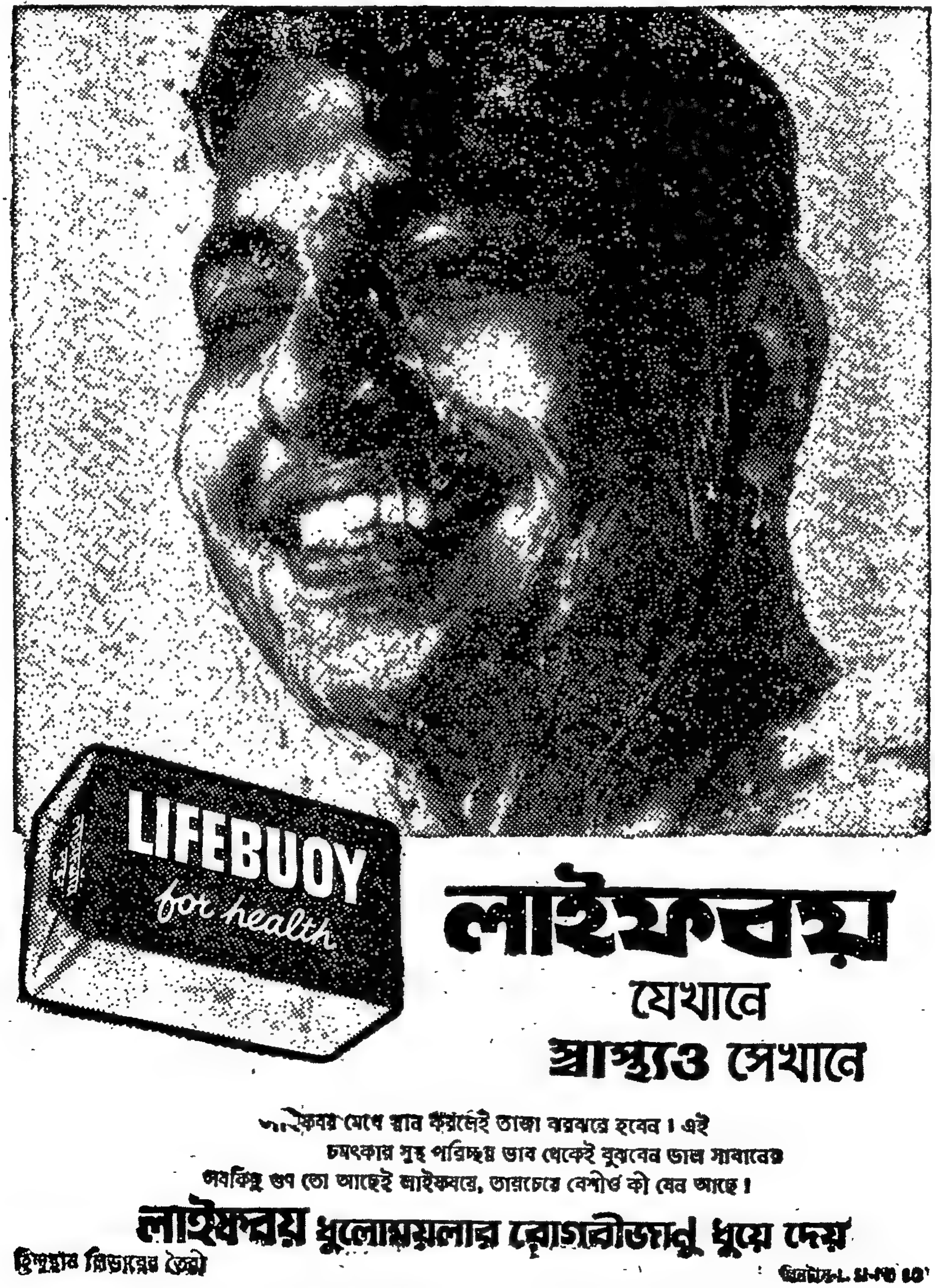

আইন ও শৃঙ্খলা: পুলিশের ভূমিকা—

কয়েকটি অভিমত

সাগর বিশ্বাস

গত সংখ্যায় লিখেছিলাম আইন-শৃঙ্খলা এবং পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনপ্রিয় মন্ত্রীদের সংগে কথা বলতে গিয়ে বাধা পেয়েছি। বাধা পেয়েছি তাঁদের (সকলের নয়) ওই 'একান্ত নিজস্ব, সহকারীদের (পি এ, সি এ, পি এস) কাছ থেকে। জানি না এই বাধা নিষেধ মন্ত্রীমহোদয়দের নির্দেশে, না ওই সহকারীদের খেয়াল-খুশির ফলে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা একটা আমলাতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হতো বলে বাজারে কংগ্রেসের ডিভ্যাল্যুয়েশন হয়েছিল। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীদের সেক্রেটারিয়েটে যদি আমলাতান্ত্রিক আবহাওয়ার পূর্বাভাষ কিংবা প্রবাহ দেখতে পাওয়া যায়, তখন স্বভাবতই আমাদের একটু হতচকিত হতে হয়। অবশ্য এমন মন্ত্রীর সংখ্যাও কম নয়, যাঁদের দরজা সকলের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত আছে, যাঁদের চলনে-বলনে-ব্যবহারে কোথাও এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। তাঁদের পি এ, পি এস, সি এ-রা সাক্ষাৎপ্রার্থীর পথরোধ করে দাঁড়ান না, সাক্ষাতের উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেন না। বর্তমান সংখ্যার দু'টি সাক্ষাৎকারের সংগে আমরা বর্তমান আলোচ্য বিষয়বস্তুর সমাপ্তি ঘোষণা করছি।

শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক
ডি. এস. ও।

—স্বাধীনতার পরেও এদেশের ছাত্রসমাজ তথা জনসাধারণের সংগে পুলিশের সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে নি। এর কারণ কি?

—বৃটিশ আমলে ঔপনিবেশিক শাসনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পুলিশকে গঠন করা হয়েছিল। পুলিশ তাই বৃটিশ সরকারের স্বার্থসিদ্ধি করেছে। দেশব্যাপী স্বাধীনতার আন্দোলন দেখেও পুলিশ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া দূরের কথা, দেশপ্রেমের আন্দোলনকে বৃটিশের ভাড়া করা গুণ্ডাবাহিনীর মতো কঠোর হস্তে দমন করতে চেয়েছে। স্বাধীনতার পরেও পুলিশের এই মনোভাব থেকে গেছে; কারণ এই বিভাগের কোনরকম পুনর্গঠন কংগ্রেস সরকার করে নি। কংগ্রেস বরাবর পুলিশকে পুঁজিপতি শ্রেণী-স্বার্থে ব্যবহার করেছে। ব্যবহার করেছে ছাত্র ও জনগণের পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল আন্দোলন দমন করতে। দুর্নীতি পুলিশ বিভাগে বৃটিশ আমলেও ছিল, কংগ্রেস আমলে তার চারিদিকের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। 'পুলিশ ঘুষ খাবে' আজ এটা একটা সাধারণ ধারণা। মালিক-শ্রমিকের বিরুদ্ধে নালিশ করলে পুলিশ সংগে সংগে এ্যাকশন নিয়েছে, অথচ শ্রমিক মালিকের বিরুদ্ধে নালিশ করলে শ্রমিককেই বিপদে ফেলেছে এমন নজির স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অনেক পাওয়া যাবে। একদিকে চোরাকারবারী এবং সমাজবিরোধীদের সংগে পুলিশ যেমন সহযোগিতা করেছে, অন্যদিকে ছাত্র ও জনগণের আন্দোলন দমন করতে তৎপর হয়েছে। এইভাবে শাসকগোষ্ঠী পুলিশের মোরালিটিকে ভেঙে দিয়েছে। এবং এইজন্যই ছাত্র ও জনগণের সংগে পুলিশের সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে নি।

—বাংলাদেশে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার ফলে এই সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় কি?

—এখনো পর্যন্ত তেমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। বরং দুর্গাপুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিধানসভায় হামলার ঘটনা সম্ভবত কংগ্রেস আমলের যে কোন ঘটনাকে ম্লান করে দেবে। এর ফলে ছাত্রদের মনে পুলিশ সম্পর্কে ধারণা মোটেই বদলায় নি।

—সামগ্রিকভাবে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমনে পুলিশ কৃতকার্য নয়। এ ব্যাপারে জনগণের প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তোলা উচিত বলে আপনি মনে করেন কি?

—জনগণের সচেতন প্রতিরোধবাহিনী সর্বদাই গড়ে তোলা উচিত। কিন্তু সেটা কোন বিশেষ দলীয় মনোভাব নিয়ে নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা কিছুটা জটিল। কারণ সমাজবিরোধীরা আত্মরক্ষার জন্য সর্বদাই ক্ষমতাসীন দলের আশ্রয় অনুসন্ধান করে। তাদের প্রশ্রয় দিলে সমাজবিরোধী কার্যকর্ম বাড়বে। সমাজবিরোধিতার পথ থেকে এদের সরিয়ে নেওয়া এক কথা আর প্রশ্রয় দিয়ে টিকিয়ে রেখে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা অন্য কথা। আজকাল শেষোক্ত কাজটিই হচ্ছে।

—পুলিশী ক্রিয়াকলাপ এবং যুক্তফ্রন্টের ক্রমবর্ধমান শরিকী সংঘর্ষ জনমনে তার ভাবমূর্তিকে ম্লান করছে বলে মনে হয় কি?

—কংগ্রেস সরকার গণ-আন্দোলন স্তব্ধ করতে পুলিশকে ব্যবহার করেছে ভাড়াটে গুণ্ডার মতো। আর যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতি হলো, গণ-আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। এখানেই কংগ্রেসের সংগে যুক্তফ্রন্টের পার্থক্য, এস. ইউ. সি. এ নীতির উদ্গাতা এবং গত '৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমদপ্তর থেকে ঘোষণা করা হয় যে, শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। সি পি এম বা অন্যান্য দল কিন্তু কার্যত এই নীতি গ্রহণ করে নি। করলে কেরালাতেই তার *implementation* দেখা যেত। যে কারণে বাংলা দেশেও '৬৭ সালের মত সেই বিপুল শ্রম-

আন্দোলন আজ আর দেখা যায় না। কার্যত কিন্তু পুলিশকে কখনও কখনও মালিক এবং জোতদারদের পক্ষে তৎপর হতে দেখা যাচ্ছে। এতে যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্তি ম্লান হতে বাধ্য। প্রধানত শরিকী সংঘর্ষই এই ইমেজকে বহুলাংশে খর্ব করছে। ১৪টা দল একসংগে সরকার পরিচালনা করতে পারে না, কংগ্রেস নির্বাচনের মুখে এমন একটা প্রচার চালিয়েছিলেন। শরিকী সংঘর্ষ জনসাধারণের মনে সেই সংশয়ের সৃষ্টি করছে। অথচ এটা হবার কথা ছিল না। পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সরকার সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। দৈহিক শক্তি বা রাষ্ট্র-ক্ষমতার প্রভাবে দলীয় শক্তি বৃদ্ধির একাগ্র বাসনায় যারা এ কাজ করছে তারা কার্যত যুক্তফ্রন্টের ইমেজকে নষ্ট করতে সহায়তা করছে। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে যারা মেজর পার্টি, ঐক্য এবং ইমেজকে রক্ষা করার মেজর দায়িত্ব তাদের। অবশ্য এ কথার দ্বারা অন্যের দায়িত্ব কিছুমাত্র কমে না। তথাপি বৃহত্তর দায়িত্ব যে তাদেরই একথা অস্বীকার করা যায় না। অথচ তারা দলীয় স্বার্থে পুলিশ ব্যবহার এবং অন্য দলের প্রতি অশালীন আক্রমণ চালিয়ে এই সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রসারিত করে চলেছে। পুলিশ সম্পর্কে সরকার যদি এই দৃষ্টিভংগী নিয়ে চলে তবে জনমনে যুক্তফ্রন্টের ইমেজ ম্লান হতে বাধ্য। জনসাধারণকে সরাসরি বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য কোথায়। বুর্জোয়া ক্যাপিটালিস্ট সমাজে সরকার পরিবর্তনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন হয় না।

* * *

শ্রীমতী বেলা লাহিড়ী,
সম্পাদিকা,
পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি।

—রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন কি?

—কতকগুলি ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, কতকগুলি ক্ষেত্রে অবনতি হয়েছে। তবে তা 'চরম' নয়।

আগে শ্রমিকদের আইনসংগত ধর্মঘট ভাঙার জন্য পুলিশকে বে-আইনীভাবে নিয়োগ করা হতো ধর্মঘটীদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার জন্য। এখন তা হয় না। আগে ধর্মঘটকে বে-আইনী করার পর শ্রমিকদের সংগঠকদের গ্রেপ্তার করা হতো এখন এ বৈষম্য দূর হয়েছে। জমিদারী উচ্ছেদ আইনকে ফাঁকি দিয়ে আমরা সরাসরি তা লংঘন করে স্বত্বভোগী প্রজাকে বে-আইনীভাবে উৎখাত করেও জমিদার, জোতদাররা নিশ্চিন্ত ছিলেন—সেখানে আইন তাঁদের স্পর্শ করে নি। এখন তা বন্ধ হওয়ায় আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির নজির বলে মনে করি।

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে অন্য এক দিক থেকে। গত কয়েক বছরে শহর ও শহরতলী অঞ্চলে বিগত যুগের নিম্ন-মধ্যবিত্তদের ভগ্নাবশেষ এক ছন্নছাড়া বাহিনী—যাদের সামাজিক রূপান্তরমুখী কোন বোধ লক্ষ্য নেই, কিন্তু সংখ্যার জোরে লক্ষ্যহীন হট্টগোল করার ক্ষমতা আছে। তথাকথিত রাজনৈতিক শ্লোগানের আড়ালে এরা একটা লক্ষ্যহীন নৈরাজ্যের হাওয়া সৃষ্টি করে যে কোন সময় যে কোন কিছুর ওপরে চড়াও হয়, ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাবার জন্য পিটিয়ে খুন পর্যন্ত করে রাজনৈতিক শ্লোগানের আড়ালে। কোন কোন রাজনৈতিক দল এদের প্রশ্রয় দিয়ে এদের আড়াল করে নিজেদের প্রভাব বাড়াবার অলীক স্বপ্নে মশগুল থাকে। তবে এটা কেবল পশ্চিমবাংলার সমস্যা নয়। ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে এই বিপজ্জনক হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছিল। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত রিপোর্ট পড়লে শিউরে উঠতে হয়॥ সে তুলনায় বাংলাদেশে এখনও এমন কিছুই হয় নি। দিল্লীর অবস্থাও মারাত্মক। আপাতদৃষ্টিতে এটা আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা মনে হলেও এর কারণ আরও গভীরে। যুক্তফ্রন্ট শাসনে অধিষ্ঠিত হবার আগেও এটা ছিল। ইদানীংকালে সামাজিক অর্থনীতিক কারণগুলি তীব্রতর হওয়ায় এটা বেড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে এটা মোটেই চরমে ওঠে নি বলেই মনে করি।

—কোন কোন মহল থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে যে, পুলিশকে যুক্তফ্রন্টের একটি বিশেষ দলের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই অভিযোগ কতদূর যথার্থ বলে আপনি মনে করেন?

—যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরও পুলিশ কায়েমী স্বার্থের তল্পীবাহকের ভূমিকা ত্যাগ করতে পারে নি। পুলিশের মধ্যে এখনও বাঘা বাঘা অংশ যুক্তফ্রন্টকে বে-কায়দায় ফেলার প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের অংশীদার। যার অন্যতম উদাহরণ আইনসভায় পুলিশী হামলা এবং জ্যোতি বসুর ওপর আক্রমণ। কিন্তু যেখানে আন্তঃশরিকী সংঘর্ষ দেখা দেয়, সেখানে কিন্তু পুলিশকে একটি বিশেষ দলের স্বার্থ রক্ষায় তৎপর দেখা যায়। অনেকক্ষেত্রে হয়তো ওপর থেকে পুলিশকে ঠিক কাজে লাগানো হচ্ছে না। পুলিশই আগ বাড়িয়ে এই দলকে তোয়াজ করছে। এটা খুব আশ্চর্য নয়। পুলিশ দপ্তর যে দলের হাতে থাকবে পুলিশ তার দিকেই একটু বেশি হেলবে। তবে মুস্কিল হচ্ছে যে, পুলিশকে এই ব্যাপারে প্রশ্রয় দিলেই আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আন্তঃশরিকী সংঘর্ষ এখন অনবরত ঘটছে। যেখানেই এই বিশেষ দল জড়িত সেখানেই সেই

দেশদেশের
জলখাবার

দাম: ৬৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান:
৮৪ এন-বি, ব্লক ই,
নিউ আলিপুর।

প্রাচীন গৃহকর্তা আর আধুনিক ছেলেমেয়ে—সব প্রিয়জনের রসনাকে তৃপ্ত করতে হয় সুগৃহিণীকে নিত্য নতুন স্বাদে।

ভারতের সব প্রান্তের পরিবেশন দীর্ঘ সাধনায় সংগ্রহ করে বাঙালী গৃহিণীদের অর্পণ করেছেন শ্রীমতী পারুল সেনগুপ্ত।

দুশো পৃষ্ঠার এই সংকলনে দেড়শো 'জলখাবার' সন্নিবিষ্ট হয়েছে॥

দলের সভ্য বা অনুগামীকে যেমন করে হোক নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে। বরাহনগরের ঘটনায় পেনাল কোডের ধারার বাধ্য কেও বিকৃত করতে বিবেকে লাগছে না।

—যুক্তফ্রণ্টের আন্তঃশরিকী সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ কিছুটা অসহায় বলে মনে হয় কি?

—পুলিশবাহিনী যদি আইনমাফিক সত্য সত্যই কাজ করতে চায়, তা হলে বেশ খানিকটা অসুবিধার সৃষ্টি হয় বৈকি? সরকারে অধিষ্ঠিত দলের সভ্যরা যদি মারামারি, গুণ্ডামী, সাধারণ মানুষের ওপর অযথা জোর-জুলুম করে এবং তার পর পুলিশ যদি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পর দলনেতৃত্বের কাছ থেকে অনুগামী বা সভ্যের অনুকূলে আইনকে আলগা করার একাধিক পরস্পর বিরোধী আদেশ আসে, তখন পুলিশকে অবশ্যই কিছুটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। এই জন্যে অনেকক্ষেত্রে পুলিশ নিজেই আইনমাফিক কাজ করে না।

—একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে পুলিশের ভূমিকা যেমন হওয়া উচিত, আমাদের দেশের পুলিশ তা কতদূর পালন করতে পেরেছে বলে আপনার মনে হয়?

—প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের তুলনায় খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে বটে তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে পুলিশ এখন নানা জনসংযোগ করে, মেলামেশা করে ভদ্র শ্রেণীর সঙ্গে একটি সামাজিক সম্পর্ক রেখে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু এখনও কি শহরে কি গ্রামে একটু ছাপোষা মানুষ এবং আর্থিক দিক দিয়ে দরিদ্র মানুষের সঙ্গে পুলিশের ব্যবহার চোখে পড়ার মত পরিবর্তন মোটেই হয় নি।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে শতাধিক বৎসর আগে কালীপ্রসন্ন সিংহ তার 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' পুলিশকে যে 'গরীবের যম' আখ্যা দিয়েছিলেন, তার কোন পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হয় না।

—এদেশের পুলিশ ও জনগণের সম্পর্ক স্বাভাবিক নয় কেন? কিভাবে এই সম্পর্কের উন্নতি হতে পারে?

—উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যেই এর উত্তর কিছুটা থেকে গিয়েছে। পুলিশবাহিনী যদি নিরস্ত্র নাগরিকের মাথায় অযথা ছড়ি না ঘোরায়, নিজেদের প্রিভিলেজের অপব্যবহার না করে, দুর্নীতিমুক্ত হবার প্রয়াস করে তাহলে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। জাতি, ধর্ম, আর্থিক প্রতিষ্ঠা নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিকের আইনসংগত অধিকারের সক্রিয় রক্ষক হিসাবে পুলিশ যদি কাজ করতে চেষ্টা করে তাহলে জনগণের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

—পুলিশের ক্রিয়াকলাপ যুক্তফ্রণ্টের ভাবমূর্তি ম্লান করছে বলে মনে করেন কি?

—সাধারণ লোক খানিকটা বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছে। তবে তার মানে এই নয় যে, সাধারণ মানুষের মনে এই ধরণের কয়েকটি ছোট-খাটো ঘটনার জন্য যুক্তফ্রণ্টের ইমেজ নষ্ট হচ্ছে।

[সমাপ্ত]

শারদীয়

সাপ্তাহিক বসুমতী

(১৩৭৬)

অসাধারণ তিনটি বৃহৎ উপন্যাস

সেই সকালে — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নতুন দিন — জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

স্বর্ণশিমুলের চরে — মনোরঞ্জন হাজরা

দু'টি অনন্যসাধারণ লেখা লিখছেন :

সতোন বোস — প্রেমেন্দ্র মিত্র

বড় গল্প

আশাপূর্ণা দেবী

আমরা সাহিত্য পাঠ করি, কিন্তু তাঁর অন্তর্কাহিনী আজো পড়ি নি। সেই কাহিনী এবার লিখছেন :

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — গোপাল হালদার

শতবর্ষের আলোয় বহু অপ্রকাশিত তথ্যে সম্পূর্ণ এক বিস্ময়কর বৃহৎ প্রবন্ধ

বিবেকানন্দ ও গান্ধী

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

প্রবীণ বিপ্লবীর স্মৃতি-কথায় এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে

বিপ্লবী জাতীয় আন্দোলন

সতীশ পাকড়াশী

কবিতা : লিখছেন

অমিয় চক্রবর্তী, অরুণ মিত্র, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, গোবিন্দ চক্রবর্তী, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, জসীমউদ্দীন, দিনেশ দাস, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

দামে সুলভ, বৃহদায়তন, এ বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ শারদ সংকলন

মূল্য : তিন টাকা (সডাক তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা)

(বিমানে প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত চল্লিশ পয়সা)

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ চৌত্রিশ ॥

রুক্ত দুপুরে ফোন বাজে। ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং। বেজেই চলেছে একটানা। যতক্ষণ কেউ একজন এসে হাত ধরে টেনে না তুলবে। চিন্তা করে দেখলে এমন জেদী টেলিফোনটাকে ভীষণ একরোখা মনে হয়। কথা শোনাবেই শোনাবে। না শুনে নিস্তার নেই।

হ্যালো...

হ্যালো ডিক্?

কে? ইয়েস—দিস ইজ হ্যারী স্পিকিং।

এনিথিং নিউজ? ফোনের এ-প্রান্তে ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর। ও-পার থেকেও সেই প্রতিধ্বনি ভেসে আসে। চাপা গলা মনে হয়। —নাথিং মোর। নো চেঞ্জ ইন দি ওয়েদার। নৈরাশ্য অপ্রচুত কণ্ঠস্বর।

নাথিং চেঞ্জ? এ-পারে বক্তার কপালে চিন্তার ভাঁজ। ভয়কাতর কণ্ঠ। উই আর স্টীল ঘেরাওড্। নো সেট্‌লমেন্ট—

উই হেল্পলেস্। উই ফাঁদ্। বাট্ কান্ট্ হেল্প য়্যু।

মুখে একটা অদ্ভুত উত্তেজনার ছায়া পড়েছে। ক্লান্তিতে যেন নেতিয়ে পড়তে চাইছে কণ্ঠ। শব্দ বেরোচ্ছে না। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। কপালের এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে রুমাল বার করল। তারপর চেয়ারে বসে পড়ল ডিক্ ধপাস করে। সমস্যার সমাধান দেখছে না। অন্ধকার দেখছে চোখের সামনে। চা-বাগানের শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার ডিক্।

একদিন যে সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না, সেই সাম্রাজ্যের অবসানে ভগ্ন দেউলের খিলানে বসে তিল তিল মৃত্যুর বিভীষিকা দেখছে। উপায় নেই। বাঁচবার কোন উপায় নেই। দিনকাল চলে গেল। বড়ো দ্রুত পাল্টে গেল চোখের সামনে। একদিন তাদের প্রতাপে বাঘে-গরুতে একসাথে জল খেয়েছে। খেতে বাধ্য হয়েছে। তার দেশীয়রা এখানকার মাটির তলায় নয়, মাটির ওপরেই ঐশ্বর্যের সুবর্ণ সন্ধান করেছিল। সবুজ রঙের চা-পাতায়।

সে-কথা জানে ইতিহাস। জানে ওই মিঃ হ্যারীদের দল। সুদূর পারের সাগরপ্রান্ত থেকে ছুটে এসেছিল ঐশ্বর্যের লালসায়। তাদের চার-পাঁচ পুরুষ দুই হাতে মজা লুটেছে। অর্ঘ অর্ঘ। দেদার অর্ঘ। প্রতিপত্তি। যেন এককেজন খুদে সম্রাট। শাহানসা। ক্লাব-বার-ককটেল পার্টি। হাসি-হুল্লোড় আর নিশ্চিন্ত আমোদের দিন। ভারতবর্ষের মাটির ওপরে যেন দ্বিতীয় ইংরাজ-বসতি। বাংলো-বাড়িগুলি ঝকমক করছে। অক্ষত প্রতাপ। যেন বা মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রবল পরাক্রান্ত নাইট। নেশা ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়েছে।

হেভেনলি—

সো চার্মিং ইউ আর।

ফেয়ারী কুইন! ইউ আর মাই লাভ। লেডী লাভ।

তার আগেই ওষ্ঠের ভাষা হয়েছে বাধারুদ্ধ। ফেয়ারী কুইনের ডানাগুলি কাটা ছিল তাইতেই এমন অসম্ভব সম্ভব হতে পারল। নইলে তিনি উড়তে পারতেন।

কোথা দিয়ে চলে গেল সে-সব দিন। উপনিবেশের রঙিন মোলায়েম আবেশে ভরা দিনগুলো। যা খুশি করা যেত অবাধে। ভাবতে হত না, চিন্তা করতে হত না। তখন দুরন্ত দাপটের দিন। প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজের ভয়ে অস্থির এ দেশের মানুষগুলো। ভয়ে ভয়ে এসে মাথা নোয়াচ্ছে। মাথা ঠুকছে পায়ের কাছে। সাহেব, ইউ আর ফাদার-মাদার। তুমি রাখলে আছি। না-রাখলে কোথাও নেই। হ্যাভ পিটি অন আস। উই আর অল ব্ল্যাক নেটিভস। কত দূর-দুরান্ত থেকে সভ্য করতে এসেছ আমাদের। অসীম তোমাদের দায়িত্ব।

ইউ ব্লাডি সোয়াইন ইউ ফুল। ক্ষিপ্ত সাহেব বুটজুতো ঠুকছে বুকে।

ইয়েস স্যার।

যন্ত্রণাটা মুহূর্তে হজম করে ফেলস। যদিও পাঁজরার গোটাকয়েক হাড় ভেঙে গেছে মনে হচ্ছে।

ইউ ফুল। লালমুখো টক্‌টক্ করছে রাগে।

ইয়েস স্যার। দ্রুত আবার পা জড়িয়ে ধরল হরিচরণ কিংবা কালীপদ অথবা উমাকান্ত-শ্যামাপ্রসাদের দল।

ইয়েস স্যার। ব্লাডি সোয়াইন স্যার। ইউ আর ফাদার-মাদার স্যার।

সাহেবকে খুশি রাখতে কোন কাজই বাকী রাখে নি ওরা। সাহেব তবু খুশি থাক। লালমুখো ইংরাজের বাচ্চা। রাজার জাত ওরা। সারাটা দুনিয়া ওদের পদতলে। হাতে রাখতে পারলে কোন অভাব-অসুবিধেই থাকবে না।

ইতিহাস জানে এমনি অনেক কথা ও কাহিনী। আজো ফেরে লোকের মুখে মুখে। লুণ্ঠনের ও ব্যভিচারের কাহিনী। এ দেশের মাটির ওপরে তারা চা-বাগান গড়ে তুলেছে। মাইলের পর মাইল জুড়ে চা-বাগানের আবাদ। মনোরম দুটি পাতা ও একটি কুঁড়িকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। সবুজ পাতা ও কুঁড়িগুলি দুললে তার মধ্যে সোনার হাতছানি দেখতে পেয়েছে।

এক হিসেবে দেখতে গেলে এই সব চা-বাগানগুলির মধ্যে আছে তাদের অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয়। আছে তাদের তীক্ষ্ম বিষয়বুদ্ধি ও কর্মকারিতাশক্তি। অন্যদিকে তেমনি আছে শক্তির ঔদ্ধত্যের ও মদগর্বিতার

ইতিহাস। তার যুপকাষ্ঠে নারী ও পুরুষের লাঞ্ছনার চরম ইতিবৃত্ত।

প্রকৃতপক্ষে সুবিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই প্রান্তে—এইখানেই সাম্রাজ্যের ভেতরে নতুন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল চা-বাগানগুলিতে। এবং শাসক শক্তিরও সবটুকু সমর্থন ছিল সাত-সমুদ্র তেরো নদীর প্রান্তে বৃটিশ জাতির বাসভূমির প্রীত।

অথচ এদের অত্যাচারকে চিত্রিত করে কোনো বড় রকমের সাহিত্য রচিত হয় নি সে-যুগে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-উৎপীড়নের মর্মান্তিক বেদনাকে ভাষা দেবার জন্য লেখনীধারণ করেছিলেন দীনবন্ধু। সেই নীলদর্পণ ইংরাজিতে অনূদিত হয়ে গিয়েছিল দেশে দেশে। দেশের ভেতরে ও বাইরে চরম সমালোচনা জাগিয়ে তুলেছিল। দাস-প্রথার অবসানের জন্য ইংরাজি সাহিত্যে লেখা হয়েছিল টমকাকার কুটির। চা-বাগান নিয়ে তেমন কোন সাহিত্য রচিত হয় নি বাংলায়—যা এই অন্ধকার অধ্যায়ের চিত্রগুলিকে ভাষা দিতে পারে।

খুঁজতে গেলে তার কারণও হয়তো পাওয়া যাবে। ডুয়ার্সের হিংস্র আরণ্য পরিবেশ ও অস্বাস্থ্যকর ভয়ংকর উপনিবেশে চা-করদের অত্যাচারের অভিজ্ঞতা অর্জনের আগ্রহ জাগে নি ভীত ও সন্ত্রস্ত লেখকদের মনে।

ওদিকে ভারতীয় চা—অর্থাৎ ডুয়ার্সের চা তখন বিপুল বিক্রমে বিশ্ব-পরিক্রমা করছে। সে-কথা বলতে গেলে পরিষ্কার করতে হবে চা-বাগান ও চা-র উৎপত্তির ইতিহাস। সংক্ষেপে বলব পরে।

ভারতবর্ষে গ্রামে-গ্রামান্তরে তখন চা একটি প্রসিদ্ধ নাম। তার আগে ভারতবর্ষের আদিযুগে কিন্তু চা-পানের কথা শুনি নি।

ভারতবর্ষের কাগজে কাগজে বিজ্ঞপ্তি : চা খান, চা। Indian Tea. চা-র শক্তিকারিতা ও তার অত্যদ্ভুত ক্ষমতার কথা তখন লোকের মুখে মুখে।

হাজারি মনসবদার সৌখিন জাপানী পেয়ালায় কর্মচাঞ্চল্যের এক ফাঁকে মেমসাবকে নিয়ে চা খেতে বসতেন। সুন্দর নক্সাকাটা পেয়ালা। পেয়ালায় সোনালী চা। টেবিলে ফুলপাতা আঁকা টেবিলক্লথ। বেলা ন'টা দশটা। চা-র কাপে চুমুক দিয়েই সাহেব মানুষটি বলতেন, দার্জিলিং টী!

চুমুক দেবার পর মেমসাহেবও তা সমর্থন করতেন। আরামে ও আমেজের আয়েসে তাঁর নয়ন নিমীলিত মনে হত।

দিস্ ইজ রিয়্যাল ফাইন টী!

আরেক কাপ নেবে? টী-পট থেকে স্বামীর পেয়ালায় আরো খানিকটা ঢেলে দিতে দিতে মিসেস বলতেন, যাই বল, A fine delicious drink.

সন্ধ্যার আঁধারে সরকারী অফিসের আমলা বা কোর্টের মোক্তার বিশ্বম্ভর বাবু একটি প্যাকেট লুকিয়ে আনতেন স্ত্রীর জন্যে। খানিকটা আড়ালে ডেকে দিতেন চুপি-চুপি।

বিগলিত আহ্লাদে হাত পেতে গ্রহণ করতেন চল্লিশোত্তর গৃহিণী। পুত্রবধূ বা আয়েরা দেখে কি না লুকিয়ে দেখতেন। আর হাসি-হাসি মুখে নাকে নথের শোভা বিকিরণ করতে

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখিকা

আশাপূর্ণা দেবীর
গ্রন্থাবলী
আবার একখণ্ড
প্রকাশিত হয়েছে!

তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস। সাতটি বড় গল্প
১। বলয়গ্রাস ২। প্রেম ও প্রয়োজন
৩। দুর্নিবার ৪। এক গুচ্ছ গল্প
মূল্য মাত্র সাড়ে ছয় টাকা

আগেই বেরিয়েছে আর এক খণ্ড
গ্র ন্থা ব লী
১। জহুরী ২। অনির্বাণ
৩। সোনালী দিনের মন
৪। এক গুচ্ছ গল্প
মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

করতে চাপাগলায় বলতেন, কি গো?

দ্যাখই না খুলে—

মানুষটার গলা খুশি-খুশি।

স্বর্ণালংকার ভেবে মনে মনে পুলকিত হতেন বা। কিন্তু তাই বা কি করে হবে? ওজনে কম মনে হচ্ছে যে। ভয়ে ভয়ে আড়ালে লুকিয়ে খুলে হতাশ হতেন। মাথায় রক্ত উঠতে বাকি থাকত না।

এ কি? ঠাট্টা করবার আর জায়গা পেলে না?

বাছা বাছা বাকি বিশেষণগুলি প্রয়োগের আগেই বিপন্ন কর্তা মুখ চেপে ধরতেন গিন্নীর, আরে চুপ চুপ!

চুপ করবে কেন?

করবে এই জন্যে যে—গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলতেন কর্তা, আরে, শুধু শুধু রাগ করছ তুমি। এ হচ্ছে গিয়ে চা। তোমার জন্যে আনলাম।

চা? সে বস্তুটির নাম বোধ করি এই প্রথম শুনলেন গিন্নী, বিটলেমির আর জায়গা পাও নি? কতকগুলি শুকনো পাতা গুঁড়ো করে নিয়ে এসে যা-খুশি তাই বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশেষে হাতে-কলমে বস্তুটির পরীক্ষা। বলা বাহুল্য, ততক্ষণে গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটেছে।

জিনিষটা একেবারে মন্দ নয়, কি বলো?

তাই তো তোমার জন্যে আনলাম।

বাজারে-বন্দরে গঞ্জে-নগরে হাটে-হাটে তখন চা-র অব্যর্থ দিগ্বিজয়। টী। ইণ্ডিয়ান টী। চা-কোম্পানীর মাইনে বাঁধা কর্মচারীরা তখন চাকা-ওয়ালা গাড়ি নিয়ে বিনা পয়সায় লোককে চা খাইয়ে ফিরতেন। আর শুধু কি খাওয়া? চা খান, আবার নিয়েও যান এক প্যাকেট।

কিন্তু চা তো বুঝলাম—দার্জিলিং টী। ডুয়ার্সটা আবার কি?

কেন, ডুয়ার্স টী! জ্ঞানীজন বিস্মিত।

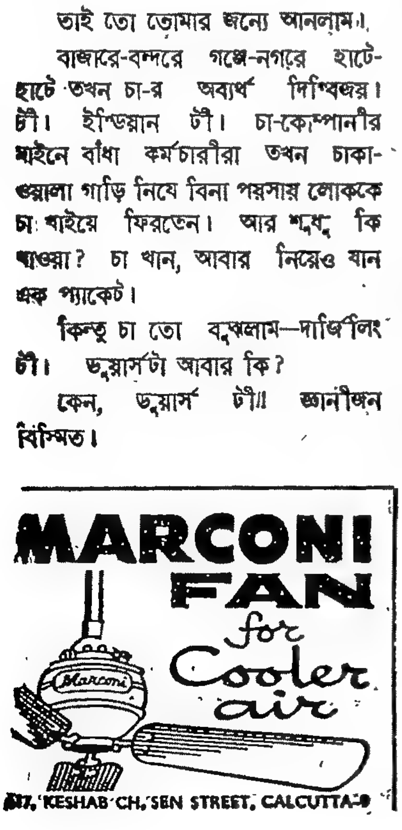

সেজন্যই তো বলতাম ডুয়ার্সটা কী বস্তু।

ডুয়ার্স বলে একটি জায়গা আছে—ভুটানের কাছাকাছি, সে ঘোর জংলী জায়গা—সেইখানে হয় চা। ডুয়ার্স চা।

ততদিনে জেনে ফেলেছে লোকে ডুয়ার্সকে। ডুয়ার্স, ডুয়ার্স টী। দার্জিলিং-এর আছে কৌলীন্য। সে সৌন্দর্যরাণী। তার নাম জানি। পড়েছি ভূগোল বইতে। পৃথিবীর লোক জানে দার্জিলিং চা-কে। স্বাদে-গন্ধে শ্রেষ্ঠ চা। দেশে-বিদেশে কাড়াকাড়ি। ডুয়ার্সের চা কিন্তু তা নয়। কিন্তু তারও আছে পৃথিবীব্যাপী চাহিদা।

শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজাররদের দল সেই সুবাদে ধরাকে সরাজ্ঞান করতেন। বিদ্যাবত্তা বলতে অবশ্য তাঁদের কিছু ছিল না। রাঙা চামড়াই ছিল তাঁদের একমাত্র কোয়ালিফিকেশন। আর এ দেশের মানুষেরা ছিল তাঁদের কাছে লাঞ্ছনা ও পরিহাস এবং শাসন ও শোষণের পাত্র। অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত হরিচরণের দল তাঁদের হুকুম জুগিয়ে চলত ভয়ে ভয়ে।

কী করে চলে গেল সে-সব দিন। ইতিহাসের ছেঁড়াপাতার মত উড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য-জাল বিস্তৃত ছিল যাদের, রাঙা চামড়া বলে যাদের ঔদ্ধত্যের সীমা ছিল না—তাদের সে-সাম্রাজ্য গেল তাসের প্রাসাদের মত হারিয়ে। কী নির্মম ইতিহাস-দেবতার বিধান। এ বিধান মেনে নিতে কষ্ট হয়।

বসে বসে ভাবে টম-হ্যারী-ডিকদের দল। তাদের স্বদেশীয়রা অধিকাংশই চলে গিয়েছে এ-দেশের সঙ্গে সকল সম্পর্কের সূত্র চুকিয়ে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই এ-দেশে থাকা আর নিরাপদ মনে করে নি তারা। উনিশ শ সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট। রাঙামুখোদের পক্ষে পরম বিপর্যয়ের দিন। রাত্রি প্রভাত হবার অনেক আগেই বিচক্ষণের মত ছেঁড়া তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে আকাশপথে বা জাহাজে স্বদেশের টিকিট কেটেছিল ওরা।

তাঁরাই শুধু রয়ে গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে কি করবেন ভেবে নিরস্ত হয়েছিলেন। যোগ্যতাই বা কী আছে তাঁদের। তা ছাড়া এতদিন-কার ঐশ্বর্য-আড়ম্বরেরও একটা নেশা আছে। তার মায়া কাটানো বড়ো শক্ত।

দেখাই যাক না কংগ্রেস কি করে? নিজেদের মধ্যে তাঁরা কথাবার্তা চালিয়ে-ছিলেন। এখনো তো আছেন নেহরু। আর কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য যত আন্দোলনই করুক, বড়োরকম একটা বিপ্লব ঘটাবার অভিসন্ধি তাদের আছে বলে মনে হয় না। তবে বন্দেমাতরম ধ্বনিটার মধ্যে কেমন একটা চাপা উত্তে-জনা আছে। একটা উচ্চকিত ঘৃণার ভাব। জাতীয় চেতনার সুর বড়ো বেশি উচ্চারিত। সহ্য করা যায় না যেন। জানালা বন্ধ করে রাখতেন ওঁরা প্রথম-প্রথম। তার পর গা-সওয়া হয়ে গিয়ে-ছিল।

এইভাবে কাটল বাইশ বছর কংগ্রেসের শাসনকাল। কেন্দ্রে যদিও কংগ্রেস শাসন, ইতিমধ্যে কিন্তু মূর্তিমান অশান্তির মত স্থাপিত হয়েছে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। বিপ্লবের চেহারাটা বড়ো বেশি সুস্পষ্ট। যেন একটা ঝড় আসছে মনে হয়। সেই বোকা গোবেচারা কুলি-দের মুখে-চোখে এখন সুস্পষ্ট উত্তেজনা। শ্রমিক-অসন্তোষ কথায় কথায়। আজ এ-বাগানে লক-আউট, কাল ও-বাগানে। কথায় কথায় হরতাল। বিশ্বাস নেই কাউকে। হরদম চাকা বন্ধ।

অবশেষে এসেছে ঘেরাও। পর পর কটি বাগানে ঘটে গেল বিপর্যয়। রাত্রি দুপুরে ফোন বাজে। ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং। পাশের বাগানে চলেছে উত্তেজিত অশান্তি। এক ভয়ংকর অনিশ্চয়তা। হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলতে ভয় হয়। ডায়না এসে দাঁড়িয়েছে। তাকেও কেমন যেন ভয়-ভয় লাগে। চোখ তুলে তাকাতে পারে না। ডায়না এসেছে তার কাছে। হয়তো সে কিছু বলতে চায়। সে-ও কি অমনি কিছু বলবে? বিশ্বাস নেই কোনকিছুতেই। একটা অস্থির আতংক তাড়া করছে। মনে হয় একটা আগ্নেয়গিরির ঠিক পাশেই জেগে বসে আছে।

ক্রীং ক্রীং...

ফোনটা আবার দ্রুত বেজে উঠলো। নিশ্চয়ই হ্যারী কথা বলছে। ভীষণ বিপদে পড়েছে ও। কিন্তু ডিক কি করবে? তার বাগানের শ্রমিকেরাও তেমনি উত্তেজিত মনে মনে। সে কী করে ডিককে বাঁচাবে? ফোনের দিকে হাত বাড়ালো না ডিক, হুইস্কির বোতলটা টেনে নিল কোলের কাছটিতে। ছিপি খুলে বেশ খানিকটা ঢেলে নিল গ্লাসে। গ্লাসটা তুলে নিল তারপর। ঢক ঢক করে গিলতে লাগলো। বাইরে ডুয়ার্সের অন্ধকার আকাশ। জানালা গলে একরাশ হাওয়া ছুটে ছুটে ভেতরে আসছে।

[ক্রমশ]

কবিতার ভবিষ্যৎ

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

প্লেটো তাঁর পরিকল্পিত রিপাব্লিকে কবিদের জন্য কোন স্থান-নির্দেশ করতে পারেন নি। সেটা বহু যুগ আগের কথা। বর্তমান যুগে জীবন যেভাবে দ্রুত যান্ত্রিক হয়ে উঠছে, তাতে ভবিষ্যৎ সমাজে কল্পনাপ্রবণ কবির অস্তিত্ব আদৌ থাকবে কি না এ নিয়ে আজও কোন কোন মহলে সকৌতুক জল্পনা-কল্পনা হতে শোনা যায়। এ অবস্থায় কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতই মনে হয়। কবিতার ভবিষ্যৎ বলতে কী বোঝায় তাও খুব স্পষ্ট নয়। এক অর্থ হতে পারে, বর্তমান আবেগবর্জিত নির্মম বাস্তব পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে কবিতার কোন ভবিষ্যৎ আছে কী? কিংবা ভবিষ্যতে কবিতা কী রূপ নিতে পারে? এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্তরও অনুমান-নির্ভর হতে বাধ্য। কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কৌতূহলের ভেতর চমৎকারিত্ব আছে, কিন্তু বাস্তব বিবেচনায় এ কৌতূহল অর্থহীন। তবু এ কৌতূহলের মধ্যে মানসিক সক্রিয়তার পরিচয় আছে বলে বিষয়টি মনোযোগের দাবি রাখে।

প্রশ্নগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা যাক। প্রথম, কবিতার কোন ভবিষ্যৎ আছে কী?

আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি দেখে পাঠকের মনে যে ক্লান্ত নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে প্রশ্নটি তার সঙ্গে জড়িত। কবিতার জন্ম-উৎসে থাকে কবি-মনের আত্মপ্রকাশের তাগিদ। সে স্পর্শকাতর মন বহির্বিশ্বের বাস্তবতার সংস্পর্শে এসে সর্বদা একটি প্রবল আলোড়ন অনুভব করে। সে মন যদি জীবনের বাস্তবতা দেখে সাড়া না দেয়, স্পর্শ-কাতরতা হারিয়ে ফেলে, বহির্বিশ্ব সে মনের ওপর যদি কোন চিহ্ন রেখে না যায় অর্থাৎ মানসজগতে কোন আলোড়নের সৃষ্টি না করে—তাহলে সে অনুর্বর উৎসমুখ থেকে কবিতার জন্ম হবে কী করে? যান্ত্রিকতা মনের জগৎকে ক্রমশই অসাড় করে তুলবে—এ অনুমান যে মিথ্যা নয় সাময়িক সাহিত্যের রসহীন বিবর্ণতাকে তার সমর্থক প্রমাণ রূপে ধরা হয়। এরূপ অনুমান যুক্তিনির্ভর কি না তা বিচার করে দেখতে হবে। অনেক সময় আমরা এমন কণ্ঠস্বর শুনতে পাই যা আমাদের সত্তাকে চমকিত করে, হৃদয়কে উন্মুখ করে এবং সমস্ত চেতনাকে জাগ্রত করে জীবনের কোন অভিনব এবং অনাবিষ্কৃত জগতে। এ ধরণের হৃদয়বিপ্লব সব সময় সুন্দর এবং আকর্ষণীয় নাও হতে পারে, তবে এটা যে বাস্তব এবং জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত তা অস্বীকার করা যাবে না। যে পর্যন্ত কবি বিস্ময়ের চমক দিয়ে আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করতে পারেন, কিংবা স্বপ্ন এবং কল্পনার সাহায্যে আমাদের মনকে স্পর্শ করেন, অন্তত সেইটুকু সময় তিনি আমাদের মনে জীবনের সাড়া জাগিয়ে তোলেন। যে সুচিহ্নিত পথকে আশ্রয় করে পাঠকমনকে জীবনের প্রতি উন্মুখ করে তোলা যায় তাকে নিঃসন্দেহে বলা যায় কবির পথ।

এখন প্রশ্ন ওঠে এ যুগের কবি-পথ কোন দিকে বিস্তৃত?

আধুনিক কবির আন্তরিক প্রয়াস বাস্তব জীবনের রাজ্যে পাঠকমনকে জাগ্রত করা। কবি-পরিকল্পিত আশ্চর্য অভিনব রূপকল্প সৃষ্টি সে প্রয়াসকে অব্যর্থ পরিণতির দিকে এগিয়ে দেয়। যেহেতু এ ধরণের রূপকল্প কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত, সজীব, মৌলিক এবং পূর্বযুগের রোমান্টিক কল্পনার প্রতিক্রিয়ায় অনেকটা বিদ্রোহী চেতনা থেকে উদ্ভূত। 'আলোক ছায়া শিব-শিবানী সাগর জলে দোলে'—এ অপূর্ব-সুন্দর রূপকল্প পাঠকমনকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করে প্রীতিস্নিগ্ধ কাল্পনিক প্রেমের জগতে। কিন্তু 'মৃত্তিকার মত তুমি আজ/তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে/সুরঞ্জনা,/তোমার হৃদয় আজ ঘাস।/আধুনিক জীবনের বিবর্ণ প্রেমের এই রূপকল্প আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তৎক্ষণাৎ স্পর্শ করে। 'আজ ফাল্গুনী চাঁদের জোছনা আলোতে ভুবন ভাসিয়া যায়/তোরা তারালোক হতে পরীবিহঙ্গী পাখা মেলে উড়ে আয়।/—চাঁদকে নিয়ে রোমান্টিক কবির এ স্বপ্নকল্পনা 'নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি/তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?/চাঁদের শতক আজ নহে তো/এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে'।—আধুনিক কবির বাস্তবধর্মী এ রূপকল্পের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। আধুনিক কবির তাই প্রত্যাশা প্রথাসিদ্ধ কবিভাষা ত্যাগ করে জীবনের বাস্তব রঙ্গমঞ্চ থেকে কবিভাষার আহরণ: 'রেখো না বিলাসী কোন আশা/নববাবু-ভাষা ছাড়ো মন.../লাঙলের ফলায় ফলায় সুতীব্র স্বনন/সাবেক নূতন ছন্দে মেলাও সে নাচ/গ্রামে ও শহরে পাবে কবিতার ভাষা/(বিষ্ণু দে)। বলা বাহুল্য সে কবিভাষাকে মর্মভেদী করে তোলা যায় জীবনঘনিষ্ঠ রূপকল্পের সাহায্যে।

আসলে এ যুগের কবির সত্যানুসন্ধিৎসা পূর্বযুগের কবির চাইতে আন্তরিক, যেহেতু প্রহেলিকা সৃষ্টির সাহায্যে পাঠকের বিশ্বাস এবং মনোযোগ আকর্ষণে তিনি অনাগ্রহী। পূর্বযুগের মত গতানুগতিক রূপ পরিকল্পনার ওপর তিনি নির্ভরশীল নন—যে রূপমূর্তি অস্পষ্টতা এবং অবাস্তবতার আবরণে সত্যকে গোপন করে। বিগত দুই দশকেরও বেশি কাল সময়ে দৈহিক এবং মানসিক জগতের বিমর্ষ অভিজ্ঞতা আধুনিক মনকে জাগিয়ে তুলেছে জীবনের অনভিপ্রেত কঠোর এবং কুৎসিত বাস্তবতার জগতে। পূর্বযুগের মত ভাবালু মন নিয়ে তারা সে বাস্তবের ওপর আদর্শলোকের দীপ্তি বিকীর্ণ করতে চান নি। বরং বাস্তবের রিক্ত রুক্ষ রূপকে সাহসের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় ভবিষ্যতে কবি-ব্যবহৃত রূপকল্প আরো বাস্তবঘনিষ্ঠ হবে এবং এর সৌন্দর্যানুভূতি নির্ভর করবে সে বলিষ্ঠ আশাবাদী মনের ওপর, যে মন নির্মোহ দৃষ্টিতে সত্যের ভেতর সৌন্দর্য আবিষ্কারে সক্ষম। এ যুগে মানুষের বাস্তবনিষ্ঠা এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, তাতে মনে হয় কুৎসিতকে ছদ্মবেশ পরিয়ে মনোরম রূপ দেবার প্রবঞ্চনা ক্রমশই অন্তর্হিত হবে।

এ পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতি হিসেবে আমরা একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হই: কবির জীবনে যুগ-প্রভাব অনতিক্রমণীয়, সে প্রভাব তার মানসিক প্রতিক্রিয়ায় এবং সুরের প্রকাশে। যাঁদের বুদ্ধিগত স্থিতি কেবলমাত্র অতীতের বুকেই দৃঢ়বদ্ধ একমাত্র তাঁরাই আধুনিক কবিতাকে কবিতা বলে স্বীকার করতে পারবেন না। আধুনিক কবিতার প্রকৃতি পৃথক হলেও স্বতঃস্ফূর্ততা এবং তাৎপর্যময়তার দিক থেকে এ-ও কবিতা। কোন কোন পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য কিংবা তাদের সমর্থন লাভ করে নি বলেই যে এ কবিতার মৃত্যু হবে এমন ভাবনা ছেলেমানুষী ছাড়া কিছুই নয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন—পৃথিবী ক্রমশই প্রবীণতর হচ্ছে—নবীনতর নয়। যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ যুগের মানুষকে আজকের যুগের ভাষা বোঝবার ক্ষমতা দান করবে—যদিও এ যুগের ভাষা পূর্বযুগের ভাষা থেকে অনেকাংশে পৃথক।

॥ দুই ॥

ভবিষ্যতের কবিতা কোন্ রূপ নেবে এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়, যেহেতু এরূপ কল্পনার ভিত্তিতে পরীক্ষানির্ভরতা নেই। তবু পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে একটা ইংগিত দেওয়া যেতে পারে। সাহিত্যের অপরাপর বিভাগের তুলনায় কবিতা যুগ-চেতনার সংগে গভীরভাবে সংপৃক্ত। জনমনের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ হয় কবিতায়, বাস্তবজীবনের অবিকৃত সুর ধ্বনিত হয় কবিতায়। সুতরাং ভাবীযুগের কবিতা ভাবীযুগের মানুষের চিন্তা, অনুভূতি এবং প্রত্যাশাকে রূপ দেবে, যেহেতু সামগ্রিক জীবনে ভাবীযুগের মানুষ এ যুগের মানুষ থেকে আরো বেশি শিক্ষিত এবং সংস্কৃত হবে, বেশি অবকাশের অধিকারী হবে। আমরা যে একটা নতুন যুগের তোরণ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি এটা অস্বীকার করা যাবে না, আমাদের জীবনদৃষ্টি কয়েক দশক পূর্বেকার জীবনদৃষ্টি থেকে পৃথক এটাও স্বীকার্য। মানব-মনের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে, যে আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন বা ভীতিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে সেটাও ব্যক্তি-মানবের নয়, সমাজজীবনের। ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা বা জীবনের লক্ষ্যের কথা বলতে গিয়ে আমরা পূর্বযুগের মত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষের কথা ভাবি না—ভাবি জনগণ বা জাতির প্রেক্ষিতে ব্যক্তির কথা। এর কারণ, আধুনিক মানুষের মানসিক প্যাটার্নটাই ক্রমশ সামাজিক এবং যৌথ জীবনবোধের দিকে বিবর্তিত হচ্ছে। বিচ্ছিন্ন অভিজাত একাকীত্বের চাইতে আজ জোর দেওয়া হচ্ছে মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধের ওপর, ব্যক্তিপ্রাধান্য থেকে ভাবপ্রাধান্যকেই স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে বেশি। সুতরাং এটা অনুমান করতে বাধা নেই যে, ভাবীকালের কবিতা হবে মুখ্যত ব্যক্তিনিরপেক্ষ সমাজমনের সৃষ্টি—যে ধরণের সমাজমন সুদূর অতীতের পর বহুকাল দেখা যায় নি। সে কবিতায় থাকবে এমন মানুষের কথা যারা একই ঐতিহ্যে লালিত মানবসাম্য লাভের জন্য একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত—সাধারণ মানবভাগ্যের সমান অংশীদার।

আর একটি দিকে আধুনিক কবিতার অগ্রগতি হতে পারে। ইদানীংকালে কবি নৈরাশ্যকবলিত হওয়ায় কবিতা প্রাণশক্তি হারিয়েছে এটা স্বীকৃত। ভবিষ্যতের কবি সে প্রভাব অতিক্রম করে সুস্থ সবল জীবনবোধের অধিকারী হবেন, সুতরাং ভবিষ্যতের কবিতা আরো বেশি সজীব হয়ে উঠবে—এ আশা অহেতুক নয়। আধুনিক কবিতার অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও একটি বৈশিষ্ট্য পাঠকের চোখ এড়ায় না ঃ আজকের কবি জীবনবিমুখ বা জীবনক্লান্ত নন। জীবনের ব্যাপ্তি ও ব্যাকুলতা চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু। এ সঞ্জীবশক্তি কবিতায় আত্মপ্রকাশ করবে গতানুগতিক কল্পনা-বিরোধী উদ্ভট রূপকল্পের মধ্যে। এ ধরণের কবিশক্তির আবির্ভাবের আভাসও ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'—এ রূপকল্প প্রচলিত কল্পনাবিরোধী, উদ্ভট কিন্তু সৌন্দর্যস্বপ্ন প্রতিহত আধুনিক জীবনের বিবর্ণতাকে বাস্তবের রাজ্যে ফুটিয়ে তুলতে অব্যর্থ। 'আজ জীবনের কুঁজ দেখি তোমার গর্ভে/সেইদিন লুপ্ত হোক, যেদিন পুরুষ পৃথিবীতে আসে'/—এ রূপকল্প উদ্ভট হলেও এর বাস্তব আবেদনের প্রত্যক্ষতা অনস্বীকার্য। নবতর ভাববস্তুর আলোড়নের প্রভাবে ভবিষ্যৎ কবির নিত্যপ্রয়াস হবে মনন এবং অভিজ্ঞতার অভিনব দিগন্তে নিজের কবিসত্তাকে সম্প্রসারিত করা। এ সম্ভাব্য মানস-প্রসারের কথা চিন্তা করে এটা সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অযৌক্তিক নয় যে, ভবিষ্যৎ কবির আত্ম-প্রকাশ ঘটবে প্রচণ্ড শক্তিমত্তার মধ্য দিয়ে। যে ঐতিহ্য অর্থমূল্য হারিয়েছে সে ঐতিহ্যপ্রভাবে তথ্যকে গোপন বা বিকৃত করবার পাণ্ডুর প্রথাকে অতিক্রম করে অভিজ্ঞতাকে কাব্যে রূপ দিতে গিয়ে তিনি আরো বেশি সৎ এবং সত্যনিষ্ঠ হবেন।

এ পরিস্থিতিতে কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হবার সংগত কোন কারণ নেই। বরং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা করা যেতে পারে। মানুষের অনুভূতি এবং চিন্তাধারা যে সত্যনিষ্ঠা, প্রত্যয় এবং সাহসের পথে ক্রমপ্রসারিত হতে চলেছে, পারিপার্শ্বিক জীবনের লক্ষণ দেখে তা অনুমান করতে দ্বিধা হয় না। অস্তিত্ববাদের অবসাদ, ভাবপ্রবণ আদর্শবাদের উত্তেজনা এবং সর্বস্তরে ব্যাপ্ত ক্লান্তির নাস্তিক্যবাদী প্রতিক্রিয়ার প্রভাব পৃথিবী ক্রমশ কাটিয়ে উঠছে। আধুনিক যুগের আত্মিক অবক্ষয় থেকে পৃথিবী যদি কোন প্রকারে বেরিয়ে আসতে পারে, ভবিষ্যতের কবিতা অপ্রত্যাশিত সমুন্নতির পথে এগিয়ে যাবে, সন্দেহ নেই।

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনায় বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রয়েজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়
জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন)
লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্যে মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।
[illegible] অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্যথার ওপর ব্যথা। এ সেই পুরোতন ব্যথা। নতুন করে নড়া খেয়ে ধক্ করে জ্বলে উঠল। বিজয় অধিকারী কয়েক-খানা নোট এগিয়ে ধরেছিল তার দিকে। মুকুন্দ ফুঁসে উঠল, "লিয়ে যান টাকা। মোরা কাঙালি লয়।"

এমনি প্রতিক্রিয়াই আশা করেছিল মহেশ মণ্ডল—এ চরের ছোট মণ্ডল। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সানো চৌধুরীর দিকে।

সানো চৌধুরী অবস্থা সামলাতে এগিয়ে এল। বললে, "তোর বাপকে খালাস করতে যাবি নি?"

মুকুন্দ চুপ করে রইল।

সানো চৌধুরী বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললে, "তো এক কাজ কর। ও টাকা তোকে নিতে হবে না। বুঝলেন বিজয়-বাবু, সদরে যাওয়া-আসা, থাকা-খাওয়ার তো খরচা আছে। সেটা ওই টাকায় সারুন। কাল সকালে—চাই কি শেষ রাতের দিকে, মুকুন্দকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যান সদরে। না-কি?"

বিজয় বললে, "আমার আপত্তি নেই।"

মুকুন্দ ভাবছিল। এক লহমায় অনেক কথা মনে হচ্ছিল তার। বিচার হয়ে গেছে গ্রাম পঞ্চাতের। নয়নকে তার ছাড়তে হবে। যাকে ছাড়তে হবে তার সঙ্গে এক চালের তলায় দিন কাটানো কি যে দম্-চাপা লাগে! চরের বাইরে তবু দু'দিন জুড়িয়ে আসতে পারবে।

সানো চৌধুরী আবার জিজ্ঞেস করলে, "কি রে মুকুন্দ—যাবি তো?"

মুকুন্দ বললে, "যাব।"

সানো চৌধুরী বললে, "মহেশ, তুমিও যাও না।"

"উঁ হুঁ, মোর কাজ আছে।" মহেশ বললে, "বরং সঙ্গে হাবুকে পাঠাব।"

মতলবটা মহেশের মাথায় তখনি এসে গিয়েছিল।

সুযোগ যেন আপনি এসে হাজির। মহেশ মণ্ডল এ সুযোগ আর হাত-ছাড়া করলে না। মুকুন্দ আর হাবু সদরে চলে গেছে বিজয় অধিকারীর সঙ্গে। সেই দিনই সুবলকে পাঠিয়ে পড়তি বেলার দিকে নিমাই মাঝিকে ডাকিয়ে আনলে। বললে, "লিয়ে যাও তোমার ঝি।"

নিমাই মাঝি ঘাড় হেঁট করে কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইল মহেশের দাওয়ায়। তারপর আস্তে আস্তে শুধোলে, "এই কি পঞ্চাতের বিচার হলো?"

"হ্যাঁ।" মহেশ বললে, "সেদিন তো তোমাকে সব বলে এসেছি নিমাই।"

নিমাই স্বীকার করলে, "তা বলেছ।" বলে তেমনি মাথা হেঁট করে বসে রইল।

মহেশ তাড়া দিয়ে বললে, "যাও—উঠে পড়। বেলা গেল। যেতে যেতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।"

মেয়ের বাপ। তার যেমন দায—তেমন জ্বালা। নিমাই মাঝি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে করুণ গলায় আস্তে আস্তে বললে, "মেয়্যাটাকে মোর এবারের মত ক্ষমা করলে পারতে।"

"তা আর হয় না নিমাই।"। মহেশ গম্ভীর গলায় বললে, "সেদিন যেয়ে সব ঘটনা তোমাকে জানিয়ে এসেছি। ও আগুন ঘরে রেখে কবে আবার কি বিপদ ঘটবে—কে বলতে পারে! কার জাহান যাবে—কে জানে! এই তো তোমার ঝি-ই বলেছে কাকে—সে বিষ খাবে। যদি খায়? তখন?"—

তেমনি করুণ মুখে নিমাই মাঝি আবার ঘাড় হেঁট করে বসে রইল।

মহেশ বললে, "লিয়ে চলে যাও সঙ্গে করে—যেখানে পণের টাকা আগে খেয়ে-ছিলে সেইখানে গছিয়ে দাও গে যাও। মোদের টাকা মোরা ছেড়ে দিলম। বাস্।"

"কিন্তু ছাড়-পত্র?" নিমাই মাঝি বললে, "সুবলের কাছে শুনলম—মুকুন্দ ঘরে নাই।"

মহেশ বললে, "বাপকে খালাস করতে গেছে—সে ফিরতে তার ঢের দিন লাগবে। এখন তো ঝিকে লিয়ে চলে যাও। টিপ কাগজ আমি নিজে যেয়ে তোমাকে দিয়ে আসব। চিন্তা নাই।"

নিমাই বললে, "একটা গাই দিয়ে-ছিলম মোর ঝিকে।"—

"লিয়ে চলে যাও—লিযে চলে যাও।" মহেশ বললে, "যা দিয়েছ—লিবে বৈকি। গহনা, বাক্স, কাপড়—যা দিয়েছ সে তোমার ঝিয়ের। তাতে মোদের কোনো দাবি নাই।"

"তা হলে উঠি।"

"ওঠ। বেলা গেল।" নিমাইয়ের আগে মহেশ নিজেই উঠে দাঁড়াল। ওদের বাপ-বেটিকে বিদায় করতে পারলে যেন সে বাঁচে। নিজের মনেই সে বলতে লাগল, "মুকুন্দ নাই। মুকুন্দের মা তার বৌয়ের ছায়া মাড়ায় না। তোমার ঝি কি খেল

না-খেল, তাও জানি না। পরের ঝি—এ ভারি ঝঞ্ঝাট বাবু। নিয়ে চলে যাও—আমরাও নিশ্চিন্ত হই।"

নিমাই মাঝি উঠে গেল মুকুন্দের ঘরের দিকে। মহেশ মণ্ডল উদ্বিগ্ন হয়ে বসে রইল দাওয়ায়—একা। কি জানি, মেয়েটা আবার কি গোলমাল বাধায় কে জানে! খাড়া রইল দুটো কান।

না সাড়া—না শব্দ। না গোলমাল—না ডাকপাড়া কান্না। মহেশ-মণ্ডলের উদ্বিগ্ন মুহূর্তগুলো যেন আর কাটতে চায় না।

তা প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে মহেশ মণ্ডলের খামার উঠোনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দ এগিয়ে এসে দাওয়ার কাছে থামল।

মাথায় তোবড়া, হাতে গরুর দড়ি। নিমাই মাঝি বললে, "যাচ্ছি গো মণ্ডল।"

বিরস গলায় মহেশ শুধু বললে, "যাও।"

ঘোমটা ঢাকা নয়ন গড় করল দাওয়ায় মাথা ঠেকিয়ে। কি জানি দু' ফোঁটা চোখের জল পড়ল কি না মাটিতে। তারপর নিঃশব্দে চলে গেল বাপের পেছনে পেছনে, চোখ মুছতে মুছতে মহেশ মণ্ডলের উঠোন পার হয়ে, ডোবার পাশ দিয়ে গিয়ে উঠলো ভেড়ি বাঁধে। পড়তি বেলার আলো তখন সিঁদুর হয়ে উঠেছে।

এমনি রাঙা আলোয় আলোয় একদিন মুকুন্দ আর এই মেয়েটাকে নিয়ে সে এই চরে ঢুকেছিল না!...সঙ্গে ছিল মুকুন্দের বন্ধুরা।

চুলোয় যাক।...

মহেশ মণ্ডল বিড় বিড় বললে, "মোকে বিচার করতে হবে।...বিচার করতে হবে।"

॥ চোদ্দ ॥

থানা মহকুমার জেল হাজত উছলে এসে যেন ভরে গেল জেলার পুরানো জেল, নতুন জেল। তাতেও কুলোলো না, চালান হয়ে গেল খড়্গপুর—হিজলী। কলকাতা। ...সারা জেলা পুলিস যেন চষে ফেললে। হাওয়া চন্‌মনে। অনিশ্চিত। সন্ত্রস্ত।

বাইরে-মানুষজনের ফিস্‌ফিসানি। জেলের ভেতরে—থেকে থেকে হাজার গলার গর্জিত আওয়াজ ঃ বন্দেমাতরম্।.. সেখানে কি হচ্ছে কেউ জানে না। শুধু মাঝে মাঝে চম্‌কে ওঠে জেলা শহরের নিঃশব্দ বায়ুমণ্ডল। বাইরের বিস্মিত মানুষ শুধায় গলা চেপে। উত্তর আসে—চাপা গলায়। ছড়িয়ে পড়ে নানা গুজব। বেটন চার্জ.. গুলী...অনশন...মৃত্যু...গুম্। হাজার কথা। নিত্যদিনের কাজকর্মের মধ্যে জেলা শহর যেন তলায় তলায় থম্‌থম্‌ করছে।

সপ্তাহ কয়েক আগের ঘটনা। ম্যাজিস্ট্রেটের হাতায় ঢুকে বারান্দার সিঁড়ির ওপরে কে বা কারা একটা নতুন সরায় কিছুটা আতপ চাল, গোটা দুই কাঁচকলা আর একটা কালো রুমাল রেখে এসেছিল। কাঁচকলা চাপা ছোট্ট একটা কাগজে নাম লেখা ছিল মেমসাহেবের—লেখা ছিল "শ্রদ্ধা ও বেদনার সঙ্গে নিবেদিত"। সকালবেলা তাই দেখে দারোয়ানের চক্ষু-স্থির।

প্রথমে ডেকে দেখালে জাতভাই আর এক পশ্চিমা দারোয়ানকে। তারও চোখ ডাগর ডাগর হয়ে উঠল। তারপর সাহেবের খাস আর্দালী। সে জাতে মুসলমান—কিছুই বুঝলে না। তারপর স্বয়ং সাহেব। ইয়া লম্বাচওড়া খাস বিলাতের বাচ্চা। বুঝতে না পারলেও, চটে বললে, "হোয়াট্!"

কিছু না বুঝুক, সরার মধ্যে ওই কালো রুমালটা মেমসাহেবের মন খারাপ করে দিলে। আর ওই দুটো কথা।

ডাক পড়লো এস-পি'র। ডাক পড়ল ডি-আই-জির।

ব্যাপার দেখে তাদেরও মুখ থম্‌থম্ করতে লাগল।

সাহেব শুধোলে, "ব্যাপার কি। এ রসিকতার মানেটা বলো।"

তারা মেমসাহেবকে আগে সরে যেতে বললে।

তারপর অনেক মাথা চুলকে এবং অনেক দ্বিধা সঙ্কোচে সাহেবকে যা বললে, তার মানে হলো—মেমসাহেবের আসন্ন বৈধব্য।

গোয়েন্দা বিভাগের জেলাকর্তা খাস কুলীন ব্রাহ্মণ। সন্ধ্যা আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করে না। বললে, "আমাদের বিধবাদের আতপ চাল আর কাঁচকলা খেতে হয় স্যার। নিয়ম।"

"হাউ ফানি।"...বলে সাহেব জুতোর এক ঠোক্কর দিয়ে সবা দিলে ছিটকে। সাহেব খুব সাহসী। নিজেই হেসে হেসে বললে, "আর কালো রুমালটা বুঝি আমাদের শোক চিহ্ন!"

"ইয়েস স্যার।" গোয়েন্দা কর্তার গলা কেঁপে উঠল।

"অল কাউয়ার্ডস্!"...

সাহেব তীব্রদৃষ্টিতে তারপর তাকাল এস-পি'র দিকে। বললে, "তুমি কি করছ? এ সব রাবিশ অমার হাতায় আসে কি করে!"

সেদিন থেকে গেটের সামনে মোতায়েন হয়েছেন দুই সান্ত্রী।

থানা পুলিস উথাল-পাথাল করে দিয়েছে শহর। থানায় থানায় গেছে আরও কড়া নির্দেশ। পীড়নের চাপ হয়েছে প্রবলতর।

আর সেদিন থেকে শহর যেন দম্ চেপে অপেক্ষা করছে। কিছু একটা ঘটবে। কিছু একটা ঘটতে পারে।...

এর মধ্যে এসে পড়ল মুকুন্দ আর হাবু। একে শহর তারা কখনো দেখে নি—তার ওপরে থানা পুলিশের কড়াক্কড়ি।

হাবু বললে, "অ বিজয়বাবু—এ কোথা এলম গ'?"

"ডগলাসের রাজত্বে।" বিজয় অধিকারী বললে, "তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল।"

প্রথম দিন গেল উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, কোর্ট দারোগা, জেল সুপারিনটেন্ডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। দায়রা কেস, বত্রিশ মাথা সাক্ষী—আসামী কম করে পঁচিশ জন। ইস্কুল-কলেজের ছাত্র থেকে কোর্ট-কাছারির জুনিয়ার উকিল, মাস্টার—আর গাঁউলি চাষা-ভুষো পর্যন্ত। সব ছেঁকে তুলেছে পুলিশ—যেখানে যাকে পেয়েছে জুড়ে দিয়েছে কেসে। স্বদেশী ডাকাতির মস্ত ফলাও কেস। চলেছে ঢিমে চালে। বিজয় অধিকারীর যোগাযোগে শেষ পর্যন্ত গোবিন্দ পাইকেরও উকিল ওকালতনামা দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কোর্টে।

দ্বিতীয় দিনে জেল হাজতে ঢের দিন বাদে দেখা হলো বাপ-বেটার, সঙ্গে উকিল। স্বদেশী ডাকাত—ভারি কড়াক্কড়ি। সময় দিয়েছে মাত্র পনেরো মিনিট। তার মধ্যে বাপ-বেটার আর কথা হবে কি, উকিলই সময় নিলে বেশি।

শুধু আসার সময় গোবিন্দ জিজ্ঞেস করেছিল, "তোর মা"—

মুকুন্দ বলেছিল, "ভাল আছে।"

"পবন খাঁ?"

"সে কোথায়—কেউ জানে না। লোকে বলে—গাঙে ডুবে"—

"ধুৎ।"—গোবিন্দ চটে শুধু একটা শব্দ করেছিল মাত্র।

জেল কর্মচারী উকিলকে কি বললে ইংরেজিতে কে জানে। উকিল মুকুন্দকে ঠেলা দিয়ে বললে, "চল।"

ওরা বেরিয়ে এল। পেছনে ঘট্-ঘটাং করে মোটা গরাদ দেওয়া জেলের ভারী গেট বন্ধ হয়ে গেল।

পেছন ফিরে বাপকে আর একবার দেখেছিল মুকুন্দ। পেছনে পেছনে এসেছিল গেট পর্যন্ত। দাঁড়িয়েছিল গরাদ ধরে। সেই মোটা মোটা লোহার গরাদের ভেতরে, এক মাথা লম্বা লম্বা চুল, এক মুখ গোঁফ-দাড়ি। তার সেই লম্বা-চওড়া কাঠামো যেন কুঁকড়ে গেছে। না চিনিয়ে দিলে মুকুন্দ বোধ করি চিনতে পারতো না।

গেটের বাইরে হাবু দাঁড়িয়েছিল—দেখছিল। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস

ফেলে বললে, "চিনতে কষ্ট হয়।"

উকিল বললে, "চল। কোর্টে দেখবে।"

ব্যাপারটা ঘটে গেল কোর্টে থাকতে থাকতেই।

তখন বোধকরি দুপুর গোটাদুই হবে। টিফিনের পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বেরিয়ে গেল কোর্টের হাতা থেকে। জেলা বোর্ডের মিটিং আছে—সাহেব চেয়ারম্যান। আর্দালী ছুটল পেছনে পেছনে। বোর্ডের অফিস কাছেই।

কনট্রাকটার কুলি-কামিন সেদিন অফিস হাতার ভেতর ঢুকতে পেল না—ফিরে গেল ফটকের বাইরে থেকে। মিটিং-এর ফাইলপত্র সাজিয়ে অপেক্ষা করছে বোর্ড অফিসের কেরানী, কর্মচারী—মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিরা। লম্বা লম্বা পা ফেলে সাহেব ঢুকল জেলা বোর্ডের অফিসে। মিটিং রুম।

মিটিং রুমে ঢুকে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে সাহেব বসতে না বসতেই ঘটে গেল বিপর্যয়। ছুটে এল পিস্তলের গুলী। একেবারে চাঁদি উড়িয়ে দিয়ে

ইউবিআই এর ঋণদানের মাপকাঠিতে

বিরাট পরিবর্তন

ছোট ছোট শিল্পদ্যোগী, চাষী, খুচরা দোকানদার, পরিবহন পরিচালক বা অন্যান্য ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের যে গুণটি প্রধান ব'লে গণ্য হয় তা হ'ল ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা যার অর্থই হ'ল

● কারিগরি বিদ্যা
●● পরিচালন পারদর্শিতা
●●● উৎপন্ন দ্রব্যের বা সেবার বিপণন-ব্যবস্থা
●●●● ব্যক্তিগত সততা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
হেড অফিস: ৪, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত-সরণি
(পূর্বতন ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ১১৫টিরও অধিক শাখা অফিস আছে

গেল। সাহেব মুখ থুবড়ে পড়ল টেবিলে।

তারপর হৈ-হৈ হাল্লা। এদিক-ওদিক মানুষজনের ছুটোছুটি। জেলা বোর্ডের কেরানী, আর্দালী ছত্রভঙ্গ। কোর্টের মানুষ ভয় পেয়ে ছুটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। তার মধ্যে পুলিশের কয়েক রাউন্ড গুলীর শব্দ...নির্বিচারে ধর-পাকড়। হাকিমদের এজলাস বন্ধ।

তার মধ্যে দম্ করে ফেটে গেল একটা টাইম-বোমা। জেলা বোর্ডের পেছন দিকে একটা ঝোপের মধ্যে থেকে উঠল ধোঁয়া। সেপাই-সান্ত্রীর দৃষ্টি পড়ল সেই দিকে।

"চার্জ...ফায়ার।" হেঁকে উঠল একজন ইন্সপেক্টার।

দুর্ভেদ্য নাটা আর ঘেঁটুর ঝোপ। বাইরে থেকে শাদা জামার মত দেখা যাচ্ছে। সেপাই-সান্ত্রীর দল ঝোপটাকে ঘিরে ফেলে নির্বিচারে কয়েক রাউন্ড গুলী ছুড়লো। কিন্তু পাল্টা গুলী এলো না। বোমাও না।

ওদিকে জেলা বোর্ডের অফিসে একজন ধরা পড়ে গেল। পিস্তলসুদ্ধ হাত মুচড়ে ধরলে একজন অফিসার। আর একটা হাত বোধকরি একেবারে তৈরি ছিল—ধরবার আগে মুখে উঠে গেল পটাসিয়াম সায়ানাইড। অফিসার হুশিয়ার। সংগে সংগে আঙুল মুচড়ে ঢুকিয়ে দিলে মুখের ভেতরে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। সে আঙুল আর টেনে বার করা সহজসাধ্য হলো না। দাঁতে দাঁত চেপে বসল—যেন কুমীরের কামড়। অনেক ঘি-দুধ খাওয়া মাংসল সুডোল তর্জনী। অনেক আদেশ-নির্দেশ দেওয়া সাধের প্রবল প্রতাপী তর্জনী। জাঁতি-কলে পড়া ইঁদুরের মত ছটফট করছে ধরা পড়া ছোকরার মুখের মধ্যে। কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অনেকদিনের সযত্নে সঞ্চিত রক্তধারা।

প্রবল যন্ত্রণায় চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে অফিসারের। সেই মুহূর্তে বোঝা গেল না ঠিক—কে কাকে ধরেছে। স্থূলকায় অফিসারটিকে উদ্ধার করবার জন্য ছুটে এল দু'জন সেপাই। তারা এসে গলা চেপে ধরলে ছোকরার, এক-জন নাক টিপে ধরলে। ততক্ষণে শিথিল হয়ে আসছে দাঁতের পাটি। চিবানো আঙুলটা যখন উদ্ধার পেল তখন ধরা-পড়া আসামী সমস্ত আইন-আদালত কারাগারের বাইরে।

ওদিকে ঘেঁটু নাটার কাঁটা ঝোপ ঘিরে তখন প্রবল উত্তেজনা। বেশ কিছুক্ষণ একতরফা বন্দুকবাজীর পর সেপাই-সান্ত্রী পরবর্তী অ্যাকসনের জন্য অপেক্ষা করছে।

ঝোপের ভেতর থেকে প্রতিপক্ষ একেবারে নিঃসাড়।

ইনস্পেকটার প্রবল বিক্রমে হুংকার দিলে, "ভেতরে ঢোক।"

নাটার কাঁটা ঝোপ সরিয়ে, ঘেঁটুর ঘন গাছগাছালি সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো দু'জন সেপাই—শাদা জামাটা লক্ষ্য করে। কাছে গিয়ে দেখল—কোথায় কি। হাফ হাতা একটা ছেঁড়া সার্ট ঘেঁটু গাছে বাঁধা। বুলেটে ঝাঁঝরা বুক পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বেরুলো। তাতে শুধু লেখা : বন্দেমাতরম্। চোখের সামনে তুলে দেখলো লেখাগুলো লালচে। এ কি লাল কালি—না রক্ত।

"ভাগ্ গিয়া হুজুর।"...

"ধোঁকা দিয়া।"...

এতক্ষণের ধোঁকাবাজী। ইনস্পেকটার রাগে, ক্ষোভে প্রায় পাগলের মত এদিক-ওদিক নেচে বেড়াতে লাগল। বিরাট পুলিশবাহিনীকে চার ভাগ করে ছুটিয়ে দিলে চারদিকে। কংসাবতীর নির্জন বনভূমি, শালবন—প্রান্তর সংলগ্ন পাহাড়ী খাদ-খানা, সারা জেলা শহর আর তার পোড়ো আনাচ-কানাচ, গোপনন্দিনীর টিলা আর ঝোপ, সব তল্লাসী সুরু হয়ে গেল। পুলিশ চৌকি বসে গেল শহরে ঢোকার প্রধান প্রধান সড়কের মুখে, রেল ইস্টিশানের সামনে। পুলিশের ছাড়পত্র না পেলে আসা-যাওয়া বন্ধ।

হাবুর উত্তেজনা প্রবল। নিজের দুঃখ-বেদনার কথা ভুলে মুকুন্দও ভেসে গেছে সে উত্তেজনায়।

হাবু বললে, "এ কিসের মধ্যে এসে পড়লাম গো!—অ বিজয়বাবু! এ্যাঁ, সায়েবকে মেরে দিল?"

মুকুন্দ বললে, "তা হলে মোর বাপের বিচার করবে কে?"

বিজয় বললে, "সাহেবের কি অভাব!"

উথাল-পাথাল শহরে তিন দিন কেটে গেল। চরের কথা মনে পড়ে মুকুন্দের। ব্যথার জায়গায় মানুষ যেমন সকাতরে হাত বুলোয়—তেমনি মন তার ঘোরে নয়নের আশ-পাশে। মুকুন্দ বললে, "এখন চরে ঘুরব কি করে?"

বিজয় অধিকারী বললে, "আমরা মামলা-মোকদ্দমার লোক, আমাদের ভয় কি?"

অমন গাঁ-গাঁউলির মানুষ জেলা কোর্টে মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে এসেছে ঢের। ওরা মিশে গেল সেই দলে। থানার ছাড়পত্র পেয়ে একেবারে খড়্গ-পুরে এসে বাসে চেপে বসল। সোজা এবার কাঁথি।

কিন্তু এখানেও ঝামেলার অন্ত নেই।

মোটর স্টার্ট নিয়েছে—এমন সময় হৈ-চৈ করে ছুটে এল এক দল সেপাই-সান্ত্রী। একজন প্রবীণ পুলিশ অফিসার।

ড্রাইভার গাড়ি থামাল।

অফিসার বললে, "সার্চ হবে।"

সেপাই-সান্ত্রীরা গাড়ি ঘিরে ফেললে।

দু'টো সাইকেল পাওয়া গেছে কংসাবতীর কিনারে ; তাদের মালিক নিপাত্তা। নিশ্চয়ই তারা মজা নদী সাঁতরে খড়্গপুরে এসে থাকবে। নদীর এপারে—চরের সাঁওতাল ভূমিজদের কাছে পুলিশ খবর পেয়েছে—দু'টো ছ্যাংড়া ভোরে এই দিক দিয়ে চলে গেছে রেল ইস্টিশানের দিকে। একজনের গায়ে জামা ডোরাকাটা, অন্যজনের শাদা। স্টেশনে কড়াকড়ি ব্যবস্থা। সেপাই-সান্ত্রী গোয়েন্দা গিজ্‌গিজ্ করছে। কাছেই বাস স্ট্যান্ড। বাস থেকে একটি একটি করে লোক নামিয়ে তল্লাসী চলতে লাগল। সবাই প্রায় দেহাতী মানুষ—দু'-চারজন কারবারী। সকলের বোঁচকা-বুঁচকি, স্যুটকেস-তোরঙ্গ উল্টে-পাল্টে তছনছ করে দিলে পুলিশ। কিছুই পাওয়া গেল না।

অফিসার জিজ্ঞেস করলে ড্রাইভারকে, "এইটেই তো প্রথম গাড়ি?"

"আজ্ঞে না। রাত সাড়ে চারটের সময় বেরিয়ে গেছে একটা।"

"তবে ওরা নির্ঘাৎ বেরিয়ে গেছে আগের গাড়িতে।"

সহকারী সাব-ইনসপেকটার বললে, "কিন্তু স্যার সাঁওতালরা দেখেছে ভোরবেলা।"

"তবে!"

"আমার মনে হয়"—

প্রবীণ অফিসার ধমকে উঠল, "তর্ক করার সময় নেই। এদিক দিয়ে পালাবার এই একমাত্র পথ। ওরা এই দিকেই এসেছে। খোঁজ। জলদি। আমি এগিয়ে যাচ্ছি এই মোটরে। যদি আগের গাড়ি ধরতে পারি।"—

হুইশিল বাজিয়ে সেপাই-সান্ত্রী জড়ো করে সাব-ইনসপেকটার ছুটে গেল অন্য গাড়িগুলো তল্লাস করতে।

অফিসারটি ড্রাইভারের পাশে উঠে বসে বললে, "ছাড়ো গাড়ি।"—ঘড়ি দেখলে—সাড়ে পাঁচটা। অর্থাৎ এক ঘণ্টার ফারাক মাত্র। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলে, "আপনাদের স্পীড কত?"

ড্রাইভার বললে, "দশ থেকে পনেরো।"

"বিশ-ত্রিশে ছুটুন।" বলে অফিসার গ্যাঁট হয়ে বসল। [ক্রমশ]

কান্নার রকমফের

নীলকৃষ্ণ পাল

মিছিল; কি বিরাট মিছিল! হাজার হাজার মানুষের উদ্বেলিত জনস্রোতে মহানগরীর জনপথ যেন উপচে পড়ছে।

অথচ এ কেমনতরো মিছিল। মুখে শ্লোগান নেই, হাতে ঝাণ্ডা নেই, হাজার হাজার মানুষের শোকস্তব্ধ, মূক মিছিল উদ্দীপ্ত প্রতিবাদে যেন মুখর। সামনে ক'টি শবাধার মিছিলের পুরোভাগে চলেছে। জনপথের দুধারে দোতলা-তেতলা অট্টালিকা থেকে গৃহবধূরা ফুল ছুঁড়ে দিলেন শবাধারের ওপর মিছিলের ওপর। অনাম্নী মায়ের দুটি চোখ ওই ক'টি শবাধারের জন্যে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা ট্রাম-বাস থেকে নেমে মিছিলের কলেবর বৃদ্ধি করলো। কারো মুখে ভাষা নেই, হাতে ঝাণ্ডা নেই, অথচ সহস্র মানুষের মূক প্রতিবাদে মহানগরীর রাজপথ মুখর।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড বেয়ে রাসবিহারী এ্যাভেনু্য ছাড়িয়ে মিছিল কেওড়াতলা শ্মশানে এসে থামলো। ট্রাক থেকে শবাধারগুলো নিচে নামানো হলো। তাকে ঘিরে দাঁড়ালো হাজার হাজার মানুষ। যারা একদিন আগেও ঐ মৃতব্যক্তিদের চিনতো না: অথচ যারা ফ্যাসিবাদী শাসকের বুলেটের প্রতিবাদে সমস্ত মহানগরীর লোকের নিকটতম আত্মীয় হয়ে উঠলো। যাদের আত্মদান সমস্ত মহানগরীর লোকের অশ্রু এক মুহূর্তে ঘৃণা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদে এক মিছিলে সামিল করেছে।

দাউ দাউ করে মুহূর্তে সব ক'টি শ্মশান জ্বলে উঠলো। সেই লেলিহান অগ্নিশিখায় যেন মানুষগুলো নিজেদের প্রতিশোধের ভাষা খুঁজে পেলো। অনুভূতির সেই স্তরে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে শ্লোগান উঠলো, শহীদ মৃত্যুঞ্জয়—লাল সেলাম!

শ্লোগানের তীব্রতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো কেঁপে উঠলো প্রমীলা।

প্রমীলা যেন আবার সম্বিৎ হারিয়ে ফেললো। নীরব, নিথর। অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল কিভাবে লিকেলিকে অগ্নিশিখাগুলো দু' বাহু বাড়িয়ে নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল। সেই অন্ধকার রাতের আকাশে মিটমিট করে তারাগুলো জ্বলেছিলো কি না সে খেয়াল প্রমীলার ছিল না। জনতা আবার নীরব। প্রমীলার অপলক দুটো চোখে অশ্রু নেই। শুধু স্থির, নিবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে লিকেলিকে অগ্নিশিখাগুলোকে গিলে গিলে খাচ্ছে।

প্রমীলা মৃত্যুঞ্জয়ের মা।

এক ছেলে দুই মেয়ে, বৃদ্ধা শাশুড়ী ও স্বামীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার প্রমীলার। তবুও স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখে নি সে জীবনে। স্বামী সুখেন্দুবাবু শিক্ষক। অমায়িক ব্যবহার আর পরিশ্রমী। দিনরাত্ত পরিশ্রম করেন এই ছোট্ট সংসারটিকে সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে তুলতে। কিন্তু বাড়িভাড়া, সবার মুখে দুবেলা দুমুঠো খাবার, আর ছেলের লেখাপড়ার খরচ জোগাতেই নুন-আনতে-পান্তা ফুরলো অবস্থা। সুখেন্দুবাবু ভাবেন : দিন যাবে, সংসার বাড়বে, সংসারের খরচাও বাড়বে। কিন্তু আয় তো বাড়বে না। তিনি ভাবেন আর চোখে অন্ধকার দেখেন।

প্রমীলা কখনও অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে, আবার কখনও সুস্থ হয়ে ওঠে সংসারের কাজকর্মে মন দেয় সংসারটাকে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করে। সুখেন্দুবাবুর মার বয়স বাড়ে। তিনি আরও বুড়িয়ে যান, আরও বেশি করে ঠাকুরের নাম জপ করেন। শেফালী, দীপালী, মৃত্যুঞ্জয় তিল তিল করে বড়ো হয়ে ওঠে। সুখেন্দুবাবু মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। প্রমীলা মৃত্যুঞ্জয়ের ওপর আকাঙ্ক্ষার সিঁড়ি তৈরি করে সুখ ও আনন্দের কল্পনার মধ্যে ডুবে যায়, সে সুখ দেখতে পায়। মৃত্যুঞ্জয় বড় হবে। পড়াশুনা করবে। ডাক্তার হবে। তারপর সে অনেক টাকা-পয়সা রোজগার করবে। টুকটুকে সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করবে। তখন প্রমীলা হবে শাশুড়ী। ওরা বনেদী পাড়ায় গিয়ে নতুন বাড়ি নেবে। সুখেন্দুবাবু তখন শিক্ষকতা ছেড়ে দেবেন। দুজনেই অবসর জীবনের মধ্যে দিয়ে অধিকতর সুখের মধ্যে দিয়ে সারা জীবনের দুঃখকষ্টের পাওনা সুদে-আসলে আদায় করে নেবেন। সুখ—কত সুখ। প্রমীলা যেন আর কল্পনা করতে পারে না।

তারপর দিন বয়ে যায়। কিন্তু প্রমীলার সুখ কল্পনার মত স্বচ্ছন্দ গতিময়। নিকষ অন্ধকার সামনে রেখেও সুখেন্দুবাবু এগোন; কারণ এগুতে হয় বলে। বাস্তবের আঘাতে প্রমীলার সুখ পথে পথে আছাড় খেয়ে মরে। মৃত্যুঞ্জয় স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে। অনেক চেষ্টার পর শেফালী, দীপালীর বিয়ে হয়ে যায়। সুখেন্দুবাবুর মাথার ওপর থেকে একটা দুশ্চিন্তার বোঝা অন্তত নেমে যায়। কিন্তু সে দুশ্চিন্তা বেশি করে চেপে বসে প্রমীলার ওপর। মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে প্রমীলার সব ক'টা গয়না গেছে, পাকিস্তান থেকে চলে আসার সময় যে অল্প টাকা নিয়ে আসতে পেরেছিল, তাও। এবার প্রমীলার চোখের সামনে নেমে আসে একটা নিকষ কালো অন্ধকার ভবিষ্যতের পর্দা। ছেলের ডাক্তারী পড়ার আশা এবার শিকেয় উঠলো চিরজন্মের মতো।

বয়েস বাড়ে, তবু সুখেন্দুবাবু আরও জোরে সংসারের ঘানি চেপে ধরেন। সময় নেই; শরীর এত পরিশ্রম সহ্য করতে পারে না। মনটাও তাই মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু একে তো প্রশ্রয় দিলে চলে না! ছেলের কলেজের বাড়তি খরচ জোগাতে হবে যে। তবু পারা-না-পারা শরীর মন নিয়ে আরও একটা টুইশানি বাড়িয়ে নেন। মনকে বোঝান আর তো ক'টা বছর। তারপর ছেলে পাশ দিয়ে বেরোলেই...। মৃত্যুঞ্জয় সত্যিই একদিন বি এসসি পাশ করে বেরিয়েছে।

কিন্তু এই ক'বছরে সুখেন্দুবাবুর স্বাস্থ্য আরও ভেঙে পড়েছে। সারা জীবনের দুর্বার পরিশ্রম তাঁর সমস্ত শরীর মনের ওপর ক্লান্তির ছাপ রেখে গেছে। বয়সের চেয়েও তিনি বেশি বুড়িয়ে গেছেন। আগের তুলনায় অনেক অল্পেতেই হাঁপিয়ে ওঠেন। চিরদিন শান্ত স্বভাবের লোক সুখেন্দুবাবুর মেজাজটাও খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্যের খাতিরে দু-একটা টুইশানিও ছেড়ে দিতে হয়।

প্রমীলা স্বামীর দিকে তাকায় আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে; অথচ সে কিছুই বলতে পারে না; না স্বামীকে—না ছেলেকে। মৃত্যুঞ্জয় সবই বুঝতে পারে, সে নিজেই একদিন মায়ের কাছে কথাটা পাড়লে—চাকরীর কথা; বাবাকে এই দুর্বিষহ চাপ থেকে কিছুটা রেহাই দেবার কথা। প্রমীলা বাধা দিতে পারলে না। শুধু স্বাভাবিকের চাইতেও চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে মৃত্যুঞ্জয়কে দেখলে, তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলে। তারপর সেই বড়ো বড়ো চোখ দুটো কখন যে ভিজে উঠেছিল প্রমীলার সে খেয়াল ছিল না। বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে শুধু বলতে পেরেছিল, হ্যাঁ বাবা তাই কর। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে। কেঁদে কেঁদে মন খারাপ করেছে ছেলেকে আর পড়াতে পারে নি বলে।

মৃত্যুঞ্জয় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও জানাশোনা লোকের কাছে থেকে চাকরীর খোঁজ-খবর নেয়। সকাল সন্ধ্যে কলকাতার অফিস পাড়ায়, শিল্পাঞ্চলে ঘোরাঘুরি করে। দরখাস্তের পর দরখাস্ত করে যায়। অধিকাংশক্ষেত্রে ইন্টারভিউর আমন্ত্রণও পায় না। ইন্টারভিউর আমন্ত্রণ পেলেও গিয়ে দেখে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শত শত প্রার্থী। ওরাই বলাবলি করে—খুঁটির জোর না থাকলে চাকরী হবার নয়। মৃত্যুঞ্জয় শোনে; বোঝে আর হতাশ হয়। তার তো খুঁটির কোন জোর নেই।

তবুও সেবার একটা ইন্টারভিউ পেলে, কেমন একটা যোগাযোগও জুটে গেল। ঐ কারখানার জনৈক উচ্চপদস্থ ফোরম্যান সুখেন্দুবাবুর প্রাক্তন ছাত্র। নিজের ছেলের জন্যে সুখেন্দুবাবু ফোরম্যানের দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রাক্তন ছাত্র তাঁকে আন্তরিকভাবে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটি করবেন না। কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল মৃত্যুঞ্জয় কিছুই বুঝতে পারলো না। তার চাকরিটা সেবারও হলো না। মৃত্যুঞ্জয় জীবনের প্রতি সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে। চোখে ছানিপড়া বুড়ো লোকের মতো তার মনে হলো, সামনে শুধু একরাশ অন্ধকার।

একদিন সুখেন্দুবাবুর কাছে একখানা চিঠি এল। সেই প্রাক্তন ছাত্র ফোরম্যান লিখেছেন, ইন্টারভিউ বোর্ডে তার ছেলে নাকি রাজনৈতিক প্রশ্নে কি সব বেয়াড়া উত্তর দিয়েছে। সেজন্যে অনেক চেষ্টা করেও তার চাকরিটা হয় নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। চিঠি পেয়ে সুখেন্দুবাবু গুম মেরে গেলেন। কোন কথা বললেন না। মৃত্যুঞ্জয় ভাবতে পারে না, এমন কি সে অন্যায় বলেছে, তাকে অবশ্য ভিয়েতনাম, আমেরিকা প্রভৃতি নিয়ে দু'-একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল। সে বলেছে ভিয়েতনামে আমেরিকা সৈন্য প্রেরণ করে তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণ করেছে। যা সত্য তাই তো সে বলেছে। অথচ এতে অন্যায় যে কোথায় তা সে মোটেই বুঝতে পারে না। এহেন বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে ঘৃণায়, ক্ষেভে সে জীবনকে নতুন করে আবিষ্কার করলো।

দীর্ঘদিন বেকার জীবনের গ্লানি নিয়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুঞ্জয়। চাকরির জন্যে দরখাস্ত লেখায়, ইন্টারভিউর আমন্ত্রণ পাওয়ায় এখন আর কোন রোমাঞ্চ জাগে না। জীবনের সব রঙিন স্বপ্ন মুছে গেছে। তবু সে দরখাস্ত লিখে ইন্টারভিউ দেয়, চাকরি হয় না। সবই যেন নিয়মমাফিক।

আশ্চর্য! এই নিয়ম, হতাশা সব কিছুকে মিথ্যে করে দিয়ে একদিন সহসা মৃত্যুঞ্জয়ের চাকরি হয়ে গেল কাশীপুর গান এ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরীতে। একটা মুমূর্ষু জীবনবোধের ভেতর থেকে সে যেন প্রাণের স্পন্দন শুনতে পেলো। হালভাঙা নাবিক ঝড়-সমুদ্রে হঠাৎ তীর দেখতে পেয়ে যেভাবে বাঁচার আশায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, সেভাবে বেঁচে উঠলো প্রমীলা। সে যেন আবার দেখতে পায় পূর্বকল্পিত অন্তত কিছুটা সুখ।

প্রমীলার সে সুখ-কল্পনা অনেকাংশে সত্যিও হয়ে উঠলো। বাপ-বেটা দুজনের রোজগারে সংসার বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই চলছিল। বিশ্রামের প্রয়োজনে সুখেন্দুবাবু টুইশানিগুলো ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র স্কুলে শিক্ষকতাটাই রাখলেন। মৃত্যুঞ্জয় বাসা-কারখানা করে। শিফট ডিউটি করে। প্রমীলা হাঁফিয়ে ওঠে; ছেলের বিয়ের কথা ভাবে। সুখেন্দুবাবু বিকেলে মিতালী সঙ্ঘের মাঠে হাওয়া খেতে বেরোন; রাত করে বাসায় ফেরেন। ঠিক এমনি করেই বছর দুই কেটে গেল।

প্রমীলা ছেলের বিয়ের কথা বলে; সুখেন্দুবাবু শোনেন। সুখেন্দুবাবু শুনে চুপ করে থাকেন। প্রমীলা রেগে যায়। সুখেন্দুবাবু বিয়ের প্রস্তাবে সায় দেন।

প্রমীলা বিয়ের প্রসঙ্গ তোলে; মৃত্যুঞ্জয় হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। প্রমীলা চোখের জলে ছেলেকে বোঝায়

সেই কাশি ?
গ্লাইকোডিন এর
প্রভাবে পালিয়ে বেঁচেছে!
কি ? আপনি বিশ্বাস করবেন কি, যে এই কিছুক্ষণ আগেও কষ্টদায়ক কাশিতে উনি নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন। উনি গ্লাইকোডিন খেলেন। গ্লাইকোডিন খেতেই ওঁর কাশি খুব অল্প সময়ে সম্পূর্ণ নিরাময় হ'ল।
কাশি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে গ্লাইকোডিন এর বাড়া আর কোন ওষুধ নেই
আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত গ্লাইকোডিন এর ফর্মূলা সব আক্রান্ত অংশ থেকে কাশিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ আরাম দেয়।
■ মস্তিষ্কে—কাশির হামলা নিয়ন্ত্রণ করে।
■ গলায়—খসখসে ভাব থামায় ও জমাট শ্লেষ্মা দূর করে।
■ বুকে—চেপে ধরা পেশিগুলিতে আরাম পাওয়া যায় ও শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ করে তোলে।
■ ফুসফুসে—শ্লেষ্মাকে পাতলা কোরে বার কোরে দেয় ও কাশিকে দূরে তাড়ায়।
গ্লাইকোডিন
টার্প বসাকা
Alembic
কাশির জন্য বিশ্বস্ত, সর্বাধিক বিক্রীত গার্হস্থ্য চিকিৎসা
everest/659b/ACW/bn

আমার বয়েস হয়েছে। তা ছাড়া আমার, তোর বাবার দুজনেরই শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে। আমাদের পরিচর্যার জন্যে তো অন্তত একটা মেয়ে ঘরে আনা চাই।

ছেলে দশ দিন শোনে, একদিন মত দেয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের বিয়ে হয়, নতুন বৌ ঘরে আসে। নতুন বৌমা নিয়ে ঘর করে প্রমীলা। মধ্যবিত্ত জীবনের পরিধিতে ঐটুকু ঐশ্বর্য আর বৈভবের মধ্যে যে পরিমাণ সুখ উপভোগ করা যায়, প্রমীলা তার সবটুকুই যেন উপভোগ করে। প্রমীলা সুখী। নতুন বৌ রান্না করে খাইয়ে-দাইয়ে শ্বশুরকে স্কুলে পাঠায় স্বামীকে কারখানায় পাঠায়, শাশুড়ীর পরিচর্যা করে। এমনি করে সে ছোট্ট সংসারটিকে সুখী করে তুলেছে।

মর্নিং শিফ্‌টে মৃত্যুঞ্জয়ের ডিউটি পড়েছে। খুব সকাল সকাল সে কারখানায় বেরিয়ে যাচ্ছিল; মায়ের ডাক শুনে ফিরে দাঁড়াল, "খোকা, কাল পরশু যখন সময় হবে বৌমাকে একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবি। মনে থাকে যেন।" খানিকটা অবাক বিস্ময়ে মৃত্যুঞ্জয় বললে, কেন, তোমার বৌমার অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে নাকি?"

না, না, তেমন কিছু নয়। নিয়ে গেলেই বুঝতে পারবি, তার বিস্ময় আরো বাড়ে। সে ঘরের মধ্যেই ঢুকে পড়ে। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল অঞ্জলি। তাকে দেখেই মৃত্যুঞ্জয় বললে, 'কই তোমার শরীর খারাপ করেছে—এ কথা তো আমাকে বল নি?'

'না, নাগো, না। আমার মোটেই শরীর খারাপ করে নি।'—তবে, মা যে বললে—'

মৃত্যুঞ্জয়কে শেষ করতে না দিয়েই অঞ্জলি বললে,—তুমি একদম বোকা। বলেই সে এমন লজ্জাভরা ও দুষ্টুমি মেশানো ভঙ্গিতে তাকালো যে মুহূর্তে মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় চালাক হয়ে গেল।

বেরিয়ে যেতে যেতে সে ডাকলে মা, দেখো, এ মাসে মাইনে হবার পর আমি সময়ের অভাবে একদিনও বাজারে যেতে পারি নি। আজ আমি কিন্তু সকাল-সকাল ফিরে আসবো। আজ বিকেলে মাংস হবে কিন্তু। সব যেন তৈরি থাকে। মর্নিং শিফ্‌টে তো আমার ঘরে খাওয়ার সময় হয় না।—

বলেই সে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল।

মৃত্যুঞ্জয় ফ্যাক্টরীর গেটে-এ গিয়ে যখন পৌঁছয়, তখন মর্নিং শিফ্‌ট শুরু হতে মিনিট কয় বাকি। গেটের সামনে তখন গেট মিটিং চলছিল। গত বছর ১৯শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী-দের ধর্মঘট উপলক্ষে যাদের বরখাস্ত করা হয়েছিল তাদের পুনর্বহাল দাবিতে কাল জনসভা হবার কথা আছে। সেই জন-সভার প্রস্তুতিতে আজ চলেছে গেট সভা। তখনো সভার বক্তৃতা চলছিল, "বন্ধুগণ, আমাদের ধর্মঘটের অধিকার বেআইনী ঘোষণা করেও সহকর্মীদের কাজ থেকে বরখাস্ত করে কেন্দ্রীয় সরকার গণতন্ত্রের শেষ মুখোশটুকুও খুলে ফেলেছে। আজ তাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমাদের এই ফ্যাসী-বাদী আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে এবং বরখাস্ত সহকর্মীদের কাজে পুনর্বহাল করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করতে হবে।" মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল সে বক্তৃতা। শুনে তার বুকখানা আবেগে উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছিল। কখন যে সাড়ে সাতটা বেজেছে কারো খেয়াল নেই। মৃত্যুঞ্জয়েরও। হঠাৎ কারখানার ভোঁ বেজে উঠলো। এবার মর্নিং শিফ্‌ট আরম্ভ হবে। সবাই ছুটো-ছুটি করে গেটের মধ্যে ঢুকে পড়তে আরম্ভ করলো। তখনো অর্ধেকেরও বেশি লোক গেটে-এর বাইরে রয়ে গেছে। কিন্তু ওপর থেকে হঠাৎ গেট পড়ে গেল। কারো মাথায়, কারো কাঁধে আর কারো বা পিঠে আঘাত লাগলো। যারা ভেতরে প্রবেশ করলো তারা সান্ত্রীদের অনুরোধ করলো গেট খুলে দেবার জন্যে যারা বাইরে আছে তারা যেন ভেতরে ঢুকতে পারে। তারা বোঝাতে চাইলে যে এক মিনিটের ভেতর এতগুলো লোকের ভোঁ একসঙ্গে ঢোকা সম্ভব নয়। বিশেষ করে সাড়ে সাতটার পরও প্রবেশ করার জন্যে পাঁচ মিনিট বাড়তি সময় দেওয়া হয়। অন্তত সে সর্তে হলেও গেট খোলার প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু সান্ত্রীরা উদ্ধত, অনমনীয়। এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে যখন কথা কাটাকাটি চলছিল; এক সময়ে উত্তেজনা যখন বিশেষ একটা পর্যায়ে পৌঁছয় তখন জনৈক সান্ত্রী বললে, 'বাবু, গণ্ডগোল করবেন না। তাহলে আমাদের ফায়ার করার অর্ডার আছে।'

জনতার ভেতর থেকে কে যেন বললে, এ কি—মগের মুল্লুক পেয়েছ যে কথায় কথায় 'ফায়ার' করবে?

ঠিক সেই সময়ে নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে সিকিউরিটি অফিসার অর্ডার দিলেন, ফয়ার। সঙ্গে সঙ্গে বুলেটের গর্জনে দিগন্ত কেঁপে উঠলো। রক্তমাখা চারটি শবদেহ মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। লুটিয়ে পড়লো মৃত্যুঞ্জয়ের দেহ। বুলেটের আঘাত লেগেও বেঁচে গেল অনেকে। ফ্যাসীবাদী বুলেটের নগ্ন আক্রমণে ক্ষণিকের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। টুকরো টুকরো সুখ, গৃহটিকর ভবিষ্যতের অপমৃত্যু হলো। মূক উত্তেজনায় সমস্ত মহানগরী ফেটে পড়লো।

নিকষ অন্ধকারের যবনিকা সরিয়ে বিশাল আকাশে ছোট্ট একফালি চাঁদ উঁকি মারছে। শ্মশানের প্রজ্বলিত শিখাগুলো নিভে আসছে। জনতার ভিড়ও কমেছে। অনিল সুখেন্দুবাবুর কাছে এলো। অনিল মানে মৃত্যুঞ্জয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী। কিন্তু সে কিভাবে কথা আরম্ভ করবে, সান্ত্বনা দেবে কিছুই বুঝতে পারে না। তবুও সসঙ্কোচে বললে, মেসোমশায়, এক্ষুণি গৌতম বাড়ি থেকে এসেছে। অঞ্জলির এখনো জ্ঞান ফেরে নি। চলুন, আমরা বাড়ি যাই।

যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলেন সুখেন্দুবাবু। তারপর কারো দিকে না তাকিয়ে কারো জন্যে অপেক্ষা না করে শুধুই হেঁটে চললেন কোন অনির্দেশের পানে। এবার অনিল প্রমীলার কাছে এলো, বললো, মাসীমা, চলুন। এবার যে আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে।

কথাটা শুনে প্রমীলা বিকটভাবে হেসে উঠলো হঠাৎ। সে হাসি আর থামে না। সে হাসি রাতের আধো অন্ধকারে আছড়ে পড়ে শ্মশানের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিলে। অনিল প্রথমটায় হতবাক হয়ে গেল। তার পর নিজেকে সংহত করে আবার ডাকলে, মাসীমা। প্রমীলার হাসির জোয়ারে অনিলের কণ্ঠস্বর ভেসে গেল। যারা শুনলো তারা বুঝতে পারলো ও হাসি—কান্নারই নামান্তর। কেঁদে যে দুঃখের লাঘব হয় না; যে দুঃখ মানুষকে পাগল করে দিতে পারে তারাই শুধু এ হাসি হাসতে পারে। বস্তুত প্রমীলা পাগল হয়ে গেছে।

পুজোর বাজার করতে
সমবায়িকায়
আসুন

সুন্দরবনের কথা

অসীম মুখোপাধ্যায়

বাসন্তীর পথে

আঠার বাঁকী নদী যেখানে দিশেহারা, ঠিক সেখানে এসে থমকে দাঁড়াতে হোল। টেম্পো নেই। বেরিয়ে গেছে। আর কি, এবার হাঁট। অগত্যা বাসন্তীর পথে পা বাড়ালুম। গাছপালার আড়াল থেকে মাতলার কালো জল উঁকি দিচ্ছে। আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টি এল বলে। এতটা পথ পাড়ি দিতে ক'বার ভিজব কে জানে। নামেই পাকা রাস্তা। আসলে খোয়াওঠা, ক্ষত-বিক্ষত। জোর পায়ে হাঁটব সে উপায়ও নেই। কে যেন বলেছিল, এ পথে টেম্পো যারা চাপে তারা পেটের যন্ত্রপাতি গামছায় বেঁধে নেয়। লোকটি রসিক বটে। তবে তার কথাটি খাঁটি। ভালই হয়েছে। গাড়িটা বেরিয়ে গেছে।

বছরের পর বছর ঘুরে আসছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল রেখে বদলায় নি কিছুই। সেই খানা-খন্দ, সেই ঝোপ-ঝাড়, সেই উঁচু-নিচু পথ। নদী পার হয়ে এদিকে এলে মনে হয়, অনেককালের অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে আদিমযুগের সীমানায় পৌঁচেছি। ছন্নছাড়া সংসার, নগ্ন, রুগ্ন শিশু, পানা-পচা ডোবা আর বন্ধুর পথ। আর এর পাশেই দিগন্তজোড়া সবুজ ধানক্ষেত। সব মিলিয়ে একটা ভীষণ বেমানান ছবি। যেন বিদ্রূপ করে আঁকা।

সরবেড়ে থেকে হাঁটছি। দু'পাশ থেকে কত পথ গাঁ—ছাড়িয়ে সড়কে উঠেছে! সব পথই কাদায় মাখামাখি। এঁটেল মাটির কাদা, কোথাও এক হাঁটু, কোথাও এক কোমর। তাই ভেঙে বাজারে আসছে কেউ, কেউ ঘরে ফিরছে। এক জায়গায় চাষীমতন একজনকে ডাক দিলুম—কি নাম ভাই গাঁয়ের? উত্তর দিল—আমঝাড়া। হেসে বললুম—উঁহুঃ। কাদাপাড়া। সেও হাসল। আর এক জায়গায় একটা বাছুর কাদায় পড়ে ছটফট করছে। লোকজন ছুটে এসে টেনে তুলল তাকে। তার মায়ের সে কি আনন্দ। বড় বড় চোখ বেয়ে জল ঝরছে। এক বুড়ো বলল—ঠিক মানুষের মত। আর একজন বলল—তার চেয়ে ঢের বেশি।

আবার পা বাড়িয়ে দিলুম।

ক্যানিং থেকে গোসাবা, বাসন্তী, কড়খালি, দেলবাড়ি, মোল্লাখালি, সাতজেলে, পাঠানখালি আরও এমনি অনেক জায়গায় যেতে হয়। ওদিকের মানুষও ক্যানিং টাউনে আসে, কেন না তাদের প্রয়োজনটাই বেশি। ক্যানিং তাদের কলকাতা। বড় ডাক্তার, বড় বদ্যি, বড় ইস্কুল, বড় কলেজ, সবই তো ক্যানিংয়ে। গোসাবা, বাসন্তী, সাতজেলে, এ সব জায়গায় আছে টা কি? এই ওষুধটা নেই, ক্যানিং ছোট। ঐ ফুড়টা নেই ক্যানিং ছোট। বই নেই ক্যানিং ছোট। খাতা নেই ক্যানিং ছোট। মোটের ওপর, ক্যানিং বাদাবনের মানুষের নয়নের মণি। কিন্তু সেই ক্যানিংয়ের সাথে যোগাযোগটা যেন বিনি সুতোর গাঁথা মালার মতন। মাত্র ক'টি লঞ্চ সারাদিনে বার কয়েক আসা-যাওয়া করছে। সন্ধ্যের পর গঞ্জ, ঘাট সব নিস্তব্ধ। মাঝে-মধ্যে শৌখীন মানুষের হাতে সরব ট্যানজিস্টর রেডিও ঘোষণা করছে আমরা জীবিত-পৃথিবীতেই আছি। এ' ছাড়া দু'-একবার লঞ্চের ভেঁপু শোনা যাবে। আরও পরে দুপুর রাত দল বেঁধে নামবে। তখন

মাতলা নদী আজও মাতাল।

কেবল পাড়ের বুকে ঢেউ ভাঙার শব্দ। সে শব্দ শোনার জন্য কেউ থাকে না।

চৈত্র-বৈশাখে থেকে থেকে বুক-কাঁপানো ঘূর্ণি ঝড় ওঠে। ডাঙায় বসে কালবৈশাখী নিয়ে কাব্য করা চলে, কিন্তু এই রাক্ষুসে নদীর বুকে সে কথা ভাবাই যায় না! জীবন এখানে নেহাৎই—গদ্যময়! পুরন্দর পাড়ি দিয়ে গোসাবায় গেছি। যেমন গম্ভীর নাম, দেখতেও তেমনি। কুচকুচে কালো জল। ওপারের গাছপালা শেওলার মত ছোট্টটি হয়ে জলের সাথে মিশে আছে। তিন নদীর মুখ এক হয়ে রাক্ষসের হাঁ তৈরি হয়েছে। ঝড় উঠলেই রাক্ষসের ঘুম ভেঙে যায়। লঞ্চের মানুষ তখন "বদর, বদর" জপে! হেন পুরন্দরকে ফাঁকি দিয়ে নিত্য যাওয়া আসা! মানুষগুলোর কলজে কি দিয়ে তৈরি?

লঞ্চ না বাড়িয়ে কিংবা নদী পাড়ি না দিয়েও অনেকটা যাওয়া চলে। যেমন ক্যানিং থেকে আমঝাড়া বা ভাঙনখালি, ফেরীতে। ভাঙনখালি থেকে বাসন্তী অবধি একটা রাস্তা তো আছেই, যে রাস্তায় আমি এখন চলেছি। এটাকেই দুরস্ত করে নেওয়া যেতে পারে। তারপর বাসন্তীর মুখ থেকে খেয়া বেয়ে গঞ্জে গিয়ে ওঠ। সেখানেও লম্বা একটা রাস্তা আছে। গিয়েছে সেই গোসাবার অপর পারে, মসজিদবাড়ির ঘাটে। সেখান থেকে ছোট্ট খেয়াতেই গোসাবার ঘাটে ওঠা যায়। মাত্র তিনটি খেয়াঘাট আর দুটি রাস্তা মেরামত করে নিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। ঝড়বাদলে নদী পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকি নিতে হয় না। খরচাটাই বা কি? খেয়াঘাটও আছে, পথও আছে। সব ঠিকঠাক করে কাঁটা টেম্পো ছেড়ে দাও। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচুক। মনে মনে ভাবছি, বাসন্তী পৌঁছে চেনা জানা সবাইকে বলতে হবে। দেখি কি বলে তারা।

এমনি করে আরও দূরে পথে পাড়ি জমানো যায়। যেমন গোসাবা থেকে কুমীরমারি। গোসাবা থেকে উত্তরডাঙা পর্যন্ত পথ করতে হবে। তারপর মেলমেল নদী পার হয়ে ওপারে হেঁতালবাড়ি। সেখান থেকে ছোট-মোল্লাখালির জন্য আর একটা পথ দরকার। মোল্লাখালির হাটটি নেহাৎ ছোট নয়। যোগাযোগের ব্যবস্থাটা ভাল হলে দিব্যি ফুলে ফেঁপে উঠবে। এর পরে আর একটা নদী পার হয়েই কুমীরমারি। কয়েক ঘণ্টায় অনেকটা পথ চলে আসা যাবে। কুমীরমারির গুরুত্ব খুবই। তার ওপারেই তো পাকিস্তানের খুলনা। মাঝখানে রায়মঙ্গল নদী। একটা প্রয়োজনীয় সীমান্ত ঘাঁটি এখানে গড়ে তোলা উচিত। তাছাড়া জল-ডাকাতি, খুন-জখম এ সব তো হামেশাই চলছে। পথঘাট ঠিক হলে অনেক বিপদ কাটে।

গোসাবা থেকে লাহিড়ীপুর যাতায়াতেরও একটা ব্যবস্থা করা দরকার। রাঙাবেলে অবধি পথ তৈরি করে খেয়া পার হোতে হবে। সেখান থেকে সাত জেলের হাট অবধি আরও একটি পথ চাই। সাতজেলের হাট বাদাবনে বেশ নামকরা। এর পর গোমরের গাং। গাংয়ের দুপারে দুটি ভাল জেটি চাই—আর চাই কটি সেগুনকাঠের বড় নৌকো। তারপর সুধাংশুপুর, লাক্স-বাগান ছুঁয়ে পথ চলে যাবে সোজা লাহিড়ীপুরে। লাহিড়ীপুর, সাধুপুর, হ্যামিল্টন আবাদ, দয়াপুর, সোনাগাঁ, এসব গাঁয়ে বাঘের উপদ্রব বেশি। মানুষজনের আসা-যাওয়া বাড়লে উপদ্রবটা কমবে।

ডাকসাইটে নদীগুলো চর পড়ে বুজে আসছে। মাতলা আজও মাতাল। তার বুকেও বিরাট চর জমেছে। পাঠান-খালির কাছে লম্বা এক চর। লঞ্চ সাবধানে ঘুরে ঘুরে আসছে। বাসন্তী-তেও তাই। কাজেই এমন দিন আসবে যখন লঞ্চ চালানোই দায় হবে। তাছাড়া আজও লঞ্চে চড়ার ঝক্কি অনেকখানি। তার চেয়ে ফেরী আর টেম্পো, মন্দ কি?

যাতায়াতের ব্যবস্থাটাই বড় সমস্যা এদিকে। এটার সমাধান না করে অন্য কিছু ভাবা ভীষণ ভুল।

পাঠানখালির কাদা মাখা বাঁধের পথ

হ্যাঁগা, তোমাদের গাঁয়ের নাম কি?

—ফুলতলী।

—বাঃ বেশ নাম। কিন্তু ফুলগাছ কই? নেই! তার বদলে ডোবা আছে, ঝোপ আছে, ধানভরা মাঠ আছে, আর আছে একটা ঝুঁকে-পড়া বোবা আকাশ।

—তা তোমরা কলসী নিয়ে যাচ্ছ কোথায়? গাঁয়ে খাবার জল নেই?

নাঃ, ঘোমটার আড়ালে সবাই মাথা নাড়ে।

—তা হোলে কোথায় জল পাবে?

—ঐ হোথা।

ওরা সব হেথা হোথায় জল আনতে যায়। জল এখানে নোনা, মাটি এখানে মিষ্টি। জীবনভোর প্রকৃতির খাম-খেয়ালির মাশুল গোণে সবাই, ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, পুরুষ কেউই বাদ যায় না! পাখীর অলয়, সোনাগাঁ, আমলামেথি, এ সব জায়গায় গাঁয়ের মানুষ বৃষ্টির জল ধরে রাখে। যদ্দিন পারে তাই দিয়ে চালায়। গরমের দিনে বউ-ঝিরা দেড়-দু' মাইল ঠেঙিয়ে "বড় পুকুরে"র জল নিয়ে আসে। দরকার হলে ছোট-খাটো খেয়াও পার হয়। পায়ে পায়ে বিপদ। সাপের মত নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করে। তবুও এ সব তো না করলে নয়!

ক'দিন আগে গোসাবার ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখলুম মসজিদবাড়ির খেয়া পার হয়ে ক'টি, মেয়ে এপারে জল নিতে এল। ডেকে বললুম—বাড়ি কোথায়? বলল—বিরাজনগর।

—অদ্দুর থেকে আসছ। সায় দিল সবাই। বর্ষাকালেও আস? মিটি মিটি হাসছে সবাই। বলে—যাব কোথায় আর! আমাদের কাছে সব কালই সমান!

আজকে আমার সাথে কেউ নেই। হাটবার হলে দু'-চারজন ঠিক জুটে যেত। এতটা রাস্তা একা একা হাঁটা বেজায় বিরক্তিকর! টর্চ এনেছি তো? না কি ক্যানিংয়েই রেখে এসেছি। তাড়াতাড়ি ঝোলা হাতড়াই। হায়! সবই আছে কিন্তু খানিক বাদেই যেটির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি হবে, সেটিই

দুলাকিতে চরের বাঁধনে বাঁধা নদীর দৃশ্য

নেই! টর্চটা আমি রেখেই এসেছি! হাত-ঘড়িতে বিকেল ছ'টা। ঘাটে পৌঁছতে সন্ধ্যে হবে ঠিক। তারপর? পরের কথা ভেবে আরও জোরে পা চালালুম।

যাতায়াত, জলের কষ্ট, এ দু'টো ছাড়া আরও একটা জুজু এদিকে আছে। অন্ধকার যার নাম। গাঁয়ের পর গাঁ বেলা পড়তেই আবছা হোয়ে আসে, যেন সারাদিন রোদ্দুরে থেকে গলতে শুরু করে। মাঝে মাঝে টিমটিমে আলো কুঁড়ে ঘরের জানালা দিয়ে ইসারা করে। ভারী রহস্যময় মনে হয় জগৎটাকে। গা শিউরে ওঠে। গরমের দিনে বিষাক্ত সাপ বাঁধের ঠাণ্ডা মাটিতে এলিয়ে পড়ে থাকে। সাথে টর্চ বা হারিকেন থাকলে খানিকটা ভরসা। তাও যদি না থাকে তা হোলে কেবল "আস্তিক"-আস্তিক কর। কোন্ কালটাই বা সুবিধে? যখন সাপ থাকে না তখন কাদা থাকে। যখন কাদা থাকে না তখন গর্ত থাকে। একটা না একটা আছেই। বাদাবনের লোক ঐ নিয়েই আছে। ঐ নিয়েই আবাদ করে, বিবাদ করে সুবাদ করে তারা ঐ নিয়েই বুড়িয়ে যায়।

বাসন্তীর ঘাট এসে পড়েছে!*

---

*আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

খবর বলছি

পুনরাবৃত্তি/রেকর্ড সংগ্রহ/আগমনী গান

আকাশবাণী (কলকাতা)-র প্রোগ্রাম নিয়মিত শুনলে কারো কারো কানে যদি তালা ধরে যায়, তাতে খুব বেশি অবাক হবার কারণ নেই। কিন্তু কানে তালা ধরবে কেন ?

থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড় জাতীয় প্রোগ্রাম শুনে শুনে কতক্ষণ না কানে তালা ধরে মশায় ?

বিশেষভাবে সংগীত-শ্রোতাদের দুর্ভাগ্যই বড় বেশি। রেকর্ড বাজালে সেই একই গানের পৌনঃপুনিকতা। ঐ সব রেকর্ডের অনেক গানই নামকরা শিল্পীদের এবং শুনতেও ভালো লাগে। তবু এ কথাটাও সত্য : আদা কচকালে তিত হয়।

রেকর্ড ছাড়া রেডিওতে গান শুনতে পাওয়া যায় শিল্পীদের স্বকণ্ঠে—যা আকাশবাণীর স্টুডিও-তে টেপ রেকর্ড করে রাখা হয়। অনেক সময় আমরা অবাক হয়ে যাই যখন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের কণ্ঠে বহু পরিচিত সংগীতের পুনরাবৃত্তি শুনতে পাওয়া যায়। আর নবাগত শিল্পীদের চান্স পাওয়াটাই বড় কথা। তাই শ্রোতাদের বহু পরিচিত ও বহুবার শোনা গান শুনিয়ে তারা পার পেয়ে যেতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করেন। সংগীত বিভাগের দায়িত্ব যাঁর হাতে, তিনি শিল্পীদের নতুন গান পরিবেশন করতে বললে নিশ্চয়ই তা নিন্দনীয় ব্যাপার হবে না।

সম্ভবত সংগীত জগতে নবাগত শিল্পীদের বহু পরিচিত গান শিখিয়ে ছাড়পত্র দেওয়া হয় বলেই, মুরুব্বির জোরে তাঁরা আকাশবাণী (কলকাতা)-তেও গাইবার ছাড়পত্র পেয়ে যান। তার চাইতে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ বরং একটা কাজ করতে পারেন, নবাগত শিল্পীদের জন্য সপ্তাহে আধঘণ্টা সময় বরাদ্দ করতে পারেন, সেখানে তাঁদের সুযোগ দেওয়া হলে শ্রোতারা খুশি হবেন, প্রথম কারণ এই যে, নবাগত শিল্পীরা অবহেলিত হচ্ছেন না, দ্বিতীয় কারণ—অর্থেরও অপব্যয় ঘটছে না।

রেকর্ড বাজানোর ব্যাপারে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের একটি আবেদন আছে : প্রাচীন রেকর্ড সংগ্রহ করা কি আকাশবাণীর পক্ষে সম্ভব নয় ? এমনিতেই তো প্রাচীন রেকর্ডগুলি লুপ্ত হতে চলেছে বলে শোনা যাচ্ছে, আকাশবাণীর সংগ্রহশালায় সরকারী তত্ত্বাবধানে ঐসব রেকর্ড সংগ্রহ করে রাখা খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়। জনসাধারণই এজন্য সহযোগিতা দিতে এগিয়ে আসবেন বলে আমাদের ধারণা।

পুরনো আমলের রেকর্ডগুলি থাকলে শ্রোতাদের চিত্ত আজ দু-একটা আগমনী গান শুনতে পেত। আগমনী গান আকাশবাণী (কলকাতা) মারফৎ পরিবেশনের জন্য শ্রোতাদের দাবি বহুদিনের। কিন্তু আকাশবাণী কথা বললেও সে যথাসময়ে বলে না।

পল্লীবাংলা এখন ভাঙনের মুখে অবস্থান করলেও আজও শারদোৎসবের প্রাক্কালে পল্লীর অখ্যাত গায়করা আগমনী গান ঘরে ঘরে শুনিয়ে যায়। অভ্রবাহন আপাতত গ্রামছাড়া হলেও তাঁর শৈশবে শোনা পল্লীগায়কের গানগুলি আজো স্মৃতিতে ব্যঞ্জনাময়। অভ্রবাহন একথা জোরের সঙ্গেই বলতে পারেন যে, তাঁদের গান শহুরে পল্লীগায়কদের গানের তুলনায় কোনো অংশে ন্যূন নয়। তবে হ্যাঁ, সেই শৈশবে এক অখ্যাত পল্লীতে অভ্রবাহন শুনেছিলেন, নতুন আনা গ্রামোফোন রেকর্ডে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কমলা ঝরিয়ার আগমনী গান। এমনই মন্দ কপাল যে, এই শহরে বসে সেই গান আর শোনা যায় না। কলকাতায় এবার শারদোৎসবের বিপুল আয়োজন হচ্ছে : সরকারী খবর। কিন্তু সরকারী কলকাতার আকাশবাণীর সেক্ষেত্রে বোধ হয় কিছু করণীয় নেই—গতস্য শোচনা নাস্তি্র তুলা মামুলি সংবাদ-বিচিত্রা প্রকাশ করে নিজেদের নাম প্রকাশ করা ছাড়া।

আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ, তাঁরা আগমনী গানের জন্য নতুন গায়ক সংগ্রহ করতে অক্ষম হলেও, অন্তত ঐ সংক্রান্ত পুরনো রেকর্ডগুলি সংগ্রহের চেষ্টা করুন এবং তা বাজিয়ে শ্রোতাদের সংগীত-পিপাসা নিবারণ করুন। এটা কি খুব ভয়ঙ্কর প্রস্তাব ?

এবার অন্য একটি প্রস্তাব আকাশবাণীর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

অনেক সময় সংগীত পরিবেশনের ব্যাপারে কেমন একটা অবৈজ্ঞানিকোচিত হিসেব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কখন রেকর্ডের কোন গান পরিবেশিত হওয়া উচিত, তা ত্রুটিহীন নয়। উপরন্তু রবীন্দ্রসংগীতের পর অনেক সময় এমন আধুনিক সংগীত পরিবেশিত হয়, যা শুনলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। এ যেন সেই অবস্থা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠের পর বিটলে কবিতা পাঠ! গত ২রা অক্টোবর '৬৯ বেলা আড়াইটার পর—প্রথমে হোল পল্লীসংগীত, তারপর রবীন্দ্রসংগীত, পরে আধুনিক সংগীত শুনতে শুনতে মনে হোল ধরণী দ্বিধা হও। আমি সুর-টুরের কথা বলছি না। কোনো সংগীতশিল্পীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ করছি না। তবে রবীন্দ্রনাথের গানের শব্দের যে বাঁধুনি এবং যে ভাবৈশ্বর্য, তারপর আধুনিক গানটি শুনে মনে হোল এ যেন ছেলেখেলা অর্থাৎ কিছু শব্দের ও বর্ণের যোগ-বিয়োগ বোধ হয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গানটি শুনে মনে যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছিল, আধুনিক গানটি শোনার পর মনে হোল হায়রে কপাল! অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আবহাওয়ার খবর

ইতিপূর্বে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন ছিল : আবহাওয়া সংক্রান্ত সতর্কতামূলক সংবাদ সংশ্লিষ্ট মহলে বেতার মারফৎ নিয়মিতভাবে প্রচার করা হোক। এখন তা কিছু কিছু হচ্ছে। বন্যা বা বঙ্গোপসাগরীয় ঘূর্ণির সংকেত মাঝি-মাল্লা ও জনসাধারণ এখন জানতে পারেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের জানা উচিত যে, ইংরেজী ও বাংলা দুটো ভাষাতেই তা পরিবেশিত হওয়া উচিত। গত ২রা অক্টোবর কোনো সাবধান বাণী নেই এটা শুধু ইংরেজীতে শোনা গেল, বাংলা ভাষা সেখানে নীরব। আবহাওয়া বুঝি ঐ ভাষায় বেশি কথা বলে না ?

* * *

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর আকাশবাণী কলকাতা থেকে রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটে 'খ'-তে প্রচারিত পাশ্চাত্য সংগীতের বিশেষ অনুষ্ঠানে শিল্পী রঞ্জিত চক্রবর্তীর ইলেকট্রিক হাওয়াইয়ান গীটার শুনলাম।

আজকাল আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে বহু শিল্পীই হাওয়াইয়ান গীটারে পাশ্চাত্য সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। কিন্তু হাওয়াইয়ান গীটারে হাওয়াইয়ান সংগীতের আবেদন কোথায় ? অধিকাংশ শিল্পীই তো ল্যাটিন আমেরিকার শরীর-দোলান

কোলাহলপূর্ণ সঙ্গীতের পেছনে ঘুরছেন! গহন পার্বত্যদেশের নির্জন অরণ্যপথে বয়ে যাওয়া শান্ত স্রোতস্বিনীর মতো হাওয়াইয়ান সঙ্গীতের আপন বৈশিষ্ট্যে ভরা একটি মধুর গতি সবিশেষ লক্ষণীয়। তার সুর, তার ছন্দের মধ্যে রয়েছে যেন মহুয়ার হৃদয় উজাড় করে নেওয়ার মাদকতা। আকাশবাণীর খুব অল্প শিল্পীর বাজনায় এই হাওয়াইয়ান আবেদন রয়েছে। বহুক্ষেত্রেই অধিক পরিমাণে ভারতীয় সঙ্গীতের রীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে (স্লার এফেক্ট) পাশ্চাত্য সঙ্গীত তার নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এই জাতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে যেখানে বহু যন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে সেখানে বিভিন্ন যন্ত্রের যথাযথ সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা সমতা (ব্যালানসিং) রক্ষা করা বিশেষ কর্তব্য: নচেৎ গোটা অনুষ্ঠানটিই মাটি হয়ে যায়। রঞ্জিত চক্রবর্তীর অনুষ্ঠানটির প্রচারেও এই ব্যালান্স-এর ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। ঘোষণায় সহযোগী অন্যান্য যন্ত্রের সাথে স্ট্রিং বেস্-এর কথা বলা হোলো, কিন্তু অনুষ্ঠান যখন চলছে—তখন বেস্-এর কোনও এফেক্ট-ই শ্রুতিগোচর হয় নি। স্প্যানিশ গীটার-এর রিদম আর একটু চাপা হলে অধিকতর ভাল হতো।

আশা করি, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে একটু নজর দেবেন।

—অভ্রবাহন

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দ্বিতীয় অংক

[একই দৃশ্য]

নোরা—(Wings-এর দিকে চেয়ে) কেউ কি আসছে? না আমারই ভুল! আজ ক্রিসমাস, আজ নিশ্চয় কেউ আসবে না—কালকেও না। কিন্তু তারপরে ...(Wings-এর দিকে চেয়ে) নাঃ চিঠির বাক্সও খালি, একেবারে খালি। (ফিরে এসে) হয়তো মিথ্যা-মিথ্যাই ভেবে মরছি। এত সাহস কি ওর হতে পারে? আমাকে ভয় দেখিয়ে দিয়ে কাজ সেরে নিতে চায়। কিন্তু সত্যিই যদি হেলমারকে সব জানিয়ে দেয়? না, না এ হতে পারে না—অসম্ভব। আমার যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে—না, না মানুষ কখনও এত নীচ, এত নিষ্ঠুর হতে পারে না। (চমকে উঠবে) কে যেন আসছে—

(মিসেস লিণ্ডের প্রবেশ)

নোরা—ক্রিষ্টিন!—তুমি! ওঃ তুমি আসতে এত নিশ্চিন্ত হলাম—

মিসেস লিণ্ড—শুনলুম আমার ওখানে গিয়েছিল?

নোরা—হ্যাঁ ঐ পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম—ভাবলাম তোমার খোঁজ নিয়ে যাই।

মিসেস লিণ্ড—কিছু দরকার ছিল কি?

নোরা—না ঠিক দরকার নেই—তবে কাল আমাদের ওপরতলার ফ্ল্যাটের স্টেনবার্গদের ওখানে একটা ফ্যান্সিড্রেস উৎসবে যোগ দিতে হবে। আমার ব্লাউজটায় যে কাজ করছিলাম সেটা তোমায় শেষ করে দিতে হবে। ছুঁচের কাজ তোমার সঙ্গে তো আমরা কোনকালেই পেরে উঠতাম না।

মিসেস লিণ্ড—ও বাতিকটা এখনও আছে—জামাটা নিয়ে এস না।

নোরা—এখন এস গল্প করা যাক—আমি হেলেনকে বলে রেখেছি একটু বাদে তুমি ওঘরে গিয়ে বসে নিও কাজটা। টরভ্যাল্ড আবার দু'চক্ষে দেখতে পারে না ছুঁচের কাজ। ও এলে পরেই যেও।

মিসেস লিণ্ড—বেশ, এ কাজ আর কতক্ষণ লাগবে। কাল সন্ধ্যাটা কিন্তু ভারি সুন্দর কেটেছে তোমাদের এখানে।

নোরা—আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল এবার অন্যবারের তুলনায় কিছুই জমে নি।

মিসেস লিণ্ড—আমি কিন্তু বেশ enjoy করেছি। আচ্ছা, তোমাদের এই ডক্টর র‍্যাঙ্ক কি সব সময়েই মনমরা হয়ে থাকেন?

নোরা—না, কালকেই বিশেষ করে চোখে পড়ছিল। বেচারী একটা সাংঘাতিক অসুখে ভুগছেন—Spine-এ T. B. হয়েছে। ভদ্রলোকের জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। ওঁর বাবার ছিল চরিত্রের দোষ—আর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আজ ছেলেকে—কি Pathetic বল তো?

মিসেস লিণ্ড—উনি কি প্রায়ই এখানে আসেন?

নোরা—প্রায় রোজই—টরভ্যাল্ডের উনি সবচেয়ে বড় বন্ধু—আর আমারও। অনেকটা ঘরের লোকের মত হয়ে গেছেন আর কি।

মিসেস লিণ্ড—কিন্তু আমার যেন একটু গায়ে পড়া গোছের মনে হচ্ছিল। সত্যিই উনি কি ঠিক খাঁটি ধরণের লোক?

নোরা—নিশ্চয়—একথা তোমার হঠাৎ মনে কেন হোল বল দেখি?

মিসেস লিণ্ড—শোন নোরা, এখনও অনেক ব্যাপারে তুমি ছেলেমানুষ রয়েছ—আমার জীবনের অভিজ্ঞতা তোমার থেকে অনেক বেশি—বয়সেও আমি তোমার থেকে খানিকটা বড়। তোমাকে স্পষ্টই বলছি ডক্টর র‍্যাঙ্ককে এভাবে প্রশ্রয় দিও না।

নোরা—এ কথার অর্থ?

মিসেস লিণ্ড—আমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই নোরা। কাল যে বড়লোক admires-এর কাছ থেকে টাকা পাওয়ার কথা বলছিলে তার পরিচয় আর আমার অজানা নেই।

নোরা—কি মুস্কিল! সে তো একটা কাল্পনিক কথা বলেছিলাম—তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? একথা তোমার মনে হোল কি করে? ডক্টর র‍্যাঙ্ক আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, রোজ এখানে আসেন—তাঁর সঙ্গে—নাঃ—তোমাদের মন ভারি বিশ্রী—ছিঃ ছিঃ—

মিসেস লিণ্ড—তা যদি হয় তবে সত্যিই আমার অন্যায় হয়ে গেছে নোরা—

নোরা—আশা করি, ভবিষ্যতে আর এ ধরণের উদ্ভট কল্পনা তোমার মাথায় আসবে না। থাক, ওকথা। আচ্ছা বল দেখি ধার শোধ হয়ে গেলে দলিলটা ফেরৎ পাওয়া যায় তো?

মিসেস লিণ্ড—আইন অনুসারে তাই তো হওয়া উচিত।

নোরা—তারপরে সেই নোংরা কাগজটাকে টুকরো টুকরো করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা যাবে কি বল?

মিসেস লিণ্ড—নোরা আমার কাছে কি তুমি কিছু গোপন করছ?

নোরা—আমাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে?

মিসেস লিণ্ড—কাল সকাল থেকেই তোমাকে যেন কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত লাগছে।

নোরা—(দরজার দিকে চেয়ে) ক্রিস্টিন, টরভ্যাল্ড আসছে—তুমি ভাই ও ঘরে গিয়ে জামার কাজটি কর।

মিসেস লিণ্ড—নিশ্চয়ই—আমি যাচ্ছি হেলেনের কাছে। তবে তোমার বাড়ি থেকে যাবার আগে জেনে যাব তোমার কি হয়েছে।

(মিসেস লিণ্ডের প্রস্থান—
হেলমারের প্রবেশ)

নোরা—তোমার কথাই বার বার মনে হচ্ছিল টরভ্যাল্ড!

হেলমার—এ ঘর থেকে কে যেন ওদিকে গেল?

নোরা—ও ক্রিস্টিন—আমার পোষাকটা ঠিক করতে গেল...টরভ্যাল্ড!

হেলমার—কিছু বলতে চাও?

নোরা—তোমার কাছে আমি যদি একটা জিনিস চাই—দেবে?

হেলমার—প্রথম আমার জানা দরকার যে, জিনিসটা কি? আজ সকালে যে অনুরোধ করেছিলে সে কথা আবার নিশ্চয় বলবে না।

নোরা—টরভ্যাল্ড আমার একান্ত অনুরোধ।

হেলমার—তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি নোরা—

নোরা—না, না টরভ্যাল্ড, আমার কথা তোমাকে রাখতেই হবে। ক্রগস্টাডের চাকরিটা যাতে না যায় সেজন্য তোমাকে একটা কিছু উপায় করতেই হবে।

হেলমার—শোন নোরা, ওর জায়গাতেই আমি মিসেস লিণ্ডকে নেব বলে ঠিক করেছি।

নোরা—এ তোমার সত্যিকার মহত্ত্বের পরিচয়। কিন্তু ক্রগস্টাডের বদলে অন্য যে কোনও লোককে তো ছাড়িয়ে দিতে পার।

হেলমার—এ তোমার অন্যায় একগুঁয়েমি।

প্রিয়পছন্দ শোভন জুতো
সব মেজাজের সকল সাজে
সমান শোভন
দিনের পর দিন পায়ে দিন, এই-যে দেখছেন সুঠাম ছিমছাম জুতোগুলো, এদের জৌলুশ থাকবে অনেকদিন। কাজে বা মজলিশে, সব মেজাজের সকল সাজে, সমান শোভন এইসব বাহারে জুতো। পছন্দসই রঙে-নকশায় রমনীয় উপকরণে তৈরি বাটার এই জুতোগুলো পরে সত্যি ভালো লাগবে আপনার—সবাই যেমন তারিফ করবে, তেমনি পায়ে দিয়েও কেমন আরাম। আজই আসুন, দেখতে পাবেন এ-রকম কত-না জুতোর মেলা ব'সে গেছে আপনার প্রিয় বাটার দোকানে।
সলমেট ১৪.৯৫—১৮.৯৫
ইভা ১১.৯৫–১৭.৯৫
Bata
অনু ১৪.৫০

কোনরকম না ভেবেচিন্তে কাকে কি কথা দিয়েছ বলে, আশা কর যে, আমি সেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেব?

নোরা—ভুল বুঝো না টরভ্যাল্ড। আমি তোমার নিজের ভালর জন্যই বলছি। তোমার কাছেই শুনেছি লোকটা সব নোংরা কাগজে-টাগজে লেখে। ও তোমার যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে—এসব ভেবেই আমি ভয় পাচ্ছি।

হেলমার—তোমার বুঝি অতীতের কথা মনে হচ্ছে?

নোরা—তার মানে?

হেলমার—তোমার বাবার জীবনে যা ঘটেছিল সেই সব বুঝি মনে পড়ছে?

নোরা—ঠিকই ধরেছ। মনে পড়ে এই সব কুচক্রীর দল বাবার নামে কি জঘন্য সব কথা লিখেছিল? ভাগ্যে তাঁর ওপরওয়ালারা তোমাকে ব্যাপারটার তদন্তে পাঠিয়েছিলেন—তা না হলে তাঁর চাকরিটাও যেত।

হেলমার—আমার ছোট্ট নোরা একটা কথা ভুলে যাচ্ছে যে, তার বাবার আর আমার মধ্যে এ বিষয়ে একটা বড়-রকমের তফাৎ রয়ে গেছে। সততা সম্বন্ধে লোকে তাঁকে ঠিক সন্দেহের অতীত বলে মনে করত না—কিন্তু আমাকে এখন পর্যন্ত এবং আশা করি ভবিষ্যতেও তাই করবে।

নোরা—কিন্তু এ সব লোক যে কি ভয়ানক প্রতিহিংসা নিতে পারে সে সম্বন্ধে তোমার ধারণাই নেই টরভ্যাল্ড। আমি, তুমি, ছেলেমেয়েরা এখন কি সুখে শান্তিতে আছি। আমার ভয় করছে ও আমাদের এই সুখের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। তাই তোমাকে বলছিলুম—

হেলমার—তুমি এত জেদ করছ বলেই ওকে রাখা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ব্যাংকে সবাই জানে আমি ক্রগস্টাডকে বরখাস্ত করব। এরপর তোমার কথায় ওকে রাখলে আমার বদনাম রটবে। আর তা ছাড়া এখন ইচ্ছে করলেও ওকে আর রাখা যাবে না।—

নোরা—কেন?

হেলমার—তোমাকে এতক্ষণ বলি নি। এই একটু আগে ওর বরখাস্তের চিঠি পোস্ট করা হয়ে গেছে।

নোরা—কি সর্বনাশ! টরভ্যাল্ড, এখনও সময় আছে একটা বন্দোবস্ত কর—আমার মুখ চেয়ে তোমার নিজের মুখ চেয়ে, ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে একটা উপায় বের কর ওকে চাকরিতে বহাল রাখতে।

হেলমার—আর হয় না, দেরি হয়ে গেছে।

নোরা—আর বোধ হয় উপায় নেই।

হেলমার—শোন নোরা! তোমার এই অসংগত ভয় যদিও আমার পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক—কোথাকার কে একটা হতভাগা প্রতিশোধ নিতে পারে এই ভেবে আমি উচিত কাজ করব না বলতে চাও? তবু আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমার প্রতি গভীর ভালবাসার জন্যই তুমি এভাবে ওকে ঠান্ডা রাখতে চাইছ। কিন্তু আমি বলছি, এ তোমার মিথ্যা ভয়—নিছক পাগলামী—যাও এবার গিয়ে কালকের ফ্যান্সী ড্রেসটা ঠিক করে নাও—আর গানগুলো Practice কর। আমি আমার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে কাজ করব। যত খুশি গলা ছেড়ে গাইতে পার আমার কানে একটুও আওয়াজ পৌঁছবে না—আর র‍্যাঙ্ক এলে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিও।

[প্রস্থান]

নোরা—(দুশ্চিন্তায় কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকার পর) ক্রগস্টাড কিছুতেই ছেড়ে কথা বলবে না—প্রতিহিংসা ও নেবেই। কিন্তু তাহলে উপায়? এ যে আমি ভাবতেই পারছি না। আমি কি পাগল হয়ে যাব। কার যেন পায়ের শব্দ—ওঃ ডক্টর র‍্যাঙ্ক আসছেন।

(ডক্টর র‍্যাঙ্কের প্রবেশ)

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—হেলমার কোথায়?

নোরা—ও এখন একটু ব্যস্ত। কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করুন না।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—হ্যাঁ, যে কদিন আছি আপনাদের সঙ্গ থেকে কিছুটা আনন্দ নিয়ে যাই—

নোরা—যে কদিন আছেন মানে?

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—যার জন্য এতদিন মনে মনে তৈরি হচ্ছিলুম, এবার সেটা মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে মিসেস হেলমার। নিজেকে ফাঁকি দিয়েও লাভ নেই—আর আপনাদেরও জানা দরকার। কিন্তু ব্যাপারটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটবে তা আমার ধারণা ছিল না।

নোরা—ব্যাপার কি ডক্টর র‍্যাঙ্ক?

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—মিসেস হেলমার! আমার শারীরিক অবস্থা, আমার সমস্ত রোগীদের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। সম্প্রতি এই দেহটার হিসেবনিকেশ করছিলাম। একেবারে দেউলিয়া। এমন কি মাসখানেকের মধ্যেই হয়তো Churchyard-এর তলায় পচতে শুরু করবো।

নোরা—কি সব বিশ্রী কথা বলছেন।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—ব্যাপারটাই যে সুশ্রী নয়। আর তার থেকেও খারাপ হোল মরবার আগে অনেক নোংরা জিনিস ভোগ করে যেতে হবে। আর একবার নিজেকে শেষ পরীক্ষা করে দেখবো—তাহলে ঠিক বুঝতে পারব কবে থেকে খেলা ভাঙার খেলা শুরু হবে।

নোরা—কিন্তু ডক্টর র‍্যাঙ্ক—

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—যখনই বুঝবো শেষের দিন এগিয়ে এসেছে, আপনাকে আমার কার্ড পাঠাব, তার ওপরে থাকবে একটা কালো ক্রশ চিহ্ন, দেখলেই বুঝতে পারবেন শেষের সেই ভয়ংকর দিন এগিয়ে এসেছে।

নোরা—কি সব যা-তা কথা বলছেন? অথচ আপনাকে আজ স্বাভাবিক অবস্থায় পেলে—

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—স্বাভাবিক অবস্থা! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছি কেন? না অন্যের পাপের জন্য।

নোরা—কি করবেন বলুন—তার চেয়ে বরং এমন কিছু বলুন যা শুনতে ভাল লাগে।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—(ম্লান হেসে) এর থেকে বড় আনন্দের কথা আর কি আছে? বাপ করে গেলেন জীবনটাকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ—আর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে ছেলেকে—এর থেকে মজার ব্যাপার কল্পনা করতে পারেন?

নোরা—আজ আমারও মনটা ভাল নেই।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—তাই তো মনে হচ্ছিল।

নোরা—ডক্টর র‍্যাঙ্কের মৃত্যু কিছুতেই আপনাকে আমার আর টরভ্যাল্ডের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—এখন তাই মনে হচ্ছে বটে কিন্তু এ ক্ষতি পূরণ হতে বেশি সময় লাগবে না, যারা চলে যায় তাদের ভুলে যেতে বেশি সময় লাগে না—

নোরা—একথা সত্যিই আপনি বিশ্বাস করেন?

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—এই তো জগতের নিয়ম—মানুষ নিত্য নতুন বাঁধন সৃষ্টি করে।

নোরা—কিন্তু আপনি না থাকলে সে জায়গা কেউ পূরণ করতে পারে?

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—ইতিমধ্যেই তো একজন

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর
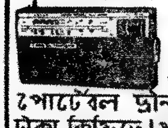
HAVA
৩ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।
HAVA SALES (34) SHAKTI NAGAR, DELHI-7

দেখা দিয়েছেন—কাল রাতে ওই মিসেস লিণ্ডের এখানে কি কাজ ছিল বলুন তো?

নোরা—সত্যি আপনি একেবারেই ছেলেমানুষ ডক্টর র‍্যাঙ্ক—ক্রিস্টিনকে দেখে আপনার হিংসে হয়েছে? সত্যিই এবারে আমার হাসি পাচ্ছে।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—কেন হবে না বলুন। আমি চলে যাবার আগে কি উনি আমার জায়গা দখল করতে আসেন নি?

নোরা—আমাদের আপনার বাড়ির লোকের মত মনে হয় না?

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—অথচ আর সবাই ঠিক থাকবে, কিন্তু আমাকে চলে যেতেই হবে।

নোরা—কেন আপনি বার বার এই কথাই বলছেন।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—একটা স্মৃতিও থাকবে না পেছনে।

নোরা—আচ্ছা ধরুন যদি আপনার কাছে একটা অনুরোধ করি—

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—কিসের অনুরোধ—

নোরা—আপনার বন্ধুত্বের একটা প্রমাণ দিতে পারেন?

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—সে তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা—বলুন কি চান?

নোরা—ধরুন একটা বড় রকমের কিছু।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—যত বড় হবে ততই ভাল। খুলে বলুন না—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—আমাকে কি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না?

নোরা—সব থেকে বেশি বিশ্বাস করি আপনাকে। শুনুন ডক্টর র‍্যাঙ্ক, একটা বড় বিপদ থেকে আমাকে বাঁচাতে হবে। আপনি তো জানেন টরভাল্ড আমাকে কি গভীরভাবে ভালবাসে, আমার জন্য ও বোধ হয় জীবন দিতে পর্যন্ত দ্বিধা বোধ করবে না।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—নোরা! তোমার কি মনে হয় একমাত্র ও ছাড়া আর কেউ তা পারবে না? আমার কথা কি কখনও—

নোরা—(আশ্চর্যভাবে) আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—ভেবেছিলাম, যাবার আগে কথাটা তোমায় জানিয়ে যাব। আজকে সুযোগ পেলাম, ভালই হোল। শোন নোরা, জেনে রাখ আমার চেয়ে বড় হিতৈষী তুমি পাবে না। আমাকে বিশ্বাস করে যা খুশি বলতে পার—জানি তোমাকে ভালবাসা আমার অন্যায়—

নোরা—এবার সত্যিই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন ডক্টর র‍্যাঙ্ক, আমাদের সুন্দর সন্ধ্যাটা এভাবে নষ্ট করে দেবেন না।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—আপনার কথাটা তো বললেন না?

নোরা—এরপর আর আপনাকে বলা চলে না।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—এবার বোধ হয় আমার পক্ষে চলে যাওয়াই ভাল। আর আপনাদের বিরক্ত করতে আসব না মিসেস হেলমার।

নোরা—যেতে আপনি পাবেন না—আগের মতই আপনাকে আসতে হবে। একটা ছেলেমানুষী করেছেন বলে, তাই নিয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে নাকি? তবে এরপর আর কখনও এ-ধরণের ছেলেমানুষী করবেন না। এবার বোধ হয় টরভাল্ডের ঘরে যেতে পারেন।

ডক্টর র‍্যাঙ্ক—আচ্ছা—ও ঘরে যাই—যদি পারেন আমায় ক্ষমা করবেন।

(ঘরের দিকে প্রস্থান)

নোরা—(হাসতে হাসতে) সত্যিই একেবারে ছেলেমানুষ।

(হেক্টরের প্রবেশ—একটি কার্ড দিল)

নোরা—এখানে দেখা করতে এসেছে?

হেক্টর—ভদ্রলোক বললেন না দেখা করে তিনি যাবেন না

নোরা—ভারি মুস্কিলে পড়া গেল। টরভাল্ড কাজে যোগ দেবার আগে থেকেই সব উমেদারি শুরু করেছে, যেন আমার কাছে এলেই সব হয়ে যাবে—যাকগে আসতে বল—

[হেক্টরের প্রস্থান]

নোরা—এখন আমি কি করি? ভয়ানক একটা কিছু ঘটবেই ঘটবে—কিন্তু উপায় কি? না, না, না এ বন্ধ করতেই হবে। না হলে—

আপনার কেশগুচ্ছ
দীর্ঘ সুন্দর ক'রে
আপনাকে রূপ-লাবণ্যে
উজ্জ্বল করবে
বেঙ্গল কেমিক্যালের
সুবাসিত
তিল তৈল

বেঙ্গল
কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই
কানপুর • দিল্লী

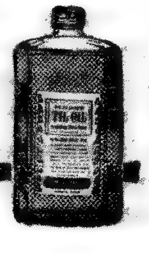

[ক্রগস্টাডের প্রবেশ]

ক্রগস্টাড—আপনি তা হলে আমার শত্রুতাই চান মিসেস হেলমার?

নোরা—দয়া করে একটু আস্তে কথা বলুন। আমার স্বামী বাড়িতেই রয়েছেন। হয়েছে কি?

ক্রগস্টাড—কেন, আপনি জানেন না যে আমার চাকরি গিয়েছে?

নোরা—আমি কিছুতেই পারলাম না মিঃ ক্রগস্টাড। প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছু করতে পারলাম না।

ক্রগস্টাড—আপনার স্বামীর ভালবাসা কি এতই সামান্য? তাকে বলেছেন যে এতে তার কি সর্বনাশ হতে পারে?

নোরা—তা কখনও বলতে পারি?

ক্রগস্টাড—তাই বলুন। একথা শুনলে পরে যে অত সাহস হেলমারের হবে না তা আমি জানি।

নোরা—আমার স্বামীর সম্বন্ধে দয়া করে একটু সম্মান দেখিয়ে কথা বলবেন।

ক্রগস্টাড—নিশ্চয়ই, যতটুকু সম্মান তার প্রাপ্য তা দেব বৈকি। কথাটা যখন গোপন করেছেন তখন তার ফলাফল কি হতে পারে ভেবে দেখেছেন কি?

নোরা—কি চান আপনি? এভাবে আমার সর্বনাশ করবেন না—আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে—অন্তত তাদের কথা ভেবে—

ক্রগস্টাড—আপনারা স্বামী-স্ত্রী কি আমার কথা ভেবেছেন একটুও? তবু আপনাদের মত অতটা হৃদয়হীন আমি নই। সমস্ত দিন শুধু আপনার কথাই ভেবেছি। নালিশ আমি করব না, আসুন একটা আপোষ করে ফেলা যাক।

নোরা—কি রকম?

ক্রগস্টাড—আসুন আমাদের তিনজনের মধ্যেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে ফেলা যাক। চতুর্থ কোনও ব্যক্তিকে এর মধ্যে আনবার দরকার হবে না।

নোরা—কিন্তু আমার স্বামীকে একথা কিছুতেই জানাতে পারব না।

ক্রগস্টাড—না জানিয়ে উপায় কি? ধারটা কি নিজেই শোধ করে দিতে পারবেন?

নোরা—একসঙ্গে সবটা পারব না।

ক্রগস্টাড—পারলেও তাতে কাজ হবে না। দলিলটা আমি ফিরত দেব না।

নোরা—সেটা নিয়ে আপনি কি করবেন?

ক্রগস্টাড—অন্য কাউকেও দেখাব না ভয় নেই। তবে আপনার স্বামীর নামে একটা চিঠি লিখে এনেছি—

নোরা—আমার স্বামীর কাছে কত টাকা দাবি করেছেন বলুন—আমি যে-করে হোক যোগাড় করে দেব—চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলুন।

ক্রগস্টাড—আপনার স্বামীর কাছে এক কাণাকড়িও দাবি করি নি।

নোরা—কি লিখেছেন তবে?

ক্রগস্টাড—শুনুন মিসেস হেলমার—আমি আর পাঁচজনের মত বাঁচতে চাই—আবার নিজেকে সম্মানের সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এর জন্য দরকার আপনার স্বামীর সাহায্য। গত দেড় বছর ধরে আমি প্রাণপণ করে, ন্যায় পথ ধরে চলবার চেষ্টা করেছি, ক্রমাগত ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেছি নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলতে। হঠাৎ এইভাবে আমার নিজের সর্বনাশ আমি ঘটতে দিতে পারি না। এই ব্যাঙ্কেই আমাকে কাজ দিতে হবে এবং আগের চেয়ে বড় চাকরি।

নোরা—আমার স্বামী কিছুতেই রাজী হবেন না—

ক্রগস্টাড—ভুল, মিসেস হেলমার মহা ভুল, আপনার স্বামীকে আমি আপনার থেকেও ভাল করে চিনি। আপনি দেখবেন ব্যাঙ্কে ঢোকবার এক বছরের মধ্যেই আসল সব ক্ষমতা এসে পড়বে আমার হাতে—হেলমার থাকবে নামে ম্যানেজার, কিন্তু সবকিছু চালাব আমি নিজে।

নোরা—এসব আপনার আকাশকুসুম কল্পনা। আমাকে ভয় দেখাতে আসবেন না—যা খুশি করতে পারেন।

ক্রগস্টাড—শুনুন আপনাকে যথেষ্ট সাবধান করে দিয়ে গেলাম, যাবার সময় নিচে Letter Box-এ চিঠিটা ফেলে দিয়ে যাব। তারপর অপেক্ষা করব হেলমারের উত্তরের জন্য। আমার চাকরিটা নেওয়াতেই এভাবে ওকে শায়েস্তা করতে হচ্ছে—নইলে মানুষ হিসাবে ওর থেকে আমি কোন অংশেই ছোট নই—আচ্ছা, নমস্কার মিসেস হেলমার।

[ক্রগস্টাডের প্রস্থান]

নোরা—ওই চলে যাচ্ছে। চিঠিটা কি সত্যিই দিয়ে যাবে? না, না, তা কি করে হবে। বাক্সটার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল—কি সর্বনাশ। সত্যি সত্যিই চিঠিটা বাক্সে ফেললো......টরভাল্ড, টরভাল্ড, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল—আর আমাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

[মিসেস লিণ্ডের প্রবেশ]

মিসেস লিণ্ড—ব্যাপার কি নোরা? তোমাকে এত excited দেখাচ্ছে?

নোরা—এদিকে এস......ঐ চিঠির বাক্সে একটা চিঠি দেখতে পাচ্ছ?

মিসেস লিণ্ড—বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

নোরা—চিঠিটা ক্রগস্টাড রেখে গেছে।

মিসেস লিণ্ড—টাকাটা তাহলে তার কাছ থেকেই ধার নিয়েছিলে?

নোরা—ক্রিস্টিন, টরভাল্ড এবার সবই জানতে পারবে।

মিসেস লিণ্ড—আমি বলছি, সেটাই হবে সবদিক দিয়ে ভাল।

নোরা—তুমি তো সবটা জান না, বাধ্য হয়ে আমাকে একটা জাল সই করতে হয়েছিল।

মিসেস লিণ্ড—কি সর্বনাশ!

নোরা—ক্রিস্টিন—আমার যেন মাথার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—আমি কি পাগল হয়ে যাব?

মিসেস লিণ্ড—কি সব যা-তা বলছ—

নোরা—কিন্তু সবার ভাল করবার জন্যই আমি—

মিসেস লিণ্ড—সে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।

নোরা—কিন্তু ক্রিস্টিন এ ভারি মজার ব্যাপার—অথচ কি ভয়ানক, ক্রিস্টিন—ক্রিস্টিন, এ কিছুতেই হতে পারে না, কিছুতেই না।

মিসেস লিণ্ড—আমি এখুনি ক্রগস্টাডের সঙ্গে দেখা করছি।

নোরা—খবরদার যেও না, ও তোমাকেও বিপদে ফেলবে।

মিসেস লিণ্ড—কিন্তু জান, এমন একদিন ছিল, যখন ও আমার জন্য সবকিছু করতে পারতো?

নোরা—সত্যি!

মিসেস লিণ্ড—আচ্ছা, ও কোথায় থাকে বলতে পার?

নোরা—জানি না তো—ও হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। (টেবিল হাতড়ে) এই তো ওর কার্ড—কিন্তু চিঠিটা? চিঠিটার কি করা যাবে?

মিসেস লিণ্ড—চিঠিটা বাক্সে পড়ে থাক। আমি ক্রগস্টাডের কাছে চললাম—চিঠিটা তোমার স্বামীর পড়বার আগেই ও ফেরত চাইবে।

নোরা—কিন্তু এই সময়টাতেই তো টরভাল্ড চিঠি আনতে যায়।

মিসেস লিণ্ড—যে করে হোক ওকে আটকে রাখ এ-সময়টা। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব। ওর কাছে গিয়ে ওকে ব্যস্ত রখ।

[মিসেস লিণ্ডের প্রস্থান]

নোরা—কি ভীষণ ভয় করছে। ক্রিস্টিন কি পারবে ওকে রাজী করাতে? ততক্ষণ যেভাবেই হোক টরভাল্ডকে আটকাতেই হবে। এ হতেই পারে না—একটা কিছু ঘটতেই হবে, নইলে সত্যিই যে আমি পাগল হয়ে যাব—যাই টরভাল্ডকে গিয়ে কোনরকমে ব্যস্ত রাখি।

[নোরার প্রস্থান]

যবনিকা।

রংঢং

ছবিতে সময় ও পরিবেশ

সম্প্রতি জাপানী ছবি দেখার আলোচনা প্রসঙ্গে এক ভদ্রলোক বলছিলেন, জাপানী পরিচালকরা তাঁদের ছবিতে সময় এবং পরিবেশ এত নিখুঁত করে দেখান যে, সাব-টাইটেল অথবা পুস্তিকা পড়ে জানার দরকার হয় না কোন সময়ের কথা বলা হচ্ছে। যেমন কুরোশাওয়ার 'রশোমন' বা 'রেড বিয়ার্ড' ছবির কথা মনে করুন। দুটি ছবি বক্তব্যের দিক থেকে আধুনিক, কিন্তু কাহিনীর পটভূমি গ্রহণ করা হয়েছে দীর্ঘ অতীতে। সেই অতীত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বাড়িঘর থেকে পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা বলার ধরণ, ব্যবহার পর্যন্ত সবই সেকালের। দর্শকদের সামনে অতীত জাপানের একটা ছবি ফুটে ওঠে। সে সময়ের অর্ধচেতন মানসিকতা এবং সংস্কার ইত্যাদিতে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে অতীতের জাপানী সমাজ ব্যবস্থাকে। ছবিটি তো বর্তমান সময়ে স্টুডিওতে করতে হচ্ছে। অথচ এত সতর্ক যে, কোন রকমে

উত্তমকুমার

সুচিত্রা সেন

যেন বর্তমান কালের কিছু প্রকাশ না পায়। জাপানী ছবির এটা একটা বৈশিষ্ট্য বলা যায়। সোভিয়েত ছবিতেও এই সতর্কতা থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের ছবিতে এই সতর্কতা দেখা যায় না কেন?

সময় এবং পরিবেশকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার ওপর ছবির সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের দেশের পরিচালকরা এ বিষয়ে মোটেই সতর্ক থাকেন না। পরিচালকদের সময় জ্ঞান ও পরিবেশ বোঝার মত ক্ষমতা আছে কি না সে বিষয়েও মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে। ছোট থেকে বড় সবার মধ্যেই ভুল দেখা যায়। এমন কি সত্যজিৎ রায়ের মত লোকেরও এ রকম ভুল হয়ে থাকে। যার জন্য ছবিগুলি সময় কালের সাক্ষী হয় না। এ কথার প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার' ছবির কথা উঠল। সেই ছবিতে রেল স্টেশনে যে ট্রেন দেখান হয়েছে রেলের সেই কামরাটা হয়েছে একালের। অথচ ঘটনা দেশ বিভাগের আগের। যখন পূর্বাঞ্চলের রেলের নাম ছিল ই বি রেল-ওয়ে। ইস্টার্ন রেলওয়ে নাম দেশ ভাগের পরে। কাজেই এই ছবিটি দেখে নির্দিষ্ট একটা সময় বোঝা গেল না। সম্প্রতি আর একটা ছবিতেও একই অসতর্কতা দেখা গেল। ঘটনা দেশ বিভাগের আগের—অথচ রেলের ইঞ্জিন দেখান হচ্ছে একালের। আর নায়ক এমন একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়েছেন—যে গেঞ্জি আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে ব্যবহার করা হত না। পোষাকের ব্যাপারে অসতর্কতার দৃষ্টান্ত তো প্রায় সব কয়টি ছবিতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে একমাত্র সত্যজিৎ রায় এবং ঋত্বিক ঘটক অন্যদের তুলনায় বেশি সতর্ক।

সময় ঠিকভাবে প্রকাশ করতে না পারলে উপন্যাসের যেমন ভিত রচনা করা যায় না, ছবিতে তার গুরুত্ব আরো বেশি। কারণ ছবি ভিসুয়াল আর্ট, জীবন্ত চিত্র। উপন্যাসে পরিবেশকে কল্পনা করে নিতে হয়, ছবিতে তা চোখের সামনে দেখা যায়। সুতরাং এখানে সতর্কতার প্রয়োজন আরো বেশি। নাটক দেখে যেমন একটা জাতিকে অনুভব করা যায়, ছবি দেখেও সে রকমই একটা জাতির চিন্তা, সমস্যা এবং মানুষ-গুলির সাংস্কৃতিক মন বোঝা যায়। বোঝবার ব্যাপারটা নির্ভর করে পরিচালক-দের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রয়োগ ক্ষমতার ওপর।

বছরে ত্রিশ-বত্রিশটা বাংলা ছবি তৈরি হয়। অধিকাংশ কাহিনী সামাজিক এবং আধুনিক সমস্যা। এই কাহিনীর চরিত্র-গুলি আধুনিক সমাজের মানুষ। কিন্তু ছবিতে আধুনিক সমস্যা দেখাতে গিয়ে আধুনিক কালকে দেখান হয় না। আধুনিক কালের ছবি—কিন্তু কোন ছবিতে একালের কলকাতার পথঘাটের আসল চেহারা, একালের গ্রামের যথার্থ পরিচয় পাবেন না।

ছবির জন্য কাহিনীগুলি বাছাই করা

হয় সে রকমই। আধুনিক কাহিনীর নামে কেউ বেছে নেন বটতলার গল্প; কেউ সাগিনা মাহাতো-র মত প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার পরিপোষকতা করছেন। আমাদের প্রযোজকরা গল্পের পেছনে দৌড়ন, কিন্তু সিনেমা বর্তমানে যত বেশি উপন্যাস ভিত্তিক নয়, তার চেয়ে বেশি চিত্রনাট্য ভিত্তিক। উপন্যাসের গল্পকে অবলম্বন না করে সিনেমার জন্য স্বাধীন চিত্রনাট্য রচনা করা উচিত, তা হলে ছবিতে আধুনিক সমস্যা, কাল ও পরিবেশ ঠিক-ভাবে প্রতিফলিত হবে। —সুজন

চিত্র আলোচনা

রেড বীচ

গত মহাযুদ্ধের ভয়ংকর দিনগুলির কথা মানুষ আজও ভুলতে পারছে না। ভুলতে না পারারই কথা। সেই হিংস্রতম দিনগুলি—যখন সভ্য মানুষ আদিম যুগের অসভ্য মানুষের চেয়েও বেশি বর্বর হয়ে উঠেছিল। 'রেড বীচ' ছবিটিতে সাক্ষাৎ মিলবে ইতিহাসের সেই কালো দিন-গুলির। এই ছবিতে কেবল যুদ্ধের সময়ের ভয়ংকর দিনগুলি দেখিয়েই শেষ করা হয় নি। তার সঙ্গে বলা হয়েছে সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায় না। যে মানুষ-গুলি যুদ্ধের দিনে পরস্পরকে শিকার করছে তারাও যুদ্ধ চায় না। কিন্তু অবস্থার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে মানুষ পরস্পরকে হত্যা করছে।

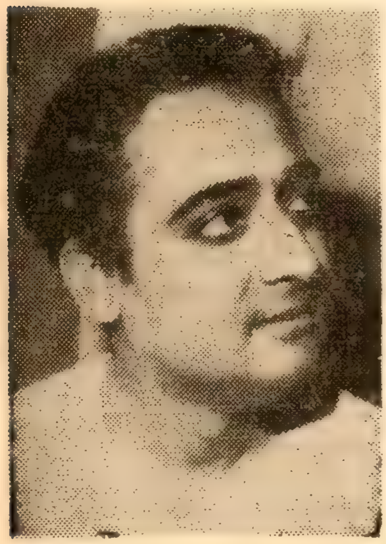

নির্মলকুমার

'রেড বীচ' একটি যুদ্ধবিরোধী গান দিয়ে শুরু। এই গানে রয়েছে যুবশক্তির বনে-জঙ্গলে প্রাণদানের কথা। ফিলিপাইন আর জাপানী সহযোগিতায় ছবিটি নির্মিত। জাপান অধিকৃত একটা অঞ্চলে আমেরিকার সৈন্যরা জাহাজ থেকে নামল—প্রবল গুলীবৃষ্টি উপেক্ষা করে। এক এক ইঞ্চি অগ্রসর হবার জন্য তাদের কি প্রচন্ড লড়াই। তারপরে শুরু হল জঙ্গল-যুদ্ধ। জাপানী আর অমেরিকানরা পরস্পরকে খুঁজছে যেমন করে শিকারী শিকার খোঁজে। এরই ফাঁকে এক-একটি ব্যক্তিচরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এক তরুণ আমেরিকান সৈনিক এত রক্ত দেখে বমি করে ফেললো। তার সঙ্গী সৈনিকটি নারী-সঙ্গের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। যুদ্ধে আসার আগে এক নারীর সঙ্গে তার সহ-বাসের স্মৃতি তাকে পাগল করে দিচ্ছে। অধিনায়কের মনে পড়ছে বাড়িতে প্রিয়তমা স্ত্রী ও সন্তানকে। অপর দিকে জাপানী শিবিরেও একই অবস্থা। এক কৃষক সৈনিক হয়ে যুদ্ধে এসেছে—সে দিবাস্বপ্ন দেখছে তার খেতের ধান। জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষের মনে পড়ছে বাড়িতে স্ত্রী ও ছেলেদের নিয়ে এক মমতাময় পরিবেশের কথা। এক তরুণ সৈনিক অবসর পেলেই ছবি আঁকে, যুদ্ধের চেয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যে তার মন ভরে আছে। এক চরম মুহূর্তে সেই শিল্পীর সঙ্গে সেই আমেরিকান সৈন্যের মোকাবিলা হল—যে রক্ত দেখে বমি করেছিল।

ছবিটি দেখবার সময় মাঝে মাঝে চোখে জল আসে। মানবিক মুহূর্তগুলি হৃদয় স্পর্শ করে। কিন্তু যুদ্ধ ভাল নয়, যুদ্ধ কেউ চায় না বলা হলেও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের নিন্দা স্পষ্ট নয়। বরঞ্চ অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে বলা হয়েছে মানুষ হিসাবে আমেরিকান সৈন্যরা খারাপ নয়। দেশে দেশে ওরা যা করে বেড়ায় তা অবস্থার বিপাকে পড়ে। ছবিতে কয়েকবার নুড ও যৌন উপভোগের দৃশ্য দেখান হয়েছে কাহিনীকে রসাত্মক করার জন্য। ছবিটি বয়স্ক দর্শকদের জন্য।

একটি ডেফা চলচ্চিত্র জমাট বিদ্যুৎ

গণতান্ত্রিক জার্মানির ডেফা স্টুডিওর সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি ছবির নাম জমাট বিদ্যুৎ। ছবিটি দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, সিনেমাস্কোপ। জাপান থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত বহু দেশে ছবিটি দেখানো হয়েছে এবং সকলে ছবিটির প্রশংসা করেছেন। নোমপেন চলচ্চিত্র উৎসবে আরও আঠারোটি ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের জন্য এই ছবিটি 'স্বর্ণ অপ্সরা' পুরস্কার পেয়েছে।

সত্যি যা ঘটেছে, তারই ভিত্তিতে ছবিটি তোলা। যদিও গল্পটি কাল্প-নিক। ছবির চিত্রনাট্যের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে ডঃ যুলিয়ুস মাডের-এর বই থেকে। গল্পে দেখা যাবে জার্মান ফ্যাসিস্ট নেতাদের। উন্মত্তের মত তারা কাজ করছে প্রথম দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রকেটটি তৈরি ও ব্যবহার করার জন্য, যাতে যুদ্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে সামরিক ও মানসিকতার দিক থেকে বড় রকমের সুবিধা লাভ করা যায়। রকেটটিকে বলা হত 'অবাক অস্ত্র', এটির গবেষণা ও নির্মাণের কাজ চলত বাল্টিক সাগরের দ্বীপ উগেডোম-এর উত্তরে পেনেমুয়েণ্ডে-তে। জার্মান বিজ্ঞানীরা ও ইঞ্জিনীয়াররা জ্ঞান ও সাধ্যমত চেষ্টা করেছিল সে সময়ের সবচেয়ে বিপজ্জনক অস্ত্র হিটলারের হাতে তুলে দিতে।

রকেট কিভাবে তৈরি হয়েছে, কারা তৈরি করেছে, শুধু এইটুকুই ছবির বলার কথা নয়। অন্যদিকে বলা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা। ফ্যাসিস্ট জার্মানি যখন পোল্যান্ড আক্রমণ করে, তখন ফ্রন্টের পিছনে সংগঠিত হয় ফ্রান্স ও জার্মানি পর্যন্ত বিস্তৃত একটি গোপন দ্বিতীয় ফ্রন্ট। উদ্দেশ্য, রকেটের নির্মাণ ও ব্যবহার বন্ধ করা কিংবা অন্ততঃ বিলম্বিত করা। অধিকৃত পোল্যান্ডে রকেটের পরীক্ষাকার্যের ওপরে নজর রাখে পোল্যান্ডের প্রতিরোধ যোদ্ধারা, এমন কি আস্ত একটি রকেট চুরিও করে। তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে সকলেই উপকৃত হয়, বিশেষ করে ইংল্যান্ড, সম্ভাব্য রকেট আক্রমণে যে দেশটি ছিল সবচেয়ে বিপন্ন। রকেট উৎক্ষেপণের জায়গাটা খুঁজে বার করে ফরাসী প্রতি-রোধ যোদ্ধারা। কড়াকড়ি রকমের গোপন কারখানাটি ছিল মাটির নিচের বন্দীশিবির "ডোরা"য়। নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে এই কারখানার উৎপাদন বন্ধ করে বাধ্যতামূলক শ্রমে নিযুক্ত সোভিয়েট, জার্মান, পোলিশ ও ফরাসী শ্রমিকরা। ভি-১, ভি-২ রকেটের লক্ষ্য ছিল ব্রিটেন ও বেলজিয়ামের ঘনবসতি এলাকা, তাতে অনেক লোক মারা পড়ত। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের জন্য এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়।

চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে গল্পের

সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নিজস্ব স্টাইলে, শিল্পগত প্রয়োগগত বিষয়গত বিরাট এক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। ঘটনাবহুল চিত্রনাট্যের জন্য ছবি তুলতে হয়েছে অনেক জায়গায়। অভিনয় করেছেন আটটি দেশের শিল্পীরা। ভিন্ন ভিন্ন দেশের অজস্র শিল্পীর আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় যে বিষয়টির ওপরে জোর পড়েছে, সেটাই এই চলচ্চিত্র থেকে শিক্ষণীয় বিষয়।

হিমাংশু সংগীত সম্মেলনে পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠানে শান্তা বসুর

নাটকের কথা

চিরকুমার সভা

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর স্টার্লিং ইন্সুরেন্স স্টাফ ক্লাব রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা অভিনয় করলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় এক কথায় ভালো কি মন্দ এভাবে মন্তব্য করা একটু কঠিন। তবে যদি দর্শকদের নির্মল আনন্দ দানই উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁরা সার্থক হয়েছেন। নাটকের উপদেষ্টা হিসাবে আছেন খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকের প্রধান আকর্ষণ সম্ভবত তিনিই। রসিকচন্দ্রের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এ নাটকের সার্থকতার চাবিকাঠি। চিরকুমার সভা সংলাপপ্রধান প্রহসন নাটক। এর আগে এ নাটকের অভিনয় দর্শকদের একঘেয়েমী বোধ লক্ষ্য করা গেছে বহুবার। এঁদের সেদিনকার দলগত অভিনয়ে এমন একটি দানাবাঁধা রূপ ছিল যা দর্শকদের কৌতূহল ও আমেজকে ক্ষুণ্ণ করে নি কোথাও। এটি সম্ভব হয়েছে মূলে নাটকটির সুন্দর সম্পাদনায়। চিরকুমার সভার তিন সভ্য কিভাবে কৌমার্য ব্রত রক্ষায় বিফল হয়ে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করতে চলল. তারই একটি নির্মল আমেজ তীব্র গতির সঙ্গে মঞ্চস্থ করা হয়েছে। কোথাও বেগ ব্যাহত হয় নি। তবে কুমারদের পোষাক নির্বাচন ঠিক হয় নি: সর্বদাই তাঁরা একই পোষাক পরে কেন? বেশভূষার মধ্য দিয়ে নাটকের কালকে বোঝা যায় নি। চন্দ্রমাধববাবুর ঘর ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। অভিনয় প্রসঙ্গে যাঁর নাম প্রথমেই করতে হয় তাঁর কথা আগেই বলেছি। রসিকচন্দ্র রূপে শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় নাটককে টেনে নিয়ে গেছেন। সুন্দর অভিনয় করেছেন অক্ষয় রূপে শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিমা পালের নীরবালা স্বচ্ছন্দ. চরিত্রানুযায়ী প্রাণচঞ্চল। কুমারদের সুযোগ এ নাটকের অভিনয়ে অপেক্ষাকৃত কম। তবু তাঁরা সু-অভিনয় করেছেন। শ্রীশের ভূমিকায় শ্রীঅরুণ চৌধুরীর অভিব্যক্তি সুন্দর, বাচনভঙ্গী বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। ভীরু প্রেমিক রূপে শ্রীশৈবাল সেন ও চঞ্চল বিপিনের ভূমিকায় তাপস গঙ্গোপাধ্যায় ভালো অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন সন্তোষ রায়, প্রভঞ্জন রায়চৌধুরী. দেবব্রত গুপ্ত, শম্ভু চৌধুরী, অলোক নাথ, বংশী চট্টোপাধ্যায়. মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোকা গঙ্গোপাধ্যায়, ছবি তালুকদার, শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়, যূথিকা ভট্টাচার্য প্রভৃতি। আবহসঙ্গীত সুপ্রযুক্ত।

পুরুষ চরিত্রে শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া প্রায় সকল শিল্পীরই কণ্ঠস্বর অনুচ্চ। এদিকে যেন শিল্পীরা নজর দেন।

বেলুড়ে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

বেলুড় উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সংসদ আয়োজিত নবম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফলাফল—শ্রেষ্ঠ দল—শিবতলা যুব সমিতি অভিনীত রতন ঘোষের 'সমুদ্র সন্ধানে'। শ্রেষ্ঠ পরিচালক শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় (সমুদ্র সন্ধানে)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—'আমরা

কল্পনা' দলের নাটক নীরেন সেন রচিত 'অভিনয় নয়' নাটকে শ্রীদেবরঞ্জন বসুমল্লিক। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—শ্রীমলয় চৌধুরী (সমুদ্র সন্ধানে)।

'মহারাজ নন্দকুমার'

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষায়তনের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে 'জনশিক্ষা মন্দির' মঞ্চে সম্প্রতি শ্রীসুধীন্দ্র রাহা বিরচিত 'মহারাজ নন্দকুমার' নাটকটি অভিনীত হয়ে দর্শকমণ্ডলীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিভিন্ন চরিত্রে উল্লেখ্য অংশ নেন শ্রীসন্তোষ নাথ, রজতবরণ সেন, তাপস বসু, অশোক বেরা, নীলাদ্রি ঘোষ, জবাকুসুম সিংহ, সুরেশ তালুকদার, কেশবলাল বণিক, পান্নালাল সাহা, দিলীপ দাশগুপ্ত, কল্যাণ বসু, হেমেন্দ্র চক্রবর্তী, শশাংক মাইতি, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, তপন বেরা প্রভৃতি।

শিশু স্বর্গ

শিশু স্বর্গের নিয়মিত অনুষ্ঠান মহাজাতি সদনে রবিবার (১২ই অক্টোবর) সকাল ৯টায়। এদিন যাদুকর এস কে সাহার যাদু প্রদর্শন এবং ভারত স্কাউট (১২শ পূর্ব-কলিকাতা) কর্তৃক শিশু নাটক "রূপকথার দেশে" পরিবেশিত হবে।

স্টুডিও খবর

আলেয়ার আলো

মঙ্গল চক্রবর্তী রচিত ও পরিচালিত ইউনিট প্রোডাকশন অব্ ইন্ডিয়ার প্রথম ছবি "আলেয়ার আলো"-র চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ। বর্তমানে সম্পাদনা চলছে। গোপেন মল্লিক ছবিটির সুরকার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—সন্ধ্যা মুখার্জী ও হেমন্ত মুখার্জী। চরিত্র-চিত্রণে আছেন—সৌমিত্র চ্যাটার্জী, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, অনুপকুমার, সন্ধ্যারাণী, কালী ব্যানার্জী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, ভানু ব্যানার্জী, মঞ্জু দে, শেখর চ্যাটার্জী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, বনানী চৌধুরী, সাধনা রায়চৌধুরী, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী ও অজিতেশ ব্যানার্জী।

ঝরিয়া, ধানবাদ ও রাজাউনি ফরেস্টের প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবিটির বহু বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে।

নাটকীয় ঘাত-সংঘাতে ভরপুর এই ঘরোয়া ছবিটির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে—রামানন্দ সেনগুপ্ত ও বিশ্বনাথ নায়ক।

বি, পি, পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

মৌসুমী মন

চৌধুরী প্রোডাকসন প্রযোজিত ও নিবেদিত ছবি 'মৌসুমী মন'-এর সুটিং নিয়মিত এগিয়ে চলেছে। গত ৮ই সেপ্টেম্বর টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে এই ছবির তিনখানি গান রেকর্ড করা হয় অনিল দত্ত-র সুরে। অংশগ্রহণকারী কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন—সুবীর সেন, চন্দ্রাণী মুখার্জী ও শ্রীদত্ত স্বয়ং। ছবিটির পরিচালক সমর চৌধুরী।

সর্বেন্দ্র ও মিতা চৌধুরীকে এই ছবির নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে। বোম্বের লক্ষ্মীছায়া এই ছবির একটি বিশেষ চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন। এ ছাড়া অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, গীতা দে, রত্না ঘোষাল, মণি শ্রীমানী, সৌরভ মুখার্জী, বেবী সুচিত্রা ও সিনে আর্টিস্ট সংস্থার শিল্পিবৃন্দ। ছবিটি সমাপ্তির পথে।

আলেকজান্দার ফ্ল্যাগের 'মার্কাস' ছবিতে হ্যানেলোর হোজার

সংবাদ কণা

আমেরিকান নৃত্যশিল্পী

আধুনিক আমেরিকান নৃত্যের অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পী লোনি যোশেফ গর্ডন কলকাতায় এসেছেন। তিনি আগামী ১০ই অক্টোবর সন্ধ্যায় হিন্দী হাই স্কুলে তাঁর নৃত্যানুষ্ঠান করবেন। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটি। গত ৩রা অক্টোবর কলা মন্দিরের নিচের হলে তাঁর নাচের বিষয়ে বক্তৃতা সহযোগে ব্যাখ্যা করেছেন।

আবৃত্তির কনসার্ট

কনসার্ট হলেও সাধারণত কনসার্ট বলতে যা বোঝায় এ ঠিক তা নয়। অভূতপূর্ব মঞ্চের পরিবেশে এবং সুরসঙ্গীতের সহযোগিতায় আবৃত্তি বলা যায় একে। মস্কো স্টেট ফিলহারমনিক সোসাইটির শিল্পী নিনা চিজোভা সেদিন

চিত্রবীক্ষণ
শারদীয় চলচ্চিত্র সংখ্যা
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী এবং সকল সম্ভ্রান্ত বুক স্টলে পাওয়া যাচ্ছে।
মূল্য: ২·০০ টাকা; ডাকযোগে ২·৫০
সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটা
২নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

যখন একের পর এক মঞ্চে ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য থেকে আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন শ্রোতারা অধীর আগ্রহে তা শুনছিলেন। 'নল-দময়ন্তীর' উপাখ্যান, কালিদাসের 'শকুন্তলা' ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যিকদের গল্প থেকে সুকণ্ঠী নিনার আবৃত্তি প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের পরিবেশ ও তার নায়ক-নায়িকার মনের রহস্য ধীরে ধীরে প্রাণবন্ত করে তুলছিল দর্শকদের শ্রবণে। প্রাচীন ভারতের বিশাল অরণ্য, সুবিশাল প্রাসাদ, অপরূপ মন্দির একের পর এক যেন সজীব হয়ে উঠছিল চোখের সামনে আবৃত্তির আবেগ ও গভীরতার মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানটিতে মঞ্চসজ্জায় সাহায্য করেছেন সোভিয়েতের খ্যাতনামা মঞ্চ নির্দেশক ওয়াই এফরন।

ইন্দিরা সিনেমায় অনুষ্ঠিত সুরদাস সংগীত সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পাশে নৃত্যশিল্পী বন্দনা সেন।

সঙ্গীত কথা

হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলন

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে হিমাংশু সংগীত সম্মেলনের দশম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনের অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সুচিত্রা মিত্রের একক সংগীত। তিনি পর পর ছয়টি সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্ধন করেন। রথীন চৌধুরীর পরিচালনায় "হিমাংশু গীতি" পরিবেশন করেন মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইরা মুখোপাধ্যায়। পূর্বা সিংহ-র রবীন্দ্রসংগীত ও রজনীকান্তর গান এবং সুমিত্রা বসুর নজরুলগীতি সবার অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন তমালিকা গুহ, অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া রায় ও শিবনাথ সাহা। শান্তা বসুরায়ের রবীন্দ্রনৃত্য দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এঁর সঙ্গে সঙ্গীতে সহযোগিতা করেছেন গৌতম বসু ও তুষার ভদ্র। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ শান্তিভূষণ দত্ত এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমতী পুষ্পরাণী দত্ত।

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীকে তরুণ অপেরার নাটক 'রাজা রামমোহন'-এর পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছেন নাট্যকার সৌরিন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পাশে বসে আছেন শিব ভট্টাচার্য ও শান্তিগোপাল।

মাসিক ১০৲ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০৲। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

সঙ্গীন অবস্থা

প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত জিতেছে। ভারতের এ জয় অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবে লাফালাফি করার মতোও যে বিশেষ কিছু নয়—সে কথা বোধহয় না বলে দিলেও চলে। কারণ প্রথম টেস্ট ম্যাচই একথা বেশ ভালোভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, দল হিসেবে নিউ জিল্যান্ড যেমন এমন কিছু নয়, তেমনি দলগত শক্তির দিক থেকে ভারতও খুব একটা বেশি এগুতে পারে নি। এ কথার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হবে প্রথম টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলার ধারা দেখে। ব্যাটিং-এ পাতৌদি আর ওয়াদেকার ছাড়া আর কেউ যেমন বিশেষ কিছু করতে পরেন নি, তেমনি বোলিং-এ প্রসন্ন আর বেদী ছাড়া আর কাউকে তো খুঁজেই পাওয়া গেলো না। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এইভাবে না হয় চলে যেতেও পারে—টেস্ট ম্যাচে ভারত জিততেও পারে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কি হবে? আবিদ আলি আর চৈতন চৌহানকে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের ইনিংস সূচনা করিয়ে যে সুবিধে হবে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হয়তো জয়সীমা কিম্বা সারদেশাই-এর ডাক পড়বে। সংগে হয়তো থাকবেন ইঞ্জিনিয়ার। তাই যদি হয়, তাহলে ওঁদের দিয়ে এখন একটু প্র্যাকটিশ করিয়ে নিলে ক্ষতি কি ছিল? নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে উঠতি খেলোয়াড়রা যে সুযোগ পাবেন—একথা আমরা আগেই লিখেছি—আর পাওয়াও উচিত। কিন্তু তাই বলে নতুনদের দিকে তাকাতে গিয়ে পুরনোদের একেবারে ভুলে যাওয়া তো ঠিক নয়। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া এখন খুবই শক্তিশালী দল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রাবার জিতে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের মনোবল এখন তুঙ্গে। অস্ট্রেলিয়া দলে আছেন সেরা ফাস্ট বোলার, স্পিন বোলার আর ব্যাটসম্যানরা। তাদের সংগে সমানে সমানে পাল্লা দিতে গেলে ভারতীয় খেলোয়াড়দেরও প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। সারদেশাই আর জয়সীমাকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অন্তত একটা টেস্টে খেলিয়ে তা দের ফর্মটা দেখে নেওয়া এবং সেই সংগে ওদেরও টেস্ট খেলায় একটু প্র্যাকটিশের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সিলেকশন কমিটির। কারণ আর যাই হোক চৌহান কিম্বা অজিত পাই-এর মতো খেলোয়াড়দের দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না। তাই সময় থাকতে ব্যবস্থা করাই ভালো। কারণ ভারতীয় দলের বিগত অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় জয়সীমা হঠাৎ উড়ে গিয়ে যে খেলা খেলেছিলেন তার কথা অন্তত ভুলে যাওয়া উচিত নয়...! —শান্তিপ্রিয়

ক্রিকেটের খবর

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বম্বের প্রথম টেস্টে ভারত জিতেছে। এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে ততদিনে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচও শেষ হয়ে যাবে। যাই হোক প্রথম টেস্ট ম্যাচে ভারত জিতলেও ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলা আশানুরূপ হয় নি। সত্যি কথা বলতে কি প্যাতৌদি, বেদী আর প্রসন্নর জন্যেই প্রথম টেস্ট ম্যাচে ভারত শুধুমাত্র পরাজয়ই এড়ায় নি—জয়লাভও করেছে।

প্রথম টেস্টের সবচেয়ে বড় কথা হলো ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের চরম ব্যাটিং

অম্বর রায়

শেষ পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেটে অম্বরের ডাক পড়লো। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত অম্বর ভারতীয় দলে নিজের স্থানটি পাকা করে নিতে পারেন কি-না।

ব্যর্থতা। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ওয়াদেকার আর পাতৌদির নবাব ছাড়া আর কেউ ধরতে গেলে কিছুই করতে পারেন নি। অসহায়ের মতো আউট হয়ে হয়ে ফিরে এসেছিলেন তাঁরা—নিউজিল্যান্ডের ফিল্ডারদের নিপুণ ফিল্ডিং আর বোলারদের মাঝারিধরণের বোলিং-এর শিকার হয়ে।

সেদিক দিয়ে অবশ্য টেস্ট ক্রিকেটে নবাগত ব্যাটসম্যানদ্বয় চেতন চৌহান আর অশোক মানকড় মোটামুটি ভালো খেলেছেন। বিশেষ করে অশোক মানকড় দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক পাতৌদিকে যেভাবে সাপোর্ট দিয়েছিলেন তার তুলনা মেলা ভার! অশোকের খেলার সহজ এবং সাবলীল ধারা দেখে এই কথাই মনে হয়েছে যে, খুব শীগগিরই তিনি হয়তো ভারতীয় দলে নিজের স্থানটা পাকা করে নিতে পারবেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে চৌহানের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

বোলিং-এর দিকে নজর দিলে এ কথা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না যে, নবাগত পেস বোলার অজিত পাই-এর চেয়ে বাংলার সুব্রত গুহ সম্ভবত অধিক নিপুণ। সুব্রতর হাতে যে সুইং আছে মাঝে মাঝে তা যে সাংঘাতিক আকার ধারণ করে! বেদী যে কালে ভালো বোলার হবেন এ বিষয়ে অনেকেই আশাবাদী ছিলেন। ভিনু মানকাদের বোলিং-এর ছায়া আছে বেদীর কব্জায়। বেদী কব্জি মুচড়ে আর আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে লেগ ব্রেক বল করেন। শুধু তাই নয়—বেদীর ফ্লাইটও চমৎকার। সুন্দরভাবে ফ্লাইট চেঞ্জ করতে পারেন বেদী। মনে হয় সুভাষ গুপ্তের অভাব অনেকদিন পরে বেদী পূর্ণ করবেন। সেদিক দিয়ে প্রসন্নর কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ বিশ্বের অন্যতম

বেদী

বেদীর বোলিং-এ ভিনুর ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর লেগ ব্রেক বলে নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়রা নাজেহাল।

কংডন

ব্যাটিং-এ নিউজিল্যান্ডের অন্যতম প্রধান ভরসা।

শারদীয়
সাপ্তাহিক বসুমতীর আকর্ষণ

অজয় বসু :
'অঙ্গিনায় আবির্ভাব'—১৯০২ সালে টেস্ট ক্রিকেটের আসরে ভারতীয় দলের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক চিত্রটি তুলে ধরেছেন তাঁর নিপুণ হাতের লেখনীর মাধ্যমে।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় :
'মাই ডিয়ার গোপালদা'—বাংলা ভাষায় খেলা-ধুলার ওপর গল্প লেখেন একমাত্র শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। গোপালদার ওপর লেখা মজার গল্পটি পড়তে পড়তে পাঠক-পাঠিকারা যেমন হাসিতে ফেটে পড়বেন, তেমনি কলকাতার ফুটবলের প্রথম যুগের কাহিনীও জানতে পারবেন।

শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার হিসেবে প্রসন্ন স্বীকৃতি পেয়েছেন ইতিমধ্যেই।

নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কংডন আর ডাউলিং খুবই ভালো খেলেছেন। এ'রা দু'জন ছাড়া আর কেউ বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। বোলিং-এ হ্যাডলে, কংডন, টেলর আর হাওয়ার্থ মোটামুটিভাবে সাফল্য লাভ করেছেন।

যাই হোক আকর্ষণীয় প্রথম টেস্টে প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে ভারত মাত্র ১৫৬ রান করেছিল। এর মধ্যে ওয়াদেকার ৪০, ইঞ্জিনিয়ার ২০, পাতৌদি ১৮, চৌহান ১৮ ও মানকড় ১৯ রান করেন। এর মধ্যে হ্যাডলে ১৭ রানে ৩টি, কংডন ৩৩ রানে ৩টি উইকেট পান।

এর উত্তরে নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ২২৯ রান করে। কংডন করেন সবচেয়ে বেশি। ৭৮ রান—এ ছাড়া ডাউলিং ৩২ ও টারনার করেন ২৪ রান। প্রসন্ন ৯৭ রানের বিনিময়ে পান ৪টি উইকেট। পাই ও বেদী ২টি করে উইকেট পান যথাক্রমে ২৯ ও ৫১ রানের বিনিময়ে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ২৬০ রান করে। এর মধ্যে ছিল পাতৌদির ৬৭, চৌহানের ৩৪, ওয়াদেকারের ৩৪, মানকড়ের ২৯ ও আবিদ আলীর ২৭ রান। বোলিং-এ নিউজিল্যান্ডের টেলার ও হেডলী ৩টি করে উইকেট পান যথাক্রমে ৩০ ও ৫৭ রান দিয়ে। এ ছাড়া হাওয়ার্থ ৬৯ রানে ২টি ও বারজেস ৩০ রান দিয়ে পান ১টি উইকেট।

১৮৮ রান করতে পারলে নিউজিল্যান্ড জিতবে এই অবস্থায় ব্যাটিং করতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে তারা ১২৭ রানের বেশি করতে পারলো না। ফলে প্রথম টেস্ট ম্যাচে ৬০ রানে তারা হেরে গেলো ভারতের কাছে।

নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ডাউলিং ৪নং ব্যাটসম্যান হিসেবে ব্যাট করতে নেমে শেষ পর্যন্ত ৩৬ রান করে থেকে গেলেন অপরাজিত। নিউজিল্যান্ডের অন্য কোন ব্যাটসম্যানই ভারতের স্পিন বোলারদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারেন নি। শেষের দিকে হ্যাডলে ২১ আর ওয়ার্ডসওয়ার্থ ১৩ রান করেছিলেন। বোলিং-এ ভারতের বেদী ৪৬ রানে ৬টি ও প্রসন্ন ৭৪ রান দিয়ে দখল করেন ৪টি উইকেট।

শান্ত মিত্র
জাতীয় ফুটবলে বাংলা দলের অধিনায়ক

মানস ব্যানার্জী
চিরকাল ছোট ক্লাবে খেলায় নিপুণ খেলোয়াড় মানস ব্যানার্জী এতোকাল ছিলেন উপেক্ষিত। এবারে তাঁর ডাক পড়েছে জাতীয় ফুটবলে বাংলা দলের পক্ষে খেলার জন্যে।

পি দে
শেষ পর্যন্ত বাংলা দলের পক্ষে খেলার জন্যে ডাক পড়েছে ইস্টবেঙ্গলের পরিমল দে-র।

চুম্বক

একটা পুরোদিন! অত সময়! আর সমস্ত দিন ব্যাটে-বলে ঠোকাঠুকি করে রান হল কি না মাত্র......? সবাই—একবার মনে করুন তো, ১৯৫৬ সালে করাচীতে পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেকার টেস্ট খেলার সেই দিনটির কথা।

প্রথম দিনের খেলা আরম্ভ হল। প্রথম ব্যাটিং করার সুযোগে অস্ট্রেলিয়া সর্বসাকুল্যে করল মাত্র ৮০ রান। এর পর পাকিস্তানের পালা। ঐ প্রথম দিনেই তারা দিনের শেষে ১৫টি রান করতে ২টি উইকেট খোয়ালো।

এখন প্রশ্ন হল—ওটা টেস্ট খেলা, একদিনে ১২টা উইকেট পড়ল, আর সেখানে রান উঠল গিয়ে কি না মাত্র ৯৫। কল্পনা করতে কষ্ট হয়, কত মন্থর হয়েছিলো সেদিনকার ব্যাটিং। টেস্ট খেলায়, ঐ রানসংখ্যাই এখন পর্যন্ত একদিনের সব চেয়ে কম রান হিসাবে টেস্ট ইতিহাসে রেকর্ড হয়ে রইল।

পবিত্র সমাদ্দার

ফুটবল-ফুটবল

জাতীয় ফুটবল দলে অংশগ্রহণকারী বাংলা দলে এ বছর বেশ কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড় আছেন। নিঃসন্দেহে এই মনোনয়ন প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে কালীঘাট দলের অধিনায়ক মানস ব্যানার্জীকে দলে নেওয়ায় বাংলা দেশের ফুটবলরসিকদের অনেকেই খুশি হয়েছেন। কারণ ভালো খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু মানস ছোট দলে খেলেন সেই হেতু তিনি ছিলেন উপেক্ষিত।

ইস্টবেঙ্গল দলের শান্ত মিত্রর ওপর পড়েছে বাংলা দল পরিচালনার ভার।

আগামী ৪ঠা অক্টোবর বিমানযোগে বাংলা দল নওগাঁ যাত্রা করছে আর ৬ই অক্টোবর থেকে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছে।

বাংলা দলের পক্ষে মনোনীত ১৮ জন খেলোয়াড়ের নাম নিচে দেওয়া হলো।

গোলরক্ষক ঃ জোহা (মহঃ স্পোর্টিং) ও কানাই সরকার (এরিয়ান্স)

ব্যাকঃ এস কর্মকার (ইস্টবেঙ্গল), কল্যাণ সাহা (মোহনবাগান), ডি ঘোষ (এরিয়ান্স), আলতাফ (মোহনবাগান), অশোক ব্যানার্জী (খিদিরপুর) ও শান্ত মিত্র (ইস্টবেঙ্গল)—অধিনায়ক

হাফ ব্যাকঃ কালন গুহ (ইস্টবেঙ্গল), এস মান্না (খিদিরপুর), বরুণ মিশ্র (এরিয়ান্স) ও কাজল মুখার্জী (ইস্টবেঙ্গল)

ফরোয়ার্ডঃ মানস ব্যানার্জী (কালীঘাট), সীতেশ দাশ (মোহনবাগান), সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার (মোহনবাগান), বিমান লাহিড়ী (মহামেডান স্পোর্টিং), হাবিব (মোহনবাগান) ও সুভাষ ভৌমিক (ইস্টবেঙ্গল)

সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার

সুকল্যাণের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করছে নওগাঁয় অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলার সাফল্য।

দি এ্যাসেস

শুকদেব মুখোপাধ্যায়

ইং-অস্ট্রেলীয় টেস্ট ক্রিকেট থেকেই 'এ্যাসেস' কথাটির উৎপত্তি। ১৮৮৩ সালের সেই ঘটনাকে উল্লেখ করার আগে ১৮৮২ সালের 'ওভাল' মাঠের ঐতিহাসিক টেস্টটির কথা মনে করা দরকার।

১৮৮২ সালের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না। ইংলন্ডের ওভাল মাঠে সেদিন চলেছিল ইং-অস্ট্রেলীয় টেস্ট ম্যাচ। মাঠ দর্শকে পরিপূর্ণ। টসে জিতে অস্ট্রেলিয়া দল ব্যাটিং করতে নামলেন। শুরু হল উইকেট পড়তে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হল মাত্র ৬৩ রানে। ইংলন্ড এর জবাবে প্রথম ইনিংসে করল ১০১ রান। দ্বিতীয় ইনিংসেও অস্ট্রেলিয়ার ঘটল শোচনীয় বিপর্যয়। ১২২ রানে তাদের ইনিংস শেষ হল। সুতরাং মাত্র ৮৫ রান করতে পারলেই ইংলন্ড জয়ী হবে।

প্রথম ৫০ রান উঠল মাত্র ২টি উইকেট হারিয়ে। জয়লাভের জন্য আর ৩৫ রানের প্রয়োজন—হাতে আছে ৮টি উইকেট। জয় সুনিশ্চিত ভেবে ইংলন্ডের জনসাধারণ আনন্দে উৎফুল্ল। কিন্তু তারপর? এই টেস্ট ঐতিহাসিক হল তারপর......

শুনুন তার পরের ঘটনা। অস্ট্রেলিয়ার "দানব" স্পিনবোলার স্পোফোর্থ এবং বয়েল এমনই মারাত্মক বোলিং শুরু করলেন যে, ইংলন্ডের পক্ষে সম্ভব হল না সেই প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করা। মাত্র ২৭ রানে আউট হলেন ইংলন্ডের সেরা সেরা খেলোয়াড়রা—গ্রেস, লিটিলটন, স্টীল, মোরিস, বিওবার্নেস, পিট ইত্যাদি। ইংলন্ডের মাটিতে অস্ট্রেলিয়া সেই প্রথম জিতল, জিতল মাত্র ৭ রানে। ক্রিকেট-প্রিয় ইংলন্ডের ঘরে ঘরে তখন বিষাদের ছায়া। লন্ডনের সংবাদপত্র "স্পোর্টিং" সখেদে শোকসূচক কালো রেখার বেষ্টনীর মধ্যে মন্তব্য করল ঃ

"An affectionate rememberance of English cricket which died at the Oval, August 29, 1882. Deeply lamanted by a large circle of Sorrowing friends and acquaintances.—(R.I.P).

N.B.—The body will be cremater and the ashes taken to Australia."

এর পরের ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার মাঠে। যে ঘটনার সঙ্গে এ্যাসেস বিশেষভাবে জড়িত। ১৮৮৩ সাল। শীতকাল। ইংলন্ড এল অস্ট্রেলিয়ায় আইভো ব্লাইয়ের পরিচালনায় (যাঁর পরের নাম লর্ড ডার্নেল)। তিনটি টেস্টের প্রথমটিতে অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল। পরের দুটো টেস্টে ইংলন্ড জিতে '৮২ সালের গ্লানির শোধ নিল কিছুটা।

শেষ টেস্টে ইংলন্ড জেতার পর একদল অস্ট্রেলিয়ান তরুণী খেলার স্টাম্পগুলো দিল পুড়িয়ে। তারপর তার ছাই ভর্তি করল একটা মৃৎপাত্রে। এবং সেটা বিজয়ী নেতা আইভোকে উপহার দিল। পাত্রের গায়ে লেখা থাকে ঃ

"When Ivo goes back
with the urn the urn.
Studds, Steel, Read and
Tylecote return return.
The welwin will
ring ring loud.
The great crowd will
fill proud.
Seeing Darlow and Bates
with the urn the urn
And the rest coming home
with the urn."

লর্ড ডার্নেল মৃত্যুকাল পর্যন্ত মৃৎপাত্রটি সযত্নে তার অধিকারে রেখেছিলেন। ১৯২৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর পাত্রটি লর্ডস মাঠের ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে।

৮৭ বছর আগের সেই ঘটনার দুঃখময় স্মৃতিকে মনে রেখে বিশ্বের ক্রিকেট শ্রেষ্ঠ দুই দেশ এখনও সেই 'এ্যাসেস' বা ছাই অধিকারে রাখার সম্মান নিয়ে ক্রিকেট মাঠে লড়াই করে চলেছে। যতদিন বিশ্ব ক্রিকেট খেলার প্রচলন থাকবে ততদিন এ লড়াইয়ের অবসান হবে না এবং ১৮৮২ সালের সেই দুঃখময় স্মৃতিও কোনদিন মুছে যাবে না ইংলন্ডবাসীর মন থেকে।

প্রশ্ন উত্তর

অমিতাভ রায় (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, বিবেকানন্দনগর, পাঃ বগুলা)

প্রশ্ন : পেনাল্টি কিক বারে লেগে ফিরে এলে যে কিক করেছে সে যদি আবার গোলে মারে তাহলে গোল হবে, না হবে না? তবে যদি গোলরক্ষকের হাতে লেগে ফিরে আসে তাহলে কি হবে?

উত্তর : বারে লেগে ফিরে এলে যিনি বলটা গোলে মেরেছেন তিনি ছাড়া আর যে কেউই গোলে মারলে গোল হবে। শুধু মাত্র কিককারী খেলোয়াড় মারতে পারবেন না। মারলে তাঁর বিরুদ্ধে রেফারী ফ্রি কিকের নির্দেশ দেবেন। তবে গোলরক্ষকের হাতে লেগে ফিরে এলে যে কেউই মারতে পারেন। তখন গোলে গেলে গোল হবে।

সুভাষরঞ্জন দত্ত (নেতাজী বিদ্যাপীঠ, ট্রাংগুলার কলোনী, পান্ডু)

উত্তর : আপনার প্রস্তাবটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে দেখবো।

প্রবীর বসু (কাঞ্চনপাথ, মালিগাঁও. গৌহাটি-১১)

প্রশ্ন : বর্তমানে এরিয়ান দলের ফুটবল কোচ কে?

উত্তর : শচীন হালদার।

অলোককুমার গাংগুলী (বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬)

প্রশ্ন : কোন্ খেলোয়াড় বিশ্বের মধ্যে টেস্ট খেলায় এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন? কতো রান?

উত্তর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের সোবার্স। ৩৬৫ রান।

নিশিকান্ত সিংহ (কমলপুর, পঃ দিনাজপুর)

প্রশ্ন : বিশ্ববিখ্যাত হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান 'ক্যাসিয়াস ক্লে' সর্বপ্রথম কবে এবং কোন অলিম্পিকে যোগদান করেছেন? বর্তমানে তিনি কি অবসর গ্রহণ করেছেন?

উত্তর : ক্লে কোন অলিম্পিকে যোগ দিয়েছেন বলে তো শুনি নি। না এখনো ক্লে অবসর গ্রহণ করেন নি।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিশহর, ২৪ পরগনা) ও অমলকুমার চ্যাটার্জী (বি কে পাল এ্যাভেনিউ, কলিকাতা-৫)

উত্তর : আপনাদের চিঠি পেয়েছি। 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগটা আবার চালু করা হবে কি না, আমরা নিশ্চয়ই ভেবে দেখবো।

অজয় বর্মণ (গৌহাটি)

প্রশ্ন : একজন খেলোয়াড় খুব ভালো খেললেই কি তাঁকে বেস্ট ফুটবলার বলবেন, না তাঁর চরিত্র বা ব্যবহারের বিচার করে দেখবেন? আপনাদের পুজাসংখ্যা কবে বেরুবে?

উত্তর : শুধু খেলা নয়, সেই সঙ্গে মাঠে ও মাঠের বাইরের ব্যবহার, নৈতিক চরিত্র প্রভৃতি বিচার করে দেখার পরই বেস্ট ফুটবলার নির্বাচন করা হয়।

সাপ্তাহিক বসুমতীর পুজাসংখ্যা মহালয়ার আগেই বেরুবে।

প্রতিমা ঘোষ (খাদিনান, হাওড়া)

প্রশ্ন : ইংলন্ডের যে ষোলজন মহিলা ক্রিকেট খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড আর দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ওঁদের খেলা কি শেষ হয়ে গেছে? ওঁরা কি দেশে ফিরে গিয়েছেন? ওঁরা কোন কোন দেশের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন সম্ভব হলে জানাতে চেষ্টা করবেন।

উত্তর : আমি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না। কেউ জানালে জানিয়ে দেবো।

অসিত ঘটক (ঘটকগ্রাম, বাঁকুড়া)

উত্তর : ক্রিকেট খেলা ডান্ডাগুলি খেলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। বইটির জন্যে আপনি জ্ঞানতীর্থ, ১নং বিধান সরণী, কলকাতা-১২, এই ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন।

লক্ষ্মী বিশ্বাস (ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন, কলকাতা-১৬)

উত্তর : খেলাধুলার ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে কি ধরণের সাহায্য চান জানালে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

এ্যালান নটের বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে এক মত নই। ওঁকে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উইকেটরক্ষক বলা বোধহয় সংগত নয়।

বাবলু, দীপা ও পলাশ (ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান কে?

উত্তর : এখনো বোধহয় সোবার্সই।

জীবনজ্যোতি ঘোষ ও বিপ্লব ঘোষ (জে বি রোড, জোড়হাট)

উত্তর : কলকাতা ময়দানে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা বাড়ছেই।

শেখরকুমার দত্ত (ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় কে? পেলে না ইউসোবিও?

উত্তর : আমার মতে পেলে।

হীরেন্দ্রমোহন দত্ত (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় কোন বোলার কি একই ম্যাচে দু'বার হ্যাট্রিক করেছেন?

উত্তর : একই ম্যাচে দু'বার হ্যাট্রিক করেছেন—

এ শ—নটস : গ্লুস দলের খেলায়—নটিংহামে ১৮৮৪ সালে।

টি ম্যাথিউস—অস্ট্রেলিয়া : সাউথ আফ্রিকার খেলায়—ম্যানচেস্টারে—১৯১২ সালে।

সি পারকার—গ্লুস : মিলিডসেক্সের খেলায়—ব্রিস্টলে—১৯২৪ সালে।

আর জেনকিনস—ওরস : সারের খেলায়—ওরচেস্টারে—১৯৪৯ সালে।

সুভাষরঞ্জন দত্ত (নেতাজী বিদ্যাপীঠ, ট্রাংগুলার কলোনী, পান্ডু, আসাম)

উত্তর : ক্রীড়া সাংবাদিকের পরিচিতি প্রকাশ করা সম্ভব হবে কি না জানি না। তবে শ্রীঅজয় বসু ও শ্রীকমল ভট্টাচার্যের পরিচিতি প্রকাশের চেষ্টা করবো। তবে অন্যটি তো সম্ভব হবে না।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসদকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

কালিদাস গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	২য়	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	৩য়	৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—	১ম	৩-০০
" "	২য়	"
" "	৩য়	"
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)	১ম	৩-০০
" "	২য়	৩-০০
" "	৩য়	৩-০০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
" "	২য়	৬-০০
" "	৩য়	৮-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
মানিক গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-৩০
" "	২য়	৪-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	৪র্থ	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	৩য়	৪-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী—		৩-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী—		৫-০০
স্কট গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী—	৩য়	৩-০০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ে গ্রন্থা:—		৪-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী— ২য়	৪-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী—	৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ১ম	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ২য়	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা: ১ম	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:— ২য়	৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী—	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ১ম	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৩য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৪র্থ	৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী—	৪-০০
" " " —২য়	৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—	৬-০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী—	৪-০০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:—২য় ভাগ	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৩য়	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৫ম	৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—	৫-০০
কথাসরিৎসাগর—১ম ভাগ	৪-০০
" —২য় ভাগ	৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী— ১ম, ২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড	৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড—	৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী—২য়	৪-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—	৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা—২য় ভাগ	৫-০০
অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী—২য়	৩-০০
" " " —৩য়	৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী—	৩-০০
নবীন সেনের গ্রন্থাবলী—	৭-০০

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস —২য় ভাগ	৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থা:—১ম	১০-০০
অরুণ বহ্নি—	৪-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী—	৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর—	৩-৫০
পরলোক—	৪-৫০
পরলোক রহস্য—	২-২৫
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব—	৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়—	১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা—	৩-০০
ভারত প্রতিভা—	৫-০০
প্রতাপাদিত্য—	৩-০০
সাধক কমলাকান্ত—	২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার—	৩-০০
নানার মা—	৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ—	৩-০০
বিক্রমাদিত্য—	৩-০০
বিসমার্ক—	২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী	৩-০০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—	২-০০
মাধবী কঙ্কণ—	২-০০
শিবরাম গ্রন্থাবলী—	৪-০০
বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ— ১ম	৪-০০
যৌন-মনোদর্শন	
৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ	৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া	৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ত-কালিকত্বের ব্যাপারসমূহ	৪-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—১ম	৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবী গ্রন্থাবলী—২য়	৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী—	৮-০০
ANANDAMATH (শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)	৪-০০
DAVID HARE	৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

10 OCT 1969

সে কি! তুমি এখনও ব্যবহার করনি?
কিন্তু কুকমী না হলে আমার রাঁধতে মন চায় না
কুকমী
গুঁড়া মশলা
স্বাদে গন্ধে বিশুদ্ধতায়
এর তুলনা হয় না!
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
পোস্তা • কলিকাতা-৭
মিল - কাশীপুর

সাপ্তাহিক বসুমতী

যুক্তফ্রণ্টে সংকট ?

বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে সি পি এম-বাংলা কংগ্রেসের বিরোধ তীব্রতর : নতুন স্বাস্থ্য-অধিকর্তা নিয়োগের প্রশ্নে আর এস পি দলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কর্তৃক পদত্যাগের হুমকী

৭৪ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৯শে আশ্বিন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] -DEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 17. 16th Oct.,

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১০২৭
আজকের মানুষ		১০২৮
কলকাতায় গান্ধীজীর প্রথম বক্তৃতা : গোখলের ধন্যবাদ-জ্ঞাপণ	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১০২৯
বই-বাছাই—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	১০৩৭
বঙ্গদর্শন		১০৩৯
ভারতদর্শন		১০৪২
আন্তর্জাতিক		১০৪৪
সপ্তাহের ঝোঁক	কৃত্তিবাস ওঝা	১০৪৬
যুক্তফ্রন্ট সরকার পদাঙ্কপথে	শ্রীসর্বদর্শী	১০৪৮
ভোর (কবিতা)	সুনন্দা দাশগুপ্ত	১০৪৯
হাজার নদী যখন (কবিতা)	মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত	১০৪৯

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	১০৫৩
রূপযেলা		১০৫৪
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল জানা	১০৫৫
মাজকের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত	তুষার চট্টোপাধ্যায়	১০৫৯
ভাঙ্গাতলা (গল্প)	ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৬২
তিমিরপ্রান্ত ভগ্নাংশ	অগ্নিবর্ণ	১০৬৭
গ্রামবাংলার কথা	অসীম মুখোপাধ্যায়	১০৭০
শহর কলকাতা	শহরদর্শী	১০৭৩
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	১০৭৪
রূপজগৎ		১০৭৭
পাঠকমন		১০৮২
খেলাধূলা	শান্তিপ্রিয়	১০৮৩

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে ॥—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। ... এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বায়রনের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।...... বায়রনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।...... নবীনবাবুর যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাকবি

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ॥ কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০৮।

সাত টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

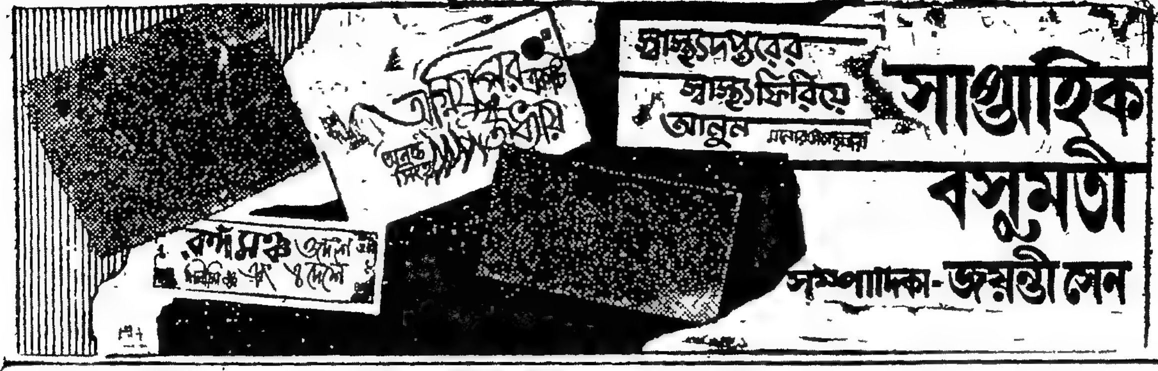

৭৪ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ২৯শে আশ্বিন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ | Thursday, 16th October, 1969

শারদোৎসব

এই তো দু'দিন আগেই মেঘের তর্জন-গর্জনে হৃৎকম্প সুরু হয়েছিল। কিন্তু শরৎ ঋতুর এমনি বৈশিষ্ট্য—সে আবার হাসতে সুরু করছে। সংগে সংগে শারদোৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত লোকগুলির মুখে হাসি দেখা দিয়েছে। এভাবেই আমরা শরতের লুকোচুরি খেলা দেখে আসছি। তাতেই আমরা মুগ্ধ হই। তারই মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করে উৎসব।

প্রকৃতির রাজ্যে শরৎ ঋতুর ঐ আলো-ছায়ার দিকটিই আমাদের কাছে মধুর মনে হয়। শরৎ ঋতুতে যে কাশ-শিউলি-অপরাজিতার নামে উচ্ছ্বসিত হই, সেসব শহরে তো চোখেই পড়ে না, গ্রামেও প্রায়-বিলীয়মান অবস্থা। তা সত্ত্বেও শরৎ ঋতুতে মেঘ মাটির স্নেহস্পর্শে আন্দোলিত হয় নতুন ধানের মঞ্জরী। সেখানে সবুজ ঢেউয়ের কবিত্ব জাগলেও, মৌল সম্পর্ক গ্রাসাচ্ছাদনের। কিন্তু তা অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন। তবু শরতের আহ্বানেই আছে আগামী দিনের নবান্নে ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণের সুর। অবশ্য বিষয়টি বড়ই হেঁয়ালি মনে হবে তাঁর কাছে, গ্রাম যাঁর কাছে আজো সুদূর।

এতদ্‌সত্ত্বেও বলতে দ্বিধা নেই—গ্রামে গ্রামে এখনো সর্বজনীন পূজার আড়ম্বর নেই। সেখানে একশ্রেণীর মানুষ আজো অসীম দারিদ্র্যে দিন যাপন করছে। পূজামণ্ডপে আজো তাঁদের প্রবেশাধিকার নেই। সারা কলকাতা বা ছোটখাট কোনো শহরে সর্বজনীন পূজোর রূপ দেখে বাহ্যিক খুশি হই। কিন্তু ভিতরে কোথায় যেন ফাঁকা-ফাঁকা একটা নীরব ভাব। কারো সংগে কারো মিল নেই। আর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এরই নাম শারদোৎসব।

"হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।" একথা কবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় বলে গেছেন এবং এও বলেছেন যে, 'মাতৃহারা মা যদি না পায় তবে আজ কিসের উৎসব?'

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন এবং বাস্তব ঘটনা আমরা দু'চোখে দেখে আসছি—তবু মানুষ হিসেবে আমাদের চৈতন্য হয় নি। আমরা উদ্বোধনে ব্যস্ত হই লোকজন ডেকে, কিন্তু নিজেদের চিত্তের উদ্বোধন ঘটে না।

এই অবস্থার জন্য দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সৌভাগ্য, আর কোটি কোটি মানুষ নিরন্ন অবস্থায় আজো দিন কাটাচ্ছে।

মুষ্টিমেয় মুনাফাশিকারীর হাতেই অসহায় মানুষের জীবন। সে জীবন নিয়ে তারা ছেলেখেলা করছে।

উৎসবের তাৎপর্য এই যে, মানুষ মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে গ্রহণ করে হৃদয়ের আনন্দ আদান-প্রদান করবে। সেকালের উৎসবের যেটুকু পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে জেনেছি যে, গোয়ালা, তাঁতি প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ ব্যবসা করতেন কিন্তু উৎসব-মুহূর্তে কখনো কোনো খরিদ্দারকে মুনাফার শিকার হিসেবে মনে করেন নি। একালে ব্যাপার উল্টো। শারদোৎসবের প্রাক মুহূর্তে সমস্ত জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং গরীব খরিদ্দারদের গলা কাটার জন্য তারা যেন বিরাট ফাঁদ পেতেছে।

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে উৎসবের অর্থ কি? উৎসব যদি সর্বজনীন আনন্দের রূপ পরিগ্রহ না করে—তাহলে উৎসব করে লাভ কি? পাশের বাড়ির ছেলে যদি দেখে যে, তার মাতা-পিতা নিঃসম্বল অবস্থায় তাকে একটা ছেঁড়া প্যান্টও দিতে পারে নি, অথচ তারই চোখের সামনে বিলাসিতার বন্যা বয়ে যাচ্ছে, তাহলে উৎসব সম্বন্ধে তথাকথিত জাতির ভবিষ্যৎ ঐ ছেলের মনে কি ধারণা হতে পারে?

এবার তো সাড়ম্বরে কলকাতা মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই মেলার আকর্ষণ খবরের কাগজে পড়ে ভ্রমণকারীদের চোখে রঙ ধরবে, আন্দাজ করা যায়। কিন্তু কলকাতা শহরের রাজপথে আবর্জনার স্তূপ, যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড় দেখে তাঁদের নেশা ছুটে যাবে না তো? তাছাড়া গোণাগুণতি কদিনের জন্য শহরকে সুন্দর করে তারপর কি হবে?

মোদ্দা কথা, বাইরে আমাদের উৎসবের আনন্দে জয়ঢক্কা, কিন্তু উৎসবকে সুন্দর করে তোলার জন্য কোনো পরিকল্পনা আমাদের নেই। তাই শারদোৎসব শেষ হতে না হতেই সেই তিমিরেই পুনরাবর্তন। আমরা চাই, এ অবস্থার শেষ হোক; নেমে আসুক প্রত্যেকের জীবনে শারদোৎসব। তবেই হবে যথার্থ উৎসব।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতি—ব্যবস্থা হিসেবে ভালই। আজকের সভ্য দুনিয়ার লক্ষ্য ও আদর্শই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা। কিন্তু গণতন্ত্রের সার্থক সাফল্যের জন্যে যে সহিষ্ণুতা, ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, সকল রাজনৈতিক দল ও নেতা কি ততখানি উদারতা দেখাতে প্রস্তুত আছেন? কেরালার বিতর্কিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী বি ওয়েলিংডনকে কেন্দ্র করে এ-জরুরী প্রশ্নটিই আজ ভারতের রাজনৈতিক মহলে দেখা দিয়েছে। কেরালা বিধানসভায় এই মর্মে এক বেসরকারী প্রস্তাব পাশ হয়েছে যে, শ্রীওয়েলিংডনের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করার জন্যে ১৫ দিনের মধ্যে হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত বিচারকের ওপর ভার দেওয়া হোক। সি-পি-আই (এম) এ-প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হন নি, তাঁরা স্পীকার শ্রীদামোদরন পত্তির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তোলার তোড়জোড় করছেন। অন্যদিকে সি-পি-আই, আর-এস-পি, মুসলিম লীগ, আই-এস-পি যে-চারটে দল বিধানসভায় ওই প্রস্তাব এনেছেন, তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন যে, নির্ধারিত দিনের (১৮ অক্টোবর) মধ্যে যদি সরকার তদন্তের আদেশ না দেন, তাঁরা সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবেন। অর্থাৎ ওয়েলিংডনের কারণে কেরালার যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংকট চরমে উঠেছে।

শ্রীওয়েলিংডনের পক্ষ সমর্থনের জন্যে যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট দল যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বা তার অস্তিত্বকে বাজি রেখেছেন, উনি কিন্তু সে দলের টিকিটে নির্বাচন জেতেন নি। শ্রীওয়েলিংডন কমিউনিজমে বিশ্বাসী নন, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট তিনি নন। বরঞ্চ কমিউনিস্টদের থেকে তাঁর শতেক যোজন দূরত্ব। ইনি ছিলেন কংগ্রেস, হয়েছেন কর্ষক থোজিলালি। যুক্তফ্রন্ট ভুক্তির পর মার্ক্সবাদীদেরই সঙ্গে তাঁর মাখামাখি। নাস্তিকদের সঙ্গে নাড়া বেঁধেও ওয়েলিংডন সাহেব যেন এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেন-না যে তিনি গোঁড়া খৃস্টান ক্যাথলিক।

কুইলন শহরের উপকণ্ঠে ওয়েলিংডনের জন্ম। বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেটি স্কুলে-কলেজে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের তখন শেষ পর্যায়। আন্দোলনের পুরোভাগে জাতীয় কংগ্রেস। তারই ছাত্রশাখা ছাত্রকংগ্রেসের কিশোর সংগঠক ওয়েলিংডন। স্কুল ছেড়ে কলেজের বৃহত্তর পরিবেশে এলেন, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র। গ্র্যাজুয়েট হবার পর ওয়েলিংডনের কর্মপরিধি বিস্তৃততর

শ্রীওয়েলিংডন

হল। শ্রমিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। কেরালার কৃষি-মজুরদের সংগঠিত করতে লাগলেন। দেশ স্বাধীন হবার পরে ওয়েলিংডন আই-এন-টি-ইউ-সি'র কেরালা শাখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রমিক আন্দোলন চালাতে থাকেন।

অবশ্য স্নাতক হবার পরে কিছুদিন ওয়েলিংডনকে স্থানীয় এক স্কুলে শিক্ষকতা করতে হয়েছিল। কিন্তু মানুষগড়ার কাজে তাঁর যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ১৯৫২ সালে কুইলনের আই-এন-টি-ইউ-সি'র সংগঠক হিসাবে তাঁর খ্যাতি রীতিমত ছড়িয়ে পড়েছে।

কেরালার শ্রমিক-মধ্যবিত্তদের ওপর কমিউনিস্টদের প্রভাব দেশ স্বাধীন হবার আগে থেকেই। কিন্তু খৃস্টানরাও যাতে কমিউনিস্টদের খপ্পরে না পড়ে তা দেখার দায়িত্ব যেন ওয়েলিংডনের ওপরেই। যে-ক্যাথলিক ধর্মগুরু ব্রাদার ভাদাক্কান এখানে কমিউনিস্ট-বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তুলেছিলেন, ওয়েলিংডন হলেন তাঁর ডান হাত। কেরালার অধিবাসীদের একটা বড় অংশই খৃস্টান। বিদেশী মিশনারীরা সমুদ্রপারের দরিদ্র প্রদেশটিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর গোঁড়া খৃস্টানরা কমিউনিস্টদের আবার সুনজরে দেখেছেন কোথায়, কবে? ব্রাদার ভাদাক্কানের নেতৃত্বে খৃস্টান ক্যাথলিকরা যখন কেরালা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিয়ে এখানকার রাজনীতিকে জটিল শুধু নয়, বিষিয়ে তুলল, তখন চারদিক থেকে দাবির সুউচ্চ ধ্বনি শোনা গেল মিশনারীদের রাজনীতি করা চলবে না। বাধ্য হয়ে ভাদাক্কানকে রাজনীতি ছাড়তে হল। কিন্তু ওয়েলিংডন দ্বিগুণ রোষে কমিউনিস্ট-বিরোধী ফ্রন্ট চালিয়ে যেতে লাগলেন, সংস্থার প্রেসিডেন্ট তো তখন তিনিই। ওয়েলিংডনেরই নেতৃত্বে সংস্থাটি কেরালার প্রথম কমিউনিস্ট-বামপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৫৯ সালের মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু কংগ্রেসী কার্যকলাপে শেষ পর্যন্ত ওয়েলিংডন সাহেবেরও মোহমুক্তি ঘটল। বহু ভূমিহীন দরিদ্র চাষীরা এখানকার বনাঞ্চলের কিছু কিছু জমি দখল করেছিল যাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল ক্যাথলিক। কিন্তু কংগ্রেস যখন বেআইনী জবরদখলের বিরুদ্ধে গেল, চাষীদের উৎখাত করল, তখন ওয়েলিংডনের ক্যাথলিক মন বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ব্রাদার ভাদাক্কানকে নিয়ে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করলেন অচিরেই। ক্যাথলিক কৃষিজীবীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে গড়ে তুললেন নতুন রাজনৈতিক সংগঠন, কর্ষক থোজিলালি পার্টি।

এখানেই ওয়েলিংডনকে শত্রুর সাথে হাত মেলাতে হল, কৃষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগঠিত আন্দোলন বলতে কমিউনিস্টরা ছাড়া আর কোন্ দল আন্তরিকতার সঙ্গে করেছে? কমিউনিস্টদের কাছাকাছিই যদি এলেন ওয়েলিংডন, তবে আর বিরোধ কেন? ই-এম-এস নাম্বুদ্রিপাদ সুযোগ নিতে ভুল করলেন না। ১৯৬৫ সালের মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনে কে-টি-পি'কে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত করলেন। সেই থেকে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টদের সঙ্গে ওয়েলিংডনের সহবৎ, দহরম-মহরম সব কিছু।

কিন্তু বিগ্ ব্রাদার কি ওয়েলিংডন সাহেবকে এযাত্রা বাঁচাতে পারবে? তা যদি করেনও গণতন্ত্র বাঁচবে তো?

কলকাতায় গান্ধীজীর প্রথম বক্তৃতা

গোখলের ধন্যবাদ-ভাষণ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

রবিবার, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯০২ তারিখে কলিকাতা টাউন হলে মিঃ এম কে গান্ধী তাঁর "দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। যথেষ্ট সংখ্যায় আগ্রহী দর্শক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন।

মিঃ এম কে গান্ধী নিম্নের কথাগুলি বলেন ঃ

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, ভদ্রমহোদয়গণ, বন্ধুগণ, এবং সতীর্থ ছাত্রগণ! আপনারা জানেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রায় ভারতবর্ষের মতই বৃহৎ। আমার বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হবে উত্তমাশা অন্তরীপ, নাটাল, ট্রানস্‌ভাল ও অরেঞ্জ রিভার—এই উপনিবেশগুলি। প্রথম উপনিবেশ দুটিতে দায়িত্বশীল সরকার আছে, শেষোক্ত দুটিতে আধা-সামরিক শাসন। দক্ষিণ আফ্রিকা চমৎকার দেশ, অসাধারণ তার জলবায়ু। এক সময়ে তো ইউরোপের ক্ষয়রোগগ্রস্তদের স্বাস্থ্যনিবাসের মত ছিল জায়গাটি। অপূর্ব এর প্রাকৃতিক দৃশ্য। মাসের পর মাস বিনা ক্লান্তিতে অন্তরীপের উপরে-সমতলে পাহাড়গুলিতে আবিষ্কারের আনন্দে ঘুরে বেড়ানো যায়। ডারবান থেকে নাটালের মারিজবুর্গ পর্যন্ত যাত্রাপথটি পাহাড় ও উপত্যকার মধ্য দিয়ে গিয়েছে, বৃক্ষলতা-গুল্মে তা পরিকীর্ণ। নাটালকে সঙ্গতভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্যান বলা হয়, যেমন ডারবান তার স্নান-সৈকতের রাণী-ভূমি।

এই দক্ষিণ আফ্রিকা পূর্বে, এবং বর্তমানেও, বিখ্যাত জুলু জাতির স্বদেশ। তাদের স্ত্রী-পুরুষের আকার উন্নত ও সুন্দর। পাইনটাউনের ট্রাপিস্ট মঠ থেকে যেসব জুলু বালক শিক্ষা নিয়ে বেরোয়, তারা সব দিকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে—তাদের মধ্যে নীতিবোধ যেমন দৃঢ়প্রোথিত হয়, তেমনি তারা বাস্তব কাজে-কর্মে পারদর্শিতা অর্জন করে। এ মঠে ১৩০০ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী আছেন। পুণ্যকর্মে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। যে-স্থানটি একদিন বিজন প্রদেশ ছিল তাঁদের পরিশ্রমের ফলেই তা এখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সুন্দরতম স্থানের অন্যতম হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানটি যেন মৌচাক-বিশেষ। সেখানে দেখা যাবে নানা কারখানায় জুলু বালকেরা চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, ছাপার কাজ করছে, মেয়েরা করছে সেলাই, নক্সা বা জ্যাম-তৈরি প্রভৃতি কাজ। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা স্থায়ী মৌনব্রত গ্রহণ করেছেন, একমাত্র মঠাধ্যক্ষের অনুমতিতে তাঁরা মৌনভঙ্গ করতে পারেন। আপনারা শুনে আগ্রহবোধ করবেন যে, ট্রাপিস্টরা সকলেই নিরামিশাষী এবং তাঁরা মাদক-বর্জন করেছেন। অন্য কারণে যদি নাও হয় এই পবিত্র মঠটির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা দর্শন করার যোগ্য স্থান।

এমনই এক দেশের সঙ্গে এক লক্ষ ভারতীয়ের ভাগ্য জড়িত। বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশ থেকে তাঁরা সেখানে গিয়েছেন।* প্রথম দুই প্রদেশ থেকে নাটালে চুক্তিবন্ধ শ্রমিকেরা গেছে, আর শেষোক্ত প্রদেশ থেকে গেছে ব্যবসায়ীরা। শেষোক্তরা ধর্মে প্রধানত মুসলমান, সুরাট, রনদের, পোরবন্দর এবং কচ্ছন জেলার অধিবাসী। চুক্তিবন্ধ শ্রমিকদের চুক্তি-মেয়াদ পাঁচ বছরের। স্বর্গত স্যার উইলিয়াম হাণ্টার এই ব্যবস্থাকে প্রায় ক্রীতদাস-ব্যবস্থা বলেছেন। এই ধরনের শর্তবন্ধ শ্রমিকদের যে ক্লেশ স্বীকার করতে হয়, সাধারণ মানুষ কখনো স্বেচ্ছায় তাকে বরণ করবে না। এসব কথা মেনে নিয়েও আমি বলব, নাটালে চুক্তিবন্ধ শ্রমিকদের অবস্থা অন্যান্য শ্রমিক-আমদানী-করা উ প নি বে শে র শ্রমিকদের অবস্থার চেয়ে কম খারাপ। সেদিন পায়োনীয়ার কাগজ মন্তব্য করেছে যে, প্রত্যাবৃত্ত ভারতীয়রা কয়েক হাজার পাউণ্ড সঙ্গে নিয়ে এসেছে—তাদের অভাব-অভিযোগের বিষয়ে এটাই চরম উত্তর। কিন্তু পায়োনীয়ারের ঐ যুক্তির ভ্রান্তি আপনারা সহজেই বুঝবেন। অসন্তোষ চুক্তিবন্ধ শ্রমিকদের নয়, মুক্ত মানুষদেরই। তাই বলে একথা অস্বীকার করছি না যে, মুক্ত ভারতীয়রাও জীবিকানির্বাহ করে এবং টাকা জমায়। মূল ব্যাপার হল, সর্বপ্রকার বিরক্তিকর আইনের দ্বারা ভারতীয়দের কর্মপ্রচেষ্টাকে নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

নাটালের 'বহিরাগত-নিরোধ আইন' অনুযায়ী যেসব প্রবেশেচ্ছু মানুষ কোনো ইউরোপীয় ভাষায় ফর্ম ভর্তি করতে অসমর্থ নাটালে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আপনাদের কাছে ইংরাজী জানা বিশেষ কিছু কষ্টের বিষয় নয়, কিন্তু যেসব উদ্যোগী ভারতীয় ব্যবসায়ী ঐ জায়গায় যেতে চায়, যারা যথেষ্টই মর্যাদাসম্পন্ন, তাদের কাছে ওটি কঠিন ব্যাপার, কারণ তারা কোনো ইউরোপীয় ভাষা জানেই না। 'ডিলারস্‌ লাইসেন্স অ্যাক্টে'র দ্বারা লাইসেন্স অফিসারদের হাতে চরম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তার ফলে সেখানে ভারতীয়দের অবস্থা সব সময়ই অনিশ্চিত ও সংকটপূর্ণ। এক সময়ে ছিল—ভারতীয় হলেই লাইসেন্স বরবাদ। এখন অফিসাররা যদিও কিছুটা বিবেচনা দেখাচ্ছেন; তাহলেও অনিশ্চয়তা যায় নি, ভাগ্যে কি আছে সেই দুশ্চিন্তা প্রতি বছর ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ভোগ করতে হয়। মিঃ চেম্বারলিনের সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবকে ধন্যবাদ, তাঁর জন্য এই আইন বহিরাগত সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য. কিন্ত কার্যকালে

---

* এই সময়ে সাধারণভাবে বাংলা বলতে পূর্ব ভারত, মাদ্রাজ বলতে দক্ষিণ ভারত এবং বোম্বাই বলতে পশ্চিম ভারত বোঝাত।

দেখা যায়, বেছে বেছে ভারতবাসীদের বিরুদ্ধেই আইন জারি করা হচ্ছে।

অপরাপর বিধিনিষেধও রয়েছে। তাদের মধ্যে এখানে শিক্ষাগত বিধিনিষেধের উল্লেখ করতে পারি। এই উপনিবেশে—বলা চলে সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকাতেই—ভারতীয় শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া শক্ত ব্যাপার। দরিদ্র শিশুদের জন্য স্কুল আছে, সেখানে তারা মাত্র প্রাথমিক শিক্ষা পেতে পারে। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে অসুবিধা দূর করতে নাটাল সরকার যদিও উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় বিদ্যালয় খুলবার ব্যবস্থা করেছেন, যেখানে ভালো ঘরের ভারতীয় ছাত্ররা শিক্ষা পেতে পারবে, তাহলেও তার দ্বারা সকল প্রয়োজন মেটে নি। মূল সরকারী স্কুলগুলির দরজা আমাদের ছাত্রদের কাছে বন্ধ। সুতরাং বলা চলে, উচ্চতর শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই সেখানে নেই।

উত্তমাশা অন্তরীপে ভারতীয় জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। সেখানেও আইনসভা সত্বর নাটাল সরকারের অনুরূপ আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব করেছে।

ট্রান্সভালে আমরা সাধারণভাবে জমি রাখতে পারি না, ব্যবসা করতে পারি না। ব্যতিক্রম যা করা হয় সে অন্ত্যজ জায়গার ক্ষেত্রেই। সেখানে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটবার অধিকারও আমাদের নেই। অরেঞ্জ রিভার কলোনীতে কুলিরূপে ছাড়া প্রবেশই করতে পারি না, তার জন্যও আবার বিশেষ অনুমতি লাগে।

এই সব অসুবিধার মূল কারণ, সেখানে ইংরেজী-জানা বিশ্বাসযোগ্য নেতার অভাব রয়েছে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা বক্তব্য বিনিময়ের কাজ করতে সমর্থ। এই রকম যোগসূত্রের অভাবের জন্যই ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়, যা ক্রমে বেড়ে উঠে ঐ ধরণের আইনের সৃষ্টি করে।

এখন, এই সব মন্দ জিনিস দূর করতে আমরা কী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি? দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের দেশবাসীর পথনির্দেশকরূপে দুটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। সেই নীতি দুটির উল্লেখ করার আগে আপনাদের সবিনয়ে বলছি, আপনারা বিশ্বাস করুন, ওগুলি হাততালি কাড়বার বচনমাত্র নয়, জীবন্ত জীবন-নীতি, এবং ধারাবাহিকভাবে সেগুলিকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়। অবশ্য যদি বলি, ঐ নীতি থেকে আমরা কখনও ভ্রষ্ট হই নি, তাহলে নিজেদের অতিমানুষ বলে দাবি করা হবে। কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে ঐ নীতি দুটি কার্যে পরিণত করবার আদর্শ হিসাবে আমরা গ্রহণ করেছি। প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছি আমরা, আর যখনই তা হয়েছি তখনই দুর্গতি ঘটেছে। ঐ দুটি নীতি হল ঃ এক, সত্যকে—পূর্ণ সত্যকে, সত্য ভিন্ন অন্য কিছুকে নয়—যে কোনো মূল্যে ধরে থাকতে হবে; দুই, প্রেমের দ্বারা ঘৃণাকে জয় করতে হবে। এই নীতিকে কার্যকর করবার জন্য ১৮৯৪ সালে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে, যার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে এটিও রয়েছে—"উপনিবেশে বসবাসকারী ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে আরও ভালো বোঝাপড়ার ব্যবস্থা করা।"

এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫০০। সদস্যদের কমপক্ষে বাৎসরিক চাঁদা দিতে হয় তিন পাউন্ড। স্বেচ্ছাসেবকেরাই প্রতিষ্ঠানের সব কাজকর্ম করেন; নিজের খরচে সেজন্য বহু দূরে সকল সদস্যই চাঁদা আদায়ে বেরিয়ে পড়েন; তার জন্য সকল অসুবিধা সহ্য করেন; নিজেদের খরচে সেজন্য বহু দূরে যেতে হয় তাঁদের; অপমানাদিও সহ্য করতে হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠান দুটি ভূসম্পত্তি কিনতে সমর্থ হয়েছে, যার আয় মাসে কুড়ি পাউন্ড। নিজ কর্মগত যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে এই কংগ্রেস প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য সংস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সরকার একে স্বীকার করে, এবং কাজের ব্যাপারে এর সাহায্য নেয়।

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত অপমান-লাঞ্ছনা ভারতীয়গণ সর্বদা নীরবে সহ্য করে।

নাটালের লোকজন যখনই কোনো ব্যাপারে অর্থ সংগ্রহ করে, ভারতীয়রা সানন্দে তাতে সাহায্য করে।

(বুয়র) যুদ্ধ বাধবার আগে আমাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই নিন্দা করে বলা হত, যুদ্ধবিগ্রহের মত যদি কিছু বেধে যায় তাহলে ভারতীয়রা খরগোসের মত ছুটে পালাবে, শান্তি ফিরে এলেই আবার উপনিবেশে এসে জুটবে, পরগাছার মত বাস করবার জন্য। অন্যান্যদের পক্ষে দুঃখজনকভাবে, ভারতীয়দের পক্ষে অবশ্য আমার মতে সৌভাগ্যজনকভাবে, যুদ্ধ বেধে গেল ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে। আমাদের স্বদেশীয়গণ তৎক্ষণাৎ মিলিত হয়ে বিশেষ বিচার-বিবেচনার পরে স্থির করলেন, যুদ্ধ-ব্যাপারে কোন্ পক্ষে ন্যায় কোন্ পক্ষে অন্যায় সে হিসাব না নিয়ে (বিচারের অধিকারী একমাত্র মহামান্য সম্রাট, তিনিই বিচার করবেন) তাঁরা সরকারের কাছে সাহায্যের প্রস্তাব করবেন, —সরকারের দৃষ্টিতে তাঁরা যত ক্ষুদ্রই হোন না কেন। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি এই, বৃটিশ প্রজা হিসাবে যদি তারা সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দাবি করেন, তাহলে দায়িত্বও তাঁদের গ্রহণ করতে হবে। ইউরোপীয় বণিক এবং চাকুরিয়ারা যখন নিজ ব্যবসাস্থান এবং চাকরির টেবিল ছেড়ে সাম্রাজ্যের সেবায় অগ্রসর হয়ে গেছে, তখন ভারতীয় সম্প্রদায়েরও অনুরূপ কর্তব্য সর্বপ্রকার স্থানীয় বৈষম্য ভুলে গিয়ে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব, তা করা। এই সূত্রে এক দল ইংরেজী-জানা ভারতীয় জানালেন, তাঁরা বিনা বেতনে যে-কাজ তাঁদের করতে বলা হবে যোগ্যতানুসারে তা করবেন। ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্স কোর-এর ক্ষেত্রে তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। প্রায় ১২০০ জন ভারতীয় স্ট্রেচার-বাহকরূপে সপ্তাহে এক পাউন্ড মাহিনায় কাজে যোগদান করলেন—স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা (স্বয়ং গান্ধীজী) কোনো মাহিনাই নিলেন না। অ্যাম্বুলেন্স কোর-এর কাজ এত উত্তম বিবেচিত হয়েছিল যে, জেনারেল বুলার তাঁর প্রেরিত বিবরণগুলির মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। এই কাজ ঔপনিবেশিকদের দৃষ্টিতে ভারতীয়দের মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

নাটালে ভারতীয় বসবাসকারীরা স্বদেশ সম্পর্কে যে সেবা করেছেন তার উল্লেখও করা যায়। ১৮৯৭ এবং ১৯০০, এই দুই বছরই ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। মুক্ত ভারতবাসীর সংখ্যা যদিও কয়েক হাজার মাত্র, একবার ১২০০ পাউন্ড, অন্যবার ১৭০০ পাউন্ড অর্থ সংগৃহীত হয়। দরিদ্র ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে ১০০ পাউন্ড পর্যন্ত দান দিয়েছেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে একটি যুক্ত কমিটি গঠিত হয়, মহামান্য গভর্নর তার পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। ইউরোপীয়রাও উদারভাবে সাড়া দেন, নাটালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় স্যার জন রবিনসন, এবং অন্যান্য সংবাদপত্রের মালিকরাও দুর্ভিক্ষ কমিটির ব্যবহারের জন্য তাঁদের সংবাদপত্রে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন; ম্যাজিস্ট্রেট সহ ইউরোপীয় রাজকর্মচারিগণ সকলের কাছেই এমন কি কাফ্রীদের কাছেও চাঁদার আবেদন করেছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার অভিজ্ঞতার এই কিছু বিবরণ। ছবির উজ্জ্বল দিকটিই আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। সেদিক দিয়ে চিত্রটি অসম্পূর্ণ ও অসত্য। অন্য দিকও আছে। উভয় সম্প্রদায়েরই দুর্বলতার দিক আছে।

সে সব সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্র এখন নয়। কিন্তু আপনাদের সামনে বিনীতভাবে আমি যা উপস্থিত করলাম, তা যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনাদের আশান্বিত করে তোলে, তাহলে আমার পরিশ্রমকে আমি সার্থক জ্ঞান করব। স্বর্গত স্যার উইলিয়ম হাণ্টার দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগকে সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত বলে গেছেন। এক্ষেত্রে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। স্বর্গত বিচারপতি রানাডে তাঁর বহুবিধ কাজকর্মের মধ্যেও আমাদের উৎসাহিত করার সময় পেয়েছেন। প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যাকে তিনি খুবই গুরুতর বিবেচনা করেন। তাঁর মতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় যাঁরা উভয় জাতির মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করার চেষ্টা করছেন তাঁরা খুবই প্রয়োজনীয় কাজ করছেন, এবং সর্বপ্রকার সাহায্য তাঁদের প্রাপ্য।

ধৈর্যের সঙ্গে আপনারা আমার কথা শুনেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ।

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বক্তার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

মাননীয় মিঃ গোখলের বক্তৃতা

মাননীয় মিঃ গোখলে ধন্যবাদ প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন—মিঃ গান্ধীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৯৬ সালে যখন তিনি পুণায় অল্প সময়ের জন্য গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে মিঃ গান্ধী তাঁর মনে যে ছাপ রেখেছিলেন তা এখনো তাঁর স্পষ্ট স্মরণে আছে। মিঃ গান্ধীর সামর্থ্য, ঐকান্তিকতা, বিচক্ষণতা এবং অতি মধুর অথচ অত্যন্ত দৃঢ় আচরণ, যা তাঁর চরিত্রের প্রধান আকর্ষণীয় জিনিস—এই সকলের জন্যই তাঁর মনে ঐ ছাপ পড়েছিল। তারপর থেকে বক্তা গভীরতম আগ্রহের এবং সবিশেষ প্রশংসার সংগে মিঃ গান্ধীর কার্যাবলী লক্ষ্য করে এসেছেন। তাঁর প্রতিটি উক্তির পর্যালোচনা করে এবং যে সব আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন সেগুলিকে লক্ষ্য করার পরে বক্তা কোনো প্রকার দ্বিধা না রেখে বলতে পারেন, মিঃ গান্ধী নামক মানুষটি সেই উপাদানে গঠিত যা দিয়ে বীরচরিত্র নির্মিত হয়। মিঃ গোখলে তাঁর শ্রোতৃবৃন্দকে চিন্তা করে দেখতে বলেন, ১৮৯৩ সালে মিঃ গান্ধী প্রথম যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় যান তখন তিনি কী ছিলেন আর এখন সেখানকার বৃটিশ-ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে কোন স্থান তিনি গ্রহণ করেছেন। মিঃ গান্ধী প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় যান এক মক্কেলের মামলায় পরামর্শ দিতে। সেই কাজে সেখানে তাঁকে এক বছর কাটাতে হয়। এই সময়ের মধ্যে তাঁর চরিত্র ও সামর্থ্য নাটালের ভারতীয়দের মধ্যে এমনই আশা-বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে যে, তাঁরা তাঁকে সেখানে থেকে যাবার জন্য চাপ দেন। মিঃ গান্ধী অবশ্য স্বদেশে ফিরতে ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু নাটাল সরকার ভারতীয়-বিরোধী আইন পাশ করলে ব্যাপারটা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল; তিনি তখন সেখানকার ভারতবাসীর ভাগ্যের সঙ্গে নিজ ভাগ্য জড়িত করে যথাসাধ্য তাদের সাহায্য করতে মনস্থ করলেন। সেইক্ষণ থেকে মিঃ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশ-ভারতীয়দের জন্য যে উৎসাহ, বিচক্ষণতা, সাহস এবং দায়িত্ববোধের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন, বক্তার মতে তা নিতান্ত বিরল। এই কাজ করার কালে নাটালের ইউরোপীয়দের কাছ থেকে যে তীব্রতম বিরোধিতা এসেছে, মিঃ গান্ধীকে তার সম্মুখীন হয়ে তাকে জয় করতে হয়েছে। বক্তা এইবার কিছু সময় নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৮৯৬ সালে মিঃ গান্ধীর অবতরণকালে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছিল তার বর্ণনা করেন। ঐ সময়ে বহু সংখ্যক ইউরোপীয় বলপ্রয়োগের দ্বারা তাঁর অবতরণ বন্ধ করতে চেয়েছিল, এবং পরে রাস্তায় তাঁকে দলবদ্ধভাবে মারধর করেছিল। এক্ষেত্রে মিঃ গান্ধী সম্বন্ধে মিঃ গোখলের প্রশংসার বিশেষ কারণ—দুই বৎসর পূর্বে ঐরকম ব্যবহার পাওয়া সত্ত্বেও মিঃ গান্ধীর মনে নাটালের ইউরোপীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিক্তভাবের লেশমাত্র নেই, অপরপক্ষে তিনি তাঁদের গুণগুলির সমাদর করতে, এবং যে সব ইংরাজ ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে উদার সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে সতত উৎসুক। বক্তা তারপর 'ইণ্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স কোর'-এর উল্লেখ করেন। বুয়র যুদ্ধ বেধে যাওয়ার পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় মিঃ গান্ধীই প্রধানত ওটি সংগঠিত করেন। এই অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠনের ফলে ভারতীয়দের সম্বন্ধে ইউরোপীয় মনোভাবের যে উন্নতি ঘটেছে তার বিষয়ে বক্তা উল্লেখ করেন। মিঃ গান্ধীর ঐকান্তিকতা, নীতিবোধ এবং নম্র সাদাসিধে আচরণের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার পরে মিঃ গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় মিঃ গান্ধীর কার্যাবলী থেকে কোন্ শিক্ষা পাওয়া যায় তার আলোচনা করেন। মিঃ গান্ধী প্রমাণ করেছেন—কঠিনতম প্রতিরোধকে জয় করা যায়, তিক্ততম ভুল বোঝাবুঝিকে দূর করা যায়, যদি আমরা নিজের কাছে খাঁটি থাকি, নিষ্ঠার সংগে নিঃস্বার্থভাবে সরল পথে কাজ করি এবং অপমানের বিরুদ্ধে অপমান, নিন্দার বিরুদ্ধে নিন্দাকে ফিরিয়ে না দিই। মিঃ গান্ধী তাঁর কাজের দ্বারা যথার্থই প্রমাণ করেছেন প্রেম ঘৃণার উপর জয়ী হয়। এসবের দ্বারা মিঃ গান্ধী ইংরাজের চোখে ভারতীয় চরিত্রকে উঁচু করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। এবার দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মিঃ গান্ধী যখন আসেন, তখন সেখানে খোলাখুলিভাবে স্বীকৃত হয়েছিল যে, তিনি সর্বসময়ে খাঁটি ভদ্রলোকের মতন আচরণ করেছেন, উভয় জাতির (ইউরোপীয় ও ভারতীয়) মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমাজের মর্যাদাকে উন্নীত করতে চেয়েছেন, এবং তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত বন্ধু। সর্বোপরি মিঃ গান্ধী ভারতের জনগণের কাছে কিভাবে তারা দেশের জন্য কাজ করতে পারে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ২৪ বছর বয়সে মিঃ গান্ধী নাটালে ভারতীয় সমাজের সংগঠনের ভার নিয়েছিলেন। ঐ বয়সে অধিকাংশ মানুষ শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করে কি করে না। প্রথম যে স্মারকলিপি তিনি প্রস্তুত করেছিলেন তা তাঁর বন্ধু ও শত্রু উভয়পক্ষের দ্বারাই উচ্চাঙ্গের দলিল হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। ঐ রচনার সুর ধীর স্থির, বন্ধুত্বপূর্ণ, অথচ অকাট্য অনবদ্য যুক্তিতে সমৃদ্ধ। যেভাবে যাত্রারম্ভ করেছিলেন, সেইভাবেই তিনি এগিয়ে চলেছেন। তার ফলে নাটালের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত মিঃ এস এসকোম্বের মত মানুষও, যিনি একদা অত্যন্ত ভারতীয়-বিরোধী ছিলেন, তিনি কালক্রমে ভারতীয় দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। হয়ত কোনো কোনো নাক-উঁচু অবিশ্বাসী ব্যক্তি বলতে পারেন, মিঃ গান্ধী অধিকাংশক্ষেত্রে অশিক্ষিত মানুষদের সংগঠিত করার সুযোগ পেয়েছেন, তাতে তাঁর সুবিধা হয়েছে, অপরদিকে যেখানে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাধিক্য সেখানে সবাই নেতা হতে চায়, অনুগামী আর পাওয়া যায় না। কিন্তু বক্তা বলতে চান, যদি এদেশের জনসেবকেরা অধিকতর ঐকান্তিকতা, অধিকতর নিঃস্বার্থতা, অধিকতর দায়িত্ববোধ দেখান, তাহলে তাঁরা আর নেতা হতে চাইবেন না, অপরপক্ষে তাঁরা মিঃ গান্ধীর মত ব্যক্তির নেতৃত্বে কাজ করতে পেরে সন্তুষ্ট ও গর্বিত হবেন, যাঁর নেতৃত্বাধীনে থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা নিজেদের কঠিন কর্তব্যের মধ্যে সত্যের উচ্চ গুণ, বন্ধুত্বের নমনীয় মনোভাব এবং দূরদর্শিতার অসাধারণ পরিচয় দিয়েছেন। যে সব তরুণ বন্ধু এই সভায় সমবেত হয়েছেন তাঁদের অনুসরণের জন্য মিঃ

গান্ধীর আদর্শ তুলে ধরতে মিঃ গোখলের কোনো দ্বিধা নেই। মিঃ গোখলে এমনও মনে করেন, মিঃ গান্ধী যদি এদেশে বসবাস করতে রাজী হন তাহলে সকল নিষ্ঠাবান কর্মীর পক্ষে মিঃ গান্ধীকে তাঁর যোগ্য-স্থানে অর্থাৎ শীর্ষদেশে স্থাপিত করাই উচিত হবে। এই সকল মন্তব্য করে মিঃ গোখলে ধন্যবাদ-প্রস্তাবের প্রশংসা করে সেটি যাতে সভায় সাদরে গৃহীত হয় তার অনুরোধ জানান।

॥ ৩ ॥

গোখলে-গান্ধী সম্পর্কের বিষয়ে এখানে কিছু বলে নেওয়া উচিত। আমরা জানি গান্ধীজী গোখলেকে তাঁর রাজনৈতিক গুরু বলে মনে করতেন। গোখলের কাছে গান্ধীজীর কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। যে সব উদ্ধৃতি আমরা উপস্থিত করেছি, তার থেকে দেখা যায়, গান্ধীজী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ভাগে গোখলের কাছ থেকে কি পরিমাণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেয়েছিলেন। ১৯১২ খৃস্টাব্দের শেষ ভাগে গোখলের উক্তি থেকে মনে হয়, গান্ধীজীর গোখলের প্রীতি পূজায় ও প্রণামে পরিণতি পেয়েছিল। এর ঋণ গান্ধীজীর পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। স্মরণ রাখতে হবে, সেকালের প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একমাত্র গোখলেই গান্ধীজীকে গোটাগুটি স্বীকার করেছিলেন। ১৯০১ সালে গোখলের বক্তৃতা থেকেই বোঝা যায়, সূচনা থেকেই তিনি গান্ধীর সম্বন্ধে কী মনোভাব পোষণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেখব, ভারতবর্ষের মাটিতে গান্ধী-প্রতিষ্ঠায় কংগ্রেসের উচ্চতর নেতৃবৃন্দের মধ্যে গোখলের ভূমিকাই সবচেয়ে বড়। এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর সংগ্রামেও গোখলের নৈতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক সাহায্য অল্প নয়।

গান্ধীজী গোখলেকে রাজনৈতিক গুরু বলে স্বীকার করতেন কোন্ দিক দিয়ে সে প্রশ্ন উঠতে পারে। গোখলে তাঁর জন্য অনেক কিছু করেছেন—এই কৃতজ্ঞতার উত্তরেই কি গান্ধীজীর ঐ স্বীকৃতি? একথা সত্য, গোখলের সঙ্গে গান্ধীজীর মনে অনেক বিষয়ে ঐক্য ছিল। গোখলের ধীরতা, বিচক্ষণতা, মানসিক প্রশান্তি, নীরব সেবার মনোভাব, এবং দেশের মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা গান্ধীজীর পছন্দের বস্তু ছিল। গোখলের মডারেট রাজনীতি, ইংরাজ-ভক্তি—এসব ক্ষেত্রেও গান্ধীজীর অনুরূপ মনোভাব। কিন্তু পার্থক্যের ক্ষেত্রও অল্প ছিল না। ইংরাজ-ভক্তি ও সাম্রাজ্যস্তুতির মধ্যেও গান্ধীজী সংগ্রামী, গোখলে সংগ্রাম ব্যাপারটাকে এড়িয়ে চলতেন। দায়ে পড়ে তিনি কখনো কখনো সংগ্রামকে সমর্থন হয়ত করেছেন, কিন্তু প্রথম সুযোগেই সে পথ ত্যাগ করেছেন। এসব ক্ষেত্রে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যও হয়েছে। অহিংস সত্যাগ্রহের নীতি গোখলের কাছ থেকে গান্ধীজী পান নি, সংগঠনী শক্তিও নয়, তাহলে গান্ধীজী গোখলের কাছ থেকে রাজনৈতিকভাবে পেলেন কী—প্রশস্তি ও প্রশ্রয় ভিন্ন? আমার তো মনে হয়, গান্ধীজীর উপর গোখলের প্রভাবের চেয়ে গোখলের উপর গান্ধীজীর প্রভাবই বেশি।

গোখলে গান্ধীজীর রাজনৈতিক গুরু কি না, এই সন্দেহ প্রকাশ করা হলে গান্ধীজী সে সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব দেখিয়েছিলেন। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে জনৈক পত্রলেখক বেনামী এক চিঠিতে অভিযোগ করেন যে, গান্ধীজী তিলকের পথ অনুসরণ করেও নিজেকে রাজনৈতিকভাবে গোখলের শিষ্য বলছেন। এর দ্বারা তিনি কপটতা করছেন। এই পত্র পেয়ে গান্ধীজী অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করেন। ১৯২১-এর ১৩ জুলাই তারিখে তিনি লেখেন, তিলকের প্রতি ভক্তি তাঁর অল্প নয়, তিলকের "বিশাল পাণ্ডিত্য, দেশপ্রেম, সর্বোপরি ব্যক্তিজীবনের পবিত্রতা ও বিরাট আত্মত্যাগ" তাঁর শ্রদ্ধার বস্তু, "আধুনিককালের সকল মানুষের মধ্যে তিনিই জনগণের কল্পনাকে সর্বাধিক আকর্ষণ করেছেন", তাহলেও রাজনৈতিকভাবে তিনি তিলকের অনুগামী নন। "আমি সচেতন যে, তাঁর পথ আমার পথ নয়।" গান্ধীজীর অবলম্বিত উপায়ের সাফল্যে তিলকের সন্দেহ ছিল। তাহলেও, গান্ধীজী জানালেন, স্বরাজের প্রতি তিলকের প্রবল আগ্রহের তিনি অংশীদার। "স্বরাজের সন্ধানে আমি তিলকের অগ্রণী শিষ্যদের পাশাপাশি চলব।"

গান্ধীজী বলতে চেয়েছিলেন, স্বরাজ-সাধনায় তিলকের নেতৃত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা থাকলেও তিনি তিলকের শিষ্য নন, কারণ শিষ্যত্ব ভিন্ন বস্তু। তা এমন কি পিতা-পুত্রের সম্পর্কের চেয়েও গভীরতর। গান্ধীজী লিখেছিলেন—"শিষ্যত্ব এক পবিত্র ব্যক্তিগত ব্যাপার। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে আমি দাদাভাই নৌরজীর পাদমূলে পতিত হয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম তিনি আমার থেকে অনেক দূরের মানুষ। আমি তাঁর সন্তানতুল্য হতে পারি, শিষ্য কদাপি নয়। শিষ্য সন্তানের চেয়ে বড় কিছু। শিষ্যত্ব নবজন্মের মত। শিষ্যের স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ। ১৮৯৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে আমি ভারতের প্রায় সকল পরিচিত নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। বিচারপতি রানাডে আমার মধ্যে ভীতি ও সম্ভ্রম জাগিয়েছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে আমি প্রায় কথা বলতেই পারি নি। বদরুদ্দিন তায়েবজি পিতৃসুলভ ব্যবহার করে আমাকে বলেছিলেন, আমি যেন রানাডে এবং স্যার ফিরোজ শা মেটার নির্দেশে চলি। শেষোক্ত জন আমার পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছাই আইন। কিভাবে আদেশ পালন করতে হয় তা তিনি শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর শিষ্য বলে গ্রহণ করেন নি। ...ডাঃ ভাণ্ডারকরকে আমি প্রায় পূজা করেছি, তাঁর ছিল জ্ঞানীর মুখমণ্ডল। কিন্তু আমার হৃদয়ে একটি ক্ষুদ্র সিংহাসন ছিল, তাতে তাঁকে স্থাপন করতে পারি নি। তা শূন্য ছিল তখনো। অনেক বীরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম কিন্তু হৃদয়ের রাজা কেউ নন।

"গোখলের ব্যাপারটা ভিন্ন দাঁড়াল, কেন তা বলতে পারব না। কলেজের মাঠের ধারে তাঁর বাসস্থানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। যেন কতদিন পরে পুরনো এক বন্ধুর দেখা পেলাম, না, তাও ঠিক নয়, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে মায়ের কাছে ফিরলাম। তাঁর কোমল মুখখানি মুহূর্তের মধ্যে আমার মনের স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিল। আমার নিজের বিষয়ে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কার্যাবলীর বিষয়ে তাঁর খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা অবিলম্বে আমার হৃদয়ের সিংহাসনে তাঁকে তুলে দিল। যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি, তখন বলেছি মনে মনে—'আমার মানুষ তুমিই।' দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৯০১ সালে আমার দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনের পরে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। তিনি তখন যেন আমাকে একেবারে দুহাতে তুলে নিয়েছিলেন; তারপর আমাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তৈরী করতে লাগলেন। আমি কিভাবে কথা বলব, কোন্ পোষাক পরব, কিভাবে চলব-ফিরব, খাব—সব বিষয়েই তিনি ব্যস্ত। আমার সম্বন্ধে গোখলে যতখানি উৎকণ্ঠিত আমার নিজের মাও তেমন ছিলেন না। আমাদের মধ্যে কোনো সংকোচের অন্তরাল ছিল না, অন্ততঃ আমার তাই মনে হত। বাস্তবিকই প্রথম দর্শনে প্রেমের মত ব্যাপার এটা, যা ১৯১৩ সালের কঠিন সংঘাতের মধ্যেও অটুট ছিল। রাজনৈতিক কর্মীর কাছে প্রত্যাশিত আদর্শের সবটুকুই তাঁর চরিত্রে দেখেছিলাম—স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, মেষের মত শান্ত, সিংহের মত বীর, এবং বীরের বেহিসেবী ঔদার্যে পূর্ণ। এইসব জিনিস সত্যিই তাঁর মধ্যে ছিল কিনা তাতে কিছু এসে যায় না, আমি যে তাঁর মধ্যে নিন্দাযোগ্য কোনো ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারি নি, তাই যথেষ্ট ছিল। রাজনৈতিক জগতে আমার কাছে তিনি তখনো

এবং এখনো সর্বাপেক্ষা নিখুঁত মানুষ। তাই বলে আমাদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না তা নয়। ১৯০১ সালে পর্যন্ত সামাজিক আচার-বিচারের ব্যাপারে, যেমন বিধবা বিবাহের ব্যাপারে, আমাদের মত-পার্থক্য ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনোভাবে পার্থক্য আছে দেখে-ছিলাম। অহিংসা সম্বন্ধে আমার চরম মতকে তিনি স্পষ্টই মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু এইসব পার্থক্য তাঁর কাছে বা আমার কাছে ধর্তব্যের বিষয় ছিল না। কোনো কিছুই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ ছিল না। আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে কী ঘটত, সে অনুমান আমার কাছে অপবিত্র প্রশ্ন ছাড়া কিছু নয়—তাঁর অধীনেই আমি কাজ করতাম। এই স্বীকারোক্তি আজ আমাকে করতে হল এই জন্য যে, বেনামা পত্রটি আমাকে আঘাত করেছে, রাজনৈতিক শিষ্যত্ব সম্বন্ধে আমার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভি-যোগ আনা হয়েছে। যিনি আর ফিরে

১৯০৯ সালে "হিন্দী পাঞ্চ" পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুন

এসে কথা বলতে পারবেন না তাঁর কাছে কি আমি ঋণস্বীকারের কর্তব্য পালন করছি না! গোখলের উদ্দেশ্যে আমার আনুগত্যের ঘোষণা ঠিক এখনি আমাকে করতে হবে যখন তিনি ও আমি, ভারতবর্ষে প্রচলিত কথা অনুযায়ী, বিরোধী শিবিরে রয়েছি।”

—অপূর্ব রচনা। গুরুর উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শিষ্যের যোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন। অনামা পত্রলেখকের অভিযোগের চূড়ান্ত উত্তর দেবার চেষ্টা গান্ধীজী করেছেন। কিন্তু, গান্ধীজীর অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করেও আমরা বলতে বাধ্য, চূড়ান্ত উত্তর দেওয়া হয় নি। পত্রলেখকের প্রশ্ন ছিল, স্বরাজের জন্য অসহযোগের সংগ্রামে নেমে গান্ধীজী কি রাজনৈতিক কর্মে গোখলের চেয়ে তিলকের প্রতি অধিক আনুগত্য দেখান নি, যেখানে গোখলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এই ধরণের সংগ্রামকে সমর্থন করত না? রাজনৈতিক শিষ্যত্ব বলতে কী বোঝায়? রাজনৈতিক মতে ও পথে কাউকে অনুসরণ না করলে কি তাঁর রাজনৈতিক শিষ্য হওয়া যায়? গান্ধীজী কি কখনই তাঁর মূল রাজনৈতিক প্রয়াসে গোখলের দ্বারা চালিত হয়েছেন? গান্ধীজীর কৈফিয়ৎ—রচনাটিতে অন্তত তার পরিচয় নেই—অন্যত্রও তা পাই নি।

আসলে গান্ধীজী ব্যক্তিগত আনুগত্য ও রাজনৈতিক আনুগত্যকে এক করে দেখেছেন। এখানে একথা বলে ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না যে, গান্ধীজীর ধর্মজীবন ও রাজনৈতিক জীবনে কোনো পার্থক্য ছিল না, সুতরাং ব্যক্তিগত আনুগত্য ও রাজনৈতিক আনুগত্য তাঁর কাছে একই বস্তু। তাই যদি হয় তাহলে যে-গান্ধীর কাছে অহিংসার চেয়ে বড় কিছু নেই, তিনি অহিংসার প্রশ্নে গোখলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হয়েও তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন কি করে, এবং কি করে বলতে পারলেন গোখলে জীবিত থাকলে তিনি তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতেন, যেখানে গোখলের নেতৃত্ব গান্ধীজীর নীতি বা বিবেকসম্মত না-ও হতে পারত?

সুতরাং একথা বলতেই হয়, গান্ধীজীর ‘মনের মানুষ’ হয়েই গোখলে গান্ধীজীর গুরু। গোখলের ব্যক্তিগত ভালবাসাই গান্ধীজীকে জয় করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা নিয়ে গান্ধীজী তখন ব্যস্ত, তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ তাতে জড়ে আছে, সংগ্রামীর একমুখিতা ও স্পর্শকাতরতা নিয়ে সাহায্যের জন্য তিনি স্বদেশে এসেছেন—তখন যাঁর কাছে প্রশ্রয় পাবেন তাঁর কাছেই লুটিয়ে পড়বেন—সেটাই স্বাভাবিক। গোখলের কাছে সেই প্রশ্রয় ও ব্যক্তিগত স্নেহস্পর্শ পেয়েছিলেন।

তাই গোখলে মুহূর্তের মধ্যে ‘এই সেই মানুষ!’১

গোখলে গান্ধীকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং জনজীবনে প্রবেশের পথ করে দিয়েছিলেন তার আরও সংবাদ দেওয়া যায়। ফার্গুসন কলেজের মাঠের ধারে গোখলের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৯৬ সালে একথা আগেই বলা হয়েছে। গান্ধীজীকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পরে সন্তুষ্ট হয়ে গোখলে পুণায় গান্ধীজীর বক্তৃতার আয়োজনে প্রচুর সাহায্য করলেন। গান্ধী প্রথমে গিয়েছিলেন তিলকের কাছে। তিলক তাঁকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রস্তাবিত সভার সভাপতিত্ব করার জন্য রাজনৈতিক সম্পর্কহীন ডাঃ ভাণ্ডারকরকে অনুরোধ জানাতে বললেন। গোখলেও তাই বলেন। ডাঃ ভাণ্ডারকরের সভাপতিত্বে পুণার সভা ক্ষুদ্র হলেও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

এর আগে গান্ধীজী বোম্বাইয়ে সভা সেরে এসেছেন। সেখানে বিচারপতি রানাডে, বদরুদ্দিন তায়েবজি, দীনশা ওয়াচা এবং ‘বোম্বাই সিংহ’ স্যার ফিরোজ শা মেটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। স্যার ফিরোজ বোম্বাইয়ের জাহাঙ্গীর কাওয়াসজী হলে তাঁর সভার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। জনাকীর্ণ সভায় বক্তৃতা করার কালে গান্ধীজী যখন ভয়ে কেঁপেছেন তখন স্যার ফিরোজ তাঁকে উৎসাহিত করেছেন, এবং তার জন্য গান্ধীজী বিশেষ কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিলেন। তিলকের সাহায্যের মনোভাবও তাঁকে সুখী করেছিল। কিন্তু গোখলে তাঁকে একেবারে

---

১ গোখলের কাছে গান্ধীজীর রাজনৈতিক শিষ্যত্ব-প্রসঙ্গ চিত্তরঞ্জনের কাছে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক শিষ্যত্ব-স্বীকারের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। উভয় শিষ্যত্ব কি একই ধরণের? সম্পূর্ণ এক নয় বলেই মনে হয়। এখানে একথা সহজেই বলা যায়, সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী কার্যকলাপ চিত্তরঞ্জন সমর্থন নাও করতে পারতেন। সে সম্ভাবনার কথা মনে রেখেও বলব—সুভাষচন্দ্র সত্যই চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক শিষ্য ছিলেন, যদিও সুভাষচন্দ্রকে বশীভূত করতে চিত্তরঞ্জনের রাজনীতির সঙ্গে অন্যতর বস্তুরও প্রয়োজন হয়েছিল—চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিমহিমা সুভাষচন্দ্রকে কম বেঁধে রাখে নি এবং যখন রাজনীতিতে মতপার্থক্য হয়েছে তখন সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক চিত্তরঞ্জনের চেয়ে মানুষ চিত্তরঞ্জনকেই বেশি বিশ্বাস করেছিলেন। তাহলেও চিত্তরঞ্জনের কাছে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক শিষ্যত্ব ব্যাপারটাই বড়। চিত্তরঞ্জন জীবিত থাকা পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র তাঁর অধীনেই কর্মী; বলা যায়, স্বরাজ্য পার্টির যুবক কর্মীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। গান্ধী-পদ্ধতির প্রতিবাদে চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দল যে-রাজনৈতিক পথ অবলম্বন করেছিল, তার প্রতি সুভাষচন্দ্রের সমর্থনের অভাব ছিল না। ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থে তিনি পুরোপুরি স্বরাজ্যনীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। চিত্তরঞ্জনের দেহান্তের পরে সুভাষচন্দ্র যে-পথ নিয়েছিলেন, তাতে চিত্তরঞ্জনের প্রতি শিষ্যত্ব কখনো ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন মনে করেন নি, কারণ চিত্তরঞ্জন হৃদয়ের মত বুদ্ধিতেও বিশাল। তিনি সংগ্রামে বিশ্বাস করতেন এবং একই সঙ্গে মনে করতেন, শত্রুপক্ষের সঙ্গে চুক্তি সংগ্রামেরই অংশ। গুপ্ত বিপ্লবের কার্যকারিতায় চিত্তরঞ্জনের সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামকে তিনি নীতিবিরোধী মনে করতেন এমন কথা আমরা জানি না। রাজনীতিতে তিনি অতিশয় রাষ্ট্রবাদী ছিলেন। ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের কোনো পথকেই বাস্তববাদীরা অগ্রাহ্য করতে পারে না এবং সশস্ত্র উত্থান ন্যায়সঙ্গত পথ। আততায়ীর বিরুদ্ধে সবলে প্রতিরোধ করাকে ভারতবর্ষ সর্বসময়ে ধর্মসঙ্গত মনে করেছে। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের কাছে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক শিষ্যত্বের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী কার্যকলাপের বিরোধের কথা ওঠে না। আরও একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়। সুভাষচন্দ্র যতদিন চিত্তরঞ্জনের কাছে ছিলেন, ততদিন তাঁর কোনো রাজনৈতিক দর্শন গড়ে ওঠে নি। কিছু রাজনৈতিক ধারণা তাঁর ছিল এবং তার নিয়ন্ত্রণে চিত্তরঞ্জনের হাতও ছিল। অপরপক্ষে গোখলের সঙ্গে ১৮৯৬ সালে গান্ধীজীর যখন প্রথম সাক্ষাৎ, তার মধ্যেই তিনি নেতা হয়ে উঠেছেন, এবং রাজনৈতিক জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে। গোখলে সেই জীবনদর্শনের গঠনে বা তার পরবর্তী রূপান্তরে কোনো অংশই নিতে পারেন নি। গোখলে শুধু মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং বিবেকবান মানুষের মুগ্ধতার অর্থ যা হয়, তাই দেখা গিয়েছিল—গোখলে গান্ধী-মহিমা প্রচার এবং গান্ধী-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারপর আরও দেখতে পাই, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক জীবনে গোখলে যখন বর্তমান, সেই সময়ে ভারতবর্ষ গান্ধীজীর কর্মক্ষেত্র নয় বলে স্বতঃই গোখলের নেতৃত্বে গান্ধীজী হাতে-কলমে কাজ করছেন না। সুতরাং খাঁটি অর্থে রাজনৈতিক শিষ্য বলতে যা বোঝায় গোখলের সম্পর্কে গান্ধীজী তা ছিলেন না, যেরকম ছিলেন সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের সম্পর্কে।

হরণ করে নিয়েছিলেন। "স্যার ফিরোজ শাকে মনে হয়েছিল হিমালয়তুল্য, লোকমান্য সমুদ্রবৎ, কিন্তু গোখলে যেন গঙ্গা। সেই পুণ্য বারিতে স্নান করে নির্মল হয়ে ওঠা যায়। হিমালয় দুরারোহ, সমুদ্র দুস্তর, কিন্তু গঙ্গা তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ডাক দেন।"

মাদ্রাজেও গান্ধীজীর মিশন সফল হয়। 'মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড', 'হিন্দু' প্রভৃতি পত্রিকা তাঁর বক্তব্য ফলাও করে ছাপে, মাদ্রাজের জননেতারা তাঁর বিষয়ে উৎসাহিত হন, পাচিআপ্পা হলে উৎসাহী দর্শকের সামনে তিনি দীর্ঘ ভাষণ দেন, এবং, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে তিনি যে 'গ্রীন প্যামফ্লেট' প্রস্তুত করেছিলেন, সভান্তে উৎসাহী শ্রোতাদের মধ্যে ঐ প্যামফ্লেটের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

অতঃপর কলকাতা। ২৭ বছরের সঙ্কুচিত শীর্ণ দিগ্বিজয়ীর উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল কলকাতা—ভারতের রাজধানী—পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি। কলকাতার রাজনৈতিক ও অভিজাত মহলে গান্ধীজী যে ঔদাসিকতা ও সৌজন্যের অভাব দেখেছিলেন, তা কখনো ভুলতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ, সম্ভবত পারেন নি। অপরদিকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে, বিশেষত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র-পরিচালকদের কাছ থেকে যে সমর্থন ও প্রচারসৌভাগ্য পেয়েছিলেন, তা তাঁর মনে অক্ষয় কৃতজ্ঞতায় রচনা লিখে দিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌখিক সহানুভূতি, অমৃতবাজার কর্তৃপক্ষের অবজ্ঞা এবং বঙ্গবাসী-সম্পাদকের রূঢ়তার বিবরণ গান্ধীজী দিয়েছেন: সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপনের প্রয়োজন নেই, শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিতব্য 'বিবেকানন্দ গান্ধী' রচনার মধ্যে তা উদ্ধৃত করেছি, কিন্ত নিতান্ত নীলরক্ত 'ইংলিশম্যানে'র সম্পাদক মিঃ স্যাণ্ডার্সের সঙ্গে গান্ধীজীর বন্ধুত্বের বিবরণ এখানে দেওয়া দরকার।

"(বঙ্গবাসীর সম্পাদকের সঙ্গে ব্যর্থ সাক্ষাতের পরে) আমি অন্য সম্পাদকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে চললাম। যথারীতি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করলাম। স্টেটসম্যান ও ইংলিশম্যান প্রশ্নটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলেন। তাঁদের পত্রিকার জন্য আয়োজিত দীর্ঘ সাক্ষাৎকার-বিবরণ তাঁরা গোটাগুটি তাঁদের কাগজে প্রকাশ করলেন।

"ইংলিশম্যানের সম্পাদক মিঃ স্যাণ্ডার্স আমাকে নিজস্ব মানুষ বলে গ্রহণ করলেন। তাঁর অফিস ও পত্রিকা কার্যতঃ আমার হাতে ছেড়ে দিলেন। এমন কি তিনি ঐ সমস্যার উপরে যে মুখ্য সম্পাদকীয় লিখেছিলেন তাতে ইচ্ছামত পরিবর্তনের অধিকারও আমাকে দিয়েছিলেন, প্রুফ তিনি আগে-ভাগে আমাকে পাঠিয়ে দেন। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, একথা বললে কিছু অত্যুক্তি করা হবে না। তিনি আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছিলেন...... সারাজীবনে এই ধরণের অনেক অপ্রত্যাশিত বন্ধুত্ব আমি পেয়েছি। মিঃ স্যাণ্ডার্স আমার মধ্যে অতিভাষণের প্রতি অনিচ্ছা ও সত্যের প্রতি প্রীতিকে বিশেষ পছন্দ করেছিলেন। আমার কাজের প্রতি সহানুভূতি জানাবার আগে তিনি খুঁটিয়ে জেরা করেছিলেন, এবং তিনি দেখেছিলেন যে, গোটা ব্যাপারটার নিরপেক্ষ একটা রূপ উপস্থিত করতে আমার ইচ্ছা বা চেষ্টার কোনো অভাব হবে না, এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয়দের সমস্যার বিষয়েও নয়। তাদের সমস্যাও আমি বুঝি।

"আমার অভিজ্ঞতা বলে, অপরের প্রতি সুবিচার করলেই আমরা সবচেয়ে দ্রুত সুবিচার লাভ করতে পারি।"

মিঃ স্যাণ্ডার্সের সমর্থনে উৎসাহিত গান্ধীজী ভেবেছিলেন, কলকাতায় তিনি সভা করতে পারবেন, করতেনও হয়ত, যদি না দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জরুরী তার পেয়ে তাঁকে সেখানে চলে যেতে হত।

১৯০১ সালে ভারতে ফিরে আবার তিনি কলকাতায় এলেন কংগ্রেস উপলক্ষে। এবারও শোচনীয় অভিজ্ঞতা। এই কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ দীনশা ওয়াচা। অভ্যর্থনা সমিতি খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সভাপতিকে কংগ্রেস শিবিরে নিয়ে গেল। গান্ধীজী অন্যান্য কিছু প্রতিনিধির সঙ্গে রিপন কলেজে রইলেন। সেখানে দেখলেন অব্যবস্থার চূড়ান্ত। স্বেচ্ছাসেবকেরা (বলাই বাহুল্য তারা প্রধানত বাঙালী) বিশৃঙ্খল, কেউ কারো কথা শোনে না, কাউকে মানে না, কাজের সময়ে তাদের পাওয়া যায় না। প্রতিনিধিদেরও যথেষ্ট দোষ ছিল, তাঁদের ফাইফরমাসের সীমা ছিল না। একেই তো শৌচাগারের অবস্থা শোচনীয়, সংখ্যায় সেগুলি অত্যন্ত অল্প, তদুপরি কিছু কিছু প্রতিনিধি রাত্রিকালে ঘরের সামনের বারান্দাকেই সাময়িক শৌচাগার হিসাবে ব্যবহার করতেন। নারকীয় অবস্থা। নোংরা পরিষ্কারের জন্য গান্ধীজী স্বেচ্ছাসেবকদের অনুরোধ জানালেন। যে-উত্তর পেলেন তাতে বুঝলেন স্বেচ্ছাসেনা যতক্ষণ পরিষ্কার পর্যন্ত অগ্রসর হবে না।

কংগ্রেসের যেসব বাঙালী কর্মকর্তাদের সঙ্গে গান্ধীজীর পরিচয় হয়েছিল, তাঁরা তাঁকে বিশেষ খুশি করতে পারেন নি। কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক জানকীনাথ ঘোষালের (স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী, সরলা দেবী চৌধুরাণীর পিতা) তো তিনি রীতিমত ক্যারিকেচার দিয়েছেন। কিছু কাজ করার প্রার্থনা নিয়ে তিনি শ্রীযুক্ত ঘোষালের কাছে গিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাকে কেরানীর কাজ মাত্র দিতে পারি, তুমি কি তা করবে?' গান্ধীজী যখন বললেন, 'নিশ্চয়ই, যদি না তা আমার সামর্থ্যের বাইরে হয়',—তখন জানকীনাথ আহ্লাদে বললেন, 'এই হল ঠিক মনোভাব।' তারপরে চারপাশের স্বেচ্ছাসেবকদের ডাক দিয়ে বললেন, 'শোন হে, তোমরা, এই ছোকরা কি বলছে।'

ঘোষাল মহাশয় গান্ধীজীর কোনো পরিচয় না নিয়েই তাঁর ঘাড়ে রাশিকৃত চিঠিপত্রের ভার চাপিয়ে দিলেন। গান্ধীজীর কাজে তিনি খুব খুশি হলেন। "তিনি বেশী কথা বলতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকে যেতে পারতেন। যখন তিনি আমার কাছ থেকে আমার ইতিহাস কিছু জেনে নিলেন তখন তিনি আমাকে কেরানীর কাজ করতে দিয়েছেন বলে বিশেষ কিন্তু-কিন্তু করতে লাগলেন।২ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আপনি বিব্রত হবেন না। কংগ্রেসের কাজ করে করে আপনার চুল পেকে গেছে। আপনি আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। বিশ্বাস করে এইসব কাজের দায়িত্ব আমার উপরে ছেড়ে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। আমি কংগ্রেসের কাজ করতে চাই, আর আপনি এইসব খুঁটিনাটি বিষয় বোঝার বিরল সুযোগ

---

২. জানকী ঘোষালকে গান্ধীজী যতখানি কৌতুক ও করুণার পাত্র করেছেন, গান্ধীজীর কথা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি সত্যই তার যোগ্য। দীর্ঘদিনের কংগ্রেস-সেক্রেটারী খবরের কাগজ পড়েন না—এ কখনো হয়! যদি হয়, তাহলে কি তিনি তামাসাযোগ্য নন? ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে স্টেটসম্যানে বিরাট আকারে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর লাঞ্ছনার খবর বেরিয়েছিল, তা না হয় তিনি না পড়লেন, ইংলিশম্যানও না পড়লেন, কিন্তু ১৯০১ সালের নভেম্বর মাসে বেঙ্গলীতে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চলে আসার সময়ে গান্ধীজীর বিপুল সংবর্ধনার যে দীর্ঘ বিবরণ বেরিয়েছিল, তা না পড়ে পারলেন কি করে? নিশ্চয় পড়েন নি। মনে হয় অসতর্ক স্বভাবের মানুষ তিনি ছিলেন: নচেৎ সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ছোকরার হাতে তার নাম-ধাম কিছু না জেনে কংগ্রেসের চিঠিপত্র সামলাবার দায় কখনো ছেড়ে দেন। গান্ধীজীর আঁকা স্বচিত্র সম্বন্ধে জানকী ঘোষালের কোনো উত্তর যতক্ষণ না পাচ্ছি, তা পাবার সম্ভাবনা কম, ততক্ষণ অগত্যা গান্ধীজীর কথাকেই নির্ভেজাল সত্য বলে মেনে নিচ্ছি।

আমাকে দিয়েছেন।' 'সত্যি কথা বলতে কি', শ্রীযুক্ত ঘোষাল বললেন, 'এই হল ঠিক মনোভাব। কিন্তু এখনকার ছোকরারা তা বোঝে না। আমি অবশ্য কংগ্রেসকে তার জন্মাবধি জানি। ঠিক বলতে গেলে, কংগ্রেসকে বর্তমান অবস্থায় আনার পিছনে মিঃ হিউমের সঙ্গে আমারও কিছু ভূমিকা আছে।'"

গান্ধীজীর ছিল সেবা করার অভ্যাস এবং শ্রীযুক্ত ঘোষালের সেবা নেওয়ার অভ্যাস। চাকর-বাকরে শ্রীযুক্ত ঘোষালের জামার বোতাম লাগিয়ে দিত। গান্ধীজী সেই সেবা-সৌভাগ্য যাচ্ঞা করেছিলেন এবং প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে শ্রীযুক্ত ঘোষাল তাঁকে তা দান করেছিলেন।

এই পর্যায়ে অন্তত বাংলাদেশে বা বাঙালীদের মধ্যে গান্ধীজী প্রশংসনীয় প্রায় কিছু দেখতে পান নি। একমাত্র ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনাড়ম্বর জীবন তাঁকে কিছুটা আকৃষ্ট করেছিল। রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ঐক্যের বস্তু পাওয়া সম্ভব হয় নি। বাঙালীর মধ্যে একদিকে মডারেটী রাজনীতির উচ্চভাষণ, কিংবা উগ্র ইংরেজ বিদ্বেষের অস্পৃশ্যার—কোনোটাই গান্ধীজীর মনঃপূত নয়। ইউরোপীয়দের হাতে লাঞ্ছিত হয়েও গান্ধীজী তাদের স্তুতি করতে পারেন—বাঙালীর সহজ বুদ্ধিতে ব্যাপারটির উচ্চতত্ত্ব ধরা পড়ে নি। গান্ধীজী যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের পীড়নের কথা জানিয়েছেন, তেমনি ফলাও করে বলেছেন সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যে তিনি কিভাবে অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠন করে ইংরেজ সরকারের সেবা করেছেন। ভারতবর্ষ তখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মধ্যে, প্লেগ মহামারীর মধ্যে। র‍্যান্ড ও আয়ার্স্টের হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে, সেই সূত্রে চাপেকার ভ্রাতৃগণের চরম দণ্ড ও তিলকের মত মানী ব্যক্তির অহেতুক লাঞ্ছনা ঘটেছে। এমনই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু ভারতীয় ব্যবসায়ীর স্বার্থ নিয়ে বেশি ব্যস্ত হওয়া শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে সম্ভব ছিল না—যখন গোটা ভারতবর্ষই শ্মশান ও কারাগার বিশেষ। ফিরোজ শা মেটার মত রক্ষণশীল নেতাও গান্ধীকে তীক্ষ্ণ কথা না বলে পারেন নি—"What rights have we in our own country? I believe, that so long as we have no power in our own land, you cannot fare better in the colonies."

গোখলে উল্টো জাতের মানুষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শুভশক্তিতে তাঁর অচল আস্থা। তিনি বুদ্ধিমান, হৃদয়বান, সুশান্ত যুক্তিতে আগ্রহী, তিনি দেশপ্রেমিক, কিন্তু একই সঙ্গে দারুণ ইংরাজ-ভক্ত। ইংরেজ জানত, গোখলেকে দিয়ে স্বকার্যসাধন করিয়ে নেওয়া যায়। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি কেন গান্ধীজীকে সমর্থন করেছিল? তা কি এইজন্য নয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু ব্যবসায়ী ভারতীয়ের নাগরিক অধিকারের সঙ্গে ইংরেজের সাম্রাজ্যস্বার্থের বিশেষ বিরোধ ছিল না, বিশেষত তার দ্বারা যখন 'আমি বড় ন্যায়বান ইংরেজ' এই খাতির পাওয়া যায়? সর্বোপরি, ভারতে যারা সাম্রাজ্য চালাচ্ছে তারা জানে, ভারতে সাম্রাজ্য বজায় রাখাটাই বড় কাজ। ভারতের মানুষ গরম হয়ে উঠবে যদি না প্রবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে মৌখিক সহানুভূতি জানানো যায়। ঐ সহানুভূতিতে কোনো খরচ নেই, বরং লাভের সম্ভাবনা, বিশেষত সাম্রাজ্যের

ভ্রম-সংশোধন

সাপ্তাহিক বসুমতীর এবারকার শারদীয় সংখ্যায় মনোরঞ্জন হাজরার "স্বর্ণশিমুলের চরে" উপন্যাসটির একেবারে শেষ লাইনটি মুদ্রণ প্রমাদবশত বাদ পড়ে গেছে। "কে জানে স্বর্ণশিমুলের' এই লাইনটির পর শেষ লাইনটি এই রকম হবে—"চর হয়তো এবার রক্ত শিমুলের চর হয়ে যাবে।" সাপ্তাহিক বসুমতীর সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ এটুকু সংশোধন করে নিলে বাধিত হব।

—সম্পাদিকা

বন্দনা-প্রতিযোগিতায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী (গান্ধীজীর স্বীকৃতি অনুযায়ী) যখন ঐ সহানুভূতি কামনা করছেন!

১৯০১ সালে ভারতবর্ষ যখন নৈরাশ্যে মথিত এবং ভিতরে গুমরে-ওঠা আক্রোশে তপ্ত, তখন গান্ধীনীতি সত্যই বাংলাদেশে সাড়া জাগাতে সমর্থ ছিল না। তিলক প্রভৃতির পিঠ-চাপড়ানি, ফিরোজ শা মেটা প্রভৃতির কৃপাদাক্ষিণ্য এবং বাঙালী নেতাদের অবজ্ঞার ঔদাসীন্যের মধ্যে গান্ধীজী একমাত্র উত্তপ্ত করস্পর্শ পেয়েছিলেন গোখলের কাছ থেকে। সেজন্য তাঁর কাছে চিরদিনের জন্য কেনা হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯০১ সালে কলকাতা কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রস্তাব উত্থাপন সময়ের কথাই স্মরণ করা যাক। বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে গোখলের চেষ্টাতেই ঐ প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি মিলেছিল। গান্ধীজীর বর্ণনায় ব্যাপারটা এই রকমঃ "বিষয়-নির্বাচনী সভায় প্রতিটি প্রস্তাবের পক্ষে দীর্ঘ বক্তৃতা হতে লাগল। সব বক্তৃতাই আপাদমস্তক ইংরেজীতে। সব প্রস্তাবের পক্ষেই সুপরিচিত নেতার বক্তৃতা। এইসব পুরাতন ভেরী-তূরীর মধ্যে আমার হাতে তো সরু বাঁশের বাঁশী। যতই রাত্রি বাড়তে লাগল ততই আমার বুকের ধুকধুকুনি বেড়ে চলল। শেষের দিকে, যতদূর স্মরণ হয়, বিদ্যুৎ বেগে প্রস্তাবের পর প্রস্তাব ছুটতে লাগল। প্রত্যেকেই সেরে দিয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত। রাত্রি এগারোটা, তখনো আমার কথা বলবার সাহস নেই। ইতিমধ্যেই গোখলের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি আমার প্রস্তাব দেখেছেন। সুতরাং তাঁর চেয়ারের কাছে এগিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বললাম, 'আমার জন্য দয়া করে একটা কিছু করুন।' তিনি বললেন, 'তোমার প্রস্তাবের কথা ভুলি নি। দেখতেই পাচ্ছ কিভাবে প্রস্তাব নিয়ে ওরা ছুটছে। কিন্তু তোমার প্রস্তাব এড়িয়ে যেতে আমি দেব না।' 'এবার তাহলে আমাদের কাজ শেষ হল কি বলেন আপনারা?' —ফিরোজ শা মেটা বললেন। গোখলে চেঁচিয়ে বললেন, 'না, না, এখনো দক্ষিণ আফ্রিকার প্রস্তাবটি বাকি আছে। মিঃ গান্ধী তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন।' ফিরোজ শা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি প্রস্তাবটি দেখেছেন?' 'নিশ্চয়ই।' 'আপনি কি সেটা পছন্দ করেন?' 'হাঁ, যথেষ্টই ভালো।' 'বেশ, তাহলে ওটাকে নেওয়া যাক। গান্ধী—।' আমি প্রস্তাবটি কম্পান্বিত দেহে পড়লাম। গোখলে সমর্থন করলেন। 'সর্বসম্মতিক্রমে পাশ'—সকলে চীৎকার করে বলল।"

আত্মজীবনীতে গান্ধীজী যথেষ্ট জায়গা নিয়ে বর্ণনা করেছেন, তিনি এই সময়ে কত আনন্দে, কতখানি শিক্ষালাভ করতে করতে গোখলের সঙ্গে একমাস কাটিয়েছিলেন। যেদিন কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন, হাওড়া স্টেশনে তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও গোখলে হাজির হলেন। গোখলের নিষেধ সত্ত্বেও গান্ধীজী তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে মনস্থ করেছিলেন। "আমি আসতাম না যদি তুমি প্রথম শ্রেণীতে যেতে। এখন কিন্ত না এসে উপায় ছিল না"—গোখলে বলেছিলেন।

পরের একটি ছবিই আমরা তুলে ধরতে পারি। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা চিরতরে ত্যাগ করে গান্ধীজী স্বদেশে ফিরে এলেন। শান্তিনিকেতনে এলেন ১৭ই ফেব্রুয়ারী। দিন দুই-ও সেখানে কাটে নি—পুণা থেকে টেলিগ্রাম এল গোখলের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। অবিলম্বে একটি শোকসভা বসল। গান্ধীজী বললেন, "একটি যথার্থ বীরের সন্ধানে আমি বেরিয়েছিলাম। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একজনকেই সেইভাবে পেয়েছি। সেই বীর—গোখলে।"

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

নিজের সন্দেহ দূর করবার জন্যেই আমাকে জিগেস করতে হোলো—আঠারো শ' থেকে প্রায় আঠারো শ' তিরিশ পর্যন্ত বাংলায় যেসব বই বেরিয়েছে, সেগুলির মধ্যে তুমি ইতিপূর্বে 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী'টিই পছন্দ করে রেখেছ,—আর এইবার বললে—এই পর্বের লেখকদের মধ্যে একমাত্র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেই সাহিত্যিক বলা যায়। তাহলে কি ধরতে হবে যে, এই পর্বের বাংলা বইয়ের মেলায় মৃত্যুঞ্জয় আর ভবানীচরণ—শুধু এই দুজনেই ছিলেন যথার্থ সাহিত্যিক,—আর, বাকি যাঁরা, তাঁদের সব বইগুলিই এই বাছাইয়ে বাতিল হোলো?

আনন্দ বললে—না, আমি একথা বলি নি,—কারণ, এ রকম কথা আমার নয়, তোমারও নয়,—কোনো সৎ পাঠকেরই নয়। তাছাড়া 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী' নামে বইখানি মোটেই ১৮০০ থেকে ১৮৩০-৩১-এর মধ্যে বেরোয় নি,—ওটি 'রঞ্জন প্রকাশালয়' থেকে বেরিয়েছে খুবই সাম্প্রতিককালে।

—আচ্ছা, তা না হয় তুমি বলতে চাও নি। কিন্তু কী তুমি বলতে চেয়েছ, সেটা একটু স্পষ্ট করে বলো।

—স্পষ্ট কথার জন্যে বেশি জায়গা লাগে না, বেশ সংক্ষেপেই তা বলা যায়। অতএব শোনো—এই তিরিশ-বত্রিশ বছরের বাংলা বইয়ের মেলায় ঈষৎ যেটুকু মৌলিক সাহিত্যিক হাওয়া পাওয়া যায়, তা কেবল ভবানীচরণের বাবু-বিবি-দূতী-সম্পর্কিত রচনাগুলিতেই বিদ্যমান। মৃত্যুঞ্জয়ের লেখাতে ছিল বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক ভঙ্গি-সন্ধানের উল্লেখযোগ্য চেষ্টার উদাহরণ। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বইখানি যে বাংলা ভাষায় লেখা এবং ছাপা এই শতাব্দীর প্রথম বই, সে-কথা আগেই বলেছি। এই বইখানি,—এবং সেই সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি'-র (১৮০৮) কথাও মনে পড়ে,—মনে পড়ে কেরির 'ইতিহাস মালা' (১৮১২)। প্রধানত সাহিত্যিক কারণে নয়,—এসব বই গদ্য-চর্চার উদাহরণ হিসেবেই স্মরণযোগ্য। 'ইতিহাস-মালা' কেরির মৌলিক রচনা নয় বলেই পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন। সেটি হোলো বেতাল-পঞ্চবিংশতি, ভোজপ্রবন্ধ ইত্যাদি থেকে নেওয়া প্রায় শ'দেড়েক গল্পের সংগ্রহ। তারই মধ্যে—অধ্যাপক সুকুমার সেনের কথায়—"তিনটি গল্পের পাত্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি—প্রতাপাদিত্য, রূপ ও সনাতন, এবং আকবর ও বীরবল।" সুকুমারবাবু লিখেছেন যে, 'ইতিহাসমালায়' এইসব গল্প বিভিন্ন লোকে লিখেছিলেন কিংবা তাঁরাই পরিমার্জিত করে দিয়েছিলেন।—আর, "এগুলি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রীতিতে রচিত, হয়ত তাঁহারই লেখা।"

বলতে বলতে একবার থেমে, একটু দম নিয়ে আনন্দ বললে—'ইতিহাসমালা', 'রাজাবলি', 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'—এক নিঃশ্বাসে এই তিনখানি বইয়ের উল্লেখ করতে হোলো, তার কারণ, তিনটিতেই অল্পবিস্তর ইতিহাস আছে। এইসব ঘটনার বছর-পঞ্চাশেক পরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বাংলাদেশে বাংলার ইতিহাস-সন্ধান নেই বলে দুঃখ করেছিলেন বটে, তবে এইসব বইয়ের নাম এবং বিষয়-বস্তু থেকেই বোঝা যায় যে, বাংলা গদ্যে ইতিহাস-চর্চা শুরু হয়েছিল আমাদের সাহিত্যিক গদ্যের সেই সূচনাকালেই।

আমি বললুম—মৃত্যুঞ্জয়ের নামে প্রচলিত 'রাজাবলি' বোধ হয় মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের লেখা নয়। আর সে-বইয়ের ইতিহাসগুণও বিচারসাপেক্ষ। সে যাই হোক, রামরামের 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' যে নিঃসন্দেহে ইতিহাসধর্মী,—যদিও তাতে কিছু কিছু অন্য ধরণের ব্যাপার ঢুকে গেছে, সে-কথা মানি। আবার, 'ইতিহাস' নামটা থাকলেই যে যে-কোনো বই ইতিহাস হয় না, তার উদাহরণ চণ্ডীচরণ মুনশীর 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫)। ফারসী 'তুতিনামা' ছিল—তার মূলে ছিল সংস্কৃত 'শুকসপ্ততি',—চণ্ডীচরণ সেই বইয়েরই হিন্দি-অনুবাদ অবলম্বনে তাঁর বাংলা 'তোতা ইতিহাস' লিখেছিলেন বলে শোনা যায়। আর, রামরামের প্রতাপাদিত্য চরিত্রের আদর্শে লেখা হয় রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের বই—'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'। সুকুমারবাবু রাজীবলোচনের গদ্যকে বলেছেন রামরামের তুলনায় 'সরলতর'।

আনন্দ বললে—এই সব লেখকের ভাষা-রীতির চুল-চেরা বিচার নিয়ে সময় নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। ভাষার 'সারল্য' ব্যাপারটি এঁদের মধ্যে অর্জনীয় বিশেষ লক্ষ্য হিসেবেই বিদ্যমান ছিল,—কিন্তু 'পৌঁছোবো' বললেই তো যে-কোনো সময়ে যে-কোনো লক্ষ্যে পৌঁছোনো যায় না। সেজন্যে সময় চাই, দৃষ্টান্ত চাই,—উপলব্ধির জন্যে যথার্থ প্রতীক্ষা চাই,—উপযুক্ত সুযোগ চাই!

আমি বললুম—বই-বাছাইয়ের এই কাজে নেমে,—রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-সম্পর্কিত বইখানির ভাষা-গুণ, ইতিহাস-গুণ দুই-ই আমাদের মনোযোগ দাবি করে না কি?

—হাঁ, দুই-ই।

—তা হলে মৃত্যুঞ্জয়ের সব ক'খানি বই এবং ভবানীচরণের নববাবু, নববিবি, দূতী ইত্যাদির বিলাস-কথার

আগেই কি রামরামের ঐ বইখানি আমাদের এই বাছাইয়ে স্বীকৃত হওয়া উচিত নয়?

—নিশ্চয়,—তাতে কোনো আপত্তি নেই। আপত্তি তো নেই-ই, বরং আরো কথা আছে শোনো—রামরামের বই একমাত্র রাজীবলোচনের কাছেই যে একটা আদর্শ ছিল, তা নয়। 'পরিষদ-গ্রন্থাবলী'—২০—এই পর্যায়ের বই নিখিলনাথ রায়ের 'প্রতাপাদিত্য' বেরোয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান থেকে বাংলা ১৩১৩ সালে। তার ভূমিকায় নিখিলনাথ লেখেন যে রামরামের ঐ বইখানিই বাংলায় আদিগ্রন্থ।—"উক্ত গ্রন্থের আর সংস্করণ হয় নাই। আমরাই উহার দ্বিতীয় সংস্করণ করিলাম।"

আমি বললুম—নিখিলনাথের এই ভূমিকা থেকেই জানা যায় যে, হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র মধ্যে বিশেষভাবে রামরামেরই রীতির অনুসৃতি দেখা যায়—"তর্কালঙ্কারের গ্রন্থ রামরাম বসুর গ্রন্থেরই নব্যভাষায় রূপান্তর।"

সে বললে—প্রতাপাদিত্য আমাদের অনেক লেখকেরই প্রেরণা জুগিয়েছেন,—তবে রাজা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে এই আগ্রহ এক জাতিগত গৌরবের লক্ষণ,—রামরাম ছিলেন আমাদের এই জাতীয় গৌরব অনুভবের আদি-লেখক।

আমি বললুম—'আদি-লেখক' কথাটা একটু শুধরে দিতে চাই—বলা যাক 'আদি গদ্য-লেখক',—কারণ, তাঁর আগে ভারতচন্দ্র লিখে গেছেন সে-কথা,—গদ্যে নয়, পদ্যে।

সে বললে—এবং পরে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক বেরিয়েছে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে।

সকলেই জানেন, এক-এক সময়ে দূর কালের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেবার একটি ভঙ্গি ফুটে ওঠে কোনো কোনো মুখে। সেদিন সেই রকম ভঙ্গি দেখা গেল আনন্দর দুই চোখে। সে যেন আপন মনে অনেক দূর অতীতের দৃশ্য স্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলো তার। আমি ভাবছিলুম, সে-পর্বের ইতিহাস-চিন্তার উদাহরণগুলির মধ্যে রামরামের 'লিপিমালার' (১৮০২) গৌরাঙ্গ-জীবনীর প্রসঙ্গটা ধরা যাবে কি না। ভাবছিলুম, স্কুল-বুক সোসাইটি থেকে ইতিহাসের বই বেরিয়েছিল মোট ক'খানাই বা? হঠাৎ আনন্দর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

সে বললে—

কেরি আর রামমোহন,—এই দুজনই ছিলেন সে-কালের কেন্দ্রীয় পুরুষ,—সে আমরা ঠিকই বলেছি। সাহেবরা অনেক চেষ্টা করেছেন,—দেশের পণ্ডিতরাও অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শ্রম, সংকল্প, আন্তরিকতা—শুধু এই তিন গুণই কি সত্যিকার ভাল রচনার হেতু?

সে আরো বললে—পথ ধীরে ধীরে তৈরি হয়,—মন ধীরে ধীরে জাগে।

সে বললে—সার্থক রচনা যদি শুধু শ্রমে-সংকল্পে-আন্তরিকতায় ঘটানো সম্ভব হোতো, তাহলে টমাসই তো প্রথম পর্বের বাংলা গদ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক হতেন! কেরি, টমাস,—রামরাম, মৃত্যুঞ্জয়,—এঁরা প্রত্যেকেই স্মরণীয়, প্রত্যেকেই সাধক ছিলেন। রামমোহন তো ছিলেন বৃহৎ প্রাণের, গভীর জ্ঞানের মানুষ! বাংলা বইয়ের মেলায় এঁরা প্রত্যেকেই পথিকৃৎ। এঁদের খাটুনিতেই পাহাড় উঁচু হয়েছে,—ধীরে ধীরে পথ জেগেছে সেই বন্ধুর ভূমিতে।

আনন্দর এই আবেগে বাধা দিয়ে আমি বললুম, সাহেবদের হাতে ভারতীয় ভাষার চর্চা যে কম হয় নি, সে তো ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু আমাদের গত শতাব্দীর প্রথম তিরিশ বছরে প্রধানত সাহিত্যিক গুণের জন্যে বাছাই করবার মতো বই তাঁদের হাত থেকে সত্যিই কি আমরা কিছু পেয়েছি?

সে বললে—'সাহিত্যিক কারণ', 'সাহিত্যগুণ' ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ তোমাকে একটু বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছে, বোধ হয়?

—না, ঠিক তা নয়,—তবে তুমি ঐ যে খাটুনির পাহাড়ের কথা বললে, সেই কথা থেকেই এ-প্রশ্নটা আমার মনে দেখা দিচ্ছে পুনর্বার।

—কোন্ প্রশ্ন? 'সাহিত্যিক গুণ' মানে কি শুধুই রসোদ্দীপনার সামর্থ্য? আমরা অনেক আগেই কি এ-দিকটার আলোচনা করে নিই নি?

—শুধুই তা নয়,—কিন্তু অনেকটা তাই তো? রসোদ্দীপনা-প্রসঙ্গ কি উহ্য রাখা যায়?

আমি আনন্দকে বললুম—শতাব্দীর প্রথম তিরিশ বছর না-হয় পড়ে থাক পিছনে,—ধরো আরো বছর-কুড়ি-বাইশ এগিয়ে আসা যাক,—১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বেরিয়েছিল হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্সের বই 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। মিশনারীদের গদ্য-রীতির প্রাঞ্জলতার উদাহরণ দিতে হলে সে-বই থেকে অবশ্যই উদ্ধৃতি দেখানো যেতে পারে। শোনো একটু—

> "পরে ঐ স্ত্রী আমার প্রতি ফিরিয়া জিজ্ঞাসিল, মেমসাহেব, আপনি আমাদিগের পাড়ার মধ্যে কি দেখিতে আসিয়াছেন? পাদ্‌রি সাহেবের মেম ভিন্ন আর কেহ এখানে আইসেন না। তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, এ বড় দুঃখের বিষয়, কারণ বাঙ্গালি খ্রীস্টিয়ানদের হিত চেষ্টা করা বিলাতীয় লোকদের অবশ্য কর্তব্য। আমি নূতন মেজিস্ট্রেট সাহেবের বিবি, যিনি গত মাসে আম্রতলায় বড় দোতালা বাটী ভাড়া লইয়াছেন। কল্য আমি তোমাদের পাদ্‌রি সাহেবের নিকটে এই খ্রীস্টিয়ানদের গ্রামের বিষয় শুনিয়া অদ্য তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

আনন্দকে আমি বললুম—এ গদ্য সহজ বটে কিন্তু এ কি সত্যিই আমাদের মনের মণিকোঠায় বেছে তুলে রাখবার মতন সামগ্রী? এসবই কৃত্রিম,—এসবই প্রভূত চেষ্টার উপার্জন,—শ্রমের ফসল!

আনন্দ বললে—এবং এসব কথনোই আমাদের উপেক্ষার বিষয় নয়, নয়, নয়! দয়া করে এই কথাটা মনে রেখো।

[ক্রমশ]

বঙ্গদর্শন

কিভাবে বর্তমান নিবন্ধটি আরম্ভ করব, পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক হতাশাজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা ঠিকমত ভেবে উঠতে পারছি না। কথায় বলে, অর্ধসত্য অসত্যের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের যে কুয়াসা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, এক্ষেত্রে প্রতিটি দলই অর্ধসত্যের দ্বারা চালিত হয়েছে, অথচ প্রত্যেকেই দাবি করছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিই যথার্থ, যদিও প্রত্যেকের বক্তব্যের মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে। কিন্তু সেইটুকুকেই পরম সত্য ধরে নিয়ে অপর দলের বক্তব্যগুলিকে অস্বীকার করার প্রবণতাই যাবতীয় সংঘর্ষের মূল।

সম্প্রতি বাংলা কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তা যেমন অর্ধসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার জবাবে সি-পি-এম, আর-এস-পি প্রভৃতি দলগুলি যে কথা বলেছে তাও অর্ধসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, গত সাত মাসে পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নষ্ট হয়েছে, জোরপূর্বক পার্টি ফাণ্ডে টাকা আদায় করা হচ্ছে, পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে, বেনামী জমি দখলের নামে বহুক্ষেত্রেই বেআইনী জবর দখল চলছে, অসামাজিক লোকেরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে পুষ্ট হচ্ছে, শিল্পক্ষেত্রে অরাজকতা এসেছে, ইত্যাদি। প্রত্যেকটি অভিযোগের স্বপক্ষে নিশ্চয়ই কিছু কিছু প্রমাণপত্র তাঁদের হাতে আছে এবং বিষয়গুলিও মিথ্যা নয়। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের সামগ্রিক কার্যকলাপের বিচারে বাংলা কংগ্রেসের এই প্রস্তাবটি অর্ধসত্যকে প্রতিফলিত করে।

এর জবাবে বলা হচ্ছে যে, যুক্তফ্রন্ট মেহনতী মানুষের কল্যাণের জন্য ইতিমধ্যে যে কাজগুলি করেছে, সেগুলির কোন উল্লেখ তো ওই প্রস্তাবে নেই। একথা কি ঠিক নয়, যুক্তফ্রন্ট মেহনতী মানুষের হাতিয়ার হয়েছে? একথা কি ঠিক নয়, যুক্তফ্রন্টের জন্যই শ্রমিকশ্রেণী একটির পর একটি ক্ষেত্রে মালিকদের কাছ থেকে দাবি আদায়ে সমর্থ হচ্ছে? একথা কি ঠিক নয়, ভূমিসংস্কারের কর্মসূচী শুধু বাংলাদেশই নয়, সারা ভারতের ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে? বাংলা কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে এত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বোম্বাই-গুজরাটের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার কথা কিছু বলেন নি, তেলেঙ্গানায় যে হাঙ্গামা চলছে, দিল্লীতে যুব উৎসবে যে নারীনিগ্রহ হল—সেসব কথার উল্লেখ করে তো উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় নি?

অর্থাৎ বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট শাসনের অন্ধকার দিকটা দেখেছেন, আলোর দিকটা দেখতে চান নি, পক্ষান্তরে অপরাপর দলগুলি, বিশেষ করে সি-পি-এম আলোর দিকটাই দেখছেন, অন্ধকার দিকটা দেখতে চাইছেন না। এই কারণেই আমরা বলেছি যে সকল দলই আংশিক সত্যকে ভিত্তি করে অগ্রসর হচ্ছেন, যার ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠছে এবং এ অবস্থা যদি অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে দেওয়া হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অচিরেই কেরলের মত হবে। আজ কেরলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে শোচনীয়তম স্তরে উপনীত হয়েছে, স্থিরভাবে যদি বিষয়টিকে গোড়া থেকে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, অতি তুচ্ছ কারণ থেকে সেখানকার সর্বনাশা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেই টলস্টয়ের আইভান গ্যাব্রিয়েলের গল্পের মত।

অন্তত একটা বিষয় খুব পরিস্কার হয়ে গেছে, যুক্তফ্রন্টের কোন দলই ফ্রন্টের সামগ্রিক স্বার্থ সম্পর্কে আন্তরিক নন। তা না হলে শরিকী বিবাদ নিরসনকল্পে একটি বাস্তব কর্মসূচী সকল দল নেওয়া সত্ত্বেও মাত্র সাতদিনের মধ্যেই সেই প্রস্তাব কার্যত চোথা কাগজে রূপান্তরিত হল কেন? যে সংবাদপত্রগুলিকে তাঁরা প্রত্যেক জনসভায় ফ্রন্ট-বিরোধী বড়লোকের কাগজ বলে উল্লেখ করেন, সেখানেই আবার একে অপরের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক বিবৃতি দিতে লাইন লাগান কেন? নেতারা এমন কিছু খোকা নন, তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন যে, তাঁদেরই বিবৃতিগুলি এই সংবাদপত্রগুলি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তাঁদেরই বিরুদ্ধে বুমেরাং করে ছাড়বে। কিন্তু কথা হচ্ছে এভাবে আর কতকাল চলবে?

আরও একটি সাফল্য

ধর্মঘটী সুতাকল শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী সুতাকলের ৫৫ হাজার শ্রমিকের প্রতি মাসে কুড়ি টাকা করে বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। বোনাসের প্রশ্নে চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয়েছে যে, যে-সকল সুতাকল গত বছর শতকরা চার টাকা থেকে পাঁচ টাকা হারে বোনাস দিয়েছেন, তাঁরা এ বছর ওই হারে টাকা ছাড়াও প্রত্যেককে মাথাপিছু আরও কুড়িটাকা এবং যে-সমস্ত সুতাকল শতকরা পাঁচ টাকা হারে গত বছর বোনাস দিয়েছেন তাঁরা এবারেও ওই একই হারে বোনাস দেবেন। মজুরী নির্ধারণ এবং অন্যান্য ব্যাপারেও নিষ্পত্তির জন্য চুক্তি অনুযায়ী একটি ত্রিপাক্ষিক কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটির চেয়ারম্যান হবেন একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি এবং রাজ্য সরকার মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে কমিটি গঠন করবেন। শ্রমমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ জানিয়েছেন যে, উপরি-উক্ত চুক্তিতে উভয়পক্ষই সন্তুষ্ট হয়েছেন। সুতাকল কর্মীরা পর পর ৩৮ দিন শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট চালিয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুতাকল শ্রমিকদের এই সাফল্যের কারণ তাঁদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। ইতিপূর্বে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারাই চটকল-শ্রমিকরা, চা-শ্রমিকরা এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা দাবি আদায়ে সক্ষম হয়েছেন। এইসব সাফল্যের পিছনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের যথেষ্ট অবদান আছে, কিন্তু দুঃখ এই যে, এই একতার মূল্য চোখে দেখেও যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির নেতারা বোঝেন না!

বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক

স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক

পরিচালিত—পাঠ্যসূচী স্থির করা থেকে শুরু করে পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং ডিপ্লোমা বিতরণ সব কিছুই শিক্ষা অধি-কর্তার কুক্ষিগত। সরকারী মতে স্নাত-কোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ ডিপ্লোমা-ধারীরা বি-টি'দের সঙ্গে সমমূল্যসম্পন্ন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রথমোক্তদের অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে যদিও পাঠ্যসূচীর ক্ষেত্রে এই দুই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। পোস্ট-গ্রাজুয়েট বেসিক ট্রেন্ডরা উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হবার বিশেষ সুযোগ পান না, এক্ষেত্রে বি-টি বা বি-এড-দেরই সুবিধা বেশি। প্রচলিত বি-টি অথবা বি-এড'রা শিক্ষাবিজ্ঞানে এম-এ বা এম-এসসি পড়তে পারেন, এ'দের সে সুযোগ কেন দেওয়া হয় না সেটাই বিচিত্র। বি-এসসি অথবা বি-কম উত্তীর্ণ শিক্ষক-গণ বি-টি পাশ করার পর যে-কোন বিষয়ে এম-এ পরীক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ সে সুবিধা ভোগ করার অধিকারী নন। যদিও কাগজে-কলমে বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে কিন্তু কার্যত জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ এবং পোস্ট-গ্রাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজগুলিতে শিক্ষক পদে বেসিক ট্রেনিং শিক্ষকগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। জুনিয়ার বেসিক স্কুল ও প্রাই-মারী স্কুলে পরিদর্শক হিসাবে বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে পূর্বে অগ্রাধিকার দেওয়া হত, এখন বি-টি উত্তীর্ণদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

এই সকল কারণে পোস্ট-গ্রাজুয়েট বেসিক ট্রেন্ডরা সঙ্গতভাবেই দাবি তুলেছেন যে, অবিলম্বে বি-টি অথবা বি-এড শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকগণকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগগুলি তাঁদের ক্ষেত্রেও সম্প্র-সারিত করতে হবে। চলতি ১৯৬৯-৭০ সেসনে উত্তীর্ণ শিক্ষকগণকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বি-এড ডিগ্রী দিতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ ডিগ্রীটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত করতে হবে, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকারের হাতে রাখলে চলবে না। বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গে দুইটি মাত্র স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় বর্তমান—একটি রহড়ায়, অপরটি বাণীপুরে। সরকার অপর কোন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন নি, যদিও বি-টি কলেজের সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিমান। এ'দের এই দাবি সম্পূর্ণ ন্যায্য। আমরা সংশিল্লষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কলকাতায় গান্ধীমুদ্রা

মহাত্মা গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে দশ টাকা মূল্যের গান্ধীমুদ্রা চালু করা হয়েছে। কিন্তু সেটিকে উপলক্ষ করে বিশেষ করে কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে যে কাণ্ডটা দিনের পর দিন ঘটে চলেছে তা ভাবতে গেলে শুধু লজ্জিত হওয়াই বুঝি যথেষ্ট নয়। এই গান্ধীমুদ্রা নিয়ে যেরকম কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে তাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, লোকে গান্ধী-ভক্তিতে এতই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে যে, গান্ধী-শতবার্ষিকীর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবেই দশ টাকা মূল্যের এই গান্ধীমুদ্রা সংগ্রহের জন্য বুঝি এই ব্যস্ততা। কিন্তু এই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে অনেকেরই চক্ষু চড়কগাছ হবে। কারণ গান্ধীমুদ্রার জন্য এই কাড়াকাড়ি ওই মুদ্রার মধ্যে যে রূপা আছে তার জন্য, গান্ধীজীর প্রতি ভক্তির জন্য নয়। ওই মুদ্রার আশি ভাগ রূপা আর-বাকিটা তামার। এই রূপার পরিমাণ বড় কম নয়, প্রতিটি মুদ্রায় প্রায় বারো গ্রামের মত রূপা আছে, অর্থাৎ দশ টাকার মুদ্রায় দশ টাকার বেশি রূপা আছে এমন কথা বাজারে রটেছে। সুতরাং কালো-বাজারে গান্ধীমুদ্রার খুবই চাহিদা, বার বার লাইন দিয়ে ওই মুদ্রা সংগ্রহ করা হচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা নেই, গান্ধীজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা বা ভালবাসা নয়, গান্ধীমুদ্রার ভেতরকার রূপার তাগিদটাই আসল। গান্ধীজীর প্রতিকৃতিবিশিষ্ট ওই মুদ্রা ফুটন্ত আগুনে গলিয়ে কালো-বাজারীরা এখন শুধু রূপাটুকুই বার করে নেবে। কালোবাজারীদের আক্রমণে গান্ধীজীও বাদ গেলেন না, এটাই আমাদের দেখতে হল।

সাপ্তাহিক বসুমতী

নতুন স্বাস্থ্য-অধিকর্তা নিয়োগের প্রশ্নে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের হুমকী

কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী বি ওয়েলিংডনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে ১৮ই অক্টোবরের পূর্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের নির্দেশ না দিলে আর-এস-পি সহ কেরলের শাসন ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রন্টের চারটি শরিক দল নাম্বুদ্রিপাদ সরকারকে আর সমর্থন করবে না বলে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, ঠিক তখনই পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক আর-এস-পি দলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য স্বাস্থ্য-অধিকর্তা (ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস) হিসেবে ডাঃ কনকচন্দ্র সর্বাধিকারীর পুনর্নিয়োগের আবেদন অগ্রাহ্য করে, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসেসের একজন অফিসারকে (যিনি বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পোস্টেড আছেন, যাঁর সার্ভিস রেকর্ডস্ ভাল নয় এবং রাজ্যপালের প্রশাসনে হেলথ সেক্রেটারী ও খোদ যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে জনৈক সুযোগ্য জয়েন্ট সেক্রেটারী যাঁর পারফরম্যান্স সম্পর্কে অ্যাডভার্স কমেন্টস্ করেছেন) নতুন স্বাস্থ্য-অধিকর্তারূপে (ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস) নিয়োগের যে সুপারিশ করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তা অনুমোদন না করলে পদত্যাগের হুমকী দিয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই পদত্যাগের হুমকীর নেপথ্য কাহিনী সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত থেকেও মুখ্যমন্ত্রী যুক্তফ্রন্টের আশু সঙ্কটের কথা বিবেচনা করে একটু থমকে দাঁড়িয়েছেন। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আরও অনেকে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন—মুখ্যমন্ত্রীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে সব কাজ হাসিল করা যায় না এবং যাবেও না। বিশেষ করে দুর্নীতি ও অন্যায় কার্যকলাপের যেখানে অভিযোগ থাকে, সেখানে তিনি দল বা ব্যক্তির স্বার্থকে উপেক্ষা করে দৃঢ়তার সংগে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এতটুকু ইতস্তত করেন না।

প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী উপরোক্ত অফিসারের সার্ভিস রেকর্ডস্ দেখে স্বাস্থ্য-অধিকর্তা হিসেবে তাঁকে নিয়োগ করার প্রস্তাবে তাঁর আপত্তি জানিয়ে নতুন স্বাস্থ্য-অধিকর্তার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত ডাঃ কনকচন্দ্র সর্বাধিকারীকে কাজ চালিয়ে যেতে দিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দিলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাকি মুখ্যমন্ত্রীকে সোজা জানিয়ে দেন—এক ঘণ্টার জন্যও ডাঃ সর্বাধিকারীকে পুনর্নিযুক্ত করা যাবে না—আপনি জোর করলে আমাকে পদত্যাগ করতে হবে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, হয়তো কোন কারণ আছে, না হলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের কেউ কেউ ডাঃ সর্বাধিকারীর পুনর্নিযুক্তির [মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবত জানেন না যে, ডাঃ রায়, ডাঃ সেন, ডাঃ আচার্য, জনৈক পাবলিক অ্যানালিস্ট (এঁকে আবার একজন ডেপুটি ডিরেক্টর ট্রাঙ্ককল ও টেলিগ্রাম করে পুনর্নিযুক্ত করেছেন)-এর মতন বয়োবৃদ্ধরা কেন বা কিভাবে পুনর্নিযুক্ত হলেন। এঁদের কারো কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনাচারের গুরুতর অভিযোগ আছে] বিরুদ্ধে এত সোচ্চার ও সক্রিয় হবেন কেন? ডাঃ সর্বাধিকারীর ব্যাপারে তাঁদের এই অস্বাভাবিক বিরূপ মনোভাব ও এলার্জি কেন, তার চাঞ্চল্যকর নেপথ্য কাহিনী আগামী ৩০শে অক্টোবরের সংখ্যায় কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির (এর মধ্যে কয়েকজন মন্ত্রী ও এম-এল-এ এবং প্রখ্যাত চিকিৎসক আছেন) মন্তব্যসহ প্রকাশ করা হবে। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হঠাৎ ট্রাঙ্ক টেলিফোন-কল পেয়ে উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে আসার পর শেষ মুহূর্তে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ডাঃ সর্বাধিকারীর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হলে মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলেন—এতদিন এসব অভিযোগ কোথায় ছিল? রাতারাতি সব তৈরি হয়ে গেল নাকি?

সংবাদে আরও জানা গেছে যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে যাবার আগে স্বাস্থ্য-অধিকর্তা হিসেবে নীলরতন সরকার হাসপাতালের অফিসারের নাম সুপারিশ করে যে একখানা নতুন ফাইল তৈরি করে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের (এ্যাপ্রুভ্যাল) জন্য পাঠানো হয়, তাতে পূর্বের সমস্ত কাগজপত্র না থাকায়ও নাকি মুখ্যমন্ত্রী বিস্মিত হন। মুখ্যমন্ত্রী উপরোক্ত অফিসারের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট (সি-সি-আর) দেখতে চাইলে তাঁকে নাকি বলা হয়—দেখানো হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের জনৈক মুখপাত্রের মতে ডাঃ সর্বাধিকারী রাইটার্স থেকে বিদায় হলে 'সুহৃদচক্রে'র কৃপায় ব্যাক ডেট দিয়ে ঠিক ওটার ব্যবস্থা করে দেওয়া পাঁচ মিনিটের কাজও নয়। ভরসা করি, মুখ্যমন্ত্রীর সজাগ দৃষ্টি নিশ্চয়ই এদিকে আছে।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, নতুন স্বাস্থ্য-অধিকর্তা নিয়োগের ব্যাপারটির চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত এডিশন্যাল ডিরেক্টর অব হেলথসার্ভিসেস (ইনি আর্মি মেডিক্যাল সার্ভিসের রিটায়ার্ড অফিসার—বয়স ষাটের ওপারে) ডাঃ অমর দেবকে স্বাস্থ্য-অধিকর্তা হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

যুক্তফ্রন্টের কয়েকজন দায়িত্বশীল নেতা (এঁদের অধিকাংশই মার্কসিস্ট) স্বাস্থ্য দপ্তরের কার্যকলাপে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছেন। যুক্তফ্রন্টের সভায় এ বিষয়ে অবিলম্বে আলোচনা করার কথাও তাঁরা ভেবেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন নিয়োগের দাবিও জানিয়েছেন।

বেপরোয়া দলীয় স্বার্থসিদ্ধির কার্যে ডাঃ কনক সর্বাধিকারী নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁকে জব্দ করার জন্য গত কয়েকদিন ধরে প্রতিশোধাত্মক যে-সব নোংরামি করা হয়েছে, তাতে 'সুহৃদচক্রে'র গোটাকয়েক লোক ছাড়া স্বাস্থ্যদপ্তরের প্রায় সকলেই (জনৈক জয়েন্ট ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর, এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অবশ্য নতুন স্বাস্থ্য-অধিকর্তা হিসেবে যাঁর নাম স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রস্তাব করেছেন, তাঁকে অগ্রিম অভিনন্দন জানিয়েছেন) ক্ষুব্ধ হয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিশ্বস্ত সহকারী ভদ্রলোক অবশ্য ইতিমধ্যে একটা তালিকা তৈরি করে ফেলেছেন—যাদের বিরুদ্ধে (সর্বাধিকারীর লোক বলে ধরে নিয়ে) ট্রান্সফার, প্রোমোশন বন্ধ করা প্রভৃতি নানা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে।

ভারত দর্শন

বদলা—প্রতিবদলা

কুক্ষণে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত নিজলিঙ্গাপ্পা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করে কংগ্রেসের মধ্যে যে তারুণ্যের তরঙ্গভঙ্গ শুরু হয়েছে, তাকে রোধ করার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁর কয়েকজন সমসাময়িক সমধর্মী বর্ষীয়ান নেতার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে। প্রথম কিস্তী প্রচণ্ড পরাজয় এলো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রেড্ডির প্রতিপক্ষে ভি ভি গিরির আলোড়ন-সৃষ্টিকারী বিজয়বার্তা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে। নিজলিঙ্গাপ্পা, পাতিল, কামরাজ, মোরারজী দেশাইরা সে আঘাত হজম করেই দ্বিতীয় আঘাতের জন্য অস্ত্র শাণাতে লাগলেন। তা হল, নিয়মভঙ্গের অজুহাতে গান্ধী ও গান্ধী শিবিরের কিছু কিছু নেতাকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অস্ত্রে ধরাশায়ী করব। বলা বাহুল্য, এই আঘাত হানতে গিয়ে নিজলিঙ্গাপ্পা-কামরাজ-মোরারজী দেখলেন তাঁদের সিণ্ডিকেটের বজ্র-আঁটুনি আরও বেশি ফসকা গেরোয় পরিণত হয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে বুদ্ধিমান চ্যবন সাহেব হাওয়ার গতি দেখে সরে দাঁড়িয়েছেন। এমন কি—য পাতিল সাহেবের হম্বিতম্বিতে প্রতিক্রিয়াশীল জগৎ ভরসা পেতেন, আশ্বস্ত বোধ করতেন, তিনি কাগজে বারেং পরিণত হয়ে সাবধানে গা- ঢাকা দিয়েছেন। আশেপাশে তাকিয়ে দেখা গেল কেউ নেই। অতুল্য, সি বি গুপ্ত একে একে সবাই মিইয়ে যাচ্ছেন।

এরও পরে যা প্রকাশ হয়ে পড়ল তা সাংঘাতিক। কামরাজ নাকি চ্যবনকে প্রধানমন্ত্রীর পদে আরূঢ় করতে চেয়েছিলেন।

হায়, কোনটাই ধ্বংসই হল না। বরং হারাতে হল 'মোরারজীভাই'-এর মন্ত্রিত্ব। অসহনীয়া শ্রীমতী গান্ধীর ওপর বদলা নিতে গিয়ে বারম্বার পরাজয়গুলি অধিকতর আঘাত নিয়েই ফিরে এলো শ্রীযুক্ত নিজলিঙ্গাপ্পা এবং তাঁর সুহৃদবৃন্দের ওপর। কিন্তু কালা না-শোনে ধর্মের কাহিনী। পর পর এই পরাজয়ও নিজলিঙ্গাপ্পাকে পরিস্থিতি বোঝবার মতো ক্ষমতা দান করল না। নিজলিঙ্গাপ্পা এখনো বদলা নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সব পথই পরীক্ষা করে দেখছেন। অর্থাৎ শ্রীযুত নিজলিঙ্গাপ্পা তাঁর মানসিক ভারসাম্য কৌশলী রাজনীতির প্রভাবে ঠাণ্ডা ও সুস্থির রাখতে আর পারছেন না। গরম হাওয়া জুড়িয়ে এলে যে জিরিয়ে নিয়ে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে নামবেন, এই তিতিক্ষা তাঁর নেই। তিনবার তাপ লেগে তিনি তাম্রাভ হয়েছেন, তবু রণে ভঙ্গ দেন নি। কিন্তু নাই-বা দিলেন রণে ভঙ্গ, যাকে বলে 'ম্যাগনিফিসেন্ট রিট্রিট', কিম্বা 'চমৎকার পশ্চাদপসরণ', তেমন কিছু করলে শ্রীযুত নিজলিঙ্গাপ্পাকে বারম্বার জনসমক্ষে 'এক্সপোজড' বা ধরা পড়তে হত না। রাজনীতিতে আড়াল দিয়ে লুকিয়ে যাওয়ার নীতিটা হয় তিনি কাজে খাটাতে জানেন না, নয় পরিস্থিতি তাঁকে এমনি বে-কায়দা করেছে যে, বার বার প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী জেনেও নিজলিঙ্গাপ্পা নান্যোপায়।

সম্প্রতি তিনি যে চাল চাললেন তার প্রতিক্রিয়াও তাঁকে খুব শক্ত প্রত্যাঘাতই দিয়ে যাবে বলে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। অন্তত এটা সুস্পষ্ট যে, নিজলিঙ্গাপ্পার ক্রিয়াকলাপ তাঁর পদমর্যাদাকে সঠিক ধরে রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ছে ক্রমশ। সম্প্রতি তিনি প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকবৃন্দকে কংগ্রেসের স্ব স্ব ক্ষমতার আসন থেকে পদচ্যুত করার কৌশল গ্রহণ করতে গিয়ে ফেঁসে গেছেন। কংগ্রেসী নেতৃমহলে স্পষ্টই তাঁকে অগ্রাহ্য করার লক্ষণও তাই পরিস্ফুট। শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যমকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ থেকে অপসারণের জন্য কংগ্রেস সভাপতি চেষ্টা করছেন, সংবাদটা রটনামাত্র কংগ্রেসী মহলে তার ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তামিলনাড়ু কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধান সুব্রহ্মণ্যম নিজেই ঘোষণা করে দিয়েছেন: আমার মত হল এ আই সি সি আমাকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নির্বাচিত করেছে। সুতরাং ঐ পদ ত্যাগ করার আমার পক্ষে কোন কারণ দেখা দেয় নি। সুব্রহ্মণ্যম এমন মন্তব্য করছেন কংগ্রেস সভাপতির সম্ভাব্য চিঠির উত্তরে। নিজলিঙ্গাপ্পার স্বাক্ষরিত সেই চিঠিতে আছে:- সুব্রহ্মণ্যমকে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান সম্ভব নয়। কারণ তামিলনাড়ু কংগ্রেস প্রধানরূপে পদাধিকার বলে তিনি ছিলেন এ আই সি সি'র সদস্য। আজ তাঁর সে পদও নেই, কাজে-কাজেই তিনি এ আই সি সি'র সভ্যও নন। আর তা না হলে ওয়ার্কিং কমিটিতেই বা তিনি থাকেন কী করে। সুব্রহ্মণ্যম এই যুক্তি মানতে অসম্মত।

নিজলিঙ্গাপ্পার এইরকম চিঠি আরও দুজনের জন্য তৈরি ছিল। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস ও অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিদ্বয় যথাক্রমে কমলাপতি ত্রিপাঠী এবং কে ভেঙ্কটরত্নমের কাছে প্রেরিত পত্রে লেখা হয়েছে, যেহেতু তাঁরা রাজ্যে মন্ত্রিত্বের গদির অধিকারী সেহেতু তাঁরা স্ব স্ব রাজ্যে কংগ্রেসের সভাপতি পদে আর বহাল থাকতে পারেন না। যুক্তি হিসাবে কোনটাই দুর্বল নয়। এমন চিঠি তৈরি হচ্ছে বলে জানার পর সদলে প্রধানমন্ত্রী তার প্রতিবাদ করায়, নিজলিঙ্গাপ্পা ঐ যুক্তি খাড়া করে বলেছেন, কংগ্রেস দলের সংবিধান অনুসারেই ঐ জাতীয় কর্মপন্থার কথা তিনি চিন্তা করছিলেন। অবশ্য তিনি চিঠির কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু চিঠির কথা এখন অস্বীকার করলেও অভিজ্ঞ মহলে ব্যাপারটা অনেকদূর প্রকাশ পেয়েছে। শোনা যাচ্ছে, কামরাজ এবং পাতিল নিজলিঙ্গাপ্পাকে এহেন পন্থা গ্রহণে উৎসাহিত করেছেন।

সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার, কংগ্রেস সভাপতিকে বারম্বার অসহায়ের মত তাঁর মতলব প্রকাশ্যে অস্বীকার করতে হচ্ছে। বিহারে বাংলাদেশ রাজ্যের জনতা পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের দীর্ঘ-দিনের পরিকল্পনা বানচাল হওয়াই নাকি নিজলিঙ্গাপ্পা এইভাবে বদলা নেওয়ার পরিকল্পনা করেন বলে প্রকাশ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কার্যত শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতি তাঁর আক্রমণ রচনায় বারম্বার ব্যর্থ।

আজ তাঁর প্রতি কংগ্রেসী নেতারা পদত্যাগের জন্য আহ্বানও জানাচ্ছেন।

কোনও মর্যাদাবান ব্যক্তির পক্ষে এহেন অবস্থায় বেশিদিন ক্ষমতার আসনের গৌরব বজায় রাখা দুঃসাধ্য। কংগ্রেসের সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য শীঘ্র বৈঠকের দাবিও পাতিলের পরামর্শে নিজলিঙ্গাপ্পা পিছিয়ে দিলেন ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত।

নিজলিঙ্গাপ্পার গান্ধী-সমর্থক হটাও লাইন যে পরবর্তী বৈঠকে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে তা সহজেই অনুমেয়। কারণ কংগ্রেস অনেক প্রস্তাবই গ্রহণ করেছিল, কোনটাই কোনদিন কার্যকরী করে নি। তাই কংগ্রেসের প্রস্তাব—নাকের ওপর এমন শিখণ্ডী খাড়া করার মুখ আজ আর কারও নেই। নিজ শিবিরের সুবিধার্থে কংগ্রেসী প্রস্তাবকে কাজে লাগানোর গুড়ে অনেককালই বালি পড়েছে।

কংগ্রেস সভাপতি অকস্মাৎ সচেতন হয়ে উঠেছেন। মন্ত্রীরা সাংগঠনিক প্রধানরূপে থাকেন কি করে, এই মহৎ চিন্তা তাঁকে বিনিদ্র করেছে আর্জ কেবলমাত্র গোষ্ঠীস্বার্থে। নয়ত উক্ত মর্মে কংগ্রেসের প্রস্তাব পাশ হয়েছিল ১৯৪৯ এবং ১৯৫১ সালে। কিন্তু তারপরও অনেক পাঁক পুণ্যস্রোতা গঙ্গার দুই কূলে জমা করে এসেছে কংগ্রেসই। আজ সেই পাঁকে সে ডুবন্ত। কংগ্রেস সভাপতি কোন্ কুটোটি আশ্রয় করে তাঁর সিণ্ডিকেটকে বাঁচাবেন।

কংগ্রেসী প্রস্তাব অবলম্বন করতে গেলে সর্বাগ্রে স্বর্গত শ্রীনেহরুই তাঁকে ফাঁসিয়ে দেন। নেহরুজী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন কংগ্রেস সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন কংগ্রেসী প্রস্তাবের মুখের ওপর। তিনি ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতির পক্ষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে এতাবৎকাল কোনও বাধা দেখা দেয় নি। প্রসঙ্গত উত্তর প্রদেশে সি বি গুপ্ত, বিহারে এস কে সিংহ বা পাঞ্জাবে দরবারা সিং-এর উদাহরণই যথেষ্ট। তাহলে নিজলিঙ্গাপ্পা তাঁর পার্টি-প্রস্তাব-চেতনার পক্ষে যুক্তি খুঁজে পাবেন কোথায়?

যখন প্রশ্ন উঠবে, কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পর শ্রীযুত নিজলিঙ্গাপ্পা মহাশয় নিজে কেমন করে ছয়-ছয় মাস তাঁর আপন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গদি আঁকড়ে থাকলেন? তখন তাঁর এই মহৎ চিন্তা সুষুপ্ত ছিল কেন?

নিজলিঙ্গাপ্পা যেখানে নিজেই ছিলেন মন্ত্রিত্ব রক্ষায় আগ্রহী, সেখানে কমলাপতি ত্রিপাঠী নিজে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দিতে চেয়েছেন মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর। কিন্তু সংগঠনই তাঁকে ছাড়তে চায় নি। ভেঙ্কটরত্নম অতি সম্প্রতি মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন। তিনি নিজে কী করেন, নিজলিঙ্গাপ্পার মতো দুই পদই আঁকড়ে থাকতে চান কি-না এখনো তার পরীক্ষাই হয় নি। আর সুব্রহ্মণ্যম তো এ-আই-সি-সি'তে ওয়ার্কিং কমিটিতে নির্বাচিত। কংগ্রেসের কানুন হল, ওয়ার্কিং কমিটির কোন সদস্য এ-আই-সি-সি দ্বারা নির্বাচিত না হলে তাঁকে ছ' মাসের মধ্যে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। সুব্রহ্মণ্যমকে তাও হতে হবে না, কারণ সে ঝঞ্ঝাট তিনি আগেই গুছিয়ে রেখেছেন।

সুতরাং নিজলিঙ্গাপ্পা প্ল্যান এবারও জুৎ করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না।

বাদশা খানের বিষাদ

শ্রদ্ধেয় পাখতুন নেতা সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফর খান এক প্রশ্নোত্তরকালে বর্তমান ভারতের চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার মধ্যে বৃদ্ধ নেতার বিষাদক্লান্ত মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছে। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর উক্তি ভারতের আপামর জনসাধারণকেও বিষাদাচ্ছন্ন করবে, বলে আশঙ্কা হয়।

বাদশা খান ভারতে পদার্পণ করেই চতুর্দিকে ভয়াবহ বিদ্বেষের যে ছবি দেখছেন বলে বারম্বার উল্লেখ করছেন, বলা বাহুল্য ভারতের নাগরিকবৃন্দ সর্বত্র তাঁর সেই উক্তির সঙ্গে একমত হতে হয়ত দ্বিধান্বিত হবেন। অন্তত ব্যক্তিগতভাবে 'ভারতদর্শন' প্রবন্ধকার বাদশা খানের উপর্যুপরি দোষারোপগুলি লক্ষ্য করে অত্যন্ত বেদনাবোধ করছেন।

সম্প্রতি বাদশা খান বলেছেন, ভারতে তাঁর অবস্থানের ইচ্ছে নেই। তিনি ভারতব্যাপী আজ শুধু স্বার্থান্ধতা, ঘৃণা এবং বলপ্রয়োগ লক্ষ্য করছেন। তাঁর বিশ্বাস, এই চারিত্রিক অধোগতি থেকে বাঁচতে হলে সমগ্র জাতিকে তার চরিত্র সংশোধন করতে হবে। অন্যথা, অন্যান্য দেশে যে অগ্রগতির ধারা বইছে তার থেকে ভারত ঢের দূরে পিছিয়ে থাকবে।

বাদশা খানের এহেন মনোবেদনা আমরা অনুভব করতে পারি বটে, কিন্তু বুঝতে পারি না তিনি ভারতবাসীকে দীর্ঘকাল ধরে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জেনেও কেন রামের দোষ শ্যামের কাঁধে চাপাচ্ছেন। অবশ্য গান্ধীজী চিরকালই একের দোষে অপরের প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়ে এসেছেন। বাদশা খান যদি ভারতের কুচক্রী কতিপয় নেতৃবৃন্দ এবং স্বার্থগোষ্ঠীর দোষ সমগ্র জাতির ওপর চাপিয়ে দিয়ে সমগ্র জাতিকে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে আহ্বান জানিয়ে থাকেন, তবে সেই যীশুবাণী শিরোধার্য করে অনেকেই হয়ত আত্মনিপীড়নের দ্বারা জাতির মুক্তি আনয়নে উৎসাহবোধ করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, আজ গান্ধীজীও নেই, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিও ভারতবর্ষে দুর্লভ। ঠোঁটের ডগায় যাঁরা গান্ধীভক্ত তাঁরা অনেকেই আপাদমস্তক গান্ধী-আদর্শ বিচ্যুত। বাদশা খান এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে সেই ভাবাদর্শের যাদুদণ্ড বুলিয়ে খুব বেশি কাজ তুলতে পারবেন কি? অথচ তাই যদি না পারেন, তবে সমগ্র জাতির মুখে এই কালিমাঞ্জন লেপন কি যথার্থ সুচিন্তিত কর্মপন্থা হচ্ছে। ভারতের যে সাধারণ মানুষ ত্যাগে ও তিতিক্ষায় রেকর্ড সৃষ্টি করতে পারেন এবং পারেন বলে বহুবার প্রমাণও রেখেছেন, কতিপয়ের উদগ্র লোভ, প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং আকাঙ্ক্ষার জন্য সেই অগণিত সজ্জন ব্যক্তির ওপর এই দোষারোপের বিনীতভাবে প্রতিবাদ জানানো প্রয়োজন বলে মনে করি।

আজ পাকিস্তান এবং ভারত-বিরোধী প্রচারকরা বাদশা খানের ভারত আগমনের এবং ঐ সমস্ত উক্তির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে অপপ্রচার শুরু করলে বাদশা খান কি পারবেন দেশের সেই সমস্ত প্রভাবশালী কুচক্রীদের চিহ্নিত করে সাধারণ মানুষকে তাঁর দ্বারা আরোপিত অকারণ কলঙ্কের পাঁক থেকে তুলে তাদের সত্য রূপ সমগ্র দুনিয়ার সামনে প্রচার করতে। মনে হয়, বাদশা খানের পক্ষে অতদূর এগোনোও সম্ভব নয়। তা সম্ভব হলে তিনি এখনই মুখোশের আড়ালের মুখগুলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরে বলতেন: আমি ওদের চিনি, তোমরাও ওদের চিনে রাখ। এদের নোংরা হাত থেকে ভারতের ভবিষ্যৎকে মুক্ত না-করতে পারলে তোমাদের অগ্রগতি নেই। অথচ এই কথাটাই একজন সুমহান নেতার মুখ থেকে শোনবার জন্য সমগ্র ভারত আজ উন্মুখ। বাদশা খান জাতির মুক্তির সেই পথ বাৎলালে তাঁর পদযুগল মাথায় রাখতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, সত্যভাষণকে একটা সামগ্রিকতার মোড়কে মুড়ে রাজনীতিবিদরা এমনভাবে তা তুলে ধরেন যাতে সমস্যা একই তিমিরে বহাল তবিয়তে বর্তমান থাকে, মাঝে পড়ে অপরাধী চিহ্নিত হন নিরীহ নিরাশ্রয় জনসাধারণ।

বাদশা খানের বিষাদ অকারণ নয়, একথা যেমন সত্য, ভারতবাসী হিংস্র নয় একথা তারও চেয়ে ঢের বেশি সত্য।

বাদশা খানও কি তা না বোঝেন। বোঝেন বলেই তো বলেছেন, রাজনীতি নিয়ে ভারতের রাজনীতিবিদরা করছেন "পলিটি কিং"। তাঁদের দেশ ও দশের প্রতি কোন মমত্ববোধ কোন প্রকৃত চিন্তা নেই।

কিন্তু এ তো কোন নতুন কথা নয়। আজ বিশ বছর একথাই শুনে আসছি।

(১১।১০।৬৯)

আন্তর্জাতিক

ব্রিটেন-২

গত সপ্তাহে ব্রাইটনে ক্ষমতাসীন শ্রমিক দলের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলনের গুরুত্ব খুবই বেশি। ১৯৬৬ সালে ব্রিটেনে শেষ নির্বাচন হয়েছে। আগামী আঠারো মাসের মধ্যে যে-কোন সময় নির্বাচন হতে পারে। হ্যারল্ড উইলসন সরকার স্থির করবেন, ঠিক কোন্ সময় নির্বাচন হবে।

ব্রাইটন সম্মেলনের বক্তৃতা, আলোচনা, প্রস্তাব সব কিছুই সাধারণ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে। সরকারীভাবে নির্বাচনী ইস্তাহাররূপে বর্ণনা করা না হলেও, 'নতুন যুগের বিষয়' বা 'অ্যাজেন্ডা ফর এ জেনারেশন' বলে যে দলিলটি সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর উদ্দেশে নিবেদিত শ্রমিক দলের মূল বক্তব্য।

ছেষট্টির নির্বাচনে জয়লাভের পর নানা কারণে উইলসন সরকারের জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। দলের প্রধান শক্তি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের নেতাদের তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। ধর্মঘটের প্রশ্নে সরকার ও ট্রেড ইউনিয়ন পরস্পরের বিরোধিতা করেছে, শেষ পর্যন্ত অবশ্য একটা মিটমাটও হয়েছে। দলের ভেতরে আভ্যন্তরীণ দলাদলিও দেখা দিয়েছে। উইলসনের পরেই যাঁর জনপ্রিয়তা সব চেয়ে বেশি এবং চৌষট্টি ও ছেষট্টি, দুবারের নির্বাচনেই লেবার পার্টির সাফল্যের পেছনে যাঁর অবদান খুব বেশি, সেই জর্জ ব্রাউন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। সব মিলিয়ে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, অনেকেই বলা সুরু করেছিলেন, নতুন নির্বাচনে শ্রমিক দলের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। পর পর চার-পাঁচটি

সবিনয় নিবেদন

শারোদৎসব উপলক্ষে সাপ্তাহিক বসুমতীর আগামী সংখ্যাটি (২৩.১০.৬৯) প্রকাশিত হবে না। ৩০শে অক্টোবর তারিখের সংখ্যাটি যথারীতি প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদিকা

উপনির্বাচনে শ্রমিক দলের অসাফল্য এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করেছে। বিরোধী রক্ষণশীল দল এতে উল্লসিত বোধ করেছে, এবং নির্বাচনে জয়লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশান্বিত হয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি অবস্থার বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। শ্রমিক দলের অভ্যন্তরে ঐক্য ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ব্রাউন আবার নেতৃত্বে এসেছেন। ব্রাইটন সম্মেলনে ব্রাউন উপস্থিত ছিলেন এবং সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গেও একটা বোঝাপড়া হয়েছে। সরকারী কাজে আরও দক্ষতা ও গতিশীলতা আনার জন্য মন্ত্রিসভায় কিছু রদবদল করা হয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা, বৃটেনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যালান্সে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গত ছয় মাসে বৃটেনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাড়ে এগারো কোটি স্টার্লিং পাউন্ড উদ্বৃত্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে আবার শ্রমিক দলের পক্ষেই অনুকূল হাওয়া বইতে সুরু করেছে।

হ্যারল্ড উইলসন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্রাইটন সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর ভাষণের প্রতি ছত্রে গভীর আস্থার ভাব ব্যক্ত হয়েছে। ব্রিটেনের অনড় অটল গতিহীন বন্ধ্যা অর্থনীতিতে তাঁর সরকার গতি আনতে পেরেছেন এবং শ্রমিক দলের নীতির দ্বারাই একমাত্র অবস্থার উন্নতি হতে পারে, এই হল তাঁর বক্তব্য। তাঁরা পরিবর্তনের পক্ষপাতী। শ্রমিক দলকে সমর্থন করে জনসাধারণ ঘোষণা করবে, তারাও পরিবর্তন চায়। আগামী নির্বাচনে শ্রমিক দল যে জয়লাভ করবে, এ বিষয়ে উইলসনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। উইলসন তাঁর বক্তৃতার জন্য প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছেন। সম্মেলনের পর দল তথা জাতির কাছে উইলসনের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হল। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ব্রাইটন বক্তৃতা কেবল উইলসনের শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা নয়, ইদানীংকালে ব্রিটেনে যত রাজনৈতিক বক্তৃতা হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা।

দুটি প্রভাবশালী ট্রেড ইউনিয়নের বিরোধিতা সত্ত্বেও সম্মেলনে দাম ও আয় সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রিসভার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্যা শ্রীমতী বারবারা ক্যাস্‌ল এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিয়নের স্ক্যানলন ও ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জোনস এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন।

শ্রমিক দলের নির্বাচনী বক্তব্যে অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলা হয়েছে। তবে বারবারা ক্যাসল পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, মেয়েদের বেতন পুরুষদের

ব্রাউন

হ্যারল্ড উইলসন

সমান করার দাবি ১৯৭৫ সালের আগে মেটানো যাবে না।

যাই হোক, ব্রাইটন সম্মেলনের পর শ্রমিক দল নতুন আস্থা এবং উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হতে পারবে। বিপরীত দিকে কিন্তু রক্ষণশীল দলের অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। উগ্র বর্ণবৈষম্যবাদী নেতা এনক্ পাওয়েল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই-এ নেমেছেন। এবার তাঁর 'ইস্যু' কমন-মার্কেট। এডওয়ার্ড হিথকে দলের নেতৃত্ব থেকে সরানোর জন্য তিনি চেষ্টা করছেন। তবে বর্ণবৈষম্য এবং ব্রিটেন থেকে কৃষ্ণকায় বিতাড়নের প্রশ্নে দলের মধ্যে তিনি যেমন ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিলেন, এ ব্যাপারে তা তিনি পান নি। তবু এই দ্বন্দ্বের ফলে রক্ষণশীল দল দুর্বল হচ্ছে, জনসাধারণের কাছে দলের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। নির্বাচনের সম্মুখীন হবার জন্য যে দৃঢ়তা দরকার, দল তা হারাচ্ছে।

সব দেখে মনে হয়, শ্রমিক দলের দিকেই আবার জনমত ঝুঁকেছে এবং আসন্ন নির্বাচনে পূর্বের চেয়েও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে।

পশ্চিম জার্মানীঃ

সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ও ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টি মিলিতভাবে পশ্চিম জার্মানীর নতুন সরকার গঠন করবে এবং সোস্যাল ডেমোক্রাট নেতা-বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলি ব্রান্ডট হবেন পশ্চিম জার্মানীর নতুন চ্যান্সেলার। এই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এখন 'বান্ডেস্টাগের' (সংসদ) অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যান্সেলার নির্বাচন করতে হবে।

ইতিমধ্যে উইলি ব্রান্ডট আগামী 'একশ' দিনের জন্য তাঁর 'কোয়ালিশন সরকারের নীতি ঘোষণা করে বিবৃতি দিয়েছেন। ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা ওয়ালটার শিল্ও তাঁর বিবৃতিতে নতুন সরকারের পক্ষে আরও প্রগতিশীল নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন।

ব্রান্ডট ও শিলের বিবৃতি থেকে নতুন সরকারের যে নীতির আভাষ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ক্ষেত্রেই এতদিনের অনুসৃত জার্মান নীতির বেশ পরিবর্তন হবে।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হবে। বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর পরিবর্তে শ্রমিক ও কর্মচারীর স্বার্থে নতুন সরকারের নীতি গ্রহণ করা হবে।

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন আসবে। পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীর যে সম্পর্ক রয়েছে, তা অব্যাহত রাখা হবে। 'ন্যাটো'র সঙ্গে যোগও অক্ষুণ্ণ থাকবে। এদিক থেকে ব্রান্ডট নতুন কিছু করছেন না, বরং আদেনুয়ার ও কিসিঙ্গারের পথই তিনি অনুসরণ করছেন। পরিবর্তন আনা হবে কমিউনিস্ট শিবিরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে পূর্ব জার্মানী ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা হবে। এদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানো হবে, রাজনৈতিক দিক থেকেও বোঝাপড়ার চেষ্টা হবে। পূর্ব জার্মানীকে একটি পৃথক রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতিদান এখনই সম্ভব হবে না, তবে ব্রান্ডট চান দুই জার্মানীর মধ্যে বন্ধুত্বের একটা চুক্তি হোক এবং উভয়ে মিলিমিশে থাকার চেষ্টা করুক। বার্লিনের ব্যাপারটাও স্বাভাবিক করা হোক। ১৯৫৫-এর হলস্টাইন নীতিও বোধ হয় এবার পশ্চিম জার্মানী বাতিল করবে। এই বহু বিতর্কিত নীতি অনুসারে যদি কোন রাষ্ট্র পূর্ব জার্মানীকে স্বীকার করে, তবে পশ্চিম তার এই কাজকে পশ্চিম জার্মানীর প্রতি বৈরিতামূলক কাজ বলে গণ্য করা হয়।

তবে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী বিশেষ করে 'ন্যাটো' সামরিক জোটের সঙ্গে পূর্ব সম্পর্ক বজায় রেখে, ব্রান্ডট সরকার কমিউনিস্ট শিবিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব-প্রতিষ্ঠার নীতি কতটা অনুসরণ করতে পারবেন, বলা শক্ত।

তথাপি, দুই জার্মানীর সম্পর্ক যদি ভাল হয়, তবে কেবল জার্মানী নয়, ইউরোপের উত্তেজনা অনেকখানি প্রশমিত হবে।

(১২-১০-৬৯)

কয়েকখানি বিখ্যাত বাংলা অনুবাদ

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা	— রবার্ট ফ্রস্ট	৩.০০
কার্ল স্যান্ডবার্গের এক মুঠো	— কার্ল স্যান্ডবার্গ	২.০০
মোহক ভ্যালিতে রণবাদ্য	— ডাব্লিউ, ডি, এডমণ্ডস্	১.২৫
চিরজীবী রূপালয়	— এলমার রাইস	৫.০০
মিত্রালয়		
জীবনের খতিয়ান	— হেনরী জেমস্	৫.০০
মবি ডিক	— হারমান মেলভিল	৫.০০
মহানদের পাঁচালী	— মার্ক টোয়েন	৫.০০
বাক্-সাহিত্য		
মজ্ঞানপুরী	— আন্দ্রি সিনিয়াভ্স্কি	৪.০০
মানব ও সমাজবিজ্ঞান	— স্টুয়ার্ট চেজ	৩.০০
বিচার	— ম্যাক্স হেওয়ার্ড	৩.০০
সাহিত্যায়ন		
আদালোর ঘণ্টা	— জন হার্সি	৪.০০
পুনর্মিলন	— সান সান	২.০০
অতৃপ্তির অমানিশা	— জন স্টাইনবেক	৩.০০
পলাতকা	— পার্ল বাক	৩.০০
হোমশিখা, কৃষ্ণনগর		
মাটি, মানুষ আর ইতিহাস	— হেলফ্‌ম্যান	১.৫০
হিউবার্ট হোরেশিও হামফ্রী	— গ্রিফিথ	১.৫০
পালিয়ে এলাম	— রবার্ট লো	১.৫০
বসুধারা		
অরিগনের যাত্রাপথে	— পার্কম্যান	৫.০০
শান্তির দূত	— পি, মোয়ার	২.০০
মহান রুজভেল্ট	— সি এ পিয়ার	৩.০০

নানা বিষয়ে আরো অনেক বই : তালিকা চেয়ে পাঠান :

—তক বিক্রেতাদের উচ্চ কমিশন আজই অর্ডার দিন

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলি-১২

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

পক্ষকাল পূর্বে সপ্তাহের বোঝায় "শিরে সর্পাঘাত" লিখেছিলাম। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র পাঠকরা হয়তো অনেকে এই নিবন্ধে কিছু বিস্মিত হয়েছিলেন, কেউ কেউ যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে কথা তাঁরা জানিয়েও দিয়েছিলেন। কম করে চারজন মন্ত্রী এবং চার-পাঁচটি রাজনৈতিক দলের নেতাও এই নিবন্ধ সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পক্ষকালের মধ্যে সেই 'শিরে সর্পাঘাত' নিবন্ধের বক্তব্য যে এত দ্রুত জীবন্ত হয়ে উঠবে, সে কথা কিন্তু আমারও কল্পনার বাইরে ছিল। কারণ রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দলনেতাগণ সম্পর্কে মনে কিছুটা বিশ্বাস ও আস্থা থাকায় ভেবেছিলাম সঙ্কট যদিও দ্রুতগতিতে ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে, তবুও যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই তাঁদের রাজনৈতিক বাদুতে সঙ্কটের বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারবেন। কিন্তু নেতৃবৃন্দের ও দলনেতাদের হাত যে এত কাঁচা এটা সত্যিই চিন্তার অতীত ছিল।

যেমন বাংলা কংগ্রেসের কথাই সর্বপ্রথম বলতে হয়। বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া মশায় সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে, দলনেতা হিসাবে তিনি অতি বিচক্ষণ ও সংগঠন শক্তির অধিকারী। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে সামনে নিয়ে দল গড়ে তুলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটানো এবং নিজের ক্ষুদ্র দলকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দলে পরিণত করানোয় শ্রীসুশীল ধাড়ার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই ধাড়ামশায় যে কাজটি করলেন, সেই কাজটি এত কাঁচা কাজ যে, তার ফল শুধু তিনি নন, তাঁর নেতা শ্রীঅজয় মুখার্জী নয়, তাঁর দল বাংলা কংগ্রেস নয়, সমগ্র যুক্তফ্রন্ট তথা পশ্চিমবঙ্গের শাসক পার্টিতে গুরুতর সঙ্কট সৃষ্টি করল। বাংলা কংগ্রেস গত '৬' তারিখে যে রাজনৈতিক প্রস্তাবটি গ্রহণ করে, সেই প্রস্তাবটিই হল রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্কটের মূল উৎস। প্রথম কথা হল, যুক্তফ্রন্টের একটি শরিক দল—যে দলের নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী—সেই দল থেকে এইরকম একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, বাংলা কংগ্রেস তার প্রস্তাবে যে সকল অভিযোগ করেছে সেই সব অভিযোগ সম্পর্কে দু'দিন আগেও যদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হত, তিনি নিশ্চিতভাবে যুক্তিতর্ক দিয়ে এই অভিযোগগুলি উড়িয়ে দিতেন। যেমন শান্তি-শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে দু'দিন আগেও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন—'সব ঠিক আছে'। এবং যে কোন অভিযোগ সম্পর্কে সরকারী নীতিকে ডিফেন্ড করেছেন। কিন্তু দু'দিন পর বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবে দেখা গেল এই রাজ্যে কিছু নেই; আইন-শৃঙ্খলা, ন্যায় বিচার এমন কি নারীর মর্যাদা পর্যন্ত। একটি কথা অবশ্য আজ গোপন নেই। এই প্রস্তাব রচনা এবং সাংবাদিকদের কাছে বন্টন দুই-ই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন না। শ্রীসুশীল ধাড়া দলের প্রস্তাব সাংবাদিকদের কাছে পেশ করার পর সাংবাদিকরা যখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একের পর এক প্রশ্ন করেন, তখনই জানা গিয়েছিল এই প্রস্তাব সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞান সীমিত। কিন্তু তাঁর দ্বারা প্রস্তাবের গুরুত্ব লঘু হয় না, মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব হ্রাস পায় না। প্রথম কথা হল, এই বাংলা কংগ্রেস এমন গুরুতর অভিযোগ প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ করল কেন? যদি করল, তবে সেটা যুক্তফ্রন্টের সভায় আলোচনার জন্য পেশ না করে আন্তঃপার্টির আলোচনার সুযোগ না দিয়ে সরাসরি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দিল কেন? আর যদি দিল তবে মহাকরণে মন্ত্রীর ঘরে বসে দেওয়া হল কেন? নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায়, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা, ধন, মান, প্রাণ, সব কিছুর নিরাপত্তা চরম বিঘ্নিত ও বিপন্ন এ কথা অস্বীকার করার অর্থ সত্যের অপলাপ করা এবং যে বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবে লিখিত অভিযোগগুলি কিঞ্চিত আধিক্যদোষে দুষ্ট ছাড়া বহুলাংশে সত্য ও বাস্তব সম্মত। কিন্তু আরেকটি কথাও আছে। সেই কথা হল, এই নৈরাজ্যময় পরিবেশের পাশে একটা বিরাট সাফল্যের সৌধ গড়ে উঠেছে। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, সরকারী কর্মচারী, শিক্ষকসহ অগণিত মানুষ—যারা ছিল বঞ্চিত, অবহেলিত, অধিকারহীন কুণ্ঠিত, তারা এই সরকারের কাছ থেকে বিগত কয়েক মাসে যা পেয়েছে, তা নজিরহীন, তুলনাহীন, গর্ব ও অহঙ্কারের। বাংলা কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিগত কয়েক মাসের কার্যকলাপের খতিয়ান রচনায় ও মূল্যায়নে শুধু অন্ধকার দিকটাই দেখল, দেখল ব্যর্থতার দিক, অসাফল্যের দিকটি। উল্লেখ করল না সাফল্যের মহিমাময় কর্মকাণ্ডের। একটা পাকা গুটি কিভাবে কাঁচা করে দেওয়া যায়, বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব হল তারই একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রদপ্তর পরিচালনা সম্পর্কে কম বেশি অভিযোগ যুক্তফ্রন্ট শরিক দলের অনেকেই করছে। সত্য কথা বলতে কি, পুলিশের ব্যবহার ও অন্যান্য কিছু ঘটনায় সি পি এম বেশ কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল বলা যায়। অর্থাৎ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র-পুলিশমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে প্রায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল কয়েকটি দল।

কিন্তু আজ বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবে শুধু বাংলা কংগ্রেস আসামীর কাঠগড়ায় আসামী হল না, সি পি এম দলের কার্যকারণ সম্পর্কে অভিযোগ তুলতে আজ আর কারও মুখে রইল না। কোন ক্ষতিই হত না—বাংলা কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, সেই প্রস্তাবের সঙ্গে যদি বলত সরকার কিছু ভাল কাজও করেছে, যদি বলত যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনে ছয় মাস শুধু অন্ধকার নয়, আলোরও একটা দিক আছে। সেই সঙ্গে প্রস্তাবটি যদি সরাসরি জনগণের কাছে তুলে দেওয়া না হোত। এ ছাড়া এই প্রস্তাবে উল্লেখ করা হল শুধু সেইরকম কয়েকটি দপ্তরের কথা যা সি পি এম দলের হাতে। উল্লেখ করা হল না অন্য কোন দলের দপ্তরের যা সি পি এম দলের হাতে। উল্লেখ করা হল না অন্য কোন দলের দপ্তরের ব্যর্থতার। কিন্তু ব্যর্থতা যদি থেকে থাকে, সে কি শুধু স্বরাষ্ট্রদপ্তরেই আছে? শ্রম শিক্ষা ভূমি-রাজস্ব দপ্তরেরই আছে? অন্য কোন মন্ত্রীর দপ্তরগুলি কি রেসের টাট্টু ঘোড়ার মত চলছে। একথা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হল, সরকার পরিচালনার সাথে যুক্ত একটি দল যে দলের নেতা হলেন—রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, সেই দল থেকে এমন প্রস্তাব কিভাবে গ্রহণ করা যায় বা গ্রহণ করে প্রচার করা যায় যার দ্বারা সরকারের স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়! বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবে যা গ্রহণ করা হয়েছে এবং যে-প্রস্তাবের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নাম যুক্ত করা হচ্ছে, সেই প্রস্তাবটি কয়েক'শ কপি করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন যদি লোকসভার সদস্যদের নিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি হল এই, অতএব রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা হোক। তাহলে কারো কিছু বলার থাকে না। শ্রীসুশীল ধাড়া মশায় অথবা বাংলা কংগ্রেস নিশ্চয় সেটা চান নি। তাই বাংলা কংগ্রেসের এই রাজনৈতিক প্রস্তাব হল একটি কাঁচা কাজ. 'শিব গড়তে' গিয়ে বাঁদর গড়ে ফেলার পরিণতি।

শিব গড়তে সি পি এম বাঁদর গড়ে বসল। সি পি এম দলের সর্বোচ্চ সংস্থা হল পলিট ব্যুরো। পলিট ব্যুরো বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে এক বিরাট প্রস্তাব নিয়ে বসল। সেই

প্রস্তাবটিও যথারীতি দেওয়া হল সংবাদপত্রে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই রাজ্যে কংগ্রেস কোন মার্কসবাদী রাজনৈতিক দল নয়, দূরদর্শী চিন্তাশীল ও সারা ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নির্ভরশীল দলও নয়। কিন্তু সি পি এম দল সম্পর্কে একথা আশা করা যায়—তারা যে কথা বলবে সেই কথা সাতবার ভেবে বলবে, সেই কথার সুদূরপ্রসারী ফলের কথা ভেবে বলবে। কিন্তু সি পি এম পলিট ব্যুরো বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবের ওপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল শুধু সংবাদপত্র দেখে। স্মাগল্ড ওয়েতে 'বাংলা কংগ্রেসের' একটা মূল কপি যদি পেয়েও থাকে সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু পলিট ব্যুরো তাদের প্রস্তাব গ্রহণের আগে একবারও কি সরকারিভাবে বাংলা কংগ্রেসের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মশাই কাগজে দেখছি আপনারা এইরকম একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, তার তাৎপর্যটা কি?" আমি অত্যধিক নির্ভরযোগ্যসূত্রে জেনেছি '৬—৯' তারিখের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়কে যদি প্রস্তাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হত—তবে তিনি বলতেন, যুক্তফ্রন্টকে হেয় করতে, দুর্বল করতে, তিনি চান নি। হয়তো একথাও বলে দিতেন, এই প্রস্তাবটি রচনা ও প্রকাশ অসাবধানতাবশত হয়েছে। অতএব সকলে মিলে চেপে যাওয়াই ভাল। কিন্তু সি পি এম সে পথে গেল না। তারা দেখল কাঁচা কাজ করে বাংলা কংগ্রেস তথা মুখ্যমন্ত্রী যখন গাড্ডায় পড়েছে, তখন আর এক ধাপ এগিয়ে যাও। উল্টোপাল্টা কথা বা প্রস্তাব বাংলা কংগ্রেস এই প্রথম প্রকাশ করেছে এমন নয়। ভোজে কম হলেও এই ধরণের কিছু কিছু কথাবার্তা অতীতে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তখন সকলে চেপে যাওয়াটাকেই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছে।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে চেষ্টা শুরু হল 'ফয়দা' তুলবার। তাই শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন, ময়দানে ইন্দিরা গান্ধীর সভা দেখে অনেকে বিকল্প পথের কথা ভাবছে, বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব হল তারই উৎস। অজয় মুখার্জী মশায় তাঁর দলের প্রস্তাবে চ্যবনের হাতকেই শক্ত করছেন। 'গণশক্তি' লিখল—চ্যবনের হাতে হাতিয়ার তুলে দেওয়া হল। গণশক্তি আর এককাঠি এগিয়ে চ্যবন, টাটা, বিড়লা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সকলের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি'কে পংক্তি-ভোজনের শরিক করে দিল। অর্থাৎ "দাদা ছিল দাঁড়িয়ে সেও দিল বাড়িয়ে"। বোকামির প্রতিকার বোকামী দিয়ে হয় না। সি পি এম বাংলা কংগ্রেসের বোকামীকে যুক্তফ্রন্ট দলের বড় শরিক হিসাবে সামাল দেওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে আগুনে আরও খানিকটা ঘি ঢেলে দিল। মূল ফলটি কি হল? মূল ফল হল এই লোকহাসা। যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি চালাতে হয়, তবে অজয় মুখার্জীকে বাদ দিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত চালাতে পারবেন না, প্রমোদ দাশগুপ্তকে বাদ দিয়েও শ্রী—শীল খাড়া পারবেন না। কিন্তু সরকার ভেঙে দিয়ে কোন বিকল্প সরকার গঠন করা বা কাউকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করা যেমন কারো হিম্মতেই নেই, বলবার সাহসে নেই, বাস্তবেও তাই সম্ভব নয়।

এই সব ঘটনার একমাত্র ফলশ্রুতি হল সরকারের ভাবমূর্তিকে বিকৃত করা, পরমায়ুকে সীমিত করা আর বিষধর সাপকে হাতে করে তুলে 'শিল্পে সর্পাঘাতের সহায়তা' করা।

কথায় বলে বাগির পর বিষফোড়া। বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে যখন টাল-মাটাল অবস্থা, তখন ফরওয়ার্ড ব্লক প্রস্তাব গ্রহণ করে সংকটকে আর এক-দফা বৃদ্ধি করে দিল। তবে এর মধ্যে একমাত্র লাভ হল—গ্যাস বেরিয়ে যাওয়া ভাল। পুজোর বাজার বেশ কিছুদিন ধরে পুজোর আমেজে থাকবে, মানুষ দল-নেতাদের অপেক্ষা প্রতিমা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকবে—যদি সেই সুযোগে দল-নেতারা নিজেদের গ্যাস বের করে নিতে পারেন ভাল।

শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের সামনে বসে আছি। প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা বলুন তো, যুক্তফ্রন্টের এই সংকট মোচন কিভাবে হবে? শ্রীদাশগুপ্ত চুরুটের ছাই ঝেড়ে নিরুত্তর রইলেন। বললাম—আমি কিন্তু একটা সহজ সমাধান দিতে পারি, সেটা হল অনেক সংকটই সংকট থাকবে না, আপনি যদি রাজ্য মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মন্ত্রী হলে আর যুক্তফ্রন্টের সভায় নিয়মিত যোগ দিলে অনেক সংকটই সৃষ্টি হবার আগে মিটে যাবে।

শ্রীদাশগুপ্ত বললেন—আপনি সংকট দেখছেন কোথায়? সংকট হলেই কেউ মরে না—কাজেই যুক্তফ্রন্ট সরকার চলছে, চলবে।

হরষে বিষাদ—

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

যুক্তফ্রন্ট আবার সংকটের সম্মুখীন। স্বভাবতই ফ্রন্টে সংকট দেখা দিলে সরকারের মধ্যে-ও তার প্রতিফলন দেখা দিতে বাধ্য। বাংলা কংগ্রেস এতদিন পর্যন্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ একেবারে বোমা ফাটিয়েছেন। ফরোয়ার্ড ব্লক-ও এতদিন পর্যন্ত সি পি এম, সি-পি-আই-এর শরিকী বিবাদ মেটানোর ব্যাপারেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন। হঠাৎ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পর থেকেই ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ সি-পি-এম-এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত মুখর হয়ে উঠেছেন।

বাংলা কংগ্রেসের যে প্রস্তাব শ্রীসুশীল ধাড়া সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করেছেন তার বক্তব্যের সব ঘটনাই সত্য যদি হয়ে থাকে তাহলেও একদিনে ঘটে নি। এতদিন পর্যন্ত আশ্চর্যতর নীরবতার পর বাংলা কংগ্রেস আকস্মিকভাবে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে রুখে দাঁড়ালেন কেন? ফরোয়ার্ড ব্লক সম্পর্কে সি-পি-এম-এর দৃষ্টিভঙ্গিও নতুন নয়। সংঘর্ষ অনেকদিন ধরেই এখানে-ওখানে ঘটছে। কিন্তু শ্রীঅশোক ঘোষই বা এত সরব হলেন কেন?

কম্যুনিস্ট পার্টি এবং এস্-ইউ-সি'র ভূমিকায় কোথাও ভুল বোঝার সুযোগ নেই। মুখ্যমন্ত্রিত্ব ও স্বরাষ্ট্রদপ্তর কে পাবেন—এ নিয়ে বিতণ্ডার সুরু। দপ্তর বন্টনে তার পরিণতির দিন থেকে। অসন্তুষ্ট কম্যুনিস্ট পার্টি এবং এস্-ইউ-সি মন্ত্রিসভার বড় শরিক সি-পি-এম-এর ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে মুখর।

বাংলা কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লক মোটামুটিভাবে পুরনো পালক-এর সম্পর্ক বজায় রাখলেও সি-পি-এম সম্পর্কে এতটা সোচ্চার ছিলেন না। সি-পি-এম নেতৃবৃন্দ এই ঘটনাগুলোকে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে একটা চক্রান্তের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলাদেশে সে অবস্থা সৃষ্টি কি সম্ভব!

একটা দিক সম্পর্কে ভাবা প্রয়োজন। বিবৃতির লড়াই যখন জোর কদমে চলেছে তখনো কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংসে পারস্পরিক হৃদ্যতার অবনতি দেখা যাচ্ছে না। মন্ত্রিসভার বৈঠকে হাসাহাসি রসিকতা সব সমানে চলছে। তাহলে কি বুঝতে হবে কোন দলই যে এখনো ফ্রণ্ট ভাঙতে চায় না সব দলই সে সম্পর্কে সচেতন।

বাংলা কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলীর সাম্প্রতিক প্রস্তাব আর ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদকের সাম্প্রতিক ভূমিকা গ্রহণের সময়টা লক্ষণীয়। বাংলা কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে নভেম্বর মাসে আর ফরোয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় সম্মেলন ফেব্রুয়ারী মাসে। এই দুটো সম্মেলনের আগে দলের র‍্যাঙ্ক এণ্ড ফাইলকে চাঙ্গা করার একটা চেষ্টা চলছে কি? নীতি নিয়ে আর নেতৃত্ব নিয়ে আভ্যন্তরীণ বিরোধের ছোঁয়াচ কি বাংলা কংগ্রেস আর ফরোয়ার্ড ব্লকের গায়ে আদৌ লাগে নি। আসন্ন সম্মেলনের আগে তারই প্রতিক্রিয়া কি পড়তে সুরু করেছে? না হলে যে অভিযোগ তাঁরা করছেন তার পরে-ও এক সঙ্গে সরকার চালানো সম্ভব কি?

অন্যদিকে আর-এস্-পি মোটামুটিভাবে পুরনো উলফ্ সম্পর্ক বজায় রাখলেও বাংলা কংগ্রেসের সম্পূর্ণ বিপরীত সমালোচনায় তারাও ফ্রন্ট সরকারকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করছেন না। তাঁরা বাড়াবাড়ির অভিযোগ না তুলে উল্টো অভিযোগ করছেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার সত্যি সত্যি সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে উঠলে কৃষক এবং শ্রমিক-আন্দোলন আরো জঙ্গী হয়ে উঠতো। গরীব কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে সচেতনতা দেখা দিয়েছিল তাকে সঠিক খাতে বইয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না বলে আর-এস্-পি কলকাতায় নভেম্বর মাসে কৃষক সমাবেশ আর জানুয়ারী মাসে গণ-সমাবেশের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে আর-এস্-পি এই প্রথম সারা রাজ্যভিত্তিক সমাবেশের ডাক দিয়েছে। আর-এস্-পি'র এই সিদ্ধান্তও কি আর-এস্-পিই তত্ত্ব আর তার ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে বৈষম্য থাকায় কর্মীদের মধ্যে যে চাপা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তা চাপা দেওয়ার জন্যই।

এ তো গেলো ফ্রন্টের কথা। আর ফ্রন্ট সরকার কি করছেন? গোড়ার দিন থেকে সরকার যদি ঠিক পথে চলতেন তা হলে ফ্রন্টের এত সংঘর্ষ দেখা দিত না।

প্রথম দিন থেকেই ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কাজ সুরু করেছে বিচ্ছিন্ন কতকগুলো স্বয়ংশাসিত দপ্তরের ফেডারেশন হিসেবে। মন্ত্রিসভার কোন যৌথ দায়িত্ব নেই। যাঁর যাঁর দপ্তর তাঁর তাঁর মাথা-ব্যথা। যে দল যে দপ্তরের ভার পেয়েছেন সেই দল সেই দপ্তরের একচ্ছত্র অধিকর্তা। শুধু দল বললে ভুল হবে। দলাদলির দপ্তরের প্রতিক্রিয়া এক দলের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে দেখা দিতে সুরু করেছে। একটি দপ্তরের সঙ্গে আর একটি দপ্তরের যোগাযোগ নেই। ফলে দায়-ও নেই—দায়িত্ব-ও নেই।

আইন-শৃঙ্খলার কোনো প্রশ্ন উঠলেই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেন—জ্যোতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন। কৃষক কর্মীরা ডেপুটেশনে এলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সাফ জানিয়ে দেন—ওটা তো হরেকৃষ্ণবাবুর ব্যাপার। হাসপাতালে ধর্মঘট—ননীবাবু মেটাবেন।

স্বয়ং শাসিত দপ্তরগুলোর কনফেডারেশনে শুধু সভাপতিত্ব করার দায় মুখ্যমন্ত্রীর। এই যৌথ দায়িত্বের অভাব সব দপ্তরেই আমলাদের সুযোগ দিয়েছে। আর এই অভাব-ই শরিকী বিরোধের ভিত্তি পত্তন করেছে।

দলীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজ দপ্তর চালানোর অভিযোগের বিরুদ্ধে বাংলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যত সোচ্চার-ই হোন না কেন, এ সত্য কে অস্বীকার করবে যে, শ্রীধাড়ার বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের কাজ-কর্মে অন্য দলের কোনো পরামর্শ গ্রহণ করার চেষ্টাও হয় নি। আর-সি-পি-এম-এর সম্পর্কে তো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁদের সদস্য বেশি—হাতে দপ্তর বেশি। তাই তাঁদের কার্যকলাপ সকলের চেয়ে বেশি নজরে পড়ে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তর বহু উপদেষ্টা-কমিটি গড়েছেন। কোনো মন্ত্রী কি বলতে পারেন, তাঁর দপ্তরে যে কমিটি গঠিত হয়েছে সেখানে সিংহভাগ নিজের দলকে না দিয়ে অন্য দলকে দিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর কমিটির প্রধান সি-পি-এম-এর ডন বসকোর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করার সময় সর্বপ্রথম নাম ওঠে সি-পি-এম নেতা শ্রীকে জি

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০,। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

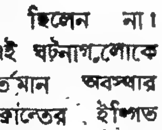

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

ভোর
সুনন্দা দাশগুপ্ত

কুয়াশার পর্দাঢাকা ঘুমন্ত নগরে
বন্ধ হল নাচঘর।
জানলার ঘষা কাঁচে আলোর ইঙ্গিত।
নির্জন রাতের পরে
নৃত্যসুনিপুণা নটী ক্লান্ত পায়ে ঘরে ফিরে চলে
রাতের শিশিরে ভেজা পীচঢাকা কালো পথ ধরে।

ভোরের অস্পষ্ট আলো মন্দির চত্বরে।
সূর্যের আভাসমাখা দু-একটি পাখির ডানায়,
মেঘের তুলিতে আঁকা দূরে দিগন্তরে
ঈষৎ চাঞ্চল্য জাগে বুঝি।
শীতের কাঁপন লাগে শিরীষের রিক্ত ডালে ডালে।
সবুজ পান্নার মতো দূর্বাদলে শাদা ফুল ঝরে,
রাতজাগা আরক্তিম চোখের তারায়
নিটোল মুক্তার বিন্দু টলোমল করে।

হাজার নদী যখন
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

হাজার নদী যখন লাফ দিয়ে মেঘের সঙ্গী হয়
মাতাল বাতাস যখন তাদের নিয়ে ছোটাছুটি করে
কৌতুকে সূর্য ছুটি নিলে পর
দিন-দুপুরে উদাসী বাউল
বৃষ্টির একতারা বাজায়;

আলো নিংড়ে নেওয়া সকালটা কেমন যেন বিরুদ্ধ মুহূর্ত;
শরীরে বৃষ্টি লাগিয়ে সারাদিন
কী যেন খুঁজে ফেরে সেই যুবক;
কী আশ্চর্য ভালোবাসা ভালোবাসা করে
সময়টা ভিজে বাতাসেও অক্লান্ত;
শরীরে বৃষ্টি লাগিয়ে সারাদিন
সারাদিন কী যে খুঁজে ফেরে সেই যুবক,
ভেবেছিল বকুল কুড়িয়ে পাবে
ভেবেছিল কদমের সুবাস শরীরে মাখবে, ভেবেছিল
ভালোবাসার নির্বাসে শিল্প রচনা করবে;

ফুল পাখি নারীর শরীর একাকার হয়ে যায়,
সন্ধ্যার ধূসরতায় ছিন্নভিন্ন কোরক
ভেসে যায় নদীতে; হাজার নদী হয়ে
সমুদ্রে; সমুদ্র থেকে আবার আকাশে;
মেঘের সঙ্গী হয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে?

আশ্চর্য যুবক কে আসবে বলে ভরা বাদলে
এখনো খুঁজে ফেরে বকুল, কদম............ ॥

বসুর। কলেজ পরিচালকমণ্ডলী গড়তে হলেও যত যোগ্যতাই থাকুক না কেন, অন্য দলের সদস্যরা নায়কত্ব করতে পারবেন না। ভূমি সংস্কারের যা কিছু করা হোক সি-পি-এম-এর স্থান সর্বাগ্রে। সোমনাথবাবুর ফ্ল্যাট বিতরণ কমিটির চেয়ারম্যান হবেন শ্রীমতী ইলা মিত্র। ঋণদান কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমতী গীতা মুখার্জী। সি-পি-এম-এর ভাগের পরিবহন দপ্তরের আর-টি-এ'র মুখ্য হোতা হবেন শ্রীহরপ্রসাদ চ্যাটার্জী। শ্রীশম্ভু ঘোষের দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীহেমন্ত বসুর নাম স্থির করার সময় তাঁর খাদিপ্রীতির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তিনি কোন্ দলের সেদিকে নজর দেওয়া হবে। আইন-মন্ত্রী ভক্তি মণ্ডল পাবলিক প্রসিকিউটার আর সরকারী উকীল নিয়োগ করার সময় অন্য কোন দলের পরামর্শ নেবেন না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য কাকে ডিরেক্টর নিয়োগ করবেন তা নিয়ে অন্য মন্ত্রী প্রশ্ন তুলবেন না। এমন কি সি পি এম-এর কোনো এম-এল-এরও যদি কোন রোগী ভর্তির জন্য তদ্বির করতে হয়, তিনি ননীবাবুর কাছে হাজির হবেন আর একজন আর এস পি কর্মীকে নিয়ে।

এই অবস্থা ওপরতলায় দেখা দিলে নীচে তা প্রকাশ পাবেই। কোথাও কোনো সমবায় সমিতির কর্তৃত্ব নেওয়ার প্রশ্নে কম্যুনিস্ট পার্টি মনে করছে এ অধিকার অন্য কারো নেই। এ মনোভাব স্বাভাবিক-ভাবেই সি পি এম-এর কর্মীদের মধ্যে বেশি ছড়াচ্ছে। বর্ধমানের কোন এক ব্লকের ফুড কমিটির সি পি এম সেক্রেটারী প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি যে, তিনি যা করবেন তাতে অন্য কোনো দলের আপত্তি করা চলবে না। থানা-পুলিশ স্বরাষ্ট্রদপ্তরের। তাই সি পি এম নেতা জ্যোতিবাবুর দপ্তরের অধীন থানা-পুলিশ সি পি এমের কথা শুনতে বাধ্য। সরকারী ডাক্তাররা তোয়াজ করবে স্থানীয় আর এস পি কর্মীদের।

শরিকী দলের এই মনোভাব সরকারী কর্তাদের মধ্যে সংক্রামিত। নির্দেশ থাকুক আর না থাকুক এস-পি বা থানার দারোগা সি পি এম-এর সব দোষকে চাপতে চেষ্টা করবেন। জমি দখল নিয়ে ঝগড়া দেখা দিলে থানা আর ভূমিরাজস্বদপ্তরের কর্মীরা সি পি এম-এর পক্ষে যাবেন।

একদিকে এই অবস্থা। আর অন্য দিকে সংগঠনগতভাবে সর্বত্র কংগ্রেস বেপাত্তা। সাধারণ শত্রুর দলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রভাব বৃদ্ধির কাজে তাই শরিকী সংঘর্ষ অনিবার্য কারণ। প্রত্যেকের-ই তো নিজ নিজ দপ্তর আছে। সি পি এম-এর এদিক থেকে সুযোগ বেশি। তাই তার সঙ্গেই অন্য প্রায় সব দলের হানাহানি।

সাধারণ শত্রু অর্থাৎ পুঁজিবাদকে ভুলে যাওয়ায় তার বিরুদ্ধে ঐক্য না গড়ে বিভিন্ন দপ্তরের সাহায্য নিয়ে প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টার ফলেই আজ এত হানা-হানি। সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের আমলা-তন্ত্রের পোয়াবারো। তাঁরা কাজের সময় নাক ডাকাতে সুরু করেছেন আর তলায় তলায় ফ্রন্ট ভাঙার চক্রান্ত করছেন। কারণ ফ্রন্টের যত দোষই থাকুক তারা জনমতকে কিছুটা জাগ্রত করায় আমলাতন্ত্রকে সর্বদাই জনসাধারণের হামলার ভয়ে অস্থির থাকতে হয়।

অনেক দলিল—অনেক কর্মপন্থা রচনায় আর তা কার্যকরী করা নিয়ে মাথা ঘামানোর আগে মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব নিরূপণ করতে হবে। একটা হাস-পাতালে ধর্মঘট হলে বিশ্বনাথবাবু তাতে উৎসাহ না দিয়ে যৌথভাবে সরকারের দায় ঘাড়ে নেবেন। একটা এলাকায় সেচের অভাবের জন্য আর-এস-পি কর্মীরা সব দায় বিশ্বনাথবাবুর ঘাড়ে চাপাবেন না। এই অবস্থা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত যুক্ত-ফ্রন্ট সরকার বর্তমান সীমিত অবস্থার মধ্যে যেটুকু করা সম্ভব তা করতে পারবেন না। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে সকলের অভীপ্সিত সমাজতন্ত্রের পথে জনসাধারণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হবে না।—শ্রীসর্বদর্শী

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

"ভীরুতা কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা বর্জন করতে হবে"

—মাস্টারদা

স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রীতিলতার চরম আত্মোৎসর্গ বাংলার তরুণ প্রাণে যেন নতুন করে বৈপ্লবিক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া জাগালো।

ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার সদস্যেরা মাস্টারদার উদাত্ত কণ্ঠের ঘোষণায়—"ভীরুতাই বিপ্লবী জীবনের মহা শত্রু—ভীরুতা, কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতা বর্জন করতে হবে—আরও, আরও অনেক বেশি সাহসী হতে হবে—আরও অনেক দৃঢ়তা সহকারে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে"—নতুন কর্মসূচী রূপায়িত করবার জন্য নতুন উদ্যমে ও নতুনভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে এলো।

তারকেশ্বর দস্তিদার ও দলের সংগঠকদের নিয়ে মিলিত আলোচনায় মাস্টারদা স্থির করলেন পল্টন মাঠে ক্রিকেট খেলার সময় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকবর্গের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে হবে।

কল্পনা দত্ত প্রথম সারির কর্মী। কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিজের বাড়িতেই সে তখন নজরবন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। তার সর্বপ্রকার গতিবিধির ওপরেই পুলিশের কড়া নিয়ন্ত্রণ—কলেজ থেকে সোজা বাড়ি ফিরতে হবে, সন্ধ্যে থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত বাড়িতেই থাকতে হবে, অভিভাবক ছাড়া একা কোথাও যাওয়া চলবে না—ইত্যাদি, ইত্যাদি নানা বিধিনিষেধের কড়াকড়ি। পাহাড়তলীর রাস্তায় যাওয়ার সময় একদিন কিছু সংখ্যক সমাজবিরোধী লোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পুরুষবেশিনী কল্পনাকে নিজেই থানায় উপস্থিত হতে হয় এবং সেখানে তাকে গ্রেফতার করা হয়—এই ঘটনা আগেই বর্ণিত হয়েছে। মাস্টারদার আপীলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের জাজমেন্ট থেকে সংগৃহীত অতদিনের পুরনো ঘটনার কিছুটা উদ্ধৃতি এখানে লিপিবদ্ধ হোল। জাজমেন্টের ৬৬ পৃষ্ঠায় বিচারকেরা সেখ আহম্মদের জবানবন্দীর উল্লেখ করেছেন:—

"..I am a motordriver, I remember the day a female was arrested in a male attire at Pahartali. I was seated in the Motorstand about 7 p.m. 6—7 days before the Pahartali Raid. I saw Abdul Baser's car, with three passengers. They got down and went to the east, towards the station by the south of the Beluadighi. Abdul Baser told me he believed that one of the passengers was a female. He said he had understood this from their conversation. I followed these three. They went to east and then turned north by the east of Beluadighi Tank. They went north near the foot of the hills. Then they turned back and were going by the north of Beluadighi. I questioned them then as to whence they were coming. One of them I know to be Dinabandhu. He is an employee in the Pahartali Workshop. They said they were coming from the town. One of those three is Kalpana Dutt (indentifies in dock). She was dressed in male attire, *dhuti, and shirt* and handkerchief tied on the head. Dinabandhu said she was his cousin and they were going on invitation to his house. Dinabandhu's house is at Kattali. I said if they were going to Kattali why they were wandering round aimlessly. I flashed my torchlight at the girl and she turned her face away. I said to Dinabandhu she was a female but he denied it. I asked them who could identify

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনায় অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ.
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

them and they mentioned the name of Suren Doctor and Toka, son of Prasanna Doctor. They accompanied me and our member Ebadulla came up and I told him of my suspicions. After making enquiries from Toka we took them to Suren Doctor's dispensary and made them sit there. The thana was informed by telephone and later Sanjib Babu, S. I. and Pandeali came from Kotwali thana. Then those three were taken away...

"....these three did not object to my taking them to Toka of Suren's dispensary. They said themselves to take them there.....When having the conversation they suggested they should go to Toka or Suren Doctor." (From the Judgement Copy delivered by their Lordship in the appeal of Surjya Sen. Page—66|67).

পুরুষবেশিনী কল্পনা দত্তকে গ্রেফতার করে কোতোয়ালিতে আনা হয় ও তার বিরুদ্ধে ১০৯ ধারায় মামলা রুজু হয়। এই সময় কল্পনার বাবা রাঙামাটিতে সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। গ্রেফতারের খবর পেয়ে তিনি এসে অনেক চেষ্টায় কল্পনাকে জামীনে মুক্ত করেন। আগেই লিখেছি এইভাবে পাহাড়তলীতে গ্রেফতার হওয়াতে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ প্ল্যানটি কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে গিয়েছিল। ১৯৩০ সালের ১৭-১৮ই সেপ্টেম্বর কল্পনা জেল-হাজতে ছিল ও তারপরে জামীনে মুক্তি পেয়ে বাড়িতে অন্তরীণ অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়। ১৯৩০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রান্ত হয়। কল্পনা ঘুণাক্ষরেও এই ঘটনা জানতে পারে নি। ২৫শে সেপ্টেম্বর সকালে পুলিশের D. I. B. ইন্সপেক্টার যোগেন গুপ্ত কল্পনার সঙ্গে দেখা করে এই ঘটনার কথা তাকে জানান।

যোগেনবাবু কল্পনার বাবার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ও পরিবারের বিশেষ শুভানুধ্যায়ীর ভূমিকা নিয়ে কল্পনার ওপর তাঁর 'অভিভাবকত্বে'র দাবি জানাবার নানা সুযোগ নিতেন। ইউরোপীয়ান ক্লাবে প্রীতিলতার মৃত্যু-সংবাদটি পরিবেশনের সূত্রে কল্পনার থেকে পুলিশী তথ্য সংগ্রহের আশায় যোগেনবাবু সেইদিন সকালে কল্পনার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। কল্পনার মুখেই শোনা কথা—"যোগেনবাবু নাটকীয়ভাবে অনেক অভিনয় করে গেলেন—'...ভগবানের অশেষ দয়া! ভগবানের কৃপা না থাকলে আমরা মা তোমাকেও হারাতাম! আমার প্রীতি-মা আর বেঁচে নেই। পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে সেখানেই সে প্রাণ দিয়েছে। তুমি যেরকম পুরুষের পোষাকে পাহাড়তলীতে গ্রেফতার হয়েছিলে ঠিক সেইরকম পোষাকেই সজ্জিত প্রীতির মৃতদেহ আমরা পেয়েছি। তাই বলি, ভগবানের অশেষ দয়া—তাঁরই অপরিসীম কৃপা না থাকলে কি মা তুমি সেদিন পুরুষবেশে বন্দী হতে? তোমাকেও হয়ত আমাদের হারাতে হোত। তোমাদের মত এমন কৃতী ও অশেষগুণসম্পন্না মেয়েদের এভাবে বিপথগামিনী করে তোলা কি সূর্য সেনের উচিত?...প্রীতির পরিবার আজ সূর্য সেনের প্রসাদে শ্মশানে পরিণত...!' যোগেনবাবু এইভাবে নানা কথা বলে যাচ্ছিলেন আর মাঝে মাঝে যেন বেদনাভিভূত হয়ে চোখ মুছছিলেন ও ক্ষণে ক্ষণে ভগবানের কৃপা স্মরণে ললাট স্পর্শ করছিলেন। এই সবের সঙ্গে পুলিশের কর্তব্য পালনের জন্য ফাঁকে ফাঁকে নানা প্রশ্নে বিপ্লবী সংগঠনের সংবাদ জানবার চেষ্টারও ত্রুটি করেন নি।"

যোগেনবাবুকে কিন্তু আশাহত হয়েই ফিরতে হয়েছিল—সংগঠনের কোন সংবাদই তিনি পান নি। বিপ্লবীদের কাছ হতে পুলিশদের বারে বারেই বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়, কিন্তু তবু তাঁদের হাল ছাড়লে চলে না। কারণ, তাঁদের প্রমোশন পেতে হবে—রায়বাহাদুর বা খানবাহাদুর খেতাবে ভূষিত হতে হবে। কাজেই "তাঁরা" কখনই নিরাশ হয়ে নিবৃত্ত হতে পারেন না।

কল্পনার বিরুদ্ধেও পুলিশের সদা সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। কল্পনাও কিছুদিন একটি অত্যন্ত নিরীহ শান্তশিষ্ট মেয়ের মত বাড়িতে অন্তরীণ অবস্থায় থেকে পুলিশের মনে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে বোধ হয় সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া কল্পনা রায়বাহাদুর দুর্গাদাসবাবুর নাতনী এবং গভর্নমেন্ট অফিসারের কন্যা। তাই তার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণাদেশ কিঞ্চিৎ শিথিল হয়েছিল। সেই সুযোগে কল্পনা কিছুটা ঘোরাফেরা করতে ও দলের সভ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু তার চলাফেরায় পুলিশের সন্দেহ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। পুলিশ যে তার বিরুদ্ধে সহসাই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এবং বিনা বিচারে জেলেও আটক করে রাখতে পারে, কল্পনাও এটা অনুমান করলো। এই পরিস্থিতিতে কল্পনা সমস্ত সংবাদ মাস্টারদাকে জানিয়ে আত্মগোপন করে থাকবার অনুমতি প্রার্থনা করলো।

পুলিশ প্রীতিলতার বাবার কাছে গিয়েও কল্পনা সম্বন্ধে অনেক খোঁজ-খবর করে এবং কল্পনা যেন তার দ্বিতীয় মেয়ে কনকের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ না রাখে তার জন্য তাঁকে বিশেষ ব্যবস্থা করবার নির্দেশ দেয়। প্রীতিকে হারাবার পর প্রীতির বাবা (জগৎবন্ধু ওয়াদ্দেদার) বড়ই অসহায় হয়ে পড়লেন। তাঁর শেষ সম্বল সরকারী চাকরীটিও পুলিশের কৃপার ওপর নির্ভর করছিল। কাজেই পুলিশের ভয়ে দু'একটি কথা তিনি বেফাঁস বলে দিলেও তৎক্ষণাৎ তা' আবার গোপনে কল্পনাদের জানিয়ে দিতেন। হাইকোর্টের বিচারপতিরা তাঁদের জাজমেন্টে 'জগৎবন্ধুবাবুর জবান যা' উদ্ধৃত করেছেন তারই কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া গেল:—

"I know the accused Miss Kalpana Dutt.

"She used to come to our house to see Prittilata occasionally. Kanak is a second daughter of mine and lives with me. After Prittilata had left my house for the last time, perhaps about two weeks later, I was returning from my morning-walk and I saw Kalpana Dutt on the field near my house going to the south with Kanak. I called Kanak but as they were some distance off my voice did not carry. I went forward and I asked a man nearly to call to them. He did so, and my daughter Kanak came back but Kalpana did not. I took my daughter home. I gave information to Jogen Babu about this.

"Before that I was told by Jogen Babu that Kalpana was released on a bond and I should not allow the daughters of my house to mix with her, Kalpana Dutt is in dock

"..I have known Kalpana Dutt for 5—6 years.

"The people of Durgadas Babu and my people visit each other. Durgadas Babu is Rai Bahadur Durgadas Dutt, the grand-father of Kalpana.

"Prittilata used to come to Chittagong during the holidays and used to go out to visit friends. She took a job as a school-teacher in Chittagong in end of April, 1932. 2—3 students from college and also school students used to come and see her, but not to be coached by her. I was not always present when they came. We are not related to those who used to come but some of them are people with whom we are on visiting terms.

"Kalpana Dutt had been to our house about 2—3 weeks before the incident I mentioned about seeing Kanak with her. Kalpana Dutt had books with her that day. It was about the time of her going to college.

"It was after the 5th July that Jogen Babu warned me about letting my daughter go with Kalpana. I cannot say how long after it would be. I had a bad memory for times, specially after 5th July, 1932.

"I cannot say either how long before 25th Sept., 1932, I was told this by Jogen Babu. It was certainly before 25th Sept. that I saw Kalpana and Kanak going together. It may be two months before 25th Sept., 1932, that Kalpana and Kanak were seen going together

"When Kalpana came to our house 2—3 weeks before this meeting outside with Knank I did not make any objection."

পুলিশের তৎপরতায় বাড়িতে স্বাধীনভাবে থাকা কল্পনার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ ও প্রীতিলতার স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণের পর কল্পনা যতই না কেন রায়বাহাদুরের দুলালী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর কন্যা বা যত মেধাবী কৃতী ছাত্রীই হোক না কেন, এ-সব কিছুই তাকে পুলিশের কবল থেকে বাঁচাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কল্পনা পুলিশী তৎপরতার সবিশেষ বৃত্তান্ত দিয়ে ও তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশঙ্কা জানিয়ে মাস্টারদাকে সংবাদ পাঠালো। মাস্টারদা নিজেও এইরূপ একটি প্রতিকূল পরিস্থিতি সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কা পোষণ করছিলেন। অতএব আর কালক্ষয় না করে কল্পনা যেন বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপন করে সেই উদ্দেশ্যে কল্পনাকে নিয়ে আসবার জন্য মাস্টারদা শান্তি চক্রবর্তীকে পাঠালেন।

[ক্রমশ]

শুভমুক্তি ১০ই অক্টোবর

প্রযোজনা : মঞ্জুশ্রী বসু ।। গীত : রবীন্দ্রনাথ ০ পুলক বন্দ্যো ও শ্যামল গুপ্ত ।। আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত ।। চিত্রশিল্পী : জ্যোতি লাহা ।। সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায় ।। নেপথ্য কণ্ঠে : সন্ধ্যা মুখো:, মান্না দে, মঞ্জুশ্রী বসু ও অশোকতরু বন্দ্যো :

জ্যোতি ০ উত্তরা ০ পূরবী ০ উজ্জলা

(২॥, ৫॥, ৮॥) (৩, ৬, ৯) (৩, ৬, ৯) (৩, ৬, ৯)

পার্বতী ০ সন্তোষ ০ শ্রীমা কৈরী ০ রামকৃষ্ণ অনুরাধা (হাওড়া) (বেলিয়াঘাটা) (খড়দহ) (চুঁচুড়া) (নৈহাটি) (দুর্গাপুর) রমা (বিরাটি) ও অন্যত্র ।।

গ্রন্থলোক

কবিকালিদাসম্ ঃ ডঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা-৬। মূল্য ঃ আট টাকা।

ডক্টর বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য সুধী-মহলে সুবিদিত। শুধু জ্ঞানান্বেষণই নয়, গবেষণালব্ধ জ্ঞান বিতরণেও তিনি উদার ও অকুণ্ঠ। ইতিপূর্বে তাঁর-লেখা কয়েকটি বাংলা কাব্যগ্রন্থ এবং ইংরেজিতে রচিত তাঁর দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটি একটি নাটক এবং এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

একালে যখন সংস্কৃতভাষাকে 'ডেড ল্যাংগোয়েজের' সমপর্যায়ে ফেলা হচ্ছে, তখন ডক্টর ভট্টাচার্য সংস্কৃতভাষায় 'কবি কালিদাসম্' নাটকটি লিখে যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন তার জন্য প্রথমেই তাঁকে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বলা বাহুল্য, এই নাটকটি পড়ে আমাদের মনে হয়েছে, ডক্টর ভট্টাচার্যের নাট্যকার হিসেবে গৌরবলাভ স্বতঃসিদ্ধ। সপ্তমাঙ্কের নাটকটিতে কালিদাসের কিম্বদন্তীমূলক জীবনী প্রচার করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য নয়। সেই সঙ্গে বলা উচিত, আনুমানিক ইতিহাসকে নাট্যাকারে প্রকাশ করাও তাঁর মনোবাসনা নয়। তবে কালিদাসের মূর্খতাকে কেন্দ্র করে যে কিম্বদন্তী আছে তা কতখানি সত্য সে সম্বন্ধে অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তির মতো ডক্টর ভট্টাচার্যও সন্দিহান। তাই নাটকটির বিষয়বস্তুতে মহাকবি কালিদাস সম্পর্কিত কাল্পনিক গল্পগাথাগুলি নাট্যকার এড়িয়ে গিয়ে নাটকের সূচনাতেই 'প্রস্তাবনাংশে' মহাকবি প্রতিভার কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর সুরু হয়েছে মহাকবির ছন্দোবদ্ধ, নাটকায়িত জীবন প্রসঙ্গ। নাটকটি শেষ পর্যন্ত পড়ে অন্তত এইটুকু আমাদের লাভ হয়েছে যে, মহাকবির কবিতা ও নাটকগুলির যথার্থ পরিচয় আমরা পেয়েছি এবং তদ্দ্বারা মুগ্ধ হয়েছি। প্রসঙ্গত এ কথা বলাও দরকার, কালিদাসীয় সাহিত্য-রস এই নাটকটিতে যেমন কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি, তেমনি নাটকের মধ্যে প্রয়োজন যে ঘাত-প্রতিঘাত ও সাসপেন্স সেসবও তীব্র-গতিসম্পন্ন। এই কারণে কবি-কালিদাসম্ একটি সার্থক নাটক। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে, ধন্বন্তরী, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, বরাহমিহির, বররুচি—সহচরিত্র হিসেবে যথাযথভাবে পরিস্ফুট। বিক্রমদুহিতা মঞ্জু-ভাষিণীর কোমলমধুর চরিত্র অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। আর বিক্রমাদিত্যের চরিত্র-স্ফুটন? আমরা বিক্রমাদিত্যের কথাই উচ্চারণ করে আমাদের আলোচনা শেষ করিঃ

জয়তু কালিদাস-ভারতী নিত্যভাস্বরা মঞ্জুমুখরা!

একাল জনগণের কাল, কিন্তু সেকালের রাজা মহাকবিকে যে সম্মান দান করে ধন্য হয়েছিলেন, একালে তা কতটুকু সম্ভব হচ্ছে? বিক্রমাদিত্যের চরিত্রাঙ্কন নাট্যকারের মৌল উদ্দেশ্য নয়, তবু কয়েকটি আঁচড়েই সেই চরিত্র সুস্পষ্ট।

নাটকটির কাগজ, ছাপা, বাঁধাই সুন্দর। বৈজয়ন্তী ভট্টাচার্যের অলংকরণ প্রশংসনীয়। নাটকটির মূল্য কিছু কম করা কি সম্ভব নয়?

শারদীয় উত্তরযুগ—শ্যামাদাস গঙ্গোপাধ্যায়। ১৪, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড, কলকাতা—২৮। দামঃ দু টাকা।

মামুলি চিন্তার পৃষ্ঠপোষকতা করে নি এই সংখ্যাটি। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও কবিতা পড়ে নবজীবনের সঞ্চরণ অনুভব করা যায়। বস্তুত মনোরঞ্জন হাজরার উপন্যাস "ক্রাইপার রোডে ঝড়" পড়তে পড়তে প্রতি ক্ষণে যে শিহরণ অনুভব করেছি—তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অবশ্য এই শিহরণ সেই মামুলি ভূতের গল্প বা বিদঘুটে এ্যাডভেঞ্চার জাতীয় গল্পের জন্য নয়। মনোরঞ্জন হাজরা শ্রমিক-জীবনকে মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন, জেনেছেন তার পারিপার্শ্বিককে প্রগাঢ়ভাবে—যেখানে আছে রক্তমুখী সংগ্রাম, ভালবাসা এবং প্রচন্ড ধরণের বেদনা আবার এক্সপ্লয়টেশন। এই উপন্যাসটিতে মনোরঞ্জনবাবু নতুন কাহিনী, নতুন চরিত্র, নতুন জীবনের স্বাদ দিয়েছেন একথা হলপ করেই আজ যে-কোনো সমালোচক বলবেন। উত্তরযুগের বিভিন্ন প্রবন্ধের স্বাতন্ত্র্য বিষয়বস্তু হচ্ছে, কেন্দ্র-রাজ্য, রাজনীতি, মধ্যবিত্ত সমাজ ও কৃষক আন্দোলন, প্রতিরক্ষা শিল্প ও শ্রমিক-কর্মচারী, ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা, চীনে জাপ আক্রমণ। অরুণকুমার রায়ের 'কেঁদুলির কথা'-য় নতুন তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন রণেন নাগ, মদন দাস, নৃসিংহ চক্রবর্তী, ভবানী পাঠক, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, নেপাল মজুমদার, চিত্ত ঘোষাল, শ্যামসুন্দর দে, সুজন সেন, তপোবিজয় ঘোষ, প্রণব চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

শারদীয়া কিশোর ভারতী—সম্পাদক, দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৮।৩, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা—৯। দামঃ পাঁচ টাকা।

একথা জোরের সঙ্গেই বলা যায় 'কিশোর ভারতী' আবির্ভূত হয়েই শুধু বাংলাদেশ-ই নয়, ভারত জয় করেছে। তার শারদীয়া সংখ্যাটি আরো অপূর্ব, আরো অসাধারণ। সারা ভারতে এতো ভালো কিশোর পত্রিকা আর নেই। আমরা গত বছর গত বছর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, যা নেই ভারতে, তা আছে কিশোর ভারতীতে। আমাদের কথা সত্যি কি না তা লেখেরাই বলুক। এবার শারদীয়া কিশোর ভারতীতে আছে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখিত অতি অপূর্ব ঘনাদার উপন্যাসোপম গল্প, অন্যান্য বড় বড় লেখকদের হাসির গল্প, উপন্যাসোপম লোমহর্ষক জলদস্যুকাহিনী, মিষ্টি গল্প, রোমাঞ্চকর অভিযানমূলক উপন্যাস, বহু আশ্চর্য ও মজার নানারকম কবিতা ও ছড়া, গোয়েন্দা কাহিনী, সামাজিক গল্প, ইতিহাসনির্ভর দেশপ্রেমমূলক উপন্যাসোপম কাহিনী, বিচিত্র শিকার কাহিনী, দুঃসাহসিক কাহিনী, বিজ্ঞাননির্ভর রোমাঞ্চকর গল্প, দুটি নাটক, শিহরণ-জাগানো উপন্যাস, চন্দ্রজয়ের কথা, করুণ-রসের গল্প, রূপকথাধর্মী উপন্যাস, উপন্যাসোপম গোয়েন্দা কাহিনী, উপন্যাসোপম মজার গল্প, সিনেমা, সংবাদ-বিচিত্রা, টুকরো হাসি, গানের আসর, ছবিতে ব্যঙ্গকৌতুক কাহিনী, ছবিতে লোমহর্ষক গোয়েন্দা কাহিনী, উপকথা, অসংখ্য কার্টুন, গ্রাহক-গ্রাহিকার আসর, খোলামনের মেলাতে বিজ্ঞানীর দপ্তর, ধাঁধা-হেঁয়ালি, ছোটদের প্রশ্নের সুন্দর সুন্দর জবাব। বাংলাদেশের ওই সেরা সংকলনে প্রায় একশ' সেরা লেখক আছেন —ছেলেদের বড়দের মন জয় করতে যাঁদের জুড়ি নেই।

[পূর্বানুবৃত্তি]

বাস ছেড়ে দিল।

হাবু ফিস ফিস করে বলল, "অ বিজয়বাবু, এ যে মোদের সঙ্গে চলল গ'।"

বিজয় বিড়বিড় করে বললে, "জ্বালাবে।"

খানিক পরেই জ্বালাটা বোঝা গেল। সড়কের ধারে যত থানা আর ফাঁড়ি আছে—তার কাছে এলেই পুলিশ অফিসার হুকুম দেয়, "থামো।"

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যায় থানায়—দু'-একটা কি কথা হয় থানা অফিসারের সঙ্গে। তারপর আবার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বসে। বসেই হুকুম, "জোরে হাঁকাও।"

রাস্তার প্যাসেঞ্জার রাস্তায় পড়ে রইল। তারা হাত, ছাতা, লাঠি নেড়ে গাড়ি দাঁড় করাতে পারল না। স্পীড একটু কমালেই অফিসার হাঁকড়ে ওঠেন, "জোরে।"

যদি বা ড্রাইভার মিন মিন করে বলে, "দুটো প্যাসেঞ্জার ছিল স্যার।"

অফিসার গরগর করে ওঠে, "চুলোয় যাক প্যাসেঞ্জার।"

ছোকরা কণ্ডাক্টার অসহায়। ড্রাইভারের কপাল থেকে-থেকে কুঁচকে উঠছে। রাঙা ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ছুটে চলল গাড়ি।

পাথর ভাঙা প্রাচীন বহু কালের উঁচু সড়ক—দু' পাশে ঝুরিবাঁধা বট অশথ আর ঝাঁকড়া আমগাছের সারি নিয়ে এ'কেবেঁকে ছুটে গেছে পশ্চিমে। হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই ড্রাইভারের মনে হলো—সামনে বহু দূরে লাল ধুলোর কুণ্ডলীর মধ্যে কালো একটা বিন্দু। বোধ করি ধরে ফেললে আগের গাড়ি।

বেলদা—কন্টাই রোড স্টেশন। রাঙা সড়ক হঠাৎ বাঁক নিয়েছে দক্ষিণমুখো। মোড় ঘুরতে গিয়ে কি হলো কে জানে। এদিক ওদিক করতে করতে থেমে গেল ঘটঘটাং করে।

অফিসার জিজ্ঞেস করলে, "কি হলো।

"গাড়ি ব্রেক নিচ্ছে না স্যার।" ড্রাইভার এটা ওটা টেনে, ঠেলে, চেপে বিরস গলায় বললে, "আপনি ততক্ষণ থানা থেকে ঘুরে আসুন স্যার।"

থানা থেকে একটু দূরে থেমেছে গাড়ি। অফিসার লাফ দিয়ে সীট থেকে নেমে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেল থানার দিকে।

ড্রাইভারও নেমে পড়ল। কণ্ডাক্টার পাশে যেতেই চোখ টিপে দিয়ে বললে বিড় বিড় করে, "দে শালার নাট খুলে।"

"ক্লাচ?"

"যা না বে।"—ড্রাইভার ধমকে উঠল। তারপর বনেট খুলে নিজেও এটা ওটা নাড়া-চাড়া করে দেখতে লাগল। রেঞ্চ নিয়ে কণ্ডাক্টার শুয়ে পড়ল গাড়ির তলায়।

খানিক বাদে অফিসার ফিরে এল ছুটতে ছুটতে। জিজ্ঞেস করলো, "হলো ঠিক?"

নিরুত্তাপ গলায় ড্রাইভার বললে, "উঠে বসুন।" হেঁকে দিলে কণ্ডাক্টারকে. "হলো রে বিষ্টু। লে জলদি।"

গাড়ির তলা থেকে বিষ্টু বললে, "হলো ওস্তাদ। আর একটুন।"—

তারপর স্রেফ একটা নাট পকেটে পুরে গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে এসে বিষ্টু বললে, "দেন স্টার্ট। দেখেন—"

এবার গাড়ি স্টার্টও নিল না।

ড্রাইভার তেমনি নিরুত্তাপ গলায় বললে, "মার হ্যাণ্ডেল।"

হ্যাণ্ডেল মেরে মেরে হায়রাক হয়ে গেল বিষ্টু—হাঁসফাস করতে লাগল।

ড্রাইভার বকবক করতে করতে নেমে গেল, "শালা লঝঝড় মাল।"—নেমে গিয়ে আবার বনেট খুলল।

অফিসার জিজ্ঞেস করলে, "কি হলো?"

"গাড়ি বিগড়েছে হুজুর।" ড্রাইভার বললে, "সময় নেবে।"

"সময় নেবে?" অফিসার জ্বলে উঠল, "সময় নেই!—এক্ষুণি যেতে হবে।"

"গাড়ি বিগড়ালে কি করব স্যার।"

অফিসার সীটে বসে হাত পা ছুঁড়ে চেঁচাতে লাগল।

"দেখি স্যার—আমাদের এখানকার গ্যারেজে একজন মিস্ত্রী থাকে, তাকে ডাকি।" বলে খেঁকরে উঠল কণ্ডাক্টারের ওপরে, "যা-না বে—খুঁজে দেখ না।"

কণ্ডাক্টার গেল তো গেলই। তাকে খুঁজতে আবার ড্রাইভারও চলে গেল। ঢেরক্ষণ বাদে এল একজন মিস্ত্রী। সে এসে আবার কলকব্জা নাটবল্টু সব খুলে ফেললে।

ব্যাপার দেখে অফিসার পাগলের মত আর নাচতে শুরু করে দিলে, "স্যাবোটাজ —স্যাবোটাজ!"...আবার ছুটে গেল থানার দিকে।

সেখান থেকে সেপাই এল, থানা অফিসার এল, জমাদার এল। কিন্তু গাড়ি যেমন অচল ছিল—তেমনি অচল রইল। যন্ত্র বিগড়ালে কারুর কিছু করার নেই। অন্য আর দ্বিতীয় গাড়ি ত' নেই যে আসামীর পিছু ধাওয়া করে। নিরুপায় থানার দলবল ফিরে গেল থানায়।

গাছের তলায় বসে বিড়ি টানছিল ড্রাইভার। সামনে উবু হয়ে বসে কণ্ডাক্টার বিষ্টু। ড্রাইভার চোখ টিপে দিলে। মিটিমিটি হাসতে লাগল।

বিষ্টু বললে, "খুব জব্দ করে দিলে গোষ্ঠদা।"

"চলে যাক—যমপুর পারে চলে যাক ছোকরা।" গোষ্ঠ বললে, "চলে যাক শালাদের নাগালের বাইরে।"

"ইদিকে গেছে?"

"আগের গাড়িতে।" গোষ্ঠ বললে, "দুজন এসেছিল—একজন চলে গেল অন্যদিকে।"

"তুমি দেখেছ! কত বয়স?—তোমার মত?"

"তোর চেয়ে ছোট।"

"বল কি গোষ্ঠদা!" বিষ্টু বললে, "খুব জোয়ান?"

"রোগা-পটকা!" গোষ্ঠ বললে, "তার কাছে তুই শালা হাতী।"

বিষ্টু বিস্ময় মাখানো গলায় বললে, "বাহাদুর ছোকরা।"...

"তোর ওই হাতীর মত গতর নিয়ে তুই শালা কি করলি এ জন্মে বল?"

"কিছু না দাদা।" বিষ্টু বুক পকেট হাতড়ে নাটটা বের করে নিজের চোখের সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললে, "এই নাটটা শুধু খুলে নিয়েছি—তাও তুমি বলতে। পায়ের ধুলো দাও ওস্তাদ। আজকের কথা মোর চিরদিন মনে থাকবে।"...

"কিন্তু খবর্দার।" গোষ্ঠ বললে, "দু-কান হয়েছে কি শালা রঙের বাড়ি মেরে দেবো গাড়ির তলায় ফেলে।"

"এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।" বিষ্টু পায়ে হাত দিলে।

এমন সময় এসে দাঁড়াল বিজয় অধিকারী। বললে, "গাড়ি যাবে তো?"

"যাবে বৈকি।" গোষ্ঠ ড্রাইভার বললে, "আপনাদের তুলেছি যখন গাড়িতে—ঠিক নিয়ে যাবো কাঁথি। মরে গেলেও লাস পৌঁছে দেব মশায়।"

বিজয় হেসে বললে, "তা দেরি কত হবে—আন্দাজ?"

গোষ্ঠ বললে, "খিদে পেলে খেয়ে নেন মশায়। বেলদার বাজারে হোটেলের অভাব নাই। সেই কাঁথিতে যেয়ে খেতেন—না হয় এখানেই খেয়ে লেবেন। গাড়ি ঠিক হতে দেরি হবে।"

হাবু আর মুকুন্দের দিকে চেয়ে বিজয় বললে, "বোঝা যাচ্ছে—এ বেলার ধাক্কা!"

প্রায় এক বেলার ধাক্কাই বটে। গাড়ি যখন চালু হলো তখন প্রায় এগারোটা। ইতিমধ্যে অগ্রবর্তী থানাগুলোয় টেলিগ্রামে চেহারার মোটামুটি একটা বিবরণ দিয়ে পুলিশ অফিসার মুখ গোমড়া করে বসে ছিল থানায়। থানার নিজস্ব মোটর নেই যে হাঁকিয়ে ছুটে যাবে।

গোষ্ঠ বললে মিচকি হেসে, "যা রে বিষ্টু, এবার সাহেবকে ডেকে আন। ছাড়ি মোটর।"

"হেই গোষ্ঠদা—মোর কেমন ডর লাগছে।" বিষ্টু হাত যোড় করলে।

"মর শালা—তোর জন্ম বৃথা।"

গোষ্ঠ নিজেই চলে গেল ডাকতে।

অফিসার এসে বসল সীটে। মনমরা।

গোষ্ঠ আড়চোখে একবার অফিসারের বিরস চেহারাটা দেখে নিয়ে বললে, "এবার দেখুন স্যার—উড়োজাহাজ চালিয়ে দিচ্ছি।"

"আর উড়োজাহাজ! সব ভণ্ডুল করে দিলে।" অফিসার হতাশভাবে গা ছেড়ে হেলান দিয়ে বসল।

"আমি স্যার?" গোষ্ঠ তৎপর জবাব দিলে, "যন্ত্র বিগড়ে গেলে কি করবো বলুন! অন্য সময় হলে আজ এইখানে পড়ে থাকতাম স্যার। নিতান্ত আপনি যাচ্ছেন—আসামী ধরতে—তাই যাচ্ছি।"

"আর কি তার নাগাল পাবো!" অফিসার বিড় বিড় করতে করতে চুপ করে গেল।

গাড়ি ছুটল কাঁথির দিকে।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে গেল মহকুমা শহরে। সঙ্গে সঙ্গেই অফিসার গাড়ি থেকে নেমে ছুটল থানার দিকে।

বিষ্টু বললে, "বাপ রে—বাঁচলম।"

শুধু বিষ্টু নয়—গাড়ি সুদ্ধ একটা স্বস্তির নিশ্বাস।

প্যাসেঞ্জাররা সোরগোল শুরু করে দিলে, "গাড়ি ছাড়ো। ছেড়ে দাও ঝটপট। আবার হয়তো চড়ে বসবে এসে।"

গাড়ি ছেড়ে দিলে। সোজা রসুলপুর। ধোঁয়া আর ধুলো উড়িয়ে মহকুমা শহর ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটল দেহাতী পথে।

বিজয় বললে, "খেয়াঘাটে পৌঁছে দিলে চলে যেতে পারবে তো?"

মুকুন্দ বললে, "তা পারবো।"

মুকুন্দ গম্ভীর।

হাবু ফড় ফড় করে বললে, "খেয়া পার হয়ে চলে যাবো চরে—সে আর শক্ত। এখন রাস্তা জানা হয়ে গেল—শহরে চলে যেতে পারি একলা। বলো না।"

মুকুন্দের বিরস গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বিজয় অধিকারী বললে, "ভাবনা-চিন্তা আর কোরো নি। উকিলবাবু ভার নিয়েছেন। বাপ তোমার খালাস হয়ে যাবে।"

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে গাড়ি এসে থামল খেয়াঘাটে।

ঘাটের হাল-চাল দেখে হাবু বলে উঠল, "অ বিজয়বাবু, এ যে সেপাই চৌকিদার গিজ গিজ করছে গ'। সেই ছোকরাকে ধরে ফেলেছে না-কি?"

"পাখী পালিয়েছে ঢের আগে—নাগালের বাইরে।" গোষ্ঠ ড্রাইভার চোখ মটকে হি হি করে হাসল। বললে, "ভিড় না করে একে একে উঠে যাও খেয়ায়। তোমাদের ভয় কি!"

বিজয় গলা নামিয়ে বললে, "আর নয়। আমি চললাম।"

ঠেলাঠেলি করে নামছে মানুষজন বাস থেকে—উঠছেও। দোকানী-পসারী প্যাসেঞ্জার, বোঁচকা-বুচকি—সবে মিলে ভিড়ের একটা এলোমেলো দলা। বিজয় অধিকারী তার মধ্যে হারিয়ে গেল।

একজন দারোগা খুব হম্বিতম্বি করছে। রোগা কালসিটে মারা চেহারা—তালপাতার সেপাই। কিন্তু দাপট ভারি। মাথায় টুপি—হাতে বেটন। একে ধরছে, তাকে গুঁতোচ্ছে। দেহাতী মানুষেরা তটস্থ। জামাপরা লোক দেখলেই সেপাইরা গিয়ে জাপটে ধরছে দেখে সবাই প্রায় জামা—মায় গেঞ্জি পর্যন্ত খুলে পোটলায় বেঁধেছে। আদুড় গা। তল্লাসীর পর একে একে গিয়ে উঠছে ফেরি বোটে।

মাঝি দাঁড়িয়ে আছে লগি নিয়ে—দুই দাঁড়িও প্রস্তুত। ওপর থেকে দারোগার হুকুম হলেই নৌকো ছাড়বে। কিন্তু তল্লাসী আর শেষ হয় না।

মাঝি বিরক্ত হয়ে বললে বিড় বিড় করে, "শালার এখন উদে চাষী টিপে দেখছে! যার যাওয়ার—সে চলে গেল কখন তার ঠিক নেই। সেই কখন এসেছে সকালের গাড়ি।"......

সকলের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। তবু সবাই চুপ।

হাবু আর মুকুন্দ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। হাবু আর চেপে থাকতে পারলে না—ফিস ফিস করে শুধোলে, "ইদিকে এসেছে?"

"হতে পারে।" মাঝি বললে, "সেই পয়লা গাড়িতে এক ছোকরা এসে খেয়া পার হয়ে চলে গেল তো। তার ভাবভঙ্গি এ দেশী লয়।"

"সেপাই দারোগা ছিল নি?"

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

ধরুন, বাচ্চার সবে সর্দি লেগেছে;—নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়েছে—গলা খুস্ খুস্ করছে। তক্ষুনি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান্‌ঝামেলা—নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি,—কিছু আর বাকি থাকবে না—অযথা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা।

সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, কোনো কষ্ট পেতে হয় না—বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।

আর একটা কথা। ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায়—যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,—যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।

খুবই সহজ কাজ। তেতো বড়ি বা, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না।

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,—সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে—

১) ২)

বাইরে থেকে গায়ে — ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে—

২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।

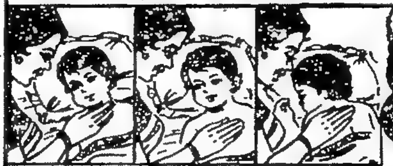

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব—নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

580C

"ওরা ঢের পরে এসেছে।" মাঝি বিড় বিড় করে বললে, "এসেই হাই দেখ না—একে গুঁতোচ্ছে, ওকে গুঁতোচ্ছে। শালা দাঁড়িয়ে আছি সেই থেকে—এতক্ষণে দুটো খেয়া হয়ে যেত।"

এমন সময় হুইসিল বেজে উঠল। জেটির ওপর থেকে দারোগা হাত নেড়ে জানালে—খেয়া ছেড়ে দাও। রীতিমত মিলিটারী কায়দা।

খেয়া ছেড়ে দিল।

নৌকো দুলছে। ওপারে গহন গ্রামের দেশ—চর—জঙ্গল—জালপাই মহাল। এতক্ষণ মোটরের গর্জন, সন্ত্রাসবাদীর উত্তেজনা, নানা মানুষের কলকণ্ঠে জড়ানো গোলমাল যেন মাথা ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। এখন ভরা নদী স্নিগ্ধ ছলছলানি, সমুদ্রের উথাল-পাথাল হাওয়া আর গ্রামদেশের অগাধ নিঃশব্দতার মাঝখানে ফিরে এসে জলের মাছ যেন জলে ফিরে এল।

মুকুন্দ বিড় বিড় করে বললে, "এখন ঘরে মোর কি হচ্ছে কে জানে!"

"কি আর হবে।" হাবু মুকুন্দের কথা যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, "ছোট মণ্ডলের বিচার হয়ে গেছে—ঝঞ্ঝাট মিটে গেছে। চরে থাকতে হলে তার উপরে আর কথা নেই।"

মুকুন্দ চুপ করে রইল। মুখটা তার থমথম করতে লাগল।

চরে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে।

ঘরে এসে মুকুন্দ শুনল—নয়নকে তার বাপ এসে নিয়ে চলে গেছে। ছোট মণ্ডল ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

॥ পনেরো ॥

জেলা শহর থেকে ফিরে এসে মহেশের সঙ্গে মুকুন্দ আর দেখাই করলে না। আলা-পাগলার মতো কোথায় ঘোরে—কি করে, কেউ জানে না। তবে হাবুর কাছ থেকে সব খবর পেয়েছে মহেশ—মায় সেই সাহেব মারার ঘটনাটি পর্যন্ত। ওইটেতেই তার উৎসাহ ও উত্তেজনা বেশি—অন্যের বৌয়ের ঘটনা সম্পর্কে নয়।

হাবু পরম উৎসাহে বললে, "জানো ছোট মণ্ডল, সবাই বলছে—লোকটা নাকি খেয়া পার হয়ে চলে এসেছে মোদের দিকে।"

মহেশ ভাবছিল মুকুন্দের কথা। চরের মাতব্বর—তার দায়-দায়িত্বের জ্বালা ঢের। মুকুন্দের বৌয়ের ছাড়পত্র টিপ করানো এখনও বাকি।

মহেশ বললে, "তোকে একটা কাজ করতে হবে হাবু।"

"বলো কি করতে হবে।"

"ছাড়পত্রের কাগজ আমি রেজিস্টারী আপিসের গদাই মোহরীকে দিয়ে লিখিয়ে রেখেছি। সব তৈয়ার।" মহেশ বললে, "বাকি শুধু মুকুন্দের টিপ। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওটা তোকে করে দিতে হবে।"

"তো তাকে ডেকে আনি।"

"অমনি কাগজটাও হাতে করে নিয়ে যা।" মহেশ বললে, "শহর থেকে এসে সে মোর সঙ্গে দেখাও করে নি। বোধ হয়, মোর ওপর গোঁসা করেছে। আসে কি না আসে।"

"রাগ গোঁসা করে যাবে কোথায় ছোট মণ্ডল।" হাবু বললে, "কাগজ দাও—টিপ করে আনছি।"

মহেশ হাবুর হাতে একখানা ডেমি কাগজ দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিলে, "বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ নিবি। টিপ হয়ে গেলে কাগজটা নিয়ে আসবি। তারপর সে আমি নিজে যেয়ে নিমাই মাঝিকে বুঝিয়ে দিয়ে আসব।"

"তবে দাও কাগজ।"

মহেশের কাছ থেকে কাগজ নিয়ে হাবু চলে গেল মুকুন্দের ঘরের দিকে।

কিন্তু মুকুন্দ কাগজটা নিয়ে রেখে দিলে—টিপ দিলে না। বললে, "ভেবে দেখি।"

হাবু বললে, "বিচার সালিশ হয়ে গেল, বাপ তার মেয়ে নিয়ে চলে গেল—এখনও তোর ভাবনা!"

সে ভাবনার শেষ নেই মুকুন্দের। গায়ে লেপটানো যেন পাখীর নরম পালক ঢাকা চামড়ার মতো গিঁটে গিঁটে বাঁধা একটা মেয়েলোক, তাকে ছেড়ে দাও বললেই কি ছেড়ে দেওয়া যায়! কথা বাড়ালে না মুকুন্দ—শুধু বললে, "কাগজ থাক মোর কাছে। ও টিপ দিয়ে আমিই দিয়ে আসব।"

হাবু চোখ পিট পিট করে যেন মুকুন্দের মতলব বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল। বললে, "তো চল—ছোট মণ্ডলকে যেয়ে ওই কথা বলবি।"

মুকুন্দ চিরদিন কথা বলে কম। তার মনের ভাব বোঝা ভার।

মুকুন্দ শুধু বললে, "চল যাচ্ছি।"

কাগজ হাতে করেই মুকুন্দ গিয়ে হাজির হলো মহেশ মণ্ডলের সামনে।

ইতিমধ্যে সাগরখুড়িও এসে হাজির হয়েছে। মহেশের সঙ্গে মুকুন্দের হালচাল সম্পর্কেই কথা হচ্ছিল। মুকুন্দ এসে মাথা হেঁট করে বসল দাওয়ায়।

হাবু বললে, হাই দেখ মণ্ডল—মুকুন্দ টিপ দিল নি, আবার বলছে—ভেবে দেখি।"

এই রকম একটা গোলমালের আশঙ্কাই করেছিল মহেশ। খানিকক্ষণ একমনে চুপচাপ তামাক খেতে লাগল। তারপর বললে, "আর ভাবনা-চিন্তার কিছু বাকি আছে কি?"

মুকুন্দ নীরব।

মহেশ মণ্ডল চটে গেল মনে মনে। রাগ করে কথা বললে হাবুর মারফতে। বললে, "ওকে জিজ্ঞেস করতো হাবু, মিথ্যে মিথ্যে থানায় ধরে নিয়ে যেয়ে লাই ভলু মাঝি ওর একদিন গলা টিপে ধরেছিল কি-না? সেদিন আমি না থাকলে মুকুন্দ বাঁচত?"

মুকুন্দ তখনো চুপ।

"ও বৌ ওর ঘরে থাকলে তেমন বিপদ আবার ঘটতে কতক্ষণ?" মহেশ বললে আস্তে আস্তে, "সে বিপদের ঝুঁকি থেকে ওকে বাঁচাতে চেয়েছিলম। ওর বাপ একদিন মোকে বাঁচিয়েছিল—সে কথা আমি ভুলবো নি।"

সাগরখুড়ি বললে, "হেই তো শুনলম—নিমাই মাঝি ভলুর কাছে কথা পেড়েছে, ভলুও রাজী। বিয়ে-সাদি হয়তো লেগে যাবে এর মধ্যে। তা শুনলম—মেয়্যা তো হুঁ-না কিছু করে নি। তার মানে কি? নিশ্চয়ই রাজী আছে।"

মুকুন্দের মুখটা দেখতে দেখতে কেমন যেন ফেকাসে হয়ে গেল।

"হাই দেখ!" —মহেশ বললে, "তাই বল। খবর পেলম—ভলুও চরের হুদ্দা ছেড়ে তার নিজের গ্রামের হুদ্দায় চলে গেছে।"

সাগরখুড়ি বললে, "হবে। তার এ হুদ্দায় আর থাকবার দরকার কি বলো। চুলো যেখানে আগুন সেখানে।"

বহুদিন আগে কোনো এক যাত্রায় কথাটা শুনেছিল মহেশ—সেই কথাটা মনে পড়ে যায়। আস্তে আস্তে বললে, "যত দিন বেঁচে আছি—দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন মোকে এ চরে করতে হবে।"

ফেকাসে মুখে রাগে ক্ষোভে কখন ধীরে ধীরে এসে জমেছিল গরম রক্ত, লাল হয়ে উঠেছিল চোখের কোণ, দপ্ দপ্ করে উঠেছিল কপালের শিরা মুকুন্দের—মহেশ জানে না। তার শেষ কথায় ফেটে পড়ল মুকুন্দ। বললে, "দুষ্টের দমন কি হয়েছে ছোট মণ্ডল।"

মহেশ নীরবে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মুকুন্দ বললে, "মোর বৌ কথা চেপেছিল ঠিক, কিন্তু বার বার সে মাথা ঠুকে ঠুকে বলেছে—ভলু মাঝি তার পিছনে লেগেছে। তার শাসনের মোরা কি করেছি? হাবুর মামুকে কোথায় না কোথায় খেদিয়ে নিয়ে গেল কি মেরে ফেলালে—তার মোরা কি করেছি? বলো? দুষ্টে সে না মোর চৈছ? বলো?"

[ক্রমশ]

আজকের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

তুষার চট্টোপাধ্যায়

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দ্বন্দ্বে ভি ভি গিরির জয়লাভের ঘটনার ফলশ্রুতি দেখতে হবে কংগ্রেস এবং বামপন্থী শক্তি দু'দিক থেকেই। আশু লক্ষণ হিসাবে বেশি করে চোখে পড়ে কংগ্রেসের দিকটাই। 'সিণ্ডিকেট' পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত এখনকার মতো মাথা নিচু করেছে সিণ্ডিকেট-বিরোধীদের, অর্থাৎ ইন্দিরা-সমর্থকদের কাছে। প্রথমটা মনে হয়েছিল যে, নিজলিঙ্গাপ্পা-গোষ্ঠী ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা-বিধান প্রয়োগে বদ্ধপরিকর থাকবে এবং তার ফলে কংগ্রেস দু'ভাগ হয়ে যাবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইন্দিরা গান্ধীর পিছনে দাঁড়ানোর ফলে তাঁরাই এগিয়ে যাবেন, আর সিণ্ডিকেট-সমর্থক সংখ্যালঘু অংশ একটা স্থায়ী প্রতিরোধ শক্তি হিসাবে চলতে থাকবে ও আরো মরিয়া ষড়যন্ত্র চালাবে। কিন্তু 'সিণ্ডিকেট' এখনকার মতো পিছু হটাই স্থির করল দেখে কংগ্রেসের ভাঙনও আপাতত হল না এবং কংগ্রেসের পলিসিও নিজলিঙ্গাপ্পা-গোষ্ঠীর হাত থেকে ইন্দিরা-গোষ্ঠীর হাতে এসে গেল এবং এই দুইয়ে মিলে কংগ্রেসের মধ্যে আবার একটা নতুন উৎসাহ সৃষ্টি হল। পঃ বাংলার দিকে চেয়েই বলি, ইন্দিরা গান্ধীর কলকাতায় এসে বিপুল অভিনন্দন লাভ, বিরাট জনসভা করা, সেই জনসভায় কংগ্রেসের দুই অংশেরই সাধারণ সমর্থকদের যোগদান, কংগ্রেসের নীতি ও কাজ হিসাবে এমন অনেক প্রগতিশীল কথা ইন্দিরা গান্ধীর মুখ থেকে ঘোষিত হওয়া, যা আজ পর্যন্ত সাধারণত কংগ্রেসের মুখে শোনা যেত না—এ সবই এখানে শুধু কংগ্রেস-সমর্থকদেরই মনে নয়, সাধারণ লোকের অনেকাংশের মনেও কিছুটা রেখাপাত যে করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এর ফলে ধসেপড়া অবস্থা থেকে কংগ্রেসের আবার উঠে দাঁড়ানোর একটা সম্ভাবনার কথাও যে লোকে ভাবতে আরম্ভ করেছে তাও অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু এটা তো হল কংগ্রেসের দিক। বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শক্তির দিক থেকে অবস্থাটা কতটা অনুকূল হল? দেশের শাসনব্যবস্থা ও শাসন-নীতিকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর পূর্ণ আয়ত্তে আনার যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল 'সিণ্ডিকেটের' দ্বারা, তাকে প্রতিরোধ করা ছিল এই মুহূর্তের সব চেয়ে বড় কাজ। তাই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও মোরারজী দেশাই-এর হাত থেকে অর্থ-দপ্তর কেড়ে নেওয়া থেকে আরম্ভ করে 'সিণ্ডিকেট'-মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভি ভি গিরির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর ও তাঁর সমর্থক-দের সব কাজকে বামপন্থী দলগুলি শুধু স্বাগতই জানায় নি, সমস্ত শক্তি সংহত করেছে চরম প্রতিক্রিয়াশীল চ্যালেঞ্জকে পরাজিত করতে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে যে বিদ্রোহ হয়েছিল এবং যার ফলেই ভি ভি গিরির পক্ষে এত বেশি কংগ্রেসী ভোট পড়েছে, তা শুধু কংগ্রেসের মধ্যকার একটা ঘটনা হিসাবেই প্রতিভাত হয় নি, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটা সামগ্রিক প্রগতিশীল সমাবেশ হিসাবেই তা গণ্য হয়েছে সকলের কাছে। অর্থাৎ, চরম প্রতিক্রিয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটা মৈত্রী হয়েছে বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে কংগ্রেসের ভেতরকার গণতান্ত্রিক শক্তির। এটা একটা নতুন পরিপ্রেক্ষিত তো বটেই। এ-পরিপ্রেক্ষিত বামপন্থীদের কাছেও যে অত্যন্ত স্পষ্ট তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখি ভি ভি গিরি পরাজিত হলে পঃ বাংলার কোনো বামপন্থী দল হরতাল করার প্রস্তাব দেন যুক্তফ্রন্টের কাছে এবং আরো যখন দেখি ভি ভি গিরির জয়লাভে প্রগতি শক্তির জয় বলে পঃ বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট ছুটি ঘোষণা করেন এবং জন-সমাবেশে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ, পরিস্থিতিটা সামগ্রিকভাবেই প্রগতি শক্তির জয়রূপেই বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শিবিরের দিক থেকেও অনুভূত হয়েছে।

আজকের পরিস্থিতির এই দ্বিবিধ লক্ষণই পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নতুনত্ব এনে দিয়েছে। নতুনত্ব এই অর্থে যে, কংগ্রে-সের মধ্য থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসে বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে এক মোর্চায় দাঁড়ানর বদলে কংগ্রেসের মধ্যেই তাদের প্রতিরোধ-সংগ্রাম এমন প্রবল হয়েছে যে, সেই অবস্থাতেই বাম-পন্থী-গণতান্ত্রিক মোর্চার সঙ্গে তাদের মৈত্রী হয়েছে। অবশ্য মূলগতভাবে দেখলে এতে নতুনত্ব নেই বলাও চলে। কেন না, কংগ্রেসের মধ্যকার এই শক্তির প্রতিরোধের চরিত্র আজ এমনই যে তা কংগ্রেস ভেঙে বেরিয়ে আসার মতই। কংগ্রেসের এতাবৎকালের নিয়ম-শৃঙ্খলা অস্বীকার করেই ভি ভি গিরির পক্ষে তারা দাঁড়িয়েছে। এর স্বাভাবিক পরি-ণতি হিসাবে কংগ্রেস দুই টুকরো হয়ে যাবে এটাই সকলের ধারণা ছিল, অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থকরা স্বতন্ত্র একটা কংগ্রেস দাঁড় করাবে বলেই মনে হয়েছিল। সেটা যে হল না, তার প্রধান কারণ সিণ্ডিকেটের পশ্চাদপসরণ। এই পশ্চাদপসরণের প্রকৃত অর্থ কি এবং এত মৌলিক বিরোধের পরও কংগ্রেসকে মিলিত রাখার প্রশ্নে ইন্দিরা গান্ধী সমর্থকদের রাজী হয়ে যাওয়ার রাজ-নৈতিক মূল্যায়ন কি, তা পরে আলো-চনা করব। কিন্তু সব মিলিয়ে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, দেশের ক্রমবর্ধমান যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকট কংগ্রেসে বেশি বেশি করে ভাঙন সৃষ্টি করছিল এবং যার ফলে কংগ্রেস-বিরোধী গণ-তান্ত্রিক শিবিরের পরিধি ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছিল, সেই অবস্থারই আরো অগ্রসর রূপ এটা, যেখানে ভাঙনের শক্তি এত বড় হয়েছে যে, সেটাই পাল্টা আঘাত হানতে পেরেছে প্রতিপক্ষের ওপর। এর মানে এই নয় যে, কংগ্রেসের ভেতরকার এই শক্তি ও বাইরেকার কংগ্রেস-বিরোধী গণতান্ত্রিক মোর্চা এক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা না হলেও, প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত রোধের দিক থেকে দুয়ের গতিমুখ যে অনেকটা একই দিকে, এটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইন্দিরা গান্ধী আজকাল যেসব কথা বলছেন, তা এতদিনকার মতো কমিউনিস্ট-বিরোধী বা যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী নয়। কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান যতই তিনি দিন না কেন, সে-আহ্বানে বামপন্থী-বিরোধী কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি। এটাই হচ্ছে অবস্থার নতুনত্ব ও অগ্রগতি।

কিন্তু অবস্থার এই নতুনত্ব ও অগ্র-গতিই আবার সমস্যারও উদ্রেক করেছে। সমস্যা হচ্ছে এই যে, কংগ্রেসের পুনরু-

জ্জীবনের এই শক্তি কি বামপন্থী-গণতান্ত্রিক মোর্চার সামনে একটা নতুন চ্যালেঞ্জের মতই আসছে না? বামপন্থী-গণতান্ত্রিক মোর্চার আহবানের পাশে কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের এই শক্তির আহবান এসে জনসাধারণকে কিছুটা বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে না কি? অর্থাৎ, এই প্রশ্ন এসে পড়ছে যে, ইন্দিরা গান্ধী যে নতুন পথে এগিয়ে চলতে চেষ্টা করছেন, সেই পথটার আকর্ষণ বড় না, কংগ্রেসের স্পষ্ট বিকল্প হিসাবে বামপন্থী-গণতান্ত্রিক মোর্চার পথের আকর্ষণ বড়? বামপন্থী দলগুলির ও তাদের কর্মীদের কাছে হয়ত এ-প্রশ্ন বড় নয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এ-প্রশ্ন আছে এটা অস্বীকার করলে চলে না। এবং এই বিভ্রান্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে আসছে বলেই বাম-পন্থী দলগুলির পক্ষ থেকে ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে মনোভাব স্পষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। গত ১৭ই সেপ্টেম্বরের স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার এক খবরে পঃ বাংলার যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দলের মনোভাব একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। এই মনোভাবের মধ্যে অভিন্নতাটা হচ্ছে এই যে, কোন দলই ইন্দিরা গান্ধীর ওপর আস্থা স্থাপনের কথা বলেন নি। কিন্তু এই অভিন্নতার মধ্যে রয়েছে দুটো ঝোঁক। একটা ঝোঁক হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী যে প্রগতিশীল নন এবং হতে পারেন না, সেটাই যেন জোর গলায় জানিয়ে দেওয়া। এই ঝোঁক থেকেই বলা হয়েছে যে, ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসেরই দুই রূপের একটা রূপ, তাই কংগ্রেসী হিসাবে তাঁকে নিজ-লিঙ্গাপ্পা থেকে আলাদা করে দেখা যায়। কেউ বলেছেন, তাঁর আপাত বামপন্থী আওয়াজগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসকে বাঁচানো। কেউ বলেছেন, তাঁর এক-চেটিয়া-বিরোধিতা আসলে বুর্জোয়া-শ্রেণীর একাংশকেই সাহায্য করার জন্য। এই সমস্ত মনোভাবের মধ্যে আবার বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হয় সেই দলের কার্যক্রমটা, যা ইন্দিরা গান্ধীর কলকাতা আগমনের দিনে তাঁর আপাত-বামপন্থী বক্তব্যের মুখোস খোলার জন্য সভা-মিছিলের আহবান জানান হয়েছিল। কিন্তু... এই ঝোঁকের থেকে পার্থক্য রয়েছে আর একটা দলের বক্তব্যের, যাতে ইন্দিরা গান্ধীকে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি বলা হলেও, তাঁর প্রগতিশীলতা আসল কি নকল আজই তার শেষ বিচার না করে, প্রতিক্রিয়া-বিরোধী শক্তি-সমাবেশের আজ-কের সাফল্যের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সেই সমাবেশকে আরো কার্যকর রূপ দেওয়ার জন্য, অগ্রগতির সম্ভাবনাকে সার্থক করার জন্য, বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শক্তির উদ্যোগ-বৃদ্ধির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছে; যে-বিরাট দায়িত্ব বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর এসেছে তা পালনের জন্য আহবান জানিয়েছে। অর্থাৎ অগ্র পদক্ষেপের ইতিবাচক মনোভাবটাই এতে প্রধান।

প্রথম ঝোঁকটা আপাতদৃষ্টিতে যতই বেশি বামপন্থী বা বেশি বিপ্লবী মনে হোক না কেন, এটা না বলে উপায় নেই যে, তার মধ্যে রয়েছে একটা 'কমপ্লেক্স'। মাত্র কিছুদিন আগে যখন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হল, সিণ্ডিকেটের পক্ষ থেকে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে চক্রান্তের আভাষ পাওয়া গেল এবং ভি ভি গিরির সমর্থনে ইন্দিরা গান্ধীর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা দেখা গেল। তখন এই সমস্ত দলও অন্যদের মতো তো সোৎসাহে ইন্দিরা গান্ধীর পিছনে দাঁড়িয়েছিল, তাঁর ভূমিকাকে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতির লড়াই বলে গণ্য করে। প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত যদি প্রগতি শক্তির দ্বারা প্রতিহত হয়, তাহলে সেটা রাজ-নৈতিক মতামত নির্বিশেষে সকল প্রগতিশীল শক্তির পক্ষেই একটা অগ্র-পদক্ষেপ। যাঁরা এখন ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিক্রিয়ারই একটা অংশ বলে বা প্রগতিশীলতার আবরণ নিয়ে তিনি কংগ্রেসের প্রভাব বাড়ানোর কৌশল অবলম্বন করছেন বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, তাঁরা কি তাহলে এটাকে অগ্রপদক্ষেপ মনে করছেন না? সমস্তটাই যদি প্রতিক্রিয়ারই একটি অন্যতম অংশের কৌশল হয়, তবে এ কৌশলকে উন্মুক্ত করা উচিত ছিল তো প্রথম থেকেই। কিন্তু তা করা হয় নি। কেন না, সেটাই হত অবাস্তব ধারণাপ্রসূত কাজ এবং যাকে বলে হঠকাবী কাজ। আসলে, প্রগতি শক্তির এই অগ্রপদ-ক্ষেপকে দেশের গণতান্ত্রিক শক্তির বিপুল প্রভাব হিসাবে না দেখে, শুধুমাত্র কংগ্রেসের ভেতরকার ইন্দিরা গান্ধী সমর্থকদের কৃতিত্ব হিসাবে দেখলে এবং এই অগ্রপদক্ষেপের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে প্রগতি শক্তিকে আরো সুসংহত ও সুপরিচালিত করার দায়িত্ব অনুভব না করলেই এই 'কমপ্লেক্স' আসে।

বামপন্থী দলগুলিব সামনে আজকের প্রধান দায়িত্ব এই নয় যে, ইন্দিরা গান্ধীর প্রগতিশীলতা আসল কি নকল তা প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগতে হবে। প্রধান দায়িত্ব এটাই যে. প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধ ব্যর্থ করে প্রগতিশীল যে পদক্ষেপ আজ নেওয়া হয়েছে, তা রক্ষা করার জন্য এবং সেখান থেকে আরো অগ্রপদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংগ্রাম করা। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠবে ইঁদিরা গান্ধীর প্রগতিশীলতার কতটা আসল ও কতটা নকল। যতটা আসল, তা এই কংগ্রেসকে সাহায্য করবে, যতটা নকল তাকে এই সংগ্রামই উন্মুক্ত করে দেবে এবং তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিরোধ দুর্বার হয়ে উঠবে। এই পথেই গণ-তান্ত্রিক শিবির আরো প্রসারিত ও সংহত হবে ও গণতান্ত্রিক মোর্চার বিকল্প আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

উদাহরণ স্বরূপ ব্যাঙ্ক-জাতীয়করণের প্রশ্নটি তোলা যায়। ব্যাঙ্ক-জাতীয়-করণের সিদ্ধান্তের পিছনে ইন্দিরা গান্ধীর নীতি যে বামপন্থী দলগুলির মতো প্রগতিশীল, তা কেউ মনে করবে না। কেন না ইন্দিরা গান্ধী বুর্জোয়া শ্রেণীরই প্রতিনিধি। কিন্তু সেই বিচার করে ব্যাঙ্ক-জাতীয়করণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা বা সমালোচনা করাটা এখনকার প্রধান কাজ নয়। এই সিদ্ধান্তটাই এক-চেটিয়া পুঁজির আধিপত্যের ওপর প্রচণ্ড আঘাত করেছে, অর্থনীতি-ব্যবস্থায় জনসাধারণের সামনে নতুন সুযোগ খুলে দেওয়ার পথ তৈরি করছে। প্রগতিশীল শক্তি দৃঢ়ভাবে সেই পথ অনুসরণ করবে, সুযোগকে পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করবে এবং সেই পথে কংগ্রেসের ভেতরকার গণ-তান্ত্রিক শক্তিকেও সমাবিষ্ট করবাব চেষ্টা করবে। এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই নতুন সংঘাত বাধবে তাদের সঙ্গে, যারা ব্যাঙ্ক-জাতীয়করণকে শুধু লোক-ভোলানো ব্যবস্থা হিসাবেই রেখে দিতে চায় বুর্জোয়া-স্বার্থের জন্য বা একচেটিয়া-পুঁজির সঙ্গে আপোষের খাতিরে। সেই সংঘাতের মধ্য দিয়েই আরো স্পষ্টভাবে প্রকট হয়ে উঠবে কংগ্রেসের ভেতরকার কোন্ অংশ সত্য প্রগতিশীল পথে থাকতে চায় ও কোন অংশ পিছু হঠতে চায়, অর্থাৎ কাদের সঙ্গে প্রগতির শিবিরের মৈত্রী হবে ও সে-মৈত্রী কাদের বিরুদ্ধে সংহত হবে।

সুতরাং, আপাতদৃষ্টিতে যেটা সমস্যা মনে হচ্ছে, সেটা আসলে সমস্যা নয়, তার মধ্য দিয়ে সম্ভাবনাই প্রকট হয়ে উঠছে বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্র-গতির। কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যটা একান্তই বাহ্য ও সাময়িক। কেন না, যে পথ-পরিবর্তনের কথা বলে সাধারণ মানুষকে কংগ্রেসের বর্তমান ভেঙে একার পক্ষে নতুন কংগ্রেস করতে হয় বাংলা-কংগ্রেসের মতো (অথবা সে-পথের ধোঁকা দিয়ে চলতে হয়, যার ফলে অন্তর্বিরোধের নতুন শক্তি জেগে

উঠবে) যে অবস্থাই হোক, কংগ্রেস-পুনরুজ্জীবন তাতে হয় না।

ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস-পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা যে এই দোটানার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। সিণ্ডিকেটের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধের মূলে ভিত্তি যে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পথ গ্রহণ, সে ভিত্তিটা এখনও বজায় আছে। এবং সেই আবেদন নিয়েই তিনি জনসাধারণের কাছে উপস্থিত। কিন্তু অন্যদিকে কংগ্রেসের ঐক্যরক্ষার ঝোঁকে সিণ্ডিকেটের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করতে তিনি অক্ষম এবং এ-অক্ষমতা মানেই প্রগতিশীল পথে প্রচণ্ড বাধা জিইয়ে রাখা। এটা তো ব্যক্তির দোটানা নয়। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বাভাবিক দ্বৈত চরিত্রই-এর মধ্যে ফুটে উঠেছে। সংকটের ধাক্কায় জনসাধারণের পথে আসতে হয় তাদের, আবার বুর্জোয়া-স্বার্থ জনসাধারণের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজ শ্রেণীর দিকেই চোখ নিবন্ধ করে। প্রগতির পথে এসেও বুর্জোয়াশ্রেণীর এই দ্বৈত ভূমিকা থাকে বলেই অগ্রগতির উদ্যোগ হাতে নিতে হয় বামপন্থী শক্তিকেই, প্রগতিশীল ব্যবস্থাগুলির দাবিতে গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তুলতে হয়, যার প্রভাব ও গতিবেগ শুধু যে পশ্চাদ্‌গতিকে বাধা দিয়ে অগ্রগতির চেষ্টার পথ খুলে দেয় তাই নয়, প্রগতির শিবিরের সঙ্গে তার মৈত্রী অপরিহার্য করে তোলে। আজকের পরিস্থিতিতে এরই স্পষ্ট পরিচয় দেখছি নাকি? বামপন্থী দলগুলিকে ইন্দিরা গান্ধীর দিকে তাকাতে হচ্ছে না, ইন্দিরা গান্ধীকেই তাঁর প্রগতিশীলতা রাখার জন্য বামপন্থী দলগুলির দিকে তাকাতে হচ্ছে, বামপন্থী ভাষায় কথা কইতে হচ্ছে, বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে এতাবৎকালের বিরোধী সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে হচ্ছে। এটাই হচ্ছে পরিস্থিতির বিকাশে বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শক্তির নির্ধারক ভূমিকায় আসা, বামপন্থী-গণতান্ত্রিক শিবিরের দায়িত্ব অত্যন্ত বেড়ে যাওয়া।

এই পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়েই সাম্প্রতিক একটা ঘটনা লক্ষ্য করতে হবে। কিছুদিনের মধ্যে যে চটকল শ্রমিক, চা-শ্রমিক ও সূতাকল শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে, তার চরিত্রটা পূর্বেকার দিনের থেকে যথেষ্ট পৃথক নয় কি? বি-পি-টি-ইউ-সি থেকে আই-এন-টি-ইউ-সি পর্যন্ত, অর্থাৎ বামপন্থী মোর্চার শ্রমিক-সংস্থা থেকে কংগ্রেসী শ্রমিক-সংস্থা পর্যন্ত সম্মিলিত-ভাবে এই শ্রমিক-ধর্মঘটগুলি করেছে। এইরকম ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক-ধর্মঘট পঃ বাংলায় কোনদিন হয় নি। এই সংগ্রামের মোর্চা গঠিত হয়েছে প্রধানত বামপন্থী শক্তির দ্বারাই, তারাই এর নির্ধারক শক্তি। সেই বামপন্থী মোর্চার সঙ্গেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ-ভাবে আসতে হয়েছে এবং সংগ্রামী পথে অবিচল থাকতে হয়েছে আই-এন-টি-ইউ-সি'র শ্রমিক-সংস্থাকেও। এটা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়। আজকের পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া বনাম প্রগতির পোলারিজেশন যেভাবে বেড়ে উঠেছে, তাতে কিছুটা শ্রমিক-স্বার্থরক্ষা করতে গেলেও প্রগতির শিবিরে এসে মেলা ছাড়া অন্য পথ নেই। আর, প্রগতির শিবিরে এসে দাঁড়ালে তার আজকের গতিবেগের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া ছাড়াও অন্য পথ নেই, অন্য পথ নেওয়া মানে প্রতিক্রিয়ার শিবিরেই চলে যাওয়া। বিকল্প এত স্পষ্ট বলেই গণতান্ত্রিক মোর্চার প্রসার ও অগ্রগতি অবধারিত।

এই যে পরিপ্রেক্ষিত, এটাই নিরূপণ করে দিচ্ছে বামপন্থী-গণতান্ত্রিক দলগুলির দায়িত্ব। কংগ্রেস আবার কতটা সংহত হবে, প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপোষ হয়ে প্রগতিশীল পদক্ষেপটা আবার কতটা পশ্চাদপসরণ করবে, তার আলোচনা ও বিশ্লেষণটাই আজ যথেষ্ট নয়। তার চেয়ে বেশি কাজই আজকের পরিস্থিতি দাবি করে। আজ প্রয়োজনীয় যে-প্রগতিশীল ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে তাকে রক্ষা করার ও আরো অগ্রপদক্ষেপ নেওয়ার জন্য, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের ভিত্তিতে বিরাট আন্দোলন ও সংগ্রাম উন্মুক্ত করা, যার মধ্য দিয়ে আজকের গণতান্ত্রিক শিবির আরো প্রসারিত হবে এবং প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত ও তার সঙ্গে আপোষের প্রচেষ্টাও প্রতিহত করা যাবে। জনসাধারণের চেতনা ও দায়িত্ববোধ আজ এই স্তরে উন্নীত হয়েছে, জনসাধারণের আত্মবিশ্বাসও আজ এই নির্ধারক ভূমিকা পালনের উপযোগী। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক রূপান্তর এই পথেই হতে পারে।

dayp 69/106

আহা, ডাঙ্গাতলার জমি। যতীনের জিভে প্রায় জল আসে আর কি। যতীন্দ্র পাছাল, শিবু পাছালের ছেলে অঘোর পাছালের পৌত্র।

গাঁয়ের নাম ধানসী। সামনে বিল, দক্ষিণে যতদূর চোখ যায় বিল, বিল আর বিল। আকাশের নীল রং ঠিক যেখানে শেষ হয়েছে মনে হবে সেখানেও তার শেষ হয় নি। প্রায় আট মাস জল থাকে, সামনে দূরের বিল হয় ত' সমুদ্দুরেই মিশে গেছে, সেখানে জল বার মাস থৈ-থৈ করে। গাঁয়ের নিচে বিলের একটা বড় অংশে ভেড়ী বেঁধে ফসল তৈরি হয়। সযত্নে বার মাস পাহারা দিয়ে খাটুনী দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে সেই ভেড়ীকে বাঁচিয়ে রাখা হয় পাশের সেই সমুদ্দুরের খাঁড়ি বিশাল বিলের লোনা জল থেকে। নইলে লোনা জল রাক্ষসী হয়, ফসল খেয়ে ফেলে, মন্বন্তর আসে। ধানসীর চাষীরা ভেড়ীকে তাই রক্ষা করে পবিত্র এক দৈবী সম্পদের মতো। গোটা চাষীপাড়ার জীবনও একদিন বাঁধা পড়েছিল তাই ভোমরা-ভুমরীর কৌটো ঐ ভেড়ীর বাঁধে। আজ আর সেদিন নেই।

চাষীপাড়ার পেছনে ছোট খাল, নাম একটা আছে—জীয়ানির খাল। একদিন হয়ত জীয়ানির কোন মানে ছিল, আজ লোকে তা ভুলে গেছে। তবু কোন ঠাকুরদা পেলে ভেড়ীর বাঁধের পথের ওপর শুয়ে বসে শুনে নিতে তাদের প্রাণ সব সময় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। সেই কবে এক জীয়ানি এসেছিল গাঁয়ের পথে, সাপে কাটা মানুষ গরু বাছুর ছাগল সব প্রাণীকে জীইয়ে তুলতে পারে। তখন এখানে বাদাবন। সদ্য আবাদকরা জলার তীরে সাপে কাটা নয় শুধু, সাপে মারা প্রাণীদের বাঁচবার মত একটা লোক পেয়ে নতুন আবাদীরা হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। খালের ধারে নয়া বসতি থেকে অনেক দূরে জীয়নতলায় ছোট একটা থান আর ঘর করে তাকে বসানো হয়েছিল। জীয়ানি ফকীরের নামডাক ছড়িয়ে পড়ল এক আবাদ থেকে আর এক আবাদে। নামের সঙ্গে পশার, পশারের সঙ্গে পয়সা, পয়সার সঙ্গে সম্পত্তি, সম্পত্তির সঙ্গে আর যা-যা আসবার জীয়ন ফকীর বেঁচে থাকতেই সব ভোগ করেছিল। থান বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ফকীর তার পদবী বদল করে গোঁসাই হয়েছিল। জীয়ন ফকীর হল জীয়ন গোঁসাই। সাহেব কোম্পানীর লোকরা কাছারীবাড়ি বসাল কাছাকাছি ট্যাঁকে। কিছুদিন পরে সবাই জানল খালের মালিক জীয়ন গোঁসাই। গোঁসাই খালের নামকরণ করল। তখন থেকে খাল হল জীয়ানির খাল। গোঁসাই যখন পার্থিব সুখে স্বর্গবাস করছেন, তখন এক সকালবেলা খবর ছড়িয়ে পড়ল সাপে মারা প্রাণীর জীবনদাতা জীয়ন

ফকীরকে ঘুমের ভেতর সাপেরাই মেরে রেখে গেছে।

যতীন পাছাল ডাঙ্গাতলার জমির কথা ভাবতে ভাবতে একথাগুলোও ভাবছিল। কারণ এই ভাবনার সঙ্গে ডাঙ্গাতলার কঠিন সম্পর্ক ছিল। যতীন এসব ঘটনা নিজে জানত না, জানত তার ঠাকুরদা অঘোর পাছাল, জীয়ন ফকীরের নৌকোর যে মাঝি ছিল। খালের সঙ্গে সাহেব কোম্পানী ওদের পাড়ার পিছন দিককার, মানে ফকীরের থান থেকে নিচের দিকে খাল পর্যন্ত সমস্ত আবাদী জমিও, প্রায় চারশো বিঘে, জীয়ন ফকীরকে বন্দোবস্ত দিয়েছে। জীয়ন ফকীর তার আপনার লোকদের ও সেবকজনদের কিছু জমি দিয়েছিল। যতীনের ঠাকুরদা পেয়েছিল সতেরো বিঘে। একনাগাড় জমি, আধা ডুবন্ত আধা জাগন্ত, ফকীরের নৌকো যেখানে বাঁধা থাকত পাড়ার মুখে খালের ধারে সেই জায়গায়। ঠাকুরদা অঘোর পাছালের সময়েই সেই জমি খালের পলি পড়ে পড়ে ভরাট হচ্ছিল। বাবা শিবু পাছালের সময় উঁচু হয়ে উঠল, জাগন্ত অংশটা ট্যাঁক হয়ে পড়ল, জোয়ার ভাটার নাগাল থেকে ওপরে উঠল বেশ খানিকটা। খালের জলের রস বারো মাস পেত বলে সব রকম ফসল হত। পাড়ার ভেতর পাছালদের অবস্থা ভাল হল, বাড়িতে দেয়াল দেওয়া ঘর উঠল, গোয়ালঘরের পাশে ছোট একটা ধানের মরাই গোলার ছাঁদেই বসাতে হল।

তার পরের ঘটনা যতীন জানে। তার বত্রিশ বছর জীবনের বিশটা বছর সেই ঘটনায় কালো হয়ে আছে। জীয়ন ফকীরের তৃতীয় পুরুষ এখন ফুলে ফেঁপে বিশাল—ধনে জনে ক্ষমতায় অহঙ্কারে এ তল্লাটে ডাকসাইটে।

পাড়ার নিচে ধানসীর বিলের ভেড়ী ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে যেখানে বারো মাস জলের ওপর শুধু ঢেউ খেলে বেড়ায়, যতদূর চোখ যায় সবটাই জীয়ন ফকীর ওরফে গোঁসাইয়ের বংশধর পৈতে নিয়ে বামুন হওয়া নয়া গোঁসাইদের মেছোঘেরী। খাল যেখানে বড় গাঙে মিশেছে পূব দিকের সেই মাথায় স্লুইস গেট। পশ্চিমে যেখানে ছোট গাঙে মিশেছে সেই মাথায়ও। সাহেব কোম্পানীর কাছ থেকে গোঁসাইরা ওদের গ্রাম সমেত মেছোঘেরীর নদীর পাড় পর্যন্ত সমস্ত অংশ ছাড় করিয়ে নেয়। এই অংশটা আলাদা লট, আলাদা রেকর্ডে খাস জমিদারী—মূল মালিক কালেকটরি, দখলদার গোঁসাইবাবুরা।

ছেলেবেলার কথা অনন্তর মনে আছে। একদিন শয়ে শয়ে লেঠেল এল, একটা দল ছিপ নৌকায় আর একটা দল ডাঙার পথে। কালেকটরির লোক, পুলিশ দারোগা আমীন নায়েব তহশীলদার। সব জায়গা জল দিয়ে ডাঙা দিয়ে ওরা দখল করল। নতুন একটা বসতি গড়ে উঠেছিল ভেড়ীর কাছাকাছি, সেটাও ভেঙে দিল তারা দা-কুড়ুল লাঠি চালিয়ে। চালগুলো ভাসিয়ে দিল খালের জলে। ভেড়ীর বাঁধের দক্ষিণ দিককার অংশ চার-পাঁচ জায়গায় ভেঙে মেছোঘেরীর সঙ্গে মিশিয়ে দিল। পাড়ার ক'জন জোয়ান পুরুষ বাধা দিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঁচিয়ে উঠল গোঁসাইবাবুদের আর পুলিশদের বন্দুকগুলো।

তার পরের ইতিহাস চোখের জলের। ক্রমে ক্রমে বছরের পর বছর অজন্মা। চাষীপাড়া ফাঁকা হয়ে গেল। যারা পারল নতুন নতুন আবাদে জমির সন্ধানে চলে

গেল। যারা পারল না বেঁচে রইল বাবুদের খেতমজুর হয়ে, মাছধরা হয়ে খানসামা হয়ে। যতীনও তেমনি একজন—কখনো খেতমজুর, কখনো খানসামা। চালা বেঁধে ঘর বিশেক তারা এ পাড়ায় আছে। গোলপাতা কিনে ঘর ঢাকবার সাধ্য নেই, বাঁধের তালগাছ থেকে পাতা কেটে বছর বছর ঢাকতে হয়, বর্ষায় পচে যায়, উড়ে যায় ঝড় হলে।

সেই যতীন আজ বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছে। ডাঙ্গাতলার জমি আবার লকলকে ধানে ভেঙে পড়েছে, এক হাত করে লম্বা লম্বা ধানের শীষ রোদের তলায় ঝকমক করছে। ধান কাটছে পাড়ার লোকদের সঙ্গে গাঁতার দল বেঁধে। বাড়ির খলেনে আঁটি আঁটি ধান গাদায় গাদায়। উঠোনে পাঁচটা গরুতে মলন মলছে, বড় ছেলেটা গরু তাড়াচ্ছে 'হেট্ হেঁয়ো ট্রুক্-ট্রুক্।' ওপাশে ধান ওড়াচ্ছে বৌটা কুলোয় করে, মাঝে মাঝে কোলের মেয়েটাকে মাই দিচ্ছে। বাওড় বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কাপড় সামলাতে প্রাণান্ত, মাঝে মাঝে যতীনের দিকে তাকিয়ে 'আ মরণ' বলে হেসে ফেলছে।

আমার জমি আমারে দাও, গোঁসাইবাবু হাত সরাও, আমার জমি—

যতীনের স্বপ্নটা ভেঙে গেল। রসিক লস্কর তার প্রাণের বন্ধু, তারই মত গোঁসাই বাড়ির জোয়ালে বাঁধা। কৃষক সমিতির মিটিংয়ে চেঁচিয়ে বলা ধ্বনিটা সে খাটো গলায় বলে ওর স্বপ্নটাকে ভেঙে দিয়েছে। বন্ধু হয়ে এমন শত্রুতা কেন করেছে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে অজান্তেই বলে ফেলল—বিকেলে আবার মিটিং আছে কিন্তুন।

জানি কিন্তুন।

রসিক মিটি মিটি হাসছিল। আবার বলল—তুই অ্যাট্টা ভেড়া, ভেড়াও নয় ভেড়ী।

তুই তালে ছাগলী। যতীন রাগবার চেষ্টা করল—ল্যাজ গুটে মাইরি পাইলে এলি ক্যানে।

—তুই ক্যানে মাইরি গামছা মুড়ি দে গা ঢাকা দিলি হারু গোমেস্তাকে দেখে।

যতীন রেগে গেল এবার। তেজী গলায় বলল—আজ যাবো শিরদাঁড়াটা সুজা করে। দ্যাখা হলে বুলব, কমনে যাচ্চেন গো গোমেস্তাবাবু। জিগ্গেস করলে বুলব মিটিন ঠেঙ্গে এসচি।

রসিক তখনো মিটি মিটি হাসছে। বলল, আমি কি বুলব জানিস, বুলব কাল আমরা গোঁসাইবাড়ি যাব। কাগজপত্তর ঠিক রেখো, আমাদের জমিগুলো সব ফেরৎ দিতি হবে।

যতীন আরো রাগল। রসিকের কাঁধের গামছা টেনে ধরে বলল—আমি জানি তুই কি বুলবি। তুই বুলবি মিটিনওয়ালারা শয়তান, উদের কুথা শুনে যানো জমিজমা কাউকে দিয়ে দিওনি বাবু।

—আমি যদি গোমেস্তাটাকে সেই কথাডা বুলেও ফেলি, তালেও জমি উরা রাখতে পারবে নি ইবার।

—ক্যানে, ক্যানে। যতীনের রাগ বিস্ময়ে রূপান্তরিত হল।

—ক্যানে সিটা আপন পরাণেই বুঝবি। গহরমেন হল অ্যাখোন আমান্দের। আমান্দের যা ভাল তাই করবে। আইনে আচে বাবুরা বেশি পেলে পঁচাত্তর বিঘে। উরা তিন সরিক। পঁচাত্তর পঁচাত্তর করে দাওগা। তালে কঁবিঘে গেল উদের ভাগে।

যতীন হাঁ করল এবার। কিছুক্ষণ কথা বন্ধ করে রসিকের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর রেগে গিয়ে রসিকের বাহুতে চড় বসিয়ে দিল শব্দ করে। প্রায় হেঁকে উঠল—আসল শয়তান হলি তুই, মিথ্যে কথার তেইশ মারিস শালো।

রসিক ব্যথা পেয়েছিল, তবু রাগে নি। কোমরের কাপড় নামিয়ে দিল। ঘুনসির মতো করে একটা জালি বাঁধা। তার থেকে একটা লাল রুমাল আর একখানা কাগজ বার করল। লাল রুমালখানা যতীনের চোখের সামনে তুলে ধরে বলল—ইটা কি জানিস। নাড়িয়ে নাড়িয়ে আবার বলল—বুলতে পারবি ইটা কুন বস্তু?

যতীনের চোখে এবার সত্যিকার বিস্ময়। শুধু লাল রুমাল নয়, তার মাঝখানে সাদা রংয়ের কাস্তে হাতুড়ি তারা। কৃষক সমিতির মিছিলে আর মিটিংয়ে যে পতাকা ওড়ে তাতে থাকে ওই চিহ্ন। আর লাল রুমাল। সে-তো ভলেণ্টিয়ারদের গলায় বাঁধা থাকে। তারা হল বাবুপাড়ার ছেলে, বড় ইস্কুলে উঁচু 'কিলাসে' পড়ে, অনেকে আবার বোর্ডিংয়ে থাকে, যে-বোর্ডিং গোঁসাইবাবুরাই করে দিয়েছে। কিন্তুন ইটা ক্যামন য্যানে উল্টো ঠেইকচে যতীনের কাছে। রসিক হল চাষী। শুধু চাষী নয়, খেতমজুর, তার ওপর গোঁসাইবাবুদের জোয়ালে বাঁধা' প্রায় দাসখত দেয়া জীবনবন্দী, তার হাতে শেষে লাল রুমাল!

—রুমালটাকে তুই মাইরি ফিলে দে, খালের জলে ভাস্যে দে, দে বুলচি।

—ক্যানে?

—ন্যায়তো তোর ভাল হবে নি।

—খারাপডা কিসে হবে রে ভেড়ো।

—বাবুরা তেইড়ে দেবে, ত্যাখোন ডাঁড়াবি কুথাকে?

—দিলেই বা। কি আচে আমার? বাবুরা সবই তো কেড়ে লিয়েচে, লেয়নি? তোর লিয়েচে, আমার লিয়েচে, ষষ্টির লিয়েচে, ই পাড়ার সব্বার লিয়েচে—লেয়নি? কিচ্চু কি রেকেচে আমান্দের যে ভয় পাবো গিয়ে কেড়ে লিবার? তবে কিসির ভয় রে, কিসির ভয়? কাজ দেবে না? না দেয় না দেবে। গতর থাকলি ভয় পাবো ক্যানে? এইখেনে, লয়তো সেইখেনে, হিথা লয়তো সিথা, কাজ আমার মিলবেই মিলবে। ন্যায়তো সমিতি আচে, আমান্দের কিষক সমিতি, জমি দেবে ন্যায়তো অন্য লটে কাজ দেবে। ভয় পাবো ক্যানে। ভয় পেতে হয় তুই পা, তুই ভ্যাড়াও লয়, ভেড়ী। তুই তাই ভয় পাস, ব্যাঁ করিস, ভেড়ীর ভেড়ী—

যতীন চুপ করে আছে। অতবড় গাল খেয়েও চটে নি।

রসিক বোধহয় আরো বলত। অতবড় বক্তৃতা দিতে দিতে হঠাৎ থেমে যতীনের নিশ্চুপ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে মুখে যা দেখতে চাইছিল তার কোন আভাস নেই, না বিরক্তির, না উত্তেজনার। ভীষণ একখানা থমথমে মুখে গভীর কিছু এঁকে রয়েছে। চোখের দৃষ্টিও রসিকের দিকে নয়—সামনে একটা আমগাছ, সব দৃষ্টি তার সেখানে আঁটা। মুখের ওপর ঠোঁট দুখানা মাঝে মাঝে নড়ছে, কিছু বোধহয় বলতে চাইছে, কিন্তু শরীরের জোরে সেটা কথা হয়ে ফুটে বেরুচ্ছে না। রসিক তাড়াতাড়ি সেই কথাটা ফোটাবার জন্যেই বললে—তুই হলি পাছাল বাড়ির ভেড়ীর ভেড়ী।

—জমি দেবে, না রে?

রসিক কি বলবে ভেবে পেল না। কোনমতে একটা জবাবের মতো খাড়া করে বলল—দেবে, কিন্তুন ভেড়ীকে লয়, মানুষকে, মানষের মদ্দি চাষাকে। আরো শুদ্ধ করে বলল কিষকদিকে।

—আমিউ কিষক, পছাল বাড়ির সন্তান। তুই বল, আমি কিষক কি না।

রাণীধূপ
কাকার প্রডাক্টস

রসিক একটু ভাবল। বলল, একদিন কিষকই ছিলি। অ্যাখোন মেছো কিষক, খেটো কিষক—হেলে কিষক লয়, বললতে পারিস মজুরও, খেতমজুর।

যতীন এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি রসিকের হাত চেপে ধরল। প্রায় কাতর গলায় বলল—খেত মজুর কি কিষক হতে পারে না, সেই যেমন আমার বাবা ছিল, ঠাকুরদা ছিল। একখান হাল, দুটো বলদ—ডাংগাতলার জমি চষবে—ডাঁয়-ডাঁয় ট্রি-রি-রি—এই-এই—

রসিক সহসাই স্তব্ধ হয়ে গেছে। যতীনের গলা দিয়ে লাঙলে জোতা গরু তাড়াবার সাংকেতিক ধ্বনিগুলো আপনা থেকে যে-ভাবে সুরেলা হয়ে বেজে উঠল রসিকের মাথায় তা ঘুরে বেড়াচ্ছে পাকে পাকে। তার মধ্যে সেই ধ্বনিতে ঘুমন্ত চাষীটা জেগে উঠল। মুখ থেকে ব্যঙ্গের হাসি মিলিয়ে গেল, গলা থেকে ঠাট্টার সুর। রসিক সেই মুহূর্তে গোঁসাইবাড়ির গর্ভে মেছোঘেরীর মধ্যে এক-লপ্তে তেরো বিঘে জমিকে শুয়ে থাকতে দেখল জলের তলায়। একদিন ঐ জমিতে ফসল ছিল, সবুজ সবুজ শীষ ভেঙে পড়ছিল দুধেলো ধানের ভারে। সেই ফসল তৈরি করেছিল তার বাবা চন্দোর লস্কর। তারপর গোঁসাইবাবুদের ডাকাতরা ভেড়ী ভেঙে জল ঢুকিয়ে সেই জমিকে ফসলশূন্য ডুবিয়ে দিল। সেই থেকে অফসলা জমি জলের তলায় শুয়ে থাকে। রসিক ভাবতে পারল, তার পৈতৃক জমি তারই আছে। গোঁসাই-বাবুরা তাকে লুকিয়ে রেখেছে। ডাকাতের হাতে-পড়া মেয়েছেলের মত সেই জমি কেঁদে চলেছে সব সময়। বলছে—আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাও, উদ্ধার কর, আর কতকাল আমি রাক্ষসদের হাতে বন্দী হয়ে থাকব। রসিক আরো গভীর করে ভাবল—জমি মাটি—মা বসুমাতা! তিনি জীব দিয়েছেন পরাণ দিয়েছেন, অন্ন দিয়েছেন। তিনি কাঁদছেন, ডাকছেন বলছেন উদ্ধার কর, উদ্ধার কর।

ওরা অনেকক্ষণ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভেড়ীর বাঁধে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ যে ওরা কাউকে কোনদিন চিনত তখনকার মতো সে কথাটাও ভুলে গেল। ওদের সমস্ত সত্তায় জমির কান্না ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছড়ে পড়ছে জোয়ারের বেগে।

দুজনে কখন উঠে এসেছে ডাংগা-তলার আমগাছটার তলায়। কতক্ষণ এসেছে, কেমন করে এসেছে কিছুই টের পায় নি। যতীনও যে কেমন করে কথা বলল বুঝতে পারল না—এই আমগাছ আমার, এই জমিউ আমার। এক সঙ্গে সতেরো বিঘে, ড্যাংগাতলার জমি। এই আমগাছটার নাম ড্যাংগাতলী, বড় মিঠে আম।

যতীন যেন আর কাউকে বলছে, রসিককে নয়। এই রসিক যেন এসব কিছুই জানে না, নতুন আগন্তুক, তাই খুব ভাল করে তাকে বুঝিয়ে বলছে। যতীন বলছে, কালিটিরি ঠেঙে বাবু এসবে, তিনাকে বুলব—এই যে দেখচেন ড্যাংগাতলা, পর সবটুকুনই আমার। আমার বাপ-ঠাউন্দার। কাগজপত্তর যা চান সবই আচে। গোঁসাইবাবুরা লিয়ে গিয়ে লুয়ার সিন্দুকে আটকে রেখেচে। এ জমি আমার, আমার নামেই লিকাবেন কিন্তুন।

যতীনের কথাগুলো অস্বাভাবিক ঠেকছে। তবু রসিক আপত্তি করছে না, মুখ ভেংচে তাকে সংশোধন করতেও আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এখানে দাঁড়িয়েও যতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যতীনের কাছ থেকে কথাগুলোকে ইচ্ছে হল নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে ধরে রাখতে। তেরো বিঘের ডাক সেই কান্নার মতো ছড়িয়ে থাকছে, তার ওপর দিয়ে নিরন্তর উড়ে চলেছে ডাঙা না-পাওয়া পাখীদের মতো যতীনের ঐ কথাগুলো, লাল-কালো-সাদা-হলুদ ঝাঁক ঝাঁক স্বপ্নের মতো।

রসিক একসময় সেই লাল রুমাল-খানা আর ছাপানো কাগজখানা পবিত্র সম্পদের মতো কোমরের গেঁজেয় লুকিয়ে রাখতে রাখতে খুব আস্তে আস্তে বলল—আজ মিটিন আচে কিষক সমিতির। যাবি কিন্তুন।

যতীন মিটিংয়ে গেল। তার আগে রসিকের সঙ্গে গেল কৃষক সমিতির অফিসে। সভ্য হল এবং স্বেচ্ছাসেবকের দলে নাম লেখাল। লাল রুমালখানা তার গলায় রসিকই বেঁধে দিল বুকের দিকে ঝুলিয়ে।

ইস্কুলের মাঠে খুব বড় মিটিং হল। অধিকাংশই চাষী, খেতমজুরের সংখ্যাই বেশি। ভদ্রলোকও কিছু কিছু যোগ দিলেন, খুব যে আগ্রহভরে তা নয়, খানিকটা করুণা, খানিকটা তাচ্ছিল্য আর কিছুটা সৌহার্দ দেখাতে।

ঠিক হল যাদের জমি নেই তারাই আগে জমি পাবে। তবে আসল মালিক-দের অর্থাৎ যাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাদের জমি ফেরৎ দেওয়ার পর যা বাড়তি থাকবে তা-ই ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা হবে। গোঁসাইবাবুদের তিন সরিকের জন্যে পঁচাত্তর বিঘে করে মোট দুশো পঁচিশ বিঘে রেখে বাকী জমিটাই পড়বে বিলি করবার ভাগে। পরদিন কালেক্টরির লোক আসবে, তাঁরাই পুরনো রেকর্ড দেখে বিলি করবেন। সাহায্য করবে কৃষক সমিতির নেতারা। বাবুদের লোকও থাকবে। বিলি হয়ে যাওয়ার পর দখল নেওয়া হবে, দেরি করা হবে না একদিনও।

মিটিং শেষ হলে রসিক আর যতীন একটু রাত করেই গোঁসাইবাবুদের বাড়িতে গেল।

বাড়িতে কেমন থমথমে ভাব। ওদের কেউ গ্রাহ্য করল না। কোন কাজ কর-তেও বলল না, এমন কি তামাক সাজতেও না। ওরা নিজেরাই গোয়ালে গেল বারান্দা থেকে হারিকেন নিয়ে। গরুগুলোকে ঠিকমত বাঁধল, জাবনা কেটে দিল। আর কিষেণদের সঙ্গে কথা বলতে গেল খাওড়া ঘরে। কিন্তু, সেখানে কেউ নেই দেখে অবাক হয়ে গেল। মাইন্দারের সন্ধানে ভেতরে গেল। তারা খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছে। বাড়ির কাজ করে কেসব মেয়েছেলে তাদের খোঁজ করল। কমলার মা, মাতু, সরোজিনী, বিমলা সবাই ওদের দেখে সরে গেল। কি করবে ভেবে না পেয়ে ওরা তখন কাছারিবাড়িতে ঢুকল। গোমস্তাবাবু নেই। ছোট গোমস্তা আর হেড মুহুরী চুপ করে বসে আছে। জনাদশেক বরকান্দাজের মধ্যে মাত্র দুজন বসে আছে বারান্দায়, রঘু আর চরণ। তাঁরাও ওদের সঙ্গে কথা বললেন না।

ওরা দুজন একবার ঘর একবার বারান্দা করতে করতে এক সময় বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তার-পর কোণে গিয়ে বসে থাকল। রাত্রি বাড়লে রসিক সাহস করে ভেতরে ঢুকল এবং সবিনয়ে বলল—ছোট গোমেস্তা-বাবু অ্যাটা গিয়ে লিবেদন ছেল—এই গিয়ে—

ছোট গোমস্তা আড়মোড়া ভাঙলেন। হারিকেনের আলোয় তাঁর দেহের সেই নড়ন্ত ছায়া ভয়ঙ্কর দৈত্যের মতো নড়া-চড়া করল দেয়ালের গায়ে। মুখ দিয়ে তাঁর প্রথম কথা বেরুল—শোরের বাচ্চারা—

যতীন ঘরে ঢুকল। তার মুখ পাষাণের মতো কঠিন। গলার লাল রুমালে আঙুল ঢুকিয়ে বলল—কি বুললেন, কিসির বাচ্চারা? আর অ্যাক-বার বুলুন। বুলুন, কিসির বাচ্চারা—

রসিক যতীনকে ধরল। কখন আবার লাল রুমাল গলায় বেঁধেচে অবাক হয়ে দেখল। বলল—রাগিস নে অতো,

ছোট গোমস্তাবাবুরে বুলতে দে। আজ আর কাল, এই দুডো দিন সুমায় দে।

বড় গোমস্তা, ছোট মুহুরী আমলা-বাবুরা, বরকন্দাজরা বাইরের অন্ধকারে যেন লুকিয়ে ছিল। একে একে ঘরে ঢুকল।

বড় গোমস্তা সেরেস্তায় বসলেন। দেহে ফুটিয়ে তুললেন সেনাপতির ভঙ্গি। বললেন—শোরের বাচ্চা। কুত্তির বাচ্চা। আর শুনবি?

যতীন এবং রসিক একসঙ্গে থ হয়ে গেল। ঘরের আর সবাইও।

বরকন্দাজদের একজন এর মধ্যে ভেতর থেকে একটা হ্যাজাক জেবলে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছে। সেই ঝকঝকে আলোয় ঘরের অতগুলো মুখকে একসঙ্গে শবের মুখ বলে মনে হল।

বড় গোমস্তা গম্ভীর গলায় বললেন—কুকুরকে মাথায় তোলা হয়েছিল, আবার আজ তাকে নাবাতে হবে পায়ের গোড়ায়। জল থেকে তোদের ড্যাঙায় তুলেছিলেন বাবুরা, মানুষ করেছিলেন। খেতে পেতিস নে, বাবুদের দয়ায় খেতে পাচ্ছিস। এততেও যখন সুখ নেই তখন জলের জীব অ্যাখন জলেই যাবি, সেখানেই তোদের স্বর্গোসুখ, মাটির ওপরে কোনো বন্ধন তলায় নয়।

বড় গোমস্তার এত চমৎকার বক্তৃতার কেউ প্রতিবাদ করল না। শুধু দু'টি লোক একটা ভীষণ অবস্থার মধ্যে জেগে উঠছিল। বিস্ময় কেটে স্বাভাবিক অবস্থা এল। স্বাভাবিক অবস্থায় কথাগুলো শুনতে শুনতে আবার এক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে তারা ফিরে যেতে থাকল। সেইভাবে যতীন জেগে উঠল। এগিয়ে গেল বড় গোমস্তার সামনে। সেই ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে কি বলতে কি বলা হয়ে গেলর মতো ভাবটা আর নেই। স্পষ্ট সহজ কথা—গোমস্তাবাবু, আমরা এইলাম গিয়ে জমির কথাডা বাবুদের বুলতে। বাবুদের কাউরে না পেয়ে অ্যাখন আপনারেই বুলচি বাবু। আমার জমি ইবার আমারে ফেরত দিতি হবে—আমার ড্যাঙাতলার সতেরো বিঘে। আমরা কিষক সমিতি করিচি। আমি হলাম লাল ভলেণ্টিয়ার। সমিতি বুলে দিয়েচে জমি আমার নামেই নিকাপড়া আচে। যার যার নামে যে-জমি নিকাপড়া আচে সমিতি লিস্টি দেখে দেখে বুলে দিয়েচে তান্দের। আমাদেরও বুলেচে বাবুদের ঠেঙে কাগজপত্তোর চেয়ে নিতে। রোববার সকালে সব্বাই মিলে জমির দখল নিব একথাও বুলতে। কুনু যাতে হ্যাঙ্গাম না হয় আগে ঠেঙে তাই এই সব কথা বুলতে আর কাগজপত্তোর সব নিয়ে নিতে বুলে দিয়েচে। তাই বুলেচি, আমাদের কাগজপত্তোর আমাদের দিয়ে দ্যান। ড্যাঙাতলা, রবিবার আমি দখল লেব। বাবুরা যেন বাদী না হয়। যতীন একটা দমে এতগুলো কথা গুছিয়ে বলল এবং যেমন হঠাৎ সুরু করেছিল তেমনি হঠাৎই থেমে গেল।

বড় গোমস্তা ছোট গোমস্তা থেকে সুরু করে ঘরের অতগুলো প্রাণীর সবাই কথা বলতে ভুলে গেল। ঘরের আলো ক্রমে ক্রমে তীব্র অসহ্য হয়ে উঠল। ঘাম ফুটে উঠল গোমস্তার মুখে। একসময় তিনি ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—রসিকলাল, তোমার কথাও কি ওই?

রসিক এ বাড়িতে রস্‌কে। এই মুহূর্তে তার এতবড় সম্মান সবার বুকে আছড়ে পড়ল একটা মর্মান্তিক আঘাতের মতো। যারা মন্তব্য করার জন্য মুখিয়ে উঠছিল তারাও থেমে গেল।

রসিক এগিয়ে এল না। আর একবার নমস্কারও করল না। কথা বলল স্বাভাবিক স্বরে, যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়েই। তার গলায় তার সেই স্বাভাবিক স্বর কখনো নামানো কখনো সুরেলা—এজ্ঞে হ্যাঁ। যে-কিষক সমিতির দয়ায় রস্‌কে আজ রসিকলাল তার কথা তো আর ঠেলতে পারি নে মশায়। আমার তেরো বিঘে তো ডুব্যে রেখেচেন জলের তলায়, মাছেদের দিয়েচেন। ইবার সিটা ছেঁচে নে ধান বুনব ভাবচি। কাগজপত্তোরগুলো আজ দিয়ে দ্যান গে। উটারেও যতীনের মতোন ড্যাঙাল বানাবো। আপনারা বাবু খুশি মনে গে অনুমোতি করুন।

যতীনের কথায় যা হয় নি রসিকের কথায় তাই হল। তার কথাগুলো সুচের মতো বিঁধে বিঁধে নোকর মহলের বুকে ঢুকল। মর্মান্তিক যন্ত্রণায় ওরা কাঁদতে চাইল। হ্যাজাকের আলোয় ওদের ছায়ামুখগুলো কান্নার ভঙ্গি এবং ঘামের জলের ধারায় রাক্ষুসে দেখাল।

বড় গোমস্তা উঠে দাঁড়ালেন নির্বাকে। হাত দিয়ে 'তিষ্ঠ' ভঙ্গি করলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সবাই তেমনি নির্বাকে বসে রইল। বড় গোমস্তার চটির শব্দ ধারাবাহিক বন্দুকের শব্দে বারবাড়ি থেকে ভেতরবাড়িতে প্রবেশ করতে থাকল। বহুক্ষণ পরে সবাই শ্বাস ফেলল একসঙ্গে শব্দ করে। মনে হল সারা ঘরে অনেক মানুষ একসঙ্গে হায় হায় করল, সকাতরে।

বেশ খানিকক্ষণ পরে কাছারীঘরে সেই নির্বাক জনতার সামনে যিনি দেখা দিলেন তিনি বড় গোমস্তা নন, বড় কর্তা ধনঞ্জয় গোঁসাই। যে পট্টবস্ত্র পরে সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করেছিলেন সেই বস্ত্রেই ঠিক তেমনি খালি গায়ে পবিত্র মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। তাঁর বাম কাঁধ থেকে ডান হাতের তলা পর্যন্ত শুভ্র উপবীতের প্রত্যেকটি সূত্র উজ্জ্বল আলোতে আলাদা আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল। তাঁকে দেখেও ওরা কথা বলল না। শুধু ছায়াগুলো দেখে যতীন এবং রসিক বুঝতে পারল নোকরদেহে একে একে প্রাণপক্ষীরা ফিরে আসছে এতক্ষণে।

ধনঞ্জয় গোঁসাইয়ের গৌরকান্তি দেহ উজ্জ্বল আলোতে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। দেবতার মতো প্রসন্ন মুখে কথা ফুটল—রসিক কে? যতীন কে?

সব ক'টি চোখ এক সঙ্গে রসিক এবং যতীনের দেহে বিদ্ধ হল হিংস্র তীরের মতো। সব ক'টি মুখে উল্লাসের আভা চকচকিয়ে উঠল একই সঙ্গে। যতীন এবং রসিক হঠাৎ কেমন আলাদা মানুষ হয়ে গেল। সেই একটু আগেকার কৃষক সমিতির উত্তাপ দুটি স্বেচ্ছাসেবকের দেহকে খাড়া রাখতে পারল না। দু'জনে তারা সরে এসে পাশাপাশি উপুড় হয়ে পড়ল গোঁসাইবাবুর পায়ের গোড়ায়। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল একজোড়া বলির পাঁঠা হয়ে।

—তোমরা জমি ফেরত চেয়েচো?

ওরা দু'জন আবার নত হয়ে জোড় হাতে প্রণাম জানাল। মুখ দিয়ে কথা না বলে বেশ কিছুক্ষণ নিচু হয়ে রইল সম্মতি জানিয়ে।

প্রতিটি নোকরের মুখ ঝলমল করছে উল্লসিত কৌতূহলে। কেউ আর এখন ফিস্‌-ফিস্‌ করছে না, শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ।

—তোমরা জমি ফেরত পাবে। সুপ্রসন্ন গোঁসাই দেবতার মুখ থেকে বর নামল ধারায় ধারায়—জমি সবই রেকর্ড করিয়ে রেখেচি তোমাদের নামেই। কাগজপত্রও ফেরত পাবে। তোমাদের খাবার তৈরি, ভেতরে যাও। খেয়েদেয়ে যাবার সময় কাগজপত্রগুলো নিয়ে যেয়ো

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

HAVA
৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।
HAVA SALES (39) SHAKTI NAGAR, DELHI-7

বড় গোমস্তাবাবুর কাছ থেকে। চরণ, ওদের তুমি বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আন। যাও তোমরা।

ঘরের মধ্যে সবাই একসঙ্গে মরে গেল। কারণ এমন কখনো ঘটে না। দু'টো নগণ্য মানুষের জন্যে এমন ঘটে নি, সশরীরে দেবতা এসে বর দেন নি। তাই, দেবতার এই অভাবিত বর দু'জনকে নয়, সব ক'জনাকেই পাহাড়ী ঢলে দেওয়ালের পাথরে আছড়ে ফেলেছে। ব্যথা যন্ত্রণা টের পাবার আগেই মৃত্যু হয়েছে তাদের। অনেকক্ষণ পরে সবাই যখন জেগে উঠল তখন দেবতা নেই। ফাঁকা ঘরে উজ্জ্বল আলো এবং চন্দন আর এসেন্সের গন্ধ। অনেক দূরে মিলিয়ে যাওয়া খড়মের শব্দে দেবতার বিদায় সংকেত।

যতীন এবং রসিককে নিয়ে রান্না-ঘরের সামনেকার উঠোনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ফিরে গেল চরণ। সেখানে তারা দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কেউ ডাকল না, খেতে বলল না, অপেক্ষা করতে কিম্বা ঘুরে আসতেও বলল না। দাঁড়িয়ে থেকে ওরা সদর বাড়ির দিকে চলে গেল।

সদর বাড়ির দিকে যেতে যেতে ওরা দু'টো মহল ঘুরে ঘুরে পার হল। কেউ কোথাও নেই। মন্ত্রবলে কোথায় যেন অন্তর্ধান করেছে। ওরা সদর দেউড়িতে গেল। ভেতর থেকে তালা বন্ধ। এমন কখনো হয় না, এত অল্প রাত্রে দেউড়িতে খিল পড়লেও তালা পড়ে না কখনো। ওরা এসে সদর উঠোনে দাঁড়াল।

রসিক বলল—ভাল ঠেকচে নি।

—ক্যানে, কিসের? যতীনের গলায় অস্বস্তি।

—কিচু অ্যাট্টা হচ্চে বোদকরি। পথ পাচ্চিনে ক্যানে।

—তালে চল্ আমরা কাচারিঘরে যাই। বড় গোমস্তা কাগজপত্তোর দেবে, কত্তা গোঁসাই বুলে দিয়েচে, সেগুনো নিয়েই যাই।

রসিক কোনো কথা বলল না। সেখান থেকে নড়ল না। যতীন কিছু বলতে গেল। রসিক ফিস্-ফিস্ করে বলল—চুপ মেরে থাক। কিচু অ্যাট্টা হচ্চে কুতাও।

পরদিন সকালে কৃষক সমিতির অফিসের বারান্দায় রসিকের এবং ডাঙ্গাতলার জমিতে যতীনের আধমরা দেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। সারা দেহে নির্দয় প্রহারের চিহ্ন। মুখের মধ্যে কাগজ পোরা, ওপরটায় ওদের গলায় সেই লাল রুমাল বাঁধা। দু'কস বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, সেই সঙ্গে লাল গ্যাজলা। মাঝে মাঝে দম ছাড়ছে শেষ নিশ্বাসের মতো হাপসি কেটে।

ঝড়ের সংকেতে সমস্ত এলাকায় এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। বেলা বাড়তেই কৃষক সমিতির লোকেরা ওদের দেহ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেল। সেখানকার ডাক্তারের মুখ দেখে সবাই বুঝল নির্ধারিত ভবিতব্য কোন পথে নেমে আসবে।

কালেক্টরির লোক এসে ফিরে গেল। যতীন ও রসিকের নামে জমি বিলি হল না।

দুপুরের পর ওদের শব নিয়ে মিছিল বেরুল। চারখানা লটের চাষীরা, ছোট দোকানদাররা আর ইস্কুলের ছেলেরা দীর্ঘতম মিছিলে সারা অঞ্চল ঘুরে বেড়াল। সন্ধ্যায় সেই মিছিল থামল গোঁসাইবাড়ির সামনে।

গোঁসাইবাড়ি থেকে কেউ বেরিয়ে এল না আজকের জনতার মোকাবিলা করতে। সদর গেটে প্রকাণ্ড তালা। পরিত্যক্ত দুর্গপ্রাসাদের মতো গোঁসাই-বাড়ি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের প্রহরী হয়ে।

জনতা আবার মিছিল করে ইস্কুলের মাঠে গেল। সেখানে মিটিং হল অন্ধকারে। দু'টো প্রস্তাব নেওয়া হল। একটি শহীদবেদীর, আর একটি পর-দিন বেনামী জমি দখলের।

ডাঙ্গাতলার জমির নিচে জীয়ানির খাল ধারে অনেক রাত্রে দু'টো চিতা জ্বলে উঠল। জনতার সিংহনাদের মধ্যে সেই রাত্রে দুই শহীদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে গেল। ওদের চিতার ছাই একটা মাটির গামলায় করে সমিতির অফিসে তুলে রাখা হল।

পরদিন সকাল থেকেই লোক জমল কাতার দিয়ে। তাদের সামনেই শহীদ-বেদী তৈরি হল জয়ধ্বনির মধ্যে। বেদীর ওপর রাখা হল ওদের চিতা-ভস্মের পাত্রটা। ধানসীর ডাঙ্গাতলার নতুন নাম হল শহীদতলা।

ওদের চিতাভস্ম ছড়িয়ে দেওয়া হল, বিলিয়ে দেওয়া হল জনতার মধ্যে। সেই ছাই গায়ে মাখতে মাখতে নতুন ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে সেই জনতা প্রস্তুত হতে থাকল জমি দখলের উন্মাদনায়।

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রয়েজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন)

লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পঁয়ত্রিশ

ডুয়ার্স। ডুয়ার্স টী।

চা দিয়েই আজ আধুনিককালের আওতায় পরিচিত হয়ে গেছে সে। ডুয়ার্স টী-র কল্যাণে ডুয়ার্সকে চিনে গিয়েছে লোকে। বর্তমান যুগে ডুয়ার্সের চা-র আছে একটি আন্তর্জাতিক বাজার। দেশে-বিদেশে। অবশ্য দার্জিলিং-এর কৌলীন্য আলাদা। ইংরাজের দৌলতে একদিকে পর্বতের রাণীর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। অভিজাতদের গ্রীষ্মাবাস। অন্য দিকে, তার চা-র আছে স্বাদ ও গন্ধের এক আলাদা অনির্বচনীয়তা।

ডুয়ার্সেরও আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তার রঙ। চা-এর এমন সুন্দর রঙ আর দার্জিলিং-চায়ে নেই। ব্রাউন টী যদি সত্যি সত্যি বলতে হয় তো দেখে এসো ডুয়ার্স টী-কে। সাধারণ মানুষ বেশি পছন্দ করে তাকে। অবশ্য আসাম-চাও চলে।

ভালো-মন্দ দুয়েরই আছে। ডুয়ার্সেরও রপ্তানীযোগ্য চা-র কোন-কোন বাজার আছে। সে শুধু বিদেশেই যাবে। বিনিময়ে নিয়ে আসে অনেক মূল্যবান অর্থ। সে চা দার্জিলিং-এর ভালো চা-র চাইতে গুণে খাটো নয়। সে স্বাদ মনে রাখবার।

এক ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনারা হলেন গিয়ে চা-সম্রাট। তা আপনাদের এখানে এলেও, ভালো চা খেতে পাই নে কেন?

তিনি হাসছিলেন। এক্সিকিউটিভ চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছিলেন। এই পা দোলানো এক অদ্ভুত নেশা। সম্রাট হলে রাজতক্তে বসে পা দোলাতে হয় কি না জানি না। আমরা কিন্তু সাধারণ মানুষেরাও বাড়ির জীর্ণ তক্তপোষে বা আটপৌরে কেদারায় বসে পা দোলাবার মহড়া নিয়ে থাকি। ওই সময়টা একটু পদস্থ বলে মনে হয় কি না নিজেকে, সে-বিষয় মনস্তাত্ত্বিকদের বিচার্য।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বললেন, আপনি কিছু বেশি বলেছেন অবশ্য। চা-সম্রাট না আমরা। চা-বেনিয়া। আমাদের কাজ বাজারের জন্য চা তৈরি করা। তৈরি যারা করে—আমি হেসে বললাম, তারা সাধারণ শ্রেণীর চাকর। আপনারা চা-কর।

আমরা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তিনি গোঁপের প্রান্তে বিনয়ের গৌরব বিকীর্ণ করলেন মৃদু হাসিতে।

কথাটার প্রতিবাদ করি নি। কারণ চা-বাগানওয়ালাদের বেশির ভাগই কমবেশি এই অর্থে একটু গৌরব বিকিরণ করে থাকেন। মানুষ বটে তাঁরা। নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ। কোন কোন অর্থে সাধারণ মানুষের ধর্মেও পতিত হয়ে থাকেন। বিনয়ের ব্যভিচার অত্যন্ত বেশি। একে বিনীত অহংকার বলা যেতে পারে। শিল্পপতিরা, যাঁরা অনেকেই সাধারণ মানুষ, বিদ্যা-বুদ্ধি-যোগ্যতা এইসব সাধারণ মানুষের মত বা না-থাকলেও, তাদের কিছুতেই সাধারণের মাপকাঠিতে ফেলা চলে না। কারণ তাঁরা অর্থ ও বিত্তের চূড়ায় বসে আছেন। বাড়ি গাড়ি ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের ঐশ্বর্যচূড়ায়। আর কে না জানে এ-যুগ প্রধানত বৈশ্যদেরই যুগ। এঁদের অর্থের ঝনৎকারে সবারই মন খুশি। একালে "রাজ"-এর কল্যাণে রাজা অবশ্য দুর্লভ হতে চলেছেন, উজীর-আমীর এবং সচিবদেরই পাদ-প্রদীপের আলোয় সোচ্চার দেখা যায়, তারাও প্রধানত শ্রেষ্ঠীদের প্রসাদ-এর এক আধকণা প্রত্যাশা করে থাকেন।

চা-মালিকেরাও তাই। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রমের কথা আলাদা। অবশ্য আমার বক্তব্য চা-বাগানের বর্তমান পুরুষদের নিয়ে। চা-শিল্পের প্রতিষ্ঠাতাদের ইতিহাস অন্য। তাঁরা অনেকেই ছিলেন জ্ঞানী ও গুণী। যতটা পরিমাণে অর্থনীতি, তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে তাঁদের নিয়ন্ত্রিত করেছিল দেশপ্রেমিকতা।

কিন্তু সে-কথা অন্যত্র বলা যাবে।

আমি বর্তমানকে নিয়ে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, হালুইকর তার মিষ্টির দোকানে মিষ্টি সাজিয়ে রাখে, নিজে খাবার দিকে খুব ঝোঁক দেখা যায় কি?

উত্তরটা স্পষ্ট হয়ে আসছিল।

বললাম, আপনারা হালুইকর। বেশ বোঝা গেল। কিন্তু নিজে না খেলে অন্যের ভালো-মন্দ কোয়ালিটি যাচাই করেন কি করে? শুধু চোখ দিয়ে দেখে বা মন দিয়ে জেনে কি তা যাচাই করা যায়?

সে কাজটার জন্যে লোক আছে। তাদের বলে টেস্টার। তারা হাতে-কলমে এ-ব্যাপারে জ্ঞান সঞ্চয় করে আসে।

একটু থেমে বললেন, আর জানেন কী তাদের জন্যে ভালো মাইনের ব্যবস্থা আছে?

মনে মনে ভাবছিলাম এই রকম একটা চাকরি আমাদের স্বদেশদার জন্যে হলে মন্দ ছিল না। স্বদেশদা যাকে বলে সত্যিকারের চা-খোর। আড্ডায়-মজলিসে সকলের জন্যে সবকিছু আসবে, দোক্তা-জর্দা-সিগারেট। নানাপ্রকার মশলাদার খাবার। এমন কি পান পর্যন্ত। স্বদেশদার কিছুতেই রুচি নেই। পানের কথায় শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলবেন, আমার পান-দোষ নেই। কয়েক কাপ চা-র ব্যবস্থা করতে হবে ভাই।

হবে, হবে স্বদেশদা। কেউ হয়ত বললাম।

অপ্রসন্ন মনে স্বদেশদা বলবেন, তাহলে হবে বলছ। হয় নি এখনো? চা তিনি কাপের পর কাপ খেতে পারেন। এ ব্যাপারে তিনি উদার অকৃপণ। নিজ-বৃত্তির কথা জিজ্ঞাসা করাতে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত বলেছিলেন, নিমন্ত্রণ রক্ষা করাই তার পেশা। তাহলে স্বদেশদাও "কি করে থাকেন" এই প্রশ্নের উত্তরে অকৃপণকণ্ঠে বলতে পারেন, আজ্ঞে চা পান করে থাকি। চা-এর ভালো-মন্দ দোষ-গুণ তিনি বাছেন না। সব রকম চা-ই তাঁর পক্ষে অমৃত। এ-হেন লোককে অবশ্য টেস্টাররূপে মনোনীত করা বিপজ্জনক। কারণ এ ব্যাপারে সমদর্শিতা আর যাই হোক চা-বাজারের পক্ষে নিরাপদ নয়।

বরঞ্চ স্বদেশদা কথিত কোনো এক বাগান-কর্মচারীর বৌ, স্বদেশদা যাকে বৌদি বলেন এবং এ ব্যাপারে যার অসাধারণ খ্যাতি, তার কথাও এক পলকে আমার মনে আসে। জন্ম তাঁর আসামে, কোন এক চা-বাগানে। বাবা ও কাকাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কেটেছিল চা-বাগানে। পরে বিবাহ—তাও চা-বাগানে। সেই বৌদির না কি চা-বসায়নে অদ্ভুত দক্ষতা।

এমন চা আর কাউকে করতে দেখলাম না, সত্যিকার দীর্ঘশ্বাস মোচনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশদা বলতেন। বলতেন, চা সিলেকশনের এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ওঁর। ভালো চা ছাড়া খেতেনই না। কোন্ চা কত পরিমাণের সঙ্গে কোন জাতীর চা মিশিয়ে সত্যিকারের ভালো চা হয়—টি গার্ডেনের পরিভাষায় যাকে বলে ব্লেণ্ডিং—তা ছিল তাঁর অদ্ভুত আয়ত্তে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বলছিলেন, তবে হ্যাঁ, ভালো চা যে আমরা একেবারে পাইনে তা নয়।

মনে মনে বলছিলাম, এইবার পথে আসুন তাহলে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বলছিলেন, তবে কথা হচ্ছে কি সত্যিকার ভালো চা-এর সবটুকুই যায় বিদেশে। তার জন্যে খরবদারীও কম নয়।

অর্থপ্রাপ্তির জন্য খিদমৎ বস্তুটা চলে আসছে চিরকাল। সব কিছুতে। বিনিময়-প্রাপ্তির জন্যে মনোরঞ্জন চাই। মনোরঞ্জন শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ব্যবসায়ীদের ধ্রুব আদর্শ তাই। সম্ভবত তাই বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে মনোরঞ্জন নামের মানুষদের কিছু বেশি দেখা যায়। গ্রাহক সবখানেই খানিকটা নাক উঁচু হয়ে থাকেন। কারণ তিনি অন্যের সওদা কিনে তাঁকে বাধিত করতে আসেন। এবং বিক্রেতার আসল লক্ষ্য ব্যক্তিটির পকেটের দিকে। তার পকেটের বোঝা হাল্কা করাই তাঁর কাজ, তাঁর রীতি। এই দোহন-পর্বটিও হওয়া চাই একটি শ্রেষ্ঠ আর্ট। হাসিমুখে হাসি দিয়ে অজেয় দুর্লভ জয়।

দেশে দেশে আছে এমনিতর বাজার। ব্যবসা। আমার এটি চাই। তোমার ওটি দাও। এজন্যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা। সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাকে বলে। স্বদেশীয় বাজারে গেলেই যেমন দোকানীদের ভাড়াটে কর্মচারীরা একযোগে মধুকণ্ঠে গুঞ্জন করে ওঠে তড়িদ্গতিতে, আসুন স্যার। আসুন স্যার। দেখে যান স্যার। কতকটা যেন তাই। অনিচ্ছুক অন্যমনস্কেরা অনেক সময় দেখতে পায় না। তাদের কর্ণ-আকর্ষণের জন্যই বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপন তাই আর্ট। সুস্থ শিল্পকর্ম একালে।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কল্যাণে এক পেয়ালা দুর্লভ ডুয়ার্স টী ভাগ্যে জুটেছিল সেদিন।

বলা বাহুল্য সে চা জাতে ও স্বাদে আলাদা।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগকে বলা চলতে পারে চা-যুগ। চা এক ভুবন-ভোলানো পানীয়। রবীন্দ্রনাথ দেশবন্দনা-সূত্রে "অয়ি ভুবনমনমোহিনী" বলেছেন। চা-কেও বলা চলে ভুবনমনমোহিনী। এই তরল স্বর্ণাভ পানীয়টি প্রকৃত চা-পিয়াসীদের মনে মনে যে আনন্দ উৎফুল্লতা জাগিয়ে তোলে তার তুলনা কমই মেলে। প্রাচীনেরা এর স্বাদ জানতেন না। চা ছিল তাঁদের কাছে অনাবিষ্কৃত। তাই ঋষিরা গেয়েছেন সোমরসের প্রশস্তি। আনন্দ থেকেই যে বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি, তার মহিমা একমাত্র উপলব্ধি করা যেতে পারে নানা শিল্প-নক্সা-উৎকীর্ণ চায়ের পানপাত্রে। দুঃখের বিষয় মৃত মহেঞ্জোদারোর মৃত্তিকাতল থেকে প্রাচীন সভ্যতার মূল্যবান বস্তু যতই আবিষ্কৃত হোক না কেন, বার হয় নি কোনো ডাণ্ডি-ভাঙা চা-এর পেয়ালা।

চা অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের। আধুনিকতার একটি শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য চা। সমুদ্র-মন্থনে অমৃত উঠেছিল, তা নিয়ে দেবতা-দানবে যোঝাযুঝির কথা পাওয়া যায় প্রাচীন শাস্ত্রে-পুরাণে। কিন্তু সেই বস্তুটি চা কি না তার কোনো প্রমাণ লেখাজোখা নেই।

চা কিন্তু অমৃত নয়, সরল পানীয়। এবং নিতান্ত সরল পানীয়টিই বিশ্ব-বিজয়ীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

চা এখন ঘরে-পরে। দেশে-বিদেশে। চা এখন আত্মীয়-অনাত্মীয়। অর্থে-অনর্থে চা। ক্ষয়ে-ক্ষতিতে মনস্তাপে স্বপ্নভঙ্গে চা। চা-ছাড়া কিছু নেই।

কফি যদি হয় মুষ্টিমেয়ের বিলাস—চা তবে অধিকাংশের জীবনমন্ত্র। জীবন-বেদ। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ চা-এর অষ্টোত্তর শতনাম রচনা করেছেন কি-না সন্দেহ। ভোরে ঘুম ভাঙবার পর যাকে দিনের প্রথম শুভদৃষ্টি বিতরণ করি, সে চা-এর পেয়ালা। সাদা-সুন্দর নক্সাদার চীনামাটির পেয়ালায় এক-আধটু শব্দ উঠলে তার চাইতে রোমান্টিক কিছু নেই। এই চা আবার কারুর কাছে বেড-টী। অর্থাৎ কি না শয্যা-চা।

তারপর সারাদিন যখন খুশি চা। সকালে চা, আটটায় চা। দশটায় চা। মধ্যাহ্নে চা। বৈকালিক চা-পর্ব। তার সঙ্গে অন্য কিছু থাকে তো থাকুক। বাঙালীর ঘরে-ঘরে প্রিয় চা-বিস্কুট। বেকারের জন্য শুধু চা। এবং সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটি। চাকুরি-সংবাদ। চা-সিঙাড়া, চা-কচুরী, চা-নিমকি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। কফির সঙ্গে যেমন স্যাণ্ডুইচ্ কথাটার চলন। ওটা রাজকীয়। চা সর্ব-ঋতুর তৃষ্ণাহর পানীয়। বালক-যুবক বৃদ্ধ-প্রৌঢ় নারী বা পুরুষ সকলেরই নির্দোষ পানীয়। কেরানী-ডাক্তার, উকিল-মোক্তার, শিক্ষক-মজুর বা কারখানার মজদুর সকলেরই পানীয় চা। কারুর নির্দোষ প্রেরণা। কারুর বা সারাদিনের ক্ষুধা মেটাবার সম্বল। চা সাধারণ মানুষের। রুজির উপাদানও বটে।

ছাপড়া জেলার মঙ্গল মাহাতোকে দেখ বসে গেছে পথের ধারে। পেতলের কলসীতে চা জ্বাল হচ্ছে। একদিকে কলসীতে একটা বাড়তি নলমত লাগানো আছে। তাই দিয়ে খদ্দেরদের কাঁচের গ্লাসে চা ঢেলে দিচ্ছে। হাটের দিনেই বেশি দেখেছি ঘুরে ঘুরে। এই চিত্র ডুয়ার্সেও আছে। যেমন ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র। চা-বাগানের হাটগুলিতেই বেশ এর কদর

সদ্য প্রকাশিত হইল !

বাঙলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরসিক

শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

(১) মনের মত বৌ
(২) মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি
(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো
(৪) প্রেমের বিচিত্র গতি
(৫) রক্তের টান
(৬) যখন তারা কথা বলবে

পৃষ্ঠা ২৪০

মূল্য মাত্র চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

দেখতে পাওয়া যায়। যারা খেতে আসে তারা নিজেরাও অনেক সময় কাচের বা এলুমিনিয়ামের গ্লাস নিয়ে এসে বসে যায়। রঙ যাই থাক, স্বাদ-গন্ধ যাই বিকিরণ করুক না কেন, চা খেতে খেতে গল্প জুড়ে দেয়।

লঙকাপাড়ার হাটে এক রবিবারে বুধু ভগতকে শুধিয়েছিলাম, বিক্রিবাটা কেমন? বেশ ভালো চলছে তো?

সবই তার স্বদেশীয় ক্রেতা। তাদের চারধারে নিয়ে মাঝখানে বসে বিক্রি করছিল চা। ভোলা পাছমুন, গিরধর তেওয়ারী, কালু সিং-এর দল। ময়লা কাপড়। ছিটের ময়লা ফতুয়া। কারুর বা কাঁধে গামছা ঝোলানো। ফু দিয়ে ঠান্ডা করে তারিয়ে তারিয়ে চা খাচ্ছিল কেউ কেউ। সেই সঙ্গে চালভাজা। কারুর বা ভুট্টা দানা।

বুধু ভগত আমাকে চা-বাগানের লোক বলে ঠাউরেছিল। বিনয়ে বিগলিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম দিয়েছিল। বলেছিল, আপ্‌কা কৃপা সে জি। কৃপার অবশ্যই অভাব ছিল না। বান্দাপানির হাটে, লঙ্কাপাড়ার হাটে, শিলতোর্সার হাটে, ফালাকাটার হাটে ঘুরে ঘুরে এই চা-ছত্র দেখেছি।

পূব-বাংলায় অবশ্য চা-এর অতটা আধিপত্য ছোটবেলায় দেখতে পাই নি। চা-এর যে বাগান আছে, এত কাছেই এবং সেখানে বাগান থেকেই যে এদের সৃষ্টি তা কেউ তখন বুঝিয়ে দেয় নি। মনে হত চা এক অসাধারণ জিনিস। তখন চা-এর প্রচার হচ্ছে ধীরে ধীরে। হাটে-হাটে ভ্রাম্যমাণ চা-গাড়ি। আসুন, চা খান। স্টোভে জল গরম হচ্ছে। তারে ঝুলছে নানারঙা চা-এর বিজ্ঞাপ্তি। বিনামূল্যে চা খান একপেয়ালা। বেশ ভিড় হত। অবশ্য প্রথম দিকে নয়। প্রথমে লোক ভয়ে-ভয়ে তাকাতো। গ্রামের লোকেরা। চা? এ আবার কি জিনিস রে বাবা? আবার বিনামূল্যে খেয়ে যেতে বলছে? বুক দুরু-দুরু করত দুরন্ত-প্রাণ ছেলেদেরও। ইস্কুল থেকে ফিরতে হাটের দিনে এসে দাঁড়িয়ে গেছি। তাক সার্ট প্যান্ট পরনে। তখন বিনা পয়সায় চা-তে লোক খুব ঝুঁকেছে। মফস্বলের চাষীদের দেখেছি চায়ের পাবলিসিটি স্টলে দাঁড়িয়ে গরম চা পেয়ালায় ঢেলে শব্দ করে খেতে। কেউ-কেউ বা দাড়ির চিকন আগা ভিজিয়েও চুমুক দিয়েছে আবেগে। মনে মনে ভেবেছি তাহলে কি চা থেকেই চাচা কথার উৎপত্তি? নিতান্তই ছোটবেলা। অসীম বিস্ময় ছিল দু'চোখে। লুকিয়ে-চুরিয়ে খেয়েওছি দু'-এক কাপ। এমন তৃপ্তিকর বস্তুটি বিনা পয়সায় দিচ্ছে কেন নিশ্চয় নিজেকে প্রশ্ন করে জবাব পাই নি। আবার বিনামূল্যে একটি চা-প্যাকেটও দিয়ে দিয়েছে। এখন বুঝি সে মানুষকে আকর্ষণ করবার সোনালী পেয়ালার টোপ ছাড়া কিছু নয়।

মণি সা বলেছিল একদিন, ক্লাশ এইটের ছাত্র, আমার সহপাঠী। মণি সা বলেছিল, আসলে কি জানিস?

কি? বই-বগলে ফিরতে ফিরতে দাঁড়িয়ে পড়েছি বড়বাজারের হাটের মধ্যিখানে।

আসলে আগে আমাদের খাইয়ে নেশা করিয়ে দিচ্ছে—

নেশা কথাটা শুনেই বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করে। মা জানত পারলে আর রক্ষে নেই। সে যুগটাই যে ছিল বাপ-মায়ের শাসনের যুগ। কথায় কথায় চ্যালাকাঠ খুবই পিঠের ওপরে ভাঙে। পাখার ডাঁটি হচ্ছে তার সুলভতম সংস্করণ। কি করে ওঁরা বুঝেছিলেন যে, ওটি গরমের দিনে ঘোরালে যত মজা, ছেলেমেয়েদের পিঠে ভাঙাতে তার চাইতে একতিল কম মজা নয়। নেশা হয়ে গেলেই ওরা তখন পয়সা নিয়ে বাজারে ছাড়বে।

আজ মনে হয়, ওইটুকু ছেলের কী বুদ্ধি ছিল। সারাংসার বুঝেছিল। খোল্দা কথা, ব্যবসার গুপ্ত লক্ষ্যটি। আগে প্রাণ দিয়ে খাইয়ে জান ধরে টেনে তার উসুল করবে। এ প্রায় বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি চা ছিল অনেকটা বিলাসিতা। লিপটন্‌স টি'র এক প্যাকেট আসত। তখন নাইনে-টেনে পড়ি। সে চা-কে ঘিরে সারা সকাল ম' ম' করত। শরীর খারাপ হলে, ফুটবল খেলে গা-ম্যাজম্যাজ করলে বাবা-কাকারা বলতেন, দাও দিকি এক পেয়ালা আদা-চা।

আর শুধু আদা-চা-ই বা কেন। চা-এর আছে বিশ্বরূপ। নানাভাবে উপভোগ করা চলে। গ্রীষ্মে গরম চা পছন্দ করেন, কেউ বা চান বরফ-চা। বরফের কুচি-কুচি দিয়ে সে চা নাকি বড়মানুষীর একটা অলংকরণ হয়ে ওঠে। আমাদের দেশেও কেউ কেউ খেয়ে থাকেন। আদা-চা-এর কথা আগেই বলেছি। মাড়োয়ারীরা চা খান। সে চা স্বাদে-গন্ধে একেবারে আলাদা। ঘন দুধ, এলাচ-লবঙ্গ-তেজপাতার ঝাঁঝে চা-এর গন্ধ ভুলিয়ে দেয়। জটেশ্বরের রতনলালজীকে শুধিয়েছিলাম, এ চা আপনারা খান কেন? কপালে চন্দনের ফোঁটা, খাটো জামা গায়ে, মস্ত মোটা ভুঁড়ি রতনলালজী বলেছিলেন, কিউঁ?

কেন মিছিমিছি এতসব পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে চায়ের জাত মারা?

আমি হাসছিলাম।

চায়ের গ্লাসে তিনি চুমুক দিচ্ছিলেন। এক চুমুকে দিয়ে গরম গ্লাসটা নামিয়ে রাখতে রাখতে তিনি হিন্দীতে-বাংলায় বলেছিলেন, আরেক গিলাস লিব?

অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেছিলাম, না। চা-এর জন্যে চা খান না আপনারা। মনে হচ্ছে দুধ-এলাচ মশলাপাতির জন্য খান।

রতনলালজী শুধু বললেন, জী।

বুঝিভেদে এমন মানুষ এমন সম্প্রদায় অনেক আছেন। এই আমাদের মধ্যেই ধরা যাক। কারুর পিসীমা অন্যদিন চা খান না, শুধু একাদশীর দিন একটু খান। তাও পাথরের বাটিতে। গঙ্গাজল দিয়ে খান কেউ চিনি বা দুধ একটুও না দিয়ে। তাতে উপবাসের ধর্মরক্ষা করা হয়। আগের দিন বৃষ্টি গিয়েছে, শিয়রের ধারে জানালা খোলা ছিল, কেউ ভিজেছেন জলে, হাঁচি পড়ছে ঘনঘন। শীতকম্পও আছে। প্রিয় কন্যার উদ্দেশে হাঁকছেন, কই মা, এক কাপ চা খাওয়াও দেখি।

চা মুখে দিয়েই তিনি ঝরঝরে হয়ে উঠবেন। এমন প্রিয় পানীয় আর হয় না।

চা-সম্পর্কে একটি মজার গল্প শুনিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের এক বৃদ্ধ অধ্যাপক। রংপুরে ওকালতি করতেন। পার্টিশনের পরে অধ্যাপনা। অধুনা বিগত তিনি। সুরেশচন্দ্র সেননিয়োগী। বলেছিলেন, সত্যযুগে শব্দটি ছিল কিঙ্কর—একালের সার্ভেণ্ট অর্থে আর কী। কিঙ্কর বলত তখন। কিং করোমি কিং করোমি—অর্থাৎ কি করব, এই বলত চাকরেরা। একালে হয়েছে চাকর। অর্থাৎ কিনা চা কর্‌ চা কর্‌ এই কথা। নিতান্তই ঠাট্টা, রসিকতার কথা। কিন্তু বর্তমান যুগে চায়ের ভূমিকা সম্পর্কে একটি বুদ্ধিদীপ্ত শ্লেষ আছে এতে, একথা অস্বীকার করবার জো নেই।

[ক্রমশ]

গ্রামবাংলার কথা

অসীম মুখোপাধ্যায়

ঝুলকি

"শরীরে মাটির গন্ধ মেখে
শরীরে জলের গন্ধ মেখে
উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে
চাষার মতন প্রাণ পেয়ে
কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর
'পরে?"
(জীবনানন্দ দাস)

—কি হোয়েছিল ওর?

—কাশি।

—তাতেই কেউ মরে?

—সাথে রক্তও পড়ত।

—বুঝলুম, তা শ্মশানে যাবে কারা? খবর দিয়েছ?

—হ্যাঁ। গাঁয়ের ক'জন যাবে বলেছে। ঐ তো আসছে সব।

—আমিও যাব।

—চলুন। ওকে আপনি চিনতেন?

—চিনতুম। গত পরশু ওর ঘরে বসে মুটি খেয়ে গেছি।

—ও! তাই আমাদের কাছে গল্প করেছিল!

—কি বলেছিল?

—বলেছিল নতুন বন্ধুর সাথে ক্যানিং যাবে। কোনদিন শহর দেখে নি তো?

—শহর দেখা হোল না!

—হ্যাঁ, আরও অনেক কিছুই!

—আজ আকাশটা কি নীল!

—ও যাবার সময় সব মেঘগুলো নিয়ে গেছে।

—আর আলো রেখে গেছে।

—ওর মুখের রক্তটা মুছিয়ে দাও।

—গাটা কি ঠাণ্ডা, যেন হিমঘরে ছিল!

—তাই একটা মশাও বসছে না!

—কিন্তু হারান কয়াল আসবেই।

—কে সে?

—মহাজন। ওর শনি।

—সবটুকু জমি গেছে। কেবল এই কুঁড়েটাই ছিল।

—এটাও বাঁধা আছে।

—ঠিক জানিস?

—হ্যাঁ, একদিন বলছিল আমায়।

—ওর আত্মীয়রা কই?

—নেই।

—বিয়ে করে নি?

—বউ পালিয়েছে। খেতেই পেত না।

—বাচ্চা?

—একটা ছিল। এখন নদীর জলে

—যাবি নাকি এবার?

—চল।

—ও খুড়ো? ঘরটা কাদের গো?

—মোদের।

—মাদুর বুনছ না কি।

—হুঁ। বসুন। ও গো, চাটাই পেতে দাও।

—বয়স কত হোল?

—সত্তর।

—বলছ কি? চোখে দেখতে পাও।

—দেখতে হয়।

—মাদুর বুনে ক'টি পয়সা পাবে?

—ওপরওয়ালা জানে।

—চাষের জমি আছে?

—এক বিঘে। পার্টি থেকে দিল।

—কোথায় সেটা?

—সোজা উত্তরে। ঐ টালির ঘরের পাশে।

—ঘরে ক'জন লোক?

—বউ, বিধবা মেয়ে আর নাতনী।

—ছেলে?

—দেয় নি?

—খুব কষ্ট তাই না? কাঁদছ?

—নাঃ!

—ঐ মেয়েটি কে?

—নাতনী।

—বিয়ে দেবে না?

—কার সাথে দেব? কে খেতে পায়?

—তোমার আগে জমি-জমা ছিল?

—ছিল। তিরিশ বছর আগে।

—এতদিন জনমজুর ছিলে?

—

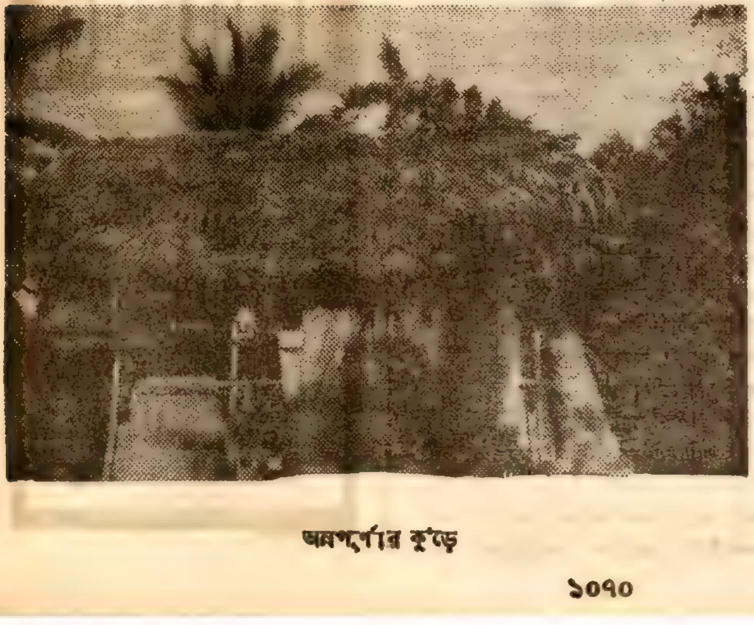

অন্নপূর্ণার কুঁড়ে

—হ্যাঁ। এদ্দিনে আবার জমি পেলাম।

—এ তো সামান্য!

—তাও কি থাকবে?

—কেন, কি হোল আবার?

—গাঁয়ের ধনীরা শাসায়, জমি কেড়ে নেবে।

—নালিশ করে দাও।

—করে দিয়েছি।

—কোথায়

—ওপরে?

—ওখানে কেউ নেই। একদম ফাঁকা।

—তাই হবে' নইলে...।

—আজ কি রাঁধবে?

—শাক।

—আর?

—আবার কি? পয়সা থাকলে হোত।

—রেশন দেয়?

—তোলার পয়সা নেই। মাঝে-মধ্যে তুলি, মাঝে মধ্যে থাকে।

—মাছ ধর না কেন?

—জালের পয়সা কই?

—তোমার নামটা বললে না তো!

—কুবের, কুবের মন্ডল।

—বাপ তোমার রসিক ছিল বটে!

—যা বলেছেন!

—কত টাকা দিলে?

—এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

—ডাক্তার না কি ও?

জনমজুরের ঘর

—হ্যাঁ। দেখছ না চোও কাঁদিয়ে গেল?

—আমি তো জানতুম জমির দালাল।

—দুটোই।

—তা হলে ওর নাম রাখি ডাক্তার দালাল?

—মন্দ কি?

—রুগী তোমার কে?

—পড়শী। অনেক দিনের চেনা।

—ক'দিন হোল ভুগছে?

—দিন পনেরো।

—চলছে কি করে?

—চলছে না। দু'টা বাচ্চা ধুঁকছে। বৌটা ভিক্ষে করে।

—জমি আছে?

—তিন কাঠা।

—পাশের জমিটা কার?

—এক বড়মানুষের। আগে ওর ছিল।

—নিল কেমন করে?

—যেমন করে নেয়। ধার আর সুদ। সুদ আর ধার।

—তোমরা কিছু বল নি?

—প্রমাণ পেলে তো?

—দলিল?

—সেটা একতরফা। বাবুর কাছেই থাকে।

—একটা কিছু করলে হয়।

—করবে কে? এবার নিজের জমিটাও বাঁধা রাখব ভাবছি।

—তোমরা ভাল থাকতে চাও না?

—ও সব ভাগ্যে নেই!

—ভাগ্য কথাটা মিছে।

—অত ভাবতে পারি না।

—তাই কষ্ট পাচ্ছ।

—উঁহু। কষ্ট দিচ্ছে। একটু ভাত, একটু জল, একটা ছোট্ট কুঁড়ে তাও পেতে দিচ্ছে না!

—কেড়ে নাও।

—নেব, ঠিক নেব। দিন আসছে।

—দিন তো কত এল গেল?

—আবার আসবে।

—যেমন পাঁজিতে থাকে?

—না, সত্যি আসবে।

—তাকে চিনতে পারবে তো?

—চিনে নিতেই হবে।

—এত পাতায় কি হবে গো!

—ঘরের ছাউনী।

কুবের মন্ডল

—ঘর কোথায় তোমার?

—দুলকি।

—বাঃ ভারি মিষ্টি নাম। চল ঘুরে আসি।

—চলুন। হাঁটতে হবে কিন্তু।

—হাঁটব।

—তোমার মানুষ কোথায়?

—গবান বোসে।

—সে যে অনেক দূর! বড় গাংয়ের পারে!

—সে সেখানেই আছে।

—মাছ ধরছে?

—হ্যাঁ। ঐ তো তার পেশা।

—নেশাও।

—ঠিক কথা।

—তোমার দিন চলে কি করে?

—গাদুর বনে, রান্না করে, ছেলে আগলে।

—কবে আসবে সে?

—সময় হয়ে এল।

—এসে ছাউনী দেবে?

—ধরেছেন ঠিক।

—বনের গল্প বলবে?

—উঁহু, মনের কষ্ট জানাবে।

—কেন?

—মাছ নেয় সাইদার! সে শুধু মাছ মারে!

—মজার ব্যাপার!

—সে আর বলতে! ডাঙায় মহাজন, জলে সাইদার। ঐ আমাদের দাঁ। দুলকি।

—কি সুন্দর, নামের সাথে মানিয়েছে বেশ।

—না গো, ওটা ঘুণে ধরা বাঁশ। ভেতরে ফাঁপা।

—তোমার ঘরটা কই?

—এখনও অনেক দূর।

—আমরা না হোলে ওদের দেখে কে?

—যা বলেছেন।

—মিলেমিশেই আছি।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

—আরে মশাই, এটা হোল পিতৃ-পুরুষের সিস্টেম।

—সত্যি কথা!

ওরা চাইবে, আমরা দেব। তবে হ্যাঁ, মাগনা নয়।

—বটেই তো।

—আমরা তো আর দানছত্র খুলে বসি নি?

—ঠিক, ঠিক।

জমি রাখতে না পারলে আমাদের দোষ?

—কেউ কি তা বলে?

—বলে না মানে? যাচ্ছেতাই বলে! কিন্তু আমি তো আর জমি চুরি করি না।

—ও!

—ওরাই বিক্রি করে দেয়। রাক্ষস তো এক-একটা—

—তাই না কি?

—তবে আর বলছ কি? আধ সের চাল না হলে পেট ভরে না। চাষের সময় ফতুর করে দেয়।

—কিন্তু শুনেছি সারা বছর পেট শুকিয়ে থাকে?

—থাকবেই তো। দু' দিনেই সব ফুঁকে দেয়!

—আচ্ছা!

—আরে মশাই, আজকাল আবার পার্টি-ফার্টি করে। বদমাস হয়ে গেছে।

—জানতুম না তো?

—জেনে রাখুন। তবে ওদের কিস্যু হবে না। আবার এখানেই আসতে হবে।

—আসবে?

—ঘাড় আসবে। পার্টিগুলো তো সব খেয়ো-খেয়ি করে। ভরাডুবি হবেই।

—আপনার অনেক জ্ঞান!

—হেঃ হেঃ, তা না হোলে কি আর এত ঘোল খাওয়াতে পারি?

—এবার নিজেই গোল খেয়ে যাবেন।

—তার মানে?

—আচ্ছা এখন চলি।

---

* আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত।

উপাসক-সম্প্রদায়। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়

বহুকাল পরে

সদ্য প্রকাশিত হইল!

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত

বাঙলা ও ধর্ম-সাহিত্যের এই অদ্বিতীয় গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল। অনুসন্ধানীরা দীর্ঘকাল এর অভাব বোধ করছিলেন। সেই অভাব পূরণ করার জন্য অক্ষয়কুমারের বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের বিবরণ সম্পূর্ণ এক খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৭ ॥ মূল্য কুড়ি টাকা। মূল্যবান কাগজে লাইনো টাইপে ছাপা। প্রচুর চিত্র সম্বলিত। বোর্ড বাঁধাই।

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত

বসুমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

সান্যাল এণ্ড কোং ॥ কলিকাতা-৯

উপাসক-সম্প্রদায়। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

শহর কলকাতা

ছেলে নিয়ে ছেলেখেলা

খোদ কলকাতায় মাঝে মাঝে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস বে-পাত্তা হয়। পুজোর মরশুমে বহু জিনিসের দাম হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে—এ তো কোনো নতুন ব্যাপার নয়। পুজোর মওকায় দু' পয়সা যদি লোকে বেশি উপার্জন করে, তা হলে সেই পয়সা উচিত-দামের চেয়ে বেশি দাম দিতে গিয়ে শেষ হয়। এসব ঘটনাও নতুন নয়।

তেমনি নতুন ঘটনা নয় ছেলেদের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করা। বেবি-ফুড বেশ কিছুকাল ধরে উধাও হতে সুরু হয়েছে। জীবনের দায়, তাই ভোর হলেই ছেলের বাপকে খাটালে ছুটতে হয়। খাটাল বিদায় দেওয়ার কথা হলেই হা-হুতোশ করতে হয় তাঁকে। সরকারী দুধ পাওয়াও অসম্ভব। প্রসঙ্গত আমরা প্রস্তাব রাখছি ঃ নবজাত শিশুদের দুধের জন্য আবেদন করা হলে, তা মঞ্জুর করতে। সরকার তা সম্ভব করতে যদি না পারেন, তাহলে যুক্তফ্রন্ট সরকার কি বেবিফুড বাজার থেকে উধাও হলেও নির্বাক হয়ে থাকবেন।

অবশ্য কোনো কোনো বেবিফুড বেশি দাম দিলে কোনো কোনো দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। অধিকন্তু ট্যাক্স বাড়ার জন্য নাকি—প্রকাশ্য বাজারেই কোনো কোনো বেবিফুডের দাম বেশি নেওয়া হচ্ছে।

শিশুদের ওষুধ

বেবিফুডের পর আর একটি জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। তা হচ্ছে হুপিং কফ ও ডিপথেরিয়া নিরোধক ওষুধ। ওষুধের দোকানে দোকানে গেলে মেলে না—কবে মিলবে তাও জানা নেই। হয় তো ওষুধ তৈরির নতুন করে খরচা কষা হচ্ছে। অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

রাজপথের মন্দির

কলকাতার রাজপথের আইল্যান্ড-গুলির সঙ্গে ট্রাকগুলির সম্পর্ক বোধ হয় অহি-নকুলম্। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় চৌরঙ্গী বা পার্ক স্ট্রীটের আই-ল্যান্ডটাকে ধাক্কা মেরে ভেঙেচুরে সরিয়ে দিয়েছে রাতকানা বা দিনকানা কোনো ট্রাক। আইল্যান্ডগুলির মাথায় পাথর নিশানায় লাল-নীল বাতিগুলির তখন কি অবস্থা ভাবুন।

অথচ এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করার মতো যে, কলকাতায় বহু রাজপথের ওপর গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠছে ছোট-খাটো বহু মন্দির। এখনো কোনো কোনো রাজপথে পাতালফোঁড় শিব পথযাত্রীদের দর্শন দিতে নাকি আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হচ্ছেন। আমরা মনে মনে এই কথা ভেবে আশ্বাস পাই যে, রাজপথে বেহিসেবী গাড়ি ছোটা-ছুটির সময় ঠিক মন্দির ঘেঁষে দাঁড়ালে সে যাত্রা প্রাণটা রক্ষে পেয়ে যাবে।

এই ব্যাপার লক্ষ্য করেই জনৈক 'রোড স্পেশ্যালিস্ট' বন্ধু আমাদের কাছে অনুরোধ করছেন—তাঁর একটি প্রস্তাব 'শহর কলকাতা'য় প্রকাশ করতে। প্রস্তাবটি যুক্তিযুক্ত কি না, জানি না, তবে ঐ জাতীয় প্রস্তাবের প্রচার হলে যদি সমস্যার সমাধান হয়, তাহলে প্রস্তাবটি প্রচার করাই বিধেয়।

তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজপথের আইল্যান্ডগুলিকে বাঁচানো। তাই তিনি তাঁর প্রস্তাবে বলেছেন, রাজপথের মন্দিরগুলির বিরুদ্ধে ট্রাকগুলির যখন কোনো আক্রমণসুলভ মনোভাব নেই, তখন আইল্যান্ডগুলিকে মন্দির বানিয়ে দেওয়া হোক। আর তার ওপর লাল-নীল-শাদা বাতির শাসন সুরু হোক।

দ্বিতীয়ত, আইল্যান্ডের যবনিকা-পাত হলে, সম্ভবত কলকাতার রাজ-পথগুলিকে বর্ষার সময় সত্যিকারের সমুদ্র বলে মনে হবে না।

সাধুবাবার পাশবই

সেদিন ছোট্ট একটি চায়ের দোকানে বসে শহরদর্শী যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা তিনি জীবনেও ভুলবেন না। গেরুয়া এবং জটাধারী একজন সন্ন্যাসীও সেই দোকানের একটি কোণে বসে।

সময় ঃ দুপুর। বাইরে ঃ খররৌদ্র। দোকানটাও নির্জন। সুতরাং সাধুবাবার এক মনে নিবিষ্ট থাকতে কোনোরকম অসুবিধা হয় নি। কিন্তু তাঁর নিবিষ্ট-চিত্ততা ঈশ্বরচিন্তায় বা ঐ রকম কোনো কারণে নয়। তিনি ঐ সময় একটি পাশবই নিয়ে হিসেবে ব্যস্ত ছিলেন। মোদ্দা কথা, টাকার অঙ্কটাও কম নয়। তবে এটাও অজানা থেকে গেল যে, তিনি মঠ প্রতিষ্ঠার কোনো পরিকল্পনা করছেন কি না। কারণ তিনি এমন কটমট করে তাকাতে থাকলেন যে, শহরদর্শী তাতে পরাস্ত হলেন। সেই অবস্থায় এই শ্লোকবাক্যই শ্রেয় ঃ যঃ পলায়তি স জীবতি।

শারদীয় পত্রিকা!

আমাদের পত্রিকা আপিসে জনৈক ভদ্রলোক একটি শারদীয় পত্রিকা নিয়ে এসেছিলেন। ভদ্রলোকের কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। কারণ তিনি রাগে ফুঁসছিলেন। তাঁর রাগ উচিত কি অনুচিত, পাঠকেরাই বিবেচনা করুন।

উক্ত ভদ্রলোকের কিশোর পুত্র স্টল থেকে একটি পত্রিকা কিনে নিয়ে গিয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকলে, ছেলের মা'র সন্দেহ হয়, যে-ছেলে পড়তে চায় না, তার পড়ায় হঠাৎ অত সুমতি হোল কেন! পরে অবশ্য ব্যাপারটা অজানা থাকল না। এবং ভদ্রলোক দু'-চার পাতা উল্টেই রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে পত্রিকা আপিসের দ্বারস্থ হয়েছেন। 'ছিঃ ছিঃ এমন জঘন্য ও নিচুস্তরের পত্রিকা বাজারে বের হবার অনুমতি পায়?'

আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল ঃ আপনার পুত্রও তো অনুমতি পায় নি। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ আপনি যে পত্রিকাটা ভালো বলে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন—তার ভেতরেও কী আছে তা কি জানেন? সেটাও তো আপনার বাড়ির ছেলে-মেয়েরা পড়বে। **—শহরদর্শী**

রঙ্গমঞ্চ এদেশে এবং ওদেশে

ঝিলিমিলি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তৃতীয় অঙ্ক

[একই দৃশ্য]

[একই দৃশ্য—টেবিলে একটি কেরোসিনের টেবিলল্যাম্প—মিসেস লিন্ড একটি বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন—অত্যন্ত চঞ্চল, কারও প্রতীক্ষা করছেন বলে কিছুতেই বইতে মনোনিবেশ করতে পারছেন না।]

মিসেস লিন্ড—(হাতের ঘড়ি দেখে) এখনও এল না—অথচ আর তো সময়ও ... না। যদি না আসে? (Wings-এর দিকে চেয়ে) যাক এসে গেছে।

[Wings-এর দিকে চেয়ে থাকবে ও একটু পরে বলবে]

ভেতরে আসুন—এখানে এখন কেউ নেই।

ক্রগ—বাড়িতে ফিরে আপনার একটা চিঠি পেলাম, ব্যাপার কী, আমার ওখানে হঠাৎ গিয়েছিলেন কেন?

মিসেস লিন্ড—একটা অত্যন্ত জরুরী দরকারে। আপনাকে না পাওয়াতেই চিঠি লিখে রেখে আসতে হোল। একটু দরকারী কথা আছে।

ক্রগ—তা এখানে?

মিসেস লিন্ড—আমার মাত্র একটি ঘর—সেখানে বসে ঠিক কথাবার্তা বলার সুবিধা নেই—হেলমাররা ওপরতলায় ভাড়াটেদের ওখানে উৎসবে যোগ দিতে গেছে।

ক্রগ—আজকেও উৎসবে যোগ দেবার মত তাদের মনের অবস্থা আছে?

মিসেস লিন্ড—কেন বলুন তো?

ক্রগ—যাকগে ও আলোচনা থাক।

মিসেস লিন্ড—শোন নিল্‌স—তোমার সঙ্গে আমি খোলাখুলিভাবে একটা বিষয় আলোচনা করতে চাই।

ক্রগ—অর্থাৎ?

মিসেস লিন্ড—তুমি কিন্তু আমাকে আগাগোড়াই ভুল বুঝেছ।

ক্রগ—বোঝাবুঝির আর ছিলই বা কি? আমার থেকে ঐ ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা ছিল ভাল—সুতরাং সেক্ষেত্রে হৃদয়হীনা নারীরা যা করে থাকে তুমিও ঠিক তাই-ই করেছ।

মিসেস লিন্ড—তুমি কী সত্যিই আমাকে হৃদয়হীনা বলে বিশ্বাস কর? না মনে কর আমি হাল্কা চরিত্রের মেয়েদের মত সাতপাঁচ না ভেবেই ওখানে বিয়ে করেছিলাম।

ক্রগ—তবে?

মিসেস লিন্ড—তবে কি? আমি তোমাকে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করতে চাই আমার সম্বন্ধে এই তোমার সত্যিকার ধারণা কি-না?

ক্রগ—তবে আমাকে তখন ও ধরণের চিঠি লিখেছিলে কেন?

মিসেস লিন্ড—আর অন্য কোন উপায় ছিল না বলে। ভুলে যেও না—বুড়ো মা আর অসহায় দুটি ছোট ছোট ভাইয়ের সমস্ত ভার তখন আমার ওপরে। তোমার আর্থিক অবস্থা তখন মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। এ বিয়ে না করে আমার তখন কি উপায় ছিল বলতে পার? সেক্ষেত্রে তোমাকে দূরে সরিয়ে দিলেই ভাল হবে বলে মনে করেছিলাম এবং সেইজন্যই এভাবে চিঠি লিখি।

ক্রগ—হয়তো তোমার কথাই ঠিক, তবু ঠিক এভাবে আমাকে সরিয়ে দেওয়াটা তোমার উচিত হয় নি।

মিসেস লিন্ড—সত্যি আজ পর্যন্ত আমি নিজেও বুঝতে পারলাম না কাজটা ঠিক উচিত হয়েছিল কি না।

ক্রগ—কিন্তু এর ফলে আমার কী অবস্থা হোল জান? মনে হতে লাগলো যেন পায়ের তলা থেকে পৃথিবী সরে গেছে। জাহাজডুবি হলে, মানুষ ডুবতে ডুবতেই, কিভাবে সামান্য কুটোটা পেলেই আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে, জান তো?

মিসেস লিন্ড—কেউ কেউ বেঁচেও তো যায়।

ক্রগ—আমিও তাই যাচ্ছিলাম। আবার আমার পথে এসে বাধা হয়ে দাঁড়ালে সেই তুমি-ই।

মিসেস লিন্ড—আমি জানতাম না যে তোমার চাকরিটাতেই আমাকে নেওয়া হচ্ছে।

ক্রগ—কিন্তু এখন যখন জানছো—আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও না কেন?

মিসেস লিন্ড—তাতে কোনও ফল হবে না। কারণ আমি সরে গেলেই তোমাকে নেওয়া হবে না।

ক্রগ—আমি কিন্তু অতশত না ভেবে সরেই যেতাম।

মিসেস লিন্ড—তাতে কি লাভ হত? না নিল্‌স, এখনও তুমি ভেতরে ভেতরে সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেছ। একটা কথা শোন—একটু আগে জাহাজডুবি হওয়া লোকের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করছিলে না? আমার অবস্থাও তার থেকে ভাল না কিছু—দুজনে আলাদা আলাদা না ডুবে, এস না একসঙ্গে ভাগ্যকে রুখে দাঁড়াই।

ক্রগ—কিছুই বুঝতে পারছি না—কি বলতে চাও?

মিসেস লিন্ড—দেখ নিল্‌স, বিশ্বাস করো—আর এভাবে আমি নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে পারছি না। কর্তব্য করছি, এই ভাবটা আমাকে এতদিন নেশার মত পেয়ে বসেছিল, তা শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন শূন্যতায় ভরে গিয়েছে। আজ আমি একা, অত্যন্ত একা, আবার কি আমরা নতুনভাবে জীবনকে গড়ে তুলতে পারি না?

ক্রগ—কি পাগলের মত কথা বলছ? আমার অতীত জীবনের সব কথা যদি জানতে—

মিসেস লিন্ড—সেসব আমার অজানা নয়, কিন্তু এও জানি আমাকে স্ত্রী হিসাবে পেলে তুমি একেবারে নতুন মানুষ হয়ে যাবে। আমি নিশ্চয় জানি, সে শক্তি তোমার আছে। তোমার চরিত্রের আসল পরিচয় তো আমার অজানা নয় নিল্‌স—

ক্রগ—সত্যিই কি তুমি একথা বিশ্বাস কর?

মিসেস লিন্ড—নিল্‌স, নিল্‌স! তোমার ছেলেমেয়েরা মাতৃহারা। আমাকে তাদের মা হতে দাও।

ক্রগ—অনেক—অনেক ধন্যবাদ ক্রিস্টিন! মনে হচ্ছে আবার যেন সেই অতীতে ফিরে গেছি—মাঝের সময়টা যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত। কিন্তু একটা কথা তোমায় বলা হয় নি—

মিসেস লিন্ড—কিন্ত হেলমারদের ফেরবার সময় হয়ে গেছে—তোমার বোধ হয় এখন চলে যাওয়াই ভাল।

ক্রগ—যাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে এখনও পর্যন্ত জানাই নি যে—ওদের বিরুদ্ধে......

মিসেস লিন্ড—সেসব আমি জানি।

ক্রগ—চিঠিটা যদি ফিরিয়ে নিতে পারতাম!

মিসেস লিন্ড—সে আর সম্ভব নয়।

ক্রগ—ধর যদি হেলমারদের জন্য অপেক্ষা করে তার থেকে চিঠিটা ফেরৎ চাই!

মিসেস লিন্ড—আমিও প্রথম এইভাবেই ব্যাপারটা চাপা দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে, হেলমারের সব কিছুই জানা দরকার। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবকিছু খোলাখুলিভাবে আলোচনা হয়ে যাওয়াই সবদিক দিয়ে ভাল—এইসব লুকোচুরিতে আর আমরা থাকব না।

ক্রগ—তবে একটা কাজ আমি করতে পারি। আর সেটাই সর্বদিক দিয়ে ঠিক হবে। আমি এখন চললাম—রাস্তায় তোমার জন্য অপেক্ষা করব। (প্রস্থান)

মিসেস লিন্ড—(স্বগত) কী আশ্চর্য! একটু আগে এমন কি কল্পনাতেও আনতে পারি নি যে নতুন করে আবার জীবন শুরু করব। বিয়ে করলেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, একথাটা যদি সেদিন বুঝতে পারতাম, বোধ হয় এত বড় ভুল কখনও করতাম না। (Wings—এর দিকে চেয়ে) ওই ওরা বোধ হয় আসছে।

[হেলমার ও নোরার প্রবেশ]

হেলমার—গুড ইভ্নিং—আপনারা বসুন, আমি এখুনি আসছি।

[ভেতরের দিকে প্রস্থান]

নোরা—কি হল?

মিসেস লিন্ড—ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

নোরা—কিন্তু কি বলে?

মিসেস লিন্ড—নোরা—স্বামীর কাছে তোমাকে সব কথা খুলে বলতেই হবে।

নোরা—আমি আগেই জানতাম ওর থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যাবে না।

মিসেস লিন্ড—ক্রগস্টাডের থেকে তোমার কোনও বিপদের ভয় নেই। তবে মিঃ হেলমারের কাছে কোন কিছু গোপন করা সম্ভব হবে না।

নোরা—আমি বলতে পারব না।

অ্যাঁ! বলেন কি?
ব্যাঙ্ক আমাকে
ঋণ দেবে?
আমি তো
সামান্য কয় বিঘার চাষী!

হাঁ দেবে। যদি আপনি আধুনিক উন্নত প্রণালীতে চাষবাসে আগ্রহী কৃষিজীবী হন, তাহলে ভাল বীজ, সার, পোকা-মাকড় মারার ওষুধ—এই সব যোগাড় করতে ব্যাঙ্ক আপনাকে আর্থিক সাহায্য করবে। চাষের জন্য কলকব্জা, যেমন পাম্প, পাওয়ার টিলার, এমন কি ট্রাক্টরের জন্যও ঋণ পেতে পারেন।

আপনার শস্যোৎপাদন বৃদ্ধিই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য।

UNITED BANK OF INDIA

ইউবিআই-এর
যে কোনো শাখা অফিসে চলে আসুন।
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
হেড অফিস: ৪, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

UBI-4-B-69

পশ্চিমবঙ্গে ১১৫টিরও অধিক শাখা অফিস আছে

মিসেস লিণ্ড—চিঠি থেকেই তিনি সব জানতে পারবেন।

নোরা—যাকগে, আমার পথ আমি ঠিক করে ফেলেছি।

মিসেস লিণ্ড—যা-তা কিছু একটা করে বোস না যেন—একটু সময় দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

নোরা—ভয় নেই, ওসব কিছু করব না—যাক, তোমাকে ভাই ধন্যবাদ, অনেক চেষ্টা করেছিলে—

মিসেস লিণ্ড—আমি তোমাকে বলছি ভয়ের কিছু নেই। সব দেখবে ঠিক হয়ে যাবে। অনেক রাত হয়ে গেল—আজ চলি।

নোরা—(অন্যমনস্কভাবে) এস—(মিসেস লিণ্ডের প্রস্থান ও একটু পরে হেলমারের প্রবেশ)

হেলমার—মিসেস লিণ্ড কি চলে গেলেন?

নোরা—এইমাত্র গেল।

হেলমার—যাক, বাঁচা গেল। সুন্দর কেটেছে সন্ধ্যাটা—র‍্যাঙ্ক কি রকম খোস মেজাজে ছিল লক্ষ্য করেছ?

নোরা—তাই নাকি? আমার সঙ্গে ওখানে আজ প্রায় কথাই হয় নি।

হেলমার—কথা আমার সঙ্গেও খুব হয় নি। কিন্তু বহুদিন ওকে এরকম স্ফূর্তি করতে দেখি নি। যাকগে—কিন্তু এই সময়টার জন্যই চেয়েছিলাম—শুধু তুমি আর আমি। সত্যি নোরা, কি অদ্ভুত, কী আশ্চর্য সুন্দর তুমি!

নোরা—ওভাবে আমার দিকে চেয়ে থেকো না টরভ্যাল্ড।

হেলমার—আমার জীবনে যা সবচেয়ে মূল্যবান—সবচেয়ে আদরের—যা আমার একান্ত নিজস্ব—

নোরা—এখন ঠিক এসব কথা ভাল লাগছে না টরভ্যাল্ড।

হেলমার—উৎসবের আনন্দ যেন তোমার রক্তে আগুনের স্পর্শ ছুঁইয়ে দিয়ে গেছে—তোমাকে করে তুলেছে আরও অপরূপ আরও প্রহেলিকাপূর্ণ।

ডাঃ র‍্যাঙ্ক—(বাইরে থেকে) আসতে পারি?

হেলমার—(চাপা গলায়) আঃ এদের জ্বালায় নিজেরা বসে যে একটু গল্প করব সে উপায় নেই। (উঠে গিয়ে) এস র‍্যাঙ্ক!

র‍্যাঙ্ক—(ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে) ওপর থেকে নামতে নামতে তোমাদের গলা পেলুম। তোমরাই আসলে আনন্দে আছ।

হেলমার—তুমিও যে খুব নিরানন্দে ছিলে তা তো মনে হচ্ছিল না।

র‍্যাঙ্ক—মহানন্দে ছিলাম হে। থাকবো না-ই বা কেন? পৃথিবীর সবকিছু আনন্দ উপভোগ করবার অধিকার প্রত্যেকেরই থাকা উচিত। কথায় বলে—"হেসে নাও দুদিন বৈ তো নয়"—মদটাও খাসা ছিল হে—

হেলমার—বিশেষ করে শ্যাম্পেনটা।

র‍্যাঙ্ক—আমি প্রায় আকণ্ঠ পান করেছি হে।

নোরা—টরভ্যাল্ডও কম শ্যাম্পেন খায় নি—

র‍্যাঙ্ক—দিনে যথেষ্ট কাজ থাকলে—রাত্রে এ ধরণের স্ফূর্তি করাটা সত্যিই আরামদায়ক।

নোরা—আজকের দিনটা আপনি বোধ হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাটিয়েছেন।

র‍্যাঙ্ক—ঠিকই ধরেছেন।

হেলমার—শোন একবার। আমার নোরাও আবার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা বলে।

নোরা—গবেষণার ফলটা নিশ্চয় অভিনন্দন জানাবার মত হয়েছে?

র‍্যাঙ্ক—তা জানাতে পারেন বৈকি। চিকিৎসক এবং রুগী উভয়ের দিক থেকেই একটা চরম সমস্যার সমাধান পাওয়া যাচ্ছে।

নোরা—চরম সমাধান!

র‍্যাঙ্ক—একেবারে চরম সমাধান যাকে বলা যায়। সুতরাং এরপরে সন্ধ্যাটায় একটু প্রাণখুলে স্ফূর্তি করব না?

হেলমার—তা করতে পার—তবে এর জের টানতে সকালে আবার না প্রাণান্ত হয়।

র‍্যাঙ্ক—সে তো জানা কথাই। কোন কিছু পেতে হলেই তার মূল্য দিতে হবে।

নোরা—আচ্ছা ডক্টর র‍্যাঙ্ক, ফ্যান্সি ড্রেস ব্যাপারটা আপনার কেমন লাগে?

র‍্যাঙ্ক—ভারি সুন্দর—কত রকমের পোষাক।

নোরা—আচ্ছা বলুন না—আসছে বছর আমরা কি সাজব?

হেলমার—তুমি কি এখন থেকেই আসছে বছরের কথা ভাবছ?

র‍্যাঙ্ক—কি সাজবেন? ...ঠিক হয়েছে। আপনি সাজবেন সুন্দরী একটি পরী—

হেলমার—আর তুমি নিজে কি সাজবে?

র‍্যাঙ্ক—আমি? তাও ঠিক করে ফেলেছি—আসছে বছর ফ্যান্সি ড্রেসে আমি থাকব অদৃশ্য।

হেলমার—বেশ বলেছ হে।

র‍্যাঙ্ক—এক রকম কালো টুপির কথা শোন নি? ঐ টুপি পরলে লোকে অদৃশ্য হয়ে যায়—যে মাথায় দেয় কেউ তাকে দেখতে পায় না।

হেলমার—(হাসি চেপে) ঠিক বলেছ।

র‍্যাঙ্ক—রাত হয়ে যাচ্ছে—চললাম। শুভ রাত্রি।

হেলমার—আচ্ছা এস।

নোরা—শুভ রাত্রি ডক্টর র‍্যাঙ্ক।

র‍্যাঙ্ক—শুভ রাত্রি (প্রস্থান)।

হেলমার—পানের মাত্রাটা একটু বেশি করে ফেলেছে আজ।

নোরা—বোধ হয়। কিন্তু তুমি কোথায় চলেছ?

হেলমার—চিঠিগুলো নিয়ে আসি। বাক্সটা ভর্তি থাকলে কাল আবার খবরের কাগজ রাখবার জায়গা থাকবে না।

নোরা—আজ রাতে কাজকর্ম করবে নাকি?

হেলমার—পাগল হয়েছ? নিজেও বেশ জান (Wings-এর দিকে যাবে)

নোরা—(স্বগত) আর কয়েক মিনিট, তার পরেই সব জানতে পারবে চিঠি থেকে। আজকে হয়তো পড়বে না। কিন্তু কাল তো আর আটকানো যাবে না। তার থেকে আজকে পড়ে ফেলাই ভাল। আমি আর এ Suspense-এ থাকতে পারছি না—শেষে কি পাগল হয়ে যাব? (হেলমারের প্রবেশ—হাতে চিঠিপত্র)

হেলমার—চিঠির বাক্সে সবের ওপরে পেলাম র‍্যাঙ্কের দুটো কার্ড। নামের পাশে কালো ক্রশ চিহ্ন—নিশ্চয় যাবার আগে ফেলে দিয়ে গেছে। এমন বিশ্রী লাগছে ব্যাপারটা—যেন নিজেই নিজের মৃত্যুর খবর দিয়ে গেল।

নোরা—সেই উদ্দেশ্যেই কাজটা করেছেন।

হেলমার—এ বিষয়ে তোমাকে আগে কিছু বলেছিল নাকি?

নোরা—বলেছিলেন যে, এ ধরণের কার্ড দিয়ে জানিয়ে যাবেন যে বিদায় নেবার সময় এসেছে।

হেলমার—আমার হতভাগ্য প্রিয় বন্ধু! জানতাম আমাদের মধ্যে বেশিদিন ও থাকবে না—তবু এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটবে ভাবি নি। আমাদের জীবনে ও এতটা জড়িয়ে গেছে যে, ও নেই একথা যেন ভাবতেই পারা যায় না।

নোরা—ও'র দিক দিয়ে হয়তো ভালই হল—এ রোগের যা কষ্ট।

হেলমার—এখন থেকে শুধু তুমি আর আমি—নোরা—নোরা—তোমাকে আমি আরও নিবিড়ভাবে গভীরভাবে পেতে চাই। মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি যদি কোনও একটা ভয়ানক বিপদে পড়তে, তাহলে আমি সুযোগ পেতাম আমার প্রেমের গভীরতা প্রমাণ করতে। জীবন পণ করে দেহের প্রতিটি রক্তকণা দিয়ে তোমাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করতাম।

নোরা—চিঠিগুলো পড়ে ফেল টরভ্যাল্ড।

হেলমার—আজ নয়, আজ শুধু তোমার কাছেই থাকতে চাই।

নোরা—টরভ্যাল্ড, এই দুঃসংবাদের পর আমাকে একটু একলা থাকতে দাও দয়া করে।

হেলমার—ঠিকই বলেছ। আচ্ছা আমি ও-ঘরে গিয়ে চিঠিগুলো পড়ি [প্রস্থান]

[ক্রমশ]

রংঢং

রবীন্দ্র সদনে যাত্রা উৎসব

সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে মহাসমারোহে যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের ষোলটি যাত্রা দল অংশ গ্রহণ করেছিল এবং জনপ্রিয় যে কয়টি পালা আছে সে কয়টিই অভিনীত হয়েছে। সুতরাং কলকাতার দর্শকরা যাঁরা যাত্রাপালা শুনবার আগ্রহ রাখেন তাঁরা নিজেদের পছন্দমত পালা দেখার সুযোগ লাভ করলেন। যাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসে বসে যাত্রা দেখতে অভ্যস্ত নন, তাঁদের পক্ষেও রবীন্দ্র সদনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আরামের আসনে বসে আভিজাত্য রক্ষা করে এই লোক-সংস্কৃতির রসাস্বাদন করার সুযোগ হল। যাত্রা গান হয় খোলা জায়গায়। ওপরে সামিয়ানা খাটিয়ে। মাঝখানে থাকে মঞ্চ। দুদিকে বসেন বাজনাদাররা। দর্শকরা চারদিকে ঘিরে বসেন, অভিনেতারাও এমনভাবে অভিনয় করেন যাতে চারদিকের দর্শক সমানভাবে রসাস্বাদন করতে পারেন. এই অভিনয়-রীতি এবং দর্শকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য যাত্রাগান থিয়েটার অপেক্ষা মানুষের বেশি কাছাকাছি। বন্ধ হলঘরে যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হলে এই পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে না, অভিনয়রীতি ও পরিবেশনার কিছু কিছু ব্যাপার বড় স্থূল মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বাইরে বসে দেখলে সাধারণ মানুষের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে স্বতন্ত্র এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শহরের মানুষের জন্য আজকাল অবশ্য হলঘরে বসে যাত্রা দেখার অনুষ্ঠান প্রায়ই হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্র সদনের এই উৎসবের স্বতন্ত্র এক রূপ আছে। মহৎ উদ্দেশ্য আছে। রবীন্দ্র সদনের পরিচালকমণ্ডলী রবীন্দ্র সদনকে কেবলমাত্র ভাড়া খাটাবার প্রেক্ষাগৃহে পরিণত না করে—পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করতে চান। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা কয়েকটি উৎসব অনুষ্ঠান ইতোপূর্বে করেছেন। যাত্রা উৎসব এই উদ্যোগের একটি সংযোজন মাত্র। ষোল দিনের অনুষ্ঠানে টিকেটের বিক্রয়লব্ধ অর্থের অধিকাংশই যাত্রার দলগুলি লাভ করেছেন। কেবলমাত্র শতকরা ৩০ ভাগ রাখা হয়েছে হলের খরচ ও প্রচার ব্যয়ের জন্য। এরূপ সুযোগ যাত্রা দলগুলির পক্ষে অচিন্তনীয় ছিল। রবীন্দ্র সদনের এরূপ প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য।

আশা পারেখ 'মহল' ছবিতে

এই যাত্রা উৎসব উপলক্ষে একটি উৎসব উপসমিতি গঠিত হয়েছিল। এবং এই উপলক্ষে একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই দুটি কাজই খুব তাড়াহুড়ো করে হয়েছে মনে হয়। এ দুটো ব্যাপারেই আমরা পরিচালকমণ্ডলীর প্রশংসা করতে না পেরে দুঃখিত। উপসমিতিতে রবীন্দ্র সদন কমিটির সদস্য ছাড়া দুজন আমন্ত্রিত সদস্য রয়েছেন। এই উপসমিতিতে আরো এমন ব্যক্তির স্থান হতে পারত যাঁরা যাত্রাকে জনপ্রিয় করা এবং বর্তমান কালের যাত্রায় যে প্রগতিশীল পালাগান গ্রহণ করা হয়েছে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। প্রসঙ্গত শ্রীকিষাণ দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি অধুনালুপ্ত 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রত্যেকটি যাত্রা দলের পরিচয়, যাত্রা শিল্পীদের পরিচয়, যাত্রা পালা লেখক ও পালাগুলোর আলোচনা ছবিসহ বৎসরাধিককাল লিখেছিলেন। তাঁর আগে কেউ প্রগতিশীল দৃষ্টি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লেখেন নি। আর 'স্বাধীনতা'র আগে কোন পত্র-পত্রিকায় এত দীর্ঘ সময়ব্যাপী যাত্রা নিয়ে লেখা হয় নি। সেই লেখাগুলির মাধ্যমে যাত্রা-জগতের একটা চিত্র বাংলার মানুষ জানতে পারেন। এই লেখাগুলি অবলম্বন করে কলকাতার কোন কোন অধ্যাপক প্রবন্ধ লিখে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ঢাকাতে লোকশিল্প গবেষণার উপকরণ জুগিয়েছে। তবে ঢাকার অধ্যাপক 'স্বাধীনতা'র কথা স্বীকার করেছেন, কলকাতায় সে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। এই কথা রবীন্দ্র সদনের পরিচালকদের অনেকের জানা থাকার কথা। যাত্রাকে নতুন করে পরিবেশন ও সংবাদপত্র জগতে তুলে ধরার ব্যাপারে সত্যসন্ধ

অপেরার বর্তমান অধ্যক্ষের উদ্যোগও স্বীকার্য। পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে তিনি বিভিন্ন পত্রিকার দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলেন। সর্বত্র প্রত্যাখ্যাত হয়ে একমাত্র এই প্রবন্ধের লেখক সুজনের সহায়তায় যাত্রাগানের কথা একটি মাত্র সংবাদপত্রে নিয়মিত ফিচার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এসব প্রবন্ধগুলি প্রকাশের পরে যাত্রাজগতে আলোড়ন শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে যাত্রাপালার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই পরিবর্তনে বাধা দেবার ব্যাপারে সেদিন যাঁরা সক্রিয় ছিলেন তাঁদেরই কেউ কেউ স্মারক পুস্তিকায় যাত্রার পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন। আর যাঁরা এগিয়ে নেবার ব্যাপারে চেষ্টা করেছেন—তাঁদের অভিজ্ঞতার একটা লেখাও স্থান পেলো না। যে শিল্পীদের আজীবন সাধনায় যাত্রাগান জনপ্রিয় হয়েছে, তাঁদের কথাও স্মরণ করা হয় নি কোন প্রবন্ধে। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের মত শিল্পীর মৃত্যু হল অভিনয় করতে করতে, কোন প্রবন্ধ লেখক তাঁর সম্পর্কে একটা শব্দও লিখলেন না। কিন্তু এ'রা সকলেই যাত্রা দরদী, যাত্রার পৃষ্ঠপোষক বলে নিজেদের জাহির করেন। তাঁদের লেখাগুলিতে প্রগতি-শীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ নেই। যাত্রার নতুন চিন্তাজগৎকে অভিনন্দন জানাবার মত সাহসই নেই। স্মারক পুস্তিকাটিতে কিছু ভুল তথ্য রয়েছে, সে প্রসঙ্গ আর এখানে তুললাম না। আমরা খুশি হতাম পুস্তিকাটির ব্যাপারে আরো সতর্কতা অবলম্বন করলে, সু-সম্পাদনা হলে।

যাত্রা উৎসবে যে পালাগুলি অভি-নীত হয়েছে—তাতে আজকের দিনের যাত্রাজগতের রূপ যথার্থভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি, আন্দোলন, পতিঘাতিনী সতী, হিটলার আর সূর্য সেন, এক টুকরো রুটি প্রভৃতি নাটকে যাত্রার সেকাল-একাল প্রতিফলিত। রবীন্দ্র সদনের এই উদ্যোগের আমরা আবার প্রশংসা করছি। —সুজন।

চিত্র আলোচনা

কমললতা

[পরিচালনা : হরিসাধন দাশগুপ্ত]

চারু চিত্র প্রযোজিত 'কমললতা' মুক্তিলাভ করেছে। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত চতুর্থ খণ্ডের কমললতা-গহর-শ্রীকান্ত

'মন নিয়ে' ছবিতে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

উপাখ্যান চিত্রনাট্যের অবলম্বন। শরৎ সাহিত্যের আকর্ষণ বাঙালী পাঠকসমাজে এখনো প্রবল, তার মধ্যে মেয়েদের মধ্যে সর্বাধিক। সমাজের নারীরা শরৎ সাহিত্যে নিজেদের জীবনের, সুখ-দুঃখের যথার্থ প্রকাশ দেখতে পান। তার মধ্যে কমললতা জীবনের কথা এবং গহরের অব্যক্ত প্রেম পাঠকমনে বিশেষ রেখাপাত করে। পড়তে পড়তে গহরের জন্য চোখের জল পড়া বা কমললতার জন্য মনটা কেমন যেন শূন্যোতায় ভরে যাওয়া, প্রায় সকল পাঠকেরই অভিজ্ঞতা। এই কাহিনীর চিত্ররূপ দেখার স্বাভাবিক আগ্রহ দর্শকদের রয়েছে।

এই লেখা অনেককাল আগের। সেকালের সমাজ—আর একালের সমাজে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেখানে শরৎ সাহিত্যে নারীসমাজের চিত্র নিয়ে রক্ষণশীলরা প্রতিবাদ করেছে। গহর মুসলমান, কাজেই শরৎচন্দ্রকে কত সাবধানে এই চরিত্রটি উপস্থিত করতে হয়েছে। অথচ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাঙালী সমাজের সাহিত্য তাঁকে লিখতে হচ্ছিল। সেকালে গহরকে উপস্থাপনার মধ্যে শরৎচন্দ্রের প্রগতিশীল মনের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু একালে? বিশেষ করে ছবি দেখে মনে প্রশ্ন এসেছে—গহর সম্পর্কে কি আর একটু সাহসের পরিচয় দেওয়া যেত না। বিশেষ করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত সাহিত্যিক যেখানে মূল কাহিনীকে পরিবর্ধন করেছেন বলে প্রচার করা হয়েছে। প্রথম থেকে গহরের নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের একটি দরদী চিত্র ছবিতে প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু শ্রীকান্তর উপস্থিতির পরে—একটি দৃশ্যে শ্রীকান্ত ও কমল-লতা ফুল তুলতে তুলতে কথা বলছে, অন্তরাল থেকে গহর সব কথা শুনে চুপি চুপি সরে গেল, তার পরে নিরুদ্দেশ। সেই নিরুদ্দেশ থেকে জ্বর নিয়ে ফিরে এসে তার মৃত্যু হল। গহরের চুপি চুপি সরে যাওয়ায় চরিত্রটির প্রতি অবিচার করা হয়, তার নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের চিত্র ম্লান হয়ে—প্রেমের ক্ষেত্রে ঈর্ষাকাতর বলে তাকে চিত্রিত করা হয়েছে। গহরকে এভাবে চিত্রিত করলে আজকের দর্শকের দৃষ্টিতে গহর কিছুটা ছোট হয়ে যায়, সহানুভূতি হারায়। কমললতা শ্রীকান্ত সম্পর্ক আজ-কের দিনের দৃষ্টিতে দেখলে লেখকের প্রতিও প্রশ্ন উপস্থিত হয়। শ্রীকান্ত একটি দরদীমনের চরিত্র। তার দরদী-মন, উদারতা ও সততার জন্য সে সকলের বিশ্বাস অর্জন করে। কিন্তু শ্রীকান্ত নিজে জড়িত হয়ে পড়ে না। বিশ দশকের আর ষাট দশকের শেষভাগের চিন্তাধারার মধ্যে তফাতের জন্য কি না কে জানে, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তকে যেন অনুভব করা যায় না এখানে।

কমললতা বৈষ্ণবী—আখড়ার সব দায়িত্বে সে অধিষ্ঠিতা। গ্রামের মুসলমান যুবক গহর বৈষ্ণব ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। বৈষ্ণবদের আখড়া তাকে আকৃষ্ট করে। সে গান রচনা করে, রামায়ণ রচনা করে—প্রেমের এক ভাবরাজ্যে বাস করে সংসার, অর্থ, ব্যক্তিজীবনের সুখ তার কাছে তুচ্ছ। কমললতা তার ভাব-রাজ্যের দেবী। এমন সময় গহরের বন্ধু শ্রীকান্তের আবির্ভাব হয় আকস্মিক-ভাবে। গহরের মাধ্যমে শ্রীকান্তের সঙ্গে কমললতার পরিচয়। কমললতার বিশ্বাস ও নির্ভরতার পাত্র হয়ে উঠলো শ্রীকান্ত।

কমললতা শ্রীকান্তকে শোনাল তার অতীত জীবনের বেদনাপূর্ণ কাহিনী—এক নির্মম অভিজ্ঞতার কথা। এদিকে গহরকে সেবা করার অপরাধে কমললতাকে সরে যেতে হল আখড়া থেকে। সে চলে গেল বৃন্দাবনের পথে মুক্তির আশায়।

এই কাহিনীকে চিত্ররূপ দিয়েছেন হরিসাধন দাশগুপ্ত। বহির্দৃশ্যে আর স্টুডিও দৃশ্যের মিশ্রণে ছবিটিকে গ্রামীণজীবনের—পটভূমিতে তুলে ধরার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। তার সঙ্গে বৈষ্ণবদের একটা আখড়া তাদের দৈনন্দিন জীবন, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি খুঁটিনাটি দেখান হয়েছে এক বিশ্বাস্য পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। ছবিটি গানে গানে ভরা। কিছু পদাবলী আর কিছু প্রণব রায়ের রচিত গান। পদাবলী সুরে আর রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে গানগুলি সু-গীত। প্রেম ভক্তিরসের প্রাধান্য এই গানগুলিতে কিছুটা বেশি।

অভিনয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নির্মলকুমারের নাম। তিনি গহরের ভূমিকাকে সার্থক রূপদান করেছেন। সংযত ও স্পষ্ট অভিনয়ে তিনি দর্শকমনে রেখাপাত করেন। গহর তাঁর অভিনেতা-জীবনে এক প্রসংশনীয় চরিত্র সৃষ্টি। কমললতার চরিত্রে সুচিত্রা সেনকে দেখবার জন্য দর্শকদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। তিনি তাঁর সুনাম রক্ষা করে চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। তবে কমললতা যখন উষা ছিল সেই অধ্যায়ে পরিচালক সব সময় লঙ শট নিলে তাৎপর্যপূর্ণ হত। কমললতা ও উষার জীবনে তফাৎ শুধু নয়—সময় ব্যবধান যথেষ্ট বেশি। দর্শকের কাছে কমললতা প্রত্যক্ষ, উষা অস্পষ্ট। উষাকে অস্পষ্টতার মধ্যেই থাকতে দেওয়া উচিত ছিল। শ্রীকান্তের ভূমিকায় উত্তমকুমারকে গ্রহণ করতে দর্শক হিসাবে আমার বেশ অসুবিধা হয়েছে। কারণ তাঁর আধুনিক ছবির নায়কোচিত রীতিদোষ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। শ্রীকান্ত হিসাবে তিনি ব্যর্থ। এবং তাঁরই কারণে ছবিটি কিছুটা দুর্বল হয়েছে। অন্যান্য ভূমিকায় শিল্পীদের মধ্যে পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, ছায়া দেবী, যূঁই ব্যানার্জী, রমি চৌধুরী প্রশংসনীয়। ছবিতে অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ঃ সমরকুমার, বিজন ভট্টাচার্য, জহর রায়, বীরেন চ্যাটার্জী, মণি শ্রীমানী, অজিত চ্যাটার্জী প্রমুখ আরো অনেকে।

ছবির সম্পাদনা ও আলোকচিত্রের কাজ প্রশংসনীয়ভাবে করেছেন যথাক্রমে দুলাল দত্ত ও অনিল গুপ্ত এবং সহযোগী জ্যোতি লাহা

'কমললতা' ছবিতে সুচিত্রা সেন ও যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটকের কথা

সাজাহান

গত ৩রা অক্টোবর বসুমতী রিক্রিয়েশন ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান বিশ্বরূপা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান ও শ্রীমতী ধাওয়ান। শ্রীধাওয়ান তাঁর ভাষণে বলেন বহু আন্দোলনের পথ-নির্দেশকারী এই বাংলাদেশ। বহু ভাষাভাষী-মানুষ এখানে বাস করে, কিন্তু প্রাদেশিক সংকীর্ণতা থেকে এ দেশ মুক্ত। বসুমতীর পরিচালকমণ্ডলী ও কর্মীদের পক্ষ থেকে শ্রীধাওয়ান ও সমাগত অতিথিদের অভ্যার্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

এই অনুষ্ঠান শেষে রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটক অভিনয় করেন। এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন ঃ অমিতাভ অধিকারী (সাজাহান), প্রবীর চট্টোপাধ্যায় (দারা), কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুজা), অসিত মিত্র (ঔরংজেব), অজিত ভট্টাচার্য (মোরাদ), বিনয় চক্রবর্তী (সোলেমান), নারায়ণ দে (মহম্মদ), খগেন চৌধুরী (দিলদার), পংকজ বন্দ্যোপাধ্যায় (দিলির খাঁ), সুধাংশু মুখোপাধ্যায় (জয়সিংহ), সন্তোষ ভট্টাচার্য (যশোবন্ত সিংহ), নির্মল দাস (জিহন আলি), শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী (শায়েস্তা খাঁ), ধ্রুব সাহা (মীরজুমলা), অনিল বেরা (গো রক্ষক), মহাদেব দত্ত (মাজির), চন্ডীচরণ ঘোষ, অর্জুন মোহান্ত ও তরুণ ভট্টাচার্য (সৈনিক), অনিন্দিতা অধিকারী (সিপার), শাশ্বতী রায় (জাহানারা), সবিতা মিত্র (নাদিরা), বেলা রায় (পিয়ারা), মন্দিরা দাস (জহরৎউন্নিসা), নমিতা গাঙ্গুলী (নর্তকী)।

নাটক পরিচালনায় ছিলেন রাস বিহারী দাস। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন তাপসী দে।

"চিল্ড্রেন নোভেল থিয়েটার-এর অনুষ্ঠান"

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর "চিল্ড্রেন নোভেল থিয়েটার" "বিশ্বরূপায়" সংগীত, নৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে। সভানেত্রী ইলা পালচৌধুরী ও প্রধান অতিথি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু মহাশয়ের বক্তৃতার পর পরিবেশিত হল নূপুরে ঝুমুর নাচ। এর পরেই "চিল্ড্রেন নোভেল থিয়েটার-এর" শিশু শিল্পীরা মঞ্চস্থ করলো "কাগজে বাঘ" ও "রূপকথা" নামে দুইটি মুখোশ নাটক। শিশু শিল্পীরা প্রচুর বাহবা পেলো। এর সংগে প্রশংসার দাবি রাখেন জনপ্রিয় "হরবোলা" অজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

বাটানগরে 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য

গত ৩রা অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে—উক্ত ক্লাবের সৌজন্যে নৃত্যবিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রযোজনায় ও কানাই মজুমদারের পরিচালনায়—ভা র তী য় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীদের দ্বারা 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য ও নৃত্যবিচিত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন নৃত্যে—চিত্রা চ্যাটার্জী, শুভ্রা চ্যাটার্জী, তন্দ্রা রায়, মায়া ভট্টাচার্য, অরুণা দে, ইন্দ্রাণী সেনগুপ্তা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সোমা ব্যানার্জী, পূর্ণিমা হালদার, শোভা ধর, সর্বাণী দাস, রিঙ্কু ভাদুড়ী, বিদুষী বসু, শান্তি চৌধুরী, কণিকা দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কল্পনায় ছিলেন—শ্রীবাদল রায় ও শ্রীমতী অণিমা রায়। উপদেষ্টারূপে ছিলেন—নীরেন্দ্রনাথ। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন—শ্রীমতী অনিতা চ্যাটার্জী। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন—শ্রীমতী নমিতা ঘোষ।

নাট্যানুরাগী, শিল্পীকর্মী ও গবেষকদের জন্য
বাংলা ভাষায় প্রথম থিয়েটার এ্যানথোলজি
নতুন থিয়েটার
এতে থাকছে নাট্য-আন্দোলন ও নাট্য বিষয়ক মৌলিক ও গভীর তাৎপর্যমূলক রচনাদি ও কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক নাটক। দাম: সাড়ে তিন টাকা।
পরিবেশক: পারিজা ব্রাদার্স
অফিস:
৬৮।৪, যোগীপাড়া রোড, কলিকাতা-২৮

ভারতী অপেরার 'মান্দারদা' যাত্রা পালায় সুজিত পাঠক, সব্যসাচী ও গুরুদাস

স্টুডিও খবর

মৌসুমী মন ছবির সংগীত গ্রহণ

গত ৮-৯-৬৯ তারিখে 'মৌসুমী মন' চিত্রের গান টেপ করা হয় টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত তিনটি গানে অংশ গ্রহণ করেন সুরকার শ্রীঅনিল দত্ত, চন্দ্রাণী মুখার্জী ও সুবীর সেন।

সংবাদ কনা

ইউথ পাপেট্ থিয়েটার, ইণ্ডিয়া

ইউথ পাপেট্ থিয়েটার আয়োজিত শিশুদের জন্য বাৎসরিক প্রতিযোগিতা যথারীতি সম্পন্ন হয়েছে ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর, সেণ্ট্ লরেন্স্ হাইস্কুলে।

২রা অক্টোবর এঁরা গান্ধী শতবার্ষিকী উৎসব পালন করেন এঁদেরই "ট্রেনিং সেণ্টার"—১৩৮ শরৎ বোস রোডে। সভাপতির ভাষণে শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় গান্ধীজীর আদর্শ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। শ্রীরমাপতি বসুও বক্তৃতা দেন। এ ছাড়া রচনা প্রতিযোগিতার প্রথম স্থানাধিকারী তিনজন, গান্ধীজীর জীবনীর ওপর লেখা, তাদের রচনা পাঠ করে। সংগীতানুষ্ঠানও হয়।

ডঃ রমা চৌধুরীর সভাপতিত্বে ইউথ্ পাপেট্ থিয়েটার এবার তাদের ৬ষ্ঠ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলেন—বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনে ৪ঠা অক্টোবর সন্ধ্যায়। প্রধান অতিথি, মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি· এন্· সিন্‌হা ও ডঃ চৌধুরী তাঁদের ভাষণে সংস্থার উদ্যোগ-পর্বকে সাধুবাদ জানিয়ে

বলেন—এই ছোট ছেলে-মেয়েদের দলটি পুতুল নাচকে যে শিল্পের মধ্যে প্রাধান্য দিচ্ছেন তা' দেখে তাঁরা খুশি। একথাও বলেন যে, জনসাধারণ ও সরকারের উচিত—এই শিল্পের উন্নতির জন্যে প্রয়োজন মত সহায়তা করা। ভাষণান্তে শুরু হয়—রঙে, রসে একাকার ক'রে সংস্থার পুতুল নাচের আসর। দু' ঘন্টা-ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ হাসিতে আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে।

৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার বার্তাসম্পাদক শ্রী এস্‌· বি· চ্যাটার্জী সংস্থার 'ট্রেনিং সেন্টার' ১৩৮ শরৎ বোস রোডে উদ্বোধন করেন অঙ্কন, শিল্পকলা ও 'পাপেটস'-এর এক রঙীন প্রদর্শনী। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রী চ্যাটার্জী ইউথ পাপেট্‌ থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর পরিচিতির কথা প্রকাশ করে বলেন ঃ এই সংস্থা শুধু পুতুলনাচ দেখিয়েই ক্ষান্ত নন—ছোটদের চারু-

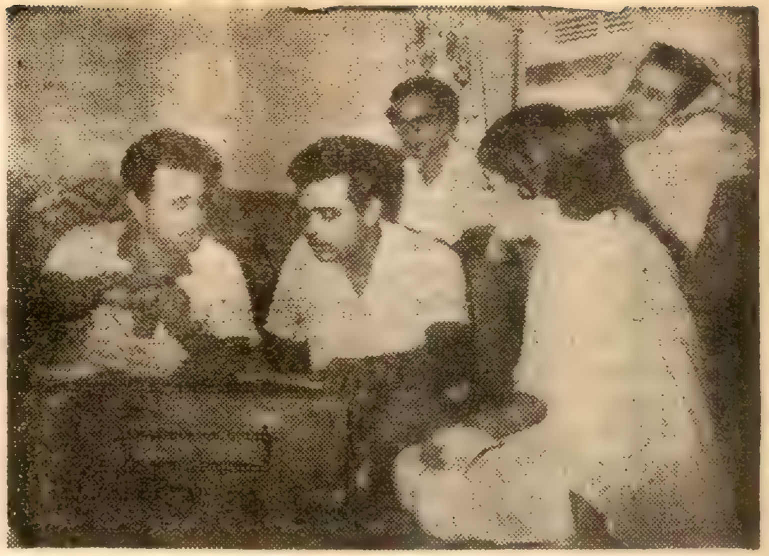

সমর চৌধুরী পরিচালিত 'মৌসুমী মন' ছবিতে সঙ্গীত গ্রহণ করছেন সঙ্গীত পরিচালক অনিল দত্ত, সুবীর সেন ও চন্দ্রানী মুখার্জী।

কলা শিল্পকলা ইত্যাদিতে আকর্ষণ করে তাদের অবসর সময়কে যে কাজে লাগাচ্ছেন তার জন্য এঁরা ধন্যবাদার্হ। তা ছাড়া প্রতি বছর বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে ছোটদের মধ্যে থেকে প্রতিভা খুঁজে বার করেছেন, এটাও প্রশংসার কথা। এবার যারা অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে তাদের ছবি ও সংস্থার সভ্য-সভ্যাদের তৈরি চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ পাপেট্‌স্‌ এবং বাটিক নিয়ে এই প্রদর্শনী ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।

বসুমতী রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যগণ অভিনীত 'সাজাহান' নাটকে সাজাহানের ভূমিকায় অমিতাভ অধিকারী ও জাহানারার ভূমিকায় শাশ্বতী রায়।

সঙ্গীত কথা

পপ গানের রেকড

গ্রামোফোন রেকর্ডের ক্ষেত্রে 'লিভিং সাউন্ড' একটি নতুন উদ্যোগ। এই প্রতিষ্ঠান বাংলায় পপ সঙ্গীত প্রচলনের জন্য চারটি গান রেকর্ড করেছে। এই গান চারটির দুটি রেকর্ড শারদীয় উৎসবের দিনে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। গানগুলি গেয়েছেন শ্রাবন্তী মজুমদার ও নন্দিতা সান্যাল। দু'জনেরই সু-কণ্ঠে গীত গানগুলি জনপ্রিয় হবে আশা করা যায়। গানগুলি রচনা করেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'লিভিং সাউন্ড' পরবর্তী সময়ে আরো গান রেকর্ডের কথা চিন্তা করছে।

পাঠক মন

লেনিন জীবনীর নাট্য রূপায়ণ প্রসঙ্গে

১৩শ সংখ্যা, ১লা আশ্বিন তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে "লেনিনের জীবনের নাট্যরূপ দেবার প্রথম কৃতিত্ব থিয়েটর লাইবর-এর"—এই সংবাদটি পড়ে বিস্মিত হলাম। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে মহান লেনিনকে উপস্থাপিত করার প্রথম কৃতিত্ব আই· টি·-এর (ইণ্ডিয়ান থিয়েটার এসোসিয়েশন-এর)। আপনার অবগতির জন্যে জানাই—এই নাটক আমরা ১৯শে নভেম্বর ১৯৬৭ সালে হরিশ মুখার্জী পার্কে, গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের উৎসব প্রাঙ্গণে প্রথম উপস্থাপিত করি। উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীমাখনলাল চ্যাটার্জী (বাপী চ্যাটার্জী) এবং সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীহরপ্রসাদ চ্যাটার্জী, শ্রীবারীন চ্যাটার্জী প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকরা। ১৯৬৮ সালে ২০শে আগষ্ট আবার লেনিন শতবার্ষিকী প্রস্তুতি সমিতির (কলিঃ ৪১) উদ্যোগে লেনিনের ৯৮তম জন্মদিবস পালন উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষের সভাপতিত্বে ত্যাগরাজ হলে একটি অনুষ্ঠান হয়। দুর্ভাগ্যবশত শেষ মুহূর্তে শিল্পীর অসুস্থতার দরুণ গোর্কীর 'মা' নাটকটি উপস্থিত করতে বাধ্য হই।

এরপর ৫ই জুলাই ১৯৬৯ ত্যাগরাজ হলে আই· টি· এ লেনিন শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করে এবং শতরজনী অভিনয়ের সংকল্প গ্রহণ করে। সেদিনের অভিনয় এই শতরজনী সংকল্পের প্রথম রজনী। আপনার পত্রিকার সাংবাদিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং গত ১লা শ্রাবণ সংখ্যায় তাঁর সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছে। অতএব লেনিন জীবনের নাট্য রূপায়ণের প্রথম কৃতিত্ব আই· টি· এ অনায়াসেই দাবি করতে পারে।

—নিবেদিতা দাস
সভাপতি
আই· টি· এ

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

বহুল প্রচারিত 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র আমি একজন একনিষ্ঠ পাঠক। পত্রিকাটি সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়—পত্রিকাটি আমার মনোমত।...কেন না অন্যান্য 'তথাকথিত' এবং বহু বিজ্ঞাপিত পত্রিকার মত সস্তায় বাজীমাৎ করার মত কোন প্রচেষ্টা এর মধ্যে নেই। নেই কোনো 'বিবরমার্কা' তথাকথিত সাহিত্যিকদের লেখা প্রকাশ করে প্রচার সংখ্যা বাড়াবার কোনো অসৎ প্রচেষ্টা। পত্রিকার প্রতিটি লেখা মূল্যবান। প্রত্যেকটি লেখক তাঁদের বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা, মানুষের বিশেষ করে নিপ্পেষিত ও সমস্যাজর্জরিত সাধারণ মানুষের অন্তরের ব্যথা-বেদনার কথা সকলের সামনে তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ধারাবাহিক রচনা বা প্রবন্ধ যেমন—শঙ্করীপ্রসাদ বসুর "সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ" এবং অনন্ত সিংহের "অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়" উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া 'বঙ্গদর্শন' এবং 'ভারতদর্শনের' লেখকদের লেখনীর জোর প্রচণ্ড। কোন কিছুকে ধামাচাপা দিয়ে লেখার কু-অভ্যাস তাঁদের মধ্যে নেই। 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক তো বাংলাদেশের স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকে দূরে সরিয়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর। তাঁর এই প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসা পাবার যোগ্য। 'সপ্তাহের বোঝা বহনকারী 'কৃত্তিবাস ওঝা' মশাইয়ের লেখা পড়ার জন্য তো ৭ দিন অপেক্ষা করা রীতিমত দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সিনেমা বিভাগে 'সুজনে'র সমালোচনা ভাল, কিন্তু উপরি-উক্ত লেখা বা বিভাগগুলির সঙ্গে 'শান্তিপ্রিয়' মোটেই তাল রাখতে পারছেন না। তাঁর লেখা আরো সমালোচনামূলক, আরো বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন মনে করি। কেন না প্রায় প্রতিটি খেলাধুলোর বিভাগেই ভারত ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। এই পিছিয়ে পড়া ভাব থেকে কীভাবে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে আসা যায় তার চিন্তাও আমাদের করতে হবে বৈকি! —এত সব হবার পরও কিন্তু কিছু ভুল-ত্রুটি থেকেই যায় যেমন—এবারকার সংখ্যায় (2nd Oct. 1969) প্রকাশিত অনিমেষ সেনের গল্প 'মধ্যাহ্নের ব্যাধ' পড়তে পড়তে খেই হারিয়ে ফেলতে হলো, কেন না ছাপা আগে-পরে হয়ে গেছে। ৯৪৬ পাতার পর নিশ্চয়ই ৯৫০ পাতার লেখা পড়তে হবে, আবার ৯৫০ পাতার লেখার পর পড়তে হবে ৯৪৭ পাতার লেখা। যদিও এ ধরণের ভুল হওয়া স্বাভাবিক, তবুও এতখানি ভুল হওয়া একটু দৃষ্টিকটু দেখায় নাকি? আশা করি এদিকে একটু দৃষ্টি দেবেন।

—শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ
নিবারণপুর, রাঁচী—২

'তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স' প্রসঙ্গে

কিছুকাল থেকে সাপ্তাহিক বসুমতীর পাতায় জনৈক অগ্নিবর্ণ লিখিত "তিমিত প্রান্ত ডুয়ার্স" গভীর ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সঙ্গে পাঠ করছি। উত্তরবাংলার এ প্রান্তে নীরব ইতিহাসের যবনিকা উন্মোচিত করে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। সমাজ নিরীক্ষার আলোকে বর্তমান ও অতীতকে রস-সঞ্চারী করে তোলা অসাধারণ কৃতিত্বের দাবি রাখে। নেপথ্যে থেকে একটি বলিষ্ঠ প্রয়োজনীয় বক্তব্য সম্পাদনের জন্য এই জাতীয় রচনাকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আশা করি এই জাতীয় রচনা আপনার সাপ্তাহিকে আরও স্থান পাবে।

—সোনা বসু
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর
দার্জিলিং

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতী যা কিছু প্রকাশ করে তা জনস্বার্থেই প্রকাশ করে থাকে। তাতে ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ কারোর প্রতি নেই, তা বলাই বাহুল্য।

গত ১৭ই এপ্রিল, ১৯৬৯ (৪ঠা বৈশাখ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ) তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে কৌশিক বসু লিখিত নিকট দূর পর্যায়ে 'পাঠক সাবধান' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ নিবন্ধে প্রকাশিত তথ্যগুলি ঠিক নয় বলে আমি শ্রী বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি পত্র পাই। কিন্তু সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে যথাযথভাবে অনুসন্ধান করতে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় আমার মন্তব্যসহ সেই পত্রটি প্রকাশ করতে পারি নি।

বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, কৌশিক বসুর নিবন্ধের তথ্যসমূহ ঠিক নয়। উক্ত নিবন্ধে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কে যে তথ্যসমূহ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর দিকে খোলা চোখে তাকালে বোঝা যায়, তাঁর সম্বন্ধে অপপ্রচার করবার মতো স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অভাব নেই। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ব্যাপারে যে সমস্ত মন্তব্য শ্রীযুক্ত কৌশিক বসু করেছিলেন, তাও হয়তো ঐ মহলের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েই। অথচ এর জন্য ঝড়-ঝাপ্টা সহ্য করতে হয়েছে গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়কেই।

আমাদের প্রবন্ধের ফলে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের যে ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

—জয়ন্তী সেন
সম্পাদিকা, সাপ্তাহিক বসুমতী

কেন এই পরাজয়

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় টেস্টে ভারত হেরে গেলো। শুধু হেরে গেলো বললেই বোধহয় সবটা বলা হবে না, বরঞ্চ বলতে হবে বিশ্রীভাবে লোক হাসিয়ে বিশ্বের দুর্বলতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিউজিল্যাণ্ডের কাছে ভারত হেরে গেলো লজ্জাজনকভাবে। ভারতের এই হাল ক্রিকেটরসিকদের কাছে একেবারেই কি অপ্রত্যাশিত? হয়তো তাই! প্রথম টেস্টের সেই নাটকীয় জয়লাভের পর দ্বিতীয় টেস্টে অকল্পনীয় পরাজয় নিঃসন্দেহে অভাবনীয়।

আজ তাই সবার মনে একই প্রশ্ন—কেন এই পরাজয়? কেন এমনভাবে ভারত হারলো? কেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা নিউজিল্যাণ্ডের বোলারদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলেন না।

সত্যি কথা বলতে কি এই প্রশ্নগুলির বিশেষ কোন উত্তর নেই। শুধু এককথায় বলা যায় যে, ভারতের এই শোচনীয় দশার পেছনে আছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রীড়াধারার চিরন্তন পন্থা।

যাক সে কথা। অন্য প্রসংগে আসা যাক। পাঠক-পাঠিকাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, ভারতীয় দল গঠন নিয়ে অর্থাৎ ভারতীয় দলের পক্ষে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মনোনয়ন নিয়ে আমরা বারবার তীব্র সমালোচনা করেছি। আমরা বার বার বলেছি যে, এইভাবে খেলোয়াড় নির্বাচন করে আর যাই হোক না কেন, আসল কাজের কাজ হবে না। আর সত্যিই যে তা হতে পারে না, তার প্রমাণ হলো নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের পরাজয়। আজ শুধু একটা কথা ভেবে দেখুন, নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যদি ভারতের এই হাল হয় তাহলে অস্ট্রেলিয়ার সংগে খেলতে গিয়ে আমাদের কি অবস্থা হবে! অথচ আর মাত্র এক মাসের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া এসে যাবে ভারত সফরে। তখন কি হবে?

তখনকার কথা বাদ দিয়ে এখন না হয় এখনকার প্রসংগে আসা যাক। দ্বিতীয় টেস্ট দলে ভারতীয় দলে ব্যাটসম্যান হিসেবে ছিলেন চৌহান, আবিদ আলী, ওয়াদেকার, সুর্তি, পাতৌদি, অশোক মানকাদ, অম্বর রায়, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার—ভেঙ্কটরাঘবনও মোটামুটি ভাবে ভালাই ব্যাটিং করেন। অর্থাৎ ভারতীয় দলে ছিলেন আটজন ব্যাটসম্যান। ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের দিক দিয়ে এ'দের অনেকেই আজ খ্যাতির উচ্চতম শিখরে।

কিন্তু প্রয়োজনের সময় কে কি করলেন সেইটাই দেখার বিষয়। প্রথম টেস্টেও দু-একজন ছাড়া ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে বিশেষ কেউ খুব একটা সুবিধে করতে পারেন নি। দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের হাল আরো শোচনীয়। আর তারই মাশুল দিতে গিয়ে ভারতকে বরণ করে নিতে হল বিশ্রী রকমের পরাজয়।

সত্যিকথা বলতে কি ভারত একেবারেই ছোট করে দেখেছিল নিউজিল্যাণ্ডকে অর্থাৎ তাদের আণ্ডার এস্টিমেট করেছিল। কিন্তু আমরা এই বিষয়েই

॥ চার বছর আগের দৃশ্য ॥

চার বছর আগে নিউজিল্যাণ্ডের ভারত ভ্রমণের সময় কলকাতা টেস্ট ম্যাচের সময়কার একটি দৃশ্য। ছবিতে সার্টক্লিফ আর টেলরকে দেখা যাচ্ছে।

বার বার সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখেছিলাম। আমরা লিখেছিলাম যে নিউজিল্যান্ডকে কোন মতেই আন্ডার এস্টিমেট না করে, এই খেলাগুলোকে আসন্ন ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট মরশুমের প্রস্তুতি হিসেবে নিতে।

কিন্তু তার কোন প্রয়োজন বোধ করলেন না ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সিলেকশান কমিটি এবং খেলোয়াড়রা। ভারতীয় ক্রিকেটের হর্তাকর্তা বিধাতারা নিজেদের স্বার্থের দিকটাই বড় করে দেখলেন আর খেলোয়াড়রা নিউজিল্যান্ডের সংগে আবার কি খেলবে, এই ভাব নিয়ে খেলে দেশের মান-সম্মান ডুবোতে বসলেন।

আগে আমরা দেখেছি কোন টেস্ট মরশুমের আগে বসতো একটা কোচিং ক্যাম্প। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নামী এবং উদীয়মান খেলোয়াড়রা যেতেন অভিজ্ঞ কোচের নির্দেশে কিছুদিন নির্ভেজাল অনুশীলনের জন্যে। সেখানে ব্যাটিং বোলিং এবং ফিল্ডিং কসরত্ চলতো। আর শেষ পর্যন্ত এঁদের মধ্যে থেকেই নির্বাচন করা হতো টেস্ট খেলোয়াড়দের। বিদেশী দলের ভারত সফরের সময় এই কোচিং ক্যাম্পের প্রয়োজনীয়তা হয়তো অনেকের কাছে নেই—কিন্তু এই ধরণের কোচিং ক্যাম্পের মূল্য এবং গুরুত্ব যে কতোখানি তা বোধহয় আর বলে দেবার প্রয়োজন রাখে না। কিন্তু এ বছর সে সব দরকার আছে বলে মনে করেন নি ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ। তবে এরও যে প্রয়োজন ছিল তা বোধহয় এখন জলের মতো স্পষ্ট।

॥ অম্বর রায় ॥

প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে অম্বর প্রথম ইনিংসে করেছেন মন মাতানো ব্যাটিং। তৃতীয় টেস্টে ভালো খেলার ওপর এখন নির্ভর করছে টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবন।

॥ জয়সীমা ॥

শেষ পর্যন্ত তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে অংশগ্রহণ করার জন্যে জয়সীমার ডাক পড়লো।

দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হলো, ভারতীয় খেলোয়াড়দের ফিল্ডিং আর একের পর এক ক্যাচ ফেলে দেওয়া। ভারতীয় খেলোয়াড়রা যদি নিউজিল্যান্ডের প্রথম এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যাচগুলো ঠিকভাবে ধরতে পারতেন, তাহলে নিউজিল্যান্ড কোন ইনিংসেই বেশি রান করতে পারতো না—ফলে খেলার ধারাও হয়তো বদলে যেতো—বলা যায় না ফলাফলও অন্যরকম হতে পারতো।

কথায় বলে, 'ক্যাচ ধরায়, ম্যাচ জেতায়'—এই প্রবাদটা যে কতো সত্যি তার প্রমাণ এবার পাওয়া গেলো। অবশ্য তাতে খুব একটা বেশি লাভ হবে বলে মনে হয় না। কারণ ভারতীয় খেলোয়াড়দের ফিল্ডিং চিরকালই অত্যন্ত নিম্নস্তরের। কিন্তু এই বিষয়ে উন্নতি করার যে প্রয়োজন আছে এ কথা আমরা কখনো ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষকে বলতে শুনি নি এবং তার জন্যে চেষ্টা করার কথাও কারো জানা আছে বলে মনে হয় না।

অথচ ভারতের পাশে নিউজিল্যান্ডের ফিল্ডিং কতো উন্নত ধরণের। নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়রা ধরতে গেলে ক্যাচই মিস করেন নি ভারতের বিরুদ্ধে খেলার সময়। শুধু ক্যাচ লোফাতেই নয়, গ্রাউন্ড ফিল্ডিং-এও তাঁরা ছিলেন নিপুণ। কিন্তু কিছু দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা তো আমাদের স্বভাব নয়।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নতুন খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু তাই বলে পুরনো খেলোয়াড়দের বিশেষ কয়েকজনের কথা একেবারে ভুলে যাওয়ার কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে? কতকগুলো সংগত কারণেই জয়সীমাকে ভারতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। পরের মরশুমে ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের মাঝপথে জয়সীমাকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হলো। সেখানে গিয়ে জয়সীমা সকলকে তাক লাগিয়ে দেবার মতো খেলা খেললেন। তাই সকলের আশা ছিল যে, আর যাই হোক জয়সীমাকে অন্তত উপেক্ষা করা হবে না। কিন্তু......

আমাদের মনে হয় জয়সীমা আর ইঞ্জিনীয়ারকে দিয়ে ভারতীয় দলের ইনিংস সূচনা করা উচিত ছিল। সারদেশাইকেও আর একবার সুযোগ দিয়ে দেখলে জানি না কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হতো।

আজ এই প্রসংগে আমার মনে পড়ছে স্বর্গত স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের কথা। ওরেল বলেছিলেন, ভারতে এমন অনেক খেলোয়াড় আছেন যাঁদের নিয়ে দল গড়লে ভারত সত্যি সত্যিই খুব শক্তিশালী দল হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। তবে ভারতীয় দলে সব চেয়ে বেশি দরকার স্পেস বোলারের। ভারতীয় দলে ভালো স্পেস বোলার থাকলে আর ভারত যদি আন্তরিকতার সংগে প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে।

কিন্তু ওরেলের কথা শুনছে কে আর এ প্রচেষ্টা কি সত্যিই কোনদিন চালানো হয়েছে? ভারতে ফাস্ট বোলার তৈরির জন্যে কি কখনো তেমন কিছু করা

(শেষাংশ ১০৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

॥ একনাথ সোলকার ॥

তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে সোলকার এর মধ্যেই অর্জন করেছেন যথেষ্ট সুনাম। এবার তিনি লাভ করলেন টেস্ট ক্যাপ। দেখা যাক তৃতীয় টেস্টে তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেন কি না!

খেলাধুলা

শুধু একটি টিকিট

অনেক টানাহ্যাঁচড়া, অনেক টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কলকাতার চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ পরিচালনার ভার পড়লো সি এ বি-র ওপরেই। ভালোই হলো। অনেক আগেই এ দায়িত্ব সি এ বি-কে ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। ডিসেম্বর মাসের বারো তারিখ নাগাদ কলকাতায় টেস্ট ম্যাচ আরম্ভ হবে। ধরতে গেলে তাই আর দুটো মাসও নেই। ইডেনকে ক্রিকেটের নন্দনকানন হিসেবে পরিণত করতে অর্থাৎ মাঠ ও পিচ তৈরি করে ফেলতে এই সময় মোটামুটিভাবে যথেষ্টই, বিশেষ করে এবার যখন ইডেনে ফুটবলের আসর বসে নি। যাই হোক কলকাতায় টেস্ট ক্রিকেটের আসর বসেছে প্রায় দু বছর আগে। আর তাই এই মুহূর্তে দু বছর আগে ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারীতে ইডেন উদ্যানে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট ম্যাচের সময় যে কলঙ্কিত, যে অভাবনীয় অঘটন ঘটেছিল তার কথাই আজ বার বার মনে পড়ছে। সেদিনের সেই কেলেঙ্কারীর পেছনে ছিল চাহিদার দিকে তাকিয়ে স্থানের কথা না ভেবে অনেক বেশি টিকিট বিক্রী করার ফল। খেলা-পাগল বাংলাদেশের দর্শকরা অনেক কষ্টে টিকিট জোগাড় করে মাঠে এসেছিলেন খেলা দেখতে। কিন্তু টিকিট থাকা সত্ত্বেও যদি খেলা দেখার সুযোগ তাঁরা না পান তাহলে কেন চুপ করে থাকবেন তাঁরা? তাই সেদিন ইডেন উদ্যানে ঘটেছিল তুলকালাম কান্ড। যা শুধু কলকাতা বা বাংলাদেশকেই নয় সমস্ত ভারতবর্ষকেই ছোট করে তুলেছিল ক্রিকেট বিশ্বের কাছে। কলকাতায় আবার টেস্ট ম্যাচের সময় ঘনিয়ে আসছে, টেস্ট খেলার দিন এগিয়ে আসার সংগে তাল দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ছে টিকিটের চাহিদা। এর মধ্যেই চেনা-জানা অনেকেই টিকিটের জন্যে আবেদন জানাতে শুরু করেছেন। মনে হয় পুজোর পরেই টিকিটের চাহিদা উঠবে তুঙ্গে।

তাছাড়া আরো একটা বিষয়ে এবার একটু চিন্তা করার দরকার আছে। ফুটবলের সময় চ্যারিটি খেলাতেও সরকারী দপ্তরের পাস নিয়ে এবং না নিয়ে এবার যে ভাবে অনেকে মাঠে ঢুকেছেন কিম্বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কেউ কেউ তাঁদের মাঠে ঢুকিয়েছেন—তা এতোকাল ছিল কল্পনার বাইরে। ফুটবলের চ্যারিটি ম্যাচেও যখন এ কান্ড হতে পারে তখন টেস্ট ক্রিকেটের সময় যে হবে না, একথা কে বলতে পারে! মনে হয় এবার ঐ কান্ডটা আরো বেশি করে হবে। আর রাইটার্স বিল্ডিংস-এ বোধহয় টিকিটও এবার অনেক যাবে। এই প্রসংগে সরকারী ক্রীড়াদপ্তর আর সি এ বি-র কাছে আমাদের অনুরোধ, খুঁটির জোর যাঁদের আছে তাঁরা যে কোন ভাবেই হোক না কেন টিকিট পাবেনই। কিন্তু সাধারণ ক্রীড়ারসিক যাঁদের খুঁটির কিম্বা মামার কোন জোরই নেই তাঁদের দিকেও এবার একটু কৃপাদৃষ্টি দিন। কোন ক্লাবের সদস্য না, কিম্বা হোমরা-চোমরা কারো সংগে চেনা-জানা নেই বলে তাঁরা যে টিকিট সংগ্রহ করার কোন সুযোগই পাবেন না—এ ব্যবস্থা ঠিক নয়। তাই আমাদের বিনীত অনুরোধ, যাই হোক না কেন সাধারণ দর্শকদের জন্যে যেন এবার টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থা থাকে। আমরা জানি, এদিক-ওদিক থেকে এবার অনেক টিকিটই অনেক দিকে যাবে—তারই কিছু অংশ সাধারণ ক্রীড়ারসিকদের কাছে বিক্রী করার জন্যে আমরা দাবি জানাচ্ছি। আমরা চাই, যাঁরা একটা টিকিটের জন্যে চাতকদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, মাথা খুঁড়ে মরেন—তাঁরাও যেন এবার পান টিকিট কেনার অন্তত একটা সুযোগ......।   —শান্তিপ্রিয়

ওপরের ছবি তুলেছেন: সুধীর মল্লিক

ক্রিকেটের খবর

বম্বের প্রথম টেস্টে নাটকীয়ভাবে জেতার পর নাগপুরের দ্বিতীয় টেস্টে ভারত ১৬৭ রানে হেরে গেছে। শুধু হেরে গেছে বললে ভুল হবে, বলতে হবে অসহায়ের মতো পরাজিত হয়েছে। বিশ্বের দুর্বলতম ক্রিকেট দল নিউজিল্যাণ্ড ব্যাটিং-বোলিং এবং ফিল্ডিং-এ দিয়েছে ভারতের চেয়ে অনেক বেশি কৃতিত্বের পরিচয়।

আর তারই জের টেনে ভারতের মাটিতে নিউজিল্যাণ্ড লাভ করলো প্রথম জয়লাভের সম্মান। এর আগে নিজেদের দেশে নিউজিল্যাণ্ড আর একবার হারিয়ে দিয়েছিল ভারতকে।

যাই হোক রাবার এখন দু'দেশের কাছে মোটামুটি মুক্ত। দু'দেশই জিতেছে একটি করে টেস্টে। হায়দ্রাবাদের তৃতীয় টেস্টের ওপরই এখন নির্ভর করছে রাবারের ভাগ্য। এর আগে নিউজি-

॥ আবিদ আলী ॥

ভারতের সূচনাকারী ব্যাটসম্যান হিসেবে আবিদ আলী হয়তো নিজের স্থানটা পাকা করে নিতে পারবেন।

ল্যাণ্ডের সংগে ভারতের তিনটি মরশুম খেলা হয়েছে। প্রতিবারই রাবার দখল করেছে ভারত। নিউজিল্যাণ্ড এখনো রাবার জয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তৃতীয় টেস্টে তারা যদি ভারতকে হারাতে পারে তাহলে তাদের এতোকালের স্বপ্ন সার্থক হবে।

তাই মনে হয় হায়দ্রাবাদের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচটা জমবে খুব। তবে তৃতীয় টেস্টেও ভারতের পক্ষে দু'জন নতুন টেস্ট ক্যাপ পাচ্ছেন। চৈতন চৌহান আর অশোক মানকাদের জায়গায় নির্বাচিত হয়েছেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাটা ব্যাটসম্যান অশোক গান্দোত্রা আর বম্বের একনাথ সোলকার। তৃতীয় টেস্টে বাদ পড়ছেন সুর্তিও, তাঁর স্থানে এসেছেন হায়দ্রাবাদের প্রবীণ খেলোয়াড় এম এল জয়সীমা। তৃতীয় টেস্টে তাই মনে হয় জয়সীমা আর আবিদ আলীই দলের সূচনা করবেন। তবে ঐ টেস্টটি জয়সীমার কাছে একটা বিরাট পরীক্ষা। তৃতীয় টেস্টে সাফল্যের ওপরই নির্ভর করছে জয়সীমার ভবিষ্যৎ জীবন।

যাই হোক তৃতীয় টেস্টে ভারতের পক্ষে খেলবেন—পাতৌদির নবাব (অধিনায়ক), ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (উইকেটরক্ষক), এম এল জয়সীমা, আবিদ আলী, অজিত ওয়াদেকার, ই এ এস প্রসন্ন, বি এস বেদী, এস ভেংকটরাঘবন, অম্বর রায়, অশোক গান্দোত্রা ও একনাথ সোলকার। দ্বাদশ ব্যক্তি—রুসি সুর্তি। অতিরিক্ত—ইন্দারজিৎ সিংজী (উইকেটরক্ষক) ও সুব্রত গুহ।

তৃতীয় টেস্টের কথা থাক। এখন বরঞ্চ ফিরে আসা যাক দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের কথায়। দ্বিতীয় টেস্টে ডাউলিং-এর টসে জেতাই নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে খুব সুবিধের হয়ে যায়। সেই সংগে নিউজিল্যাণ্ড পুরোপুরিভাবে পায় ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের ত্রুটিপূর্ণ ফিল্ডিং-এর সুযোগ।

সেই সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে

দুই অধিনায়কের কে কি বললেন

আশা পূর্ণ হলো : ডাউলিং
ফিল্ডিংই হারিয়ে দিলো : পাতৌদি

দ্বিতীয় টেস্টে ভারতকে হারাতে পেরে নিউজিল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের সংগে দলের অধিনায়ক গ্রাহাম ডাউলিংও আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। ডাউলিং বলেন যে, তাঁর অনেক দিনের আশা পূর্ণ হলো নাগপুরের দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড জয়লাভ করায়। তিনিই হলেন দ্বিতীয় অধিনায়ক যাঁর নেতৃত্বে নিউজিল্যাণ্ড বিদেশের মাটিতে জয়লাভের সম্মান অর্জন করলো। এর আগে মাত্র একবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নিউজিল্যাণ্ড বিদেশে জয়লাভ করেছিল। ভারতের পরাজয় প্রসংগে ডাউলিং বলেন যে, টসে জয়লাভ করাই তাঁদের জেতার প্রধান কারণ হলেও, ভারতীয় খেলোয়াড়দের দুর্বল ফিল্ডিং আর ক্যাচ ফেলে দেওয়াই তাঁদের জয়লাভকে অনেক সহজ করে তুলেছিল।

* * * * * *

দ্বিতীয় টেস্টে জয়লাভের জন্যে নিউজিল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের এবং অধিনায়ককে অভিনন্দন জানিয়ে পাতৌদি বলেন যে, খেলার ধারা অনুযায়ী যোগ্য দলই জয়লাভ করেছে। তিনি আরো বলেন যে, টসে হারাই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়ালো, খারাপ পিচে টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ হারানো বড় বিশ্রী ব্যাপার। আর শেষ পর্যন্ত তার খেসারত দিতে ভারতকে হার স্বীকার করে নিতে হলো। পাতৌদির মতে ভারতের এই পরাজয়ের জন্যে ব্যাটসম্যানদের চেয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ফিল্ডিং-ই অনেক বেশি দায়ী। ভারতীয় খেলোয়াড়রা বার বার ক্যাচ ফেলে দিয়েছেন এবং সহজ বলগুলো পর্যন্ত আটকাতে পারেন নি ভারত যদি ভালোভাবে ফিল্ডিং করতে পারতো তাহলে নিউজিল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসে দু'শ' রানের কাছাকাছিতে আউট হয়ে যেতো। বলা যায় না খেলার ফলাফল তাহলে অন্য রকমও হতে পারতো।

নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসে করলো ৩১৯ রান। অথচ ভারতীয় খেলোয়াড়রা যদি ঠিকমত ক্যাচ লুফতে পারতেন আর ফিল্ডিং-ও অমন ত্রুটিপূর্ণ না হতো তাহলে হয়তো নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস দু'শো রানের আশেপাশেই শেষ হয়ে যেতো। এর মধ্যে ছিল ডাউলিং-এর ৬৯, কংডনের ৬৩ ও বার্জেসের ৮৯ রান। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে বেদী ৯৮ রানে ৪টি, ভেঙ্কটরাঘবন ৫৯ রানে ৩টি ও প্রসন্ন ৯২ রানের বিনিময়ে পান ২টি উইকেট।

প্রথম ইনিংসে ভারত কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবিদ আলী ৬০, অম্বর রায় ৪৮, ইঞ্জিনিয়ার ৪০ আর ওয়াদেকার ৩২ রান করায় ভারত ২৫৭ রান করে। নিউজিল্যান্ডের হাওয়ার্থ ৬৬ রানে ৪টি, বার্জেস ২৩ রানে ৩টি ও পোলার্ড ৩৩ রানে ২টি উইকেট পেয়ে বোলিং-এ সাফল্য লাভ করেন।

৬২ রানে এগিয়ে থেকে নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে ও ভারতীয় খেলোয়াড়দের দুর্বল ফিল্ডিং-এর সুযোগ নিয়ে ২১৪ রান করে এগিয়ে যায় ২৭৬ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের টারনার ৫৭, হ্যাডলে ৩২ রান করেন। বোলিং-এ ভারতের ভেঙ্কটরাঘবন ৭৪ রানে ৬টি ও প্রসন্ন ৬১ রানে ২টি উইকেট পান।

২৭৭ রান করলে ভারত জিতবে এই অবস্থায় ব্যাটিং করতে নেমে চতুর্থ দিনের শেষে ভারত করে ৭ উইকেটে ৮৬ রান। পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিন মধ্যাহ্ন ভোজের আগেই ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায় মাত্র ১০৯ রানের মাথায়। ফলে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে নিউজিল্যান্ড ১৬৭ রানে ভারতকে হারিয়ে দেয়।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়াদেকার ২৩ আর পাতৌদির ২৮ রান করা ছাড়া আর কেউ দাঁড়াতেই পারেন নি। নিউজিল্যান্ডের হাওয়ার্থ পেয়েছেন সব থেকে বেশি উইকেট। ২৩ ওভার বল করে মাত্র ৩৪ রান নিয়ে তিনি লাভ করেছেন ৫টি উইকেট। আর পোলার্ড ২১ রানের বিনিময়ে পেয়েছেন ৩টি উইকেট।

দেখা যাক হায়দ্রাবাদের তৃতীয় টেস্টে কি হয়!

পাঠকের কলম থেকে

একটি সমীক্ষা

সুধীর সিংহ

বম্বেতে অনুষ্ঠিত ভারত-নিউজিল্যান্ডের এই সিরিজের প্রথম টেস্টে ভারতের ৬০ রানে জয় ক্রিকেট মরশুমের শুভ সূচনা করেছিল। কিন্তু নাগপুরে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ১৬৭ রানে ভারতের পরাজয়—ঐ শুভ সূচনার মাঝে একটা কালো সীমারেখা টেনে দিয়েছে। এই টেস্টে প্রথম থেকেই নিউজিল্যান্ড দলের বোলাররা প্রবল বিক্রমে বল করেছিল। আঘাত হেনেছিল ভারতীয় ব্যাটসম্যানের ওপর বার বার। মাত্র ১৫৫ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ। অজিত ওয়াদেকার ছাড়া কেউই আস্থার সঙ্গে খেলতে পারেন নি। ১৫৫ রানের জবাবে নিউজিল্যান্ড করল ২২৯ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ২৩০ রানের মধ্যে অধিনায়ক পাতৌদির ৬৪ রান। জয়ের জন্য নিউজিল্যান্ডের প্রয়োজন ১৮৮ রান। শেষদিনের খেলায় প্রথম ৩০ মিনিটে রান ওঠে মাত্র ১৯। জয়লাভের জন্য এই রান নিশ্চয়ই শুভ ইংগিত নয়। তাই অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই নিউজিল্যান্ড দলকে পরাজিত হতে হলো। আগন্তুক দলের ওপর প্রধান আঘাত হেনেছিল ভারতের দুই স্পিনার প্রসন্ন ও বেদী।

কিন্তু ভাল বল করে ব্যাটসম্যানকে পরাস্ত করলে কি হবে? ফিল্ডিং যদি আলগা হয়, ক্যাচ যদি ফসকে যায় তাহলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। নাগপুরে দ্বিতীয় ম্যাচ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ফিল্ডিং-ই ম্যাচ জেতায় আবার হারায়ও। নাগপুর টেস্টে ভারতীয় দলের নিচুমানের ফিল্ডিং-ই হচ্ছে পরাজয়ের কারণ। বছর দশেক আগে ফিল্ডিংএ ভারতীয় ক্রিকেটারদের খুবই দুর্নাম ছিল। কয়েক বছর আগে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সেই দুর্নাম কিছুটা ঘোচে। ফিল্ডিংয়ের মানও ক্রমশ উন্নত হচ্ছিল। কিন্তু নাগপুর মাঠে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা যে দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, তা দেখে মনে হয় ভারতীয় ক্রিকেটের সেই দুর্দিন বুঝি আবার ঘনিয়ে এলো। এ সম্পর্কে ভারতের দুই প্রাক্তন অধিনায়ক লালা অমরনাথ ও পলি উম্রিগড় একই ধরণের মন্তব্য করেছেন।

ভারতীয় ক্রিকেটে অলরাউণ্ডার হিসাবে রুসি সুর্তির নাম আছে। তার ওপর গত ক্রিকেট মরশুম থেকেই তিনি অস্ট্রেলিয়ায় নিয়মিত খেলছেন। তাই এবার তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু তাঁর খেলা দেখে মন ভরে নি। কি ফিল্ডিং, কি বোলিং, কি ব্যাটিং। কোনটাতেই ধার ছিল না। প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচে জায়গা পেয়ে বাংলার অম্বর নিজের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন। নাগপুরের মাঠে প্রথম ইনিংসে তাঁর মনমাতানো ভঙ্গিতে ৪৮ রান দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল। ফিল্ডিংয়ে ওয়াদেকার, প্রসন্ন, বেদীকে আরো তৎপর হতে হবে।

ভারত-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় ম্যাচে মানকড়, চৌহান, সুর্তিকে বাদ দিয়ে প্রবীণ জয়সীমা, গান্দাত্রা ও সোলকারকে নেওয়া হয়েছে। নাগপুর টেস্টের পরাজয়ের গ্লানি রোধ করার জন্য আশা করবো ভারতীয় দল আপ্রাণ চেষ্টা করবে। ভারত-নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজের ওপর অনেক খেলোয়াড়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বস্তুতপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলার আগে এটা তার মহড়া। তাই নবীনরা তাদের অন্তর্ভুক্তির দাবি জোরদার করার জন্য রীতিমত উঠে পড়ে লাগবে।

[১০৮৪ পাতার পর]

হয়েছে? বিদেশ থেকে দু-চারজন ফাস্ট বোলার এনে নিজেদের দায়িত্ব সেরেছেন ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড। ফলে কাজের কাজ কখনো হয় নি।

শুধু তাই নয়, ভারতে হয়তো সত্যিই কোন ফাস্ট বোলার নেই, কিন্তু যে সব মিডিয়াম পেস বোলার আছেন—তাঁদের দিকেও তো খুব একটা নজর দেওয়া হয় না। তাঁদের বরঞ্চ রাখা হয় উপেক্ষিতের তালিকায়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের কথাই ধরা যাক না কেন। সে টেস্টে সুব্রত গুহ কিম্বা অজিত পাই—কারোরই স্থান হয় নি। অথচ ভারতীয় দলে ওঁদের দু'জনের মধ্যে অন্তত একজনের প্রয়োজন যে খুব বেশি ছিল এ কথা বোধহয় আজ আর কাউকে না বললেও চলে। কারণ স্পিন বোলারদের সাফল্যের পেছনে পেস বোলারদের সাহায্য অনেক সময় খুব বেশিভাবেই দরকার হয়। আর দ্বিতীয় টেস্টেও সে প্রয়োজন বার বার অনুভূত হয়েছে।

শুধু মাত্র স্পিন বোলারদের ওপর নির্ভর করে যে ম্যাচ জেতা যায় না, তার প্রমাণ হলো ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি। তবে ভারতের ফিল্ডিং ভালো হলে ফলাফল যে কি হতো—তা বলা যায় না। তবে যাই হোক না কেন, আজ বেশ ভালোভাবে পরিস্থিতি উপলব্ধি করার সময় এসেছে, সময় এসেছে নিজেদের অবস্থাটা আর একবার যাচাই করে নেবার।

নিউজিল্যান্ড খেলছে, অস্ট্রেলিয়া আসছে—কিন্তু আজ আমরা কোথায়......?

প্রশ্ন উত্তর

তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা—১২)

উত্তর : ১৮৯৩ সালে আই· এফ· এ শীল্ড খেলা শুরু হয়। প্রথম বছর থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত আই· এফ· এ শীল্ড বিজয়ী দলের নাম জানানোর মতো জায়গা কই। তাই সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আপনি যদি বিশেষ কোন বছরের কথা জানতে চান তাহলে জানাবেন।

সমীর দে মজুমদার (ইস্ট টাউন, বাবুপাড়া, কুলটি)

প্রশ্ন : আই এফ এ শীল্ড কি কোনবার কলকাতার বাইরের দল লাভ করেছে।

উত্তর : অনেকবার করেছে।

ক্রীড়া সম্পাদক সমীপেষু

শ্রদ্ধেয় ক্রীড়াসম্পাদক মহাশয়,

১লা আশ্বিনের সাপ্তাহিক বসুমতীতে শ্রীপ্রদীপ্ত চক্রবর্তীর লেখা "পর্বতাভিযান ও ট্রেলস গিরিপথ" অতিক্রমের কথা পড়লাম। তিনি লিখেছেন যে, ১৮২৭ খৃঃ কুমায়ুনের ডেপুটি কমিশনার মিঃ জি ডব্লু ট্রেলস প্রথম এই পথ অতিক্রম করেন। কিন্তু এই প্রসংগে একজন ভারতীয়ের নাম উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন। **পথ প্রদর্শক শ্রীমালক সিং বুদারই** মিঃ ট্রেলসকে এই পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন খুব সম্ভবত ১৮৩০ (১৮২৭ খৃঃ নহে) তাঁরা ১৭,৫০০ ফুট শৃঙ্গ অতিক্রম করে গৌরীগঙ্গা উপত্যকায় মার্তোলি গ্রামে পৌঁছান। ইতি—

শ্রীসুনীলকুমার নিয়োগী
আপকার গার্ডেন, জি টি রোড,
আসানসোল।

চুম্বক

১৮৯১ সালের কথা।

ফুটবল খেলায় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ দল।

একদিন ক্যালিফোর্নিয়ার দুইটি খেলোয়াড় ছাত্রের সংগে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রের দেখা। স্টানফোর্ডের ছাত্রটি কথা প্রসংগে জানাল যে, স্টানফোর্ডে সে একটি ভাল ফুটবল দল গড়ে তুলবে। এই কথা শুনে ক্যালিফোর্নিয়ার ছাত্র দুইটি একটু হাসলো। তাদের হাসাহাসি দেখে স্টানফোর্ডের ছাত্রটি বলল যে, ক্যালিফোর্নিয়ার ছাত্র বলে তাদের অহংকার, কিন্তু এই স্টানফোর্ডের কাছে ক্যালিফোর্নিয়াকে একদিন গোল খেতে হবে। এই কথা শুনে ক্যালিফোর্নিয়ার ছাত্র দুইটি আরও উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো।

কিছুদিনের মধ্যেই বিশ-পঁচিশ-জন বন্ধুকে নিয়ে স্টানফোর্ডের ছাত্রটি একটি ছোটখাটো ফুটবল দল গড়ে তুলল। আর নিজেই দলপতি এবং প্রশিক্ষকের ভার নিল। তারপর চললো একটানা অনুশীলন।

ক্যালিফোর্নিয়ার ছাত্রদের অবজ্ঞার হাসি ছাত্রটি কিন্তু ভোলে নি। যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার জন্য ক্যালিফোর্নিয়াকে ফুটবল খেলায় আহবান জানাল। ছাত্রটির এই বাড়াবাড়িকে স্টানফোর্ডের অনেকেই ভাল চোখে দেখলেন না। অনেকে ভাবলেন, ক্যালিফোর্নিয়া হয়ত স্টানফোর্ডের সংগে খেলতে রাজী হবে না। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া স্টানফোর্ডের সংগে খেলতে রাজী হলো।

সানফ্রান্সিসকোর প্রকাণ্ড মাঠে দুই দলে খেলার জন্য ঠিক হল। ক্যালিফোর্নিয়ার খেলা দেখবার জন্য প্রায় ত্রিশ হাজার লোক সেদিন মাঠে উপস্থিত। খেলা শুরু হলো। সকলেই ভাবছিল স্টানফোর্ড ডজন ডজন গোল খাবে।

স্টানফোর্ডের এগারটি খেলোয়াড়ই মরণ পণ করে খেলতে আরম্ভ করলো। হঠাৎ এক সুযোগে দলপতি বালকটি ক্যালিফোর্নিয়াকে একটি গোল দিয়ে বসলো। ক্যালিফোর্নিয়া আর কিছুতেই সেই গোল পরিশোধ করতে পারলো না। বিশ্ববিখ্যাত ক্যালিফোর্নিয়া একা-দশকে হারিয়ে জয়লাভ করলো স্টানফোর্ড দল। সেদিন স্টানফোর্ডের খেলোয়াড়রা দলপতিকে কাঁধে তুলে জয়োল্লাস করতে লাগলো।

স্টানফোর্ডের এই দলপতি খেলোয়াড়টিই পরবর্তীকালে হয়েছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। নাম হার্বার্ট হুভার।

—জীতেশরঞ্জন দত্ত
পোঃ লংকা
নগাঁও (আসাম)

জগন্নাথ মজুমদার (বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ)

উত্তর : ক্রিকেটের নতুন নিয়ম নিয়ে বিস্তারিতভাবে পরে আলোচনা করার ইচ্ছে আছে। এখনো ভারতে আগের নিয়মই চলছে—এল· বি· ডবিউ নিয়মের খুব একটা সাংঘাতিক কিছু তো বদলানো হয় নি।

প্রশান্ত বড়াল ও অমিতাভ ভদ্র (জলপাইগুড়ি)

উত্তর : পেলে এবং ইউসেবিও দুজনেই ভালো। তবে দুজনের মধ্যে আমার মতে পেলেই শ্রেষ্ঠ।

চয়ন দত্তরায় (লাবান, শিলং)

প্রশ্ন : পিটার মে টেস্ট খেলায় ক'টা সেঞ্চুরী করেছেন?

উত্তর : ১৩টা।

গোপাল চক্রবর্তী ও শম্ভু রক্ষিত (সয়েরকাটা উচ্চ বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি) ও **অরুণ লোহ** (করিমগঞ্জ)

উত্তর : গল্প হলেও সত্যি আবার চালু করা হবে কি না—ভেবে দেখা হচ্ছে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। বিশুদ্ধ সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের সারাৎসার। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবন্মুক্তি, ষড়্‌জ, হংস, মঙ্কি, গীতাসার, পিতৃ, পৃথিবী, সপ্তশ্লোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, গর্ভ, পাণ্ডব, উত্তর রাস, শ্রীমদ্‌গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমাবেশ প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। রেকসিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকা, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, চুলকা, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদনারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, শাট্যায়নীয়, যোগতত্ত্ব, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—প্রতি খণ্ড—৪-০০ টাকা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ :

সামবেদের তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ। শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ। তথ্যপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন :

মহর্ষি কপিলকৃত. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈশেষিক দর্শন :

মহর্ষি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩-০০ টাকা।

জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনম্ :

॥ পরমর্ষি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও বঙ্গানুবাদ ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে—পারমর্ষ সূত্র, পর্ব মীমাংসা, বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পর্বতন্ত্র, জৈমিনি সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবরস্বামীর ভাষ্যের ভাবার্থানুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের শ্লোকবার্তিক ও তন্ত্রবার্তিক টীকা-বিষয়ক পাদটীকা-সমন্বিত। পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থের দীর্ঘকালের সাধনায় অনূদিত, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য—প্রতি খণ্ড—৮-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্ :

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পুরশ্চরণ প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম্, দীক্ষাপদ্ধতি, শ্রীগুরু, মন্ত্রমালা প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা ব্রহ্মসংহিতা, অষ্টাবক্রসংহিতা, ষটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়পোক্ত যোগরহস্যম্, পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগ গ্রন্থের সমাবেশ, কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

17 NOV 1969

সে কি! তুমি এখনও ব্যবহার করনি?
কিন্তু কুকমী না হলে আমার রাঁধতে মন চায় না
কুকমী
গুঁড়া মশলা
স্বাদে গন্ধে বিশুদ্ধতায়
এর তুলনা হয় না!
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃলিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
পোস্তা • কলিকাতা-৭
মিল - কাশীপুর

সাপ্তাহিক বসুমতী

কেরলে নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার পতন

পশ্চিমবঙ্গে কেরলের ঘটনার পুনরাবৃত্তির প্রতিরোধ ও যুক্তফ্রণ্টের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সাতদফা কর্মসূচী গ্রহণ

৭৪ বর্ষঃ ১৮শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩ই কার্তিক, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 18, 30th Oct.

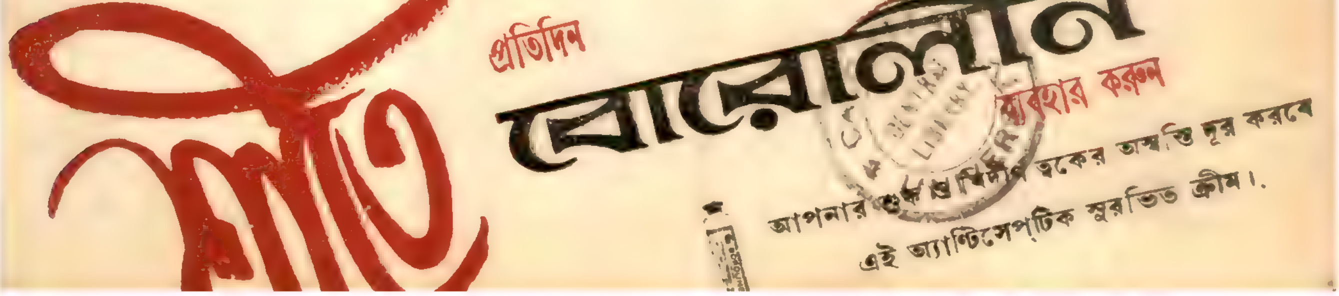

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১০৯১
আজকের মানুষ		১০৯২
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—পুজো সাহিত্যে?	— মনোরঞ্জন হাজরা	১০৯৩
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১০৯৬
বন্ধ জানালা (কবিতা)	— শ্যামশ্রী পাল	১১০০
বই-বহাই—বাংলা বইয়ের মেলা	— হরপ্রসাদ মিত্র	১১০১
রঙ্গদর্শন		১১০৪
ভারতদর্শন		১১০৬
আন্তর্জাতিক		১১০৮
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	১১১০
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	— শ্রীসর্বদর্শী	১১১২
পাঠকমন		১১১৩

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান
ফোন: ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অন্য গ্রাম অন্য জঙ্গল	— সমীর মুখোপাধ্যায়	১১১৫
নিজেকে সে বলে না কৃতঘ্ন (কবিতা)	— মনোরমা সিংহরায়	১১১৯
আঁধারের নীল পদ্মে (কবিতা)	— কার্তিকচন্দ্র মিত্র	১১১৯
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১১২০
প্রাণের সন্ধানে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	১১২৪
ষড়যন্ত্রের রাত (প্রবন্ধ)	— খায়রুল বাসার	১১২৮
বক্সিং (গল্প)	— কান্তি গুপ্ত	১১৩১
গ্রামবাংলার কথা	— অসীম মুখোপাধ্যায়	১১৩৫
রঙ্গমেলা		১১৩৮
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১১৪০
খবর বলছি	— অভ্রবাহন	১১৪৩
রঙ্গজগৎ		১১৪৪
আমরা কোথায় আছি	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৪৮
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	১১৫০

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

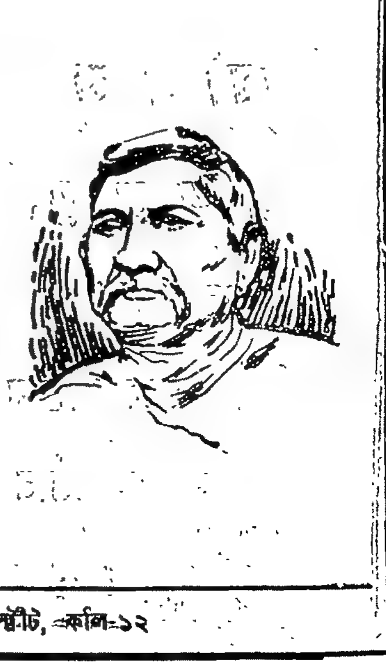

প্রথম খণ্ড ঃ প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ সিরাজউদ্দৌলা ; য্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড ঃ পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড ঃ চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা ঃ শ্রীরমেন চৌধুরী

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৪৪ বর্ষ ঃ ১৪শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা । বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ১৩ই কার্তিক, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ Thursday, 30th October, 1969

শুভ ৺বিজয়া

শুভ ৺বিজয়া উপলক্ষে জানাই আমাদের অগণিত সুহৃদ, পৃষ্ঠপোষক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক-পাঠিকা ও বিজ্ঞাপনদাতাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। যাঁরা গঠনমূলক সমালোচনার পক্ষপাতী, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের কাজে-কর্মে নিয়ত উদ্দীপনার সঞ্চার করেছেন, তাঁদের প্রতি থাকলো আমাদের অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

এবারের শারদোৎসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। উৎসবের সময় বেলাল্লাপনার বিন্দু-বিসর্গ লক্ষ্য করা যায় নি। কলকাতা শহরে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার সর্বজনীন দুর্গাপুজো বেশি সংখ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবং এও বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা গেছিল যে, প্রায় প্রতিটি মণ্ডপ সুসজ্জিত; কোথাও রুচিহীনতার প্রকাশ ছিল না। পুজোর প্রাক্কালে চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, এবার তাও প্রায় ছিল না। বস্তুত বাংলাদেশের যুবসমাজের কৃতিত্বের জন্যই পুজোর দিনগুলিতে কোথাও অনাচার বা বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায় নি। এমন কি পাড়ায় পাড়ায় যুবকেরাই এগিয়ে এসে রাজপথের গাড়ি ও পথ-যাত্রীদের নিয়ন্ত্রিত করেছেন। আরেকটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, পুজোর সময় সহস্র সহস্র দর্শনার্থী জনতার সমাগমের মধ্যে রাজপথের গাড়িগুলি ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাথার সৃষ্টি করে নি। ঐ ব্যাপারটি দেখে অনেকেই এমন ধারণা পোষণ করেছেন যে, ট্রাফিক পুলিশরা সতর্ক হলেই গাড়ির 'জ্যাম' এড়ানো অসম্ভব নয়।

এবার মূর্তি ও মণ্ডপের অঙ্গসজ্জা ও শিল্পোৎকর্ষের জন্য তিনটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ যাই হোক না কেন, পুরস্কারের ঘোষণা ফলপ্রসূ হয়েছে। কারণ পুজোর উদ্যোক্তারা ঐ পুরস্কারের ঘোষণায় উৎসাহিত হয়েই পুজোর মণ্ডপগুলিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারায় শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে কোনোরূপ কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নি। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এবার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরা যোগ্যতা অনুসারেই পেয়েছেন, কিন্তু যাঁরা সে পুরস্কার পান নি তাঁরা অযোগ্য নন। তাঁদের অনেকেই যথাযোগ্য চেষ্টা করেছেন এবং সামগ্রিকভাবে না হলেও আংশিকভাবেও তাঁদের দক্ষতা, প্রচেষ্টা ও রুচিবোধ অসংখ্য দর্শনার্থীর প্রশংসা অর্জন করেছে।

এই যে শারদোৎসব—যে উৎসবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার এবং যা মানুষে মানুষে মিলনোৎসবের নামান্তর—তার শেষ দিনটি অর্থাৎ দশমীর দিনটি নির্বিঘ্নে কাটে নি। সেদিন পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই যখন শান্তি অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করছিল, তখন প্রতিমার শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র মাত্র একটি স্থলে যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিন্দনীয় এবং গোলযোগের আড়ালে যারা প্রাণঘাতী বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছিল তারা ক্ষমার অযোগ্য। জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং সমাজবিরোধীদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য ঐ ধরণের ঘটনা নিবারণের দায়িত্ব একমাত্র সরকারের ওপর ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষ চুপচাপ থাকবে—সেটাও অনুচিত। হাঙ্গামা নিবারণের জন্য সাধারণ মানুষকেই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে এবং তাঁদের এ ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে। কারণ সমাজবিরোধীদের ফাঁদে তাঁরাই প্রথমে পা দিয়ে ফেলেন। জনসাধারণ তৎপর হলে এমন কোনো শক্তি নেই, যা অনাসৃষ্টি ও অনাচার ঘটাতে পারে।

সমাজের নানা দিকে অনাচারের প্রাবল্য দীর্ঘকাল ধরে দুষ্ট ব্রণের মতো বিরাজ করে আসছে। এবং ঐ অনাচারের মূলে একদল বিকৃতশ্রেণীর লেখকও রয়েছে। আমরা খবর পেয়ে আনন্দিত হয়েছি যে, বিকৃত রুচিতে ভর্তি পত্রিকাগুলি এবার পাঠকসমাজে আমল পায় নি। এটা সমাজের সুস্থ লক্ষণ এবং শারদোৎসব উপলক্ষে সেই সুলক্ষণের প্রকাশ দেখে বাংলাদেশের মানুষ কিছুটা আনন্দিত।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার তত্ত্বে কম্যুনিস্টদের আস্থা নেই। তাঁরা বিপ্লবের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করবার জন্য নির্বাচনের সুযোগ গ্রহণ করেন মাত্র। তা সত্ত্বেও ১৯৫৭ সালে ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে কেরালার কম্যুনিস্ট পার্টি যখন নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন সারা দুনিয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

নাম্বুদ্রিপাদের কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভা বছর দেড়েক শাসনকার্য চালাবার পর কংগ্রেস, ক্যাথলিক, নায়ার এবং মুসলিম লীগ যৌথভাবে সেই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু করেন। নাম্বুদ্রিপাদ পুলিশের সাহায্যে কঠোর হস্তে সেই আন্দোলন দমন করতে রাজী হন নি। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার নানাভাবে তাঁকে বিব্রত করতে থাকেন এবং গণতন্ত্রের সর্বপ্রকার নীতি বিসর্জন দিয়ে ১৯৫৯ সালের মাঝামাঝি কেরালায় সংখ্যাগরিষ্ঠের গভর্নমেণ্টকে বরখাস্ত করা হয়। তাতে কংগ্রেস কিছু আপাত সুবিধা লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসেরই ক্ষতি হয়েছে সব চেয়ে বেশি। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে কয়েকটি বামপন্থী দল যে যুক্তফ্রণ্ট গঠন করেন, তার কাছে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দলের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে যায়। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে যুক্তফ্রণ্ট কেরালায় সরকার গঠন করেন। বিগত আড়াই বছরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সমস্ত যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটলেও কেরালার যুক্তফ্রণ্ট সরকার কিন্তু সম্পূর্ণ অটুট ছিল। শরিকী কোঁদল চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গত ২৪শে অক্টোবর সেই গভর্নমেণ্টের পতন ঘটেছে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের দাবিতে বিধানসভায় এক প্রস্তাব পাশের পর মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পদত্যাগ করেছেন।

ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মধ্যে প্রথম এবং এখনও পর্যন্ত একমেবাদ্বিতীয়ম মুখ্যমন্ত্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ সৎ, চরিত্রবান, বিজ্ঞ এবং বাস্তববাদী জননায়ক হিসাবেই সুপরিচিত। রাজনীতি মিশে আছে তাঁর রক্তের প্রতিটি কণায়। প্রথম যৌবনে দেশমাতৃকার মুক্তির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন কংগ্রেসী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে বিদেশী সরকারের দ্বারা বহুবার নির্যাতিত হন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের

ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ

পুনঃপ্রবর্তক শঙ্করাচার্যের বংশে জন্মলাভ করেও ধর্ম সম্পর্কে তিনি একেবারেই নিস্পৃহ। কংগ্রেসে থাকতে থাকতেই তিনি সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সোস্যালিস্ট দলে যোগদান করেন। পরে তিনি সদলবলে এসে যোগ দেন কম্যুনিস্ট পার্টিতে। সংগঠক এবং তত্ত্ববিদ হিসাবে অল্পদিনেই কম্যুনিস্ট দলে তাঁর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে উন্নীত হন। সুলেখক এবং সুবক্তা হিসাবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতিমান। তিনি দীর্ঘকাল কম্যুনিস্ট পার্টির বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এক সময় তিনি অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারীও হয়েছিলেন। অতি সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নাম্বুদ্রিপাদ মুখ্যমন্ত্রী হয়েও ক্ষমতাগর্বে কখনও স্ফীত হন নি। কিছুকাল আগে এক রবিবারে জনৈক বিদেশী সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। শাদা লুঙ্গি এবং হাফ শার্ট পরা একটি লোক সেই অতিথিকে অভ্যর্থনা করে নাম্বুদ্রিপাদের বৈঠকখানায় নিয়ে আসে। তাকে দেখে আগন্তুকের মনে হয়েছিল তিনি গৃহের পরিচারক। কিন্তু পরে সেই ভদ্রলোক দু' কাপ চা হাতে নিয়ে যখন বৈঠকখানায় ফিরে আসেন এবং নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ বলে পরিচিত করেন, তখন আগন্তুক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। নাম্বুদ্রিপাদ তাঁকে বলেন যে, রবিবার তাঁর বাড়ির পরিচারকরা সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করে থাকে। সেই কারণে তিনি নিজেই চা বানিয়ে নিয়ে এসেছেন। সাধারণ মানুষের প্রতি নাম্বুদ্রিপাদের দরদ কত গভীর, তা এই ঘটনার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে।

কেরালায় দলীয় রেষারেষিতে যুক্তফ্রণ্টের সকল মন্ত্রীই দুর্নীতির দায়ে পরস্পরের দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছেন, কিন্তু নাম্বুদ্রিপাদের বিরুদ্ধে সে ধরণের কোন অভিযোগ তোলার সাহস কারও হয় নি। শেষ মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ দেওয়া হয়েছে, সেটা একেবারেই অসার। তিনি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কাছ থেকে কিস্তিতে একটা ছোট বাড়ি কিনেছেন। বাড়িটা তাঁর স্ত্রীর নামে কেনা হয়েছে। নিজের নামে বাড়ি না কিনে স্ত্রীর নামে কেনা দুর্নীতির আওতায় পড়ে বলে মনে হয় না।

নাম্বুদ্রিপাদের মত চরিত্রবান এবং দক্ষ জননায়কের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রণ্ট সরকার শরিকী কোঁদলের ফলে যেভাবে ক্ষমতাচ্যুত হল, তাতে ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের আশু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা বোধ করার কারণ আছে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-পুজো সাহিত্যে?

মনোরঞ্জন হাজরা

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনও হচ্ছে, আবার অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা বস্তুটি চালিয়েও যাচ্ছে পুরোদমে। সাংস্কৃতিক জগতের এই দুই ধারার সংঘাতে কবে সিনথেসিস অথবা নতুনতর অধ্যায়ের সৃষ্টি হবে, সেই কথাটাই ভাবছিলাম পুজোর বাজারে একটা বইয়ের স্টলে দাঁড়িয়ে। এত সব রঙ-বেরঙের ছাপা পত্র-পত্রিকা, সব কেনা যায় না, কারণ কেনার সামর্থ্য নেই। তাছাড়া বোধ করি সব কিনতে মনও চায় না—কারণ পয়সা দিয়ে অপসংস্কৃতির ইনফেকশন সওদা করে ঘরে তুলে লাভ কি। অন্যের মত আমারও ঘরে ছেলেমেয়ে আছে, তাদেরও বন্ধুবান্ধব আছে। সেই সব কচি মনে ক্যান্সারের মত এই দুরারোগ্য অপসংস্কৃতি যদি বাসা বাঁধে, তবে শুধু আমারই ছেলেমেয়ের অপমৃত্যু ঘটবে না—অপমৃত্যু ঘটবে গোটা সমাজের, গোটা জাতির।

সারা বছর যা হয় তা হয়ত ধীরেসুস্থে পাঠকসমাজ তলিয়ে দেখার কিছুটা সুযোগ পান। আর সুযোগ পান বলেই মাঝে মাঝে মন তাঁদের বিদ্রোহীও হয়ে ওঠে। সাহিত্যের পদ্মবনে মত্তহস্তীদের মোকাবিলা করবার হয়তো কিছুটা সুযোগও থাকে। এমন কি হয়তো আদালতের শরণাপন্ন হবারও চেষ্টা করেন। কিন্তু পুজোর ভিড়ে সে সময়ও থাকে না, সুযোগও থাকে না। রেলের টার্মিনাস স্টেশনে 'পুজো-এক্সোডাসের' মত 'হেভি এক্সোডাস অফ কালচার' হয়। সকলের ওপর নজর রাখার মত সতর্কতা অবলম্বন করা যায় না। তাই সাহিত্যের নামে বেলেল্লাগিরি, আর সংস্কৃতির নামে সোনাগাছি আর রামবাগানকে হার মানবার ডিমনস্ট্রেশন দেখে যে কোন সজাগ মনকে আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে বলব, আমি যার পর নাই আতঙ্কিত এবং এ বিষয়ে আমার মনের প্রতিক্রিয়া এই দেশের সমস্ত বিদগ্ধসমাজ যদি না রুখে দাঁড়ান, সরকার যদি কোন সুষ্ঠু আইন প্রণয়ন না করেন এবং যেমনভাবে রাস্তায় রাস্তায় উচ্ছৃঙ্খল সমাজবিরোধী বা চোর-ডাকাতদের মোকাবিলা করা হয় তেমনিভাবে এইসব পত্র-পত্রিকাগুলিকে সর্বরকমে মোকাবিলা না করেন, তবে আগামী দিনে তাঁরা যতই মহত্তর পথের কথা দুবেলা ঘোষণা করুন না কেন, সে পথের দুধারে জন্তুজানোয়ারের যৌনলীলার মত নরনারীর অনুরূপ লীলা তাঁদের দেখতে হলে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না। প্রসংগত বলে রাখি বর্তমান প্রবন্ধে আমাকে এমন কতকগুলি উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে যা দেয়াও আমার পক্ষে পাপ। কিন্তু কি করব এই পাপকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যই আমাকে এই উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন আশা করি।

স্টলের একখানি বই তুলে নিলাম

পুজো সাহিত্যের বুকস্টল থেকে অর্থাৎ রেলওয়ে স্টল থেকে একখানি পত্রিকা তুলে নিলাম। নাম লিখব না। কেন না তার বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে। প্রথমেই কভারে তিনরঙা ছবি একখানি। বলে দিতে হবে না ছবিখানি কোন যুবতীর এবং যুবতীর দেহের উপরিভাগের যে অংশ দেখলে পত্রিকাখানি বিকোবে বেশি করে তার প্রয়াসের অন্ত নেই। কভার ওল্টাতেই জাঙিয়া-কসটিউম পরিহিতা তরুণীর উলঙ্গপ্রায় ব্লক। পাতা উল্টে যেতে লাগলাম। এলাম ঊনপঞ্চাশ পৃষ্ঠায়—আবার জাঙিয়া-কসটিউম। বাহান্ন পাতায়ও তাই। পর পর নগ্নপ্রায় তরুণীর ছবি। একশো আটত্রিশ, ঊনচল্লিশ, চল্লিশ পর পর পাতাগুলিতে এরই উন্নত সংস্করণ অর্থাৎ এবার যুক্ত হয়েছে রকমারি পোজ এবং শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে কাব্যের মধুর ছন্দ 'রাত্রে আমি একলা শোব—চাইবে তোমার বুক।' এরপর দুশো একচল্লিশ পৃষ্ঠায় আবার এক বিশেষ ভঙ্গিমায় কোন সিনেমা স্টার।

দুশো আটষট্টি পাতায় হঠাৎ নজর পড়ল। পড়েই চমকে উঠলাম!

আরও চমকে ওঠার বা আঁৎকে ওঠার জিনিস এই পত্রিকায় আছে। কভারের শেষ পৃষ্ঠার এপিঠ-ওপিঠের ছবি দুখানি। শেষ পৃষ্ঠায় উদাসীন এক সচেতন তরুণীর বিকৃত ভঙ্গির ছবি এবং তার আগের পৃষ্ঠায় এক নর্তকীর বাঁ হাত দিয়ে বক্ষের যুগল স্বর্গ ঢাকার আঢাকা-চেষ্টা এবং ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকার ইঙ্গিত। এবং সবকিছুকে ছাপিয়ে একটি গল্প "আমি কুমারী অন্তঃসত্ত্বা।" এই হচ্ছে তেরো শো ছিয়াত্তরের পুজো সাহিত্যের একদিক।

ডেলিপ্যাসেঞ্জারী তর্ক

ট্রেনে উঠে বসেছি। এইসব সাহিত্যের কথাই বলছিলেন কয়েকজন ভদ্রলোক। আমার হাতে ছিল দু'খানা পত্র-পত্রিকা। একখানি সাপ্তাহিক বসুমতী, আরেকখানি সান্ধ্য গণশক্তি। দুই ভদ্রলোক দু'খানি একে একে টেনে নিলেন। শেষোক্তজন মুখর। তিনি সাপ্তাহিক বসুমতীখানা নিয়ে বললেন, মশাই যা সব পত্রিকা বেরুচ্ছে তার থেকে অন্তত বাঁচব। দিন অন্তত এখানা পড়ে নিই।

দেখলাম মানুষ ক্লান্ত পূর্বোক্ত পত্র-পত্রিকাগুলো সম্পর্কে। ভাল লাগল কথাগুলো। কিন্তু এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'তা বলে কি সব পত্রিকাই খারাপ।'

যে ভদ্রলোক মুখর হয়ে আমার হাত থেকে সাপ্তাহিক বসুমতী নিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'সব খারাপ হতে যাবে কেন?' যিনি সান্ধ্য গণশক্তি নিয়েছিলেন তিনি বললেন, 'উনিশ বিশ বলতে পারেন।'

যে ভদ্রলোক প্রশ্নটা করেছিলেন 'সব পত্রিকাই কি খারাপ' তিনি তাঁর ব্যাগ থেকে একখানা পুজো সংখ্যা বের করে বললেন, এই তো এটাও তো 'সিনেমা সম্পর্কিত কাগজ। কেমন সুন্দর হয়েছে দেখুন তো। যতীন চক্রবর্তী লিখেছেন জ্যোতি বসু সম্পর্কে, শৈলজানন্দ লিখেছেন তারাশঙ্কর সম্বন্ধে—অন্য ভদ্রলোকেরা বলে উঠলেন, 'ভাল হলে ভাল বলব না কেন?'

কিন্তু মুস্কিল এই ভাল বলব কাকে, অনেক দুঃখেই আমাকে একথা বলতে হল। যে ভদ্রলোক পুজোসংখ্যাখানি তাঁর ব্যাগ থেকে বের করেছিলেন, তিনি আমার ওপর বিশেষ প্রসন্ন হলেন না। বরং তিনি আমাকে একটু বিশ্বনিন্দুকই ভাবলেন এবং মেয়ের সার্টিফিকেট উদ্ধৃত করে তিনি আমাকে বললেন, 'মশাই আমার মেয়ে কখনো বাজে জিনিস পড়ে না—সেই আজ আমাকে সকালে এই পত্রিকাখানা কিনে নিয়ে যাবার জন্য বার বার করে বলে দিয়েছিল।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার মেয়ে কি পড়াশোনা করে?'

'হ্যাঁ', ভদ্রলোক বললেন, 'আসছে বারে হায়ার সেকেন্ডারী দেবে।'

বললাম, 'খোঁজ নিয়ে দেখবেন নিশ্চয়ই এই পত্রিকাখানা ইতিপূর্বে আপনার মেয়ে কোন সহপাঠী বান্ধবীর কাছে দেখেছিল। তাই আপনাকে কিনতে দিয়েছে।'

'তা হতে পারে।'

বললাম, 'হতে পারে নয়—নিশ্চয়ই হয়েছে। কেন না তাহলে কখনই আপনার মেয়ে এই বিশেষ পত্রিকাখানা কিনে নিয়ে যেতে আপনাকে বার বার বলে দিত না।'

'মানে', ভদ্রলোক তো জিজ্ঞাসুভাবে আমার দিকে তাকালেনই। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও।

স্টলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকাখানা থেকে নোট নিয়েছিলাম। পকেট থেকে বের করলাম। বললাম, 'বের করুন আপনারই পত্রিকা থেকে 'অমুক' গল্পটি।' ভদ্রলোক সকলের নীরব চাপে বের করলেন গল্পটা। আমি বললাম, গল্পের নায়কের কি গভীর প্রেরণা আমি পড়ে যাই, আপনি শুধু মিলিয়ে যান—

উলঙ্গ বোন ও বন্ধু

যখন প্রথম দেবেশদের ঘরে বাণীকে, পুরন্দর একেবারে নগ্ন দেখেছিল তখন ও নিজেই এমন চমকে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা যেন ঠিক বুঝতেই পারে নি। দেবেশ তখন উনিশ বাণী সতেরো। দেবেশ পুরন্দর সমবয়সী। দেবেশদের বাড়িতে লোক কম। দুপুরবেলা ওর মা ছাড়া, আর কেউ থাকত না।

বাণী যে কি করে, দেবেশের মার চোখ ফাঁকি দিয়ে ওপরের ঘরে ঢুকেছিল, কে জানে। কতদিন ধরে ঢুকছিল, তাই বা কে জানত। ওদের কি দরজা বন্ধ করার কথাও মনে ছিল না। এত সাহস কোথা থেকে পেয়েছিল ওরা; অথবা সেটা শুধুমাত্র নির্লজ্জতা। কিংবা দুজনের প্রেমের মত্ততায়, কিছুই মনে ছিল না, খেয়ালই ছিল না। দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকতে প্রথমে দুটো উলঙ্গ অস্পষ্ট ছায়া দেখেছিল পুরন্দর। পরমুহূর্তে বাণীকে দেখে চমকে উঠেছিল। রাগ বা ঘৃণা, সে সব কিছুই যেন হয় নি। কিন্তু সেই অবস্থায় যে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, এ কথা ওর চকিতে মনে হয়েছিল, আর বাণী আচমকা একটা ভয়ের শব্দ করে; ঘরের কোণে ছুটে যাবার আগেই পুরন্দর দরজার বাইরে চলে এসেছিল।

এর পরে নায়ক পুরন্দর অবিবাহিতা বোন বাণীর সঙ্গে বন্ধু দেবেশের এই ব্যাপারটা নিয়ে তাকে বলেছিল, 'কিন্তু লোকে যদি জানতে পারে?'

দেবেশ বলেছিল, 'ও তুই ছেলেপিলে হবার কথা বলছিস?'

ও বলে উঠেছিল, 'নিশ্চয়ই।'

দেবেশ বয়স্ক লোকের মতো, হেসে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, 'সেজন্যে তুই একটুও ভাবিস না। আজকাল আবার হয় না কি। কত রকমের জিনিস বেরিয়ে গেছে।'

এখানে আমি একটু থামলাম। হেসে বললাম, 'আপনার মেয়ে আমারও মেয়ে। কাজেই আমি কড়া কথা তো বলতে পারি না কিন্তু মা-মণি আমার 'আজকাল কত রকমের জিনিস বেরিয়েছে' জেনে যদি কোথাও কোনরকমভাবে প্রলুব্ধ হয় তাহলে কি ঘটবে বলুন তো?' ভদ্রলোকের মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছিল।

বললাম, 'আপনি ভাববেন না। লেখক আপনার আমার ছেলেমেয়ের জন্য এসবের প্রেরণাও যোগাতে চেয়েছেন। আবার মেলান, লেখক লিখেছেন—

উলঙ্গ বীথি ও উলঙ্গ বাণী

'যা ছিল ওর মধ্যে (নায়ক পুরন্দরের মধ্যে) সুপ্ত তাকে জাগিয়ে দিয়েছিল দেবেশ বাণী। বীথির কাছে ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে যত বাধাই থাক, পরে আর বীথির সঙ্গে, অবারিত প্রেমে কোন বাধাই ছিল না। যে বিষয় ছিল পুরন্দরের কাছে অত্যন্ত দুরূহ, ভয়ঙ্কর ভয়ের, তাই যেন অতি অনায়াস হয়ে উঠেছিল।...তারপরে যখন ও বীথিকে প্রথম বুকের কাছে জড়িয়ে ধরেছিল, চুমো খেয়েছিল তখন পুরন্দর ওর নিজের অবস্থাটা ভেবে, কেমন যেন লজ্জিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বীথি যেমন স্বাভাবিক, লজ্জায় আর খুশিতে, অথচ যেন একটা মেশানো রাগ রাগ ভাবে বলেছিল, 'এই অসভ্য ছি।' তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, 'আর একদিন।'

আরেকদিন মানে কী বুঝতেও পারে নি। পরে বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল যা নিয়ে ওর লজ্জা, হীনমন্যতা সেটা বীথির কাছে গভীর সুখ-

তাঁর আকাঙ্ক্ষার বিষয়। বীথি ওর কাছে সব খুলে দিয়েছিল, সমস্ত গোপনীয়তা, সমস্ত লজ্জা, আজীবন যে কৌতূহল, এক বিশেষ গোপনীয়তা ও সংস্কারে আড়াল করা ছিল সমস্তই।

বীথিদের বাড়ির একটা সুবিধা ছিল। ওদের বাড়ির পাশে একটা পোড়ো জমি ঘেঁষে, বছর পাঁচেক আগে একজন বাড়ি তৈরি শুরু করেছিল। দরজার লিন্টেল অবধি উঠে তা আর শেষ হয় নি। সেটা একটা পোড়ো বাড়ির আকার নিয়েছিল প্রায়। সন্ধ্যার সময়, তুলসীতলায় আলো দেখিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে সেখানে ঢুকে পড়তে ওর কোন অসুবিধা ছিল না। প্রথম যেদিন বীথি ওর সামনে জামা-কাপড় খুলে দাঁড়িয়েছিল সেইদিন সেই মুহূর্তে দেবেশ আর বাণীর নগ্নমূর্তি দুটো ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। হঠাৎ মনে হয়েছিল বাণীই যেন ওর সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

মেয়ের জন্য পুজোসাহিত্য কিনে নিয়ে যাওয়া ভদ্রলোককে বললাম, নায়ক বোন আর বন্ধুর কাছ থেকে প্রেরণা তো পেলই। লেখক শুধু সেখানেই থামলেন না, সতেরো বছরের উলঙ্গ বোনকে নিজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কল্পনায় মসগুল করে দিলেন দেশের গোটা জেনারেশনকে। এরপর কি আপনি বলবেন, 'আপনার মেয়ে কখনো আজেবাজে জিনিস পড়ে না?'

অন্যান্য ভদ্রলোকেরা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের একজন আলোচ্য পুজো সংখ্যাখানির মালিককে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, 'কি মশাই চুপ করে গেলেন কেন?'

রবীন্দ্রোত্তর যুগের বর্ণনাভঙ্গী

শেষ করুন পাঁচশো একাত্তর পৃষ্ঠা : স্বীকারোক্তি পড়ুন—"জানেন পুরন্দরবাবু অমরাবতীর ডি, কে, মুখার্জী একটা পার্টিতে মাতাল হয়ে নিজের মেয়েকেও চিনতে পারে নি। ছুটে ধরতে গিয়েছিল। আর আমি তো তার কাছে..." পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বর্ণনা শুনে শেষ পাঁচশো একাত্তরের বর্ণনার ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল। সে নিস্তব্ধতা দুঃখ ও বিস্ময়ের।

পুজোসাহিত্যের মর্মবাণী

সত্যিই দুঃখ পেয়েছি আমিও। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে সব চলেছে পুলিশ আর প্রচার বিভাগ কি করছে? কে কবে এই নর্দমার পাঁক আদালতে তুলে নিয়ে যাবে তখন তার প্রতিকার হবে? তাদের নিজের থেকে কি কিছুই করার নেই? ইংরেজ আমলে 'বিসর্জন'-কে তারা লালবাজারে গুদামজাত করে রেখেছে। সেটা তখন দেশের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযান করার ছিল পুলিশের একটা অভ্যাস—আজ কি সেই অভ্যাসই বজায় থাকবে তাদের অপসংস্কৃতিকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে? তাছাড়া যুক্তফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ তথা দেশের সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদেরও কি কিছু করার নেই? যতীনবাবু কি লিখবেন জ্যোতিবাবু প্রসঙ্গ, শৈলজাবাবু কি আঁকবেন তারাশঙ্করবাবুর ছবি, এইসব কাগজে? তাঁরা কি একবারও ভাববেন না তাঁদের সামনে তুলে ধরে তাঁদেরই আড়াল দিয়ে তাঁদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ওরা ক্যানসার রোগগ্রস্ত করে তুলবে? খানিকটা প্রচার আর অর্থই কি বড় হবে—পুজোসাহিত্যের আসল মর্মবাণী? এরপর যদি কেউ মনে করে, এক ছিয়াত্তরে মন্বন্তর হয়েছিল পেটের খোরাকের, তেরোশো ছিয়াত্তরে মন্বন্তর হয়েছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির, সে কি তবে খুব ভুল করবে?

কয়েকখানি বিখ্যাত বাংলা অনুবাদ

সাহিত্যায়ন		
আগামী দিনের পৌরশক্তি	—ডি, এস, হ্যালেসি, জুনিয়ার	৪·০০
মহাবিশ্বের মৌল উপাদান	—আইজাক এসিমভ	৩·০০
ব্যাধির উৎস সন্ধানে	—বার্টন রোস	৪·০০
জনাকীর্ণ পৃথিবী	—মার্গারেট ও হাইড	৩·০০
বিজ্ঞানের অভিযান	—ওয়াল্টার ই, গোর্লে	২·৫০
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং		
মহাবিশ্বের সন্ধানে	—হাইনেক ও এ্যান্ডার্সন	৩·৫০
আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাহিনী	—বার্ণার্ড জাফি	৫·০০
যন্ত্রের মানুষ	—বেরিল বেকার	৩·৫০
সাগর পেরিয়ে বার্তা	—আর্থার সি ক্লার্ক	৪·০০
জীবের স্বভাবধর্ম	—এন্ডার্স ও রুকওয়ার্থ	৪·০০
রশ্মি (দৃশ্য ও অদৃশ্য)	—ফ্রেড রাইনফেল্ড	৫·০০
মহাকাশ অভিযান	—হোমার ই, নেওয়েল	২·০০
বসুধারা প্রকাশনী		
আমরা এবং আণবিক শক্তি	—জন লেওয়েল	১·৫০
হোমশিখা প্রকাশনী		
সেতু	—হেনরী বিলিংস	১·০০
হৃদয়ে শেয়াল	—হাওয়ার্ড ও কুক	১·০০
মাটি থেকে মহাকাশ	—ক্লাইড অব	১·০০
অতীতের সন্ধানে বিজ্ঞান	—লিন ও পুল	২·০০
বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন		
আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়ার কথা (ছয় খণ্ড)	—আইজাক এ্যাসিমভ প্রতি খণ্ড	৩·০০
বাক্-সাহিত্য		
মানব ও সমাজ বিজ্ঞান	—স্টুয়ার্ট চেজ	৩·০০

এছাড়া নানা বিষয়ে আরো অনেক বই : পুস্তক বিক্রেতাদের উচ্চ কমিশন
তালিকা চেয়ে পাঠান : আজই অর্ডার দিন

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলি-১২

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(১৩)

সুভাষচন্দ্র ও মেঘনাদ সাহা—৪

১৯৩৭ সালে জাতীয় পুনর্গঠন সম্বন্ধে এ আই সি সি-র ওয়ার্ধা প্রস্তাবের প্রবর্তক অবশ্যই জহরলাল। তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ না পাওয়া সম্ভবত ডঃ সাহার কাছে কিছুটা হতাশাজনক মনে হয়েছিল। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ধারণার পরিচয় পেয়েও তিনি চমৎকৃত হয়ে পড়ছিলেন, এবং অস্থিরও। চুপ করে বসে থাকা তাঁর স্বভাবে ছিল না। সহসা পথ দেখলেন, তাঁর পুরনো বন্ধু সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে। ডঃ সাহা হাজির হলেন তাঁর কাছে। এ বিষয়ে সাহা লিখেছেন:

"বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ করে বলা হয়, তাঁরা গজদন্তমিনারে বাস করেন, বাস্তবের ঝঞ্ঝাটে তাঁরা থাকেন না। শৈশবকালে রাজনীতির সঙ্গে কিছু সংযোগের কথা বাদ দিলে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই গজদন্তমিনারেই আমি বাস করেছি। কিন্তু শাসনকার্যের জন্য 'আইন ও শৃঙ্খলা'র মতই একালে বিজ্ঞান ও কারিগরি সমগুরুত্ব লাভ করেছে। আমি ক্রমেই রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছি, কেন না আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের দ্বারা দেশসেবা করতে চেয়েছি। জনসাধারণের কাছে জানাতে পারি, আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কাটজু কিভাবে এর পরোক্ষ কারণ হয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালে যুক্তপ্রদেশে প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে ডঃ কৈলাসনাথ কাটজুকে যুক্তপ্রদেশের কোনো এক স্থানে একটি দেশলাই কারখানা উন্মোচন করতে আমন্ত্রণ করা হয়। সেখানে তিনি এক অতীব উদ্দীপ্ত ভাষণে বলেন, এই দেশলাই কারখানা উন্মোচনের দ্বারা দেশে বৃহৎ শিল্প প্রবর্তনের পথে এক পদক্ষেপ করা হল।

"বক্তৃতাটি কঠোরভাবে আঘাত করল আমাকে; কারণ এর দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন উচ্চপদস্থ কংগ্রেস নেতা, যাঁর উপরে নিজ প্রদেশের শিল্পের পুনর্গঠন, উন্নয়ন, বা প্রবর্তনের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত, তিনি জানেন না বৃহৎ শিল্প কাকে বলে!! আমি দেখলাম, অধিকাংশ কংগ্রেসীর অবস্থা একই প্রকার। এঁরাই ভাবী মন্ত্রী বা বর্তমান মন্ত্রী। আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, এঁরা ক্ষমতা পেলে, জীবনে বড় আকারে জল দেখে নি অথচ সমুদ্রে জাহাজ চালাতে অনুরুদ্ধ হয়েছে এমন মাটির মানুষদের মত হয়ে পড়বেন। এই সকল চিন্তা সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করতে আমাকে বাধ্য করাল।

"এইকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তাঁর নির্বাচন সংবাদ ঘোষিত হওয়ার সময়ে আমি কলকাতায় ছিলাম; অভিনন্দন জানাতে তাঁর বাসভবনে গেলাম।১৮ নেতাজীকে আমি প্রশ্ন করলাম: 'কংগ্রেস এখন ক্রমে ক্ষমতাসীন হচ্ছে; ক্ষমতা পাবার পরে আপনারা কিভাবে দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, এবং ব্যাধি সমস্যা দূর করবেন?' নেতাজী বললেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যস্ত থাকার জন্য কংগ্রেস নেতারা অন্য বিষয়ে সময় দিতে পারেন নি। তিনি জানতে চাইলেন, এ বিষয়ে আমার মত কি? আমি তাঁর কাছে কাটজুর বক্তৃতা সংবলিত খবরের কাগজের অংশ এগিয়ে দিয়ে বললাম, এই বক্তৃতার দ্বারা ডঃ কাটজু যেভাবে নিজেকে তুলে ধরেছেন, অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা যদি একই জাতীয় হন, যদি তাঁদের ধারণায় দেশলাই বা চরকা তৈরীর কারখানা বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের পথে অগ্রগতির নিদর্শন হয়, তাহলে ক্ষমতা পাবার পরে কংগ্রেস দেশের সর্বনাশ ঘটাবে।১৯ আমার বক্তব্যের গুরুত্ব স্বীকার করে

---

১৮ এখানে সামান্য তথ্যগত ভুল রয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, এ সংবাদ ঘোষিত হওয়ার সময়ে সুভাষচন্দ্র ইংলণ্ডে ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ফিরে আসেন। তারপরেই ডঃ সাহা নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

১৯ কংগ্রেসের অধিকাংশ কর্তা-ব্যক্তির জ্ঞানগম্যি সম্বন্ধে ডঃ সাহার অবজ্ঞার অবধি ছিল না। তিনি কংগ্রেসীদের 'গোবরতত্ত্ব'কে অবিরত আক্রমণ করেছেন, এমন কি স্বাধীনতার পরেও। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, স্বাধীনতার আগে

নেতাজী প্রশ্ন করলেন, তাহলে কী করা যায়? আমি তাঁকে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গঠনের পরামর্শ দিলাম। নেতাজী তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন।

দেশলাই কারখানারূপে বৃহৎ শিল্পের কথা শুনে চমৎকৃত মেঘনাদ সাহা সুভাষচন্দ্রের কাছে বিস্ময়জ্ঞাপনের জন্য গিয়েছিলেন, তার কারণ ছিল। কয়েক বছর আগে সুভাষচন্দ্রই মেঘনাদ সাহার কাছে পত্রযোগে প্রশ্ন ও আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল—জাতীয় সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের জন্য। মেঘনাদ সাহার উদ্ধৃত রচনা থেকে মনে হতে, তাঁর দ্বারা চালিত হয়েই বুঝি সুভাষচন্দ্র 'জাতীয় পরিকল্পনা'র প্রবর্তন করেন। সেকথা মোটেই ঠিক নয়। ১৯৩৩ সালে লণ্ডনে প্রেরিত ভাষণে (যার মধ্যে সাম্যবাদী সংঘের পরিকল্পনা ছিল) সুভাষচন্দ্র রাশিয়ার অনুরূপ ভারতবর্ষও স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতীয় পুনর্গঠনের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন বলেছিলেন, তা আগে কয়েকবার জানিয়েছি। পরের বৎসরে লেখা 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলের' মধ্যে পাই, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে প্রস্তাবিত বামপন্থী কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"এই দল দেশের কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় বিশ্বাস করে।" সুতরাং একথা না বললেও চলে, ডঃ সাহার কথায় সুভাষচন্দ্র যে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়েছিলেন—ঐ রাজী হওয়াটা তাঁর নিজের তাগিদেই হয়েছিল। ডঃ সাহার সঙ্গে প্ল্যানিং নিয়ে সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনান্তে ডঃ সাহার মনে হয়েছিল, তিনি সুভাষচন্দ্রকে স্বমতে টানতে সমর্থ হয়েছেন। আসল কথা সুভাষচন্দ্র আগেই আকৃষ্ট হয়ে আছেন; কিন্তু তাঁর বাস্তববাদীর স্বভাব কোনো জিনিসকেই খুঁটিয়ে বিচার না করে গ্রহণ করত না। তাঁর অভ্যাস ছিল, আগে কোনো জিনিসের মন্দ দিকটি তুলে ধরা—তা কতখানি মন্দ হতে পারে পরীক্ষা করে নেবার জন্য। ডঃ সাহার সঙ্গে আলোচনাকালে সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় তাই করেছিলেন এবং এই একাগ্রমন বৈজ্ঞানিক প্রবল যুক্তির দ্বারা সুভাষচন্দ্রের জিজ্ঞাসাকে আক্রমণ করে, ও জয়লাভ করে উল্লসিত হয়ে ভেবেছিলেন—জয় তাঁরই। জয় তাঁর, সুভাষচন্দ্রেরও কম নয়, যিনি খুশি হয়ে ভেবেছিলেন, তাহলে এতদিনে বিজ্ঞান এসে রাজনীতির হাত ধরল।

১৯৩৮ সালের ২১ আগস্ট তারিখে সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য ডঃ সাহা সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সভা হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে। অধ্যাপক সাহা সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও কর্মধারা উপস্থিত করার পরে দাবি করেছিলেন, তাঁরা এই পত্রিকার মারফৎ সর্বদা নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হিসাব পেশ করে পরিস্থিতির আসল চেহারা উপস্থিত করেছেন। "এই পত্রিকাই প্রথম দেখিয়ে দিয়েছিল, এদেশে মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ ইউরোপীয় দেশগুলির চেয়ে কুড়ি গুণ কম। জনগণের জীবনযাত্রার মানকে কিছু পরিমাণে ভদ্র করতে গেলেও উৎপাদনের পরিমাণ মাথাপিছু অন্তত দশ গুণ বাড়াতে হবে,—এর পক্ষে ঐ হিসাবের থেকে আর কোনো যুক্তি বেশি জোরালো হতে পারে? এই পত্রিকাই প্রথম দেখিয়ে দিয়েছিল, এদেশে মাথাপিছু বিদ্যুতের পরিমাণ মাত্র ৭ ইউনিট, ইউরোপীয় দেশসমূহের চেয়ে যা প্রায় ১০০ গুণ কম। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের তুচ্ছ পরিমাণ বোঝাতে ঐ হিসাবের যুক্তির চেয়ে অন্য বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি সম্ভবপর? আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, এদেশে মিউজিয়ামের সংখ্যা সুইডেনের মত দেশের তুলনায় হাজার গুণ কম। এ দেশের জনগণের সাংস্কৃতিক নিম্নমান বোঝাতে আর কোন্ তথ্য অধিক গ্রাহ্য হবে?"

এই সব মারাত্মক হিসাবের সত্য উদ্ঘাটন করার পরে ডঃ সাহা ১৯৩৫ সালে কার্লসবাড থেকে সুভাষচন্দ্র বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে নানা প্রশ্ন করে যে রচনা পাঠিয়েছিলেন, একে একে তার উত্তর দিতে থাকেন। সভাপতি সুভাষচন্দ্র সামনেই বসে ছিলেন।

১৯৩৫ সালের অক্টোবর সংখ্যায় 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচারে' প্রকাশিত সুভাষচন্দ্রের এই রচনাটির উল্লেখ আগেই করেছি। এর মধ্যে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সাতটি সমস্যার উত্থাপন করেন। দীর্ঘ দিনের

বাংলা দেশে মন্বন্তরের ফলে যখন ভারত সরকারের কিছু চৈতন্য উদয় হয়েছিল এবং স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের প্রচেষ্টায় সরকার সার তৈরীর কারখানার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন (যা পরবর্তীকালে সিন্দ্রী সার কারখানায় রূপায়িত হয়)—তখন শিল্পপতিরা পর্যন্ত এই জাতীয় পরিকল্পনায় অযথা অর্থব্যয়ের বিরোধিতা করেছিলেন, যেহেতু কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশ নাকি ইতিমধ্যেই মিশ্র অর্থনীতি নিয়ে বসে আছে, এবং সার কারখানার দ্বারা মিশ্র অর্থনীতির অমিশ্র রক্ত দূষিত হবে!!—"The creation of this factory at Government initiative and expense elicited a lot of criticism from many quarters. The industrialists of the Country who had absolutely nothing to do with its conception and erection, saw in this a violation of the principle of 'Mixed economy' to which they were wedded".

কংগ্রেসীদের গোবরনীতির বিরুদ্ধে ডঃ সাহার সমালোচনার উল্লেখ করে *Professor Meghnad Saha* গ্রন্থের সম্পাদক লিখেছেন—"This is not a joke. One highly placed Congressman actually pleaded for the abandonment of the project, as there was sufficient cow-dung in the Country."

Country."

চিন্তার ফলে ঐ সমস্যাগুলি তাঁর মনে আকারিত হয়েছিল। সেগুলি উপস্থিত করার পরে শেষকালে তিনি লিখেছিলেন —"আমাদের বিজ্ঞানীদের কাছে আমার বক্তব্য, একে একে বিচার করে সমস্যাগুলির সন্তোষজনক উত্তর তাঁরা দিন। বিজ্ঞানের সহযোগিতা ভিন্ন কোনো জাতিগঠন সম্ভব নয়।"

সুভাষচন্দ্রের প্রশ্নগুলির কোনো উত্তর কিন্তু অবিলম্বে দেওয়া হয় নি। সে কথা স্বীকার করার পরে ডঃ সাহা ঐ সভায় সংক্ষেপে উত্তরগুলি দেবার চেষ্টা করলেন।

সুভাষচন্দ্রের প্রথম প্রশ্ন ছিল : ভারতীয় সভ্যতা কি তার জীবনসন্ধ্যায় উপনীত কিংবা নবযুগের প্রত্যুষলোকে? যে জাগরণ দেখা যাচ্ছে তা কি সত্যই সর্বাত্মক উদ্বোধন, যার মধ্যে নবসৃষ্টির তাগিদ রয়েছে, না কি তা পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে সম্পর্কের প্রতিক্রিয়া মাত্র—উত্তেজক কোনো কিছু গ্রহণ করলে মাংসপেশীতে যেমন চাঞ্চল্য-শিহরণ ঘটে, তেমনি কিছু?

সুভাষচন্দ্র বলেছেন, প্রশ্নটি সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধীয়; ভাবাবেগমূলক উত্তর চাই না—বৈজ্ঞানিক উত্তর চাই।

সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় প্রশ্নটিও সমাজবিজ্ঞানমূলক; সেটিও এই সঙ্গে তুলে ধরছি, কারণ ডঃ সাহা উভয় প্রশ্নের উত্তর এক সঙ্গে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল : আমাদের সভ্যতার মত যেসব সভ্যতার মধ্যে জড়ত্ব এসে গেছে, সেখানে নব প্রাণসঞ্চারের উপায় কি? ভারত অধিকার করার জন্য ইউরোপীয় শক্তিগুলি যখন পরস্পর বিবাদ করছিল, তখন সত্যই আমাদের জীবন চরম গতিহারা বা ক্ষয়গ্রস্ত। সভ্যতার উত্থান-পতন সম্বন্ধে কি কোনো নিয়ম আছে, যা বলে দিতে পারবে কিভাবে আমাদের সভ্যতার মধ্যে আমরা নতুন জীবনীশক্তি এনে দিতে পারব? কিংবা একেবারে হতাশ হয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসে থেকে ভাবব, জড়ত্ব যখন এসেই গেছে তখন জাতি হিসাবে আমাদের কোনো ভবিষ্যৎই নেই।

মেঘনাদ সাহা উভয় প্রশ্নের একত্র উত্তর দিতে গিয়ে জানালেন : flinders Petric বা Spengler-এর থিয়োরীকে মেনে নিলে দেখব, জাতির জীবনে ১৫০০ বছরের এক-একটি পর্ব। তদনুযায়ী, ১২০০ খৃস্টাব্দে আমরা সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছিলুম; এখন সম্ভবত আমরা দীর্ঘ, ক্ষয়িষ্ণু শীত ঋতু কাটিয়ে নবজীবনের বসন্ত ঋতুতে উত্তীর্ণ হচ্ছি। কিন্তু এই নবজীবনের আন্দোলনকে যথাযথভাবে পরিচালিত করতে হবে। আমাদের বিশেষ দরকার নতুন জীবনদর্শন, যা আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎসকে অবারিত করে দেবে।

সুভাষচন্দ্রের তৃতীয় সমাজবিজ্ঞানমূলক প্রশ্নটি ছিল জাতিদেহে জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য রক্তমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন : আমাদের জাতির প্রাণশক্তি বৃদ্ধির জন্য স্বজাতিতে বিবাহ বা ভিন্ন জাতিতে বিবাহ—কোন্‌টি বাঞ্ছনীয়? স্বগোষ্ঠীতে বিবাহ না ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিবাহ—কোন্‌টি লোককল্যাণের অধিক উপযোগী? শুধু সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা নির্দ্বিধায় বলতে পারতেন, ভারতবর্ষে বিবাহের ব্যাপারে যেসব কৃত্রিম বিধিনিষেধ রয়েছে, সেগুলি তুলে দিলেই মঙ্গল। কিন্তু নাজীদের জাতি সম্পর্কে নতুন থিয়োরীর পর থেকে এ ব্যাপারে আমাদের সকলকেই আবার ভাবতে হচ্ছে। নাজীদের থিয়োরী যদি বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল হয়, যদি ভিন্ন গোষ্ঠী বা বর্ণে বিবাহ জাতির পক্ষে ভাল হয়, তাহলে আমার মনে হয়, নাজীদের থিয়োরীর বিরুদ্ধে একেবারে দেরি না করে বৈজ্ঞানিক উত্তর দেওয়া দরকার।

সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তৎকালে দেশবাসীর ধারণা, তিনি রাজনীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানুষ, এবং ব্যক্তিজীবনে প্রায় সন্ন্যাসী—তাঁর পক্ষে রক্ত মিশ্রণের দ্বারা জাতিদেহে বলাধানের চিন্তা কিছু অভিনব মনে হতে পারে। কিন্তু এখানে জানিয়ে দেওয়া যায়, এই চিন্তা তাঁর মধ্যে ১৯৩৫ সালেই প্রথম ওঠে নি—অনেক আগেই উঠেছে। বাঙালী জাতির মধ্যে নানা আকারের মানুষ ও তাদের বিভিন্ন প্রকৃতির কারণ সন্ধানে তিনি নৃতত্ত্ববিদ্যার সাহায্য নিয়ে স্থির করেছিলেন, রক্তমিশ্রণের ফলেই এমন ঘটেছে। ১৯২৬ সালের গোড়ার দিকে দেশবন্ধুর বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী প্রতিভার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন—"আর্য দ্রাবিড় ও মঙ্গোল, এই তিনটি জাতির রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান বাঙালী জাতির উৎপত্তি। প্রত্যেক জাতির মধ্যে কতকগুলি গুণ বিশেষভাবে বিকাশলাভ করে, সুতরাং রক্তের সংমিশ্রণ হইলে গুণের সংমিশ্রণও হইয়া থাকে। রক্ত সংমিশ্রণের ফলেই বাঙালীর প্রতিভা এমন সর্বতোমুখী এবং বাঙালীর জীবন এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ। আর্যের ধর্মপ্রবণতা ও আদর্শবাদ, দ্রাবিড়ের কলাবিদ্যা ও ভক্তিমত্তা, এবং মঙ্গোলের বুদ্ধিকৌশল, অনুচিকীর্ষা ও বাস্তববাদ বাংলার সাগরসঙ্গমে আসিয়া মিশিয়াছে। বাঙালী যে একসঙ্গে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ও ভাবুক, মায়াবাদবিদ্বেষী ও আদর্শবাদী, অনুকরণপ্রিয় ও সৃষ্টিক্ষম, তাহা এই রক্ত সংমিশ্রণের ফল।" ('তরুণের স্বপ্ন')

পরের বছর, ১৯২৭ সালে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বঙ্গীয় যুব সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে রক্তমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন; ১৯২৮ সালের পাবনা যুব সম্মিলনীতেও তাই। ভারতীয় সভ্যতার অপরাজেয় প্রাণশক্তির মূলে এই রক্তমিশ্রণ : "ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির আগমনের ফলে এই ভারতভূমি বিভিন্ন শিক্ষাধারার সঙ্গমস্থলে পরিণত হইয়াছে। হয়ত, এই সংমিশ্রণের দরুণই ভারতীয় জাতি ও ভারতীয় সভ্যতা বারবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে এবং তাহারই ফলে এই প্রাচীন জাতি অমর হইয়া পৃথিবীর বক্ষে বাস করিতেছে।" ১৯২৯ সালে হুগলী জেলা ছাত্রসম্মেলনে একই কথা বলার পরে যোগ করেছিলেন—"জাতির রক্তস্রোত যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—এখন চাই নূতন রক্ত।"

সুভাষচন্দ্রের পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ডঃ সাহা প্রথমে নাজী-মতবাদের উল্লেখ করে বলেন : "জাতির বা রক্তের শ্রেষ্ঠত্বের ভাব কোনো নূতন জিনিস নয়। কোনো জাতি যদি শক্তি অর্জন করে, সে অপর জাতিসমূহকে

দুর্ভাগা মনে করে এবং নিজের মহিমার কারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট থাকে। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রীস যখন মহিমান্বিত, অ্যারিস্টটল সগর্বে নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন: আচ্ছা, গ্রীকরা কেন পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে তিনি ব্যাপৃত হন। গ্রীসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তাঁর মতে আবহাওয়াগত। উত্তরের বর্বরেরা (তার মানে পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিগুলির পূর্বপুরুষেরা) এমনই শীতল আবহাওয়ায় বাস করে যে, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতেই তাদের সকল শক্তি ব্যয়িত হয়। দক্ষিণের অধিবাসীরা (অর্থাৎ আরব, ইহুদী প্রভৃতি) এমন উষ্ণ স্থানে বাস করে যে, উচ্চতর বিষয়ে মন দেবার মত কোনো শক্তিই তাদের অবশিষ্ট থাকে না। গ্রীসের আবহাওয়াই সেরা, অধিবাসীরাও তাই। তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, গ্রীকরা তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজাতিরূপে বর্তমান থাকবে।

কিন্তু পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ অ্যারিস্টটলের ভবিষ্যদ্বাণীকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে পৃথিবীর সভ্যতায় গ্রীসের দান প্রায় কিছু নেই; অপরদিকে যেসব বর্বরদের সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল নিতান্ত ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন, অল্পদিন পরেই তারা বিরাট সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবেরা এক অপূর্ব সভ্যতার সৃষ্টি করল, চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবল প্রাণশক্তির সঙ্গে যা বেড়ে উঠেছিল। বিজ্ঞান ও সাহিত্যে ইসলামের দান এককথায় অনবদ্য। অ্যারিস্টটল-কথিত উত্তরের বর্বরেরা বিরাট পশ্চিম-ইউরোপীয় সভ্যতার স্রষ্টা, বর্তমানকালে যার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। এইভাবে দেখা যাচ্ছে, অ্যারিস্টটলের আবহাওয়া-থিয়োরী সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

ডঃ সাহা আরও বলেছিলেন, নাজীদের জাতিতত্ত্ব আমাদের দেশের বর্ণাশ্রম ধর্মতত্ত্বের মতই। দ্বিতীয় শতাব্দীতে (মনুস্মৃতির কালে) বর্ণাশ্রমতত্ত্ব সম্পূর্ণ আকারলাভ করেছিল, যখন কোনো কোনো সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছিল অংশত জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে, অংশত বৃত্তি-শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। এর ফল—যে-জাতি ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে বসবাস করল, তারা তুর্কী আক্রমণকারীদের কাছে লজ্জাজনকভাবে পরাভূত হয়েছিল। সেই একই তত্ত্ব ভারতে এখনো বজায় আছে—ফলে ভারতের সুদীর্ঘ পতনের যুগ আর শেষ হচ্ছে না।

নিগ্রোদের দৈহিক মাপ, এবং বুদ্ধিশক্তির হিসাব নিয়ে দেখা গেছে শ্বেত মনুষ্যদের চেয়ে তারা কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। কে বলতে পারে, পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে আফ্রিকার নিগ্রোরা নতুন বীর্যবন্ত সভ্যতার প্রবর্তক হবে না?

সুভাষচন্দ্রের চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রশ্নের উত্তর মেঘনাদ সাহা দেন নি, তাঁর পত্রিকায় ঐসব বিষয়ে অল্পাধিক আলোচনা হয়েছিল বলে। চতুর্থ প্রশ্নটি ছিল ভারতের জনসংখ্যা বিষয়ে। সুভাষচন্দ্রের মনে হয়েছিল, ভারতের জনসংখ্যা অতিস্ফীতির দিকে। এত মানুষের দারিদ্র্য নিবারণ ভারতের সাধ্যে নেই। "যে জাতি নিরন্তর অনাহারের অবস্থার মধ্যে রয়েছে, সেই অবস্থাতেই সে এমনভাবে সন্তান

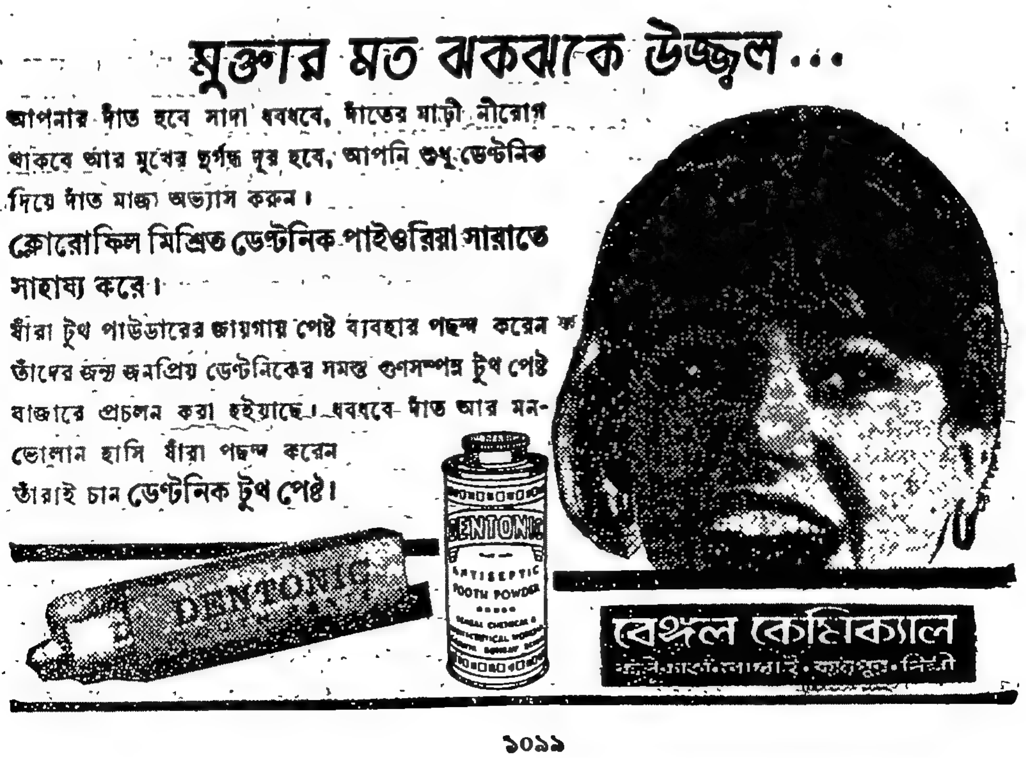

বন্ধ জানালা

আনন্দী পাল

বন্ধ জানালা, নীরব কাঁচের শার্সি
ঘষা কাঁচে বৃষ্টির ছোপ
তোমার চোখের মতন মনে হ'ল:
নগ্ন, শুষ্ক, নিরাবরণ
সেই যন্ত্রণা—
তোমার চোখে আমার ক্রন্দন,
তোমার চোখে আমার আয়না।

জনারণ্যে সেদিন দাবানল,
আগুনে তোমার আমার মাঝে:
দু' চোখের শীতল শাসন
শুধু মেনে নিলে—
"সাবধান! ধীরে ধীরে
পিছু হটে যাও,
তারপরে আর ভয় নেই।"
সেদিন জনারণ্যে প্লাবনী দাবানল।

আজ তাই খুলে দিই বন্ধ জানালা:
আহা! কী হাহাকার বৃষ্টির জলে,
কী অভিমানী এই হাওয়া।
হুতাশন কবে নিভে গেছে,
হোমভস্ম ধুয়ে যাক্ জলে।

উৎপাদন করে যাচ্ছে যা পশুকেও লজ্জা দেবে।" ভারতবর্ষে জনসংখ্যাবৃদ্ধির চরম সীমা কী?—তিনি প্রশ্ন করেছিলেন —কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণপদ্ধতি কি অবলম্বনীয় নয়?২০

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল সাধারণ লিপি নিয়ে। সুভাষচন্দ্র জানিয়েছেন, পূর্বে তিনি দেবনাগরী লিপির খুবই পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ১৯৩৪ সালে তুরস্ক ভ্রমণের পরে তাঁর মত বদলে যায়। তিনি এখন রোমান লিপির পক্ষপাতী।২১

ষষ্ঠ প্রশ্ন, সারা ভারতের জন্য একই জাতীয় উন্নত খাদ্যরীতির প্রবর্তন সম্ভব কি না? ভারতের অনেক স্থানের খাদ্যরীতিই অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাস্থ্যকর, যার জন্য শারীরিক সামর্থ্যের হানি ঘটছে।

সপ্তম প্রশ্ন, সারা ভারতের জন্য একই পোষাকের প্রবর্তন বিষয়ে। সুভাষচন্দ্র স্থানীয় পোষাকের সৌন্দর্য অস্বীকার করেন নি, কিন্তু সেই সঙ্গে জাতীয় পোষাকও চাই, যা না থাকার জন্য ইউরোপে গেলে ভারতবাসীকে ইউরোপীয় পোষাকই পরতে হয়।২২

[ক্রমশ]

---

২০ হরিপুরা-ভাষণে সুভাষচন্দ্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, কিন্তু খুব সন্তর্পণে, পাছে গান্ধীজী চটে যান। এখানে তিনি খোলাখুলি মত জানিয়েছেন।

২১ ডঃ সাহা রোমান লিপির পক্ষে যথেষ্ট প্রচারকাজ করেছেন। 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচারে' আগস্ট, ১৯৩৫ সংখ্যায় লেখেন *A Common Script for India.* ঐকালে সংবাদ বেরিয়েছিল, গান্ধীজী ভারতীয় জাতির ঐক্য-বিধানের জন্য দেবনাগরী লিপির সংস্কার করে সর্বজনগ্রাহ্য একটি লিপি প্রবর্তন করতে চাইছেন। সাহা গান্ধীজীর অভিমতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। নাগরী লিপির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে গান্ধীজীর ভ্রান্ত ধারণা দূর করার চেষ্টাও করেছিলেন। ডঃ সাহার রায় রোমান লিপির পক্ষে, বলাই বাহুল্য। ১৯৪১ সালের অক্টোবর সংখ্যাতেও এক প্রবন্ধে (*A Common Language for India*) অনুরূপ মত তিনি প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে পণ্ডিত নেহরুর বিশৃঙ্খল বক্তব্যের সমালোচনাও তিনি করেন। নেহরু স্বীকার করেছিলেন, দ্রুত কাজের পক্ষে নাগরী বা উর্দু লিপির তুলনায় রোমান লিপি 'নিঃসন্দেহে অধিক উপযোগী'; তাহলেও তাঁর মতে, ভারতে নাগরী বা উর্দু লিপির সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় রোমান লিপির জয়ের কোনো সম্ভাবনাই নেই, যেহেতু 'বিদেশী শাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে তার বিরুদ্ধে দেশে ভাবগত বিরোধিতার সমুচ্চ প্রাকার।' পণ্ডিত নেহরুর এই কথা ডঃ সাহা মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু নেহরু যখন বল্লেন, 'লিপি সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গি বস্তু, তাদের বিচ্ছিন্ন করলে বহুলাংশে পুরাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে' —তখন সাহার পক্ষে সেকথা মানা সম্ভব হয় নি, এবং তিনি যথেষ্ট যুক্তির সঙ্গে তার প্রতিবাদও করেছিলেন। বাংলা দেশে অধিকাংশ সংস্কৃত পুঁথি বাংলা অক্ষরেই লেখা হচ্ছে, দেব নাগরীতে নয়, এবং উর্দু লিপিতে গীতাও রয়েছে।

২২ ক্ষমতা হাতে পাওয়া মাত্র সুভাষচন্দ্র তাঁর পরিকল্পনাকে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রয়োজনে গঠিত আজাদ হিন্দ সরকার সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে অবিলম্বে সামাজিক সংস্কারে অগ্রসর হয়েছিল। এস এ আয়ার *Selected Speeches of Subhas Chandra Bose* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—"Before leaving for the Andamans, Netaji appointed a committee to make recommendations for the national unification of Indians in East Asia in matters of language, dress, food, greeting, emblem and ceremonies. He attached the greatest importance to this aspect of constructive work with a view to bring about abiding unity in the Indian nation."

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই
বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

ম্যলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণা' যে উপেক্ষণীয় রচনা নয়, সে-কথা আমিও জানি। আনন্দর সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার সত্যিকার কোনো মতান্তর ছিল না। তবে, সে-রচনা যে প্রধানত সেকালের সাম্প্রদায়িক একটি অনুষ্ঠান, সেই দিকটিতেই আমি জোর দিতে চেয়েছিলুম,—আর, আনন্দ চেয়েছিল ম্যলেন্সের বাংলা রচনার সাবলীলতা দেখাতে।

সে আমাকে ভুল বুঝেছিল সেদিন। কথায়-কথায় উত্তেজিত হয়ে, আমাকে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল সে।

আমার উচিত ছিল সে-দিকে কথা না বাড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গের দিকে এগুনো। সেই ভিন্ন প্রসঙ্গেই সরে গিয়েছিলুম আমি,—কিন্তু যাবার পথে আমি তাকে একটু খোঁচা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি।

তাকে বললুম—বিশুদ্ধ রচনাশক্তির কথাই যদি ধরতে হয়, তাহলে রামরাম বা মৃত্যুঞ্জয় ম্যলেন্সের চেয়ে মোটেই পিছিয়ে ছিলেন না। আর, সমসাময়িক সমাজ-জীবনের নিপুণ চিত্রকর কি ম্যলেন্স ছাড়া আর কেউ ছিলেন না? —ভবানীচরণের মধ্যেই কি সে-ক্ষমতা আমরা বিশেষভাবে ব্যক্ত হতে দেখিনি? অথচ তাঁর লেখা কি সত্যিই উপযুক্ত প্রচারের সুযোগ পেয়েছিল? এঁদের লেখা কি ইংরেজিতে কেউ অনুবাদ করেছিলেন?

সে বললে—হঠাৎ একথা উঠছে কেন?

—কারণ, অনুবাদ এক বৃহৎ প্রচারমাধ্যম। ইংরেজিতে অনুবাদ ঘটলে লোকের নজর পড়ে সে-রচনার ওপর। ম্যলেন্সের বই বাংলা মূলে যে-বছর বেরোয়, তার পরের বছরেই—১৮৫৩ খৃীস্টাব্দে তার ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয়। কলকাতার ক্রিশ্চান ট্রাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটির তেইশ নম্বর রিপোর্টে দেখা যায় যে, ভারতের নানা ভাষায় প্রকাশিত খৃীস্টপ্রাসঙ্গিক বইগুলির মধ্যে ম্যলেন্সের ঐ বইখানি ছিল সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থাবলীর অন্যতম।

আনন্দ বলেছিল—সে-বইয়ের অনুবাদ যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের ছিল অন্য দৃষ্টি, অন্য স্বার্থ। সে অন্য কথা।

আমি বললুম—সে তো ঠিক কথা। তবে এখন অন্য কথায় এগুনো যাক। রামরাম থেকে ম্যলেন্স পর্যন্ত কতো যে গদ্য-লেখকের কথা আলোচনা করা গেল! এ তো প্রায় পঞ্চাশ বছরের বিস্তার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং আরো কতো লেখক প্রথম দেখা দিয়েছিলেন এই সময়ের মধ্যেই। তাঁদের কথাও উঠবে নিশ্চয়। কিন্তু এইবার একটু পরিবর্তনের জন্যেই সেকালের একজন কবির কথা ভাবতে ভাল লাগছে।

সে বললে—তাহলে ঈশ্বর গুপ্তের কথাই ধর্তব্য—ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত, আর ম্যলেন্স—এই তিনজনের রচনা একসঙ্গে দেখলেই—মানে এঁদের মেলাতে পারলেই তখনকার সমাজমনের এবং ব্যক্তিমনের সাধারণ চেহারাটা চোখে পড়ে।

আমি বললুম—সেটা কি ঠিক? —রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথ বা বিদ্যাসাগর—এই অর্ধশতকের অন্তর্ভুক্ত এইসব মনের দর্পণ কি ঐসব রচনা?

—না, —আমি সে-কথা বলিনি। এই কারণেই আমি ঐ 'সাধারণ' শব্দটা ব্যবহার করেছি। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ছিলেন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যাক সে-কথা,—ঈশ্বর গুপ্তের কথা বলো শুনি। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন সেই ধরনের মানুষ যাঁদের সম্বন্ধে 'অব্যবস্থিতচিত্ত' বিশেষণটি ব্যবহার করতে কোনো-রকম কুণ্ঠা হয় না।

—এক্ষেত্রে তোমার এই প্রয়োগটি কি নিন্দাসূচক?

—না, নিন্দাসূচক হবে কেন? সমাজ এবং ব্যক্তি—দুয়েরই তখন অব্যবস্থিত ভাব গেছে। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন সেই কালের কবি। সেই বাংলাদেশ এখন আর নেই।

অতঃপর আমাকে আর বিশেষ কিছু বলতে হয়নি। আনন্দই কথা শুরু করে—

দ্যাখো,—সংসারকে কখনো মনে হয় অরণ্য, কখনো বা প্রমোদ-কানন। এ দুই-ই মর্জির কথা। দেহ-মন সুস্থ থাকলে যাকে ভারি প্রিয় মনে হয়,—আঘাতে-অনাদরে, সংশয়ে অতৃপ্তিতে জীর্ণ হতে-হতে তাকেই মনে হতে পারে দুর্বহ ভার। ঈশ্বর গুপ্ত একযোগে ইহজীবনের এই দুই অবস্থাই লক্ষ্য করেছিলেন। 'পরমার্থ', 'তত্ত্বজ্ঞান', 'সব হ্যায় ফাঁক', 'সব ভরপুর', 'মায়া', 'তত্ত্বপ্রকরণ', 'কে তুমি', 'সংসার-কানন' ইত্যাদি কবিতায় তাঁর এই আধ্যাত্মিক নিরীক্ষার পরিচয় আছে। তবে, এ নিরীক্ষা যথার্থ ভক্তের বা ভাবুকের নয়,—এ সবই সাংবাদিক স্বভাবকবির বাক্-চাপল্য।

বাংলা কবিতার ধারায় সদ্য-অতিক্রান্ত মধ্যযুগ

এবং অনাগত ভবিষ্যৎকেও তিনি যেন একযোগে অনুভব করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নতুন যুগের 'আধুনিকতা'র যোগ্য শিক্ষা বা সংযম তাঁর ছিল না। ইতিহাসে তাঁকে 'সন্ধিযুগের কবি বলা হয়। কথাটা মন্দ নয়।

একটু থেমে আনন্দ বললে—'সংসার-কানন' কবিতাটিতে তিনি লেখেন—

বনের প্রথম ভাগ দেখিতে সুন্দর।
শৈশব সময় নামে খ্যাত চরাচর॥
নাহিক জঞ্জাল জাল কন্টক-কামনা।
পথিক না পায় তাহে বিশেষ যাতনা॥
নব নব তরু চারু পূর্ণ ফল ফলে
মন মধুকর গন্ধে প্রতি দলে দলে॥
পরিষ্কৃত প্রমোদিত স্বভাব সদন।
মধুমল্লিকার বেড়া, মোহনীয় বন॥
ষোল বিঘা পরিমিত ভূমির অন্তরে
শোভনীয় যৌবনের বন শোভা করে,

আমি বললুম—'ষোল বিঘা পরিমিত ভূমি'র রূপকটি যেমন চিত্তাকর্ষক, 'যৌবনের বন'-ও সেই রকম,—যদিও একথা ঠিকই যে, এই ছত্র পড়তে গেলেই মনে পড়ে আমাদের সুপরিচিত বৈষ্ণব কবিতার উক্তি—'যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল'। যাই বলো,—ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্বের পরিচয় আছে এসব ছত্রে।

আনন্দ বললে—তিনি যে মধ্যযুগের বাংলা কবিতার ভাবে, ভাষায় লালিত ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। মধ্যযুগের পদাবলী, ধর্মকথা, কাহিনীকাব্যের পর্ব যখন শেষ হয়েছে, আমাদের সেই উনিশ শতকের প্রথম 'আধুনিক' কবি ছিলেন তিনি। দারিদ্র্য এবং গতানুগতিক সাধারণতাই ছিল তাঁর শৈশবের অবলম্বনভূমি। তাঁর অদম্য প্রাণশক্তিই সেই ভূমিতে তাঁকে মাত্র সাতচল্লিশ বছরের পরমায়ুর অধিকারী করেছিল।

ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম হয় ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে। দরিদ্র পিতার সন্তান ছিলেন তিনি। মাত্র দশ বছর বয়সে মাতৃহারা হয়ে তাঁকে জোড়াসাঁকোয় মাতুলালয়ে এসে উঠতে হয়; কিন্তু নিয়মমাফিক ছাত্রজীবন যাপনের সুযোগ হয়নি তাঁর। পনেরো বছর বয়সে বিবাহ হয় বটে, কিন্তু দাম্পত্য চরিতার্থ হয়নি কোনোদিনই। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির আনুকূল্যে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারির শেষ শুক্রবারে উনিশ বছর বয়সে, ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর বিখ্যাত 'সংবাদ-প্রভাকর' সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা শুরু করেন।

'প্রভাকর' নামটি তাঁর ভাল লেগেছিল। 'প্রভাকর' কথাটার মানে 'সূর্য'। নিজের ইহভূমির সংকোচের যন্ত্রণাই বোধ হয় এই সূর্যবন্দনার কারণ ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে, সূর্যের আলো সর্বব্যাপী। 'সার উপদেশ' নামে এক দীর্ঘ পদ্যে তিনি লেখেন—

অবোধ কুরঙ্গ কুল নিজ নিজ ভ্রমে।
সূর্য-কর জলবোধে নানাস্থানে ভ্রমে॥
ভ্রমে ভ্রমে প্রাণ যায় পিপাসার দায়
সর্বব্যাপী প্রভাকর দোষী নন তায়।

'তত্ত্ব' নামে আর একটি দীর্ঘ রচনায় তিনি এই সূর্যের শক্তির উৎস সম্বন্ধে লেখেন,—

প্রভাকর প্রভাকর, তুমি তার প্রভাকর,
নতুবা এ রবি ছবি কোথায় লুকায়॥
এই ভব চরাচর, বটে বটে মনোহর,
কিন্তু নহে স্থিরতর, রচিত মায়ায়॥

তাঁর কবিতায় নিত্য-নৈমিত্তিক প্রসঙ্গের দিকেই সমালোচকরা যদিও বেশি জোর দিয়ে থাকেন, তবু তাঁর রচনায় এই আধ্যাত্মিকতাও বার বার দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছেন—'আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বণ, আজ মিশনারি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন।'

পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুর আগেই সাময়িকভাবে ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে 'প্রভাকর'-এর সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং পরে আবার তাঁরই সম্পাদনায় 'প্রভাকর' দৈনিক রূপে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে 'সমাচার-চন্দ্রিকা' পত্রিকায় লেখা হয়—'প্রভাকর একেবারে ধর্মদ্বেষী হন নাই কেন না ধর্মাশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।'

পৃথিবী-শিক্ষা, অগ্নি শিক্ষা, চন্দ্র-শিক্ষা, সমুদ্র-শিক্ষা ইত্যাদি শিক্ষা-নামসংযোগী এক গুচ্ছ কবিতা আছে তাঁর। এই গুচ্ছটিরই অন্যতম 'সূর্য-শিক্ষা'তে তিনি লেখেন—

এক আত্মা দুই নাই এই বলে বেদ।
শরীরের ভেদ বলে তাহার প্রভেদ॥
প্রতি জলে রবি ছবি যেরূপ প্রকার।
সেইরূপ দেহ ঘটে আত্মার সঞ্চার॥
বায়ু বেগে বারি যদি করে টল টল।
তার মাঝে ভানু-তনু দেখায় চঞ্চল॥
গগনেতে তপনের নাহিক বিকার
স্বরূপ স্বভাবে স্থিত সদা একাকার॥

বোধ হয়, এই নিত্যশুদ্ধতার প্রতীক হিসেবেই 'প্রভাকর' নামটি তাঁর কাছে এক প্রিয় সংকেত হয়ে ওঠে।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্বের মজ্জায় ছিল এই ধর্মবোধ—যার একদিকে সংসারের নশ্বরতার চিন্তা, অন্যদিকে মানুষকে সমাজের কল্যাণকর্মে উদ্বোধিত করবার নিশ্ছিদ্র তাগিদ। আবার তাঁর শব্দে, অলঙ্কারপ্রবণতায়,—ব্যাপকভাবে তাঁর রচনার ভঙ্গিতে ছিল ভারতচন্দ্র এবং কবি-

ওয়ালাদের স্থূলতা, চাতুরী,—কতকটা গ্রাম্যতাও বটে।

আর, বিষয়-নির্বাচনে তিনি সাময়িক নানা ঘটনার দিকে যেমন আগ্রহ দেখিয়ে গেছেন, দেশের ফুল-ফল পুজো-পার্বণ ইত্যাদির অকৃত্রিম আবেগও তেমনি তাঁর কবিতায় বিদ্যমান। সমগ্রভাবে এই লক্ষণগুলির সমাহারে পাওয়া যায় এমন এক ভাব, যা একালে দুর্লভ। তাঁর শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র তাই তাঁর মৃত্যুর পরে, তাঁর কাব্য সম্বন্ধে লেখেন—'এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না, জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই।'

আনারস, তপসে মাছ,—মুগ, খেসারী, বরবটি,—চালতা, কৎবেল,—কুল, পেয়ারা ইত্যাদি কতো যে রূপ-রসের সৌরভ তাঁর কবিতায়। একটি ফলের কবিতায় দেখা যায়—

অনেক যতনে তোরে রসময় আতা
বিশেষ বিরলে বসি গড়েছেন ধাতা॥
সুচারু শ্যামল বর্ণে সুশোভিত পাতা
মনোহর কলেবর, অতি দক্ষ দাতা॥
হৃদয়ে ধরেছে তোরে বসুমতী মাতা।
প্রণাম করিছ তাঁরে, করে হেঁট মাতা॥
থোপ থোপ টোপ গাঁথা সকল শরীরে
বেঙকের ছাতা যেন প্রকৃতির শিরে॥
থাকে না রসের লেশ নব অনুরাগে
ফুটি ফাটা হয়ে যাও পাকিবার আগে।
তখন বিচিত্র এক রূপ যায় দেখা।
নীরদ ধরেছে যেন পারদের রেখা॥

পাকা আতার সবচে টোপ ঝিকে হয়ে এসেছে, শাঁসে ফুলে উঠেছে ফলটি, গায়ের চিড়গুলির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভেতরের শাদা—'নীরদ ধরেছে যেন পারদের রেখা'—এ রূপ সাময়িকতার সংকোচমুক্ত নিত্যের বিষয়। এতে ভোজ্যবস্তুর সম্ভোগ্যতা সহজ হয়েছে কবিমনের সরসতার গুণে।

আমি বললুম—এই সব ক্ষেত্রে তাঁকে আমার দেবেন্দ্রনাথ সেনের পূর্বগামী আত্মীয় বলে মনে হয়। মনে পড়ে বেদানা সম্বন্ধে তাঁর একটি কবিতা—যাতে তিনি লেখেন—

দুই কন্যা অপরূপ রূপের মাধুরী।
কাবেলে বিরাজ করে বেদানা সুন্দরী॥
মঙ্গল করেন তিনি মঙ্গলের দেশে।
কনিষ্ঠা দালিম নাম পাটনায় এসে॥
স্থির চক্ষে চেয়ে দেখি, উদ্যানের মাঝে
এমন মধুর ফল আর নাহি আছে॥
যত পাই তত খাই নাহি মিটে স্বাদ।
কিন্তু মনে দুঃখ এই বিচি যায় বাদ॥
কে বলে রসিক বিধি অতি রসময়।
রসময় হলে পরে হেন কেন হয়॥

আনন্দ বললে,—তবু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কবিত্বের কথা প্রসঙ্গে লিখে গেছেন—

'মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরমালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না; কাশীরামের মত সুভদ্রাহরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, কীর্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণার ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম, এসব সামগ্রী বড় বেশি নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।'

এই অধিকার-ক্ষেত্রটি ব্যাখ্যা ক'রে বঙ্কিম আরো লেখেন—'স্থূল কথা ঈশ্বর গুপ্ত রিয়্যালিস্ট এবং ঈশ্বর গুপ্ত স্যাটায়্যারিস্ট। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।'

ঈশ্বর গুপ্তের এই বাস্তব দৃষ্টি এবং ব্যঙ্গস্বভাবের নমুনা হিসাবে হিন্দুর বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে সমসাময়িক আইন-জারি উপলক্ষে তাঁর লেখাগুলির কথা মনে পড়ে। তিনি লেখেন—

গ্রান্ট করি গ্রান্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল কাল বিল করিলেন পাস॥

কবিওয়ালাদের শ্লেষ-অনুপ্রাস যমকের কথা মনে পড়ে। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁদেরই সমব্যথী,—মনে মনে তাঁদেরই সহচর। তিনি 'আধুনিক'—এবং আধুনিক ননও। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ তাঁর ভাল লাগে নি। তাই লিখেছিলেন—

সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন॥
নচেৎ না দেখি কোন সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই উপহাস সার॥
কেহ কিছু নাহি করে আপনার ঘরে।
যাবে, যাবে, যায় শব্দ, যাক্ পরে পরে॥

[ক্রমশঃ]

বঙ্গ দর্শন

...বাঙালীর জীবনের সবচেয়ে বড় উৎসব আনন্দ-মধুর পরিবেশে সমাপ্ত হয়েছে। পাঠক-পাঠিকাবর্গকে আমরা ... শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাঁদের ভবিষ্যৎ দিনগুলি সুন্দর হোক, মধুময় হোক এই কামনা করছি।

এবার সারা বাংলা জুড়ে দুর্গোৎসবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। সর্বত্রই সুশৃঙ্খলতার একটা আশ্চর্য প্রকাশ ছিল। শুধু সুশৃঙ্খলতারই নয়, মার্জিত রুচিরও। গত কয়েক বছর ধরে পূজা উপলক্ষে যে বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যেত এবার যেন তা যাদুমন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের যে চিরন্তন বদনাম আছে, এবারের শারদীয় উৎসব তার যেন যোগ্য জবাব দিয়েছে। প্রতিটি পূজা প্যাণ্ডেলে যুক্তফ্রণ্টের শরিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া যাতে আইনশৃংখলা ঠিকমত বজায় থাকে সরকারের তরফ থেকেও সে বিষয়ে চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নি। কলকাতা পৌরসভাও দর্শনার্থী জনসাধারণের অসুবিধাগুলির দিকে নজর রেখেছিলেন। সুরুচির পরিচয়ও সর্বত্র পাওয়া গেছে, এবারে সব জায়গাতেই মাইক্রোফোনে হিন্দী গানের প্রচার অনেক কম ছিল। একই ধরণের শৃংখলা ও সুরুচির পরিচয় মফস্বল বাংলার সর্বত্রও পাওয়া গেছে।

শুধু একটিমাত্র স্থানে, কলকাতা থেকে পঁচিশ মাইল দূরে, জগদ্দলে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে দুইটি সমাজবিরোধী দলের মধ্যে যে হাঙ্গামা ঘটেছে তা কলংকজনক। জগদ্দলের অবস্থা এখন আয়ত্তের মধ্যে। সরকারী মতে এই হাঙ্গামা পূর্বপরিকল্পিত। এই হাঙ্গামার সংগে যুক্ত থাকার অপরাধে পুলিশ এ পর্যন্ত ৫৩২ জন লোককে গ্রেপ্তার করেছে।

পাওয়ারলুম শিল্পে সংকট

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বারো হাজার পাওয়ারলুম আছে, এগুলির মধ্যে ১৬০০ বিভিন্ন সমবায় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। অবশিষ্ট তাঁতগুলির মধ্যে বেশির ভাগই চারখানা করে এক-একটি ইউনিটে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত। বিদ্যুৎচালিত এই তাঁতগুলিতে মোটা সুতোর বস্ত্র উৎপাদিত হয়ে থাকে এবং দরিদ্র শ্রেণীই এই বস্ত্র ব্যবহার করে থাকে। এই মোটা কাপড়ের চাহিদা পূর্বে বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে ছিল, এখন ওই সকল স্থানে বিদ্যুৎচালিত তাঁত গড়ে ওঠায় পশ্চিমবঙ্গের তাঁতশিল্পে বিক্রয়ের সংকট দেখা গেছে। মিহি বা অতিমিহি বস্ত্র বয়নের প্রসেসিং মিল পশ্চিমবঙ্গে নেই। সম্প্রতি পাওয়ারলুম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁদের কতকগুলি অসুবিধার কথা বলা হয়েছে। তাঁরা রাজ্য সরকারের নিকট মিহি, অতিমিহি ও সুতি বস্ত্র উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রসেসিং মিল ও তৎসহ অপরাপর যন্ত্রপাতির জন্য অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দানের দাবি করছেন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কোন নতুন সুযোগ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করছেন। সরকারী ক্রয়কেন্দ্রে পাওয়ারলুম কাপড়ের শতকরা কুড়ি থেকে তিরিশ ভাগ সংরক্ষিত করার দাবিও তাঁরা করছেন। যুক্তফ্রণ্ট সরকার জমি দখলের ক্ষেত্রে যেমন অল্প জমির মালিকদের রেহাই দিচ্ছেন, তেমনি শিল্পের ক্ষেত্রে ছোট ছোট কারখানার মালিকদের ওপর ঘেরাও-এর জুলুম বন্ধ করার দাবি তাঁরা জানিয়েছেন। এ সকল বিষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। সামগ্রিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রশিল্প সংকটের মুখে। মহারাষ্ট্র-গুজরাট কাপড়ের বাজার একচেটে করে রেখেছে। শুধু হস্তচালিত বা বিদ্যুৎচালিত তাঁতই নয়, বহুকালের প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলগুলিও সংকটের মুখে। পশ্চিমবঙ্গের তিরিশটি কাপড়ের কলে ৫০ হাজারের মত শ্রমিক কাজ করে। সম্প্রতি তাদের ধর্মঘটের অবসান হয়েছে; কিন্তু মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি ও অদক্ষ পরিচালকমণ্ডলীর জন্য এই রাজ্যে মোটা সুতোর কাপড়ই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মিহি ও অতিমিহি কাপড় আমেদাবাদের একচেটে। বিদেশ থেকে তুলো আনার ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলগুলি কোটা পায় না। সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রশিল্পই আজ ভেঙে যেতে বসেছে। হস্ত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে মাদ্রাজ পশ্চিমবঙ্গের বাজার দখল করে নিয়েছে। কাজেই বস্ত্রশিল্পের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আশা করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হবেন।

দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের তথ্যকেন্দ্র

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব একটি তথ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই তথ্যকেন্দ্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন সাধিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অনেক অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, শরিকী বিবাদ পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব প্রভৃতি সত্ত্বেও, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সরকার এমন অনেকগুলি সৎ কাজ করেছে যার তাৎপর্য ও গুরুত্ব কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যুক্তফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাধারণ মানুষ অনেক অধিকার পেয়েছে। শ্রম-আন্দোলনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। ভূমিহীনদের ভূমি বিতরণ করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ একর বেনামী বে-আইনী জমি উদ্ধার করা হয়েছে; তিন একর পর্যন্ত জমির মালিকদের ভূমিরাজস্ব চিরকালের জন্য মকুব করা হয়েছে, অপরাপর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। কিন্তু আজকের প্রচারের যুগে সাফল্যের প্রচারও দরকার, এবং তার জন্য শক্তিশালী প্রচারকেন্দ্রের প্রয়োজন। আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের সম্পর্ক ভাল নয় প্রতিটি বৃহৎ সংবাদপত্রই যুক্তফ্রণ্টের প্রতিকূল। বিভিন্ন দলীয় মুখপত্রগুলিতে সামগ্রিকভাবে সরকারের কার্যকলাপকে তুলে ধরার পরিবর্তে অন্য শরিক দলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের চেষ্টাই অধিকতর প্রকট। ভারতবর্ষের অন্যত্র পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে

ব্যাপক প্রচারকার্য চলছে। দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট বিরোধী একটি লবী আছে যাদের কাজই হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা। বলাই বাহুল্য যে, কায়েমী স্বার্থের এই সব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সময়মত জবাব দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ রাজধানী দিল্লী সারা ভারতের কেন্দ্রবিন্দু। সেখান থেকেই যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী প্রচার সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অতএব অপপ্রচারের ওই কেন্দ্রস্থলেই শক্তিশালী জবাব দেবার ঘাঁটিও তৈরি করা দরকার। শুধু মিথ্যা ও অপপ্রচারের জবাব দেওয়াই নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ পর্যন্ত জন-স্বার্থে যে সব সৎ কাজ করেছেন এবং যেগুলি করতে উদ্যোগী হয়েছেন, সে সম্পর্কেও দিল্লীবাসী তথা সারা ভারত-বাসীকে প্রকৃত তথ্য ও ঘটনা জানানো প্রয়োজন। রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত নয়াদিল্লীর নতুন তথ্যকেন্দ্র যদি সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে, তবেই তা সার্থক হবে।

অবৈতনিক শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার আগামী বৎসরের প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করতে মনস্থ করেছেন। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করতে কমপক্ষে দশ কোটি টাকা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় জানিয়েছেন যে, এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তর মোটেই আশাপ্রদ নয়। কাজেই ওই টাকা তোলার জন্য রাজ্য সরকার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাকর বাবদ শতকরা পাঁচ ভাগ থেকে দশ ভাগ রোডসেস ও শহরের জমি ও বাড়ির ওপর অতিরিক্ত কর বসাবার চেষ্টা করছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য যে এই কর যেন প্রত্যক্ষ কর হয়। ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, আইনজীবী, পদস্থ কর্মচারী, অর্থাৎ সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর কাছ থেকে যেন প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাকর আদায় করা হয়। এই করের হারও যেন সকলের ক্ষেত্রে এক না হয়, যার যেমন মাসিক আয় সে সেই অনুপাতে কর দেবে। বস্তুত ব্যক্তির উপার্জনের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে নানা প্রকার জনকল্যাণ-মূলক কাজের জন্য প্রত্যক্ষ কর আদায় করা বহু দেশেরই রীতি, পশ্চিমের গণ-তান্ত্রিক দেশগুলিতেও তা করা হয়। কাজেই চেষ্টা করলে উচ্চ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে দশ কোটি টাকা শিক্ষাকর হিসাবে আদায় করা কঠিন ব্যাপার হবে না। —২৪।১০।৬৯

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেট

আইরিশ লেখক স্যামুয়েল বেকেট সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকদের কাছে বহু পরিচিত। ইতিপূর্বে এই পত্রিকায় তাঁর নাটক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শিলালি। স্যামুয়েল বেকেটের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি আমাদের কাছে আশাতীত ছিল না, তাই আমরা আনন্দিত।

স্যামুয়েল বেকেটের বিখ্যাত 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকটির বাংলায় অনুবাদ বহুদিন আগে করেছেন শ্রীঅশোক সেন। ঐ নাটকটির আলোচনাও সাপ্তাহিক বসুমতীর গ্রন্থবার্তায় প্রকাশিত হয়েছে, আশা করি তা পাঠকদের স্মরণে আছে।

সাপ্তাহিক বসুমতীর আগামী সংখ্যায় শ্রীঅশোক সেন লিখছেন স্যামুয়েল বেকেটের সাহিত্য ও সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে একটি মূল্যবান নিবন্ধ।

—সম্পাদিকা

ভারতদর্শন

নাম্বুদ্রিপাদ বিদায় নিলেন

১৯৬০ ভোটে পরাজয়ের পর কেরল মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত শঙ্করণ নাম্বুদ্রিপাদ 'নাম্বুদ্রিপাদ জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করার জন্য পদযাত্রা করলেন আর কেরল রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ করল অনিশ্চিত অন্ধকারের মধ্যে। এখন শুরু হয়েছে ক্ষুদে-ফ্রণ্টের মন্ত্রিসভা গঠনের তোড়জোড়। কাকে নিয়ে, কাদের নিয়ে? না, মুসলিম লীগকে নিয়ে, অমার্ক্সবাদীদের সমর্থনে। অবশ্য এই বাসনা শেষ পর্যন্ত কতদূর ফলপ্রসূ হবে তা ভগবানই জানেন। (অ-মার্ক্সবাদীরা বলেছেন, একমাত্র ভগবান বিশ্বাসীরাই ফ্রণ্ট টিকিয়ে রাখতে পারেন)। আপাতত নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভাকেই বিকল্প ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে হবে। অন্তত সপ্তাহখানেক তো বটেই। কেরল মন্ত্রিসভার সাতজন মন্ত্রী ইতিপূর্বেই পদত্যাগ করেছিলেন। অবশিষ্ট ছিলেন চারজন মন্ত্রী এবং ই এম এস নিজে। এ'দের মধ্যে সি পি এম-এর তিনজন, কে এস পি'র একজন এবং সি পি এম মুখ্যমন্ত্রী।

অতএব বত্রিশ মাসের যুক্তফ্রণ্টকে এইভাবে ভেঙে দেওয়া হল ২৪শে অক্টোবর, ১৯৬৯ সালে। এর আগে ই এম এস-এর নেতৃত্বে গঠিত প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ৫ই এপ্রিল। ভাঙা হয়েছিল ৩১শে জুলাই, ১৯৫৯ সালে। তখনও দোষ ছিল মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টদের ওপরেই অর্থাৎ কম্যুনিস্টদের ওপরে। এবারও কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধেই জোট, তবে নাটের গুরুও কম্যুনিস্ট: যাঁদের অ-মার্ক্সবাদী বলা হয় এবং সংশোধনবাদী বলে যাঁরা নিজেদের সুপরিচিত করেছেন ও করছেন। প্রথম মন্ত্রিসভা অবশ্য বাতিল করে দেন রাষ্ট্রপতি রাজ্য বিধান সভায় ই এম এস-এর দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও। সেদিন মন্ত্রিসভা ভাঙার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন কংগ্রেস। আজ তাঁরা নেপথ্যে। মন্ত্রিসভা ভাঙতে এলেন যে চৌদল তাঁদের পুরোভাগে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি, সহযোগী হলেন মুসলিম লীগ, আই এস পি ও আর এস পি। ভোটযুদ্ধে পরাজিত করার জন্য সি পি আই-চক্রকে মদত যোগাতে দুই বাহু প্রসারিত করে ধরলেন কংগ্রেস, কেরল কংগ্রেস এবং কর্ণাটক সমিতির সদস্য দুজন নির্দলীয় এম এল এ। বিপক্ষে সি পি এম-এর সঙ্গে ছিলেন দুজন নির্দলীয় সহ এস এস পি এবং কে টি পি।

ফ্রণ্ট কেন ভাঙল?

ভাগ্যের পরিহাস, ফ্রণ্ট ভাঙল দুর্নীতির অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে, অন্তত প্রত্যক্ষ কারণ এটাই। আর সেই অভিযোগ ছোঁড়াছুঁড়ি করলেন তাঁরা, কেরলের প্রথম কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভার যাঁরা ছিলেন অবিভক্ত কমরেডস। সেদিন কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভা ভাঙতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন মুসলিম লীগ এবং আর এস পি এবং এ'রা কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিয়ে দুষ্কার্যটি করেছিলেন। সেই দুই দলও ই এম এস-এর মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেয়েছিলেন। সুযোগমাত্র সি পি আই-কে সামনে রেখে ই এম এস-কে তাঁরাই পুনশ্চ বিদায় করলেন।

খেলাটা ভালই জমেছিল। মার্ক্সবাদীদের দলীয় প্রভাব বৃদ্ধি এ খেলায় ইন্ধন যুগিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালেও দেখা যাবে মার্ক্সবাদীদের জয়যাত্রাটা অনেকের চক্ষুশূলের কারণ।

চতুর্থ নির্বাচনের পর অনেক উল্টো স্রোত ঠেলে ই এম এস ফ্রণ্ট-মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে না-করতেই, ফ্রণ্টের শরিকানি কচলাকচলি মুখব্যাদন শুরু করল। উঠল অভিযোগ। উত্তরে পাল্টা অভিযোগ। তারপরে অভিযোগের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ।

দুর্নীতির অভিযোগ উঠল কে-টি পি দলের বি ওয়েলিংডন (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) এবং আই এস পি দলের পি কে কুঞ্জুর-এর বিরুদ্ধে। এইখানে উল্লেখ্য, আই এস পি'র জন্ম চতুর্থ নির্বাচনের পর এস এস পি ভেঙে বার সদস্যের ভারতীয় সোস্যালিস্ট পার্টি গঠনের মধ্যে। আই এস পি মন্ত্রিসভার পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

ই এম এস কি ভাবলেন তিনিই জানেন, দুই মন্ত্রীর একজন অর্থাৎ আই এস পি'র কুঞ্জুর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে তাঁকে পদত্যাগ করতে বললেন আর ওয়েলিংডনের দুই হাত ধরে ফ্রণ্টে টাগ অব ওয়ার শুরু হয়ে গেল। মার্ক্সবাদীরা ওয়েলিংডনকে অ-স্পর্শিত রাখতে চান, অ-মার্ক্সবাদী ক্ষুদে ফ্রণ্ট চান তাঁকেও ঘায়েল করতে।

ই এম এস জার্মানী থেকে প্রত্যাবর্তন করলে ক্ষুদে ফ্রণ্ট ওয়েলিংডন-কে কুরুক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য তৈরি হয়েই হুমকী দিলেন। তাঁরা তো তখন কালিকটে মিলিত হয়ে (সি পি আই, মুসলিম লীগ, আর এস পি, আর আই এস পি) আগেই চরম পত্র তৈরি করেছেন। হয় ওয়েলিংডনের বিচার কর, নয় চার-পার্টির সমর্থনের আশায় জলাঞ্জলি দাও।

সি পি এম জনমত সামলাতে তৈরি হলেন। সম্পাদক সুন্দরায়া বললেন, কংগ্রেসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চার পার্টি ফ্রণ্ট ভাঙতে ও বিকল্প সরকার গঠন করতে প্রস্তুত হয়েছেন। আর এস পি ফুঁসে উঠলেন, কভি নহী। কংগ্রেসের সঙ্গে কোন কোয়ালিশনে পার্টি থাকবে না। অর্থাৎ সেই ধোয়া তুলসীর বনে কাগজে বাঘের হুঙ্কার। কংগ্রেসও শাপ, তোমার মার্ক্সবাদীও খাবাপ। সাচ্চা কে?

এ প্রশ্নের জবাব হয়ত কেরলে পুনশ্চ মধ্যবর্তী নির্বাচনই দেবে। পশ্চিমবঙ্গে বসে আর বলব কি। এখানেও তো ধোয়া তুলসীর খেল চলছে। সরকার কবে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে অনেক ভাগাড়ের শকুনই থুবড়ো হয়ে বসে আছে।

যাকগে, দুর্ভাগা দেশে ধোয়া তুলসীর নাচন এখনও বেশ কিছুকাল দেখতে ও সহ্য করতে হবে। বিধিলিপি।

আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফেরা যাক।

১৩ তারিখে ই এম এস ফিরলেন। ফের আলোচনা বৈঠক হল। ফল ফলল না। অতএব ১৮ তারিখ তিনি নির্দেশ দিলেন, অভিযোগের তদন্ত যদি করতেই হয় তো প্রতিটি অভিযুক্ত মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই তদন্ত হোক, তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কারও পদত্যাগের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মুখ্য-মন্ত্রীর প্রয়োজন না থাকলে কি হবে, তদন্ত পেছনে নিয়ে কে আর মন্ত্রিত্ব করবেন। ঝপাঝপ ছ'জন মন্ত্রী (সি পি আই, মুসলিম লীগ, আই এস পি এবং আর এস পি'র) পদত্যাগ করলেন। প্রশ্ন উঠল ই এম এস কজন মন্ত্রীকে চাদর ঢেকে আড়াল করলেন কেন ?

ই এম এস-এর অনুরোধ সত্ত্বেও পদ-ত্যাগপত্র কেউ প্রত্যাহার করলেন না। ওদিকে এতেক কাণ্ডের কেন্দ্রীয় নায়ক বি ওয়েলিংডনও শেষ পর্যন্ত পদত্যাগই করলেন। তবু ফ্রন্ট রক্ষা পেল না।

ই এম এস ঘোষণা করলেন বাইশে অক্টোবর, তিনি যে সব প্রশ্নে বিরোধিতা করেছেন, তার যে কোন একটির ওপর ভোটে হারলেই সেই ভোটকে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা গণ্য করে পদত্যাগ করবেন। আর তাই করতেও হল ২৪ তারিখ বেলা ১টা ৫ মিনিটে।

ই এম এস মন্ত্রিসভায় যে কজন সদস্যকে জিইয়ে রেখেছিলেন সি পি আই-এর টি এ মজিদ আনলেন তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। কংগ্রেসী, কেরল কংগ্রেসী এবং অ-মার্ক্সবাদীদের ১টি ভোটের সংখ্যাধিক্যের ব্যবধানে ই এম এস-এর প্রতি অনাস্থাই প্রকাশিত হল। (তাঁর ঘোষণা অনুসারে) ই এম এস পদ-ব্রজে রাজ্যপালের কাছে গিয়ে পদত্যাগপত্র পৌঁছে দিলেন।

সাধু বচন-নিচয়

মন্ত্রিসভা পড়লে রীতি অনুসারে সাংবাদিকরা কিছু সাধু নেতৃবচন চয়ন করে আনেন। তারই কয়েকটি কেরল মন্ত্রিসভা পতনে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী-নিচয়ের উল্লাস ও বেদনাকে মূর্ত করে তুলবে।

নিচে কয়েকটি তুলসী-সংশোধিত বচন সঙ্কলন করে ধরে রাখলাম :

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ার-ম্যান শ্রীডাঙ্গে বলছেন : সি পি এম নেতারা একদল সর্বনাশকারী। আজকতার আরা তাঁরা বুর্জোয়া, জমিদার ও প্রতি-ক্রিয়াশীলদের সাহায্য করছেন।

প্রগতিশীল কেরল কংগ্রেসের শ্রীশঙ্কর নারায়ণ মনে করছেন : ক্ষমতার অপব্যবহার এবং যুক্তফ্রন্টের দলগুলিকে খতম করার মার্ক্সবাদী নীতিরই ফলশ্রুতি।

উড়িষ্যার-মুখ্যমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দল) তার প্রগতিশীল সাধুবচনে বলেছেন : এটাই ছিল অনিবার্য।

প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির যুগ্ম সম্পাদক তাঁর প্রগতিশীল বাণীতে বলছেন : কেরল সরকারও কংগ্রেসের চেয়ে কম দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন না। এবার পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টও পড়বে। [লক্ষণীয় তিনি সামগ্রিকভাবে কেরল ফ্রন্টকেই অভিযুক্ত করেছেন। অতএব তাঁকে কি 'প্রগতিশীল' বলা যাবে। শ্রীডাঙ্গের মতে যাঁরা 'প্রগতিশীল', ইনি আবার তাঁদেরও ছেড়ে কথা বলেন নি। ইনিও সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল এবং বুর্জোয়াদের জিইয়ে রাখতে চান।]

স্বতন্ত্র দলের দশজন প্রগতিশীল (?) এম পি বলেছেন, জাতীয়তা ও সমাজ-বিরোধী চিন্তাধারাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন নাম্বুদিরিপাদ ও তাঁর সরকার।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেসী সিন্ডিকেটের অন্যতম পাণ্ডা শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত মহাশয় ডাঙ্গেজীর মতই বলেছেন : সরকার গঠনের সুবিধাবাদী নীতি অসাফল্যের কারণ, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কেরলের কংগ্রেসী নেতা প্রগতিশীল ডঃ জর্জ টমাসও প্রতিক্রিয়াশীল নাম্বুদিরি-পাদের প্রতি ডাঙ্গোচিত দোষারোপ করে প্রগতিবাদের পরাকাষ্ঠা এইভাবে তুলে ধরেছেন : পদত্যাগে নাম্বুদিরিপাদের এতো দেরি করা অনুচিত হয়েছে।

সবচেয়ে প্রগতিশীল উক্তি ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি অটলবিহারী বাজ-পেয়ীর। এঁর উক্তি : কেরলবাসীর আজ মুক্তি দিবস। মন্ত্রিসভার পতনের কারণ ঐ মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট দল।

অবশ্য ডাঙ্গেপন্থীদের হাতেও তিনি কেরলবাসীর মুক্তির ভার দিতে চান না। বলেন : সর্বোত্তম পন্থা হবে রাষ্ট্রপতির শাসন।

প্রগতিশীল প্রজা সমাজতন্ত্রীরা উন্মুখ পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট পতনের জন্য। তাই দলের চেয়ারম্যান প্রগতিশীল শ্রীযুত গোরেকেও বলতে শোনা যাচ্ছে : এতোকাল কেরলে সরকার টিকেই বা ছিল কী করে। পশ্চিমবঙ্গেও সরকার ভাঙল বলে।

পরিতাপ

পরিতাপ প্রকাশ করেছেন তামিলনাড়ুর ডি এম কে. আর গুজরাটের মহা গুজরাট জনতা পরিষদ। পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীইন্দুলাল যাজ্ঞিক বলেন : ফ্রন্ট শরিকরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে কংগ্রেসের কবলে পড়ল, ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন।

জনগণেরও এ ছাড়া উপায় কি। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় যে দেশে সে দেশে ধোয়া তুলসী বেছে খাঁটিটুকু দুই আঙুলে তুলে নিয়ে ভোট বাক্সে ফেলা অতঃপর একটা সমস্যা হয়েই দাঁড়াল। তবে প্রকৃত-পক্ষে ধোয়া তুলসী হওয়ার জন্য যদি সত্যিই প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং তা বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গে এক ফুঁয়ে মার্ক্সবাদীদের হটিয়ে দেওয়াই বা এমন কি শক্ত কাজ হবে।

—২৫।১০।৬৯

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী

বিদ্যাপতির সমগ্র পদ
মূল্য : চার টাকা

জ্ঞানদাসের সমগ্র পদ
মূল্য : দুই টাকা

গোবিন্দদাসের সমগ্র পদ
মূল্য : দুই টাকা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সান্যাল এণ্ড কোং
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

আন্তর্জাতিক

পশ্চিম এশিয়া ঃ

গত ২৫শে অক্টোবর লেবানন গভর্নমেন্ট ঘোষণা করেন যে, সাঁজোয়া গাড়ি, মর্টার এবং ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান নিয়ে ৩০০ পদাতিক সৈন্য সিরিয়ার সীমান্ত দিয়ে লেবাননে ঢুকে পড়েছে এবং লেবাননের একটি গ্রাম ঘেরাও করেছে। এই সৈন্যরা কোন্ দেশের লোক তা সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ করা হয় নি। তবে রয়টার নাকি জানতে পেরেছেন যে, তারা সিরিয়ার সৈন্য। বে-সরকারী সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে যে, ৮টি ট্যাঙ্ক নিয়ে সিরিয়ার সৈন্যরা লেবাননে ঢুকে ইয়ান্টা নামে একটি গ্রাম দখল করেছে এবং অপর একটি গ্রাম অবরোধ করেছে।

সিরিয়ার সরকারী মহল কিন্তু লেবানন সীমান্তে সেনা সমাবেশের কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, সিরিয়া অপর দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করবে না। তবে প্যালেস্টাইন কমান্ডোদের (প্যালেস্টিনীয় মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সংগঠন) বিরুদ্ধে লেবানন সরকার যে রক্তাক্ত অভিযান চালাচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে তারা স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের মতামত ব্যক্ত করবেন।

ওয়াকেবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে যে, সিরীয় গভর্নমেন্ট লেবাননের বিরুদ্ধে পুরোপুরি অর্থনৈতিক অবরোধ চালু করার কথা বিবেচনা করছেন। প্যালেস্টিনীয় গেরিলাদের বিরুদ্ধে লেবানন সরকারের অভিযান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সেই অবরোধ চালু থাকবে। সিরিয়া লেবাননের বিরুদ্ধে কোন সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তাই করছে না, কারণ তারা লেবাননে মার্কিন ফৌজ অবতরণের অজুহাত সৃষ্টি করতে চায় না।

সিরিয়ার সঙ্গে লেবাননের এই মনোমালিন্য আকস্মিক ঘটনা নয়। লেবাননে আরবরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও খ্রীস্টানদের সংখ্যাও কম নয়। খ্রীস্টানরা পশ্চিমী দুনিয়ার প্রতি অনুগত এবং লেবানন সরকারের ওপর তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সেই কারণে লেবানন আরব-ইসরাইল বিরোধে নিরপেক্ষ থাকবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইসরাইলের বে-পরোয়া দমন-নীতির ফলে প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তু গেরিলারা দল বেঁধে এসে আশ্রয় নিয়েছে লেবাননের দক্ষিণ অঞ্চলে। লেবানন সরকার তাতে আপত্তি করতে পারেন নি। গত সপ্তাহে সেই গেরিলাদের ঘাঁটি লেবাননের সেনাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। একই সময় ইসরাইলের গোলন্দাজবাহিনীও নাকি তাদের ওপর গোলাবর্ষণ করে। লেবানীজ ফৌজী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে, ফৌজের আদেশ গেরিলারা অমান্য করেছিল বলেই তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল। প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা সে কথা স্বীকার করেন নি। তাঁরা বলেছেন যে, প্যালেস্টাইন বিপ্লবকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করাই ছিল লেবাননী ফৌজের আসল উদ্দেশ্য। লেবাননের প্রধানমন্ত্রী কারামি এই সংঘর্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চান নি। তিনি পদত্যাগ করে এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, গেরিলাদের ঘাঁটি আক্রমণের আগে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নি এবং তিনি এই আক্রমণের বিরোধী। কারামির পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং সিরিয়া তার লেবাননের সীমান্ত বন্ধ করে দেয়। লেবানন থেকে তাঁরা তাঁদের রাষ্ট্রদূতকেও সরিয়ে নিয়েছেন। ওদিকে জর্ডানে অবস্থানকারী ইরাকী সেনাবাহিনীর ওপর ইরাক সরকার এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, রাজা হোসেনের সৈন্যরা যদি প্যালেস্টাইনের গেরিলাদের ওপর আক্রমণ চালায়, তাহলে ইরাকীবাহিনী যেন গেরিলাদের পক্ষ অবলম্বন করে। লেবাননের ঘটনায় সমগ্র আরবজগৎ ক্ষুব্ধ হয়েছে বলে মিশরের আধা-সরকারী আল আহ্‌রাম পত্রিকা ঘোষণা করেছেন এবং আরব জগতের প্রায় সর্বত্রই লেবানন সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছে।

পশ্চিমী শক্তিবর্গের দ্বারা প্রভাবিত লেবানন সরকার আরব-ইসরাইল বিরোধে নিরপেক্ষ থাকবার ভান দেখালেও গোড়ায় গোড়ায় ইসরাইলকেই মদত দিচ্ছিলেন। গত বছর ডিসেম্বর মাসে ১২খানা ইসরাইলী হেলিকোপ্টার লেবাননের রাজধানী বেইরুটের বিমান ঘাঁটিতে নেমে কতকগুলো সামরিক বিমান ধ্বংস করার পর সেদেশে সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। লেবাননবাসী দাবি করে যে, তাদের দেশ থেকে প্যালেস্টিনীয় আরবদের ইসরাইলের ওপর হানাদারী ক্রিয়াকলাপ চালাবার সুযোগ দিতে হবে। এই নিয়ে লেবাননের নিরাপত্তা-বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয় এবং তাতে বিশজন মারা যান। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে, লেবাননের সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গেরিলারা সেখানে তাঁদের ইসরাইল-বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যেতে পারবে। লেবাননের সেনাবাহিনী সেই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করে গেরিলাদের ওপর আক্রমণ চালানোর ফলেই বর্তমান সংকটের উদ্ভব।

পরিস্থিতি এমন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে যে, গত ২৫শে অক্টোবর লেবাননের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী ত্রিপোলীর নাগরিকরা নিরাপত্তা-বাহিনীকে শহর থেকে বিদায় দিয়ে শহরটি দখল করে নিয়েছেন। সেখানে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় বিক্ষোভকারীদের এক সংঘর্ষে ৬ জন নিহত এবং ৭ জন জখম হওয়ার পর এই ঘটনা ঘটে। নিরাপত্তাবাহিনী এখন ত্রিপোলী শহর থেকে সরে গিয়ে তার উপকণ্ঠে ঘাঁটি গেড়েছে এবং শহরে ঢোকার সমস্ত সড়ক বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী কারামির রাজনৈতিক শত্রু ফারুক মোকাদ্দেম। শহরে প্যালেস্টাইনের বহু উদ্বাস্তু এসে বসবাস করছেন এবং এটা আরব জাতীয়তাবাদীদের একটা মস্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত।

লেবাননের প্রেসিডেন্ট চার্লস্ হেলো এই রাজনৈতিক সঙ্কট মোচনের জন্য শনিবার আরব নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের বলেন যে, গেরিলারা উস্কানিমূলক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করলেই নিরাপত্তাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করে দেবে।

এদিকে ইসরাইলের সহকা[illegible] প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ্যালন এই মর্মে স[illegible] বাণী করেছেন যে, নিজের নিরা[illegible] প্রয়োজনে ইসরাইল দক্ষিণ লেবানন দখল করে সেখানে আরব গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পারে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র

অ্যালনের এই উক্তির নিন্দা করে টিট-ম্যাটের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, বিষয়টা নিয়ে বৃটেন এবং ফ্রান্সের সংগে আমেরিকা আলোচনা চালাচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়নও চুপ-চাপ বসে নেই। তাঁরা লেবাননে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী করেছেন। পাকিস্তানের এক সংবাদে জানা গেছে যে, শতাধিক আরব ছাত্র ইসলামাবাদের লেবাননী দূতাবাস দখল করে নিয়েছে।

সম্প্রতি তেল আভিভের মার্কিন দূতাবাস ঘোষণা করেছেন যে, আমেরিকার নাগরিকরা ইচ্ছা করলে ইসরাইলের নাগরিক হতে পারেন। তাতে তাঁদের মার্কিন নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন হবে না। অর্থাৎ মার্কিন নাগরিক ইসরাইলী নাগরিক সেজে ইসরাইলী সেনাবাহিনীতে যোগদান করলে আমেরিকা তাতে আপত্তি করবে না। এই সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরব দুনিয়ায় যথেষ্ট বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এতদিন শোনা যাচ্ছিল, ইসরাইলী বাহিনীতে বহু মার্কিন সৈন্য আছে। এখন দেখা যাচ্ছে, কথাটা মিথ্যা নয়। মার্কিন নাগরিকরা ইসরাইলী নাগরিক হয়ে ইসরাইলী সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করছে। বিগত আরব-ইসরাইল লড়াইয়ে সহস্র সহস্র মার্কিন যুবক ইসরাইলের হয়ে লড়াই করেছিল। এমন কি এ বছরও ৫ হাজার মার্কিন যুবক দ্বৈত নাগরিকতা গ্রহণ করে ইসরাইলে গিয়ে পৌঁছেছে। অবশ্য আরব-ইসরাইল বিরোধে ইসরাইলের পক্ষে আমেরিকার সক্রিয় অংশ গ্রহণ কোন নতুন কাহিনী নয়। কাজেই এই চাঞ্চল্যকর নতুন তথ্য প্রকাশ হওয়ার পর পশ্চিম এশীয় পরিস্থিতির কোন হেরফের হবার সম্ভাবনা নেই।

পশ্চিম জার্মানী ঃ

গত ২১শে অক্টোবর সোসাল ডেমোক্রাট উইলী ব্রানডুট পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর দল ফ্রি ডেমোক্রাটদের সংগে কোয়ালিশন করে যে সরকার গঠন করেছেন, তাতে আছেন ১৫ জন সদস্য। তার মধ্যে ৩জন ফ্রি ডেমোক্রাট। ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীর যুদ্ধোত্তর বিশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম একজন সোসাল ডেমোক্রাট চ্যান্সেলর নির্বাচিত হলেন। এতদিনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত খৃস্টান ডেমোক্রাটদের এবার বিরোধী দলে আসন গ্রহণ করতে হবে। বুন্দেস্ট্যাগে (লোকসভা) প্রথম ব্যালটেই ব্রানডুট জয়লাভ করেন। তিনি পান ২৫১ ভোট। খৃস্টান ডেমোক্রাটরা পায় ২৩৫ ভোট। পাঁচজন ভোট দেন নি এবং ৪টি ব্যালট পেপার বাতিল হয়। নির্বাচনের পরই ব্রানডুট ঘোষণা করেন যে, তাঁর গভর্নমেন্ট পারমাণবিক প্রসার সংকোচন চুক্তিতে স্বাক্ষরের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করবে। পশ্চিম জার্মানীতে সোসাল ডেমোক্রাটরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় কম্যুনিস্ট দেশগুলোর সংগে জার্মানীর সম্পর্কের উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। কারণ ব্রানডুট ঠাণ্ডা লড়াইয়ের একজন সেনাপতি হলেও বাস্তব-বাদী রাজনীতিক হিসাবে সুপরি-চিত। কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে তিনি খৃস্টান ডেমোক্রাটদের মত গোঁড়ামী পোষণ করেন বলে মনে হয় না। নতুন গভর্নমেন্ট কায়েম হবার তিন দিনের মধ্যেই জার্মানীর মার্ক মুদ্রার বাট্টার হার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে ৪ মার্কে এক ডলার পাওয়া যেতো। এখন পাওয়া যাবে ৩·৬৬ ডলারে। বিগত কয়েক বছর পশ্চিম জার্মানীর অস্বাভাবিক অর্থ-নৈতিক সমৃদ্ধির ফলে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের মুদ্রার বাজারে যথেষ্ট সংকটের সৃষ্টি হয়। মুদ্রা ব্যবসায়ীদের মার্ক ক্রয়ের হিড়িকে ফ্রান্সের দ্যগল সরকার কয়েক মাস আগে কি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা কারও অজনা নেই। সেই সংকটের ফলেই দ্যগলকে ফ্রান্সের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে চিরকালের মত বিদায় গ্রহণ করতে হয়। তখন পশ্চিমী দুনিয়ার সকল দেশই মার্কের বাট্টার হার বাড়াবার জন্য পশ্চিম জার্মানীর ওপর চাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু তৎকালীন চ্যান্সেলর কিসিঞ্জার ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে মার্কের মূল্য বৃদ্ধি করবেন না। সোসাল ডেমোক্রাটরা ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী দুনিয়ার সেই দাবি মেনে নেওয়ায় এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, তিনি পশ্চিমী দুনিয়ার পুরো অংশীদার থেকেই পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে কিছুটা সমঝোতার চেষ্টা করবেন। মার্কের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ভারতের কিছুটা ক্ষতি হবে। কারণ পশ্চিম জার্মানীর কাছ থেকে ঋণ অথবা আম-দানী বাবদ আমাদের যে দেনা দাঁড়াবে, সেটা শোধ করতে আমাদের আরও বেশি টাকা দিতে হবে।

পশ্চিম ইউরোপে ধর্মঘটের হিড়িক

সুসমৃদ্ধ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী সম্প্রতি বেতন এবং ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়েছেন। কোন কোন দেশে নাকি বিরোধী রাজনৈতিক দলের চেয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলো সরকারের বৃহত্তর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃটেনের অর্ধেকখানি শ্রমিকই ওয়াইল্ড ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। নতুন পশ্চিম জার্মান গভর্নমেন্টও বহু বড় বড় শ্রম বিরোধের সম্মুখীন। ইটালীতে সরকারী এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোয় ধর্মঘটের জোয়ার নেমেছে। ফ্রান্সের ট্রেড ইউ-নিয়নগুলোও দ্যগলোত্তর অবস্থা যাচাইয়ের জন্য ছোটখাটো ধর্মঘট শুরু করে দিয়েছেন। সর্বত্রই শ্রমিকদের দাবি আরও বেশি বেতন এবং আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা।

উপরোক্ত দেশের কর্ণধাররা মুদ্রা-স্ফীতি এড়াবার জন্য দ্রব্যমূল্য এবং বেতনবৃদ্ধি স্থগিত রাখতে ইচ্ছুক। কারণ তাঁরা মনে করেন যে মুদ্রাস্ফীতির ঝোঁক দেখা দিলেই মন্দার আবির্ভাব ঘটবে। বৃটেনের লেবার গভর্নমেন্ট অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বেতন এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বন্ধের চেষ্টা করছেন।

ইটালীর ধর্মঘট মাঝে মাঝে হিংসাত্মক হানাহানিতে আত্মপ্রকাশ করছে। সংবাদ-পত্র এবং ডাকতার বিভাগ ধর্মঘটের ফলে সেখানে গত সপ্তাহে কোন সংবাদপত্র প্রকাশ হয় নি। রেল শ্রমিকদের বেতন-বৃদ্ধি করে কোনক্রমে দেশব্যাপী রেল ধর্মঘট ঠেকানো গেছে।

জাটোপেক বহিষ্কৃত

চেকোশ্লোভাকিয়ার বিশ্ববিখ্যাত দৌড়-বীর কর্নেল এমিল জাটোপেক কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সুযোগসন্ধানী দলত্যাগীদের সংগে যোগসাজসের অভিযোগ আনা হয়েছে।

উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদীয় দাঁতের মাজন

দেব দশন

হাসিতে মুক্তো ঝরাবে

দেব কেমিক্যাল কোং কলি–৩২

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

শেষ। পূজা, বিসর্জন—দুই-ই শেষ। মণ্ডপ শূন্য—আলো, বাজী, জৌলুষ, আবেগ, আনন্দ সব শেষ। এখন শুধু চলছে টুইস্ট আর হুলা-হুপ ড্যান্স। মণ্ডপ থেকে প্রতিমা বের করবার বেশ আগে থাকতেই এই টুইস্ট হুলাহুপ ড্যান্স আর তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গান ও খেউড় সুরু হয়েছিল—প্রতিমা বিসর্জন শেষ হয়ে যাবার পর এখনও ড্যান্স শেষ হয় নি, গানও শেষ হয় নি। না, আমি দশভুজা দুর্গা মহিষমর্দিনীর কথা বলছি না। পুজো দেখি নি, বিসর্জনও দেখি নি—যে পুজোতে ঐক্য ও সংহতির প্রতীক দুর্গা, অনৈক্য ও বিভেদের প্রতীক মহিষা-সুরকে বধ করেন, সে পুজো আমি দেখি নি। আমি দেখেছি যেখানে অনৈক্য ও বিভেদের প্রতীক মহিষাসুর ঐক্য-সংহতি-শান্তি-সমৃদ্ধি-আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক দশভুজা দুর্গাকে বধ করে—আমি সেই অসুরের হাতে দুর্গা বধের পূজা দেখেছি। পূজা দেখেছি, বিসর্জন দেখেছি—বিসর্জনের পর টুইস্ট ও হুলাহুপ ড্যান্স দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপে প্রতিমা এখনো রয়েছে—তবুও নাচ চলছে। আগেই বলেছি এ নাচ সুরু হয় প্রতিমা বিসর্জনেব অনেক আগে থাকতেই। আর বিসর্জন হয়ে গেলেই শেষ হয় না। আমরা যারা ইতরজন—তারা দূরে দাঁড়িয়ে শূন্য মণ্ডপ দেখেছি—সারা বছরের সঞ্চিত আশা-আকাঙ্ক্ষা নানা প্রত্যাশা, সহায় সম্বলের সবটুকু দিয়ে এই মণ্ডপকে সাজিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছি। পূজা হয়েছে প্রসাদও পেয়েছি—মায়ের চরণে অঞ্জলি দিয়ে রূপং দেহি, জয়ং দেহি যশ দেহি দ্বিষো-জহি প্রার্থনা করেছি। কিন্তু শেষ।

কেরল শেষ। আর শেষ না হয়েও শেষ পশ্চিমবঙ্গ। হার্ট অপারেশনের রোগী বেঁচে থাকে কি না অথবা হার্ট অপারেশন বিদ্যা সফল হয়েছে কি না আজ পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ নির্ধারিত হয় নি। তবে এখনও পর্যন্ত যতদূর খবর—হার্ট অপারেশনের রোগী বেশিদিন বাঁচে না। পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে এই নিষ্ঠুর কথাটি বলতে হচ্ছে। কারণ আস্থা ও বিশ্বাসের মৃত্যুর পর শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্টের শব পাহারা দিয়ে চলেছেন। আবহাওয়া-গুণেই হোক অথবা মমত্ববোধেই হোক তাঁরা হয়তো বুঝতে পারেন নি, যে দেহ পাহারা দিচ্ছেন সেই দেহে প্রাণ নেই। কিশোর সন্তানের মৃতদেহ কোলে নিয়ে মা যেমন প্রতি মুহূর্তে চিন্তা করে তাঁর সন্তান আবার চোখ মেলে চাইবে, আবার মা বলে ডাকবে—পশ্চিমবঙ্গে আজকের প্রতীক্ষা সেই অন্ধ স্নেহের প্রতীক্ষা। ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের সভায় বসে যে সাত দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে পশ্চিম-বঙ্গের যুক্তফ্রন্টের ঐক্য অটুট রাখা ও সরকারকে বিপদমুক্ত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, সে হল ঐ হার্ট অপারেশন। তাই সাত দফা কর্মসূচীর হার্ট অপারেশন এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই হইল। এর মধ্যে আশার কথা হল এই যে, রোগী বেঁচে আছে। রোগী চলছে, ফিরছে, কথা বলছে এই পর্যন্ত—এর বেশি নয়। কারণ সব ভাঙলে জোড়া লাগে—কিন্তু সহজে জোড়া লাগে না যখন হৃদয় ভাঙে, যখন পরস্পরের প্রতি আস্থা ভেঙে যায়। যেখানে শক্তির উৎস হল সহ-যোগিতা, আস্থা ও ঐক্য, তখন এই তিনকে মাঠে-ময়দানে কোতল করব আর শুধুমাত্র ক্ষমতা দখল রাখার জন্য 'আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি, ঐক্যবদ্ধ থাকব' এই আপ্তবাক্য উচ্চারণ করব—এতে কোন লাভ নেই। মেহের আলির মত মাঝে মাঝে সব ঝুটা হ্যায় বলে চিৎকার করে উঠে অন্য সকলকে চমকে দিয়েও লাভ নেই। মূলকথা পার্টির স্বার্থের ঊর্ধ্বে জন-গণের স্বার্থকে সামনে রেখে সরকার চালানো হবে কি না? ঐক্য রক্ষার জন্য অনৈক্যের বীজকে বিনষ্ট করা হবে কি না? এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা অন্তরের সঙ্গে পালন না করলে, মাঝে মাঝে এক-একবার বৈঠকে বসলে আর পরম স্বস্তির সঙ্গে বললে—সব বিরোধ মিটে গেছে আমরা ঠিক আছি, এতে বিরোধও মেটে না, ঠিক থাকাও যায় না। বিরোধের বীজ না মেরে পরন্তু অতি নিপুণভাবে বপন করে আশা করব বিরোধ থাকবে না—এটা তো ছেলেমানুষী কথা। এ কথা সত্য যে, বিরোধের সব বীজ নির্মূল করা সব সময় সম্ভব হয় না। সর্ব-ভারতীয় রাজনীতির মানদণ্ডে রাজ্য রাজনীতির পাল্লা ওঠা-নামা করবে। নীতির বিরোধ এবং আদর্শের বিরোধ, নীতি রূপায়ণে পথের বিরোধ থাকবেই। কেউ চাইলেই নীতি বিসর্জন দিয়ে আদর্শ রূপায়ণে নিশ্চেষ্ট হতে বলতে পারে না। কিন্তু এইসব বিরোধ বিবাদ-বিসংবাদ থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি ক্ষেত্র থাকে, যেখানে দাঁড়িয়ে যুক্তফ্রন্টের শরিকরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারেন। দলীয় আদর্শের কথা বাদ দিলে সত্যি-কারের বামপন্থীদের একটি তত্ত্বকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা অপরিহার্য নয় কি? সেই তত্ত্ব হল কংগ্রেসের বিকল্প বা কংগ্রেসের শূন্যস্থানে কোন একক দল নয় বা একাধিপত্য সৃষ্টির প্রয়াসী রাজনৈতিক প্রচেষ্টা নয়—বিকল্প হল অনেক দল ও মতের যুক্তফ্রন্ট। মুখে এই কথাটা সকলে প্রতিনিয়ত আউড়ে থাকেন। কেরলে একত্রিশ মাসের যুক্ত-ফ্রন্ট সরকারের পতনের একত্রিশ ঘণ্টা পরে কেরল থেকে কলকাতায় এসে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ বললেন, যুক্তফ্রন্ট চান। যুক্তফ্রন্ট ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ কোন জবাবে খুশি করবেন যে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা ভেঙে গেছে শুধুমাত্র অনৈক্যের কারণে? সর্ব-বৃহৎ দলের নেতা হিসাবে তিনি। পারেন নি সকলকে তাঁর প্রতি আস্থাশীল রাখতে। মুখ্যমন্ত্রীর নিষ্ঠা, আচরণ এবং সহনশীলতা যদি অনেক আগে থাকতে সক্রিয় ও সুষ্ঠু পথে চলত, তবে কেরলের মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া কখনই শেষ কথা হত না। কেরলের যুক্তফ্রন্ট সরকার চললেও যুক্তফ্রন্টকে কেন সক্রিয় রাখা হয় নি? কেন মন্ত্রীদের খেয়ো-খেয়িতে ফ্রন্ট ভেঙে গেল? কেন মন্ত্রীদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট এগিয়ে আসতে পারল না? কেন মন্ত্রিসভা সঙ্কট ও ভেঙে দেওয়ার আগে কেরলের

যুক্তফ্রণ্টের সভা আহবান করে যুক্তফ্রণ্টের সভাতে মন্ত্রিসভার সঙ্কট সমাধানের চেষ্টা করা হল না? আমি যদি যুক্তির খাতিরেও মনে করি কেরলের সি-পি-আই, আর-এস-পি, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলগুলি পরম খারাপ, তাহলেও একথা মিথ্যে হয়ে যায় না, কেরল যুক্তফ্রণ্টের আহবায়ক ছিল সি-পি-এম দলের প্রতিনিধি; কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সি-পি-এম দলের নেতা। শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ দলনেতা হিসাবে এবং সি-পি-এম বৃহত্তম দল হিসাবে যদি গৃহবিবাদ মেটাবার চেষ্টার আন্তরিক প্রচেষ্টা সুরু থেকে চালাতেন, তবে যুক্তফ্রণ্টের মৃতদেহের ওপর বসে আবার যুক্তফ্রণ্ট গড়বার কথা বলার দরকার হত না। এক্ষেত্রে অবশ্য পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি এখনও পর্যন্ত কিছুটা ভিন্নস্তরে রয়েছে।

কেরলে যুক্তফ্রণ্টকে মেরে ফেলে (সাত মাস কোন সভা না ডেকে) মন্ত্রিসভাকে বাঁচিয়ে রেখে বেঁচে থাকার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এখনও যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার বিরোধ ও সঙ্কটকে কাটিয়ে উঠতে নীতি-নিয়ামকের কাজ করছেন মন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া—যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার বিগত কয়েক মাসের কার্য-কলাপ বিশ্লেষণ করে বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবের মাধ্যমে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সেই বক্তব্যের পটভূমিকায় রাজ্যে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের যে সঙ্কট সরকারকে বধ্যভূমিতে এনে দাঁড় করিয়েছিল—২৫ ও ২৬ তারিখে যুক্তফ্রণ্টের সভায় বসে সরকারকে বধ্যভূমি থেকে ফিরিয়ে আনা হল। এইটুকুই হল কেরলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মৌলিক ব্যবধান। কিন্তু আগেও বলেছি, এখনও বলছি—যদি কর্মসূচী রূপায়ণে আন্তরিকতা না থাকে, যদি কথায় আচরণে সংযম না থাকে, যদি কর্মীদের দৃঢ় শৃঙ্খলায় নীতি পালনে বাধ্য করা না যায়, তবে কেতাবী প্রস্তাব ও শ্রীসুধীন কুমারের স্বস্তির নিশ্বাস যুক্তফ্রণ্টকে বাঁচাতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকার সবচেয়ে সুস্থ ও স্বস্তিতে ছিল সেই কদিন, যে কদিন অজয় মুখাজী ও জ্যোতি বসু দুজন দুজনকে বিশ্বাস করতেন, দুজন দুজনের ওপর নির্ভর করে চলতেন। কিন্তু যেদিন থেকে অজয়বাবু ভাবতে সুরু করলেন জ্যোতি বসু সম্পর্কে কিছু মনগড়া ভাবনা—জ্যোতি বসু যেদিন থেকে অজয় মুখাজী সম্পর্কে প্রাধান্য দিলেন কিছু অলীক কল্পনার, সেইদিন থেকে বিপদ সুরু হল। দুজনের অবিশ্বাসের বিষাক্ত নিশ্বাস ধীরে ধীরে মন্ত্রিসভার সকল সদস্যের শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু দূষিত করে তুলল। ফল হল এই মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব-নেতৃত্ব উবে গেল—স্বস্বপ্রধান হয়ে উঠলেন সকলে, চলতে লাগলেন স্বকল্পিত পথে অথবা দলীয় গোষ্ঠীতন্ত্রের নীতিতে। ফল হল এই—চিরাচরিত প্রথামত যে কোন মন্ত্রী ছুটিতে গেলে, অসুস্থ হলে ও পদত্যাগ করলে তাঁর দপ্তরের দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আসে—মুখ্যমন্ত্রী কখনও দপ্তরের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখেন, কখনও অন্যের হাতে অর্পণ করেন; কিন্তু এখানে কোন মন্ত্রীই তাঁর দপ্তরের ভার অন্যের হাতে দেবার আগে একবার মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসার কথা ভুলে গেলেন। প্রথমে নিজ দলের হাতে দিতে সুরু করলেন, পরে অন্য দলের মন্ত্রীর হাতেও দিতে সুরু করলেন (শ্রীযতীন চক্রবর্তী বিদেশে যাবার সময় তাঁর দপ্তর শ্রীজ্যোতি বসুর হাতে দিয়ে গেছেন)। ঐভাবেই ধীরে ধীরে যে স্বস্বপ্রধান মনোভাব গড়ে ওঠে, তার ফল হয় এই মন্ত্রিসভার কোন নীতি রূপায়ণে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণের অপেক্ষা দলনেতার পরামর্শকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এ হল সঙ্কটের একদিক।

একই সঙ্কট দেখা দেয় যুক্তফ্রণ্ট শরিক দলগুলির মধ্যে। যুক্তফ্রণ্টে থাকব, একসঙ্গে সরকার চালাব আর "শ্রীকান্ত"র নন্দ মিস্ত্রির রসিকতার মত বলব "বিশ বছর ঘর করেছি, কিন্তু কখনও হেঁসেল ছুঁতে দিই নি"। এক্ষেত্রেও ঘর করব অথচ হেঁসেল ছুঁতে দেব না এই যুক্তি চলে না। একসঙ্গে সরকার চালাব আর নিজের নিজের দপ্তরে বসে একে অপরের বাপান্ত না করে জলস্পর্শ করব না এ যুক্তি অচল। যে-যার চৌহদ্দি থেকে দল করবেন, আদর্শের কথা বলবেন, নিজের কথা বলবেন; অন্যের নিন্দায় বিরত থাকবেন—এই পথই তো হল যুক্তফ্রণ্টের পথ। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সঙ্কট দুই কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিয়ে। এরা কেউ অন্য কথা দূরে থাক, একে অপরের দলের নামটা পর্যন্ত সঠিকভাবে উচ্চারণ করেন না। কম্যুনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বলার আগে 'Right' কথাটা জুড়ে দেবে আর কম্যুনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নাম উচ্চারণের আগে একটা 'Wrong' কথাটা জুড়ে দেবেই। আবার কেউ কাউকে বলে শোধনবাদী, কেউ কাউকে বলে সংকীর্ণতাবাদী। কাজেই নাম উচ্চারণেই যাদের এতখানি সংযমের অভাব বা উদারতার অভাব, তারা একসঙ্গে ঘর করবে কি করে? কাজেই যুক্ত হয়ে সরকার চালাবার আগে ভাবা দরকার—একজায়গায় দাঁড়িয়ে দল চালাতে পারি কি না। এক জমিতে দাঁড়িয়ে যদি দল চালানো সম্ভব না হয়, শত্রুর প্রতি আক্রমণে যদি দশভুজ একত্রিত না হয়, তবে আমার দুর্গাপূজো দেখাই সরুলো দেখবে—যে পূজায় দুর্গা অসুরকে বধ করেন না, অসুর বধ করে দুর্গাকে।

যোগসাধনার নিগূঢ় রহস্য সুপ্রকাশ—যোগসাধনায় দীর্ঘজীবন লাভের নির্দেশ

যোগশাস্ত্র

সিদ্ধযোগিগণপ্রদত্ত পাঠ্যিদুষ্টে সুসংস্কৃত বড় অক্ষরে মূল—সরল বিশদ বঙ্গানুবাদ সংযুক্ত পরিবর্ধিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ দীর্ঘকাল পরে বহু সাধনায় প্রকাশিত। ১। শিবসংহিতা। ২। ঘেরণ্ডসংহিতা। ৩। ব্রহ্মসংহিতা। ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা। ৫। ষটচক্রনিরূপণম্। ৬। দত্তাত্রেয় যোগরহস্যম্, ৭। পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। অতি দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগগ্রন্থের অভাবনীয় সমাবেশ। যে সকল গুহ্য সাধনতত্ত্ব এতদিন হিমালয়ের নিভৃত গুহায় নিহিত ছিল—যে সকল মহাপুরুষের উপদেশ—সাধন নির্দেশ উপেক্ষা—অবহেলা করিয়া আমরা দিন দিন ক্ষীণ, নানা রোগাক্রান্ত, স্বল্পজীবী, অল্পভোগী হইতেছি, একমাত্র যোগশাস্ত্র পাঠে—অনুশীলনে—সাধনায় তাহার প্রতিকার সম্ভব। হিন্দু সন্তান আবার আর্যঋষির বলবীর্য, প্রতিভা-দীর্ঘায়ুর অধিকারী হইয়া নীরোগ, সুস্থ শরীরে জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভ করিয়া মোক্ষসাধনায় আত্মনিবেদন করিবে। যোগের প্রভাবে মানুষ দেবতা হয়। প্রথমে সহজ ক্রিয়া, সংযম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যানধারণা, ধৌতি, শুদ্ধি, শৌচাচার, দেহতত্ত্ব, অবগতি, মনঃশুদ্ধি, বাহ্য ও অন্তরশুদ্ধি প্রভৃতি সকল প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পর জ্যোতিঃ ধ্যানে—দর্শনে আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সাধনে সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত। অশেষ মঙ্গল-নিলয় দেবাদিদেব মহাদেব উপদিষ্ট—সিদ্ধ-ঋষিগণ অনুষ্ঠিত যোগশাস্ত্র অনুশীলনে—সাধনায় যোগের অতুল বিভূতিলাভ সম্ভব হইবে। ভুলট কাগজে সুন্দর নির্ভুলভাবে মুদ্রিত প্রামাণ্য অষ্টম সংস্করণ। মূল্য: পাঁচ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২।

কেরালার যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন স্বভাবতই এ রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তাই যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে কোনো আবেদন করার আগে কেরালার প্রশ্ন আলোচনা করাই শ্রেয়ঃ।

পশ্চিমবাংলা থেকে অনেক দূরে কেরালা। তবু কেরালার উত্থান-পতনের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার ভাগ্য জড়ানো। এই দুই রাজ্যের সরকারের সাফল্য আর ব্যর্থতার ওপর অন্যান্য রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলনের প্রসার নির্ভর করে।

পশ্চিমবাংলার মানুষ বারংবার বামপন্থী নেতাদের মুখ থেকে শুনেছে কেরালা আর পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে চোখের মণির মত রক্ষা করতে হবে। শুনেছে আর আশান্বিত হয়েছে। ভোটের বাক্সে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের পক্ষে সুস্পষ্ট রায় দিয়ে ভেবেছে, দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস শাসনে মানুষের ব্যথা ও বেদনার যে বোঝা বেড়ে চলেছিলো তা দূর করার ভিত্তি পত্তন হবে। নেতাদের তত্ত্ব কথা শুনে নয়, নিজেদের গরজে মানুষ যুক্তফ্রন্ট গড়তে সাহায্য করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রই হোক আর বিপ্লবী আন্দোলনই হোক যে কোন পথে এগুতে হলে যুক্তফ্রন্ট ছাড়া গত্যন্তর নেই—এই সত্য নেতাদের হৃদয়ঙ্গম করতে বাধ্য করেছে পশ্চিমবাংলার মানুষ।

তাই কেরালায় দুর্নীতির তদন্তের জন্য বামপন্থীদের কয়েকটি দলের আনীত প্রস্তাব আর কয়েকটি বামপন্থীদলের বিরুদ্ধে গৃহীত হওয়ার পরে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের পদত্যাগের ঘটনায় পশ্চিমবাংলার মানুষ বিহ্বল হয়েছে। দুই পক্ষ পরস্পরের ওপর দোষারোপ করছেন। পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ এখন পর্যন্ত কোন পক্ষকেই সমর্থন করছেন না, কিন্তু সচেতন নিম্নবিত্ত বুদ্ধিজীবী, শ্রমিকশ্রেণী আর গ্রামের কৃষকের মধ্যে একটা বোবা কান্না গুমরে উঠছে।

কেরালার ঘটনা থেকে পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার শিক্ষা গ্রহণ করুক—এই কামনা পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্টের সমর্থক প্রতিটি মানুষের।

সাধারণ মানুষের এই আকাঙ্ক্ষার পটভূমিকায় কেরালার যুক্তফ্রন্ট সরকারের দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে পতনের ঘটনাবলীর কিছুটা বিশ্লেষণ করা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কেরালার ঘটনাবলীতে যাওয়ার আগে প্রথমেই মনে রাখা দরকার কেরালা সরকারের বৃহৎ অংশীদার ভারতবর্ষের তিনটি মার্ক্সবাদী পার্টি। সি পি এম, কম্যুনিস্ট পার্টি এবং আর এস পি প্রত্যেক দলই নিজেদের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বলে দাবি করেন। কে কতটা সাচ্চা তা নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে আলোচনা করলেও সি পি এম বাদে অন্য দলগুলো

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

নিজেদের কখনোই অ-মার্ক্সবাদী বলে স্বীকার করেন না।

কিন্তু কেরালার ৩২ মাসব্যাপী যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে শরিকী বিরোধ যে স্তরেই উঠুক না কেন, একটি দলও এই বিরোধের মধ্যে রাজনীতি আমদানী করতে পারেন নি। রাজনীতি বহির্ভূত নীতি নিয়ে মার্ক্সবাদের দাবিদার কয়েকটি দলের পারস্পরিক বিবাদ শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটালো।

আমি অন্য দলের কথা বলবো না। প্রধানত এই তিনটি দল কেরালার মেহনতী মানুষের কাছে কোন্ প্রশ্ন তুলে ধরলেন—সে প্রশ্ন কি শ্রেণী সংগ্রামের, সে কি মিল-মালিক বা জোতদারের বিরোধী সংগ্রামের? না—তা নয়। একটি দলও জনসমক্ষে সেই প্রশ্ন তুলতে পারেন নি। বিরোধের শেষ পর্যায়ে পদত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে সি পি এম কম্যুনিস্ট পার্টি এবং আর এস পি-কে কংগ্রেসের সঙ্গে চক্রান্ত করার একটা অস্পষ্ট অভিযোগ তুলেছেন মাত্র। কিন্তু একটি উদাহরণও তাঁরা দেখান নি যেখানে আর এস পি দূরের কথা, বহু-নিন্দিত কম্যুনিস্ট পার্টিকেও শ্রমিক আর কৃষকের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে বলে একটি সুস্পষ্ট অভিযোগে নিন্দিত করতে পারেন নি। অন্য পক্ষে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং শেষ পর্যন্ত আর এস পি-ও সি পি এম-এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ চালাতে পারেন নি।

আগাগোড়া সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ কেন্দ্রীভূত ছিল দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে। সি পি এম এবং আর এস পি প্রায় একই সুরে দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীকুঞ্জুর বিরুদ্ধে। তারপর তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠিত হলো এবং তিনি পদত্যাগ করলেন। তার পরেই কম্যুনিজমের আদর্শ বিরোধী দাদার ব্যাদাক্কানেব দলের মন্ত্রী স্বাস্থ্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত শ্রীওয়েলিংডনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা দেশাভিমানীতে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হোল। এর কিছুদিন পরেই বিধানসভায় আইনানুগভাবে কংগ্রেস সদস্যরা ঐ শ্রীওয়েলিংডনের বিরুদ্ধে আবার দুর্নীতির অভিযোগ পেশ করলেন। এখান থেকেই শরিকী বিবাদ চরমে উঠতে শুরু করলো। সি পি এম হঠাৎ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্ত করাতে আপত্তি করলেন—অন্য চারটি দল এই তদন্তের পক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। আরো আশ্চর্যের বিষয়, এই বিরোধ মেটানোর জন্য যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সমন্বয় কমিটিতে আলোচনার সব সুযোগ বন্ধ হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে গত মে মাসের পর একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া সমন্বয় কমিটির কোন সভাই ডাকা হলো না।

দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ এভাবে দুপক্ষ ওঠাতে শুরু করলেন যে, কেরালার মানুষ সবিস্ময়ে দেখলো এতদিনের এত পরীক্ষিত নেতৃবৃন্দ প্রত্যেকেই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। একটা ভ্রান্ত মর্যাদাবোধ থেকে পারস্পরিক অভিযোগ সুরু হলো—এই অভিযোগের অন্তরালে আছে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। এই অভিযোগ যেভাবে উঠতে লাগলো, ন্যায়শাস্ত্রের গতিপথে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ঘটলো যুক্তফ্রন্টের ভাঙন এবং মন্ত্রিসভার পতনের মধ্য দিয়ে।

অন্যদিকে পশ্চিমবাংলায় শরিকী সংঘর্ষ রীতিমত হানাহানির স্তরে থাকলেও, এখানে রাজনীতি অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রামের প্রশ্নকে খাড়া করে প্রায় সব দলই সামনে আসতে চেষ্টা করছেন। ৩২ দফা কর্মসূচীর মধ্যে যে রাজনীতি নিহিত আছে তাকে কেউ অস্বীকার করতে পারছে না বলেই শ্রীসুশীল ধাড়ার প্রস্তাবে সি পি এম-এর ঘোর বিরোধী দলগুলো পর্যন্ত সায় দিতে পারছেন না।

পশ্চিমবাংলায় শ্রেণী সংগ্রামের প্রশ্নটি মার্ক্সবাদের দাবীদার সব কয়টি দলের সামনে আছে। তার ওপর সব দল এখনো তত্ত্বগতভাবে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। এই অবস্থায় পশ্চিমবাংলার বিরোধের মধ্যে পথে যত হানাহানি ঘটুক না কেন, এ বিরোধ রাজনীতি বিবর্জিত নয়। যুক্তফ্রন্ট শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার এই শ্লোগান আজ সামনে আছে। তার সঙ্গে কেরালার রাজনীতি বিবর্জিত সংগ্রামের অভিজ্ঞতাকে যদি সব দল বিশেষ করে মার্ক্সবাদের দাবীদার দলগুলো স্মরণে রাখেন, তাহলে পশ্চিমবাংলার পরিণতি কেরালার পথে হবে না। যদি বিরোধ বাড়ে এখানে তা বাড়বে শ্রেণী সংগ্রামের পথে। ৩২ দফা কর্মসূচীতে কার কতটা আস্থা আছে তা নিয়ে। সে বিরোধ যতই রক্তক্ষয়ী হোক না কেন তা নিশ্চয়ই কেরালার মত বন্ধ্যা রাজনীতি হবে না।

—শ্রীসর্বদর্শী

স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য

গত ৯ই অক্টোবরের "সাপ্তাহিক বসুমতীতে" মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট নেতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন হাজরা "স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্যে শ্রীননী ভট্টাচার্যকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত করার যে সুপারিশ করেছেন তার সঙ্গে একমত হতে পারছি না:

এমনি কপাল, বেছে বেছে ননীবাবুকে এমন একটি দপ্তরের ভার দেওয়া হল, যার সংগঠন বিশাল অথচ সেখানে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের কোন গণভিত্তি ছিল না। এ রকম ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একজন নেতার যা করা উচিত ছিল তা কিন্তু উনি করলেন না; ওঁর দপ্তরের আওতাভুক্ত ফ্রন্ট সমর্থক গণসংগঠনগুলির কোন পরামর্শই নিলেন না। "ভেসাপসী টু দি পিপ্‌ল্‌ অ্যান্ড সারেন্ডার টু দি অথরিটিজ"—এই নীতি অনুসরণকারী ননী ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই নির্ভর করলেন স্বাস্থ্যদপ্তরের ঝুনো আমলাদের ওপর—যে কুচক্রী ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলারা ননী ভট্টাচার্যকে সাতবার একহাটে কিনে আর একহাটে বেচতে পারে। এবং করছেও তাই।

মন্ত্রিত্বের সুযোগ নিয়ে পার্টি বাড়াবার চেষ্টা এদেশে অস্বাভাবিক নয়। আমরা শুধু একটা কথাই বলতে পারি— এমন কিছু সজ্জনকে নিয়ে ননীবাবুর পরামর্শদাতা কমিটি গড়ে উঠেছে, বাংলাদেশের মেহনতী মানুষের ঘাম-রক্ত করা সংগ্রামে যাদের টিকিও কেউ দেখেন নি। বিভিন্ন হাসপাতালে পরিকল্পিতভাবে এঁদেরকে প্রোমোশন ও ট্রান্সফার করে, নিজের ঘাঁটি তৈরি করার পর ননীবাবু আজ ঘোষণা করছেন "অনেকের-প্রতি অবিচার হয়েছে এই অভিযোগ আসাতেই অ্যাকাডেমিক কমিটির সুপারিশ নাকি বদলান হচ্ছে" (দৈনিক বসুমতী, ১৬।১০।৬৯)। খবরটা পড়ে হায়ু কংগ্রেসী মন্ত্রী ও ঘুঘু আমলারা মুচকি হেসেছিল কিনা জানি না, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে পার্টি বাড়ানোর এই আদেখলেপনায় যুক্তফ্রন্টের মুখে কী ধরণের চুণ-কালি মাখান হয়েছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ ফ্রন্টেরই অন্যতম নেতা শ্রীমনোরঞ্জন হাজরার প্রকাশ্য অভিযোগ। ছমাস আগে নাকি ননীবাবুকে এ. সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। উনি কর্ণপাত করেন নি, গরম হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য—আর এস পি নেতৃত্ব কি এ খবর রাখেন না? আমার ধারণা, যুক্তফ্রন্টের যে সাংগঠনিক দুর্বল-

পাঠক মন

(মতামত লেখকের)

জন্যে বিভিন্ন পার্টি পরিচালিত দপ্তরগুলি স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গিয়েছে, সেই ভ্রান্তি বা অদূরদর্শিতার সহজ শিকার হয়েছেন শ্রীননী ভট্টাচার্য তাঁর নিজগুণে। কোন প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করা যে ওঁর ধাতে সয় না, শুধু আর জি কর নয়, ন্যাশনাল বা পুরুলিয়া নয়, শুধু আই এম-এ নয়, এই খেদোক্তি তো একাধিক যুক্তফ্রন্ট নেতার মুখেই শোনা গিয়েছে একাধিকবার। তাই যদি হয়, তাহলে কেন সময় থাকতে ফ্রন্টের সভায় এই সমস্যা আলোচনা না করে কেরালার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়েলিংডনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওঁকে? ফ্রন্ট ভেঙে যাবে এই ভয়ে? তোষামোদে টিকবে ফ্রন্ট?

মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি শ্রমিক-কৃষক-নিম্নবিত্তদের জীবনে সামান্য হলেও কিছু রিলিফ এনে দিয়েছে। সেই তুলনায় আমাদের স্বাস্থ্যদপ্তরের সাফল্য কতটুকু, সে বিচারই বা ফ্রন্ট করছেন না কেন? প্রতিদিন শহর ও গ্রামীণ হাসপাতালগুলির আউটডোরে যে হাজার হাজার আর্ত মানুষ চিকিৎসার জন্য ধর্ণা দেয়, যুক্তফ্রন্টের আমলে তারা কি আগের চেয়ে একটু ভাল ওষুধ, একটু ভাল চিকিৎসা পাচ্ছে? ৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর দেড় মিনিটে রোগ নির্ণয়ের লজ্জাকর পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটেছে? গুরুতর পীড়িত যারা মাসের পর মাস বেডের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, লাঘব হয়েছে কি তাদের দুর্ভোগ যন্ত্রণা? শিশু চিকিৎসার কোন উন্নতি হয়েছে? হাসপাতালে হাসপাতালে মারদাঙ্গা কমেছে না বেড়েছে? বক্তৃতার সুযোগ পেলে ননীবাবু প্রায়ই বলে থাকেন, ওঁর হাতে নাকি ম্যাজিক ওয়ান্ড নেই। কিন্তু একথা ওঁকে বলে দেওয়া কি উচিত নয় যে, বাপু হে, তোমার হাতে যদি ম্যাজিক ছড়িই থাকত, তাহলে মন্ত্রী না করে গুপী গায়েন বাঘা বায়েন ছবিতে তোমাকে তো ভূতের রাজা বানাতাম আমরা।

শোষিত শ্রেণীগুলি যাতে সুচিকিৎসা পায় সেই উদ্দেশ্যে যুক্তফ্রন্টের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল শ্রেণীসংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা করে প্রোগ্রাম নির্ধারণ করা এবং অন্যদিকে স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠনসমূহকে একত্রিত করে সেই প্রোগ্রাম কার্যকরী করার ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা। আমরা যতদূর জেনেছি, ননীবাবু সে পথ মাড়ান নি।

পঃ বাংলার মানুষ কোন একটি পার্টির হাতে তাদের জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোকের দায়িত্ব অর্পণ করে নি—যেমন দেয় নি অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা ইত্যাদির দায়িত্ব। দিলেও তা পালন করা সম্ভব নয়। যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেওয়ার মধ্যে এই অভিনবত্ব রয়েছে। কংগ্রেস জাহান্নমে নিয়ে যাচ্ছিল দেশটাকে, তোমরা সবাই মিলে আমাদের বাঁচতে দাও—এই আশায় ফ্রন্টকে ভোট দিয়েছে তারা। এখন ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পার্টিগুলি যদি যৌথভাবে সে দায়িত্ব পালন না করেন, যদি স্বাস্থ্যদপ্তরের চাল-চলন সম্পর্কে কোন খবর না রাখেন, তবে ব্যক্তিতন্ত্রের ও পার্টিতন্ত্রের কুফল তো ফলবেই।

ননী ভট্টাচার্য গত ছ'মাসে বাংলাদেশের ইতিহাসে যে সব কীর্তির ছাপ এঁকেছেন মনোরঞ্জনবাবুর প্রবন্ধে তার কিছু কিছু উল্লেখ আছে। নির্লজ্জভাবে সরকারী সার্ভিস রুলস্‌ ভেঙে, শত শত ন্যায্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করে নিজের পেটোয়া লোকদের প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে। যারাই স্বাস্থ্যদপ্তরের সমালোচনা করেছে, বে-আইনীভাবে ট্রান্সফার করা হয়েছে এরকম বেশ কয়েকজনকে; প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছে অজস্রবার; রোগী-ডাক্তার সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয় এমন ধরণের উস্কানিমূলক কাজ করে যাওয়া হচ্ছে গোড়া থেকে। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি, কয়েকদিন আগে আই-এম-এর এক ডেলিগেশন ননীবাবুর ঘরে বসে তাঁর সামনেই ওঁর দপ্তরের বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ আনেন। আমি এও শুনেছি যে, উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকেও এ সব কথা জানান হয়েছে। ক্যাবিনেটে বা ফ্রন্টের সভায় কোনদিন এসব কথা উঠবে কি না জানি না। উঠলেও পদত্যাগের হুমকি দিয়ে ব্ল্যাকমেলিং-এর পথ তো খোলাই আছে।

তাই বলছিলাম, শ্রীমনোরঞ্জন হাজরার প্রথম শ্লোগান "স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে যুক্তফ্রন্টকেই"—এটা সঠিক। কিন্তু তার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে ননী ভট্টাচার্যকে অপসারিত করে আর-এস-পি'র অন্য কোন সভ্যকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী করলেই সমস্যার সমাধান হবে এই ফরমুলেশন সমীচীন মনে হচ্ছে না। আসলে যুক্ত-

ফ্রন্টের যৌথ দায়িত্ব হিসাবে প্রতি দপ্তরে একটি করে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা-সম্পন্ন সর্বদলীয় বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা কমিটি তৈরি করাই যুক্তিযুক্ত।

—অশ্বিনীকুমার সামন্ত.
৩৭নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩

একটি প্রতিবাদ

আপনার পত্রিকায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে হেলথ ডিপার্টমেণ্ট বা ডাইরেক্টরেটের যে সব দুর্নীতির সংবাদে বঙ্গদর্শন বিভাগে বা প্রবন্ধাকারে অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধ করলে সে সবের জবাব দেবেন। বিশ্বস্ত সহকারী হিসাবে আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে তার উত্তর আমি দিচ্ছি।

ডায়েট সাপ্লাই-এর কণ্ট্রাক্ট প্রসঙ্গে:

১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর বঙ্গদর্শন বিভাগে বলা হয়েছে, 'বিশ্বস্ত সহকারীর প্ররোচনায় ডায়েট সাপ্লাই-এর কণ্ট্রাক্ট দেবার ব্যাপারে একটি মোটা অঙ্কের টাকার অবৈধ লেনদেন হয়েছিল। মোটা টাকার বিনিময়ে দুই ব্যক্তিকে ডায়েট সাপ্লাই-এর কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বিষয়টি পরে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এবং ঐ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অভিযোগ যাবার পর শেষ পর্যন্ত ঐ কণ্ট্রাক্ট বাতিল করতে হয়।' এসব খবর যে কতখানি ভিত্তিহীন, বঙ্গদর্শনের অভিযোগ সম্পর্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে সেণ্ট্রাল ডায়েট কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছেন [ফাইল নং HAD/9D-24-67] সেই রিপোর্টের প্রাসঙ্গিক অংশ হুবহু উদ্ধৃত করে তার প্রমাণ দিচ্ছি। রিপোর্টে বলা হয়েছে:

So far as the Central Diet Committee is concerned it may be mentioned that the Selection of Diet Contructors for 1969-70 was made in a meeting held on 26.4.69 in the Office Chamber of Hon. Minister, Health. In case of each hospital for each category of diet (out of 10 categories) detailed discussions were held among the members and the selections were unanimously finalised recording the names of the Parties and firms in the broadsheet under the signature of the members. *No such selection as mentioned in the above weekly* (অর্থাৎ সাপ্তাহিক বসুমতী) *was made in the Central Diet Committee nor any cancellation was stated therein was affected on the selection made on 26.4.69.*

এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ প্যাথলজী বিভাগের অধ্যাপক নিয়োগের প্রসঙ্গে:

১৮ই সেপ্টেম্বর এবং তার পূর্ববর্তী বিভিন্ন তারিখের পত্রিকায় বঙ্গদর্শন বিভাগে ঐ প্রসঙ্গ তুলে যা বলা হয়েছে তার সারাংশ হল: প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জনৈক বিশ্বস্ত সহকারীর প্ররোচনায় তাঁরই সম্পর্কিত ডাক্তারকে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজী বিভাগে রাতারাতি অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়, এই ভদ্রলোকের বাঁকুড়ায় বদলীর আদেশ বাতিল করা হয়, তাঁর বিভিন্ন দুর্নীতিপূর্ণ কাজকে ধামাচাপা দেওয়া হয়।—এই অভিযোগগুলিও ভিত্তিহীন। প্রকৃত ঘটনাবলী সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমত নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজী বিভাগের উক্ত ভদ্রলোক আদৌ বর্তমান বিশ্বস্ত সহকারীর আত্মীয় নন। দ্বিতীয়ত প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননীবাবুর বিশ্বস্ত সহকারী ছিলেন শ্রীসিংহরায়, তিনিও উক্ত চিকিৎসক ভদ্রলোকের আত্মীয় ছিলেন না। তৃতীয়ত প্যাথলজী বিভাগের উক্ত ভদ্রলোক 'রীডার' পদ থেকে এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পদে উন্নীত হন ১২-১-১৯৬৭ তারিখের হেলথ ডিপার্টমেণ্টের ESH/232/DHS/IS-103-66 নং নোটিফিকেশনের বলে। ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকারই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন নি, তো সেই সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিশ্বস্ত সহকারীর প্ররোচনায় কারও প্রমোশন হবে কি করে? চতুর্থত ঐ ভদ্রলোকের বাঁকুড়ায় বদলীর আদেশ বাতিল হওয়ার প্রশ্নও অবান্তর কারণ ESH/230/DHS/IS-103-66 dt. 12.1.67 নং নোটিফিকেশন অনুযায়ী যাঁর বাঁকুড়ায় বদলীর আদেশ বাতিল হয়েছিল; তিনি ছিলেন ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজী বিভাগের একজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসর, পূর্বোক্ত ভদ্রলোক নন। এসব বদলী বা প্রমোশনের ঘটনায় বর্তমান বিশ্বস্ত সহকারীর কোনভাবেই কিছু করার ছিল না, কারণ তিনি তখন বিশ্বস্ত সহকারীই ছিলেন না। পঞ্চমত বর্তমান বা প্রাক্তন কোন বিশ্বস্ত সহকারীই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতিমূলক কাজের অভিযোগ ধামাচাপা দেন নি। বরং প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা কায়েম হওয়ার পর বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আমলেই ভিজিলেন্স কমিশনের কাছে ঐ দুর্নীতিমূলক কাজ সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ যায় এবং তদন্তের পরে অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন বলেও প্রমাণিত হয়।

WBHS চিকিৎসকদের প্রমোশন তালিকা তৈরির প্রসঙ্গে:

স্বাস্থ্য দপ্তরের তথাকথিত সুহৃদচক্রের নায়কের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশ্বস্ত সহকারী বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত চিকিৎসকদের প্রমোশন তালিকা তৈরি করেছেন বলে বঙ্গদর্শনের লেখক ১৮ই সেপ্টেম্বরের সাপ্তাহিকের ঐ বিভাগে যে সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা সত্য নয়। WBHS-এর অফিসারদের শিক্ষক পদে নিয়োগ ও লেকচারার থেকে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসর, রীডার ইত্যাদি পদে প্রমোশনের ব্যাপারে সুষ্ঠু ও বাস্তবদর্শী নীতি অনুসরণের উদ্দেশ্যে বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি এ্যাকাডেমিক এ্যাডভাইসরি — কমিটি গঠনের আদেশ দেন। কিন্তু শীঘ্রই যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়। পরে ১৯৬৮ সালে ঐ কমিটি গঠিত হয় এবং বর্তমান মন্ত্রিসভা গঠনের কয়েকমাস পরে কমিটি তাঁদের সুপারিশগুলি পেশ করেন। কিন্তু বহু চিকিৎসকের কাছ থেকে, বিশেষ করে শিক্ষক হওয়ার গুণগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মফস্বলে যাঁদের চাকুরির পোস্টিং হয়েছে এবং বদলীর সুনির্দিষ্ট পলিসির অভাবে মফস্বলেই থেকে যেতে হয়েছে, তাঁদের কাছ থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই অভিযোগ পান যে তাঁদের দাবির প্রতি সুবিচার করা হয় নি, এমন কি অনেকক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। এইসব কারণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হেলথ সেক্রেটারিয়েট ও ডাইরেক্টরেটের ৫ জন বিশেষজ্ঞ অফিসারকে নিয়ে একটি 'সেল' গঠন করে, তাঁদেরকে প্রার্থীদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত গুণাবলী, গবেষণা ইত্যাদির সঙ্গে মফস্বলে স্পেশালিস্ট মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে কাজ করার বিষয়টিকেও যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে ধরে সমস্ত সুপারিশগুলির পুনর্বিবেচনার আদেশ দেন। এই বিশেষজ্ঞরা (এঁদের মধ্যে সুহৃদচক্রের নায়ক অথবা বিশ্বস্ত সহকারীর কোন ভূমিকা নেই) প্রতিটি চিকিৎসকের ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে ও 'মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট'-এর নির্দেশ অনুসরণ করে WBHS চিকিৎসকদের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক হিসাবে পদমর্যাদা নির্ধারণ করেছেন।

—বাণীন রায়
২৬-১০-৬৯

অন্যগ্রাম অন্য তরঙ্গ

সমীর মুখোপাধ্যায়

বাড়ি থেকে বার হলেই আমার পা পীচে পড়ে। তাও এমনি পা, মানে খালি পা নয়। জুতোশুদ্ধু পা। জন্মে ইস্তক্ই কি এই হয়ে আসছে না? তা ছাড়া, তেমন করেই বা কাদা লাগে কৈ? পা আর পীচে ফেলতে চাই না। পা মাটিতে ফেলতে চাই। পায়ে জুতো থাকবে না। মাটিতে পা দোব জুতোশুদ্ধু? মাটি কথাটা একটু ছেড়ে ছেড়ে উচ্চারণ করলে মাটিতে কি পা দেওয়া যায়।

এসব এতোদিন জানতাম না। থাকতাম এক ছন্নছাড়া জগতে। তার নাম শহর। এই শহর আমার বাঁয়ে। আমার ডাইনে। আকাশে কোন কিছু থাকা সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হত তাহলে সেখানে শহরের কথাই ভাবতাম। যেখানে মাটি নেই শুধু পীচ। শুধু সিমেন্ট আর কংক্রীট। মানুষও ত' সেই রকমেরই হয়। সিমেন্টের মানুষ। কংক্রীটের মানুষ। ও ধরণের মানুষ ভালো কি মন্দ তা' জানি না। কিন্তু একদিন দিনটা কেমন যেন ছিল মেঘলা। বাড়ির ছাদে ছাদে উতলা হয়ে উড়ছিলো শাড়ি। নারকোল পাতার ঝালর দুলছিলো হাওয়ায়। পাওনা ছুটির দমকা নিশ্বাসে সাইকেলটা নিয়ে এলোমেলো বেরিয়ে পড়েছিলাম। উড়ে চলছিলাম পীচের ওপর দিয়েই। একবারও মনে হয় নি কোথাও একটা আমার যাওয়া দরকার। আমি চলছি পথে পথে। কে যেন আমার নাম ধরে ডেকে গেছে। আমি তারই ডাকে সাড়া দিতে দিতে চলেছি। চলতে চলতে কখন রোদ গিয়েছে পড়ে, শহর পড়ে গেছে পেছনে, দু' পাশে এসে

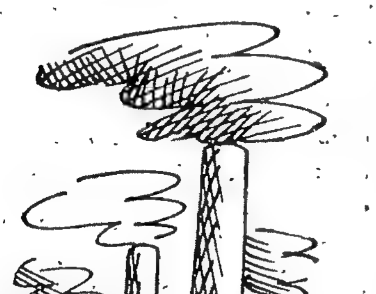

অতিকায় চুরুটের মত এক-একটা চিমনী

গেছে শান্ত বনশ্রী, দূর আকাশের কিনার দিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। অনেকখানি করে যাচ্ছি, এক-একটা করে চায়ের দোকান চোখে পড়ছে. সেখানে কিছু কলরব আর চায়ের কাপ নিয়ে গোল হয়ে বসা মানুষ, তারপরেই জলে থৈ থৈ বিরাট বিরাট-মাঠ, মাঠের মাঝে মাঝেই নতুন নতুন দৃশ্য, মানুষজন একটাও দেখা যায় না, জলে ডুবে গেছে সমস্ত প্রান্তর, কেবল এক জায়গায় একটুখানি মাথা জাগানো উঁচু ডাঙা. সেখানে একটা খোলা ছাতি, হাওয়া দিচ্ছে, মাঠের জলে আঁকাবাঁকা ঢেউ-এর সাপ, ধান গাছের ডগা দেখা যায় শুধু, চারিদিক নিস্তব্ধ, আমার কানের দু' পাশে হু হু হাওয়া, এখানে কেমন করে এলো ছাতি এতো বড়ো একটা অনিশ্চিত আকাশের নীচে আর এই জলে ভরো ভরো প্রকান্ড প্রান্তরের নিরালায়? মানুষটা গেল কোথায়? তারপরেই মুখে জাল আটকানো দু' চারটে গরু। দিনের কাজ শেষ করে ফেরা টোকা মাথায় চাষী অথবা মাথায় কাটা ঘাসেরবোঝা নিয়ে হেঁটে হেঁটে যাওয়া মানুষ অথবা পাশ দিয়ে সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝোলানো প্রকান্ড কাঁচকলার বোঝা নিয়ে ছুটন্ত মানুষ. মন্দ লাগছে না। তারপর এক সময় দেখা দিলো বনঝোপের মধ্যে মধ্যে দু-একটা চালা। তখনো কিন্তু আমার সাইকেলের নিচে পীচ। মাটি না। আর আমার কিছু মনে হয় নি।

কিন্তু হঠাৎ দেখলাম কয়েকটি ঘর। সেখানে পিদিম জ্বলছে। একটা নয়। ভিটের মাথায় জ্বলছে। দাওয়ার ওপর জ্বলছে। জ্বলছে 'নাচে'। পাঁচিলের ওপরও জ্বলছে। আজ কি দেয়ালি? এ্যাতো আলো এই সন্ধ্যের সময় কেন?

জিগ্যেস করলাম একজনকে 'ওহে' বলে।

সে ঠোঁটটা বেঁকিয়ে চতুর একটু হেসে বললে, আপনারা শওরের'। আপনারা ফট্ করে সুইচ টেপেন। আলো হয়। আমাদের এখানে আলো হয় না। আমরা আলো দি। একে সন্ধ্যে দেওয়া বলে।'

ঠিকই ত'। এসব আমিও কোন এক-কালে জানতাম। হঠাৎ আমার চোখের থেকে একটা পর্দা সরে গেল। আমি দেখলাম মাটির দাওয়ায় মাটির পিদিম মাটির মেয়েরা দিয়ে দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছে। আবিষ্কার করলাম আমি আর এখন সাইকেলের ওপর নেই। চলে এসেছি রাস্তা থেকে ওদের ঘরের কিনারে। আর আমার পায়ের তলায় পীচ নেই। মাটি। আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। পা থেকে জুতো খুলে ফেললাম।

তারপর পা থেকে জুতো খুলে মাটির ওপর দিয়েই হাঁটছি। মাটির সার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাটির মানুষদের কাছে যাবারও চেষ্টা করেছি। জানি না যেতে পেরেছি কি না। কেন না আমার শুধু সেই ভয়, আমি যে আসলে সেই ছন্নছাড়া শহরের লোক। গায়ে আমার শহরের এঁটো, এ কি সহজে যাবার? কোথায় সেই জল যা' দিয়ে ধুলে গা থেকে এঁটোর দুর্গন্ধ যাবে?

'এই ঢালু পথটা বেয়ে নেবে যান খানিক। তা'লেই পাবেন।'

যে বলল সে আর মুখ ফিরিয়ে তাকালো না। কাঁধে তার বাঁক। সে চলল রণ-পায়ে। ইস্টিশানের গাড়ি ধরবে।

ঢাল ধরে নেবে গিয়ে সামনেই দেখলাম অকূল গংগা। ওপারের আকাশে খোদাই করা অতিকায় চুরুটের মত এক-একটা

চিমনী। কখনো কালো, কখনো শাদা, ধোঁয়া ছাড়ছে। গঙ্গায় এক পারে যদি জ্বলে কারখানার ম্যাজিক ত' অন্য পারে জাগে কচুরিপানা। আর মাঝখানে ভাসে মহাজনী নৌকো। এ ছাড়াও আছে জেলে-নৌকো, কখনো ভ্রাম্যমাণ কখনো খুঁটিতে বাঁধা। সামনের নৌকোটার ভেতরে চোখ চলে গেল। একটা কালিপড়া, নিভন্ত লণ্ঠন। চ্যাটাই একটা। কুন্ডুলী পাকানো একটা চাদর। মাটির কলসী। একটা খেলো হুঁকো। সেখানে বসে এক মনে কাঠের ছুঁচ দিয়ে জাল সেলাই করছে কোঁচকানো মুখের একটা সাতকেলে বাসি বুড়ো। এরই ধারে গড়ে উঠেছে জনপদ। এরা সবাই জেলে। নামও তাই জেলেপাড়া। জলের ধারে এদের বাস। ঢালু পথ বেয়ে নেবে আসতে হয় বলে জেলেরা নিজেদের এই পল্লীটিকে বলে 'নীচুতলা'। আর ঢালু বেয়ে ওপরে উঠে যে প্রকান্ড বর্ধিষ্ণু গ্রাম তাকে এরা বলে 'উঁচুতলা'। এক হিসেবে কথাটা ঠিকই। আমি দেখতে দেখতে চলেছি। সামনেই কুমোরপাড়া। খালি গা, গলায় কণ্ঠি। পাল আর হালদার মশাইরা বসে বসে আছেন নিচু পিঁড়িতে। মাথার ওপর টালির চালটা দাওয়ায় নেবে এসেছে। ঢুকতে গেলে মাথা নিচু করেই ঢুকতে হবে। বোধ হয় খদ্দেরদের জন্যে আর একটা বাড়তি পিঁড়ের বন্দোবস্ত। মাটির কলসীর ছাঁচ কাটা পড়ে আছে রোদ্দুরে। আর যেগুলোর রঙ ধরে গেছে তাদের গায়ে কাপড় চাপানো। না আমার মাটির কলসী বা জালা বা খুরি আপাতত কোন-টারই দরকার নেই। পাল-গিন্নী আমার দিকে তাকালো। যখন বুঝলো আমি খদ্দের নই, তখন ঝট্‌কা মেরে মুখটা ঘুরিয়ে নিলো। বিরক্তি প্রকাশ করার

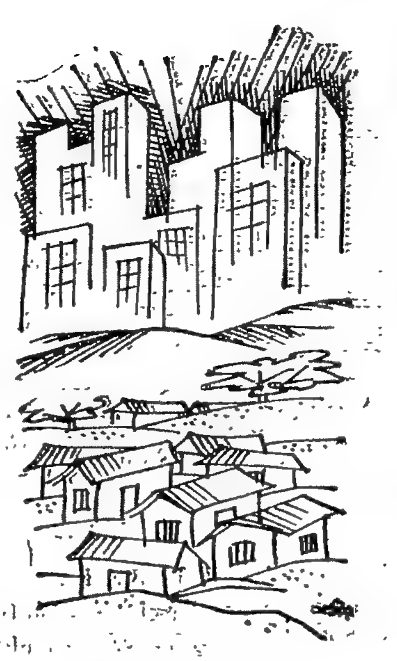

উঁচুতলা, নীচুতলা

বোধ হয় এটা একটা বিশেষ ঢং। আমি ঠিক জানি না। সামনেই মাটি কাটা প্রকান্ড পুকুর। ঐ মাটিই তাহলে লাগে কুমোরেরা চাকে?

বেশির ভাগ ঘরের দেয়াল ইঁটের। চালটা টালির। টালির ফুটোয় কাটা টিন চাপানো। কোন কোন চাল হয়েছে কুমড়ো লাউ-এর মাচা। কিন্তু দেয়ালে ওসব কি লেখা? অদ্ভুত ত'? বিপ্লবের চেয়ে প্রতিক্রিয়ার হাতেই বেশি রক্ত ঝরে। 'তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম'। আবার অন্য লেখাও আছে, 'ভুলে গেছে বাপের নাম, মুখে খালি ভিয়েতনাম" এমনি আরো কিছু।

সামনে অলস কয়েকটি গ্রামের কুকুর, দু'পাশে জীর্ণ অশ্বত্থের মর্মর, মাথার ওপর রোদ্রতপ্ত একটি চিল, এখানে-ওখানে কালোকোলো, হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, খড়ি ওঠা, কণ্ঠিধারী কয়েকটি মানুষ। ঠিক এইরকম একটি পরিবেশে প্রথম চোটে কথাগুলো দেখলে কেমন অবাক অবাক লাগে। নিশ্চয় এসব লেখা ওরা লেখে নি। 'উঁচু'তলা থেকে কেউ কেউ এসে লিখে দিয়ে গেছে 'নীচু'তলার দেয়ালে। এসব কথার এরা মানে বোঝে কি? গত নির্বাচনেরও কিছু কিছু প্রতীক চিহ্নও দেখছি।

এই পল্লীটি যে জেলে পল্লী তাতে সন্দেহ নেই। দু'চারটি ঘর পার হলেই এক-একটি ঘরের সামনেই রাস্তার দিকে একটু করে খোলা জায়গায় হয় দু' পাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতে, নয়তো ভগবানের সৃষ্টি দু'পাশের গাছের ডালে টাঙানো গত্য রাত্রের জলে ভেজা জাল। ওগুলো রোদ্দুরে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। খোলা জায়গাতে উপুড়-করা দু-একটা নৌকো কুমীরের মত রোদ্দুর পোয়াচ্ছে। কি জানি কেন যুবক জেলে তেমন দেখছি না। সবই প্রবীণ। মাথার চুল পাকা, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, এমন ক'জনকেই দেখলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাবনায় ধাক্কা দিয়ে সুতো ঘোরাচ্ছে জাল তৈরির জন্যে। জেলে পল্লী, তবু দেখছি একজন ছড়ানো হাঁটুর ওপর কুলো, নিবিষ্ট মনে বিড়ি বাঁধছে। সেলাইকল-ও চালাচ্ছে একজন অনর্গল।

তেষ্টা পাচ্ছিলো। টিনের বেড়া দেওয়া হতচ্ছাড়া এক চায়ের দোকান। চা খেতে খেতে জিগ্যেস করলাম: 'শুনেছিলাম এটা জেলেপাড়া। তা' এটা কেমন ধরণের জেলেপাড়া?"

ওরই মধ্যে যার চোখের দৃষ্টি ধারালো সে একটু মুচকে হেসে বললো 'মনে নিচ্ছে আপনি দুলাল রায়ের তরজা শোনেন নি?"

— 'কে দুলাল রায়?'

— দুলাল রায়কে চেনেন না?' বুঝলাম দুলাল রায়কে না চিনে মহা অন্যায় করে ফেলেছি। নিশ্চয় এ অঞ্চলের এক মান্যগণ্য ব্যক্তি।

'পথে আসতে কি দেখলেন?' উল্টো প্রশ্ন। কোথায় আমি প্রশ্ন করবো তা' নয় আমাকেই প্রশ্ন। আবার প্রশ্নের ধরণটিও অদ্ভুত। প্রশ্ন না ধাঁধা বোঝার উপায় নেই।

'পথে আসতে দেখলাম কুমোরবাড়ি।"

'তবেই।' ব্যস। কথা শেষ। ওরা সবাই কাঠের বেঞ্চিতে বসে পা দোলাতে লাগলো।

'বুঝলাম না।" অতি কষ্টে বললাম।

'যে কুমোর সে জাল বুনবে। যার জাল বোনার কথা সে কুমোরের চাক ঘোরাবে। তার মানেটা কি। তার মানে মেলাতলার নাগরদোলা।'

হ্যাঁ। এইবার সহজ হল। সবাই যে যার বৃত্তি থেকে ছিট্‌কে পড়েছে। ছিট্‌কে পড়ে অন্য বৃত্তি ধরেছে। পনেরো বছর আগেও কি কেউ ভেবেছিলো জেলের ছেলে বিড়ি বাঁধবে?' এই যে চায়ের দোকানটা দশ বছর আগেও কি এটা এখানে ছিলো? চা হয়তো তখনো অনেকে খেত। কিন্তু খেতে হলে ঐ ঢালু পথটা বেয়ে ওপরে অর্থাৎ ভদ্দরলোকদের গ্রামে যেতে হত। এখানে এসব 'অনাচার' ওরা ঢুকতে দিতো না। পনেরো বছর আগেও সকলের একরকম একই অবস্থা ছিলো। এমনিতে কাদা মাখা, গায়ে 'বস্তর' নেই, ব্যস্ত সারাদিন, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেরই ছিলো এক-একখানা করে নৌকো, এক-একখানা করে জাল। ওরা ছিলো

বসুমতীর
যাবতীয়
গ্রন্থ ও
গ্রন্থাবলীর
প্রাপ্তিস্থান
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২
এবং
সান্যাল এন্ড কোং
১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

এইরে—সর্দি লাগল।

এবার গা ম্যাজম্যাজ করবে, নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হবে, গলাব্যথা করবে,—তারপর সর্দি বসলেই মুস্কিল।

এক্ষুনি ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

সবে সর্দি লেগেছে। এখনই এর একটা ব্যবস্থা করুন।
তা না হলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হবে নানান ভোগান্তি—নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি—অযথা কষ্ট ভোগ করতে হবে।
সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, তাহলে কোনও কষ্ট পেতে হয় না—বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।
আর একটা কথা। ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায় যেখানো ঠাণ্ডা বেশী লাগে,—যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।
খুবই সহজ কাজ। তেতো বড়িও গিলতে হবে না, বিচ্ছিরি মিক্সচারও খেতে হবে না।

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,—সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে—

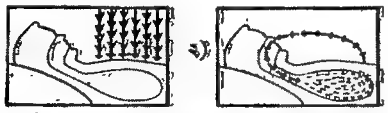

১) বাইরে থেকে গায়ে   ২) ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে।
২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয়, তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ করে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব—নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

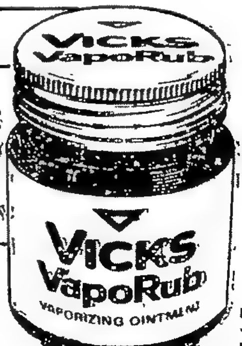

NAS 643

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

স্বাধীন। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্দর—এই তিনটে মাস একটু 'গোণ' দেখে বার হলেই হাতে মুঠো মুঠো টাকা। একবার এমন হল, এ্যাতো মাছ জালে পড়লো যে সেই প্রথম প্রত্যেকের ঘরে ঘরে ঢুকলো সাইকেল। মেয়েদের গায়ে উঠলো গয়না। এর আগে জেলের বাড়ির বৌ-ঝি 'টকি' দেখতে যেত না। এর পর থেকে, পায়ে খটর-মটর জুতো, জেলে বৌ-ঝি 'টকি' দেখতে ছুটলো। তারপর ত' 'টকি' দেখে দেখে 'টকি'র চালও শিখলো। আগে জেলের মেয়ে মাথায় এক হাত ঘোমটা দিয়ে 'উঁচু'তলার কাজ করতে যেত। ছেলে ধরে রাখতে, বাসন মাজতে, ঘর পুঁছতে বাবুদের দরকার হত। ওরা বাবুদের সংগে কথা বলতো না। নাকের নথ নেড়ে শুধু কথা বলতো গিন্নীমার সংগে। কালে কালে ওরাও চাল পাল্টে ফেলল।

বাবুদের ঘসামাজা বৌ-ঝির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগলো, বাবুদের সংগে তুলনা করতে শিখলো নিজেদের স্বামীদের, স্বামীরাও ত' এক-একটি গুণধর, ঘুণ-ধরা বাঁশের মত কাঠামো, খক্ খক্ করে কাসছে, 'পাছপানি' টেনে ভাঁটার মত চোখ, হাত আর পায়ের আঙুলে আঙুলে হাজা, দুদিন 'জলে' বেরুলো ত' তিনদিন বেরুলো না, কোথা দিয়ে যে সংসারটা চলবে অতোশতো খোঁজ রাখবার দরকার নেই, 'ছানাপোনো'গুলো যখন খিদের জ্বালায় খুব চীৎকার জুড়েছে তখন চুপ করে উধাও হয়ে যাওয়া। তারপর একদিন আবার দমকা বাতাসের মত এসে পিঠে চ্যালাকাঠ আছড়ানো, 'বল শালী, এ ক'দিন তোর ভাতার ছিল কে?' এই ত' সব, এও জেলের বৌ-ঝি সহ্য করেছে, ফুটো সংসারের ভাঙা শাঁখটাকে তবু দু' হাতে তুলে ধরেছে, মশাল থেকে শেষ আগুনের কণা নিয়ে নিরানন্দ অন্ধকারে তবু জ্বালিয়েছে জীবনের পিদিম, বহু বহু ধৈর্যে দীর্ঘকাল নিজেকে ধরে রেখেছে নোংরা, লোভী চোখের কুটিল ফণা আর ওপরে মিষ্টি হাসির প্রলেপ মাখানো নিচে লুকোনো বিষদাঁতের কামড় থেকে, শেষে মাথার ওপর একদিন ভেঙে পড়েছে ঝড়, ঘরের চালটা উড়ে গেছে আশ্বিনের ঝড়ে আর এক ভুতুড়ে অন্ধকারে হাঁটুতে মুখ গুঁজড়ে থাকা সেই মানুষটার মুখ থেকে শুনেছে, 'গংগায় ছাই পড়েছে। আজ একটাও মাছ পেলাম না।'

এ যে ভীষণ কথা, যে জানে না সে জানে না, কিন্তু যে জানে সে হয় গুম খেয়ে যাবে একবারে, নয়তো পাগলের মত দু' হাতে বুক চাপড়াতে থাকবে আর ভগবানকে অভিসম্পাত দেবে, 'তুমি মরো, মরো'।

তাই ত' একদিন হল। গংগার জল শুকোতে লাগলো। কাজে কাজেই জেলের জালও শুকিয়ে দড়ি। জল যদি শুকোলো, জাল যদি শুকোলো ত' নৌকো রেখে কি হবে। শেষে নৌকো কেনে কে? সকলেই বিক্রী করতে চায়। যে যেমন পারলো এদিক-ওদিক বেচে দিলো জলের দরে। কিন্তু তারপর? এই তারপর নিয়েই যতো ভাবনা। বুড়োরা বললে, 'না। এসবে আমরা আর নেই। আমরা কেউ ষাট। কেউ পঁয়ষট্টি। কেউ সত্তর। কেউ পঁচাত্তর। অনেক একদিন ভেবেছি তোমাদের জন্যে। আর আমরা ভাববো না। আমাদের এখন যাবার পালা। আমরা যাবো। আমরা একটা 'হরিবাসর' করেছি। ঐখানেই নামগান হবে। ওতেই মত্ত হয়ে থাকবো।'

বুড়োরা 'হরিবাসর'এ ভিড়ে গেল।

তখন থেকেই ভাঙনটার শুরু। ইতিমধ্যে পীচের রাস্তা তৈরি হয়েছে শহরে যাবার। বাস আসছে। বাস যাচ্ছে। জোতদার, মহাজনের সুবিধের জন্যেই প্রথমত এসব তৈরি। ওরা লরী লরী ধান, পাট চালান দিতে লাগলো। ঐ পথ ধরেই আর একজন এগিয়ে এলো। সে শুধু এগিয়ে এলো না। চলতে লাগলো। সে শুধু চলতে লাগলোই না। সবাইকে নিয়ে চলতে চাইলো। তার নাম ইতিহাস। ঐ পীচের পথ ধরেই কেউ কেউ গ্রামের স্কুলে একটু-আধটু লেখাপড়া শিখে মহকুমা শহরের কোর্টে গিয়ে সেরেস্তা খুলে মুহুরী, ভেণ্ডার হয়ে গেল। আরও উঁচুতে গেল। হ্যাঁ, এই গ্রামেরই ছেলে, অনেক উঁচুতে। এ্যাডভোকেট হয়ে গেল।

ঐ পীচের পথ ধরেই কেউ হল প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার। কেউ দূরের কারখানার শ্রমিক। শহরের হাওয়া তারাই নিয়ে এলো গ্রামে, তারাই বহন করে নিয়ে এলো নতুন কাল; জেলেপাড়ার বিবর্ণ আকাশে তারাই টাঙিয়ে দিলো নতুন সকাল। জেলেদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে। 'জেলেদের পাছায় ট্যানা। নিকিরির কানে সোনা।' নিকিরির হাতে পয়সা একটু বেশি কিন্তু জাত জেলের গর্ব অন্য জায়গায়। আমি জলে জলে ঘুরি এদেশ ওদেশ। আমি স্বাধীন। আমি শুধু চিনি জল আর মাছ। মাছ বেচি বটে, কিন্তু খদ্দেরদের কাছে মিছে কথা বলি না। ওদের খোশামোদও করি নি। ওদের পরোয়াই করি না। ওদের মুখ-নাড়া খাই না। নিকিরিরা ওদের কাছ থেকে মাছ কিনে সেই মাছ বঁটিতে কুটে বাজারে বসে বিক্রী করে। সেই জন্যে জাত জেলে নিকিরিদের ঘরে নিজেদের মেয়েদের দিতো না। যাদের একদিন পাঁচ-ছ' বছর ছিলো, পনেরো-ষোলো বছরের পর যখন তাদের বয়েস কুড়ি-বাইশ হল

তারা যখন দেখলো শুকনো গংগা তখন তারাও এ আড়ত সে আড়ত থেকে মাছ কিনে ঐ বাজারেই বসে গিয়ে নিকিরিদের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলল। জেলে আর নিকিরির সূক্ষ্ম তফাৎটা আর রইলো না। এইরকমভাবে যখন উল্টেপাল্টে যাচ্ছে সাজানো ছক, যে যা' নয় সে তাই যখন হয়ে যাচ্ছে, জাত ব্যবসা লাটে উঠতে তখন কেউ বাঁধছে বিড়ি, কেউ গজে দিচ্ছে দোকান; কেউ চায়ের দোকান খুলছে নিজের গ্রামেই, কেউ ফেরি করছে কাটা কাপড়, কেউ লেখাপড়ার লাইনে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু যেমন হয়, এক ধরণের লোক কিছুই করতে পারে না, কোন নতুন ধান্দা ঠিক করতে পারে না, কোন নতুন ফিকির ধরতে পারে না, তারাই কিন্তু মূল শক্তি, তাদের ক্ষোভ ভেতরে ভেতরে ফেনিয়ে উঠতে লাগলো। গংগা শুকোলেই সব শেষ হয়ে যায় না যাদের কাছে তারা কেউ কেউ পুকুর জমা নিলো। এদের হাতে কিছু টাকা ছিল। এদেরি কেউ কেউ সুদী কারবার ধরলো। সেই পথে এলো কিছু চোরা টাকা। তা' দিয়ে রেললাইনের ধারে ধারে যে সমস্ত বড় বড় গর্ত, বর্ষার জলে যা' খাল, বিল হয়ে যায়, সেগুলো জমা নিয়ে বা কিনে নিয়ে ওরা হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেল। জেলে পল্লীতে দেখা দিলো নতুন কোঠা বাড়ি। এদের ছেলেরাই কাঁচা টাকায় চোলাই কিনে খেয়ে মুখে গন্ধ করে ফেললে। চালাক চতুর, ফন্দিবাজ লোকের অভাব কোন সমাজেই হয় না। দেখতে দেখতে এই পল্লীতেই চোলাই মদের ভাটিখানা খুলে গেল। আগে ছিলো তাস। এবার এলো ফ্লাশ।

কিন্তু গংগা শুকোলেই যাদের সব শেষ তারা কোথায় গেল? পুকুরে মাছ আছেই। পুকুর জমাও নেওয়া যায়। কিন্তু পয়সা? পয়সা যাদের নেই তারা কি করবে? কেমন করে কিনবে পুকুর অথবা জমা নেবে?

একদিন যাদের বাবা, কাকা, জ্যাঠারা গংগায় নিজেদের নৌকো ভাসিয়েছে, জাল ভর্তি তুলেছে মাছ, কোঁচর ভর্তি এনেছে টাকা এখন তাদের ছেলেরা, মগজে যাদের লেখাপড়া ঢুকলো না, অন্য ফন্দিফিকিরও ঢুকলো না, তারা সেই রাত ভোরে উঠে কার্তিকের হিমে কাঁপতে কাঁপতে দু-হাতে পচা পানা সরাতে সরাতে পরের পুকুরে জাল টানছে। এই জালটাও তাদের নয়। মহাজনের জাল। জাল টেনে মজুরী পায় কোথাও দু' টাকা, কোথাও আড়াই।

যাদের সাগরে যাবার কথা ছিলো তারা গেল গংগায়। যাদের গংগায় যাবার কথা ছিলো তারা গেল পুকুরে। যাদের কথা ছিলো স্বাধীন জেলে হবার, তারা

নিজেকে সে বলে না কৃতঘ্ন

মনোরমা সিংহরায়

কৃতঘ্ন হৃদয় যদি কখনো তোমার দ্বারে এসে
হার্দ্য প্রগল্‌ভতা দেয়, অভাবিত সন্দেহ কেবল
আপনিই বাসা বাঁধে, বলে কী বলে ফেরাবে শেষে
অন্তর্লীনা আপনি মন্থর প্রত্যহের অবসাদ নিয়ে॥

নিষ্ঠুর আঘাতে সত্তা বার বার আলোড়িত হয়।
প্রেমের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারিত হলেও আবার
বিস্মরণে শেষ হয়। তবুও সে করে অভিনয়
অন্তিম দৃশ্যের জন্য অপেক্ষায় থাকে বন্ধু বেশে॥

নিজেকে সে বলে না কৃতঘ্ন। পরিচয় প্রেমিক সুজন
অথচ মিতালি তার নির্বিরোধ ছলনাই আনে।
নাটক তখন জমে যখন পঞ্চম অঙ্কে মন
অবসাদে ক্লান্ত হয়ে অপমানে ধূলায় ধূসর॥

আঁধারের নীল গদ্যে

কার্তিকচন্দ্র মি

নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তির গান
নীরব স্মৃতির মধ্যে,
উদ্বায়ু আয়ু পৌঁছয় ধীরে
আঁধারের নীল গদ্যে।

বীণার শব্দ অর্থের ঝঙ্কারে
সভাসনে সংহত,
শবাসনে মৃত মানুষের হাড়ে হাড়ে
সভ্যতা উন্নত।

চারিদিকে তারই যুক্তিও বেশ মধুর।
ঝরছে ঝরছে মাটিতে করুণ
বেহালার আদি সুর।

হল পরের পুকুরের পরের অধীনের মজুর, ধাপে ধাপে এ তারা কোন্ অন্ধকারে চলেছে? মানুষগুলো প্রথমে ছিলো খাড়া, সটান, কড়িকাঠে মাথা ঠেকে যেত ঠক্ করে। ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে তারা, ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, বেঁটে হচ্ছে।

কোন উপায় না দেখে এই সব দিশেহারা মানুষেরা নিজেদের বসতবাড়ি সমেত জায়গা বেচে দিচ্ছে। এখন দরও পাচ্ছে ভালো। এমন লোকও আছে যারা এই গংগার পারের এই পল্লীতে জায়গা কিনে বাড়ি তুলতে চায়। হাজার টাকা দেড় হাজার টাকা কাঠা। বেচে দিচ্ছে নিজের জোতজমা জাত জেলেরা। সেখানে গ্রামের উঠতি ধনীরা পুরোনো টালির চালার পাশে নতুন চকমিলোনো, গ্রীল বসানো প্রকাণ্ড বাড়ি তুলছে আকাশমুখো আর এরা, এই সব দিশেহারা, ছন্নছাড়া মানুষ লক্ষ্মী বেচা পয়সায় গেরো দিয়ে চলে যাচ্ছে উদ্বাস্তু পল্লীতে। ১৯৬৭ সালে এসে গেল নয়াজমানা। মাঝখানে এলো হাজতবাসের দিন। হাতে হাতকড়া। পায়ে শেকল। পিঠে কালসিটের দাগ। বাতাসে তাজা বারুদের গন্ধ। মানুষের রক্ত আবার অবাধ্য হয়ে উঠলো। এক হাতে ঘাম আর অন্য হাতে রক্ত মুছতে মুছতে এলো ১৯৬৯ সাল। সমাজের এই সব সবচেয়ে নিচে পড়ে থাকা লোকেরা এতোদিন যেন ঘুমিয়ে ছিলো, এবার আবার চাংগা হয়ে উঠেছে। আগে ঘেঁসতে ভয় পেত। এখন নিজেদের গরজেই খুঁজেছে কোথায় কৃষক সমিতি। কে যেন ওদের বলেছে, সরকার সব্বাইকে জমি দেবে। ওদের চোখের নোন্‌তা জলে ভেসে উঠেছে হারানো জমি, ওরা যেন জানতোই না, কে যেন ভুলিয়ে ভালিয়ে ওদের জমি থেকে উৎখাত করেছে, ঠিক এমনি একটা মন নিয়ে ওরা কৃষক সমিতির কাছে যাচ্ছে।

'জমি নাকি দিচ্ছেন আপনারা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা কারা?'

'আমরা জেলে। তবে এখন মজুর।'

'তোমাদের জমি দেওয়া হচ্ছে না। জমি দেওয়া হচ্ছে ক্ষেতমজুরদের। অন্য মজুরদের নয়।'

ওরা নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছে তারপর। চায়ের দোকানেই চা খেতে খেতে ওদের কেউ উস্‌কেছে, 'যা' না। যেখানে দেখবি খালি মতন জায়গা ঐখানেই খড়ের ছাউনি করে বসে পড় গা যা।'

উদ্বাস্তু কলোনীতে এমন জায়গা কিছু কিছু আছে যেখানে লোন পাওয়া জমিতে হয়তো বাড়ির চারটে দেয়াল খাড়া করা আছে। কিন্তু যার বাড়ি তার দেখা নেই দু-চার বছর, দেয়ালের মধ্যে গজিয়েছে আগাছা, ওরা কেউ কেউ সেই সব জায়গায় খড়ের ছাউনী তৈরি করে বসে গেছে।

কৃষক সমিতির লোকেরা ছুটে এসেছে। এ তো ঠিক নয়। ভালো করে কি খোঁজ নিয়েছো যার ঘর সে আর আসবে না কোনদিন? যদি না আসে তবে একটা বন্দোবস্ত করা যায়। কিন্তু যদি আসে? এভাবে জবরদখল ত' হবে না। এটা বেআইনী। এই নিয়ে কোথাও ঘটছে রক্তারক্তি, মাথা ফাটাফাটি, কোথাও কিছু হচ্ছে না, ওরা ম্লান, বিষণ্নভাবে ফিরে আসছে, কাঁধের দু' পাশ থেকে অবসন্ন হাত ঝুলিয়ে।

'কিন্তু এভাবে আর চলবে না।' যে চায়ের দোকানে বসে, সময়ের বাড়িতে থেঁতলে যাওয়া, সর্বাংগ কুঁকড়ে যাওয়া যে বৃদ্ধ এতোক্ষণ আমাদের জেলে জীবনের জীবন্ত পাঁচালি শোনাচ্ছিলো, তার খেলো হুঁকো থেকে একটা স্ফুলিংগ হঠাৎ ছিটকে আমার গায়ে লাগলো, ও বলতে লাগলো, 'এভাবে আর চলবে না বুঝলেন।

'আমাদের গেরামের ম্যাস্টার বলেছে আমরা জোট বাঁধবো। তারপর সকলে মিলে যাবো রেল লাইনের ধারে যে সমস্ত জলে-ডোবা খাদ আছে, সেখানে। ঐ সব জলে ডোবা খাদ যে শালা বড়লোক মহাজনেরই হোক আমরা ছাড়বো না। ঐ খাল, বিল আমরা দখল নোবই। যদি জমির মজুর জোতদারের লুকোনো জমি দখল নিতে পারে, তবে সরকারী আইন থাক বা না থাক আমরাও পুকুরের মজুর ঐ সব জোতদারদের খাল-বিল কেড়ে নোবই। ছুঁড়ুক ওরা বন্দুক। আমরাও খালি হাতে যাবো না।'

'হাতে যাবো না।'

আমি চায়ের দোকানের ভেতর দেখলাম নিশাচর প্রাণীর মত ভয়ে-ভয়ে। সেখানে আসন্ন সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা অন্ধকারে চিত্রবাঘের চোখগুলো জ্বলছে।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ফেরারী জীবনের বৈচিত্র্য

কত দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা—কত দিনের আকুল প্রতীক্ষা! চাই অস্ত্র, চাই সুযোগ, চাই মাস্টারদার আদেশ—আনন্দের জোয়ারে কল্পনার অন্তর আজ কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কল্পনা প্রস্তুত—"দূরদেশী দাদা" আসবে এবং তার সঙ্গে সে আজই চিরকালের জন্য বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যাবে। মা-বাবার স্নেহচ্ছায়াচ্ছন্ন শান্ত গৃহ-নীড়—কৃতী ছাত্রীর কলেজের আকর্ষণ তার কাছে সবই আজ অর্থহীন—নগণ্য। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও অধ্যাপকের সর্বোচ্চ স্থান লাভে কল্পনা কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় পাশ করবে সেই আশাই পোষণ করতেন। তাঁদের প্রভাব খুব সামান্য বা তুচ্ছ মনে করে নিশ্চয়ই অবহেলা করার মত নয়। এইরকম কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে ভবিষ্যৎ অধ্যয়ন বিসর্জন দিয়ে জীবনের গতিপথে দাঁড়ি টেনে দেওয়া যে কতবড় স্বার্থত্যাগ—কেবল তাঁরাই তা অনুভব করতে পারবেন। কোন বন্ধন কোন আকর্ষণ কোন স্বার্থের প্রভাবই আজ কল্পনাকে পিছু টানতে পারলো না। মাস্টারদার অনুমতি পাওয়া গেছে—বিপ্লবের সুদূর কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথের হাতছানি উপেক্ষা করবার ক্ষমতা তার আজ নেই।

কল্পনার মুখের কথা। সে বলেছিল "সে দিনটির কথা আজও—এখনও আমার মনে পড়ছে। দূরদেশী দাদার কণ্ঠের গান এখনও যেন বহুদূর থেকে কানে ভেসে আসছে—

"দূরদেশী কোন রাখাল ছেলে,
আমার বাড়ির বটের ছায়ায়,
সারা বেলা গেল খেলে—"

দূরদেশী দাদা হচ্ছেন শান্তি চক্রবর্তী। এই গানটি শান্তি প্রায়ই আপনমনে গাইত। তাই মাস্টারদা শান্তির ছদ্মনাম দিয়েছিলেন—"দূরদেশী", কল্পনার 'দূরদেশী দাদা।' এই শান্তিই ইউরোপীয়ান ক্লাবে প্রথম বোমা ছোঁড়ে।

গুপ্ত বিপ্লবী দলে সবারই ছদ্মনাম ছিল। নিজের নামে শান্তিও তখন কল্পনার কাছে পরিচিত ছিল না। শান্তি যথাসময়ে যথাস্থানে কল্পনার সঙ্গে দেখা করল এবং সেই রাত্রেই পুলিশের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে কল্পনা উধাও হয়ে গেল।

কল্পনার যতদূর মনে পড়েছে তা সে বলছিল—প্রথম সে "কুটিরে" যায়। এই "কুটির" আশ্রয়স্থলেই জালালাবাদ যুদ্ধের পর মাস্টারদা প্রীতির সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। বোয়ালখালী থানার জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামে এই বাড়িটি। কল্পনার আগমনবার্তা পেয়ে তাকে স্বাগত জানাতে মাস্টারদা ও ফুটুদা (তারকেশ্বর দস্তিদার) সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মাস্টারদার সাক্ষাৎ পাওয়ার পর কল্পনার মনে হয়েছিল—আজ যেন তার কঠিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলো। মাস্টারদা দু'-তিনটি রিভলভার তার দিকে এগিয়ে দিয়ে তার মধ্য থেকে তাকে একটি বেছে নিতে বললেন। রিভলভার দেখে—আবার তিন-তিনটি রিভলভার একসঙ্গে হাতের কাছে পেয়ে তার আনন্দের সীমা ছিল না। মাস্টারদা ও ফুটুদা দু'জনেই সামনে বসে। তাঁদের দেওয়া রিভলভার সে বেছে নেবে—এ যে কতখানি সৌভাগ্য, কতখানি বৈপ্লবিক প্রেরণা ও উৎসাহব্যঞ্জক, তার গভীর পরিধি কল্পনা আমাকে ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারছিল না। সেই বয়সের নিজের মনের বিশ্লেষণীশক্তি দিয়েই বুঝেছি

কল্পনার মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা। এ যে উপলব্ধির জিনিষ—ভাষা দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। অন্তরের এই উদ্দাম, উচ্ছল, আবেগতরঙ্গ কে রোধ করবে—হাতের কাছে বহু আকাঙ্ক্ষিত বহু মূল্যবান ধনরাশি ছড়ানো। বিপ্লবীর কাছে রিভলভারের বিনিময়ে মণি-মুক্তা, হীরা-জহরৎ অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য ও অর্থহীন। একটার পর একটা রিভলভার দু হাতে তুলে নিয়ে কল্পনা সযত্নে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখতে লাগল। কোনটা নেবে? তিনটিই নিলে কি হয়? হাত তো দুটি—তবু তিনটি রিভলভারই সঙ্গে রাখাব তার ইচ্ছা। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়—এ যে স্বার্থপরতা। সব রিভলভার-গুলি পুলিশ আর্মারী হতে সংগৃহীত। প্রত্যেকটিরই ·৪৫০ ব্যাস। তিনটির মধ্যে দুটি কোল্ট ও একটি ওয়েবলী কোম্পানীর মার্কামারা। মেয়েদের ব্যবহারের জন্য ছোট সাইজের রিভলভার দরকার। আর্মি রিভলভার সাধারণত মেয়েরা ব্যবহার করতে পারে না। এমন কি ছেলেদের দুর্বল মুষ্টিতে ওগুলি ব্যবহার করা এক-রকম অসম্ভব। আমার দিদি ও সুভাষিণীদিকে (পুটুদি) কোল্ট ও ওয়েবলী রিভলভার ব্যবহারের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিতে চেষ্টা করতে দেখেছি। হাতে খুব জোর না থাকলে আর্মি রিভলভারের ট্রিগার টেপা খুবই শক্ত।

আমার দিদি সাধারণের অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তি-শালিনী ছিলেন। তবু তিনি প্রাথমিক অবস্থায় এই জাতীয় রিভলভারের ট্রিগার টিপে ফায়ার করতে পারেন নি। চন্দননগরের বাড়িতে পুটুদি প্রথম টোটা ছাড়া রিভলভার হাতে নিয়ে ট্রিগার টেপার চেষ্টা করতে গিয়ে স্ট্রাইকার নড়াতেই পারেন নি। অনেক চেষ্টাতেও যখন স্টাইকার স্বস্থান থেকে কোনমতেই গাত্রোত্থান করলো না তখন পুটুদি প্রায় কেঁদেই ফেললেন।

আমি, গণেশ, আনন্দ, মাখন সবাই সেখানে বসে—আমাদের সামনে এইরূপ 'অক্ষমতায়' তিনি ক্রমশ যে লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন, তা তাঁর চোখ-মুখের ভাবেই সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। পুটুদি বলতে লাগলেন—"আমি পারছি না কেন.....এটা কি এতই অসম্ভব—মেয়েরা কি আর্মি রিভলভার চালাতে পারবে না?......" দেখতে দেখতে পুটুদির চোখ-মুখে দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটে উঠলো। তিনি বদ্ধপরিকর—যতই শক্ত বা কঠিন কাজ হোক না কেন, আর্মি রিভলভারকে আয়ত্তে আনতেই হবে। সে এক একনিষ্ঠ সাধনা। পাউডারের টিন নিয়ে এলেন। আঙুলে, হাতে পাউডার মাখাতে লাগলেন—কারণ ট্রিগার টিপে টিপে আঙুলে ইতিমধ্যেই ফোস্কা পড়ে গেছে। পুটুদির ইচ্ছাশক্তির কাছে আর্মি রিভলভারকে পরাজয় মানতে হলো।

মাস্টারদার দেওয়া তিনটি আর্মি রিভলভারের মধ্য হতে কল্পনা শেষ পর্যন্ত একটি বেছে নিলো। মাস্টারদা আর্মি রিভলভারের ক্রিয়া-কৌশল ও কাঠিন্যের কথা কল্পনাকে বলে দিলেন এবং বললেন এইসব রিভল-ভারের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনতে হলে কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। হাসিমুখে কল্পনা মাস্টারদাকে জানালো, তার দিক থেকে চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের কোন ত্রুটিই থাকবে না।

তারপর অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য নিয়ে মাস্টারদা কল্পনাকে বললেন: (এই সব কথা কল্পনার মুখেই শোনা): "......দেখ আমরা কিভাবে আছি। কোন কিছু গোছানো নেই। আমাদের স্নান, খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-জামা—কোন কিছুরই ঠিক-ঠিকানা নেই। আজ হয়তো এ-গ্রামে আছি, কাল হয়তো অন্য গ্রামে চলে যেতে হবে; যে বাড়িতে যাবো, সে বাড়িতে হয়তো সামান্য একটু স্থান পাব যেখানে কষ্ট করে রাত জেগেই কাটাতে হবে—বিছানা থাকবে না—মশারির তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এইরূপ নানা কষ্ট ও বাধার ভেতর দিয়েই বিপ্লবের এই কণ্টক-সমাকীর্ণ দুর্গম রাস্তা অতি-ক্রম করতে হবে। এই সব কথা এতদিন কেবল বইতে পড়েছ—ও নানা লোকের মুখে শুনেছ মাত্র। আজ থেকে প্রত্যক্ষভাবে ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তোমার যাত্রা শুরু। এ পথের বাঁকে বাঁকে ক্রুর সর্প ছোবল হানতে ফণা বিস্তার করে আছে; রাত্রে-দিনে পুলিশ ও মিলিটারীর রাইফেল আমাদের বুক লক্ষ্য করে উদ্যত; আর মিত্র ব্যূহের মধ্যেও বিভীষণের কুটিল চক্র আমাদের এই প্রশান্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তে সচেষ্ট। এর মধ্যেই আমাদের বাঁচতে হবে; সংগঠিত হয়ে শত্রুকে আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ফেরারী জীবনের এত দুঃখ-কষ্ট, এত অসুবিধা সহ্য করতে পারবে কি না একান্তভাবে ভেবে দেখ—নিজের অন্তরের সাথে এখনই খুব ভালোভাবে বোঝাপড়া করে নাও। পারবে রাতের পর রাত অনিদ্রায় কাটাতে? বিশ্রাম ছাড়া আহার্য ছাড়া পারবে কি সুদীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করতে?—পারবে কি মিলিটারীর রাইফেল উপেক্ষা করতে বা ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে? এখনও সময় আছে; এখনো বাড়ি ফিরে যেতে পারো........যদি কোনমতেই বাড়ি ফিরে যাবে না—এই প্রতিজ্ঞায় মনস্থির করে এসে থাকো, তবে বলছি—বৈপ্লবিক আদেশ অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন। —তোমার মনঃপূত নাও হতে পারে—। তবু দ্বিধাহীনচিত্তে নিষ্ঠার সঙ্গে সে আদেশ পালন করতে পারবে বলে তোমার মনে যদি স্থির ধারণা থাকে, তবেই তুমি এই রিভলভার নাও—আমাদের সাথে থাকো। এক্ষেত্রে আমি এবং আমরা তোমার দায়িত্ব লেবো। বিপ্লবের যজ্ঞে আমরা সবাই আত্মাহুতি দেবো। ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার বৈপ্লবিক দায়িত্ব আমার ওপরে এসে পড়েছে। আমি সেই দায়িত্ব উপেক্ষা করতে পারি নি। তাই—নিজের হাতে প্রীতিলতাকে রণসাজে সাজিয়ে দিয়েছি—যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করার জন্য এগিয়ে দিয়েছি। আদেশ যতই কঠিন হোক না কেন, বৈপ্লবিক দায়িত্ব পালনে প্রীতিলতাকে সেই আদেশই আমি দিয়েছি। বিপ্লবের কর্তব্যে সময়মত তোমার ওপরও আমাকে কঠোর আদেশ দিতে হবে। তোমাকেও সেই আদেশ পালন করতে হবে। তুমি একজন ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির প্রথম শ্রেণীর নির্ভীক সৈনিক।.........কল্পনা! খুব ধীর-স্থির-

ভেবে চিন্তা করে বল—পারবে আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিপ্লবের এই দুর্গম পথে চলতে?...... ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে পাড়ি দিতে? পারবে মরুপথের অসহ্য অসহনীয় উত্তাপ সহ্য করতে?"

মাস্টারদার কথা কল্পনার অন্তর স্পর্শ করছিল—মনে ফাঁকি রেখে ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দিয়ে মাস্টারদার নেতৃত্বে সৈনিক হওয়া যায় না তা সে আগেও বুঝেছিল আর আজও তা নির্ভুলভাবে বুঝতে পারল। খুব সংযতভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে সে মাস্টারদাকে জানালো—"মাস্টারদা! আমার মনের কথা আমি যা মুখে বলবো তার সত্যতা আমার অন্তরকে কতখানি প্রভাবান্বিত বা আচ্ছন্ন করেছে তা কিন্তু আপনাকেই বুঝে নিতে হবে। বহুদিন ধরে এই দিনটির জন্যই অপেক্ষা করেছিলাম। আমি সম্পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই বাড়ি ছেড়ে এসেছি। প্রীতিদি বিপ্লবের প্রজ্বলিত মশাল হাতে এগিয়ে গেছে। আমি সেই মশাল তুলে নিয়ে আপনার নির্দেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে মরব—ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমার হাতের রিভলভার অবসর গ্রহণ করবে না!......"

কল্পনা সম্বন্ধে মাস্টারদা যা শুনেছিলেন বা ধারণা করেছিলেন তার যে ব্যতিক্রম ঘটবে না তা তিনি জানতেন। তবু আনুষ্ঠানিকভাবে কল্পনার মুখ থেকে এই বৈপ্লবিক স্বীকৃতিটুকু আদায় করা তাঁর প্রয়োজন ছিল। মাস্টারদার এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে জানার সুযোগ আমার আরো অনেক হয়েছে। প্রত্যেক সদস্যের ক্ষেত্রে আমিও এই পদ্ধতি অনুসরণ করতাম—মৌখিক প্রতিজ্ঞার মূল্যও অনেকখানি। তবে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা আদায় করার পূর্বে প্রত্যেক সদস্যকে Subjectively তৈরি করার অপরিহার্য কর্তব্য ভুললে যে চলবে না তার উপলব্ধি আমাদের মধ্যে ছিল।

বিপ্লবীদের চারিত্রিক গঠন যদি আমরা কেবল তাদের বোমা পিস্তল ও রিভলভারের মধ্যে দেখি তবে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। বিপ্লবের মরুপথে অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যেও শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে সজাগ থেকে দিন কাটানো খুবই কঠিন। সেই যুগে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে যাবো, এই ছিলো আমাদের একমাত্র চিন্তা। বিভিন্ন ধরণের বৈপ্লবিক বই পড়া বা মার্কসীয় শাস্ত্র অধ্যয়নের কোনো ব্যবস্থাই তখন ছিল না। এইরূপ শুষ্ক বেকার ফেরারী জীবনের মধ্যেও রস ছিলো। মরুভূমিতে যেমন মরূদ্যান ক্লিষ্ট, তৃষিত প্রাণে রসসঞ্চার করে, সেরূপ ফেরারী জীবনেও বিপ্লবীরা গান, কবিতা, আবৃত্তির মধ্যে রস উপভোগ করতেন।

১৯৬১ সালে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ সম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে যখন লিখছিলাম তখন আমি কল্পনার কাছে তার ফেরারী জীবন ও মাস্টারদার সম্বন্ধে জানতে চাই। আবার দু বছর আগে সাপ্তাহিক বসুমতীতে জলধাট যুদ্ধের বিবরণ ও প্রীতিলতা সম্বন্ধে লেখার সময়েও মাস্টারদার "চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের তথ্য সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে কল্পনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তার কাছ থেকে মাস্টারদার জীবনের ছোট-খাটো ঘটনা সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছিলাম তা তখন লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম।

কল্পনার মুখে যেভাবে শুনেছিলাম তা তার ভাষায় হুবহু দিতে না পারলেও, মোটামুটি প্রায় ঠিকভাবে বলতে পারবো বলেই আমার বিশ্বাস।

মাস্টারদা গান ভালবাসতেন। নিজে গান গাইতেন—অবশ্য আসলে গান কখনো করেন নি—নিজেদের মধ্যেও আপনমনে তাঁকে গান করতে শুনেছি। মাস্টারদা কল্পনাকে অনেক সময়ে গান করতে বলতেন। সব বাড়িতে উচ্চ-কণ্ঠে গান করা সম্ভব ছিলো না। তাই নিম্নকণ্ঠে কল্পনা মাঝে মাঝে এই গানটি গাইতো—

"হে ক্ষণিকের অতিথি
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া......"

কল্পনা আমাকে বলার সময়েই এই পঙক্তিটি বলেছিলো, আমি আমার খাতায় লিখে রেখেছি। গানের সব কলিগুলো তুলে দিয়ে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। কল্পনা আরও একটি গানের ক'টি কলি মুখে মুখে বলেছিলো—

"অতিথি এসেছে দ্বারে
ছিলো সে নদীর পারে........"

কল্পনা যখন এই দু'টি গান গাইতো, তখন মাস্টারদা নিবিষ্ট মনে শুনতেন। কোনো একদিন খোলা মাঠে বা কোনো এক পুকুর পাড়ে মাস্টারদা, কল্পনা ও আর কয়েক-জন সাথী উপস্থিত ছিলো, তখন মাস্টারদা প্রীতিলতা যে একটি গান করতো—"ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলো, পথ ভুলে মরো......" সেই গানটি জানে কি না কল্পনাকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং জানলে গাইতে বললেন। কল্পনা মাস্টারদাকে জানালো : "প্রীতির মুখে এই গানটি শুনেছি। কিন্তু পদগুলো সব আমার জানা নেই। প্রীতিদি আর একটি গান গাইতেন, সে গানটি আমি জানি—আমার খুব ভালো লাগতো। যারা উপস্থিত ছিলো সবাই আগ্রহ প্রকাশ করলো সেই গানটি শোনার জন্য। মাস্টারদা কল্পনাকে সেই গানটি গাইতে বললেন। কল্পনা গাইলো—

—"ওরে দেবতা আমার পাষাণ দেবতা,
হৃদি-মন্দিরে বসি, আমি তোমার চরণে উজাড়
করিনু, যতেক বাসনারাশি......।"

এই পঙক্তি কটিও কল্পনা আমাকে বলেছিলো।

প্রীতিলতার অভাব সবাই অনুভব করতো। কল্পনার কণ্ঠে প্রীতিলতার এই প্রিয় গানটি যখন গীত হলো তখন স্বভাবতই সবাই ক্ষণিকের জন্য হলেও অভিভূত হয়ে পড়েছিলো।

তারকেশ্বর দস্তিদার—(ফুটুদার) কয়েকটি গান খুব ভালো লাগতো এবং সময় ও সুযোগ পেলে কল্পনাকে অনুরোধ করত গান গাইতে। কল্পনা গাইতো :

"হে ক্ষণিকের অতিথি......"

বিপ্লবীরা ভাবপ্রবণ—ভাবাবেগ তাদের থাকবেই। তারকেশ্বর দস্তিদারের ভগবানের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিলো। ফাঁসির পূর্বে গোপন পথে তার শেষ বাণী সে বিপ্লবী সাথীদের কাছে পাঠিয়েছিলো—তা আমি যথাস্থানে প্রকাশ করবো। তারকেশ্বরের প্রথম থেকেই এবং ফেরারী জীবনেও ভগবানের প্রতি এই ভক্তি নানাভাবে প্রকাশ পেতো। সে সুযোগ পেলেই গানটি কল্পনাকে গাইতে বলতো—

"প্রভু দাঁড়াও তোমায় দেখি........"

অন্তরের দরদ দিয়ে এই গানটি গেয়ে কল্পনা নিজেও অভিভূত হোতো। [ক্রমশ]

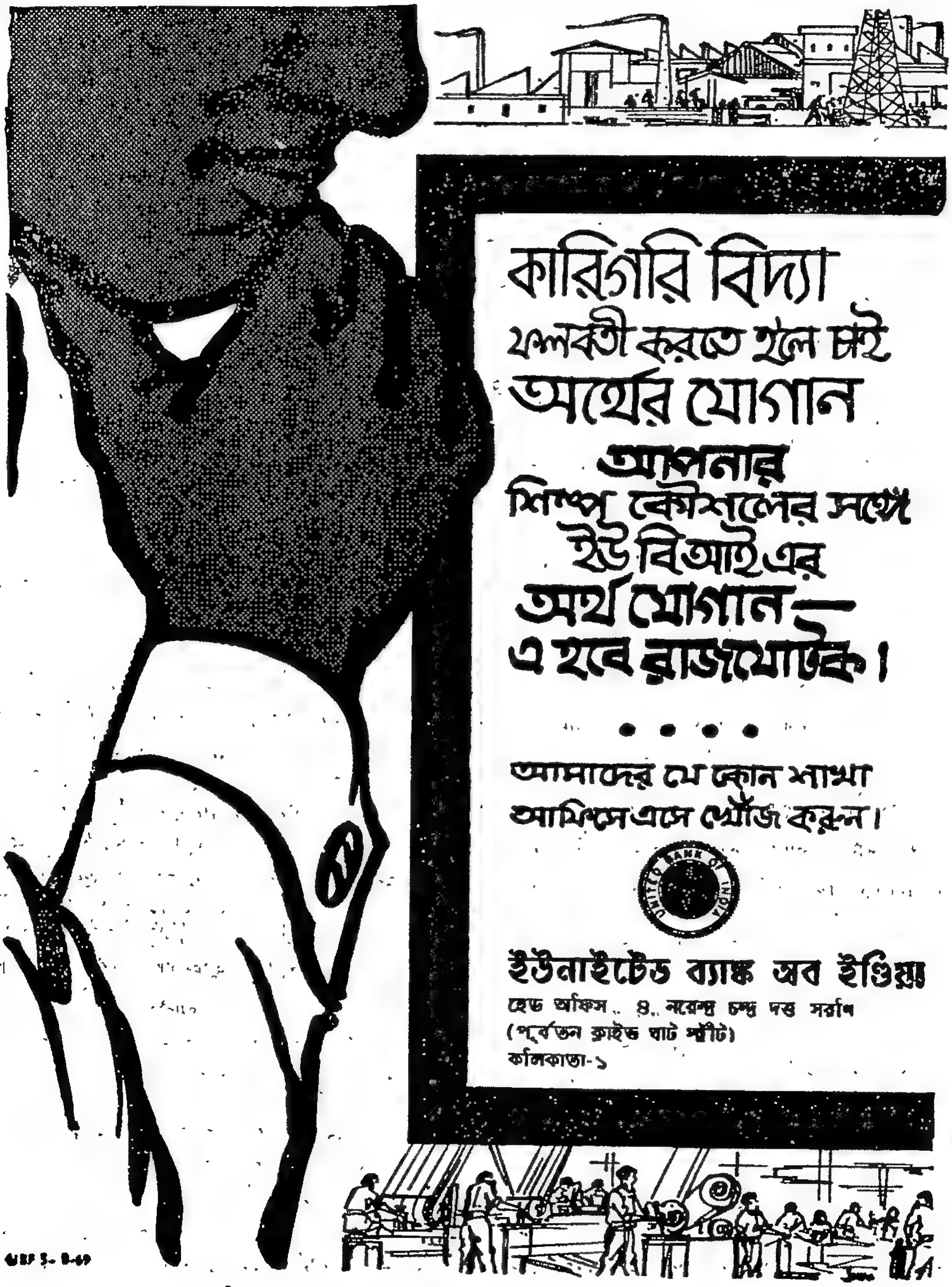

পশ্চিমবঙ্গে ১১৫টিরও অধিক শাখা আছে

[পূর্বানুবৃত্তি]

মুকুন্দের কথা বোধহয় হাবুর মনে ধরল। কথা বললে না—তবে নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিল।

কিন্তু মহেশ বললে, "ভলু মাঝির মোরা কি করতে পারি—সে মোদের চরের বাইরে। থানা তার পিছনে আছে। দারুগা তার সহায়।"

"রাখো তোমার থনা আর দারুগা।" মুকুন্দ গর গর করে উঠল, "হেই দেখে এলম—সাহেব-কে-সাহেব মেরে ভুত করে দিল শহরে। মোরা ভেড়ী, মোরা কুত্তা, মোরা মানুষ লয়। না হলে মোর বাপের বিচর হাতে হাতে লিতম। মোর বৌয়ের বিচার অন্য রকম হত। হাবুর মামুর বিচারও বাদ যেতনি ছোট মন্ডল।"

হাবুর মুখ-চোখ গরম হয়ে উঠল। মহেশের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তাজা নবীন রক্তের উচ্ছ্বাস! তার সামনে মহেশ মন্ডল চুপ করে রইল। মুকুন্দ যে বিচারের কথা বলে—সে বিচারের শক্তি কই এ চরে—সামর্থ্য কোথায়! ও যোয়ান পাগলের কানা পাগলামি!

কিন্তু সেই পাগলকে সমর্থনের জন্য হাবুর মন হঠাৎ যেন সমস্ত অন্তর দিয়ে এগিয়ে এল। সেই শহর—আর শহর থেকে ফেরার কথা মনে পড়ে হাবুর। মুকুন্দ বোধ করি তখন একটা কথাও বলে নি। সারাক্ষণ সে গুম্ হয়ে ছিল। কিন্তু মনে মনে এই সব রক্ত-পাগলকরা কথা যে গুমরে মরেছে—হাবু তার আঁচটুকুও পায় নি। এখন যেন সেই গুমরে মরা বুকের ভেতর থেকে কথার জমাট তরঙ্গ গলে গলে উছলে উছলে বেরিয়ে আসছে। সে উজানে হাবু ভেসে গেল।

হাবু আস্তে আস্তে বলল, "তোমার বিচার মাথায় থাক ছোট মন্ডল। বিচার হয়তো তুমি ঠিকই করেছ খানিকটা—কিন্তু শেষ বিচার এখনও বাকি থেকে গেছে। মুকুন্দ কথাটা মিছা বলে নি।"

মুকুন্দের কথাগুলো যেন শেষ বিচারের নতুন সীমানা—নতুন দিগন্ত মেলে দিলে। সেই দিকে চেয়ে মহেশ যেন একটু হকচকিয়ে গেছে। তার একান্ত বশংবদ এই দুই যোয়ান ছোকরার কথায় ব্যথাও পেয়েছে। হাবুর দিকে চেয়ে বললে, "তুইও বলছিস এ কথা!"

হাবুর মা সাগরখুড়ি বললে, "শহর থেকে অরা আগুন এনেছে ছোট মন্ডল—ও চরসুদ্ধ পুড়াবে।"

মুকুন্দ হাতের ভাঁজকরা কাগজটা দেখিয়ে বললে, "এ কাগজ রইল মোর কাছে এখন ছোট মন্ডল। তোমার বিচার মাথায় জমা রাখলম। সময় যদি তেমন আসে—টিপ দিব। মরে গেলেও মোর হাতের টিপ করে লিও ছোট মন্ডল। তার ছাড়পত্র খালাস দিয়ে যাব।"

বলতে বলতে মুকুন্দ গোঁ ভরে উঠে চলে গেল। সঙ্গে হাবু।

সাগরখুড়ি চোখ ঘুরিয়ে বললে, "এই হল যৈবনের টান!"

মহেশ কিছুই বলল না। ওই ছোকরা দুটোকে সে জানে। অকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে নীরবে তামাক টানতে লাগল।

মহকুমা, থানা-চৌকি, ইউনিয়ান, গ্রাম—যেন বিদ্যুচ্চকিত। হঠাৎ শাদা পোষাকের পুলিশ কর্মচারীদের ঘন ঘন থানায় আনাগোনা, প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ-বাবুকে নিয়ে এদিক-ওদিক সফর—সেপাই-সন্ত্রীর কুচকাওয়াজ, বড় দারোগার তর্জন-গর্জন—সব মিলে নতুন একটা সাড়া পড়ে গেল। অসহযোগ আন্দোলন নিষিদ্ধ—অবদমিত, আগন্তুক ভলান্টিয়ারকুল নির্মূল। তাদের অনুপ্রবেশের ওপর কড়া নজর তো ছিলই—তার ওপরে যত ফেরিঘাট ছিল, বসে গেল পুলিশ চৌকি। নদী-নালার দেশ—ফেরিঘাট যাতায়াতের প্রধান ধমনী। তার এপারে-ওপারে বসলো তল্লাসী ঘাঁটি। সারা এলাকা সন্ত্রস্ত সজাগ হয়ে উঠল।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন থানা থেকে সেপাই-সান্ত্রী এসে সানো চৌধুরীর সাজানো তাঁতঘর ভেঙে-চুরে লণ্ডভণ্ড তছনছ করে দিয়ে গেল। বিজয় অধিকারী ফিরে গিয়েই তাঁতী আর তুলো পাঠিয়েছিল দুই-ই। তুলোগুলো হাওয়ায় উড়ে উড়ে যেন খেলা সুরু করে দিলে আর তাঁতী বসে রইল ডাক্তারখানার দাওয়ায় বিরস মুখে।

ক্রুদ্ধ সানো চৌধুরী চেঁচাতে

আসল, "আমি মামলা করবো—আমি ক্ষতিপূরণ আদায় করবো।"

ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠল।

"তুমি হাসছো ডাক্তার!" ক্ষ্যাপা গলায় সানো চৌধুরী বললে, "এ কী ঘোর অন্যায়! দেখ তুমি—ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারি কি না।"

"এই হলো খাঁটি স্বদেশী জোতদার জমিদারের কথা।" ডাক্তার মন্তব্য করলে, "যাও আদালতে।"

"আলবাৎ যাবো।" সানো চৌধুরী বললে, "এ আমার ব্যবসা—খরো, আমার রুজি।"

"জরুর।" ডাক্তার কটাক্ষ করে বললে, "তবে কি জানো, ওরা বোধ করি রুজি-রোজগার ব্যবসার খোঁজ-খবর করেই তোমার তাঁতঘরে হানা দিয়ে থাকবে সানো কত্তা। তার দুদুটো ম্যাজিস্ট্রেট ঘায়েল করে দিলে বছর পেরোতে-না-পেরোতে, আর তারা তোমার তাঁতঘর ভাঙবে না।"

সানো চৌধুরী ডাক্তারের কথার জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল। তৃতীয় আর একটি লোক সড়ক থেকেই স-কলরবে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

"নমস্কার চৌধুরীমশাই। নমস্কার ডাক্তারবাবু।"...

ডি আই-বি পরাণ চাটুজ্যে। কালো-কালো গোলগাল মানুষটি, আচার-আচরণে খাঁটি ভদ্রলোক। হোই-হাই করে থাকতে ভালোবাসে—চেঁচিয়ে ছাড়া কথা বলে না। বোঝা দুষ্কর—এ হেন কাছাখোলা লোক গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করে কি করে। কদাচিৎ কখনো আসে থানায়—এলে ডাক্তারখানায় একবার আড্ডা না দিয়ে যায় না।

দাওয়ায় উঠে নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসে বললে, "তারপর? মঙ্গল কুশলের কাড়া-খাঁটি ঈশ্বরের ইচ্ছায় আশা করি ভালই চলছে?"

"আর মশায়!"—সক্ষোভে সানো চৌধুরী বলে উঠল, "আপনাদের দৌরাত্ম্যে আমাদের রুজি-রোজগার-ব্যবসাপত্তর সব মাটি।"

"আপনার রুজি-রোজগার-ব্যবসা!"

সানো চৌধুরী তার তাঁতঘরের দুর্দশার কথা বললে।

শুনে পরাণ চাটুজ্যে বললে, "এ ভারি অন্যায়। ব্যবসার অধিকার নিশ্চয়ই আপনার আছে। থানা অফিসার এটা কি করলে?" তারপর গলা নামিয়ে বললে, "আপনাদের থানায় একটা খাসী আছে—বুঝলেন। পাঁঠাও নয়। —না হলে এমন শান্ত এলাকার লোকগুলোকে না-হক ক্ষেপিয়ে তোলে।"

সানো চৌধুরী বললে, "বামুন না ছাই। ব্যাটা কসাই; গুণ্ডা। মাঝে মাঝে চর থেকে বেচারা চাষীগুলোকে ধরে এনে আগাধুম পিটিয়ে যাচ্ছে মশাই।"

"হ্যাঃ হ্যাঃ—বললুম যে।" খুব এক-চোট নিজের মনেই হেসে নিলে। তার-পর ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে, "ছেলের চিঠিপত্র আসছে?—না একদম চুপ? বুঝলেন—আমরা বাপেরাই শুধু হোঁদিয়ে মরি।"

উপায় নেই—ডাক্তারকে কথা বলতে হয়। এ সময়ে লোকটা যে হঠাৎ অকারণে এসে উদয় হয়, নি—ডাক্তার তা বোঝে। কবে সেই ছেলের একটু খবর এনে দিয়েছিল ভেতর থেকে—সেই সুবাদে ভদ্রতা বজায় রাখতে হয়। তবু কথাগুলো সোজা বলতে গিয়ে যেন বেঁকে যায়। বললে, "চিঠি এলে সে তো আপনারাই আগে জানতে পারবেন সেনসর থেকে।"

"ও, হো-হো!" পরাণ চাটুজ্যের আবার অট্টহাসি। হাসতে হাসতে বললে, "এক হাত নিয়েছেন।"

ডাক্তার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললে, "তবে যদি ভেবে থাকেন—অন্য পথে চিঠিপত্তর চালান-টালান আসছে।..."

"আরে না না—তা বলছি নে।" পরাণ চাটুজ্যে জিভ কেটে গলা নামিয়ে বললে, "ভাল-মন্দের কথা জিজ্ঞেস কর-ছিলুম।" একটু থেমে আবার বললে, "জানি তো, চিঠিপত্তর আসে—আসছে। আপনার ছেলেটি ওখানে সেলুলার জেলে গিয়ে এখনও ঠিক পেকে ওঠে নি বোধ হয়।"

ডাক্তার গর্ গর্ করে বললে, "না—সেদ্ধ হচ্ছে।"

"আপনি চটে আছেন।—চৌধুরী মশাই তো পয়লাই এক চোট নিয়ে নিয়েছেন।" পরাণ চাটুজ্যে হাসতে হাসতে বললে, "কদ্দিন পরে এলুম—ভেবলুম, সন্ধ্যেটা দিব্যি আড্ডায় কাটবে।"

আড্ডাবাজ মানুষ, আমুদে মানুষ বলে স্থানীয় বাবু-ভায়াদের মধ্যেও তার আনাগোনা আছে। এমনিতে সর-কারী অফিসার মহলে খুবই জনপ্রিয়। সব কজনাই বাইরের মানুষ—পড়ে আছে পাণ্ডববর্জিত দেশে। পরাণ চাটুজ্যে এলে ওরা যেন প্রাণ পায়। তা সরকারী অফিসও কম নেই। সেই বাজার ঘেঁষে বেশ ক'টা অফিস—রেজেস্টারী অফিস, ঋণ-সালিশী বোর্ড, খাসমহাল অফিস, পোস্ট অফিস। প্রধানত আড্ডাটা সেই-দিকে জমে—দু'-চারজন প্রবীণ জোত-দারও জুটে যায়। গান-বাজনার জলসাও বসে। গাইয়ে-বাজিয়ে বড় একটা কেউ নেই—তারস্বরে তবু গান ধরে—

হরে মুরারে......

কেমন করে না-জানি—ও গানটা সবাই গাইতে পারে।

সে আড্ডা ছেড়ে আজ ছিটকে এসে-ছিল এই দিকে।

পরাণ চাটুজ্যে বললে, "প্রায় বছর-খানেক আসি নি—এর মধ্যে দেখছি অনেক কিছু বদলে গেছে। আপনারাও—" বলে আবার হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল।

সানো চৌধুরী গর্ গর্ করে বললে, "আপনারাই বদলে দিয়েছেন মশাই।"

"বিলক্ষণ।" পরাণ চাটুজ্যের মুখ থেকে কিন্তু হাসি মিলালো না। বললে, "নইলে তখন ফেরিঘাটে আপনাকে দেখলুম। আপনি যেন কাকে খুঁজছেন। খুব ব্যস্ত। পেছন থেকে কত ডাকাডাকি করলুম—ভাবলুম, যদি একটু উপকার করতে পারি। এই মাথামোটা দারোগার নন্দীভৃঙ্গীরা আপনার কোনো লোককে—বুঝি বা আটকেছে-টাটকেছে। তা এত ডাকলুম—আপনি কানেই নিলেন না।"

সানো চৌধুরী অবাক হয়ে বললে, "আপনি ডেকেছিলেন!"

"বিলক্ষণ।"

ডাক্তার মুচকে হেসে বললে, "ওই যে-ছোকরা আপনাদের ম্যাজিস্ট্রেট মেরেছে—তাকে ও রিসিভ করতে গিয়ে-ছিল। শোনা যাচ্ছে সে এদিক পানেই নাকি এসেছে।"

সুরু হয়ে গেল আবার পরাণ চাটুজ্যের অট্টহাস। কিন্তু সে দস্তুর হাসি বেশিক্ষণ রইল না—ডাক্তারের আপাত রসিকতাটা বোধকরি বা তার মর্মভেদ করল। বললে, "এতটা সন্দেহ আমাকে করবেন না। ফেরিঘাটে দেখেছিলুম—তাই বলছি।"

সানো চৌধুরী বললে, "এক বস্তা তুলো চালান এসেছিল মশাই। তার মধ্যে মসার পিস্তল ছিল না। ওই দেখুন আপনার থানার কীর্তি—মাঠময় সে তুলো উড়ছে। আমি মামলা করবো—ক্ষতি-পূরণ আদায় করবো।"

পরাণ চাটুজ্যে উসকে দিয়ে বললে, "করুন। যতটা পারি—আমি সাহায্য করবো। আপনাদের মত লোককে ক্ষেপিয়ে এ সরকার দাঁড়াবে কোথায়? করুন

রাণীধূপ
কাকার প্রডাক্টস

আপনি মামলা।” বলে আবার গাল পাড়লে মাথামোটা থ না অফিসারের উদ্দেশ্যে।

ডাক্তার ফস্ করে বলে বসলো, “তা যে জন্যে আসা—তার সন্ধান-টন্ধান পেলেন কিছু?”

একটু থতোমতো খেয়ে লোকটার গোলগাল হাঁড়ির মতো মুখটা আবার হাসিতে ভরে উঠল। বললে, “কোথায় কি মশাই, জেলা থেকে মহকুমা—মহকুমা থেকে থানা, বন-বাদাড় চুঁড়ে বেড়াচ্ছি! কোন হদিস পাচ্ছি না।” একটু থেমে আবার ভঙ্গী করে জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, “আর ধন্য আপনাদের জেলা মশাই—পায়ে দণ্ডবৎ। এই পাহাড়ী খাদ, এই অতিকায় শালের জঙ্গলে, নদী-নালার তো লেখা-জোখা নেই। তারপর এই সাগরতট—বাদা...জলপাই জঙ্গল! এর কোনখানটায় খুঁজি বলুন তো। সরকারী ঘানিতে জোতা আছি মশাই—ঘুরে ঘুরে কর্তব্য করে যাচ্ছি।”

তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে বললে, “তারপর.. বুঝলেন না, বুনো-বাদার চাষাভুষোরও আজকাল চোখ খুলে গেছে মশায়। সরকার যত কসে রটায় ওদের 'ডাকাত' বলে—ওরা বলে, 'স্বদেশী ডাকাত।' ব্যস্—বুঝুন, কোথাও কোনো চাষার ঘরে যদি ওনারা ঘাপ্‌টি মেরে থাকেন—ধরে কোন্ শা।” বলে প্রবল বেগে আবার হেসে উঠল। হাসির বেগে ভুঁড়িও প্রবল বেগে আন্দোলিত হতে লাগল।

“বুঝেছি।” সানো চৌধুরী বলে উঠল, “আমার চরের চাষীদের সন্দেহ করছেন।”

“শুধু আপনাদের চর নয় মশায়, এ যে তমাম জেলা।” পরাণ চাটুজ্যে ঘনিষ্ঠভাবে বললে, “শুনেছি—অসহ-যোগীরা এবার ওদের ভেতর থেকে ভলান্টিয়ার বানাচ্ছে।”

সানো চৌধুরী আবার কি বলতে যাচ্ছিল—ডাক্তার চোখ টিপে দিলে।

পরাণ চাটুজ্যে একাই বক্ বক্ করতে লাগল। এবং শেষ পর্যন্ত কথা বলতে বলতে যেন হাঁপিয়ে উঠল। কথা একটু বেশিই বলে। কিছু আর বলার না থাকলেও খুঁচিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলে কথার পর কথা বাড়াতে জানে। কিন্তু আজ ওর উপস্থিতি কারুরই ভালো লাগছিল না—না সানো চৌধুরী, না ডাক্তার।

কিন্তু পরাণ চাটুজ্যে চড়াও হয়ে চা চেয়েও খেতে জানে। বললে, “ও ডাক্তারবাবু, আপনার একটা স্টোভ ছিল না ডাক্তারখানায়? চা-টা হোক একটু।”

ডাক্তার গাঁই-গুঁই করে বললে, “চিনি নেই।”

পরাণ চাটুজ্যে দমলো না। বরং কথাটা লুফে নিয়ে বললে, “ভালই হলো—চিনি আজ এক বছর ছেড়েছি। ডায়াবেটিস। হোক—একটু চা হোক। কত দিন পরে এলাম।”

উপায় নেই—স্টোভ ধরিয়ে চা খাওয়াতে হলো।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে পরাণ চাটুজ্যে একটা তৃপ্তির শব্দ করে বললে, “যাক গে সব রাজনীতির কথা। দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলুন ভায়া।” সানো চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললে, “আপনার ছেলের খবর কি? এম· এসসি পড়তে গেল?”

“হুঁ।” সানো চৌধুরী বললে, “হিজলী জেলে।”

“বলেন কী! জানতুম না তো? সে আবার কবে ধরা পড়ল?” পরাণ চাটুজ্যের গলায় নিরীহ বিস্ময়।

“মেদিনীপুর কলেজে বিজ্ঞান পড়ে—ডাক্তারের ছেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অতএব তাকে আপনারা বাইরে রাখবেন কেন?”

“হুঁ।” বলে একটু থেমে ম্রিয়মান গলায় পরাণ চাটুজ্যে জিজ্ঞেস করলে, “আর ছোটটি? সেটিও টাউনে পড়ত না?”

“পড়ত। সে-ও বাইরে নেই।” সানো চৌধুরী ধীর গলায় বললে, “সে বোধকরি দাদার পথের সন্ধান করতে না পেরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অসহযোগ আন্দোলনে।”

চায়ের কাপ ঘিরে পরাণ চাটুজ্যে যে আশা করেছিল—জমল না। লোকটা যেন এখন উঠতে পারলে বাঁচে। কোনো-রকমে চায়ের কাপটা শেষ করে উঠে পড়ল। যাওয়ার সময় বললে, “কাল ভোরেই চলে যাচ্ছি—ছুটতে হবে অন্য দিকে।” তারপর একটু থমকে সানো চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললে, “আপনার ছেলেদের নাম দুটো যদি বলেন—যদি কিছু করতে পারি”—

সানো চৌধুরী ধীর সংযত গলায় শুধু বললে, “থাক পরাণবাবু। তারা তাদের পথ বেছে নিয়েছে। একদিন বুক কেঁপে উঠেছিল ঠিক—...যাক সে কথা।”

সানো চৌধুরী সহসা থেমে গেল। মনে হলো—তার পাথর বুকের কথাটা এ লোকটার কাছে বলে লাভ কি!

হঠাৎ এই থেমে যাওয়াটুকু কিন্তু পরাণ চাটুজ্যের খুদে খুদে চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না যাই হোক তার একটা মানে করে নিলে নিজের মনে। তার পর বিরস গলায় ছোট্ট করে বললে—“আচ্ছা চলি তাহলে। নমস্কার।”

দুটো নমস্কার ঠুকে পরাণ চাটুজ্যে চলে গেল।

ডাক্তার গর্ গর্ করে বললে, “খবর জোগাড় করতে এসেছিল।”

“হুঁ।” সানো চৌধুরীর চোখে রহস্যময় জিজ্ঞাসা। আস্তে আস্তে বললে, “সবাই বলছে—ছোকরা এই দিকেই এসেছে।”

“ওদের অনুমান।”—

“না ডাক্তার, মনে হচ্ছে—চরের ওপর আবার হামলা হবে।”

অনুমান সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক—ও পক্ষের চেষ্টার ত্রুটি নেই। পরাণ চাটুজ্যে ডাক্তারখানা থেকে বিদায়

সদ্য প্রকাশিত হইল!
বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ
সায়ন মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত
বেদান্ত-গ্রন্থ
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ
বেদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ
অনুবাদক
পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ
১ম খণ্ড মূল্য চার টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা ১২

নিয়ে গেল দিনান্তের মুখ-আঁধারিতে আর নিশান্তের মুখ-আঁধারিতে। থানা-তল্লাসীর জন্যে থানা থেকে সেপাই-সান্ত্রী গিয়ে ঘিরে ফেললে সানো চৌধুরী আর জগৎ ডাক্তারের বাড়ি।

ঘর থেকে বার হতে দিলে না কারুকে।

সানো চৌধুরীর বাড়ির ঝি কাঁখে কলসী নিয়ে বোধ করি পুকুরঘাটে জল আনতে যাচ্ছিল—একজন সেপাই তাকে টেনে নিয়ে হাজির করে দিলে বড় দারোগার কাছে।

বড় দারোগা হুকুম দিলে, "হারাম-জাদীকে তল্লাসী কর ভালো করে—চিঠি-চাপাটি কোথায় গুঁজে নিয়ে যাচ্ছে।" চোখের ইসারা করে দিলে।

মেয়েটা প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলো। একজন সেপাই তাকে টেনে নিয়ে চললো একটা ঘন ঝোপের দিকে।

ওদিকে ডাক্তারের বাড়িতে তখন তুলকালাম কান্ড। তৈজসপত্র উল্টে-পাল্টে, বালিস-বিছানা ছিঁড়ে-ফেঁড়ে, তোরঙ্গ স্যুটকেস খুলে তন্ন তন্ন করে তল্লাস চলছে। ফুলের মালা ঝোলানো নিবারণের ছবিটকে টেনে নামিয়ে আছড়ে ফেলেছে মেঝেতে। সামনে জগৎ ডাক্তার চেয়ারে বসে আছে পাথরের মত।

নজর ওদের বিশেষ করে কাগজ-পত্রের দিকে। একটা বাজে কাগজও বাদ গেল না।

পেয়ে গেল। মাধবীর ঘরে। তার তোরঙ্গের ভেতরে এক তাড়া চিঠি। সযত্নে সুতোয় বাঁধা।

কৌতূহলী সাব-ইন্সপেক্টার বাঁধন খুলে দু-একটা চিঠি উল্টে-পাল্টে দেখলে। সাব-ইন্সপেক্টার ছোকরা মানুষ—একটু মিচকে হাসলে রোমান্সের গন্ধে। তাকালো চোখ তুলে মাধবীর দিকে। মুখ তার পাংশু হয়ে গেছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে একটু একটু।

সাব-ইন্সপেক্টার হাসি হাসি মুখে অর্থপূর্ণ ভাবে বললে, "বিমলবাবুর চিঠি দেখছি।" গন্ধ শুঁকলো। না, এসেন্স নেই—শুধু মেয়েলী বাক্সের একটা গন্ধ লেগে আছে।

মাধবী নীরব।

চিঠি দেখতে দেখতে সাব-ইন্সপেক্টারের মুখের হাসি আবার মিলিয়ে গেল। বলে উঠল, "আরে! নিবারণবাবুর চিঠিও আছে দেখছি।"

বলতে বলতে চিঠির তাড়া আবার বেঁধে পকেটে ভরে নিলে।

মাধবী হঠাৎ অস্বাভাবিক জোরে চিৎকার করে উঠল, "ও চিঠি আপনি কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবেন না।"

সাব-ইন্সপেক্টার তেমনি আস্তে শান্ত গলায় বললে, "গোলমাল করে লাভ নেই। চিঠিগুলো আপনি পরে পাবেন।"

ফ্যাকাসে মুখে চেয়ে রইল মাধবী। চোখের কোণে জল জমেছিল অনেক-ক্ষণ—একটা রূঢ় দমকা হাওয়ায় যেন ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল। [ক্রমশ]

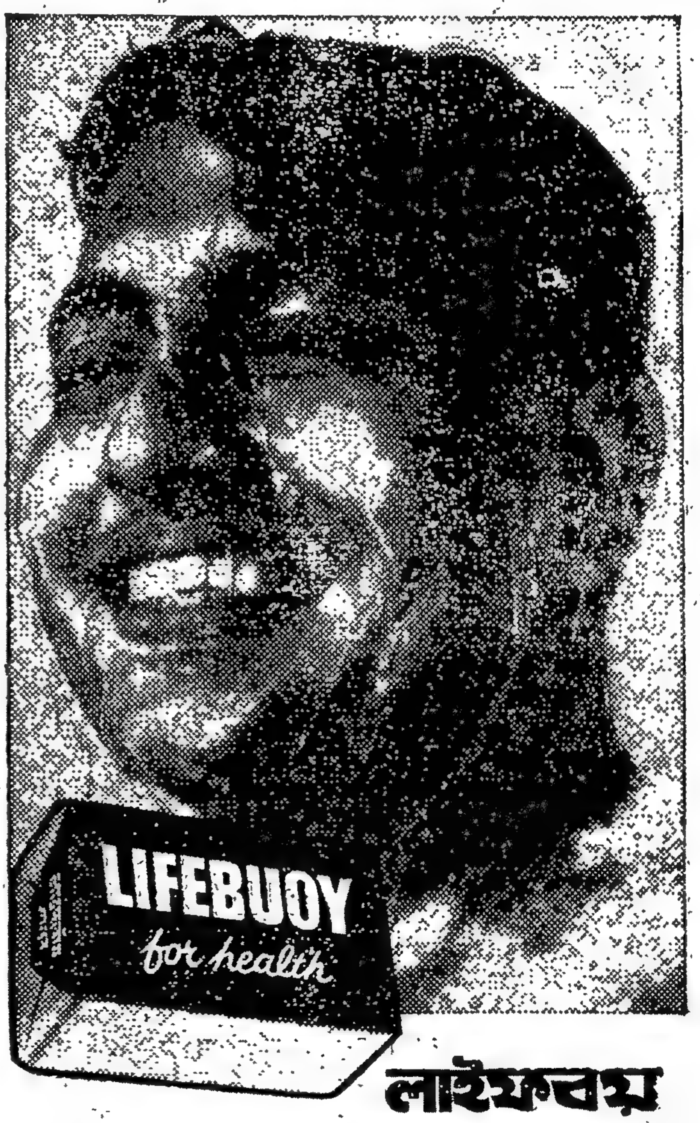

লাইফবয়

যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন।
এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন তা।
সাবানের সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবয়ে,
তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে।

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

বরাতের রাত

খায়রুল বাসার

পরবের নাম শবে বরাত। বাংলায় বরাতের রাত। বরাত অর্থে ভাগ্য। সুতরাং মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে এই রাতের যোগাযোগের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। আসলে সৃষ্টির আদিতে স্বর্গীয় দূতেরা আল্লার আদেশে মানুষের ভাগ্যলিপি প্রণয়নের দুরূহ কর্তব্য সম্পাদন করে এই রাতে বিশ্রাম লাভ করেছিলেন। ইমানদার মানুষের পক্ষে কিন্তু এ রাতে বিশ্রাম-সুখ অবাঞ্ছনীয়। এ রাত জেগে থাকার রাত। জেগে থাকো। আল্লার এবাদত কর। পারলে সারা রাত। কেন না বিনিময়ে প্রাপ্য, সৃষ্টির সংহার পর্যন্ত এবাদতের অপরিমেয় পুণ্য।

এ রাতের তাৎপর্য তাই মুসলমানের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। নিষ্ঠাবান মুসলমান পুরুষ, রমণী শবে বরাতের সন্ধ্যায় স্নান সেরে নামাজে বসে। চন্দ্রালোকিত রাত্রি যামে যামে বৃদ্ধি পেয়ে গাঢ় হয়, প্রশান্ত হয়। এবাদতের নিষ্ঠাও গাঢ়তর হতে থাকে। নিত্যদিনের অভ্যস্ত বিশ্রাম নামাজের পাটির তলায় চাপা পড়ে যায়। এ যুগের সর্বব্যাপী ধর্মাচারহীনতার পরিমণ্ডলেও শত শত মুসলমান বারে-বারে মাটিতে মাথা রেখে আল্লার উদ্দেশে সেজদা দেয়। ক্লান্তির ঊর্ধ্বে উঠে বলে চলে—

আমার সকল প্রশস্তি আল্লার জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, যিনি দাতা, দয়ালু ও শেষ দিবসের প্রভু। প্রভু, আমাদিগকে সেই সরল পথ দেখাও যে পথে পূর্বসূরীরা তোমার অপার করুণা লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা অদ্বিতীয়। তিনি কারও প্রত্যাশী নন। তিনি কারও পিতা বা পুত্র নন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি জীবিত। তিনি অতন্দ্র। তিনি স্বর্গে-মর্তে সব কিছুর একক অধীশ্বর। তাঁর আদেশ ব্যতিরেকে পাপীর পরিত্রাণে সুপারিশ করার সাধ্য কারও নেই। তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ জ্ঞাতা। তাঁর করুণা ছাড়া মানুষের সীমিত বুদ্ধিতে জ্ঞানের কণামাত্রও লভ্য নয়। তাঁর আসন পাতা স্বর্গে ও মর্তে। তিনি অভ্রান্ত। তিনি সর্বোচ্চ। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। হে প্রতিপালক, তুমি আমাদিকে ইহলোকে পুণ্য ও পরলোকে মঙ্গল দান কর এবং নরকের অগ্নিদণ্ড থেকে রক্ষা কর। প্রভু, তুমি আমার জনক-জননী ও সকল ইমানদার পুরুষ ও রমণীকে ক্ষমা কর এবং তাদের উপর তোমার অপার করুণা বর্ষণ কর।

ইসলামী অষ্টম চান্দ্র মাস শাবানের পনেরো তারিখে শবে বরাত। এবারে পড়েছে ইং ২৭ অক্টোবর '৬৯, বাংলা ১০ কার্তিক, ১৩৭৬ তারিখে। শাবান মাস-শ্রেষ্ঠ রজবের পরবর্তী ও রমজান মাসের পূর্ববর্তী। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের কাছে রজব, শাবান ও রমজান—এই তিন মাস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দৈনন্দিন ওক্তিয়া নামাজ (পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচবারের নামাজ, যা প্রাত্যহিক) ছাড়াও বিশেষ বিশেষ নামাজের মাধ্যমে, উপবাসের মাধ্যমে [রমজান মাসের ৩০ উপবাস অবশ্য পালনীয়], দান-খয়রাতের মাধ্যমে ঈশ্বরের ক্ষমা ও করুণালাভের তথা পাপ-মোচন ও পুণ্য সঞ্চয়ের লগ্ন একটির পর একটি এই তিন মাসে সমাগত হয় মুসলমানের কাছে। রজব চান্দ্রমাসের সাতাশ তারিখে পবিত্র শবে মেরাজ, যে রাতে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ, অনন্ত ঐশী করুণার অধিকারী পয়গম্বর হজরত মহম্মদ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। চান্দ্রমাস রমজানের সাতাশ তারিখে পবিত্র শবে কদর, যে রাতে রসুলাল্লার উপরে মহাগ্রন্থ কোরান শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিল।

শবে বরাতের মাস শাবানের শুরু থেকেই বাড়িতে বাড়িতে কোরান শরীফ পাঠ, মিলাদ মহফিল ইত্যাদি হতে থাকে। অবস্থাপন্নেরা উপযুক্ত আলেম দ্বারা কোরান শরীফ খতম করায় অর্থাৎ সমগ্র কোরান শরীফ পাঠ করায়। এসবের আর এক বিশেষ উদ্দেশ্য, পরলোকগত পূর্বপুরুষ আত্মীয়স্বজনদের আত্মার সদ্‌গতি কামনা। ইসলামে পরলোকগতদের আত্মার প্রতি আল্লার করুণা প্রার্থনা অনুমোদিত। শবে বরাতে বা শাবান মাসে এ ধরণের প্রার্থনা সবিশেষ বাঞ্ছনীয়। মৃতজনদের সদ্‌গতির উদ্দেশ্যে কোরান শরীফ পাঠ, জিয়ারৎ [অর্থাৎ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা] ছাড়াও গৃহস্থ এই চান্দ্রমাসে দরিদ্র-সেবার আয়োজন করে। সাধ্যমত পারিপাট্যের সঙ্গে দরিদ্রদের আহার করিয়ে তাদের প্রত্যেককে মাথার জন্য একটু নারকেল তেল দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, এই তেল মেখে দরিদ্রের যত শান্তি, মৃত আত্মীয়স্বজনরা কবরের মধ্যে যেন অনুরূপ শান্তি লাভ করেন।

ইসলামে খয়রাত অর্থাৎ দান-ধ্যানের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সৎকাজের তালিকার শীর্ষে দান-ধ্যান। বাধ্যতামূলক দান অর্থাৎ জাকাত [সম্পদের ১/৪০ ভাগ] ছাড়াও পর্ব-বিশেষে অনুরূপ আলাদা আলাদা দানের ব্যবস্থা। যেমন, ঈদ্-উল-ফিতরে দেয় ফিতরা বা ঈদ্-উজ্-জোহায় কোরবানীর পশুমাংস বিতরণ এবং শবে বরাতে রুটি-হালুয়া বিতরণ। বলা যেতে পারে, পর্ববিশেষে এই ধরণের দান-বিতরণের অন্যতম উদ্দেশ্য সমাজ-চেতনা অটুট রাখা, উৎসবের উপভোগ্যতাকে দীনাতিদীনের কাছেও পৌঁছে দেওয়া।

শবে বরাতে গ্রামের লোকে তৈরি করে চালের আটার পাতলা রুটি আর হালুয়া। গ্রাম বাংলা অ-জ নিঃস্ব হয়ে এসেছে। চালই দুর্লভ, চালের আটা তো বিলাস সামগ্রী। তাছাড়া চান্দ্রমাসের আবর্তনের নিয়মে শবে বরাত বছর তিনেক হল ধান ওঠার মরশুম ছেড়ে এক পা এক পা করে অনেকটা সরে এসেছে। এখন থেকে আগামী প্রায় বিশ বছর ধান ওঠার মরশুমের বাইরেই থাকবে। ততদিন গ্রামের মুসলমান মেয়ে চালের আটার রুটি গড়ার বিদ্যা মনে রাখতে পারবে কি না কে জানে!

শবে বরাতের বিশেষ আকর্ষণ এই রুটির প্রস্তুতিপর্ব আরম্ভ হয় শাবান চন্দ্রোদয়ের পর থেকেই। প্রথমে ধান ভেনে আলো চাল তৈরি করা। গ্রামের যাদের যাদের বাড়িতে ঢেঁকি আছে সেখানে লাইন পড়ে যায়। এর পর চাল গুঁড়ো করা। ঢেঁকিতে গুঁড়ো করাই মেয়েদের কাম্য। শুধু সুবিধা-জনক বলে নয়, উৎসবের স্পন্দন যে ঢেঁকিশালেই। একবেলা চালকে ভিজিয়ে রাখা, আর একবেলা গুঁড়ো করা। কলায় কলায় শাবানের চাঁদ বেড়ে চলেছে। সন্ধ্যায় উঠছে একেবারে মাথার ওপরে। তার মানে আর মোটে সাত দিন বাকি। ঢেঁকির বিরাম নেই। ঢেঁকিশালে ঢেঁকিকে গাল দিয়ে সুখ। কথা করে সুখ। ঝগড়া করে সুখ। আর সবচেয়ে বেশি সুখ গুঁড়িয়ে যেতে থাকা ধপধপে আলো চালকে আঁজলায় ভরে নেড়ে-চেড়ে।

সদ্য গুঁড়োনো আটা অতিশয় পবিত্র। ঘরে রাখা হবে সাবধানে। ছেলেপুলেরা যেন হাত না দেয়, মুখে না দেয়। অকল্যাণ হবে। রুটি পবিত্র। সেঁকতে হবে মাটির নতুন তাওয়ায় বা ধোয়া তক্‌তকে ধাতব তাওয়ায়। রাখতে হবে হয় নতুন না হয় পাক-সাফ চাঙারিতে। সে সব গিন্নীবান্নিরা আগে-ভাগে যোগাড়যন্ত্র করে রাখে। ইতিমধ্যে

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনায় অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ।
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা

মিস্কিন খাওয়ানো [দরিদ্র সেবা] হয়ে গেছে। ঘরের মেঝে উঠোন ধোয়া-মোছা, বাড়ির আঁদাল-কাঁদাল সাফ-সুতরো করা হয়ে গেছে। ব্যবহার্য যত কাপড়চোপড় সব সোডায় সাজিতে কাচা-ধোয়া হয়ে গেছে। এসবেরই মধ্যে দিনগুলো কেটে যায়। আসে শবে বরাতের সকাল। ঘর-দোর আর এক দফা ধুয়ে-মুছে নিয়ে গিন্নী বসে বৌ-ঝিদের নিয়ে রুটি গড়ায়।

চালের আটা গরম জলে না মাখলে রুটি হয় না। এর হিসাব আছে। কতটা আটায় কতটা জল কতখানি ফুটবে, তা অভিজ্ঞরাই জানে। আটা মেখে তাকে রুটি গড়ার উপযোগী করে তুলতে বিস্তর যত্ন ও মেহনতের দরকার। এর পর দ্রুত হাতে কেউ গড়ে গড়গড়া, কেউ বেলে রুটি। আটা মাখার গুণে, গড়গড়া গড়ার গুণে এবং বেলবার গুণে শেষ পর্যন্ত নিখুঁত বৃত্তাকার পাতলা পাতলা রুটি একের পর এক তৈরি হয়ে যায়। তারপর একজন নতুন কেনা মাটির তাওয়ায় বা ধোয়া তকতকে ধাতব তাওয়ায় রুটি সেঁকতে বসে। এখানেও যত্ন ও মনোযোগের প্রয়োজন। কাঠের জ্বালে পরিমাণমত মাঝারি উত্তাপে রয়ে বসে সেঁকতে হয়, যেন রুটিতে দাগ না পড়ে।

রুটির পরে হালুয়া। চালের গুঁড়ি, গুড় বা চিনি ও নারকেল হল উপকরণ। সাদাসিদে মশলা। তেজপাতা, মৌরি বা গরমমশলা। চালের আটার রুটি আটা মাখা থেকে সেঁকে শেষ করতে যথেষ্ট সময় লাগে। এখানে বলা দরকার, শবে বরাতে পরিবারের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বেশি পরিমাণ রুটি-হালুযা তৈরি করতে হয় দান ও বিতরণের জন্য। গড়পড়তা একটা মাঝারি আকার ও সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের রুটি-হালুয়ার কাজ সাঙ্গ করতে দু'-তিন জনের সাত-আট ঘণ্টার মেহনত লাগে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে। চাঙারিতে স্তূপীকৃত রুটি বাচ্চা-কাচ্চাদের উৎপাতের কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু খাওয়ার নিয়ম নেই। অন্তত একজন মিস্কিনকে রুটি-হালুয়া দান না করে পরিবারের কারও তা খাওয়া চলে না। বাচ্চাদের অবশ্য মেতে ওঠার অন্য উপকরণ আছে। সন্ধ্যায় আলোকসজ্জা। বাড়িতে বাড়িতে সারি সারি মোমবাতি জ্বালাতে হবে। কেউ যে কাজে মাতে নিজের ঘরে, কেউ ছুটে যায় মসজিদে, কেউ আত্মীয়-স্বজনের কবরস্থানে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবরস্থানে মোমবাতি জ্বালার রেওয়াজ সব জায়গায় নেই—এবং এই প্রথা শরিয়তের অননুমোদিত। ছেলেরা কোথাও কোথাও মেতে ওঠে বাজী পোড়ানোয়। এতেও অবশ্য শাস্ত্রের অনুমোদন নেই।

এদিকে সন্ধ্যার পর থেকে পুরাঙ্গনারা ভয়ঙ্কর ব্যস্ত। একের পর এক প্রার্থী মিস্কিন আসছে। প্রত্যেকের ঝুড়িতে তুলে দিতে হচ্ছে দু'খানা-চারখানা রুটি আর হালুয়া। কোন কোন জায়গায় আর একটি সুন্দর প্রথা আছে। প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে রুটি-হালুয়া বিতরণ। দু'খানা পেলে তিনখানা দিতে হয়, চারখানা পেলে পাঁচখানা। এমনও হতে পারে নিজের চাঙারিতে শেষতক্ জমা পড়ে থাকে বহুলাংশে অন্যের রুটি। মৈত্রীবন্ধনের অপূর্ব সুন্দর রীতি!

শহর এলাকায় মুসলিম রমণীদের পারদর্শিতা বিভিন্ন ধরণের হালুয়া প্রস্তুতে। ডালের হালুয়া, সুজির হালুয়া, পাকপ্রণালী কোনটির সরল, কোনটির জটিল। সম্ভবত মৈত্রীর প্রতীকস্বরূপ গড়ে 'দোস্তি' রুটি, এক ধরণের দু-খোল রুটি। শহরের জীবন অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন, তবু মহল্লার মধ্যে শবে বরাতে রুটি-হালুয়া বিনিময়ের মাধ্যমে মৈত্রী-প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। রুটি দান-বিতরণের কাজ সারতে রাত হয়ে যায়। কোন্ সকালে মেয়েদের ব্যস্ততা সুরু হয়েছে। তারপর থেকে মুহূর্তেকও বিরাম নেই। শরীর স্বভাবতই শ্রান্ত, তবু এ বরাতের রাত! বছরের একটিমাত্র রাত, যে-রাতের এবাদতের বিনিময়ে প্রাপ্য কেয়ামত (সৃষ্টি-সংহার) পর্যন্ত এবাদতের পুণ্য। অতএব আর দেরি নয়, এবাদতে বসা চাই। এবাদত সবার পক্ষেই ফরজ অর্থাৎ আবশ্যিক। দিনে-রাতে নিত্য পাঁচবার। অনেকে পারে, অনেকে পারে না। যে পারে তারও ক্লান্তি নেই, সে চায় আরও এবাদত। কোন উপলক্ষকেই বাদ দিতে প্রাণ চায় না। যে পারে না, সেও কোন এক মুহূর্তে একবার হয়তো ভাবে নিজের জীবনের জমার দিকের বিশাল ঘাটতির কথা। শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটির ভাবনায় হয়তো বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু কিসের ভয়! ইহলোকে আল্লাহ্ রহমানুর রহিম। অপার করুণাময়। তিনি ধারেকের তন্ময় এবাদতেও প্রীতি। তিনি ক্ষমা-সুন্দর। হয়তো এসবও সে ভাবে না। ভাবে শুধুই ইহকালের কথা। সংসারে সমৃদ্ধি, শান্তি, সন্তান-সন্ততির কল্যাণ, বিপদ-মুক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি ঐহিক কামনা। এ রাত যে বরাতের রাত। লোকের বিশ্বাস, এ রাতে আল্লাহ তায়ালা আগামী বছরের জন্য প্রত্যেকের বরাত-লিপি রচনা করেন। ক্ষমা-সুন্দর অন্তর্যামী ঈশ্বর মূঢ় মানবের এই মূঢ় প্রার্থনায় সারারাত ধরে হাসেন কি না কে জানে। বিশ্বচরাচর ধপধপে জোছনায় উছলে ওঠে। আর শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ মুসলমান নর ও নারী বিশ্রামসুখ তুচ্ছ করে এবাদত করে চলে। দীর্ঘ বা স্বল্প। বারে বারে সেজদা দেয়—করুণাময় প্রভু, তুমি করুণা কর!

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

বক্সিং

কান্তি গুপ্ত

বক্সিং খেলা দেখলেই রামনাথ কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না। খেলা শুরু হলেই অজান্তে হাত দুটো বুকের কাছে গুটিয়ে আসে, আর এলোপাথাড়ি ছোড়াছুড়ির জন্যে হাত দুটো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। খেলা দেখতে দেখতে ভুলে যায় সংসার, কাজ, ভাবনা। মনে হয়, মঞ্চের একজন মস্ত বক্সার, মুষ্টিযুদ্ধে নেমেছে। ঘন্টার পর ঘন্টা, যতক্ষণ খেলা শেষ না হবে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে হাত-পা নাড়তে আমোদ বোধ হয়। জানই থাকে না—ও খেলোয়াড় না দর্শক? এটাই একমাত্র নেশা। মলিনা বলে 'মরণ নেশা গো মরণ নেশা!'

এর জন্যে কম সইতে হয় নি। সন্ধ্যার পরে ট্যুইশনি থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হলেই মলিনা খোঁচাবে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গায়ের ঝাল মেটাবে। দুমদাম শব্দ তুলে গোঙাবে, 'আসা হলো? ঘরে যে লোক আছে একটা, সারাদিন সংসার টেনে আমোদ-আহ্লাদের মুখ দেখল না যে, তার কথা একবারও স্মরণ হয় না?...কী নেশা, মা গো!' এরপর মলিনা ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেকক্ষণ বলবে এবং শেষে যেখানে থামবে সেটা রামনাথের জানা। '...একটা ঘুষি বাগানো মেয়ে এনে ঘুষোঘুষি চালালেই হতো, বাড়ির বাইরে রাত কাটানোর দরকার ছিল না।'

প্রথম প্রথম রামনাথ সংকুচিত হতো। বাড়ির আশেপাশে দু'দশ ঘর শুনে ওর সম্পর্কে কি বিশ্রী ধারণা করছে সে কথা ভেবে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেত। এখন একঘেয়ে হয়ে গেছে কথাগুলো। কানে লাগে না। হাসি পায়, মলিনার ওসব কথায় কী উত্তর দেবে? কাকেই বা বোঝাবে, স্কুল থেকে বেরিয়ে খালি পেটে ছাত্র পড়ানোর পর বক্সিং দেখার নেশা আর থাকে না। ফিরতে দেরি হওয়ার-কারণ বক্সিং দেখার জন্য নয়, জীবিকা নির্বাহ নামক কর্তব্য পালনের জন্যে ট্যুইশনি।

রামনাথ ভিড়ের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিল। ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে গেলে ওটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। গুঁতোগুঁতি করে ভিড়ের মধ্যে লক্ষ্যস্থলে এগুনো যায় না। তাহলেই ডাক পড়ে শারীরিক শক্তির। সে ক্ষেত্রে দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করা দূরে থাকুক ল্যাজ গুটিয়ে পেছিয়ে আসতে হয়। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে রামনাথ একেবারে মঞ্চের কাছাকাছি ডানদিকে চেয়ারগুলোর পেছনেই স্থান পেল। এ কাজে রামনাথ রপ্ত। বাসে-ট্রামে যে-কোন জায়গায় ভিড় হোক না কেন ওকে হেনস্থা হতে হয় না। কিন্তু জীবন-সমস্যার ভিড়ে প্রবেশ করে অকুস্থলে পৌঁছুনো হল না কোনদিন। সেখানে সমস্যাটা ভারী শক্ত, খুব জমাট। সেখানে ভিড় ঠেলতে গেলেই এই বক্সিং খেলার মতো ঘুষি খেয়ে খেয়েই দম আটকে আসে, সমস্যার সমাধান হয় না।

বক্সিং রিং-এ দুই বিপরীত পক্ষ উঠে এসেছে। এরপর এরা লাফাবে ঠিক পুতুলের মতো। কিন্তু আনতাবড়ির লাফানো নয়। এই লাফানোর মধ্যে একটা ক্রম আছে। লক্ষ্য যার স্থির, শক্তির সঙ্গে লক্ষ্য যেখানে একেবারে খাপে খাপে এঁটে গেছে সেই জিতবে। মার খেয়ে মরবে ভোঁতামুখো লক্ষ্যহীন যে কোন একপক্ষ। লক্ষ্যস্থির রাখাটা মুষ্টিযুদ্ধের অন্যতম বিষয়। শারীরিক শক্তি বড় কথা নয়, আসলে তৎপরতা আর ঝোপ বুঝে কোপ মারা। ব্যস! তাহলেই জিত।

রামনাথ বক্সিং জানে। ছোট-বেলায় বাবা বক্সিং শেখার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে এই বক্সিং খেলার প্রতি নেশা আঠার

মতো লেগে আছে। ওর দুর্বল শরীরটা দেখে বাবা ওকে তাগড়াই করতে চেয়েছিলেন। শুরুতে মন্দ লাগে নি। সব সময় মনে হতো কেউকেটা। বন্ধুরা একটু বিস্ময় নিয়ে ওকে দেখত, সমীহ করত ফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিট্যুশনের ছাত্র বলে। রামনাথের খেলা শেখার আগ্রহ দেখে খুশি হয়ে ইনস্ট্রাক্টরমশাই বাবাকে বলতেন, 'ছেলে আপনার চৌকস! ওর হবে। এ তো কুস্তী খেলা নয়, বক্সিং খেলা। মোটা মাথা নিয়ে ষাঁড়ের মতো গুঁতোগুঁতি এখানে চলে না।' রামনাথের মাথাটা সজোরে নেড়ে বাবাকে তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন, 'বুঝলেন মশাই, এটা সাফ চাই।'

রামনাথকে বক্সার করে তোলবার জন্যে বাবার এমন খেয়াল হলো কেন, সেটা রামনাথের কাছে লুকোনো নেই। বাড়ির মধ্যে রামনাথই ছিল দুবলা। টিঙটিঙে শরীরটার ওপর বৃহৎ মাথাটা বড় বেমানান লাগত বাবার। মার কাছে বসে অনেকদিন সে কথা বলেছেন। রামনাথের মনে পড়ে। বাবা চেয়েছিলেন ওকে শারীরিক শক্তিতে বলীয়ান করে তুলতে। ভুল করেছিলেন তিনি। বেঁচে থাকলে ভুলটা বুঝতে পারতেন। শরীর আর মনকে তিনি আলাদা করতে পারেন নি। আসল প্রশ্ন হলো মন। মনটাব চারদিকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে আছে শরীর। বক্সিং লড়ে শরীর হতে পারে কিন্তু মনটার কী হবে? ওটাকে পাল্টাতে গেলে স্বার্থের হাতুড়ি ঠুকতে হয়। ঠিক প্যাকিং বাক্সের মতো যেখানটায় যেরকম দরকার পেরেক ঠুকে ঠুকে একেবারে ফিট বানাতে হবে। নয়ত সব খুলে যাবে। সব বেরিয়ে আসবে ভেতরের মাল। রামনাথের মনটা খুলে আছে সারা জীবন। ফলে রিং-এ দাঁড়িয়ে বক্সিং আর হলো না। সংসার জীবনের বক্সিং খেলায় দাঁড়িয়ে মারই খেল কেবল নাকে মুখে চোখে।

ইনস্ট্রাক্টর বলতেন, 'মারবি তো ভয় কিসেব? ভাবছিস কি? তুই কি মেয়েছেলে? ওর চোখে লাগবে তো তোর কি? হাঁদারাম! না মেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? রিং-এ দাঁড়িয়ে চান্স খুঁজতে হয়। যে কোন দুটো সাদা চোখেব টলটলে কালো মণি, চকচকে ঘেমো উঁচু হয়ে থাকা নাক, পুরু দুটো ঠোঁট আর নিচেই মোক্ষম স্থান থুতনি। সে সব বাঁকিয়ে তোর প্রচণ্ড ঘুসির জোরে। আর নিটোল ফোলা গাল দুটো তো রয়েছেই হতভাগা!'...

কিন্ত খেলতে খেলতে রামনাথের হাতটা মনের মতোই খুলে পড়ে। শক্ত হযে সটান প্রচণ্ড ঘুষি আর পেঁছিয না প্রতিপক্ষ পর্যন্ত। ওই এক-একটা বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তে প্রতিপক্ষের কোমল কমনীয় গোটা মনুষ্য অবয়বটা সামনে ফুটে ওঠে। মার দেওয়া হয় না। মার খায়। লড়াইয়ের সময়ে দুর্বলচিত্ত হয়ে আর নিস্তার নেই। মার মার। উপর্যুপরি এলোপাথাড়ি মার। দম নিয়ে আর দাঁড়াবার সুযোগ নেই। খেলা ছাড়তে হল। বক্সিং খেলা ওর হলো না।

'অপদার্থ!' নিজের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল রামনাথ। কখন যে খেলার সঙ্গে মিশে গেছে খেয়াল নেই। আপন মনে চিৎকার করে উঠেছে আত্মহারা হয়ে। বেঁটে ওই ছেলেটা একটা রাউণ্ড নিয়েছে। সমস্ত শক্তিটা জড়ো করে এ্যাপ্রোপিয়েট প্লো করেছে। অথচ যারা খেলা জানে তারা বলবেই এবারে রাউণ্ড ছিল লম্বা ছেলেটির। একটু পেছিয়ে এসেই যদি ঝুঁকে পড়ত বাঁদিক ঘেঁষে, ঘুষিটা পড়ত চোখটার ঠিক নিচেই। বেঁটের সাধ্য কি এই প্রচণ্ড ঘুষি ঠেকিয়ে পালাবে। হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল রামনাথের। ইডিয়ট! হাঁদার মতন খালি লাফালো আর পেছিয়ে গেল। নেবে পড়। তোর হবে না নেবে পড়!'

একটু উচ্চগ্রামেই কথাগুলো বিড়বিড় করতে লাগল রামনাথ। রামনাথ লক্ষ্য করল চেয়ার থেকে পেছন ফিরে কয়েকজন দর্শক ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো বোধ হয় ওই হাসাহাসিতে যোগ না দিয়ে পারে নি। রামনাথ সংযত হলো। খেলা দেখতে বসে আপন মনে খেলার ভালমন্দ নিয়ে কেমন যে আপন মনে বকে! গম্ভীর হলো রামনাথ। দৃষ্টিটা কোনদিকে না ছড়িয়ে মঞ্চের ওপর রাখল।

রামনাথ অন্য কাউকে ইডিয়ট বলছে শুনলে মলিনা ব্যঙ্গ করত। 'আপন মুখ আপনি দেখ গো মহাশয়!' মাঝে মাঝেই রামনাথের অপদার্থতা নিয়ে মলিনা অভিযোগ তোলে। অপদার্থ স্বামীর হাতে জীবন সমর্পণ করে জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল। মলিনার কথা মনে পড়তেই রামনাথের খেয়াল হলো। বাড়ি থেকে ও বেরিয়েছে মেয়েব ওষুধের টাকা সংগ্রহ করতে। তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবী গলিযে বেরিযে এসেছে বাড়ি থেকে। কিন্ত যাবে কোথায়? টাঁক খসানোর মতো মালদার রাত ন'টার আগে কাকে পাবে? আর গিয়েই বা লাভ কি? শুধু শুধু হাঁটাই সার। সংসারের ক্ষুধা মেটাতে নেকড়ের মতো বন্ধুরা হন্যে হয়ে ঘুরঘুর করছে এদিক-ওদিক। কেউ ছাত্র পড়ায়, কেউ সেলসম্যান, কেউ শেয়ার মার্কেটের দালাল। এরা ছাড়া অফিসের কেরানীবন্ধুদের কাছে যাওয়া বৃথা। ধার দেওয়ার মতো উপরি পয়সা ওরা রোজগার করে না।

রামনাথের মাথায় চ্যুইশানি বাড়িগুলোতে যাওয়ার কথা ঢুকল। হরিহরবাবুর কাছে এবারের আগে তিনবার গেছে। শালা ছুঁচো। ছেলে পাশ করেছে এক পয়সা আর খসাবে না। প্রাণধন চ্যাটার্জি গদিতে বসে খদ্দের দেখছে। দেখা হলেই একগাল হাসবে। 'আসুন আসুন মাস্টারমশাই।' বসাবে আদর করে, চায়ের অর্ডার দেবে। টাকার কথাটা পাড়ার আগেই বিগলিত হয়ে বলবে, 'এ্যাজ্ঞে দেখছেন তো নিজ চোখে, বাজারের হাল কী ব্যাজার। খদ্দের নেই। ভাঁড় ঠনঠন্। তা মাস্টারমশাই এ্যান্দিন কি দিই নি নিয়মিত? সামনের মাসে ঠিক...।'

রামনাথ আরও কয়েকটা নাম স্মরণ করার চেষ্টা করল। প্রেক্ষাগৃহের ছবির মতো এরা একে একে বদন দেখিয়েই মিলিয়ে গেল। কেউ ভ্রূকুঞ্চিত। মাস্টার টাকা চেয়ে যেন ওর সম্মানের ফুলবাগানে ময়লা ঢেলে দিয়ে গেল। আবার কেউ সামনে দাঁড়ালো, স্মিত হাসিতে ঈষৎ স্ফীত ওষ্ঠাধর। শালারা যেন বিনয়ের টিউবওয়েল! বিনয়ের জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে খালাস। ভাবতে ভাবতে অক্রুর দত্ত লেনের তিনবার ফেল করা শীলাদের বাড়ির কথা ভাসল। একগাল হেসে শীলার মা বসতে বলবেন। টাকা চাওয়ার কারণ শুনে সারা মুখে কপট সহানুভূতিতে গাম্ভীর্য নেমে আসবে। সিল্কের শাড়িটা বুক থেকে খালি খালি খসে পড়ে। সেটা সামলাতে সামলাতে বলবেন, 'আহা! সত্যিই কি মুস্কিলে পড়েছেন, ইস্।'

তারপর লিলির অনুপস্থিত বাবার উদ্দেশ্যে একটা ক্রোধের সুর তুলে বলতে থাকবেন, 'লোকটাকে কত যে পই পই করে বলি, বাড়ির কাজকম্ম যারা করে ওদের টাকাগুলো সময় মতো ঠিক ঠিক পাঠিও কিন্তু। কিন্তু কে কার কথা শোনে। এই দেখুন না কাগজওয়ালার বাকী, ঝি রামুর মার বাকী, আপনারটা পড়ে আছে। ...কী যে করি।...ছিঃ ছিঃ ছিঃ!'

রামনাথ অতঃপর আর নতুন করে চিন্তা করতে পারল না। এই টাকাগুলো ওর প্রাপ্য। নিজের টাকা। কিন্তু কিছুতেই বুক চিতিয়ে ও জোর করতে পারে না। স্পষ্ট বলতে পারে না, নাঃ, অনেকদিন অনেক টালবাহানা করেছেন, আর নয়। টাকা দিন। টাকা দিতেই হবে। আমার মেয়ের অসুখ টাকা না হলে চলবে না।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে উল্লাসের দমকা হওয়া। রামনাথ মঞ্চের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল। বেঁটে ছেলেটি কোণঠাসা করছে লম্বা ছেলেটিকে। বেঁটে ছেলেটির প্রতিপক্ষ দাঁড়াতে পারছে না। নিয়ে এসেছে

রিং-এর কাছে। দর্শকবৃন্দ উল্লাসে হেসে পড়েছে বিজয়ীর দিকে। ওরা খেলা বোঝে না। যে জেতে তার দিকেই ঝুকে পড়ে। কিন্তু আসলে লম্বা ছেলেটি চৌকষ খেলোয়াড়। ওর হারার কারণ কেউ খুজে দেখবে না। ওর অভাব শক্তির নয়; স্থির লক্ষ্যেরও নয়; ওর অভাব অন্যত্র। সেটা বোঝা যাবে না কোনদিন। কোথাও যেন আটকে আছে। সুগঠিত সুন্দর দেহটাকে নিয়ে কিছুতেই উদ্দাম হয়ে উঠতে পারছে না, দুর্বিনীত হতে ওর যেন কোথায় একটা বাধা। এটাই তো অপদার্থতা। এর ফলে স্থির লক্ষ্য হারিয়ে যায়। বিশ্লেষণাত্মক বোধগুলো কেবলই এসে প্যারেড করে, লেফট্ রাইট্ লেফট। কোনদিকে যাবে? কোন্ রাস্তায় মতিটা স্থির করাবে সেটা ভাবতেই সময় চলে যায়। বক্সিং খেলার মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাবার সময় নয়। ওখানে চলতে হবে। সামনে বাঁয়ে ডানে যেখানে যেমন। দাঁড়িও না, চলো। ঘুষি চালাতে হবে একটি সুনির্দিষ্ট ক্রমে এলোপাথাড়ি। তা না হলে বক্সিং চলে না। বুঝলে সাধুবাবা।

'উঃ! অ,মার সাধুবাবা এলোরে! তা সংসার কল্লে কেন? বনে যাও, বনে যাও।' মলিনা চিৎকার করে পাড়া মাতিয়ে দেয় মাঝে মাঝে। 'কেন টীচার্সদের নিয়ে মাতামাতি করছ কেন? নৃসিংহবাবু তো বাড়িতে এসে আমাকে বলেছিলেন তোমাকে হেডমাস্টার করবেন গণ্ডগোলটা মিটে গেলেই।...তোমার কী দরকার অন্য মাস্টারদের নিয়ে মাথা ঘামানো? ভাত বন্ধ হলে তোমাকে দেবে কেউ দুটো ভাত? দাঁড়াতে পারবে ওদের দোরগোড়ায়? রা বেরুবে মুখ দিয়ে—দুটো ভাত দেবে গো...।' মলিনা আজকালকার মেয়ে, মাটিতে বসে কপাল থাপড়ায় নি, ঠুকে ঠুকে কপাল ফোলায় নি, এমন কি চুলও ছেঁড়ে নি। কিন্তু রামনাথের চুল ছিঁড়বার উপক্রম করেছিল। মলিনার সাফ জবাব সংসার করেছ সংসার করে যাও। স্কুলে কে টাকা মেরেছে, ম্যানেজিং কমিটি সরকারকে ফাঁকি দিচ্ছে, মাস্টারদের স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ইত্যাদি দেখা চলবে না। মুখ-গুঁজে নৃসিংহবাবুর পায়ের মাটির দিকে তাকিয়ে থাকো, দয়া কামনা করো। নিজের আখের দেখতে হবে না?

কিন্তু রামনাথ পারল না। পারল না। কিছুতেই পারল না। জীবনমঞ্চের খেলাটা জমল না কোনদিন। একেবারে ধরাশায়ী। নৃসিংহবাবু দুবেলা হেসে কথা কয়েছেন; বাড়িতে বসে একদা—সুন্দরী মলিনার মিষ্টি হাতের পান খেয়ে গেছেন। রক্তচক্ষু ফোলাতে তাঁর বাধে নি। নিঃসংকোচেই বাড়িয়ে দিয়েছেন বিতাড়ন পত্র।

লোকগুলো উল্লাসে মত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু রামনাথ জানে; হটে এলেই হার এমন কথা নেই। হটে আসাটা আক্রমণের এক পদ্ধতি। সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে তড়পানোর সুযোগ দিতে হয়। উল্লাসে প্রতিপক্ষ যখন মিথ্যা লড়াইয়ে শ্রান্ত হবে, নিজ সম্পর্কে অচেতন হয়ে উঠবে, তখন নিতে হবে চান্স। থ্রো করতে হবে একটা হেভী স্ট্রোক। একেবারে চরম আঘাত। লম্বা ছেলেটি দাঁড়িয়েছে দৃঢ়ভাবে। বেঁটে ছেলেটি অনবরত ঘুষি হাঁকছে। এইবার লম্বা ছেলেটি ছুঁড়বে চরম আঘাত। মোক্ষম সে আঘাত। রামনাথ দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'চিয়ার য়ু'। চিৎকার করে উঠে রামনাথ এদিক-ওদিক তাকালো। ভিড়ের লোকগুলো হো হো করে হেসে ওকে ভিজিয়ে দিল।

কে যেন মন্তব্য করল, 'দেখ তো দাদার কেউ হয় নাকি?'

অন্য আরেকটা সুর ভেসে এলো, 'ওকে উঠিয়ে দে ওখানে ছোটভাইকে মদত্ দিয়ে আসুক, হাঃ হাঃ হাঃ।'

রামনাথ গম্ভীর হল। ওর সমস্ত দেহটা দুলে দুলে উঠছে। হাত দুটো নিস্‌পিস্ করছে। হাত দুটোকে থামিয়ে রাখা যাচ্ছে না। মনে হল লম্বা ছেলেটির হয়ে ঘুষিটা ও ছুঁড়ে মারবে। ওঃ দিস্ ইজ্ দি টাইম। হাই টাইম। কিন্তু? ও-হো-হোঃ ননসেন্সটা পারল না। বেঁটে ছেলেটি কাৎ হয়ে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মারছে এলোপাথাড়ি। রামনাথ চেঁচিয়ে উঠল, 'মার, মার, মার লম্বুকে। ঐ ইডিয়টকে শেষ করে।...'

রামনাথ চমকে উঠল ওর মুখ দিয়ে একই ঢঙে কথা বেরিয়েছে। ওর ইনস্ট্রাক্টর বলেছিলেন একদিন। ক্লাবের মঞ্চে অন্য এক ক্লাবের লড়াই। ক্লাবের ভরসা রামনাথ। সারা সপ্তাহ ধরে তালিম দিয়েছেন ইনস্ট্রাক্টর। ক্লাবের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে, কুমারটুলী ক্লাবের দুর্ধর্ষ মুষ্টি-

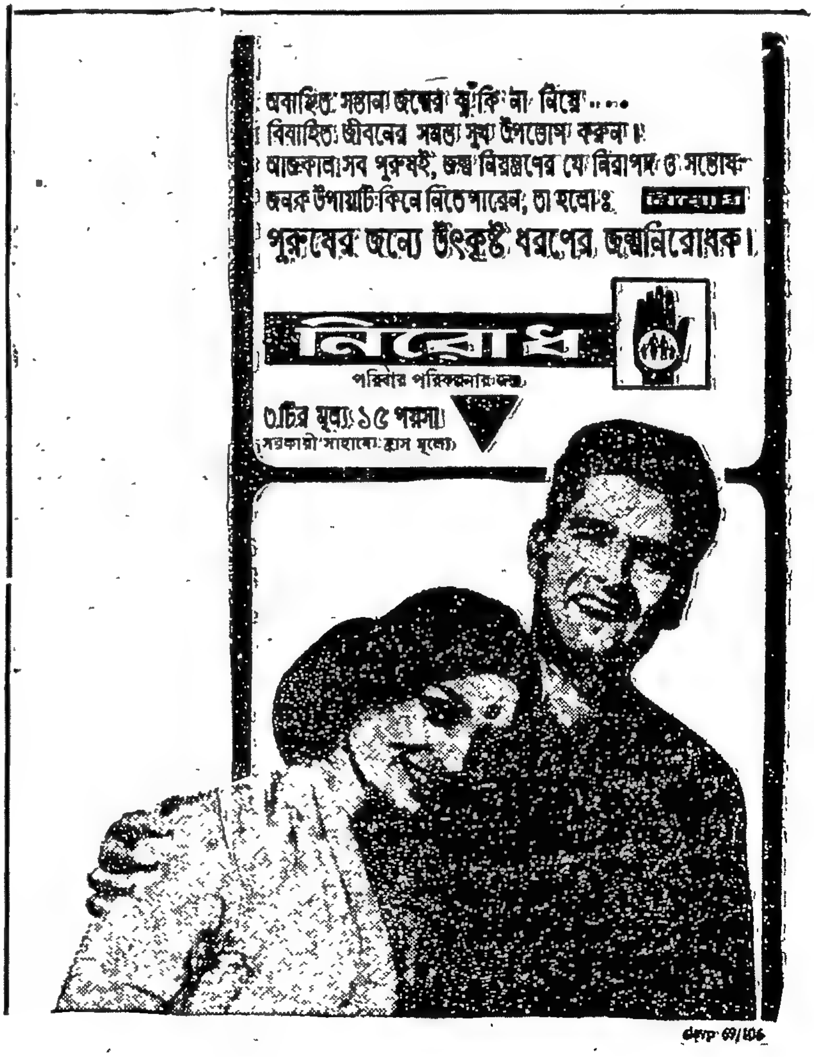

davp 69/106

যোদ্ধাকে হারাতেই হবে। সে অনেক-দিনের কথা। অস্পষ্ট, চোখে ভাসে সামান্য। পর পর কয়েকটা রাউন্ড নিয়ে কেমন হয়ে গেল রামনাথ। কুমারটুলীর সুন্দর ফর্সা ছেলেটার সারা শরীর দিয়ে যেন রক্ত বেরুচ্ছে। চোখটা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। নাকের কাছে বিশাল নীলচে ছাপ। মনে হলে আরেক রাউন্ডে ছেলেটি থেঁৎলে যাবে। কেমন মায়া হল...। ইনস্ট্রাক্টরের রুক্ষ স্বর এখনও কানে বাজে। ইডিয়ট্‌। ইডিয়ট্‌।

সেই একই শব্দ মলিনার কণ্ঠে অন্য সুরে ভেসে ওঠে, 'অপদার্থ। অপদার্থ। অপদার্থ। অপদার্থ স্বামীর হাতে পড়ে সব গেল। রাস্তার কুকুর তো না খেতে পেয়ে হেঁসেল ঠেলে, তুমি তো মানুষ! মাথায় না মারতে পারো পায়ে লুটিয়ে বাঁচার চেষ্টা কর।'

রাগে ফুঁসে ফুঁসে মলিনার চেহারাটা বীভৎস আকার নিয়েছে। কিন্তু রামনাথ মজুমদার কোম্পানীর চাকরীটা কিছুতেই রাখতে পারল না। গোডাউনে যে ভীষণ কারচুপি হয়েছে তার জন্য এ্যাসিস্টেণ্ট বৃদ্ধ শ্যামলবাবুর চাকরী যেত নির্ঘাত। রামনাথ দোষ ঘাড়ে না নিলে সে যাত্রায় এত বড় সংসার নিয়ে শ্যামলবাবু পথে বসতেন। বৃদ্ধ বয়সে কে দেখবে তাঁকে?...মলিনা কানের কাছে রেকর্ড বাজাচ্ছিল, 'পুরুষ তো নয়, মেয়ে-মানুষের বাড়া। কী এমন মহাত্মারে! একটা স্ত্রীর পেট ভরাতে চোখে যে সর্ষেফুল দেখে, তার আবার বড় বড় আদর্শ, বড় বড় কথা। আদর্শ ফাদর্শ মাদুলীতে ভরে জপ কর। আর বেলপাতা খেয়ে সন্ন্যাস নাও। সংসার করতে হবে না।'

লম্বা ছেলেটি হাঁপাচ্ছে। এই ক্যাবলা সব কয়টা রাউন্ডে হারবে। রামনাথ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে মুষ্টিবদ্ধ হাতটা রাখল প্যাণ্টের পকেটে। প্রেসক্রিপশনটা খচ্‌খচ্‌ করে উঠল। রামনাথ আঁৎকে উঠল। এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করা উচিত হয় নি। টাকার ব্যবস্থা করতেই হবে। টুইশনি বাড়ি যেতে হবে, যেতে হবে বন্ধুদের কাছে। নয়তো পুরনো স্কুলের সেক্রেটারী নৃসিংহবাবুর কাছেই যাবে। যেমন করেই হোক টাকা চাই। বলিষ্ঠ হতে হবে। নৃসিংহবাবুর কথা মনে হতেই চেহারাটা চোখে ভাসল। চারদিকে টিনের পাত লোহার রড, স্ক্রু-বল্টুর স্তূপাকার গদিতে বসে আছেন উনি। ওকে দেখেই হাসবেন, যেন কত খুশি হয়েছেন। ধূর্ত লোকটা চা খাওয়াবে ভাল প্লেটে। মিষ্টির অর্ডার না দিয়ে পীড়াপীড়ি করবেন মিষ্টি খাওয়ার জন্যে। রামনাথের কথা শুনবেন মন দিয়ে। তৎক্ষণাৎ টাকাটা বাক্স থেকে বের করে হাতের মুঠোয় রেখে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা তুলবেন। 'বুঝলেন, যা দিনকাল পড়েছে কেসটা তুলে নিন। একটা মিউচুয়েল ব্যবস্থা দেখুন না। চারদিকে মশাই পীসফুল কো এক্সিস্‌টেন্সের ডাক। ...আরে মশাই ব্যক্তিগত রাগারাগি করে লাভ কী? এই তো আপনাদের মন্ত্রী-মশাইরা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন—শান্তি রক্ষা কর। সামান্য ডিস্‌মিস্‌ নিয়ে স্ট্রাইক, এ-বি-টি-এ, মন্ত্রী...। একটা পুরনো স্কুলের ঐতিহ্যের কথা...। একটু ভেবে দেখুন রামনাথবাবু, আর আপনার সঙ্গে...।'

রামনাথ কীরকম নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। নাঃ, শক্ত হতে হবে বজ্রের মতো। যা হয় হবে আজ যাবেই নৃসিংহবাবুর কাছে। টাকাটা ওখানেই অনায়াসে পাওয়া যাবে।

রামনাথ ভিড় থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল।

হঠাৎ ওর সার্টটায় পেছন থেকে কে যেন টান দিল। রামনাথ ঘাড়টা চকিতে সরাতেই কাঁধের ওপর পাঁচটা ঝকঝকে পাথর বসানো সোনার আংটি জ্বলজ্বল করে উঠল।

'আরে মশাই এখানে কী'—স্কুলের সেক্রেটারী নৃসিংহবাবু সামনে দাঁড়িয়ে।

'মানে'—কী বলবে রামনাথ ভেবে পেল না।

'অনেকক্ষণ ধইরা দেখতাছি।'

'মানে বক্সিং...'

'বক্সিং দেখেন নাকি? আপনে তো মশয় সগোল কামেই এক্সপার্ট। লেখা, খেলা, গান, বক্সিং। ওই যে কয়, মাস্টার অব জ্যাক...'

পান খাওয়া মুখটা অট্টহাসিতে ভরে উঠল। কয়েকটা সুপরীর কুচি রামনাথের মুখে ছিটকে পড়ল।

রামনাথ অন্যমনস্ক হলো না। লক্ষ্য স্থির রাখল। কল্পমূর্তিতে ইচ্ছেটা ধরে রাখল। চাইবে নাকি নৃসিংহবাবুর কাছে টাকা কয়টা। নৃসিংহবাবু ফেরাবেন না একথা নিশ্চিত। নৃসিংহবাবু পরিস্থিতি বোঝেন, পরিস্থিতি মোচড় দিতে হয় কেমন করে সে সব তাঁর নখদর্পণে। না হলে লোহার ব্যবসায়ী হয়ে স্কুলের সেক্রেটারী, নানা সভাসমিতির সভাপতি হতে পারতেন না।

'কী ভাবতাছেন? কিছু বলবেন নাকি?'

রামনাথ বোকার মতো নৃসিংহবাবুর আপদমস্তক দেখতে শুরু করল। যেন নৃসিংহবাবুর সঙ্গে ওর এই প্রথম দেখা। চক্‌চকে টাকের নিচেই ফোলা মুখটা গণ্ড-দেশের সঙ্গে মিশে গিয়ে কাঁধের ওপর জুড়ে বসেছে। সোনার বোতাম লাগানো পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবী দিয়ে গেঞ্জীটা দেখা যাচ্ছে। ভুঁড়িটা বুঝি গেঞ্জী ফুঁড়ে এখুনি ফেটে পড়বে। ময়ূরের পেখমের মতো কোঁচানো ধুতির অংশ হাত থেকে সটান ঝুলে পড়েছে কালো প্লেসকিটের পাম্প সু পর্যন্ত। রামনাথের হাতে প্রেসক্রিপশনের কাগজটা খচ্‌খচ্‌ করে উঠল। চাইবে নাকি?...

'চলেন যাই এসপ্লানেডের দিকে চা খাইয়া আসি।' নৃসিংহবাবুর কণ্ঠে রাম-নাথের হুঁশ হল। রামনাথ এমনি একটা সুযোগ খুঁজছিল। এসপ্লানেডের চায়ের দোকানে নীলচে আলোর নিচে নিবি-বিলিতে বসে টাকা চাইতে অসুবিধে নেই। যাবে নাকি?...কিন্তু..। হঠাৎ রামনাথ বলে উঠল, 'না আপনি যান, আমার একটু তাড়া আছে।'

নৃসিংহবাবু চলে গেলেন। ওঁর মোটরটা দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে রামনাথ প্রেসক্রিপশনটার হিজিবিজি লেখা পড়তে শুরু করল মনোযোগ দিয়ে। কী যেন রামনাথ খুঁজতে লাগল সেখানে।

বক্সিং খেলা তখন চলেছে। প্রচণ্ড করতালিতে ভিড়টা উন্মত্ত হয়ে উঠতেই রামনাথের খেয়াল হল। ছুটে পার্কের রেলিং ধরে মাথাটা উঁচু করে তুলে ধরল। কালো মাথাগুলোকে নিচে রেখে মঞ্চের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। বেঁটে খেলোয়াড়টা হাঁপাচ্ছে। লম্বা ছেলেটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে মঞ্চে। রেফারী সময় গুণছে এক—দুই—তিন...। কিন্তু অনেক্ষণ দাঁড়িয়েও রামনাথ ছেলেটিকে উঠতে দেখল না।

রামনাথ জানে, ছেলেটি আর উঠতে পারবে না।

মাসিক ১০৲ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

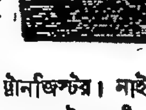

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০৲। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

গ্রামবাংলার কথা

অসীম মুখোপাধ্যায়

অজগর

কগাদা হাঁড়িকুড়ির পাশে বুড়ো বসে ...। হাতে ধেলো হুঁকো। কাছে গিয়ে ...ম।—খবর কি? কেমন আছেন?

—আরে বাবু যে। বসুন এসে।

—...সিরহাট থেকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল এইসেছি।

—?

—আজ সকালে। কিন্তু ব্যাপার কি? ...ড়ে হাট?

—আর বইলবেন না। ইর পরের হাট ...ড় ঘাট।

—কেন হোলটা কি?

—বসলুন, বলাতিছি। সদানন্দ হুঁকোটা বাড়িয়ে দিল।

—সব কিছু গেছে। আর ম্যাথতির পাল্লাম নি।

—বলেন কি! সেবার যে গেলুম, টের পাই নি তো।

—আমিও না। টাকাটা আনতে মাস ছয়েক গেল। কিন্তু শালোর বেটা বলে মেট ওপার হইয়ে গেছে। জমি পাবি না।

—গাঁয়ের মানুষ?

—ভেড়া।

—এগিয়ে আসে নি?

—খুটোর দাঁড় অবধি।

—জোটির খবর কি?

—কান্না আবার কি!

—তাই তো।

—উপায় ছেল না কিছু! ছেলেটা জ্বরে মত্তিছে; বউটা বিয়োবে; ছাপকবলা লিখে দেলুম। জমি বেশি না অল্পের টান, বলুন?

—ঠিক কথা।

—তখন নি জানতম গেল। পিতৃপুরুষের মাটি। আর ফিরবে নি?

—লোকটা আস্ত কসাই।

—ভগমানের চেয়ে বেশি?

—তাও তো বটে।

—বেশ ফেঁপেছে, না?

—খু—উ—ব। গরীবের অক্ত চুষে।

—জমি-জমা

—নামে তিরিশ; বেনামে পাচশ।

—কৃষ্ণ কালী। তাই না?

—সত্যি। মোহন বাঁশী বাজায়, রাম খাঁড়ায় কাটে।

—ওর ছেলে না মাস্টার?

হ্যাঁ। ছাওরদের পড়ায়—চুরি বিদ্যে, মহাবিদ্যে যদি না পড় ধরা।

—বাপের বেটা।

—হক কথা।

—কিন্তু বসে আছেন কেন? একদিন টেনে এনে ঠেঙিয়ে দিন?

—উপায় নেই। ঘড়গাছে নৌকো আটকেছে।

—তার মানে?

—কমুনিষ্ট।

—বাহাদুর লোক?

—সন্দেহ নেই।

—পার্টিকে বলুন?

—বইলেছি।

—কি হোল?

—বলে, তুমি তো কংগ্রেস।

—সে কি?

—বাঃ! জনার্দন কয়াল এখন কমুনিষ্ট, তাই আমি কংগ্রেস।

—চমৎকার বিচার!

—এমনিই চলছে!

—ব্যবসার খবর কি?

—মাঠ ছেড়ে হাটে; বংশে এই পেরথম। কাজেই...।

—সুবিধে হোচ্ছে না?

—নাঃ ভাবতিছি...!

—কি?

—কাছেই তো নদী। একটা কলসী গলায় বেঁধে নেমে যাব কি না!

বুড়ো সদানন্দ তার জমি ফিরে পাবে না। কোন দিনও না। সাফকবুলিয়তের নিয়মানুযায়ী সে তার মাটিটুকু জনার্দনের রাক্ষুসে মুখে ঠেলে দিয়েছে। সর্ত ছিল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত না দিলে জমি খোয়া যাবে। তাই গেছে, তাই যায়। আমাদের সমাজব্যবস্থা আইন-বিচার, সবই একটা অন্ধকার ঘরের মত। তার বন্ধদ্বারে, মরচে ধরা পুরনো কুলপের বুকে অনেক সূর্যালোক, আর ভেতরে অন্ধকার!

মারুতীর হাটে 'হাঁড়ি-কলসীর মেলা'

বাদাবনের চাষী : বাসন্তীর হাটের ব্যাপারী

—ঐরকমই বলে। দেখুন দিনি? তখন দাম ছেলে বেশি। তাই দু' বস্তায় একশ টাকা। কিন্তু অঘ্রাণে দাম কইমবে। তখন একশ টাকায় পেরাই তিন বস্তা। এরপর আবার সুদ।

—তাই তো দেখছি।

—একা আমি নই দাদা। মোর মত সবাই।

—তোমার শ্বশুরের খবর কি?

—হইয়ে এইসেছে।

—আহা! চিকিৎসা হোল না?

—চিকিচ্ছে? করবে কে? আমিও তো উপোসী।

—দেখছে কে?

—গাঁয়ের লোক:

—ফেরার পথে আমাকে সাথে নিও। দেখে আসব।

—তাই হবে। কৈলাসের দোকানে যাবেন।

—বেশ।

গোসাবার নাবাণ সামন্ত। বর্গা ওরফে "ভাগহীন" চাষী। মিথ্যে বলি সবাই জানে, ওরা ন্যায্য ভাগ পায়। কি এ জানাটা সঠিক নয়। সুদ আর আ মেটাতে ভাগের অনেকটাই জোতদারের ঘ চলে যায়। ওদের রক্ত মাঠে ঘাম হো ঝরে, ঘরে ঝরে চোখের জল হোয়ে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এমনিই ঘটছে। আমরা নাকি এগিয়ে গেছি। সন্দেহ নেই। তবে আলোর দিকে নয়। অন্ধকারের পথে।

—মাস্টারমশাই?

—আরে তুমি যে? কেনাকাটা করছ কিছু?

—নাঃ। একটু ঘুরে-ফিরে দেখছি।

—আজ দেখছি অনেকেই এসেছে?

—কেন কা'কে দেইখলেন আবার?

—সদানন্দ এসেছে। ঐ তো ওখানে। তুমিও এসেছ।

—বুড়োর ভারি কষ্ট।

—যা বলেছ? তুমি কেমন?

—যেমন দেইখছেন?

—দেখছি তো, মাদুর বেচতে এসেছে।

—হ্যাঁ। বিক্রি হলে ভাল, নইলে তো উপোস।

—গাঁয়ের খবর বল।

—কি খবর আর দিব! ধারে ডুইবে আছি।

—সবাই তাই আছে।

—তা ঠিক। বীজ ফেলার সময় ধান নেছিলুম, দু'বস্তা একশ' টাকা। বাবু বলে —অঘ্রাণে মোকে দেড়শ' টাকার ধান দিতি হবে।

—বলে কি লোকটা?

হাটে কেনা-অকেনার ভিড়

—ডাক্তার গুপ্তও এসেছেন।
—রোগী দেখতে?
—রুগীও দেখবেন, খাতকও ধরবেন, দুটোই।
—তা বেশ। এক ঢিলে দুই পাখী।
—হ্যাঁ। বস্ত টাকা চিনেছে? আমায় বলে কি জানো?
—কি?
—আসুন, বড়লোক হবার রাস্তা বাৎলে দিচ্ছি।
—তারপর?
—আমি শুনলে তো।
—নোংরা মন।
—কত চাষীর সর্বনাশ করেছে, তার ঠিক নেই। একদিন বলেছিলুম—ডাক্তার তোমার ওষুধ খেয়ে ওরা ভাল হয়, কিন্তু টাকা নিয়ে আবার খিদেয় শুকিয়ে মরে।
—কি বলল শুনে?
—বলল—আপনার বিষয়বুদ্ধি নেই।
—ওকে যা মানায় তাই বলেছে।
—ডাক্তার না বলে ডাকাত বলাই ভাল।
—সত্যি তাই!
এই আমাদের গুপ্তসাহেব।
সবাই জানে উনি ডাক্তার। তাম্রাম বাদাবনের ধন্বন্তরী। "দেখা পেলেই হুঁশ ফেরে, ছুঁয়ে দিলেই জ্বর কমে আর সেরেফ বিশুদ্ধ ডোবার জল খাওয়ালেও রোগী মহাবেগবান"। তবে তিনি আরও একটি মহৎ পেশায় অভ্যস্ত। অর্থাৎ মহাজনী করে থাকেন। টাকা ধার দেন, ওষুধ ধার দেন, বিনিময়ে গয়না রাখেন, জমি রাখেন, বলাবাহুল্য খাতকদের মাথাও জমা রাখেন। ভালই আছেন। খান ভাল, পরেন ভাল, থাকেন ভাল, কেবল একটা জিনিসই ভালবাসেন না, সেটা হল ডাক্তারের দায়িত্ব। ডাক্তার মহাশয়ের প্রাথমিক অবস্থার কথা, যা বর্তমানে তাঁর কাছে প্রাগৈতিহাসিক কিন্তু ভুক্তভোগীদের কাছে সেদিনের কথা, তা শুনে পূবে বাঙলার তেভাগার গান মনে পড়ে যায়:—

বিকান থাকি আলরে কাইয়া
হাতে লইয়া ঘটি।
আস্তে আস্তে নিলরে ডাইয়া
মোদের দ্যাশের মাটি॥
হীন দ্যাশের নাড়িভা কাইয়ারে
মোর মাটি নিল।
পেটের ভোখে তেভাগা চাইতে
মারিল ডাংগালু॥

এই স্বনামধন্য ডাক্তার মহাশয় ঠিক এইভাবে রিক্ত হস্তে ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। পেয়েছেনও তাঁকে। আজ বাদাবনে তাঁর অনেক বেনামী জমি। কলকাতায় লক্ষাধিক টাকায় তৈরি বাড়ি। ভালই আছেন! সাফকবুলিয়তের কল্যাণে কত হতভাগ্যের অবলম্বন তাঁর দখলে। তাঁর অনেক খেলাই দেখেছে স্থানীয় লোক। কেবল একটি দেখা বাকী। তিনি কোন্ দলে যাবেন?

বেলা পড়ে গেছে। কয়েক পশলা বৃষ্টি হোয়ে বাজারের অবস্থা সঙ্গীন। সাবধানে পা ফেলে কৈলাসের দোকানে যাচ্ছি। পথে এক বুড়ী পা ভেঙেছে। তাকে ঘিরে ছোট্ট একটা ভিড়। কাদায় টাল রাখতে পারে নি বেচারী। ঘর কোথায় ওর?
—নারাণ, যাবে নাকি?
—হ্যাঁ, আমি তৈরি।
—লণ্ঠন আছে সাথে?
—হেরিকেন আছে।
—ভরতগড় কত দূরে?
—আড়াইকোশ। কাপড় গুইটে নিবেন। কাদা ভাঙতি হবে।
—ঠিক আছে, চল।
—আজ সেথাই থাইকবেন।
—কার ঘরে?
—মোর বান্ধবের কাছে।
—ভালই তো।

—মোর মাতায় একটা পেলেন আছে। শুনবেন?
—কিরকম?
—মোর মত অভাগাদের নে এ মানষেলা ছেড়ে যাব।
—উঠবে কোথায়?
—কেন? বাদায়! সিখানে জংগল কেটে বসতি হবে। সেথা মোরা লক্ষ্মীর সংসার পাতব।
—তারপর?
—সেথা মোরাই সব। জোতদার, মহাজন কেউ যাবে নি। গেলেই মাতা নেব।
—পালিয়ে যেতে চাইছ?
—পালাচ্ছি কোথায়!
—তবে আবার কি? দু'চারটে জোতদারের ভয়ে বাদায় গিয়ে উঠবে?
—যাব না?
—কখনোই না। এখানেই থাক। তোমার গাঁয়েই লক্ষ্মীর আসন পড়বে। তার আগে সবাই মিলে ওদের তাড়িয়ে দাও।
—সবাই যে মিলে না দাদা!
—মিলতেই হবে। নইলে ভুগবে যে। যেখানেই যাও ওরা পিছু নেবে।
—ভরতগড়ের হেংগামায় এক পার্টি ডাকাত লাগায়েছিল। তাদিগের একজন পাকিস্তানে পাইলেছে। আসলে জোতদার বেটাই ইসবের মূলে।
—তবুও এক হবে না?
—হব, হোতি হবে।
—পড়শীদের বুঝিও, বিবাদ করে লাভ নেই।
—বিবাদটা বাবুভেয়েরাই লাগায়। তারা মোদের লিডার সাজতি আসে। ইদিকে তারা নিজেরাই এক নয়।
নারাণ মোক্ষম জায়গায় ঘা দিয়েছে। কি উত্তর দেব?
এরপর আর কোনও কথা হোল না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে, পঙ্কিল পথে, শামুকের সুতীক্ষ্ণ খোলায় পা রেখে এগিয়ে গেলুম। *

* আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত।

মলয়
স্যাণ্ডাল সোপ
ও
মলয়
স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌ক

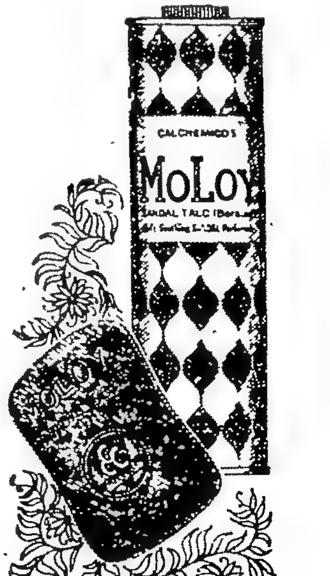

দুয়ে মিলে
আপনাকে সারাদিন
চন্দন সৌরভে
ভরপুর রাখবে

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

শারদীয় সংখ্যা ঃ ১৩৭৩

মানবমন—সম্পাদক ঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পাভলভ ইনস্টিটিউট, ১৩২/১এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৪। দাম ঃ ২·৫০ (শারদ সংখ্যা)

পত্রিকাটি হাতে নিয়েই বলা যায়, বাংলা ভাষায় এ জাতীয় রচনা অন্যত্র দুর্লভ। আট বছর ধরে পত্রিকাটি চলছে এবং একমাত্র নিজস্ব গুণেই এটি বিদগ্ধজনের হৃদয় জয় করেছে। মনস্তত্ত্বের ব্যাপারগুলি জানার জন্য সাধারণ পাঠকরা পত্রিকাটি নিয়মিত পড়লে উপকৃত হবেন। শারদীয় সংখ্যাটিতে বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে আছে, দেহে মনের সংস্থান, কুট্টনীমতম্, সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির মূল্যায়ন, মানবমনের ক্রমবিকাশ, ধর্ম প্রসঙ্গে লেনিন, শ্রীঅরবিন্দের কবিতা, সুপ্রজনন তত্ত্বে লেনিনবাদের সার্চলাইট, বুদ্ধির মান, মার্কসীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীবাদ। এছাড়া আছে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। লিখেছেন রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, নৃপেন্দ্র গোস্বামী, কালিদাস বসু, বিষ্ণুরঞ্জন গুহ, মনোবিদ, গেরম্যান এল্‌কিন, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, নিকোলাই মিনায়েভ, শ্রীকুইকসট প্রমুখ।

উত্তরণ—সম্পাদক ঃ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। ৩১১ গাঙ্গুলী বাগান, কলকাতা-৪৭। দাম ঃ এক টাকা।

শারদীয় উত্তরণের উৎকর্ষ লক্ষণীয়। সুনির্বাচিত কবিতা, গল্প ও কয়েকটি মূল্যবান অনূদিত চিঠির মাধ্যমে এ যুগের হৃদয়ের প্রসারতা ও মানবিক ভাবনা-চিন্তা পরিস্ফুট। ইয়ে তিং যোগ দিয়েছিলেন ১৯২৫-২৭-এর মহাবিপ্লবে। তাঁর একটি কবিতার অনুবাদ করেছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র—যা পড়লে আশ্চর্য এক শিহরণের সৃষ্টি করে। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, অন্নদাশঙ্কর রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, অরুণ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য গোপাল ভৌমিক, সুশীল রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, জয়ন্ত সাহা, শোভন সোম, রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত প্রমুখ। হো চি মিনের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ উল্লেখ্য। ভবতোষ দত্ত লিখেছেন মোহিতলালের সাহিত্যতত্ত্ব। র‍্যাঁবো ও রিলকের চিঠিগুলি আকর্ষণীয়।

নন্দন—সম্পাদক ঃ সৈয়দ শাহেদুল্লাহ। ২ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ঃ তিন টাকা।

শারদীয় সংখ্যাগুলির মধ্যে 'নন্দন'-এর বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা প্রশংসনীয়। পত্রিকাটির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ হচ্ছে এর বারোটি প্রবন্ধ। অনিমেষ রায়চৌধুরী অনূদিত মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর ওয়ার্কার্স এন্ড পেজেন্টস পার্টি সংক্রান্ত লেখাটি ভারতের আগামী দিনের ইতিহাস রচয়িতাদের নতুন পথ প্রদর্শন করবে। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে আছে—কেরালা যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতা, সংস্কারবাদীর দর্পণে সংস্কারবাদের স্বরূপ, ভিয়েতনামের শিক্ষা ও স্মৃতি, মুক্তিযোদ্ধা হো চি মিন, গান্ধীবাদ না লেনিনবাদ, সোভিয়েতে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী, মার্ক্সবাদকে বিকৃত করার দুটি ঝোঁক, গান্ধীজী ঃ কিছু তত্ত্বের আলো, সাহিত্য প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন, রাজনৈতিক উপন্যাস, 'বিজয়ী পেলে' ও মার্টিন এন্ডারসেন নেকসো। লিখেছেন ঃ বি টি রণদিভে ; এম বাসবপুন্নাইয়া ; অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ; হরেকৃষ্ণ কোঙার ; সমর মুখার্জী ; ডি জি এস- ; সুধাংশু দাশগুপ্ত ; সৈয়দ শাহেদুল্লাহ ; মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল ; রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ; ছবি বসু ; উপন্যাস লিখেছেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী। তিনটি গল্পের লেখক তপোবিজয় ঘোষ, দেবদত্ত রায় ও মনোরঞ্জন হাজরা। নাটক লিখেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। কবিতা ঃ পনেরটি। সমাজ ও জীবনের মূল্যায়নই কবিতাগুলিতে অনুরণিত। ব্যঙ্গ কবিতাগুলি অকপট। কবিদের মধ্যে উল্লেখ্য দীপঙ্কর চক্রবর্তী, সুনির্মল কুণ্ডু, সুকুমার ভট্টাচার্য, মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত, অসীম দাস, প্রতিমা সরকার, শ্যামসুন্দর দে, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, গোপীনাথ দে, অমল চক্রবর্তী, সুদর্শন রায়চৌধুরী, কনক মুখোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, বর্ণ বসু, শ্যামল সেন। কয়েকটি স্কেচ সুন্দর।

ক্রান্তি—সম্পাদক ঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ডি, লিট। ৮বি, কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম ঃ দু টাকা। শোভন সংস্করণ ৪্।

আলোচ্য বিশেষ বর্ধিত সংখ্যাটি গান্ধীজীর আদর্শবাদ ও জীবন সংক্রান্ত। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে ঃ "গান্ধীজী সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশিত রচনাসমূহ গান্ধীজী সম্পর্কে গভীরতর আগ্রহ সৃষ্টি করার কাজে কথঞ্চিৎ সহায়তা করতে পারলেই ক্রান্তির উদ্যোগের সার্থকতা। পূর্বনির্দিষ্ট ধারণাসঞ্জাত ছাঁচে-ফেলা সূত্রাবলীর অন্ধ ভজনা নয়, মুক্তবুদ্ধির উদ্‌বোধনই আমাদের অভিষ্ট।" নীহাররঞ্জন রায়, ত্রিদিব চৌধুরী, নির্মলকুমার বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিমানবিহারী মজুমদার, বিনয় ঘোষ, ফণী রায়, অরবিন্দ পোদ্দার, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরীর বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধগুলি গভীর আগ্রহে পাঠ করে মনে হ'ল কিছু জানলাম এবং সম্পাদক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। পুস্তক পরিচয় বিভাগটি মূল্যবান। কবিতা ক্রোড়পত্রে লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, মানস রায়চৌধুরী, বাসুদেব দেব।

সারস্বত—সম্পাদক ঃ অমিয়কুমার ভট্টাচার্য। ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দাম ঃ ১·৫০।

ইতিমধ্যে বুদ্ধিজীবী মহলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি সাড়া জাগিয়েছে। আগেকার কয়েকটি সংখ্যা আমরা দেখেছি এবং পত্রিকাটির উচ্চ স্ট্যান্ডার্ড আমাদের মনে একটা আশার সঞ্চার করেছে। আলোচ্য শারদ সংখ্যাটিতে প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে, আমাদের শিক্ষা-চিন্তাহীনতা ও শিক্ষাব্যবস্থা, প্রেমের কাব্য ঃ জন ডান, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চায় রমেশচন্দ্র দত্ত, পুঁজিবাদী উৎপাদন—পুঁজি সঞ্চয় ও বেকার শ্রমিক কাহিনী, একটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ও বাংলার পট। লিখেছেন বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, অশোকদেব চৌধুরী, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, সুনীল সেন, রণেন নাগ ও দেবপ্রসাদ ঘোষ। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুশীল রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর প্রমুখ। এছাড়া আছে চারটি গল্প, একটি কাব্য-

নাট্য। তিনটি চিত্রই চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান। চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়। অন্যটি একটি দুর্লভ পাণ্ডুলিপি চিত্র। প্রচ্ছদ-চিত্রে কৃষ্ণলীলাপট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বৈতানিক—সম্পাদক : ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : দু' টাকা।

অন্যান্যবারের চেয়ে 'বৈতানিক' এবার আরো আকর্ষণীয়। প্রবন্ধ, আলোচনা, স্মৃতিচারণ, বড় গল্প, নাটক, একগুচ্ছ ছোট গল্প ও কবিতায় পত্রিকাটি পাঠকদের চিত্ত জয় করবে। বাংলাদেশে পত্রিকা বের করা যে নিছক খেয়াল নয়, পাঠকদের কাছে সত্যিকারের কিছু তুলে ধরা—সম্পাদক তার প্রমাণ রেখেছেন। বস্তুত তিনি চমকপ্রদ কিছু করতে চান নি; কিন্তু পত্রিকাটি চমৎকারিত্বে উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটিতে লিখেছেন প্রায় ৫৮ জন লেখক। ভিন্নধর্মী মননে, বিভিন্ন স্বাদের লেখা। লেখকদের মধ্যে আছেন ডঃ রমা চৌধরী, প্রবোধকুমার সান্যাল, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, বিশ্ব মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুশীল রায়, গোপাল ভৌমিক, ভবানী মুখোপাধ্যায়, ডঃ অমিয়কুমার হাটি প্রমুখ।

একক—সম্পাদক : শুদ্ধসত্ত্ব বসু। ২১ কালী টেম্পল রোড, কলকাতা-২৬। দাম : এক টাকা।

এককের শারদীয় সংখ্যাটিতে বহু নামী-অনামী লেখক রয়েছেন। এই কবিতা-পত্রিকাটির প্রতি প্রায় প্রতি কবির একটা প্রচ্ছন্ন দরদ রয়েছে। সম্পাদকও একে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন দেখে আমরা খুশি—কারণ বাংলা কবিতা পত্রিকাগুলি দুদিন আসরে এসে হঠাৎ বিদায় নেয়। তবে এককের প্রয়োজন নিজস্ব রীতি-নীতি।

সবুজ কলি—উৎপল হোমরায়। ১৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা-৪। দাম : এক টাকা।

সচিত্র শিশু-মাসিক পত্রিকাটির শারদীয় সংখ্যাটি ছোটদের খুশি করবে। ছোট ছোট লেখা ছোটদের জন্যই, কিন্তু ভারী মজার মজার। কী গল্প, কী কবিতা বা ছড়া পড়লেই মনে দোলা লাগে। লিখেছেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে আছেন : স্বপনবুড়ো, নির্মলেন্দু গৌতম, নগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার, কুমারেশ ঘোষ, রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

শারদীয়া লোকসেবক (১৩৭৬) সম্পাদক—সুধাংশু রায়। ৮৬এ, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা—১৪। দাম—তিন টাকা।

বিচিত্র স্বাদের গল্প কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদিতে সুসজ্জিত শারদীয়া লোকসেবক পাঠকদের মনোরঞ্জন করবে। শ্রদ্ধেয় মুজাফ্‌ফর আহমদ-এর একটি রচনা পত্রিকাটিতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন দীপালি সিংহ ও সুধীর ব্রহ্ম। রণেন নাগ-এর প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখ্য। তারাপদ লাহিড়ীর উপন্যাস 'নিগৃহীতা' ভাল লাগবে। নিবেদিতা দাস-এর সুলিখিত নাটক 'অক্টোবর বিপ্লব ও লেনিন' পত্রিকাটির অন্যতম সম্পদ। গল্প লিখেছেন পরেশ দাশ, বিরাজ দাশগুপ্ত, আরতি বসু, অসিতকুমার চন্দ্র, তপনকুমার ভট্টাচার্য, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সরোজেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী, জীবনময় দত্ত, প্রতিমা অধিকারী, ভানুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় ও সুরজিৎকুমার মজুমদার। কতকগুলি সুন্দর কবিতা উপহার দিয়েছেন কবি দুর্গাদাস সরকার, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, রজত রায়চৌধুরী, দিপালীকুমার বাগ, মুরারি দে, কৃতী সোম ও অমিয়কুমার হাটি।

শারদীয় জনমত (১৩৭৬) সম্পাদক : মুকুলেশ সান্যাল। বীণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড, জলপাইগুড়ি। দাম : দু' টাকা।

উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় প্রগতিবাদী পত্রিকাটির বর্তমান শারদীয় সংখ্যা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজ বিষয়ক বিবিধ রচনায় সমৃদ্ধ সুসজ্জিত সঙ্কলনটি বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। হরেন ঘোষ-এর গল্পে বিশিষ্টতার ছাপ আছে। সুন্দর সুন্দর জীবনভিত্তিক গল্প লিখেছেন নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু ভৌমিক, বিমান সরকার, বিকাশচন্দ্র ঘোষ, সুব্রত গোস্বামী ও সুরজিৎ বসু। কবিতার অর্ঘ্য সাজিয়েছেন দুর্গাদাস সরকার, রজত রায়চৌধুরী, বেণু দত্তরায়, অরুণ মিত্র, অর্ণব সেন, নিখিল বসু, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস ঘোষ, সতী সেনগুপ্ত, কানাই গঙ্গোপাধ্যায়, মলয় সেনগুপ্ত, কানাই গঙ্গোপাধ্যায়, মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ষষ্ঠী বাগচী, বরেন রায়, কমলেন্দু রায়, পরিমল দে, বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, মোহিত ঘোষ, অমিয়কুমার হাটি প্রমুখ। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র সান্যাল, ভবানীগোপাল সান্যাল, বনবিহারী দত্ত, নির্মলকুমার সেন, মালবিকা সান্যাল, সুশান্ত পাল ও সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

একসাথে (শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৬) সম্পাদিকা : কনক মুখোপাধ্যায়। ২, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : দেড় টাকা।

অন্যান্য আর পাঁচখানা শারদীয় সঙ্কলনের সঙ্গে তুলনা করলে মহিলা সাহিত্যিকদের লেখা এই পত্রিকাটির [illegible] চিন্তাধারা, আদর্শ ও জীবনবাদ পত্রিকাটির মূল সুর। কনক মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্মী রায়, পাথরপ্রতিম রায়, ঊষারাণী ভট্টাচার্য, মহুয়া চক্রবর্তী প্রভৃতির কবিতা সংগ্রামমুখর। রাজনীতি, সমাজনীতি, স্বাস্থ্য, শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে মূল্যবান কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন মঞ্জরী গুপ্ত, মাধুরী দাশগুপ্ত, বিমলা রণদিভে, স্মৃতি চট্টোপাধ্যায়, অনীতা মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রেণুকা রায়, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, কমল সেনগুপ্ত, জ্যোতি চক্রবর্তী ও লীলা সুন্দরায়া। বিদেশী কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করেছেন পদ্মা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রণতি ঘোষ। সন-ইট-এর একটি নাটকের অনুবাদ করেছেন গৌরী ঘোষাল। গল্প লিখেছেন সুপ্রিয়া আচার্য, ছবি বসু, জাহ্নবী আইচ-সরকার, শিপ্রা দত্ত, অণিমা ভট্টাচার্য ও মঞ্জু বসু।

শারদীয় নর-নারী—সম্পাদক : সুবোধ মিত্র। সহঃ সম্পাদক—মোহন মিত্র। ৭, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯। দাম : সাড়ে তিন টাকা।

ইদানীং বিদেশ থেকে আগত এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অর্থে বাংলাদেশের বাজারে বাজিমাৎ করতে চাইছে একশ্রেণীর বিকৃত রুচির যৌন পত্রিকা। ওগুলি কিছু বড় পত্র-পত্রিকার প্রশ্রয়পুষ্ট। যাহোক নর-নারী ও-শ্রেণীতে পড়ে না। এটি বাংলাদেশের একমাত্র বিজ্ঞাননির্ভর মনস্তত্ত্বমূলক প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা। যৌনতা এই পত্রিকায় অচ্ছুৎ নয়, তবে তা মনস্তত্ত্ব, চিকিৎসা ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় ভারত তথা বাংলা, এমন কি বিদেশের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত। নর-নারীর শারদীয় সংখ্যাটি বাংলাদেশের যাবৎ সমস্ত পত্র-পত্রিকার জগতে সম্পূর্ণ নতুন জাতের ও নতুন স্বাদের। উপন্যাস ও গল্পগুলি প্রায় সেই ছাঁদেই লেখা। উপন্যাস লিখেছেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও মোহন মিত্র। বিমল করের 'নিম' একটি আশ্চর্যরকম মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী। অন্যান্য গল্প লেখকদের মধ্যে আছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কণা বসু প্রভৃতি। নর-নারীর প্রবন্ধই হচ্ছে এক অভিনব আকর্ষণ। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 'পাপ ব্যবসায় ?' প্রবন্ধে সমাজের দুষ্ট-ক্ষতের কারণগুলি অপূর্ব বিশ্লেষণ ও উদাহরণের সাহায্যে উন্মোচন করে দিয়েছেন। অন্নদাশঙ্কর রায় 'একটি প্রশ্নে' এক শ্রেণীর সন্তান অবৈধ সন্তান নামে কেন অভিহিত হবে—সে প্রশ্ন তুলেছেন। এছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, দুর্গাদাস সরকার, মানস রায়চৌধুরী, ডাঃ মদন রাণা, ডাঃ অরুণ রায়চৌধুরী, ডাঃ বিশ্বনাথ রায়, [illegible]

রঙ্গমঞ্চ এদেশে এবং ওদেশে

বিলিতি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তৃতীয় অঙ্ক

[একই দৃশ্য]

নোরা—এবারে যেতে হবে। আর ওদের কাউকে দেখতে পাব না—ছেলেমেয়ে, টরভ্যাল্ড সবাইয়ের কাছ থেকে এবার চিরবিদায় নিয়ে যেতে হবে। মরণ ছাড়া আর কোনও গতি নেই। বরফের মত ঠান্ডাজলে ডুবে মরতে হবে। দুদিন পরে দেহটা ভেসে উঠবে—দেখে কেউ চিনতেও পারবে না। এতক্ষণে ও নিশ্চয়ই চিঠিটা পড়তে শুরু করেছে। বিদায় টরভ্যাল্ড।......ছেলেমেয়েগুলোকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে একবার। কিন্তু উপায় নেই...যেতে হবেই।

[উইংসের দিকে যেতে থাকবে—হেলমারের প্রবেশ]

হেলমার—নোরা!

নোরা—(থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে)। কি বলছ?

হেলমার—(হাতের চিঠিটা দেখিয়ে)। এই চিঠিটায় কি লিখেছে জান?

নোরা—জানি, আমায় যেতে দাও টরভ্যাল্ড, বাধা দিও না।

হেলমার—কোথায় যাবে? দাঁড়াও! চিঠিতে যা লিখেছে তা কি সত্যি? কি ভয়ানক কথা। না, না, এ কিছুতেই সত্যি হতে পারে না! অসম্ভব।

নোরা—চিঠির সব কথাই সত্যি, তোমাকে এতটা ভালবাসি বলেই—

হেলমার—কি সমস্ত বাজে অজুহাত দিচ্ছ ..

নোরা—টরভ্যাল্ড!

হেলমার—তোমার মত এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন— . . . .

নোরা—আমাকে যেতে দাও, আমার জন্য তুমি কেন এ দুর্ভোগ সহ্য করবে—

হেলমার—অনুগ্রহ করে আর থিয়েটারী ঢং শুরু কোর না। তোমার কি এতটুকু ধারণা আছে কী বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়েছ? কি করেছ বুঝতে পার?

নোরা—(ওর দিকে চেয়ে থাকবে এবং নির্লিপ্তর সঙ্গে বলবে) হ্যাঁ, এখন সবই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

হেলমার—এতকাল যেন ঘুমিয়ে ছিলাম। আট বছর ধরে যে ছিল আমার সমস্ত গর্ব, সমস্ত অহংকারের একমাত্র অধিকারী—আজ দেখছি, অতি হীন প্রতারণা আর মিথ্যা দিয়ে সে এতকাল আমাকে ভুলিয়ে এসেছে। ছিঃ ছিঃ এ আমার কল্পনারও অতীত ছিল। অবশ্য আগেই আমার ভাবা উচিত ছিল যে, এমনি একটা কিছু ঘটবে। বাবার চরিত্রের অসংযম যে মেয়ের মধ্যে আসবে সে তো জানা কথা। ধর্ম, নীতি, কর্তব্যজ্ঞান এসব যিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না, তাঁর মেয়ে আর এর থেকে কি ভাল হবে।

নোরা—তুমি ঠিকই বলেছ।

হেলমার—আমার সমস্ত আশা, আনন্দ, ভবিষ্যৎ সব নষ্ট হয়ে গেল। তোমার হঠকারিতায় একটা শয়তানের কবলে গিয়ে পড়লাম। এখন আমাকে দিয়ে ও যা খুশি তাই করাবে।

নোরা—আমি সরে গেলেই তোমার মুক্তি।

হেলমার—দয়া করে আর বক্তৃতা দিও না। তোমার বাবাও এমন অনেক বড় বড় কথা বলতেন। চলে যাবে—তাতেই বা আমার কি লাভ হবে? এই ব্যাপারটা তো ও সবার কাছে রটিয়ে দিল বলে—তখন সবাই মনে করবে এই জালিয়াতির ব্যাপারে আমিই আসল বুদ্ধিদাতা। আমার এত ভালবাসা, এত বিশ্বাসের সুন্দর প্রতিদান। এখন বুঝতে পারছ কি করেছ?

নোরা—(স্তব্ধ গম্ভীরভাবে) পারছি।

হেলমার—এখনও যেন সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস হচ্ছে না ব্যাপারটা। যাই হোক আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। যে করেই হোক লোকটাকে ঠান্ডা করতেই হবে। সে উপায় আমি দেখছি। আমাদের সম্বন্ধ বাইরে থেকে দেখতে একই রকম থাকবে বটে, কিন্তু এখন থেকে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্কই থাকবে না। আর আমি ওদের তোমার হাতে দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি না।

[ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য—ম্যাডামের একটা চিঠি।

হেলমার—দেখি দাও। [চিঠি দিয়ে ভৃত্যের প্রস্থান] হ্যাঁ! ওর কাছ থেকেই এসেছে। আমিই এ চিঠি পড়ব।

নোরা—বেশ পড়।

হেলমার—[খাম খুলে চিঠি ও সেই সঙ্গে দলিলটা পাবে—চিঠি পড়তে পড়তে উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠবে]—নোরা, নোরা, আমি বেঁচে গেছি।

নোরা—আর আমি?

হেলমার—দুজনেই—ক্রগস্টাড তোমার সেই দলিলটা ফেরত পাঠিয়েছে। লিখেছে যে আগেকার ব্যবহারের জন্য ও লজ্জিত। ওর জীবনে একটা পরম সৌভাগ্য আসাতেই নাকি—যাক গে ওর কথা—আসল কথা আমরা বেঁচে গেছি। আর কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আগে এই নোংরা কাগজটা নষ্ট করে ফেলি (ছিঁড়ে ফেলে দেবে)—ক্রগস্টাড লিখেছে যে, ক্রিসমাসের সন্ধ্যা থেকে এই তিনটে দিন যে তোমার কিভাবে কেটেছে—

নোরা—মৃত্যুযন্ত্রণা যে কাকে বলে এই তিন দিন আমি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি।

হেলমার—নোরা।—আমি বেশ বুঝতে পারছি এ কদিন কি কষ্টে তোমার কেটেছে। নাঃ—ওই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা আর মনে করব না। বিপদ কেটে গেছে এইটাই সবচেয়ে বড় কথা। এখন থেকে আমরা শুধু আনন্দ করব। কিন্তু এরকম গম্ভীর হয়ে আছ কেন নোরা। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে আর কোনও ভয় নেই। এ রকম ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন? ও ভাবছ বুঝি আমি তোমাকে ক্ষমা করি নি—বিশ্বাস কর আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করেছি। আমি কি বুঝি না আমাকে এতটা ভালবাস বলেই একাজ তুমি করেছিলে।

নোরা—ঠিক তাই।

হেলমার—স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে গভীর ভালবাসা থাকা উচিত তাই তুমি দেখিয়েছ, কিন্তু শুধু বিবেচনার অভাবেই তুমি ভুল পথে গিয়েছিলে। আর ভয় নেই, এখন থেকে সব দায়িত্ব আমার। কিভাবে তুমি চলবে, কিভাবে কি করবে এবার থেকে আমিই বলে দেব। জান নোরা, এই অসহায় ভাবটা তোমার নারীত্বকে আরও সুন্দর, আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রথমটায় এ ব্যাপারে আমি এতো হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম বলেই তোমাকে কতগুলো কড়া কড়া কথা বলে ফেলেছি। ওসব কথা ভেবে আর মন খারাপ কোরো না। এখন তোমাকে আমি সত্যি সত্যি মনে প্রাণে ক্ষমা করেছি।

নোরা—তোমার এই উদারতার জন্য অনেক, অনেক ধন্যবাদ টরভ্যাল্ড।

হেলমার—চল এবার ঘুমোতে যাওয়া যাক।

নোরা—আজ আমার ঘুম হবে না।

হেলমার—কিন্তু নোরা—

নোরা—এখনও বেশি রাত হয় নি, এখানে এসে বোসো টরভ্যাল্ড। তোমার আর আমার মধ্যে আজ খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা হওয়া দরকার।

হেলমার—ব্যাপার কি নোরা? তোমার মুখ মড়ার মত স্তব্ধ, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে?

নোরা—ঠিক হতে খানিকটা সময় আমার লাগবে, তোমাকে অনেক কিছু বলবার আছে।

হেলমার—তোমাকে জানি কি রকম অস্বাভাবিক লাগছে, আমি ঠিক তোমাকে আজ বুঝে উঠতে পারছি না।

নোরা—তুমি আমাকে কোন দিনই ঠিক বুঝে উঠতে পার নি। টরভ্যাল্ড। আমিও আজকের রাতের আগে এতকাল তোমাকে ভুল বুঝেই এসেছিলাম।

হেলমার—তার মানে?

নোরা—আজ আট বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এই আজই বোধহয় প্রথম আমরা স্বামী-স্ত্রী এভাবে সিরিয়াসলি কথা বলছি।

হেলমার—তার মানে?

নোরা—আমাদের এই আট বছরের বিবাহিত জীবনে—শুধু তখন থেকে কেন—তারও আগে যখন থেকে তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে—তুমি, আমি কখনও সিরিয়াস ব্যাপারের আলোচনা করি নি।

হেলমার—আমার কাজকর্ম সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার কথা নিয়ে আলোচনা করলে তোমাকে শুধু শুধু বিরক্ত করা হোত নোরা।

নোরা—সে সবের কথা নয়। আমি শুধু এই বলতে চাই যে: কোন ব্যাপার নিয়েই আমরা স্বামী-স্ত্রী বসে কখনও গভীরভাবে আলোচনা করবার সুযোগ পাই নি।

হেলমার—কিন্তু তাতে কি লাভ হোত বলতে পার?

নোরা—সেই কথাই বলছি। আজ পর্যন্ত তুমি আমাকে একটুও বোঝবার চেষ্টা কর নি টরভ্যাল্ড। আমার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করেছ তোমরা—প্রথমে বাবা—তারপরে তুমি—

হেলমার—অর্থাৎ যারা দুজন পৃথিবীতে তোমাকে সবচেয়ে ভালবেসেছে।

নোরা—এ বিষয়ে তুমি নিজেকেও ঠকিয়েছ টরভাল্ড—আমাকে তুমি সত্যিকার ভালবাস নি কোনদিনই। আমাকে ভালবাস এই কথাটা ভেবেই তুমি মনে মনে আনন্দ পেয়েছ।

হেলমার—এ সব কি বলছ?

নোরা—সত্যি কথাই বলছি। বাবার ওখানে থাকতে সব ব্যাপারে তাঁর মতামতই খাটত। বিরক্ত হবেন বলে, আমার নিজের মতামত কখনও ব্যক্ত করতে সাহস পেতাম না। বিয়ের পর হল হাত বদল—তোমার ইচ্ছা মতই সব কিছু হয়ে এসেছে এ সংসারে। আমারও যে একটা নিজস্ব মতামত থাকতে পারে, সে কথাটা বোধহয় তোমার কখনও মনে হয় নি। তোমাকে খুশি করার জন্যই যেন আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। আজ বুঝতে পারছি তুমি আর বাবা আমার কি সর্বনাশ করেছ। তোমাদের দুজনের জন্যই আমার সমস্ত জীবনটা এভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।

হেলমার—এখানে কি তুমি কোনই সুখ পাও নি?

নোরা—আমোদ করেছি যথেষ্ট—কিন্তু আনন্দ পাই নি। আমাদের ঘর-কন্নাটা যেন পুতুলের খেলাঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরনো বাড়িতে ছিলাম বাবার Dollchild—আর এখানে এসে হয়েছি তোমার Dollwife।

হেলমার—হয়তো তোমার কথায় খানিকটা সত্য আছে। যাই হোক সামনে রয়েছে ভবিষ্যৎ—খেলার পালা শেষ করে, এসো আমরা শেখবার অধ্যায় শুরু করি।

নোরা—কার শেখবার পালা? আমার, না আমার ছেলেমেয়েদের?

হেলমার—তোমারও—ছেলেমেয়েদেরও।

নোরা—আমাকে যোগ্য স্ত্রী হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষমতা তোমার নেই টরভ্যাল্ড।

হেলমার—একথা তুমি বলতে পারলে—

নোরা—আর ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার যোগ্যতাই বা আমার কোথায়?

হেলমার—নোরা—

নোরা—একটু আগে তুমি নিজেই আমায় বললে না যে আমার হাতে ছেলে-মেয়েদের ভার দিয়ে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না।

হেলমার—রাগের মুখে কি বলেছি সেইটাই এতবড় করে ধরবে?

নোরা—তুমি ঠিকই বলেছিলে। সত্যিই ও কাজের যোগ্যতা আমার নেই। তার আগে নিজেকে গড়ে তোলার দরকার। সেইজন্যই এখন তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই।

হেলমার—কি বললে?

নোরা—নিজেকে জানতে হলে, চারপাশের সব কিছুকে বুঝতে হলে—প্রথমে আমার একলা হওয়ার দরকার। সেই-জন্যই আর তোমার সঙ্গে আমি থাকতে পারি না।

হেলমার—নোরা—

নোরা—এখনি আমি এখান থেকে চলে যাব। আজ রাতটুকু ক্রিস্টিনের ওখানে নিশ্চয় আশ্রয় পাওয়া যাবে।

হেলমার—নোরা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

নোরা—আর আমাকে বাধা দিয়ে লাভ নেই টরভ্যাল্ড। যেতে আমাকে হবেই। পুরনো বাড়িতে গিয়েই উঠব। যা হোক একটা কাজ ওখানে জুটিয়ে নিতে হবে।

হেলমার—স্বামী, ছেলেমেয়ে, ঘর—সব ছেড়ে যাবে? লোকে কি রকম কুৎসা রটাবে ভেবে দেখেছ কি?

নোরা—ওসব কথা ভাববার সময় আমার নেই। নিজেকে তৈরি করাই এখন আমার সবচেয়ে বড় কাজ। আজ বুঝতে পারছি—প্রত্যেক মানুষের প্রধান কর্তব্য নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা।

হেলমার—কিন্তু তোমার সবচেয়ে বড় কর্তব্য—স্ত্রী হিসাবে, মা হিসাবে—

নোরা—ওসব কথায় আর আমার বিশ্বাস নেই—

হেলমার—তোমার কি ধর্মবোধ বলেও কিছু নেই?

নোরা—ধর্ম জিনিসটা যে কি আজ পর্যন্ত আমি তাই বুঝে উঠতে পারলাম না।

হেলমার—কিন্তু বিবেক - সুনীতি-দুর্নীতি...

নোরা—এসব সম্বন্ধে কোন ধারণাও নেই, আর ভেবেও কূলকিনারা পাওয়া যায় না। আইন সম্বন্ধে আমার যা ধারণা ছিল আসল আইনের সঙ্গে তার কত তফাৎ তা আগে জানতাম না। তাই বলে একথাও স্বীকার করব না যে, আইন যা করে তাই ঠিক। যে আইন মতে মেয়ে মরণাপন্ন পিতাকে চিন্তার হাত থেকে রেহাই দিতে পারে না বা স্বামীর জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারে না, সে আইন যে খুব নির্ভুল এ কথাও আমি মানি না।

হেলমার—তুমি নিশ্চয় খুব অসুস্থ—কদিন চিন্তায় চিন্তায় তোমার মাথারও ঠিক নেই—তা না হলে স্বামী ছেলেমেয়েদের ছেড়ে—

নোরা—আমাকে যেতেই হবে।

হেলমার—তবে কি আমার প্রীতি ভালবাসাও তোমার আর নেই?

নোরা—তোমাকে ব্যথা দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে টরভ্যাল্ড—তবু সত্যি কথা না বলে উপায় নেই—সত্যিই তোমায় আর ভালবাসি না—আর সেই জন্যই এই বাড়িতে আর থাকতে চাইছি না!

হেলমার—নোরা বুঝতে পারছি না কি করে তোমার ভালবাসা আমি হারালাম—

নোরা—আজ রাতের একটা ব্যাপার, একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটবার আশায় উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিলুম—সেটা কিন্তু ঘটল না, সঙ্গে সঙ্গে একথাটাও পরিষ্কার হয়ে গেল, তোমাকে আমি যে ধরণের মানুষ মনে করতাম আসলে তুমি তা নও।

হেলমার—তোমার কথাবার্তা ক্রমশ হেঁয়ালীপূর্ণ হয়ে উঠছে—কিছুই বুঝতে পারছি না।

নোরা—এই আট বছর ধরে প্রতীক্ষা করছিলাম যে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে। জানি যে এ ধরণের ঘটনা প্রতিদিন ঘটে না। তারপর এল আমার জীবনে দুর্যোগের রাত্রি। মনে হোল এইবার সময় হয়েছে সেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটবার। ক্রগস্টাডের চিঠি পেয়ে তুমি যে ভয়ে তার সর্তে রাজী হয়ে যাবে এ ছিল আমার ধারণার অতীত।

হেলমার—তার ফল কি হোত! তোমার ওপর এসে পড়ত রাজ্যের কলঙ্ক আর লজ্জা।

নোরা—আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে তার পরে তুমি এসে সমস্ত দোষ নিজের ওপর নেবে।

হেলমার—নোরা!

নোরা—অবশ্য তোমার এই স্বার্থত্যাগ আমি কিছুতেই মেনে নিতুম না। এই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটবে বলেই আমি উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম আর মনে মনে ভয়ও পেয়েছিলাম যে, তোমাকে বিরত করবার জন্য শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না।

হেলমার—তোমাকে সুখী করবার জন্য আমি তো দিনরাত্রি পরিশ্রম করতে—সবরকমের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে কখনও অস্বীকার করি নি নোরা। যাকে ভালবাসি তার জন্য সব রকম কষ্ট সওয়া যায়—কিন্তু কোন স্বামীই স্ত্রীর দিকে চেয়ে আত্মসম্মান আর সুনাম নষ্ট করতে রাজী হবে বলে আমার মনে হয় না।

নোরা—কিন্তু বহু নারীই তার ভালবাসার পাত্রের জন্য এ ধরণের আত্মবিসর্জন করতে দ্বিধা করে নি।

হেলমার—এ তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বলছ—

নোরা—হয়ত তাই। কিন্তু আমি যে পুরুষকে স্বামীরূপে চেয়েছিলাম, তার কাছ থেকে এ ধরণের চিন্তাধারা বা কথাবার্তা আশা করি নি। দলিলটা ফেরত পাওয়া মাত্র তোমার ভয়ের কারণ চলে গেল—আর আমার বিপদের কথাটা তুমি একবারও ভাব নি—তোমার শুধু চিন্তা ছিল তোমাকে কি বিশ্রী অবস্থায় পড়তে হবে। ব্যাপারটা মিটে গেলে তুমি এমন ব্যবহার করতে লাগলে যেন কিছুই ঘটে নি। এখন থেকে আর আমি তোমার স্কাইলার্ক আর ডল হয়ে থাকতে চাই না। তা না হলে ভবিষ্যতে এ পুতুল স্ত্রীটিকে কত সাবধানে, কত নজরে নজরে রাখতে হবে সেই চিন্তাতেই তোমাকে মগ্ন হয়ে থাকতে হত। আজই আমি প্রথম উপলব্ধি করলাম যে, এতকাল ধরে একজন অপরিচিতের সঙ্গে ঘর করে এসেছি। কথাটা ভাবতেও আমি এখন শিউরে উঠছি।

হেলমার—(দুঃখিতভাবে) বুঝতে পারছি নোরা আমাদের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান এসে গেছে, আচ্ছা, কোন রকমেই কি সেটা ভরে দেওয়া যায় না?

নোরা—এই অবস্থায় আর আমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ থাকতে পারে না। এখুনিই—আজ রাত্রেই আমাকে চলে যেতে হবে।

হেলমার—কিন্তু নিজেকে অন্যভাবে গড়ে তোলবার শক্তি আমার আছে।

নোরা—আমি সরে গেলেই তা সম্ভব হবে।

হেলমার—কিন্তু তোমার কাছ থেকে সরে যাওয়া.....না, না, নোরা, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

নোরা—যেতে আমাকে হবেই।

হেলমার—অন্তত আজকের রাত্রিটাও তুমি থাকতে পারবে না? কাল সকালে তুমি যেও—

নোরা—অপরিচিতের বাড়িতে এক রাত্রিও আমি আর থাকতে পারি না। বিদায় টরভ্যাল্ড। ছেলেমেয়েদের আর দেখতে যাবো না—ওদের নার্স আমার থেকে অন্তত ভালভাবে ওদের মানুষ করে তুলতে পারবে। আমার সংস্পর্শে ওদের খারাপ ছাড়া ভাল হবে না। বিদায় টরভ্যাল্ড বিদায়।

হেলমার—কিন্তু ভবিষ্যতে কি কখনও ফিরে আসবে না?

নোরা—সে কথা কি করে বলি, ভবিষ্যতে আমি কি হয়ে দাঁড়াই তারই ওপর সেটা নির্ভর করছে।

হেলমার—তবে কি সব শেষ হয়ে গেল?

নোরা—এই নাও চাবির গোছা। কাল ক্রিস্টিন এসে আমার জিনিসপত্র নিয়ে যাবে।

হেলমার—আমাকে কি মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে দেবে নোরা?

নোরা—তা হয় না টরভ্যাল্ড। তোমার আর ছেলেমেয়েদের কথা আমার বার বার মনে পড়বে।

হেলমার—কিন্তু তুমি তো অভাবেও পড়তে পার—অন্তত কিছু—

নোরা—তোমার থেকে কোন রকম সাহায্যই আর আমি নিতে পারি না।

হেলমার—চিরকালই কি আমাকে এমনি দূরে দূরে থাকতে হবে?

নোরা—যতদিন পর্যন্ত কোন অদ্ভুত ঘটনা না ঘটে।

হেলমার—সেই অদ্ভুত ঘটনা ঘটবার অপেক্ষাতেই এখন থেকে চেয়ে থাকব—সেইটেই হবে আমার সবচেয়ে বড় আশা।

নোরা—তা যদি ঘটে আবার মিলিত হব সত্যিকার স্বামী-স্ত্রী হিসাবে। বিদায় টরভ্যাল্ড— [প্রস্থান]

(হেলমার এসে কাউচে বসবে এবং একটি সিগারেট ধরাবে)

[ধীরে ধীরে যবনিকা]

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

হিন্দীর যথেচ্ছাচার

কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষানীতি, কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলিতে হিন্দী চালানোর নামে, যথেচ্ছাচারের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকাশবাণী কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ আওতায় থাকলেও—তা নাকি নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু হিন্দীর আধিপত্য সেখানে প্রবলপরাক্রম শক্তিতে আকাশবাণীতে অংশগ্রহণকারী অন্য ভাষাভাষী শিল্পী ও লেখকদের গিলে ফেলতে চাইছে। হিন্দীর বাড়াবাড়ি অনেক সময় সহ্য করা যায়—যদি অন্যান্য ভাষাগুলি অবহেলিত না হয়। বস্তুত হিন্দী ভাষাই এখন ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত ভাষাগুলিকে বোঝার আদি ও অকৃত্রিম মাধ্যম—এমন ধারণা কেন্দ্রীয় সরকারের। তাই অখিল ভারত কার্যক্রমে হিন্দী ভাষারই আধিপত্য! শুধু কি তাই?

কিছুদিন আগে মহাত্মা গান্ধী স্মরণে অখিল ভারত কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। আকাশবাণী, কলকাতা কেন্দ্র থেকেও ভারতের বিভিন্ন ভাষার কবিদের কবিতা বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সুসংগত ও সুষ্ঠু হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও যে অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে, তা নগণ্য বা তুচ্ছ নয়।

ভারতের বিভিন্ন ভাষার কবিদের কবিতা আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারের আগে ঐ সব মূল কবিতাগুলিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য ইতিপূর্বে বাংলাদেশের কবিদের ইংরেজি ও হিন্দীতে অনুবাদ করে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে হিন্দীর একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হয় না; দেওয়া হয় শুধু মূল ভাষায় লিখিত কবিতা ও তার সঙ্গে নাগরী অক্ষরে লিখিত মূল কবিতা এবং হিন্দী ভাষায় অনুবাদ। অর্থাৎ ইংরেজিকে বিদায় দিয়ে কবিদের হিন্দী ভাষার মুখাপেক্ষী অনুবাদের মাধ্যমে মূল কবিতাটির অনুবাদ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

আমরা জানি না এই অভিযোগ কতোটা সত্য; এবং অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে তা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার।

আশা করি, কেন্দ্রীয় সরকার উপরি-উক্ত নীতি বলপূর্বক চাপিয়ে আকাশ-বাণীকে শিল্পী ও লেখকের চোখে উষ্মার কারণ করে তুলবেন না। শক্তি থাকলেই সেই শক্তির অপব্যবহার ঘটালে তা বিপদস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কেন্দ্রীয় সরকার তথা আকাশবাণীর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি, হিন্দী চালানোর ব্যাপারে তাঁরা আকাশবাণীকে ঐভাবে ব্যবহার না করে স্বচ্ছদৃষ্টির পরিচয় দান করুন।

খবর বলছি

* * *

আগমনী গান

শারদোৎসবের প্রাক্কালে কিছু আগমনী গান পরিবেশনের ব্যবস্থা করে আকাশবাণী, কলকাতা, শ্রোতাদের আনন্দ দিতে পেরেছেন।

প্রিয় এবং পুরনো শিল্পীদের মধ্যে আঙুরবালা ও কমলা ঝরিয়ার আগমনী গানগুলি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। একটা কথা দুঃখের সঙ্গে বলছি, একালের অনেক নামকরা শিল্পী আছেন, আর্থিক স্বচ্ছলতাও তাঁদের আছে; কিন্তু বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ সম্বন্ধে তাঁরা নির্বিকার! আকাশবাণী এ ব্যাপারে কিছু কি ভেবেছেন?

সাপ্তাহিক সংবাদ-পরিক্রমা

বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদ পরিক্রমায় যাঁরা সংবাদ পরিবেশন করেন তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনোরকম অভিযোগ নেই। কিন্তু বিভিন্ন সংবাদপত্রে অনেক কৃতী সাংবাদিক থাকতেও মাত্র কয়েকজন কেন যে ঐ বিভাগে ঘাঁটি গেড়ে বসেছেন তা আমাদের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য।

আসলে বিভিন্ন সাংবাদিকদের ঐ বিভাগে আহ্বান জানালে বিষয়বস্তুর মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যেতে পারে। আশা করি, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ বিষয়টি স্বচ্ছ দৃষ্টিতে বিচার করে দেখবেন। অবশ্য, যেখানে সাপ্তাহিক সংবাদ পরিক্রমায় উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনো ব্যাপার আছে, সেখানে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করতেই হবে। তা সত্ত্বেও বলা বাহুল্য, ভিন্ন কণ্ঠস্বরের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

* * *

আকর্ষণীয় সংবাদ :

"একদিন মণিদার (মণীন্দ্র মজুমদার) অনুরোধে নৃপেনবাবু (নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার) বীরেনবাবুকে (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র) মাইক্রোফোনে অডিশন নিলেন, কিন্তু হতাশ হয়ে বললেন যে, তাঁর গলা মাইক্রোফোনের উপযোগী নয়। বীরেন-বাবু শুনে হেসে বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কয়েক মাস পরেই দেখা গেল, এই বীরেনবাবুই বেতারের জনপ্রিয় শিল্পী হয়ে দাঁড়িয়েছেন...।" (শারদীয় বেতার জগৎ, ১৯৬৯ পৃঃ ১৭৫)

—শ্রবাহন

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কঠিকো নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচূলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তর-তাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, বামরহস্য, গোপাল-পূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয় কৌষীতকী, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪.০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

কণ্টক

অভিনন্দনীয় সিদ্ধান্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদেশী গোয়েন্দা সিরিজের ছবিগুলি সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বেশ কিছুকাল পর্যন্ত কলকাতার ছবি-ঘরগুলিতে গোয়েন্দা সিরিজের ছবির জয়লাপ চলছে। যে কোন বিদেশী ছবিঘরে যান গোয়েন্দা ছবি না দেখে উপায় নেই। এই গোয়েন্দা হিচককের বা শার্লক হোমস্-এর গোয়েন্দা নয়। এ সব ছবির নায়করা রাজনৈতিক গোয়েন্দা। কখনো ওরা মধ্য এশিয়ায় গণতন্ত্র রক্ষা করছে, কখনো ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়ার জনগণকে রক্ষা করছে, কখনো চীনাদের মত দেখতে এমন একটা দেশকে শয়তানরূপে চিহ্নিত করে তার হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করছে। কখনো রাশিয়াকে নির্বোধ প্রমাণ করে গোয়েন্দারা বাহাদুরী দেখাচ্ছে। কাহিনী ছাঁকাছোঁকা রাজনৈতিক প্রচার। এই প্রচার আমেরিকার পক্ষে, বিশেষ করে আমেরিকার সি, আই, এ সংস্থার প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। আর প্রলোভন সৃষ্টি করা : গোয়েন্দা হলে কত লাভ—টাকা আর নারীদেহ দুই-ই পাওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্য ও প্রলোভনকে আড়াল করার জন্য নগ্ন নারীদেহ, যৌনতামূলক দৃশ্য সাজিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার উদ্দেশ্যটাকে ঢাকতে চায়। দিনের পর দিন অবাধে নির্বোধ দর্শকরা এই ছবিগুলি নীরবে দেখে যাচ্ছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য সংবাদপত্রের চলচ্চিত্র রিভিউতে এসব ছবির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না। এমন কি উগ্র যৌনতামূলক দিকগুলি সম্পর্কেও প্রতিবাদ করা হয় না। কেন করা হয় না—সে কথা রহস্যজনক!

যুক্তফ্রন্ট সরকারের তথ্যমন্ত্রী এই অপরাধমূলক ছবিগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কলকাতার সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে একমাত্র সাপ্তাহিক বসুমতীতে এবং দৈনিক বসুমতীতে বিদেশী ছবির পর্যালোচকরূপে সুজন এই ছবিগুলির বিরুদ্ধে অবিরাম জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। সুজনকে সমর্থন করে বসুমতী অফিসে অসংখ্য চিঠি পাঠক-পাঠিকারা পাঠিয়েছেন। এতে বোঝা যায় এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানালেন।

এই বিদেশী অপরাধমূলক চিত্রগুলি দর্শকমনকে কলুষিত করছে, মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এই ছবিগুলি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার টাকায় তৈরি হয় কি না তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই ছবিগুলি ভারতীয় ছবির ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছে। বোম্বাই-এর কিছু কিছু হিন্দী ছবি তৈরি হয়েছে এই বিদেশী ছবিগুলিকে অনুসরণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি কঠোরভাবে এই ছবিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তবে সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে। অল্পবয়স্ক ছেলে থেকে পরিণত বয়স্ক মানুষ এই ছবিগুলি দেখছে আর সমাজে নানারকম বিকৃতি দেখা দিচ্ছে। বর্তমানে সমাজজীবনে যে উচ্ছৃঙ্খলা ও বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় খোঁজ করলে দেখা যাবে তার উৎপত্তির স্থান এই সব ছবি। এ সব ছবি রোগ বীজাণু ছড়াবার মত যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করছে।

—সুসংগঠিত যুবসমাজ এই ছবিগুলি সম্পর্কে সচেতন। তার পরিচয় পাওয়া গেছে গণতান্ত্রিক যুব সংস্থা ও ছাত্র ফেডারেশন কলকাতার রাজপথে মিছিল করে এ সব ছবির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এই ছবিগুলির বিরুদ্ধে জন-বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে। লাইট হাউস ও গ্লোব সিনেমার অভ্যন্তরে বোমা পাওয়াতে প্রমাণ হয় এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা এরূপ দর্শকদেরও ক্ষমা করতে চান না। এই ঘটনাগুলি দেখে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ছিল এই ছবি-গুলির প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া। অনেক লেখালেখি ও বিক্ষোভের পরে কেন্দ্র নাইট সিরিজের ছবি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। কেন্দ্র এক্ষেত্রে নীরব দর্শক রয়েছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে জনসাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করলেন। আশা করব এই সিদ্ধান্ত কেবল কাগজে-কলমে থাকবে না, অবিলম্বে কার্যকরী করা হবে। এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার সময় পূর্বাঞ্চলের সেন্সর বোর্ডকেও পুনর্গঠিত করার বিষয়ে রাজ্য সরকার পরামর্শ দিতে পারেন। সেন্সর বোর্ড গঠিত হওয়া দরকার প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে। যাঁরা ছবির রাজনৈতিক খেল বুঝতে পারেন। —সুজন

মাধবী মুখার্জী

চিত্র আলোচনা

ভুবন সোম

মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' ছবিটি কলকাতায় মুক্তি লাভ করেছে। ছবিটি সিনেমা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে যে কয়জন পরিচালকের ছবি দেখার জন্য শিক্ষিতসমাজ আগ্রহ দেখান তাঁদের মধ্যে অন্যতম মৃণাল সেন। সাধারণত পণ্যচিত্র বলতে আমরা যা বুঝি—এই ছবি তার চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র। ছোট্ট এক কাহিনীকে অবলম্বন করে স্বচ্ছন্দ গতিতে সুন্দর দৃশ্য রচনা করে অভিনয়ের প্রাণবন্ততায় ছবিটি অগ্রসর হয়েছে। আঙ্গিক রচনার দিক থেকে এই ছবি মৃণাল সেনের পূর্ববর্তী ছবিগুলি অপেক্ষা উন্নত এবং নতুনত্বের দাবি করতে পারে। আমাদের দেশে পণ্যচিত্রের যে মান সে তুলনায় তো এই ছবি অনেক বছর এগিয়ে আছে। শিল্পীর দৃষ্টি, সুমার্জিত রুচিবোধ, কাব্যিক মেজাজ ও মানবিক অনুভূতি দিয়ে ছবিটির আঙ্গিক রচিত হয়েছে। ছোট একটা গল্পকে ভিত্তি করে চলচ্চিত্র কি অসাধারণ চিত্র-কল্প তৈরি করতে পারে, চলচ্চিত্রের ক্ষমতা কত বেশি এই ছবি তার একটি নিদর্শন। ভারতে কমার্শিয়াল ছবির জঙ্গলের মধ্যেও কি সুন্দর শিল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন ছবি তৈরি করা যায় 'ভুবন সোম' তার নিদর্শন।

'ভুবন সোম' ছবির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক—অভিনয়। চরিত্র খুবই কম। প্রধান দুটি—ভুবন সোম ও

গ্রামের মেয়েটি। এই দুজনের পরে গ্রামের গরুর গাড়িওয়ালা। এই তিনটি চরিত্র সারা ছবিটিতে প্রাণ সৃষ্টি করেছে। বাস্তবমূল্য আরোপ করেছে। এই তিনটি চরিত্রের সার্থক রূপায়ণগুণে মনে হয়েছে দর্শক নিজে যেন গুজরাটের কোন গ্রামে নিজে ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখছেন। এই ছবির শিল্পীদের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে সুহাসিনী মুলেকে। এই তরুণী চলচ্চিত্র শিল্পে নবাগতা। এই তাঁর প্রথম অভিনয়। কোন রকমের রীতি-দোষ বা কৃত্রিমতা তাঁর অভিনয়ে নেই। গ্রামের সরল এক মেয়েকে তিনি পর্দায় তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সহজভাবে। এই সহজ ও সরল ভাব ফুটিয়ে তোলা কোন পেশাদার শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হত কি না সন্দেহ আছে। সুহাসিনী মুলে সিনেমার পর্দায় প্রথম দর্শনদানেই বিখ্যাত হয়ে গেলেন। অবশ্য এর মূলে রয়েছে পরিচালকের কৃতিত্ব। সুহাসিনীর পরে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন একটা টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করে শেখর চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্গে মিলিয়ে চলার ক্ষমতা তার নেই। এমন কি পাখি শিকারে গিয়েও এই মেয়েটির সাহায্য ছাড়া তার এক পাও চলার উপায় নেই। তার দম্ভ, তার অহঙ্কার সব যেন এই গ্রাম্য মেয়েটির কাছে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ফিরে আসার সময় সে জানল যে সরল গ্রাম্য মেয়েটির কাছে তার অহংকার চূর্ণ হয়েছে সেই মেয়েটি তারই অধস্তন কর্মচারী টিকেট কালেক্টরের বৌ, যাকে বরখাস্ত করবার জন্য সে তৈরি হয়ে আছে। মেয়েটি তাকে অনুরোধ করেছিল সে যদি ভুবন সোমকে চেনে তবে তাকে যেন বলে তার স্বামীর চাকরিটি রক্ষা করবার জন্য। ভুবন সোম ফিরে এসে যেন অনেকটা পাল্টে গেল; টিকেট কালেক্টরকে সতর্ক করে দিয়ে সে রেহাই দিল।

গল্পটি খুবই ছোট। ছোট গল্পের মেজাজ ছবিতে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য ছবিটি এগার হাজার মিটার দীর্ঘ করা হয়েছে। এই দৈর্ঘ্য প্রথমে এবং শেষের দিকে প্রয়োজন

সংগ্রাম থেকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মেদিনীপুর ও কলকাতার ঘটনাবলীর কথা মনে রেখে বিপ্লবী বাংলার এক সামগ্রিক রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। ছবির চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট ছাড়া আর সকলেই কাল্পনিক চরিত্র। কিন্তু কাল্পনিক হলেও তা বাস্তবভিত্তিহীন নয়। এই চরিত্রগুলির মধ্যে বাংলার অনেক বিপ্লবীর ছায়া রয়েছে। সূর্য সেন থেকে প্রীতিলতা, যতীন মুখার্জী থেকে অনেক বিপ্লবী নায়কের কথা মনে আসবে এই ছবি দেখার পরে। ছবির কাহিনী কাল্পনিক বলেই ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঘটনাগুলি আসে নি। ছবি শুরু হয়েছে ১৯২১ সাল থেকে—যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। চট্টগ্রামের সমুদ্রসৈকতে মাস্টারদার চমকপ্রদ প্রতিশোধ গ্রহণের ঘটনা থেকে একটা বিপ্লবী দলের সৃষ্টি, শেষ হয়েছে কালাহান্ডির জংগলে ইংরেজের ফৌজের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে। কাজেই ইতিহাসের

'ভুবন সোম' ছবির একটি দৃশ্যে সুহাসিনী মুলে

গুজরাটের দূরাঞ্চলের কোন উপেক্ষিত গ্রামের এক গরুর গাড়িওয়ালা কিছুটা হিন্দী ভাষা যে রপ্ত করেছে এবং শহুরে লোকদের দেখেশুনে চালাক হয়েছে এমন একটি চরিত্রকে অদ্ভুত দক্ষতায় রূপদান করেছেন। ভুবন সোম একজন জাঁদরেল আমলা। অধস্তন কর্মচারীদের দোষ পেলে সে ক্ষমাহীন। এই চরিত্রে যথার্থ রূপদান করেছেন উৎপল দত্ত।

'ভুবন সোম' ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন বনফুলের একটি ছোট গল্প। এই গল্পের প্রধান চরিত্র ভুবন সোম একজন রেলের অফিসার। এক টিকেট কালেক্টরকে ঘুষের দায়ে ধরে শাস্তি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এ সময় হাঁস শিকারের জন্য ভুবন সোম গ্রামে গিয়ে গ্রামের এক চাষী মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হল। কিছুক্ষণের সান্নিধ্যে ভুবন সোম বুঝতে পারল নিজের অফিসে সে যতই ব্যুরোক্রাট হক—বাইরের জগতের

ছিল বলে মনে হয় না। ছবিটির আঙ্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করার মত—কিন্তু গল্প উপস্থাপনা দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাজেই সাধারণ দর্শকরা গল্পের পূর্ণাঙ্গতাহীন ছবি গ্রহণ করতে পারবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ছবির ফটোগ্রাফি খুবই উন্নত। সঙ্গীত ও অন্যান্য বিভাগের কারিগরি প্রশংসা করার মত।

অগ্নিযুগের কথা

শহরের সিনেমায় অগ্নিযুগের কথা' ছবি চলছে। বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি যুগকে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে এই ছবির মাধ্যমে। নির্দিষ্ট কোন ঘটনা নয়। বিশদশক থেকে ত্রিশ দশক পর্যন্ত বাংলার বুকে যা ঘটে গেছে, যে ছেলেমেয়েরা দেশের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম বিশ্বাস করে প্রাণ দিয়েছে তাদের এক স্মৃতিকথা এই ছবি। বালেশ্বরের

সঙ্গে সাল তারিখের মিল খুঁজলে চলবে না। মনে রাখতে হবে বাংলার বিপ্লবী প্রচেষ্টা ভিত্তিক এক কাহিনীচিত্র। এই কাহিনীচিত্রের অবলম্বন বীরেন রায় এম-পি লিখিত 'খেয়ালী' উপন্যাস। উপন্যাসটি সেকালে ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল।

ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিপন্নপালক বসু। এই চিত্রনাট্য পণ্যচিত্রের ফর্মুলা অনুযায়ী। তাই যে মীরাকে প্রথম দেখা গেল গ্রাম্য বালিকারূপে, ছাগলের দুধ বেচে তারা সংসার চালায়। সেই মীরা বিপ্লবী দলের আরো ঘনিষ্ঠে এসে বড়লোকের মত জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল না কেবল, তার সঙ্গে বাইজীর মত ঢং এবং গানও আয়ত্ত করেছে, কীর্তনও আয়ত্ত করেছে। কীর্তনের অংশ গ্রহণীয় হলেও একই মেয়ের বাইজীর গান আয়ত্ত করা বিশ্বাস্য হয়ে

ওঠে না। এ সব জায়গায় স্বাভাবিকতা সৃষ্টি হতে পারে নি। ছবির শেষে অর্থাৎ কালাহান্ডির সংগ্রামে মীরা ও সমীরের নিহত হবার পরে বিপ্লবীরা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল সংগ্রামকে আরো তীব্রতর ও ব্যাপক করার। তারপরেই দেখান হল কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন, গান্ধীজী ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বক্তৃতা দেবার চিত্র, অবশ্য সিঙ্গাপুরে নেতাজীর স্যালুট গ্রহণের দৃশ্যও দেখান হয়েছে। কিন্তু এই পাঁচমিশালি দৃশ্যে—নেতাজী ও বল্লভভাইকে একই সঙ্গে দেখবার উদ্দেশ্য কি? চিত্রনাট্যকার কি বলতে চান বাংলার বিপ্লববাদের ঐতিহ্য-বাহী কংগ্রেস? নতুবা ঘন ঘন বন্দেমাতরম ধ্বনি ও বল্লভভাই-গান্ধীজীর ছবি এল কেন? এই ঐতিহ্য নির্ধারণ বা সমাধান ইতিহাসসম্মত নয়। ইতিহাস বলে—বাংলার সেদিনের বিপ্লবীদের অগ্রগতি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার পথে, শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের পথে। সেই অগ্রগতির প্রকাশ হয়েছে ইন কিলাব্ জিন্দাবাদে—বন্দেমাতরম-এ নয়।

ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রশংসা লাভ করবেন মাধবী মুখার্জী। তিনি গ্রাম্য বালিকা, বাইজী, বৈষ্ণবী এবং বিপ্লবী নায়িকারূপে অসাধারণ অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, জহর রায়, গীতা দে, বিজন ভট্টাচার্য, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, সীমান্তিনী রায়, অজয় গাঙ্গুলী, মণি শ্রীমানী প্রমুখ আরো অনেকে।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন ভূপেন রায়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন গোপেন মল্লিক।

'অগ্নিযুগের কাহিনী' ছবির একটি দৃশ্য

নাটকের কথা

তরুণ অপেরার 'লেনিন'

ঐতিহাসিক জীবনীমূলক যাত্রা-পালা অভিনয়ে তরুণ অপেরা এক অগ্রগামী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এঁদের নতুন পালা 'লেনিন'। গত ১২ই অক্টোবর এই যাত্রাপালার উদ্বোধন করেছেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবহনমন্ত্রী মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সোভিয়েট ভাইস কনসাল মিঃ পেরাস্তোয়েভ, একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় প্রমুখ বক্তৃতা করেন। তাঁরা প্রত্যেকে 'লেনিন'-এর জীবনী নিয়ে পালা রচনা এবং অভিনয় প্রচেষ্টাকে যাত্রাজগতে এক যুগান্তকারী উদ্যোগ বলে অভিনন্দিত করেন। যাত্রা শিল্পী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে শ্রীশিব ভট্টাচার্য সমাগত অতিথিদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

লেনিন জীবনীকে কেন্দ্র করে সোভিয়েট ইউনিয়নে এ পর্যন্ত প্রায় তেরটি ছবি হয়েছে, কিন্তু নাটকের ব্যাপারে সম্প্রতি উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। লেনিনের চরিত্রে কে রূপদান করবেন এটা মস্ত বড় সমস্যা। কারণ সোভিয়েট দেশের মানুষের মনে লেনিন এখনো জাগ্রত। লেনিন স্মারক ভবনে এখনো লেনিনের দেহ আধারে রক্ষিত। প্রতিদিন হাজার হাজার সারিবদ্ধ মানুষ এই শবাধারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলেছেন। কাজেই প্রশ্ন নাট্যমঞ্চে দর্শকদের ঘনিষ্ঠতায় লেনিনের সেই বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, দ্রুত অভিব্যক্তি পরিবর্তন এবং প্রজ্ঞাকে প্রকাশ করতে কে পারবেন? সিনেমায় যাঁরা লেনিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন নিকানাদ্রোভ (অক্টোবর), বোরিস শচুকিন, ম্যাক্সিম স্ত্রখ! সোভিয়েট রাশিয়ায় এ পর্যন্ত এই তিনজনকে দিয়েই লেনিনের ভূমিকা অভিনয় করান হয়েছে। সোভিয়েট চিত্র ও নাট্য সমালোচকরা বলেন আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এবং অভিনেতার পক্ষে লেনিন চরিত্রের সব কয়টি দিক প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। লেনিনের ভূমিকাভিনেতা শচুকিন বলেছেন: অভিনয়ের আগে তিনি লেনিন সম্পর্কিত নিউজ রীল এবং ফটো দেখেন, লেনিনের বক্তৃতার রেকর্ড শোনেন, লেনিনের জীবনের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়েন, সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। তার পরে তিনি অনুভব করেন যে, এবার তিনি লেনিনের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারবেন।

লেনিন জন্মশতবর্ষের প্রস্তুতি পর্বে কলকাতায় দু'টি নাট্যসম্প্রদায় লেনিন জীবনের নাট্যরূপ অভিনয় করেছেন। এবার যাত্রাজগতে তরুণ অপেরা এক অভিনব পালা অভিনয় করলেন। যাত্রা দলগুলির মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। জনতার আন্দোলন ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার চেষ্টা করছেন যাত্রা দল। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'লেনিন' অভিনয় এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। দ্বিধাহীনভাবে বলছি এই প্রচেষ্টায় তরুণ অপেরা সফল হয়েছেন। রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে যেভাবে লেনিন যাত্রাপালা উপস্থিত করা হয়েছে কোন যাত্রা দলের কাছে আমরা এতটা আশা করি নি। অবশ্য এই সাফল্যের মূলে রয়েছেন লেনিন পালা রচয়িতা এবং ভূমিকাভিনেতা। বরঞ্চ বলব, নাট্যমঞ্চে যে দু'টি নাটক দেখেছি সে তুলনায় তরুণ অপেরার লেনিন বেশি সার্থক। লেনিনের জীবনের রাজনৈতিক ঘটনাবলী, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও মানবতাবোধক ইত্যাদির সঙ্গে স্তালিন-ট্রটস্কির মতাদর্শমূলক দ্বন্দ্ব, মেনশেভিক ও বলশেভিকদের আদর্শগত তফাৎ শ্রেণী-সংগ্রামের বিচারে

'প্রথম কদমফুল' ছবিতে সৌমিত্র ও তনুজা

মেনশেভিকদের ভূমিকা, লেনিনের বিশ্লেষণে সশস্ত্র সংগ্রামের পর্যায়, বিপ্লবের রণ-কৌশল ইত্যাদি বলা হয়েছে। জনশিক্ষার দিক থেকে এই নাটক এক সময়োচিত উদ্যোগ। নাটকটিকে সাধারণ দর্শকের উপযোগী করার জন্য কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। তাতে নাটকের গুরু-গম্ভীর বক্তব্যের সঙ্গে রসোপলব্ধির সহায়ক হয়েছে।

এই যাত্রাপালার সার্থকতায় লেনিনের ভূমিকাভিনেতা শান্তিগোপাল খুবই প্রশংসনীয়। তিনি মোটামুটি লেনিনের ভঙ্গি অনুকরণ করেছেন; তবে হাঁটা যথার্থভাবে লেনিনের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হয় নি। যদিও কণ্ঠস্বর এবং অভিব্যক্তিতে লেনিনের বুদ্ধিদীপ্তি ফুটে ওঠে না, তথাপি বাংলার এক অভিনেতার এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই। মেক-আপ-এর দিক থেকে স্তালিনকে মানায় নি, তাঁর ব্যক্তিত্বও ফুটে ওঠে নি। তবে মতাদর্শের সংগ্রাম উপস্থাপনা যথার্থ। বলা বাহুল্য ক্রুপস্কায়াকেও মানায় নি। কাল্পনিক চরিত্রগুলির মধ্যে এক বলশেভিক যুবক ও মেনশেভিক তরুণীর ভূমিকায় অভিনয় প্রশংসনীয়। তরুণী কণ্ঠে 'হরিণ শাবক'-এর গানটি সুগীত এবং এই গানটি শ্রোতাদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে। সংবাদপত্রের রিপোর্টারের টাইপ চরিত্র ও সংলাপ দর্শকদের কাছে রিলিফ। 'লেনিন' দেখে সেদিনের দর্শকরা সকলেই খুশি হয়েছেন সত্য এবং এই সাফল্যের জন্য বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তবে যাত্রাপালার দিক থেকে বিচারে 'লেনিন' মঞ্চ নাটকের ধারায় পরিচালিত হয়েছে। শ্রমিক-কৃষকের যুক্ত নৃত্য ইত্যাদি দিয়ে শুরু হলে ঐতিহ্যগত হত। আরো কিছু ছোটখাটো বক্তব্য হয়ত থাকবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে 'লেনিন' সার্থক যাত্রা-পালা, এবং তার জন্য পালা লেখককে ও তরুণ অপেরাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চতুর্মুখের নতুন নাটক অথ মালতী-বৃষভ কথা

[illegible]কের মৃত্যু, থানা থেকে আসছি, নীল রঙের ঘোড়া ও সন্দেশের পর চতুর্মুখ নাট্য সংস্থা বের্টোল্ট ব্রেশ্‌টের "সেন্ট জোন্ অব্ দি স্টকইয়ার্ডস্" অবলম্বনে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের "অথ মালতী-বৃষভ কথা" নাটকটি আগামী ৩১শে অক্টোবর মুক্তাঙ্গনে প্রথম অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এবং দ্বিতীয় অভিনয় ৮ই নভেম্বর বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে। পরবর্তীকালে নাটকটি বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হবে। এ ছাড়া ১৯৭০-এর মার্চের মধ্যে আরো দু'টো নাটক যথাক্রমে, ব্রেশটের "মাদার কারেজ এন্ড হার চিলড্রেন্" অনুপ্রাণিত উৎপল দত্তের "হিম্মৎ বাই" এবং আলবার্য়ার ক্যামুর "ক্যালিগুলা" অনুপ্রাণিত অসীম চক্রবর্তীর "আমি একা" চতুর্মুখ প্রযোজনা করবে। আলো ও মঞ্চ পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে অজিত মিত্র, অলোক দে এবং হিমাংশু সোম। নির্দেশনায় অসীম চক্রবর্তী।

রুশ সুরকার রচিত "ডাকঘরের" সুরসংগীত

উজবেকিস্তানের বিখ্যাত বেহালা ও পিয়ানো কনসার্ট র চ য়ি তা ইক্‌রাম আকবারোভ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটকের মর্মবাণীকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি এক অভূতপূর্ব সুরসংগীত রচনা করেছেন।

তিরিশের ঊর্ধ্বে বয়স, এই উজবেক সুরকারের রচিত উজবেকি ফিল্ম সংগীত ইতিমধ্যেই উজবেকিস্তানে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। উজবেক হামজা ড্রামা থিয়েটার কিছুদিন পূর্বে যখন 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ করে তখনই তাদের অনুরোধে মিঃ আকবারোভ "ডাকঘরের" মর্মবাণীকে কেন্দ্র করে উল্লিখিত সুরসংগীত রচনা করেন।

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে মিঃ আকবারোভ বলেন "বিষয়টি আমাকে এত মুগ্ধ করে যে আমি এ নিয়ে সুর সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যাব স্থির করে ফেলি। সেই প্রচেষ্টাই জন্ম দিয়েছে এই সংগীতের, এতে আমি রবীন্দ্রনাথের সুর ব্যবহার করেছি।"

আমরা কোথায় আছি

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা কোথায় আছি? ক্রিকেট বিশ্বের ঠিক কোনখানটাতে আমাদের স্থান আবার তা চিন্তা করে দেখার সময় এসেছে। সময় এসেছে সব কিছু খতিয়ে দেখে, ঠিকমতো বিচার করে বর্তমান পরিস্থিতিতে আবার নতুনভাবে সব কিছু উপলব্ধি করে দেখার।

এতোকাল আমাদের মধ্যে একটা প্রত্যয়ের ভাব ছিলো, আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, নেই নেই করেও আমাদের দেশে এমন কয়েকজন অন্তত ক্রিকেট খেলোয়াড় আছেন যাঁরা প্রয়োজনের সময় ঠিক রুখে দাঁড়াতে পারেন, পারেন অসীম ধৈর্য আর পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনের সময় উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে। তাই ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের দিক থেকে আমরা অন্তত কয়েকজন খেলোয়াড়কে বিশ্বের কয়েকটি দেশের কয়েকজন ভালো খেলোয়াড়ের সংগে তুলনা করতে চাইতাম।

কিন্তু আমাদের সেই চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে যে ফারাক অনেকখানি তার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া গেলো নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আর তৃতীয় টেস্ট খেলার সময়। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সেই অসহায় অবস্থার কথা ভাবতেও অবাক লাগে। ঠিক যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

অথচ যা ঘটে গেছে, বিশেষ করে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। ভারতের কোন ব্যাটসম্যানই নিউজিল্যান্ডের সীমিত আক্রমণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন নি। ঠিক এমন নজীর আর আছে কি না সন্দেহ। আর যাই হোক ঠিক এমন অসহায় অবস্থার মধ্যে ভারতকে এর আগে কখনো পড়তে হয় নি।

নিউজিল্যান্ড বর্তমান বিশ্বের দুর্বলতম দল। আজ পর্যন্ত তারা কোন দেশের বিরুদ্ধে রাবার পায় নি। কিন্তু সেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের খেলার বহর দেখে ক্রীড়ারসিকরা হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

ভারতীয় দলের এই শোচনীয় ব্যর্থতার জন্যে খেলোয়াড়দের চেয়ে আমরা অনেক বেশি দায়ী করবো সিলেকশান কমিটিকে। একটু চিন্তা করে দেখলেই এর কারণ বোঝা যাবে। আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না যে, পেস বোলার ছাড়া একটি দল কি করে মাঠে নামে? তবলা ছাড়া যেমন বেশির ভাগ সময়ে গান-বাজনা জমে না তেমনি পেস বোলার ছাড়া ক্রিকেট দল তো কানা-ই।

ভারতে সত্যিকারের ফাস্ট বোলার নেই। কিন্তু মিডিয়াম ফাস্ট বোলারেরা তো আছেন। অজিত পাই-এর বোলিং সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বললেও আমরা তো সুব্রত গুহর কথা বলতে পারি। আর যাই হোক অর্থাৎ তাঁর বলের পেস যাই হোক না কেন—তিনি তো খুব সুন্দরভাবে স্যুয়িং করাতে পারেন। তাঁর বল দু'দিক থেকে অনেকখানি করে ঘোরে। আমাদের মনে হয় হায়দ্রাবাদ টেস্টে সুব্রত দলে থাকলে নিউজিল্যান্ডকে যথেষ্ট বিপদের সম্মুখীন হতে হতো।

নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়রা জানতেন যে, নতুন বলে বল করার মতো ভারতীয় দলে বিশেষ কেউ নেই। যাঁরা আছেন তাঁদের বলে যে কেউ খেলতে পারে। কিন্তু নতুন বল পুরোন হলেই বিপদ। স্পিন বোলাররা তখন নেবেন আক্রমণের ভার। আর ভারতীয়

চার বছর আগে ভারত সফরে এসেছিল নিউজিল্যান্ড। কলকাতা টেস্টের সময় তোলা ছবিটি মরগানকে আউট হয়ে ফিরে আসতে আর পোলার্ডকে ব্যাট করতে যেতে দেখা যাচ্ছে।

স্পিনারদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানো রীতিমত কষ্টকর। তাই নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক ডাউলিং শুধু নির্দেশ দিয়েই চুপ করে থাকেন নি। নিজেই প্রথম থেকে দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দিয়ে যতোটা পেরেছেন তাড়াতাড়ি রান সংগ্রহ করেছেন।

ডাউলিং-এর ঐ মনোভাব এবং সার্থক দল পরিচালনাই নিউজিল্যাণ্ডকে নিয়ে গিয়েছিল সাফল্যের পথে। কখন কি করতে হবে, কখন কি করা উচিত তা বোধহয় ডাউলিং-ই সব থেকে ভালো বুঝতেন আর সেই জন্যেই সীমিত শক্তি নিয়েও নিউজিল্যাণ্ড এ বছর ভারতকে একেবারে নাজেহাল করে তুলেছিল আর পেছনে ফেলে বার বার এগিয়ে গিয়েছিল সাফল্যের পথে।

'রেকর্ড বুক' যাই বলুক না কেন সত্যি কথা বলতে কি—এ মরশুমের 'রাবার' পেয়েছে নিউজিল্যাণ্ডই। প্রথম টেস্টে তারা অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে গিয়েছিল। দ্বিতীয় টেস্টে ভারতকে হারিয়ে তারা নিল সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ। আর হায়দ্রাবাদের তৃতীয় টেস্টে একান্ত দুর্ভাগ্যের জন্যে তারা 'রাবার' পেল না।

কিন্তু তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের 'পর শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে বর্তমান ক্রিকেট বিশ্বে আমাদের স্থানটা কোথায়? আমরা কোথায় আছি?

আমাদের মনে যে জোরটা এতো-

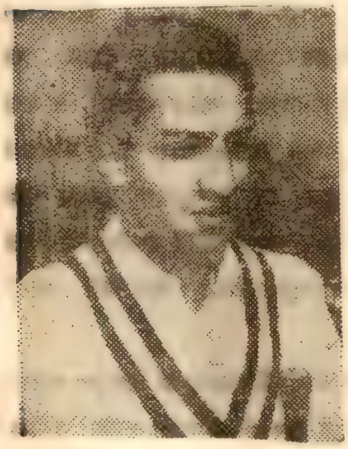

॥ পাতৌদি ॥

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের শোচনীয় ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অধিনায়ক নির্বাচনের গুরুত্ব এবার অনেক। পাতৌদির ওপরই কি পড়বে ভারতীয় দল পরিচালনার ভার? যদি না পড়ে তাহলে তাঁর জায়গায় আসবেন কে?

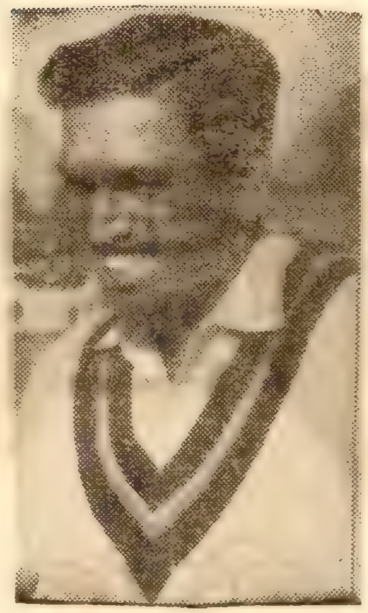

॥ বোরদে ॥

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড অনুশীলন শিবিরে আহ্বান জানিয়েছেন চাঁদু বোরদেকে। দেখা যাক ভারতীয় দলে বোরদে আবার ফিরে আসেন কি না।

দিন ছিল, যে সমস্ত খেলোয়াড়দের ওপর আমরা বিশেষভাবে নির্ভর করে থাকতাম—আমরা ভাবতাম যে, ভারতীয় দলে অন্তত এমন কয়েকজন খেলোয়াড় আছেন যাঁরা প্রয়োজনের মুহূর্তে ঠিক রুখে দাঁড়াতে পারবেন। কিন্তু আমাদের সেই বিশ্বাসের মূলে এবার ঘা পড়েছে। যেভাবে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা পিচে গিয়ে খেলছেন আর ফিরে ফিরে এসেছেন প্যাভিলিয়নে তার তুলনা মেলা ভার। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই চিন্তা ভারতের প্রতিটি ক্রিকেট-রসিকদের মাথায় ঢুকেছে যে, আমরা কোথায় আছি

ক' বছর আগে দেখেছি ভারতীয় খেলোয়াড়রা শোচনীয়ভাবে ফিল্ডিং করতেন। মাঝে ভারতের ফিল্ডিং-এর মান অনেকটা উন্নত হয়। কিন্তু এ বছর আবার যে কে সেই। ভারতীয় খেলোয়াড়দের শোচনীয় ফিল্ডিং-ই নিউজিল্যাণ্ডকে জেতার পথে এগিয়ে দিয়েছিল বার বার। আজ তাই ফিল্ডিং-এ উন্নতি করার দরকার সব থেকে বেশি। কারণ অস্ট্রেলিয়ার সংগে তাল দিয়ে খেলতে হলে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অনেক

লরী, ওয়ালটারস প্রমুখের মতো খেলোয়াড়দের ক্যাচ মিস করা মানেই তাঁদের গাদা গাদা রান করার সুযোগ দেওয়া। বোম্বাই-এ অবশ্য এখন কোচিং ক্যাম্প চলছে। মনে হয় সেই অনুশীলন শিবিরে ভারতীয় খেলোয়াড়রা ব্যাটিং এবং বোলিং-এর সংগে তাল দিয়ে ফিল্ডিং-এর দিকেও নজর দেওয়া হবে।

দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। তবে এ কথা ঠিক যে, নিউজিল্যাণ্ড দল ভারতের মুখে কলঙ্কের যে কালি লেপন করে দিয়ে গেছে, তা ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলতে হলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতকে রীতিমত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে হবে।

যাই হোক ক্রিকেট বিশ্বে আমরা এখন কোথায় আছি অর্থাৎ আমাদের স্থানটা ঠিক কোথায় এবার তা পরখ করে দেখতে হবে আমাদের। অস্ট্রেলিয়া বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দল। তাদের বিরুদ্ধে আমরা অর্থাৎ ভারতীয় খেলোয়াড়রা কেমন খেলি তার ওপরই নির্ভর করছে ভারতের মান সম্মান থেকে আরম্ভ করে সব কিছু।

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই ভারত অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে দেখা যাক সে পরীক্ষায় আমরা কতোটা কি করতে পারি......!

॥ দুরানী ॥

শেষ পর্যন্ত অনুশীলন শিবিরে সেলিম দুরানীরও ডাক পড়লো! তবে কি তরুণদের ওপর ঠিক ভরসা করতে পারছেন না ভারতের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষরা। কই মুখে তো সে কথা কেউ বলছেন না। যাই হোক অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার জন্য ভারতীয় দলকে শক্তিশালী করেই গড়ে তুলতে হবে।

খেলা ধূলা

হরিষে বিষাদ

সাফল্য আর ব্যর্থতা এক সংগে আমাদের কাছে ঠিক এই মুহূর্তে এনে হাজির করেছে আনন্দের জোয়ারের সংগে বিষাদের ঘনঘটা। একদিকে সাফল্যের আনন্দে মন আমাদের আত্মহারা। আর একদিকে ব্যর্থতার বোঝা জ্বালা হয়ে ভারতের আপামর জনসাধারণের মনের মধ্যের মনটাকে বড় বিশ্রীভাবে নাড়া দিয়ে গেলো। সন্তোষ ট্রফির খেলায় বাংলা দলের অসাধারণ সাফল্য আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। ফুটবল খেলার মান উন্নত হচ্ছে কি হচ্ছে না সে প্রশ্ন ভুলে গিয়ে আজ বাংলা দলের সাফল্যের আনন্দে ভাগ নেওয়াই বোধহয় বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘ ছ' বছর পরে সন্তোষ ট্রফি ফিরে এলো বাংলাদেশে। শুধু ফিরে এলো বললেই বোধহয় সবটা বলা হবে না—বরঞ্চ বলতে হবে পূর্ণ মর্যাদায় এবং অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা সন্তোষ ট্রফি জয় করে ফিরে এসেছেন নওগাঁ থেকে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের প্রাণান্ত পরিশ্রম আর আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্যেই সব কটি খেলায় অতোগুলো গোল করে বাংলা হারাতে পেরেছে অন্য প্রদেশী দলগুলোকে। শুধু তাই নয়—সন্তোষ ট্রফির ফাইন্যালে সার্ভিসেসকে ছ' গোল দেওয়া আর যাই হোক সহজ নয়। তবে এই প্রসংগে আমাদের শুধু একটা কথা বলার আছে—বাংলা দলের সংগে যে সব খেলোয়াড়রা একটি খেলাতেও অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পান নি, তাঁদেরও একটু-আধটু খেলার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল—অন্তত বাংলা দল কয়েকটি করে গোল দেবার পরও তাঁদের মাঠে নামানো চলতো। কারণ কোন খেলায় অংশ গ্রহণ করেন নি এমন খেলোয়াড়ের সংখ্যা তো খুবই কম ছিল। যাই হোক সমালোচনার কথা ভুলে গিয়ে সাফল্যের আনন্দে আমরা বাংলা দলের খেলোয়াড়দের জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

কিন্তু বাংলার সাফল্যের আনন্দের পাশে হরিষে বিষাদের মতো এসে হাজির হলো নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় ক্রিকেট দলের শোচনীয় ব্যর্থতার জ্বালাময় মুহূর্তগুলো। ঠিক এমনটি যে হবে তা বোধহয় কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। পারবেনই বা কি করে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিপর্যয়ের ইতিহাসে ঠিক এই রকম জঘন্যতম ব্যর্থতা আর কখনো দেখা যায় নি। শূন্য রানে ভারত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম কয়েকটি উইকেট হারিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার পরেই খেলার চেহারা পাল্টে দিয়েছিলেন কয়েকজন ভারতীয় খেলোয়াড়। কিন্তু এবার? খেলার ধারা বদলাবার জন্যে কেউই আর পারলেন না রুখে দাঁড়াতে। অসহায়ের মতো আউট হয়ে হয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন প্যাভেলিয়নে। নিউজিল্যাণ্ডের দুর্ভাগ্য, রাবার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও তাঁরা পেলেন না আর ভারতের দুর্ভাগ্য, বড় বিশ্রীভাবে তাঁদের রাবার নিজেদের দখলে রাখতে হলো......। —শান্তিপ্রিয়॥

ক্রিকেটের খবর

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ ভারতকে শেষ করতে হলো লজ্জাজনক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। খেলাটা এমন অবস্থায় পৌঁচেছিল যখন আমাদের মনে হয়েছিল যে, ভারতের হেরে যাওয়াই ভালো। ভারত হারতোই। কেউই আর সে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারতেন না ভারতকে।

আজ মনে হয় বিশ্বের দুর্বলতম ক্রিকেট দল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত 'রাবার' হারালেই বোধহয় ভালো হতো। গ্রাহাম ডাউলিং-এর যোগ্য নেতৃত্বে নিউজিল্যান্ড এই সফরে সব দিক থেকেই ভারতের চেয়ে অনেক বেশি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়দের ফিল্ডিং-এর তুলনা হয় না। পেস বোলিং-এ তাঁরা যথেষ্ট উন্নত। ব্যাটিং-এও তাঁরা দিয়েছেন উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয়।

সেদিক থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের বড় বেশি অসহায় মনে হয়েছে। তাঁরা ঠিক মতো বল ধরতে পারেন নি, পারেন নি নিউজিল্যান্ডের পেস বোলারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। ফাস্ট বোলিং-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সেই চিরকালের দুর্বলতা

॥ ভেঙ্কটরাঘবন ॥

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে বোলার ভেঙ্কটরাঘবন ব্যাটিং-এ অনেক বেশি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।

বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের সময়। উইকেটের বাইরের বলে খোঁচা মেরে কিম্বা উইকেটের মধ্যে টেনে এনে তাঁরা আউট হয়েছেন একের পর এক।

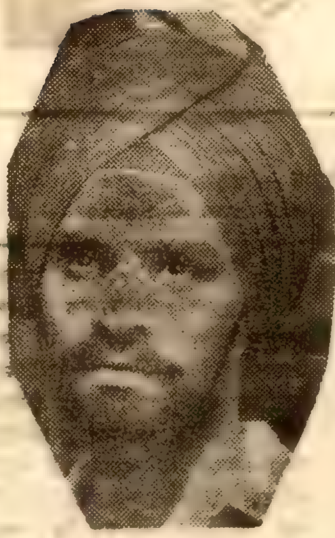

॥ বেদী ॥

বেদী আর অশোক মানকাদের বিয়ের খবর একসংগে বাজার মাৎ করেছে।

তাই ভাবতে ভয় লাগে যে, নিউজিল্যান্ডের ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের হাল যদি এই হয়, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার সংগে খেলতে নেমে তাঁরা কি করবেন?

অথচ ব্যক্তিগত নিপুণতার দিক থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়রা তো কোন অংশেই কম নন—তাহলে কেন এমন হয়, কেন এমন হলো? ভিজে পিচ শুকোনর মুখে ভারত ব্যাট করেছিল ঠিকই, দ্বিতীয় ইনিংসে একটু-আধটু বৃষ্টিও হয়েছিল—তবু ভারতের এমন বিপর্যয়ের কথা কল্পনাও করা যায় না।

টসে জিতে নিউজিল্যান্ড প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে করলো ১৮১ রান। ভারত প্রথম থেকেই সম্মুখীন হলো প্রচণ্ড বিপর্যয়ের। ৪৯ রানের মধ্যে পড়ে গেল ৯টা উইকেট। শেষ উইকেটে ভেঙ্কটরাঘবন ও বেদী ৪০ রান করায় ৮৯ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেলো ভারতের প্রথম ইনিংস।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটের বিনিময়ে নিউজিল্যান্ড ১৭৫ রান করে শেষ দিনের পুরো সময়টা ভারতকে খেলতে দিল। ২৬৮ রান করলে ভারত জিতবে এই অবস্থায় খেলতে নেমে ভারত নিশ্চিত পরাজয়ের মুখোমুখি হয়। লাঞ্চের পর ৭০ মিনিট মাত্র খেলা চলে। সে সময়ে ভারত ৭টি উইকেট হারিয়ে করেছিল ৭৬ রান।

সত্যি কথা বলতে কি ভারতের বাকী তিনটি উইকেট ফেলতে নিউজিল্যান্ডের খুব একটা বেশি সময় লাগতো না। কিন্তু বৃষ্টি ইত্যাদির জন্যে খেলা আর মোটে হতেই পারলো না। ফলে রাবার থেকে গেলো ভারতের দখলেই আর নিউজিল্যান্ড সামান্যের জন্যে অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে হারালো তাদের প্রথম রাবার জয়ের সুযোগ।

কোচিং ক্যাম্প

শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কোচিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করলেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের শোচনীয় ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতেই বসছে এই ক্যাম্প। নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকেই অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতের প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দল গঠনের দিকে তাকিয়েই ২৬শে অক্টোবর থেকে বম্বের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে ২৭ জন খেলোয়াড় নিয়ে বসছে অনুশীলন শিবির। এই শিবিরে থাকছেন—পাতৌদি, সুর্তি, ইঞ্জিনিয়ার, ওয়াদেকার, সোলকার, হনুমন্ত সিং, পাই, অশোক মানকাদ, আবিদ আলী, জয়সীমা, অম্বর রায়, সুব্রত গুহ, আর সাক্সেনা, প্রসন্ন, জি· আর· বিশ্বনাথ, কুন্দরন, চন্দ্রশেখর, ভেঙ্কটরাঘবন, সারদেশাই, বোরদে, এস অমরনাথ, বেদী, অশোক গান্দোত্রা, সি· জি· যোশী, ভি· ভি· কুমার, ইন্দ্রজিৎ সিং ও চেতন চৌহান।

আগামী ৩০শে অক্টোবর সিলেকশন কমিটি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দল পরিচালনার জন্যে অধিনায়ক নির্বাচন করবেন আর ২রা নভেম্বর তাঁরা মিলিত হবেন প্রথম টেস্ট দল মনোনীত করার জন্যে।

প্রশ্ন উত্তর

শুভরঞ্জন বৈষ্ণব (হরিনারায়ণপল্লী বুদবুদ, বর্ধমান)

প্রশ্ন ঃ টেস্ট খেলায় কার বোলিং এ্যাভারেজ সব থেকে বেশি জানতে চাই।

উত্তর ঃ ফ্রেডী ট্রুম্যানের।

টেস্ট — বল — মেডেন — উইকেট — গড়
ট্রুম্যান—৬৭ — ১৫১৭৮ — ৫২২ — ৬,৬২৫ — ৩০৭ — ২১·৫৭

রথীন কুণ্ডু (বীরেন রায় রোড, কলকাতা—৩৪)

প্রশ্ন ঃ বারডেকাগামী ভারতীয় দল মনোনয়নের সময় লতিফের অ-খেলোয়াড়ী মনোভাবের জন্যে (রেফারীর আদেশ অমান্য এবং খেলার বাকী সময় না খেলার) তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাঁকে নির্বাচন না করা উচিত ছিল—ঠিক কি না? অতীতে মহঃ স্পোর্টিং-এর উজ্জ্বল দিনে বাচ্চি খানের মত খেলোয়াড়কেও একবার অ-খেলোয়াড়ী মনোভাবের জন্যে বিদেশগামী ভারতীয় দলে নির্বাচিত করা হয় নি। অথচ এবার লতিফের অমন মারাত্মক অপরাধের জন্যেও কোন শাস্তি হলো না। এই সব কারণেই বোধহয় বাংলা দেশের ফুটবল খেলার মান নেমে যাচ্ছে। আপনার কি মনে হয়?

উত্তর ঃ আমি আপনার সংগে একমত!

অরুণ কর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

উত্তর ঃ আই· এফ· এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় এবার বহিরাগত দলের সংখ্যা কেন এতো কম—এই নিয়ে সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা হয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই।

অরুণকান্তি লোহ (করিমগঞ্জ, আসাম)

উত্তর ঃ আপনার কথাই ঠিক। নিউজিল্যান্ড-ই টেস্ট খেলায় সব চেয়ে কম রানে (২৬ রান) ইনিংস শেষ করেছে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে।

শুভংকর সরকার (রবীন্দ্রনগর, শালবনী, মেদিনীপুর)

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ওক্ষেত্রে অফসাইডই হবে।

অনিলচন্দ্র দাস (হালিশহর, মান্না-পাড়া, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন ঃ মোহনবাগানের লীগ ও শীল্ড জয়ের মূলে কোচ অমল দত্তের কৃতিত্ব অনেকখানি। আপনার ধারণা কি?

উত্তর ঃ ঠিক তাই।

বিপ্লব মিত্র (হালিশহর, বাজারপাড়া)

উত্তর ঃ বোরদে পাবেন না, তবে জয়সীমার ভারতীয় দলের পক্ষে খেলার সম্ভাবনা আছে।

বাহা, বাবলা, প্রভা, শুভেন্দু, কাকিমা, বৌদি ও হারু (হালিশহর, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন ঃ ১৯১১ সালে মোহনবাগানের শীল্ড বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের নাম জানতে চাই!

উত্তর ঃ হীরালাল মুখার্জী, ভূতি সুকুল, মনমীর চ্যাটার্জী, কানু রায়, হাবুল সরকার, অভিলাষ ঘোষ, রাজেন সেন, শিবদাস ও বিজয়দাস ভাদুড়ী, নীলমাধব ভট্টাচার্য ও মনোমোহন মুখার্জী

বরুণ বাগচী ও অরুণ বাগচী (বানারহাট বাজার, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন ঃ কোন কোন ভারতীয় খেলোয়াড় টেস্ট খেলায় দু' ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেছেন? কার বিরুদ্ধে, কতো সালে এবং কত রান করেছেন তাও জানাবেন।

উত্তর ঃ ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র ভি এস হাজারেই টেস্ট খেলায় দু' ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন। তিনি ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় এডিলেড টেস্টে ১১৬ ও ১৪৫ রান করে দু' ইনিংসে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।

চুম্বক

১৯৫৬ সালের ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টটিকে 'লেকারস্ গেম' বলা চলে। ঐ টেস্টে লেকার সৃষ্টি করেছিলেন এক অবিস্মরণীয় বিশ্ব রেকর্ড। ঐ টেস্টে লেকার অস্ট্রেলিয়ার ২০টি উইকেটের (উভয় ইনিংসের) মধ্যে একাই ১৯টি উইকেট নেন। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৫৩ রান দিয়ে ১০টি উইকেট ও দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৩৭ রান দিয়ে ৯টি উইকেট সংগ্রহ করেন তিনি।

* * *

১৮৯৫-৯৬ সালের ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট সিরিজের জোহানস্‌বার্গ টেস্টে ইংল্যান্ডের জি· এ· লোম্যান একটি ইনিংসে মাত্র ২৮ রান দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ৯টি উইকেট নিলেন। ঐ একই সিরিজে পোর্ট এলিজাবেথ টেস্টে লোম্যান আবার বোলিং-এ ভেল্কি দেখালেন। এবারে তিনি মাত্র ৭ রান দিয়ে পেলেন ৮'৮ উইকেট—এটিও একটি রেকর্ড।"

—শ্রীসোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
হালিশহর
গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা

সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার সাফল্যের খতিয়ান

বাংলা (৪) ঃ গোয়া (১)
বাংলা (৮) ঃ তামিলনাড়ু (০)
বাংলা (৪) ঃ অন্ধ্র (১)
বাংলা (৬) ঃ অন্ধ্র (১)
বাংলা (৬) ঃ সার্ভিসেস (১)

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স্থ কালকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

কালিদাস গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	২য়	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	৩য়	৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী	২য়	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)	১ম	৩-০০
” ”	২য়	”
” ”	৩য়	”
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)	১ম	৩-০০
” ”	২য়	৩-০০
” ”	৩য়	৩-০০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
” ”	২য়	৬-০০
” ”	৩য়	৮-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
মানিক গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-৩০
” ”	২য়	৪-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	৪র্থ	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	৩য়	৪-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী—		৩-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী—		৫-০০
স্কট গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী—	৩য়	৩-০০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:—		৪-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—২য়	৪-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী—	৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ১ম	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ২য়	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—১ম	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—২য়	৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী—	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ১ম	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৩য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৪র্থ	৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী—	৪-০০
” ” ” —২য়	৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—	৬-০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী—	৪-০০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:—২য় ভাগ	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৩য়	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৫ম	৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—	৫-০০
কথাসরিৎসাগর—১ম ভাগ	৪-০০
” —২য়	৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী— ১ম, ২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড	৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড—	৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী—২য়	৪-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—	৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা—২য় ভাগ	৫-০০
অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী—২য়	৩-০০
” ” ” —৩য়	৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী—	৩-০০
নবীন সেনের গ্রন্থাবলী—	৭-০০

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস —২য় ভাগ	৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থা:—১ম	১০-০০
অরুণ বহ্নি—	৪-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী—	৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর—	৩-৫০
পরলোক—	৪-৫০
পরলোক রহস্য—	২-২৫
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব—	৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়—	১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা—	৩-০০
ভারত প্রতিভা—	৫-০০
প্রতাপাদিত্য—	৩-০০
সাধক কমলাকান্ত—	২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার—	৩-০০
নানার মা—	৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ—	৩-০০
বিক্রমাদিত্য—	৩-০০
বিসমার্ক—	২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী—	৩-০০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—	২-০০
মাধবীকঙ্কণ—	২-০০
শিবরাম গ্রন্থাবলী—	৪-০০
বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ—১ম	৪-০০
যৌন-মনোদর্শন	
৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ	৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া	৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ত-কালিকত্বের ব্যাপারসমূহ	৪-৫০
আশাপূর্ণা দেবী গ্রন্থাবলী—১ম	৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—২য়	৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী—	৮-০০
ANANDAMATH (শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)	৪-০০
DAVID HARE	৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

17 NOV 1969

সে কি! তুমি এখনও ব্যবহার করনি?
কিন্তু কুকমী না হলে আমার রাঁধতে মন চায় না
কুকমী
গুঁড়া মশলা
স্বাদে গন্ধে বিশুদ্ধতায়
এর তুলনা হয় না!
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইসেস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
পোস্তা • কলিকাতা-৭
মিল - কাশীপুর

সাপ্তাহিক বসুমতী

কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত ?

দুই ওয়ার্কিং কমিটি ঃ এ আই সি সি-এর অধিবেশন সম্পর্কে দুই সিদ্ধান্ত

৪ বর্ষ ঃ ১৯শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২০শে কার্তিক, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 19, 6th Nov., 19

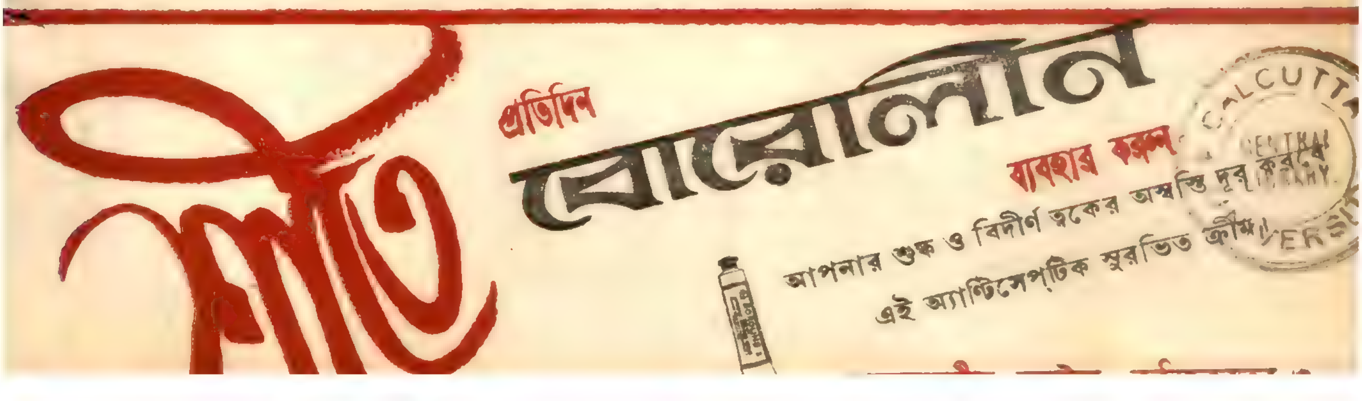

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১১৫৫
আজকের মানুষ		১১৫৬
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১১৫৭
বই-বছাই—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	১১৬১
তুমি দেখতে পাও না কেন? (কবিতা)	বেণু দত্তরায়	১১৬৩
বঙ্গদর্শন		১১৬৪
ভারতদর্শন		১১৬৬
আন্তর্জাতিক		১১৭০
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	১১৭২
এবার শারদ-উৎসবের মর্মকথা	মনোরঞ্জন হাজরা	১১৭৪
অন্য গ্রাম অন্য তরঙ্গ	সমীর মুখোপাধ্যায়	১১৭৮

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

৭১/১৫ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৬

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শহর কলকাতা	— শহরদর্শী	১১৮১
পাঠকমন	—	১১৮২
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১১৮৩
তিমিরপ্রান্ত ডয়ার্স	— অগ্নিবর্ণ	১১৮৭
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—		
উনিশ বছরের খতিয়ান	— সুধীররঞ্জন চক্রবর্তী	১১৯০
সাগর সংগমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	১১৯২
গ্রন্থমেলা	—	১১৯৬
হোমিওপ্যাথ ক্রম জ্যোতিষী (গল্প)	— মানব গঙ্গোপাধ্যায়	১১৯৮
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১২০৪
রূপজগৎ	—	১২০৭
খেলাধূলা	— শান্তিপ্রিয়	১২১২

সদ্য বেরিয়েছে ॥ বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ ॥ নামমাত্র মূল্য

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ ঃ নীলদর্পণ। জামাই বারিক। বিয়ে পাগলা বুড়ো। নবীন তপস্বিনী। কমলে কামিনী।
২য় ভাগ ঃ সধবার একাদশী। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। পোড়া মহেশ্বর। কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। লীলাবতী। সুরধুনী কাব্য। দ্বাদশ কবিতা। পদ্য সংগ্রহ। তৎসহ লেখকের জীবনী ও ভূমিকা।

(দুই ভাগে সম্পূর্ণ)

মূল্য প্রতি ভাগ চার টাকা

বিদ্যারণ্য মুনি রচিত
বিবরণ প্রমেয়-সংগ্রহ
মূল্য চার টাকা

—০—

স্তবকবচমালা
মূল্য আট টাকা

—০—

যোগশাস্ত্র
মূল্য পাঁচ টাকা

—০—

শিবায়ন
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

সাপ্তাহিক বসুমতী
সম্পাদিকা জয়ন্তী সেন

৭৪ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২০শে কার্তিক, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 6th November, 1969

শ্রীফেরুমনের আত্মত্যাগ

স্বাধীন ভারতের বিধিলিপি এই যে, একটি সমস্যার সুরাহা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। বস্তুত নেতৃবৃন্দের অব্যবস্থচিত্ততার জন্যই একটির পর একটি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং যে-সংহতির জন্য প্রতিনিয়ত প্রচার চালানো হচ্ছে তাকে চোখের সামনে বলি দেওয়া হচ্ছে। দাবির ঔচিত্য বা অনৌচিত্য বিবেচনা না করে আন্দোলনের প্রথম দিকে নেতৃবৃন্দ ঘটা করে নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করে এমন মতামত প্রকাশ করেন—যেন তাঁদের মতো দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ অনমনীয় মনোভাবের মানুষ আর কোথাও নেই ; তারপর বিপদের ছায়া ক্রমাগত নিকটবর্তী হলে তাঁরা এক মুহূর্তে সঙ্কল্পচ্যুত হন এবং তাঁদের নরম মনোভাবের জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন। পাকিস্তান-সৃষ্টি থেকে সুরু করে ভাষাগত রাজ্য গঠনের স্বীকৃতি—প্রায় সব কিছুতেই তাঁদের কঠোরতা এবং অবস্থাগতিতে তথাকথিত উদারতার মনোভাব স্বাধীন ভারতের কী মঙ্গল সাধন করেছে—ঠান্ডা মাথায় এই প্রশ্নের বিচার করা উচিত। কারণ নেতাদের খেয়ালখুশির কাছে দেশকে সমর্পণ করার চেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার আর কিছু নেই।

অন্ধ্রের আন্দোলন আজও স্তিমিত হয় নি। এবং দেশের বড় বড় নেতারা সারা ভারতের ওপর মাতব্বরী করলেও সেখানে দীর্ঘকাল ধরে যে আন্দোলন চলছে—তা প্রশমিত করতে পারেন নি। অন্ধ্র রাজ্যের পর বর্তমানে তেলেঙ্গানা সৃষ্টির দাবি উঠেছে। এই দাবির প্রতি আমাদের সমর্থন না থাকলেও আমরা বলতে বাধ্য যে, তেলেঙ্গানার অধিবাসীদের প্রতি বৈষম্য দেখানোর ফলে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে [illegible] ঐ সমস্যার উদ্ভব দেখে এই ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, আঞ্চলিকতার সঙ্কীর্ণতা এখন প্রায় সব দল ও মতাদর্শকে গ্রাস করতে বসেছে।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবিতে সৃষ্টি হয়েছিল হরিয়ানার। কেউ কেউ ধরে নিয়েছিলেন, সমস্যার বোধ হয় সেখানেই শেষ। কিন্তু দুটি পৃথক রাজ্য গঠিত হবার পর সৃষ্টি হোল আর একটি সমস্যা এবং তা হচ্ছে চণ্ডীগড়কে কেন্দ্র করে। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা উভয়েরই দাবি চণ্ডীগড়কে নিজেদের রাজধানী হিসেবে লাভ করার। চণ্ডীগড়কে যদি উভয় রাজ্যের রাজধানী করা সম্ভব হোত তাহলে হয়তো মীমাংসার পথ পাওয়া যেত। কিন্তু সেভাবে হরিয়ানা বা পঞ্জাব চণ্ডীগড়কে রাজধানী হিসেবে লাভ করতে রাজী নয় ; অবশ্য তাতে জটিলতাও বাড়তো, একথা অস্বীকার করা যায় না।

চণ্ডীগড়কে পঞ্জাব রাজধানী হিসেবে লাভ করার জন্য দীর্ঘদিন আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে সে ব্যাপারে তেমন সজাগ ছিলেন বলে মনে হয় না। অথবা এটাও সত্য, শ্যাম রাখি না কুল রাখি—এই মনোভাবের দরুণ পঞ্জাব বা হরিয়ানার অধিবাসীদের না-চটাবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার চণ্ডীগড়ের ব্যাপারে গড়িমসি নীতি অবলম্বন করে চলছিলেন।

কিন্তু এখন যা ঘটল তা চণ্ডীগড় সমস্যাকে কেন্দ্র করে পঞ্জাবের আন্দোলনকে গভীরতর করার সুযোগ দেবে কি না—সেটাই বিচার্য।

পঁচাশি বৎসর বয়স্ক শ্রীদর্শন সিং ফেরুমন চণ্ডীগড়কে পঞ্জাবের রাজধানী করার দাবিতে অনশনের তাঁর মৃত্যু বীরের মৃত্যু, আদর্শের জন্য অসাধারণ আত্মত্যাগ, একথা স্বীকার করতেই হবে। শ্রীফেরুমনের রাজনৈতিক জীবনের সুরু থেকে মৃত্যুর শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তাঁর প্রাণ ছিল দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত। জীবনের চেয়ে তাঁর কাছে দেশের সামগ্রিক কল্যাণই ছিল শ্রেয়। তবু একটি বিশেষ রাজ্যের রাজধানীর দাবিতে তাঁর আত্মত্যাগের মূলে হয়তো ছিল সুবিচারের কঠিন-কঠোর আবেদন। তাঁর অনশনের প্রতিবাদেও অনশন হয়েছিল, সে অনশনও আবেদনে-নিবেদনে ভেঙেছে কিন্তু দেশভক্ত ও সত্যের পূজারী শ্রীফেরুমন 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' গান্ধীজীর এই জীবনবাণী বাস্তবে রূপায়িত করে গেছেন।

তা সত্ত্বেও মনে প্রশ্ন জাগে—অনশন, অসহযোগ শেষ অস্ত্র হলেও এখন তার যত্রতত্র প্রয়োগে মনে হয় অস্ত্রটি বোধ হয় ভোঁতা হয়ে পড়েছে। শ্রীফেরুমনের অনশনের প্রতি কেউ কেউ অনৈক্য মত পোষণ করলেও একথা ঠিক যে, তিনি ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করে নিজেদের দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রতি মর্যাদা রক্ষা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে দেশের অব্যবস্থচিত্ত নেতৃবৃন্দের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে দুর্বলতার প্রতি সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। উপরন্তু তিনি পঞ্জাবের অধিবাসীদের নতুন শক্তি দান করে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে বিরোধের অবসান হয় নি বরং এখন তা আরো জটিল আকার ধারণ করতে চলছে। আমরা মনে করি, এই অবস্থায় আর গড়িমসি করা অনুচিত। এখনো পর্যন্ত পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতেই সমস্যার সমাধান করা সহজ।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

সৈনিকদের কার কখন কী ডিউটি পড়ে, কিছুরই ঠিক নেই—বিশেষ করে দেশে যখন জরুরী অবস্থা চলছে। তাদের সদা প্রস্তুত থাকতে হয় মুহূর্তের নির্দেশে কাঁধে বন্দুক ফেলে শত্রুর মোকাবিলায় এগিয়ে যাবার জন্যে। কারণ কর্তব্য পালন এক কঠোর পরীক্ষা। শ্রীচেলোত অচ্যুত মেননের সামনে এখন সেই পরীক্ষা, তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি কীভাবে পালন করেন, তার দিকে কোটি জোড়া চোখ নিবদ্ধ। কেরালায় চ্যালেঞ্জ করে নতুন সরকার গঠন করা হয়েছে। আর সে-সরকারের নেতৃত্বভার দেওয়া হয়েছে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা শ্রীঅচ্যুত মেননের ওপর।

কেরালার সাম্প্রতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপট আজ আর কারো অজানা নেই। কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ, আর-এস-পি, আই-এস-পি ইত্যাদি কেরালার যুক্তফ্রন্টভুক্ত চারটে দল বড় শরিক মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মাতব্বরি মেনে নিতে পারছিল না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়েলিংডনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করার দাবি ছিল চার দলের মিনিফ্রন্টের। তাকে কেন্দ্র করেই রাজ্য রাজনীতিতে চরম জটিলতা দেখা দিল। মিনিফ্রন্টের পক্ষ থেকে বিধানসভায় বেসরকারী প্রস্তাব আনা হল দুর্নীতির তদন্তের জন্যে কমিশনের দাবি জানিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ ঘোষণা করলেন সে-প্রস্তাবকে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব বলে মনে করবেন। প্রস্তাব পাশ হল, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ঘোষণা করলেন।

অতঃ কিম? ৩১ মাস ১৬ দিনের মাথায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সরকারেরও অপমৃত্যু ঘটলো। এর পরে তাদের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে? সোজা পথে কংগ্রেসের ক্ষমতায় ফিরে আসার কোন আশাই নেই, বিধানসভায় তাঁদের মোটে ন'টি আসন, কেরল কংগ্রেসের পাঁচটি। কিন্তু বাঁকা পথেও কি অসম্ভব? কেরালায় যদি রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা যায়, তবে তার অর্থ তো দাঁড়াবে কেন্দ্রীয় (কংগ্রেসী) শাসন। সে সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেবার এবং জনগণ ভোটের মাধ্যমে বামপন্থীদের ওপর যে-আস্থা স্থাপন করেছিলেন, তার মর্যাদা রক্ষার জন্যে যুক্তফ্রন্টকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কিন্তু বিধানসভায় সর্ববৃহৎ দল সি-পি-এম নেতৃত্ব দিতে নারাজ, নতুন করে সরকার গঠনেও রাজী না। কিন্তু মিনিফ্রন্টের চারটি দলই আগ্রহী। আলাপ-আলোচনার পর ১লা নভেম্বর—ঠিক যেদিনটিতে ১০ বছর আগে রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার পঞ্চম সরকার ভূমিষ্ঠ হল। তৃতীয় বামপন্থী সরকারের নেতৃত্ব নিলেন কমিউনিস্ট নেতা শ্রীঅচ্যুত মেনন। রাজ্যের এ-সংকটে এগিয়ে এসে তরণীর হাল ধরার মত শক্ত সমর্থ লোক কেরালায় আর ছিলেন কি?

শ্রীঅচ্যুত মেনন

কিন্তু অচ্যুত মেনন কি কেরল রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত? কারণ বিদায়ী কেরালা মন্ত্রিসভার সদস্য তিনি ছিলেন না, এমন কি কেরালা বিধানসভার সদস্যও তিনি না। কিছুদিন ধরে কেরালায় তিনি থাকছেনও না, বরং কর্তব্যের খাতিরে অচ্যুত মেননকে থাকতে হয় রাজধানী দিল্লীতে। রাজ্যসভার সদস্য তিনি, কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের প্রভাবশালী সদস্য। তবে মন্ত্রীগিরি তিনি করেছেন। সেই ১৯৫৭ সালে যখন প্রথম কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয় তখন নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার তিনি সদস্য ছিলেন। বস্তুত শ্রীমেনন ছিলেন ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ, দলেও, সরকারেও। কেরালার প্রথম কমিউনিস্ট গভর্নমেণ্টে তিনি পেয়েছিলেন অর্থ ও কৃষিদপ্তর। পরে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল স্বরাষ্ট্রদপ্তর। অর্থাৎ নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের দু' নম্বর ব্যক্তি ছিলেন শ্রীঅচ্যুত মেননই। সে সরকার ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন, আড়াই বছর পরে ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে সরকারকে গদিচ্যুত করা হয়। কিন্তু পরের বছরে মধ্যবর্তী নির্বাচনে আবার বামপন্থীরা জয়যুক্ত হলেন, আবার নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হল, অচ্যুত মেনন হলেন বিধানসভায় সরকারী দলের ডেপুটি লীডার।

সেদিন দু'জনে হাত ধরাধরি করে কাজ করেছেন, সুখ-দুঃখের সমান ভাগী হয়েছেন। আজ কিন্তু রাস্তা দু'জনের উল্টো। নেতা শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ আজ দলের নেতৃপদে, আর সরকার গঠন করেছেন তাঁরই সহকারী নেতা অচ্যুত মেনন। পথ অবশ্য আজই আলাদা হল না, ১৯৬৪ সালে যখন কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল, তখন অচ্যুত মেনন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন এবং নাম্বুদ্রিপাদ মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শ্রীমেনন বিধানসভায় কমিউনিস্ট দলের নেতৃপদ নিলেন এবং দলের রাজ্য কাউন্সিলেরও সেক্রেটারি হলেন।

অভিজ্ঞ রাজনীতিক হিসেবে কেরালায় অচ্যুত মেননের খ্যাতি প্রচণ্ড। আর পাঁচজন রাজনৈতিক নেতার মত অচ্যুত মেননও কংগ্রেস রাজনীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন। ১৯৪০ সালে রাজনৈতিক কারণে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। কিছুকাল তিনি কোচিন কংগ্রেসের সেক্রেটারিও ছিলেন, পরে কেরালা প্রদেশ কংগ্রেসেরও সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

১৯১৩ সালে ত্রিচুরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্রীমেননের জন্ম। লেখাপড়ায় তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ডিস্টিংশন নিয়ে তিনি গ্র্যাজুয়েট হন, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে আইন পাশ করে হিন্দু আইনে ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে ভি· আয়েঙ্গার স্বর্ণপদক লাভ করেন।

অতীত অভিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতার কারণেই আজ কেরালায় নতুন পরীক্ষার জন্যে শ্রীঅচ্যুত মেননকে দায়িত্ব দেওয়া হল। কেমন করে তিনি কর্তব্য পালন করেন তাঁর দিকে লাখো চোখ সাগ্রহে চেয়ে থাকবে।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(১৪)

সুভাষচন্দ্র ও মেঘনাদ সাহা—৫

যে সাতটি সমস্যা সুভাষচন্দ্র উত্থাপন করেছিলেন, সেগুলি সত্যই ভারতীয় জাতীয় জীবনের পক্ষে মূলগত সমস্যা। সমস্যাগুলি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর মনকে আলোড়িত করেছে। এর দ্বারা স্পষ্টই বোঝা গেছে, একেবারে প্রথম থেকে তিনি কি রকম বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন মানুষ; কোনো কিছুই তিনি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন; 'অন্তরের আলো' অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু 'বুদ্ধির আলো' কম প্রয়োজন নয়; গান্ধীজীর কাছ থেকে পশ্চাতের ছায়া তিনি চান নি, চেয়েছিলেন সম্মুখের আলো, পান নি, দ্বারস্থ হয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে। জাতির অবনতি যদি হয়ে থাকে, কতকগুলি কারণেই তা হয়েছে। ঐ কারণমূলগুলি দূর না করলে উন্নতি ঘটানোও যাবে না, এবং শিকড় যদি ওপড়াতে হয় চোখ চেয়েই ওপড়াতে হবে, চোখ বুজে নয়; শিকড় ওপড়ানো সহজও হবে না, পরিকল্পিত উপায়ে তা করতে হবে,—'পরিকল্পনা' ছিল সুভাষচন্দ্রের রক্তের মধ্যে।

মেঘনাদ সাহা-প্রদত্ত উত্তরগুলিতে সুভাষচন্দ্র কতখানি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন জানি না, নিশ্চয় সম্পূর্ণ তৃপ্ত হন নি, কারণ সাহা যা বলেছিলেন, তা সবই সুভাষচন্দ্রের জানা ছিল। ডঃ সাহা প্রশ্নগুলির প্রধানত ঐতিহাসিক উত্তর দিয়েছিলেন—সুভাষচন্দ্র নিজে ইতিহাসের উত্তম ছাত্র, দর্শনেরও। ইতিহাস ও দর্শন এসব বিষয়ে কি বলে, তা তাঁর যথেষ্টই জানা ছিল, বৈজ্ঞানিক উত্তরের মোটা কথাটাও জানতেন, তিনি চাইছিলেন বৈজ্ঞানিকদের গভীর গবেষণা-লব্ধ কোনো সমাধান—ডঃ সাহা সেই সভায় তা দিতে পারেন নি, বোধ হয় দেওয়াও সম্ভব ছিল না ঐ সভার নাতিদীর্ঘ ভাষণের মধ্যে।

ডঃ সাহা যা বলেছিলেন, সুভাষচন্দ্র যে তা জানতেন, তা দেখতে পাই, এই সভার দশ-এগারো বৎসর পূর্বে প্রদত্ত সুভাষচন্দ্রের কয়েকটি ভাষণের মধ্যে। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে সুভাষচন্দ্র ছাত্র ও যুব সম্মেলনগুলিতে যে সব ভাষণ দিয়েছেন, তার প্রায় প্রত্যেকটিতে জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস-পর্যবেক্ষণ করেছেন। জাতীয় জাগরণের জন্য যিনি প্রাণপাত করছেন, তাঁর কাছে জাতির উত্থান-পতনের প্রশ্ন মূলগত। ভারতীয় জাতির উন্নতির যুগ, পতনের কাল ও তার কারণ, বর্তমান উত্থানের চরিত্র এবং তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাকে তিনি এড়াতে পারেন নি, এবং ভারতীয় জাতির উন্নতির জন্য আত্মবলিদানে যাঁদের আহ্বান করছেন, তাঁদের কাছে তাঁর সিদ্ধান্ত উপস্থিত করার দায়িত্বও বোধ করেছিলেন। ১৯২৭ সালের শেষের দিকে বঙ্গীয় যুব সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্যতায় উত্থান-পতন দেখতে পাওয়া যায়; যে-ভারত সভ্যতায় পৃথিবীর শীর্ষে ছিল, তা অধঃপতনের গভীরে পড়েছে; তবে "আনন্দের বিষয় এই যে, অজ্ঞান-নিশা প্রায় কাটিয়া গিয়াছে; আমরা জাতীয় চৈতন্য ফিরিয়া পাইয়াছি।" জাতীয় চৈতন্য যে সত্যই ফিরেছে, তার প্রমাণ—"সৃষ্টিই জীবনের লক্ষণ; কাব্যে সাহিত্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, ধর্মে কর্মে, কলা বিজ্ঞানে,—নূতন সৃষ্টির যে পরিচয় ভারতবাসী দিতেছে, তাহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, ভারতের আত্মা জাগিয়াছে।"

১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে পাবনা যুব সম্মিলনীতে প্রদত্ত ভাষণে তিনি পুনশ্চ জাতির উত্থান-পতনের প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে উত্থাপন করে বলেছিলেন, "এই বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে বহু চিন্তা ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে এবং কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক এই অভ্যুত্থান ও পতনের কারণ নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের গবেষণার সারমর্ম এই যে, ব্যক্তির জীবনে যেমন জন্মমৃত্যু বিকাশ আছে, জাতির জীবনেও তদ্রূপ জন্ম, উন্নতি ও মৃত্যু আছে।......কখনও জাতিবিশেষ ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং মাত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, আবার কখনো বা জাতি-বিশেষ একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া নররূপী পশুর মত কোনো প্রকারে জীবনধারণ করিতে থাকে। যে জাতি নিতান্ত ভাগ্যবান সে জাতি মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত হইয়াও পুনর্জন্ম লাভ করে।" সুভাষচন্দ্র ভারতীয় জাতিকে পুনর্জন্ম লাভ করার মত সৌভাগ্যবান বিবেচনা করেছিলেন।

তবু তার প্রশ্ন যায় নি। সত্যই জাগরণ তো? বাইরের উত্তেজক বস্তুর সংস্রবে জড়বস্তুও শিহরিত হয়—ভারতের জাগরণ সেই রকম নয় তো? ১৯২৮ সালের শে

মাসে মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে, ১৯২৯-এর অক্টোবর মাসে প্রথম লাহোর ছাত্র সম্মেলনের ভাষণেও ঐ প্রশ্নই তুলেছিলেন। শুধু ভারতে নয়, প্রাচ্যেও জাগরণের লক্ষণ; অনড় প্রাচ্য নড়ে-চড়ে উঠছে; সবই সত্য, তবু প্রেম থেকে যে সংশয়ের জন্ম, তা সহজে যায় না। জাগরণ যাতে অকাল নির্বাপণের দুর্ভাগ্য লাভ না করে তার জন্য বৈজ্ঞানিকদের একটি সিদ্ধান্তকে তিনি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন—"কিরূপ অবস্থায় জাতির পুনর্জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহাও কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির রক্ত সংমিশ্রণের ফলে এবং বিভিন্ন শিক্ষার (culture) সংস্পর্শের ফলে জাতির এবং জাতীয় সভ্যতার পুনর্জন্ম হইতে পারে।" (পাবনা ভাষণ)। ২৩ রক্তমিশ্রণের জন্য সুভাষচন্দ্রের আগ্রহের মূল এইখানে।

কেবল রাজনৈতিক সুভাষচন্দ্র নন, বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহাও ভারতীয় জাতির উত্থানবিষয়ে আশা বোধ করেছিলেন, কারণ উভয়েই দেশপ্রেমিক, এবং উভয়ে একই সঙ্গে মনে করেছিলেন, ঐ উত্থানের বাঞ্ছিত পরিণতির জন্য কয়েকটি শর্তপূরণ আবশ্যক। শর্তগুলির বিষয়ে উভয়ে মোটামুটি একমত হয়েছিলেন দেখতে পাই। জাতির উত্থান-পতনের তত্ত্বব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মেঘনাদ সাহা স্যার ফ্লিনডার্স পেত্রীর নাম করেছিলেন, সুভাষচন্দ্রও তাঁরই নাম করেছিলেন ১৯২৮ ও ১৯২৯-এর মহারাষ্ট্র ও লাহোর ভাষণে।২৪

সুভাষচন্দ্রের পুরাতন প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টার পরে ডঃ সাহা উল্টোদিকে সুভাষচন্দ্রের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন রেখে উত্তর চান। প্রশ্নগুলি জাতীয় পরিকল্পনা এবং যন্ত্রশিল্পায়ন সম্বন্ধে। তাঁর জিজ্ঞাসা—"ভবিষ্যতের ভারত কি গ্রামজীবনের আদর্শকে, গরুর গাড়ির যুগকে, জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করবে, এবং তার দ্বারা দাসত্বকে দীর্ঘতর করবে, নাকি আধুনিক শিল্পোন্নত দেশের মত হয়ে উঠতে চাইবে, দেশের স্বাভাবিক সম্পদসমূহের ব্যবহারের দ্বারা দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও আত্মরক্ষার সমস্যার সমাধানে ব্রতী হবে, এবং পৃথিবীর জাতিসভায় সম্মানের আসন গ্রহণ করে নূতন সভ্যতাচক্রের প্রবর্তন ঘটাবে?"

ডঃ সাহা আরও জিজ্ঞাসা করেন—"কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড যদি সত্যই শিল্পায়নের নীতি গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁরা কি শিল্পায়নের কেন্দ্রীয় নীতি গ্রহণ করবেন, একটি ন্যাশ-ন্যাল রিসার্চ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে সমবেত করবেন? কংগ্রেস কয়েকটি প্রদেশে ক্ষমতাসীন হয়েছে বলেই এসব প্রশ্ন করছি; দেখেছি যে, ভারতের ভাবী শিল্পায়ন সম্বন্ধে বিপুল চিন্তা-বিভ্রান্তি রয়েছে দেশে।"

ভারতের এক-জাতীয়তার প্রশ্নটি ডঃ সাহা সব শেষে উত্থাপন করেছিলেন: "ভারত কি এক জাতিতে পরিণত হতে যাচ্ছে, নাকি তা পরিকল্পনাহীনভাবে গঠিত বিভিন্ন প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য এবং নানা সম্প্রদায়ের জোড়াতালি দেওয়া কিছুতে পর্যবসিত হবে, যেখানে ভাষা, ভাবাবেগ এবং কৃত্রিম রাজনৈতিক বিধিনিষেধের ব্যবধান বহু বিস্তৃত?"

এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে উঠে গোড়ায় সুভাষচন্দ্র আন্তরিক বিনয় প্রকাশ করেছিলেন—বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সম্মেলনে তাঁর মত অবৈজ্ঞানিক কিছু বলার যোগ্য নন। ডঃ সাহার ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন, "কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি, আপনাদের 'সায়েন্স

---

২৩ সুভাষচন্দ্র অবশ্য বিদেশী জাতির সঙ্গে রক্তমিশ্রণের পক্ষপাতী তখনই নন, কারণ ব্রহ্মদেশে তার ফল ভাল হয়নি। তিনি ভারতবর্ষে সকল বর্ণের মধ্যে অবাধ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন।

২৪ মহারাষ্ট্র ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন—"I agree with Sir Flinders Petrie that civilisation, like individuals, grow and die in a cyclic fashion and that each civilisation has a certain span of life vouchsafed to it. I also agree with him that, under certain conditions, it is possible for a particular civilisation to be reborn after it has spent itself. When this rebirth is to take place, the vital impetus, the *elan vital*, comes not from without but from within."

লাহোর ভাষণে অতি চমৎকারভাবে যা বলেছিলেন, তার সঙ্গে মেঘনাদ সাহার পরবর্তী বক্তব্যের অক্ষরে অক্ষরে মিল:

"Indian civilisation has emerged out of the dark ages and is now entering on a new lease of life. At one time then was a genuine danger that our civilisation might die a normal death like the civilisations of Phoenicia and Babylon. But it has once again survived the onslaught of time. If we want to continue the work of rejuvenation that has begun, we must bring about a revolution of ideas, in the world of thought, and an intermingling of blood on the biological plane. Unless we refuse to accept the verdict of history and the considered opinion of thinkers like Sir Flinders Petrie, we have to admit that it is only by this means that old and wornn-out civilisations can be rejuvenated."

অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকাটি শিল্পায়ন সমস্যার দিকে দেশের বুদ্ধিজীবিদের মনকে চালিত করতে সাহায্য করেছে। বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী-বিজ্ঞান, ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন প্রভৃতি সম্বন্ধে আপনারা মাঝে মাঝে যেসব লেখা প্রকাশ করেছেন সেগুলি খুবই জ্ঞানগর্ভ এবং শিক্ষাপ্রদ।"

তারপরে সুভাষচন্দ্র জাতীয় পরিকল্পনার রূপরেখা দান করেন। ডঃ সাহার প্রশ্নাদির উত্তরও তিনি দিয়েছিলেন। সে উত্তর ডঃ সাহাকে এতই আনন্দিত করেছিল যে, সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার পত্রিকায় সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে (*The Congress President on National Reconstruction*) মুক্ত অভিনন্দন জানান। মেঘনাদ সাহার মত প্রখর বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে এই ধরনের অভিনন্দন নিঃসন্দেহে শ্লাঘনীয়।

"কংগ্রেস সভাপতি দেশকে বহুপ্রত্যাশিত নেতৃত্ব দিয়েছেন"—ডঃ সাহা ঐ রচনায় বলেছিলেন—"বোম্বাইয়ে অল্পদিনের মধ্যে তাঁর সভাপতিত্বে কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হতে যাচ্ছে, তাতে তাঁর উপদেশ অবশ্যই স্বীকৃত হওয়া উচিত।" কংগ্রেস সভাপতির নেতৃত্ব সানন্দ অভিনন্দনের যোগ্য, কারণ—"তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দেশে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পায়নের পক্ষে বলেছেন; ঐ উপায়েই মাত্র, তাঁর মতে, দারিদ্র্য, বেকারী, এবং দেশরক্ষার সমস্যা দূর করা যাবে। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পায়নের পরিষ্কার পরিকল্পনা-নীতিও তিনি তুলে ধরেছেন।" সুভাষচন্দ্রের তুল্য প্রগতিশীল মনোভাব সাধারণভাবে কংগ্রেস-কর্তাদের মধ্যে ছিল না। যা ছিল, তার রূপ, মেঘনাদ সাহার মতে এই প্রকারঃ "পর্বতাকার চিন্তার বিশৃঙ্খলা, কর্মপদ্ধতিকে যা পঙ্গু করে রেখেছে—তার ভয়াবহ চেহারা সম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এক কংগ্রেসী প্রদেশের শিল্পমন্ত্রী সম্প্রতি বৃহৎ শিল্পব্যবস্থার প্রবর্তনের পক্ষে তাঁর প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করার পরেই বক্তৃতাযোগে বললেন, যা শুনে আমরা স্তম্ভিত,—বৃহৎ শিল্পায়ন বলতে তিনি কার্ড বোর্ড তৈরি ও সাবান তৈরি বোঝেন। তিনি জানেন না, ও-দুটি নিতান্ত ছোট শিল্প।" এক্ষেত্রে ডঃ সাহার মনোভাবের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মনোভাবের সমূহ ঐক্য। "শ্রীযুক্ত বসু জনৈক শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের দাবির অসারত্ব তীক্ষ্ণভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। উক্ত ডিরেক্টর ছাতার বাঁট এবং কাঁসর-ঘন্টার ধাতুমিশ্রণ পদ্ধতির প্রবর্তন করে ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, তিনি তাঁর প্রদেশে শিল্প নবজাগরণ এনে ফেলেছেন। আশঙ্কা হয়, এক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র মহাত্মা নন।" না, সত্যই, তিনি একমাত্র নন, আর আরও কিছু নমুনা ডঃ সাহা দিয়েছিলেন। জ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে ভারত সরকারের শিল্পনীতির নিয়ামকগণ এবং কিছু উগ্র গান্ধীবাদী কংগ্রেসী এসব বিচিত্র ধারণার প্রচার করে যাচ্ছেন—ভারত সরকারের কর্মচারীরা সজ্ঞানে করেছেন এবং গান্ধীবাদীরা করেছেন, ধরে নেওয়া যেতে পারে

দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥

রন্ধনশিল্পে অভিজ্ঞা

পারুল সেনগুপ্তের

দেশদেশের জলখাবার

এই নিদারুণ খাদ্য সমস্যার দিনে সস্তায় মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য তৈয়ারীর এমন অভিনব সংগ্রহ ইতিপূর্বে বাঙলায় ছিল না বললেই হয়। বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক রন্ধন-প্রক্রিয়ার বহুবিধ প্রকরণ এই গ্রন্থে আছে। প্রবীণা ও নবীনাদের পক্ষে অপরিহার্য বইটির ভূমিকা সুলেখিকা আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন—"দেশদেশের জলখাবার বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। শুধু নবীনা গৃহিণীরাই নয়, প্রবীণা জননী, ভগিনী, গৃহিণীরাও এর থেকে পরম উপকৃত হবেন। শ্রীমতী সেনগুপ্ত যে উৎসাহে, যে পরিশ্রমে ও যে নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে জলখাবার শিল্পের বহুবিচিত্র পদ্ধতি সংগ্রহ করে সেগুলি অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করে সহজ সরল ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিয়েছেন তা বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।"

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে ।। মূল্য : ছয় টাকা

বসুমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার

স্থানে।—"শ্রীযুক্ত বসুর স্বচ্ছ সাহসী ঘোষণার অদ্ভুত উল্টো রূপ দেখা যায় শিল্প সম্বন্ধে সরকারী নীতির মধ্যে। ...সেই নীতি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, যেসব ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ভারত শাসনের জন্য দায়ী, তাঁরা চান ভারতীয়রা আলু আর তামাক চাষ করেই সন্তুষ্ট থাক। বিচিত্র কথা, তাঁরা কথায় না হলেও কাজে সমর্থন পাচ্ছেন কংগ্রেসের চরম ভাবাদর্শের একটি দলের কাছ থেকে, যাঁরা আদিম জীবনে ফিরে যাওয়ার পক্ষে প্রচার করেন—সেই গরুর গাড়ি, চরকা আর খাদিতে।" এই পরিস্থিতিতে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন সুভাষচন্দ্র, সে কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে ডঃ সাহা বললেন, "আমরা ভরসা করি, শ্রীযুক্ত বসুর ঘোষণা উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করবে; ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্টকে ঐ ঘোষণার সঙ্গে যোগ করে দিলে সঠিক কর্ম-পথ নির্ধারিত হয়ে যাবে। আমরা আরও আশা করতে পারি, শ্রীযুক্ত বসুর ঘোষণার দ্বারা ভারতীয় জাতি গরুর গাড়ির যে-দর্শনের দ্বারা গলরজ্জু হয়ে আছে তার থেকে মুক্তি পাবে।" তাই বলে কি ডঃ সাহা বৃহৎ শিল্পের সম্ভাব্য দোষ সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন? কদাপি নয়, সব শেষে তার উত্তর ডঃ সাহা দিয়েছেন—"আধুনিক ধনতন্ত্রী ও বিজ্ঞাননির্ভর পৃথিবীতে যেসব পাপ প্রবেশ করেছে, তাদের গুরুত্বকে আমি ছোট করে দেখছি না। এই সব মন্দ ঘটছে, কারণ মানুষ নিজের স্বভাবের উপর নৈতিক আধিপত্যের শক্তি অর্জন করার আগেই প্রাকৃতিক শক্তির উপর প্রভুত্বের যথেষ্ট শক্তি পেয়ে গেছে। বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান যাদুশক্তি আমাদের আয়ত্তে—তার ব্যবহার বা অপব্যবহারের দায়িত্বও আমাদেরই। এই মূল কথাটা কিন্তু ভুললে চলবে না, জনপ্রিয় নেতারা এবং জনপ্রিয় সরকারগুলি যদি শ্রীযুক্ত বসুর তুল্য বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হন, যদি ব্যবসায়ীরা আরও স্বার্থবোধহীন হন, সকলে যদি সামাজিক উন্নতি ও ন্যায়বিচারের জন্য কাজ করেন, তাহলে আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির যুগে প্রবেশ করতে পারব, যেখানে ভারতের প্রতিটি নরনারী এমন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বাঁচতে পারবে সম্রাট শাজাহানের পক্ষেও যা ঈর্ষাযোগ্য।"

অতএব মেঘনাদ সাহার পরবর্তী ভূমিকা কি হবে আমরা অনুমান করতে পারি। ডঃ সাহা তাঁর সমস্ত আবেগ ও শক্তি দিয়ে সুভাষচন্দ্রের প্রগতিশীল কার্যাবলীর পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র যখন দ্বিতীয় বার কংগ্রেস সভাপতিপদের প্রার্থী হলেন, তখন ডঃ সাহা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে নিজের প্রভাব যথাসম্ভব প্রয়োগ করেছিলেন। সে প্রভাব হয়ত সাধারণ কংগ্রেসীদের উপর প্রত্যক্ষভাবে খুব বেশি ছিল না, সাহা তাই চেয়েছিলেন কংগ্রেসীদের প্রধান নেতা গান্ধীজীর উপর যাঁর প্রভাব আছে, এমন একজনকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করতে। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র সকাশে গমন। রবীন্দ্রনাথ ডঃ সাহার দ্বারা এবং অন্যান্যের দ্বারাও প্রণোদিত হয়ে গান্ধীজীকে চিঠি লিখেছিলেন সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন সমর্থন করে। সুভাষচন্দ্রের পক্ষ সমর্থনের রাজনৈতিক কারণ ডঃ সাহা উপস্থিত করেন নি; তিনি বলেছিলেন, জাতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য সুভাষচন্দ্রের কর্তৃত্বে আসা প্রয়োজন; এবং আমরা জানি, জাতীয় পরিকল্পনা যেখানে প্রয়োজন, মেঘনাদ সাহার সমর্থন সেখানে সর্বাঙ্গীণ।২৫

[ক্রমশ]

---

২৫ প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হয়ে যাওয়ার পরে, ১৯৩৯ সালের ৬ জানুয়ারীর হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে *Industrialisation in India* নামে ডঃ সাহার একটি লেখা বেরোয়। এর মধ্যেও তিনি প্ল্যানিং ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা ও স্বচ্ছদৃষ্টির প্রশংসা করেন। প্রবন্ধের গোড়ায় ঐ বছর লাহোর অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের ভাষণের বিশেষ প্রশংসা ছিল। অধ্যাপক ঘোষ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ব্যাপারে ভারত সরকারের অসার-নীতির সমালোচনা করেছিলেন। সেই সূত্রে ডঃ সাহাও ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিস্তৃত আলোচনা করেন। তারপর লেখেনঃ

"It is therefore a matter of great gratification that the Indian National Congress has awakened to the importance of large scale industries in this Country. Unlike the Committees of the Government of India th[illegible]e not wasting their time in looking to the foliage, Srijut Subhas Chandra Bose in his address while inaugurating the Industrial Planning Committee at Bombay has struck at the root of the tree. He has clearly recognised, the Planning Committee should devise ways and means for developing key-industries of India and these industries should entirely be freed from foreign control and from the motif of private gains."

অতঃপর ডঃ সাহা জাতীয় পরিকল্পনায় বিদ্যুতের ভূমিকা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন, এবং রাশিয়া বিদ্যুতের ব্যাপারে ও পরিকল্পনার অন্যান্য ব্যাপারে কিরূপ সাফল্য অর্জন করেছে, তা বর্ণনা করেন। ডঃ সাহার এই ধরনের বক্তব্য আমরা আগে যথেষ্ট জানিয়েছি।

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শব্দ-পরিহাসের প্রয়োগে বেশ এক-রকম রূঢ়তা ছিল ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। সে-কথা ভাবতে বসলে সুইফট্-এর কথা মনে পড়ে যায় যেন।

আনন্দ এই 'রূঢ়তা' ব্যাপারের ওপর জোর দিয়ে বললে—সেকালে ভবানীচরণ গদ্যে যে কাজ করেছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর পদ্যের বাহনে সেই একই মেজাজ ব্যক্ত হতে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত আর ভবানীচরণ যে একই সময়ের মানুষ, সেটা ভুললে চলবে না। —আমাদের এই সাম্প্রতিকতম পর্বে আমাদের পাঠকরা ঈশ্বর গুপ্তকে ঠিকভাবে দেখছেন কি না,—দেখতে পাচ্ছেন কি না, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

আমি বললুম—অর্থাৎ?

সে বললে—বলছি শোনো—নিধুবাবুর মৃত্যুর পনেরো-ষোলো বছর পরে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন—"অনেকেই 'নিধু' 'নিধু' কহেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই 'নিধু' কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি কি? তাহা জ্ঞাত নহেন।"

—অর্থাৎ, নিধুবাবু সম্বন্ধে—তাঁর খুবই নিকট-কালে,—ঈশ্বর গুপ্তের আমলেই দেশের পাঠকমন কতকটা উদাসীন হয়ে গিয়েছিল—কিংবা তাঁর প্রকৃত সত্তাস্বরূপটি বেশ ঝাপসা হয়ে এসেছিল? ঈশ্বর গুপ্ত কি এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন?

—হাঁ, শুধু 'উদাসীন' নয়,—'বিস্মৃতি' বলাই ভাল। সময় তখন দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। ১২৯২ সালে কৈলাসচন্দ্র ঘোষ নিধুবাবুর গান সম্বন্ধে তাঁর 'বাংলা সাহিত্য' বই-খানিতে লেখেন—"ইহার অধিকাংশ গীতই অশ্লীলতাদুষ্ট।" 'উদভ্রান্ত প্রেম'-এর লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ও নিধু-বাবুর রচনা সম্বন্ধে খুবই কড়া সমালোচনা করেন। 'রামনিধি গুপ্ত' সম্বন্ধে ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁর 'নানা নিবন্ধ'-এ যে প্রবন্ধটি রেখে গেছেন, তাতে এসব বলা হয়েছে।

আমি বললুম—এসব খবর এখন অনেকেরই নজরে পড়েছে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তকে যদি 'রূঢ়' বলতে হয়, তাহলে সেরকম রূঢ়তা কি কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'তেও পাওয়া যায় না?—মধুসূদনের প্রহসন দুখানিতেও কি তা নেই?

আনন্দ বললে—কেন থাকবে না? আছে হয়তো,—কিন্তু রূঢ়তারও তারতম্য ঘটে থাকে। 'হুতোম' অবলীলাক্রমে এমন সব শব্দ ব্যবহার করে গেছেন, যা ঠিক একালের রুচিতে অবাধ নয়।

একটু থেমে, কী যেন ভেবে সে বললে—অবিশ্যি খুবই সম্প্রতি,—এই হাল আমলে,—দু'পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলা গল্প-উপন্যাস-কবিতাতেও এমন সব শব্দ দেখা দিচ্ছে যা নিঃসন্দেহে অশালীন রকমের বাস্তব বলা চলে। কিন্তু যাক্ সে কথা। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে ঠিক সেরকম শব্দগত রূঢ়তা কম,—কিন্তু তাঁর কোনো কোনো বাক্যের ইঙ্গিত মর্মান্তিক। মধুসূদনের প্রহসনে পরিস্থিতি ঘটিয়ে তোলার মধ্যে কতকটা সেই রকম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। কিন্তু এখন এ-চিন্তা বেশি ছড়িয়ে যেতে দিলে একসংগে অনেকের প্রসঙ্গ এসে পড়বে—ঈশ্বর গুপ্তের নিজস্ব ব্যঙ্গবচনের রূঢ়তার নমুনা দেখাবার দায়িত্ব তখন ভুলে যেতে হবে। অতএব শোনো ঈশ্বর গুপ্তের কথাই,—বিদ্যাসাগর যে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তিত করতে চেয়েছিলেন, গুপ্ত-কবি সে-বিষয়ে সীমা-লঙ্ঘনের আশঙ্কা প্রকাশ করেন, সে তো বলা হয়েছে?

আমি বললুম—হাঁ, কিন্তু সে তো সীমা রক্ষা করে বিধবা-বিবাহ অনুমোদনের ভাবও নয়,—বিধবা-বিবাহ তিনি মোটেই অনুমোদন করেন নি—

> সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন
> তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন।

—অর্থাৎ সমুদ্রেরও সীমা আছে: সাগর যদি সেই সীমা লঙ্ঘন করে, বিধবা-বিবাহ সেই অবস্থাতেই ঘটতে পাবে—অর্থাৎ তা অসম্ভব।

আনন্দ খুশি হয়ে বললে—শোনো আরও মন্তব্য—তাঁর এই কথাটিই আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল এইসব ছত্রে—

> বিধবার বিয়ে দিতে যাহারা উদ্যত
> তার মাঝে বড় বড় লোক আছে যত।
> যারে ইচ্ছা তারে হয়, ডাকিয়া আনিয়া
> ঘরেতে বিধবা কত পরিচয় নিয়া।
> গোপনেতে এই কথা বলিবেন তারে
> জননীর বিয়ে দিতে পারে কি না পারে
> যদি পারে তবে তারে বলি বাহাদুর
> এমনি করিলে সব দুঃখ হয় দূর।

আনন্দ প্রসঙ্গে—এই হেদোর ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গচিত্র। এ রসিকতার তুলনা কোথায়?

ছদ্ম মিশনারি সম্বন্ধে এই ব্যঙ্গনিপুণ ঈশ্বর গুপ্তই কলকাতার হেদুয়া অঞ্চলের দিকে তর্জনী-সংকেত করে লেখেন—

হেদো বনে কেঁদো বাঘ রাঙ্গা মুখ তার।
বাপ্ বাপ্ বুক ফাটে নাম শুনে তার॥

এবং—

বিদ্যাদান ছল করি মিশনারি ডব
পাতিয়াছে জাল এক বিধর্মের টব॥
মধুর বচন ঝাড়ে, জানাইয়া লব।
ঈশমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশুসব॥

ডাফ্-সাহেবের ওপর রাগটা লক্ষ্য করলে তো? ডব হলেন ডাফ—আর 'লব' মানে Love—বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?

দেশ তখন অব্যবস্থিত। বড়ো বড়ো পরিবর্তনও ঘটতে আরম্ভ করেছে। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ সেটা ভাবতে সময় লাগে। সমকালের সব ঘটনারই তিনি যে অভ্রান্ত সমালোচক ছিলেন, তা নয়। তবে তাঁর সজাগ মেজাজটি ভোলবার নয়। আমাদের সেকালের সমাজে স্ত্রীশিক্ষার উন্মেষও তাঁর নজর এড়িয়ে যায় নি। তিনি লেখেন—

আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো
ব্রত কর্ম কোর্তো সবে ॥
একা বেথুন এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে
তখন এ বি শিখে, বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে
সাঁজ-সেঁজোতির ব্রত গাবে
সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।
ও ভাই! আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

দেশীয় আচারে অভ্যস্ত মানুষটি গোমাংসের প্রতি সেকালের বিদেশী ও নব্য সমাজের আগ্রহ দেখে ভারত-সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করে লেখেন—

ওমা, এমন ত নয় গরুর মাংস
না খেলে পর প্রাণ বাঁচেনা।
সোনার বাঙ্গাল করে কাঙ্গাল
ইয়ংবেঙ্গল যত জনা।
তারা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে
কানে লাগায় ফোঁস্-ফোঁসনা॥
এরা না হিন্দু, না মোছোলমান
ধর্ম ধনের ধার ধারেনা।
নয় মগ ফিরিঙ্গি বিষম খিঙ্গী
ভিতর বাহির যায় না জানা।
ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে
ঘটায় কত অঘটনা।

এই অঘটনের কথা-প্রসঙ্গেই তাঁর চিন্তায় ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও একই সঙ্গে জায়গা নিয়েছেন—

এরা নোনা জল ঢোকালে ঘরে
আপন হাতে কেটে খানা।
অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।

এসব ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতা সন্দেহাতীত। কবি-গানের মহড়া—চিতেন—অন্তরা অবলম্বন করেই ঈশ্বর গুপ্ত নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে অতিসাহিক বাঙালীর অভিযোগ পেশ করেন ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে—

হলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা ঘটে সর্বনাশ।
কাল সাপ কি কোনকালে দয়াতে ভেকে পালে
টপাটপ অমনি করে গ্রাস।
বাঙালী তোমার কেনা, একথা জানে কে না?
হয়েছি চিরকেলে দাস॥
করি শুভ অভিলাষ
তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা
গামলা ভাঙেনা
আমরা ভুসি পেলেই খুশি হব
ঘুসি খেলে বাঁচব না।

বিধবা-বিবাহের আইন-প্রবর্তন, নীলকরদের ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া,—দেশে দুর্ভিক্ষ, ইয়ং-বেঙ্গলের নীতিভ্রষ্টতা ইত্যাদি সমকালীন দুশ্চিন্তার মধ্যেই আবার অক্ষয়কুমার দত্তের বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়-গ্রন্থ-মতো রচনাও তাঁর মনে উঁকি দিয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন—

হল নিরামিষে শরীর শুষ্ক
আমিষের মুখ দেখব কবে?
ওরে উড়ো খই গোবিন্দায় নম
এই ব্যবস্থা যদি সবে।
এস অক্ষয় দত্তে গরু কেটে
বাহ্যবস্তু পড়ি তবে।

লোকজীবনের একজন সাংবাদিক কবি ছিলেন তিনি।

তুমি দেখতে পাও না কেন ?

বেণু দত্তরায়

সারারাত সারাদুপুর
লজ্জা গা—
ফুঁপিয়ে কাঁদে, তুমি দেখতে পাও না কেন?
কাশতে গেলে যে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে
দুগ্‌গোটুনটুনি গঙ্গাফড়িং কোথায় গেল
মস্ত বড়ো চন্দ্রটা যে আকাশটাকে গিলে
রাখছে তুমি দেখতে পাও না কেন?

জ্যোতিষী হ'য়ে তুমি পথের ধারে
বসলে কেন? কুপিত গ্রহের শান্তিস্বস্ত্যয়নে
তোমার জুড়ি নেই—তোমার আদিখ্যেতা
নষ্ট চোখ দেখে তোমার ভয় পাই।

সারাদুপুর সারারাত
লজ্জা গা—
ফুঁপিয়ে কাঁদে। ঝোলার ভিতর থেকে
তুমি এ-কোন্ বুজরুকি বাদুড়ের ঠ্যাং
বার করলে!

আমরা মানুষ চাই, মানুষের ছা—
মানুষের গায়ে গণ্ডারের চামড়া
দেখতে চাই না।

কতো প্রসঙ্গই যে তাঁর কলমে ধরা দিয়েছিল। ১৮৪৫-এর শিখ যুদ্ধের কথাই ধরা যাক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যবিস্তারের নীতি তখন কার্যকরী। ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই খালসা সৈন্য সাটলেজ পার হয়ে আসে। তখন গবর্নর জেনারেল ছিলেন সার হেনরি হার্ডিঞ্জ। ইংরেজ-শিখের সেই প্রচণ্ড যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের ৬৫৭ জন আহত হন, ২১৫ জনের মৃত্যু হয়—দুজন মেজর-জেনারেল-এর মধ্যে একজনের নাম ছিল সার রবার্ট সেল। ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন—

হইতে লাহোর রাজ্য হেনরির কোপ
নির্ভয়েতে যোদ্ধা সব কর ভাই হোপ
শতলজ পার হয়ে, জোরে ছাড় তোপ
উড়ে যাক শীকমুণ্ড পুড়ে যাক গোঁপ
বিপক্ষের পরাক্রম সব করি লোপ
শতদ্রুতে স্নান করি গায়ে মাখ সোপ॥

লিখিতে উদয় দুঃখ, লেখনীর মুখে
সেলের মরণ শুনি শেল ফুটে বুকে।

কানপুর, দিল্লি, এলাহাবাদ,—কাবুল, ব্রহ্মদেশ বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের বাহুবল তখন অপরাজেয়। সেই সব যুদ্ধের কথা আছে ঈশ্বর গুপ্তের অজস্র পদ্যে। এসব তাঁর ইতিহাসচেতনার সার্থক উদাহরণ মনে করলে কিন্তু ভুল হবে। ইতিহাসের গতি উপলব্ধি করবার মতো শান্ত শিক্ষিত মন ছিল না তাঁর। তবে একথা ঠিক যে, বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে যেমন তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ ছিল, ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে তেমনি তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ছিল।

আবার একটু থেমে, আনন্দ বল্‌লে—সেকালের সাধারণ লোকচেতনার কবি তিনি। তাঁর সম্বন্ধে ততোধিক যা,—বাঙালী কবি হিসেবে সে ছিল তাঁর দেশপ্রীতি। সেই প্রীতিবশেই তিনি নিজে বহু পরিশ্রমে রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, লালু, নন্দলাল প্রভৃতি কবিদের জীবনী সংগ্রহ করে গেছেন। বঙ্কিম-দীনবন্ধু-দ্বারকানাথ অধিকারীর মতো পরবর্তী কালের কবিদের উৎসাহ দিয়ে গেছেন। আর, আমাদের বাংলার নিজস্ব ঝোঁকে, দেশী বুলিতে অজস্র পদ্য লিখে গেছেন যার ঢেউ ছুঁয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল অবধি। তাঁর 'বোধেন্দুবিকাশ'-এর প্রস্তাবনায় নটীর সেই গানটি অনেকেরই মনে থাকবার কথা—

ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে, হাসবে লোকে।

বঙ্গদর্শন

সাপ্তাহিক বসুমতীর ১০ই অক্টোবরের সংখ্যায় শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা এম এল এ তাঁর প্রবন্ধে স্বাস্থ্যদপ্তর তথা ঐ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে যে চাঞ্চল্যকর অভিযোগসমূহ এনেছেন, তা নিশ্চয়ই পাঠকবর্গের অজানা নেই।

দুটি দৈনিক পত্রিকায় সম্প্রতি দুটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সে দুটি সংবাদের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যেহেতু আর এস পি দল সি পি এম-এর খুবই ঘনিষ্ঠ, "ভ্রাতৃপ্রতিম" সেই দলের একজন নেতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে অভিযোগ আনায় মনোরঞ্জনবাবুকে পার্টি সেক্রেটারিয়েটে জবাবদিহির জন্য তলব করা হয়েছে! আশা করি মনোরঞ্জনবাবু সেখানে যোগ্য জবাবই দেবেন, এ বিষয় আমাদের কোন বক্তব্য নেই।

শ্রীননী ভট্টাচার্যের বক্তব্য অনুযায়ী মনোরঞ্জনবাবু তাঁর সম্পর্কে যে সব অভিযোগ করেছেন, তা নির্জলা মিথ্যা। মনোরঞ্জনবাবু নাকি কায়েমী স্বার্থের ওকালতি করেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাকি এবার চক্রান্তকারীদের মুখোস খুলে দেবেন। তিনি বহু অগ্নিপরীক্ষায় নাকি উত্তীর্ণ হয়েছেন। চক্রান্তকারীদের কাছে মাথা তিনি নত করবেন না!

সবই বোঝা গেল। মনোরঞ্জনবাবু কায়েমী স্বার্থের দালাল, আমরা চক্রান্তকারী। আমাদের মুখোস তিনি যদি সত্যই খুলে দিতে পারেন, তো দিচ্ছেন না কেন? কিন্তু "অগ্নিপরীক্ষা" ব্যাপারটা বোঝা গেল না। অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন মানে কি আমরা এটা বুঝব যে, তিনি ভোটে জিতে এসেছেন? সে রকম অগ্নিপরীক্ষায় তো মনোরঞ্জনবাবু তাঁর চেয়ে অনেক বেশিবার উত্তীর্ণ হয়েছেন। ১৯৫২ সাল থেকে মনোরঞ্জনবাবু বিধানসভার অবিচ্ছিন্ন সদস্য। "অগ্নিপরীক্ষা" বলতে কি তিনি দেশের জন্য দুঃখবরণ বোঝাচ্ছেন? মনোরঞ্জনবাবু তাঁর চেয়ে যে কম দুঃখবরণ করেছেন তা তো নয়, বরং ননীবাবুর চেয়ে তিনি প্রাচীনতর দেশসেবক, কারাগার-লাঞ্ছনা কারো চেয়ে তিনি কম ভোগ করেন নি। আর অগ্নিপরীক্ষা পার হয়েও অনেকে আবার যে "মায়ার ডোরে" আবদ্ধ হতে পারেন, তার প্রমাণ কি গত বাইশ বছরের ইতিহাস দিচ্ছে না। কংগ্রেস নেতারা তো একদা কম আত্মত্যাগ করেন নি, এবং গত বাইশ বছরে তা সুদে-আসলে পুষিয়ে নিয়েছেন। কাজেই ও সব কথা বলে কোন লাভ নেই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, "আমি দুর্নীতিতে নাড়া দিয়েছি এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নিয়েছি বলে কায়েমী স্বার্থের চক্র যন্ত্রণা বোধ করছেন এবং সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়কে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি তিনি কোন্ দুর্নীতির মূলে নাড়া দিয়েছেন? ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত দুর্নীতিগুলির কথা বাদই দিলাম, মনোরঞ্জনবাবু তাঁর রচনায় যে অভিযোগগুলি তাঁর বিরুদ্ধে করেছেন, সেগুলির জন্য তদন্তের সম্মুখীন হতে তিনি গররাজি কেন? শুধু "নির্জলা মিথ্যা" বলে উড়িয়ে দিলেই তো বিষয়টির নিষ্পত্তি হচ্ছে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি অস্বীকার করতে পারেন সেই পরম গোপনীয় দিনটির কথা, যে-দিন ব্যাক-ডেট দিয়ে আমাদের বহু-আলোচিত সুহৃদ-চক্রের নায়ককে প্রমোশন দেওয়া হয়েছিল? স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি বলতে পারেন যে, নতুন স্বাস্থ্য-অধিকর্তা পদে ডাঃ সাহার নিয়োগ স্বাভাবিক ও সহজভাবে হয়েছে? শরিকী সংঘর্ষে বিপর্যস্ত যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সুপারিশ কেন মেনে নিতে বাধ্য হলেন তা কি কারো অজানা আছে? স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি বলতে পারেন যে, লিনেন মিসট্রেস পদে শ্রীমতী গোস্বামীর নিয়োগ বৈধভাবে ও স্বাভাবিক উপায়ে হয়েছিল? স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় কি অস্বীকার করতে পারেন যে, তাঁর এই দ্বিতীয় মন্ত্রিত্বকালের প্রথম দিকে গোবরা মানসিক হাসপাতালের হেডক্লার্ক, যাঁর বিরুদ্ধে বদলির আদেশ দেওয়া হয়েছিল দুর্নীতির অপরাধে, তাঁকে স্বস্থানে পুনর্বহাল করেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দুর্নীতিদমন অভিযান (?) শুরু, এবং শেষ পর্যন্ত আমাদেরই চাপে নিজের আদেশ নিজে বদল করতে বাধ্য হন?

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি যে, তাঁর আমলে যতগুলি দুর্নীতি হয়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ আমরা "স্বাস্থ্যদপ্তর সংক্রান্ত একটি বিশেষ সংখ্যায়" পেশ করব। ওই বিশেষ সংখ্যাটিতে স্বাস্থ্যদপ্তর সংক্রান্ত অনেক চাঞ্চল্যকর রচনা থাকবে, এবং সেগুলির দ্বারাই প্রমাণিত হবে কে বা কারা কায়েমী স্বার্থের দালাল।

কারখানা স্থানান্তরের চেষ্টা

বেশ কিছুকাল যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্যত্র কিছু কিছু কলকারখানা সরিয়ে নিয়ে যাবার একটা ব্যাপক প্রবণতা দেখা গেছে। সম্প্রতি বেঙ্গল ইলেকট্রিক ল্যাম্প কারখানাটি বাঙ্গালোরে স্থানান্তরকরণের প্রচেষ্টা হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও একজন ডিরেক্টর হচ্ছেন দক্ষিণ ভারতীয়। স্থানান্তরকরণের কারণ হিসাবে কোম্পানীর তরফ থেকে চিরাচরিত যুক্তি সেই শ্রমবিরোধের কথাই বলা হয়েছে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ গত জুন মাস থেকে কারখানাটি বন্ধ করে রেখেছেন, ফলে প্রায় এক হাজার শ্রমিক কর্মচারী বেকার রয়েছেন। রাজ্যের শ্রমদপ্তর উক্ত কারখানার বিরোধ মেটানোর নানা চেষ্টা করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের একগুঁয়েমীর জন্য তা সম্ভব হয় নি। অথচ এই কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। ১৯৫০-৫১ সালে উক্ত কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন ছিল সাড়ে ষোল লক্ষ টাকা, ১৯৬৭-৬৮ সালে তা দাঁড়িয়েছে সাড়ে সাতচল্লিশ লক্ষ টাকায়। নীট মুনাফা ১৯৫৯-৬০ সালের ৫·৮২ লক্ষ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকায় উঠেছে। এই লাভের কোন অংশই শ্রমিকরা পায় নি, কোম্পানী দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ১৯৫১ সাল থেকে এই কোম্পানী ধারাবাহিকভাবে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করে আসছে এবং তা কোনক্ষেত্রেই সোয়া ছয় শতাংশের কম নয়, সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে তা পনের শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৬ সালে কোম্পানী শেয়ার-হোল্ডারদের ১৫ লক্ষ টাকা বোনাস-শেয়ার দিয়েছে। কাজেই শ্রমবিরোধের যে ধুয়ো তুলে কারখানা স্থানান্তরের চেষ্টা

ঘটছে তার কোনই ভিত্তি নেই। এই অবস্থায় শ্রমিক কর্মচারীরা দাবি করেছেন, উক্ত কারখানার পরিচালনভার যেন সরকার গ্রহণ করেন। এই দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

রেল বন্ধের হিড়িক

সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই রেলপথে ৫২ বার ট্রেন চলাচলকালে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে, যার ফলে একমাত্র পশ্চিম-বঙ্গেই ৫৪১ ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথেরই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে পূর্ব রেলওয়েতে যে আরও কত ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে এবং কতবার গাড়ি থামানো হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে ঘন ঘন রেল অবরোধ করা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত এক মাসের মধ্যে শেয়ালদা সেকসনে আটবার ও হাওড়া সেকসনে তিনবার রেলপথ অবরোধ করা হয়েছে। অবরোধকারীদের অভিযোগ হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গত হতে পারে, কিন্তু রেল লাইন অবরোধ করাটা কোন যুক্তিই নয়, এর দ্বারা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির নিদারুণ ক্ষতি ভিন্ন আর কোনই লাভ হয় নি। লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রতিদিন নানা কাজের জন্য কলকাতার ওপর নির্ভর করতে হয়, অথচ তুচ্ছাতি-তুচ্ছ কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ হলে যাত্রী-সাধারণ যে কি নিদারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। যে সব কারণে ট্রেন-চলাচল বন্ধ হয় সেগুলিকে বহুক্ষেত্রেই সমাজবিরোধী কাজ বলে অভিহিত করা চলে। চোরা-কারবারীরা তাদের চোরাই মাল ইচ্ছামত জায়গায় নামাবার জন্য চেন টেনে গাড়ি থামায়। বিনা টিকিটের যাত্রীদের দৌরাত্ম্যের ফলেও ট্রেন বন্ধ হয় এমন নজিরও অসংখ্য আছে। শেয়ালদা সেকসনে রানাঘাট পেরুলেই আর টিকিট কাটার পালা নেই, চেকারের পক্ষে টিকেট চাওয়াও অপরাধ, এবং যদি কখনো তেমন ঘটনা ঘটে তৎক্ষণাৎ ট্রেন বন্ধ। রেলের একজন সাধারণ যাত্রীর সঙ্গে টিকেট চেকারের বচসা হলেও ট্রেন বন্ধ হয়। এই সেদিন, দুর্গাপূজার কয়েক-দিন আগে শেয়ালদা স্টেশনে একজন বিনা টিকেটের যাত্রী ছাত্রের সঙ্গে টিকেট পরীক্ষকের বচসার ফলে যে তুলকালাম সৃষ্টি হয় তাতে ওই সেকসনে ট্রেন চলাচল প্রায় আট ঘণ্টা বন্ধ থাকে। অল্প ভাড়ার যাত্রীকে উচ্চ ভাড়ার গাড়িতে উঠতে না দিলে ট্রেনের চাকা অচল হয়। এ ছাড়া স্থানীয় দাবি এবং ট্রেড ইউনিয়নী দাবিকে কেন্দ্র করেও ট্রেন চলাচল বন্ধ করা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিদ্যুৎ এবং জল সরবরাহের মত রেলওয়ে একটি অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস। যে কোন অজুহাতে তা বন্ধ করা আইন করে নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন।

বস্তি অঞ্চল ও হাঙ্গামা

১৯৪৬ সাল থেকেই দেখা গেছে যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, তা সাম্প্রদায়িকই হোক, প্রাদেশিকই হোক, দলীয়ই হোক, মূলত বস্তি অঞ্চলগুলিতেই ঘটে। দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে জগদ্দলে যে হাঙ্গামা হয়ে গেল তা হয়েছে শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন বস্তি এলাকাগুলিতে। কিছুকাল আগে তেলেনীপাড়া-ভদ্রেশ্বরে যে হাঙ্গামা হয়েছে তারও বিস্তার কারখানা সংলগ্ন বস্তি এলাকায়। তার আগে কলকাতার কলা-বাগান বস্তি এলাকায়, এন্টালীর অপরা-পর বস্তি এলাকায়, বাগমারীর বস্তি এলাকায়। এই হাঙ্গামাগুলিতে যারা নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা সমাজের নিম্নস্তরের অধিবাসী, আর্থিক দিক থেকে নিস্ব, শিক্ষায় দীক্ষায় সবচেয়ে বেশি পশ্চাৎপদ। আশা করি এ বিষয়ে দ্বিমত হবার কোন কারণ নেই।

বিশেষ করে এই সব স্লাম এরিয়াতেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা কেন ঘটে তার কারণ অন্বেষণের জন্য বেশি দূর যাবার প্রয়োজন নেই। এই বস্তি এলাকাগুলিকে গড়ে তোলা হয়েছিল কলকারখানার প্রয়োজনে। এগুলি গড়ে উঠেছিল এমন একটা যুগে যখন শ্রমিকশ্রেণীকে মানুষ বলেই গণ্য করা হত না। গত বাইশ বছরে কোন কোনক্ষেত্রে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হলেও অধিকাংশক্ষেত্রে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। অবশ্য এই বস্তি এলাকাগুলির বাসিন্দা শুধু শ্রমিক-শ্রেণীই নয়, সমাজের অপরাপর দরিদ্র শ্রেণী, বরং বলা যায় তারাই, যারা আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত, যাদের উন্নততর জীবনযাত্রার সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, মানসিক উৎকর্ষের কোন চেষ্টাই করা হয় নি। এই এলাকাগুলির জনসমাজ মিশ্রিত ধরনের, এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মিল খুবই সামান্য। এদেশে শ্রমিক আন্দোলনগুলি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আর্থিক দাবি-দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে, কাজেই ট্রেড ইউনিয়ন-গুলির সঙ্গে এদের সম্পর্কটা মূলত আর্থিক। মানসিক দিক থেকে এরা আজও অত্যন্ত পিছনের স্তরে রয়েছে, তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবার কোন প্রচেষ্টাই হয় নি। এই সকল লোককে উত্তেজিত করা খুব কঠিন নয়। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সহজেই এদের ব্যবহার করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রচণ্ড পরিশ্রম, অনুপযুক্ত আহার, শান্তিতে বিশ্রামের স্থানাভাব, অপরিসীম দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সব মিলিয়ে এদের প্রকৃতি শুষ্ক বারুদের মত হয়ে থাকে, অতি সহজেই এদের উত্তেজিত করা যায়।

এই অসহনীয় পরিবেশের পরিবর্তন করেই একমাত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা চিরকালের জন্য রোধ করা যায়, সম্প্রীতির বাণী প্রচার করে কোন লাভ নেই। আসলে যা দরকার তা হচ্ছে উন্নততর জীবনযাত্রার সঙ্গে বস্তিবাসীদের পরিচয় ঘটানো। সমস্ত বস্তি এলাকাগুলিকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, এবং এখানকার বাসিন্দা বিভিন্ন পরিবারকে উন্নততর এলাকায় পুনর্বসতি দিতে হবে। আসলে পরিবেশই মানসিকতাকে গড়ে তোলে। এটা দেখার জন্য বেশি দূর যাবার দরকার নেই। বস্তিবাসীদের জন্য যে সামান্য কয়েকটি ফ্ল্যাটবাড়ি নির্মিত হয়েছে সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারা যায়। শিক্ষিত ও রুচিশীল পরিবারের জীবনযাত্রার সঙ্গে এঁদের জীবনযাত্রার পার্থক্য খুবই সামান্য, অথচ মাত্র কিছুকাল আগেই এঁরা অতি কদর্য পরিবেশে কদর্যভাবেই বাস করতেন। কাজেই শিল্পাঞ্চল সংশ্লিষ্ট বস্তি এলাকাগুলি নিশ্চিহ্ন করে মনোরম পরি-বেশে বসবাসের উপযোগী ফ্ল্যাটবাড়ি নির্মাণ করা প্রয়োজন, এবং এই সকল মানুষের মধ্যে শিক্ষিত ও রুচিশীল পরিবারসমূহের বসতি স্থাপন করা প্রয়োজন। আসলে তথাকথিত ছোটলোক-ভদ্রলোকের পার্থক্যটা আন্তরিকভাবে দূর করতে হবে।

পুরশ্চরণ রসোল্লাস ঃ
(দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ।) মূল্য—৩'০০ টাকা।
পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য ঃ
শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম্‌ শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম্‌, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যম্‌, শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্যম্‌, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যম্‌। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩'০০ টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা—১২

ভারত দর্শন

নিজলিঙ্গাপ্পার জেহাদ

কংগ্রেস সভাপতি শেষ পর্যন্ত ফকরুদ্দিন আলি আমেদ এবং সুব্রহ্মণ্যমকে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাদ দিলেন। ইন্দিরাপন্থীদের ওপর নতুন করে আক্রমণের এ হল আর এক দফা মহড়া। গায়ের জোরে নেতা থাকার আর একটি আপ্রাণ প্রয়াস।

ওদিকে ইন্দিরা-হটাও চক্রান্তের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কর্মীরা সুভদ্রা যোশীর নেতৃত্বে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলাকালীন বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। দুই শিবিরে আবার নিশাচরী তৎপরতায় ক্ষমতা দখলের খেল খেলছে।

নিজলিঙ্গাপ্পার সঙ্গে আছেন হিতেন্দ্র দেশাই, মোরারজী, পাতিল, সি বি গুপ্ত, কামরাজ, অতুল্য ঘোষ, ভেঙ্কট সুব্বিয়া। তৎপর হয়েছেন বারাণসী দাস, মঙ্গলা প্রসাদ, এস এন মিশ্র, মোহনলাল গৌতম প্রমুখ।

অন্যদিকে ইন্দিরা ফ্রন্টের রথী-মহারথীরা হলেন চ্যবন, আমেদ, রাম, সুব্রহ্মণ্যম, রেড্ডি, নায়েক, সুখাড়িয়া, শঙ্করদয়াল দীক্ষিত।

ইন্দিরাপন্থীদের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এ কোনোও নতুন উপায় নয়। বরং নিরুপায়ের দীর্ঘশ্বাস। কেন না নিজলিঙ্গাপ্পাকেই হটানোর উদ্দেশ্যে জরুরী বৈঠক আহবানের জন্য ইন্দিরা-পন্থীরাই প্রকাশ্যে উদ্যোগ করেছিলেন। বিনা যুদ্ধে কে আর. বিশেষ ভারত-ভূমিতে, সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়তে রাজী হন। তাই পাল্টা জেহাদ ঘোষিত হয়েছে গাপ্পা শিবির থেকে।

ভাঙন চতুর্দিকে। কংগ্রেসের মধ্যে যেমন, বামপন্থী ফ্রন্টগুলির মধ্যেও তেমনি। এই সব লক্ষ্য করে সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশজী মুখ খুলেছেন। বলছেন: ওঁ তৎ সৎ! বাঁচতে চাও তো সর্বোদয় কর। না হলেই টুকরো-টাকরা ব্যাপার।

কিন্তু শ্লোগানটা বাস্তবসম্মত করতে হলে, শ্লোগান হওয়া উচিত, বাঁচতে ও দল বাঁচাতে হলে প্রথমেই গলিত নখদন্ত ভোগী বৃদ্ধদের গঙ্গাযাত্রা করাও। এটা প্রকৃতির নিয়ম। ব্যত্যয় ঘটলে বিপদ অনিবার্য।

কংগ্রেস ভেঙে দু' টুকরো

মোরারজী, কামরাজ, পাতিলের মন্ত্রণাপুষ্ট নিজলিঙ্গাপ্পা মহোদয় শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে ভাঙলেন। অবশ্য নিজলিঙ্গাপ্পা এবং তস্য সহযোগী ও চেলাচামুণ্ডারা কংগ্রেসের আরব্ধ কর্মসূচী গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে, কংগ্রেসী নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যদি শেষ পর্যন্ত আসলী কংগ্রেসে টিকতে না পেরে একটা নকলী কংগ্রেস খাড়া করে ঘোষণা করেন যে, যেহেতু চেয়ার আমার দখলে, অতএব আমি যেখানেই কুরসী হটাবো সেখানেই ভানুমতীর খেলের মতো গজিয়ে উঠবে কংগ্রেস, তাকে প্রকৃতই পার্টির ভাঙন বলে গণ্য করা যায় কি না আজ সেটাও একটা জ্বলন্ত প্রশ্ন। শ্রীমতী গান্ধী গাপ্পা-গ্রুপের এহেন কার্যকারিতায় নতুন প্রশ্ন তুলে ধরেছেন এবং গাপ্পা-আহূত এ আই সি সি-র বৈঠক বর্জন করে স্বগৃহে পাল্টা বৈঠক ডেকে সে প্রশ্নকে সাধারণ্যে উপস্থাপিতও করেছেন। ভিড় বাড়ছে গান্ধী-শিবিরে। কংগ্রেসের সিণ্ডিকেট নামক কট্টরপন্থীদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন অর্জুন অরোরা এবং মালব্য ও শশি-ভূষণরা শুরু করেছিলেন অতঃপর তা ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বাস-ভবনে প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ নিল। শ্রীমতী গান্ধীর গৃহে আহূত বৈঠকে (ঠিক যখন গাপ্পা-গ্রুপ মিটিং করছেন দিল্লীর ৭ নং যন্তর মন্তর রোডে) প্রকাশ্যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে এই মর্মে যে দিল্লীর কংগ্রেস ভবন থেকে গাপ্পা-গ্রুপ কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে তা অসঙ্গত বলে গণ্য হবে এবং কংগ্রেস সংগঠনের ওপর তার বাধ্যবাধকতা স্বীকৃত হবে না। এবং গান্ধী-নেতৃত্বে পাল্টা এ আই সি সি বৈঠকই এমন প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। পারে তার কারণ, গান্ধী আজ সংখ্যাধিক্যের সমর্থনপুষ্টা।

ওয়ার্কিং কমিটির ২১ জনের দল থেকে এগারজনাই তাঁর সমর্থক তো বটেই, তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রি-সভার বেশির ভাগ মুখ্যমন্ত্রী এবং এ আই সি সি-র ৭০৫ জনের ৪০৭ জনাই গাপ্পা-গ্রুপের স্বেচ্ছাচার-বিরোধী বক্তব্যে সোচ্চার হয়েছেন। এবং সবশেষে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মাও তাঁর উক্ত পদ থেকে পদত্যাগ করে হাত মিলিয়েছেন গান্ধী-সমর্থকদের সঙ্গেই।

ক্রুদ্ধ নিজলিঙ্গাপ্পা এখন বরখাস্তের নোটিশ লিখতে ব্যস্ত। ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ফকরুদ্দিন আলি আমেদ এবং সুব্রহ্মণ্যমকে বাদ দেওয়ার পরই নিজলিঙ্গাপ্পাকে ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মাকেও লিখতে হল, আপনার ওপর আর আস্থা নেই; আপনিও বরবাদ। গাপ্পাজী কংগ্রেস সভাপতির 'থ্রোনে' বসে যেভাবে বরখাস্ত নোটিশ থ্রো করে চলেছেন, শেষে হয়ত তাঁর গুটিকয় অভিন্ন-হৃদয় সহযোগী ছাড়া দেখা যাবে সকলের ওপরই তাঁকে নোটিশ জারি করতে হচ্ছে। এবং তখনও কি পাতিল সাহেব বলতে পারবেন, ইন্দিরা-ভবনে যা হচ্ছে তা কতক-গুলি 'সাধু'র সম্মেলন (দিল্লীর সাধু-বিক্ষোভের রেফারেন্স নাকি পাতিলের 'সাধু' উক্তিতে?)

কিন্তু তা আর বলা হয়ত সম্ভব হবে না। কারণ ইন্দিরাজী দ্বিতীয় কোনও পার্টি গঠন করতে যাচ্ছেন না, কংগ্রেসের দ্বিতীয় ডানা সৃষ্টিও তাঁর লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল গাপ্পা-গ্রুপকে মুষ্টিমেয় সিণ্ডিকেটে পরিণত করে কংগ্রেস সংগঠন থেকে সমূলে উৎখাত করা। আর এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই তাঁর সংখ্যাধিক্য স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান এবং নিজ বাসভবনের বৈঠকেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। অতঃপর জল যেমন নিচের দিকেই চলে, এ আই সি সি-র দর্শক সদস্যরাও তেমনিই ইন্দিরাজীর পক্ষেই ঢল নেবেন এমন ভবিষ্যদর্শন হয়ত অমূলক হবে না। এবং এইভাবে কংগ্রেস থেকে কট্টরপন্থী সিণ্ডিকেট সম্মার্জিত হলে আর একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেবে, তা হল রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস-ছুট বিদ্রোহী কংগ্রেসীরা হয়ত দল বেঁধে সংস্কৃত কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন শুরু করবেন

"দিলীপের মুখ থেকে খবরটা শুনে আমার যে কি আনন্দ হল! ওকে দুহাতে বুকে টেনে নিলাম। ও যথেষ্ট অনুশীলন করেছে, খেটেছে। তবুও বলবো এর জন্য যে-বাড়তি শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন তার সবটুকুই ও পেয়েছে বোর্নভিটা থেকে। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বোর্নভিটা খেতে ও বরাবরই বড্ড ভালোবাসে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে ব'লে ওকে আমি নিয়মিত বোর্নভিটা খাওয়াই। তাই কি খেলাধুলায়, কি পড়াশুনায় সবদিকেই ছেলে আমার সমান চৌকশ।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যপ্রদ সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ, চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ!

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—

শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাস্থ্যের জন্য

যার রাজনৈতিক তাৎপর্য বর্তমান ভারতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আব্রাহামরা কী করবেন?

স্পষ্টত যে ক্ষেত্রে দুটি কংগ্রেস (যদি নিজলিঙ্গাপ্পা পাল্টা কংগ্রেস গড়তে চান) রূপ গ্রহণ করতে চলেছে, সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল কে সি আব্রাহামদের নিয়ে। কেরালার এই কংগ্রেসী নেতা ইন্দিরাজীর বৈঠক শেষ করেই গাপ্পাজীর বৈঠকে যন্তর মন্তর রোডে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বলেছেন, তিনি সংগঠনের সঙ্গে আছেন। প্রশ্ন, কোন সংগঠন, এবং কার সঙ্গে? আব্রাহাম বলেছেন, তিনি সিন্ডিকেট ওয়ার্কিং কমিটিকেই অফিসিয়াল কমিটি হিসাবে গণ্য করেন এবং কংগ্রেসে ঐক্য চান।

'ঐক্যে'র প্রশ্নটি বর্তমানে একটি তাজ্জব সোনার পাথর বাটি বিশেষ। সুতরাং হ্যাঁ, না, না বলে যাঁরা ঐক্য-বিলাসী তাঁরা একটি হাওয়াই বাতাবরণে উড্ডীন। তাঁদের নিয়েই মূল গোলমাল। আব্রাহাম ইন্দিরাজীর সেন্টিমেন্টটা উপলব্ধি করে সহানুভূতিশীল আবার গাপ্পাজীর দন্ডাঘাতকেও মানতে চান। সুতরাং আব্রাহামদের মতো যাঁরা দুদিকে তাল ঠুকে নো ম্যানস ল্যান্ডে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবিহীন মহাশূন্যে ঝুলতে চাইবেন সমস্যা দেখা দেবে তাঁদের নিয়েই। এবং বস্তুত তাই দেখা দিয়েছে। এখনও শক্তির পাল্লাব গুরুত্ব বুঝে যাঁরা তাঁদের রথের চাকার গতিমুখ ফেরাবেন বলে অপেক্ষাতুর তাঁরা বলতেই হবে, ব্যক্তিগত লাভের দিকে তাকিয়ে সাংগঠনিক প্রশ্নের জল ঘুলিয়ে তুলবেন। তাঁদের নিয়ে বিপদ আছে।

সরকারের ওপর প্রভাব

গাপ্পাজীর কংগ্রেস বসছে ডিসেম্বরের শেষে গুজরাটে। শ্রীমতী গান্ধী তার আগেই ২২।২৩শে নভেম্বর এ আই সি সি ডেকে বসেছেন দিল্লীতে। ওদিকে আবার কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির প্রধান সচেতক রঘুরামাইয়া কংগ্রেসী এম-পি-দের ১৬ই নভেম্বর দিল্লীতে হাজিরা দেওয়ার জন্য জরুরী আহ্বান জানিয়ে বসেছেন। অর্থাৎ ১৭ই নভেম্বর সংসদের শীতকালীন অধিবেশনেই যে একটা গোলমাল আশঙ্কা করা হচ্ছে, এ সমস্ত তারই প্রাক্‌প্রস্তুতি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ইন্দিরাপন্থীরা ৪০৫ সদস্যের 'রিকুজিশন্ড' মিটিং-এ (দিল্লীতে) একটি পরিষ্কার উদ্দেশ্যে মিলিত হচ্ছেন। উদ্দেশ্য গাপ্পাজীকে সভাপতিপদ থেকে সরানো। গাপ্পাজীর পাল্টা চাল, যদি আগলে বসে থাকা। স্বভাবতই দুই শিবিরের এই অগ্রগতি সংসদের অধিবেশনে যে কিছুটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেই সেটা স্পষ্ট।

তবে এটাও ঠিক, শ্রীমতী গান্ধীর পেছনে সংসদে সংখ্যাগুরুরই সমর্থন। যদি গাপ্পা-গ্রুপ অন্যান্য সমমতাবলম্বীদের সাহায্যে এবং ভাসমান সদস্যদের আনুকূল্যে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা পাশ করিয়েও নেন; সে ক্ষেত্রেও ইন্দিরাজীর পক্ষে হাওয়া অনুকূল। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি সভা ভেঙে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করে মধ্যবর্তী নির্বাচনে সিন্ডিকেটপন্থীদের সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলায় নামতে পারেন। এবং তেমন অবস্থায় সিন্ডিকেটের অবস্থা যে কাহিল তা সাধারণ বুদ্ধিতেও ধারণা করা যায়।

এমতাবস্থায় একমাত্র সিন্ডিকেটের কিছুটা নমনীয় মনোভাব এবং আপোষই ঐক্য বজায় রাখতে পারত এবং সংগঠনের স্বার্থে নিজলিঙ্গাপ্পা সরে দাঁড়ালে সব জটিলতার ইতি হত। যেমন সরে দাঁড়াতে পারতেন সঞ্জীব রেড্ডি। অতি সম্প্রতি তিনি স্বীকার পেয়েছেন যে, তাঁকে অযথা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জড়িয়ে দেওয়া হয়, এবং ইন্দিরাজী চাইলে তিনি সরে দাঁড়াতেন। কিন্তু যতদূর স্মরণ হচ্ছে, তাঁর প্রতি ইন্দিরা-সমর্থকদের কাছ থেকে সেদিন এ আবেদন পৌঁচেছিল। সেদিন তিনি আজকের মনোভাব প্রদর্শন করলে জল হয়ত এতোদূর ঘোলা হত না।

জল ঘোলা হওয়ার আগেই শ্রীযুত নিজলিঙ্গাপ্পা যদি সরে দাঁড়ান, তাহলে হয়ত কংগ্রেস তথা ভারত এক অন্ধকারময় ভবিষ্যতে পদার্পণের রিস্ক থেকে এ যাত্রা বেঁচে যেতে পারে।

অনশন রাজনীতি

না, চন্ডীগড় প্রশ্নের ওপর আর কলম ধরতে চাই না। বিভক্ত পাঞ্জাব চন্ডীগড়ের দুই ডানা ধরে শুধু যে ঝুলে পড়েছে তাই নয়, পাঞ্জাব-হরিয়ানা চন্ডীগড়কে কেন্দ্র করে প্রাণঘাতী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। হরিয়ানার পক্ষে আছে শাহ কমিশনের অনুকূল রিপোর্ট; পাঞ্জাবের অন্তরে আছে পাঞ্জাব নামের সঙ্গে যুক্ত চন্ডীগড় শহরের নামের ঐতিহাসিক অবিচ্ছেদ্যতার ধারণা। তাছাড়া চন্ডীগড়কে সাজানো হয়েছে অতি আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যার কেরামতি দিয়ে। চন্ডীগড় আজ সেদিক থেকেও লোভনীয় নিঃসন্দেহে। আমার বাঙালী কলমের কালি পাঞ্জাবী কিম্বা হরিয়ানাবাসীর চন্ডীগড়-সম্পর্কিত দরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিগলিত জাহ্নবী সৃষ্টি করতে অক্ষম। দুই রাজ্যবাসীর মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আমার অনভিজ্ঞতার দরুণ চন্ডীগড় সমস্যার ওপর শুষ্ক আলোচনায় অবতরণ সুতরাং যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি না। তাই, চন্ডীগড় প্রসঙ্গ তোলাই থাক।

সম্প্রতি ভারতবাসীমাত্রকেই যে প্রশ্ন ভাবিত করে তুলেছে, তা হলঃ চন্ডীগড় নিয়ে ফেরুমন দেহ রাখলেন ও সন্ত ফতে সিং কেন আগে দেহরক্ষা করেন নি, এজন্য অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন; তাই নিয়ে আবার পাঞ্জাবে রাজনীতির কূটকৌশল চলছে।

বস্তুত ভাবতে গেলে সে এক আদিম হিংস্র রাজনীতি। বলিদানের রাজনীতিটাই আদিম। অনশন একটা রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন গান্ধীজী, নচেৎ অনশন-রাজনীতি হয়ত 'এ্যাটেম্পট টু সুইসাইড' বা 'আত্মহত্যার প্রচেষ্টা' বলে আইনত দূষণীয় ঘোষিত হতে পারত। স্বাধীনতা আন্দোলনকালে অবশ্য অনশন-রাজনীতি যথেষ্ট কাজের কাজই করেছিল। সেদিন দেশের নিদ্রিত সাধারণকে অনশন-মৃত্যু বিস্মিত, চমকিত ও সজাগ করেছে। যতীন দাস তরুণ বয়সে অনশন করে তিলে তিলে শুকিয়ে মারা গেছলেন: ইংরেজ সরকার ছিল অনমনীয়। স্বাধীনতাপূর্বকালে অসহায় ভারতের হাতে অনশনই হয়ত ছিল একমাত্র ধারাল অস্ত্র। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কিন্তু অনশন-রাজনীতির সেই প্রয়োজন বিলুপ্ত হয়েছে। আমরা আজ আর পরদেশী-পদানত নই। আমাদের প্রতিনিধিবর্গই কেন্দ্রে রাজ্যে শাসকের আসনে আসীন। তাই আমরা আজ ততদূর দুর্বল আর অসহায় নই, যে কারণে অনশন দ্বারাই শুধু চাপ সৃষ্টি করতে হবে, নান্য পন্থাঃ। না; তা নয়, উপায় আরও ছিল, উপায় অনেক আছে। কিন্তু অনশন-রাজনীতিকে টেনে এনে পাঞ্জাব হরিয়ানা এমন একটি সমস্যার সমাধান চাইছে, যে সমস্যাকে কোন কেন্দ্রীয় সরকারই দুই রাজ্যের মনঃপূতভাবে সমাধান করতে পারেন না। চন্ডীগড়কে হরিয়ানার দিলে পাঞ্জাব অনশনের সিরিজ সাজিয়ে ধরবে। আবার পাঞ্জাবে দিলে হরিয়ানায় 'হারা কিরি' হতে পারে। কেন্দ্র সুতরাং উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন। এই উভয় সঙ্কট থেকে সাময়িক অব্যাহতি খোঁজা হয়েছিল চন্ডীগড়কে দুই রাজ্যেরই রাজধানীরূপে টাঙিয়ে রেখে। ঐ নতুন সাজানো নগরকে নিয়ে কমিশনও বসানো হল, কিন্তু সুপারিশ মানার উপায় রইল না, আত্মাহুতির হুমকীতে কেন্দ্রীয় সরকার পিছিয়ে গেছলেন। এখন এমন অবস্থা, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা এই সমস্যার সমাধান নিজেরা না করে না দিলে কেন্দ্র বাস্তবিকপক্ষে কি-ই বা করতে পারেন। কাকে রেখে

কাকে বঞ্চিত করলে কম আত্মাহুতি হবে?

সন্ত ফতে সিং কেন আত্মাহুতি দেন নি তাই নিয়ে বিক্ষোভ। কী সাংঘাতিক চাপ একজন বৃদ্ধ নেতার জীবন নিয়ে! জনৈকা কলেজ অধ্যাপিকাও এবার আসরে নামছেন। পরলোকগত নেতা ফেরুমন জীবন বিসর্জন দিয়েছেন কিন্তু চণ্ডীগড়কে পাঞ্জাব পায় নি। এজন্য ফেরুমনের সংগ্রামকে অধ্যাপিকা আপন জীবনাহুতি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবেন। তাঁর বক্তব্যে সন্ত ফতে সিং-এর প্রতি চোখ ঠারা আছে। তিনি বলেছেন, শিখ জাতির প্রতিজ্ঞা পালন না-করার কলঙ্ক থেকে ফেরুমন শিখ সম্প্রদায়কে উদ্ধার করে গেলেন। অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলা, সন্তজী পিছিয়ে গেছলেন। এ কেমন কথা? শিখ জাতি সত্য পালনে অনমনীয়। তাঁদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শ্রদ্ধেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু চণ্ডীগড়ের জন্য মূল্যবান নেতৃস্থানীয় নেতারা প্রাণদান করে যাবেন, আমি শিখ হলে এ দাবি করতাম না। আমরণ অনশন এমনই এক অস্ত্র, অগ্নিতে জীবন বিসর্জন এমনই এক অস্ত্র যা ছিলাচ্যুত হলে দাবি না মেটা পর্যন্ত সে অস্ত্র আর সম্বরণ করা যায় না। হরিয়ানার দাবিকে সামনে রেখে সুতরাং এই মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার কতদূর যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নের ফেরুমনের জীবনাবসানের পর তা গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় উপস্থিত। সন্তজী কিংবা অধ্যাপিকা মহোদয়াকে রক্ষা করতে আজ যদি চণ্ডীগড় পাঞ্জাবকে দিয়ে দেওয়া হয়, আগামীকাল হরিয়ানায় যে গণ্ডা গণ্ডা অনশন-মৃত্যু শুরু হবে না তার গ্যারাণ্টি কোথায়। এবং তাহলে কেন্দ্র কোন্ পন্থায় সেই প্রাণহনন বন্ধ করবেন?

এমতাবস্থায় কেন্দ্র যদি চণ্ডীগড়কে দুই রাজ্য থেকেই বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় শাসনাঞ্চলে পরিণত করেন, তবে কি কেন্দ্রকে খুব একটা দোষ দেওয়া যাবে? বস্তুত যুক্তির দ্বারা এ সমস্যা সমাধানের পথ অনশন-রাজনীতি আজ বন্ধ করে দিয়েছে।

সীমান্ত রাজ্য পাঞ্জাব হরিয়ানায় চণ্ডীগড় নিয়ে যে ছেঁড়াছেঁড়ি শুরু হল, তা সমগ্র জাতির আতঙ্ক ও পরিতাপের কারণ।

কেন্দ্রীয় নেতারা বারম্বার বলছেন: পাঞ্জাব হরিয়ানা নিজেদের মধ্যে গোলমাল মিটিয়ে যে সমাধানে পৌঁছবেন সেটাই বিবেচনা করা হবে। কিন্ত এ শুধু অরণ্যে রোদন হচ্ছে। সন্তজী একবার দমে গিয়ে পাঞ্জাবে তাঁর নেতৃত্বের ইমেজ হারাতে বসেছেন বলে রটনা। এবার আর তাঁর পক্ষে থেমে পড়াও হয়ত সম্ভব হবে না। কিন্তু তামাম পাঞ্জাব কি চুপ করে এই আত্মঘাতী রাজনীতি দেখবে? ভারতবাসী কি অসহায়ের মতো দুটি ভগ্নীস্থানীয়া রাজ্যে আত্মঘাতের এই প্রতিযোগিতা চুপ করে তাকিয়ে দেখবেন।

অনশন, আত্মপীড়ন ও আত্মঘাতী রাজনীতির সামনে আমরা আজ এমনই অসহায় যে, কিছুই আমাদের করণীয় নেই। আমরা নীরবে অশ্রু মোচন করতে পারি। তা ছাড়া নিরুপায়। গান্ধীজী থাকলে আজ কি বিলাপ করতেন? পাল্টা অনশন করে অনশন-রাজনীতি বন্ধ করতেন কি তিনি?

সমস্ত গান্ধীবাদী কি আজ পাল্টা অনশন করে এই চাপ সৃষ্টির রাজনীতিকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারেন? কিন্তু শিখ জাতির মতো হাসতে হাসতে জীবনদানের এমন মানসিক বল আজ কার আছে? অথচ অনশন-রাজনীতিতে আশু ইতি টানার প্রয়োজন। এ কাজ একমাত্র গান্ধীবাদীরাই করতে পারেন। তাঁদের অস্ত্র তাঁদেরই প্রত্যাহার করে নিতে হবে। নচেৎ এই আদিম অস্ত্র প্রয়োগ করে ভারতেই জাতীয় সরকার উল্টে দেওয়া যাবে হয়ত একদিন।

কী সাংঘাতিক ব্যাপার! যে দেশে রোজ তারিখে খাদ্যের অভাবে ও অপুষ্টিতে গণ্ডা গণ্ডা মানুষ মরছে এবং যে জন্য আমরা একফোটা চোখের জলও রাজা নিরোর টিউবে জমা করে রাখি না, সেই অনশন মৃত্যুই এদেশে একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে সংগ্রামের ময়দান দখল করছে।

বস্তুত এই সব ভাবনার পর বাক্ রুদ্ধ হয়ে যায়, কলমে কালি সরে না।

সন্তজী বর্ষীয়ান নেতা। এই আদিম আত্মাহুতির রাজনীতি থেকে তিনিই গোটা দেশকে রক্ষা করুন।

কেরলে নতুন সরকার

সি পি আই-এর শ্রীঅচ্যুৎ মেনন আসছেন। নাম্বুদ্রিপাদ সরে গেছেন, এখন উনিই তাঁর পরিত্যক্ত আসনের অধিকার নেবেন। মন্ত্রিসভার হাল ধরবেন পাঁচদলীয় অমার্কসবাদী জোট। সি পি আই পুরোভাগে অর্থাৎ পাঁচ দলের লীডার। তাই মুখ্যমন্ত্রিত্ব ও'দের। তাছাড়া আর দুজন মন্ত্রী। মুশ্লিম লীগের দুজন, আই এস পি'র দুজন আর কেরল কংগ্রেসের একজন হবেন নতুন মন্ত্রিসভার অলঙ্কার। আর এস পি পিছিয়ে গেছেন। মন্ত্রিসভা অলঙ্করণে জুৎ পাচ্ছেন না। তবে সমর্থন অবশ্যই দেবেন। তাছাড়া পঞ্চদলীয় মন্ত্রিসভার সাব-কমিটিতে অন্যতম আহ্বায়ক পদেও আর এস পি তাঁদের একজন সদস্যকে রেখেছেন।

নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভায় ঐ পঞ্চদলের হাতে যে সব দপ্তর যেমনভাবে ছিল ঠিক তেমনিই থাকছে, শুধু মার্কসবাদীরা এবং তাঁদের সমর্থকরা সরে যাওয়ায় যে দপ্তরগুলি পড়ে রইল পরে ধীরে-সুস্থে পঞ্চদল তা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবেন। সবচেয়ে প্রগতিশীল ব্যাপার কেরলের এই মন্ত্রিসভাতেই বুঝি হতে যাচ্ছে। মুশলিম লীগ রাজ্যের স্বরাষ্ট্রদপ্তর পাচ্ছেন, শিক্ষা তো আছেই। এতো বড় প্রগতিশীল কাজ (?) আজ ভারতের অন্য কোথাও নেই।

কেরল এবং কংগ্রেস
দুই নেতার মন্তব্য

কেরল মন্ত্রিসভা — 'কংগ্রেসেরই সরকার', বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু।

'আমরা কংগ্রেসের সমর্থন চাই না, সে জন্য অনুরোধও জানাই না। তবে ও'রা আমাদের পিছু পিছু এলে আর কি করা যাবে।'—উক্তিটি সি পি আই-র শ্রীঅচ্যুৎ মেননের।

'কেরলে বাইরে থেকে কংগ্রেস যা করতে পারে নি, ছদ্ম কংগ্রেসী—দক্ষিণপন্থী যুক্তফ্রন্টের মধ্যে থেকেই তা করতে সক্ষম হয়েছে।...

'দুর্নীতির অভিযোগের জন্য পতন হয় নি মন্ত্রিসভার। সি পি এম-এর নেতৃত্বে গঠিত গণ-আন্দোলনে অন্যান্য দল ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁরা যোগ দেন নি এই আন্দোলনে। উল্টো আন্দোলন শুরু করেছিলেন মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধেই। পতন ঘটল সে জন্যই।'—কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে ফ্রন্ট সম্পর্কে তাঁর প্রস্তাব রেখে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুন্দরায়া।

বিদেশে প্রতিক্রিয়া

'সোভিয়েটপন্থী পূর্ব বার্লিন রেডিও এবং পিকিং রেডিও কেরলে মিনি-ফ্রন্টের বক্তব্য প্রচার করেছেন। এতে মার্ক্সবাদীরা আশ্চর্য হন নি। কারণ মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট দল রাশিয়া বা চীনের নির্দেশে চলেন না। দেশের জনগণের প্রয়োজনেই তাঁরা তাঁদের কর্তব্য নির্ধারণ করেন।'—মার্ক্সবাদীরা যে বিদেশী প্রভাবমুক্ত শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের এই উক্তি তারই ওপর জোর দিয়ে দেশে কেরল মিনি-ফ্রন্ট তৈরির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে এই মন্তব্য রেখেছেন: 'কেরলে ফ্রন্টের পতনে স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ, সিণ্ডিকেট এবং শ্রীডাঙ্গে উল্লসিত, কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী কোনও উচ্চবাচ্য করেন নি। নি।'

—১-১১-৬৯

আন্তর্জাতিক

কেনিয়ায় অন্তর্বিরোধ

কেনিয়ার একমাত্র বিরোধী দল "কেনিয়া পিপলস্ ইউনিয়ন" বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। কেনিয়া গভর্নমেন্ট এক সরকারী ঘোষণায় বলেছেন যে, পিপলস্ ইউনিয়ন কেনীয় গভর্নমেন্টের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে এবং ক্রমেই তাদের ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ঘাতমূলক হয়ে উঠছে। পিপলস্ ইউনিয়নের আটজন পার্লামেন্ট সদস্যই স্ব স্ব গৃহে অন্তরীণ হয়েছেন। গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট জোমো কেনিয়াটা নাইরোবির ২০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কিসুমু শহরে সোভিয়েটের সহায়তায় নির্মিত একটা হাসপাতালের উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন। সেই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরই সেই শহরে কেনিয়াটার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। পুলিশ বল প্রয়োগের দ্বারা সেই বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করে। তাতে ১১ জন নিহত এবং ৭০ জন জখম হয় এবং কিসুমু ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ওপর কারফিউ আদেশ বলবৎ করা হয়। পরে সেখানে এক জনসভায় দাঁড়িয়ে কেনিয়াটা বিরোধী নেতা ওগিঙ্গা ওডিঙ্গার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, ওডিংগা যদি তাঁর দীর্ঘকালের বন্ধু না হতেন, তা হলে তিনি ওডিংগাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিতেন। সেই সভায় শ্রোতা হিসাবে ওডিংগাও উপস্থিত ছিলেন। কেনিয়াটা আরও বলেন যে, পিপলস্ পার্টির "নোংরা ক্রিয়াকলাপ" তিনি কঠোর হস্তে দমন করবেন। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সরকারের দৈনন্দিন কার্যপরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করলে তা তিনি কোনক্রমেই বরদাস্ত করবেন না। কেনিয়াটা যে বিরোধী দলকে মিথ্যা ভয় দেখান নি, পিপলস্ পার্টি বে-আইনী ঘোষণা করার মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

পশ্চিম জার্মানীর নতুন পররাষ্ট্রনীতি

উইলি ব্রানড্ট্ পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর নির্বাচিত হওয়ায় পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর সম্পর্কের উন্নতি হতে পারে বলে গত সপ্তাহে আমরা যে আভাস দিয়েছিলাম, তা সত্য প্রতিপন্ন হতে চলেছে। গত ২৮শে অক্টোবর পশ্চিম জার্মানীর পার্লামেন্টে ব্রানড্ট্ তাঁর পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করে বলেছেন যে, তিনি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে সম্ভাব বৃদ্ধির জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন, পোল্যান্ড এবং পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে ইচ্ছুক। ব্রানড্ট্ বলেছেন যে, পোল্যান্ডের সঙ্গে তিনি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক। অবশ্য পূর্ব ইউরোপ সম্পর্কে তাঁর এই নরম নীতির ফলে পশ্চিমী দুনিয়ার অস্বাভাবিক বোধ করবার কোন কারণ ঘটে নি। মার্ক মুদ্রার বাট্টার হার বাড়িয়ে তিনি ইতিমধ্যেই পশ্চিমী দুনিয়ার আস্থাভাজন হয়ে উঠেছেন। তিনি আরও ঘোষণা করেছেন যে, ইউরোপীয় কমন মার্কেটে বৃটেনকে ঢুকতে দিতে পশ্চিম জার্মানীর কোন আপত্তি নেই। তবে সে ব্যাপারে পশ্চিম জার্মানী নিজে উদ্যোগী হতে রাজী নয়। পশ্চিম জার্মানীতে মার্কিন সেনাবাহিনী আরও দু বছর মোটামুটি পূর্ববৎ মোতায়েন থাকবে ঘোষণা করে তিনি পশ্চিম-ঘেঁষা নাগরিকদেরও সন্তুষ্ট করেছেন। অর্থাৎ ব্রানড্ট্ যে নীতি নিয়ে চলতে চাইছেন, তাতে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দুনিয়ার মধ্যেই ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা হবে। তাতে ইউরোপে ঠান্ডা লড়াইয়ের গরম আবহাওয়াও কিছুটা শীতল হবার আশা আছে। প্রাক্তন চ্যান্সেলর কিসিঙ্গার হিটলারের নাৎসী দলের সদস্য ছিলেন। স্বভাবতই তাঁর সম্বন্ধে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির যথেষ্ট সংশয় ছিল। ব্রানড্ট্-এর অতীত ইতিহাস সেভাবে কলঙ্কিত নয়। ব্রানড্ট্-এর জন্ম ১৯১৪ সালে। তিনি জন্মাবার আগেই তাঁর পিতা নিরুদ্দেশ হন। মা দাসীবৃত্তি করে উইলী ব্রানড্ট্‌কে মানুষ করেন। নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জোরে তিনি বড় হন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতা লাভ করে যখন সমাজতন্ত্রীদের কোতল করতে শুরু করেন, তখন ব্রানড্ট্ তরুণ সঙ্ঘ গঠন করে তাদের পাল্টা আঘাত হানতে থাকেন। পরে ইনি নরওয়েতে পালিয়ে যান এবং সেখানকার গেরিলা বাহিনীতে যোগদান করেন। নাৎসী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে একবার তিনি অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে কোনক্রমে রক্ষা পান। যুদ্ধের পর নরওয়ের সেনাবাহিনীতে মিলিটারী এটাচি হিসাবে ব্রানড্ট্ বার্লিনে ফিরে আসেন। ব্রানড্ট্-এর এই নাৎসীবিরোধী অতীত ইতিহাস পূর্ব ইউরোপের সহিত পশ্চিম জার্মানীর সম্ভাব স্থাপনে সহায়ক হতে পারে বলে আশা করা যায়।

পাকিস্তানে অগ্নিগর্ভ অবস্থা

ইয়াইয়া খাঁর সামরিক ডিক্টেটরী শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র পাকিস্তানে গণবিক্ষোভ এমন দানা বেঁধে উঠেছে যে, তিনি এখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে শুরু করেছেন। পাকিস্তানবাসী আর সামরিক ডিক্টেটরের হুকুম মেনে চলতে রাজী নন। তাঁরা গণভোটের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন এবং নির্বাচিত গভর্নমেন্টের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। ইয়াইয়া খাঁ বেশ বুঝতে পারছেন যে, এই ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জননায়ক মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করে নিজে পিছু হঠতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুজিবর রহমান সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের চার দফা দাবি স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে রাজী নন। সেই চার দফা দাবি হচ্ছে: (১) কেন্দ্রে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে। (পাকিস্তানের মোট ১২ কোটি লোকের মধ্যে ৭ কোটিই পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। সুতরাং এই ন্যায়সংগত দাবি গৃহীত হলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে পূর্ববঙ্গের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। সেটা পশ্চিম পাকিস্তানের ধান্দাবাজ নেতারা মেনে নিতে রাজী নন।) (২) পাকিস্তানে ফেডারেল শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (৩) আয়ুব খাঁর ঐক্যতন্ত্র বাতিল করে পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধি, বেলুচ এবং পাঠানদের জন্য পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠন করতে হবে এবং (৪) পূর্ব পাকিস্তানকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। দুই পাকিস্তানে পৃথক পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু থাকবে। কর এবং রাজস্ব হবে প্রাদেশিক সরকারের বিবেচ্য বিষয়। তা ছাড়া, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে, তা পৃথক পৃথক হিসাবে জমা করতে হবে। আর পূর্ব পাকিস্তানকে একটা নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠনের সুযোগ দিতে হবে।

বলা বাহুল্য, ইয়াইয়া খাঁ বাঙালীদের এই দাবি মেনে নিতে রাজী নন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত অদ্ভুত। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ১২শ মাইলব্যাপী ভারতভূমি পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে প্রতি মুহূর্তেই যেন ব্যঙ্গ করছে। পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা পশ্চিম

পাকিস্তানের জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। তার কারণ দেশের সেনাবাহিনী, সিভিল সার্ভিস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সবই পশ্চিম পাকিস্তানী-দের হাতে। পূর্ব পাকিস্তানের পাটই পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রাহক, অথচ সেটা বেশির ভাগই ভোগ করে পশ্চিম পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের মতলববাজ রাজনৈতিক নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের ওপর রাজ-নৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভুত্ব করার এই মজ্জাগত অভ্যাসটা কিছুতেই ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। পাকিস্তানের পরি-স্থিতি দাঁড়িয়েছে এই যে; একদিকে সমগ্র পাকিস্তানেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি উঠেছে, অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিটাও তার সঙ্গে জুড়ে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি-ক্রিয়াশীল নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সংগত দাবির প্রতিবন্ধকতা করায় পূর্ব পাকিস্তানের গণ-আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। ইয়াহিয়া খাঁ বুঝতে পারছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে গেলে ১২শ' মাইল দূরে বসে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী দিয়ে সেই আন্দোলন তিনি দমন করতে পারবেন না। সেই কারণেই তিনি মুজিবর রহমানকে প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে বলির কোরবাণীর মুরগি বানাতে চেয়েছিলেন। মুজিবর সেই ফাঁদে পা না দিয়ে ভালই করেছেন।

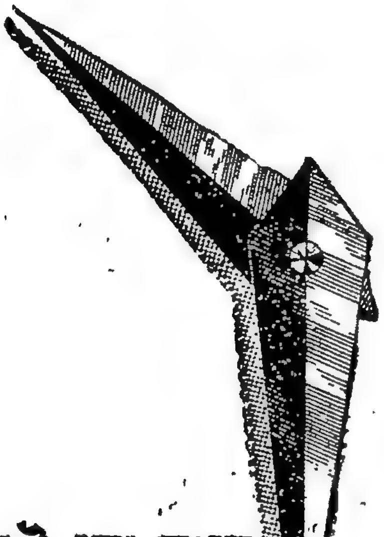

এই তো সময়
ইউনাইটেডে সঞ্চয় করার

* সেভিংস অ্যাকাউণ্টে বছরে শতকরা ৩½ টাকা সুদ।
* মাত্র ৫৲ টাকা জমা দিয়ে হিসেব খুলতে পারেন।
* চেকবই ব্যবহার করা যায়।
* টাকা সহজেই তোলা যায়।
* মেয়াদী আমানতে মেয়াদ অনুসারে সর্বাধিক শতকরা ৬½ টাকা পর্যন্ত সুদ।
* পৌনঃপুনিক আমানতের (রেকারিং ডিপোজিট) শর্তাদি সুবিধাজনক।

আসুন···আমাদের এখানেই সঞ্চয় করুন

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
হেড অফিস:
৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন: ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

UBI-7/68

পশ্চিমবঙ্গে ১১৫টিরও অধিক শাখা আছে

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

মুক্তকচ্ছ। মুক্তকচ্ছ কংগ্রেস—মুক্তকচ্ছ কম্যুনিস্ট পার্টি। মুক্তকচ্ছ নাম্বুদ্রিপাদ—মুক্তকচ্ছ অচ্যুত মেনন। বড় মিল দিল্লীর সঙ্গে কেরলের। দিল্লীতে কংগ্রেসের মুক্তকচ্ছ রাজনীতি—কেরলে কম্যুনিস্ট পার্টির মুক্তকচ্ছ রাজনীতি। মিল শুধু দিন তারিখ, সময়েই নয়—মিল ঘটনা পরম্পরায়ও। দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক—কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা সাত নম্বর যন্তরমন্তর রোডে এসে পৌঁছতেই তাঁকে জোর করে গাড়ি থেকে নামানো হয়, ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়—শ্রীঅতুল্য ঘোষ দ্রুত এগিয়ে আসেন নিজলিঙ্গাপ্পাকে রক্ষা করতে অন্য গাড়ি থেকে নেবে: কিন্তু নিজলিঙ্গাপ্পাকে বিক্ষোভকারীদের হাত থেকে মুক্ত করবার আগেই তিনি নিজেই মুক্তকচ্ছ হয়ে পড়েন। এদিকে ত্রিবান্দ্রামে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা অচ্যুত মেননের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করলে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বিশ্বাসঘাতকতা দিবস পালন করে। শপথ নেবার পর মন্ত্রীরা বেরিয়ে এলে বিক্ষোভকারীরা ধ্বনি দেয় "দক্ষিণপন্থী জুডাসরাই মন্ত্রিসভা ভাঙল।" এ ছাড়া নানাস্থানে ইট-পাটকেল ছোঁড়া, মারামারি, পুলিশের লাঠি চালনা এইসব ঘটনাও কেরলে ঘটেছে। দিল্লী আর কেরলে তফাৎ হল—এখানে নিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদানের পথে বিক্ষোভকারীদের হাতে লাঞ্ছিত হন—আর কেরলে অচ্যুত মেনন মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করে বেরিয়ে আসার পর বিক্ষোভকারীদের কাছে ধিক্কৃত হন। তাই দিল্লীতে ভাঙনপর্ব যদি শুরু বলা হয়, তবে কেরলে ভাঙনপর্ব শেষ হয়েছে বলা যায়।

ভেঙে টুকরো হল কংগ্রেস—যার প্রস্তুতি চলছিল ব্যাঙ্গালোর অধিবেশনের পর থেকে। যার পরিণতি ত্বরান্বিত হয়েছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক শ্রীমোরারজী দেশাইকে অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে সরানো এবং সর্বশেষ নিজলিঙ্গাপ্পা কর্তৃক শ্রীসুব্রহ্মনিয়াম ও শ্রীফকরুদ্দিন আলিকে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বিতাড়নের পর। কেরলে যুক্তফ্রন্টের ভাঙন দেখা দিল বিধানসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীওয়েলিংডনের বিরুদ্ধে তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ আর পরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ কর্তৃক আরও চারজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তের জন্য নির্দেশ দানের পর। অর্থাৎ এই ভাঙনপর্ব দিল্লীর কংগ্রেস আর কেরলের যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ঘটনা পরম্পরায় বেশ মিল নজরে পড়ে। একদা ইংরেজ বিতাড়নে, দেশের স্বাধীনতা আনয়নে গঠিত হয়েছিল কংগ্রেস নামে সব দল ও মতের যুক্তফ্রন্ট—কংগ্রেস। আর বিশ বছর কংগ্রেস দেশ শাসন করার পর কংগ্রেসকে গদিচ্যুত করে ক্ষমতা দখলের জন্য কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট। পয়লা নভেম্বর দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনে এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদর দপ্তরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আলাদা আলাদা বৈঠকে মিলিত হবার পর কংগ্রেস দলের ভাঙন নির্দিষ্ট গতিপথ গ্রহণ করল। আর কেরলে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর যুক্তফ্রন্টের ভাঙনও স্থায়ী গতিপথ গ্রহণ করল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভেঙে দুই ভাগ হওয়ার পর এক পক্ষের নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, "আমি ঐক্য চাই।" তিনি যা করলেন ঐক্যের জন্য করছেন। কেরলে নতুন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "আমি ঐক্য চাই।" তিনি যা করছেন ঐক্যের জন্য করছেন। বিপরীত পক্ষ নিজলিঙ্গাপ্পার নেতৃত্বে পাল্টা ওয়ার্কিং কমিটির নেতা শ্রীমোরারজী দেশাই বলেছেন, "ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থকরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ছেড়ে চলে যাওয়াতে ভালই হয়েছে" কেরলে কম্যুনিস্ট পার্টির আর এক পক্ষের নেতা নাম্বুদ্রিপাদ বলেছেন, "ওরা মন্ত্রিসভা গঠন করে ভালই করেছে। ওদের স্বরূপ ধরা পড়েছে।"

কিন্তু ভাঙন তো হল—এর পর? ইতিমধ্যে কথা উঠেছে কংগ্রেসের এই ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিতে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চান নিজলিঙ্গাপ্পার অপসারণ—সিন্ডিকেট চায় শ্রীমতী গান্ধীর অপসারণ। আর যুক্তফ্রন্ট? কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে কংগ্রেসের ভাঙনকে পুঁজি করে যুক্তফ্রন্ট রাজ্যের পর রাজ্য দখল করবে, দখল করবে দিল্লী—কিন্তু সেই যুক্তফ্রন্ট দিল্লীর পথে যাত্রা শুরুর আগেই ভেঙে গেল। যুক্তফ্রন্টের দুটি প্রধান ঘাঁটি কেরল আর পশ্চিমবঙ্গ। কেরলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও শিবরাত্রির সলতে জ্বলছে। দিল্লীতে ভাঙন কংগ্রেসের—কেরলে ভাঙন কম্যুনিস্টদের, তথা যুক্তফ্রন্টের। এই দুই ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট যুক্ত থেকে কোন্ ঐক্যের গান গাইবে? কোন্ ঐক্যের ধ্বনি তুলবে?

কংগ্রেসের ভাঙন শুরু হয়েছে বিশ আগে থেকেই। ক্ষমতাভোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক শক্তি কংগ্রেসের মধ্যে বেঁচে ছিল—ক্ষমতার অবলুপ্তিতে সংগঠনের চিড় খেয়ে যায়। প্রথমে কংগ্রেস ভাঙল রাজ্যে রাজ্যে—গত সাধারণ নির্বাচনে ও নির্বাচনের পর। নয়টি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হল। তারপর এই ভাঙনের ঢেউ লাগল দিল্লীতে। দিল্লীতে কংগ্রেসের এই ভাঙন শুধু সাংগঠনিক কারণে নয়। কোন আদর্শের তাগিদেও নয়। এই ভাঙনের পিছনে সবচেয়ে বড় শক্তি জুগিয়েছে মনোপলিস্ট ও নন-মনোপলিস্ট ক্যাপিটালিস্ট ফোর্স। শ্রীমতী গান্ধী মনোপলিস্ট ক্যাপিটালিস্টদের দর্প ভেঙে দিয়ে নন-মনোপলিস্ট ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে নিয়ে চলতে চেয়েছিলেন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও অন্যান্য যে-সকল কর্মসূচী শ্রীমতী গান্ধী গ্রহণ করেছেন ও করতে চান সেটা হল যতটা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তাগিদে—প্রায় ততটাই হল মনোপলিস্ট ক্যাপিটালিস্টদের শক্তি ও প্রভাব খর্ব করতে। এই একই মনোপলির লড়াই কম্যুনিস্ট পার্টিতে। সি. পি. আই সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে থাকা পার্টি। বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির কাছে স্বীকৃত কম্যুনিস্ট পার্টি। কাজেই এক দিকের মনোপলি রয়েছে সি. পি. আই-এর। আর এক দিকে সি. পি. আই (এম) বিশ্ব দরবারে তার কদর নেই—ভারতবর্ষেও কয়েকটি রাজ্যে প্রভাব সীমাবদ্ধ। কিন্তু তারা হল আর একটি মনোপলির অধিকারী। সেই মনোপলি হল ভারতবর্ষের দুইটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধান শক্তি হল সি. পি. আই (এম)—নীতিনির্ধারকের অধিকারী হল সি. পি. আই (এম)। আর

সি. পি. আই ও সি. পি. আই (এম) এরা দুজনেই হল আবার যুক্তফ্রন্টের প্রধান শক্তি। যে যে রাজ্যে সি. পি. আই ও সি. পি. আই (এম)-এর প্রভাব বেশি, সেই সেই রাজ্যেই কংগ্রেস-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছে, শক্তিশালী হয়েছে। যেখানে দুই কম্যুনিস্ট পার্টি নেই বা প্রভাব কম সেখানে যুক্তফ্রন্ট নেই—যুক্তফ্রন্ট শক্তিশালী নয়। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের মধ্যে শুরু হল দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মনোপলি দখল ও খর্বের লড়াই। সি. পি. আই চাইল সি. পি. আই (এম)-এর মনোপলি খর্ব হোক। তারই পরিণতি হল নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার পতন—অচ্যুত মেননের ক্ষমতা দখল। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অভ্যন্তরে একের বিরুদ্ধে অপরের কুৎসা ও শরিকী হানাহানির ভয়াবহ রূপ।

পয়লা নভেম্বর নিজলিঙ্গাপ্পা, অতুল্য ঘোষ, কামরাজ প্রমুখ যখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ঢুকছিলেন, তখন কয়েকশত কংগ্রেসকর্মী বুক চাপড়ে চীৎকার করছিলেন, 'নিজলিঙ্গাপ্পা হায়! হায়!' আর প্রায় একই সময়ে কেরলে যখন অচ্যুৎ মেনন নতুন মুখ্যমন্ত্রিরূপে শপথ গ্রহণ করে রাজভবন থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, তখন কয়েকশত মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মী বুক চাপড়ে চীৎকার করছিলেন, 'অচ্যুত মেনন হায়! হায়!' দিল্লীতে কংগ্রেস ভবনের সামনে কংগ্রেস নেতাদের ঘিরে যাঁরা বুক চাপড়ে হায়, হায় করছিলেন তাঁরা সকলেই কংগ্রেসকর্মী। আর কেরলে রাজভবনের সামনে কম্যুনিস্ট নেতা অচ্যুত মেননকে ঘিরে যাঁরা বুক চাপড়ে হায়, হায় করছিলেন, তাঁরাও সকলে কংগ্রেস-বিরোধী যুক্তফ্রন্টেরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মী।

দিল্লী অনেক দূরে। কেরলও অনেক দূরে। দিল্লী আর কেরলের ভাঙন এবং হায়, হায় ধ্বনি পশ্চিমবঙ্গের আকাশ-বাতাসে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে সেটাই হল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হিসাবে আমাদের ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "কেরলের হাওয়া পশ্চিমবঙ্গে লাগবে না।" তার জবাবে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন, "কেরলের থেকে যে হাওয়া পশ্চিমবঙ্গে আসছে তা মাঝ-পথে কি উবে যাবে? কেরলের হাওয়া যারা দূষিত করেছে তারা তো পশ্চিম-বঙ্গেও সক্রিয়।" জ্যোতি বসু বলেছেন, "কেরলের অচ্যুত মেননের সরকার কংগ্রেসের থেকেও খারাপ।" জবাব দিয়েছেন সোমনাথ লাহিড়ী, "কংগ্রেসত্যাগী আর বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের সংগে সরকার গঠন কি এই প্রথম? অজয় মুখার্জী তো একজন কংগ্রেসত্যাগী। বিদ্রোহী কংগ্রেসী অজয় মুখার্জীকে নিয়ে গঠিত সরকার পশ্চিম-বঙ্গের মানুষের অনেক মঙ্গল তো করেছেই—সারা ভারতবর্ষে নতুন হাওয়া বইয়ে দিয়েছে।" কিন্তু এ হল শুরু। যে ভাঙনের শুরু কেরলে, যে ভাঙনের শুরু দিল্লীতে এ হল তার শুরুর প্রতিক্রিয়া। এর পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল নেমে আসবে। সেই জলে সৃষ্টি হবে ঢেউ—ভাসিয়ে নেবে কূল—ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে পড়বে কূলের গ্রাম জনপদ। এবার দেখা যাক এই ঢেউ কোন্ গতিপথে আসছে আর নদীর কোন্ কূল ভাঙছে। কেরলের আলোকে দিল্লীর আলোকে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিটা যাচাই করে দেখা যাক।

এবার শারদ-উৎসবের মর্মকথা

মনোরঞ্জন হাজরা

দীর্ঘকাল পরে এবার শারদীয় উৎসবে অনেক অন্ধকারের পর যেন আলোর একটুখানি ঝলকানি দেখলাম। শরতের আকাশ এমন নির্মেঘ নীল দেখি নি বহুদিন। বহুদিন এই আকাশেরই মত পরিচ্ছন্ন দেশটাও যেন নজরে পড়ে নি। এমন সুচিস্নিগ্ধ প্রাণবন্ত উৎসব যেন কত বছর পরে দেশে অনুষ্ঠিত হল। খড় আর মাটি, রং আর তুলি দিয়ে যে প্রতিমা গড়া হয় তার অন্তর্নিহিত মর্মকথা নিয়ে মাতামাতি করবেন ভক্তিমান নরনারী—আমি কিন্তু চেয়েছিলাম পায়ে হেঁটে দেখতে আমার দেশের মানুষকে—দারিদ্র্য আর দুঃখে, অভাব আর অনটনে, রোগে আর বঞ্চনায় বিপর্যস্ত হয়েও যারা বেঁচে থাকার সংগ্রামে অচল আর অটল। এই মানুষই তো যতবার ঘরে আলো জ্বালাতে গেছে ততবারই নিভে গেছে, যতবার উঠে দাঁড়াতে গেছে ততবারই আঘাত খেয়েছে, যতবার আশা করেছে ততবারই নিরাশ হয়েছে। তবুও এ মানুষ মন্বন্তরে মরেনিকো, মারী নিয়ে ঘর করেছে—এ মানুষ আছে, আছে আর থাকবেও। ভাগ্যলিপি বলে যদি কিছু থাকে তবে তাকে নতুন করে আপন হাতে লিখবেও এ মানুষ! তাই এ মানুষের আকর্ষণ আমার কাছে দুর্নিবার। শারদ-উৎসবের অবিশ্রান্ত চলমান মিছিলে তাই আমিও ছিলাম এদের সাথী।

পুরনো কথা মনে পড়ে গেল

অনেক অতীতের কথা মনে পড়ে গেল। অতীতই তো বর্তমানের উৎস, তার মাঝেই তো ভবিষ্যতের সোনালি স্বপন। তাই অতীতকে না মনে করে পারি নি। সেই ছেলেবেলাকার কথা। দশ-আনার একখানা ধুতি, বারো আনার একখানা শাদা পাঞ্জাবী, পাঁচ আনার একখানা বেলেঘাটার গেঞ্জী, বুকের কাছে কিনুকের বোতাম দেয়া আর খাখম মুচির কাছে আগে থাকতে মাপ দেয়া দু' টাকার ক্রোম লেদারের সেলিম স্যু, যা এক বছর কিনলে পা বড়ো হয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত চলে যেত বছরের পর বছর—এই ছিল তখনকার দিনে আমাদের মত দরিদ্র ঘরের পুজোর পোষাক। সেদিন আমরা "রায়বাবুদের গুপী পরেছে জরির টুপি/ফুল কাটা সাটিনের জামা" বলে কোন বায়না করি নি বা মনে কোন ঈর্ষাও পোষণ করি নি। মনে পড়ল হোসেন চাচার কথা। মাথার দু' পাশে কোঁকড়ানো-কোঁকড়ানো কালো চুল বাবরি হয়ে নেমে গেছে দুই কাঁধে, একরাশ কালো দাড়ি পৌঁছেছে গিয়ে কোন সেলাই করা শুভ্র পাঞ্জাবীর বুকে। চাচার কানে গোঁজা আতর মাখানো শাদা তুলোর গুলি। বগলে ঝুলছে আতরের বাক্স লালখেরোর ঝুলিতে। চাচা পথ দিয়ে চলে গেলেই আতরের গন্ধ ভুর ভুর করত বাতাসে। তাই তাঁকে "আতর চাই গো আতর" বলে হাঁকতে হত না কোনদিন—এমনিই লোকে বুঝতে পারত। বড়রা পয়সা দিয়ে আতর কিনতেন হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশিতে করে। আমরা ছোটরা চাচার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই চাচা তুলোর গুলি গুঁজে দিতেন আমাদের কানে। আর সে কি অপূর্ব গন্ধ! কান থেকে সেই তুলোর গুলি আমরা রেখে দিতাম নতুন কেনা জামার বুক পকেটে। সপ্তমী যেত, অষ্টমী যেত, নবমী যেত, দশমীও চলে যেত—তারপর যতদিন না সেই জামা কাচতে দেয়া হত, ততদিন সেই আতরের গন্ধ জামায় যেন লেগে থাকত। আজ এই লিখতে বসে, মনে হল যেন সে গন্ধ এখনও পাচ্ছি!

তখনকার মেয়েদের কথা

তখনকার দিনে মেয়েদেরও পোষাক ছিল সাদাসিধে। মায়েরা দিদিরা বড় জোর পরতেন সেমিজ। তার ওপরে ফরাসডাঙা অথবা শান্তিপুরী, টাঙাইল না হয় ঢাকাই শাড়ি। ব্লাউজ বা বক্ষ-আবরণীর কথা তখন কেউ কল্পনাও করত না। এসবের মোট দাম যোগ করলে তখন আট-দশ টাকারও বেশি হত না। জুতো ছিল তখনকার দিনে দূরের কথা। একখানা বঙ্গলক্ষ্মী সাবান তাঁদের ট্রাংকগুলোকে বছরের পর বছর সুবাসিত করে রাখত। তবে স্নো আর পাউডারের চলন হলেও দরিদ্র ঘরে প্রাধান্য যেটার দেখা যেত তা হচ্ছে আলতা আর সিঁদুরের। ছোট ছোট বোনেরা তখনকার দিনে ফ্রক বা ইজের খুব যে একটা পরত তা নয়—পুজোর সময়ে নীলডুরে পাছাপাড় মিলের কাপড়ই পরত তারা অধিকাংশ। প্রসাধনের সামগ্রী অন্যান্য যা ছিল তার মধ্যে আতর অথবা অগুরুই ছিল প্রধান।

চণ্ডীমণ্ডপের গণ্ডী

তখনকার পুজো চণ্ডীমণ্ডপের গণ্ডী ছেড়ে বাইরে বেরোয় নি। সাধারণভাবে ধনীগৃহেই পুজো হত। বাড়ির কাছে ছিল বিখ্যাত গোস্বামী বংশ। তাঁরা ছিলেন রাজা উপাধিধারী। রাজবাড়িতে খুব ধুম-ধাম করে পুজো হত। কত লোককে তাঁরা খাওয়াতেন, কত লোককে কত কাপড়-কম্বল বিতরণ করতেন। সন্ধ্যাবেলায় ঝলমল করে উঠত তাঁদের নাটমন্দির। কত রঙ-বেরঙের পোষাকে নরনারী যেত রাজবাড়িতে সন্ধ্যারতি দেখতে।

শুধু যে তখনকার দিনে ধনীগৃহেই পুজো হত তা নয়। মধ্যবিত্ত নিষ্ঠাবানেরা এবং দরিদ্র মানুষকেও মাঝে মাঝে তিন বৎসর পুজো করার আগ্রহে আগ্রহী দেখা যেত। ধনীগৃহে আমাদের নিমন্ত্রণ কখনো জোটে নি। নিমন্ত্রণ করতেন তাঁরা জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশসাহেব, রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর আর তা-বড় তা-বড় লোকদের—অবশ্য দরিদ্ররা তাঁদের বাড়িতে গেলে ফিরিয়ে দেয়া হত না কোনদিন, কিন্তু দরিদ্ররা এমনিভাবে যাবেই বা কেন? আত্মসম্মান যখন দরিদ্রের একমাত্র ঐশ্বর্য তখন সে তাকে রবাহুতের টিকিট হিসাবে ব্যবহার করবে কেন? নিমন্ত্রণ পেতাম আমরা মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র গৃহ থেকে। এসব বাড়িতে কটা দিন আমাদের খাওয়া-দাওয়া হত প্রচুর।

দরিদ্রা ধাই-মা

আজ পুরনো দিনের কথা লিখতে বসে একটি মানুষের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি আমাদের ধাই-মা—পৃথিবীতে নতুন মানুষের আবির্ভাবের দিনে যাঁকে আমাদের একান্ত করে প্রয়োজন হত। বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে মায়ের একক জীবন থেকে আরেকটি জীবনকে বিভক্ত করে দিতেন তিনি নাড়ী কেটে। এমনি করে নাড়ী কেটে কেটে যে অর্থ তিনি উপার্জন করতেন প্রতি বছর এই শারদ-উৎসবের দিনে প্রতিমা এনে তিনি তা খরচ করতেন। ধাই-মার বাড়িতে আমাদের যেতেই হত। তা না হলে বুড়ী আমাদের গালাগালি দিয়ে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দিতেন। কিন্তু সে গালাগালি কি মিষ্টিই না লাগত! দরিদ্রের প্রতি দরিদ্রের দরদভরা তিরস্কার—এর কি কোন তুলনা হয়?

ঠাকুরমার মুখে শুনেছিলাম ধাই-মা নাকি বাবারও নাড়ী কেটেছিলেন। কাজেই তিনি বাবারও ধাই-মা, আমারও ধাই-মা। ধাই-মার কোন সন্তান ছিল না, তাই শহর জোড়া ছেলেমেয়েই ছিল তাঁর আপন সন্তান। সেই ছেলেমেয়েরা যদি তাঁর

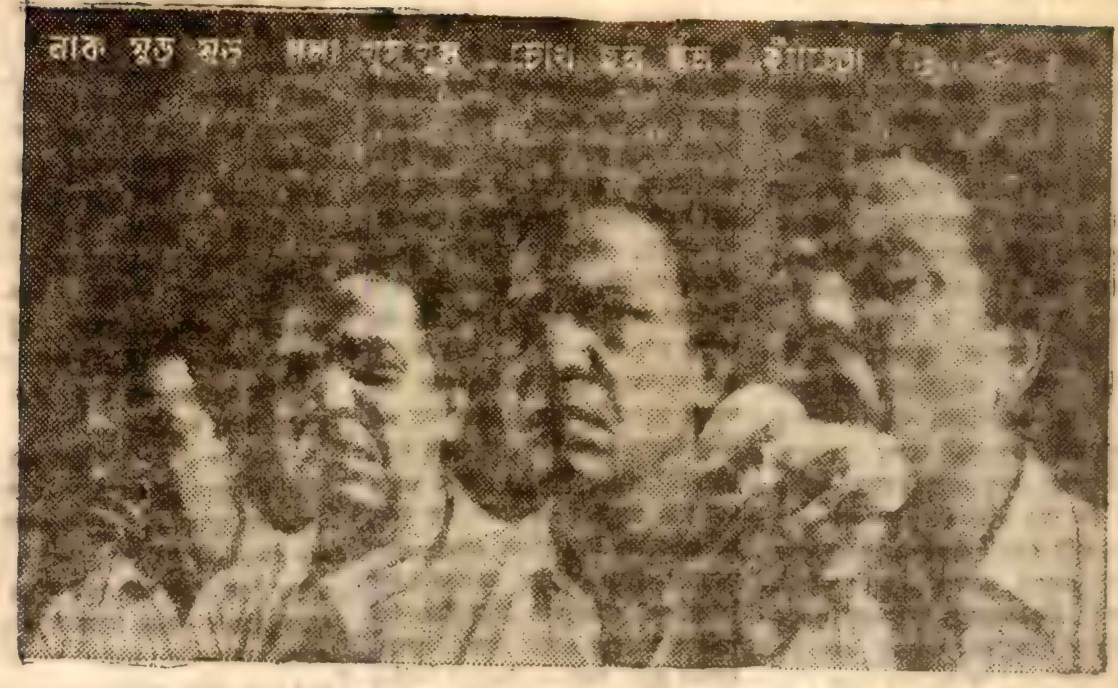

এইরে—সর্দি লাগল!

এবার গা ম্যাজম্যাজ করবে, নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হবে, গলাব্যথা করবে,—তারপর সর্দি বসলেই মুস্কিল!

এক্ষুনি ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন! বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না!

সবে সর্দি লেগেছে! এখনই এর একটা ব্যবস্থা করুন!
তা না হলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান ভোগান্তি—নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি—অযথা কষ্ট ভোগ করতে হবে।

সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, তাহলে কোনও কষ্ট পেতে হয় না—বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না। আর একটা কথা! ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায় যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,—যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে। খুবই সহজ কাজ। তেতো বড়িও গিলতে হবে না, বিচ্ছিরি মিক্সচারও খেতে হবে না!

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,—সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে—

১)
বাইরে থেকে গায়ে

২)
ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে
২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ করে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব—নাকে, গলায় বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

NAS

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

বাড়িতে না যায় তাহলে তিনি গালমন্দ না করবেন কেন? বাস্তবিক সে স্নেহ যেন ভোলার নয়। ধাই-মার বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াতে হত তাঁর সামনে কোঁচড় পেতে। নিজে হাতে তিনি দিতেন পিতলের সরায় করে এক সরা চিনির মুড়কি, বাতাসা, নারকোল নাড়ু আর সন্দেশ। কোঁচড় ভর্তি করে চলে আসার জো ছিল না—সেইখানে বসে তাঁর সামনে খেতে হত।

ধাই-মার বাড়িতে নবমীতে বলি হত প্রতিমার সামনে। দেখতে যেতাম। বাবার নাম করে তিনি ডাকতেন, এই শুঁড়ওলা ঠাকুরের ছেলে, তোর বাবা এল না কেন রে? বলতাম, ছুটি পায় নি বাবা। ধাই-মা মুখ খিঁচিয়ে বলতেন, 'তা কলা-বৌটা কি করছে' অর্থাৎ আমার মা। এ থেকে পাঠক মনে করে নিতে পারেন আমার বাবার নাম কি। যাই হোক, দেখতাম, ছাঁচি-কুমড়ো, আখ, বাতাবী লেবু, আরও কত কি যেন বলি হত। বলির পর কাদা মাটি হত। বলির জায়গাটায় জল ঢেলে পাড়ার ছেলেরা সব কাদামাটি করত। এক-একজনকে টেনে এনে কাদায় ফেলত। নাচত, গান গাইত। এমন কি কেউ কেউ মদ খেয়ে আনন্দও করত।

এই পুজোয় ঘরে ও বাইরে

শারদ-উৎসবের এই পুজোর ঘরে ঘরে দেখেছি, ঝাড়ামোছা, কাচাকুচি চলত কয়েকদিন আগে থাকতেই। তারপর ছিল নারকোল ছোলা, নাড়ু তৈরি করা, ছাপা সন্দেশ তৈরি, নানারকম মিষ্টি ইত্যাদির প্রস্তুতিপর্ব। মেয়েদের অষ্টমীর ধুনো-পোড়ার আয়োজন।

বাইরে থাকত ছেলেদের হুল্লোড়। পুজো হত লোকের চণ্ডীমণ্ডপে, বাড়িতে। কিন্তু বাইরে সামিয়ানা খাটিয়ে মঞ্চ তৈরি করে চলত বীরাষ্টমীর মহড়া। থিয়েটার হত, যাত্রা হত—তার আগে হত লাঠি খেলা, তরোয়াল খেলা, ছোরা খেলা। ফিজিক্যাল ফিটনেস-এর শো হত—ওয়েট-লিফটিং, প্যারালাল বার, রিং, ট্রাপিজ, যুযুৎসু ও মাসল কন্ট্রোলিং। আর হত এক জায়গার সঙ্গে আরেক জায়গার প্রতিযোগিতা।

বিসর্জনের বাজনা বাজত

দশমীতে প্রতিমা তোলা হত নৌকোয় গঙ্গাবক্ষে বিসর্জনের জন্য। তার আগে বরণ করা হত প্রতিমাকে। ঠাকুরমা, মা, পিসী-মাসী সবাই আঁচল দিয়ে দেবীর পদরজঃ নিতেন এবং তা বুলিয়ে দিতেন আমাদের মাথায়। তারপর বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠলে ঘরে গিয়ে বিল্বপত্রে অথবা কদলীপত্রে লিখতে হত দেবীর নাম আলতা দিয়ে। অতঃপর গুরুজনদের প্রণাম, বাড়িতে, পাড়ায় এবং স্কুল খুললে স্কুলে। শারদ-উৎসব এইভাবেই [illegible] শেষ হত।

তখন যাদের জানতাম

আমাদের ছেলেবেলায় শারদ-উৎসবে আমরা গান্ধীকে জানতাম না, জিন্নাকে জানতাম না—জানতাম দুটি নাম। একটি হচ্ছে যিনি বলেছিলেন, 'মুচি, মেথর, চণ্ডাল আমার রক্ত আমার ভাই' আর যিনি বলেছিলেন, 'মাতৃহারা মা যদি না পায় তবে আজ কিসের উৎসব' সেই দুজনকে।

সম্ভবত এই চেতনা থেকেই আমরা কখনো মানুষকে ছোট করে দেখতে পারি নি এবং এ যে কত বড় সত্য, সে কথা আজও মনে পড়ে—আমানত আর আবুল ওরা মুসলমান ঘরের ছেলে, ওরা ছিল আমার সহপাঠী, ওরাও আমাদের এই শারদ-উৎসবে যোগ দিত। আমাদের সঙ্গে বীরাষ্টমী করত, বিজয়ার সময় ওরাও ঘরে ঘরে প্রণাম করতে যেত—ঠিক যেমন আমরা যেতাম ঈদের দিনে ওদের ঘরে। মহরমের দিনে মশরফ হোসেনের সেই বিষাদসিন্ধু আমাদেরও নাড়া দিত—সেই মিছিলে আমরাও ওদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় লাঠি, ছোরা ও তরোয়াল খেলতাম একাত্ম হয়ে। সেদিনের শারদ-উৎসব মনে হলে আজও কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি।

(২)

থাক্ যে কথা বলছিলাম, এবারের শারদ-উৎসবে দেখলাম যেন অন্ধকারে একটুখানি হঠাৎ আলোর ঝলকানি! পুরনো দিন কবে শেষ হয়ে গেছে। এর মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে জাতীয় উন্মেষের যুগ, যুদ্ধ গেছে, মন্বন্তর গেছে, ব্যবচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার মাদকতাও শেষ হয়েছে, প্রচণ্ড অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে সারা দেশে। শাসকশ্রেণীর মুখোসও গেছে অনাবৃত হয়ে। মানুষ বাঁচতে চায়, মানুষ মহৎ হতে চায়—তাই আক্রান্ত হয়েও সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছে। পুরনো শাসকশ্রেণীকে টেনে নিক্ষেপ করেছে সে ডাস্টবিনে। সংগ্রাম তার শেষ হয় নি—এখনও সে তা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সে ভোলে নি তার ঐশ্বর্য-মণ্ডিত ঐতিহ্যকে।

বছরের পর বছর শারদ-উৎসব এসেছে আর চলে গেছে। এমনিভাবে আবারও আসবে, আবারও চলে যাবে। কিন্তু বিগত অতীত, আর অনাগত ভবিষ্যতের বর্তমান মোহানায় দাঁড়িয়ে কি এবারের শারদ-উৎসবের কোন মূল্যায়ন আমরা করতে পারি না?

বিগত বিশটা বছরে

বিগত বিশটা বছরে কি দেখেছি আমরা এই পশ্চিমবাংলায়? কুমোরটুলির প্রতিমায় তুলির শেষটান থামা মাত্রই আচমকা যেন গোটা বাংলাদেশ কেমন একটা চাঞ্চল্যে ভরে ওঠে। ঘরে-বাইরে উৎসবের অন্ত থাকে না। পল্লীতে পল্লীতে সর্বজনীন পুজোর মণ্ডপ, ঢাকঢোল কাঁসির বাজনা বাজিয়ে পথে পথে কলা-বৌ চান করানোর মিছিল; মণ্ডপে মণ্ডপে চারদিকের ছকা রুটিন, মাইকে সব বিচিত্র ঘোষণা। পৌর কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্য ও জনস্বার্থ সংক্রান্ত হুঁশিয়ারী, পুলিশের জনতা নিয়ন্ত্রণ আর বিভিন্ন ধরণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা—সব যেন এক সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

অন্যদিকে দেখা গেছে ঘরে চাল নেই, অফিসে বোনাস বা এ্যাডভান্স মেলে নি, কারখানায় বোনাস চেয়ে ছাঁটাই হয়েছে শত শত মানুষ, না হয় গেছে জেলে। খাদ্য চাইতে গিয়ে দেশে বয়ে গেছে রক্তের বন্যা, নয়তো হাজার হাজার ছেলে বন্দী হয়েছে পাষাণ চৌহদ্দীর মধ্যে। শারদ-উৎসব আর শারদ-উৎসব থাকে নি—নরশোণিতের হোলি উৎসবে পরিণতি লাভ করেছে। এই তো সেদিন ১৯৫৯ সালে আশীটা মানুষকে পুজোর আগে পিটিয়ে লাস করে দিয়েছিল ওরা। এই তো বাষট্টি সাল থেকে শত শত মানুষকে ভারতরক্ষা আইনে বিনা বিচারে আটক করে রেখে দিয়েছিল ওরা ছেষট্টি সাল পর্যন্ত। এত রক্ত, এত অশ্রু, এত জেলখানার দাপটে কখনো কি শারদ-উৎসব জম-জমাট হয়?

জনতার অভিজ্ঞতা

জনতার মাঝে চলতে চলতে একজন বললেন, সত্যিই এবার খাদ্যসংকট নেই বলে পুজোটা জমেছে ভালো। আরেক-জন বললেন, 'তাছাড়া শ্রমিকসংঘর্ষও নেই এবার।' প্রথমোক্ত ব্যক্তি বললেন, 'সে কথা খুবই সত্যি।'

ও'দের কথা শুনতে শুনতে যাচ্ছিলাম। মন্তব্য করি নি কোন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, 'যা কখনো হয় নি এবার তা হয়েছে। লোকে পর্যাপ্ত রেশন পেয়েছে। যে চা-বাগানের মজুরদের কখনো মানুষ মনে করা হয় নি তারা এই প্রথম মজুরী বৃদ্ধির আস্বাদ পেয়েছে। যে চটকল শ্রমিক ছিল একেবারে অবহেলিত তারাও এবার মাইনে বাড়াতে পেরেছে, ইঞ্জি-নীয়ারিং শ্রমিকদের মাইনেও বেড়েছে বোনাসও মিলেছে, সুতোকল মজুররাও বঞ্চিত হয় নি। তাছাড়া অনেক বন্ধ কারখানা এই সময় খুলেছে—মানুষের হাতে তাই দুটো পয়সা এসেছে। এবার

পুজো ভালভাবে হবে না কেন বলো তো?'

প্রথম ব্যক্তি বললেন, 'তাছাড়া মস্ত বড় জিনিস হচ্ছে এবারে পুজোর আগে কংগ্রেসের লাঠি, গুলি, গ্যাস আর জেল, জরিমানা নেই।'

ওর মধ্যে কথা বলে উঠলেন তৃতীয় এক ব্যক্তি। তিনি বললেন, যুক্তফ্রন্ট ১৯৬৭ সালে যা করতে পারে নি—এবার '৬৯ সালে তা পেরেছে।' অর্থাৎ তিনি যা বললেন সে কথা এখানে লিখতে গেলে শ্রমনীতি নিয়ে শরিকী গোলমাল লেগে যেতে পারে, তাই আপাতত আমি তা থেকে বিরত রইলাম।

লোকের মুখে শোনা

বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম সাজানো-গোজানো কয়েকটা দোকানের সামনে। নবমীর দিনেও বিক্রীবাটা হবার আশা তাঁদের আছে। ঢাক বেঁধে একদল ছেলেমেয়ে আর তাদের অভিভাবকবৃন্দ চলেছেন। বলা বাহুল্য সকলেই বেশ মুখর। সঙ্গে টেপ রেকর্ডার ছিল না, তাই কথাগুলো তাদের ধরে রাখতে পারি নি, কিন্তু মনে করে রাখতে পেরেছি। একজন অভিভাবক গোছের মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বললেন, 'এবারে জিনিসপত্রের দাম একটু বেশি'।

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার যতদূর মনে পড়ল—শুধু আমি নই, বাংলা দেশের প্রতিটি মানুষ বোধ করি বিগত তিরিশটা বছর ধরে এই একই কথা প্রতি বছর শুনে আসছেন। কেন না এই দীর্ঘকালের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধ্বদিকেই ছুটেছে নিম্নদিকে নয়। মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের কথাটাকে খণ্ডন করে একটি ছেলে বললে, 'কি আর এমন বেশি?'

ভদ্রলোক বললেন, গতবারে যে টেরিকটের প্যান্ট কিনেছিলুম তোর জন্যে সেটা ছিল পঞ্চাশের মত—এবারে দেখলি তো সেই জিনিসটাই সত্তরের কম নয়?'

ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, 'একেবারে কুড়ি টাকা বেশি!'

জামাও দ্যাখো—গত বছরে নেপুর জন্যে যে হাওয়াই শার্টটা কিনেছিলুম তার দাম ছিল আটাশ; এবারে চল্লিশ। অথচ নেপু বলছে কি আর এমন বেশি?'

'তাছাড়া শাড়ি ব্লাউজ, ফ্রকেরই বা কি অবস্থা', নেপুর মা বললেন, 'গতবারে বড় খুকুর শাড়িখানা নিয়েছিল বত্রিশ, ছোট খুকির ফ্রকটা নিয়েছিল উনিশ আর আমার ব্লাউজখানা নিয়েছিল সাড়ে সাত। এবারে দ্যাখো তার চেয়ে কি আর এমন ভাল জিনিস—শাড়ি পঞ্চান্ন, ফ্রক উনত্রিশ, ব্লাউজ চোদ্দ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'সবই বেড়েছে। কিন্তু তবে কি জানো—

নেপুর মা বললেন, 'কি—ই?'

'এবারে কিন্তু কিনতে পেরেছি।'

এবার পুজোর এইটেই হয়তো মর্মকথা!

* * *

তবু শারদ-উৎসবকে ম্লান করে দিয়েছে জগদ্দলের ঘটনা। লিখতে বসে কেবলই মনে হচ্ছে যদি খাদ্যসংকট থাকত, যদি শ্রমিক-সংঘর্ষ থাকত, তবে বোধ করি এই জগদ্দলের ঘটনা ঘটত না। লুটেরাদের গাত্রদাহই এই একতরফা দাঙ্গার কারণ নয় যে তা কি করে বলা যাবে? তবু এই শারদ-উৎসবের শেষে স্মরণ করব একবার ছেলেবেলাকে—যখন বীরাষ্টমীতে আমানত আসত, আবদুল আসত, আর আমি যেতাম মহরমে তরোয়াল খেলতে তাদের সঙ্গে মিছিলে!

অন্য গ্রাম অন্য দেশ

সমীর মুখোপাধ্যায়

॥ দুই ॥

সে গ্রাম আর নেই যার নাম নিশ্চিন্দিপুর।

উদার, অনাসক্ত, নির্জন সেই সব গ্রাম কবে আগুনে ঝলসে গেছে। কোথায় পাওয়া যাবে ধাওতাল সাহুকে, সেই সুদখোর মহাজন? পাওয়া যাবে কি বুনো মহিষের দেবতা 'ট্যাড়বারো'কে? মুলশুলতার বিষন্ন ডালে আজো আসে এক বিকেলের নীলকণ্ঠ পাখি। অপরাহ্নের তাজা রোদ আজো বাঁকাভাবে পড়ে মতীর জলে। স্যারবাসিনীর মাঠে আজো তেমনি বিহ্বল জ্যোৎস্না নাবে। যারা এসব অপরূপ জিনিস দেখবে, দেখে শিখবে, শিখে কবি থেকে দার্শনিক হবে অপুর মত, তারা কেউ আর নেই।

কোথায় সেই বিহার-প্রবাসী 'বাঙালী' মেয়ে দুর্গা? ছেলেমানুষি আর ভাঙ্গা-বাসায় দোল-খাওয়া শ্রীরামপুরের সেই নিটোল ছোট বৌ আজো বেঁচে আছে কি? আজো কি নিশ্চিন্দিপুরের পাবলো ভিটের ওপর দুপুরের ঘুঘু করুণ উদাস সুরে ডাকে?

কোপাই-এর গহিন জলে গলা ডুবিয়ে যে গান—তাঁর মাতাল জ্যোৎস্নায় বনোয়ারী শুনতো, 'তোমার চোখে অঙের ছটা; আমায় ছিটে দিলে না, পদ্মপাতায় কাঁদি-লায় হে, যে জল পদ্ম নিলে না—সেই পরাণ-ভ্রমরের অমর গান আর সেই বনোয়ারী, সে সবই কবে কোপাই-এর গর্ভে নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। বরং সেই হেঁকো-ডেকো করালী যে ইতিহাসকে বহন করে এনেছিলো তারই রেল লাইনের ধারে ধারে ভীষণ রৌদ্রালোকে এখন জেগে উঠেছে এক-একটা অগ্নিবর্ণ গ্রাম।

শরৎচন্দ্রের সেই রসজ্ঞা প্রেমিকা কমল-লতা আর তারা কৌলিবিলাস 'বাপ-মায়ের অবাধ্য হবো?' একথা বলার দেব-দাস আর 'দোষ কি?' উত্তর দেবার সেই পার্বতী দেবদাসের সঙ্গ আদরের পারু, কি দেবদাসকে দেখতে এসেছিলে?' —সেই মনোদিদি আর 'না, সঙ্গে করে নিতে এসেছিলাম'—সেই পারু—জানি না এই লক্ষ্মীছাড়া সমস্ত ওরা সব বেঁচেবর্তে আছে কিনা, কিন্তু সেই ষাঁড় মহেশের ভালোবাসার লোক, উপায়হীন, অপমানিত, ক্ষুধার্ত গফুর, আর ক্রোধ, তার ক্ষোভ দিগন্তে বিস্তৃত মাঠের ক্ষমাহীন ঢেউ-এ ঢেউ-এ।

'দুই বিঘা জমি'-র সেই উপেন ফিরে এসেছে আবার অন্যরূপে। আধ-ডোবা গাছের মাথায় দেখেছি গোখরো, কেউটে। 'আল'-এ দেখেছি আল-কেউটে। গাছে দেখেছি লাউডগা, বেত আছড়া। এই সব গফুর আর উপেনেরা এরা এখন ওদের চেয়ে কিছু কম নয়। তারই দলিল, তারই পরচা অথচ সাতপুরুষের ভিটে হাতছাড়া হয়ে যায়—এতোদিন নিরুপায় হয়ে এসব তারা দেখেছে। সকালবেলায় মিথ্যে মামলার দায় মেটাতে নিজের ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে কোর্টে গেছে, পয়সা খরচ হয়েছে, কোর্টের দস্তুরি মত 'ডেট' সেদিন পড়ে নি। বিকেলবেলায় 'নেনোর মাঠ'-এ এসে দেখছে ফসল কে বা কারা কেটে নিয়ে গেছে, এক কণা ধানও পড়ে নেই, বৃথাই কাক আর অপরের ছাড়া গরু শস্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। নিজের ভাগেরটা ঘরে এনে রেখেছে, পুলিশের লোক এসে কোমরে দড়ি দিয়ে থানায় নিয়ে গেছে। বৌ-এর পেটে 'ব্যথা' উঠেছে, অঞ্চলের মান্য-গণ্যদের একজনাকে শুধিয়েছে সে হাসপাতালের মেঝেতে একটা জায়গা করে দিয়েছে বটে অনেক জল ঘোলার পর। কিন্তু নানা ফিকিরে বার বার 'গা' থেকে মাংস কেটে নিতে ভোলে নি। অর্থাৎ এখান থেকেও দু' পয়সা আয় করে নিতে তার আটকায় নি। মাঠে 'কিষাণ' খাটায় পরও দশ দিনের একদিন জ্বর-জারিতে, বাবুর হাত-পা ডলাই-মলাই করে দেবার জন্যে সাঁঝবেলায় যেতে পারে নি, তার জন্যে সকালের 'জায়গা'-টা গেলে ... জুতোর মার খেয়েছে। মিছিলে গেছে লুকিয়ে লুকিয়ে, জানতে পেরেছে পাড়ার জমির মালিক যে ডোঙা দেয় নি ছ্যাঁচবার। ভাগের জমি যা সে অনেক দিন চষে আসছে, তা অন্য অভাবী লোককে দিয়ে ভাগে মেরেছে। ঘরের চালে ইচ্ছে করে ছুটিয়ে দিয়েছে 'লালঘোড়া'। জরু-গরু যখন যেমন পছন্দ তুলে নিয়ে গেছে নিজের আস্তানায়। এসব নিয়ে কোর্টে যাবে কি, তার জন্যে বুকের পাটা দরকার, তাছাড়া কোর্টে যাবে যে রোজ রোজ তার পয়সা কই। থাকলেও কারো যদি বা পয়সা জুটলো; তাতেই যা কি যে ঘুষ দিতে পারবে। কোর্ট তো তার। হ্যাঁ, একরম জোর করেই বলল আমাকে জনার্দন আদক। মশাই সাদা চোখেই ছিনু। বলবেন যে গাছপালা টেনে শালো 'আনসান' বকছে সিটি হবে না দেবতা। সাইকেলে আলো না জেলে যাওয়ার জন্যে জরিমানার ব্যাপার। কোর্টের আর্দালীটা এসে বললে, 'এ কেস-এ তিরিশ টাকা লাগবে।' তার চে' 'আমাকে বেশি না বিশ টাকা দ্যাও। তা'লেই হবে।'

সাইকেলের আসামী সেও ব্যাটা ধুরন্ধর। আমার মত মুরুখ্যু গেঁয়ো নয় গো। সে অমনি তক্কো জুড়ে দিলে। তারপর ধানাই-পানাই শেষে বিশ থেকে আর্দালীটা পনেরোতে নেবে এলো। তারপর লোকটা ওর হাতে পনেরো টাকা দিতে আমি কোর্টঘরের পেছনকার ঘরের একপাশের পর্দা সরিয়ে পোস্কার দেখলাম, আট টাকা সে রাখলো কোর্টবাবুর প্যাডের ভিতরে, পাঁচ টাকা চুপি চুপি রাখলো উকিলবাবুর হাতে আর দু' টাকা নিজের কোমরের গেঁজেতে। কেস যখন উঠলো তখন কোর্টবাবু সাই-কেলে আলো না থাকার দরুণ জরিমানা করলো মাত্তর পাঁচ টাকা। তিরিশ টাকা করলো না। লোকটার দশ টাকা বেঁচে গেল। আপনাদের মত ভদ্দরলোক পারে মশাই কোর্টে গিয়ে ঘুষ দিতে, আমরা তো দামঘাসের শিষ, মহাজন, জমিদার 'বাবু'-রা আমাদের যাখন ত্যাখন পটাপট ছিঁড়ে নিচ্ছে।'

'কোর্ট? কোর্টের কথা আর শুধোবেন না।' বল একমুখ থুথু ফেলল কৃষক সমিতির একজন নেতা, 'তা'লে শুনুন কোর্টঘরের কেচ্ছা। আমরা মশাই জে. এল. আর. ও-কে জানিয়ে পতিত জমি দখল নিতে গেছি। দখল নিয়ে চলেও এসেছি দিন পনেরো হল। হঠাৎ হল কি কোর্ট থেকে এক সমন এসে হাজির। তোমার কেন জেল হবে না তার শো-কজ নোটিশ। সঙ্গে সঙ্গে গেলাম কোর্টে। খোঁজ নিয়ে জানলাম। কোর্ট আমাদের দরখাস্ত পায় নি। দরখাস্ত দেবার কথা জে. এল. আর. ও-র। সেখানে গেলাম। অফিসের কেরানী মুখ কাঁচুমাচু করে বললে। রোজনামচা খাতা খুঁজে পাচ্ছি না। চোখ রাঙিয়ে বলে এলাম,

এখন আমি একা এসেছি বলে খুঁজে পাবেন না। দাঁড়ান; দু'-দশজন লোক জুটিয়ে এখানে এনে জড়ো করি তারপর নিশ্চয় রেজেস্ট্রী খাতা খুঁজে পাবেন। ব্যাপার বুঝতে পেরেছেন? যারা পতিত জমি ভোগ করছিল তারা ঘুষ দিয়ে টিপে দিয়েছে, বুঝেছেন?'

শ' শ' বছরের পাথরে চাপা ইতিহাস আজ মুখর। রক্তাক্ত প্যারী কমিউন ওরা জানে না। তবু গ্রামগুলি গম গম করে। গর্ব হয় না? আনন্দে বুক ভরে ওঠে না? তাকিয়ে দেখছি পিল পিল করে চলেছে নামগোত্রহীন মানুষ আলের পথ দিয়ে লং মার্চ করতে করতে।

ইতিহাসে এই প্রথম ওদের জমি ওরা বুঝে নিতে যাচ্ছে।

রাস্তাটা পাঁচের। মিটিং হবে। প্রচারের ধারাটা শহর-ঘেঁষা। এখানেও সেই রিক্সায় বসে মাইক হাতে টহল দিয়ে ফিরছে। তবে শহরে যেমন পোস্টার পড়ে এখানে তেমন নয়। এখানে সচরাচর পাকা বাড়ির দেয়ালেই পোস্টার। আর পাকা বাড়ির সংখ্যাও যথেষ্ট কম। শহরে পোস্টার দেখে দেখে চোখে অরুচি। সে আর নতুন কোন বিস্ময়, কোন নতুন উত্তেজনা দেয় না। মাঝে নকশালপন্থীরা পোস্টারে কিছু বৈচিত্র্য এনেছিল। কিন্তু

লিনটাস-১.৬৮-১৩৪৪
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

সেই পোস্টার তার সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলল অমনি দেখতে দেখতে তার ক্ষুরের ধারেও মুচকে পড়ে যেতে লাগল। গ্রামে ব্যাপারটা তেমন নয়। এখানে একটা পোস্টার এখনো বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। সে হয়তো ট্যারা-বেঁকা অক্ষরে অমার্জিত তুলিতে উদ্ভট ভঙ্গিতে আঁকা। তবু চায়ের দোকানের ধুপাঁচতে, মন্দিরতলায়, বটতলার নিচে তামুক খেতে খেতে তারই আলোচনা।

মিটিং হবে। ভালোই। শহরের মিটিং শুনে শুনে কান পচে গেছে। গাঁয়ে কখনো এমন করে আসি-ই নি তো মিটিং শুনবো। দেখলাম মাঠের মধ্যে একটা উঁচু ডাঙা জমিতে দু'-তিনটি চৌকি জড়ো করে প্ল্যাটফর্ম তৈরি। চারিদিকে শস্যে ভরা স্তব্ধ ক্ষেত্র। ভরা নদী দূর থেকে দেখা যায়। দিগন্তের কিনারে মন্থর, শান্ত মেঘ। ছায়া-রৌদ্রে রচিত যেন সুন্দর একটা কবিতা। বাপ্‌রে, কত মানুষ। আর আসবার কি ধরণ! কোন দল আসছে মাদল বাজিয়ে। কোন দল আসছে কাঁসর, করতাল বাজাতে বাজাতে। কোন দলের সখ হয়েছে ব্যাণ্ড বাজাতে। বুকজোড়া খোলা হাওয়ায় দুলছে মিছিল। পায়ে পায়ে উড়ছে পুরনো দিনের যত শুকনো ধুলো। স্ফীত, তপ্ত, উজ্জ্বল স্রোতে ওরা ভাসছে।

কারুর কারুর সঙ্গে দেখলাম হ্যারিকেন। হয়তো ফিরতে হবে দূরের গাঁ। তাই কোঁচড়ে অনেকেরই মুড়ি বা চিঁড়ে।

কারুর গায়ে গেঞ্জি, পরনে মালকোঁচা মেরে পরা ধুতি। কারুর লুঙ্গি আর কাঁধে গামছা। অন্য একজনের হয়তো আদুড় গা। যেন এই মাত্র মাঠ থেকে উঠে আসছে। কারুর চুল পোড়া খড়। কারুর চুলে তেলে মাখামাখি। বাবা, এত সব লোক শুনতে আসছে কবি না, তরজা না, মিটিং? এ কোন্‌ নেশা? এ যে অন্য সব নেশাকে হার মানালো?

'হ্যাগো, কে আসবে গো বলতে?'

'জানো না?' বলে সে একটা নাম বলল। 'জানি না' বলতে এমন অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকালো যে আমি এতটুকু হয়ে গেলাম। হয়তো সেই নেতা ওদের জন্যে যা করেছে তার কোন তুলনা হয় না। ওদের অস্থির ভেতরে, পাঁজরে পাঁজরে যে পুরোন ঘা-টা আছে তাকে হয়তো খুঁচিয়ে দিয়েছে, রক্তকে অসংযত করে তুলেছে, পাইয়েও দিয়েছে সামান্য সামান্য জমি। কি হয় তাতে, কিছুই হয় না, হয়তো এক গেরামের রামদাস বাড়ুই এক বিঘে জমি পেল আবার মাঝে ফাঁক, ভুস করে দু-দশ মাইল দূরে আব একজন গুঁইরাম আদক পেয়ে গেল দু' বিঘে জমি। তারপর আবার মাইলের পর মাইল চুপ-চাপ [illegible] কিন্তু হঠাৎ কেন মুচি ভিটে করবার জায়গা পেয়ে গেল মাতলা নদীতে যে নতুন চরটা উঠেছে সেইখানে। কোন কাগজে এসব বিবরণ বার হয় না, কাগজে বার হয় খালি ফাটাফাটির খবর, কে কার ক'টা মাথা ফাটালো, কে কার লাস নাবালো, কে কাকে গুম খুন করলো, কিন্তু কে কত ছটাক জমি পেল, কিভাবে পাচ্ছে, সেসব বিবরণ দেবার কোন নিজস্ব সংবাদদাতা কোন খবরের কাগজে নেই। কিন্তু তা না হোক তবু ঐ যে একটুকরো জমি রামদাস বাড়ুই পেয়েছে মোল্লাহাটিতে, মানুষের মুখে মুখে সে কাহিনী রটে গেছে মাইলের পর মাইল। তারপর নিরীহ চাষীর চরিত্র বদলে দিয়েছে। আমি জিগ্যেস করি নি তবু সেই লোকটি এই নামহীন নেতাটির একটা গল্প শুনিয়ে দিল আমায়।

বলল, 'ভেঁটোতে লুকোনো জমি টেনে বার করতে হবে। কি করা যায়? জোতদারও ডাকাবুকো। বেশ একটি তৈরি লেঠেলের দল আছে। তাছাড়া আছে বন্দুক। ঘাবড়ে গেলাম। তখন কে একজন বললে, ওরে উনি আসছেন আজ আমাদের সমিতির মিটিনে। তা' ওনাকে গিয়ে যাহা বলা উনি তো রেগে গিয়ে আমাদের এই মারতে আসেন না এই মারতে আসেন।

'তোমরা এখনো কাঁদুনি গাইছো? ওর ক'জন লোক আছে, দশটা, বারোটা, বিশটা? তোমাদের ক'জন? কেন জোট বাঁধো নি? সব ব্যাপারে আমি করে দোব? কেন, তোমরা কচি খোকা, কোলে বসে দুধ খাইয়ে দিতে হবে? অনেক কষ্টে ওনাকে বোঝালাম। উনি মশাই কিছুতেই বুঝবেন না। শেষে কি মতি হল, বললেন, চলো, যে যাবার আমার সংগে চলো। আমি জমির দখল নিতে যাচ্ছি। আমরা যে দশ-বারো জনা তখন ছিলাম ওনার সংগে সংগে চললাম। মাইলখানেক হেঁটেই বাস। বাসে চেপেই যাবো। ওমা, যেই বাসের কাছে গেছি, অমনি কোথা থেকে খবর পেয়েছে, দু'-দশজন করে এখান-সেখান থেকে জুটে গেল, মেলাই লোক, বাসে তো জায়গা হবে না। মশাই বলবো কি আপনাকে, সে এক মহা ইল্লুতে কান্ড! উনি বললেন, যখন সকলের জায়গা হল না বাসে তখন সকলেই হেঁটে যাবো। ক' মাইল আর হবে? দশ-বারোর বেশি হবে না।

'চলতে আরম্ভ করলাম সকলে। সে তো মশাই চুপচাপ চলা নয়। হড়্‌পা বানের নাম শুনেছেন? সেই হড়্‌পার মত চলা। এঁকে বেঁকে দশ দিক ভাসিয়ে সে একটা চলার মত চলা। কেউ চুপ করে বসে নেই। খালি হাঁকাড়ের পর হাঁকাড়। খালি ইনকিলাব জিন্দাবাদ। কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ। হো চি মিন জিন্দাবাদ। পতিত জমি দখল করো, দখল করো। লুকোনো জমি দখল করো, দখল করো। আমরা যতো যাই, ততো আশপাশের গেরাম থেকে লোক জড়ো হয়। কিরকম করে শুনে ফেলেছে উনি নাকি নিজে জমি দখল নিতে যাচ্ছেন, অমনি এ-গেরাম সে-গেরাম থেকে কাতারে কাতারে লোক জুটতে লাগলো, যে যেরকম অবস্থায় ছিল সে সেই অবস্থায় ছুটে এসেছে, শেষে ভেঁটোয় যখন পোঁছোলাম তখন সে এক বিশাল জনসমুদ্দুর, কোথায় জোতদার, কোথায়ই বা লেঠেলের দল, সব ভোঁ ভাঁ, আমরা জমির দখল নিলাম, এবার বুঝলেন ইনি কে?'

সন্দেহ নেই, শক্তিমান পুরুষ। বোধ হয় ইনিই বক্তৃতা করছেন। 'কোন লড়াই ভিন্ন নয়। শ্রমিকের লড়াই, চাষীর লড়াই, শিক্ষকের লড়াই, সমস্ত লড়াইয়ের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে সকলকে টেনে নিয়ে যেতে হবে চূড়ান্ত ও অনিবার্য এক মহান লড়াইয়ের দিকে।' শুকনো বক্তৃতাও নয়। আবার, গল্পও আছে।

আমি বসে আছি সমিতির অফিসে। তখন চৌধুরীদের একটা ছেলে আমার সংগে দেখা করতে এলো। চৌধুরী মানে বুঝতে পেরেছেন তো, আমি কু… মারা গ্রামের চৌধুরীদের কথা বলছি।

ওদের সেই লম্বাচুলো বকা ছেলেটা আমার সংগে দেখা করতে এলো।

'তুমি এখানে কি ব্যাপার?'

'চাষীরা যদি আমাদের মারে তাই আপনার কাছে'.....

আমি বললাম, 'চাষীরা যদি তোমাদের বাড়ির প্রত্যেকটা ইট খুলে নেয় তাতেও তোমরা যে তাদের ওপর অবিচার করেছ বছরের পর বছর, তা' শোধ হবে না। তবে আমি চাষীকে জানি। তাকে কেউ না খোঁচালে সেও কাউকে খোঁচায় না। বাবাকে গিয়ে বল, দিনকাল বদ্‌লে গেছে। বদ মতলব-টতলব ছাড়ুন।'

'যদি মেয়েদের গায়ে হাত দেয়?'

'না, তা দেবে না।' আমি বললাম, 'চাষীর নৈতিক চরিত্র তোমার বাবার, ঠাকুর্দার, জ্যাঠার নৈতিক চরিত্রের চেয়ে অনেক বড়ো। সে তা' করবে না। লজ্জা করে না তোমার? তুমি তোমার বাড়ির জন্যে ওকালতি করতে এসেছো। বরং ধিক্কার দাও নিজেকে যে তুমি ঐ অভিশপ্ত বাড়ির সন্তান। ওখান থেকে, ঐ নরক-কুণ্ডু থেকে বেরিয়ে এসো। ও বাড়ি পচে, হেজে, রসে গেছে। এসো সব ছেড়ে আমাদের কাছে। হ্যাঁ, চাষীরাই তোমাকে পথ দেখাবে। এতোদিন ওদের শিখিয়েছো। এবার ওদের কাছ থেকে শেখো।'

শহর কলকাতা

শনির পুজো—রাস্তায়

এক শনিবারের ব্যাপার নয়। বেশ কিছুদিন ধরে প্রত্যেক শনিবার—শিয়ালদার আশেপাশে এবং আরো কতকগুলো বড় বড় ফুটপাথে শনি পুজোর অস্থায়ী মন্ডপ দেখা যায়, শনিঠাকুর বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হন, পুজো হয়। সামনে থাকে বিরাট একটা রেকাবী—উপচে-পড়া পয়সায় ভর্তি। রেকাবীর কানা ঘেঁসে টাকাগুলো গোল করে সাজানো। যিনি বা যাঁরা উদ্যোক্তা, তাঁর বা তাঁদের সাপ্তাহিক আয় মন্দে হয়, বেশ শাঁসালোই। হবে নাই বা কেন? মানুষের ওপর ছায়া ফেলেন যে সব গ্রহ, তাঁদের মধ্যে সব থেকে রাগী তো ইনিই! এঁকে তুষ্ট রাখতে পারলেই সংসারে সর্বসাধ্য। শনির ভক্তের অভাব কোথায়? শনিবার রেসের দিন। রেসুড়েরা শনির প্রসাদ চান। আকছার লটারীর খেলা হচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে। শনির কৃপাদৃষ্টি পড়বে না? দশ পয়সার প্রণামী দিয়ে ভাবে—লটারীর টিকিট কেনা যুবক। আছে পরীক্ষা পাশ, মামলা-মোকর্দমা, মায় ব্যর্থ প্রেম।

সাধারণ ভাগ্যবাদী মানুষও শনির সন্তুষ্টির জন্যে পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা, পঞ্চাশ পয়সা বা এক টাকা সপ্তাহান্তে দিয়েই তার দায়িত্ব এড়াতে চায়।

শনি পুজোর এই বাড়াবাড়ি দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমাদের সমাজ এবং অর্থনৈতিক জীবনে আজ শনির কোপদৃষ্টি সদা জাগ্রত। ভাগ্যের দোহাই দিয়ে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে কি? —শহরদর্শী

'হ্যাঁ। চাষীর ঘুম ভেঙেছে। অজগর নড়তে আরম্ভ করেছে। ভুল হচ্ছে কোথাও কোথাও। তখন চাষীকে বোঝাচ্ছি, ওরে দেখিস, ছোট চাষীর জমি দখল নিস না বাবা। ওকে তোর সংগে নিতে হবে। ওকে শত্রুর করিস নে। ওকে কাছে ডেকে নে। বুকে জাপ্‌টে ধর। এই তো শুরু, আমাদের অনেকটা পথ...আমাদের'...

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই নামহীন নেতার আশ্চর্য কথকতা শুনছিলাম। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলাম জনতার দিকে। মাথার ওপর কালো আকাশ আর অসংখ্য তারা। তাদের ধারালো আলোর নিচে গভীর বিস্ময়ে অগণিত মানুষ সেই প্রকান্ড খোলা মাঠে তাদের অভ্যুত্থানের কাহিনী শুনছে এই প্রথম তাদেরই ভাষায়। এখনো ঠিক ঠিক বুঝতে পারছে না কতোখানি তার শক্তি, এখনো অনেক ভয়, অনেক সংশয় তবু একথা ঠিক, ঐ নেতার ভাষায়, অজগর নড়তে আরম্ভ করেছে।

ওরা বলতে আরম্ভ করেছে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। কোথায় সুদূরে ভিয়েতনাম। কি হচ্ছে সেখানে, আমেরিকান কারা, কারা ভিয়েত কং, এসব ওরা কিছুই জানে না। তবু শ্লোগান দিচ্ছে, 'তোমার নাম, আমার নাম, ভিয়েতনাম।'

আমি তো শহরের মার্কামারা চরিত্রহীন লম্পট লোক। ভেজালে আমার সন্দেহ নেই। একটা কিছু খাঁটি দেখলেই সন্দেহ। আমি যখন শিক্ষক তখন আমাদের মাইনে বাড়ানোর মিছিলে যোগ দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ভিয়েতনাম দিবস উপলক্ষে যে মিছিল প্যারেড গ্রাউন্ডে যাবে তাতে যোগ দিতে ঘোরতর আপত্তি।

সরকারী কর্মচারী হয়ে ডালহাউসী পাড়া কাঁপাতে আমাকে পাওয়া যাবে ঠিক, কিন্তু ঘুষ না দিলে আমার কাছে একটা ভুখা শ্রমিকও কাজ পাবে না, এটাও ঠিক।

আমার মতন একজন চরিত্রহীন লেখককে আমি জানি। তিনি নাকি একখানি বইতে খুব খানিকটা সাহসের পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। যে সব কথা আমরা বলতে ভয় পাই উনি নাকি সেসব কথার কাপড় খুলে দিয়েছেন। তা' সেই লেখককেই একদিন জিগ্যেস করেছিলাম, 'আপনি তো সত্যিই আপনার বইতে অনেকখানি সাহস দেখিয়ে ফেলেছেন। আমাদের দেশে দৈনিক পত্রিকারও একটা বিরাট ভূমিকা আছে। ওদের আপনি চেনেন, জানেন। দিন না সাহসের সংগে ওদের মুখোস খুলে।'

সেই সাহসী লেখক সংগে সংগে আমার হাত চেপে ধরে বলেন, 'ওরে বাবা। তাহলে চাকরি যাবে।'

চাকরি যাবে অর্থাৎ ঐ কাগজের সাপ্তাহিক বা ক্রোড়পত্রে লেখার জন্যে ওঁর আর জায়গা হবে না। তার মানে না খেয়ে মরা।

সে যাই হোক, গল্পেতে উনি বাংলাদেশের মেয়ের গা থেকে জামা-কাপড় খুলে নিতে খুব সাহসী। কিন্তু কাগজের মালিকের জামা-কাপড় খুলে নিতে আর সাহসী নন। এরকম সুবিধেবাদী সাহস একমাত্র চরিত্রহীন, লম্পট লেখকের পক্ষেই সম্ভব।

কলকাতার দামী কিন্তু নামী নয় এমন একজন লেখক ওঁর কোন এক বইতে বলেছেন, আমরা নাকি সবাই শব্দের কারাগারে বসবাস করছি। অক্ষরের জগতে হাজতবাস করছি। শুধু কথা আর কথা। কথার ডান্ডাবেড়ি আমাদের হাতে। কথার শেকল আমাদের মুখে। বইখানি নাকি কফি হাউসে খুবই জনপ্রিয়। ইনটেলেকচুয়াল মহলে এখন ঐ বই নিয়েই আলোচনা। বামপন্থী কোন একটা পত্রিকা বইটির খুব পিঠ চাপড়ে দিয়েছে। বইটি পড়ে, সত্যি বলতে কি, আমিও খুব মুগ্ধ। সেই পড়া বিদ্যেটা এখানে ঝালিয়ে নেবার জন্যে একজন মাতব্বর চাষাকে জিগ্যেস করেছিলাম একদিন, 'এই, তুমি যে ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম বলে ছাড়া বাছুরের মত লাফাচ্ছো, ভিয়েতনাম মানে জানো?' সে বলল, 'জানি না।' তারপর রুখে উঠে ফের আবার বলল, 'জানি না তো হয়েছেটা কি? এ্যাঁ?'

'জানো না যখন তখন বলবে না।'

'কেন বলবো নি? বললে মশাই আমি জোর পাই। মনে হয় শালো নিরাপদ ঘোষের খুলিটা আমি দু' ফাঁক করে দি ডান্ডা মেরে।'

'কে এই নিরাপদ?'

'কেনে, আপনার মত ভদ্দরলোক। মিহি মিহি কথা কয়। কোঁচা দিয়ে ফেত্তা দিয়ে কাপড় পরে। অঞ্চলের পিসিডেন্ট। খানিঘরের মালিক। দু' শো বিঘে লুকনো জমি রেখেছে জলের তলায়। বাড়িতে দুগ্‌গা পিতিমের মত বৌ এদিকে শালোর বাগদীপাড়ার দিকে লজড়।'

স্বীকার করতে বাধ্য হলাম লোকটা ভিয়েতনাম কথাটার মানে জেনেছে। অন্তত আমার থেকে অনেক বেশি জানে। যাঁরা কফি হাউসে বসে বসে বাংলাদেশ দেখেন, দেখে বই লেখেন, ইচ্ছে করে তৈরি করেন 'সুখী নির্জনতা', তৈরি করেন 'সৌখিন বিষণ্ণতা' আর চিন্তার বুড়বুড়ি কাটেন, আমার বড় দেখতে সাধ, তাঁরা এসে এই আকাটমুখ্যু চাষীটার সংগে 'শব্দতত্ত্ব' নিয়ে একটু আলোচনা করছেন।

'অসুখী', 'স্বাধীন' লেখকেরা, আপনারা আপনাদের ধারায় চলুন।

মানুষ কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষ এগিয়ে যাবে। [ক্রমশ]

পাঠক মন

স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য

গত ৯ই অক্টোবর তারিখে সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় "স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফেরাতে হবে গোটা ফ্রন্টকে" শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখার পর আমার কাছে এবং পত্রিকার দপ্তরে অসংখ্য চিঠিপত্র আসছে। অধিকাংশ চিঠিই ধন্যবাদ জানিয়ে। দু-একখানিতে অবশ্য প্রতিবাদের সুর যে নেই তা নয়।

আমি এ সম্পর্কে জানাতে চাই বিষয়টিকে আমি কোনক্রমেই Political battle বা রাজনৈতিক লড়াইয়ের ইসু করতে চাই নি এবং তা চাইও না। দুর্গত মানুষের সেবার জন্য স্বাস্থ্যদপ্তর পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠুক—যেমন ইতিপূর্বে শ্রীজ্যোতি বসুর স্বরাষ্ট্র ও প্রশাসনদপ্তর সম্পর্কে লিখেছিলাম "চাই একটি পরিচ্ছন্ন প্রশাসন যন্ত্র।" এগুলি Political battle-এর মনোভাব নিয়ে লেখা নয়।

তবু দেখছি দু-একখানা পত্র এমন আসছে, যা দপ্তরের আমলারা ফাইল দেখিয়ে দেখিয়ে তুলে দিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছেন।' এরপরে আমাকে হয়তো লিখতে হবে; কিন্তু লেখার আগে সেটি আমি আমার পার্টি ও যুক্তফ্রন্টের সামনে উপস্থাপিত করব। এ বিষয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নি।

—মনোরঞ্জন হাজরা

আপনারা 'সাপ্তাহিক বসুমতীতে' স্বাস্থ্যদপ্তর সংক্রান্ত বহু সংবাদ ছাপছেন। আমি মফস্বলে থাকলেও আর-জি-কর ও বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানি। আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করলে বাধিত হব।

১। স্বাস্থ্যদপ্তরের এক ডাক্তার ১৯৬৭-৬৮ সালে আর-জি-কর'এ এ্যানাটমির ডেমনস্ট্রেটর হিসাবে কাজ করতেন। তখন সেখানকার অবস্থা ছিল দুর্যোগপূর্ণ। বনহুগলী থেকে একজন প্রিন্সিপ্যাল হয়ে এলেন সেখানে। ছাত্র-শিক্ষকদের মিলিত সভায় তিনি এমন বক্তৃতা করলেন, যেন কলেজকে স্বর্গরাজ্য বানাবেন। কিন্তু তৈরি করলেন গ্রুপ সর্বস্তরে। বাধল বিপরীত পন্থ ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। প্রতিশ্রুতি কণা মাত্রও সফল হল না। উপরোক্ত ডাক্তার সেই সংগ্রামের বলি হলেন। ঐ প্রিন্সিপ্যাল তাঁর এক প্রিয়পাত্রকে (যিনি এখন বিলেতে, স্বাস্থ্যদপ্তরের অনুমতি না নিয়ে, কোন রেজিগনেশন না দিয়ে চলে গেছেন। স্বাস্থ্যদপ্তরের খাতায় এখনও তাঁর নাম বহাল আছে) বসিয়ে দিয়ে ঐ ডাক্তারটিকে শিক্ষকতার লাইন ছাড়িয়ে বাঁকুড়ার ইমার্জেন্সী অফিসার করে বদলী করে নিজে সরে গেলেন। অথচ কলকাতায় ঐ ডাক্তারের চাকরির দু' বছরও হয় নি। ২।১ মাসের মধ্যে ডাক্তারের পোস্ট-গ্রাজুয়েট পরীক্ষা ছিল। ঐ ভদ্রলোকের চেয়ে বেশিদিন কলকাতায় আছেন, এমন অনেকেই বহাল তবিয়তে রয়েছেন। অকারণে তাঁকেই ভিকটিমাইজড্ করা হল। আবেদন নিবেদন নিষ্ফল হল। ডিসেম্বর গেল, জানুয়ারী গেল। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হল। ডাক্তার ভদ্রলোক পুলকিত হয়ে আবেদন করলেন। কোন উত্তর তিনি পান নি—ভদ্রতার খাতিরেও না। এমন কি রিগ্রেট লেটারও নয়। তাঁর বক্তব্য কলকাতা থেকে বদলীর বিষয় নয়—বক্তব্য ছিল পরীক্ষার কয়টা দিন তাঁকে সময় দেওয়া হোক। কিন্তু তা হলো না। একবার যখন তিনি পরীক্ষার ফার্স্ট চান্স নষ্ট করেছেন, তখন পুনরায় কখন পাবেন, কে বলতে পারে? অনেকেরই বদলীর আদেশ তো প্রত্যাহৃত হলো, এ'রটাই বা কেন হলো না? কারণ তাঁর হয়ে তদ্বির করার কেউ ছিল না।

২। যুক্তফ্রন্ট সরকার হবার সঙ্গে সঙ্গে আর-জি-কর'এ একটি মৃতদেহ নিয়ে যে ধর্মঘট হয়েছিল এবং যে ছেলেরা সেই ধর্মঘট ভেঙেছিল, বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেইসব ছাত্রদের কলেজের উন্নতিকল্পে ও অন্যান্যদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর অজুহাত হল, সেইসব ছাত্রদের নাকি বলা হয়েছিল আর-জি-কর'এ একটি আর-এস-পি শাখা খোলার কথা। ছাত্ররা নাকি তা করে নি। ছাত্ররা কয়েকজন প্রতিক্রিয়াশীল ডাক্তারের কলেজ থেকে বদলী চেয়েছিল। এ'রা অনেকে ৫।১০ বৎসর পর্যন্ত কলকাতায় রয়েছেন। একজন আছেন সার্জারীর এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। সি-এ'র উত্তর হলো—ওঁকে আমাদের দরকার। কলেজের খবরাখবর পাবো। বোধকরি সেই ডাক্তার পার্টি মেম্বার হয়ে গেছেন। পার্টির কাজ চালাবার জন্য হাসপাতাল এখন গোয়েন্দা বিভাগে পরিণত হতে চলেছে।

৩। আর-জি-কর'এর একজন অভিজ্ঞ মেডিসিন-এর শিক্ষককে ৬০ বছর বয়সে রিটায়ার করানো হলো জোর করে। অথচ আর একজনকে একই কলেজে একই কোয়ালিফিকেশন থাকা সত্ত্বেও এর পরেও ৬৫ বছর বয়সে পুনর্নিযুক্ত করা হল। এখানে কি অন্য কিছুর গন্ধ পাওয়া যায় না। অবশ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সৎসাহস আছে—তিনি ছেলেদের কাছে অকপটচিত্তে স্বীকার করেছেন ওটা ভুল হয়েছে। কি লজ্জার কথা?

৪। বাঁকুড়ার দলীয় রোগী ভর্তি ও তত্ত্বাবধানের জন্য পার্টির লোকেরা খুব সচেতন। হাসপাতালটিকে পার্টির লোকেরা যেন ঘরোয়া সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করেন। ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত না থাকলেও তাঁরা হম্বিতম্বি করেন—প্রশাসনিক ভয় দেখান।

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভাড়া করে একটা জেনারেটার বসান হয়েছে। সরকারের খাত থেকে ৭০০৲।৮০০৲ টাকা প্রতিমাসে দিতে হয় ভাড়া হিসেবে। শোনা গেল, জেনারেটারটি কয়দিন কাজ করার পরই খারাপ হয়ে পড়ে আছে। আর মাসে মাসে ভাড়া বাবদ টাকাগুলো নাকি একটি পার্টি আফিসে জমা পড়ছে। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন।

অডিট রিপোর্টের বিভিন্ন অবজেক্সন্ (যথা—টাকা ও জিনিষপত্রের) কোন তদন্ত করা হল না।

তারপর নিত্যনৈমিত্তিক লোক্যাল পারচেজের বায়নাক্কা তো আছেই—দলীয় লোকের ঔষধের জন্য।

অনুগ্রহ করে এ সমস্ত অনুধাবন করবেন। এবং যা করণীয় করবেন।

—মফিরুল ইসলাম
বাঁকুড়া

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা :

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত।

প্রথম খণ্ড—৫'০০ টাকা।
তৃতীয় খণ্ড—৪'০০ টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ :

(সমগ্র সপ্তকাণ্ড। কবির জীবনী-সম্বলিত)

আদি কবির মহাকাব্যের বাঙালীর সংস্করণ। সোনার বাংলার ভক্তি-অর্ঘ্য। পদানুসারে। রাজসংস্করণ। সচিত্র। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৮'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মানুষ নও—দেবতা নও তুমি বিপ্লবী মহানায়ক

ফেরারীজীবনের দিনগুলিও শত বৈচিত্র্যে পূর্ণ। যদি কেউ বলেন যে—উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমির মতই ফেরারী জীবনও কঠিন ও কণ্টক-সমাকীর্ণ—তবে তা মানুষের বাস্তব জীবন ইতিহাসকে অস্বীকার করে—একটা মিথ্যা আবরণে সত্যকে ঢেকে রাখার দুর্বল প্রয়াস মাত্র হবে!

পুলিশের বিরুদ্ধে বিনিদ্র রজনীর সদা জাগ্রত সতর্ক আঁখি, প্রতি মুহূর্তে সংঘর্ষের আশঙ্কায় দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ রিভলভার, গুপ্তচরের উদ্যত গুপ্তফণা—বিপ্লবীদের ফেরারীজীবনের "পরম আত্মীয়" ও "ঘনিষ্ঠ সহচর"। তা সত্ত্বেও মরুভূমির মরূদ্যানের মতই বিপ্লবীদের ক্লিষ্ট শুষ্ক প্রাণের মধ্যেও ছিল হাসি, আনন্দ ও সঙ্গীতের অমৃতধারার শত মূর্ছনা।

চট্টগ্রাম জেলে মাস্টারদাকে গান গাইতে শুনেছি। খোলা মাঠেও মাস্টারদা কখনও কখনও প্রাণ খুলে গান করতেন—তাও শুনেছি। মাস্টারদা ভাল গাইতেন কিনা—সুরজ্ঞান ছিল কিনা তা আমি বলতে পারব না—কারণ সুর বা তাল সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই নেই। তবে মাস্টারদা সুকণ্ঠ ছিলেন—তাঁর দরাজ কণ্ঠের গম্ভীর সুরঝঙ্কার আমার খুব ভাল লাগত।

মাস্টারদার প্রাণখোলা হাসি ও সঙ্গীতে তন্ময়তা সকলকেই মুগ্ধ করতো। তিনি আমাকে বলতেন, "তুই হাসতে পারিস না কেন?" সত্যি আমি যেন হাসতে পারতাম না। আজ লিখতে বসে জীবনের কথা কটি মনে পড়ছে। আমার পরম বন্ধু ও আত্মীয় স্বনামখ্যাত চিত্র পরিচালক শ্রীসত্যেন বসু পরিচালিত "বরযাত্রী" ছবিটি চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছিল। আমি বন্ধুদের সঙ্গে ছবিটি দেখতে যাই। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ যেন হাসিতে ফেটে পড়ছে। পাশে বসে আমার বন্ধু শ্রীসলিল সেনগুপ্ত। তিনি নাকি আমাকে খুব গম্ভীর দেখে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছিলেন—"কি অনন্তবাবু, হাসি পাচ্ছে?...।" আর আমি নাকি গম্ভীর গলায় ধীরে উত্তর দিয়েছিলাম—"হ্যাঁ পাচ্ছে...।" এই নিয়ে আজও সেই দিনকার প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত বন্ধুরা আমাকে ঠাট্টা করেন। মাস্টারদার বলা সত্ত্বেও প্রাণখোলা হাসি কখনও আয়ত্তে আনতে পারি নি। এই সঙ্গে আবার আরও এক দিনের কথা মনে পড়ে গেল। প্রায় আটদশ বছর পূর্বে আমাদের অভিনেতা শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় দুদিন একহোটেলে ছিলাম। সেই সময় কয়েক ঘণ্টা সুযোগ পেয়েছিলাম তাঁর কাছে বসে নানা কথা ও কৌতুকাভিনয় শোনার। আমার মনে পড়ছে আমি এত হেসেছিলাম যে একেবারে পেটে খিল ধরে যাওয়ার মত। উপস্থিত বন্ধু-বান্ধবদের বলেছিলাম—"আমার এত হাসি ছিল কোথায়? আমি তো বেশ হাসতে পারি দেখছি।" কাবুলিওয়ালাও গান গায়! ধূ-ধূ মরুভূমিতেও শীতল জলের সন্ধান মেলে।

কল্পনা তার প্রথম ফেরারীজীবনের নানা ঘটনার বিবরণ দিয়েছিল—সেগুলি তার সামনেই আমি টুকে নিয়েছিলাম। তাতে মাস্টারদার জীবন-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—এক হাতে বাঁশের বাঁশি অন্য হাতে উন্মুক্ত অসি—সবাইকে যে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একটানা শান্ত পরিবেশে ফেরারীজীবন কাটানো সম্ভব নয়। কল্পনা বাড়ি ছেড়ে এসেছে—খুব বেশীদিন হয় নি। তারকেশ্বর, মাস্টারদা ও কল্পনা "কুটিব" আশ্রয়স্থলে দিন কাটাচ্ছেন। গৃহকর্ত্রী রাতেদিনে সকল সময়েই সজাগ প্রহরায় থাকতেন। চতুর্থ দিন রাত্রে পুলিশ এই বাড়িতে হানা দিল। কল্পনা নিজে যা বলেছে তা আমি তারই ভাষায় লিখছি:

"......তখন রাত প্রায় দুটো। আমি একা একটি কামরায় শুয়ে আছি, মাস্টারদা ও ফটুদা পাশের কামরায় ঘুমোচ্ছেন। তখনও কেন জানি না, আমার ঘুম আসে নি। একরকম জেগেই ছিলাম। গৃহকর্ত্রী মাসীমা হঠাৎ ব্যস্ততার সঙ্গে অস্ফুট চাপাকণ্ঠে বলে উঠলেন 'পুলিশ! পুলিশ!' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুটের আওয়াজ শুনতে পেলাম। অনেকগুলি বুটের শব্দ দ্রুত আমাদের বাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছে বুঝতে পারছিলাম। ইতিমধ্যে মাসীমার ব্যাকুলতা ও তৎপরতায় মাস্টারদা ও ফটুদা

বিছানা ছেড়ে নিমেষের মধ্যে উঠে পড়লেন। দুজনেরই হাতের মুঠোতে রিভলভার ধরা। আসন্ন চরম বিপদের কথা ভেবে আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিল। অনভিজ্ঞ আমি সহজভাবে সব নিতে পারছিলাম না। তারা দুজনে কালবিলম্ব না করে পেছনের দরজা দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। দুর্ভাগ্য আমার—তখনও আমার রিভলভারটির জন্য আমি বিছানা হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আমার এই মারাত্মক দেরি ও মুহূর্তের মধ্যে রিভলভার খুঁজে না পাওয়ার অপরাধ যেন ক্ষমার অযোগ্য মনে হচ্ছিল। আমার দেরি দেখে ফুটুদা আবার ছুটে ঘরে এলেন এবং বললেন—মাস্টারদা নিরাপদে পুলিশ বেষ্টনীর বাইরে চলে গেছেন। দেরি কোরো না। মুহূর্তে চলে এস।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে ফুটুদাকে অনুসরণ করলাম। রিভলভার আর পাওয়া গেল না। কেন হাতের কাছে রিভলভার রেখে প্রস্তুত হয়ে ঘুমোতে যাই নি তার জন্য নিজেকে শত ধিক্কার দিতে দিতে রিভলভার ফেলেই দৌড়োলাম। রিভলভারের প্রতি এইরূপ ঔদাসীন্যের কারণ—ফেরারীজীবনের অনভিজ্ঞতা! আমি ও ফুটুদা বেরিয়ে এসে মাস্টারদাকে দেখতে পেলাম না, মনে হচ্ছিল দূরে অন্ধকারের মধ্যে কে একজন যেন হেঁটে চলেছেন। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হল যে তিনিই মাস্টারদা। তিনিও নির্জন মাঠে আমাদের দুজনকে একসঙ্গে আসতে দেখে ধরে নিয়েছিলেন যে আমরাই—একজন কল্পনা ও অন্যজন ফুটুদা। আমরা তিনজন মিলিত হলাম। বেশ কিছু পথ অতিক্রম করে জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামে একটি ছোট্ট মন্দিরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ওই গ্রামে আমাদের আশ্রয় গ্রহণের উপযুক্ত কোন একটি বাড়ি ফুটুদা চিনতেন। তিনি সেই বাড়ির খোঁজে চলে গেলেন।

দুঃসহ শীতের রাত। দারুণ শীতে সর্বশরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। পুলিশের তাড়ায়, উত্তেজনায় বা ভয়ে সেইরূপ কাঁপছিলাম কিনা জানি না। মনে হচ্ছিল—সম্মুখে মন্দির, আবার আমার সামনে স্বয়ং মাস্টারদা! তবে আবার ভয় কিসের?

"সেই দিন সেই রাতে মন্দিরের সামনে অতি নিকটে মাস্টারদা দাঁড়িয়ে। বিচিত্র সেই অনুভূতি। একই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছিলাম মানুষ, দেবতা ও বিপ্লবী মহানায়ককে। মানুষ মাস্টারদা বা দেবতা মাস্টারদা তা নিয়ে আমার মনে দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিল না। বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন যে অতি-বাস্তব সত্য, সেই উপলব্ধির বাস্তব গণ্ডীর মধ্যেই মাস্টারদাকে দেখতে ও বুঝতে চেয়েছি। বিপ্লবী মহানায়ককে "দেবতা" সাজিয়ে প্রাণহীন, স্পন্দনহীন, এক ঠুঁটো জগন্নাথের মূর্তিতে দেখার মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনার বিলাস থাকতে পারে, কিন্তু তাতে সত্যের প্রতিষ্ঠা হতে বিচ্যুত হতে হয়। আমার কাছে মাস্টারদা দেবতাও নহেন বা মানুষও নহেন—তিনি বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন। রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো—ভোরের আকাশে ঊষার রক্তিমা—ফুটুদা বাড়ির সংবাদ নিয়ে এলেন। আমরাও নতুন আশ্রয়ে গিয়ে উঠলাম...।"

বিশ্ববিপ্লবের মহানায়ক লেনিন, স্ট্যালিন প্রমুখও সাধারণ মানুষ বা দেবতা ছিলেন না—তাঁদের বাস্তব পরিচয়—বিপ্লবী মহানায়ক।

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পর সাংগঠনিক ব্যবস্থায়, অনেকের বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপন করে দিন কাটানো—তার মধ্যে গৃহে অন্তরীণ অবস্থায় বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে কল্পনার ফেরারী-জীবন অতিবাহিত করার কর্মসূচী এবং ক্রিকেট মাঠে ইংরেজ শাসকদের ওপর আবার আক্রমণ চালাবার প্ল্যান স্থির করার কাজে মাস্টারদার পথ পরিক্রমা চলতে লাগলো। এই সময়কার আরো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার কথা বলা দরকার। ১৯৩২ সালের পয়লা মার্চ "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" প্রথম মামলায় আমরা দণ্ডিত হলাম। আমাদের মামলা চলাকালেই ১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসে অম্বিকাদা ধরা পড়েছিলেন। সুদীর্ঘকাল ধরে অম্বিকাদা জেলহাজতে বাস করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সরকার যেন আর মামলা শুরু করতে চাইছিলেন না। বিচার না করে মাসের পর মাস জেল-হাজতে বন্দী রাখা আইনবহির্ভূত। বিচার করার ক্ষমতা থাকে বিচারকের charge sheet দাও, নইলে মুক্তি দাও। তারপর যদি বন্দী রাখা প্রয়োজন মনে কর, তবে আর তোমাদের অসুবিধা কি?—বিনা-বিচারে আটক রাখার অস্ত্র Bengal Ordinance তো তোমাদের হাতেই আছে। তবু কা কস্য পরিবেদনা! শেষ পর্যন্ত সরকারকে যেন ঘোমটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বাধ্য হয়েই তড়াতাড়ি Tribunal গঠন করে অম্বিকাদার বিরুদ্ধে মামলা শুরু করতে হোল। ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রান্ত হয়। এর পরও যদি সরকার অম্বিকাদার ফাঁসির জন্য তৎপর না হন, তবে তাঁদের শত্রুমিত্র উভয় পক্ষেরই মনে বহু প্রশ্ন জাগবে। কাজেই আর দেরি করা চলে না। ক্লাব আক্রমণের প্রায় দু' মাস পরে ১৯৩২ সালের ২২শে নভেম্বর অম্বিকাদার বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হোল। আর ১৯৩৩ সালের ৩রা জানুয়ারী বিচার আরম্ভ হোল। ধরা পড়ার পর প্রায় দু বছর তিন মাস পরে এই বিচার প্রহসনের শুরু, বিনা বিচারে এই সুদীর্ঘকাল অম্বিকাদাকে জেলহাজতে রেখে দিয়ে সরকারের পক্ষে উদাসীন থাকার কি কারণ বা যৌক্তিকতা ছিল? বিশ্লেষণী দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে এর কারণ উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন বলেই মনে হয়। বিশেষ স্থানেই সে আলোচনা করবো।

মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের বিচারের রায় প্রদত্ত হয়েছিল—১৯৩২ সালের ১লা মার্চ। অর্থাৎ আমাদের Judgement-এর দশ মাস পরে অম্বিকাদা ও যুব-বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকারী—হেমেন্দু বিকাশ দস্তিদার ও সরোজকান্তি গুহ—এই দুজনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" মামলার আরম্ভ।

সরকারের পক্ষে মামলা রুজু করার জন্য নিয়ম অনুসারে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অম্বিকাদা ও অন্য দুজনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেন। সেই দরখাস্তের হুবহু কপিটি নিম্নে লিপিবদ্ধ হোল:

"Petition of complaint by V. W. F. Hicks, Superintendent of Police, Ex. I.

"In the Court of the Commissioners appointment under sub-sections (1) and (2) of section 4 of the Bengal Criminal Law Amendment Act, 1925, at Chittagong.

In the matter of.

V. W. F. Hicks Complainant

Versus.

Accused

1) Ambika Charan Chokrabarty..
2) Hemendu Bikash Dastidar alias, Barakhoka.
3) Saroj Kanti Guha.

Sections 121, 121-A and 122, I.P.C.

The humble Petition of V.W.F. Hicks, the complainant above named.

"Respectfully showeth'—

"1. That your petitioner is the Superintendent of Police, Chittagong.

"2. That between September, 1928 and September 1930, the accused persons along with Ganesh Ghosh,

Ananta Singh, Lokenath Bal and others (convicted in the Main Armoury Raid Case) and Naresh Roy, Tripura Sen, Ardhendhu Dastidar, Bidhu Bhattacharjee, Hari Gopal Bal, Hemangsu Bimal Sen, Debu Gupta, Rajat Sen, Jiban Ghosal, Monoranjan Sen, Swadesh Roy, Amarendra Nandy, Nirmal Sen and others (who are dead) and Surjya Sen, Bhabatosh Bhattacharjee, Tarakeswar Dastidar and others (who are yet absconding), were parties to a criminal conspiracy), were parties to a criminal conspiracy *to wage war against the king and deprive His Majesty of the Sovereignty of British India* or any part thereof and to overawe by means of criminal force or show of criminal force the Government of India or the Local Government.'

"3. That in pursuance of the aforesaid conspiracy the accused persons collected men, arms amunitions, purchased motor cars, iron implements, leather requisites, uniforms, and made all necessary *preparations with the intention of waging war against the king.*

"4. That on the night of the 18th April, 1930, the accused persons and their party *in fact waged war against the king* or abetted the waging of such war and raided the Police Lines, Armoury and Magazine, the A.F.I. Headquarters Armoury, the Telephone Exchange, shot down sentries and officers, looted arms and amunitions, and were engaged by the Police in an action at The Police Lines.

"5. That the Party of the accused persons came in military uniforms with the requisites of war and after their depredations marched away and the main body continued their movements in the hills to the north of the town till the evening of the 22nd April, 1930, when there was a heavy engagement at Jalalabad between them and the forces detailed by the authoritiets, after which they dispersed, leaving 12 of them dead or dying.

"6. That on the same night four of the members of the accused' party opened fire upon the police who had arrested them on suspicion at the Feni Railway Station and escaped.

"7. That in the night of 6th of May, 1930, six insurgents were persued by the villagers and the Police at Kalarpole; they opened fire killing and wounding some villagers, Later killed a constable at the Kalarpole Out-Post and eventually there was an action between the Police and four of them at Jhulda and the four rebels were killed.

"8. That on the morning of 2nd of September, 1930, there was an encounter between four of the accused Party and the Police at Chandannagar : Ganesh Ghosh, Lokenath Bal, and Ananda

Gupta, were arrested and Jiban Ghosal killed.

"9. That there was a trial in the main case which ended on 1st March, 1932, of 12 persons.........................

....

"10. That the present accused and others were absconding when the trial started and the accused Ambica Charan Chokravarty was arrested in October, 1930, in village Kachuai, P.S. Patiya.

"11. That the accused Saroj Kanti Guha was arrested on 3rd August, 1932, at Dharampur, P.S. Kotoali, in the district of Noakhali where he was passing under name of Sailesh Chandra Roy and working as a private tutor on Rs. 4 per month.

"12. That the accused Hemendu Dastidar alais Barakhoka was arrested on 28th August, 1932, while coming out of a mess at 130, Manicktolla Street, Calcutta, by the Police; he gave his name as Surendranath Roy at the time of arrest, but he had been living in the mess and had signed the mess register as Kshitish Chandra Roy.

"13. That there is sufficient evidence to contract the accused person with offences under sections 121, 121-A, and 122, I.P.C.

"14. That the requisite order of the Local Government authorising your petitioner to prefer this complaint has been obtained and the copy of the under is filed herewith.

"Under the circumstances your petitioner prays that the Commissioners will be pleased to take cognizence of the case and try the three accused persons for offences under sections 121, 121-A, and 122 of the Indian Penal code.

"And your petitioner as in duty bound shall ever pray.

Sd. V. W. F. Hicks,
Supdt. of Police, Chittagong
(Emphasis mine)

(From Criminal Bench Reference No. 8 of 1933 and 1933 and Apeal No. 134 of 1933 and also Appeal No. 135 of 1933., Page : 9, 10, 11).

ওপরের উম্ধৃতি থেকে আমরা সরোজকান্তি গুহ ও হেমেন্দুবিকাশ দস্তিদার সম্বন্ধে সামান্য কিছু মাত্র জানতে পারলাম —কিভাবে ও কোথায় তারা ছিলো এবং সেই সময়ে তারা কি ছদ্মনাম ব্যবহার করতো। পুলিশ সাহেব হিক্সের দরখাস্ত অনুযায়ী প্রেসিডেণ্ট ও দুজন কমিশনারকে নিয়েই ট্রাইবুনাল গঠিত; তাঁদের নামও বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁরা হলেনঃ

(1) Mr. A. dec. Williams, I.C.S. District and Session Judge, Chittagong. (2) Mr. Nrisimha Ranjan Mukherjee, Addl. District Magistrate and Collector, Chittagong.

পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, এই পুস্তকের গোড়ার দিকে আমি কিছু কিছু গোপন সরকারী ডকুমেণ্ট উম্ধৃত করেছি। সেই সব ডকুমেণ্টে সরকারী চক্রান্ত ও তাদের প্রতিশোধপরায়ণ মনোভাবের তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। Mr. H. Williamson, Director, Intelligence-Bureau লিখেছেন, "Seen and returned with thanks. The remedy in future (there is no remedy applicable to the 12 murdered and unavenged policemen and soldiers) is to appoint judges, men who will not flinch from their duty. I have suggested elsewhere that the field of recruitment for such tribunals should be extended to other provinces."

অম্বিকাদার বিচারের জন্য যে ট্রাইবুনাল হোলো তাতে প্রেসিডেণ্ট ও ট্রাইবুনালের দুজন কমিশনার Active Service-এ ছিলেনও দুজন I.C.S.—একজন মৈমনসিং-এর Addl. Judge আর একজন চট্টগ্রামের Addl. Magistrate—বেশ জবরদস্ত ট্রাইবুনাল বিচারও যথাসম্ভব শীঘ্র আরম্ভ হয়ে ১৯৩৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী অম্বিকাদাকে প্রাণদণ্ড, সরোজকান্তি গুহকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও হেমেন্দুবিকাশ দস্তিদারকে মুক্তিদানে আটত্রিশ দিনে সমাপ্ত হলো।

সেই সময়ে বড়লাট লর্ড উইলিংডন ও বাংলার ছোট লাট স্যর জন এ্যান্ডারসনের শাসনযন্ত্রের স্টীম রোলারের নিষ্পেষণ অবাধ গতি। বৃটিশ প্রেস্টিজ রক্ষায় বদ্ধপরিকর জাঁদরেল ট্রাইবুনাল অম্বিকাদাকে ন্যায়বিচারে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে কি পারেন? তবে এই বিচারকেও আমি বিচার-প্রহসন আখ্যায় ভূষিত করছি কেন? যথাস্থানেই তার বিশদ ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা রইল। ১০ই ফেব্রুয়ারী ট্রাইবুনালের রায় প্রদত্ত হলো এবং সরকার সাতদিনের মধ্যেই আপীল করার অনুমতি দিলেন।

মাস্টারদার কাছে এই সমস্যা খুব প্রকট হয়ে দেখা দিলো—অম্বিকাদা ফাঁসির অপেক্ষায় আছেন। আপীল হয়তো নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু আপীলের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে থাকলে তো চলবে না। সমস্যার আশু সমাধান চাই।

সদ্য প্রকাশিত হইল !
বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ
সায়ন মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত
বেদান্ত-গ্রন্থ
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ
বেদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ
অনুবাদক
পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ
১ম খণ্ড মূল্য চার টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ।। কলিকাতা-১২

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ছত্রিশ ॥

আজ যুগ বদল হচ্ছে। ইতিহাস আড়-মোড়া ভাঙছে ডুয়ার্সে। অন্ধকার ভূখণ্ডে পড়ছে নতুনকালের আলো। কতদিনেরই বা কথা!

সেদিন বাণিজ্যিক স্বার্থে গড়ে উঠেছিল ইংরাজের বাগানগুলি। ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলির পশ্চাতে ছিল উপনিবেশবাদের ঘৃণ্য চক্রান্ত। ইংরাজের জাতীয় চরিত্রে যত গুণই থাক, তাদের চরিত্রের সর্বপ্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে বৈষয়িকতায়।

বিষয়ী জাত ইংরাজ। বিষয়-আশয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তার কারণ আজ কে না জানে সমুদ্রজল বেষ্টিত ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডটুকুর মধ্যে তার চাহিদা মেটে নি। তাই প্রয়োজনের তাগিদে তাকে লোভীর হাত বাড়াতে হয়েছে দিকে-দিগন্তরে। লুটবার স্বপ্ন দেখতে হয়েছে অন্যের ধন ঐশ্বর্য সম্পদের। এই লোভ তাকে লুঠেরা করেছে। দুর্বলের বাণিজ্য নেই। তাই বাণিজ্যের স্বার্থে তাকে হাতের কাছে তৈরি রাখতে হয়েছে নানা অস্ত্রশস্ত্র গোলা-বারুদ। ঘৃণ্য চক্রান্ত। এই রূপ-কমবেশি সেকালের য়ুরোপীয় অনেক জাতির মধ্যেই সুস্পষ্ট। পর্তুগীজ বেনিয়ারা প্রধানত এই উদ্দেশ্য নিয়েই জলদস্যুতায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। প্রাচ্যের ভারতবর্ষে চীন প্রভৃতির ঐশ্বর্য তখন রূপকথার মত ফেরে লোকের মুখে মুখে। অগাধ প্রাকৃতিক সম্পদ। ধনরত্ন মণি-মাণিক্যের দেশ। ভারতবর্ষের শক্তিমদমত্ত মোগলরাও ছিল মূলত আক্রমণকারী। দস্যুতা পরজীবিতা ছিল তাদেরও চরিত্র। কিন্তু তারা এই দেশে এসে ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রাণধর্মের কল্যাণে ও বিশেষ জাতীয় দার্শনিকতায় এই দেশেরই মানুষ হয়ে গিয়েছিল। আত্মার ঘনিষ্ঠ মর্মবন্ধন গড়ে উঠেছিল তাদের সঙ্গে।

মোগলদের শক্তি তখন অস্তাচলগামী। প্রকৃত রণদুর্মদ শাসনকর্তার অভাবে সেই দুর্বলতার সুযোগে দেশের প্রান্তে প্রান্তে তখন বিরোধ-বিচ্ছেদ অব্যবস্থা-অরাজকতা। সেই অনিশ্চয়তার পর্দাটা দুলিয়েছিল বিদেশাগত দস্যুদের দল। বঙ্গোপসাগরের তীরে তীরে ঘাঁটি বানিয়েছিল পর্তুগীজেরা। সুযোগ-সন্ধানে ফিরত তৎপর হয়ে। সুবিধা মত ঝাঁপিয়ে পড়ত দেশীয় বাণিজ্য-জাহাজে, নৌকোয়। জলডাকাতি করত। নিরীহ মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠত বঙ্গোপসাগরের নীল জল। এল ইংরাজ-দিনেমারের দল। ইংরাজেরা আরো সাহসী। ছলনা কূটনীতি ছিল তাদের গুপ্ত অস্ত্র। এবং বাণিজ্য-বেসাতির অন্তরালে তারা ভবিষ্যৎ কর্মতৎপরতার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই পর্বে ইংরাজ-ফরাসী-দিনেমার-পর্তুগীজদের ভূমিকার সঙ্গে যে-কোন ইতিহাস-পাঠকের পরিচয় আছে।

চীনেও তাই। বাণিজ্যের স্বার্থে সরল চীনাদের কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে আফিং খাইয়েছিল ইংরাজেরা সেকথা রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন। এবং অবশেষে সন্ধি-বন্দর স্থাপনায় পশ্চাতেও সেই ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত।

এদেশটাকে অধিকারে আনতে পারার পরই ইংরাজ সচেতন হয়েছিল তার উপনিবেশিক স্বার্থকে নিরাপদ করে তুলতে। সেই স্বার্থে সে প্রথমত সুকৌশলে দেশবাসীর চরিত্রহনন করতে চেয়েছিল। আমাদের অতীত আমাদের শিক্ষা-দর্শন-ঐতিহ্য সবকিছুই আমাদের চোখে অবহেলার বিষয় করে তুলেছিল। তারপর গেল আমাদের নিজস্ব শিল্প-সমাজ। আমাদের আত্মনির্ভরতা। অত্যাচারের রাজরথ চলেছে তখন বিপুল গতিতে। দেশের মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে। চূর্ণ চূর্ণ করে সবল মনুষ্যত্ব।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা আছে নীলদর্পণে। দীনবন্ধুর নীল-দর্পণং নাম নাটকম্ লেখা হয় ১৮৬০ খৃস্টাব্দে। তার আগেই নীল চাষের জন্য বাংলাদেশের কৃষকদের ওপরে জুলুমবাজি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। এই দুর্দান্ত-প্রতাপ শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের প্রকোপ পীড়নে কৃষকের জীবনের সমস্ত আনন্দ ও নিরাপত্তা হয়েছিল অপহৃত। দীনবন্ধুও অত্যাচারের ভয়ে নিজের নাম লিখতে পারেন নি রচনায়। লেখা ছিল "নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম্"।

দেখা যাচ্ছে ঠিক তার কিছুদিন পরে পরেই ডুয়ার্সের মাটিতে জেগে উঠছিল চা-বাগান। ইংরাজের দলিল বলছে—"The tea industry in this district began in the year 1874-75. The first leases were issued to 22 gardens in 1877." এই দলিল অনুসরণে দেখা যাচ্ছে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের মধ্যেই ডুয়ার্সে সর্বসমেত একশ বিরাশিটি বাগানের সৃষ্টি হয়েছে। "The total area comprised in them is 139,751 Acres. Eleven of the gardens belong to native Companies and individuals and are worked exclusively by native agency. The remaining gardens belong to European capitalists mostly formed into Companies."

ইংরাজী দলিলে যাই বলুক এ-ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব বক্তব্যও আছে। R. D. Marrison-এর লেখা Tea, Ukers-এর All about Tea. এবং সর্বোপরি বিখ্যাত History of the Growth and development of Tea Industry by the Indians of Jalpaiguri থেকে এ-ব্যাপারে আলোকপাত করা যেতে পারে।

তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব-কাল। ভারতে চা-চাষের প্রেরণা তখন জেগে উঠেছে। চা-র সঙ্গে ইংরাজের পরিচয় ও সখ্য তখন বেশ নিবিড়। চীনের এময় নামক বন্দরে চা বোঝাই করত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। সমুদ্রের জলে কেঁপে কেঁপে দীর্ঘদিনে সেই জাহাজ পৌঁছতে বিলাতের বন্দরে। একক সে ব্যবসা। বাণিজ্যিক স্বার্থের দিকে তাকিয়ে কোম্পানী ভারতে চা-চাষের ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ নীরব।

এই বাণিজ্য-চুক্তির মেয়াদ ছিল ১৮৩৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু কোম্পানীর ভয়ও ছিল মনে যে, চীন হয়তো ভবিষ্যতে এই বাণিজ্যিক চুক্তি রক্ষায় সচেতন না-ও থাকতে পারে। তাই অন্তরে অন্তরে নতুন একটা পরীক্ষা গড়ে তোলবার চেষ্টাও ছিল তার।

১৮৭৪-৭৫-এ নয়, প্রকৃতপক্ষে জলপাইগুড়ির এ অঞ্চলে প্রথম চা-বাগান গড়ে ওঠে ১৮৭১ খৃস্টাব্দে। পিলান্‌সে সাহেবের চেষ্টায় ইংরাজের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে ফুলবাড়ি চা-বাগান। তার অনেক আগেই অবশ্য ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে ইংরাজের হাতে গড়ে উঠেছিল চা-র প্রথম আবাদ। আসাম টী কোম্পানী। ভারতীয় চা-শিল্পের অগ্রনায়ক বলা চলে এঁদেরই। আসামের জোড়হাটের কাছে খুলেছিলেন এঁরা প্রথম চা-বাগান।

বসে গল্প হচ্ছিল ডুয়ার্সের বর্ষীয়ান জননায়ক শ্যামলাল চৌধুরীর সঙ্গে। এককালের দুর্দান্ত তেজী মানুষ। অগ্নি-যুগের আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী যুগে অবশ্য নেন মহাত্মার নেতৃত্ব। সে-যুগে অবশ্য ওঁকে দেখি নি। কিন্তু একালেও ওঁর নাম ফেরে লোকের মুখে মুখে। আজ অবশ্য বৃদ্ধ হয়েছেন। চোখেও ভাল দেখতে পান না।

কথা হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে বসে বসে ইংরাজের সম্পর্কে। এখনও ইংরাজের ওপরে হাড়ে-হাড়ে চটা। ইংরাজের নাম শুনলেই চটে ওঠেন। তাঁর মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করে। বলেন, জানেন আমাদের দুঃখ দুর্দশা সব ওদেরই সৃষ্টি? আজ ওরা চলে গিয়েছে ভাবেন? আসলে যায় নি ওরা। দেশটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান করে দিয়ে ব্যাটারা এইখানেই বসে আছে। ধূর্ত শেয়াল যে ওরা। ওদের বিশ্বাস নেই এক ফোঁটাও।

আপনি তো জানেন ওদের ইতিহাস বলছে ভারতে প্রথম চা আবিষ্কার করেন রবার্ট ব্রুস নামে এক মেজর—আপার আসামে ১৮২৩ খৃস্টাব্দে? শুনে জ্বলে উঠেছিলেন তিনি, এখনও বুঝি তাই জেনে বসে আছেন আপনারা? এগুলি সত্যের খাতিরে দেশবাসীকে জানানো কর্তব্য। একটু থেমে বললেন, ভারতবর্ষে চা প্রথম আবিষ্কার করেন আমাদেরই দেশবাসী। আসামের মণিরাম দেওয়ান। আসামের আদি অধিবাসীরা বহু প্রাচীন আমল থেকেই চায়ের পাতা রশুন দিয়ে খেতে অভ্যস্ত। মণিরাম দেওয়ানই সেই চায়ের চারা দেন মেজর রবার্ট ব্রুসের হাতে। অথচ দেখুন সেই ইংরাজ কুচক্রীরা সেই মেজরকেই ভারতবর্ষে চায়ের আবিষ্কারক বলে ঘোষণা করে বসে আছে। এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা খুললেই দেখতে পাবেন। মণিরামের কোন নামই নেই। এভারেস্টের বেলাও এমান করে রাধানাথ শিকদারের নাম উপেক্ষিত হয়েছে। একটু থেমে শ্যামলাল চৌধুরী বললেন, ইতিহাসের প্রতি পাতায় পাতায় দেখবেন ওদের এমনি শঠতা ও নির্লজ্জ স্বার্থপরতার ইতিহাস। কিন্তু ওরা ভুলে গেছে ইতিহাসকে বানানো যায় না। তার সত্য আবিষ্কৃত হবেই।

কণ্ঠে এখনো যৌবনের উত্তাপ। যেন একটি দেদীপ্যমান আগ্নেয়গিরি কথা বলছে। চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে শ্যামলাল চৌধুরীর। স্বাধীনতা-আন্দোলন যুগের সেই শক্তিমান মানুষটিকে মনে করিয়ে দেয়। জীবনের একটি প্রান্তে পৌঁছেছেন তিনি আজ। বার্ধক্যের একটি রূপ আছে। পূর্ণ পরিণতির। অথচ সে-রূপ স্পষ্টতই উপেক্ষিত হয়েছে কাব্যে। কবিগণ প্রধানত যৌবনের পূজারী। তাই পাতার পর পাতা যৌবনের যশোগান। কিন্তু যৌবনশ্রীর থাকুক না যতই তারুণ্য-দীপ্ত লাবণ্য ও প্রাচুর্যের বহিঃপ্রকাশ, বার্ধক্যেরও সৌন্দর্য আছে। একটি অপরিম্লান শুভ্রতার সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। সেখানে কোন উচ্ছ্বাস থাকে না। চাপল্যও নেই। পরিমিত বহিঃপ্রকাশ। শ্যামলাল চৌধুরীর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে, তাঁর শুভ্র-শীর্ষ প্রশস্ত কপাল এবং সুউন্নত নাসিকা আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করছিল। তিনি বললেন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কবিতা জানেন তো? বলে নিজের মনেই আবৃত্তি করে গেলেন

মরে না মরে না তাহা সত্য যাহা
শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে
নাহি মরে উপেক্ষায় অপমানে না হয় অস্থির
আঘাতে না টলে।

একটু থেমে বললেন, কোথায় লিখেছিলেন বলতে পারেন? শিবাজী উৎসবে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সে যে কী যুগ?

আপনি কি মনে করেন সে-যুগের চা-বাগান পরিকল্পনার মূলে সাহেবদের চাইতে আমাদের ভূমিকাই অনেক বেশি সক্রিয় ছিল? আঘাত দেবার উদ্দেশে বলি নি। এমনি বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। বলে ফেলে মনে মনে আতঙ্কিত বোধ করছিলাম।

কিন্তু তাঁকে আহত বা বিচলিত মনে হল না। তিনি তেমনি শান্ত। সাধারণ একখানা ঘর। ঘরে কোন সৌখিন আসবাবপত্র বিলাস-ঐশ্বর্যের চিহ্ন নেই। ততোধিক সাধারণ একখানি তক্তপোষের ওপরে সাদা চাদর পাতা। তাইতে একটা বালিশে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন শ্যামলাল চৌধুরী। পিছনের জানালাটা খোলা। পর্দাটা এক

বেকার সমস্যার সমাধান ?
সদ্য প্রকাশিত হয়েছে ।।
বাংলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি অনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনায় বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।
রয়েজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়
জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন)
লিখিত সচিত্র
আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং
মূল্য মাত্র চার টাকা।। ডাকমাশুল এক টাকা।
অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ।। কলিকাতা-১২

আগে টেনে মোটানো। হাওয়া এসে তাকে উড়িয়ে দিচ্ছিল। একদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ত্রিপুরী কংগ্রেসের আমলের একটি বিরাট চিত্র। তাতে শুকনো ফুলের মালা দুলছে।

শ্যামলাল চৌধুরী বললেন, না, কারুর কোন কাজই অস্বীকার করতে চাই না আমরা। কারুর ভূমিকাকেই গৌণ করব না। আমরা সাদা চোখে সবকিছু দেখতে পাই। আমাদের তা কখনো শেখানো হয় নি। একটু থেমে বললেন, তবে চা-বাগান পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠার মূলের বিষয়টার দিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে। সংকীর্ণ জাতীয়তার ভীতির কথাটা আজকাল খুব চলেছে। কিন্তু আসলে আমাদের দেশের নেতারা কেউই সে-রকম উগ্র তো ছিলেন-ই না, উপরন্তু তাঁদের আদর্শ ও বিশ্বাস ছিল মানবিক সম্পর্কের উদারতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। They were more philosophers than your ordinary leaders. হাঁ, যা বলছিলেন। আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আমাকে খানিকটা বলবার সুযোগ দিতে হবে। বললাম, কিছু ভাববেন না। আমি আন্তরিক শ্রোতা মাত্র।

আমার ভাগ্য। সে-রকম শ্রোতা পাওয়াও আজকাল কঠিন হয়ে গিয়েছে। তিনি হঠাৎ বললেন। মনে হল তাঁর চোখে এক-পলক বিরক্তির ছায়া খেলা করল, অনেক যুগ হয়ে গেল তো বেঁচে আছি। সুখের বিষয় এমন একটা যুগের ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলাম যে, সে-সময়টায় না-জন্মালে এ-দুনিয়ার তীর্থদর্শন বাকী থাকত।

তাঁর কণ্ঠে শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাসের ছোঁয়া লাগল।

আমি বললাম, তাই তো তীর্থের দু'-এক কণা ধূলি সঞ্চয়ের জন্য আসা।

হো-হো করে হেসে উঠলেন তিনি। একেবারে ছেলেমানুষের মত নির্ভেজাল খুশির গলায়। হাসি থামলে বললেন, তাহলেই ঠকেছেন। ভিক্ষুকের কাছে কি ভিক্ষে মেলে? আমি-ই দু'-এক কণা ধূলি সঞ্চয় করে রেখেছি নিজের জন্যে।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন তারপর। বললেন, দেখুন একটা কথা পরিষ্কার জেনে রাখা ভাল। ডুয়ার্সে অবশ্য আমি জীবনের খুব বেশিদিন কাটাব বলে আসি নি। পূর্ব-বাংলার ছেলে। সেখানেই যা-কিছু করেছি। তারপর একদিন পুলিশের তাড়ায় পালিয়ে এলাম এখানে। জায়গাটা তখনকার দিনে পালাবার পক্ষে ছিল উৎকৃষ্ট। জলা-জঙ্গলার দেশ।

না, বনে-জঙ্গলে পালিয়ে থাকা যায় না বেশিদিন। পালাতে হলে মানুষের মধ্যে পালানোই সবচাইতে সুবিধেজনক। এখান-কার মানুষজন ছিল অনেক সরল ও আন্তরিক। আর তাছাড়া আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসাবে পূর্ব-বাংলায় সরকারী দৃষ্টি ছিল ঢের বেশি সজাগ ও সক্রিয়। তাই এখানে পালিয়ে আসা। সেই সূত্রে এসে থেকে গেলাম এখানেই। কার্যক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিল্যম এখানটাকেই। এবং কম দিনের কথা তো নয়। বিরাশী বছর বয়স হয়ে গেল আজ। অন্তত ষাট বছর ধরে তো ডুয়ার্সকে দেখছি, চা-বাগানের সঙ্গে না-হয় জড়িত ছিলাম না—কিন্তু তার ইতিহাস কিছু কিছু জানি।

আমি কাগজ-কলম-খাতা গুছিয়ে স্থির হয়ে বসেছি তাঁর কথা শুনতে। ঠিকমত নোট করে নিতে। কোথাও না ভুল হয় আমার। আমার চোখ দিয়ে যাঁরা দেখছেন, তাঁদের দেখাতে যেন ভুল না করি ক্ষণিকের জন্যে।

শ্যামলাল চৌধুরী বললেন, ডুয়ার্সের চা-র পত্তন সর্বপ্রথম ইংরাজরাই করেন। বাঙালীরা আসেন তারপর। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসা থেকেই তার শুরু বলা যেতে পারে। ১৮৩৪ খৃস্টাব্দ সেটা। তাঁরই আগ্রহে একটি কমিটি গঠিত হল—to formulate a plan for the introduction of cultivation. যতদূর জানি চীন দেশ থেকে আনা হয়েছিল বীজ-চারা। কিন্তু দূর বিদেশ থেকে চারা নিয়ে এসে চা-বাগিচা গড়ে তোলা সম্ভব হল না শেষ পর্যন্ত। ততদিনে নিজস্ব মাটির চারায় কাজ শুরু হয়ে গেছে। ইংরাজরাই আগে আবাদের কাজ শুরু করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শোষণ। আগেই বলেছি এদেশের মাটি আর মানুষকে শোষণ করে দিনের পর দিন নিজেদের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে তোলা। আর হবে না-ই বা কেন? সাম্রাজ্যবাদীরা কবে আবার কোন্ দেশে বন্ধুত্ব ও সহৃদয়তার মাহাত্ম্যকীর্তন করতে গিয়েছে বলতে পারেন? মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ কোথায় বুর্জোয়ার পরিবর্তে পরজীবী শব্দটা ব্যবহার করেছেন। এমন নিখুঁত শব্দ আর হয় না—in the truest sense of the term। বাস্তবিক, পরকে আশ্রয় করেই যাদের বাঁচতে হয়—

আমি বললাম, চা-শিল্পের দেশীয় উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা কি তবে শোষণের ওপরে গড়ে ওঠে নি?

চোখ দুটি ধক্ করে জ্বলে উঠলো শ্যামলাল চৌধুরীর। বললেন, শোষণ নিশ্চয়ই আছে। এ-জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থায় ও রাষ্ট্রনীতিতে শোষণ নেই এ-কথা বলা অনুচিত। নিশ্চয় আছে। তবে একটা কথা আপনাকে বলতে চাই। বাংলা বা ভারতবর্ষের সেইযুগে ডুয়ার্সের এই প্রান্তে যে চা-শিল্পের আবাদ প্রথম গড়ে উঠেছিল, তার মূলে যা ছিল—তার প্রধান কথাই হচ্ছে দেশপ্রেম। এর প্রেরণা ছিল—সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি, জাতীয়তা। সে-যুগ এক আলাদা যুগ। তখন আকাশ-বাতাসে আগুনের ফুলকির মত দেশপ্রেমের ফুলকি ছুটছে। নব-জাতীয়তার স্পন্দনে থরথর করে কাঁপছে মানুষ। দোলা লেগেছে দেশের মানুষের মনে। আর এ-অঞ্চলে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখনকার দিনে তার প্রায় সবাই প্রাণ-তুচ্ছ-করা দুঃসাহসী বাঙালী ছেলের দল। সুযোগ-সন্ধানীরা অবশ্য ছিলই। কিন্তু বুকের পাটাওয়ালা বাঙালী ছেলেরাও ছিল। স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তখন তাদের পেয়ে বসেছিল। চোখের সামনে ওরা দেখতে পেয়েছিল হাজার হাজার মাইল দূর-থেকে-আসা একদল সাহেব শুধুমাত্র প্রাণশক্তি ও কর্মদক্ষতাকে সম্বল করে এই দেশের মাটিতেই সোনার খনি বানাচ্ছে, আর দেশের মানুষ হয়ে তারা থাকবে হাত-পা গুটিয়ে বসে?

অনেকক্ষণ ধরে একনাগাড়ে বলে হয় তো তিনি খানিক ক্লান্ত হয়েছিলেন। তাঁর গলার একদিকে একটা রগ ফুলছিল, একটা শিরা লাফাচ্ছিল। বাঁ-গালের পাশে একটা অতীত দুর্ঘটনার চিহ্ন—শেলাইয়ের দাগ কালচে হয়ে এসেছে। কিন্তু তিনি থামছিলেন না। ক্লান্ত হচ্ছিলেন না। তিনি একটু নিচু গলায় বললেন, আরেকটা জিনিষ অবশ্য ছিল। সেটাও তাদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল।

আমি বললাম, সেটা কি জানতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য অনেকক্ষণ ধরে বলে আপনি একটু ক্লান্তও হয়েছেন।

না, ক্লান্ত যে হয়েছি ঠিক তা নয়। তিনি বললেন, পুরনো দিনের সে-সব কথা বলতে আমি একটা উত্তেজনা অনুভব করছি। খুবই ভালো হল যে অতীত কথাকে আপনি এমনি করে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন। আজকাল এ-সব কেউ শোনে না। কারুরও আগ্রহও নেই।

[ক্রমশ]

মাসিক ১০৲ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০৲। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

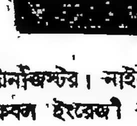

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ বছরের খতিয়ান

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী ॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকান্তরিত হন ১৯৫০ সালের ১লা নভেম্বর। তারপর থেকে আজ উনিশটি বছর অতিবাহিত হলো। অথচ বিভূতিভূষণের মতন আর একজন মানুষেরও আবির্ভাব ঘটলো না আমাদের মধ্যে। আর একজন লেখকেরও দেখা পেলাম না আমরা, যাঁর কাছ থেকে আমাদের দুঃখ ও যন্ত্রণার কালে সান্ত্বনার বাণী শুনতে পাব। ব্যথায় মুষড়ে পড়লে যাঁর কাছে গেলে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও সহানুভূতিসূচক কণ্ঠস্বর শুনতে পাব। এখন আর এমন একজনও রইলেন না আমাদের জন্য, যিনি আমাদের ক্ষতস্থানের উপর ব্যথা উপশমের ওষুধ লেপন করে দেবেন। তৃষ্ণার্ত হলে এগিয়ে দেবেন শীতল পানীয়। বড়ই হতভাগ্য আমরা। তাঁর স্বভাবের সুমিত উত্তরাধিকারী লেখকও একজন নেই আমাদের ধারে-কাছে।

এই উনিশটি বছরে আমাদের যত যন্ত্রণা বেড়েছে, যত কাতরতা দেখা দিয়েছে, যত ক্লেদ হয়েছে পুঞ্জীভূত তার নিরাময়ের ব্যবস্থা হয় নি সামান্যও। অথচ শিল্পী সাহিত্যিক কবি ও দেশপ্রেমিক এবং সমাজসেবকের সংখ্যা আমাদেব ঘিরে রয়েছেন কম নয়। তবু এমনটি কেন হলো? কেন তবু পুরাতন, প্রাক্তনের জন্যই এই দীর্ঘশ্বাস? এই কাতরতা প্রকাশ করা কেন? তার কারণ আছে বৈকি?

বিভূতিভূষণ যে আমাদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। দিনযাত্রার মুখর মিছিলে তাঁর প্রসন্ন মুখের হাসিটি আমরা যে খুব স্পষ্ট করেই চিনতে পেরেছিলাম। আমাদের পল্লীবাংলার প্রতিটি মানুষ তাঁর কাছে এসে শান্তি পেয়েছিল—আম জামের বনে, নিবিড় কলমীদামে ছাওয়া পুরনো পুকুরে, পোড়ো বাড়ির ধারে, আঁশশ্যাওড়া আর কাল কাসুন্দির কোণে তিনি যে আমাদের বিশ্রামের জায়গা ঠিক করে দিয়েছিলেন। হতাশাজর্জর, গ্রীষ্ম বর্ষার অন্তে কাশফুলের দোলন-লাগা শরতের দুপুরে বহন করে এনেছিলেন এক "ঘরপালানো কিশোরমনের স্বাপ্নিকতা।"

এ যুগের কিশোর ও যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা যখন অকারণেও হয় উচ্ছ্বসিত, উদ্দামতা হারায় সংযম ও সম্ভ্রম, মানে-না-বোঝা কিশোরের বিপথগামিতাতে যখন রীতিমতভাবে বিষিয়ে ওঠে মন—এবং একালের প্রথম সারির লেখকের লেখাতেও হয় তারই নিত্যবন্দনা—বিদ্রোহী 'নবীন বীরের' জন্য সাধনা একে কখনোই বলা যাবে না সততার সঙ্গে, তখনই মনে পড়ে

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণের কথা। অপুকে কাছে পেতে চাই তখনই।

আমাদের নাগরিক জীবনে যখন জমে উঠলো 'নিরবচ্ছিন্ন ক্ষতির খতিয়ান'—দুর্বিনীত সুখেন্দু, জবুছন্দ ধীরাপদ আর আত্মহনন শেষে ভিড় করে দাঁড়ালো এসে হেমন্তরা, আর সব লম্পটদের কথা মনেও পড়ে না, তখন ভাবতে বসি বিভূতিভূষণেরই কথা। হয়তো এখন জীবিত থাকলে তিনি আমাদের অবশ্যই বলতেন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কোন পল্লীগ্রামের শান্তিনিকেতনেরই কথা। যেখানে গেলে সব বেদনাকে বিলীন করে ছাপিয়ে উঠতো "একটি মধুমান প্রশান্তি।"

প্রতিবাদে প্রতিবাদে যখন কান ঝালাপালা—জীবনযাত্রার স্বাভাবিক চলমান অবস্থার 'পরে যখন তখন ঘনিয়ে ওঠে আকস্মিক অচলায়তন—শিক্ষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন; ধর্মঘট যেকালে রূপান্তরিত হয় নিত্যনৈমিত্তিক ছেলেখেলায় তখন বড় আশ্চর্য লাগে বিভূতিভূষণের 'অনুবর্তন' কথিত করুণাঘন শিক্ষক জীবনের রূপাঙ্কনের সংযম দেখে। জানি না এর জন্যে কেউ তাঁকে এসকেপিস্ট বলবেন কি না? কিন্তু বাস্তবিকই জীবনযাত্রার কোন স্থির এবং চিরস্থায়ী শর্ত আছে কি? পান্থশালার বিশ্রাম ভোগেই কি পথিকের যাত্রার অবসান? মনে হয় না এমন চিন্তা এ যুগের কট্টর প্রগতিবাদীটিও করে থাকেন? তাহলে তো বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করা হয়। আসলে আরণ্যকেই যে আমাদের বাঞ্ছিত নির্বাণ সে কথা বিভূতিভূষণ বেশ ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। কুশল পাহাড়ীর তীর্থযাত্রায় তাই এসেছিল অমন "বিস্তীর্ণ-পক্ষ স্বাচ্ছন্দ্য।" অথচ এই যুগের অন্ধ চোখে তা প্রতিভাত হয় না?

মানুষের সকল সংস্কারের মূলে আঘাত করে এ যুগ যখন লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে চায়—ভেবে দেখে না, সম্ভব অসম্ভবের কথা, সত্য অসত্যের বাছবিচার করে না, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, দৃষ্টিপ্রদীপ ও দেবযানের কথা। ধর্মকে যখন হারিয়ে ফেলে, গুলিয়ে ফেলে এ যুগের অসহিষ্ণু মন, হয়তো প্রকৃত ধর্মের অর্থ বোঝে না বলেই, তখন মনে হয় "ধর্ম সংস্কারের প্রতি বিভূতিভূষণের অনুরাগ, অর্ধস্ফুট অতীতের প্রতি বিমুগ্ধ আকর্ষণ" বড় বেশি প্রয়োজনীয় ছিল। এ যুগের বিভূতিভূষণের কণ্ঠেও তা শুনতে পেলে যেন আমরা ধন্য হব।

মানুষের প্রতি মমত্বশীল লেখক এ যুগে আর কোথায়? জীবনের বঞ্চনার কথা তুলে ধরলে, হাহাকারের কথা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করলেই তাঁকে দরদীয়া বলতে পারি না। নিশ্চয়ই পাতক বা বিবরের মধ্যে সহানুভূতি নেই। অন্যায় অত্যাচার সম্পর্কে স্বাভাবিক ঘৃণার ওই কি অভিব্যক্তি? না, তাও নয়। এ যুগের পাংক্তেয় শিল্পীরা (?) অত-প্রেমিক নন। তাঁরা সস্তা স্টান্ট দিয়ে বাজীমাৎ করে বাজার রাখতে চান, যেহেতু এ যুগের পাঠক-পাঠিকারাও বিভ্রান্ত (তারা তাই তাঁদের লেখাকেই সতত স্বাগত জানাতে উন্মুখ থাকেন।) আর সবচেয়ে দায়িক হলো সম্পাদক ও প্রকাশকদের কতিপয়ের দলবাজী যা অবক্ষয়কে সংক্রামক রূপ নিতে প্রতিমুহূর্তে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে। বিভূতিভূষণের মমতা—মানুষের প্রতি ভালোবাসার জন্য সহানুভূতি ও সমবেদনার

অজস্র অশ্রুবিন্দু বার বার বিকীর্ণ হয়েছে পথের পাঁচালীর ভোরের ভৈরবী থেকে ইছামতীর শান্ত পূরবী পর্যন্ত। তিনি সকল সময়ই সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন। স্বীকার করতে বলেছেন। হয়তো প্রতিবাদ করাও তাঁর উচিত ছিল। কিন্তু এ যুগের দাবী লেবেল-আঁটা সমস্বত্বতী লেখকদের মধ্যে না আছে স্বীকারের সংযম, না প্রতিবাদের জন্য কোন সংহত প্রস্তুতি। তাঁরা যে "মাতভোর বৃষ্টি" দেখে দেখেই ক্লান্ত হয়েছেন, 'পাতাল থেকে আলাপ' করেছেন পাতকীর সংগে। তারপর জল যখন গর্জিয়ে ফুলিয়ে উঠেছে তখন কাম্যার্ত চীৎকার জুড়েছেন : 'জল দাও' বলে॥

ভাবতে আশ্চর্য লাগে তাই বিভূতিভূষণও বাঙালী ছিলেন। বাংলা ভাষাতেই তিনি লিখে গেছেন এ দেশের মানুষ, মানুষী, প্রকৃতি ও নিসর্গের কথা।

বিভূতিভূষণের মৃত্যু তাই বাংলাদেশ, তার সাহিত্য এবং প্রতিটি মানুষের কাছে এক অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বিয়োগেরই সামিল। যিনি সকল সময়ই তার পাশাপাশি ছিলেন।

তাঁর পরলোকগমনের অপূর্ণতা জানি না, কোনদিনও আমাদের পূর্ণ হবে কি না? কোনদিনও পুষিয়ে নিতে পারব কি না এ লোকসান?

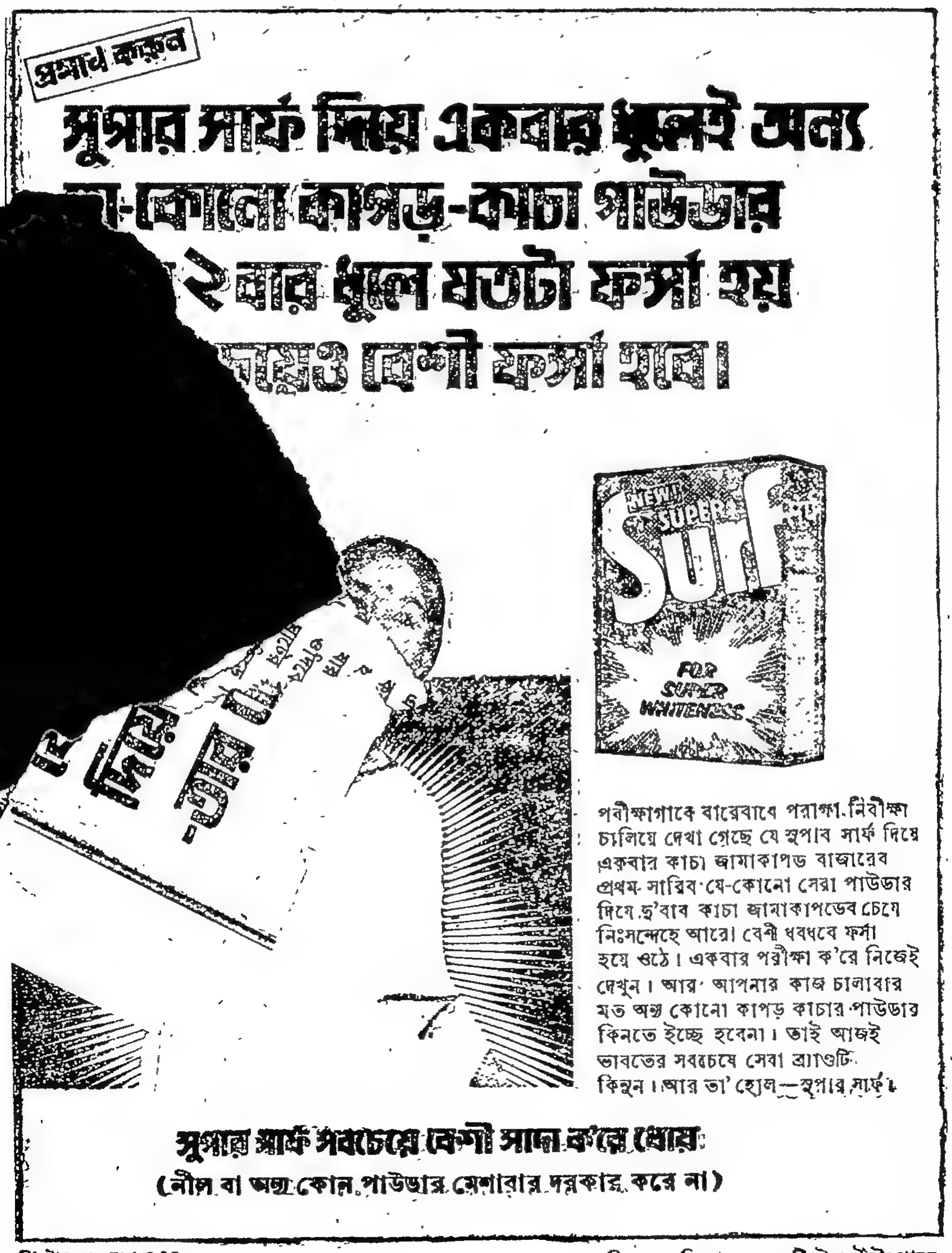

লিন্টাস-SU. 76.140.BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

[পূর্বানুবৃত্তি]

শানো চৌধুরীর অনুমান মিথ্যে নয়। ব্যাপক খানাতল্লাসী থেকে চরও বাদ গেল না। আরও ঢের জায়গায় থানা পুলিশ উথাল-পাথাল করে দিলে। ফেরারী আসামীকে কোথাও পাওয়া গেল না।

থানায় ধরে নিয়ে গেল হাবু আর মুকুন্দকে। তাদের অপরাধ—চরের উদো চাষা তারা, সদরে গিয়েছিল কেন?

দফায় দফায় জেরা চললো সারা দিনমান—কখনো জোড়ে, কখনো আলাদা আলাদা। প্রশ্ন সেই এক : জেলায় গিয়েছিল কেন, সেখানে গিয়ে কার কার সঙ্গে দেখা করেছে, সঙ্গে কে ছিল, শহর থেকে কি কিনলে, সঙ্গে কি ছিল ইত্যাদি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার বার জিজ্ঞেস করেও কোনো হদিস মিললো না। ছাড়া পেল সন্ধেবেলা—শেষমেস বেশ ঘা কয়েক খেয়ে। অস্নাত। অভুক্ত।

থানা কম্পাউণ্ডের বাইরে এসে হাবু গর্‌গর্‌ করে উঠল। বললে "আঁটকুড়োর ব্যাটারা মুখে ফ্যানা তুলে দিলে গ। জিভ যেন ভিতর দিকে টানছে।"

মুকুন্দ কোনো কথা বললে না। নীরবে এগিয়ে চলল চরের দিকে। ভাবছিল। একটা ভয়ঙ্কর কিছু মনের তলায় ঘুলিয়ে উঠলে মুখের রেখাগুলো যেমন কঠিন হয়ে ওঠে—তেমনি তার মুখ।

॥ ষোল ॥

শহর আর নিরাপদ ছিল না।

আগের ম্যাজিস্ট্রেট পেডি হত্যার পর সদরের গোয়েন্দা পুলিশ বিপ্লবীদের অনেক আড্ডা ভেঙে দিয়েছে। গোপন আস্তানা বেরিয়ে পড়েছে ঢের। জেলে—দ্বীপান্তরে গিয়ে মাশুল দিয়েছে অনেকে।

গোয়েন্দা পুলিশও হয়েছে অভিজ্ঞ—সতর্ক। প্রথম চোটেই ঝটপট বন্ধ করে দিলে সদর থেকে বেরোবার সব রাস্তা। রেল স্টেশনে স্টেশনে কড়া পাহারা, সাদা পোষাকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গেছে গোয়েন্দা ইনফর্মারের দল।

তবু চেষ্টা করেছিল তারা দু'জন। গাউলি স্টেশনে, জংসন স্টেশন খড়্গপুরে। হলো না। অগত্যা মোটামুটি একটা প্ল্যান করে নিয়ে ছিটকে গেল দু'দিকে দু'জন।

জীবেন দত্ত ছিটকে এসেছিল এদিকে। দু'-তিনটে ফেরীঘাট আছে। গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে মিশে কোনো-রকমে নৌকোয় হুগলী নদী পার হতে পারলে—ওপারে সুন্দরবন। তারপর ডায়মণ্ডহারবার হয়ে মহানগরীর জনারণ্যে। কলকাতা। এ রাস্তা অনেকটা ঘুরে। কিন্তু এ তার অজানা নয়।

কিন্তু তাও হলো না। টেলিগ্রাম চলে মোটরেরও আগে। ইংরেজ এস· ডি· ও খুব তৎপর। জেলা থেকে বাইরে বেরুবার প্রত্যেকটি ফেরীঘাটে কড়া চৌকি।

দেশী পুলিশের প্রথম উদ্যম। দিনের পর দিন হতাশ হতে হতে উদ্যম শিথিল হবে, উত্তেজনার প্রথম ধাক্কা একটু থা মন্দ হবে। জীবেনের মনে হলো, তার [illegible] নে[illegible]

[illegible]

মুড়িগ[illegible] সিধে দক্ষিণে[illegible] নদী যেখানে গিয়ে[illegible] নদীর দুরন্ত মোহানায়[illegible] সাগরের নিবিড় নীল তরঙ্গ[illegible]

পশ্চিমে—রসুলপুরের নদীর ও[illegible] বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি, সুগভীর অরণ্য—চলে গেছে দরিয়াপুর, বীরকুল, দীঘা পার হয়ে সুবর্ণরেখার মোহানা পর্যন্ত। এপারে হিজলী, মেহেদীনগর, খেজুরী। কোম্পানীর আমলের সেরা স্বাস্থ্যনিবাস—বিশ্রাম যাপনের সাগর সৈকত। সৌধকিরীটিনী প্রাচীন বন্দর-নগরী—একদিন ছিল বাগান-বাগিচায় সাজানো। আজ জনমানবহীন গভীর অরণ্যে আকীর্ণ। প্রায় শতাব্দী পূর্বের এক প্রলয়ঙ্করী ঝড় আর সমুদ্রোচ্ছ্বাসে ধু-ধু বালুবেলার কোন গভীর অতলে তলিয়ে গেছে খেজুরীর উজ্জ্বল 'সাহেব-নগর'—ওয়ারেন হেস্টিংসের বিজন-বিশ্রাম বীরকুলের সৈকতাবাস। বালু-বিলীন বিধ্বস্ত নগরীর ওপরে এখন কয়েক মাইল গভীর নিবিড় অরণ্য। সে অরণ্য বাড়তে বাড়তে এখন মিশেছে

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনায় অপরিহার্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

গিয়ে নিমক মহাল সংলগ্ন জালপাই জঙ্গলের সঙ্গে, হুগলী নদীর তটদেশ জুড়ে চলে গেছে বরাবর উত্তরে।

নিবারণ মিশ্রের বন্ধু প্রতাপ চৌধুরী বলেছিল, এ জঙ্গলের লেজুড় চলে গেছে তাদের চরের সীমানায়।

সরু একটা পথের রেখা ঢুকে গেছে জঙ্গলের মধ্যে। সেই পথ ধরে জীবেন এগিয়ে চললো জঙ্গলের গভীরে। প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর এসে দাঁড়াল এক মসজিদের চত্বরে।

মসজিদের তিনটে গম্বুজ মাথা তুলে এখনো খাড়া হয়ে আছে—গম্বুজের ওপরে সকালের আলো-ছায়ার খেলা। মসজিদের সামনে ছোট একটা পুকুর—পাড় থেকে তলা পর্যন্ত পাথরে বাঁধানো। কাল জীর্ণতায় ভেঙে পড়েছে পাথরের সিঁড়ি। কাকচক্ষু স্বচ্ছ জলে পড়েছে প্রশান্ত নীল আকাশ, আলো আর অরণ্যের ছায়া। এ সেই বড়খান—হিজলীর মসনদ-ই-আলী, আউলিয়া নবাব তাজ খাঁর নিশ্চিহ্ন রাজ্যপাটের অবশেষ।

জীবেন মসজিদ সংলগ্ন পুকুরের জলে হাত-মুখ ধুয়ে ভাঙা সিঁড়িতে বসে খানিকটা চিঁড়ে-মুড়ি চিবুলে। বাকিটুকু পুঁটলি করে বেঁধে রাখলে জামায়। ভবিষ্যতের সামান্য রসদ। তারপর পুকুরে নেমে জল খেল পেট ভরে।

মনে পড়ে।...

নিবারণ বলেছিল, "সমুদ্র তো কয়েক শ' গজ দূরে। কিন্তু খেয়ে দেখ জলটা অদ্ভুত ভালো।"...

এখানে এসে নিবারণের কথা বড় বেশি মনে পড়ে। তখন বোধ করি সবে কলেজে ঢুকে আলাপ। বেড়াতে এসেছিল এই দিকে।

মসজিদের পাশে কয়েকটা সমাধি। একটার দিকে চোখ পড়তেই জীবেন চমকে উঠল। সমাধির এক প্রান্তে একটা হাঁড়ি। তার ভেতরে প্রদীপ। পোড়া সলতে। কোনোটাই খুব পুরাতন মনে হলো না। পীরের থানে চেরাগ জেলে যাওয়ার চিহ্ন। হয়ত ওই সমাধি তাজ খাঁর। মাঝে মাঝে কেউ দূরের গ্রাম থেকে চেরাগ জ্বালতে আসে।...

মানুষের আনাগোনা আছে। এ জায়গায় আস্তানা গাড়া ঠিক মনে হলো না। উপকূল ধরে জীবেন এগিয়ে চললো পূব দিকে।

সামনে তাকিয়ে দেখল—দূরে বনভূমির তরঙ্গিত সবুজ শিখরমালা ছাড়িয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কাউখালির আলোকস্তম্ভ। প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর জীবেন স্তম্ভের কাছে এসে পৌঁছল।

বাতিঘর এখন পরিত্যক্ত। তিন দিকে জনমানবহীন গহন অরণ্য—শুধু উন্মুক্ত দক্ষিণে তরঙ্গিত দিগন্তবিলীন জলরাশি। বাংলার বৃটিশ বাণিজ্যতরীর প্রথম দিশারী—কোম্পানীর আমলের প্রাচীন আলোকস্তম্ভ। উঁচু প্রায় আশি ফুটের ওপর—আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মিনারের মত। নাব্যতা ওপারে সুন্দরবনের দিকে সরে যাওয়ায় ১৯২৩ সাল থেকে এর বাতি জ্বালা বন্ধ হয়ে গেছে।

শূন্য পড়ে আছে স্তম্ভ সংলগ্ন বাতিদারের ঘর। দরজা জানালার বালাই নেই। ঘরের ভেতরে ধুলোবালি এক হাঁটু। তবু একদিন মানুষ ছিল। তার চিহ্ন পড়ে আছে আশপাশে। অযত্নে বেড়ে ওঠা কলাগাছগুলো নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে বংশ বৃদ্ধি করে করে অরণ্যের সামিল হয়ে গেছে। কয়েকটা গাছে বড় বড় কাঁদি ঝুলছে। দীর্ঘকায় অর্জুন শিরীষ সুবেরির মাঝখানে পর্তুগীজদের অবদান কাজু বাদামের গাছে গাছে ফলে আছে পাকা ফল। সুদীর্ঘ কয়েকটা নারকেলগাছ আলোকস্তম্ভের সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে তেড়ে-ফুঁড়ে উঠে গেছে ওপরে—পাতায় ঝালরের তলায় ঝুলে আছে কাঁদিভরা নারকেল। খাদ্যের আয়োজন আছে, খাওয়ার লোক নেই।

মনে মনে জীবেন খুশি হলো। নিরাপদ আশ্রয়ে ক'দিন খারাপ কাটবে না।

আলোকস্তম্ভের বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভারী পাল্লার দরজা। এখনো জীর্ণ হয় নি। মোটা মোটা দুটো কড়া লাগানো। একটা কড়া যেন কিছুটা দুমড়ানো, গোড়া আলগা।...

...মনে পড়ে। নিবারণের সঙ্গে যখন এসেছিল তখন যেন মস্ত একটা তালা ঝুলতে দেখেছিল।...

কি জানি!...

জীবেন দরজায় একটা জোরে ঠেলা দিল। মর্চেধরা কব্জা করুণ আর্তনাদ করে উঠল। দরজা খুলে গেল।

ভেতরে ঢুকেই সিঁড়ি—ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পাঁচতলার গম্বুজঘরে। সিঁড়ির এক পাশে একচিলতে একটু জায়গা, ধুলোবালি নোংরা আবর্জনায় ভরে আছে। আর তেমনি চামচিকের ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। আপাতত ওই জায়গাটুকুকে আস্তানা হিসেবে বেছে নিয়ে জীবেন জঞ্জাল পরিষ্কারে লেগে গেল।

মোটামুটি জায়গাটাকে রাত্রিবাসের মতো করে নিয়ে জীবেন চারদিকটা ঘুরে দেখতে বেরিয়ে গেল।

না, ভয়ের কিছুই নেই। নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে দিনটা ভালই কেটে গেল।

মনে পড়ে...বাতিঘরে যাওয়া-আসার একটা সরু পথ ছিল বনের মধ্যে দিয়ে—দেখে গিয়েছিল নিবারণের সঙ্গে এসে। সে পথটা কোথাও খুঁজে পেল না। দিনে দিনে বছরে বছরে অরণ্য ঘনতর হয়ে সে পথের চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দিয়েছে। মনে মনে সে খুশিই হলো।

না, ভয়ের কিছুই নেই। নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে বাকি দিনটুকু কাটিয়ে দিলে বুনো গাছ-গাছালির ছায়ায় উপ[illegible] বসে বসে—অবসন্ন তন্দ্রায়, স্বপ্নে [illegible] নিবারণের কথায়।...

সামনে হুগলী নদীর বিস্তীর্ণ গৈরি[illegible] জলধারা দূরে কোথায় দিগন্তে [illegible] নীলের সঙ্গে মিশে নীল হয়ে [illegible] সেই অসীম অনন্ত রৌদ্রদগ্ধ উজ্জ্বল নীলিমার দিকে চেয়ে চেয়ে কেবলি মনে হয়—ওর ওই দুস্তর বুকে দূরে কোথায় কোন দ্বীপে, এই দেশ-বিচ্ছিন্ন—সুহৃদ-বিচ্ছিন্ন দিনগুলো কাটছে নিবারণের। আর তারই দেশের একান্তে আজ এসে বসে আছে সে—একা।...

সামনের নিঃসীম শূন্যে কচিৎ কখনো দু-একটা গাঙচিল দেখা যায়। সারাদিনে না দেখতে পেল একটা গাউলি নৌকো—অথবা সওদাগরী জাহাজ।

নিবারণ বলেছিল, "এই সেই রোগ্‌স্ রীভার—দুর্জনের নদী!"...

—তখন এ অরণ্য ছিল না—ছিল সমৃদ্ধ গ্রামের পর গ্রাম জনপদ। ব্যবসা-বাণিজ্য মুখরিত-জন কোলাহলে ভরা। তার লবণ, তার কাপড়, তার রেশম—তার নীল, তার কসুম রঙ। ওদিকে পশ্চিমে তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলীর রাজ্য-পাট—হিজলীর বন্দর। ইংরেজের খেজুরী বন্দরের তখনো পাত্তা নেই, ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার আয়ত্ত করে রাজ্যের পত্তনি নিয়ে বসে নি বানিয়া কোম্পানী। ভরা খামার—ভরা গোলাতে উছলে পড়ছে তার গ্রাম। নদীর বুক ভরে দেশী-বিদেশী নৌযান, শাদা শাদা হাজার পাল ছুটেছে বুকে উঁচু করে। উপকূলরক্ষী নৌয়া সরবোলার ছিপের দঙ্গল তাদের পাহারা দেয়—পথ দেখিয়ে চলে।

তবু ভাগাড়ে শকুনের মতো এসে পড়ে পর্তুগীজ আরাকানী মগের ঝাঁক রাতের অন্ধকারের আড়ালে।

"হেই...সামাল!"...হাঁক পাড়ে সরবোলারা।

"হুঁশিয়ার!"...নৌয়ার পাল্টা হাঁক।

কোথায় কি! যেন বুনো হাতীর পাল, কষ বেয়ে ঝরে পড়ছে লোভের লালা। নৌকো, জাহাজ, গ্রাম, জনপদ দলে পিষে—চলে গেছে, শ্মশান জাগিয়ে।

টেনে-হিঁচড়ে ছিপে তুলেছে গোলাম গোলামীর দঙ্গল। হাতের চেটো ফুটো ক'রে দঙ্গলকে দঙ্গল গেঁথে দিয়েছে লিকলিকে বেতে—যেন কানকোয় গাঁথা মাছ। বেতের দুই প্রান্ত বেঁধে রেখে দিয়েছে ছিপের গলুইয়ে। খোলা পাটাতনে ছেলে-মেয়ে, যোয়ান-যুবতী—সব এক সঙ্গে গাঁথা। পাটাতনে ছিটিয়ে দিয়েছে দু-বেলা কয়েক মুঠো চিঁড়েমুড়ি ভাত। এক হাতে তাই খেয়েছে কাড়াকাড়ি করে। যে বাঁচতে পেরেছে গেছে গোলামের হাটে। যে মরেছে—রয়ে গেছে হাত গাঁথা হয়ে।

ইংরেজ বানিয়ারা নাম দিয়েছিল—Rogue's river, তখন ওদের প্রথম ব্যবসা-পাট।...

সে নদী আজ বড় শূন্য। পড়ন্ত বেলায় বড় বিষণ্ণ মনে হয়। আকাশে আলোর পাট গুটোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোলাটে জল কালো হয়ে এলো। ছায়া ঘন হয়ে এলো তটভূমির গাছ-গাছালির তলায়। দূরে নীল ঢেউয়ের মাথায় ঝিকমিক করছে সূর্যাস্তের আলো।

জীবেন উঠল। ফিরে চলল বাতি-ঘরের আস্তানায়।

দিন কাটল স্বপ্নে। কিন্তু রাত সুরু হলো অন্যভাবে।

সিঁড়ির তলায় সেই সাফসুফ করা এক চিলতে জায়গায় এসে শুয়ে পড়েছিল জীবেন নিশ্চিন্তে। ভারী দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে। ভেতরে আবছা অন্ধকার। দোতলার শার্সি ভাঙা জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের কিছুটা নিষ্প্রভ আলো এসে বোধ করি ভেতরের অন্ধকারকে কিছুটা ফিকে করে দিয়েছে। তারই খানিকটা চুইয়ে এসে পড়েছে একেবারে সিঁড়ির নিচে।

কয়েকটা চামচিকে ফর ফর করে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে।

ক্লান্ত অবসন্ন দুটো চোখ বোজবার আগে হঠাৎ জীবেনের মনে হলো—সিঁড়ির একান্তে একটা শাড়ির প্রান্ত যেন সহসা দুলে উঠে মিলিয়ে গেল।

জীবেন চোখ ঘষে ভালো করে চেয়ে দেখল। না আর কিছুই দেখা গেল না। অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। না সাড়া, না শব্দ।

বাইরে, অরণ্যের গাছপালায় পোখ-পাখালির কিচির-মিচিরও আর শোনা যায় না। দেখতে দেখতে সিঁড়ির মধ্যে চোয়ানো পাৎলা আলোটুকুও অন্ধকারে ঘন হয়ে গেল। আর কিছুই দেখা যায় না।

ধ্যুৎ।...কি না কি দেখল!

অরণ্য-সমাধির তলায়, হারানো গ্রাম-জনপদের স্বপ্ন দেখেছে সারাদিন। এ তারই প্রতিচ্ছায়া। হয়—এমন হয়, এমনি করে মানুষ ভূত দেখে।

গায়ে ভালো করে কাপড়খানা জড়িয়ে নিয়ে জুৎ করে শুল।

কিন্তু আবার চোখ বুজতে না বুজতে ওপরে সিঁড়িতে যেন কার পায়ের শব্দ শোনা গেল—বোঝা গেল না সেটা ওঠার না নামার। ধুপ্-ধুপ্-ধুপ-ধুপ!

চোখ ফাঁকি দিলেও কান ফাঁকি দিচ্ছে না। শব্দ সুস্পষ্ট।

শুধু সুস্পষ্ট নয়—জীবেনের মনে হলো, শব্দটা সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপের ওপরে এসে থামল।

কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ভারী দরজাটাও নিজেই চেপে ভালো করে লাগিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার এখন একেবারে ঘুটঘুটি। আর সেই অন্ধকারে জীবেন যেন কার শ্বাস-প্রশ্বাসের চাপা মৃদু একটা শব্দ শুনে উঠে বসল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর জীবেন হেঁকে উঠল, "কে! কে ওখানে!"

ওর গলার শব্দ লক্ষ্য করে একটা খস্‌খস্ শব্দ যেন ঘনিয়ে আসছে বলে মনে হলো। স্পষ্ট হয়ে উঠছে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

অভ্যাস বশে হাত গিয়ে ঠেকল কোমরে। বেল্টে রিভলভার বাঁধা। জীবেন হেঁকে উঠল, "কথা বলো—নইলে গুলী করবো।"

সহসা তার শব্দগুলো লক্ষ্য করে একটা বিপুল লোমশ বোঝা যেন বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে এসে তাকে চেপে ধরলে। তার কর্কশ লোমশ হাত একটা যেন সাগ্রহে তার কণ্ঠনালীটা খুঁজছে, হাতড়াচ্ছে। হাত নয়—যেন থাবা, কর্কশ—কঠিন। দুটো থাবায় যেন তাকে দলে পিষে ফেলবে। গলায় জন্তুর মতো একটা গরগর শব্দ হচ্ছে।

ধস্তাধস্তির মাঝখানে জীবেনের রিভলভার গর্জে উঠল।

একটু শব্দ হলো না বস্তুটার—হঠাৎ জীবেনকে একটা প্রবল ধাক্কায় আছড়ে দিয়ে দ্রুত যেন সেটা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। ধুপ ধুপ করে পায়ের শব্দ উঠে গেল ওপরের সিঁড়ি বেয়ে!

জীবেন ধাক্কা সামলে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। রিভলভার বাগিয়ে ঠাউরে ঠাউরে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। এক ধাপ উঠে আবার পেছিয়ে এল। এই অন্ধকারে আশি ফুট সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে কোথায় খুঁজবে কাকে! আলো নেই।

সারা বাতিঘর আবার নিঃসাড় নিঝুম। অরণ্যের গহন রাত্রি তার বিচিত্র পোকা-মাকড় আর ঝিঁঝিঁস্বর নিয়ে, চারিদিক থেকে যেন নিবিড় হয়ে এল। বোধ করি বাদুড়ের ডানা ঝাপটানি শোনা গেল বাইরের কলাবাগানে।

বস্তুটা যাই হোক—সে ওপরে, জীবেন নিচে। এমন একটা বস্তুর সঙ্গে সহ অবস্থান করে রাতে ঘুমনো অসম্ভব। জীবেন ঠায় জেগে বসে রইল।

ভূতে জীবেন বিশ্বাস করে না। গুপ্ত সমিতির কাজেকর্মে অমন ভাঙা পড়ো বাড়িতে তার ঢের ঢের রাত কেটে গেছে। কিন্তু বস্তুটা কে—তাই সে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল।

গভীর রাতে আবার একবার আক্রমণ। হঠাৎ গোল সিঁড়ির একটা কোণা থেকে দুম্‌দাম্ কি যেন এসে তীব্রবেগে এসে পড়তে লাগল উল্টো দিকের দেওয়ালে। দু-একটা ফট্‌ফাট্ করে যেন ফেটেও গেল। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে তার একটা গড়াতে গড়াতে এসে পড়ল জীবেনের পায়ের কাছে। হাতে ওটা তুলে নিয়ে অনুমানে বুঝতে পারলে—ছোবড়া খসানো নারকেল।

মন্দ না—একদিনের রসদ। বাকিগুলো সকাল পর্যন্ত থাকলে তার শুকনো চিঁড়েমুড়ির সঙ্গে চলবে দিব্যি ক'দিন।

কিন্তু থেকে থেকে এই দমাদম নারকেল বৃষ্টি।—আপাতত মাথা বাঁচাবার জন্য জীবেন আবার রিভলভার ছুঁড়লে। আবার সেই রকম ধুপ্ ধুপ্ শব্দ করে ভারী ওজনের বস্তুটা ওপরে উঠে গেল।

জীবেন মনমরা। কিসে না কিসে তার দু-দুটো মূল্যবান গুলী খরচ হয়ে গেল। ভবিতব্য কি আছে—কে জানে!

অনেক্ষণ পরে, ওপরের কোন তলা থেকে কে জানে—একটা কর্কশ, ফোঁপানীর কান্না তরঙ্গ তুলে তুলে সেই অন্ধকারে যেন ঝরে পড়তে লাগল।

তারপর হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ সারা বাতিঘরটাকে কে যেন চমকে দিল : গম্ গম্ করে উঠল গম্বুজ আর মিনার।

"এইবার!...এইবার তুই কোথা যাবি!... আল্...লা...হা...হা...হা .. পালাবি ...ই ...হি-হি-হি।"

কান্না যেন সহসা একটা আকাশ ফাটানো অট্টহাসিতে উছলে উছলে উঠতে লাগল। ঝিম্ ধরা গভীর অরণ্যের অন্ধকার চম্‌কে উঠল। ধারে কাছে কোথায় বোধ করি কতকগুলো শেয়াল হঠাৎ হুয়া হুয়া করে ডেকে উঠল।

হঠাৎ যেন মনে হয়—শতাব্দীর যবনিকা সরিয়ে এই জনমানবহীন অরণ্যের অন্ধকারে সেই কলরব মুখর নিশ্চিহ্ন গ্রামের ভূতুড়ে আত্মা জেগে উঠেছে। স্বপ্ন-পাগল জীবেনকে লক্ষ্য করে সবাই হো হো করে হাসতে সুরু করে দিয়েছে।

ঘুমের দফা রফা। বাকি রাতটুকু জীবেন সিঁড়ির দেয়ালে পিঠ দিয়ে কাটিয়ে দিলে।

[ক্রমশ]

নান্দনিক—সম্পাদক : সুশীলকুমার বশিষ্ঠ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা 'খ' বিভাগ থেকে প্রকাশিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের গল্প ও কবিতাগুলি অভিনন্দনযোগ্য। খ্যাতিমানদের মধ্যে আছেন ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র। তাছাড়া আছেন নির্মলেন্দু ভৌমিক, উজ্জ্বল মজুমদার। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখ্য উৎপলা ভট্টাচার্য, শ্রীহীন, সুশান্ত অধিকারী, গিরিশ দাস মহাপাত্র, গৌতম সেনগুপ্ত, অমিত ভট্টাচার্য, তেজেশ অধিকারী, রীতা দত্ত, অরুন্ধতী চক্রবর্তী, পঙ্কজ গোস্বামী, চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভানাথ কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমিহির দাস, শ্রীঅর্বাচীন, গৌরী মুখোপাধ্যায়, সুভাষ সেনগুপ্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, রজত আশ প্রমুখ। তিনটি স্কেচ আকর্ষণীয়।

একতমা—(শারদ সংকলন) সম্পাদনা : দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ও পাঁচুগোপাল দেবনাথ। ২০বি রামকানাই অধিকারী লেন। কলকাতা-১২। দাম : দু' টাকা।

সাহিত্যসেবায় উৎসর্গীকৃত সংকলন হিসেবে 'একতমা' সুধীজনকে পরিতৃপ্ত করবে। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প—বস্তুত সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনা এই সংখ্যাটিকে মূল্যবান সংকলনে পরিণত করেছে। মোটকথা উচ্চমানের রুচিসম্মত অঙ্গসজ্জায় প্রকাশিত এই পত্রিকাখানি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। যাঁদের রচনা পত্রিকাখানিকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের মধ্যে আছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, রঘুনাথ চক্রবর্তী, জরাসন্ধ এবং আরো অনেকে।

অন্যমনে—সম্পাদক : সুজন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশিসকুমার সান্যাল। ১৭এম, ইস্ট রোড, কলকাতা-৩২। মূল্য : দু' টাকা।

নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে এই শারদ সংখ্যাটির কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। তা সত্ত্বেও বলা দরকার কোনো কোনো কবি নিজস্ব বক্তব্য জানাতে গিয়ে দলীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। সেদিক থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন—যা পড়ে পাঠকরা লাভবান হবেন। পরিবেশিত কবিতাগুলি উন্নতমানের।

লেখা ও রেখা (শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৬) সম্পাদক : ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। ১২/১সি, পাইকপাড়া রো, কলকাতা-৩৭। দাম : দু' টাকা।

এই সংকলনে রয়েছে ২৪টি কবিতা, ৬টি গল্প, ৪টি প্রবন্ধ ও ১১ জন কবির কবিতার বই-এর জন্যে ৫টি সমালোচনা। গল্পগুলিতে নতুনত্ব কিছু নেই, ২।১টিতে বিকৃত যৌন রসের প্রাধান্য। রণেন নাগ-এর 'বৃহৎ সংবাদপত্রের ভূমিকা ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধটি সুলিখিত, তথ্যপূর্ণ ও যুগোপযোগী। বিষ্ণু দে, মণীশ ঘটক, সুশীল রায়, দুর্গাদাস সরকার, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য প্রমুখ কবির কবিতা ভাল লাগলো। গ্রন্থ সমালোচনার নামে অনেকক্ষেত্রে অবান্তর কথা বলা হয়েছে। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সজল রায় ও সুশীলমাধব চক্রবর্তী অংকিত রেখাচিত্র তিনটি সুন্দর।

ছুটি—(শারদীয় সংকলন, ১৩৭৬) সম্পাদক : কনকেন্দু মজুমদার। ৩৭ রসা রোড, সাউথ থার্ড লেন, কলকাতা-৩৩। দাম : এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

সাহিত্য ও সিনেমার রুচিশীল এই শারদীয় সংকলনটি পাঠকমাত্রকেই খুশি করবে। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর 'সাহিত্য' সম্বন্ধে মূল্যবান একটি প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। সুনীলচন্দ্র সেন-এর একাঙ্ক নাটিকাটি বেশ ভাল লাগবে। শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মিষ্টি গল্পটিতে (অন্যমন) নতুনত্ব আছে। এছাড়া লিখেছেন শ্রীলেখা মজুমদার, কনকেন্দু মজুমদার, চিত্রলেখা ঘোষ প্রমুখ।

শারদীয়া আশাবরী—(১৩৭৬) সম্পাদক : শিশিরকুমার মাইতি। ২৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন। সাঁত্রাগাছি, হাওড়া। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

বর্তমান সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন দিনেশ দাস, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুনির্মল কুন্ডু প্রমুখ। বটকৃষ্ণ দাস, শ্রীকর নন্দী ও শিশিরকুমার মাইতির প্রবন্ধ উল্লেখের দাবি রাখে। গল্প লিখেছেন সনৎ মিত্র, অমল হালদার, মুক্তি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সমরেশচন্দ্র রুদ্রের নাটিকাটি ভালই হয়েছে।

নবাহ—(কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৬) যুগ্ম-সম্পাদক : সমর দত্ত ও বিমান পাল। ৩৪সি হরিশ নিয়োগী রোড, কলি:-৪। দাম : এক টাকা।

এই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে আছেন হরপ্রসাদ মিত্র, সমর দত্ত, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া বিশ্বাস, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে রামেন্দু, মৎস্যন্দি প্রমুখ।

সানাই—(শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৬) সম্পাদক : বিশ্বনাথ ঘোষ। সানাই সাহিত্য সংস্থা। পোঃ রসুলপুর, জেলা বর্ধমান। দাম : দেড় টাকা।

এই সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: কবিতায় বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, কুমারেশ চক্রবর্তী, জয়েশ ভট্টাচার্য, শিশির ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রবন্ধে দীপককুমার সেন, সুনীলকুমার দে প্রমুখ। কয়েকটি গল্পে বিকৃত যৌন-রুচির ভূত ঘাড়ে চেপেছে। কালাচাঁদ রায়, বিকাশভানু, নির্মলেন্দু গৌতম প্রমুখ লেখকের গল্পগুলি ভাল লাগল।

শারদীয় তন্দ্রা—(১৩৭৬) সম্পাদক : সুধাংশু ঘোষ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সন্তোষপুর গভর্নমেন্ট কলোনী, মহেশতলা, ২৪ পরগনা। দাম : এক টাকা।

একটি পরিচ্ছন্ন রুচিশীল পত্রিকা। প্রেমেন্দ্র মিত্র-র ছোট গল্প 'ছবি' সকলেরই ভাল লাগবে। আর কয়েকটি গল্প লিখেছেন সুশীল মজুমদার, সতীশচন্দ্র ভুইয়া, রোহিতকুমার বিশ্বাস প্রমুখ। দুর্গাদাস সরকার (নিহত সৈনিকের ডায়েরী থেকে), গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, আয়েষা সেন প্রমুখ কবিদের কবিতা মনে দাগ কাটে।

বিচার—সম্পাদক : মুকুল রায়চৌধুরী। ৮৬-এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৪। দাম : ২৫ পয়সা।

বিচারের বিশেষ পূজা সংখ্যাটি অতিরিক্ত বারো পৃষ্ঠার বিশেষ ক্রোড়পত্র সহ প্রকাশিত হয়েছে। বিচার ইতিমধ্যে পাঠকদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। দুর্নীতির বিবরণ, বিভিন্ন ধরণের আকর্ষণীয় ফিচার, খেলাধুলা, চিত্র ও মঞ্চকথা পত্রিকাটির উপজীব্য। সত্য কথা সুস্পষ্টভাবে বলার জন্য বিচার প্রশংসনীয় এবং তার নামকরণও সার্থক। আলোচ্য

সংখ্যায় গান্ধী জন্মশতবার্ষিকীর ভূমিকা, জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের তরুণ সম্প্রদায়, বিদেশ বার্তা, একটি পত্রিকার হিসেবপত্রের চাঞ্চল্যকর বিবরণ, তপনকিরণ দাশগুপ্তের মানুষ বিভূতিভূষণ, চিত্রগুপ্তের ডায়েরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থলকোবাদে একরাত্রি, সুধাংশু বক্সীর দুর্গাপূজো—দুর্গোৎসব—দুর্গাদায়, কৃত্তিবাস ওঝার কংগ্রেস শেষ—কিন্তু তারপর?, নিরঞ্জন সেনগুপ্তের সাদায় কালোয়, কিরণকুমার রায়ের গল্প, মিলন চক্রবর্তীর ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতির দুই দিক, গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষের আজকের যাত্রা পালা, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিউজিল্যান্ড খেলছে, অস্ট্রেলিয়া আসছে উল্লেখ্য। সংখ্যাটি দামেও সস্তা।

ক্ষপণক—(নবম সংকলন, ১৩৭৬) সম্পাদক ঃ বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়। ৫৯বি, প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা-২৬। দাম ঃ এক টাকা।

ক্ষপণক-এর বর্তমান সংকলনে কবিতা লিখেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, সমীর দাশগুপ্ত, অরুণাভ দাশগুপ্ত, শংকর দে প্রমুখ। দীপক সরকার-এর প্রবন্ধ ও বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প চলনসই।

বিশ্ববার্তা—(শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৬) সম্পাদক ঃ কালীপদ চক্রবর্তী। ৪৪।৪ গড়চা রোড, কলকাতা-১৯। দাম ঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

একটি পরিচ্ছন্ন পত্রিকা। লেখকদের মধ্যে আছেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রমা চৌধুরী, তারাপদ রাহা, কালীপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। একটি বৈশিষ্ট্য—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ স্মরণীয় সাহিত্যিকদের পুরনো গল্প (বিশ্ববার্তাতে প্রকাশিত হয়েছিল) এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

মানসী—(মহালয়া, ১৩৭৬) সম্পাদক ঃ কানু চক্রবর্তী। পোঃ বেবালয়, ২৪ পরগনা। দাম ঃ চল্লিশ পয়সা।

ছোট হলেও কয়েকটি সুখপাঠ্য রচনায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ। জয়ন্ত চৌধুরীর প্রবন্ধ ও শ্রীশ্বেতকমলের গল্প ভালো লাগবে। মঁপাসার একটি গল্প অনুবাদ করেছেন বেণী বিশ্বাস। সুপর্ণা রায়, অমিত গুপ্ত, এস সুন্দরম প্রমুখের কবিতা উল্লেখের দাবি রাখে।

সমাজসেবী সংঘ—যুগ্ম-সম্পাদক ঃ কাজলকুমার ঘোষ। দীপংকর দাশগুপ্ত। ৮৪এ লেক ভিউ রোড, কলকাতা-২৯।

লেক রোড, বালীগঞ্জ সমাজসেবী সংঘ প্রতিমা ও মণ্ডপালংকরণের অভিনবত্বের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। বিনামূল্যে প্রচারিত তাঁদের প্রদীপিকাটিও সুরুচি, শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যের জন্য আকর্ষণীয়।

বিচিন্তা-ভারতী—সম্পাদক ঃ নন্দদুলাল চক্রবর্তী। ৭১এ নেতাজী সুভাষ রোড (রুম নং ডি ২৭), কলকাতা-১। দাম ঃ দু টাকা।

কয়েক মাসের যুগ্ম সংখ্যা একত্রে শারদীয় সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। এতে আছে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, গল্প, পাঠকের বৈঠক, সমালোচনা-সাহিত্য, একগুচ্ছ কবিতা, ভ্রমণ ও বিভিন্ন চিন্তার প্রবন্ধ। লেখকদের মধ্যে উল্লেখ্য জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, অখিল নিয়োগী, সুধীর গুপ্ত, চিত্রিতা দেবী, সন্তোষকুমার অধিকারী, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ।

শারদ স্মরণী—সমর দত্ত সম্পাদিত। পাঁচিশপল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি ৩২এ, হরিসভা স্ট্রীট, কলকাতা-২৩। দাম ঃ উল্লেখ নেই।

রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে বৃহদাকার এই সংকলনটিতে সম্পাদনার কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ধরণের মূল্যবান এবং আকর্ষণীয় রচনা পত্রিকাটির মুখ্য উপজীব্য। খিদিরপুরের নানা বৈশিষ্ট্য এতে প্রকাশিত হয়েছে—যা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের খুশি করবে। তাছাড়া বহু অজ্ঞাত পুরাতন সংবাদের প্রকাশ করে সম্পাদক পত্রিকাটিকে সকলের কাছে লোভনীয় করে তুলতে পেরেছেন। পত্রিকাটিতে লিখেছেন সমীর দত্ত, নৃপেন্দ্রনাথ আঢ্য, যুগলকিশোর দাস, ভবানী মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, রূপসী-মন্দীন, বনফুল, হরপ্রসাদ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নচিকেতা ভরদ্বাজ, শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার দত্ত, এ সি সরকার, আনন্দ দাশগুপ্ত, গোবিন্দপ্রসাদ বসু ও সাগর চক্রবর্তী প্রমুখ।

অভিযান—(শারদীয় সংকলন, ১৩৭৬) যুগ্ম-সম্পাদক ঃ তপনকিরণ রায় ও জয়নারায়ণ সাহা। রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর। দাম ঃ এক টাকা।

উত্তরবঙ্গের আর একটি শারদ সাহিত্য সংকলন। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পুনর্মুদ্রিত কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। কবিরুল ইসলাম লিখেছেন 'সঞ্জয় ভট্টাচার্য ; জীবনী ও রচনাপঞ্জী।' তপনকিরণ রায় ও শ্রীকান্তের উপন্যাস দুটি সাধারণ ধরণের। সন্ধ্যাশ্রী চক্রবর্তী, রবীন সুর, কালীপদ কোঙার, শ্যামা পালচৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখের কবিতা ভালো লাগবে।

অন্যদিন—সম্পাদক ঃ আশিস সান্যাল, শিশিরা ভট্টাচার্য, অমল ভৌমিক। ৫৩ বিধানপল্লী, যাদবপুর, কলকাতা-৩২। দাম ঃ এক টাকা।

কবিতা ও কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ এর উপজীব্য। লিখেছেন সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, আশিস সান্যাল প্রমুখ।

শারদীয়া অভিনব অগ্রণী—(১৩৭৬) সম্পাদক ঃ দিলীপকুমার বাগ। ৫৩ গোপাল ব্যানার্জী লেন, হাওড়া। দাম ঃ এক টাকা।

কিশোরদের মাসিক সংবাদ সাহিত্য পত্রের শারদীয় সংখ্যাটিতে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের লেখা অনেক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ছাড়াও নরেন দেব, নবনীতা দাশগুপ্ত, ত্রিদিবেন্দ্র রায়চৌধুরী, রবিরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনা স্থান পেয়েছে।

নবাঙ্কুর—(শারদ সংকলন, ১৩৭৬) সম্পাদক ঃ বিকাশচন্দ্র দাস। ৩০ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-৫৪। দাম ঃ এক টাকা।

গল্প কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণবৃত্তান্ত এমন কি ভূতুড়ে কাহিনীও রয়েছে। যাঁদের রচনা উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, অনিতা মিত্র (কবিতা), কুমারেশ ঘোষ (ভ্রমণ কাহিনী), শ্রীমতী লক্ষ্মী দাস ও বিকাশচন্দ্র দাস (গল্প)।

ছন্দিতা—সম্পাদক ঃ অনিমেষ চট্টোপাধ্যা। গৌরগোপাল দাশ। বি-৫৯, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা-১৮। দাম ঃ এক টাকা।

গতবারের তুলনায় 'ছন্দিতা'র শারদ সংখ্যাটি এবার সংযত। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ফিচার, রম্যরচনা, কৌতুক রচনা ও টুকিটাকিতে নতুনত্ব আছে। লিখেছেন হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা দে, সুরেশ হালদার, হেনা চৌধুরী, রজত রায়চৌধুরী, ঊষা ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু গৌতম, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, তেজেন্দ্রলাল মজুমদার। এগারটি কবিতা স্পষ্ট ও ব্যঞ্জনাময়।

কুশানু—সম্পাদক ঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ। ১৮ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ঃ এক টাকা।

পূর্ব বাংলার সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ও সেখানের সমকালীন গল্প ও কবিতার পরিবেশন—আলোচ্য শারদ সংখ্যাটির মৌল বৈশিষ্ট্য। লিখেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ, প্রজেশকুমার রায়, আহসান হাবীব, আবুবকর সিদ্দিক, ফজল শাহাবুদ্দীন, শওকত ওসমান, বন্দে আলী মিয়া, আবুজাফর শামসুদ্দীন ও রোকনুজ্জামান খান, জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

সত্যিই নিখিলবাবু দুস্থ। টাকা দিতে পারবেন না। নিখিলবাবুর বাড়ি গেলে এ কথা না বুঝে উপায় থাকে না। যতবার উজ্জ্বল গেছে একবারও টাকার কথা তুলতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত বের হয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। বরং মনে মনে টাকা ধার দিয়েছে বলে এই

হোমিওপ্যাথ কাম জ্যোতিষী

মানব গঙ্গোপাধ্যায়

সান্ত্বনাই পেয়েছে যে, আর ধার দেবার নৈতিক দায়িত্ব ওর নেই। ধার শোধ না দেবার কুণ্ঠায় নিখিলবাবু আর ধার চাইতে পারবে না—নিখিলবাবুর বাসা থেকে বের হবার সময় এই চিন্তাই ওকে আশ্বস্ত করেছে। ইচ্ছে করে টাকা যে দিচ্ছে না এমন নয়, একথা বুঝতে পেরে টাকা মারা যাবার অর্ধেক কষ্টও চলে যায়। শুধু দুটি দুশ্চিন্তা বাকি থাকে—এক, মীনাকে একথা বোঝান যাবে না, দুই, টাকার বড় দরকার।

শেষ গিয়েছিল মাস ছয় আগে। বোধ করি একটু আগেই দুস্থ সংসারের একমাত্র ডাইভারসন স্বামী-স্ত্রী ঝগড়ার একটা পর্ব শেষ হয়ে ইন্টারভেল চলছিল। উজ্জ্বলকে দেখেই নিখিলবাবুর মুখ মুহূর্তের জন্যে সংগ পাবার আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পর মুহূর্তেই বোধ করি দেনার কথা চিন্তা করে, কেমন একটু নিস্তেজ হয়ে অভ্যর্থনা করে। উজ্জ্বল ভাবে, ওকে সানন্দে অভ্যর্থনা করলে পাছে মনে করে বেশ আনন্দেই আছে—তবু টাকা দিচ্ছে না—একথা ভেবেই বোধ করি নিখিলবাবু ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক কেমন নিস্তেজ ও বিস্বাদ হয়ে যান।

নিখিলবাবু অভ্যর্থনা শেষ করেই, হয়ত বা উজ্জ্বলের সামনে একা থাকতে ভরসা না পেয়ে স্ত্রীকে ডাকতে থাকেন—ওগো দেখ, কে এসেছেন—এস এদিকে।

স্ত্রী আসতে দেরি করেন। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা এসে জড়ো হয়। একটু পরে শুষ্কমুখে অনাহার-অনশনক্লিষ্ট চেহারা নিয়ে নিখিলবাবুর স্ত্রী এসে মীনার কথা, বাচ্ছাদের কথা জিজ্ঞেস করেন।

এদিকে তখন নিখিলবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করেন, বুঝলেন উজ্জ্বলবাবু একার ভাগ্যে কিছু হয় না। স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে বলেন, এই এদের ভাগ্যের বিরুদ্ধে একা-আমি কি করতে পারি? এমন সময় সব জন্মেছে—যা এক-একখানা ছক—

স্ত্রী তীক্ষ্ণভাবে নিখিলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাগ্য নয়, তোমার কর্মফল। মিউনিসিপ্যালিটির কাজ ছেড়ে দিতে তোমাকে কে বলেছিল? আমি নিষেধ করি নি? তোমার আত্মীয়স্বজন পই পই করে মানা করে নি? তুমি কারো কথা শুনেছ? তোমার জন্য আজ আমাদের এই অবস্থা। এই দুর্গতি। শেষের দিকে ভদ্রমহিলার কণ্ঠে অশ্রুর আভাস পাওয়া যায়। বোধ করি কান্নার একটা বেগকে রুদ্ধ করবার জন্য তিনি থামলেন।

—তা সে সব আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়ে থাকলেই তো হয়? আমাকে জ্বালানো কেন?

—আহা কত সুখে রেখেছেন—দাস-চাকর সেবায় করছে—পোলাও-কালিয়া খাচ্ছি। একবেলা ভাল জোটে না ওদের—তোমার জন্য জীবু মরে গেল—নীচ।

ছেলেমেয়েরা একবার বাবার দিকে একবার মা'র দিকে তাকাতে লাগল। ভবখানা, দেখি বাবার কথায় মা কেমন জবাব দেয়, মা'র জবাবে বাবা কেমন উত্তর দেয়—কে জেতে—কার কৃতিত্ব বেশি।

বড় মেয়েটি ধমক দিয়ে ওঠে, কি হচ্ছে কি তোমাদের। কাণ্ডজ্ঞান কি একেবারে গেছে। ছিঃ ছিঃ; কি ভাবছেন বলতো? এই যাঃ তোরা—এখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া গেলা হচ্ছে।

উজ্জ্বলের সংগে রাস্তা পর্যন্ত আসতে আসতে নিখিলবাবু বলেন, সংসারে শান্তি নেই, শনির ভেতরে রবির অন্তর্দশা চলছে—মাস ছয়-সাত আরও ভোগারে—অথচ এত ভোগান্তি হবার কথা নয়। ইন্দ্রনীল তো নিয়েছি একটা।

স্ত্রীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন, ওর হচ্ছে একনাইট থার্টির সিমটম। এই ঝগড়া-কলহ আন্তরিক নয়—এ কেবল পাওনাদার তাড়াবার একটা কৌশলমাত্র। এ হচ্ছে মীনার রায়। তোমাকে বোকা বানানো কঠিন নয় ওদের পক্ষে। উজ্জ্বলের ইচ্ছে হয়, জিজ্ঞেস করে, আমাকে বোকা বানানো তোমার পক্ষেও কি কিছু কঠিন হয়েছে? পাছে এমন আদরের খোঁচাটি রাগের মাথায় মীনা মূল্য না দেয় সেই ভয়ে আর জিজ্ঞাসা করে না। নিজেকে সান্ত্বনা দেয় উজ্জ্বল, নিতান্ত বোকা নই বলেই চুপ করে যেতে পারলাম। বোকা হলে পারতাম না। সংগে সংগে প্রতিবাদ করতাম।

কিন্তু নিখিলবাবু জন্মদুঃখী নন। সোনা-রূপো-তামা-পেতল কোন রকমের চামচ মুখে নিয়ে ভূমিষ্ঠ না হয়েও মোটামুটি চলনসই ঘরের ছেলেই ছিলেন। পড়াশুনা ভাল লাগে নি। বাবা-মাও জেদাজেদি করেন নি। মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য-বিভাগে বাবা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, বিয়েও দিয়ে দিয়েছিলেন। এমনিভাবেই হয়ত জীবন কেটে যেত—হঠাৎ একখানা হোমিওপ্যাথির বাংলা বই ভদ্রলোকের জীবনে বিপ্লব এনে দিল। আরো বই জোগাড় করলেন; কোথায় গিয়ে একটা পরীক্ষা দিয়ে 'এইচ এম বি' উপাধিও জোগাড় করলেন। শুধু তাই নয়, বিপত্তিও ঘটল যখন তার চিকিৎসায় অনেকে ভালো হয়ে যেতে লাগলো। বাড়ির দরজায় নিজের নামে একটি নেমপ্লেটও লাগালেন, 'ডাঃ নিখিল ব্যানার্জী এম বি' অতি ছোট হরফে 'এইচ' বন্ধনীর মধ্যে। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন—কিন্তু ডাক্তারবাবু বলতে হত। নিখিলবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন—ঐ ডাক্তারবাবু ডাকটাই ওর ভিজিট—ঐটুকু যে দিতে চাইত না—তাকে তিনি কেন ভালো করবেন—অতটুকু বিশ্বাস যার নেই—তার কাছে আসা কেন তবে? যারা ডাক্তারবাবুও ডাকতে চাইত না—নিখিলবাবু জানতেন—সেই ঈর্ষাও একটা রোগ—রাস্টাক্সের সিমটম। নানা গ্রাম থেকেও ডাক আসতে লাগল। দু-এক টাকা ভিজিটও পেতে আরম্ভ করলেন। আনন্দে, উত্তেজনায় নিখিলবাবুও ঘুমোতে পারেন না—নিজেরই প্রায় পালসিটিলা টু হাণ্ড্রেডের সিমটম দেখা যেতে লাগল। একটা কথা তাঁর মনে হত, তিনি যে স্বাস্থ্যবিভাগের নিম্নতন কর্মচারী এ কথাটা এ শহরের লোক ভুলতে পারছে না। তাই নগদ উপকার না হলে তৎক্ষণাৎ অন্য ডাক্তারের কাছে ছুটে যেত। অথচ ক্রনিক রোগ এত সহজে সারানো সম্ভব নয়। এদিকে তিনি নিয়মিত অফিসে যেতেন না—কাজকর্ম করতেন না। কিন্তু তাতে চাকরির কোন ক্ষতি ছিল না—কারণ, হেলথ-অফিসার থেকে মেথররা পর্যন্ত সকলেই তাঁর বিনি পয়সার পেসেন্ট। সারাদিন রোগী দেখে বই পড়ে—যখন রাতে ঘুমোতে যেতেন তখনও মাথায় সোরা-সিফিলিস-সাইকোসিস ঘুরছে। তদুপরি যদি দৈবাৎ কেউ রাতে 'কল' দিত—তবে আনন্দে উত্তেজনায় বাকী রাতটুকু পেসেন্টের বাড়ি থেকে হয়ত ফিরতেনই না। উজ্জ্বলের ইচ্ছে হয় জিজ্ঞাসা করতে—রাতের পেসেন্ট আবার কল দিত কি? ওর মনে হত—হয়ত পেসেন্টের বাড়িতে সারারাত কাটানোর ফলে ডাক্তারকে এড়াবার জন্য আর নিখিলবাবুকে ডাকতেন না।

তারপর ওষুধের দাম নিতেন। কিংবা প্রেসক্রিপসন লিখে দিতেন। বিনে পয়সার ডাক্তার হলেও লোকে সব সময় অকৃতজ্ঞ নয়। গ্রামের রোগীরা কখনও একছড়া কলা, মোচা, বেগুন নিয়ে আসত। প্রতিবেশীরা মাংস রান্না করে পাঠিয়ে দিত। একবার দুটো 'কলেরা কেস' তিনি ভাল করলেন। রোগীরা ভালো হবার পরই তিনি স্থির করে ফেললেন, কলকাতা গিয়ে প্র্যাকটিস করবেন। নিজের মনেই নিজের ভিজিট স্থির করলেন, দু' টাকা। নাম হলে, রোগী বাড়লে চার টাকা করবেন। এখানকার চাকরি ছেড়ে দেবেন। রোগীরা হাঁ হাঁ করে উঠল। আত্মীয় বন্ধুজন যত মানা করতে লাগল ততই তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, আত্মীয়রা নিষেধ করেছে, কারণ তাঁর ডাক্তারীর ক্ষমতার 'পর এদের বিশ্বাস নেই বলে। কখনও ভাবেন, আমি পাছে নাম ও সম্পদে বড় হই—তাই ঈর্ষায় এরা নিষেধ করছে। দুর্দিনে পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে নিখিলবাবু বললেন, সবই গ্রহের ফের। একজন জ্যোতিষীকে যদি তখন কোষ্ঠী বা হাত দেখাতাম! কিন্তু দেখানো যে হল না তাও সে গ্রহের দোষেই। দেখালেই বা কি হত—মানতাম নাকি জ্যোতিষীর কথা—রাহুর দশা তখন—নিজের ঘরে থাকতে দিকে তো। বুঝলেন উজ্জ্বলবাবু, বুদ্ধি-নাশও গ্রহই করে।

নিখিলবাবুর স্ত্রীর এদিকে দোমনা অবস্থা। কলকাতায় গিয়ে থাকবার লোভ, নতুন জীবনের প্রতি আকর্ষণ, স্বামীর ডাক্তারীর প্রতি বিশ্বাস আবার পুরনো জীবন ছেড়ে অজানা শহরে বাস করতেও ভয়। আবার স্বামী এত কি পারবে এ নিয়েও মাঝে মধ্যে উদ্বেগ। এতটা আশা করতেও ভয় হয়—আবার না করেও পারে কই। তবুও স্বামীকে বলেছেন বই কি, নাই বা গেলে, যা হয় বুঝে কর। কিন্তু তিনি জানতেন, নিখিলবাবু যাবেনই। নিখিলবাবুকে তিনি নিষেধও করেছেন—কিন্তু তাঁর ভরসা ছিল, নিখিলবাবু মত পাল্টাবেন না। সব মিলে তিনি মৌন থাকলেন। মনে মনে ভাবলেন; আমার চেয়ে কি আর কম বোঝে। তিনটি ছেলে, দুটি মেয়ে তখন। মেয়েটিই বড়। ছোট ছেলেটির বয়স পাঁচ বৎসর।

এদিকে লোকে নিখিলবাবুর শহর ত্যাগের সিদ্ধান্তে যত দুঃখ করে—ততই নিখিলবাবু চলে যাবার সংকল্পে আরো শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরেন। এমন আদর, এমন ভালবাসা যতই তিনি পাচ্ছেন—ততই তাঁর মনে হচ্ছে, আমি গেলে আমার অভাবে আমার মূল্য আরো বুঝবে। এত করে থাকতে বলবার পর কি আর থাকা যায়? থাকলে কি আর এত ভালবাসা পাব। যাচ্ছি বলেই ভালবাসা পেলাম।

হঠাৎ একদিন কলকাতা গিয়ে বাসা ও

রাণীধূপ
কাকার প্রডাক্টস

ডিসপেনসারী ঠিক করে এলেন। তারপর একদিন দিনক্ষণ দেখে কলকাতা রওনা হলেন। নিজের বাড়ির অংশ ভাইদের কাছে বিক্রী করে, চাকরি ছেড়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সব টাকা তুলে যখন সপরিবারে কলকাতা এসে উঠলেন—তখন তাঁর বয়েস চল্লিশ। গিন্নী বার বার চোখের জল মুছলেন—কিন্তু কলকাতা যাবার আনন্দিত-উৎকণ্ঠায়, জিনিবপত্রের হিসেবের ভারে মামুলি চোখের জলও ভালো করে ফেলতে পারলেন না। ছেলে-মেয়েরা আনন্দে, উত্তেজনায় নতুন জামা-কাপড় পরে উৎসাহে কলরব করে, চোখ বড় বড় করে দেখতে দেখতে কলকাতার দিকে যেতে লাগল।

চিড়িয়াখানা দেখে, মিউজিয়ম দেখে কালীঘাটে পুজো দিয়ে, বায়োস্কোপ দেখে প্রথম দিকের দিনগুলো উৎসবের মত কেটে যেতে লাগল। তারপর রাস্তার দিকের ঘরটিকে ডিসপেনসরী বানিয়ে, বেশ বড় সাইনবোর্ড টাঙিয়ে, নিজের নতুন করা নেমপ্লেট লাগিয়ে আলমারী কিনে ওষুধপত্র সাজিয়ে, টেবিল-চেয়ার, তক্তাপোষ বেঞ্চ কিনে—ভালভাবে ডিসপেনসারী সাজিয়ে তিনি বসলেন। প্রায় সারাদিনই একা একা কাটে। মাঝে মাঝে মেয়ে এসে তামাক দিয়ে যায়—একা থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যান—তখন ভরসা করে বাড়ির ভেতরও যেতে পারেন না পাছে কোন রোগী বা ওষুধ ক্রেতা এসে ফিরে যায়। এসব পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে নিখিলবাবু এত তন্ময় হয়ে যেতেন যে হোমিওপ্যাথির ডাক্তারদেব অভ্যেসমত প্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও এলোপ্যাথির নিন্দে করতেও ভুলে যেতেন।

হঠাৎ একদিন রাস্তায় এক জ্যোতিষীকে দেখে কি মনে হল, হাত দেখালেন। তারপব থেকেই নানাজনের কাছে হাত ও ঠিকুজী দেখাতে লাগলেন। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় ছিল, তার বাতিক ছিল হাত দেখা, ছক গণনা করা। বিকেলে অনেকদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিখিলবাবু তার কাছে বসে থাকতেন। তার শরীব খারাপ হলে ওষুধপত্র দিয়ে ঋণশোধ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। এমনি করে হাত দেখাতে দেখাতে, ছক গণনা করাতে করাতে সেই আত্মীয়ের ক্রমাগত সান্নিধ্যে তিনি হাত দেখা ছক গণনা একরকম শিখে ফেললেন।

এদিকে সংসারের পুঁজি শেষ হয়ে এল। কত টাকাই বা ছিল। বাড়ির অংশের টাকা আর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা এমন কিছু বিরাট ছিল না। শেষ হতে সময় নিল না। এদিকে ডিসপেনসারীতে ওষুধ বিক্রী হয় না—কোন 'কল' নেই। দৈবাৎ দু'-একজন ওষুধ কিনতে এলে তিনি নিজের চিকিৎসার ক্ষমতার কথা জানিয়ে, কোন কোন মুমূর্ষু রোগীকে অবহেলায় ভালো করেছেন সাড়ম্বরে সে কথা বলে, তার লগ্ন, রাশি জিজ্ঞেস করে, হাত দেখে তাকে এমন অস্থির করে তুলতেন, সে তখন ডিসপেনসারী থেকে বের হতে পারলে বাঁচে। কতদিন রাতে শুয়ে শুয়ে তিনি হোমিপ্যাথি আর জ্যোতিষীকে এক একবার চিন্তা করেছেন। রোগীর ইতিহাসই নেবেন না—রাশি, নক্ষত্র লগ্ন বিচার করবেন—দেখবেন ভালো হবে কি না—ভালো হবার পর আবার কবে অসুখে পড়তে পারেন। লগ্ন বিচারে তনুভাব ভাল করে লক্ষ্য করবেন।

নগদ টাকা শেষ হল। স্ত্রীর গহনাও গেল। অনাবশ্যক বোধে ডিসপেনসারীর তক্তাপোষটাও একদিন অনেকটা শূন্যতা সৃষ্টি করে বিদায় নিল। স্ত্রী শুষ্ক মুখে, উৎকণ্ঠিত চিত্তে স্বামীর মুখের দিকে তাকান। নিখিলবাবু জানান, সামনেই ভালো সময়—মাত্র ২ মাস পর বারই কার্তিকের পর সময় ভালো আসছে—শনির বক্রীভাব চলে যাচ্ছে।

বাড়ি ভাড়া বাকী পড়তে শুরু করল, গয়লা গালাগালি দিয়ে দুধ বন্ধ করল, মুদি ধার দেওয়া বন্ধ তো করলই—ওর দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়া যায় না—তাগাদা করে। ভাবার বিকর্ষণ শক্তি প্রবল। বাজার করবার পয়সা নেই—ডিসপেনসারীর বেঞ্চটাও চলে গেছে কিছুকাল আগে। ছেলেরা স্কুল যাওয়া বন্ধ করল—মাইনে অনেক দিনের বাকী। স্ত্রী বার বার বলেন, ওগো কিছু উপায় কর, উপায় কর—ওরা যে না খেয়ে মরতে বসেছে। অবশেষে নিখিলবাবু এক উপায় করলেন। ছেলেদের রুটিন যে পিসবোর্ডে টাঙানো হত—সেই পিসবোর্ডখানা নিয়ে তাতে সাদা কাগজ এঁটে নিজের হাতে কালি দিয়ে লিখলেন ঃ ভাগ্য গণনা, ঠিকুজী ও হাত বিচার করিয়া অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বলিয়া দেওয়া হয়। ঠিকুজী ২ টাকা, হাত ১ টাকা।

বিদেশ বিভূঁই জায়গা। তাও আবাব কলকাতা। কে চেনে, কে জানে? ক'দিন নিখিলবাবু কর্পোরেশনেও ঘোরাঘুরি করলেন—পুরনো অভিজ্ঞতার দাবিতে স্বাস্থ্যবিভাগে কোন চাকরি পান কি না। সেখানেও কিছু হল না। আসবার সময় এত আদরযত্ন পেয়েছেন—সেজন্যে নিজের শহরে ফিরে যাবার কথাও ভাবা যায় না। আর ফিরে গিয়ে উঠবেনই বা কোথায়? হয়ত ওঠবার জায়গা হবে দু'-চার দিনের জন্যে। একটা কি বন্দোবস্ত হবে না? কিন্তু লোকে তো হাসবে? আর কি লোকে তেমন করে সম্মান করবে? না, যাবেন না। বিশেষ করে, মাত্র একমাস পরে শনিতে শুক্র আসছে—সর্বাভীষ্ট যোগ এসে পড়ল বলে। না, না উজ্জ্বলবাবু শনি সব সময় খারাপ নয়। তুলাতে তো নয়ই। তুলা লগ্নে শনি তুঙ্গী না হোক, বেশ ভাল।

ইতিমধ্যে ছোট ছেলে জীতুর টাইফয়েড হল। নিখিলবাবু কলকাতা আসবার পর এই প্রথম একটা 'কেস' পেলেন। পরম উৎসাহে, প্রাণ দিয়ে চিকিৎসা সুরু করলেন। অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হতে লাগল। স্ত্রী এলোপ্যাথি করবার জন্যে জিদ করতে সুরু করল, ছেলে-মেয়েরা বড় ডাক্তার ডাকবার জন্যে কান্নাকাটি সুরু করল। কিন্তু নিখিলবাবু অবিচলিত হয়ে চিকিৎসা সুরু করলেন। ছেলের কাছে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা তিনিই বসে থাকেন। কাউকে কাছে আসতে দেন না। হয়ত দেড় বৎসর কোন 'কল' না পেয়ে আত্মবিশ্বাসে যে চিড় ধরেছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ারও দরকার ছিল তাঁর। সকল অবিশ্বাসীর সন্দেহ দূর করবার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেছিলেন। স্ত্রীর জেদ, ছেলে-মেয়ের কান্না, বাড়িওয়ালার তাগাদা, মুদিব গালাগাল সব কিছু অগ্রাহ্য করে তিনি জীতুর পাশে অটল হয়ে বসে চিকিৎসা করে চললেন। বাইশ দিনের দিন জীতু মারা গেল। তারপর একদিন তিন টাকায় ডিসপেনসারীর চেয়ার, টেবিল, আলমারী এক টাকায় সাইনবোর্ড ও হোমিওপ্যাথির শিশিবোতল চার আনায় বিক্রি করে উজ্জ্বলদের পাড়ায় এক বস্তিতে উঠে আসেন। তখন তাঁর কলকাতা বাস মোট দু' বছরও হয় নি। এখানেই সংসার চালাবার জন্যে নিখিলবাবু উজ্জ্বলের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন।

এর পরে বরং হাত দেখে, ছক করেই যা হোক দু'-এক টাকা পেতেন। কদাচ রোগীও জুটত। অবশেষে একদিন তিনি উজ্জ্বলদের পাড়া থেকেও ভাড়া দিতে না পেরে মধ্য কলকাতার এখনকার ঠিকানায় চলে যান। উজ্জ্বলদের পাড়ায় যখন থাকতেন প্রায়ই সন্ধ্যায় পত্রিকা পড়তে উজ্জ্বলদেব বাসায় এসে বসতেন। কেন যেন লোকটিকে উজ্জ্বলের বড় ভাল লাগত। একবার মীনার পা মচকে গেছে জেনে তক্ষুণি বাড়িতে গিয়ে ছুটে আর্নিকামণ্ট টু হাণ্ড্রেড এনে দিয়েছিলেন। মীনা

সেই কাশি ?
গ্লাইকোডিন এর
প্রভাবে পালিয়ে বেঁচেছে!

কি ? আপনি বিশ্বাস করবেন কি, যে এই কিছুক্ষণ আগেও কষ্টদায়ক কাশিতে উনি নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন। উনি গ্লাইকোডিন খেলেন। গ্লাইকোডিন খেতেই ওঁর কাশি খুব অল্প সময়ে সম্পূর্ণ নিরাময় হ'ল।

কাশি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে গ্লাইকোডিন এর বাড়া আর কোন ওষুধ নেই

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত গ্লাইকোডিন এর ফর্মূলা সব আক্রান্ত অংশ থেকে কাশিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ আরাম দেয়।

- মস্তিষ্কে—কাশির হামলা নিয়ন্ত্রণ করে।
- গলায়—খসখসে ভাব থামায় ও জমাট শ্লেষ্মা দূর করে।
- বুকে—চেপে ধরা পেশিগুলিতে আরাম পাওয়া যায় ও শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ করে তোলে।
- ফুসফুসে—শ্লেষ্মাকে পাতলা কোরে বার কোরে দেয় ও কাশিকে দূরে তাড়ায়।

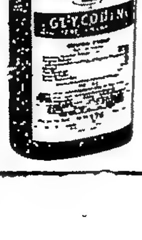

Alembic

গ্লাইকোডিন

টার্প বসাকা

কাশির জন্য বিশ্বস্ত, সর্বাধিক বিক্রীত গার্হস্থ্য চিকিৎসা

everest/659b/ACW/bn

উপকৃতও হয়েছিল। অবশ্য গোপনে উজ্জ্বল মীনা হাসাহাসি করেছিল ওর ছুটে যাবার ধরণ দেখে। পাছে মীনা আবার অন্য ডাক্তার ডাকে কি অন্য ওষুধ খায়—এ হচ্ছে উজ্জ্বলের সিদ্ধান্ত। কিন্তু সেদিন মীনা বলেছিল, তা নয়, নিখিলবাবু যে ভালো ডাক্তার একথা আমাদের বিশ্বাস করানোর জন্যেই এত ব্যস্ত হয়েছিলেন। কাজ হয়েছে, যাই বল।

সেই যে মাস ছয় আগে একবার গিয়েছিল, আর যাওয়া হয় নি। সেদিন বেলা একটায় অফিস ছুটি হয়ে গেল—একজন ডিরেক্টরের মৃত্যুতে। উজ্জ্বল হঠাৎ ঠিক করে ফেলল, নিখিলবাবুর খোঁজ নেবে। না, টাকার জন্যে নয়; টাকা দিতে পারবেন না ঠিকই, তবুও খোঁজ নিতে আপত্তি কি? গেলে হয়ত অপ্রস্তুত হবেন—তবু বলে আসব, যেদিন পারবেন দেবেন। গতবার ভদ্রলোককে একটা সান্ত্বনার কথাও বলা হয় নি। মীনাও নিখিলবাবুর কথা ভুলে এসেছে। উজ্জ্বলের ত্রুটি-বিচ্যুতির লম্বা ফর্দের মধ্যে তাকে এখন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—ফলে নিখিলবাবুর ব্যাপার একা থাকবার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে গৌণ হয়ে উজ্জ্বলকে স্বস্তি দিয়েছে।

প্রায় বস্তির মত বাড়িটি। দরজায় ঠকঠক করতেই একটি অপরিচিত গামছা-পরা লোক দরজায় উঁকি দিয়ে জানাল, নিখিলবাবু এখন এখানে থাকেন না। ঐ মোড়ের বাঁ পাশের তের নম্বরে উঠে গেছেন। ডিসপেনসারীর সাইনবোর্ড দেখতে পাবেন।

বসুমতীর

যাবতীয়

গ্রন্থ ও

গ্রন্থাবলীর

প্রাপ্তিস্থান

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ

কলিকাতা—১২

এবং

সান্যাল এন্ড কোং

১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

পাকা বাড়ি না হলেও দেওয়াল ও মেঝে পাকা—টিনের চাল দেওয়া বাসা হচ্ছে এই তের নম্বর। দরজার ওপর সাইনবোর্ড। একটি বড়—হোমিও-প্যাথিক—অপরটি ছোট—হাত দেখার। তা ছাড়াও নিখিলবাবুর নেপপ্লেট।

কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার পর ঘুম-ভাঙা চোখে নিখিলবাবু দরজা খুলে বাইরে এলেন। কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে উজ্জ্বলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—আরে আসুন, আসুন—ওগো দেখ, কে এসেছেন। বসুন আপনি এখানে—আমি চোখে-মুখে একটু জলের ঝাপটা...

নিখিলবাবু ফ্যান ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। কি ব্যাপার। এ যে দারুণ পরিবর্তন। ডিসপেনসারীতে বেতের সোফাসেট। বড় টেবিল। নিখিলবাবুর জন্যে গদি-আঁটা চেয়ার। রোগীদের জন্যে একটা তক্তাপোষ। মাথায় ফ্যান। তক্তাপোষের 'পর দুটো বালিশ রয়েছে। তাতে পরিষ্কার ওয়াড়। বোধকরি ঐ তক্তাপোষের 'পরই নিখিলবাবু ঘুমোচ্ছিলেন। বেশ বড় আলমারী। তাতে অনেক ওষুধও আছে মনে হল। কি করে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ জোগাড় করলেন। ভারত সরকারের ক্যালেণ্ডার। একটা ফটোও রয়েছে—ফটোটির গায়ে চন্দন দেওয়া এবং কাগজের ফুলের মালা দেওয়া। বোধ হয় মৃত পত্র-জীতুরই হবে। কেবল হানিমানের ছবিটি ঠিক আগেকার মতই আছে। ফ্রেমটিও পাল্টান নি।

এবার মুখ কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুছতে মুছতে নিখিলবাবু ঢুকলেন।

—বাঃ ঘর তো বেশ সুন্দর সাজিয়েছেন। নতুন কিনেছেন বুঝি এসব?

—আরে আপনিও যেমন। এ ঘরের যা কিছু দেখছেন—চেয়ার টেবিল—খাট, আলমারী ঐ নিওন লাইট—ফ্যান সব ভাড়া নিয়েছি। বেশ ক'টা টাকা মাসে মাসে বেরিয়ে যাচ্ছে এজন্যে। কিন্তু কি করব বলুন? শো না থাকলে কলকাতায় কিছু হবার উপায় নেই।

উজ্জ্বল নিওন লাইটটি দেখে, নিরীক্ষণ এবার দেখে নিল।

—দেখুন উজ্জ্বলবাবু, তবু এতেই বরং দু'-চারজন খদ্দের আসছে। রোগীও আসে—হাত দেখাতেও আসে। রোগী মনে করে যে, ডাক্তার নিজের ভাগ্য ফেরাতে পারে না—সে তাব রোগকে ফেরাবে কেমন করে—মৃত্যুকে আটকাবে কেমন করে। ডাক্তারকে সুস্থ দেখলে রোগী ভরসা পায় না। ভাবে ভালো ডাক্তার নয়—নইলে এমন অবস্থা হবে কেন? হাত যে দেখাতে আসে সে ভাবে যে তাবিজ-কবজ করে নিজের ভাগ্য ফেরাতে পারে না—অপরের ভাগ্য সে ফেরাবে কেমন করে, আর বলবেই ব কিণ যদি দায়ে পড়ে এরা আসেও ভরসা পায় না; অন্য জায়গা থেকে কম দাম দেয়, অন্য জায়গায় উপকার না হলে যতক্ষণ অপেক্ষা করে—এখানে তা করে না। রোগী বলুন, হাত বা ছক গুণতে যারা আসে তাদের কথা বলুন—সবাই ডাক্তার বা জ্যোতিষী সম্পর্কে প্রথমে মোহগ্রস্ত হতে চায়।

উজ্জ্বল সায় দিয়ে বলে—এতে যে অনেকগুলো টাকা যাচ্ছে।

—কড়কড়ে পঁচিশ টাকা। প্রত্যেক মাসের শেষে ফেলতে হচ্ছে। ফ্যানের জন্যে আর সাত টাকা। এই বত্রিশ টাকা। উপায় কি?

একটু চুপ থেকে নিজেই আবার জানায়, তবে এখন সত্তর আশি টাকা আসে ডিসপেনসারী থেকে। ভাড়ার টাকাটা উঠে আসে—যা আসে, মন্দ কি?

একটা কথা—মুখভাবে, কথাবার্তায় নিখিলবাবুকে বেশ খুশি খুশি লাগছিল। পাওনাদারকে দেখে খুশি! সোজা কথা নয়।

এমনি সময় নিখিলবাবুর স্ত্রী এলেন। জীর্ণশীর্ণ চেহারা খুব পাল্টায় নি। তবে আগে মুখে অসন্তোষের সেই শুষ্কভাবটি নেই। মাথায় কাপড়টি তুলে দিয়ে হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন। মীনা ও বাসার কুশল জিজ্ঞেস করলেন।

হাসি দেখে উজ্জ্বল যারপর নাই আশ্বস্ত হল।

ভদ্রমহিলা বাইরে গিয়ে পানের পিক ফেলে এসে বললেন—ঐ এক অভ্যেস হয়েছে—পান না খেয়ে পারি নে খাবার পর একটা। আগে ছিল। মাঝে ক'বছর আর খাই নি।

ভদ্রমহিলা পান খেতেন কি না উজ্জ্বল তা জানতো না। কতই বা ভদ্রমহিলাকে দেখেছে? তবু আজকের এই পান খাওয়া শুধু এদের নতুন অবস্থার বিজ্ঞাপন নয়—এই পানের স্বাদের মধ্য দিয়ে মহিলাটি হয়ত আগের পুরনো সুখের স্বাদ অনুভব করেন।

—আমার খরচ [illegible] বেড়েছে আব কি? নিখিলবাবুব কণ্ঠে প্রসন্ন প্রশ্রয়ের ছদ্ম অনুযোগ।

এবার মহিলা নিখিলবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—তোমার নতুন চাকরির গল্প বলেছ?

এবার উজ্জ্বল যেন একটা কিছু আলোর রেখা দেখতে পায়—নতুন চাকরি।

—দাঁড়ান সিগারেট আনি আপনার

জন্যে—সিগারেটে টান দিতে দিতে শুনুন।

নিখিলবাবু বের হবার আগেই উজ্জ্বল প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে।

নিখিলবাবু তবু কন্যাকে ডাকলেন—একটা এ্যাসট্রের জন্যে।

বড় একটা সিগারেটের খালি টিন হাতে করে এল। উজ্জ্বলকে প্রণাম করল।

—বুঝলেন উজ্জ্বলবাবু, ওকে দিয়েছি একটা সেলাই স্কুলে ভর্তি করে। কাছেই স্কুল—দুপুরেই যেতে হয়—এই আরেকটু পরেই যেতে হবে। যাক গল্পটা শুনুন।

আমার শনি খারাপ নয়—তবু তাকে আরো এ্যাকটিভ করবার জন্যে ইন্দ্রনীলও কিনেছিলাম। কিছু হয় না। তারপর একদিন এক রোগীর কাছে এক খবর পেলাম। এক রাজাবাহাদুর রাতের জন্যে এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার চান। ঠিকানা নিয়ে সেদিন সারারাত কালী-মন্ত্র জপ করলাম। শনি আবার কালীর শিষ্য কি না। সেদিক থেকে শনি গুরুভাই হচ্ছে আমার। দোষটুকু কাটিয়ে, ইন্দ্রনীলটি আবার শোধন করে পকেটে হোমিওপ্যাথির সার্টিফিকেট-খানা নিয়ে হাজির হলাম।

চাকরি হয়ে গেল—সেদিন রাত থেকেই। ব্যাপার কিছু নয়—ভদ্রলোকের ডিসপেন্সারি-টারি কিছু নেই। রাজা-বাহাদুর বিলেত আমেরিকায় ঘুরেছেন—হোমিওপ্যাথির আদর জানেন। তাছাড়া ভদ্রলোকের এলোপ্যাথি ডাক্তারও আছে চিকিৎসার জন্যে। ভদ্রলোকের ধারণা, হঠাৎ হার্টফেল করে মৃত্যু হতে পারে। তাই চব্বিশঘণ্টা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার চাই। বয়সও সত্তর হতে চলল। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার চাই—একজন রাতের একজন দিনের জন্যে। ইন্দ্রনীলের এফেক্ট—না হয়ে যায় না। আমাকে রাতে থাকতে হয়—সন্ধ্যে সাতটা থেকে ভোর ছটা। এক-ফোঁটা ঘুমুলেও চলবে না। আগের জনের চাকরি গেল—তন্দ্রা এসেছিল বলে। ঝিমুচ্ছিলেন। রাতে খাবার ঐখানেই। সে এক নেমতন্ন রোজ। ভোরে চা জল-খাবার খেয়ে বেরিয়ে আসি। মাইনে তিন-শত টাকা। নেই নেই করেও রাজাবাহাদুর এখনও মরা হাতী। লাখ লাখ টাকার মালিক। কলকাতায় আট-দশখানা বাড়িও আছে—ভাড়া খাটে—মফস্বলে বহু বাস ভাড়া খাটছে—ট্রাক রয়েছে কত......

মেয়েটি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলে—বুড়োটা হঠাৎ মারা না যায়।

—না সে ভয় নেই, হাত দেখেছি, ঠিকুজী দেখেছি—অনেক আয়ু। মঙ্গল ভাল নয় বলে একটা প্রবাল পরিয়ে দিয়েছি। ভোরের জলখাবার হচ্ছে গরম লুচি, আলুর দম শুকনো শুকনো, সন্দেশ, চা। আলুর দমে হলুদ দেয় না—সাদা সাদা।

মেয়েটি আবার বলে—বাবা তো আমাদের জন্যে কত কি খাবার নিয়ে আসে—নিখিলবাবু যেন এ কথাটি শোন-বার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন—সংগে সংগে বললেন—সন্দেশটা। অত মিষ্টি ভোরে আমি খেতে পারি নে।

—বা শুধু সন্দেশ আন বুঝি?

ভদ্রলোক মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন—আবার কি আনলাম?

—জানেন, বাবা একটা টিফিন বাক্স করেছেন—ওখান থেকে খাবার নিয়ে আসবার জন্যে। তাতে লুচি থাকে, সন্দেশ থাকে, বরফি থাকে, আখরোট, বাদাম কত কি থাকে।

নিখিলবাবু একটু সলজ্জ গর্বে উজ্জ্বলের দিকে তাকাল।

—আরে দূর, ওসব আবার বলছিস। আখরোট, বাদাম, বরফি ওসব দেওয়া থাকে প্লেটের ভেতর। রাজাবাহাদুর রাতে ওসব ছুঁয়েও দেখেন না। তবু দেওয়া নিয়ম। শালা চাকরগুলো মারবে। আমি তাই একটা টিফিন বাক্স করলাম। তবে হ্যাঁ রাতে আমি একবিন্দুও ঘুমুই না। রাজাবাহাদুরের বিছানার পাশে চেয়ারে ঠায় আমি বসে থাকি। কোন মশা নেই —ফনফনে ফ্যানের হাওয়া—ঘুম আসে বই-কি। কিন্তু আমি ঘুমুই না। যতবার রাজাবাহাদুর জাগবেন—ততবার নিঃশব্দে কাছে যেতে হবে। তিনি শুধু চেয়ে দেখবেন—তার পরেই পাশ ফিরবেন। কোন কথা বলা চলবে না। শব্দে যদি রাজাবাহাদুরের ঘুমের আমেজ ভেঙে যায়।

উজ্জ্বল বলে, রাজাবাহাদুরের ওঁর মনের চিকিৎসা দরকার। ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট কনসাল্ট করলে...

অবাধ্য ছেলেকে বাবা যেমন বিরক্তি ও স্নেহ নিয়ে কিছু বোঝাতে চায় ঠিক তেমনিভাবে নিখিলবাবু বললেন—আরে মশায়, হোমিওপ্যাথিও ইংরেজীতেই লেখা —ইউরোপের জিনিষ—তাতেও ওষুধ আছে। ওর তো সাইকোসিস আছে তা থেকেই—আরে এক ডোজ ওষুধে ওকে ভালোও করে দিতে পারি। ওষুধের নামও আপনাকে এক্ষুণি বলতে পারি। কিন্তু তাহলে আমার চলবে কি করে?

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলে—বাবার যেমন কথা।

—তাছাড়া, বুঝলেন উজ্জ্বলবাবু, রাজাবাহাদুরের শনিচন্দ্রের অশুভ যোগ রয়েছে। এ রোগ না হয়ে যায় না। আর আমাদের কাছে তো ওষুধ চায় না—হাজিরা চায়। আমরা আছি শুধু এমারজেন্সীর জন্যে।

এবার উজ্জ্বল ওঠবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। ভদ্রলোক পাওনা টাকার অর্ধেকটা এনে দিল। ভদ্রমহিলা বলতে লাগলেন —যে দুর্দিনে সাহায্য করেছেন—তা সারা-জীবন ভুলব না। মীনা কতভাবে সাহায্য করেছে—তা হয়ত আপনি জানেনও না।

উজ্জ্বল অবশ্য জানতো না। পরে পাওনা টাকা না পেয়ে মীনা কিছু কিছু অকৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত হিসেবে উজ্জ্বলকে জানিয়েছিল।

নিখিলবাবু ওঠবার আগে উজ্জ্বলকে সরবৎ খাওয়ালেন। মিষ্টি খাওয়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উজ্জ্বল ভীতভাবে প্রবল আপত্তি জানিয়ে উঠে পড়ে—কি জানি রাজাবাহাদুরের বাড়ির মিষ্টি কি না।

সদ্য প্রকাশিত হইল।
বাঙলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরসিক
শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী
গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত
(১) মনের মত বৌ
(২) মস্কো বনাম পন্ডিচেরী
(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো
(৪) প্রেমের বিচিত্র গতি
(৫) রক্তের টান
(৬) [illegible] তারা কথা বলবে
পৃষ্ঠা ২৪০
মূল্য মাত্র চার টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

রঙ্গমঞ্চ এদেশে এবং ওদেশে

শিলালি

স্যামুয়েল বেকেট ঃ

এ বছর সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন স্যামুয়েল বেকেট। অতীতে বেকেটের নাটক সম্পর্কে সাপ্তাহিক বসুমতীতে আমি বহু আলোচনা করেছি —সুতরাং সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বেকেট মোটেই অপরিচিত নাট্যকার নন। কোন একটি শারদীয়া সংখ্যায় সাপ্তাহিক বসুমতীতে আমার বাংলায় অনূদিত বেকেটের 'এ্যাক্ট উইদাউট ওয়ার্ডস' মূক-নাটিকাটিও প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৫৬ সালে ইংলণ্ড থাকাকালীন দুটি নাট্যকারের লেখা আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে—এ'দের একজন স্যামুয়েল বেকেট, অন্যজন বেরটল্ট ব্রেশট যাঁকে নাট্যকার হিসাবে অল টাইম গ্রেটসদের শ্রেণীতে ফেলা হয়। বেকেটের সব লেখা অবশ্য আমার ভাল লাগে নি—আমাকে মুগ্ধ করেছিল তাঁর অসাধারণ রচনা 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকটি। বেকেটের অন্যান্য নাটকগুলো এ্যাবসার্ড শ্রেণীর নাটক—এতে ইণ্টালেকচুয়াল জিমন্যাস্টিকেরই প্রাধান্য, বক্তব্য মোটেই প্রাঞ্জল বা স্পষ্ট নয়। বিশেষ শ্রেণীর বুদ্ধিবিলাসী দর্শক এবং পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্যই এ সব নাটক রচিত। কিন্তু 'গোডো' অন্য ধরণের লেখা। ধনতন্ত্রবাদী সমাজে মানুষের জীবন কি রকমের গতিবর্জিত ভয়াবহ রূপে ধারণ করে তারই ছবি দেওয়া হয়েছে 'ওয়েটিং ফর গোডো'তে।'

১৯৫৭ সালে দেশে ফেরবার পর একটি মাসিক পত্রিকার দুটি বিশেষ নাট্য-সংখ্যার পরিচালনার দায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করতে হয়। পত্রিকাটির নাম ছিল 'জাতক'। 'জাতকে'র নাট্যসংখ্যা দুটিতে (১৯৫৭ সালে) আমি বিশদভাবে ব্রেশট এবং বেকেটের নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম।

প্রসঙ্গত 'ওয়েটিং ফর গোডো' সম্পর্কে আর একটা কথা বলা দরকার। কলকাতার একজন উগ্র বামপন্থী নাট্য পরিচালক নানাভাবে নানা সময়ে "গোডো" নাটকটি সম্পর্কে বিষোদ্গার করে থাকেন। ব্রেশট সম্বন্ধে এই পরিচালকের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে—এ ভদ্রলোক বোধ হয় জানেন না যে, স্বয়ং বেরটল্ট ব্রেশটও বার্লিনার আসেম্বলের দ্বারা "গোডো" প্রডিউস করবার জন্য আগ্রহী হয়েছিলেন। কোনো কারণে তাঁর ইচ্ছা কার্যে রূপান্তরিত হয় নি—কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আসলে ব্রেশট যে 'গোডো'-কে প্রগ্রেসিভ এবং বামপন্থী নাটক হিসাবে প্রডিউস করবার জন্য বেছে নিয়েছিলেন সেটাই লক্ষণীয় ব্যাপার।

১৯৫৭ সালে আমি এই নাটকটির বাংলা অনুবাদ করি—আমারই পরিচালনায় ভবানীপুর 'সন্ধ্যানীড় ক্লাব' ১৯৫৭ সালের ২৩শে নভেম্বর এদেশে প্রথম সাফল্যের সঙ্গে এই নাটকের মঞ্চরূপ দেন। এরপর 'সন্ধ্যানীড় সংস্থা' আরও বহুবার কৃতিত্বের সঙ্গে 'ওয়েটিং ফর গোডো'-র অভিনয় করেছেন। স্টেটসম্যান প্রভৃতি কাগজে এই অভিনয়ের প্রভূত প্রশংসা বের হয়েছিল। আর সব থেকে বড় কথা প্রত্যেক অভিনয়ের সময়ই দর্শকরা নাটকটিকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

এরপর আমি 'ওয়েটিং ফর গোডো'-র Exclusive International Copyright For Bengali Translation কিনি এবং আমার 'ওয়েটিং ফর গোডো'-র বাংলা অনুবাদটি ছেপে বের করেন প্রকাশক এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে।

এবার বেকেটের জীবনী এবং রচনাবলী সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলব ঃ

১৯০৬ সালে ডাবলিনে বেকেটের জন্ম হয়। অস্কার ওয়াইল্ড, বার্নার্ড শ' এবং ডাবলিউ. বি. ইয়েটসের মত বেকেটও ছিলেন আইরিশ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। চোদ্দ বছর বয়সে এ্যাংলো আইরিশ ঐতিহ্যসম্পন্ন পোরটোরা রয়েল স্কুলে ভর্তি হন বেকেট। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বয়ং রাজা প্রথম জেমস। অস্কার ওয়াইল্ডও এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন এক সময়।

বেকেটের লেখা পড়ে বোধ হয় তাঁর মনটা অত্যন্ত নিপীড়িত এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল। অর্থাৎ সাধারণ জাগতিক জীবনের সঙ্গে মেলামেশা করবার মত মানুষ তিনি নন। অথচ ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন খুবই পপুলার। স্কলার হিসাবেও সেই সময় থেকেই তাঁর প্রচণ্ড নামডাক ছিল। আবার খেলাধূলাতেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন—ক্রিকেটে ব্যাট করতেন বাঁ হাতে এবং ডান হাতে বল দিতেন। র‍্যাগবী খেলাতেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন।

১৯২৩ সালে পোরটোরা ছেড়ে তিনি ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। এখানে তিনি ফ্রেঞ্চ ও ইতালিয়ান ভাষা শেখেন এবং ১৯২৭ সালে বি, এ, পাশ করেন। এরপর তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি এল বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে। প্যারিসের বিখ্যাত Ecole Normale Superieure-এর সঙ্গে ব্যবস্থামত এক্সচেঞ্জ-অভ্-লেকচারার্স-স্কিমে বেকেট প্যারিসে চলে গেলেন ইংরাজী ভাষার শিক্ষক হয়ে।

ভবিষ্যৎ জীবনে বেকেটের প্যারিসের সঙ্গে যে অন্তরঙ্গ এবং দীর্ঘকালের যোগাযোগ স্থাপিত হয় তার শুরু হয় এইভাবেই।

প্যারিসেই জেমস জয়েসের সঙ্গে বেকেটের আলাপ হয় এবং তিনি এ'দের গোষ্ঠীর সভ্য হয়ে পড়েন। এই সময় বেকেট কিছু কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রথমবার প্যারিসে এসে বেকেট একটি কবিতার বইও প্রকাশ করেছিলেন এবং এই বইটির জন্য দশ পাউণ্ড পুরস্কারও পান। এরপর তিনি মাস্টার অভ্ আর্টস ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯৩১ সালে বেকেট প্রুস্টের ওপর একটি বই লেখেন। প্যারিস থেকে ফিরে তিনি ট্রিনিটি কলেজে চারটি টার্ম অধ্যাপনা করেন। ক্রমশ গতানুগতিক বাঁধাধরা কাজ করে যাওয়ার ব্যাপারটা তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। চাকরি ছেড়ে তিনি যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করলেন। কবিতা লেখেন, গল্প রচনা করেন, টুকিটাকি কাজ করেন—আর ঘুরে বেড়ান ডাবলিন থেকে লণ্ডনে, লণ্ডন থেকে প্যারিসে, ফ্রান্সের নানা জায়গা এবং জার্মানীতে। এখন থেকেই বেকেটের মনে ধারণা হয় যে, শিল্পীর জীবন হচ্ছে নৈঃসঙ্গের জীবন—সামাজিক মেলামেশাটা একটা মায়াজালের সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু নয়।

অনেকের মনে একটা ধারণা আছে যে, বেকেট এক সময় জেমস জয়েসের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। এ ধরণের একটা গুজব এক সময় রটেছিল—কিন্তু এটা নিছক গুজবই, আসলে এর মূলে কোন সত্যি নেই। এই গুজব রটার পেছনে যেটুকু কারণ ছিল তা হচ্ছে এই—প্যারিসে গেলেই বেকেট জয়েসের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। এ'রা দু'জনেই ছিলেন শান্ত প্রকৃতির এবং স্বভাবত নিঃস্তব্ধতাপ্রিয়। তাই অনেক সময় এমনও হোত যে, পাশাপাশি বসে থেকেও দু'জনেই চুপচাপ থাকতেন। বেকেট বোধ হয় বিষণ্ণভাবে

জগতের কথা ভাবতেন, আর জয়েস নিজের কথা। এই সময় জয়েসের দৃষ্টিশক্তি কমে আসছিল। দু'-একদিন তিনি 'ফিনিগ্যানস্ ওয়েকের' কিছু কিছু অংশ মুখে বলে যেতেন এবং বেকেট তা লিখে দিতেন। এর থেকেই বোধ হয় ঐ অদ্ভুত গুজবটা রটেছিল। তবে বেকেট এবং অন্যান্য এ্যাবসার্ড লেখকদের ওপর যে জয়েসের লেখার স্টাইলের যথেষ্ট প্রভাব আছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

জয়েস পরিবারের সংস্পর্শে এসে বেকেট অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি করুণ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। জয়েসের মেয়ে লুসিয়া তাঁদের বাড়িতে বেকেটের আসা-যাওয়ার ফলে তাঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। লুসিয়া ছিলেন অত্যন্ত হাই স্ট্রাং এবং নিউরটিক গোছের। বেকেট মাঝে মাঝে লুসিয়াকে সহজ সরল মনে রেস্তোরাঁ এবং থিয়েটারে নিয়ে যেতেন। লুসিয়া যে তাঁর আচরণের অন্যরকম ব্যাখ্যা করবেন বেকেট তা বুঝতে পারেন নি। এদিকে লুসিয়া যেন ক্রমশ আত্মসংযম হারিয়ে ফেলছিলেন। তিনি বেকেট সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব সবার কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। বেকেটের কানে যখন কথাটা উঠল তিনি খোলাখুলিভাবে লুসিয়াকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তাঁদের বাড়িতে যান তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য—অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। পরে বেকেট পেগী গাগেনহাইমকে বলেছিলেন যে, এ ব্যাপারে তাঁকে লুসিয়ার সঙ্গে অত্যন্ত হৃদয়হীনের মত ব্যবহার করতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে—কারণ তাঁর অন্তরের মানবিক এবং কোমল প্রবৃত্তিগুলো অনেক আগেই শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যই তিনি লুসিয়ার প্রেমের প্রতিদান দিতে পারেন নি।

ভুবনবিজয়ী ভারতীয় নৃত্যবিদ শ্রীউদয় শঙ্করের নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে জেমস জয়েস একবার এই মেয়ে লুসিয়াকে চিঠিতে লিখেছিলেন—"এ'র নাচ দেখে মনে হল এখনও পৃথিবী থেকে সব সুন্দর জিনিস অন্তর্হিত হয়ে যায় নি। নৃত্যশিল্পী হিসাবে ইনি বলশয় ব্যালেকেও অনেকটা পেছনে রেখে এগিয়ে গিয়েছেন।"

পেগী গাগেনহাইম ছিলেন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক এবং আধুনিক চিত্রকলার বিখ্যাত সংগ্রাহক। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন যে তিনি নিজেও বছরখানেক ধরে বেকেটের প্রেমে আত্মহারা হয়েছিলেন। বেকেটের স্বভাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন—"অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর যুবক। কিন্তু কেমন যেন অনুভূতিহীন এবং ঔদাস্যে ভরা স্বভাব। সময় সময় দুপুর অবধি বিছানা থেকে ওঠেন না। বেকেটকে কথাবার্তা এবং আলাপ-আলোচনায় আকৃষ্ট করাটা একটা দুরূহ ব্যাপার বলেই মনে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লাগে তাঁকে সহজভাবে কথা বলাতে—এবং এইজন্য তাঁকে যথেষ্ট মদ্যপানও করাতে হয় প্রাণচঞ্চল করে তুলতে। এমনভাবে সাধ্যসাধনা করবার পর তবেই বেকেট অন্যদের কাছে জড়তা কাটিয়ে উঠে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে থাকেন।"

পেগী গাগেনহাইম আরও বলেছেনঃ বেকেট বলতেনঃ 'মাতৃগর্ভে থাকাকালীন ভয়াবহ অবস্থার স্মৃতি তিনি কখনও ভুলতে পারেন নি'।" এ ধরণের অদ্ভুত মন্তব্য করা বোধ হয় একমাত্র এ্যাবসার্ড শ্রেণীর শিল্পীদের পক্ষেই সম্ভব। বেকেটের পক্ষে এই চিন্তাটা একটা অবসেশনের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং মাঝে মাঝে তাঁর অবস্থা এমন সাংঘাতিক হয়ে পড়তো যে, মনে হোতো যেন তিনি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন। তিনি পেগীকে বলতেন—"একদিন আমাদের জীবন বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ হয়ে যাবে।" কিন্ত যখনই পেগী তাঁকে বিয়ের ব্যাপারে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে বলতেন, অমনি বেকেট আগেকার সমস্ত কথা ফিরিয়ে নিতেন এবং নিজেকে ফের গুটিয়ে ফেলতেন।

বেকেট "মারফী" প্রকাশ করেন ১৯৩৮ সালে। এ ব্যাপারে তাঁকে যথেষ্ট সহানুভূতি ও সাহায্য করেছিলেন হার্বার্ট রীড। পেগীর সঙ্গে বেকেটের বাস্তবজীবনে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে "মারফীর" নায়ক এবং তার বান্ধবী সেলিয়ার সম্পর্কের কাহিনীর—মেয়েটি ক্রমাগত চেষ্টা করে যাতে নায়ক স্থায়ী চাকরি নিয়ে তাকে বিয়ে করে। কিন্তু নায়ক কোন-না-কোন উপায়ে তার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয় নিজেকে সরিয়ে নিয়ে। ঠিক যেমনটা করতেন বেকেট পেগীর সঙ্গে, যখনই পেগী তাঁদের সম্পর্কটাকে একটা স্থায়ী পরিণতিতে রূপায়িত করতে চাইতেন।

বেকেটের প্রথম নাটক "এলিউথেরিয়াতেও" (ফরাসী ভাষায় লেখা—এখন পর্যন্ত ছাপা বা মঞ্চস্থ হয় নি) আছে একজন যুবক আপ্রাণ চেষ্টা করছে সাংসারিক এবং সামাজিক দায়িত্বের পেষণ থেকে রেহাই পেতে। এটি তিন অঙ্কের নাটক—স্টেজটিকে মাঝামাঝি জায়গা থেকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ডানদিকে নায়ক বিছানায় শুয়ে থাকে—তার মনটা যেন অসাড় এবং ঔদাস্যে ভরা। বাঁদিকে থাকে তার পরিবারের লোকেরা এবং বন্ধুবর্গ। তাকে নিয়েই এরা সবাই আলোচনা করে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাকে সম্বোধন করে না কথা বলবার সময়। ক্রমশ নাটকের এ্যাকশন বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত নায়ক সমর্থ হয় কর্মশক্তি সংগ্রহ করে নিজেকে বন্ধনমুক্ত করতে ও সমাজের আওতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে।

'মারফী' এবং 'এলিউথেরিয়া'-তে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বেকেটের মুক্তির অনু-

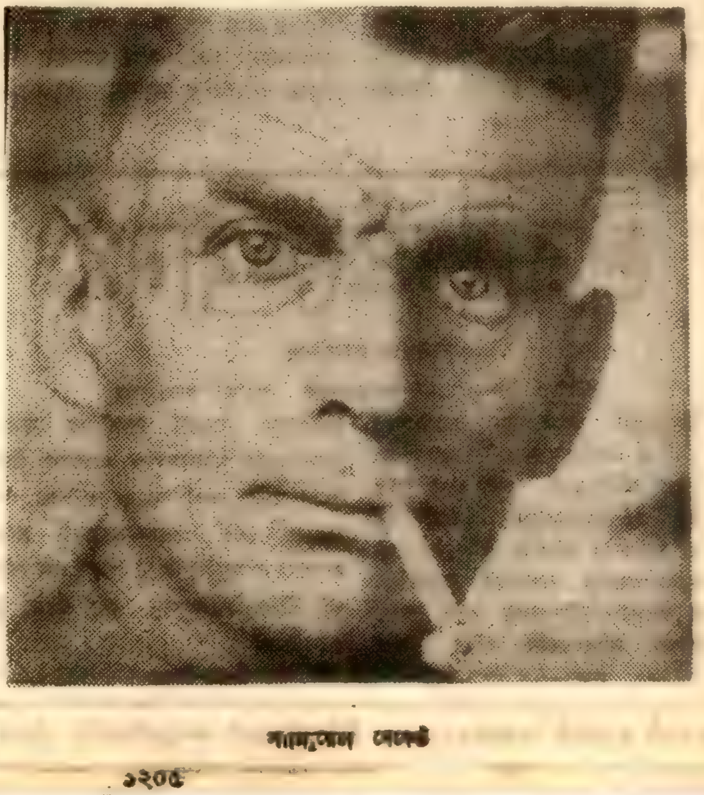

স্যামুয়েল বেকেট

সন্ধানের প্রয়াস এবং নিজের জীবন নিজের ইচ্ছামত কাটানোর ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথা। এরপর বেকেট সত্যিই একটি স্থায়ী বাসভূমি পেলেন প্যারিসে। ১৯৩৭ সালে মোপারনেসের সীমান্তে একটি ফ্ল্যাট-বাড়ির ওপরতলার ঘর ভাড়া করলেন—এইখানেই তিনি যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর সময়ে অনেক বছর কাটান।

এই সময় বেকেটের জীবনে একটি ঘটনা ঘটে যা শুনলে মনে হবে যেন এটি বেকেটেরই রচিত উদ্ভট এবং অদ্ভুত একটি ব্যাপার। একদিন প্যারিসের রাস্তায় একটি গুন্ডাগোছের লোক বেকেটকে আদেশ করে তাঁর পকেটের সমস্ত টাকা তাকে দিয়ে দিতে—বেকেট তার কথায় রাজী না হওয়াতে লোকটা তাঁর বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়—ছুরিকাঘাতে বেকেটের ফুসফুস ফুটো হয়ে যায় এবং তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সুস্থ হবার পর বেকেট জেলে গিয়ে তাঁর সেই আততায়ীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে এভাবে আঘাত করার হেতু কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে গুন্ডাটি বলেছিল 'Je ne sais pas, Monsieur' অর্থাৎ 'আমি জানি না।' এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমালোচক Martin Esslin লিখেছেন: 'It might well be the voice of this man that we hear in Waiting For Godot and Molloy.'

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ লাগে সে সময় বেকেট ছিলেন আয়ারল্যান্ডে। তিনি সেখানে তাঁর বিধবা মাকে দেখতে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের খবর পাওয়া মাত্রই তিনি প্যারিসে ফিরে এলেন। বহুকাল আগে থেকেই বেকেট ছিলেন জার্মানীর ন্যাশনালিস্ট সোস্যালিস্ট পার্টির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী—এদের পাশবিক রাজনীতি এবং ইহুদী-বিরোধী বর্বর আচরণের জন্যই তিনি নাৎসীদের অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। [এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে আসে—ইহুদীদের প্রতি হিটলারের অত্যাচার চরম বর্বরতার পরিচায়ক সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু ইহুদী জাতটাও যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই জার্মানীর অর্থনৈতিক প্রগ্রেসকে কিভাবে প্রতি পদে ব্যাহত করে আসছিল সে কথাটাও ঠিক অগ্রাহ্য করবার মত ব্যাপার নয়। তাছাড়া হাতে ক্ষমতা পেলে তারা যে নিজেরাও কত নৃশংস হয়ে উঠতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি আরব-ইস্রায়েলের বর্তমান যুদ্ধের ঘটনা থেকে। এবিষয়ে বেকেটের মনের সত্যিকার রি-এ্যাকশন জানতে ইচ্ছা করে!]

আয়ারের নাগরিক বলে বেকেট নিরপেক্ষ জাতির নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হতেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানদের প্যারিস অধিকারের পরও তিনি সেখানে থাকবার অনুমতি পেয়েছিলেন। এরপর তিনি একটি রেজিসটেন্স গ্রুপে যোগ দেন এবং আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্টের সদস্য হিসাবে বিপজ্জনক এবং অনিশ্চিত জীবনযাত্রা শুরু করেন।

১৯৪২ সালের অগাস্ট মাসে একদিন নিজের ঘরে ফিরে বেকেট দেখেন যে, তাঁকে দলের থেকে গুপ্ত সংবাদ পাঠানো হয়েছে, যে, তাঁদের দলের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—সুতরাং তিনি যেন অবিলম্বে আত্মগোপন করেন। তখনই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং জার্মান অনধিকৃত একটি জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেন (Vaucluse, Near Avignon)। এখানে একটি কৃষকের কাছে তিনি এগ্রিকালচারেল লেবারারের কাজ নেন। এই সময় তিনি তাঁর 'ওয়াট' (Watt) নামে উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন—যাতে লেখার চর্চাটা একেবারে বন্ধ না হয়ে যায়। এতে একটি চরিত্র আছে যে অত্যন্ত একা এবং উদ্ভট স্বভাবের। সে কোন গ্রামে গিয়ে এক বাড়িতে চাকরের কাজ নেয়। এ বাড়ির কর্তা অত্যন্ত রহস্যজনক এবং খামখেয়ালী—তার দেখা পাওয়াও অসম্ভব। এই কর্তা অর্থাৎ মিস্টার নটের (Mr. Knott) সঙ্গে বেকেটের পরের রচিত মিস্টার গোডোর অনেক সাদৃশ্য আছে।

প্যারিসের মুক্তির পর ১৯৪৫ সালে বেকেট কয়েকদিনের জন্য প্যারিসে এসে থাকেন—তারপর যান আয়ারল্যান্ডে এবং সেখানে রেড ক্রশে যোগ দেন। আবার ফ্রান্সে ফিরে আসেন ১৯৪৫ সালের শরৎকালে এবং কিছুদিন সেইন্ট লোর হাসপাতালে স্টোরকীপার ও দোভাষীর কাজ করেন। এই বছরই শীতকালে বেকেট প্যারিসে নিজের পুরনো ঘরে ফিরে এসে দেখলেন সব কিছুই ঠিক আগের মত অবস্থায় রয়েছে—যেন ঘরটি তাঁর ফিরে আসবার জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

এই সময়ই পাঁচ বছরের ভেতর বেকেটের কয়েকটি সেরা উপন্যাস, মোলোয়, মালোন ডাইজ, দি আন্‌নেমেবল প্রভৃতি, তিনটি শ্রেষ্ঠ নাটক, যথা এলিউথেরিয়া, ওয়েটিং ফর গোডো এবং এন্ড গেম, কয়েকটি ছোট গল্প এবং অন্যান্য গদ্য রচনার অংশবিশেষ লেখা হয়ে যায়। সমস্ত রচনাগুলোরই ভাষা ছিল ফ্রেঞ্চ। এখানে একটা প্রশ্ন মনে আসে—মাতৃভাষা ইংরাজী হওয়া সত্ত্বেও বেকেট ফরাসী ভাষায় মূল রচনা করতেন কেন? এর উত্তর হল—বেকেট মনে করতেন while in his own language a writer may be tempted to indulge in virtuosity of style for its own sake, the use of another language may force him to divert the ingenuity that might be expended on mere embellishments of style in his own idiom to the utmost clarity and economy of expression.

[ক্রমশ]

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

রঙ্গজগৎ

সাবিত্রী চ্যাটার্জী
নল-দময়ন্তী চিত্রে দময়ন্তীর
রূপসজ্জায়

বাংলাছবির মুক্তি প্রসঙ্গে

চলচ্চিত্র মুক্তির ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট সরকার একটা নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করছেন। ছবির সেন্সর হবার তারিখ অনুযায়ী ছবিগুলি মুক্তি পাবে। কালো-টাকার জোরে অথবা প্রভাব খাটিয়ে একটা ছবিকে ডিঙিয়ে আর একটা ছবির মুক্তি পাওয়া চলবে না। এই ব্যবস্থা যদি কঠোরভাবে কার্যকরী করা হয় তবে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের প্রভূত উপকার হবে। এরূপ নীতি অনুসরণ করার দাবি চলচ্চিত্র শিল্প সংশ্লিষ্ট কোন কোন মহল থেকে উঠেছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার তা মেনে নিয়েছেন এবং কার্যকরী করার চেষ্টা করছেন, বাস্তবিকপক্ষে বর্তমানে যে ছবিগুলি মুক্তি পাচ্ছে সেগুলি সেন্সর তারিখ অনুসারে মুক্তি পাচ্ছে।

এই ব্যবস্থা চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে সহায়ক হলেও কোন কোন ক্ষমতাশালী মহল থেকে বানচাল করার চেষ্টা চলছে। সেন্সর তারিখকে ডিঙিয়ে নিজেদের ছবিকে আগে মুক্তি দেবার জন্য নানারকম পথ তাঁরা গ্রহণ করতে চাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এরূপ অপচেষ্টাকে কোন রকমেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে সেন্সর তারিখ ক্রমকে ব্যাহত করা না যায়। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে—বাংলা ছবির চেনের সঙ্গে হিন্দী ছবির চেন একাকার হয়ে যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে করা যায় যে হিন্দী ছবিঘরগুলিতে বাংলা ছবি মুক্তি লাভ করছে—সুতরাং ব্যাপারটা ভাল। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক সিনেমায় বছরে কয়েক সপ্তাহ বাংলা ছবি দেখান উচিত। কিন্তু বাংলা ছবিঘরে যখন হিন্দী ছবি আসে তখন উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। সম্প্রতি দেখা গেছে পূরবী, উজ্জ্বলা, শ্রী বাংলা ছবির চেনে হিন্দী মুক্তি দেখান হয়েছে। একে ত' বাংলা ছবির রিলিজ চেন মাত্র তিনটি। এই তিনটিও যদি বাংলার জন্য সংরক্ষিত না থাকে তাহলে হিন্দী-বাংলা একাকার হয়ে বাংলা ছবির ক্ষতি হবে। রিলিজ চেন নির্দিষ্ট না থাকলে বহু দর্শক ছবি দেখতে উৎসাহ বোধ করেন না। আর একদিকে শেষ পর্যন্ত বাংলা ছবিকে রিলিজ চেনের অভাবে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। যে কোন সিনেমায় দেখালেই বাংলা ছবি চলে না। যেমন বড়বাজার অঞ্চলে যদি বাংলা ছবি মুক্তি পায় সে ছবি যেমন 'হাউস ফুল' হওয়া কষ্টকর তেমনি পূরবীতে হিন্দী ছবি দেখালে বাংলা ছবির বাঙালী দর্শকদের অসুবিধা হয়।

সুতরাং এমন ব্যবস্থা হওয়া দরকার যাতে বাংলা ছবির রিলিজ চেন কোন রকমে ব্যাহত না হয়। বরঞ্চ আর একটা রিলিজ চেন খুলতে পারলেই ভাল হয়। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত কলকাতায় বাংলা ছবির পাঁচটা রিলিজ চেন ছিল। এই পাঁচটা রিলিজ চেন আবার খোলা থাকা দরকার। এই সঙ্গে সেন্সর তারিখ অনুসারে ছবির মুক্তির ব্যাপারটার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। —সুজন।

চিত্র আলোচনা

ফুট প্রিন্টস অন দি মুন
এ্যাপোলো—১১

গ্লোব সিনেমায় একটি ছবি মুক্তিলাভ করেছে—যে ছবিতে মানুষের কীর্তির চিহ্ন তুলে ধরা হয়েছে। চাঁদ ছিল মানুষের কাছে আধা বাস্তব আধা কল্পনা। চাঁদকে আমরা শিশুকাল থেকে দেখছি -চাঁদকে নিয়ে স্বপ্নকথা রচনা করেছি। আজ সেই বাস্তব ও কল্পনায় মেশানো চাঁদে মানুষ গিয়ে পৌঁছেছে: মানুষের পদচিহ্ন পড়েছে চাঁদের বুকে। মানুষের বিস্ময়কর এই চন্দ্র অভিযান নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখা হয়েছে, ইতোমধ্যে অনেক বই বাজারে বেরিয়েছে। এবার দেখা গেল চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্র তিন মহাকাশচারী আর্মস্ট্রং, অলড্রিন ও কলিন্সের তোলা। চন্দ্র অভিযানে তাঁদের তোলা ছবিগুলিকে সম্পাদিত করে টয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স এই চলচ্চিত্রটির মুক্তি ঘটিয়েছে। ছবিটিতে আছে ফ্লোরিডা থেকে কিভাবে এবং কখন স্যাটার্ন—৫ রকেট মহাকাশে উঠলো, কি-ভাবে প্রথম পর্যায় রকেটকে ছেড়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় চন্দ্রলোকের দিকে উঠে গেল। অসীম আকাশে রকেটের নীল

আল্পনরেখা কি সুন্দর! মহাকাশে ভার-শূন্য অবস্থায় রুটির ওপর অন্য খাবার মাখানো ও কোটার ভেসে বেড়ানো দেখে মনে হবে কোন যাদুকরের যাদুখেলা দেখছি। আর রোমাঞ্চ জাগবে আর্মস্ট্রং-এর নির্বিকার বসে থেকে কথাবলা শুনলে! তার পরে কলম্বাস থেকে ঈগলের আলগা হয়ে চাঁদের মাটিতে নামা এবং হেসে বেড়ানো দেখে যেমন বিস্ময় জাগবে, তেমনি হাসি হাসবে হাঁটার ধরণ দেখে। আবার কলম্বাসে ফিরে আসা এবং পৃথিবীর বায়ুস্তরে প্রবেশ করার আগে ঘুড়ির মত দুলতে দুলতে চলা তারপরে প্রশান্ত মহাসাগরে নামা এবং সেখান থেকে উদ্ধার পর্যন্ত ছবিতে দেখান হয়েছে। মানুষের এই বৈজ্ঞানিক সাফল্যের ইতিহাস স্বচক্ষে দেখে রাখা ভাল, তা জীবনের মস্তবড় একটা স্মৃতি এবং শিক্ষা। এদিক থেকে ছবিটি সকলের দেখা উচিত।

অবশ্য ছবিটিতে কলম্বাস থেকে ঈগলের আলাদা হওয়া, মহাকাশচারীদ্বয়ের ঈগলের মধ্যে চলে আসা, চাঁদে কি করে অবতরণ করল এবং চাঁদ থেকে উঠার মুহূর্ত এবং মহাসাগরের জলে নামবার দৃশ্যগুলি দেখান হয় নি। সম্ভবত এগুলি আমেরিকার বৈজ্ঞানিক অভিযানের গোপন দিক, তাই দেখান হয় নি। ছবিটির সঙ্গে ইংরেজীতে কমেন্টারী রয়েছে এবং জুলে ভার্নের কল্পনার সঙ্গে তুলনা করে এই কমেন্টারী চলেছে।

ইয়ং জার্মান ছবি

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ, ম্যাক্সমূলার ভবন এবং পশ্চিম জার্মানীর কনস্যুলেট জেনারেলের যুক্ত উদ্যোগে পশ্চিম জার্মানীর এক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন হয়েছে। এই উৎসবে যে ছবি দেখান হবে সেগুলি 'ইয়ং জার্মান ছবি' রূপে চিহ্নিত। নতুন পরিচালকদের ভাব-ভাবনা এই ছবিগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। নির্বাচিত সাতটি ছবির মধ্যে কয়েকটি পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিও রয়েছে। এই ছবিগুলি দেখান হবে জ্যোতি সিনেমায় আগামী ৭ই নভেম্বর হতে ২০শে নভেম্বর। নির্বাচিত ছবিগুলিঃ (১) ইউ আর এ ম্যান মাই বয়, (২) লাস্ট ফর লাভ, (৩) কাম টু দি পয়েন্ট—ডারলিং, (৪) টাট্টু, (৫) ওয়াইল্ড রাইডার লিঃ, (৬) সাইনস্ অব লাইফ, (৭) দি আর্টিস্ট আন্ডার দি বিগ টপঃ ডিসওরিয়েন্টেড।

নাটকের কথা

জন্মভূমি

থিয়েটার ইউনিটের নতুন নাটক 'জন্মভূমি' সম্প্রতি কলকাতা মেলা উপলক্ষে অভিনীত হয়েছে। এই নাটকটি বিষয়বস্তুর বাস্তবতায়, বক্তব্যের গভীরতায় ও বিশ্লেষণশক্তিতে সাম্প্রতিককালের সেরা নাটকগুলির শীর্ষস্থানে স্থান পাবার যোগ্য। 'জন্মভূমি'-র সার্থকতার অন্যতম কৃতিত্ব শিল্পীদের। তাঁদের সমবেত ও একক অভিনয় এই নাটকে প্রাণসঞ্চার করেছে। যাঁরা গ্রামের জীবনের সঙ্গে পরিচিত তাঁদের মনে হবে যেন গ্রামের শোষক ও শোষিত লোকগুলিকেই গ্রাম থেকে মঞ্চে তুলে আনা হয়েছে। নাটকের পরিচালক বিখ্যাত নট ও নাট্যকার শেখর চট্টোপাধ্যায়। নাটকটির রচনা তাঁরই। সময়োপযোগী এই নাটক রচনার জন্য তিনি অভিনন্দন লাভ করবেন।

ফিল্মস ওরিয়েনটালের 'দ্য ড্যান্স অব বেঙ্গল' ছবির একটি দৃশ্য

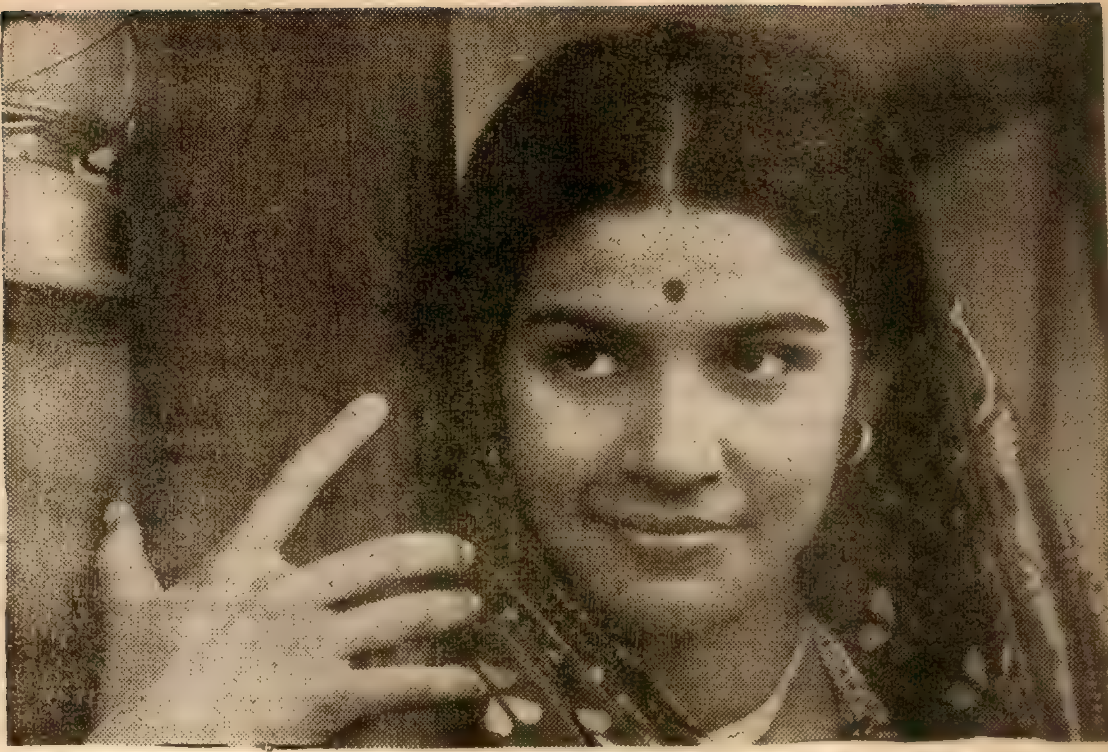

মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' ছবিতে সুহাসিনী মুলে

জন্মভূমি' নাটকে স্বাধীনতোত্তর বিশ বছরের পরে গ্রামের জীবনের চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। জমিদারী প্রথা উঠে গেছে কিন্তু জোতদাররা শক্তিশালী হয়েছে, কৃষকরা হয়েছে নিঃস্ব। মধ্যচাষী হয়েছে ভাগচাষী, ভাগচাষী হয়েছে ক্ষেতমজুর। নতুন কিছু হবার মধ্যে হয়েছে বি-ডি-ও অফিস এবং গ্রামে এসেছে সরকারী আমলারা। এতদিন ছিল জমিদার আর পুলিশের আঁতাত; এখন জোতদার, পুলিশ আর বি-ডি-ও'র আঁতাত আরো হিংস্র, আরো নিষ্ঠুর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামে গেলে মনে হবে সভ্যতার বাইরে কোন আদিম সমাজে যেন প্রবেশ করা হয়েছে। সেখানে মানুষ এই অত্যাচারী শক্তির নিষ্পেষণে মুখ বুজে মরছে। ভাগ্যকে দোষ দিয়ে ভগবানের করুণার আশায় অপেক্ষা করছে। এক শহুরে লেখক গ্রামে গিয়ে এই অভিজ্ঞতায় বিস্মিত হয়ে গেল। তার মনে প্রশ্ন উপস্থিত হল বিধানসভায় এত আইন-কানুন যে পাশ হয় তা কার জন্য? এই আইন-কানুনের প্রয়োগ কোথায়? হতাশার এই চরম মুহূর্তে সে বাঁচার সংগ্রামও দেখল। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ক্রমে ক্রমে গ্রামের মানুষের মনে বল-ভরসা জাগিয়ে তুলছে। একদিন এই মূক মানুষগুলি কথা কয়ে উঠল। আর দেখা গেল সরকারী সব আমলাদের মধ্যেও দু-চারজন বিবেকবান মানুষ আছে—যারা আইনকে কার্যকরী করতে গিয়ে জোতদার ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের রোষে পড়ে। তাদের মধ্যেও এমন মানুষ আছে যারা পরাজয় স্বীকার করে না। কৃষকরা যখন প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠলো, জমির ধান নিজের ঘরে তোলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হল। সে সময় হিন্দু, মুসলমান জোতদাররা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে কৃষকদের ঐক্যকে ব্যাহত করল। সাময়িকভাবে চাষীরা পরাস্ত হল বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতার আগুনে নতুন করে ঐক্যবদ্ধ হল—সংগ্রামের মশাল জেলে।

এই নাটকে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর মত বর্তমান কালের গ্রামের জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। যা দেখে অনুমান করা যাবে গত কুড়ি-একুশ বছরে গ্রামগুলির কি চেহারা হয়েছে। আর কেন আজকে গ্রামের সর্ব-নিম্নস্তরের চাষীর মধ্যে এতটা চাঞ্চল্য, এতটা উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। কোন শক্তিতে চাষীরা লাঠি হাতে জোতদার ও পুলিশবাহিনীর মোকাবিলা করছে। কৃষকের জীবনের মনের কথা, তার বেদনা ও অভিজ্ঞতা এই নাটক তুলে ধরেছে শহরের মানুষের কাছে। প্রশ্ন উঠবে—নাটকের সমাপ্তি হল দাঙ্গা ও কৃষক নেতার গ্রেপ্তারে, কিন্তু আজকের বাস্তবতা কি তাই? এই প্রশ্ন সঙ্গত। কিন্তু গ্রাম-বাংলার সামগ্রিক অবস্থা দেখাতে গেলে আজও কৃষকের চেতনার স্তর সমান নয়। তার অধিকারের চেতনাকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করছে গ্রামের ও শহরের শোষক-শ্রেণী। সুতরাং এই গ্রামের জীবনের পরিসমাপ্তিতে জঙ্গী সংগ্রাম যেমন দেখান চলত, সংগ্রামকে ব্যর্থ করার চক্রান্ত ও পুনঃ ঐক্যবদ্ধ হবার চিত্রও বাস্তবসঙ্গত। বরঞ্চ শোষকশ্রেণীর চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্কতা অনেকাংশে ভাল। গ্রামের জীবনকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য গ্রাম-বাংলার লোকসংস্কৃতি ও সঙ্গীত প্রয়োগ নাটকের উপভোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। এই সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি।

নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘৃণা ও ক্রোধের পাত্র হয়েছে রহিম জোত-দার। এই চরিত্রের অভিনেতা যেভাবে চরিত্রটিকে প্রকাশ করেছেন তাতে বিস্মিত হয়ে গেছি। পোষাকে, চলনে, বলনে সে সত্যই গ্রামের এক অশিক্ষিত জোতদার। তার শয়তানী হাসি, ঘাড় কাত করে থাকা কুটিল চাহনি এবং স্বভাবের নিষ্ঠুরতা অভিনেতা যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে মঞ্চে আর কারো পক্ষে সম্ভব কিনা বার বার সে প্রশ্ন জেগেছে। তারপরেই শয়তানীতে সমান হরি সাহার চরিত্রটি সমদক্ষতায় প্রকাশ করা হয়েছে।

এ দু'জনকে দেখলেই দর্শকরা মুগ্ধ হয়েছেন। চরিত্র দুটির সার্থকতা এখানেই। হেড মাস্টারের চরিত্রটি যথাযথ অভিনীত, তবে এই চরিত্রটিকে হিন্দু করা উচিত ছিল। কারণ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে শিক্ষা-জীবনে হিন্দুদেরই প্রাধান্য। জনসংখ্যানুপাতের দিক থেকেও এই চরিত্রটিকে হিন্দু দেখান উচিত। সরকারী অফিসের চিত্রটি নিখুঁত। এই অফিসের সহকারী অফিসারটিকে গ্রামের মানুষ হাড়ে হাড়ে চেনেন। তবে বি-ডি-ওর মত মানুষ চোখে কম পড়ে। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এরকম মানুষ চোখে পড়া উচিত। এরকম যাঁরা আছেন তাঁদের কাজের প্রতিবন্ধকতা এখানে ভালভাবে দেখান হয়েছে। কৃষক পক্ষের চরিত্রগুলির মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষক, পাগলা পানু এবং অন্যান্যরা সকলেই মোটামুটি ভাল অভিনয় করেছেন। নারী চরিত্রগুলি প্রত্যেকটি সুঅভিনীত। তবে গ্রামের সেই ভ্রষ্টা নারী চরিত্রটিতে কিছুটা আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে মনে হয়। সংলাপে নয়—ভাবভঙ্গিতে।

'জন্মভূমি' নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সর্বক্ষণ আঞ্চলিক গ্রাম্য ভাষায় কথা বলেছেন এবং এ কাজটা তাঁরা প্রশংসনীয়ভাবে করেছেন। নাটকে গানগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। এই নাটক প্রযোজনা এবং পরিচালনার জন্য থিয়েটার ইউনিটের সদস্য ও শেখর চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সোভিয়েট ইউনিয়নে নাটকের নতুন মরশুম

একশ বছর আগে বিখ্যাত রুশ সমালোচক বেলিনস্কি বলেছিলেন : "রুশিয়ায় নাটকের প্রতি জনগণের ভালবাসা প্রগাঢ়"। আজকের দিনে কথাটা আরও বেশি করে সত্যি। নাটকের জন্য সোভিয়েট জনগণের ভালবাসা কখনো পুরনো হয় না। সোভিয়েট ইউনিয়নে আসন্ন নাটকের নতুন মরশুমের জন্য নাটক কম্পানিগুলি যে প্রস্তুতি চালাচ্ছে তারই এক পূর্বাভাস নিচে দেওয়া হল।

নতুন নাটকের মরশুমের প্রধান আকর্ষণ কি? এ প্রশ্নের অবধারিত উত্তর হচ্ছে : যথাযোগ্যভাবে লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা। অভিনেতা আর মঞ্চ পরিচালকেরা একে বলেন 'লেনিন মরশুম'। বিপ্লবের মহান নেতা লেনিন, তাঁর সংগ্রামের সহকর্মীবৃন্দ এবং তাঁর শিক্ষা, যাকে সোভিয়েট জনগণ কাজে রূপান্তরিত করছেন তাই নিয়ে নাটকের পরিকল্পনা চলছে। সোভিয়েট নাটক যে সত্য, স্বাধীনতা, মানবতা, জীবনে, মানুষে ও ভবিষ্যতে বিশ্বাসের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে এ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর একটি আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে পোলাণ্ডের নাটকের উৎসব। সোভিয়েট ও পোলিশ পরিচালকেরা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্নস্থানে পোলিশ নাটক মঞ্চস্থ করছেন এবার। এ ধরণের উৎসব দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শের সমন্বয়ের পতাকা উচ্চে তুলে ধরে এবং সোভিয়েট জীবনে এ ধরণের উৎসবের ঐতিহ্য বহুদিনের।

নতুন মরশুমের নতুন নতুন নাটকের নাম অল্পদিনের মধ্যেই পোস্টারে দেখা যাবে। ভাখতানগোভ থিয়েটার বিখ্যাত নাট্যকার আলেকজান্দার করনেইচুকের "হৃদয়ের স্মৃতি" মঞ্চস্থ করবে। সোভিয়েট জনগণের বর্তমান জীবনের ওপর লেখা এই নাটকটি পরিচালনা করছেন প্রখ্যাত সোভিয়েট অভিনেতা ও পরিচালক রুবেন সিমোনোভের পুত্র এভগেনি সিমোনোভ। এভগেনি সিমোনোভ এর পরে গ্যেটের "ফাউস্ত" মঞ্চস্থ করবেন। একদল ভ্রাম্যমাণ অভিনেতা নাটক অভিনয় করছে এইভাবে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হবে। শোনা যায় গ্যেটে নাকি স্বয়ং এইভাবে তাঁর নাটকটি মঞ্চস্থ করার কল্পনা করেছিলেন।

চেকোভ এখনও সোভিয়েট শিল্প ও শিল্পীদের সর্বক্ষণের সংগী। কেন্দ্রীয় সোভিয়েট সেনাবাহিনীর থিয়েটার "খুড়ো ভানিয়া" নাটক মঞ্চস্থ করছে।

গোগল ও ওসত্রোভস্কিকে বাদ দিয়ে রুশিয় নাটক কখনো কল্পনা করা যায় না। আসন্ন নাটকের মরশুমে স্যাটায়ার থিয়েটার মঞ্চস্থ করছে "ইন্সপেক্টর জেনারেল" এবং পুশকিন থিয়েটার করছে "অরণ্য"। বিখ্যাত সোভিয়েট অভিনেতা ইগোর ইলিনস্কি একদিন "অরণ্য" নাটকে অরকাদি সচাস্তলিভৎসেভের ভূমিকায়

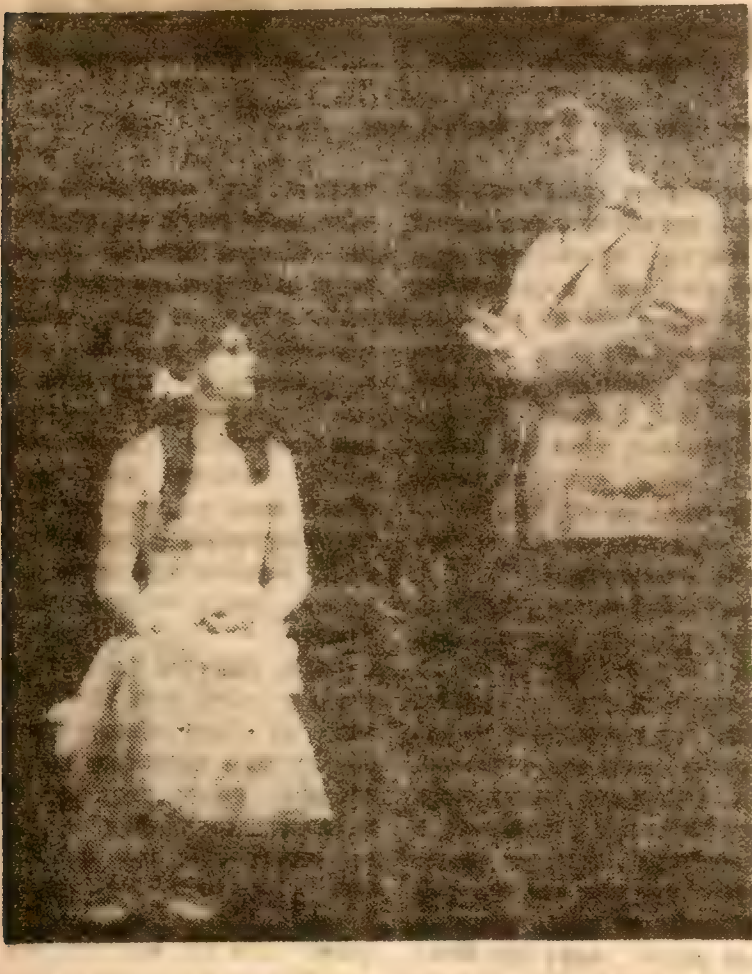

[illegible] "[illegible]" নাটকের একটি দৃশ্যে লিনা [illegible] ভূমিকায় এম, [illegible] এবং [illegible] চরিত্রে এম, [illegible]।

অভিনয় করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে-ছিলেন। পঁয়তাল্লিশ বছর পরে আবার তিনি সেই নাটকে সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন।

অতীতের শিল্পগত ঐতিহ্যকে সোভিয়েট নাটক সর্বদাই মূল্যবান বলে গ্রহণ করেছে। গোগল ও ওসত্রোভস্কির পাশাপাশি সোভিয়েট ইউনিয়নে শেক্স-পীয়রের "রোমিও ও জুলিয়েট" এবং শিলারের "ডি রাউবের" হবে এবারের নাটকের অন্যতম আকর্ষণ।

আধুনিক নাটকের ক্ষেত্রে মায়াকো-ভস্কি থিয়েটারে এ ফাদায়েভের "ছত্রভঙ্গ" এবং এ তলস্তয়ের "অগ্নি পরীক্ষা" মঞ্চস্থ করে রুশ-বিপ্লবের সেই প্রথমদিকের [illegible] পূর্ণ কঠিন ঝোড়ো [illegible] সজীব করে তুলবে।

[illegible] বছর হচ্ছে নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ের ২৫তম বার্ষিকী। মালি থিয়েটার এবং কেন্দ্রীয় সোভিয়েট সেনাবাহিনীর থিয়েটার যথাক্রমে কে সিমোনোভের "এ্যান্ড সো ইট উইল বি" এবং ভি তুর ও ভি এগোরোভের "এ্যাট দ্য টাইম ইন তেহরান" মঞ্চস্থ করে সেইদিনের ঘটনাবলী দর্শকের সামনে তুলে ধরতে চলেছেন।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একসূত্রে গাঁথা হয়ে নতুন নাটকের মরশুমে মঞ্চে পুনর্জীবন ও জীবন লাভ করবে।

নান্‌হা ফরিস্তা’ ছবিতে বেবী রাণী

সংবাদ-কনা

আবাদ

গত ২৫শে অক্টোবর টাকী ঘোষবাবুর বাড়িতে শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাসের নাটক ‘আবাদ’-এর অভিনয় করলেন টাকী ‘সুব-গোষ্ঠীর’ শিল্পিবৃন্দ। কয়েকজন শিল্পীর অভিনয় দর্শকমন্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। আলোকসম্পাত ও দৃশ্যসজ্জা আশানুরূপ। সুঅভিনয়ে অজয় মুখো-পাধ্যায়, রঞ্জিত বসু, বাবলা রায়চৌধুরী, বিভূতি চ্যাটার্জী, প্রদীপ দে, সুমঙ্গল দে, জহর রায়চৌধুরী, চিত্ত চ্যাটার্জী, রমাপদ চ্যাটার্জী, তুষার রায়, গীতা চক্রবর্তী, সংহিতা সেনগুপ্তা প্রমুখের নাম উল্লেখ-যোগ্য। অধীর চট্টোপাধ্যায়-এর অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীচৈতন্য

কলকাতা মেলার নয়দিনব্যাপী উৎসবের পরিসমাপ্তি হল গত ২৩শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার। এই দিনকার বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল মহাজাতি সদনে ভারতীয় শিল্পী পরিষদের ৩০০ রজনী অতিক্রান্ত চিরনতুন নৃত্যনাট্য "শ্রীচৈতন্য"। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী ডঃ করণ সিং কলকাতা মেলা পর্যবেক্ষণ করবার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি একটি মাত্র অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন আর তা হল ভারতীয় শিল্পী পরিষদের "শ্রীচৈতন্য" নৃত্যনাট্য। মুগ্ধ বিস্ময়ে তিনি সেদিন আগাগোড়া "শ্রীচৈতন্য" দেখেছেন। অভিনয় শেষে শিল্পীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি তাঁদের অভিনন্দন জানান।

একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

ফিল্ম এন্ড থিয়েটার আর্কাইভস্ অব ইন্ডিয়া অনুমোদিত এবং শ্রীনাট্যম সুভাষ মঞ্চ পরিচালিত দ্বিতীয় বার্ষিক শিশির-কুমার একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা আগামী ১১ই ডিসেম্বর থেকে ব্যারাকপুরের জাফর-পুর রোডে অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতি-যোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ১১ই নভেম্বর। বিচারকমন্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের পুরস্কার দেওয়া হবে। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে। আর্কাইভস্ কার্যালয়, ৮১ বিধান সরণি, কলিঃ-৪। শৈলেশ মুখার্জী, পানশিলা গভর্নমেন্ট কলোনী, সোদপুর, ২৪ পরগনা। শ্রীনাট্যম চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা।

আবিষ্কার

গত ২৩শে অক্টোবর বেলঘরিয়ার অরূপ গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করল রঞ্জিত সরকারের ‘আবিষ্কার’ নাটক। নাটকের মধ্যে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের দল-গত অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। অভি-নয়ে ছিলেন—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ গাঙ্গুলী, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, অশোক গুহরায়, তপনকুমার বসু, বরুণ মুখোপাধ্যায়, সোমেশ রায়, রঞ্জিত সরকার, সমীর মুখার্জী, বিভাস ঘোষাল, দীপক মুখোপাধ্যায়, অমিয় মুখোপাধ্যায়, অমল্য চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর দত্ত ও সুকান্ত শী। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নাটকটি দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছিল।

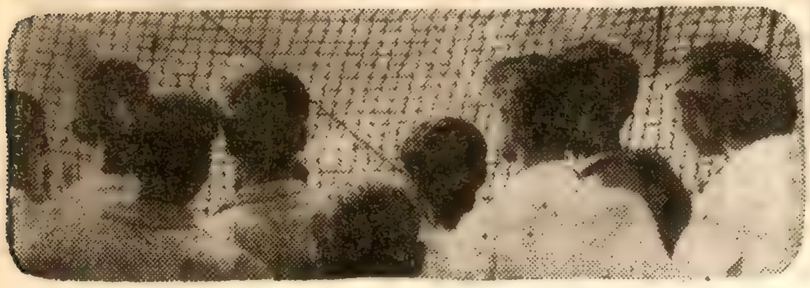

খেলাধুলা

টিকিট চাই টিকিট নাই

ডিসেম্বর মাসের বারো তারিখ থেকে কলকাতায় আরম্ভ হবে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ। বোম্বাই, কানপুর আর দিল্লী টেস্টের পর টেস্ট ক্রিকেটের আসর ঝিমিয়ে পড়বে—না ক্রিকেটানন্দে আর উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে তা বোধহয় এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে একটা কথা চোখ বুজেও বলা চলে যে, আগের তিনটি টেস্টের ফলাফল যাই হোক না কেন হাজার মাথা খুঁড়ে মরলেও কলকাতা টেস্টের একটা টিকিট সংগ্রহ করা বোধহয় সাধারণ ক্রীড়ারসিকদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। টিকিট টিকিট করে, সেই একই রব উঠবে এবারও। কিন্তু ক্রিকেট-রসিকদের সেই ব্যর্থ হাহাকারের উত্তরে আকাশে বাতাসে শুধু একই কথা ধ্বনিত হবে—টিকিট চাই...টিকিট নাই...। কলকাতা ময়দানে ফুটবল কিম্বা ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে এই রব আর নতুন নয়। প্রতি বছরই আমরা শুনি এমনই হাহাকার আর প্রতি বছরই আমরা ক্রীড়ারসিকদের দেখি খেলা দেখার সুযোগ না পাওয়ায় ব্যর্থতার জ্বালায় জ্বলতে। কিন্তু এর কি কোন প্রতিকারই নেই। সত্যিকারের ক্রীড়ারসিক—যাদের পেছনে বড় ক্লাব কিম্বা মামার জোর নেই তাঁরা কি কিছুতেই পাবেন না কলকাতায় অনুষ্ঠিত বড় খেলাগুলোর দেখার সুযোগ? অথচ মাঠে গেলে দেখা যাবে কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বাড়ির বাচ্চারাও খেলা দেখতে এসেছে চাকর কিম্বা ঐ ধরণের কারো সংগে। তারা যদি খেলা দেখতে আসতো তাহলে আমাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু তারা যে কি করতে আসে তা তো আজ সকলেরই জানা। আর দুঃখ সেই জন্যেই। এর কি সত্যিই কোন প্রতিকার নেই?

এই বিষয়টির প্রতি আমরা মুক্তকণ্ঠ সরকারের এবং ক্রীড়ামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ক্রীড়ামন্ত্রী মহাশয় মন্ত্রী হবার পর আমাদের উদ্দেশে বিতরণ করেছিলেন অনেক নরম-গরম বাণী। হাজার বার শোনা কথাগুলো আমরা আবার নতুন মুখে শুনেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেনো জলে ভেসে গেল সব কিছুই। হবে হ বে করেও এই ন' মাসে কিছুই হলো না। থাক সে কথা। ও দুঃখ আমাদেরই থাক। আজ ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট লড়াই-এর পূর্ব মুহূর্তে আমরা শুধু ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে একটি বিষয়ে আবেদন জানাই—আমরা চাই ক্রীড়ামন্ত্রী নিজে এগিয়ে এসে সাধারণ ক্রীড়ারসিকদের খেলা দেখার ব্যবস্থা করে দিন। এমন একটা ব্যবস্থা করা হোক যাতে সাধারণ ক্রীড়ারসিকরাও খেলা দেখার সুযোগ পান—আর সেই সংগে সবাকে চেষ্টা করুন খেলা নিয়ে ব্যবসা করার হীন প্রচেষ্টাকে। —শান্তিপ্রিয়॥

ক্রিকেটের খবর

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের ভারত সফর শুরু হবার সংগে সংগেই দলের অধিনায়ক বিল লরী বলেছেন যে, তিনি চান তাঁর দল প্রত্যেকটি খেলাতেই

॥ পাতৌদি ॥

শেষ পর্যন্ত পাতৌদির ওপরই পড়লো অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের নেতৃত্বভার।

জিতুক। তিনি আরো বলেছেন যে, ভারতের মাটিতে ভারতের সংগে পাল্লা দেওয়া বেশ শক্ত। তবে তাঁর দল খুবই শক্তিশালী আর দলের খেলোয়াড়দের ওপর তাঁর আছে পূর্ণ আস্থা। তাই তিনি মনে করেন যে, অস্ট্রেলিয়া প্রত্যেকটি খেলাতেই জেতার জন্যে চেষ্টা করে খেলবে।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছে লরীর এই মন্তব্য রীতিমত চ্যালেঞ্জই। দেখা যাক ভারত এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত কি করতে পারে।

তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অস্ট্রেলিয়া দলটি এবার খুবই শক্তিশালী। দলে আছেন লরী, ওয়ালটারস, রেডপাথ, সিহান, চ্যাপেল প্রমুখের মতো নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। এঁদের ব্যাটিং ভারতীয় দর্শকদের যেমন দিতে পারবে নির্মল আনন্দ তেমনি নিজেদের দলকে অনেক রান সংগ্রহের পথে এগিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

বোলিং-এও অস্ট্রেলিয়া দলটি কম শক্তিশালী নয়। গ্লিসনের স্পিন বোলিং, চ্যাপেল আর স্ট্যাকপোলের লেগ ব্রেকের আর গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জির ফাস্ট বোলিং-এর ওপরই অস্ট্রেলিয়া দলটি অনেকাংশে নির্ভরশীল। তবে এ কথা ঠিক যে স্পিন বোলারদের চেয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের অনেক বেশি বিব্রত করবে ম্যাকেঞ্জির ফাস্ট বোলিং।

অস্ট্রেলিয়ার সংগে সমানে সমানভাবে পাল্লা দিতে হলে ভারতীয় দলের ফিল্ডিং আরো অনেক উন্নত করতে হবে। নিউজিল্যাণ্ডের কংডন কিম্বা টারনারের একটা ক্যাচ ফেলে দেবার মধ্যে যতোখানি তার চেয়ে অনেক বেশি খেসারত দিতে হবে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যদি লরী, ওয়ালটারস, রেডপাথ, চ্যাপেল প্রমুখের মতো ব্যাটসম্যানদের ক্যাচ ফেলে দেন। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা মারকুটে—জোরে জোরে মারতেই তাঁরা অভ্যস্ত। তাই ফিল্ডিং করতে নেমে ভারতীয় খেলোয়াড়দের আরো অনেক বেশি তৎপর হতে হবে, অনেক বেশি ক্ষিপ্র হতে হবে।

ভালো ফিল্ডিং করার ওপরই ভারতীয় দলের সব কিছু নির্ভর করছে। কারণ লরী যাই বলুন না কেন খেলার সময় দেখা যাবে যে, অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা প্রসন্ন, বেদী কিম্বা ভেঙ্কটরাঘবনের বল যথেষ্ট সমীহ করে খেলছেন। আর তার সুযোগই ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিতে হবে পুরোপুরিভাবে।

যাই হোক নিচে অস্ট্রেলিয়া দলের সম্পূর্ণ সফরসূচী দেওয়া হলো :

পশ্চিম অঞ্চলের সংগে : পুনায় (৩১শে অক্টোবর, ১ ও ২রা নভেম্বর)

প্রথম টেস্ট : বোম্বাই (৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯ই নভেম্বর)

মধ্য অঞ্চলের সংগে : জয়পুরে (১১, ১২ ও ১৩ই নভেম্বর)

দ্বিতীয় টেস্ট : কানপুর (১৫, ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০শে নভেম্বর)

উত্তর অঞ্চলের সংগে : জলন্ধরে (২২, ২৩ ও ২৪শে নভেম্বর)

নিউইয়র্ক অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্যে নানাভাবে টাকা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিছুদিন আগে মেয়েদের একটি দলের সংগে পুলিশ দলের ফুটবল খেলার আসর বসেছিল। মেয়েদের সংগে ছেলেদের ফুটবল খেলা দেখতে সেদিন মাঠ ভেঙে পড়েছিল দর্শকে। ফলে মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও...। ছবিতে খেলা আরম্ভের আগে দু' দলের অধিনায়ককে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা যাচ্ছে।

তৃতীয় টেস্ট : দিল্লী (২৮, ২৯, ৩০শে নভেম্বর, ২ ও ৩রা ডিসেম্বর)

পূর্ব অঞ্চলের সংগে : গৌহাটি (৬, ৭ ও ৮ই ডিসেম্বর)

চতুর্থ টেস্ট : কলকাতা (১২, ১৩, ১৪, ১৬ ও ১৭ই ডিসেম্বর)

দক্ষিণ অঞ্চলের সংগে : বাঙ্গালোর (২০, ২১ ও ২২শে ডিসেম্বর)

পঞ্চম টেস্ট : মাদ্রাজ (২৪, ২৫, ২৭, ২৮ ও ২৯শে ডিসেম্বর)

ফুটবল-ফুটবল

কুয়ালালামপুরে এখন বসেছে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর। ইন্দার সিং-এর নেতৃত্বে ভারতীয় দল ইতিমধ্যেই খেলতে আরম্ভ করেছে। ভারতীয় দলে এবার আছেন—গোল : সিলিটিন (মাদ্রাজ), বলাই দে (বাংলা)

ব্যাকস : ভবানী রায় (বাংলা), সৈয়দ নায়িমুদ্দীন (বাংলা), সি প্রসাদ (বাংলা), কে এস রাজু (মাদ্রাজ), নগেন্দ্রন (মহীশূর), খৈরুদ্দীন (সার্ভিসেস)

হাফ ব্যাকস : গুরুকৃপাল সিং (পাঞ্জাব), রণজিৎ সিং থাপা (মহারাষ্ট্র) ও আবদুল লতিফ (বাংলা)

ফরোয়ার্ডস : ইন্দার সিং (পাঞ্জাব—অধিনায়ক), অমর বাহাদুর (মহারাষ্ট্র), মহম্মদ হাবিব (বাংলা), মগন সিং (রাজস্থান), ভুপেন্দার সিং রাওয়াট (মহারাষ্ট্র) ও পি গাঙ্গুলী (বাংলা)

চুম্বক

সম্প্রতি লণ্ডনে টেনিস বলকে ব্যাঙ্কের চেক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ডেভিস কাপের আন্তঃআঞ্চলিক খেলায় ব্রেজিলকে পরাজিত করার জন্য ইংলণ্ডের বিজয়ী খেলোয়াড়রা মোটা অঙ্কের বোনাস পেয়েছেন। বৃটিশ দলের উদ্যোক্তা রথম্যানস ২০৫ স্টার্লিং (৪,৫০০ টাকা)-এর একটি চেক টেনিস বলের ওপর লিখে দেন।

উইম্বলেডনের একটি ব্যাঙ্ক 'বলে' লেখা চেকের টাকা দিতে রাজী হয়েছেন।

—নির্মলকুমার ঘোষ
গোমস্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি

পাঠকের কলম থেকে

আজকের ভারতীয় ক্রিকেট দলের অবস্থা

পরিতোষ নাগ

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং অনেক ক্রিকেট অনুরাগী নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলকে শক্তিহীন বলে মনে করেছিলেন। এবং অনেকে দলটিকে একেবারে আমলই দিতে চান নি।

কিন্তু নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট টীম তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের শক্তি ভারতের চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং ভারতের চেয়ে একটু বেশি।

প্রথম টেস্টে ভারত জয়ী হয়েছিল ৬০ রানে। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যান্ড ভারতকে হারিয়ে দিয়েছে ১৬৭ রানে। তৃতীয় টেস্টে যদি মাঠে দর্শক হামলা, বৃষ্টি এবং ভারতীয় ক্রিকেটের হর্তাকর্তারা যদি তাঁদের মন্থর গতি বজায় না রাখতেন, তবে হয়তো নিউজিল্যান্ড তৃতীয় টেস্টে জয়ী হয়ে ভারতের হাত থেকে রাবার ছিনিয়ে নিতে পারতো।

তৃতীয় টেস্টে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং-এর দিকে চেয়ে এই কথাটাই বার বার মনে হয়েছে যে, ভারতীয় দলের ব্যাটিং-এর কোন মান নেই। যদি তাই থাকে, তবে তারা দু' ইনিংসেই এমন ব্যর্থতার পরিচয় দেন কি করে? যে পাতৌদির নবাবকে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানরূপে তুলে ধরা হয়, সেই পাতৌদির নবাব মনসুর আলী খাঁ কি পেরেছেন তাঁর নাম অনুযায়ী খেলতে? যখন দলের অবস্থা সঙ্কটজনক তখন তিনি কি আদর্শ কাণ্ডারীর (প্রথম টেস্ট ম্যাচ ছাড়া অন্য দুটি টেস্টে) মত হাল ধরতে পেরেছিলেন? দলের অন্যরা যখন হতাশ করেছেন তখন পাতৌদিও তাঁদের অনুসরণ করেছেন। তবে অন্যদের সাথে অধিনায়কের যে তফাৎ তা রইল কোথায়।

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্তারা নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে টেস্ট খেলায় নতুনদের হাতে খড়ি দিয়ে ভালই করেছেন। কিন্তু তাঁদের দিয়ে বোধ হয় অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে লড়াই করা যাবে না। তাই কর্তাদের উচিত অভিজ্ঞ পুরোনোদের দিয়ে দল পুষ্ট করা। অবশ্য দলে এক-আধজন নতুনদেরও নেওয়া উচিত। চান্দু বোরদে, হনুমন্ত সিং, দিলীপ সারদেশাই এবং চন্দ্রশেখরকে নতুনদের সাথে বাজিয়ে নেওয়াটি কি খুব খারাপ কাজ হবে?

এবার আমাদের বোলিং-এর বিষয় কিছু বলা যাক। আমাদের স্পিন বোলাররা সত্যিই শক্তিশালী। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টে একজনও পেস বোলারকে স্থান দেওয়া হয় নি। অবশ্য দলে এক এক করে তিনজন স্পিনারকে স্থান দেওয়া হয়েছে। কেন না আমাদের কর্তাদের মতে না কি পেস বোলাররা ভারতীয় পীচে কোন কিছু করতে পারবেন না। কিন্তু কথাটা যে কতখানি খাটে তা জানি না। নিউজিল্যান্ডের বোলিং শক্তি কি স্পিনারদের দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছে?

দ্বিতীয় টেস্টে আবিদ আলী এবং সুর্তিকে দিয়ে আক্রমণ চালানো হয়েছে। তৃতীয় টেস্টে আক্রমণ চালিয়েছেন আবিদ আলী ও জয়সীমা।

এরা কি সত্যিকারের ভাল পেস বোলার? নিউজিল্যান্ডের পেস বোলার হেডলী, কিউনিস, টেলর, এবং কাওডেন কি ভারতীয় পীচে কিছুই করতে পারেন নি? তাই বলছি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট খেলায় যেন পেস বোলার সুব্রত গুহ এবং অজিত পাই-এর মধ্যে অন্তত একজনকে নেওয়া হয়। এবার সব চাইতে জরুরী কথাটাই বলছি।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট খেলায় কিছু করতে চাইলে ভারতীয় ফিল্ডিং-এর দিকে নজর দিতে হবে সবার আগে। যদি ক্যাচ ধরতে ব্যর্থতা প্রকাশ পায়, তবে অবস্থাটা যে কি হবে তা চিন্তার বাইরে। তৃতীয় টেস্টে নিউজিল্যান্ড ভারতীয় দলের মেরুদন্ডটা বাঁকিয়ে দিয়ে ভালই করেছেন, কেন না ভারতীয় দলের মেরুদন্ডটা বাঁক খাওয়ার ফলে ভারতীয় ক্রিকেটের হোমরা-চোমরাদের টনক নড়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সংগে টেস্ট খেলার ব্যাপারে একটি শক্তিশালী দল গঠন করার জন্য ২৬ জনকে নিয়ে কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে টেস্ট খেলার আগেও যদি এ রকম করা হতো তবে তা ভাল হতো না কি?

ভারত সফররত অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের ব্যাটিং শক্তির প্রধান স্তম্ভ হলেন দলের অধিনায়ক বিল লরী। ভিক্টোরিয়ার ন্যাটা ব্যাটসম্যান বিল লরীর বয়েস এখন মাত্র বত্রিশ। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি খেলে ফেলেছেন ৫০টি টেস্ট ম্যাচ। আর টেস্ট খেলায় সংগ্রহ করেছেন প্রায় সাড়ে চার হাজারের কাছাকাছি রান।

শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবেই নয়, সফল অধিনায়ক হিসেবেও লরী লাভ

পরিচীয়তে

করেছেন প্রতিষ্ঠা। এই বছরের গোড়ার দিকে গ্যারি সোবার্সের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে হারিয়ে লরীর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া লাভ করেছে ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি।

গত বছর অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের গোড়ার দিকে ভারতীয় দল যখন অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল তখনই ববি সিম্পসনের কাছ থেকে লরী বুকে নিয়েছিলেন অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব। ভারতের বিরুদ্ধে শেষ দু'টি টেস্ট ম্যাচে লরী ছিলেন অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরীর জন্ম ১৯৩৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী। ছোটবেলা থেকে লরীর মধ্যে দেখা গিয়েছিল ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। লরী প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬১ সালে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে লরী সে বছর পাঁচটি টেস্ট ম্যাচেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

যাই হোক এ পর্যন্ত মোট ৫০টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করে লরী সংগ্রহ করেছেন ৪,৪৭৮ রান। শতরানের মুখ দেখেছেন ১০ বার। আর টেস্ট খেলায় তাঁর সবচেয়ে বেশি রান হলো ২১০।

সমাচারদর্পণ

অলিম্পিকের জন্য অর্থ সংগ্রহ

যত.ই আগামী অলিম্পিকের দিন এগিয়ে আসছে ততোই নানাভাবে অলিম্পিকের জন্য টাকা তোলা হচ্ছে। এই তো কিছুদিন আগে এক মজাদার খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। পুলিশ দলের সঙ্গে মেয়েদের ফুটবল খেলা। খেলা যা হল ভগবানই জানেন, কিন্তু সেই অপূর্ব খেলা দেখতে মাঠে ভিড়ের অন্ত ছিল না। ফলে অলিম্পিকের অর্থভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ সমাগম হয়েছে। অলিম্পিক বাবদ শীঘ্রই পাঁচটি ডাকটিকিট বেরুবে। এই ডাকটিকিট থেকে কর্তৃপক্ষ চার কোটি টাকার মত যোগাড় করতে পারবেন বলে আশা করছেন। (আই সি এস)

খেলার পত্রিকা

শারদীয় অলিম্পিক

(সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯৮এ প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—তিন টাকা।)

খেলাধুলা সংক্রান্ত যে ক'টি পত্রিকা আমরা পেয়েছি তার মধ্যে শারদীয় অলিম্পিক নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। রেখায়, লেখায় আর ছবিতে ভরা এই সংখ্যাটি ছোটদের মন মাতাবে। বাংলাদেশের নামকরা ক্রীড়া-সাংবাদিক, খেলোয়াড় আর ক্রীড়ারসিকরা খেলাধুলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখেছেন।

তবে অলিম্পিকের আসল আকর্ষণ হলো তার ছবি। এবারও সে আকর্ষণ পুরোপুরি বজায় আছে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, সাঁতার থেকে আরম্ভ করে খেলাধুলার সব বিষয়েরই নানা রকম ছবিতে ছবিতে শারদীয় অলিম্পিক ছবিময় হয়ে উঠেছে।

ছবির সংগে তাল দিয়ে খেলাধুলার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখাগুলোও আকর্ষণীয়। তার মধ্যে অজয় বসুর 'পুরোনো খেলা—ভাঙা গড়া ভাঙা', কমল ভট্টাচার্যের 'নির্মল চ্যাটার্জী কেন টেস্ট খেলেন নি', রবীন সরকারের 'মুষ্টিযুদ্ধে বাঙালী', নীলিমেশ রায়চৌধুরীর 'লিসবনে ইউসেবিও', শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ক্রীড়াঙ্গনা' প্রভৃতি লেখাগুলো এক কথায় সুন্দর।

খ্যাতনামা কোচ অমল দত্তর 'চিন্তার জট, প্রশ্ন হাজারো' মধ্যে চিন্তার খোরাক বর্তমান। কোচ শচীন হালদার লিখেছেন 'ফুটবলের ক্রীড়ামান তোলা যাচ্ছে কৈ'—এই বিষয়ে। অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অনুশীলনের সুযোগ চাই' প্রবন্ধটিতে খেলাধুলার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টি আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। খেলোয়াড়দের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখেছেন—ভবানী রায়, পরিমল দে, শান্ত মিত্র প্রমুখ।

এক কথায় বলা যায় যে, পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর এবং পত্রিকাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পাদকের যত্ন ও আন্তরিকতার ছাপ বর্তমান। প্রচ্ছদটি আরো আকর্ষণীয়। জানা-অজানা, চেনা-অচেনা নানা ট্রফির ছবিতে ভরা এবারের পুজো সংখ্যা অলিম্পিকের প্রচ্ছদ।

প্রশ্ন উত্তর

ভবেন্দ্রনাথ দত্ত (মাইথন) ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (মাইথন)

উত্তর : হ্যাঁ, ও ক্ষেত্রে গোল হবে। আপনার মতে ইস্টবেঙ্গল হয়তো শিশু, আবার আর একজনের মতে হয়তো শিশুর......

অরুণকুমার কর (ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : কোন ব্যাটসম্যান এক ইনিংসে সব চেয়ে বেশি বাউন্ডারী এবং ওভার বাউন্ডারী মেরেছেন?

উত্তর : ১৯০৪ সালে চেস্টারফিল্ডে এসেক্স বনাম ডার্বির খেলায় পি পেরিন ৬৮টি বাউন্ডারী মেরেছিলেন। সেই খেলায় তিনি অপরাজিত থেকে করেছিলেন ৩৪৩ রান।

টেস্ট খেলায় ১৯৬৪ সালে লীডস মাঠে ইংলন্ডের জন এডরিচ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫টি ওভার ও ৫২টি বাউন্ডারী মেরে অপরাজিত থেকে করেছিলেন ৩১০ রান।

সব থেকে বেশি ৬ মেরেছেন নিউজিল্যান্ডের জন রিড ১৫টা—১৯৬২-৬৩ সালে ওয়েলিংটন বনাম নর্দান ডিস্ট্রিক্টের খেলায়।

টেস্ট খেলায় ইংলন্ডের হ্যামন্ড নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অকল্যান্ড টেস্টে ১০ বার ওভার বাউন্ডারী করেছিলেন ১৯৩২-৩৩ সালে।

দ[illegible]রঞ্জন দত্ত (নেতাজী বিদ্যাপীঠ, [illegible] কলোনী, পাণ্ডু, আসাম)

উত্তর : হ্যাঁ, মোহনবাগান গৌহাটিতে কয়েকবার খেলে এসেছে। কিন্তু কার বিরুদ্ধে তা বলতে পারবো না। আপনি যদি ওখানকার ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনে খবর নেন তাহ'লে মনে হয় ওঁরাই সব কিছু বিস্তারিতভাবে আপনাকে জানাতে পারবেন।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিশহর, গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটের একটি ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান করার রেকর্ডটি কার? কত রান করেছিলেন তিনি? কত সালে কার বিরুদ্ধে।

উত্তর : ৩৬৪ রান ইংলন্ডের লেন হাটন করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওভাল টেস্টে ১৯৩৮ সালে।

এক নজরে

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

এ পর্যন্ত ভারতের সংগে অস্ট্রেলিয়ার মোট ২০টি টেস্ট খেলা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে (নিজের দেশের মাটিতে ৮টি) আর ভারত জিতেছে মাত্র ২টি টেস্ট (দু'টিই দেশের মাটিতে)।

১৯৫৯-৬০ সালে কানপুর টেস্টে ভারত প্রথম জয়লাভ করে। ১৯৬৪ সালে বোম্বাই টেস্টে ভারত দ্বিতীয়বার জেতে।

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান : অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ২০১ রান ডন ব্র্যাডম্যান ১৯৪৭-৪৮ সালে এডিলেড টেস্টে।

ভারতের পক্ষে—১৪৫ রান বিজয় হাজারে ১৯৪৭-৪৮ সালে এডিলেড টেস্টে।

দু' ইনিংসেই সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ডন ব্র্যাডম্যান—১৩২ ও ১২৭ রান ১৯৪৭-৪৮ সালে মেলবোর্ন টেস্টে।

ভারতের পক্ষে : বিজয় হাজারে—১১৬ ও ১৪৫ রান ১৯৪৭-৪৮ সালে এডিলেড টেস্টে।

সর্বোচ্চ রান

ভারতের পক্ষে—৩৮১ রান ১৯৪৭-৪৮ সালে এডিলেড টেস্টে।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে—৬৭৪ রান ঐ টেস্টেই।

সর্বনিম্ন রান

ভারতের পক্ষে : ৫৮ রান ব্রিসবেনে ১৯৪৭-৪৮ সালে।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১০৫ রান কানপুর ১৯৫৯-৬০ সালে।

এক ইনিংসে সেরা বোলিং

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : রে লিণ্ডওয়াল ৪৩ রানে ৭টি উইকেট—মাদ্রাজ টেস্টে ১৯৫৬-৫৭ সালে। গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ৬৮ রানে ৭টি উইকেট মেলবোর্ন টেস্টে ১৯৬৭-৬৮ সালে। রিচি বেনো ৭২ রানে ৭টি উইকেট মাদ্রাজ টেস্টে ১৯৫৬-৫৭ সালে। ৯৩ রানে ৭টি উইকেট এ্যালান ডেভিডসন কানপুর টেস্টে ১৯৫৯-৬০ সালে।

ভারতের পক্ষে : জসু প্যাটেল ৬৯ রানে ৯টি উইকেট কানপুর টেস্টে ১৯৫৯-৬০ সালে।

একটি টেস্টে সেরা বোলিং

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১২৪ রানে ১২টি উইকেট—ডেভিডসন—কানপুর টেস্টে ১৯৫৯-৬০ সালে।

ভারতের পক্ষে : ১২৫ রানে ১৪টি উইকেট—জসু প্যাটেল—কানপুর টেস্টে ১৯৫৯-৬০ সালে।

শত রান

ভারতের পক্ষে এ পর্যন্ত ৯ জন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী করেছেন। এর মধ্যে দেশের মাটিতে ৩ ও ৬টি অস্ট্রেলিয়ায়।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এ পর্যন্ত ২১ জন খেলোয়াড় ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী করেছেন। এর মধ্যে ১৪টি দেশের মাটিতে এবং সাতটি ভারতে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসত্যকুমার [illegible]মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। বিশুদ্ধ সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের সারাৎসার। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবন্মুক্তি, ষড়্‌জ, হংস, মঙ্কি, গীতাসার, পিতৃ, পৃথিবী, সপ্তশ্লোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, গর্ভ, পাণ্ডব, উত্তর রাস, শ্রীমদ্‌গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমাবেশ প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকা, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, চুলকা, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ঘটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদনারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, শাট্যায়নীয়, যোগতত্ত্ব, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতকী, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—প্রতি খণ্ড—৪-০০ টাকা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ :

সামবেদের তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ। শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ। তথ্যপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন :

মহর্ষি। কপিলকৃত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈশেষিক দর্শন :

মহর্ষি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩-০০ টাকা।

জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনম্ :

॥ পরমর্ষি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও বঙ্গানুবাদ ॥

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে—পারমর্ষ সূত্র, পর্ব মীমাংসা, বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পর্বতন্ত্র, জৈমিনি সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবরস্বামীর ভাষ্যের ভাবার্থানুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের শ্লোকবার্তিক ও তন্ত্রবার্তিক টীকা-বিষয়ক পাদটীকা-সমন্বিত। পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থের দীর্ঘকালের সাধনায় অনূদিত, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য—প্রতি খণ্ড—৮-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্ :

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পুরশ্চরণ প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম্, দীক্ষাপদ্ধতি, শ্রীগুরু, মন্ত্রমালা প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা ব্রহ্মসংহিতা, অষ্টাবক্রসংহিতা, ষটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত যোগরহস্যম্, পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগ গ্রন্থের সমাবেশ, কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

Thursday, 6th November, 1969 SAPTAHIK BASUMATI REGD. No. C 71
PRICE : 30 Paise GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34—7771, 72, 73, 74

17 NOV 1969

সাপ্তাহিক বসুমতী

"পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট ও সরকারের দুই প্রধান শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসু আজ আর নতুন কোন ভাবনাই ভাবতে পারছেন না—তাই অসহায়ভাবে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছেন। ভাবনা চলেছে নিজের খেয়াল-খুশীমত। সেই আপন মনে চলা, ভাবনার সঙ্গে শরিক হচ্ছেন অন্য সকল দলের নেতা, মন্ত্রী ও সেই সঙ্গে দেশের মানুষ।"

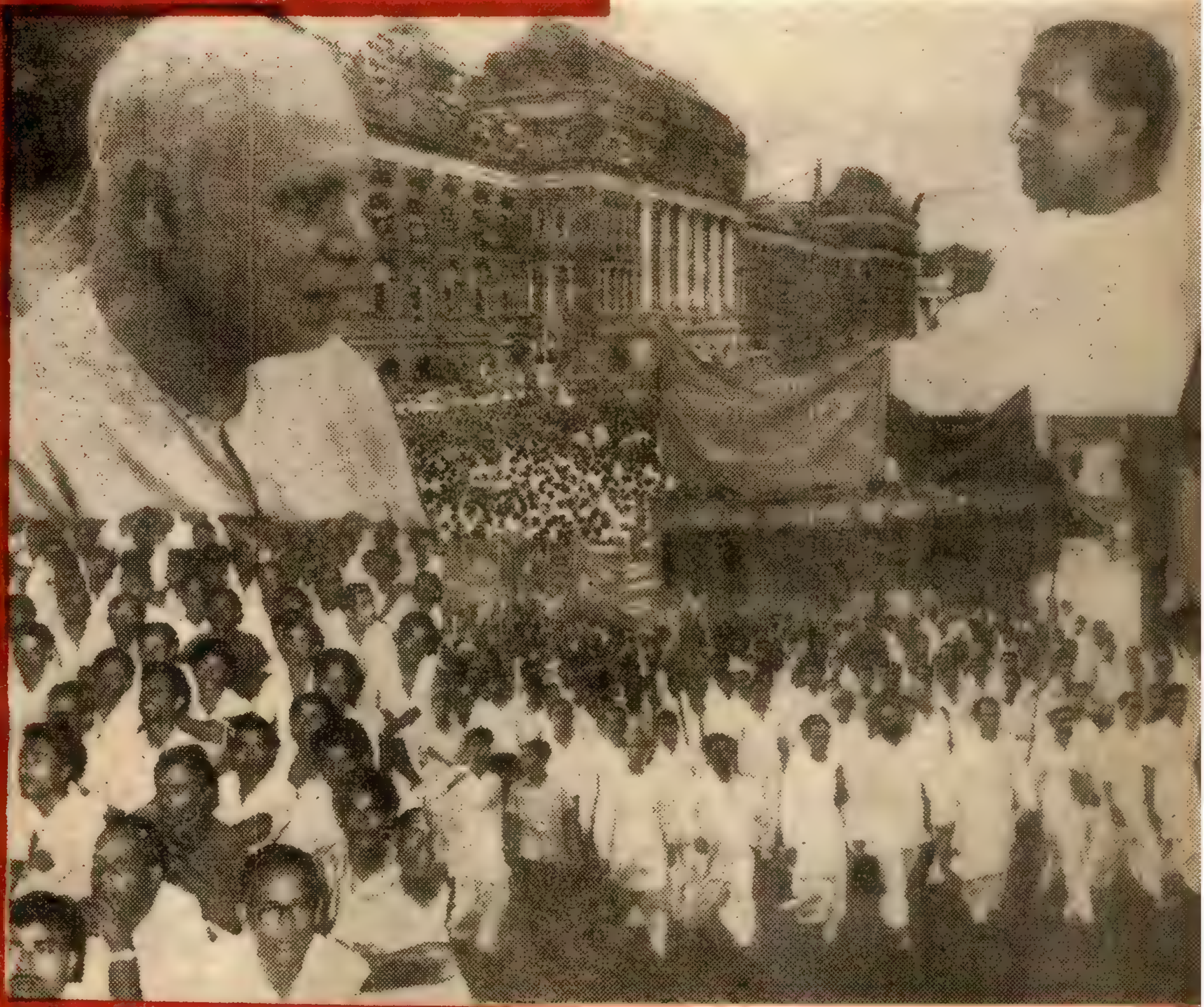

৭৪ বর্ষঃ ২০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৭শে কার্তিক, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 20, 13th Nov.,

শীতে
প্রতিদিন
বোরোলীন
ব্যবহার করুন
আপনার শুষ্ক ও বিদীর্ণ ত্বকের অমৃতস্বরূপ
এই অ্যান্টিসেপ্টিক সুরভিত ক্রীম।
বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১২১৯
আজকের আনন্দ		১২২০
স্বাস্থ্য বিভাগের প্রমোশন রহস্য	— সুনীল ঘোষ	১২২১
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১২২৫
আত্মদর্শন (কবিতা)	— সুচেতা মিত্রভট্টাচার্য	১২২৮
বঙ্গদর্শন		১২২৯
ভারতদর্শন		১২৩০
আন্তর্জাতিক		১২৩২
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	১২৩৪
স্বাস্থ্যমন্ত্রী দুর্নীতিতে সাড়া দিয়েছেন।	— নীলকণ্ঠ বাচস্পতি	১২৩৮

যে কোন

গয়না

আর

আ স ল

গ্র হ র ত্ন

কেনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন ঃ ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট

এম. বি. সরকার

এ. সরকার এন্ড সন্স

৭১/১৫ রাসবিহারী এভিন্যু

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কয়েকটি জিজ্ঞাসা	— ডঃ নরেন ভট্টাচার্য	১২৪১
স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমীপেষু	— প্রদ্যোতকুমার রায়	১২৪৬
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন প্রসঙ্গে	...	১২৪৯
মৃত্যুদণ্ড (গল্প)	— নির্মলেন্দু গৌতম	১২৫৬
তিমিরগ্রাস্ত ডুয়ার্স	— অগ্নিবর্ণ	১২৫৯
গ্রামবাংলার কথা	— অসীম মুখোপাধ্যায়	১২৬৩
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	— শিবালি	১২৬৭
রঙ্গজগৎ	...	১২৭১
খেলাধূলা	— শান্তিপ্রিয়	১২৭৬

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে ॥—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ।...... এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বায়রনের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।......বায়রনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।......নবীনবাবুর যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাকবি

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ॥ কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮।

মূল্য মাত্র সাত টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CALCUTTA
CENTRAL LIBRARY

৭৪ বর্ষ ঃ ২০শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৭শে কার্তিক, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ
বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
PRICE : 30 Paise
Thursday, 13th November, 1969

যুক্তফ্রন্ট ভেবে দেখুন

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের ওপর জনসাধারণের মোহ বোধ হয় কিছুটা ভাঙতে সুরু করছে। যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে তারা বিরূপ মত প্রকাশ করতে সুরু করলেও, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, একথাও সত্য নয়। কারণ কানু ছাড়া যেমন গীত নেই, তেমনি দেশের পক্ষে যুক্তফ্রন্ট ছাড়া গতি নেই—এটা তারা ভালোভাবেই বোঝে। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কাজকর্ম ও রীতি-নীতি কী রকম—তা জানার অধিকার তাদের আছে।

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠিত হবার পর কাজ কিছুই হয় নি, তা বোধহয় চরম শত্রুও বলবে না। তবু কাজের চেয়ে অকাজটাও কম হয় নি। যেমন শরিকী সংঘর্ষ যেন নিত্য দিনের ব্যাপার। এবং নেতৃবৃন্দ পরস্পর দলগুলিকে গালিগালাজ করে যে পরিমাণ বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে জাহাজ বোঝাই হয়ে যাবে। অথচ শরিকী সংঘর্ষ প্রতিরোধের জন্য দিনের পর দিন, এমন কি একেলা-ওবেলা বৈঠক, পর্যন্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সাত দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য কাগজে কলমে যে চুক্তি হয়েছে, তার কালি শুকোতে না শুকোতে আবার বিবাদ-বিসম্বাদের মুখরোচক সংবাদ প্রভাতী কাগজগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে আর কদ্দিন—এমন প্রশ্ন নিশ্চয়ই অবান্তর নয়। এতোদিন শুধু শরিকী বিবাদের জন্য দোষটা চুনোপুঁটিদের ঘাড়েই চাপানো হচ্ছিল, কিন্তু নেতারা নিজেরাই যদি সতর্ক না হন এবং সভা ডেকে অন্যান্য দলগুলিকে দোষারোপ করতে থাকেন, তাহলে চুনোপুঁটিদের দোষ দিয়ে লাভটা কি? শরিকী বিবাদের মূল কারণগুলি সম্ভবত এই যে, (১) এক দল অন্য দলকে ডিঙিয়ে এক এক অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়, (২) পরস্পর দলগুলির প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ, (৩) জনগণের সমর্থনকে কতোটা বেশি লাভ করছে এ বস্তুগের সভার ঐক্যবদ্ধ দায়িত্ব সম্বন্ধে চেতনার অভাব এবং (৬) কোনো মন্ত্রী তাঁর দপ্তরের কাজ পরিচালনার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ না রাখা এবং (৭) যুক্তফ্রন্টের সর্বদলীয় বৈঠকে সেই কাজ পরিচালনার আগে ব্যাপক আলোচনার ব্যবস্থা না করা।

জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা যে কাজ করবেন, তাতে যদি বাধা উপস্থিত হয় তাহলে যুক্তফ্রন্টের সর্বদলীয় সভায় তার আলোচনা হতে পারে এবং কে প্রতিক্রিয়াশীলদের সুযোগ উপস্থিত করছে এবং কেই বা জনসাধারণের জন্য প্রাণপাত করছেন—তার সুবিচার হতে পারে সেই সভায় এবং যুক্তফ্রন্টের নেতা উক্ত বিষয়ে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিতে পারেন।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, যুক্তফ্রন্টের প্রায় প্রতিটি দল অপর দলকে খুন-জখমের জন্য দায়ী করছেন এবং নিজের দলকে প্রগতিমূলক কাজকর্মের জন্য বাহবা দিচ্ছেন। এ তো হচ্ছে খবরের কাগজে প্রকাশিত বহু পচা সংবাদ। কাজ-কর্মের সফলতা যারা পাচ্ছে, তারাই বুঝছে—আসল কৃতিত্ব কার। আসল কৃতিত্ব যুক্তফ্রন্টের, যে যুক্তফ্রন্টকে জনসাধারণ গদিতে বসিয়েছে। মূলত কৃতিত্ব জনসাধারণেরই, রথ এবং পথ এদের কেউ দেবতা নয়। কিন্তু তাদের লালসা, লোভ ও আশা দেখে অন্তর্যামী হাসেন।

আর অন্তর্যামীই জানেন, মুখ্যমন্ত্রীর ওপর কোনো কোনো মন্ত্রী পদত্যাগের হুমকি দিয়ে কিভাবে রীতিনীতি বহির্ভূত কাজ করেন। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী হলেই ধোয়া তুলসী পাতা নয়। তাঁর দপ্তর সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণসহ অভিযোগ উঠলেও, যদি দলগুলি হাতে থাকে, তাহলে তাঁর এমন মনোভাব যে, কুছপরোয়া নেই। যুক্তফ্রন্ট রক্ষার খাতিরে মুখ্যমন্ত্রীও সেখানে যেন সব কিছুই সহ্য করে নিতে বাধ্য। দুর্নীতির দায়ে কেরল মন্ত্রিসভা ভেঙেছে, পশ্চিমবঙ্গেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটুক, এমন কেউ চায় না। তবু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার [illegible] চক্র স্বাস্থ্যদপ্তরের বহুদিনের পচা দুর্নীতিতে পড়ে আটকে গেছে। ফলে দুটো চাকাই গতিহীন হবার উপক্রম হয়েছে! কারণ দুর্নীতি একবার প্রশ্রয় পেলে তা সব কিছুই নষ্ট করে ফেলে। স্বাস্থ্যদপ্তরের এই দুর্নীতির জন্য আমরা ব্যক্তিগতভাবে কারো বিরুদ্ধে দোষারোপ করছি না। যেমন আমরা এখানে অন্য কোনো দপ্তরের বিরুদ্ধেও অনাবশ্যক অভিযোগ উপস্থাপিত করছি না। আমরা চাই যুক্তফ্রন্টের দুর্নীতিহীন প্রশাসন। যুক্তফ্রন্টের নেতাগণ এতোকাল ধরে সে কথাই বলে এসেছেন। আমলাদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে জনসাধারণকে বারবার সচেতন করে দিয়েছেন। আশ্চর্যের কথা তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ এখন আমলাতন্ত্রের খপ্পরে এবং স্বাস্থ্যদপ্তরের দুর্নীতি রোধ করতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যান্য মন্ত্রিদপ্তর সম্বন্ধে অভিযোগ করা দূরে থাক, আমরা সামান্য প্রশ্ন করলেও সেই দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের সন্দেহ মোটামুটিভাবে নিরসন করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যের কথা, যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর সম্বন্ধে সে কথা আমরা বলতে পারছি না। উপরন্তু পরোক্ষে এমন চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতির সংবাদ আমরা প্রকাশ না করি।

আমাদের জিজ্ঞাসা, এজন্যই কি জনসাধারণ যুক্তফ্রন্টকে গদিতে বসিয়েছে? সর্বদলীয় যুক্তফ্রন্টের কাছে আমাদের কামনা শরিকী সংঘর্ষ যেমন বিপজ্জনক, তেমনি যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রিদপ্তর কর্তৃক দুর্নীতির প্রশ্রয়দান কম বিপজ্জনক নয়। যুক্তফ্রন্টকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে মোহহীন হতে হবে এবং জনগণের স্বার্থকেই সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে অচলাবস্থার সৃষ্টি হোক—এটা কারো কাম্য নয়।

আজকের মানুষ

রাজতন্ত্রের যুগ আর নেই, অতএব রাজকবি বা সভাকবি হবার দিনও ফুরিয়েছে। রাজা-রাজড়া, বাদশা-ওমরাহ, একদিন কবি-সাহিত্যিকের ওপর যে অনুগ্রহ বর্ষণ করতেন, এদেশে তাই বা এখন কোথায়। এমন কি জমিদার ভূস্বামী সামন্ত প্রভুরাও যে দাক্ষিণ্য বিতরণ করতেন, তাও শুকিয়ে নিঃশেষিত হয়েছে। কিন্তু তবুও যদি বর্তমানে বিদগ্ধ-মহলে স্বীকৃতি মেলে যদি যশ খ্যাতি হয়, তবে তারই আনন্দে বিহ্বল হয়ে কবি তাঁর কাব্য-চর্চা করে যান। স্বীকৃতি, খ্যাতি ইত্যাদি কবিদের কাছে দুর্লভ, বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। চলতি বছরের জন্যে কবি শ্রীবিষ্ণু দে 'সোভিয়েট দেশ' আয়োজিত 'নেহরু পুরস্কার' লাভ করে তাঁর কাব্যচর্চায় নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হলেন।

বাংলাদেশের এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারির কবি বিষ্ণু দে'র কি নতুন করে খ্যাতির প্রয়োজন ছিল? খ্যাতিতে কি তাঁর কোনো ঘাটতি পড়েছিল? তা হয়তো পড়ে নি। টাকার অঙ্কে যে পুরস্কারের মূল্য নির্ধারিত হয়, সে পুরস্কারেও কোনো লোভ বিষ্ণু দে'র নেই। নগদ পাঁচ হাজার টাকা আনন্দে লাফিয়ে ওঠার মত পরিমাণ কিছু নয়; তবে নতুন দেশ সফরের আমন্ত্রণ নিঃসন্দেহে লোভজনক বিশেষ করে সৃজনশীল শিল্পীর কাছে। বিষ্ণু দে পুরস্কারের দৌলতে সোভিয়েট যুনিয়ন সফরে যাবার অধিকারও অর্জন করলেন। কবির পক্ষে সেটুকুই আসল লাভ।

কারণ আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যিকরা সত্যিই মন্দভাগ্য। ইয়োরোপ-আমেরিকার শিল্পী-সাহিত্যিকরা যত না লেখেন তার চেয়ে বহু বেশি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান। বাস্তবিক সৃষ্টি, শিল্পকে যাঁদের পেশা হিসেবে নিতে হয়েছে, ভ্রমণকেও তাঁদের নেশা করতে হয়। নিজের চোখে যত বেশি দেখা যায়, যত বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, কাব্য-সাহিত্যও তত সমৃদ্ধ হবে, বেশি মূল্যবান হবে। কারণ কবি, ঔপন্যাসিক, কাহিনীকাররা যা চোখে দেখেন তা আপন মনের মাধুরী মিশায়ে নতুন করে রচনা [illegible] সুন্দর [illegible] সামনে তুলে ধরেন।

সোভিয়েট যুনিয়ন সম্পর্কে বিষ্ণু দে'র ধারণা কিছু কম নয়, সোভিয়েটের মানুষের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট আলাপ-পরিচয়-আত্মীয়তা রয়েছে। কিন্তু তা হলেও যে-দুনিয়া সম্পর্কে অবশিষ্ট দুনিয়ার উদ্বেগ-কৌতূহল-গবেষণার অন্ত নেই তার মাটিতে বিচরণ করে তার সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুটো মনের কথা বলা, মনের ভাব বিনিময় করার মূল্য কি কম?

সেদিক দিয়ে বাংলাদেশ থেকে শ্রীবিষ্ণু দে'র সোভিয়েট সফরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিষ্ণু দে-কেই

শ্রীবিষ্ণু দে

নিঃসন্দেহে একনিশ্বাসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি বলা যেতে পারে। গত তিন যুগ ধরে তিনি ক্লান্তিহীন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে কাব্য-সাধনা করে আসছেন। বিখ্যাত 'কল্লোল', বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'প্রগতি' এবং 'মহাকাল' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় শ্যামল রায় ছদ্মনামে ছাত্রজীবনেই শ্রীবিষ্ণু দে'র কাব্যজীবনের সূত্রপাত ঘটে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩। সেই থেকে নিরলস-ভাবে লিখে চলেছেন চোরাবালি, পূর্বলেখ, বাইশে জুন, সাত ভাই চম্পা, সন্দীপের চর, অন্বিষ্ট, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, আলেখ্য, তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ কাব্যগ্রন্থ সাহিত্য আকাদামি কর্তৃক পুরস্কৃত হয়।

বিষ্ণু দে'র সৃষ্টির লিস্টটা সংক্ষিপ্ত নয়। কারণ কেবল মূল কাব্য রচনা করেই তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বহু বিদেশী কবিতা অনুবাদ করেও শ্রীদে একদিকে খ্যাতিলাভ করেছেন অন্যদিকে আগ্রহী বাঙালী পাঠকদের সঙ্গে বিদেশী কবি-সাহিত্যিকের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এলিয়টের কবিতা এবং মাও সে-তুঙের কবিতা এককথায় অতুলনীয় বলে বিদগ্ধ ও কাব্য-সমালোচকদের কাছে সমাদর লাভ করেছে। বিশিষ্ট ইংরেজ কবি টি এস এলিয়ট বিষ্ণু দে লিখিত এলিয়টের প্রবন্ধ পড়ে নাকি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন ঃ ইনিই আমাকে বুঝেছেন। কবি, ঔপন্যাসিক নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এলিয়টের এ মন্তব্যের মূল্য অপরিসীম সন্দেহ নেই।

কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও বিষ্ণু দে বহু মূল্যবান প্রবন্ধও রচনা করেছেন যেগুলি বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে। রুচি ও প্রগতি, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য, সাহিত্যের দেশ-বিদেশ ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। ফরাসী ঔপন্যাসিক ভেরস্করের 'পুট আউট দা লাইট' উপন্যাসটির তিনি বঙ্গানুবাদ করেন এবং অবনীন্দ্রনাথের ক্ষীরের পুতুলের ইংরাজী অনুবাদ করে বিশ্বসাহিত্যের মেলায় উপহার দেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'একালের কবিতা' বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

কবি-সাহিত্যিক-সমালোচক—কিন্তু এতেও বিষ্ণু দে'র পরিচয় সম্পূর্ণ হল না। চিত্রশিল্পেরও তিনি একজন বড় সমঝদার বোদ্ধা, সমালোচক। শিল্পরীতি সম্পর্কে বিষ্ণু দে'র কয়েকখানি মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলনও রয়েছে। দা আর্ট অফ যামিনী রায়, দা পেইন্টিংস অফ রবীন্দ্রনাথ, বেঙ্গল পেইন্টারর্স টেস্টিমনি, ইনট্রোডাক-শন টু নীরদ মজুমদার ইত্যাদি গ্রন্থ শিল্পসমালোচকদের তালিকায় বিষ্ণু দে'র অমরত্ব দান করেছে। যামিনী রায় বলেছেন ঃ ঘরে ঢুকেই মনে হয় শিল্পীর বাড়ি। আর রয়েছে তাঁর রেকর্ড সংগ্রহ, তাঁর প্রিয় কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে পল রোবসন অন্যতম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে শ্রীবিষ্ণু দে মার্ক্সবাদে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, সে-আগ্রহ তাঁর আজো অক্ষুণ্ণ থাকলেও আজকাল তিনি আবার প্রেম ও রোমান্সধর্মী কবিতা লিখছেন। অনেকের অবশ্য অভিযোগ বিষ্ণু দে একজন দুর্বোধ্য কবি।

স্বাস্থ্য বিভাগের প্রমোশন রহস্য

সুনীল ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরের বহুবিধ দুর্নীতির কাহিনী বিশদভাবে প্রকাশ করে সাপ্তাহিক বসুমতী একটি গুরুতর সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। স্বাধীনতার পর থেকে স্বাস্থ্যদপ্তরের ব্যয় ক্রমবর্ধমান। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু জনগণ সেই বর্ধিত ব্যয়ের সুফল পাচ্ছেন কি?

স্বাস্থ্যদপ্তর চিরকালই সুযোগসন্ধানী মতলববাজ ব্যক্তিদের বিচরণক্ষেত্র। এখানে যোগ্যতা দক্ষতার কোন মূল্য নেই। মুরুব্বি আর তদ্বিরের জোর থাকলে সিঁড়ির প্রথম ধাপের অতি অযোগ্য লোকও রাতারাতি সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছতে পারে এবং পৌঁছোচ্ছেও। নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে এই দপ্তরে সম্পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করছে।

এ সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ সাপ্তাহিক বসুমতীতে আগে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের হেলথ সার্ভিসে পদোন্নতির ব্যাপারটা দুর্নীতির গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত। কেন এমন হল? সেখানে কি পদোন্নতির কোন নিয়ম নেই? সরকারের চিরাচরিত বিধি-বিধান সেখানে অচল কি? আজ্ঞে না, তা নয়। নিয়ম-কানুন সবই আছে, কিন্তু নিয়ম লঙ্ঘনটাই সেখানকার সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপার দেখে মনে হয় মুষ্টিমেয় মতলববাজ উচ্চপদাধিকারী নিজেদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খেয়ালখুশিকেই বিভাগীয় নিয়ম বানিয়ে ফেলেছেন।

১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকার স্বাস্থ্যদপ্তরের পরিচালকের কাছে রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলোয় শিক্ষক নিয়োগের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতা নির্দেশ করে একটা স্মারকলিপি প্রেরণ করেছিলেন। ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলের সুপারিশ বিবেচনার পর রাজ্যপাল শিক্ষক নিয়োগের কয়েকটি নীতি স্থির করে দেন। তাতে বলা হয় যে, সরকারের দ্বারা গঠিত একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি সেই নীতির ভিত্তিতে শিক্ষক পদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা পর্যালোচনা করবেন এবং শিক্ষকদের একাডেমিক মর্যাদা (status) স্থির করে দেবেন। প্রয়োজন বোধে শিক্ষকের বর্তমান মর্যাদা বাড়িয়ে দেবার সুপারিশও তাঁরা করতে পারবেন। উক্ত স্মারকলিপিতে যে নীতি ঘোষণা করা হয়েছিল তা নিচে দেওয়া হল।

(ক) লেকচারার, সহকারী প্রফেসর, রীডার, এসোঃ প্রফেসর, প্রফেসর এবং প্রফেসর-ডিরেক্টর পদে নিয়োগযোগ্য ডাক্তারদের নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা চাই :—স্ব স্ব বিষয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা। তবে উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব দেখা দিলে এই নিয়ম শিথিল করা যাবে।

(খ) বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য কি ধরণের যোগ্যতা দরকার—

(১) লেকচারার—যে কোন মেডিক্যাল শিক্ষায়তনের রেজিস্ট্রার, ডিমনস্ট্রেটর, ক্লিনিকাল টিউটর, রেসিডেন্ট সার্জন এবং রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান অথবা রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে তিন বছরের শিক্ষকতার মৌলিক অভিজ্ঞতা।

(২) সহকারী প্রফেসর—উপরোক্ত ধরণের পাঁচ বছরের শিক্ষকতার মৌলিক অভিজ্ঞতা অথবা লেকচারার হিসাবে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।

(৩) রীডার—৭ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। তার মধ্যে দু' বছর সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা।

(৪) এসোসিয়েট প্রফেসর—৯ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। তার মধ্যে দু' বছর রীডার হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা।

(৫) প্রফেসর—১১ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। তার মধ্যে দু' বছর এসোঃ প্রফেসর হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা।

(৬) প্রফেসর ডিরেক্টর—১৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। তার মধ্যে ৩ বছর প্রফেসর হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা।

(গ) ওপরে (ক) এবং (খ)-তে বর্ণিত যোগ্যতা ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি বিবেচনা করবেন—

(১) মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাও লেকচারার অথবা সহকারী প্রফেসর নিয়োগের যোগ্যতা বলে গণ্য হতে পারে।

(২) রীডার অথবা তদূর্ধ্ব পদে নিয়োগের সময় দেখতে হবে যেন নিযুক্ত অফিসার পূর্ববর্তী যোগ্যতার স্তরগুলো যথারীতি অতিক্রম করেন। কোন একটি মধ্যবর্তী স্তর লাফ দিয়ে অতিক্রম করলে চলবে না। প্রত্যেক স্তরেই তাঁকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে।

(৩) ফোরেনসিক এবং স্টেট মেডিসিন ও প্রিভেন্টিভ এবং সোসাল মেডিসিনে উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব আছে। কাজেই সেখানে নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে ১ নং নিয়ম শিথিল করা যেতে পারে।

(৪) লেকচারার থেকে সহকারী প্রফেসর এবং রীডার থেকে এসোসিয়েট প্রফেসর পদে পদোন্নতির সময় যথেষ্ট কড়াকড়ি অবলম্বন করতে হবে। এই সমস্ত পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসারের গবেষণা এবং রচনার অভিজ্ঞতার ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

(৫) শিক্ষকতার যোগ্যতা না থাকলে

কেউ শিক্ষকতার পদ পাবেন না। শিক্ষকতার দক্ষতার ওপর শিক্ষকের শিক্ষকতার মর্যাদা নির্ভর করবে।

(৬) মফস্বলে অন্ততঃ ৪ বছর কাজ না করলে কেউ শিক্ষক হতে পারবেন না। নন-ক্লিনিকাল বিভাগে অবশ্য এই নিয়ম খাটবে না। অন্তত ৩ বছর মফস্বলে কাজ করার অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউ লেকচারারের ওপরে কোন পদ আগামী ৫ বছরের মধ্যে পাবেন না। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পটভূমিকায় ক্লিনিকাল বিষয়ে সহকারী প্রফেসর পদে নিয়োগযোগ্য হতে হলে মফস্বলে বিশেষজ্ঞ হিসাবে অন্তত তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

(৭) একাধিক প্রার্থীর একই ধরণের যোগ্যতা থাকলে শিক্ষকতার কাজে নন-প্র্যাকটিশিং মেডিক্যাল অফিসারদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৮) একাডেমিক উপদেষ্টা পরিষদ প্রতি বছর নির্বাচিত অফিসারদের একটা করে তালিকা প্রণয়ন করবেন। তার থেকেই গভর্নমেণ্ট বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ করবেন।

রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলোর শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্ট কি ধরণের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট গুণাগুণ আবশ্যক বলে নির্দেশ করেছেন, তার একটা তালিকা নিচে দেওয়া হচ্ছে—

এনাটমী—এনাটমীতে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি, এম-এসসি, পি-এইচ-ডি, এম-এস, ডি-এসসি, এম-ডি, অথবা এফ-আর-সি-এস (বিশেষ সাবজেক্ট হিসাবে এনাটমী সহ) অথবা অনুরূপ কোন গুণাবলী।

ফিজিওলজি—ফি জি ও ল জি তে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা—এম-এসসি, পি-এইচ-ডি, ডি-এসসি, এম-ডি অথবা এম-আর-সি-পি (বিশেষ সাবজেক্ট হিসাবে ফিজিওলজি সহ) অথবা অনুরূপ গুণাবলী।

বায়োকেমিস্ট্রি—বা য়ো কে মি স্ট্রি তে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি, পি-এইচ-ডি, ডি-এসসি, এম-ডি, এম-এসসি, এম-আর-সি-পি (বিশেষ সাবজেক্ট হিসাবে বায়োকেমিস্ট্রি সহ) অথবা অনুরূপ গুণাবলী।

প্যাথলজি ও মাইক্রোবায়োলজি—এম-ডি (প্যাথলজি), এম-ডি (ব্যাকটিরিওলজি), এম-এসসি, পি-এইচ-ডি, ডি-ফিল (প্যাথ-ব্যাক), স্পেশালিস্ট বোর্ড অফ প্যাথলজি (আমেরিকা), এম-ডি (মেডিসিন), এম-আর-সি-পি অথবা এফ-আর-সি-পি (ডি-বি-ও ডি-সি-পি, অথবা ডি-প্যাথ সহ, এম-আর-সি-পি (বিশেষ সাবজেক্ট হিসাবে ব্যাকটিরিওলজি/প্যাথলজি) অথবা অনুরূপ গুণাবলী।

মেডিসিন—এম-ডি, এম-আর-সি-পি, এফ-আর-সি-পি, এফ-আর-এফ-পি-এস (গ্লাসগো) স্পেশালিস্ট বোর্ড অফ ইনটার্নাল মেডিসিন (আমেরিকা) অথবা অনুরূপ গুণাবলী।

সার্জারী—এম-এস, এফ-আর-সি-এস, এফ-আর, এফ-পি-এস (গ্লাসগো), স্পেশালিস্ট বোর্ড অফ সার্জারী (আমেরিকা) অথবা অনুরূপ গুণাবলী।

অবস্টাট্রিক্স ও গায়নোকোলজি—এম-ডি (অবস্টা ও গায়না), এম-এস (ঐ), এম-ও, এম-আর-সি-ও-জি, স্পেশালিস্ট বোর্ড অফ অবস্টা ও গায়না (আমেরিকা), এফ-আর-সি-এস/এফ - আর - পি - এস (গ্লাসগো), এম-আর-সি-পি (বিশেষ সাবজেক্ট হিসাবে অবস্টা ও গায়না) অথবা অনুরূপ গুণাবলী।

সোসাল এণ্ড প্রিভেণ্টিভ মেডিসিন—সোসাল এণ্ড প্রিভেণ্টিভ মেডিসিনে

সবিনয় নিবেদন

সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা, এম-এল-এ'র স্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কিত লেখাটি রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ঐ লেখার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কয়েকটি পত্র পাওয়া গেছে। ঐ সব পত্রের লেখকদের মধ্যে আর-এস-পি দলের বিধানসভার সদস্য শ্রীঅশোক চৌধুরীও রয়েছেন। স্থানাভাবের কারণে ঐ সব পত্র এবার প্রকাশিত না হওয়ায় আগামী সংখ্যায় পত্রস্থ করা হবে।

—সম্পাদিকা

এম-ডি, স্পেশালিস্ট বোর্ড অফ প্রিভেণ্টিভ মেডিসিন (আমেরিকা), এম-আর-সি-পি (বিশেষ সাবজেক্ট হিসাবে পাবলিক হেল্‌থ্‌ সহ), এম-ডি (মেডিসিন—সোসাল এণ্ড প্রিভেণ্টিভ মেডিসিনে ডিপ্লোমা সহ), ডি-পি-এইচ অথবা অনুরূপ গুণাবলী।

ফোরেনসিক মেডিসিন—এম-ডি (প্যাথলজি), এম-ডি (ফোরেনসিক মেডিসিন), স্পেশালিস্ট বোর্ড অফ প্যাথলজি (আমেরিকা), এম-ডি/এম-আর-সি-পি/এফ-আর-সি-পি (ডি-এফ-এম ডিপ্লোমা সহ), এম-আর-সি-পি (বিশেষ সাবজেক্ট হিসাবে ফোরেনসিক মেডিসিন সহ) অথবা অনুরূপ গুণাবলী।

ফার্মাকোলজিঃ—এম-ডি, পি-এইচ-ডি, এম-এসসি (ফার্মাকোলজি), এম-আর-সি-পি/এম-ডি (বিশেষ সাবজেক্ট হিসাবে ফার্মাকোলজি সহ) অথবা অনুরূপ গুণাবলী।

পেডিয়াট্রিক্সঃ এম-ডি (পেডিয়াট্রিক্স), স্পেশ্যালিস্ট বোর্ড অফ পেডিয়াট্রিক্স (আমেরিকা), গ্লাসগোর এম-ডি/এম-আর-সি-পি/এফ-আর-সি-পি (বিশেষ সাবজেক্ট হিসাবে পেডিয়াট্রিক্স অথবা ডি-সি-এইচ সহ) অথবা অনুরূপ গুণাবলী।

১৯৬৯ সালের ১৪ই অক্টোবর রাজ্য সরকার তাঁদের উপরোক্ত নির্দেশ-নামা সংশোধন করে স্থির করেছেন যে, একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি উচ্চতর পদে নিয়োগের জন্য ডাক্তারদের যে প্যানেল তৈরি করবেন সেটা পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত প্যানেল তৈরি করবেন গভর্নমেণ্ট নিজেই। অনুযায়ী গভর্নমেণ্ট শিক্ষক-হিসাবে নিয়োগযোগ্য অফিসারদের একটা প্যানেল তৈরি করেছেন। সিনিয়রিটি ও উপযোগিতার ভিত্তিতে সেই প্যানেল থেকে মেডিক্যাল শিক্ষালয়ের বিভিন্ন পদে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে মফস্বলে কাজ করা অফিসাররা অগ্রাধিকার পাবেন।

প্যানেলে সহকারী প্রফেসর ও তদূর্ধ্ব পদে নিয়োগযোগ্য অফিসারদের যে তালিকা আছে, তাঁরা যদি বর্তমানে মেডিক্যাল শিক্ষালয়ে নিযুক্ত থাকেন, তাহলে তাঁদের নিয়োগ ১৯৬৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকরী হবে। আর লেকচারাররা যে তারিখ থেকে সেই কাজে যোগ দিয়েছেন, সেই তারিখ থেকে তাঁদের নিয়োগ কার্যকরী হবে। যাঁরা শিক্ষালয়ে কাজ করছেন না অথচ প্যানেলভুক্ত হয়েছেন, তাঁরা শিক্ষালয়ে পদ খালি হলেই সেখানে যোগ দেবার সুযোগ পাবেন। প্যানেলে নাম থাকলেও ক্লিনিকাল বিষয়ে সহকারী প্রফেসর পদপ্রার্থীকে মফস্বলে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছাড়া ঐ পদে নিয়োগ করা যাবে না। তবে জনস্বার্থের খাতিরে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শেষোক্ত নিয়ম শিথিল করা যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের মেডিক্যাল কলেজগুলোর শিক্ষক হিসাবে বিভিন্ন পদে কাজ করতে হলে কি কি গুণাবলী থাকা দরকার, তা খুব স্পষ্ট করেই ওপরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্যানেল তৈরির সময় সরকার এই নীতি অনুসরণ করেছেন কি?

মেডিক্যাল শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে, প্যানেল তৈরির ব্যাপারে সরকার নিজেই তাঁর ঘোষিত নীতি এবং নির্দেশ বারংবার লঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু কেন করেছেন, তার কারণ তাঁরা দেখাতে পারেন নি। প্রবন্ধ বড় হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই সপ্তাহে আমি শুধু প্রিভেণ্টিভ এণ্ড সোসাল মেডিসিনের মধ্যেই এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে উপরোক্ত বিভাগের কয়েকজন প্যানেলভুক্ত অফিসারের পদোন্নতির একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখবেন "সেলের সুপারিশ" বলে একটা স্তম্ভ আছে। সরকারী নির্দেশনামায় কোথাও এই "সেল"-এর উল্লেখ না থাকায় পাঠক বিভ্রান্ত বোধ করতে পারেন। তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, এই 'সেল' স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্যের নিজস্ব সৃষ্টি। তিনি তাঁর প্রিয়পাত্র কয়েকজনকে নিয়ে এই 'সেল' গঠন করেছেন এবং চূড়ান্ত প্যানেল প্রণয়নে এই 'সেল'ই শেষ কথা বলেছেন। ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিল এবং একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও ননীবাবু আবার একটা 'সেল' গঠন করলেন কেন, তা জানবার অধিকার নিশ্চয়ই নাগরিকদের আছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, সেল একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি এবং মেডিক্যাল কাউন্সিলের সুপারিশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কিছু কিছু অফিসারের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ডাঃ মাধুরী বোসের কথাটাই ধরা যেতে পারে। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ইনি ডিমনস্ট্রেটর হিসাবে কাজ করছেন। ভদ্রমহিলা তাঁর বিষয় নিয়ে কখনও কোন প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করেন নি। মফস্বলেও কখন কাজ করেন নি।

১৯৬৭ সালের সরকারী আদেশ অনুযায়ী তাঁর কোন পদোন্নতির সুপারিশ করা হয় নি। মেডিক্যাল কাউন্সিলও তাঁর পদোন্নতির প্রশ্ন বিবেচনা করেন নি। কিন্তু একাডেমিক উপদেষ্টা পরিষদ তাঁকে লেকচারার করবার সুপারিশ করেছিলেন। এই সুপারিশ ননীবাবুর সেলের আদৌ পছন্দ হয় নি। তাঁরা মাধুরী বোসকে একেবারে সহকারী প্রফেসর করবার সুপারিশ করেছেন। শ্রীমতী বোসের যোগ্যতার মধ্যে এমন কোন অসাধারণত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যাতে করে তাঁর এই ডবল প্রোমোশন সাধারণ মানুষের কাছে যুক্তিযুক্ত বলে বোধ হতে পারে। অপর দিকে দেখা যাচ্ছে একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি, মেডিক্যাল কাউন্সিল এবং ১৯৬৭ সালের সরকারী আদেশ অনুযায়ী ডাঃ অমল পালের পদোন্নতি বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হলেও সেল তাঁর পদোন্নতির সুপারিশ করেন নি। ডাঃ রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য এবং ডাঃ রথীন্দ্রনাথ মিত্রের পদোন্নতির প্রশ্ন কেউই বিবেচনা করেন নি, অথচ 'সেল' তাঁদের লেকচারার করবার সুপারিশ করেছেন।

ডাঃ গুরুদাস রায়ের মামলাটা আরও মজার। ইনি ডিমনস্ট্রেটর হিসাবে ডাঃ মাধুরী বোসের চেয়ে অনেক বেশি দিন কাজ করছেন। নিজ শাস্ত্রে প্রায় ডজনখানেক প্রবন্ধ লিখে ইনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। মফস্বলেও চাকরী করেছেন বছর ছয়েক। একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি এঁকে সহকারী প্রফেসর পদের যোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন। ১৯৬৭ সালের সরকারী আদেশ অনুসারেও ইনি সেই পদের জন্য সুপারিশ পেয়েছেন। মেডিক্যাল কাউন্সিল তাঁকে রীডার পদে নিয়োগের সুপারিশ করেন, কিন্তু ননীবাবুর 'সেল' ভদ্রলোককে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছে। লেকচারারের বেশি আর কোন পদ তাঁকে দেওয়া যায় না বলে সেল ঘোষণা করেছেন।

সহকারী প্রফেসর ডাঃ এস এন গাঙ্গুলীর বেলায়ও এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তিনি গ্রামে কখনও চাকরী করেন নি ঠিকই, কিন্তু নিজ শাস্ত্রে ১৭টি প্রবন্ধ রচনা করে সুনাম পেয়েছেন। একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি এবং মেডিক্যাল কাউন্সিল তাঁকে এসোসিয়েট প্রফেসর করবার সুপারিশ করেন। কিন্তু 'সেল' তাঁকে রীডারের চেয়ে উঁচু পদ দিতে নারাজ।

মেডিক্যাল কাউন্সিল, ১৯৬৭ সালের সরকারী আদেশ এবং একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ অগ্রাহ্য করে ননীবাবুর সেল শ্রীমতী মাধুরী বোসকে ডবল প্রোমোশন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করছেন না, অথচ ডাঃ গাঙ্গুলী আর ডাঃ রায়ের প্রোমোশন সুপারিশ হওয়া সত্ত্বেও ননীবাবুর সেল সেটাকে আটকে দিচ্ছেন। এক যাত্রায় এই পৃথক ফল কেন, তা ননীবাবু ব্যাখ্যা করতে পারবেন কি?

শ্রীমতী মাধুরী বোস যদি সত্যিই ডবল প্রমোশনের যোগ্যা হন, তাহলে তাঁর সৌভাগ্যে কারও আপত্তি হবার কথা নয়। সেক্ষেত্রে ননীবাবুর 'সেল'কে

কয়েকখানি বিখ্যাত অনুবাদ

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ		
যুবসমাজ ও কমিউনিজম	—রিচার্ড করনেল	৫·০০
কমিউনিজম ও বিপ্লব	—ব্ল্যাক ও থরনটন	৪·০০
যুগান্তরের দুর্গম পথে	—হফার	১·০০
বাক্-সাহিত্য		
এশিয়ার ধূমায়িত অগ্নিকোণ	—ক্রোজিয়ার	৩·০০
অর্থনীতি ও মানব কল্যাণ	—ক্লারক	৪·০০
প্রশ্নোত্তরে আমেরিকা	—বিয়ার	৩·০০
মানব ও সমাজ-বিজ্ঞান	—স্টুয়ার্ট চেজ	৩·০০
পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ	—রেমন্ড	৩·০০
এশিয়া পাবলিশিং কোং		
উপনিবেশবাদ থেকে কমিউনিজম	—হোয়াং ভ্যান চি	১·৫০
ভিয়েৎকং	—ডগলাস পাইক	১·৫০
আক্রান্ত উত্তর ভিয়েৎনাম	—পি, জে, হনি	১·৫০
সাম্যবাদঃ বিষয়বস্তু ও কার্যপদ্ধতি	—স্লেসিংগার ও ব্লাস্টেইন	১·৫০
ভিয়েৎনামের যুদ্ধ কেন?	—এম শিবরাম	১·০০
বিশ্ব বিধানের সন্ধানে	—গারডনার	৩·০০
সাহিত্যায়ন		
লাল শহর কালো গলি	—লিয়াও সান	৩·০০
পলাতকা	—পার্ল বাক	৩·৫০
পুনর্মিলন	—সান সান	২·০০
হোমশিখা প্রকাশনী		
পালিয়ে এলাম	—রবার্ট লো	১·৫০
হিউবার্ট হোরেশিও হামফ্রী	—গ্রিফিথ	১·৫০

নানা বিষয়ে আরো অনেক বই : পুস্তক বিক্রেতাদের উচ্চ কমিশন
তালিকা চেয়ে পাঠান : আজই অর্ডার দিন

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলি-১২

(১) নাম	(২) বর্তমান পদ	(৩) রচনা সংখ্যা	(৪) গ্রাম্য সার্ভিস	(৫) শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা	(৬) একাডেমিক রিভ্যু কমিটির সুপারিশ	(৭) সেলের সুপারিশ	(৮) সরকারী আদেশ অনুযায়ী পদোন্নতির যোগ্যতা	(৯) আই-এম-সির সুপারিশ অনুযায়ী পদোন্নতির যোগ্যতা	(১০) মন্তব্য
অমলকৃষ্ণ পাল	এসো: প্রফেসর	শূন্য	আছে	১৪ বছরের বেশি	প্রফেসর	শূন্য	প্রফেসর	প্রফেসর	
এম এম গাঙ্গুলী	এ্যাসি: প্রফেসর	১৯	শূন্য	৯ বছর	এসো: প্রফেসর	রীডার	এসো: প্রফেসর	এসো: প্রফেসর	
অশ্বিনীকুমার মণ্ডল	ডিমনস্ট্রেটর	শূন্য	আছে	৩।৪ বছর	এ্যাসি: প্রফেসর	রীডার (১-৪-৭০ থেকে)	এ্যাসি: প্রফেসর	রীডার	
গুরুদাস রায়	ডিমনস্ট্রেটর	১১	৬ বছর	৫ বছর ৭ মাস	এ্যাসি: প্রফেসর	লেকচারার	এ্যাসি: প্রফেসর	রীডার	
মাধুরী বোস	ঐ	শূন্য	শূন্য	৫ বছর	লেকচারার	এ্যাসি: প্রফেসর (১-৪-৭০ থেকে)	—	—	১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ডিমনস্ট্রেটর হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন
নীহাররঞ্জন মুখার্জী	ঐ	শূন্য	আছে	৪ বছর	বিবেচিত হয় নি	লেকচারার	—	লেকচারার	
সন্তোষ দাশগুপ্ত	ঐ	শূন্য	আছে	৩ বছর ৬ মাস	বিবেচিত হয় নি	লেকচারার	লেকচারার	—	
উমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য	স্টেট নিউট্রিসন অফিসার	শূন্য	আছে	৩ বছর	বিবেচিত হয় নি	ঐ	—	—	শিক্ষকতা ত্যাগ করে বিদেশ চলে গিয়েছিলেন
রবীন্দ্রনাথ মিত্র	ডিমনস্ট্রেটর	শূন্য	আছে	আড়াই বছর	বিবেচিত হয় নি	ঐ	—	—	
অজিৎকুমার চ্যাটার্জী	ঐ	শূন্য	শূন্য	সাড়ে ৩ বছর	বিবেচিত হয় নি	ঐ	লেকচারার	লেকচারার	

মায়া কাজল

অলকা উকিল

বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র মঞ্চ ও পরিচ্ছদ পরিকল্পনা এবং স্বরলিপি সহ গীতিনাট্য।
দাম: টা: ৩·৫০ পঃ

সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি সত্যিই অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারিণী। আবার প্রোমোশনের সুপারিশ সত্ত্বেও 'সেল' যাঁদের দাবি অগ্রাহ্য করেছেন, তাঁদের "অযোগ্যতা"ও সেলকে প্রমাণ করতে হবে। নইলে স্বাস্থ্যদপ্তরের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ উঠবে এবং সেটা যুক্তফ্রন্টের সুনামহানি করতে বাধ্য।

(চলবে)

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(১৫)

শিল্পায়ন আন্দোলনে বিশ্বেশ্বরায়ার ভূমিকা

প্ল্যানিং কমিটির ইতিহাসে আসার আগে স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ার সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পরিবেশন প্রয়োজন মনে করি। ন্যাশন্যাল প্ল্যানিংয়ের বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং মেঘনাদ সাহার রচনা ও কার্যের মূল্যের কথা বিশদভাবে আমরা বলেছি। তাই বলে একথা যেন মনে করা না হয়, ঐ দুজনেই মাত্র পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন। দুজনের একজন রবীন্দ্রনাথ, আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, তাঁর প্রভাবকে সাধারণভাবে যন্ত্রশিল্পায়নের বিরোধীশক্তিরূপেই উপস্থিত করেছিলেন। মেঘনাদ সাহা অবশ্য আদ্যন্ত যন্ত্রশিল্পায়নের পক্ষপাতী ব্যক্তি। কিন্তু এখানে জানানো উচিত, দুজন বাঙালীর কথা এই প্রসঙ্গে আমরা বিশেষভাবে বললেও ভারতীয় শিল্পায়নে বাংলার চেয়ে বোম্বাইয়ের চিন্তা ও চেষ্টা অনেক ব্যাপক। বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় যথেষ্ট শিল্পসমৃদ্ধ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই শিল্প বাঙালীর দ্বারা গড়ে ওঠে নি, তার মালিকানা বিদেশীর। অপরদিকে, বোম্বাইয়ের শিল্প-সংগঠনে দেশীয় মূলধন সবিশেষ, এবং শুধু আলোচ্যকালে নয়, পূর্বের অর্ধশতাব্দী ধরে শিল্প প্রসারের জন্য বোম্বাই ও সংলগ্ন অঞ্চলের ভারতীয় ব্যবসায়ীরা প্রাণপণ চেষ্টা করে এসেছেন। ভারতীয় শিল্পায়নের প্রধান ভারতীয় নেতা জামসেদজী টাটা বোম্বাইয়ের অধিবাসী ছিলেন একথা ভুললে চলবে না। বোম্বাই অঞ্চলের শিল্পপতিদের চেষ্টায় এবং সেখানকার পত্র-পত্রিকার দীর্ঘদিনের প্রচারে শিল্পায়নের উপযোগী একটি মানসিক পটভূমিকা প্রস্তুত হয়েছিল, তা অবশ্য স্বীকার্য।

শিল্পপতি জামসেদজী টাটার কথা বাদ দিলে আমাদের বিবেচনায় চাকুরীজীবী এম বিশ্বেশ্বরায়াই ভারতবর্ষে পরিকল্পনা ও শিল্পায়নকে বাস্তবে সম্ভবপর করতে সবচেয়ে বড় অংশ নিয়েছিলেন। মেঘনাদ সাহা প্রমুখের চেষ্টা ছিল মানসিক পটভূমিকা রচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান—বিশ্বেশ্বরায়া হাতে-কলমে শিল্পায়নকে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

এইকালে শিল্পব্যাপারে প্রধান বিশেষজ্ঞরূপে যদি কারো নাম করতে হত, বিশ্বেশ্বরায়ার নাম সর্বাগ্রে এসে যেত। ভারতবর্ষে ইঞ্জিনীয়ারকুলে বিশ্বেশ্বরায়াই কুলপতি।

মেঘনাদ সাহা 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকার সেপ্টেম্বর ১৯৪১ সংখ্যায় বিশ্বেশ্বরায়ার জীবন ও কীর্তি-কথা বলেছিলেন—তার সারসংক্ষেপ এখানে উপস্থিত করছি। এই অংশ পড়লেই পাঠক বুঝবেন, কেন আমরা ন্যাশন্যাল প্ল্যানিংয়ের পটভূমিকা রচনায় তাঁর নামকে এত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চার্য মনে করি।

মোক্ষকুন্দম বিশ্বেশ্বরায়া জন্মেছিলেন বারাণসীতে, ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বরে। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে মানত করে পুত্রলাভ হয়েছিল বলে বিশ্বেশ্বরায়া নামকরণ।*১

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল কলেজ থেকে বি-এ পাস করে পুনার 'কলেজ অব সায়েন্স' থেকে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রি নেন প্রথম স্থান অধিকার করে।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়াররূপে তাঁর চাকরী জীবনের আরম্ভ। ওখানকার সেচ ও জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিতে তাঁর হাত ছিল। ১৯০৯ সালে হায়দারাবাদে যখন বিশেষ পরামর্শদাতা ইঞ্জিনীয়াররূপে যোগদান করলেন, তার আগে তিনি বোম্বাইয়ের উক্ত বিভাগে সুপারিনটেনডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

হায়দারাবাদে গিয়ে তিনি মুসী নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন। হায়দারাবাদ শহরে ভূগর্ভের পয়ঃপ্রণালীও তাঁরই কীর্তি।

১৯০৯ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত তিনি মহীশূর রাজ্যে চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং পাবলিক ওয়ার্কস ও রেল বিভাগের সেক্রেটারী। এই সময়ে তাঁর প্রধান কীর্তি কাবেরী নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃষ্ণরাজসাগর নামক জলাধার নির্মাণ। এর থেকেই মহীশূরে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিল্পায়নের সাহসী চেষ্টার সূত্রপাত। নতুন মহীশূর রেল বিভাগ তাঁর সময়েই সংগঠিত হয়েছিল। ১৯১১ সালে তিনি মহীশূর অর্থনৈতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন সে দেশের শিক্ষা, কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতির জন্য।

১৯১২ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত সময়ে তিনি মহীশূরের

১ বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহাও বিনা মন্তব্যে সরলভাবে এই তথ্যটি পরিবেশন করেছেন।।

সওয়ান। তাঁরই চেষ্টায় মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর ব্যাঙ্ক, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, চন্দন-তৈল ও সাবান কারখানা, ভদ্রাবতীতে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা সংগঠিত হয়। তিনি গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনাও করেছিলেন এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তথ্যানুসন্ধানের জন্য ব্যবস্থা করেন। শেষোক্ত কাজটিকে ভারতবর্ষে প্রথম পরিকল্পিত অর্থনৈতিক পুনর্গঠন-প্রয়াস বলা যায়।

দীর্ঘ ও নিয়মিত জীবনের অধিকারী এই কীর্তিমান মানুষটি অবসর নেবার পরেও অবসর নেবেন না সহজেই বোঝা যায়। অন্ততঃ তাঁকে অব্যাহতি দিতে কেউ প্রস্তুত ছিল না। অবসর নেবার পরেই তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করেন, তারপর নানা কাজের ভার তাঁকে ক্রমান্বয়ে নিতে হয়েছে। ১৯২২ সালে ভারত সরকার কর্তৃক দিল্লীর নিউ ক্যাপিট্যাল এনকোয়ারী কমিটি-র সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯২৫-এ হয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান এনকোয়ারী কমিটি-র চেয়ারম্যান। ১৯২৬-এ ভারত সরকার-গঠিত বোম্বে ব্যাক বে-এনকোয়ারী কমিটি-র সদস্য। ১৯২৯-এ সক্কর বাঁধের ব্যাপারে তদন্তের জন্য বোম্বাই সরকার-নিযুক্ত দুই ইঞ্জিনীয়ারের এক কমিটির সিনিয়ার সদস্য। ১৯৩৮-এ বোম্বাই ইরিগেশন এনকোয়ারী কমিটি-র চেয়ারম্যান।

মহীশূর রাজ্যের দাবি তাঁর উপর সর্বাধিক। অবসর নেওয়ার চার বৎসর পরে তিনি ভদ্রাবতীর লৌহ ও ইস্পাত কারখানার পরিচালক সমিতির চেয়ারম্যান হন, যে-কাজ পরবর্তী সাড়ে ছয় বৎসর করে গেছেন। মহীশূর রাজ্যের অনুরোধে তিনি 'আরউইন ক্যানেল ওয়ার্কস'-এর পরিকল্পনাকারী কমিটির চেয়ারম্যান হন। পাহাড়ের গায়ের ভেতর দিয়ে এক মাইলের উপর দীর্ঘ সুড়ঙ্গ এই ব্যাপারে কাটতে হয়েছিল, দক্ষিণ ভারতে যে-ধরণের জিনিস সেই প্রথম। বাঙ্গালোর শহরে যে সংস্থা পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে, তার চেয়ারম্যানও তিনি ছিলেন।

বিশ্বেশ্বরায়া স্বাধীনতার পূর্বেই ভারতবর্ষে মোটর ও বিমান উৎপাদন শিল্পের পরিকল্পনায় নিজের শক্তিসামর্থ্য নিয়োগ করেছিলেন। সম্পূর্ণ ভারতীয় উপাদানে এবং ভারতীয় শ্রমের সাহায্যে তা সম্ভবপর করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। ১৯৩৫ সালে ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে এ বিষয়ে সন্ধানাদি করে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন; বহুদিন ধরে এই বিষয়ে তিনি কাজ করেন।

এমন যাঁর কর্মজীবন তিনি স্বভাবতই ১৯২৩-এ লক্ষ্ণৌ বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন এবং ১৯২৪-এ বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিও। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শেষে সভাপতি হয়েছিলেন 'অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অর্গানাইজেসন'-এর।

নিজে বড় যন্ত্রবিজ্ঞানী হয়েই বিশ্বেশ্বরায়া সন্তুষ্ট হন নি। যন্ত্রশিল্পের প্রতি ভারতবাসীর আকর্ষণ বাড়াবার জন্য প্রচারকাজও যথেষ্ট চালিয়েছেন। বহু মূল্যবান রিপোর্ট তাঁর রয়েছে, এবং এই উদ্দেশ্যে অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন। *Reconstructing India* এবং *Planned Economy for India* তাঁর দুই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা।২

অবসর গ্রহণের পরে সুবৃদ্ধ বয়সেও যিনি মুহূর্তের বিশ্রাম না নিয়ে ভারতের শিল্পগত ও অর্থনৈতিক অভ্যুদয়ের জন্য পরিকল্পনায় ও কার্যে নিযুক্ত, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিচয় দিতে গিয়ে ডঃ সাহা বোম্বাইয়ের রয়াল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-এ ২৫-জুন, ১৯৪০ তারিখে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে কিছুটা উদ্ধৃত করেছেনঃ

"বিজ্ঞানের জন্যই কয়েকটি পাশ্চাত্ত্য দেশে জীবনযাত্রার উচ্চ মান এবং প্রগতি সম্ভবপর হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর অগ্রগতি ও সভ্যতার বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণতঃ বিজ্ঞানের দ্বারাই হয়েছে যার উপরে এখনকার শিল্প ও বাণিজ্য নির্ভরশীল।......

"জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য শিল্পের প্রয়োজন সর্বাধিক, আর শিল্পের বিশেষতঃ বৃহৎ শিল্পের উন্নতির জন্য ফলিত বিজ্ঞানে গবেষণা অতীব প্রয়োজনীয়। এই ব্যাপারটি আমাদের দেশে যথাযোগ্যভাবে বুঝে ওঠা হয় নি।

"বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক গবেষণা শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণার পথ পরিষ্কার করে, সুতরাং সে বিষয়ে অবহেলা অনুচিত। কিন্তু বিশেষভাবে প্রয়োজন শিল্প বিষয়ক গবেষণার সম্প্রসারণ। বর্তমানে তাত্ত্বিক ও ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণার মধ্যে পরিমাণগত যে অসামঞ্জস্য রয়েছে, তা অবিলম্বে দূর করা দরকার।

"বৃহৎ শিল্পের উন্নতির দ্বারা বাষ্পীয় যন্ত্র, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি, যান্ত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমরসম্ভার এবং অন্যান্য যান্ত্রিক শক্তিতে জাতি বলীয়ান হয়। শিল্পের উন্নতিতে জনগণ কেবল বৃহৎ আকারে উৎপাদনের সামর্থ্যই লাভ করবে না, সেই সঙ্গে প্রতিরক্ষার উপযুক্ত শক্তিসামর্থ্যও অর্জন করবে।"

মোক্ষগুন্দম বিশ্বেশ্বরায়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই। সুভাষচন্দ্র যখন ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশন গঠন করলেন, তখন তার সভাপতি হবার জন্য একটি নামই প্রস্তাবিত হতে পারত—তা ঐ নামটি। ঐ নামের মানুষটির যোগ্যতা অবিসংবাদিত, তবু তিনি সভাপতি হন নি কেন—সে উত্তর আমরা পরে দেব।

---

২ Sir M. Viresvaraya has published a number of reports on engineering designs and works and on technical and technological education, economic development and kindred topics, and addresses touching the well-being of the masses and their moral and material advancement. Among his more important publications may be mentioned 'Reconstructing India' and 'Planned Economy for India." (সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার, ১৯৪১ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় সাহার প্রবন্ধ *Sir M. Vivesvaraya*)।

যে মুখখানির দিকে
সবাই তাকিয়ে আছে
তিনিই বলবেন

কারণটা ঃ

হেজলীন স্নো

হেজলীন স্নো-র মোলায়েম হাল্কা পরশ সেরা বিউটি ক্রীমেরই মতন।
আপনার মুখখানিকে স্নিগ্ধ সুন্দর নিটোল লাবণ্যে ভ'রে দেয়।
অপরূপ তরুণ কোমল কান্তিতে আপনার মুখখানি নির্মল হয়ে ওঠে।
ছোটখাটো দাগ অতি সহজেই ঢাকা পড়ে যায়···আপনার মুখে
ফুটে ওঠে এক স্নিগ্ধ কমনীয় আভা।
আজই আপনার হেজলীন স্নো-র সঙ্গে পরিচয় হোক - দিনের পর দিন
সে পরিচয়ের সার্থকতা আপনার মুখখানিকে সুন্দর থেকে সুন্দর
সুন্দর ক'রে তুলবে।

হেজলীন স্নো-তরুণের স্বপ্নমাখানো স্বাভাবিক কান্তির উৎস

আত্মদর্শন

সুচেতা মিত্রভট্টাচার্য

যেন কোন ভয়ংকর রাত্রির দুঃস্বপ্ন যেন কারা
আমাকে অন্ধকারে খুঁজে খুঁজে তাণ্ডব প্রলয়
জীবিত কিংবা মৃত যে কোনও অবস্থা কাম্য তার
অশরীরী শত্রু ওরা নজরবন্দী করে রাখে।

এই তো শিলাখ হাত বাতাসে কি প্রতিধ্বনি ফেরে?
আমার গলার স্বরে প্রেতলোক থেকে কোনো বাণী?
আমার পায়ের তলা কাঁটার আঘাতে কি বিক্ষত?
তৃষ্ণা কেন শুষ্ক তালু কেন তবে ক্ষমাপ্রার্থী হলো?

ঘুরে ঘুরে বার বার আমারই ছায়ার নিচে আসি
এখনো বিশ্বাস নেই আমি কি আমার প্রতিবেশী!

আরও কিছু প্রয়াস

১৯৩৮ সালে কংগ্রেস কর্তৃক প্ল্যানিং কমিটি গঠন ত্বরান্বিত হয়েছিল আরও কিছু সচেতন প্রচারের দ্বারা। ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্ল্যানিং সম্বন্ধে খুব উৎসাহী ছিলেন। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ করে ভারতে ফিরে বোম্বাইয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ভারতের জন্য অবিলম্বে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। কিন্তু তিনি যন্ত্রশিল্পায়নের দিকে জোর না দিয়ে কৃষির পরিকল্পিত উন্নতির উপরই জোর দিয়েছিলেন, এবং কিভাবে গ্রেট বৃটেন, জার্মানী, রাশিয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশ কৃষিতে উন্নতি ঘটিয়েছে, তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।৩

মডার্ন রিভিউ পত্রিকা এই সময়ে প্ল্যানিং-এর পক্ষে জোরালো প্রচারে নেমে পড়েছিল। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব স্বীকার করার পর থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতি-শীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি পত্রিকাটি সমাদর জানিয়ে এসেছে। বিশ্বেশ্বরায়া, বা রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বা জহরলাল বা সুভাষচন্দ্র, যাঁরাই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখান, এই পত্রিকা তার প্রশংসাপূর্ণ উল্লেখ করেছে। ১৯৩৮ সালের আগস্ট সংখ্যাকে পত্রিকাটি শিল্পসংখ্যারূপে প্রকাশ করেছিল এবং ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে *The Industrialisation of India* নামে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় রচনায় ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পায়নের পক্ষে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছেন, তাঁদের কথা লিখেছেন। পত্রিকাটি বলেছিল: ভারতবর্ষ বর্তমানে কৃষিজীবী হলেও চিরদিন তার এমন অবস্থা ছিল না। মেজর বামনদাস বসু তাঁর *Ruin of Indian Trade and Industries* বইয়ে দেখিয়েছেন, ভারত শিল্পের দেশও ছিল। একালে শিল্পায়নের জন্য প্রচারকার্য বেশ কিছুদিন ধরে চলেছে—স্বদেশী আমল থেকেই। তারও আগে উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকের শেষে ও সপ্তম দশকের গোড়ার দিকে হিন্দুমেলাতেও অনুরূপ প্রয়াস। পরবর্তী স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সত্যই দেশীয় শিল্পের বিস্তার ঘটেছিল।

পত্রিকাটি আরও লিখেছিল: "সাম্প্রতিককালে স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া ভারতের পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে-বই লিখেছেন, তাতে শিল্পায়নের পক্ষে বলা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তববাদী ব্যবসায়ী উভয়রূপেই সুপরিচিত স্যার পি সি রায় বেশ কয়েক দশক ধরে আমাদের ইংরাজি ও বাংলা মাসিক ও দৈনিক পত্রিকাগুলিতে এই বিষয়ে নাগাড়ে লিখে যাচ্ছেন। গত জুন মাসে আমরা শিল্প ও অর্থনীতি সম্বন্ধে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলাম, ৩০শে জুলাই তা প্রস্তুত হয়ে আগস্ট সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। স্যার পি সি রায়, ডঃ মেঘনাদ সাহা, স্যার শান্তি-স্বরূপ ভাটনগর, জি এল মেহতা, ডি পি খৈতান, এ আর দালাল, অধ্যাপক ভি সুব্রহ্মণ্য ও অন্যান্য বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতিদের রচনায় সমৃদ্ধ।"

মডার্ন রিভিউ নিজের পক্ষে আরও কিছু দাবি করে-ছিল। তার মতে, অগাস্ট সংখ্যায় মেঘনাদ সাহা শিল্পায়ন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, জে সি কুমারাপ্পা যার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রবন্ধে লেখেন,—তার দ্বারা সুভাষ-চন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রভাবিত হয়েছে। মডার্ন রিভিউয়ের এই দাবি কতখানি গ্রহণযোগ্য, তার যথেষ্ট আলোচনা আমরা এর পরেই করব। [ক্রমশ]

---

৩ "He (Dr. Mukerjee) proceeded: 'Economic planning had been the chief implement in different countries in Europe for recovery from the depression and my experience of the new agricultural policy in Great Britain, in Hitlar's Germany and in Stalin's Russia and the vast public works and intregal benefication carried on in Mussolini's Italy, or in the far-reaching and comprehensive measures of soil-conservation, flood control and rural rehabilitation of the New Deal in America forces the conclusion that India must immediately launch far-sighted agricultural, industrial and social planned projects under the new regime of Provincial Autonomy, if she wants to take advantage of the tide of world economy." (*Modern Review*; *Notes*; Nov-1937).

বঙ্গ দর্শন

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন একটা অবস্থায়, বরং বলা যায় শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব বজায় থাকবে কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সংশয় দেখা দিয়েছে। অদূরদর্শী নেতাদের হাতে পড়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীর সমুদয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হতে চলেছে। দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াও অপরের ঘাড়ে তা চাপিয়ে দেবার যে নিকৃষ্ট মনোভাব ভারতবাসীর মজ্জাগত, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের নেতাদেরও সেই মনোভাব আচ্ছন্ন করে রেখেছে আর তারই ফলস্বরূপ একে অন্যের ওপর ক্রমাগত বিষোদ্গার ও দোষারোপ করে চলেছেন। একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যুক্তফ্রন্টের শরিক সকল রাজনৈতিক দলই নিছক দলীয় স্বার্থে কাজ করে চলেছেন এবং সেই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যুক্তফ্রন্টকে ব্যবহার করছেন। এ-কথাটা বললে মোটেই মিথ্যা বলা হবে না, প্রত্যেকটি দলনেতা শরিকী সংঘর্ষ আরও জোরদার করার জন্য র‍্যাঙ্ক এন্ড ফাইলকে উৎসাহিত করছেন। বিভিন্ন দলের কয়েকটি জনসভা পর্যবেক্ষণ করলেই এই বক্তব্য প্রমাণিত হবে যে, যে সব নেতারা যুক্তফ্রন্টের সভায় শরিকী দ্বন্দ্ব বন্ধ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবাণী উচ্চারণ করেছেন, তাঁরাই তাঁদের দলীয় সভায় সমর্থকদের তাতাচ্ছেন, খেপাচ্ছেন, উসকে দিচ্ছেন, প্রকাশ্যভাবেই প্ররোচনামূলক বক্তৃতা করে যাচ্ছেন।

জনসাধারণ যুক্তফ্রন্ট করেছিলেন, নেতারা নয়। কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করার পরিস্থিতি জনসাধারণ সৃষ্টি করেছিলেন, নেতারা নয়। অজয়বাবু বা সুশীলবাবু, প্রমোদবাবু বা জ্যোতিবাবু, ননীবাবু বা বিশ্বনাথবাবু, কেউই সত্যদ্রষ্টা ঋষি নন, এবং বলাই বাহুল্য, আপনার আমার মত সীমিত দৃষ্টিসম্পন্ন এই ব্যক্তিদের পারস্পরিক হানাহানির ফলে তাঁদের দলগুলিরও যে কি স্থায়ী স্বার্থের সিদ্ধি হবে, সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যাঁরা শরিকী সংঘর্ষের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম দেখেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে একটি সোজা কথা বলতে ইচ্ছা করে—এ দেশে যদি আদৌ কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসে তাহলে তা পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের শরিক কোন দলেরই ঘাড়ে ভর করে আসবে না। অতএব এভাবে লোক হাসানোর প্রয়োজনটা কি আছে? আপাতত যুক্তফ্রন্ট ভিন্ন যখন উপায় নেই, এমন কি নিজেদের অস্তিত্বটুকুও বজায় রাখার উপায় নেই, তখন খামোকা বাড়াবাড়ি করে পারস্পরিক গলা কাটাকাটির প্রতিযোগিতায় নামা কেন? আজ যদি যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয়, কাল এই সব দলগুলি কোথায় দাঁড়াবে? যেটুকু কাজ যুক্তফ্রন্টের দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে, যুক্তফ্রন্টের বারোটা বাজলে সেগুলির যে বারোটা বাজবে না এমন কোন গ্যারান্টি আছে কি?

এ বিষয়ে অস্বীকার করে কোন লাভ নেই যে, শরিকী সংঘর্ষগুলিকে আজ যে পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখান থেকে সেগুলিকে ফিরিয়ে আনার আর কোন রাস্তা নেই। এতকাল যারা মার মার কাট কাট করে কর্মীদের উত্তেজিত করেছেন, এখন শান্তির ললিত বাণী তাঁদের কর্ণে মধুবর্ষণ করবে না। কাজেই প্রত্যেকটি শরিকদলের প্রতি আমাদের নিবেদন তাঁরা প্রত্যেকেই একতরফাভাবেই যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করুন। নতুন করে আর আগুনে ঘৃতাহুতি দেবেন না। বাংলা কংগ্রেসের নিকটেও আমাদের নিবেদন, তাঁদের বক্তব্যের কিছু অংশকে যখন সত্য বলে আরও কয়েকটি শরিক দল গ্রহণ করেছে, তখন আর ফালতু সত্যাগ্রহ ইত্যাদি করে নতুন কোন সমস্যার সৃষ্টি করবেন না, আর দুই কমিউনিস্ট পার্টির নিকট আমাদের নিবেদন, জনসভায় পরস্পরকে গালিগালাজ করার সময় প্রতিপক্ষের পার্টিটির নামটুকুও যেন অন্তত সঠিকভাবে উচ্চারণ করেন, 'বিশেষণে সবিশেষ' বুঝিয়ে না বললেও চলবে।

ভারতদর্শন

ইন্দিরাজীর দলবৃদ্ধি

যেমন আশা করেছিলাম পূর্ববর্তী সংখ্যায় নদীর জল গড়ানের পথেই চল নেবে, বাস্তবে তাই ঘটতেও চলেছে। ইন্দিরাজীর রিক্যুজিশন্ড মিটিং-এ উপস্থিতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ইতিপূর্বে এ আই সি সি-র ৪০৪ জনের স্বাক্ষর ছিল। এখন হিসেবে দেখা যাচ্ছে ঐ সংখ্যা অর্থাৎ ইন্দিরা-বৈঠকে যোগ দিতে ইচ্ছুক সদস্যের সংখ্যা ৫০০ শতয় গিয়ে দাঁড়াবে। চাই কি বাড়তেও পারে। এ আই সি সি-র মোট সদস্য-সংখ্যা ৭০৭ এবং সেই হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর মেজরিটি অবধারিত।

রাজ্য মন্ত্রিসভাগুলিরও সংখ্যাগুরুর সমর্থন তাঁরই কোলে। পার্লামেন্টারী পার্টি? হ্যাঁ, সেখানেও শ্রীমতী গান্ধীকে কংগ্রেসের সংখ্যাগুরু সদস্যরাই সমর্থন করছেন। রাজ্যে কেন্দ্রে গাম্পা-গ্রুপের তুলনায় শ্রীমতী গান্ধীর অপেক্ষাকৃত কুসুমাস্তীর্ণ পথ।

তত্রাচ পাতিল সাহেবদের মতো তাঁকে পার্টি ভাঙার হুমকি দিতে কেউ শোনেন নি। তাঁর সাফ কথা, সংগঠনকে আরও গণতান্ত্রিক করা হোক। সিন্ডিকেটের কুক্ষিগত করে রেখে সংগঠন ক্রমেই পঙ্গু হয়ে পড়ছিল। শুরু হোক সেখানে নতুন করে রক্ত সঞ্চালন।

গাম্পা-গান্ধী বৈঠক একমাত্র সমাধানের ইঙ্গিত

আর তাই গাম্পা-গ্রুপের দুতিয়ালীতে আশান্বিতভাবেই সাড়া দিয়েছিলেন শ্রীমতী গান্ধী। বীরেন্দ্র পাতিল, কে সি আব্রাহাম চেষ্টার কসুর করেন নি। গান্ধীকে দিয়ে গাম্পাজীকে সাদর ভূরিভোজনের জন্য আমন্ত্রণও আদায় করে নেওয়া হয়েছিল। পাল্টা নেমন্তন্ন গাম্পাজীর তরফেও এসেছে। খানাপিনার আসর জমজমাট। শুধু তাঁরা দুজনে একান্ত গোপনে দেশের দশের ভবিষ্যৎ ভাবতে চেষ্টিতও হয়েছিলেন। উত্তরে ফলম্ নাস্তি। একম্ অদ্বিতীয়ম ফল। অর্থাৎ যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী সাংগঠনিক প্রধানদের নির্বাচন ত্বরান্বিত করার প্রস্তাব থেকে যুক্তিপূর্ণভাবেই একচুলও নড়েন নি। নড়লে শুধু যে তাঁর দলবলকেই দমে যেতে হত, তাই নয়, যে অগণিত জনসাধারণ একটা অনুকূল হাওয়ায় শ্বাস গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছেন, ভীষণ হতাশা নেমে আসত তাঁদেরও চোখে-মুখে। সুতরাং ইন্দিরাজী যে পাল্টা খাওয়ার টেবিলে অযথা সময়ের অপচয়ে গররাজি, তা শুনে সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাসই পরিত্যাগ করবেন।

মোরারজী সাহেবের গদি

শুধু গাম্পাজীর গদিই নয়, গোসার আর একটি বড় কারণ মোরারজী ছাঁটাই। ছাঁটাই এবং পুনর্বহাল প্রশ্নে গান্ধীর তরফে দাবি ছিল, সুব্রহ্মণ্যম, আলি এবং শর্মাজীকে এ আই সি সি-তে পুনর্বহাল করতে হবে। গাম্পাজী খুব রাজী, যদি মোরারজীভাইকে আবার মন্ত্রিত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আরে তাই কি আবার হয় নাকি? জলে বাস করে কুমীর পালন কি সম্ভব? প্রধানমন্ত্রী সুতরাং সম্মত হতে পারেন নি। আর তখনই খানাপিনার আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ব্যর্থ হওয়াই তো স্বাভাবিক। নিজলিঙ্গাপ্পা চাইছেন সংগঠনে সর্বস্তরে নির্বাচন হোক। যার মানে আরও অর্ধ বৎসর স্বপদে টিকে থাকার ব্যবস্থা করে নেওয়া। শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে এতো সময় ভাসতে দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন, নির্বাচন এক-দুই মাসের মধ্যে যাতে অনুষ্ঠিত হয় তার জন্যই প্রতিষ্ঠানের চাবিকাঠিগুলির নির্বাচন হোক। নিজলিঙ্গাপ্পা নিজেও পুনর্নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন। অর্থাৎ টানাপোড়েনটি যথাপূর্বং বহাল রইল। ভোজসভাটি বস্তুতই নিরামিষ্য ভোজে অবসিত হল।

ওয়ার্কিং কমিটি থেকে অপসারণ প্রসঙ্গ

কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, ওয়ার্কিং কমিটিতে সুব্রহ্মণ্যমকে ফিরিয়ে নেওয়ার যৌক্তিকতা কোনও খ্যাতনামা আইনজীবী পরীক্ষা করে তাঁর অভিমত জানাতে পারেন। এ-বিষয়ে তো কোন মতান্তর নেই যে, ভারতের খ্যাতনামা আইনজ্ঞদের মধ্যে শ্রীযুত অশোক সেন, এম-পি (কংগ্রেস) মহোদয় একজন অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তা সেই শ্রীসেনই নিজলিঙ্গাপ্পাজীর এ্যাকসনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন শ্রীগাম্পার উক্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের পূর্বেই।

শ্রীসেন বলেন: ১লা নভেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এবং সভাপতির দ্বারা তিনজন সদস্যের অপসারণ সংগঠনের গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী হয়েছে। এ কাজ গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন এবং অবৈধ। প্রসঙ্গত: তিনি গঠনতন্ত্রের ২৬ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে দেখান শো-কজ নোটিশ দান করার নির্দেশ এক্ষেত্রে লঙ্ঘন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীআমেদ এবং ডঃ শঙ্কারদয়াল শর্মার ক্ষেত্রে শো-কজ তো করাই হয় নি, এমন কি যে ব্যবস্থা একমাত্র ওয়ার্কিং কমিটিই নিতে পারেন, আগ বাড়িয়ে সংগঠনের সভাপতি সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যার বৈধতাও স্বীকার্য নয়। সুব্রহ্মণ্যম যদি ওয়ার্কিং কমিটিতে নির্বাচনের সময় যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন, তবে এ আই সি সি-র সদস্যপদ খারিজ হয়ে গেলেও, ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁর সদস্যপদ অনাহতই থাকে। অপসারণের প্রশ্ন ওঠে না এক্ষেত্রেও।

তলবী সভার নোটিশ সম্পর্কেও প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শ্রীযুত অশোক সেনের মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন: ১৯৬৯ সালের

৩১শে ডিসেম্বর সভাপতির (মেদি-নীপুর) দু' বছরের কার্যকালের মেয়াদ ফুরিয়েছে। গঠনতন্ত্রে দু' বছর কার্যকালেরই উল্লেখ আছে এবং অনুচ্ছেদে। সুতরাং সে হিসেবে শ্রীসেনের মতে, তলবী সভার ডাকও যুক্তিযুক্তই হয়েছে।

এ আই সি সি-ই গঠনতন্ত্র সংশোধনের সর্বোচ্চ সংস্থা। এ আই সি সি-র শতকরা বিশ জনের বেশি সদস্য স্বাক্ষর দিয়ে তলবী সভার নোটিশ দিয়েছেন। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটি তলবী সভা ডাকতে বাধ্য।

ভারতের অন্যান্য প্রখ্যাত আইনজ্ঞের এই বিচারের পর নিজলিঙ্গাপ্পা কী বলবেন? ইন্দিরা-সমর্থক মহলে শ্রীযুক্ত সেনের ব্যাখ্যাকে কি উড়িয়ে দেওয়া যাবে?

—৮।১১।৬৯

রাশিয়াই আরবদের বন্ধু এবং আমেরিকা আরবদের শত্রু : নাসের

পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা

সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে স্থানীয় বাঙালী অধিবাসীদের সঙ্গে বহিরাগত অবাঙালীদের প্রচন্ড দাঙ্গা হয়ে গেছে। ফলে সেখানে বেশ কয়েকদিন সান্ধ্য আদেশ বলবৎ করা হয়েছিল এবং আদেশ অগ্রাহ্যকারীকে দেখা মাত্র গুলী করবার জন্য সেনাবাহিনীর ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দাঙ্গায় হতাহতের সংখ্যাও কম নয়। এই দাঙ্গাটা হঠাৎ বাধে নি। মাস দেড়েক আগে স্থানীয় একটা সুতা-কলে ইউনিয়ন গঠনের ব্যাপার নিয়ে গুরুতর বাঙালী-অবাঙালী সংঘর্ষ হয়েছিল। তাতে ৪0 জন গুরুতর জখম হন। কয়েকদিন বাদে মিলিটারী সার্জেন্টরা বাঙালী ফেরীওয়ালাদের ওপর উৎপীড়ন করায় তারা সার্জেন্টদের উত্তম-মধ্যম দিয়ে দেয়। জনতা এক সার্জেন্টের রিভলভার কেড়ে নিয়ে তার মোটর-সাইকেল জ্বালিয়ে দেয়। এইরকম ছোট-খাট সংঘর্ষই গত সপ্তাহে বিরাট দাঙ্গার রূপ পরিগ্রহ করে।

আসল কথা, পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা আর পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হয়ে থাকতে রাজী হচ্ছেন না। দুই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক আর সামাজিক মর্যাদার মধ্যে ব্যবধান এত বেড়ে উঠেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানবাসীর ধৈর্য এবং সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। এমন কি অন্ধদের বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারেও দুই পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য দেখা দিচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানে অন্ধদের স্কুলগুলো সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে হয় বে-সরকারী তত্ত্বাবধানে। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের নায়ক মুজিবর রহমান লন্ডনে প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে সোনা বিক্রি হয় ১২০ টাকা তোলা দরে, আর পূর্ব পাকিস্তানে হয় ১৮০ টাকা দরে। পূর্ব পাকিস্তানে চালের মণ ৬০ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে পঞ্চাশ। পূর্ব পাকিস্তানে কাপড়ের গজ ৮ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ২ টাকা। দুই পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কিরকম প্রকট তা মুজিবর রহমানের এই বিবৃতি থেকেই বোঝা যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা তাই পশ্চিম পাকিস্তানের জোয়াল থেকে মুক্তি চাইছেন। তাঁদের স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম যতই আসন্ন হয়ে উঠছে, ততই সামরিক ডিক্টেটর ইয়াহিয়া খাঁ হে-সামাল হয়ে পড়ছেন। সম্প্রতি তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার না করে পারেন নি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের মতলব-বাজ এবং কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাদের চাপে সেই দাবি মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা তাই গণ-আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করবার জন্য বাঙালী-পাঞ্জাবী দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছেন বলে কোন কোন মহলের ধারণা। জাতীয় আওয়ামী পার্টির নেতা মওলানা ভাসানী দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য ঢাকার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মুজিবর রহমানও একই উদ্দেশ্যে বিলেত থেকে ঢাকায় ফিরে এসেছেন।

অপর দিকে ধর্মের গোঁড়ামী চাগিয়ে তুলে গণ-আন্দোলনকে ঘায়েল করার চেষ্টাও হচ্ছে। পাকিস্তানের মোল্লারা ধুয়ো তুলেছেন, সে দেশের প্রার্থনা সভায় উর্দুর বদলে আরবী ভাষা চালু করতে হবে। ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে সেই দাবি স্বীকৃত না হলে মোল্লারা নাকি আন্দোলন শুরু করবেন বলে শাসিয়ে দিয়েছেন। পাকিস্তান জামিয়াত উলেমার প্রেসিডেন্ট মওলানা এথাসামুল হক ঘোষণা করেছেন যে, প্রার্থনা সভায় উর্দু বন্ধ না হলে সমগ্র পাকিস্তানে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।

মওলানা ভাসানী বলেছেন যে, জামিয়াতের এই আন্দোলনের আসল লক্ষ্য হল ইন্দোনেশিয়ার মত পাকিস্তানেও সমস্ত প্রগতিবাদীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা। বর্তমান দাঙ্গার পেছনেও জামিয়াতের উস্কানী আছে। দাঙ্গাটা হল সোসালিস্ট উচ্ছেদ প্রকল্পের প্রাথমিক কার্যক্রম। ভাসানী আরও বলেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জননায়করাও জামিয়াতকে খুনে পার্টি বলে অভিহিত করেছেন। রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়াই নাকি এদের আসল উদ্দেশ্য। সম্প্রতি জামিয়াত সোসালিস্টদের কোতল করবার আহবান জানিয়ে লক্ষ লক্ষ ইস্তাহার বিলি করছে। ভাসানীর ঘনিষ্ঠ মহল বলেছেন যে, বর্তমান দাঙ্গা যদি বন্ধ না হয় তাহলে গ্রামাঞ্চলে তিনি এমন সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেবেন যে, তাতে জামিয়াতের পৃষ্ঠপোষক ভূস্বামী এবং শিল্পপতি গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারেন।

সমস্ত ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের গণ-আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাতের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ধান্ধাবাজরা যে চক্রান্ত করেছেন, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ বেশ কঠিন হয়ে পড়বে। আর এক সংবাদে জানা গেছে যে, এই ডামাডোলের বাজারে চীনের প্রধান-মন্ত্রী চৌ এন-লাই জানুয়ারী মাসের মাঝা-মাঝি পাকিস্তান সফরে আসছেন। চৌ আসবার আগেই ইয়াহিয়া খাঁ সোভিয়েট দেশ সফর করে আসবেন। তাতে ইয়াহিয়া-সোভিয়েট আলোচনার বিস্তারিত বিবরণও চৌ পেয়ে যাবেন।

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট মিটবে কি?

সম্প্রতি সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের বলেছেন যে, গত দুই বছর ধরে ইসরাইলের সঙ্গে অনেক শান্তি আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কোনটাই সফল হয় নি। ভবিষ্যতেও হবার সম্ভাবনা নেই। সামরিক বোঝাপড়া ছাড়া এই বিরোধ মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ার বিরোধ মীমাংসার সম্ভাবনা ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। নাসেরের উক্তির দুরকম ব্যাখ্যা হতে পারে। হয় তিনি নিরাশ হয়ে দেশবাসীকে আসন্ন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করছেন, না হয় তিনি আমেরিকার ওপর

চাপ সৃষ্টি করে ইসরাইলকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করবার কথা ভাবছেন। কারণ তিনি খোলাখুলিভাবেই ঘোষণা করেছেন যে, রাশিয়া আরবদের বন্ধু এবং আমেরিকা আরবদের শত্রু।

নাসেরের বক্তব্য শুনে ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব উইলিয়াম রোজার্স বলেছেন যে নাসেরের এই উক্তির পর মিটমাটের চেষ্টা দস্তুরমত ব্যাহত হবে। আমেরিকা মিশরের শত্রু—এই কথাটা ঠিক নয়। আমেরিকার বিরুদ্ধে নাসের যে অভিযোগ তুলেছেন তা মিথ্যা। আমেরিকা ইসরাইলী সামরিক ক্রিয়াকলাপে কোন সহযোগিতা করে নি।

ইসরাইলের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মিঃ এলন বলেছেন যে, নাসের নিজের ওপর এবং জনগণের ওপর আস্থা হারিয়ে হতাশভাবে ঐ কথাগুলো বলেছেন। এদিকে আমেরিকার পররাষ্ট্রদপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ রিচার্ডসন ঘোষণা করেছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে সোভিয়েট-মার্কিন আলোচনায় যথেষ্ট মতৈক্য দেখা গিয়েছে। তবে সকল সমস্যা সমাধানের আগে আরও কিছু দর কষাকষি করতে হবে। আমেরিকা সোভিয়েটের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবে।

আপনার নতুন
হিসেব-খাতার প্রথম পৃষ্ঠা
দেখেই মনে হচ্ছে

উজ্জ্বল-সুন্দর
দীপাবলীর পায়ের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে! দিন আগত ঐ !!

অভিনন্দন জানাই আপনাকে। এ বছর দীপাবলী আরও লাভজনক হয়ে উঠেছে-কারণ আপনি ইউনিটে টাকা খাটিয়েছেন। ইউনিট তো আর ধোঁয়ায় মিলিয়ে যায় না। ওরা কাজ করে—আপনারই জন্যে যাতে আপনি বেশ মোটারকমের লাভাংশ পেতে পারেন। আগামী দীপাবলীও আরও জমজমাট হবে—আপনি আপনার মনপসন্দ জিনিস আরও বেশী করে পেতে পারবেন কিন্তু তারজন্যে আপনাকে ইউনিটে আরও বেশী টাকা খাটাতে হবে তবেই তো আপনি আরও বেশী লাভ পাবেন।

ইউনিট কেনা খুবই সোজা ব্যাপার। নিরাপদে টাকা খাটাবার জন্যে এ ব্যবস্থার আর জুড়ি নেই।
লাভাংশের পরিমাণ বেশ ভালো। আর হ্যাঁ—1000 টাকা পর্যন্ত এই লাভাংশ কর-মুক্ত।
যে কোনও সময়ে ইউনিট ভাঙিয়ে আপনি নগদ টাকা পেতে পারেন।

ইউনিট—এমন এক অর্থ বিনিয়োগ ব্যবস্থা যাকে আপনি সদাসর্বদা বিশ্বাস করতে পারেন।

ইউনিট ট্রাষ্ট অব্ ইণ্ডিয়া
বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • দিল্লী

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

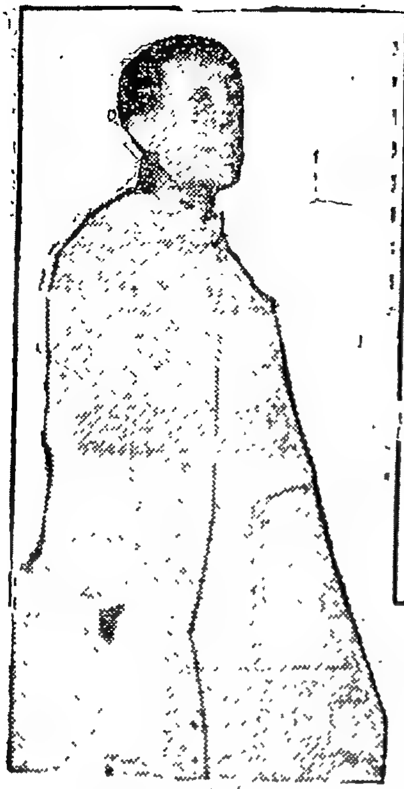

মাটির হাঁড়ি আর নারীর মন এই দুই একবার ভাঙলে আর জোড়া লাগে না। এই প্রবাদ যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁরা সম্ভবত রাজনীতির নেতাদের সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন না। মহাজনরা যদি আজকের দিনের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা, শ্রীঅজয় মুখার্জী, শ্রীজ্যোতি বসু প্রমুখকে জানতেন ও চিনতেন তবে মাটির হাঁড়ির সঙ্গে বলতেন—রাজনৈতিক নেতাদের মন যদি একবার অবিশ্বাসে ভেঙে যায়, তবে সেই ভাঙাও জোড়া লাগে না। মাটির হাঁড়ি হয়ত কাঁচা মাটি দিয়ে কিছুটা সারাই করা যায়, কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের মন সারাই করার মত কোন দ্রব্যই বোধ হয় নেই। রাজনীতিতে মন-ভাঙবার সবচেয়ে বড় রোগ হল অবিশ্বাস। অন্য কোন কারণে যদি মন ভাঙে, তবে হয়তো কোন তুকতাকে জোড়া লাগতে পারে, কিন্তু অবিশ্বাসে ভাঙলে তা মেরামতে কোন দাওয়াই পাওয়া যায় না। কেরল ও দিল্লীতে যুক্তফ্রন্ট ও কংগ্রেসের ভাঙন সারা ভারতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকুক না কেন, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় প্রভাব হল অবিশ্বাসের বীজ বপন। কেরলে নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভা পতনের পরই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গুঞ্জন উঠলো—এইবার পশ্চিমবঙ্গে কেরল হবে, দিল্লীতে শ্রীমতী ইন্দিরা আর শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার মধ্যে যত লড়াই বাড়তে লাগলো, তত পশ্চিমবঙ্গে গুঞ্জন উঠলো—এইবার পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় সি-পি-এম'কে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা হবে; পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাবে। প্রথমে কথাটা সাধারণ মানুষের মধ্যে সংক্রামিত করলেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পরে জনমনে এর ছাপ পড়তে সুরু করল। গুঞ্জন স্পষ্ট হয়ে গেল। তার পর আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে একটা অদ্ভুত উৎকণ্ঠা, সকলেরই মনে প্রশ্ন—কেরল গেল, দিল্লী যায় যায়, পশ্চিমবঙ্গে কি হবে?

পশ্চিমবঙ্গে কি হবে এই কথাটা বড়ই দুরূহ প্রশ্ন। প্রশ্ন থাকলে তার একটা জবাবও থাকে। রাজ্যের রাজনৈতিক নেতা তথা মন্ত্রিবৃন্দ যখন মহাকরণে বসে কথা বলেন, তখন তাঁরা কিন্তু সরকার সম্বন্ধে খুবই নিশ্চিন্ত। শ্রীঅজয় মুখার্জী বা শ্রীজ্যোতি বসুকে তাঁদের নিজের ঘরে ফাইলের স্তূপের মধ্যে বসে থাকা অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা কিন্তু খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—সরকার চলছে ও চলবে। কিন্তু এই নেতারা যখন ময়দানে বক্তৃতা দিতে যান, তখন অন্য কথা বলেন। মহাকরণে কথা বলেন—সরকার চলছে চলবে; কিন্তু ময়দানে কথা বলবার সময় বলবেন—এই সরকার চলবার পথে অনেক বাধা, অনেক ষড়যন্ত্র চলছে। কতদিন এই সরকার চলবে কেউ তখন বলতে পারেন না। এই ব্যাপারে দুজনের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ভাবনার ও চিন্তার। তাঁরা দুজন হলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসু। আমি অনেক আগেই বলেছি পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্থায়িত্ব অথবা সচলতা নির্ভর করে মূলত এই দুজনের ওপর। বেশ কিছুদিন আগে এই সপ্তাহের বোঝাতেই আমি বলেছিলাম যে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলে হামেশা মন্ত্রীরা যে যার খুশিমত অন্যকে দপ্তরের দায়িত্বভার দিয়ে যান—এটা ভাল লক্ষণ নয়, এতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি পরোক্ষে অবমাননা প্রকাশ পায়। দেখা গেল লেখা প্রকাশ হওয়ার কয়েকদিন পরেই মুখ্যমন্ত্রী এই দপ্তর সম্পর্কে বেশ কড়া কথা বলেছেন। বলেছেন কোন দপ্তর কারো দলীয় সম্পত্তি নয়—যে খুশি যাকে দিয়ে যাবে। এই রকমভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবিশ্বাস সৃষ্টির অনেক রোগের কথাই দীর্ঘদিন থেকে বলে এসেছি। কিন্তু আজ আর সেই সব রোগের কথা বলে লাভ নেই—কারণ রোগ সৃষ্টি থেকে সুরু করে প্রকট হওয়া পর্যন্ত অনেক কথা বলে শিরে সর্পাঘাত বলে সেই পর্ব শেষ করেছি। এখন পরিস্থিতি আর ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সারা ভারতের রাজনীতির আবর্তে পড়ে গেছে। কেউ আর শ্রীঅজয় মুখার্জী শ্রীজ্যোতি বসুর মধ্যে ভাবনা সীমাবদ্ধ রাখতে পারছেন না, সকলেই দিল্লী আর কেরলের তুলাদণ্ডে শ্রীঅজয় মুখার্জী শ্রীজ্যোতি বসুকে বিচার করছেন। কিন্তু একবার শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় শ্রীজ্যোতি বসুর মনের একান্ত খবরটি নেবার চেষ্টা করেছেন কি? অন্যের কথা জানি না, তবে একান্তভাবে শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সহ রাজ্যের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী আছেন যাঁরা কিন্তু আজও বর্তমানে রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে চোখের মণির মত ভালবাসেন ও রক্ষা করতে চান। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় গান্ধীবাদী ও শান্তিপ্রিয় মানুষ, খুনখারাপী, রক্তপাত জাতীয় ঘটনা ছাড়া অন্য যে কোন ঘটনা তিনি মানিয়ে নিতে পারেন। শ্রমিকদের প্রতি দরদ, কৃষকের স্বার্থ রক্ষা যে কোন ঘটনায় ঠিক মত

ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট

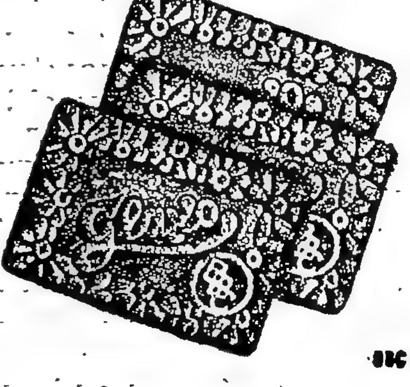

প্রচুর দুধ আর অঢেল পুষ্টিতে ভরা ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট। বাড়ন্ত শিশুদের তো তাই-ই চাই। আপনার বাচ্চার খাবার পুষ্টিকর ক'রে তুলুন— ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট দিন।

ব্রিটানিয়া মানেই সেরা বিস্কুট

বোঝানো যায়, তবে যে কোন প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি যে কোন মার্কসবাদী মন্ত্রীর সমান অগ্রণী ও উৎসাহী। আবার শ্রীজ্যোতি বসু আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী, হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, উপদ্রব সৃষ্টিকারী যে কোন শক্তি সম্পর্কে যে কোন শান্তিবাদী ব্যক্তির চেয়ে বেশি শান্তিবাদী। মনের দিক দিয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় ও শ্রীবসু উভয়েরই সরকারের কাজে বিঘ্ন হয়, সরকারের নামে বদনাম রটে; এমন কাজ রোধে একই রকম উৎসাহ। এবং এই সব কাজের ব্যতিক্রম ও ব্যর্থতায় একই রকম ব্যথিত হন। তবে অবিশ্বাসের রাজনীতি এই দুটি মনকে বেশ ফারাক করে দিয়েছে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সরকার সম্পর্কে কি ভাবেন? তাঁর ভাবনা হল—শ্রীজ্যোতি বসুর দল সি-পি-এম কোন কথা শুনছে না, সভায় বসে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত হয়, সেই সিদ্ধান্ত সি-পি-এম কার্যকরী করে না। সি-পি-এম সরকারী যন্ত্রকে অন্যায়ভাবে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে। তিনি সবই বুঝতে পারছেন, কিন্তু হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। অবশ্য তিনি হস্তক্ষেপ করলেই কিছু ভাল ফল হবে এমন নয়। শ্রীজ্যোতি বসুর আন্তরিকতায় তাঁর সন্দেহ নেই, কারণ শ্রীবসু বহু সময় চেষ্টা করেও দলের নেতা ও কর্মীদের বাগে আনতে পারছেন না—এই অভিজ্ঞতা বহু ক্ষেত্রেই তিনি লাভ করেছেন। যেমন বলা যায় আসানসোলের নিমচা কোলিয়ারীর শ্রমিকদের কোলিয়ারীতে ফেরত যাবার ব্যবস্থা করা। শ্রীজ্যোতি বসু নানাভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেছেন—এমন কি শ্রীবিনয় চৌধুরীকে শ্রীজ্যোতি বসু ধমক দিয়ে কি বলেছেন, সেই কথাও তিনি জানেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রীজ্যোতি বসু কিছু করতে পারেন নি। এই তো সেদিন শ্রীনীরেন ঘোষের একটা লেখার ওপর মুখ্যমন্ত্রী একটা কড়া নোট দিয়ে শ্রীজ্যোতি বসুকে বলেছিলেন—"ইউ হ্যাভ ফেলড"। একজন মন্ত্রীকে "ইউ হ্যাভ ফেলড" বলার মত কড়া কথা হতে পারে না, শ্রীজ্যোতি বসু সেই কথা হজম করেছেন এবং মেনেই নিয়েছেন এই অভিযোগ। আচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সরকার ভেঙে দেবার কথা ভাবেন, অথবা সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে সরকার গড়বার কথা ভাবেন? শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে বসে প্রায় এই সোজা প্রশ্নটা সোজাভাবেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায়-এর সামনে তুলে ধরেছিলাম। দীর্ঘ সময় ধরে কথা হল। বহু কথার মধ্যে যে সত্য ধরা পড়ল সেটা হল, এই সরকার ভেঙে দিয়ে তিনি কি করবেন? আবার নির্বাচন? তাতে বর্তমান বিধানসভার কাঠামোর কতটা পরিবর্তন হবে? আর কোন যুক্তি ও ভিত্তিতেই বা সরকার ভাঙবেন—কার বিরুদ্ধে অভিযোগ? সি-পি-এম দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি হয়, তবে কয়েক মাস আগে তাদের নিয়েই নির্বাচন লড়েছেন, সারা রাজ্য ঘুরে বেড়িয়ে সি-পি-এমকে নিয়ে গড়া যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। মাত্র কয়েক মাস পরে বিপরীত কথা বললে লোকে শুনবে কেন? এর পর প্রশ্ন আসে সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে সরকার পুনর্গঠন করা। কিন্তু সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে কাকে নিয়ে সরকার করবেন? অঙ্কের হিসাব বাদ দিলেও কটা দল আছে, যারা সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে সরকার গঠনে এককথায় এগিয়ে আসবেন। সি-পি-এম সম্পর্কে যত ক্ষোভ আর বিক্ষোভ দলগুলির মধ্যে থাক না কেন, সি-পি-এমকে একেবারে বাদ দিয়ে সরকার গঠনে রাজী অনেকেই হবে না। সি-পি-আই—যারা কেরলে সি-পি-এমকে এত বড় ল্যাং মারল, পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু তারা এককথায় সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে সরকার গঠনে রাজী হবে না। ফরওয়ার্ড ব্লক, যারা হামেশা সি-পি-এম-এর কড়া কথার জবাবে কড়া কথা শোনায়; তাদের যদি বলা হয় সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করা হোক, সেই প্রস্তাবে তারা মোটেই রাজী হবে না। এমন কি এস-ইউ-সি—যাদের সঙ্গে সি-পি-এম-এর সম্পর্ক প্রায় কুমড়ো কাটাবীর মত, তারাও কিন্তু সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে সরকার গঠনে এগিয়ে আসবে না। আর-এস-পি তো এই প্রস্তাবে থাকবে না এটা জানা কথা। এই সব দলগুলোকে বাদ দিয়ে কোন সরকার গঠন যেমন বাস্তবসম্মত নয়, তেমনি সেই জাতীয় সরকার জনপ্রিয় হবারও কোন সম্ভাবনা নেই। এর পর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কি করতে পারেন? রাগ করে সরকার ভেঙে দিলে কোন লাভের সম্ভাবনা নেই, নতুন কোন সরকার গঠনেরও সম্ভাবনা নেই। এই বাস্তব পরিস্থিতি মনে রেখে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় দিল্লী ও কেরল কোন দিকেই তাকাতে পারেন না। মনে ক্ষোভ আছে, দুঃখ আছে, রাগ আছে, অভিমানও আছে—কিন্তু কিছু করার নেই।

শ্রীজ্যোতি বসুর অবস্থা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় থেকে ভিন্নতর। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের রাগ করার, অভিমান করার একটা ক্ষেত্র আছে, কিন্তু শ্রীজ্যোতি বসু সেদিক থেকে এক অনাথ অবস্থায় মনের রাজ্যে বাস করেন। মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ খুবই কম, কারণ নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন, কংগ্রেসী মানসিকতায় গঠিত এই গান্ধীবাদী মানুষটিকে বোঝাতে পারলে সব কথা বোঝেন এবং কোন কাজেই তিনি বাধাস্বরূপ নন। রাজ্যে আজ পর্যন্ত যে সকল প্রগতিমূলক কাজ হয়েছে, শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থে কোনটাতেই শ্রীবসু অন্তত মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কোন বাধা পান নি। বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক ও অন্য সব দলের ব্যাপারে শ্রীবসু খুব বেশি চিন্তা করেন না—কিন্তু সি-পি-আইকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। শ্রীজ্যোতি বসুর ধারণা—মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আওতায় থাকলে তিনি ঠিক থাকেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মাথা খারাপ করে দেয় ছোটভাই "দামু"। তাই শ্রীজ্যোতি বসুর কাছে সমস্যা মুখ্যমন্ত্রী নন, সমস্যা হল মুখ্যমন্ত্রীর ছোট ভাই ও তাঁর দল। সি-পি-আই কেরলে শ্রী ই এম এস-কে যা করেছে, পশ্চিমবঙ্গে তাঁকেও তাই করতে চায় সি-পি-আই। মুখ্যমন্ত্রী মাঝে মাঝে সি-পি-আই-এর খপ্পরে পড়ে যান। কিন্তু এ ছাড়া শ্রীবসুর কাছে মুখ্যমন্ত্রী আর সি-পি-আই দলের সম্পর্কে ভাবনা ছাড়া আর একটা ভাবনা আছে সেটা হল নিজের দল সম্পর্কে। শ্রীবসু চান না এমন অনেক কাজ, যা তাঁর দলের লোকেরা করে বসেন। আবার চান, এমন অনেক কাজ করতে অস্বীকার করে ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে। দলের নেতারাও অনেক সময় এমন অনেক কথা বলেন, যা না বললেও চলে এবং বলাতে জটিলতা বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন লাভ হয় না। শ্রীজ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে যেরকম স্বাধীনভাবে চালাতে চান, তাতে বাধা যত আসে শরিক দল থেকে, তার চেয়ে বেশি আসে নিজের দলের কর্মীদের আচরণ থেকে। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাবে এই ভাবনা শ্রীজ্যোতি বসু সবচেয়ে কম করেন, আবার স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে—এই ভাবনাও তাঁর নেই। কিন্তু এই প্রশ্নগুলি ওঠে, আলোচনা হয়, উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। শ্রীবসু এই সব ক্ষেত্রে নিতান্তই অসহায় দর্শক বই অন্য কিছু নন।

কেরলে ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ শ্রী এ কে গোপালন সম্পর্কে ভাবনা ভাবতেন, পশ্চিমবঙ্গে শ্রীবসু শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত সম্পর্কে একই ভাবনা না ভেবে পারেন না। কেরলে ই এম এস সরকারের পতন রোধে শ্রী এ কে গোপালন যে ভূমিকা নিতে পারতেন, সেই ভূমিকা তিনি নেন নি। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার রক্ষায় শ্রীদাশগুপ্ত যে ভূমিকা নিতে পারেন, তা ঠিকমত নিচ্ছেন কি? যাহোক এই মনের ভাবনা কোন বাস্তব ঘটনায় প্রমাণিত সত্য

নয়, তবে, দীর্ঘদিন ধরে উভয়কে দেখে তাঁদের আচরণ লক্ষ্য করে আমার নিজের ভাবনা। এর কতটা সত্য, আর কতটা ভ্রান্ত সেই কথা এই দুই নেতাই বলতে পারেন। নইলে আমাদের মত ইতর জনের এইসব বড় বড় নেতার মনের হিসাব করার দুঃসাহস হবে কোথা থেকে।

মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী দু'জনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনের ফারাক সৃষ্টি হয় ১৪ই তারিখের যুক্তফ্রন্টের সভার পর থেকে বলা যায়। কারণ এর আগে পর্যন্ত এঁরা দু'জন জানতেন; যে কোন সমস্যাই তাঁরা দু'জনে আলোচনায় বসলে মীমাংসা করতে পারেন। এই মনোভাব নিয়েই ১৪ই তারিখে যুক্তফ্রন্টের সভায় আগের দিন দু'জনে বসেছিলেন—কারণ পরদিন যুক্তফ্রন্টের সভায় বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবার কথা। এই বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে দুই পক্ষে অনেক কড়া কথার আদান-প্রদান হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় শ্রীমুখোপাধ্যায় ও শ্রীবসু বসলেন আলোচনায়। দীর্ঘ সময় আলোচনা করে বেশ মনের কাছাকাছি এলেন, ঠিক হল পরদিন যুক্তফ্রন্টের সভায় মুখ্যমন্ত্রী নিজে আলোচনার উদ্বোধন করে সব কথা বলবেন। যুক্তফ্রন্টের সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন করে আগামী দিনের কর্তব্য নির্দেশ করবেন। সি-পি-এম ও বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে বেশি কথা বলবেন না, বাংলা কংগ্রেসও তাঁদের প্রস্তাব নিয়ে কোন চাপাচাপি করবেন না। যাকে বলে বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবকে টক আউট করে দিয়ে কাজের কথা আলোচনা হবে। কিন্তু পরদিন যুক্তফ্রন্টের সভায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। শ্রীসুশীল ধাড়ার হাতে কয়েক কিলো ওজনের কাগজ দেখে শ্রীজ্যোতি বসু চটে গেলেন আর সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথার কথা ভুলে গেলেন। ফলে হল এই, যা চাপা পড়বার কথা ছিল, শ্রীজ্যোতি বসু সেটাই টেনে তুললেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায় বললেন—এমন কথা তো ছিল না, শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে কথা বলে তাঁর অন্য রকম ধারণা জন্মেছিল। আর শ্রীজ্যোতি বসু বললেন—তিনি তো মুখ্যমন্ত্রীকে কোন কথা দেন নি, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কথা হয়তো ঠিক মত বুঝতে পারেন নি। এই সুরু হল মনের ব্যবধান রচনা এবং তা বেড়েই চলল। ফল হল এই—২৫শে ও ২৬শে যুক্তফ্রন্টের সভায় যে সাত দফা কর্মসূচী রচিত হল, সেটা চাপা পড়ে গেল। সাত দফা কর্মসূচীর অন্যতম ছিল, সকলে মিলে নিচুতলার কর্মীদের যে কোন সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকতে বলবেন। কিন্তু বিরত থাকা দূরে থাক, সাত দফা কর্মসূচী গ্রহণের সাত দিনের মধ্যে আরো সাতটা খুন হয়ে গেল। ফল হল এই আজ কারো মনে নেই যে, তাঁরা যুক্তভাবে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সভা করবেন, যুক্তফ্রন্টকে যুক্তরূপে জনগণের সামনে তুলে ধরবেন। আজ তাই অবস্থা হল নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট শরিকরা কখনও কেরল দেখে ভাবছেন—এই পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারও যাবে, কখনও দিল্লী দেখে ভাবছেন—এইবার পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার যাবে। সকলের মনেই নানাভাবে ভাবনা হল—সরকার যাবে, আজ না হয় কাল। কিন্ত কেউ জানেন না কেন যাবে, কিভাবে যাবে ? অন্য ভাবনা যখন ফুরিয়ে যায়, তখনই মানুষের মনে আসে একটা শেষ ভাবনা। সেই ভাবনার পিছনে কোন যুক্তি থাকে না, কোন সত্যও থাকে না, তবু আর কিছু ভাববার নেই, তাই শেষ ভাবনার জালে বন্দী হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট ও সরকারের দুই প্রধান শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসু আজ আর নতুন কোন ভাবনাই ভাবতে পারছেন না—তাই অসহায়ভাবে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছেন। ভাবনা চলেছে নিজের খেয়াল-খুশিমত। সেই আপন মনে চলা, ভাবনার সঙ্গে শরিক হচ্ছেন অন্য সকল দলের নেতা, মন্ত্রী ও সেই সঙ্গে দেশের মানুষ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী দুর্নীতিতে নাড়া দিয়েছেন!

নীলকন্ঠ বাচস্পতি

খবরের কাগজে দেখা গেল স্বাস্থ্যমন্ত্রী দুর্নীতিতে নাড়া দিয়েছেন। অনেক দিন পরে এরকম একটা খবর স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে খবরের কাগজের মাধ্যমে জানিয়েছেন, এটাও বোধ করি একটা খবর এবং এ খবরের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। কেন না স্বাস্থ্যদপ্তরের দুর্নীতি সম্বন্ধে সাপ্তাহিক বসুমতীর পাতায় পড়তে পড়তে আমরা সাধারণ পাঠকরা স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্পর্কে একরকম প্রায় ধারণাই করে ফেলেছিলাম—ভদ্রলোক হয় পাষাণ, না হয় দেবতা এবং তিনি হয়তো সেই দেবতা, যিনি একই সঙ্গে পাষাণ আর দেবতা দুই-ই, অর্থাৎ তিনি শিব। মাঝে মাঝে তাই আমাদের মনে হত, পাষাণরূপী মহাকাল হয়তো বর্তমানে ধ্যানমগ্ন। কিন্তু যেদিন কেউ তাঁর ধ্যানভংগ করাতে পারবেন সেদিন বোধ করি তিনি সংহার মূর্তিতে ত্রিশূল হাতে এগিয়ে আসবেন। এবং সম্প্রতি তিনি ঠিক সেইভাবেই কোন এক এম-এল-এ ভদ্রলোকের খোঁচানির জবাবে বলেছেন, "তথ্য দিয়ে সব ফাঁস" করে দেবেন—কিভাবে তিনি দুর্নীতিতে নাড়া দিয়েছেন। কে জানে এই 'তথ্যই' হয়তো তাঁর ত্রিশূল।

অর্ধশতাব্দীর চিকিৎসক-শিক্ষাবিদের অভিজ্ঞতা

কিন্তু সেই প্রভাতী মেঘ, দাম্পত্য কলহ আর অজাযুদ্ধের উপমাটা অথবা পর্বতের মূষিক-প্রসব, কিম্বা উল্টো বুঝলি রাম—এ সব কথাগুলিই একসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে গেল স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ত্রিশূলী-আস্ফালনে। কেন, সে কথা বলছি। গিয়েছিলাম বাংলাদেশের এক চিকিৎসক-শিক্ষাবিদের কাছে, যিনি অর্ধশতাব্দী ধরে এই মহান কাজে ব্রতী ছিলেন এবং আজও যিনি সেই ব্রতে সমানভাবে উৎসাহী। তিনি তাঁর সারা জীবনের ভাবনার সূত্র দিয়ে সংগৃহীত মূল্যবান তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ কিছু কাগজপত্র ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে, পরম শ্রদ্ধাভরে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে দিয়েছিলেন যাতে যুক্তফ্রন্ট সরকার স্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে পারেন। কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি করলেন?

প্রথম যুক্তফ্রন্টের ন-মাসের মধ্যে সে কাগজপত্র মাননীয় মন্ত্রী ঐ শিক্ষাবিদ্-চিকিৎসককে ফেরৎ দিতে পারলেন না। তা না দিন। উক্ত শিক্ষাবিদ্ও আর সেগুলি তাঁর কাছ থেকে চাইলেন না। কেন চাইলেন না সে কথা বলতে গিয়ে তিনি আমাকে বললেন,—"দেশের রাজনৈতিক অবস্থা দৃষ্টান্তে আমি জানতাম যে, যুক্তফ্রন্ট আবার দেশের শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। আবার আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীও তাঁর দপ্তর ফিরে পাবেন এবং সে সময় আমার ঐ কাগজপত্র নিশ্চয়ই তাঁর কাজে লাগবে। আমার অনুমান সত্য হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হলেন। আমি আমার কাগজপত্র আবার কাজে লাগবে বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দনও জানালাম।" এরপর তিনি আর বলতে পারলেন না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হল তারপর?'

তিনি বললেন, 'নিতান্ত দপ্তরী কায়দায় দপ্তরের সেক্রেটারীকে দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাকে একখানি চিঠি দিলেন।'

'শুধুই দপ্তরের একখানা চিঠি?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করলেন না?'

'না।'

'এরপর আপনি কি করলেন?'

'কিছুই না। শুধু ননীবাবু যেখানে সভাপতি বা ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হন, আমি সেখানে আমন্ত্রিত হলে, সেখানে যাওয়া ছেড়ে দিতে লাগলাম।'

'কেন?'

'আপনজনকে যারা ভুলে যায় তাদের সঙ্গে এক জায়গায় বসতে আমার মন সাড়া দেয় না।'

বুঝলাম একাত্তর বছরের বৃদ্ধ এই চিকিৎসক-শিক্ষাবিদের মনোবেদনাটা কোথায়। তবুও জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর?'

'তারপর আর কি?' তিনি বললেন 'অদৃষ্টের পরিহাস বলে একটা কথা আছে তো। শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গা থেকে আমার ডাক এলো, যেখানকার সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ। আমি ফিরিয়ে দিতে পারলাম না তাদের। সেখানেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। সভার শেষে ফিরছিলাম ওঁরই গাড়িতে। বললাম ওঁকে—আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আপনার ইমেজ, যুক্তফ্রন্টের ইমেজ আপনার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে ১৯৬৭ সালের চেয়ে কত নিচে নেমে গেছে?'

'তাতে উনি কি বললেন?'

'উনি কিছু বলার আগে দেখি ওঁর সে সচিবটির নামের শেষে 'ইন' আছে সে ছোকরা ফড়ফড় করে উঠল। দিলাম তাকে ধমক। বললাম, আমি মিনিস্টারের সঙ্গে কথা কইছি। তোমার সঙ্গে নয়। ছোকরাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বয়স কত? কি যেন সে একটা বললে। তাতে আমি যা বলেছিলাম সেটা ননীবাবুর মনে থাকার কথা। কিন্তু যাক সে কথা। এরপর আমি ননীবাবুকে বলেছিলাম যে চোর আর ডিবচগুলো কংগ্রেস আমলে মস্তানী করে বেড়াতো, ননীবাবু, তারা আজ unrestricted opportunity পেয়েছে, সেটা কি লক্ষ্য করেছেন?'

'ননীবাবু তাতে কি বললেন?'

'ননীবাবু আর কি বলবেন। যতদিন না ওঁর ঐ একান্তসচিব যাঁর নামের শেষে 'ইন' আছে—সে ছোকরা 'আউট' হচ্ছে ননীবাবু কিছু করতে পারবেন বলে আমার মনে হল না। কারণ ঐ ছোকরাই স্বাস্থ্যদপ্তরে যাবতীয় নোংরা কাজের লিংক।'

'কি করে বুঝলেন?'

'ছোকরা যাদের নাম করে ফড়র ফড়র করতে লাগল তাদের যে আমি চিনি।'

অথচ স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাকি দুর্নীতিতে নাড়া দিয়েছেন। সব নাকি তথ্য দিয়ে ফাঁস করবেন। পূর্বোক্ত শিক্ষাব্রতী আমাকে বললেন, 'ভাই বাচস্পতি, ১৯৬৭ সালের ননীবাবু আর ১৯৬৯ সালের ননীবাবু এক মানুষ নন। আর ১৯৬৭ সালের স্বাস্থ্যদপ্তরের অফিসার আর ১৯৬৯ সালের অফিসার নামের খাতায় এক হলেও কার্যত তারাও এক নয়। '৬৭ সালে ননীবাবুকে তারা সম্পূর্ণ হাতের মুঠোয় আনতে পারে নি। কিন্তু এবারে তো তারা পেরেছে। অতএব যা ঘটবার তাই ঘটছে।'

'কিন্তু আপনার কাগজপত্র?'

'স সব ফেরৎ পাবার সৌজন্যবোধের প্রতীক্ষায় আছি।'

নারী নিগ্রহ : নারী তোষণ

শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদের কথাটা মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিলাম। মনশ্চক্ষে একবার স্বাস্থ্যদপ্তরের অফিসারদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কারা ফিরে

গেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে আর তাঁদের link maintain করছে কে বা কারা? এই তো সেদিনের কথা, একটি মেডিকেল কলেজের রেডিও থেরাপী ডিপার্টমেন্টের লজ্জাকর কাহিনী। কেন মাননীয় মন্ত্রী-মশাই তদন্ত করতে গিয়ে চেপে গেলেন ঘটনাটা? তিনি কি জানেন না 'এক্সরে এ্যাসিস্টান্ট' কোন মহিলাকে রাত্রে ডাক্তারের চেম্বারে যেতে বাধ্য করার অর্থ কি? সেই জানোয়ার ডাক্তারটির সম্বন্ধে কেন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি এবং কার পরামর্শে তদন্ত করতে আর তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বিধান নিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিরত থেকেছেন, তা কি জানবার আশা করতে পারি? শুধু তাই নয়, কোন-প্রকারেই যখন উক্ত মহিলাটিকে আর হাত করা গেল না, তখন কেন হঠাৎ তাকে উদ্বৃত্ত বলে এন-আর-এস হাসপাতালে পাঠানো হল? এভাবে হঠাৎ পাঠানো সম্পর্কে স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশ কোথায় জানতে পারি কি? যে ডাক্তাররা এই ব্যাপারে জড়িত তাদের anteceedent না জানা আপনার কথা নয়। খুব চাঞ্চল্যকর নারীঘটিত মামলা হয়েছিল এদের একজনের বিরুদ্ধে।

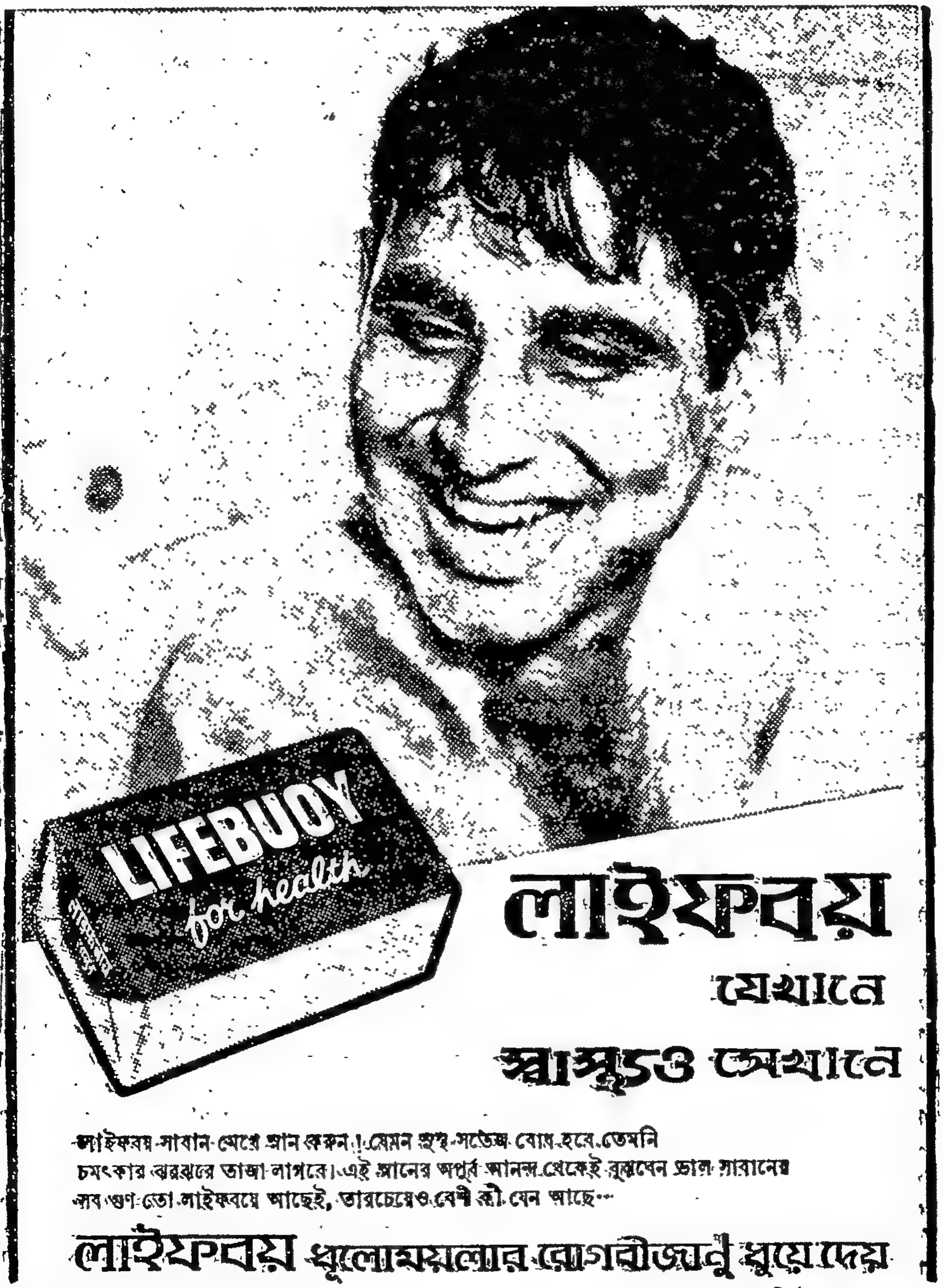

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
লিন্টাস-L.391-40 BG

আবার অন্যদিকে এই বিভাগেই কি মজা দেখুন। একদিকে যখন এই মহিলা-টির ওপর নির্যাতনের সর্বপ্রকার স্টীম-রোলার চালানো হয়েছে, তখন অন্যদিকে আরেক মহিলাকে কি অদ্ভুত সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তা দেখলে স্বাস্থ্যদপ্তরকে আর স্বাস্থ্যদপ্তর বলে মনে হয় না—মনে হয় যেন কলকাতার অভিজাত পল্লীতে অবস্থিত কোন হোটেল। কোন মহিলা এই বিভাগে ডিউটি করেন এবং ঠিক ঐ একই সময়ে আবার কলেজ করেন। এসব তথ্য আমাদের হাতে রয়েছে এবং সব থেকে নির্ভয়ে বলতে পারি, এই প্রবন্ধের জন্য একটা মামলা হলে আদালতে এগুলি আমরা উপস্থাপিত করতে পারি? জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যখন একজন মহিলাকে রাতে সকলের অজান্তে চেম্বারে যেতে রাজী না হওয়ার দরুণ অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হল, তখন আরেকজন মহিলা বে-আইনী সুবিধা ভোগ করছেন—এটা কি তাঁর চেম্বারী-অভিসারের পুণ্যফল?

স্বাস্থ্যমন্ত্রী অবশ্যই দুর্নীতিতে নাড়া দিয়েছেন! তিনি নাকি তথ্য দিয়ে সব ফাঁস করবেন।

পরিবার পরিকল্পনার তথ্য বিভাগ

এবারে একবার পরিবার পরিকল্পনা সংস্থার জনসংযোগ ও তথ্য বিভাগের মাস এডুকেশন এ্যাণ্ড ইনফরমেশন দপ্তরে আসা যাক। এই বিভাগের অফিসারটি কোন রাজনৈতিক দলের কোন নেতার কে হন, কেন এবং কিভাবে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে সে কথা বর্তমানে আলোচনা করতে চাই না, তবে শুধু জিজ্ঞাসা করতে চাই, ভদ্রলোকের মুরুব্বি আছে বলে কি সরকারী খরচে তাঁর জীবনীটিকেও প্রকাশ করতে হবে? মাননীয় মন্ত্রীমশাই হয়তো বলবেন, কাগজওয়ালারা যদি তাঁর জীবনী ছাপে তাতে দপ্তরের কি করবার আছে? কথাটা ঠিকই। কিন্তু সবিনয়ে তাঁকে এই কথা নিবেদন করব, ঐ বিশেষ পত্রিকাখানায় ঠিক ঐ সংখ্যাটিতেই তিন হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, অন্যত্র ছাপা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে এবং তা প্রচার করবার উদ্দেশ্যে এক হাজার কপিও কেনা হয়েছে (দাম অবশ্য পত্রিকাখানার বেশি নয়, কপি পিছু মাত্র পঞ্চাশ পয়সা)—এক্ষেত্রে অবস্থায় উক্ত অফিসারের কোন অলিখিত শর্ত কি পত্রিকাখানির কর্তৃপক্ষের ওপর চাপানো হয় নি? পত্রিকাখানি আমার হাতের কাছে রয়েছে। বাস্তবিকই পশ্চিমবঙ্গের এত বড় সৌভাগ্য আমি কল্পনাও করি নি। যে বছর গান্ধী শতবার্ষিকী হচ্ছে, লেনিন শতবার্ষিকী হচ্ছে, তাঁদের কত মূল্যবান তথ্যবহুল জীবনী প্রকাশিত হচ্ছে, ঠিক সেই বছরে পরিবার পরিকল্পনার ইনফরমেশন দপ্তরের মুরুব্বিপুষ্ট অফিসারটিরও জীবনী প্রকাশিত হচ্ছে। তাই ভাবছি, এমন কর্মিৎকর্মা অফিসার যখন আমরা পেয়েছি, তখন সে গৌরব রাখবার আমাদের জায়গা কোথায়?

অথচ এই ভদ্রলোকের প্রচারের একটু নমুনা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই এবং আশা করব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তা একবার আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কৃতী সন্তানের কাছে এর অর্থ খোঁজবার চেষ্টা করবেন। আলোচ্য পত্রিকাখানির ২৬২৪ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমের একেবারে শেষে ও দ্বিতীয় কলমের একেবারে প্রথম লাইনে লেখা হয়েছে—"তবু দেখা যায়, এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হচ্ছে। কারণ এঁরা জন্মশ্রেণীর বিরোধিতায় তুলনায় প্রবল।" অদ্ভুত বাংলা কিন্তু। "জন্মশ্রেণীর বিরোধিতা" এ-কোন্ দেশী বাংলা এবং কোন্ ইংরাজীর অনুবাদ এবং কোন্ মানুষ এই বাংলা বুঝবেন, সে কথা একটু জানতে ইচ্ছা হয়। অথচ মন্ত্রীমশাই নাকি দুর্নীতিকে নাড়া দিয়েছেন। তিনি নাকি সবকিছু তথ্য দিয়ে ফাঁস করবেন। আশ্চর্য!

সবিনয় নিবেদন

স্থানাভাববশত এ সংখ্যায় অনন্ত সিংহের বিপ্লবী যুগের ধারাবাহিক স্মৃতি-কথা 'অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়', সুশীল জানার ধারাবাহিক উপন্যাস 'সাগর সঙ্গমে', সমীর মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্টাজ 'অন্য গ্রাম, অন্য তরংগ', শ্রীসর্বদর্শীর ফিচার 'যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু' প্রকাশ করা গেল না, এর জন্যে আমরা দুঃখিত।

আগামী সংখ্যায় রচনাগুলি যথারীতি প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদিকা

বশম্বদদের জমিদারী

আরও আশ্চর্য লাগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন তথ্য দিয়ে সবকিছু ফাঁস করবেন বলেন। তাই তাঁর অবগতির জন্য আমি এই তথ্যগুলি তাঁর সামনে উপস্থাপিত করছি। তিনি এ সম্বন্ধে কি বলেন, তা জানবার ইচ্ছা রইল। একজন ডেপুটি ডিরেক্টর খুবই যোগ্য ব্যক্তি দপ্তরে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীমশাই বলবেন কি, শ্রীমতী রায় তাঁর কে হন? ডাঃ জি রায়ই বা তাঁর কে? ডাঃ অসীম রায়ের সঙ্গে তাঁর কোন্ সম্পর্ক? আর ডেপুটির কন্যা—যাঁর জন্য কোন পোস্ট ছিল না, সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসাবে তাঁকে আনা হল কেন? এ কি একটি বশম্বদ পরিবারকে স্বাস্থ্যদপ্তরে জমিদারী করতে দেওয়ার বিশেষ সনদ নয়?

আরও বলি, মেডিকেল ফ্যাকাল্টি সম্পর্কে। মাননীয় মন্ত্রীমশাই নিশ্চয়ই জানেন ফ্যাকাল্টিতে কিরকম *stature*-এর চিকিৎসক সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। ডাঃ বিধান রায় আমাদের বিরুদ্ধবাদী লোক ছিলেন, কিন্তু ডাক্তার হিসাবে তাঁকে তো আমরা ছোট করতে পারি না। সেইরকম *stature*-এর চিকিৎসকদেরই নিয়ে এই ফ্যাকাল্টি হয়। এবং স্বাস্থ্যদপ্তরের সুপারিশও ছিল সেইরকমের। তাতে অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান চিকিৎসকদের নাম ছিল। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীমশাই ডাঃ স্বরাজ ব্যানার্জী, ডাঃ সেনগুপ্ত প্রভৃতিকে সে জায়গায় মনোনীত করলেন কি করে এবং কার স্বার্থে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

হাইকোর্টে মিথ্যা সাক্ষ্যের আসামী

ক্রমশই প্রবন্ধের কলেবর দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের মত বেড়ে যাচ্ছে। তাই আমাকে স্বাস্থ্যদপ্তরের মহাভারতকে উদ্যোগপর্বেই শেষ করতে হচ্ছে। তবে মাননীয় মন্ত্রীমশাই যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী বলে তাঁকে বাঁচাবার জন্যই আমাকে আঘাত করতে হবে। কারণ যাঁদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি চলছেন, তাঁদের অনেকেরই জেলখানায় থাকার কথা। আর এই জেলখানার লোকের সঙ্গে সহবাসে মন্ত্রীর বা যুক্তফ্রন্টের ইমেজ কখনই সমুন্নত হতে পারে না। আমার বক্তব্যটা এইখানে। আমার অগ্রজ 'বিষকণ্ঠ নাগস্পতি' আমাকে এই কথাটাই বার বার শিখিয়ে গেছেন। মাণিকতলা বোমা মামলার সেই দ্বীপান্তরের বন্দী বন্ধু আজ স্বর্গত। আমি তাঁর কনিষ্ঠতম অনুজ বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর আশীর্বাদ আমার মাথায়। সেই আশীর্বাদের মর্যাদা রাখতে কখনই আমি সত্যি কথা লিখতে পিছিয়ে যাব না এবং এজন্য আদালতের সম্মুখীন হতেও আমি প্রস্তুত।

জনৈক প্রাক্তন অধ্যক্ষকে মন্ত্রীমশাই নানা দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার দিয়েছেন। মন্ত্রীমশাই কি জানেন এঁর এ্যান্টিসিডেন্ট? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একবার এজন্য জবাবদিহি করতে হয়েছিল—এর কোন খবর কি তাঁর জানা আছে? ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অত্যন্ত জাঁদরেল মানুষ ছিলেন, তাঁকে কিভাবে ব্যাপারটা সামলাতে হয়েছিল সেই ঘটনাটা সংবাদপত্রের প্রতিটি পাঠকেরই জানা।

মহামান্য হাইকোর্টের কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার দায়ে ভদ্রলোক দাগী এবং এরই জন্য যাঁর জেলে থাকা উচিত তিনি আজ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তর আলো করছেন দেখে বিস্মিত হতে হয়।

কয়েকটি জিজ্ঞাসা

ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

॥ এক ॥

যদিও আমার নামের আগে একটা ডঃ আছে সেটা কিন্তু রোগী দেখার ছাড়পত্র নয়। তাই সাপ্তাহিক বসুমতীর কর্তৃপক্ষ যখন বর্তমান চিকিৎসাব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কে কিছু লেখার অনুরোধ করলেন এই বিশেষ সংখ্যার জন্য, আমি প্রবল আপত্তি করেছিলাম, কেন না প্রতিটি বিষয়ের অধিকারী-ভেদ আছে এবং এ বিষয়ে কিছু লেখার ক্ষেত্রে আমি শুধু অযোগ্যই নই, অনধিকারী। তবু যে কেন লিখতে সম্মত হয়েছি তার কৈফিয়ৎস্বরূপ কয়েকটি কথা বলা যায়। প্রথমত চিকিৎসাবিভাগ ও স্বাস্থ্য-দপ্তরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চিকিৎসক হিসাবে না থাক রোগী হিসাবে অবশ্যই আছে। নিজের জন্য, আত্মীয়স্বজনের জন্য, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শীর জন্য হাসপাতাল-ঘর যে-কোন লোকের মত আমাকেও করতে হয়। দ্বিতীয়ত চিকিৎসাবিভাগের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আমার পরিচয় অথবা বন্ধুত্ব আছে, তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের ডিপার্টমেন্টের সুবিধা-অসুবিধা ভাল-মন্দের কিছু কিছু সংবাদ সাধারণভাবেই কানে আসে। তৃতীয়ত একজন প্রগতি-শীল নাগরিক হিসাবে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল থাকা আমার পক্ষে নৈতিক কর্তব্য বলেই মনে করি। এই কারণেই আমি বর্তমান রচনাটিতে আমার স্বল্প অভিজ্ঞতার মধ্যে যেটুকু জানি, যা শুনেছি, বা পড়েছি তারই ভিত্তিতে আমার বক্তব্যগুলি এখানে যথাসাধ্য রাখবার চেষ্টা করব।

সাপ্তাহিক বসুমতীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নবপর্যায়ে এই পত্রিকাটির সৃষ্টির কাল থেকেই। আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি যে, এই পত্রিকার বঙ্গদর্শন নামক বিভাগটিতে চিকিৎসাজগৎ ও স্বাস্থ্য-দপ্তর সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা ও চাঞ্চল্যকর তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ থাকে। একদিন কথাচ্ছলে কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম যে, অন্যান্য দপ্তরের চাইতে স্বাস্থ্যদপ্তরের প্রতিই বা তাঁদের এত আকর্ষণ কেন। জবাবে তাঁরা বলেছিলেন যে, যেহেতু এই বিশেষ দপ্তরটি জন-জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কান্বিত সেইহেতু স্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কিত আলোচনাই বঙ্গদর্শন নামক ফীচারটিতে অগ্রাধিকার পায়। গত আট বছর ধরে দেখে আসছি যে, স্বাস্থ্যদপ্তর সংক্রান্ত নানা প্রকার দুর্নীতির সংবাদ এঁরা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করে আসছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিকার হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে হয় নি, যদিও স্বাস্থ্য-দপ্তরকে জঞ্জালমুক্ত করার প্রচেষ্টা থেকে সাপ্তাহিক বসুমতী কোনদিনই বিরত হয় নি বলে আমার বিশ্বাস।

॥ দুই ॥

কদিন আগে কয়েকটি সংবাদপত্রে বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল, যে-বিবৃতিতে প্রকারান্তরে বলা হয়েছে যে, সাপ্তাহিক বসুমতী মাননীয় মন্ত্রী-মহাশয়কে লোকচক্ষে হেয় করার চেষ্টা করছে এবং তাঁর দপ্তরের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক কুৎসা ছড়িয়ে যাচ্ছে কোন বিশেষ স্বার্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে। যুক্তফ্রন্টের কোন কোন মন্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমার আছে, যদিও ননীবাবুর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তবে তাঁর সম্পর্কে লোকমুখে যা শুনেছি, তিনি অতি সজ্জন ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি। কাজেই তাঁর নামে প্রচারিত বিবৃতিতে সাপ্তাহিক বসুমতীর উদ্দেশ্য ওইরূপ মন্তব্য দেখে স্বাভাবিকভাবেই দুঃখ বোধ করেছিলাম। আমার যতদূর স্মরণে আছে, এ প্রতিকূল মনোভাব ননীবাবুর পূর্বে ছিল না, দ্বিতীয় পর্যায়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা স্থাপিত হবার পর সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে দেখা যাচ্ছে ননীবাবু স্বাস্থ্যদপ্তরের ব্যাপারে সাপ্তাহিক বসুমতীর ভূমিকার প্রশংসা করেছেন এবং এই পত্রিকার কাছ থেকে ওই দপ্তরের অনাচার দূর করার জন্য সহযোগিতা কামনা করেছেন। কিন্তু তাঁর অনুরাগ অকস্মাৎ এমন বিরাগে পরিণত হল কেন?

এদিকে দেখছি, সাপ্তাহিক বসু-মতীর বিগত কয়েকটি সংখ্যাতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ আনা হয়েছে এবং তাঁকে দুর্নীতিপরায়ণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দেখছি দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন: "মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, মার্কসবাদের নামাবলী গায়ে চাপালেই দুর্নীতি সুনীতি হয়ে ওঠে না; যুক্তফ্রন্টের আমলে দুর্নীতি দুর্নীতি নয়, নির্ভেজাল সদাচার, এবং যারা সেই দুর্নীতির মুখোস খুলে দেবে তারা কায়েমী স্বার্থের দালাল, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এ হেন ব্যাখ্যা শুনলে কবরেও কার্ল মার্কস সাহেব শিউরে উঠবেন।" স্পষ্টই বোঝা গেল ননীবাবু প্রদত্ত বিবৃতির জবাবের এটা একটা অংশ। পরে সুযোগমত একদিন সাপ্তাহিক বসুমতীর কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসা করতে তাঁরা বললেন, "বঙ্গ-দর্শনে প্রকাশিত লেখাগুলিতে স্বাস্থ্য-মন্ত্রী মহাশয় বেসামাল হয়েই ছিলেন, তার পর শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা মহাশয়ের একটি রচনা প্রকাশিত হবার পর তিনি আর ক্রোধ সংবরণ করতে পারেন নি, আমাদের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন। আমরাও ছেড়ে দেব না। আমাদের কাছেও তথ্য বড় কম নেই।"

॥ তিন ॥

এ হেন পরিস্থিতির মাঝখানে আমাকে যখন এই বিশেষ সংখ্যার জন্য লিখতে বলা হল, আমি রাজী হলাম শুধুমাত্র এই কারণেই যে, বর্তমান রচনা-টির মারফৎ আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট থেকে কয়েকটি প্রশ্নের জবাব সোজাসুজি পেতে সক্ষম হব। একজন যুক্তফ্রন্টের সমর্থক প্রগতিশীল নাগরিক হিসাবে আমার এটুকু জানবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে যে, সাপ্তাহিক বসুমতীর বঙ্গদর্শনের নিবন্ধগুলিতে এবং শ্রীহাজরার রচনায় স্বাস্থ্যদপ্তর তথা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে সেগুলি কতদূর যথার্থ। অবশ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী জবাব না দিতেও পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাহলে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হব

যে, মনোভাবের দিক থেকে সে আমলের কংগ্রেসী মন্ত্রীর সঙ্গে আজকের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীর কোন তফাৎ নেই।

বলাই বাহুল্য, স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে আসামীর কাঠগড়ায় তোলার কোন মতলবই আমার নেই; কিন্তু এ কথাটাও ভুললে চলবে না যে, অনাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যই যুক্তফ্রন্ট সরকারের সৃষ্টি হয়েছে, তাই সর্ষের মধ্যেই যদি ভূত ঢুকে থাকে সেটা সত্যই খুব পরিতাপের বিষয় হবে। বঙ্গদর্শনের রচনাগুলিতে এবং মনোরঞ্জনবাবুর প্রবন্ধে যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে সেগুলিকেও "টেকন ফর গ্রান্টেড" মনে করার কোন কারণ অন্ততঃ আমার দিক থেকে নেই। যে প্রশ্নগুলি অতঃপর তুলব সেগুলির সুনির্দিষ্ট জবাব পেলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে এবং জবাবগুলি জনস্বার্থেই চাইছি কেন না ব্যক্তিগতভাবে আমি নিঃসন্দেহে, বৃহত্তর জনসাধারণেরই একটি অংশ।

॥ চার ॥

সাপ্তাহিক বসুমতীর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অভিযোগগুলির কথায় আসা যাক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মনোরঞ্জনবাবুর রচনায় উল্লিখিত কয়েকটি অভিযোগ ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শনেও প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্গদর্শনের রচনাগুলি পড়ে আমার যে ধারণাগুলি হয়েছে সেগুলি পরেই স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্ব থেকেই সাপ্তাহিক বসুমতী স্বাস্থ্য দপ্তরের জনৈক পদস্থ আমলাকে চিহ্নিত করেছে এবং পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়েছে যে, ওই লোকটিকে অপসারণ করলেই স্বাস্থ্যদপ্তরের বারো আনা দুর্নীতি দূর হবে। এই ব্যক্তিটিকেই সাপ্তাহিক বসুমতী "সুহৃদচক্রের নায়ক" বলে অভিহিত করে। সাপ্তাহিক বসুমতীর বঙ্গদর্শন বিভাগে প্রকাশিত নিবন্ধগুলি পাঠ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়: (ক) কংগ্রেসী আমলের শেষের দিকে জনৈক প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য অধিকর্তা পদে নিযুক্ত ছিলেন। যাঁকে প্রাইভেট প্রাকটিশ করার বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি স্বাস্থ্যদপ্তরের কাজে বিশেষ মনোযোগ দিতে না পারার দরুণ ওই বিভাগে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তারই সুযোগ নিয়ে জনৈক পদস্থ আমলা স্বাস্থ্যদপ্তরকে নিজের খাস তালুক বানিয়ে ফেলেন। এই পদস্থ আমলাটিই হচ্ছেন উক্ত "সুহৃদচক্রের নায়ক" এবং মজা হচ্ছে এই যে, এই একই ব্যক্তিকে বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননীবাবু ব্যাক-ডেটে প্রমোশন দিয়েছেন; যে অভিযোগ করেছেন শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা। (খ) এই ব্যক্তিটির জাল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছড়ানো, সব জায়গাতেই এঁর এজেন্ট আছে—নিয়োগ বদলী-প্রমোশন, ঔষধপত্র সরবরাহ, পথ্যের জোগানের ঠিকাদারী এবং আরও নানা বিষয় এই ব্যক্তিটির মুঠোর মধ্যে, এঁকে এবং এঁর গোষ্ঠীকে ঠিকমত সেবা করতে না পারলে ডব্লিউ বি এইচ এস-এ যাঁরা চাকরি করেন তাঁদের অবস্থা শোচনীয় হয় এবং এঁকে খুশি রাখতে পারলে তরতর করে উন্নতির সোপানগুলিতে আরোহণ করা যায়। এঁকে আশ্রয় করলে নাকি সকল দুর্নীতিই সোনার কাঠির স্পর্শে সুনীতিতে পরিণত হয়। (গ) স্বাস্থ্য অধিকর্তার পদ থেকে উক্ত স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ অবসর গ্রহণ করলে তাঁর জায়গায় ডাঃ কনক সর্বাধিকারী স্বাস্থ্য অধিকর্তা হয়ে আসেন। স্বাভাবিকভাবেই উক্ত "সুহৃদচক্রের নায়ক" তখন বেকায়দায় পড়ে যান এবং ধর্মবীরের আমলে তিনি একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ডাঃ সর্বাধিকারী স্বল্পকালের মধ্যেই স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য কিছুটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। (ঘ) এরপর দ্বিতীয়বার যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হলে পর ননীবাবু পুনরায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়ে আসেন এবং সেই সুযোগে তাঁর প্রিয়পাত্র উক্ত "সুহৃদচক্রের নায়ক" পুনরায় পাদপ্রদীপের আলোয় প্রকাশিত হন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উক্ত "সুহৃদচক্রের নায়ক" ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের ওপরেই নির্ভর করতে শুরু করেন। (ঙ) শুধু তাই নয়, গত ১৬ই অক্টোবরের সাপ্তাহিক বসুমতীর বক্তব্য অনুযায়ী, বেপরোয়া দলীয় স্বার্থসিদ্ধির কাজে ডাঃ কনক সর্বাধিকারী নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁকে জব্দ করার জন্য নাকি নানাপ্রকার প্রতিশোধমূলক কাজ করা হয়েছে, এমন কি ডাঃ সর্বাধিকারীর সমর্থক সন্দেহে কয়েকজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনেরও নাকি তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে।

এ-সকল বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য কি? একথা কি সত্য যে, যিনি নতুন স্বাস্থ্য অধিকর্তা পদে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁর সার্ভিস রেকর্ড ভাল নয় এবং রাজ্যপালের প্রশাসনে হেলথ সেক্রেটারী ও খোদ যুক্তফ্রন্ট আমলে জনৈক জয়েন্ট সেক্রেটারী তাঁর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন? একথা কি সত্য যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর নিয়োগে আপত্তি করায় স্বাস্থ্যসচিব পদত্যাগের হুমকী দিয়েছিলেন?

॥ পাঁচ ॥

ডাঃ সর্বাধিকারীর পুনর্নিযুক্তির প্রশ্নে অনেক জল যে ঘোলা হয়েছে। সাপ্তাহিক বসুমতীর বক্তব্য অনুযায়ী, অন্তত বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলি পড়ে আমার যা মনে হয়েছে, এই রি-এমপ্লয়মেন্টের ব্যাপারটি কোন সুস্পষ্ট নীতিভিত্তিক নয় এবং এ বিষয়ে গত ২৮শে আগস্টের সংখ্যায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্রী এস. আর. দাস কর্তৃক প্রচারিত একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, কোন অফিসারের পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার অনুমোদন লাগবে এবং সময়মত তা উপস্থাপিত করতে না পারলে পদাধিকারীকে মেয়াদ ফুরনোর দিনেই মুক্তি দিতে হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাস্য, এই যদি নিয়ম হয় তাহলে চাকরির মেয়াদ পার হয়ে যাবার পরও তাঁর দপ্তরের অধীনে কর্মরত তিনজন অফিসার—ডাঃ দত্তগুপ্ত, ডাঃ সেন ও ডাঃ আচার্য বহাল তবিয়তে কাজ করে যাচ্ছেন কি করে? যদি তর্কচ্ছলে ধরেও নেওয়া যায় যে, যথাবিহিতভাবেই তাঁদের পুনর্নিযুক্ত করা হয়েছে, তা হলেও তা অপর একটি সরকারী নির্দেশের পরিপন্থী হয়ে যায়; যা হল হেড কোয়ার্টারের বাইরে অবস্থিত কোন স্থানে রি-এমপ্লয়মেন্ট দিতে হবে যদি আদৌ তা দিতে হয়। অতএব স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট পুনরায় জিজ্ঞাস্য: এঁরা কিভাবে আজও পর্যন্ত খোদ রাইটার্স বিলডিংসের ভেতরেই রয়ে গেলেন?

রি-এমপ্লয়মেন্টের প্রশ্নে আরও কয়েকটি গুরুতর বিচ্যুতির সংবাদ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছে। আমি যতদূর জানি, যুক্তফ্রন্টের একটি বিশেষ ঘোষিত নীতিই হচ্ছে যে, একজন কর্মচারীর পুনর্নিয়োগ যদি অপর কোন কর্মচারীর উন্নতির অন্তরায় হয় তবে তাঁকে আর পুনর্নিয়োগ করা চলবে না। যদি স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই নিয়মটি অবগত হয়ে থাকেন, তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে, তাঁর দপ্তরের জনৈক সেনগুপ্ত মহাশয়ের ৩১-১২-৬৯ পর্যন্ত চাকরিতে পুনর্নিয়োগ ঘটল কেন? উক্ত কর্মচারীটিকে পুনর্নিযুক্ত করার আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি এই তথ্য অবগত ছিলেন যে, বিভাগীয় অফিসারেরা এমন কি সেক্রেটারী পর্যন্ত উক্ত সেনগুপ্ত

মহাশয়ের পুনর্নিয়োগের আবেদন সোজা দুজি নাকচ করে দিয়েছিলেন? সাপ্তাহিক বসুমতীর (৩১শে জুলাই ১৯৬৯) মতে এই পুনর্নিয়োগ সম্ভব হয়েছে ওই "সুহৃদচক্রের নায়কটির" চাপেই। ঠিক এমনিভাবেই একজন অফিসার শ্রীমজুমদারকে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি বলেন?

সেখানে পরীক্ষার্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দুর্নীতি ও অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোন কোন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে টাকা নেবার অভিযোগ উঠেছিল। এই ব্যাপারে পরীক্ষার্থীরা এতদূর উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, পুলিশ প্রোটেকশন না দিলে আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিটিকে সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরতে হত না।

এই দুটি বিষয়ে ননীবাবুর কাছে আমার কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা আছে। ৩১শে জুলাই-এর সাপ্তাহিক বসুমতীর বঙ্গ-দর্শনে এই প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে যে, "মাত্র কয়েকদিন আগে আমরা স্বাস্থ্য অধিকারের প্রশাসন শাখার দুজন করণিক সম্পর্কে যে কথা লিখেছিলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন হওয়া দূরে থাক, উল্টে তাদের আড়াল করার ন্যক্কারজনক প্রচেষ্টা চলছে। স্বাস্থ্য অধিকারের দুজন পদস্থ

॥ সাত ॥

১৭ই জুলাই তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর বঙ্গদর্শনে দুজন ব্যক্তির নামে দুটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তুলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রথমজন একজন করণিক, যিনি দীর্ঘকাল ধরে স্বাস্থ্য অধিকারের প্রশাসন (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) শাখায় কাজ করছেন। তাঁর কাজ হল প্রধানত নন-গেজেটেড মেডিক্যাল অফিসারদের নিয়োগ-বদলী-প্রমোশন সংক্রান্ত ফাইল-গুলি দেখাশোনা করা। তাঁর স্ত্রী লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের একজন এজেন্ট, বলাই বাহুল্য, স্বামী ভদ্রলোকই স্ত্রীর হয়ে এই এজেন্সি চালান। নিয়োগ-বদলী-প্রমোশন ইত্যাদির ব্যাপারে যাঁরা তাঁর কাছে আসেন, তাঁকে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে মোটা অংকের ইনসিওরেন্স করতে বাধ্য করান, না করলে হয়রানি সুনিশ্চিত। এ ছাড়া নিয়োগ-বদলী-প্রমোশনের ব্যাপারে তাঁকে মোটা টাকা খাওয়াতে হয়, যার পরিমাণ দুশো থেকে পাঁচশো টাকার মধ্যে। এই সেদিনও তিনি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ছিলেন, ইতিমধ্যেই তিনি নাকি মধ্যমগ্রামে একটি ভাল বাড়ি করেছেন।

অপরজনও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্রাঞ্চে করণিকের কাজ করছেন। একবার তাঁকে রাইটার্স বিল্ডিংসের বাইরে বদলী করা হয়েছিল, কিন্তু কতিপয় অফিসারের আগ্রহাতিশয্যে তাঁকে আবার স্বস্থানে ফিরিয়ে আনা হয়। ইনি প্রকাশ্যেই হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ ও বদলী এবং স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দেবার জন্য মোটা টাকা নেন. তাছাড়া ইনি কারো পরোয়া করেন না, ব্যবহার ও চালচলন অত্যন্ত জঘন্য ও সন্দেহজনক। এঁর পিছনে দুজন পদস্থ আমলা থাকাতে এঁর বিরুদ্ধে বড় কেউ যেতে পারেন না। গত ২রা জুলাই ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টেন্ট, হেলথ অ্যাসিস্টেন্ট প্রভৃতি পদের জন্য শেয়ালদায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হলে যে লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল, সেখান থেকে ভদ্রলোককে পুলিশের সাহায্যে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

প্রথম প্রেমের মত স্নিগ্ধ মধুর!

দুজনে যেদিন প্রথমে দেখা, ও বলেছিল, 'ভারী মিষ্টি গন্ধ তো'। আমি বলেছিলাম, 'তানিয়া'। এখন ও আমাকে ডাকে 'তানিয়া' ব'লে। আচ্ছা, তানিয়ার মিষ্টি গন্ধে কি আমাকে ওর ভালো লেগেছিল, না আমাকে ভালোবেসেই তানিয়া ওর এত পছন্দ—কে জানে।

তানিয়া সুরভি

প্রস্তুতকারক : সাহেব সিং'স্

'বিউটি ইজ ইওর বার্থরাইট' পুস্তিকার জন্য এবং আপনার রূপ-চর্চার নানা সমস্যার উত্তরের জন্য আমাদের 'বিউটি কনসালটেন্টস্', পোস্ট বক্স : ৪৪০, নিউ দিল্লী,—এই ঠিকানায় লিখুন।

Progressive/SS- 2/69

আমলার (এঁরা দু'জনেই সুহৃদচক্রের সক্রিয় অংশীদার) দ্বারা এবং এই বিষয়ে ওই দুর্নীতিবাজদের ঘাঁটি হয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীরই জনৈক বিশ্বস্ত কর্মচারী, খোদ তাঁর ঘরের লোক,—এ যদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেও কি স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বীকার করবেন না যে, তিনি সজ্ঞানে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন?" ১৪ই আগস্ট তারিখের বঙ্গদর্শনে এই বিষয়ে আরও আলোকপাত করা হয়। সেখানে বলা হয় যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁরই দলের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা এবং অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী যখন অফিসিয়েট করছিলেন, তখন শ্রীচক্রবর্তী নিজে বিষয়টি টেক-আপ করেন এবং ওই দু'জন দুর্নীতিবাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। স্বাস্থ্য-দপ্তরের কতিপয় পদস্থ আমলা এতে শ্রীচক্রবর্তীর ওপর চটে যান এবং তাঁর সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেন। তাঁদের মধ্যে একজন শ্রীচক্রবর্তীর অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফিরে এলে এর প্রতিশোধ নেবেন বলে হুমকি দেন। তিনি বলেন যে, ওই দু'জন পরম দক্ষ কর্মচারীকে বদলী হতে তিনি দেবেন না, যতীনবাবু যতই বলুন না কেন, বিশেষ করে যখন "সুহৃদদা" রয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট আমার জিজ্ঞাসা ও-বিষয়ে অতঃপর কি হয়েছে?

১৮ই সেপ্টেম্বরের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত একটি সংবাদে প্রকাশ, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে হেলথ অ্যাসিস্টেন্ট পদে নিয়োগের জন্য বর্ধমান রুর্যাল ট্রেনিং সেন্টারে একটি বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছিল। স্বাস্থ্যদপ্তরের কিছু কর্মী ও বাইরে থেকে আগত এক-দল পরীক্ষার্থীর প্রচণ্ড বিক্ষোভের ফলে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা পণ্ড হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে পূর্ব-উল্লিখিত প্রশাসন শাখার ওই দুর্নীতিবাজ ক্লার্কের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না দেওয়া সত্ত্বেও, প্রচুর টাকা-পয়সার বিনিময়ে বর্ধমানের বাইরের বহু লোক নাকি উক্ত ক্লার্কের সহায়তায় স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে ইন্টারভিউ লেটার পেয়ে বর্ধমানে পরীক্ষা দিতে আসে এবং এই থেকেই বিক্ষোভের সূত্রপাত। কলকাতা থেকে জনৈক কানাইবাবু ইন্টারভিউ-এর দিনে ফাইলপত্র নিয়ে বর্ধমানে উপস্থিত হয়ে ওইসব বেআইনী পরীক্ষার্থীর (যারা অবৈধ লেনদেনের মারফৎ ইন্টারভিউ লেটার পেয়েছিল) খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে প্রকাশ। কে এই কানাইবাবু? স্বাস্থ্যমন্ত্রী তা জানেন কি? এই ঘটনাটির বিষয়ে তিনি কিছু আলোকপাত করতে পারেন কি?

॥ আট ॥

এর পর একটি জেলা হাসপাতালের ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখা নিশ্চয়ই অসমীচীন হবে না। এটা কি সত্য যে, আজও পর্যন্ত কল্যাণী জওহরলাল নেহরু হাসপাতালের প্রাক্তন সুপারিন্টেন্ডেন্টকে পুনর্বাসন দেবার প্রচেষ্টা ওই "সুহৃদচক্রের নায়ক" করে যাচ্ছেন? ১৩ই মার্চের সাপ্তাহিক বসুমতীতে দুর্নীতির অভিযোগে বহু চেষ্টার ফলে অপসারিত এই ব্যক্তিটিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বাস্থ্য-দপ্তরের চক্রান্তের কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে। ওই পত্রিকারই ২৪শে এপ্রিল সংখ্যার বঙ্গদর্শনে দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত একটি সংবাদ উদ্ধৃত করা হয়ঃ "ভিজিলেন্স কমিশন কল্যাণী জওহরলাল হাসপাতালের প্রাক্তন সুপারিন্টেন্ডেন্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত শুরু করে। কিন্তু কমিশনের কাছে দুর্নীতির তথ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত না করে তাঁকে বাঁচাবার জন্য স্বাস্থ্য অধিকারের এক শ্রেণীর অফিসার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, স্বাস্থ্যদপ্তরের সচিব শ্রী এস আর দাস ইতিপূর্বে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে দু' দফায় উক্ত প্রাক্তন সুপারিন্টেন্ডেন্টকে চার্জসীট দেন। অভিযোগগুলি তদন্তের জন্য তিনি বিষয়টি ভিজিল্যান্স কমিশনের কাছে পাঠান। শ্রীদাস কল্যাণী হাসপাতালের ওই প্রাক্তন সুপারিন্টেন্ডেন্টের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দফায় যে চার্জসীট দিয়েছেন তার প্রতিলিপি ২৯শে মে তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে। আমার জিজ্ঞাসা, বিষয়টির শেষ পর্যন্ত কি হল? অভিযোগগুলিকে কি শেষ পর্যন্ত হুস-আপ করা হবে? এ-বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি বলেন?

॥ নয় ॥

এবারে "সুহৃদচক্রের" কথায় আসা যাক। আমার যতদূর জানা আছে এই নামটি সাপ্তাহিক বসুমতীর দেওয়া। এই চক্র ও তার নায়কের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এ'দের পরিচয়টা কিভাবে পাওয়া গেল সে বিষয়ে কিছু বলার অবকাশ এখানে আছে। ১৯৬৮ সালের ১০ই অক্টোবরের সাপ্তাহিক বসুমতীর বঙ্গদর্শন বিভাগে প্রকাশিত একটি সংবাদের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছিঃ সম্প্রতি ভিজিলেন্স কমিশন জাল ওষুধের একটি বড় কেস ধরে ফেলেছেন। কমিশন সাত মাস আগে কোন একটি সূত্র থেকে খবর পান যে, সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স থেকে সরকারী হাসপাতালগুলিতে ভেজাল ও নিম্নমানের ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে। বহু হাসপাতালের ডাক্তার ভেজাল ঔষধ দেওয়া হচ্ছে বুঝতে পেরে স্বাস্থ্যদপ্তরকে তা জানান কিন্তু "সুহৃদচক্রের নায়কের" কারসাজিতে ব্যাপারটি চাপা পড়ে যায়। স্বাস্থ্যদপ্তরের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে ওই ডাক্তারেরা বিষয়টি ভিজিলেন্স কমিশনের নিকট উপস্থিত করেন এবং কমিশন ওই ব্যাপারে বিশেষ তদন্ত করে একটি দীর্ঘ রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে, অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, যারা হাজার হাজার রোগীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তাদের কঠোর সাজা হওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স ঔষধ তৈরি করে না। বিভিন্ন কণ্ট্রাক্টরের কাছ থেকে টেন্ডার আহ্বান করা হয় এবং সেখানে একটি বিশেষ কোম্পানী এই কণ্ট্রাক্ট পেয়ে থাকে এবং এর পিছনে ওই "সুহৃদচক্রের নায়কের" হাত আছে বলে ভিজিল্যান্স কমিশন মন্তব্য করেন।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট আমার জিজ্ঞাসা, এই "সুহৃদচক্রের নায়ককে" তিনি ব্যাক ডেট দিয়ে প্রমোশন দিয়েছেন বলে যে অভিযোগ সাপ্তাহিক বসুমতী ও শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা করেছেন তা কি সত্য? শোনা যায় ইনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছেন, এমন কি তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরকালেও ইনি তাঁর অনুগমন করেছেন, এ-কথা কি সত্য? স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ওপর এঁর প্রভাব এমনই যে, খোদ যুক্তফ্রন্টের আমলে, রাইটার্স বিল্ডিংসের মধ্যেই, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নাকের ডগার ওপর তিনি মদের আসর বসান, সাপ্তাহিক বসুমতীতে এই যে অভিযোগ করা হয়েছে তা কি সত্য? গত দু'বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা হাসপাতালের সমুদয় দুর্নীতির সঙ্গে এই ব্যক্তিটিকে যে সাপ্তাহিক বসুমতী সম্পর্কিত করে আসছে, এ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোন অনুসন্ধান করেছেন কি?

॥ দশ ॥

রচনাটি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পড়ছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত লেখা একটি প্রবন্ধের কর্ম নয়। স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আর মাত্র একটি প্রশ্ন করেই আপাতত নিবৃত্ত হব।

অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর অফ হেলথ পদটির প্রয়োজনীয়তা কি? এই পদটি কি একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেপোষবার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে? পরিবার পরিকল্পনা নামক যে মুখোসের অন্তরালে তাঁকে রাখা হয়েছে সে বিষয়ে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা-অভিজ্ঞতা কতটা?

এই ভদ্রলোকের অজস্র কীর্তিকলাপের মধ্যে একটির উদাহরণ দিয়ে স্বাস্থ্য-মন্ত্রীকে তাঁর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি। এই বছরের জানুয়ারী মাসে ইউ এন ও থেকে পাঁচ-ছয় জন সদস্য বিশিষ্ট একটি দল আসে পরিবার পরিকল্পনার কাজ কেমন হচ্ছে দেখার জন্য। সেই উপলক্ষে আমাদের আলোচ্য ভদ্রলোকটি ফ্যাক্টস অ্যাবাউট ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল নামে একটি পুস্তিকা ছাপান, এক-আধ কপি নয়, পাঁচশো কপি, তিমির প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে, প্রতিটি কপির দাম নাকি ৭১ টাকা! ওই দামে সমগ্র 'রবীন্দ্র রচনাবলী' অথবা চার-পাঁচ খণ্ডের 'ভারতকোষ' পাওয়া যায়। এই পুকুর চুরির বিষয়ে মাননীয় স্বাস্থ্য-মন্ত্রী কি বলেন?

দেখুন! পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে...

টিনোপাল সবচেয়ে সাদা ধবধবে করে

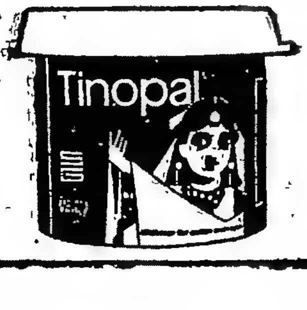

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাল শেষবার ধোবার সময় দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়— এমব সাদা শুধু টিনোপালেই সম্ভব। আপনার শার্ট, শাড়ী, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব ধবধবে!

আর, তার খরচ? কাপড়পিছু এক পয়সারও কম। টিনোপাল কিনুন —রেগুলার প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিম্বা "এক বালতির জন্যে এক প্যাকেট"

® টিনোপাল—জে আর গায়গী এস এ, বাসল, সুইজারল্যান্ড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

সুহৃদ গায়গী লিঃ, পোঃ আঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ২০ বি. আর.

Shilpi SGT-1A/69 Ben

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমীপেষু

// প্রদ্যোতকুমার রায় //

এবার যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরই সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষ থেকে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননীবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। গত ২০শে মার্চের সাপ্তাহিকে এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হয়। ননীবাবুর প্রতি আমাদের কোনও অশ্রদ্ধা নেই। তাঁকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা কখনও এই পত্রিকায় হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবে তাঁর দপ্তর সম্পর্কে বহু অপ্রিয় অথচ সত্য কথা সাপ্তাহিকের লেখকগোষ্ঠী প্রকাশ করেছেন। এবং তাঁরা এ কাজ করেছেন শুধুমাত্র জনস্বার্থেই। এ-ছাড়া এ-কাজের মধ্যে অন্য কিছুর সন্ধান করতে গেলে মস্ত বড় ভুল করা হবে।

ননীবাবুর সহজ ব্যবহার, সাদাসিধে জীবনযাপন খুব সহজেই তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা জাগায়। আমিও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কাজেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছিলাম : "পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আবাস রিপন স্ট্রীটে ক্রান্তি প্রেসের ছোট্ট একটি ঘরে। অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র-সজ্জন মানুষ হিসাবে ননীবাবুর খ্যাতি আছে। একটি অতি সাধারণ তক্তপোশের ওপর বসে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য দীর্ঘ সময় ধরে আমার বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন। তাঁর মুখে সামান্যতম বিরক্তি বা ক্লান্তির ছাপ ছিল না। এত সহজ ও সাধারণ জীবন যে মন্ত্রীদের হতে পারে—তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হত। দীর্ঘ ২০ বছর মন্ত্রীদের 'ড্রয়িংরুম' দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। চাকর-বাকর, চাপরাসী, বেয়ারা এসব না হলে কি আর মন্ত্রীর ঘাড়ি মানায়? ননীবাবুর 'ড্রয়িংরুম' নেই। নেই কোনও আসবাবপত্র বা বেয়ারা, চাপরাসী। সর্বসাকুল্যে ঐ একটি ঘরেই তিনি খুশি। জনগণের যদি কিছু মঙ্গল করতে পারেন—এই তাঁর একমাত্র কামনা।"

এ-কথা লিখতে আমার সেদিন এতটুকু বাধে নি। সম্ভবত তাঁর সম্পর্কে আরও বলা যেত। কিন্তু আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বক্তব্য যথাযথভাবে তুলে ধরা।

আজ আট মাস পরে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে সেদিনকার জনহিতব্রতী ননীবাবু যা করবেন বলেছিলেন তার কতটুকু করলেন? কেমন যেন মনে হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কর্মধারা ও'কেও পেয়ে বসেছে, যদিও ননীবাবু একজন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী। বুর্জোয়া মন্ত্রীরা আমলাতন্ত্রের শিকার হবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু দুঃখ হয় যখন দেখি একজন খাঁটি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী মন্ত্রীও কেমন করে আমলাতন্ত্রের ফাঁসকে মুক্তোর মালা বলে কণ্ঠে ধারণ করেছেন।

প্রথমেই বলতে চাই ১০ই অক্টোবর, ১৯৬৮ সালে সাপ্তাহিক বসুমতীর 'বঙ্গ-দর্শন বিভাগে' 'এদের চাবকানো হোক' শিরোনামায় সরকারী হাসপাতালে ভেজাল ওষুধ-সরবরাহের যে চাঞ্চল্যকর কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল, ১৯৬৯-এর মার্চ মাসে সর্বপ্রথমেই মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আমি সেদিকে আকর্ষণ করেছিলাম। 'ভিজিলেন্স কমিশন'-এর রিপোর্টে এই জাল ওষুধ সরবরাহের ব্যাপারে যে সব ব্যক্তিদের দায়ী করা হয়েছিল—ননীবাবু তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কি? এ বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন—এ কথা কি তিনি স্বীকার করেন না? নিরপেক্ষ তদন্ত ছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যথাযথ শাস্তি দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। অথচ এই সব ব্যক্তির দৌরাত্ম্যে স্বাস্থ্যদপ্তর একটি ঘুঘুর বাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। মন্ত্রী মহাশয় সাক্ষাৎকারের দিন বলেছিলেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে তিনি খোঁজ খবর নেবেন এবং প্রয়োজনবোধে তদন্তের ব্যবস্থা করবেন। পরিতাপের বিষয় এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কিছু করার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। কিছু না করার কারণও আমাদের অজানা নয়। উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন নিরপেক্ষ তদন্ত হলেই বহু আলোচিত দুষ্টচক্রের নায়ক ধরা পড়ে যাবেন। মন্ত্রী মহাশয় জেনেশুনে তা করেন কেমন করে? 'কানু ছাড়া যেমন বৃন্দাবন অন্ধকার'। তেমনি এই নায়ক ছাড়াও স্বাস্থ্যদপ্তর। আহা, এমন কাজও কি করতে আছে?

"অর্থের জন্য মানুষের জীবন নিয়ে যারা এভাবে ছিনিমিনি খেলতে পারে তাদের নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে না কেন? এ-প্রশ্ন আমরা অক্টোবর মাসেও রেখেছিলাম। যুক্তফ্রন্ট সরকার যেহেতু দুর্নীতি দূর করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন, সেই হেতু জনগণের প্রতি দায়িত্ব-বোধে আমরা মনে করি যে, যে সব অফিসাররা নিছক অর্থের লোভে ঠাণ্ডা মাথায় এতগুলি রোগীকে ভেজাল ওষুধ খেতে বাধ্য করেছে এবং কারো-কারো মৃত্যু ঘটিয়েছে তাদের প্রতি সামান্যতম করুণা প্রদর্শন করাও জনগণের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার সমান।" এ সব কথা জনগণের বক্তব্য হতে পারে, কিন্তু আমলাতন্ত্রের ফাঁসে আবদ্ধ বিপ্লবীদের তাতে কিছু যায় আসে না। 'সদা সত্য কথা বলিব'-এর মত 'দুর্নীতি দূর কর' এই কথাটিরও ব্যবহারিক জীবনে কোনও মূল্য নেই। অন্তত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাজকর্ম দেখে সে কথাই মনে হয়। নির্বাচনের পর দুর্নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই কোনও কোনও মন্ত্রী ক্ষিপ্ত হন। যে ব্যক্তি বা পত্রিকা মন্ত্রীদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন, অনেক সময়েই ঐ ব্যক্তি বা পত্রিকাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'চক্রান্ত-কারী', কায়েমীস্বার্থের দালাল প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করা হয়। এক্ষেত্রে শুধু একটিমাত্র কথাই মনে হয়—বাহবা বাহবা বেশ।

ধরা যাক গোবরা হাসপাতালের প্রাক্তন হেড ক্লার্কের প্রসঙ্গ। এখানেও বেপরোয়া দুর্নীতির অভিযোগ। আমাদের পত্রিকা ছাড়া একটি দৈনিকেও এই ক্লার্কটির বদলীর আদেশ প্রত্যাহার হওয়ার সংবাদ বেরোয়। প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা তাঁকে বদলীর আদেশ দিয়েছিলেন।

দেখা গেল, আর এস পি দলের জনৈক বিধানসভার সদস্য ভদ্রলোককে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। সুহৃদচক্রের নায়কের তৎপরতায় তখন ক্লার্কের বদলী আদেশ কিভাবে বন্ধ হয় তা পাঠকসাধারণের নিশ্চয়ই মনে আছে। পত্র-পত্রিকায় সমস্ত ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আবার ক্লার্কটির বদলীর আদেশ দেওয়া হয়। মন্ত্রী মহাশয় ইচ্ছা-অনিচ্ছার দোলায় দুলতে দুলতে অবশেষে ক্লার্কের বদলীর আদেশ মেনে নেন। দুর্নীতিদমন যেখানে যুক্তফ্রন্টের মূলনীতি—সেখানে স্বাস্থ্য-

দপ্তরের এ ধরণের কাজকর্ম হতাশার সৃষ্টি না করে পারে??

নদীয়ার সি-এম-ও-এইচ অফিসের ক্লার্কটির বেলায়ও ঐ একইরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। গণবিক্ষোভের চাপে দুর্নীতিপরায়ণ ক্লার্কটির বদলীর আদেশ কার্যকর করা হয়েছে বটে; কিন্তু ঐ চক্রের অফিসার কর্তাব্যক্তিরা সকলেই বহাল তবিয়তে পূর্ববৎ কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টরের ভূমিকা অদ্ভূত ও সন্দেহজনক। ক্লার্কটিকে রক্ষা করার জন্য কী চেষ্টাই না। তাঁর ছিল। মন্ত্রীমশাই সে খবর নিশ্চয়ই রাখেন।

এবার চন্দন কল্যাণী। ডঃ নির্মল সেনগুপ্তের আমলে জহরলাল নেহরু হাসপাতালের দুর্নীতি ছিল আকাশ ছোঁওয়া। ২৪-১০-৬৭ তারিখে ননীবাবু এক পত্রে আমাদের জানিয়েছিলেন যে, ঐ হাসপাতাল সম্পর্কিত অভিযোগের ব্যাপারে তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা যতদূর জানি, সেই সময় কিছুই করা হয় নি। রাজ্যপালের আমলে তৎকালীন স্বাস্থ্য অধিকর্তাই কল্যাণী হাসপাতালের প্রাক্তন সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বিরুদ্ধে অনীতি অভিযোগসমূহ ভিজিলেন্স কমিশনে পাঠান এবং স্বাস্থ্যসচিব তিন দফায় ঐ সুপারসাহেবকে চার্জসিট দেন। এক্ষেত্রে আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, ভিজিলেন্স কমিশনের কাজ যাতে ঠিক মত পরিচালিত হতে না পারে সেইজন্য স্বাস্থ্যদপ্তরে কিছু সংখ্যক পদস্থ আমলা উঠে পড়ে লাগেন। এই সব আমলারা এত তৎপর, কারণ কল্যাণী হাসপাতালটি ছিল সুহৃদচক্রের একটি 'মধুচক্র'। যে মন্থর গতিতে কল্যাণীর ব্যাপারে তদন্তকার্য চলছে, তাতে মনে হয় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ভিজিলেন্স কমিশনের রিপোর্ট বেরোবার আগেই চাকরী থেকে অবসর নিয়ে দু'চার বছর অতিরিক্ত কাজ করে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে বিদায় হতে পারবেন। একেই বলে চক্রের মাহাত্ম্য। চক্রের নারকী যাঁর সহায় তাঁর আবার ভয় কিসের?

চব্বিশ পরগনার চিত্র দেখুন। সি-এম-ও-এইচ বদলী হয়ে পুরুলিয়ায় গেছেন। প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তার এই কাজে মন্ত্রীমশাই অবশ্য সমর্থন সৃষ্টি করেন নি। সম্ভবতঃ এই একটিমাত্র ক্ষেত্রেই —যেখানে সুহৃদচক্রের আবদার মন্ত্রীমশাই রাখেন নি। কিন্তু এতেও কি কাজ শেষ হয়? যে ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ হয়েছে, তাঁকে শুধু বদলী করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। ভিজিলেন্স কমিশনের নিকট সমস্ত বিষয়টি পাঠান হচ্ছে না কেন? সুহৃদচক্রের আবদার রাখতে কি মন্ত্রীমশাই হাত গুটিয়ে বসে আছেন??

বর্তমানে চব্বিশ পরগনায় যিনি সি-এম-ও-এইচ হয়ে এসেছেন, তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধেও নানারকম অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। জি-ডি-এ নিযুক্ত করার ব্যাপারে নানা অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতির সংবাদ আমাদের দপ্তরে আসছে। এখানে দলীয় স্বার্থরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টাও চলছে।

জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টরের অসাধুতা ও আত্মীয় পোষণের কথা স্বাস্থ্যদপ্তরের অজানা নেই। মন্ত্রীমহাশয়কে সবিনয়ে এ ব্যক্তিটির বহুমুখী প্রতিভার কথা বলেছিলাম। কিছুদিন পূর্বেও তিনি অত্যন্ত অন্যায়ভাবে তাঁর এক আত্মীয়ার চাকরীর ব্যবস্থা করেছেন। স্বজনদের পোস্টিং যাতে ভাল হয় সেদিকেও এই স্বজনবৎসল ব্যক্তিটির সদাজাগ্রত দৃষ্টি আছে। ননীবাবু বলেছিলেন, এই বিষয়টি তিনি অবশ্যই দেখবেন। তিনি সত্যিই কি কাগজপত্রের খোঁজ করেছেন?? এই ডেপুটি ডিরেক্টরের অধীনে কর্মরত এই ক্লার্কের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে ডেপুটি সাহেব নিজেই তদন্ত করে রিপোর্ট দিলেন। লিখলেন—দুর্নীতি সব ঝুটা হ্যায়। এই দুই ক্লার্ক অতীব সৎ, দক্ষ এবং এঁদের সততা নাকি 'rarely found'। কিন্তু প্রশ্ন আসে—এই দুই ব্যক্তি ডেপুটি ডিরেক্টরেরই আশ্রিত লোক এবং তাঁরই দপ্তরের কর্মচারী। এঁদের অসাধুতা প্রমাণিত হলে ডেপুটি সাহেবের মান কোথায়? অতএব দাও কষে অভিজ্ঞানপত্র। এমন সাধু কর্মচারী সরকারী অফিসে বিরল—নিন্দুকের কথায় কান দেওয়া উচিত নয়—সব ঠিক হ্যায়। তাঁর আত্মকেন্দ্রিক কাজকর্মের বান্ধব দুটি বহাল তবিয়তে রইলেন, ডেপুটি সাহেবও নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসলেন।

এই দুইজন ক্লার্কের একজনের স্ত্রী নাকি জীবনবীমা ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিতা। ক্লার্কটি নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন। ডেপুটি সাহেবের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, উক্ত মহিলা তাঁর স্বামীর কোনওরকম সাহায্য না নিয়েই ব্যবসা পরিচালনা করে থাকেন। প্রশ্ন ওঠে (১) ইন্সিওরেন্সের ফিল-আপ করা 'ফর্ম' গুলি কার হাতের লেখা? ভদ্রমহিলার না তাঁর স্বামীর? (২) যাঁরা এসব ইন্সিওরেন্স করলেন, তাঁদের ঠিকানা ও পেশা কি? যদি দেখা যায় যে স্বামী ভদ্রলোক এঁদের সকলকেই চেনেন এবং ফরমগুলি সবই তাঁরই হাতের লেখা, তাহলেও কি বলব যে ভদ্রমহিলা নিজেই সব কাজ পরিচালনা করেন আর স্বামী ভদ্রলোক শুধু কেরাণীগিরিতেই সন্তুষ্ট থাকেন? ডেপুটি সাহেব কি বলেন? একটু মাথা

প্রকাশিত হল

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সং

SAMSAD
ENGLISH-BENGALI
DICTIONARY

সঙ্কলক : শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস
সংশোধক : ডঃ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

চন্দ্রাভিযানের ফলে যে শব্দসমূহ প্রচলিত হইয়াছে, সেগুলি সহ প্রায় ৫৫০০ শব্দ ও প্রবচন এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে। অধুনা প্রচলিত শব্দাবলী নির্বাচনে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। শব্দার্থ-বিন্যাসে প্রাধান্য ও প্রচলন অনুযায়ী শব্দার্থ ও শব্দের প্রয়োগ দেওয়া হইয়াছে। শব্দের উচ্চারণ-সঙ্কেত ইংরেজি ও বাঙলায় এবং শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে। অভিধানটি আগাগোড়া সংশোধন করা হইয়াছে। সর্ববৃত্তিধারীর বিশেষ করিয়া ছাত্রদের অপরিহার্য সঙ্গী। ১২৭২+১৬ পৃষ্ঠা, ডিমাই অক্টেভো আকার। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

মূল্য : পনের টাকা

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : : কলিকাতা-৯

আড়িয়ে ভাবলেই এসব কথাগুলি সবই তাঁর মনে আসত। কিন্তু তিনি তো সত্যই সমগ্র বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখতে চান নি। তিনি চেয়েছেন বিষয়টিকে চাপা দিতে এবং নিজের কাজকর্ম ঠিক মত গুছিয়ে নিতে। কাজেই তাঁর রিপোর্ট শুধুই ঠিক হায়!'

ডেপুটির চরিত্রের মহিমা অপার। তাঁর নিকট আত্মীয়ের চাকরীলাভ কিভাবে সম্ভব হল? ডেপুটি সাহেব কি বলতে পারেন যে, কাজটা ঠিক হয়েছে? মন্ত্রী-মশায় একবার এদিকে দৃষ্টি দেবেন কি?

দুটি পিওনকে 'সুপিরিয়র পোস্টে' চাকরী দেওয়া হল অথচ বহু অভিজ্ঞ পিওন ও রেকর্ড সাপ্লায়াররা প্রমোশন থেকে বঞ্চিত হল। এটিও ডেপুটির কীর্তি।

ডেপুটি সাহেবের খাস চাপরাসির স্ত্রীর নামে কোয়ার্টার জুটল। কিন্তু আর কারোর ভাগ্যে জুটল না কেন?

ডেপুটি সাহেবের আত্মীয় বেশ কিছু সংখ্যক ডাক্তার কলকাতাতেই চাকরী করেন কেমন করে? স্বাস্থ্যদপ্তরের অধীনে কর্মরত ডেপুটি সাহেবের আত্মীয়স্বজনের একটি তালিকা মন্ত্রীমশাই সংগ্রহ করবেন কি? এবং এই সব ভাগ্যবান পুরুষ ও মহিলারা কিভাবে সরকারী দপ্তরে এলেন, জনগণকে সে কথা জানার সুযোগ দেবেন কি?

ডাক্তার বি সি রায় মেমোরিয়াল হাসপাতালের সচিব ও অন্যান্যদের সম্পর্কে যে-সব অভিযোগ উঠেছে, সেগুলি দেখে ডেপুটি সাহেবকে তাঁর নিকট একটি রিপোর্ট দাখিল করতে বলবেন কি?

কে এই ডেপুটি? পাঠক বন্ধুদের বলি, ইনি হলেন সুহৃদচক্রের অন্যতম সদস্য। দুর্নীতির ডিপো নামে যে কথাটি বাংলাদেশে চালু আছে, এই ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে সম্ভবত এ কথাটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। মন্ত্রীমহাশয়কে এ ভদ্রলোক সম্পর্কে আগেও বলেছি। আবার বলব, দয়া করে এদিকে একটু দৃষ্টি দিতে। একটু শক্ত হতে।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমার এক প্রশ্নের উত্তরে মৃদু হেসে বলেছিলেন, "আমি তো দুর্নীতির মধ্যেই বসে আছি। যতদূর সম্ভব দুর্নীতি বন্ধ করতে চেষ্টা করে যাব।" আজও পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগে স্বাস্থ্যদপ্তরের কোনও কর্মীর কেশাগ্র স্পর্শ করার সৌভাগ্য মন্ত্রীমশাই-এর হয়েছে বলে আমার জানা নেই। একেই বলে মন্ত্রিত্ব।

স্বাস্থ্যদপ্তরে বেপরোয়া পুনর্নিয়োগ হচ্ছে। এমন কি ট্রাঙ্ককল করে অবসরপ্রাপ্তকে চাকরী দেওয়া হয় এ বিভাগে। আমরা মনে করি, পুনর্নিয়োগ নীতিগত-ভাবে অন্যায়। কিন্তু নীতির প্রশ্ন তো এখন নয়, সে তো নির্বাচনের সময়। কাজেই এ কাজ চলছে, সম্ভবত চলবে। আমরা শুনেছি দলীয় স্বার্থরক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে পুনর্নিয়োগ, প্রমোশন, বদলী প্রভৃতি বিষয়গুলি জড়িত হয়ে পড়ছে। যদি তাই হয়, তবে আমরা, অর্থাৎ জনগণ এই নবতম নীতিকে বিপ্লবাত্মক বলে ধরে নেব কি?

'রাইটার্স বিল্ডিংসে' সুপারনিউমারী ডিউটিতে ডাক্তারদের সংখ্যা কমে তো নাই-ই, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে হাসপাতালের চেহারা বড়ই করুণ। ডাক্তারের অভাবে নাকি এদেশে হাসপাতালে চিকিৎসা হয় না। এম-ডি পরীক্ষার ব্যাপারে নানান্ অভিযোগ উঠল। সিনেট সিন্ডিকেটের সভায় ঝড় বইল। স্বাস্থ্য-মন্ত্রীমশাই এ সম্পর্কে কিছু করেছেন বলে আমি জানি না।

প্রমোশন হয়েছে অনেক ডাক্তারের। সরকারী তালিকা মস্ত বড়। এ সম্পর্কে অন্য প্রবন্ধ থাকায় আপাতত কোনও মন্তব্য করলাম না।

আবার বলি, আমার বক্তব্য স্বাস্থ্য-দপ্তর সম্পর্কে। কোনও ব্যক্তিকে আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বাল্যকাল থেকেই ননীবাবুর কথা আমি শুনেছি। তখনও তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম; আজও করি। কিন্তু স্বাস্থ্যদপ্তরের কাজকর্ম দেখে দুঃখ বোধ করছি। তাই ননীবাবুকে একটু সজাগ করে দেবার চেষ্টা করলাম। আমলা-তন্ত্রের হাত থেকে তিনি যদি মুক্ত হতে না পারেন—তবে সবিনয়ে বলব, তাঁর দলের অন্য কোনও সদস্যকে এ দায়িত্ব ছেড়ে দিন। সবাইকে সব কাজে পারদর্শী হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। ননীবাবু এ কথা আমার চেয়ে অনেক বেশি ভাল বোঝেন। কাজেই জনগণের স্বার্থরক্ষার্থে আশা করব তাঁর চেতনা ফিরে আসবে এবং স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবার জন্য অন্য কোনও যোগ্য ব্যক্তি মন্ত্রিত্বের আসন অলংকৃত করবেন।

বেঙ্গল কেমিক্যালের
পারফেক্টেড্
কোল্ড ক্রীম অব রোজেস
ল্যানোলিন সংযুক্ত
সকল ঋতুতে ত্বক অম্লান ও নিরাপদ রাখে
টিউবে এবং
সুদৃশ্য আধারে পাওয়া যায়

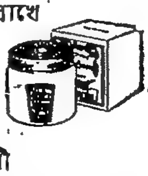

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী
Progressive/BC

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন প্রসঙ্গে

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বাস্থ্যদপ্তরের দুর্নীতির বহু সুনির্দিষ্ট (স্পেসিফিক কেস) অভিযোগ স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যের দৃষ্টিতে এনেছিলাম। ভেবেছিলাম, দুর্নীতি দমনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর দুর্নীতি ও অনাচারমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবে না, দেশের আপামর জনসাধারণ দপ্তরের পদস্থ আমলা ও অসাধু চিকিৎসকদের যথেচ্ছাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবে। মুক্তি পাবে স্বজনপোষণ থেকে। কিন্তু অপ্রিয় হলে একান্ত সত্য এই যে, ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন অভিযান চালানো হয় নি, দুর্নীতিবাজ এক দল আমলার কারসাজির ফলে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতির ব্যাপারে স্বাস্থ্যদপ্তরে এমন সব অবৈধ কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা কোন কোন ক্ষেত্রে বিগত কংগ্রেস আমলকেও ছাড়িয়ে গেছে। ২।১টি ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের নামে বদলির আদেশ দিয়ে প্রহসন করা হয়েছে। বদলি করে একজন দুর্নীতিবাজ আমলার চরিত্র সংশোধন করা কি এযুগে সম্ভব না স্বাভাবিক?

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন

স্বাস্থ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করার পরেই শ্রীননী ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন যে, আউটডোরের রোগীরা যাতে একটু ভদ্রভাবে চিকিৎসা পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন হাসপাতালে বৈকালেও আউটডোর চালু রাখা সম্ভব কি না সেই বিষয়ে চিন্তা করছেন। বস্তুত যেভাবে ভিড়ের জন্য গবাদি পশুদের চেয়েও অধম অবস্থায় হতভাগ্য যন্ত্রণা-কাতর রোগীদের চিকিৎসিত হবার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়ে থাকতে হয় তা লক্ষ্য করেই হয়ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী এইরকম একটা সংকল্প নিয়েছেন।

কিন্তু এ তো একটা বাহ্যিক অবস্থা মাত্র। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় যদি তাঁর দপ্তর তথা পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাটা আরও গভীরভাবে দেখেন তাহলে তিনি সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হবেন যে, এই বিভাগটি কায়েমী স্বার্থ তথা আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির জালে অক্টোপাশের কামড়ের মত এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, সমস্ত বিভাগটিকেই কঠোর হস্তে ঢেলে সাজানো ভিন্ন আর কোন গত্যন্তর নেই।

আমরা এখানে খোলাখুলিভাবে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করছি। এ সংখ্যায় আমরা শুধুমাত্র সাধারণ অবস্থাগুলি বর্ণনা করব, কোন স্পেসিফিক ঘটনা নয়।

•

প্রথমেই ডাক্তারদের কথায় আসতে হয়। একথা বলাই বাহুল্য যে, দেশে রোগীর সংখ্যা ডাক্তারের চেয়ে অনেক বেশি, এই কারণে আরও অধিক সংখ্যক ডাক্তারের প্রয়োজন, এবং তার জন্য প্রয়োজন মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বাড়ানো। তবে বর্তমানে বোধ হয় তা সম্ভবপর নয়, কাজেই সেদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়কে আপাতত টানছি না। বর্তমানে যে সব ডাক্তার পাশ করে বেরুচ্ছেন বা বেরিয়েছেন তাঁরাই একমাত্র ভরসা।

কিন্তু একান্ত দায়ে না পড়লে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যদপ্তরে কোন ডাক্তারই কাজ নিতে চান না, কেন না বেতন অল্প। আর যে সব ডাক্তার অল্প বেতন সত্ত্বেও স্বাস্থ্যদপ্তরে চাকরি নেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের কাছেই হাসপাতালটি গৌণ বিষয় হয়ে যায়, সকলেই প্রাইভেট প্রাকটিশের দিকে ঝোঁকেন।

ভাগ্যান্বেষী ডাক্তারদের কাছে হাসপাতালগুলি হয় উপলক্ষ্য মাত্র। মাত্র আধ ঘন্টার চেষ্টায় কয়েকশত বিখ্যাত ডাক্তারের নামের উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁরা এক-ঘন্টার বেশি হাসপাতাল অ্যাটেন্ড করেন না, ফলে হাসপাতালে চিকিৎসক এবং ঝুড়ি ঝুড়ি স্পেসালিস্ট থাকলেও তা রোগীর বিশেষ কোন প্রয়োজনে লাগে না। কয়েক মাস পূর্বে একজন বিখ্যাত ডাক্তারের কথা এই বঙ্গদর্শনেই লেখা হয়েছিল, এখন যিনি স্বাস্থ্যদপ্তরের একজন হোমরাচোমরা। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে থাকাকালীন তিনি রোগীদের সামনে খোলাখুলিই বলতেন, "যাঁরা আমার চেম্বারে আমায় পয়সা দিয়ে দেখিয়েছেন তাঁরাই শুধু এই ঘরে থাকুন, বাকি সব বেরিয়ে যান।"

হাসপাতালে নিযুক্ত ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিশ বন্ধ করতে না পারলে রোগীদের চিকিৎসিত হবার কোন সুযোগই থাকবে না। এবং এই কারণেই প্রয়োজন এঁদের বেতন বৃদ্ধি করা। সাধারণ এম-বি-বি-এস-রা বর্ধিত বেতন পেলে তাঁদের সমগ্র সময়টাই হাসপাতালে ব্যয় করতে পারবেন। ফলে রোগীকে লাইন দিয়ে চিকিৎসার জন্য হাপিত্যেশ করতে হবে না।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী চিন্তা করে দেখুন, একজন সাধারণ এম-বি-বি-এস ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসে চাকরী নিয়ে কোন মফস্বল শহরে বা গ্রামের হেলথ সেন্টারে গেলেন। মাত্র চারশো টাকা বেতনে দূর অঞ্চলে গিয়ে সেখানে তাঁরা ওই অল্প টাকায় কিভাবে জীবনযাপন করবেন? ফলে একদিকে তরুণ ডাক্তারেরা ফ্রাসট্রেসন রূপ ব্যাধিতে ভুগে কর্তব্য কর্মে মন দিতে পারছেন না, অপর দিকে যাঁরা গুছিয়ে আনতে পেরেছেন তাঁরা হাসপাতালরূপ নামমাত্র বুড়ি ছুঁয়ে গাড়ি বাড়ি হাঁকাচ্ছেন। আর রোগীর অবস্থা ১৯০০ সালেও যা ছিল ১৯৬৭তেও তার চেয়ে বিন্দুমাত্র ভাল হয় নি।

তরুণ ডাক্তারদের আরও একটি সমস্যা বিশেষ করে উল্লেখ করার মত। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্র তাঁদের নিকট একান্তই সঙ্কুচিত। একটা এম-ডি বা এম-এস হওয়ার চেয়ে বিলাত থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসা বোধ হয় অনেক বেশি সহজ, যদি সেখানে যাওয়ার এবং থাকার মত সংস্থান থাকে। এদেশে ইচ্ছা করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রটিকে 'সংকুচিত' করা হয়েছে। কেন না গাদা গাদা এম-ডি বা এম-এস হলে কায়েমী স্বার্থে ঘা পড়বে। এই কারণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া পাশই করানো হয় না। ওই ডিগ্রীগুলি বর্তমানে পেতে

বিদ্যা লাগে না, লাগে খুঁটি। কাগজে কলমে এ কথাটাকে অবশ্য প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু যে কোন ভুক্তভোগী ডাক্তারই আমার কথায় সায় দেবেন।

ডাক্তারী লাইনে যে কায়েমী স্বার্থটি বাসা বেঁধে আছে তার আবার আসল জিম্মাদার হচ্ছেন তাঁরাই। অর্থাৎ স্বাস্থ্য-দপ্তরের সেই দুই তিনজন আমলা; যাঁরা ফাইল হাতে সর্বদাই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘরে ছুটোছুটি করছেন। এঁরা দুদিকেই লক্ষ্মীকেই ঘরে তুলছেন। একদিকে সরকারী কাগজপত্রে সই করে মাসান্তে মোটা অঙ্ক ঘরে তুলছেন অপরদিকে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে দরাজে প্রাইভেট প্রাকটিস বজায় রেখেছেন। ডাক্তারদের কত ডেপুটেশন এঁদের কাছে গেছে, এঁরা নির্বিকার। কংগ্রেসী আমলে স্বাস্থ্যদপ্তর সম্বন্ধে অজস্র অভিযোগের প্রতি এঁদের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করেছি। কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা বৃথাই হয়েছে। নতুন আমলে এঁরা ভোল অবশ্যই বদলাবেন। কিন্তু এঁদের চরিত্র বদলাবে না। কাজেই এঁদের সম্বন্ধে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেন সাবধানতা অবলম্বন করেন। মনে আছে প্রাক্তন কংগ্রেসী স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি এই দপ্তরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে হয়, তাহলে তা যেন সরাসরি তাঁর কাছে করা হয়, তিনি নিজেই সেগুলির প্রতিকার করবেন। প্রথম প্রথম উৎসাহ দেখিয়ে কাজও আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে দপ্তরের সচিব এবং অধিকর্তা ও সহ-অধিকর্তাদের পাল্লায় তিনিও শেষ পর্যন্ত ধরা দিলেন। তাঁর উৎসাহ শূন্যে মিলিয়ে গেল। এই আমলাতান্ত্রিক চক্র বড় মারাত্মক, যার বহুরূপী চরিত্র চিনে ওঠা দুঃসাধ্য। আশা করি, নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে গোড়া থেকেই সতর্ক হবেন।

*

এর পরেই উল্লেখ করতে হয় নার্সদের কথা। এখানেও একটি কায়েমী স্বার্থ বাসা বেঁধে আছে। কিছুদিন আগে আমরা এই সাপ্তাহিক বসুমতীতে জনৈক শিক্ষার্থিনী নার্সের বিনা চিকিৎসায় ও শোচনীয় অবহেলায় মৃত্যুর কথা লিখেছিলাম। সেই কাহিনী প্রকাশিত হবার পর বহু নার্স আমাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের বহু চিঠিপত্র এই পত্রিকায় ছাপা হয়, যা থেকে তাঁদের জীবনযাত্রার অসহনীয় দিকটা ফুটে ওঠে। নিজেদের অভিযোগ জানানোর কোন রাস্তা নেই। কর্তৃপক্ষের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার কোন উপায় নেই। এবং তা জানাতে গেলে যে পরিমাণ বিড়ম্বনায় সম্মুখীন হতে হয় তার তুলনা নেই। বিনা কারণে এখানে ওখানে পোস্টিং, শোচনীয় খাওয়া-দাওয়া, ডিউটির সময়ের কোন সীমা নেই। বিশেষ মহলের প্রিয়পাত্রী না হলে নিয়ত অত্যাচারভোগ, সব মিলিয়ে তাঁরা এমন এক নরককুণ্ডে পড়ে আছেন যেখানে থেকে আর যাই হোক রোগীর সেবা সম্ভবপর নয়। এঁদের অভাব অভিযোগ দেখার জন্য, রাইটার্স বিল্ডিংস-এ একজন আছেন, কিন্তু তাঁর কাছে কোন কিছু নিবেদন করতে গেলেই সর্বনাশ, যিনি বা যাঁরা যাবেন তাঁদের নির্ঘাৎ জলপাইগুড়ি বা পুরুলিয়ায় বদলী হতে হবে। এই অফিসারটির বিরুদ্ধে নার্সমহলের নানান ধরণের অভিযোগ আছে। কিন্তু কংগ্রেসী আমলে তা করতে যাবার অর্থই ছিল নার্সদের পক্ষে নিজের কবর নিজেই খোঁড়া। কর্তৃপক্ষের অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে জনৈকা নার্স আত্মহত্যা করেছিলেন এবং তাঁর মৃতদেহ কোয়ার্টার্সে পড়েছিল তিনদিন। অথচ কোন হদিশ করা হয় নি। এতো সেদিনের অভিযোগ। পরবর্তী সংখ্যায় আমরা স্পেসিফিক কেসগুলি তুলে ধরব, যেগুলির পূর্বে আমরা এখানেই প্রকাশিত করেছিলাম। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট আমাদের অনুরোধ যেন তিনি এই হতভাগিনী নার্সদের একটা ইন্টারভিউ নেন। তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন কী অসহনীয় অবস্থার মধ্যে এঁদের কাজ করতে হয়। সব ক্ষেত্রে বেতনটাই বড় কথা নয়। কাজের পরিবেশই হল আসল জিনিস।

(সাপ্তাহিক বসুমতী—২৩শে মার্চ, ১৯৬৭)

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন (২)

সংবাদে প্রকাশ যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মশাই বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের প্রাত্যহিক ঝামেলাটির স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সার্থক হোক।

বর্তমান সংখ্যায় আমরা কয়েকটি বিশেষ বিষয় তুলে ধরে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই বিষয়গুলি নিয়ে সাপ্তাহিক বসুমতীতে ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা হয়েছিল, এবং আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কংগ্রেসী আমলে আমাদের এই সব অভিযোগে কেউ কর্ণপাত করে নি। কাজেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমীপে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট আমরা বিষয়গুলি পুনর্বার পেশ করছি। সাপ্তাহিক বসুমতীর ১৯৬৬ সালের ৬ই জানুয়ারীর সংখ্যায় চুঁচুড়া থেকে শ্রীহৃদয়কিশোর ভট্টাচার্য নামক এক ব্যক্তির একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সেই পত্রে ভদ্রলোক নীলরতন সরকার হাসপাতালে জনৈক প্রাক্তন হাউস সার্জেনের বিরুদ্ধে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনেন। অভিযোগটি হচ্ছে এই যে উক্ত হাউস সার্জেনের অনবধানতা ও দায়িত্বহীনতার ফলে তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু (নাকে সামান্য ধরণের অস্ত্রোপচারের পর) ঘটে। অস্ত্রোপচারের সময় ছেলেটির নাক দিয়ে প্রচুর রক্তস্রাব হচ্ছিল, কিন্তু তা বন্ধ করার চেষ্টা না করে, বা সেই অবস্থায় অন্য কাউকে না ডেকে, অপারেশনের টেবিলে হতভাগ্য ছেলেটিকে নাকি ফেলে রাখা হয়েছিল।

শোচনীয় অবহেলার ফলে শ্রীভট্টাচার্যের তরুণ পুত্রের (বি-এসসি অনার্স ক্লাসের মেধাবী ছাত্র) মৃত্যুর এই মর্মান্তিক কাহিনী তখন বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং মৃত রোগীর পিতা ওই ডাক্তারের বিরুদ্ধে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট অভিযোগ করেছিলেন। একটা নিয়মমাফিক তদন্তও হয়েছিল এবং ওই হাসপাতালের প্রিন্সিপাল মৃত রোগীর পিতাকে জানিয়েছিলেন যে, ওই অপরাধী ডাক্তারকে চাকরী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কি রকম সরিয়ে দেওয়া? সেই ডাক্তারকে নাকি পরে সস্ত্রীক তুফানগঞ্জ হাসপাতালে ভাল চাকরী দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চমৎকার শাস্তিই বটে! এখন উক্ত ডাক্তার "Study leave" নিয়ে নাকি বিলাতে উচ্চতর শিক্ষালাভ করছেন। বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করবেন? এই প্রসঙ্গটি বোধ হয় বিধানসভাতেও উঠেছিল। কিন্তু আলোচ্য ডাক্তারটি স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন বড়কর্তার বিশেষ স্নেহভাজন হবার দরুণ সমস্ত অভিযোগই হাস আপ হয়ে যায়।

এর পর আরও একটি পুরোনো অভিযোগের কথা তুলি। ১৯৬৫ সালের ২৪শে জুন সংখ্যায় বর্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালের অভ্যন্তরে দুর্নীতির এক বিশদ চিত্র আমরা প্রকাশ করেছিলাম। ওই হাসপাতালের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ সম্বলিত একটি পত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাস্থ্য বিভাগের সচিব শ্রী কি আর গুপ্তের নিকট প্রেরিত হয়েছিল। সেই পত্রের কি গতি হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেন তা অনুসন্ধান করেন। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের অভ্যন্তরে দুর্নীতি ও অব্যবস্থার কথা ১৯৬৬-র ৮ই ডিসেম্বরের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল, এখনো পর্যন্ত তার কোন প্রতিকার হয় নি।

তারও আগে ১৯৬৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের বঙ্গদর্শনে খোদ স্বাস্থ্য দপ্তরের মধ্যেই একটি দুর্নীতির সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল; স্বাস্থ্য অধিকর্তার অধীনে কার্যরত একজন কর্মচারীকে কেন্দ্র করে কিভাবে তিনি মেদিনীপুরের সি-এম-ও অফিসের একজন নন-ম্যাট্রিক কর্মচারীকে একটি টি-বি আরোগ্যোত্তর কলোনীতে অফিসার বানিয়েছেন; কিভাবে

স্বাস্থ্য বিভাগের পরিবহণ শাখার স্টোর সংক্রান্ত একটি পদে ৩০০—৬০০ টাকা স্কেলে একজন নন-ম্যাট্রিককে ঢোকান। এই মহাপুরুষের বহু কার্যাবলীর বিবরণ দিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের সচিব ও স্বাস্থ্য অধিকর্তার দৃষ্টি বৃথা আকৃষ্ট করা হয়েছিল।

১৯৬৬-র ২৬শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় আমরা নার্স জীবনের বিড়ম্বিত দিকগুলি সম্বন্ধে অনেকগুলি অভিযোগ তুলে ধরেছিলাম, অনেক উদাহরণ দিয়ে। স্বাস্থ্য-দপ্তরের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি রকম দুর্নীতি ও অনাচারের লীলাখেলা চলে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে তার বিশদ পরিচয় সেখানে দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এই বিভাগের আমলাতান্ত্রিক কর্মকর্তাদের দূরদৃষ্টি ও কর্মশক্তির অভাবের ফলে সমগ্র দপ্তরটিতে যে বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সকল কর্মতালিকার সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া উচিত।

উদাহরণ দিতে গেলে শেষ পর্যন্ত তা মহাভারতের আকার ধারণ করবে এবং যেহেতু স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় পূর্বে সমাজের ওপরতলার বিচরণকারী ছিলেন না, সাধারণ মানুষ হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন এই বিভাগটিকে ভদ্র-লোকের উপযোগী করতে হলে বিভাগের

লিনটাস-S. 64-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

সর্বাঙ্গে কি প্রকার ঝাড়ুর প্রহার দিতে হবে।

চেকনোক্রাট দিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তর চলবে না, অর্থাৎ নামকরা ডাক্তারদের বিভাগীয় বড় বড় পদে বসিয়ে রাখলে স্বাস্থ্যদপ্তরের উন্নতি হবে না। যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে চিরকালই কেরিয়ারিস্ট তাঁরাই আজ দপ্তরের চূড়ায় বসে আছেন। এ কথা অজ্ঞ শিশুতেও বোঝে যে, কর্তব্যকর্মে গুরুতর অবহেলা না করলে ডাক্তারী মার্গের শিখরে ওঠা যায় না। অর্থাৎ আজ যাঁরা এই লাইনে কেষ্টবিষ্টু হয়েছেন, স্বাস্থ্যদপ্তরের চূড়ায় এসে বসেছেন, তাঁরা যে মইটি বেয়ে ওপরে উঠেছেন, সেদিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, হাসপাতালের সঙ্গে সংযুক্ত হবার সুযোগ নিয়ে, হাসপাতালে নিজেদের প্রকৃত কর্তব্য না করে, ওই সুবাদে জমকালো প্রাইভেট প্র্যাকটিশ জমিয়ে আজ তাঁরা মাতব্বর ব্যক্তি হয়েছেন। এটা স্থূল সত্য কথা। একের পর এক উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায়, যিনি যতবড় ডাক্তারই হোন না কেন, যত বিদেশী ডিগ্রীতেই দেদীপ্যমান হোন না কেন, হাসপাতাল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্র্যাকটিশের পরিমাণ শোচনীয়ভাবে কমে গেছে। এই কারণে বলছি, যে কর্তব্য করার জন্য তাঁরা একদা হাসপাতালের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন, হাসপাতালের প্রতি সেই কর্তব্য না করে, হাসপাতালের ডাক্তার হিসাবে সুযোগ নিয়ে যাঁরা আখের গুছিয়েছেন, সেই ফাঁকিবাজের দল যদি স্বাস্থ্য দপ্তরটির চূড়ায় উঠে বসে থাকেন তাহলে কি কোন জন্মে এই বিভাগটির উন্নতি হবে?

(সাপ্তাহিক বসুমতী—৩০শে মার্চ ১৯৬৭)

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন—(৩)

গত সপ্তাহে স্থানাভাবের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্যসমূহ রাখা হয় নি, বর্তমান সপ্তাহে আবার তা পেশ করছি। এখন থেকে আমরা স্বাস্থ্য বিভাগের দুর্নীতি ও অনাচারের নিদর্শনস্বরূপ একের পর এক স্পেসিফিক কেস তুলে ধরে সেগুলির প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

বর্তমান সংখ্যায় আমরা একজন কর্মচারীর কথা লিখবো। এঁর পরিচয় হচ্ছে যে ইনি স্বাস্থ্য-অধিকর্তার ব্যক্তিগত কর্মচারীদের অন্যতম এবং সেই সঙ্গে নাকি একটি বিশেষ চক্রের মধ্যমণি।

এই বিশেষ চক্রটি ডিরেক্টরেটের এসটাব্লিসমেন্ট বিভাগের কতিপয় অসাধু কর্মচারী নিয়ে গঠিত যার কাজ হচ্ছে নিয়োগ, বদলী ও প্রমোশনের জন্য প্রার্থীদের নিকট থেকে টাকা নেওয়া। এটি সন্দেহ ঘুষের ব্যাপার নয়, বেশ কলাও কারবার। এই চক্রের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে এই চক্রের মধ্যমণি এই বিশেষ কর্মচারীটির বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে বহু অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু যেহেতু তারা সকলে বড় বড় অফিসারদের আশ্রিত, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই এযাবৎ গ্রহণ করা হয় নি।

এই চক্রটির জাল সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়ানো এবং এই চক্রের হয়ে যারা কাজ করে তাদের প্রতাপ এতই বেশি যে, সৎ ও ন্যায়বুদ্ধিসম্পন্ন অফিসারেরাও এদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে অক্ষম। চক্রের মধ্যমণি ঐ কর্মচারীটি এভাবে বিচরণ করেন যেন তিনিই আসল অধিকর্তা, মোটামুটি পরিমাণে রজতচক্রের বিনিময়ে নিয়োগ, বদলী ও প্রমোশন প্রদানে ইনিই ভগবানরূপে বিবেচিত হন।

নদীয়া জেলায় কর্মরত এই চক্রের একটি লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করে নদীয়া জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মত একজন কর্মদক্ষ ও সৎ অফিসার কিভাবে বিড়ম্বিত ও নৈরাশ্যপ্রপীড়িত হয়েছেন তার বিবরণ এখানে দেওয়া হল। ইনি নাকি দুখানি ডি-ও চিঠি দিয়েছিলেন, একটি ডেপুটি ডিরেক্টর হেলথ সার্ভিসেস (অ্যাডমিনিস্ট্রেসন)-কে অপর একটি ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসের (স্বাস্থ্য-অধিকর্তা) পি, এ-র নিকট। চিঠি দুটির তারিখ ও নম্বর যথাক্রমে ১৮।৮।৬৬ নং ৮৭৭২ এবং ২।৮।৬৬ নং ৮২৬৫। এই পত্র দুটিতে তিনি একজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রমাণসম্বলিত কয়েকটি অভিযোগ পেশ করেন। প্রত্যুত্তরে তাঁকে জানান হয যে, ঐ কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, কিন্তু পরে জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টর তাঁকে (নদীয়ার পূর্বোক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে) নাকি ধমক দিয়ে জানিয়ে দেন যে, এসব বিষয়ে অভিযোগ করার কোন প্রয়োজন নেই (বি, ও, ২৮৯, তাং ১৬।৮।৬৬)। কারণ নদীয়ার যে লোকটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই লোকটির সঙ্গে আমাদের পূর্বোক্ত চক্রের মধ্যমণি, স্বাস্থ্য-অধিকর্তার ব্যক্তিগত কর্মচারীদের অন্যতম ঐ বিশেষ কর্মচারীটির যোগাযোগ আছে এবং এই ব্যক্তি ঐ চক্রেরই একজন এজেন্ট।

ঐ বিশেষ কর্মচারীটির বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ জমা হয়ে আছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এদিকে একটু নজর দিলেই অজস্র তথ্য তাঁর হাতে গিয়ে পড়বে।

(সাপ্তাহিক বসুমতী—১৬ই এপ্রিল, ১৯৬৭)

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন—(৪)

এবারে আমরা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে নিয়োগের ব্যাপারে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের কয়েকটি অভিযোগ আনছি।

(১) ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে এক ব্যক্তিকে ট্রপিক্যাল স্কুলের কোন একটি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়, যিনি মেডিক্যাল লাইনেরই লোক নন; তবে তাঁর একটি বড় কোয়ালিফিকেশন এই যে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন বড় কর্তার আত্মীয়। যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিটির ওই পদ পাওয়া উচিত ছিল তাঁকে আগেই অন্যত্র বদলী করে রাখা হয়েছিল। আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিটির হয়তো অন্য বিষয়ে যোগ্যতা থাকতে পারে, কিন্তু বর্তমান পদের পক্ষে তিনি একান্তই অনুপযুক্ত, ট্রপিক্যাল স্কুলে ডাক্তারদের পড়াবার যোগ্যতা তাঁর নেই। ছাত্ররা এঁর পড়াতে না পারার কথা নিয়ে বহুবার বর্তমান ডিরেক্টারের কাছে লিখিত নালিশ জানিয়েছেন।

(২) ১৯৬৬-র ৭ই নভেম্বর তারিখে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয়েছিল যে, "কলকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের এণ্টোমোলজি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্প্রতি রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর যে মনোভাব প্রকাশ করে চলেছেন, তাতে সংশ্লিষ্ট মহল ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই মহলের অভিযোগ যে অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয় উপেক্ষা করে উক্ত বিভাগে স্বজনপোষণ চলছে।"

যাঁকে রীডারের পদে নিয়োগ করা হয় তাঁর এণ্টোমোলজি বা পতঙ্গবিজ্ঞান বিষয়ে কোন গবেষণা বা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ছিল না। এই পদটির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল ১৯৬৬-র ৪ঠা নভেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায়। দরখাস্ত দেবার শেষ তারিখ ছিল ওই মাসের ১৫ই। ওই পদের জন্য সর্বনিম্ন যোগ্যতা চাওয়া হয়েছিল ওই বিষয়ে ডি-ফিল ডিগ্রী।

যাঁকে এই পদে নেওয়া হয়েছে তখন তাঁর ডি-ফিল ডিগ্রী ছিল না, অথচ তিনি দরখাস্ত করেছিলেন এবং ইণ্টারভিউতে আহূত হয়েছিলেন। ১৯৬৭-র ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইণ্টারভিউ হয়। ইণ্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন স্বাস্থ্যদপ্তরের ডিরেক্টার ডাঃ চুনীলাল মুখার্জী, ডি-জি, ডাঃ কে, এন, রাও এবং ট্রপিক্যাল স্কুলের প্রাক্তন ডিরেক্টার ডাঃ চৌধুরী। অধ্যাপক পদের জন্য তাঁরা কোন লোকই খুঁজে পেলেন না (!) এবং আমাদের আলোচ্য ভদ্রলোককে রীডারের পদে নিয়োগ করা হল (ইনি ইণ্টারভিউ-র একদিন আগে ডি-ফিলের রেজাল্টটা যেমন করে হোক নাকি বার করতে পেরেছিলেন)। এই নিয়োগটি সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূত কেন না ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের আইন অনুযায়ী ডি-ফিল ডিগ্রী লাভের পর তিন বছর

শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা না থাকলে কোন ব্যক্তিকে রীডারের পদ দেওয়া যায় না। তদুপরি এই ভদ্রলোকের প্রতি কর্তাদের আশ্চর্য করুণা। রীডার হওয়া সত্ত্বেও এঁকে বেতন দেওয়া হচ্ছে অধ্যাপকের। এমন চক্ষুলজ্জাহীন কাণ্ড কি আর কোথাও দেখা গেছে? স্বজনপোষণের বিষয়টি এখানেই সমাপ্ত হল না। উক্ত ব্যক্তিটিকে আবার নাকি বেলজিয়ামে পাঠিয়ে দেওয়া হল উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য, অবশ্য এন্টোমোলজিতে নয়।

কিন্তু রীডার এবং অধ্যাপকের পদের জন্যে যোগ্যতর লোকের অভাব ছিল না। অন্তত একজনও ছিলেন যাঁর এই এন্টোমোলজিতে ডি-ফিল ডিগ্রী ও ওই বিভাগে তিন বছর (প্রায়) শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ছিল। অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও এই জাতীয় স্থূল স্বজনপোষণের নমুনা একান্তই পীড়াদায়ক।

(৩) ট্রপিক্যাল স্কুলের বর্তমান সেক্রেটারী আগে ট্রপিক্যাল স্কুলের স্টাফ ছিলেন—হেডক্লার্ক থেকে প্রমোশন পেয়ে তিনি ওই পদে আসীন হয়েছেন। বর্তমানে যিনি হেডক্লার্ক আছেন তিনিও খুব যোগ্য লোক। তিনি সেক্রেটারী ছুটি নিলে অনেক সময় অনেকবার সেক্রেটারীর পদে অফিসিয়েট করেন। কিন্তু এখন একটি নতুন নিয়ম চালু হতে চলেছে। রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ডব্লিউ বি, সি, এস-এর লোক আসবে সেক্রেটারী হয়ে। আগে যদি প্রমোশনের ভিত্তিতে পদটি পাওয়া যেত, এখন তার ব্যতিক্রম হবে কেন? এখানকার সিনিয়ার ম্যানকে দিতে আপত্তি কি? এই রকম প্রমোশন থাকলে অফিসের লোকের কাজকর্মের আগ্রহ বাড়ে না কি? যে ব্যবস্থাটি চালু রয়েছে এবং যার জন্য কোন অসুবিধা হচ্ছে না, অনাবশ্যকভাবে তা পরিবর্তনের কোন অর্থ হয় না। এতে ভিতরের স্টাফেরা ক্ষুব্ধ হবেন এবং যিনি বাইরে থেকে আসবেন তিনিও বিশেষ সহযোগিতা পাবেন না।

(সাপ্তাহিক বসুমতী—২০শে এপ্রিল, ১৯৬৭)

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন—(৫)

ইতিপূর্বে আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অনেকগুলি স্পেসিফিক কেস তুলে ধরেছি, যদিও সেগুলি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে এমন কোন খবর এখনও আমরা পাই নি, যদিও আমরা তা একান্তভাবে আশা করেছিলাম।

এবারে আমরা আরও একটি বিশেষ প্রসঙ্গ তুলে ধরছি। যাঁর বিরুদ্ধে আমাদের এবারে অভিযোগ তিনি হচ্ছেন নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের রেডিওলজি বিভাগের একজন কর্তাব্যক্তি। তিনি গত সাত বছর ধরে এখানে আছেন, যদিও তিনি এখন বিশেষ এক্সটেনশন ভোগ করছেন।

এঁর বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ খুব স্পষ্ট। প্রথম হচ্ছে, তাঁর অভদ্রোচিত ব্যবহার, যা শুধুমাত্র রোগীদেরই নয়, তাঁর সহকর্মীদেরও বিব্রত ও বিরক্ত করে। অপরাপর স্টাফদের তিনি নানান কারণে উত্যক্ত করেছেন এবং করে চলেছেন।

তাঁর কর্মশক্তির কয়েকটি নমুনা শুনুন। শুধুমাত্র এক্স-রের দিনটা জানিয়ে দেবার জন্যই রোগীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখা হয়। ওয়েটিং লিস্টে রোগীদের নাম উঠতে পারাটা ভাগ্যের কথা, বহুক্ষেত্রে যেগুলি খুবই শক্ত কেস, সেগুলিরও এক্স-রে হতে অনাবশ্যক দীর্ঘদিন সময় লাগে। এই দীর্ঘদিন সময় লাগা ও রোগীদের হয়রানির কারণ হচ্ছে যান্ত্রিক ত্রুটি। যে যন্ত্রটিতে এই কাজ হয় তা এতই সেকেলে এবং তার পদ্ধতি এতই হতাশাব্যঞ্জক যে, তা দিয়ে একাজে কাজ চলে না।

অথচ ঐ মহামান্য ব্যক্তিটি নতুন যন্ত্র ব্যবহার করবেন না। মাত্র কয়েক বছর আগে একটি শক্তিশালী এক্স-রে মেসিন বসানো হয়েছিল, কিন্তু এ, সি, কারেন্ট পাওয়া যাবে না, এই অজুহাতে তিনি তা চালান নি; যার ফলে প্রচুর অর্থব্যয়ে সংগৃহীত এই মেসিনটি অকেজো হয়েই পড়ে আছে।

আরও একটি এক্স-রে যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে আছে কয়েক মাস ধরে, যদিও সেদিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন না। আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, স্পেয়ার পার্টস প্রভৃতির অভাব না থাকা সত্ত্বেও ঐ মেসিন সারানোর কোন ব্যবস্থা তিনি করতে অনিচ্ছুক। এর ফলে প্রত্যহ প্রচুর মূল্যবান এক্স-রে ফিল্মও নষ্ট হচ্ছে।

ফিল্মের স্টক রাখার পদ্ধতিও দোষযুক্ত। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, প্রত্যহ বহু ফিল্মের মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েসন হয়। পুনরায় এক্সটেনশন পাবার আগে পর্যন্ত আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিটি কখনও নিয়মিতভাবে হাসপাতালে হাজিরা দিতেন না।

আমরা বুঝতে পারি না, কেন সরকার তাঁদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে এই ভদ্রলোককে পুনরায় এক্সটেনশন দিয়েছেন। আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ জানাবো যে, এই ব্যক্তি সম্বন্ধে যেন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় এবং নীলরতন সরকার হাসপাতালে এক্স-রে ব্যবস্থার উন্নতি হয়, যাতে রোগীদের অনাবশ্যক হয়রান হওয়া থেকে রেহাই মিলতে পারে।

(সাপ্তাহিক বসুমতী, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৬৭)

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন—(৬)

আমরা ইতিপূর্বে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, কিন্তু সেগুলি তাঁর দৃষ্টিপথে পতিত হয়েছে কি না তা অবশ্য আমরা এখনো বুঝতে পারছি না।

নীলরতন সরকার হাসপাতালের রেডিওলজি বিভাগের যে ভদ্রলোকের কথা আমরা লিখেছিলাম, তাঁর চাকরীকালের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও (তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে প্রত্যক্ষ অভিযোগ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও), তাঁকে যে কেন নতুন করে নিয়োগ করা হচ্ছে তা সত্যই একটি রহস্য। জানি না স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি করছেন।

এবারে আমরা স্বাস্থ্যকৃত্যকের অপর এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করছি। যিনি স্বাস্থ্য অধিকর্তার একজন ঘনিষ্ঠ কর্মচারীর পৃষ্ঠপোষকতায় ওই দপ্তরে জাঁকিয়ে বসেছেন। বর্তমানে তিনি না কি একজন ওয়ার্ডমাস্টার হিসাবে চাকুরীতে বহাল আছেন এবং ওই পদে তাঁর মাহিনা ও উন্নতি হয়েছে, অথচ আশ্চর্য তিনি নাকি একদিনও ওয়ার্ডমাস্টার হিসাবে কোথাও কাজ করেন নি। আজ থেকে ছয় মাস আগে একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওয়ার্ডমাস্টার হিসাবে এই ভদ্রলোককে বদলী করা হয়, কিন্তু তাঁর মুরুব্বি স্বাস্থ্য অধিকর্তার সেই ঘনিষ্ঠ কর্মচারী তাঁকে ছাড়তে নারাজ। ৩১।৩।৬৭ তারিখে স্বাস্থ্য দপ্তরের সহ-অধিকর্তা না কি তাঁকে নিশ্চিতভাবে ছেড়ে দেবার জন্য হুকুম দেন, কিন্তু স্বাস্থ্য অধিকর্তার সেই ঘনিষ্ঠ কর্মচারীটি সেই হুকুমের কোন গুরুত্ব না দিয়ে তাঁকে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ঐ ঘনিষ্ঠ কর্মচারীটি এই ব্যক্তিকে নাকি আবার ট্রানসপোর্ট অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে নিয়োগ করতে চাইছেন, এবং ভদ্রলোক তাতে রাজী আছেন কি না তা জানতে চেয়ে তাঁকে না কি চিঠিও দেওয়া হয়েছে।

এই ভদ্রলোক এবং আরও অনেকের ব্যাপার নিয়ে একটি তদন্ত হয়েছিল, কিন্তু সেই তদন্তের রিপোর্ট স্বাস্থ্য অধিকর্তার ঘনিষ্ঠ কর্মচারীটি চেপে রেখেছেন। আমাদের জিজ্ঞাসা—স্বাস্থ্য অধিকরণের প্রকৃত মালিক কি স্বাস্থ্য অধিকর্তার ওই ঘনিষ্ঠ কর্মচারীটি?

স্বাস্থ্য অধিকর্তার ঘনিষ্ঠ কর্মচারীটির বিরুদ্ধে নিজের সেকশনে অপ্রয়োজনীয় টাইপিস্ট ও মহিলা কর্মীদের এবং একদল চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে রেখে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে দিয়ে নিজের বাড়ির কাজ করানোর অভিযোগ রয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বদলী হবার

অনুদেশ হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য অধিকর্তার ঘনিষ্ঠ কর্মচারীটিকে নিজের স্থান থেকে নড়ানো সম্ভবপর হয় নি।

স্বাস্থ্য অধিকর্তার ঘনিষ্ঠ কর্মচারীটি এবং তাঁর প্রিয়ভাজন উপরিউল্লিখিত কর্মচারীটির বিষয় নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় একটু ভেবে দেখবেন কি?

(সাপ্তাহিক বসুমতী—২৫শে মে, ১৯৬৭)

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন—(৭)

এবারে আমরা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের কয়েকটি বৈষম্যমূলক আচরণের ঘটনার উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি এগুলির প্রতিকার হবে। প্রথমেই জনৈক কম্পাউন্ডারের কথা উল্লেখ করেছি, জুন মাসে যাঁর অবসর গ্রহণ করার কথা। তিনি পুনর্নিয়োগের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু সরকার তা নাকচ করেছেন।

এতে আমাদের আপত্তি করার কিছু ছিল না যদি পাশাপাশি আর একটি ঘটনার নজীর না থাকত। রেডিওলজি বিভাগের সহ-অধ্যাপকের অবসর গ্রহণ করার কথা জুলাই-এর ষোল তারিখে। তিনিও পুনর্নিয়োগের আবেদন করেছিলেন, আবেদন নাকি মঞ্জুর হয়েছে। এক বছরের জন্য পুনরায় তাঁকে নিযুক্ত করা হচ্ছে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করে, এবং যে পদটিতে তিনি এতদিন বিরাজ করছিলেন সেটি এক বছর খালি রাখা হবে।

একই প্রতিষ্ঠানের দুজন কর্মীর প্রতি দুরকম ব্যবহার শুধু দৃষ্টিকটু ও পীড়াদায়কই নয় দুর্নীতিপূর্ণও বটে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীমহাশয় আশা করি এইদিকে দৃষ্টি দেবেন।

(সাপ্তাহিক বসুমতী, ১লা জুন, '৬৭)

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতি

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টিগোচর করার জন্য আমরা ইতিপূর্বে "স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন" এই শিরোনামায় কয়েকটি স্পেসিফিক কেস তুলে ধরেছিলাম। ভেবেছিলাম সেগুলির প্রতিবিধান হবে। কেন না বড় আশা ছিল যে, অন্তত দুর্নীতিদমনের ব্যাপারে মন্ত্রীরা তৎপর হবেন।

আমরা বিশেষভাবে জানতে পেরেছি যে, কোন কোন মন্ত্রী এ বিষয়ে যথেষ্ট তৎপরতা দেখালেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় কিন্তু নিজ বিভাগের দুর্নীতি দেখেও দেখছেন না। আমরা এই অভিযোগ পেয়েছি যে, তিনি কার্যত অধিকর্তা ও সচিবদের হাতে স্বেচ্ছাবন্দী এবং তাঁরা যে নোট দেন তার ওপর চেরা সই দেওয়া ভিন্ন আর কিছু করেন না।

আমরা পূর্বে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলাম যে, যে সকল দুর্নীতির বিষয় সম্বন্ধে আমরা আলোকপাত করেছি হয় তিনি সেগুলির প্রতিবিধান করুন, নয় হয় আমাদের বক্তব্য যে অসত্য তা প্রতিপাদন করুন। দুটির যে কোন একটিতেই তাঁর প্রবল অনিচ্ছা, অন্তত আমাদের তা এখন মনে হচ্ছে।

তথাপি আমরা আশা করি যে, আমাদের উপস্থাপিত বিষয়গুলির গুরুত্ব অনুধাবন করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। তাঁর প্রতি আমাদের আরও নিবেদন এই যে, শুধুমাত্র আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে তিনি যেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতিশ্রুতি মত জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন।

(সাপ্তাহিক বসুমতী—৬ই জুলাই, ১৯৬৭)

ডাক্তারদের কায়েমী স্বার্থ

সম্প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি আদেশে ডাক্তারদের কায়েমী স্বার্থে একটি সুবৃহৎ আঘাত লেগেছে যার ধাক্কায় তাঁরা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

অথচ আদেশটি এমন কিছু মারাত্মক নয়। যে সব ডাক্তারেরা হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁদের মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, তাঁরা যেন একটা নির্দিষ্ট সময় হাসপাতালে থাকেন। তাঁদের কার্যকাল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁদের কাছ থেকে সঙ্গতভাবেই আশা করা হয়েছে যে, তাঁরা সেই সময়টুকু হাসপাতালে স্বশরীরে থাকবেন, কেন না তাঁদের সেই জন্য পয়সা দেওয়া হয়।

এতেই ডাক্তার সাহেবরা ক্ষেপে গেছেন, এগারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত হাসপাতালে থাকতে হবে। এতখানি অপমান তাঁরা হজম করতে রাজী নন। তাই তাঁরা খোলাখুলি বিদ্রোহের হুমকি দিয়েছেন।

আমরা সাধারণ লোক, আমরা বুঝি যে, যেখান থেকে পয়সা পাচ্ছি সেখানে কাজ করতে হবে। কিন্তু ডাক্তাররা অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁদের ব্যাপারই আলাদা।

একটা কথা আমরা বঙ্গদর্শনে বহুবার বলেছি যে, ডাক্তারীমার্গের সাফল্যলাভের জন্য হাসপাতাল একটা মই-বিশেষ। কলকাতার হাসপাতালগুলি থেকে শুরু করে জেলা হাসপাতাল সর্বত্রই দেখবেন স্পেসালিস্ট ডাক্তারদের টিকি কোথাও দেখা যায় না, অথচ তাঁরা নাকি হাসপাতালেই চাকরী করেন। সকলেরই জাঁকালো প্রাইভেট প্র্যাকটিশ আছে, এবং সময়টা তাঁরা সেদিকেই ব্যয় করেন। তাঁদের কাছে হাসপাতালটা হচ্ছে বুড়ি ছোঁয়ার মত, আর হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত আছেন বলেই এমন জমজমাট প্রাইভেট প্র্যাকটিশ।

দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে স্পেসালিস্ট মাত্রেই চিকিৎসার কালোবাজারী। হাসপাতালের নাম করে ব্যক্তিগত রোগী টানেন, এবং দিনে পাঁচ মিনিট হাসপাতালে চক্কর দিয়েই কর্তব্য শেষ করেন এবং হাসপাতাল থেকে মাসান্তে মোটা অঙ্কের চেক নেন।

সেই প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাহিনী আমরা বঙ্গদর্শনের পাতায় বহুবার বলেছি যিনি হাসপাতালের মধ্যেই নাকিসুরে বলতেন, যাঁরা আমার চেম্বারে আমাকে পয়সা দিয়ে দেখিয়েছেন তাঁরাই এখানে থাকুন, আর বাকি সকলে চলে যান। ইনি আবার বর্তমান রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তরের সঙ্গে যুক্ত আছেন। ইনি তো একটি প্রতীক, সকলেরই টাইপ এক।

কাজেই সরকার যখন হুকুম দেন যে, পয়সা যখন নিচ্ছ তখন সময় হিসাব করে কাজ দিতে হবে, হাসপাতাল ভাঙিয়ে চিকিৎসার কালোবাজার চলবে না তখন এই সম্মানিত বিশেষ সুবিধাভোগীরা যে একযোগে বিদ্রোহে ফেটে পড়বে এতে আর অবাক হবার কি আছে?

শোনা যাচ্ছে মেডিক্যাল কলেজের জনৈক সার্জন এবং নীলরতন সরকার হাসপাতালের জনৈক মেডিসিনের অধ্যাপক প্রকাশ্যেই এই সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যকে আমরা আরও একটি বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিই। ডাক্তারদের এই বিদ্রোহে রাইটার্স বিল্ডিংস্ থেকে উস্কানি দেবার লোকের অভাব নেই। আমরা একজন ডেপুটি সেক্রেটারী আর একজন ডেপুটি ডিরেক্টরের কথা জানি (যিনি অতীতে নদীয়া জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান অধিকর্তারূপে কাজ করেছেন) যাঁরা ডাক্তারদের এই বিদ্রোহে পিছন থেকে মদত দিচ্ছেন। এঁদের বিষয়ে পূর্বাহ্নে সতর্ক না হলে বিপদ আছে। আমরা এজন্য আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। যদি এই সরকারী নির্দেশটি মান্য করতে ডাক্তারদের তিনি বাধ্য করতে পারেন তাহলে তিনি এই অভাগা দেশের একটি চিরন্তন কল্যাণ করবেন। চিকিৎসার নামে শ্রেণী বিশেষের যে কালোবাজারী চলছে তা দূর করার জন্য এই প্রচেষ্টা সত্যই অভিনন্দনযোগ্য।

(সাপ্তাহিক বসুমতী—৩১শে আগস্ট '৬৭)

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের পরিচালনার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজে গ্রহণ করার পর বিভিন্ন মহল থেকে এই বিষয়ে সরকারকে হেয় করার প্রবণতা দেখা গেছে। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কলেজটির পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন এবং তার ফলে

এখানে দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থ একটা জোর ধাক্কা খেয়েছে। সম্প্রতি কয়েকজন চিকিৎসক-অধ্যাপকের উপর কর্মচ্যুতির নোটিশ আসাতে সেই বিষয়-টিকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল কিছুটা সোরগোল তোলার প্রয়াস পেয়েছে। অথচ যাঁদের উপর কর্মচ্যুতির নোটিশ এসেছে সঙ্গত কারণেই তা এসেছে, কেন না সরকারী আইন অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর প্রত্যেককেই অবসর গ্রহণ করতে হয়। যাঁদের এভাবে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে তাঁদের যোগ্যতার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কোন কটাক্ষপাত করছি না। কিন্তু নিয়মমাফিক কাজ করতে গেলে কাজের নিয়মটাকে অবশ্যই মেনে নিতে হয়। তা ছাড়া অথর্ব হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কর্মস্থল আঁকড়ে বসে থাকব অতীত কীর্তির দোহাই দিয়ে, তরুণতরদের জন্য কোন পথ করে দেব না, এ দৃষ্টিভঙ্গীটা কদাপি সমর্থনযোগ্য নয়। উর্ধতনগণ এ হেন ব্যক্তিকে নাচিয়ে যাঁরা জল ঘোলা করার প্রয়াস পাচ্ছেন, তাঁরা কিন্তু হতাশই হবেন। এই বলিষ্ঠ নজীর সৃষ্টি করার জন্য স্বাস্থ্যদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে ধন্যবাদ।

(সাপ্তাহিক বসুমতী—২রা নভেম্বর, ১৯৬৭)

আসুন... ইউবিআইতেই সঞ্চয় করুন

- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের বার্ষিক সুদ পাবেন সেভিংস অ্যাকাউণ্টে শতকরা ৩½ টাকা, মেয়াদী আমানতে সর্বোচ্চ শতকরা ৬½ টাকা।
- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের ফলে ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে আপনার টাকা খরচ করতে পারবেন।
- ইউবিআইতে আপনার ও আরও অনেকের সঞ্চয় একত্র করেই ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে, কৃষিতে, রপ্তানীর জন্যে, আর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্যে সরকারকে আমরা আরও বেশী ঋণ দিয়ে দেশের আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করব।

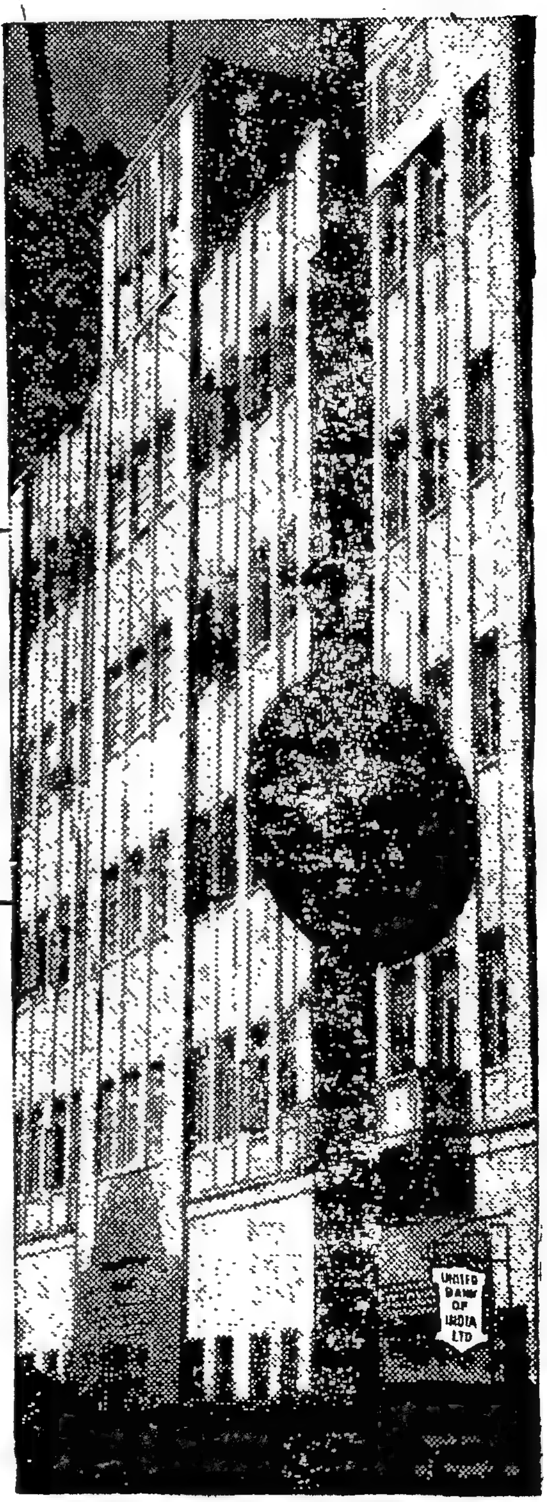

ইউবিআই

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

হেড অফিস ৪, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

UBI-60-68

সন্ধ্যের খানিক পরে বিশ্ব শিস্ দিতে দিতে গ্যারেজের পাশ দিয়ে ফিরছিল। হাওয়ায় ভাসা পাখীর মতো মনটা বিশ্বকে নিয়েই উড়ে যেতে চাচ্ছে যেন। এখন-সোজা বাড়ি ফিরবে বিশ্ব। হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক পাল্টে সোজা সিনেমা হলে। নাইট শো'র টিকিটটা তার পকেটে একটা রাজত্বের দলিলের মতো সযত্নে রাখা।

হঠাৎ অমিয়বাবুর ডাকে থামলো বিশ্ব। গ্যারেজ ঘরের মধ্য থেকে অমিয়বাবু ডাক দিয়েছেন তাকে। একবার ভালো করে গ্যারেজের দিকে তাকিয়ে বিশ্ব এগিয়ে এলো। বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না এখানে। বন্ধুরা তার জন্য অপেক্ষা করছে সিনেমা হলে। হাতমুখ ধুয়ে পোষাক পাল্টে এখুনি তাকে যেতে হবে।

'কোথায় যাচ্ছিস?' কাছাকাছি হতেই অমিয়বাবু শুধোলেন।

'বাড়িতে।'

নির্মলেন্দু গৌতম

'কোথাও কাজ করছিস নাকি এখন?'

'না।'

একটু থামলেন অমিয়বাবু। ভাঙা-চোরা যন্ত্রপাতির মধ্যে একটা লোহার চেয়ারে বসে আছেন তিনি। পাশে তাঁর গাড়িখানা। বনেটটা হাঁ করানো। ভেতরের যন্ত্রপাতি খুলে নেওয়া হয়েছে। ও-পাশে একটা ছেলে আলোর তলায় কি যেন ঘসছে বসে বসে।

গাড়িখানা ক'দিন থেকেই খারাপ হয়ে এমনিভাবে পড়ে আছে। যেতে-আসতে চোখে পড়েছে বিশুর। কিন্তু বিশু জানে গাড়িটাকে অমনিভাবে পড়ে থাকতে হবে বেশ কিছুদিন। কারণ গাড়িটা খারাপ হয়ে আসবার পরই পুলিনদা কার যেন অসুখের খবর পেয়ে দেশে চলে গেছে। আর যে দু'জন আছে, তাদের সাধ্য নেই গাড়িটাকে ঠিক করে। বিশু ওদের দু'জনকে ভালো করেই জানে।

অমিয়বাবু বললেন, 'তাহলে আমার একটু উপকার করে দে না।'

বিশু জানে এবার গাড়িটা সারিয়ে দেবার কথা বলবেন অমিয়বাবু। তবু বললো, 'কি উপকার বলুন না।'

'গাড়িটার জন্য দু'-চারদিন সময় দে।'

না, বিশুর আপত্তি নেই। কাজ যখন একটা পাওয়া গেছে, তখন করতে আপত্তি কি। তাছাড়া পুলিনদা তাকে ডাকতোই সময়মতো। এখানে অনেক কাজও করেছে বিশু। পুলিনদা জানে গাড়ির কাজে বয়স কম হলেও বিশুর মতো ওস্তাদ আর কেউ নেই এদিকে। অমিয়বাবুও অবশ্য তা জানেন।

'কিন্তু পুলিনদা শেষে কিছু বলবে না তো।' বিশু বললো।

'না না, যাবার সময় তোর নামটা বলে গেছে পুলিন।'

'তাহলে তো হয়েই গেলো।' বিশু আশ্বস্ত হলো।

'তুই যা চাস তাই পাবি। অবশ্য একেবারে আকাশছোঁয়া কিছু একটা চেয়ে ফেলিস না।' এবার আস্তে আস্তে অমিয়বাবু বললেন।

হাসলো বিশু। বললো, 'আমি কিছু চাইবো না। কাজ তুলে দেবো, আপনি আপনার ইচ্ছেমতন দেবেন।'

অমিয়বাবু হেসে বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

বিশু বললো, 'আর কাজ যেদিন শেষ হবে সেদিন একটা মুরগী এনে দেবেন। সবাই মিলে খাবো। বেশ ভালো মুরগী হওয়া চাই কিন্তু।'

'কালকেই আমি মুরগী এনে দেবো।' উৎফুল্ল হয়ে বললেন অমিয়বাবু।

'ব্যস, আর কি। আমি এবার চলি। কাল সকালে আপনিও একবার আসবেন।' বিশু পা বাড়াবার আগে বললো।

অমিয়বাবু বললেন, 'আজ থেকেই কাজ শুরু করতে আপত্তি কি?'

একটু হাসলো বিশু। তারপর বললো, 'আজ একটা সিনেমায় যাচ্ছি

নাইট শোতে। টিকিট কাটাও হয়ে গেছে। না হলে আজই ধরতাম কাজটা।'

'তাহলে আর কি করা যাবে!' অমিয়বাবু বললেন।

বিশু আবার শিস্ দিতে দিতে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। একটু বোধ হয় দেরি হয়ে গেছে। যাক্ তার জন্যে ভাববার কিছু নেই।

পরদিন সকাল থেকেই কাজে লেগে গেলো বিশু। অমিয়বাবু আগেই এসে বসেছিলেন গ্যারেজে। বিশুকে তার কাজটা বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

কাজ করতে শুরু করলে বিশুর আর কিছু খেয়াল থাকে না। পুলিনদা এইজন্যই তাকে পছন্দ করে। কাজ এলে খুঁজে বেড়ায় তাকে।

আজও কাজের মধ্যে ডুবে গেলো বিশু।

গোটা ন'য়েকের সময় আবার এলেন অমিয়বাবু। হাতে ঝোলানো বিরাট এক মুরগী।

মুরগীটাকে দেখেই বিশু লাফিয়ে উঠলো। 'একি, সত্যি সত্যি আজকেই নিয়ে এলেন!'

'তোর চোখের সামনেই বাঁধা থাকলো এটা।' হাসতে হাসতে বললেন অমিয়বাবু।

বলে পকেট থেকে একটা শক্ত দড়ি বের করে মুরগীটাকে একটা ভারি লোহার সঙ্গে বেঁধে দিলেন। ঝটপট্ করে উঠে মুরগীটা পালাতে চাইলো। গলায় শব্দ করলো। লাল ভেলভেটের মতো ঝুঁটিটা নাড়িয়ে চারদিকে তাকাতে থাকলো।

'দারুণ মুরগীটা এনেছেন কিন্তু!' সবিস্ময়ে বললো বিশু।

মুরগীটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে অমিয়বাবু বললেন, 'অনেক দেখেশুনে এনেছি। যেদিন কাটবি, সেদিন আমায় খানিকটা দিস কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই পাবেন। অতোবড়ো মুরগীটা কি চার-পাঁচজনে খেতে পারবো!'

বলে খপ্ করে মুরগীটাকে ধরে ওজনটা পরখ করে দেখলো বিশু। মুরগীটা ভয়ে ভয়ে আড়ালে পালাতে চাইল আবার। কক্কর-কক্কর শব্দ করলো কিছু সময়।

আরো দু'জন যারা বিশুর সঙ্গে কাজ করছিলো তারাও মুরগীটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো।

'এবার চলি।'

বলে মুরগীটার দিকে চোখ ফিরিয়ে কিছুটা হেসে গেলেন অমিয়বাবু।

বিশু মুরগীটাকে বারকয়েক ভালো করে দেখে ফের কাজের মধ্যে ডুবে গেলো।

কাজ থাকলে বিশু বাড়ি যায় না। রাতেও যায় না। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে। কাউকে দিয়ে খাবারটা আনিয়ে নেয়। এজন্য চমৎকার একটা টিফিন ক্যারিয়ারও কিনে নিয়েছে সে। কাজ করতে বসে বাড়ি যাওয়া পছন্দও করে না বিশু। নানা কথায় কাজের গতিটাই যেন নষ্ট হয়ে যায়। কাজ যখন করবে তখন কাজের মধ্যে থাকতে চায় সে।

দুপুরবেলায় খেতে খেতে যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে এ সব কথা ভাবছিলো বিশু। নিজের খাবার থেকে একমুঠো ভাত তুলে দিয়েছে মুরগীটাকে। মাথা নাড়িয়ে, ঝুঁটি দুলিয়ে ভাতগুলো খুটে খুটে খাচ্ছে মুরগীটা। মাছের কাঁটাগুলো চিবিয়ে মুরগীটার দিকে ছুঁড়ে দিতে থাকলো বিশু।

যেখানে কাঁটাগুলো পড়ছে ছুটে ছুটে সেখানে এসে কাঁটাগুলো খেয়ে নিচ্ছে মুরগীটা। ব্যাপারটা বিশুর ভারি ভালো লাগছে। কাঁটা ফুরোতেই বিশু আরো একমুঠো ভাত দিলো মুরগীটাকে। তারপর খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লো। নিজের গ্লাসের অবশিষ্ট জলটুকু একটা ভাঁড়ে করে মুরগীটার পাশেই রাখলো। জল খাক খানিকটা। ওদেরও জল তেষ্টা পায়।

সত্যি সত্যি মুরগীটা ভাঁড়ের জল খেলো ছিটিয়ে ছিটিয়ে।

খুশি হল বিশু।

রাত্রিবেলা একজনকে দিয়ে খাবার আনিয়ে নিজে খাবার আগেই খাওয়ালো মুরগীটাকে। খেয়ে নিক। গ্যারেজ ঘরে কিছু পিঁপড়ে ছাড়া খাবার আর কিছু নেই। সুতরাং খেতে দেওয়া উচিত ওকে।

রাত বারোটা পর্যন্ত একাই কাজ করলো বিশু। সন্ধ্যে হতে হতেই আর দুটো ছেলে চলে গেছে। মুরগীটা সারা সময় ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে। পায়ের দড়িটা বেশ বড়ো বলে গোটা ঘরখানাতেই ঘুরে বেড়াতে পেরেছে সে। আলোর জন্য, আর শব্দের জন্য সুস্থভাবে বসতে পারে নি কোথাও।

বারোটা বাজতেই কাজ বন্ধ করলো বিশু। সাবান দিয়ে ঘসে ঘসে হাত-মুখ ধুয়ে ফেললো। দারুণ ঘুম পাচ্ছে তার।

গ্যারেজ ঘরের মধ্যেই একখানা পুরনো খাটিয়ার ওপর বিছানা পাতলো বিশু। বারকয়েক হাই তুললো। তেল-কালি মাখা জামা-প্যান্ট পাল্টে নিলো তাড়াতাড়ি। তার পর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। শুয়েই একটা সিগারেট ধরালো। অনেকক্ষণ সিগারেট ধরায় নি বিশু।

মুরগীটা অন্ধকার ঘরের মধ্যেই খানিকটা ঘুরে বেড়ালো। চোখ বুজে সিগারেট টানতে টানতে টের পেলো বিশু। খাসা মুরগীটা। অমিয়বাবু খুব চালাক না হলে চোখের সামনে মুরগীটাকে বেঁধে রেখে যান?

মুরগীটার কথা, অমিয়বাবুর কথা এবং গাড়িটার কথা ভাবতে ভাবতে বিশু কখন ঘুমিয়ে পড়লো তা নিজেই জানে না।

একেবারে ভোরবেলায় তার ঘুম ভাঙলো মুরগীর ডাকে। মনে হলো তার কোলের কাছ থেকে মুরগীটা ডেকে উঠেছে।

চম্‌কে উঠে তাকিয়ে দেখলো বিশু, তার পাশেই বিছানার ওপর মুরগীটা ওম্ দেবার মতো করে বসে চেঁচিয়ে ডেকে উঠেছে। জানালা দিয়ে রোদ্দুর আসছে। সেই রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে মাথার লাল ভেলভেটের মতো ঝুঁটি নেড়ে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে মুরগীটার দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লো বিশু।

'এ্যাই নাম—নাম—' বলে চেঁচিয়ে উঠলো তারপর।

ডানা ঝট্‌পট্ করে লাফিয়ে নামলো মুরগীটা। চেঁচিয়ে বার কয়েক কক্কর-ক করে ডাকলো। তারপর গাড়ির মাথায় উঠে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলো।

সকালবেলা মুড়ি আর চা খাবার সময় মুরগীটাকেও কিছু মুড়ি দিলো বিশু। খুটে খুটে মুড়ি খেলো মুরগীটা। পায়ে দড়ি নিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে থাকলো তারপর।

খাবার জিনিসটাকে অমনি চোখের সামনে রাখতে বেশ লাগছে বিশুর। ভাবতে ভাবতে আজকে সকাল থেকেই কাজের মধ্যে ডুবে গেলো বিশু।

কাজের মধ্য দিয়ে দুটো দিন কি করে কেটে গেলো টেরই পেলো না বিশু। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় গাড়ির কাজ শেষ করে ফেললো।

অমিয়বাবু এলেন, বললেন, 'কাল ট্রায়াল দিয়ে দেখতে হবে।'

বিশু বললো, 'আমি ভেবেছিলুম আজই গাড়ি নিয়ে বেরুবো।'

'আজ বরং মুরগীর জন্য মশলা-টশলা কিনে নিয়ে আয়। কাল সকালেই ওটাকে কাটা হবে।' বলে পকেট থেকে টাকা বের করলেন অমিয়বাবু।

'সেই ভালো।' বলে হাত বাড়িয়ে বিশু টাকাটা নিলো।

বনেট তুলে অমিয়বাবু এঞ্জিনের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'খুব উপকার করলি কিন্তু। গাড়িটা না হলে আর চলছিলো না আমার।'

তারপর বনেট নামিয়ে সীটে বসে স্টার্ট দিয়ে দেখলেন।

বিশু বললো, 'কি ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।' বলে গাড়ি থেকে নেমে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন অমিয়বাবু।

'চল্ তাহলে। আমি বাজারের দিকে যাবো। শুনুন, কাল সকালের দিকে কিন্তু ট্রায়ালে বেরুবো গাড়ি নিয়ে।'

'আচ্ছা।'

দুজনে গ্যারেজ তালাবন্ধ করে বেরিয়ে পড়লো।

পরদিনও সকালবেলায় মুরগীর ডাকে ঘুম ভেঙে গেলো বিশুর।

বিশু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকিয়ে দেখলো, ঠিক তেমনি পাশে ওম্ দেবার মতো করে বসে মুরগীটা খোলা জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে আলোর দিকে তাকাচ্ছে। অদ্ভুত একটা শব্দ করছে গলায়।

তাকিয়েই রইলো বিশু। মুরগীটা তার গা ঘেঁসে বসে আছে। এই তিন-রাত তারা এক সঙ্গে, এক বিছানায়। এখন আর তাকে ভয় পায় না মুরগীটা। গায়ে হাত দিলেও মুরগীটা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবে। বিশু ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলো। এই মুরগী-টাকেই আজ সে খেয়ে ফেলবে রান্না করে। এখান থেকেই ঘরের কোণায় সকালবেলা এনে রাখা স্টোভটা দেখতে পাচ্ছে। বালিশের তলায় হাত ডোবালেই মশলাগুলো বের করে দেখতে পাবে।

বিশু একটু অস্বস্তিবোধ করলো। অথচ কেন যে অস্বস্তিবোধ করলো, তা ঠিক ধরতে পারলো না।

মুরগীটা এবার উঠে দাঁড়ালো। জানালার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, কক্কর-ক। গলাটা ফুলে উঠলো মুরগী-টার। লাল ভেলভেটের মতো ঝুঁটি দুলে উঠলো।

মুরগীটাকে হঠাৎ যেন নতুন করে দেখলো বিশু। অবাক হয়ে গেলো সে।

ঘরের মধ্যে এখন আর অন্ধকার নেই। জানালা দিয়ে জোয়ারের মতো আলো আসছে। ঘরের ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতিগুলো দেয়ালের গায়ে, মেঝের ওপর স্তূপ হয়ে আছে। সে সব দেখতে ইচ্ছে হলো না বিশুর। তিনদিন এই যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে করতে আজকে সে যেন খানিকটা ক্লান্ত। মুরগীটার দিকেই তাকিয়ে রইলো বিশু। লাল ঝুঁটিটা তার নড়ছে। গলায় শব্দ হচ্ছে তেমনি।

বিশু ঠিক তেমনি অস্বস্তিবোধ করলো আবার।

সিগারেটের প্যাকেটটা বালিশের পাশেই। কিন্তু একটা সিগারেট ধরাতেও ইচ্ছে হলো না। মনের মধ্যে একটা ভাঙা মেসিন কি করে যেন চালু হয়ে উঠেছে। অনুভব করলো বিশু। ভালো মোটর মেকানিক হয়েও নিজের মনের মধ্যেকার এই ব্যাপারটা তার কাছে বিস্ময়কর মনে হলো।

বিশু উঠে বসলো।

বিশু কি ভাবছে, বিশু নিজেই তা জানে না। খাবার জন্য কেনা মুরগী নিয়ে এসব ভাবনা সে কোনোদিন ভাবে নি।

অথচ যতো ভাবতে থাকলো ততো অসহায় হতে থাকলো বিশু। নিজের সুখ-দুঃখ-বেদনাগুলো সে এবার নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করলো। সুখ-অসুখের দোলায় দুলতে থাকলো।

দড়ির ওপর থেকে জামাটা নিয়ে এবার গায়ে দিলো বিশু। খাটিয়ার তলা থেকে চটিজোড়া বের করে পায়ে গলিয়ে নিলো। দ্রুতপায়ে বাইরে এলো তারপর। দরজাটা টেনে দিয়ে এবার তেমনি দ্রুত পায়ে অমিয়বাবুর বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকলো।

বুকের মধ্যে সুখ-দুঃখ-বেদনাগুলো কোন্ সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠেছে। খবরটা একবার চেঁচিয়ে আকাশের দিকে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে বিশুর। রোদে মাখামাখি হয়ে আকাশটা উৎসবের মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিশু রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো হঠাৎ।

খুব কম সময়ের মধ্যেই অমিয়বাবুর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো বিশু। অমিয়বাবু বাইরের ছোটো দেয়ালের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁতে ব্রাস ঘসছেন। খানিক আগে ঘুম থেকে উঠেছেন মনে হলো।

'একি রে, তুই হঠাৎ। কি হলো?' অবাক হয়ে শুধলেন অমিয়বাবু।'

'না কিছু হয় নি।...একটা কথা বলতে এসেছি শুধু—'

বলে থামলো বিশু। ঠিক যা বলবে তা গুছিয়ে নিতে পারছে না। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সব। ঠিক এমন কথা সে কোনোদিন বলতে শেখে নি। বলতে শিখলেও হয়তো এসব কথা একবারে, অন্তত সহজে বলা যায় না।

'কি, টাকা চাই?'

'না, টাকা নয় মুরগীটা চাই।'

'মুরগীটা চাই মানে? ওটা তো তোর জন্যেই। আজকেই তো ওটা রান্না হবে।'

'না, মানে মুরগীটা খেতে চাই না। মুরগীটাকে পুষবো ঠিক করেছি।'

'সে কিরে; তোর আবার মুরগী পুষবার সখ হলো কেন? অমন একটা খাবার জিনিস। এ-ক'দিন চোখে চোখে রাখলি!'

উত্তর দিতে পারলো না বিশু। এই কথাটা কিছুতেই বুঝিয়ে বলতে পারলো না, মুরগীটার মধ্যে সে হঠাৎ প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছে। তারই মতো একটা শরীর নিয়ে বেঁচে আছে মুরগীটা। তার মধ্যে সুখ আছে, হয়তো দুঃখও আছে। আলোর জন্য তৃষ্ণাও আছে তার। হয়তো ভালোবাসাও আছে। বিশু এসব কিছুই অস্বীকার করতে পারছে না।

অমিয়বাবু বললেন, 'ঠিক আছে, তুই নিয়ে যা মুরগীটাকে। তোকে দিয়েছি, খেলে খাবি, না হলে যা ইচ্ছে তাই করবি।'

বিশু ফিরলো। খুব দ্রুতপায়ে। রোমাঞ্চিত বিশু ভাবলো, মুরগীটা বুঝতেও পারবে না, তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল এবং তা বাতিলও হয়ে গেছে। তবু মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি তাকে এই খবরটা দেওয়া দরকার।

বিশু এবার দৌড়ুতে থাকলো।

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ সাঁইত্রিশ ॥

একটা কথা কি জানেন? শ্যামলাল চৌধুরী বলেছিলেন, ডুয়ার্সের চা-বাগান গড়ে তোলার পিছনে ইংরাজ শাসনকর্তাদেরই ছিল গোপন হাত। তাঁরাই আড়াল থেকে এই প্রয়াসকে সমর্থন করে চলেছিলেন। আর শুধু সমর্থনই বা বলি কেন, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যই করছিলেন তাঁদের। আচ্ছা থাক, ওসব পরে হবে। আসুন—

ততক্ষণে চা এসে গিয়েছিল এক পেয়ালা। একটি ছোট ছেলে আমার সামনে চা-র পেয়ালা নামিয়ে রাখছিল কাঠের একটি টুলের ওপরে। পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উঠছিল। আর সেই সঙ্গে দু প্লেট খাবার। ছেলেটি এক প্লেট আমার সামনে রেখে আরেক প্লেট শ্যামলাল চৌধুরীর কাছে একটি কাগজের ওপরে রাখল। আমি কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হয়ে বলছিলাম, আপনার চা দেয় নি? আর এসব খাবারের দরকারই বা ছিল কী!

শ্যামলাল বলেছিলেন, চা আমি খাই না। বলতে বলতে খাবার প্লেটটা তুলে হাতে নিতে নিতে বলছিলেন, তবে এ জিনিসটা খুবই খাই। তেল, নুন আর আদার কুচি দিয়ে মচমচে চিড়েভাজা। কি করব, মিষ্টি তো খাওয়াতে প্যারি না। তাই এই দিয়েই আমি আতিথেয়তা সারি।

মুখে হাসি-হাসি। একমুখ চিড়েভাজা তিনি চিবুচ্ছিলেন।

আমি বলেছিলাম, তাই নাকি? কিন্তু আমি তো অতিথি হয়ে আসি নি।

অতিথি বটে। নিশ্চয় অতিথি। যাঁর তিথিজ্ঞান নেই তিনিই অতিথি, জানেন তো? আরে খান খান, আমি নিজে যে খেতে শুরু করলাম দেখছি।

চিড়েভাজা আমারও খুব প্রিয়। আমি বলছিলাম, তবে কিনা এখন এ-সবের দরকারই বা ছিল কি! আমি খেয়েদেয়েই আপনার এখানে এসেছি। ভয় ছিল দুপুরবেলা এসে আপনাকে জ্বালাতন না করি।

আপনার চিঠি পেয়ে আমি অবাক। বস্তুত এখন তো আর কেউ চিঠি লেখে না আমাকে—

কেউ লেখে না মানে? আমি চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে একটুক্ষণ থামলাম।

লেখে না মানে লেখে না। এই সোজা সরল সাদা কথাটা বুঝতে পারলেন না?

শিশুর মত শ্যামলাল চৌধুরী হাসছিলেন। স্বচ্ছন্দে তেমনি করে চিড়েভাজা চিবুতে চিবুতে বললেন, এখন আমি পরিত্যক্ত বুঝলেন? এখন মানে—ধরুন প্রায় একযুগের ওপর হয়ে গেল। আমি এইখানে আছি—

আপনার সংগঠন?

সংগঠন হয়তো ভুলেই গেছে আমি কোনদিন ছিলাম। তাঁর মুখে বেদনার ছায়া খেলা করছিল, আর এখন তো আরো একযুগে ভুলে যাবারই কথা। লোকটার মরে যাওয়াই সম্ভব। এত বছর পর্যন্ত কি কেউ বাঁচে? না, বেঁচে থাকাটা রীতি আপনিই বলুন।

চিড়েভাজাগুলি তেতো হয়ে উঠছিল আমার মুখের মধ্যে। সব আনন্দ চলে গিয়েছিল মুহূর্ত মধ্যে। বলা বাহুল্য, আমি ইতিহাস খুঁজি। ডুয়ার্সের অতীত ইতিহাসের সূত্রে এসে পড়ছে মানুষ, মানুষের ঘরকন্না সমাজ-বিন্যাস রাজনীতি ইত্যাদির কথা। বস্তুত মানুষ তো খুঁজি না। বিচ্ছিন্ন মানুষের হৃদয়লোকের লীলা আবিষ্কার করুন যাঁরা সাহিত্যিক। রক্ত-রসে তাঁদের আন্তরিক পরিচয় নিবিড় করে তুলুন লেখার মধ্যে। বলা বাহুল্য এ আমার কাছে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। মানুষের ইতিহাস-গড়ার সাধনায় ব্রতী এমনি মানুষ আসছে চিরকাল। ইংরাজী কবিতা The Patriot মনে আসছিল আমার। ছেলেবেলা ওপরের ক্লাশে সুরেন্দ্র সাহা ইংলিশের টীচার পড়াতে এসে বোঝাতেন। এখনও মনে ভাসে তাঁর কথাগুলি—"Only a year ago the patriot was acclaimed as a conquering hero. But the very same people sent him to the scaffold as a traitor."

শুনতে শুনতে ভেসে উঠত দেশপ্রেমিকের মুখখানা। বেদনায় বিহ্বল তিনি। ভেঙে পড়েছেন। তাঁর উন্নত-মস্তক নত হয়ে পড়েছে বেদনা ও অপমানে। চারদিকে দুয়ো দুয়ো রবে তিনি বিচলিত ও বিমথিত। শ্যামলাল চৌধুরীকে অবশ্য নিতে হয় নি অনুরূপ দণ্ড স্বজন-প্রিয়জনদের কাছ থেকে। একালে পার্টি মানেই দেশ। পার্টি থেকে নির্বাসিত হবার মত চরম বেদনা ও পরাজয় আর কিছু হতে পারে না। যে-মানুষ একদিন দলের হয়ে সমস্ত জীবন-যৌবন উৎসর্গ করেছিলেন, যাঁর ছিল না কোনো ব্যক্তিগত আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ, উত্তরজীবনে তিনি আজ বিশ্বাসঘাতক পদবী লাভ করেন নি—কিন্তু নিঃসংশয়ে ভগ্ন চিত্ত এবং নির্বাসিত। বার্ধক্যে আজ তিনি একক। কে জানে হয়ত বা নিঃস্বও। ঘর বাঁধেন নি শ্যামলাল চৌধুরী। সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু নিয়ে কোন কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী আসে নি তাঁর জীবনে। কল্যাণ-কঙ্কণ-করে বিনম্র সেবায়-সাহচর্যে-আনন্দে ভরিয়ে তোলে নি তাঁর জীবন। চন্দন-চর্চিত একটি নারীর মুখ শুভদৃষ্টির আলোয় দেখবার অবসর পান নি তিনি। তাঁর জীবন-পথ ছিল একক অসমান ও অস্বাচ্ছন্দ্যে ভরা। চা চিড়েভাজা খেতে খেতে সেদিন অনেক কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। আর তাইতেই একটি চরিত্র ভেসে উঠেছিল আমার সামনে। সে চরিত্র শক্তিতে অসাধারণ, আত্মত্যাগে ও বেদনারাগে অনির্বাণ। বলিষ্ঠ কর্মশক্তিতে ও উদ্দীপনায় যে-কোন মানুষেরই পক্ষে আকর্ষণীয়।

তাঁর কাছ থেকে চা-বাগান বা ডুয়ার্সের কথা যা জেনেছিলাম তা বলব পরে। প্রথমে শ্যামলাল চৌধুরীর নিজের কথাই লিখে নিতে চাই।

শৈশবেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন শ্যামলাল। না, গতানুগতিক কোন স্বপ্ন নয়। সুখ-স্বপ্ন সব ছেলেমেয়েরাই দেখে এক বয়সে। সে-কথা শেখে তারা পরিবেশ থেকে। গুরুজনদের কাছ থেকে। পড়াতে বসে গুরুমশাই বলেন, মুখস্থ শেখো।

তারপরই সুর করে দুলে দুলে পড়া আরম্ভ হয়ে যায়—

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।

পড়ার-ছলেই জীবনের মূল উদ্দেশ্য চিনতে শেখে ওরা—লেখাপড়া করে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই। যেন গাড়িঘোড়া চড়াটাই জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য। তাই সে-বয়স থেকে পরবর্তী জীবনের ভূমিকা গ্রহণ শুরু হয়ে যায়। হাতে বই নিয়ে তাই জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে ব্যক্তিজীবনের সফলতা-নিষ্ফলতাগুলি।

কিন্তু এই লক্ষ্মীপ্যাঁচা হয়ে ওঠেন নি শ্যামলাল। যদিও ছেলেবেলা থেকে তাঁকে তেমনি করে শেখাবার চেষ্টার কমতি হয় নি। বাবা ছিলেন সরকারী লোক। তাঁর জীবনের বাস্তব লক্ষ্যে ছিল না কোন ভেজাল বা ত্রুটি। জীবনকে তিনি সাদা-দৃষ্টিতে চিনতে শিখেছিলেন। তাই অর্থের অভাব ছিল না জীবনে। পাকা-বাড়ি। ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের ছড়াছড়ি চারদিকে। মক্কেলরা আসত বাড়িতে। লোকজন চাকর-বাকর আত্মীয়-স্বজন চার-দিকে। দশ-বারো বছরের ছেলে বাপকে প্রশ্ন করেছিল, তুমি চাকরি কর কেন বাবা? বাবা অবাক। ছেলের কথার উত্তরে বলেছিলেন, চাকরি না-করলে টাকা আসবে কোত্থেকে?

তা বটে। শিশু তখনকার মত চুপ করে গিয়েছিল। দিনকতক পরে আবার বললে, তুমি ওই পাকাবাড়িটাতে চাকরি করো?

হাঁ বাবা।

ওই লাল বাড়িটা?

হাঁ বাবা।

ও তো সাহেবদের কাছারী। তুমি ওখানে যাও আর তোমাকে টাকা দেয়?

শিশুর চোখে বিস্ময়।

বাবা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের দেশের রাজা ইংরাজ। তারাই আমাদের মালিক। তারাই এদেশের মালিক। তাদের শক্তি অসাধারণ। তাদের চাকরি না করলে তারা টাকা দেবে কেন? আর টাকা না পেলে আমাদেরই বা চলবে কেন

ওদের অনেক টাকা আছে?

আছে বাবা। ওদের টাঁকশাল আছে।

টাঁকশাল কি?

ওখানে টাকা বানায়।

আমরা কেন টাকা বানাতে পারি না?

ছিঃ ছিঃ ওসব বলতে নেই। পাপ হয়। রাজ্য যাদের শুধু তারাই টাকা বানাতে পারে।

শিশু ভাবে আপনমনে। তার বড় বড় চোখ দুটিতে একরাশ চিন্তা আর বিস্ময় ঝলমল করছে। বাবার কাছে শোনা সেই কথাই তার সব চাইতে বিস্ময় হয়ে বাজে। রাজ্য যাদের শুধু তারাই টাকা বানাতে পারে? শুধু তাদেরই হয় টাঁকশাল? তবে আমাদের রাজ্য নেই কেন? আমরা কেন নিজেদের টাঁকশাল বানাতে পারি না?

উত্তরজীবনে তারই প্রভাব দেখা গেল। ভালো ছাত্র ছিল শ্যামলাল। ক্লাশের সব মাস্টারমশায়দের ছিল কৌতূহল ও আকর্ষণের পাত্র। অশ্বিনী মাস্টার পড়াতে আসতেন ক্লাশ কোরে। তার বুদ্ধি দেখে সবাইকে শুনিয়েই বলতেন, এ ছেলে বড় হয়ে যদি জজ-ব্যারিস্টার না হয় তো কি বলছি। জজ-ব্যারিস্টার-ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া ছিল সেকালের মানুষের আদর্শ। বড় হওয়া মানে কে কত বড় চাকরি পাবে তাই। কে কত বেশি টাকা মাইনের চাকরি করবে। চাকর-বাকর দাস-দাসী। সেলাম-স্যালুট কুড়াবে উঠতে-বসতে। মোহিনী বাঁড়ুজ্যে কিছুদিনের জন্য এস-ডি-ও হয়ে এলেন। ছোট শহরে সাদা কেশর-ঝোলানো ঘোড়ায় সকাল-সন্ধ্যায় টগবগিয়ে বেড়ান। খট্-খটা-খট্ খটাখট্-খট্ ঘোড়ার নালের শব্দ ওঠে। রাস্তার লোকজন সভয়ে পেছিয়ে যায়। সরে দাঁড়ায় রাস্তা ছেড়ে।

সেই মোহিনী বাঁড়ুজ্যে ঢাকার না কোথাকার বাঙালী ঘরের ছেলে। বাবা ছিলেন হেডমাস্টার। ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করেছেন। অবশ্য ছেলেও ছিল অসাধারণ ভালো ছাত্র। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে নম্বর পেয়েছিল চমক-লাগানো। সেই মোহিনী বাঁড়ুজ্যে বাবা, আত্মীয়-স্বজন, মাস্টারমশাইদের চোখে আদর্শ।

মা বলতেন, তোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, বাবা। ভাল করে লেখাপড়া কর, যাতে বড় হতে পারিস।

তারপর অভাবিত ঘটনা ঘটে গেল একদিন।

তখন নাইনে কি টেনে পড়ছেন শ্যামলাল। ইস্কুলে গিয়ে আর ফিরে এলেন না শ্যামলাল।

ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করলেন মা-বাবা। বিকেল যায়-যায়।

এসে উপস্থিত পুলিশের দারোগা। জবরদস্ত এমদাদ আলী। সঙ্গে ডি-আই-বি অফিসার ঘণ্টাকর্ণবাবু। ওঁর নাম একটা কিছু ছিল বোধ হয়। কিন্তু কান দুটো স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বড় ঘণ্টার মত বড় ছিল বলে ওঁর এইরকম নাম হয়েছিল বোধ হয়। চোখ দুটি লাল-লাল।

ঘণ্টাকর্ণবাবুই এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার বাড়ি সার্চ করবো। ওয়ারেন্ট আছে। কিন্তু তার আগে ছেলেকে কোথায় লুকিয়েছেন বার করে দিন তাহলে আর সার্চ-ফার্চ করবো না।

শিরে বজ্রাঘাত। তা-ও আবার নির্মেঘ নীল আকাশ থেকে আচম্বিতে। একমাত্র পুত্রকে ঘিরে কত না স্বপ্ন। কত না স্বপ্ন-জাল। তার পরিবর্তে সহসা একদিন থানার দারোগা ও ডি-আই-বি অফিসারের সশব্দ আবির্ভাব। সইতে কে-ই বা পারে।

আমার ছেলে? যেন শিশুর মত কেঁদে ভেঙে পড়েছিলেন সঞ্জীববাবু। শ্যামলালের বাবা। আমার ছেলেকে বার করে দেব আমি? তার নামে ওয়ারেন্ট আছে? কি বলছেন আপনারা? আমি সরকার-বাহাদুরের একান্ত বশম্বদ সরকারী কর্মচারী?

সেজন্যেই তো ব্যাপারটা আরো ভয়ঙ্কর—আরো রাজদ্রোহকর হয়ে উঠছে। গোঁফ প্যাকিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন দারোগা এমদাদ আলী, It's extremely seditions. একবার ভেবে দেখুন—when you are a faithful servant to the Government—একে বেইমানী ছাড়া কি বলব?

ঘণ্টাকর্ণ বললেন, দুঃখিত, খুবই দুঃখিত মিস্টার চৌধুরী। আপনাকে বিরক্ত করবার জন্যে আমরা আন্তরিক—। কিন্তু ভেবে দেখুন ছেলে আপনার স্বদেশী কুলাঙ্গারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে—

এ আমি ভাবতেই পারি না—

পারেন না-পারেন আপনি বুঝুন সেটা। আমাদের কর্তব্য আমাদের করতেই হবে। কি বলুন মিঃ আলী?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবারে আমাদের ভিতরে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। আমাদের সার্চ করতেই হবে। সরকার-বাহাদুরের পরোয়ানা আছে—

ঘণ্টাকর্ণ লালচোখে তাকিয়ে বললেন, ছেলে আপনার লং কোম্পানীর বুড়ো সাহেবকে মারতে গিয়েছিল। অবশ্য সঙ্গে আরো ছিল। তার সঙ্গে রিভলভার ছিল। তাছাড়া তার বিরুদ্ধে আরো অনেক অভি-যোগ—রাজদ্রোহীদের সঙ্গে মিলবার—

না-না-না। আমার ছেলে.....

আপত্তি করতে চেয়েছিলেন সঞ্জীব-বাবু। আপত্তি টেকে নি। সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে ওলট-পালট করে তবে সেদিন গিয়েছিল পুলিশ। আর সেদিন থেকেই শ্যামলাল নিরুদ্দেশ। ডি-আই-বি অফিসার শাসিয়ে এসেছিল, চাকরি আপনার থাকবে না মশাই। অবশ্য আমি বিশ্বাস করি এর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

ধরুন, বাচ্চার সবে সর্দি লেগেছে;—নাকে দিয়ে জল পড়া শুরু হয়েছে—গলা খুস্ খুস্ করছে। তক্ষুণি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান্ ভোগান্তি—নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা; কাশি-কিছু আর বাকি থাকবে না-অযথা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা।

সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, কোনো কষ্ট পেতে হয় না— বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।

আর একটা কথা। ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায়-যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে.-যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।

খুবই সহজ কাজ। তেতো বড়ি না, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না।

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,— সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে—

১) 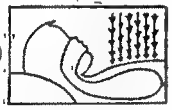

বাইরে থেকে গায়ে

২)

ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে-

২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব— নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

নেই—তবু সরকারকে তো অবস্থা বিবেচনা করতেই হবে।

সেবারে একনাগাড়ে এক মাস আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। বাংলাদেশে তখন বিষাক্ত হৃদয়-বেদনা ও তিক্ত অবিশ্বাস ঘনীভূত হচ্ছে ঘরে ঘরে। ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। অবশ্য তখনও তা পাকাপাকি রূপ পায় নি। লং সাহেবকে আক্রমণ করা হয় নি। যাওয়া হয়েছিল কিছু টাকার জন্যে। সংগঠন গড়ে তোলবার জন্যে চাই টাকা। সে তো আর কেউ এমনি দিত না।

কিন্তু লং সাহেব ইংরাজ। আর যে-কোন ইংরাজকে আক্রমণ করাই রাজদ্রোহিতার সামিল।

পড়াশুনো হয়ে গেল সেইখানে। এন্ট্রান্সটা আর পাশ দেওয়া হয় নি। তখন তিনি মনে-প্রাণে যুবক। তার আগেই স্বদেশ-কর্মে দীক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত হয়ে গেছে পুরোপুরি। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সেই উত্তাল উত্তাল দিনগুলির কথা মনে হয়। অগ্নিযুগের অগ্নিবর্ণ দিনগুলি। আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি কাড়াকাড়ি।

রাত্রির অন্ধকারে গা লুকিয়ে ফিরেছেন ছায়ার মত। অন্ধকার—ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্ধকারে তাড়া করেছে পুলিশ। গুলী-বোমা-রাইফেল সবকিছু থাকছে সঙ্গে। একনাগাড়ে মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন। আহার জোটে নি বিশ্রাম জোটে নি। অনিশ্চয়তা। সেই সময় একদিন পরিচয় নিরুপম বাগচীর সঙ্গে। নিরুপম বাগচী ছিলেন সরকারী উকিল। কিন্তু তিনিই সাহায্য করেছিলেন তাঁকে। তখন আর দাঁড়াবার উপায় নেই। ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তাড়া করে ফিরছিল রাতদিন। মুখে রক্ত উঠছে। এই সময় একদিন একটি চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তাঁকে নিরুপম। সেখানে তাঁর মামাবাবু আছেন। চা-বাগানের--- কর্মচারী। তাঁর কাছে গেলে আপাতত বিশ্রাম মিলবে কিছুদিন। তারপর যদি আবার—

কাজ তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না এখনই—নিরুপমবাবু বলেছিলেন।

প্রায় হাঁটাপথ ছাড়াছাড়াভাবে কখনও কোথাও লুকিয়ে এলেন কুচবিহার। কুচবিহার থেকে বাগানে। সে এক আলাদা পরিবেশ। কিন্তু এ-পরিবেশ ভাল লাগে না। বদল চাই। ইংরাজের হৃৎপিণ্ড-ছেঁচা রক্তে লাল করতে হবে স্বদেশের পবিত্র প্রাঙ্গণ।

ইতিমধ্যে এসে পড়েছে নতুন উপদ্রব। নিরুপমবাবুর মামার মেয়ে সীতার তাঁর প্রতি নতুন আসক্তি। সে আগ্রহে ফাঁক ছিল না। ফাঁকি ছিল না। ছিল না কোন ছলনা। মুগ্ধ হৃদয়ের আন্তরিক নিবেদনে শ্যামলালের জীবন রাঙিয়ে তোলাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। প্রেমের লীলা-কলা নাকি সাধুকেও বিচলিত করে। পাথরে ফোটায় ফুল। বাঙালী কবি কোথায় বলেছেন—

প্রেমে শিলা ভাসে জলে
মরণে প্রাণ মেলে

মৃত্যুতে প্রাণ মেলে কি না প্রেমের স্পর্শে আজও তা স্পষ্ট করে বলতে পারেন না শ্যামলাল। সীতার গভীর প্রেমকে দেখেছিলেন তিনি সন্দেহের চোখে নয়, নতুন উপদ্রবের মত তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। যথার্থ প্রেমে শিলা হয়তো ভাসে জলে—সে অসম্ভবও হয়তো সম্ভব—কিন্তু তাঁর হৃদয়শিলায় একটু দাগও লাগাতে পারে নি সীতা।

শ্যামলালের নিজের ভাষাতেই বলি, ডি, এল, রায়ের নাটক নিয়ে তখন আবার ভাঙা-উদ্যোগ জাগিয়ে তোলবার চেষ্টায় আছি বাগানে। যুবকদের নিয়ে রিহার্সেল দিই—কিন্তু গোপনে-গোপনে তাদের নিয়ে দল পাকাবার চেষ্টার ত্রুটি নেই। এমন সময় একদিন রাত্রে ঘরে ফিরে অবাক হয়ে গেছি। সীতা দাঁড়িয়ে আছে। ঘর গোছাবার গোপন প্রচেষ্টা চালাতে এসে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে আমার গোপন-সঞ্চিত পুঁজি।

সীতা, তুমি এখানে?

ঠোঁট কাঁপছিল সীতার। হাত বাড়িয়ে সে তার আঁচলের তলা থেকে বার করে দিল আমাকে ছোট পিস্তলটা। এ-জিনিস আমি সঙ্গে সঙ্গে রাখি। কখনও কাছ-ছাড়া করি না। আজই ভুল করে ফেলে গিয়েছিলাম ময়লা কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে। নিরাপত্তা আমাকে অনেকটা অসাবধানী করে তুলেছিল।

সীতা, তুমি এ কি করে পেলে? ছিঃ ছিঃ। আমি গর্জন করে উঠেছিলাম, তোমার এই কাজ?

মাথা নিচু করে সীতা কাঁদছিল। কথা বলছিল না। তার চোখের জলের ফোঁটাগুলি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল।

আমি চীৎকার করে তাকে বললাম, সীতা, তুমি জান না কি অন্যায় করেছ?

আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।

ক্ষমা? না, ক্ষমা নেই কাউকে। আমাকেও নয়। এ ঘৃণ্য কাজ।

আমি না-জেনে একাজ করেছি, সীতা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

ভালোই করেছ। কিন্তু দোহাই দয়া করে কেঁদে আর সবাইকে জানিও না।

আমি আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি। সীতা নত হয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিল।

আমি পিছিয়ে এসেছিলাম প্রণাম নিয়ে। সীতা বলছিল, আমি জানি, সব জানি। দয়া করে আপনি আমাকেও দলে নিন। তাহলে তো আর সন্দেহ থাকবে না।

না, দলে নেন নি শ্যামলাল। নারী নিজেই আগুন। একটি অস্থির বিদ্যুৎ-শিখাকে আগুন-বোমার সঙ্গে জড়াতে চান নি তিনি। সাহস হয় নি। সেই রাতেই তিনি পালিয়েছিলেন। এখানে-ওখানে। তারপর ধরা পড়লেন একদিন। অবশ্য হাতে-নাতে কিছু পায় নি ইংরাজ। রাজশাহী হয়ে বিচারের রায় বেরুতে সাত বছরের শ্রী-ঘর।

তারপর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব। জেল থেকে বেরিয়ে। এমনি করে চলে গেল দিন। এল একদিন বাঞ্ছিত স্বাধীনতা। ইংরাজ নিল বিদায়। সেই থেকে তিনি ডুয়ার্সেই আছেন।

সীতা এখন কোথায়? তার জবাব দিতে পারেন নি শ্যামলাল। খোঁজও করেন নি। জীবনটা কেটে গেল এমনি করে।

ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক।
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।

আজ বাইশ বছর স্বাধীনতা এসেছে দেশে। পনেরোই আগস্টের সভায় ছিলেন সকলের সঙ্গে। নিশান ওড়ালেন। বন্দে-মাতরম গাইলেন। আজ আর বন্দেমাতরম গাইতে শুনি না আগেকার মত, বললেন শ্যামলাল, অবশ্য তার দরকারই বা কী। আমাকেও ভুলে গেছেন সহকর্মীরা। আমরা যে ভাঙনের দিনে দুর্যোগের মধ্যে কর্মী ছিলাম। গঠনের কাজে তাই হয়তো নেন নি আমাদের। উপযুক্ত মনে করেন নি হয়তো। জলপাইগুড়ির ডি-সি'র সঙ্গে দেখা একদিন। চিনলেন তিনি আমাকে। বললেন, কি করে চলে আপনার? বললাম, চলে যাচ্ছে, এখানকার লোকদের দয়ার অভাব নেই। তিনি বললেন, অমুকের তো খুব নাম শুনি আজকাল। তিনিই তো হোমরা-চোমরা মাতব্বর। চান তো বলি ওঁকে—। হাতজোড় করে বলি, না ভাই, আমি সাধারণের মধ্যে অচেনা হয়ে থেকেই স্বাধীনতার আস্বাদ পেতে চাই। দয়া করে বাকি দিনগুলির জন্যে এইটুকু সুখ আমাকে দিন।

শ্যামলাল চৌধুরীর কাহিনী শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। বাইরে ডুয়ার্সের রৌদ্রদগ্ধ একটি দিন। দুপুর-বেলা। হাতঘড়িতে বেলা আড়াইটা। সময় বসন্তকাল। কিন্তু বসন্তেই বেশ গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ হাওয়া দিয়েছে। হাওয়ার সঙ্গে বৃন্তচ্যুত একটা শুকনো পাতা উড়ে চলে এল ঘরের মধ্যে।

বিছানার একপাশে রাখা হাত-পাখাটা খুঁজছিলেন শ্যামলাল। আমি নিজেই এগিয়ে দিলাম। [ক্রমশ]

সুন্দরবনের কথা

অসীম মুখোপাধ্যায়

লুকানো কুঁড়ি

[illegible] হ্যামিলটন,

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্
শস্য শ্যামলাং মাতরম্
বন্দেমাতরম্।"

একটু থামলেন যেন, তারপর আবার [illegible]—

"শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীম্ সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্"

দূরে বনভূমির শিয়রে হেমন্তের চাঁদ, ধূসর, রহস্যময়,—নির্বাক। হ্যামিলটন উঠে দাঁড়ালেন। আপনমনে বললেন, "পারব, পারতেই হবে।" দুর্গাদয়ানীর হীরেকুচি জল ঘুরে ঘুরে সে কথা বললো —"পারব, পারতেই হবে"।

এমন বিনিদ্র রাত আরও কেটেছে। হয়ত আরও কাটবে। তবুও হ্যামিলটন প্রত্যয়ের ভূমিতে অটল। [illegible] শেষ নিশ্চয় দেখবেন। তাঁর চোখের পাতায় লেগে আছে এক বিচিত্র স্বপ্ন—আদিগন্ত সোনালী ফসলের ক্ষেত, সবুজের ঘেরা টোপে ছায়ামাখা শান্তির নীড়, চাষী, নারী, কলকণ্ঠ শিশু, নবান্নের ঘ্রাণ! এ স্বপ্ন রূপ নেবে কবে?

কলকাতার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে বন্ধুদের কথা, পাথুরেঘাটার শ্রীকণ্ঠ রায়ের সাবধানবাণী—আপনার এমন উদ্ভট শখ কেন হোল বলুন তো? কেউ মরতে সুন্দরবনে যায়।

হ্যামিলটন হেসেছিলেন—কেন?

—আরে জমিদার তো আমিও! সেখানে আমারও জমি আছে। কিন্তু নায়েব, গোমস্তা থাকতে আমি নিজে যাব কেন? ওরা দেখবে!

হ্যামিলটন বিস্মিত—সে কি! জমিদার হিসেবে প্রজার প্রতি দায়িত্ব পালন করবেন [illegible]

উত্তরে শ্রীকণ্ঠ রায় বলেছিলেন— আপনি [illegible] যান, [illegible] থাকবেন।

শ্রীকণ্ঠ রায়ের [illegible] সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। [illegible], হুগলী, [illegible], রাজশাহী, সব জায়গায় [illegible] জাল [illegible]। [illegible] ঘরে [illegible]। হ্যামিলটনের [illegible] পথ [illegible]।

মনে পড়ে আর এক জমিদারের কথা।

—আপনি [illegible] থাকবেন?

—নিশ্চয়ই এবং [illegible] কাছি।

[illegible] জমিদার [illegible] এদেশে একটা প্রবাদ আছে, [illegible] জমিদার [illegible] জমাদার হয়। [illegible]

হ্যামিলটন [illegible] মনে [illegible] বিদ্রূপ তাঁর বাধা হয় নি। তাঁকে টলায় নি এতটুকু। বাধা এসেছে প্রকৃতির [illegible]। নোনা জল, রাক্ষুসে নদী, মহামারী, জোঁক, [illegible], সাপ আর বাঘ, তার [illegible] সব [illegible] তীর [illegible] প্রকৃতি লড়ছে মানুষের সাথে। কয়েকটি [illegible] প্রাণ বিকিয়ে গেছে। বাকীরা সন্ত্রস্ত। এবার কার পালা? কে যাবে এবার?

হ্যামিলটন এখানেই অসহায়।

রাতের শেষে আকাশের শান্ত, সাদা পথ ধরে দিন এলো। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হোল সবুজ বনানী। জোয়ারের ঘা লেগে বিশাল নৌকোগুলো দুলছে। শ্রমিকদের ঘুম ভাঙল। কাজ শুরু হবে এবার।

দূরবীণ, মানচিত্র, কম্পাস আর কিছু আহার্য নিয়ে হ্যামিলটন তাঁর ছোট পানসীতে উঠলেন। মাঝিকে বললেন— [illegible] চল।

আরও [illegible], সাউথীর [illegible], ক্রুটাকের [illegible] সুন্দরবনের [illegible] জানা, [illegible] ভৌগোলিক [illegible] তাঁর, [illegible] পা [illegible]।

[illegible] কাজ [illegible]। প্রতি [illegible] শিকারী [illegible] পাহারা দিচ্ছে। [illegible] বিচিত্র [illegible] আর এক বিচিত্র [illegible] শিকারী তাই [illegible]। কিন্তু তার [illegible] আরও [illegible] আকাশের [illegible] একটি [illegible] প্রাণী [illegible]। কুলীরা [illegible], শিকারীও। [illegible] প্রাণীটা [illegible]। [illegible] আরও আকস্মিক, আরও ভীতিকর। এক মাঝি নদীর তীরে একটা কাদামাখা কাঠের গুঁড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সেই কাঠ সজীব হয়ে তাকে নিয়ে জলে [illegible] গেল।—কুমীর, কুমীর। চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

সর্দার কুলী তার খাতায় [illegible] —রাহাত্তর।

পানসীতে হ্যামিলটন চিন্তায় [illegible] পরিবর্তন হয় নি কোনও। সুন্দরবন ঠিক তেমনি আছে। তেমনি [illegible], তেমনি বিপদসঙ্কুল, যেমন দেখেছিলেন তাঁর পূর্বসূরীরা। জরিপ-বিভাগের কর্মচারী হিউ মরিশনকে মনে পড়ে। দুঃসাহসী মরিশন আর তাঁর [illegible] দিনপঞ্জী পড়েছেন তিনি। অনেক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁরা।

"নদীর তীরে এত বেশি কাদা [illegible] আমরা নামতে পারলাম না। [illegible]

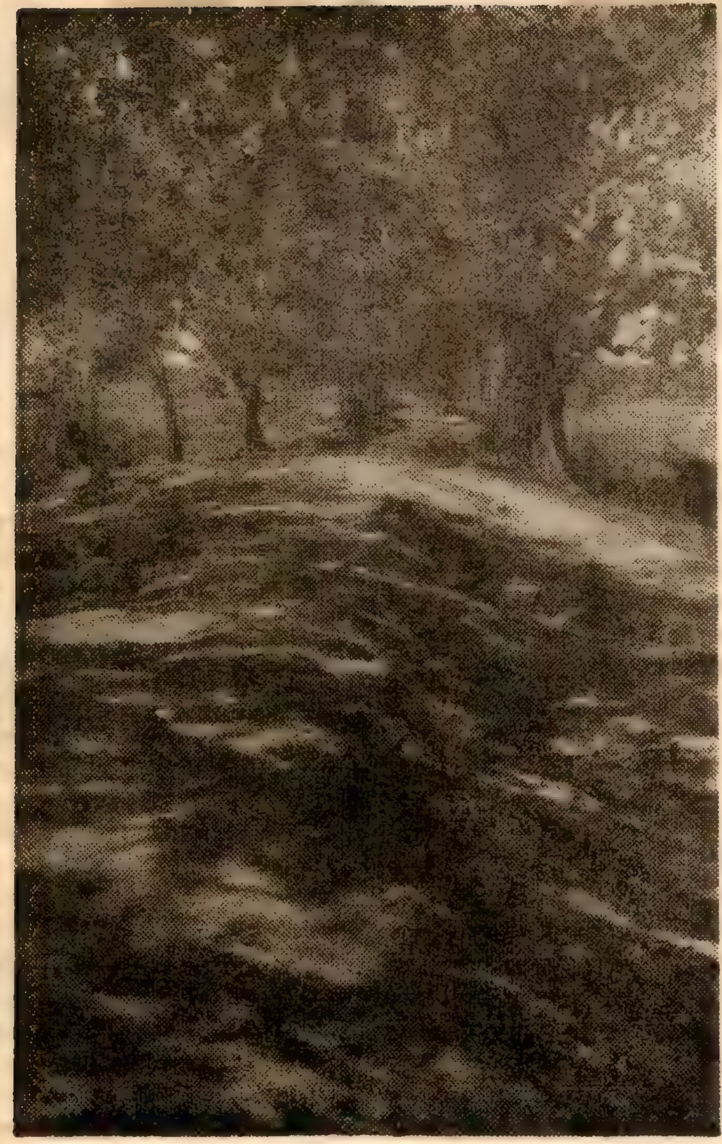

গোসাবার ছায়া-পথ

টেনে পানসীটা উঁচু ডাঙায় তুললে পর আমরা নামলুম। কিন্তু থিয়োডোলাইটটি মাটিতে স্থির হয়ে বসছে না। তার পারদ কেবলই ওঠানামা করছে। মাঝিদের ধমক দিলুম—তোমরা মাটি কাঁপাচ্ছ কেন? তারা বলল— আমরা তো হুজুর দাঁড়িয়েই আছি।—তবে মাটি কাঁপাচ্ছে কে? এমন সময় একজন সিপাই জানাল একটা বাঘ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। ব্যাপারটা এবার বোঝা গেল। মাত্র চার গজ দূরে দাঁড়িয়ে বাঘটা গর্জে উঠল। সিপাইটির বন্দুক সময় মত কাজ করেছিল, নইলে আমরা কেউ নৌকোয় ফিরতুম না।"

"সাগরদ্বীপের এক জায়গায় আমরা খানার আয়োজন করছিলুম। হঠাৎ একটা বাঘ এসে বুড়ো মাঝিটিকে আক্রমণ করল। একটি জোয়ান সিপাই কুঠার নিয়ে তেড়ে আসতে বাঘ বুড়োকে ছেড়ে তাকেই নিয়ে উধাও হোল।

"মানুষও পশুর চেয়ে কম হিংস্র নয় এই সুন্দরবনে। কুমীরমারির কাছে এক-দিন নোঙর করে আছি। বিকেলের দিকে দেখলুম চারটি ছিপ নৌকা প্রায় পঞ্চাশজন দেশীয়কে নিয়ে তীরের মত জল কেটে যাচ্ছে। আমরা ডাকলুম, ওরা থামল না, সাড়াও দিল না। মাঝিরা বলল ওরা জলদস্যু, ডাকাতি করতে যাচ্ছে। জল-ডাকাত, এদিকে এই প্রথম দেখলুম।"

মরিশন আর তাঁর ভাই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। দুঃসাহসিকতার পুরস্কার!

কুলীদের ডাকে চমক্ ভাঙে হ্যামিল-টনের। অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে আসেন তিনি। তবুও মনের মধ্যে একটা ভয় চলাফেরা করে। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর পরিকল্পনা বুঝি মিথ্যে হয়ে যাবে।

ঊনিশ'শ তিন থেকে দশ সাল, নিরলস্ শ্রম আর ধৈর্যের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে একটি ছোট্ট জনপদ। হ্যামিলটনের আশা আরও বেড়েছে, বেড়েছে তাঁর পরিকল্পনার পরিধি। এক আদর্শ গ্রাম গড়ার সাধনায় তিনি মগ্ন হয়েছেন। গোসাবা দ্বীপ, একশ তেতাল্লিশ, একশ আটচল্লিশ আর একশ ঊনপঞ্চাশ নম্বর লাটের ইজারা নিয়ে শুরু হয়েছে সেই সাধনা। শুধুই কি সাধনা? না, মৃত্যুর রাজ্যে জীবনকে বাজী রেখে হারজিতের লড়াই? দিনে বন হাসিল করার খাটুনি, রাতে গাছের ওপর মাচা বেঁধে, মশাল জ্বালিয়ে রাত্রি-বাস। টুপটুপ করে জোঁক খসে পড়ছে গায়ে, ডাল বেয়ে উঠে আসছে বিষধর সাপ আর আনাচেকানাচে জেগে আছে নরখাদক, অতন্দ্র প্রহরীর মত। জল নেই, খাবার নেই, ঘুম নেই, শান্তি নেই। আছে শুধু কাজ আর ভয়। তবুও মানুষের গভীর নিষ্ঠায় বুনো মাটি প্রসব করেছে, জন্ম দিয়েছে এক ক্ষুদ্র জনপদের। নদীর ধারে বাঁধ উঠেছে। বানানো হয়েছে দুটি-একটি কুটির, বনের বুকে স্বাভাবিকভাবে দিন কাটানোর প্রথম পদক্ষেপ। হ্যামিলটন তাঁর সহচরদের নিয়ে গভীর উৎসাহে কাজ করছেন। যদিও আট বছরের চেষ্টায় মাত্র নয়শ' কুলী বসতি নিয়েছে, আরও অনেকে মারা গেছে জঙ্গলের জ্বরে, সাপের কামড়ে, বাঘের থাবার ঘায়ে। যদিও জলের কষ্টে, খাবারের কষ্টে কেউ কেউ ফিরে গেছে। তবুও হ্যামিলটন দমে যান নি। এ জঙ্গলের কড়ো বাতাসে তিনি যে লক্ষ্মীর শরীরের ঘ্রাণ পেয়েছেন, ভিজে মাটিতে দেখেছেন তাঁর পদচিহ্ন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুনগুন করে ওঠেন তিনি—সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্। দূরে কুলীকামিনরা পানীয় জলের পুকুর কাটে। বাতাসে ভেসে আসে ওদের সমবেত কণ্ঠের গান। নীল নক্সাটা গুটিয়ে রেখে হ্যামিলটন তা' শোনার চেষ্টা করেন।

এরই মধ্যে একদিন দু'টি চিঠি এল। একটি স্ত্রীর। লিখেছেন—আমি আসছি, তোমার কাজের কিছুটা আমার জন্যে রেখো, একা শেষ করো না যেন। হ্যামিলটন হাসলেন।

দ্বিতীয়টি এক বন্ধুর। তিনি লিখে-ছেন, সবাই তোমার কাজের কথা বলছে। আমারও মনে হচ্ছে গোসাবা যেন তোমার জমিদারী নয়, সেবাগ্রাম। হ্যামিলটন আকাশের দিকে মুখ তুললেন, অস্ফুট

আজকের গোসাবার একটি চিত্র

স্বরে কাকে যেন বললেন,—যেন তাই হয়, তাই হয়।

ইদানীং গোসাবায় একটি ডাকঘর হয়েছে, আর হয়েছে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। হাটও বসেছে একটা, পানীয় জলের অভাবও কিছুটা ঘুচেছে। প্রজাদের জন্য ইস্কুল খোলার কথাও ভাবছেন হ্যামিলটন। কিন্তু মহাজনদের উৎপাতে কিছু করার উপায় নেই! নিরীহ, সরল চাষীদের জীবনে ওরা দুষ্টগ্রহের মত হানা দিচ্ছে!

এক সন্ধ্যায় হ্যামিলটন তাঁর বাংলোর বারান্দায় বসে আছেন। কোলের ওপর বেহালাটা, তাঁর অবসরের সঙ্গী, অবসাদের সান্ত্বনা। এমন সময় কে যেন ডাকল, কথায় এদেশী টান—সাহেব আছ?

—কে? উঠে এস।

ছোটখাটো রোগাটে চেহারার এক চাষী কাছে এসে দাঁড়াল।

পরিষ্কার বাংলায় হ্যামিলটন কথা বললেন,—তুমি কাঁদছ? কি হয়েছে?

—সাহেব, মোহাজনে মোর ভিটে ধইরে টান মাত্তিচ্ছে। আমি আর পারিনে, আমারে তুমি বাঁচাও।

অর্জুন মণ্ডলের চোখের জলে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল সেই সন্ধ্যায়। হ্যামিলটনের চোখও শুকনো ছিল কি?

বছর দশেক আগে অর্জুন এক মহাজনের কাছ থেকে একশটি টাকা ধার নিয়েছিল। তারপর থেকে, ফি বছর সে সুদের টাকা দিয়ে এসেছে। তবু, আসল তো দূরের কথা সুদও নাকি শোধ হয় নি!

রামচন্দ্র মহাজন হিসেব দেখিয়েছে, সুদে আসলে সে অর্জুনের কাছে আড়াইশ টাকা পাবে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়! বছর কয়েক আগে বিশেষ প্রয়োজনে অর্জুন এই রামচন্দ্রের কাছেই পাঁচশ টাকার জন্য তাঁর ভিটে বন্ধক রেখেছিল। ফি বছর চারশ টাকার ধান দিয়েছে, তবুও নাকি সুদই শোধ হয় নি। সম্প্রতি রামচন্দ্র বলেছে নতুন আর পুরনো দুটো ধার শুধে না দিলে জমি বিক্রি করে দেবে।

পরদিন হ্যামিলটন রামচন্দ্র মাইতিকে ডেকে পাঠালেন। অর্জুনের সামনে তাকে তার পাওনা মিটিয়ে দিলেন আর বললেন —মনে রেখ জমিটা আমার, এ জমিতে বসে আমার প্রজার ওপর অত্যাচার করা চলবে না। সেই শুরু হোল, গোসাবায় সমবায় আন্দোলন। শুধু গোসাবায় কেন, সারা ভারতেই তখন সমবায়ের শৈশব। অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজ শুরু করলেন হ্যামিলটন। উনিশশ পনের সালে গোসাবা; আরামপুরের প্রজাদের নিয়ে গড়লেন "গোসাবা সমবায় ব্যাঙ্ক"। চার বছরের মধ্যে আর ন'টি ব্যাঙ্ক বসল। খোলা হোল একটি সমবায় ভাণ্ডার, সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসের জোগান দেবার জন্যে। গাঁয়ে গাঁয়ে "সমবায় ব্যাঙ্ক পঞ্চায়েত" হোল সবাইকে সমবায়ের আদর্শে দীক্ষা দিতে। খোলা হোল একটি কৃষি ফার্ম। চাষের উন্নতির জন্য শুরু হোল গবেষণা। হ্যামিলটনের আমন্ত্রণে সরকার কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা চাষীদের অধিক ফলনের কৌশল শেখাবেন।

উনিশশ একুশ থেকে আঠাশ, মাত্র ৭ বছরে গোসাবার আরও পরিবর্তন হোল। গাঁয়ের সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল আঠারো। তাছাড়া একটি সমবায় ধান-বিক্রি সমিতিও হোল। উনিশশ বাইশ সালে জন্ম নিল গোসাবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। কয়েক বছর বাদে সমবেত চেষ্টায় গড়ে উঠল গোসাবার সমবায় ধানকল। আরও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ এ সময়ে হোল। হ্যামিলটন প্রতি গাঁয়ে প্রজাদের নিয়ে একটি করে সমবায় ধর্মগোলা বসালেন। ঠিক হোল প্রজারা সমবেতভাবে যে পরিমাণ ধান গোলায় দেবে, তিনি জমিদারী থেকে ঠিক ততটা ধান দিয়ে যাবেন। পরে এই ধর্মগোলা খুব কাজে লেগেছিল।

কিন্তু যে কাজে হ্যামিলটনের মৌলিকত্ব, দূরদৃষ্টি আর দরদ সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠল তা' তাঁর পল্লী সংগঠনের চেষ্টা। উনিশশ বত্রিশ সাল থেকে হ্যামিলটন তাঁর যাবতীয় সামর্থ্য নিয়ে নামলেন এ কাজে। যে স্বপ্ন একদিন কলকাতা ছেড়ে আসার সময় দেখেছিলেন, তা' আজও অম্লান, বরং আরও উজ্জ্বল। গোসাবার গাঁ হবে স্বাবলম্বী! চাষী তার ভাত, কাপড়ের সংস্থান নিজেই করে নেবে এখানে! কারো মুখের দিকে চেয়ে ভিক্ষা মাগবে না, বলবে না—আমাকে দাও আমার কিছু নেই!

উনিশশ চৌত্রিশ সালে গোসাবায় পল্লী সংগঠন মহাবিদ্যালয় গড়লেন হ্যামিলটন। তাঁর সংকল্প—একদল আদর্শ কর্মীকে গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে দেওয়া, যারা পল্লী সংগঠনের কাজে সবাইকে উৎসাহিত করবে। কিছুদিন বাদে একই উদ্দেশ্য নিয়ে খোলা হল একটি ইস্কুল। বিনে খরচায় চাষীর ছেলেমেয়েরা এখানে পড়াশুনা ছাড়া চাষ, তাঁতের কাজ এবং প্রয়োজনীয় কুটির শিল্পের শিক্ষা নেবে।

শুধু সমবায় আন্দোলন বা কৃষি-মহাবিদ্যালয়ই নয়, যে কোনও কাজে, যে কোনও বিষয়ে সমান উৎসাহে এগিয়ে আসতেন হ্যামিলটন। পাশে থাকতেন তাঁর স্ত্রী, বিশ্বস্ত, অনুরাগী সহকর্মীর মত। মাঝে মাঝে কলেরা আর ম্যালেরিয়ার প্রকোপে গাঁয়ে গাঁয়ে মানুষ মরত। ডাক্তারের

উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদীয় দাঁতের মাজন
দেব দশন
হাসিতে মুক্তো ঝরাবে
দেব কেমিক্যাল কোং কলি-৩২

ভয়ে গা ঢাকা দিত। কিন্তু এই মানুষ দুটি তাঁদের কাজ করে যেতেন। দমতেন না, ফিরতেন না, ঘৃণায় মুখ ফেরাতেন না কখনো। কেউ বলত না ওরা জমিদার, বলত—বাপ আর মা। একবার এক চাষী বলেছিল—সাহেব গায়ের সাদা চামড়া আর বেশ বাদ দিলে পর তুমিও বাঙালী। আমাদের ঘরের লোক। সেখানে যারা ছিল সবাই তার কথায় সায় দিয়েছিল; হ্যামিলটন হাসছিলেন। গোসাবার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে। তাই কেবল সদস্থ রাজপুরুষরাই নন, কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেও এসেছিলেন এখানে। বলেছিলেন—"স্বদেশী সমাজের যে স্বপ্ন আমি দেখেছিলেম, এখানে তার পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছে। গোসাবা সারা ভারতের আদর্শ হোক।" উনিশশ তিন থেকে আটত্রিশ—এই সুদীর্ঘ সময় ধরে হ্যামিলটন নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করে গেছেন। এ সাধনা অমূল্য, অতুলনীয়! গোসাবার আকাশে, বাতাসে, নদীর বুকে, গাছের ছায়ায় একটি ছবি আজও আঁকা আছে—শীতের সকালে দুর্গাদুয়ানীর বুকে একটি লঞ্চ যাত্রার জন্য প্রস্তুত। হাজার হাজার মানুষ তীরে দাঁড়িয়ে ভিজে চোখ মুছছে। অদূরে এক বৃদ্ধ নত হয়ে খানিকটা মাটি তুলে জামার পকেটে রাখলেন। তারপর অপেক্ষমাণ জনতার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নিচে নেমে গেলেন। সবাই দেখল তিনি শিশুর মত অঝোরে কাঁদছেন।

স্কটল্যাণ্ডের আরান দ্বীপে, অতলান্তিক মহাসাগরের কূল ঘেঁষে এক ডেফোডিলের হলুদ শয্যায় ডেনিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন চিরদিনের মত ঘুমিয়ে আছেন। বুকের ওপর গোসাবার সেই নরম মাটি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই হয়ত হ্যামিলটন দেখছেন সেই স্বপ্ন—আদিগন্ত সোনালী ফসলের ক্ষেত, গাছপালার ঘেরাটোপে ছায়া মাখা শান্তির নীড়, চাষী, নারী, কলকণ্ঠ শিশু, নবান্নের ঘ্রাণ, হেমন্তের গীত!

কিন্তু সত্য অপ্রিয় হলেও তাকে তুলে ধরতেই হবে। হ্যামিলটন যে স্বপ্ন নিয়ে, যে বিশ্বাস নিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন, তার মর্যাদা রাখে নি কেউ, রাখতে পারে নি। তা' না হলে গোসাবা আজ এত হতশ্রী কেন? হ্যামিলটনের মানস-কন্যা গোসাবা আজ লক্ষ্মীছাড়া, ভিখারিণী! সাম্প্রতিক সফরে গোসাবার কৃষি-সম্প্রসারণ বিভাগের এক কর্মচারীর সাথে দেখা হয়। তিনি যে বিবৃতি দিলেন তা' এই—আমাদের এই ব্লকে প্রায় এক লক্ষ পাঁচ হাজার মানুষ বাস করে। অধিকাংশই চাষী এবং তাদের বেশির ভাগই ভূমিহীন। যদি সত্যকে তুলে ধরতে হয়, তা' হলে বলতে হবে যে, এই ভূমিহীন চাষীরা একরকম ভিক্ষুক। তারা বছরে সাত মাসেরও বেশি আধপেটা থাকে। জমির মালিকদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাইরের লোক। এরা কেবল চাষের সময় আসে। জমি বা চাষীর সাথে এদের আর কোনও যোগাযোগ নেই। ফলে ফসলের পরিমাণ বাড়ে না, জমির ক্ষমতাও কমে। কৃষি ঋণদান সমিতি আছে তিরিশটি, কিন্তু এদের আর্থিক অবস্থা ভাল চলে না। প্রাইমারী ইস্কুলগুলিরও এক অবস্থা। জল নেই, পথ নেই, ওষুধ নেই, খাদ্য নেই। মানুষগুলো কোনও মতে বেঁচে আছে এখানে।

মাত্র কদিন আগে গোসাবার এক শিক্ষকবন্ধু চিঠি লিখেছেন। তাঁর চিঠির প্রতিটি অক্ষর বেদনাবহ।

—"গোসাবা, বাসন্তী, মোল্লাখালি ইত্যাদি জায়গায় ভূমিহীন চাষীদের অবস্থা বর্ণনাতীত। বছরে তারা তিন মাস খায়, চার মাস অর্ধাহারে থাকে আর পাঁচ মাস হয় উপোস করে নয় ত' অখাদ্য খেয়ে। মহাজনরা ওদের নিয়ে জাঁকিয়ে ব্যবসা করে। টাকা প্রতি ছ' আনা থেকে বার আনা সুদ নেয়, ভাবতে পারেন? অনুপস্থিত জমির মালিকদের সংখ্যা যথেষ্ট। চাষীরা এদের দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত নয়। এরা ফসল তোলার সময় বন্দুক আর লাঠির জোরে ধান ছিনিয়ে নিয়ে যায়। চাষীরা কাঁদে, গাল পাড়ে ভয় দেখায়, কিন্তু এর বেশি ওরা আর কি করতে পারে!

বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ওদের সামনে নানা লোভনীয় টোপ ফেলেছে। ওরা আজ একদল নতুন ফাটকাবাজের শিকারে পরিণত, ওদের মুক্তি নেই! কোনও রাজনৈতিক দল বলে না আমরা যে কোনও গাঁয়ের যে কোনও চাষীকে ভালবাসি, আমরা তার হয়ে লড়ব, কেন না তারা যার ভোট পেতে পারে তাকেই মদত্ দেয়। চাষীরা আজ যথার্থই "ভাগের মা"। ওদের কেউ দেখে না।

হ্যামিলটনের মানস-উদ্যানের সেই বর্ণোজ্জ্বল কুঁড়িটি প্রাণের বৃন্ত থেকে ঝরে গেছে, শুকিয়ে গেছে। ফোটার সময় তার আর হয় নি।*

হ্যামিলটনের বাংলো

আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

* বর্তমান রচনাটির জন্য নিম্নলিখিত তথ্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে:

১। W. W. Hunter: Statistical Account of Bengal, VOL—2, 3, 5, 6, 8 etc.

২। L. S. S. O'Malley: Bengal District Gazetteers (24 Parganas, Khulna, Jesore)

৩। A Mitra: Census Handbook: 24 ps. (1951)

৪। Gosaba Co-operative Commonwealth (Pamphlet)

৫। "মহাপ্রাণ হ্যামিলটন" (জীবনী)

৬। সাক্ষাৎকার এবং চিঠি

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

স্যামুয়েল বেকেট :

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

'ওয়েটিং ফর্ গোডো' প্রকাশিত হবার সংগে সংগে বেকেটের নাম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫৩ সালের ৫ই জানুয়ারী নাটকটি থিয়েটর দ্য ব্যাবিলোন-এ মঞ্চস্থ হয়—জ্যাঁ আনুইল, থর্নটন্ ওয়াইল্ডার, টেনেসি উইলিয়ামস, উইলিয়াম সারোয়ান প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিক এ-নাটকটির অভিনয় দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। আজ পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় এ নাটকটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়েছে।

নাটকটি প্রথম পড়বার পর লণ্ডনে বৃটিশ ড্রামা লীগের অফিসে (ফিটজরয় স্কোয়ারে) ও'দের প্রিন্সিপ্যাল (১৯৫৬ সালে) মিস ম্যাকেঞ্জির সংগে "গোডো" সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়। তিনি কথাপ্রসংগে আমাকে বলেছিলেন—"বেশ কয়েক বছরের ভেতর লণ্ডনে এ ধরণের অদ্ভুত এবং উত্তেজনাপূর্ণ নাটক আর দেখা যায় নি। ১৯৫২ সালের এক সন্ধ্যায় এর প্রথম প্রদর্শনী হয় প্যারিসে। নাটকটি ছিল ফরাসী ভাষায় এবং ওখানে বিরাট এবং অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এর বেকেটকৃত ইংরাজী অনুবাদ ইংলণ্ডে প্রথম মঞ্চস্থ হয় লণ্ডনের আর্টস থিয়েটারে। পরে ক্রাইটেরিয়ানেও বেশ কিছুকাল নাটকটি প্রদর্শিত হতে থাকে।

ওয়েস্ট এণ্ডে দর্শক, সমালোচক এবং শিল্পিগোষ্ঠী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, বহুদিন বাদে আবার একটি প্রথম শ্রেণীর নাটকের সংগে পরিচয় হল 'ওয়েটিং ফর গোডো' দেখতে গিয়ে।

It's form is unnsnal : its contents weird; its chief themes are madness, boredom, suffering, cruelty ! Yet the effect of its inspired cross-talk is hilarious.'

অন্য একদল সমালোচকের মতে পিরানদেল্লোর 'সিক্স ক্যারেকটার্সে'র পর এত মৌলিক রচনা তাঁদের চোখে পড়ে নি। আবার অনেকে ভালভাবে না বুঝলেও নাটকটির মূল বক্তব্য সম্বন্ধে খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন এবং একথা স্বীকার করেছেন যে, নাটকটির ভেতর যথেষ্ট চিন্তার খোরাক আছে।

নাটকটির বিষয়বস্তু নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক চলা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত সমালোচকেরা কোনো একটি বিশেষ মীমাংসায় পৌঁছতে পারেন নি।

মিঃ বেকেটের নভেলগুলো যেমন 'মলি' বা 'ওয়াট' থেকেও এ নাটকটির ওপর কোনো আলোকসম্পাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বেকেটের নভেলগুলো পড়তে পড়তে অনেক সময়েই ক্লান্তি এবং একঘেয়েমির ভাব আসে। কিন্তু অত্যন্ত অসুস্থ মনোভাবসম্পন্ন এবং খুঁৎখুঁতে দর্শক ছাড়া সবাই স্বীকার করেছেন যে, এ নাটকটির মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকত্ব এবং চিন্তা করে দেখবার বিষয়বস্তু পাওয়া যায়।

আর যাই হোক এ নাটকটির মধ্যে একঘেয়েমির নামগন্ধও নেই। বরং বলা যেতে পারে 'একঘেয়েমিকে' বিষয়বস্তু করে তার ভেতরকার করুণ আবেদন এবং হাস্যকর পরিস্থিতিটাই নাট্যকার সবার কাছে তুলে ধরেছেন।

টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেন্টের নাট্য-সমালোচক 'গোডো' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে এক জায়গায় লিখেছিলেন—

Audiences do not leave the Theatre, after seeing his play, feeling that life has been deprived of meaning. They feel rather that a new light has been cast on life's meanings, at several deep levels.

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—জীবনের ওপর এই যে আলোকসম্পাত—সেটা কি ধরণের? নাট্য-সমালোচকদের মধ্যেও এ নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। এমন কথাও রটেছে যে, মিঃ বেকেট তাঁর নাটকের ইংরাজ প্রযোজককে জানিয়েছিলেন যে, অভিনেতাদের যেন এ নাটকের কাহিনীটি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা না করা হয়।

প্লটের জটিলতার জন্য অনেকে মনে করেছেন আসলে এ নাটকের ভেতর কোন কাহিনীই নেই। অর্থাৎ 'ওয়েটিং ফর গোডোতে' মিস্টার বেকেট যেন শূন্য-গর্ভতার ওপর ভিত্তি করেই নাট্য রচনা করেছেন। এঁদের মতে—এ নাটকটির অভূতপূর্ব মঞ্চ-সাফল্যের কারণ হচ্ছে—অদ্ভুত প্রয়োজন কৌশল, অভিনয় কৃতিত্ব এবং মিস্টার বেকেটের মঞ্চশিল্পের মেকানিক্স সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান।

প্যারিসে গোডোর প্রথম অভিনয় দেখে (ফরাসী ভার্সন) বিখ্যাত নাট্যকার জ্যাঁ আনুইল বলেছিলেন :

"Nothing happens, Nobody comes, Nobodv goes, It's awful!" But M. Anovilh added, "I think the evening at the Babylone is as important as the premicre of Pirandello, put on in Paris by Pitoeff in 1923."

বর্তমান পশ্চিম ইউরোপের একটা চমৎকার আলেখ্য পাওয়া যায় 'ওয়েটিং ফর গোডোতে'। শুধু ইউরোপ কেন, প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর থেকেই সারা পৃথিবীতে মানুষের মনে যে অনিশ্চয়তা, যে উদ্দেশ্যহীনতা, যে কলের পুতুলের মত জীবনযাত্রার ভাব এসেছে তারই একটি করুণ এবং নৈরাশ্যপূর্ণ ছবি দেখানো হয়েছে এ নাটকে। সেদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে "গোডোর" সংগে চাপেকের "আর ইউ আর", জর্জ কাইজারের "গ্যাস", রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" এবং এলিয়টের "ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের" যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

"ওয়েটিং ফর গোডোর" নায়ক হচ্ছে দুজন ট্র্যাম্পস্। কোথা থেকে যে তারা এসেছে বা কোথায় যাবে তার কোন নির্দেশ নেই নাটকে। জীবনের এমন একটা অবস্থায় তারা এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে সামনের দিকে তাদের তাকাবার কিছু আর নেই। মরুভূমিতে মরীচিকা যেমন পথিককে প্রতারিত করে, তেমনি এক মিথ্যা আশা নিয়ে তারা আত্মপ্রতারণা করে চলেছে যে গোডো আসবে। প্রতিদিনই এইভাবে গোডোর প্রতীক্ষায় কাটছে এবং একদিনও সে আসছে না। গোডো সম্বন্ধে তাদের এই যে মনোভাব সেটা হচ্ছে আশা এবং ভয়ের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

কোনো কোনো সমালোচক এ নাটকটির সাংকেতিকতার এইভাবে অর্থ করেছেন—দুর্দশাগ্রস্ত ট্র্যাম্প দুটি হচ্ছে বর্তমান যুগের পথভ্রান্ত মানুষ। তাদের মনের অনিশ্চয়তা, আশা, ভীতি, নৈরাশ্য সব কিছুই আজকের দিনের মানুষের দ্বিধা-সংশয়পূর্ণ অস্তিত্বের একটা সুন্দর ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে। তবুও ডিডি এবং গোগো অন্য দুটি চরিত্র। অর্থাৎ পোজো এবং লাকির থেকে অনেক ভাল। ডিডি এবং গোগোর ভেতর চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে। পোজো এবং লাকি হচ্ছে সংসারের তথাকথিত কাজের লোক। পোজো জাতীয় লোক চায় সবার ওপর কর্তৃত্ব করতে—ইংরাজীতে এই শ্রেণীর লোককেই বলা হয় 'বুলি'। আর লাকি চিরন্তন দাস মনোবৃত্তির। পোজোর ভেতর দিয়ে বেকেট নিৎসিয়ান সুপারম্যানের ক্যারিকেচার

করেছেন। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করবার মত। ডিডি এবং গোগোর ভেতর একটা স্নেহ এবং বিবেচনার সম্বন্ধ আছে। পোজো এবং লাকির সম্পর্কটা হচ্ছে ঘৃণা এবং ভীতির। নাটকের গতির সঙ্গে সঙ্গে এদের দুর্দশাও উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ডিডি এবং গোগোর অবস্থা ভালর দিকে না গেলেও খারাপের দিকেও যাচ্ছে না। শেষ অবধি তারা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—শুধু আশার ওপর নির্ভর করে রয়েছে যে, একদিন গোডো আসবে।

কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন 'গোডোর' ভেতর দিয়ে সোজাসুজিভাবে অস্তিত্ববাদের প্রচার করা হয়েছে। গোডোর জন্য অপেক্ষা করার পরিণতি যদি এই অবস্থাতে মানুষকে এনে ফেলে। সে-ক্ষেত্রেও (এস্ট্রাগনের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয়) "মাস্ট উই ওয়েইট ফর গোডো?"

অস্তিত্ববাদের নিয়মানুসারে 'লাকি' মানুষটিও অত্যন্ত সুনির্বাচিত। জীবনে সব থেকে যা সহজলভ্য তাই সে চায় এবং পায়ও—অর্থাৎ সে কখনও চিন্তা করতে চায় না, বা নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু ভেবে ঠিক করা, বা জীবনের জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ভাবনা করা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। জগতের বেশির ভাগ পুতুল-মানুষের মতই সে চায় প্রভু-শ্রেণীর লোকেদের আদেশ মেনে চলতে। পোজো বলে:

'Lucky likes to be driven.

EXCERPT From Times Literary Supplement, Friday, March 2, 1956: 'Waiting for Godot fulfiles Sartre's definition of an existentialist play as one which sets out to present the contemporary situation in its full horror so that the audience, finding it unendurable, may feel forced to remedy it. He would call your reviewer's attitude a typical instance of the "bad faith" which attributes all our misery to God or fate—as if our human situation were given—in order to evade having to face up to our own responsibility for it. The moral of the play then, as I see it, poses itself in the question-since this is what Waiting for Godt of is like, must we wait for Godot?'

এরপর 'গোডোর' বঙ্গানুবাদ থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে আলোচনা করবো—

ভ্ল্যাডিমার—কিন্তু আমি বলি কি, জীবনে কখনও কোন অবস্থাতেই আশা হারিও না। এমনটা যে হবে সে কথা তো আগেই—অর্থাৎ যখন বয়স অল্প ছিল সেই সময়েই ভেবে দেখা উচিত ছিল।

এস্ট্রাগন—বাজে বোকো না। জুতোটা খুলতে একটু সাহায্য কর দেখি। আচ্ছা, তুমি কি কখনো জুতো খুলতে গিয়ে মুস্কিলে পড় না?

ভ্ল্যাডিমার—প্রত্যেকদিন একবার করে জুতো খুলতে হবে...একথা বার বার বলতেও বিরক্তি লাগে। তুমিই বা আমার কথায় একেবারে কান দাও না কেন?

প্রত্যেকদিন জুতো খোলা এবং পরার ভেতর দিয়ে নাট্যকার একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবন বা হুজারী অভ রুটিন লাইফের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তা ছাড়া বঞ্চিত মানুষের মনের কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ওপরের সংলাপে।

ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে সাধারণ মানুষের অবস্থা এমনটাই হয়ে থাকে। বেঁচে থাকাটা যেন তাদের পক্ষে দিনগত পাপক্ষয় করে যাবার মত হয়ে দাঁড়ায়। শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি যে কতটা মর্মবিদারক একথা তারা প্রতিক্ষণে উপলব্ধি করে।

এস্ট্রাগন—তুমি কিসের আশায় বসে আছ বলতে পার? সব সময়েই দেখি তুমি শেষ মুহূর্ত অবধি অপেক্ষা করছ।

ভ্ল্যাডিমার—(চিন্তান্বিতভাবে) শেষ মুহূর্ত অবধি! এই আশার দীর্ঘ প্রতীক্ষাটাই আমাদের সমাজব্যবস্থার সমস্ত নোংরামীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ধনতন্ত্রবাদী সমাজে—এমনটাই দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে অবস্থার উন্নতি করবার কোন উপায় থাকে না সাধারণ মানুষের। তবু তারা শেষ পর্যন্ত আশা করে বসে থাকে অনেক কিছু ঘটবে এবং তাদের জীবনের দারিদ্র্য এবং একঘেয়েমির অবসান ঘটবে। কেউ লটারীর টিকিট কেনে মুস্কিল-আসান ঐ পথেই আসবে ভেবে। কেউ-গোডোরূপ-ভগবান এসে তাদের সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। আমাদের দেশে অনেকে আবার ছোটেন মাতাজী বা সাধুবাবার পেছনে। এদের এক-একজনের কাছে গোডোর এক, এক রূপ। গোডো কিন্তু আসবো আসবো করেও আসে না। এ এক অদ্ভুত মিজেবরীয়েল এটিচুড টু লাইফ।

এস্ট্রাগন—আমরা জন্মালাম কেন বলতে পার?

ভ্ল্যাডিমার—(হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে হো হো করে হেসে উঠবে) প্রাণভরে হাসতেও আজকাল সাহস হয় না। কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে কোন কিছুই করবার নেই।

যে সব রাষ্ট্রের বেশির ভাগ লোক দারিদ্র্যক্লিষ্ট এই সব সংলাপ তো সেখানকারই জনসাধারণের মনের কথা। আমাদের দেশের লোকের পক্ষে তো আরও অধিকতরভাবে বেকেটের বক্তব্যগুলো প্রযোজ্য—কারণ এদেশে যত বেকার, এদেশে যত দারিদ্র্য, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তার তুলনা পাওয়া যায় না। আঘাতের পর আঘাত এসে যখন আমাদের জর্জরিত করে ফেলে, হতাশ হয়ে তখন আমরা ভাগ্যের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে ভাবি আমরা জন্মালাম কেন? অথবা ভ্ল্যাডিমারের মত সিনিকাল হয়ে উঠি এবং মনের নৈরাশ্যের প্রকাশ করি বিকৃত অট্টহাসির ভেতর দিয়ে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর যে নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তাও তারা (পূর্ব এবং পশ্চিম দুই ভাগই) কাটিয়ে উঠেছে নিজেদের কর্মশক্তিতে। আর স্বাধীনতা লাভের বাইশ বছর বাদেও নিজেদের দেশকে আজও আমরা গড়ে তুলতে পারি নি। বরং অবস্থা ক্রমশই আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের নানা স্টেট থেকে লটারীর টিকিট বিক্রির হিড়িকটা সবাই নিশ্চয় নজর করেছেন। দেশের লোক সাধ্যাতীতভাবে পয়সা খরচ করে এই সব টিকিট কিনছে—মনে মনে তারা আশা পোষণ করছে লটারীতে প্রাইজ পেয়ে তাদের জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এও তো এক ধরণের গোডোর জন্য অপেক্ষা করা।

ভ্ল্যাডিমার—(পোজোকে) আচ্ছা, এই অদ্ভুত জীবটির কি চিন্তাশক্তি আছে?

মাসিক ১০. টাকার কিস্তিতে লাভ করুন
অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০.। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।
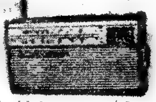
Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনায় অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

পোজো—(দড়িতে টান দিয়ে) এগো! (লাকি এগোতে থাকবে), পেছো! (লাকি থামবে), এই শুয়োর! এরা কি জিজ্ঞেস করছে? তোর চিন্তাশক্তি আছে?

লাকি—তাই যদি জিজ্ঞেস করলেন তবে বলি...পালচার এবং ওয়াটমানের রচনাতে আছে, জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে...ব্যক্তিগত ঈশ্বরের...কোয়া, কোয়া, কোয়া, কোয়া...সাদা দাড়ি... কোয়া, কোয়া, কোয়া, কোয়া...সময় দিয়ে তাকে মাপা যায় না...পবিত্র-মিরান্দার মত তার কণ্ঠ...অকারণে আগুনে পুড়ে সেঁকে ওঠা...সারা আকাশ আগুনে লালে লাল...স্বর্গ নরক এক সঙ্গে ধ্বংস...শান্ত, স্তব্ধ, নীল আকাশ...হাড়ভাঙা খাটুনী... সমস্ত পণ্ডশ্রম। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে...সহজ ভাষায় বলতে গেলে, মানুষ হচ্ছে...কায়িকশ্রম...ফুটবল, দৌড়দৌড়ি, সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা, উড়ে বেড়ানো, ভেসে যাওয়া, ঘোড়ায় চড়া, পিছলে পড়া—

অর্থশূন্য প্রলাপ। এইখানেই এই নাটকটির সঙ্গে এ্যাবসার্ড নাটকের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে লাকির কথা-বার্তা থেকে অস্পষ্টভাবে মনে হয় অসম সমাজে অস্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে মানুষের ভেতর যে মরণদশা দেখা দিয়েছে তারই ইঙ্গিত এই সংলাপে। লাকি বোধ হয় এই অর্থে ভাগ্যবান যে ধনতান্ত্রিক সমাজের নাগরিক হলেও, নিজের চিন্তা-শক্তিকে সে বিসর্জন দিয়েছে। পোজোরূপ 'বলির' কাছে সে গৃহপালিত কুকুরের মতন আত্মসমর্পণ করেছে—প্রভুর উচ্ছিষ্ট রুটির টুকরো খেয়ে তার খিদে মেটে। পোজোর লাথি এবং চাবুকে তার চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত।

বসুমতীর

যাবতীয়

গ্রন্থ ও

গ্রন্থাবলীর

প্রাপ্তিস্থান

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ

কলিকাতা—১২

এবং

সান্যাল এণ্ড কোং

১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

গোডোর দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু ভ্ল্যাডিমারের গান দিয়ে:

ভ্ল্যাডিমার—(ঘুরে ঘুরে গাইতে থাকবে)—

একটা কুকুর এসে ঢুকলো রান্নাঘরে,
করলে চুরি একটুকরো শুকনো রুটি।
ঠাকুরটা তাই না দেখে হাতাটা তুলে নিয়ে
এ্যায়সা পিট্টি দিলে, কুকুরটা পেল অক্কা।
সমস্ত কুকুরগুলো তখন এল ছুটে,
এই কুকুরটার জন্য খুঁড়লে একটা কবর।

(থামবে, চিন্তা করে আবার শুরু করবে।)

সমস্ত কুকুরগুলো তখন এল ছুটে,
এই কুকুরটার জন্য খুঁড়লে একটা কবর।
...লিখলে তার স্মৃতিফলকে,
ভবিষ্যতের সব কুকুরদের জন্য।

....

একটা কুকুর এসে ঢুকলো রান্নাঘরে
করলে চুরি একটুকরো শুকনো রুটি।
ঠাকুরটা তাই না দেখে হাতাটা তুলে নিয়ে
এ্যায়সা পিট্টি দিলে, কুকুরটা পেল অক্কা।
সমস্ত কুকুরগুলো তখন এল ছুটে,
এই কুকুরটার জন্য খুঁড়লে একটা কবর,
লিখলে তার স্মৃতিফলকে,
ভবিষ্যতের সব কুকুরদের জন্য।

আমরাও তো চিরকাল এমনটাই করে চলেছি। বঞ্চিতের দল অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে যায়—এ যেন এক ক্ষুধার্ত কুকুরের শুকনো রুটি চুরির প্রয়াসের মত। অত্যাচারীর তরফ থেকে আসে প্রচণ্ড আঘাত—আঘাতের ফলে আমাদের দু'একজন শহীদ হয়—তাদের শবদেহ নিয়ে আমরা মিছিল করি—তারপর তাদের স্মৃতিফলক তুলি—আর ঐখানেই সব শেষ হয়ে যায়। অথচ আমাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। দরিদ্রের দল আরও দরিদ্র হয়—আর বিত্তবানদের বিত্ত ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমাদের একমাত্র আশা গোডো এসে আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দেবে—সেদিনের অপেক্ষায় অর্ধমৃত অবস্থায় আমরা প্রতীক্ষা করতে থাকি।

'ওয়েটিং ফর গোডোর' মূল ফরাসী ভার্সনের নাম—'আঁ আতাঁদ গোদো'। এর সঙ্গে মনে হয় সিমন ওয়াইলের 'আতাঁত দা দিউ' বইটির কোথায় একটা মিল আছে এবং সেক্ষেত্রে গোডো গডের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হতেও পারে।

সমালোচক এরিক বেন্টলে বলেছেন—বালজাকের একটি নাটক আছে যার একজন চরিত্র সম্বন্ধে বহু কথা বলা হয়েছে—অথচ যাকে দেখা যায় না। এ নাটকটি হচ্ছে বালজাকের কমেডী 'লা ফেজেয়ার'—'মেরকাদে' নামেই নাটকটি বেশি পরিচিত। মেরকাদে শেয়ার বাজারের ফাটকাবাজ—আর্থিক সঙ্কটের ব্যাপারে সে সব সময়েই তার প্রাক্তন অংশীদার গোদোর ওপর দোষারোপ করে। বলে গোদো কয়েক বছর আগে তাদের জয়েন্ট ক্যাপিটেল নিয়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে আছে—জ্য পর্ত ল্য পোয়া দ্যু ক্রিম দ্য গোদো।

অন্যদিকে আবার মেরকাদে তার পাওনাদারদের ক্রমাগত আশা দিচ্ছে যে, শেষ পর্যন্ত গোদো ফিরে আসবে এবং তছরুফ্ করা টাকা ফেরত দেবে—তুলমদ' আ স' গোদো, আঁ ফো ক্রিস্তফ কাল' আপ্রে তু গোদো...জ্য ত্রোয়া কিল মা দেজা রাপর্তে প্লু দারজ' কিল ন্য মাঁ আ প্রি। মেরকাদে শেষ পর্যন্ত এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র করলো—এক নকল গোদোকে এনে হাজির করবার ব্যবস্থায় সে মেতে উঠল। এই সময়েই শোনা গেল আসল গোদো এসে গেছে—সে নাকি ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে ফিরেছে। নাটকের শেষে মেরকাদে বলে: জে ম'হে তাঁ দ্য ফোয়া গোদো ক্য জে বিয়াঁ ল্য দ্রোয়া দ্য ল্য ভোয়া। আল' ভোয়া গোদো।

নাটক দুটির সাদৃশ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বেশ বোঝা যায় এটা কোয়েন্সিডেন্সের ফল নয়। মার্টিন এস্লিন বলেছেন:

In Beckett's play, as in Balzac's, the arrival of Godot is the eagerly awaited avent that will miraculously save the situation; and Beckett is as fond as Joyce of subtle and vecondite literary allusious.

গোডো বলতে কোন অশরীরী ব্যক্তিত্ব, কোন দৈবী সত্তা বা এই দুয়ের সংযোগকে বোঝাচ্ছে, সেটা বড় কথা নয়। 'গোডো'র বিষয়বস্তু হচ্ছে "প্রতীক্ষা করার ব্যাপারটা" —মানবজীবনের এটি একটি প্রধান বিশেষত্ব। সারা জীবনব্যাপী আমাদের কিছু না কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়। কিসের জন্য প্রতীক্ষা করি? না, গোডোর জন্য—গোডো বলতে, যার জন্য অপেক্ষা করি তার বাস্তব রূপায়ণ-কেই বোঝায়—হয়তো সেটা একটা ঘটনা বা বস্তু বা একজন ব্যক্তি, অথবা মৃত্যু। তা ছাড়া এই অপেক্ষমাণ অবস্থাতেই আমরা সময়ের গতিকে নির্ভেজাল এবং স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি। কাজে ব্যস্ত থাকলে সময়ের গতি আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয় না—কিন্তু আমরা যদি নিষ্ক্রিয় অপেক্ষমাণ অবস্থায় থাকি, তবে সময়ের গতি স্পষ্টভাবে আমাদের চোখের সামনে প্রকট হয়ে ওঠে।

রঙ্গমঞ্চ

নাট্যমঞ্চে 'লেনিন'

লেনিন জন্ম-শতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি পশ্চিমবঙ্গে পুরোদমে শুরু হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু লেখা বার হচ্ছে। কবিরা এ ব্যাপারে অগ্রণী। লেনিনকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সোভিয়েত কবি মায়াকভস্কির বিখ্যাত কবিতা 'লেনিন'-এর অনুবাদ পুস্তকাকারে বার হয়েছে। অনুবাদ করেছেন বাংলার খ্যাত কবি সিদ্ধেশ্বর সেন। নাটকের দলগুলি আরো আগে কদম বাড়িয়ে চলেছেন। শতবর্ষ উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান থিয়েটার এ্যাসোসিয়েশন 'লেনিন ও অক্টোবর বিপ্লব' মঞ্চস্থ করেছে। এ পর্যন্ত এই সংস্থা কয়েক রজনী অভিনয় করেছে। থিয়েটার লাইবর নাট্যসংস্থার 'লেনিন' গত ২২শে এপ্রিল থেকে বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হচ্ছে। নাট্যসংস্থাগুলি যখন এগিয়ে এসেছে, যাত্রার দলও পিছিয়ে নেই। সম্প্রতি আমরা তরুণ অপেরার 'লেনিন' দেখেছি। এই যাত্রা পালার পর্যালোচনা সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের ওপর লেনিনের প্রভাব কত বেশি এই নাটকগুলি ও যাত্রা পালা তার নিদর্শন। লেনিনের নেতৃত্বে মানবসমাজের ইতিহাসে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা জন্ম নিয়েছে। এই সমাজ ব্যবস্থা যে-সকল মানুষের কাম্য, লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশে তার পরিচয় পাওয়া যায়। লেনিন নাটক ও যাত্রা পালা দেখার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আগ্রহ দেখেছি তাও লক্ষ্য করার মত। যাঁরা লেনিন নাটক অভিনয় করেন তাঁদের কাছে শুনেছি এই নাটকের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। লেনিন জীবনী নাটকের অভিনয় এখানেই শেষ নয়। আরো নাটকের দল প্রস্তুত হচ্ছে। সাপ্তাহিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে 'লেনিন' নাটক লিখেছেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও নাট্য-সমালোচক শ্রীঅশোক সেন। প্রকাশ, তাঁর নাটকটিকে মঞ্চরূপ দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সন্ধ্যানীড় নাট্যসংস্থা। আরো একটি নাট্যসংস্থা লেনিন নাটক নিয়ে শীঘ্র মঞ্চে উপস্থিত হবে শোনা যাচ্ছে। বাংলাদেশের নাট্যজগতে এ এক বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের মানুষের চিন্তাধারা নাট্যমঞ্চে প্রতিফলিত। ভারতের আর কোন রাজ্যে নাটকের দলগুলি এত সমাজ-সচেতন বোধ হয় নয়। বাংলা সাহিত্যের তুলনায় নাটক সমাজ-চেতনার দিক থেকে অনেক এগিয়ে আছে।

লেনিনকে নিয়ে নাটক করা বড় সোজা কথা নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে নাকি মঞ্চে লেনিন চরিত্র সরাসরি উপস্থিত করার ব্যাপারে ভয়ানক রকমের কড়াকড়ি। মাত্র দুজন অভিনেতা আছেন যাঁরা লেনিনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁরাই চলচ্চিত্রে লেনিনের ভূমিকাভিনেতা। সোভিয়েটে এ পর্যন্ত তেরটা ছবি লেনিনকে নিয়ে হয়েছে। সব কয়টিতে অবশ্য লেনিনের চরিত্র উপস্থিত করা হয় নি। আমাদের দেশে কেউ কেউ বলছেন লেনিনকে সরাসরি মঞ্চে উপস্থিত করা ঠিক নয়। কারণ লেনিন চরিত্রের সবদিকগুলির রূপ দেবার মত অভিনেতা নেই। একদিকে একথা ঠিক। সত্যিই লেনিনের ব্যক্তিত্ব, প্রাণশক্তি, প্রজ্ঞা, তাঁর কথায় ও চলায় যে বৈশিষ্ট্য তাকে প্রকাশ করার মত অভিনেতা কোথায়? কিন্তু ইতিহাস আজ এমনভাবে এগিয়ে গেছে যে, পৃথিবীর দূর গ্রামাঞ্চলের মানুষও লেনিনকে জানেন। তাঁর মহৎ জীবনের নানা গল্প ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করছে, তাঁকে মনে-প্রাণে অনুভব করছে। সুতরাং মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে তাঁর প্রকাশ অবশ্যই ঘটবে। তবে নাটকের দলগুলির সতর্ক থাকতে হবে লেনিনের চরিত্রাভিনেতা নির্বাচনে এবং সংলাপ ও বিষয়বস্তুর যথার্থতা সম্পর্কে।

লেনিন নাটক মঞ্চরূপ দেওয়া ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার। আর্থিক অসঙ্গতির দরুণ নাট্যসংস্থাগুলি ইচ্ছা ও শক্তি থাকলেও অনেক সময় যথাযথভাবে নাটকের মঞ্চরূপ দিতে পারেন না। ধার-কর্জ করে মঞ্চে উপস্থিত হতে হয়েছে। শোনা যাচ্ছে একটি মাত্র সংস্থা নাকি পূর্ব জার্মানি থেকে হাজার দশেক টাকার সহায়তা পেয়েছেন লেনিন অভিনয় করার জন্য। কিন্তু এরকম ভাগ্যবান অন্য দলগুলি নয়। তাঁদের সহায়তা দানের বিষয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার কি ভাবতে পারেন না? লেনিন জন্ম-শতবর্ষ উদ্‌যাপন যুক্তফ্রন্টের কর্ম-সূচীর সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন। যুক্তফ্রন্ট সরকার একশত রজনী পর্যন্ত অভিনয়ে প্রমোদকর ছাড় দিতে পারেন। একশত রজনী পর্যন্ত লেনিন অভিনয় যদি প্রযোজক ছাড় পায় তবে দর্শক এবং নাট্য-সংস্থাগুলির কাছে তা অনুপ্রেরণার হবে। দেশব্যাপী লেনিন জন্ম-শতবর্ষ উদ্‌যাপন আরো ব্যাপক হবে।

—সৃজন

ইয়ং জার্মান ছবির একজন অভিনেত্রী

চিত্র আলোচনা

মায়া

জয়া চিত্রের প্রথম ছবি 'মায়া' মুক্তি লাভ করেছে। ছবিটির পরিচালক অরিন্দম। পরিচালক ছদ্মনামে পরিচিত হতে চান মনে হয়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অনল চ্যাটার্জী। ইতোপূর্বে তিনি আরো কয়েকটি ছবিতে সুর দিয়েছেন এবং সঙ্গীতজগতে তাঁর সুপরিচিতি আছে। 'মায়া'-র কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নির্মল সর্বজ্ঞ। এই নামটিও পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র জগতে পরিচিত।

এই ছবি বর্তমান সমাজের একটা দিককে উন্মোচন করে দিতে চেয়েছে। যেখানে মানুষের সরলতা ও সততার সুযোগ নিয়ে এবং অর্থের লোভ দেখিয়ে সর্বনাশ করে। সহজ সরল মানুষ এই ক্রূরতার ফাঁদে পড়ে ধ্বংস হয়। এমন এক মেয়ে-শিকারীর নাম নলিনী—তার অনেক টাকা। এই টাকা সে যথেচ্ছ ওড়াচ্ছে নারী-সঙ্গ ও নারীদেহ ভোগে। একদিন তার নজর পড়ল আদর্শ শিক্ষক জীতেনবাবুর মেয়ে মায়ার ওপর। জীতেনবাবুর ছাত্র নলিনী, সুতরাং বাড়িতে সহজেই সে সকলের বিশ্বাস অর্জন করে। এই সুযোগ নিয়ে সে মায়ার অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, এমন কি মায়াকে বিয়ে করার প্রস্তাবও দেয়। আরেকদিকে মায়ার দাদা অজয়কে নিজের কোম্পানীতে চাকরী দেয়। বিয়ের দিন যখন ঘনিয়ে এসেছে, এমন সময় নলিনী বিয়ের ব্যাপারে টালবাহানা করতে থাকে আরেকদিকে মায়া সন্তানসম্ভবা। এ সময় মায়া নলিনীর আসল চেহারা দেখতে পায়। নলিনী মায়াকে কিছু টাকা দিয়ে এতদিনের অন্তরঙ্গতার মূল্য দিতে চাইল। এই ছলনার প্রতিবাদে অজয় চাকরী ছেড়ে এল। শাসিয়ে এল উপযুক্ত শাস্তিবিধানের। কিন্তু উল্টো শাস্তি হল অজয়ের। মিথ্যা মামলায় তার দু' বছর জেল হল। এ নিয়ে জীতেনবাবুর সংসার ভেঙে ছারখার হয়ে গেল। আসন্ন-প্রসবা মায়া নলিনীর ড্রাইভারের সহৃদয়তায় তার বাড়িতে স্থান পেয়ে বেঁচে গেল। তার পরে এক সময় অজয় মুক্তি পাবার পর পরিবারের সকলের পুনর্মিলন হল, কেবল জীতেনবাবু অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিলেন। নলিনীকেও পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল তবে তা মানুষে দেয় নি, দিয়েছিল ভগবান। যেমন হিন্দী ছবিগুলিতে আমরা দেখে থাকি।

বিত্তবানরা মানুষের সরলতা ও অভাবের সুযোগ নেওয়ার এই কাহিনীকে সময়োপযোগী চেতনা আরোপ করে ভিন্ন পরিণতির দিকে নিতে পারলে ছবিতে কিছু নতুনত্ব আরোপিত হত। তা না করায় গতানুগতিক ফর্মুলার ছবি হয়েছে। যার জন্য ছবির গোড়াতেই পরিণতির কথা এবং কোন চরিত্রের কি পরিণতি হবে ভেবে নেওয়া যায়। এই ফর্মুলা চিত্র হয়ত আরো গতিবেগ লাভ করত সম্পাদনা আরো সতর্কতার সঙ্গে হলে।

ছবিতে অভিনয় দর্শন জীতেনবাবুর ভূমিকায় অসিতবরণ। তাঁর অভিনয়ে চরিত্রটি দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করবে। মায়ার চরিত্রে সুমিতা সান্যাল যথাযথ। শ্যামল ঘোষাল নলিনীর চরিত্রকে যথার্থ রূপ দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় সতীন্দ্র

পশ্চিম জার্মানীর 'লাস্ট ফর লাইফ' ছবির একটি দৃশ্য

ভট্টাচার্য, চিত্রা মণ্ডল, শিখা ভট্টাচার্য সীতা মুখার্জী, অপর্ণা দেবী, অজয় গাঙ্গুলী প্রমুখ অভিনয় করেছেন। ছবির গানগুলি সুগীত। গেয়েছেন হেমন্ত মুখার্জী, আরতি মুখার্জী, মানবেন্দ্র মুখার্জী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বাংলায় ছো নাচ

ফিল্মস ওরিয়েণ্টালিয়ার পক্ষে বিদেশ সরকার প্রযোজিত 'ছো ড্যান্স অব বেঙ্গল' একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি সম্প্রতি দেখলাম। ছবিটি ইস্টম্যান কলারে রঙিন।

বাংলার পুরুলিয়ায়, বিহারের সেরাই-কেলা এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে 'ছো' নাচের প্রচলন আছে। মহাভারত রামায়ণ কাহিনীকে রূপায়িত করে এই নাচের মাধ্যমে। 'ছো' নাচ মুখোস নাচ। উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে এক বিশিষ্ট লোক-নৃত্যের মর্যাদায় 'ছো' নাচ স্বীকৃত। ধান কাটার পরে ঘরে ঘরে নবান্নের আনন্দের দিনে 'ছো' নাচের মেলা বসে। সে সময় কৃষকরা দরাজ দিল। আনন্দে দিন কাটে। কারণ ঘরে তাদের ধান রয়েছে। যাঁরা 'ছো' নাচেন তাঁরাও কৃষক। ধান কাটার পরে তাঁরা নাচে নেমে যান। সঙ্গে ঢোল, কাঁসর, সিঙ্গা, বাঁশী। তবে নাচের জন্য প্রস্তুতির সময় কম নয়। মুখোস বানানো, রঙ লাগানো ইত্যাদি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। নাচের আসর মাঠ বা কাটা-ধানের মাঠ—যেখানে লোক জমে সেখানেই চলতে পারে। কিন্তু তাল ছন্দ থাকবে পুরো মাত্রায়। সেদিক থেকে কথাকলির প্রজাতি মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সূক্ষ্মতা কিছু কম বটে।

'ছো' নাচের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া অঞ্চল আবিষ্কৃত 'ছো' নাচের দাবি করে। কারো কারো মতে অন্যান্য অঞ্চলে কিছুটা আধুনিক করতে গিয়ে কৃত্রিমতা এসেছে কিন্তু পুরুলিয়ার 'ছো' সেদিক থেকে নিখুঁত।

এই ছবিতে পুরুলিয়ার আঞ্চলিক 'ছো' নাচ দেখা যাবে। সে সঙ্গে কৃষকদের জীবন, পার্বণের দিন এবং 'ছো' নাচের

সন্ত চৌধুরী

প্রস্তুত পর্ব। কাজেই জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হয়ে দেখা দেওয়ায় আসল 'ছো' নাচের রস আস্বাদন করা যায়। এক দৃশ্যে একটি মেলা দেখা গেছে বড় সুন্দর। অন্যান্য দৃশ্যের নাচগুলি যদি মেলা বা লোক-অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে দেখা যেত তবে ভাল হতো। তা হলেও ছবিটি দেখতে ভাল লাগে এবং বাংলার 'ছো' নাচের একটি প্রামাণিক দলিলচিত্ররূপে অভিনন্দনীয় প্রয়াস। ছবিটির পরিচালনা ও ক্যামেরার কাজ করেছেন গোপাল সান্যাল। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অংশুমান রায়। সম্পাদনা করেছেন মধুসূদন ব্যানার্জী। সারা ভারতের এবং বিদেশী দর্শকদের সুবিধার জন্য ইংরেজীতে কমেণ্টারি দেওয়া হয়েছে। কমেণ্টারি করেছেন ভিক্টর মোসেস।

নাটকের কথা

শৃংখল

ক্লাশ থিয়েটারের নাটক 'শৃংখল' সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে। 'শৃংখল' 'কঙ্গো'র রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পটভূমিতে রচিত। যখন প্রেসিডেন্ট লুমুম্বা পালিয়ে যাচ্ছেন আর দেশের মধ্যে লুমুম্বার সহযোগী শক্তি সংগঠিত হচ্ছে। সেই মুহূর্তে বর্বর শ্বেত-সন্ত্রাস লুমুম্বা-পন্থীদের বিরুদ্ধে চালিত হয়। সহস্র সহস্র দেশপ্রেমিক বেলজিয়াম সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের তাঁবেদারদের দ্বারা নিহত হয়। এই পটভূমিকায় দেশপ্রেমিকদের মনোবল ও দৃঢ়তা এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। এই সঙ্গে বলা হয়েছে দেশপ্রেমিকরা কোন নির্দিষ্ট দেশের সীমাবদ্ধ নয়, সত্যিকার যে দেশপ্রেমিক সে একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক। আন্তর্জাতিকতার কষ্টিপাথরে দেশপ্রেমের পরীক্ষা। কঙ্গোতে তাই লুমুম্বার পাশে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় লীনা গুপ্তাকে, বেলজিয়ামের সাদা ডাক্তার জোনস্‌কে। সত্যিকার যারা দেশপ্রেমিক তাদের কাছে সাদা-কালোর তফাৎ নেই, নেই কোন দেশের ব্যবধান।

সম্পাদকীয় বক্তব্যে বলা হয়েছে নাটকটি লেখা হয়েছে 'আফ্রিকা উইদ ফ্রিডম', 'ইনসাইড আফ্রিকা' এবং 'কঙ্গো থেকে ফেরা' অবলম্বনে। প্রথমোক্ত দুটি বই প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। বলা বাহুল্য লীনা এবং ডাঃ জোনস্ কাল্পনিক চরিত্র হলেও বাস্তবের দিক থেকে সঙ্গত। ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি রাজেশ্বর-দয়ালের চোখের ওপর লুমুম্বা খুন হতে পারে, কিন্তু দেশপ্রেমিক ভারতীয়রা এই খুনীদের ক্ষমা করে নি, করবে না।

এককথায় নাটকটি সুপ্রযোজিত। কিন্তু প্রগতিশীল নাটকের দলগুলির ওপর উৎপল দত্তের পীড়নমূলক দৃশ্য রচনার ভূত যেভাবে চেপে বসেছে তাতে অনেক সময় সহজ বক্তব্য কঠিন হয়ে পড়ে এবং নাটকের সৌন্দর্য অনুভূতির দিকটি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রসহানি ঘটে। 'শৃংখল'-এর ব্যাপারে তাই হয়েছে। এত পীড়ন দৃশ্যের মধ্যে জনসাধারণ হারিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সৈন্যদের মধ্যে গোপনে কয়েকজন বেঁচে আছে মাত্র। ইতিহাস এবং বিপ্লবী নৈতিকতার দিক থেকে এরূপ বক্তব্য ঠিক নয়; হতাশাবাদের প্রকাশ। 'শৃংখল'-এর মত নাটক প্রযোজনার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সন্ত্রাসের কঠোরতা দেখাবার জন্য নয়—মানুষের অপরাজেয় শক্তিকে তুলে ধরার মধ্যে এইরূপ নাটক অভিনয়ের সার্থকতা।

অভিনয়ে ডাঃ জোনসের ভূমিকায় অজিত সান্যাল, জিঙ্গোরূপে গৌরীশঙ্কর লাল, আনানোরূপে রমেন সরকার, কামিনীর চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্রে সুকুমার দাস, সুশীল ব্যানার্জী, সমীর চ্যাটার্জী, সুনীল দত্ত, প্রশান্ত বোস, পরিমল ভট্টাচার্য প্রমুখ যথাযথ অভিনয় করেছেন। স্ত্রী ভূমিকার অভিনয় কিছুটা দুর্বল। লীনা গুপ্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ডলি গোস্বামী।

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত 'প্রতিদান' ছবিতে সন্ধ্যা ব্যানার্জী ও সুখেন দাস

মার্গারেটে কৌমির ভূমিকায় মিস দাসের অভিনয়ে কিছুটা আতিশয্য আছে—তবে তার জন্য দায়িত্ব পরিচালকের। 'শৃংখল'-এর গানের অংশ প্রশংসনীয়। মঞ্চসজ্জা, শব্দ প্রয়োগ, আলোক ইত্যাদি বিশেষ প্রশংসনীয়। শব্দ প্রয়োগে একটা পরিস্থিতি বোঝানো সিনেমার আঙ্গিক ছিল, কিন্তু থিয়েটারে তা কত ভাল কাজ করে 'শৃংখল'-এ তা বোঝা গেছে।

সংবাদ কণা

ইয়ং জার্মান ছবি

ভারতের জার্মান দূতাবাস ও ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটির যুক্ত উদ্যোগে লেনিন সরণিস্থ জ্যোতি সিনেমায় পশ্চিম জার্মান চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে। গত ৭ই নভেম্বর সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই উৎসব উদ্বোধন করেন চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়। অনুষ্ঠানে কলকাতাস্থ কন্সাল জেনারেল এবং ম্যাক্সমূলার ভবনের ডিরেক্টর বক্তৃতা করেন। এই উৎসবে পশ্চিম জার্মানীর নতুন পরিচালকদের সাতটি ছবি দেখান হবে। এই ছবিগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'ইয়ং সিনেমা' রূপে। ছবিগুলি দেখার জন্য ফিল্ম সোসাইটিসমূহের সদস্যদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

৭ই তারিখ উদ্বোধন হলেও সেদিন নির্ধারিত ছবি দেখান সম্ভব হয় নি। নির্দিষ্ট সময়ে ছবি এসে না পৌঁছনোয় ম্যাটিনী এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ছবি দেখান সম্ভব হয় নি। সান্ধ্য শো-তে আমন্ত্রিত ব্যক্তি ও সাংবাদিকরা এসেছিলেন, কিন্তু নির্ধারিত ছবির পরিবর্তে দুটি স্বল্প-দৈর্ঘ্যের 'খেয়ালী' ছবি দেখে তাঁদের ফিরে যেতে হয়। অবশ্য রাত্রির শো-তে নির্ধারিত ছবি দেখান হয়েছে। ইতিমধ্যে ছবিটি এসে পৌঁছয়।

'বিসর্জন'-এর পাণ্ডুলিপি প্রত্যর্পণ অনুষ্ঠান

আগামী ১৪ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'-এর পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতীকে প্রত্যর্পণ করবেন। নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে সন্ধ্যা ছয়টায় এই অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী। উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বিশ্বভারতীর হাতে পাণ্ডুলিপিটি প্রত্যর্পণ করবেন। এই উপলক্ষে কলকাতা পুলিশবাহিনীর সদস্যরা 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় করবেন।

বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম মঞ্চে বেঙ্গল মিউজিক কলেজ একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এ'রা প্রতি বছর চারটি বিশেষ উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করার কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে রবিপ্রভা বিভাগের ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথ রচিত ব্রহ্মসংগীত, প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রীরা "মজার দেশ" নৃত্যনাট্য, নৃত্যবিভাগের ছাত্রীরা 'সাত ভাই চম্পা' গীতিনাট্য, দ্বিজেন্দ্রগীতি, কান্তগীতি, পল্লীগীতি, নজরুলগীতি ইত্যাদি বাংলা গানের বিভিন্ন শাখায় বিচিত্রসম্ভার ছাত্রী-দের কণ্ঠে মূর্ত হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সর্বশেষ আকর্ষণ ছিল কবিগুরুর সঙ্গীত অবলম্বনে ঋতুবীণা এই গীতি-আলেখ্যটি। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের সম্মিলিত অনুষ্ঠান সবদিক থেকে মনোজ্ঞ হয়েছিল। গ্রন্থনায় ছিলেন শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীতাংশে ছিলেন শ্রীপ্রসাদ সেন, শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রণব চৌধুরী, শ্রীমতী মীনাক্ষী বসু।

আজারবাইজানে ভারতীয় সাংস্কৃতিক উৎসব

সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের আজারবাইজানে দশদিনব্যাপী ভারতীয় সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীযশোবন্ত ঠাকুরের নেতৃত্বে একদল সাংস্কৃতিক কর্মী এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

২৪ পরগনা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

সংগঠনী, উদয়পুর আয়োজিত ২৪ পরগনা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা আগামী ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সংগঠনীর নিজস্ব মঞ্চে শুরু হচ্ছে। যে-কোন অপেশাদার নাট্যসংস্থা এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে, যোগদানের শেষ তারিখ ২৩শে নভেম্বর। যোগদানেচ্ছু নাট্যসংস্থাকে সংগঠনী, উদয়পুর, কলকাতা—৪১ অথবা কল্যাণ আর্ট প্রেস, ৭৪ সারপেণ্টাইন লেন, কলকাতা, এই ঠিকানায় বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চতুরঙ্গের নতুন প্রযোজনা

চতুরঙ্গের নতুন প্রযোজনা বনফুলের 'কাঁথা'—প্রথম পরিবেশিত হবে মুক্তঅঙ্গনে আগামী ১৯ নভেম্বর। এটি বনফুলের ঐ নামের একটি হাল্কা হাসির সরস কৌতুক নাটিকার সম্প্রসারিত রূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চতুরঙ্গ এই নাটিকাটি ও আর একটি 'ভাগ' ইতিপূর্বে বছর ছয়েক আগে কয়েকবার অভিনয় করেছিল। এখন এটি পরিবেশিত হবে পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপে। নাট্য সম্প্রসারণ, শিল্পনির্দেশনা ও পরিচালনা—বরুণ দাশগুপ্ত; আবহ—দেবাশিস দাশগুপ্ত এবং আলো—শান্তি দে।

বেলুড়ে নাট্যাভিনয়

বেলুড় শ্রীমা নাট্যসমাজের ব্যবস্থাপনায় 'বিজয়া সম্মেলন' উপলক্ষে শ্রীমহেন্দ্রলাল দাস এবং শ্রীনীরেন সেনের সভাপতিত্বে ও প্রধান আতিথ্যে 'কার

ঝড়ী দিদি' হিন্দী ছবির একটি দৃশ্যে জিতেন্দ্র ও নন্দা

দোষ' ও 'বিদিশ' নাটক দুটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

শ্রীসুরাজকুমার দে'র নাট্য পরিচালনায় অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন ঃ শ্রীঅতনু ঘোষ, রঞ্জিৎ দেবনাথ, দুলাল মণ্ডল, দিলীপ চক্রবর্তী, গোপাল সরকার, দিনেন মণ্ডল, কমল ঘোষ, অসিতবরণ দাস, সুশান্ত বসু, সঞ্জয় বিশ্বাস, দয়াল মুখার্জী, সুভাষ বারিক, কুঞ্জলাল মহন্ত, নিমাই ঘোষ, সুভা দাস, বিল্বদল মুখার্জী প্রমুখ।

বিশ বছরের পুরনো ক্ষুদে রঙ্গমঞ্চ

ডুইরতজবুর্গ (ডি· এ· ডি·)—সোমেরহাউসেন বলে পশ্চিম জার্মানীর মধ্যযুগীয় শহরের প্রবেশদ্বারের মাথায় একটা ক্ষুদে থিয়েটার আছে। থিয়েটার ক্ষুদে বটে, কারণ এখানে মাত্র চুয়ান্ন জন দর্শকের আসন আছে, তবে যেসব নাটক হয় তা সবই গুরুগম্ভীর এবং দেখবার মত, যাকে বলে উপভোগ্য নাটক। সারাবছরই এই থিয়েটারে নাটক হয়। বিশ বছর ধরে এই ক্ষুদে থিয়েটারটি চালাচ্ছেন মালিপিয়ারো নামে এক ভদ্রলোক যিনি নিজেই এর প্রযোজক, পরিচালক ও মঞ্চসজ্জাকর। এর পাশেই এই ভদ্রলোক আরেকটি প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করেছেন যেখানে গান, মজার আবৃত্তি ও তামাসা হয়। রুচি অনুযায়ী মানুষ যে কোনটাতে গিয়ে চিত্তবিনোদন করতে পারেন।

সঙ্গীত কথা

ভ্রাম্যমাণ সংগীত পরিচালক

হামবুর্গ (ডি· এ· ডি·)—পিতার ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য যে লোকটি সসম্মানে আইনের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, পরবর্তী জীবনে তাঁকেই দেখা গেলো সংগীত পরিচালক হিসেবে। এই মানুষটির নাম কার্ল বোম। সংগীত পরিচালক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। নিখুঁত, নির্ভুলভাবে তিনি মোত্জার্ট, হ্বাগনার, রিচার্ড স্ট্রাউসের অনবদ্য ধ্রুপদী সংগীতগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম। কার্ল বোম এখন আন্তর্জাতিক সংগীত জগতের একজন হয়ে গেছেন। সেজন্য তাঁকে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে হয়। পঁচাত্তর বছর বয়সে, সংগীত পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি যে কোন তরুণের মত সতেজ, সজীব।

নিঃ ভাঃ ভাতখণ্ডে সংগীত প্রতিযোগিতা

ভাতখণ্ডে কলেজ অফ্ মিউজিকের উদ্যোগে চতুর্থ বার্ষিক নিখিল ভারত ভাতখণ্ডে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার বিষয়সূচীতে যাবতীয় কণ্ঠসঙ্গীত ও গীটার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদনপত্র গৃহীত হবে। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ স্বপন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক ভাতখণ্ডে কলেজ অফ্ মিউজিক্ ১০/৭৩ চারু এভিনিউ, কলকাতা—৩৩।

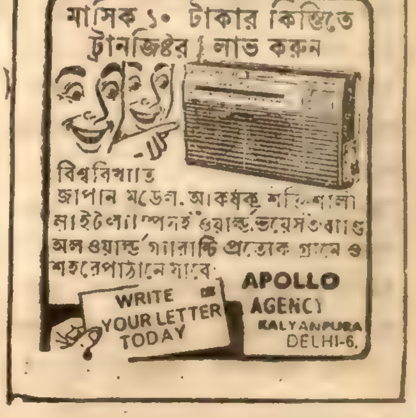

খেলাধুলা

ছেলেখেলারও একটা সীমা আছে। যাঁরা দেশের মানসম্মান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করেন—তাঁদের সহ্য করারও একটা সীমা আছে। সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষ সে সীমাও ছাড়িয়ে গেলেন। আর তারই জের হিসেবে বিদেশের মাটিতে ভারতকে এবং ভারতীয় দলকে কি অবর্ণনীয় অপমান সহ্য করতে হয়েছে, তা বোধহয় আজ আর ক্রীড়ারসিকদের জানতে বাকী নেই। কুয়ালালামপুরে ভারতের খেলার সময় দর্শকরা চীৎকার করে বলেছেন, 'গো ব্যাক ইণ্ডিয়া'—'ভারত ফিরে যাও।' কি লজ্জা! এর চেয়ে দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় কি হতে পারে! কিন্তু কেন এই লাঞ্ছনা, কেন এই অপমান? কাদের জন্যে আজ ভারতের খেলোয়াড়দের মাথা নিচু করে দেশে ফিরে আসতে হলো? কাদের জন্যে ভারতের লক্ষ লক্ষ ফুটবলরসিকরা অস্বাভাবিক এই অকথার মধ্যে নিমজ্জিত হলেন হতাশার সাগরে? ভারতের এই পরাজয়ের দায়িত্ব কাদের?

ভারতীয় দল নিয়ে এই সব কাণ্ড-কারখানা স্বেচ্ছাচারিতা যে কারা করেন

ছেলেখেলা

সাধারণ ক্রীড়ারসিকদের আজ আর তা দেখতে বাকী নেই। মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ভারতীয় দল সম্বন্ধে আমরা কোন রকম মন্তব্য করি নি। কারণ নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম দেখে আমরা বিস্ময়ে থ হয়ে গিয়েছিলাম। ভারতীয় দলের আক্রমণ রচনা করার জন্যে যে সমস্ত খেলোয়াড়দের দলে নেওয়া হয়েছে তাঁদের ক্রীড়ানৈপুণ্যের প্রশ্ন না তুলেও আমরা সবিনয়ে ভারতীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করি যে এঁদের চেয়ে ভালো খেলোয়াড় কি ভারতবর্ষে এখন আর নেই? আর কোচ হিসেবে জার্নাল সিং কতোটা সাফল্য লাভ করেছেন সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কারণ ভালো খেলোয়াড় হলেই যে দক্ষ প্রশিক্ষক হওয়া যায়—আর যাই হোক এ কথা তো কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই এ কথা বলতে আজ আর এতটুকুও দ্বিধা নেই যে, মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে ভারতীয় দল গঠন নিয়ে ভারতীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষ খামখেয়ালমত ছেলেখেলা করেছেন। আর তারই জের টেনে ভারত বিদেশের মাটিতে ভারতের মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেশে ফিরে আসছে লোক হাসিয়ে। ভারতের সম্মান নিয়ে যাঁরা ছেলেখেলা করেন, যাঁরা দেশের চেয়ে নিজেদের স্বার্থকেই বড় করে দেখেন—আর কতকাল তাঁদের আমরা সহ্য করবো? আজো কি তাঁদের জবাবদিহি করার সময় আসে নি?

—শান্তিপ্রিয়

ক্রিকেটের খবর

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেবার পর ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর প্রথম টেস্ট ম্যাচের প্রথম ইনিংসে খুব একটা সুবিধে করতে পারলেন না।

তরুণ খেলোয়াড় অশোক মানকাদ (৭৪) আর পাতৌদির নবাবের (৯৫) অনবদ্য ব্যাটিং-এর জন্যে ভারত প্রথম ইনিংসে মোটামুটি একটা ভদ্রগোছের রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল।

আজ তাই ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ক্রীড়ানৈপুণ্যের দিকটা আবার নতুনভাবে চিন্তা করে দেখার সময় এসেছে। কেন ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা বার বার এই-রকমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আউট হয়ে যাচ্ছেন অসহায়ের মতো? অথচ ভারতীয় দলে এখন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানের সংখ্যাও তো কোন অংশে কম নয়।

তবু কিছু হচ্ছে না, কিছুই করতে পারছেন না ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। আমাদের মনে হয় তার একমাত্র কারণ হলো ভয়। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা এখন ভয়ে ভয়ে ব্যাট করতে নামেন। সে কিন্তু ফাস্ট বোলার কিম্বা স্পিন বোলারদের বিরুদ্ধে খেলতে নামার ভয় নয়। এ ভয় হচ্ছে পরের টেস্টে খেলার সুযোগ পাবার প্রশ্ন।

আর সেই প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠাতেই বোধহয় সারদেশাই প্রথম থেকে মেরে খেলতে চেয়েছিলেন। মনে হয়েছিল বোধ হয় তাঁর, কিছু রান তো তাড়াতাড়ি করে নিই। তারপর যা হয় দেখা যাবে। ফলে প্রথম থেকে মেরে খেলার প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সারদেশাই বোধ হয় 'সেকি'ই ছিলেন। তাই বড় অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎই আউট হয়ে গেলেন সারদেশাই।

ওয়াদেকারের খেলাতেও ঐ একই ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। ফলে হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ওয়াদেকার ফিরে পান নি তাঁর স্বভাব অনুযায়ী খেলার ধারা।

তাই আজ সবার আগে দরকার খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার। একটা বা দুটো টেস্ট খারাপ খেললেই যে তাঁরা দল থেকে বাদ পড়বেন খেলোয়াড়দের মন থেকে এ ভয় মুছে ফেলতে না পারলে ভারতীয় দলের ব্যাটিং শক্তি কিছুতেই বাড়বে না।

প্রথম টেস্ট ম্যাচের প্রথম ইনিংসেই পাতৌদি তাঁর সমালোচকদের মুখের ওপর বেশ ভালো জবাবই দিয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ৬৮ রান করে ভারতকে জেতার পথে এগিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, পাতৌদির ফর্ম আর দল পরিচালনা নিয়ে অনেক রকম সমালোচনা হয়েছিল। এমনও কথা হয়েছিল যে পাতৌদির স্থানে অন্য কাউকে অধিনায়ক করা হোক। শেষ পর্যন্ত সিলেকশন কমিটি সে রিস্ক না নিয়ে প্রথম দুটি টেস্টের জন্যে পাতৌদিকে অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত করলেন। প্রথম দুটি টেস্টের জন্যে অধিনায়ক করা মানেই হলো যে, পাতৌদি যদি বোম্বাই আর কানপুরে সাফল্য লাভ করতে না পারেন তাহলে তাঁর জায়গায় আর কাউকে অধিনায়ক করা হবে। কিন্তু এখনকার ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে পাতৌদি ছাড়া আর কারো মধ্যে অধিনায়ক হবার মতো অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং যোগ্যতা আছে বলে তো মনে হয় না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পাতৌদি যে তাঁর দক্ষতা এবং যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরেছেন এতেই আমরা খুশি।

কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের খেলায় দেখা গেলো সেই চিরাচরিত ব্যর্থতা। প্রয়োজনের মুহূর্তে নামী ব্যাটসম্যান আউট হয়ে প্রথম টেস্টে ভারতকে এগিয়ে দিলেন শোচনীয় ফলাফলের পথে। অথচ ঠিক এমনটি তো হবার কথা ছিল না। কিন্তু কেন এমন হলো।

॥ অশোক মানকাদ ॥

প্রথম ইনিংসে ৭৪ রান করে ভারতীয় দলে নিজের স্থানটা পাকা করে নিলেও ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে অশোকে একদম সুবিধা করতে পারেন নি।

॥ ষ্ট্যাকপোল ॥

প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী করে অস্ট্রেলিয়াকে ৭৪ রানে এগিয়ে থাকতে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছিলেন।

॥ গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ॥

মাত্র সাতাশ বছর বয়সে টেস্ট খেলায় দু'শ উইকেট লাভ করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন—কম বয়সে বেশি উইকেট দখল করায়।

মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী আটটি দেশের মধ্যে ভারত অষ্টম স্থান লাভ করেছে। ছবিতে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সংগে ভারতের খেলায় বলা ইদেকে একটা বল ধরার পূর্ব মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে। এই খেলায় ভারত এক গোলে জিতেছিল।

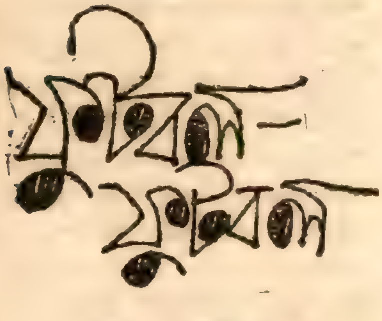

স্টেডিয়াম কমিটি প্রসংগে

কলকাতা ময়দানের বহু পুরনো আর সব থেকে প্রয়োজনীয় স্টেডিয়াম প্রসংগটি আবার চাপা হয়ে উঠেছে। স্টেডিয়াম প্রসংগে আমরা অনেক বাণী শুনেছি, আশায় আশায় বুক বেঁধেছি বহুবার। কিন্তু আসল ব্যাপারটা থেকে গেলো যে কে সেই। কিছুই হয় নি। আর আদৌ সত্যিকারের কিছু হবে বলেও তো মনে হচ্ছে না।

জানি এ বিষয়ে আমার সংগে অনেকেরই মতের মিল হবে না। ইডেন উদ্যানে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরির স্বপ্নে যাঁরা বিভোর তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ ক্রীড়ারসিকদের সব আশা হতাশায় পরিণত হয়েছে।

বাংলা দেশে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বয়েস হতে চললো প্রায় দশ মাস। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করে ক্রীড়া বিভাগে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, কাজের বেলায় কিন্তু তার কিছুই হলো না। আমরা শুধু বড় বড় কথাই শুনলাম। আর ইডেন উদ্যানে নামে কম্পোজিট হলেও আসলে ফুটবলের জন্যে কম্বাইন্ড স্টেডিয়াম তৈরি নিয়ে দেখলাম অনেক জল ঘোলা হ'তে। ইডেন উদ্যানে ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলা এক-সংগে চলতে পারে না। কারণ ফুটবল এবং ক্রিকেট মাঠের যে কতকগুলো মৌল পার্থক্য আছে সে কথাটা আজ আর কেউ বোধহয় ভেবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করছেন না।

কলকাতায় স্টেডিয়াম তৈরির জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু খেলাধুলাকে রাজনীতির বাইরে রাখার প্রচেষ্টা যে কতো ব্যর্থ তার প্রমাণ এই কমিটিটি। শুধু তাই নয়, এই কমিটিতে সবার আগে যাঁদের থাকা উচিত ছিল তাঁদের মধ্যে অনেককেই বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রথমেই ধরা যাক পঙ্কজ গুপ্তর কথা। শ্রীগুপ্তর মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভারতের ক্রীড়াজগতে ধরতে গেলে আর নেই-ই। সারা দুনিয়া তিনি ঘুরেছেন। দেখে-ছেন বিভিন্ন দেশের নানা ধরণের স্টেডি-য়াম। কলকাতায় ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরির ব্যাপারে তিনিই বোধহয় তাই দিতে পারতেন সব থেকে ভালো নির্দেশ। তাছাড়া ফুটবল কোচ হিসেবে অমল দত্ত, ক্রিকেট কোচ হিসেবে কমল ভট্টাচার্য আর হকির জন্যে গুরুবক্স সিংকে কমিটিতে নিলে আর যাই হোক ফুটবল, ক্রিকেট আর হকি একই মাঠে খেলা সম্ভব কি না জানা যেতো। আমাদের মনে হয় সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে বেরী সর্বাধিকারীর মতামত জানাও উচিত।

কিন্তু ঐ অবধিই। আর কিছু হবে বলে তো মনে হয় না। কারণ খেলা-ধুলোকে রাজনীতির বাইরে রাখতে গিয়ে রাজনীতিই পুরোপুরিভাবে খেলাধুলাকে গ্রাস করে বসেছে। আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের দরবারে ভারত দিনের পর দিন শুধু পিছিয়েই পড়ছে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর প্রথম টেস্ট ম্যাচের শেষ মুহূর্তে দল থেকে বাদ পড়েছিল সুব্রত গুহ। সুব্রতর পূর্ণ সম্মতিতেই তাঁর জায়গায় দলভুক্ত হন অফ ব্রেক বোলার ভেঙ্কটরাঘবন।

খেলার দিন সকালে অনুশীলন করার পরই পিচ দেখে সুব্রত বুঝেছিলেন ব্রাবোর্নের পিচে তিনি খুব একটা সুবিধে করতে পারবেন না।

শুধু সুব্রতই নয়, পিচ দেখে এ কথা বুঝেছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক পাতৌদি আর খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি বিজয় মারচেন্টও। কিন্তু তখন তো আর কিছুই করার নেই। খেলা আরম্ভ হবার সময়ও হয়ে এলো। তাছাড়া সরকারিভাবে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নাম তো আগেই ঘোষণা করা হয়ে গেছে। এখন তো আর কোনমতেই দল পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। অথচ ভেঙ্কটরাঘবনের মতো অফ স্পিনার দলে থাকলে ভারতের হয়তো খুবই সুবিধে হতো।

তখন শেষ উপায় হিসেবে বিজয় মারচেন্ট আর পাতৌদি সুব্রতর কাছে আবেদন জানালেন। সুব্রতকে বলা হলো, পিচ দেখলে তুমি বুঝবে একজন অফ ব্রেক বোলার এই পিচে কতোটা সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হতে পারে। তুমি কি দেশের স্বার্থে তোমার স্থানটা ভেঙ্কটরাঘবনকে ছেড়ে দিতে পারো না?

সুব্রত গুহ ভেঙ্কটরাঘবনের দলভুক্তির যৌক্তিকতা সমর্থন করে বললেন, এ তো অতি সামান্য কাজ। সুব্রত রাজী হলেন। সুব্রতর এই আচরণ শুধু মাত্র সত্যিকারের সার্থক ক্রিকেট খেলোয়াড়সুলভই নয়, বাঙালী হিসেবে সুব্রতর ঐ মন্তব্যটি আমাদের গর্বের বিষয়।

খেলার পত্রিকা

স্টেডিয়াম-শারদ সংখ্যা

(সম্পাদক শ্রী... বিশ্বাস, ২৬।২এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-৫। দাম : দু টাকা।)

অন্য বছরের মতো এ বছরও ক্রীড়া সাপ্তাহিক স্টেডিয়াম পত্রিকার শারদ সংখ্যা ক্রীড়ামোদিদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। রেখায় এবং লেখায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি খেলোয়াড়দের আর খেলার ছবিতে ভরা। খেলাধুলোর বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার সংগে আছে প্রতিটি খেলার আলোকচিত্র। তাছাড়া কয়েকটি লেখা বড়ই মনোগ্রাহী, সারগর্ভও বটে। লেখকদের মধ্যে দিলীপকুমার ঘোষ, উজ্জ্বলকুমার মুখোপাধ্যায়, বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়, জি শঙ্কর, শৈলেন চৌধুরী, তারক ব্যানার্জী, অলোক সেন, চিরঞ্জীব, নীলেশ সরকার, মৃণাল মুখার্জী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবকুমার প্রমুখের লেখা বেশ ভালো লাগলো। নামী ফুটবল খেলোয়াড়দের নয়নাভিরাম আলোকচিত্রে ভরা প্রচ্ছদটি স্টেডিয়াম পত্রিকার ক্রীড়া সংখ্যার একটি বাড়তি আকর্ষণ। আমাদের মনে হয় এই সংখ্যাটি ক্রীড়ারসিক মাত্রেই—ছোট বড় সকলকেই যথেষ্ট আনন্দ দেবে।

ময়দান-শারদ সংখ্যা

(সম্পাদক—শ্রীবিপ্লব তালুকদার : হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র কর্তৃক সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত। দাম : এক টাকা।)

কলকাতা শহর থেকে অনেক দূরে ডুয়ার্স অঞ্চলে ফুটবল খেলা যে কতোটা এগিয়ে গেছে তারই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলো শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ময়দান পত্রিকাটি। পাক্ষিক এই পত্রিকাটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছেন কয়েকজন তরুণ ক্রীড়া উৎসাহী। খেলাধুলোকে যে তাঁরা মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন তারই প্রমাণ হলো তাঁদের প্রাণান্ত পরিশ্রমের ক্রীড়া পাক্ষিক ময়দান। আজকালকার দিনে সীমিত সম্বল নিয়ে কাগজ চালানো যে কতো কঠিন তা বোধহয় একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। তবু আশার কথা ময়দান চলছে এবং ময়দানের তরুণ কর্তৃপক্ষরা জানিয়েছেন যে ময়দান চলবেও। আমরাও তাই সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকলাম ময়দানের পরবর্তী সংখ্যার জন্য। অনেক ছবিতে ভরা শারদ সংখ্যা ময়দানে খেলাধুলার বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন, পরিতোষ নাগ, হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র, বিপ্লব তালুকদার, রণবিজয় ঘোষ, প্রশান্ত মজুমদার, মুকুল সিনহা, প্রদীপ রায়, আশীষ মিত্র, পরিমল দে, কৃপানন্দ রায়, মৃণ্ময় সেন, স্বপন ঘোষ ও শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ময়দানের প্রচ্ছদেও নতুনত্বের ছোঁয়া। মোট কথা ময়দানের শারদ সংখ্যা আমাদের ভালো লেগেছে, মনে হয় ক্রীড়ারসিকদেরও সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে পত্রিকাটি।

[১২৮০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রিয়জিৎ ভৌমিক (বুধা রেল কোয়ার্টার্স, আসানসোল)

উত্তর : কেন এই 'পরাজয়' প্রবন্ধটি আপনার ভালো লেগেছে জেনে আনন্দিত হলাম। ভারত-নিউজিল্যাণ্ড টেস্ট খেলাগুলো সম্বন্ধে আপনার সংগে আমি সম্পূর্ণ এক মত।

শ্যামল কুণ্ডু, অপু, কল্যাণ ও মন্টু (বেলদা, মেদিনীপুর)

উত্তর : চুম্বক নিয়মিতভাবেই প্রকাশ করা হবে। অন্য প্রশ্নটির উত্তর আপনারাই ঠিক করে নিন।

আনন্দপ্রসাদ ভট্টাচার্য (কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগনা)

উত্তর : বৃষ্টির মধ্যে কোন সময়েই টেস্ট খেলা কেন, ক্রিকেট খেলাই চলতে পারে না। এক দলের অধিনায়ক খেলতে চাইলেও তাই উপায় নেই। খেলা বন্ধ রাখতেই হবে—তা না হলে পিচ খারাপ হয়ে যাবে।

গোপীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিশহর, ২৪ পরগনা)

উত্তর : জায়গার অভাব বলে সব সময় পরিচয়তে বিভাগটা চালু রাখা যায় না। তবে মাঝে মাঝে খেলোয়াড়দের জীবনী তো প্রকাশ করা হচ্ছে।

মনোরঞ্জন নাগ ও খাতির সরকার (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি), **জয়ন্ত মুখার্জী** (মীরহাট, বর্ধমান), **নির্মলকুমার ঘোষ** (গোমস্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি), **জগন্নাথ মজুমদার** (বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ), **পরিতোষ নাগ** (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি), **দীপু, পলাশ ও বাপ্পু** (ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি), **প্রদীপ বিশ্বাস** (গুলমা চা-বাগান, দার্জিলিং), **অরিন্দম দাশগুপ্ত** (সিউড়ী, বীরভূম), **মৃন্ময় কুণ্ডু** (হাসপাতাল রোড, টাংলা, দরং, আসাম), **হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র** (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

উত্তর : 'বিজয়া' উপলক্ষে আপনাদের পাঠানো কার্ড ও সম্ভাষণলিপি পেয়েছি। আপনারাও 'বিজয়ার' আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচমুড়া কলেজ, বাঁকুড়া)

উত্তর : 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগটা আবার চালু করার চেষ্টা করছি।

চয়ন দত্তরায় (সৌরভ কুটির, লাবান, শিলং)

প্রশ্ন : হাওড়া ইউনিয়ন কবে প্রথম বিভাগীয় ফুটবল লীগে তৃতীয় স্থান লাভ করেছিল?

উত্তর : মুশকিলে ফেললেন। আমার হাতে এখন চ্যাম্পিয়ান আর রানার্স আপের লিস্টটা আছে। যদি কারো জানা থাকে তাহলে জানাবেন।—

বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায় (কে· পি· রায় লেন, কলকাতা—১৩)

প্রশ্ন : যদি কোন খেলোয়াড় গোল দেবার সময় বিপরীত দলের কোন খেলোয়াড় তাঁকে অবৈধভাবে বাধা দেন—কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তিনি গোল করতে সক্ষম হন তখন রেফারী কি করবেন? গোল দেবেন না ফাউলের নির্দেশ দেবেন?

উত্তর : গোলের নির্দেশ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

জীবনজ্যোতি ঘোষ, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও দেবদাস ভট্টাচার্য (লক্ষ্মী ইউনিয়ন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, জোড়হাট)

উত্তর : আপনাদের প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না তো? ভারতে পেশাদারী প্রথা তো চালু হয় নি।

প্রশ্ন উত্তর

তপনজ্যোতি ও জীবনজ্যোতি ঘোষ (জে· বি· রোড, জোড়হাট—১)

উত্তর : না, হাবিবের হ্যাটট্রিকটাই একমাত্র নয়।

মানবকুমার ঘোষ (ফোরম্যান কলোনী, কাঁচরাপাড়া)

উত্তর : গল্প হলেও সত্যি বিভাগটা আবার চালু করা হবে। ইংরেজরাই ভারতে ক্রিকেট খেলার পত্তন করেন।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : ক্রিকেট খেলার ফলো অন, নো-বল, রান আউট, বাউণ্ডারী আইন কবে এবং কার কার খেলার সময় ও কোথায় আবিষ্কৃত হয়?

উত্তর : সে যে মহাভারত হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে উত্তর দেবো।

অশোককুমার মল্লিক (বেলদা, মেদিনীপুর)

উত্তর : আপনার আগের চিঠিটা আমি পাই নি। আই· এফ· এ শীল্ড আরম্ভ হয় ১৮৯৩ সালে

অমিতাভ রায় (হস্টেল ২য়, রুম-৬, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, বিবেকানন্দনগর)

উত্তর : বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হলেই জুলে রিমে কাপ পাওয়া যায়। কাপটি তো বিজয়ীর পুরস্কার—আমাদের আই· এফ· এ শীল্ড, ডুরাণ্ড কিম্বা রোভার্স কাপের মতোই, যে জিতবে সেই পাবে।

ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী (সিঁথি)

উত্তর : চুনী গোস্বামী ও পি· কে· ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা সরকার নেবেন তা তো এখন বলা সম্ভব নয়।

[১২৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

চুম্বক

পবিত্র মজুমদার

সে এক বিস্ময়কর, সে এক অবিস্মরণীয় জয়। সে জয় অসীম গৌরবের। দারুণ গর্বের। সেদিনের জয়লাভের শেষে এক বাঁধনহারা আনন্দের স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ইংলণ্ডের প্রতিটি খেলোয়াড় আর আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসী। স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি পানীয়, অনেক বেশি খাওয়া-দাওয়া, অনেক বেশি হাসি, আর অনেক সিগ্রেটের ধোঁয়া বাতাসে উড়েছিল। অপরদিকে বিশ্বের প্রতিটি ক্রীড়ারসিক হয়েছিলেন বিস্ময়ে হতবাক।

আসলে আমি সেই জয়টিকে খুব বড় করে দেখাতে চাইছি। আর, বাস্তবিকই তাই। ইংলণ্ডের জয় হয়েছে। ক্রিকেট ইতিহাসে এক সুমহান জয়।

ওভাল মাঠের পুণ্য রণাঙ্গনে তাঁরা অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছেন। হারাবার ব্যবধানটাও বড় বেশি। এক ইনিংস ও ৫৭৯ রান। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় এখন পর্যন্ত এইটিই সবচেয়ে বড় জয়। কৃতিত্বপূর্ণ জয়টি হয়েছিল ১৯৩৮ সালে।

* * *

টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় ব্যক্তিগত ৫০ রান করতে সবচেয়ে বেশি সময় নেওয়ার অধিকারী কে? প্রশ্নটি করলে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় ইংলণ্ডের সেই ক্রিকেট-খেলোয়াড়টির কথা। নামটি তার ট্রেভর-বেইলী।...

১৯৫৮-৫৯ সালের ঘটনা। সেবার টেস্টের আসর বসেছিল ব্রিসবেন মাঠে। তালিকায় দুটি দলের নাম—ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া। ইংলণ্ডের বেইলী খেলতে নামলেন এবং নেমে সেই অদ্ভুত ঘটনাটির নায়ক হলেন। তিনি তাঁর ৫০ রান পূর্ণ করতে মোট সময় নিয়েছিলেন ৩৬১ মিনিট। ঐ রান সংখ্যাটির পক্ষে বড় বেশি সময় নয় কি?

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কালকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

কালিদাস গ্রন্থাবলী---	১ম	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী---	২য়	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী---	৩য়	৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী---	১ম	৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী---	২য়	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)---	১ম	৩-০০
,, ,,	২য়	,,
,, ,,	৩য়	,,
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)	১ম	৩-০০
,, ,,	২য়	৩-০০
,, ,,	৩য়	৩-০০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী---	১ম	৬-০০
,, ,,	২য়	৬-০০
,, ,,	৩য়	৮-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী---	১ম	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী---	১ম	৪-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী---	২য়	৪-০০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী---		৩-৫০
মানিক গ্রন্থাবলী---	১ম	৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী---	২য়	৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী---	১ম	৩-৩০
,, ,,	২য়	৪-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী---	৪র্থ	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী---	১ম	৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী---	২য়	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী---	৩য়	৪-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী---	১ম	৩-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী---	২য়	৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী---		৩-০০
রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী---		৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী---		৩-০০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী---		৫-০০
স্কট গ্রন্থাবলী---	২য়	৩-০০
স্কট গ্রন্থাবলী---	৩য়	৩-০০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ে গ্রন্থা:---		৪-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী--- ২য়	৪-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী---	৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী---	৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী---	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী--- ১ম	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী--- ২য়	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা: ১ম	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:--- ২য়	৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী---	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ১ম	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ৩য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ৪র্থ	৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী---	৪-০০
,, ,, ,, ---২য়	৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী---	৬-০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী---	৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী---	৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী---	৪-০০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:---২য় ভাগ	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:---৩য়	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:---৫ম	৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী---	৫-০০
কথাসরিৎসাগর---১ম ভাগ	৪-০০
,, ---২য় ভাগ	৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী---	৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী--- ১ম, ২য়, ৩য়---প্রতি খণ্ড	৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে ৮ম খণ্ড---প্রতি খণ্ড---	৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী---২য়	৪-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী---	৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা---২য় ভাগ	৫-০০
অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী---২য়	৩-০০
,, ,, ,, ---৩য়	৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী---	৩-০০
নবীন সেনের গ্রন্থাবলী---	৭-০০

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস ---২য় ভাগ	৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থা:---১ম	১০-০০
অরুণ বহ্নি---	৪-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী---	৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর---	৩-৫০
পরলোক---	৪-৫০
পরলোক রহস্য---	২-২৫
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব---	৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়---	১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা---	৩-০০
ভারত প্রতিভা---	৫-০০
প্রতাপাদিত্য---	৩-০০
সাধক কমলাকান্ত---	২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার---	৩-০০
নানার মা---	৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ---	৩-০০
বিক্রমাদিত্য---	৩-০০
বিসমার্ক---	২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী	৩-০০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত---	২-০০
মাধবী কঙ্কণ---	২-০০
শিবরাম গ্রন্থাবলী---	৪-০০
বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ--- ১ম	৪-০০
যৌন-মনোদর্শন	
৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ	৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া	৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ত-কালিকত্বের ব্যাপারসমূহ	৪-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী---১ম	৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবী গ্রন্থাবলী---২য়	৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী---	৮-০০
ANANDAMATH (শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)	৪-০০
DAVID HARE	৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

17 NOV 1969

সে কি! তুমি এখনও ব্যবহার করনি?
কিন্তু কুকমী না হলে আমার রাঁধতে মন চায় না
কুকমী
গুঁড়া মশলা
স্বাদে গন্ধে বিশুদ্ধতায়
এর তুলনা হয় না!
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
পোস্তা • কলিকাতা-৭
মিল – কাশীপুর

সাপ্তাহিক বসুমতী

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে সংসদের অধিবেশন সুরু

কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না থাকলেও বর্তমান লড়াইয়ে ইন্দিরা গান্ধীর জয় অনিবার্য

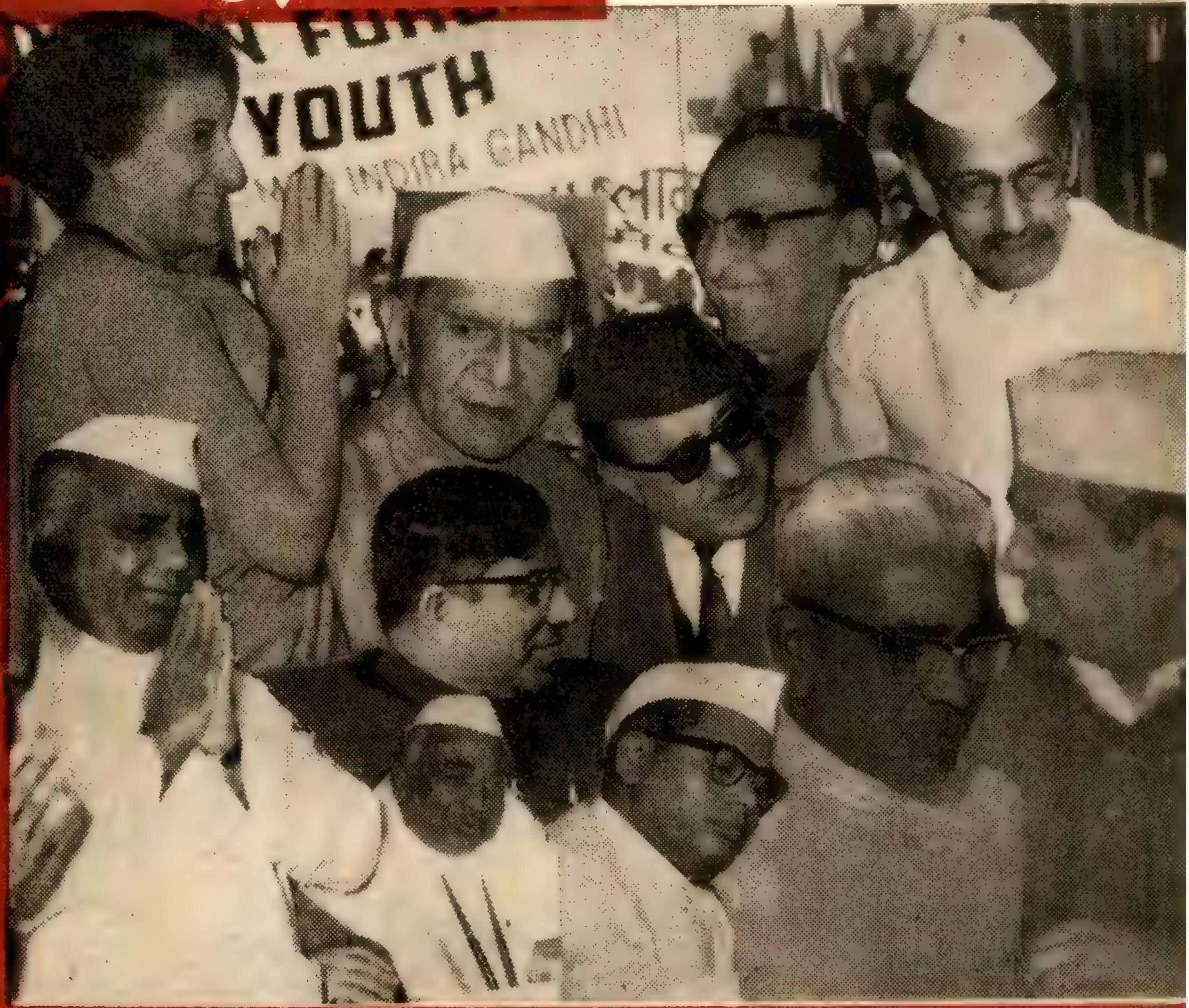

৭৪ বর্ষ: ২১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা অগ্রহায়ন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 21, 20th Nov., 19

শীতে
প্রতিদিন
বোরোলীন
ব্যবহার করুন
আপনার শুষ্ক ও বিদীর্ণ ত্বকের অস্বস্তি দূর করতে
এই অ্যান্টিসেপ্‌টিক সুরভিত ক্রীম।
বোরোলীন হাউস কলিকাতা-৩

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১২৮৩
আজকের মানুষ		১২৮৪
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১২৮৫
বই-বাহাই—বাংলা বইয়ের মেলা	— হরপ্রসাদ মিত্র	১২৮৯
কম্পাস (কবিতা)	— জয়ন্ত সাহা	১২৯২
বঙ্গদর্শন		১২৯৩
ভারতদর্শন		১২৯৬
আন্তর্জাতিক		১২৯৮
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	১৩০০
স্বাস্থ্য বিভাগের প্রমোশন রহস্য	— সুনীল ঘোষ	১৩০৩
পাঠকমন		১৩০৫
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	— শ্রীসর্বদর্শী	১৩১১

যে কোন

গয়না

আর

আ স ল

গ্র হ র ত্ন

কেনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব ছোট

এস. বি. সরকার

এ. সরকার এণ্ড সন্স

রাসবিহারী এভিনিউ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রন্থমেলা	...	১০১২
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১০১৩
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	১০১৬
তিমিরগ্রস্ত ভূস্বর্গ	— অগ্নিবর্ণ	১০১৯
ম্যাজিক টাচ (গল্প)	— রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী	১০২২
অন্য গ্রাম অন্য তরঙ্গ	— সমীর মুখোপাধ্যায়	১০২৫
চিত্রলেখা	...	১০৩০
খবর বলছি	— অভ্রবাহন	১০৩১
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	১০৩২
রূপজগৎ	...	১০৩৫
পরাজয়ের পরে	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৪০
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	১০৪২

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা ; ম্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

আজই আপনার অর্ডার পেশ করুন॥

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা জয়ন্তী সেন

৭৪ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ | Thursday, 20th November, 1969

ইন্দিরাজীর ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ

শ্রীজওহরলাল নেহরুর অশীতিতম জন্মদিবসের মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনের কথাই সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন।

শ্রীনেহরু ছিলেন মনেপ্রাণে সমাজবাদী। এই ভারত রাষ্ট্রের তিনি যখন কর্ণধার ছিলেন, তখন তাঁর উচ্চাশা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। তাঁরই প্রচেষ্টায় কংগ্রেস অধিবেশনে সমাজবাদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও একশ্রেণীর স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তির চাপে তিনি কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে সমর্থ হন নি। তাই এমন ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে, আশাভঙ্গই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছিল।

যে অসাধ্য সাধন করা শ্রীনেহরুর পক্ষে সম্ভব হয় নি, তাকে সম্ভাবনাময় করে তুলছেন নেহরু-তনয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

দেশের বর্তমান অবস্থায় ইন্দিরাজীরই পথ সঠিক এবং নির্ভুল একথা বিবেকবান ব্যক্তিরা স্বীকার করবেন। শ্রীনেহরু ও বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ ব্যক্তিরা ব্যক্তিত্বের অবসানে কংগ্রেসের দুর্দিন নেমে আসে এবং চতুর্থ নির্বাচনের সময় এটা হাতেকলমে প্রমাণিত হয় যে, জনসাধারণের মন কংগ্রেসের নামে পূর্বের মতো আর আবেগে আপ্লুত হয় না। ক্রমাগত দৈন্যের চাপে তারা অনন্যোপায়; তাই যে কোনো উপায়ে বাঁচার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তারা এক ধরণের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কোথাও প্রগতিশীলতার জয় হয়েছে, কোথাও বা প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির জয় সূচিত হয়েছে। ঐ সব প্রতিক্রিয়াশীল দল অপেক্ষা কংগ্রেস যে বহুগুণে শ্রেয়, তাও অস্বীকার করা যায় না।

এসব ঘটনা সত্ত্বেও, কংগ্রেসের মাতব্বর-শ্রেণীর যেসব ব্যক্তিরা মনে করেন, তাঁরাই সব—তাঁদের কোনো রকম আক্কেল হয় নি। এমন কি, মাঝে মাঝে তাঁদের কেউ কেউ এমন কথা উচ্চারণ করেছেন যে, প্রয়োজন হলে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সঙ্গে মিতালি করে তাঁরা কংগ্রেসের ভরাডুবি কালে কেন্দ্রে যেন-তেন-প্রকারেণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করবেন। ঐসব নেতারা মুখে বারবার গণতন্ত্র রক্ষার কথা বললেও, জনসাধারণের দুঃখ-মোচনের, আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণের ও সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন নি। অপরপক্ষে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচুর অর্থ সঞ্চয়ের কথা উঠলেও কোনো রকম তদন্তের সম্মুখীন হতে তাঁরা স্বীকৃত হন নি, তাঁরা নিজেদের মনে করেছিলেন দেশের ভাগ্য-বিধাতা এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁদের হাতের পুতুল ও রাষ্ট্রপতির পদটিতে কাউকে বসানো-না-বসানোর ব্যাপারে তাঁদের খবরদারী করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অথচ এমনই আশ্চর্যের ব্যাপার, জনগণের নির্বাচনকেও ছলে বলে কৌশলে তাঁরা যখন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন তখন তাঁদের কেউ কেউ নির্বাচনে পরাজিত হয়ে নিজের রাজ্য থেকে বিতাড়িত-প্রায়।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ ঐ সব নেতাদের বিরুদ্ধেই। ব্যাঙ্ক ন্যাশন্যালাইজেশন অর্ডিনান্স জারী করার দিন থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে ইন্দিরাজীর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হয়েছে। তারপর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ইন্দিরাজী সিণ্ডিকেটের বে-আইনী নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিবেকের লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন। উপরোক্ত দুটি ঘটনার সময় সারা ভারতের জনোচ্ছ্বাসে প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দিত হয়েছিলেন এবং তখনই কংগ্রেসের বহু নেতা লক্ষ্য করেছিলেন যে, জনগণ প্রধানমন্ত্রীর দিকে এবং সিণ্ডিকেটপন্থীরা 'একঘরে'র মতো হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও সিণ্ডিকেটের নেতারা শৃঙ্খলাবিধি ভঙ্গের অহেতুক অভিযোগে এক-একজন নেতাকে শাস্তি দিয়ে, ছাঁটাই করে, ঐ অন্যায় পদ্ধতিতে নিজেদের দলভারী করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কিন্তু কংগ্রেসের সংসদীয় দল সিণ্ডিকেটকে এমন পাল্টা আঘাত হেনেছে যে, শ্রীমতী গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ থেকে সরানো শুধু অসম্ভব নয়, অবাস্তব বলে মনে হয়।

এই ঘটনার পর ইন্দিরা-বিরোধী কংগ্রেসের সংখ্যালঘিষ্ঠ উপদল চোখ বুজে বসে থাকবে, এমন কথা ভাবা যায় না। সংসদের অধিবেশন সুরু হলেই ইন্দিরাজীকে প্রমাণ করতে বাধ্য করা হবে যে, নেতৃত্ব করার অধিকার তাঁর আছে কি না। দেশের প্রগতিশীল দলগুলি—প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে ইন্দিরাজীর লড়াইয়ে তাঁকে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কয়েকটি দল প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন উদ্দেশ্যে বৈঠক করে চলেছেন। বলা বাহুল্য, ঐসব অনাস্থা প্রস্তাব লোকসভায় উত্থাপিত হলে সিণ্ডিকেটপন্থীরা চেষ্টা করবেন ইন্দিরাজীকে জব্দ করতে। তাছাড়া, সিণ্ডিকেটপন্থীরা খুব সহজে ইন্দিরাজীকে ছেড়ে দেবেন—এমন কথা ভাবাও অনুচিত। কারণ চতুর্থ নির্বাচনের পর দল ভাঙাভাঙির ঘটনা কারো অজানা নয়। তবে জনসাধারণ মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর এমনভাবে ভোট দিয়েছে যে, সেই দল ভাঙাভাঙির যুগ শেষ হতে চলেছে।

গণতন্ত্রের কথা মুখে বললেও ওপরমহলে এখনো যে দল ভাঙাভাঙির ঘটনা ঘটবে না, তা বলা অসম্ভব। কারণ একদিকে দারিদ্র্য-মুক্তির জন্য লড়াই, অন্যদিকে পুঁজিবাদীদের স্বার্থ। অর্থ যাতে অনর্থ না ঘটায় এবং ও গণতন্ত্রকে উপহাস্য করে না তোলে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে আশা এই যে, ভোটের জন্য নেতাদের আবার জনগণেরই স্মরণ হতে হবে। তাই আমরা মনে করি, জনগণের কল্যাণের জন্য ইন্দিরাজী যে পথ বেছে নিয়েছেন সেই পথে তাঁর নেতৃত্বে চলাই একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ডুবন্ত নৌকোর হাল ধরার আগ্রহ দেখা যায় ক'জনার? জলের নিয়মও ডাঙার নিয়মের চেয়ে অনেক-অনেক কঠোর। মাঝ-দরিয়ায় জাহাজ যখন গুরুতর বিপদের মুখে টলমল করছে, তখন তার ক্যাপটেনের নির্দেশ অমান্য করে এমন দুঃসাহস হয় কোন্ ক্রু বা যাত্রীর? 'ডুবন্ত নৌকো ডুবিয়ে দাও'—এ-মতের সমর্থকও যথেষ্ট রয়েছে। তবে ডুবন্ত নৌকো সিণ্ডিকেট কংগ্রেসের হাল ধরে ডঃ রামসুভগ সিং তাকে অতল জলে ডুবিয়ে দেবেন, না শেষ পর্যন্ত জলে ভাসিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন, তাই আগামী দিনগুলিতে সকলে সাগ্রহে প্রত্যক্ষ করবেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সিণ্ডিকেট কংগ্রেস কর্তৃক বহিষ্কৃত হবার পর পার্লামেণ্টে দলের নতুন নেতার নির্বাচনের প্রয়োজন হল। ডঃ রামসুভগ সিং-ই সিণ্ডিকেট কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতার পদ পেলেন।

জাতীয় কংগ্রেস আজ পরিষ্কার দ্বিধাবিভক্ত : একদিকে রয়েছেন পুরনো প্রতিক্রিয়াশীল, কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিরা, যাঁদের নেতৃত্বে রয়েছেন নিজলিঙ্গাপ্পা, মোরারজী দেশাই, কামরাজ, পাতিল, অতুল্য ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ, অন্যদিকে প্রগতিশীল, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কংগ্রেসের প্রথম সারিতে রয়েছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, জগজীবন রাম, সুব্রহ্মনিয়ম ইত্যাদি। অবিভক্ত কংগ্রেসের মোট ৩৪২ জন পার্লামেণ্ট সদস্যের মধ্যে ২৯০ জনই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে পার্লামেণ্টারী দলনেতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এ-দলের রাজ্যসভার সদস্য-সংখ্যা হচ্ছে ১০৪। তাছাড়া নিত্যনতুন স্বতন্ত্র ও নির্দল সদস্যরা ইন্দিরাপক্ষে যোগ দিচ্ছেন। পার্লামেণ্টের শীতকালীন অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য হলো, এবারে সরকার যেমন কংগ্রেস দলের হাতে, তেমনি প্রধান সরকারবিরোধী দলও কংগ্রেস। এবং ৬৫ সদস্য বিশিষ্ট এই প্রধান বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব পেলেন প্রবীণ পার্লামেণ্টারিয়ান ডঃ রামসুভগ সিং।

পরিষদীয় রাজনীতিতে ডঃ সিং যে একজন খান্দা ব্যক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের পার্লামেণ্টে এ-

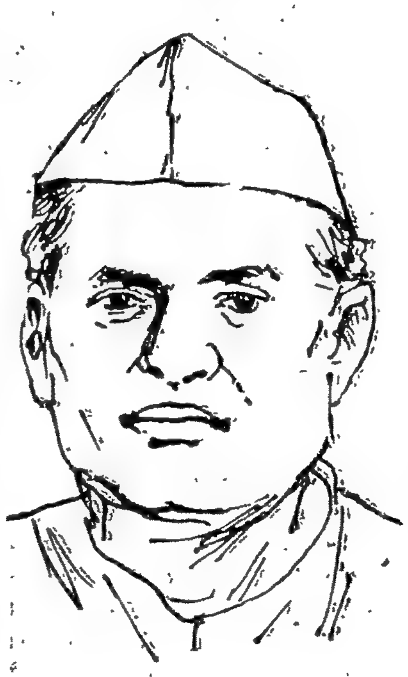

ডঃ রামসুভগ সিং

মুখটি এত পরিচিত যে, তাঁর ক্ষণিক অনুপস্থিতিও নজরে পড়ে যায়। ১৯৫০ সালে অস্থায়ী পার্লামেণ্ট গঠিত হলে ডঃ সিং তার সদস্যপদ অর্জন করেন এবং সেই থেকে তাঁর পার্লামেণ্টে নিত্য আনাগোনা। শুধু যাওয়া-আসা কিম্বা শুধু পার্লামেণ্টারী রাজনীতির স্রোতে ভাসাই নয়, ডঃ রামসুভগ ভারত সরকারের দায়িত্বপূর্ণ দপ্তর হাতে নিয়ে কৃতিত্বও দেখিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাঁর প্রথম যোগদান খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের উপ-মন্ত্রী হিসাবে ১৯৬২ সালে নেহরুর শেষ ক্যাবিনেটে। এর পরে তিনি স্থানান্তরিত হলেন রেল দপ্তরে, শ্রী এস কে পাতিল যখন বিভাগটির কর্তা। তখনই পাতিলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন রামসুভগ। শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে '৬৭ সালে পরিষদীয় বিষয় এবং যোগাযোগ দপ্তর দিয়ে পুরো মন্ত্রী করেন। পরে তাঁকে সেই পুরনো দপ্তর ফিরিয়ে দেওয়া হলো : মাত্র কদিন আগে তিনি রেলমন্ত্রী হিসেবেই পদত্যাগ করেছেন।

কিন্তু মন্ত্রিত্বের আগে ডঃ রামসুভগ সিং অন্য কয়েকটি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। পার্লামেণ্টে কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ কিম্বা সেক্রেটারী হিসেবে পরিষদে তিনি নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছেন। ১৯৬১ সাল থেকে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য রয়েছেন।

কিন্তু এত পদ এত সম্মান জুটে গেলেও সংগঠক হিসেবে ডঃ রামসুভগের খুব একটা নামডাক নেই। ছাত্র বয়স থেকেই তিনি অবশ্যি রাজনীতি করে আসছেন। প্রথমে স্ব-রাজ্য বিহারের আরা জেলা স্কুল, তারপরে কাশী বিদ্যাপীঠ এবং সর্বশেষে আমেরিকার মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডক্টরেট নিয়ে ফেরেন রামসুভগ। স্বাধীনচেতা এবং মৌলিক চিন্তাধারা পোষণের জন্যেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। এ-কারণে দলনেতার সঙ্গে কুটতর্কে প্রবৃত্ত হতেও তিনি ইতস্তত করেন নি। ভারত সরকারের চীন, কাশ্মীর, পাকিস্তান, নাগা, ফরাক্কা ইত্যাদি নীতি তিনি সমর্থন করতে তো পারেনই নি, বরঞ্চ তীব্র সমালোচনা করেছিলেন নেহরুর জীবদ্দশাতেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোঁড়ামি দেখাতেন না বলে বরাবরই তিনি দলীয় নেতার অনুগ্রহ লাভ করে এসেছেন। সিণ্ডিকেট-গোষ্ঠী আজ ডঃ রামসুভগের ওপর যে কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা তিনি কেমন করে পালন করেন, তার দিকে উৎসুক চোখ নিবদ্ধ হয়ে আছে।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(১৬)

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি ও প্ল্যানিং কমিশন গঠনের ইতিহাস

কংগ্রেসই ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করেছিল। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কিভাবে ব্যাপারটার অগ্রগতি হয়েছিল লক্ষ্য করা যাক।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন অনুযায়ী কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে। মন্ত্রিত্ব নেবার পরে বিভিন্ন কংগ্রেসী প্রদেশে একই প্রকার শিল্পনীতি প্রবর্তনের কথা ওঠে। তাছাড়া বড় ধরণের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে হলে প্রদেশগুলির পারস্পারিক সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল, কারণ ভৌগোলিকভাবে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্তও বটে। এই সব বিবেচনা করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৭-এর অগাস্ট মাসে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাতে ছিল:

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাসমূহের নিকট একটি বিশেষজ্ঞদের কমিটি গঠনের সুপারিশ করছে; ঐ কমিটি জাতীয় পুনর্গঠন ও সামাজিক পরিকল্পনা সাধনের জন্য আশু এবং মূলগত উভয় শ্রেণীর সমস্যা সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করবে। সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান, তথ্যসংগ্রহ, এবং সামাজিক উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট নির্ধারণ প্রয়োজন। এই সকল সমস্যার অনেকগুলির কার্যকরী সমাধান প্রাদেশিক ভিত্তিতে করা সম্ভব নয়—সংলগ্ন প্রদেশসমূহের স্বার্থ এমনভাবে পরস্পর জড়িত। সর্বনাশা বন্যা-নিবারণ, সেচের জল সরবরাহ, ভূমিক্ষয় নিরোধ, ম্যালেরিয়া বিতাড়ন এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে নীতিনির্ধারণের জন্য নদী সম্বন্ধে ব্যাপক সমীক্ষার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সকল নদী উপত্যকা নিয়ে সন্ধান ও গবেষণা চালাতে হবে, যাতে করে বৃহৎ আকারের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গৃহীত হতে পারে। শিল্পসমূহের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো কোনো প্রদেশের যৌথ ও সমন্বিত প্রয়াসের দরকার। ওয়ার্কিং কমিটির ইচ্ছা, প্রথমতঃ একটি আন্তঃপ্রাদেশিক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হোক। ঐ কমিটি সমস্যাগুলির সাধারণ রূপ নির্ণয় করবে এবং কিভাবে, কোন্ পথে সেগুলির সমাধান করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেবে। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি পৃথক পৃথক সমস্যার বিবেচনার জন্য পৃথক পৃথক কমিটি বা বোর্ড গঠনের সুপারিশ করতে পারবে এবং যৌথ চেষ্টা কিভাবে করা যেতে পারে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারবে।"

প্রয়োজনীয় অস্পষ্টতা সমেত সব কিছু আছে প্রস্তাবটির মধ্যে। এতে বিশেষজ্ঞ কমিটি, শিল্পের বিকাশ, জলবিদ্যুৎ, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা—পাওয়া যাবে না এমন জিনিস নেই। কিন্তু মূল প্রশ্নটি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে—সে প্রশ্ন হল—ভারতবর্ষে জাতীয় পুনর্গঠনের ব্যাপারে যন্ত্রশিল্প না কুটীরশিল্প—কোন্‌টিকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করবে? প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল জওহরলালের সভাপতিত্বকালে। দক্ষিণপন্থী সহযোগীদের কাছ থেকে এমন একটি প্রস্তাবকে তিনি পাশ করিয়ে নিতে পেরেছিলেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রমাণ, কিন্তু তা করতে গিয়ে দেশের সামনে স্পষ্ট নীতি তুলে ধরার ইচ্ছাও তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র সভাপতি হলেন তাঁর পরেই। সুভাষচন্দ্রের কাছে শিল্পায়ন-প্রশ্ন নীতি হিসাবে মূলগত। সুতরাং তার সুস্পষ্ট রূপদানে তিনি কৃতসংকল্প হলেন। এখানে বলে নেওয়া যায়, পরবর্তী সভাপতি সুভাষচন্দ্র না হয়ে, যদি সীতারামিয়া, রাজেন্দ্রপ্রসাদ বা কৃপালনী জাতীয় কোনো খাদি-প্রাণ ব্যক্তি হতেন, তাহলে ঐ প্রস্তাব ধামাচাপা পড়ত, এমন কি জওহরলালকে যদি তৃতীয়বারের জন্য সভাপতি করা হত তাহলেও তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংকট পরিস্থিতি এবং ঐ সংকটে জাতীয় ঐক্যের সমূহ প্রয়োজনীয়তার কথা সুগভীরভাবে বিবেচনা করে যুদ্ধকাল পর্যন্ত প্রস্তাবটির বাস্তব রূপায়ণকে স্থগিত রাখতেন।

সভাপতি হবার পরে সুভাষচন্দ্র জাতীয় পরিকল্পনার প্রণয়নে দ্রুত এগোলেন। এ ব্যাপারে চারটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন কয়েক মাসের ব্যবধানে। মে, ১৯৩৮-এ বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং এবং কংগ্রেসী মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনকে প্রথম সম্মেলন বলতে পারি। পরবর্তী জুলাই মাসে ওয়ার্কিং কমিটির সভাকে এ-ব্যাপারে দ্বিতীয় সম্মেলন বলা যায়। অক্টোবর মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলনই তৃতীয়

সম্মেলন। চতুর্থ সম্মেলন ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে, যেখানে পাকাপাকিভাবে প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয়।

মে মাসের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেকথা কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে পট্টভি সীতারামিয়া স্বীকার করেছেন।১ এই সম্মেলন আহ্বানের জন্য সুভাষচন্দ্রকে জওহরলাল প্রকাশ্যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।২ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে সম্মেলনের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল।৩ ১৩ মে, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে, ওয়ার্ডেন রোডে ভুলাভাই দেশাইয়ের বাড়িতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতাদের আলোচনা হয়েছিল, সভাপতিত্ব করেছিলেন সুভাষচন্দ্র, সভার শেষে সংবাদপত্রের কাছে আসল আলোচনার বিষয় বলতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন, তবে আলোচনার সাধারণ বিষয়বস্তু জানতে সংবাদপত্রের অসুবিধা হয় নি।

"শুরুতে শ্রীযুক্ত বসু মোটামুটি বিস্তৃতভাবে সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্য এবং করণীয় কার্য সম্বন্ধে মোটামুটি বিস্তারিতভাবে বলেন। তিনি জানান, এই সভার কাজ হল, কংগ্রেস প্রদেশসমূহের শাসনকার্যে কিভাবে উন্নততর সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা যায়, এবং কিভাবে কার্যনীতিতে ঐক্যবিধান করা যায়, তা নির্ধারণ করা। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারকে কিভাবে কার্যকরী করা হয়েছে, তা দেখাও সভার উদ্দেশ্য।৪ (টাইমস অব ইন্ডিয়া, ১৪ মে, ১৯৩৮)

(সম্মেলনে—তৎকালীন কংগ্রেসের সকল প্রধান ব্যক্তি

১* প্ল্যানিং কমিটির ইতিহাস প্রসঙ্গে পট্টভি তাঁর *History of the Congress, II*-এর মধ্যে লিখেছেন:

"Early in August 1937,—hardly a mouth after the Congress had formed ministries in the six provinces, the Working Committee contemplated the formation of an Expert Committee to explore the possibilities of an All India Industrial Plan and to this end as a preliminary step, the President of the Congress was authorised in July 1938 to convene a conference of the Ministers of Industries and called for a report of the existing industries operating in different provinces and the needs and possibilities of new ones. Such a Conference was held at Delhi on the 2nd. and 3rd. October, 1938...In the Premier's Conference convened in May 1938, by President Subhas Chandra Bose, problems of Industrial Reconstruction, Power Resources and Supply as well as the general question of Co-ordination amongst the provinces had come up for consideration...At the conference of Industrial Ministers, Subhas Babu delivered an instructive inaugural address in which he foresaw the details of national reconstruction in an Independent India."

পট্টভির বিবরণের মধ্যে সবই আছে, নেই শুধু প্রাণ, যে-প্রাণ প্রায় প্রতি দ্বিতীয় বাক্যে উচ্ছ্বসিত হয় গান্ধী প্রসঙ্গে, পট্টভির কংগ্রেস-ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই তা জানেন। প্ল্যানিং কমিটি গঠনে সুভাষচন্দ্রের মূল নেতৃত্বের কথা বলতে পট্টভি ভুলে গেছেন স্বাভাবিক সংস্কারে।

২ শুক্রবার সন্ধ্যায় বোম্বাইয়ের এস্‌প্ল্যানেড ময়দানে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সংবর্ধনায় বিরাট সভা হয়। সেই সভায়—

"Pandit Jawaharlal Nehru congratula ted the Congress President on his having called the conference of Prime Ministers, which he said, was necessary not only to find out what the Congress Ministries had achieved but also to find out what still remained undone." (*Times of India* May 16, 1938)

৩ ১০ মে তারিখে *Congress Conferences* নামক সম্পাদকীয়তে টাইমস অব ইন্ডিয়া অন্যান্য কথার সঙ্গে লিখেছিল:

"Bombay this week the venue of a series of important Congress Meetings. Practically all important Congress leaders are now in the city or will be within the next few days. On Thursday there opens the 'Prime Ministers' Conference, at which the Premiers of the provinces where Congress Governments are in office will discuss their problems. Their object is to secure as far as possible uniformity of policy, and there are rumours of fresh schemes for the raising of revenue for nation-building activities."

৪ এই সভা সম্বন্ধে অক্টোবর মাসে শিল্পমন্ত্রীদের সভায় সুভাষচন্দ্র বলেন—"In may last, I convened In Bombay a conference of the Premiers of the seven Congress Provinces...On that

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পদ্মপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনায় অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

উপস্থিত হয়েছিলেন।৫ গান্ধীজী সভায় হাজির না থাকলেও পরামর্শ দেবার জন্য বোম্বাইয়ে উপস্থিত ছিলেন।

মূল সম্মেলন আরম্ভ হয় শুক্রবার, শেষ হয় শনিবার সন্ধ্যায়। জাতীয় ও সামাজিক পরিকল্পনার জন্য আন্তঃপ্রাদেশিক কমিটি গঠনের ব্যাপারে প্রভূত আলোচনা হয়েছিল।৬ একই বিষয়ে পরবর্তী ওয়ার্কিং কমিটির সভাতেও আলোচনা হয়, কিন্তু পরিকল্পনা কমিটির সদস্য কারা হবেন সে বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি কোনো সিদ্ধান্তে আসতে অসমর্থ হওয়ায়, সে কাজের ভার সভাপতি সুভাষচন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।৭

জুলাই মাসে এক বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নের প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিল:

"ওয়ার্ধায় ১৯৩৭ সালের ১৪—১৭ অগস্টের সভায় ওয়ার্কিং কমিটি সর্বভারতীয় শিল্প-বিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করবার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের যে-প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, তদনুযায়ী ঐ বিষয়ক প্রাথমিক কার্যরূপে ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস সভাপতিকে শিল্পমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন যথাশীঘ্র আহ্বান করার দায়িত্ব দিচ্ছে এবং তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছে, তিনি যেন প্রদেশসমূহের শিল্পের বর্তমান অবস্থা, তার অভাবের রূপ এবং সেখানকার নূতন শিল্প সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করেন।" (স্থূলাক্ষর লেখক-নির্দেশে)

একটি বৃহৎ পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে—১৯৩৭ অগস্টের এবং ১৯৩৮ জুলাইয়ের প্রস্তাব দুটিকে পাশাপাশি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। ১৯৩৭-এর অগস্ট-প্রস্তাবে আন্তঃপ্রাদেশিক পরিকল্পনার কথা ছিল, কিন্তু সে পরিকল্পনা যে শিল্পকেন্দ্রিক হবে তা স্পষ্টভাবে বলা ছিল না। ১৯৩৮-এর জুলাই-প্রস্তাবে খোলাখুলি বলা চল—ঐ কমিটি গঠিত হবে সর্বভারতীয় শিল্প পরিকল্পনার জন্য।

এই বৃহৎ পরিবর্তনের দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রের। তা যে সুভাষচন্দ্রেরই, তার অন্য প্রমাণ না দিয়েও সহজেই যে মাসে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, যে-সম্মেলন আহ্বানের মূল কৃতিত্ব তা জওহরলালের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আগেই দেখে এসেছি। যে-সম্মেলনে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের যথেষ্ট আলোচনা হয়েছিল, ওয়ার্কিং কমিটি প্রারম্ভিক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রের উপরই অর্পণ করেছিল, অথচ বিস্ময়ের কথা তার কোনো উল্লেখ নেই ওয়ার্কিং কমিটির জুলাই-প্রস্তাবে।

[ক্রমশ]

---

occasion, we discussed, as some of you will remember, the problems of industrial reconstruction, development of power resources and power supply as will as the general question of co-ordination and Co-operation among the Congress Provinces."

৫ প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—বি জি খের (বোম্বাই), সি রাজাগোপালাচারী (মাদ্রাজ), গোবিন্দবল্লভ পন্থ (যুক্তপ্রদেশ), ডঃ খান সাহেব (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), ডঃ এন বি খারে (মধ্যপ্রদেশ), শ্রীকৃষ্ণ সিংহ (বিহার), বিশ্বনাথ দাস (উড়িষ্যা)।

আরও উপস্থিত ছিলেন—বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচার্য কৃপালনী, পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল, ডি কে মেহতা, দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র, আর এম দেশমুখ, পি বি গোলে, ডঃ সৈয়দ মামুদ, নিত্যানন্দ কানুনগো, ডঃ কে এন কাটজু, এ বি লাথে, কে এম মুন্সী, মোরারজী দেশাই, ডঃ এম ডি গিলডার, এল এম পাতিল এম ওয়াই নুরী।

৬ "A good deal of discussion was devoted to the question of the appointment of an inter-provincial expert Committee to collect data for the purpose of national reconstruction and social planning." (*Times of India*, May 16, 1938)

৭ "The Working Committee was unable to come to any decision regarding the personnel of the inter-provincial experts Committee, although various names of prominent economists were suggested. The matter for the time being has been left in the hands of the President to select the personnel in consultation with provincial Congress Committee." (*Times of India*, May 21, 1938)

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঈশ্বর গুপ্তের সুনির্বাচিত একটি কবিতা-সংগ্রহ পাওয়া গেলে ভাল হোতো। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর আয়ুষ্কালের শেষ দু'টি দশকে বাংলার সাহিত্যিক মনন যে একটি বড়ো বাঁক নিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এই দু'টি দশকের পরেই বাংলা বইয়ের বৈচিত্র্য বেড়ে গেছে—যথার্থ আধুনিকতা দেখা দিয়েছে।

আনন্দর এই মন্তব্য শুনে আমি বললুম—তার মানে? বিষয়ের বৈচিত্র্য তো ১৮৪০-এর আগেই দেখা দিয়েছিল। নানা ধরনের গদ্য-রচনা,—অভিধান, ব্যাকরণ,—বিজ্ঞান-গ্রন্থ,—এই সব শ্রেণীর বই তো শতাব্দীর প্রথম থেকেই ছিল,—এবং সে ধারা পরেও চলেছে।

সে বল্‌লে—আমি রচনার গুণগত বিশিষ্টতার ওপরেই জোর দিতে চাই। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, মধুসূদন দত্ত ইত্যাদি লেখকরা রচনার ক্ষেত্রে, সকলেই ছিলেন ১৮৪০-এর পরের আগন্তুক। ম্যালেন্সও ছিলেন সেই পঞ্চাশের দশকের লেখিকা। কালীপ্রসন্ন সিংহও এ'দেরই সমসাময়িক ছিলেন,—দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতিও। মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্বের কেন্দ্রীয় চরিত্র,—যেমন আগের পর্বে ছিলেন কেরি আর রামমোহন।

আমি বললুম সে-কথা স্বীকার করলুম,—কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সুনির্বাচিত কোনো কবিতা-সংগ্রহ নেই বললে যে,—এ মন্তব্যের মানে কি? তাঁর সব পদ্য-রচনাই কি মোটামুটি একই ধরনের নয়?—তার আবার নির্বাচন?

—ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁর ছোট ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কিছু কবিতার এক সংগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনটি পুস্তিকায় এই সংগ্রহের প্রথম তিন সংখ্যা প্রকাশিত হয়—বাংলা হিসেবে সেটা ১২৬৯ সালের কথা। ১২৭৬ সালে চতুর্থ সংখ্যা,— ১২৮০-তে একসঙ্গে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম সংখ্যা,—এবং ১২৮১-তে অষ্টম সংখ্যা ছাপা হয়। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় বলা হয়েছে—'আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই মনে হইতেছে।' রামচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত এই সংগ্রহ-পর্যায়ের নাম—'মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার সংগ্রহ।'

আনন্দ বললে—দ্যাখো, ঈশ্বর গুপ্তের সব কবিতাই এক জাতের নয়। বাছাই দরকার। ১২৯২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় তাঁর একখানি 'কবিতা-সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। এই কবিতাগুলি 'সংবাদ-প্রভাকর' থেকে নেওয়া হয়েছিল,—আর, এই বইয়েরই ভূমিকায় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ—'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ববিষয়ক প্রবন্ধ'। পরের বছর ১২৯৩ সালের মাঘ মাসে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড বেরোয়। তারপর ১৩০৬ সালে কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের সম্পাদনায় বসুমতী-অফিস থেকে ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী ছাপা হয়—এবং আরো পরে, সেখান থেকেই তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থাবলী বেরোয়। ১৩০৮ সালে মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সম্পাদনায় আবার তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। এইসব সংস্করণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু একালে কেউ যদি তাঁর সুনির্বাচিত একখানি কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করতেন, তাহলে সত্যিই বড়ো ভাল হোতো। সে-রকম ঘটলে বাংলা বইয়ের মেলায় ঈশ্বর গুপ্তের রচনার বেশ একটা বাছাই সম্ভব হোতো। বর্তমানে তাঁর অজস্র কবিতার ভিড়ে তাঁর যথার্থ ভাল লেখাগুলিও যেন হারিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এই যে তাঁর 'বোধেন্দু বিকাস'-এর কথা বলা হোলো, সেটির ওপরেও একালের পাঠকের নজর পড়া উচিত বলে মনে করি। তাঁর 'কালীকীর্তন' (১৮৩৩)—যা মূলে রামপ্রসাদ সেনের রচনা এবং যা তাঁরই বিশেষ প্রয়াসে সংগৃহীত হয়,—সে-বই আজকাল ক'জন পাঠকের পরিচিত? ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি যে ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত ছেপেছিলেন, তার ভূমিকায় তিনি লেখেন—"এতন্মধ্যে উক্ত মহাশয়ের প্রণীত অনেকগুলীন অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পদ প্রকটিত হইয়াছে,—সেই সকল কবিতা এ পর্যন্ত কাহারো নেত্র কর্ণের গোচর হয় নাই, তাহার মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি ও পারস্য ভাষার চমৎকার চমৎকার কবিতা আছে,......"

আনন্দর এই উচ্ছ্বাসের মধ্যেই আমাকে বলতে হোলো—আমাদের আলোচনা ছড়িয়ে পড়ছে আবার। নেত্র-কর্ণ খোলা থাক্, কিন্তু একটু রাশ টেনে সামনে এগুতে হবে। ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গে সময়ের ধারায় আবার পেছিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। বরং মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গে এগিয়ে যাবার আগে ঐ ভবানীচরণ-ঈশ্বর গুপ্ত-ম্যালেন্স-টেকচাঁদ ঠাকুর প্রভৃতি সমাজচিত্রীদের কথাটা আরো কিঞ্চিৎ ভেবে দেখা যেতে পারে।

সে বললে—তাহলে প্যারীচাঁদ এবং হুতোমের প্রসঙ্গ একযোগে ভাবা দরকার। মাখন দত্তগুপ্তের ছবিতে আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'নতুন সাহিত্য ভবন' থেকে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর একখানি সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৩৬৩ সালে। 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'রও অনুরূপ এক আধুনিক সংস্করণ দেখেছি। বই দুখানি চমৎকার লেগেছিল। ঈশ্বর গুপ্তের ঐ রকম একটি সংস্করণ বেরোয় না কেন?

এই প্রশ্নের পরে সে পুরোপুরি স্তব্ধ হয় নি। তার স্বগত উত্তর শুনতে পেলুম—এরকম বই যে বেরোয় না,—তার কারণ, প্রকাশকরা ঠিক রুচি-সৃষ্টির দিকে মনোযোগী নন। পণ্ডিত-পাঠকরা উদাসীন। পণ্ডিত-লেখকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রপাঠ্য বইয়ের টীকা-টিপ্পনী লিখতেই ব্যস্ত। 'নতুন সাহিত্য ভবনের' ঐ উদ্যম সত্যিই ভাল লেগেছিল।

আমি বললুম—কতকটা একই সময়ে হলেও প্যারীচাঁদ মিত্রের বই-ই আগে বেরিয়েছিল,—হুতোমের বই তার কয়েক বছর পরে বেরোয়। প্যারীচাঁদ নানা বিষয়ে ব্যাপৃত ছিলেন; হুতোম বোধ হয় সে তুলনায় নানাচারী ছিলেন না,—তাঁর আয়ুষ্কালও ছিল স্বল্প। আগে তাঁরই কথা উঠুক।

আনন্দ বললে—'হুতোম' কে ছিলেন,—তিনি সত্যিই কালীপ্রসন্ন না আর কেউ,—এ নিয়ে বিবাদ আছে; শুধু সংশয় নয়, পণ্ডিতে পণ্ডিতে বেশ বিবাদ করে থাকেন। কিন্তু তিনি যিনিই হোন, কালীপ্রসন্নই 'হুতোম' নামে পরিচিত। অতএব 'হুতোম' আর কালীপ্রসন্ন,—দুজনে একই মানুষ, এই পূর্বসংস্কার মেনে নিয়ে, আগে সেই কালীপ্রসন্নের ব্যক্তিজীবনের কয়েকটি ঘটনা দেখে নিতে চাই। প্যারীচাঁদ লেখক হিসেবে তাঁর পূর্বগামী সমকালীন ছিলেন বটে,—প্যারীচাঁদ নানা কাজে নিযুক্ত ছিলেন, সে-কথাও ঠিক। কিন্তু 'হুতোম'-ছদ্মনামে পরিচিত কালীপ্রসন্নও কম কাজের মানুষ ছিলেন না।

অতঃপর কালীপ্রসন্নের কথাই চললো।

খুবই অল্প আয়ুষ্কালের মধ্যে অনেক কাজ করে গেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০—৭০)। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায়' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কীর্তির বৈচিত্র্য এবং তাঁর শক্তির বেগ,—অর্থাৎ তাঁর বিভিন্ন কর্মের দ্রুত পারম্পর্য আর সহাবস্থানের কথা লিখেছেন। জোড়াসাঁকোতে কালীপ্রসন্নের প্রপিতামহ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বাস ছিল। কালীপ্রসন্নের জন্ম উপলক্ষে তাঁর পিতা নন্দলাল সিংহ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এক নাচের মজলিশের ব্যবস্থা করেন,—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাশ্মীরী শাল উপহার দেওয়া হয় সেই উৎসবে। ছেলেবেলায় হিন্দু কলেজে কিছুদিন পড়েছিলেন তিনি, আর বাড়িতে উইলিয়াম ক্লার্ক প্যাট্রিক নামে এক সাহেবের কাছেও রীতিমত তাঁর ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল বিসূচিকা রোগে তাঁর পিতা নন্দলালের মৃত্যু হয়। অতঃপর,—ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনায় বলা হয়েছে,—প্রতিবেশী হরচন্দ্র ঘোষ কালীপ্রসন্নের অভিভাবক এবং পিতৃসম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে বাগবাজারের বেণীমাধব বসুর কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বেণীমাধব তখন রংপুরের সদর আমীন ছিলেন। তের বছর বয়সে, ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের মে-জুন মাসে কালীপ্রসন্ন বাংলা ভাষা চর্চার জন্যে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রবর্তিত করেন। এই সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয় ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯-এ জানুয়ারি তারিখে—এবং এই কারণেই ব্রজেন্দ্রনাথ অনুমান করেছেন যে, এই সভার 'প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক।'

১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর একটি খবরে জানা যায় যে, বিদ্যোৎসাহিনী-সভা থেকে বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে লেজিসলেটিব কাউন্সিলে যে দরখাস্ত পাঠাবার ব্যবস্থা হয়, তাতে তিন হাজার ভদ্রলোকের স্বাক্ষর ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হয়েছিল এবং আরো যাঁরা ইচ্ছুক ছিলেন তাঁদের স্বাক্ষর দেবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ বছর জুলাই মাসে বিধবা-বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হলে কালীপ্রসন্ন প্রতিটি বিধবার বিবাহে বিদ্যোৎসাহিনী-সভার পক্ষ থেকে এক হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রায় একই সময়ে (১৯, নবেম্বর, ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর'-এর খবর—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা পৃষ্ঠা ২০-২৩ দ্রষ্টব্য।)—কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা পতিতা-পল্লীগুলি ভদ্রজনের বাসস্থানের সন্নিহিত না রেখে, এক জায়গায় পৃথক পল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে বিদ্যোৎসাহিনী-সভার সম্পাদক হিসেবে লেজিসলেটিব কাউন্সিলের কাছে আবেদন জানান কালীপ্রসন্ন।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ঐ সভা থেকেই জনসাধারণের এক পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। সেই সিপাহী-যুদ্ধের বছরটি কালীপ্রসন্নের নিজের জীবনেও ছিল খুবই ঘটনাবহুল। সেই বছরেই শেষদিকে 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' [৩, ডিসেম্বর] পত্রিকার এক খবরে দেখা যায় যে, বিদ্যোৎসাহিনী-সভার রঙ্গমঞ্চ তখন দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। অর্থাৎ ১৮৫৬-তে এই রঙ্গমঞ্চের সূচনা হয়—এবং ১৮৫৭-র ১১ই এপ্রিল, শনিবার সেখানে ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার'-এর রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত বঙ্গানুবাদের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে কালীপ্রসন্ন নিজেও যোগ দেন এবং তখন থেকে তাঁর নাটক রচনার আগ্রহ দেখা যায়। ১৮৫৭-র সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ২৪এ নবেম্বর বিদ্যোৎসাহিনী-রঙ্গমঞ্চে তাঁর সেই নাটকের অভিনয় হয় এবং কালীপ্রসন্ন নিজে পুরূরবার ভূমিকায় অভিনয় করেন। দেশে তখন নাটক আর অভিনয়ের দিকে খুবই মনোযোগ দেখা দিয়েছিল।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

ধরুন, বাচ্চার সবে সর্দি লেগেছে;—নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়েছে—গলা খুস্ খুস্ করছে। তক্ষুনি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান্ ভোগান্তি—নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি-কিছু আর বাকি থাকবে না-অযথা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা।

সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, কোনো কষ্ট পেতে হয় না—বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।

আর একটা কথা। ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায়-যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,-যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।

খুবই সহজ কাজ! তেতো বড়ি বা, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না।

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,—সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে—

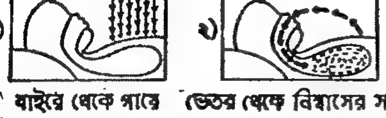

১) বাইরে থেকে গায়ে ২) ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে-
২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব—নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

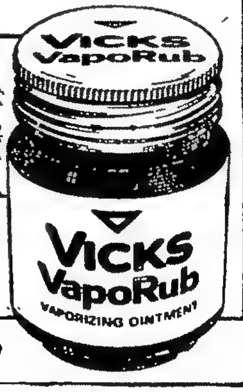

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

কম্পাস

জয়ন্ত সাহা

মধ্যাহ্নের দিনগুলো পাড়ি দিতে
তুলেছি নোঙর;
সমুদ্রে উঠেছে ঝড়
বেদুইন ঝড়
নিয়ে গেছে বহু দূরে
অজানা গভীর অন্ধকারে।

দড়ি ছিঁড়ে দাঁড় ভেঙে
উড়িয়ে নিয়েছে পাল
কত বার ভেঙে গেছে
বিশ্বস্ত মাস্তুল
খুলে গেছে পাটাতন সমুদ্রের ঢেউয়ে।
বিপন্ন জোয়ার জলে
তবুও তোমার জন্য
আমার হৃদয়—

যত দূরে যাই
যেখানেই থাকি
আমার হৃদয় যেন
কম্পাসের মত।

এই তো সে দিন
দুদণ্ড সময় নিয়েছিলে।
প্রচ্ছন্ন কাশের বনে হেমন্তের শেষে
কুয়াশা নীরব দুটি চোখ
সমুদ্রের বাঁকে বাঁকে
আজও চোখে পড়ে;
নোনা জলে মোছে নাই
তোমার দোহার।

এরই মধ্যে জীবনের যাদুঘরে
জমেছে অনেক পুঁথি
উড়ে গেছে খোলা পাতা
বহু পঞ্জিকার।
তবুও আমার
হৃদয় কম্পাস
তুমি আছো
সমগ্র উত্তর জুড়ে।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন—'এক্ষণে দেশে নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে।' বহরমপুরের রামদাস সেন ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মে তারিখের 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায় লেখেন—

'আহা কি আহ্লাদ।
পয়ার।
নিত্য নিত্য শুনতে পাই অভিনয় নাম
অভিনয়ে পূর্ণ হলো কলিকাতা ধাম।

কিন্তু নাটকের দিকে এই আগ্রহের ব্যাপার কালীপ্রসন্নের জীবনের নানা দিকেরই এক দিক। মদ্যপানের রুচি, কৌলীন্যপ্রথার ব্যাধি, বিধবার যন্ত্রণা, বহুবিবাহের কুফল ইত্যাদি সেকালের নানা সামাজিক ঘটনার মধ্যেই তিনি তাঁর শুভ সংকল্প নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন। 'বিদ্যোৎসাহিনী' ছিল তাঁর সেই আপন রুচিরই সংকেত।

বিদ্যোৎসাহিনী-সভায় দেশের সাহিত্য এবং সমাজবিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা তো ছিলই, তাছাড়া সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগী সমাজহিতৈষী কোনো কোনো মনীষীর সংবর্ধনারও আয়োজন হোতো। উনিশ শতকে দেশের পক্ষ থেকে বিশেষ কবি বা লেখকের সংবর্ধনার সূচনা এই বিদ্যোৎসাহিনী-সভা থেকেই ঘটে। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি এই সংবর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়—অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনার জন্যে মধুসূদনকে অভিনন্দিত করা হয়। ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কালীপ্রসন্নের নামে প্রচারিত এই সংবর্ধনা-সভার ইংরেজি আমন্ত্রণপত্র থেকে জানা যায় যে, সন্ধ্যা—সাতটায় কালীপ্রসন্নের বাড়িতেই সেই অনুষ্ঠান হয়। ফাল্গুনের সেই সন্ধ্যায়,—রবীন্দ্রনাথের জন্মের মাত্র মাস দুয়েক আগে,—অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টির গৌরব-স্বীকৃতির অনুষ্ঠানে মানপত্রের উত্তরে মধুসূদন অল্প কয়েকটি কথায় তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। সেই ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র আষাঢ়-সংখ্যায় মেঘনাদবধ কাব্যের প্রশংসাসূত্রে মধুসূদনের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের প্রতি দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কালীপ্রসন্ন। 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌সা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সূচনার দুটি কবিতা উল্লেখ করে ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া সর্বপ্রথম কালীপ্রসন্ন সিংহই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।'

বিদ্যোৎসাহিনী-সভার পক্ষ থেকে পাদরী লঙ্‌ সাহেবকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। 'নীলদর্পণ'-এর ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করার অভিযোগে সেই ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ২৪-এ জুলাই সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সার মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স রেভারেণ্ড লঙ্‌-সাহেবের এক মাস জেল আর এক হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন। কালীপ্রসন্ন নিজে অযাচিতভাবে আদালতে সেই জরিমানার টাকা জমা দেন। তার কয়েক মাস পরেই সাহেব দেশে ফিরে যান। এবং তাঁর এই স্বদেশ-যাত্রার আগেই বিদ্যোৎসাহিনী-সভা তাঁকে সংবর্ধিত করেন।

[ক্রমশ]

বঙ্গ দর্শন

শেষ পর্যন্ত কি পশ্চিমবঙ্গেও কেরালার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে? একটি প্রখ্যাত ইংরাজী দৈনিকে কয়েকদিন আগে আভাসে ইঙ্গিতে এই কথাই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ-যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে একটি মিনিফ্রন্ট গড়ে উঠছে, যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এখানে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসন্ন। তবে সংবাদটির ধরণ দেখে মনে হয় যে, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। গত ১০ই নভেম্বর তারিখে ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির বৈঠকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ওই দল মিনিফ্রন্টের শরিক হবার ব্যাপারে নেই, তবে নাকি এই বিষয়ে কিছু প্ররোচনা চলছে। বলা বাহুল্য, এগুলি সবই হাওয়ার খবর, নিছক গুজব ছাড়া আর কিছুই নয়, তবে এটুকু আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, রাজনৈতিক দলের নেতারা গুজব ছড়ান এবং গুজবে কান দেন, এটাই তাঁদের রীতি, যার ফলে অনর্থ বড় কম ঘটে না।

যুক্তফ্রন্ট চলছে এবং চলবে, পশ্চিমবঙ্গে কেরালার অবস্থা হবে না, একথাটা অনেক নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়। এর কয়েকটি কারণ আছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সংগ্রামী ঐতিহ্য অতুলনীয়, এখানে যুক্তফ্রন্ট দলীয় নেতাদের ইচ্ছায় গড়ে ওঠে নি, বরং জনগণই নেতাদের যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে বাধ্য করেছে। এখানে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ চলবে না, ধাপ্পা দিয়েও কাজ হবে না, বড় বড় বুলির অন্তরালে জনগণকে ভাঁওতা দেওয়া যাবে না। বস্তুত স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যেও যুক্তফ্রন্ট সরকার যে বলার মত কিছু করতে পেরেছে, তা না করলে চলত না বলেই। পশ্চিমবঙ্গের ন'মাসের তুলনায় কেরলের আড়াই বছরের কোন কৃতিত্ব নেই। সেখানকার মানুষ পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে অনেক বেশি অনগ্রসর, তা উপজাতীয়, সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্ন মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত। কেরালায় শিক্ষিতের হার বেশি এবং সেখানে কংগ্রেস শাসন কোনদিনই টেকে নি, এই যুক্তিতে কেরলবাসীর রাজনৈতিক পরিপক্কতাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট এই কারণেই টিকবে যে, এখানে যদি কোন দল যুক্তফ্রন্ট ভাঙার দায়িত্ব নেয়, তাহলে সেই দলকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিশ্চিহ্ন হতে হবে।

তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট দলগুলি ভালো করেই জানে যে, যুক্তফ্রন্ট না থাকলে তাদের অবস্থাটা কি হবে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার চলাকালীন এক শরিকদল অন্য শরিকদলের শ্রাদ্ধ করেছে, আর যে মুহূর্তে সেই সরকার উল্টে গেল তখন গলাগলি করে কান্নার সে কি ঘটা! এবার যদি যুক্তফ্রন্ট সরকার ওলটায়, রাষ্ট্রপতি শাসন ও পরবর্তী নির্বাচন যে ঘড়ির কাঁটা ধরে হবে তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? এতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না, এবারে তা আছে, সেখানে ক্ষমতার লড়াই-এ এখনো পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী জয়ী হচ্ছেন বটে, কিন্তু এ জয় যে ক্ষণিকের নয় তা কে বলতে পারে? কেন্দ্রে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যদি কিছুকালের জন্যও সাফল্য লাভ করে, তার ধাক্কা সামলাতে যুক্তফ্রন্টের অনেক শরিক দলেরই অস্তিত্ব রক্ষার সংকট দেখা দিতে পারে না কি? দ্বিতীয়ত, এ কথাটা অস্বীকার করার কি উপায় আছে যে, আজকে যুক্তফ্রন্টের প্রতিটি শরিক দলেরই যে বাড়-বাড়ন্ত (যদিও এই বৃদ্ধি সকলের ক্ষেত্রেই সমান হারে ঘটছে না এবং সেই কারণেই এত দ্বন্দ্ব) তা সম্ভবপর হচ্ছে সরকারে থাকার জন্যই? কাজেই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারতে কে আর রাজী হবে?

কাজেই যুক্তফ্রন্ট সরকার চলছে এবং চলবে, কিন্তু যেভাবে তা চলছে এবং যেভাবে তা চলবে বলে মনে হচ্ছে সেটা মোটেই কাম্য ও শোভন নয়। আজ ন'মাস ধরে তিক্ত দলাদলি এবং শরিক দলের ক্ষমতা বাড়াবার নির্লজ্জ ও অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা চলছে। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দল বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তর বাঁটোয়ারা করে নেবার পর আর যৌথ দায়িত্বের বালাই বড় বেশি নেই। সকলেই যে যার দপ্তরের ডিক্টেটর হয়ে বসে গেছেন। এক এক পার্টি এক এক কণ্ঠস্বরে কথা বলছেন। যুক্তফ্রন্ট কার্যত বিযুক্তফ্রন্টে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি দলীয় প্রচারপত্র একে অপরের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত প্রচার করে চলেছে। মাঠে-ময়দানে জনসভায় প্ররোচনামূলক বক্তৃতা চলছে এবং প্রকাশ্যেই শরিকী সংঘর্ষে উস্কানী দেওয়া হচ্ছে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে যে সাত-দফা কর্মসূচী যুক্তফ্রন্ট গ্রহণ করেছিল তা গ্রহণ করার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেই কর্মসূচীকে কার্যত বাতিল করা হয়েছে।

যুক্তফ্রন্টের প্রধান দুটি শরিকদল মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলা কংগ্রেস, একে অপরের নিকট থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং রাজ্যে জঙ্গলের শাসন চলছে এই কথা ঘোষণা করে সত্যাগ্রহ করতে চলেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অভিনব পরস্পরবিরোধী হাস্যকর ব্যাপার বোধ হয় আর ঘটে নি, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যটাও তো আর মিথ্যে নয়। প্রত্যহ সংবাদপত্রের পাতা খুললেই শরিকী সংঘর্ষের ঘটনা যে প্রতিনিয়ত চোখে পড়ছে সেটাকে কি মিথ্যা, মায়া, ভ্রম, বুর্জোয়া অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব? যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি কি চান? দলের নেতারাই বা কি চান? সংগঠনের মাথায় চেপে উল্টো-পাল্টা উদ্ভট বুলি দিয়ে নিজেদের নেতৃপদের মহিমা কি জনগণকে বোঝাতে চান? তাঁরা কি চান তাঁদের দলীয় মন্ত্রীরা দাবার বোড়ের কাজ করবে আর তাঁরা আড়াল থেকে সুতো টানবেন?

কিন্তু বাস্তবে সেই ঘটনাটাই ঘটেছে। প্রতিটি দলের শীর্ষেই যাঁরা বসে আছেন, কি মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির, কি বাংলা কংগ্রেসের, কি ফরোয়ার্ড ব্লকের, প্রত্যেকেই গোড়া থেকে এক অদ্ভুত নেপথ্য রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। মন্ত্রিসভার সদস্যরা নানা কাজের মধ্য দিয়ে যখনই একে অপরের সঙ্গে নিকটতর হচ্ছেন, তখনি পিছন থেকে টান আসছে, দলনেতা অপরের হাড়-জ্বালানো গরম গরম বিবৃতি দিয়ে মন্ত্রিসভার সদস্যের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ বপন করে চলেছেন, একথা প্রমোদবাবু, সুশীলবাবু, অশোকবাবু সকলের সম্পর্কেই খাটে। যে সম্ভাবনার সূচনা পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছিল ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা, এঁদের অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে তার সর্বনাশ ঘটতে চলেছে? এককালে বঙ্গেশ্বর বলতে একজনকেই বোঝাত, আজ ডজনখানেক নব বঙ্গেশ্বরের পাল্লায় পড়ে পশ্চিমবঙ্গের সমূহ সর্বনাশ হতে চলেছে।

কারণটা সহজেই অনুমান করা যায়। সেটা হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট-সম্পর্কে কোন দলেরই আসলে কোন আগ্রহ নেই। প্রতিটি দলই চায় যে যুক্তফ্রন্টই তাদের পাকাপাকি ক্ষমতায় আসার পক্ষে একটা উপায় মাত্র। যুক্তফ্রন্ট বা তার সাফল্য লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য এককভাবে নিজেদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার জন্য যুক্তফ্রন্ট একটা ক্ষণস্থায়ী হাতিয়ার-ছাড়া আর কিছুই নয়। এই উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রায় প্রতিটি দলই চালিত হচ্ছে এবং যে দপ্তর যে দলের অধীন, সেই দল সেই দপ্তরকে পুরোপুরিভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে। সংশ্লিষ্ট দলের তরফ থেকে অবশ্য এই কথার প্রতিবাদ আসতে পারে বটে, কিন্তু প্রতিবাদ এলেই ব্যাপারটি মিথ্যা হয়ে যায় না। যুক্তফ্রন্ট যে তাঁদের লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র, এ-কথাটা কোন দলনেতাই গোপন করেন না; মাঠে-ময়দানে, সভা-সমিতিতে সর্বত্রই বলে যাচ্ছেন, না বললে তাঁদের বৈপ্লবিকতা নাকি প্রমাণিত হয় না।

কিন্তু এইসব কার্যাবলীর দ্বারা শুধু যুক্তফ্রন্ট সরকারই নয়, শরিক দলগুলিও যে কার্যত আত্মহননের পথে যাচ্ছে, এটা দলের বাইরে থেকে সাধারণ বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ যত সহজে বুঝতে পারে, দলের মধ্যে থেকে, অজস্র সাকরেদ আর স্তাবক পরিবৃত হয়ে দলের 'অসাধারণ' নেতারা বুঝে উঠতে পারেন না। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতেই তাঁরা ভয় পান। বস্তুত যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির প্রত্যেকেরই যে পূর্বের তুলনায় শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে, তা হয়েছে শুধুমাত্র যুক্তফ্রন্টেরই কল্যাণে, ঐক্যের মাধ্যমে, এটা পরীক্ষিত সত্য। জনগণ আজ যেটুকু অধিকার অর্জন করতে পেরেছেন, তা সম্মিলিত সংগ্রামের ফলেই হয়েছে। এই সোজা বিষয়টিকে অস্বীকার করার ফল যে কতদূর বিষময় হতে পারে তা হয়ত দলীয় শক্তিবৃদ্ধির অহমিকায় অন্ধ নেতারা বুঝতে পারছেন না। তাঁরা শুধু নিজেদেরই কবর খুঁড়ছেন না, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনেরও সর্বনাশ ঘটাচ্ছেন।

যুক্তফ্রন্ট চলছে ও চলবে, এই বলে বর্তমান নিবন্ধের সূচনা করা হয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট চলছে ও চলবে এই অর্থেই যে আজও পর্যন্ত সম্পূর্ণ দলীয় স্বার্থে বিভিন্ন শরিক দলের কাছে যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজন একেবারে ফুরোয় নি। এখনো পর্যন্ত দলীয় প্রয়োজন সিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে যুক্তফ্রন্টকে ব্যবহার করা চলে বলেই নববঙ্গেশ্বরেরা মনে করেন, তাই পারস্পরিক গলা কাটাকাটি ও খিস্তি-খেউড় সত্ত্বেও আরও কিছুকাল যুক্তফ্রন্ট চলবে। আর, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, গুঁতোয় পড়ে নেতাদের কাণ্ডজ্ঞান হয়ত ফিরেও আসতে পারে।

আসন্ন ধান কাটার মরশুম

এবারে পশ্চিমবঙ্গে রেকর্ড পরিমাণ ফলন হয়েছে, কিন্তু ধান কাটার দিন যতই এগিয়ে আসছে একটা অজানা আশঙ্কা সকলকেই আচ্ছন্ন করছে। প্রত্যেকেরই এক প্রশ্ন, ধান কাটার মরশুমটা শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হবে তো? এবং একথাও সত্য যে, ভালোয় ভালোয় এই পর্বটা চুকে গেলে যুক্তফ্রন্ট সরকারেরও একটা বড় ফাঁড়া কাটবে, শরিকী হানাহানিও অনেকটা বন্ধ হবে।

ধান কাটা উপলক্ষে খুন-জখম অবশ্য নতুন নয়। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা অন্যরকম। এই প্রথম বহু বেনামী জমি উদ্ধার করা হয়েছে, যা আগে কোনদিন হয় নি। সেই সব জমিতে চাষও করা হয়েছে। বেনামী জমির বে-আইনী মালিকানা এতদিন যাদের ছিল তারা অনেকে আবার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই হোক, বা যে-কোন কারণেই হোক, আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। এখন এদের মতলব এদের এতদিনের অধিকারে থাকা এই বে-আইনী জমিগুলির ফসল এরা নিজেরাই যেমন করে হোক ঘরে তুলবে, দরকার হলে বলপ্রয়োগেও দ্বিধা করবে না।

পক্ষান্তরে যারা ঐ জমিগুলি সত্যই চাষ করেছে এবং ফসল ফলিয়েছে তারাও এবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, ওই ফসল তারা নিজেদের ঘরে তুলবে। সরকারের তরফ থেকেও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যে বা যারা ওইরূপ জমিতে চাষ করেছে এবং ফসল ফলিয়েছে, সে বা তারাই ওই ফসল ঘরে তুলবার অধিকারী। এই বিষয়ে সরকার পূর্ণ সমর্থন দেবেন এবং অজস্র ক্যাম্প কোর্ট বসানো হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য ফসল তোলার ব্যাপার নিয়ে যদি কোন গণ্ডগোল হয় তাহলে তড়িঘড়ি অবস্থাটাকে আয়ত্তে এনে যার ন্যায্য পাওনা তাকেই ফসল তুলতে সাহায্য করবে।

কিন্তু ব্যাপারটা যদি শুধুমাত্র এই-ই হত, অর্থাৎ বে-আইনী জমির তথাকথিত মালিকদের সঙ্গে ওই জমিতে যারা চাষ করেছে তাদের সংঘর্ষ, তাহলে বিষয়টি নিয়ে এত চিন্তার ছিল না। কেন না, সেখানে সরকার ও সরকারী প্রয়াস ওই বঞ্চিত শ্রেণীর পক্ষেই থাকবে। কিন্তু এর মধ্যে রাজনীতির ভূত-ও প্রচুর পরিমাণে ঢুকেছে। এবং তারই ফলে সমস্যাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে রীতিমত জটিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন স্বার্থের বিভিন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে এবং গণ্ডগোলটা সেখানেই।

প্রকাশিত হল

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ

SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

সংকলক : শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

সংশোধক : ডঃ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

চন্দ্রাভিযানের ফলে যে শব্দসমূহ প্রচলিত হইয়াছে, সেগুলি সহ প্রায় ৫৫০০ শব্দ ও প্রবচন এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে এবং অভিধানটি আগাগোড়া সংশোধন করা হইয়াছে। অধুনা প্রচলিত শব্দাবলী নির্বাচনে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজি ও বাংলায় উচ্চারণ সংকেত ও শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে। সর্ববৃত্তিধারীর বিশেষ করিয়া ছাত্রদের অপরিহার্য সঙ্গী। ১২৭+১৬ পৃষ্ঠা, ডিমাই অক্টেভো আকার, মজবুত বোর্ড বাঁধাই। [১৫·০০]

আমাদের অন্যান্য অভিধান :

সংসদ বাংলা অভিধান [৮·০০]

SAMSAD BENGALI-ENGLISH DICTIONARY [১২·০০]

SAMSAD LITTLE ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

[বোর্ড বাঁধাই ৭·০০ ; সাধারণ বাঁধাই ৫·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-৯ [৩৫-৭৬৬৯]

অনেকক্ষেত্রে বে-আইনী জমির পূর্বতন দখলদার, হয়ত সে জোতদার শ্রেণীর লোক, কোন একটি তথাকথিত প্রগতিশীল দলের আশ্রয় নিয়েছে এবং যে সত্যই ওই জমিতে চাষ করেছে সে-ও আর একটি তথাকথিত প্রগতিশীল দলকে আশ্রয় করেছে। এরকম ক্ষেত্রে অবস্থাটা যে কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

দ্বিতীয়ত দলীয় প্রভাব বাড়ানোর এটাও একটা মস্তবড় মওকা। যেখানে যে দলের সংগঠন নেই সেখানে সেই দল এই মওকায় নিজেকে অনুপ্রবিষ্ট করতে সক্ষম হবে। এইটাই হচ্ছে ধান কাটার মরশুমের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক এবং মূল সমস্যা এখানেই। ধরা যাক, কোন একটি এলাকায় "ক" পার্টির প্রভাব আছে। অবশ্যই ফসল তোলার মরশুমে ওই "ক" পার্টি বঞ্চিত শ্রেণীর পক্ষ নেবে। "খ" পার্টির সেখানে কোন ঘাঁটি নেই। এই ফসল তোলাটা "খ" পার্টির কাছেও একটি মওকা। সেও তখন ওই এলাকায় গিয়ে কিছু লোকের হয়ে ওকালতি করবে, তাদের মদত দেবে, এমন কি দাবি অন্যায় হলেও। ফলে সংঘর্ষ-হানাহানি অনিবার্য।

কাজেই দলীয় নেতাদের সুবুদ্ধির ওপরই আসন্ন ধান কাটার মরশুমের সাফল্য নির্ভর করছে। যে কয়েকশো মানুষ মারা যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে তাদের প্রাণরক্ষা হয়ত হতে পারে, যদি এই ধান কাটার মরশুমকে নোংরা পার্টি-বাজির আসরে পরিণত করতে নববাংলা-শ্বরেরা বিরত হন। কিন্তু তাঁদের সে সুবুদ্ধি হবে কি?

বড়বাজারী তাণ্ডব

ক'দিন আগে বড়বাজারের দোকানদার, ব্যাপারী ও মহাজনেরা রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সামনে যে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে, তার নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। বিক্ষোভ জানাবার, মহাকরণের সামনে সমবেত হবার, মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলবার অধিকার সকলেরই আছে একথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বড়বাজারের ওই বাহিনী কি উদ্দেশ্যে রাইটার্স বিল্ডিংস ঘেরাও করেছিলেন সেটা আমাদের বোধগম্য হয় নি। যেসব মুটে-মজুর তাঁদের মালপত্র এখানে-ওখানে বহন করে, তাদের কিছু দাবি-দাওয়া ছিল। কিন্তু বলাই বাহুল্য, এখানকার মিল-মালিকরা যেমন শ্রমিকদের তাদের রাজ্যের প্রজা বলে মনে করে এবং মজুরী বৃদ্ধির দাবি যেমন রাজদ্রোহের সামিল, পারে তো সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় লক-আউট করে দেয়, বড়বাজারের একদল দোকানদার তাই করেছিল, একদিন দোকানসমূহ বন্ধ রাখা হয়েছিল, অবশ্য ওজরের অভাব ছিল না, মুটে-মজুরেরা নাকি মারমুখী হয়েছিল, ইত্যাদি। সে যাই হোক, ওই দোকানদার-ব্যবসায়ী মহাজনেরা কি উদ্দেশ্যে সে রাইটার্স বিল্ডিংসে হাঙ্গামা করেছিল সে তারাই জানে। যাই হোক, ঘটনা যতদূর জানি, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বেরিয়ে এসে তাদের বলেছিলেন যে, তাদের যদি কোন অভিযোগ থাকে তিনি বিচার করে দেখবেন এবং দু'-চার দিনের মধ্যেই ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। এরপরেই এই দোকানদার-ব্যবসায়ী-মহাজনদের শান্তিপূর্ণভাবে ওই স্থান ত্যাগ করা উচিত ছিল, এই রকম ডেপুটেশনের যা রীতি। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা এতে শান্ত হল না। তারা দাবি করল—উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুকে চাই। জ্যোতিবাবু বলে পাঠালেন যে, যা বলার তা তো অজয়বাবু বলেই দিয়েছেন, কাজেই তাঁর আর ওখানে যাবার প্রয়োজন নেই। সঙ্গে সঙ্গে দাবি বদলে গেল। এতক্ষণ যারা হাঁক পাড়ছিল 'জ্যোতিবাবুকে চাই', এবার তাদের দাবি উঠল 'জ্যোতি বসু মুর্দাবাদ'। আর শুধু 'জ্যোতিবাবুই' নন, তাঁর নামের আগে ও পরে অজস্র বিশেষণ যুক্ত হল। তারপরেই ইট-পাটকেল ছোড়া শুরু হল, একদম ঘড়ির কাঁটা ধরে, নিয়মমাফিক। যা হোক মনে হলো যে, তারা হামলা করতেই এসেছিল। অগত্যা পুলিশ আর কাঁদানে গ্যাস। বিষয়টিকে সহজে ছেড়ে দেওয়া সরকারের পক্ষে উচিত হবে না বলেই আমরা মনে করি।

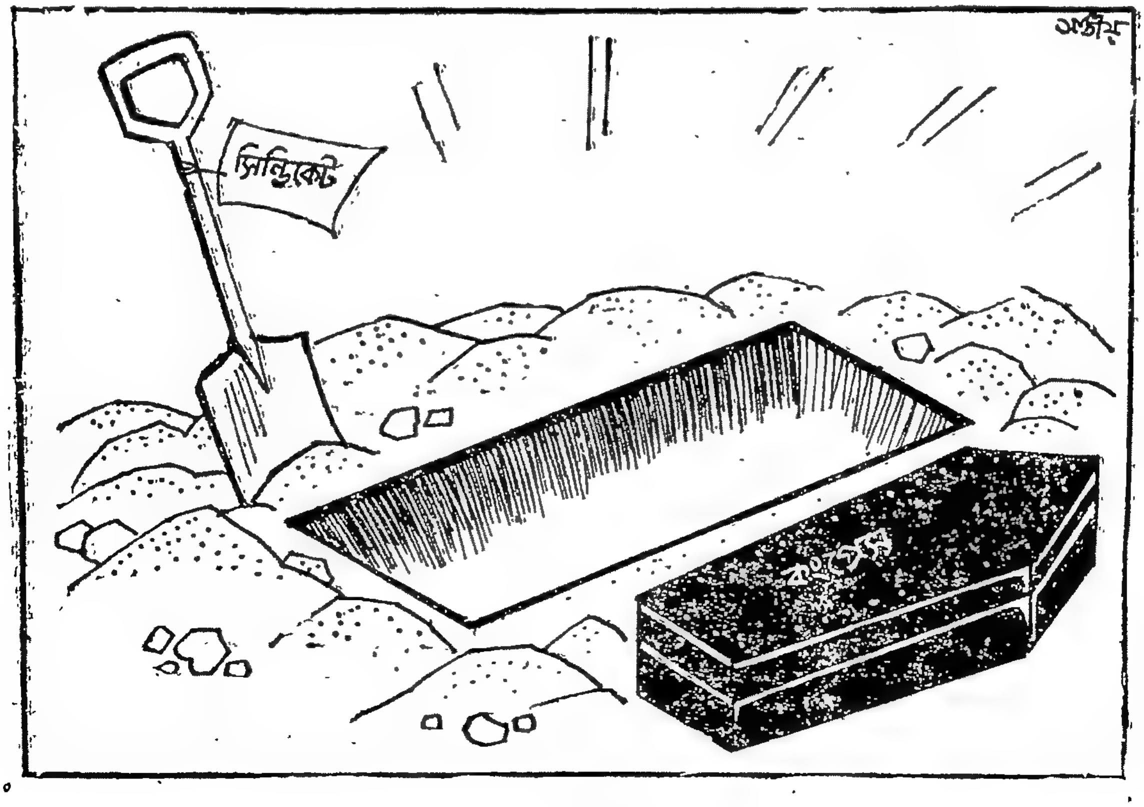

অতীত স্মৃতি

আর একটি যুগসন্ধিক্ষণ

১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনের পর গত ১৩ই নভেম্বর শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি বিতর্কিত (সিন্ডিকেট পন্থীদের ওষ্ঠে) তিনশ' তিরিশজন সংসদ সদস্যের সমর্থনের সংবাদ পত্রস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাসে আর একটি দিক পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। যদিও ১৩ই নভেম্বরকে ১৯৬৭-রই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি বলে বর্ণনা করার দাবি ইতিপূর্বেও 'ভারতদর্শনে'র পাতায় নথিবদ্ধ করে রেখেছি। একই দাবি রেখেছিলাম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে রেড্ডি-গিরি পাঞ্জা-লড়াইয়ের সময়েও। এবং ১৩ই নভেম্বরের পরে, (অনেকের মতো সুর পালটে কথা বলার মেজাজে নয়), '৬৭-র পর থেকেই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে 'ভারতদর্শন' বলে আসছিল, দিন পালটেছে, পালে হাওয়া লেগেছে, উটপাখীর মতো আর বালিতে মুখ গুঁজে থুবড়ে উপুড় হয়ে থাকার সুযোগ নেই, কান্ডারী হুঁসিয়ার! বলা বাহুল্য, পন্থ-প্রধানের সিন্ডিকেটের বধির শ্রবণেন্দ্রিয়ে এ-ডাক পৌঁছয় নি। এ-ডাকের তাৎপর্য বোঝার মতো রাজনৈতিক পরিশীলিত দৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র জনসঙ্ঘ এমন কি বিস্ময়ের বিষয়, এস এস পি'র মতো দলগুলিও বঞ্চিত। এঁরা একত্রে ভারতের বুকে নতুন এক হোয়াইট নাইট সম্প্রদায়ের রূপ গ্রহণ করবার জন্য কাঠের তরবারিতে ধার দিচ্ছেন। ওঁদের রিপ ভ্যান উইঙ্কল-ঘুম সম্ভবত আর ভাঙবে না। মাত্র গত সংখ্যার আগের সংখ্যায়ই প্রস্তাব ছিল 'ভারতদর্শনে',—গাম্পাজী সরে দাঁড়ান! অবশ্য প্রস্তাবটি আদৌ সিরিয়স করবার বাসনা ছিল না। কারণ জমিদারের পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট যখন ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল তখনও এবং তার পরেও তাঁরা মৌরসীপাট্টা ছাড়তে নারাজই ছিলেন। আজও জোতদারের ছদ্মবেশে এঁরা ভারতের মাটি কলঙ্কিত করে বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টায় কসুর করছেন না; যেমন রাজারা মাসোহারা বজায় রাখতে আজও এককাট্টা; একচেটিয়া কোটিপতি কোটি কোটি মুনাফার পেছনে অন্ধভাবেই ধাওয়া করে ছুটছেন। কিন্তু তবুও, অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকবে না। যুগসন্ধির সীমানায় দাঁড়িয়ে পেছনের বিদীর্ণ আহ্বানে জনস্রোত কর্ণদান করবে না। অথচ গলিত নখদন্ত শ্মশানযাত্রীকে কে দেখাতে পারে পূব আকাশের নতুন রাঙা সূর্যের ফাগুয়া। তাই ওদের, ওদের মতোই আপন কফিনে মণিরত্ন সাজাতে দিতে হবে যতক্ষণ না নরখাদক পিরামিডের গুপ্তধন নির্ধন ডাকাতের হাতে তছনছ হচ্ছে। সেই আতঙ্কও অনেকেরই চোখমুখে পরিস্ফুট। ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি যে মধুর সম্ভাষণ পাল্টা শিবির থেকে বর্ষিত হচ্ছে তার পেছনে সেই আতঙ্কিত মুখগুলি আরও কালো হয়ে গেছে। ডাকাতের ভয়ে একদিন মিশরের বিচ্ছিন্ন পিরামিড থেকে শতখানেক ফারাও-এর কফিন এনে জড় করা হয়েছিল একটি নিরাপদ পিরামিডের আশ্রয়ে। তবে ইজ্জৎ গেছল ফারাওদের। গণ-ডাকাতের ভয়ে এখন প্রতিক্রিয়াশীলরা একটিই কবরখানা খুঁজছেন। এককাট্টা হয়ে মৌরসীপাট্টা বাঁচাবার ব্যর্থ প্রয়াস করছেন। সিন্ডিকেট চাইছে সি পি পি গড়তে; স্বতন্ত্র জনসঙ্ঘ চাইছে গান্ধী গভর্নমেন্টের প্রতি অনাস্থার খড়্গাঘাত হানতে আর এস এস পি'র মতো পার্টি-গুলো মুখোস ঢেকে সতর্কভাবে এগোবার চেষ্টা করছে। তবে সুখের বিষয়, শোনা যাচ্ছে, হাওয়ার নিশানা দেখে এসব দল থেকেও একটা বিশিষ্ট সংখ্যক সদস্যের দলত্যাগ ঘটবে। আত্মঘাতকদের সঙ্গে অনেকেই হাত মেলাতে চাইবেন না। আমেন!

কংগ্রেস কার?

বলাই বাহুল্য, ন'জন ক্ষমতাচ্যুত গোঁসাকারী বৃদ্ধের যুগপরিবর্তনের কঠোর বাস্তবিকতা মেনে নেওয়ার অক্ষমতা আশি বছরের সাবালক একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দিতে পারে না। পারলে কংগ্রেসের অস্তিত্বই হাস্যকর হত। ঐ বৃদ্ধ কতিপয় কংগ্রেসের গৃহীত নীতিকে কার্যে রূপায়ণে আতঙ্কিত; ঐ বৃদ্ধ কতিপয় মুষ্টিমেয়ের হাতে সমগ্র দেশের শুভাশুভকে মুষ্টিবদ্ধ করে রাখতে উৎসুক; ঐ বৃদ্ধ কতিপয় আপন স্বার্থে সমগ্র সংগঠনকে সমূলে দুর্বল করতেও চেষ্টার কসুর করছেন না—এ হেন দলদ্রোহীরা আর যাই হোন, কংগ্রেসী নন এবং ন্যায্যত তাঁরাই কংগ্রেস থেকে দলছুট। কংগ্রেস তাঁদেরই যাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর আশাবাদী কয়েকটি কর্মনীতিকে ক্যাপিটল করে নব-পর্যায়ে পদযাত্রা শুরু করতে উৎসুক। মাত্র তিনটি প্রদেশ ছাড়া ভারতের সংখ্যাগুরু সব ক'টি প্রদেশ থেকেই তাই আগ্রহ দেখা দিয়েছে ভুয়ো কংগ্রেসীদের হটিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে প্রকৃত কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য। একে নিছক সাময়িক ক্ষমতালিপ্সা বললে ভুল হবে, আজকের পরিস্থিতি বহুদিনের আভ্যন্তরীণ দলীয় সংগ্রামেরই ফলশ্রুতি। সিন্ডিকেট-নামী একদল কুচক্রীর লালসার কাছে শেষ পর্যন্ত স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর শুভ-ইচ্ছাও সেদিন সাফল্য লাভ করতে পারে নি; সৌভাগ্যত অশীতিতম নেহরু-জন্মদিবসের ঠিক প্রাক-মুহূর্তে নেহরু-কন্যা সেই ব্যর্থতার বেদনাকে জয়ের বিজয়-হাস্যের স্পর্শে মুছিয়ে দিলেন। কুচক্রীরা যন্তরমন্তর রোড থেকে পশ্চাদ-পসরণ করে মোরারজী ভবনে একটি মৃত সৈনিকের আসর বসিয়েছিলেন মাত্র। দ্বিতীয় সি পি পি'র বৈঠক তলব ব্যর্থ হয়ে গেছল। মোরারজী বৈঠকে সিন্ডিকেটী পাঁচজনের উঁকি এঁকে উপস্থিত হয়েছিলেন মাত্র জনা কুড়ি সংসদ সদস্য এবং দল ভারী করার জন্য আরও জনাচল্লিশেক মানুষ। ১৩ তারিখটা সত্যি অলক্ষুণে না সুলক্ষণা অতঃপর সেকথাও মনে হয়েছে আমার। অলক্ষুণে অবশ্যই সিন্ডিকেটীদের কাছে, কিন্তু ১৩ই নভেম্বর ভারতের ইতিহাসে একটি সুক্ষণ সমুপস্থিত করল, যাতে সন্দেহ নেই। এহেন

অবস্থায় শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে সংসদে আস্থা ভোট চাওয়ার আইনত ছাড়া প্রকৃত কোনো প্রয়োজন নেই। যেক্ষেত্রে মহান দেশবাসীর শুভ ইচ্ছা তাঁকে ঘিরে আছে সেখানে এস এস পি জনসংঘ স্বতন্ত্র সিণ্ডিকেটের মুষ্টিমেয় কুচক্রী এম পি'র মুখব্যাদন ফুৎকারেই উড়ে যায়। তবে আইন বলে একটা কথা আছে। তাঁর বিরুদ্ধে আনা হচ্ছে ১৪টি অনাস্থা প্রস্তাবের আক্রমণ। ভূত চতুর্দশীর আয়োজন আর কী!

যাক, ওসব 'ফুটে' যাবে সেজন্য চিন্তার কারণ নেই। দেওয়ালী পোকার উৎপাত সাময়িক। জ্বলে উঠবে যুগবরণের নতুন দীপাবলী। কংগ্রেস মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে বৃদ্ধ শকুনির পাশার চালের বন্ধন থেকে।

নেহরুজীর জন্মদিন

নেহরুজীর জন্মদিনে নেহরু-কন্যা পিতাকে দুটি উপহার দিলেন 'আনন্দ-ভবন' এবং সিণ্ডিকেট কবলিত কংগ্রেসের মুক্তির আনন্দ। মনে থাকবে, মনে রাখবে ইতিহাস এই ঐতিহাসিক উপহার দুটি। পিতার আশীর্বাদে কন্যার কপালে উঠবে জনপ্রিয়তার জয়টীকা. যদি না পথিমধ্যে পিছলে পড়েন শ্রীমতী গান্ধী।

(১৫।১১।৬৯)

লিনটাস-S. 64-140 BG
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আমেরিকায় ৩০টির অধিক সংস্থা ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে

আমেরিকায় যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ

গত সপ্তাহে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমগ্র আমেরিকায় যে বিরাট গণ-বিক্ষোভ হয়ে গেছে, আগে কখনও তেমনটা হয় নি। এবারের বিক্ষোভের আয়োজন করেছিলেন প্রগতিশীল নাগরিকদের নিয়ে গঠিত 'মবিলাইজেশন কমিটি'। ১৩ই নভেম্বর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয় এবং ১৫ই নভেম্বর হোয়াইট হাউস অভিযানের পর বিক্ষোভ অভিযানের সমাপ্তি ঘটে।

ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে প্রদর্শিত এই বিক্ষোভ-মিছিলে সমগ্র আমেরিকার লক্ষ লক্ষ নরনারী যোগদান করেন। ওয়াশিংটনের মিছিলে পুলিশের হাঙ্গামা হলেও দেশের অন্যান্য এলাকায় মিছিলকারীরা শান্তিপূর্ণভাবেই তাদের প্রতিবাদ জানায়। আবহাওয়া খারাপ থাকার ফলে কোন কোন এলাকায় মিছিলকারীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল এবং দু'-এক জায়গায় মিছিল বাতিল না করেও উপায় ছিল না। তবে সংগঠকরা ওয়াশিংটনের মিছিলটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং সেটা সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১৪ই সেপ্টেম্বর ৩ হাজার শান্তি মিছিলকারী যখন যুদ্ধ-বিরতি ধ্বনি দিতে দিতে দক্ষিণ ভিয়েত-নামের দূতাবাসের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের ওপর পুলিশ কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে।

৩০টির অধিক প্রগতিশীল সংস্থা একযোগে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। মিছিলকারীরা 'হো-হো-হো-চি-মিন' ধ্বনি দিতে থাকে। তাদের হাতে ছিল লাল-কালো ভিয়েতকং পতাকা।

আমেরিকার বিচার বিভাগ মিছিলকারীদের হোয়াইট হাউস অভিযানের অনুমতি দেন নি। তাই মিছিলকারী একটি সারি করে আর্লিংটন কবরখানা থেকে যাত্রা শুরু করে নীরবে হোয়াইট হাউস অতিক্রমের পর ক্যাপিটল অভিমুখে চলে যান।

এই বিরাট শান্তি মিছিলের পূর্ণ বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নি, তবে যেটুকু পাওয়া গেছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, আমেরিকার সাধারণ মানুষ ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে আমেরিকার কর্মকর্তারা ছোট ছোট দেশের ওপর গিয়ে মোড়লী করবেন—এটা কেউ বরদাস্ত করতে রাজী হচ্ছেন না। ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমেরিকার শিল্পপতি এবং বণিক-শ্রেণী লাভবান হচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝা বাড়ছে এবং শান্তিকামী গৃহস্থ ঘরের ছেলেরা সেখানে গিয়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছেন। মার্কিন সেনাবাহিনী ভিয়েতনামীদের গরু ছাগলের মত হত্যা করছে ঠিকই, কিন্তু তাদের নিজেদের লোকেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে গরু ছাগলের মত মারা পড়ছে। মার্কিন ধনিকদের মুনাফা বৃদ্ধির প্রয়োজনে হাজার হাজার মার্কিন যুবককে প্রাণ দিতে হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে চোখের জলে প্রিয়জনদের বুক ভাসছে। এটা মার্কিন নাগরিকদের কাছে ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠছে।

কিন্তু আমেরিকার সরকারী কর্তারা প্রশ্নটাকে সেভাবে চিন্তা করছেন না। প্রেসিডেন্ট নিকসন ক্ষমতা লাভের পর গত জানুয়ারী মাসে ভিয়েতনাম থেকে অবিলম্বে মার্কিন ফৌজ অপসারণের কথা বলেছিলেন। কিন্তু গত ৩রা নভেম্বর তিনি সুর একেবারে পাল্টে ফেলেছেন। ঐ তারিখে তিনি এক ভাষণে বলেছেন যে, ভিয়েতনাম থেকে সংগ্রামী মার্কিন স্থলবাহিনী অপসারণ করে সেই জায়গায় দক্ষিণ ভিয়েতনামী ফৌজ মোতায়েনের কথা তিনি চিন্তা করছেন। তিনি নতুন করে মার্কিন ফৌজ অপসারণের কথা কিছু ঘোষণা করেন নি অথবা যুদ্ধবিরতির কথাও কিছু বলেন নি। বরং উল্টে তিনি হ্যানয়ের উদ্দেশ্যে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, তারা যদি ইতিমধ্যে যুদ্ধের

মাত্রা তীব্রতর করে, তাহলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, আমেরিকা যদি দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে চলে আসে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্য, বার্লিন এবং পশ্চিম গোলার্ধের সর্বত্র হাঙ্গামা দেখা দেবে। ঐ সব জায়গায় আমেরিকার উপস্থিতিই নাকি শান্তি বজায় রেখেছে। কিন্তু ভিয়েতনামে মার্কিন ফৌজের উপস্থিতি যদি এত জরুরী হয়, তাহলে সেখান থেকে সরে আসার কথা চিন্তা করা হচ্ছে কেন, সেই প্রশ্নের জবাব নিকসন দিতে পারেন নি।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে যে, ভিয়েতনামে যুদ্ধ জয় করা আমেরিকার পক্ষে অসম্ভব উপলব্ধি করে নিকসন মানে মানে সেখান থেকে সরে পড়বার পক্ষপাতী। সেটা দৃষ্টিকটু হবে এবং তাতে আমেরিকার ইজ্জতহানি হতে পারে ভেবে তিনি মার্কিন ফৌজের স্থলে দক্ষিণ ভিয়েতনামী ফৌজের সহায়তায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতলব এঁটেছেন। তিনি এটা বেশ ভাল করেই জানেন যে, যে মুহূর্তে মার্কিন ফৌজ দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছাড়বে, সেই মুহূর্তেই উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম একাকার হয়ে যাবে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুতুল গভর্নমেন্ট রাতারাতি বায়ুভূত হয়ে পড়বে। সুতরাং দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের বকলমে ভিয়েতনামে লড়াই চালানো শূন্যে সৌধ নির্মাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কপটতা অবলম্বন না করে তাঁর উপায় নেই। কারণ তাঁর দক্ষিণপন্থী সমর্থকরা ভিয়েতনাম থেকে তাঁকে কিছুতেই সরে আসতে দিতে রাজী নন।

রাণীর অর্থকষ্ট

একদা বৃটিশ রাজার রাজত্বে সূর্যদেবের অস্ত যাবার উপায় ছিল না। সাম্রাজ্যের কোন-না-কোন আকাশে সূর্যদেবকে মোতায়েন থাকতেই হত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেই সাম্রাজ্য প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তার ফলে গ্রেট-বৃটেন ক্রমাগত অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে এবং সারা দুনিয়ায় তার প্রভাব-প্রতিপত্তিও বিলীয়মান। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে, বিলেতের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথও নাকি নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়েছেন। সংবাদটা ফাঁস করেছেন তাঁর স্বামী ফিলিপ। ভদ্রলোক আমেরিকায় এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে, অর্থাভাবে রাণীর সংসার বড়ই সঙ্কটাপন্ন। বৃটেনের রাণী বছরে ভাতা পান ৮৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মত। এ ছাড়া তাঁর নিজস্ব জমিদারীর আয় আরও ৬ লক্ষ টাকা। আর করমুক্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির আয় আরও এক কোটি টাকা। অর্থাৎ রাণীর বার্ষিক আয় প্রায় দু' কোটি টাকার মত। রাণীর স্বামী বলেছেন যে, যুদ্ধের পর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সকলেরই ব্যয় বেড়েছে। তার সঙ্গে তাল রেখে লোকের আয়ও বাড়াতে হয়েছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে রাণীর ভাতার পরিমাণ মোটেই বাড়ে নি। ফলে রাণীর সংসারে দস্তুরমত টানাটানি দেখা দিয়েছে। সেই কারণে দু'-একটি প্রাসাদে যাদুঘর খুলে কিছু আয় বাড়াবার কথা উঠেছিল, কিন্তু তাতে আর এমন কি আয় বৃদ্ধি ঘটতে পারে। ইংলেণ্ডের রাণীর কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই ঠিকই, কিন্তু জাতের প্রতীক হিসাবে তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা বিদ্যমান। কাজেই দু' কোটি টাকায় তাঁর সংসার চলছে না জানতে পেরে সেখানকার নাগরিকরা খুবই অস্বস্তি বোধ করছেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, রাণীর আয়ব্যয়ের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য পার্লামেন্টের সদস্যদের নিয়ে একটা সিলেক্ট কমিটি গঠন করা হবে। রাণীর উপদেষ্টাদের সঙ্গে অর্থদপ্তরের আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

চীনের দাবি আবার প্রত্যাখ্যাত

চিয়াং কাইশেকের কুয়োমিণ্টাং গভর্নমেন্টের বদলে কম্যুনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ দেবার আর একটি প্রস্তাব গত সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে অগ্রাহ্য হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সকল শাখায় কুয়োমিণ্টাং চীনের প্রতিনিধিই চীনের প্রকৃত প্রতিনিধি বলে গণ্য হতে থাকবেন। এই নিয়ে গত বিশ বছরে ১৯ বার চীনের দাবি রাষ্ট্রসংঘে প্রত্যাখ্যাত হল। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, বিষয়টি নিয়ে ৭ দিনব্যাপী আলোচনায় রাশিয়া আগাগোড়াই নীরব ছিল। এর আগে কম্যুনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রসংঘে আসন দেবার জন্য রাশিয়াই চেষ্টা করেছে সব চেয়ে বেশি। চীন-রুশ বিরোধ যতই পাকিয়ে উঠতে থাকে, ততই এ ব্যাপারে রাশিয়ার উৎসাহে ভাটা পড়ে।

পাবলো পিকাসোর 'গুয়েরনিকা'

স্পেনে গৃহযুদ্ধের (১৯৩৬—৩৯) সময় জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সহায়ক নাৎসী বিমান বহর যখন গুয়েরনিকার বাস্ক শহরের ওপর অমানুষিক বোমাবর্ষণ করে, তখন সেই দৃশ্য বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী শিল্পী পিকাসোকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে, তিনি সেটা বিরাট এক ক্যানভাসে ধরে রাখেন। "গুয়েরনিকা" নামক এই ছবিখানি পিকাসোর অনবদ্য সৃষ্টি। ছবিখানি তিনি স্পেনের রিপাবলিকান গভর্নমেন্টকে (যাঁদের উচ্ছেদ করে ফ্রাঙ্কো স্পেনের ডিক্টেটর হয়ে বসেছেন) দান করেন। বর্তমানে এই ছবিখানি নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টের শোভা বর্ধন করছে। সম্প্রতি জেনারেল ফ্রাঙ্কো এই ছবিখানি ফিরে পাবার জন্য পিকাসোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলেন। ফ্রাঙ্কো-বিরোধী পিকাসো ফ্রাঙ্কোকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ ছবি তিনি ফ্রাঙ্কোকে ফিরিয়ে দিতে রাজী নন। ৮৭ বৎসর বয়স্ক পিকাসো বলেছেন, "এই ছবিখানি স্পেনিশ রিপাবলিক গভর্নমেন্টের সম্পত্তি। ফ্রাঙ্কো এটা দাবি করতে প্যারেন না।"

ইরাকী প্রেসিডেন্টের নতুন ক্ষমতা

বাগদাদ বেতারে ঘোষণা করা হয়েছে, ইরাকী প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সংবিধান সংশোধন করে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রেসিডেণ্ট হাসান আল বকর এতদিন শুধু গভর্নমেণ্ট এবং রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন। এখন থেকে সেনাবাহিনীরও সর্বাধিনায়ক হলেন। তাছাড়া বিপ্লব পরিষদের সভাপতিত্বও তাঁর ওপর অর্পিত হল।

আয়ুব-কীলার কেচ্ছা

সম্প্রতি পাকিস্তানের কয়েকজন নাগরিক পাকিস্তানের প্রাক্তন ডিক্টেটর আয়ুব খাঁকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন তাঁর রাজনৈতিক আত্মজীবনীতে প্রোফুমো কেলেঙ্কারীর নায়িকা ক্রিস্টিন কীলারের কাহিনীটাও জুড়ে দেন।

সম্প্রতি কীলাব তার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত জীবনকাহিনীতে আয়ুব খাঁকে তার প্রমোদ-সাঁতারের সঙ্গী বলে বর্ণনা করেছে। ক্লাইভডন দীঘিতে লর্ড এস্টরের অতিথি হিসাবে কীলার নাকি ডিক্টেটর আয়ুব খাঁর সঙ্গে সাঁতার কেটেছিল। আয়ুব খাঁর এই কেচ্ছার কথা জানতে পেরে পাকিস্তানে ছ্যা ছ্যা পড়ে গেছে। ডেমোক্রাটিক পার্টির একজন নেতা বলেছেন, আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের ইজ্জত ঢিলে করে দিয়েছেন।

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

অবশেষে পঁচাশি বৎসর বয়সের বৃদ্ধের মৃত্যু হল। বৃদ্ধ এতদিন হাঁপানী রোগী হয়ে বেঁচেছিলেন। মাঝে মাঝে হাঁপানীর টান উঠতো, তখন মনে হতো এই বুঝি গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার সুস্থ হয়ে উঠতেন। শীত ও বর্ষার মুখে বৃদ্ধের হাঁপানী বাড়তো, খুবই কষ্ট পেতেন, কিন্তু আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতেন। নিয়োপিন, বিটাকর্টারল, ক্যাটিশন জাতীয় বহু ওষুধে বৃদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে নিজের শ্বাসযন্ত্র আর হৃদযন্ত্রকে সচল রাখতেন। বৃদ্ধের অনেক দোষ ছিল। বয়সের ধর্মে লোভার্ত হয়ে পড়েছিলেন, দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে অনেক অকাজ-কুকাজ করতেন। স্থান-কাল-পাত্রের বিচার ভুলে গিয়েছিলেন, বহু সময় অপাত্রে স্নেহ বর্ষণ করতেন—প্রকৃত পক্ষে বৃদ্ধের এতদিন বেঁচে থাকা নানা দিক দিয়েই বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সব কিছুর ঊর্ধ্বে বৃদ্ধের উপস্থিতিতে একটা কাজ হত, সেটা হল বৃদ্ধ একখানি লাঠি হাতে করে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে সকলের ওপর খবরদারি করতেন—যার ফলে বৃদ্ধের সাবালক ছেলেরা, যারা অনেকেই নানা মত-চিন্তার প্রভাবে চলত, তারা বৃদ্ধের লাঠির ভয়ে কিছুটা সংযত থাকত। বৃদ্ধের বেঁচে থাকা একটা বড় কাজ করত—সেটা হল কেউ হাঁড়ি ভাগ করবার কথা ভাবতে পারত না। যে যতই বেয়াড়া হোক, বুড়োর ভয়ে হাঁড়ি আলাদা করার কথা বলতে সাহস পেত না। অর্থাৎ এই বৃহৎ পরিবারে বৃদ্ধ একটা বন্ধন হয়ে সকলকে এক করে রাখতেন।

সেই বৃদ্ধের মৃত্যু হলে, তার ফল হাতে হাতে যা ফলবে, সেটা হল পরিবারের কোন স্থায়ী পরিচালক থাকবে না। নিত্য নতুন কর্তা বদল হবে, একজন কর্তা হবে তো সাতজন তার পিছনে লাগবে। একজন কর্তাকে সরাতে তিনজন কোমর বাঁধবে, আবার একজন কর্তা হতে তিনজনের কাঁধে পা রাখবে—সেই চড়নদাররা আবার সময় সুযোগ মত কাঁধ থেকে নামিয়ে দেবে। হরেক রকম মিতালি দেখা যাবে, পরিবারের কর্তা হতে অথবা কর্তাকে সরাতে। আজ যারা একে অপরের নামে দুয়ো না দিয়ে দিয়ে জল খায় না, যারা পরস্পরের মুখ দর্শন করে না, দেখা যাবে তাদের মধ্যে কত গলায় গলায় ভাব। আবার আজ যারা অভিন্নহৃদয়ের, একান্ত বন্ধু সুহৃদ, মুহূর্ত একে অপরকে না দেখলে চোখে অন্ধকার দেখে, তারা দেখা যাবে একজন আর একজনের গলায় বসাতে ছুরি শাণ দিচ্ছে।

বৃদ্ধ মারা গেলেন। তাঁর আত্মার শান্তি হোক, বৃদ্ধের শেষ বয়সের ভীমরতির কাল ছেড়ে সেই কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সে পরিবারের জন্য সেবা, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখব। চিরকাল কেউ বেঁচে থাকে না, তাই তিনিও বাঁচবেন এমন আশা করি না। আর এই বয়সে তিনি বেঁচে থেকে কোন কাজই করতে পারছিলেন না। কিন্তু পরিবারটা এক ছিল, পরিবারে একটা বাঁধুনী ছিল, পরিবারের একজন নামকাওয়াস্তে হলেও কর্তা ছিল, কিন্তু আজ আর সেই সব কিছু রইল না। বৃদ্ধ মারা যাবার পর পরিবারের অন্যদের স্ব স্ব প্রধান হবার পথ খুলে দিয়ে গেলেন।

আমি এতক্ষণ যে বৃদ্ধের কথা বলছিলাম, তার নাম কংগ্রেস। আশা করি সকলেই সেটা বুঝতে পেরেছেন এবং কংগ্রেসের মৃত্যুর পর ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কি পরিবর্তন আসবে সেটাও বুঝতে পারা গেছে। কংগ্রেসের ভেঙে যাওয়া তথা মৃত্যু হওয়ার একটি মাত্র ফল হাতে হাতে পাওয়া যাবে, সে হল কেন্দ্রে আর কোন স্থায়ী সরকার হবে না, কেন্দ্রে স্থায়ী সরকার না হবার ফলে রাজ্যেও স্থায়ী সরকার থাকবে না। স্থায়ী সরকার না থাকার অর্থ কি সেটা আমরা এখনও বুঝতে পারি নি, পাকিস্তান হাড়ে হাড়ে বুঝছে। কংগ্রেস ভাগ হবার পর কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার থাকবে না, থাকলেও পরনির্ভর হয়ে থাকবে, এবং পরনির্ভরতার বিড়ম্বনা কত সেটা প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়বে। এক কথায় বলতে গেলে দীর্ঘদিনের সর্বভারতীয় সংগঠন কংগ্রেসের মৃত্যু ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ভালমন্দ যাই হোক; যে গণতান্ত্রিক ধারা ছিল, তার মূলে আঘাত করবে।

দিল্লীর কথা, উচ্চস্তরের রাজনীতির কথা—সে না হয় যা হবার হল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কি হবে? দিল্লীর ভাবনায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির তো দম বন্ধের অবস্থা। গুজব আর কল্পনা, সত্য-অর্ধসত্য ও রকমারী মিথ্যা সব মিলিয়ে অবস্থা অতি চমকপ্রদ পরিস্থিতিতে চলছে। কোন কোন মহল থেকে বেশ কিছুদিন আগে থাকতেই পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার গেল, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙল, পশ্চিমবঙ্গে মিনি ফ্রন্ট হল, পশ্চিমবঙ্গে বাম কম্যুনিস্টদের বাদ দিয়ে নতুন সরকার গঠিত হল—এমনি বহু রসালো গবেষণা, আলোচনা, সংবাদ পরিবেশিত হয়ে আসছিল। কেরলে যুক্তফ্রন্ট ও দিল্লীতে কংগ্রেসের ভাঙনে সেই রসালো সংবাদ সৃষ্টির জনকগণ একেবারে দুই বাহু তুলে নৃত্য করতে সুরু করলেন। ভাবখানা এই, এইবার আর

"দিলীপের মুখ থেকে খবরটা শুনে আমার যে কি আনন্দ হল! ওকে দুহাতে বুকে টেনে নিলাম। ও যথেষ্ট অনুশীলন করেছে, খেটেছে। তবুও বলবো এর জন্য যে-বাড়তি শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন তার সবটুকুই ও পেয়েছে বোর্নভিটা থেকে। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বোর্নভিটা খেতে ও বরাবরই বড্ড ভালোবাসে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, বোর্নভিটার তা পুরোমাত্রায় রয়েছে ব'লে ওকে আমি নিয়মিত বোর্নভিটা খাওয়াই। তাই কি খেলাধুলায়, কি পড়াশুনায় সবদিকেই ছেলে আমার সমান চৌকশ।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ!

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—
শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পাকা বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। শ্রীমতী গান্ধী নতুন কংগ্রেস গড়ে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে সেই কংগ্রেসের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস মিলে যাবে—ব্যস তার পরই সি পি এম বাদ।

আমার একজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু—যার সঙ্গে আমার অপরাহ্ণ থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যার সাংবাদিক হিসাবে বেশ নামডাকও আছে—সে তো একদিন লিখেই দিল—অজয়বাবুর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসের মিতালী শেষ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা খুব সোজা নয়—এই কথা বা প্রচার শুধু কয়েকজন সাংবাদিক কষ্টকল্পনায় রচনা ও পরিবেশন করছেন তা নয়, যুক্তফ্রন্টের অনেক শরিক দলও এই কথা সত্য হিসাবে মনে করতে সুরু করেছেন। আমার কিন্তু এই প্রচার অর্থাৎ দুই-একদিনের মধ্যে সি পি এম-কে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়ে গেল বা হয়ে যাবে, ব্যাপারটার সেই গল্পটা মনে করিয়ে দেয়। যে গল্পে আছে একজন একটি ছাগল কিনে নিয়ে যাচ্ছে আর কয়েকজন বন্ধু পরামর্শ করে শুধু তাকে বলতে লাগল, লোকটা একটা কুকুর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে ছাগলের মালিক ভাবল—এতগুলো লোক যখন বলছে ওটা ছাগল নয়, কুকুর, তখন আমারই ভুল। আসলে আমার কাঁধে ছাগলের বদলে কুকুরই রয়েছে। তাই কাঁধের ছাগলকে কুকুর মনে করে ফেলে দিল আর সেই প্রচারকারী দল ছাগলটাকে তুলে নিয়ে দিব্যি সুন্দর ফিস্ট করে খেল। এই ক্ষেত্রেও একইভাবে ছাগলকে ক্রমাগত কুকুর বলে প্রমাণের চেষ্টা হচ্ছে বলে মনে হয়। কংগ্রেস সে যে রূপেই হোক অর্থাৎ ইন্দিরাপন্থী, অথবা যে কোন পন্থী হোক, সেই কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার থেকে সি পি এম-কে এক্ষুণি বাদ দিয়ে সরকার গঠন অঙ্কের হিসাবে হলেও বাস্তবে কতটা সম্ভব ভেবে দেখা দরকার।

শুধু একটা সংবাদ যা মুখরোচক হবে, সেটা বললেই সব বলা হয় না। এই সব সংবাদের মূল্য মাত্র কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে। সকালবেলা খবরের কাগজে পড়ে বেশ গরম অনুভব করলাম, সারাদিন ট্রামে-বাসে অফিসে-ক্যান্টিনে তা নিয়ে বেশ গরম গরম সারগর্ভ বাণী দিলাম। ব্যস পরদিন সকালে ঠিক তার উল্টো সংবাদ পড়ে আবার মতটা পাল্টে ফেললাম। এই ঘটনাই তো ঘটলো সেই দিন, যখন কোন একটা কাগজে বেরুলো শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজ্যের ইন্দিরাপন্থীদের পাকা কথা হয়ে গেছে। পরদিনই কাগজে দেখা গেল ঠিক উল্টো খবর সেই কাগজেই লেখা হয়েছে। অজয়বাবু সেই সংবাদ পড়ে বলেছেন—সর্বৈব মিথ্যা, ইন্দিরাপন্থী নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বললেন—সর্বৈব মিথ্যা; কিন্তু এই দুজন ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি যিনি এই সম্পর্কে বললেন, তিনি শ্রীজ্যোতি বসু। তাঁর কথার গুরুত্ব অনেক বেশি। শ্রীবসু বলেছেন—অজয়বাবু যে পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ছেড়েছিলেন, তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। তাছাড়া অজয়বাবু যুক্তফ্রন্ট গড়েছেন, ৩২ দফা কর্মসূচী রচনা করেছেন, সেই সব ছেড়ে, ময়লা কাগজের বাক্সে ফেলে তিনি কি কংগ্রেসে চলে যেতে পারেন? তাছাড়া শ্রীমুখোপাধ্যায় কি মনে করেন রাজ্যের বর্তমান সরকার ভেঙে দিয়ে নতুন কোন সরকার করলে সেই সরকার এই সরকার থেকে ভাল কাজ করতে পারবেন—অন্য কোন দলের সমন্বয়ে গঠিত সরকার আরো ভাল কাজ করতে পারবেন? শ্রীবসুর এই কথাগুলি শুধু তার নিজের কোন মনগড়া কথা বা নিতান্ত কোন কষ্টকল্পনার কথা নয়—অজয়বাবুকে তিনি যেভাবে দেখেছেন ও বুঝেছেন, সেই অভিজ্ঞতারই কথা। যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের সরকার এক্ষুণি ভেঙে যাচ্ছে বা সি পি এম-কে বাদ দিয়ে সরকার গঠিত হচ্ছে বলেন, তাঁরা শ্রীজ্যোতি বসুর এই কথায় নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন—বাস্তব অবস্থা কি? শ্রীজ্যোতি বসু পরিস্থিতি বোঝেন না, আমরা বেশি বুঝেছি এই কথা হতে পারে না। তবে আমি একটা লোভ সম্বরণ করতে পারছি না, যদিও আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে এই গোপন কথাটি ফাঁস করবো না। সেই গোপন কথাটি হলো—পশ্চিমবঙ্গের ইন্দিরাপন্থীরা আজ পর্যন্ত দুবার যুক্তফ্রন্টের দুজন নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছেন, একবার সফল হয়েছেন আর একবার ব্যর্থ হয়েছেন। এই দুবারই চেষ্টা করেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। শ্রীগিরির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালে শ্রীরায় শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কথা বলেছিলেন ও সলাপরামর্শ করেছিলেন। তখন ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের শরিক দল এক হয়েছিলেন।

আর গত ১২ই নভেম্বর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে যখন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হল, তখন শ্রীরায় প্রথমে ফোন করলেন বাংলা কংগ্রেস দপ্তরে। ফোন ধরলেন শ্রীসুকুমার রায়। শ্রীরায় শ্রীসুকুমার রায়কে বললেন—আমি অজয়দার সঙ্গে দেখা করতে চাই, একটু যোগাযোগ করে দিন। শ্রীসুকুমার রায় দ্রুত যোগাযোগ করলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় জবাব দিলেন অতি সংক্ষিপ্তভাবে। এখন কারো সঙ্গে দেখা-টেখার দরকার নেই, দেখা করলেই পাঁচ কথা হবে, কোথাকার জল কোথায় যায় তার নেই ঠিক—এখন দেখা সাক্ষাতের দরকার নেই। শ্রীসুকুমার রায় আবার ফোন করে শ্রীরায়কে জানিয়ে দিলেন, অজয়দার এখন তো দেখা করার সময় হচ্ছে না। এই খবরের পর আর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসের অন্য কোন যোগাযোগের চেষ্টা হয় নি।

কিন্তু এই চেষ্টা হোক বা না হোক, ওপরের শোনা কথা সত্য হোক বা না হোক, আর একটা মূল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই প্রশ্ন হল—যাঁরা বলছেন যে, রাজ্য সি পি এম-কে বাদ দিয়ে ইন্দিরাপন্থীদের নিয়ে নতুন সরকার হবে, তাঁরা কি বলতে পারেন কেন্দ্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন সি পি এম-এর সাহায্য নেবেন সরকার রক্ষা করতে, সি পি এমও ইন্দিরা সরকারকে রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন—তখন ইন্দিরাপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম-কে শত্রু করবে আর করতে চাইলে শ্রীমতী গান্ধী সেটা অনুমোদন করবেন, এমন সম্ভাবনা কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে? শ্রীমতী গান্ধী কেন্দ্রে যদি নিজের সরকারকে সুষ্ঠভাবে রক্ষা করতে চান, তবে তিনি একই সঙ্গে চাইবেন মাদ্রাজে ডি এম-কে, পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার বেঁচে থাক। এই যে সেদিন কেরলে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ সরকারের পতন হল, শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা কত আনন্দ প্রকাশ করলেন; কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী একটি কথা উচ্চারণ করলেন না। অথচ শ্রীমতী গান্ধী একদা কেরলে নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের পতন ঘটিয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী যদি কেন্দ্রে নিজের সরকারকে রক্ষা করতে চান, তবে যেভাবে তিনি বোম্বের ভি পি নায়েকের সরকার, অন্ধ্রের শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডির সরকার রক্ষা করতে চাইবেন, তেমনি একইভাবে মাদ্রাজের ডি এম কে, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা করতে চাইবেন। শ্রীমতী গান্ধী যদি ভাঙতে চান, তবে ভাঙবেন উত্তরপ্রদেশের সি বি গুপ্তের সরকার, গুজরাটের হিতেন্দ্র দেশাইয়ের সরকারকে। এটা হল অঙ্কের কথা, যুক্তির কথা—যদিও রাজনীতি সব সময় অঙ্কের হিসাবে চলে না। রাজনীতিতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা অঙ্কের হিসাবে মেলে না, যুক্তিতে মেলে না। রাজনীতি হলো এক জাতীয় নারকেল, যা মাটিতে পড়ে না, আকাশে ওড়ে।

—১৪ই নভেম্বর, '৬৯

স্বাস্থ্য বিভাগের প্রমোশন রহস্য

সুনীল ঘোষ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর

গত সপ্তাহে আমি স্বাস্থ্যদপ্তরের প্রমোশন রহস্যের কিছুটা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছিলাম। দেখলাম, সেটা মৌচাকে ঢিল মারার অবস্থা সৃষ্টি করেছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের বহু পদাধিকারীর গুণাবলী এবং প্রমোশন সম্পর্কে অনেক গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করে কিছু চিঠি আমার কাছে এসে পৌঁচেছে। আপাতত সেগুলো নিয়ে আমি কোন আলোচনা করতে চাই না। কারণ সেই সব তথ্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে বেশ কিছু সময় লাগবে।

স্বাস্থ্যদপ্তরের মন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য অথবা অপর কোন পদাধিকারীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বিশেষ করে ননীবাবুকে আমি বহুকাল ধরেই চিনি। ট্রেড ইউনিয়নের সংগঠক হিসাবে তাঁর দক্ষতা আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাঁর চারিত্রিক সততা সম্পর্কেও আমার মনে কখনও সংশয় দেখা দেয় নি। তিনি নরম প্রকৃতির ভাল মানুষ গোছের লোক বলেই আমার ধারণা। স্বাস্থ্যদপ্তরের বাস্তুঘুঘুরা তাঁর সেই ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির মতলব এঁটেছেন বলেই আমার মনে হয়।

মনে রাখা দরকার যে, স্বাস্থ্যদপ্তরের পদাধিকারীরা সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ। একজন আই-এ-এস অফিসার নিছক একজন উচ্চবেতনভোগী সরকারী আমলা ছাড়া আর কিছুই নন। কিন্তু স্বাস্থ্যদপ্তরের উচ্চপদাধিকারীরা একদিকে আমলা, অপর দিকে স্বনামখ্যাত চিকিৎসক। তাঁদের অনেকের কাছেই সরকারী বেতন 'নস্যি' ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁদের কারও কারও আয় ছোটখাট শিল্পপতিদেরও ঈর্ষার বস্তু। এ কথা ঠিক যে, সরকারী চাকরী এবং হাসপাতালগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ তাঁদের সমৃদ্ধির পথ সুগম করেছে। কিন্তু চিকিৎসক হিসাবে সমাজে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এত সুপ্রতিষ্ঠিত যে, সরকারী শৃঙ্খলার আওতায় তাঁদের বেঁধে রাখা দস্তুরমত কঠিন কাজ। কাজেই ননীবাবু যে কি নিদারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন তা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়।

কিছু উচ্চপদাধিকারী চিকিৎসক স্বাস্থ্যদপ্তরে যে কায়েমী স্বার্থের ঘাঁটি তৈরি করে বসে আছেন, সেখানে প্রবেশ করা বিভাগীয় মন্ত্রীর পক্ষেও সম্ভব কি না বলা কঠিন। অন্তত ননীবাবু যে এখনও সেখানে প্রবেশ করতে পারছেন না, সে কথা অসঙ্কোচেই বলা চলে।

বাইশ বছরের কংগ্রেসী কুশাসনে দুর্নীতি আমাদের সমাজজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছে যে, তার হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ মোটেই সহজ নয়। কিন্তু এই দুর্নীতির উৎস হচ্ছে দেশের উচ্চপদাধিকারী শ্রেণী। গরীব লোকেরা এই দুর্নীতির শিকার মাত্র। কাজেই ননীবাবু যদি স্বাস্থ্যদপ্তরের পঙ্কোদ্ধার করতে চান, তাহলে গোড়াতেই স্বার্থপর, ধান্দাবাজ এবং সুযোগ-সন্ধানী উচ্চপদাধিকারীদের শায়েস্তা করতে হবে। সেখানে ভালোমানুষী দেখাতে গেলেই বিপদ অনিবার্য। সৎ লোক ভালোমানুষীর মর্যাদা দিতে পারে। কিন্তু অসৎ লোক নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মন্ত্রীর ভালোমানুষীর সুযোগ গ্রহণ করবে। সুতরাং ননীবাবু যে ভালোমানুষীর জন্যে বন্ধুমহলে স্নেহভাজন, সেই ভালোমানুষী তাঁর নিজের চরিত্র হননের সহায়ক হয়ে উঠবে। তাতে তাঁর নিজের দল এবং যুক্তফ্রন্টই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি।

এবার আসুন, আবার প্রমোশন রহস্যে ফিরে যাই। এ সপ্তাহে আমি মেডিসিন বিভাগের কয়েকটি অসঙ্গতির দিকে ননীবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি মেডিসিন বিভাগে তিনজনকে এসোসিয়েট প্রফেসর, পাঁচজনকে রীডার, সাতজনকে এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিশজনকে লেকচারার পদে প্রমোশন দেবার সুপারিশ করেন। কিন্তু ননীবাবুর 'সেল' যে প্যানেল প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে আরও বেশি সংখ্যক ব্যক্তির পদোন্নতির সুপারিশ করা হয়েছে।

কমিটি এসোসিয়েট প্রফেসর পদের জন্য সুপারিশ করেছিলেন তিনটি নাম: ডাঃ শ্যামলকৃষ্ণ সেন, ডাঃ তুষারকান্তি সাহা এবং রথীন্দ্রনাথ রায়। কিন্তু সেলের সুপারিশে দেখা যাচ্ছে তিনটে নামই আছে, তবে লোক এক নয়। তুষারকান্তি সাহা এবং রথীন্দ্রনাথ রায়ের বদলে নির্মল চন্দ এবং ধীরেন্দ্র নন্দীকে ঢোকানো হয়েছে। ডাঃ চন্দ আর নন্দীকে সেল কেন আনুকূল্য প্রদর্শন করলেন আর কেনই বা ডাঃ সাহা আর রায়ের প্রতি বিরূপ হলেন, তা আমার মাথায় ঢুকছে না। শুনেছি একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজন আবার সেলেও আছেন। সেই সব সদস্যরা দুই জায়গায় দুইরকম সুপারিশ করলেন কেন, তা জানবার অধিকার নাগরিকদের নিশ্চয়ই আছে।

রীডার নিয়োগের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি পাঁচটি নাম সুপারিশ করেছিলেনঃ প্রভাতকৃষ্ণ রায়, দুলালচন্দ্র চৌধুরী, প্রণয়ভূষণ মিত্র, সনৎকৃষ্ণ সরকার এবং বিজন রায়। সেলও পাঁচটি নাম সুপারিশ করেছেন। তবে সেখানে শেষোক্ত তিনটে নামের বদলে নতুন তিনটে নাম ঢোকানো হয়েছেঃ অজিতনাথ সেনগুপ্ত, ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য আর নীহাররঞ্জন পাল। কি কারণে তিনজনের নাম বাদ দিয়ে নতুন তিনজনের নাম ঢুকলো, তা ননী-বাবু অনুসন্ধান করে দেখেছেন কি?

এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদের জন্য একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ ছিল সাতটি নামের। কিন্তু সেল সুপারিশ করেছেন পাঁচটি নামের। কমিটির তালিকার নাম ছিলঃ অজিতা চক্রবর্তী, শীতলচন্দ্র ঘোষ, ভবরঞ্জন সেনগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন মাইতি, কমল মল্লিক, মাধববন্ধু ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র-প্রসাদ মাওয়ার এবং ভাস্করানন্দ রায়-চৌধুরী। সেলের তালিকায় নাম আছেঃ অজিতা চক্রবর্তী, ভাস্করানন্দ রায়চৌধুরী, পূর্ণেন্দু সেন, হীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার এবং অশোককুমার চৌধুরী। অর্থাৎ ভাস্করানন্দ রায়চৌধুরী আর অজিতা চক্রবর্তী ছাড়া প্রথমোক্ত তালিকার আর কোন নামই সেলের তালিকাভুক্ত হয় নি। ব্যাপারটা কি? পদোন্নতির প্রশ্নে কমিটি এবং সেলের মধ্যে এই গুরুতর মতভেদ কি অস্বাভাবিক ঘটনা নয়? পদোন্নতির লোক বাছাইয়ের ব্যাপারটা কি পুরোপুরিই ক্লিকের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে? নইলে একটা সুনির্দিষ্ট নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটো পৃথক পৃথক সংস্থার সুপারিশ একেবারে পরস্পর-বিরোধী হয়েছে কেন? ননীবাবু যখন সেলের সুপারিশ মতামতের জন্য বাজারে ছাড়লেন, তখন কি তিনি তাঁর "মল্লিকদা"র কাছে এই অসঙ্গতির কারণ অনুসন্ধান করেন নি? অবশ্য আমলা যখন মন্ত্রীর 'দাদা' হয়ে যান, তখন দাদার হুঁকো ভাইটিকে মাঝে মাঝে ধরতে হবে বই কি।

একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি মেডিসিন বিভাগে ২০ জন লেকচারারের নাম সুপারিশ করেছিলেনঃ অশোক চৌধুরী, ভাস্করানন্দ রায়চৌধুরী (এঁর নাম সহকারী প্রফেসরের জন্যও সুপারিশ করা হয়েছিল এবং সেলও এঁকে সেই পদের জন্য সুপারিশ করেছেন), দীপেন্দ্রকৃষ্ণ বাগচী, পরেশচন্দ্র নাগ, গীতা দাস, মঞ্জুশ্রী মিত্র, সত্যেন্দ্রনারায়ণ বোস, দ্বিজেন্দ্র রায়, অশোক দাস, দেবেন্দ্রনাথ গুহমজুমদার, বেচারাম সাধুখাঁ, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাসঅধিকারী, অনাদিকালী সাঁই, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, অনুপম দাসগুপ্ত, রঞ্জিৎ পাঁজা এবং শান্তি ইন্দ্র। শেষোক্ত দুজনের নাম সহকারী প্রফেসর পদের জন্যও সুপারিশ করা হয়েছিল। সেলের সুপারিশে দেখা যাচ্ছে, মোট ৪৪ জনকে লেকচারার করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই তালিকায় গীতা দাস, অশোক দাস, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, অনুপম দাসগুপ্ত, রঞ্জিৎ পাঁজা এবং শান্তি ইন্দ্রের নাম নেই। এঁদের ভাগ্য অপ্রসন্ন কেন, তা একমাত্র সেলই বলতে পারেন, এবং আশা করি, তাঁরা সেটা বলতে দ্বিধা করবেন না।

মেডিক্যাল শিক্ষালয়ে শিক্ষক পদে কাজ করতে হলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অপরিহার্য। কিন্তু পদোন্নতির তালিকায় এমন বহু লোকের নাম দেখা যাচ্ছে, যাঁরা বর্তমানে 'সুপারনিউমারারি' ডিউটিতে নিযুক্ত আছেন। সেটা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা বলে স্বীকৃত কি?

এদেশের ডাক্তাররা নাকি মফস্বলে কাজ করতে একেবারেই অনিচ্ছুক। সেই কারণে গভর্নমেন্ট শিক্ষকতার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে মফস্বলের অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক করেছেন। তাতে দেশবাসীর পূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু পদোন্নতির প্যানেলে দেখা যাচ্ছে, এমন কয়েকজনের নাম আছে, যাঁদের মফস্বলে কাজ করার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাঁদের পদোন্নতির সুপারিশ করে বলা হয়েছে যে, নিয়োগের আগে তাঁরা যেন মফস্বলের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আসেন। আমার মনে হয়, পদোন্নতির নিশ্চয়তা পেলে সব ডাক্তারই দু'তিন বছর মফস্বলে ঘুরে আসতে রাজী আছেন। কাজেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এইরকম সুবিধাদান কি বৈষম্যের আওতায় পড়ে না?

এই প্রবন্ধে যে সব ডাক্তারের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে, তাঁদের কাউকেই আমি চিনি না। তাঁদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্বন্ধেও ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন ধারণা নেই। নির্ভরযোগ্য নথিপত্রে আমি যে তথ্য পাচ্ছি, তারই ভিত্তিতে এটা লেখা হচ্ছে। কোন ডাক্তারের পক্ষে অথবা বিপক্ষে আমার কোন বক্তব্য নেই। সরকারী নীতি অনুযায়ী যোগ্য লোক যোগ্য পদে অধিষ্ঠিত হোন—এটাই আমার কাম্য। সে ব্যাপারে যে-সব অসঙ্গতি আমার চোখে প্রকট হয়ে উঠেছে, আমি শুধু সেইগুলোর দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দ্বিতীয়ত একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশকেই আমি সর্বোত্তম বলে মনে করি না। তার মধ্যেও ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সেলের সুপারিশ সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। দুই তালিকার মধ্যে গুরুতর অসামঞ্জস্য সমস্ত ব্যাপারটাকে আরও ঘোরালো করে তুলেছে।

তবে ডাক্তারদের পদোন্নতির সময় তাঁদের প্রত্যেকের একাডেমিক গুণাবলী আরও বিশদভাবে পর্যালোচিত হওয়া দরকার বলে আমার মনে হয়। বিশেষ করে বিদেশ থেকে আনা ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমাগুলো আরও ভালভাবে পরীক্ষা করা দরকার।

[চলবে]

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনায় বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রয়েজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন)

লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

পাঠক মন

স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য

সাপ্তাহিক বসুমতীর বিগত ৯ই অক্টোবর সংখ্যায় শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা লিখিত "স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফেরাতে হবে গোটা ফ্রন্টকে" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে প্রতিবাদের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করছি এই জন্যে যে, মনোরঞ্জনবাবু যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশিষ্ট দলের প্রবীণ এম-এল-এ। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননীবাবুর বিরুদ্ধে তিনি দুর্নীতি, আমলাতোষণ, স্বজনপোষণ ইত্যাদি যে সব গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন, সেগুলো ননীবাবু যে-দলভুক্ত সেই দলের কাছে বা তাঁর নিজের দলের মারফৎ যুক্তফ্রন্টের কাছে উত্থাপন না করে তিনি স্বনামে সংবাদপত্র মারফৎ প্রকাশ করেছেন, এজন্য বিস্মিত হলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রবীণ বামপন্থী এম-এল-এ এবং তাঁর উত্থাপিত অভিযোগের সুযোগ যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে তথা ননীবাবুর বিরুদ্ধে ফ্রন্টবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অবশ্যই নিতে চাইবে। সেজন্য যুক্তফ্রন্টের একজন সমর্থক হিসেবে মনোরঞ্জনবাবুর উত্থাপিত প্রত্যেকটি অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখতে চেষ্টা করছি। প্রকৃতপক্ষে এই অনুসন্ধানের জন্য আমার কিছুটা সময় লেগেছে এবং সেজন্য এই প্রতিবাদপত্র পাঠাতে আমার দেরি হলো। তবে আমার অনুসন্ধানের ফলে এখন আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে, অভিযোগগুলো তুলে মনোরঞ্জনবাবু স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে তাঁর যে চূড়ান্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন, তার অধিকাংশই সম্পূর্ণ বাস্তব ভিত্তিহীন এবং অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনা তাঁর পরিবেশিত রিপোর্টের একেবারে বিপরীত। একথা বলার মত তথ্য-প্রমাণ আমার কাছে আছে যে, স্বাস্থ্যদপ্তরে ডাইরেক্টর, ডেপুটি ডাইরেক্টর প্রভৃতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে কংগ্রেস তথা পি-ডি-এফ ও গভর্নর ধর্মবীরের আমল পর্যন্ত যে সমস্ত আমলাতান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী অপ্রতিহতভাবে নিজেদের দাপট খাটিয়ে এসেছেন এবং বেপরোয়া দুর্নীতি, ব্যক্তিগত স্বৈরাচার ও অপশাসন চালিয়ে এসেছেন—ননীবাবুর অনুসৃত নীতির ফলে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় এবং হবার আশঙ্কায় তাঁরাই আজ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছুদিন ধরে মিথ্যা কুৎসাপ্রচারে নেমেছেন।

বলা বাহুল্য, দ্বিতীয়বার স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর যখন থেকে ননীবাবু তাঁর অনুসৃত নীতি অনুযায়ী কংগ্রেস দপ্তরে বাসা বেঁধেছিলেন তাঁদের কায়েমী আমল থেকে যে সব বাস্তুঘুঘুরা স্বাস্থ্য-স্বার্থে আঘাত হানতে উদ্যত হলেন, তখন থেকেই প্রচার আরম্ভ হয়ে গেল যে, ননীবাবু বর্তমান জয়েন্ট ডাইরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস-এর নেতৃত্বে একটি সুহৃদচক্রের কবলে পড়েছেন এবং তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী ননীবাবু সমস্ত কিছু করেন। খোলাখুলি বলা ভাল ঐ জয়েন্ট ডাইরেক্টর হলেন ডাঃ সরিৎনাথ মল্লিক। ডাঃ মল্লিক ননীবাবু স্বাস্থ্যমন্ত্রী হওয়ার বহু আগে থেকেই স্বাস্থ্যদপ্তরের প্রশাসন বিভাগে ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন। "সকালবেলায় সলতে পাকানো" এই শিরোনামায় কয়েকটি অনুচ্ছেদ ধরে কাহিনী সৃষ্টি করে ও যুক্তফ্রন্ট অনুরাগীদের পক্ষে আবেগজড়ানো একটি তারিখের উল্লেখ করে মনোরঞ্জনবাবু এই জয়েন্ট ডাইরেক্টর নিয়োগ সম্পর্কে যে বৃত্তান্ত দিয়েছেন সেটি একটি নির্জলা মিথ্যা। জয়েন্ট ডাইরেক্টর পদ ননীবাবু সৃষ্টি করেন নি। এই পদ আগে থেকেই ছিল। '৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের কয়েক মাস পর তদানীন্তন ডি-এইচ-এস ঐ পদে নিয়োগের জন্য সিনিয়র সিলেকশান গ্রেড অফিসারদের কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, শিক্ষণের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির তুলনামূলক বিচারে তার মধ্য থেকে ডাঃ মল্লিকের নাম সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ ননীবাবুর বিচার-বিবেচনার জন্য বেশ কিছুদিন ধরে পড়েছিল। ইতিমধ্যে ঐ পদের জন্য অন্য কোনো প্রস্তাব বা নাম ডাইরেক্টরেট বা ডিপার্টমেন্ট কোনো তরফ থেকেই আসে নি। ননীবাবুর অপরাধ তিনি তৎকালীন ডাইরেক্টরের সুপারিশের সঙ্গে ফাইলের সমস্ত রিপোর্ট দৃষ্টে একমত হন। ডাঃ মল্লিকের নিযুক্তি সম্পর্কে স্বাস্থ্যদপ্তরের সেক্রেটারীর স্বাক্ষরিত সরকারী অর্ডার ২১শে নভেম্বর, ১৯৬৭ বেরোয়। ডাইরেক্টরের সুপারিশে মন্ত্রীর অনুমোদন তার আগেই হয়েছিল। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে লাঠিচার্জ হয়েছিল ২২শে নভেম্বর বিকেলে। ২১শে নভেম্বর রাত্রে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত হওয়ার পর কোনো যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীর পক্ষে সরকারী ফাইলের বা সরকারী অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির ধারে কাছে যাওয়া যে সম্ভব ছিল না, সেটা মনোরঞ্জনবাবুর অজানা থাকার কথা নয়। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডাঃ ধর্মবীর ও পি-ডি-এফ-এর আমলে স্বাস্থ্যদপ্তরের কোন কর্মচারী লুকিয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ব্যাকডেট দিয়ে দলিলপত্র তৈরি করে সই করাতে পারেন, তেমন কোনো সাহসী কর্মচারী ছিলেন বলে আমার জানা নেই।

সেই ডাঃ সরিৎ মল্লিক এখনও জয়েন্ট ডাইরেক্টর পদেই আছেন। বোধ হয় আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর এই চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের কথা। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ বা তাঁর ব্যক্তিগত আচার-আচরণ সম্বন্ধে প্রকৃত কোনো অভিযোগ থাকলে যে কেউ সরাসরি লিখিতভাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে আনতে পারতেন এবং সে সম্পর্কে ননীবাবু ভিজিল্যান্স কমিশন মারফৎ উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থাও করতে পারতেন। মনোরঞ্জনবাবু জানেন না বোধ হয় যে, ডাঃ মল্লিকের পরিচালনাধীন একাধিক দপ্তর সম্পর্কে ননীবাবুর আদেশেই তদন্তের ব্যবস্থা হয়েছে এবং এখনও চলছে। ননীবাবুর উপর ডাঃ মল্লিকের বা তাঁর ঐ সুহৃদচক্রের বিন্দুমাত্র প্রভাব থাকলে এটা যে হতো না তা যে কোনো সহজবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই বুঝতে পারেন।

জয়েন্ট ডাইরেক্টর প্রসঙ্গে প্রয়োজন হলে পরে আবার আসা যাবে। কেন না মনোরঞ্জনবাবুর প্রধান অভিযোগ হচ্ছে যে, প্রাক্তন ডাইরেক্টর—ডাঃ ধর্মবীরের আমলের ও তাঁর অনুগত জনৈক উচ্চপদস্থ বৃটিশ আমলের সিভিলিয়ান কর্মচারীর সঙ্গে যিনি কুটুম্বিতার সূত্রে আবদ্ধ এবং যিনি ডাইরেক্টর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন ঐ গভর্নরেরই আমলে—তাঁকে ননীবাবু কেন এক্সটেনশন দিলেন না। বলা বাহুল্য ইনিই হলেন ডাঃ কনক সর্বাধিকারী। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদ থেকে রিটায়ার করার পর গভর্নর ধর্মবীর বাছাই করে তাঁকে রিঅ্যাপয়েন্ট করেন। মনোরঞ্জনবাবুর দুঃখ এবং প্রধান অভিযোগ যে, কেন এই ভদ্রলোককে আরও একবার এক্সটেনশন দেওয়া হলো না। মনোরঞ্জনবাবুর যেমন ডাঃ সর্বাধিকারীর সঙ্গে পরিচয় নেই, আমারও এই ভদ্রলোক সম্পর্কে অহেতুক বিদ্বেষ নেই। কিন্তু যেদিন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শাসনভার নেন, তখন এই ভদ্রলোক কি অজুহাতে কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিলেন এবং ফিরে আসার পর থেকে একাবৎ যুক্তফ্রন্টের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কিরকম সহযোগিতা করে গেছেন মনোরঞ্জনবাবু একটু অনুসন্ধান করে দেখেছেন কি? মনোরঞ্জনবাবুর অভিযোগের মর্মার্থ হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাকি ধর্মবীরের মনোনীত এই ডি, এইচ, এস-এর সঙ্গে সহযোগিতা করেন নি। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত মন্ত্রী তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, না

অধীনস্থ কর্মচারা মন্ত্রীর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এই নিয়ে কোনো চুলচেরা তর্ক করতে চাই না। তবে মনোরঞ্জনবাবু স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ডি, এইচ, এস-এর সাপ্তাহিক বৈঠক, কলকাতা ও জেলার হাসপাতালগুলোতে একত্রে ভিজিট ইত্যাদি যে সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন এগুলো তো ডি, এইচ, এস-এরই রুটিন কাজ। আশ্চর্যের বিষয় মনোরঞ্জনবাবু কোনো সময় ননীবাবুর কাছ থেকে এটা খোঁজ করার দরকার অনুভব করেন নি যে, ডাঃ সর্বাধিকারী নিজে এই রুটিন কাজকর্মগুলো করেছিলেন কিনা এবং করার মত শারীরিক অবস্থায় ছিলেন কি না?

মনোরঞ্জনবাবু জানেন কি না জানি না যে, ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে এই ডি, এইচ, এস কাজে যোগ দেন, আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী দপ্তরের ভার নেন ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে। তার কয়েক মাস পরেই ডি, এইচ, এস অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এই অক্টোবরে তাঁর এক বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অসুস্থতার কারণে তিনি দীর্ঘদিনের ছুটিতে চলে যান। এই অবস্থায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পক্ষে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ করার সুযোগ কতটুকু ছিল মনোরঞ্জনবাবু সহজেই বুঝতে পারেন। তবু মনোরঞ্জনবাবু ডি, এইচ, এস সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলো করেছেন সেগুলো সম্বন্ধে খোঁজ করে দেখেছি এবং তার ফলাফল মনোরঞ্জনবাবুকে জানানোর আগে একথা না উল্লেখ করে পারছি না যে, তিনি এমন কতকগুলো কথা তুলেছেন যা ডি, এইচ, এস ও মন্ত্রী ছাড়া কেউ জানেন না। ননীবাবুর সঙ্গে তো মনোরঞ্জনবাবুর ডি, এইচ, এস-এর প্রসঙ্গে কোনো সময় কোন আলাপ হয়েছে মনে হয় না। তাহলে মনোরঞ্জনবাবু এত সব কথা জানলেন কোথা থেকে, যেগুলো একমাত্র ডি, এইচ, এস-এর ভাবনার আওতায় পড়ে। সে যাই হোক, আমার অনুসন্ধানের ফলে জেনেছি (১) প্রতি সপ্তাহে এক সঙ্গে বসে পরবর্তী সপ্তাহের কাজকর্মগুলো সম্পন্ন করার কোনো প্রস্তাব ডি, এইচ, এস ননীবাবুর কাছে রাখেন নি। (২) জেলার এবং কলকাতার হাসপাতালগুলো ননীবাবু তাঁকে নিয়ে পরিদর্শন করতে চাইলেও ডি, এইচ, এসই এই সব প্রোগ্রামে উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। সম্ভবত দূর মফস্বলের হাসপাতাল বা হেলথ সেন্টারগুলো ঘুরে দেখতে হলে যে পথকষ্ট বা পরিশ্রম করতে লাগে ততটা শারীরিক ক্ষমতা বা অভ্যাস তাঁর ছিল না। একথা সবাই জানেন যে, তিনি সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত এবং মহাকরণে স্বাস্থ্যদপ্তরে একমাত্র তাঁর ঘরই এয়ার-কন্ডিশানিং করা। (৩) স্বাস্থ্যদপ্তরের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও টেকনিক্যাল ব্যাপারে তিনি নিজে মন্ত্রীর কাছে কোনো কার্যকর প্রস্তাব বা সমাধান পেশ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত বিগত ৭ মাসের মধ্যে বিরল। বরং মহাকরণে তাঁকে প্রয়োজনের সময় পাওয়া যেতো না বলে এবং অনেক ক্ষেত্র তাঁর কর্তৃত্বাভিমানী মেজাজের জন্য বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের সমস্যা, ডাক্তার ও অন্যান্য স্টাফেদের সমস্যা, ডাক্তার বা নার্সদের ওপর সমাজবিরোধীদের হামলা, স্বাস্থ্যবিভাগের বিভিন্ন কর্মীদের ইউনিয়ন ও অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধিদের ডেপুটেশন ইত্যাদি পরিস্থিতির মোকাবিলা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেই করতে হয়েছে বেশির ভাগ সময়। উপরন্তু মন্ত্রীর সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে হাসপাতালে ওষুধের বরাদ্দ কমিয়ে তিনি এক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডারও ছেড়েছিলেন যা নিয়ে বিভিন্ন মহলে মন্ত্রীকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অথচ ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ওষুধের সরবরাহ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত তার আগেই মন্ত্রী নিয়ে নিয়েছেন। (৪) ট্রান্সফার, প্রোমোশান প্রভৃতি ব্যাপারে প্রস্তাবগুলো যেহেতু প্রশাসনিক নিয়মে ডাইরেক্টরেটের থেকে আসে এবং সেক্রেটারিয়েট তা কার্যকরী করেন, মন্ত্রীর কাছে যেহেতু কতকগুলো নির্দিষ্ট গ্রেডের কর্মীদের ক্ষেত্রে ছাড়া এসব ব্যাপারে ফাইল আসে না, সুতরাং পরামর্শের দায় মন্ত্রীর ছিল না, ছিল ডাইরেক্টরের। (৫) উত্তরবঙ্গে ওষুধের মোড়কে পাথর পাওয়ার ব্যাপারে এবং কল্যাণীর জহরলাল হাসপাতাল, গোবরা মেন্টাল হাসপাতাল, পুরুলিয়া, নদীয়া প্রভৃতি জেলার হাসপাতালে দুর্নীতির ব্যাপারে তদন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই সুরু হয় এবং এখানে লক্ষণীয় মনোরঞ্জনবাবু যে জয়েন্ট ডাইরেক্টরকে ননীবাবুর আস্থাভাজন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন তদন্তগুলো সেই অফিসারেরই পরিচালনাধীন দপ্তরের সম্পর্কে। যাই হোক কয়েকটি ক্ষেত্রে তদন্ত এখনও চলছে। বিলম্বের কারণ ইচ্ছাকৃত নয়, ভিজিল্যান্স কমিশনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে এবং প্রশাসন বিভাগের কর্ণধার হিসাবে ডি, এইচ, এস-এর দায়িত্ব ছিল কাজ ত্বরান্বিত করার।

মনোরঞ্জনবাবু আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ তিনজন অর্থাৎ ডাঃ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রায় মহাশয় ও ডাঃ উপাধ্যায়কে বসিয়ে রাখার জন্য ননীবাবুর কাছে কৈফিয়ত চেয়েছেন। মনোরঞ্জনবাবুর অজানা থাকার কথা নয় যে, ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে গভর্নরের আমলে আর জি কর-এর বিশেষ গণ্ডগোলের পরিস্থিতিতে সামনে আনা হয়; ডাঃ রায় মহাশয় শারীরিক কারণে তার কলেজের প্রশাসনিক দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি চাওয়ায় ঐ অনুরোধ তাকে ছুটি মঞ্জুর করা হয়। এদের দুজনের কাউকেই বসিয়ে রাখা হয় নি। এঁরা স্বাস্থ্য বিভাগের প্যারা-মেডিক্যাল ও টেকনিক্যাল কর্মীদের ট্রেনিং কোর্স ইত্যাদি প্রস্তুত করা এবং হেলথ সার্ভিসে কর্মরত চিকিৎসকদের অ্যাকাডেমিক স্টেটাস নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত আছেন। বাঁকুড়ার ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে ছুটিতে আছেন। এঁদের তিনজনেরই স্থায়ী পোস্টিং শীঘ্রই হবে। আর ঐ তিনটি কলেজের মধ্যে ন্যাশনালে অস্থায়ী ব্যবস্থা নেই। সেখানে প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হয়ে কাজে যোগ দিয়েছেন। অপর দুই কলেজের প্রিন্সিপ্যালও শীঘ্রই নিযুক্ত হবেন।

স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল যে মনোরঞ্জনবাবুকে ইচ্ছামত সত্য গোপন করে বিকৃত রিপোর্ট দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করতে চেয়েছেন, তার প্রমাণ পেলাম আমলারাও যা করছেন মন্ত্রীও তাই করছেন শীর্ষক অনুচ্ছেদগুলোর তাঁর উল্লিখিত কয়েকটি নিয়োগের ঘটনার বিবরণ থেকে। প্রথমত, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে যে ভদ্রলোককে অবস্টাট্রিক্স ও গায়নোকলজি বিভাগের রীডার পদে পোস্টিং দিয়ে বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে, তিনি হেলথ সার্ভিসের ডাক্তার। স্বাস্থ্যদপ্তরে বর্তমানে অনুসৃত নিয়োগনীতি অনুসারে ১৯৬৭ সালেই যে নীতি ঘোষিত হয়েছিল অনারারি মেডিক্যাল অফিসারদেরকে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করা যাবে না। শুধু ঐ কলেজে কেন, রাজ্যের অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজেও সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক শিক্ষকদেরকেই যথাসম্ভব বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে। এখানে অনারারি চিকিৎসকদের সিনিয়রিটি থাকার প্রশ্ন স্বভাবতই বিবেচ্য নয়। তবে সার্ভিসে নিযুক্ত সিনিয়র চিকিৎসকদের দাবি যথাযথভাবেই বিবেচিত হয়েছে। মনোরঞ্জনবাবু খোঁজ নিলে জানবেন যাঁকে রীডার পোস্টিং দিয়ে বিভাগীয় প্রধান করা হয়েছে, শিক্ষক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা শিক্ষাগত গুণাবলী ও প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনার ক্ষমতায় স্বীকৃত। তাঁর বাঁকুড়ায় বদলীর প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনো সময় গুজব উঠে থাকতে পারে, কোনো অর্ডার হয় নি। কাজেই বদলীর আদেশ স্থগিত হওয়ার পিছনে কোনো গূঢ় কারণ থাকাটা মনোরঞ্জনবাবুর আবিষ্কার ছাড়া কি বলবো? দ্বিতীয়ত নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে মেডিসিনের লেকচারার করে যাঁকে আনার

জন্য মনোরঞ্জনবাবু স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে কৈফিয়ত চেয়েছেন, তাঁকেও ঐ পোস্টে নিযুক্ত করা হয় গভর্নরের আমলে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আমলে নয়। তার চেয়ে যাঁরা সিনিয়র ডাক্তার তাঁদের ব্যাপারে সুবিচার করার জন্য বরং স্বাস্থ্যমন্ত্রীই অগ্রণী হয়েছেন, অ্যাকাডেমিক এ্যাডভ ইসরী কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশে তার প্রমাণ রয়েছে। ঐ ভদ্রলোক আর, পি থাকাকালে অর্থ নিয়ে রোগী ভর্তি করেছেন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সমেত এমন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কারও কাছ থেকে অন্ততঃ ননীবাবুর কাছে পৌঁছয় নি। তৃতীয়ত ঐ এন আর এস মেডিক্যাল কলেজেরই প্যাথলজি বিভাগের তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধানকে যে বাঁকুড়ায় বদলীর আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা ঘটেছিল গভর্নরের আমলে নোটিফিকেশনের নং তারিখ হলো ঃ Estt/230/DHS/1S—103-66 dt. Cal. 12.1.1967) ননীবাবুর আমলে নয়। আর তাঁর জায়গায় যাঁকে বিভাগীয় প্রধান করা হয় তাঁকে ঐ পদের জন্য নির্বাচনের ব্যাপারে ননীবাবু বা তাঁর একান্তসচিব (বঙ্গদর্শনে বলা হয়েছে বিশ্বস্ত সহকারী) ভদ্রলোকের কোনোই হাত ছিল না। কারণ এই অর্ডারও হয় গভর্নরের আমলে নোটিফিকেশনের নং ও তারিখ হলো ঃ (Estt/232/DHS/103-66 dt. Cal. 12.1.1967) ননীবাবুর ১৯৬৭ সালের বা এবারকার কোন একান্তসচিব বা বিশ্বস্ত সহকারীই ঐ ভদ্রলোকের আত্মীয় নন। মনোরঞ্জনবাবু খোঁজ নিলে জানতেন ঐ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে বিড়লাবাড়ির জনৈক ডাক্তারের সহযোগিতায় দু' পয়সা রোজগার করার অভিযোগ বরং মন্ত্রীমশাই এসেই ভিজিল্যান্স কমিশনে তদন্তের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তদন্তে ঐ অভিযোগ টেকে নি। চতুর্থত ঐ একই কলেজে রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান নিয়োগের সময় ডাঃ ভট্টাচার্যের মত একজন উচ্চ ডিগ্রীসম্পন্ন প্রার্থীকে না দিয়ে একজন এম-বি-বি-এসকে নির্বাচিত করার কারণ কি মনোরঞ্জনবাবু জানতে চেয়েছেন। মনোরঞ্জনবাবু খোঁজ নিলে জানতে পারবেন যে, ঐ কলেজের আর-পি'র শূন্য পদে অফিসেরেট করার জন্য ঐ প্রার্থীকে লোক্যাল এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ যেটা তিনি করতে পারেন। কিন্তু ননীবাবু ঐ প্রার্থী নির্বাচন করেন নি। তা ছাড়া মেডিক্যাল আর-পি পদের জন্য এম-বি-বি-এস ডিগ্রী এবং ঐ পদে কিছুদিন কাজ করার অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। অপরদিকে ডাঃ ভট্টাচার্য প্যাথলজি বিষয়ের একজন স্পেস্যালিস্ট, দীর্ঘদিন ঐ বিভাগে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং মনোরঞ্জনবাবু খোঁজ নিলে জানতে পারবেন তিনি হেমাটোলজি বিষয় নিয়ে সরকারী খরচায় বিদেশে উচ্চশিক্ষালাভান্তে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন। এই সব বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যা কম বলে স্বাস্থ্যদপ্তর সাধারণত এঁদের এই বিষয় ছেড়ে ক্লিনিক্যাল দিকে চলে যাওয়া চান না। ডাঃ ভট্টাচার্যকে তাঁর নিজের স্পেসালিটির বিশেষ অভিজ্ঞতার দরুণ প্যাথলজি বিভাগের কাজ ছাড়াও ব্লাডব্যাঙ্কের অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া তিনি কলেজ হোস্টেলেরও সুপারিনটেনডেন্ট; এসবের জন্য অতিরিক্ত ভাতাও পান। এক্ষেত্রে তাঁর মতো বিরল বিষয়ের সিনিয়র স্পেসালিস্টকে অপেক্ষাকৃত জুনিয়র একটি পদে টেনে আনারই বা কী যুক্তি থাকতে পারে মনোরঞ্জনবাবুই বলুন।

উপরের নিয়োগের ঘটনাগুলো থেকে দেখাই গেল মন্ত্রী অনিয়মে কিছু করেন নি। সুতরাং আমলারাও যা করছেন মন্ত্রীও তাই করছেন বলে মনোরঞ্জনবাবু যে কটাক্ষ করেছেন, ননীবাবুর সম্বন্ধে এটা করার আগে সংশ্লিষ্ট কেসগুলো সম্বন্ধে একটু ভালভাবে খোঁজখবর নিতে পারতেন।

'স্বজনপোষণ ও মন্ত্রীর ইমেজ' শীর্ষক অনুচ্ছেদগুলোতে মনোরঞ্জনবাবু ননীবাবুর ইমেজ নষ্ট হওয়ার কারণ হিসাবে যে কয়টি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন সেখানেও মনে হলো ননীবাবুর ইমেজ নষ্ট হওয়ার সিদ্ধান্তকে প্রতিপন্ন করার জন্যই তিনি সেগুলোকে খাড়া করেছেন। স্বাস্থ্যদপ্তরের মন্ত্রীর পার্টির সংগঠক ডাক্তার থাকাটা, মনোরঞ্জনবাবু স্বীকার করবেন, শিক্ষাদপ্তরের মন্ত্রীর পার্টির সংগঠক শিক্ষক থাকার চেয়ে বেশি বিস্ময়কর নয়। মনোরঞ্জনবাবু তেমন তিনজন ডাক্তারের নাকি সন্ধান পেয়েছেন, যাঁদেরকে মন্ত্রী তাঁর আমলাচক্রের মাধ্যমে অত্যন্ত ভাল ভাল জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন। অথচ যাঁরা সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন, ছাত্রী ও মহিলাকর্মীদের লাঞ্ছিত করেছেন ইত্যাদি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভালো ভালো জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন তাঁর পার্টির সংগঠক এমন ডাক্তারদের নাম ও তথ্য সম্বন্ধে মনোরঞ্জনবাবু নিজে সুনিশ্চিত হলে নিশ্চয়ই প্রকাশ করতে ইতস্তত করতেন না। তাঁর এই আন্দাজে ছোড়া অভিযোগ-এর উত্তর এখন না দিয়ে তিনি নাম প্রকাশ করলে বরং খোঁজখবর নিয়ে দেওয়া যাবে। তবে মনোরঞ্জনবাবুর কাছে জিজ্ঞাস্য, ডাক্তাররা অতীতে কে কোন প্রগতিশীল আন্দোলনের সমর্থন বা বিরোধিতা করেছিলেন এই বিচারের আগে কি একই প্রশ্নে প্রশাসন, বিচার ও পুলিশ বিভাগের শীর্ষস্থানীয় কর্মচারীদের বিচার হওয়া উচিত নয়? মনোরঞ্জনবাবু কি সেই প্রস্তাব দেবেন। আর ডাক্তারদের প্রাথমিক আনুগত্য যে পীড়িতদের সেবার প্রতি সেটাও কি মনোরঞ্জনবাবু বদলাতে বলবেন? মহিলাদের লাঞ্ছিত করার মারাত্মক অভিযোগ তোলার আগে কি মনোরঞ্জনবাবু যাচাই করে দেখেছেন এগুলো প্রফেসনাল জেলাসীর দরুণ চরিত্রহননের অপচেষ্টা কি না?

ধুবুলিয়া টি বি হাসপাতালের ঘটনায় যে বিবরণ মনোরঞ্জনবাবু দিয়েছেন তাও সঠিক নয়। ডাঃ চক্রবর্তী তাঁর নিয়মমাফিক বদলীর আদেশ রদ করার চেষ্টায় রোগীদের একাংশকে দিয়ে সুপারিনটেন্ডেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাওয়ার ফলে সুপারিনটেন্ডেন্ট ও স্টাফের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। হাসপাতালের কায়েমী গোষ্ঠীকে বজায় রাখার জন্য তাঁকে বাটিতি বদলী করা হয়েছিল, বা এ সমস্ত ঘটনার পিছনে মন্ত্রীমহাশয়ের নিজের দলের লোক ছিল এগুলো আদৌ সত্য নয়। রোগীদের খাবার চুরি, রোগীদের দরজা বন্ধ করে অনাহারে রাখা এবং গন্ডগোলে সুপারিনটেন্ডেন্ট সহ স্টাফ ও কর্মীদের ভূমিকা ইত্যাদি সমস্ত বিষয় তদন্তের জন্য ননীবাবু একজন সদস্যাবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির উপর ভার দিয়েছেন। ভারপ্রাপ্ত বিচারক শীঘ্রই কাজ সুরু করবেন। সুতরাং এখন ঐ সব বিষয়ে মতামত না দেওয়াই সমীচীন।

মনোরঞ্জনবাবু আরও দুটি ঘটনা বিকৃত করেছেন। প্রথমত মন্ত্রীমশাই বঙ্গভবনে তাঁর কোনো বন্ধু নিয়ে ওঠেন নি। তাঁর সঙ্গে তাঁর দপ্তরের সেক্রেটারী এবং পার্সোন্যাল এসিসটেন্ট ছিলেন। দ্বিতীয়ত স্যান্যালবাবুর ১৯৬৭ সালের যে ফার্মেসী ইন ইন্ডিয়া চিত্রটির কথা তুলে মনোরঞ্জনবাবু ননীবাবুর ইমেজ নষ্ট হয়েছে প্রমাণ করতে চাইছেন সেই চিত্রটি ননীবাবুর সুপারিশে তৈরি হয় নি। তাঁর সুপারিশে কেনাও হয় নি। কলকাতার ও বাইরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভেষজ-রসায়নবিদ বিষয়বস্তুর গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজেরাই বুদ্ধিপরামর্শ দিয়ে চিত্রটি তৈরি করতে সাহায্য করেন। ফার্মেসী ট্রেনিং-এর শিক্ষার্থীদের তথা ভারতের ভেষজ সম্পদ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসুদের কাজে লাগতে পারে বিবেচনা করে তদানীন্তন তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর সরকার কর্তৃক চিত্রটি কিনে নেওয়ার পক্ষে অভিমত দেন এবং নিজেদের অর্থ সঙ্গতি না থাকায় স্বাস্থ্যদপ্তরকে চিত্রটি কেনার প্রস্তাব দেন। স্বাস্থ্যদপ্তরের ডাইরেক্টরেট এই প্রস্তাব

অনুমোদন করলে চিত্রটি কেনা হয়। প্রধানত টেকনিক্যাল বিষয়ের ফিল্ম বলে এটির বহুল প্রচার না হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এই সমস্ত নড়বড়ে তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে ননীবাবুকে আদর্শভ্রষ্টতার মতো একটা গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ অভিযোগে অভিযুক্ত করা মনোরঞ্জনবাবুর মত প্রবীণ এম-এল-এর পক্ষে কতটা সমীচীন হয়েছে তিনিই বিচার করে দেখুন। আর আমলাতন্ত্রকে ননীবাবু যথোপযুক্ত আঘাত দেন নি এটাই যদি মনোরঞ্জনবাবুর প্রতিপাদ্য হয়, তাহলে বলবো ননীবাবু কেন জাঁদরেল আমলাদের (পূর্বতন আই-সি-এস চীফ সেক্রেটারী হোম সেক্রেটারী প্রভৃতি পদে যাঁরা এখনও বহাল তবিয়তে আছেন) মনোরঞ্জনবাবুর দলনেতা জ্যোতিবাবুর দপ্তরও সরাতে পারে নি।

ননীবাবু স্বাস্থ্যদপ্তরের মত একটা বাস্তুঘুঘুদের আস্তানা থেকে কংগ্রেস আমলে হাজার হাজার টাকা কামাই করা এবং ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর গৌরীসেনের টাকা লুঠ করা কয়জন আমলাকে সরিয়েছেন। তাঁর মনোভাব যতটুকু জানি গভীর দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমলার কার্যকলাপও তিনি ভিজিল্যান্স কমিশনের কাছে অনুসন্ধানের জন্য পাঠাবার কথা ভাবছেন।

—অশোক চৌধুরী
এম-এল-এ

লেখকের বক্তব্য

ইংরেজীতে যাকে বলে 'ব্যাড টেস্ট'—স্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কে লিখে অবশেষে আমি সেই কুরুচির শিকার হব, এ আমি কখনো ভাবি নি। এতদিন যেসব রীতিনীতি প্রচলিত ছিল, স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষে আর সে সব মানবারও বোধ করি কোন প্রয়োজন নেই। সরকারী দপ্তর সম্পর্কে কেউ কোন অভিযোগ করলে বা কেউ কোন বিকৃত, ভুল অথবা অসত্য খবর প্রচার করলে বিভাগীয় মন্ত্রী নিজে, প্রচারদপ্তর অথবা প্রেস নোটের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ করে আসতেন এবং এইটাই ছিল প্রচলিত রীতি, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম অদ্ভুত এক পদ্ধতি গ্রহণ করলেন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তাঁর দপ্তরের আমলারা এবং তাঁর দলের কোন কোন নেতা ও বিধানসভা সদস্য।

প্রথমে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দলের শ্রীঅশোক চৌধুরী এম-এল-এ মহাশয় যে রচনাটি আমার লেখাটির (৯।১০।৬৯ তারিখে) প্রতিবাদে এই সংখ্যায় ছাপিয়েছেন তার থেকে একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই। তিনি লিখেছেন—"মনোরঞ্জনবাবু যুক্তফ্রন্টের একটি বিশিষ্ট দলের প্রবীণ এম-এল-এ। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননীবাবুর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, আমলাতোষণ, স্বজনপোষণ ইত্যাদি যে-সব গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন সেগুলো ননীবাবু যে দলভুক্ত সেই দলের কাছে বা তাঁর নিজের দলের মারফৎ যুক্তফ্রন্টের কাছে উত্থাপন না করে তিনি স্বনামে সংবাদপত্র মারফৎ প্রকাশ করেছেন, এজন্য বিস্মিত হলাম।" তাঁর এ বিস্ময়ের মর্মকথা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি এবং ঠিক সেই জন্যই তাঁর দলের শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীমাখন পাল মহাশয় যখন আমার দলের শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন তিনি (কমরেড দাশগুপ্ত) আমার ভুলটা কোথায় তা আমায় সুন্দরভাবে ধরিয়ে দেন। বলতে পারি লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ছিল না। আমি মার্কসবাদে বিশ্বাসী মানুষ। ভুল স্বীকার করার মত সৎ সাহস আমার থাকা উচিত এবং সেই শিক্ষাই আমি জীবনে পেয়েছি। কাজেই কমরেড দাশগুপ্তের যুক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসি এবং আমার টেকনিক্যাল ভুলের জন্য আমি নীরবেই থাকি।

কিন্তু তারপর কি ঘটল?

স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে সাংবাদিকদের কাছে বললেন—"আমি দুর্নীতিতে নাড়া দিয়েছি এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নিয়েছি বলে কায়েমী স্বার্থের চক্র যন্ত্রণা বোধ করছেন এবং সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। মনোরঞ্জনবাবু সেই সব সমালোচকদের দলে।"

এতেও কি ব্যাপারটার পূর্ণচ্ছেদ পড়ল?

না। পর পর কলকাতার দুটি সংবাদপত্রে আর-এস-পি সূত্রে প্রাপ্ত খবর ছড়ানো হল। খবরগুলি এমনভাবে ছড়ানো হল যেন কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে দলীয় এম-এল-এ-দের সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের। এটা মার্কসবাদী দল ছাড়া অন্য কোন দলের হতে পারে। যাত্রাদলের অধিকারী কাকে কোন্ পার্ট দেবেন তা ঠিক করে দেন, কিন্তু আমার দলের মধ্যে এই প্রথার প্রচলন নেই। আমি এতে খুব অপমানিত বোধ করেছিলাম। কিন্তু উপায় নেই। আমার দলের শ্রদ্ধেয় নেতার ধৈর্য আমি দেখেছি, কাজেই শরিকী গোলমাল যাতে না বাড়ে সেজন্য তাঁকেই অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি।

এরপরও কি এ ঘটনার যবনিকাপাত হল?

না। চলল সংবাদপত্র অফিসে তদ্বির এবং হুইসপারিং ক্যাম্পেন। এতদিন যাদের "কায়েমী স্বার্থের প্রতীক" বলে অঙ্গুলিসংকেত করা হচ্ছিল, এবার তাদেরই কাছে তদ্বির চলতে লাগল এই বলে, আপনাদের কাগজের 'ইমেজ' নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মনোরঞ্জন হাজরার লেখার জন্য (কারণ তাঁর দল থেকেই তাঁকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্যদপ্তরের বিরুদ্ধে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল বলে। খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এই অসত্য প্রচারের নোংরা অভিযান দেখে। আমি আমার দলের সারাক্ষণের কর্মী এবং আমার পারিবারিক দায়-দায়িত্বও অনেক বেশি। আমার দল আমাকে সব চেয়ে বেশি মাসোহারা দেন, কিন্তু তাতেও আমি দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারি না। তাই আমাকে কলম চালিয়ে কিছু উপার্জন করতে হয়। এ অবস্থায় সেখানেও হাত দেবার মত প্রবৃত্তি দেখে আমি চমকে উঠলাম। যে সব ব্যক্তি ও আমলা এসব করেছেন, তাঁরা কেউই আমার অজানা নন এবং অনেকেরই অনেক কিছু তথ্য আমার হাতে আছে। সময় মত সেসব তুলে ধরলে আর যাই হোক অন্তত আমার অন্নটা মারা যাবে না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি নীরব ছিলাম।

তবু ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল—ভাঙল এইজন্য যে, একটা লেখা আমি লিখেছি, আর সে লেখা সম্বন্ধে আমি যে-দলের সভ্য সে-দলকে বলেও হয় নি। মন্ত্রী নিজে সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেও হয় নি, সংবাদপত্রে প্রচার করেও হয় নি, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও আমলাদের দিয়ে তদ্বির করেও হয় নি, আমার রুজি-রোজগার বন্ধ করার চেষ্টা করেও হয় নি—এখন মন্ত্রীর দলের এম এল এ-কে দিয়ে লেখা পর্যন্ত পাঠানো হচ্ছে। স্বাস্থ্যদপ্তর কতখানি প্রতিহিংসাপরায়ণ হলে তবে এটা ঘটে, সেটুকু এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

আরও যেখানে আমার লেখার জবাবে একটা সরকারী বিবৃতি দিলেই ব্যাপারটা চুকে যেত, সেখানে শ্রীচৌধুরীর লেখাটি পাঠাতে দেখে স্বাস্থ্যদপ্তরের পরিণতির কথা ভেবে আমি শিউরে উঠলাম। সরকারের যেখানে বক্তব্য নেই, সেখানে যেন ষড়যন্ত্রটাই প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীচৌধুরী যে লেখাটি পাঠিয়েছেন, সেই লেখাটি ফুলস্ক্যাপ সাইজের দীর্ঘ আট পৃষ্ঠাব্যাপী এবং বাংলা টাইপরাইটারে ঠাসা ছাপা। সেই লেখাটি শ্রীচৌধুরীর স্বহস্তলিখিত একখানি ক্ষুদ্র চিঠির দ্বারা সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। টাইপ করা লেখাটির মাঝে মাঝে হাতের লেখায় সম্পাদনা করা। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই হাতের লেখা আর শ্রীচৌধুরীর হাতের লেখায় কোন মিল নেই। আরও একটা জিনিস দেখা গেল—শ্রীচৌধুরীর হস্তাক্ষর আদৌ খারাপ নয়। প্রেসের কম্পোজিটার বন্ধুদের বুঝতে কোনই অসুবিধা হবার

কথা নয়। তথাপিও টাইপ করা লেখাটির কি প্রয়োজন ছিল স্বতই মনে প্রশ্ন ওঠে। তাই বলতে হয়—এ লেখা হয় শ্রীচৌধুরী স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দলীয় এম-এল এ বলে তাঁর সামনে দপ্তরের আমলারা সরকারী ফাইল খুলে ধরে তাঁকে লিখতে সাহায্য করেছেন—নয়তো সেই আমলারাই মহাকরণের বাংলা টাইপরাইটারে নিজেদের মনগড়া তথ্য দিয়ে শ্রীচৌধুরীর মাধ্যমে সংবাদপত্রে প্রচারের রাস্তা খুঁজে নিয়েছেন। শ্রীচৌধুরীর নামের রচনাটি এই সংখ্যাতেই বেরিয়েছে, তাতে ফাইলের পর ফাইলের উল্লেখ দেখলে যে কোন পাঠক আমার বক্তব্যের মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন বলে আমি মনে করি। এই পদ্ধতিতে সরকার-বিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদ অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সরকারী গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য আমলাদের দায়িত্ব এবং বিভাগীয় মন্ত্রীর শপথের প্রশ্ন। সাপ্তাহিক বসুমতীর কর্তৃপক্ষকে শ্রীচৌধুরীর হাতে লেখা চিঠিটি ও তার সঙ্গে টাইপকরা পাণ্ডুলিপিটি আমি সযত্নে রক্ষা করার কথা জানিয়েছি। যথাস্থানে আমি এর তদন্ত প্রার্থনা করব। লর্ড প্রফিউমোর ডিসক্লোজারের কথা সারা পৃথিবী জানে। কাজেই যেকথা বলছিলাম—এও আমার একটা নীরবতা ভঙ্গ করার কারণ।

এবার শ্রীচৌধুরীর তথাকথিত বক্তব্যের মধ্যে আসি। শ্রীচৌধুরী আমাকে অযাচিত উপদেশ দিয়েছেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননীবাবুর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, আমলাতোষণ, স্বজনপোষণ ইত্যাদি যেসব গুরুতর অভিযোগ আমি তুলেছি, কেন সেগুলি ননীবাবু যে দলভুক্ত সেই দলের কাছে বা আমার নিজের দলের মারফৎ যুক্তফ্রন্টের কাছে উত্থাপন না করে সংবাদপত্রে স্বনামে লিখেছি! আমি কি সবিনয়ে শ্রীচৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না—তিনি এর কতটুকু পালন করলেন? তিনি কি আমার দলকে জানিয়েছিলেন, তিনি কি তাঁর দলের মারফৎ যুক্তফ্রন্টের কাছে তাঁর লেখাটি উত্থাপিত করেছিলেন? তবে তিনি কেন সংবাদপত্রে স্বনামে প্রকাশ করতে গেলেন?

অবশ্য আমি এমন বোধশক্তি হারাই নি যে, তাঁর লেখার কারণ সম্বন্ধে তিনি কি বলবেন তা অনুমান করতে পারব না। তিনি নিশ্চয়ই বলতে পারেন—মনোরঞ্জনবাবু লিখেছিলেন বলেই তো লিখতে হল তাঁকে। সত্যিই তো। কিন্তু মনোরঞ্জনবাবু যা লিখেছিলেন, সে তো একটা দপ্তরে সরকারের ঘোষিত প্রশাসনিক নীতির বিচ্যুতির বিরুদ্ধে। সেখানে প্রশাসনিক দপ্তরের উত্তর কোথায়, কোথায় তাঁদের বক্তব্য? তাহলে কি বুঝে নেবো বক্তব্য নেই বলেই যে টেকনিক্যাল ভুলের মাশুল আমি দিয়েছি নীরব থেকে, সেই ভুলের মাশুল কি তিনি দেবেন সরব হয়ে? তাঁর আমার প্রতি অযাচিত উপদেশের মর্মকথা কি এই? অথবা যে প্রশাসনিক দুর্নীতি থৈ-থৈ করছে স্বাস্থ্যদপ্তরে, তাকে কি আড়াল করার জনাই তিনি লিখেছেন? তাই যদি হয়, তবে বলতে হবে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন এ বিষয়ে।

শ্রীচৌধুরী যতই তাঁর রচনায় যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চান যে আমি নড়বড়ে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে লিখেছি, ততই তিনি কিন্তু আমার অভিযোগগুলি স্বীকার করে ফেলেছেন। একটা খারাপ মামলায় প্রতিভাবান আইনজীবী লড়াই করতে গেলে তাঁর যে অবস্থা হয় সেই অবস্থাই হয়েছে শ্রীচৌধুরীর রচনায়। তাঁকে বলতে হয়েছে যে, হ্যাঁ ২১শে নভেম্বর তারিখে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খারিজের দিনেই, জয়েন্ট ডিরেক্টরের নিয়োগ আদেশটি বেরিয়েছিল। তবে নাকি ব্যাক ডেট দিয়ে নয়। হ্যাঁ, তিনজন অধ্যক্ষকে রাইটার্সে আনার কথা ঠিকই তবে তিনি বলেছেন তাঁদের বসিয়ে রাখা হয় নি। অর্থাৎ ব্যাকরণের মতে বসে থাকাটাও একটা কাজ তো বটে। হ্যাঁ তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে এন আর এস, আর জি কর প্রভৃতিতে নিয়োগ ও বদলীর ব্যাপারগুলি। তবে তিনি কিছু যুক্তির অবতারণা করেছেন। যে যুক্তি আমলাতান্ত্রিক যুক্তি। হ্যাঁ, বিড়লাবাড়ির ডাক্তারের সহযোগিতায় যিনি এন আর এস-এ দু' পয়সা রোজগার করতেন, তাঁকেই বিভাগীয় প্রধান করা হয়েছে। তবে নাকি তদন্ত হয়েছিল। তাছাড়া যতগুলি হাসপাতালে দুর্নীতির ব্যাপারের কথা আমি বলেছিলাম, সব জায়গাতেই তদন্তের আদেশ নাকি দেওয়া হয়েছে। শুধু ভিজিলেন্স কমিশনের জন্য বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই কি অন্যায় কথা! হ্যাঁ, তিনি স্বীকার করেছেন ধুবুলিয়া হাসপাতালে তদন্তের আদেশ ননীবাবু দিয়েছেন—তবে মুস্কিল এই সেটা আমার লেখার পরে, আগে নয়। তিনি 'মেডিসিন ইন ইণ্ডিয়া' চিত্রটি কেনার কথাও স্বীকার করেছেন। তবে ননীবাবু নাকি সেজন্য দায়ী নন বলেছেন। স্বাস্থ্যদপ্তরের অনেক নিয়ম উল্লেখ করে কেন সিনিয়র লোকদের এবং উচ্চগুণসম্পন্ন চিকিৎসকদের উন্নীত করা যায় নি সে কথা তিনি আত্মরক্ষামূলক ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এ সবই আমি তথ্য দিয়ে লিখেছিলাম, কিন্তু সাপ্তাহিক বসুমতীর কর্তৃপক্ষ এ সংখ্যায় আমাকে বেশি স্থান দিতে পারছেন না, তাই সেসব আগামী সংখ্যায় আমি লিখব। আগামী সংখ্যাতে দিয়ে জানাবো, যাঁকে শ্রীচৌধুরীর রচনায় অত্যন্ত কুৎসিতভাবে আক্রমণ করা হয়েছে এবং যাঁর জন্য শ্রীচৌধুরী তাঁর রচনার বেশির ভাগ জায়গা ব্যয় করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে এক অহেতুক বিদ্বেষ তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে এবং আমি যাঁকে চিনিও না, তাঁকে জড়িয়ে আমাকে বলা হয়েছে তাঁর সম্বন্ধেই নাকি আমার প্রধান অভিযোগ। তাঁকে আরও এক্সটেনশন দেওয়া হল না কেন একথা নাকি আমার লেখায় আমি বলেছি বলে শ্রীচৌধুরী বলেছেন। আমি জানি আমার দুটো চোখে রিডিং গ্লাসের পাওয়ার হচ্ছে +১৪০—শ্রীচৌধুরীর চোখ কি আমার চেয়েও খারাপ? তিনি কোথায় এরকম তথ্য পেলেন আমার লেখার মধ্যে? যেহেতু শ্রীচৌধুরীরা প্রাক্তন ডাইরেক্টারকে অত্যন্ত নীচভাবে আক্রমণ করেছেন সেইহেতু ভদ্র রাজনৈতিক মানুষ হিসাবে আমার সহানুভূতি তাঁর দিকে যাবেই। তাছাড়া আমি এখানে কঠোরভাষা প্রয়োগ করতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু সে ভাষার জোর আমার নেই—তবে তথ্য আছে, যে তথ্যের দ্বারা আগামী সংখ্যায় গোটা স্বাস্থ্যদপ্তরের নর্দমার পাঁক আমি পশ্চিমবাংলার সুস্থ রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে তুলে জড়ো করে দেব? আমাকে ভয় দেখাবেন এরপর? ঠিক ততটা ভীরু মানুষ আমি নই।

—মনোরঞ্জন হাজরা

*

আমি "সাপ্তাহিক বসুমতী"র একজন নিয়মিত পাঠক। আপনাদের পত্রিকার 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতদর্শন', 'সপ্তাহের বোঝা' আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। আপনাদের পত্রিকায় (৯ই অক্টোবরের সংখ্যায়) স্বাস্থ্যদপ্তরের দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধে ধুবুলিয়া টি· বি· হাসপাতালের ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ সত্য। জানি না আপনারা কোথা থেকে, কিভাবে ঐ সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে আপনাদের সংবাদ পরিবেশনায় নির্ভীকতার জন্য আপনারা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন। ধুবুলিয়াতে যখন (হাসপাতালে) তুলকালাম কাণ্ড চলছিল, সেই সময় আমি ধুবুলিয়াতে ছিলাম। একটি ঠিকানা আমি নিচে দিলাম। যদি আরও কোন তথ্য আপনার বা মনোরঞ্জন হাজরা মহাশয়ের প্রয়োজন হয়, আমাকে জানালে বা মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে কবে কিভাবে দেখা হবে তা যদি দয়া করে জানান, তবে হয়তো সত্য তথ্য পরিবেশনায় আপনাদের যথেষ্ট সুবিধা হবে। স্বাস্থ্যদপ্তর সম্বন্ধে মনোরঞ্জনবাবুর তথ্যবহুল প্রবন্ধের জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ

রাত ৩টার সময় যেদিন ডাঃ চক্রবর্তীর ছেলেকে মারধোর করে, তখন সেখানে সুপার, সেক্রেটারী, গোপন পরামর্শদাতা, ধুবুলিয়া হাসপাতালের সমস্ত ঘটনার নায়ক জনৈক ব্যানার্জী সাহেব, একাউন্টস্ অফিসার অন্যান্য ডাক্তার এবং কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন। অথচ তাঁরা এর একটি প্রতিবাদও করেন নি। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, উক্ত রাত্রের গুণ্ডামি সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। সকলেরই জানা যে, ধুবুলিয়াতে ডাঃ চক্রবর্তীর ওপর সুপার এবং অন্যান্য অফিসারদের রাগ ছিল এই কারণে যে, হাসপাতালের রোগীদের খাবার যথেচ্ছভাবে চুরি যেত এবং রোগীরা ভাল এবং উপযুক্ত পরিমাণ খাবার পেতেন না এবং ডাঃ চক্রবর্তী এই সব খাবার চুরি এবং রোগীদের খাবারের স্বল্পতার প্রতিবাদ করতেন। আমি বুঝতে পারি না রোগীরা যে ডাক্তারকে চান, তাঁকে যত তাড়াতাড়ি বদলী করে দেওয়া, যাঁদের চান না, তাঁদের রেখে দিয়ে কুচক্রের জাল বিস্তার করতে সহায়তা করাই কি সরকারের নীতি? তা না হলে যে জনৈক ব্যানার্জী সাহেব রোগীদের দ্বারা পদে পদে অবাঞ্ছিত বলে পরিগণিত হয়েছেন এবং যে সুপার ধুবুলিয়ার সেই ঘটনার পর থেকে আজও 'ওয়ার্ডে' যেতে চান না, তারা আজও স্ব স্ব স্থানে কিভাবে বহাল আছেন?

কিছুদিন আগে ব্যানার্জী সাহেব ওয়ার্ড থেকে কল-বুক আসা সত্ত্বেও অবহেলাভরে ডিউটিতে না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকেন। পরে রোগী মারা গেলে অন্যান্য রোগীরা স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তখন প্রাণভয়ে বিনা ছুটিতে এবং সুপার-এর পরামর্শে অনেকদিন ধুবুলিয়ার বাইরে কাটিয়ে আসেন। এমনি যেখানে প্রশাসনের অবস্থা, সেখানে আমাদের যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর কি করে যে চুপ করে বসে আছেন জানি না।

ডাঃ চক্রবর্তীর ছেলেকে মারধোর করার পর স্থানীয় থানায় ডায়েরী করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও পুলিশ বিভাগ ঐ ঘটনার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে সক্ষম হন নি। আপনারা এতদিনের ঘটনাকে মনে রেখে সত্য-তথ্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এজন্য আপনাদের আবার ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি এই ঘটনা আরও বিশদভাবে প্রকাশ করে স্বাস্থ্যদপ্তরকে উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য করবেন। যদি আমি আপনাদের কোন উপকারে আসি তবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করলেই আমার উত্তর পাবেন। অনুগ্রহ করে আমার নাম-ঠিকানাটি প্রকাশ করবেন না, তাহলে আমার সমূহ বিপদ হবে।

—জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী

•

আপনার ৭৪ বর্ষ, ১৯শ সংখ্যার (৬ই নভেম্বর, ১৯৬৯) 'পাঠকমন'-এ প্রকাশিত মণিরুল ইসলামের (বাঁকুড়া) চিঠিখানা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভদ্রলোক বাঁকুড়াতে বসে আর জি কর থেকে সুরু করে বাঁকুড়া পর্যন্ত সব খবরই রাখছেন। তাঁর চিঠির ৩ নম্বর পর্যন্ত আলোচনা করার অভিপ্রায় আমাদের নেই, কারণ তা বাঁকুড়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন। কিন্তু ৪ নম্বর যা লিখেছেন বাঁকুড়ার হাসপাতাল নিয়ে। তার জবাব না দিয়ে পারছি না।

প্রথমত আমাদের পার্টির বেশির ভাগ কর্মীই যুবক, যাদের জনসেবা করার যথেষ্ট সুনাম আছে। দুস্থ এবং সংকটাপন্ন রোগীদের 'ব্লাড ব্যাংক' থেকে রক্ত দেওয়ার জন্য আবেদন করা ঘরোয়া সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা নয় বরঞ্চ না দেওয়াটাই পৈত্রিক সম্পত্তির মত ব্যবহার করা।

দ্বিতীয়ত সার্জিকাল ওয়ার্ডে একটি জেনারেটর ভাড়া করেছেন কর্তৃপক্ষ। যার দাম ৫।৬ হাজার টাকা। তার জন্য ভাড়া দিতে হয় ৭০০।৮০০ টাকা, এর প্রতিবাদে আর এস পি-ই প্রিন্সিপ্যাল-এর কাছে প্রতিবাদ করেছে।

তৃতীয়ত নিত্যনৈমিত্তিক লোকাল পার্চেজের ব্যবস্থা করেছেন কর্তৃপক্ষ। আমরা বহু খবর জানি যে লোকাল পার্চেজ হচ্ছে, স্টোরে যাচ্ছে কিন্তু রোগী পাচ্ছে না, অথচ খরচ দেখানো হচ্ছে।

চতুর্থত আর এস পি-র কোন সভ্য বা কর্মী আজ পর্যন্ত বাঁকুড়ার হাসপাতালে ভর্তি হয় নি। অনেক আগে থেকেই হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত নন এমন একজন ডাক্তার আমাদের সমর্থক আছেন। খুব প্রয়োজনে তিনিই আমাদের পার্টি-কর্মীদের চিকিৎসা করে থাকেন।

পঞ্চমত বাঁকুড়ার হাসপাতালের ইমার্জেন্সী অফিসার যিনি সম্প্রতি আর জি কর হাসপাতাল থেকে এখানে এসেছেন, তাঁকে প্রায় সময়েই ডিউটিতে দেখা যায় না বলে জনসাধারণ খুবই ক্ষুব্ধ।

ষষ্ঠত স্থানীয় আর এস পি কর্মীরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করে এবং অবশেষে ১৫ই আগস্ট বাস মালিকদের ঘেরাও করে হাসপাতাল পর্যন্ত ২১টি বাস চলাচলের ব্যবস্থা করে এবং তার ফলে বহির্বিভাগের রোগীর চাপ বেড়ে গেছে। সেইজন্যেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ কমে যাওয়ায় কায়েমী স্বার্থের ডাক্তারদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, অঞ্চলের লোকেরা তা জানেন।

—মোহন পাত্র
সম্পাদক, আর-এস-পি, বাঁকুড়া

•

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার 'প্রসঙ্গদর্শনে' স্বাস্থ্যদপ্তর ও জলপাইগুড়ির (বর্তমান কলিকাতাবাসী) জনৈক সান্যালবাবুর সম্বন্ধে আলোকপাত করিতেছেন জানিয়া ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য যদি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করেন তাহা হইলে খুবই বাধিত হইব।

(১) স্বাস্থ্যদপ্তরের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র ফার্মেসী ট্রেনিং সেন্টার জলপাইগুড়িতে অবস্থিত, এই শিক্ষায়তনের চারজন ডেমনস্ট্রেটর যাঁহারা সুদীর্ঘ ১৩।১৪ বৎসর যাবৎ পূর্ণ যোগ্যতার সহিত শিক্ষকতা করিতেছেন হঠাৎ কোন কারণ না দর্শাইয়া অন্যায়ভাবে তাঁহাদের শিক্ষক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান হইয়াছে। (Vide Govt. Order No. Medl/4170/Estt/5P-6/69 dated Calcutta the 28th July '69). সান্যালবাবু মন্ত্রীমহাশয়কে প্রভাবিত করিয়া এই আদেশ জারী করাইয়াছেন। নিজের লোকদের চাকুরির প্রয়োজন, তাই ১৩।১৪ বৎসরের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের না হটাইলে চলিবে কেন? তাই জনগণের সরকারের মন্ত্রীমশাই ন্যায়-নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া স্বৈরাচারী আদেশ জারী করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

(২) সান্যালমশাইয়ের চেষ্টায় বিশেষ অনুগ্রহভাজন কয়েকজন ভাগ্যবান শিক্ষকের জন্য মাসিক ৫০, হারে শিক্ষাভাতা বরাদ্দ করা হইয়াছে, শিক্ষাভাতার জন্য শিক্ষকদের কোন দাবি অবশ্য ছিল না এবং যৌক্তিকতাও নাই। (Vide Order No. Medl/4170/Estt/5P-6/69 dated Calcutta the 28th July '69).

(৩) ২ মাস পূর্বে ফার্মেসী ট্রেনিং সেন্টার-এ একজন কেমিস্ট্রি টিচার নিয়োগ করা হইয়াছে। ভদ্রলোক কেমিস্ট্রি-তে M.Sc.-ও নন, M.Pharm.-ও নন। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, ইনি সান্যালবাবুর একান্তই অনুগত।

(৪) ফার্মেসী ট্রেনিং সেন্টার-এর অধ্যক্ষ পদটির জন্য পুরা সময়ের লোক এখনও নিয়োগ করা হয় নাই। শোনা যাইতেছে কিছুদিনের মধ্যেই নাকি সান্যালবাবু তাঁহার বর্তমান পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি হয়তো এই শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করিতে চাহেন।

—শ্রীমতী চক্রবর্তী
বাবুপাড়া, আলিপুরদুয়ার

যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু

যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে এই মুহূর্তে দপ্তরওয়ারি কোন অভিযোগ তুলে লাভ নেই। যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলের সদস্য ও সমর্থকদের বাইরে যুক্তফ্রন্ট সমর্থক পশ্চিমবাংলার অগণিত মানুষ আজ আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে। আশঙ্কেটা আইন-শৃঙ্খলার অবনতির জন্য নয়—আশঙ্কা যুক্তফ্রন্ট টিকবে কিনা।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের শত দোষ-ত্রুটিই থাকুক না কেন, এই সরকারের মাত্র নয় মাসের আমলে পশ্চিমবাঙলার মেহনতী মানুষের জীবনে আশা-ভরসার যে নতুন স্বাদ উন্মুক্ত হয়েছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অতি বড় শত্রুও তা অস্বীকার করতে পারবে না।

ব্যক্তিগত যোগ্যতার নিরিখে বিচার করলে স্বাধীনতালাভের পর থেকে এ রাজ্যে যতগুলো মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটির প্রত্যেক সদস্য অপেক্ষা যুক্তফ্রন্টের প্রত্যেক মন্ত্রী যোগ্যতর, এ-সত্য সিণ্ডিকেটপন্থী কংগ্রেসীরাও অস্বীকার করতে পারবেন না। যত শরিকী সংঘর্ষ ঘটুক না কেন, পশ্চিমবাংলার দরিদ্র আর ভূমিহীন কৃষক গত নয় মাসে নতুন আশায় সঞ্জীবিত হয়েছে—চটকলের মজুর, চা-বাগিচার শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার কারিগর নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। আশার দিন গুণেছে নিম্ন-বিত্ত সরকারী-বেসরকারী কর্মচারী, স্কুল-কলেজের শিক্ষক আর অধ্যাপক।

দিকে দিকে জীবনের সাড়া পড়েছিল বলেই যুক্তফ্রন্ট সরকার যে বিপুল গণ-সমর্থন নিয়ে কাজ সুরু করেছে এক কথায় তা অভূতপূর্ব। অভূতপূর্ব বলেই বৃহত্তম শরিক দল সি-পি-এম-এর ডাকে কলকাতায় যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ ধ্বনি দেয়, কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে ময়দানের সভাতেও তেমনি লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে হাজির হয়—আর-এস-পি'র কৃষক সমাবেশেও তাই কলকাতায় হাজার হাজার সত্যিকারের ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক এসে যোগ দেয়।

এই লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ আশঙ্কায় দিন গুণছে। গ্রামের যে জোতদার ভূমিহীন কৃষককে ঠকানোর তাগিদে রাতারাতি কোন-না-কোন শরিক দলের উগ্র সমর্থক সেজেছে, কংগ্রেসী আমলের সময়ে লালিত যে সমাজদ্রোহী হঠাৎ বামপন্থী মস্তান নেতার স্থানাধিকার করেছে সে ছাড়া আর সবাই শঙ্কিত। কারণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের যদি অবলুপ্তি ঘটে তবে কয়েক ঘন্টার মধ্যে রং বদলে ফেলে যে শরিক দলের বড় সমর্থক আজ সে সেজেছে সেই দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে লাঠি ধরবে। স্বল্প-সংখ্যক এই ধরণের সুবিধাবাদী ছাড়া রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ শঙ্কার সঙ্গে প্রশ্ন করছে যুক্তফ্রন্ট টিকবে তো?

যুক্তফ্রন্টের কর্ণধারদের কাছে সবিনয়ে প্রশ্ন করতে চাই : আপনারা তো গজদন্ত মিনারের অধিবাসী নন। লক্ষ লক্ষ অবহেলিত মানুষের সঙ্গে আপনাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তো ছিন্ন হয় নি। তাদের এই মুহূর্তের শঙ্কার কথা তো আপনাদের অজানা থাকার কথা নয়। বড় দলের সমাবেশে যে খেটে-খাওয়া মানুষ আপনাদের ফ্রন্টের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আওয়াজ তুলেছে সি-পি-এম জিন্দাবাদ, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে যে মানুষ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছে চেয়ারম্যান ডাঙ্গে—যুগ যুগ জীয়ো, রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে এসে পশ্চিম দিনাজপুরের যে কৃষক আর-এস-পি'র জয়ধ্বনি করার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ তুলেছে নিচের তলায় মানুষ জাগছে—পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভাঙছে তার অন্তরের কথা কি আপনারা জানেন। দলের স্বপক্ষে এই জিন্দাবাদ ধ্বনি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আকুল হৃদয় থেকে আর একটি ধ্বনি স্বতোৎসারিত হয়েছে, সে ধ্বনি হোল যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ। চোদ্দ শরিকের কারো ওপর তার একক আস্থা নয়।

আপনারা দলীয় মঞ্চ থেকে অন্য দলের কর্মীদের কাছে আহ্বান জানান, তাঁরা যেন চাপ সৃষ্টি করে সেই সব দলের নেতাদের সঠিক পথে চলতে বাধ্য করেন। কিন্তু আপনারা কি জানেন না, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ক্যাডার তৈরি করার দিকে নজর না দিয়ে, আপনারা সব দলেই কর্মীর নামে এমন একদল লোককে সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা আপনাদের নিজ নিজ দলের সুনাম নষ্ট করার তথা যুক্তফ্রন্ট ভাঙার নেতৃত্ব করছে! আপনারা কি জানেন না, ওপরের তলার নেতাদের তুলনায় স্থানীয় ক্ষুদে নেতারা অনেক বেশি দলবাজিতে অভ্যস্ত—যুক্তফ্রন্টের ঐক্যকে অস্বীকার করার জন্যই তারা তৎপর। আপনারা কি জানেন না, সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থবুদ্ধি নিচের তলায় অনেক বেশি সংক্রামিত। আপনারা কি জানেন না, স্থানীয় ক্ষুদে নেতাদের অনেকেই আজ কিভাবে কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে আপনার দল এবং সামগ্রিকভাবে যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করছে। যদি না জানেন তাহলে খোঁজ নিন। যুক্তফ্রন্টের কর্ণধারদের কাছে আমার আবেদন প্রত্যেকে নিজ নিজ দলকে সামলান।

আমার অভিযোগ যদি বিশ্বাস না করেন, তাহলে খোঁজ নিন ক্যানিং-এর এপার থেকে নৌকো ভাড়া করে, দলের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে, মাতলা পার হয়ে রাতের অন্ধকারে গিয়ে অন্য গ্রাম যারা আক্রমণ করে তাদের হাতের বন্দুকগুলো কার কাছ থেকে আনা। খোঁজ নিলে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন, সুদূর জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি থানায় ১৯৬৯ সালেও যেসব জোতদার কংগ্রেসের পক্ষের লোক ছিল, তারা আজ কার ঝাণ্ডাকে অবমাননা করার জন্য সেই ঝাণ্ডার আশ্রয় নিয়ে চাষীদের বিরুদ্ধে বন্দুক চালাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন পুরনো ওয়াগনভাঙা-ছিনতাই দলের লোকেরা হাতে বোমা নিয়ে একটা না একটা ঝাণ্ডার আশ্রয় নিচ্ছে কি-না? আর খোঁজ নিন আপনাদের দলের কোন কোন স্থানীয় নেতা রাইটার্স বিল্ডিংস-এর মন্ত্রীর চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাবানের ভূমিকা গ্রহণ করে এলাকায় নিজ দলের সুনাম নষ্ট করছেন।

বৌবাজার স্ট্রীটের কম্যুনিস্ট পার্টির অফিসে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের পর আপনারা যে নীতি নির্ধারণ করছেন, মুহূর্তের মধ্যে তা বানচাল করে দিচ্ছে কারা, তাদের সম্পর্কে আপনারা সংবাদ নিন। দোহাই আপনাদের একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর বিবৃতি দেওয়ার আগে নিজেরা খোঁজ নিন। দলের কর্মীরা নিন্দার বাইরে—তাদের শতখুন মাপ এই মনোভাব ত্যাগ করে দিয়ে প্রকৃত অবস্থা তদন্ত করুন। আপনার দলের সিদ্ধান্ত আপনার দলের যে কর্মী অবমাননা করছেন, তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে আখেরে আপনার দলের-ই যে ক্ষতি হবে, আপনাদের প্রশ্রয়ে যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সৃষ্টি হচ্ছে তার সংবাদ আপনারা নিন। দেখবেন শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ হবে—রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যমে দলের প্রতিপত্তি বাড়ানোর আদর্শে যদি আপনারা দলকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন তাহলেই যুক্তফ্রন্ট বাঁচবে।

আর যুক্তফ্রন্ট না বাঁচলে আজকে যাঁরা জয়ধ্বনি দিচ্ছেন তাঁরা রুখে দাঁড়াবেন—মনে রাখবেন দলের বাইরে লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষ আজো আপনাদের সমর্থক। আর স্মরণ রাখবেন তাঁরা একক কোন দলের সমর্থক নন—অগণিত মূক মানুষ যাঁরা নতুন আশায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠছেন তাঁরা সকলে যুক্তফ্রন্টের সমর্থক।

—শ্রীসর্বদর্শী

ধ্রুপদী : (বিশেষ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৭৬)—সম্পাদক : সুশীল রায়। ৫৯বি কাঁকুলিয়া রোড, কলকাতা-১৯। দাম : এক টাকা।

আধুনিক বাংলা কবিতা আন্দোলনে 'ধ্রুপদী'র একনিষ্ঠ অবদান আশা করি নতুন করে উল্লেখ করতে হবে না। গত বছরে এই অনন্য কবিতা পত্রিকাটির ১০১তম সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর আর কোন সংখ্যা বের হয় নি। স্বভাবতই বিদগ্ধ পাঠকসমাজ শঙ্কাকুল হয়ে উঠেছিলেন। কবিতাকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই ধ্রুপদীর প্রতি অন্তরের একটা টান আছে। আলোচ্য সঙ্কলনটি প্রকাশিত হতে দেখে তাই আবার আমরা আশান্বিত হয়ে উঠেছি। সম্পাদক বলেছেন, 'ধ্রুপদীর এই শারদ উচ্ছ্বাসের পর কোন বৈশাখী অভিলাষ তার আছে কি না—সেকথা এখনই অবশ্য জোর করে বলা যাচ্ছে না।' আমরা কিন্তু ধ্রুপদীর নিয়মিত প্রকাশের অধীর আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে রইলাম। সূচীপত্রের ধ্রুপদী প্রসঙ্গে অবশ্য নিয়মিত প্রকাশের আশ্বাসই দেখতে পেলাম। এটি আশ্বাসের কথা।

আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাটিতে 'বাংলা কাহিনী কবিতা' শীর্ষক দীর্ঘ তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন সুশান্ত বসু। নবীন, প্রবীণ, খ্যাত, অল্পখ্যাত, অখ্যাত ৬৪ জন কবির বিচিত্র স্বাদের কবিতার অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে। এবং কবিতাগুলি সুনির্বাচিত। কয়েকটি মিষ্টি প্রেমের কবিতা লিখেছেন মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, বঙ্কিম মাহাত প্রমুখ। মহিলা কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মনোরমা সিংহরায়, মঞ্জু মিত্র, হেনা হালদার প্রমুখ। দীর্ঘ একনিষ্ঠ প্রেমের কবিতা লিখেছেন বিনোদ বেরা। কয়েকটি বিশিষ্ট স্বাদের কবিতা দুর্গাদাস সরকার-এর 'পশুক্লেশ নিবারণী সভায়', বেণু দত্তরায়-এর 'আমার যন্ত্রণা হচ্ছে', সুধাংশু সেন-এর 'সুহৃদ', অমিয়কুমার হাটির 'কৈশিক নালীতে' ও সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের 'প্রক্ষালণ'। ১৯৩৯ থেকে ১৯৫২ সালের ৫টি কবিতাকণিকা উপহার দিয়েছেন সুশীল রায়, তৎসহ দুটি কবিতা গ্রন্থের আলোচনা। অন্যান্য কবিদের মধ্যে আছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কানাই বেরা, জ্যোতির্ভূষণ সেন প্রমুখ।

গ্রন্থপরিক্রমা—(সপ্তম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা)—সম্পাদক : অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : দু' টাকা।

আলোচ্য সংখ্যাটি লাতিন সাহিত্য সংখ্যারূপে অভিহিত। একালের জটিল, অসুস্থ মনোবিকারসম্পন্ন দেশ, কাল, জীবনযাত্রায় ক্লাসিক সাহিত্যের অনুশীলন আর নেই। তার চর্চা বোধ করি কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে এবং গুটিকতক বিদগ্ধ গুণিজনের ভেতর সীমাবদ্ধ। তথাপি, স্বল্পপরিসরে এমন একটি সৎ প্রচেষ্টার জন্য সম্পাদকমণ্ডলী নিশ্চয় প্রশংসা পাবেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্বে লাতিন সাহিত্য পাঠের আগ্রহ বোধ করি জাগ্রত করেছিলেন মধুসূদন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেকেই নাড়াচাড়া করেছিলেন অভিদ, ভার্জিল, হোরেস প্রমুখের। আর ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে লাতিনের প্রভাবের প্রসঙ্গ তো সর্বজনবিদিত।

বর্তমান সংখ্যাটি মোটামুটিভাবে লাতিন কাব্য, নাটক, ইতিহাস ও অলঙ্কারশাস্ত্রের একটা সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান বলেই বিবেচিত হবে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিদ ও আদিরস প্রবন্ধটি উপযুক্ত উদ্ধৃতির প্রয়োগে চিত্তাকর্ষক ও সুখপাঠ্য। দেবতোষ বসুর সেনেকা স্বল্প পরিসরে তাঁর সাহিত্যসিদ্ধিকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। অমলেন্দু বসুর লাতিন মহাকাব্য ও ভার্জিল এবং অতুলানন্দ চক্রবর্তীর রোমের সমাজে সাহিত্যের আবহাওয়া দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এছাড়া আর যাঁরা প্রবন্ধ লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন : সুবোধ সেনগুপ্ত, রবেয়ার আঁতোয়ান, দিলীপ সেন প্রমুখ। ভূমিকা অংশের লাতিন সাহিত্যকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংখ্যাটির উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

মধুবেণু (সপ্তম বর্ষ, ১৩৭৬)—সম্পাদক : কল্যাণ বসু। ৬৪।১৩ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা—৩৭। দাম : তিন টাকা।

অন্যান্য বছরের মতই এবারের এই শারদ সঙ্কলনটিও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সাঁওতাল সাহিত্য বিভাগ একটি বিশেষ আকর্ষণ। সাঁওতাল সাহিত্যের আলোচনা আছে, কয়েকজন বাঙালী কবির কবিতা মাসুমণ্ডল, হেমব্রম, বীর লীটা হেমব্রম প্রমুখ সাঁওতাল কবি অনুবাদ করেছেন। আর একটি উল্লেখ্য সংযোজন পূর্ববঙ্গের সাহিত্য, লিখেছেন পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিকবৃন্দ—মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, রওশন ইজদানী, অরুপ তালুকদার, আঞ্জুমান আরা বেগম, নুরুল ইসলাম খান, রবীন্দ্রনাথ ঘটকচৌধুরী ও আবদুল হাই মাশরেকী। মন্মথ রায়-এর নাটক ও পরেশ সাহার উপন্যাস মোটামুটি ভাল লাগবে। প্রবন্ধ লিখেছেন নারায়ণ চৌধুরী ও দেবীপদ ভট্টাচার্য। রণজিৎকুমার সেন, নিখিল নন্দী, নারায়ণ দত্ত প্রমুখ-এর গল্প উল্লেখযোগ্য। কবিতার অর্ঘ্য সাজিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, জয়ন্ত সাহা, অমিয়কুমার হাটি প্রমুখ কবি।

উত্তরসূরী (শরৎ, ১৩৭৬)—সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য। ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার। দাম : দু' টাকা।

উত্তরসূরীর শারদীয় সংখ্যায় কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধের লেখকদের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নাম দেখা গেল, এ ছাড়া আছেন, অসিতকুমার চক্রবর্তী, সুধীর নন্দী, ভাস্কর মিত্র। কবিতার অর্ঘ্য সাজিয়েছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। অন্যান্য সংখ্যার মত এই সংখ্যাটিও সাহিত্যপিপাসুদের তৃপ্তি দান করবে।

প্রগতি (শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৬)—সম্পাদক : মৃণাল চট্টোপাধ্যায়। ৩৯বি, ডেন্টমিশন রোড, কলকাতা—২৩। দাম : দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কালোপযোগী গল্প, কবিতা, প্রবন্ধে সমৃদ্ধ 'প্রগতি'-র বর্তমান সংখ্যাটি সকল শ্রেণীর পাঠককে আনন্দ দান করবে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিন্নর কবিতাটি অন্যতম সম্পদ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অনিলকুমার বিশ্বাস একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন, ভাল লাগবে। এ ছাড়া লেখকগোষ্ঠীতে আছেন—সুশীল রায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুধীরা লাহিড়ী, প্রতিমা রায় প্রমুখ।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

প্রস্তারসমী শাসনের প্রচণ্ডতা—রুখবে কা'রা ?

"চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" প্রথম নম্বর মামলায় আমাদের (লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী ও অনন্ত সিংহ) গুলীতে নরহত্যা ও সরকারী সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়েছে বলে সরকার পক্ষের অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ মজুত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের কারও প্রাণদণ্ড না হওয়াতে অম্বিকাদার ফাঁসির হুকুম হতে পারে এ আশঙ্কা মাস্টারদা করেন নি। অম্বিকাদার মামলাতেও যদিও প্রথম মামলার সাক্ষ্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, তবু অম্বিকাদাকে আমাদের মত প্রত্যক্ষ হত্যাপরাধে লিপ্ত করবার মত কোন সাক্ষী ছিল না। কাজেই, ট্রাইব্যুনাল বিচারে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়াতে দেশবাসী ও আইনজ্ঞদের সকলের মনেই একই প্রশ্ন জেগেছিল—এ কি করে সম্ভব? একই সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর নির্ভর করে প্রথম মামলাতে কাউকেই চরম দণ্ড দেওয়া হয় নি, অথচ এঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হোল—এ যে অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ঘটনা। তবু এই বাস্তব সত্যই বাংলার লাট স্যার জন এণ্ডারসনের প্রতিহিংসা নীতির ঐতিহাসিক দলিল!

স্বাধীনতা-যুদ্ধে বিপ্লবীদের মৃত্যুবরণে আবার সমস্যা কি! কেউ হয়ত সাম্রাজ্যবাদীর ফাঁসিকাষ্ঠের শহীদ বেদীতে প্রাণ দান করে আবার কেউ বা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর গুলীতে আত্মাহুতি দিয়ে ভবিষ্যতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তীব্রতর করে এগিয়ে দেবার সোপান রচনা করে। এই রক্তক্ষরা পথে মৃত্যু কখনও ফাঁসির বরণ-মাল্য হাতে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসবে, কখনও বা মহা সমারোহে রণবাদ্য বাজিয়ে রাইফেল ও মেসিনগানের গুলীবর্ষণে বিপ্লবীদের অভিনন্দন জানাবে!

অম্বিকাদার ফাঁসির হুকুম হয়েছে; আপীল করার অনুমতি পাওয়া গেছে; আপীলের জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করা হবে এবং আপীলের শুনানীও হবে—তারপর অনিবার্য ঘটনার ব্যতিক্রম এণ্ডারসন শাসনের আমলে ঘটা যে সম্ভব নয় সে-সম্বন্ধে মাস্টারদার স্থির ধারণা ছিল।

আই জি পুলিশ ক্রেগ তারিণী মুখার্জীর হত্যাপরাধে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। হাইকোর্টের আপীলে তার মৃত্যুদণ্ড রহিত হয় নি। ফাঁসির বরণ-মাল্য ভূষিত রামকৃষ্ণ চির বিদায় নিয়েছে। সুনিশ্চিত পদক্ষেপে মৃত্যু অম্বিকাদাকে আলিঙ্গন করতে ধীরে এগিয়ে আসছে! আর কয়েক মাস মাত্র বাকী! মাস্টারদার মনে প্রশ্ন—সাম্রাজ্যবাদীর এই ফাঁসির ব্যবসা কি ব্যর্থ করে দেওয়া যায় না?

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার হয় তাদেরই জেলা-আদালতে। রায় দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ সুবিধে মত দণ্ডিত ব্যক্তিদের অন্যান্য জেলে স্থানান্তরিত করেন। অম্বিকাদা ও সরোজকান্তি গুহকে সাত দিনের মধ্যে, অর্থাৎ, ১৯৩৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই আপীলের অনুমতি দিয়ে চট্টগ্রাম জেল হতে আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত পাঠান। আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে থেকে হাইকোর্টে আপীলের তদ্বির করা অম্বিকাদার পক্ষে যদিও সুবিধাজনক ছিল, কিন্তু মাস্টার-দার কাছে সমস্যাটি গুরুতর রূপ নিল। সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার পক্ষে কলকাতায় গিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই জেল থেকে অম্বিকাদাকে উদ্ধার করে আনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এই পরিস্থিতিতে মাস্টারদা দু'টি বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করবার বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। যদিও এই দুইটি কর্মসূচীও সাংগঠনিক শক্তির ওপরেই নির্ভরশীল, তবু মাস্টারদা চিন্তা করেছিলেন—অম্বিকাদার ফাঁসির বিনিময়ে কতিপয় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রতিভূকে প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে অথবা কোন উচ্চ-

পদস্থ সরকারী ইংরেজ কর্মচারীকে জামিন স্বরূপ বিপ্লবীদের হাতে বন্দী থাকতে হবে। অম্বিকাদার যদি ফাঁসি হয়, তবে তাঁকেও অনুরূপভাবেই প্রাণ দিতে হবে।

দুবছর ধরে আমরা যখন চট্টগ্রামে নিজেদের মামলা চালাচ্ছিলাম, তখন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলের নির্জন কক্ষে ফাঁসির অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছেলো। সরকারের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করবার জন্য আমাদের সাথী অর্ধেন্দু গুহ মারফৎ আমরা জেল থেকেই একটি বিস্তারিত ও সক্রিয় প্ল্যান মাস্টারদাকে পাঠাই। অর্ধেন্দু গুহ আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। সে তখন জামিনে মুক্ত ছিল। মামলার সময় প্রতিদিন তাকে আমাদের সঙ্গে আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত থাকতে হোত। এই অবস্থায় অর্ধেন্দু বন্দুকের পনেরো মণ বিস্ফোরক পাউডার ও ল্যান্ড-মাইন তৈরি করে এবং এই জামিনে মুক্ত অবস্থার সুযোগে সে আমাদের ও মাস্টারদার মধ্যে নিয়মিত সংযোগ বজায় রাখে। তারই মারফৎ আমরা মাস্টারদার কাছে চট্টগ্রাম 'জেলা-শাসক' বা 'বিভাগীয় কমিশনারকে রামকৃষ্ণের জীবনের বিনিময়ে 'Hostage' (জামিনে বন্দী) রাখার প্ল্যান পাঠাই। এই বন্দী করবার কাজে কজন যাবে, তাদের হাতে কি কি অস্ত্র ও কিরূপ হাতবোমা থাকবে, অজ্ঞান করাবার জন্য কি ওষুধ ব্যবহার করা হবে ও কিভাবে তা প্রয়োগ করবে, আমাদের কয়টি গাড়ি থাকবে ও কোন স্থানে সাহেবের গাড়ি আটক করা হবে, কিভাবে সাহেবকে গাড়িতে তোলা ও নামানো হবে, সাহেবকে অতর্কিতে কিভাবে ত্রিভলভার বাগিয়ে কি ভাষায় ও কিরূপ ভারী গলায় ছোট ছোট কথায় বন্দোবস্ত করা হবে—এই সমস্তই বিশদভাবে লিখে মাস্টারদাকে আমরা জানিয়েছিলাম। তাছাড়াও "জামিনে বন্দী" সাহেবকে কি ধরনের গৃহে আটক রাখা হবে তাও জানিয়েছিলাম। সর্বপ্রকারে আরামপ্রদ আধুনিক সরঞ্জামযুক্ত যে ঘরে টিত সাহেবকে আটক রাখা হবে, প্রয়োজনে ডিনামাইটের সাহায্যে সেই ঘরটি যাতে নিমেষে উড়িয়ে দেওয়া যায় তারও ব্যবস্থা থাকবে। সর্বক্ষণ আমাদের প্রহরী মোতায়েন থাকবে এবং কিরূপে সজাগ হয়ে পাহারা দিতে হবে তারও বিস্তারিত বিবরণ মাস্টারদাকে দেওয়া হয়। এইভাবে Hostage রাখবার জন্য কোন গোপন বাড়ির প্রয়োজন নেই বলেই আমরা জানাই। চট্টগ্রামে তখন পুলিশ ও মিলিটারীর কঠোর দমননীতি চলেছে; একজন ইংরেজ জেলা-শাসককে "জামিনে বন্দী" রাখার মত গোপন বাড়ি সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই গোপন বাড়ির পরিবর্তে আমরা চেয়েছিলাম রাজপথের ওপরেই একটি বাড়ি যার সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে—"এখানে রামকৃষ্ণের জীবনের বিনিময়ে জীবনদানে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষারত 'জামিনে বন্দী' জেলা-শাসক—পুলিশ যেন তাঁর উদ্ধারের চেষ্টা হতে বিরত থাকে। কারণ, 'জামিনে বন্দী' সাহেবের অতর্কিত উদ্ধার চেষ্টায় এই বাড়িটি ডিনামাইট বিস্ফোরণে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

আমাদের এই প্ল্যানটি পেয়ে মাস্টারদা অর্ধেন্দু মারফৎ যে খবর পাঠিয়েছিলেন তার সারমর্ম নিম্নরূপঃ—

"......অপূর্ব প্ল্যান। এতে নিখুঁতভাবে তোমরা সব বলেছো। এই প্ল্যান কার্যকরী হলে ভারতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে এক অভিনব আদর্শ থাকবে।...কিন্তু বর্তমানে আমাদের সংগঠনে এইরূপ কাজের জন্য উপযুক্ত ক্যাডার কোথায়? নরেশ, বিধু, ত্রিপুরা, টেগ্‌রা, রজত, মনা প্রমুখ বিপ্লবী সাথীরা যদি বেঁচে থাকতো, তবে একজন জেলা-শাসককে অনায়াসে আমরা 'জামিনে বন্দী' করে রাখতে পারতাম। কিন্তু বর্তমানে সেইরূপ সাহসী ও শারীরিক শক্তির অধিকারী বিপ্লবী সাথীর অভাব। তাই ইচ্ছে থাকলেও এইরূপ বাস্তব ও সক্রিয় প্ল্যানটি আপাততঃ আমাদের বাদ দিতে হচ্ছে....।" অর্ধেন্দু আদালতের কাঠগড়ার মধ্যেই এই কথাগুলো আমাকে বলেছিলো।

এরও প্রায় আড়াই তিন বছর পরে অম্বিকাদার ফাঁসির বিনিময়ে Hostage রাখার প্ল্যান কার্যকরী করার মত সাংগঠনিক শক্তি থাকার কথা নয়। কারণ, ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে—বিপ্লবীরা অনেকে প্রাণ দিয়েছে ও অনেকে গ্রেফতার হয়ে কারাবাস করছে। অবশিষ্ট স্বল্প শক্তি নিয়ে চট্টগ্রাম জেলের বাইরে কলকাতায় জেল ভাঙার চেষ্টা বা Hostage রাখার প্ল্যান মাস্টারদাকে বাধ্য হয়ে বাতিল করতে হয়েছে।

চট্টগ্রামে ক্রিকেট খেলার মাঠে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা মিলিত হন—এই তথ্য মাস্টারদার আগে থেকেই জানা ছিল। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পর ক্রিকেট খেলার মাঠে সরকারী ইংরেজ কর্মচারীদের ওপর আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা ছিল মাস্টারদার। চোখের বদলে চোখ—দাঁতের বদলে দাঁত—রক্তের বদলে রক্ত—প্রাণের বদলে প্রাণ চাই। বাংলার জনগণ নির্বাক দর্শকের মত নিশ্চলভাবে অম্বিকাদার ফাঁসি দেখবে—এ কথা চিন্তারও বাইরে। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা মাস্টারদার নির্দেশে ক্রিকেট খেলার মাঠে আক্রমণ চালাবার প্ল্যানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য এগিয়ে এলো। নতুন-নতুনভাবে আক্রমণের এই প্রস্তুতিপর্বে মাস্টারদা যখন সাংগঠনিক সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য তরুণদের মধ্যে নতুন সাড়া জাগাতে চেষ্টা করছেন, তখন কে জানতো মহানায়ক বিপ্লবী সূর্য সেনের বিরুদ্ধে শত্রুর জাল তাঁর চতুর্দিকে ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে তাঁকে বেষ্টন করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে? কে জানতো ঘরের শত্রু বিভীষণ মাস্টারদার এতদিনের একতা, এত বৈপ্লবিক পারদর্শিতা ও অপরিসীম চাতুর্যকে পরাস্ত করতে শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঘোর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে? কে জানতো ছদ্মবেশী মিত্র ছদ্মবেশের সুযোগ নিয়ে এই মহানায়কের বৈপ্লবিক ফেরারী কর্মজীবনের অবসান ঘটাবার চেষ্টায় ছিদ্রপথে এগিয়ে আসছে?

১৯২৪ সালে সারা বাংলায় বেঙ্গল অর্ডিনান্সে বিনা বিচারে আমরা অনেকেই একসঙ্গে বন্দী হয়েছিলাম। সেই রাত্রে মাস্টারদা চট্টগ্রামের যে বাড়িতে ছিলেন সেই বাড়ি এবং গণেশের, অম্বিকাদার ও আমার বাড়ি রাইফেল হস্তে পুলিশ-বাহিনী ঘেরাও করলো। পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করে বিনা বিচারে জেলে পাঠালো। কিন্তু মাস্টারদা পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে বাড়ির পিছনের কোন এক গুপ্ত পথে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কয়েক বছর আত্মগোপন করে থেকে মাসের পর মাস তিনি বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করেন। তারপর আসামে যান ও ইউ-পিতে শচীন সান্যালের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বাংলা, আসাম ও উত্তরপ্রদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একযোগে আক্রমণ চালাবার সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণের জন্য খুবই চেষ্টা করেন। রেলে, ট্রামে, বাসে, রাজপথে, দিনের পর দিন তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে এবং বহুবারই প্রায় ধরা পড়তে পড়তে মাস্টারদা কোনমতে পরিত্রাণ পেয়েছেন—কখনও মিথ্যা নাম বলেছেন; কখনও বা উদ্ভ্রান্তের, কখনও বা নির্বোধ পথিকের ভাণ করেছেন। কখনও মুসলমানের পোষাকে, কখনও বা নগ্ন গাত্র দীন-দরিদ্র পরোহিতের বেশে তিনি বাংলার দুর্ধর্ষ পুলিশ দফতরকে বিভ্রান্ত ও নিষ্ক্রিয় করে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। তারপর বাজাবাজারের তিনতলা বাড়িটি ঘিরে পুলিশ যখন তিনতলার একটি ঘরের দরজা ভেঙে প্রমোদ চৌধুরীদের গ্রেফতার করলো সেই দিনও মাস্টারদা সেই দুর্ভেদ্য পুলিশ ব্যূহ ভেদ করে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

তিনি তিনতলা থেকে ড্রেনপাইপ দিয়ে নেমে অন্ধকার গলির মধ্যে উধাও হন। ১৯৩০ সালে যুব-বিদ্রোহের পর প্রায় চার বছর কাল পুলিশের বিভিন্ন চক্রান্ত ব্যর্থ করে চট্টগ্রাম জেলায় তাঁর ফেরারী জীবন অতিবাহিত হয়। মাস্টারদার জন্য নানাভাবে পুলিশের ফাঁদ পাতা ছিল, নানা রকমের টোপ ফেলা ছিল, যাতে তিনি কোনমতে একবার সে ফাঁদে পা দেন বা কোন অসতর্ক মুহূর্তে লোভনীয় টোপটি গিলতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু পুলিশের আপ্রাণ চেষ্টা সমস্তই ব্যর্থ হয়েছিল। কোন নির্ভীক বিপ্লবী তরুণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলে কোন সূত্রে ঠিক হলেও পূর্ব-মনোনীত স্থানে মাস্টারদা কখনই যেতেন না। স্কাউট পাঠিয়ে আগে অবস্থা নিরীক্ষণ করাতেন এবং নির্দেশ মত তাঁবই মনোনীত স্থানে "আগন্তুক"কে দেখা করবার জন্য নিয়ে আসা হোত। কোন বিপ্লবী সাথী বা দরদী বন্ধু মাস্টারদাকে নিজহাতে অর্থ সাহায্য দেবেন বলে খবর পাঠিয়ে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করলেও মাস্টারদা তাঁর নিজের ব্যবস্থা অনুযায়ীই এইরূপ দেখা-সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রিত করতেন। পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে গোয়ালার বেশে কখনও তাঁকে গোয়াল থেকে গরু নিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়েছে। আবার কখনও বা কাপড়ের বোঁচকা মাথায় ধোপার মত পুলিশের পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন। মাস্টারদাকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশী তৎপরতার অন্ত ছিল না। এত সাবধানতা সত্ত্বেও তাঁকে ধলঘাটে মিলিটারী কর্ডনের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকেও তিনি নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামের বাড়ি থেকেও পুলিশের বেড়াজাল ভেদ করে তিনি বেরিয়ে এসেছেন।

ক্রমবর্ধমান হারে মাস্টারদার মাথার মূল্য বেড়েই চলেছে। সরকার পুরস্কারের পর পুরস্কার ঘোষণা করছেন। ট্রেন, স্টেশন, বাজার, স্কুল-কলেজ এবং আদালত প্রাঙ্গণে মাস্টারদার ছবি সহ পুরস্কারের বিজ্ঞপ্তিতে ছেয়ে গেছে। মাস্টারদার নিরাপত্তার জন্য চট্টলবাসী হয়ত প্রতিদিনই ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। মাস্টারদাকে সরকার গ্রেফতার করবে—এ-কথা চট্টলবাসী যেন চিন্তাতেও আনতে চাইতো না। কিন্তু সবাইকে নিরাশ করে সবার আশা-আকাঙ্ক্ষা নিশ্চিহ্ন নির্মূল করে কে জানতো ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ঘোর অমঙ্গলের মসীকৃষ্ণ যবনিকা চট্টগ্রাম তথা সারা বাংলাদেশ ঢেকে নেমে আসবে?

ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ শান্ত নিশি রাত—প্রায় দুটো। গৈরলা গ্রামের এই নির্জন শান্ত স্তব্ধ রজনী হঠাৎ চঞ্চল শব্দমুখর হয়ে উঠলো কেন? প্রায় বছরখানেক আগে এমনি এক নিশীথ রাতে ধলঘাট গ্রামও হঠাৎ সচকিত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ক্যাপটেন কেমারনের পরিচালনায় সরকারের সৈন্যদল অতর্কিতে এসে সাবিত্রী মাসীমার বাড়ি ঘেরাও করেছিল। কিন্তু নির্মলদার গুলীতে ক্যাপটেন কেমারনকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর পক্ষে সেদিন মাস্টারদা ও প্রীতিলতাকে বন্দী করা সম্ভব হয় নি।

ধলঘাট থেকে দু' মাইল দূরে এই গৈরলা গ্রামে রাতের অন্ধকারে আজ আবার মিলিটারীর এই গোপন অভিযান কাদের বিরুদ্ধে? কে সে? কা'র গোপন ইঙ্গিতে ক্যাপটেন ওয়ামসলে পুলিশ ও মিলিটারীর সুবিশাল বহর নিয়ে চলেছেন? নির্ভীক ক্যাপটেন ওয়ামসলের থেকে থেকে কি বন্ধু কেমারনের কথা মনে পড়ছে না? তিনি নির্ভীক সৈনিক বটে, তাই সাবধানতা অবলম্বন না করার মধ্যে সাহসের পরিচয় পাওয়া গেলেও মূর্খতার গ্লানি থেকে তা রেহাই পাবেন না। তাহলে তাঁকেও হয়ত ক্যাপটেন কেমারনের মতই তাঁর অমূল্য প্রাণটিও দান করতে হতে পারে। তাই ওয়ামস্‌লে সাহেব কেবল সৈন্যদল সঙ্গে নিয়েই ক্ষান্ত হলেন না—পথ-নির্দেশের জন্য গোয়েন্দা পুলিশ ও কতিপয় অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইন্সপেক্টারকেও সঙ্গী করলেন। পথ ভুল হলে চলবে না—সঠিক বাড়িটায় পৌঁছতে হবে। চারিদিক ঘেরাও করে কোন্ কোন্ নির্দিষ্ট পথে আচমকা ঘরে ঢুকে বিপ্লবীদের বন্দী করা যায় সেই উদ্দেশ্যে একটি সুপরিকল্পিত প্ল্যান নিয়েই ক্যাপটেন সাহেব আসরে অবতীর্ণ হলেন।

গৈরলা গ্রামের মাসীমা ক্ষীরোদবালা বিশ্বাসের এই বাড়িটি জমিদার নেত্র সেনের ছোট ভাই ব্রজেন সেন বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়স্থলের জন্য যোগাড় করেছিলেন। এই বাড়িতে তখন মাস্টারদা, মণি দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, ব্রজেন সেন, সুশীল দাশগুপ্ত ও কল্পনা দত্ত উপস্থিত। পুলিশের নিশ্চয়ই আগে থেকে এই বাড়ির সন্ধান জানা ছিল। এই বাড়িতেই তারা মাস্টারদাকে সদলবলে গ্রেপ্তার করতে পারবে—এ বিষয় স্থিরসংকল্প হয়েই ক্যাপটেন ওয়ামস্‌লের পরিচালনায় পুলিশ-বাহিনী বীরদর্পে হানা দিল। ক্যাপটেন সাহেব বিপ্লবীদের ঘুমন্ত অবস্থায় পেতে চান। সেইজন্য যথাসম্ভব লঘু পদক্ষেপে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এই বাড়িটিকে ঘেরাও করবার Tactical advantage নিতে ফৌজী ক্যাপটেন ওয়ামস্‌লে সাহেব কসুর করলেন না।

শত্রুর এই গোপন অভিযানের সংবাদ বিপ্লবীদের পক্ষে আগে জানা সম্ভব হয় নি। চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলে মাস্টারদার নেতৃত্বে অতি সামান্য হলেও পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধে পাল্টা "গোয়েন্দাগিরি" করার ব্যবস্থা ছিল। তবে পাল্টা ব্যবস্থা থাকলেও কারও পক্ষে, এমন কি খুব শক্তিশালী সরকারের পক্ষেও প্রতিপক্ষের সকল গোপন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়—এ সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা মাস্টারদা কখনই হারান নি। তিনি জানতেন দলের ভেতরে ও বাইরে পুলিশের গুপ্তচর থাকবেই এবং কোন না কোন অসতর্ক মুহূর্তে তারা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সুযোগ নেবে এবং বেশি শক্তিশালী বলেই অনেক ক্ষেত্রে বেশি সুবিধার অধিকারী হবে।

অতর্কিত আক্রমণ হতে বাঁচার জন্য ফেরারী বিপ্লবীরা প্রহরার ব্যবস্থা রাখতেন। মাস্টারদা যে বাড়িতে আশ্রয় নিতেন সেই বাড়ির নিরাপত্তা ও মাস্টারদা যাতে পুলিশের কবলে পড়বার আগেই উধাও হতে পারেন যতদূর সম্ভব তার ব্যবস্থা রাখা হোত। খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, মাস্টারদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হয়েই পুলিশ এই বাড়িতে হানা দিয়েছিল।

পুলিশ ও মিলিটারীর শত গোপনীয়তা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা তাদের আগমন-বার্তা জেনে গেলেন। তখনও পুরো বাড়িটি ঘেরাও হয়ে ওঠে নি। ফিস্ ফিস্ করে বিপ্লবীদের কানে খবর পৌঁছে গেল—"পুলিশ"। নিমেষে প্রত্যেকে শত্রুব্যূহ ভেদের চেষ্টায় প্রস্তুত হয়ে উদ্যত রিভলভারের ট্রিগারে আঙুল নিবদ্ধ রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

[ক্রমশ]

মাসিক ১০৲ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০৲। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

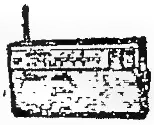

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

[পূর্বানুবৃত্তি]

ভোর হলো।

জীবেনের প্রথম কাজ হলো—রাতের সেই বিচিত্র বস্তুটার সঙ্গে মোকাবিলা করা। তেমন বুঝলে এ জায়গাও ছেড়ে যাওয়া।

সামনের দরজাটা হাটকে খুলে দিলে। ভোরের আলো ভেতরে এসে ঢুকলো। পোখপাখালির বিচিত্র কলরবে রাতের ভয়াল অরণ্য তখন জেগে উঠছে।

দুঃখ হলো—হয়তো আরও একটা গুলী তাকে খরচ করতে হবে। রিভলভার বাগিয়ে সে সন্তর্পণে গোল সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উঠতে লাগল।

বাতিঘর পাঁচতলা—প্রত্যেক তলা বরাবর একটা করে জানালা। শার্সির ফ্রেমটুকু আছে—কাচ নেই। দোতলায় এসে সে থমকে দাঁড়াল।

একেবারে উছলে পড়া ভাঁড়ার ঘর। এক কোণায় জড়ো করা কাজুবাদাম, এক কোণায় ঝুনো নারকেল অন্তত বিশ-পঁচিশটা, তিন-তিনটে পাকা কলার কাঁদি। এক কোণায় ঝুলছে স্রেফ আধখানা শাড়ি।

দো-তলা থেকে তিন তলা, তিন তলা থেকে চার তলা পাঁচ তলা, আর কোনো বৈচিত্র্য নেই। সিঁড়ি ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। বাকি সব তলাই ফাঁকা। কারুর সঙ্গে দেখা নেই। বস্তুটা কি উবে গেল!

বাকি গম্বুজঘর—যেখানে একদিন বাতি জ্বলত।

গম্বুজ ঘরের দরজার সামনে এসে জীবেন থমকে দাঁড়াল রিভলভার তুলে।

মারবে কাকে! সে ঘুমোচ্ছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে। বোধ করি সারা রাত সে-ও বসে কাটিয়েছে। কখন ঢুলে পড়েছে ঘুমে—মাথাটা ঝুলে পড়েছে এক পাশে। দেখতে মানুষের মত। অজস্র গোঁফদাড়িতে ভরা মুখ—মাথায় লম্বা লম্বা রুক্ষ খয়েরি চুল, যেন সিংহ। পরণে দোতলায় ঝোলানো আধখানা শাড়ির বাকি অর্ধেক। হাতের শিথিল মুঠোয় মর্চে ধরা একটা মোটা গরাদের খণ্ড—একদিক যেন পিটিয়ে-পাটিয়ে ঘষে-টসে সরু করা।

জীবেন সাবধানে সন্তর্পণে দু'পা এগিয়ে গিয়ে আচম্বিতে লোহার রডটা টেনে নিলে।

একটু শব্দ হলো। সেই শব্দে লোকটা চমকে জেগে উঠল। আক্রমণের জন্য হিংস্র হয়ে উঠল। হাত মুঠো করলে—নেই, রডটা নেই। তার একমাত্র হাতিয়ার।

জীবেন তার মুখের সামনে রিভলভার তুলে ধীর দৃঢ় গলায় বললে, "একটু নড়েছ কি একেবারে শেষ করে দেব।"

লোকটার বিহ্বল চোখে পশুর ক্রুদ্ধ হতাশা। কুঁকড়ে সরে যেতে চাইল—দেয়াল ঠেসে চিৎকার করে উঠল, "আঁ... আঁ..."

"চুপ!"—জীবেন জিজ্ঞাসা করলে, "কে তুমি! এখানে কেন?"

হঠাৎ লোকটা লাফ দিয়ে উঠে গম্বুজের ভাঙা শার্সি গলে পালাবার চেষ্টা করলে।

পড়ে মরে যাবে!...

জীবেন গিয়ে জাপটে ধরলে। লোকটার গায়ে পশুর শক্তি। রডের মৃদু একটা খোঁচা দিয়ে বললে, "নেমে না এলে সিধে বিঁধে দেব। নেমে এস—ভয় নেই।"

লোকটা নেমে এল—সভয়ে তাকিয়ে রইল জীবেনের দিকে।

জীবেন রিভলভার দেখিয়ে বললে, "চুপ করে বসো। কে তুমি?"

লোকটা উবু হয়ে বসে দু' হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

তাকে কাঁদবার সময় দিল জীবেন। বলতে লাগল আস্তে আস্তে, তোমার ভয় নেই। শান্ত হয়ে কথার জবাব দিলে তোমাকে আমি মারবো না। এমনি আমি কারুকে মারি না। এখন বলো—এখানে তুমি কি কর।"

"কিছু না।" লোকটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে।

কথার ধারা বদলাল জীবেন। জিজ্ঞেস করলে, "ওই কলার কাঁদি, নারকোল বাদাম—ওসব তোমার?"

"হ্যাঁ।"

কে জানে চোরাই ব্যবসা করে কি-না! বাতিল হলেও—সরকারী সম্পত্তি, গাঁয়ের মানুষ—হয়তো ধরা পড়ে ভয় পাচ্ছে। জীবেন জিজ্ঞেস করলে, "ওগুলো নিয়ে কর কি—ব্যবসা?"

"না।—খাই।"

"এইখানে থাক?"

"থাকি।"

"তোমার ঘর বাড়ি নেই?"

"না।"

আর কি জিজ্ঞেস করবে? মনে হলো—লোকটার মাথা খারাপ, আগলা-পাগলা।

ভাব জমাবার জন্যে জীবেন বললে, "তবে ভালই হলো। আমারও ঘর বাড়ি নেই। এক সঙ্গে থাকা যাবে। আপত্তি আছে?"

লোকটা নির্বোধের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

জীবেন হেসে বললে, "কি? আপত্তি আছে?"

"তুমি পুলিশের লোক?" জিজ্ঞেস করে লোকটা জীবেনের রিভলভারের দিকে চেয়ে রইল।

কি বলবে জীবেন এক মুহূর্ত ভেবে নিলে। সোজাসুজি উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বললে, "তোমার মতো। এইরকম যেখানে সেখানে থাকি।"

"কেন?" এবার লোকটার উল্টো প্রশ্ন।

"এমনি।" জীবেন বললে, "এই-ই ভালো লাগে।"

"তোমার বাপ নাই? বৌ নাই? ব্যাটাবেটি নাই?"

"কেউ নাই।"

"ভালো। কেউ না থাকা ভালো।"

"তোমার? তোমার কেউ নাই?"

"অ মার!" লোকটা মুখ নিচু করলে। আস্তে আস্তে বললে, "কে জানে।

"তুমি জান না?"

"জানতাম। এখন জানি না।"

"কি রকম!" সকৌতুকে জীবেন বললে, "ভুলে গেছ?"

"ভুলে গেছি?" লোকটা বিড়বিড় করে বললে, "না না—ভুলি নি......ভুলি নি......ভুলি নি।"......

আশ্চর্য! বলতে বলতে লোকটার চোখের কোণে যেন জল উপচে এল। কি জানি—কি রহস্য আছে ওর জীবনে।

জীবেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে, "তাহলে ক'দিন এখানে আমি যদি থাকি—তোমার আপত্তি নেই?"

লোকটা কথা বললে না—বোকার মত চেয়ে চেয়ে শুধু মাথা নেড়ে জানালো—আপত্তি নেই।

"ঠিক আছে। আবার দেখা হবে।"

জীবেন সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। লোকটাও এল পেছনে পেছনে।

একতলায় এসে জীবেন লোকটার সঙ্গে আরও ভাব জমাবার জন্যে জামায়-বাঁধা মুড়ি-চিড়ের পুঁটলিটা তুলে নিয়ে বললে, "চিড়ে-মুড়ি খাবে? ধর।"

হঠাৎ যেন লোকটার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল—মনে হলো, বহুদিন ওসব খায় নি।

জামার পুঁটলিসুদ্ধ লোকটার হাতে তুলে দিয়ে জীবেন সহাস্যে বললে, "খাও। জামাটা ঐখানে রেখে দিও।"

লোকটা পুঁটলি ধরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। বললে আস্তে আস্তে, "তুমি খাবে না।"

"ওগুলো তুমি খাও।" জীবেন হেসে গত রাতের ছুঁড়ে-মারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নারকেলগুলো দেখিয়ে বললে, "আমি ঐগুলো খাব।"

লোকটা ঘাড় হেঁট করে রইল।

"তুমি খাও।" জীবেন বললে, "আমি একটু ঘুরে-টুরে আসি।"

কিন্তু যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই লোকটা ওর কাঁধ চেপে ধরলো। চোখে-মুখে উত্তেজনা। জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় যাবে?"

"এই একটু চারদিকটা ঘুরে-টুরে দেখি।"

"খবর্দার! জঙ্গলের বাইরে যেয়ো নি—খবর্দার!" ......লোকটা চাপা গলায় বলে উঠল—যেন এই গহন জঙ্গলে কেউ তার কথা শুনে ফেলবে। চোখে তার ভয়।

লোকটাকে যেন একটু একটু এবার বুঝতে পারছে জীবেন। খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কেন?"

তেমনি চাপা গলায় লোকটা বললে, "কেউ দেখে ফেলবে!"

"তুমি যাও না?"

লোকটা জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল। তারপর তেমনি গলা চেপে, চোখ গোল গোল করে সভয়কণ্ঠে বললে, "পুলিশ, দলে দলে পুলিশ...গিজগিজ করছে। ঢের লোককে ধরে নিয়ে গেল।"

"ভয় কি!" জীবেন সকৌতুকে বললে, "পুলিশ এলে লড়াই করবো। আমার বন্দুক আছে।"

লোকটা সসংশয়ে তবু ভাবতে লাগল। বললে, "তুমি একলা! —পারবে? তারা অনেক।"

জীবেন হেসে বললে, "একলা কেন?" তুমিও তো আছ।"

একদিক থেকে জীবেন নিশ্চিন্ত হলো। লোকটা বনের বাইরেও যায় না, আর পুলিশে ধরা পড়ারও ভয় আছে।

জীবেন বললে, "তুমি চিড়ে-মুড়ি খাও—আমি জল খেয়ে আসি। নদীর জল বড় নোনতা। ভাল জল তো সেই পীরের পুকুর।"

"এস। জল আমি রেখেছি।"

লোকটা জীবেনকে ছাড়ল না। বোধ করি সন্দেহ তার যায় নি।

দোতলা থেকে ভরা এক কলসী জল নামিয়ে আনল। বললে, খাও কত খাবে।"

কলসীটা নতুন নতুন মনে হলো জীবেনের—জিজ্ঞেস করলে, "এটা কোথায় পেলে? জঙ্গলে তো কলসী নেই।"

লোকটার বোকা বোকা মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, "জঙ্গলের ধারে একটা শ্মশান আছে—সেখান থেকে এনেছি।"

"তোফা।" জীবেন হেসে বললে, "শ্মশানে তো মড়াকে গেলাস দেয় না—নিশ্চয়ই নেই। তা তুমি ঢালো—আমি খাই।"

ভাব হয়ে গেল। একবেলার মধ্যেই লোকটার সঙ্গে জমিয়ে ফেললে। লোকটা মন্দ না—একটু খ্যাপাটে, এই যা। হয়তো দীর্ঘদিন লোকালয় বিচ্ছিন্ন হয়ে একলা থেকে থেকে এমনি হয়ে গেছে। একলাই বিড় বিড় করে কথা বলে। একাই প্রশ্ন করে—একাই জবাব দেয়।

"কচির মা।"

মিহি গলায়ঃ "কি গ'।"

"আর একটা লোক এসেছে। হত-ভাগা—মোর মত।"......

হি...হি...হি...হি...

রুক্ষ কর্কশ গলা থেকে হাসি যেন উছলে উছলে পড়ে।

তার একমাত্র হাতিয়ার—সেই পুরনো লোহার গরাদ, বুনো মানুষের মত কষ্টে-সৃষ্টে হয়ত বহুদিন ধরে বহু চেষ্টায় কিছুটা ছুঁচলো করা—জীবেন তাকে ভরসা করে ফিরিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ সেটা কখনো শূন্যে তুলে আস্ফালন করে ওঠে। গর-গর করে ওঠে একটা কোণঠাসা জন্তুর মতঃ

"শির ফেড়ে দিব—ফেড়ে দিব ইব-লিসের বাচ্চা।"......

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী

বিদ্যাপতির সমগ্র পদ

মূল্য : চার টাকা

জ্ঞানদাসের সমগ্র পদ

মূল্য : দুই টাকা

গোবিন্দদাসের সমগ্র পদ

মূল্য : দুই টাকা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

সান্যাল এণ্ড কোং

বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

"কার মরণ ডাকছে হে!" জীবেন জিজ্ঞেস করল পেছন থেকে।

"এ্যাঁ!" লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় জীবেনের দিকে।

জীবেন জিজ্ঞেস করলে, "আমার?"

"হেই লও—রাখো তুমার কাছে।" তার হাতিয়ার এগিয়ে দিলে এক কথায় জীবেনের দিকে। বললে, "তুমি মোকে মেরো নি।"

জীবেন ওর কাঁধে হাত রাখল। বললে, "আমার গুলী তোমাকে মারার জন্যে নয় ভাই। তুমি আমার বিপদের বন্ধু।"

আতিথ্যে তার কৃপণতা নেই। তার ভাঁড়ারের সব জিনিস একে একে এনে ধরে দিলে জীবেনের সামনে। পাকা কলা, কাজুবাদাম, নারকেল। একটা ছোট মাটির হাঁড়িতে পাতা ঢাকা ঘন মধু।

জীবেন জিজ্ঞেস করলে, "এই খেয়েই তোমার চলছে?"

"আর কি চাই?" লোকটা বললে, ডিম খাবে? চারটে কুমীরের ডিম পেয়েছিলম। দুটো এখনও আছে।"

বলতে বলতে তার গোপন ভাণ্ডার থেকে দুটো রাজকীয় আকারের ডিম এনে হাজির করলে।

জীবেন শেষ পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে বললে, "ও থাক, তুমিই খেও ভাই—আমার সহ্য হবে না।"

লোকটা সামনে বসে জীবেনের পুঁটলি খুলে অত্যন্ত আগ্রহে এবং আরামে চোখ বুজে চিড়ে-মুড়ি চিবোতে লাগল।

জীবেন জিজ্ঞেস করলে, "জঙ্গলে তোমার কতদিন কাটল?"

শূন্যচোখে তাকাল লোকটা—সেখানে বোধ নেই, বুদ্ধি নেই। সব বোধ কবি ঘুলিয়ে গেছে জীবনের রুক্ষ চাপে। বিড় বিড় করে বললে, "কে জানে!"

"অনেক দিন?"

"অ—নে—ক দিন।"......

শূন্য চোখে সামনের দিগন্তলীন জলরাশির দিকে চেয়ে রইল। যেখানে অনেক জলরাশি এমনি নিঃশব্দে তার সব দিন গোণা হিসেব নিয়ে একে একে অনন্ত নীল তরঙ্গলীলায় হারিয়ে একাকার হয়ে গেছে।

"তোমার বাড়ি কোন্ দিকে"

"বাড়ি!" লোকটা আবার তার বুনো নির্বোধ চোখ তুলে জীবেনের দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে বললে, "ছিল—জঙ্গলের ধারে তো ছিল একদিন। পুলিশ আগুন লাগিয়ে দিল। তারপর হারিয়ে গেল। আর খুঁজে পেলম নি।"......

"ব্যাটা বেটি"

"জানি না।"

"বৌ"

"চুপ!" ফিস ফিস্ করে বললে লোকটা। কেমন একটা খ্যাপামী সহসা যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে চোখে-মুখে। তেমনি ফিস ফিসিয়ে বললে, "কেউ শুনতে পাবে। বেইজ্জৎ!" জীবেনের মুখের কাছে গলা বাড়িয়ে বললে, "পুলিশ তাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সে গাঙে ডুবে গেল।"

শুনতে শুনতে রক্ত গরম হয়ে ওঠে জীবেনের। পুলিশের তাড়া খেয়ে যে উষ্ণ আবেগ ঝিমিয়ে এসেছিল—সে যেন আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। রুদ্ধ নিশ্বাসে বললে, "আর তুমি!"

লোকটা কোনো কথা বললে না—দূরের দিকে চোখ মেলে অসহায় উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে রইল।

জঙ্গলে লুকনো ভীরু এই গ্রামের লোকটার দিকে চেয়ে চেয়ে সে রাগে গরগর করে উঠল। বললে, "আর তুমি জঙ্গলে লুকিয়ে গেলে? বদলা নিলে না?"

সেই নির্বোধ জানোয়ারের দৃষ্টি—ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে জীবেনের দিকে। আস্তে আস্তে বললে, "নিয়েছিলম—পল্লা চোটে। দুটো।" আঙুল তুলে দেখাল।

"তারপর?"

"সব হারিয়ে গেল।"

"বুঝতে পারলে না?"

"দেখবে? এই দেখ—এই দেখ—এই দেখ—"

পিঠ ঘুরিয়ে দেখালে—কেটে বসা বেতের দাগ। মাথার জটার মত চুল সরিয়ে দেখালে—সেলাইয়ের দাগ। হাঁ করে দেখালে—দু' পাটির দাঁত সামনের দিকে ভাঙা।

"হাজতে ভরে দিলে। তো ভেঙে পালালম। তুরাট ছুঁড়ে ফেললে—তিষ্টোতে দিলে না। ধরে ফেললে—আবার চালান করে দিলে। তো গাঙে ঝাঁপ দিয়ে পালালম। বুঝলে?" ...লোকটা হাসতে লাগল খুব, "আর ধরতে পারল নি...হি...হি...হি।" ...চোখ বড় বড় করে আবার বললে, "হুঁশি...য়া...র। বনের বাইরে যাবে নি।"

মমতায়, বিস্ময়ে, সহানুভূতিতে এই কিম্ভূতদর্শন মানুষটার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। যেন একটা ভাঙা মানুষ। ক্রুর কঠিন শাসনের নির্জিত অবশেষ—একটা দৈত্য হঠাৎ যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে তার সামনে মরবার জন্য ধুঁকছে। এমন একটা গ্রামের মানুষের সঙ্গে জীবেনের এই প্রথম পরিচয়।

জীবেন জিজ্ঞেস করলে, "সবই বললে—শুধু তোমার নামটা এখনও জানতে পারি নি ভাই। কে তুমি?"

লোকটা বললে. "আমার নাম পবন খাঁ।"

"পবন খাঁ!" বিচিত্র নাম শুনে জীবেন জিজ্ঞেস করলে, "তুমি মুসলমান?"

"জী।"

কিন্তু সারা দিনে তাকে একবারও নামাজ পড়বার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখা গেল না।

সন্ধ্যের দিকে জীবেন জিজ্ঞেস করলে, "নামাজ পড়ো না?"

পবন খাঁ বললে, "ভুলে গেছি।"......

সেদিন শোয়ার ব্যবস্থা একেবারে ছ' তলার গম্বুজে ঘরে।

কাজকর্ম নেই—শুধু বসে থাকা, আর নানা ভাবনার প্রবাহে ভেসে যাওয়া। পবন খাঁ তার সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে থেকে থেকে গুটি-সুটি মেরে শুয়ে পড়েছে। হয়তো ঘুমিয়ে গেছে।

মাথার ওপরে উদভ্রান্ত নক্ষত্রখচিত আকাশ, আকাশে চাঁদ নেই। তবু সেই নীরব নিবিড় অন্ধকারে আঁকা-বাঁকা ফিকে মলিন রজত রেখার মতো দেখা যায় চঞ্চলী নদীকে—বহুদূর পর্যন্ত। অদূরে দক্ষিণে অশ্রান্ত দোলায়মান হিম কালো জল—তার বুকে আলোর ঝিলিকের মতো জলে জলে উঠছে ঢেউভাঙা ফসফরাস সুদীর্ঘ রেখায়। এদিকে অরণ্যের মাথার ওপর দিয়ে মাঠ-প্রান্তর-গ্রাম—দূর-দূরান্ত। এমন কত নদী, কত মাঠ, কত গ্রাম....., সমুদ্র পরিবৃত। নদীজপমালা ধৃত প্রান্তর। ......তার স্বদেশ। পাতলা অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে এমনি পবন খাঁর মতো ঘুমিয়ে গেছে।

সে দৈত্যকে জাগাবে কে!

জীবেন দত্ত? ......কি তোমার সাধ্য?

একদিন, সুযোগ মতো এ জঙ্গল থেকে চলে যাবে সে ঠিক। তারপর? কি করবে?

জঙ্গলে এমনি একলা পড়ে থাকবে পবন খাঁ?

তার ঋণ শোধ করবে না জীবেন দত্ত? ভবিষ্যতের কর্মধারা কি হবে তোমার?

উত্তপ্ত মস্তিষ্কে অনেকক্ষণ সে ছটফট করে, পায়চারী করতে লাগল। কেবলই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনগুলি:

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই,
চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-
উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-
মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হ'তে
বিশ্বাসের ছবি।

[ক্রমশ]

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ আঠারো ॥

দুপুরের রোদ্রে গরম ধুলো উড়ছিল বাতাসে।

আমি এলোমেলো পথে হাঁটছিলাম। ঘুরছিলাম ইতস্তত।

ডুয়ার্সে এখন চৈত্র মাস। বসন্ত ঋতু। ঋতুর রাজ্যে এই ষষ্ঠ ঋতুটির আছে বিশেষ স্থান। হৃদয়লোকে তার বিশেষ অধিকার। মানুষের মনকে দুলিয়ে দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা তার করায়ত্ত। তার আবির্ভাবের সঙ্গে বনে বনে জাগে নতুন ছন্দ, নব-চঞ্চলতা। সে গৃহবাসীকে করে অনিকেত, দেয় সুদূরের দোলা। বিবাগীকে করে চঞ্চল। সন্ন্যাসীকে সে ফিরিয়ে আনে গৃহে, কেড়ে নেয় তার গেরুয়া উত্তরীয়। সংযমীকে প্রেরণা দেয় বন্ধন ভাঙতে, অচঞ্চলকে করে চঞ্চল। তার প্রতি পায়ে পায়ে নতুনের ইতিহাস। লাবণ্য ও সৌন্দর্যের অব্যাহত লীলা।

কিন্তু এ বসন্তঋতু কোনও মাদকতার স্পর্শ বহন করে আনছে না। হিল্লোলিত হচ্ছে না তনুমন। ফুরফুরে হাওয়ায় প্রাণ ভরিয়ে তুলছে না অফুরন্ত উন্মাদনায়। মধুমাধবীর কথা কবি বলেছেন কাব্যে। তার স্পর্শে নায়ক-নায়িকাদের নানা ভাবান্তর স্বেদ-কম্প্র ইত্যাদি বিভূতি হয়। ডুয়ার্সের বসন্ত-বাতাস কিন্তু বয়ে আনছে গরম আগুনের হল্কা। জানান দিয়ে দিচ্ছে স্পর্শমাত্রে। ফলে ছ্যাঁকা লেগে চমকে উঠতে হচ্ছে যখন-তখন।

রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে ঘাম সামলাতে পারছি না। উল্টে নিজেকে আরো রাঙা করে তুলছি।

এমন সময় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল রাধাকেষ্টর সঙ্গে।

পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে জিপখানা খাঁচ করে দাঁড়িয়ে গেল। ড্রাইভার ব্রেক কষেছে বিপদ-শঙ্কিত।

নিশ্চয়ই সামনে পথচারী কেউ পড়ে গিয়েছে। নইলে এমনটি হবার কথা নয়। ডুয়ার্সের রাস্তাঘাটের আজকাল যা অবস্থা। নতুনকালের আঙিনায় পৌঁছতে-না-পৌঁছতে ভিড়িয়ে পড়েছে পাল-পাল মানুষ। বিংশ শতাব্দীর বর্তমান দশকে মানুষ বাড়ছে পিলপিল করে। দিনের পর দিন। এর আর কমতি নেই। তাই মানুষকে ছুটতে হচ্ছে দিক্‌দিগন্তে। খাদ্যের প্রয়োজনে, অর্থের প্রয়োজনে। রুটি-রুজির প্রয়োজনে। সবার চাইতে বড় প্রয়োজন মাথার ওপরে ছাদ চাই। নিজেকে ঘেরবার সবার ব্যবস্থা। খাদ্য বড় নয়, অর্থ বড় নয়, সবচাইতে বড় প্রয়োজন নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার।

তাই অরণ্য মানছে না মানুষ। বনজঙ্গলা ভয়ঙ্কর অরণ্যভূমিতে বিচরণরত হিংস্র বন্যপ্রাণীকে পর্যন্ত উপেক্ষা করছে মানুষ। পায়ের তলার ঘাসে বিষাক্ত সর্পের আলিঙ্গন তুচ্ছ করছে। ভাঙছে পাহাড়, বিদ্ধ করছে ডিনামাইট দিয়ে পাথরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টুকরো। কাটছে কাঠ। বয়ে আনছে কাঠের কাণ্ডগুলি পরিষ্কৃত লোকালয়ে। বন কেটে বানাচ্ছে বসত। স্থাপন করছে নতুন আবাদ।

কাল যেখানে ছিল চিররাত্রির অন্ধকার, আজ সেখানে ঝলমল করছে নিয়ন লাইটের আলো। পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট। দোকান-বাজার। বন্দর। লোকালয়। ডুয়ার্স প্রসঙ্গেও সেই কথা।

কিন্তু যাক সে কথা। জিপগাড়িটা দাঁড়িয়ে যেতে তার শব্দে চমকে উঠে দেখছিলাম কেউ ভারী টায়ারের তলায় পিষ্ট হল গেল কিনা। সেটাই সম্ভব। লোকসংখ্যা বেড়ে যেতে হামেশাই ঘটছে এমন। তবে এক্ষেত্রে প্রাণদানকারীর ভাগ্য এই যে, ঘটনাটা ঘটেছে নতুন যুগের বাহন জিপগাড়ির তলায়। বর্তমান যুগ। এক-কথায় জিপেরই যুগ। দ্রুত ঘূর্ণ্যমান যুগের গতি বুঝতে চাও তো তাকাও জিপের চাকার দিকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলেই এ-গাড়িগুলির প্রথমাগমন। তবে তখন ছিল সৈন্যদের, এখনও অবশ্য এক হিসেবে বলতে গেলে সৈন্যদেরই রথ জিপ। বর্তমান যুগের এই সৈন্যগণ অধিকাংশই সরকারী অফিসার। পেশায় ও মর্যাদায় অনন্য। আর বাকিরা কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ কন্ট্রাক্টর।

বস্তুত অশ্ববানের চাকার তলায় গুঁড়িয়ে যাবার ভাগ্যও ঈর্ষা করবার মত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হতাশ হতেই হল।

এক্ষেত্রে ঘটেনি সেরকম কোন দুর্ঘটনা।

হ্যালো। হাউ ডু য়ু ডু? একটি মোটা পুরুষকণ্ঠ। পুরুষটি নিজেই স্টিয়ারিং হাতে ড্রাইভারের আসনে। মাথায় ফেল্ট। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে—আরে কী আশ্চর্য! আমারই উদ্দেশে বলছে দেখছি! বিস্মিত।

উত্তর দেব কি দেব না তখনও স্থির করে ওঠা যায় নি।

গাড়িটা পিছিয়ে এল। দু-চার হাত এদিকে।

আমাকে বলছেন? চমকে বলতে গিয়েছিলাম। তার আগেই বক্তা কর্তৃক দ্রুত হস্তে মস্তকাশ্রিত ফেল্ট অপসারণ।

আরে, রাধাকেষ্ট না? আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল তৎক্ষণাৎ।

বাবা, চিনতে পেরেছ তাহলে? চোখ টিপবার পুরনো ভঙ্গিটা করে উঠল রাধাকেষ্ট।

আমার খারাপ লাগল ভঙ্গিটা। হারামজাদা এখনো তেমনি গাড়ল আছে দেখছি। এই গাড়ল শব্দটির আসল অর্থ মেষ বা ভেড়া। আমরা না-জেনে অনেকেই গোঁয়ো প্রচলিত শব্দ মনে করে থাকি। মূলত শব্দটির সৃষ্টি সংস্কৃত গড্ডল থেকে।

সে যাই হোক, লেফ্‌ট্ হ্যান্ড-ড্রাইভ গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বাঁহাত রেখে রাধাকেষ্ট আমাকে অবারিত আহবান জানাল তার পাশের সীটে, আয়, আয়, উঠে আয়।

আহবান আন্তরিক। আন্তরিকতা থাকাই স্বাভাবিক। কলেজ-জীবনের একান্ত অভিন্ন-আত্মা বন্ধু। সতীর্থ হলে যা হয়। ক্লাশ পালিয়ে এন্তার স্বাধীনতা। সুরেন ঠাকুরের দোকানে গরম চা-সিঙাড়ার সঙ্গে সে-স্বাধীনতা হয়েছিল আরো মর্মময়। রকমারী বৈচিত্র্য ভরা দিন। কলেজ-সোসাল, ফাংশন।

তারপর পরীক্ষা পাশ দিয়ে বৈকুণ্ঠ প্রস্থান।

না, কোন দুর্গম গিরিশিখর প্রান্তে

পৌরাণিক বৈকুণ্ঠলোকের সাধনোচিত শ্রীধাম নয়।

পুরুষের বৈকুণ্ঠলোক তার কর্মজীবন। নিঃসঙ্গ কর্মময়।

তারপর কোথা দিয়ে দিন চলে গিয়েছে। কেউ কারুর খোঁজ রাখি নি। আর এতদিন পরে হঠাৎ দেখা ডুয়ার্সে। আনন্দিত হয়ে ওঠবারই কথা।

কোথায় যাবি?

আয় না। দেখাই যাবে।

তবু কিন্তু-কিন্তু করছিলাম। ঝটকা-গতিতে তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে কোথায় যাব?

রাধাকেষ্ট কোন দ্বিধাকে আমলই দিলে না। একরকম জোর করেই উঠিয়ে নিলে তার গাড়িতে। পাশের সীট আলো করে বসলাম।

তুই? এতদিন পরে সপ্রশংস বিস্ময় আমার কণ্ঠে।

গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে রাধাকেষ্ট বলে উঠলো, সেইটেই তো আমারো প্রশ্ন।

আমি অনেকদিন এখানে।

অনেকদিন?

তুই?

আমিও তো এখানেই। ইস্, তোর সঙ্গে যে এভাবে দেখা হয়ে যাবে কে জানত!

কোথায় যাচ্ছিস?

চল না দেখাই যাক।

বাঁহাতেই স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে রাধাকেষ্ট। ডানহাতে প্যান্টের পকেটে হাত চালিয়ে বার করল এক প্যাকেট দামী সিগারেট।

নে।

আমি ঘাড় নাড়লাম।

সে কী! সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিস? তার দু' চোখে বিস্ময় ছেয়ে থাকল।

ছেড়ে দিয়েছি।

তুই তো খোর ছিলি। নে নে ধরা একটা।

আগ্রহাতিশয্যে ধরাতেই হল। ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলাম, তারপর তোর খবর কি? তুই ডুয়ার্সে কতদিন?

সিগারেট তারও ঠোঁটে। আমি-ই কাঠি জ্বেলে ধরিয়ে দিয়েছি।

দাঁড়া, হিসেব করছি। একটু চিন্তা করে সে বলল, প্রায় এক যুগ হতে চলল।

এক যুগ! আশ্চর্য! আমিও যে অনেক দিন এখানে। বললাম, তুই আছিস কোথায় এখানে?

দেখতেই পাবি। নিয়েই যাচ্ছি তোকে।

কিন্তু আমাকে যে ফিরতে হবে।

সে না-হয় দেখা যাবে। কিন্তু তোকে কি ফিরতেই হবে? কি আছে তোর ময়নাগুড়িতে?

বললাম, কিছুই নেই। এক বন্ধুর কাছে—

এ-ও তো ভালো কথাই। এক বন্ধুর কাছ থেকে যাচ্ছিস অন্য বন্ধুর কাছে। আরও পুরনো। বহুদিনের পুরনো বন্ধু। তবে আর এত ব্যাকুলতার কি আছে? সিগারেটে একটা জোর টান দিল রাধাকেষ্ট। বলল, তোর ঘর-সংসার কোথায়?

ঘর-সংসার মানে যদি বৌ-ছেলেমেয়ে হয়, তবে জেনে রাখ বিয়েই করি নি।

যেন আৎকে উঠল রাধাকেষ্ট। বলল, বলিস কি? Am I to believe my ears?

বললাম, বিশ্বাস করতে পারো বন্ধু।

রাধাকেষ্ট হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। খানিক বাদে বলল, তাহলে তো তুই এখনো তেমনি আছিস। ঢের বেশি স্বাধীন।

অর্থাৎ তোর স্বাধীনতা কম? সেটাই তো স্বাভাবিক।

আর তোরটা অস্বাভাবিক?

না, সংসারে কোন্টা স্বাভাবিক কোন্টা অস্বাভাবিক কে বলতে পারে? আমাদের বিচারের ক্ষমতাই বা কত!

তাহলে যে বললি ময়নাগুড়ি ফিরতে হবে?

এক বন্ধুর কাছে উঠেছি। তিনি ভাববেন।

তোর ডেরা কোথায়?

মাথা নাড়লাম, আপাতত সেটাও নেই। যখন যেখানে থাকি বলতে পার সেখানেই—একটা temporary ডেরা দাঁড়িয়ে যায়, এই তো? আমার কথায় সঙ্গে জুড়ে দিল রাধাকেষ্ট। পরে বলল, ইস্, কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা! ভাবাই যায় না!

আমিও ভাবছিলাম। বাস্তবিক রাধাকেষ্টর সঙ্গে এতদিন পরে এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবি-ই নি কোনদিন। বাস্তবে অনেক সময়ই যা ঘটে কোন নাটকেও তার তুলনা মেলে কিনা সন্দেহ। কত বদলে গিয়েছে রাধাকেষ্ট। শুধু কথাবার্তার সেই ভঙ্গিগুলি, মুখের সেই পরিচিত ভাব অবশ্য এখনো তেমনি আছে।

আমি এখানে একটা সাহেব-বাগানে এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে আছি। রাধাকেষ্ট হঠাৎ বলল।

একেবারে এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার? কথা বললাম না। সিগারেটে একটা টানের সঙ্গে বাইরে ছুঁড়ে ফেললাম সেটাকে। জিপের চাকায়-চাকায় অভ্রান্তগতির উন্মাদনা। বাইরে মধ্যাহ্নের ডুয়ার্স। রাস্তার দু' পাশে দ্রুত উল্টোদিকে ছুটে ছুটে হারিয়ে যাচ্ছে ডুয়ার্সের পরিচিত চেহারা। সামনে চকচকে পীচের রাস্তা। চওড়া প্রসারিত। দু'ধারে সারি সারি গাছ। কতদিনের এ গাছগুলি কে জানে! হলুদে রঙের ফুলে ফুটেছে জংলা একরকম গাছে। ডালে ডালে কৃষ্ণচূড়া ও রাধাচূড়ার সমাবেশ। মাঝে মাঝে ধানক্ষেত। বাঁকা এক-আধটি নদী। বাঁদিকে আকাশের পটে দাঁড়িয়ে-থাকা নীল স্বপ্নের মত পাহাড়।

স্পীড বাড়িয়েছে রাধাকেষ্ট স্পীডোমিটারের কাঁটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম থরথরিয়ে কাঁপছে গতির উদ্ভ্রান্ত উন্মাদনায়।

অথ রাধাকেষ্ট কথা।

বি-এ পাশ দেবার পর কলকাতায় একটা ভদ্রগোছের চাকরির সন্ধানে ফিরেছিল রাধাকেষ্ট। দিনের পর দিন। খুব বেশিকিছু প্রার্থনা ছিল না। মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার গোছের ব্যাপার আদৌ নয়।

তবু কিন্তু চাকরি জোটে নি।

এক অল্প-পরিচিত দেশী সাহেবের সঙ্গে ছিল খানিক আত্মীয়তার বন্ধন। সেই সূত্রে গিয়েছিল তাঁর কাছে, যদি চাকরি একটা কিছু হয় তাঁর কৃপায়। নির্লজ্জের মতই প্রার্থনা জানিয়েছিল।

শুনে তিনি কি পরিমাণ খুশি হয়েছিলেন বলা কঠিন। বলেছিলেন, দেখা যাক।

এইটুকু ভরসা পেয়েছিল বলেই বার বার যাওয়া। এবং প্রায় তাঁর বাজার-সরকারের মতই হয়ে উঠেছিল। বাজার-সরকারেরও একটা স্বাধীনতা থাকে। তার ছিল না এসব কিছু। ভদ্রলোকের স্ত্রী দেশী মেম তাকে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। যেতে হত তাঁর সঙ্গে গাড়িতে। সঙ্গ দিতে। তিনি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে জিনিসপত্র কিনলে সেগুলি বয়ে এনে গাড়িতে তুলত। তাইতেই বিগলিত। লাইনের পর লাইনে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সিনেমার টিকিট কাটার অবিরত পরিশ্রম। সপ্তাহের একটি দিনও বাকি থাকত কিনা সন্দেহ। তারপর ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচের টিকিট কাটতে সে যে কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। সবকিছুই করেছিল চাকরি পাবার একান্ত প্রত্যাশায়। ভদ্রলোক খবরও রাখতেন কিনা সন্দেহ।

তারপর একদিন ককটেল-পার্টি থেকে ফিরতে নেশাজড়িত আবেগে ভদ্রমহিলা যেদিন তার হাত জড়িয়ে ধরে গাড়ির ভিতরে হাউ-হাউ করে কাঁদছিলেন এবং তার গায়ে মুখ গুঁজবার প্রাণান্তকর প্রয়াস করছিলেন, সেদিন থেকেই সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দিলে রাধাকেষ্ট। না, রমণীর পরকীয়ায় হয়তো আপত্তি ছিল না তার। কলেজের কবিতা-বইয়ে পড়া কবি মোহিতলালের "রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই" কথাটিকে সে-ও বিশ্বাস করে। কিন্তু একটি চাকরিতে তার একান্ত প্রয়োজন। অবসরপ্রাপ্ত পিতা ও দুটি বিবাহযোগ্যা বোন। মা অবশ্য অনেক আগেই বিদায় নিয়েছিলেন দায়-দারিদ্র্যের বোঝা থেকে

অব্যাহতি দিয়ে। অতএব চাকরিতে প্রয়োজন ছিল তার। এবং কামিনীতে অরুচি ছিল না। দায়-দায়িত্বহীন মধুপানে কারই বা অরুচি থাকে। কিন্তু কামিনী অপেক্ষা কাঞ্চনের গুরুত্বই তার কাছে বেশি ছিল এবং সে প্রয়োজনে চরিত্র-হননের অধিকার দিতেও সে ছিল না গররাজী। কিন্তু কই চাকরি? অতএব প্রস্থান সেখান থেকে।

অতঃপর প্রজাপতির নির্বন্ধ। ধনী-কন্যা বরুণাকে বিবাহ ও চাকরি প্রাপ্তি। এ বিবাহ নিতান্তই অভাবিত। শাস্ত্র বলেছে পুরুষের দশ দশা। বিবাহও তেমনি একটি দশা বটে।

এবং সেই দশার দৌলতে দুর্দশার হাত থেকে পরিত্রাণ। সাহেব-বাগানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন শ্বশুর। তাঁরই সূত্রে চা-বাগানে সরাসরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের ট্রেনীরূপে প্রবেশ। বেতন আটশত তঙ্কার কাছাকাছি। এবং কর্মক্ষেত্র পাণ্ডব-বর্জিত ডুয়ার্স।

একটি চাকরির জন্য যে-কোন জায়গায় যেতে প্রস্তুত রাধাকেষ্ট। কিন্তু তাই বলে ডুয়ার্স? সে যে ঘোরতর অরণ্য বলে শুনেছে। সভ্য জগতের সম্পূর্ণ অগোচরে এক অজ্ঞাত বনাঞ্চল।

প্রথমটায় কিছুদিন কষ্টকর মনে হয়েছিল।

ক্রমে সেটা কেটে গিয়েছে। আটশত তঙ্কার সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি তো কম নয়। মাস গেলেই টাকা। কে দিচ্ছে এত টাকা কলকাতায়? তাই অস্বস্তি-অসুবিধে কাটতে বিলম্ব হয় নি। টাকাই যে সর্বরোগহর সর্বদুশ্চিন্তাহর মহৌষধ। টাকা মানুষকে দিতে পারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ। টাকার ঝংকারই জাগে দুনিয়ার সেরা ঝংকার। তার কাছে কোন বাদ্যযন্ত্র লাগে না। সব সুরে সব সঙ্গীতের পূর্ণ সফলতা সেইখানে। মনের তৃপ্তি। স্বাস্থ্যের দীপ্তি।

দিনে দিনে সে-আয় বৃদ্ধি হয়ে ঠেকেছে তেরোশ' টাকার কাছাকাছি। সুন্দর বাংলো, বাগান, গাড়ি। দাস-দাসী পরিচারকবৃন্দ। এবং সর্বোপরি সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও দুটি সন্তান। ছ' বছরের একটি মেয়ে। আট বছরের ছেলেটি পড়ে কনভেন্টে।

দেশ-কালের যা অবস্থা, রাধাকেষ্ট বলছিল, তাই ভেবে-চিন্তে ওকে কনভেন্টে দেওয়াই স্থির করলাম। মানুষ হওয়া চাই তো।

আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ওপরে একটি ছোট বক্তৃতা করল সে।

আর যাই বলিস, সবকিছু ভীষণ গতানুগতিক হয়ে গেছে। After all, শিক্ষা মানে হচ্ছে highest attainment of life. সেজন্যে উপযুক্ত শিক্ষিত মানুষ চাই ইস্কুল-কলেজগুলিতে। এসব ভাড়াটে মানুষ দিয়ে কতদিন চলবে? শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই গেছে। কণ্ট্রাক্টরদের দিয়ে আর যাই হোক প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি হতে পারে না।

আমি বড় বড় চোখে শুনছিলাম।

আমার মিসেস আবার এদিকে খুবই—আলাপ হোক, দেখবি। আর হবে না-ই বা কেন? কতবড় Cultural Environment-এ মানুষ হয়েছে। জীবন সম্পর্কে ওদের ধারণা-দৃষ্টিই আলাদা।

বাংলোর লনে বসে কথা হচ্ছিল। পামকুঞ্জের তলায় সৌখীন কুশন-চেয়ার। ডানলোপিলোর গদি। বেলা আড়াইটে-তিনটে। রাধাকেষ্টর ডান হাতের চওড়া কব্জীতে বাঁধা ঘড়ি। ডায়াল চকচক করছে।

আর ভালো লাগে না ভাই। Extremely tired! ইচ্ছে করে এদেশ ছেড়ে চিরকালের মত দেশান্তরী হয়ে যাই। ভাবছিস হয়তো কেন এসব বলছি! এইসব dirty কুলিদের নিয়ে দিন-রাত্তির—। তাছাড়া আজকাল আবার লাগাতার হরতাল-ফরতাল লেগেই আছে।

একটু পরেই এলেন মিসেস। মিসেস রাধাকৃষ্ণ ওরফে রাধাকেষ্ট ঘটব্যালের স্ত্রী। খবর অনেক আগেই গিয়েছিল। তার পিছন পিছন বয়। আন্দাজে বছর তিরিশের যুবক। হাতে ট্রে। কফি, কাটলেটের ডিস। কাঁটা-চামচে।

বসে বসেই কাঁধ শ্রাগ করলে রাধাকেষ্ট। আমাকে দেখিয়ে বলল, মিসেসকে, my friend. নামটা আর বললে না। কে জানে ভুলেই গিয়েছে কি-না। স্ত্রীকে দেখিয়ে বলল আমাকে, She is Baruna.

এবার নমস্কার-নিবেদনের পালা।

মিসেসের পরনে ঘননীল বর্ণের মুর্শিদাবাদ সিল্ক। বয়ের হাত থেকে কফির পেয়ালা পরিবেশন করছিলেন তিনি। ফিকে নীলের স্লিপলেস ব্লাউজ। পেটকাটা ব্লাউজের তলায় নাভির ঠিক নিচেই শাড়ি।

আপনি কি কফি একটু কড়া-ই পছন্দ করেন? আরেকটু দুধ দেব কি? তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন।

তাঁর ঠোঁটে গোলাপী হাসি। রঙকরা গোলাপী ঠোঁটের হাসিকে কি বলব?

নো, থ্যাঙ্কস্।

থ্যাঙ্ক যু।

লাইটার জ্বেলে শব্দ করে নতুন একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলেন চা-বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। তাঁর আংটির পাথরটা জ্বলছিল. জ্বলজ্বলে এক পাথর চোখ। [ক্রমশ]

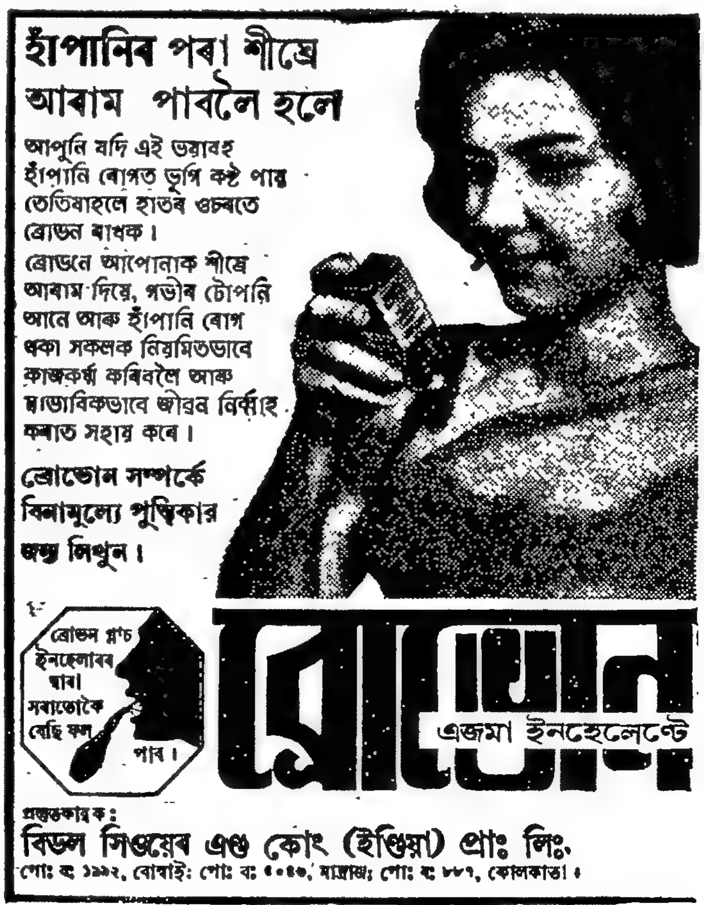

VAPI-BS-760

লাকি ডিসট্রিবিউটারের মালিক হরেন দত্তের নিকনেম খোঁড়া দত্ত। এ নাম ওর বন্ধুদের দেওয়া। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন ভদ্রলোক, তাই বন্ধুরা নাম দিয়েছে খোঁড়া দত্ত।

আজ এ লাইনের সকলেই হরেনবাবুকে চেনেন, খোঁড়া দত্ত বলতে পরিচিত মহলে এক ধরনের শ্রদ্ধা মেশানো বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে। কচুগাছ কাটতে কাটতে সত্যি ডাকাত হওয়া যায় কিনা সাধারণের সেটা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ নেই, কিন্তু লটারীর টিকিট বিকি করতে করতে অনেকেই খোঁড়া দত্তকে লাকি ডিসট্রিবিউটারের মালিক হতে দেখছেন।

এইতো সেদিন একজন নামকরা মন্ত্রী এসে লাকি ডিসট্রিবিউটারের উদ্বোধন করে গেলেন, ভাষণ দিলেন। ভাষণে ওদের দীর্ঘ আয়ু কামনা করে দুটি তরুণ-তরুণীর ব্যবসা-বুদ্ধি, কর্মনিষ্ঠা আর একাগ্র সাধনার কথাও বেশ দরদ দিয়েই ভদ্রলোক শুনিয়ে গেলেন।

এইতো সেদিনের কথা। তারপর দেখতে দেখতে শৈশব কাটিয়ে লাকি ডিসট্রিবিউটার এখন ভরা যৌবনের অধিকারী। দিল্লী মাদ্রাজ আর বোম্বাই শহরে তিনটে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হয়েছে। ব্রাঞ্চ অফিস তিনটির পরিচালনার ভার তিনজন বাঙালী ম্যানেজারের ওপর ছেড়ে দিয়েও খোঁড়া দত্ত ঠিক হেড অফিসেই পড়ে থাকতে পারেন না। আজ দিল্লী, কাল বোম্বে, পরশু মাদ্রাজ এ তো প্রায় লেগেই আছে। এর পরেও আছে ছোটখাটো সভা-সমিতির ডাক। আজকাল এই এক আপদ এসে জুটেছে, সভা। তবে ভাষণ দিতে উঠে খোঁড়া দত্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একটি কথাই স্মরণ করিয়ে দেন: "সামান্য মূলধন হাতে নিয়ে তোমরা কাজ সুরু কর। কর্মীর একাগ্র সাধনায় সৃষ্টি হয় সিদ্ধিলাভের সোপান।

"তারপর আদর্শ নিয়ে সততা নিয়ে দু-চোখে স্বপ্ন নিয়ে তোমরা সামনে এগিয়ে চল; দেখবে ভাগ্যও তোমাদের সঙ্গে চলেছে।"

এখন এই তিন কামরার ঘর নিয়ে লাকি ডিসট্রিবিউটারের হেড অফিস। শোনা যাচ্ছে শিগগির নিজস্ব জমিতে অফিসের বাড়ি তৈরি হবে। কোচ আর চেয়ার দিয়ে সাজানো প্রথম ঘরখানি ওদের একজিবিসনা রুম। এখানে বসেই কত ভাগ্যবান-ভাগ্যবতীর ছবি দেখতে পাবেন। কেউ পেয়েছেন এক লাখ। কেউ দু-লাখ, কেউ পাঁচ—কেউ ছয় লাখ। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাবে ওদের সম্পর্কে মুখরোচক চুটকী গল্প। পাশের ঘরেই সেলস কাউন্টার। সঙ্গে অফিস। তৃতীয় ঘরখানি কাঠের পার্টিশনে দু ভাগ করে তৈরি হয়েছে; দুই শরিকের দুই চেম্বার। একটিতে বসেন হরেন দত্ত অন্যটিতে মিসেস দত্ত।

হরেনবাবুর বিপরীত চরিত্র এই শ্রীমতীর। মুখে কথা নেই, ঠিক একটা যন্ত্রের মতই সারাদিন কাজ করে চলেছেন। এ কর্ত্রীটির নাকের দু-পাশে দুটো চোখ ছাড়াও আর কটা বাড়তি চোখ আছে ওরা ভেবেই পায় না। নিজের চেম্বারে বসে স্রেফ বলে দেবেন কোথায় কি হচ্ছে।

কোন কাস্টমারকে রিসিভ করা হল না। কাকে আর একটু রিকোয়েস্ট করলে দুটোর জায়গায় চারটে টিকিট দেওয়া যেত, কোন কর্মচারী টিফিনের নাম করে দু-ঘণ্টা বাইরে কাটিয়ে এল, এসব সংবাদ মিসেস দত্তের নখদর্পণে।

মাঝে মাঝেই মিসেস দত্ত বাইরে এসে দাঁড়ান, ওরা বলে সাডেন ভিজিট। এটা ওদের কাছে এক অস্বোয়াস্তিকর ভয়াবহ সময়। মিসেস দত্ত দাঁড়িয়ে থাকেন, কাস্টমারদের সঙ্গে রসিকতা করে হাসেন, আর ওরা অকারণে ঘামতে থাকে।

এছাড়াও আর এক কারণেও ওকে চেম্বার ছেড়ে বাইরে বেরোতে হয়। পুরনো কোন কাস্টমারের রিকোয়েস্টে টিকিটের ওপর মিসেস দত্ত লাকি টাচ দিয়ে যান। তখন ওকে দেখে কে বলবে উনি লাকি ডিসট্রিবিউটারের আতঙ্ক, বিগতযৌবনা স্থূলাঙ্গী। দুরন্ত খুশির বন্যায় যেন ওর মধ্যে আর এক নারী জেগে ওঠে। চাঁপার কলির মত সুন্দর আঙুল নাচিয়ে তিনি আবদারের সুরে বলেন, সেদিন এমনি মিষ্টি হাসিতে ভুলব না কিন্তু,

আঙুল কাটা সোনায় মুড়ে দিতে হবে। এরপর নিজের চেম্বারে ফিরে গিয়েই কোন কোন দিন শ্রীমতীকে শুনতে হবে, "কত রূপই না জানগো তুমি, নিকনেমটা বদল নাকি একবার।" কথা চলবে—পার্টিশন দেওয়ালের ছোট জানলাটি খুলে। কখন ছদ্ম গাম্ভীর্যে মিসেস দত্ত ধমক দেবেন, এখনও বুঝি সেই ছেলেটা ঘাড় থেকে নামে নি, কিন্তু অত ঘন ঘন জানলা খুললে ওরা দেখে ফেলবে যে।

ক্ষতি কি? ভাবছি ওদের নিয়ে একটা গল্প লিখলে কেমন হয়। একটা ছেলে আর মেয়ে। সারাদিন অফিস-পাড়ায় পাড়ায় লটারীর টিকিট বিক্রি করে ঘুরত ওরা। আর দু-জনে দু-জনকে মনে করত পরম শত্রু বলে। আচ্ছা শোনই না গল্পটা :

সেদিন বহু আকাঙ্ক্ষিত অফিসের লিফ্‌ট থেকে মেয়েটিকে নামতে দেখে ছেলেটা থমকে দাঁড়াল। ওর চওড়া কপালে তখন নিদারুণ বিরক্তির রেখা। মেয়েটিও ওকে দেখল কিন্তু দাঁড়াল না। কেবল দীপ্ত বিজয়িনীর ভঙ্গিতে মুখের ওপর একবার করুণা মাখানো দৃষ্টি বুলিয়েই চলে গেল।

রাগে অপমানে ছেলেটা বারবার ঠোঁট কামড়াতে থাকে। আর মনে মনে বিজয়িনীর নাম দেয় জরুলবতী। মুখের ওপর একটা জরুল চিহ্ন আছে মেয়েটার, তাই ওর নাম দেয় জরুলবতী। কিন্তু এই বিদকুটে নামে ডেকেও মনের বিরক্তিটা যেন মুছে ফেলা যায় না।

অফিসে ঘুরে লটারীর টিকিট বিক্রির কৌশলটা কেমন করে যেন ওর মাথায় এসেছিল। শিক্ষিত ভদ্রছেলে দু-দিনেই ব্যবসা জমে গেল। অবশ্য আজ আর সেদিন নেই, এসেছে জরুলবতী, এসেছে আরও অনেকে। তবে জরুলবতীর মত অমন করে কেউ এ লাইনে আসে নি। এ-যেন আসা, দেখা আর জয় করা।

সেদিন একটা অফিসে ভাল কাজের আশা ছিল। কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে ভূমিকা তৈরি করা গেছে। কিন্তু নির্ধারিত দিনে অফিসে ঢুকতেই দেখা জরুলবতীর সঙ্গে। ওকে ঘিরে তখন ছোটখাটো ভিড় জমে উঠেছে। টিকিট কেনার আগে ওরা একবার করে জরুলবতীকে হাত দেখিয়ে নিচ্ছে।

দেখুন তো একবার হাতটা আমার লাকি নাম্বার কত হতে পারে।

ধন্য তুমি জরুলবতী! কত রূপই না জান। লাকি নাম্বার পর্যন্ত হাত দেখে বলতে পারো। শত্রু হলেও মেয়েটার ব্যবসা-বুদ্ধির তারিফ করা চলে। কিন্তু এ পরাজয়ের প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। লাকি নম্বরের টোপ ধরিয়ে খদ্দের ভাঙাচ্ছে মেয়েটা। এখন ওর একমাত্র ভরসা কিছু মহিলা কাস্টমার। এরা কেউ জরুলবতীর ছলনায় ধরা দেয় না। কারণ সেই পুরনো, মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু।

জরুলবতী সুন্দরী। শত্রুরা মুখে যতই বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি করুক না কেন; সাজলে-গুজলে ওকে ভালই দেখায়। এ-হেন মেয়েকে নিয়ে ছেলে-ছোকরাদের বাড়াবাড়িটা কোন মহিলাই সহ্য করতে পারে না।

সেটাই এখন ওর একমাত্র মূলধন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে আর কতটুকু। ফুটিফাটা মাঠে সে তো কুপ থেকে সেচ করা জল। ওদিকে নেমেছে দাক্ষিণ্যের বন্যা। যেখানেই তুমি ফোলিও খুলে দাঁড়াও না শুনতে পাবে, টিকিট? নিয়েছি শ্রীমতী হালদারের কাছে।

ওঃ নামের ঘটা দেখ একবার—শ্রীমতী! শ্রীমতী না ছাই। ছেলেটার কাছে ও হল জরুলবতী। কেবল জরুলবতী নয়, শুটকী—রক্তঠোঁটি, গরু-চোখী, উচ্‌গোড়ালী, গজদাঁতি, আরও অনেক কিছু। চেহারা আর সাজগোজের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে যত রকমের বিদঘুটে বিদঘুটে বিশেষণ আছে সব কটা জুড়ে দিয়েও যেন গায়ের জ্বালা জুড়াতে চায় না।

সেদিন মার্চেন্ট অফিসের কেতকী দত্ত বলে সেই টাইপিস্ট মেয়েটা বলল, আপনিও ভেকটেক ধরুন না মশাই, নইলে মার্কেট ডাল হয়ে যাবে। ওদিকে দেখুন নিত্যি নতুন ঢং।

কেন কি হল আবার?

আর বলবেন না, দেখলেও গা জ্বালা করে। আজকাল শ্রীমতী টিকিটের ওপর টাচ দিতে সুরু করেছে।

সেটা আবার কি?

এই দেখুন, লাইনে আছেন অথচ লাকি টাচ জানেন না। আজকাল শ্রীমতী চোখ বন্ধ করে টিকিটের ওপর আঙুল ছোঁয়াতে সুরু করেছে। সেটাই ওরা কেনে। এর নাম লাকি টাচ্‌।

ধন্য তুমি জরুলবতী। কত রূপই না জানো। লাকি নাম্বার থেকে সুরু করে লাকি টাচ্‌ দিতে সুরু করেছো। শত্রু হলেও মনে মনে ওর ব্যবসা-বুদ্ধির তারিফ করে ছেলেটা।

কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানি আর সহ্য হয় না। তাই সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেদিন প্রচণ্ড ক্ষোভে সে ফেটে পড়ল।

এক ভদ্রলোকের কাছে তিনটে টিকিটের দাম পাওনা ছিল ওর। কিন্তু দেবার নাম করেন না ভদ্রলোক। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, এই করে ক্রমাগতই ঘোরাচ্ছেন। মিষ্টি কথায় হয়তো সেদিনও ভুলিয়ে রাখা যেত, কিন্তু অফিসে পা দিয়েই সামনে জরুলবতীকে দেখে ছেলেটার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। রক্ত চড়ার কারণ ছিল বৈ-কি। দেখল জরুলবতী সেই ভদ্রলোকের মুখোমুখি চেয়ারে বসে ওর টিকিটের ওপর লাকি টাচ্‌ দিচ্ছে।

আজ আর নিজেকে সামলে রাখা গেল না। সোজা ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে প্রশ্ন করে, বেশ ভদ্রলোক তো মশাই, টিকিট নেবার নাম করে কতদিন ঘোরাচ্ছেন বলুন তো?

ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ভদ্রলোকের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানেন না।

আপনার মত অনেক ভদ্রলোক আমার দেখা আছে। লজ্জা করে না, ধারে টিকিট নেবার বেলায় আমি, আর নগদ টাকায় লাকি টাচ্‌ নেওয়া হচ্ছে।

মুহূর্তে জরুলবতীর মুখটা কাগজের মত সাদা হয়ে যায়। চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, কিন্তু একেবারে চলে গেল না। হয়তো চাবুকের মত সেই মন্তব্যের একটা জুতসই পাল্টা উত্তর খুঁজতে থাকল।

হোয়াট ডু ইউ মিন। ভদ্রলোক ওর দিকে ঘুঁসি পাকিয়ে এগিয়ে আসেন।

টাকা দিয়ে লাকি টাচ্‌ নিই আর যাই করি তাতে তোমার কি?

ভদ্রভাবে কথা বলুন।

ভারি আমার ভদ্রলোক এসেছেন রে, এসেছো তো লটারীর টিকিট বিক্রি করতে।

রাগে-দুঃখে ওর তখন মরিয়া অবস্থা। রক্তশিরায় পদ্মার প্রমত্ত দোলা। অফিসের দু-চারজন এসে ওকে না ধরলে হয়তো সেদিন মেরেই বসত লোকটাকে।

ক্লান্ত-অবসন্ন পায়ে এক সময় ও রাস্তায় বেরিয়ে এল। রাগে-অপমানে কপালের দু-পাশের শিরা দুটো ছিঁড়েই যাবে বুঝি।

রাণীধূপ
কাকার প্রডাক্টস

লটারীর টিকিট বিক্রি করে তাই সে ভদ্রলোক নয়, অথচ শ্রমের মর্যাদার ওপর এরাই তো বড় বড় বুলি আওড়ায়। সব মিথ্যে, সব ভণ্ডামী! আর সেই জরুলবতী? ছি-ছি এতটুকু আত্মসম্মানবোধ থাকতে নেই।

শুনেছেন, ও মশাই!

ডাকছে সেই মেয়েটা, জরুলবতী।

কথা বলবে না ভেবেও অনিচ্ছায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

আচ্ছা রাগ তো আপনার!

না রাগ করব কেন, আমরা লটারীর টিকিট বিক্রি করি তা বলে মান-সম্মান বেচি না।

এখনও রাগ যায় নি দেখছি। যে-ভাবে ঘুঁসি পাকিয়ে দাঁড়ালেন ভাবলাম দেবেন বুঝি দু'ঘা।

তাহলে আপনার খুব সুবিধে হত তাই না? কিছুদিন মানুষটার জেল-টেল হোক আমি ততদিন মজা লুটতে থাকি।

আমিও আর ওখানে যাব ভেবেছেন?

সহসা জরুলবতীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল সে।

কি বলতে চান?

আপনি খুব রেগে আছেন, নইলে বুঝতেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আমাকেও অপমান করেছে।

কিছুদিন পরেই আক্রমণ এল সম্পূর্ণ নতুন পথে। আর কিছুকাল এভাবে আক্রমণ চললে অফিসপাড়া থেকে হাত গুটিয়ে ওকে হেদো-গোলদীঘির রেলিং-এ টিকিট সাজিয়ে বসতে হবে। আর এটাই হবে ওর কাছে সবচেয়ে বড় পরাজয়। এ পরাজয় মৃত্যুতুল্য।

কোন এক খেলায়, সেবার জরুলবতীর টিকিটেই কে যেন দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়ে গেল। কিন্তু সেটাও যে ঢাক পিটিয়ে বলার মত সংবাদ এর আগে ভাবতে পারে নি কেউ।

এই তো ক'বছর আগে কানু দাস বলে সেই ফলওয়ালা ওরই টিকিটে লাখ টাকা পেয়েছিল। অথচ দাসমশাই (টাকা পাবার পর লক্ষপতি কানু দাস এখন দাসমশাই) কিছুতেই টিকিট কিনতে চান নি। আর যেদিন সে নিজেই ওর কাছে লাখ টাকা পাওয়ার সংবাদ নিয়ে ছুটে গেল, খুশির বদলে কানু দাসের সেকি কান্না। ভিড়ের মধ্যেই ওর পা দুখানা জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে থাকেন দাসমশাইঃ জানেন লক্ষ নয় হাজার নয় মাত্র কয়েকশো টাকার জন্য বউটাকে তিলে তিলে মরতে দেখেছি...।

কই তার এই কৃতিত্বের কথা কাগজে ফলাও করে বের করতে চায় নি সে। অথচ জরুলবতী এটাকেই ক্যাপিটাল করে আক্রমণ চালাতে চায়। কেবল সংবাদ নয়, কুলীন জাতের এক কাগজে পুরস্কার বিজয়িনীর সঙ্গে ওর ছবিও ছাপা হয়েছে। সঙ্গে জরুলবতী সম্পর্কে একটি ছোট্ট সংবাদ।

এটাকেই ক্যাপিটাল করে জরুলবতী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। টিকিট বের করার আগেই বাঁধানো কাগজের কাটিং-খানা ওদের সামনে বাড়িয়ে ধরে জরুলবতী আবদারের সুরে বলবে, একবার দেখুন তো চিনতে পারেন কি-না? হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, কি করব বলুন আমারই লাকি টাচ্ দেওয়া টিকিট কি-না তাই ধরে বসল আপনারও ছবি নেব, অগত্যা দাঁড়াতেই হল।

সেদিন কিসের যেন বিক্ষোভ মিছিল ছিল অফিসপাড়ায়। মিছিলের পর মিছিল, অগণিত জনস্রোত। ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ। দেখতে দেখতে জ্বলন্ত ট্রাম-বাসের ধোঁয়ায় শহরের আকাশ কালো হয়ে উঠল। এসপ্লানেডের মোড়ে কিছুক্ষণ আগেই গুলী চলেছে। এখানে ওখানে টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটার শব্দ।

গ্যাসের ধোঁয়ায় ছেলেটার চোখ দুটো অসম্ভব জ্বালা করতে থাকে। কিন্তু দৌড়ে পালাবার মত পায়ের অবস্থা নেই। কিছুক্ষণ আগেই টিয়ার গ্যাসের সেল লেগে ভীষণ জখম হয়েছে ওর ডান পাটা।

সহসা পুলিশ এলোপাতাড়ি লাঠি চালাতে সুরু করল। মিছিল ভেঙে জনস্রোত ছড়িয়ে পড়ছে, ইঁট ছুটছে পুলিশের মাথা লক্ষ্য করে, সঙ্গে ক্র্যাকারের শব্দ। হয়তো আবার গুলী চলবে। চলুক ও আর এক পাও সামনে এগুতে পারবে না। ওর পায়ের সে শক্তি নেই। হয়তো চিরদিনের জন্যেই পাটা এমনই জখম হয়ে থাকবে।

পুলিশ এগিয়ে আসছে। ওরই দিকে। ওদের চোখ জ্বলছে। এক হাতে তারের জাল অন্য হাতে বেতের মোটা লাঠি।

পড়ে যাবার আগেই সহসা কে যেন ওর হাত চেপে ধরল। সেই জরুলবতী।

আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলতে পারবেন?

একটু ধরলে বোধহয় চলতে পারব।

দৌড়তে হবে কিন্তু, নইলে পড়ে মার খেতে হবে।

স্ট্যাণ্ড রোড ধরে ওরা নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছে। পেছনে অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে গুলীর শব্দ। সদ্য বাস পোড়ার কালো ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার।

ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে জরুলবতীর। এতখানি পথ সে প্রায় কাঁধে করেই ওর শত্রুটাকে বয়ে এনেছে। বিপদ কাটতেই লজ্জাটা ফিরে আসে। এখন ওর কাঁধে ভর দিয়ে চলতে আসোয়াস্তি লাগে যেন। তাই বলে, ছেড়ে দিন এবার বোধহয় চলতে পারব।

তা তো পারবেন, কিন্তু পায়ের যা অবস্থা বাড়ি ফিরবেন কি করে? চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি।

সহসা মেয়েটার কপালের দিকে চোখ পড়তে ছেলেটা কি দেখে যেন চমকে উঠল।

সর্বনাশ আপনার কপালে এ কিসের রক্ত?

রক্ত, কই না তো!

কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জরুলবতী যেন লজ্জা পেয়ে যায়। বলে বুঝেছি—পুলিশের লাঠি খেয়ে পড়ে যেতেই তো আপনাকে ধরে ফেলি. মনে নেই।—তখন হয়তো—

বুঝেছি তাই তো সেই থেকে কপালটা চিন চিন করছে, দাঁড়ান দেখি রক্তটা মুছে দিই।

শান্ত চোখ তুলে জরুলবতী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দুই শত্রুর চোখের তারায় দুটো ছবি কিছুক্ষণের জন্যে বন্দী হয়ে থাকে।

* * *

সহসা লাকি ডিসট্রিবিউটারের ছোট চেম্বারেই আবার ফিরে আসতে হল। গল্প শুনতে শুনতে শ্রীমতী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, জাস্ট এ মিনিট একজন পুরনো কাস্টমার এসেছে, লাকি টাচ্ দিয়ে আসি।

উত্তরে খোঁড়া দত্তের নিম্নকণ্ঠের মন্তব্য শোনা যায়ঃ

ধন্য তুমি জরুলবতী, কত রংগই না জানো।

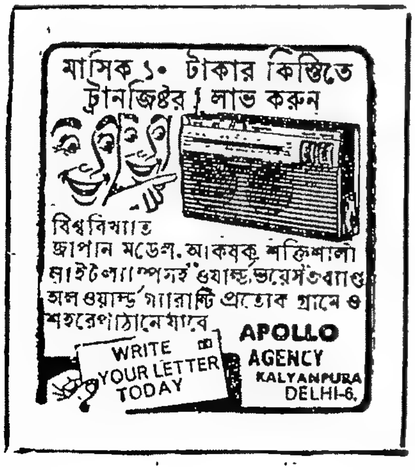

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অন্য গ্রাম অন্য কেউ

সমীর মুখোপাধ্যায়

॥ তিন ॥

বয়েস বেশি নয়। এই বাইশ-তেইশ হবে। চোখ দুটি বড় বড়। একটু উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। নাকটা খাড়া। মুখে সর্বদা কারণে-অকারণে হাসি। কিন্তু এসব ছাড়িয়ে সব থেকে চোখে পড়ে ধাঁকানো, কাটা দাগ, যেটা জ্বলজ্বল করছে আধো-চাঁদের মত কপালে।

বলুন তো, কি ব্যাপারে এসেছেন আমার কাছে? তক্তাপোষ থেকে হ্যান্ড-লুমের ব্যাগটা ও কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো। বোধ হয় তাড়া আছে। বেরুবে কোথাও।

বেরোবেন কোথাও? এক্ষুণি বেরো-বেন?

একটু তাড়া আছে, তবে ঘণ্টাখানেক দেরি করলেও চলে। যাবো পাশের গ্রামে একটা গ্রুপ মিটিং করতে। বান্দীপাড়ায় যাবো।

আমি তাকিয়ে দেখছিলাম যুবক-টিকে। পাৎলা চেহারা। ময়লা পাঞ্জাবী। ময়লা পাজামা। একটু ব্যস্তসমস্ত ভাব। খুবই নিরীহ, সজ্জন চেহারা। অথচ একে ঘিরেই নাকি একদিন এ অঞ্চলের ট্রেনে ট্রেনে অনেক গল্প তৈরি হয়েছিলো। কলেজের মেয়েরা বেরিয়েছিলো হাতে কাটা টিন নিয়ে। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত কোন ট্রেনকে ওরা বাদ দিতো না। ছ'-সাতজন মিলে এক-একটা গ্রুপ এক-একটা ট্রেনে উঠে বসতো।

তারপর অবিরাম চলতো ওদের প্রচার অভিযান আর সংগে সংগে আর্থিক সাহায্যের জন্যে আবেদন। চোখে সুর্মা নেই। ঠোঁটে লিপস্টিক নেই। গালে রুজ নেই। কোমর খোলা, হাত খোলা, কাঁধ খোলা জামার চিৎকার নেই। ওরা যেন সব ভুলে গেছে যা এতোদিন করতো সেই রুটিন করে প্রেম, বাহার করে পরচর্চা, চুটিয়ে দেখা সিনেমা। পরনে যেমন-তেমন একটা শাড়ি। এলোমেলো রুক্ষ চুল হাওয়ায় উড়ছে। কোনদিকে লক্ষ্যই নেই। কেন না ওরা এমন একটা জিনিষ পেয়ে গেছে যার কাছে আর সবই ম্লান। কলেজে হয়তো বড়জোর এরা চুপি চুপি ভোট দিতেই পারে কিন্তু এইভাবে প্রকাশ্যে হাতে কাটা টিন, কাঁধে ছেলেদের মতই হ্যান্ডলুমের ব্যাগ, যে কথাগুলো বলছে সে কথাগুলোতে সত্যি সত্যি বিশ্বাস, এ সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ, আমি যেন দু'কান ভরে শুনতে পাচ্ছি, ওরা যেন বলছে চলন্ত ট্রেনের কামরায় কামরায় অসংখ্য মানুষের সামনে যুদ্ধ ঘোষণার মত : বন্ধুগণ, আমাদের বন্ধু অমিয়, আমাদের ভাই, সত্যি কথা বলেছিলো বলে জমিদারের পোষা গুন্ডারা ওকে মেরেছে। একটা পা ওর অকেজো হয়ে গেছে। মাথা ফেটে গেছে। কপালের অনেকখানি কেটে গেছে। ওর এখনো জ্ঞান ফেরে নি। এতো করেও জমিদারের আশ মেটে নি। ওরা ওর নামে কেস করেছে। আমরা কলেজের গরীব ছাত্র-ছাত্রী। এই কেস চালাতে গেলে পয়সা লাগবে অনেক। আপনারাই আমাদের গার্জেন, অভি-ভাবক। আপনারা যে যেমন পারেন সাহায্য করুন। ও এখনো হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। ওর এখনো জ্ঞান ফেরে নি। আমরা যে ট্রেনে ট্রেনে ওর হয়ে ঘুরছি ও এসব কিছুই জানতে পারছে না। জানতে পারলে বাধা দিত। বন্ধুগণ......

আপনার কপালের দাগটা, এটার গল্প শুনতে এসেছিলুম।

ও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেল। মুখ নিচু করে বলল, দেখুন তো, এর, জন্যে আপনাকে কতোখানি পথ অযথা আসতে হল। আমাকে একটু খবর দিলেই আমি আপনার আস্তানায় চলে যেতে পারতাম। ভারি তো একটা ব্যাপার, দেখুন, এটা কোন বলার মত ব্যাপারই নয়।

তবু বলুন। আমি শোনার জন্যে ব্যাকুল।

বলতে পারি। ও হ্যান্ডলুমের ব্যাগটা কাঁধ থেকে তক্তোপোষে রাখলো। তারপর ওর বড় বড় উদ্‌ভ্রান্ত চোখ দুটি তুলে মিটমিট করে হেসে বলল, আমাকে আপনি বলে যদি সম্বোধন না করেন তবেই। আমি আপনার চেয়ে ছোট অনেক।

আচ্ছা। ঠিক আছে। আপনি আরম্ভ করুন তো আগে। দেখবেন কখন 'আপনি' 'তুমি' হয়ে গেছে। ওর জন্যে চিন্তা করবেন না।

বলছি যা আমি জানি, কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্ন, অমিয় বলল, কোথায় শুনলেন আমার কথা?

আমি তো গ্রামে গ্রামে ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে লোকমুখে শুনেছি।

ও, আচ্ছা। জায়গাটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখেছেন?

কাল আমি বিকেলের দিকে একটু বেরিয়েছিলাম। দু'পাশে নিবিড় বাঁশ-বন। জায়গাটা খুব শান্ত। মানুষজন দেখা যায় না বড় একটা। শুধু দু'-একটা কাক ঠোঁট ফাটিয়ে তখনো কা কা করছে। তখন ভারি অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হল আমার।

কি?

কি জানি বিকেল শেষ হয়ে আসছিলো বলে কি না জানি না। হঠাৎ গাটা কিরকম ছম্ ছম্ করে উঠলো। আর বললে বিশ্বাস করবেন না, সংগের লোকটি সংগে সংগে দূরে দাঁড়ানো একটা গাছের গুঁড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐখানে আমার ছেলে আখতারকে জমিদারের গুন্ডারা কালীবাড়ি থেকে মদ, তাড়ি খেয়ে ছুটে এসে বল্লম দিয়ে মেরে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। ঐ দেখুন সেই কালীমন্দির।

ত্রস্ত সুরে তাকিয়ে দেখি ঘন, নিবিড় বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্ট, বিরাট কালী-মন্দিরের পর পর তিনটি চূড়া। আমি লোকটির দিকে ফিরে তাকালাম। লোকটা শুকনো মুখে আস্তে আস্তে বলল, ১৯৬৬ সাল হলে আমি এই ভর বিকেল-বেলায় এই পথে আপনাকে পৌঁছে দিতে আসতে পারতাম না। ওরা আমাকে খুন করতো। আপনাকে বলতো আপনি হিন্দু, তায় ব্রাহ্মণ, তার ওপর পরদেশী, ওরা আপনাকে কিছু করবে না, আপনি একা একা চলে যান। আমি সংগে থাকলেই বরং বিপদ।

ঠিকই বলেছে। অমিয় কেমন অদ্ভুত এক

রুক্ষ গলায় বলল, ও ঠিকই বলেছে। ১৯৬৬ সালে সত্যিই ওখানে একটা মুসলমান মার্ডার হয়েছিলো। সেদিন আমরা কিছু করতে পারি নি। পড়ে' পড়ে' মার খেয়েছিলাম। এ যে আমাদের কি আফশোস...আজ হলে...ঐ শুনুন...

অদূরে পেটা ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

শুনলেন?

হ্যাঁ, ঘণ্টা বাজছে কোথাও।

দেউড়িতে প্রহর ঘোষণার সংবাদ হচ্ছে।

মানে?

ওটা জমিদারবাড়ির ঘণ্টা। শুধু প্রহর ঘোষণাই নয়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওটা বাজানোর নিয়ম। ওঁদের অধীনে যতো-গুলো গ্রাম আছে সমস্ত গ্রামে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওদের জানানো যে, ওদের মাথার ওপর চন্দ্র, সূর্য আর আছে জমিদার। রাত্রেও বাজে।

অদ্ভুত তো!

অদ্ভুত এবং সামন্ততান্ত্রিক। এই পরিবেশটুকু না বুঝলে আপনি এই কাটা দাগের কাহিনী কিছুই হয়তো তেমন করে বুঝতে পারবেন না। ...

ঘণ্টা বাজানো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তার আশ্চর্য অনুরণন তখনো বেজে উঠছিলো।

তাহলে মার্ডার কি এঁরাই করেন।

তাছাড়া আবার কে।

কেউ কিছু বলে নি, পুলিশ কেস?

পুলিশ কেস? আপনি...কি বলবো আপনাকে...গ্রাম যে কি জিনিষ, জমিদার যে কি জিনিষ কিছু মনে করবেন না, বোধহয় সে ধরণের কোন অভিজ্ঞতা...

না। আপনি ঠিকই ধরেছেন। নেই।

আমারো ছিল না। পড়তাম শহরের স্কুলে। ওখানে কোথাও সীট পেলাম না। কাজেই এই গ্রামের দিকে নজর পড়লো। এখানকার কলেজে জায়গা পেয়ে গেলাম।

একটু থামলো। হাসলো। ঐটাই ওর স্বভাব। কথায় কথায় হাসি। বলল, আমি তখনো এখানকার চালচলন জানি না। আদব-কায়দা জানি না। একদিন, হ্যাঁ, এই ১৯৬৬ সালেই, তখনি তো আমরা ভর্তি হয়েছিলাম কলেজে, আমরা ক'জন, দুজন হোস্টেলের বাকি একজন আমি, হোস্টেলের নয়। গ্রামের চওড়া মেটে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ ওপাশ থেকে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠলো, তফাৎ যান। তফাৎ যান। জমিদারবাবুর ছোট ভাই আসছেন। ঠিক বুঝতে পারলাম না। পাশ দিয়ে ধবধবে ফর্সা, মাংসল চেহারার একজন, গায়ে নকসাদার মেরজাই, পায়ে বুটি-দার নাগরা, সাইকেল চালাতে চালাতে চলে গেলেন। যাবার সময় আমাদের দিকে ভ্রূকুটি করে গেলেন। যেন অসম্ভব বিরক্ত। কি করলেন বলুন দিকি? লোকটা, যে দূরে থেকে 'তফাৎ যান তফাৎ যান', বলে চেঁচিয়েছিলো, সে আমাদের কাছাকাছি এসে বলল, এখন যেতে হবে জমিদারবাড়ি। বলে আসতে হবে আপনাদের কথা। বলতে হবে বাবু-দিগে আমি সাবধান করে দিয়েছিনু। বাবুরা শোনেন নি। বাবুরা এখানকার লয়। নিয়মকানুন জানেন না।

নিয়ম? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

জমিদারবাড়ির কেউ যখন এ পথ দিয়ে যাবেন কি ফিরবেন তখন ওঁদের চলার সুবিধের জন্যে অনেক তফাতে সরে যেতে হয়। সেইটাই নিয়ম।

কেন? এরকম অদ্ভুত নিয়ম কেন? জায়গা তো যথেষ্ট রয়েছে। ধাক্কা লাগবার ভয় তো নেই।

না। সেজন্যে নয়। লোকটা বলল, ওটা ওঁদিগে মান জানানোর রীতি। সেই কতকাল থেকে চলে আসছে আজ্ঞে।

যদি কেউ বেয়াদপি করে না শোনে তাহলে কি হয়?

আরে বাপ্ রে! তাহলে আর বাঁচতে হবে নি।

যদি একশো দুশো বিঘে জমির মালিক হন তাহলে বাবু আপনার বাবা, কাকা, জেঠাকে একটু বলে দেবেন, ছেলেটাকে সহবৎ শিখিও।

যদি এমনি ভদ্দরনোক হন মানে এখানেও রইলো কিছু জমি, সারা বছরের খোরাকী আর কোলকেতায় অপিসে রোজ কাজে যাচ্ছেন আপনার বাপ, কাকা, তাহলে তেনাদের ডেকে আপনাকে শাসন করতে বলবেন আর আপনি যদি ছোটনোক হন, মানে আমারি মত কাওট বা বাগ্দী তাহলে আর রক্ষে নেই, বাবুর লাঠিয়াল, সে বেটা পাকি চোর, এক-সময়কার আবার দুর্দান্ত মাতাল, অষ্ট-পহর মদ খেয়ে রে রে করছে, বাবুরাই মদের খরচ জোগান, আমাদের জেতেরই, মনে করুন সে 'শুয়ার কি বাচ্ছা', 'ছোট-নোকের আস্পদ্দা হয়েছে', 'বেটা চন্দ সূয্য মানচো নি', 'সাপের পাঁচ পা দেখেচো' বলে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করে ঘর থেকে টেনেহিঁচড়ে জমিদারবাবুর বাড়ি নে যাবে। তারপর বাবু হাঁকবেন, রামরতন! বাবুর খাসকামরার চাকর, এই চেহারা মশাই, গোঁফজোড়া কি, বাপ্পো রে, সে বেটা আসবে যম-দূতের মত শংকর মাছের বেতজোড়া নে। তারপর আর কি বলবো বাবু, আমাদের এই ছোটনোকদের কপালের লেখন, পড়ে পড়ে মার খাওয়া।

আমরা এ গল্প শুনে সত্যি সত্যি আঁৎকে উঠলাম। এখনো এসব চলে, এই ১৯৬৬ সালে, কলকাতা থেকে সামান্য ক'মাইল দূরে! এসব বলছে কি? বানিয়ে বলছে না তো? শুধু শুধু বানাতেই বা যাবে কেন? আমরা যখন শহরগুলো মিছিলে মিছিলে ছেয়ে দিচ্ছি, মোড়ে মোড়ে করছি স্ট্রীট কর্নার, হাতে হাতে গুঁজে দিচ্ছি নিষিদ্ধ বুলেটিন, দেয়ালে যা খুশি তাই লিখছি, কোন কিছুই মানছি না, দরকার হলে স্কুলের হেড মাস্টারের, কলেজের প্রিন্সিপ্যালের টেবিল উল্টে দিয়ে আসছি, কথায় কথায় জেলে যাচ্ছি। পুলিশ লাঠি চার্জ করবার আগেই ব্যাগ থেকে বার করছি বোম, কোমর থেকে বেল্টের ওপর লাগানো চেন খুলে নিয়ে ছুটে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা চায়ের দোকানে উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্কের যখন ধোঁয়া উঠছে, বিরাট বিরাট মিছিল নিয়ে যাচ্ছি ট্রেনে ট্রেনে, মনুমেন্ট আর প্যারেড গ্রাউন্ড ভরিয়ে ফেলছি, সে সব মিছিলও আবার দেখবার বস্তু, মিছিলের ল্যাজটা পড়ে আছে হাওড়া স্টেশনে মিটিং শেষ হতে চলল তখন মুখটা সদ্য ঢুকছে মিটিং-এর জায়গায়, ডায়াস থেকে তখনো চিৎকার হচ্ছে, 'আমাদের সমস্ত মিছিল এখনো এসে পৌঁছোয় নি, এই মাত্র একটা মিছিল সবে মাঠে ঢুকেছে এখনো পেছ-নের লোকেরা পড়ে আছে হাওড়া স্টেশনে, এ্যাতো লোক কেউ কখনো দেখে নি, আমাদের সমস্ত কল্পনাকে ছাপিয়ে'...তখন এখানে এই চওড়া, মেটে রাস্তার ওপর সম্পূর্ণ অন্য ধরণের একটা ব্যাপার, এই সামন্ততান্ত্রিক অসভ্যতা ফর্সা, মেদবহুল গায়ে নকসাদার মেরজাই চাপিয়ে সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে চলেছে, আশ্চর্য, কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমরা কোন কথা বলতে পারি নি। আমরা যাচ্ছি-লাম একটা জায়গায়। আর চলতে ভালো লাগলো না। মনটা ভীষণ দমে গেল। মুখ নিচু করে, কেমন হতভম্ব হয়ে সেদিন কলেজের হোস্টেলে ঢুকে-ছিলাম। আপনি কোন পার্টির লোক আমি তা' জানি না। আপনার আদৌ কোন রাজনৈতিক সচেতনতা আছে কি না তাও জানি না। তবু একথা আজ আপ-নার কাছে গোপন করে রাখার কোন মানে নেই, তাই বলছি গোড়া থেকেই আমাদের বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিলো সেদিন কলেজের গায়ে লাগানো ঐ গ্রামটা ঘুরে ফিরে দেখার। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন, পার্টি থেকে আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল ওখানে প্রথমে গোপনে, তারপর শক্তি সঞ্চয় করলে প্রকাশ্য একটা

সংগঠন গড়ে তুলতে। আর যে কলেজে পড়ছি ঝড় ওঠার আগে সেই কলেজেই প্রথমে মেঘ জমা করবো। যে জমিদারের কথা আগে বলেছি আপনাকে, এই কলেজ তাঁরই কীর্তি। শুধু তাই নয় এখানের হিন্দু হোস্টেল, মুসলিম হোস্টেল, নিবেদিতা হাসপাতাল এ সবই ওনারা করেছেন।

আচ্ছা একটা কথা। আমি অমিয়কে থামালাম, বললাম, বার বার আপনি জমিদার জমিদার করছেন। কিন্তু জমিদারী তো উঠে গেছে বহুদিন।

হ্যাঁ। যে অর্থে আপনি বলছেন সে অর্থে উঠে গেছে বহুদিন। এঁরা শুধু ট্যাক্স নেন না বাকি সব চালচলন পাক্কা জমিদারের মতন। এমন কি লুঠ, বখরার ভাগ সবই। কিন্তু যে কথা বলছিলাম। এমন আশ্চর্য কলেজের কথা শুনেছেন যেখানে কোন ইউনিয়ন ছিলো না ১৯৬৬ সালেও? শুনবেন এখানকার প্রিন্সিপ্যালের আশ্চর্য যুক্তি! ওনাকে যখন আমরা একদিন গিয়ে বললাম, স্যার, ইউনিয়নের ব্যবস্থা করুন। ছাত্র-ছাত্রীরা খুব চাপ দিচ্ছে।

তো উনি প্রথমে রেগে উঠলেন, বললেন, এ ধরণের অদ্ভুত কথা তো এর আগে কখনো শুনি নি। কই এতোদিন তো আমি এ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আছি কখনো কোন ছাত্র ইউনিয়নের কথা নিয়ে আমার কাছে আসে নি। নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে অন্য কোন কারসাজি আছে বাইরের কোন দল-টলের। বুঝুন ব্যাপার! ইনি আবার অকৃতদার, বেদান্ত দর্শনে পণ্ডিত, ভালো লোক হিসেবে খুবই পরিচিত। উনি বললেন, না, না। কারখানা-কারখানায় ওসব আছে। কলেজে ওসব চলবে না।

আমি আর থাকতে পারলাম না, বললাম, কিছু যদি মনে না করেন স্যার তাহলে বলতে কি, কারখানাতেও আগে ওসব ছিলো না। মজুরেরা যখন ইউনিয়ন চাইতে গিয়েছিলো তখন মালিকেরা ঐ একই যুক্তি দেখিয়েছিলো। ওসব স্বর্গে-টর্গে থাকতে পারে পৃথিবীতে নেই। পরে অবশ্য মজুরেরা কেমন করে ইউনিয়ন কায়েম করলো আমার চেয়ে আপনি অনেক ভালোভাবে তা' জানেন।

না, না। আমি জানি না। আমি কিছু জানি না। বেরোও, বেরোও তোমরা, আই সে, ক্লিয়ার আউট, ক্লিয়ার আউট। প্রিন্সিপ্যাল আমাদের দিকে মারমুখী হয়ে তেড়ে এলেন। আমরা আপাতত সরে এলাম।

বুঝলাম কোন অধিকারই সহজে

মধ্যে একদিন আমরা ফিরে এসে ইউনিয়নের পতাকা ওড়াবো সুনিশ্চিত, কিন্তু তার আগে সামনে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা। এমনি সব বড় বড় কথায় মাথা সর্বদা ভরাট থাকতো।

ঘরে আলো ঢোকবার সব জানলা ওঁরা বন্ধ করে দিয়েছেন। কোথাও এতোটুকু ফাঁক রাখেন নি। বেছে বেছেই ওঁরা কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ঢোকাতেন। তবু বলা তো যায় না যদি এক-আধজন বেতালা ছাত্র ঢুকে পড়ে। অতএব জমিদারের লোকজনেরা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের, বিশেষ করে ছাত্রদের আওতার বাইরে গ্রামকে রাখবার জন্যে একটা অদ্ভুত, ঘৃণ্য, কুৎসিত গল্প তৈরি করেছিলেন আর সে গল্প বিশ্বাসও করতো গ্রামের লোকেরা।

প্রত্যেকদিন জমিদারবাড়ির রাষ্ট-বাবু আসতেন হোস্টেলে, উনি সেক্রেটারী, আসা মাত্র নিয়ম ছিল একজন গিয়ে ওনাকে সাইকেল থেকে নামাবে।

সে কি! উনি নিজে নামতে পারেন না?

তা' জানি না। অমিয় খুব খানিকটা হাসলো, আমি তো এই দেখেছি। শুধু তাই নয়। একজন গিয়ে ওনাকে পাখার বাতাস করবে। একজন একমাইল পথ আসার জন্যে মারাত্মক এই যে পরিশ্রম হল তার জন্যে মিষ্টির থালা এগিয়ে দেবে। তারপর, এই তারপর নিয়েই প্রথম সংঘর্ষটা বাধলো বলা যায়।

সেটা কি?

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যের সময় সবাইকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা কবেকার সেকেলে সংস্কৃত স্তোত্র চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে

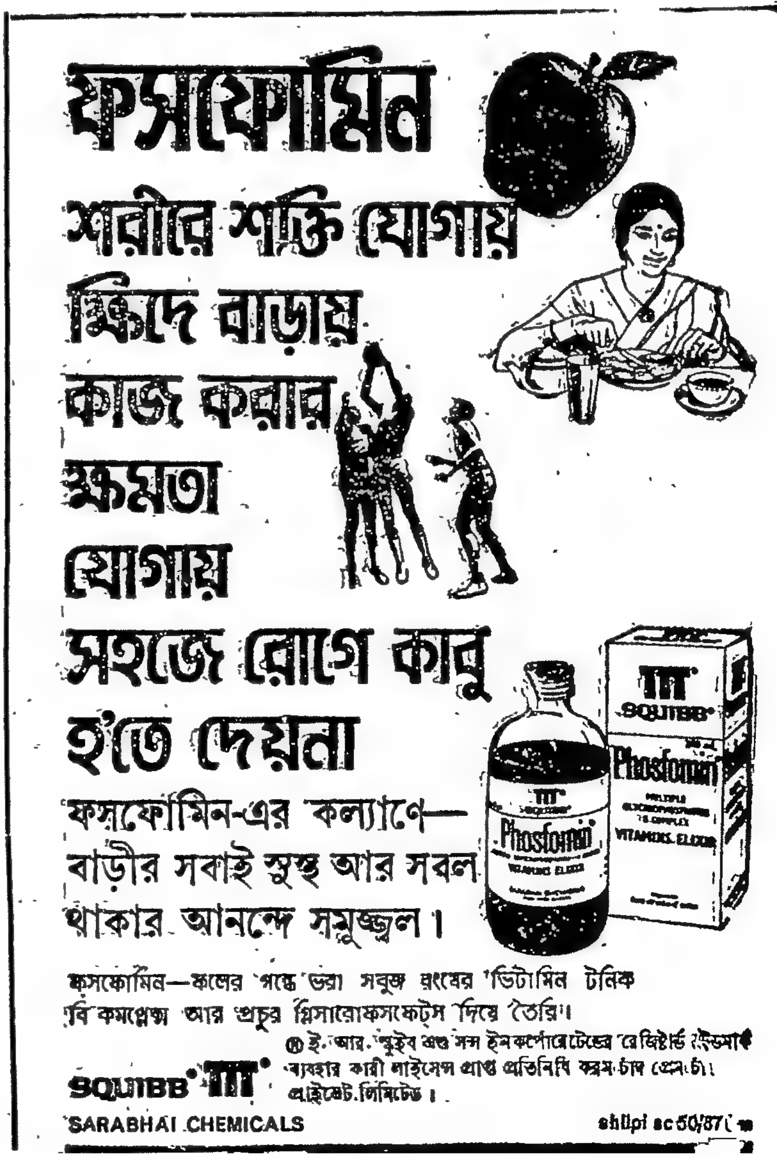

আউড়ে যেতে হবে। উনিও আউড়ে যাবেন। ঐ একই সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ হবে নিবেদিতা হাসপাতালে, তারপর আপনি যে কালীমন্দির দেখেছেন সেখানেও।

তারপর?

তারপর রন্টিবাবু খোঁজখবর নেবেন প্রত্যেকটি ছেলের। প্রত্যেকের সংগেই আলাপ জমাবেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের খুঁটিনাটি সংবাদ নেবেন। প্রথম প্রথম আমরা ভাবতাম, এই তো সেক্রেটারীর উপযুক্ত কাজ। উনিই আদর্শ সেক্রেটারী। ক্রমে ক্রমে আমাদের ভুল ভাঙলো যেমন করে আর আর ভুলগুলো একদিন ভেঙে গেছে। আসলে উনি এসব করতেন এই জন্যে যে, ওঁর সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে যাতে সকলে থাকে। একটা ঘটনায় জমিদারবাড়ির এই রত্নটির মুখোস খুলে গেল।

অমিয় একটু থামলো। আবার সেই হাসির ঝিকমিক।

'সামন্ততান্ত্রিক' কথাটা কেতাবে পড়েছি। অনেক বক্তৃতায় শুনেছি। সামান্য সামান্য আলোচনা নিজেদের মধ্যে করতে গিয়েও বারবার এই শব্দটা ব্যবহার করেছি। কিন্তু শব্দের প্রকৃত অর্থ ব্যবহার করলেই কি জানা যায়? অন্তত আমি তো এতোদিন জানতাম না। একটা কিছুর সংগে আর একটা কিছুর ঘর্ষণ না হলে, কোথাও কিছু একটা ছারখার না হয়ে গেলে শব্দের আসল মানে যে জানা যায় না, এ আমার অভিজ্ঞতা। 'সামন্ততান্ত্রিক' এই অদ্ভুত শব্দটাকে সেদিন সনাক্ত করে শিউরে উঠেছিলাম। হোস্টেলের কিছু ছেলে কিছুদিন থেকেই এই সংস্কৃত মন্ত্রতন্ত্রের অর্থহীন আবৃত্তি বরদাস্ত করতে পারছিলো না। ওদের এতে অসুবিধে হচ্ছিল। সন্ধ্যের দিকটায় মাঝে মাঝে সিনেমা দেখার ইচ্ছে। তাছাড়া, আপনার কাছে লুকোনো ঠিক হবে না, কোন কোন ছাত্র এই সময়টা আবার একটু-আধটু তাড়িফাড়ি বা চোলাই খাবার ফিকিরে থাকতো, সবাই তো আর সমান নয় বুঝতেই পারছেন, এখানে ওসব নিষিদ্ধ জিনিস হাতের নাগালের মধ্যেই ওদের কাছে সন্ধ্যের এই প্রার্থনাটা নিতান্তই একটা শাস্তি, একটা আপদই বলতে হয়, এই সব অং বং চং অবৃত্তি করে কি যে লাভ ওরা বুঝতে পারতো না। ওরা ইয়ারকী করে একে ওকে বলতো, যদি সন্ধ্যের দিকটায় এই কলেজের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কারুর মনে হয় কাছাকাছি কোথায় দাঙ্গা লেগেছে, তাহলে তার বোঝা উচিত আসলে এখানে সঙ্গীত হচ্ছে, দাঙ্গা নয় অবশ্য একে 'দাঙ্গা-সঙ্গীত'ও বলা যায়।

অনেকদিন ধরেই ওদের ফুর্তিফার্তা হচ্ছিল না বলে ওরা ভেতরে ভেতরে ধোঁয়াচ্ছিল। এ গ্যাঁড়াকল আর সহ্য হচ্ছে না। কিছু একটা করা চাই। হঠাৎ সুযোগ মিলে গেল। পাপ আর পারা গোপন থাকে না। ঠিক ফুটে বেরোবেই। রন্টিবাবুর এক আত্মীয়ের ছেলে এ কলেজে নতুন ভর্তি হল। সেই একদিন কথায় কথায় বলল, ও যে কি মাল তা' তোমরা কি করে জানবে? মাসখানেক আগে একটা সাঁওতাল মেয়েকে ও ফুসলে এনেছিল বলে সাঁওতালেরা মাদল বাজিয়ে মশাল জেলে কাঁড় বর্শা নিয়ে জমিদারবাড়ির ফটক পর্যন্ত ছুটে এসেছিল। দেউড়ির ওপর থেকে রন্টিবাবুর বড়দা বন্দুকের দু'-দশটা ফাঁকা আওয়াজ করে তবেই হাঙ্গামা সামলায়। দ্যাখ কান্ডা সন্ধ্যের সময় রন্টিবাবু যখন প্রার্থনা সভায় এসে দাঁড়াবেন গরদের ধুতি চাদর পরে, তখন মুখে এমন একটি সাত্ত্বিক ভাব যেন পরমহংসদেবও হার মেনে যায়। কিন্তু যতো রাত চড়ে ততোই আসল যে রন্টিবাবু গরদের ধুতি-চাদরের নিচে এতোক্ষণ অতি কষ্টে লুকিয়ে ছিল, সে বেরিয়ে আসে, টেবিলের নিচে রন্টিবাবু আর বোতল গড়ায় তখন গন্ডায় গন্ডায়, মধ্যবিত্তের প্রতি ও'র এতো রুচি নেই, ক্যাওট আর বাগদীপাড়ার মেয়েদের সৌভাগ্য হয়। তার পরের দিন আবার সন্ধ্যে হয়। আবার গরদের ধুতি আর চাদর পরে রন্টিবাবু সাইকেল চেপে হোস্টেলের প্রার্থনা সভায় যথারীতি উপস্থিত হন। তখন আর দাঁতে মুরগী আর মানুষের মাংসের কুচি লেগে নেই। তখন উনি পরম সাত্ত্বিক।

এমনি এক সন্ধ্যেবেলায় ধুতি-চাদর পরে রন্টিবাবু প্রার্থনা সভায় এসে দাঁড়িয়ে দেখলেন প্রার্থনা সভার লাইনটা বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। এটা ক'দিনই লক্ষ্য করছিলেন। হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডকে জিগেস করলেন, কি ব্যাপার? এসব কতদিন থেকে? সুপারিন্টেন্ড তো কেঁপেই অস্থির, বললেন, ওরা স্যার আমার কথা শোনে না। ওরা বলেছে আমাদের যা' খুশি তাই করবো।

এসব ত' কোনদিন ছিল না। এতখানি আস্পর্দা এদের হল কি করে? আপনি খোঁজ নিয়েছিলেন?

হ্যাঁ স্যার। সুপারিন্টেন্ড বললেন, নিয়েছিলুম স্যার। ওরা স্যার দল বেঁধেছে। আলাদা করে কাউকে সনাক্ত করতে পারা যাচ্ছে না। ওরা আজ দল বেঁধে সিনেমা গেছে।

তা' যাক। কিন্তু খোঁজ নিন ত' ওদের উসকেছে কে? আমার মনে হচ্ছে অন্য ব্যাপার আছে। আচ্ছা, আপনার কাছে যারা আসে তাদের হয়ে প্রথম কে কথা বলে? অনিমেষ, অনিমেষ রায়।

ওর বাড়ির ঠিকানা কোথায় জানেন? বাপের নাম?

বাপের নাম ভবতোষ রায়, বাড়ি নিত্যানন্দপুর।

খোঁজ নিন তো ওদের বাড়ির কেউ কমিউনিস্ট কিনা।

হ্যাঁ স্যার খোঁজ নিয়েছিলাম। ওদের বাড়ির কেউ কমিউনিস্ট নয় বটে, তবে ওদের এক জামাইবাবু একটু ফরোয়ার্ড ব্লক মার্কা।

ফরোয়ার্ড ব্লক? ওদেরো পতাকা লাল নয়? দেখলেন ত', পাওয়া যাবে না কি? আমি শুকে বলে দিতে পারি।

কিন্তু সে ত' জামাইবাবু। ওরা ত' আর—

থামুন আপনি। ওই বুদ্ধি নিয়ে ছেলে চরানোই চলে জমিদারী চরানো চলে না।

আচ্ছা চলি। ব্যবস্থা হবে।

এ ঘটনার দু' চারদিন পর যে ব্যবস্থা হল তা' যেমন অমানুষিক তেমনি ইতর আর জঘন্য আর ওই রন্টিবাবুদের মত লোকেদের পক্ষেই একমাত্র মানানসই।

রাত দশটা কি ন'টা নাগাদ অনিমেষ একটু হোস্টেল কম্পাউন্ডের বাইরে আসে। সেদিন বড্ড গুমোট। কম্পাউন্ডের বাইরে যে বিরাট নিমগাছ তার নিচে দুদণ্ড দাঁড়ালে গাটা একটু জুড়োয়। এখানে ও দাঁড়িয়ে ছিল। মিনিট পনেরো কুড়ি পর হঠাৎ 'বাবাগো, মাগো, মেরে ফেললে', বলে অমানুষিক চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে 'মার শালোকে, পুতে ফেল, গোর দে মাটিতে, পরের গোয়ালে শালো জাব খেতে এয়েছিল, হারামী বেজন্মার বাচ্ছা, কমুনেকার', অন্ধকার, নিস্তব্ধ সেই রাতে সে এক রৈ রৈ কাণ্ড। হোস্টেলের জনচল্লিশ ছেলে, ওরা দুদ্দাড় করে নেবে এলো নিচেতে। কি ব্যাপার, কিছুই জানে না।

এসে দেখে ধক্ ধক্ করে একটা মশাল জ্বলছে। কলাগাছে অনিমেষ কলার বাকলে শক্ত করে বাঁধা। মুখের দু' পাশ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। মাথা ফেটে চৌচির। আর ওকে ঘিরে প্রায় একপোজন উন্মত্ত লোক, কারুর হাতে টাঙি, কারুর বর্শা, কারুর লাঠি, খালি হাতে কেউ নেই, কোমরের কাপড় মালকোচা মেরে পরা, খালি গা, বেশ মনে হয় যেন মারামারি করবার জন্যে যথেষ্ট টাইম নিয়ে রীতিমত প্রস্তুত হয়েই এসেছে আর, আর একটা বৌ, এই এ্যাতোখানি চেহারা প্রায় তাড়কা রাক্ষসী বললেই হয়, সে এক পাশে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে একে তাকে কি বোঝাচ্ছে গলায় শির ছিঁড়ে ফেলে।

ব্যাপারটা তাড়কা-রাক্ষসী মার্কা বৌটাকে নিয়েই। অনিমেষের নাকি এই বৌটার দিকে অনেক দিন থেকে নজর ছিল। প্রায়ই মাঠেঘাটে গিয়ে অনিমেষ নাকি ইসারা করতো ওকে। বৌটা প্রথম প্রথম আমল দিত না। অমন বাবুভায়েরা একটু-আধটু ছলাৎ ছলাৎ করেই। ওসব আমল দিলে মেয়েদের আর বাড়ির বাইরে ফাঁকা মাঠে কাজ করতে আসা হয় না। ওসব ঢং বড়লোকের বাড়ির বৌঝিদেরই মানায়।

একদিন অনিমেষ নাকি বাড়াবাড়ি করে। তখন বৌটা ওর মরদকে সব ব্যাপারটা বলে। ওর মরদ আবার ওদের নিজেদের পঞ্চায়েতে ব্যাপারটা আলোচনা করে। তারপর এই ত' ব্যাপার। অনিমেষ নাকি আজ রাত দশটার সময় এখানে ওকে আসতে বলেছিল।

আমি বললাম, অতগুলো ছাত্র প্রায় চল্লিশজন বলছেন, অনিমেষকে ঐ অবস্থায় দেখেও ওরা হাত গুটিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো, কিছু করলো না?

কি করবে। অমিয়র মুখে দুঃখের হাসি, বললে, অভিযোগটা এমনি আকস্মিক, সঙ্গের লোকজনের এমন নিখুঁত অভিনয়, তাড়কা রাক্ষসী চেহারার দুঁদে বৌটার এমনি বোলচাল যে অনিমেষের ওপর চাপানো অভিযোগটাকে প্রায় সত্যি বলে মনে না হলেও জোর করে মিথ্যে বলারও ত' কোন উপায় নেই। বিশেষ করে অনিমেষ যখন মারের চোটে বেহুঁশ, সে কোন কথা বলতে পারছে না, তাছাড়া এ ধরণের ঘটনা একেবারে যে অসম্ভব তা'ও ত' নয়। সুতরাং, ভেতরে যে কোন একটা ব্যাপার আছে আন্দাজ করলেও, প্রয়োজন হলে যে ও'রা কোথায় নাবতে পারেন, আমাদের মত বয়সের যুবকদের ঠিক সেটা জানার কথা নয়।

পরে অনিমেষের মুখ থেকে আমরা জানতে পেরেছিলাম আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই সাজানো।

অনিমেষের বিরুদ্ধে ওরা কেস করে-ছিল?

কেস করবার দরকার হয় নি। অনিমেষকে প্রিন্সিপ্যাল কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

অনিমেষ পায়ে পর্যন্ত হাত দিয়ে-ছিল প্রিন্সিপ্যালের, বলেছিল, স্যার আমি আপনার ছেলের বয়েসী। একবার স্যার একটু নিরপেক্ষ তদন্ত করুন। তাতে যদি আমি দোষী সাব্যস্ত হই ত' যে কোন শাস্তি দেবেন। একবার একটা চান্স দিন স্যার।

প্রিন্সিপ্যাল বলেছিলেন, নো। কোন চান্স নয়। পয়লা চান্সেই এখান থেকে তুমি বেরিয়ে যাও। তোমাকে এ কলেজে রাখলে জমিদার-সেক্রেটারীর কাছে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আমারো চাকরী থাকবে না। তাছাড়া এমন একটা অপবাদ, ছিঃ, ছিঃ, আমি ভাবতেও পারি না, তুমি আবার বলছো আমি আপনার ছেলের বয়েসী, আমার ছেলে হলে তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতাম, যাও আমার চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাও।

অনিমেষের তখন করবার কোন উপায়ই আর রইল না। ছাত্র ইউনিয়নই নেই যে ছাত্ররা কোন সংগঠনের মধ্যে দিয়ে কাজ করবে? আশেপাশের জনসাধারণ বলতে চাষীরা, তারা সবাই বিমিয়ে আছে, কেন না চরিত্রদোষ ব্যাপারটা এমনি যে, এটা একটু কায়দা করে রটিয়ে দিতে পারলে এই সব চাষাভুষো এলাকায় তখন আর সত্য-মিথ্যে যাচাই-এর ধৈর্য কারুর থাকে না। অনিমেষ চলে গেল। কিন্তু আমাদের মধ্যে জাগিয়ে দিয়ে গেল প্রতিজ্ঞাকে। আমরা দমে গিয়েছিলাম সেদিন প্রিন্সিপ্যালের কথাবার্তায়। উনি আমাকে বলেছিলেন ওসব ইউনিয়ন টিউনিয়ন হবে টবে না। কিছুদিনের জন্যে চারদিকের হালচাল দেখে আমরা কি করবো কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বিশেষ নানা জায়গা থেকে এ কলেজে পাঁচমেশালি ছেলো পড়তে আসে। মেয়েরাও তাই। তারা প্রত্যেকেই এক একরকম। এদিকে এ সময়ে বসিরহাটে নুরুল মাটি নিলে কি হয়, এদের তখনো মেয়েদের মধ্যে কে কি ব্লাউজ কিনলো, কে ক'জন লাভার জোটালো, নতুন, টাটকা সিনেমা কি এসেছে, ছেলেদেরও প্রায় তাই, সেই চোঙা প্যান্ট, টুইস্ট, সেই পা ফাঁক করে মেয়ে-দের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকাতে তাকাতে গাছের ছায়ায় সিগারেটের পর সিগারেট টেনে যাওয়া, রাত্রে একটু তাড়ির রস খেয়ে গলা ভেজানো, এই সব রং তামাসা চলছে। কিন্তু হঠাৎ অনিমেষের এই নিরুপায় মার খাওয়া, তার প্রিন্সিপ্যালের পায়ে ধরে কান্না, মর্যাদাহীন সুপারিন্টে-ন্ডেন্ট, শেষে অনিমেষের নিঃশব্দ, ক্লান্ত চলে যাওয়া আমাদের আরো শক্ত, আরো জমাট আরো দৃঢ় করে দিয়ে গেল। কি ভেবে-ছিল অনিমেষ এই কলেজ ছেড়ে যাওয়ার সময়? ভেবেছিল এখানে কোন মানুষ নেই, না হলে মানুষ হয়ে মানুষের এতো [illegible]

সময় অনিমেষ স্টেশনে আমার কাঁধ ধরে কেঁদেছিল হাউ হাউ করে, কি আমার অপরাধ অমির? তুই অন্তত বল। আমার বুকের মধ্যে তখন যে কি হচ্ছিল তা' আমি আপনাকে কেমন করে বলবো? ভেতরে ভেতরে আমি গুমরে গুমরে উঠ-ছিলাম। আমি তবু চুপ করেই ছিলাম।

ট্রেন যখন ছেড়ে দেয় তখন অনিমেষের কান্না কান্না চলন্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলেছিলাম, আবার তুই ফিরে আসিস অনিমেষ, দেখবি, তখন সব অন্য-রকম হয়ে গেছে যে, আমরা সব অন্যরকম হয়ে গেছি, মানুষ সব বদলে গেছে, এখানেও নুরুলেরা মাটি তৈরি করছে, তুই আবার আসিস, তোর এই অপমানের উত্তরাধিকার আজ আমরা বহন করে নিয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু কাল, পরশু, তরশু দিন এমন থাকবে না, তখন তুই আমাকে, আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরে বলবি, সত্যি, তোরা তো আমাকে ভুলিস নি...

এমনি করে, ট্রেন চলে গেলেও, এই প্রতিজ্ঞাটাকে সেদিন কেঁদে কেঁদে, অনেক-ক্ষণ প্ল্যাটফর্মে একা একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দীর্ঘ করেছিলাম।

[ক্রমশ]

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকো নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, ন্যাস, নীলরুদ্রচূলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, জাবল, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তর-তাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপাল-পূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয় কৌষীতকী, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড়ে ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

চিত্রলেখা

রাজস্থানের চিত্রশিল্পীদ্বয়

(জি পি শারদা ও কে ডি অগ্রবাল)

গত ৪ঠা নভেম্বর '৬৯ রাজস্থানের চিত্রশিল্পী শ্রী জি পি শারদার চিত্র প্রদর্শনী একেডেমী অব ফাইন আর্টসে সুরু হয়; ৯ই. নভেম্বর পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলে। এই সঙ্গে শ্রীকিশোরদেও অগ্রবালের ছবিগুলিও প্রদর্শিত হয়। জি পি শারদার অঙ্কন পদ্ধতিতে বিশেষত্বের ছাপ রয়েছে এবং বিশেষ করে মোজাইকোর দুরন্ত রচনাশৈলীর আস্বাদ এই ছবিগুলিতে বর্তমান। তাঁর আঁকার হাত নিপুণ এবং রঙের ব্যবহারে বিশেষ মননশক্তির স্বাক্ষর মেলে। বোম্বাইয়ের জে জে স্কুল অব আর্টসে তিনি ভুর সিং সেখাওয়াতের অধীনে শিক্ষানবিশী সমাপ্ত করে কলকাতায় ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু ও সুহৃদ মিত্রের অধীনে অধ্যয়ন করে মনস্তত্ত্বে এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। হিন্দি সাহিত্যেও তিনি একজন এম-এ। অথচ, অন্তরের জাত শিল্পীটি তাঁকে বিভিন্নস্থানে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে: ভারতের শৈলমালা, গ্রাম, শহর, মানুষ সবই তাঁর কাছে সমান আকর্ষণীয়। অন্তরের বিদ্রোহীসত্তা তাঁকে তুলি ধরিয়েছে; রঙে, বর্ণে, শৈলীতে তাঁর অস্থির বিদ্রোহীসত্তার ছাপ স্পষ্ট। জীবিকার ক্ষেত্রে একজন যন্ত্রশিল্পের অধিকর্তা। আশ্চর্যরূপে সেই অন্তরের বাধাহীন কথাটি ফুটে উঠেছে তাঁর "শ্রম

"বিবাহ-বন্ধন" শিল্পী—কে, ডি অগ্রবাল

ও মালিকানা", "আমাদের হাতেই আমরা যন্ত্র তৈরী করি", "যন্ত্রের পিছনে মানুষ" শীর্ষক ছবিতে। লাল, সবুজ, হলুদ ও কালোর মিশ্র ব্যবহার মনকে উৎসাহিত করে।

একই সংগে শ্রীকিশোরদেও অগ্রবালের ছবিগুলি কিন্তু একেবারে ভিন্ন পর্যায়ের। লোকসংস্কৃতি ও গ্রামজীবনের সংগীতটি ধরা পড়েছে এঁর ছবিগুলিতে। রাজস্থানের যে পরিচিত শৈলীর সংগে আমাদের অন্তরংগতা, কিশোরদেও তার থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর শিল্পশিক্ষাও বোম্বাইয়ের জে জে স্কুল অব আর্টসে। বর্তমানে তিনি পিলানীর বিড়লা এডুকেশনাল ইনস্টিট্যুটের শিক্ষক। তাঁর ছবিগুলির মধ্যে পয়লা নম্বরের ছবিটি, সাত নম্বরের ও দশ নম্বরের ছবিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'সংগ্রাম চলবে'...... শিল্পী—জি পি শারদা

খবর বলছি

একঘেয়েমি কেন

কলকাতার আকাশবাণীর শ্রোতারা ক, খ, গ তিনটি বিভাগে নাকি ইচ্ছেমতো প্রোগ্রাম শুনতে পান। অবশ্য তাঁদের ইচ্ছেমতো প্রোগ্রাম কোনোদিনই হয় না এবং অনুরোধের আসরে নাম প্রচারে উৎসুক শ্রোতাদের অভিলাষ পূরণ করা হলেও অসংখ্য শ্রোতার অনুরোধ অবহেলিত-ই থেকে যায়। আকাশবাণী, কলকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ চোখ বুজে যা করেন, তা হচ্ছে এই যে, একই রেকর্ড বার বার বাজিয়ে শ্রোতাদের খুশি রাখা। এতে শ্রোতারা খুশি হন না, পরিবর্তে তাঁদের কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে, এমন কি, রেডিও সেটটা সংবাদ শোনার সময় ছাড়া ব্যবহার করার দরকার-ই হয় না। অবশ্য নতুন নাটক অভিনীত হবার কথা থাকলে রেডিও সেট আবার প্রগল্‌ভ হয়। নাটক যাঁরা শোনেন তাঁদেরও অভিযোগ যে, একটা নাটক মোট কতবার শোনানো যেতে পারে? সবচেয়ে আশ্চর্য হতে হয়, মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীত শুনে! একই গান গাওয়া হল পর পর দুদিন; দুজনই ভিন্ন শিল্পী। নিশ্চয়ই দুজন শিল্পীই পারিশ্রমিক পান। কিন্তু সরকারী অর্থ ও-ভাবে ব্যয় করাও অর্থহীন।

ইতিপূর্বে উপরি-উক্ত বিষয়ে আমরা কয়েকবার লিখেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত আকাশবাণী (কলকাতা) কর্তৃপক্ষ নীরব থাকায় আমরা বিস্মিত!

আর একটি প্রশ্ন আমাদের আছে। শিল্পীরা যে-সংগীত পরিবেশন করেন, তা নির্বাচনের ভার কি শিল্পীর ওপর সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়? তা যদি হয় তাহলে তাঁকে কি জানানো হয় না যে, ঐ গান আর একজন শিল্পী আগামী কাল বা পরশু গাইবেন? দুজন শিল্পী যে গানটি আলাদা আসরে দু-এক দিনের মধ্যে গাইলেন, সেই গানটি রেকর্ডের মাধ্যমে আবার শোনাবার দায়িত্ব কার?

আমাদের ধারণা, এমন ব্যাপার ঘটে যাবার মূলে আছে পারস্পরিক যোগাযোগের অভাব। যোগাযোগের অভাব যদি নাই থাকে, তাহলে আসল কারণ কি? আকাশবাণীতে পাঁচটা মিনিটও যদি বাজে কাজে নষ্ট হয়, তার জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তা অজনা নয় বলেই আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, তাঁরা পুনরাবৃত্তি ও একঘেয়েমির হাত থেকে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের ইজ্জৎ রক্ষা করবেন।

* * *

সমীক্ষা

সন্ধ্যায় দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ ও স্থানীয় সংবাদের মাঝখানে একটি অনুষ্ঠান শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। সমীক্ষা নামক ঐ অনুষ্ঠানটি কোন্ জাতীয় শ্রোতাদের জন্য? বোধ হয় যাঁরা সংবাদ সম্পর্কে কৌতূহলী সংবাদ সমীক্ষায় অন্যভাবে তাঁদের কৌতূহল কিছুটা নিবারণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সমীক্ষা বলতে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ যা বোঝেন—শ্রোতারা তা শুনতে চান না। তাই দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, নিরক্ষর এবং শিক্ষিত দুই ধরণের শ্রোতারাই ঐ পাঁচ মিনিট রেডিওটি বন্ধ করে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

* * *

শিলিগুড়ি কেন্দ্র

দেশবন্ধুনগর, জলপাইগুড়ি থেকে শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ ভৌমিক একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। শিলিগুড়ি কেন্দ্র সম্পর্কে এমন অভিযোগ করা হয়েছে, যা আকাশবাণীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাত থাকা উচিত নয় এবং অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে অবিলম্বে তার প্রতিবিধান করা উচিত—সেই উদ্দেশ্যে আমরা চিঠিটি প্রকাশ করলাম।

"কয়েক বছর আগে কার্শিয়াঙ বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য সংস্কৃতি প্রচারই এই কেন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। নেপালী ও তিব্বতী অনুষ্ঠান এই কেন্দ্র থেকে প্রধানত প্রচারিত হয়। এ ছাড়া কখনো-সখনো হিন্দী ও ইংরেজি। মাঝে দু'বার আধঘণ্টা করে বাংলা অনুষ্ঠান হয়—দুটি রবিবারে। মোট এক ঘণ্টা বাংলাদেশে বাংলা ভাষার এই সমাদর। কার্শিয়াঙ বেতার কেন্দ্রটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন্দ্র।

এর পর হল শিলিগুড়ি কেন্দ্র। আশা করা গিয়েছিল অবহেলিত উত্তরবঙ্গের শিল্পী, কবি-সাহিত্যিকরা কিছুটা সুযোগ পাবেন। কলকাতায় না গেলে প্রতিভা বিকাশের বা প্রচারের সুযোগ নেই। সকলের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। সুযোগের অভাবে অনেক প্রতিভার অকালমৃত্যু হয়, অনেকে হতাশায় ভেঙে পড়েন। এই কেন্দ্রটিকে রিলে স্টেশন করে রাখা হয়েছে। 'সাইড স্টেশন' করার জন্যে অনেক আবেদন-নিবেদন করেও সাড়া মেলে নি। হুবহু কলকাতার প্রোগ্রাম এখান থেকে শোনান হয়, কখনো কিছু রেকর্ড বাজান হয়। অথচ উত্তরবঙ্গের নিজস্ব সম্পদ গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, রাজবংশী সংস্কৃতির নানা দিক প্রচার করা যেত। মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিঙের সমতল অঞ্চলে অনেক জ্ঞানী-গুণী শিল্পী, সাহিত্যিক আছেন—শিলিগুড়ি বেতারকেন্দ্রকে স্বয়ং সম্পূর্ণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করলে তাঁদের সুযোগ দেওয়া যেত কলকাতামুখী চাতক হতে হত না।

—অগ্রবাহন

সদ্য প্রকাশিত হইল!
বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ
সায়ন মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত
বেদান্ত-গ্রন্থ
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ
বেদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ
অনুবাদক
পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ
১ম খণ্ড মূল্য চার টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

দীপালি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

স্যামুয়েল বেকেট ঃ বেকেটের 'এন্ড গেম' নাটকটি রচিত হয় ১৯৫৭ সালে। পোজো ও লাকির মত এতেও আছে প্রভু হ্যাম (অন্ধ) এবং ভৃত্য ক্লোভ। আর আছে হ্যামের মা-বাবা। এরা একটা ডাস্টবিনে থাকে। বাইরের জগতের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই—আর বাইরের জগতেও এখন কোন জীবিত প্রাণী নেই। কারণ কি এক দুর্যোগে এই কজন বাদে পৃথিবীর আর সব প্রাণী মরে গেছে। ক্লোভ বারবারই হ্যামকে ছেড়ে যেতে চায়—কিন্তু পারে না। হ্যাম স্বার্থপর—ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং প্রভুত্বব্যঞ্জক। ক্লোভ অন্তর থেকে হ্যামকে ঘৃণা করে। তাকে ত্যাগ করে যেতে চায় বটে, কিন্তু হ্যামের প্রভুত্ব অস্বীকার করবার শক্তি তার নেই—এ যেন তার ভবিতব্য। ক্লোভের কি এতোটা মনের শক্তি আসবে যে সে হ্যামকে একলা ফেলে চলে যেতে পারবে? এ নাটকের ড্রামাটিক টেনসন তারই ওপর নির্ভর করছে।

হ্যামের চরিত্রে একটা বেশ ছেলে-মানুষীরও ভাব আছে। তিন-পা-ওয়ালা একটি খেলনা-কুকুর নিয়ে সে খেলা করে। সব সময় তার মনটা আত্ম-অনুকম্পায় ভরা। সে অন্ধ—ক্লোভ তার চোখের কাজ করে। বার বার ঘরের ছোট দুটি জানলা দিয়ে বাইরের পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করে ক্লোভ, হ্যামকে বলে সে কি দেখল। শেষবার যখন ক্লোভ টেলিস্কোপের সাহায্যে বাইরেটা পরীক্ষা করে, তখন যেন তার দৃষ্টিপথে পড়ে ছোট একটি বালকের মূর্তি। কিন্তু ঠিক বোঝা যায় না এর দ্বারা 'কণ্টিনুয়িং লাইফের' সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে কি না! এর পর প্রশ্ন ওঠে 'এন্ড গেম' নাটকটি কি মনোড্রামা? হয়তো তাই—একটি লোকেরই নানা দিককে দেখাবার জন্যই বোধহয় বেকেট নাটকটি লিখেছেন! ডাস্টবিন দুটিতে মা-বাপ বসে থাকে—তারা হয়তো হ্যামের অতীত জীবনের ভুলভ্রান্তির স্মৃতি বা হেরিডিটি। কোন কোন সমালোচক মনে করেন, ক্লোভ হচ্ছে ইণ্টালেক্ট—আর হ্যাম সেই একই লোকের ইমোশ্যনাল সেলফ।

হ্যাম এবং ক্লোভের সঙ্গে অধুনালুপ্ত মিউজিক হলের হ্যাম-এ্যাক্টর এবং ক্লাউনেরও কিছুটা সাদৃশ্য আছে।

হ্যাম নিজেকে লেখক মনে করতে ভালবাসে—অথবা সে ভাবে সে কাহিনীকার—প্রতিদিনই সে যেন একটি কাহিনীর কিছুটা অংশ রচনা করছে। একটি মারাত্মক ঘটনার ভিতরে বহু লোক মৃত্যু-বরণ করেছিল সেই বিষয়েরই ওপর রচিত হচ্ছে এই কাহিনী। একটি বিশেষ দিনে, কাহিনী এমন একটি ঘটনায় এসে পর্য-বসিত হয়েছে যখন একজন উপবাসী শিশুর বাবা হ্যামের কাছে এসে তার শিশু-পুত্রের জন্য রুটি ভিক্ষা করলো। শেষকালে বাপটি হ্যামের কাছে আবেদন জানালো তার ছেলেটিকে নিয়ে নিতে—অবশ্য সেটাও নির্ভর করবে যদি সে বাড়ি ফিরে দেখে শিশুটি তখনও বেঁচে আছে। মনে হয় ক্লোভই বোধহয় সেই শিশু-পুত্রটি। এত অল্প বয়সে তাকে হ্যামের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল যে, সে কথা ক্লোভের স্মরণেও নেই। সেই হিসাবে হ্যাম সত্যিই ক্লোভের পিতৃস্থানীয়। জেমস জয়েসের ইউলিসিসে এর বিপরীত দিকটা দেখতে পাই। সেখানে বাপ তার হারিয়ে-যাওয়া ছেলের জায়গায় একজন বদলি বা প্রতিকল্প ছেলে পান। 'এন্ড গেমে' পালিত পুত্র সব সময় চেষ্টা করছে পালক পিতাকে ছেড়ে যেতে।

জয়েস ইউলিসিসে ঘটনার জাল বুনে চলেছেন যুবক স্টিফেন ডিডেলাস এবং পরিণতবুদ্ধি মিস্টার ব্লুমের সাক্ষাৎ ঘটাবার জন্য। দেখা হবার আগেও ক্রমা-গত যেন দুজনের ভেতর টেলিপ্যাথিক কমিউনিকেশন চলেছে। এদের সম্পর্কটা কি জাতের? মিস্টার ব্লুম হচ্ছে আসলে স্টিফেনের স্পিরিচুয়াল ফাদার। "Physical parents cannot be the progenitors of the spiritual germ of the child, that germ is the product of a previous spiritual evolution"—HARTMANN, MAGIC, page 70.

'এন্ড গেম' নাটকটির সঙ্গে রাশিয়ান নাট্যকার নিকোলাই এভরিনভের বিখ্যাত নাটক 'দি থিয়েটার অভ দি সোল'-এর একটা কৌতূহলোদ্দীপক সাদৃশ্য আছে। এ নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে।

১৯৩৫।৩৬ সালে এ নাটকটি পড়বার সুযোগ হয় আমার—একজনের মারফৎ প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী থেকে একটি নাট্য সংকলনের বই পাই, তাতেই 'দি থিয়েটার অভ দি সোল' নাটকটি ছিল। নাটকটি সত্যিই ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ—জটিল বিষয়বস্তুকে লোকশিক্ষার জন্য কত সহজভাবে নাট্যরূপ দেওয়া যায় এটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরে আমি এ নাটকের লেখকের নাম ভুলে যাই—আমার মনে কেমন একটা ধারণা হয় যে নাটকটি আন্দ্রেয়েভের লেখা। মার্টিন এজলিনের 'দি থিয়েটার অভ দি এ্যাবসার্ডে' আবার আসল নাট্যকারের নামটি দেখতে পাই। নাট্যসাহিত্যের অনুরাগী ছাত্রদের প্রত্যেকেরই 'দি থিয়েটার অভ দি সোল' নাটকটি পড়ে দেখা উচিত। বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য এবং বিরাটত্বের কথা বাদ দিলেও, এ নাটক থেকে লেখবার টেকনিক সম্বন্ধে অনেক কিছু শেখা যায়। এই একাঙ্ক নাটকটি একটি মনোড্রামা—মানুষের অন্তর্দেশ নিয়েই এর কারবার—যা দিয়ে তার এ-গো (অহং) সংগঠিত অর্থাৎ তার ইমোশ্যনাল সেলফ এবং তার র‍্যাশনাল সেলফ, এদের দুয়ের কলহই নাটকে দেখানো হয়েছে। নাটকে দেখা যায় ইভানভ বলে একটি লোক একটি কাফেতে বসে নিজের মনেই তর্ক করছে, সে একটি নাইট ক্লাবের গায়িকার সঙ্গে পালিয়ে যাবে, না স্ত্রীর কাছেই ফিরে যাবে। ইমোশ্যনাল সেলফ উস্কানি দিচ্ছে পালাতে। র‍্যাশনাল সেলফ বোঝাচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে থাকলেই নৈতিক এবং ঐহিক সব দিক থেকেই ভাল হবে। এই দুই সত্তায় শেষ পর্যন্ত মারামারি বাধল—পশ্চাদপটে একটি হৃদযন্ত্রের প্রতিচ্ছবি দর্শকেরা দেখতে পাচ্ছিল, এটি এতক্ষণ স্পন্দিত হচ্ছিল—কিন্তু এবার একটি বুলেট এসে হৃদযন্ত্রটিকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলে। অর্থাৎ ইভানভ নিজেকে গুলী করলো। র‍্যাশনাল এবং ইমোশনাল সেলফ প্রাণ হারালো—তাদের শব মাটিতে পড়ে গেল। একটি তৃতীয় সত্তা এতক্ষণ পেছনের দিকে বসে ঘুমোচ্ছিল—এবার সে উঠে দাঁড়ালো। তার পরিধানে ভ্রমণের পোষাক—হাতে একটি সুটকেস। এটিই হচ্ছে ইভানভের অনন্ত সত্তা বা অমর আত্মা—যার কোনদিনই বিনাশ নেই—আত্মার অাদি-অন্তহীন যাত্রার পথ দিয়ে সে এগিয়ে চললো। বেকেটের 'এন্ড গেম'ও বোধহয় এই ধরণেরই মনোড্রামা। তবে জোর করে কিছুই বলা যায় না—সাহিত্য আর গণিতশাস্ত্রে এইখানেই তফাৎ। ১+২=৩—এই নিয়মে সাহিত্যের বিশ্লেষণ হয় না।

সমালোচক লাওনেল এ্যাবেল তাঁর "জয়েস দি ফাদার, বেকেট দি সান" বইতে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হ্যাম এবং পোজোর মাধ্যমে বেকেট তাঁর সাহিত্যগুরু জয়েসের চরিত্র-রূপায়ণ করেছেন এবং লাকি আর ক্লোভের ভেতর দিয়ে নিজেকে দেখিয়েছেন। সেক্ষেত্রে

স্যামুয়েল বেকেট

'এণ্ড গেম' নাটকটি হয়ে দাঁড়ায় একটি রূপক নাট্য—an allegory of the relationship between the domineering, nearly blind JOYCE and his adoring disciple (Beckett) who felt himself crushed by his master's overpowering literary influence —Yet on closer reflection this theory surely becomes untenable. কিন্তু এ ধরণের ব্যাখ্যায় নাটকটিকে অনেক নিচের স্তরে নামিয়ে আনা হয়। 'এণ্ড গেমের' একটা নিজস্ব গভীরত্ব এবং গাম্ভীর্য আছে—যাকে বুঝতে হলে আরও অনেক তলিয়ে দেখতে হয়।

'এণ্ড গেমের' প্রথম মঞ্চাভিনয়ের সময় বেকেটের একটি ছোট মূকনাট্য 'অ্যাক্ট উইদাউট ওয়ার্ডস' একই সঙ্গে অভিনীত হত। এতে জড়বস্তুর প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তার অসারত্বের কথাই ইঙ্গিতের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

'অল দ্যাট ফল'—এই নাটকটির নামকরণ করা হয়েছে সাম ১৪৫ (বাইবেল) থেকে—সেখানে বলা হয়েছে 'দি লর্ড আপহোল্ডেথ অল দ্যাট ফল এ্যাণ্ড রেইজেথ আপ অল দোজ দ্যাট বি বাউড ডাউন।' এ নাটকে ম্যাডি রুনী নামে এক আইরিশ মহিলাকে দেখতে পাই, বেশ স্থূলকায়, অত্যন্ত অসুস্থ, বেশ কষ্ট করে নড়াচড়া করেন। মহিলা বগাহিল রেলওয়ে স্টেশনে যাচ্ছেন তাঁর অন্ধ স্বামী ড্যান রুনীকে নিয়ে আসবার জন্য। স্বামীর এসে পৌঁছবার কথা সাড়ে বারটার ট্রেনে। রাত্রের দুঃস্বপ্নের মত মন্থর গতিতে মহিলা চলেছেন। কয়েকজন লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়—তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চান, কিন্তু পারেন না। 'আমি সবাইকে দূরে সরিয়ে দিই' —মহিলা নিজেই বুঝতে পারেন।

চল্লিশ বছরেরও আগে মিসেস রুনী, মিনি নামে একটি কন্যা-সন্তানকে হারিয়েছেন। যখন তিনি রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছন—তখনও কোন বিস্ময়কর কারণে ট্রেন আসতে দেরি হচ্ছে। ট্রেনটি পৌঁছবার পর জানা গেল খোলা রাস্তায় অনেক সময় অবধি সেটি দাঁড়িয়ে ছিল। ড্যান এবং ম্যাডি রুনী বাড়ির পথে রওনা দিলেন। রাস্তায় শিশুরা তাঁদের উদ্দেশ্যে উপহাসাত্মক মন্তব্য করতে লাগল। ড্যান স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—"কখনও কোন শিশুকে হত্যা করবার ইচ্ছা হয়েছে তোমার? ......কুঁড়ি অবস্থায় উপড়ে ফেলতে?"— ড্যান একথাও স্বীকার করেন, যে-ছেলেটি শীতকালে তাঁকে স্টেশন থেকে বাড়ির দিকে নিয়ে আসে, অনেক সময়েই তাকে আক্রমণ করবার ইচ্ছা হয়েছে তাঁর।

যখন তাঁরা প্রায় বাড়ির কাছে এসে গেছেন—যে ছেলেটি তাঁকে স্টেশন থেকে আসতে সাহায্য করতো, সে দৌড়তে দৌড়তে ড্যানের কাছে এসে হাজির। ট্রেনের কামরায় ড্যান একটি জিনিস ফেলে এসেছিলেন—সেই জিনিসটি হচ্ছে একটি শিশুদের খেলবার বল—ছেলেটি ড্যানকে সেই বলটি ফেরত দিতে এসেছে। এই বালকটি একথাও জানে যে, ট্রেনটি স্টেশনে আসবার আগে খোলা রাস্তায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ঃ একটি শিশু ট্রেন থেকে পড়ে যায় এবং রেল লাইনে কাটা পড়ে। ড্যান রুনীই কি ওই শিশুকে ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন? "শৈশবেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানো দরকার"—তাঁর এই মনোভাবটাই কি ট্রেন জার্নির সময় তাঁকে দিয়ে ঐ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়েছিল? শিশুদের প্রতি ড্যানের ঘৃণার ভাবের সঙ্গে ম্যাডির সন্তান না হওয়ার কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে কি? ম্যাডি রুনী ফোর্সেস অভ লাইফ এবং প্রোক্রিয়েশনের প্রতীক—ড্যান মৃত্যুকামনার। ড্যান মনে করেন শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনটা হচ্ছে অশেষ দুঃখ-দৈন্যে ভরা। সুতরাং কোরক বয়সেই তাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটুক এই কি তিনি চান? বাইবেলের কোটেশন দিয়ে এই নাটকের নামকরণ করাটা কি ড্যানের মতবাদের সমর্থক? যে শিশুটি এইভাবে ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেল এবং জীবনের ও বার্ধক্যের দুঃখ-দৈন্য এবং নানারকম

আঘাতের হাত থেকে রেহাই পেল—তাকে কি ঈশ্বর নিজের কাছে টেনে নেবেন ?

এরপর ম্যাডি এবং ড্যান যখন শুনলেন যে পরের রবিবারে গীর্জায় ঐ স্তোত্রটি নিয়েই উপদেশ বর্ষণ করা হবে, তাঁরা দুজনেই উন্মাদের মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

All that fall touches many of the chords that are sounded in Waiting for Godot and Endgame—but in a somewhat lighter and less searching manner.

'ক্রাপস লাস্ট টেইপ' নাটকটিতে দেখানো হয়েছে মানুষের জীবন পরিবর্তনশীল। ক্রাপ বার্ধক্যের দ্বারা পিস্ট—যৌবনে তার অভ্যাস ছিল প্রতি বছর সে তার আগের বছরের জীবনের ঘটনাবলী টেইপ করে রাখতো। তিরিশ বছর আগেকার এই জাতীয় একটি টেইপ শুনতে গিয়ে সে নিজের কণ্ঠস্বর এবং চিন্তাধারাকে নিজের বলে বুঝতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে এ যেন কোন অপরিচিত লোক কথা বলছে। এ নাটকটি সম্বন্ধে এজলিন লিখেছেন:

Through the brilliant device of the autobiographical library of annual recorded statements, Beckett has found a graphic expression for the problem of the ever-changing Identity of the self, which he had already described in his essay on Proust.

রেডিও-প্লে 'এম্বার্সের' সঙ্গে 'ক্রাপস লাস্ট টেইপের' সাদৃশ্য আছে। এটির নায়কও একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি—এবং সে তার অতীত নিয়ে চিন্তামগ্ন। পটভূমিকায় সমুদ্রগর্জন শোনা যাচ্ছে—হেনরীর মনে পড়ছে তার যৌবনের কথা, তার বাবা ছিল আনন্দোচ্ছল স্বভাবের লোক এবং মিনমিনে ধরণের ছেলে বলে হেনরীকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতো। মনে হতে থাকে হেনরী যেন মৃত বাপের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চায়—তার বাবা বাড়ির কাছেই পেছনের দিকের সমুদ্রে ডুবে মারা গিয়েছিল। কিন্তু মৃত বাপের তরফ থেকে হেনরী কোন সাড়া পায় না। হেনরীর স্ত্রী আডা—বোধহয় সেও মারা গিয়েছে—কিন্তু সাড়া দেয়। তারা সমুদ্রের ধারে তাদের প্রেমালাপের কথা স্মরণ করে, মেয়ের ঘোড়ায় চড়ার কথা এবং মিউজিক লেশনসের কথা ভাবে—তারপর আডা মিলিয়ে যায় এবং হেনরী একা বসে বসে চিন্তা করতে থাকে। তার চিন্তা এসে পর্যবসিত হয় একটি দৃশ্যে, যে দৃশ্যটি সে শৈশবে দেখেছে রাত্রিবেলায় দুজন পুরুষকে কেন্দ্র করে। এ'দের একজন ছিলেন তাদের পরিবারের চিকিৎসক হলোওয়ে—অন্যজন তার বাবা বোলটন। বোলটন ডাক্তারকে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন মেডিক্যাল হেল্পের জন্য—সেটা কি ধরণের আজ হেনরীর মানসপটে তা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

বাইরে শীতের রাত্রি—ফায়ারপ্লেসের আগুনে নিভে এসেছে—শুধু অবশিষ্ট জলন্ত ছাই চিকচিক করছে—আর আগুনের শিখা বা হল্কা দেখা যাচ্ছে না।

এইভাবেই হেনরী একা বসে থাকে—বসে বসে তার নিঃসঙ্গতার সম্বন্ধে চিন্তা করে : "শনিবার......কিছুই ঘটলো না। রবিবার......রবিবার......না সমস্ত দিনে কিছুই ঘটে নি......না, সমস্ত দিনে কিছুই না......একটু শব্দও হয় নি।"

বেকেট, কামু প্রমুখের ওপর জয়েসে। স্ট্রিম অভ কনসাসনেসের প্রভাবের কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু মনোলগ ইন্টিরিওরের উদ্ভাবক কিন্তু আসলে জেমস জয়েস নন—এর আবিষ্কর্তা একজন ফরাসী লেখক। জয়েস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ স্টুয়ার্ট গিলবার্ট লিখেছেন :

"স্বগতোক্তি" ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়—শেক্সপীয়ারের টেকনিকের এটা তো একটা প্রধান অঙ্গবিশেষ। জয়েসের ইউলিসিসের উপর শেক্সপীয়ারের প্রভাব এবং বিশেষভাবে হ্যামলেটের বেদনার্ত জীবনেতিহাসের প্রভাব (হ্যামলেটই বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে মহৎ স্বগতোক্তির জন্য সব থেকে বেশি বিখ্যাত) ইউলিসিসের পাতায় পাতায় পরিস্ফুট। অনুক্ত এবং নাটকীয়তা বর্জিত এই "স্বগতোক্তির" নাম দিয়েছেন এম ভ্যালারী লারব্য—"মনোলগ ইন্টিরিওর"।

লারব্য "স্ট্রিম অভ কনসাসনেস" বা "মনোলগ ইন্টিরিওর" সম্বন্ধে আরও খানিকটা নতুন আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন:

In 1920 I read that portion of Ulysses which had appeared in the Little Review and soon after I had the privilege of several long conversations about Ulysses with James Joyce himself at the time when he was completing the last episodes. One day he mentioned to me that the monologue interieur had already been employed, as a continuous form of narration, in a tale by Edouard Dujardin, Les Lauriers sont coupes (originally published in 1887), published over thirty years before Ulysses, at the time when the symbolist movement was at its height. 'In Les Lauriers sont coupes', Joyce told me, 'the reader finds himself, from the very first line, posted within the mind of the protagonist, and it is the continuous unfolding of his thoughts which, replacing normal objective narration, depicts to us his acts and experiences. I advise you to read Les Lauriers sont coupes.' [ক্রমশ]

রুশ্যানীড়-এর মোজো অভিনয়ের একটি দৃশ্য (১৯৫৭ সাল)

রংঢং

সাংস্কৃতিক কর্মকেন্দ্র রবীন্দ্র সদন

রবীন্দ্র সদনের নির্মাণপর্ব থেকে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বিষয়ে নানা কথা উঠেছিল। এই ভবনের উদ্বোধন ত্বরান্বিত করার জন্য সভা, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন পর্যন্ত হয়েছিল। তার পরে আনুষ্ঠানিকভাবে যেদিন উদ্বোধন হয় সেদিন পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মীরা সেই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন সরকার তাঁদের পেটোয়া লোকদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তার আগে থেকে দেশের অধিকাংশ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান দাবি করেছিল রবীন্দ্র সদনকে জাতীয় নাট্যশালায় রূপান্তরিত করা হোক এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালন কমিটি গঠিত হোক। তদানীন্তন মন্ত্রিসভা এই দাবিতে কর্ণপাত করেন নি। বরং উদ্বোধন দিনে জনতাকে লাঠি-পেটা করে। তারপর থেকে রবীন্দ্র সদনের ব্যাপারে সংস্কৃতি কর্মীদের তেমন আগ্রহ ছিল না। রবীন্দ্র সদনের এক পরিচালক কমিটি হয়েছিল, কিন্তু সে কমিটি যে কার্যকরী ছিল এমন বলা চলে না। রবীন্দ্র সদন কমিটির বিশেষ কোন পরিকল্পনা ছিল না, জনসাধারণ রবীন্দ্র সদনকে আর দশটা ভাড়া খাটাবার হলের মত মনে করত। এক হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে সকল সংগঠনের সাধ্য ছিল না সেখানে অনুষ্ঠান করা। ম্যাজিক থেকে ভ্যারাইটি শো, প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দী নাটক ইত্যাদি হতো রবীন্দ্রনাথ নামাঙ্কিত এই ভবনে। পরিচালকমণ্ডলীর এদিকে লক্ষ্য করার মত সময় ছিল না। সে সময় সাপ্তাহিক বসুমতীতে এই অবস্থার নিন্দা করে কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হবার পর অবস্থার পরিবর্তন হয়। যুক্তফ্রণ্ট সরকার নতুন করে পরিচালক কমিটি গঠন করে। এই কমিটিতে প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মীদের কয়েকজন স্থান লাভ করেন। এই নতুন কমিটি ধাপে ধাপে রবীন্দ্র সদনকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরে এই কমিটির পক্ষ থেকে একটি গঠনতান্ত্রিক খসড়া পেশ করা হয়েছে।

সোভিয়েট ছবি 'লিভিং কর্পস্'-এ প্রোটসভের ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেতা আলেক্সি বাতালভ।

রবীন্দ্র সদনের পরিচালন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা এই খসড়ার উদ্দেশ্য। যুক্তফ্রণ্টের আমলে গঠিত পরিচালক কমিটি নিজেদের সীমাবদ্ধ অধিকারের মধ্যেও রবীন্দ্র সদনকে একটি কর্মচঞ্চল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। যে রবীন্দ্র সদনে কয়েক বছর আগে কেবলমাত্র ভাড়ার দিনে আলো জ্বলত সেই রবীন্দ্র সদনে বর্তমানে একটার পর একটা অনুষ্ঠান লেগেই আছে। রবীন্দ্র জন্মোৎসব, নজরুল জন্মোৎসব, নাটকের উৎসব, যাত্রার উৎসব, রবীন্দ্র নাট্যোৎসব ইত্যাদির সঙ্গে কবি জসিমুদ্দীন সম্বর্ধনা থেকে নানা অনুষ্ঠানে এই ভবন আজ মুখর। মনে হবে যেন রবীন্দ্র সদনে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাত্রা এবং নাটকের যে উৎসব হয়েছে তাতে কোন প্রতিষ্ঠানকে এক হাজার টাকা ভাড়ার জন্য ব্যয় করতে হয় নি। যাত্রার ব্যাপারে জেনেছি বিক্রিত টিকেট থেকে যে টাকা পাওয়া গেছে তার শত-করা সত্তর ভাগ যাত্রার দলগুলিকে দিয়ে মাত্র ত্রিশ ভাগ রবীন্দ্র সদন রেখেছে। তার মধ্য থেকেই ইলেকট্রিক খরচা ও বিজ্ঞাপনের ব্যয় ইত্যাদি রবীন্দ্র সদন বহন করেছে। কলকাতার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার। বর্তমানে রবীন্দ্র সদন আর কেবলমাত্র ভাড়া খাটাবার হল নয়, একটা ব্যবসায়িক হল থেকে মুক্ত হয়ে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হতে চলেছে। রবীন্দ্র সদন যদি এভাবে সত্যিকার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে তবে বর্তমান কমিটি তার জন্য প্রশংসা পাবেন। জনসাধারণ রবীন্দ্র সদনকে একটি সজীব সাংস্কৃতিক কর্মকেন্দ্র হিসাবে চায়। —সুজন

চিত্র আলোচনা

অজয় বিশ্বাস পরিচালিত হিন্দী ছবি সম্বন্ধ'-এর একটি দৃশ্যে দেব মুখার্জী ও অঞ্জনা

তিনটি ইয়ং জার্মান ছবি

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ এবং জার্মান দূতাবাস ও ম্যাক্সমুলার ভবনের উদ্যোগে জ্যোতি সিনেমায় পশ্চিম জার্মানীর ইয়ং চলচ্চিত্র উৎসব চলছে। যদিও এই উৎসব ফিল্ম সোসাইটির সদস্যদের জন্য, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এই উৎসবের ছবিগুলি দেখার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। টিকেট কেনার জন্য যেমন লাইন দেখা গিয়েছিল, আবার হলের সামনেও কারো বাড়তি টিকেট কেনার জন্য অনেক লোককে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। এই আগ্রহ সৃষ্টির কারণ বোধ হয় 'ইয়ং' কথাটি। আজকাল ইউরোপে যৌবনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে যৌনতা। সুতরাং ছবিগুলির যৌন গন্ধ কিছু লোককে যে আকৃষ্ট করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনটি ছবি দেখার পরে আমার ধারণা হয়েছে—ইয়ং জার্মান ছবিগুলি আসলে অ্যামেচার প্রোডাকসন! সমাজবোধের তেমন গভীরতা এতে নেই যতটা রয়েছে বাহ্যিক চাকচিক্য। আর রয়েছে যৌন-দৃশ্য। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যৌনদৃশ্য ছবিগুলির এক বিশেষ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে চলচ্চিত্র উৎসবে ব্রীজ-এর মত পশ্চিম জার্মান ছবি দেখেছিলাম, সেই তুলনায় এগুলি নিতান্ত নিকৃষ্ট ছবি। ইতিমধ্যে আগ্রহী দর্শকদেরও এই ধারণা হয়েছে, সুতরাং কেউ কেউ টিকেট ছেড়ে দিচ্ছেন।

ইয়ং জার্মান ছবিব জগতে এডগার রিৎজ নাকি একজন নামকরা পরিচালক। তাঁর ছবি 'লাস্ট ফর লাভ' দেখলাম। শুরু থেকে শৃঙ্গাররস পরিবেশনের যে চেষ্টা ছবিতে দেখা গেল তাতে একসময় মনে হল পশ্চিম জার্মানীতে তরুণদের মধ্যে কোন সামাজিক নীতিবোধের বালাই নেই বোধ হয়। পথে-প্রান্তরে, বাগানে যেখানে-সেখানে একজোড়া যুবক-যুবতী শৃঙ্গারে মত্ত হচ্ছে। তবে সমাজটা কি মানুষের স্তর থেকে নেমে গেছে? এসব দৃশ্যাদির পর সমস্যার কথায় আসা গেল। এক ডাক্তারীর ছাত্র বিয়ে করে পাঁচ সন্তানের জনক হয়েছে। জীবনে সে কিছু করতে পারল না। হতোদ্যম অবস্থায় আমেরিকার ধর্মপ্রচারকরা এল তাদের কাছে, নতুন করে দীক্ষা দিল। তাতেও কিছু হল না। অবশেষে আত্মহত্যা করল। আর তার বিধবা পত্নী একজন আমেরিকানের সঙ্গে প্রেম করল। আমেরিকানটি এতই সদাশয় যে, এই পাঁচ সন্তানের জননীকে বিয়ে করে সন্তান-সন্ততি নিয়ে আমেরিকা চলে গেল। এই কাহিনীতে একদিকে ছাত্রাবস্থায় বিয়ে করার বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে আর একদিকে বোঝা যায় আজকের পশ্চিম জার্মানীর জীবনে আমেরিকানদের প্রাধান্য কত বেশি। আমেরিকার দান, আমেরিকার আধ্যাত্মিকতা পর্যন্ত আজ পশ্চিম জার্মানীর জীবনে একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হয়ে পড়েছে।

'কাম টু দি পয়েন্ট, ডার্লিং' ছবির পরিচালক একজন তরুণী—মে স্পিল। সাধারণত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ছাড়া মহিলা চিত্র-পরিচালক ব্যতিক্রমের ব্যাপার। মে স্পিল-এর এটি প্রথম ছবি। এই ছবিতে দুজন যুবকের চব্বিশ ঘণ্টার জীবনের কথা দেখান হয়েছে। তাতে দুজন যুবতীর আবির্ভাব ঘটেছে। যুবকদের উদ্দেশ্য-হীন জীবন, সমাজের প্রতি নির্লিপ্ত ভাব, নিজের সম্পর্কেও আস্থাহীনতা ইত্যাদি ছবিতে দেখা গেছে। শুধু পশ্চিম জার্মানীতে নয়, পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যুবমানসে হতাশা ও নিরুৎসাহ বোধ এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা না মানার ভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ আছে। ছবিতে পরিস্থিতি ও মানসিকতা বোঝা গেছে, কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখান হয় নি। সুতরাং প্রশ্ন আসে যুব-মানসের শুধু মাত্র এই ফটোগ্রাফি দেখাবার সার্থকতা কি আছে?

ইতিহাস থেকে জানা যায়, যুবকদের মধ্যে হতাশা ও শৃঙ্খলাবোধের অভাব

বিশ্বরূপায়
সোমবার ২৪শে নভেম্বর
সন্ধ্যা ৬৷৷ টায়
তরুণ অপেরার
লেনিন
।। বুকিং চলছে ।।

অশ্লীল সাহিত্য ও ছবির ছড়াছড়ি ইত্যাদি ফ্যাসিজমের সূতিকাগার। বিশ দশকের শেষে এই পরিস্থিতি ছিল জার্মানীতে এবং ধনতান্ত্রিক জগতের দেশে। তার মধ্য থেকে জেগে ওঠে ফ্যাসিজমের দানব হিটলার। আজ কি পশ্চিম জার্মানীর পরিস্থিতি সেরকম?

'টাট্‌' ছবিটি দর্শকদের বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই ছবির পরিচালক জোহান শ্চাফ। এই ছবিতে একটা বক্তব্য আছে এবং কাহিনীর শেষ হয়েছে প্রচণ্ড এক আলোড়নে। তাই বোধহয় এই ছবিটি বেশি দর্শক আকর্ষণ করেছে। এক নিঃসন্তান দম্পতি ষোল বছরের এক ছেলে আর মেয়েকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছিল। তাদের নিজ সন্তানতুল্য আদর-যত্নের মধ্যেও ছেলেটির মনে ঈর্ষা এবং অসন্তোষ জমে ওঠে। মেয়েটির

'কৃষ্ণলীলা' ছবির একটি দৃশ্য

পশ্চিম জার্মানীর 'টাট্‌' ছবির একটি দৃশ্য

সঙ্গে তার ভালবাসা হয় কিন্তু সে প্রেম প্রাণহীন মনে হয়। মেয়েটির প্রতি পালক পিতার ব্যবহার তার কাছে ঈর্ষার বিষয় হয়ে পড়ে। তার প্রতি মেয়েটির মনোভাব তার কাছে করুণা বলে মনে হয়। এক সময় সে মনে করে অনাথ আশ্রমের চৌহদ্দির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে সে আর একটা দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে। স্নেহ, করুণা, প্রাণহীন ভালবাসায় সে পীড়িত হয়ে ওঠে। সে তার পালক পিতাকে হত্যা করে মনের ভার লাঘব এবং স্বাধীনতা অনুভব করে। এই ছবিতে বার্লিন প্রাচীর একটি প্রধান লক্ষ্য। এই প্রাচীর জার্মানীর জীবনকে সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ থেকে বিরত রেখেছে এমন একটা বক্তব্য এতে রয়েছে। বলা বাহুল্য এই ছবিও দর্শকদের শৃঙ্গার-রস থেকে বঞ্চিত করে নি।

নাটকের কথা

শ্রীমতী নৃত্যনাট্য

গত ৭ই নভেম্বর রাত ৭টায় পার্ক সার্কাস বেনিয়াপুকুর সংযুক্ত পূজা কমিটি আয়োজিত পার্ক সার্কাস ময়দানে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'শ্রীমতী' নৃত্যনাট্য ও নৃত্যবিচিত্রা অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যনাট্যের প্রযোজনায় ছিলেন শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা। উপদেষ্টায় ছিলেন নৃত্যবিদ্‌ নীরেন্দ্রনাথ। কৃষ্ণের

ভূমিকায়—পাপড়ি বোস, শিপ্রা সেন (ছোট), রাধিকা—শুক্লা সেনগুপ্তা, কংসের ভূমিকায় সুতপা দত্ত, একক নৃত্যে (ভারতনাট্যম) কৃষ্ণা রায় ও বিভিন্ন ভূমিকায় অনুপশঙ্কর সু-অভিনয় করেন। শ্রীমতী শোভনা চৌধুরীর কীর্তন শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করে, তাঁর সহযোগিতায় ছিলেন বিপুল ঘোষ ও কুইনি চক্রবর্তী। নৃত্য পরিচালকরূপে ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অনুপশঙ্কর ও স্বপ্না সেনগুপ্তা।

স্টুডিও খবর

আবিরে রাঙানো

"পান্না হীরে চুনী" খ্যাত অমল দত্তের নতুন ছবি "আবিরে রাঙানো" নাটক ও নাট্যকার এবং নাট্যকে দলের পটভূমিকায়। এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। মধু বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনীকার। প্রগতি চিত্রমের পতাকাতলে ছবিটি তৈরি হবে। গত ৮ই নভেম্বর ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটরীতে প্রথম পর্যায়ের সংগীত গ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালক সত্যদেব চট্টোপাধ্যায়। কণ্ঠদান করেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, পিণ্টু ভট্টাচার্য, সুজাতা মুখার্জী, মৃণাল ব্যানার্জী, নীলা মজুমদার এবং আরো অনেকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংগীত গ্রহণ এ-মাসের শেষের দিকে হবে। সম্ভাব্য শিল্পী—মান্না দে, ললিতা ধরচৌধুরী ও আশা মৈত্র।

এ মাস থেকেই চিত্র গ্রহণ শুরু হবে। অভিনয়ে অংশ নেবেন—সুচন্দ্রা পাল, অনিল মুখার্জী, নিপন গোস্বামী, রজনী গুপ্তা, সলিল ঘোষ, সৌজিৎ পাল, মালা চক্রবর্তী, প্রশ্বানন্দ ব্যানার্জী, দেবপ্রসাদ কুণ্ডু, সুপ্তি, দীপক চ্যাটার্জী প্রমুখ নতুন শিল্পীরা।

কলা-কুশলীদের মধ্যে আছেন—আলোকচিত্রশিল্পী সুবোধ ব্যানার্জী, সম্পাদক রমেশ যোশী, শিল্প-নির্দেশক গৌর পোদ্দার ও রূপ-সজ্জাকর দুর্গা চ্যাটার্জী।

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা ঃ

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত।

প্রথম খণ্ড—৫'00 টাকা।

তৃতীয় খণ্ড—৪'00 টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ঃ

(সমগ্র সপ্তকাণ্ড। কবির জীবনী-সম্বলিত)

আদি কবির মহাকাব্যের বাঙালীর সংস্করণ। সোনার বাংলার ভক্তি-অর্ঘ্য। পদানুসারে। রাজসংস্করণ। সচিত্র। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৮'00 টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

'বড়ী দিদি' হিন্দী ছবিতে নন্দা ও জিতেন্দ্র

সংবাদ কণা

লেনিনের সমগ্র রচনাবলী সম্পর্কে ডকুমেণ্টারি ফিল্ম

৫৫-খণ্ড সমগ্র লেনিন-রচনাবলী প্রকাশের প্রস্তুতি-পর্ব নিয়ে মিখাইল তোভারনোভ "মহান উত্তরাধিকার" নামে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তুলেছেন। ভি, স্তরেইবের্গের চিত্রনাট্য অবলম্বনে

"থসেণ্ট্রানাউচ ফিল্ম" (কেন্দ্রীয় বিজ্ঞানমূলক ফিল্ম) স্টুডিওতে ছবিটি তোলা হয়েছে।

সমগ্র লেনিন রচনাবলী প্রকাশের কাজে বহু অপ্রকাশিত তথ্য ও দলিল আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউটের গবেষকরা ৮ বছরেরও বেশিকাল ধরে এ কাজটি করেন।

ডকুমেণ্টারি ফিল্মটিতে কয়েকটি দৃশ্যকাহিনীর মধ্য দিয়ে এরই বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। এর একটি দৃশ্যকাহিনীর নাম "রচয়িতা লেনিন", আর একটি নাম "একটি পত্রের কাহিনী," শেষাংশটির নাম "একটি শোভনাকোম শর্টহ্যাণ্ড বিবরণী"। ৫০ বছর আগেকার সোভিয়েট সরকারের জনগণের কমিশারের এক বৈঠকের রিপোর্টের শর্টহ্যাণ্ড বিবরণী হল এটি। এই বৈঠকে লেনিন জনগণের অধিকারে দেশের সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত করার ঘোষণাটি করেন।

লেনিনের মহার্ঘ উত্তরাধিকার সংরক্ষণের কর্মে নিযুক্ত গবেষক ও কর্মীদের কাহিনী ফিল্মটিতে বর্ণিত হয়েছে।

চলচ্চিত্রে টলস্টয়ের সাহিত্য

টলস্টয়ের সাহিত্যের চিত্ররূপ পৃথিবীর প্রায় সব দেশে হয়েছে। 'ওয়ার এণ্ড পীস' হলিউড থেকে জাপানে অনেক বার হয়েছে। সম্প্রতি নতুন করে

সোভিয়েটে আবার টলস্টয় সাহিত্য অবলম্বনে ছবি হচ্ছে। চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকদের কাছে টলস্টয় রচিত কাহিনীর প্রতি গভীর এক আকর্ষণ রয়েছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে সোভিয়েটে নতুন করে সের্গেই বন্দরচুক 'ওয়ার এন্ড পীস'কে চিত্ররূপ দিয়েছেন। আলেকজাণ্ডার ঝার্কি—চিত্ররূপ দিয়েছেন 'অ্যানা কারানিনা'। লেন ফিল্ম স্টুডিওতে সবেমাত্র শেষ হল 'লিভিং কর্পস্'-এর কাজ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ভ্লাডিমির ভেনগেরভ।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে টলস্টয় নাটকটি লিখেছিলেন এবং সোভিয়েট ক্ল্যাসিক্যাল নাটকের ক্ষেত্রে এটি শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম।

১৯৫২ সালে লেনিনগ্রাড ড্রামা কোম্পানীতে যখন এই নাটকটির অভিনয় হচ্ছিল তখন তরুণ পরিচালক ভেনগেরভ সেই মঞ্চাভিনয়ের চিত্ররূপ গ্রহণ করেন। সেই মঞ্চাভিনয়ের চিত্রদানের প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রোটসভের চরিত্রাভিনয়। সতের বছর পরে একই পরিচালক নিজের চিত্রনাট্যে আবার ছবিটি করেছেন। এই চিত্ররূপে প্রোটসভের চরিত্রে রূপ দিয়েছেন আলেক্সি বাটালভ। এই চরিত্রাভিনয় সম্পর্কে বাটালভ বলেছেন—যেমন প্রত্যেক নাটকের ছাত্রের থাকে তেমনি আমারও স্বপ্ন ছিল এই চরিত্রে অভিনয় করার। চল্লিশ বছর বয়সে আমি সে সুযোগ পেলাম। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছে লিজা প্রোটসভের ভূমিকায় আল্লা ডেমিডোভা, জিপসী তরুণী মাসার ভূমিকায় স্বেৎলানা তোমা, ওলেগ বাসিলাসভিলি, ইনকোশ্টি স্মোকতুনভস্কি প্রমুখ।

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত 'অপরাজিতা' ছবির সঙ্গীত গ্রহণ অনুষ্ঠানে গীতিকার সুনীলবরণ, সুরকার সুকুমার মিত্র, শিল্পী মান্না দে ও নির্মলা মিশ্র।

হরবোলা অজয় গঙ্গোপাধ্যায়

গত ৩রা নভেম্বর শিক্ষা সদন হলের ময়দানে 'অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি' আয়োজিত সিলভার জুবিলী উৎসবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হরবোলা অজয় গঙ্গোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর নাসিকাশব্দে পিলু ও ভৈরবী রাগে সানাই এবং কণ্ঠশব্দে তবলা বিশেষ প্রশংসালাভ করেছে। গত ১০ই নভেম্বর মহেশতলা ইউরেকা ক্লাবের অনুষ্ঠানে এবং আরো বিভিন্ন স্থানের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন।

বিশ্বরূপায় লেনিন

আগামী ২৪শে নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় বিশ্বরূপা মঞ্চে তরুণ অপেরা দলের শিল্পীরা লেনিন পালা অভিনয় করবেন। মহামতি লেনিন-এর জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধায় এ দলের নিবেদিত এ-পালাটি শহর কলকাতায় দ্বিতীয় অভিনয় প্রয়াস।

তরুণ অপেরার 'লেনিন' নাটকের একটি দৃশ্য

সুরসভার সঙ্গীত সম্মেলন

হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলনের সহযোগিতায় আগামী ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে সুরসভার উদ্যোগে চার দিনব্যাপী সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, হিমাংশুগীতি, পল্লীগীতি, অতুলপ্রসাদের গান, সেতার ও নৃত্য পরিবেশিত হবে। নবাগত শিল্পীদের উৎসাহদান ও তাঁদের জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করাই এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। যোগাযোগের ঠিকানা—২১ই, দেশপ্রিয় পার্ক রোড, কলি—২৬।

পরাজয়ের পরে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর প্রথম টেস্টে পরাজয়ের পরে কিছু বলার কিম্বা আলোচনা করার আগেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। আর এ লেখা আপনাদের হাতে পৌঁছুতে-না-পৌঁছুতে শেষ হয়ে যাবে কানপুর টেস্ট। কানপুর টেস্টেও কি ভারত হারবে? আবার কি ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যানেরা দেবেন চরম ব্যর্থতার পরিচয়?

ও কথা থাক। কানপুরে কি হবে তা নিয়ে এখনই কানাকানি না করাই ভালো। তবে ভারতীয় দল নির্বাচন নিয়ে এখন আমাদের কিছু আলোচনা করার আছে।

ভারতীয় খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সকলেই এখন প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড়—বিজয় মারচেন্ট, ফাদকার, মানী ও গোপীনাথ। সুতরাং ওঁদের কাছ থেকে আমরা বৈপ্লবিক কিছু আশা করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আমরা কিছু সংখ্যক খেলোয়াড়দের ওপর তাঁদের বিমাতৃসুলভ আচরণও প্রত্যাশা করি নি। অবশ্য এখনই হয়তো এ কথা বলা ঠিক হবে না, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত।

॥ ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ॥

দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ইঞ্জিনিয়ারের অনন্য ব্যাটিং এবং তাঁর আক্রমণাত্মক খেলার ধারাই ভারতীয় খেলোয়াড়দের অনুসরণ করা উচিত বলে মনে হয়।

ভারতের কয়েকজন নামী এবং অভিজ্ঞ খেলোয়াড় যাঁদের বয়েস তিরিশের আশেপাশে, যাঁদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা এখনো অনেক, যাঁরা হয়তো

॥ ঠিক জবাব ॥

অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতের অল রাউন্ডার রুশি সুর্তি উচিত জবাব দিয়েছেন সিলেকশান কমিটিকে।

এখনো অনেকদিন ভারতের পক্ষে খেলে সাফল্য লাভ করতে পারবেন—তাঁরা আজ ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর কাছ থেকে বড় বিচিত্র ব্যবহার পাচ্ছেন।

খেলোয়াড়দের একটা আলাদা মানসিক দিক আছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা সকলেই তাঁদের অতি একান্ত সেই মানসিক দিকটা হয়তো উপলব্ধি করতে পারবো।

যদি কোন খেলোয়াড় বোঝেন যে তিনি যে খেলাটিতে অংশগ্রহণ করছেন সেটিতে ভালো খেলতে না পারেন তাহলে পরের খেলায় তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হবে—তাহলে তার চেয়ে চরম মানসিক অস্বস্তি তাঁর কাছে আর কিছু হতে পারে না।

আজ অত্যন্ত দুঃখের সংগে আমাদের স্বীকার করতে হচ্ছে ভারতীয় দলের অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ই এই রোগে ভুগছেন। ফলে তাঁদের আত্মবিশ্বাসের মূলে পড়েছে ঘা। আর তারই জের টেনে তাঁরা কিছুতেই পূর্ণ আস্থার সংগে খেলতে পারছেন না।

তাই সারদেশাই-এর মতো খেলোয়াড়কে দল থেকে বাদ পড়তে হলো। অথচ এ কথা আজ বোধহয় কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, দিলীপ সারদেশাই-এর মতো নিখুঁত ওপনিং ব্যাটসম্যান ভারতে আজ সত্যিই কম। কিন্তু যেহেতু তিনি পর পর কয়েকটা টেস্টে ভালো খেলতে পারেন নি—তাই তাঁকে একবার বসিয়ে একবার খেলিয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাসের মূলে ক্রমাগত ঘা দিয়ে চলেছেন ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী। অথচ তাঁরা বেশ ভালোভাবেই জানেন যে কোন খেলোয়াড়ের সংগে এই ধরণের আচরণ করার মানেই হলো তাঁর খেলোয়াড়জীবনের ওপর ইতি টানার ব্যবস্থা করা।

সারদেশাই-এর পরে আসে আবিদ আলীর কথা। আবিদ আলী মিডিয়াম পেস বল করতে পারেন, পারেন নিখুঁতভাবে ফিল্ডিং করতে আর পারেন ব্যাটিং করতে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আবিদ আলীর বয়স অনেকের চেয়ে কম। তাই মনে হয় ক'টা টেস্টে ভালো খেলতে পারেন নি বলে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া ঠিক নয়, বিশেষ করে তাঁর মধ্যে সম্ভাবনা যখন রয়েছে প্রচুর পরিমাণে।

একই কথা সুর্তি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। স্পিন এবং পেস বোলিং, নিখুঁত ফিল্ডিং আর মোটামুটি ধরণের ব্যাটিং করতে অভ্যস্ত সুর্তি। অন্য খেলোয়াড়দের তুলনায় সুর্তির বয়স হয়তো একটু বেশিই—কিন্তু একটা কথা

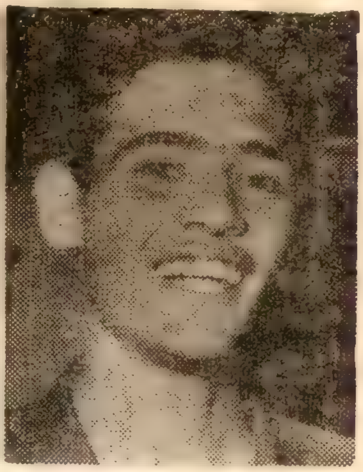

॥ অম্বর রায় ॥

সুর্তির স্থানে অম্বর দ্বিতীয় টেস্টে দ্বাদশ ব্যক্তির স্থান লাভ করেছেন। কিন্তু আমরা সকলে চাই যে ভারতীয় একাদশের মধ্যে তিনি নিজের স্থান পাকা করে নিন।

ভুলে গেলে চলবে না যে, ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র গুপ্তেই অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের পুরোপুরি-ভাবে চেনেন। কারণ মাত্র কিছুদিন আগেও তিনি ওঁদের সংগেই অংশগ্রহণ করেছিলেন শেফিল্ড শীল্ডের খেলাগুলোতে। আর সেখানে সাফল্যও তিনি লাভ করেছেন প্রচুর।

॥ দিলীপ সারদেশাই ॥

সারদেশাইকে দল থেকে বাদ দেওয়া নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক। তবে তাঁর স্থানে অশোক মানকাদ কিন্তু মোটামুটিভাবে ভালোই খেলছেন।

বোরদেকে বাদ দেওয়াতে নয়, দলে নেওয়াতেই আমাদের যথেষ্ট আপত্তি ছিল। বোরদে অনেক খেলেছেন এবার তাঁর তরুণদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, বোরদে আজকাল চোখেও ভালো দেখেন না। যতোদূর জানি বোরদে এখন কনটাক্ট লেন্স ব্যবহার করছেন।

এখন হয়তো কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, কাউকেই যদি দল থেকে বাদ দেওয়া না হয় তাহলে নতুন খেলোয়াড়রা সুযোগ পাবেন কি করে? খুব সত্যি-কথা। তবে এ কথাও ঠিক যে, অশোক মানকাদ যেভাবে ভারতীয় দলে নিজের স্থানটা মোটামুটিভাবে পাকা করে নিতে পেরেছেন সেইভাবেই আসতে হবে নতুন খেলোয়াড়দের।

এই প্রসংগে একটা কথা এখনই বলার দরকার। অশোক মানকাদের কথা ছেড়ে দিলাম—অন্য সকলের বিষয়ে একটা কথা বলা যায় যে, নতুন খেলোয়াড়দের মধ্যে সবার আগে ভারতীয় দলে স্থান লাভ করা উচিত ছিল অম্বর রায়ের। কারণ নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলায় তাঁর ব্যাটিং এ্যাভারেজই ছিল সব থেকে ভালো। তাই মনে হয় দ্বিতীয় টেস্ট দলে বিশ্বনাথের চেয়ে অম্বরকে খেলালেই ভালো হতো।

অম্বর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটা-না-একটা টেস্টে চ্যান্স পাবেই, কিন্তু সেই সুযোগটা অম্বরের কাছে যতো আগে আসে ততোই ভালো।

দ্বিতীয় টেস্ট দলে অশোক গান্দোত্রা, একনাথ সোলকার আর বিশ্বনাথ খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। অশোক মানকাদকেও এ'দের দলে অর্থাৎ নতুনদের তালিকায় ফেলা যেতে পারে। ফলে দ্বিতীয় টেস্ট দলে ভারতের চারজন ব্যাটসম্যানই নতুন। পুরোনোদের মধ্যে থাকলেন পাতৌদি, ওয়াদেকার আর ইঞ্জিনিয়ার। এ'দের সংগে ভেঙ্কট-রাঘবনের নামও যোগ করা যেতে পারে।

এবার একটু খোলা মনে চিন্তা করে দেখা যাক যে, এতোগুলো নতুন খেলোয়াড় দলে থাকায় 'টিম স্পিরিট' বাড়বে না কমবে? কমবে কি না বলা না গেলেও বাড়বে বলা কিন্তু অন্যায়। ফলে সমস্ত মানসিক চাপটা গিয়ে পড়বে দলের অধিনায়ক পাতৌদির জবাবের ওপর। আর এই চাপটাই শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যের পথে হয়তো কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে।

অথচ এই দিকটা এতোটুকুও ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সিলেকশান কমিটির সদস্যরা।

যাই হোক পরিশেষে আর একটি বিষয়ে আলোচনা করার দরকার বলে মনে হয়। বোরদেকে যখন প্রথম টেস্টে সুযোগ দিতে পারলেন ভারতীয় ক্রিকেটের হর্তা-কর্তা-বিধাতারা, তখন কেন জয়সীমাকেই বা একবার সুযোগ দেওয়া হবে না। জয়সীমার ভারতীয় দলের পক্ষে খেলতে সুযোগ পাওয়া উচিত। কারণ ভারতীয় দলের বিগত অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় জয়সীমাকে মাঝ সফরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে খেলার মতো খেলে জয়সীমা সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

॥ আবিদ আলী ॥

আবিদ আলীকেও দল থেকে বাদ দেওয়া ঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ আবিদ আলীর বয়েস কম এবং তাঁর মধ্যে সম্ভাবনাও আছে যথেষ্ট।

॥ জয়সীমা ॥

বোরদেকে যদি চান্স দেওয়া যায় তাহলে কেন জয়সীমাকেও দেওয়া হবে না? বিশেষ করে জয়সীমা যখন অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অতো ভালো খেলে এসেছিলেন।

জয়সীমা সবে তিরিশ পার হয়েছেন অর্থাৎ বয়সও তাঁর এমন কিছু আর বেশি নয়। একটু মনোযোগী অর্থাৎ রেসপনসিবিল আর অত্যন্ত বেশি আত্মবিশ্বাস অর্থাৎ ওভার কনফিডেন্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারলে মনে হয় জয়সীমা শুধু ভালো খেলবেনই না আরো কয়েক বছর ভারতীয় দলের পক্ষে সাফল্যের সংগে খেলে যেতে পারবেন।

তাই আমরা চাই যে, প্রথম দুটি টেস্টে যা হয়েছে হোক—এর পর থেকে যেন ভারতীয় খেলোয়াড় নির্বাচক-মণ্ডলী সমস্ত দিকটা একটু ভালো ভাবে দেখে নিয়ে আন্তরিকতার সংগে দল নির্বাচন করেন।

খেলায় জয়-পরাজয় আছেই। সেটা বড় কথা নয়—বড় হলো দলগত সংহতি এবং মর্যাদার প্রশ্নটি। আমরা আশা করি যে, এবার থেকে এই প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড় হয়ে থাকবে আমাদের সামনে।

খেলা ধুলা

অরাজকতা

চার দিকের সংগে পাল্লা দিয়ে খেলাধুলোর জগতেও এখন চলেছে চরম অরাজকতা। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি থেকে আরম্ভ করে সব স্তরেরই অবস্থা আজ সঙ্গীন। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের দরবারে ভারত দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়ছে। আজ আর আমাদের দল বিশ্বের সেরা হকি দল নয়। ক'বছর আগেও যাদের আমরা হেলায় হারাতাম, আজ তারাই ভারতীয় ফুটবল দলকে গাদা গাদা গোলে হারায়। নিউজিল্যান্ড বর্তমান ক্রিকেট জগতের দুর্বলতম দল। আজ তাদের বিরুদ্ধে নেহাৎ বরাত জোরেই আমরা রাবার হারাই নি। টেনিসে যাদের কাছে হারার কোন আশংকাই ছিল না, আজ আমাদের খেলোয়াড়রা তাদের কাছে হেরে যাচ্ছেন বিশ্রীভাবে। এর চেয়ে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? অন্য দেশ হলে লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট হয়ে যেতো। নিশ্চিতভাবে পরিবর্তিত হতো কর্মকর্তা থেকে আরম্ভ করে পরিচালন-পদ্ধতিও। দেশ জুড়ে বইতো প্রতিবাদের ঝড়। জাতীয় অসম্মান কোন দেশের নাগরিকরাই মুখ বুজে সহ্য করেন নি। কিন্তু আমরা?

এ বিষয়ে আমাদের বোধহয় কোন হুঁসই নেই। আমাদের মনোভাব, ভারত হারছে তাতে আমাদের কি? দেশের মান-সম্মান ডুবছে তা ডুবুক—আমাদের তো ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি হচ্ছে না, তাহলেই হলো। আমরা এতো বেশি আত্মকেন্দ্রিক যে, দেশের অসম্মানও যে আমাদের অসম্মান এ কথাটাও বোধহয় উপলব্ধি করতে পারি না। পারলে আর যাই হোক, মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী আটটি দেশের মধ্যে ভারত অষ্টম স্থান লাভ করে ভারতের মুখে চুন-কালি মাখানো নিয়ে রীতিমত বইতে শুরু করতো প্রতিবাদের ঝড়। কিন্তু কোথায় কি! এ ব্যাপারে কারো তো মাথাব্যথাই নেই। যেন কিছুই হয় নি। আমরা সাধারণ ক্রীড়ারসিকরা যদি এ ব্যাপারে প্রতিবাদ না করি, বিদেশের মাটিতে বার বার এইভাবে ভারতের মুখ হাসানো নিয়ে যদি আন্দোলন না করি তাহলে আর যাই হোক, ভারতের খেলাধুলা জগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতাদের তো কোনদিনই হুঁস হবে না। তাঁরা বহাল তবিয়তে গদি জুড়ে থাকবেন আর ভারত বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের দরবারে দিন দিন পিছিয়ে পড়বে। আজ সময় এসেছে প্রচলিত এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার, সময় এসেছে খেলাধুলোর জগৎ থেকে এই অরাজকতা ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেবার। আজ তাই বাংলাদেশের ক্রীড়ারসিকদের কাছে আমাদের আবেদন, আসুন আমরা সকলে মিলে স্বেচ্ছাচারীদের বর্তমান পরিচালন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ জানিয়ে খেলাধুলোর জগৎ থেকে অরাজকতাকে বিদায় দেবার আন্দোলনে নামি...! —শান্তিপ্রিয়॥

জিমন্যাস্টিকের আসরে

দু'দিনের প্রদর্শনী জিমন্যাস্টিকের আসরকে কেন্দ্র করে ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়াম বেশ জমে উঠেছিল। পশ্চিমবাংলার প্রতিযোগীরা জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের জিমন্যাস্টদের সংগে সমানভাবে পাল্লা দিতে পারে নি ঠিকই, তবে বাংলার কয়েকজন জিমন্যাস্টের মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মনে হয় ঠিকমতো অনুশীলন করলে আর প্রশিক্ষণ পেলে এঁরা যথেষ্ট উন্নতি করতে পারবেন।

দিলীপ ওঝা আর নিমাই কাণ্ডিকে আরো বেশি মনোযোগের আমরা দেখলাম। মনে হয় পোমেল হর্স, রোমান রিং, প্যারালাল বার, হরাইজেন্টাল বার প্রভৃতিতে এঁরা এঁদের কসরৎ আরো উন্নত করতে পারবেন।

মেয়েদের মধ্যে আমাদের নীলিমা আর অসীমা পাল, অম্বালিকা মজুমদার, আরতি দাশ প্রমুখের ফ্লোর এক্সারসাইজ আর বিম ব্যালেন্স প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু এদের মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তা এখনো সম্পূর্ণভাবে স্ফুরিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

জার্মান দলে পুরুষরাই শ্রেষ্ঠ। এঁদের মধ্যে দু'-একজন অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন আর ব্রোঞ্জ মেডেলও পেয়েছেন। আগন্তুক দলের আরউইন কোপ, গুনটার বারার ও ওয়ারনার ভোয়েলিং যেভাবে ভল্টিং ও ডবল সমারসল্ট প্রদর্শনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন।

মেয়েদের মধ্যে উনিশ বছরের জার্মান তরুণী সুশানে [illegible] আর মিসেস [illegible] বিম ব্যালেন্স ও ফ্লোরে আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক কৌশলে দর্শকদের দিয়েছেন প্রচুর আনন্দ।

এই ধরণের দ্বৈত অনুষ্ঠানগুলোর মূল্য যে কতো তা সহজেই বোঝা যায়। এই ধরণের মিলিত প্রদর্শনীর মধ্যে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় আমাদের কোথায় দুর্বলতা কিম্বা কোন বিষয়ে আমরা কতোটা পিছিয়ে আছি তার পরিচয়। তারপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা সহজেই এগিয়ে যেতে পারি আরো উন্নতির পথে। বিভিন্ন দেশের মিলিত প্রদর্শনীর আসল উদ্দেশ্যই এই। কিন্তু আমাদের দেশে এই উদ্দেশ্যটিকে কি কোনদিন বড় করে দেখা হয়েছে?

খেলার ক্যাম্প থেকে

লড়াই জমেনি

অনেক আশা ছিল নিউজিল্যান্ড পর্বের শেষে অস্ট্রেলিয়ার সংগে ভারত নাক-মুখ গুঁজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাবে। ফলাফল যাই হোক না কেন—বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শক্তিশালী দল অস্ট্রেলিয়াকে লড়াই করতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। কিন্তু হায়! প্রথম টেস্টের হালচালের দিকে তাকালে আশাভঙ্গ হয়।

সেই চিরাচরিত ব্যর্থতার চূড়ান্ত রূপটিই আবার ফুটে উঠল সদ্যসমাপ্ত অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম টেস্ট ম্যাচে। প্রথম ইনিংসের দুর্যোগ ভেদ করে মানকড়-পাতৌদি দলের রানসংখ্যা নিয়ে গেলেন ২৭১-এ। তর্কের খাতিরে এটাকে একটা মোটামুটি পর্যায়ের রানসংখ্যা বলে ধরে নিতে হবে।

প্রথম ইনিংসে ম্যাকেঞ্জির বুলেট-মাখানো বলে ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা ঘন ঘন ভূপাতিত হয়েছেন। আর দ্বিতীয় ইনিংসে উইকেটে স্পিন ধরাতে শুরু করলে গ্লীসনের ছোবলে শেষ হয়ে গেছেন তাঁরা কিছু বোঝার আগেই। ওয়াদেকার ঠেকা দিলেও সংগী পান নি।

ব্যাটিং-এ ব্যর্থতা—গ্রাউন্ড ফিল্ডিং মোটামুটি ভাল—কিন্তু বোলিং খুব একটা ভাল ধরনের হয় নি। প্রসন্নর বলেই যা কিছু অসুবিধা ঘটেছে অস্ট্রেলিয়ার। বেদীর বলে কোন ধার ছিল না—যদিও তার অ্যাভারেজ ভাল। রামকান্ত অসুবিধার কারণ ঘটান নি। সুর্তি কাজের কাজ কিছুই করতে পারেন নি। অপরদিকে ম্যাকেঞ্জি-গ্লীসন-হ্যালেট আর কনোলী আগামী টেস্টগুলোতে যে ভীতির কারণ হবেন তা এখন থেকেই বলা যায়। ব্যাটিং-এ অস্ট্রেলিয়া লরী-চ্যাপেল-রেডপাথ-স্ট্যাকপোল-ম্যাকেঞ্জি এবং সর্বোপরি ওয়াল্টার্স-এর ওপর পুরোপুরি দাঁড়িয়ে আছে। এদের দেড়শ' রানের মধ্যে ফেলে দিলে দলের রান কিছুতেই ২০০-র বেশি হবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে ভারত এদের ১৫০-তে আউট করতে পারবে না। কেন না—বোলিং কিংবা ফিল্ডিং-এ প্রথম টেস্টে এমন কোন প্রতিশ্রুতি ভারত রাখতে পারে নি যাতে ঐ কথা বলা যায়। যাই হোক—আগামী খেলাগুলোতে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অশেষ দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে খেলাগুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। খুব ভাল ব্যাট, খুব ভাল বোলিং করতে হবে। ক্যাচ ধরাতে হবে—এককথায় সমস্ত ক্রিকেটের সুন্দর সবটুকুই হাতের মুঠোর মধ্যে আনলে তবে যদি অস্ট্রেলিয়ার সংগে পাল্লা দেওয়া যায়।

—পবিত্র সমাদ্দার

সমাচারদর্পণ

খেলাধুলো সব বয়সের ও সবরকম পেশার লোকদের পক্ষে দরকার। এটা পশ্চিম জার্মান পার্লামেন্টের একটি সিদ্ধান্ত। তবে মুশকিল হচ্ছে সবাইকে খেলাধুলোয় আগ্রহী কোরে তোলা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। সবাই চেহারাটাকে ছিমছাম, দোহারা রাখতে চায় কিন্তু সে খেলাধুলো কিম্বা ব্যায়াম কোরে নয়, ডাক্তারের পিল খেয়ে কিম্বা খাওয়া কমিয়ে। দেখা গেছে শরীরটাকে একটু নাড়াচাড়া না করলে দেহের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। পশ্চিম জার্মানীর স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির সংখ্যাতত্ত্বে দেখা গেছে যে শতকরা ৪০ ভাগ স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য খারাপ, হার্ট দুর্বল, রক্তচলাচল ভালো নয় এবং স্নায়ুগুলির কাজকর্ম ঠিকমত হয় না।

সুতরাং খেলাধুলোর ওপর এবার জোর দেওয়া হয়েছে এবং একাজে এগিয়ে এসেছে জার্মান স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। খেলাধুলোকে জনপ্রিয় করার জন্যে এই সংস্থা থেকে বিনামূল্যে ব্যাজ পাওয়া যায়। ব্যাজ তিনরকমের—সোনা, রূপো ও ব্রঞ্জের। এই ব্যাজ পেতে হলে একটি পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষায় দেখা হয় হার্ট ও ফুসফুসের শক্তি, দেহের

[শেষাংশ ১৩৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন উত্তর

দীপু, পলাশ ও বাবু (ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : একজন ফুটবল খেলোয়াড় তার যদি নৈতিক চরিত্র খারাপ থাকে—তাহলে তাকে কি আমরা সত্যিকারের খেলোয়াড় বলতে পারি।

উত্তর : না পারাই বাঞ্ছনীয়, কারণ খেলোয়াড়দের কাছ থেকেই আমরা খেলোয়াড় সুলভ আচরণই প্রত্যাশা করি সব থেকে বেশি।

সুখময় কুণ্ডু (টাংলা, আসাম)

প্রশ্ন : পৃথিবীর মধ্যে কোন কোন দেশ টেস্ট ক্রিকেটে অংশ গ্রহণ করে—তাদের নাম জানাবেন।

উত্তর : ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ভারত, পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ড। সাউথ আফ্রিকা তাদের উগ্র বর্ণবৈষম্য নীতির জন্যে অশ্বেতকায় খেলোয়াড় সম্বলিত দেশের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে না।

ব্যাডমিন্টন খেলার নিয়মকানুন অন্য একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। তাই ও বিষয়ে এখন ধারাবাহিকভাবে না লেখাই ভালো।

ভবেন্দ্রনাথ দত্ত ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (মাইথন, এরিয়া)

প্রশ্ন : আপনার কাছে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট ও টেনিস খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কে কে?

উত্তর : আপনাদের মতে যে যে—তাঁরা শৈলেন মান্নার মতো অতো নিখুঁত এবং জোরাল ফ্রি-কিক পরিমল দে করতে পারেন না।

বাবলু (নেহালপুর, ২৪ পরগনা)

উত্তর : আবিদ আলীর জীবনী সাপ্তাহিক বসুমতীর ক্রিকেট সংখ্যায় প্রকাশ চেষ্টা করবো। অমর রায়কে আপনি C/o. স্পোর্টিং ইউনিয়ন টেন্ট, কলকাতা ময়দান, কলকাতা-২১ এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

দীপককুমার চৌধুরী (নাগ্রাকাটা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ রাইটব্যাক, স্টপার, রাইট ইন ও লেফট আউট কে কে?

উত্তর : আপনিই বলুন না।

গল্প হলেও সত্যি

১৯৪৪ সালে লর্ডস্ মাঠে ডন ব্রাডম্যান এক ইনিংসে এবং একই দিনে তিনটি সেঞ্চুরী করেছিলেন। একটি মধ্যাহ্ন ভোজন, দ্বিতীয়টি চা-পান এবং তৃতীয়টি খেলা ভাঙার আগে। এ কাহিনী অনেকেই জানেন। কিন্তু সবাই কি জানেন। আর একজন এক দিনে তিনটি খেলায় তিনটি সেঞ্চুরী করেছিলেন। এ কাহিনীর নায়ক হলেন অবিস্মরণীয় রনজি।

১৮৯০ সালে রনজি তখন কেমব্রিজের ছাত্র। সেদিন ছুটির দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আসপাশের অনেক মাঠে সকাল থেকে প্রীতি ক্রিকেট খেলার আসর বসেছে। একটি মাঠে রনজি খেলছিলেন। ১৩২ রান করার পর উনি পাশের মাঠে খেলা দেখতে গেলেন। সেখানে খেলোয়াড় কম ছিল। ব্যাটিং দল রনজিকে ডেকে নিল। (তখন ক্রিকেট খেলার ওপর এত নিয়ম-কানুন ছিল না) মধ্যাহ্নভোজনের আগেই রনজি ঐ মাঠে সেঞ্চুরী করে নিজের দলের মাঠে ফিরলেন। সেখানে তখনও তাঁদের নিজেদের ব্যাটিং চলছে। সময় কাটাতে এবার গেলেন তৃতীয় একটি মাঠে, সেখানেও সেই অবস্থা। রনজির তখন মস্তো নামডাক। যারা পায় তারাই তাদের হয়ে খেলতে বলে। তাদের আহ্বানে রনজি না করতে পারলেন না। ব্যাটিং করতে নামলেন। এবং করলেন তৃতীয় সেঞ্চুরী (১২০)। আবার ফিরে এলেন নিজ মাঠে ফিল্ডিং করতে।......

—শুকদেব মুখোপাধ্যায়,
মিরহাট, বৈদ্যপুর
বর্ধমান

ব্যারাকপুরে ফুটবল ফাইন্যাল

আগামী ২৩শে নভেম্বর ব্যারাকপুরে সাগর-বিন্দু চ্যালেঞ্জ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস্ মাঠে বিকেল ২-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত খেলায় শেওড়াফুলির পার্ক বয়েজ ক্লাব ও বারাসাতের সুভাষ ক্লাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন শ্রীমতী নন্দী ও শ্রীঅমল দত্ত প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন।

সঞ্জীবকুমার ঘোষ, বিপ্লবকুমার ঘোষ ও জীবনজ্যোতি ঘোষ (জগন্নাথ বরুয়া রোড, জোড়হাট-১

উত্তর : ভারতীয় দলে সহ-অধিনায়ক বলে কেউ নেই। পাতৌদি মাঠে না থাকলে দলের সিনিয়ার সদস্যর ওপরই থাকে দল পরিচালনার ভার।

দিলীপ দোসী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার সুযোগ পাবেন না বলেই তো মনে হয়।

[১০৪০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

নমনীয়তা ও কর্মক্ষমতা, দ্রুততা ও সহিষ্ণুতা। এগুলি আয়ত্ত করতে হলে প্রার্থীকে এই কটি ব্যায়াম রপ্ত করতে হবে যথা : দৌড়ানো, লাফানো, শটপুট এবং হয় দূর পাল্লার দৌড় নয় সাঁতার। এগুলি মুখ্য এবং গৌণ ব্যায়াম হিসেবে সাইকেল চালনা কিম্বা বোলিং করা চাই। এসব ব্যায়াম জানলেই চলবে না, জার্মান স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থায় ট্রেনিং নিতে হবে। এই ব্যবস্থা চালু হবার পর থেকে সারা দেশে সর্বসাধারণের মধ্যে শরীরটাকে ঠিক রাখা সম্বন্ধে ভীষণ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। শুধু সাধারণের মধ্যে নয়, কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের পাঁচজন মন্ত্রী পর্যন্ত এই ট্রেনিং সমাপ্ত করে খেলাধুলার জন্য সোনার ব্যাজ পেয়েছেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। বিশুদ্ধ সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের সারাৎসার। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবন্মুক্তি, ষড়্‌জ, হংস, মঙ্কি, গীতাসার, পিতৃ, পৃথিবী, সপ্তশ্লোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, গর্ভ, পাণ্ডব, উত্তর রাস, শ্রীমদ্গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমাবেশ প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। রেকসিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকা, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, চুলকা, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদনারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, শাঠ্যায়নীয়, যোগতত্ত্ব, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতকী, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—প্রতি খণ্ড—৪-০০ টাকা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ :

সামবেদের তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ। শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্য, শাঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ। তথ্যপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন :

মহর্ষি কপিলকৃত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈশেষিক দর্শন :

মহর্ষি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩-০০ টাকা।

জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনম্ :

।। পরমর্ষি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও বঙ্গানুবাদ ।।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে—পারমর্ষ সূত্র, পর্ব মীমাংসা, বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পর্বতন্ত্র, জৈমিনি সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবরস্বামীর ভাষ্যের ভাবার্থানুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের শ্লোকবার্তিক ও তন্ত্রবার্তিক টীকা-বিষয়ক পাদটীকা-সমন্বিত। পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থের দীর্ঘকালের সাধনায় অনূদিত, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূল্য—প্রতি খণ্ড—৮-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্ :

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পুরশ্চরণ প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম্, দীক্ষাপদ্ধতি, স্ত্রীগুরু, মন্ত্রমালা প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা ব্রহ্মসংহিতা, অষ্টাবক্রসংহিতা, ষটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত যোগরহস্যম্, পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগ গ্রন্থের সমাবেশ, কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) ল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ।। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সে কি! তুমি এখনও ব্যবহার করনি?
কিন্তু কুকমী না হলে আমার রাঁধতে মন চায় না
কুকমী
গুঁড়া মশলা
স্বাদে গন্ধে বিশুদ্ধতায়
এর তুলনা হয় না!
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
পোস্তা • কলিকাতা-৭
মিল - কাশীপুর

সাপ্তাহিক বসুমতী

এ-আই-সি-সি'র তলবী অধিবেশনে নিজলিঙ্গাপ্পা অপসারিত

সুব্রহ্মনিয়ম অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি

৪ বর্ষ ঃ ২২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 22, 27th Nov., 19

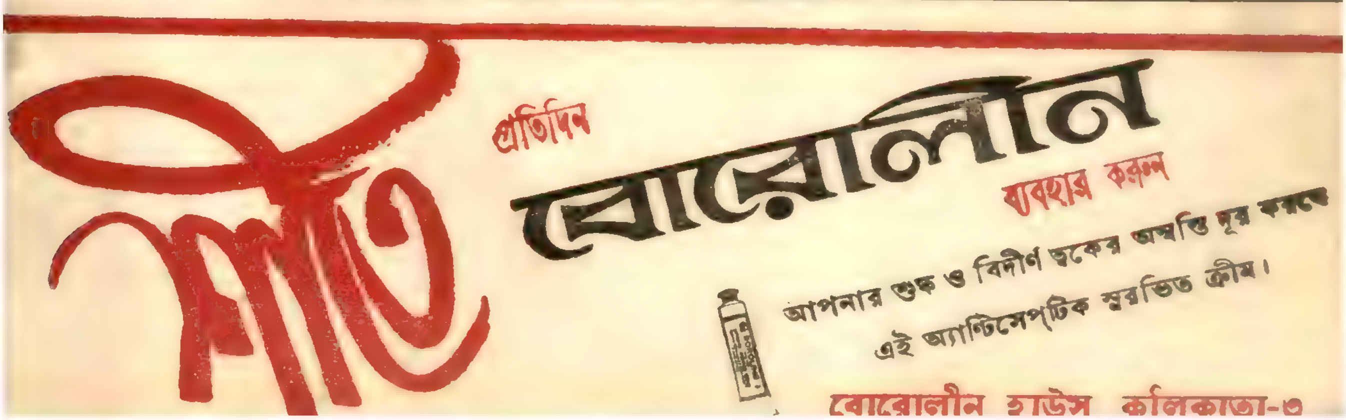

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১০৪৭
আজকের মানুষ		১০৪৮
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১০৪৯
বই-বাছাই—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	১০৫২
বুকের মুক্তি চাই (কবিতা)	গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৫৪
কোথায় পাওয়া যাবে (কবিতা)	শ্যাম রায়	১০৫৪
বঙ্গদর্শন		১০৫৫
ভারতদর্শন		১০৫৭
আন্তর্জাতিক		১০৫৯
স্বাস্থ্য বিভাগের প্রমোশন রহস্য	সুনীল ঘোষ	১০৬১
চাঁদ-সংবাদ	বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১০৬৩

যে কোন
গয়না
আর
আ স ল
গ্র হ র ত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এ. সরকার
এণ্ড সন্স
রাসবিহারী এভিন্যু

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফেরাতে চাই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন	মনোরঞ্জন হাজরা	১০৬৫
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	শ্রীসর্বদর্শী	১০৭০
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	১০৭১
সাগর সংগমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল জানা	১০৭৩
যুক্তফ্রন্ট কি এবং কেন? (প্রবন্ধ)	তুষার চট্টোপাধ্যায়	১০৭৭
সুন্দর-তুঙ্গা (পর্বত-অভিযান কাহিনী)	অমিয়কুমার হাটি	১০৮০
তিমিরপ্রান্ত তমসার্স	অগ্নিবর্ণ	১০৮৯
মধুর যন্ত্রণা (গল্প)	প্রিয়দর্শন সেনশর্মা	১০৯২
গ্রামবাংলার কথা	অসীম মুখোপাধ্যায়	১০৯৫
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	১০৯৭
রঙ্গজগৎ	...	১৪০০
খেলাধুলা	শান্তিপ্রিয়	১৪০৪

সত্য বেরিয়েছে ॥ বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ ॥ নামমাত্র মূল্য

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ ঃ নীলদর্পণ। জামাই বারিক। বিয়ে পাগলা বুড়ো। নবীন তপস্বিনী। কমলে কামিনী।
২য় ভাগ ঃ সধবার একাদশী। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। পোড়া মহেশ্বর। কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। লীলাবতী। সুরধুনী কাব্য। দ্বাদশ কবিতা। পদ্য সংগ্রহ। তৎসহ লেখকের জীবনী ও ভূমিকা।

(দুই ভাগে সম্পূর্ণ)

মূল্য প্রতি ভাগ চার টাকা।

বিদ্যারণ্য মুনি রচিত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ
মূল্য চার টাকা

স্তবকবচমালা
মূল্য আট টাকা

যোগশাস্ত্র
মূল্য পাঁচ টাকা

শিবায়ন
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

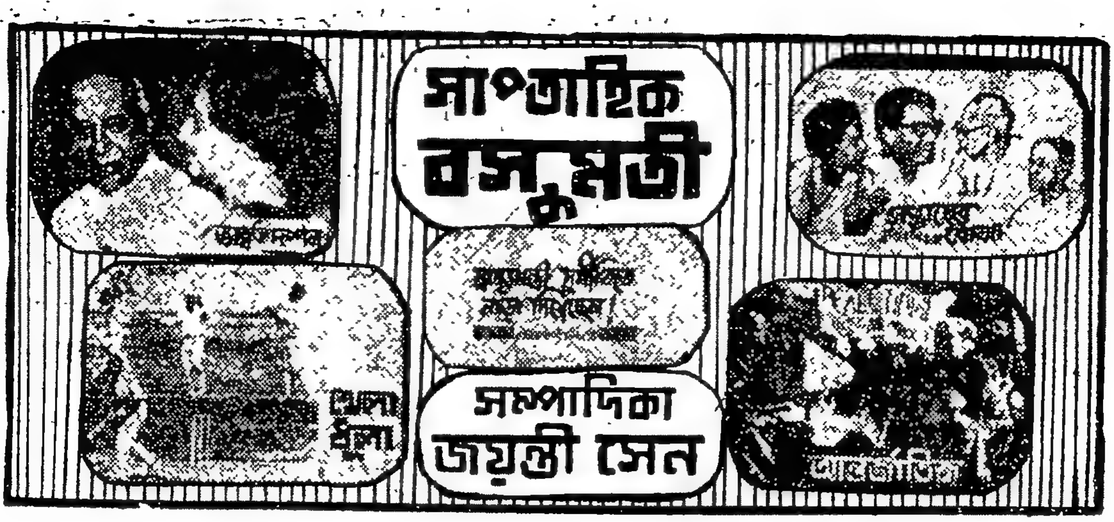

৭৪ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ | Thursday, 27th November, 196[illegible]

এ-আই-সি-সি'র তলবী অধিবেশন

গত ২২শে নভেম্বর নয়াদিল্লীতে এ-আই-সি-সি'র দু'দিনব্যাপী তলবী অধিবেশন সুরু হয়। এ-আই-সি-সি'র মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৭০৫ এবং মনোনীত সদস্য সংখ্যা ৯৪। তলবী সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪১৯ জন সদস্য। এ-আই-সি-সি'র প্রকাশ্য অধিবেশন হবে এ বছরের ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ বোম্বাই-এ।

এ-আই-সি-সি'র তলবী সভা আহ্বানকে শ্রীনিজলিংগাপ্পা প্রমুখ ব্যক্তিরা অবৈধ বলেছিলেন এবং সিণ্ডিকেটপন্থীরা স্বভাবতই তাতে যোগদানে বিরত ছিলেন। সম্ভবত এই ধারণা সিণ্ডিকেটপন্থীদের ছিল যে, তলবী সভায় বেশির ভাগ সদস্য যোগদান করবে না। কিন্তু ঐ তলবী সভায় ৪১৯ জন সদস্যের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে যে, শ্রীনিজলিংগাপ্পা প্রমুখ ব্যক্তিরা যে পথে চলেছেন সে পথ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং এতকাল কংগ্রেসের হাল ধরে থেকে শ্রীনিজলিংগাপ্পা প্রমুখ ব্যক্তিরা কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটাবার জন্য দায়ী।

এ-আই-সি-সি'র এই তলবী সভায় শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাকে কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে অপসারণ করা হয়েছে।

অধিবেশনের প্রারম্ভে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন ১৯৬৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের আগেই নতুন কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীসুব্রহ্মানিয়ম। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, সিণ্ডিকেটগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীসুব্রহ্মানিয়মকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ থেকে সরিয়েছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে এক একজনকে সরিয়ে নিজেদের দল ভারী করে সিণ্ডিকেটগোষ্ঠী এমন যথেচ্ছাচার সুরু করেছিলেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করতেও তাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। যে অর্থনৈতিক প্রগতির কথা আজ শ্রীমতী গান্ধী বলছেন, তা তাঁদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল, কারণ মুখে উক্ত গোষ্ঠী জনসাধারণের কল্যাণের কথা বললেও, বর্তমানে জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগ নেই, তাঁরা দলের পবিত্র ধ্বজা ধরে নিজেদের শ্রীবৃদ্ধিই করেছেন আর বঞ্চিত জনসাধারণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে।

তলবী সভার অধিবেশনে শ্রীমতী গান্ধী সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "কংগ্রেস এখন অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। তাই আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের এক নতুন আলোর সন্ধান করতে হবে। আমাদের মধ্যে সমস্যা রয়েছে, তা সমাধানের জন্য এক নতুন পথের সন্ধান করতেই হবে এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।"

এখন কংগ্রেসের ধমনীতে নতুন রক্ত সঞ্চারিত হল। কারণ সিণ্ডিকেটপন্থীরা আর অর্থনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সেবকদের কাছে পর্বতপ্রমাণ বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে না। সুতরাং জনগণ এখন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করছে, অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে কংগ্রেস দল কিভাবে পুনরায় আত্মনিয়োগ করে দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারবেন।

অবশ্য এখন নতুন যে কংগ্রেস গড়ে উঠল এবং তলবী সভায় অস্থায়ী ওয়ার্কিং কমিটির যে দশজন সদস্য নির্বাচিত ও দশজন সদস্য অস্থায়ী সভাপতি শ্রীসুব্রহ্মানিয়ম কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন, তাঁদের প্রতিপদে বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তবে সে-বাধা দেশের প্রগতিশীল দলগুলির পক্ষ থেকে আসবে বলে কেউ ধারণা করেন না। দেশের মধ্যে যে সব প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি রয়েছে সিণ্ডিকেটগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর প্রগতিমূলক কাজের ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে তারা বাধা সৃষ্টি করবে—এটাই সত্য। আজ যাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থনে মিলিত হয়েছেন, তাঁদের সহায়তা সেদিনই প্রয়োজন হবে সবচেয়ে বেশি।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

জাতির জীবনে স্থিতাবস্থা কোনো ঘটনা নয়। ট্রানজিশন বা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ-ধরণের অবস্থান্তর পর্বে যেমন উত্তেজনা রয়েছে তেমনি আছে নাটকীয়তা। পর্বটির সময়ের পরিধি স্বল্পই হয়তো, কিন্তু তবুও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, চরিত্র থাকে, এমন কি ঘাত-প্রতিঘাতও যা পরবর্তীকালের ইতিহাসের পাতা দখল করে। ঘটনাগুলো হয়তো ছোটোখাটোই, কিন্তু তবুও সুদূর আকশের ক্ষুদ্র তারকার মত তারা দীর্ঘকাল জনমানসে গ্রথিত হয়ে থাকে, দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল উপকাহিনী বা তার চরিত্র আলোকিত করে উত্তরকালের ঘটনাপঞ্জীকেও। ৮৫ বছরেব পুরনো ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজনৈতিক সংস্থা জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঐতিহাসিক, কোনো সন্দেহ নেই। যে ঘটনাগুলো এ-বিভাজনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাও বোধহয় কখনো ভোলা যাবে না। সাময়িককালের জন্যে হলেও কংগ্রেসকে পরিচালনা করার দায়িত্বভার যাঁর ওপব অর্পিত হল তিনিও কাহিনীর অন্যতম মুখ্য চরিত্র হিসেবে আগামী দিনের ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করবেন। জাতির যুগসন্ধিক্ষণে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হয়ে শ্রী সি সুব্রহ্মনিয়ম ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সভাপতিত্বে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এ আই সি সি-র তলবী সভায় দলের গঠনতন্ত্র ভঙ্গ করা, অতিরিক্ত কর্তৃত্ব ফলানো এবং স্বেচ্ছাচারীসুলভ কাজ করার অভিযোগে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাকে অপসারণ করা হয়েছে এবং শূন্য পদে তামিলনাড়ুর কংগ্রেস নেতা শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম সর্বসম্মতিক্রমে অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। অস্থায়ী এজন্যে যে, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত শ্রীসুব্রহ্মনিয়মই এ-পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

রাজনীতির কী বিচিত্র গতি। মাত্র কদিন আগে সুব্রহ্মনিয়ম তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন—এবং সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি থেকেও অপসৃত হয়েছিলেন। সেদিন যিনি তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পাকেই বিদেয় করে আজ তাঁর গদি দখল করলেন

শ্রী সি সুব্রহ্মনিয়ম

সুব্রহ্মনিয়ম। এমন চমকপ্রদ এবং অবিশ্বাস্য খেলা দেখা না গেলে অবশ্য রাজনীতি আর বলেছে কেন!

শ্রীসুব্রহ্মনিয়মের রাজনৈতিক জীবনটাই নাটক। এই দেখা গেল তাঁর বৃহস্পতি তুঙ্গে, খ্যাতির শীর্ষে উঠলেন তিনি, এই উচ্চ থেকে উচ্চতর ক্ষমতার আসনে চড়ছেন, আবার এই হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। গোড়ার দিকে অবশ্য ছিলেন খানিকটা স্টেডি, ধীরে অথচ সুনিশ্চিত দৃঢ় পদক্ষেপে আসছিলেন এগিয়ে। আইন পাশ করার পর তিনি কোয়েম্বাটুরে ওকালতিই শুরু করেছিলেন—অবসর সময়ে রাজনীতি করতেন। ছাত্র থাকাকালীনই কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ ঘটেছিল, আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ১৯৩২ সালে তাঁর কারাবাসও ঘটেছিল।

বৃটিশ আমলে জেলে যাওয়াটা আর এমন কী শক্ত ছিল—ঘরে বসে 'বন্দে মাতরম' বলাটাও ইংরেজের আইনে ছিল যেন 'সিডিশন' 'রাজদ্রোহিতা'—তা ধ্বনি শিশুর কণ্ঠ থেকেই বেরোক আর পাগলের প্রলাপই হোক। কাজেই পরে ১৯৪১ এবং '৪৩ সালেও কারারুদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে সুব্রহ্মনিয়মের খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো—তা নয়। আসলে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে অর্থাৎ মাদ্রাজে যখন সরকার গঠিত হয় এবং শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম তার অর্থ, শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী হন তখনই তাঁর নাম প্রচারিত হয়। তার আগে অবশ্য গণপরিষদের সদস্যপদও তিনি লাভ করেছিলেন। '৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়ে তিনি নেহরু ক্যাবিনেটে ইস্পাত ও ভারীশিল্পদপ্তর পেয়ে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। এর পরে তিনি খাদ্য ও কৃষিদপ্তর পেয়েছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ভাষার প্রশ্নে দাঙ্গার প্রতিবাদে তিনি মন্ত্রিত্বপদে ইস্তফা দিয়েছিলেন পরে অবশ্য আবার তা প্রত্যাহার করে নেন। পদত্যাগের হুমকি তিনি আরো একবার দিয়েছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি যদি রামগড়ের রাজার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার না করেন তবে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ইস্তফা দেবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন সেটাও প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

'৬৭-র সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হবার পর সুব্রহ্মনিয়ম তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান হন। সমাজতন্ত্রবাদে তাঁর অবিচল আস্থা আছে বলে খ্যাতি আছে। সত্যিকারের সমাজতন্ত্রের আদর্শে কংগ্রেসকে দীক্ষিত ও পরিচালিত করতে তিনি কতটা সক্ষম হবেন, ৫৯ বছর বয়স্ক সুব্রহ্মনিয়মের সামনে সেটাই পরীক্ষা।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশনাল প্ল্যানিং—(১৭)

ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি ও প্ল্যানিং কমিশন গঠনের ইতিহাস—(২)

ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে অধিকার পেয়ে সুভাষচন্দ্র অক্টোবর মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলন ডাকলেন। সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসে এই সম্মেলনের বিপুল গুরুত্ব অবিলম্বে স্বীকৃত হল।

২ অক্টোবর সম্মেলন উদ্বোধন করে সুভাষচন্দ্র বললেন, "আজ কংগ্রেসীদের কেবল স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করলেই চলবে না, জাতীয় পুনর্গঠনের চিন্তাতেও কিছু চিন্তা ও শক্তি নিয়োগ করতে হবে।"৮

বিহারের শিল্পমন্ত্রী ডঃ সৈয়দ মামুদ এক দীর্ঘ স্মারকলিপি দাখিল করেছিলেন। তিনি যেসব গুরুশিল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তাদের তালিকা দেন এবং একটি 'সেনট্রাল ইনডাসট্রিয়াল ব্যুরো' স্থাপনের পরামর্শ দেন, যে-সংস্থা সমগ্র ভারতের উন্নয়নের বিষয়ে সন্ধান করবে ও প্রাদেশিক সরকারগুলিকে শিল্পবিষয়ে পরামর্শ দেবে।

মাদ্রাজের শিল্পমন্ত্রী ভি ভি গিরি খুবই উৎসাহের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর মতে পরিকল্পনা না থাকলে একদিকে অযথা প্রতিযোগিতার সংঘাত এবং দ্রব্য-বিশেষের অতি-উৎপাদন ঘটবে, অন্যদিকে প্রয়োজনীয় বহু বস্তুর উৎপাদনই হবে না। যথার্থ পরিকল্পনা থাকলেই তবে বেকারী দূর করা এবং বিদেশে টাকা চলে যাওয়া থামানো সম্ভব হবে। শ্রীযুক্ত গিরি প্রদেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করার পক্ষেও বলেন। যে-সব জায়গা অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাজনক সেখানেই শিল্প স্থাপন করতে হবে। (টাইমস অব ইন্ডিয়া, ৪ অক্টোবর)

৩ অক্টোবর বেলা তিনটের সময়ে সম্মেলন শেষ হয় অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করার পরে। প্রস্তাবগুলি কংগ্রেসের এবং ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই মূল্যবান। সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবনের পক্ষেও। গান্ধী-নীতি ও দর্শনকে সুস্পষ্টভাবে অগ্রাহ্য করে আধুনিক জীবননীতির দিকে দেশ অগ্রসর হতে যাচ্ছে, প্রস্তাবগুলির মধ্যে তারই প্রকাশ। এই প্রস্তাবগুলি যে সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করাতে পেরেছিলেন, তাঁর নেতৃত্বের প্রগতিশীলতা ও সামর্থ্যকেও তা প্রমাণ করেছে। এই সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের পরিপূর্ণ আধিপত্য ছিল, সুতরাং গৃহীত প্রস্তাবগুলিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনও ছিল। তা যে ছিল, কিছু পরে সুভাষচন্দ্রের এই বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক আলোচনার সময়ে দেখিয়ে দেব। পরবর্তীকালে সংগঠিত ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশনের কার্যনীতিও এই সকল গৃহীত প্রস্তাবগুলির নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

প্রস্তাবগুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রায় সর্বাংশে অনুবাদ করে দিচ্ছি:

"শিল্পমন্ত্রীদের এই সম্মেলনের অভিমত, দারিদ্র্য ও বেকারী, জাতীয় প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান শিল্পায়ন ভিন্ন কখনই করা যাবে না। শিল্পায়নের পথে অন্যতম পদক্ষেপরূপে জাতীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণ করা উচিত। এই পরিকল্পনায় মূল ও গুরুশিল্প, মাঝারি শিল্প, এবং কুটীর শিল্পের উন্নয়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে। জাতীয় প্রয়োজন, দেশের সম্পদ এবং দেশের বিচিত্র পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই পরিকল্পনা করতে হবে। পরিকল্পনায় সর্বপ্রকার নতুন শিল্পের

---

৮ "New Delhi, Oct. 2—Mr. Subhas Chandra Bose, Congress President, opened to-day the Conference of the Industries Ministers from the seven Cogress provinces.

"Declaring the Conference open Mr. Bose emphasised that Congressmen to-day had not only to strive for liberty but also to devote a portion of their thought and energy to problems of national reconstruction." (*Times of India*, Oct. 4, 1938)

প্রবর্তনের ব্যবস্থা থাকবে, সেইসঙ্গে চালু শিল্পগুলির উন্নতির ব্যবস্থাও।

"এই সম্মেলন কয়েকটি প্রাদেশিক সরকারের অভিমত বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, সমগ্র ভারতের জন্য সর্বাত্মক শিল্পায়নের পরিকল্পনা যতক্ষণ বিবেচনাধীন থাকবে, এবং উপস্থাপিত না হবে, তার আগেই জাতীয় জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত গুরু শিল্পগুলি অবিলম্বে শুরু করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করা দরকার। এই শিল্পগুলি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে স্থাপিত হবে এবং সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের সহযোগিতা যথাসম্ভব আহ্বান করে সমন্বিত করতে হবে।

"(ক) কলকারখানার যন্ত্রপাতিসমেত সকল প্রকার যন্ত্র নির্মাণ;

"(খ) মোটরগাড়ি ও মোটর বোটের কারখানা নির্মাণ, সেই সঙ্গে পরিবহন এবং যোগাযোগ সম্পর্কিত অন্যান্য শিল্প স্থাপন;

"(গ) বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের ও তার আনুষঙ্গিক বস্তুর শিল্প স্থাপন;

"(ঘ) গুরু রসায়ন শিল্প এবং সার শিল্প স্থাপন;

"(ঙ) ধাতু শিল্প স্থাপন;

"(চ) বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহের শিল্প স্থাপন।

"পূর্ববর্তী দুটি প্রস্তাবের রূপায়ণের প্রাথমিক কার্যরূপে এই সম্মেলন একটি প্ল্যানিং কমিটি নিয়োগ করছে (যার সদস্যগণের নাম কংগ্রেস সভাপতি ঘোষণা করবেন)। এই কমিটি যাতে অনতিবিলম্বে কাজ আরম্ভ করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে উপযুক্ত অর্থসাহায্য করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এই কমিটি কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটির কাছে রিপোর্ট পেশ করবে। বর্তমান কমিটির প্রথম অধিবেশনের সময় থেকে চার মাসের মধ্যে যে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হবার কথা রয়েছে, তার কাছেও এই কমিটি রিপোর্ট দেবে।

"এই সম্মেলনের আরও অভিমত—বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির সদস্য নিয়ে পূর্ণ-প্রতিনিধিত্বমূলক একটি সর্বভারতীয় কমিশন গঠিত হওয়া উচিত, যে-কমিশনের কাজ হবে প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশগুলিকে যথাযোগ্য বিবেচনা করার পরে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা। কমিশনের নাম হবে 'দি অল ইন্ডিয়া ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশন'; তা গঠিত হবে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে; সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষমতাও এই কমিশনের থাকবে:

"(ক) যে সব প্রদেশ কিংবা দেশীয় রাজ্য সহযোগিতা করবে, তাদের একজন করে প্রেরিত প্রতিনিধি;

"(খ) 'ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স'-এর চারজন প্রতিনিধি;

"(গ) নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের একজন প্রতিনিধি; এবং

"(ঘ) তৃতীয় প্রস্তাবে উল্লিখিত প্ল্যানিং কমিটির সকল সদস্য।

"প্ল্যানিং কমিটি এবং নিখিল ভারত প্ল্যানিং কমিশনের জন্য একজন বেতনভোগী সেক্রেটারী থাকবেন, যিনি কমিশনের সদস্য হবেন না। তাঁর সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারিবৃন্দও থাকবেন। কমিশন তার প্রথম অধিবেশনে নিজ কার্যপরিচালনার বিধি প্রণয়ন করবে। বিবেচনাধীন শিল্পের অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তথ্য দেবার জন্য কমিশন এক বা একাধিক উপ-সমিতি নিয়োগ করতে এবং যথাযোগ্য অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে পারবে। কমিশনের প্রথম অধিবেশনে স্থিরীকৃত তারিখের মধ্যে কমিশন বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে সন্ধান-বিবরণী পেশ করবে।

"অল ইন্ডিয়া প্ল্যানিং কমিশনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করবেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি; সেই সভায় কমিশন নিজ সভাপতি নিয়োগ করবে। তিনি যদি ইতিমধ্যেই কমিশনের সদস্য না হয়ে থাকেন পদাধিকারে সদস্য হয়ে যাবেন।

"কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুপারিশসহ সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

"(ক) শিল্পের স্থান নির্ণয়; কোন্ স্থানে বা স্থানসমূহে কোনো বিশেষ শিল্প স্থাপিত হবে তা নির্ণয়ের কালে কাঁচা মাল সরবরাহ, ও অন্যান্য স্থানীয় স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে;

"(খ) শিল্প-সংগঠনের নীতি; শিল্পটি কি সম্পূর্ণ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণে থাকবে, না কি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হবে? শেষোক্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সাহায্য কি ধরনের হবে?

"(গ) শিল্প পরিচালনার এবং তার অর্থভিত্তির নীতি।

"সহযোগিতায় স্বীকৃত প্রতি প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য প্রয়োজনীয় খরচাদির জন্য প্রারম্ভিক অর্থ সাহায্য করবে।

"অল ইন্ডিয়া ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হওয়া মাত্র তৃতীয় প্রস্তাবের দ্বারা সৃষ্ট প্ল্যানিং কমিটি তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং কমিশনের কাছে ঐ কমিটি তার কার্যকালে সংগৃহীত তথ্য, উপাদান, বিবরণ প্রভৃতি হস্তান্তর করে দেবে।

"মাদ্রাজের শিল্পমন্ত্রী শ্রী ভি ভি গিরি অল ইন্ডিয়া ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করবেন; কমিশনের প্রথম অধিবেশন তিনিই আহ্বান করবেন।

"পঞ্চম প্রস্তাব : এই সম্মেলনের অভিমত—শিল্প ও বিদ্যুৎ-শক্তির জন্য অ্যালকোহল ভারতেই উৎপন্ন হওয়া উচিত। তার জন্য দরকারী কাঁচা মাল, প্রধানত চিটেগুড় ভারতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যা বর্তমানে নষ্ট হচ্ছে—তার পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করা উচিত।

"এই সম্মেলন একথা শুনে গভীর পরিতৃপ্তি বোধ করেছে যে, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রদেশ শক্তি-উৎপাদন এবং শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করছে। এই সম্মেলনের অভিমত, শক্তি-শিল্প প্রবর্তনের ও বিকাশের ব্যাপারে সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের সহযোগিতা করা উচিত, যাতে তা সর্বভারতীয় পরিসরে সংগঠিত হতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন সুপারিশ করছে, সারা ভারতে যেন গাড়ি চালাবার জন্য কোনো হিসাবে পাওয়ার অ্যালকোহলের সঙ্গে মিশ্রিত নয় এমন পেট্রলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

"ষষ্ঠ প্রস্তাব : এই সম্মেলনের অভিমত ক্রয়-বিক্রয়, শিল্প-গবেষণা, শিল্প-বাণিজ্যের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িক শিক্ষা, বিশেষজ্ঞ-পরামর্শ প্রভৃতি বিষয়ে সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের পরস্পরের সহযোগিতা করা উচিত।

"সপ্তম ও সর্বশেষ প্রস্তাব : সম্মেলনের সামনে উপস্থাপিত অটোমোবাইল পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই সম্মেলন অনুকূল মনোভাব পোষণ করে। সম্মেলন সুপারিশ করছে যে, সমস্ত পরিকল্পনাটিকে অনুসন্ধানের পরীক্ষা করে প্ল্যানিং কমিটি তাদের সুপারিশগুলি যেন ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশনের সামনে উপস্থিত করে।"

(টাইমস অব ইণ্ডিয়া; ৫ই অক্টোবর)

সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হল শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলন। সম্মেলন শেষ হওয়ার অল্পদিনের মধ্যে জানা গেল—প্ল্যানিং কমিটির সদস্যদের নাম এক মাসের মধ্যে কংগ্রেস সভাপতি ঘোষণা করবেন; চেয়ারম্যানকে নিয়ে পনেরজনের কমিটি হবে। বোম্বাই শহর হবে হেড কোয়ার্টার। বোম্বাই সরকার সেক্রেটারীর কাজ করার জন্য একজন কর্মচারী দেবেন; সকল কংগ্রেসী প্রদেশই অর্থসাহায্যে সম্মত; প্ল্যানিং কমিটি শুধু বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত হলেও প্ল্যানিং কমিশনে বিভিন্ন প্রদেশের, দেশীয় রাজ্যের এবং বাণিজ্য-সংস্থাগুলির প্রতিনিধি থাকবেন। আরও জানা গেল, অকংগ্রেসী প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যগুলির সহযোগিতার জন্য আহ্বায়ক শ্রীযুক্ত গিরি তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপ করছেন; পঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াত খান ইতিমধ্যেই অটোমোবাইল পরিকল্পনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহের কথা জানিয়েছেন।

জানা গেল, ১১ জনের কমিটিতে বোম্বাই সরকার চারজনের নাম পাঠিয়েছেন : আমেদাবাদে মিল মালিক সঙ্ঘের শেঠ কস্তুরভাই লালভাই, বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, অর্থনীতিবিদ শ্রী কে টি শাহ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ ঘোষ। "এ ছাড়া স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া, যাঁর ভারতে মোটর নির্মাণ পরিকল্পনা বিপুল প্রচারলাভ করেছে, তিনি স্বতঃই কমিটির অন্তর্ভুক্ত হবেন।"

(টাইমস অব ইণ্ডিয়া; ১০ অক্টোবর)

১৬ই অক্টোবর সাংবাদিক সভায় সুভাষচন্দ্র ঐ সব তথ্যই পরিবেশন করলেন। বললেন, প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হতে তিন-চার মাস লেগে যাবে। "ভারত অর্থনৈতিকভাবে অখণ্ড এই বিবেচনা করেই পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে, ভারতকে যথাসম্ভব স্ব-নির্ভর করে তোলাই লক্ষ্য। এর সাফল্যের পথে বাধা অবশ্যই বিরাট, বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য যখন পাওয়া যাবে না, অথচ তা না পেলে সাফল্যের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত"—সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন।[১]

সাফল্যের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, সন্দেহ নেই, কিন্তু সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে তাও স্বীকার্য। প্রধান উৎসাহীদের অন্যতম শ্রীযুক্ত গিরি সম্মেলনের পরে বোম্বাইয়ে পৌঁছে সোল্লাসে বললেন, "সমগ্র দেশের জন্য সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এই প্রথম।" দেশের শিল্পায়নের জন্য শিল্পপতি ও বিশেষজ্ঞরা উৎসাহভরে এগিয়ে এসেছেন, তাতে আনন্দপ্রকাশ করে তিনি বললেন—"আমরা জানি যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু দেশের শিল্প সম্ভাবনা সম্বন্ধে উপদেশ, নির্দেশ, সহযোগিতা এবং সাহায্যের প্রার্থনা জানিয়ে ইতিমধ্যেই দশ-বারজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। কয়েকজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ কমিটিভুক্ত হবেন, এমন কথা আছে।" "কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত বসু ভারতের শিল্প-সম্ভাবনার পূর্ণ সমীক্ষা সম্বন্ধে নীতিনির্দেশ করে যা বলেছেন, তদনুযায়ী একটি সম্মেলন আহ্বান করতে প্রায় চার মাস সময় লেগে গেল"—শ্রীযুক্ত গিরি বক্তৃতায় তাও জানিয়েছিলেন।

(টাইমস অব ইণ্ডিয়া; ৭ অক্টোবর)

[ক্রমশ]

১. "In formulating a comprehensive plan (Mr. Bose said), India would be treated as one economic unit and efforts would be put forward to make India self-sufficient, as far as possible, in the matter of her particular requirements, subject to the fundamental laws of economics. The task was undoubtedly a formidable one, especially as the Co-operation of the Central Government which was essential for its success, would not be forthcoming." (Times of India Oct. 17, 1938)

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

কালীপ্রসন্ন সম্পর্কে আলোচনা কেমন যেন আকস্মিকভাবে শুরু হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছিল আমার। ১৮৫০-এর পরবর্তী ঘটনার ধারায় তাঁর প্রসঙ্গ অবশ্যই ওঠা উচিত, তবে প্যারীচাঁদের কথা স্থগিত রইলো কেন? ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধেও তো অনেক কথা বলবার ছিল। মধুসূদনের প্রবেশও কি কম বিস্ময়কর? আগে সেসব কথা না বলে নিলে পাঠক কি সন্তুষ্ট হবেন? আলোচনা কি খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছে না?

এই দ্বিধা সত্ত্বেও আনন্দকে আমি বাধা দিই নি। কিন্তু সে নিজেই আমার অতৃপ্তির ভাবটা অনুভব করেছিল বোধ হয়। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো—'ধর্মসভা'র উল্লেখ করেছি আমরা,—মনে আছে তো?

আমি বললুম—হাঁ, সে তো ১৮৩০-এর ঘটনা?

—হাঁ, ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে—যখন থেকে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর উত্তেজনার সূচনা ধরা হয়, তখন থেকেই 'ধর্মসভা'র কাজ শুরু হয়েছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার সম্পাদক ছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুর সভা ছিল এই 'ধর্মসভা'। ইংরেজি শিখতে হবে, পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ-রাজনীতি-দর্শনের খবর রাখতে হবে,—কিন্তু নিজের ঐতিহ্য ভাসিয়ে দেওয়া চলবে না,—এই ছিল 'ধর্মসভা'র আদর্শ।

—বেশ তো। কিন্তু তার সঙ্গে হুতোমের সম্পর্ক কি?

—'সম্পর্ক'-ব্যাপারটা কি সবক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হতেই হবে? চিন্তার স্রোতে কতো ঢেউ যে পরস্পরের গায়ে গায়ে গড়িয়ে পড়ে! আমি বলতে চাই যে, ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি সেকালের সমাজচিত্রীদের প্রসঙ্গ ঐ 'ধর্মসভা' আর 'ইয়ং বেঙ্গল'—সমকালীন এই দুই ভাবনার সঙ্গে যুক্ত রেখে ভাবা দরকার। দুটি যেন বিপরীত ঢেউ,—বিপরীত কি? প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত, ভোলানাথ সেন, কালীনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বর গুপ্ত—পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রক্ষার চিন্তায় এঁরা কি বিমুখ ছিলেন? ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আয়ুষ্কাল মনে আছে তো?—১৮২৭ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তিনিও ছিলেন এই সময়ের ভাবুক। ইংরেজি শিক্ষার বিষ তাড়াবার জন্যে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তিনি ইংরেজির সঙ্গে সংস্কৃত-চর্চা চালু করবার পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগরও তাই চেয়েছিলেন। এঁরা কেউই ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না—প্যারীচাঁদও তাই,—কালী-প্রসন্নও সেই শ্রেণীর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরও সেই বিশ্বাসের মানুষ ছিলেন। এমনি ছিলেন সেকালের অনেকেই।

আমি বললুম—বিদ্যাসাগর মশাইও আমাদের ঐতিহ্য ভাসিয়ে দিতে বলেন নি, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত বা বঙ্কিম-চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতের কি পুরোপুরি ঐক্য ছিল?

আনন্দ বললে—সে তাঁদের ব্যক্তিগত ধারণা এবং ব্যক্তিগত আবেগের দিক। সে-প্রসঙ্গ আমাদের এ-আলোচনায় তুলতে চাই না। বিদ্যাসাগরও এই সময়ের মানুষ—১৮২০ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত ছিল তাঁর আয়ুষ্কালের বিস্তার। তাঁর জীবনীকার শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে তিনি জানান—'আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি'।

আমি বললুম—'দাস'—এঁরা কেউই ছিলেন না। দাসত্ব তো বাধ্যতা। বঙ্কিম কি আচারের দাস ছিলেন? দাসত্ব নয়,—এঁদের পৃথক পৃথক ধারণার দিক ওটা।

—যাক, ও-প্রসঙ্গ। আমরা বই-বাছাইয়ের কাজে নেমেছি—এই পর্বটি ঠিক ঠিক জানবার জন্যে যেসব বই পড়া দরকার, সেগুলির মধ্যে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যা-সাগর জীবন-চরিত' (১৮৯১),—বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর',—দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মচরিত' (১৯০৮),—ভূদেবের প্রবন্ধগুলি,—বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ',—যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত একাধিক বই,—ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী ইত্যাদি যেমন প্রয়োজনীয়, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্নও তেমনি পড়ে দেখা দরকার। আরো নানা বইয়ের নাম মনে পড়ছে। রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকেই লিখে গেছেন। কিন্তু তালিকা বাড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রসঙ্গ থেকে সোজা কালীপ্রসন্নে চলে আসতে বাধা নেই,—এই কথাটাই বিশেষভাবে অনুভব করতে চাই। ঈশ্বর গুপ্ত যখন কবিতা লিখেছেন তখন 'ধর্মসভা'-র গোঁড়া রক্ষণশীলরাও ছিলেন, প্রগতিপন্থী রক্ষণ-বাদীরাও ছিলেন,—আবার 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর উগ্র প্রগতিবাদীরাও ছিলেন। ভবানীচরণ তার আগেই কাজ শুরু করেছেন,—প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি দেখা দিয়েছেন সেই একই পর্বের আরো কিঞ্চিৎ পরের প্রহরে। সময়ের স্রোতে সহিষ্ণুতা, আসক্তি আর প্রতিবাদ একই সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। আলাদা করে তখনকার কবিতার

ধারাটি দেখলে দেখা যায় সেই ১৮৩০-এর দশকে এবং তার কিছু আগে, কিছু পরেও—পুরোনো দেবদেবীর মহিমা কীর্তনের অভ্যাস বজায় ছিল। পৃথ্বীচন্দ্র নামে এক কবি লিখেছিলেন 'গৌরীমঙ্গল',—নন্দকুমার কবিরত্ন লিখেছিলেন 'কল্য-কৈবল্যদায়িনী'। গবেষকরা এরকম অনেকের নাম দিতে পারেন। কিন্তু আমাদের সে-তালিকারও দরকার নেই। বৈষ্ণব পদাবলী রচনার অভ্যাসও তখন টিকে ছিল—মধুসূদন হঠাৎ 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' লেখেন নি,—রবীন্দ্রনাথও অকস্মাৎ 'ভানুসিংহ' হন নি।

আমি বললুম—থাক, থাক, ওসব প্রধানত গবেষক-ক্ষেত্রের অঞ্চল-উপাঞ্চল মাত্র। ১৮৫০-এর ঠিক পরবর্তী পর্বের জীবিত বর্তমান তো ওসব রচনায় বিশেষ প্রতিফলিত হয় নি—ওতে আমাদের আগ্রহ থাকবে কেন?

আনন্দ বললে—যে-পর্বে যা ঘটে, সে-পর্বের পক্ষে সে-সবই তো জীবিত। তবে, বিশেষ পর্বের বিশেষ যে-সব রচনার গতি অপেক্ষাকৃত ভবিষ্যতের দিকে,—যা শুধুই অতীতে আবদ্ধ নয়,—সেইসব রচনাই আমরা বেশি সজীব বলে মনে করি। তখনকার অতীতে-আশ্রিত লেখকরা শুধু যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনায় আর বৈষ্ণব পদ রচনায় নিযুক্ত ছিলেন, তাও নয়,—পদ্য এবং নাটক মিশিয়ে কিছু কিছু উপাখ্যান পরিবেষণেও ব্যস্ত ছিলেন অনেকে। আবার, ঈশ্বর গুপ্তের রঙ্গ-ব্যঙ্গের আমলেই মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা' (১৮৩৬-৩৭) বেরিয়েছিল,—এরকম আরো বই ছিল। রাধামোহন সেনের 'সংগীত তরঙ্গ' ছিল, নন্দকুমার কবিরত্নের 'শুক-বিলাস' ছিল। তাছাড়া, আমরা রামনিধি গুপ্তের কথা আগেই বলে নিয়েছি। তাঁর আয়ুষ্কাল গেছে পলাশীর আগে থেকে প্রায় তত্ত্ববোধিনী সভার আমল পর্যন্ত—১৭৪১ থেকে ১৮৩৯,—অর্থাৎ ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদের সময় পর্যন্ত। ভবানীচরণ যখন প্রথম লেখা আরম্ভ করেছেন, হরু ঠাকুর তখনো জীবিত (১৭৩৮—১৮২৪); নীলু ঠাকুর মারা গেছেন সেই সময়ে (১৮২৫); নিতাই বৈরাগীর মৃত্যু হয় আরো কয়েক বছর আগে—১৭৫১ থেকে ১৮১০ পর্যন্ত গেছে তাঁর আয়ুর বিস্তার। দাশরথি রায়ের (১৮০৬—৫৭) জন্ম হয় ঈশ্বর গুপ্তের আগেই,—মৃত্যুও ঘটে গুপ্ত কবির মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে। কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০—৮৮) সেই একই পর্বে কৃষ্ণ-যাত্রার পালা বেঁধেছেন। সাহিত্যের স্রোতে একই কালে এইরকম নানা ভাব-ভঙ্গি মিশে ভেসে চলে। —মধুসূদন আর দীনবন্ধুর অভ্যুদয় যে-সময়ে, সেই ১৮৬০—৬২ সালেই কৃষ্ণকমলের 'স্বপ্নবিলাস' বেরিয়েছিল,—'রাই-উন্মাদিনী' ছাপা হয়েছিল। অতএব প্যারীচাঁদ বা ভূদেবের কথা আগে বলে নিয়ে,—তবে কালীপ্রসন্নের কথা শুরু করা যাবে,—এর অন্যথা ঘটা অন্যায়,—এরকম খুঁৎখুঁতে ভাব ত্যাগ করো। এঁরা সবাই মোটামুটি একই কালের মানুষ ছিলেন।

আমি বললুম—'মোটামুটি' হিসেবটা গোলমাল ঘটিয়ে তোলে। ঈশ্বর গুপ্ত গরিব ছিলেন, কালীপ্রসন্ন ধনী ছিলেন। দুজনের মেজাজ কখনোই একরকম হতে পারে না।

সে বললে—ঈশ্বর গুপ্ত যে গরিব ছিলেন, সে-কথা বঙ্কিম চমৎকারভাবে জানিয়ে গেছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন ধনী ছিলেন বলেই যে তাঁর মেজাজ অন্যরকম ছিল—সে-কথাটা সত্য হলেও এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

আমি বললুম—না, ঠিক অপ্রাসঙ্গিক নয়,—বঙ্কিমের উক্তি মনে রেখেই বলতে চাই যে, ঈশ্বর গুপ্ত—'জেঠা-মশায়ের জুতো' তুলে রেখেছিলেন সমাজের জন্যে,—প্যারীচাঁদ এবং কালীপ্রসন্নও সমাজ-সমালোচনায় উৎসাহী ছিলেন,—কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের রীতিগত পার্থক্য কি চোখে পড়ে না? এঁদের মন-মেজাজের তুলনার চেষ্টা কি সত্যিই অবান্তর?

সে বললে—সে চেষ্টা এখন নয়,—আগে শেষ হোক কালীপ্রসন্ন এবং প্যারীচাঁদের কথা। পুরোনো প্রসঙ্গে ফেরা যাক আবার—

অতঃপর আবার কথা শুরু হোলো।

'বঙ্গবাসী'-পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষায় লেখক—প্রথম ভাগ' বেরোয় ১৩১১ সালে—অর্থাৎ ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে। কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর সে ঠিক চৌত্রিশ বছর পরের ঘটনা। কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদের প্রসঙ্গটিই হরিমোহন তাঁর প্রবন্ধে বেশি স্মরণ করেন। তবে তাঁর সে-আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত—মাত্র তিন পৃষ্ঠা (২৬৫—৬৭)। সেই সংক্ষিপ্ত আলোচনার শেষ অংশে হুতোম-এর কথা উল্লেখ করে উৎসর্গ-কবিতাটির কয়েকছত্র উদ্ধৃতি দিয়ে হরিমোহন লেখেন—'এই কয়েক পংক্তিতেই প্রকাশ,—অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক,—বস্তুতঃ কালীপ্রসন্ন,—পরিপোষ্টা মাইকেল। হুতোম প্যাঁচার নক্সা তদানীন্তন কলিকাতার নিখুঁৎ চিত্র।'

রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১—৯৪) ছিলেন কালীপ্রসন্নের সমসাময়িক লেখক। তাঁর জীবৎকালে তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রথমে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে—এবং পরে তার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৮-তে প্রকাশিত হয়। এই দুটি সংস্করণে কালীপ্রসন্নের উল্লেখ ছিল না। সে রকম অনুল্লেখ অবশ্য আরো ঘটেছিল,—যেমন, বিহারীলাল, নবীনচন্দ্র প্রভৃতিরও উল্লেখ ছিল না। পরবর্তী তৃতীয় সংস্করণে রামগতির পুত্র গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসব অংশ যোগ করেন—এবং কালীপ্রসন্নের প্রসঙ্গও সেইসূত্রে সংযোজিত হয়।

'নীলদর্পণ' সম্পর্কিত ব্যাপারে তো বটেই,—তাছাড়া সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ,—'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' রচনা,—আর বাংলা নাটক চর্চায় এবং অভিনয়ে উৎসাহ,—এই তিন কারণেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন সিংহের নামযশ ছড়িয়ে পড়ে।

অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' বইখানির দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩৫৬-র দ্বিতীয় সংস্করণে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের

বুকের স্বাস্থ্য চাই

গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কান্না পেলে ওকে কাঁদতে দাও
হাসতে দাও দিল খুলে যদি হাসতে চায়
মুখোশ-চোখের হাসি-কান্না অভিনয়ে
নিজেকে করো না প্রতারণা
বুকের খাঁচার পর্দা সরাও এবার
বুক আকাশ দেখুক।

বুকের আনন্দ্য ফাঁস দিয়ে—
না হয় চাঁদে নাই বা গেলে
বুক মেরে কেউ চাঁদ পায় নি কখনো
বুককে নিজের সত্যিকারের গান গাইতে দাও
বুকের বিশ্বছিল অন্ধকারে
চাঁদটা নামুক মুক্ত বুকের প্রাঙ্গণে।

কোথায় পাওয়া যাবে

শ্যাম রায়

অনেকদিন পর একটি কাঁচ নিম-সকালে
পূবের আকাশে সাদা পশুটার কাছে
এক টুকরো টোস্ট, আমার টেবিলে চা ও দৈনিক।

কি চাই লক্ষ্মীর মা! এখানে আর কেন
নেই নেই! বাড়ন্ত! লক্ষ্মীছাড়া দিন।
খেতে দিও না, কথা সাজাতে দাও,
অথবা তক্তকে মাছের মতো শরীরটাও
ফুটতে দিতে পারো। আঁচল চোখে গোঁজা
অলক্ষ্মীর ডাক ফুস-ফুসরে, অসহ্য তোমার।

শহরে-হাঁড়ি-বন্দি জিওল মাছের মতো
কোথায় রেখেছিল ওকে লক্ষ্মীসাধকেরা
এখন বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে গেছে, ভেসেছে লক্ষ্মী
বেনো জলের তোড়ে খড়কুটো যেমন ভাসে।

আজ ছুটির কাঁচ সকালে কথা ছানতে বসি
কথায় কথায় কারা অনেক আসে
যারা গেছে লক্ষ্মীকে নিয়ে—ভালই গেছে
তাদের সীমানা হারায়—যারা আছে।
মানুষ আছে, পশুরা আছে, পাখিরাও
ওরা খাবে কি, চরবে কোথায়?
চিৎকার! গুমরে ওঠো লক্ষ্মীর মা!

এখন ভেবে দেখরে লক্ষ্মীকে কোথায় পাওয়া যাবে!

অনুবাদের সঙ্গে প্রথম কালীপ্রসন্নের নামোল্লেখ করবেন, সেইসঙ্গে হুতোম প্যাঁচার নক্সার কথাও ছিল—তার সেই কথাগুলি এখানে উল্লেখ করা দরকার।

এই বলে আনন্দ একটি উদ্ধৃতি শোনালো—

কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৩০—৭০) কীর্তি, মহাভারতের গদ্য অনুবাদ প্রকাশ (১৮৬০—৬৬) এই বিষয়ে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার অপর বিশিষ্ট রচনা হইতেছে হুতোম প্যাঁচার নক্সা (১৮৬২-৬৩)। এই বইটির ভাষা সম্পূর্ণভাবে কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত।

আনন্দ বললে—দ্বিতীয়ত তখনকার অভিনয় প্রসঙ্গে বলা হয়—রামজয় বসাকের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের অভিনয় হয় ১৮৫৭-র মার্চ মাসে। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক লিখেছেন—

তাহার পর কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চে (১৮৫৭) রামনারায়ণের বেণীসংহার নাটকের এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের বিক্রমোর্বশী নাটকের অভিনয়। তৃতীয়ত— কালীপ্রসন্ন সিংহের দ্বিতীয় নাটক সাবিত্রী-সত্যবান (১৮৫৮) তাঁর মৌলিক রচনা। তাঁর তৃতীয় নাটক মালতীমাধব (১৮৫৯) ভবভূতির অনুবাদ।

আনন্দ বললে—আবার অধ্যাপকের মন্তব্য শোনো—

নাটকগুলির রচনার কোন বৈশিষ্ট্য নাই, অভিনয়যোগ্যতাও কিছুই নাই। তবে কালীপ্রসন্নের স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে এগুলির অভি[illegible] কোন বাধা হয় নাই।

[ক্রমশ]

বঙ্গ দর্শন

সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃংখলা বিপন্ন এমন একটা রব সম্প্রতি লোকসভায় উঠেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন জানিয়েছেন যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গের দিকে নজর রাখছেন। এ সময় এ কথাটা বলে তিনি খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন নি, কারণ তিনি ভাল করেই জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের আত্মসমালোচনাকে মূলধন করে কোন রাজনৈতিক মুনাফা লোটা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। আইনশৃংখলার ব্যাপারটাই আপেক্ষিক; পশ্চিমবঙ্গে তার অবনতি ঘটেছে যদি একথা তর্কের ছলে ধরেও নেওয়া যায়, সেই একই তর্কপদ্ধতি অনুসরণ করে বলা যায় যে, ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে, এমন কি খোদ দিল্লীতেও আইন বলে কিছু নেই, পশ্চিমবঙ্গে তবু তো কিছু একটা আছে যার অবনতি ঘটেছে বলে দাবি করা যায়। সেটুকুর কণামাত্রও কি অপরাপর রাজ্যে আছে? খোদ দিল্লীতে আছে? রাজধানী দিল্লীতে কোথাও কোথাও সন্ধ্যার পর মেয়েরা একা রাস্তায় বেরুতে পারে না এ অভিযোগও আছে। কলকাতা সে তুলনায় আজও স্বর্গরাজ্য।

খোদ চ্যবন সাহেবের স্বদেশ মহারাষ্ট্রেরই বা অবস্থা কেমন? সেখানকার শিবসেনারা কি করছে? মহারাষ্ট্রে কোন্ অ-মহারাষ্ট্রীয়র ধন-প্রাণ নিরাপদ? আর একটু উত্তরদিকে এগিয়ে গুজরাটে এলে কি দেখবেন? আমেদাবাদের হাঙ্গামা রুখতে না পারার জন্য হিতেন্দ্র দেশাই-এর সরকারকে উচ্ছেদ করা হল না কেন? ভারতের অন্য কোন রাজ্যে আইন আছে? যত দোষই থাক, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশবাহিনী যে কর্মদক্ষতার অধিকারী, তার শতাংশের একাংশও কি ভারতের অন্যত্র আছে? আইন-শৃংখলার হাল পশ্চিমবঙ্গে কিরকম তা কি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গেলেই দেখতে পাওয়া যায় না? আইন-শৃংখলার দোহাই দিয়ে এখন আর কিছু করা যাবে না।

এটা জানাই ছিল যে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক আত্মসমালোচনামূলক বিবৃতিগুলিকে এবং তাঁর প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহকে সুযোগসন্ধানীরা কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে, এবং কার্যত সেই চেষ্টাই হচ্ছে। এ-জাতীয় আত্ম-সমালোচনার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার মোটেই পরিচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট আত্মসমালোচনা করে, নিজেদের কাজের ফলাফল কি হচ্ছে তা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে আলোচনায় বসে, তা থেকে অনেক বিষয় জানা যায়। কোথায় কোন্ এলাকায় ক্ষীণতম অন্যায় ঘটছে তা যুক্তফ্রন্টের শরিকদের নজর এড়ায় না এই কারণেই যে, শরিকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, এক শরিকের কাজে কোন অন্যায় ঘটলে অপর শরিক গর্জন করে ওঠে। এটাকে মোটেই আমরা অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার বলে মনে করি না। খুন-জখম কোথায় না হয়? সর্বত্রই তা ঘটে-পাইকারীভাবে, এবং সংখ্যা বা পরিমাণের দিক থেকে তা পশ্চিমবঙ্গের থেকে কোন অংশেই কম নয়। হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গে শরিকী দ্বন্দ্ব আছে, তাতে কিছু লোক প্রাণ হারিয়েছে। খুব সত্য কথা। তা ঘটা উচিত ছিল না এবং ঘটা উচিত নয়, এই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী সত্যাগ্রহ করতে চলেছেন। কিন্তু এগুলিকে কি সাধারণ অপরাধের পর্যায়ে ফেলা যায়? এগুলির সঙ্গে কি দক্ষিণ ভারতের ব্যাপক হরিজন হত্যার তুলনা করা চলে? আজ পশ্চিমবঙ্গের কৃষক-সমাজে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়েছে। বে-আইনী জমির মালিকেরা সহজে ধান ছাড়বে না, বলপ্রয়োগ করবে, কাজেই কিছু রক্তপাত ঘটবে, যদিও তা না ঘটা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা যদি ঘটেই তাহলে কি তা সাধারণ আইনশৃংখলা ভঙ্গের ব্যাপার হবে? এর কি কোন গভীরতর তাৎপর্য নেই? উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ঠিকই বলেছেন, "উনি আমেদাবাদের দিকেই দেখুন। পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃংখলার অবস্থা দেখা আমাদের ব্যাপার, তা আমরা বুঝব।"

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের আপাতত মৃত্যু ঘটছে না, এবং তার মৃত্যু ঘটাবার যে কোন চেষ্টাই এখন ব্যর্থ হতে বাধ্য, বরং দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্বই এখন পশ্চিমবঙ্গের সদিচ্ছার ওপর বহুলাংশে যে নির্ভরশীল, একথা যদি এখনো চ্যবন সাহেবরা বুঝে উঠতে না পেরে থাকেন, তাহলে তাঁদের কাণ্ডজ্ঞানের তারিফ করতে পারছি না। চোদ্দ দলের সরকারের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই মাঝে মাঝে ভুল বোঝাবুঝি ঘটবে, মাঝে মাঝে সংকট আসবে, কোন্ বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে দু দলের মূল্যায়ন সম্পূর্ণ উল্টোও হতে পারে; কিন্তু তাতে যুক্তফ্রন্ট ভাঙবে না। কেন না যুক্তফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে মাত্র কয় মাসের মধ্যে অনেক কিছুই করতে সক্ষম হয়েছে, সবচেয়ে বড় কথা যুক্তফ্রন্ট সংগ্রামী মানুষের হাতিয়ারে আজ পরিণত হয়েছে। তারচেয়ে বড় কথা পশ্চিম-বঙ্গ জেগেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে, দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাঝে মাঝে তীব্র হচ্ছে, সব স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, আজকে যুক্তফ্রন্টের শরিক সকল রাজনৈতিকদল এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যুক্তফ্রন্টকে শক্তিশালী করেই নিজেরা শক্তিশালী হতে চায়। যত দিন যাচ্ছে এই চাওয়াটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে, কাজেই পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃংখলার ধুয়ো তুলে আসর জমানোর চেষ্টা করা এখন নিরর্থক–এই কথাটা দিল্লীর কর্তারা স্মরণে রাখলে ভাল করবেন। একদা ঘেরাও-এর নামে প্রচুর সোরগোল তোলা হয়েছিল, ঘেরাও-এর নামে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের বাপান্ত করা একটা ফ্যাসান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আজ আর ঘেরাও-এর কথা বলে বাজার গরম করা যায় না, যদিও ঘেরাও এখনো ঘটে, নিয়তই ঘটছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয় ভারতের অন্যত্রও। অনুরূপভাবে আইনশৃংখলার ধুয়ো তুলে এখনো হয়ত দিল্লীর বাজার কিছুটা গরম করা যায় বটে, কিন্তু দু'দিন পরে এতেও চিঁড়ে ভিজবে না।

ধানের মরশুম

ধান কাটার সময়ে কিছু গণ্ডগোল হতে পারে এই আশঙ্কা গত সপ্তাহের বঙ্গদর্শনে করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গণ্ডগোল এড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, অজস্র ক্যাম্প কোর্ট বসানো হয়েছে, কোন বিরোধ দেখা দিলে ঘটনা-স্থলেই তা মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্তহীন ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, উদ্ধার করা বে-আইনী জমিগুলিতে যে চাষ করা হয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে যে বা যারা ফসল ফলিয়েছে ফসল ঘরে তোলার মালিক তারাই হবে। এ বিষয়ে সরকার সুস্পষ্ট-ভাবেই চাষীকে মদত দেবেন, বে-আইনী জমি যারা এতকাল দখল করেছিল তাদের নয়। অবশ্য যারা ওই সব বাড়তি জমি বে-আইনীভাবে এতদিন দখল করে রেখে-ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে, এবং এই সব মামলার ফয়সালা হতে বেশ কয়েক বছর লেগে যাবে। ততদিন তারাই ফসলের মালিক হবে যারা ওই সব জমিতে নিজের হাতে চাষ করেছে।

বলা বাহুল্য, জোতদার শ্রেণী সহজে এই ব্যবস্থাটাকে মেনে নিতে পারছে না, এবং তারা প্রকৃতপক্ষে সশস্ত্র প্রতিরোধে নেমেছে। বহু জোতদারের বাড়িতে বন্দুক আছে এবং তারা ধান কাটাকে কেন্দ্র করে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার করছে। গত ২০শে নভেম্বর তারিখে হাড়োয়া থেকে সাত মাইল দূরে কোপা গ্রামে একজন জোতদারের লোকজনের সঙ্গে চাষীদের সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষের সময় জোতদারেরা সাত আটটি বন্দুক ব্যবহার করে এবং তা থেকে পনের রাউণ্ড গুলী চালায় যার ফলে পাঁয়ত্রিশ-জন লোক আহত হয়েছে, তিনজনের অবস্থা গুরুতর। তার দুদিন আগে চব্বিশ পরগনারই মিন খাঁ নামক গ্রামে একদল জোতদার এক কৃষক জনতার ওপর দু দফায় কয়েকবার গুলীবর্ষণ করলে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। এই সব ঘটনাগুলিই প্রমাণ করে যে, জোতদারেরা সংঘবদ্ধভাবে মরিয়া হয়েই নিজেদের হারানো অধিকারকে ফিরে পেতে চেষ্টা করছে। জোতদারদের বন্দুকসমূহ সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করার যে প্রস্তাব উঠেছিল তা বাস্তবে কার্যকরী করা যায় কি না তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

সুখের বিষয় ধান কাটা উপলক্ষ করে শরিকী সংঘর্ষ এখন ততটা প্রকট নয়, অথচ এটাই আশঙ্কা করা গিয়েছিল। গত সংখ্যায় আমরা লিখেছিলাম যে, ধান-কাটার বিষয়কে উপলক্ষ করে বিভিন্ন দল যেসব এলাকায় তাদের সংগঠন নেই সেই সব এলাকায় অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করবে। এই আশঙ্কাটা মিথ্যায় পর্য-বসিত হলেই মঙ্গল। তবে ধান কাটার মরশুমের এই সূচনামাত্র। যদি যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক সত্যই কিছুটা আন্তরিক হন তা হলে অনেক অবাঞ্ছিত রক্তপাত এড়ানো যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে। সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকটি বই বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এর জন্য যাবতীয় ব্যয় সরকারের তরফ থেকে করা হবে। এছাড়া সারা পশ্চিমবঙ্গে সহস্রাধিক নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলারও একটা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা শুধু প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারই ঘটবে না, এর জন্য যে হাজার চারেক শিক্ষকের প্রয়োজন হবে তা পশ্চিমবাংলার ভয়াবহ বেকার সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান করবে। এছাড়া অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা-দানেরও একটা পরিকল্পনা সরকারের ঝুলিতে আছে। এগুলি থেকে নানা বিষয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সদিচ্ছা প্রমাণিত হয়। যে কাজগুলি বহু পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল, এতদিনে সেগুলিতে যে কিছুটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেটা খুবই আনন্দের বিষয়। বিগত বাইশ বছরের প্রচ্ছদপটে বিচার করলে এ কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে দুটি সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কংগ্রেসী আমলে শিক্ষা স্কুল বোর্ডগুলো গড়তে গেলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল, প্রাথমিক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা ও তাতে শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি সম্পূর্ণ-ভাবেই রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বারাই চালিত ছিল। এটাকে ঠিক যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু ব্যাপারটি সত্যই ছিল। বলা বাহুল্য এটা অন্যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এক অন্যায়ের প্রতিকার অপর অন্যায় দিয়ে হয় না। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ঠিক সেই একই মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হচ্ছেন। শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদির ব্যাপারে দলীয় আনুগত্য ইত্যাদিই দেখা হচ্ছে, যোগ্যতার ভিত্তিতে তা হচ্ছে না। আগেই বলেছি, এটাকে ঠিক যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিপাদন করা যাবে না। কিন্তু ব্যাপারটি সত্যই ঘটছে, ঠিক যেমন কংগ্রেসী আমলে ঘটত। এ বিষয়ে আমরা যুক্তফ্রন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বস্তুত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়েই আজ রাজনীতির ভূত প্রচুর পরিমাণে ঢুকেছে যার পরিণাম মোটেই শুভ হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত যে সমস্যাটি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অতি প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস। শিক্ষামন্ত্রী নিজে শিক্ষক ছিলেন কাজেই আশা করা গিয়েছিল যে সার্বিকভাবেই আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সমূহের সিলেবাস সংস্কার করে তাকে যুগোপযোগী করে তোলার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বারো ক্লাসের ফতোয়া দিয়েই তিনি কর্তব্য শেষ করলেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার কোন সামঞ্জস্য নেই, মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে কলেজী শিক্ষা সামঞ্জস্যবিহীন। অনাবশ্যক বোঝা ছাত্রছাত্রীদের মাথার ওপর চাপানো হয়েছে, অথচ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা হয়েছে। আমাদের মনে হয় একটি কার্যকরী পাঠক্রম প্রস্তুত করার সময় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়েছে এবং তা তৈরি করতে হবে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে।

ভারতদর্শন

এ-আই-সি-সির তলবী অধিবেশনে সমাগত নেতৃবৃন্দ

শ্রীমতী আলভা

১৯৫২ সালে রাজ্য সভার সদস্যা হওয়ার পর শ্রীমতী ভায়োলেট আলভা '৬৯ সাল পর্যন্ত এক নাগাড়ে সংসদীয় জীবনে আটকা পড়েছিলেন। '৬২ সাল থেকে '৬৯ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন ডেপুটি চেয়ারম্যানের চেয়ারে। ঐ চেয়ারটিও ছাড়লেন এবং বিনা রোগে অকস্মাৎ হৃদ্‌-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ছেড়ে গেলেন হিংসাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীর জল-হাওয়াও। ৬১ বছরে তাঁর এই অকস্মাৎ লোকান্তর-যাত্রা সকলকে স্তম্ভিত এবং মূহ্যমান করে দিয়েছে। একটি রাজ্যে শ্রীমতী আলভার এর পর রাজ্যপাল হওয়ার কথা ছিল। ভারতের সংসদীয় ইতিহাসের সঙ্গে শ্রীমতী আলভার জীবনও ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিল। শ্রীযুত আলভা নিজেও একজন এম-পি। আজ শোকার্ত। শ্রীমতী আলভার শান্তি কামনা করে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই।

যুদ্ধবিরতি

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্‌কাল থেকে এ পর্যন্ত টানা ঝঞ্ঝাবাত্যায় সাময়িক বিরতির যতি পড়ল। সিণ্ডিকেট পাকা-পোক্তভাবে সংসদের বিরোধী আসনে স্থান গ্রহণ করার পর এবং কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার ধাক্কাটা প্রাথমিকভাবে সামলে ওঠার শেষে। ইতিমধ্যে ইন্দিরা সরকারকে বেকায়দায় করার এস এস পি-স্বতন্ত্র-জনসঙ্ঘ-সিণ্ডিকেট জোটের ক্রিয়া-কলাপ যদিচ কোনো উদ্বেগের সৃষ্টি করে নি, আপামর জনসাধারণের কৌতূহল আকৃষ্ট অবশ্যই করেছিল। এতৎ সত্ত্বেও কিন্তু ঘট ওলটায় নি। ইন্দিরা গান্ধী যথাপূর্বং প্রধানমন্ত্রী তো আছেনই, এমন কি জওহরলাল যেমন একাধারে প্রধান-মন্ত্রী এবং কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন, শ্রীমতী গান্ধীর কাছে অনুরূপ দ্বিতীয় নজির সৃষ্টির প্রস্তাবও এসেছে তবে তিনি নাকি অসম্মত। শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতিত্বেও ইতিপূর্বে আসীন হয়েছিলেন, অফিসটা সুতরাং তাঁর অজানা নয়, তবু যা জওহরলালের সাজে, সকলকেই তাই সাজালে বেমানান হতে পারে। সুতরাং কংগ্রেসের তলবী সভায় নতুন সভাপতি নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী যদি প্রার্থী না হন তাতে ভাল বই খারাপ হবে না। আজ শুক্রবার, আগামী-কাল এ আই সি সির ৭০০ সদস্যের ৪৪০ জনই তলবী বৈঠকে আগামীকাল যোগ দিচ্ছেন বলে সংবাদ।

অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই, স্বয়ং নিজ-লিঙ্গাপ্পার কাছেও আমন্ত্রণপত্র যাচ্ছে, তলবী সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য। বলা বাহুল্য, উনি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারবেন না। ওঁর দলের নতুন নামকরণ হতে চলেছে; নাম হবে কংগ্রেস সংসদীয় দল (সংগঠন)। জনান্তিকে বলে রাখা ভাল, বেশ ভেবে-চিন্তেও এই নামটির উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি কিম্বা ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যগত অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারি নি। যাক, সবটাই যখন ধোঁয়াটে, তখন নামে আর কি আসে যায়।

রাজ্যে রাজ্যে শিবির সাজছে

যা বলছিলাম, রণক্ষেত্রে দেবী দুর্গাকে পাঠাবার সময় কে কোন অস্ত্রাদিতে তাঁকে বিভূষিত করেছিলেন আকাশবাণীর কল্যাণে অনেকেই তা জানি; সংবাদে প্রকাশ শ্রীমতী গান্ধীর বাহুবল লোক-বলের যোগান আসছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে এইভাবেঃ—পশ্চিমবঙ্গ দিচ্ছে ৬১-তে ২৪ জন। আসাম, ২৯-এ ১৬। উড়িষ্যা, ২৩-এ ২০। বিহার ৭২-এ ৪২। উত্তর-প্রদেশ, ১১৭ জনের মধ্যে এ পর্যন্ত সই করার খবর আছে ৪৫ জনের। দিল্লী ৭-এ দুই। মধ্যপ্রদেশ; ৪৩-এ ৪১। হরিয়ানা, ১২-য় ১০। পাঞ্জাব, ২১-এ ১১। রাজ-স্থান; ৩৫-এ ৩০। মহারাষ্ট্র, ৫২ জনে পঞ্চাশজনাই। গুজরাটে, বলা শক্ত, ৩৪-এ ৩ জন তলবী সভার পক্ষে এ পর্যন্ত ঘোষণা। কেরল, ২৮-এ ১৬। মহীশূর গুজরাটের অনুরূপ। অন্ধ্র, ৫২ জনে ৪৭। বোম্বাই, ১১ জনে ৬ জন। তামিলনাড়ু—১৬। মণিপুর থেকে ৬-এ ১ জন। আর গোয়া, দমন, দিউ দিচ্ছে প্রত্যেকটি সদস্য। মহারাষ্ট্রে যে দুজন গান্ধীপন্থী রইলেন তাঁদের একজন এককালে সোস্যালিস্ট ছিলেন, সেই অশোক মেহতা মহাশয়।

উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী

ওদিকে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিসভায় অনিবার্য তোলাপড়া শুরু হয়েছে। চন্দ্র-ভান গুপ্ত আড়ালে দিয়ে পুরোপুরি সরে থাকতে পারলেন না তাঁর সিণ্ডিকেটী মিত্রদের ইন্দিরা-বিরোধী শ্বাস-প্রশ্বাসের আবহাওয়া থেকে। সুতরাং অনিবার্য ফল-শ্রুতি আর রোধ করা গেল না। ইন্দিরা-পন্থী প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান ত্রিপাঠী সহ সাত সাতজন মন্ত্রী দমাদম পদত্যাগ করে বসলেন। ব্যাপারটা ঘটল দিল্লীতে প্রধান-মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর শ্রীত্রিপাঠীর

প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই। ফলত গাপ্পাজীর একমাত্র অস্ত্র ঝণৎকারও সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল। সাসপেনসন। ত্রিপাঠী আর বহুগুণা সাসপেন্ড হলেন (এ এক মজা বটে, বর্তমানে ৭০০-র সাড়ে চারশই ইন্দিরা কংগ্রেস—সকলকে এক কোপে সাসপেন্ড করলেই বা কী আসে যায়। তবে গাপ্পাজী আইনত পর পর সাসপেন্ড করে যাবেনই, যতক্ষণ না আর একজন সভাপতি আসছেন।) তা নতুন সভাপতি নির্বাচনে গাপ্পাজীকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আহবান জানিয়েছেন তলবী সভার উদ্যোক্তারা। গাপ্পাজীর জন্যে একটা মানানসই বড় ব্যাজও রেডি আছে। এখন কর্তার ইচ্ছা।

যাক, উত্তরপ্রদেশের অবস্থাটা তাহলে দাঁড়াল কেমন? সি বি গুপ্ত বলছেন, কুছ পরোয়া নেই। নয়া মিনিস্টার আসবে। ক্যাবিনেটের ওসারও বাড়বে। অর্থাৎ হারাধনের ছেলে-হারানই সব নয়, পোষ্য-পুত্র গ্রহণের ১৯৬৭-তক' রেওয়াজে সি বি গুপ্তকে এখন ঠেকাবেন কে। ক্যাবিনেটে মন্ত্রী বাড়িয়ে সভা চালাবার অত্যাধুনিক হরিয়ানী চালটাও চালু হবে। তাই 'রাজ্যের স্বার্থে (?)' মধ্যবর্তী নির্বাচনটা যে গুপ্তজী অপছন্দ করবেনই তাতে আর সন্দেহ কি। তিনি আশা করেন, মন্ত্রিসভার সংখ্যাধিক্য তিনি বিধানসভার অধিবেশনই যাচাই করিয়ে দেবেন। কিন্তু কবে? ফেব্রুয়ারীর আগে সভা ডাকা হবে বলে মনে হয় না। তবে বহু উচ্চারিত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ব্যবস্থা গঠনের পক্ষে সি বি গুপ্ত এই প্রথম পরিষ্কার আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, ঐক্য বজায় রেখে 'মন্ত্রিত্ব করলে' সমাজতন্ত্রের মেওয়া তিনিই প্রদেশবাসীকে উপহার দেবেন! অন্যদিকে ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিং তাঁর বি-কে-ডি নিয়ে এখনও বাতি জেলে বসে আছেন। কংগ্রেসী ঘর ভেঙে পড়ার পর ইন্দিরাপন্থীরা তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করে সরকার গঠনের চেষ্টা করতে পারেন বলেও অনেকের ধারণা শেষ বেশ যাস্তবরূপ নিতে পারে। মোদ্দা কথা যখন মন্ত্রিত্ব করা, তখন সি বি গুপ্ত যেমন ভোকাট্টা ঘুড়ির সন্তোষ নতুন ঘুড়ি যোজনা করবেন, তেমনি ত্রিপাঠীও নিশ্চয় হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। অতএব শুরু হল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের হর্স-রেশ। '৬৭ টু '৬৯ দেশে মন্ত্রিসভা ভাঙাগড়া হচ্ছে। কেরলে অ-মার্ক্সবাদী অ-কংগ্রেসীরা ভেঙে গড়েছেন, উত্তরপ্রদেশে এবার দুই কংগ্রেস কোমর বাঁধল। পশ্চিমবঙ্গের ওপরও ভাঙাগড়ার কোপ মুখিয়ে আছে।

বিহারে গাপ্পাজীর সবুজ সঙ্কেত পেয়েও কিন্তু হরিহর সিং-এর আশা পূরণ হয় নি। সি বি গুপ্তের ভবিষ্যৎও অবশ্যই অনিশ্চিত রয়ে গেল।

কালা কানুন

পি ডি এ্যাক্ট অর্থাৎ বিনাবিচারে আটক রাখার সেই কালা কানুন থাকছে না যাচ্ছে ৩১শে ডিসেম্বরের পর, তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে চতুর্দিকে। আগে হলে কেবলমাত্র হা-হুতাশই হত। কারণ ভোটের জোরে কংগ্রেস সরকার আগে সোচ্চার বিরোধিতার মধ্যেও এই কালা কানুন পাশ করিয়ে নিয়ে গেছে সোল্লাসে। তখনও ছিলেন চ্যবন। এখনও তিনিই। তবে বড় বেকায়দা। নিজলিঙ্গাপ্পা গ্রুপ পর্যন্ত এবার 'প্রগ্রেসিভ' হয়ে ওঠায় এই কানুন চ্যবন সাহেবের পক্ষে এবার পাশ করিয়ে নিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হবে না। শোনা যাচ্ছে, সি পি এম-এর কোন এক নেতা যেন ঐ কালা কানুনের পক্ষে আওয়াজ তুলেছেন। দল হিসেবে সি পি এম কালা কানুনের পক্ষাবলম্বী হবে এটা স্বপ্নেরও অতীত। হলে, লজ্জা রাখার আর জায়গা থাকবে না।

কালা কানুন তুলে নেওয়ার দাবি আমাদের চিরকালের। শ্রীমতী গান্ধীর সরকার ওটা তুলে নিলে তাঁর বর্তমান ইমেজটুকু আর একটু উজ্জ্বল করতেই পারবেন। অবশ্য বিরোধী পক্ষ গাপ্পা গ্রুপ সহ কালা কানুনের এবার যদি বিরোধিতা করেন তবে আর প্যাটেল সাহেবের আমলে চাপিয়ে দেওয়া ঐ বদ কানুনটি এবার চ্যবন সাহেব হেসে হেসে পাশ করিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না। চ্যবন সাহেবও তো বর্তমানে 'প্রগ্রেসিভ' হয়েছেন (আর কেই বা নন?)। সুতরাং আর কেন। হামলা রুখতে নতুন একটা হামলা কানুন তৈরি হোক। রাগ-বিরাগ থাকলেই পেয়াদা পাঠিয়ে আটক করব, এই জমিদারী মনোবৃত্তিটা আর কোনও সভ্য সাবালক সরকারের শোভা পায় না।

ও পাপ উঠেই যাক।

হায় সোস্যালিস্টস

সমাজতন্ত্রী শব্দে জাতিব করব আব তলে তল স্বতন্ত্রী জনসঙ্ঘী সিণ্ডিকেটীদের পোঁ ধরব, এস এস পি নেতৃত্বের একাংশের এ হেন মনোভাবে দলের অনেকের মধ্যেই যে বিক্ষোভের স্ফুরণ দেখা দিচ্ছে, জর্জ ফার্নাণ্ডেজ মহাশয় প্রশ্নোত্তরকালে তার একটা ঢাকঢাক গুড়-গুড় জবাব দিয়েছেন। তাঁর মতে, ওটা কিছু নয়, দল ওতে ভাঙবে না। ইন্দিরা গান্ধীর সরকারই যা এমন কি ধোওয়া তুলসী হল যে তাকেই সমর্থন করতে হবে। হাঁ সোস্যালিস্ট (?)দের প্রোগ্রাম মেনে নাও, আমরা আছি। কিন্ত দিন আগত যখন ঐ গান্ধী সরকারের মুখোশও খুলে পড়বে।

কথাগুলো চমৎকার সন্দেহ নেই। কিন্তু ফার্নাণ্ডেজের বক্তব্যে কী আর এমন চেকনাই আছে যা বিশ্বভুবনে আর কেউ বুঝতে অক্ষম বা টের পান নি। ত্রিভুবনে এস এস পি-র ফার্নাণ্ডেজী নেতৃত্ব একটা বিস্ময়কর পলিটিক্স করছে কি? যদি বলা যায়, হ্যাঁ! তবে বলতে হবে বিস্ময় এই যে সোস্যালিস্ট নামাবলী চাপিয়ে সাহেব সিণ্ডিকেটের সঙ্গে যেভাবে করমর্দনের ঘটাপটা শুরু করেছেন তাতে বিস্ময়ে বস্তুতই হতবাক হতে হয়।

আর যদি বলা যায়, না! তবে স্বীকার করতেই হবে, সিণ্ডিকেটের প্রভাবমুক্ত হয়ে যে গান্ধী সরকার বর্তমানে বিরোধীদের সমর্থনধন্য হয়েছে, সে সরকার যে রাতারাতি দেশের অর্থনীতির ভোল পাল্টে দেবে এমন দুরাশা ফার্নাণ্ডেজ কেন, রাস্তার সবচেয়ে অজ্ঞ লোকটিও করে না। তবু কেন সমর্থন, এ প্রশ্নের জবাব পরিষ্কার জলবৎ তরলম যা সাহেবের পলিটিকেল ব্রেন ঠিক ধরতে পারছি না—আশ্চর্যের কথা! সোজা কথা হল, মন্দের ভালকে কে না চায়। সোজা কথা হল, ফ্যাসিস্ট রাজ থেকে সাম্রাজ্যবাদকে একদিন দুনিয়ার মানুষ যেমন রক্ষা করতে গেছিলেন, এ-ও একরকম তাই-ই। সবচেয়ে সহজ কথা হল, শ্রীমতী গান্ধী দেশের লোকের কাছে কিছু প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। তাঁকে সেগুলি রূপায়ণের কাজে সাহায্য করার জন্যই সমর্থনের প্রয়োজন। ফার্নাণ্ডেজ মহোদয় সেই সব প্রতিশ্রুতির চেহারা দেখে কেন যে ঘাবড়ে যাচ্ছেন, তারই কোন ব্যাখ্যা নেই। বিশেষত তিনি যখন আবার সোস্যালিস্ট!

এস এস পি ভাঙবে কি ভাঙবে না সেটা বড় কথা নয়। বড় প্রশ্ন হল, লোকসভায় এস এস পি সদস্যদের একটি অংশ ঐ সাহেবী প্রত্যয়ে অবিশ্বাসী। শ্রীযুত এস এম যোশী ও তাঁর গ্রুপ দলের ইন্দিরা-বিরোধী নীতিতে সায় দিতে পারছেন না। রাজ্যে রাজ্যেও দলের মধ্যে মতভেদ চাড়া দিচ্ছে। সাহেব (দলের সাধারণ সম্পাদক) অতএব বে-কায়দা বুঝে কবুল করেছেন যে, দলীয় নীতির (ইন্দিরা সরকারের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে) একটু বিশ-পঁচিশ অদল-বদল করতে হবে। সে কারণে জানুয়ারীতে দল একটা বৈঠকেও বসবে।

দেরিতে হলেও সঠিক কাজ হওয়া ভাল। ফার্নাণ্ডেজ সাহেবদের 'পলিটিকিং'-এ নতুবা দেশবাসীর চক্ষু চড়কগাছে চড়বে। আর যাই হোক, সাহেব বুঝবেন, গাপ্পা-যুগ গত জ্যোতি। ও লাইনে পা বাড়িয়ে যে ভবিষ্যতের তিনি স্বপ্ন দেখছেন তা অর্জন করা অতঃপর খুব শক্ত।

—২১।১১।৬৯

আন্তর্জাতিক

ভিয়েৎনামে মার্কিন নৃশংসতা :

ভিয়েৎনামের শান্তিপ্রিয় নরনারী এবং শিশুর ওপর মার্কিন সেনাবাহিনীর অমানুষিক উৎপীড়ন নতুন কাহিনী নয়। ক্ষুদ্র ভিয়েৎনামকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার বাসনা নিয়ে আমেরিকা সেখানে লড়াইয়ে নেমেছিল। কিন্তু মুক্তিকামী মানুষের কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে আমেরিকা একেবারে ল্যাজে-গোবরে হয়ে গেছে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে তার বড় বড় সেনাবাহিনী এবং বিরাট বিরাট ধনভাণ্ডার। আজ আমেরিকা অনিবার্য পরাজয়ের সম্মুখীন। যুদ্ধে যতই সে কাহিল হয়ে পড়ছে, ততই সে মরীয়া হয়ে ভিয়েৎনামে ব্যাপক গণহত্যায় আত্মনিয়োগ করছে। নাপাম বোমা, বিষাক্ত জীবাণু এবং আরও অনেক নিষিদ্ধ অস্ত্র প্রয়োগ করে ইতিমধ্যেই সে বিশ্ববাসীর ধিক্কারের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাতেও তার বিবেক জাগ্রত হচ্ছে না। মার্কিন ফৌজের নৃশংস হননবৃত্তি হিটলারের ফ্যাসিবাদী নৃশংসতাকেও ম্লান করে দিয়েছে। বাইরের লোক যখন সেই সব নিষ্ঠুর গণহত্যার কাহিনী প্রকাশ করেন, তখন আমেরিকা সেগুলোকে "অপপ্রচার" বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিগত কিছুকাল যাবৎ খোদ আমেরিকার স্পষ্টবাদী সাংবাদিকরাও মার্কিন ফৌজের অপকীর্তি প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করছেন না। সম্ভবত তাঁদের বিবেক এখনও পেন্টাগনী মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয় নি। সম্প্রতি ক্লিভল্যান্ডের "প্লেন ডিলার" পত্রিকা ভিয়েৎনামে মার্কিন সভ্যতা বিস্তারের যে ভয়াবহ এবং বীভৎস কাহিনী ফটো সহ প্রকাশ করেছেন, তাতে সভ্য মানুষ আতঙ্কে শিউরে না উঠে পারবেন না। রোনাল্ড হেবেরি নামক ২৮ বৎসর বয়স্ক একজন ফটোগ্রাফার ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সঙমাই নামক শহর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখতে পান মার্কিন ফৌজ মেসিনগান আর হাতবোমা চালিয়ে সেই গ্রামের নিরীহ নারী এবং শিশুদের দল বেঁধে হত্যা করছে। সঙমাই গ্রাম ভিয়েৎকঙের প্রতি সহানুভূতিশীল সন্দেহ করেই নাকি এই গণহত্যার ব্যবস্থা করা হয়। হেবেরির যে সমস্ত ফটোগ্রাফ "প্লেন ডীলার" পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৫।১৬টি অসামরিক নাগরিকের মৃতদেহ রাস্তার ধারে পড়ে আছে। একটি গৃহের দরজায় একজন পুরুষ এবং একটি শিশুর মৃতদেহ পড়ে আছে। একজন মার্কিন সৈন্য মৃতদেহ পরিবেষ্টিত একটি জ্বলন্ত কুটীরের আগুনে একটা মুড়ি ছুড়ে দিচ্ছে।

নিউজার্সিতে জনৈক মার্কিন সার্জেন্ট রয়টারের প্রতিনিধির কাছে বলেছেন যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সঙমাই গ্রামে তাঁর সহকর্মীরা অত্যধিক নিরীহ মানুষকে দলবদ্ধভাবে খুন করেছিল। সে দৃশ্য তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন।

রোনাল্ড হেবেরির এই সচিত্র কাহিনী প্রকাশ হবার পর সারা দুনিয়ায় মার্কিন নৃশংসতার বিরুদ্ধে নতুন করে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। গত ২০শে নভেম্বর বৃটিশ পার্লামেন্টেও বিষয়টি নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা হয় এবং বিভিন্ন সদস্য মার্কিন ক্রিয়াকলাপে আতঙ্ক প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনকে এই মর্মে অনুরোধ করা হয় যে, আগামী বছর প্রেসিডেন্ট নিক্সন যখন বিলাত পরিদর্শনে আসবেন, তখন যেন তিনি (উইলসন) এই ব্যাপক নারী ও শিশু হত্যার প্রতিবাদ জানান। বিষয়টি নিয়ে পার্লামেন্টে পুরোদস্তুর আলোচনার দাবি উঠলে প্রধানমন্ত্রী উইলসন বলেন যে, ভিয়েৎনামে অতি গুরুতর কয়েকটি ঘটনার কথা তিনি জানতে পেরেছেন। তার এক-চতুর্থাংশও যদি সত্য হয়, তাহলে ব্যাপারটাকে নৃশংস উৎপীড়ন বলতে তাঁর আপত্তি নেই। বিষয়টা আমেরিকারই তদন্ত করে দেখা

কয়েকখানি বিখ্যাত বাংলা অনুবাদ

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ		
মোহক ভ্যালিতে রণবাদ্য	— এডমণ্ডস্	৯.২৫
দগ্ধতিক্ত	— ইউজিন ও'নিল	৩.০০
উদারপন্থী বিবেক	— চেস্টার বোলজ	৫.০০
বাক্-সাহিত্য		
বিচার	— ম্যার্ক্স হেওয়ার্ড	৪.০০
স্বপ্ননগরী	— আন্দ্রে সিনইয়াভস্কি	৩.০০
মিত্রালয়		
জীবনের অভিযান	— হেনরী জেম্স	৫.০০
মবিডিক	— হারমান মেলভিল	৫.০০
মহানদের পাঁচালী	— মারক টোয়েন	৫.০০
রূপা এণ্ড কোং		
প্রেম এক স্বপ্ন	— হেনরী জেম্স	৪.৫০
স্বাদশ দুর্গ	— প্যাডোভাস্ক	৪.৫০
প্রেসিডেন্ট নিক্সন	— মোজো ও হেস	৩.৫০
সাহিত্যায়ন		
আদালতের ঘণ্টা	— জন হার্সি	৪.০০
অতৃপ্তির অমানিশা	— স্টাইনবেক	৩.০০
সাদা হরিণ	— জেমস থারবার	৩.০০
পলাতকা	— পাবল বাক	৩.৫০
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং		
আমাদের শহর	— থর্নটন ওয়াইলডার	২.০০
ফেমেন্ডি মানস	— পেডাব সেন	৩.০০
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির		
সবাই যেথা স্বাধীন	— মিডোক্রফট	২.৫০
অ্যাডভেঞ্চারস অব হাকলবেরি ফিন	— মারকটোয়েন	৫.০০
মানুষের কাহিনী	— ভান লুন	৭.৫০

নানা বিষয়ে আরো অনেক বই : তালিকা চেয়ে পাঠান :

পুস্তক বিক্রেতাদের উচ্চ কমিশন আজই অর্ডার দিন

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলি-১২

নিকসন

উচিত। ঘটনাগুলো সত্য হলে বৃটেনের অধিবাসীদের পক্ষে আতঙ্কবোধ না করে উপায় কি। ইউ-পি-আই-এর এক সংবাদে প্রকাশ, হ্যারল্ড উইলসন ভিয়েৎনামে এই নিষ্ঠুর গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে প্রতিবাদ জানাতে পারেন।

এমন কি আমেরিকার রিপাবলিকান সিনেটর চার্লস গুডঅলও এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত দাবি করেছেন। কোন কোন মহলের ধারণা, সেই হত্যাকাণ্ডে মৃত্যুর সংখ্যা ১০০ নয়, ৫৬৭ জন। মস্কো অভিযোগ করেছে যে, আমেরিকা এই ভয়াবহ অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই আগাগোড়া চেষ্টা করছে। এখন বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ব্যাপক অপপ্রচারের আয়োজনে ব্যস্ত।

এদিকে সিঙ্গাপুরের এক সংবাদে জানা গেছে যে, ভিয়েৎনাম থেকে মার্কিন সেনাবাহিনী সরিয়ে নেবার গুজব রটায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সেনাবাহিনীর সৈনিকরা দলে দলে পালাতে শুরু করেছে। এ বছরের প্রথম ৯ মাসে ৩ হাজারের বেশি দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈনিক দল ত্যাগ করে উত্তর ভিয়েৎনামে চলে গেছে। তিনটি সিভিল ডিফেন্স প্লেটুন অস্ত্রশস্ত্র সহ উত্তর ভিয়েৎনামীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সেনাবাহিনীতে মাঝে মাঝে বিদ্রোহও দেখা দিচ্ছে। দা-নাঙ এলাকায় গত ১০ মাসে দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্যরা বিদ্রোহ করে ৩১২ জন মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্যকে হত্যা করেছে। নিহতদের মধ্যে ৪ জন মেজরও আছেন, বিনদিন এলাকার ফৌজী বিদ্রোহে মারা গেছে ৪০৫ জন মার্কিন এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্য। ব্যাপার দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে ভিয়েৎনাম থেকে মার্কিন সৈন্য সরিয়ে সেই জায়গায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্য মোতায়েন করার যে মতলব নিক্সনের মাথায় ঘুরছে, সেটা বানচাল হতে বাধ্য।

ইরাকে গুপ্তচর :

গত কয়েক মাসে ইরাকে ইজরাইলের বহু গুপ্তচর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। সেই ব্যাপক গুপ্তচর নিধন কোন কোন মহলে দারুণ অস্বস্তি সৃষ্টি করেছিল। ফলে কিছুকাল গুপ্তচরদের বিচার স্থগিত রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি সেখানে একজন ইহুদী সহ মোট আটজন গুপ্তচরের ফাঁসি হয়েছে বলে জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়া একজন কয়েদী জানিয়েছে। সেই প্রাক্তন কয়েদী আরও জানিয়েছে যে, ইরাকের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আবদুল রহমান বাজাজ বর্তমানে জেলে ৩০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ইরাকী সরকার উচ্ছেদের চক্রান্তের অভিযোগ আনা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে একটা মামলা এখনও বিচারাধীন। তিনি নাকি মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সি আই-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী কুর্দিশ বিদ্রোহীদের যোগসাজসে বিদ্রোহের চক্রান্ত করেছিলেন। ৫৭ বৎসর বয়স্ক জাহাজ ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে তিনি সেই পদ ত্যাগ করেন। তখন ইরাকের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আবদেল সালাম মারেক।

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সপ্তাহে কৃত্তিবাস ওঝার 'সপ্তাহের বোকা' ও সমীর মুখোপাধ্যায়ের 'অন্য গ্রাম অন্য তরংগ' প্রকাশ করা গেল না। আগামী সংখ্যায় এই ফিচার দুটি যথারীতি প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদিকা

অগ্নিগর্ভ পাকিস্তান :

পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ভাষা দাঙ্গা (উর্দুভাষী বনাম বাংলাভাষী)টাকে দেশের গণবিক্ষোভ দমনের কাজে ব্যবহার করবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক কর্তারা খুবই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা বোঝাতে চাইছিলেন যে, বাঙালীদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি আসলে ইসলামের পরিপন্থী। তাই পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রে পূর্ব পাকিস্তান উর্দুভাষীদের ওপর তথাকথিত উৎপীড়নের কাহিনী খুব ফলাও করে ছাপা হতে থাকে। তাছাড়া চরম প্রতিক্রিয়াপন্থী জমাত-ই-ইসলামীর গুণ্ডাদেরও অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তারা রটাতে আরম্ভ করে যে, পাকিস্তান সমাজতন্ত্র বনাম ইসলামের লড়াইয়ের চরম পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। কিন্তু এই সব অপপ্রচার ফলপ্রসূ হয়েছে মনে হয় না। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিকশ্রেণী এই অপপ্রচারে কান দেয় নি। পাকিস্তানের ডিক্টেটররা বরাবরই পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে ভয় পান বেশি। কিন্তু এবার তাঁদের বিপদ দেখা দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানেই। পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিকশ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবীরাই ডিক্টেটর আয়ুব খাঁর পতন ঘটিয়েছিলেন। এবারও ইতিহাসের গতি সেই পথেই অগ্রসর হবে বলে মনে হচ্ছে।

করাচীতে এখন শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক ধর্মঘট চলছে। বন্দর-শ্রমিকদের জমায়েতে গুলী চালাতে হয়েছে। সুতীকল শ্রমিকরা সামরিক আইন উপেক্ষা করে বড় বড় বিক্ষোভ-মিছিল বার করছেন। মিছিলে যোগ দিলে ৮।১০ বছর জেল হতে পারে জেনেও হাজার হাজার শ্রমিক রাজপথে বেরিয়ে পড়েছেন। ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু তাতে কেউ ভয় পাচ্ছে না। ধর্মঘটী শ্রমিকদের 'শায়েস্তা' করার ব্যাপার নিয়ে সামরিক শাসকদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে। সাধারণ সৈনিকরা নাকি জনপ্রিয় গণ-আন্দোলনের ওপর দমননীতি চালাতে অনিচ্ছুক।

পশ্চিম পাকিস্তানে বর্তমানে ধর্মঘটের যে ঢেউ এসেছে তাতে শহরাঞ্চলের ৩৫ শতাংশ শ্রমিকই জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের দাবি-দাওয়া শুধু অর্থনৈতিক নয়। গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাঁদের প্রধান দাবি। পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়নের নেতা মির্জা ইব্রাহিম বলেছেন, "অর্থনৈতিক অধিকারের দাবি রাজনৈতিক মুক্তির দাবির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই করা কঠিন কারণ পাকিস্তানের শাসকরা মালিকশ্রেণীর রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।"

এই আন্দোলন কি রূপ পরিগ্রহ করবে, তা পরিষ্কার নয়। জাতীয় আওয়ামী পার্টি এবং পিপলস পার্টি শ্রমিকদের আন্দোলনে মদত দিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে জামাত-ই-ইসলামী এই আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন। আসগর খাঁর পি-ডি-এফ এবং দৌলতানার মুসলিম লীগ মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছেন।

স্বাস্থ্য বিভাগের প্রমোশন রহস্য

সুনীল ঘোষ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

স্বাস্থ্যদপ্তরে শিক্ষকতার কাজে নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রার্থীর একাডেমিক গুণাবলী আরও ভালভাবে পরীক্ষা করা উচিত বলে গতবার আমি যে মন্তব্য করেছিলাম, তাতে অনেকের ধারণা হয়েছে, ডাক্তারদের স্বঘোষিত গুণাবলী সম্পর্কে আমি বোধ হয় সন্দেহ পোষণ করি। হ্যাঁ, আমি সন্দেহই পোষণ করি। কারণ চিকিৎসাশাস্ত্রে জাল-জালিয়াতির নজির কিছু কম নেই। কলকাতার জনৈক প্রাক্তন মেয়রের জামাতা কিভাবে জাল সার্টিফিকেটের জোরে বিরাট প্র্যাকটিশ জমিয়ে ফেলেছিলেন, তা কারও অজানা আছে বলে মনে হয় না। সেই ভদ্রলোক মেডিক্যাল শিক্ষালয়ে ছাত্র হিসাবে প্রবেশের কোন সুযোগ কখনও পান নি। কিন্তু জাল সার্টিফিকেট যোগাড় করে তিনি ডিসপেনসারী খুলেছিলেন এবং পসার জমাতেও তাঁর বিশেষ কষ্ট হয় নি। পরে পাড়াপড়শীর চেষ্টায় তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

কয়েক বছর আগে পার্শ্ববর্তী একটি রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ থেকে বাঙালী শিক্ষক বিতাড়নের হুজুগ উঠেছিল। বহু বাঙালী শিক্ষক তখন চাকরি ছেড়ে দেন। তাঁদের শূন্য আসনগুলো তাড়াহুড়ো করে অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা হয়। পরে দেখা যায়, নতুন শিক্ষকরা অনেকেই জাল সার্টিফিকেট দাখিল করে ঐ পদগুলো দখল করে নিয়েছেন। তখন আবার বাঙালী শিক্ষকদের ডাক পড়ে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য যেসব উচ্চ-পদাধিকারী চিকিৎসককে রাইটার্স বিল্ডিংসে এনে তাঁর পরামর্শদাতা বানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্তত একজন যে জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্ত, তাও বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। সুতরাং আমার সন্দেহ মোটেই অযৌক্তিক নয়।

মনে পড়ছে, কয়েক বছর আগে মানস রায়চৌধুরী নামক একজন তরুণ প্রতিভাবান ডাক্তার হাসপাতালে একজন অজ্ঞাত রোগীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। দুরন্ত ভাইরাসের আক্রমণে মুমূর্ষু সেই রোগীর দূষিত রক্ত মানসবাবু নিজের মুখ দিয়ে টেনে বার করতে গিয়েছিলেন। তাতে তিনি সেই ভাইরাসের শিকার হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। সেই মহৎ আত্মদান অবিস্মরণীয়। স্বাস্থ্যদপ্তর এবং ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন মানসবাবুর স্মৃতি রক্ষার কি ব্যবস্থা করেছেন জানি না। কিছু একটা করা যে উচিত ছিল, সে বিষয়ে আমার সঙ্গে সকলেই একমত হবেন বলে আশা করা যায়। মানসবাবুর মত আত্মত্যাগী মানবসেবাপরায়ণ ডাক্তারের সংখ্যা স্বাস্থ্যদপ্তরে যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল এবং এই ধরণের ডাক্তারদের পদোন্নতির বিশেষ সুযোগ পাওয়া উচিত বলেই আমার মনে হয়।

সাপ্তাহিক বসুমতীতে স্বাস্থ্যদপ্তরের পদোন্নতি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পর এ সম্পর্কে সরকারী চিকিৎসকরা বেশ সজাগ হয়ে পড়েছেন। ২১শে নভেম্বর কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার খবর দিয়েছেন, "সরকারী চিকিৎসকরা সম্প্রতি প্রমোশন পদ্ধতি সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করে স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে অভিযোগ করেছেন যে, বর্তমান প্রমোশন পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। প্রথা অনুযায়ী একটি প্রমোশন কমিটি চিকিৎসকদের গুণগত যোগ্যতা ও সিনিয়রিটির বিচার করে প্রমোশনের সুপারিশ করে থাকেন। সেই কমিটিতে পাঁচটি সরকারী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগের ডীন, রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং চিকিৎসা বিষয়ের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি আছেন। কিন্তু সম্প্রতি রাজ্য সরকার, প্রমোশনের বিষয়টি একটি নবগঠিত রিভিউ কমিটির (সেল নামে পরিচিত) ওপর ন্যস্ত করেন। এই কমিটি সম্প্রতি যেসব প্রমোশনের সুপারিশ করেছেন, তা ত্রুটিপূর্ণ বলে চিকিৎসকরা অভিযোগ করেছেন। তাঁরা আরও অভিযোগ করেছেন যে, কয়েকজন যোগ্য সিনিয়র চিকিৎসকের প্রমোশন নাকি এই কমিটি সুপারিশ করেন নি।"

এই সংবাদের ওপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সরকারী ডাক্তারদের জন্য সুবিচার আদায়ের প্রচেষ্টায় সাপ্তাহিক বসুমতী যে সাফল্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, উপরোক্ত সংবাদটি তার প্রমাণ।

এবার আসুন, সার্জারী বিভাগের

প্রমোশনের সুপারিশগুলো একবার পর্যালোচনা করে দেখা যাক। একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি সার্জারী বিভাগে যেসব প্রমোশনের সুপারিশ করেছিলেন, তাঁদের তালিকা নিচে দেওয়া হল:

এসোঃ প্রফেসর

(১) অশোককুমার বাগচী।

রীডার

(১) গুরুকৃপা চৌধুরী, (২) ভবানী ভট্টাচার্য, (৩) অঞ্জলি মুখার্জী, (৪) অশোককুমার ব্যানার্জী, (৫) প্রদীপ মজুমদার, (৬) রণেন্দ্রনাথ রায়।

সহকারী প্রফেসর

(১) সরোজভূষণ বোস, (২) প্রণব মুখার্জী, (৩) বারীনকুমার দত্ত, (৪) এম ব্যানার্জী, (৫) বিনয়গোপাল চক্রবর্তী, (৬) অজয়কুমার চন্দ, (৭) ব্রজগোবিন্দ সাহা, (৮) অমিয়কুমার চক্রবর্তী, (৯) উদয়শঙ্কর অরোরা, (১০) সৌমেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, (১১) অজয়কান্তি পোদ্দার, (১২) অমিত গাঙ্গুলী।

লেকচারার

(১) অমরেন্দ্র দে (২) সরোজ নিয়োগী (৩) সলিল মুখার্জী (৪) দুর্গাদাস সেনগুপ্ত (৫) অমলেন্দু গুপ্ত (৬) হরিপদ পোইন (৭) অজিত ঘোষ (৮) মীরা সেন (৯) একেন্দ্র ঘোষ (১০) দুর্গাদাস রায়চৌধুরী (১১) হেমেন্দ্র দেব (১২) কমল চ্যাটার্জী (১৩) নুরুল ইসলাম (১৪) গৌরাঙ্গ গুপ্ত (১৫) দিলীপ সেনগুপ্ত (১৬) চিত্তরঞ্জন জোশ।

সার্জারী বিভাগে ননীবাবুর সেল যে প্যানেল তৈরি করেছেন সেটা নিচে দেওয়া হল:—

এসোঃ প্রফেসর

(১) অমিতাভ রায় (২) প্রিয়ব্রত চক্রবর্তী (৩) অঞ্জলি মুখার্জী।

রীডার

(১) গুরুকৃপা চৌধুরী (২) অশোককুমার ব্যানার্জী (৩) প্রদীপ মজুমদার (৪) এন ব্যানার্জী (৫) অশোককুমার ঘোষ (৬) রণেন্দ্রনাথ রায়।

সহকারী প্রফেসর

(১) অমরেন্দ্রকুমার দে (২) সরোজবন্ধু চক্রবর্তী (৩) সরোজভূষণ বসু (৪) প্রণবকুমার মুখার্জী (৫) সরোজ নিয়োগী (৬) বারীনকুমার দত্ত (৭) বিনয়গোপাল চক্রবর্তী (৮) শম্ভুনাথ মুখার্জী (৯) অমিয়কুমার চক্রবর্তী।

লেকচারার

(১) অমরেন্দ্র দে (২) সরোজবন্ধু চক্রবর্তী (৩) সরোজভূষণ বসু (৪) সরোজকুমার নিয়োগী (৫) সলিল মুখার্জী (৬) দুর্গাদাস সেনগুপ্ত (৭) বিশ্বনাথ সাহা (৮) জ্ঞানরঞ্জন মণ্ডল (৯) অমলেন্দু গুপ্ত (১০) অনিল মুখার্জী (১১) মণীন্দ্রনাথ রায় (১২) অজিত ঘোষ (১৩) সারদাপ্রসন্ন ঘোষ (১৪) রঙ্গলাল দাস (১৫) শিশির গুপ্ত (১৬) ইন্দুভূষণ ভৌমিক (১৭) মীরা সেন (১৮) একেন্দ্র ঘোষ (১৯) যতীন্দ্রচন্দ্র পাল (২০) পান্নালাল চক্রবর্তী (২১) মানস মৈত্র (২২) দুর্গাদাস রায়চৌধুরী (২৩) নির্মল ঘোষ (২৪) অসীম রায়চৌধুরী (২৫) হেমেন্দ্রকুমার দেব (২৬) ভোলানাথ সাধু (২৭) দেবকুমার মুখার্জী (২৮) সুখেন্দুকুমার মণ্ডল (২৯) প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ (৩০) অজয় দে (৩১) সন্তোষকুমার দত্ত (৩২) পরিমল সেন (৩৩) কমলকান্তি চ্যাটার্জী (৩৪) জলধর রায় (৩৫) নুরুল ইসলাম (৩৬) সুধীর ঘোষ (৩৭) শোভনলাল চ্যাটার্জী (৩৮) মনোজিৎ রায় (৩৯) প্রশান্ত সাহা (৪০) অরূপ ভট্টাচার্য (৪১) দিলীপ মিত্র (৪২) দিলীপ সেনগুপ্ত (৪৩) শঙ্কর ব্যানার্জী (৪৪) শশাঙ্ক পাজা (৪৫) চিত্তরঞ্জন জোশ (৪৬) অসিত পাল (৪৭) দিলীপ মুখার্জী।

একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি এবং সেলের সুপারিশের মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, সেটা সাদা চোখেই দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মকর্তারা গত সপ্তাহে ঘোষণা করেছেন যে, প্রমোশনের ক্ষেত্রে ১৯৬৭ সালের ঘোষিত নীতির দ্বারা তাঁরা পরিচালিত হচ্ছেন। কিন্তু সেই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক পৃথক কমিটির সুপারিশে এমন স্ববিরোধিতা প্রকট হয়ে উঠল কেন? সেখানে কি গুণাবলী এবং সিনিয়রিটির চেয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ বেশি প্রাধান্য বিস্তার করেছে? সেখানে কি কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা ক্লিকের প্রতি কোন আনুকূল্য প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে? সেল যাঁদের প্রমোশনের সুপারিশ করেছেন, তাঁদের সকলের শিক্ষকতার (১৯৬৭ সালের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী) যোগ্যতা আছে কি?

স্বাস্থ্যদপ্তর জানিয়েছেন যে, সেলের প্যানেল চূড়ান্ত নয়। এই প্যানেলের বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ থাকলে সেটা ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্য সরকারকে জানাতে হবে। তাঁরা সেই অভিযোগের বিচার করে প্যানেল পুনর্বিন্যাস করবেন। কিন্তু চিকিৎসক মহল মনে করছেন, তাতে সকল ক্ষেত্রে বোধ হয় সুবিচার পাওয়া যাবে না। কারণ কোন পদে যদি পূর্বেই কোন চিকিৎসক প্রমোশন পেয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে সরিয়ে আসল দাবিদারকে সেই পদে বসানো বোধ হয় সম্ভব হবে না। সেটা আইনের বেড়াজালে পড়ে যেতে পারে। তা ছাড়া সেটা দৃষ্টিকটুও হবে।

প্রমোশনের ব্যাপারে বৈষম্য এবং অসন্তোষ স্বাস্থ্যদপ্তরের দক্ষতা হ্রাস করতে বাধ্য। কারণ তখন অফিসারদের মধ্যে দলাদলি রেষারেষি প্রকট হয়ে উঠবে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হবে সরকারী কাজে গাফিলতি। রাজ্যের রাজনীতিতে শরিকী বিবাদ যুক্তফ্রন্টের সুনাম ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ করেছে। অফিসারদের পেশাগত দলাদলিতেও সেই বিবাদ প্রতিফলিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তখন ননীবাবু যে কি বিরাট সমস্যায় পড়বেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সরকারী দপ্তরে নিয়োগ এবং পদোন্নতির ব্যাপারে মন্ত্রীদের সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে বিরাজ করাই বাঞ্ছনীয়। সরকারী নীতি ঠিক মত প্রয়োগ হচ্ছে কি না, সেটাই তাঁর একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। সেখানে তিনি কোন গলদ লক্ষ্য করলে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে ত্রুটি সংশোধন করবেন।

আমার মনে হয়, চিকিৎসকদের পদোন্নতির ব্যাপারটা ননীবাবু নিজের হাতে না রেখে সার্ভিস কমিশনের হাতে তুলে দিলেই ভাল করবেন। সার্ভিস কমিশন নিরপেক্ষ এবং চরিত্রবান ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে প্রমোশনের প্যানেল তৈরি করবেন। তাহলে ননীবাবুর দায়িত্ব অনেক কমে যাবে। তিনি তখন এই ঝুট-ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের অন্যান্য জরুরী সংস্কার সাধনের কাজে একনিষ্ঠভাবে রতী হতে পারবেন।

[চলবে]

চাঁদ-সংবাদ

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

জমেছে ভালো। চাঁদ নিয়ে মাতামাতি খাসা জমেছে। তাই না অ্যাপোলো-১১র স্মৃতিটা সময়ের আগুনে ঝলসাবার আগেই অ্যাপোলো-১২-র ডাক পড়ল। মানুষ আবার চাঁদে নামল।

চাঁদের নতুন খবর এবারেও নাকি অনেক মিলবে। ১২-র কীর্তি ১১-কে নাকি ছাড়িয়ে যাবে।

আমরা বলি, সাধু' সাধু!

আর বলি, এই 'বারো'দের নিয়ে যত বাড়াবাড়ি হবে, মানব-কীর্তির বিজয়-ধ্বজাও ততই পত্-পত করে উড়বে।

ওদিকে ধ্বজা ঠিক উড়ছেও। নিত্য নতুন খবর এসে পৌঁছুচ্ছে আমাদের ঘরে।

এই সেদিন এলো নতুন খবর। ১৪ই নবেম্বর রাত-দুপুরে এলো। ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি থেকে সারা বিশ্বে রটনা করা হল, তিন মার্কিন নভশ্চর চার্লস কনরাড, রিচার্ড গর্ডন ও অ্যালান বীনকে নিয়ে অ্যাপোলো-১২ চাঁদের পথে যাত্রা করেছে।

যাত্রা শুরু হয় ভারতীয় সময় রাত ঠিক ৯টা ৫২ মিনিটে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অ্যাপোলো-১২ পৃথিবীর কক্ষপথে প্রবেশ করে। পরে ১২টা ৩৯ মিনিটে এই কক্ষপথ ছেড়ে চাঁদের দিকে যাত্রা করে সে।

যাত্রার মুহূর্তে বাধাবিঘ্ন বড় কম আসে নি। ঝড় জল বৃষ্টি থেকে শুরু করে বজ্রের আঘাত অবধি কম অত্যাচার সইতে হয় নি স্যাটার্ন-৫ আর অ্যাপোলোকে।

বৃষ্টি আর বৃষ্টি! প্রবল বর্ষণে কেপ কেনেডি যেন ভেসে যাবার উপক্রম করে সেদিন! ঝাপসা ও অস্পষ্ট অ্যাপোলো-১২-কে যেন জলের তলাকার কোনো বস্তু বলে মনে হয়। অথচ উৎসাহের অবধি নেই। কয়েক লক্ষ লোক আশেপাশে। প্রেসিডেন্ট নিক্সনও সস্ত্রীক এসেছেন। কানাঘুষো করছেন সবাই, অ্যাপোলো-১২ মানুষের জ্ঞানের দিগন্তকে অনেকদূর অবধি প্রসারিত করবে।

জ্ঞানের প্রসারণ অবিশ্যি অ্যাপোলো-১১-র দৌলতেও কম হয় নি। চাঁদ যে পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও অদ্ভুত একটা জগৎ, তা তো ওরই সারথি-দের কাছ থেকে এই সেদিন জানলাম আমরা। এই সেদিন চাঁদ থেকে মাটি এল পৃথিবীতে।

—কিন্তু তবু, অনেকেই আক্ষেপ করছেন,—তবু এখনও অবধি চাঁদ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানগম্যি খুবই সীমিত। এখনও অনেক কিছুই জানার আছে প্রতি-বেশী উপগ্রহটি সম্পর্কে।

এই জানার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে অ্যাপোলো-১২ এবং তার উত্তর-সূরীরা।

আর ১২ থেকেই শুরু হচ্ছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা।

চাঁদ কোত্থেকে এল? বয়স কত তার? পৃথিবীর সঙ্গে কোথায় তার পার্থক্য? কেন সেখানে জীবন আবির্ভূত হয় নি? সেখানকার উপাদানগুলোই বা কেমনতরো?—এই সব দুরূহ প্রশ্ন অ্যাপোলো-১২-কে ঘিরে জট পাকিয়ে ওঠে।

ওদিকে লী-আর শিরার মতো বিশেষজ্ঞরা অভয় দেন,—দাঁড়াও। ধৈর্য ধরে আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর। সব প্রশ্নেরই জবাব পাবে। অ্যাপোলো-১২ অভিযান থেকেই চাঁদ নিয়ে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম গবেষণা শুরু করছি আমরা। চাঁদে স্থাপন করছি 'জিয়োফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী'। এই ল্যাবরেটরী থেকে জানা যাবে, চাঁদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা। আর এ-ছাড়া, চাঁদের মাটি-সংগ্রহের কাজ চলবে পুরোদমে। অ্যাপোলো-১২-র নভশ্চর কনরাড এবং বীন মাটি-সংগ্রহ

করার আগে এবং পরে চাঁদের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলোর ছবি তুলছেন। এবং বিশেষ করে বড় গহ্বরগুলোর পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকেই মাটি আর পাথর সংগ্রহ করছেন ওঁরা।

ওঁদের এই সব মূল্যবান সংগ্রহ বিশ্লেষণ করে চাঁদের ভেতরকার অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু নতুন খবর জানা যাবে।

অবশ্য চাঁদে 'জিয়োফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী' স্থাপন করাই হবে অ্যাপোলো-১২-র নভশ্চরদের প্রধান কাজ।

সংক্ষেপে এই ল্যাবরেটরীর নাম হল 'অ্যালসেপ' (অ্যাপোলো লুনার সারফেস এক্সপিরিমেণ্ট প্যাকেজ)। পাঁচ প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রপাতি থাকছে এতে এবং 'আইসোটোপ জেনারেটার'-এর সাহায্যে আপনা থেকেই এ চালু থাকছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধরণের আরও কয়েকটি ল্যাবরেটরী আগামী দিনের অ্যাপোলো-অভিযানগুলোর মাধ্যমে চাঁদে রেখে আসা হবে। এরা বেতার-তরঙ্গ মারফৎ খবর পাঠাবে পৃথিবীতে এবং দীর্ঘ দু বছর অবধি এরা সক্রিয় থাকবে।

এছাড়া, এই প্রথম চাঁদে 'আইসোটোপ জেনারেটাব' স্থাপন করা হচ্ছে।

চাঁদের কম্পন মাপবার জন্যে উন্নত ধরণের সিসমোমিটার যন্ত্রও এই প্রথম যাচ্ছে চাঁদে। অবশ্য সিসমোমিটার অ্যাপোলো-১১-র সঙ্গেও ছিল; কিন্তু তা নিখুঁত ছিল না এত। ক্ষুদ্রকায় সব উল্কা চাঁদকে আঘাত করলে সে-যন্ত্রে সাড়া জাগত না বিশেষ।

এই সাড়া যাতে জাগে, সেজন্যে এ যন্ত্রটিকে এবার বিশেষ সতর্কতা সহকারে চাঁদে বসাবার ব্যবস্থা হয়েছে এবার এ থাকছে মসৃণ একটি আবরণের ওপর। এমনভাবে থাকছে, যাতে চাঁদের মাটির সঙ্গে এর সংযোগটা আগের বারের তুলনায় নিবিড় হয়, অথচ তলাকার 'ইলেকট্রনিক প্যাকেজ'টিও থাকে মূল যন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই বিচ্ছিন্নতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে এবার; কারণ, সংকেত-প্রেরণের পথে কোনো বাধা আসুক বা মিথ্যে কোনো কম্পন ধরা পড়ুক ওতে, এ কারও কাম্য নয়।

চাঁদযাত্রী দ্বিতীয় যন্ত্রটি হল এক ম্যাগনেটোমিটার। এই ধরণের যন্ত্র এই প্রথম যাচ্ছে চাঁদে। এর কাজ হবে চাঁদের দুর্বল চুম্বকশক্তির পরিমাপ করা; আর পরিমাপ করা চাঁদের ভেতরকার বিদ্যুৎ-শক্তির। চাঁদের ভেতরটা কেমন আছে এখন, ঠাণ্ডা না গরম আছে, এই ম্যাগনেটোমিটার-এর সাহায্যে সে-সম্পর্কে নতুন খবর কিছু পাওয়া যাবে।

এছাড়া 'লুনার অ্যাটমোসফিয়ার ডিটেক্টার'ও চাঁদের দেশে নতুন। বাতাস-হীন সে দেশের মাটির কাছাকাছি অণু-গুলোর হালচাল লক্ষ্য করাই হবে এ যন্ত্রটির কাজ।

চার নম্বর যন্ত্র 'সোলার উইণ্ড স্পেকট্রোমিটার'-এর কাজ আরও গুরুত্ব-পূর্ণ। এ একদিকে যেমন স্বাভাবিক সৌরবায়ুর খবর নেবে, অপরদিকে ঠিক তেমনি নেবে সৌরঝঞ্ঝা থেকে জাত অস্বাভাবিক সৌরকণিকার খবর। এ খবর চাঁদকে জানার দিক দিয়ে তাৎপর্য-পূর্ণ খুবই। কারণ, চাঁদের পৃষ্ঠদেশের পরিবর্তন বাইরের যে সব শক্তির দ্বারা সূচিত হয়, তাদের মধ্যে সৌরবায়ুই হল সবচেয়ে প্রভাবশালী।

সৌরবায়ু-সহচর বিভিন্ন গ্যাসকে সংগ্রহ করার জন্যে পৃথক আর একটি যন্ত্র চাঁদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং যন্ত্রটিকে আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে পৃথিবীতে। সবাই জানেন, অ্যাপোলো-১১ অভিযানের সময়েও ঠিক এমনটি ঘটেছিল। কিন্তু যা আগে আর কখনও ঘটে নি, তা হল চাঁদের দেশে 'লুনার আয়নোস্ফিয়ার ডিটেক্টার' পৌঁছে দেওয়া। এই যন্ত্রটির কাজ হবে, চাঁদের খুব কাছাকাছি এলাকার বিদ্যুৎবাহী অণুগুলোর পরিমাপ করা। সন্দেহ নেই, সংখ্যায় এরা হয়তো খুবই নগণ্য হবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও চাঁদের রাসায়নিক উপাদান, তেজস্ক্রিয়তা এবং আগ্নেয় কার্যকলাপ নির্ধারণে এদের সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানীদের সাহায্য করবে অনেকখানি।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা সাহায্য শেষ অবধি পাবেন তো? অভিযাত্রীরা শেষ অবধি যেতে পারবেন তো চাঁদে? কেপ কেনেডিতে সন্দেহ ধীরে ধীরে দানা বেঁধে ওঠে।

এই সন্দেহের কারণ; কলরাডোর বোল্ডার নামক মহাকাশ-গবেষণা কেন্দ্র থেকে বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন, সূর্যের একটি অংশে বিপজ্জনক কিছু চোখে পড়ছে। ১৩-১৪ দিনের মধ্যেই ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটতে পারে সেখানে এবং ওই বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া নভশ্চরদের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। নভশ্চররা মূল মহাকাশযানে থাকবার সময় ক্ষতির সম্মুখীন অবিশ্যি হবেন না; ক্ষতিটা দেখা দেবে চান্দ্রযানে থাকবার সময় অথবা চাঁদের মাটিতে ঘুরে বেড়াবার সময়।

এই খবর শুনে কেপ কেনেডির বিশিষ্ট মহাকাশ-বিজ্ঞানী কিনেথ, সি, অ্যাটকিসন বললেন,—ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর ভিত্তি করে আমরা কোনো কাজ করতে প্রস্তুত নই। সৌর-বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা করবো আমরা; দেখবো, সেটা কী ধরণের হয়। যদি দেখি, মারাত্মক নয় সেটা; তবে পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী কনরাড এবং বীন চাঁদের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং চাঁদের ঝঞ্ঝা-সমুদ্রে অবতরণ করবেন। আর যদি দেখি, সেই বিস্ফোরণ মারাত্মক, তবে হয়তো অভিযান মাঝপথে পরিত্যক্ত হবে।

ওদিকে অভিযান পরিত্যক্ত হবার আশঙ্কা অন্য কারণেও একবার দেখা দেয়। ১২ই নভেম্বর বুধবার হঠাৎ খবর পাওয়া যায়, অ্যাপোলো-১২-র তরল হাইড্রোজেন ট্যাঙ্কে ফুটো দেখা দিয়েছে। 'ফুয়েল সেল'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'হাইড্রোজেন ট্যাঙ্ক'-এর এই গলদ নিয়ে ভাবনায় পড়লেন বিজ্ঞানীরা। কারণ, এই সেলরা মহাকাশচারীদের কাছে পানীয় জল সরবরাহে সাহায্য করা ছাড়াও মূল মহাকাশযানে বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত করে থাকে।

—'এই বিদ্যুৎশক্তিকে যেমন, জল-সরবরাহ-ব্যবস্থাকেও তেমনি অটুট রাখতে হবে', বললেন বিজ্ঞানীরা এবং নির্দিষ্ট দিনে যাতে অভিযান শুরু হয়, সেজন্যে ওঁরা উঠেপড়ে লাগলেন। অ্যাপোলো-১২-র ২৮ গ্যালন (১০৬ লিটার) পরিমাপের হাইড্রোজেন ট্যাঙ্ক শূন্য করা হল এবং অ্যাপোলো-১৩-র হাইড্রোজেনকে কাজে লাগানো হল অবিলম্বে। নভশ্চররা এই যান্ত্রিক গোলযোগের ওপর আগাগোড়া লক্ষ্য রাখলেন; আর ওদিকে রকেটের পর্যায়-গণনাও যথারীতি চলতে লাগল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফেরাতে চাই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন

মনোরঞ্জন হাজরা

[একটি জবাব]

"Have patience, gentle friends...It will inflame you, it will make you mad"—Shakespeare in Julius Caeser.

কর্তব্য বড় নির্মম। নির্মম আর বেদনাদায়ক। গত সংখ্যার 'সাপ্তাহিক বসুমতীতে' স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দলের এম-এল-এ শ্রীঅশোক চৌধুরীর নামে প্রকাশিত লেখাটি কোন্ ধরণের তা আমি বলেছি। আমার "স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফেরাতে হবে গোটা ফ্রন্টকে" শীর্ষক রচনাটির বিরুদ্ধে যখন কোন সরকারী ব্যক্তব্য নেই তখন দেখলাম তাঁর নামের রচনাটি যেন ইন্দ্রজিতের মত মেঘের আড়াল থেকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সম্ভবতঃ আমলাবর্গের একটা অপপ্রয়াস। হয়তো শ্রীচৌধুরীর পক্ষে আমার এই উক্তি খুবই বেদনাদায়ক হবে। কিন্তু আমি কি করব, আমার উপায় নেই—যদিও আমার কাছেও ব্যাপারটা কম বেদনাদায়ক নয়। আমার বিপদ যে আমি একটু-আধটু লিখতে জানি, আর লিখতে জানি বলে আমাকে তথ্যনিষ্ঠও হতে হয়। তথ্যকে চেপে যাওয়া বা ইংরেজীতে যাকে বলে Concealment of fact, সেটা আমি শিখি নি।

আমলাদের অপচেষ্টা

যাই হোক অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি আমার মূল বক্তব্যে আসবার চেষ্টা করব। আমার অভিযোগটা ছিল আমলা-চক্রের বিরুদ্ধে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেই চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে তাঁদেরই সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছেন এবং তাতে আর যাই হোক যুক্তফ্রন্টের ঘোষিত নীতিকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া এর ওপর আমি ননীবাবুকে আদর্শভ্রষ্টতার দায়েও দায়ী করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, শ্রীচৌধুরীর নামে যে রচনাটি 'সাপ্তাহিক বসুমতীর' গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমার অভিযোগের জবাব সুস্পষ্টভাবে না দিয়ে "জাঁদরেল আমলাদের" না সরাতে পারার জন্য আমার দলনেতা জ্যোতিবাবুর দিকে অহেতুক অঙ্গুলি সংকেত করা হয়েছে। তাঁর রচনার শেষ অনুচ্ছেদের ঠিক পূর্ব অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—"আমলাতন্ত্রকে ননীবাবু যথোপযুক্ত আঘাত দেন নি এটাই যদি মনোরঞ্জনবাবুর প্রতিপাদ্য হয় তাহলে বলবো ননীবাবু কেন জাঁদরেল আমলাদের (পূর্বতন আই-সি-এস চীফ সেক্রেটারী, হোম সেক্রেটারী পদে যাঁরা এখনও বহাল তবিয়তে আছেন) মনোরঞ্জনবাবুর দলনেতা জ্যোতিবাবুর দপ্তরও সরাতে পারে নি।" এই মন্তব্যই প্রমাণ করে শ্রীচৌধুরীর রচনার যথার্থতা। এ কথা কি তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর দলের অথবা ননীবাবুর অথবা যুক্তফ্রন্টের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে বলা কথা? একথা কাদের হতে পারে? জ্যোতিবাবুর দপ্তরের আমলাদের দেখিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের আমলাদের এটা কি আত্ম-রক্ষার একটা হীন অপচেষ্টা নয়?

নৈতিক অধঃপতন

তাছাড়া শ্রীচৌধুরী কোথায় পেলেন, আমার লেখায় আমলাদের সরাবার কথা? আমার লেখায় কি আমলাচক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা ছিল না? আমি খুব সুস্পষ্টভাবেই তো একথা তুলে ধরে-ছিলাম। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পুনরায় আমি তা উদ্ধৃত করছি—"দীর্ঘ-কাল ধরে কংগ্রেসের হাতে পড়া ও গড়া যে কোন দপ্তর আমলাচক্র শাসিত না হয়ে পারে না এবং সে আমলাচক্র দুর্নীতি-পরায়ণ হতে বাধ্য। যুক্তফ্রন্টের সকল দপ্তরকেই এর বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করতে হচ্ছে। কিন্তু যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে আমি দেখছি স্বাস্থ্যদপ্তর তার বিন্দুমাত্র চেষ্টা তো দূরের কথা, আমলাচক্রের একটা সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীর হাতে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমশাই আত্মসমর্পণ করেছেন।" এর পর শ্রীচৌধুরী আর তাঁর পরামর্শদাতাদের জিজ্ঞাসা করব, জ্যোতি-বাবু কি তাঁর দপ্তরের আমলাদের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন? আশা করি জ্যোতিবাবুকে আমি সার্টিফিকেট না দিলেও চলবে।

কিন্তু শ্রীচৌধুরীরা প্রশ্নটাকে ঘোলাটে করার চেষ্টা করছেন কেন? একটা সাংবিধানিক সরকারের রক্ষাকবচযুক্ত ও বিশটা বছর ধরে আস্কারাপ্রাপ্ত আমলাদের চট করে সরাবার কথা বলবার মতো মূর্খামী তো আমার লেখায় আমি কোথাও দেখাই নি! তবে কাল্পনিক কথা তুলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা কেন? এর জবাবে এই কথাই মনে করব—আমলাচক্রের পরামর্শে চললে পরিণতিটা এমনিই হয়। অর্থাৎ একান্ত বন্ধু শরিক দলের সবচেয়ে শুভ মানুষকেও অহেতুক আক্রমণ করার মত নৈতিক অধঃপতন ঘটে।

বিজ্ঞজনোচিত আশংকা

এরপর শ্রীচৌধুরীর নামে প্রকাশিত রচনায় এমন একটি বিজ্ঞজনোচিত আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যেটার স্ববিরোধিতাটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার। রচনার প্রথম অনুচ্ছেদে আমার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে—"তিনি প্রবীণ বামপন্থী এম-এল-এ এবং তাঁর উত্থাপিত অভিযোগের সুযোগ যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে তথা ননীবাবুর বিরুদ্ধে ফ্রন্টবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অবশ্যই নিতে চাইবে।" এই আশংকা প্রকাশ করবার আগে শ্রীচৌধুরীদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, ফ্রন্টবিরোধী রাজ-নৈতিক দলের মানুষগুলো কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলেন বলে তাঁরা মনে করেন? ঐ সব দলের কারো কোনদিন কি স্বাস্থ্য-দপ্তর সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না? তাঁদের কি কোন বশম্বদ ননীবাবুর দপ্তরে নেই? সেই সব বশম্বদরা ফ্রন্ট-বিরোধী কোন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে কি এখনও চলাফেরা করছেন না? তাই একটু ভেবেচিন্তে প্রবীণ এম-এল-একে কোতল করবার উদ্দেশ্যে, কল্পিত আশংকা প্রকাশ না করলেই বোধ হয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হত। কেন না, পরে ল্যাজে-গোবরে হওয়ার চেয়ে আগে নিজেদের ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলেই আমি মনে করি। তবে এ প্রসঙ্গে শ্রীচৌধুরীরা বলতে পারেন, সেটা তো ননীবাবুকে জানালেই পারতেন। হ্যাঁ, আমিও তাই বলি। কিন্তু প্রথমে এ সবই অত্যন্ত বিনীতভাবে এই পত্রিকাতেই আমি লিখেছিলাম, কিন্তু তার ফল কি হয়েছে, সেটা কি শ্রীচৌধুরীরা জানেন? যাঁর বিরুদ্ধে কৌশল করে কর্মক্ষেত্র ছেড়ে থাকা, ক্লাস টি-এ তোলা প্রভৃতির হাতে-নাতে প্রমাণ দিয়েছি, দুর্নীতি দমন বিভাগ যাঁর বিরুদ্ধে লম্বা রিপোর্ট দিয়েছে—তাঁকেও তো রিটায়ার করার পর পুনর্নিয়োগ করতে ননীবাবুর আটকায় নি। কাজেই ভাবের ঘরে চুরি করে লাভ কি! মনে রাখতে হবে দুর্নীতির তজোয়ার দিয়ে ফ্রন্ট-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির গলা কাটা যায় না।

তথ্য হল সারমেয়র লাঙ্গুল

এবারে আসা যাক জয়েন্ট ডাইরেক্টরের প্রশ্নে। আমি তাঁর নাম করি নি। শ্রীচৌধুরীর রচনায় তাঁর নাম করা হয়েছে এবং তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এমন কি উক্ত রচনায় বলা হয়েছে—"সকাল বেলায় সলতে পাকানো" এই শিরোনামার কয়েকটা অনুচ্ছেদ ধরে কাহিনী সৃষ্টি করে ও যুক্তফ্রন্ট অনুরাগীদের পক্ষে আবেগজড়ানো একটি তারিখের উল্লেখ করে মনোরঞ্জনবাবু এই জয়েন্ট ডাইরেক্টার নিয়োগ সম্পর্কে যে বৃত্তান্ত দিয়েছেন সেটি একটি নির্জলা মিথ্যা।" এখন শ্রীচৌধুরীদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা ছাড়া আমার আর প্রদেয় কিছু নেই। কেন না তথ্য বেচারা এমন জিনিস, যার সঙ্গে সারমেয় লাঙ্গুলের তুলনা চলে, আর মুস্কিল এই যে, কিছুতেই তার স্বভাববিচ্যুতি ঘটানো যায় না। গতবারে কবিগুরুর যে লেখা থেকে 'সকালবেলার সলতে পাকানোর' উপমাটা দিয়েছিলাম এবার ঠিক তার আগের কথাগুলো উদ্ধৃত করে বলব, এই ব্যাপারে 'আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে।'

শ্রীচৌধুরীদের মতে জয়েন্ট ডাইরেক্টার নিয়োগের প্রশ্নে আমার নির্জলা মিথ্যার জবাব দেবার আগে এই 'আরম্ভের আগেও আরম্ভটা' একটু বলে নিতে চাই।

আরম্ভের আগেও আরম্ভ

সুবে বাংলার ভূতপূর্ব অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী দুই ভদ্রলোক—শ্রীঅতুল্য ঘোষ আর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন; নিশ্চয়ই শ্রীচৌধুরীদের কাছে অজানা ব্যক্তি নন। আর তিনিও বোধ হয় অজানা নন যিনি এই দুই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভূতপূর্ব অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারীদের দক্ষিণহস্তরূপে বঙ্গদেশে সশরীরে বিরাজ করতেন এবং যিনি সমবায়-প্রসিদ্ধির বিজয়-তিলক ললাটে ধারণ করে সর্বদা শাসিয়ে বেড়াতেন। সেই তিলকধারী ভদ্রলোক ও জয়েন্ট ডাইরেক্টার একই সঙ্গে পরস্পরের শ্যালক এবং ভগ্নীপতি। এমন নিবিড় সম্পর্ক বোধ করি শ্রীচৌধুরী লিখিত সমাচারে কথিত প্রাক্তন ডি-এইচ-এস-এরও নেই কোন সিভিলিয়ান অফিসারের সঙ্গে। এছাড়া আরও নিবিড় সম্পর্কের লোক জয়েন্ট ডাইরেক্টারের মহাকরণে ছিলেন। সে কথা এখন উল্লেখ করার দরকার নেই। যদি যুক্তফ্রন্টের আমলে তেলিনীপাড়ায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর ব্যাপার বা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কথা কখনো এই আলোচনায় এসে পড়ে তখন তাঁর কথা উল্লেখ করা যাবে।

এ-ডি-এইচ-এস পদে

এ যখনকার কথা বলছি, তখন মাত্র এ-ডি-এইচ-এসের পদটি খালি হয়েছে। সেই পদে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সিনিয়র একজন অফিসারের নিয়োগ ঠিক হয়ে গেল। এমন কি ভদ্রলোকের অভিনন্দন-সভাও সম্পন্ন হল। কিন্তু কি আশ্চর্য, হঠাৎ বরের পিঁড়িতে এসে বসে গেলেন বর্তমান জয়েন্ট ডাইরেক্টার।

এরপর আরও আছে।

ডি-ডি-এইচ-এস পদে

সৌভাগ্যের সিংহদ্বার মানুষের কি করে খোলে এটা একটা গবেষণার বস্তু। এরপর ডি-ডি-এইচ-এস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) পদটির পালা। ডাঃ এস সি মজুমদারের রিটায়ার করার সময় হল। এই ডাক্তার মজুমদার, বোধ হয় যিনি একমাত্র অফিসার—যাঁর সার্ভিস রেকর্ড অত্যন্ত ভাল, কিন্তু তাঁকে কিছুতেই পুনর্নিয়োগ করা হল না। কারণ পদটি তাহলে খালি হয় না আর খালি না হলে ঈপ্সিত ফললাভে স্বার্থসংশ্লিষ্টচক্রের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না। মহাকরণে স্বয়ম্বরসভার কোন পদ্ধতি প্রচলিত নেই। তবুও অনেক সিনিয়র অফিসার পদটির জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু দেখা গেল বরমাল্য পড়ল গিয়ে বর্তমান জয়েন্ট ডাইরেক্টারেরই গলায়। কেন ডাঃ মজুমদারকে রি-এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হয় নি তাঁর সার্ভিস রেকর্ড ভাল হওয়া সত্ত্বেও, কেন অন্য অফিসারদের মধ্যে থেকে কাউকে নিয়োগ করা হয় নি সিনিয়রিটি থাকা সত্ত্বেও, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সুবে বাংলার অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং তাঁর সঙ্গে শালা-ভগ্নীপতি-কাম-ভগ্নীপতি-শালার যে চক্র দপ্তরে বাসা বেঁধে রয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচৌধুরীরা ঘোষণা করছেন—"কংগ্রেস তথা পি-ডি-এফ ও গভর্নর ধর্মবীরের আমল পর্যন্ত যে সমস্ত আমলাতান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী অপ্রতিহতভাবে নিজেদের দাপট খাটিয়ে এসেছেন এবং বে-পরোয়া দুর্নীতি, ব্যক্তিগত স্বৈরাচার ও অপশাসন চালিয়ে এসেছেন—ননীবাবুর অনুসৃত নীতির ফলে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার এবং হবার আশঙ্কায় তাঁরাই আজ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছুদিন ধরে মিথ্যা কুৎসাপ্রচারে নেমেছেন।" আশ্চর্য, যাঁরা নিজেদের দপ্তরের খবর রাখেন না, পূর্বাপর ইতিহাস জানেন না, যাঁদের কোন স্বাধীন চিন্তা নেই, দুর্বলচিত্ত, অকর্মণ্য এবং অসহিষ্ণু তাঁরাই শুধু একথা বলতে পারেন। তবু ঘটনার এখানেই শেষ নয়। বর্তমান জয়েন্ট ডাইরেক্টারকে সে সময় ডি-ডি-এইচ-এস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) করার জন্য আরেকজন অফিসারকে ডেপুটির পদে উন্নীত করতে হয়। এ সব তথ্য শ্রীচৌধুরীদের জানবার ইচ্ছা থাকলে জানতে পারতেন। কিন্তু তথ্যরূপী সারমেয় লাঙ্গুলকে স্বভাব-বিচ্যুত করার জন্য বাগাড়ম্বর করতে যতখানি তাঁরা উৎসুক, সে ঔৎসুক্য অন্যদিকে দেখা যায় না। কেন তা দেখা যায় না সে কথা বোঝা আদৌ কষ্টকর নয়।

জানা গণ্ডীর বাইরে আসুন

এরপর জয়েন্ট ডাইরেক্টার কি করে হলেন সে কথা আমি আগেই বলেছি। কিন্তু আমার সে কথাকে 'নির্জলা মিথ্যা' বলা হয়েছে শ্রীচৌধুরীর রচনায়। আমি নাকি "যুক্তফ্রন্ট অনুরাগীদের পক্ষে আবেগজড়ানো একটি তারিখের উল্লেখ করে" কথাটা বলেছি। সত্যিই তো 'আবেগজড়ানো তারিখ' সেটি। অস্বীকার করতে পারে কেউ? আগের রাত্রে পশ্চিমবাংলার কোটি কোটি মানুষের সংগ্রাম-অর্জিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বে-আইনীভাবে অপসারিত করা হয়েছে এবং পরদিন ২২শে তারিখে সুরু করে দেওয়া হয়েছে নিষ্ঠুর বীভৎস অত্যাচার। সে তারিখটা ভুলব কি করে? কেন সে তারিখ আবেগজড়ানো হবে না আমার ও সমগ্র পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে। শ্রীচৌধুরীর রচনায় এটাকেই তো ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে। কেন না আমার অভিযোগে এটি একটি স্মরণীয় তারিখ। শ্রীচৌধুরীর রচনায় বলা হয়েছে—'দোর্দণ্ড-প্রতাপ ডাঃ ধর্মবীর ও পি-ডি-এফের আমলে স্বাস্থ্যদপ্তরের কোন কর্মচারী লুকিয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ব্যাক ডেট দিয়ে দলিলপত্র তৈরি করে সই করাতে পারেন, তেমন কোন সাহসী কর্মচারী ছিলেন বলে আমার জানা নেই।' নিজের জানার গণ্ডীর বাইরে জগৎ নেই, এমন কূপমণ্ডূকতা দেখিয়ে ফেলবেন শ্রীচৌধুরীরা তা আমি ভাবি নি। কর্মচারীদের সাহসের সীমা বা সীমান্ত তিনি কতখানি দেখেছেন জানি না—তবে যদি জানতে চান, তবে, ননীবাবুকে আমি একখানা চিঠি লিখেছি সেটা দেখে নেবেন। হাইকোর্টে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের কোন অফিসার নিজের ফলস ডিগ্রীকে সত্যি বলতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। অবশ্যই তার ডকুমেন্ট আমার হাতে আছে। কিন্তু এখানে আমি লিখতে পারলাম না। কারণ ঐ অফিসারের জাল বহু দূর বিস্তৃত। আমার লেখাকে তিনি সূতিকাগারে হত্যা করার ক্ষমতা রাখেন।

সেই অভিশপ্ত ২১শে তারিখ

তাছাড়া এই প্রসঙ্গে আমার কথা হচ্ছে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের কথাটা ঐ তারিখেরই ঘটনা বলে আমি ওটা উল্লেখ

করেছিলাম একটা উদ্দেশ্য নিয়েই। এবং সে উদ্দেশ্য আমার সফল হয়েছে। শ্রীচৌধুরীরা ভাবলেন সমস্তটা যখন আমি ঠিক করতে পারি নি, তখন অভিযোগটাও আমি এস্টাব্লিশ করতে পারব না বোধ করি। তাই তাঁর রচনায় কখনো সরকারী কর্মচারীর সাহসের কথা, কখনো সুপারিন্টেন্ডেন্ট মন্ত্রীর এ্যাম্বুলেন্সের খাসে কাছে যাওয়ার অসম্ভবতার কথা উল্লেখ করে ব্যাপারটা ঘুলিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে ঐ দিনই যে জয়েন্ট ডাইরেক্টারের কাগজপত্র সই হয়েছিল সেটাই আমি আরও একবার জোর করে বলবার জন্য ফাঁক রেখেছিলাম। এখন তাহলে বলি সেই কথাটি—এ্যাম্বুলেন্স কার সেদিন সকালে কেন ননীবাবুর প্রেসে গিয়েছিল? তাতে জয়েন্ট ডাইরেক্টার ফাইল বগলে কেন গিয়েছিলেন? আর ননীবাবু সি-পি-আই অফিসে যুক্তফ্রন্টের সভায় যখন যোগ দিতে এলেন, তখন সেই গাড়িতে এলেন কেন? এরপর ব্যাক ডেট দিয়ে ২১শে তারিখে নিয়োগ আদেশ সম্পর্কে আমি আর কিছু বলতে চাই না। তবু একটা ফাঁক এখানেও রেখে গেলাম। আবার প্রতিবাদ হলে আবার লিখব।

অধ্যক্ষত্রয়ের কথা

এর পর খুচরো প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে আসল বক্তব্যে আসব। প্রথমে ধরি অধ্যক্ষ ভদ্রলোকত্রয়ের কথা। প্রথম ধরা যাক্ রায় মহাশয়ের কথা। তাঁর দৈহিক অসুস্থতার জন্য শারীরিক দক্ষতা কমে এসেছে এবং সে জন্য তাঁকে ন্যাশনাল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল এবং ডাঃ লাহিড়ীকে সেখানে নিয়ে আসা হল। তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেল গঙ্গার বুক দিয়ে। তদন্ত কমিশন বসল। হাজার হাজার টাকা গরীব রাজ্যের খরচ হতে লাগল। অবশেষে আমার লেখার দায় এড়াতে এবার তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে মেডিকেল কলেজে। কয়েক মাস আগে যাঁর গুরুতর অসুস্থতা দেখা গিয়েছিল, শারীরিক অক্ষমতা যাঁর ইতিপূর্বে বিজ্ঞাপিত ও প্রচারিত হয়েছিল বহু জায়গায়, কয়েক মাস পরেই ন্যাশনাল মেডিকেলের চেয়ে অনেক বেশি বড় অথচ অনেক বেশি কাজের চাপ যে হাসপাতালে সেই মেডিকেল কলেজে বসাবার যুক্তি কি থাকতে পারে?

আরও আসা যাক্ ডাঃ উপাধ্যায়ের কথায়। তিনি সার্ভিসের দিক থেকে জুনিয়ার। বাঁকুড়ায় পাঠানো হল তাঁকে। সেখানে ছাত্ররা তাঁকে গ্রহণ করতে পারলেন না। আমার লেখায় তাঁকে বসিয়ে রাখার অভিযোগে হল—অতএব দাও তাঁকে নীলরতনে। বাঁকুড়ায় যিনি ইনএফিসিয়েন্ট কলকাতার নীলরতনে তিনি এফিসিয়েন্ট হবেন কি করে বোঝা খুব মুস্কিল। অবশ্য ডাঃ সাহার চলে আসায় শূন্যস্থান তো পূরণ করতে হবে নীলরতনের। তাই বোধ হয় এই ব্যবস্থা।

তারপর আর জি করের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে যদি বলা যায় তাঁকে কি অন্য কাজে দেওয়া যেত না? দপ্তরে রাখার চেয়ে অন্য অনেক প্রয়োজনীয় কাজে তাঁকে দিলে ব্যাপারটা সুষ্ঠু হত। কিন্তু কি করা যাবে, এ-সবগুলিই তো একই চক্রের খেলা। ননীবাবুকে দিয়ে যে খেলা চক্র খেলাতে চায়—ননীবাবু যে সেই খেলাই খেলে বসেন। আমি আর তাঁকে কত সাবধান করি।

কতকগুলি অভিযোগ সম্পর্কে

আমি অভিযোগ করেছিলাম আর-জি-কর মেডিকেল কলেজের অবস্ট্রেটিক এ্যাণ্ড গায়নাকোলজি বিভাগে, রীডার পদে পোস্টিং দিয়ে বিভাগীয় প্রধান করা হয়েছে এবং খোঁজ করলে দেখা যাবে তাঁরই বিভাগে এর চেয়ে অনেক গুণসম্পন্ন সিনিয়র ডাক্তার রয়েছেন। এর জবাবে শ্রীচৌধুরীরা বলেছেন, সরকারের অনুসৃত নীতির জন্যই এটা করা হয়েছে এবং রাজ্যের সমস্ত কলেজ এই একই নিয়মের অধীন। তাই যদি হয়, তবে সে নিয়ম কি শুধু স্বাস্থ্যদপ্তরে যে চক্রটি আছে সেই চক্রকে বাদ দিয়ে? তা যদি না হবে তবে কেন নীলরতনে ডাঃ ডি এল পোদ্দার এবং মেডিকেল কলেজে ডাঃ কৃপা মিত্রের বেলায় ব্যতিক্রম ঘটল। এঁরাও তো অনারারী এবং পার্টটাইম সার্ভিসের লোক? শ্রীচৌধুরীদের তো একটা যুক্তিতে আসতে হবে। এ বিষয়ে ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য, ডাঃ বি, হালদার এঁদের ব্যাপারটাও একবার ভেবে দেখুন। স্ত্রী-স্বাধীনতা ঘরের বেলায় নয়, শুধু পরের বেলায়—এ কোন্ ধরণের কথা?

আমি নীলরতন মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের লেকচারারের কথা বলেছিলাম —বলেছিলাম অনেক সিনিয়র লোক থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁকে আনা হল? তাতে শ্রীচৌধুরীর রচনা যে আলোকপাত করছে তাতে দেখছি বলা হচ্ছে ওটা হয়েছিল গভর্নরের আমলে। তাই আমার প্রশ্ন গভর্নরের আমলে কি বর্তমান জয়েন্ট ডাইরেক্টার দপ্তরে ছিলেন না এবং এ সবই তাঁর খেলা, সেটা কি মনে করবার কোন কারণ নেই?

ঐ কলেজেই প্যাথলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে বাঁকুড়ায় বদলী করা হল কেন। অবশ্য আমি এই প্রসঙ্গে ননীবাবুর একান্ত সচিবের কথা উল্লেখ করেছিলাম। আমার এই শেষোক্ত কথাটি ঠিক নয়। এজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু এঁকে বাঁকুড়ায় বদলী করে যাঁকে এনে বিভাগীয় প্রধান করা হল, তিনি কি চক্রের লোক নন? এখানে ননীবাবুর দায়দায়িত্ব নেই, আমি জানি কিন্তু আমার অভিযোগটা তো এইখানেই। এমনিভাবে অবিচার হবে আর তার কোন প্রতিকার হবে না?

এরপর ঐ কলেজেই আর-পি নিয়োগ প্রসঙ্গে ডাঃ দিলীপ ভট্টাচার্যের মত ডাক্তার যাঁর এম-ডি (ক্যাল) পি-এইচ-ডি (লণ্ডন) ডিগ্রী ছিল তাঁকে কেন নিয়োগ করা হয় নি, এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল তিনি অধ্যক্ষের দ্বারা লোকাল এ্যাপয়েন্টমেন্টপ্রাপ্ত। সুতরাং ননীবাবুর করণীয় কিছু নেই। বাস্তবিক এ একটা নিয়ম বটে। কোয়ালিফায়েড লোককে বাইরে রেখে অপেক্ষাকৃত কম কোয়ালিফায়েড লোককে কাছে টেনে নেবার কি যুক্তি থাকতে পারে আমি জানি না। আমার অভিযোগটা এইখানেই।

তদন্ত প্রসঙ্গ

কতকগুলি হাসপাতালে দুর্নীতি সম্পর্কে আমি অভিযোগ করেছিলাম। শ্রীচৌধুরীর রচনায় সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"উত্তরবঙ্গে ওষুধের প্যাকেট পাথর পাওয়ার ব্যাপারে এবং কল্যাণীর জওহরলাল হাসপাতাল, গোবরা মেন্টাল হসপাতাল, পুরুলিয়া, নদীয়া প্রভৃতি জেলার হাসপাতালে দুর্নীতির ব্যাপারে তদন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই সুরু হয় এবং এখানে লক্ষণীয় মনোরঞ্জনবাবু যে জয়েন্ট ডাইরেক্টারকে ননীবাবুর আস্থাভাজন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন তদন্তগুলো সেই অফিসারেরই পরিচালনাধীন দপ্তর সম্পর্কে।"

এ ক্ষেত্রে শ্রীচৌধুরীর এই উক্তি আংশিক সত্য, অসত্য ও ধাপ্পাজাতীয় তথ্যের দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রথমত স্বাস্থ্যমন্ত্রীই সব তদন্তের নির্দেশ দেন নি। কারণ এর অনেক তদন্তের আদেশই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আমলে নয়। দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী আসার পর জয়েন্ট ডাইরেক্টারের সুকৌশল কার্যকলাপে অনেক তদন্তই আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়। তৃতীয়ত তদন্ত কার বিরুদ্ধে, কে করছে, তার সঙ্গে দপ্তরের কোথায় কি গোপন যোগসূত্র সে সব কথা কি শ্রীচৌধুরীরা জানেন? সময় আসুক এ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার সুযোগ রয়ে গেল।

পুরুলিয়া হাসপাতালের নারকীয় ঘটনার যতদূর সংবাদাদি নিয়ে দেখতে পাচ্ছি, আমার লেখার পর মন্ত্রীমশায়ের কিছুটা টনক নড়েছে।

আরও কয়েকটি কথা সম্পর্কে

বর্তমানে ছাত্রী ও মহিলা কর্মীদের লাঞ্ছিত করার কাহিনীগুলি আমি বলব না। তবে ভাল ভাল জায়গায় যাঁদের

বসিয়ে দেওয়ার কথা আমি বলেছি তাঁদের কারো কারো নাম বলার কোন অসুবিধা নেই। শ্রীচৌধুরীরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, ডাঃ স্বরাজ ব্যানার্জী, ডাঃ সেনগুপ্ত কি মেডিকেল ফ্যাকাল্টিতে থাকবার মত ডাক্তার? এর পর অনেকগুলো নাম করে এখনই রহস্য উদ্ঘাটন করতে চাই না। কারণ সময় একটা পাওয়া যাবেই বলবার। তাছাড়া আমি একথা বলি নি যে, দলের ডাক্তার কেউ থাকবে না। কিন্তু ডাক্তারদের সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে দলে ভেড়ানো বা দল তৈরি করা ঠিক নয় এবং সেটা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে। এখানে শ্রীচৌধুরীরা শিক্ষাদপ্তরকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। শিক্ষাদপ্তর এ বিষয়ে ঠিক ঠিক সব বলতে পারবেন, সেকথা আমার বলবার নয় বলে আমি কিছু বললাম না।

প্রাক্তন ডাইরেক্টার প্রসঙ্গ

প্রাক্তন ডাইরেক্টার সম্পর্কে কথাটা এইখান থেকেই সুরু করি। শ্রীচৌধুরীর রচনায় বলা হয়েছে,—"তিনি এমন কতকগুলো কথা তুলেছেন যা ডি-এইচ-এস ও মন্ত্রী ছাড়া কেউ জানতেন না। ননীবাবুর সঙ্গে তো মনোরঞ্জনবাবুর ডি-এইচ-এস-এর প্রসঙ্গে কোন সময় কোন আলাপ হয়েছে মনে হয় না। তাহলে মনোরঞ্জনবাবু এত সব কথা জানলেন কোথা থেকে, যেগুলো একমাত্র ডি-এইচ-এস-এর ভাবনার আওতায় পড়ে।" উক্ত রচনায় এই জিজ্ঞাসাটা কি খুব বুদ্ধিদীপ্ত হয়েছে বলে শ্রীচৌধুরীরা মনে করেন? বরং এতে ডি-এইচ-এস-এর প্রতি তাঁদের একটা অহেতুক ক্রোধ ছিল, সেই কথাই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি জানিয়ে রাখি, আমার খবরের উৎস কোথায়। একটু খোঁজ করলেই তাঁরা এসব পেতে পারতেন। এজন্য অহেতুক একজন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অফিসারের প্রতি অভদ্রোচিত ইঙ্গিত করা শোভন হয় নি। আমি অনেকদিন ধরে যা লক্ষ্য করেছি তারই দৃশ্যটা তুলে ধরছি।

মন্ত্রিমশাই মিটিং করছেন। সেই মিটিং-এ ডি-এইচ-এস রয়েছেন, সিনিয়র অফিসার কেউ কেউ রয়েছেন, কনফিডেনসিয়াল এ্যাসিস্টান্টরূপে দু-একজন পার্টি সভ্যও রয়েছেন, এমন কি কোন কোন প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাও রয়েছেন। আলোচনা হল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বাইরে এলেন সবাই। বাইরে এসে তাঁরা কেউই নীরব থাকতে পারলেন না। গল্পও করলেন কোথাও কোথাও। এরপর "মনোরঞ্জনবাবু এত সব জানলেন কোথা থেকে" প্রশ্ন তোলা কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ? এ বিষয়ে মন্ত্রী বা ডি-এইচ-এস কারো সহায্য আমার দরকার হয নি, আর হবেও না কোনদিন। আমি জোর করে একথা বলছি এবং প্রমাণ দিতে পারি। এই তো এখন প্রাক্তন ডি-এইচ-এস নেই এবং দপ্তর থেকে আদেশও বেরোয় নি—আমি কি করে লিখলাম 'রায় মহাশয়কে' দেওয়া হবে মেডিকেল কলেজে। কাজেই শুধু শুধু প্রাক্তন ডি-এইচ-এস-এর ওপর কটাক্ষ করে গায়ের ঝাল মেটাবার কি দরকার তা আমি বুঝতে পারি না।

এরপর প্রাক্তন ডি-এইচ-এস-কে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তাকে পূর্বাপর সাজালে এইরকম দাঁড়ায়—(১) তিনি ধর্মবীরের আমলে ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে ডি-এইচ-এস রূপে নিযুক্ত হন এবং বৃটিশ আমলের উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান কর্মচারীর সঙ্গে নাকি কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ (২) যেদিন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শাসনভার নেন সে-সময় তিনি কোন্ অজুহাতে কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিলেন (৩) শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি দীর্ঘকাল ছুটিতে চলে যান এবং শারীরিক ক্ষমতা তাঁর ছিল না (৪) তিনি সাহেবীয়ানায় অভ্যস্ত এবং স্বাস্থ্যদপ্তরে একমাত্র তাঁর ঘরই এয়ার কন্ডিশানিং করা (৫) তাঁর কর্তৃত্বাভিমানী মেজাজের জন্য অন্য অনেক কাজের সঙ্গে স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন কর্মীদের ইউনিয়ন ও এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের ডেপুটেশন ইত্যাদি পরিস্থিতির মোকাবিলা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেই করতে হয়েছে বেশির ভাগ সময় (৬) উপরন্তু মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করে হাসপাতালে ওষুধের বরাদ্দ কমিয়ে মন্ত্রীকে সমালোচনার সম্মুখীন করেছিলেন।

প্রথমে আমি বলে রাখি এই সব অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য আমি প্রাক্তন ডি-এইচ-এস-এর উকিল হয়ে দাঁড়াই নি, তবে ননীবাবু যাঁকে most efficient and honest officer বলেছিলেন, তাঁকেই এরকম হীনভাবে আক্রমণ করার প্রয়োজন হল কেন? এই ব্যাপারে পিছন থেকে কলকাঠিই বা নাড়ল কে—সেটাই আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের পক্ষে ব্যাপারটা একান্তই প্রয়োজনীয়।

প্রথমত সিভিলিয়ান কর্মচারীর সঙ্গে কুটুম্বিতা আছে কিনা কিম্বা তিনি সাহেবীয়ানায় অভ্যস্ত কিনা, মেজাজ তাঁর কর্তৃত্বাভিমানী কিনা এসব সম্পর্কে আমি কো.. কথা বলতে চাই না। যদি এগুলি প্রশাসনের অন্তরায় হয়, তখনই মাত্র কথা উঠতে পারে। কিন্তু এগুলির কি কোন সঠিক সংজ্ঞা আছে না, এগুলি বিভিন্ন রুচির মানুষের কাছে বিভিন্ন রকম? তারপর এসবের সঙ্গে তাঁর নিযুক্তির তারিখ, শারীরিক অক্ষমতা এসব কথাই বা ওঠে কেন?

আমি যতদূর পুরনো গেজেটে দেখছি শ্রীচৌধুরীরা তাঁর নিযুক্তির তারিখ যেখানে বলছেন ১৯৬৮ সালের অক্টোবর আমি দেখছি তার ক'মাস আগে। ধর্মবীর তাঁকে এনেছেন একথা ঠিক নয়—তৎকালীন ডি-এইচ-এস ডাঃ সি এল মুখার্জীই তাঁকে আনার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ও শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম ছিলেন এ কথাও সত্য নয়। জুন-জুলাই মাসে তিনি ছুটি নিয়ে ছিলেন ঠিক, কিন্তু তাঁর চাকুরীতে যোগদান করা থেকে শেষদিন পর্যন্ত—আমি তো দেখছি স্বাস্থ্যদপ্তরে তিনিই একমাত্র অফিসার, যিনি সকাল সাড়ে আটটায় প্রতিদিন অফিসে আসতেন। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে ও স্বাস্থ্যদপ্তরের অন্যান্যদের কাছ থেকে আমি যতদূর জেনেছি—প্রায় ১৯৬১ সাল থেকে গাদা গাদা ফেলে রাখা পেন্সন এবং গ্র্যাচুয়িটির কেস তিনিই তৎপরতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। সাড়ে আটটা থেকে সারাদিন কোন লোক যদি এইভাবে খাটেন তাঁকে আমি শারীরিক অক্ষমতার অজুহাতে অকেজো বলে প্রতিপন্ন করব কি করে? অবশ্য কোন হাসপাতাল অথবা টুরে গেলে তিনি স্বভাবতই সাড়ে আটটায় অফিসে আসতে পারতেন না—একথা স্বাস্থ্যদপ্তরের সবাই জানেন।

তাঁর সম্বন্ধে অবথা বলা হয়েছে—যুক্তফ্রন্ট শাসনভার গ্রহণ করার দিনে তিনি কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। জানি না যুক্তফ্রন্টের এতে কোন ক্ষতি হয়েছিল কিনা। তবে যে কথা সত্যি নয় সে কথাই বা শ্রীচৌধুরীদের এমন করে প্রচার করবার কি দরকার ছিল? আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি—যুক্তফ্রন্ট সরকার যেদিন শাসনভার গ্রহণ করেন তার কয়েকদিন আগেই প্রাক্তন ডাইরেক্টারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা শিক্ষা সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য দিল্লী চলে যেতে হয়। তিনি সেখান থেকে স্বাস্থ্যদপ্তরের সেক্রেটারীকে ট্রাঙ্ককল করে কলকাতায় আসার কথা জানান। কিন্তু তখন তাঁকে দিল্লীতেই অবস্থান করতে বলা হয় এবং টেলিফোন ও টেলেক্সের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে বলা হয়—এবং তিনি তা করার ফলে রাজ্য সরকারের কয়েক লক্ষ টাকা লাভও হয়। অথচ এত বড় একটা সত্য ঘটনাকে শ্রীচৌধুরীদের বেমালুম চেপে গিয়ে মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নিতে দেখে যারপরনাই শিউরে উঠলাম।

প্রাক্তন ডি-এইচ-এস-এর ঘর নাকি এয়ার কন্ডিশানিং করা। জিজ্ঞাসা করি এটা কি তিনি এসে করেছিলেন? তা

করলে অবশ্যই ভদ্রলোকের বিলাসিতার ওপর আমি বিরক্ত হতাম। কিন্তু এটা কি তার আগে থাকতে ছিল না? আর এ জন্য তাঁকে দায়ী করার কি দরকার—দায়ী করতে হলে তো দায়ী করতে হয় আমাদের ফ্রন্টের লোককেই। তবে গ্রীষ্মের দিনে ননীবাবুও তো এঘরে মিটিং করতেন, সেটা শ্রীচৌধুরীদের ভুলে গেলে চলবে কেন? প্রাক্তন ডি-এইচ-এস নাকি কর্মচারী প্রভৃতিদের কোন ডেপুটেশন শুনতেন না এবং তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেই শুনতে হত। এ এক আজব কথা। যুক্তফ্রন্ট হবার পর প্রতিনিধিদল ফ্রন্টের মন্ত্রীদের কাছেই যায় এবং মন্ত্রীরা তা শোনেনও। এমন কি মহাকরণের নিচে এসে তাঁরা বক্তৃতাও দেন। তাই ননীবাবুর সেটা করা একটা বড় কথা নয়। কিন্তু সেটাকেই প্রাক্তন ডি-এইচ-এস-এর "কর্তৃত্বাভিমানী মেজাজের" নজীর হিসাবে খাড়া করা অন্যায় নয় কি? তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আমি যা জানি তাতে বলতে পারি—আমি যেসব কর্মচারীদের তাঁর কাছে পাঠিয়েছি, তিনি তাঁদের সঙ্গে কখনো অসদ্ব্যবহার করেছেন বা তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন নি, এমন অভিযোগ তো আমি শুনি নি। কাজেই এসব ছেঁদো কথা বলে মানুষকে ছোট করতে গেলে, ছোট হয় কারা সেটা কি শ্রীচৌধুরীরা একবারও উপলব্ধি করলেন না?

সর্বশেষে আমি আসব সেই জঘন্য ষড়যন্ত্রের চিত্রটি তুলে ধরার অধ্যায়ে—যে অধ্যায়ে মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করে হাসপাতালে ওষুধের বরাদ্দ কমিয়ে মন্ত্রীকে সমালোচনার সম্মুখীন করেছিলেন প্রাক্তন ডি-এইচ-এস। ব্যাপারটায় আমি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম এক সময়ে। আমার নির্বাচনী ক্ষেত্রে উত্তরপাড়া জেনারেল হাসপাতাল, গভর্নমেন্ট হাসপাতাল, শ্রীরামপুর সাবডিভিশনাল হাসপাতালে হঠাৎ ওষুধের অভাব দেখে আমাকে ছুটোছুটি করতে হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বিধানসভায় মন্ত্রীমশায়ের মুখে যা শুনলাম, তারপর ব্যাপারটা খুঁজে দেখবার চেষ্টা করলাম। খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম গত বছরের বাজেট বরাদ্দ যা হয়েছিল তারই ভিত্তিতে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল। মন্ত্রীমশাই বরাদ্দ কি বাড়িয়েছিলেন তার ফলাফল অন্তত তখন দেখা যায় নি। যে আদেশনামাটি তৎকালীন ডি-এইচ-এস (বর্তমানে প্রাক্তন) দিয়েছিলেন সেটা দেওয়া হয়েছিল স্বাস্থ্যদপ্তরের স্টোর ও ইকুইপমেন্ট বিভাগের দায়িত্ববহনকারী এ্যাসিস্টান্ট ডাইরেক্টারের প্রদত্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। এইখানে আমি জিজ্ঞাসা করব, এই বিভাগের মূল দায়িত্ব কার ছিল? কে সেই লোক? স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি জানতেন না যে, বিশেষ করে ওষুধপত্র এবং সরবরাহ পরিবহন কোন্ ভদ্রলোক পরিচালনা করেন? শ্রীচৌধুরীরা লেখবার আগে একবারও কি এদিকটা ভেবে দেখলেন না—কে সুকৌশলে তথ্য সরবরাহ করেছিল ডি-এইচ-এসকে।

স্বাস্থ্যদপ্তর হচ্ছে একটা সরকারের সবচেয়ে বড় দপ্তর। যন্ত্রণাকাতর নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে গণসংযোগ করার—সেই দপ্তরে বসে মানুষকে ওষুধ না দিয়ে ক্ষেপিয়ে দেবার চেষ্টায় যে লোক ষড়যন্ত্র করতে পারে, পিছন থেকে কলকাঠি নাড়তে পারে, সে লোক শ্রীচৌধুরীদের বন্ধু হতে পারে কিন্তু সে লোককে আমি মনে করি যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বড় শত্রু।

এই শত্রুটিই আজ স্বাস্থ্যদপ্তরের সবচেয়ে বড় শনি—যে শনিকে তিনি ১৯৬৭ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখে এ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে করে ফাইল বয়ে নিয়ে যাওয়ার পর ব্যাক ডেট দিয়ে জয়েন্ট ডাইরেক্টার করে দিয়েছিলেন। তাই শ্রীচৌধুরীর রচনাকে উপলক্ষ করে উপসংহারে আমি বলতে চাই, এখনই স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন নিয়োগ করে তদন্ত শুরু করা উচিত, নতুবা যুক্তফ্রন্টের এই সবচেয়ে দুর্বল দিক থেকেই শত্রুর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হবে এবং তখন সামলাবার হয়ত আর সময় থাকবে না।

এত্তা জঞ্জাল---

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

রাইটার্স বিল্ডিংসের দিকে মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে রাইটার্স বিল্ডিংসে যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল আজ আবার তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আমলাতন্ত্রের পোয়াবারো। অত্যন্ত সুকৌশলে আমলাতন্ত্রের একটা বড় অংশ প্রচার চালাচ্ছেন যে, এই সরকারের দিন ঘনিয়ে আসছে। একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর দেওয়ার দাবি করে নানারকম গালগল্প ছড়ানো হচ্ছে। কোন দলের কোন নেতা গোপনে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কি সব ষড়যন্ত্র আঁটছেন তা নাকি এই আমলাদের একেবারে নখদর্পণে। এঁরা বর্তমান সরকারের পতনের দিন-ক্ষণ পর্যন্ত বলে দিচ্ছেন। একুশে নভেম্বর থেকে সুরু করে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো দিন তাঁরা ধার্য করে ফেলেছেন।

গোড়া থেকেই আমি এই স্তম্ভে প্রত্যেক মন্ত্রীকে বারংবার সতর্ক করে দিয়েছি আমলাতন্ত্র সম্পর্কে। মন্ত্রিসভার দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে এক-একটা দপ্তর ঐ দপ্তরের মন্ত্রীর দলীয় দপ্তরে পরিণত হওয়ায়, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আমলারা রাতারাতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দলের সমর্থক সেজে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার আর অপকর্ম চালানোর পথ প্রশস্ত করে ফেলছিলেন। শরিকে শরিকে বিবাদ যাতে আরও বেশি করে পেকে ওঠে সেজন্য যতটা ষড়যন্ত্র এই আমলাদের পক্ষে করা সম্ভব তা করতে তাঁরা কসুর করেন নি। প্রকাশ্যে তাঁরা নিজ দপ্তরের মন্ত্রীর মহা শুভানুধ্যায়ী সেজেছেন আর গোপনে ঐ মন্ত্রী যাতে অপদস্থ হতে পারেন তার ব্যবস্থা করেছেন। আর ফাঁকে ফাঁকে আমলারা সুযোগ মত দুর্নীতি আর স্বজন-পোষণের ব্যবস্থাটা বেশ চালিয়ে গেছেন।

এখন তাঁরা দিন-ক্ষণ দেখছেন। কেউ বা বিকল্প মন্ত্রিসভার সদস্য—কার কোন্ দপ্তর হবে সব কিছু প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন আর কেউ বা আবার রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হওয়ার স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছেন। ওপরের তলার আমলারা নিচের তলার কর্মীদের মধ্যে প্রচার চালাচ্ছেন আর নিচের তলার কর্মীদের একটা বিশেষ অংশ তাঁদের ফাঁদে পা দিয়ে সরবে কোনো-না-কোনো শরিক দলের পক্ষ সমর্থন করে অন্য শরিকের বাপান্ত করছেন।

ফলে রাইটার্স বিল্ডিংসে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে চলেছে। কাজকর্ম বিশেষ কিছু না করে গাল-গল্পে সময় কাটাতে চাইছেন আমলারা। তাঁদের কেউ কেউ সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন—ভাবছেন আবার কবে আমলাদের স্বর্গরাজ্য কায়েম হবে।

আমলাতন্ত্রের আসল চাবিকাঠি যাঁদের হাতে তাঁরা নির্বোধ নন্। এবার যুক্তফ্রন্ট সরকার গদিতে আসীন হওয়ার সময় থেকেই জানেন, ১৯৬৭ সালে যে কায়দায় তাঁরা উচ্চতর শক্তিজোটের ষড়যন্ত্রের সামিল হয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটিয়েছিলেন এবার সেই পথ অনুসরণ করলে চলবে না। তাই এবার তাঁরা নতুন পথ ধরে গোড়া থেকেই এগিয়ে চলেছেন। সে পথ হোল শরিক দল-গুলোর আভ্যন্তরীণ বিবাদ বাড়িয়ে তোলার জন্য পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টির ব্যবস্থা করা আর যথাসম্ভব যুক্তফ্রন্টের আসল শক্তি ৩২-দফা কর্মসূচীকে বানচাল করা। কোনো কোনো মন্ত্রীর বা মন্ত্রীর দলের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই সব অপকর্ম তাঁরা চালিয়ে গেছেন।

কিন্তু পোড়-খাওয়া সাধারণ মানুষ এই ষড়যন্ত্রের শিকার না হওয়ায় গ্রামে আর শহরে আন্দোলন থেমে না থাকায় আমলাদের ষড়যন্ত্র বার বার ব্যর্থ হয়েছে। সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে আবার তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছেন। এখন তাঁদের চেষ্টায় রাইটার্স বিল্ডিংসের টেবিলের ফাইল আর নড়তে চায় না। মন্ত্রী যে নির্দেশ দেন সুযোগ পেলে সেই নির্দেশ অমান্য করা আর তা নাহলে সেই নির্দেশকে কার্যকরী না করার পথ ধরে তাঁরা চলছেন।

কোনো কোনো তরুণ ও উৎসাহী অফিসার নতুন দিনের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাইয়ে নিয়ে যুক্তফ্রন্টের মতাদর্শকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করে অন্য আমলাদের কাছ থেকে বাধা পেয়েছেন। আসন্ন ধান কাটার মরশুমে একটা কেলেঙ্কারী ঘটবে বলে ষড়যন্ত্রকারী আমলারা আশায় আশায় দিন গুণছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আর উপ-মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যের দৃষ্টি আমি তাই গোড়াতেই আকর্ষণ করেছি রাইটার্স বিল্ডিংসে আমলাদের কাজ-কর্মের দিকে। গত মাস দুই ধরে যুক্তফ্রন্টের সামনে যে সংকট দেখা দিয়েছিল আমার হিসেবে তা এখনো অতিক্রান্ত না হলেও সংকট কমে আসছে। জনসাধারণের রাজনৈতিক মতিগতি এখানকার যুক্তফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে বড় শক্তি। জনসাধারণের চাপেই ফ্রন্টের শরিক দলগুলি ৩২ দফা কর্মসূচীকে কার্যে পরিণত করার জন্য আবার চেষ্টা করতে বাধ্য হচ্ছেন।

আমলাদের ইচ্ছানুসারে সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব হবে না কিন্তু প্রশাসনিক কাজকর্ম একেবারে অচল অবস্থায় এসে পড়ার মুখে যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে বাধা না দিলে জন-সাধারণের মধ্যে অসন্তোষ আর ক্ষোভ বাড়বে। ধান কাটার মরশুমকে নির্বিঘ্ন করে যে চাষ করেছে তার ঘরে ধান তুলে দেওয়ার জন্য মন্ত্রিসভা এবং যুক্তফ্রন্ট অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। এই কার্যক্রমের সাফল্য শরিক দলগুলোর স্থানীয় নেতৃত্বের ওপর কিছুটা নির্ভর-শীল হলেও আসলে সরকারী প্রশাসন-যন্ত্রের ওপরই পুরোটা নির্ভর করছে। বর্তমান আবহাওয়া চলতে থাকলে আমলারা "এলোমেলো করে দে মা লুটে পুটে খাই"-এর অভীপ্সিত পথে এগিয়ে যেতে পারবেন।

মন্ত্রিসভা এখনো তৎপর হলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। শ্রীসুশীল ধাড়া যে সব অভিযোগ ক্রমাগত করে চলেছেন তার মধ্যে যেখানে সত্যতা আছে তার জন্য-ও আমলাতন্ত্রই দায়ী এ কথা কি তিনি বুঝতে পারছেন না! একটু খোঁজ-খবর নিন—তাহলেই আমলাতন্ত্র যাতে রাজ্য সরকারের নির্দেশানুসারে চলতে বাধ্য হয়, আমলা-তন্ত্রের ক্ষমতাকে যাতে সীমিত করা যায় তার জন্য কেন্দ্র-বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন। যুক্তফ্রন্টের ৩২-দফা কর্মসূচীর মধ্যে প্রশাসনযন্ত্রকে জনমুখী করার যে দফাটি আছে আমি আবার যুক্তফ্রন্টকে ঐ দফার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। ঐ দফাটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংবিধান পরিবর্তনের আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে আমলা-তন্ত্র তাদের রাশ টেনে ধরতে বাধ্য হবে। যুক্তফ্রন্টের অনেক সঙ্কট কেটে যাবে এই একটি দফাকে কার্যকরী করতে পারলে।

—শ্রীসর্বদর্শী

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শত্রু পিঞ্জর

অতর্কিতে আক্রান্ত হলে ঠিক সেই মুহূর্তে কি কর্তব্য, কি কৌশল বা চাতুর্যের প্রয়োগ প্রয়োজন—মনের এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব শত মানসিক প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবীদেরও যে সাময়িকভাবে বিচলিত করে তোলে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি এবং আশা করি সকলেই নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে স্বীকার করবেন ১৮ই এপ্রিল Water Works-এর একটি প্রকোষ্ঠ হতে হঠাৎ মেশিন গানের গুলী বর্ষণ শুরু হওয়াতে কার কি মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। জালালাবাদে আচমকা আক্রমণোদ্দেশ্যে উদ্যত সঙ্গীন হাতে গুর্খাবাহিনীকে পাহাড় বেয়ে উঠতে দেখে বন্দুক হাতে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার মৃত্যুভীতিশূন্য বিপ্লবী সৈনিকদলও সাময়িকভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল। রঞ্জতের বাড়িতে হঠাৎ পুলিশের হানায় চারজন সশস্ত্র বিপ্লবীকেও কি বিপদাশঙ্কায় চঞ্চল দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে নি? চন্দননগরে স্যার চার্লস টেগার্টের মধ্যরাত্রির গোপন অভিযান মুহূর্তের জন্য হলেও কি আমাদের ফেরারী বন্ধুদের কিংকর্তব্য-বিমূঢ় করে দেয় নি?

যত বড় দুঃসাহসীই হই না কেন, মৃত্যু-ভয়হীন প্রাণ নিয়ে যুদ্ধের জন্য সদাসর্বদা যতই প্রস্তুত থাকি না কেন, অতর্কিত আক্রমণের সুযোগপ্রাপ্ত শত্রুই যে প্রাথমিক অবস্থার সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবে তাতে কোন দ্বিমত নেই। তেমন পরিস্থিতিতে প্রাথমিক প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠে যত শীঘ্র সম্ভব শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে পারলেই অবস্থা অনুকূলে আসার সম্ভাবনা থাকে।

মাস্টারদাদের আর একমুহূর্তও দেরি করার উপায় নেই। বাড়িটি এখনও হয়ত সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলতে পারে নি। বাড়িতে থেকেই যুদ্ধের মোর্চা তৈরি করে লড়াই শুরু করবেন নাকি অসমান যুদ্ধ পরিহার করে মিলিটারী বেষ্টনী ভেঙে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করবেন তা নিয়ে চিন্তারও অবকাশ নেই—নিমেষে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মাস্টারদা স্থির করলেন, বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে শত্রুর বেড়াজাল ভেদের শেষ চেষ্টা করে দেখবেন কোনমতে যদি পুলিশের হাত হতে নিস্তার পাওয়া যায়।

বাড়ির পশ্চিমে একটি পুকুর। পুকুরের উত্তর পাড় বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে গিয়ে মিশেছে। এই পথে ঝোপ ও বাঁশ বনের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে উধাও হওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে। ম্যাগাজিন রাইফেল হাতে তীক্ষ্ম দৃষ্টি সতর্ক প্রহরারত মিলিটারী অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে, ঘাপটি মেরে কোথায় বসে আছে কে জানে? অন্ধকারে নিজ অবস্থান গোপন রেখে কোন পক্ষ অপর পক্ষকে চমকিত ও বিস্মিত করে অতর্কিত আক্রমণে কাবু করবে—দু' পক্ষেরই এই একই চেষ্টা। অন্ধকারের সুযোগে নিরাপদ অবস্থানে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকার কৌশলের ওপরেই এই খণ্ড-যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করছে।

পুলিশের গোয়েন্দা ও তিনজন পুলিশ সঙ্গে ক্যাপটেন ওয়ামসলে পূর্বদিকে বাড়িটির সামনে চুপিচুপি এসে দাঁড়ালেন। সৈন্যদের বাড়িটি ঘিরে ফেলার আদেশ দেওয়া ছিল। প্ল্যান অনুযায়ী হাবিলদারেরা সৈন্যদল সঙ্গে নিয়ে নির্ধারিত পথে এগিয়ে গেল। তারা সকলেই সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সেপাই—সব রকম গেরিলা রণকৌশল অবলম্বনে পারদর্শী। কাজেই সামরিক নিয়ম ও কৌশল অনুযায়ীই তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত। মিলিটারীদল রাইফেল, রিভলভার ও সেই সময়কার আধুনিকতম মেশিন গান এবং চতুর্দিক আলোকিত করার উদ্দেশ্যে রকেট-বোমা ফায়ার করার যন্ত্র পিস্তলে সুসজ্জিত। এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়টুকুও দুপক্ষের কাছেই অতি মূল্যবান। কার কাজ আগে সম্পন্ন হবে—আগে বাড়ি ঘিরে ফেলা সম্ভব হবে নাকি আগে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বা প্রয়োজনে কে আগে গুলী চালাবে? জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ? নিশ্বাসরোধকারী মুহূর্ত!

মাস্টারদা ও ব্রজেন সেন, শান্তি চক্রবর্তী ও সুশীল দাসগুপ্ত এবং কল্পনা ও মণি দত্ত—এইভাবে দুজন দুজন করে ছয়জন বিপ্লবী তিন দলে বিভক্ত হলেন। পরামর্শ করে এইরূপ দল গঠনের সময় ও সুযোগ তাঁদের ছিল না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সামরিক কায়দায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়াও সম্ভব হোল না। অন্ধকারে মিলিটারীর অবস্থান সঠিক নির্ণয় না করেই তাদের বেষ্টনী ভাঙার কৌশল মাস্টারদাদের নিতে হোল।

সম্মুখে—বাড়ির পূব দিকে, সৈন্যদল

সঙ্গে শত্রুপক্ষের উপস্থিতি মাস্টারদারা টের পেয়েছিলেন। তাই তাঁরা বাড়িটির উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে বাড়ি থেকে বেরুবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই পথে প্রথমে শান্তি-সুশীল এগোতে লাগলো এবং তাদের একটু পিছনে কল্পনা ও মণি দত্ত নিঃশব্দে পা বাড়ালো। মাস্টারদা ও ব্রজেন সেন উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে বেরিয়ে একই পথে না গিয়ে শত্রুকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে অন্ধকারে সন্তর্পণে পা বাড়ালেন।

নিস্তব্ধ নিশিথিনীর সূচীভেদ্য ঘোর অন্ধকার—একহাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ে না! ছয়জন ফেরারী বিপ্লবী যতই সন্তর্পণে ও সাবধানে শত্রুর চোখে ধূলো দিয়ে তাদের নাগপাশ হতে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করুক না কেন, ঝোপ-জঙ্গল, বাঁশবন ও শুকনো ঝরা পাতা পদে পদে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হোল। মাঝে মাঝে খস খস—পচ পচ মড় মড় শব্দে শত্রুকে জানিয়ে দিল যে বিপ্লবীরা পালাবার চেষ্টা করছে।

বাঁশবন, শুকনো পাতা, নর্দমার কাদা, প্রভৃতির সংস্পর্শে সৃষ্ট বিপ্লবীদের পায়ের শব্দের অনুরূপ শত্রুসৈনের তৎপরতার নানা ধ্বনি রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিপ্লবীদের কানেও এসেছে।

পুকুরের খুব সরু পিচ্ছিল উত্তরের পাড় দিয়ে শান্তি, সুশীল, মণি ও কল্পনা আগে-পিছে করে চলেছে। নিকষ কালো ঘোর অন্ধকারে চতুর্দিক ঢাকা। শান্তির হাতে ছোট্ট একটা টর্চ ও গুলী-ভরা রিভলভার। আন্দামানে শান্তি চক্রবর্তীর মুখে শোনা—সে তখন মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত নিল। সিদ্ধান্তটি ঠিক কি বেঠিক হয়েছিল সে সম্বন্ধে শান্তি তখন কিছু বলতে চাইছিল না; কারণ তা বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটে গেল এবং যার দায়িত্ব একমাত্র তারই, সে কথাই সে বললো—'কোন সুযোগে মিলিটারী বেষ্টনী হতে নিষ্কৃতি পাবার উদ্দেশ্যে মাস্টারদা ব্রজেনের সঙ্গে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলেন। আমার মনে হোল উত্তর-পশ্চিম দিকে আমরা যদি বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য গুলী চালাই তবে হয়ত শত্রুপক্ষ আমাদের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং সেই সুযোগে মাস্টারদার পালাবার পথ সুগম হবে। সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। এগিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়লো। একটুখানি আলোর সাহায্যে গমন পথের সামান্য আন্দাজও যদি পাওয়া যায় তবে অনেকখানি আস্থা ও ভরসা নিয়ে এগোনো সম্ভব। তাই মুহূর্তে আমার মাথায় বিদ্যুতের মত খেলে গেল—এক ঢিলে দুই পাখী মারবো। ছোট টর্চটি এক সেকেন্ডের জন্য জ্বালালাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখে শত্রুর অবস্থান বুঝতে পেরে আমার রিভলভারটি ফায়ার করলাম। আকস্মিকভাবে আমার টর্চের আলো ও রিভলভারের গুলীতে সম্মুখস্থ শত্রুসৈন্য বিচলিত হয়ে রাইফেল ফায়ার করতে শুরু করলো। শত্রুর রাইফেলের জবাবে আমরা মাত্র কয়েক রাউন্ড ফায়ার করি। আমি ও সুশীল, কল্পনা ও মণি দত্তের কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। পুকুর ধার ধরে এগিয়ে গিয়ে আমরা দুজনে কোনমতে মিলিটারী বেষ্টনী পেরিয়ে গেলাম। তারপরে সামনেই ছোট একটি খাল বা খাদের মত একটি পরিখা। আমার প্রথম গুলীটি ছোঁড়ার পরক্ষণথেকে আমাদের এই খালটি অতিক্রম করে যাওয়া পর্যন্ত প্রায় এক মিনিট সময় অতিবাহিত হোল। এই এক মিনিটের মধ্যেই মিলিটারীর রাইফেলের বহু গুলী সাঁই সাঁই করে ছুটে চলেছে। একটি গুলী আমার পিঠে লেগে হৃৎপিণ্ড ঘেঁসে এফোঁড় ওফোঁড় করে বুকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল (শান্তির ক্ষতচিহ্ন আমরা সবাই আন্দামানে দেখেছি)। পিঠের স্ক্যাপুলা অস্থিটি গুলীতে বিদীর্ণ। অসহ্য যন্ত্রণায় বাঁ হাতটি প্রায় অবশ হয়ে পড়লো—ডান হাতে তখনও রিভলভার ধরা। বহু দুর্যোগ বহু দুরবস্থার মধ্যেও অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বাসী সাথী আমার রিভলভারটির স্পর্শ তখনও আমার মনে আশার সঞ্চার করছিল—তখনও ভাবছিলাম মিলিটারীর কবল থেকে হয়ত মুক্ত হতে পারবো। অঝোরে রক্ত ঝরছে—অতিরিক্ত রক্তপাতে সমস্ত শরীর ক্রমেই অবশ হয়ে আসছে। তবু মানসিক শক্তি ও সাহসে নির্ভর করে মায়ের ইঙ্গিতেই যেন আমি দ্বিগুণ উদ্দীপনায় পড়ি কি মরি করে ছুটতে লাগলাম। মিলিটারীরা এবারে 'আলোক-বোমা' ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো। সারা পথ মাঠ-ঘাট 'রকেট-বোমার' আলোতে দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নিজেকে শত্রুর দৃষ্টির বাইরে রাখতে কখনও মাটিতে সটান শুয়ে, কখনও ঝাড়-জঙ্গলের আড়ালে, কখনও খানা-ডোবার সুযোগ নিয়ে, আবার কখনও বা হামাগুড়ির সাহায্যে প্রায় দুশ গজ এগিয়ে গেলাম। রাইফেল ফায়ার করা ও রকেট-বোমা ফাটানোর বিরাম নেই। আলোক বন্যায় উদ্ভাসিত আমাদের ফেলে-আসা বাড়িটির চারপাশ থেকে রাইফেল মুহুর্মুহু গর্জন করে চলেছে। মাস্টারদা পালাতে সক্ষম হয়েছেন কি না তখনও আমি তা' জানি না।

"আমার পাশে আর কাউকে তখন দেখতে পেলাম না। বুঝতে পারলাম আমি ও সুশীল—আমরা পরস্পরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।......এতক্ষণে মনে হোল যেন মিলিটারীকে পিছনে ফেলে এসেছি। একেবারে নিরাপদ হয়েছি বা Danger Zone থেকে সম্পূর্ণ বাইরে চলে এসেছি বলে অবশ্য ভাবতে পারি নি। তাছাড়া রাইফেলের গুলীতে যেরকম গুরুতরভাবে আহত হয়েছি তাতে সময়মত চিকিৎসা না হলে জীবন কতখানি বিপন্ন হতে পারে তাও আমি সম্যকভাবে বুঝতে পারি নি। তবে আমার যে আশু চিকিৎসা ও বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন তা' উপলব্ধি করেছিলাম।......মনে পড়ে গেল হাবিলাশ দ্বীপের 'Amiable Shelter'-এর কথা—আমাদের দরদী বন্ধু রমণী চৌধুরীর বাড়ি। শেষ পর্যন্ত ভরসা করে তাঁর আশ্রয়ে গিয়ে উঠলাম। তিনি আমাকে এরকম গুরুতর আহত অবস্থায় দেখে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত হয়ে আমার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। আমাদের সাথী নেপাল আমার সঙ্গে এই আশ্রয়ে এসে রইল। আস্তে আস্তে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম।......মাস্টারদা ধরা পড়বার প্রায় সাত মাস পরে আমাকে ও নেপালকে এই বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়। অস্ত্র-আইনে আমাদের সাত বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হোল। কিন্তু পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে আমার সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা ও মাস্টারদার সঙ্গে গৈরলা গ্রামের বাড়িতে একত্রে অবস্থিতির কথা এবং রাইফেলের গুলীতে আমার বুক পিঠ ভেদ হয়ে যাওয়ার কথা পুলিশের সম্পূর্ণ অগোচরেই থেকে যায়......।"

সরকারী প্রেসে মুদ্রিত হাইকোর্টে মাস্টারদার আপীলের জাজমেন্টের ২৪৬ পৃষ্ঠা হতে উদ্ধৃত হোলঃ—

"The cordon was kept round the house till morning when the inmates came out. The house and grounds were then searched by the police under his supervision. A trail of blood was found at the N. W. corner which he followed about 200 yards to the East, and then deputed Sailendra Kumar Sen, A.S.I., to follow up. After the first search was completed Captain Wammsley, left with the Prisoners, Revolver, and ammunition and property found up till then."

এখানে সরকারী নথী থেকে জানতে পারছি দিনের বেলা প্রায় ২০০ গজ পর্যন্ত তারা রক্তচিহ্ন অনুসরণ করে; কিন্তু কে আহত হয়েছে বা তার কি হোল শেষ পর্যন্ত তা' জানতে সক্ষম হয় নি। [ক্রমশঃ]

[পূর্বানুবৃত্তি]

পনেরো

১৭৯২ সাল। ক্যালকাটা গেজেট। নীলাম নোটিসঃ

২১শে মে, খাজুরীতে অল্পাধিক আট বিঘা জমির উপর ৪খানি শয়নগৃহ, একটি খোলা বারান্দা ও বিরাট হলঘর সহ দ্বিতল অট্টালিকা নীলাম ডাকা হইবে।

১৮০৮ সাল।...

খাজুরী এস্টেট। ১১ই ফেব্রুয়ারী Tulloh & Co-র নীলাম গৃহে পরলোকগত মেসার্স জন রাসেল ও উইলিয়াম হল্যান্ডের একজিকিউটারগণের অনুমতিক্রমে উপরোক্ত রাসেল অ্যান্ড হল্যান্ড কোম্পানীর মূল্যবান ও সুবিখ্যাত অফিস গৃহ, এবং আরও কয়েকটি গৃহাদি সহ প্রায় এক শত বিঘা জমি পূর্ণস্বত্বে নীলাম হইবে।

এই সেই খাজুরী।...

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বন্দর-নগরী—সাধের সাহেবনগর। একদিন রামমোহন এখান থেকে বিলেত যাত্রা করেছিলেন।

সামনে ধূ ধূ করছে বালুবেলার চড়া—পেছনে বুনো গাছ-গাছালির ঘন অরণ্য।

পেছন থেকে টেনে ধরলে পবন খাঁ। চাপা গলায় বলে উঠল, "হুঁশিয়ার!"...

জীবেন থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কি!"

"বরা...দাঁতাল!" আঙুল দিয়ে দেখাল পবন খাঁ সামনের ঝোপের দিকে। বললে, "দেখেছ?"

দেখতে দেখতে বালির ঝড় তুলে বন বাদা ভেঙে জানোয়ারটা ছুটে আসছে সিধে।

"হেই......সামাল"......সামনে থেকে জীবেনকে ঠেলে সরিয়ে পবন খাঁ মহড়া নিয়ে দাঁড়াল। বললে, "সরে যাও পাশে—গোঁয়ার জানোয়ার...ফেড়ে দিবে।"

হাতে সেই লোহার রড মাত্র সম্বল। দাঁড়াল তাক করে। আর একটা জানোয়ারের মত সে-ও যেন ফুলে উঠেছে। বললে, "কাছে এলে পাশ থেকে মারো গুলী।"

কিন্তু এই একটা জন্তুর জন্যে জীবেন তার মূল্যবান বস্তুটা আর খরচ করতে নারাজ। মিথ্যে করে বললে, "ওটা বাঁতি-ঘরে ফেলে এসেছি।"

"তবে পালাও—সরে যাও, এসে পড়ল।"...

ঝড় এসে পড়ল বলতে বলতে। ছুটে দুজনেই আর একদিকে সরে গেল। বুনো শুয়োরটা ছুটে বেরিয়ে গেল খানিকটা। সেই সুযোগে ওরা দুজন আরও সরে গেল দূরে।

পবন খাঁ বললে, "একটা গাছে উঠে পড়। ঝটপট। শালাকে আমি দেখছি।"...

শুয়োরটা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ছুটে আসছে আবার লক্ষ্য স্থির করে। পবন খাঁ তাকে খেলিয়ে খেলিয়ে ক্রমাগত উত্তেজিত করে টেনে নিয়ে গেল বালির চড়ায়।

আর তেমন ছুটতে পারে না জন্তুটা, নরম তুরতুরে বালিতে ক্রমশ দেবে যায় চারটে পা। প্রবল বেগে ল্যাজ নাড়ে আর গোঙায়। ব্যর্থ আক্রোশে মাথা ঠুকে বড় বড় দাঁত দুটো বসিয়ে দেয় বালিতে। সন্তর্পণে পাশ দিয়ে ঘুরে এসে পবন খাঁ সিধে সজোরে বসিয়ে দিলে তার লোহার রডটা পেট বরাবর। একেবারে এফোঁড় ওফোঁড়।

"মর শালা।"...

আরও কয়েকটা এফোঁড় ওফোঁড়। জানোয়ারটা আর্তনাদ করতে লাগল।

কপালের ঘাম আঙুল দিয়ে চেঁছে ফেলে পবন খাঁ ফিরে চললো জঙ্গলের দিকে।

জীবেন জিজ্ঞেস করলে, "এমন জানোয়ার আর কি কি আছে?"

পবন খাঁ বললে, "আছে—হেঁড়োল আছে।"

হায়না।

নদী সাঁতরে নেকড়েও ছিটকে আসে কখনো কখনো সেই সুবর্ণরেখার জঙ্গল থেকে।

সামনের ধূ ধূ বালুকা প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে ছিল জীবেন। নেই—সে উজ্জ্বল বন্দর-নগরীর কোনো চিহ্ন নেই। সার বেঁধে দাঁড়ায় নি বিদেশী জাহাজের দল। 'হোম'-এর খবর সংগ্রহের জন্যে ছুটে আসে নি কলকাতা থেকে রিপোর্টারের ঝাঁক—হুগলী নদীর বুকে ছুটছে না খবরের ছিপ। কোথায় ভরাডুবি হয়ে গেল সুলুপের মাল বোঝাই ভড়—কেউ

—প্রনসী। হা-হা করছে যেন দিগন্ত থেকে দিগন্ত। নিঃসীম শূন্যতায় মাথা খুঁড়ে মরছে উপসাগরের ঢেউ।...

জঙ্গলের দিকে তবু দু-চারটে ইঁটের টুকরো পায়ে ঠেকে।

অন্য মনে জীবেন এগিয়ে চলেছিল —পবন খাঁ পেছন থেকে বলে উঠল, "হাই দেখ।"...

চমকে জীবেন ফিরে তাকাল। পবন খাঁ আঙুল তুলে দেখাল—গাছের ওপরে।

মধু। মস্ত মৌচাক। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পবন খাঁর মুখ। বললে, "ঢের মধু। বুঝলে। অনেক দিন চলবে। হি...হি...হি।" সে হাঁড়ি আনতে ছুটল।

জীবেন এগিয়ে চললো। থমকে দাঁড়াল একটা সমাধিভূমির পাশে। এককালে বোধ করি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল —আজ ভেঙে পড়েছে।

একটা...দুটো...তিনটে...

জীবেন গুণতে শুরু করলে। তেত্রিশটা মোটমাট। কটায় খোদিত লিপি আছে—কটা আরও পুরনো। ওই দেখ —১৮০০, ১৮০১, ১৮০৫।...শেষ তারিখ ১৮৬৪।...ওর মধ্যে সিভিলিয়ান বার্লো, ডাক্তার জর্জ করবেন, ম্যাজিস্ট্রেট চামার, বটেলহো, এডওয়ার্ড ম্যাক্সওয়েলের স্ত্রী। ...ম্যাক্সওয়েল কবিতা লিখেছে...

Here lies my darling wife..

মার্বেল পাথরে খোদিত আরও একটা দীর্ঘ কাহিনী সারলটি এ্যানি।

মিডলসেক্সের রেভারেন্ড টমাস ব্যাকনের একমাত্র মেয়ে। কবে নীল সমুদ্রে তার জাহাজ ভেসেছিল কে জানে—দুই ভাই ছুটে এসেছিল খাজুরীতে। দুই ভাই-ই কাজ করে ভারতবর্ষে—বোন আসছে ওদের দেখতে। পোর্ট অফিসের গম্বুজ ঘরে লাগানো দূরবীনে চোখ লাগিয়ে দেখেছে দিনের পর দিন। একমাস— দুমাস—তিন মাস। 'ইউনিয়ান জ্যাক'-এর পাত্তা নেই।

খবরও তো সহজে মেলে না। সমুদ্রের খবর।

পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, স্পেন, ফরাসী—সওদাগরী ঢের জাহাজ আসে। তাদের কাছেও খবর মেলে না। ফরাসীরা কথা বলে না—ভারতের মাটি আর ব্যবসা নিয়ে তাদের সঙ্গে তখন ঝগড়া।

শেষ পর্যন্ত হল্যাণ্ডের একজন নাবিক খবর বলতে রাজী হলো। লোকটা যেমন মাতাল আর তেমনি জুয়াড়ি। খবর বলার আগে ডান হাত পেতে দিলে।

বড় ভাই হাতে একটা মোহর ফেলে দিলে।

লোকটা টস্ করার মতো মোহরটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিয়ে, বাঁ হাত বাড়িয়ে বললে, "মি মোর।"

ছোট ভাই খেঁকিয়ে উঠল, "খবরের জন্যে চার মোহর!"

মোহরটা পাৎলুনের পকেটে চালান করে দিয়ে নির্বিকারভাবে বললে, "তবে রাস্তা দেখ মাই সুইট।"

ঢের দর কষাকষিতে রাজী হলো লোকটা—এক বোতল হুইস্কি আর দুটো মোহর। পোর্ট কাফেতে খেয়ে-দেয়ে বাকি একটা মোহর পকেটে চালান করে দিয়ে বললে, "সে জাহাজ ডুবে গেছে মাই সুইট। আমেন" বলে ক্রস করলে।

খবর—খবর, তার জাত নেই—ভালো হোক আর মন্দ হোক। দুভাই ম্রিয়মাণ।

পোর্ট অফিসার বটেলহো আশ্বাস দিয়ে বললে, "দুদিন দেখই না। আমরা তো কোনো খবর পাই নি। তবে পেয়ে যাবো শীগগির।"

দুভাই বসে থাকে পোর্ট অফিসের দরজায় পালা করে।

একদিন বটেলহো সহাস্যে সামনে এসে দাঁড়াল—বললে, "দেখবে এস। দূরবীন ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে, "লুক। দূরবীন ধরো।"

দূরবীনে চোখ লাগিয়ে ছোট ভাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "ইউনিয়ান জ্যাক!"...

দীর্ঘ সমুদ্র-পথ। কত না জানা কারণে দেরিও তো হতে পারে। প্রবীণ বটেলহো বুঝিয়ে বললে।

ছোট ভাই দূরবীন ছেড়ে দুবি আস্ফালন করে বললে, "বাট দ্যাট চিট! দেখা পেলে পাঁজরার দুপাটি দাঁত আমি খসিয়ে নেবো।" বলতে বলতে ছুটল বড় ভাইকে খবর দিতে।

দুপুর নাগাদ জাহাজ বন্দরে ভিড়ল।

ভরা জাহাজ। নানা মানুষ। নানা ধরনের মাল। স্বদেশাগতদের নেওয়ার জন্যে বন্দরে নানা মানুষের ভিড়। ছেঁকে ধরেছে কলকাতার রিপোর্টারের ঝাঁক। জাহাজের পাশেই তাদের বাইশ দাঁড়ের ছিপ সব তৈরার। ঝটপট খবর নিয়ে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে চলে গেল সাতখানা ছিপ।

মানুষজন নামছে। মালপত্র নামছে। নানা কলরব হৈ হাল্লায় মুখর খেজুরী বন্দর।...

ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে দুভাই চেয়ে আছে—কই, অ্যানি কোথায়! সবাই নেমে আসছে হাসতে হাসতে—শুধু অ্যানির দেখা নেই। বন্দরে যাত্রীর ভিড় পাতলা হতে হতে শূন্য হয়ে গেল, থেমে এল হাজার মানুষের কলকূজন। অ্যানি নেই।

একটা কফিন নামছে সব শেষে।

দুভাই ছুটে গেল জাহাজের ক্যাপটেনের কাছে।

"সারলটি অ্যানি! মিডলসেক্স থেকে কেউ প্যাসেজ নেয় নি?"

ক্যাপটেন জিজ্ঞেস করলে, "তোমরা তার কে?"

"ভাই। তাকে নিতে এসেছি। কোথা অ্যানি!"

"দেয়ার।" কফিন দেখিয়ে ক্যাপটেন বললে, "ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন।"...

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পথেই সে মারা গেছে।...খেজুরীর মনোরম বন্দর-নগরী তার আর দেখা হলো না। সাতসমুদ্র পার থেকে শুধু সে শুনেই গেছে।

Here lies our sweet sister,

পাশেই পোর্ট অফিসার বটেলহোর সমাধি—গায় গায় স্ত্রী মেরী আর একমাত্র ছেলে ইউজিন। সপরিবারে সে-ও মারা গেছে ১৮৬৪ সালের সমুদ্রোচ্ছ্বাসে।

অরণ্য-সমাধির ছায়ায় বিলুপ্ত খেজুরী বন্দরে বেলা বিষণ্ন হয়ে এলো।

পবন খাঁ পেছন থেকে বলে উঠল, "হেই তুমি হেথা বসে আছ! চলো চলো —ই জায়গা ভাল লয়। হেথা এসেছ কেন? আঁধারি হয়ে এল।"

অ্যানির সমাধির ওপরে বসেছিল জীবেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "কেন!"

চোখ বড় বড় করে পবন খাঁ বললে, "ঘোর রাত্তিরে ওই ঘরটায় আলো জ্বলে"!

সেই পুরনো জীর্ণ পোর্ট অফিস—

যে মুখখানির দিকে
সবাই তাকিয়ে আছে
তিনিই বলবেন

কারণটা ঃ
হেজলীন স্নো

হেজলীন স্নো-র মোলায়েম হালকা পরশ তোলা বিউটি ক্রীমেরই মতন। আপনার মুখখানিকে দিবা স্নিগ্ধ নিটোল লাবণ্যে ভ'রে দেয়। অপরূপ তরুণ কোমল কান্তিতে আপনার মুখখানি নির্মল হয়ে ওঠে। ছোটোখাটো দাগ-ছিট-অসমতা ঢাকা পড়ে যায়—আপনার মুখে ফুটে ওঠে এক স্নিগ্ধ কমনীয় আভা। আজই আপনার হেজলীন স্নো-র সঙ্গে পরিচয় হোক... দিনের পর দিন সে পরিচয়ের সার্থকতা আপনার মুখখানিকে সুন্দর থেকে সুন্দর ক'রে তুলবে।

হেজলীন স্নো-তরুণের স্বপ্নমাখানো স্বাভাবিক কান্তির উৎস

সামনে ভেঙে পড়া সিগন্যাল মাস্ট। ওই-টুকু এখনো মাথা উঁচু করে আছে।

"চলো।"—

জীবেনের উঠতে ইচ্ছে করছিল না—পবন খাঁর তাড়ায় উঠল।

সাহেবনগরের ঘন অরণ্যের ছায়া তখন কালো হয়ে আসছে।

আঠারো

চরের মানুষ একদিন হকচকিয়ে দেখল—সেপাইসান্ত্রীর একটা দল এগিয়ে আসছে চরের দিকে। অতর্কিত হামলা আক্রমণ—কারণে অকারণে, এ পর্যন্ত ওরা ঢের দেখেছে। দেখতে দেখতে কিষাণপাড়ার মেয়ে-মরদ সজাগ হয়ে গেল।

সবে তখন সকাল।

কিন্তু দলটাকে আজ তেমন কুচকাওয়াজ করা মারমুখো মনে হলো না। কেমন যেন ঢিলে-ঢালা। চরে ঢুকে কিষাণপাড়ার দিকে না এগিয়ে সোজা ভেড়ি বাঁধ ধরে এগিয়ে গেল জালপাই জঙ্গলের দিকে। বড় দারোগা তার দুজন ছোট দারোগার সঙ্গে অনেকটা এগিয়ে গেছে কথায় কথায়

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকে নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তর-তাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপাল-পূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪·০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা—১২

—সেপাইসান্ত্রীরা খানিকটা এলোমেলো—আগে পেছনে।

চরের মানুষ জিজ্ঞাসু চোখে এ-ওর মুখের দিকে তাকাল। জঙ্গলে কি? ওদিকে গেল কেন?

ব্যাপারটা জানবার জন্যে হাবু সাহস করে এগিয়ে গেল।

জন দয়েক সেপাই পিছিয়ে পড়েছিল।

হাবু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "ওদিকে যাচ্ছে কেন সেপাইজী। ওদিকে কি?"

"ডাকাত আসে—ডাকাত।" পশ্চিমা সেপাই বললে, "যা তোর গাঁউলি আদমিদের ডেকে লিয়ে আয়—পাকড়াতে পারলে ঢের রুপেয়া মিলে যাবে।"

"কোথায় ডাকাতি হলো সিপাইজী? কার বাড়ি?"

"জেলা শহরে হৈল। শালা ম্যাজিস্টর সাহাবকে খুন করল। বুঝল?" সেপাইজী বললে, "শালা পুরা খুনী ডাকাত আসে। যা তোর আদমিদের ডেকে লিয়ে আয়।"

"হেই এলম বলে।"—এক লহমায় ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে হাবু সটকে পড়ল।

পাড়ায় ফিরে এল প্রায় ছুটতে ছুটতে। উত্তেজনায় মুখ চোখ গরম। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বললে, "সেই লোকটাকে ধরতে যাচ্ছে!"

"কোন লোকটা"

সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল হাবুর মুখের দিকে। কোন লোকের কথা বলে হাবু।

দূরের মানুষ। অচেনা মানুষ। তার সঙ্গে চরের কিষাণপাড়ার মানুষের কোনো চেনা পরিচয় নেই। ওদের অবাক হওয়ারই কথা।

হাবুরও চেনা পরিচয় নেই—তবু সেই অচেনা লোকটা হাবুর যেন ভীষণ চেনা।

হাবু বললে, "সেই যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলী করে পালিয়ে এল।"

হাবুর কাছে সে গল্প সবাই শুনেছে। সকলে হাঁ করে জালপাই জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইল।

মহেশ মণ্ডল সন্দিগ্ধ গলায় বললে, "লোকটা কি এই জালপাই জঙ্গলে এসে ঢুকল?"

"না ঢুকলে সেপাই-দারোগা জঙ্গলের দিকে যাবে কেন?" হাবু বললে, "পুলিশে নিশ্চয়ই সন্ধান কিছু পেয়েছে ছোট মণ্ডল। হোই দেখ—জঙ্গলের কাছে যেয়ে পুলিশ কেমন সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে।"

তাই বটে। জঙ্গলে ঢোকবার আগে সেপাইসান্ত্রী ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় দারোগা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে কি যেন বলছে। বোধ করি প্রয়োজনীয় আদেশ নির্দেশ দিচ্ছে।

চরের মানুষ দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

হাবু মহেশের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, "একটা সেপাই মোকে বললে—সকলকে ডেকে লিয়ে আয়—ডাকাত ধরতে পারলে ঢের টাকা পাওয়া যাবে।"

মহেশ মণ্ডল গর গর করে উঠল। বললে, "খবর্দার। কেউ যাবি নি।"

"অনেকগুলান টাকা পাওয়া যেত ছোট মণ্ডল।" বলে হাবু হাসতে লাগল।

গেল না কেউ। চরের মানুষ শুধু দেখতে লাগল দূরে থেকে দাঁড়িয়ে। সেপাই-সান্ত্রী ছোট ছোট দলে ঢুকে গেল জঙ্গলের ভেতরে।

জঙ্গলের দিক থেকে তারপর আর কোনো সাড়াও নেই—শব্দও নেই। কৌতূহলী দ্রষ্টার ভিড় সরে গেল আস্তে আস্তে।

মহেশ মণ্ডল বললে, "দুরন্ত জঙ্গল—যদি কেউ ঢুকেও থাকে—কোথায় খুঁজবে তাকে!"

শুধু একটা গ্রাম্য কৌতূহল মনে মনে চেপে চরের মানুষ চলে গেল যে-যার কাজে।

ছিটকে গেল শুধু মুকুন্দ।

চালে গোঁজা টাঙিটা গামছায় জড়িয়ে সবার অলক্ষ্যে সে এগিয়ে গেল জঙ্গলের দিকে।

ধরা পড়ে গেল যুগলের কাছে।

যুগল জিজ্ঞেস করলে, "কোথা যাস।"

মুকুন্দ বললে, "ডাকাত ধরা দেখতে।"

গামছায় জড়ানো বস্তুটির চোখ কুঁচকে দেখতে দেখতে বললে, "ওটা কি? টাঙি।"

"হাতে থাক।" মুকুন্দ বললে, "যদি পারি—দুটো কাঠকুটো কেটে আনবো।"

মুকুন্দ এগিয়ে গেল—একা।

গোলবদন যাই বলুক, ছোট মণ্ডল যে বিচারই করুক, একদিন এই বনের ধারে নয়নের সেই শাড়ি ছিনিয়ে নেওয়ার রহস্য তার কাছে আজও রহস্যই থেকে গেছে। কতদিন, সবার অলক্ষ্যে এ জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে এদিক-সেদিক ঘুরেছে সে। সেপাইসান্ত্রী ঢুকেছে আজ। তারা নিশ্চয় পাতি পাতি করে খুঁজবে—সারা জঙ্গল হাটকাবে। সেই সুযোগে কারুর যদি দেখা পেয়ে যায় মুকুন্দ।

ক্রমশ।

যুক্তফ্রন্ট কি এবং কেন?

তুষার চট্টোপাধ্যায়

যুক্তফ্রন্টের সম্ভাবনার দিকটার চেয়ে যেন সমস্যার দিকটাই আজ লোককে বেশি চিন্তান্বিত করেছে। যুক্তফ্রন্ট গঠনের ও তার সাফল্যের সময়ে কি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা জনচিত্তকে আলোড়িত করেছিল। কিন্তু আজ সমস্যাগুলো এমন বড় হয়ে উঠেছে যেন সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা ধামা চাপা পড়ে যাচ্ছে। কেরালায় যুক্তফ্রন্টের সংকট এমন রূপ নিয়েছে যে, কবে যে সে-সংকট অতিক্রান্ত হবে তা লোকে ভাবতে পারছে না। পঃ বাংলাতেও যুক্তফ্রন্টের সংকট দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অথচ ঠিক এমনি সময়েই শাসকদল কংগ্রেসের মধ্যকার চরম ভাঙনের পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তির যুক্তফ্রন্টের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এমনভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে যে, কেউই তা অস্বীকার করতে পারছে না। কেরালারই হোক, আর পঃ বাংলারই হোক, সকল বামপন্থী দলই অনুভব করছে যে, যুক্তফ্রন্টের ভূমিকা এখন রাজ্যের ক্ষেত্র থেকে প্রসারিত হয়ে কেন্দ্রের ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছেচে। এই দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়া যখন, তখন নিশ্চয়ই যুক্তফ্রন্টের বিষয়টা একটু গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। সম্ভাবনা যখন রয়েছে, তখন নিশ্চয়ই সমস্যাটা অনতিক্রম্য নয়। আবার সমস্যাটা যখন রয়েছে, তখন নিশ্চয়ই সম্ভাবনাটা স্বতঃসিদ্ধ নয়। যুক্তফ্রন্ট কি ও কেন, তা একটু মূলগতভাবে আলোচনা করা তাই অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাহ্যত দেখলে, যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে কোনো একটা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম-উদ্দেশ্যসম্পন্ন কতগুলো পার্টির একত্রিত হয়ে চলা। আভিধানিক অর্থ ধরলে, যে কোনোই কোয়ালিশনই যুক্তফ্রন্ট। কিন্তু ইতিহাসগত ও ঐতিহ্যগত অর্থে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সমাবেশই হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট, যা ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা থেকে উদ্ভূত। আমাদের দেশে যুক্তফ্রন্টের ধারণা বাস্তবরূপ নেয় কংগ্রেসী-শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী শক্তিসমূহের সমাবেশের মধ্য দিয়ে। যত বড়ই হোক কোনো একটি পার্টির শক্তিতে কংগ্রেসকে পরাজিত করার অবস্থা নয় বলেই যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজন। এটাই হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা। পঃ বাংলায় ১৯৬৭-তে দুই যুক্তফ্রন্ট হয়েও শেষ পর্যন্ত তা জোড়া লাগল এই সত্য উপলব্ধি করেই। বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রচন্ড সংঘাত সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট আছে, কেন না যুক্তফ্রন্ট না হলে কংগ্রেসের বিকল্প হয় না।

কিন্তু আজই বা কংগ্রেসের বিকল্প অপরিহার্য কেন? এইরকম একটা ঝোঁকও মাঝে মাঝে দেখা যায় যে, ভিন্নমতসম্পন্ন পার্টিগুলির জোর করে তৈরি সমস্যাসঙ্কুল যুক্তফ্রন্টের চেয়ে পার্টিগুলির নিজস্ব মতাদর্শ নিয়ে জনসাধারণকে সমবেত করে ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া বেশি কার্যকর নয় কি? ছোট দলের কথা ছেড়ে দিলেও, বড় দলের দিক থেকে এই পথটাই কি বেশি সম্ভাবনাপূর্ণ নয়? ভাঙা-গড়ার বা নানা জটিলতার মধ্য দিয়ে না গিয়ে কেন সমাজতন্ত্ররূপ একটা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে এগোন হবে না? তাতে পথটা স্পষ্ট থাকে, সংগঠনও দৃঢ় থাকে, জনসাধারণের দৃষ্টিও স্বচ্ছ থাকে। তাতে সময়টা একটু বেশি লাগলেও, অযথা যুক্তফ্রন্টের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলতে হয় না। হাঁ, এই ঝোঁক মাঝে মাঝে দেখা দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনের সময় এই ঝোঁক স্বতন্ত্রভাবে পার্টি-ভিত্তিক নির্বাচনদ্বন্দ্বের পক্ষপাতী হয়। বিশেষ করে বড় দলের অনুগামীদের মধ্যে এ-মানসিকতা মাঝে মাঝে আসে।

কিন্তু সে-ঝোঁক বেশি দূর এগোতে পারে না। কারণ, আজকের পরিস্থিতিটাই এমন যে কংগ্রেসের বিকল্প এখনই সৃষ্টি করতে না পারলে পরিস্থিতিটা যেখানে আছে সেখানে থাকবে না, আরও খারাপ হবে। দেশের সংকট যত বাড়ছে, ততই শাসকশ্রেণীর মধ্যে চরম-প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সংহত হচ্ছে ও কংগ্রেসের বাইরের চরম-প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের জোটবন্ধন দৃঢ় হচ্ছে। দুইয়ে মিলিয়ে শাসন-ব্যবস্থা ও শাসন-নীতিকে ক্রমশ এমন চরম প্রতিক্রিয়ার দিকে নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে যে, গণতন্ত্রই তাতে বিপন্ন হয়, প্রগতিশীল শক্তির ওপর আক্রমণ তাতে বাড়ে। এই প্রতিক্রিয়াশীল গতি অব্যাহত থাকলে বিপ্লবী পার্টির ওপর প্রত্যক্ষ আঘাত আসে, জনগণের অধিকার আরো খর্ব হয়, দমননীতি আরো ব্যাপক হয়। তাতে বামপন্থী পার্টির অগ্রগতি ব্যাহত হয় শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের মধ্যে গণতান্ত্রিক শক্তির স্ফুরণও দমিত হয়। অর্থাৎ সমগ্র পরিস্থিতির নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায় চরম-প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। সুতরাং প্রতিক্রিয়ার এই ষড়যন্ত্রকে পরাজিত করার আশু লক্ষ্য বাদ দিয়ে শুধু দূর লক্ষ্য নিয়ে চলা আজকে সম্ভবই নয়। সেই জন্যই কংগ্রেসের বিকল্প ও তার জন্য যুক্তফ্রন্ট অপরিহার্য। পরিস্থিতির এই অনুধাবনই সকল দলকে যুক্তফ্রন্টের প্রতি আগ্রহী করেছে—তা সে বিপ্লবী আওয়াজের মাধ্যমেই হোক, আর সাধারণ গণতন্ত্রী আওয়াজের মাধ্যমেই হোক।

কিন্তু যুক্তফ্রন্টের ধারণা কি শুধু সংখ্যাগত ধারণা? অর্থাৎ, শুধু সংখ্যাগত দিক থেকেই কংগ্রেসের চেয়ে বেশি হওয়ার মতো একটা জোটবন্ধনের সম্ভাবনা হলেই কি যুক্তফ্রন্ট হয়? অনেকে হয়ত তাই মনে করেন। কেন না, সেটাই হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের হিসাবের বাইরের দিক। সেই ধারণা নিয়ে চললে কিন্তু এক-এক জায়গায় যুক্তফ্রন্টের চরিত্র এক-একরকম হয়ে যায়। যেমন, কেরালায় দুই কঃ পার্টি মিলিয়ে কংগ্রেসের বিকল্প হবার পক্ষে যথেষ্ট। পঃ বাংলায় দুই কঃ পার্টি ও অন্য বিপ্লবী পার্টিগুলিকে মিলিয়েই মোট সদস্য-সংখ্যার অর্ধেকের বেশি হয়। তা হলে কি কেরালা ও পঃ বাংলায় এইরকম যুক্তফ্রন্ট হলেই চলে যায়? অবশ্য সম্পূর্ণ যুক্তফ্রন্ট তৈরি না হলে এই সব পার্টির এইরকম বর্ধিত সংখ্যা হত না। কিন্তু তা হলেও, যদি নিছক সংখ্যাধিক্যটাই যুক্তফ্রন্টের প্রধান বিচার্য ধরা হয়, তা হলে এই শক্তি-সমন্বয়ের দিকেই ঝোঁকটা বাড়ে। অর্থাৎ, তাহলে কেরালার যুক্তফ্রন্টের চরিত্র হবে কমিউনিস্ট ফ্রন্ট, পঃ বাংলায় হবে বিপ্লবী-বামপন্থী ফ্রন্ট। আর মাদ্রাজের কথা ধরলে সেখানে ডি-এম-কেই হয়ে দাঁড়ায় কংগ্রেসের একমাত্র বিকল্প। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতিতে আবার যুক্তফ্রন্টের ধরণটা হয় ভিন্ন। অবশ্য স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি পার্টিকে বাদ দিয়েই যুক্তফ্রন্টের সম্ভাব্য চরিত্রের কথা বলা হচ্ছে। মোটের ওপর, এই ধারণায় যুক্তফ্রন্টের কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র

নেই, যেখানে যেমন সম্ভব যুক্তফ্রন্ট হতে পারে।

এইভাবে শুধু সংখ্যাধিক্যের সম্ভাবনার দিকটাকে একমাত্র বিচার্য ধরলে যুক্তফ্রন্ট হয়ে দাঁড়ায় শুধু বড়-দল-নির্ভর। এবং তার ফলে বড় দলের শক্তিবৃদ্ধির প্রবণতাই যুক্তফ্রন্টের মধ্যে প্রধান প্রবণতা হয়ে ওঠে এবং অন্য দলের সঙ্গে রেষারেষি বাড়ে। এরই পরিণতি হয় যুক্তফ্রন্টের সংকট। তা ছাড়া, এই মনোভাব নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠলে এক রাজ্যের যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে আরেক রাজ্যের যুক্তফ্রন্টের নীতির কোনো সাদৃশ্য থাকে না। বরং নীতির সংঘাতই হওয়া স্বাভাবিক। ফলে গোটা দেশ হিসাবে যুক্তফ্রন্টের সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে যায়।

যুক্তফ্রন্ট একটা জোট মাত্র নয়, যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে একটা নীতি, একটা পথ, যা একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করে। একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ের শ্রেণী-বিন্যাসের ওপর এই যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি। সুতরাং প্রথম বিচার্য হচ্ছে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কাজটা। শুধু রাজ্য হিসাবে নয়, সমগ্র দেশ হিসাবেই এবং সমগ্র পর্যায় হিসাবেই এই কাজ বিচার্য।

আমাদের দেশের আজকের ঐতিহাসিক অবস্থাটা কী? গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হয় নি। সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরতা, সামন্ততন্ত্রের প্রতি কনসেশন, একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য—এগুলিই হচ্ছে দেশের প্রগতিশীল বিকাশে বাধা। শাসকশ্রেণীর এই নীতির জন্যই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের আবর্তে দেশ পড়েছে। এরই বিকল্প নীতি, অর্থাৎ যে-নীতি সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরতা বন্ধ করবে, সামন্ততন্ত্রের সুযোগ বন্ধ করবে, একচেটিয়া পুঁজিকে বাধা দেবে, সেই নীতি-প্রতিষ্ঠার জন্যই দেশকে এগোতে হবে। এরই জন্য ১৯৪৭-এর পর থেকে বামপন্থী দলগুলি সংহত হয়েছে ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের উদ্ভব হয়েছে এবং কংগ্রেস থেকেও অনেক শক্তি ভেঙে বেরিয়ে এসেছে; আর এই সব শক্তিই কংগ্রেস-বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থাটাই তো প্রমাণ করে যে, এই সমস্ত শক্তিই কংগ্রেস-শাসনের বিকল্প সৃষ্টির জন্য বস্তুগতভাবে আগ্রহী। কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন দিনের পর দিন যে বেড়ে যাচ্ছে, তা থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, জনসাধারণের যে-অংশ কংগ্রেসকে সমর্থন করে, তারাও একটা স্থির জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। সংকটের ধাক্কায় তাদেরও অনেকে প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক এই বিকল্পের দিকে ঝুঁকছে। শ্রেণীগতভাবে দেখলে শুধু শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত নয়, বুর্জোয়াশ্রেণীর সুযোগ-বঞ্চিত অংশও এই বিকল্পের জন্য আগ্রহী। রাজনীতিগতভাবে দেখলে তাই কমিউনিস্ট ও নিশ্চিতভাবে বামপন্থী শক্তি ছাড়াও, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক বা যাদের বলা যায় ডেমোক্র্যাট বা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, তারাও এই একই দিকে আগ্রহী। এইভাবেই যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে। এই ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকলে তো যুক্তফ্রন্টের নীতিই অবাস্তব হয়ে যেত।

যুক্তফ্রন্টের এই রাজনৈতিক চরিত্রটা বুঝতে পারাটাই আসল কথা। অর্থাৎ, যুক্তফ্রন্ট মানেই হচ্ছে দুই মূল শক্তির যুক্তফ্রন্ট—কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্রাসি। যদি শুধু কমিউনিস্ট শক্তির, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শ অনুসরণকারী শক্তিগুলির ঐক্যকেই যথেষ্ট মনে করি, তাহলে সেটা আজকের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্যায়ের মূল বিরোধকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করে না। আবার যারা সোশ্যাল ডেমোক্রাসির ঐক্যকেই যথেষ্ট মনে করে, তারাও মূল বিরোধের মাত্র একাংশের ওপরই দাঁড়াতে চায়। দুটোতেই যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি খণ্ডিত হয়। অর্থাৎ, প্রকৃত বিকল্প মোর্চা গড়ে ওঠে না। এই জন্যই তো শাসনশ্রেণী অনবরত চেষ্টা করে কমিউনিস্টদের থেকে সোশ্যাল ডেমোক্রাসিকে নানা ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে।

আমাদের দেশের কংগ্রেস-বিরোধিতার মধ্যে স্পষ্ট এই দুই মতাদর্শ দেখছি না কি? দুই-কং পার্টি, আর-এস-পি, ফরোয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য যে সব দল (পারস্পরিক মত-বিরোধ সত্ত্বেও) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শের অনুগামী, তারা এক ধরনের শক্তি। আর, পি-এস-পি, এস-এস-পি থেকে বাংলা কংগ্রেস, লোকসেবক সঙ্ঘ পর্যন্ত সকল দল আর এক ধরনের শক্তি, যাদের মোটামুটি ভাবধারা সোশ্যাল ডেমোক্রাসির মতো। আঞ্চলিক দল হিসাবে ডি-এম-কে, গুর্খা লীগ প্রভৃতিও সোশ্যাল ডেমোক্রাসিরই অনুরূপ। মতাদর্শের দিক থেকে দুইয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য। সেই কারণে সো-ডে-র ভাবধারার মধ্যে কম-বেশি কমিউনিস্ট-বিরোধিতাও আছে। কিন্তু সে কমিউনিস্ট-বিরোধিতা কি স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ প্রভৃতির কমিউনিস্ট-বিরোধিতার মতো? তা নয়। স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ প্রভৃতির কমিউনিস্ট-বিরোধিতা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের কমিউনিস্ট-বিরোধিতা এবং তাই সেটা আসলে যুক্তফ্রন্ট-বিরোধিতা, গণতন্ত্র-বিরোধিতা। সো-ডেমোক্রাসির দলগুলির কমিউনিস্ট-বিরোধিতা হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত বিরোধ, যা কমিউনিস্ট ও সো-ডে-র মধ্যে চিরকালই থাকে। অবশ্য সো-ডেমোক্রাসির সকল অংশের অবস্থান একই থাকে না। ঐতিহাসিক কারণেই সো-ডে-র মধ্যে দোদুল্যমানতাও দেখা দেয়, আবার দক্ষিণ ও বাম ভাগও দেখা যায়। দক্ষিণ ও বাম ভাগ স্পষ্ট হওয়ার মানে দক্ষিণ ভাগ ক্রমশ প্রতিক্রিয়ার শিবিরের দিকেই ঝোঁকে ও কমিউনিস্ট-বিরোধিতার নামে যুক্তফ্রন্ট-বিরোধিতার পথ অনুসরণ করে। তাই আমরা দেখি বি-কে-ডি-র প্রধান অংশ, পি-এস-পি'র একাংশের যুক্তফ্রন্ট-বিরোধিতার ঝোঁক বেশি এবং সেই কারণেই বি-কে-ডি থেকে বাংলা কংগ্রেস বেরিয়ে এল ও পি-এস-পি'র মধ্যেও বিরোধ দেখা দিল। সম্প্রতি এস-এস-পি'র মধ্যেও বিচ্যুটা দুই বিরোধী ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে যার অবস্থান পাকাপাকিভাবে দক্ষিণী হয়ে যাবে, তাকে স্পষ্টভাবেই যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী হিসাবে দেখা যাবে এবং অধিকাংশের থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু সাধারণভাবে যখন সোশ্যাল ডেমোক্রাসির অবস্থা তা নয়, তখন কোনো কোনো প্রশ্নে কমিউনিস্ট-বিরোধ থাকলেও তাকে মিত্রশক্তি হিসাবেই গণ্য করতে হবে এবং তার সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়তেই হবে।

সুতরাং যুক্তফ্রন্ট নীতি অনুসরণ করতে হলে কমিউনিস্ট ও সো-ডেমোক্রাসির মতাদর্শের মধ্যে একটা সহ-অবস্থান হতেই হবে। এই সহ-অবস্থান মানে অবশ্য যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সহ-অবস্থান, তার বেশি কিছু নয়। অর্থাৎ কেউ তার মতাদর্শকে যুক্তফ্রন্টের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবে না। সেইজন্যই যুক্তফ্রন্টকে মতাদর্শ-ভিত্তিক না করে কর্মসূচী-ভিত্তিক করা হয়। কর্মসূচীরও নিশ্চয় একটা ভিত্তি থাকে, সেই ভিত্তি হচ্ছে এই পর্যায়ের অগ্রগতির কাজগুলি, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরতা বন্ধ করা, অর্থনীতিকে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার উপযোগী করা, কায়েমী স্বার্থের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা, গণতন্ত্রকে প্রকৃত করা, প্রশাসনকে গণতন্ত্রসম্মত করা, সামাজিক ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে, জনস্বার্থ রক্ষা করাই হচ্ছে এই কর্মসূচীর প্রধান বিষয়। যদি কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা যায়, তাহলে এই পথ অপরিহার্যভাবেই শ্রেণী-সংগ্রামের পথ। কেন না কায়েমী স্বার্থের এতদিনকার অনেক শোষণ-ব্যবস্থা ও পদ্ধতির বিরুদ্ধেই এই কর্মসূচী। কিন্তু সোশ্যাল ডেমোক্রাসির দলগুলি যখন এই কর্মসূচী স্বীকার করে নেয়, তখন ঠিক শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা করে না, কেন না, তারা শ্রেণী-সংগ্রামের নীতিতে

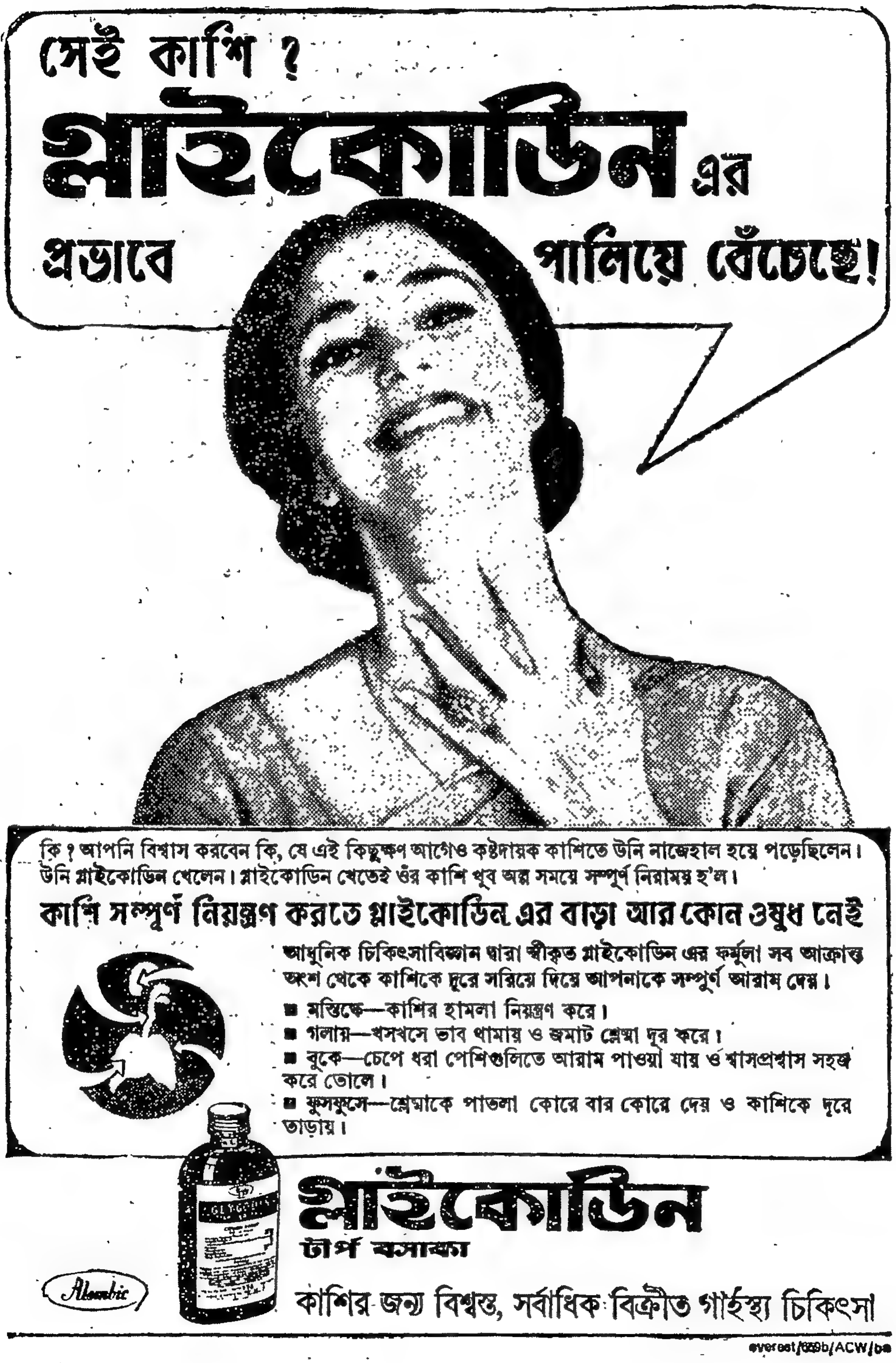

সেই কাশি ?
গ্লাইকোডিন এর
প্রভাবে পালিয়ে বেঁচেছে!
কি ? আপনি বিশ্বাস করবেন কি, যে এই কিছুক্ষণ আগেও কষ্টদায়ক কাশিতে উনি নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন। উনি গ্লাইকোডিন খেলেন। গ্লাইকোডিন খেতেই ওঁর কাশি খুব অল্প সময়ে সম্পূর্ণ নিরাময় হ'ল।
কাশি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে গ্লাইকোডিন এর বাড়া আর কোন ওষুধ নেই
আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত গ্লাইকোডিন এর ফর্মুলা সব আক্রান্ত অংশ থেকে কাশিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ আরাম দেয়।
■ মস্তিষ্কে—কাশির হামলা নিয়ন্ত্রণ করে।
■ গলায়—খসখসে ভাব থামায় ও জমাট শ্লেষ্মা দূর করে।
■ বুকে—চেপে ধরা পেশিগুলিতে আরাম পাওয়া যায় ও শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ করে তোলে।
■ ফুসফুসে—শ্লেষ্মাকে পাতলা কোরে বার কোরে দেয় ও কাশিকে দূরে তাড়ায়।
GLYCODIN
গ্লাইকোডিন
টার্প বসাকা
Alembic
কাশির জন্য বিশ্বস্ত, সর্বাধিক বিক্রীত গার্হস্থ্য চিকিৎসা
everest/669b/ACW/be

বিশ্বাসী নয়। তারা তা স্বীকার করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও জনস্বার্থ রক্ষার গণতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

এতদিনকার ব্যবস্থার এ-পরিবর্তন যদি তারা না চাইত, তবে তো তারা যুক্তফ্রন্টেই আসত না। সুতরাং সংঘাতটা বাধে তত্ত্বগত বা মতাদর্শগত রূপে প্রশ্নটি তুললেই, কর্মসূচীগতভাবে প্রশ্নটা এলে সংঘাতের অবকাশ থাকে না। একটা উদাহরণ দিই। বাংলা কংগ্রেস গান্ধীবাদ বিশ্বাসী, এটা সকলেরই জানা কথা। আবার, কমিউনিস্টরা গান্ধীবাদে বিশ্বাসী নয়, এটাও সকলের জানা। যদি একে অপরের কাছে দাবি করে তার আদর্শ ত্যাগ করতে, তাহলে কোনদিনই এই দুইয়ে যুক্তফ্রন্ট হয় না। এবং সেটা জেনেশুনেই যুক্তফ্রন্ট হয়েছে। সেইজন্যই যুক্তফ্রন্টের পার্টিগুলির দায়িত্ব কোনো প্রশ্নকে মতাদর্শগত খাতে টেনে না আনা। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা একেবারেই হবে না। কর্মসূচী রূপায়ণের পথে পিছটান কারুর দেখা গেলে নিশ্চয়ই কঠোর সমালোচনা হবে। আবার, যুক্তফ্রন্টের স্বীকৃত পথ ছাড়িয়ে কেউ নিজস্ব পদ্ধতিতে চললে তারও কঠোর সমালোচনা হবে।

এইজন্যই যুক্তফ্রন্ট কোনদিন সমস্যামুক্ত হতে পারে না। কিন্তু সমস্যামুক্ত নয় বলেই যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি শিথিল নয়, অথবা ঐতিহাসিক অগ্রগতি সাধনে যুক্তফ্রন্ট অক্ষম নয়। যে কর্মসূচীর ভিত্তিতে কমিউনিস্ট ও সো-ডেমোক্রাসির ঐক্য হয়েছে, সেটাই এই পর্যায়ে একটা মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করে এবং সেইজন্যই তার পিছনে জনসাধারণের বিপুল ঐক্য গড়ে ওঠে। এই পরিবর্তন নিশ্চয়ই এইখানেই বরাবর থেমে থাকবে না, তা আরো মৌলিক পরিবর্তনের পথ খুলে দেবে, পরিবর্তনের শক্তিকে বাড়াবে এবং সেই পথে শ্রেণী-বিন্যাসেও নতুন পরিবর্তন দেখা দেবে। সেই অবস্থায় সো-ডেমোক্রাসির মধ্যে ভাগ আসতে পারে, অর্থাৎ কোনো অংশ পরিবর্তনের বিরোধী হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং তখন তার সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ন ও ভিন্ন মনোভাব দরকার হতে পারে। কিন্তু সেটা পরের পর্যায়ের ইতিহাস, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবসাধনের পর্যায়ের ইতিহাস। আজকের পর্যায়ের সঙ্গে সে-পর্যায়কে গুলিয়ে ফেললে চলবে না।

যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি যে শিথিল নয় তার বড় প্রমাণ পঃ বাংলার দিকে চাইলেই নতুন পাওয়া যায়। শ্রমিকশ্রেণীর কাজের অবস্থার উন্নতি, ভূমিবন্টনের নতুন ব্যবস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন স্বীকৃতির ব্যবস্থা, বস্তিবাসীদের সুযোগসুবিধা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার রক্ষা প্রভৃতি যে বিরাট পদক্ষেপগুলি পঃ বাংলা যুক্তফ্রন্ট-সরকার নিয়েছে, তা সর্বসম্মতভাবেই নিয়েছে। এটাই তো যুক্তফ্রন্টের সার্থকতা প্রমাণ করে। কেরালাও এই দিক দিয়ে এতটা এগোতে পারে নি। পার্টিগত বিরোধ বা অন্য কোনো প্রশ্নে বিরোধ যতই হোক না কেন, তার জন্য কি কোনো পার্টিই এই পদক্ষেপগুলিকে ফিরিয়ে নিতে চায়? তা চায় না। মূল ব্যবস্থাগুলির জন্য বিরোধ নয়, বিরোধ হচ্ছে সেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো ঘটনার জন্য। মূল ব্যবস্থাগুলি রক্ষা করা যদি যুক্তফ্রন্টের প্রধান দায়িত্ব হয়, তবে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করাও দায়িত্ব।

যুক্তফ্রন্ট শুধু পার্টিগুলির যুক্তফ্রন্ট নয়, জনসাধারণের যুক্তফ্রন্ট। তাই জনসাধারণের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যুক্তফ্রন্টের ধারণা ও আগ্রহ জমাট হয়ে ওঠে। এই দিক দিয়ে পঃ বাংলার যুক্তফ্রন্ট কেরালার যুক্তফ্রন্টের চেয়ে বেশি গভীর। কেন না পঃ বাংলায় জনসাধারণের প্রচন্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্টের ধারণা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর রূপ নিয়েছে। তারই জন্য এক সময়ের ভাঙা যুক্তফ্রন্ট জোড়া লেগেছিল এবং যুক্তফ্রন্টের পরিধিও প্রশস্ত হয়েছে। জনস্বার্থে বিরাট পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়েছেও এইজন্য। যদি শুধু পার্টিগুলির যুক্তফ্রন্ট হত, তাহলে একটা পদক্ষেপ নিতে দশটা তর্ক ও প্রশ্ন উঠত ও সময় বয়ে যেত। কেরালায় তাই হয়েছে, কিন্তু পঃ বাংলায় তা হয় নি। কিন্তু জনসাধারণের যুক্তফ্রন্ট বলতে আবার এইরকম ধারণাও মাঝে মাঝে গড়ে ওঠে যে, পার্টির প্রশ্নকে বাদ দিয়ে জনসাধারণের প্রশ্নকেই প্রধান করা উচিত এবং জনসাধারণের যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয়, তাদের ভিত্তিতেই যুক্তফ্রন্ট হওয়া উচিত, তাতে সব পার্টি অন্তর্ভুক্ত না হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। এতে কখনও প্রকৃত যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠে না। কেন না, জনসাধারণের যুক্তফ্রন্ট মানে তো শুধু অগ্রগামী ও সক্রিয় জনসাধারণেরই যুক্তফ্রন্ট নয়, জনসাধারণের ব্যাপক অংশেরই যুক্তফ্রন্ট, যার মধ্যে অগ্রগামী অংশও আছে, আবার পশ্চাৎপদ অংশও আছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব ও তার সঙ্গে অস্পষ্ট রাজনৈতিক ধারণার মানুষ মিলিয়ে যারাই হচ্ছে জনসাধারণের অধিকাংশ। পার্টিগুলির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট না হলে, সামগ্রিকভাবে এই জনসাধারণকে পাওয়া যায় না। এবং সামগ্রিকভাবে এই জনসাধারণকে না পেলে যুক্তফ্রন্টের বিপুল শক্তি গড়ে ওঠে না। কোনো গণ-সংগ্রামে, তা সে কোনো বড় পার্টির পরিচালিত গণ-সংগ্রাম হলেও তাতে সমস্ত পার্টির সমর্থন দরকার হয় কেন? কারণ, তা না হলে এই গণ-সংগ্রামের সঙ্গে সামগ্রিক জনসাধারণের সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আর তা না হলেই, সংগ্রামকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র সফল হয়, অধিকাংশ মানুষের ইতস্তত ভাব আসে সংগ্রাম সম্বন্ধে এবং তাতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীরাও দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক চরিত্র হতেই হবে 'পার্টিগত যুক্তফ্রন্ট হিসাবে, আর তার শক্তি হবে ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণ। পঃ বাংলায় বিভিন্ন গণ-সংগঠন মিলিয়ে যে ১২ই জুলাই কমিটি হয়েছে, সেটা কি যুক্তফ্রন্টের বিকল্প হতে পারে? তা পারে না। যে-কর্মসূচীই ১২ই জুলাই কমিটি নিক না কেন, যুক্তফ্রন্ট তাকে সমর্থন করলে তবেই তা অধিকাংশ জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট বলে স্বীকৃত হবে।

যুক্তফ্রন্ট সম্বন্ধে যে এত কথা বলা হল, তা সবই ইতিহাসের শিক্ষা থেকে নেওয়া। কমিউনিস্ট বনাম সো-ডেমোক্রাসি, পার্টি বনাম জনসাধারণ, যুক্তফ্রন্ট সংক্রান্ত এই সমস্ত প্রশ্নের ওপর যুক্তফ্রন্টের প্রবক্তা ডিমিট্রভ অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রেখেছেন, যা সমস্ত দেশের বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীদের পথ প্রদর্শন করে।

যুক্তফ্রন্ট গঠনের শর্ত কি এ-সম্বন্ধে ডিমিট্রভ স্পষ্ট বলেছেন, "একটি মাত্র শর্তই আছে, তা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হতে ফ্যাসিজম্ ও ধনতন্ত্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে।" "শ্রমিকশ্রেণীর আত্মরক্ষাই হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের প্রথম কথা ও এটাই হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত।" "আক্রমণের বিরুদ্ধে আজ জনসাধারণের কি করা উচিত, সেটাই তাদের দেখিয়ে দিতে হবে।" অর্থাৎ, যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে এই মুহূর্তের কাজের জন্য, দূর লক্ষ্যসাধনের জন্য নয়। কমিউনিস্ট ও সো-ডেমোক্রাসির যুক্তভাবে সংগ্রামের ওপর জোর দিয়ে ডিমিট্রভ বলেছেন যে, এই যুক্তফ্রন্ট ফ্যাসিজম্ দ্বারা আক্রান্ত অন্য মতাবলম্বী ও অসংগঠিত অংশের ওপরও প্রভাব বিস্তার করবে। "শক্তিশালী যুক্তফ্রন্ট শ্রমজীবী জনতার অন্যান্য অংশের ওপর কৃষক, শহরের মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীর ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।" যুক্তফ্রন্টের কমিউনিস্ট ও সো-ডে-র মধ্যে মৈত্রী রক্ষা কিভাবে হবে সে-সম্বন্ধে ডিমিট্রভ কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে বলেছেন, "সো-ডেমোক্র্যাটরা যদি বলে যে, কমিউনিস্টরা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় ও তাই তাদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট হতে পারে না, তাহলে আমাদের জবাব হচ্ছে; আমরা কি সেই কথা এখন

চলছি।" কমিউনিস্টরা অন্যদের আক্রমণ করে, এই কথার জবাবে ডিমিট্রভ বলেন, "যুক্তফ্রন্টের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে যারা, তাদের কারুর বিরুদ্ধেই, তা সে ব্যক্তিই হোক, সংগঠনই হোক, আর পার্টিই হোক, কারুকে আমরা আক্রমণ করি না। কিন্তু যারা যুক্তসংগ্রামে বাধা দেয়, শ্রমিকস্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা আমাদের কর্তব্য।" কমিউনিস্টদের গণতন্ত্রের ধারণা ভিন্ন, এ-প্রশ্নের জবাবে তিনি বলছেন, "কিন্তু বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা যা পাওয়া গিয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে যখন তার ওপর আঘাত আসে, তখন তাকেও আমরা রক্ষা করি।" কমিউনিস্টরা ডিক্টেটারের মতো ব্যবহার করে, সো-ডেমোক্রাসির এই অভিযোগের উত্তরে ডিমিট্রভ বলছেন, "না, আমরা নির্দেশ দিই না। আমরা শুধু আমাদের প্রস্তাব উত্থাপন করি, তা করি এই মনে করে যে, তার দ্বারা শ্রমজীবী জনতার স্বার্থসাধন হবে।"

বিশেষ করে সো-ডেমোক্রাসির সংস্কারবাদী আদর্শ সম্বন্ধে ডিমিট্রভ বলছেন যে, "তারা আপনা থেকেই তাদের মতাদর্শ পরিবর্তন করবে, তা আশা করা যায় না।...কমিউনিস্টদের কাজই হচ্ছে এ-ব্যাপারে তাদের সাহায্য করা। তাই কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাদের যুক্তসংগ্রামের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই তাদের মধ্যে বিপ্লবী বিকাশকে সাহায্য করতে হবে।" তবে, সো-ডে-র মধ্যে দক্ষিণী বা প্রতিক্রিয়াশীল অংশকে চিনে নিতেও ডিমিট্রভ বলেছেন। কিন্তু তার নিরিখ কী? নিরিখ হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের প্রতি মনোভাব। "যুক্তফ্রন্টের প্রতি মনোভাবই সো-ডে-র বিপ্লবমুখী অংশ ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশের মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ করবে।" অর্থাৎ ঢালাওভাবে সো-ডে-র মতাদর্শের ভিত্তিতে এরকম সীমারেখা টানা চলে না, স্পষ্ট-ভাবেই যুক্ত -বিরোধী যারা তাদেরই প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করতে হবে।

ডিমিট্রভ এখানেই থামেন নি। জন-সাধারণের বিপুল অংশকে যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য তিনি নিচের গণ-সংগঠনকে কিভাবে গড়ে তোলা উচিত, তার সম্বন্ধেও বলেছেন। তিনি বলেছেন, "কারখানায়, বেকারদের মধ্যে শ্রমিক-জেলা-গুলিতে, ছোট শহরে ও গ্রামে যুক্তফ্রন্টের 'পার্টি-নিরপেক্ষ শ্রেণী-সংগঠন' গড়া উচিত। এইরকম সংগঠনই যুক্তফ্রন্ট আন্দোলনে অসংগঠিত জনসাধারণের বিরাট অংশকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।" "যুক্ত-ফ্রন্টকে নিচের জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত ও শক্তিশালী করার সর্বোত্তম উপায় হল পার্টি-নিরপেক্ষ শ্রেণী-সংগঠন গড়া। এই সংগঠনই যুক্তফ্রন্ট-বিরোধীদের যুক্তফ্রন্ট-তাতার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে।"

এই সব উদ্ধৃতিই নেওয়া হয়েছে কমিউনিস্ট-আন্তর্জাতিকের ৭ম কংগ্রেসে ডিমিট্রভের রিপোর্ট থেকে। উদ্ধৃতিগুলো দেওয়া হল শুধু যুক্তফ্রন্ট-নীতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে স্পষ্ট করার জন্য। কমিউনিস্টই হোন, আর অ-কমিউনিস্টই হোন, যুক্তফ্রন্ট-গঠনকারী সকলের পক্ষে ডিমিট্রভের শিক্ষা অত্যন্ত মূল্যবান। এই শিক্ষার দিকে নজর থাকলে যুক্তফ্রন্টের অনেক সমস্যাই উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

এই সূত্রে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে তর্কটাও আলোচনা করা যেতে পারে। যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব করবে কে? এটা ঝোঁক আছে বা সবচেয়ে বড় দল যেটা তারই নেতৃত্বকে স্বাভাবিক মনে করে। কিন্তু তা হলে তো যেখানে যেটা বড় দল, তারই দাবি হবে নেতৃত্বের। আর তা হলে এক-এক জায়গায় এক-একরকম নেতৃত্ব হয়ে যায়। এটা বুর্জোয়া-দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তফ্রন্টে চলে, কিন্তু যুক্তফ্রন্টের ঐতি-হাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চলে না। যুক্ত-ফ্রন্টের ঐতিহাসিক গঠনের যে চরিত্র,

ডার্মাকেয়ার মেখে—

অবাক হবেন নিজের রং দেখে !

গায়ের রং ফরসা নয় বা কিছুটা চাপা ব'লে মনে মনে যাঁদের আফশোস্, এবার তাঁদের ভাবনা দূর করবে ডার্মাকেয়ার হোয়াইটনিং ক্রীম ! দীর্ঘ গবেষণায় এবং বিজ্ঞানসম্মত নানা দুর্লভ উপকরণের সমন্বয়ে তৈরী এই ক্রীম,—শুধু ওপর-ওপর প্রালেপ দেবার কাজ করে না, রোমকূপের গভীরে যেয়ে এমন সব মৌল পরিবর্তন ঘটায় যে আপনার রং হ'য়ে ওঠে উজ্জ্বল আর দিনে দিনে আপনি ফরসা ও আরো সুন্দর হ'য়ে ওঠেন

ডার্মাকেয়ার হোয়াইটনিং ক্রীম

মাখলে চাপা রং হবে কনক চাঁপার মত সুন্দর

প্রস্তুতকারক : সাহেব সিং'স্

'বিউটি ইজ ইওর বার্থরাইট' পুস্তিকার জন্য এবং আপনার রূপচর্চার নানা সমস্যার উত্তরের জন্য আমাদের 'বিউটি কনসালটেন্টস্', পোষ্ট বক্স : ৪৪০, নিউ দিল্লী, এই ঠিকানায় লিখুন

Progressive/SS-1/69

যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বের প্রশ্নেও তার চরিত্রের সঙ্গে সংগতি রেখেই হবে। তার মানেই হচ্ছে, যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব কোনো এক পার্টির বা একশ্রেণীর হতে পারে না, যুক্ত-নেতৃত্বই হবে। এটা সকলেই জানে যে যুক্তফ্রন্টের প্রধান উদ্যোক্তা ও চালিকা-শক্তি হচ্ছে কমিউনিস্ট শক্তি। কিন্তু তবু কখনও কমিউনিস্টরা এ-কথা বলবে না যে, তাদের নেতৃত্বই যুক্তফ্রন্টে হবে। কেন না, তাহলেই সো-ডেমোক্রাসি যুক্তফ্রন্টে থাকতে রাজী হবে না। আর তা হলেই যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক চরিত্রও থাকবে না, তার পরিধিও হয়ে যাবে সংকীর্ণ। ডিমিট্রভ যুক্তফ্রন্ট সম্বন্ধে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তাতে কমিউনিস্ট দায়িত্বের কথা, কমিউনিস্টদের প্রধান ও নির্ধারক ভূমিকার কথা বার বার বললেও, কোনো জায়গায় কমিউনিস্ট-নেতৃত্বের কথা বলেন নি। বরং তিনি এই বলে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন যে, মুখে বলে বেড়ানর দ্বারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব হয় না, তা ধীরে ধীরে অর্জন করতে হয় এবং তার জন্য ব্যাপক জনসাধারণকে ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট অবস্থান নিয়ে আসতে হয়। যারা সঙ্কীর্ণতাবাদী হয়ে এই অবস্থা মানতে চায় না, তাদের সম্বন্ধে ডিমিট্রভ এই সমালোচনা করেছেন যে, "এরা সমগ্র যুক্তফ্রন্টকেই বিপদ মনে করে।"

যুক্তফ্রন্টের অনেক প্রশ্ন ও অনেক সমস্যাই বোধ হয় স্বচ্ছ হয়ে উঠছে আজকের সর্বভারতীয় পরিস্থিতিতে যুক্ত-ফ্রন্টের অপরিহার্যতার অবস্থায়। সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে বা কেন্দ্রের দিক থেকে অবস্থাটা কি? সিণ্ডিকেটের সঙ্গে ইন্দিরা-গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সংঘাত যেদিন থেকে হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত প্রশ্নে, সেদিন থেকে সমগ্র বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলের সামনে প্রশ্ন দেখা দিল, এই সংঘাতে চরম প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষকে পরাজিত ও ইন্দিরা-গোষ্ঠীকে জয়ী করতে হবে। ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষ কতটা প্রগতি-শীল সে নিয়ে তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু সিণ্ডিকেটপন্থীদের চেয়ে স্পষ্টভাবেই প্রগতিশীল পথে তারা চলেছে, এ-বিষয়ে তর্ক নেই। সেইজন্যই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দিন থেকে শুরু করে সিণ্ডিকেট কর্তৃক ইন্দিরা গান্ধীকে সরকারী নেতৃত্ব থেকে অপসারণের চেষ্টা পর্যন্ত প্রতিক্রিয়ার চক্রান্তের সব ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করেছে বামপন্থী গণতান্ত্রিক দলসমূহ। এই যে পরিস্থিতি, এর মানে অবশ্য এই নয় যে, ইন্দিরা-গোষ্ঠীর সঙ্গে বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তির যুক্তফ্রন্ট হয়ে গিয়েছে। তা হতে পারে না, কেন না, ইন্দিরা-গোষ্ঠীর সামগ্রিক নীতি বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায় নি। কিন্তু তবু একটা মৈত্রীর অবস্থা যে ইন্দিরা-গোষ্ঠীর সঙ্গে বামপন্থী শক্তির হয়েছে, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই মৈত্রী কতটা স্থায়ী বা তার সঠিক রূপ কি হবে, তা এখনই সুনির্দিষ্ট করা যায় না। কিন্তু ফ্রন্ট না হলেও মৈত্রীটাও যথেষ্ট গুরুত্ব-পূর্ণ। এই অবস্থার তাৎপর্য এই যে, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আজ শুধু বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বাস্তব ভিত্তি আজ এত প্রসারিত।

কেন্দ্রের দিক থেকে যদি এইরকম প্রসারিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে রাজ্যের যুক্ত-ফ্রন্টের পরিপ্রেক্ষিত তার প্রতিকূল হতে পারে না। পরিমাণের দিক দিয়ে দলগত বিন্যাসে কোনো কোনো রাজ্য ভিন্ন হতে পারে, অর্থাৎ কমিউনিস্ট শক্তির প্রাধান্য থাকতে পারে; কিন্তু তাহলেও সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতের অনুকূলেই তাকে কাজ করতে হবে। না হলে, সর্বভারতীয় পরি-স্থিতির বিকাশে বাধা দেওয়া হবে এবং তার প্রতিক্রিয়া রাজ্যের যুক্তফ্রন্টেও এসে এখানে সঙ্কট সৃষ্টি করবে। সুতরাং পশ্চিম বাংলা ও কেরালার যুক্তফ্রন্টের দৃঢ়তা ও সফলতা যেমন দরকার, তেমনি দরকার আজকের সর্বভারতীয় বামপন্থী গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টকে বাস্তবের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য এই দুই রাজ্যের অগ্রগামী যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে নীতিগত ও কর্মকৌশলগত সর্বপ্রকার চেষ্টা করা। এই দায়িত্ব মনে রাখলে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে মতাদর্শের প্রশ্নে, পদ্ধতির প্রশ্নে, শক্তি-প্রাধান্যের প্রশ্নে, দলগত বিরোধের প্রশ্নে যেসব সমস্যা দেখা দেয়, তার নিরসন অনেক সহজ হয়ে যায় নাকি? যেমন ১৯৬৭-তে পশ্চিম বাংলার পরিস্থিতি ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে এখানে যুক্তফ্রন্টকে সফল করে তুলেছিল, আজও যেন তেমনি সর্বভারতীয় পরিস্থিতি ঘাড়ে চেপে বসে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে অপরি-হার্য করে তুলেছে।

বলা বাহুল্য, যুক্তফ্রন্ট একটা চরম ও পরম পর্যায় নয়। শ্রেণী-শক্তির বিন্যাসে যত পরিবর্তন আসবে, ততই যুক্তফ্রন্টের চরিত্রেও পরিবর্তন হবে। কিন্তু আজকের পর্যায়ের যা কাজ, সেটা করতে পারার ওপরই নির্ভর করে পরের পর্যায়ে আরো সামনের দিকে এগুতে পারা যাবে কি না।

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে ॥

বাংলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনায় বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রয়েল পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন)

লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

বাঙালী পাহাড় ভালবাসে, তার কারণ বোধ হয় অধিকাংশ বাঙালীরই মনে আছে একটি হিমালয়-কঠিন দৃঢ়তা। হিমালয় অভিযানে অনেক তরুণ-তরুণী এখন এগিয়ে এসেছেন। প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন দল হিমালয়ের বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে পড়েন। পর্বতারোহণ এ যুগে খেলাধুলার বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে পড়েছে। যতদূর জানি, এ বছরে বাংলাদেশ থেকে ৬টি দল পর্বতারোহণে গেছিলেন। (১) পথিকৃৎ-এর পরিচালনায় দীপালি সিংহর নেতৃত্বে একদল উৎসাহী তরুণী গিয়েছিলেন হিমাচল প্রদেশে বড়াসিক্কী পর্বত বিজয়ে। (২) সুজয়া গুহের নেতৃত্বে আর একদল মহিলা অভিযাত্রী গিয়েছিলেন মৃত্যুতীর্থ রূপকুণ্ডে। (৩) গঙ্গোত্রী হিমবাহ অনুসন্ধান সমিতি ডঃ স্বপন রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে অভিযানে বেরিয়েছিলেন গঙ্গোত্রী হিমবাহ অভিমুখে। (৪) মাউন্টেন লাভার্স এ্যাসোসিয়েশন পরিচালনা করেছিলেন 'নন্দকু' অভিযান। এঁদের দলপতি ছিলেন প্রশান্ত চক্রবর্তী। (৫) হিমালয়ান লাভার্স এ্যাসোসিয়েশন বেরিয়েছিলেন 'ট্রেলসপাশ' অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে। নেতা প্রদীপ্ত চক্রবর্তী। (৬) টালিগঞ্জের মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব পরিচালনা করেছিলেন 'সুন্দর ডুঙ্গা' অভিযান। দলনেতা সুনীল চৌধুরী। মহিলা দুই অভিযাত্রীদল বিজয়িনী হয়ে ফিরে এসেছেন, বাংলার মুখোজ্জ্বল করেছেন। বেতারে ও সংবাদপত্রে (৩), (৪) ও (৬) নম্বর অভিযাত্রীদলের অভিযানের সাফল্যের কথা প্রচারিত হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে হিমালয়ান লাভার্স ক্লাবের সদস্যবৃন্দ 'ট্রেলসপাশ' অতিক্রম করতে সক্ষম হন নি। তাঁদের অভিজ্ঞতা আগামী দিনের অভিযাত্রীদের পথপ্রদর্শন করবে।

পর্বতাভিযানে বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্বের একটি সুখবর অতি সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৮ সালে সুনীল চৌধুরীর নেতৃত্বে মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাবের উদ্যোগে 'উত্তর গাড়োয়াল হিমালয় অভিযান' পরিচালিত হয়। এঁরা দুটি অনামা, অবিজিত পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন ও নাম দেন বিধান পর্বত ও গৌরাঙ্গ পর্বত। ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ বছরের শ্রেষ্ঠ আয়োজিত অভিযান হিসাবে দলটি বোম্বাই থেকে প্রদত্ত সুরেশ শীল্ড বিজয়ী হয়েছেন। সংবাদটি অভিনন্দনযোগ্য।

সুন্দর ডুঙ্গা শব্দটির অর্থ হল সুন্দর পাথর বা সুন্দর পর্বত। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সুন্দর ডুঙ্গা এবং সুকরাম অঞ্চলে সমীক্ষা চালানো—একদিকে মাইকতোলীর দশ-পনেরো মাইল দীর্ঘ তুষারমণ্ডিত শিরদাঁড়া, বালজৌরি পর্বত, মৃগথুনি, নন্দাখাট, নন্দাকোট, পানোয়ালিদুয়ার আর একদিকে ভানোটি শৃঙ্গ, থারকোট শৃঙ্গ ও 'টেন্টপিক'। এর মধ্যে আছে জানা, অজানা, বিজিত, অবিজিত নানা পর্বতশৃঙ্গ, তুষার ঢাকা সুন্দর সুন্দর হ্রদ। এসব সম্বন্ধে বিশদভাবে জানা, বালজৌরিতে ওঠার পথ কিছুটা চিনে রাখা, সুন্দর ডুঙ্গা ও সুকরাম নদীর উৎস সন্ধান করা, সুকরামে মূল শিবির স্থাপন করে থারকোট শৃঙ্গে ওঠার চেষ্টা করা, ঐ অঞ্চলের অনামা শৃঙ্গগুলির খোঁজখবর নেওয়া। এর সঙ্গে যুক্ত হল আর একটি পরিকল্পনা—কোন্ উচ্চতায় কোন ধরনের মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ আছে, তার একটা সমীক্ষা চালানো। স্থানীয় অধিবাসীদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া, তাদের অভাব-অভিযোগ জানা ও যথাস্থানে তুলে ধরা সকল অভিযানেরই উদ্দেশ্য থাকে। আর একটি উদ্দেশ্য—অজানাকে জানা—হিমালয়ের অভ্যন্তরের অনাবিল সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান করা। পাইন দেওদার রডোডেনড্রন বনের মধ্যে দিয়ে পথ চলা, সারাদিন কোন নির্জন নদীর গান শোনা, রাত কাটানো কোন আরামপ্রদ রাখালী কুটিরে কিম্বা গুহায় অথবা সুনীল আকাশের নিচে তাঁবু ফেলে; দু' চোখ দিয়ে দেখা শ্যামল অরণ্যরাজি আর শুভ্র তুষারকিরীটমালা। সাধারণ বাঙালীর জীবনে এর থেকে রোমাঞ্চঘন মুহূর্তসমূহ আর কী হতে পারে?

সুন্দর ডুঙ্গা অভিযানে অংশগ্রহণকারী মূল সদস্য ছিলেন ছ'জন। নেতা যুগলমানা পর্বত ও উত্তর গাড়োয়াল হিমালয় অভিযান খ্যাত সুনীল চৌধুরী। সহকারী নেতা সমর বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিম মল্লিক দলের কোয়ার্টার মাস্টার—সকলের 'দাদু'। হরিদাস চৌধুরী—পাহাড়ের মতো গানও ভালবাসেন। ধ্রুব ঘোষ—বয়সে সব থেকে ছোট—মাত্র ২০ বছর—দলের সকলেরই স্নেহের ও আদরের। মজবুত চেহারা—কিন্তু একটু কুঁড়ে। লেখকের অন্তর্ভুক্তি—ডাক্তার সদস্য হিসাবে।

কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু ১২ই সেপ্টেম্বর। লক্ষ্ণৌ হয়ে কাঠগুদাম ১৪ তারিখে। অগ্রগামী দল হিসাবে সুনীলবাবু এবং লেখক বাগেশ্বর হয়ে কাপকোটে এলেন ১৫ তারিখে। কাপকোট (৩০০০ ফুট) এদিককার শেষ বাস স্টেশন—কাঠগুদাম থেকে ১৪৭ মাইল।

সুনীলবাবু অদ্ভুত মুন্সীয়ানার সঙ্গে পথপ্রদর্শক ও মালবাহক ঠিক করলেন। পান সিং ভুটিয়া হলেন আমাদের পথপ্রদর্শক। এর আগে দেশী

বিদেশী অনেক দলের সঙ্গে কখনো মালবাহী, কখনো পথপ্রদর্শক হয়ে তিনি গিয়েছিন নন্দাকোট, মানাশৃঙ্গ, নন্দাখাট, খারকোট প্রভৃতি পর্বতাভিযানে। ১৯৬৪ সালে 'ট্রেলসপাশ' অতিক্রম করতে গিয়ে অণিমা সেনগুপ্তা পাথরের আঘাতে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। পান সিং ঐ দলটিরও পথপ্রদর্শক ছিলেন। বয়স ৪২।৪৩। শান্ত, ধীর, নিরীহ প্রকৃতির লোক। ধর্মভীরু। এ অঞ্চলের সম্পন্ন বাসিন্দা। প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট। টাকার বা খাবারের অভাব নেই ঘরে। অথচ ঘুরে বেড়ান পর্বত অভিযাত্রীদের সঙ্গে দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথে। এ এক বিচিত্র ব্যাপার—অদ্ভুত নেশা। পান সিং এক উদাসী মানুষ—আশ্চর্য ধাতুতে গড়া সত্যিকারের কুমায়ুনী।

দু'দিন পরে হৈ-হৈ করতে করতে সমরবাবু আর সবাইকে নিয়ে মালপত্র সহ এসে গেলেন। সুন্দর ডুঙ্গা অভিযাত্রীদের প্রাণচাঞ্চল্যে ছোট্ট শহর কাপকোট সরগরম হয়ে উঠল।

১৮ তারিখে কাপকোট থেকে হাঁটাপথের শুরু। রসদ, তাঁবু, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি বয়ে নিয়ে মালবাহী যাচ্ছেন ২০ জন। এঁরা সকলেই স্থানীয় অধিবাসী। ২০ দিন আমাদের একসঙ্গে কাটাতে হবে পথে-জঙ্গলে-পাহাড়ে-বরফে। আমাদেরও পিঠে দশ থেকে পনেরো কেজি ওজন। রুকস্যাক-এ পুরে নিয়েছি স্লিপিং ব্যাগ, এয়ার ম্যাট্রেস, উইন্ডপ্রুফ জ্যাকেট ও ফেদার কোট। এগুলো দার্জিলিং থেকে ভাড়া করে আনা। এ ছাড়া রয়েছে দুটো করে সোয়েটার, মাফলার, মাঙ্কিক্যাপ, গ্লাভস, জলের বোতল, থালা, মগ, চামচ ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস। সবার পায়ে এখন হান্টার সু।

কাপকোট থেকে লোহারক্ষেত-এর (৬৫০০´) দূরত্ব দশ মাইল। সরযূ নদীর পাশ দিয়ে পথ—অল্প চড়াই—হাঁটতে ভালই লাগে। সবুজ জল সরযূর। যেন সবুজ শাড়ি জড়িয়ে শ্যামল অরণ্যের মোহন মায়ায় মাতোয়ারা হয়ে নেচে চলেছে এক দুষ্টু মেয়ে। ঘন বনবীথি। দূরে দূরে নদীর ধারে ছোট ছোট গ্রাম।

কোথাও ডালিম গাছ, কোথাও লেবু বাগান। কখনো দু'ধারে পড়ছে শস্যক্ষেত্র—সবুজ ধান বা গম বা যব বা ফাবর-এর চারা কিম্বা আগুন-রাঙা চুয়ার ক্ষেত—যেন এইমাত্র রক্তস্নান সেরে উঠে এসেছে। বিশ্রাম নিই পথের ধারে, আবার চলি খুশিতে আনন্দে মশগুল হয়ে কখনো গল্প করতে করতে দল বেঁধে, কখনো বা একা।

বিকাল ৪॥টায় লোহারক্ষেত। দাদু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রান্না করতে লেগে গেলেন। সমরবাবু বিশ্বস্তভাবে তাঁর ফাই-ফরমাশ খাটতে লাগলেন। ডাক্তার দলে আছে খবর পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকে রোগী এসেছে—লেখককে বসতে হল তাদের নিয়ে। প্রচুর ওষুধ আছে সঙ্গে। পথে বিনামূল্যে প্রায় ৫০ জন স্থানীয় গ্রামবাসীর চিকিৎসা করা হয়েছে পুরো ওষুধপত্র, এমন কি অনেক সময় পথ্য সহ।

রাত্রে নামলো হঠাৎ পাহাড়ী বৃষ্টি। পথের এই ধকল সত্ত্বেও দাদু যে এমন সুস্বাদু খিচুড়ি তৈরি করবেন, কে তা ভেবেছিল! অদ্ভুত এই লোকটি। খাইয়ে আনন্দ পান। নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে ভালবাসেন। আবার খাওয়া-দাওয়ার পর রোজই হাতে দেন সযত্নে তৈরি করে আনা ছোট্ট হজমিগুলি—শুব নাম দিয়েছে 'এ্যাডোমিন'।

পরদিন দুরন্ত চড়াই। স্বর্গের সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে উঠে গেছে। লোহারক্ষেত থেকে ঢাকুরী—পথ যদিও ছ' মাইল, উঠতে বেশ কষ্ট।

ঝাউগাছের তলে ওরা এসেছিল। গাঁয়ের মেয়েরা। যাদের স্বামী বা ভাই বা ছেলে আমাদের সঙ্গে চলেছে মাল বহন করে, তাদের খাওয়ালো, পথের খাবার বেঁধে দিল। মা-বোনদের স্নেহ হতে আমরাও বাদ পড়লাম না—খেলাম ওদের দেওয়া কীরা (শশা), মাঠা, রুটি, তরকারি। বিদায় জানালো তারপর। দীর্ঘদিন তো অদর্শনে কাটবে। বিরহিনীরা ছলছল চোখে নেমে গেল।

মেয়েরা এখানকার সম্পদ। বিয়ে করতে গেলে কন্যাপণ দিতে হয়। কঠিন পর্বতের বিরুদ্ধে মেয়েরাই যেন সংগ্রাম করেন বেশি। সংসার টানা ছাড়া ক্ষেতের কাজ, লকড়ী আনা, ঘাস কাটা, গবাদি পালন ও দেখাশোনা, সব কাজই মেয়েরা করেন। সরলতা এঁদের অঙ্গের ভূষণ। আমাদের সঙ্গে কত সহজে মিশেছেন। তথাকথিত লজ্জা নেই। অথচ কী শোভন সুন্দর আচরণ। কুমায়ুন রমণীরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। অথচ আশ্চর্য, এখনো তাঁরা পুরুষের পদানত। এইটি-ই খারাপ লাগল। ফেরার সময়কার ঘটনা। এক মালবাহীর স্ত্রীর চোখের মণিতে হঠাৎ বাঁশের টুকরো ঢুকে গিয়েছে। থাকে ওয়াছম গ্রামে—ভাল চোখের ডাক্তার দেখাতে গেলে আসতে হবে মাত্র ২২ মাইল হেঁটে কাপকোট। এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু ডাক্তার না দেখালে চোখ নষ্ট হবে একথা তাকে জানাতে সে বলে উঠল—হবে তো হবে—কি করা যাবে! ভালমানুষ লোকটি। খুবই সরল এবং বোকা। কিন্তু তার এই উক্তির মধ্যে [illegible]য়ই নারীসমাজ কি ব্যবহার পান, জানা গেল। সে অবশ্য বাধ্য হয়েছিল, ফেরার পথে ভার্যাকে কাপকোট নিয়ে আসতে। ডাক্তারবাবুর (ইনি একজন বাঙালী) কাছে নিজে নিয়ে গিয়েছিলেন সুনীলবাবু।

ঢাকুরীর উচ্চতা ৮৭০০ ফুট। এখান থেকে একটা পথ সোজা চলে গেছে খাতি, দিওয়ালী, ফুরকিয়া হয়ে পিণ্ডারী হিমবাহের দিকে—দূরত্ব ২০ মাইল মাত্র। পিণ্ডারী (১৪,০০০ ফুট) নাকি পৃথিবীর সুন্দরতম হিমবাহ। দিওয়ালীর ডানদিকে—৮ মাইল দূরে আছে আর একটি হিমবাহ—কাফনী। (১২,০০০ ফুট) কাফনী নদী এই হিমবাহ থেকে বেরিয়ে দিওয়ালীতে এসে মিশছে পিণ্ডারী হিমবাহ থেকে আগত পিণ্ডারী নদীর সঙ্গে।

পিণ্ডারীর পথ নয়—ধরতে হবে বাঁদিকের অন্য একটা পথ। গন্তব্যস্থল—জাটুলি—সুন্দর ডুঙ্গার পথের শেষ গ্রাম। উচ্চতা ৮০০০ ফুট, দূরত্ব ঢাকুরী থেকে প্রায় ১২ মাইল।

প্রথমেই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একেবারে নিচে নেমে যেতে হল খরস্রোতা এক নদীর ধারে (৬০০০ ফুট)। এ নদী পিণ্ডারী। প্রাণের নদী, প্রেরণার নদী। কিছু আগে জঙ্গলের মধ্যে সুন্দর ডুঙ্গা এসে মিশেছে পিণ্ডারীর সঙ্গে। কাফনী সুন্দর ডুঙ্গার জলে পুষ্ট হয়ে তরতর করে এগিয়ে চলেছে পিণ্ডারী—মিশেছে গিয়ে শেষে অলকানন্দায়।

পিণ্ডারী নদী পেরিয়ে শুরু হল আবার চড়াই। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু পথ। কখনো ঝর্ণা। রোদ্দুর ঝলমল দিন। সুম গ্রামের এক আঙিনায় আজ দুপুরের বিশ্রামের পালা। সামনের বাগানে শশা। সকলেই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। এক কুমায়ুনী তরুণী গোবর দিয়ে ঘর নিকোচ্ছে। ধ্রুব জিজ্ঞেস করল তাঁকে, এ শশা পেতে পারি কি-না? অসঙ্কোচে উত্তর দিলেন—আমার কোন অধিকার নেই। 'অধিকার' কথাটার ওপর বেশ একটু জোর ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনের পর্দায় ভাসলো প্রবাসী এক কুমায়ুনী সৈনিকের ছবি—সামনেই দেওয়ালে টাঙানো ফ্রেমহীন বিবর্ণ একটি ফটো—পিসবোর্ডে লাগানো—তরুণীর স্বামী। একটু পরেই গৃহস্বামিনী এসে পড়লেন—তরুণীর শাশুড়ী। শশা খেতে চাইলাম। অনুমতি মিলল। তখন তরুণীর দু' চোখে সে কি আনন্দ আর স্নিগ্ধ মমতার ধারা! ছুটেই গেল সে তার গোবর-গোলা হাত ধুতে। নিয়ে এলো লঙ্কা-মাখা লবণ আর শশা। খিদে দূর হল, তেষ্টা মিটল। 'অধিকার' কথাটা কিন্তু মনে মনে সারাটা

"দিলীপের মুখ থেকে খবরটা শুনে আমার যে কি আনন্দ হল! ওকে দুহাতে বুকে টেনে নিলাম। ও যথেষ্ট অনুশীলন করেছে, খেটেছে। তবুও বলবো এর জন্য যে-বাড়তি শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন তার সবটুকুই ও পেয়েছে বোর্নভিটা থেকে। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বোর্নভিটা খেতে ও বরাবরই বড্ড ভালোবাসে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে ব'লে ওকে আমি নিয়মিত বোর্নভিটা খাওয়াই। তাই কি খেলাধুলায়, কি পড়াশুনায় সবদিকেই ছেলে আমার সমান চৌকশ।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোজ্জ্বল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ!

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—
শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

0772.BG

পথে বেজেছে। আজও বাজছে। আমাদের আধুনিক গৃহবধূদের অধিকার আজ সর্বব্যাপী। হয়তো সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এইটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। অধিকার-বোধের কাছে শান্তি-অশান্তির প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

সন্ধ্যা ৬টা বেজে গেল- জাটুলি গ্রামে পৌঁছতে। পা আর চলতে চাইছিল না। শেষটায় দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত অবস্থা হয়েছিল। এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে আজ রাত্রের বিশ্রাম। আমাদের মধ্যে সব থেকে বুড়ো দাদুর হাড়ে বুঝি ভেল্কি খেলে। সোজা ঢুকলেন রান্নাঘরে। এখানে একরকমের সীম পাওয়া যায়। আলু, পেঁয়াজ সীম-এর তরকারি, আর ঘি দিয়ে খিচুড়ি—স্বাদে অতুলনীয়।

সকাল হলেই হাঁটা শুরু। শেষ গ্রাম মিলিয়ে গেছে। আজ যেতে হবে দুন্দিয়া-চন্ড। জাটুলি থেকে ৭ মাইল। পথে কয়েকটি বিপজ্জনক ঝর্ণা। খুব সাবধানে পার হই। কুশল সিং, দারবান সিং, রাম সিং, ভাগারাম, ভগবান সিং। এরা এখন এই ক'দিনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বিশ্বস্ত আত্মীয় হয়ে গেছে। তারা অসুবিধা দেখলেই সাহায্যের হাত এগিয়ে দিচ্ছে। দুপুরে হঠাৎ এলো বৃষ্টি। চড়াই-এর পথ। ঝর্ণার পিছল পাথর। হরিবাবু সবার অজান্তেই শ্যাওলা-ধরা উপড়ে-পড়া গাছ বেয়ে ঝর্ণা পেরুলেন। গাছের গোড়াটা খরস্রোতা ঝর্ণার জলে। শিউরে উঠলাম সবাই। গাছটা যদি আলগা থাকতো, সরে যেতো? তা ছাড়া শ্যাওলায় পিছল গাছ। বড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন—যা নেওয়া উচিত নয়।

ভিজতে ভিজতে দুপুর ৩টায় দুন্দিয়াচন্ড। (৯০০০ ফুট)। বিশাল অরণ্য। বেগবতী এক ঝর্ণার ধারে বিছুটির জঙ্গল। কোন রকমে সাফা করে কয়েকটা তাঁবু পড়ল। একে একে ঢুকে পড়ল সবাই—দুজন করে এক-একটা তাঁবুতে। এয়ার ম্যাট্রেস ফুলিয়ে নিলাম। ঢুকলাম স্লিপিং ব্যাগ-এ। রাম সিংরা থাকবে কাছের একটা গুহাতে।

বৃষ্টির বিরাম নেই। অন্ধকার নেমে এল। বড় অস্বস্তি। তাঁবুর চারপাশে জল—জল এয়ার ম্যাট্রেসের নিচে। সারারাত বৃষ্টি পড়লে কালকের পথ চলা কঠিন হবে—পথে পড়বে নদী আর ঝর্ণা! ফুলে ফেঁপে উঠবে ওরা! ঘুম নেই—বাইরে সমানে বৃষ্টি—তাঁবু ভেদ করে কখনো-সখনো গায়ে পড়ছে। ...টুপটাপ...টাপুরটুপুর...ভোর হল—কিন্তু কোথায় আলো? কোথায় সোনার সকাল? সারারাত আকাশ কেঁদেছে—এখনো কালো মেঘে ঢাকা। অজস্র ধারায় বৃষ্টি পড়ছে—তাঁবুর আশে-পাশে ছোটখাট ঝর্ণা বইছে যেন! এ তো বৃষ্টি নয়—যেন আগুন ঝরছে—ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করে উঠছে বুকের ভেতরটা! অসহায় কতকগুলি মানুষ গহন গভীর অরণ্যে বৃষ্টির নাগপাশে বন্দী!

অবস্থা কাহিল! দুন্দিয়াচন্ডের এ কি চন্ড! প্রকৃতির এ কি রুদ্র লীলা! ২১ তারিখ দুপুরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ২২ তারিখ গেলো—২৩ তারিখে অবস্থা হল আরো শোচনীয়। বড় তাঁবু খাটাতে হল—চারজন আশ্রয় নিলো সেখানে। ছোট তাঁবুগুলো জলের ওপর যেন ভাসছে। রাত্রে কোথায় বিরাট একটা Rock fall হল। যেন দু-দশটা বাজ পড়ল একসঙ্গে আকাশ থেকে। পাশে যৌবনবিপন্না স্রোতস্বিনী। সেকি অভিযাত্রীদের ভাসিয়ে দেবে? ধ্রুব আর সমরবাবু ছিলেন একটা তাঁবুতে। মাঝরাতে উঠে দেখেন, নৌকোর মত দুলছে ওঁদের এয়ার ম্যাট্রেস—ছলাৎ ছলাৎ করে। ভয় পেয়েছিল ধ্রুব। ভেবেছিল হয় সামনের সুন্দর ডুঙ্গা নদী কিম্বা কাছের ঝর্ণা থেকে জল নেমে ভাঙতে, ভাসাতে চাইছে তাদের তাঁবু। কৌতুক করে উত্তর দিয়েছিলেন সমরবাবু, মন্দ কি, খুব শীঘ্রি ঠাকুরের কাছে পৌঁছে যাওয়া যাবে সুন্দর ডুঙ্গার উত্তাল স্রোতে ভেসে। কাটবে অসহ এই বন্দী-দশা!

২৪ তারিখের ভোর। হতাশ হয়ে পড়েছি। অবচেতন মন ফিরে যাবার কথা ভাবছে। হঠাৎ পাখী ডাকলো। অবাক সবাই। সেকি শুভ সংবাদ আনছে সূর্যের দূত হয়ে? সন্দেহ হচ্ছে, সূর্যের মুখ আবার দেখতে পাবো কি না। কয়েক ঘন্টা পরে হঠাৎ আলো—একফালি রোদ—বৃষ্টি বন্ধ—বন্ধ—বন্ধ। দীর্ঘ ৮৪ ঘন্টার পর আকাশ খুললো—বিদায় নিল কাল-বর্ষা।

বিপর্যস্ত অবস্থা। রুকস্যাক জলে। তার ভেতর যা কিছু ছিল সব ভিজে ঢোল। তাঁবুর ওজন বেড়ে দশগুণ। তবু সারা-দিন হৈ হৈ কান্ড। আগুনের ধারে বসে ভেজা কাপড়-চোপড় শুকোবার চেষ্টা। পাঁপড় পোড়ালো কুশল সিং। বিকালে পকৌড়ী। রাজসিক খানা। রাত্রে আকাশ আরো—আরো পরিষ্কার—চাঁদ উঠলো—ঢল নামলো জ্যোৎস্নার—পাহাড়ঘেরা নির্জন দুন্দিয়াচন্ডের বনে—গাছের পাতাগুলো রুপালী আবির মেখে দুলছে, নাচছে, হাসছে!

পরদিন সুন্দর ডুঙ্গা। পথ আরো কঠিন। কিন্তু তেমনি সুন্দর। উচ্চতা বাড়ছে। বড় গাছ কমে আসছে। রডোডেনড্রন গাছ অনেক—এখন কিন্তু ফুল নেই। কখনো কখনো নাম-না-জানা লাল নীল হলুদ সাদা পাহাড়ী ফুলের বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। কখনো সবুজ ঘাসের জঙ্গল। সারাটা দিন গান শোনাচ্ছে নির্জন নদী সুন্দর ডুঙ্গা। এ এক আশ্চর্য নদী। অনবদ্য সৌন্দর্য-সুধা নিয়ে সে আত্মগোপন করে আছে অপরূপ এক উপত্যকায়। কলেবর কোথাও ক্ষীণ, কোথাও স্ফীত—কখনো বা গম্ভীর গর্জন, কখনো মৃদু কলতান। নূপুরে কোটি হীরার ঘুঙুর বেঁধে অনন্ত নাচ নাচছে এই রূপবতী নিজের খেয়ালে। প্রাণচাঞ্চল্যে দীপ্তিময় নয়নাভি-রাম তার গতিভঙ্গী।

রাম সিং আজ অমানুষিক খাটুনি খাটছে। মারাত্মক ধসগুলো পার করিয়ে দিচ্ছে হাত ধরে। কুশল সিং তাকে জাটুলি গ্রাম থেকে একরকম জোর করেই ধরে এনেছে। রাম সিং সংসারকে চিনেছে। সে ভয় পায় না। দাদা তাদের বাবার মৃত্যুর পরেই মা আর বোনের ভার বইতে রাজী হন নি। রাম সিং সংগ্রাম করেছে। মা আর বোনকে ভাসিয়ে দিতে পারে নি। এখন তার ৮০ নালী জমি, ৪০-৫০টা বকরী, ঘরে দুনলা একটা বন্দুক। রাম সিং আর কারুকে ভয় করে না। তার গাঁয়ের সব থেকে সম্পন্ন গৃহস্থের ঈর্ষাকাতর দৃষ্টি তার ওপর। কিন্তু সে এসব থোড়াই কেয়ার করে। কুশল আর রামের চোখে স্বপ্ন—তারাও চটিতে (চূড়ায়) উঠবে। সুনীলবাবুও তাদের ওপর আশা রাখেন। বিশ্বস্তভাবে ওরা সুনীলবাবুর কথা শুনে চলে।

মেঘ জমেছে একধারে—মাইকতোলির শিরদাঁড়ার ওপরে। দুজোড়া ঈগল পাখীকে পাকসাট খেতে দেখা যাচ্ছে—কখনো মেঘের মধ্যে—কখনো বা নেমে আসছে নিচে। যেন তাদের অন্তরের সঙ্কল্প—মেঘ জমাট তুষারে পরিণত না হয়—বজ্র ও বিদ্যুৎ সহ যা কিছু বীর্যের সঞ্চয় আছে, ঈগলরা চায় মেঘের পাঁজর ছিঁড়ে তা হেলায় ছড়িয়ে দিতে।

বিকাল ৫টায় সুন্দর ডুঙ্গা (১০,৫০০ ফুট)। এখানে ভেড়া চরে। শীতে নিচে নেমে যায়। গোটা চারেক বড়-বড় রাখালী কুটির রয়েছে। এগুলো খুবই আরামপ্রদ। এরই একটিতে রাত কাটাতে হবে। শেষ আধ মাইল পথ হাঁটার সময় শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল অল্পক্ষণের মধ্যেই। শীত আছে, তবে একেবারে অসহ্য নয়।

রূপময় উপত্যকা সুন্দর ডুঙ্গা।

সবুজ মখমল পাতা রয়েছে যেন সমস্ত অঞ্চলটা জুড়ে। বড় গাছ ধারেকাছে একটাও নেই। মাঝখানে বইছে রূপালী নদী—পাথরের শাড়ি গায়ে জড়িয়ে। উচ্ছল ছলছল গতি তার অনুপম। এখান থেকে ওখান থেকে ঝর্ণাবালারা খুশিতে এসে হাত মেলাচ্ছে। একদিকে মাইকতোলির তুষার-ছাওয়া শিরদাঁড়া; বালজৌরি যাবার পথ—আর একদিকে সুকরাম-এর চড়াই—ছোট ছোট রডোডেনড্রন গাছের সবুজ বন—ওপরে দেখা যায় বালুনী পর্বতের চূড়াটুকু।

রাত্রে আর এক রূপ। নক্ষত্রদীপ্ত উদ্ভাসিত আকাশ। মাইকতোলিতে মাণিক্যশোভা। পাহাড়ের নিচের অংশ ত্যামাটে। ওপরে জমাট তুষারের শুভ্র দ্যুতি। সুন্দর ডুঙ্গা নদীকে মনে হচ্ছিল জ্যোতির হীরকহার—হিমালয় আদরে পরেছে গলায়। জ্যোৎস্নার প্লাবনে মৌ মৌ করছে শ্যামল শান্ত সজীব সুন্দর উপত্যকা।

পরদিন আমাদের বিশ্রাম। কুশল সিংদের কিন্তু খুবই খাটতে হল। একদল কিছু জিনিসপত্র সুকরামে রেখে আবার নেমে এল। এটা প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ। ফিরে এসে ক্ষিধের জ্বালায় অস্থির হয়ে একজন মালবাহক তো পলিথিনের ছেঁড়া অংশ চিবোতে আরম্ভ করল। সুনীলবাবুর নজরে পড়ায় তাড়াতাড়ি তাকে বিস্কুট, খাবার দিলেন। যা রসদ সঙ্গে ছিল, সবাই ভাগ করেই খেয়েছি পথে।

এর পরদিন বাকী মালপত্র নিয়ে সবাই মিলে চললাম সুকরামে। সুন্দর ডুঙ্গা থেকে মাইল ৮ দূরত্ব। প্রথম তিন ঘন্টা শুধুই উঠতে হল পাহাড় বেয়ে। তারপর ঘাস আর ছোট ছোট গাছের জঙ্গল। এখানে অনেকরকম ওষুধের গাছ রয়েছে। মাঝেসাঝে স্থানীয় লোকজন এসে নিয়ে যায়—বিক্রি করে। রয়েছে জুনিপার—সুন্দর গন্ধ হয় পোড়ালে। খুব ছোট ধুপগাছের মনমাতান গন্ধ। হিমালয়ের অভ্যন্তরে এসে পড়েছি।

এ পথের দু'-একটা জায়গা পেরুনো কষ্টসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। এক জায়গায় "চিমনি ক্লাইম্বিং" করতে হল। সুকরাম নদী পেরুতে হল জলে পাথর ফেলে—তার ওপর দিয়ে। ঘাসের জঙ্গল বেয়ে সুকরাম-এ (১৪,০০০ ফুট) পৌঁছুলাম বিকেলবেলা।

সুকরামে বিরাট একটা পাথর ঝুঁকে পড়ে গুহার মত জায়গা তৈরি করেছে। সামনে খানিকটা জায়গা। এখানেই প্রথম দিন তাঁবু খাটান গেল। প্রথমে ঠিক ছিল, এখানেই মূল শিবির স্থাপন করা হবে। জিনিসপত্র বাছা হল, বিভিন্ন অগ্রগামী শিবিরের জন্যে আলাদা আলাদা করে রাখা হল। কাল থেকে সুরু হবে মূল অভিযান।

সুকরামের হিমানীশোভা অতুলনীয়। চারিদিক বরফের পাহাড়ে ঢাকা। মাইকতোলির দীর্ঘ শিরদাঁড়ার সবটা দেখা যাচ্ছে। ওদিকে পানওয়ালী দুয়ার, নন্দাখাট, বালজৌরি। সামনে সুস্পষ্ট থারকোট, তাঁবুশৃঙ্গ, ভানোটি। থারকোট ও ভানোটির মধ্যে নাম-না-জানা অবিজিত আরো কতকগুলি শৃঙ্গ। ডানদিকের হিমবাহ থেকে বেরিয়েছে সুন্দর ডুঙ্গা। আর বাঁদিক থেকে সুকরাম নদী। অনতিদূরেই মিলিত হয়েছে এরা—পরে সুন্দর ডুঙ্গা নাম নিয়ে নদী চলেছে মাইকতোলি শিরদাঁড়ার নিচে দিয়ে সুন্দর ডুঙ্গা উপত্যকা অভিমুখে।

সুকরামে দ্বিতীয় দিন। কুশল, রাম ও দারোয়ানকে নিয়ে বেরুলেন সকালেই সমরবাবু ও ধ্রুব—এক নম্বর শিবিরের জায়গা খোঁজার জন্যে। বিকেলে মূল শিবিরকে আরো আট মাইল ওপরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল (১৪,৩০০ ফুট)। ওঁরা ততক্ষণে বরফের ওপর এক নম্বর শিবির তৈরি করে (১৫,৫০০ ফুট এক নম্বর ও দু' নম্বর শিবিরের কিছু মালপত্র সেখানে রেখে ফিরে এসেছেন। মূল শিবির থেকে সাদা বরফের ওপর তাঁবুটা দেখা যাচ্ছিল। আমাদের মূল শিবিরের দু'শো-তিনশো ফুট ওপর থেকেই বরফের রাজত্ব সুরু হয়েছে। এগুলো সদ্যপড়া বরফ—তিন দিনের অশ্রান্ত বৃষ্টি যখন হচ্ছিল নিচে—তখনই ধারণা করা গিয়েছিল, এরকম বরফ পাওয়া যাবে ওপরে। বরফের ওপর পথ করতে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছে সমরবাবুকে। কোথাও কোথাও গভীরতা কোমর-অব্দি।

সুকরামে তৃতীয় দিন। ভগবান সিং, রাম সিং, কুশল সিং ইত্যাদি ৮ জনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সুনীলবাবু, সমরবাবু ও ধ্রুব। এক নম্বরে ওঁরা দুটো তাঁবু খাটালেন। দু' নম্বরের জায়গা ঠিক করে দেখে এলেন। দাদু, হরিদাসবাবু আর লেখক রইলেন মূল শিবিরে। আবহাওয়া মোটামুটি। বিকেলের দিকে তুষারপাত হচ্ছে।

সুকরাম—চতুর্থ দিন। সুনীলবাবুরা অনেক পরিশ্রম করে দ্বিতীয় শিবির স্থাপন করেছেন ১৭,০০০ ফুটের ওপর। ডানদিকে ভয়াবহ সব পাথুরে গর্ত। ওদিকে এগুতে পারা যাবে না। কুশল সিং এগুতে গিয়ে প্রায় মরতে বসেছিল—ঢুকে গেছিল crevass-এ—ধ্রুব কোনরকমে পিছন থেকে টেনে বাঁচিয়েছে সমরবাবুর সাহায্যে। সঙ্গে দড়ি এত বেশি নেই যে, Rope way করা যাবে আর তা' করা গেলেও সাজসরঞ্জাম নিয়ে কুশল সিংরা ঐ মরণফাঁদ পেরুতে পারবে কি না সন্দেহ। হিমালয় হঠকারিতাকে ক্ষমা করে না। প্রতিযোগিতা করতে হিমালয়ে আসা নয়—প্রাত্যহিক সৌন্দর্যের অনুপম উপলব্ধিই মূল উদ্দেশ্য। থারকোট ডানদিকে রয়ে গেল। ঐ শৃঙ্গে ওঠার চেষ্টা করা আর সম্ভব নয়। কিন্তু দু' নম্বর শিবিরের সামনে ভানোটি শৃঙ্গের ডানদিকে কয়েকটি অবিজিত অনামা শৃঙ্গ। লক্ষ্য এখন সবার ঐদিকে। দলপতির নির্দেশে হরিদাসবাবুকে মূল শিবিরের তত্ত্বাবধানে রেখে দাদু এবং লেখক উঠে এলেন এক নম্বর শিবিরে। তুষার গাঁইতি আজ সত্যিকারের কাজে লেগেছে। চোখে বিশেষ ধরণের ঠুলি বা গগলস—যাতে তুষারে রৌদ্রদাহে চোখ ঝলসে না যায়। এদিকে ধ্রুব যে দাদুর হজমিগুলিকে এ্যাভোমিন বলতো, তার প্রমাণ মিলল আজ। দাদু সামান্য বমি করছেন। দুর্ভাগ্য, দাদুর গুলি এদিন ছিল না—পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ধ্রুবর কাছে দু' নম্বর শিবিরে। আবহাওয়া গতকালের থেকে খারাপ। দুপুর থেকেই তুষারপাত সুরু হয়েছিল। বরফের সাম্রাজ্যে রাত কাটাতে হয়েছে। রাত্রে আরো তুষার পড়েছে। তবে, উঠে তাঁবু ঝাড়বার দরকার হয় নি।

সুকরামের চতুর্থ দিন। দলপতির নির্দেশে দাদু এবং লেখক দু' নম্বর শিবিরে উঠে এলেন। এখানে দলের পাঁচজন সদস্যই সম্পূর্ণ সুস্থ। সমরবাবু ও ধ্রুব সকালেই একটি শৃঙ্গ লক্ষ্য করে কুশল ও রামকে নিয়ে এগিয়েছিলেন। কুশল ও রাম মাঝপথে অসুস্থ হয়ে পড়ায় এবং আবহাওয়া হঠাৎ খারাপ

উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদীয় দাঁতের মাজন
দেবদশন
হাসিতে মুক্তো ঝরাবে
দেব কেমিক্যাল কোং কলি-৩২

হয়ে আসায় ফিরে এলেন দুপুর ১২টা নাগাদ। তবে, একটা ভাল খবর—অনেকখানি পথ তৈরি হয়ে রইল—আর সমরবাবু বলেছেন, শৃংগ জয় সম্ভব হবেই। এদিকে দাদু সমানে বরফ গলিয়ে স্টোভে জল করছেন, খিচুড়ি রাঁধছেন, বিকালে সুজি তৈরি করলেন, আগামী কাল ভোরের জন্যে ডালের সুপ রান্না করে রাখলেন।

পঞ্চম দিনের ঘটনা। ভোরবেলা দলনেতা, সমরবাবু, দাদু এঁরা সবাই ধ্রুবকে ডেকে হয়রান—সাড়া পাওয়া গেল না তার। সুনীলবাবু স্বাভাবিক-ভাবেই দারুণ অসন্তুষ্ট। ভীষণ কুঁড়ে, ঘুমকাতুরে, শীতভীতু ছেলে। সকালে উঠে অপরাধীর মতো মুখ কাঁচুমাচু। শেষ পর্যন্ত দলনেতার নির্দেশে ধ্রুব, রাম আর কুশল যাত্রা করল সকাল ৬৷৷টায়। রোদ্দুর উঠেছে। আকাশ একদম পরিষ্কার। আমরা যেন দিগন্তবিস্তৃত বালির পাহাড়ে বসে। উদ্বেগে আগ্রহে দেখছি—ওরা তিনজন উঠছে—দ্রুত ও দৃঢ় ওদের গতি—আমাদের সামনেই ওই শৃংখটি, কিন্তু আধঘন্টা ওরা একটা বরফঢাকা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল—তখন কি অস্বস্তি। কিন্তু ঐ তো আবার ওদের দেখা যাচ্ছে—পিছনে কে? কুশল? ওকে বেশ পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে—থামছে, দেখছে, পথ করছে, এগুচ্ছে ওরা। ২রা অক্টোবর বেলা ৯টা ৫০ মিনিট। ওরা শৃংগে উঠেছে। অবিজিত, অনামা এই শৃংগের উচ্চতা ১৮,৫০০ ফুট।

অর্ধেক পথ ওরা যখন ফিরে এলো, আর যখন ভয় করার কিছু নেই, তখন সমরবাবু আর লেখক ভগরামকে নিয়ে চললেন নিচে। এক নম্বর শিবির গুটিয়ে একেবারে নিচে—সুকরামের সেই গুহার কাছে। পান সিং পরোটা ভাজছেন। খুশি খুব। বিকেল ৪টা নাগাদ ওঁরা সবাই এসে গেলেন। ধ্রুবকে সবাই জড়িয়ে ধরলাম—জড়িয়ে ধরলাম রাম সিং ও কুশল সিংকে। তিনজনেরই বয়স প্রায় সমান।

অপরূপ এই অঞ্চলে সমতলের মানুষ খুব কমই এসেছে; অথচ শান্ত, নিস্তরঙ্গ, চারিদিকে হিমানী পর্বত বেষ্টিত উপত্যকার সৌন্দর্য অতি অনুপম। শুধু তাই নয়, হিমবাহ সম্পর্কে যে সব ভূতত্ত্ববিদ্ বিভিন্ন সমীক্ষা ও গবেষণা চালাচ্ছেন, এখানে এলে মনে হয়, তাঁরা খুবই লাভবান হবেন। স্থানীয় লোকেরা বলে, সুন্দর ডুঙ্গা নদীতে নাকি সোনা পাওয়া যায়। এই নিয়ে দু' বছর আগে প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতত্ত্ব বিভাগের দু'জন অধ্যাপকের সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছে। তাঁরাও ঐ অঞ্চলে ভূতত্ত্বের গবেষণা চালানোর ওপর জোর দিয়ে-ছিলেন। আছে মাইলের পর মাইল মেষ-চারণভূমি। এদিকে স্থানীয় সরকারের নজর পড়লে এবং সরকার সচেষ্ট হলে সুন্দর সুন্দর ডেয়ারী গড়ে উঠতে পারে। বনজ সম্পদ অফুরন্ত। আখরোট, ন্যাস-পাতি গাছ পথের ধারে ধারে। কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে আপেলের ২।১টা গাছ কারুর কারুর বাড়িতে দেখেছি। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আপেলবাগান করা সম্ভব কিনা, ভাবা দরকার। এককভাবে এসব কেউ করতে চায় না—কারণ বন্যজন্তু এসে ছিঁড়ে খেয়ে নষ্ট করে যায়। গ্রামের লোকেরা ধান, গম, যব, ফাবর, চুয়া এসব বোনে ক্ষেতে। উন্নত ধরণের চাষবাস এখনো এদের অজানা। আলু হয় খুবই তবে, উন্নত বীজ পাবার আগ্রহই নেই। দুরান্তের গ্রামে চিকিৎসা ব্যবস্থা কিছুই নেই। সুস্থ সুখী সমাজ গড়ে তুলতে গেলে এদিকে দৃষ্টি দিতেই হবে। কুমায়ুন পর্বতের গ্রামবাসীরা অনেক বিষয়ে বঞ্চিত। অথচ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অনেক কুমায়ুনীর সাহস ও শৌর্য আমাদের কারুরই অবিদিত নেই। মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এরকম অনেক ধরণের জোঁক, কীটপতঙ্গ এ অঞ্চলে রয়েছে, যার ওপরে সম্যক গবেষণা হয় নি। রয়েছে বিষধর সাপ। কয়েক ধরণের ধুপগাছ আছে। মূল্যবান ভেষজ আগাছার মতই জন্মে এখানে—বিশেষজ্ঞরা খোঁজ করলে আরো অনেক কিছু পেতে পারেন। সমাজ-বিজ্ঞানীরা এখানকার বিধিব্যবহার, উৎসব আয়োজন, লোকরীতি প্রভৃতি থেকে প্রচুর মালমশলা সংগ্রহ করতে পারেন। মোট-কথা, ভূতত্ত্ববিদ্, জীবতত্ত্ববিদ্, চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, পতঙ্গবিজ্ঞানী, কৃষিবিজ্ঞানী, ভেষজবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী সকলের পক্ষেই এই প্রায় অনাবিষ্কৃত অঞ্চলটি লোভনীয়, সন্দেহ নেই।

ফেরার পালা এসে গেল। ৬ দিন লাগল কাপকোট পৌঁছুতে। ২১ দিনের সুখ, দুঃখ, বিপদ-আপদের সঙ্গীদের বিদায় দিতে হবে। ভাল-মন্দ মিশিয়ে মানুষ। এদেরও ভালমন্দ দিক আছে। আশ্চর্য লোক রাম সিং। সে আর জাটুঙ্গি গ্রাম থেকে নামে নি। মায়ের অসুখ। কি করে মাকে ফেলে আসবে? টাকার লোভ দেখিয়েও আনা যায় নি তাকে। আমাদের অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু এর থেকেও তার অন্তরের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছি। ত্রুটিবিচ্যুতি আমাদের যেমন হয়েছে, এদেরও তেমনি। কুশলের সঙ্গে দাদুর কেমন যেন বনিবনা হয় নি—তেমনি আশ্চর্য, দলপতির সঙ্গে পান সিং-এর। ফিরে এসে দেখা গেল যেন এর উল্টোটাই।

কাপকোটের দোকানদার আর এক রাম সিং কি দৃষ্টিতে যে দেখেছিল সুনীল-বাবুকে আর লেখককে! ফিরে আসতেই হৈ হৈ বাধিয়ে দিল—শিকার করে আনল হরিণ—দাদুর রান্না—ভূরিভোজ সেদিন।

বাসে উঠলাম। কিছুক্ষণ পরেই মিলিয়ে যাবে কুশল সিং—যে গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। উদাসী পান সিং পিছনে পড়ে থাকবে। ভগবান সিং সেও সম্পন্ন লোক—শুধু তীর্থের আনন্দলাভের জন্যে এসেছিল আমাদের সঙ্গে। সুকরামে রয়েছে নন্দাকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড। বড় পবিত্র এই পথ—এই পদযাত্রা। রইল নির্লোভ দারবান সিং—যার ১০০ ভেড়া পুড়ে গিয়ে দেউলিয়ার অবস্থা আজ। ভগরাম, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক—সেও এসেছিল আমা-দের সঙ্গী হয়ে। এসেছিল বোকা জিৎরাম, যার হাত থেকে আমাদের দেওয়া টর্চ ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে নিয়েছে দুন্দিয়াচণ্ডের আনোয়ালরা। বিচিত্র জীবন নিয়ে ওদের মিছিল পড়ে রইল—ওরা ওদের ঘরে ফিরে যাবে—আমরা চলেছি আমাদের ঘরে।

কিন্তু—কোন্‌টা কাদের ঘর? স্বপ্নে যে আবার স-ব একাকার হয়ে যায়। দুন্দিয়াচণ্ড, সুন্দর ডুঙ্গা, সুকরাম—২ নম্বর শিবির। 'সাব্—চা'—ঐ তো পান সিং! 'লম্বা সাব—চলিয়ে'—ঐ তো ভগবান সিং। ঐ তো অদ্ভুতভাবে জিবটা ঠোঁটে বোলালো রাম সিং। আমাকে মাফ করো—ঐ তো কুশল বলছে দাদুকে—হরিদাসবাবুকে সে বানিয়েছে তার 'গুরুজী'। সুন্দর ডুঙ্গা ও সুকরামের অনবদ্য সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষের এই মিছিলও আমাদের স্বপ্নে সাড়া জাগাবে—সমস্ত অস্তিত্বকে প্রাত্যহিক মলিনতার ঊর্ধ্বে এক অনুপম অনুভূতিতে আলোড়িত, আলোকিত করে তুলবে।

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ঊনচল্লিশ ॥

বাংলাদেশে চা-বাগান প্রতিষ্ঠার কাহিনী আরব্যোপন্যাসের চেয়ে কম মনোরম নয়। কথাপ্রসঙ্গে এটি বলেছিলেন শ্যামলাল চৌধুরী। এই কথা অনেকের কাছেই শুনেছি। চা-বাগানের ইতিহাস ফেরে এ-অঞ্চলের প্রাচীন লোকেদের মুখেমুখে। বই-কেতাব-রিপোর্ট অবশ্য আছেই। তাতে চা-বাগান প্রতিষ্ঠার খুঁটিনাটি বিবরণ উদ্যোগ-আয়োজন তার সফলতা-নিষ্ফলতার কথা আছে। মানুষের মুখে শোনা কথাও এ-ব্যাপারে কম উদ্দীপনা জাগাবার নয়॥

চা-বাগান দেখেছেন? পরিচিত লোককে উত্তর বাংলার পথে যাত্রী হতে শুনলেই আমরা এই প্রশ্নটি অনেক সময়েই করে থাকি।

চা-বাগান?

বলাবাহুল্য এক-আধ সেকেণ্ডের বিরতি। এবং তারপরই অম্লান স্বীকারোক্তি, আজ্ঞে না।

নর্থ বেঙ্গলে যাচ্ছেন, চা-বাগান দেখে আসবেন। তৎক্ষণাৎ সময়োপযোগী ভাষণ।

শ্রোতা সঙ্গে সঙ্গে ভাববেন, হ্যাঁ, অবশ্যই দেখে আসতে হবে। উত্তর বাংলায় যাবেন আর চা-বাগানের সাথে পরিচয় ঘটবে না এমন হতেই পারে না। ফিরে আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কাছে গল্প বলবেন কি? অবশ্যই দেখতে হবে।

আমরা বাঙালীরা কম-বেশি ডোবা-পুকুর অথবা দীঘি-সায়রের দেশের লোক। আমাদের শিয়রে অবশ্য পাহাড় আর পদতলে সমুদ্র। তাই পুরী যাচ্ছি শুনলে একথা একশ'বার স্বীকার্য যে আমরা যতটা না জগন্নাথের রূপ দর্শন করতে, ততোধিক সমুদ্র দেখতে যাচ্ছি। বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমারের মত সমুদ্রদৃশ্য দেখে আমরা প্রত্যেকেই কালিদাস মুখে না হোক, অন্তত মনে মনে আবৃত্তি করে থাকি। আমাদের তালপুকুরে ঘটি ডোবে না, কিন্তু সমুদ্র দেখে উচ্ছ্বসিত হতে বাধা নেই। কে জানে হয়তো নেই বলেই পাওয়াকে ঘিরে আমাদের মাত্রাতিরিক্ত চঞ্চলতা। তেমনি আমরা মুসৌরী-হরিদ্বার-সিমলা বেড়াতে যাই, হয়তো পাহাড়-পর্বতের অভিজ্ঞতা লাভের আনন্দই তাতে বড় রকমের কারণ হিসাবে ক্রিয়া করে থাকে। মঠ-মন্দির বা পার্বত্য নগরী কিংবা তার লোকসমাজের পরিচয় জানতে নয়।

নর্থ বেঙ্গলকে ঘিরেও তাই চা-বাগানের কৌতূহল থাকে। আর তার চরিতার্থতাই স্বাভাবিক ধর্ম। বিহনে তার নর্থ বেঙ্গল ভ্রমণের আনন্দও খণ্ডিত হতে বাধ্য।

চা বর্তমান যুগের অবশ্য পানীয়। চা-স্পৃহ-চঞ্চল কম-বেশি সকল সাধারণ মানুষেরাই। পার্থক্য শুধু তার ব্যবহারে ও উপভোগের কায়দায়। মাটির খুরিতে কেউ চা-পান করেন। কেউ বা চা খান পিতলের গেলাসে। কাঁসার ঘটিতে চা-খাওয়া লোকও আছেন। আবার সাধারণ মানুষেরা চা খান চীনামাটির পেয়ালায়। সে পেয়ালা-পিরীচেরই বা কত রকমারী বৈচিত্র্য! কত না শিল্প-নক্সা, কত অলংকরণের মাধুর্য! গ্রীষ্মে কেউ খান গরম-চা, কেউ চান আবার বরফ-চা। কারুর চিনি দুধ চাই-ই চাই এবং খানিক বেশি পরিমাণে। কেউ খান লেবু-চা নুন-সহযোগে। জাপানে চা-পানকে ঘিরে আছে এক অসাধারণ উৎসব। এই চা-উৎসব বহুদিনের পুরাতন উৎসব। প্রাচীন বৌদ্ধ জেন্ (Zen)-ধর্ম সম্প্রদায়ের আমল থেকে চলে আসছে বলে ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাস করেন। বিশেষভাবে নির্মিত ও সজ্জিত Tea House-এ আপ্যায়িত করা হয় অতিথিদের।

তারও আছে নিজস্ব রীতি। শুকনো চা-পাতাগুলিকে গুঁড়িয়ে তৈরি করা হয় সুন্দর বিচূর্ণ। জল মিশিয়ে তারপর তাকে করা হয় ঘন প্যাস্টের মত।

আবার মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত তুর্কিস্থানে চলে ক্রীম-চা। অত্যন্ত কড়া কালো চা ব্যবহার করা হয় এজন্যে। চা-পাতা জ্বাল দেওয়া চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না চা-জল হচ্ছে ঘোরতর কালো রঙের। তারপর চলে ক্রীম মেশানোর পালা। তাতে রুটি ভেজানো হয়। এবং তারপর চলে খাওয়া। পারস্যের অধিবাসীরা পাতা গরম জলে সেদ্ধ করে অন্য জিনিস দিয়ে খায়। রাশিয়ানরা খুব কদাচিৎ মেশায় চিনি। জ্যাম্ বা লেবু দিয়ে খায়। চীন ও জাপানের অধিবাসীরা খায় ঈষৎ-ফোটান চা। তার রঙটিও হয় খুব পাতলা। ইংরাজদের পছন্দ ব্ল্যাক-টি। মনোরম সুগন্ধে ভরা ঘন চা। তিব্বতে ভুটানেও চলে চা। অবশ্য তাদের নিজস্ব রীতিতে।

এককথায় সারা পৃথিবীতে চলে চা। চা-এর জনপ্রিয়তা অসম্ভব। অবশ্য কফিও চলে কম নয়। কফির আছে আলাদা আভিজাত্য। অবশ্য কফির বাজার অনেক পরিমাণে নিজের অধিকারে নিয়েছে চা।

এহেন চা-এর সেরা বাগানগুলি আছে দার্জিলিং-এ, ডুয়ার্সে, আসামে। বর্ণে-গন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্জিলিং চা। দার্জিলিং-এর আছে ভুবন-ভোলানো স্বীকৃতি। নানা দেশ-দেশান্তর থেকে আসে পর্যটকের দল। অবশ্য চা-বাগান দেখতে নয়। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে। সৌন্দর্যের রাণী দার্জিলিং। চা-বাগানের শোভা দেখা যাবে উত্তর বাংলার ডুয়ার্স ও আসামের বাগানগুলিতে। ডুয়ার্স টী-ও স্বাদে-গন্ধে কম আনন্দকর নয়। এখানকার ভাল চা-ও যায় দেশ-বিদেশে। তারও আছে আন্তর্জাতিক চাহিদা।

এইসব চা-বাগানগুলি কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠে নি। এগুলির পেছনে আছে গত শতকের অনেক সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, শ্রম এবং সহযোগিতা। বছরের পর বছর ধরে এগুলির সৃষ্টি। একাকিনী নায়িকা যখন নায়কের প্রতি প্রেমে জর্জর হৃদয়-মন নিয়ে একটি বেলা একাকিনী কোন চা-স্টলের ছোট্ট পর্দাঘেরা কেবিনের মধ্যে কাটাতে যায়, তখন সে ভুলেও মনে করে না সেসব ইতিবৃত্ত। অথবা নির্জন দুপুরে যখন ঘন কথা ও কাব্য আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে এ-যুগের জীবনে আসে নিভৃত মন-বিনিময়ের পালা, তখনও

সেই চা-এর পেয়ালাই থাকে সামনে। কফি হাউসেও চলে চা, যদিও কফিতেই তার পরিচয়। যৌবনোদ্দীপ্ত তারুণ্য যখন বর্তমানের সমস্যায়, যুগের নানা অশালীনতায় ধ্বংসে-বিপর্যয়ে ও জ্বালাকর নগ্নতায়, কুশ্রীতার অসংযমে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে সীমাহীন ক্রোধে, ও তার প্রতিবিধানের জন্য যখন মরিয়া হয়ে ওঠে, তখনও সাক্ষী থাকে চা-এর এই অমর পেয়ালা। ধনীর আভিজাত্য চা, দরিদ্রের আনন্দ। নিরন্নের সান্ত্বনা চা। কর্মহীনের নৈরাশ্য দূরীকরণে চা, কর্মীর ক্লান্তি অপনোদনে। প্রভাতে চা, মধ্যাহ্নে চা, সায়াহ্নে চা, চা মধ্য রজনীতে। চা জাগরণে-অর্ধ-জাগরণে, উপবেশনে এবং শয়নেও। এমন কি স্বপ্নেও। নিদেনপক্ষে কেটলী দর্শনেও।

এই চা-এর আবাদ, আগেই বলেছি বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল অন্যান্য অনেক কিছুরই সম্পর্কে গৌরবান্বিত ঊনিশ শতকে। ১৮৩৪ খৃস্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্কের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে চা-এর গবেষণা ও চা-চাষ প্রবর্তনের পরিষদ গঠিত হয়। ইংরেজ চা-করেরা নেমে এলেন এই শিল্প স্থাপনের উৎসাহে ও আয়োজনে। ততদিনে তাদের স্বদেশে চা-পান প্রচলিত হয়ে গেছে ঘরে ঘরে। ১৮৯০ খৃস্টাব্দের দিকে বৃটেনের চা-এর দোকানগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে দেখা যায়। প্রথম দিকে এই চায়ের বাজার অধিকার করেছিল চীনা চা। ১৮৪০-এর থেকেই চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দিল ভারতীয় চা। রপ্তানী-বাণিজ্যে সে ছাড়িয়ে গেল চীনা চা-কে। স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় ভারতীয় চা জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করল গ্রেট বৃটেনের ঘরে ঘরে।

ততদিনে ডুয়ার্সের মাটিতেও চা-এর আবাদ শুরু হয়ে গেছে।

চা-চাষের উপযুক্ততার দিক বিচার করলে ডুয়ার্সের মৃত্তিকা ছিল আদর্শ। হাজার হাজার বছর ধরে অরণ্য অঞ্চলের ঝরাপাতার গলিতরস শোষণ করে করে এখনকার ভূমি পরিণত হয়েছিল দোআঁশ মৃত্তিকায়। রচনা করেছিল চা-চাষের অনুকূল ক্ষেত্র।

আর এ কাজে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন বৃটিশ শাসকেরা। বিনা সেলামিতে ডেপুটি কমিশনার তাদের জুগিয়েছেন খাসমহলের শ্রেষ্ঠ জমিগুলি। সে তুলনায় দেশীয় কোম্পানীগুলির প্রতি ছিল তাঁদের অবজ্ঞামিশ্রিত ঔদাসীন্য। নানা অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছেন পদে পদে। তাঁদের না ছিল অর্থবল না উপযুক্ত সরকারী সহায়তা। একমাত্র দেশপ্রেম সম্বল করেই কাজে নেমেছিলেন তাঁরা। সে-যুগের আকাশে-বাতাসে ছিল জাতীয়তার সুর। সেই জাতীয়তাবোধই তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল কঠিন কর্মে, ত্যাগে ও বেদনাবরণে।

ডুয়ার্সের বাঙালী চা-শিল্পের অগ্রনায়ক পথিকৃৎ হিসেবে এগিয়ে এসেছিলেন জলপাইগুড়ির বিখ্যাত উকিল গোপালচন্দ্র ঘোষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁরই আগ্রহ ও উৎসাহে জলপাইগুড়ির চা-বাগানের গোড়াপত্তন ঘটে। একদিকে ক্রমবর্ধমান ইংরাজ চা-করদের আবাদ ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, অন্যদিকে রাজশক্তি তাঁদের সহায়ক। স্বভাবতই গোপালচন্দ্রের মন দ্বিধাগ্রস্ত। জলপাইগুড়িতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তখন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু। গোপালচন্দ্রকে প্রেরণা দিতে এগিয়ে এলেন ভগবানচন্দ্র।

অবশেষে শুভক্ষণে সৃষ্টি হল ডুয়ার্সের প্রথম বাঙালী চা-বাগানের। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে।

সে ইতিহাস শুনেছিলাম শ্যামলাল চৌধুরীর কাছে। বলেছিলেন, জলপাইগুড়ির প্রথম বাঙালী চা-বাগান কোন্‌টি বলতে পারেন?

বলা বাহুল্য পারি নি।

তিনি বললেন, মোগলকাটা চা-বাগান। বাংলাদেশে বাঙালীর উদ্যোগে ও উৎসাহে পরিচালিত প্রথম এই বাগান।

মোগলকাটা?

তিনি বললেন, নাম শুনে নিশ্চয় কিছু ভাবছেন। পান্ডববর্জিত এই দেশ ডুয়ার্স। ভারতেতিহাসের কোনখানে তার নাম পাবেন না। তাহলে মোগলকাটা এই নামটি এল কি করে?

বলেছিলাম, ঠিক ধরেছেন আপনি। আমিও তাই ভাবছিলাম। হ্যাঁ, ইতিহাসের পাতায় অবজ্ঞাত হলেও ডুয়ার্সের আছে কিছু কিছু ইতিহাস। অবশ্য তার খোঁজ বড় একটা কেউ রাখেন না। কিন্তু তাই বলে ভাববেন না ইতিহাস বলতে কিছুই তার নেই।

মোগলকাটা চা-বাগান সূত্রে শুনেছিলাম তারই ইতিহাস। অতীতের অলিখিত এক অধ্যায়।

জলপাইগুড়ির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত সে-কাহিনী।

দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কামরূপের দুই রাজকুমার। সে আজ কয়েক শ' বছরের কথা। রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে এগিয়ে চলেছেন দু'-জন। ভয় নেই, ভাবনা নেই। বিঘ্ন-বিপদে দুঃসাহসী। মরণপণ জয়ের সাধনায়। বেপরোয়া দুই ভাই। শিশ্ব ও বিশ্বসিংহ।

জীবন্মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।

যেতে যেতে অর্জিত হল বিরাট ভূখণ্ড। রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে এগিয়ে এলেন মঙ্গোলয়েড্ গোষ্ঠীর দুই রাজকুমার। প্রতিষ্ঠা হল দুটি রাজ্যের। কোচবিহার ও বৈকুণ্ঠপুর। এই বৈকুণ্ঠপুরই বর্তমান কালের জলপাইগুড়ি।

কোচবিহারের রাজসিংহাসনে বসলেন বিশ্বসিংহ। বৈকুণ্ঠপুরে শিশ্বসিংহ। সহোদর রাজা। দুটি সহোদর রাজ্য।

এই শিশ্বসিংহেরই বংশের ষষ্ঠ রাজা ভুজদেব তখন সিংহাসনে। একদিকে প্রবল পরাক্রান্ত ভুটানরাজ, অন্যদিকে ভারত-ইতিহাসের স্বর্ণ-সিংহাসনে তখন মোগল রাজশক্তির আধিপত্য। সম্রাট জাহাঙ্গীর তখন সিংহাসনে। মোগলরা এই যুগে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভুজদেবের রাজ্যে। একবার জবরদস্ত খাঁ-র সৈনাপত্যে এমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে চরম পরাজয়ের শিক্ষা নিয়ে গেল মোগলরা।

কিন্তু পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবশেষে পুনরায় মোগলদের আগমন। এবারে তারা অনেক বেশি তৈরি হয়ে এসেছে। পূর্ব পরাজয়ের শোধ তারা নেবেই নেবে।

অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি সাক্ষাৎ দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর। একদিকে শক্তিমান মোগল ও অন্যদিকে বৈকুণ্ঠপুরের শাসক ভুজদেব। কঠোর যুদ্ধ হল দুই দলে। কিন্তু রণদুর্মদ ভুজদেবের প্রবল পরাক্রমের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না মোগলেরা। পরাজয় স্বীকার করে ফিরতে হল তাদের। মোগল সেনা হল ছিন্নবিচ্ছিন্ন। ছত্রখান হল শিবির। অগণিত মোগলের রক্তাক্ত মৃতদেহ ছড়িয়ে রইল রণক্ষেত্রের মাটিতে।

সে আজ কতদিনের কথা। কিন্তু ইতিহাসের চিহ্নমাখা পড়ে আছে মোগলকাটায়। যুগযুগান্তর পার হয়ে মোগলদের ধ্বংসের ও পরাজয়ের সাক্ষ্য বহন করে। ভগ্নজীর্ণ বিধ্বস্ত মোগলগড়ের চিহ্ন আজও দেখতে পাওয়া যায়।

মোগল গড় নেই। আছে মোগলকাটা। মোগলকাটা টী এস্টেট। জলপাইগুড়ি থেকে চলে আসুন ধূপগুড়ির দিকে। ধূপগুড়ি থানার অধীনে মোগলকাটা চা-বাগান।

মস্ত বড়ো ফ্যাক্টরিগুলিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নূতনকালের শিল্পপীঠ। কাল যেখানে ছিল সেনা-শিবির ছাউনি। আজ সেখানে মৃতমানুষের কংকালের হাড়ের ওপরে গড়ে উঠেছে নতুন সভ্যতার বুনিয়াদ। মৃত মোগল সেনাদের হাড়ের ফসফরাস আজ তার সবুজ মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করেছে। চা-পাতাগুলিকে করে তুলেছে নিঃশব্দ সবুজ সমুদ্র। মাইলের পর মাইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

কারখানা-বাড়িগুলির ডাইনামো কেঁপে-কেঁপে ওঠে। ভোরের আলোর সঙ্গে

সীটি বাজে। সেই সীটির শব্দ কেঁপে-কেঁপে ছড়ায় চতুষ্পার্শ্ববর্তী আকাশে। বাতাসে দিগন্তে। ঘুম ভাঙে মানুষদের। কুলি-কামিনদের। রাত্রির অন্ধকারেও বাজে ডাইনামো—ধক্‌ধক্‌ ধক্‌ধক্‌। আলো পিছলে পড়ে কাল যেখানে ছিল ঘন-গভীর অরণ্য। কালো চকচকে রাস্তা বয়ে গিয়েছে তার ভিতর দিয়ে। সুন্দর আলোগুলি চাঁদনী রাত্রির জ্যোৎস্না ছড়ায় চারদিকে।

নতুন যুগ। নতুন জীবন। কোয়ার্টারে-কোয়ার্টারে বাবুদের সংসার। শিশু হাসছে দোলনায়। মায়ের মুখেও হাসি। রান্নাঘরের চালে লতিয়ে উঠেছে জালি লাউয়ের ডগা।

অতীতের ইতিহাস। বর্তমানের বিস্ময়। মোগলগড়ের কোন নিহত সেনা যদি আজ হঠাৎ জেগে উঠে তার মরণ-ঘুমের গভীরতা থেকে, চমকে হয়তো তার দু' চোখের মণিজোড়া স্তব্ধ-বিস্ময়ে থমকে যাবে।

কিন্তু মৃত আর জাগে না। নতুন চলে যায় তার ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে পথ করে। কে জানে ছিল কি-না ওইখানে জবরদস্ত খাঁ-র খাসতাবু। সে-যুগের মোগল-বাদশাদের কারুর-কারুর সঙ্গে নাকি তাঁদের হারেমের দু'টি-একটি প্রিয় বেগমরাও যুদ্ধে যেতেন। হাঁ, আমীর আর কাকে বলে! হয়ত যুদ্ধক্ষেত্রেও এসেছে রত্নমণি-মাণিক্যখচিত গড়গড়া। সাটিনে-মখমলে ঝলমল জড়োয়া তাকিয়া। পারস্যের আতর, কান্দাহারী আতরদান, হয়তো বেগম-সাহেবার মৃণালভুজে শোভা পাবার মত তানপুরাও।

গড়গড়ায় টান পড়ছে। অম্বুরী তামাকের ধোঁয়া উড়ছে সম্রাটের নিজস্ব ছাউনিতে। হাতীর দাঁতের সিংহাসনে বসে নিমীলিতচক্ষে হয়ত তাতে টান দিচ্ছেন দুর্দান্ত প্রতাপ মোগল সম্রাট। বাইরে প্রহরী। সতর্ক প্রহরায়। দূরে হয়ত রাত্রির অন্ধকারে ছুটছে কামানের গোলা। পড়ছে বারুদ। পড়ুক। কুছ পরোয়া নেই। সবটাই সম্ভব। সমস্তটাই মোগলাই ব্যাপার যে।

কে জানে সেই মোগল সম্রাটের হয়ে লড়তে-আসা জবরদস্ত খাঁ-র শিবিরেও, মোগল সম্রাটদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনুসৃত হয়েছিল কি না। হয়তো নিদেনপক্ষে দু-একজন বাঁদী বা নর্তকী নিশ্চয়ই উপস্থিত ছিল। যুদ্ধে পরাস্ত হতে তাদের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছিল কে জানে। সবটাই কল্পনা। কিন্তু কল্পনাই যে আগাগোড়া কে বলতে পারে।

আজ নতুন যুগের চকচকে রাস্তা পেরিয়ে ঝকঝকিয়ে চলে যাচ্ছে ম্যানেজারের নতুন কেনা গাড়ি। শুধু একটি বাগানে নয়, ডুয়ার্সের সব বাগানেই।

সে-যুগ আর নেই। সম্রাট-আমীরদের বিদায় নিতে হয়েছে পৃথিবী ছেড়ে। খোদার দোয়ায় তাদের জাঁকজমক ঐশ্বর্য-আমীর সবই শূন্যের কোঠায়। যেন পাঁচ আঙুলের ভোজবাজি। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ বাজে মনের দিগন্তে। চোখ বুজে কবি-কণ্ঠে যেন আবৃত্তি শুনি—

চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ,
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে পৃথিবী করিত টলমল—

সম্রাট-আমীর-নবাবেরা বিগত। তাঁদের স্থান অধিকার করেছেন বর্তমান যুগের শিল্পপতিরা। এ আরেক যুগ। এ-যুগে রাজা নেই, রাজা নেই, রাজন্যভাতাও ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। এ-যুগের নতুন ধর্ম গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে এখন পর্যন্ত বণিকেরাই রাজা। তাঁদের নতুন নাম শিল্পপতি। গালভরা নাম। সম্রাটদের হাতীর পায়ে কাদা লাগত, শিল্পপতির দামি মোটরের চাকায় দাগও লাগে না। চা-বাগানের ডিরেক্টরেরা সেই শিল্পপতি।

ডুয়ার্সের চা-বাগানের শিল্পপতিরা এক আলাদা শ্রেণী। আলাদা জাত ডুয়ার্সে। চালে-চলনে, আচারে-বিচারে, আহারে-বিহারে তাঁদের আছে আলাদা পরিচয়। বছরে-বছরে তাঁদের স্ত্রী-দের স্বর্ণালংকারের মডেল যতটা পাল্টায়, তার চাইতে অনেক বেশি পাল্টায় মোটরের মডেল। বর্তমানে অবশ্য এ-অবস্থা খানিকটা মন্দার দিকে। চা-বাজারের উঠতি-পড়তির ওপরেই জিনিসটা নির্ভর করে। তা ছাড়া রাজনৈতিক অবস্থাও অনেকটা প্রতিকূলে।

সে কথা থাক।

বলছিলাম ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলির কথা। প্রথম স্বদেশী বাগান মোগলকাটা। আর আজ এক মোগলকাটা বাগানের পাশাপাশিই গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট-বড় বাগান। ধূপগুড়ি এলাকাতেই। সব কটিই সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের যোগানদার। বানারহাট টি গার্ডেন, বিন্নাগুড়ি টি গার্ডেন, চামুর্চি টি গার্ডেন, চুনাভাটি টি গার্ডেন, দেবপাড়া টি গার্ডেন, ডায়না টি গার্ডেন, গয়েরকাটা টি গার্ডেন, গেন্দ্রাপাড়া টি গার্ডেন, হলদিবাড়ি টি গার্ডেন, কারবালা টি গার্ডেন, কাঁঠালগুড়ি টি গার্ডেন, লক্ষ্মীকান্তপুর টি গার্ডেন, মগঘাট টি গার্ডেন, পলাশগড়ি টি গার্ডেন, রেডব্যাঙ্ক টি গার্ডেন, নলডাংপাড়া টি গার্ডেন, রিয়াবাড়ি টি গার্ডেন, তেলিপাড়া টি গার্ডেন, তোতাপাড়া টি গর্ডেন, আমবাড়ি টি গার্ডেন, হরিতলিগুড়ি টি গার্ডেন। ছবির মিছিলের মত ভাসে একটির পর একটির নাম।

ছবির মত বাগানগুলি। সবুজ প্রসারিত চা-এর আবাদ সারি-সারি। সমান, সুন্দর। শৃংখলাবদ্ধভাবে ছাঁটা। সবুজ একটি হিল্লোল যেন মাইলের পর মাইল। শেড-ট্রিগুলি দাঁড়িয়ে আছে। ছায়া বিতরণ করছে বাগানগুলিকে।

দলে দলে কুলিরা যাচ্ছে। মাথায় সঙ্গে ঝুলোনো টুকরি। মেয়েরাই বেশি। সাঁওতাল, মদেশিয়াদেরই সংখ্যাধিক্য। দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি সংগ্রহের অভিযান।

বর্তমানকালের ডুয়ার্স। সেদিনের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন না সাধারণ কোনো শিল্পপতি। ব্যবসা ছিল না তাঁদের প্রধান কথা। উদ্যোগ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মহৎ আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা। সমবায় শুধু আজকের মত কথায় নয়, কাজে দেখিয়েছিলেন ওঁরা। পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রি হয়েছিল মোগলকাটার। সে-যুগে একটুখানি কথা নয়।

ভবিষ্যৎদ্রষ্টা স্বপ্নদর্শী ছিলেন ওঁরা। নতুন যুগের চত্বরে দাঁড়িয়ে বার বার তাঁদের মনে আসে।

[ক্রমশ]

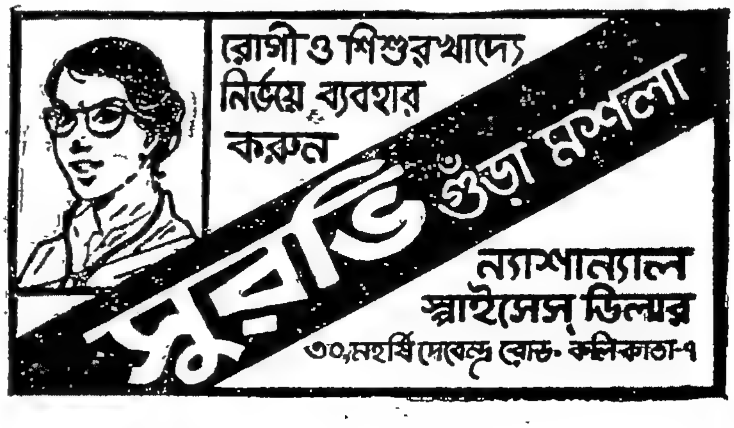

প্রিয়দর্শন সেনশর্মা

যুব-যন্ত্রণা

ছিটকে সরে পড়ে অতীন।

প্রমথবাবু তখন অফিসে যাবার জন্য বেরিয়েছেন—এ দৃশ্যটা অতীন সহ্য করতে পারে না। তবু দূর থেকে বাবাকে দেখে সে—বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ প্রমথবাবু লাঠি ঠুকে ঠুকে ততক্ষণে ট্রাম স্টপেজে পৌঁছে গেছেন। ট্রামে উঠতে গিয়ে ধাক্কা লেগে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন। দু-চারজন লোক হাঁ-হাঁ করে ওঠে, কেউ কেউ তাচ্ছিল্যও প্রকাশ করে। সব কথা শুনতে না পেলেও সমস্ত ব্যাপারটা বোঝে অতীন। বুকের মধ্যে একটা বুনো শুয়োর গুঁতোগুঁতি করতে আরম্ভ করে—দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়! নিজের শক্ত সবল হাতগুলোর দিকে তাকায়। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সময় বহুদিন হাতুড়ি পিটিয়েছে. এই হাত দিয়ে সোজা করেছে অনেক বাঁকা লোহা! তবু আজ কেমন যেন অসমর্থ মনে হয়।

চিরকাল কিন্তু এ রকম ছিল না। ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার পর প্রতিদিনই অতীন প্রমথবাবুর সঙ্গে ট্রাম স্টপেজ পর্যন্ত আসত, বাবাকে ট্রামে তুলে দিয়ে বাসায় ফিরত। মনে মনে ভাবত, আর ক'টা দিন! পরীক্ষার ফল বের হলে মোটামুটি একটা চাকরি জুটে যাবেই—টেকনিক্যাল লোক, ছাত্রও ভাল। রোজ ভেবেছে অতীন তখন বাবাকে বলবে, আর দরকার নেই অফিসে যাবার। এ কথাটা ভাবতেও যে কি আনন্দ হত অতীনের!

কিন্তু আজ!

দৃশ্যপট থেকে সরে যেতে চায় অতীন।

ততক্ষণে অবশ্য ট্রামটা চলে গেছে। অতীনের কিন্তু মনে হয় ট্রামটা বুঝি তার মাথার ওপরই নাচছে!

ফেরার মুখেই দেখা দ্বিজেন কাকার সঙ্গে। দ্বিজেন কাকা প্রমথবাবুর ছোট ভাই-এর বন্ধু। প্রথম চাকরিটা পেয়েছিল প্রমথবাবুর সুপারিশেই—আজ অবশ্য অন্য একটা ফার্মে মস্ত চাকরি করেন।

দ্বিজেন কাকাকেও এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে অতীন। দ্বিজেনবাবুর দৃষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ম। ডাকেন, কে অতীন না? অফিসে গেলে না? ও হো, তোমার বুঝি কোন হিল্লে এখনও হয় নি!

অতীনের মনে হল দুনিয়ার সমস্ত ঘৃণা, সব তাচ্ছিল্য বুঝি তার মুখে কেউ ছুঁড়ে মারল! বুকের ভেতরের সেই বুনো শুয়োরটা আবার অশান্ত হয়ে উঠল।

আজ এক বছরের বেশি হল অতীন এল সি ই পাশ করেছে। ছাত্রকালে প্রতিদিন শুনে এসেছে, টেকনিক্যাল লাইনের ছেলে—বেকার থাকতে হবে না একটা দিনও। শুনে শুনে কথাটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিল অতীন। আর তখন থেকেই স্বপ্ন দেখত—প্রমথবাবু একটু নিশ্চিন্তে বসে হুঁকো টানছেন, একটা রাঁধুনী রাখা হয়েছে মা'র সাহায্যের জন্য, ছোট ছোট ভাইবোনগুলো একটু আলো-হাওয়ার মধ্যে বড় হচ্ছে, আর বুক-ভরা আনন্দ নিয়ে সারাদিন পরিশ্রম করছে অতীন।

স্বপ্ন দেখত আর দিন গুনত!

ফাইন্যাল পরীক্ষার পর যখন বাবাকে ট্রাম স্টপেজ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল, আপত্তি করে বলেছিলেন প্রমথবাবু, 'চিরকাল এই পথেই হেঁটেছি, আজকে হঠাৎ তোর কি হলো?'

'ঘরেই ত' বসে আছি বাবা, দিলামই না হয় তোমাকে একটু এগিয়ে—ট্রামবাসে আজকাল যা ভিড়!'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন প্রমথবাবু, 'কোথায় এ সময় একটু আনন্দ করে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে দেশটেশ ঘুরে আসবি! তা আমার যেমন কপাল! কিছুই ত' তোদের করতে পারলাম না!'

আপত্তি করে বলত অতীন, 'আমাদের জীবন ত' পড়েই আছে বাবা, দেশ ঘোরার সময়ও ত' আর শেষ হয়ে যায় নি।'

'না রে—একবার কলুর জোয়ালে

ঘাড় লাগালে চোখ ঢেকে সংসারের পথেই ঘুরে মরতে হবে। তখন কি আর পারবি?'

সে সব কথা ভাবতেও আজ কান্না পায় অতীনের! বুনো শুয়োরটা দাপাতে শুরু করে বুকের মধ্যে—দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়!

কিন্তু তবু মানুষ বদলায়!

সেদিন পাড়ার পুরনো মুদি রঞ্জিতের দোকান থেকে ছোট ভাইটা খালি হাতেই ফিরে এল। কিছুক্ষণ বাদে অবশ্য রঞ্জিতও এসেছিল। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে করুণস্বরে বাবাকে বলেছিল, 'বাবু! কি শুনছি? আপনার নাকি চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে এল?'

'কেন? হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'অনেক টাকা বাকী পড়েছে বাবু!' আমতা আমতা করে বলে রঞ্জিত, 'ওগুলো শোধ না করলে আর যে বাকী দিতে পারছি না বাবু!'

রঞ্জিতের কথার ঢঙে আপত্তিকর কিছু ছিল না, তবু প্রমথবাবুর সমস্ত মুখটাই লাল হয়ে উঠেছিল। কিছুকাল গুম হয়ে বসে থেকে বলেছিলেন 'ভয় নেই রঞ্জিত, আমি মরে গেলেও অতীন আছে।'

রঞ্জিত কিন্তু তেমনি বিনয়ের ভঙ্গিতেই বলেছিল, 'দাদাবাবুর ওপর কি ভরসা করা যায়?'

আর শুনতে পারে নি অতীন। দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

সারারাত সেদিন অতীন দু' চোখের পাতা এক করতে পারে নি। মাঝে মাঝে তন্দ্রা এসেছে, ভীষণ দুঃস্বপ্নের ঘোরে ভেঙে ভেঙে গেছে।

মাঝরাতে অতীন টের পায় বারান্দায় পায়চারী করছেন বাবা, পিছনে মা। বাবার সব ক'টা কথাই শুনতে পায় অতীন—'না গিন্নী, বয়স হয়েছে, পরকালের ডাক একদিন শুনতেই হবে। তার জন্য ত' কোন দুঃখ নেই, কিন্তু বড় ছেলেটা যে মানুষ হলো না!'

সেই বুনো শুয়োরটা যেন অতীনের হৃৎপিণ্ডে লাথি মারে। চোখের সমস্ত আলো নিভে যেতে চায়। না—তবু অতীন কিছুতেই বাবার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাঁড় করাতে পারে নি। সমস্ত স্নেহ দিয়েই ত' তিনি তাদের মানুষ করার চেষ্টা করেছেন, বড় করে তুলেছেন। কিন্তু আজ যদি পাড়ার পুরনো মুদিও অতীনের ওপর আস্থা না রাখতে পারে তার জন্য কি প্রমথবাবুকে দায়ী করা যায়?

পরদিনই ভোরে ছুটে গিয়েছিল অতীন দ্বিজেন কাকার কাছে। ছোটকালে অতীনকে নাকি দ্বিজেন কাকা খুব ভালবাসত। সব শুনে কিন্তু দ্বিজেনকাকা হাত উল্টে বলেছিল, 'তুমি ত' সামান্য এল, সি, ই, পাশ করেছ, কত ইঞ্জিনীয়ারিং গ্র্যাজুয়েটই ঘুরে বেড়াচ্ছে! চাকরি কই? কোম্পানীই উঠে যাবার হাল!'

সেদিন কিন্তু বাবাকে আর ট্রামে তুলে দিতে যেতে পারে নি অতীন। সাহস পায় নি। সেদিন থেকেই বাবাকে এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে সে।

সূর্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুনীলকে বলে অতীন, 'জীবনটা জ্বলে গেল মাইরি!'

সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় সুনীল। বছর দুই হ'ল সুনীল ইকনমিক্স নিয়ে এম-এ পাশ করেছে। আজও চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অস্বস্তিকর একটা নীরবতা দু'জনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

হঠাৎ অতীন লাফিয়ে ওঠে, 'একটা কিছু করতেই হবে।'

'লাফিয়ে উঠলি যে বড়, মামার জোর আছে?'

'কিসস্যু হবে না তোদের দ্বারা', বলতে বলতে ঘনিষ্ঠভাবে পাশে এসে বসে মাধব। অতীন একটু সরে বসে—মাধবকে বড় ঘেন্না করে। মাধব পাড়ার একজন মস্তান। মাধব আবার বলে, 'পয়সা কামাতে চাস ত' আয় আমার সঙ্গে।'

অতীন উঠে পড়ে, 'বড্ড বেলা হল মাধবদা, চলি।'

স্যারবি-গ্রীশাম। মস্ত ফার্ম!

তার হেড আফিসের সামনে দাঁড়াতে অতীনের পা দুটো কেঁপে উঠল। আজ কদিন ধরেই হন্যে হয়ে আফিসে আফিসে

মুক্তার মত ঝকঝকে উজ্জ্বল...

আপনার দাঁত হবে সাদা ধবধবে, দাঁতের মাঢ়ী নীরোগ থাকবে আর মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে, আপনি শুধু ডেণ্টনিক দিয়ে দাঁত মাজা অভ্যাস করুন।

ক্লোরোফিল মিশ্রিত ডেণ্টনিক পাইওরিয়া সারাতে সাহায্য করে।

যাঁরা টুথ পাউডারের জায়গায় পেষ্ট ব্যবহার পছন্দ করেন তাঁদের জন্য জনপ্রিয় ডেণ্টনিকের সমস্ত গুণসম্পন্ন টুথ পেষ্ট বাজারে প্রচলন করা হইয়াছে। ধবধবে দাঁত আর মনভোলান হাসি যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরাই চান ডেণ্টনিক টুথ পেষ্ট।

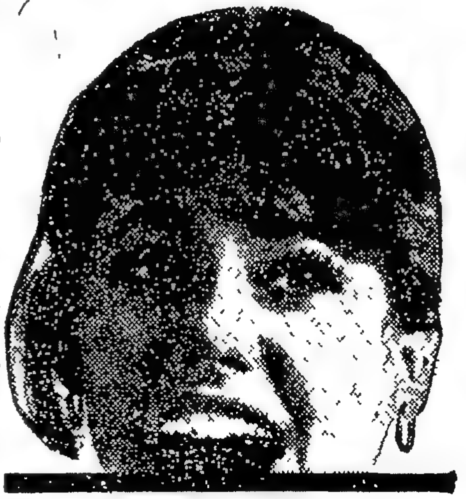

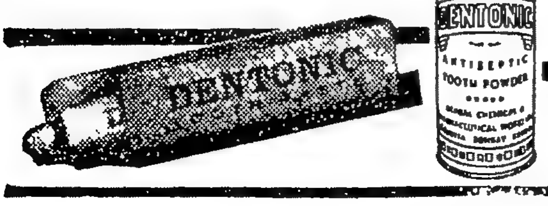

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা·বোম্বাই·কানপুর·দিল্লী

ঘুরছে অতীন। কৃশাব—কুলরার্ন—সিংহানিয়া—বার্টলিভয়—রিশেবরাইয়া—! একই কথা সবাই বলেছে। সব জায়গাতেই তাড়া খেয়ে খেয়ে অতীনের কেমন একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল আর বুঝি কোন অবস্থাতেই উত্তেজনার উষ্ণস্রোত বয়ে যাবে না তার অনুভূতির তন্ত্রীগুলো বেয়ে। দোলা লাগবে না তার হৃদয়ে চরম অপমানের মোকাবিলা করতেও। তবু এখানে দাঁড়িয়ে গলাটা তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। রুমাল বের করে কপালের ঘামটা মুছল সে।

এই ফার্মেই প্রমথবাবু একজন সিনিয়ার ড্রাফটসম্যান। তিরিশ বছর চাকরি করার পর সাহেবের হাতে পায়ে ধরে আবার রি-এমপ্লয়মেন্ট নিয়েছেন।

সবই অতীন জানে। তবু নিরুপায় হয়ে তাকে শেষ চেষ্টা আজ এখানেই করতে হবে। হাতের তালু পর্যন্ত ঘেমে ওঠে।

মরিয়া হয়ে অতীন ঢুকে পড়ে চীফ-অব-পার্সোনাল-এর ঘরে। বেয়ারা-পিওন হাঁ—হাঁ করে ছুটে এসেছিল, কিন্তু তার আগেই অতীন সাহেবের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীনের সমস্ত ইচ্ছার বিরোধিতা করেই থরথর করে কাঁপছিল তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো।

বিরক্তির মেঘ এসে জমে সাহেবের মুখে।

হাঁফাতে হাঁফাতে বলে অতীন, 'বাবা ত' আপনাদের অনেক সার্ভিস দিয়েছেন, এবার তাঁকে রেহাই দিন। বিশ্বাস করুন স্যার, বাবার কাজ আমি করে নিতে পারব—আমার কোয়ালিফিকেশান আছে, বয়স আছে!'

'হোয়াট?' প্রচন্ডভাবে গর্জে ওঠে সাহেব, 'কি বলছ তুমি? আর ইউ ম্যাড?'

তারপরেই সাহেবের ঘরে ডাক পড়েছিল প্রমথবাবুর।

সাহেবের ঘর থেকে যখন বের হয়ে এলেন প্রমথবাবু, তখন তাঁর মাথাটা ঝুলে পড়েছে। স্যাঙ্গবি-গ্রীশামের সবাই বিস্ময়ের সঙ্গে শুনল সব ঘটনা, বলে বেড়াল চারিদিকে অনেক রসান দিয়ে।

সাহেব কিন্তু অতীনকে বলেছিল, 'প্রমথবাবুর পোস্টে কি তোমার হেরেডিটারি রাইট জন্মেছে হে ছোকরা?'

'না স্যার। যে কোন পোস্টে আপনি আমায় এপয়েন্ট করতে পারেন। শুধু বাবাকে একটু বিশ্রাম দিতে চাই স্যার!'

'প্রমথবাবুর পাস্ট সার্ভিসের কথা স্মরণ রেখেই আমরা এতদিন তাকে পুষেছি, তা নইলে ঐ পোস্টটা কবে এবলিশ করে দিতাম!'

'স্যার!' আঁৎকে উঠল অতীন। মনে হোল সাহেবের প্রতিটি কথায় যেন প্রমথবাবুর প্রতি অনুকম্পা করুণা ঘৃণা ঝরে পড়ল। বুকের ভেতরের সেই বুনো শুয়োরটা ভীষণ অশান্ত হয়ে উঠেছিল। সমস্ত বিধিনিষেধের নিগড় ভেঙে বেরিয়ে পড়তে চাইছিল। কিন্তু তবু বিদ্রোহ করতে পারল না অতীন। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল তার মুখ, আরও করুণ হয়ে গেল গলার স্বর, 'মরবার আগে বাবাকে কয়েকটা দিন বিশ্রাম দিতে চাই, ছেলের কর্তব্য করতে চাই। দয়া করে একটা সুযোগ দিন!'

'হুঃ! বেস্ড ডিউটিফুল দেখছি রে!' দাঁত দিয়ে কামড়ে-ধরা পাইপটার মধ্যে আগুন দিতে দিতে সাহেব বলেছিল, 'এখন আসতে পার।'

'স্যার!'

'গেট আউট!'

তখন অফিসে ছুটি হয়েছে। ভিড় ঠেলে ঠেলে ফেরার ট্রামে উঠতে চেষ্টা করেন প্রমথবাবু।

সেই বুনো শুয়োরটা অতীনের হৃৎপিন্ডটার ওপর লাফাতে আরম্ভ করে। ডালহৌসীর একটা গলির মধ্যে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ে সে। সে সময় একদল লোক প্রোসেশান করে এগিয়ে আসছিল ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে। চীৎকার করে বলছিল তারা, 'ছাঁটাই করা চলবে না। চলবে না—চলবে না!'

একবার ভাবল অতীন সেই দলের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেয়। পরক্ষণেই মনে হল, ধ্যেৎ, ওদের সঙ্গে কি করে মিশবে অতীন, ওদের ত' চাকরি ছিল বা আছে। তাড়াতাড়ি উল্টো দিকে পা চালায় সে।

'কি রে পয়সা কামাতে চাস?' অতীনের পথ আটকে দাঁড়ায় পীযূষ—তার মুখ দিয়ে তখনই ভক ভক করে বিশ্রী গন্ধ বের হচ্ছে। একটা বিশেষ ভঙ্গি করে সে বলে, 'জানিস, কলকাতার রাস্তায় পয়সা উড়ছে?'

'সত্যি রে পীযূষ?'

'আলবৎ', বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসে পীযূষ, 'তবে হিম্মৎ থাকা চাই, এলেম থাকা চাই।' কথা শেষ হতেই পকেটের তাসগুলোকে একটা কুৎসিত ভঙ্গিতে নাড়তে থাকে সে। একটা খস খস শব্দ ওঠে।

অতীনদের সঙ্গে একই স্কুলে পড়ত পীযূষ। কিন্তু কয়েক বছরের চেষ্টাতেও স্কুলের বেড়া পার হতে পারে নি। তবু সে নাকি অনেক টাকা রোজগার করে। অতীন অবশ্য জানে যে, পীযূষের সব কাজকারবারই অন্ধকার জগতে। এতদিন তাই তাকে সযত্নে এড়িয়ে চলেছে। আজ কিন্তু জিজ্ঞেস করে, 'আমার দ্বারা হবে না পীযূষ?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারিস।' নতুন সাকরেদ পাওয়ার আনন্দে চকচক করে ওঠে পীযূষের চোখ।

পীযূষের পিছু পিছু একটা অন্ধগলিতে গিয়ে ঢোকে অতীন।

বুনো শুয়োরটা তখন অশ্রান্তভাবে তার ধারালো দাঁত-নখ দিয়ে অতীনের হৃৎপিন্ডটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছিল।

সদ্য প্রকাশিত হইল!

বাঙলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরসিক

শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

(১) মনের মত বৌ
(২) মস্কো বনাম পন্ডিচেরী
(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো
(৪) প্রেমের বিচিত্র গতি
(৫) রক্তের টান
(৬) যখন তারা কথা বলবে

পৃষ্ঠা ২৪০

মূল্য মাত্র চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

এক বাংলার কথা

অসীম মুখোপাধ্যায়

নবান্নের ডাক

আজ আমি কোনও পাড়ায় যাব না। যাব না কারও বাড়ি, বসব না কারও দাওয়ায়। কেউ যদি ডাকে, বলে—শোন, শোন, যাচ্ছ কোথায় হনহনিয়ে? থামব না, হাত নেড়ে ইসারায় বলব—পরে কথা হবে, আজ আর নয়।

সত্যি, আজ আর খিদের কথা ভাবব না, শুনব না কান্না, দেখব না হা-ঘরের রাক্ষুসে-হাঁ। আজ শুধু হাঁটব। একা-একা এই ঢেউ-তোলা পথে, এই ছায়া-মাখা পথে, ধান-বৌদের গানের তালে তালে পা ফেলে শুধু হাঁটব। আকাশে মেঘের -াকোয় কারা যেন সোনা-রোদ নিয়ে কোন্ দূরদেশে পাড়ি দেবে, আমি দেখব। মাটিতে, গাছের সবুজ বুকে বাতাস কথা রেখে যাবে, আমি শুনব।

কে যেন আজ আমার নাম ধরে বারে বারে ডেকে ডেকে গেছে। আমি যদি না যাই, তবে তার মুখ অভিমানে কালো হয়ে যাবে, তার বুকে ঝরাপাতার ব্যথা বাজবে, তার চোখে শ্রাবণ ঘনিয়ে আসবে! আমি তাই আজ হাঁটছি, আমি তাই আজ হাঁটব।

ঐ তো সে বসে আছে সিঁথি-সরু নদীটির পাড়ে, দু' পা ছড়িয়ে! কোলে তার পাকা ধানের ছড়া, মুখে হাসি! আমি কি করে বলি সে হাসিটি কেমন? জগতের সব রূপসীর হাসি হার মেনে গেছে। হার মেনে গেছে শিশুরাও। এ হাসির তুলনা তো নেই! আমি যেখানেই যাই, যতদূরেই যাই, দেখি, সে বসে আছে, পাশে তার সিঁথি-সরু নদী, কোলে তার পাকা ধান, মুখে তার হাসি।

পথে, পথে, ধুলোর পুকুরে চড়ুইদের স্নানপর্ব চলছে। "কিচ-কিচ", "কিচ-কিচ", কি যে বলছে, ওরাই জানে। শুকনো ডালে বসে ফিঙে দুটো আনমনা কেন? ওরাও কি ডাক শুনেছে? পথ ছেড়ে, মাঠে নেমে ধান-বৌদের মুখের কাছে কান পাতি। শুনি ওরা গান গাইছে, পাকাধানের গান। ওরাও তো ডাক শুনেছে, তার ডাক। সেই যে সেই। যে

"পাকাধানের দিন এল।"...সিঁথি-সরু নদীটির পাড়ে, কোলে তার ধান, মুখে তার হাসি!

বসে আছে পা ছড়িয়ে, সিঁথি-সরু নদীটির পাড়ে, কোলে তার ধান, মুখে তার হাসি!

একটা বাছুর। ভোরের শিশিরের মত টলটলে চোখে দূর মাঠে চেয়ে দিশেহারা। সেখানে অসংখ্য মেয়েলী গলায় গান হচ্ছে, "সির-সির, তির-তির" করে। বাতাসে ওর গলার ঘণ্টী দুলছে, "টিঙ, টিঙ, টিঙ টিঙ"। শব্দের মধু গলছে, ঝরছে। নীল আকাশের গায়ে কুন্দের মালা গেঁথে বক উড়ছে। আজ কি ওদেরও ছুটি? আজ কি ওদেরও ভেসে চলা? বসবে না আজ খালের পাড়ে, পদ্মের পাতায় পা রেখে? তাকাবে না জলের দিকে? স্বপ্ন দেখবে না পুঁটির, স্বপ্ন দেখবে না মৌরলার? তবে কি আজ শুধু ভাসবে কুন্দের মালা গেঁথে, আকাশের গায়ে?

কাকেরাও আজ এ-পাড়ায়, ও-পাড়ায় যায় নি। ধানের ডগা ছুঁয়ে ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। ধান-বৌদের গায়ের গন্ধে ওরা মেতে উঠেছে। আজ শুধু মাঠে মাঠে উড়ে এ গন্ধ ওরা বুকে তুলবে!

ও কনে-বউ! গান হবে না, গান? নবান্নের গান, নতুন ধানের গান? তোমার আঙিনায় আঁকবে না সেই ছোট ছোট, তুলতুলে পা দুটির ছবি? আঁকবে না ধানের ছড়া, পদ্মের কুঁড়ি? আঁকবে না কুঁড়েঘর, তার পাশে কলাগাছ, আর লাউ-এর মাচা? দুপুরে আসবে না কাক, দল বেঁধে? বসবে না ঘরের চালে? তখন আঙিনায় নতুন উনোন, মাটির হাঁড়িতে নতুন চাল ফুটবে, গন্ধে ভরে যাবে আশ-পাশ। আর সেই লোকটা গো? যে দিনের পর দিন ফাটা-মাটি চষে গোলার ফসল ঘরে তুলে এনেছে, সে তোমার দামাল ছেলেটাকে বুকে নিয়ে উবু হয়ে বসে বলবে—আঃ—আঃ—আঃ। তোমার মনে তখন খুশিতে কোটালের বান ডাকবে, তাই না, গো? সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলবে, তোমার ঘরের দাওয়ায়, ধানের গোলায়, তুলসীমঞ্চে, ছাঁচ-তলায়, কোথাও বাদ যাবে না। আর যাবেই বা কেন? কোন্ পথ তার পথ নয় বল? সব পথই তো তার! তুমি কনে-বউ, তখন গাইবে তোমার সইদের নিয়ে। গানের সুরে সুরে সন্ধ্যা নামবে, চুপি চুপি, গাঢ় হবে। তারপর গান শেষ হয়ে গেলে জোনাকির আলোয় রাত জ্বলবে ঝিক-মিক করে।

কনে-বউ। আমি সেই দিনের ছবিটি আমার বুকে নিয়ে ডেরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। আমি জানি গো, সেই দিন আসবে, ঠিক আসবে। তুমি তোমার মানুষটিকে গিয়ে বল, আমি একথা বলেছি।

আমি চলি, আমার পাশে পাশে খালের জলে মুখ দেখে আকাশ চলে, সূর্য চলে, সোনা-রোদ বোঝাই মেঘের নৌকো চলে। আর আমি যেখানেই যাই, সেখানেই দেখি তাকে। সেই রূপসীকে, পাশে তার সিঁথি-সরু নদী—কোলে ধানের গোছা নিয়ে সে হাসছে, কনে-বউ যার জন্যে আলপনা দেবে, প্রদীপ জ্বালাবে, গান গাইবে, তাকে।

"ও মধুখুড়ো, খুব যে গুনগুন করছ? মুখে হাসি! তালে তালে মাথা নাড়ছ, ব্যাপারটা কি? ওঃ হো বুঝেছি। ফসল কাটার সময় এসে গেছে, তাই না? ঘরে খুড়ি আর ভাই-বোনরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে, বেশ হবে। জানি খুড়ো জানি, তারপর আবার কান্নার দিন আসবে। তা সে পরের কথা পরে। এখন আগের কথা ভাব। খুশির দিনগুলোতে গান গেয়ে নাও। আলোর দিকে চোখ ভরে তাকাও। আর দেখ খুড়ো, আমার মন কি বলছে জান? মন বলছে মেঘলা দিনগুলো এবার থেকে অনেক সাদা হয়ে যাবে। না খেয়ে থাকার দুঃখ ঘুচে যাবেই। সবাই যে আজ মরিয়া গো খুড়ো, এবার তারা দিন বদলে নেবে। নইলে বল, তাকেই বা আজ দেখব কেন আমি? তার দেখা কি সহজে মেলে? যাকে না পেয়ে আমি, তুমি, আমরা সবাই আজ লক্ষ্মীছাড়া? খুড়ো, ঘরে তোমার মাদল আছে তো? আছে? আর পুরনো ভাতের রস? তাও আছে? বাঃ চমৎকার! তাহলে সেদিন দুপুর থেকেই মাঝের পাড়ায়, গোষ্ঠতলার মাঠে সবাই মিলে হুল্লোড় করা যাবে!"

এত ছবি, এত সুন্দর ছবি, কে আঁকে, কি করে আঁকে। সোনালি ধানের গোড়া ছুঁয়ে পান্না-সবুজ জল, ফুটে আছে অজস্র শাপলা, লাল, সাদা, হলদে। লাজুক মেয়ের মত মুখে পাপড়ির আঁচল টেনে জলে গা ডুবিয়ে বসে আছে। পায়ে পায়ে দূর্বার দল, প্রজাপতির পাখায় রামধনু রং, বাবলার ডালে মৌন মাছরাঙা, পাখার রঙের ঝিলিমিলি।

"তোমরা চললে কোথায়? উত্তরে? হরিণডাঙার মাঠে? কেন, সেখানে ফসলের ওপর কেউ চড়াও হয়েছে বুঝি? যাবেই তো। নিশ্চয় যাবে। ফসলের ভাগ কি কারো একার? যারা মাটির ঘুম ভাঙাল, রক্ত দিয়ে, ঘাম দিয়ে গর্ভিণী করল মাটিকে, ফসল তাদের নয় তো কাদের? ফসল তো তাদেরই সন্তান! যাও ভাই, বুক বেঁধে চলে যাও। শুনছ না তার ডাক, দেখছ না তাকে? আমরা এবার বাঁচব বলেই তো সে এসেছে। এসে দু' পা ছড়িয়ে বসেছে। এবার থেকে সে আমাদের, মাটির মানুষদের। আমাদের ঘরেই সে থাকবে। তোমরা যাও।"

আমি হাঁটছি, সিঁথি-সরু নদীর বাঁধ ধরে। পথের ওপর কে যেন পদ্মের পাপড়ি ছড়াতে ছড়াতে গেছে। কে রে তুই পাড়াগাঁর কবি, তুইও কি শুনেছিস তার ডাক, তোকেও কি সে নাম ধরে ডেকে ডেকে গেছে? তুইও কি দেখেছিস তাকে? সেই রূপসীকে, আমার মাকে?*

---

* আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

স্যামুয়েল বেকেট: ড্যানিউবের ধারে দক্ষিণ-জার্মানীর ছোট্ট শহর আলুমে ১৯৬৩ সালের জুন মাসে বেকেটের বিখ্যাত একাঙ্ক নাটক "প্লে"র প্রথম মঞ্চাভিনয় হয়। আপাতদৃষ্টিতে নাটকের কাহিনী অত্যন্ত সাধারণ ধরণের বলে মনে হতে পারে। স্বামী, স্ত্রী এবং উপপত্নী—এই ত্রিভুজের অবতারণা করেছেন বেকেট—সবাইকেই শেষ পর্যন্ত শোকগ্রস্ত হতে হয়। মূল পরিস্থিতি শুধু গতানুগতিক একঘেয়ে এবং নীরস বললেই সবটা বলা হয় না—বেকেট যেন ইচ্ছে করেই নাটকের প্রতিটি অংশকে উপহাসাত্মক করে রচনা করেছেন।

নাটকটির চরিত্র হচ্ছে—পুরুষ: এক, মহিলা: প্রথম এবং মহিলা: দ্বিতীয়। এদের কোন বিশেষ নাম দেওয়া হয় নি—বয়স বা চেহারা সম্বন্ধেও নাট্যকার উদাসীনতা অবলম্বন করেছেন। বেকেটের অন্যান্য নাটকের মত এ নাটকের পাত্র-পাত্রীও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর—তবে এদিকে দর্শক বা পাঠকের দৃষ্টি তেমনভাবে আকর্ষিত হয় নি।

'ওয়েটিং ফর্ গোডো'র ভ্যাডিমার বা এস্ট্রাগন যে ট্র্যাম্প একথাও জোর করে বলা যায় না। কারণ নাটকে এ-সম্পর্কে কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই।

"প্লে" নাটকের পাত্র-পাত্রীর বাগানওলা বাড়ি আছে। আছে মর্নিং রুমস এবং গাড়ি, বাড়ির এবং বাইরের কাজও রয়েছে। ঘটনাস্থলের বর্ণনা না থাকলেও নাটকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে জায়গাটা ইংলণ্ড। স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনটি চরিত্রকেই সাদাসিধে, মাঝামাঝি ধরণের এবং শোচনীয় বলে মনে হবে—অর্থাৎ যে জাতীয় চরিত্র আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। পুরুষটি দুটি মহিলার মাঝে থাকে এবং হাঁফাতে হাঁফাতে ক্রমাগত এদিকে-ওদিকে তাকায়—তার অবস্থাই সবচেয়ে সঙ্গীন। দুই নারীর মাঝে পড়ে সেই সব থেকে বেশি দুর্বল এবং জরাজীর্ণ। কপট—কিন্তু তার আচরণে দেখা যায় সৌজন্যের ভাব। বহু ধরণের বিপদের সঙ্কেত পাবার পরও এবং নানারকমের সমাধানের প্রচেষ্টা করবার পর, তিনজনেই উপলব্ধি করে যে, এভাবে আর চলতে পারে না এবং এরপর একে অপরের কি ঘটল সে বিষয়ে না জেনেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

সুচিন্তিতভাবে এবং অতি সাধারণ বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে এক অতি অদ্ভুত, হাস্যকর এবং গভীর আবেগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন বেকেট এই নাটকে।

অন্ধকারের ভেতর মঞ্চের পর্দা ওপরে উঠে যায়। স্পটলাইট এসে পড়ে তিনটি বিরাট কলসীর মত আকারের শবভস্ম রাখবার সাদা পাত্রের ওপর।

স্পটলাইটের আলো নিষ্প্রভ থেকে ক্রমশ অল্প তীব্র এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রত্যেক কলসীর মুখের ওপর একটি মাথা দেখা যায়—মাঝেরটি পুরুষের এবং তার দুইদিকে দুই নারীর—এদের দেহের বাকী অংশ থাকে কলসীর অভ্যন্তরে। যদিও এই কলসীগুলো পরস্পরকে স্পর্শ করে, তবু এই তিনটি চরিত্রের প্রত্যেকেই—নারীদ্বয় এবং পুরুষটি—মনে করে তারা অত্যন্ত একলা। এদেরই একজনের বর্ণনা অনুসারে মঞ্চের ওপর বিরাজ করে নরকের অস্ফুট আলোক। ওপরের পৃথিবীতে যে বিষাদপূর্ণ কাহিনী ঘটেছে তারই বিবরণ দেয় পৃথকভাবে এক-একজন চরিত্র। এই ঘটনার পর যারা তখন পর্যন্ত হয়তো বেঁচে আছে, তাদের সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ এবং সহানুভূতি দেখায় এরা।

'The play ends on an 'infinite echo, with the recommencement of the man's story : "We were not long together" '—BARBARA BRAY.

বেকেটের সমস্ত রচনার ভেতর এই নাটকটিই সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেছে—অথচ কোথাও এতটুকুও রাখ ঢাকা দেয় নি। নাটকটি আকারে ছোট—সবশুদ্ধ চল্লিশ মিনিট সময় নেয় অভিনয়ের জন্য। ভাষার সরলতার দিক থেকে এটি ক্লাসিকসের সঙ্গে তুলনীয়। অতি সহজ দু-একটি শব্দের বা বাক্যের সাহায্যে বেকেট মানুষের জীবনের এ্যাবসারডিটির দিকগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন—

"He went on and on, I could hear a mower."

এ নাটকে দৈহিক এ্যাকসন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবুও বেকেটের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, ফর্ম বিষয়ক প্রচণ্ড জ্ঞান, গভীর কাব্যপ্রতিভা এমন একটা উচ্চস্তরে উঠতে পেরেছে যার ফলে এই তিনজন চরিত্রের ভেতর দিয়েই জগতের সব মানুষকে আমরা দেখতে পাই। এ-নাটকের লোকেরা সবাই অদ্ভুত, তাদের চারিত্রিক দুর্বলতা এবং অসামঞ্জস্য আমাদের করুণার উদ্রেক করে, পরস্পরকে ভালবেসে জীবনে স্থায়িত্ব আনার তাদের এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা সাধারণ মানুষেরই জীবনের আলেখ্য।

"Play is above all theatrical. It exists to be embodied. The extraordinary dramatic and emotional effects of concentrating all interest on three faces is such as only the boldest of originators could have foreseen. [B. Bray.

এরপর আলমের মঞ্চাভিনয়ের বাকী সময়টায় বেকেটেরই দুটি মূক নাটক অভিনীত হয়েছিল—'এ্যাক্ট উইদাউট ওয়ার্ডস ১ এবং ২'। প্রথমটিতে দেখি একটি লোক প্রতি পদে অদ্ভুতভাবে বকে যাচ্ছে এবং অদৃশ্য শক্তির থেকে আঘাত পাচ্ছে। তবু সে ধৈর্যের সঙ্গে এবং অক্লান্তভাবে নিজের কাজ করবার চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় নাটকটিতে দুটি চরিত্র—প্রথম মানুষটি দৈনিক রুটিন মাফিক কাজ করে যাচ্ছে অতি ধীরে ধীরে। দ্বিতীয় মানুষটি আদর্শ নাগরিক—সে পরিচ্ছন্ন, পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে। কিন্তু হুজের ভেতরেই তাকে থাকতে হয় এবং বার বার নতুন করে প্রথম থেকে তাকে কাজ শুরু করতে হয়।

লণ্ডনের 'দি অবজার্ভার' পত্রিকার নাট্য-সমালোচক ব্যাম্বার গ্যাসকয়েন বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো'র লণ্ডন এবং প্যারিসের দুটি প্রডাকসনই দেখেছিলেন—এ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন: "পিটার হলের লণ্ডনের 'গোডো' প্রডাকসনে নাটকটির মানবিকতা এবং জীবনের আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর কিন্তু আসলে ট্র্যাজিক দিকগুলো সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়েছে ? কিন্তু আমি শুনেছি বেকেট লণ্ডনের প্রডাকসনটি পছন্দ করেন নি এবং প্যারিসের প্রডাকসন তাঁর অনেক বেশি ভাল লেগেছে। অথচ প্যারিসে 'গোডো'র মঞ্চাভিনয় দেখবার সময় আমার পক্ষে প্রেক্ষাগৃহে বসে থাকাটাও যন্ত্রণাদায়ক মনে হচ্ছিল।

'গোডো'র রচনাকাল থেকেই বেকেট যেন দর্শকদের দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য প্রচেষ্টা করে এসেছেন—

Since then the gradual desiccat'on and boxing-in of Beckett's theatre is famous.

'[illegible]' [illegible] চরিত্র। দুটি

থাকে ডাস্টবিনে, একজন চেয়ারে প্রায় আবদ্ধ হয়ে বসে থাকে।

'হ্যাপী ডেজ্'-এ উইনি প্রথমে কোমর অবধি এবং পরে গলা পর্যন্ত বালির ঢিপিতে ডুবে থাকে। উইনি অবশ্য এই ঢিপিমুলের চারপাশে হামাগুড়ি দিতে পারে।

"প্লে" নাটকে চরিত্রগুলোর নাম পর্যন্ত বাদ পড়ে গেছে—পুরুষ-১, মহিলা-১ এবং ২ নিয়ে নাটক। তিনটি জালার ভেতর এরা আবদ্ধ—কথা বলবার সময় বা দেখবার জন্য পর্যন্ত একে অন্যের দিকে ঘাড় ফেরাতে পারে না। নাটকের অভিনয়ের অর্ধেক সময় কেটে যায় একটি মাত্র মঞ্চ-নির্দেশের দ্বারা—'রিপিট প্লে একজ্যাক্টলি' নাটকে কয়েকটি ভাল সংলাপ আছে—কিন্তু ওল্ডভিকে ১৯৬৪ সালে এ-নাটক যখন রিহার্সালে পড়েছিল বেকেট সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নির্দেশে এত দ্রুত সংলাপ বলানো হচ্ছিল যে, কথার শব্দগুলো বোঝা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। জালাগুলোর ওপর স্পটলাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলাই ছিল এ নাটকের একমাত্র এ্যাকসন।

প্রত্যেকবারই বেকেটের এক-একটি নতুন প্লে দেখে মনে হয়েছে এই অবধি এসেই বোধ হয় উদ্ভটতার শেষ সীমানায় এসে নাট্যকার পেঁ‌ৗচেছেন—কিন্তু তার পরের নাটকেই দেখা গেছে এ-বিষয়ে তিনি আরও এগিয়ে গেছেন। এরপর বেকেটে বোধ হয় প্রাণবন্ত বা জীবন্ত অভিনেতাকে বাদ দিয়েই নাটক মঞ্চস্থ করবার চেষ্টা করবেন। 'প্লে' নাটকটিতেও মানুষের বদলে জালাগুলোর ভেতর টেপ-রেকর্ডার বসিয়ে দিলেই তো কাজ চলে যায়। দর্শক থাকার দরকার নেই—এমনিতেই তো এ-শ্রেণীর নাটক দেখতে কেউ প্রায় আসে না।

একটি ফাকা থিয়েটারে নাটকটি প্রদর্শিত হতে পারে—বেকেট এবং পরিচালক থাকবেন দর্শক হিসাবে—অবশ্য মেকানিক্যাল ডিজাইনগুলো ঠিকমত হয়ে গেলে ডিরেক্টরকেও বাদ দেওয়া চলবে—

The end, of course, is Beckett himself in a sealed box—fitting enough, since three of his five stage plays deal with old age and the approach of death—but there is a limit to the extent to which symbolism should be allowed to influence life."

সমালোচক জন ওয়েইটম্যান বেকেট বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: "বেকেটের নাটকে সবার ওপর ভাষার প্রাধান্য—জীবনের অন্যান্য দিকগুলো যেন আহত অবস্থায় থাকে এবং সহজভাবে প্রস্ফুটিত হতে পারে না। তাঁর নাটকে এ্যাকসনের স্থান অধিকার করেছে ভাষার আলঙ্কারিক বিস্তার।

বেকেটের লেখা সঠিকভাবে উপভোগ করতে হলে এক আপাতবিরোধী পরিস্থিতির ওপর এসে দাঁড়াতে হয়—(১) জীবনকে ঘৃণা করতে হবে এবং (২) ভাষাকে ভালবাসতে হবে।

বেকেট ভাষাকে এত ভালবাসেন বলেই ইংরাজী এবং ফরাসী এই দুটি ভাষার তিনি এত সংস্কারসাধন করতে সমর্থ হয়েছেন।

'গোডো' সম্বন্ধে কেনেথ টাইনান লিখেছেন:

"For the most part Mr. Beckett's tramps converse in the double talk of Vandeville; one of them has the ragged applomb of Buster Keaton, while the other is Chaplin at his airiest and fairiest."

'গোডো' মঞ্চস্থ করতে গেলে ট্র্যাম্প দুটির চরিত্রায়নে পরিচালক যদি টাইনানের উপরি-উক্ত মন্তব্যটি মনে রাখেন, তাহলেই এস্ট্রাগন এবং ভ্ল্যাডিমারকে ঠিকভাবে রূপায়িত করতে পারবেন। এখানে বাস্টার কিটন এবং চ্যাপলিনের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার স্পষ্ট রূপায়ণ দেখা যায় চার্লির 'দি লাইমলাইট' ছবিতে।

আর একটি কথা বলেই এ প্রবন্ধ শেষ করবো—বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো'র বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করবার এক্সক্লুসিভ রাইট আমার—অন্য কেউ অনুবাদ এবং ভাবানুবাদ করলে সে কাজটা ঠিক আইনসঙ্গত হবে না। এবং সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে আমাকে যথাযথ স্থানে ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে হবে। এখানে International Copyright Agency-র তরফ থেকে আমাকে গোডোর বঙ্গানুবাদের অনুমতিদান প্রসঙ্গে লেখা চিঠিটির প্রতিলিপি তুলে দিলাম:

DR. JAN VAN LOWEN, LTD.
International Copyright
Agency
81-83, Shaftesbury Avenue
London W. 1.

Waiting For Godot: Beckett

This will confirm that we received your cheque to the value of £30 in payment of translation and publication rights in Bengali, and that this payment establishes your exclusive right to translate and publish the play in that language.

Signed—Betty Jadkins
p.p. Dr. Jan Van Lowen Ltd.

এ সব কথা এই জন্য লিখতে হচ্ছে যে, কিছুকাল আগে দু' একটি দল আমার গোডোর অনুবাদটির সামান্য কথার অদল-বদল করে নাটকটি নিজেদের নামে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। এ নিয়ে আমি International Copyright Agency-র কাছে কিছু জানাতে লজ্জা বোধ করেছি। তবে ব্যাপারটা ওরা জানতে পারলে কপিরাইট আইনভঙ্গকারীদের প্রচুর জরিমানা দিতে বাধ্য করবে বলেই আমার বিশ্বাস। সেই জন্যই আগে থেকেই এই কুশনটা দিয়ে রাখলাম।

সমাপ্ত

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহাগানের শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম

রংঢং

‘বিসর্জন’-এর মুক্তি

গত ১৪ই নভেম্বর নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটকের পান্ডুলিপি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্যের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, বৃটিশ শাসিত বাংলোয় যে জবরদস্ত আইনে রবীন্দ্রনাথের ওপর পর্যন্ত খবরদারী করা হয়েছিল, স্বাধীনতার বাইশ বছর পরে সেই পাপস্খালন করা হল। স্বাধীনতা লাভের পরেও বাইশটি বছর রবীন্দ্রনাথের লেখা পান্ডুলিপি লালবাজারের পুলিশদপ্তরের মালখানায় পড়ে ছিল। বৃটিশের সেই আইনও তেমনি বলবৎ ছিল। স্বাধীন ভারতের নাট্যকার ও নাটকের দলগুলিকে পরাধীন দিনের মতই অনুমতির জন্য পান্ডুলিপি দাখিল করতে হয়েছে। বৃটিশ আমলের মতই দারোগারা নাটকের বিচার করেছে। যাঁরা কেন্দ্রে বা পশ্চিমবাংলার মন্ত্রিসভায় আসীন ছিলেন—তাঁরা নিজেদের স্বদেশপ্রীতি, জাত্যাভিমান ইত্যাদির কত বড় বড় কথা শুনিয়েছেন। বামপন্থীদের বিদেশীশক্তির তাঁবেদার বলতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু তাঁদের এমনই জাত্যাভিমান যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের আইন মাথায় রেখে রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক নাট্যকার পর্যন্ত সকলকে পুলিশের কাছে হাজির করেছেন। যাঁরা নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন তুলে দাও বলে দাবি করেছেন, তাঁদের ঠেঙানী দিয়ে বিদায় করেছেন। দেশের সচেতনশক্তি, ছাত্র ও যুবকরা এবং প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনের পক্ষ থেকে বার বার দাবি তোলা হচ্ছিল নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন তুলে দাও—এই আইন জাতির মর্যাদাবিরোধী—সংস্কৃতির অগ্রগতির প্রতিরোধক। কিন্তু কে কার কথা শোনে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে লালবাজারে বন্দী রেখে তাঁরা নিজেদের স্বদেশপ্রীতি ও রবীন্দ্রভক্তির ঢাক পিটিয়েছেন। বাইশ বছর পরে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পতনের পর যুক্তফ্রন্ট সেই পাপস্খালনের সুযোগ পেল। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন তুলে নেয়। সেই কুখ্যাত আইন প্রত্যাহার করেছিল বলেই দ্বিতীয়বারের মন্ত্রিসভা গঠনের পরে এই পাপের কথা জানা গেল। যা সমগ্র বাঙালী জাতির পক্ষে অবমাননাকর। গত ১৪ই নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জীর সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বিশ্বভারতীকে পান্ডুলিপি ফেরত দিয়ে জাতির সম্মান রক্ষা করেন। বাইশ বছরের পাপ থেকে বাঙালীকে মুক্ত করেন।

এই অনুষ্ঠানের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক—পুলিশকর্মচারীদের দ্বারা ‘বিসর্জন’ নাটক অভিনয়। যে পুলিশ একদা সাম্রাজ্যবাদীদের পাহারাদাররূপে রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত আইন দেখিয়েছে, সেই পুলিশই কংগ্রেস আমলে জন-বিরোধী শক্তিরূপে সাম্রাজ্যবাদী শাসনধারাকে রক্ষা করেছে। আজ যুক্তফ্রণ্টের আমলে পুলিশ-বাহিনী ‘বিসর্জন’ নাটক অভিনয় করে এই পাপস্খলনের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করল। দেশাভিমান ও মর্যাদাবোধ পুলিশের মধ্যে থাকবে না এমন হতে পারে না। তবে তাদের যেভাবে গঠিত করা হয় এবং পরিচালনা করা হয় সেভাবে চলে। এতদিন পুলিশকে কেবল জনবিরোধী শক্তিরূপে পরিচালিত করা হয়েছিল। আজ সুযোগ পেয়েছে বলে পুলিশ কেবল ‘বিসর্জন’ নাটক অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথ ও জাতির কাছে অপরাধের জন্য ক্ষমা চায় নি, সেইসঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে, লালবাজারে এগারশ’ দশটি নাটক জমা রয়েছে। অতীত দিনের অপরাধের চিহ্ন এই নাটকগুলি নিয়ে যাতে উৎসাহীরা কাজ করতে পারেন তার সুযোগ দেবেন বলে তাঁরা ঘোষণা করেছেন। কয়েক বছর আগে হলে পুলিশের এই মনোভাব প্রকাশ আমরা আশা করতে পারতাম না।

সেদিনের অনুষ্ঠানটি বাস্তবিকই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন : ১৯২৩ সালে ৬২ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ‘বিসর্জন’ নাটকে জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সেদিন অপর্ণা সেজেছিলেন আজকের লেডি রাণু মুখার্জী। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে লেডি রাণু মুখার্জী কংগ্রেস আমলে সাংস্কৃতিক ব্যাপারে মন্ত্রিসভার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তিনি নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন প্রত্যাহারের দাবি সমর্থন করেন নি। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভ সত্ত্বেও এদিক থেকে তিনি যথেষ্ট চেতনাবোধ প্রকাশ করতে পারেন নি।

যুক্তফ্রন্ট সরকার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মর্যাদাবোধ ও দেশাভিমানের যে পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। —সুজন

‘চিরাগ’ ছবির নায়িকা আশা পারেখ

চিত্র আলোচনা

ইয়ং জার্মান ছবির উৎসব শেষ

পশ্চিম জার্মানীর ‘ইয়ং’ ছবির উৎসব শেষ হয়েছে। গত ৭ই থেকে ২০শে নভেম্বর জ্যোতি সিনেমায় এই উৎসব হয়েছে পশ্চিম জার্মানীর ভারতস্থ দূতাবাস, ম্যাক্সমুলার ভবন ও ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে।

প্রদর্শিত সাতটি ছবির মধ্যে তিনটি ছবির বিষয়ে গত সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম দিনের ছবি “ইউ আর এ ম্যান, মাই বয়” আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হয় নি। বাকি তিনটি ছবি ‘ওয়াইল্ড রাইডার’, ‘সাইনস অব লাইফ’ এবং ‘দি আর্টিস্ট আন্ডার দি বিগ টপ’। এই তিনটি ছবির মধ্যে ‘ওয়াইল্ড রাইডার’-এ একজন উৎকেন্দ্রিক লোককে কেন্দ্র করে ভন্ডামীর একটা চিত্র উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে সংবাদ-মালিকদের ব্যবসার স্বার্থের একটা জঘন্য রূপ প্রকাশ করেছে। যে কাহিনী মনে করে দেয় ফ্যাসিস্ট দানব হিটলারের কথা। সেই লোকটিও ছিল উৎকেন্দ্রিক, কিন্তু তখন দেশব্যাপী সমাজতান্ত্রিক

জাগরণকে ঠেকাবার জন্য মনোপলি ক্যাপিটালিস্ট ও সংবাদপত্রের মালিকরা হিটলারকে তুলে ধরে। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হুজুগ-প্রিয়। অনেক সময় পাগলামি তাদের কাছে প্রতিভার স্বীকৃতি পেয়ে যায়। মানুষের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওয়াইল্ড রাইডার রাতা-রাতি খ্যাতি লাভ করে, তার উৎকট গানও জনপ্রিয় হয়। তার তরুণ পাবলিসিটি ম্যানেজারের এক সময় ভ্রান্তি দূর হল, কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে বেরিয়ে গেল ওয়াইল্ড রাইডারের জংলী আবাসের সীমানার বাইরে। এই ছবিটির পরিচালক ফ্রাঙ্ক যোসেফ স্পায়েকার।

ওয়ের্নার হেরগোগের 'সাইনস অব লাইফ' একঘেয়েমী ও নিষ্ক্রিয়তা ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে এক তরুণ জার্মান সৈন্যের বিদ্রোহের কথা। যার আচরণ নিস্তরঙ্গ জীবনে কিছুটা ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে।

আলেকজান্দার ক্লুগের 'দি আর্টিস্ট আন্ডার দি বিগ টপ' খুব গালভরা নামের ছবি। ছবিটি পুরস্কারও পেয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে একটা দার্শনিক বক্তব্য রাখার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা প্রগতি-শীল নয়। দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপারকে সার্কাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

সাতটি পশ্চিম জার্মানীর ছবির মধ্যে 'ওয়াইল্ড রাইডার' এবং 'সাইনস অব লাইফ' উল্লেখযোগ্য। বাকি চারটি ছবি—স্পষ্ট বক্তব্যহীন, যে বক্তব্য আছে তা প্রগতিশীল নয়। সব কয়টি ছবির একটি মাত্র লক্ষণীয় চরিত্র—রুচিবোধহীন যৌনদৃশ্য। একমাত্র 'সাইনস অব লাইফ' ছাড়া প্রত্যেকটি ছবিতে যৌনকেলীর নানা ভঙ্গি, শৃঙ্গাররসে ছবিতে দর্শক আকর্ষণের শালীনতাহীন চেষ্টা দেখা গেছে। শেষ দিনের ছবিতেও অর্থহীন-ভাবে বাথটাবের মধ্যে নগ্ন নারীদেহ দীর্ঘক্ষণ দেখান হয়েছে এবং অকারণে নগ্ন পুরুষকে দেখান হল। যে দৃশ্যের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না—মূল গল্পের সঙ্গে। যৌনতার এই শিল্প-বোধহীন দৃশ্যগুলি দেখে মনে হয়, পশ্চিম জার্মানীর সমাজজীবনে যৌনতা আবরণহীন পর্যায়ে পৌঁচেছে। সেখানে

পশ্চিম জার্মান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত 'ওয়াইল্ড রাইডার' ছবির একটি দৃশ্য

বুঝি শালীনতা ও নৈতিকতা আজ ধুলোয় লুণ্ঠিত। যৌনজীবনের গোপনীয়তা বলে কিছু নেই। রক্ষণশীল দৃষ্টি থেকে এই কথাগুলি বলা হচ্ছে না। শিল্পের প্রয়োজনে নগ্নদেহ দেখান যেতে পারে, যেমন বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ক্ল্যাসি-কাল চিত্রাবলীতে রয়েছে। কিন্তু এখানে দৃশ্যগুলি দেখলে গা ঘিনঘিন করে ওঠে। মনে হয় পশ্চিম জার্মানীতে বর্তমানে 'ব্লজ'-এর মত ছবি করার সুযোগ আর নেই। শিল্পের এক বন্ধ্যা পরিস্থিতি সেখানে। তাই পরিচালকরা সৃষ্টির পথ খুঁজে না পেয়ে সেই পুরনো যৌন দৃশ্য দিয়ে ছবির ফাঁক ভরাট করছেন। তরুণ পরিচালকরা 'ইয়ং' নামের বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছেন—যৌন স্বাধীনতা ও খেয়ালী ছবির জন্য। ওরাথেন শিল্পের বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

এই ছয়টি ছবি দেখে পশ্চিম জার্মানীর ছবি সম্পর্কে আমরা উচ্চ ধারণা করতে পারলাম না। এই প্রশ্নও উঠেছে যে, যাট হাজার টাকা খরচ করে প্রচারের ঢাক বাজিয়ে ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটি এরকম ছবির উৎসব করল কেন? ফিল্ম সোসাইটির উৎসব বলতে মানুষ উন্নত রুচির ক্ল্যাসিকধর্মী ছবি বোঝে, সে কারণে আগ্রহ করে টিকেট কিনতে ভিড় করে। এ ধরণের ছবি দেখিয়ে উৎসব করলে দর্শক এবং ফিল্ম-সোসাইটি সদস্যদের ধোঁকা দেওয়া হয়। এত নিম্নমানের ছবি দেখিয়ে চলচ্চিত্র উৎসব করা হলে কেবল হীনরুচির দর্শকদের ফিল্ম সোসাইটিগুলির পৃষ্ঠ-পোষক হবার আহ্বান জানান হয়।

মাসিক ১০৲ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০৲। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

স্টুডিও খবর

অনল দত্ত পরিচালিত প্রগাতি চিত্রমের 'আবিরে রাঙানো' ছবির সংগীত গ্রহণে মাধবী মুখাজী, সুরকার সত্য দেব চট্টোপাধ্যায় ও পরিচালক অনল দত্ত।

"দুটি মন" ছবির সংগীত গ্রহণ

শ্রীমতী সুপর্ণা সেন প্রযোজিত ও পার্থ বসু পরিচালিত এস এস ফিল্মের "দুটি মন" ছবির গানগুলি সম্প্রতি ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে রেকর্ড করা হয়েছে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানগুলির সংগীত পরিচালক হেমন্ত-কুমার মুখাজীর সুরে কণ্ঠদান করেছেন—মান্না দে, আরতি মুখাজী ও সুরকার হেমন্তকুমার স্বয়ং।

উত্তমকুমার ছবিটিতে দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করছেন। নায়িকাঃ নবাগতা সুপর্ণা সেন। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করছেন—কণিকা মজুমদার, ছায়া দেবী, অসিতবরণ, রবীন ব্যানাজী, সুখেন দাস, পদ্মা দেবী, এন বিশ্বনাথন, মিহির ভট্টাচার্য, শ্যামল ঘোষাল, প্রশান্ত চ্যাটাজী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ও মাঃ পার্থ।

অপ্সরা ফিল্মস পরিবেশিত ছবিটির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

"ত্রিনয়নী মা"

হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত হৃষীকেশ চিত্রমের ভক্তিমূলক ছবি "ত্রিনয়নী মা"-র বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্যে ছবিটির পরিচালক পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে সম্প্রতি রাজগীর রওনা হয়ে গেছেন। সংগীত-বহুল ও ধর্মমূলক "ত্রিনয়নী মা" ছবিতে সুরসৃষ্টি করেছেন—অনিল বাগচী।

শ্যামল গুপ্ত রচিত গানগুলিতে নেপথ্যে কণ্ঠদান করছেন—মান্না দে, সন্ধ্যা মুখাজী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখাজী ও অলক বাগচী।

চরিত্রচিত্রণে আছেন—অসিতবরণ, শরদ-দাস ব্যানাজী, অজিত ব্যানাজী, পদ্মা দেবী, মণি শ্রীমানী, রাজা মুখাজী, শমিতা বিশ্বাস, রঞ্জনী গুপ্তা, শচীন মল্লিক, শৈলজা রায়, আনন্দ মুখাজী, সীমা দেবী, অমরেশ দাস, রূপক মজুমদার ও নবাগতা মঞ্জু দেবী। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করে-ছেন। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে—রামানন্দ সেনগুপ্ত ও অমিয় মুখাজী।

"মৌসুমী মন"

চৌধুরী প্রডাকসন-এর নিবেদন, "মৌসুমী মন" চিত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের দুইখানি গান মান্না দে ও কৃষ্ণ রায়-এর কণ্ঠে অনিল দত্ত'র সুরে টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে ২রা নভেম্বর-এ রেকর্ডিং করা হলো। ইতিপূর্বে এই চিত্রের আরও তিনখানি গান সুবীর সেন, চন্দ্রাণী মুখাজী ও অনিল দত্তর সুরে রেকর্ডিং করা হয়েছে। পরিচালক সমর চৌধুরী এই চিত্রের অপর একটি গান আশা ভোঁশলের কণ্ঠে গান রেকর্ডিং-এর জন্য শীঘ্রই বম্বে রওনা হচ্ছেন। ছবিটি সমাপ্তির পথে।

"আবিরে রাঙানো"

অনল দত্ত পরিচালিত প্রগতি চিত্রমের "আবিরে রাঙানো"র নিয়মিত চিত্রগ্রহণ সুবোধ ব্যানাজীর তত্ত্বাবধানে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ডিসেম্বর-এর প্রথম সপ্তাহে নতুন জুটি সুচন্দ্রা ও অনিল মুখো-পাধ্যায়-কে নিয়ে শুরু হচ্ছে। অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে জ্ঞানেশ মুখো-পাধ্যায়, দেবী গুপ্তা, গীতা দে ও অরুণ মুখোপাধ্যায়-কে দেখা যাবে। প্রযোজনা করছেন নকুলেশ্বর সিংহরায়।

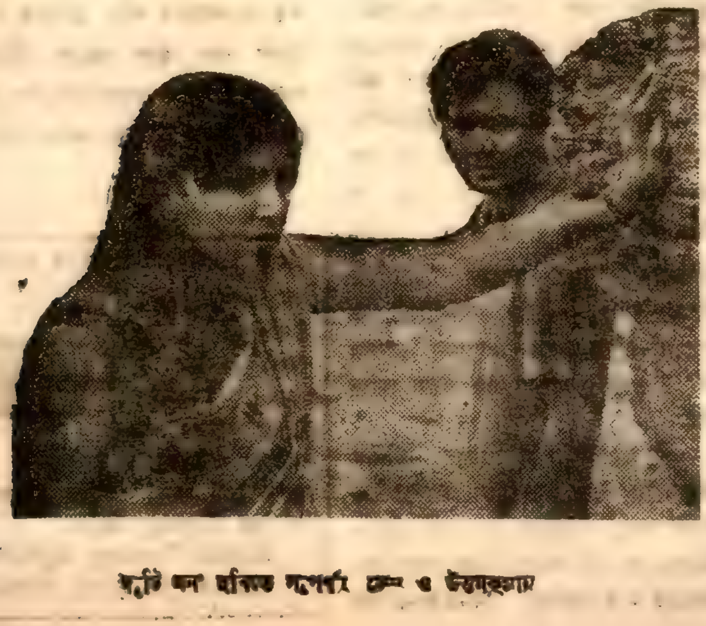

দুটি মন ছবিতে সুপর্ণা সেন ও উত্তমকুমার

সংবাদ কণা

ভারত সম্পর্কিত ইতালীয় ছবি

সম্প্রতি পোল্যাণ্ডের ক্রাকোতে আন্তর্জাতিক স্বল্প-দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে ভারত সম্পর্কে তোলা একটি ইতালীয় ছবি 'বর্তমান বছরে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পুরস্কার পেয়েছে।

ভারতে সোভিয়েত চলচ্চিত্র যন্ত্রপাতি

সোভিয়েত ইউনিয়নের চলচ্চিত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতি এখন থেকে ভারতে পাওয়া যাবে। স্টুডিও যন্ত্রপাতি, ফিল্ম প্রজেক্টর, সিনে-ক্যামেরা ইত্যাদি আমদানীর জন্য সিনে সেলস কর্পোরেশন ও সোভিয়েত বাণিজ্য সংস্থার মধ্যে এক চুক্তি হয়েছে। সোভিয়েত চলচ্চিত্র যন্ত্রপাতি আন্তর্জাতিক মানে তৈরি এবং দামেও সস্তা।

নাটকের পাত্রপাত্রী নির্বাচন

পশ্চিম জার্মানীর একটি গ্রামের নাম ওবেরামেরগাউ। বড়দিনের সময় যীশুর জীবনকাহিনী নিয়ে মুক্তাঙ্গনে নাটকের অভিনয় হয়। নাটকের পাত্রপাত্রী নির্বাচন করেন গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা। এই নির্বাচনে কিছুটা বিশেষত্ব আছে যেমন যীশুমাতা মেরীর ভূমিকা যিনি গ্রহণ করবেন তাঁকে অবিবাহিতা হতে হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোন বদনাম থাকা চলবে না। এবছর সেই ভূমিকার নির্বাচিতা হয়েছেন একুশ বছরের শিক্ষয়িত্রী বিয়াট্রিস লাং আর যীশুর ভূমিকা গ্রহণ করবেন আইনব্যবসায়ী হেলমুট ফিশার। এই নাটক দেখার জন্য বারো লক্ষ লোকের কাছ থেকে অনুরোধ এসেছে কিন্তু টিকিটের সংখ্যা মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ। এ-থেকেই বোঝা যায় কি অসম্ভব জনপ্রিয়তা এই নাটকের।

ওবেরামেরগাউ গ্রামে যীশুর জীবনকাহিনী নাটকে যীশুর ভূমিকায় হেলমুট ফিশার ও মেরীর ভূমিকায় বিয়াট্রিস লাং।

আধুনিক সঙ্গীতশিল্পী সৌরেন পাল

একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

সি পি ডবলিউ ডি এমপ্লয়িজ ইনস্টিটিউট আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা নিজাম প্যালেসস্থিত হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৭ই ও ৮ই অক্টোবর। এই প্রতিযোগিতায় পাঁচটি নাটকের মধ্যে 'বাঁশীপাড়া দিয়ে' প্রথম ও 'জীবন কাহিনী' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

ইউথ পাপেট থিয়েটার

গত ১৬ই নভেম্বর সেন্ট লরেন্স হাই স্কুলে নাচ-গান ও পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে ইউথ পাপেট থিয়েটার বিশ্ব শিশু-দিবস পালন করে। সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ছোট ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বিষয়ে যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল—তার বিজয়ী প্রতিযোগীরা পুরস্কার গ্রহণ করে।

কলকাতার মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর সভাপতির ভাষণে ছোট ছেলেমেয়েদের শিল্পকলা, চারুকলা শিক্ষায় আগ্রহী করার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন—পাঠ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এ সবেরও প্রয়োজনীয়তা আছে; এবং বেশ কয়েক বছর ধরে যে ইউথ পাপেট থিয়েটার এই ধরণের শিক্ষামূলক কাজ করে যাচ্ছেন তার জন্যে এর কর্মীদের সাধুবাদ প্রাপ্য।

বিজয়ী প্রতিযোগীরা তাদের গান শেষ করার পর সঙ্ঘ ভারতীর ছোট সভ্যরা উত্তরবঙ্গের ও বর্মার লোকনৃত্য পরিবেশন করে। কুমারী রত্নার পরিচালনায় এই নাচের আসর জমকালো ছিল—সঙ্গীত পরিচালনাও তার। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সেন্ট লরেন্সের ফাদার ডি'সুজা পুরস্কার বিতরণ করেন, রেক্টার এবং ইউথ পাপেট থিয়েটারের প্রয়াসকে অভিনন্দন জানান।

সঙ্গীতকথা

সঙ্গীতানুষ্ঠান

গত ১৫ই নভেম্বর কালীপূজা উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতাস্থ ভবানীপুরে লুনার ক্লাবের পরিচালনায় এক বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পিবৃন্দের মধ্যে ছিলেনঃ সর্বশ্রী উত্তমকুমার, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরেন পাল, নচিকেতা ঘোষ, কৃষ্ণা রায়, অপু দত্ত, তরুণকুমার, রঞ্জিত পাল, ধীমান সেন, রূপক মজুমদার, মীরা ও বুবাই বিশ্বাস, বনশ্রী সেনগুপ্তা, মূকাভিনেতা শ্রীহিরণ্ময়, অধীর বাগচী পিন্টু ভট্টাচার্য ইত্যাদি।

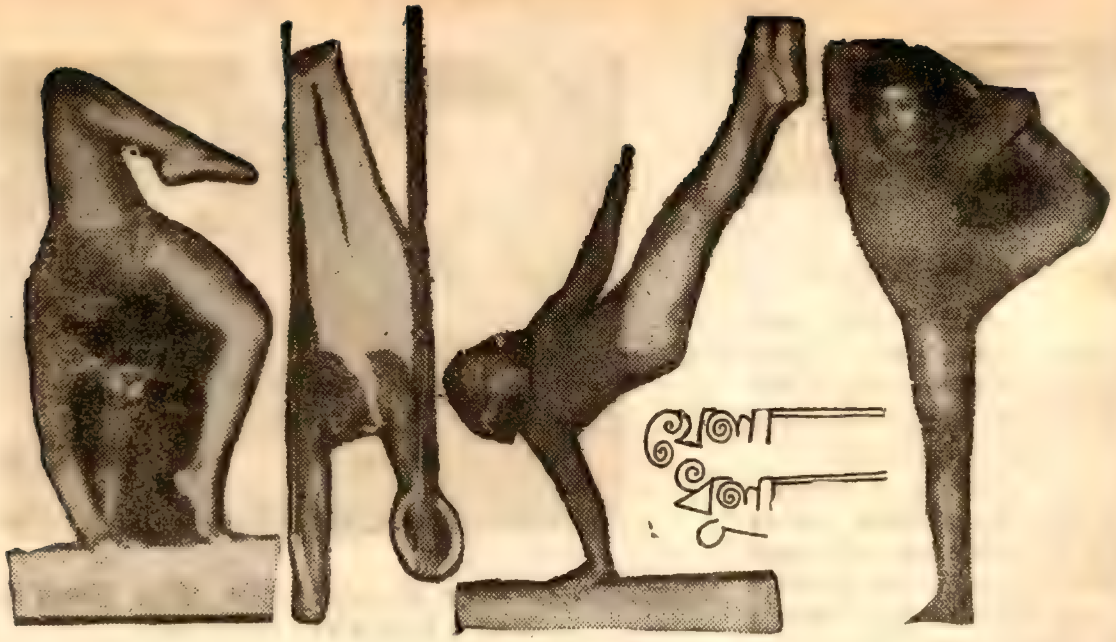

কেন

সংবাদটা শুধুমাত্র অপ্রত্যাশিতই নয়—বেদনাদায়কও বটে। বাংলাদেশের ক্রীড়া রসিকদের অতিবড় আশাকে হতাশায় নিমজ্জিত করে রাশিয়ান ফুটবল দলের কলকাতায় খেলাটা বাতিল হয়ে যাবার খবর দিলেন বাংলাদেশের ফুটবল কর্তৃপক্ষ। রাশিয়ান ফুটবল দল ভারতে আসবে। খেলবেও বেশ কয়েকটি জায়গায়। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতার মাঠগুলো এবার তাদের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠবে না। বাংলাদেশের খেলোয়াড় আর রসিক দর্শকরা এবার বঞ্চিত হচ্ছেন রাশিয়ান খেলোয়াড়দের সাবলীল ক্রীড়া-ভঙ্গিমার কসরৎ দেখার সুযোগ থেকে। অথচ এই সুযোগের আশায় একটি একটি করে দিন গুণছিলেন বাংলাদেশের ফুটবলরসিকরা। ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে কলকাতায় এই ফুটবল খেলার আসরটা বসার কথা ছিল। কলকাতায় এই খেলার জন্যে রাজ্য সরকারের ক্রীড়াবিভাগের কাছে আই· এফ· এ'র সম্পাদক তিনখানি চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের ক্রীড়াদপ্তর থেকে কোন উত্তর দেওয়া হয় নি। কারণ অতো তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়া নাকি সম্ভব নয়। ফলে একরকম বাধ্য হয়েই নাকি আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষ কলকাতায় রাশিয়ান ফুটবল দলের খেলাটা বাতিল করে দিয়েছেন। আর এই দোষটা তাঁরা চাপিয়েছেন ক্রীড়াদপ্তরের ওপর। পরে আবার এই ব্যাপারে ক্রীড়াদপ্তর দোষ দিয়েছেন আই· এফ· এ·-কে সরকারী প্রেস নোটের মাধ্যমে।

আমরা বাংলাদেশের সাধারণ ক্রীড়ারসিকরা রাজ্য সরকারের ক্রীড়াদপ্তরের এই অহেতুক নীরবতার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। যুক্তফ্রন্ট সরকার বাংলাদেশের খেলাধুলোকে যথেষ্ট মূল্য দেন বলেই তাঁরা ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করেছিলেন। বাংলাদেশের ক্রীড়ারসিকরা খেলাধুলোর ঐ মর্যাদার জন্যে শুধুমাত্র আনন্দিতই হন নি—আশা করেছিলেন আরো অনেক কিছুই। কিন্তু আজ তাঁদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আজ তাঁরা ভাবছেন যে, ক্রীড়া-মন্ত্রীর দরকার নেই—যেমন ছিল আগে তেমনি থাকুক। অবশ্য যদি নরম-গরম বাণী দেবার জন্যেই মন্ত্রীমশাই দপ্তর খুলে বসে থাকেন তাহলে বলার কিছু নেই। কিন্তু জল এখন অনেক ঘোলা হয়েছে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি খেলায় 'আর সি' সইকরা স্লিপের কাহিনীর কথা এখন সকলেই জেনে গেছেন। ইডেনে টেস্টের সময়ও কি 'আর সি' স্লিপ বাজার গরম করবে? সে দূরের কথা—এখন না হয় থাক। আমরা শুধু জানতে চাই যে, কি এমন কারণ ঘটেছে যার জন্যে রাশিয়ান ফুটবল দলের কলকাতায় খেলার ব্যবস্থার অনুমতি যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্রীড়াদপ্তর দিতে পারলেন না? আমরা চাই ক্রীড়ামন্ত্রী নিজে এই বিষয়ে তাঁর যা বলার আছে তা বাংলাদেশের ক্রীড়ারসিকদের জানিয়ে দিন। নাকি এর ভেতরেও একটা কিছু ব্যাপার আছে। —শান্তিপ্রিয় ॥

[ফটোঃ সুধীর মল্লিক]

ক্রিকেটের খবর

প্রথম টেস্টে পরাজয়ের পরেও ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী পুরোপুরিভাবে জোর দিয়েছিলেন নতুন খেলোয়াড়দের দলে নেবার ব্যাপারে। আর তাঁদের সেই জোর দেওয়া যে অংশত সফল হয়েছে তার প্রমাণ হলো কানপুরের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ভারতের নতুন ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং।

তবে তার চেয়ে অনেক বড় কথা হলো যে, অনেকদিন পরে ভারত বোধহয় খুঁজে পেলো একজন সত্যিকারের ভালো ওপনিং ব্যাটসম্যান। আর যাই হোক, কানপুর টেস্টে দু' ইনিংসেই ভারতের তরুণ খেলোয়াড় অশোক মানকাদ যে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছেন তার তুলনা মেলা ভার।

দিল্লীর অশোক গান্দোত্রা একদম সুবিধে করতে না পারলেও সোলকার নিজের যোগ্যতা পুরোপুরিভাবে প্রমাণ করেছেন। মহীশূরের ২১ বছরের ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও লেগ ব্রেক বোলার প্রথম ইনিংসে শূন্য করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি মন মাতানো ব্যাটিং করে তাঁর দলভুক্তির যৌক্তিকতা ভালভাবে প্রমাণ করেছেন।

জি· আর বিশ্বনাথ ১৯৬৭ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে সর্বপ্রথম মহীশূরের পক্ষে রনজি ট্রফির খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েই অন্ধ্রের বিরুদ্ধে করেছিলেন ২৩০ রান। তার পর থেকেই বিশ্বনাথ ক্রিকেটরসিকদের কাছে মোটামুটিভাবে পরিচিত ছিলেন।

॥ সোলকার ॥

বিশ্বনাথ তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট খেলাতেই সেঞ্চুরী করেছেন। অসীম ধৈর্য এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে শত রানের দিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন সোলকারই।

দ্বিতীয় টেস্টে নতুন খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র গান্দোত্রা ছাড়া আর সকলেই ভালো খেলেছেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে সিলেকশান কমিটির মনোনয়ন সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু এর আরো একটা দিক আছে। আমাদের নতুন খেলোয়াড়রা কিন্তু বয়সের দিক দিয়ে কেউই খুব একটা কম যান না। সবাই কুড়ির ওপরে। সে কথা যাক। আমাদের এই তরুণ ব্যাটসম্যানরা যদি দাঁড়িয়ে যেতে পারেন তাহলে বেশ কিছুদিনের জন্যে অন্তত ভারত নিশ্চিন্ত। তবে তিরিশ বছরের জয়সীমা, উনত্রিশ বছরের সারদেশাই, তেত্রিশ বছরের সুর্তি ও সাতাশ বছরের আবিদ আলী কিম্বা চব্বিশ বছরের চন্দ্রশেখরের কথা একেবারে ভুলে যাওয়াও কি ঠিক?

॥ পাতৌদি ॥

বাকী তিনটি টেস্টেও ভারতীয় দল পরিচালনার ভার পড়েছে পাতৌদির ওপরেই।

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ চলার সময়ই ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বাকী তিনটি টেস্টে পাতৌদিকেই ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত করেছেন। এ মনোনয়ন প্রত্যাশিত। কারণ সত্যি কথা বলতে কি, পাতৌদি ছাড়া ভারতীয় দল পরিচালনা করার মতো যোগ্য এবং অভিজ্ঞ আর কোন খেলোয়াড় আছেন বলে মনে হয় না। পাতৌদির কর্ম নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন বলেই পাতৌদিকে প্রথম দু'টি টেস্টের জন্যে অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়েছিল। এর পেছনে বোধহয় যুক্তি ছিল যে, প্রথম দু'টি টেস্টে পাতৌদি যদি ভালো না খেলতে পারেন তাহলে তাঁকে বসিয়ে তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে দেওয়া হবে দল পরিচালনার ভার। এ বিষয়ে কেউ কেউ ওয়াদেকারের নামও প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু ওয়াদেকারের সাম্প্রতিক খেলার ধারা দেখে সে প্রস্তাব তো ধোপে টেঁকে না। তা ছাড়া বয়সের হিসেবেও ওয়াদেকার পাতৌদির চেয়ে ন' মাসের বড়। সুতরাং...। যাই হোক পাতৌদি যে শেষ পর্যন্ত নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেই বাকী টেস্ট তিনটিতে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন এই জন্যে আমরা আনন্দিত।

যাই হোক, ইঞ্জিনিয়ার ৭৭, অশোক মানকাদ ৬৪, সোলকার ৪৪ ও পাতৌদি ৩৮ রান করায় ভারত প্রথম ইনিংসে ৩২০ রান করে। কনোলী ৯১ রানে ৪টি ও ম্যালেট ৫৮ রানে ৩টি উইকেট লাভ করেন।

এর উত্তরে অস্ট্রেলিয়া ৩৪৮ রান করে। এর মধ্যে শিহানের ১১৪, রেডপাথের ৭০ আর ওয়ালটারসের ৫৩ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিং-এ ভেঙ্কটরাঘবন ৭৩ রানে ৩টি, সুব্রত গুহ ৫৪ রানে ২টি ও প্রসন্ন ৭১ রানের বিনিময়ে পান ২টি উইকেট।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস—তরুণ খেলোয়াড় জি বিশ্বনাথ, একনাগ

[শেষাংশ ১৪০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

॥ মানকাদ ॥

মনে হচ্ছে অনেক দিন পরে ভারত খুঁজে পেলো সত্যিকারের একজন ওপনিং ব্যাটসম্যানকে। অশোক মানকাদের মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা অনেকের চেয়ে বোধহয় বেশি।

সাইকেলে দেওঘর

দীপঙ্কর আঢ্য

[সাইকেলে ভ্রমণ এখন বেড়েই চলেছে। রোমাঞ্চকর এই অভিযানের নেশায় আজকাল অনেকেই মত্ত। পত্রিকায় সাইকেলে ভ্রমণের বিবরণ প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু কিভাবে তাঁরা যান তা আমাদের অজানা। দীপঙ্কর আঢ্য সাইকেল অভিযানের অন্যতম নায়ক। তিনি নিজেই লিখেছেন এই পথ চলতি দিনলিপির বিবরণ সাপ্তাহিক বসুমতী পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে। আশা করি নতুন ধরণের এই লেখাটা সকলের ভালো লাগবে। —ক্রীড়া সম্পাদক]

গত মে মাসে সাইকেলে করে দার্জিলিং ও কালিম্পং সহ উত্তর বাংলার নানা জায়গা ঘুরে আসার পর এতদিন আর কোথাও যাওয়া হয় নি। পুজোর পরেই মনে মনে ঠিক করলাম আমার সবচেয়ে বন্ধু, আমার সুন্দর সবুজ রঙের সাইকেলটাকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে পড়ব। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সাউথ ক্যালকাটা সাইক্লিং ক্লাব-এর আমাকে দেওয়া বিরাট 'রোড ম্যাপ অফ ইণ্ডিয়া'টা খুলে বসলাম আর ঠিক করলাম যে এবার 'দেওঘর' যাব।

আর একদিনও দেরি না করে পরের দিন অর্থাৎ সোমবার (৩-১১-৬৯) ভোর পাঁচটার সময় তিরিশটা টাকা, সাইকেল-এর জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমার গন্তব্যস্থলের দিকে। কিছুক্ষণ পরেই পেরিয়ে এলাম 'হাওড়া'। সবে দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। কিছুটা এগিয়েই ধরলাম গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। এর পাথুরে ইটের রাস্তায় সাইকেল চালানো বেশ কষ্টকর। এইভাবেই শ্রীরামপুর পেরিয়ে চন্দননগরে এসে পড়লাম। এখানে সামান্য কিছু জলযোগ সেরে ও ক্যামেরার জন্য দু' রীল ফ্লিম কিনে নিয়ে আবার উঠে বসলাম সাইকেলে। এবার এগিয়ে চললাম 'পাণ্ডুয়া'র দিকে। মাঝে যাত্রাপথে পড়ে "মগরা"। এরপর বেলা ১১টার সময় 'পাণ্ডুয়া' পেঁৗছলাম। এখানে রাস্তার ধারে একটা পাঞ্জাবী হোটেলে সকালের খাওয়া সেরে নিয়ে ও একটু বিশ্রাম করে আবার রওনা হলাম। বেলা সাড়ে তিনটের সময় পেঁৗছলাম 'বর্ধমান'। তারপর 'বর্ধমান' শহরটা ঘুরে দেখে ওখান থেকে তিন কিলো মিটার দূরে 'কেশবগঞ্জ' বলে একটা জায়গায় পেঁৗছলাম এবং ওখানকার থানায় রাতটা কাটিয়ে পরের দিন, অর্থাৎ মঙ্গলবার (৪-১১-৬৯) ভোর সাড়ে চারটের সময় রওনা হলাম 'শান্তিনিকেতনে'র দিকে।

এবার আমাকে জি টি রোড ছেড়ে সিউড়ী রোড ধরতে হল। সিউড়ী রোডে ঢোকার মুখেই বর্ধমানের মহারাণীর দানে তৈরি করা একশো-আট শিবের মন্দির পড়ে। মন্দির দেখে রওনা হলাম গুসকরা'র দিকে। মাঝে গুসকরা থেকে ১০ মাইল আগে 'নতুন গ্রাম' বলে একটা জায়গায় সকালের চা খেয়ে নিলাম। এর পর নানারকম রাস্তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে 'গুসকরা', 'ভেদুয়া' হয়ে 'বোলপুর' পেঁৗছলাম। ওখান থেকে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন ঘুরে সিউড়ীর দিকে এগোলাম। যখন 'সিউড়ী' পেঁৗছলাম, তখন বিকেল পাঁচটা।

সিউড়ীতে না থেমেই চলতে লাগলাম 'বক্রেশ্বরে'র দিকে। বক্রেশ্বরে পেঁৗছে একটা মিষ্টির দোকানে কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন অর্থাৎ বুধবার (৫-১১-৬৯) ভোরবেলা বিখ্যাত উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান সেরে ও বাবা বক্রনাথের মন্দির দর্শন করে আবার রওনা হলাম 'মাসাঞ্জোর' ড্যাম দেখার আশায়। অনেকক্ষণ একটানা সাইকেল চালিয়ে এসে পেঁৗছলাম মাসাঞ্জোরে।—ভারি সুন্দর এই জায়গাটা, এই মাসাঞ্জোরেই সকালের খাওয়া সেরে নিয়ে ও কিছুটা বিশ্রাম করে বেলা প্রায় একটা তিরিশ মিনিট নাগাদ আবার রওনা হলাম 'দুমকা'র দিকে। কিছুটা পাহাড় ও উপত্যকাময় অঞ্চল পেরিয়ে দুপুর সাড়ে তিনটের সময় 'দুমকা' পেঁৗছলাম। এখানকার থানায় একটু দেখা করেই রওনা হলাম 'দেওঘরে'র দিকে। তারপর প্রচণ্ড গতিতে সাইকেল চালিয়ে 'হাঁসডিয়া' পেরিয়ে যখন 'দেওঘর' পেঁৗছলাম, তখন ঘড়িতে রাত প্রায় ন'টা।

পরের দিনই (৬-১১-৬৯) দেওঘর থেকে ঠিক দুপুর দুটোর সময় রওনা হলাম মধুপুরের দিকে। পথে পড়ল গোটা তিনেক প্রায়-শুকিয়ে-যাওয়া নদী আর কতকগুলো সাঁওতালদের গ্রাম। সাইকেল কাঁধে নিয়ে নদীগুলো পেরিয়ে আর সাঁওতালদের গ্রাম দেখতে দেখতে মধুপুরে পেঁৗছে গেলাম। এখানকার থানায় রাতটা কাটিয়ে পরের দিন অর্থাৎ শুক্রবার (৭-১১-৬৯) ভোর বেলায় আবার রওনা হলাম।

মধুপুর থেকে বেরিয়ে 'রঙসিসা' হয়ে এলাম 'কাঁরোর'। মাঝে বেশ কিছুটা জঙ্গল আর একটা নদী পড়ে। কাঁরোর থেকে 'কার্মাটা' হয়ে 'জামতাড়া' পেঁৗছলাম। জামতাড়ায় কিছু জলযোগ সেরে আবার এগিয়ে চললাম চিত্তরঞ্জনের দিকে। তারপর চিত্তরঞ্জন হয়ে আসানসোল পেঁৗছলাম—দুপুর তখন দুটো বাজে। আবার শুরু হলো যাত্রা। এবার চললাম দুর্গাপুরের দিকে। পথে পড়ে রাণীগঞ্জ,—কয়লাখনির রাজ্য। দুর্গাপুরে পেঁৗছলাম বিকেল চারটের সময়। দুর্গাপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে রাত্রিটা কাটিয়ে পরের দিন অর্থাৎ শনিবার (৮-১১-৬৯) সকাল ছ'টার সময় কলকাতার দিকে রওনা হলাম।

পানাগড় পেরিয়ে যখন বর্ধমানে এসে পেঁৗছলাম, তখন বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। বর্ধমানে সকালের খাওয়া সেরে নিয়ে আবার রওনা হলাম।...তারপর এল দুপুর, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে হল,—সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুও আস্তে আস্তে পশ্চিম দিগন্তের কোলে মিলিয়ে গেল। একটানা এগিয়ে চলেছি।

—তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার আশায় আমি আরো জোরে এগিয়ে চলেছি। চন্দননগর পেরিয়ে যখন হাওড়া পেঁৗছলাম তখন রাত আটটা বেজে গেছে। এর পর ধরলাম বাড়ির পথ,—যখন বাড়ি ফিরলাম তখন ঘড়িতে ঠিক রাত ন'টা।

চুম্বক

১৯৪৩-৪৪ সালে অবশিষ্ট ও হিন্দু দলের এক প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় হিন্দু দল দ্বিতীয় দফায় ৩৮৭ রান করে। এর মধ্যে বিজয় হাজারে একাই ৩০৯ রান করেন। বিজয় হাজারে দলের শেষ ব্যাটসম্যান হিসাবে আউট হন। তিনি মোট ৪১০ মিনিট উইকেটে থেকে একটি ওভার বাউন্ডারী ও ৩১টি বাউন্ডারী সমেত ৩০৯ রান করেন। দলীয় রানের শতকরা ৭৯.৮ ভাগ রান তাঁর একার। একচেটিয়া রান করার এটিই সর্বোচ্চ নিদর্শন।

* * *

১৯৩২ সালে এসেক্স ও ইয়র্কশায়ারের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় ইয়র্কশায়ার প্রথম ইনিংসে এক উইকেটে ৫৫৫ রান করে। এর মধ্যে হারবার্ট সাটক্লিফ ৩১৩ রান করেছিলেন। এর পর এসেক্স দলের প্রথম ইনিংস ৭৮ রানে শেষ হয়ে যায় এবং ফলোঅনের আওতার মধ্যে পড়ে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৪ রানে শেষ হয়ে যায়। এসেক্স দল এক ইনিংস ও ৩১৩ রানে হেরে যায় এবং সাটক্লিফের রানও ৩১৩ রান, কি অদ্ভুত মিল।

—হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র

[প্রশ্নোত্তরের শেষাংশ]

অনিলচন্দ্র দাস, সুধীর গুহরায় ও বিপ্লব মিত্র (হালিশহর, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন—কলকাতার মাঠে বর্তমানে শ্রেষ্ঠ সেন্টার ফরোয়ার্ড, শ্রেষ্ঠ স্টপার ও শ্রেষ্ঠ গোলকীপার কে কে?

উত্তর—আপনারাই ঠিক করে জানান না।

প্রদীপ বিশ্বাস (গুরুমা টি এস্টেট, গুরুমা, দার্জিলিং)

প্রশ্ন—সুব্রত মুখার্জী কাপের খেলায় এমন কি কোন রুল আছে যে, কোন খেলোয়াড় কেটস্ পরে খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না?

উত্তর—আমি ঠিক জানি না। কেউ জানলে যদি জানান তাহলে জানিয়ে দেবো।

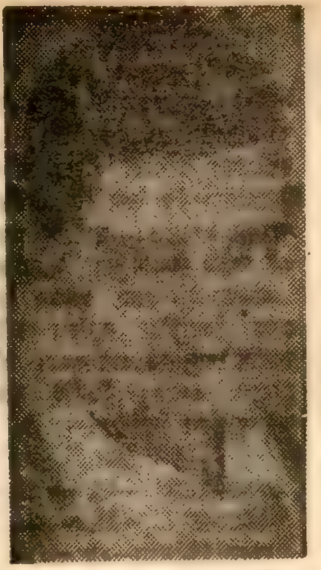

পরিচীয়তে

খেলতে নেমেই দর্শক, খেলোয়াড় আর কর্মকর্তাদের মন জয় করে নেবার ক্ষমতা মহীশূরের তরুণ অ্যাসাউন্সার জি. আর. বিশ্বনাথের এক কথায় অসীম। কানপুর টেস্টের চতুর্থ আর পঞ্চম দিনটা ছিলো বিশ্বনাথেরই দিন। সেই দুদিনে বিশ্বনাথের হাতের ব্যাট ঘুরেছিল এ্যারোপ্লেনের প্রপেলারের মতো।

বাউন্ডারীর পর বাউন্ডারী। অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডাররা হিমসিম খেয়ে গেলেন জীবনের প্রথম টেস্টে খেলতে নেমে এক তরুণের উদ্যাম ব্যাটিং-এর বহর দেখে। চতুর্থ দিন খেলার শেষে বিশ্বনাথ ৬৯ রান করে থাকলেন অপরাজিত। এর মধ্যে ৬০ রানই এসেছে (১৫টি) বাউন্ডারীর মধ্যে থেকে।

এই প্রথম নয়। দু' বছর আগে ১৯৬৭ সালে, বয়েস যখন মাত্র ১৯ তখন বিশ্বনাথ মহীশূরের পক্ষে রনজি ট্রফির খেলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেলেন। অন্ধ্রের বিরুদ্ধে সেই খেলায় বিশ্বনাথ শুধুমাত্র সেঞ্চুরীই করলেন না, করলেন ২৩০ রান।

বিশ্বনাথের স্বভাবই ঐ। তিনি আসেন, তিনি খেলেন, তিনি জয় করেন। তাই কানপুর টেস্টের প্রথম ইনিংসে বিশ্বনাথ যখন শূন্য রানে আউট হয়ে গেলেন তখন মহীশূরের ক্রিকেটরসিকদের মন রীতিমত খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

তাঁরা তাই অপেক্ষা করেছিলেন দ্বিতীয় ইনিংসের জন্যে। আশায় তাঁরা বুক বেঁধেছিলেন। তাঁদের সে আশা পূর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নেমেই বিশ্বনাথ শুরু করলেন তাঁর চিরকালের মন-জয়-করে নেওয়া খেলা। রান উঠতে লাগলো একের পর এক—বাউন্ডারী হতে লাগলো একটির পর একটি।

অথচ বিশ্বনাথের অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত! বয়েস মাত্র একুশ। খেলেছেন মাত্র কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর খেলা। আর এই বছরই তিনি দলীপ ট্রফির খেলায় সাউথ জোনের পক্ষে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন।

অভিজ্ঞতার বদলে বিশ্বনাথের আছে গভীর আত্মবিশ্বাস। আর সেই আত্মবিশ্বাসই বিশ্বনাথকে টেস্ট খেলোয়াড় জীবনের প্রথমটিতেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দিলো।

• ২০শে নভেম্বর বেলা ঠিক বারোটা তিন মিনিটের সময় কনোলীর বল মিড উইকেট বাউন্ডারীতে পাঠিয়ে প্রথম আবির্ভাবে শতরান লাভের সম্মান লাভ করেন।

বিশ্বনাথের আগে যাঁরা ভারতের পক্ষে টেস্ট খেলায় প্রথম আবির্ভাবেই শতরান করেছেন তাঁরা হলেন ঃ

১১৮ রান লালা অমরনাথ—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে (বম্বে) ১৯৩৩-৩৪,
১১০ রান দীপক সোধন—পাকিস্তানের বিরুদ্ধে (কলকাতা) ১৯৫২-৫৩,
১০০* রান কৃপাল সিং—নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে (হায়দ্রাবাদ) ১৯৫৫-৫৬,
১১২ রান আব্বাস আলী বেগ—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে (ম্যানচেস্টার) ১৯৫৯,
১০৫ রান হনুমন্ত সিং—ইলণ্ডের বিরুদ্ধে (দিল্লী) ১৯৬৩-৬৪।

প্রশ্ন উত্তর

মৃদুলকান্তি দে (গোহাটি-১১)

উত্তর—আপনি সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রশ্ন-উত্তর বিভাগটা বন্ধ করে দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু আমরা প্রতিদিন যে অসংখ্য চিঠি পাই তার মধ্যে এতদিনে একমাত্র আপনার চিঠিটির দাবি হচ্ছে প্রশ্ন-উত্তর বিভাগটা বন্ধ করে অন্য কোন বিভাগ চালু করতে চাওয়ার। আমরা তাই এই ব্যাপারে পাঠক-পাঠিকাদের মতামত জানতে চাই।

আপনি ভারতের উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা জানতে চান। কিন্তু খেলাধুলোর বিষয়ে একমাত্র হকি ছাড়া আর কোন উজ্জ্বল অধ্যায় আছে কি? অন্তত বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে তাল দিয়ে আমরা কবে চলতে পেরেছি—আপনিই বলুন। যাই হোক সাপ্তাহিক বসুমতীর খেলাধুলো বিভাগটা আরো ভালো করার জন্যে আপনার মতামত যদি জানান, তাহলে আমরা খুশি হবো।

কাজলকুমার পান (দিগপার, বাঁকুড়া)

উত্তর—মারডেকা ফুটবলে বিজয়ী দেশের কথা না লিখে এখন নিজেরাই না হয় লজ্জার হাত থেকে বাঁচলাম। পরে আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন। সন্তোষ ট্রফিতে বিজয়ী রাজ্যের নাম জানাতে অনেক জায়গা লাগবে যে। সময়মতো প্রকাশ করা হবে গত ২৬ বছরের বিজয়ী রাজ্যগুলোর নাম।

প্রেস নোট

রাশিয়ান ফুটবল দলের কলকাতার খেলাটি বাতিল করা হয়েছে সরকারী অনুমোদন না পাওয়ার জন্য—এই সং বা দ টি র প্রতিবাদ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক প্রেস নোটে বলা হয়েছে যে, সরকারী অনুমোদন না পাওয়ার জন্যে রাশিয়ান দলের খেলা বাতিল হয়ে যাওয়ার সংবাদটা ঠিক নয়। ১৮ই নভেম্বর আই• এফ• এ'র পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত সেই দিনের মধ্যেই জানানোর জন্যে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ঐ চিঠিতে এ কথা বলা হয় নি যে, ঐ দিনই সন্ধ্যের মধ্যে সরকারী অনুমোদনের সংবাদ না জানালে রাশিয়ান দলের খেলা বাতিল করে দেওয়া হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এই খেলাটি বাতিল হয়ে যাবার জন্যে সরকার কোনমতেই দায়ী নন।

ক্রীড়া সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়, বর্তমান সংখ্যার (২০ সংখ্যা) সাপ্তাহিক বসুমতীতে আপনার বিভাগে প্রকাশিত 'চয়ন দত্তরায়ের' প্রশ্নের উত্তরে আপনি লিখেছেন—উক্ত তথ্য কারো জানা থাকলে জানাতে। তাই আপনাকে এই পত্রের মাধ্যমে তা জানাচ্ছি:

হাওড়া ইউনিয়ন ১৯৬২ সালে প্রথম বিভাগীয় ফুটবল লীগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। লীগ টেবলে ওপরের তিনটি দলের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ—

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বগোল	বিঃগোল	পয়েন্ট
মোহনবাগান	২৮	১৬	৮	৪	৪৭	১৮	৪০
ইস্টবেঙ্গল	২৮	১৪	১২	২	২৬	৭	৪০
হাওড়া ইউনিয়ন	২৮	১২	৭	৯	২৭	২১	৩১

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট সমান থাকায় চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলায় মোহনবাগান ২—০ গোলে জয়ী হয়ে লীগ বিজয়ী হয়।

* * *

আপনার পত্রিকার ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত পবিত্র সমাদ্দারের 'চুম্বকটি' দেখলাম। তিনি লিখেছেন, 'সে এক বিস্ময়কর জয়...। সে জয় অসীম গৌরবের, দারুণ গর্বের।' পাঠকসাধারণ হয়তো তাঁর এ লেখা পড়ে অবাক হয়ে গেছেন। ১৯৩৮ সালের অস্ট্রেলিয়া দল বেশ শক্তিশালী, দলে ব্রাডম্যান, ফিঙ্গলেটন, বারনেস, হ্যাসেট প্রমুখের মত ব্যাটস্‌ম্যান থাকা সত্ত্বেও এত বিরাট রানে হার অকল্পনীয়। উপরন্তু, যে টেস্টে (পঞ্চম টেস্ট) পরাজয় তার আগে পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ১—০ ম্যাচে অগ্রগামী। তা হলে নিশ্চয়ই এ হারের পেছনে গুরুতর কারণ ছিল—এ সিদ্ধান্তে আসা যায়, তাই না? হ্যাঁ, ঐ ম্যাচে ব্রাডম্যান এবং ফিঙ্গলেটন দুই ইনিংসের কোন ইনিংসেই অসুস্থতা হেতু খেলতে পারেন নি। তাই অস্ট্রেলিয়াকে নয়জনে দু' ইনিংসে ব্যাট করতে হয়েছে। যার ফলে তাদের রান সংখ্যা হয়েছিল, ২০১ ও ১২৩ মাত্র, ইংল্যান্ডের ৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৯০৩ রানের প্রত্যুত্তরে।

তাই ইংল্যান্ডের জয় মোটেই গৌরবের জয় নয়, এক দুর্বল প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করেছে। যেমন যে কোন কুস্তিগীরের কাছে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত লোকের লড়াইয়ে নাস্তানাবুদ হওয়া।

সুতরাং, পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য, অস্ট্রেলিয়ার এই শোচনীয় হারের কারণটি আপনি দয়া করে ছাপিয়ে দেবেন।

—সুব্রত দত্ত
বারাসত।

[১৪০৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সোলকার আর অশোক মানকাদের ব্যাটিং-এ উজ্জ্বল।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ৭টি উইকেট হারিয়ে ৩১২ রান করে। বিশ্বনাথ ১৩৭ রান করে শেষ পর্যন্ত আউট হয়ে যান। অশোক মানকাদ করেন ৬৮ ও সোলকার করেন ৩৫ রান।

বাকী সময়ে অস্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না হারিয়ে ৯৫ রান করে। লরী ৫৬ ও স্টকপোল ৩৭ রান করে অপরাজিত থাকেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

ালিদাস গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
ালিদাস গ্রন্থাবলী—	২য়	৬-০০
ালিদাস গ্রন্থাবলী—	৩য়	৮-০০
াইকেল গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-৫০
াইকেল গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-৫০
াঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—	১ম	৩-০০
" "	২য়	"
" "	৩য়	"
াঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)	১ম	৩-০০
" "	২য়	৩-০০
" "	৩য়	৩-০০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
" "	২য়	৬-০০
" "	৩য়	৮-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
ীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	১ম	৪-০০
ীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
ানিক গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
ানিক গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
ামোদর গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-৩০
" "	২য়	৪-০০
ামোদর গ্রন্থাবলী—	৪র্থ	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	২য়	৪-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	৩য়	৪-০০
যাগেশ গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
যাগেশ গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
বিহারীলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
লাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী—		৩-০০
রপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী—		৫-০০
ট গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
ট গ্রন্থাবলী—	৩য়	৩-০০
পেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ে গ্রন্থা:—		৪-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী— ২য়	৪-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী—	৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ১ম	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ২য়	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা: ১ম	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:— ২য়	৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী—	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ১ম	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৩য়	৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৪র্থ	৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী—	৪-০০
" " " —২য়	৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—	৬-০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী—	৪-০০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:—২য় ভাগ	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৩য়	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—৫ম	৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—	৫-০০
কথাসরিৎসাগর—১ম ভাগ	৪-০০
" —২য় ভাগ	৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী— ১ম, ২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড	৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড—	৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী—২য়	৪-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—	৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা—২য় ভাগ	৫-০০
অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী—২য়	৩-০০
" " " —৩য়	৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী—	৩-০০
নবীন সেনের গ্রন্থাবলী—	৭-০০

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস —২য় ভাগ	৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থা:—১ম	১০-০০
অরুণ বহ্নি—	৪-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী—	৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর—	৩-৫০
পরলোক—	৪-৫০
পরলোক রহস্য—	২-২৫
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব—	৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়—	১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা—	৩-০০
ভারত প্রতিভা—	৫-০০
প্রতাপাদিত্য—	৩-০০
সাধক কমলাকান্ত—	২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার—	৩-০০
নানার মা—	৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ—	৩-০০
বিক্রমাদিত্য—	৩-০০
বিসমার্ক—	২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী	৩-০০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—	২-০০
মাধবী কঙ্কণ—	২-০০
শিবরাম গ্রন্থাবলী—	৪-০০
বিবরণ প্রশ্নের সংগ্রহ— ১ম	৪-০০
যৌন-মনোদর্পণ	
৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ	৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া	৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ত-কালিকত্বের ব্যাপারসমূহ	৪-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—১ম	৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবী গ্রন্থাবলী—২য়	৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী—	৮-০০
ANANDAMATH (শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)	৪-০০
DAVID HARE	৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

Thursday, 27th November, 1969 SAPTAHIK BASUMATI REGD. No. C 71
PRICE : 30 Paise GRAM : "BASUMATI" PHONE : 34—7771, 72, 73, 74

10 DEC 1969

সাপ্তাহিক বসুমতী

"মুখ্যমন্ত্রীর সত্যাগ্রহই আমাদের বিবেচ্য, কেন না সাধারণ দলনেতার থেকে তাঁর পার্থক্য অনেক। তাঁর কণ্ঠস্বরকে দলীয় নেতার চাতুর্য-পূর্ণ সংলাপের কিছুটা ঊর্ধ্বে সংগতভাবেই স্থান দেওয়া উচিত বলেই আমরা মনে করি। সব কথা ছেড়ে দিলেও, এমন কি মুখ্যমন্ত্রীর অনশন-সত্যাগ্রহ করা উচিত নয় একথা মেনে নিলেও, যে কারণগুলি তাঁকে এই পথে টেনে এনেছে, সেগুলিকে তো সব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

৭৪ বর্ষ: ২৩শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 23, 4th Dec., 1

শীতে
প্রতিদিন
বোরোলীন
ব্যবহার করুন
আপনার শুষ্ক ও বিদীর্ণ ত্বকের অস্বস্তি দূর করে
এই অ্যান্টিসেপটিক সুরভিত ক্রীম।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৪১১
আজকের মানুষ		১৪১২
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১৪১৩
বঙ্গদর্শন		১৪১৭
ভারতদর্শন		১৪২০
আন্তর্জাতিক		১৪২২
সপ্তাহের বোকা	— কৃত্তিবাস ওঝা	১৪২৪
স্বাস্থ্য বিভাগের প্রমোশন রহস্য	— সুনীল ঘোষ	১৪২৬
মুখ্যমন্ত্রী সরকার সমীপেষু	— শ্রীসর্বদর্শী	১৪৩০
গ্রন্থমেলা		১৪৩১
পশ্চিমবঙ্গ ঃ সাম্প্রতিক পরিস্থিতি		১৪৩২

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান
ফোন ঃ ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এ. সরকার এণ্ড সন্স

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	১৪৩৬
আইকম্যান	...	১৪৩৯
চাঁদ-সংবাদ	— বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১৪৪১
ফসলের ফরমান	— জীবন দে	১৪৪৫
সাগর সংগমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	১৪৪৭
সেতু (গল্প)	— গোপাল সামন্ত	১৪৫১
অন্য গ্রাম অন্য তরংগ	— সমীর মুখোপাধ্যায়	১৪৫৬
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	— শিলাজি	১৪৬১
রঙ্গজগৎ	...	১৪৬৪
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	১৪৬৮

প্রচ্ছদ-চিত্র : ধীরেন অধিকারী

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে ।।—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। ... এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরণের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। ... বায়রণের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। ... নবীনবাবুর যখন স্বদেশ বাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাকবি

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ।। কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮ ।। মূল্য মাত্র সাত টাকা।

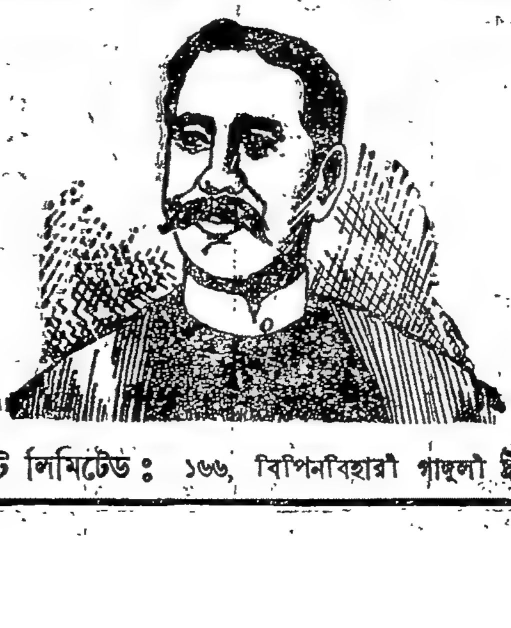

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CENTRAL LIBRARY
UNIVERSITY

৭৪ বর্ষ ঃ ২৩শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ | Thursday, 4th December, 1969

সংসদে সদস্যদের মাতৃভাষায় বক্তৃতা করার অধিকার

রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সাফ জানানো হয়েছে যে, সদস্যদের মাতৃভাষায় বক্তৃতা দানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

উপরি উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে কিছুটা অসুবিধা আছে, আমরা তা স্বীকার করি। অসুবিধার কারণ প্রধানত এই যে, তাড়িঘাড়ি অনুবাদের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তা অন্যান্য সদস্যদের শ্রবণগোচর করার পক্ষে সহায়-সম্বলের অভাব। আধুনিক পাশ্চাত্য এবং সুদূরে প্রাচ্য দেশ জাপানে বিদেশ থেকে আগত আমন্ত্রিত কোনো প্রতিনিধিকে নির্বাক থাকতে হয় না, সে দেশের ভাষা না জানার জন্যে। উক্ত দেশগুলিতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলির তাৎক্ষণিক অনুবাদের ব্যবস্থা আছে। সেই অনুবাদ যে কোনো প্রতিনিধি তাঁর নিজের ভাষায় শুনে তন্মুহূর্তে প্রশ্ন করতে কিংবা উত্তর দিতে পারেন।

এ দেশের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভের পর ভাষাগত স্বাধীনতা ভোগ করছেন, বাকী ভারতের বিরাট সংখ্যক জনসাধারণ ভাষার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নিষ্করুণভাবে বঞ্চিত। অবশ্য, সংবিধানে ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারতের গণতন্ত্র এমনই যে, সেই ভাষাগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের অসমনীতির ফলে শুধু কৃপণ দাক্ষিণ্যই লাভ করে না, তাদের সরকারী মর্যাদাও ধূল্যবলুণ্ঠিত। অর্থাৎ সংবিধানে যাদের মর্যাদা স্বীকৃত, সরকারী আচরণে তাদের মর্যাদা অপসারিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে কম বিক্ষোভ হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকার তা জেনেও উগ্রপন্থী দাবিদারদের ভাষার অগ্রাধিকারকে রাজটীকা পরিয়েছেন। সংবিধানে স্বীকৃত ভারতের জনসাধারণের মাতৃভাষায় কথা বলার গণতান্ত্রিক অধিকার ও তাদের সমৃদ্ধিসাধন—ঐ ধরনের আচরণের ফলে ব্যাহত করা হয়েছে।

লোকসভা ও রাজ্যসভায় যে-সব সদস্য নির্বাচিত হয়ে যান, তাঁরা গণতন্ত্র সম্মত উপায়েই যান। সুতরাং গণতন্ত্রকে ভারতের যদি মূলধন বলা হয়, তাহলে সদস্যগণ কর্তৃক স্ব-স্ব মাতৃভাষায় উভয় সভায় বক্তৃতাদানের অধিকার সম্পূর্ণ 'ন্যায়সঙ্গত ও মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত; এবং বক্তৃতাদানের দাবি স্বীকার করে নেওয়া হলে গণতন্ত্রকেই রক্ষা করা হবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে হয়তো এমন কথা বলা সম্ভব যে, এই মুহূর্তে ঐ দাবি কার্যকর করা কঠিন। কিন্তু যে সরকার গণতন্ত্রের বড়াই করেন, সে সরকার ঐ দাবি মেনে নিতে অরাজী হন গণতন্ত্রের কোন্ ধারা বা উপধারার সৌজন্যে?

প্রসঙ্গত স্বীকার করতেই হবে শক্তের ভক্ত আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার। একথা একশ্রেণীর হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীদের (বলা বাহুল্য, আমরা হিন্দীভাষার বিরোধী নই; কিন্তু আমরা চাই ঐ ভাষার সঙ্গে সংবিধান-স্বীকৃত অন্যান্য ভাষাগুলিরও সমান সুযোগলাভ ও সমমর্যাদা।) কেন্দ্রীয় সরকার নির্লজ্জভাবে তোষণ করেছেন, তারপর ভারতের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের খেলায় কেন্দ্রীয় সরকার বিপর্যস্ত-প্রায়, তাই দক্ষিণ ভারতের ভাষা-আন্দোলনের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার এখন কিছুটা মাথা নত করেছেন। দক্ষিণ ভারতের চারটি ভাষার প্রতিনিধিরা আগামী বাজেট অধিবেশনের সময় নিজেদের মাতৃভাষায় প্রশ্ন করার ও উত্তর শোনার সুযোগ পাবেন।

স্বীকার করা উচিত যে, দক্ষিণ ভারতের জনসাধারণের দাবির কিয়দংশ স্বীকৃতি লাভ করেছে—যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে, (যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে নিয়োগের পর ব্যবহারিক ভাষার ক্ষেত্রে)—শেষ পর্যন্ত তাঁদের হিন্দীকবলিত হতে হবে কি না জানা নেই। হয়তো ভবিষ্যৎই তার সদুত্তর দেবে। কিন্তু আমাদের বেদনাদায়ক প্রশ্ন এই যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণ এমন কি অপরাধ করেছে যে, আগামী বাজেট অধিবেশনে তাদের ভাষাগুলিকে লোকসভা ও রাজ্যসভায় ব্যবহারের পক্ষে অচল করে দেওয়া হোল।

কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভা ও রাজ্যসভার মতো পবিত্র গণদরবারগুলিতে বৈষম্য নীতি চালিয়ে কি মনে করছেন যে, তাঁরা ঐভাবে কাজ করে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসির দ্বারা দেশ শাসন করবেন? ইংরেজ ঐ বুলি বলীয়ান হয়ে দেশ শাসন করেছে, এবং স্বাধীনতা দেবার সময় দেশের যে হাল করে গেছে, তার দুর্ভোগ জনসাধারণ আজও হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার তো দেশ শাসন করেন না, জনসেবা করেন, তাহলে তাঁদের এ-কি আচরণ।

ব্যয় বাহুল্যের ভয়ই ভাষাগত বৈষম্য নীতি প্রতিষ্ঠার কারণ হতে পারে বলে আমরা মনে করি না। অর্থ তো দেবে দেশের সমগ্র জনসাধারণ। ব্যয়টা যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহলে ন্যায্য দাবি মেনে নিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি কেন? আর বিশেষ একটি ভাষাকে প্রতিষ্ঠাদানের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে, বৈষম্য নীতি না চালিয়ে সেই অর্থেও কেন্দ্রীয় সরকার আপাতত লোকসভায় ও রাজ্যসভায় ভারতের মাতৃভাষাগুলিকে ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে গ্রহণ করতে পারেন—একথা আমরা মনে করি।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

অবস্থার গুণে সাধারণ ঘটনা অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তুচ্ছ বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করে বিরাট মর্যাদায়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদ দেওয়া নিয়ে কোনদিন এত হৈ-চৈ শোনা গিয়েছিল কি? কংগ্রেস সভাপতি যাঁদের কমিটিতে নিয়েছেন, খবরের কাগজের পাতায় সে নাম দেখে যাঁরা মনোনীত হয়েছেন, তাঁরা আনন্দলাভ করেছেন, কিন্তু আহ্লাদে ডগমগ হয়ে ওঠেন নি। যাঁরা আশা করেছিলেন কিন্তু লিস্টে নাম খুঁজে পান নি, তাঁরা হতাশ হয়েছেন, ক্ষুব্ধ হন নি। কারণ কংগ্রেস সভাপতির সিদ্ধান্তের সঙ্গে সমগ্র দেশের স্বার্থকে একীভূত করে ভাবতে শিখেছিলেন কংগ্রেসসেবীরা, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের তাড়নায় সিদ্ধান্ত নেওয়া কংগ্রেস সভাপতির পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তাঁরা জানতেন। কিন্তু এবার? তরুণপন্থীদের এ-আই-সি-সির অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হলেন তামিলনাড়ুর শ্রী সি সুব্রহ্মনিয়ম। কিন্তু যেই তিনি ওয়ার্কিং কমিটিতে উত্তর প্রদেশের শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব, ওড়িশার শ্রীমতী নন্দিনী সৎপতি এবং কেরালার কে আর গণেশনের নাম করলেন, অমনি 'গেল' 'গেল' রব তুললেন কারা, কেন এবং কার স্বার্থে?

বয়সে যাদব, নন্দিনী এবং গণেশ—তিনজনেই তরুণ। কিন্তু তারুণ্যই তাঁদের অপরাধ নয়, সংশ্লিষ্ট রাজ্য এবং একটা বিশেষ মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে যে, এ-তিনজনেরই অতীত রাজনৈতিক জীবন আপত্তিজনক। আপত্তিজনক বলতে অভিযোগকারীরা বোঝাতে চেয়েছেন এই যে, এঁরা আগে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এমন কি, সে পার্টির সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ আজো বর্তমান। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম অস্বীকার করেন নি যে, ওয়ার্কিং কমিটির এই তিন নতুন সদস্য আগে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কমিউনিস্ট ছিলেন তাঁরা। কিন্তু

চন্দ্রজিৎ যাদব

তারপরেই তিনি বলেছেন যে, অতীত ইতিহাসের চেয়ে এঁদের বর্তমান প্রতিশ্রুতিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওঁরা অতীতে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন সত্য, কিন্তু বর্তমানে যে তাঁরা কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শকে মেনে নিয়েছেন তাই বা অস্বীকার করা যাবে কী করে?

কিন্তু ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস যে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে [illegible] যদি শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, তবে কংগ্রেসকে ঢেলে সাজাতে হবে। সমাজতন্ত্রের যে প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস '৫৫ সালের আবাদী অধিবেশন থেকে দিয়ে আসছে, ইতিমধ্যে তার বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে বটে, কিন্তু কার্যে রূপান্তরে কোন আন্তরিকতা দেখানো হয় নি কংগ্রেস সরকারের পক্ষ থেকে। অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেস সংস্থাটি প্রতিক্রিয়াশীল, দুর্নীতিপরায়ণ এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধীদের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। ৮৫ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাবার তাগিদে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নতুন ধাঁচে তাকে পুনর্গঠন করছেন কয়েকজন সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল সহকর্মীর সহায়তায়, নিঃসন্দেহে বলা যায় চন্দ্রজিৎ যাদব সেই সহকর্মীদের অন্যতম।

শ্রীযাদবের বৈপ্লবিক চেতনাবোধ দেখা যায় ছাত্র-বয়স থেকেই। প্রথমে বেনারস এবং পরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে চন্দ্রজিৎ ছিলেন সেখানকার ছাত্রসমাজের মধ্যমণি। ছাত্র ফেডারেশনের সেরা সংগঠক ছিলেন যাদব, যেমন ছিল তাঁর নিষ্ঠা, তেমনি মৌলিক চিন্তাধারা, কাজে অফুরন্ত উৎসাহ। ছাত্র আন্দোলনের পরিধি ছাড়িয়ে পরে যাদব যোগ দিলেন কৃষক আন্দোলনে, সভ্যপদ পেলেন কমিউনিস্ট পার্টির। কমিউনিস্ট প্রার্থী হিসেবেই তিনি '৫৭ ও '৬২ সালের নির্বাচনে রাজ্য বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু পরে কংগ্রেসের প্রতি মনোভাবের প্রশ্নে দলের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটলে চন্দ্রজিৎ কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে দেন। '৬৭-র নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। বয়সে তরুণ হলেও কৃষি ও ভূমি সমস্যা সম্পর্কে শ্রীযাদবের প্রগাঢ় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখে প্রবীণ সদস্যরাও তারিফ না করে পারেন নি। শ্রীযাদব ছিলেন তরুণ তুর্কীর অন্যতম প্রথম সারির নেতা।

কংগ্রেসকে যদি তার হৃতমর্যাদা ফিরে পেতে হয়, তবে প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী চন্দ্রজিৎ যাদবের মত তরুণ নেতাদেরই তো নেতৃত্ব দেওয়া উচিত।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(১৮)

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি ও প্ল্যানিং কমিশন গঠনের ইতিহাস—(৩)

দিল্লীতে শিল্পমন্ত্রীদের এই সম্মেলন ও পরবর্তী কার্যপরিকল্পনা প্রকাশিত হবার পরে দেশের সমগ্র বুদ্ধিজীবীমহলে কি ধরণের আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল, তা একটি উপ-পরিচ্ছেদে পরে আলোচনা করব। সুভাষচন্দ্রও ভারতের নানা স্থানে কিভাবে শিল্পায়নের পক্ষে প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন ঠিক এর পরেই কয়েক মাস ধরে; তাও পৃথকভাবে আলোচিত হবে। এই সকল আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতীব তৎপরতার সঙ্গে পরবর্তী সম্মেলন আহূত হল ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে।

বোম্বাই সেক্রেটারিয়েটে ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্ণে প্ল্যানিং কমিটির প্রথম অধিবেশন বসল। উদ্বোধন করলেন সুভাষচন্দ্র; সভাপতিত্ব করলেন পণ্ডিত জহরলাল। প্ল্যানিং কমিটির নিম্নলিখিত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন:

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া, স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস; শ্রীঅম্বালাল সরাভাই, শ্রী এ ডি শ্রফ, শ্রী কে টি শাহ; শ্রী এ কে সাহা, ডাঃ ভি এস দুবে এবং আহ্বায়ক শ্রী ভি ভি গিরি।

সভায় বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন:

বোম্বাইয়ের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মন্ত্রী শ্রী এল এম পাতিল, মধ্যপ্রদেশের শিল্পমন্ত্রী শ্রী সি জে ভারুকা, বরোদার শ্রী এম কে পগর, মহীশূরের শ্রী এম এস রামচন্দ্র রাও, শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীভুলাভাই দেশাই, শ্রী জে বি কৃপালনী, শ্রীযমনদাস বাজাজ, শ্রী পি পি অদ্‌বানি এবং অধ্যাপক সি এন ভকিল।

প্ল্যানিং কমিটির মত বিশেষজ্ঞ-সভায় জহরলাল নেহরুকে কেন সভাপতি করা হয়েছিল—জহরলালের বিজ্ঞানপ্রীতি মেনে নিয়েও—সে প্রশ্ন আমাদের মনে উঠতে পারে। মেঘনাদ সাহার রচনায় আসল কারণ দেখা যায়:

"নেতাজী ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পমন্ত্রীদের ও ভারতের কিছু অন্য 'বিশিষ্ট' ব্যাক্তিদের যে-সভা ডাকলেন, তাতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনেই মাত্র যোগ দিতে পেরেছিলাম। দেখলাম, সেখানে ডাঃ কাটজু, ডাঃ সৈয়দ মামুদ সমেত প্রদেশসমূহের প্রায় সকল শিল্পমন্ত্রীই উপস্থিত। ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব আগেই গৃহীত হয়ে গিয়েছিল এবং স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়াকে অনুরোধ করা হয়েছিল সভাপতিত্ব স্বীকার করার জন্য। আমি স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ার সঙ্গে কথা বলে সভাপতিত্ব পদ গ্রহণ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হলাম। তাঁকে বুঝিয়েছিলাম—একজন প্রথম থাকের কংগ্রেস নেতাকে সভাপতি না করলে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির সিদ্ধান্তগুলি বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত থেকে যাবে, কংগ্রেসের কাছে তার কোনো মূল্যই থাকবে না। সেই মহান্ প্রবীণ ব্যক্তি আমার কথার সারবত্তা বুঝে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। আমার পরামর্শ মতই পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে (তখন ইউরোপে) ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির সভাপতিত্ব করতে আমন্ত্রণ জানানো হল।"

(*Rethinking Our Future* গ্রন্থ থেকে)

ডঃ সাহা যে-কথা বলেছেন, সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন প্রায় সেই কথাই বলেছেন। ২১শে মে, ১৯৬১, তারিখে তিনি এ বিষয়ে মোট আমাকে যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করছি:

"১৯৩৭ সালে সুভাষচন্দ্র রাজনীতিতে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করার পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিকে একটু বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েন। অনেকগুলি factor এই সময় একত্র কাজ করেছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এইকালে সুভাষচন্দ্রের প্রতি পক্ষপাত দেখান। আগে তিনি সুভাষচন্দ্রের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু তিনি নানা বিষয়ে আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসে আধুনিক মনোভাবের প্রতীক। সুভাষচন্দ্র ভারতে যন্ত্রশিল্পের প্রসার চান। সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা রামানন্দবাবুর দল মেনে নিলেন। হরিপুরায় গান্ধীজীর ইচ্ছায় সুভাষচন্দ্র সভাপতি হলেন। হয়েই ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করতে এগিয়ে গেলেন। এ-ব্যাপারে রাজশেখর বসু, রামানন্দবাবু, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন

এবং তাঁকে সুভাষবাবুর কাজ সম্বন্ধে উৎসাহী করে তোলেন।১০ ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং-এর প্রস্তাব চরকাপন্থী কংগ্রেস গ্রহণ করবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সে জন্য প্ল্যানিং-এর রাজনৈতিক ভাষ্য যথাসম্ভব মৃদু রাখতে হয়েছিল। সে কাজ করি সুভাষবাবু ও আমি নিজে। প্ল্যানিং-এর আসল খসড়া করেন পি এন ঘোষ এবং মেঘনাদ সাহা। পি এন ঘোষের দান এ বিষয়ে খুবই বেশি। কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্য করবার জন্য গান্ধীজীর বিশ্বাসভাজন নেহরুকে প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতি করার প্রস্তাব করা হয় এবং নেহরু তা গ্রহণ করেন। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন সত্যই যাতে কাজ করে তার জন্য সারা ভারতের বিশেষজ্ঞদের তাতে আনা হল; বিশ্বেশ্বরায়া, মেঘনাদ সাহা, কে টি শাহ্ প্রমুখ। দুঃখের বিষয় তা সত্ত্বেও প্ল্যানিং কমিশনের অধিবেশনগুলি জহরলালের বক্তৃতার ফুলঝুরিতে ভর্তি থাকত, যার জন্য বিশ্বেশ্বরায়া প্রমুখ অত্যন্ত বিরক্ত হন।"

সম্মেলনের উদ্বোধন করে সুভাষচন্দ্র যে-ভাষণ দেন তার মধ্যে প্ল্যানিংয়ের মূল নীতির পুনর্ঘোষণা ছিল, শিল্পায়ন প্রস্তাবে গান্ধী-মহলে ক্রমবর্ধমান বিরাগ অপনোদনের প্রয়াস ছিল এবং সমস্ত পরিকল্পনাই যে বর্তমানে কাগজে-কলমে থেকে যাবে যদি না কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য পাওয়া যায়, (যা পাওয়া যাবে না সকলেই জানত) এই বেদনাদায়ক বাস্তবতার স্বীকৃতি ছিল।

জহরলাল সভাপতির পদ গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছেন তার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সুভাষচন্দ্র বলেন, "আমার মনে কোনই সন্দেহ নেই যে পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে কমিটি উপযুক্ত কার্যসম্পাদন করে যোগ্যতা প্রমাণ করবে এবং সমস্ত দেশে এ সম্বন্ধে যে উচ্চ আশার সৃষ্টি হয়েছে, তা পূরণ করবে।"১১

প্ল্যানিংকে পুরোপুরি কার্যকর করা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং নানা শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার হলেও অবিলম্বে কি করা যায় তার কিছু পথনির্দেশ সুভাষচন্দ্র করেছিলেনঃ

"প্ল্যানিং কমিটিকে সন্ধান করে দেখতে হবে কিভাবে তা বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজে লাগাতে পারে। সরকারী রিসার্চ ইনস্টিটিউশনগুলি, বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা সংস্থাগুলি, সরকারের শিল্প বিভাগগুলি, বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলি—এই সকলকে গবেষণার কাজে লাগানো উচিত। ভারত সরকারের ইনডাসট্রিয়াল রিসার্চ ব্যুরো এই কাজে অবশ্যই ব্যবহৃত হতে পারে। বিদেশে ছাত্রদের শিক্ষা নিতে পাঠাবার জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থাও করা দরকার।"

(টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ১৯ ডিসেম্বর)

সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছায় ও তাগিদে প্ল্যানিং কমিটির সভাপতি হতে স্বীকৃত পণ্ডিত জহরলাল তাঁর ভাষণে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্য এবং প্রগতিশীল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রতি সুবিচার করার ইচ্ছায় সুভাষ-চন্দ্রের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি। তিনি বলেছিলেন, ইউরোপে থাকাকালে একটি তারবার্তা থেকে জানতে পারেন যে, তাঁকে কমিটির চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে। দিল্লীতে গৃহীত প্রস্তাবগুলি তাঁর কাছে পাঠিয়ে কংগ্রেস অফিস তাঁকে সভাপতিপদ গ্রহণে অনুরোধ জানিয়েছিল। তার দ্বারা তিনি খুবই কৃতার্থবোধ করে-ছিলেন, অভিভূত হয়েছিলেন। "দীর্ঘদিন ধরেই আমি ভারতের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা নিয়ে ভেবেছি। কিন্তু পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে কোনো যথার্থ অগ্রগতি সম্ভব নয়। এই কমিটি সম্বন্ধে যখন দিল্লী-প্রস্তাবগুলি পেয়ে-ছিলাম, তার ব্যাপকতায় যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। তা হলেও তাদের বিস্তৃত ও দূরপ্রসারী রূপ দেখে আমি খুবই আনন্দিত।" গুরুভার দায়িত্বের চিন্তায় অভিভূত জহরলাল ভারতে ফিরে এসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বহু আলোচনা করেন, তার ফলে বুঝতে পারেন যে, দায়িত্ব না নেওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। "সব গুণ না থাকলেও আমার দু' একটি বিশেষ গুণ আছে"—জহরলাল স্বীকার করেছিলেন—"আমি কোনো বিশেষ একটি দিক দিয়ে, বলতে গেলে কোনো বিশেষ ইনডাসট্রির দিক দিয়ে, বিষয়টিকে দেখি না; আমার মন শিল্পের নির্বিশেষ চরিত্রভাবনায় আকীর্ণ।" তিনি জানালেন, "সংকীর্ণ ক্ষুদ্র দৃষ্টি চলবে না; আমাদের কাজ গোটা দেশের শিল্পদৃষ্টি বদলে দেওয়া। আর গোটা ব্যাপারটিকে যদি জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারা যায় তাহলে তা ঝিমানো ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। জাতীয়তার ভিত্তিতেই প্ল্যানিং হওয়া উচিত।" এই কথাগুলিই প্রত্যাশিত ছিল—তা উচ্চারণ করে পণ্ডিতজী সন্দিগ্ধ গান্ধীবাদীদের আশ্বস্ত করেছিলেন। পরিকল্পনা, জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, তার মানে কুটীরশিল্প-দর্শনে বিশ্বাসী জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বার বার

১০ এ ব্যাপারে মেঘনাদ সাহার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল, তা আমরা আগে দেখে এসেছি।

১১ ১৯৩৮-এর ২৩ নভেম্বর লখনৌ-এ সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে উত্তর দিতে গিয়ে বলেনঃ

The personnel of Committee is complete. We have been waiting for Pandit Jawaharlal Nehru to whom the Chairmanship has been offered. Now that he is back home, it will be possible for the Committee to commence its labours in immediate future under his able guidance and leadership." (A. B. P., Nov. 24, 1938)

সমস্যায় ভরেছে, অতএব মধ্যে, সেই জন্যই পণ্ডিতজী কুটীর-শিল্পের প্রশস্তি করলেন, বললেন : "দেশে যে গণপ্রসারী জাতীয় আন্দোলন চলেছে, তা দূরতম গ্রামের জীবনে প্রশান্ত বিপ্লব এনেছে। বস্তুতঃপক্ষে গত ১৮ বছর ধরে জাতীয় আন্দোলনে কুটীরশিল্পের বিকাশকে বিশেষ সহায়করূপে অবলম্বন করা হয়েছে। জাতীয় আন্দোলন-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে যদি কোনো পরিকল্পনা করা হয় তাহলে তা কেবল জীবনীশক্তিবিহীনই হবে না, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থও হবে। বুদ্ধিগত, এবং মনস্তত্ত্বগত বাস্তবতাবোধ চাই, তাকে তথ্যনিষ্ঠ হতে হবে, এবং সেই ধরনের বাস্তবতা-বোধের আবশ্যিক ভিত্তি হল জাতীয় আন্দোলনের জীবন্ত সমস্যাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমি আশা করি, কমিটি এই বিষয়টিকে স্মরণ রাখবে; যদি না রাখা হয় তাহলে বন্ধ্য জলায় গিয়ে পড়বে।"

পণ্ডিতজীর বাস্তববোধ অভ্রান্ত, এই বক্তৃতা থেকেই দেখা যায়. জাতীয় আন্দোলনের প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্ক না রাখলে পরিকল্পনা বদ্ধ জলায় নাকানি-চোবানি খাবে, এই সাধুবাক্যের মহিমাও সন্দেহাতীত। নাকানি-চোবানি ঠিক পরিকল্পনাই খাবে তা ঠিক নয়, আসলে তা খাবেন সেই সব ব্যক্তি, যাঁরা বৃথা স্তোক দিতে গররাজি, যেমন সুভাষচন্দ্র বসু। এবং জহরলাল নেহরু সকলকে বাক্যে সন্তুষ্ট করার মত রাজনীতিবুদ্ধি রাখতেন, সুতরাং তিনি জাতীয় আন্দোলনের ১৮ বছরের ভিত্তির প্রতি সুবিচারের জন্য কুটীরশিল্পের পক্ষে একজন প্রতিনিধি নেবার প্রস্তাব পর্যন্ত করে বসলেন পরিকল্পনা কমিটিতে। তাতেই থামলেন না, একজন শ্রমিক-প্রতিনিধিও নেওয়া দরকার বিবেচনা করলেন। সেই শ্রমিক প্রতিনিধি হংসদের মধ্যে বকস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে, তাও জানালেন। কিন্তু কোনো প্রগতিশীল রথ তেত্রিশ কোটি গণদেবতার কোনো একজনের স্পর্শ ছাড়া ছোটে কি করে।১২

এক্ষেত্রে পণ্ডিতজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মনোভাবের পার্থক্য লক্ষণীয়। কুটীরশিল্পবাদীদের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি অনেক নরম ভাষায় কথা বলেছিলেন, কিন্তু কদাপি না বলে পারেন নি যে, পরিকল্পনাভিত্তি রচিত হবে বৃহৎ শিল্পের উপর নির্ভর করে। কুটীরশিল্পের পক্ষে একজন প্রতিনিধি থাকবেন, তাতে তিনিও রাজী—দশজনের কমিটিতে একজন—এই আনুপাতিক বিন্যাসের কথাটা মনে জাগিয়েই রেখেছিলেন। কিন্তু শ্রমিক সদস্য সম্বন্ধে তাঁর কৃপাদাক্ষিণ্য মনোভাব ছিল না। শ্রমিক সদস্য যদি সত্যই অকেজো কিছু হন, তাহলে তাঁকে গদিমোড়া চেয়ারে চকচকে টেবিলের সামনে বসিয়ে কষ্ট দেবার কিংবা 'আমি কি হনু রে' জাতীয় আত্মপ্রসাদ পাওয়ার সুযোগ দিতে তাঁর রুচিতে বাধত। প্ল্যানিংয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন যেমন তিনি স্বীকার করতেন, তেমনি অপরপক্ষে কদাপি মানতেন না যে, বিচক্ষণ বুদ্ধিজীবীরাই সর্বসময়ে দেশকে প্রগতিশীল নেতৃত্ব দিতে সমর্থ। প্রবীণের তথাকথিত অভিজ্ঞতাকে মাথায় তুলে নেবার মত রক্ষণশীল তিনি কদাপি ছিলেন না। কংগ্রেসের পক্ষে ১৯৩৭ সালে মন্ত্রিত্ব স্বীকারের ভালো ও মন্দ দিকের বিস্তৃত পর্যালোচনা করে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ১৯৩৮-এর অগস্ট সংখ্যার মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় (*The Pros and Cons of Office Acceptance*) তার মধ্যে যাঁরা শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষপাতী তাঁদের যুক্তি ধারালোভাবে খণ্ডন করে বলেছিলেন—যুদ্ধোত্তর ইউরোপের শাসনকর্তারা সবাই অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক এবং শাসনভার গ্রহণ করার সময় ঐ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। বিপ্লব হবার পরে নতুন অবস্থার সঙ্গে বনেবার জন্য নতুন নীতি ও পদ্ধতির দরকার হয়। চোখা ভাবে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, লেনিন, স্ট্যালিন, হিটলার, মুসোলিনি, কামাল পাশা কি প্রবীণ বয়সে শাসনকাজ গ্রহণ করেছিলেন? সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, তুরস্কের নতুন সাধারণতন্ত্র, ইটালির নবসাম্রাজ্য কারা করেছিল?১৩

---

১২ "He (Nehru) Suggested that the committee should have a representative of the cottage industries and a representative of labour. In the first place, it was necessary to avoid any kind of conflict between large scale industries and cottage industries. Secondly, while the representative of labour might not always be of great help in their work, he wanted labour to feel that their view-point was not overlooked in any scheme of national planning." (Times of India, Dec. 19).

১৩ "The greatest administrators in post-war Europe, as in all ages and in all climes, were comparatively young and also inexperienced in administration, when they took over the reins of office from their predecessors. One has only to look at successful administrators like Lenin, Stalin, Hitlar, Mussolini, and Kemal Pasha to appreciate the force of my argument. The fact is that after a revolution (whether violent or non-violent) the new administration requires principles and technique of quite a different order and in order to cope with the new situation successfully, courage, imagination and resourcefulness. Did "experienced" administrators produce the Five-Year Plan for

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্ল্যানিং-এর সাক্ষাৎ সম্পর্ক এই পর্যন্ত। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি যখন প্ল্যানিং কমিটির উদ্বোধন করছিলেন, তার মধ্যেই কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের সঙ্গে তাঁর মানসিক সংঘাত সংকট পরিস্থিতিতে পোঁছে গেছে। অল্পদিনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্ল্যানিংয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, প্ল্যানিংয়ের প্রধান উদ্যোক্তা বলে খাদিপন্থীদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের লক্ষ্য হবেন, কিন্তু ইতিহাস তাঁর জন্য সযত্নে সঞ্চয় করে রাখবে সেই সম্মান যা প্রবর্তকেরা চিরদিন পেয়ে এসেছেন, যাঁরা আরম্ভ করেন এবং তার যন্ত্রণাও বহন করেন।১৪

(ক্রমশ)

Soviet Russia or build up a new Republic for the Turks or found a new Empire for Italy or create a new Persia (Prussia ?) out of chaos and corruption ? (*The Pros and Cons of Office Acceptance*)

১৪ প্ল্যানিং কমিটির উদ্বোধন সভা হয়ে যাবার পরে সভার বিবরণ সংবলিত একটি সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করেন অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত জি পি হাতিসিং। তার গোড়ার দিকে কমিটির অধিবেশন বিষয়ক সংবাদ ছিল: "১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ তারিখে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির প্রথম অধিবেশন পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সভার উদ্বোধন করেন। পাঁচ দিন ধরে অধিবেশন চলে; শেষ দিনে সকাল দশটা থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত একাদিক্রমে সভা চলে, মধ্যে কেবল স্বল্প সময়ের একটু বিরতি ছিল। প্রথম চারদিন ধরে প্রাথমিক বিষয়গুলি ও সেই সঙ্গে কমিটি কর্তৃক যে প্রশ্নমালা পেশ করা হবে—সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়।"

শ্রীযুক্ত হাতিসিংয়ের বিবৃতি থেকে জানা যায়, সাব-কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত প্রশ্নগুলি প্রধানত পাঠানো হবে—প্রাদেশিক সরকারসমূহ দেশীয় রাজ্যগুলির শিল্প-বাণিজ্য, শ্রম ও কৃষি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ন্যাশনাল প্ল্যানিং সম্বন্ধে উৎসুক ও প্রশ্নের উত্তরদানে প্রস্তুত বাণিজ্যসংস্থা, সমবায় সমিতি বা ব্যক্তিবিশেষের কাছে। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রশ্নমালা পাঠানো হবে। দেড় মাসের মধ্যে উত্তর পাবার আশা। আরও স্থির হয়, যদি প্রাদেশিক সরকারগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজী হয় তাহলে অধ্যাপক কে টি শাহ্ ঐ সব জায়গায় গিয়ে প্রশ্নগুলির প্রকৃতি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন। প্রশ্নগুলি কি ছিল— তা হাজির করার প্রয়োজন নেই।

প্ল্যানিংয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্নমালার সঙ্গে ব্যাখ্যাত্মক স্মারকলিপিতে পাঠানো হয়: "An explanatory memorandum is attached to the questionaire. The memorandum explains that the object of the National Planning is to improve the well-being of the community by intensifying economic development in an ordered and systematic manner. Such a planning must secure an adjustment between the interests of the producers and consumers, between the individuals and the community collectively, so as to maintain a proper balance between their interests and being about an equitable distribution."

(অমৃতবাজার, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৮)

লক্ষ্য করবার বিষয়, এই ঘোষিত উদ্দেশ্যের মধ্যে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ নেই, যদিও 'সমাজতান্ত্রিক' সুভাষচন্দ্র এবং 'কমিউনিস্ট' (বা কমিউনিজমের সরব সমর্থক) জহরলাল কর্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র এই সময়ে, এর পূর্বে এবং পরে ভাষণাদির মধ্যে যথেষ্ট বলেছেন যে, প্ল্যানিং কখনই সমাজতান্ত্রিকভিত্তি ছাড়া সফল হবে না। জহরলালও তাই বলেছেন। কিন্তু উভয়েই দেখা যাচ্ছে, সেইকালে, যখন প্ল্যানিং প্রধানত কাগজে-কলমে, তখন সমাজতন্ত্রের খোঁচায় প্ল্যানিংয়ের ভরা পাল ফাঁসিয়ে দিতে চান নি। প্ল্যানিং কমিটি যে দলনিরপেক্ষ হয়েছিল। এই সঙ্গে এইটুকু যোগ করা যায়, আলোচ্য সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর মাসে পরবর্তী সভাপতি নির্বাচন প্রশ্ন নিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হাইকম্যান্ডের বিরোধ বেধে উঠেছে; প্ল্যানিং কমিটির সভায় পাশাপাশি উপবিষ্ট সুভাষচন্দ্র ও জহরলালের মধ্যে তখন অনেকখানি ব্যবধান। তাছাড়া জহরলাল ইতিমধ্যেই প্ল্যানিং কমিটির নেতৃত্ব নিয়ে নিয়েছেন—সুভাষচন্দ্র ঐ ব্যাপার থেকে সরে যাচ্ছেন। কারণ ব্যাপারটা শুরু হয়ে যাক এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তী বন্যার মধ্যে যিনি ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছেন, তাঁর পক্ষে নিশ্চয় প্ল্যানিংয়ের খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকা সম্ভব ছিল না।

বঙ্গদর্শন

এ সংখ্যার বঙ্গদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত যে সংবাদ আমাদের হাতে আছে তা হচ্ছে এই যে, পয়লা ডিসেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় অনশন সত্যাগ্রহ করবেন। বলা বাহুল্য, শ্রীমুখোপাধ্যায় সুস্পষ্টভাবেই বহুবার ব্যক্ত করেছেন যে, এই সত্যাগ্রহ কোন ব্যক্তি বা দলের উদ্দেশ্যে নয়, এ সত্যাগ্রহ সরকারের বিরুদ্ধেও নয়। যে কোন কারণেই হোক সমাজে হিংসার প্রবণতা যে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে তাকে নৈতিকভাবে রোখার জন্য, সকলের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য, আত্মশুদ্ধির জন্য তাঁদের কাছে এটা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। অবশ্য পয়লা ডিসেম্বরের আরও দু'দিন দেরি আছে, এর মধ্যে হয়ত সিদ্ধান্তের পরিবর্তনও হতে পারে যদি তাঁর সত্যাগ্রহের তাৎপর্য জনসাধারণ ও নেতারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এ রকম অনুভব করা যায়।

খুব স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর এই সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টাকে ভুল বোঝবার অবকাশ আছে। শ্রীমুখোপাধ্যায় যদি মুখ্যমন্ত্রী না হতেন তা হলে এ নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠত না। একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই রাজ্যে হিংসার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে অনশন সত্যাগ্রহের আশ্রয় নিয়েছেন, এ দৃশ্য ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কোথাও দেখা দেয় নি। মুখ্যমন্ত্রীর এই সত্যাগ্রহকে মূলধন করে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কে নানা বিরূপ মন্তব্য এখানে-ওখানে করা হচ্ছে এবং দিল্লীতে কোন কোন মহল রাজনৈতিক মুনাফা লোটার উদ্দেশ্যে এই ঘটনাকে ব্যবহার করারও চেষ্টা করছে। কিন্তু গত সংখ্যাতেই আমরা দেখিয়েছি যে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মুনাফা লোটা কদাপি সম্ভব নয়, সে চেষ্টা ব্যর্থ হতেই বাধ্য।

কিছু বিভ্রান্তি পশ্চিমবঙ্গেও দেখা গেছে। যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে এই সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গ উঠেছিল, কোন কোন রাজনৈতিক দল মুখ্যমন্ত্রী যাতে এই সত্যাগ্রহ না করেন সেই অনুরোধ করেছেন। আবার কোন কোন দল বলছেন যে এটা বাংলা কংগ্রেসের দলীয় ব্যাপার, এতে মাথা গলাবার কোন দরকার নেই। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন, এই সত্যাগ্রহ না করলেও চলত, কেন না এতে যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্তি অনেকটা ক্ষুন্ন হবে এবং যুক্তফ্রন্টের শত্রুরা সুযোগ পাবে। শ্রীমুখোপাধ্যায় অবশ্য তা মনে করেন না। মুখ্যমন্ত্রীর সত্যাগ্রহের কিছুটা নৈতিক প্রভাব যে সত্যই পড়েছে, এটাকে অস্বীকার করা যায় না। আজ প্রত্যেকের মুখেই এই একই আলোচনা, কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে, কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার যে, মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত সত্যাগ্রহ সকলকেই চিন্তিত করেছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সত্যাগ্রহ এই কারণেই বলছি যে তাঁকে বাদ দিয়ে বাংলা কংগ্রেসের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা কেউ যদি এটাকে রাজনৈতিক চাল বলেন তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্পর্শ করা যাবে না, কেন না তিনি এমন একটি ব্যক্তিত্ব যাঁকে আর যাই বলা যাক, অনান্তরিকতার অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। এটুকু বিশ্বাস করার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে যে, যে পথই তিনি গ্রহণ করুন না কেন, তা ঠিকই হোক বা ভুলই হোক, তা তিনি করবেন সম্পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়ে এবং সেটুকুর মধ্যে কোন ফাঁকি নেই।

অথচ মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই সত্যাগ্রহ ছাড়া তাঁর সামনে আর কোন পথ নেই। ব্যক্তিগতভাবে অজয়বাবু যে দৃঢ়চেতা মানুষ নন তা নয়। তিনি তাঁর কোন প্রতিজ্ঞাই অপূর্ণ রাখেন নি। একক নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি অতুল্য-প্রফুল্লচক্রের উৎখাত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার যে আর কল্পনার বস্তু নয়, একান্তই বাস্তব তার মূলে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনেকখানি। তথাপি যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি বহুলাংশে শৃঙ্খলিত, তাঁর অবস্থা অনেকটা ধৃতরাষ্ট্রের মত। মন্ত্রিসভার প্রতিটি দপ্তর যে দলের যে মন্ত্রী সেই দলের যেন পৈত্রিক জমিদারী, সেই দপ্তরের বিষয়ে নাক গলাবার অধিকারী আইনত মুখ্যমন্ত্রী হলেও কার্যত তিনি কেউই নন। এমন কি কোন দপ্তর যদি দুর্নীতি-গ্রস্ত হয়, যদি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকে, তা হলেও যেহেতু তা একটি পার্টির জমিদারী, অপর পার্টির মন্ত্রী বা এম এল এ বা নেতার সে বিষয়ে কিছু বলার বা লেখার কার্যত অধিকার নেই, তা হলে তা নাকি যুক্তফ্রন্ট বিরোধী কাজ হবে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতেই আছে।

স্বাস্থ্যদপ্তরের মন্ত্রী আর এস পি দলের, অতএব ওই দপ্তরটি আর এস পি-র জমিদারী। সি পি এম দলের বিধানসভার সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা আমাদের পত্রিকায় ওই দপ্তরের বিরুদ্ধে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন প্রমাণপত্র সহ। বিষয়টি তদন্ত হবার পরিবর্তে যা ঘটল, তা সত্যই অভাবনীয়। এটাকে দুর্নীতির অভিযোগ বলে গণ্য করা হল না, এটাকে অপর পার্টির জমিদারীতে অশোভন হস্তক্ষেপ হিসাবে দেখা হল। দিল্লীর একটি সংবাদপত্র এটার মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ভাঙার ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেললেন। তাঁরা কেরালার সঙ্গে তুলনা করে বললেন যে, প্রথম গুলীটি একজন সি পি এম সদস্য ছুঁড়লেন...।

এখানে কোন বিশেষ দলের প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে না। যা বাস্তব তা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি দপ্তর তার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দলের জমিদারী, তা ওই দলের নেতাদের নির্দেশে চলবে। এমতাবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী কি করতে পারেন? মন্ত্রিসভার তিনি সভাপতি, কিন্তু কার্যত কোন যৌথ দায়িত্ব মন্ত্রিসভার নেই। প্রত্যেকটি মন্ত্রী যেন এক-একটি ঘুড়ি হয়ে উড়ছেন যার লাটাই দলের নেতার হাতে, তিনি কখনো সুতো ছাড়ছেন, কখনো তা গুটোচ্ছেন, কখনও অন্য ঘুড়িকে কাটার জন্যে প্যাঁচ কষছেন। মুখ্যমন্ত্রী কি করতে পারেন? মন্ত্রিসভার মধ্যে যে একটা টীম স্পিরিট যুক্তফ্রন্ট সরকারের গোড়ার দিকে গড়ে উঠেছিল, সেটাকে ভেঙে দিতে কি সংশ্লিষ্ট দলগুলির নেতারা উঠে পড়ে লাগেন নি? এই শোচনীয় অবস্থায় তিনটি রাস্তা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে খোলা আছে। প্রথমটি হচ্ছে, তিনি দৃঢ়ভাবে সকল দপ্তরের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখবেন এবং তার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে মেনে

চলতে হবে, পরলোকগত বিধানচন্দ্র রায় কেমন সরকার চালিয়েছিলেন। একদলের সরকার হলে তা সম্ভব, কিন্তু যেখানে একাধিক দল; সেখানে এই নীতি চলে না। কাজেই এক্ষেত্রে অজয়বাবু নিরুপায়। দ্বিতীয় যে রাস্তাটি খোলা আছে তা হচ্ছে এই যে, তাঁকে সরে যেতে হবে, পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তা করলে যুক্তফ্রন্ট বিরোধী ব্যাপার হবে, সেটা আবার জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না।

এমতাবস্থায় সত্যাগ্রহ ছাড়া তিনি আর কি করতে পারেন? যদি তার দ্বারা শরিক দলগুলির শুভবুদ্ধির উদ্রেক হয়। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শরিকী সংঘর্ষ এক নিমেষেই বন্ধ করা যায় যদি সংশ্লিষ্ট দলগুলি জেলা বা মহকুমা পর্যায়ে একটা সমঝোতায় আসে। কয়েকটি উদাহরণ আমাদের হাতের কাছেই আছে যেখানে বাম ও ডান উভয় কমিউনিস্ট পার্টিই আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই সমঝোতায় এসেছে যে, তাদের এলাকায় তারা শরিকী সংঘর্ষ হতে দেবে না এবং বলাই বাহুল্য, সে সব অঞ্চলে শরিকী সংঘর্ষের চিন্তা এখন সুদূরপরাহত এবং ফসল কাটার মরশুমটা সে সকল স্থানে শান্তিপূর্ণভাবেই যাবে। কাজেই নেতৃত্বের, বিশেষ করে স্থানীয় নেতৃত্বের বিজ্ঞতার ওপরেই সমস্ত কিছু নির্ভর করছে। জনসাধারণের তরফ থেকে আমরা তো অনায়াসেই প্রশ্ন করতে পারি, অন্তত এই ফসল কাটার ব্যাপারে জেলাভিত্তিক, মহকুমাভিত্তিক এবং থানাভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট এখনো গড়ে তোলা হল না কেন?

মনে আছে, একটি জনসভায় কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করেছিলেন: আমি যদি রক্তের বদলে রক্ত চাই এই শ্লোগান এই মাঠে দাঁড়িয়ে দিতাম, তাহলে বোধহয় তা যুক্তফ্রন্ট বিরোধী ব্যাপার হত না। সকলেই তো এই শ্লোগান দিচ্ছে এবং লোকের মেজাজ এমন হয়ে আছে যে, এই শ্লোগানের মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখে না, বরং করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু যখন আমি শ্লোগান দিই, রক্তের বদলে সত্যাগ্রহ চাই, তাতে অন্যায়টা কোথায়? একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে নেতারা যুক্তফ্রন্টের সভায় শান্তির কথা বলেন, সহযোগিতার কথা বলেন, বাইরে তাঁরাই প্রকাশ্য জনসভায় সমর্থকদের অন্যের বিরুদ্ধে সহিংস আক্রমণে উস্কানি দেন। এরকম কয়েকটি জনসভার নজির আমাদের কাছে রয়েছে—যেখানে দলের নেতা প্রকাশ্য সভায় রক্তের বদলে রক্ত দাবি করেছেন এবং তাঁর বক্তৃতা ঘন ঘন করতালির দ্বারা সংবর্ধিত হচ্ছে। বেশি কথা কি, সাম্প্রতিক প্রায় প্রতিটি দলের সভাতেই টাঙ্গি, বর্শা, লাঠি, সড়কি, এমন কি তরোয়াল নিয়ে মিছিল করে যাওয়া যেন একটি ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে, ওগুলো না হলে যেন সভারই অঙ্গহানি হয়। এ কথাটাকে কি কোন নেতা অস্বীকার করতে পারেন? 'যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ' এই শ্লোগান তো কবে উঠে গেছে। এখন শুধু অমুক পার্টি মুর্দাবাদের যুগ, অবশ্য যে স্থানে যে পার্টি যে পার্টির শত্রু।

বস্তুত যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে, তা তিক্ততা ও অবিশ্বাসের বাষ্পে বিষাক্ত। যুক্তফ্রন্টের স্বার্থে যুক্তফ্রন্ট নেই, বিভিন্ন দলের স্বার্থে যুক্তফ্রন্ট আছে, হয়ত বা থাকবেও; কিন্তু বিভিন্ন শরিক দলের তথাকথিত নেতারা আজ যে রাস্তা নিয়েছেন তাতে তাঁরা জনসাধারণের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলেই কুঠারাঘাত করতে চলেছেন। বাংলা কংগ্রেস সত্যাগ্রহ করছে এটা কোন বড় কথা নয়, বাংলা কংগ্রেস যে আদর্শ দল একথাও আমরা বলি না বরং আমরা মনে করি যে পশ্চিমবঙ্গের চাহিদার তুলনায় ওই দল পর্যাপ্ত প্রগতিশীল নয়। মুখ্যমন্ত্রীর সত্যাগ্রহই আমাদের বিবেচ্য, কেন না সাধারণ দলনেতার থেকে তাঁর পার্থক্য অনেক। তাঁর কণ্ঠস্বরকে দলীয় নেতার চাতুর্যপূর্ণ সংলাপের কিছুটা ঊর্ধ্বে সঙ্গতভাবেই স্থান দেওয়া উচিত বলেই আমরা মনে করি। সব কথা ছেড়ে দিলেও, এমন কি মুখ্যমন্ত্রীর অনশন-সত্যাগ্রহ করা উচিত নয় একথা মেনে নিলেও, যে কারণগুলি তাঁকে এই পথে টেনে এনেছে, সেগুলিকে তো সব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সর্বস্তরে যুক্তফ্রন্ট

এমন একটা সময় ছিল, ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত, যখন সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রতিটি বঙ্গদর্শনেই একটি করে নিবন্ধ খাদ্য পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে ব্যয়িত হত এবং একই কথা বারবার লিখতে আমরাও ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, পাঠক-পাঠিকারাও একই জিনিস বারংবার পড়তে বিরক্ত বোধ করতেন, কিন্তু উপায় ছিল না, সেদিনের প্রাত্যহিক খবরই ছিল সেটা। এখন শরিকী সংঘর্ষ সেই স্থান দখল করেছে। এমন একটা দিনও বাদ যায় না যেদিন, ধানকাটাকে কেন্দ্র করে এক বা একাধিক ব্যক্তির শোচনীয় প্রাণান্তের সংবাদ চোখে না পড়ে। বিগত সপ্তাহের পূর্বের সপ্তাহে, ফসল তোলা নিয়ে রক্তপাতের পরিমাণ কম ছিল, যা দেখে আশান্বিত হয়েছিলাম যে, বোধ হয় এবার ততটা রক্তপাত ঘটবে না এবং বোধ হয় এবারের সংঘর্ষগুলি মূলত বে-আইনী জমির তথাকথিত মালিকদের সঙ্গে যারা চাষ করেছে তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং এ ক্ষেত্রেও সরকারী সহানুভূতি ও প্রচেষ্টা চিরবঞ্চিত শ্রেণীর স্বপক্ষেই যাবে। কিন্তু কলমের কালি না শুকোতেই আমাদের আশাটা দুরাশায় পরিণত হল। বরং কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আমরা যে আশংকা করেছিলাম সেইটাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। সেই আশংকাটা ছিল এই যে, ধানক্ষেতের লড়াইটা শুধু মাত্র ধান নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে না তা রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভের জন্য বিভিন্ন শরিক দলের লড়াই-এ পরিণত হবে। কার্যত ঘটলও তাই।

আমরা পূর্বেই লিখেছিলাম যে, লড়াইটা যদি শুধুমাত্র জোতদার আর চাষীর মধ্যে জমির বেনামদার এবং যে চাষ করেছে তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেটা খুব আশংকার ব্যাপার নয়। আশংকা তখনই দেখা দেবে, যখন সেই বিষয়টিকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রতিপত্তিবিহীন অঞ্চলে প্রতিপত্তিলাভের চেষ্টা করবে। আজকের চিত্র ঠিক তাই, নতুবা ধানকাটাকে উপলক্ষ করে যে-সব সংঘর্ষ ঘটছে সেগুলিতে এমন পাইকারীহারে দরিদ্রশ্রেণীই বা মারা পড়বে কেন? যার মাত্র দু বিঘা জমি, অথবা যে ভাগচাষী, অথবা যে অপরের বে-আইনী করে ধরে রাখা জমিতে ফসল ফলিয়েছে, সে আমার দলের নয় বলেই সে জোতদারদের শ্রেণীভুক্ত, অতএব তাকে পিটিয়ে মার, এটাই কি নীতি হয়ে দাঁড়ায় নি? এবং জোতদার হলেও যেহেতু সে আমার দলে অতএব তার বে-আইনী জমির ধান আমরা রক্ষা করব এবং চাষী যদি সেই ধান কাটতে আসে তাকে পিটিয়ে লাশ করে দেব, এই নীতিই কি কার্যকরী হচ্ছে না? মূলত প্রায় সকল দলই এই নীতি, এই সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করেছে। কে জোতদার আর কে জোতদার নয়, কে বে-আইনী ফসল কাটছে আর কে কাটছে না তা যে নির্ধারিত হচ্ছে দলীয় ব্যারোমিটারে. এ কথাটাকে কি অস্বীকার করা যায়? বস্তুত সকলেরই এক নীতি, উনিশ আর বিশ, আর যত অনর্থের সূত্রপাত এখান থেকেই।

এর অর্থ এই নয় যে, জোতদারেরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে এবং তারা অহিংসার পূজারী হয়ে গেছে। এমন অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে যেখানে জোতদারেরা বেপরোয়া আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে এবং বহু লোকের প্রাণহানি ঘটিয়ে নিজেদের বে-আইনী অধিকারকে বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

কিন্তু দুঃখ হচ্ছে এই যে, এই জোতদারেরা কোন-না-কোন দলের সমর্থন পাচ্ছে নতুবা তারা প্রকাশ্যভাবে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে যেতে সাহসী হত না। এই প্রশ্নটি যখনই উঠছে তখনই বিভিন্ন দলের তরফ থেকে এই কথা বলা হচ্ছে যে, আমাদের দল সাচ্চা দল, সর্বদাই গরীব চাষীর পক্ষে আমরা রয়েছি, ওরা প্রতিক্রিয়াশীল ওরা জোতদারদের স্বার্থ দেখছে, তাই এই বিবাদ, এই খুনোখুনি। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, একই দল এক এলাকায় দরিদ্র চাষীদের অধিকার রক্ষা করছে বা করার চেষ্টা করছে, আবার সেই একই দল অপর এলাকায় জোতদারের স্বার্থ দেখছে। এটা নির্ভর করছে স্থানীয় নেতৃত্বের মতি-গতির ওপর, তাদের ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থের ওপর। সোজা কথায় ধানক্ষেতে আজ রাজনীতিটাই নীতির চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

আমরা এটা বুঝে উঠতে পারি না যে, যে সমস্যা সমাধানের অতীত নয়, আন্তরিকভাবে তার সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে না কেন? সমাধান তো এমন কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। যদি প্রতি গ্রামে যুক্তফ্রন্ট কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে সকল দলই থাকবে, তাহলে কোন্ জমির ধান কার প্রাপ্য সেটা সাব্যস্ত করতে মোটেই বেগ পেতে হয় না। কোন্ কোন্ জোতদারের বে-আইনী জমিতে ফসল ফলানো হয়েছে এবং কে বা কারা তা ফলিয়েছে এটা জানতে স্থানীয় নেতৃত্বের অসুবিধার কোন কারণ নেই। সকল শরিক দল একত্র বসে বিতর্কমূলক বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করে ফেললেই তো হয়। আমরা বর্তমান বঙ্গদর্শনের প্রথম নিবন্ধে দেখিয়েছি যে, কোন কোন স্থানে এই রকম স্থানীয় সমঝোতা বিভিন্ন দলের মধ্যে হয়েছে, যার ফলে কোনপ্রকার শরিকী সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই শান্তিপূর্ণভাবে ফসল কাটা চলছে, বে-আইনী জমির মালিকদের ক্ষেতে যারা চাষ করেছিল, তারা শান্তিতেই ফসল তুলে আনতে পারছে। এই বোঝাপড়ার বিস্তার ঘটানো কেন হচ্ছে না সেটা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। কেন্দ্রীয় নেতৃস্থানীয় ইউনিটগুলিকে কড়া নির্দেশ দিলেই সমস্যা মিটে যায়।

এটা যুক্তির কথা, আপনিও বোঝেন আমিও বুঝি। কিন্তু নেতারা যে এই সোজা কথাটা বোঝেন না, এটা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করি? কারণটা আমরা আগেই বলেছি। যুক্তিশীল রাজনীতি করতে গেলে হয়ত নেতৃত্ব বজায় রাখা যায় না, ঠাণ্ডা কথা বললে হয়ত ক্যাডারদের উদ্দীপ্ত করা যাবে না, তাই গরম গরম বুলি বোধ হয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। রক্তের বদলে রক্ত চাই-এর শ্লোগান নেতার প্রতি ক্যাডারের যে মোহ সৃষ্টি করতে পারবে, ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার উপদেশ দিলে বোধ হয় অতটা হয় না। জানি না এটা সঠিক বলছি কি না, কিন্তু যে বিষবৃক্ষের বীজ ছড়ানো হচ্ছে পরিণামে তা নেতাদের বিরুদ্ধেই বুমেরাং হয়ে আসবে এবং তার বেশি দেরিও নেই। এখনো সামলাবার সময় আছে। তাই যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলের নেতাদের নিকট আমাদের বক্তব্য, অন্তত এক মাসের জন্যও একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলতে বিরত হোন, জেলা, মহকুমা ও থানাভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট গঠনে সচেষ্ট হোন।

২৮।১১।৬৯

ভারতদর্শন

এ. আই. সি. সি'র তলরী অধিবেশনের কয়েকটি মুহূর্ত ফটো : ধীরেন অধিকারী

ওঁরা আমাদের নিয়ে তোফা মস্করা করছেন

ওঁরা, অর্থাৎ দিল্লীর সংসদগৃহবাসীরা, আমাদের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গীয়দের নিয়ে মস্করা শুরু করেছেন। লজ্জা আর কারো না হোক, পশ্চিমবঙ্গীয় হিসেবে আমার তো মাথা কাটা গেছে মশায়। ঐ চ্যবন সাহেব, যিনি খবরের কাগজের পাতা থেকে কংগ্রেসী লড়াইয়ের ফাঁকে স্রেফ কিছুদিনের জন্য উবে গেছলেন। দলীয় কোঁদলে স্লোর চেঞ্জার রূপে তাঁর চেহারা উঁকি দিয়েছিল অবশ্য. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিরূপে উপস্থিতি বড় একটা টের পাওয়া যাচ্ছিল না। সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মেঘলা আকাশে চন্দ্রোদয়ের মতো শ্রীকান্ত বলবন্ত রাওয়ের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়াও দেখা যাচ্ছে কাজে কাজেই। '৬৭-তে ঐ চ্যবন সাহেব হাসতে হাসতেই প্রফুল্ল ঘোষের বকলমে ধর্মবীরার শাসন চাপিয়ে দিয়েছিলেন যখন, তখনও চন্দ্রকান্ত বলবন্ত রাওয়ের ছবি যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, আজও তারই পুনরাবৃত্তির লক্ষণ পরিস্ফুট হচ্ছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন পাঁচদলীয় ক্ষমতালোভীদের হামলা-হামলির প্রেক্ষাপটেই এবার চ্যবন সাহেবের আত্মপ্রকাশ বেশ হৃষ্টপুষ্ট বোধ হল। কেন না তিনি ঐ রাজ্যের ঘটনাবলী নিয়ে মস্করা করেছেন। অবশ্য দোষ তাঁর নয়, পশ্চিমবঙ্গেরই। স্বয়ং রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর কিছু শিথিল বক্তব্য তাঁকে ঐ মস্করার সুযোগটি করে দিয়েছে।

কথাটা পেড়েছিলেন সংসদ সদস্য সমর গুহ মহাশয়। গুহ মহাশয় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত অসহায় বোধ করছেন, কেন না ফ্রন্টের বড় শরিক নাকি আইন-শৃঙ্খলার পঞ্চত্বপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করেছেন। চ্যবন সাহেব তখন মস্করা করে বললেন: মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং যখন নিজের এই অসহায় অবস্থা সৃষ্টি করেছেন তখন আমি আর কী করতে পারি।

রাজ্যে রাজ্যে মন্ত্রিসভা ভাঙার চেষ্টা

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁরই দলভুক্ত, বর্তমানে বিরোধী কংগ্রেসী শ্রীমানুভাই প্যাটেল অভিযোগ এনেছেন এই বলে যে, প্রধানমন্ত্রী নাকি কয়েকটি রাজ্যে মন্ত্রিসভা ভেঙে স্বদলভুক্তদের জায়গা করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। শ্রীপ্যাটেলের বক্তব্য গুজরাট, মহীশূর এবং উত্তর প্রদেশের ইঙ্গিত ছিল। রাজনৈতিক মস্করার এ হল আর এক পিঠ। অর্থাৎ মানুভাইরা কিছুদিন আগেও হাতে হাত মিলিয়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন। অদৃষ্টের পরিহাস, আজ এক কংগ্রেসী অসহায়ের মতো অভিযোগ করছেন আর এক কংগ্রেসীর বিরুদ্ধে এই বলে যে, দ্বিতীয় কংগ্রেসী প্রথম কংগ্রেসীর পাকা ধানে মই দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে হাসবার ন্যায্য অধিকারী জনগণ, তবুও তাঁরা হাসতে পারছেন না। তাঁদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যাঁরা নেতা সেজেছেন তাঁরা যে লঙ্কা ভাগ করতে করতে দেশটার কী 'হাল' করতে চলেছেন, সে সব দেখে বাস্তবিক জনগণ আতঙ্কিত এবং অসহায় বোধ করছেন। নেতারা তো ক্ষমতার ভাগ নিয়ে মশগুল, হতভাগা জনসাধারণের কী হবে॥ তাঁদের প্রশ্ন, রাবণে বিভীষণে সোনার ভারত তো পোড়াচ্ছে, গোটা দেশে কোথাও গণস্বার্থে উন্নতির লক্ষণ নেই। দেশ

জুড়েই প্রশাসন হাত-পা-ভাঙা দ’। দেশ জুড়েই বিশৃঙ্খলা এবং লোভের শকুনের প্রসারিত ডানার অন্ধকার। এমতাবস্থায় কে কাকে দুষবেন

চ্যবন সাহেব হাসছেন, অজয়বাবুর দুর্দশা (?) দেখে। আবার, অকংগ্রেসীরা হাসছেন চ্যবন সাহেবদের কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি দেখে। চ্যবন সাহেব উদ্বিগ্ন, কোথায় ধানকাটা নিয়ে শরিকী বিবাদের প্রভাতী সংবাদ পড়ে। আবার অন্য তরফ উদ্বিগ্ন চ্যবন সাহেবদের ক্ষমতা দখলের শিবির সজ্জা দেখে। কিন্তু এসবের সঙ্গে দেশবাসীর সম্পর্ক কি? দেশব্যাপী নেতাভেকধারী বর্গীর প্রভাবে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং উন্নতি বিগড়ে গেছে। কয়েকটি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণে দেশবাসীর অবস্থার উনিশ-বিশ হচ্ছে না। মিথ্যে বাগাড়ম্বরই হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেশপরিচালনার একমাত্র হাতিয়ার।

মস্করাটি ভারত জুড়ে জমেছে ভালো, তবে একথাও সত্যি যে, এর জবাবটিও বড়ো সাংঘাতিক। ক্ষমতা-উন্মত্ত ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ যদি সেই সত্যটা ভুলে যান, তবে স্বরাষ্ট্রীয় লগুড়ে পরে দেশ সামলানই দায় হয়ে দাঁড়াবে।

সি বি গুপ্তের রাজত্ব গেল

শেষ পর্যন্ত সি বি গুপ্তের (সিণ্ডিকেটপন্থী কংগ্রেস) মুখ্যমন্ত্রিত্ব আর টিকছে না, ইন্দিরাপন্থী কমলাপতি ত্রিপাঠী বি কে ডি নেতা উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিং-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গুপ্ত সরকারের গঙ্গাযাত্রার আয়োজন পাকা করে এনেছেন। বলেছেন তাঁর সঙ্গে ষোলজন মন্ত্রীর গুপ্ত মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার পর উত্তর প্রদেশ গুপ্ত মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং শ’খানেক বিধানসভা সদস্য (কং) তাঁর সঙ্গে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনে থাকবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু তারও থেকে বড় কথা, চরণ সিং জানিয়েছেন তিনি ইন্দিরাপন্থী কমলাপতির সঙ্গে কোয়ালিশনে বসবেন।

দাবি উঠছে সি বি গুপ্তকে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অবিলম্বে সভা আহবান করতে নির্দেশ দিন রাজ্যপাল।

ওদিকে রাজ্যপাল শ্রীরেড্ডী সভা ডাকতে মনস্থ করেছেন আগামী ফেব্রুয়ারীর ১১ তারিখে। আর শ্রীগুপ্ত বলছেন, সব ঠিক হ্যায়, বিভ্রান্তিকর প্রচারে তাঁর দল যেন কর্ণপাত না করেন।

মোট অবস্থা এই যে, ইন্দিরাপন্থীদের বি কে ডি-র সঙ্গে আঁতাতের পর গুপ্ত ক্যাবিনেট সম্প্রসারিত করেও বজায় রাখা শক্ত হ’ল।

তবে খুব সহজে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে বলেও মনে হয় না। কারণ সি বি গুপ্তের পক্ষাবলম্বন করতে (শর্তাধীনে) রাজী আছে জনসঙ্ঘ তার ৪৬ জন সদস্য নিয়ে। আর এস এস পি-র অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণে গুপ্তের কোন অসুবিধে হবে না এই বলে শ্রীগুপ্ত এস এস পি-রও (৩২ সদস্য) সমর্থন টানবেন। নিজের সমর্থক সংখ্যা ১৫০ জন। তাছাড়া গুপ্তের আশা, কতিপয় বি কে ডি সদস্যও তাঁকে সমর্থন জানাবেন। সমর্থন জানাবেন কয়েকজন নির্দলীয় এবং ছুটকো কিছু দলীয় সদস্য এবং দল। সুতরাং চরণ সিং-কমলাপতির উচ্চাশা ফলবতী হওয়ার পথে আরও কিছু টোপ, পাল্টা টোপ ও তার পরে আরও টোপের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ গুপ্ত মন্ত্রিসভা ভাঙতে ইন্দিরাগোষ্ঠীকে বেশ বেগ পেতেও হবে।

সুব্রহ্মণ্যমের সংকট

পাঁচ সপ্তাহের প্রেসিডেন্ট (কংগ্রেস দলের) শ্রীসুব্রহ্মণ্যমও সংকটের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। ইন্দিরা-কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে নন্দিনী সৎপতি, কে আর গণেশ এবং চন্দ্রজিৎ যাদবের অন্তর্ভুক্তিই এই সংকটকে ঘনীভূত করে তুলছিল। উপরন্তু সুব্রহ্মণ্যমের একটি বেফাঁস উক্তি ঘটনার গতিকে দ্রুততর করে দিয়েছে। উল্লেখিত সদস্যত্রয়কে নিয়ে যথেষ্ট ছোটবড় কথা হয়েছে, এমন কি তাঁদের কোনও বিদেশী এমব্যাসীর দালাল বলেও বর্ণনা করা হয়েছে, আর যখন এই সব হচ্ছে তখনই তলবী কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি বলে ফেলেছেন, সি ডব্লু সি-র সদস্য নির্বাচনে কিছু গলদ রয়ে গেছে। আর উপায় কি, এতোবড় কথার পর অভিযুক্ত তিনজন সম্ভ্রমের সঙ্গে সদস্য পদে থাকেন কেমন করে। তাঁরা কড়া ভাষায় চিঠি লিখে পদত্যাগের বাসনা প্রকাশ করেছেন, যদিও সুব্রহ্মণ্যম সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণে গররাজি।

কিন্তু ঘটনাক্রম যেমন সহজ সরল মনে হচ্ছে, ঠিক ততটা নয়। ঐ তিন সদস্যের বিপক্ষে একদলের সোচ্চার বিরুদ্ধবাদের প্রধান কারণ, তাঁরা ‘এককালে কম্যুনিস্ট আছিলেন’ এবং সেই যোগসূত্র বর্তমানেও বর্তমান। চিন্তার কথা সুতরাং। অশোক মেহতা সোস্যালিস্ট ‘আছিলেন’, তবে কেউ. ত নিয়ে মাথা ঘামান নি। কারণ ‘সোস্যালিস্ট’ শব্দটির সঙ্গে ভীতির কোন সম্পর্ক নেই। ঐ নামটা নামাবলী হলেও সমালোচকদের সঙ্গে ওর চরিত্রগত বিবাদ সম্ভবত অবর্তমান। একজন সোস্যালিস্ট যেমন ক্ষমতাচক্রে কীর্তিত ‘শোষিত’ বনতে পারেন, একজন কম্যুনিস্টের পক্ষে ততদূর সম্ভব হয় না, তিনি খুব জোর সংশোধনবাদী হয়ে নেহরুজীর নেতৃত্ব গ্রহণে অথবা ইন্দিরা-কংগ্রেসের কোয়ালিশনে বসতে রাজী। সুতরাং ঐ তিন ব্যক্তির সি ডব্লু সি-তে অন্তর্ভুক্তিতে কায়েমী স্বার্থের চিন্তার কারণ স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। সুতরাং সংকটও দেখা দিয়েছে।

সংকট মূলেই ছিল। সঞ্জীবায়াকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডীর প্রাধান্যে সুব্রহ্মণ্যমকে প্রেসিডেন্ট পদে গ্রহণ করাতেই একতরফা সংকটের সৃষ্টি। সুব্রহ্মণ্যম অবশ্য ঝট করে ম্যানেজ করেছেন ব্যাপারটা এই বলে যে, তিনি অধিককাল চেয়ার আঁকড়ে বসে থাকতে নিজেই রাজী নন। স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছে।

কিন্তু তাতেই কি সব হল, যে তরুণ তুর্কদের মাতামাতিতে সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে সমরসজ্জা হয়েছিল ‘সলিড’; সুব্রহ্মণ্যমের সি ডব্লু সি-তে তাঁদের স্থান হল না, হল সেই যথাপূর্বং বৃদ্ধ নবরত্ন সভা। শুধু তাতেই শেষ নয়, গুজরাটের রাজনীতিতে একটি পা পাতার জায়গা রক্ষা করার জন্যে গ্রহণ করা হল বরোদার মহারাজা ফতে সিং গায়কোয়াড়কে। কতিপয়ের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল একই সুবিধাবাদী সাংগঠনিক চেহারা। অর্থাৎ চারিত্রিক দৌর্বল্যের সংস্কার হল বলে যে আশা মুখিয়ে উঠেছিল, নয়া সি ডব্লু সি-র চেহারা দেখে সেই আশার আলো ম্লান হয়ে এলো। গান্ধী সমর্থকদের মুখ থেকেই (বক্তা—চন্দ্রশেখর) ব্যঙ্গাত্মক ধ্বনি শোনা গেলঃ আ মশায়, এ যে দেখছি নতুন মোরারজী এলেন গো! অর্থাৎ টি টি কৃষ্ণমাচারির বক্তৃতা দেশাই সাহেবের এতাবৎকাল উচ্চারিত ভাষণেরই কপি বলে মনে হল কারও কারও।

সুতরাং ভেঙে যা গড়া হল তাও সেই পুরনো কাঠামোর ওপর একই এঁটেল মাটিতে দোসরা ডিজাইন বলে অনেকেই ভাবলেন। সংকট কাটল না। ড্রপ সীন পড়ল না। (২৮-১১-৬৯)

বসুমতীর
যাবতীয়
গ্রন্থ ও
গ্রন্থাবলীর
প্রাপ্তিস্থান
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২
এবং
সান্যাল এণ্ড কোং
১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে জেরার্ড স্মিথ ও সেমিওনোভ

ফিনল্যান্ড ঃ

ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে এখন ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশ্বের দুই প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের প্রতিনিধিরা ১৭ই নভেম্বর থেকে আলোচনা সুরু করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য। এই আলোচনার নাম দেওয়া হয়েছে স্ট্র্যাটেজিক আরমস লিমিটেশন টক্স্ Strategic Arms Limitation Talks, বা সংক্ষেপে SALT)।

নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা আজ নতুন নয়। ১৮৯৯ সালে হেগ সম্মেলনের সময় থেকে এই চেষ্টা চলে আসছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে যুদ্ধজয় হলেও, ধ্বংসলীলার বীভৎসতায় সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েট য়ুনিয়ন পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ করার পর পরমাণু শক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটে, এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা, মতভেদ ও ঠান্ডা লড়াই-এর দরুণ উভয় পক্ষের মধ্যে অস্ত্রনির্মাণের প্রতিযোগিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার পর একে একে বৃটেন (১৯৫২), ফ্রান্স (১৯৬০) ও চীন (১৯৬৪) পরমাণু অস্ত্র নির্মাণে সক্ষম হয়। বিপজ্জনক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের ফলে বিশ্বশান্তির বিপদ ও অস্বাভাবিক সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য নিরস্ত্রীকরণের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘও উদ্যোগী হয়। গত কয়েক বৎসরে নিরস্ত্রীকরণের জন্য অনেক সম্মেলন হয়েছে, কিছু কিছু সিদ্ধান্ত ও চুক্তিও হয়েছে। তথাপি, এই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি যুদ্ধাস্ত্র, বিশেষ করে অতি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাপক ধ্বংসক্ষম নানান ধরণের পরমাণু অস্ত্রনির্মাণও অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমানে দুই প্রধান পক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন আলোচনা সুরু করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ বা স্ট্র্যাটেজিক যুদ্ধাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের পন্থা উদ্ভাবনের জন্য। এই প্রশ্নে ঐক্যমত হলে, এর থেকেই ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। প্রধান দুই শক্তি একমত হলে অন্য সব পরমাণু-রাষ্ট্রের ওপরে তার প্রভাব পড়বে। রাষ্ট্রসঙ্ঘও সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

স্টকহোলমের 'আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা কেন্দ্র' (ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট) সম্প্রতি সামরিক ব্যয় ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে যে-সব তথ্য প্রকাশ করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শান্তি গবেষণা কেন্দ্রের তথ্য থেকে জানা যায় ঃ

১৯৬৪ সালে সমগ্র বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৩২ বিলিয়ন ডলার। আর গত পাঁচ বৎসরে তা বেড়ে ১৯৬৯-এ এই ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮৫ বিলিয়ন ডলার। এই বাড়তি ৫৩ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে নয়-দশমাংশই ব্যয় হয় 'ন্যাটো' ও ওয়ারশ চুক্তি গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির দ্বারা। ১৯৬২ সালের তুলনায় সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯০০ সালে বিশ্বের মানুষের প্রয়োজনের সব কিছু মিলিয়ে যা উৎপাদন হত, তার যা অর্থমূল্য, এখন যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের মোট অর্থের পরিমাণ তাই। যুদ্ধাস্ত্রের জন্য বর্তমানে যে ব্যয় করা হচ্ছে, তা লাতিন আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও নিকটপ্রাচ্যের সব দেশের সব লোকের আয়ের মোট পরিমাণের সমান।

এই তথ্য থেকে আরও জানা যাচ্ছে ঃ

সকল দেশের সামরিক বাজেটে মোট যে অর্থ ব্যয় করা হয়, শিক্ষার জন্য তার তিন ভাগের দুই ভাগ, এবং স্বাস্থ্যের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ অর্থ ব্যয় করা হয়। যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে যখন এই বিরাট অর্থব্যয় হচ্ছে, তখন বিশ্বের শতকরা ১৬ জন লোক অনাহারে রয়েছে, এবং শতকরা ৫০ জন পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। আর, বিভিন্ন দেশে বর্তমানে ২০,০০০,০০০ লোক সৈন্যবাহিনীতে রয়েছে, এবং আরও ৩০,০০০,০০০ আনুষঙ্গিক সামরিক কাজে নিযুক্ত আছে।

হেলসিঙ্কিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন, উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এবারের নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা সুরু করেছেন। ২৬ জন সদস্যের মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করছেন গেরার্ড স্মিথ। আর, সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের নেতা হলেন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যাডিমির সেমিওনোভ।

এই বৈঠক উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ থেকে ২২০ জন বিদেশী সাংবাদিক হেলসিঙ্কি এসেছেন। এর থেকেই এই আলোচনার গুরুত্ব বোঝা যাবে। তবে প্রতিনিধিরা সাংবাদিকদের বিশেষ কিছু বলছেন না। তাঁরা এখন গোপনে আলোচনা চালিয়ে যেতে চান।

তবে যে সব খবর পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা চলছে। আলোচনাকালে কোন পক্ষই অপর পক্ষকে আক্রমণ করে কোন বক্তব্য রাখছেন না। এমন কি, আলোচনার পরিবেশ যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য উভয় দেশের পত্র-পত্রিকাতেও কোন পক্ষকে সমালোচনা করা হচ্ছে না। সোভিয়েট সংবাদপত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা পর্যন্ত কমে গেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স ২৬শে নভেম্বর এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে হেলসিঙ্কি বৈঠক সম্পর্কে

বলেছেন, আলোচনার গতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুশি। এ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে, এবারের আলোচনা তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল। কোনরূপ তিক্ততা নেই, আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা চলছে।

এই একই সুরে কথা বলেছে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা'। ২৩শে নভেম্বর 'প্রাভদায়' লেখা হয়েছে : হেলসিঙ্কি আলোচনা সফল হবে। কার্যকরী ফল পাওয়া যাবে। আলোচনার পরিবেশ ভাল। 'প্রাভদা' আশা প্রকাশ করেছে, নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলে, তার দ্বারা বৃহত্তর ক্ষেত্রে মার্কিন-সোভিয়েট সম্পর্কের উন্নতি হবে।

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য 'প্রাভদা' এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছে যে, 'ন্যাটো' গোষ্ঠীর কয়েকটি রাষ্ট্র, এবং মার্কিন শিল্পপতিদের একাংশ যারা যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে লিপ্ত তারা হেলসিঙ্কি আলোচনাকে ব্যর্থ করার জন্য চক্রান্ত করছে। নানাভাবে তাদের প্রয়াস চলছে।

তথাপি, এই আলোচনা সফল হবে বলেই আশা করা হচ্ছে। হেলসিঙ্কির পর প্রয়োজন হলে উভয় পক্ষ কিছুদিন পরে আবার ভিয়েনা বা জেনেভায় মিলিত হবেন।

ইতিমধ্যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন ১৯২৫ সালের 'জেনেভা কনভেনশন' অনুযায়ী যুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায়, 'প্রাভদা' সন্তোষ প্রকাশ করেছে। 'প্রাভদা' বলেছে, 'দেরিতে হলেও' এটি একটি ভাল কাজ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

১৯৭২ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওকিনাওয়া সহ সমগ্র রিয়ুকু দ্বীপপুঞ্জ জাপানকে ফিরিয়ে দেবে। গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী এসাকু সাটোর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের তিনদিনব্যাপী আলোচনার পর সরকারীভাবে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল : নিক্সন-সাটো চুক্তিতে লাভ কার হল? জাপান ওকিনাওয়া ফিরে পাবে ঠিকই, কিন্তু কোন মূল্যের বিনিময়ে?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর জাপানের কাছ থেকে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে রিয়ুকু দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখল করে। এই দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় দ্বীপ ওকিনাওয়া। জাপানকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করার পরেও ওকিনাওয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি।

ওকিনাওয়া জাপানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মার্কিন দখল থেকে এই অঞ্চলকে উদ্ধার করার দাবিতে জাপানের জনগণ ঐক্যবদ্ধ। তারা বারে বারে আন্দোলন করেছে, বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছে জাপানের ছাত্রসমাজ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওকিনাওয়া দ্বীপকে একটি যুদ্ধঘাঁটিরূপে ব্যবহার করছে। এই দ্বীপে মোট ১৪৮টি সামরিক কেন্দ্র রয়েছে। এখান থেকে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সামরিক উপকরণ প্রেরণ করা হয়। হাইড্রোজেন বোমাবাহী বি-৫২ বোমারু বিমানের প্রধান ঘাঁটি এখানে। তাছাড়া ৩২টি আই-আর-বি-এম ও সাবমেরিন-বিধ্বংসী দূরপাল্লার অস্ত্র রয়েছে। জাপানীদের বিক্ষোভের এটাও একটা বড় কারণ।

এসাকু সাটো ও তাঁর সরকার সম্পর্কে বামপন্থী মহল ও ছাত্রদের বক্তব্য, তাঁরা ওকিনাওয়া ও মার্কিন যুদ্ধঘাঁটির প্রশ্নে দুর্বল নীতি অনুসরণ করছেন। মার্কিন সরকারের ওপর যথেষ্ট চাপ দিচ্ছেন না। বামপন্থীরা জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তিরও বিরোধী। আগামী বৎসর এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। তারপর আর যাতে এই চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো না হয়, তার জন্য আন্দোলন চলছে।

১৭ই নভেম্বর এসাকু সাটো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হন। সেদিন সারা টোকিওতে সাটোর বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ছাত্ররা এই বিক্ষোভের উদ্যোক্তা। হাজার হাজার ছাত্র টোকিও বিমানবন্দর ঘিরে রাখে। তারা নিক্সনের পদতলে আত্মসমর্পণ করার জন্য সাটোকে যেতে দেবে না। কিন্তু সাটো যাবেনই। পথ বন্ধ। সাটো হেলিকপ্টারে করে বিমানবন্দরে উপস্থিত হলেন। ছাত্ররা প্রায় বিমানবন্দর দখল করে ফেলেছিল। কয়েক সহস্র পুলিশ ছ' ঘণ্টা চেষ্টাব পর ছাত্রদের সরিয়ে সাটোর জন্য পথ করে দেয়। সেদিনের বিক্ষোভে দু'শ জন আহত হয়েছে, আর গ্রেপ্তারের সংখ্যা দু' হাজারেরও বেশি।

এত কাণ্ড করে সাটো ওয়াশিংটন এলেন। নিক্সন রাজী হয়ে গেলেন, ওকিনাওয়া সহ রিয়ুকু দ্বীপপুঞ্জ জাপানকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, ১৯৭২ সালের মধ্যে।

স্বাভাবিকভাবেই এসাকু সাটো খুশি। তিনি এখন বুক ফুলিয়ে তাঁর দেশবাসীকে বলতে পারবেন : দেখো, ওকিনাওয়া আদায় করে নিয়ে এলাম। জাপানীরাও নিশ্চয়ই খুশি হবে।

কিন্তু এই সঙ্গে ঠিক হয়েছে, ওকিনাওয়ায় মার্কিন যুদ্ধঘাঁটি থাকবে। জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তির সর্ত অনুযায়ী যুদ্ধঘাঁটিতে পরমাণু অস্ত্র রাখতে হলে, জাপ সরকারের অনুমতি প্রয়োজন হবে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের খাতিরে জাপ সরকার তাতে রাজী হবেন।

জাপানের পক্ষে সাটো নিক্সনের কাছে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রথম, জাপান এশিয়ার নিরাপত্তা কর্মসূচীতে বেশি করে অংশ গ্রহণ করবে। অর্থাৎ, কমিউনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে সৈন্য প্রেরণ, অস্ত্র সরবরাহ, সাহায্যদান প্রভৃতি কাজে অংশ নেবে। আর এই কাজ করার জন্য ১৯৭২ সালের পর জাপানের সামরিক বাজেট দ্বিগুণ করা হবে। দ্বিতীয়ত, জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে। সাটো জাপ ডায়েটকে (সংসদ) দিয়ে এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব পাশ করাবেন। তৃতীয়ত, অল্পব্যয়ে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ধরণের জাপানী কাপড় মার্কিন বাজার ছেয়ে ফেলেছে। ফলে মার্কিন বস্ত্রশিল্পের ক্ষতি হচ্ছে। সাটো কথা দিয়েছেন, কম দামী জাপানী কাপড় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রয় করা হবে না।

এই সব সর্ত জাপানের জনগণ কতটা মানবে, বলা শক্ত। ওকিনাওয়া দ্বীপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে দেবে ঠিকই, কিন্তু তার বিনিময়ে সমগ্র জাপানকে সে তার এশীয় সামরিক পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করছে। জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চৌকিদাররূপে কাজ করবে।

জাপানকে এভাবে আবার সমরবাদী শক্তিতে পরিণত করার প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলের অনেক মার্কিন বন্ধুও ক্ষুব্ধ। ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়ায় বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাদের প্রশ্ন : জাপান যদি আবার যুদ্ধবাদী হয়ে ওঠে, তবে এই অঞ্চলের ভারসাম্য রক্ষিত হবে তো? শান্তি থাকবে তো?

—২৯।১১।৬৯

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় হরপ্রসাদ মিত্রের 'বই বাছাই, বাংলা বইয়ের মেলা' ও 'অগ্নিবর্ণ'-এর 'তিমিরপ্রান্ত জুয়ার্ন' প্রকাশ করা গেল না।

—সম্পাদিকা

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি রহস্য নাটকের অভিনয় সুরু হয়েছে। রহস্য নাটকের মজা হ'ল নাটকের শেষ পর্যন্ত আপনাকে ধৈর্য সহকারে দেখে যেতে হবে. তারপর যবনিকা পতনের পূর্ব মুহূর্তে নাটকের চরিত্র, বিষয়বস্তু সব বুঝতে পারা যাবে। রহস্য নাটকের ধর্ম হ'ল নাটকের চরিত্রগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাকে ধীরে ধীরে এক রহস্যলোকে নিয়ে যাবে, আপনার মনে একটার পর একটা প্রশ্ন দেখা দেবে, চরম কৌতূহল সৃষ্টি হবে—কিন্তু হাতে হাতে কোন প্রশ্নের জবাব পাবেন না বা রহস্যের গিট খুলে যাবে না।

রহস্য নাটকের সুরু অবশ্য হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই—এখন যে নাটকের কোথায় এসেছি সেই কথাও বলা যাবে না, কারণ রহস্য নাটকের অপর মজা হ'ল আপনি বুঝতে পারবেন না, ঠিক কখন কি পরিস্থিতিতে নাটক শেষ হবে। নাটকে কে সাধু আর কে খুনী, কে অপরাধী আর কে নিরপরাধ—এখন তার কিছুই বোঝা যাবে না।

রাজ্য-রাজনীতির রহস্য নাটকের দর্শকদের মনে গভীরভাবে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের অনশনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সারা ভারতে এই প্রশ্ন আলোচনায় সরগরম অবস্থা—কি ব্যাপার মুখ্যমন্ত্রী নিজের রাজ্যের অবস্থা মোকাবিলা করতে না পেরে অনশন করবেন এ কি রকম কথা! এর পেছনে রহস্যটা কি? গবেষকরা গবেষণায় বসলেন এবং একটি মহল বললেন—তাঁরা রহস্যলোকের চাবি পেয়েছেন। মূল রহস্য হ'ল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সি পি এম-কে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করতে চান. এ হ'ল তারই প্রস্তুতি। সি পি এম-কে কিভাবে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, তারও বহু নজির ও কার্যকরণ পাওয়া গেল। যথা, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যেদিন দিল্লী গেলেন, সেইদিনই পশ্চিমবঙ্গে এ্যাড হক কংগ্রেস গঠনের কথা ঘোষিত হয়, —মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে "গোপনে" কথা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লী যাত্রার পরই রাজ্যের মুখ্যসচিব দিল্লী যান। এরপর আর যায় কোথায়? এতগুলি সূত্র পেয়ে চারদিকে হৈ-হৈ—পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট গেল। শুধু গেল বললেই তো যায় না, দিন তারিখ বলতে হবে। গণৎকাররা বসে গেলেন পাঁজিপুঁথি নিয়ে। এখানেও আবার দুটো মত হ'ল। একমত বললেন, তাঁরা হিসাব করে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় দিল্লী থেকে ফিরেই বা দিল্লী থাকতেও হতে পারে, একখানি চিঠি লিখে শ্রীজ্যোতি বসুর কাছ থেকে স্বরাষ্ট্রদপ্তর নিয়ে নেবেন; তারপর সি পি এম মন্ত্রিসভা ছেড়ে দেবে, তখন সি পি এম-কে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়ে যাবে। অন্য মতের যাঁরা, তাঁরা বললেন, ব্যাপারটা আরও একটু পরে হবে। ৩রা তারিখ রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আসছেন, তিনি ৬ই চলে যাবেন। তিনি চলে যাবার পর এই সরকার ভাঙবার কাজ হবে। রাজ্যে গঠিত হবে মিনিফ্রন্ট সরকার, যে সরকারের সহায়তা করবে ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস। তাই তো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর গোপন কথা।

সরকার যাঁরা ভাঙছে বলে দিব্য-চোখে দেখতে পাচ্ছেন, তাঁরা তাঁদের দিব্য-দৃষ্টির সামনে আরো বেশ কিছু নজির পেয়ে গেলেন। তাঁরা মেলে ধরলেন সি পি এম দলের মুখপত্র 'গণশক্তি' ও 'দেশহিতৈষী'—যার প্রতি ছত্রে ঘোষণা করা হয়েছে—ক্যাডাররা প্রস্তুত হও, মাঠে-ময়দানে গ্রামে-শহরে, খামারে-কারখানায় সর্বত্র প্রস্তুত হও, আমাদের বাদ দিয়ে সরকার হলেই তীব্র গণ-আন্দোলন সৃষ্টি কর।

রহস্য নাটকে কখনও একটা দিক থাকে না, তাই আপাতদৃষ্টিতে যাকে সাধু মনে হয়, সেই হয়তো আসলে শয়তান! আবার যাকে শয়তান বলে চিনতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না, সেই হয়ত সাধু। এইভাবে যে নাটকে দর্শককে যত বোকা বানানো যায় সেই নাটকই তত সফল হয়ে ওঠে। এই মুখ্যমন্ত্রীর অনশন প্রসঙ্গে বিপরীত দিকের কথা হল। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলছেন তাঁর অনশন কোন দলের বিরুদ্ধে নয়, ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে নয়, তাঁর অনশন হ'ল হিংসার বিরুদ্ধে। এই তো সেইদিন বাদশা খাঁ দিল্লীতে তিনদিন অনশন করলেন। শ্রীমতী গান্ধী কি চিৎকার করেছিলেন—দিল্লীতে বসে বাদশা খাঁর অনশন তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। যে অজয় মুখোপাধ্যায়ের অনশন নিয়ে এত কথা, তিনিও তো সেদিন বাদশা খাঁর অনশনের সঙ্গে অনশন করেছিলেন, রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে কাজও করেছিলেন—কই তখন তো এই সব কথা শোনা যায় নি! সেইদিন অনশনের সময় তিনি যেমন মহাকরণে বসে কাজ করেছেন, এবারও অনশনের সময় কার্জন পার্কে বসে নিজের দপ্তরের কাজ করবেন। তবুও প্রশ্ন ওঠে—বর্তমান অনশনের প্রশ্নে এই সব কথা চলে না—উনি অনশন করছেন কেন? কিন্তু অনশনে অপরাধটা কোথায়? সব দলেরই প্রচার-অভিযানে একটা নিজস্ব পথ আছে—সি পি এম, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি এই দলগুলি বিগত কয়েক মাস ধরে অনেক সভা-সমাবেশ করেছে. সেই সভা-সমাবেশে সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল লাঠি, তীরধনুক, সড়কী, বল্লম, বর্শা, টাঙী এই সবের প্রদর্শনী। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকের বাহিনী তৈরি হয়েছে, তাদের হাতের তেল মাখানো লাঠি রৌদ্রতেজে বিদ্যুতের মত চমক দিয়েছে। সেইগুলি দেখে কবে কে বলেছেন সরকার গেল গেল. কে কবে বলেছেন—ও লাঠি, তীর, বল্লম, সড়কী সব হল সরকার ভাঙবার অস্ত্র। কেউ সেই কথা বলেন নি, বরং সেই সশস্ত্র-বাহিনীর গার্ড অব অনার নিয়ে দল-নেতারা বলেছেন : এই বাহিনী হ'ল যুক্তফ্রন্ট সরকার রক্ষার গ্যারাণ্টি।

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়, তাদের কথা হ'ল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় প্রশাসনের সর্বোচ্চ আসনে বসে অনশন করতে পারেন না। কিন্তু কেন পারেন না? শ্রীজ্যোতি বসু শ্লেষভরে বললেও যা বলেছেন. সেটাই সত্য কথা যে, কেউ যদি উপবাস করেন. কেউ যদি ভগবানের প্রার্থনা করেন সেখানে কার কি বলার থাকতে পারে? নিশ্চয়ই এই অনশনকে সমালোচনা করবার, হয়ত নিন্দা করবার অনেক যুক্তি থাকতে পারে, বিপক্ষে অনেক কথা বলার থাকতে পারে—কিন্তু কেউ যদি আত্মনিগ্রহের পথে যান. সেখানে কি বলার থাকতে পারে?

এই তো সেদিন দর্শন সিং ফেরুমান অনশন করে প্রাণ দিলেন—তখন কি কেউ বলতে পেরেছেন যে, দর্শন সিংয়ের অনশন বড় অন্যায় কাজ হচ্ছে।

আচ্ছা ব্যাপারটা একটু উল্টোভাবে হ'লে কি রকম হত। কল্পনা করুন, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের হানাহানি বন্ধের শুভ প্রচেষ্টায় অনশন করছেন। সব দলই বলুন না যে, অনশনের পথের সঙ্গে আমাদের মতের মিল না থাকতে পারে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় আমরা তাঁর পিছনে আছি। এই কথা কারো স্বীকারের অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষ খুনের সংখ্যা বেড়েছে, হিংসার পথে বা গায়ের জোরে সব সমস্যা মোকাবিলা করার প্রবণতা বেড়েছে—তার থেকে যদি মানুষের মন ফেরাবার চেষ্টা কেউ করেন, তবে তাঁর সবটাই নিন্দনীয় হবে কেন? গান্ধীজী এই কলকাতাতে ১৯৪৬ সালে বেলেঘাটায় অনশন করেছিলেন—কই তখন তো সোরাবর্দী সাহেব গান্ধীজীর কাজকে নিন্দা করতে মিছিল বের করেন নি। কিন্তু এখানে সমস্যাটা সম্ভবত আটকে গেছে অন্যত্র। সেটা কোন কর্মসূচীগত সমস্যা নয়, সমস্যা হ'ল নীতির। যে নীতির ফল হল—আইন না মেনে চলা, আইন ভাঙাকেই বিপ্লব বলে চালানো, স্বীকৃত নীতিকে অগ্রাহ্য করা, ধন-প্রাণের নিরাপত্তাহীনতা গা সওয়া করে নেওয়া। খুন হলে বিচার হবে না, ডাকাত পড়লেও পুলিশ আসবে না, নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলেও পুলিশ কোন গ্রাহ্য করবে না—সব মেনে নেওয়া যাবে, শুধু যাবে না, যদি কেউ এর প্রতিকারে এগিয়ে আসেন। সমস্যা হল একজন মনে করছেন মানুষের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা নেই, আর একজন মনে করছেন—যেটা নেই বলা হচ্ছে, ওটাই হ'ল আসলে থাকা। নেই বলাটা হ'ল ষড়যন্ত্রের অঙ্গ, নেই বলাটা হ'ল কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত শক্ত করার ব্যবস্থা। বাংলা কংগ্রেস অনশন করুক আর না করুক, অনশন-সত্যাগ্রহ আন্দোলন বহাল থাক অথবা মুলতুবী থাক, এই সবই হ'ল বাহ্য, কিন্তু এই চিন্তার সাম্য আসবে কোন পথে। ব্যাপারটা হ'ল প্রায় সেই রকম—যেমন, একজন ব্যক্তি খুব তর্কবাগীশ হয়ে উঠলো, যুক্তি ও তর্ক ছাড়া অন্য কথা সে বুঝতে রাজী নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, যদি জিজ্ঞাসা করা হ'ত মহাশয়ের নাম কি? অমনি তর্কবাগীশ মৌকা পেয়ে প্রশ্নকর্তাকেই চ্যালেঞ্জ করতো "তর্ক করুন"।

এ এক সাংঘাতিক ব্যাপার। কারও নাম, পিতামাতার নাম জিজ্ঞাসা করলে সে যদি সেটাও তর্ক না করে জবাব দিতে না চায়, তখন সেই ব্যক্তির সংগে যে কোন প্রশ্নে মীমাংসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্বীকার কেউ করুন আর না করুন, আজকে অনেকেই সেই তার্কিকের অবস্থায় নিজেদের নিয়ে গেছেন। মানুষ খুন হচ্ছে, খুনী ধরা পড়ছে না, জোর করে জমি দখল হচ্ছে, ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে, লুঠ, ঘরে আগুন দেওয়া জাতীয় ঘটনা হচ্ছে—সেই কথা বললেও যদি কেউ বলেন তর্ক করুন, তখন হাত জোড় করেই বলতে হয়— মহাশয় আপনার নাম ও পরিচয় জেনে আমার কাজ নেই। দয়া করে আপনার সঙ্গে তর্কের হাত থেকে রেহাই দিন।

রাজ্য-রাজনীতির আর এক রহস্য নাটক হল মিনিফ্রন্ট ও শ্রীজ্যোতি বসুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্রদপ্তর কেড়ে নেওয়া। রাজ্যে মিনিফ্রন্ট হবে না, করব না, করতে চাই না, হলেও শরিক হব না, এই কথা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রণেন সেন, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীসুশীল ধাড়া, শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, শ্রীমাখন পাল, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সকলে বারবার বলছেন, কিন্তু তবু একটা মহল থেকে এই চিৎকারে আকাশ-বাতাস মুখর করে তোলা হয়েছে। ডাঃ রণেন সেন একদিন আমায় বলেছিলেন: হনুমানের মত বুক চিরে তো দেখানো সম্ভব নয়, তবে কি করে ওঁদের (শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত) বোঝাই বলুন।

সত্য কথা বলতে কি, আমি আমার নিজের সামান্য অভিজ্ঞতায় মিনিফ্রন্ট বা জ্যোতি বসুর কাছ থেকে স্বরাষ্ট্রদপ্তর কেড়ে নেবার কোন লক্ষণ কোন পক্ষ থেকে অনুভব করি নি। কেউ হয়ত বলবেন—আপনি মশাই কোন্ বুঝনেওয়ালা যে, এই সব উচ্চ-জিনিষ বুঝবেন, ১৯৬৭ সালের ২রা অক্টোবর বুঝেছিলেন? এর জবাব হল—হ্যাঁ আমি বলে নই, আমাদের পেশার সহকর্মী বন্ধুরাই প্রকৃত সত্য বুঝেছিলেন এবং ২রা অক্টোবর কি হতে যাচ্ছে দিনক্ষণ-সময় নিয়ে কাগজগুলি লিখেছিল। সেদিন স্বয়ং এই সব মিনিফ্রন্ট-বাক্যবাগীশ নেতারা কাগজের কথা ১লা অক্টোবর পর্যন্ত মিথ্যে বলেছেন, কাগজের রিপোর্টারদের ষড়যন্ত্রকারী থেকে আরম্ভ করে আরও অনেক অ-কথা, কু-কথা বলেছিলেন। তাই সত্য কিছু হলে এতদিন ধরা পড়তো নিশ্চয়ই। কিন্তু সত্য কি এর বিপরীত দিকে কিছু নেই? অপরাধ নেবেন না কেউ, সত্য কিছুটা বিপরীত দিকেও আছে। সেই সত্য হ'ল আইন-শৃংখলা, খুন-খারাপী নিয়ে যখন চারদিকে হল্লা উঠে কোন একটা দলকে ডিফেনসিভ পজিশনে নিয়ে গেছে, তখন মিনিফ্রন্ট, স্বরাষ্ট্রদপ্তর নিয়ে নেওয়া এই সব কথা বলে ঐ দল নিজেকে অফেনসিভ পজিশনে আনতে চেষ্টা সুরু করে সফল হয়েছে। তাই যাঁরা সি পি এম-এর নামে দুয়ো না দিচ্ছিলেন, তাঁদেরই সকলকে একবাক্যে নিজেদের হনুমানের মত বুক চিরেও দেখাতে চেষ্টা করতে হচ্ছে—না আমরা মিনিফ্রন্ট করছি না, স্বরাষ্ট্রদপ্তর নিতে চাই না। আজকের পরিস্থিতিতে আমার কথা হল—কিছু লোক ভাবতে সুরু করেছেন মাসির গোঁফ উঠছে আর মাসি রাতারাতি মামা হয়ে যাচ্ছেন—গোঁফ হয়ত উঠছে বা তার সম্ভাবনা যে না আছে এমন নয়, কিন্তু তাঁরা একটা কথা বাদ দিয়ে ভাবছেন—শুধু গোঁফ উঠলেই মাসি মামা হয় না, অংগ-প্রত্যংগের আরও অনেক পরিবর্তন দরকার হয়। সরকার ভাঙছে বলে যাঁরা এত কথা বলছেন, তাঁরা সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু গোঁফই দেখছেন। কিন্তু শুধু গোঁফ দিয়েই বা কি হবে?

—২১শে নভেম্বর, '৬৯

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী

বিদ্যাপতির সমগ্র পদ
মূল্য: চার টাকা

জ্ঞানদাসের সমগ্র পদ
মূল্য: দুই টাকা

গোবিন্দদাসের সমগ্র পদ
মূল্য: দুই টাকা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সান্যাল এণ্ড কোং
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

স্বাস্থ্য বিভাগের প্রমোশন রহস্য

সুনীল ঘোষ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বছর দুই আগে কলকাতার কয়েকটি হাসপাতালে পর পর কয়েকজন রোগী টিটেনাসে আক্রান্ত হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করায় শহরে যথেষ্ট উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। তখন দেখা গেল হাসপাতালের পরিবেশ এত অস্বাস্থ্যকর যে, টিটেনাসের হাত থেকে রোগীদের রক্ষা পাওয়া অসম্ভব বললেই চলে। এক শ্রেণীর কর্মচারী হাসপাতালের প্রাঙ্গণে বিরাট বস্তি গড়ে তুলে সেখানে শুয়োর পুষছেন, ভাটিখানা চালাচ্ছেন এবং যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করছেন। তখন সেই বে-আইনী বস্তিগুলো তুলে দেবার দাবি ওঠে, কিন্তু আজও সেই দাবি পুরোপুরি পূরণ করা হয় নি। হাসপাতালের কর্মীদের জন্য হাসপাতালের প্রাঙ্গণে কোয়ার্টার তৈরি করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। কিন্তু সেই কোয়ার্টারগুলো যাতে বীজাণুজনন কেন্দ্র হয়ে উঠতে না পারে, সেদিকে নজর রাখা উচিত।

গত ২৪শে নভেম্বর আমি নিজের চিকিৎসার (পাইল্‌স্‌) জন্য আর-জি-কর হাসপাতালের আউটডোরে গিয়েছিলাম। সেখানে যে দৃশ্য আমার নজরে পড়ে তাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নির্মম ঔদাসীন্য দেখে আমি অবাক না হয়ে পারি নি। হাসপাতালের গেট থেকে সার্জিকাল আউটডোরে যাবার ক্ষুদ্র সড়কটির ওপর দীর্ঘকাল ঝাঁটার স্পর্শ পড়ে নি। বাইরে সিঁড়ির নিচে ধুলো এবং ময়লা জমাট বেঁধে এক ফুট উঁচু হয়ে আছে। আর বেলগাছিয়া ব্রিজের দেওয়াল এবং হাসপাতালের সীমানার মধ্যে যে বিরাট নর্দমা রয়েছে, সেটা বোধ হয় বছরখানেক সাফ হয় নি। বিষাক্ত পাঁক জমে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ঠিক তার গা ঘেঁষে রয়েছে ওষুধ তৈরির ডিসপেন্সারী। ঐ পাঁক এবং ধুলোর মধ্যে যে টিটেনাস এবং অন্যান্য ছোঁয়াচে রোগের বীজাণু কিলবিল করছে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আউটডোরের যে-কোন রোগী যে-কোন মুহূর্তেই যে ছোঁয়াচে রোগের কবলে পড়তে পারেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আমি জানি, সেই নোংরা আজও সাফ করা হয় নি। ননীবাবু ইচ্ছে করলেই গিয়ে দেখে আসতে পারেন। হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার দায়িত্ব কার তা আমি জানি না। আর-জি-কর হাসপাতালের কোন পদাধিকারীর ওপর যদি তেমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে তিনি শোচনীয় অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁকে সেই পদ থেকে অবিলম্বে অব্যাহতি দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলেই আমার মনে হয়।

শুধু ধুলোবালি আর পাঁক সাফ করলেই হাসপাতাল জীবাণুমুক্ত হবে এমন আশা করার কোন কারণ নেই। সম্প্রতি টালীগঞ্জ বাঙুর হাসপাতালে কয়েকজন ডাক্তারের যে অমানুষিক ক্রিয়া-কলাপের নজির পাওয়া গেছে তাতে সন্দেহ হচ্ছে, আমরা বোধ হয় এখনও বর্বর যুগে বাস করছি। গত ৯ই নভেম্বর পার্থ দাশগুপ্ত নামক ১২ বছরের ছেলে যখন তার বাড়ির গেটে দাঁড়িয়েছিল, সেই সময় কালীপুজো উপলক্ষে পাড়ার ছেলেদের ফাটানো একটি বোমার টুকরো এসে লাগে তার গলায়। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল তাকে ভর্তি করে নেয়, কিন্তু ৪টা থেকে ৫-১৫ পর্যন্ত কোন ডাক্তারের সন্ধান পাওয়া যায় না। পার্থর মা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ডাক্তারের জন্য ছুটোছুটি করতে থাকেন। সেই সময় একজন নার্স পার্থর মাকে পরামর্শ দেন, "আপনি ডি-এম-ওর কোয়ার্টারে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরুন, তাহলে তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন।" বহু অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও কোন ডাক্তারের করুণা উদ্রেক করা যায় না। তাঁরা সাফ জানিয়ে দেন যে, বাঙুর হাসপাতালে কোন এমার্জেন্সী ওয়ার্ড নেই। যাই হোক, বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় একজন ডাক্তার এসে পার্থর গলায় একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দেন এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পার্থ ডাক্তারদের নিষ্কৃতি দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। ভিতরে রক্তক্ষরণ হয়ে পার্থর পাকস্থলী এবং শ্বাসনালী রক্তে বোঝাই হয়ে যায় এবং শ্বাসনালী স্তব্ধ হওয়ার ফলেই তার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পার্থর জ্ঞান ছিল এবং সে প্রতি মুহূর্তে জানতে চাইছিল: "মা, ডাক্তারবাবু আসছেন কি? আমি বাঁচব তো?" পোস্ট-মর্টেম করে ডাক্তার নাকি বলেছেন যে, চিকিৎসা হলে পার্থ বাঁচত। এ ধরণের দুর্ঘটনায় উপযুক্ত চিকিৎসা হলে রোগী বেঁচে যায়।

একমাত্র সন্তান হারিয়ে পার্থর মা জানতে চেয়েছেন: বাঙুর হাসপাতালে যদি এমার্জেন্সী না থাকে, তাহলে এমার্জেন্সী কেস ভর্তি করা হল কেন? বাঙুরে আশু চিকিৎসার সম্ভাবনা নেই জানলে তিনি তাঁর ছেলেকে অনায়াসে

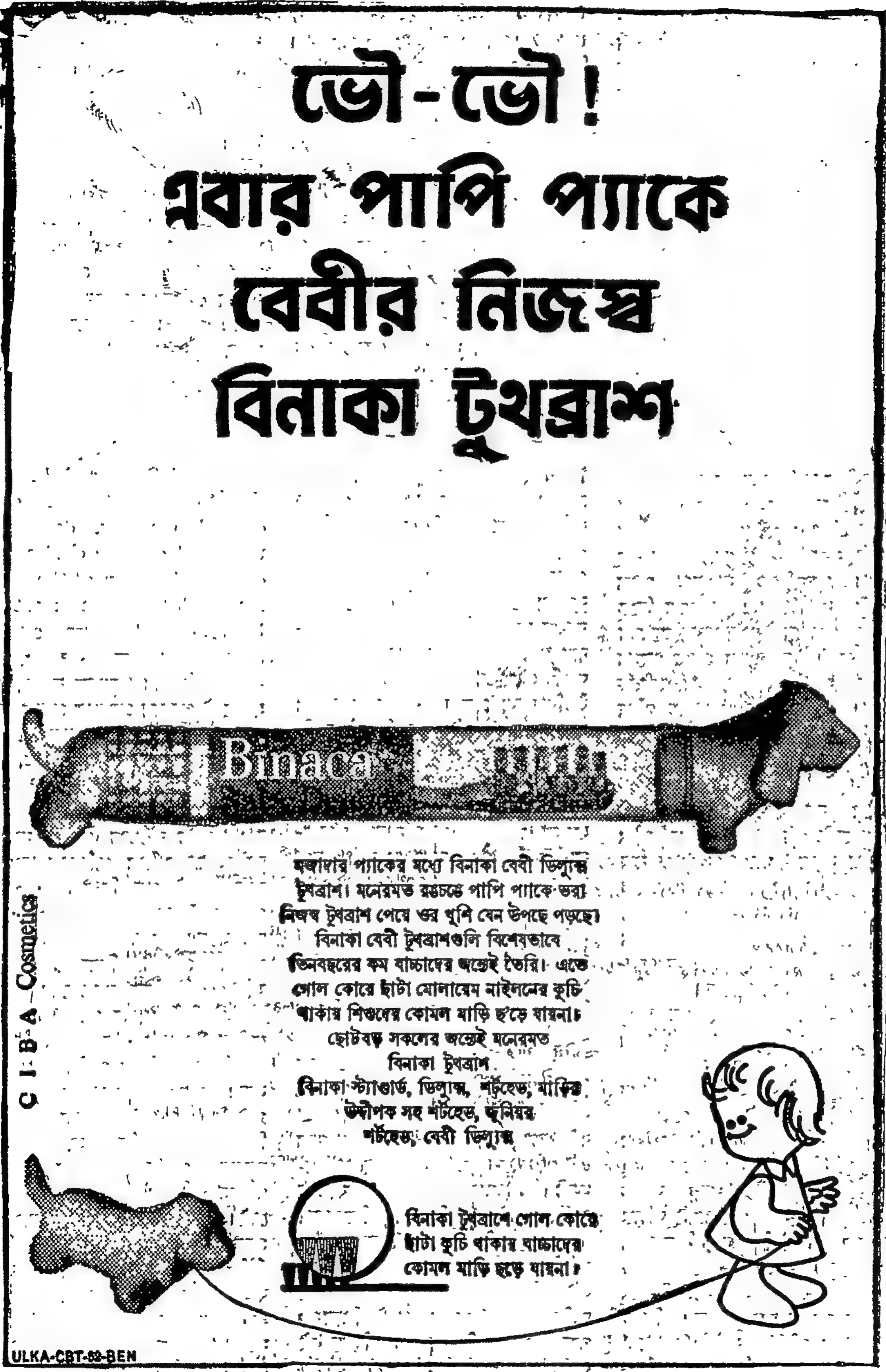
ভৌ-ভৌ!
এবার পাপি প্যাকে
বেবীর নিজস্ব
বিনাকা টুথব্রাশ
Binaca
মজাদার প্যাকের মধ্যে বিনাকা বেবী ডিলাক্স
টুথব্রাশ। মনেরমত রঙচঙে পাপি প্যাকে ভরা
নিজস্ব টুথব্রাশ পেয়ে ওর খুশি যেন উপচে পড়ছে।
বিনাকা বেবী টুথব্রাশগুলি বিশেষভাবে
তিনবছরের কম বাচ্চাদের জন্যেই তৈরি। এতে
গোল কোরে ছাটা মোলায়েম নাইলনের কুচি
থাকায় শিশুদের কোমল মাড়ি ছড়ে যায়না।
ছোটবড় সকলের জন্যেই মনেরমত
বিনাকা টুথব্রাশ
বিনাকা স্ট্যাণ্ডার্ড, ডিলাক্স, শর্টহেড, মাড়ির
উদ্দীপক সহ শর্টহেড, জুনিয়র
শর্টহেড, বেবী ডিলাক্স
বিনাকা টুথব্রাশে গোল কোরে
ছাটা কুচি থাকায় বাচ্চাদের
কোমল মাড়ি ছড়ে যায়না।
C I B A Cosmetics
ULKA-CBT-82-BEN

অন্য কোন হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারতেন এবং তাতে তাঁর ছেলে এভাবে প্রাণ হারাত না। দ্বিতীয়ত বড়র হাসপাতালে কয়েকজন ডাক্তার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও পার্থকে সময়মত চিকিৎসা করতে রাজী হলেন না কেন? মানবতাবোধ জিনিসটা তাঁরা কোথায় বাঁধা রেখেছিলেন? চোখের সামনে একটি কিশোরকে এভাবে মরণোন্মুখ দেখে তাঁদের হৃদয় আর্দ্র হল না কেন আর কেনই বা জাগ্রত হল না তাঁদের বিবেক? এইসব ডাক্তারই দু'দিন বাদে বড় বড় পদ পাবেন। তখন তাঁদের কাছ থেকে দেশবাসী কি সেবা পাবার আশা করতে পারেন? ডাক্তারদের পক্ষে এই ধরণের নির্মম অবহেলার শাস্তি কি খুব কঠোর হওয়া উচিত নয়?

সমাজ বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরেই সমাজের একটা নিজস্ব দর্শন এবং নিজস্ব মানসিকতার সৃষ্টি হয়। সমাজের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষই সেই জীবন-দর্শনের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই গরিব এবং নিঃস্ব, কিন্তু তাঁদের সকলেই ধনতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা আচ্ছন্ন। ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বার্থপরতা। অপরের দিকে চোখ বুজে কেবল নিজের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করা। অগ্রগতির প্রধান পাথেয় আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং লক্ষ্য আর্থিক সমৃদ্ধি। তাই সাফল্যের দৌড়ে গরিব মানুষ নন-স্টার্টার। প্রতিযোগিতাটা ওপর এবং মাঝের তলার লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ডাক্তারী এবং ইঞ্জিনীয়ারিং সাফল্যের সোপান। তাই এতদিন মেডিকাল এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের দরজা গরিবদের কাছে বন্ধ থাকত। ইদানীং শ্রেণীনির্বিশেষে মেধাবী ছাত্রদের সামনে সেই দরজাটা উন্মুক্ত হয়েছে। কিন্তু যাঁরাই সেখানে ঢুকছেন, তাঁরাই পূর্বসূরীদের ধ্যান-ধারণায় দীক্ষিত হয়ে যাচ্ছেন। গরিবিয়ানা বিসর্জন দিয়ে সমাজের ওপরতলায় ওঠবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠছেন। ফলে তাঁদের সুকুমার বৃত্তিগুলোর অকালমৃত্যু ঘটছে। যেন-তেন-প্রকারে কেরিয়ার তৈরি করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই সমাজে কেরিয়ার তৈরির জন্য পেশাগত দক্ষতার চেয়ে তদ্বির তদারকের মূল্য অনেক বেশি। কাজেই সেই পথ ধরেই তাঁদের এগোতে হচ্ছে। দৈনিক গড়ে তিন আনা পয়সা রোজগার করা মানুষের ওপর কর ধার্য করে মেডিকাল এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলো গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু যাঁরা সেখানে গরিবের কষ্টার্জিত অর্থে বিদ্যার্জন করছেন, তাঁরা সেই গরিবদের ঘৃণা এবং অবজ্ঞায় ডুবিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছেন না। সামাজিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁরা একেবারেই উদাসীন। ডাক্তাররা যে গ্রামে যেতে চান না, সেটা ঐ মানসিকতার পরিণাম। তাঁদের চিকিৎসাবিদ্যা অর্জনের একমাত্র লক্ষ্য বড়লোক হওয়া, সমাজসেবা নয়। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার অসুস্থ চেতনা তাঁদের অমানুষ করে তুলছে। সেই কারণেই হাসপাতালগুলোর সার্ভিসের এত অবনতি। যে যার নিজের কেরিয়ারের কথা ভাবছে, সমাজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করছে না। তাই সুযোগ পেলেই বিদেশে বেশি মাইনের চাকরি নিয়ে সপরিবারে সেখানে গিয়ে বাস করছে। সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ছাড়া এই পাপের হাত থেকে আমাদের মুক্তির কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মেডিকাল কলেজে ছাত্রভর্তির নিয়ম পাল্টালে হয়ত কিছুটা সুফল পাওয়া যেতে পারে। নিঃস্ব কৃষক এবং কারখানার দিনমজুর শ্রেণীর মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্য মেডিকাল কলেজের কিছু আসন নির্দিষ্ট করে রাখলে বোধ হয় অবস্থার কিছু পরিবর্তন হতে পারে। ডাক্তারী শিক্ষায় যতদিন শহরের ব্যবসায়ী এবং হোয়াইট কলার চাকরীজীবী এবং গ্রামের জোতদার শ্রেণীর ছেলেদের প্রাধান্য থাকবে, ততদিন মেডিকাল সার্ভিসে খুব একটা উন্নতির আশা করা যায় বলে আমার মনে হয় না। যাই হোক, বিষয়টা ননীবাবু ভেবে দেখতে পারেন। এভাবে একটা এক্সপেরিমেন্ট করলে যুক্তফ্রন্টের অন্য শরিকরা আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না এবং সেই এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলটাও অত্যন্ত মূল্যবান হবে বলে আশা করা যায়।

এবার আসুন আবার প্রমোশন প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সম্প্রতি বাঁকুড়ার পাঠকপাড়ার সলিল আচার্য সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদিকার কাছে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিটার অংশবিশেষ আমি এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

"গত ১৪ই অক্টোবর ডাক্তারদের শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগের যোগ্যতার একটি ধারাবাহিক তালিকা স্বাস্থ্য দপ্তর প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার বিস্তারিত আলোচনা এই পত্রিকায় হইতেছে। মাননীয় স্বাস্থ্য-মন্ত্রীও এ সম্পর্কে দৈনিক কাগজে অনেক তথ্যপূর্ণ বিবৃতি দিয়াছেন। যদিও এই তালিকা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নয়, তথাপি এই ধারণা করা অন্যায় নয় যে, এই তালিকা প্রকাশের পর স্বাস্থ্য দপ্তর তালিকা বহির্ভূত কাহাকেও উচ্চশিক্ষকের পদে নিয়োগ করিবেন না। কিন্তু এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। বাঁকুড়া মেডিকাল কলেজে সার্জিকাল বিভাগে ডাঃ জয়ন্তকুমার সেন মেডিকাল অফিসার অন সুপারনিউমারারি ডিউটি হিসাবে কাজ করিতেছিলেন। গত ২৮শে অক্টোবর স্বাস্থ্য দপ্তর তাঁহাকে সরকারী আদেশ (নং এস্ট।৬৩৪০।এড্স্।১জে-৮৯।৬৯) অনুসারে লেকচারারের পদে উন্নীত করেন। ঐ আদেশে কিছু অসঙ্গতি ছিল। যেমন 'Dr. Sen should be allowed to perform the function of Lecturer in Surgery in the B. S. College, Bankura, with immediate effect without any teaching assignment." বাঁকুড়া মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপাল আরও এক পা বেশি অগ্রসর হইয়া এই সরকারী আদেশকে 'obscure' আখ্যা দিয়া বিভাগীয় প্রধানকে একটি নতুন আদেশ দিয়াছেন এবং উহার অনুলিপি স্বাস্থ্য-অধিকর্তা ও স্বাস্থ্য-সচিবকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার আদেশ...... "He (Dr. Sen) will be entitled to hold lecture class, clinical teaching, demonstrations and outdoor clinics, pending clarification of the order, for which the Government has been moved." এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, সরকার যদি তালিকা বহির্ভূত নিয়োগ অব্যাহত রাখেন, তাহা হইলে ঐ প্যানেল প্রকাশের প্রহসন কেন? আর বাঁকুড়া মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপালই বা সরকারী আদেশ রদবদল করিবার অধিকার কোথায় পাইলেন? আশা করি, স্বাস্থ্য দপ্তর এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করিবেন এবং ঐ সরকারী আদেশ রদ করিয়া তালিকার অন্তর্ভুক্ত কাহাকেও ঐ পদে নিয়োগ করিবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ডাঃ জয়ন্তকুমার সেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসন বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত শ্রীঅনিলকুমার সেনের পুত্র।"

এই চিঠি পাবার পর আমি একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি এবং সেলের সুপারিশের তালিকা পরীক্ষা করে দেখলাম। তাতে জয়ন্ত সেনের নাম খুঁজে পাই নি। কাজেই কিসের ভিত্তিতে তিনি লেকচারার নিযুক্ত হলেন, তা ঠিক বুঝতে পারছি না। জয়ন্তবাবুর গুণাগুণ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। তাই তাঁর যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্নে আমি যেতে চাই না। কিন্তু টিচিং এসাইনমেন্ট না দিয়ে লেকচারার করার মর্মটা আদৌ উপলব্ধি করা যাচ্ছে না। তাতেই মনে হচ্ছে ব্যাপারটার মধ্যে মাছের গন্ধ আছে। প্রিন্সিপালের কোন দোষ এখানে দেখতে পাচ্ছি না। তিনি তাঁর সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে এইটুকু বুঝতে

পেরেছেন যে, গভর্নমেন্ট জয়ন্তবাবুকে লেকচারার করতে চান। কাজেই সেই কাজই তিনি তাঁকে দিয়েছেন। টিচিং এসাইনমেন্ট ছাড়া লেকচারারের আর কি কাজ থাকতে পারে? স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাঁদের সরকারী আদেশের কি ব্যাখ্যা দেন, তা জানবার জন্য আমরা উদগ্রীব হয়ে রইলাম। স্বাস্থ্য দপ্তরে নিয়োগ এবং প্রমোশনের ক্ষেত্রে যে কি বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে, এই ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। জয়ন্তবাবুর পিতৃদেবকে এই ঘটনার মধ্যে টেনে আনা অশোভন। এই সমাজে উচ্চপদাধিকারীরা নিজের ছেলেমেয়েদের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে থাকেন এবং পদের প্রভাব প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করেন না। এক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কাজেই পত্রলেখকের এই ইঙ্গিত আদৌ গ্রাহ্য নয়।

গত সপ্তাহে সার্জারী বিভাগে একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের যে তালিকা দিয়েছিলাম, তাতে কয়েকটি নাম বাদ পড়ে গেছে বলে আমাকে জানিয়েছেন। কাগজপত্র মিলিয়ে দেখলাম কথা ঠিকই। যাঁদের নাম বাদ পড়েছিল, তাঁদের একটা তালিকা নিচে দিলাম:

লেকচারার

(১) আশীষ সিংহ, (২) প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, (৩) অনিল মুখার্জি, (৪) শঙ্করনাথ ব্যানার্জি, (৫) জলধর রায়, (৬) পূর্ণেন্দু দত্ত।

এবার এনাটমি বিভাগে প্রমোশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি এনাটমি বিভাগে যে প্রমোশনের সুপারিশ করেছেন, তা নিচে দেওয়া হচ্ছে:

প্রফেসর

সমরেন্দ্র মিত্র

রীডার

শচীন্দ্রনাথ সাহানা

লেকচারার

(১) পতিতরঞ্জন দেব, (২) মতিলাল দত্ত, (৩) সত্যেন্দ্রমোহন সেন, (৪) ননীগোপাল দাস, (৫) শ্যামলেন্দু চৌধুরী এবং (৬) বিধুভূষণ দাস।

সেলের সুপারিশটা নিচে দেওয়া হচ্ছে:

এসো: প্রফেসর

সমরেন্দ্র মিত্র

সহকারী প্রফেসর

পতিতরঞ্জন দেব

লেকচারার

(১) পতিতরঞ্জন দেব, (২) মতিলাল দত্ত, (৩) সত্যেন্দ্রমোহন সেন, (৪) ননীগোপাল দাস, (৫) শ্যামলেন্দু চৌধুরী এবং (৬) বিধুভূষণ দাস।

এখানে দেখা যাচ্ছে সমরেন্দ্র মিত্রকে 'সেল' প্রফেসরের পদ দিতে রাজী নন। আর শচীন্দ্রনাথ সাহানাকে তাঁরা প্রমোশনের তালিকায় রাখেন নি। এনাটমির ওপর ডাঃ সাহানার একখানা পাঠ্য বই আছে। বইখানা মোটা। সারগর্ভ কি-না তা ছাত্ররাই বলতে পারেন। তবে খেটেখুটে যিনি এতবড় একখানা বই লিখেছেন এবং যাঁর বই পাঠ করে ছাত্ররা এনাটমির জ্ঞান লাভ করছেন, তাঁকে কৃতী পুরুষ বলতে বাধা নেই। প্রমোশনের ক্ষেত্রে এঁদের দুজনের শ্লথগতির কারণ স্বাস্থ্য দপ্তর প্রকাশ করতে দ্বিধা করবেন না বলেই আশা করা যায়।

এবার দেখা যাক, এনেস্থিসিওলজি বিভাগের ব্যাপারটা দেখা যাক। এই বিভাগে একাডেমিক উপদেষ্টা কমিটি প্রমোশনের যে সুপারিশ করেছেন, তা নিচে দেওয়া হল:

সহকারী প্রফেসর

(১) কমল মুখার্জি ও (২) সুবোধ মুখার্জি।

লেকচারার

(১) দেবপ্রসাদ ব্যানার্জি, (২) এন সি দেব, (৩) মহম্মদ নুরুল হাই, (৪) বিমলবরণ হোড় এবং (৫) বীরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।

এই বিভাগে সেলের সুপারিশের তালিকাটা আরও বড়। যেমন:

সহকারী প্রফেসর

(১) কমল মুখার্জি ও (২) মুরলীবদন প্রামাণিক।

লেকচারার

(১) সুবোধ মুখার্জি, (২) দীনমাথ ব্যানার্জি, (৩) দেবপ্রসাদ ব্যানার্জি, (৪) কৃষ্ণতারণ মুখার্জি, (৫) অমিতাভ বোস, (৬) নির্মলচন্দ্র দেব, (৭) নন্দদুলাল দত্ত, (৮) জয়দেব কুন্ডু, (৯) স্বরাজ ব্যানার্জি, (১০) ঊর্মিলা রায়, (১১) নুরুল হাই, (১২) বিমলবরণ হোড়, (১৩) বীরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।

সুবোধ মুখার্জির বদলে মুরলীবদন প্রামাণিকের নামটা সহকারী প্রফেসরীর জন্য কেন সুপারিশ করা হল, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জয়দেব কুন্ডু আর স্বরাজ ব্যানার্জি সুপারনিউমারারী ডিউটিতে নিযুক্ত। সুপারনিউমারারী ডিউটি শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা কি-না, সেই প্রশ্নের কোন জবাব স্বাস্থ্য দপ্তর এখনও দেন নি। কাজেই এঁদের দুজনের সম্বন্ধে প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। আর মনে হচ্ছে এনেস্থিসিওলজি বিভাগে শিক্ষকের অভাব খুব প্রকট হয়ে উঠেছে। নইলে একসঙ্গে ১৩ জন লেকচারার নিযুক্ত হবেন কেন? ঘটনাটা কি সত্যিই তাই? কোন বিশেষ ব্যক্তিকে লেকচারার করবার আগ্রহে তাঁর ওপরের সবাইকে প্রমোশন দেবার আয়োজন হয় নি তো? ননীবাবু বিষয়টা ভাল করে তদন্ত করতে পারেন। আমার সন্দেহ অমূলক হলেই আমি খুশি হব।

[ক্রমশ]

ঋষি দাস লিখিত **বাদশা খান** দাম : ৬·০০

এই সুমহান্ অতিথির পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত ও পাখতুন জাতির সংগ্রামের অপূর্ব কাহিনী। এখনই এক কপি সংগ্রহ করুন।

অশোক প্রকাশন

এ,৬২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট : কলিকাতা-১২

যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু

আবার পথে-ঘাটে একটি মাত্র প্রশ্ন: যুক্তফ্রন্ট সরকারের আর আর কতদিন। রাইটার্স বিল্ডিংসের আমলারা গোঁফে তা দিতে শুরু করেছেন। তাঁরা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে সরকারের পতনের দিন ধার্য করে ফেলেছেন।

আমলাতন্ত্রের প্রচারের শিকার হতে চলেছেন যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো দল। মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি হাব-ভাবে, বক্তৃতায়, বিবৃতিতে আমলাতন্ত্রের এই প্রচারের ওপর বিশ্বাস করে এমন ভাব দেখাচ্ছেন যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন আসন্ন। অন্যান্য যে সব দলের বিরুদ্ধে তাঁরা যুক্তফ্রন্ট ভাঙার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে অভিযোগ করছেন, সেই সব দল কিন্তু তারস্বরে চিৎকার করে বলছেন যে, মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে সরকার চালানোর কথা তাঁরা আদৌ চিন্তা করছেন না।

পরস্পরের প্রতি অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগের বহর এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে, লোকের মনে সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার আর যুক্তফ্রন্টের দলগুলি যদি এই প্রচারের জবাব না দেন, তাহলে রাজ্যে দ্রুত অচলাবস্থা দেখা দিতে বাধ্য।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রত্যেক মন্ত্রীই দক্ষ হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তুলনা করলে কংগ্রেস আমলের প্রত্যেক মন্ত্রী অপেক্ষা যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা দক্ষ। তাঁরা প্রত্যেকেই খাটছেন। রাইটার্স বিল্ডিংসের খোঁজ-খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন আমলাদের তুলনায় মন্ত্রীরা অনেক বেশি কর্মব্যস্ত—তাঁরা সরকারী কাজেই ব্যস্ত। কিন্তু আমলাতন্ত্র সরকারের ভাঙনের ধুয়ো তুলে প্রতিটি কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন।

এই অবস্থার প্রতিকার করতে হলে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে যে সব পথের আশ্রয় নিতে হবে সে সম্বন্ধে কথা এখানে তুলছি না। কিন্তু এখনি এই অপপ্রচারের বিরোধিতা করা দরকার।

কেরালায় বিকল্প সরকার গঠিত হওয়ায় এ রাজ্যে সি পি এম শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন বলেই তাঁরা ফ্রন্ট সরকারের দ্রুত পতনের আশঙ্কা করছেন। পশ্চিমবাংলা আর কেরালা এক নয়। তা ছাড়া পশ্চিমবাংলায় জনমতের ওপর এই সরকার ভাঙার যে বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, সেকথা বাদ দিলেও ভাবা দরকার যে সি পি এম-কে বাদ দিয়ে পশ্চিমবাংলায় অন্য কোন সরকার গঠন কি সম্ভব?

পশ্চিমবাংলায় বিকল্প সরকার গঠন করতে হলে ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে অন্তত বাংলা কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি আর ফরোয়ার্ড ব্লকের একত্র হয়ে সরকার গঠন করতে হবে। তাদের সঙ্গে পি এস পি এবং এস এস পি-র কিছু অংশকেও যোগ দিতে হয়। কিন্তু দিল্লীতে কোয়ালিশন সরকার গঠন যখন এখনো সম্ভব হচ্ছে না, তখন পশ্চিমবাংলায় কম্যুনিস্ট পার্টি কিছুতেই ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে পারবে না। মনে রাখা দরকার, সর্বভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক রাজ্যেই ইন্দিরাপন্থী মন্ত্রিসভার প্রধান বিরোধী দল সি পি আই। কাজেই কম্যুনিস্ট পার্টি বর্তমান অবস্থায় কিছুতেই কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে না। দ্বিতীয়ত দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে কোনো কম্যুনিস্ট পার্টিকেই দলে নেওয়া সম্ভব নয়। তা করলে তাঁকে নিজ দলের কম করে অর্ধেক সদস্যকে হারাতে হবে। তা ছাড়া শ্রীমতী গান্ধী এই মুহূর্তে সি পি এম-কে চটিয়ে আলাদা করে সি পি আই-কে কোল দিতে পারে না। কাজেই কম্যুনিস্ট পার্টি যেমন এখন সি পি এম-কে বাদ দিয়ে অন্য ফ্রন্ট গড়তে পারে না, তেমনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার ব্যাপারে তাঁর দলকে প্রশ্রয় দিতে পারে না।

এমন কি যে বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ করা হচ্ছে, সেই দলের পক্ষেও যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। বাংলা কংগ্রেসের অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করাকে তাদের কংগ্রেসে যোগদানের প্রাক-অবস্থা বলে যাঁরা মনে করছেন তাঁরাও বাস্তব অবস্থা বিচার করছেন না। সি পি এম-এর বিরুদ্ধে বাংলা কংগ্রেসের যত অভিযোগই থাকুক না কেন, ভবিষ্যতে কি হবে বলা না গেলেও অদূর ভবিষ্যতে বাংলা কংগ্রেস ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যাওয়া সম্ভব নয়। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় দিল্লীতে একথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তাছাড়া এই ভাঙাগড়ার মধ্যে কোন স্বার্থে বাংলা কংগ্রেস নিজের অস্তিত্বকে বিসর্জন দেবে। পশ্চিমবাংলায় বাংলা কংগ্রেস আর কংগ্রেসের মিলন ঘটলেও তারা আর কোনদিন ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে কি না, সন্দেহ। বাংলা কংগ্রেস যদি কংগ্রেসে ফিরে যায় তাহলে শ্রীসুশীল ধাড়া কি আর আজকের মত নেতৃত্বে থাকতে পারবেন? সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, বাংলা কংগ্রেসও আজ ভিন্ন সুরে আছে। বাংলা কংগ্রেস যদি কংগ্রেসে যোগ দিতে চায় বা যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে চায়, তাহলে বাংলা কংগ্রেসও দ্বিখণ্ডিত হতে বাধ্য।

ফরোয়ার্ড ব্লকের পক্ষেও পশ্চিমবাংলায় সিন্ডিকেট গড়া সম্ভব নয়। সি পি এম বিরোধী মন্তব্য থেকে তাদের ফ্রন্ট ভাঙার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে আসা অযৌক্তিক।

বিকল্প সরকার গঠন করা যদি না যায়, তাহলে আবার রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করার জন্য কোনো দল ফ্রন্ট ভাঙলে ভবিষ্যতে সেই দলের প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে। এই অবস্থায় আজকের পরিবেশ যতই অসহনীয় হোক না কেন, কোন দলের পক্ষেই ফ্রন্ট ছাড়া সম্ভব নয়। যাঁরা বলছেন যে আগামী নির্বাচনে একক শক্তিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের আশায় সি পি এম নিজেই ফ্রন্ট ভাঙবে, তাঁরা এই যুক্তিটা দেখছেন না যে, সি পি এম নিজে ফ্রন্ট ভাঙলে প্রথমত বিকল্প সরকার গঠনের রাস্তা করে দেওয়া হবে। কেরালার ভুল পশ্চিমবাংলায় সি পি এম করতে পারে না। আর দ্বিতীয়ত সমগ্র পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন দলের যে শক্তি আছে সে সম্বন্ধে ধারণা থাকলে কারো আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। সি পি এম-এর পক্ষে সমগ্র পশ্চিমবাংলায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে হলে আরো বয়েকটা নির্বাচন অতিক্রম করতে হবে। আর ততদিনে অবস্থা কোন দিকে দাঁড়াবে কে জানে?

ওপরের বিশ্লেষণ থেকেই একথা স্পষ্ট যে, পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। সব শরিক দলই এই যুক্তি স্বীকার করেন। তাহলে আজ এত সন্দেহ আর অবিশ্বাস কেন? আপাতত পারস্পরিক বিষোদ্গারটা বাদ দিয়ে বত্রিশ দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে ঐক্য গড়া কি একেবারেই অসম্ভব। যুক্তফ্রন্ট সরকার আর যুক্তফ্রন্টের দলের নেতৃবৃন্দকে আর একবার সুস্থ মাথায় পশ্চিমবাংলার মানুষের আশা আর আকাঙ্ক্ষার কথা ভেবে দেখতে বলি। যুক্তফ্রন্ট ভাঙছে না—অবস্থাকে ঘোরালো করে আপনারা শুধু আমলাতন্ত্রের শিকারে পরিণত হচ্ছেন।

—শ্রীসর্বদর্শী

গ্রন্থমেলা

চাঁদের দেশে মানুষ—কল্পতরু সেনগুপ্ত। নবজাতক প্রকাশন, ৬ এ্যান্টনী বাগান লেন, কলকাতা-৯ থেকে মজহারুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

১৯৬৯-এর ১৯শে নভেম্বর মানুষ দ্বিতীয়বার চাঁদে নেমেছে। এই চাঁদে নামার কাহিনী জানতে হলে, অবশ্যই জানা দরকার; প্রথমবার মহাকাশচারীরা কিভাবে চাঁদে নেমেছিলেন।

আর মহাকাশ বিজয়ের কথা না জানলে, না শুনলে যেন কিছু জানাই হয় না। ছেলেমেয়েদের প্রশ্নপত্রেও সেই এক প্রশ্ন : চাঁদের দেশে মানুষের কথা বলতে পারো? বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর দেখা হলে প্রশ্ন করে : চাঁদের দেশে মানুষ নামার আশ্চর্য কাহিনী পড়েছ? কোথায় সে বই, কী বই—এখন তা কারো অজানা নয়। কেন না কিশোর-কিশোরীদের মনের মতো করে এতো ভালো বই আর কেউ লেখে নি, লিখতে পারে নি। বইটির নাম : "চাঁদের দেশে মানুষ।" লেখক : কল্পতরু সেনগুপ্ত। এমন সুন্দর লেখা যে কঠিন বিষয়ও জলের মতো সহজ হয়ে উঠেছে।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত চাঁদের দেশে মানুষ লিখতে গিয়ে এক নিমেষেই কিন্তু মার্কিন মহাকাশচারীদের চাঁদে নামান নি। আগে তিনি সুন্দরভাবে চাঁদের রূপকথা, চাঁদকে নিয়ে কবিতা শুনিয়েছেন। কোনো বিশেষ দেশের নয়, সব দেশেরই রূপকথা। তারপর এসেছে, গ্যালিলিওর কথা, দূরবীন আবিষ্কারের কাহিনী। এসেছে কোপারনিকাস, নিউটন, কেপ্‌লার প্রমুখ পণ্ডিতদের কথা, যাদের কথা না জানলে একালের চাঁদে নামার কাহিনী জানা অসম্ভব। কারণ তাঁরাই বলেছিলেন প্রথম, আসলে চাঁদ কেমন! এরপর মানুষের মাথায় আসে চন্দ্র জয়ের কল্পনা। তা নিয়ে অনেক মজাদার কাহিনীও লেখা হল। কিন্তু চাঁদে যেতে হলে তো শুধু কল্পনা নিয়ে যাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের সাধনা করতে হয়। সেই সাধনায় জয় হয়েছে বলেই দুবার চাঁদের মাটি নিয়ে এলেন এই পৃথিবীতে মহাকাশচারীরা। কী ভয়ঙ্কর অথচ চমৎকার সেই কাহিনী।

চাঁদের জন্ম কি করে হল—সেকথা বলার পর শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত সেই চাঁদে পৌঁছবার আদি অন্ত কাহিনী শুনিয়েছেন। চাঁদে পৌঁছবার চেষ্টা অনেক দেশের লোকই করেছে। আর তার জন্য তৈরি হয়েছে মহাব্যোমযান, রকেট আরো কতো কি—আগাগোড়া তার সরস বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন তিনি। পড়তে পড়তে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। মনে হয়, পাঠকও যেন চাঁদে যাচ্ছেন। গ্রন্থে যে ছবিগুলি পর পর রয়েছে সেগুলি দেখলেও চাঁদের দেশে যাবার ঘটনাটি চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ওঠে। যেমন, ১) পৃথিবীমুখী চাঁদ—অভিযাত্রীরা দূর থেকে চাঁদকে এ রকম দেখেন। ২) স্পুৎনিক। ৩) মহাকাশে যাবার জন্যে শিক্ষাগ্রহণ। ৪) মহাকাশে প্রথম যাত্রী লাইকা। ৫) য়ুরি গাগারিন। ৬) তেরেশকোভা। ৭) কোমারফ। ৮) স্যাটার্নে উঠছেন মহাকাশচারীরা। ৯) স্যাটার্ন যাত্রা শুরু করল। ১০) এ্যাপোলো ১১-এর গতিপথ। ১১) এ্যাপোলো ১১-এর চন্দ্রযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদের বুকে শান্তি সাগরে নামছে। ১২) চাঁদে চন্দ্রযান ঈগল। ১৩) চাঁদের দেশে নীল আর্মস্ট্রং। ১৪) চাঁদের বুকে মানুষের পদচিহ্ন। ১৫) চাঁদের মাটিতে নীল আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন।

এসব ছাড়া আছে আরো অনেক ছবি, অজানা সব চাঞ্চল্যকর কথা। অথচ কোথাও তথ্যের ভুল নেই। সুতরাং বলা যায়, এমন ভালো বই সচরাচর পাওয়া কঠিন। ছেলেরা এ বই লুফে নেবে। বড়রাও পড়ে খুশি হবেন। তাছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য পুরস্কারের যোগ্য হওয়া উচিত এ বই। চমৎকার প্রচ্ছদপট এঁকেছেন প্রখ্যাত শিল্পী খালেদ চৌধুরী।

প্রেত-সংগীত : জয়ন্ত বসু। ডি (লাইট) বুক কোং, ১৭৩/৩, বিধান সরণি, কলকাতা—৬। মূল্য : তিন টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থটিতে তিনটি গল্প আছে। 'প্রেত-সংগীত' গল্পটি টেকনিকের দিক থেকে চমৎকার। লেখকের শিল্পিসুলভ নিরপেক্ষতা এই কাহিনীতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'ছেলেবেলা' গল্পটি উপযুক্ত আবহাওয়া-সৃজনের কাজে লেখকের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। দুটি কিশোর-কিশোরীর প্রেমের এই গল্প বিচ্ছেদমূলক। লেখার গুণে প্রতিটি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে এই পরিচ্ছন্ন প্রেমের কাহিনী। 'সাইকেল' গল্পটিতে তিনি আমাদের অন্য এক জগতে নিয়ে গিয়েছেন। আজকের সমাজব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যে কত কঠিন সে সম্পর্কে সুন্দরভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অবিরাম সাইকেল চালনা করে অতুল তার নিজের এবং চার পাশের মানুষগুলির যে পরিচয় পেল তা খুবই মূল্যবান। চরিত্রচিত্রণে মুন্সিয়ানা দেখানো ছাড়াও লেখকের শিল্পিসুলভ সংযম প্রশংসনীয়। তাঁর লেখাগুলিতে নানা রসের সন্ধান পাওয়া গেলেও কোনপ্রকার আতিশয্য অথবা বাহুল্যের ভাব নেই।

আর সহ্য হচ্ছে না : (ভাদ্র, ১৩৭৫)—তুলসী মুখোপাধ্যায়। ১৯, পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলকাতা-২৯। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

কবি এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থে আমাদের ১১টি কবিতা উপহার দিয়েছেন। কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণা ও অবরুদ্ধ আবেগ মূর্তি পরিগ্রহণ করেছে কবিতাগুলিতে। এই অদ্ভুত যন্ত্রণার মধ্যেও ভালবাসারো ভালবাসা চেয়েছেন, বলে-ভালবাসাকে 'জামিনে মুক্তি দিয়ে পাবো/বেকসুর খালাস দেব না।' কবির এই যন্ত্রণা, বোধ করি, ভালবাসারই যন্ত্রণা।

প্রথম দশজন—(স্কুল ফাইন্যাল—রেগুলার—১৯৬৯), স্কলার্স সিন্ডিকেট। ১৭০/এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৪। দাম : এক টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর ১৯৬৯ সালের স্কুল ফাইন্যাল রেগুলার পরীক্ষার্থীদের প্রথম দশজনের পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এরকম বই পৌঁছনো একান্তভাবেই আবশ্যক বলে মনে করি। এ ধরনের প্রচেষ্টার জন্য স্কলার্স সিন্ডিকেট সকলেরই প্রশংসাভাজন হবেন। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

দুই সাংবাদিকের দৃষ্টিতে

এই লেখা যখন ছাপা হয়ে বেরুবে তখন পশ্চিমবাংলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি আরও বদলে যাবে। শুধু বদলে যাবে বললে হয়তো সবটুকু বলা হবে না—ঘটনা আজ যা আশংকা করা যাচ্ছে হয় তা আদৌ না ঘটতে পারে অথবা তা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে কিংবা পশ্চিমবাংলার সকল সংকটময় পরিস্থিতিতে যে প্রধান নিয়ামক শক্তি বরাবর সচেতনভাবে তাকে সংকটমুক্ত করেছে—সেই জনগণ তাকে সংকটমুক্ত করে কোন এক উন্নততর পর্যায়েও নিয়ে যেতে পারে। সেজন্য পশ্চিমবাংলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সঠিক কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে না। তবে যে বিশ্বাস কোটি কোটি সচেতন মানুষ এনে দিতে পারে—সেখানে ভরসা থাকলে বোধ করি একেবারে নিরাশ হতে হবে না।

॥ এক ॥

বর্তমানে পশ্চিমবাংলা এক গুরুতর সংকটের মুখে। সর্বত্র ভাঙনের আশংকা। কংগ্রেসে ভাঙন, সিন্ডিকেট ও ইন্দিরা-পন্থীর বিবাদ। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাঙন যদিও ধরে নি, তবে ভাঙনের আশংকা।

সমগ্র ভারতবর্ষের কথা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়বস্তু নয়। তবে পশ্চিম-বাংলার পরিস্থিতি আলোচনা করতে গেলে সারা দেশে যা ঘটছে তার কিছু কিছু কথা এখানে এসে পড়বেই। সেদিক থেকে বলা যেতে পারে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের মধ্যে যে পরিবর্তন হচ্ছে সে পরিবর্তনের ঢেউ স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবাংলাতেও এসে পড়েছে। পশ্চিম-বাংলায় কংগ্রেসের ভাবমূর্তি বা ইমেজ বহুদিন আগেই কালিমালিপ্ত হয়ে গিয়ে-ছিল—এমন কি যদি বলা যায় কংগ্রেস এই রাজ্যে ক্ষমতাসীন থাকার সময়ই সেটা ঘটেছিল তা বোধকরি অত্যুক্তি হবে না। তারপর সাতষট্টি সালের শেষ দিকে যে-কোনরকমে ক্ষমতায় আসার জন্য যে নোংরা পথ ধরেছিলেন তাঁরা, তাতে তাঁদের অবশিষ্ট সুনামটুকুও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অই মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের জনমনে প্রভাব বিস্তার করা তো দূরের কথা—দল হিসেবেও রাজনৈতিক লীগ খেলার তালিকায় তাঁরা নিচে নেমে গেলেন। তারপর বর্তমানে এই রাজ্যে কংগ্রেসের যে অবস্থা সেই অবস্থায় সিন্ডিকেটপন্থী ও ইন্দিরাপন্থীদের প্রচন্ড বিবাদ। সিন্ডিকেট-পন্থীরা সমবেত হচ্ছেন শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের বাড়িতে আর ইন্দিরাপন্থীরা সমবেত হচ্ছেন "কালী মুখার্জী স্মৃতি-ভবনে।" অন্যদিকে চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবনে নেমে এসেছে নিষ্প্রদীপ অন্ধকার। তারপর চলেছে শুধু খবরের কাগজে বিবৃতির পর বিবৃতি দিয়ে যুদ্ধ।

তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সিন্ডিকেটপন্থীদের বিরুদ্ধে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের ও কংগ্রেস প্রভাবিত কিছু মানুষের পুঞ্জীভূত যে ক্ষোভ ছিল তার ফলে ইন্দিরাপন্থীরা কিছুটা সাড়া নিশ্চয়ই পাবেন কিন্তু সেও তো আসনতী সম্পদের ভাগ-বাঁটোয়ারার ভিত্তিতেই। তাছাড়া এ রাজ্যের সিন্ডিকেটপন্থীদের আছে জেলায় জেলায় সংগঠন আর অজস্র টাকা এবং তারপর পিছন থেকে রাজ-নৈতিক কলকাঠি নাড়ে যেসব শক্তি সেই শক্তিগুলির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। কাজেই স্বল্প সম্পদের বলে বলীয়ান হয়ে ইন্দিরাপন্থীদের এখানে ঘরোয়া সংগ্রামে যে সময় ও ক্ষমতা ব্যয়িত হবে, তারপরে রাজ্যের অতি দ্রুত ধাবমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে পা ফেলে কি তাঁরা চলতে পারবেন? অতএব পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে দেশবাসী তাঁদের কাছ থেকে বিশেষ কিছুই আশা করতে পারবেন না বলেই মনে হয়।

অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট তার বত্রিশ দফা কর্মসূচীকে রূপায়িত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষের মনে যে আশা ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি দফা রূপায়ণের মাধ্যমে জনমনে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন, তা যদিও অব্যাহত আছে কিন্তু মুশকিল হয়েছে, যুক্তফ্রন্টের কিছু কিছু শরিকদলের সামনে থেকে বোধ করি যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচী সরে যাচ্ছে এবং তাতে কিছু কিছু সন্দেহ আর অবিশ্বাস সৃষ্টি হচ্ছে আর মানুষও জিজ্ঞাসু হয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। তা না হলে এই সময়ের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের সাফল্য অসাধারণ। কংগ্রেস গত বিশ বছরে শাসনযন্ত্রের মাথায় বসে থেকে যা করতে পারেন নি যুক্তফ্রন্ট তাই করেছেন। অবশ্য তার বিস্তৃত আলোচনার এখানে দরকার নেই। কিন্তু মানুষ জিজ্ঞাসু হয়ে পড়লে নেতৃবৃন্দ যদি তার জবাব না দিতে পারেন তবে তার ফল হবে অন্যরকম।

সংকটটা ঠিক এইখানেই এবং এ সংকটকে আরও গভীর করে তুলেছে কেরালার ঘটনা। পূর্বঘাট পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে গৌরীশৃঙ্গের চূড়ার দূরত্ব থাকলেও ঘটনা আলোর চেয়ে দ্রুত-গতিতে পরস্পরকে ছুঁয়ে যায় এবং এ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। অনেক আগে থেকেই এখানে চলে আসছিল শরিকী সংঘর্ষ। যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের সে শরিকী সংঘর্ষগুলিকে সত্য ও তথ্যের আলোকে বিচার করার প্রয়োজন ছিল। চেষ্টা অবশ্য যে তাঁরা করেন নি তা নয়, কিন্তু যুক্তফ্রন্টের ঘোষিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে সেগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে মানবার প্রয়োজন ছিল। বলতে বাধা নেই যে অনেক ক্ষেত্রেই তা মানা হয় নি।

যুক্তফ্রন্ট সরকার শাসনক্ষমতায় আসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগসন্ধানী জোতদার মজুতদার আসামাজিক শ্রেণীর কিছু কিছু লোক কোন-না-কোন দলের অনুগামী হওয়ার চেষ্টা করেছে। যুক্ত-ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদল নিজেদের ক্ষমতা-বৃদ্ধির আত্মপ্রসাদে সেই সব ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছেন। তাই যখন যুক্তফ্রন্টের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী এবং সরকারী আইন অনুযায়ী কৃষক বেনামী জমি দখল করতে গেছে-কিম্বা সেই জমিতে চাষ করে ফসল তুলতে গেছে তখন সে সেইসব লোকদের দ্বারা কোথাও আক্রান্ত হয়েছে, কোথাও পাল্টা আঘাত হেনেছে। ব্যস অমনি সেটাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে শরিকী সংঘর্ষ। যুক্তফ্রন্টের ঘোষিত নীতির চেয়ে শরিকদলগুলির নিজের কথাটাই তখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই সন্দেহ, অবিশ্বাস, দাবি, পাল্টা দাবি প্রভৃতির সরব-প্রচারে যখন পশ্চিম-বাংলার আকাশবাতাস মুখরিত, সংবাদপত্র কণ্টকিত ঠিক তখনই কেরালা থেকে অকস্মাৎ মিনিফ্রন্টের বজ্রপাত হয়েছে। এ বজ্রপাতের ফলে কেরালায় যেমন কংগ্রেসবিরোধী যুক্তফ্রন্ট, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী ফ্রন্টে রূপান্ত-রিত হয়ে গেছে, ঠিক তেমনিই পশ্চিম-বাংলায়ও কংগ্রেসবিরোধী ফ্রন্টের কথা ভুলে গিয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী অভিযান চালানো শুরু হয়ে গেছে। যেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্টের শরিক দল নয় এবং বৃহৎ দলও নয় এবং বিশ্বস্তভাবে জনগণের সংগ্রামে যুক্তফ্রন্টের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী যেন তাঁরা চলেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেরালার ঘটনা দৃষ্টান্তে যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বৃহৎ শরিকদলের বিরুদ্ধে এই ধরণের প্রচারকে যদি সাধারণ মানুষ মিনিফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাবনা বলে ভাবেন, তাহলে কি সে ভাবনাকে অস্বীকার করা যায়?

অবশ্য এই জিজ্ঞাসার জবাব অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদল দিচ্ছেন। তাঁরা আশ্বস্তও করতে চাইছেন। জ্বলন্ত ঘটনা ঘটিয়ে দেওয়ার পর আশ্বস্ত করার যুক্তি কি খুব কার্যকরী হয়? বরং তা নেতিবাচক মনে হয় কারণ এখানে মিনিফ্রন্ট সম্ভব নয় বলার মধ্যে দিয়ে কেরালার নাম্বুদ্রিপাদের চাপের মুখে তাঁদের কেরালা কমরেডদেরই বোঝানো হয়। মিনিফ্রন্ট সম্পর্কে আশংকা দূর করতে হলে আরও বেশি কাছাকাছি হতে হয়। আরও বেশি কাছাকাছি হতে—আরও বেশি মিত্রসুলভ আচারব্যবহার আর কথাবার্তা বলতে হয়। সেদিক দিয়ে কিন্তু সাধারণ মানুষ এখনও কোন লক্ষণ দেখতে পায় নি।

তাই মানুষ চিন্তিত এই সংকটে।

এর ওপর পশ্চিমবাংলার এই পরিস্থিতিতে বাংলা কংগ্রেস ও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, অরাজকতা, হিংস্রতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে অনশন সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আজীবন সংগ্রামী মানুষ। তাঁর মত ও পথের সঙ্গে যার যত বিরোধই থাকুক তাঁর অনুভূতি-প্রবণ মনের প্রতি মানুষের একটা শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই, তিনি কেন যাবেন

লিনটাস-ব, ৬৮-১৪৩ BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

অনশন সত্যাগ্রহ করতে? তিনি যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে, অরাজকতা আর হিংস্রতা গুরুতর আকার ধারণ করেছে, একথা বললে কি তিনি স্ব-নিন্দার ভাগীদার হয়ে যান না? তিনি চান, আইন ও শৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবিধান। কিন্তু প্রতিবিধানের কি আর কোন পথ ছিল না? তিনি যুক্তফ্রন্টের নেতা, তিনি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি যুক্তফ্রন্টের সভায় এর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করতে পারতেন, তিনি মন্ত্রিসভায় একথা তুলতে পারতেন, কিন্তু এভাবে অনশন সত্যাগ্রহ করতে যাওয়ায় তিনি "একলা চলো-র" নীতিই গ্রহণ করে ফেলছেন নাকি? কিন্তু যুক্তফ্রন্টে তিনি কি সত্যিই একা? ফ্রন্ট তাঁকে নেতা নির্বাচিত করেছিল এবং সেজন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি একা নন বলেই এই মর্যাদা ও সম্ভ্রমপূর্ণ আসনটিতে তাঁর স্থান। সেই স্থান থেকে আর পাঁচজনের মত তিনি নিচে নেমে আসবেন কেন?

অবশ্য অজয়বাবুর মত শ্রদ্ধেয় নেতাকে আমি কোন সতর্কীকরণ করছি না। শুধু কতকগুলো প্রশ্ন উপস্থাপিত করছি তাঁর সামনে। এই প্রসঙ্গে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন, ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস সরকার যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করতে পারে নি, তখন গান্ধীজী অনশনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। আমেদাবাদে দাঙ্গার কারণে বাদশা খান অনশন করেছিলেন। অর্থাৎ এ তো কোন নতুন কথা নয়। অথচ অজয়বাবু যখন অনশন করছেন, তখন এত কথা উঠছে কেন? সেখানে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন: কিন্তু গান্ধীজী অথবা সীমান্ত গান্ধী, এঁরা কেউ কি প্রশাসন শীর্ষে বসেছিলেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাটা সেইখানে। এবং এই জিজ্ঞাসা খুব স্বাভাবিক। কারণ মুখ্যমন্ত্রী যখন তাঁর নিজের সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন তখন সে আওয়াজে তাঁর সম্বন্ধে নানা চিন্তার স্রোত বয়ে যাবে। প্রথমত কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লসিত হবেন এবং তিনি তা প্রকাশও করেছেন। দ্বিতীয়ত প্রশাসন শীর্ষে মুখ্যমন্ত্রী বসে তাঁর নিজের সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামছেন বলে তাঁর নিজের ইমেজ নষ্ট হতে পারে। কারণ অনশন সত্যাগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কেউ বলেন, তিনি সরকারে না থেকেই এটা ভাল করতেন তখন তার জবাব কি হবে?

যাই হোক শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর নিজের পথে চলবার স্বাধীনতা কেউ খর্ব করতে পারে না। আমিও তার প্রয়োজন দেখি না। তবে তাঁর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সিদ্ধ করার জন্য তাঁর মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের সঙ্গে অথবা ফ্রন্টের মধ্যে পরামর্শ করলে ব্যাপারটা আরও সঠিক হবে বলেই মনে করি। কেন না ইতিমধ্যে সি পি এম ছাড়াও সি পি আই আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে একমত নন বলে জানিয়েছেন।

পশ্চিমবাংলার এই সাম্প্রতিক পরিস্থিতির মধ্যে এবারে যদি সাধারণ মানুষের কথায় আসা যায়, তাহলে বলতে হয় যে, উৎসাহ-উদ্দীপনা তাদের মধ্যে আছে, তারা সেখান থেকেই আরও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আশা করে। কংগ্রেস যা পারে নি, কংগ্রেসের ক্ষমতায় যা নেই এবং আগামী ভবিষ্যতে কংগ্রেস যা পারবে না তারই বিকল্প পথ হিসাবে মানুষ যুক্তফ্রন্টকেই দেখতে চেয়েছে। এখানে 'মিনিফ্রন্ট' বা সত্যাগ্রহ মানুষের মনে কোন দাগ কাটবে না। নেতৃত্ব যদি ব্যর্থ হয় তবে জাগ্রত মানুষ নিজেরাই এগিয়ে যাবে এবং ১৯৬৭ সালের প্রাক-নির্বাচনপর্বে তারা যা পারে নি—নির্বাচনোত্তর সময়ে তাই করে যেমন দেখিয়েছিল, তেমনিভাবে এবারেও দেখিয়ে দেবে। পশ্চিমবাংলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতির মধ্যে সে লক্ষণ ইতিপূর্বেই পরিস্ফুট।

॥ দুই ॥

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অভিনব নজির সৃষ্টি করতে চলেছে। গণতন্ত্রের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সরকারী কাজের ভালমন্দের জন্য মন্ত্রিসভা যৌথভাবে নাগরিকদের কাছে দায়ী থাকেন। এযাবৎ পৃথিবীর সব দেশেই এই রীতি মেনে চলা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৪টি রাজনৈতিক দলের একটি কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট চালু আছে। প্রত্যেক দলের পৃথক পৃথক মতাদর্শ থাকলেও বত্রিশ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। দলের শক্তি অনুযায়ী আসন ভাগাভাগি করে তাঁরা যুক্তফ্রন্ট হিসাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন এবং আইনসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জী যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসাবে মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব লাভ করেন এবং তিনি কোয়ালিশনে প্রত্যেক দলের শক্তি অনুযায়ী সরকারী দপ্তরগুলো বিভিন্ন দলীয় মন্ত্রীদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেন। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর এই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা যৌথভাবে দেশবাসীর কাছে তাঁদের সকল কাজের জন্য দায়ী থাকবেন বলে সকলে আশা করেছিল। কিন্তু সে আশা ফলবতী হয় নি।

রাজ্যে শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, কিন্তু চূড়ান্ত দায়িত্ব মন্ত্রিসভার। আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে তার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়ী হবেন ঠিকই কিন্তু তাতে মন্ত্রিসভার দায়িত্ব কিছু কমবে না এবং মুখ্যমন্ত্রীও জবাবদিহির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন না।

এসব কথা অজয়বাবুর ও জানা আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অদ্ভুত পরিস্থিতিই তাঁকে প্রচলিত রীতির পরিবর্তে নতুন পথে চলতে বাধ্য করেছে।

সত্যি কথা বলতে কি পশ্চিমবঙ্গের আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় মোটেই খারাপ নয়। সে কথা অজয়বাবু নিজেই স্বীকার করেছেন। তবে এই রাজ্যের বিশেষ ধরনের কয়েকটি ঘটনাবলী ভারতের প্রগতিশীলমহলে যথেষ্ট উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। সেটা হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী হানাহানি। এই হানাহানির ফলে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দলের বহু সমর্থক নিহত এবং পঙ্গু হয়েছেন এবং বিভিন্ন এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা বিদ্যমান। যুক্তফ্রন্টের শরিকরা অভিযোগ করছেন যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দল পুলিশের সহায়তায় অন্যান্য দলগুলোকে পিটিয়ে শেষ করে দেবার কাজে নেমে পড়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দল এই অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন যে, হতাহতদের মধ্যে তাঁদের দলের সমর্থক সংখ্যাই বেশি। এই অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। তবে শরিকী সংঘর্ষ একটা বাস্তব ঘটনা এবং তাতে ইতিমধ্যেই যে শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বাংলা দেশের প্রত্যেকটি দলেরই নিজস্ব কতকগুলো এলাকা আছে। সেই সব এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে নানা কাজে জড়িয়ে থেকে বিভিন্ন দল নিজ নিজ দলীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। একদল যখনই অপর দলের প্রভাবযুক্ত এলাকায় ঢোকবার চেষ্টা করছে, তখনই সংঘর্ষ বাধছে।

জোতের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দেশক আইন চালু করেছিলেন কংগ্রেস সরকার কিন্তু তাঁরা সেই আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ না করে বড় বড় জোতদারদের আইন ভঙ্গের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। যুক্তফ্রন্টের আমলে সরকারী আনুকূল্য লাভ করে কৃষকরা বেনামা জমি উদ্ধার করতে সুরু করেন। যে দল যেখানে শক্তিশালী ছিলেন, সেই দলের কৃষকরা সেখানে এই কাজে অগ্রণী হন। অপর দল সেখানে ঢোকবার চেষ্টা করলেই হানাহানি বেধে যাচ্ছে।

সহর এবং সহরতলীতে সংঘর্ষ বাধছে ইউনিয়ন দখল নিয়ে। এক দলের নেতৃত্বাধীন ইউনিয়নে অপর দল নাক গলাতে এলেই বোমাবাজী এবং ছুরিছোরার কাজ সুরু হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, কায়েমী স্বার্থ এই শরিকী সংঘর্ষের সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দলে ভিড়ে

বাড়ছে এবং তাতে সঙ্ঘর্ষের মাত্রাটা আরও বাড়ছে।

এই পরিস্থিতি যুক্তফ্রন্টের মূলনীতির পরিপন্থী। যুক্তফ্রন্টের বড় বড় শরিকরা সকলেই মার্ক্সবাদে দীক্ষিত। মার্ক্সবাদী তত্ত্বে খুব স্পষ্ট করেই বলা আছে যে, ইতিহাসের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়ের বিরুদ্ধেই সমস্ত আক্রোশ কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং যত-বেশি সম্ভব সুহৃদের সঙ্গে মিলেমিশে একযোগে প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। সেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সহযাত্রী-দের ছোটখাট বিরোধ দূর হয়ে যাবে এবং তখন তাঁরা সমাজবিপ্লবের পথে অতি দ্রুত অগ্রসর হতে পারবেন। প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্থগিত রেখে মার্ক্সবাদী দল-গুলো যদি নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি করেন এবং সেটাকে শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষ বলে চালাতে চান, তাহলে আর যাই হোক, বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে না।

মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী যদি মার্ক্স-বাদী দলগুলোর মধ্যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত কর-বার জন্য সত্যাগ্রহ করতেন, তাহলে আপত্তির কোন কারণ নেই। কারণ মার্ক্সবাদী দল-গুলো যে তাঁদের আচরণের দ্বারা মার্ক্সবাদ থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছেন, সে কথা মোটেই অস্বীকার করা যায় না।

যুক্তফ্রন্ট একটা ঐতিহাসিক পর্যায়। ইতিহাসের সেই অপরিহার্য পর্যায়কে সার্থক করার দায়িত্ব মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী দলগুলোর। তাঁরা যদি সেই দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন, তাহলে ভবিষ্যৎ পুরুষ ওদের ক্ষমা করবে না এবং মার্ক্সবাদের এ যুগের নায়করাও ইতি-হাসের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হবেন।

আগেকার দিনে পুলিশের কাজ ছিল দেশের বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করা। যুক্তফ্রন্টের আমলে পুলিশ কিছুতেই সেই ভূমিকা পেতে পারে না। তেমনি পুলিশ কোন বিশেষ দলের তাঁবেদারও হতে পারে না। কংগ্রেসী আমলে পুলিশ ছিল কংগ্রেসী নায়কদের আজ্ঞাবহ। তাতে কংগ্রেস দল লাভবান হয় নি। কারণ মানুষ বলপ্রয়োগ, শক্তির দম্ভ, অন্যায় এবং অবিচার বেশিদিন বরদাস্ত করে না।

রাজ্যে হিংসাত্মক ক্রিয়া-কলাপ বন্ধের জন্য মুখ্যমন্ত্রী অনশন-সত্যাগ্রহ করে নতুন নজীর সৃষ্টি করলেন ঠিকই, কিন্তু তাতে তাঁর উদ্দেশ্য কতদূর সফল হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শরিকী সংঘর্ষ বন্ধ করতে হলে শরিকদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা এবং বোঝাপড়ার প্রয়োজনই সব চেয়ে বেশি। এ সম্পর্কে কয়েকটি চুক্তি ইতিমধ্যেই অবশ্য নিস্ফল হয়েছে, কারণ সেই চুক্তির সর্ত কোন শরিকই মেনে চলেন নি। কিন্তু আর একবার চেষ্টা করে দেখতে কোন বাধা আছে বলে মনে হয় না। যুক্তফ্রন্ট গভর্নমেণ্ট কায়েম হবার ফলে এই রাজ্যের গরীব এবং খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে যে নবজাগরণ দেখা দেয়েছে, তাতে মার্ক্সবাদী দল-গুলোই লাভবান হয়েছেন সব চেয়ে বেশি। কাজেই শরিকী ঐক্য বজায় রাখার দায়িত্বও তাঁদের বেশি। তাঁরা যে সে পথে কেন অগ্রসর হচ্ছেন না, তা সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারছে না। মন্ত্রিসভায় সরকারের নীতি নিয়ে যখন শরিকদের মধ্যে কোন মত-ভেদ নেই, তখন বাইরের বিরোধ আপোষে মিটিয়ে ফেলা খুব শক্ত কি? শরিকদল-গুলো পরস্পরের ইউনিয়ন এবং পরস্পরের প্রভাবিত এলাকা দখলের চেষ্টা থেকে আপাতত বিরত থাকলেই কি এই সঙ্ঘর্ষ নিবারণ করা সহজ হয়ে উঠবে না? যাঁরা আজ যুক্তফ্রন্টের সহযাত্রী, তাঁরা কি সমাজ-বিপ্লবের লড়াইয়েও পরস্পরের সহযাত্রী নন? তবে এই শরিকী বিদ্বেষ কেন?

বাংলা কংগ্রেসের নেতারা বলেছেন, তাঁদের সত্যাগ্রহ হিংসাত্মক কাজের বিরুদ্ধে, যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে নয়। তাই যদি হয়, তাহলে যুক্তফ্রন্টের শরিকরা অনায়াসেই অঙ্গীকার করতে পারেন যে, তাঁরা হিংসার আশ্রয় থেকে বিরত থাকবেন। কিন্তু অপর পক্ষ (অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের শত্রুপক্ষ) যদি হিংসাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাহলে সেজন্য যুক্তফ্রন্ট শরিকদের তো দায়ী করা যাবে না। তখন সত্যাগ্রহ আন্দো-লন কোন্ খাতে প্রবাহিত হবে? অসাধু জোতদাররা যদি বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রকৃত চাষীর অধিকার কেড়ে নিতে চায়, তখন সত্যাগ্রহ করে সেই জোতদারদের মনে শুভ-বুদ্ধি জাগ্রত করা যাবে কি?

প্রথম প্রেমের মত স্নিগ্ধ মধুর!

দুজনে যেদিন প্রথম দেখা, ও বলেছিল, 'ভারী মিষ্টি গন্ধ তো'। আমি বলেছিলাম, 'তানিয়া'। এখন ও আমাকে ডাকে 'তানিয়া' ব'লে। আচ্ছা, তানিয়ার মিষ্টি গন্ধে কি আমাকে ওর ভালো লেগেছিল, না আমাকে ভালোবেসেই তানিয়া ওর এত পছন্দ—কে জানে।

তানিয়া সুরভি

প্রস্তুতকারক : সাহেব সিং'স্

'বিউটি ইজ ইওর বার্থরাইট' পুস্তিকার জন্য এবং আপনার রূপ-চর্চার নানা সমস্যার উত্তরের জন্য আমাদের 'বিউটি কনসাল্টেন্টস্', পোষ্ট বক্স : ৪৪০, নিউ দিল্লী,—এই ঠিকানায় লিখুন।

Progressive/SS- 2/69

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সূর্য সেন বন্দী

আমরা এখন কল্পনা ও মণি দত্তের অবস্থা জানার চেষ্টা করব। ওদের মুখে ও গেরিলা সংঘর্ষের বিবরণ বিশদভাবে শুনেছি। গেরিলা সংঘর্ষ সম্বন্ধে শান্তিও অনুরূপ বিবরণই দিয়েছে। রাতের সেই নিকষ কালো অন্ধকার রকেট বোমার আলোকে নিশ্চিহ্ন—চতুর্দিক দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট। মাথার ওপর দিয়ে কানের পাশ দিয়ে অবিরাম গুলীর ধারা ছুটে চলেছে।

এরই মধ্যে শত্রুর দৃষ্টির অন্তরালে যে কোন আড়ালের সুযোগ নিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। সামনে একটি পানাভরা নোংরা এঁদো পুকুর। নোংরা কি পরিষ্কার সে বিবেচনা করার সময় বা অবস্থা তাদের নেই। কোনো দিকে না তাকিয়ে দ্বিধাহীনচিত্তে দুজনেই সেই পুকুরে নেমে পড়ল। গুলী চলেছে, রকেট বোমার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। জলের তলায় সমস্ত শরীর ডুবিয়ে মুখ-টাকেও পানার স্তুপের আড়ালে ঢেকে—কেবল নাকটুকু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য জলের ওপরে রেখে দুজনে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেবল যে তাদের মাথার ওপর দিয়েই গুলী চলছিল তা নয় রিভলভার রাইফেলের গুলী সশব্দে এসে আশেপাশে জলের মধ্যেও পড়ছিল। তারা আমাকে বলেছিল—"কেন যে গুলী লাগল না বা কেন যে আলোক বোমার সাহায্যেও শত্রুপক্ষ আমাদের দেখতে পেলো না তা অঙ্কের হিসেবে বলা যাবে না। মোট কথা আমরা আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেলাম।"

সেখানে প্রায় আধ ঘণ্টারও বেশি সময় তারা এই অবস্থায় ছিল। পুলিশ ও মিলিটারী বাড়িটির চারপাশ থেকে মাঝে মাঝে রাইফেল ফায়ার করে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করছিল—যেন কেউ পালাবার চেষ্টা না করে। মিলিটারী ও পুলিশের এত আশা-আকাঙ্ক্ষার শিকার কল্পনা ও মণি দত্ত একফাঁকে আস্তে আস্তে পুকুর থেকে উঠে রাতের অন্ধকারে অন্তর্হিত হলো ও ভোর রাত্রে পটিয়া থানার অন্তর্গত বাগদণ্ডী গ্রামে আমাদের বিপ্লবী সাথী লক্ষ্মণদের গৃহে উপস্থিত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। অন্যান্য সাথীদের ও মাস্টারদার শেষ পর্যন্ত কি হোল সে সংবাদের জন্য সকলেই ব্যস্ত-উৎকণ্ঠিত—কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করবার ছিল না।

যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক ঘটনাই ঘটে সাধারণ হিসেবে যার কোন কারণ নির্ণয় করা যায় না। সুশীল দাশগুপ্তও রাতের অন্ধকারের সুযোগে মিলিটারী বেষ্টনী হতে কোনমতে মুক্ত হলো। বিপক্ষ দল কারো সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে অন্ধকারেই চতুর্দিকে আন্দাজে গুলী ছুঁড়ছিল। শত্রুপক্ষের অস্ত্রসম্ভার প্রচুর—রাইফেল রিভলভারের টোটাও অফুরন্ত। তাই তাদের পক্ষে অবিরাম ধারায় ফায়ার করা অতি সহজ ও স্বাভাবিক—বিপ্লবীদের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে টোটা ছিল না বলেই যে তারা খুব সংযতভাবে গুলী চালিয়েছিলেন তা নয়—শত্রুকে নিজ অবস্থান জানতে না দেওয়ার জন্যই তাঁরা খুব কম ফায়ার করছিলেন। সুশীল দাশগুপ্ত গুলী-বর্ষণের মাঝখানে সামান্য বিরতির সুযোগ নিয়ে বাড়ির কম্পাউণ্ডের নিচু বেড়া টপকে পার হতে যাচ্ছিলেন। খুবই স্বাভাবিক যে তাতে খসখস মচমচ শব্দ হয়েছে। হয়তো সেই শব্দ লক্ষ্য করে গুপ্তস্থান হতে কোনো সৈনিক গুলী ছুঁড়েছে। আশ্চর্য! বোঁ করে গুলীটি এসে সুশীল দাশগুপ্তের রিস্টওয়াচে লেগে ঘড়িটিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেলো।

যুদ্ধক্ষেত্রের এইরূপ অবিশ্বাস্য চমকপ্রদ ছোট ছোট ঘটনা অনেক আছে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই বিষয়ে সৈন্যদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এক সময়ে অবসরপ্রাপ্ত দুজন পাঞ্জাবী জমাদার, একজন গুর্খা হাবিলদার ও কিংস রয়েলস রাইফেলের L. C., Mr. Mcnamara সাহেবের কাছ হতে আমার মিলিটারী ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ হয়, সেই সময়ে তাঁদের কাছে শুনেছি যুদ্ধক্ষেত্রে কে কি রকম আশ্চর্যভাবে রাইফেলের গুলী হতে বেঁচে গিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের Manual-এর শিক্ষা থেকে ও নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে বলেছেন যে, ফায়ারিং লাইনে

যখন দু' পক্ষে গুলী বিনিময় হয়, তখন নিজেকে যে কোন আড়ালের পিছনে রাখার সুযোগ নিতে হয়। দুর্ভেদ্য আড়ালের পিছনে বা বড় শক্ত গাছ প্রভৃতির পাশে আশ্রয় নিতে পারলে নিজেকে বাঁচিয়ে শত্রুকে গুলী করার সুবিধে পাওয়া যায়। আবার ঝোপঝাড়, লতাপাতা প্রভৃতির আড়ালে আশ্রয় নিয়েও অদৃশ্য থাকা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে শত্রুর গুলী প্রতিহত করার উপায় থাকে না। সে অবস্থায় বা একেবারে ধু-ধু খোলা মাঠের মধ্যে সামনাসামনি হঠাৎ আক্রান্ত হলেও শেষ আশা ত্যাগ করতে নেই—তখনও প্রাণের আশা রাখতেই হবে এবং মাটিতে বুক দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে হাতের কাছে যা পাওয়া যায়—যেমন একটুকরো ইট বা মাটির ঢেলা বা ছোট একটুকরো কাঠ বা নিজের পকেটের মানিব্যাগ বা চশমার খাপ যা-কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব, তাই যেন সেই শোয়া অবস্থায় মাথার সামনে রেখে দেওয়া হয়। তাঁরা সবাই বিশেষ জোর দিয়েই বলেছিলেন যে, এই সামরিক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে কোনো সৈনিকেরই অবহেলা বা উপেক্ষা করা উচিত নয়। আমাদের সামান্য অভিজ্ঞতাতেও এটুকুই বলতে পারি, সুশিক্ষিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনী রাইফেল ও মেশিনগানের অজস্র গুলীবর্ষণে জালালাবাদ যুদ্ধক্ষেত্র ঢেকে ফেললেও কিন্তু সেই শিক্ষিত হস্তের বহু সহস্র গুলীতে মাত্র বারোজন বিপ্লবী মৃত্যুবরণ করেছেন, আর সব গুলীই আশেপাশে গাছের ডালপালা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেই স্তব্ধ হয়েছে। একটি গুলী এসে অম্বিকাদার কপালে স্পর্শ করে নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেইভাবেই আজও রাইফেলের গুলী সুশীল দাসের রিস্টওয়াচে লেগে ঠিকরে বেরিয়ে গেল। আর সামনে ছিলেন মাস্টারদা—তিনিও রিস্টওয়াচের আড়ালের দরুণ রক্ষা পেয়ে গেলেন। সুশীল দাশগুপ্ত অক্ষত শরীরেই মিলিটারী বেষ্টনী ভেদ করে উধাও হয়ে গেলেন।

শান্তি রাইফেলের গুলীতে দারুণ আহত হয়েও আশ্রয়স্থলে উপস্থিত হল। কল্পনা ও মণি দত্ত অজস্র গুলীবর্ষণের মধ্যে সেই কর্দমপূর্ণ এঁদো পুকুরে নাকডোবা জলে প্রায় আধঘণ্টাকাল আত্মগোপন করে বিপ্লবী সাথী লক্ষ্মণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলো। কিন্তু ভাগ্যদেবী যেন সেদিন মাস্টারদার বিরুদ্ধে ঘোর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন! —তাঁর ইশারাতেই যেন বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ ক্যাপটেন ওয়ামস্‌লের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়েছিল।

আমরা মনে করতে পারি ইনটেলিজেন্সের সংবাদের ওপর নির্ভর করেই ধলঘাটের সাবিত্রী মাসীমার বাড়িতে ক্যাপটেন কেমারন হানা দিয়েছিলেন—বহুদিনের ব্যবধানে হলেও অনুরূপভাবে ওয়ামস্‌লে সাহেবও গৈরলাতে আজ ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে বিপ্লবী-সন্ধানে উপস্থিত হয়েছেন—এখানে বিশ্বাসঘাতকের কোন হাত নেই।

বিপ্লবীদের গোপন আস্তানার গোপন সংবাদ মিলিটারী বিভাগই সংগ্রহ করেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও—আমার দৃঢ় বিশ্বাস—দলের বিশ্বাসঘাতক বিভীষণের অস্তিত্ব গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই উচ্চ পর্যায়ের পুলিশ মহল মিলিটারীর সাহায্যে এই অভিযান দুইটি এইভাবেই সাজিয়েছিলেন। আমার নিশ্চিত ধারণা—বিপ্লবী দলের বিশ্বাসঘাতক পুলিশের কোন চর গোপনে পুলিশকে এ তথ্য সরবরাহ করেছিল। আমি কোনমতেই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই যে, পুরস্কারের লোভে জনসাধারণই ক্যাপটেন কেমারনকে ধলঘাটের বা আজ ক্যাপটেন ওয়ামস্‌লেকে গৈরলাতে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানার সংবাদ সরবরাহ করেছে। এ বিষয়ের আলোচনা যথাস্থানে নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রের সাহায্যে করবার ইচ্ছা রইল।

ক্যাপটেন ওয়ামস্‌লের সৈন্য পরিচালনার বিশেষ পদ্ধতি অনুধাবনে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁরা মাস্টারদাকে বন্দী করতে নিশ্চয়ই সফলকাম হবেন—এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়েই আজ গৈরলা গ্রামে উপস্থিত হয়েছেন। আজ রাত্রে এই বাড়ির প্রায় আধ মাইল দূরে কোন একটি মাঠে মাস্টারদা, কল্পনা, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত ও সুশীল দাশগুপ্তের এক গোপন বৈঠকে বাণী দে ও তারকেশ্বর দস্তিদারেরও মিলিত হবার কথা ছিল। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী পটিয়া থানার হাবিলাসদ্বীপ গ্রামের Amiable Lodge আশ্রয়স্থল থেকে কালী ও তারকেশ্বর এই সভায় যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেই রাত্রে উপস্থিত হয়েছিল। বেণী চৌধুরী ও ধীরেন দাস, তারকেশ্বর ও কালীকে পথ চিনিয়ে ঐ স্থানে নিয়ে যায়। রাত প্রায় এগারোটা বাজে—এখনো মাস্টারদা ও অন্যান্য সাথীদের দেখা নেই। এই অস্বাভাবিক বিলম্বে কালী ও তারকেশ্বর চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। অনিশ্চয়তার মধ্যে বেশিক্ষণ অবশ্য কাটাতে হল না—রাতের নিস্তব্ধতা ভংগ করে হঠ্যাৎ অদূরে রিভলভার ও রাইফেলের মুহুর্মুহু গর্জন শোনা গেল। কারো আর বুঝতে বাকী রইল না যে, মাস্টারদার গৈরলার আশ্রয়স্থল আক্রান্ত হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাইফেলের আওয়াজ তীব্রতর হয়ে উঠলো ও রকেট বোমার বিচ্ছুরিত আলোকে চতুর্দিক দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। তারকেশ্বর, কালী, ধীরেন ও বেণী সেখানে অপেক্ষা করা বা আবার Amiable Louge-এ ফিরে যাওয়া সমীচীন মনে করল না। তারা উত্তরভূর্সি গ্রামে একটি নতুন আশ্রয়স্থলে চলে গেল। এই বাড়িটি ছিল এক স্বদেশপ্রেমিক নিরীহ ব্রাহ্মণ মাস্টারের। বাড়িটির একটি অপূর্ব ছদ্মনাম ছিল—"কলস নাচ"।

মিলিটারীর কবল হতে সকলে নিষ্কৃতি পেলেও কিন্তু শোষকগোষ্ঠীর ঘুম কেড়ে নেওয়া—অগ্নিযুগের সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের নিষ্কৃতি মিললো না—ভাগ্যদেবী আজ অতি নিষ্ঠুরা নিষ্করুণ মূর্তিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এই সর্বত্যাগী মানুষটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সূচীভেদ্য অন্ধকারে এক হাত দূরের জিনিসও দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। প্রথমেই মাস্টারদা ও ব্রজেন সেন চলেছেন—বেড়া পেরিয়ে যাবার সময়ে দুজনে একেবারে কোনো এক সৈনিকের বাহুবেষ্টনীর মধ্যেই গিয়ে পড়লেন! একেবারে প্রথম ধাক্কাতেই এই ঘটনা ঘটে গেল—দুজনেই একযোগে আকস্মিকভাবে শত্রুহস্তে বন্দী হলেন।

এই গৈরলা সংঘর্ষের বিবরণ ও মাস্টারদার ধরা পড়ার তথ্য সরকারী দলিল থেকেই উদ্ধৃত হলো। হাইকোর্টে মাস্টারদার আপীলের শুনানীর মুদ্রিত জাজমেণ্টের ২৪৬ পৃষ্ঠায়ঃ

"The next incident of importance took place at Gairala, three miles off Dhalghat, when Surjya Sen was arrested. Witnesses to the occurrence are P. Ws: 94, 103, 104, 105 and 107. P. W. 94 Captain Waumsley states that he went to Gairala, on account of information received on the night of 16-2-33."

এখানে সাক্ষী ক্যাপটেন সাহেব সর্বসমক্ষে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, সেই রাত্রেই বিপ্লবীদের খবর পেয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে তিনি গৈরলা গ্রামের বাড়িতে হানা দিতে গিয়েছিলেন। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে—বিভীষণকে রক্ষা করার এই সাধু প্রয়াস নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ। আবার উদ্ধৃতিঃ

"His party consisted of 35 Sepoys, 3 A.S.Is. and 3 constables. They surrounded the house of one Biswas there, parties starting from the East side, where he and the Police Officers took their stand, and

going North and South. About 5 minutes later he heard sounds like Revolver shots from the North-West and the reply of his men."

পুলিশ অফিসারদের নিয়ে সাহেব বাড়িটির পূর্বদিকে দাঁড়ালেন এবং বাড়িটিকে ঘেরাও করবার জন্য সৈন্যদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাঠালেন। মিনিট পাঁচেক পরে তিনি রিভলভারের আওয়াজ শুনতে পান। ন্যায়বান ইংরেজ কখনোই আগে গুলী ছোড়েন না। তাই রিভলভারের শব্দ শোনার পরই তিনি তাঁর লোকদের রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পেলেন।

এই উদ্ধৃতির ঠিক পরের অংশটুকুতেঃ

"Then his Habildar Motilal (P. W. 103) came to him for Bombs and a very light Pistol, as he believed the firing came from one building. Captain Waumsley went to the North to the place where the firing had occurred. He could not see anyone but heard sounds of splashing in water."

ক্যাপটেন সাহেব দুর্বলচিত্ত কাপুরুষ নন—কেমারন সাহেবের শোচনীয় পরিণতির কথা জানা থাকা সত্ত্বেও বীরবিক্রমে তিনি যে-স্থান হতে গুলীর আওয়াজ আসছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও জলে সাঁতার কাটার মত শব্দ শুনতে পেলেন।

"About half an hour later he heard some Revolver shots on the West side and a few Rifle shots in reply."

আবার সেই পুনরাবৃত্তি—আগে রিভলভারের আওয়াজ তারপরে রাইফেলের।

"Later, his Lance Naik informed him that two Prisoners had been caught. When going round the Cordon he saw the two Prisoners tied-up on the West-side and was informed that a Webly Revolver and 12 rounds of ammunition and some papers had been taken from one of them. About 2 A.M. on going rounds the Cordon again, he told the Police Officers of the Capture and took them with him. The Police Officers then identified the Prisoners as Surjya Sen and Brojen Sen. Man Bahadur sepoy pointed out to him Surjya Sen as the person with whom he found the Revolver and other things. He identified the Revolver ....."

তাঁর ল্যান্স-নায়েকের কাছ থেকে ক্যাপটেন সাহেব খবর পান যে তারা দুজনকে বন্দী করেছে। রাত দুটোর সময় তিনি পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে বন্দীদের পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন যে, একজন সূর্য সেন ও অপরজন ব্রজেন সেন। গুর্খা সেপাই মান বাহাদুর মাস্টারদাকে বন্দী করে। অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে তিনি মান বাহাদুরের গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিলেন। মান বাহাদুর মাস্টারদার কাছ হতে প্রাপ্ত রিভলভারও কিছু কাগজপত্র ক্যাপটেন সাহেবকে দেখায় ও পরে আদালতে সেগুলি সনাক্ত করে।

তার পরের বিবরণ—সারারাত বাড়িটি তারা ঘিরে রাখে এবং পরদিন সকালে তল্লাসীর কাজ শুরু করে। ক্যাপটেনের আদেশে পুলিশ অফিসার শৈলেন্দ্রবাবু প্রায় দু' শ' গজ পর্যন্ত রক্তচিহ্ন অনুসরণ করেন। তারপরে আবারঃ

"...Motilal Habildar corroborates P. W. 94 and says he went with the Cordon by the North of the house. Whilst arranging his men to join up with those on the West-side, a torch light was flashed on the Cordon and then some revolver shots were fired from the bamboo grove. His men replied and he heard a shriek and splashing in water. He went for a very (sic) Pistol and his Saheb returned with him. Later he heard more firing South of where he was and was informed two men had been caught. When his Saheb came round the Cordon he reported this to him. In the morning he saw Surjya Sen and another man under arrest and followed a trail of blood some distance to the East.

হাবিলদার মতিলাল বলছেন যখন তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকে বাড়িটিকে ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করছিলেন তখন তাঁদের বেষ্টনীর ওপর টর্চের আলো পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে ক' রাউণ্ড রিভলভার ফায়ার হয়। শান্তির বিষয়ে লিখতে গিয়ে এ ঘটনার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। রিভলভারের গুলীর শব্দ লক্ষ্য করে সেপাইরা রাইফেল চালিয়ে ছিল ও রাইফেলের গুলীতে শান্তি গুরুতর আহত হয়। শান্তি চক্রবর্তী যে সাঁতার কেটে পার পেয়েছিল তার সমর্থনও এই উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাচ্ছে। শান্তির আঘাত যে অত্যন্ত গুরুতর হয়েছিল তার প্রমাণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দু'শ গজের ওপরেও শত্রুপক্ষ তার রক্তরেখা অনুসরণ করেছে। এই উদ্ধৃতিতে আরও একজনের গ্রেফতার হওয়ার উল্লেখ আছে।

"Man Bahadur sepoy proves that on the night in question he was posted in the Cordon on the West-side of the house on his left were Nur Singh and another sepoy. He heard some firing to his North. Later there was more Revolver firing in front of him. He kept quiet and then heard the rustling of bamboo leaves. He caught a man whom he indentifies as Surjya Sen, and another man was caught on his left.....................

...............He made over the papers to the police but took the Revolver and Cartridges to the Thana with the Saheb..................

"Nur Singh proves his capture of oneman, identified as Brojendra Sen and the capture of Surjya Sen by Man Bahadur. He found nothing on the man he captured."

নুর সিং মান বাহাদুরের বাঁদিকে ছিল, সে ব্রজেন্দ্র সেনকে জাপটে ধরে। ব্রজেন সেনের কাছে সে কোন অস্ত্রাদি বা নিষিদ্ধ জিনিস পায় নি। কথাটা ঠিক, কারণ আমরা জানি ব্রজেন সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কালী দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য মাস্টারদাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিযুক্ত ছিল।

মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে ধলঘাটের মিলিটারী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে কাঁটাতারে ঘেরা একটি স্থানে মিলিটারী প্রহরায় বহু ঘণ্টা তাঁদের আটক রাখে ও পরে মিলিটারীর সাহায্যে চট্টগ্রাম জেল হাজতে নিয়ে আসে।

[ক্রমশ]

বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৭৪ বর্ষ ২০শ সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন' শিরোনামায় প্রকাশিত আপনাদের বক্তব্য সম্পর্কে দু-একটি কথা বলতে চাই।

না চাইলেও এটা মানতেই হবে যে, যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো দল প্রায় হামেশাই শরিকী সংঘর্ষে লিপ্ত থাকছেন এবং এ সত্যও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ফ্রন্টের কোনো কোনো দলের দায়িত্বশীল নেতারাও নিজের ক্যাডারদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন। ফলত গণ্ডা গণ্ডা "চুক্তি" করেও এবং দফায় দফায় "আবেদন" জানিয়েও রাজ্যের কাজ কিছুই হচ্ছে না এবং শরিকী সংঘর্ষ চলছে। ফ্রন্টের এক দল আর এক দল সম্পর্কে নোংরা ইঙ্গিত করছেন এবং "সরকারী যন্ত্রকে দলীয় স্বার্থে লাগানো হচ্ছে" বলে অভিযোগ আনছেন। এ সবই বিরামহীনভাবে চলছে। এ ওঁকে শাসাচ্ছেন, ও ওঁকে চোখ রাঙাচ্ছেন। মাঝে-মধ্যে নেতারা বসছেন, "হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে" আলোচনা করছেন আর গাদা-গাদা "বিবৃতি" বিলোচ্ছেন। এদিকে কয়ঘণ্টা যেতে না যেতেই নতুন সংঘর্ষের খবর মিলছে। এ শরিকের লাঠির ঘায়ে ও শরিকের কর্মী মরছেন।

দেখা যাচ্ছে রোগটা ক্রমেই বেশি করে সংক্রামিত হচ্ছে। ব্যতিক্রম শুধু ওয়ার্কার্স পার্টি। শরিকী সংঘর্ষে একমাত্র এ দলটিই লিপ্ত হয় নি এবং শরিকী সংঘর্ষ রোধ করতে ও যুক্তফ্রন্টকে চোখের মণির মত অক্ষত রাখতে মার্কসবাদের প্রতিনিধিস্থানীয় এই একটি দলই দেখতে পাচ্ছি আত্যন্তিক নিষ্ঠা সহকারে নিজের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। এই দলের কোনো নেতাই এ অপবাদও দিতে পারেন না যে, উনি 'র‍্যাঙ্ক-অ্যান্ড ফাইল'-কে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন বা তুলছেন।

তাই, "......যুক্তফ্রন্টের শরিক সকল রাজনৈতিক দলই নিছক দলীয় স্বার্থে কাজ করে চলেছেন এবং সেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুক্তফ্রন্টকে ব্যবহার করছেন।। ......প্রত্যেকটি দলনেতা শরিকী সংঘর্ষ আরও জোরদার করার জন্য র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলকে উৎসাহিত করছেন......", বঙ্গদর্শনের দায়িত্বশীল লেখকের এসব দায়িত্বহীন উক্তিগুলি স্বভাবতই আমার কাছে ভিত্তিহীন মনে হয়েছে। বিশেষ করে উদ্ধৃতাংশের "সকল" ও "প্রত্যেকটি"—শব্দ দুটি যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে, ঐরূপ মনে করার সংগত কারণ আছে। কেন না যুক্তফ্রন্টের 'সকল' দল ও 'প্রত্যেকটি' দলনেতা সম্পর্কে প্রামাণ্য-তথ্য সহ অভিযোগ দায়ের করতে বঙ্গদর্শনের লেখক শুধু যে ব্যর্থ হয়েছেন তাই নয়, বিনা তথ্যেই ফ্রন্টের 'সকল' দল ও 'প্রত্যেকটি' দলনেতা সম্পর্কে দায়িত্বহীন উক্তি করতে গিয়ে সব রকমের উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে মুক্ত ওয়ার্কার্স পার্টিকেও অকারণে আক্রমণ করে ফেলেছেন।

পাঠকমন

(মতামত লেখকের)

এখন হয় তিনি সকল দল ও প্রত্যেকটি দলনেতা সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ প্রমাণিত করুন, অথবা নিজের উক্তিটি শুধরে নিন।

—রাজেন উপাধ্যায়
স্টেশন রোড,
পোঃ বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)

সপ্তাহের বোঝা প্রসঙ্গে

আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর আবাল্য পাঠক। এত অল্প দামে এত সুন্দর পত্রিকা অন্য দেশে বলছি না, অন্তত ভারতবর্ষে খুঁজে দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। 'ভারতদর্শন', 'বঙ্গদর্শন', 'আন্তর্জাতিক', 'পাঠকমন', 'রঙ্গজগৎ', 'খেলাধূলো' প্রতিটি বিভাগই চিত্তাকর্ষক ও অনুপম। তবুও কেন জানি না কৃত্তিবাস ওঝার 'সপ্তাহের বোঝা' বিভাগটি অত্যন্ত বেশি ভালো লাগে। গত ৭৪ বর্ষ, ২১ সংখ্যা সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসের লেখাটি পড়ে চমকে গেছি। ভদ্রলোককে অপ্রিয় সত্যি কথা বলতে বারণ করুন। তাহলে সাংবাদিকতায় ম্যাগসেসে বা পদ্মবিভূষণ জুটবে না। বরঞ্চ সেই কাগজের সাংবাদিকের মতো দুড়ি দুড়ি মিথ্যে আর কষ্টকল্পনার ঠাসবুনোনিতে লিখুন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইন্দিরাপন্থীদের পাকা কথা হয়ে গেছে। তাহলেই আপনি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কৃত্তিবাসের কীর্তিবাস হোক এই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

—অসিতকুমার দত্ত
৩০, বাজেশিবপুর ২য় বাইলেন,
শিবপুর, হাওড়া-২

একটি প্রতিবাদ

'পাঠকমন' কলমে বাঁকুড়ার আর-এস-পি'র সম্পাদকের (শ্রীপাত্র মহাশয়ের) আমার লেখার ওপর প্রতিবাদ পড়লাম। এ বিষয়ে কয়েকটি তথ্য আমি প্রকাশ করতে চাই ও সঙ্গে প্রশাসনিকও।

প্রথমত ব্লাড ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমাদের কাছে নালিশ এসেছিল যে তাঁর (আর-এস-পি) পার্টির সভ্যেরা তাঁদের বিশেষ রোগীর জন্য মেডিক্যাল ওয়ার্ডের রক্ত নিতে গিয়ে ডাক্তার ও সহকর্মীদের ওপর হম্বিতম্বি করেন। কারণ তখন নাকি স্টোরে ব্লাড ছিল না। এমনও বলতে শোনা যায়—'ব্লাড দেবে না মানে—ওর ঘাড় দেবে' বলা নিষ্প্রয়োজন রক্ত তো আর ফ্যাক্টরীতে তৈরি হয় না। একজনকে রক্ত দিতে হয়। তার পরিবর্তে রোগী পায়। সুতরাং একটু ধৈর্যের প্রয়োজন হয় এসব ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয়ত পাত্র মশায়ের উল্লিখিত ডাক্তারবাবু, যিনি তাঁদের দলের কর্মীদের চিকিৎসা করেন ও হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত নন—তিনি ৫।৬ মাস পূর্বে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে কোন একটি রোগীর তাড়াতাড়ি অপারেশন হচ্ছে না কেন—সেজন্য ওয়ার্ডে গিয়ে হাউস সার্জন বা নার্সদের অনুমতি না নিয়েই তিনি কি কি ইনভেস্টিগেশন হয়েছে তার তদারক করেন। এখন জিজ্ঞাস্য—সেই ডাক্তারবাবু কোন্ এক্তিয়ার বলে এ-রকম অশোভনীয় কাজ করেন। তিনি এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে না স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দলের স্থানীয় চিকিৎসক হিসেবে এ-রকম অসৌজন্য প্রকাশ করেন। যদি প্রথমোক্ত সত্য হয়—তাহলেও সেটা ভাল নয়। কারণ হাউস সার্জনদের জিজ্ঞেস না করে বেড টিকিট দেখা—মেডিক্যাল এথিক্স-এর বাইরে।

তৃতীয়ত পাত্র মশায় নিশ্চয়ই এতদিনে জানতে পেরেছেন যে, সেই জেনারেটার সম্বন্ধে প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত দুজন শিক্ষককে দিয়ে একটি কমিশন বসান হয়েছে। ভেতরের খবর তাঁরাই বেশি জানবেন। তাঁরা প্রতিবাদ কখন করেছেন? এই তো কিছুদিন হল। যখন সব জিনিস জানাজানি হয়েছে। আর সেই জেনারেটার তো তাঁর দলের জনৈক পালিতবাবুর তত্ত্বাবধানেই বসেছে বলে তো জানি।

চতুর্থত আর-এস-পি'র কোন সভ্য বা কর্মী ভর্তি হয় নি বলে সম্পাদক মশায় যে উক্তি করেছেন—সে সম্পর্কে বলি—বাঁকুড়া বাজারে যে স্থূলকায় ভদ্রলোক যিনি ফল বিক্রি করেন—তাঁকে নিয়ে তাঁরই দলের লোক এসে যখন আউটডোরে ডাক্তারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন যে, "ইনি আমাদের দলের একজন কর্মী"—এবং সেই সার্টিফিকেটে তিনি হাইড্রোসিল অপারেশন-এর জন্য ভর্তির অনুমোদন পান তখন সম্পাদক মশায় আপনার উক্তির সত্যতা আপনিই চিন্তা করুন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন আমি আমার আত্মীয়কে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম।

পঞ্চমত তাঁর ষষ্ঠ স্তবকের উত্তরে জানাই—পাত্র মশায় সত্যিই পাত্র চিনতে অক্ষম হয়েছেন। আমার উল্লিখিত ডাক্তার বহুদিন হল ইমার্জেন্সী থেকে বদলী হয়ে গেছেন। তিনি বোধ হয় কখনও প্র্যাকটিস

করেন নি। পাত্রবাবু ও-ব্যাপারে কিছু না জেনেই একটি প্রতিবাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর যে ডাক্তারের ওপর ডিউটি না দেওয়ার কারণে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ—তাঁর সম্বন্ধে পাত্র মশায়েরা কি করলেন। তাঁরা জনসেবা করেন, বাস-সার্ভিস চালু করেছেন। অথচ ডাক্তারকে তার কর্তব্য করাতে পারছেন না।

ষষ্ঠত সপ্তম স্তবকে তিনি লিখেছেন—কায়েমী স্বার্থের ডাক্তারদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। গালভরা কথা। এটা তাঁদের মন্ত্রীর বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি। কায়েমী স্বার্থে আঘাতের কথা বলবেন না। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'-ই তো বলে দিচ্ছে। আঘাতটা কোন্ ভীমরুলের চাকে। তাই ওসব কথা বললে—'জনসাধারণই হাসবেক।'

এরপরে বলি একটি প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থার কথা।

বাঁকুড়া কলেজের একটি ছাত্রের এক দাদা কলকাতার কোনও এক মেঃ কলেজে পড়ে। সে খরচ কমানোর জন্য এখান থেকে কলকাতায় বদলী চেয়েছিল। কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে তার উত্তর এসেছে 'না'। এটা খুব ইদানীং। এখানে কুমারী মৈত্রেয়ী চৌধুরী নামে একটি প্রি-মেডিক্যাল পাশ করা মেয়ে ডেন্টাল কলেজের ছাত্রী ছিল—১৩-১১-৬৯ তারিখে প্রেফারেন্স অনুযায়ী বাঁকুড়া মেঃ কলেজে ১ম বর্ষে ভর্তি হয়। (রোল নং ৪৮)। এর পর দেখা গেল তার পিতা একটি জি-ও নিয়ে এলেন—তাতে পুনর্বিবেচনা করে তাঁকে আর জি কর-এ ভর্তি করার জন্য সরকার অনুমতি দিয়েছেন। ডেন্টাল কলেজের কয়েকটি ছেলেই ডাক্তারী পড়ার সুযোগ পেয়েছে। শোনা যায় কয়েকজন দাঁতের ডাক্তারী পড়া ছাত্র প্রথমে এম-বি-বি-এস পড়ার জন্য দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু নম্বর কম থাকায় ভর্তি হতে পারে নি। দুষ্টলোকে বলে সেইসব ডেন্টাল কলেজের ছাত্রদের কেউ কেউ কলকাতার কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকদের দালাল। সেইসব চিকিৎসকদের তৎপরতায় ও জোর তদ্বিরে তাঁদের 'ছা'-দের (বাঁকুড়ার চলতি ভাষায় ছেলেকে 'ছা' বলা হয়) ডাক্তারী পড়ার সখ পূর্ণ হয়। এবং সে সুযোগে আর কিছু ছাত্র চান্স পায়। ঘুরিয়ে নাক দেখানোর এ এক মহৎ উপায়। কাজেই দেখতে পাচ্ছি যে, কোন কিছুই অসম্ভব নয়। আইন-কানুন পুরুত-ঠাকুরদের গায়ে আবৃত নামাবলীর মতন। জায়গা মত আগমার্কা ও বিল্বপত্র দিতে পারলেই সব কাজ ও মুস্কিল আসান হয়।

অতএব সম্পাদিকা মহাশয়া 'পাঠকমনে' চটক দিতে অনেক 'কথক'-ই পেশ করা হবে। কিন্তু ধোপে টিকবে না। আপনাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

—মনিরুল ইসলাম, বাঁকুড়া

স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা স্বাস্থ্যদপ্তরের মধ্যেকার কিছু দুর্নীতির খবর দিয়ে কারও কারও বিরাগভাজন হয়েছেন দেখছি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে যে ব্যর্থ হয়েছেন, সেটা তিনি নিজেও জানেন। তাই সেই চিঠি বাদ দিয়ে তিনি এখন ওখানেও পার্টি ওয়ার্ক করছেন। কিন্তু ওসব ছেড়ে দিলেও তাঁর নিছক অপদার্থতায় কয়েকটা নমুনা নিচে দিই।

১। হাজার চেষ্টা করেও ননীবাবু ডাক্তারদের দিয়ে দিনে আট ঘণ্টা ডিউটি করাতে পারেন নি। ডাক্তারদের দুষ্টচক্রের কাছে তিনি আত্মসমর্পণই করেন নি, তিনি নিজেই যেন ঐ চক্রীভূত হয়ে পড়েছেন।

২। তাঁর জানা সত্ত্বেও হেলথ ডিপার্টমেন্টের একজন বাস্তুঘুঘু অফিসারকে তিনি এক্সটেনশন দিয়েছেন? এই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে বেআইনী সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার প্রচণ্ড অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ননীবাবু তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এমন কি এই অফিসারটির কথামতো তিনি শ্রীঅমল পোদ্দার নামে একজন ইনজিনিয়ারকে ডিঙিয়ে অন্য জুনিয়ার একজন ইনজিনিয়ারের প্রমোশন দিয়েছেন বলে অভিযোগ।

৩। জনৈক শ্রীদাসকে কি 'চোর' আখ্যা থেকে ননীবাবু মুক্তি দিয়েছেন? দাস-মশাই কি মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ডিপার্টমেণ্টে?

৪। পাবলিক হেলথ ইনজিনিয়ারিং-এর একজন ইনজিনিয়ারের পেছনে লেগেছিল ডিপার্টমেন্ট। ভদ্রলোক ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে দিয়ে মুক্তি পেয়েছেন। হেলথ ডিপার্টমেন্টের খাতা থেকে বেআইনীভাবে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। আর্জি করেও কোন লাভ হয় নি। তদানীন্তন হেলথ সেক্রেটারীর (মিঃ গুপ্ত) একটি ভালো নোটিং ফাইলে থাকায় ভদ্রলোকের পার্সোনাল ফাইলটি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

৫। একজন অফিসার কি স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে রিজাইন করে দুই বছর বাইরে থেকে পরে এসে আবার জয়েন করে দু' বছরের মাইনে ও ইনক্রিমেন্ট সব পেয়েছেন একজন ডেপুটি সেক্রেটারীকে হাত করে?

ননীবাবু প্রতিবাদ করলে আরও মালমশলা ছাড়বো। —গণেশ ভট্টাচার্য

আন্দুল, হাওড়া

* * *

"গত ৯ই অক্টোবর তারিখে সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় শ্রীমনোরঞ্জন হাজরার লেখা "স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফেরাতে হবে গোটা ফ্রণ্টকে" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম এবং এইটি প্রকাশ করার জন্য আপনাকে ও শ্রীহাজরাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই লেখায় শ্রীহাজরা মাত্র কয়েকটি দুর্নীতি ও অবিচারের কথা বলেছেন। এ ছাড়াও বহু উদাহরণ আছে। স্বাস্থ্যদপ্তর এমন একটি দপ্তর, যে দপ্তরের সংগে জনজীবন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তাই সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি শ্রীহাজরার স্বাস্থ্যদপ্তর এবং সেই দপ্তরের দুর্নীতি সম্বন্ধে এক বাস্তবচিত্র তুলে ধরার জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি স্বাস্থ্যদপ্তরের অপকর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন, তাহলে আরও অনেক পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত ও দুর্নীতির সন্ধান পাওয়া যাবে। এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সাধারণ মানুষ হিসাবে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করি। তাঁরা তাঁদের সজাগ দৃষ্টি দিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনুন।"

—শ্রীসলিল চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা—৩

* * *

৩০শে অক্টোবরের সাপ্তাহিক বসুমতীতে বাণীন রায়ের প্রতিবাদপত্র পড়লাম। আমার নিজের কোন প্রয়োজনে কয়েকদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সংগে দেখা করবার জন্য মহাকরণে গিয়েছিলাম। বাণীনবাবুর ঘরে বসে ক'দিন তাঁর কার্যাবলী দেখেছি এবং তারপর বাণীনবাবুর পত্র পড়ে আমার কিন্তু বক্তব্য আপনাদের কাছে পেশ করবার কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। অবশ্য জানি না, আপনারা এই চিঠি ছাপাবেন কি না?

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিশ্বস্ত সহকারী দু'জন। কিন্তু বাণীনবাবু কেন নিজের ঘাড়ে এ দায়িত্ব নিলেন? তিনিই কি আসল কর্তা? ডায়েট সাপ্লাই সম্বন্ধে সরকারী নথিপত্র দেখবার এবং তা থেকে ফাইলের নম্বর ও ভিতরের উদ্ধৃতি নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করবার অধিকার তাঁকে কে দিল? আসলে সবাই জানেন তিনি নামে মন্ত্রী না হলেও, তিনি যা কিছু করেন তা সহজেই মেনে নেওয়া হয়, ডায়েটের ব্যাপারেই তা প্রমাণিত। তাঁর চিঠি থেকেই জানা যাচ্ছে, মিটিং মন্ত্রী মহাশয়ের ঘরে হয়েছিল এবং যে সব কনট্রাক্টরকে অর্ডার পাওয়ানো দরকার ছিল, তাদেরকে তা পাওয়াতে তো বাণীনবাবুর কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। কমিটি কাদের নিয়ে তৈরি? তাঁরা কি স্বাস্থ্যদপ্তরের লোক নন? তাঁরা কি মন্ত্রী তথা বাণীনবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করবার সাহস রাখেন?

—কিশোরী বসু

কলকাতা-১

চাঁদ-সংবাদ

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ২ ॥

বিশেষজ্ঞরা বললেন, নিখুঁত হওয়া চাই সব কিছু। ঘাড়র কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে সব কিছু চলা চাই। কারণ, এবারের অভিযানে ঝুঁকির পরিমাণ আগেরটির তুলনায় আরও বেশি।

এবার বিশেষ এক অ-বক্র পথ ধরে ছুটবে মহাকাশযান; 'হাইব্রিড ট্র্যাজেকটরি' ধরে সে চাঁদে নামবে। এর আগে চাঁদের দেশে প্রেরিত সব কটি মহাকাশযানই 'ফ্রী রিটার্ন ট্র্যাজেকটরি' অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ, অনুসরণ করেছে এমন এক পথ যে নভশ্চররা কাজকর্ম বন্ধ করে বসে থাকলেও মারাত্মক বিপদ কিছু ঘটবে না; মহাকাশযানটি চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করবে।

এ-ধরণের যাত্রাপথে সুবিধে হল এই যে, মহাকাশযানের গুরুত্বপূর্ণ কোনো যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেলেও মহাকাশচারীরা বিপদে পড়বেন না; পৃথিবীতে নির্বিঘ্নেই ফিরে আসবেন। কারণ, চাঁদ ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের হেরফের এক্ষেত্রে সাহায্য করবে ওঁদের। অর্থাৎ, মহাকাশযানটিকে একবার যদি ঠিক পথে স্থাপন করা যায় তো চাঁদের দুর্বল মাধ্যাকর্ষণশক্তি তাকে চাদ-প্রদক্ষিণে বাধ্য করতে না করতেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি কার্যকরী হবে তার ওপর এবং তাকে টেনে নামিয়ে আনবে পৃথিবীরই দিকে।

অ্যাপোলো-৮, ১০ এবং ১১র ক্ষেত্রে এ-ধরণের যাত্রাপথ অনুসরণ করা হয়েছিল। কিন্তু চাঁদের ঝঞ্ঝা-সমুদ্রে অবতরণকারী অ্যাপোলো—১২-র ক্ষেত্রে এ-পথ অকেজো বলে পরিত্যক্ত হল। অর্থাৎ, যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলে পূর্বসূরীদের মতো খুশিমাফিক ঘরে-ফেরার উপায় রইল না তার।

কিন্তু আদৌ কি রইল না?—প্রশ্ন তুললেন কেউ কেউ। বললেন, যান্ত্রিক বিভ্রাট দেখা দিলে অ্যাপোলো-১২ আদৌ কি ফিরে আসতে পারবে না পৃথিবীতে?

বিজ্ঞানীরা অভয় দিলেন। বললেন,—পারবে। বিপদের মুখে মহাকাশচারীরা যদি ইচ্ছে করেন তো সহজেই ওঁরা অ্যাপোলো-১২কে 'হাইব্রিড ট্র্যাজেকটরি' থেকে ফ্রী রিটার্ন ট্র্যাজেকটরিতে নিয়ে আসতে পারবেন; আর এই নিয়ে-আসার জন্যে খুব একটা কসরৎ করতে হবে না ওঁদের, প্রধান ইঞ্জিনটিকে চালু করলেই কাজ হাসিল হবে।

কিন্তু প্রধান ইঞ্জিনও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে? যদি হঠাৎ বিকল হয়ে যায় সে?

—যদি যায় তো চান্দ্রযানের ইঞ্জিনটিকে চালু করতে হবে, বিজ্ঞানীরা অভয় দেন আবার। বলেন 'হাইব্রিড ট্র্যাজেকটরি' থেকে 'ফ্রী রিটার্ন ট্র্যাজেকটরি'তে অ্যাপোলোকে পৌঁছে দেবার মতো শক্তি চান্দ্রযান রাখে বৈকি।

—কিন্তু এত বড় শক্তিধর চান্দ্রযান ঠিক আগের বারের মতোই তো শহীদ হবে এবারও? চাঁদের বুকে তাকে ফেলে আসা হবে?—গুনগুন করেন কেউ কেউ।

কেউ কেউ আবার বলেন,—না, ঠিক আগের বারের মতো ব্যাপার ঘটবে না এবার। অ্যাপোলো-১২র কার্যক্রমে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে।

—কী সেই বৈশিষ্ট্য?—কৌতূহলী প্রশ্নকর্তার অভাব নেই কেপ কেনেডীতে। ওঁরা এই একই প্রশ্ন করেন বার বার।

ওদিকে প্যামপলেট ছড়ানো হচ্ছে যত্রতত্র। অ্যাপোলো-১২র গতিবিধি খোলসা করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সমাগত দর্শকরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন প্যামপলেট-এর ওপর। বুঝতে চেষ্টা করছেন সব কিছু।

কিন্তু বুঝতে গিয়ে অনেকেরই আবার চক্ষু ছানাবড়া। ফিস ফিস করেন অনেকেই,—বলে কী! অ্যাপোলো-১২র চান্দ্রযানের ওপরের অংশটির সাহায্যে কৃত্রিম ভূমিকম্প সৃষ্টি করা হবে চাঁদে? চাঁদ থেকে ফিরে আসার সময় ৭০ মাইল দূরে থেকে প্রচণ্ড বেগে তাকে প্রতিবেশী

গ্রহটির মাটির ওপর নিক্ষেপ করা হবে?

—হ্যাঁ, করা হবে নিক্ষেপ,—বলছেন বিশেষজ্ঞরা,—যদিও তা দেখতে চাঁদের দেশে কেউ উপস্থিত থাকবে না। এবং এমন কি ৭০ মাইল দূরে থেকে নভশ্চরদেরও চোখে পড়বে না সে দৃশ্য। কিন্তু তবু, চান্দ্রযানটি যখন গিয়ে চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়বে, তখন তা থেকে প্রচণ্ড কম্পন সৃষ্টি হবে সেখানে; এবং সেই কম্পন হবে ১,৬০০ পাউণ্ড বা ৭২০ কিলোগ্রাম ওজনের টি এন টি'র বিস্ফোরণ-শক্তির সমান।

অবিশ্যি এই বিস্ফোরণ-শক্তিটাই সব নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, চান্দ্রযানটি যাতে ঠিক জায়গায় পড়ে। অর্থাৎ, চাঁদ-অভিযাত্রীদের ফেলে-আসা যন্ত্রপাতির ওপরে না পড়ে; আবার যন্ত্রপাতিগুলো থেকে খুব দূরেও না পড়ে।

ওদিকে বিশেষজ্ঞরা অভয় দিলেন, লক্ষ্যস্থল স্থির করা হবে বেতার-নির্দেশের সাহায্যে। অভিযাত্রীদের ফেলে-আসা যন্ত্রপাতিগুলোর কয়েক মাইল মাত্র দূরে চান্দ্রযানটিকে নিক্ষেপ করা হবে। এবং তারপর চাঁদের সঙ্গে তার সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়াটা ঠিকই ধরা পড়বে সিসমোমিটার যন্ত্রে।...এই সিসমোমিটার চাঁদের দেশে আগেই রেখে এসেছেন অভিযাত্রীরা। এ যন্ত্রটি তো বটেই, ওঁদের রেখে আসা অন্যান্য যন্ত্রগুলোও 'ক্যাবল' দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এই 'ক্যাবল' চলে গেছে কেন্দ্রীয় স্টেশনে। বলা বাহুল্য, চাঁদের ঐ স্টেশনটিও নভশ্চররাই স্থাপন করবেন। ওখানে থাকবে ছোট্ট এক 'রেডিও ট্র্যান্সমিটার'। তার কাজ হবে চাঁদের দেশে কম্পনের খবরটা 'রিলে' করে পৃথিবীতে পৌঁছে দেওয়া।

ঐ কম্পন বিশ্লেষণ করে অনেক কিছু নতুন খবর জানা যাবে। বিজ্ঞানীরা খবর পাবেন, চাঁদের মাটির তলায় কী ধরণের সব পদার্থ ছড়িয়ে আছে এবং কেমনভাবে আছে ঐ সব পদার্থরা।

মহাকাশ-বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এ-ব্যাপারে বিরাট সাফল্য ওঁরা অর্জন করবেন। কারণ, চান্দ্রযানের সঙ্গে চাঁদের যে সংঘর্ষ হবে, তার প্রতিক্রিয়া চাঁদের শিলাস্তর ভেদ করে সিসমোমিটার যন্ত্রকে উদ্‌বেজিত করবে নিশ্চয়। অবিশ্যি সংঘর্ষের খবরটা চাঁদ কীভাবে পাঠায়, কতটা জোরালো অথবা দুর্বলভাবে সিসমোমিটার যন্ত্রে পৌঁছে দেয়, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, চাঁদের শিলাস্তরের ঐ কম্পন-পরিচালনার ক্ষমতা থেকেই তার অন্দর-মহলের খবর পাওয়া যাবে। জানা যাবে, বিপুল রহস্যঘেরা তার ভেতরটা কেমন।

সিসমোমিটার যন্ত্রটি কম করে এক বছর কাজ করে থাকবে। চাঁদের দেশে কোনো কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবরও পৃথিবীতে পৌঁছে দেবে সে। তারই দৌলতে আমরা জানব, চাঁদের দেশে কোথায় কখন ভূমিকম্প হল, কখন চাঁদের ভেতরটা কেঁপে উঠল, অথবা কখন উল্কা এসে আঘাত করল চাঁদকে।

অবিশ্যি সব খবরই জানা যাবে না এ থেকে। চাঁদের দেশে সিসমোমিটার যন্ত্রের বেড়াজাল গড়ে না তুললে সঠিক খবর কিছুতেই পাওয়া যাবে না।

ওদিকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পরবর্তী কয়েকটি অ্যাপোলো অভিযানে আরও অনেক সিসমোমিটার যন্ত্র প্রেরণ করা হবে চাঁদে। যন্ত্রের বেড়াজাল ঠিকই সেখানে গড়ে তোলা হবে।

কিন্তু সব যন্ত্রই ঠিক ঠিক হুকুম তামিল করবে তো? দুর্গম পথ ধরে অ্যাপোলো-১২র মহাকাশ-অভিসার সফল হবে তো?—কেপ কেনেডীর আকাশে-বাতাসে গুঞ্জরিত হয় এই একটিই প্রশ্ন।

ওদিকে পর্যায়-গণনার চূড়ান্ত মুহূর্ত এসে যায়। অ্যাপোলো-১২ যাত্রা শুরু করে। পূর্ব-নির্দিষ্ট সময়েই পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে চাঁদের দিকে পাড়ি দেয় সে।

পৃথিবীর কক্ষপথ ছাড়ার আগে নভশ্চররা মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি ভালো করে পরীক্ষা করেন। কনরাড জানান, অ্যাপোলো-১২র জানালার আবরণীতে বরফ জমাট বেঁধেছে। ফলে, মহাকাশ-যানের গতি-নিয়ন্ত্রক রকেটগুলোর কাজে ব্যাঘাত ঘটার আশংকা দেখা দিচ্ছে। এর আগে দু' দুবার রকেট চালাতে গিয়ে অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছেন ওঁরা।

একবার অবিশ্যি ওঁদের মনে হয়েছিল, পরীক্ষা সম্পূর্ণ হবে না এবং অ্যাপোলোকে বাধ্য হয়েই অন্য কোনো কক্ষপথ ধরতে হবে।

কিন্তু পরে মহাকাশ-বিজ্ঞানী ওয়াল্টার ক্যাপ্রিয়ান জানালেন,—না, কোনো ভয় নেই আর। মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি নিখুঁত-ভাবে কাজ করছে। চাঁদে পাড়ি দেবার পথ এখন নির্বিঘ্ন।

ওদিকে ক্যাপ্রিয়ান যখন পৃথিবীর মানুষদের আশ্বস্ত করছেন, মহাকাশ-চারীরা তখন দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছেন চাঁদের দিকে। তখন পৃথিবী থেকে ৭৮,৫০০ নটিক্যাল মাইল দূরে চলে গেছেন ওঁরা। মহাশূন্যে বেরিয়ে একটানা ২২ ঘন্টা জাগবার পর ওঁরা ঘুমবার উদ্যোগ করছেন।

১৫ই নভেম্বর শনিবার ভারতীয় সময় বেলা ৩-৩০টায় দশ ঘণ্টার জন্যে ঘুমতে গেলেন মহাকাশচারীরা। ওঁরা যখন জাগবেন, ভারতের ঘড়িতে তখন রাত দেড়টা।

প্রকাশিত হল

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ

SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

সংকলক ঃ শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

সংশোধক ঃ ডঃ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

চন্দ্রাভিযানের ফলে যে শব্দসমূহ প্রচলিত হইয়াছে, সেগুলি সহ প্রায় ৫৫০০ শব্দ ও প্রবচন এই সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে এবং অভিধানটি আগাগোড়া সংশোধন করা হইয়াছে। অধুনা প্রচলিত শব্দাবলী নির্বাচনে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজি ও বাংলায় উচ্চারণ সংকেত ও শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে। সর্ববৃত্তি-ধারীর বিশেষ করিয়া ছাত্রদের অপরিহার্য সঙ্গী। ১২৭২+১৬ পৃষ্ঠা, ডিমাই অক্টেভো আকার, মজবুত বোর্ড বাঁধাই। [১৫·০০]

আমাদের অন্যান্য অভিধান ঃ

সংসদ বাঙলা অভিধান [৮·৫০]

SAMSAD BENGALI-ENGLISH DICTIONARY [১২·০০]

SAMSAD LITTLE ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

[বোর্ড বাঁধাই ৭·৫০ ; সাধারণ বাঁধাই ৫·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃঃ কলিকাতা-৯ [৩৫-৭৬৬৯]

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

ধরুন, বাচ্ছার সবে সর্দি লেগেছে;—নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়েছে—গলা খুস্ খুস্ করছে। তক্ষুনি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান্ ভোগান্তি—নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি-কিছু আর বাকি থাকবে না-অযথা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা।

সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, কোনো কষ্ট পেতে হয় না— বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।

আর একটা কথা। ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায়-যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,-যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।

খুবই সহজ কাজ! তেতো বড়ি বা, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না।

ডিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,— সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে—

১) 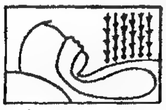 ২)

বাইরে থেকে গায়ে   ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে-

২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব— নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

সর্দি বসতে দেবেন না। সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব !

590C

ঘুম থেকে উঠে ও'দের দু'টি কাজ: প্রথমে রাত ৪টা ১৭ মিনিটে রঙিন টেলিভিশনে আত্মপ্রকাশ করা এবং পরে ৪টা ৪৫ মিনিটে মূল যানকে চাঁদের দিকে স্থাপনের উদ্দেশ্যে উদ্যোগ-আয়োজন করা।

—কিন্তু সব আয়োজন সার্থক হবে তো?' —ন্যাসা'র বিজ্ঞানীদের সংশয় আর কাটে না। কারণ, ১৪ই নভেম্বর কেপ কেনেডী থেকে যাত্রা শুরু করার একটু পরেই সম্ভবত মহাকাশযানটির ওপর বজ্রপাত হয়। ফলে, কিছুক্ষণের জন্য যানের সমস্ত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা যায় বিকল হয়ে। ছাড়া, কনরাড ও বীন 'ইনট্রিপিড' নামক যে চান্দ্রযানে করে চাঁদে নামবেন, বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার বিকলতার দরুণ তার ক্ষতি হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হয়।

এই আশঙ্কা শেষঅবধি যদিও অমূলক প্রমাণিত হল; যদিও শেষ অবধি দেখা গেল, 'ইনট্রিপিড' বহাল তবিয়তেই আছে, তবুও বিজ্ঞানীদের সন্দেহ-শঙ্কার ঘোর আর কাটল না। তাই, মহাকাশচারীরা যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন, বিজ্ঞানীরা তখনও জেগে। তখনও পৃথিবী থেকে অ্যাপোলো-১২র দূরত্বের পরিমাপ করছেন ও'রা।

১৬ই নভেম্বর ভারতীয় সময় রাত ১০-১০ মিনিটে এই দূরত্ব দাঁড়াল ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪২৬ মাইল। অ্যাপোলো-১২ তখন ঘণ্টায় ২ হাজার ১০২ মাইল বেগে ছুটছিল।

এই বেগটা দেখতে দেখতে কমে আসে আরও। অ্যাপোলোর গতি হ্রাস পেয়ে ঘণ্টায় দেড় হাজার মাইলে দাঁড়ায়। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব তখন ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৩২২ মাইল; আর চাঁদ থেকে ৩৮ হাজার ৯৩৩ মাইল।

১৭ই নভেম্বর ভারতীয় সময় ৭টা ৮ মিনিটে অ্যাপোলো-১২ পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যবর্তী সম-মহাকর্ষ এলাকায় পৌঁছয়। এই এলাকা অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদের আকর্ষণ বাড়তে থাকে এবং সেই সঙ্গে বাড়ে অ্যাপোলোর গতি।

এদিকে যত এগিয়ে চলে মহাকাশযান, নভশ্চরদের চোখে পৃথিবী ততই ছোট হয়ে আসে। আর অপর দিকে, বড় হয়ে দেখা দেয় চাঁদের দেশ। মহাকাশযানটি চাঁদের প্রায় ১১ হাজার নটিক্যাল মাইলের মধ্যে প্রবেশ করার সময় কনরাড বলেন,—অনেক অনেক পাহাড় আর গহবর চোখে পড়ছে। সত্যি, দৃশ্যটা বড় সুন্দর।

১৮ই নভেম্বর চান্দ্রকক্ষে প্রবেশ করার সময় রিচার্ড গর্ডন বলেন—চাঁদে অদ্ভুত এক পাহাড়ের চূড়া দেখছি। ওখানে বিরাট কোনো দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে যেন।...যেন চারিদিকে বালি ছড়াচ্ছে।

কিন্তু দৈত্য কি চাঁদে একটা? চাঁদের [illegible]?

চোখে পড়ছে আমাদের। দূরে দূরে গহবরও আমরা অনেক দেখছি। কখনও বা কাছাকাছি একসঙ্গে অনেকগুলো গহবর দেখছি আমরা। কখনও আবার চাঁদের পিঠে সাপের মতো আঁকাবাঁকা সুরু শৈলশিরা দেখে মুগ্ধ হচ্ছি।

কতকগুলো গহবর আবার টেলিভিশনের পর্দায় স্পষ্ট চোখে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন প্লাস্টার অব প্যারিসের ওপরে তার অসংখ্য বসন্তগুটি।

কিন্তু গুটিদেরও আবার বৈচিত্র্য কত! কত হেরফের!...আর এছাড়া, ওদের আশেপাশের পাহাড়গুলোর চূড়ারাও যে কত রকমের! কত রকমের যে শিলাগুচ্ছ চোখে পড়ছে ওদের গায়ে গায়ে। অ্যালান বীন চাঁদের ঐ বিচিত্র দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,—সটগান থেকে ছোঁড়া গুলীর মতো দেখাচ্ছে ওদের। কতকগুলো গহবর দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, ছুটে-আসা উল্কা-খণ্ডের আঘাত থেকেই ওদের সৃষ্টি।

এদিকে দেখতে দেখতে চাঁদে নামার সময় ঘনিয়ে আসে। ১৯শে নভেম্বর ভারতীয় সময় ভোর ৪টা ৩৫ মিনিটে চান্দ্রযান 'ইনট্রিপিড' মূলযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

যানটিকে বিচ্ছিন্ন করার আগে কনরাড ও বীন পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ-সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখেন। কেন না, চাঁদের বুকে নামবার সময় উচ্চতা, গতিবেগ ও কোণ সম্পর্কে এতটুকু ভুলচুক হলে সর্বনাশ অবধারিত।

শেষ অবধি বিপজ্জনক এক বাঁকা-পথ ধরে খুব সাবধানেই নেমে আসেন ও'রা। এবং নামবার একটু আগে বিজয়গর্বে উল্লসিত হয়ে ওঠেন ও'দের একজন। বলেন,—যে গহবরটির কাছে নামার কথা, তা যেন দেখতে পাচ্ছি।

নামবার ঠিক আগে কনরাড চান্দ্রযানের জানালার কাছে বসেছিলেন; আর বীন যন্ত্রপাতির দিকে নজর রাখছিলেন। পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ-সংস্থার সঙ্গে ও'দের কথাবার্তাও চলছিল পুরোদমে। ও'দের কে যেন বলছিলেন,—ঐ যে। দেখতে পাচ্ছি! ৪২ ডিগ্রি কোণ করে নামছি!...কিন্তু তবু বিশ্বাস করতে পারছি না যেন! বিস্ময়কর ও কাল্পনিক মনে হচ্ছে সব কিছু!...সেকেণ্ডে ৯৯ ফুট বেগে নিচে নামছি আমরা।

—নামার চেষ্টা করুন!' পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ-সংস্থা থেকে নির্দেশ গেল।

কনরাড বললেন,—চেষ্টা করছি। চাঁদ থেকে মাত্র দু' হাজার ফুট ওপরে আছি এখন।

—এখন আছি মাত্র ৫৩০ ফুট ওপরে। ৩৫ ডিগ্রি কোণে আছি এখন,—এবার কথা বললেন বীন।

[illegible] তাড়াতাড়ি

১২টা ২৫ মিনিটে মহাকাশচারীরা যখন চান্দ্রযানে করে চাঁদের মাটিতে নামেন, তখন সব কিছু যেন অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ঠেকে।

কনরাড বিস্ময়-বিমূঢ়কণ্ঠে বলে ওঠেন,—অতুলনীয়! অনির্বচনীয়!

দোষ নেই কনরাড-এর। চাঁদের দেশের আশ্চর্য এক সকাল অভিভূত করেছে তাঁকে। তিনি দেখছেন, সূর্য দিগন্তের সামান্য ওপরে। দেখছেন, চাঁদের বুকে পাহাড়-পর্বতগুলোর দীর্ঘ ছায়া।

এই অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখে কেউ কি চুপচাপ বসে থাকতে পারে?

কনরাডও পারলেন না। দু' মিনিট যেতে না যেতেই অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। হিউসটনের মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের অনুরোধ করলেন, চান্দ্রযানে আর বসে থাকতে পারছি না। ইচ্ছে হচ্ছে, ছুটে চলি। এই অদ্ভুত দেশের পাহাড় ডিঙিয়ে খাদ পেরিয়ে ছুটি।

কিন্তু না, কিছুক্ষণ অন্তত বসে থাকতেই হবে।—হিউসটনের কড়া নির্দেশ।...খানিকটা বিশ্রাম নেবার পর যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা করে পা ফেলতে হবে চাঁদের মাটিতে।

মাটি ওদিকে চকমক করে। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ শিলাখণ্ডগুলো বিচিত্র সব রঙ ছড়ায়। এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না কনরাড ও বীন। বার বার ভাবছেন,—এ-ও কি সম্ভব? প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূর থেকে ছুটে এসে সম্পূর্ণ নতুন এক দেশের একেবারে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে অবতরণ করা সম্ভব কখনও? ...অথচ জায়গা কতটুকু আর! এক শত মিটার ব্যাসের কাল্পনিক একটি বৃত্ত বৈ তো নয়!

এই বৃত্তের মাঝখানেই চান্দ্রযানে বসে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিলেন কনরাড ও বীন।

কিন্তু ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই এক বিপদ! ও'রা দেখলেন, প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্রাংশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; অথচ অবতরণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

যন্ত্রাংশটি খুঁজে পেতে আধ ঘণ্টারও বেশি সময় লাগল। ফলে নির্দিষ্ট সময় বিকেল ৪টা ৩৯ মিনিটের পরিবর্তে ভারতীয় সময় ৫টা ১৪ মিনিটে চাঁদে নামলেন কনরাড। চান্দ্রযানের ঢাকনা খুলে মই বেয়ে নামলেন। খুব সন্তর্পণে চাঁদের মাটিতে পা দিলেন তিনি।

সহযাত্রী অ্যালেন বীন তখন চান্দ্রযানে বসে। আর টেলিভিশন ক্যামেরাটিও কনরাড-এর দিকেই তাক করা। কারণ, পৃথিবীর অনেক লক্ষ লোক তাঁর অবতরণের দৃশ্য দেখবে বলে অধীর আগ্রহ নিয়ে তখন প্রতীক্ষা করছে। অনেকেরই এক প্রশ্ন, দেখা যাক, চাঁদের মাটিতে পা ফেলে কনরাড প্রথমে কী বলেন।

ফসলের ফরমান

জীবন দে

মাঠের বুকভরা লাল-কালো-সবুজ ধানের সমারোহ। দিন যাবে আর নির্জন প্রান্তর গৌরবরণ পাকা সোনার মন-মাতান রংয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। নেমে আসবে শালিক থেকে বাবুই পাখীর ঝাঁক। জংলী শূকর থেকে হাতীও বাদ যাবে না স্থানবিশেষে। শিশুর কাকলি আর পল্লীবধূর সলজ্জ স্পর্শে ফসলের প্রান্তরই এখন পল্লীর প্রাণ। ধানকাটা, ধান-মাড়াই পল্লীজীবনে আনন্দবিভোর নবান্নের সূচনা। খুনোখুনি আর রক্তপাতে এবার তা কোন্ উৎকট আকার ধারণ করে-তেমন আশঙ্কায় অনেকেরই বুকের রক্ত আজ হিম হয়ে আসছে।

এমতাবস্থায় শতাব্দীর অভিশাপ থেকে কৃষি-বাংলার মুক্তিপর্বে আমরা কি রাশ টেনে ধরব? অথবা গুপ্তহত্যার সনাতন স্রোতেই গা ভাসিয়ে চলব? কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের হিসেবে ১১ই মার্চ থেকে ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত সি পি এম দলীয় ৩২ জন কর্মী ও সমর্থক নিহত হয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, মেদিনীপুর জেলার ডেবরা এবং গোপীবল্লভপুর দুটি থানাতেই গত কয়েকদিনের মধ্যে, সাত-আটটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। কেবলমাত্র সি পি এম-এরই যে ৩২ জন খুনের কথা প্রমোদবাবু বলেছেন আমাদের মতে তার বারো আনাই মারা গেছেন ফসল কাটতে নয়। জমির দখল নিতে গিয়ে। সি পি আই, এস ইউ সি, আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকও আছেন, যাঁদের অনেক কর্মী দখল করতে কিংবা দখল বজায় রাখতে গিয়েই আহত কিংবা নিহত হন।

ভূমি এবং ভূমিরাজস্বমন্ত্রী কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারের মতে দ্বিতীয় পর্যায় ফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষকদের উদ্যোগ ও জনতার সমর্থনে সরকারী দখল ও বণ্টিত জমির পরিমাণ প্রায় আড়াই লক্ষ একর। সেচমন্ত্রী কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জীও এর সমর্থনে বলেন: এক লক্ষ পঁচিশ হাজার একর জমিই দখল এবং বণ্টন করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর দল অর্থাৎ সি পি আই। কেবল মন্ত্রী ছাড়াও উভয়েই তাঁরা পশ্চিম বাংলার খ্যাতনামা কৃষক নেতা।

কোন্ দল সঠিক কত বিঘা জমি উদ্ধার কিংবা দখল অথবা বণ্টন করতে সক্ষম হয়েছেন এখানে আলোচনার মূল উদ্দেশ্য তা নয়। ফাঁকা আওয়াজের কথাও আমরা বলছি নে। তার কারণ মাত্র কয়েক-দিনের ব্যবধানেই আমরা তাদের দেখেছি বড়শূল আর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে লক্ষ লক্ষ কৃষকের জমায়েত গড়ে তুলতে। কম-বেশি যে যাই দখল করে থাকুন সেটা কোন্ জমি এটাই হলো প্রথম কথা। ভূমি-সংস্কার আইন কংগ্রেস সরকারের সৃষ্ট হলেও বাড়তি জমি দখল এবং বিলি-বণ্টনের কাজে তাকে পাওয়া যায় নি। ফ্রন্ট সরকারের প্রধান কৃতিত্ব এখানে।

মোট ভেস্ট জমির কতটা আজ অবধি উদ্ধার করা গেছে ফ্রন্ট সরকারও তা বলেন নি। অনুমানে বলা যায় উদ্ধারকৃত জমির বারো আনা কিংবা কম করে দু' লক্ষ একরই ভেস্ট। কেবলমাত্র ২৪ পরগনা এবং জলপাইগুড়ি জেলা ভিন্ন আর কোন জেলাতেই তেমন চোরাই অর্থাৎ বেনামা জমি উদ্ধার করা গেছে বলে আমরা শুনি নি। বেনামা ধরার পথে নানা জটিলতা ছাড়াও কথায় কথায় হাইকোর্টের ইন-জাংশান একটা প্রধান অন্তরায়। অথচ জমির মধ্যে গুণগত দিক থেকে বেনামা অংশটাই যে সরেস অর্থাৎ আউয়াল তা সন্দেহাতীত। পরিমাণের দিক থেকেও যে কয়েক লক্ষ একর হবে বেনামা কোন সন্দেহ নেই তাতে।

নানা ফাঁক-ফিকিরের পর জোতদার যা রিটার্ন দিয়েছে স্বভাবতই তা কানা-গরু বামুনকে দান করার সামিল। কলাবাড়ি, পয়স্তি, কাশিয়া আর কুলের বনই তার পনের আনা। রিটার্নের খতিয়ান থেকে দাগ নম্বর অর্থাৎ পুরো বিবরণ রয়েছে সরকারী দপ্তরে। সরকারও আজ আর কংগ্রেসের হাতে নেই। এমনি অবস্থায় দেখা এবং লেখা জমির অংশবিশেষ দখল নিতেই সরকারী দলবিশেষের ডজন দুয়েক কর্মী বা সমর্থক যদি আত্মাহুতি দিয়ে থাকেন—দামটা কি খুব কম হলো? আর সব দলের ক্ষয়ক্ষতি এর সাথে যোগ করলে অঙ্কটা নিশ্চয়ই আতঙ্কজনক মনে হতে বাধ্য। একটা দক্ষ এবং সুসংগঠিত সরকারের তা পরিচয় বহন করে না মোটেই। ভেস্ট জমির দখল নিতে গিয়ে জোতদাররা খুব যে সামনাসামনি বাধা দিতে আসে নি তার প্রমাণ উল্লেখযোগ্য কেউ তারা হতাহত হয় নি। তখন প্রশ্ন আসে এতসব কৃষক তবে মারা গেলেন কেন? জোতদারের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে যে নয় তা সত্যি।

শরিকদের মধ্যে একে অপরকে টেক্কা দেওয়া, একজনের দখলী জমি অন্য দলের উস্কানিতে ছিনিয়ে নিতে যাওয়া, জেলা এবং মহকুমা স্তরে যুক্তফ্রন্টকে গড়ে তোলার পরিবর্তে অচল করে রাখাই তার অন্যতম কারণ। যে গ্রামে জমি বিলি-বণ্টন সে গ্রামের অধিবাসীদের পরিবর্তে দূর-দূরান্ত থেকে ট্রাক ভর্তি অস্ত্র-সজ্জিত বা আধা-সজ্জিত শক্তির জোরে জমি বিলির দরুণ যে কেবল অহেতুক খুন-খারাপিই হয়েছে তাই নয়, জমিও পাওয়া গেছে

কম। দুর্নীতি প্রসারলাভেরও সুযোগ হয়েছে এখানে। গণ-কমিটির মাধ্যমে সবকিছু করার প্রচেষ্টা যখন ব্যাহত হলো দলগত উদ্যোগে, তখনই এল ঝাঁপিয়ে পড়ার শ্লোগান। ঐক্যবদ্ধ সামগ্রিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে উদ্ধারপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ যে অনেক বেশি হতো তা কে না জানে? অন্তর্দ্বন্দ্বই প্রধানত দায়ী। যার ফলে বেনামা জমি উদ্ধারের কাজ ব্যাহত হয়েছে। কৃষক আন্দোলন প্রধানত ভেস্ট জমি দখলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে সময় এবং শক্তিক্ষয়ে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

১৯৫৯ সাল, রাজ্যে তখন কংগ্রেস সরকার গদিনসীন। একমাত্র মাথাভাঙা মহকুমাতেই তখন ২০ হাজার বিঘা ভেস্ট জমি দখল এবং ভাগচাষী ও ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা হয়। আন্দোলনের নেতা কমরেড দেবী নিয়োগী এবং অন্যান্যদের রামদা এবং রিভলভার নিয়ে জোতদারের দলবল তাড়া করে। কেউ আহত হয় নি, প্রাণেও মরে নি। আজ যখন নিজেদের সরকার তখন মরতে মরতেই কমরেড নিয়োগী কানের কাছ দিয়ে বেঁচে গেছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় ৬ মাস তাঁকে হাসপাতালেই পড়ে থাকতে হলো। এমন এক জোতদারের জমিতে এই কান্ড ঘটল, ভাবতে গেলেও তা অবাক হতে হয়।

দীর্ঘ ১৩।১৪ বছরেও ছোট-বড় বহু জোতদার তাঁদের ক্ষতিপূরণ পান নি। কিন্তু এই লোকটি হাজার পঞ্চাশেক টাকা পেয়ে গেছেন। কোন অসুবিধে হয় নি তাতে। সাড়ে তিনশত বিঘা ভেস্ট জমি তার পরেও তার দখলে। গায়ের জোরেই এটা তিনি ভোগদখল করে আসছেন। তিনি ডাকাত পোষেণ। ঢালাও মদের কারবার। সুন্দরী স্ত্রীকে হাত করতে না পেরে স্বামীকে খুনের অভিযোগে যিনি বছর তিনেক মামলায় ভোগেন। ত্রিশ হাজার টাকা তাতে খরচ পড়ে মাত্র, তার বন্দুক আছে। হত্যা মামলায় জড়িত হলে সরকার বন্দুকটি বাজেয়াপ্ত করেন।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

২৮৫ৎ টাকা মূল্যের বিশ্ববিখ্যাত ন্যাশনাল ডিলাক্স ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ১০ৎ টাকা কি স্তি তে ডাউন।

প্রত্যেক গ্রামে এবং শহরে পাঠানো যায়। আবেদন করুনঃ

IMPEX INDIA (W.B.C.)
P. B. 1045, Delhi-6

পি ডি এক রাজত্বে ঐ বন্দুক আবার তিনি ফেরৎ পান। কিন্তু দারোগা পুনরায় বন্দুক কেড়ে নেওয়ার জন্য এক বছর লিখেও আজ অবধি পাত্তা পান নি। জনসাধারণ বার বার নানাভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও ফল পাওয়া যায় না।

কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার যে আড়াই লাখ একর জমির কথা বলেন, অভিজ্ঞ মহলের মতে তার মধ্যে ৬০ থেকে ৭০ হাজার বিঘা মাত্র বেনামা জমি। অবশিষ্ট সবটাই ভেস্ট। মেছোভেরী আর চা-বাগানের অজুহাতে এই জমি আত্মসাৎ করা হয়েছিল। পার্লামেন্টে শ্রীকুলকার্নি ৭০ হাজার বিঘা জমির কথা উল্লেখ করেন। যা তাঁর মতে ন্যায্য জমির মালিকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। একথা কে না জানে সারা পশ্চিম বাংলায় বেনামা জমির তুলনায় এই পরিমাণ নেহাৎই একটা ভগ্নাংশ মাত্র। যুক্তফ্রন্ট এবং তার প্রধান শরিক ইচ্ছে করলে ভেস্ট জমিতে শরিকী সংঘর্ষ আজই বন্ধ করতে পারেন। কিন্তু যা পারবেন না তা হলো বেনামা জমিতে জোতদারের আক্রমণ সহজেই বন্ধ করতে। পূর্বোক্ত জোতদারের মতই অনেককে বাধ্য না করা পর্যন্ত।

১১শে নভেম্বর হাসনাবাদে জোতদারের আক্রমণে দুজন কৃষক কর্মী নিহত হন। একজন তার সি পি আই, অন্যজন সি পি এম দলের। বেনামা সরেস জমির লালসা এত সহজেই জমি-চোরেরা ছেড়ে দেবে কেউ তা মনে করেন না। উপরন্তু কেবলমাত্র ৬০।৭০ হাজার বিঘা বেনামা জমি উদ্ধারের মধ্যেই কৃষক আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখলে কৃষককে আর জমি দিতে হবে না। কৃষি-সঙ্কটও অব্যাহতই থাকবে। ভেড়ীর নামে রাখা বেনামা জমি উদ্ধারে সরকারী মনোভাব কিছুমাত্র দোদুল্যমান থাকলেও কৃষককে তার খেসারত দিতে হবে বহু রক্তের বিনিময়ে। তাই সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।

১৯৫০ থেকে '৫৩ সালের মধ্যে জমির বিবরণের চুলচেরা বিচার চাই। সিলিংয়ের বাইরে থাকা জমিতে হিসেবপত্রে গোলমাল থাকলে তার ওপরই সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। কেবল বন্দুক বাজেয়াপ্ত করা ছাড়াও কুখ্যাত জোতদারদের এখনই গ্রেপ্তার করা পশ্চিম বাংলার কৃষকদের স্বার্থেই অত্যাবশ্যক। শরিকী সংঘর্ষ এমনিতেই অনেক সুযোগ তাদের করে দিয়েছে।

ফ্রন্ট সরকার তিন একর পর্যন্ত জমির মালিকের খাজনা মকুব করার মাধ্যমে সারা দেশে একটা নজির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। একই কারণে এই পরিমাণ জমির মালিক গরীব কৃষকের কৃষি-ঋণ, গ্রুপ, পশু এবং ঢেঁকি-ঋণের দায় থেকে অব্যাহতি আর একান্ত জরুরী। সেচ এলাকায় ৬ এবং অ-সেচ এলাকায় ৯ বিঘা পরিমাণ জমির মালিক সরকারী ঋণের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করলে কৃষকের মনে আসবে বিরাট আত্মবিশ্বাস। বেসরকারী সুদখোর মহাজনরা তাতেই কোণঠাসা হয়ে পড়বে। যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচী অনুযায়ী সম্প্রতি কেরলেও কৃষকের ঋণমুক্তির বিল অর্ডিন্যান্স করে জারী করা হয়েছে। অন্যথায় ঋণগ্রস্ত চাষী সামান্য জমি পেয়েও পারবেন না ভোগ করতে।

শরিকী সংঘর্ষে পশ্চিম বাংলায় ফ্রন্টের যে ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়েছে তার পুনরুদ্ধার করা আজ প্রয়োজন। ভেস্ট জমি দখলপর্ব সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কৃষক-আন্দোলনে ভাটা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। গ্রামাঞ্চলে জোতদার বা মহাজনবিশেষকে 'শত্রুবদ্ধ' কিংবা 'গুপ্তহত্যার'-পথে প্ররোচনায় সেটা হবে উর্বরক্ষেত্র। সবাই জানেন কোন অংশের কৃষকেরই সমর্থন-লাভ ভিন্ন তথাকথিত এইসব অভিযান কখনও দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভবপর নয়। সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার বা মুচলেকায় আবদ্ধ করেও এর সুরাহা পাওয়া সম্ভবপর নয়।

ব্যাপক কৃষক ঐক্য, বেনামা জমি উদ্ধারের মিলিত আন্দোলন এবং কৃষি পুনর্গঠনের সামগ্রিক কর্মসূচীই কেবল পারে সংকীর্ণতাবাদী ও হঠকারীদের গ্রামজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে গ্রামে শান্তি বজায় রাখতে। জমিচোর জোতদার, কিংবা সুদখোর মহাজনদের অবাধ স্বাধীনতায় সে আবহাওয়া গড়ে উঠতে পারে না। কৃষির পুনর্বিন্যাস এবং কৃষি-বিপ্লবে তাদের মুনাফা-মৃগয়াকে উৎখাত করতেই হবে। এই ফসলেই নয়। বেনামা জমির অস্তিত্ব গ্রামদেশে বারংবার একই সমস্যাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য। পরিবারভিত্তিক সিলিং এবং যথাসম্ভব সম্ভব ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দেওয়াও তার জন্য দরকার। অন্য গ্রাম থেকে এসে এক গ্রামে হানা দিয়ে সাময়িকভাবে চমকপ্রদ ফল কিছু পেলেও তা কখনও স্থায়িত্বলাভ করে না, ঘটনাই আজ তা প্রমাণ করে দিয়েছে। এই পথ ব্যক্তিগত খুন-খারাপিকেই উস্কানি দেয় মাত্র। গণ-আন্দোলন বিশেষ করে কমিউনিস্ট আন্দোলন কখনও চক্র এবং চক্রান্তকে বরদাস্ত করে না। কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আজ এটা একান্তভাবেই প্রযোজ্য।

[পূর্বানুবৃত্তি]

চরের সীমানা থেকে সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত অরণ্য বিস্তৃত। সুদীর্ঘ এ অরণ্যকে একেবারে ঘিরে ফেলা অসম্ভব। জঙ্গল ঘেঁষে আবাদী চরের পর চর—দূরে দূরে দলা-বাঁধা কিষাণপাড়া, জেলেপাড়া। তার মানুষজনের মধ্যে ডাকাত ধরার উত্তেজনা একটা থানা থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হলেও বোধ করি মুকুন্দ ছাড়া আর কেউ জঙ্গলের ধারে-কাছেও ঘেঁষল না। তার ওপর সশস্ত্র সেপাইবাহিনী।—মানুষজন আরও ঘাবড়ে গেল।

দূরে বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে এখানে-ওখানে দল বেঁধে ভিড় করে খানিক সবাই দেখলে। তারপর সুগভীর সেই জঙ্গল সবকিছুকে যেন গ্রাস করে নিলে। আস্তে আস্তে ভিড় সরে গেল।

বুড়ো কলিমদ্দীও বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। সেপাই-সান্ত্রী যখন জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল—বুড়ো তার শাদা দাড়ি আকাশের দিকে তুলে বিড়বিড় করে কি যেন বলে উঠল। কে জানে—হয়তো আল্লার কাছে তার অভিযোগ। ইবলিসের বাচ্চারা তার পবিত্র জঙ্গলকে অপবিত্র করে দিলে।

এমনি সশস্ত্রবাহিনী ঢুকেছে হিজলীর দিক থেকে, খেজুরীর সাহেবনগরের দিক থেকে। জঙ্গলে ঢুকে তিনটে দল ছড়িয়ে পড়ে সারা জঙ্গল যেন চিরুণীর মত আঁচড়ে চলল।

হিজলীর দল তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল মসজিদ, সাহেবনগরের দল ঝোপ-ঝাপ, পড়ো পোর্ট অফিস, সমাধিভূমি আঁতি-পাঁতি করে খুঁজে দেখল। তারপর দুই দল দুইদিক থেকে জঙ্গল আঁচড়ে মিলিত হলো বাতিঘরের কাছে।

জঙ্গলের ভেতরে আশ্রয় বলতে এই শেষ—আর সব বন-বাদা।

একেবারে প্রবেশপথের দরজার ভাঙা কড়া দেখে একজন প্রবীণ ইন্সপেক্টার থমকে দাঁড়াল। সাব-ইন্সপেক্টারদের দেখালে। জিজ্ঞেস করলে, "দেখছ?"

"এ তো দুমড়ে ভাঙা স্যার।"

একজন বললে, "ঢুকে দেখা যাক।"

"কিন্তু বিপদ আছে।"

ইন্সপেক্টার বললে, "তবু ঢুকতে হবে।" একজন সান্ত্রীকে হুকুম দিলে, "দরজা খোল।"

জোরে ধাক্কা দিতে দরজাটা করুণ আর্তনাদে খুলে গেল।

ইন্সপেক্টার ভেতরে ঢোকার আগে দরজার কাছ থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে ভেতরটা দেখতে লাগল। যতটা দেখা যায়—কোথাও কিছু নেই। সিঁড়ি চলে গেছে ওপরে ঘুরে ঘুরে—তার নিচের কয়েকটা ধাপই মাত্র দেখা যায়। সিঁড়ির পাশের জায়গাটুকু পরিচ্ছন্ন। ওই পরিচ্ছন্নতার মধ্যে যেন মানুষের হাতের গন্ধ লেগে আছে।

শিকারী কুকুরের মতো যেন সে গন্ধ শুঁকতে লাগল ইন্সপেক্টার। ইঙ্গিতভরা চোখে সাঙ্গোপাঙ্গদের দিকে চেয়ে বললে, "এইখানে। ......ওপরে উঠতে হবে।"

কিন্তু সিঁড়িগুলো এমন চওড়া নয় যে একটা দল একসঙ্গে উঠতে পারে। বড়জোর দুজন পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে। যত ওপরে উঠবে—সে সিঁড়ি আরও সংকীর্ণ। তার ওপরে ঘুরন্ত সিঁড়ি—তিন-চার ধাপের পরই সামনের সিঁড়ি চোখের আড়াল হয়ে গেছে।

অনেক ভেবেচিন্তে বাহিনী ও ব্যুহ সাজানো হলো। আগে আগে যাবে একজন সাব-ইন্সপেক্টার রিভলভার নিয়ে। পেছনে সান্ত্রীর দল। ইন্সপেক্টার বাকি সকলকে নিয়ে নিচেই রইল। বিপদের সংকেত পেলে অন্যদের পাঠাবে।

সেই মতো অ্যাকসন শুরু হয়ে গেল।

প্রথম দল ধুপধাপ শব্দে উঠতে শুরু করে দিলে সিঁড়িতে।

দোতলায় উঠেই সাব-ইন্সপেক্টারের চক্ষুস্থির। পবন খাঁর সঞ্চিত খাদ্যের ভাণ্ডার। জলের কলসী। শার্সিভাঙা জানালা দিয়ে এসে পড়েছে কড়া আলো। সান্ত্রী দাঁড় করিয়ে সে কিছু নমুনা নিয়ে ছুটে নেমে এল ইন্সপেক্টারের কাছে।

"দেখুন স্যার।" একমুঠো কাজু-বাদাম আর একটা নারকেল তুলে দিলে ইন্সপেক্টার হাতে। বললে, "রীতিমতো স্টোর স্যার।"

আসামীকে ধরার আনন্দে ইন্সপেক্টারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সগর্বে বললে, "আমি দেখেই বলেছিলুম না—ব্যাটা এই-খানে ঘাঁটি গেড়েছে। যাও যাও—দ্যাখো।"

সাব-ইন্সপেক্টার চলে গেল। ইন্স-পেক্টার স্বপ্ন দেখতে লাগল। প্রমোশন......রিওয়ার্ড......প্রতিপত্তি ... অর্থ—

সিঁড়ির ওপরে ওঠা বুটের শব্দ যেন

তার বুকের গভীরে বাজতে লাগল। লোকগুলো উঠছে তো উঠছেই—আর কোনো সমাচার নেই। অধীর ইন্সপেক্টার চারজনের আর একটা দল পাঠিয়ে দিলে ওপরে।

তারাও গেল তো গেল।

ইন্সপেক্টার প্রতি মুহূর্তে একটা সংঘর্ষের শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল। সে জানে—ওই ডাকাত ছেলেগুলো সহজে আত্মসমর্পণ করে না। লড়াই করে ধরতে হয়। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কে জানে—হয়তো ধরা পড়ার আগে পটাসিয়াম সায়ানাইড......

ইন্সপেক্টার অস্থিরভাবে পায়চারী শুরু করে দিলে।

সারা বাতিঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে আসামীর দেখা কোথাও পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ বাদে সাব-ইন্সপেক্টার বিরস মুখে দলবল নিয়ে নিচে নেমে এল।

বললে, "নেই স্যার—পালিয়েছে। তবে ছিল। ওপরের গম্বুজ ঘর দেখে তাই মনে হয়। একেবারে সাফসুফ করা।"

"দেখ—খোঁজ। জঙ্গল আঁচড়ে ফেল।" ইন্সপেক্টার হুকুম দিলে।

আবার দলবল সাজিয়ে ওরা এগিয়ে চলল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে উত্তর দিকে। বড় জঙ্গল ছাড়িয়ে ছোট জঙ্গলে। এর উত্তর সীমান্তে চর। সেদিক থেকে আর একটা দল এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। এদিক-ওদিক ঝোপ-ঝাড়, কাঁটা-ঝোপ। পথ দুর্গম।

এ জঙ্গলের নাড়ী-নক্ষত্র জানে পবন খাঁ। কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় তার কাছে সব সহজ হয়ে গেছে। সে অবলীলায় জীবেন দত্তকে নিয়ে বাতিঘরের আস্তানা ছেড়ে এগিয়ে এসেছিল এই উত্তর দিকে।

গম্বুজ-ঘর থেকে তারই চোখে আগে পড়েছিল সেপাই-সান্ত্রীর দল। ডেকে দেখিয়েছিল জীবেনকে, "দেখ।"

"পুলিশ!" জীবেন বলেছিল, "চলো।"

উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল পবন খাঁ। তার সেই লোহার ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে ছুটে নামতে যাচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে। জীবেন ধরে ফেলেছিল, "কোথায় যাচ্ছ!"

"মেরে ফেলাব—ফুঁড়ে ফেলাব।"......

"পাগল!" জীবেন বলেছিল, "তোমার কাপড়-চোপড় নাও। তাড়াতাড়ি। এক্ষুণি পালাতে হবে।"

"কোথায় পালাবে......কোথায় পালাবে তুমি! ওরা নিশ্চয় ঘিরে ফেলেছে।" হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল পবন খাঁ।

"চুপ। চলো।"—

আধখানা শাড়ি পরনে। আর আধখানা ঝুলছিল গম্বুজ ঘরে। আর জীবেনের দেওয়া সেই জামাটা। সব টান মেরে পবন খাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে তাকে ঠেলতে ঠেলতে নামিয়েছিল জীবেন। তারপর সোজা উত্তরে—জলপাই জঙ্গলের দিকে।

হিজলী আর খেজুরীর সশস্ত্র দুটো দলকে এড়িয়ে ওরা জলপাই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নির্বিবাদে চলে এসেছিল অনেকখানি। আগে আগে পবন খাঁ। আধখানা শাড়ি পরনে, আধখানা মাথায় জড়ানো। হাতে তার সেই একমাত্র হাতিয়ার। পেছনে জীবেন।

উত্তর মুখো এগিয়ে চলেছিল ওরা। সজাগ—সতর্ক।

সহসা পবন খাঁ থমকে দাঁড়াল। সভয়ে এক-পা পেছিয়ে এল। জীবেনের দিকে থমথমে চোখ তুলে চাপা গলায় বললে, "শুনতে পাচ্ছ!"

জীবেন কান পেতে শুনতে লাগল—অনেক দূরে কোথায় যেন জঙ্গলের ডালপালা সরানোর শব্দ।

জীবেন এই ভয়টাই করছিল। পুলিশ জঙ্গল যদি ঘিরেই ফেলে থাকে তা হলে এ-দিকটা যে ফাঁক রেখেছে—এমন ধারণা তার হয় নি। তবু বাতিঘরের আস্তানা ছেড়ে চলছিল সে পবন খাঁর পেছনে পেছনে।

জীবেন ঘুরে দাঁড়াল বাঁদিকে। বললে, "চল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাই।"

কথা শুনে পবন খাঁর মুখ-চোখ কেন কেমন হয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে বললে, "খবর্দার! ধরে ফেলাবে।"—

"সামনে গেলেও ধরা পড়বে।" জীবেন বললে, "বাঁ দিকে কি?"

"আবাদ।"

"ডাইনে?"

"গাঙ।"

"তবে চলো বাঁয়ে।"

"খবর্দার!" পবন খাঁর খ্যাপাটে মুখে

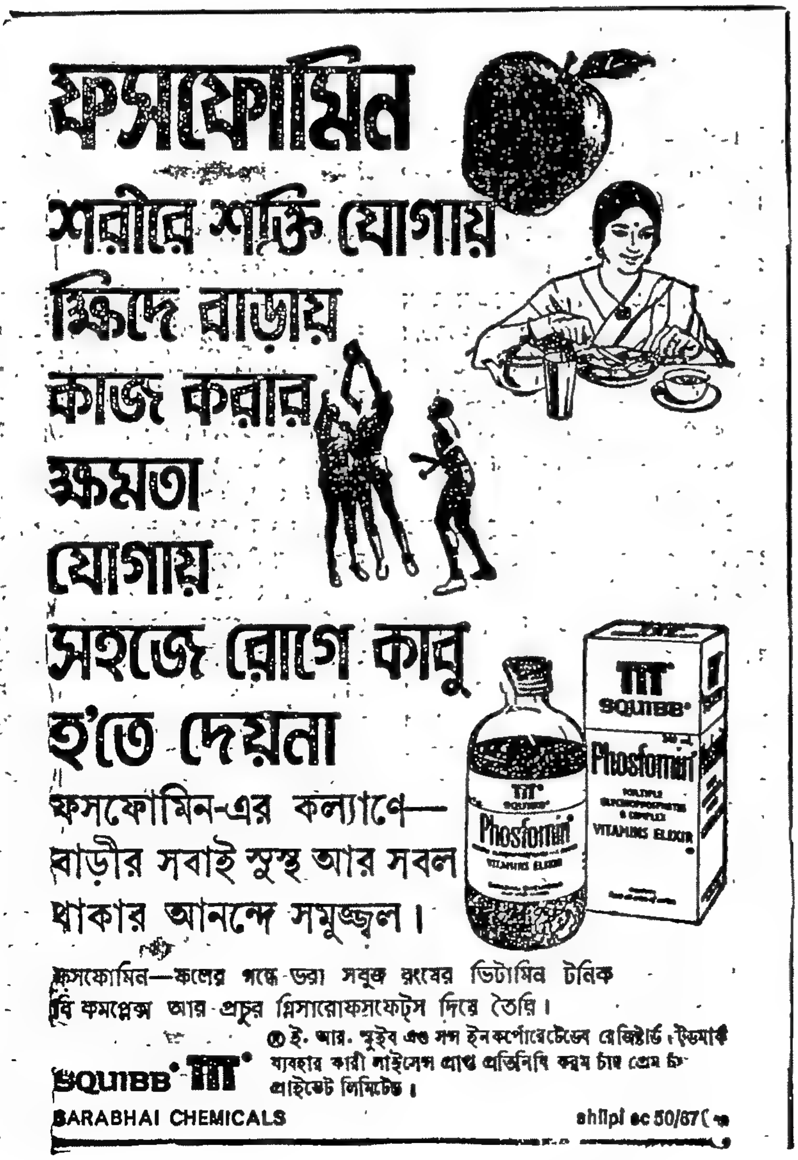

"দিলীপের মুখ থেকে খবরটা শুনে আমার যে কি আনন্দ হল! ওকে দুহাতে বুকে টেনে নিলাম। ও যথেষ্ট অনুশীলন করেছে, খেটেছে। তবুও বলবো এর জন্য যে-বাড়তি শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন তার সবটুকুই ও পেয়েছে বোর্নভিটা থেকে। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বোর্নভিটা খেতে ও বরাবরই বড্ড ভালোবাসে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে ব'লে ওকে আমি নিয়মিত বোর্নভিটা খাওয়াই। তাই কি খেলাধুলায়, কি পড়াশুনায় সবদিকেই চলে আমার সমান চোকস।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ !

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

একটা ভয় ব্যাকুলতা প্রকট হয়ে ওঠে। একদিন জঙ্গলের বাইরের যে অভিজ্ঞতা নিয়ে সে জঙ্গলে এসে ঢুকেছে, তারপর আর বনের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে তার নেই। সে যেন জঙ্গলের মানুষ হয়ে গেছে। জীবেনের কথায় সেই একটা বুনো পথ্যাপামী আবার যেন ফিরে আসে তার চোখে মুখে।

জীবেন তাকে ঠ্যালা দিয়ে বলল, "চলো!"

"আমি যাব না। তুমি যাও।" পবন খাঁ ডান দিকে সরে দাঁড়াল। জীবেনকে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে গেল।

জীবেন ডাকল পেছন থেকে আবার, "শোন!"

পবন খাঁ তার কথা গ্রাহ্যও করল না। শুধু বিড়বিড় করে বললে, "যাও!..... পুলিশ তোমাকে ধরবে, তোমাকে বেড়ি পরাবে...তোমাকে বেত মারবে...তোমার দাঁত ভেঙে দিবে। তোমার ঘরে আগুন লাগাবে। তোমার বউ থাকলে যাও..... যাও.....জাহান্নমে যাও....."

ঝোপ-ঝাড় ভাঙা, ডালপালা সরানো সেই শব্দ উত্তর দিক থেকে যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। এমন কি মানুষের অস্পষ্ট কলকণ্ঠ।

জীবেন আর সেখানে দাঁড়াল না। সোজা বাঁদিকে ঘুরে এগিয়ে চলল আবাদের দিকে—জঙ্গলের বাইরে।

একেবারে বিপরীত দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত এগিয়ে চলল পবন খাঁ ঝোপ-ঝাড় সরিয়ে, কখনো ঝুঁকে, হামাগুড়ি দিয়ে একেবারে নদী কিনারের বাদার দিকে বুনো জানোয়ারের মত।

অনুসন্ধানী সেপাই-সান্ত্রীদের নজর ঝোপেঝাড়ে। একজন দেখতে পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল হুইসিল। পাল্টা সাড়া দিয়ে বেজে উঠল আরও কয়েকটা। সকলের নজর তখন বাদার দিকে।

"উহ্ ভাগতা!"...

সান্ত্রীদের এদিক-ওদিক ছোটাছুটি, দারোগার হাঁকডাক, সেপাইদের হৈ-চৈতে জঙ্গল তোলপাড়। সবাই ছুটেছে নদী কিনারের দিকে।

একজন এস-আই বলে উঠল, "পালাচ্ছে—বাদা থেকে উঠে পালাচ্ছে। ওই যে...!"

সেপাই-সান্ত্রী ঘুরে দাঁড়াল।

বাদার পাশে পাশে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে মরিয়া হয়ে ছুটেছে লোকটা। দূরে থেকে মনে হয়—পরণে লুঙ্গি, মাথায় বুঝি আর একটা লুঙ্গি জড়ানো। এক-রকম রং। শুধু পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে লোকটাকে—মুখ দেখা যাচ্ছে না।

বড়দারোগা হুকুম দিলে, "ফায়ার!"

সান্ত্রীদের হাতে রাইফেল গর্জে উঠল।

পড়ে গেল লোকটা অথবা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে গেল—ঠিক বোঝা গেল না। সেপাই-সান্ত্রীর দল হৈ-হৈ করে ছুটল সেই ঝোপ লক্ষ্য করে।

লোকটা ছুটতে সুরু করেছে আবার—বাদার পাশ দিয়ে সোজা উত্তরে।

সান্ত্রীদের রাইফেল আবার গর্জে উঠল।

বাদার অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গা ছেড়ে তাড়া-খাওয়া লোকটা এবার জঙ্গলে ঢুকল। প্রাণপণে ছুটতে লাগল ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে।

কিন্তু বেশি দূর আর তার ছোটা হলো না। ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে একটা গুলী এসে লাগল পায়ে। বুনো শুয়োরের মত তবু পা ঘষটে ঘষটে ঝোপেঝাড়ে আশ্রয় খুঁজতে লাগল সে।

হলো না। সামনে দেখতে পেলে আর একটা লোককে—হাতে টাঙি।

ক্ষেপে গেল সে রাগে ক্ষোভে হতাশায়। গর্‌গর্‌ করে উঠল বুনো জানোয়ারের মত। দাঁতে দাঁত ঘষে যেন অন্ধ আবেগে তার হাতের ছুঁচলো লোহার শিকটাকে বাগিয়ে ধরে ছুটে গেল তার দিকে।

অবাক হয়ে দেখছিল মুকুন্দ। নয়নের সেই শাড়ি! সেই নীল ডুরে—চওড়া সবুজ পাড়! পরণে এক টুকরো—মাথায় জড়ানো আর এক টুকরো। সেই গোঁফ-দাড়ি...লোমশ...দীর্ঘদেহ একটা মানুষ। দেখতে দেখতে—যেন লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপরে।

চকিতে দু-পা পেছিয়ে নিজেকে রক্ষা করলে মুকুন্দ। বুলেট খাওয়া খোঁড়া পায়ে লোকটা টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। সেই মুহূর্তে তার ঘাড়ের নিচে শিরদাঁড়া বরাবর সজোরে পড়ল টাঙির কোপ। লোকটা আর উঠল না। রক্তের ফিনকি এসে লাগল মুকুন্দের গায়ে।

হৈ-হৈ করে সেইদিক ছুটে এল দারোগার দলবল।

খানিকবাদে এসে পড়ল হিজলী আর খেজুরীর দলবল। হুইশিল আর রাইফেলের শব্দ শুনে তারাও এসেছে ছুটতে ছুটতে।

হুমড়ি-খাওয়া লোকটা দু-একটা খিঁচুনি দিয়ে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে গেল।"

জমাদার দীনদয়াল সিং বললে, "মর্ গেল।"

দারোগা বললে, "টাঙিটা মারলি তো মারলি একেবারে ঘাড়ে!"

মুকুন্দ নীরব।

দারোগা আবার জিজ্ঞেস করলে, "তুই কোথায় ছিলি?"

"জঙ্গলে।"

"কি করতে এসেছিলি?"

মুকুন্দ বললে, "ডাকাত ধরা দেখতে।"

দারোগা চুপ করে গেল।

একজন সেপাই লাসটাকে উল্টে চিৎ করে দিলে।

ইন্সপেক্টার চোখ কুঁচকে, কপাল কুঁচকে বললে, "কিন্তু এ কে!" দারোগাকে জিজ্ঞেস করলে, "একে কোথায় পেলেন?"

দারোগা বললে, "এই জঙ্গলে।"

"কিন্তু এ তো সে নয়!" ইন্সপেক্টার বললে, "সে শহুরে ছোকরা!"

দারোগা মুকুন্দকে জিজ্ঞেস করলে, "দ্যাখদিকি ভাল করে—চিনতে পারিস?"

মুকুন্দ নীরবে শুধু ঘাড় নাড়ল। এদের কাছে সেই বনের ধারে হারানো নয়নের শাড়ির কথা বলে কি হবে! মুখ বুজে সে চুপ করে রইল।

চিনতে পারল জমাদার দীনদয়াল সিং। লাসটাকে ভাল করে দেখতে দেখতে বললে, "মালুম হচ্ছে—চিনেছি হুজুর! এ ভি আসামী আছে—ফেরারী।"

সবাই তার মুখের দিকে তাকাল।

দীনদয়াল বললে, "এই দেখুন—চোখে উল্কি। এ সেই পবন খাঁ, শালা গাঙে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে ছিল হুজুর।"

চরের সব চিহ্ন নিয়ে পড়ে আছে পবন খাঁর লাস।

সেই দিকে চেয়ে চেয়ে মুকুন্দের বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠল!

[ক্রমশ]

মাথার সামনের বাঙ্কটার ওপর হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়েছিলাম। লোক্যাল ট্রেনের মধ্যে এই দুপুর বেলায়ও ভিড়টা নেহাৎ কম নয়—ট্রেন ছাড়বার মিনিট দশেক আগেই আমি এসেছি, তবু সব সিটই আগে-ভাগে ভর্তি হয়ে ছিল। সামনে পিছনে সব দিকেই প্রথমে দেখে নিয়েছিলাম—চারজনের সিটে পাঁচজন করে তো বসেছেই, এক-একটায় আবার ছ-জনও।

শেষ মুহূর্তে দৌড়ে-আসা যাত্রীরা দরজার কাছটায় ভিড় করে, তাই কামরার মাঝামাঝি একটা জায়গা দাঁড়াবার জন্যে বেছে নিয়েছি—যেটুকু নির্বিবাদে দাঁড়ানো যায়। এইটুকুই যা শান্তি।

সেই তৃপ্তিটাই মনের মধ্যে। তবু আমার প্রশান্তির ব্যাঘাতও ঘটছিল। সামনের বেঞ্চিটায় মানুষ মোটে পাঁচজন। তার মধ্যে তিনজনই বেশ রোগা। ভাবছিলাম—একজনের জায়গা কি আর হতো না? উল্টোদিকের সিটে তো ছ-জনই! ইচ্ছে হচ্ছিল—মুখ ফুটে সে কথাটা বলেই ফেলি। সামনের ওই ভদ্রলোকটিকে বলি—দাদা, আপনার র‍্যাশন-ব্যাগটা যদি বাঙ্কের ওপর রাখেন। ভদ্রলোক র‍্যাশন-ব্যাগটার ওপর কনুয়ের হেলান দিয়ে দিব্যি আরাম করে বসে আছেন।

আরও ভাবছিলাম, ওপাশের বেঞ্চির ওই লোকটির মতো করলে কী হয়। ও তো কোন কথা না বলেই সোজাসুজি চেপে বসে পড়ল। কিন্তু না, ও-সব আমি করতে পারব না, তার চেয়ে বরং দেখাই যাক—সামনের স্টেশনে কোন সিট খালি হয় কি না।

গাড়ি ছাড়তেই হকারদের ফেরি শুরু হয়ে গেল। আমি জানি, এটা হয়। লোক্যাল ট্রেন মাত্রেই হয়। শোনা যাচ্ছিল—এই যে ডাব, কচি ডাব, ডাব, বলবেন—। শশা নেবেন—ন, কচি শশা। পিপাসা মিটবে, পেট ভরবে, কচি শশা—আ। দশ নয়া দশ নয়া—এই যে বলবেন—ন।

এর পরে একটা তেলের প্রচার হচ্ছিল। তেলটা প্রধানতোই কেশবর্ধক। নতুন চুলও গজায়। একটু দুঃখও যেন হচ্ছিল; যে এরকম গুণযুক্ত একটা তেলের কথা কেন আমি সেই বয়সে জানতে পারি নি। আরও শোনা গেল একটি সুগন্ধি ধূপকাঠির কথা। ঘরে একটিমাত্র জ্বালালেই সেটা বাসর-রাত্রির কথা মনে করিয়ে দেবে, জানালায় দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু যা এখন ভজঘট চলেছে চাঁদকে নিয়ে—ধূপকাঠিটা কেনবার কথা ভাবাই গেল না।

এইসব বিভিন্ন ডাক শুনতে-শুনতে হঠাৎ আমার মনে হল যে প্রত্যেক হকারেরই ডাকের একটা বিশেষত্ব আছে, সেটা ওদের সবাইকেই অভ্যাসে রপ্ত করতে হয়—কী বলা যায় এই ডাকটাকে? ট্রেড-কল—রুজির হাঁক? এইসব ডাক-গুলোকে যদি এক-এক করে নোট করা অথবা টেপ-রেকর্ডিং করা যায় তাহলে তো একটা নতুন বিষয়ের ওপর কাজই করা হয়। সত্যি, জীবনে যতবারই আমি ট্রেনে উঠেছি, ততবারই হকারদের এইসব ডাক ও প্রচারভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করেছে।

এবারে একটা নতুন হাঁক শুনলাম—কচি আম খাবেন—ন, টাটকা আনারস, কমলালেবু—উ। দারুণ পিপাসায় আপনার গলা ভিজবে, একটা হাতে দিলেই খোকা-খুকুর কান্না থামবে; পাঁচ নয়ায় পাঁচটা, ডজন দশ নয়া! খাবেন কচি আম—? এই ডাকটা আমাকে নাড়া দিয়ে গেল। বিষয়টাও। একই ঋতুতে কচি আম আনারস এবং কমলালেবু? মাথাটা ঘুরিয়ে ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করলাম। দেখলাম। দেখে বিস্মিত হলাম যে, ঘটনাটা শুধুই লবেঞ্চুসঘটিত।

কিন্তু এই মাথা ঘুরিয়ে দেখতে যাবার সময়ই বোধহয় একজন চলতি মানুষ আমার কাছাকাছি ভিড়ে একটু চাপ সৃষ্টি করে থাকবে, সামনে ঝুঁকে পড়ে সেটাকে সামলে নিচ্ছিলাম তখনই

আমার পা-টাও যে কোথায় গিয়ে পড়েছে তা বোঝবার আগেই একটা ঝাঁঝালো প্রতিবাদ এল—আঃ দিলেন তো মাড়িয়ে! চোখে দেখতে পান না মশায়?

আমি তাকিয়ে দেখলাম। সত্যিই ওই বেসামাল অবস্থার মধ্যে আমি ওই র‍্যাশন-ব্যাগ-অলা ভদ্রলোকের জুতোটাই মাড়িয়ে দিয়েছি। মুখে যথোচিত লজ্জার ভাব এনে সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ভদ্রলোকের চোখের চাউনি দেখে তা আর সাহসে হলো না, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বাঙ্কের গায়ে ঠেকানো আমার কব্জির ঘড়ির দিকেই তাকালাম, সেখানেই দৃষ্টি এঁটে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনটাও একটু ভারী হয়ে রইল।

কিন্তু থার্ডক্লাসে ভ্রমণের সুবিধাটাই এই যে, নিজের মনকে নিয়ে আজেবাজে চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকবার বিশেষ সুযোগ মেলে না—কিছু না কিছু বৈচিত্র্য এসে তাব থেকে টেনে তুলে নেবেই। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো—শুনলাম, একটা বক্তৃতা শুরু হয়েছে—মাননীয় বন্ধুগণ, আমার দু-একটি কথা দয়া করে শুনবেন। আপনারা যে যতোই টাকা রোজগার করেন, জিনিষ কিনেই তা খরচ করেন, কারণ পৃথিবীটাই কেনা-বেচা নিয়ে চলছে, কিন্তু যখন আপনারা পয়সা খরচ করে জিনিষ কিনতে যান, তখন কী আপনারা বিচার করেন? বন্ধুগণ আমি জানি আপনারা প্রথমেই চান সস্তা জিনিষ—কম পয়সায় বেশি দামের। তারপরে আপনারা চান টেকসই জিনিস। শেষে আপনারা খোঁজেন দুর্লভ জিনিস। বন্ধুগণ, এই তিনটে কথাই আপনারা ভাবেন, তাই আপনাদের কাছে আজ আমাদের কোম্পানীর তরফ থেকে বলছি।

আমার কান সজাগ হয়ে উঠে ওই কথাগুলো শুনছিল, মন চলে যাচ্ছিল অনেক দূরে—এ কী-সব কথা আজ শুনছি এই গাড়ির কামরায়? এ তো রীতিমতো দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপার! কম পয়সায় বেশি দামের! আরে, তাই তো। আমি থার্ড ক্লাসের ভাড়া দিয়ে খুঁজছি সেকেন্ড ক্লাসে বসার আরাম—সামনের বেঞ্চিটাব দিকে লোলুপ-নয়নে তাই এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম: আব ওই র‍্যাশন-ব্যাগের ভদ্রলোকও সেজন্যেই কনুইয়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তারপর ওই যে টেকসই আব দুর্লভ জিনিষের কথা এখনই শুনলাম, সেগুলোর সন্ধানেই কি আমরা জীবন-ভর আলেয়া-ছুট ছুটে মরছি না? এই কথাগুলোকে আরও একটু প্রসারিত করলে কোথায় বা তাদের পৌঁছে দেওয়া না যায়?

আমার বিস্ময়ের চোখ দিয়ে আমি খুঁজতে লাগলাম—বক্তাটি কে? কি বিষয় নিয়েই বা এইসব কথা তিনি বলছেন? দেখতে পেলাম। বুঝতেও আর দেরি থাকল না—গাড়ির মধ্যে এখন ফাউন্টেন-পেন বিক্রি হচ্ছে। হকার একজন দীর্ঘকায় সুবেশ মানুষ—সাধারণ ফেরি-অলা থেকে অনেক আলাদা—গাড়ি ভর্তি মানুষকে বন্ধুগণ বলে সম্বোধন করবার অধিকার যেন তিনি নিজের ক্ষমতায় তুলে নিয়েছেন। তিনি তখন বলছিলেন—বন্ধুগণ, আজ আপনাদের কাছে আমাদের কোম্পানীর তরফ থেকে একটা পুরস্কার ঘোষণা করছি—আপনাদের যদি কেউ এই কলমটির বডির ওপর দাঁড়িয়ে একে ভাঙতে পারবেন তাঁকে আমাদের কোম্পানী—শুনে অবাক হলাম—আরে! এরকম একটা পুরস্কারের কথা তো আজও আমি শুনি নি! কিন্তু তার আশায় এগিয়ে গিয়ে আমার কোন লাভ নেই—থাকতো আমাদের বন্ধু প্রহ্লাদ আজ এই গাড়ির মধ্যে! তো দেখা যেত, কলমটা সত্যিই মজবুত কি না।

তিনি তখনও বলে যাচ্ছিলেন—বন্ধুগণ, বাজারে যে কোন দোকানে এই কলমটার দাম দেড় টাকা, কিন্তু এখানে কনসেশনে পাচ্ছেন এক টাকায়, আর সঙ্গে একটা বাড়তি নিবও পাচ্ছেন, এই নিবটারই দাম আট আনা। বন্ধুগণ, আমাদের কোম্পানীর প্রচারের জন্য আজ—।

ওই মানুষটির প্রতি একটু শ্রদ্ধা এসে আমার মনের মধ্যে দাঁড়াল। মনে হলো, এই লোকটি যদি গাড়ির কামরায় না ঘুরে রাজনীতির মঞ্চে মঞ্চে বিচরণ করতেন তবে একজন ভাল বক্তা হিসাবে নিশ্চয়ই এঁর নাম হতো, তবে সে যাই হোক, একজন ভাল সেলসম্যান যে উনি, তাতে আর সন্দেহ নেই। কামরার এক পাশ থেকে অন্য পাশে তিনি কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছেন, আর হাতের কলমগুলো পথের দুধার দিয়ে নমুনা রেখে যাচ্ছেন, ফেরবার সময় আবার কুড়িয়ে নেবেন নিশ্চয়! কিন্তু কার কার হাতে যে দিয়ে রাখা হলো সেকথা মনে রাখতে নির্ঘাত এক নিখুঁত স্মৃতিশক্তি দরকার। ভাবছিলাম—এমনি একটা স্মৃতি থাকলে তো আমি আমার ছাত্রজীবনে অনেক কিছুই করতে পারতাম। ইনিও কি পারতেন না? তবে পারেন নি কেন? আশ্চর্য তো! এই পৃথিবীর কোথায় কোথায় না কোন্ কোন্ মানুষ তলায় পড়ে যায়! এই ট্রেনের কামরায় সামান্য পয়সা দিয়েই তাদের দেখতে পাওয়া যায়।

আমার হাতেও একটা কলম ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেটাকে হাতের মধ্যে ধরে আমি ভাবছিলাম, অন্তত ওই বক্তৃতা-টুকুর জন্যও একটা কলম আমি কিনব কি না—দাম তো সামান্য এক টাকা! তখনই আবার শুনলাম—আপনাদের সুবিধার জন্য আমাদের কোম্পানী আজ—।

এই কোম্পানী-প্রীতিটা আজকাল বড় একটা দেখা যায় না, তাই ভালই লাগল ব্যাপারটা। স্থির করে ফেললাম—কিনি একটা কলম! পকেট থেকে খুঁজে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে তাতে খসখস সই করে নিবটা পরীক্ষা করতে লাগলাম। দেখলাম, নিবটাও যেন ভাল বলেই মনে হচ্ছে।

এতক্ষণ ধরে একা একা আমি অনেক ঘটনা দেখে ও অনেক কথা শুনে নীরব দর্শক বা শ্রোতা হয়েই থেকেছি। কিন্তু মনের মধ্যে জমে-ওঠা ভাবনাগুলোর প্রকাশ না হলে তারা মনকেই ভারী করে তোলে, তাই হয়তো নিজের অজান্তেই আমি আমার পাশের ভদ্রলোকটিকে ওই কলমের উপলক্ষ করেই বলে উঠেছি—বাঃ, নিবটা তো মন্দ নয়! দামটা শুনে তো ভাবছিলাম—আপনি কী বুঝছেন দাদা?

তিনি বললেন—এ-সব হকারদের মালে আমি বিশ্বাস করি না মশাই—অনেকবার ঠকেছি। আর আপনি যে সই করে দেখলেন, কটা সই করে কী-ই বা বোঝা যায়?

কলমের ব্যাপারটা যে আমি বুঝি সেকথা জানালাম—বললাম, এই যে নিবের মাথায় একটা পয়েন্ট দেখছেন না, বাজে কলমে এটা থাকে না, আগে অবশ্য প্ল্যাটিনাম দিয়ে এটা তৈরি হতো, আজকাল অবশ্য—

আমার কথা মাঝপথেই থেমে গেল। নিচের বেঞ্চি থেকে একটা প্রশ্ন এল—আমারটা একটু টেস্ট করে দেবেন দাদা?

তাকিয়ে দেখলাম—সেই র‍্যাশনব্যাগের ভদ্রলোকই। হঠাৎ একটা খুশির হাওয়ায় আমার মনের সব গুমোট উড়ে গেল—ভদ্রলোক তাহলে ভুলেই গেছেন সেই পা মাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা! আমাকেই ডেকে যে বলছেন! মনে হলো—ট্রেনের ব্যাপারটাই এই রকম। চিনি না, শুনি না হয়তো হঠাৎ ঝগড়া বাধিয়ে বসলাম, অথবা এমন আলাপই হয়ে গেল যে, অনেককাল মনে থাকবে। তারপর স্টেশনে নেমে একজন একদিকে অন্যজন আর একদিকে চলে যাবে! তাই ওই ভদ্রলোকটি যখন আমাকেই আবার ডাকছেন তবে আজ আর কোন গ্লানি বয়ে নিয়ে হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে নামতে হবে না। বললাম—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। দিন, দেখে দিচ্ছি।

ভদ্রলোকের হঠাৎ এতক্ষণে কী খেয়াল হলো, ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—আরে, আরে! দাঁড়িয়ে কেন মশাই? এই তো জায়গা রয়েছে, বসুন বসুন? ওঁর র‍্যাশন-ব্যাগটাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে আমার জন্য বসার জায়গা করে দিলেন। বসলাম।

ওঁর কলমটা হাতে নিয়ে সেই কাগজটায় আবার খসখস দাগ টানতে লাগলাম। ভালই লাগছিল ব্যাপারটা—ওঁর কলমটা দিয়ে আমার নামটাই সই হয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোকটি আরও কয়েকটা কলম চেয়ে নিয়ে রং পছন্দ করলেন, আমাকে দিয়ে অনেক সই করালেন, তারপর এক সময় যথারীতি প্রশ্ন এল—কদ্দুর যাচ্ছেন?

উত্তর দিলাম।

মশায়ের কী করা হয়?

বিবাহ করেছেন নিশ্চয়?

ছেলেমেয়ে কটি?

আপনারা তো—?

উত্তর দিতেই থাকলাম। বেশ ভাল লাগে অনাত্মীয় মানুষের এমনি করে কাছে চলে আসা।

এর পরে আরও একটা প্রশ্ন—এই ফাউন্টেনপেনের বিজনেসটা দেখলেন?

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না উনি ঠিক কী বলতে চাইছেন। ওঁর মুখের দিকে না-বোঝার চোখ দিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

উনি ব্যাপারটা বুঝলেন হয়তো, মুখে একটা স্মিতহাসি নিয়ে বললেন—বুঝলেন না তো? আমি বলছিলাম কি—এই যে দেখুন, কলমটার দাম বাজারে দেড় টাকা এখানে দিল এক টাকায়, আবার একটা আট আনা দামের নিবও ফ্রি-তে আসছে, তবেই বুঝুন কি লাভে মালটা মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে।

এতক্ষণে ওঁর কথাটা বুঝতে পারলাম। ভদ্রলোকের দিকে প্রশংসার চোখে তাকিয়ে ভাবলাম—সত্যি তো, এ রকমভাবে তলিয়ে দেখবার বুদ্ধি তো আমার আসে না! বললাম—তা যা বলেছেন! দেখছি তো সেন্টপার্সেন্টই লাভ এতে।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার হাসলেন। বোঝা গেল, এবারেও আমার যেন কিছু ভুল হয়েছে, আমি একটু ধাঁধার মধ্যেই পড়ে গেলাম—ভুলটা কোথায় এবারে?

উনি বোঝাতে আরম্ভ করলেন—দেখুন এরা যে-হোলসেলারদের কাছ থেকে মাল নিয়ে আসে তার প্রফিট, আর এর যে কমিশন, সে-সব তো আপনি হিসেবের মধ্যে ধরলেন না।

যদিও এবারেও আমি ওঁর বক্তব্য সবটা বুঝতে পারলাম না, তবু শুনে একটু অবাক হলাম, কিছুটা শ্রদ্ধাও এল ভদ্রলোকের ওপর, ভাবলাম—সত্যি, কতো কিছুই না ব্যাপার আছে ব্যবসায় জগতে যার আমি কিছুই জানি না, শুধু কাগজের ওপর কথা সাজিয়ে, শব্দের সঙ্গে শব্দ বাজিয়ে নিজেকে খুব দিগ্‌গজ মনে করি।

বললাম—তা যা বলেছেন। এইসব আইটেম দেখছি বেপরোয়া লাভের ব্যাপার।

—কোন আইটেমই বা নয় বলুন? আপনি যে-সব জিনিষ সস্তা ভেবে কিনছেন তাদের আসল কস্টিংটা যদি জানতেন। মাল বেরোবার আগেই তো প্রথম গভর্নমেন্টের একসাইজ ডিউটি, আরও হাজার রকমের ট্যাক্স—গভর্নমেন্টই তো আমাদের রোজগারের অর্ধেকের বেশি নিয়ে যাচ্ছে। তারপর ঐই ব্যবসাদার আর ক্যাপিটালিস্টরা প্রফিট-এ নিয়ে যাচ্ছে বাকি অংশের অর্ধেকের মত, তার ওপরেও যে আরও কতো ফ্যাকড়া এদিক-ওদিক রয়েছে! আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষ শুধু হরেক কশাইয়ের ছুরির ডগার পাঁঠা, মশাই!

ভদ্রলোকের কথাগুলো এতক্ষণ আমার খুবই ভাল লাগছিল, কারণ আমার নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারি যে, এমনিতেই আমাদের রোজগার-করা টাকার অঙ্কটা শুনতে যদি খুব ছোট নাও বা মনে হয়, তবু মাসের শেষে কী যে নাজেহাল অবস্থা সবাইকার হয়, তা ভোলবার কোন উপায় নেই। কতো স্তরে, কতো পর্যায়ে যে আমাদের মত সাধারণ মানুষ আজ নীরক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই, ওঁর কথাগুলো আমার নিজের মনের কথার মতই এ-পর্যন্ত শোনাচ্ছিল, কিন্তু ঐই পাঁঠার উপমাটাই মনকে দমিয়ে দিল। ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন—দেখলাম ওঁর মুখে বেশ একটা তৃপ্তির হাসি। বোঝা গেল, ওই পাঁঠার উপমা হঠাৎ লাগসই হয়ে যাওয়াটা তাঁর নিজের কানেই গিয়ে ঠেকেছে, একটা তারিফও তিনি আশা করছেন আমার কাছে। কিন্তু আমার চোখজোড়া প্রায় আমার নিজেরই অজান্তে তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে ধীরে ধীরে নেমে এসে একবার আমার শরীরটাকে ভাল করে দেখে নিল, ভদ্রলোকের দেহ-টাকেও দেখল, তারপর জানালা দিয়ে চলে গেল বাইরের দিকে—যেখানে পৃথিবী চলেছে ঘুরপাক খেতে খেতে, গাড়িটা চলেছে এক সেতুর ওপর দিয়ে—সেতুটা নতুন কি না কে জানে! ধীরে ধীরেই চলেছে আমাদের গাড়ি।

এতক্ষণ যে আমি ট্রেনের কামরার মধ্যে আমাদের কথার শব্দের ভেতরে ঘেরা ছিলাম, বাইরের সেতুর শব্দ তার মধ্যে আসে নি, এখন শুনলাম—সেতুর লোহার থামগুলো আমাদের কামরার গায়ে শব্দ ছুঁড়ে দিচ্ছে—ঘটাট্যাং ঘট্যাং, ঘটাট্যাং ঘট্যাং, ঘটাট্যাং—একটা নিয়মিত ধ্বনি, একটা তাল তার মধ্যে বাজছে। আমি ওই তালটাকে মনের মধ্যে মেলাবার চেষ্টা করছিলাম আর ভাবছিলাম—ওই সেতুর শব্দটাই গাড়ির কাছে আসছে, না গাড়ির শব্দই সেতুর দেয়ালে আঘাত খেয়ে প্রতিধ্বনি ছিটকে দিচ্ছে ট্রেনের কামরায়?

সেতু দেখলেই আমার এমনি সব আজেবাজে কথা মনে হয়—কোথায় কোন্ বৌটি এখনও হয়তো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে—একটু আগেভাগেই তার কাছে কেউ পৌঁছোবে, মা ঘরের মধ্যে ঘুরছেন-ফিরছেন আর বলছেন—বৌমা, খোকা তো আজই আসবে লিখেছে, না?

সত্যি, সেতু গড়ে মানুষ অনেক দূরকে কাছে নিয়ে এল, কিন্তু মানুষের মন কি আজও মানুষের কাছে আরো একটু এগিয়ে যেতে পারল?

এই সব অবান্তর চিন্তার মধ্যে আমি ডুবে আছি, একটা কণ্ঠস্বর সেখানে গিয়ে পৌঁছল—দাদা, কী ভাবছেন? ও মশাই!

আমার ভাবনাগুলোকে কাটা ঘুড়ির মত বাইরের খোলা আকাশে ছেড়ে দিয়ে আমি কামরার মধ্যে ফিরে এলাম, তাকালাম ভদ্রলোকের মুখের দিকে। উনি একটু বিস্ময়ের স্বরে বললেন—আরে, কী ভাবছিলেন বসে বসে? মনে হলো, কিছুই যেন আপনার কানে যাচ্ছিল না!

আমি বললাম—নাঃ, এমন কিছু নয়।

উনি বললেন—আমি জানি আপনি কী ভাবছিলেন। কিন্তু মন খারাপ করে কিছু লাভ নেই মশাই। দেখবেন, ও-সব ভাবনা-টাবনা একদিনেই সাফ্—এই যে এখন জমিদার জোতদার আর ক্যাপি-টালিস্টগুলো মিলে দেশটাকে এখন চালাচ্ছে, আর আমার আপনার পকেট থেকে দিনরাত পকেট-মারী করছে, ওরা আর ক'দ্দিন মশাই? দেখবেন, আমি বলে রাখছি, আর বেশিদিন নয়!

বলে উনি মাথাটা নিচু করে র‍্যাশন ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে একটা হাত তার ওপর রেখে বললেন—বলুন তো কী আছে এতে? আপনি কী ভাবছেন বলুন?

আমি কিছু বলার আগেই তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই যেন কিছুটা উত্তেজিত হয়েই বলে উঠলেন—

রাণীধূপ
কাকার প্রডাক্টস

বলুন তো, চারশো গ্রাম র‍্যাশন করেছিল মশাই, এখন হলো সাড়ে ছশো। এক-দিনের খোরাকটাই এক হপ্তায়—তাই একটু নিয়ে আসছি।

আমি ব্যাগটার দিকে তাকালাম। এতক্ষণ মনে হয়েছিল ওতে কাপড়-চোপড়ই আছে, এখনও বিশ্বাস করা কঠিন যে—উনি আমার মুখের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বললেন—চাল মশাই, চাল! আমার বিস্ময়ের মধ্যে আরও শুনতে লাগলাম, উনি বলে যাচ্ছেন—দুবেলা ভাত না খেলে মশায় আমার চলে না, তাই মাইনের অর্ধেকটাই চলে যাচ্ছে চাল কিনতে।

আমি ওঁর কথায় সায় দিয়ে বললাম—সত্যি, র‍্যাশন তো নামেই র‍্যাশন, ওইটুকু চালে আর কি হয়! আমরা অবশ্য রাত্তিরে রুটি খাই বলে একরকম চলে যায়।

উনি জানালেন, কাঁথির দিকে এখনও এক টাকা কিলোয় বেশ সরু চাল, আর দেখুন, দেখুন ব্যাটা মজুতদারদের কার-সাজিটা!—উনি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন—কলকাতায় আমরা কিনছি দু টাকা সম্ভব, দু টাকা আশি! ব্যাটারা যা চালিয়ে যাচ্ছে—চালাক, যে কদিন পারে! পরে সুদে-আসলে তখন শোধ দিতে হবে, এখন তুলে যাক ষ-তলা বাড়ি ওদের খুশি যে কদিনেই বা পারে।

বাড়ির কথা উঠলেই আমার মনের গভীর তলার কোথায় যেন গিয়ে মোচড় লেগে যায়—এই কলকাতা শহরে আজ তিনপুরুষ কেটে গেল তবু উনুনে গাঁথার ইঁটগুলো ছাড়া আর একটা ইঁটকেও কি আমি নিজের বলে ভাবতে পারি? সেই কথাটাই আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, ভাবছিলাম, ভদ্রলোক হয়তো ঠিকই বলেছেন—সব মাল্টি-স্টোরিড আর স্কাইস্ক্রেপারের পেছনেই হয়তো এমনি কিছু অন্ধকারের ইতিহাস আছে। বল-লাম—অ যা বলেছেন! সাধারণ মানুষ তো আজ কোনদিক দিয়েই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না, জানেন, আমি যা মাইনে পাই—

আমার কথাগুলো ওঁর গলার শব্দে হারিয়ে গেল—উনি তখনও সেই বাড়ির বিষয়ে বলে যাচ্ছিলেন—জানেন, আমা-দের পাড়ার যে রঘু-শাউ। এখন অবশ্য শ্রী লালজী-এই সব সামনে পিছনে লাগিয়ে নামটা বেশ লম্বা-চওড়া হয়েছে—কিছু বছর আগে পর্যন্ত মাথায় কয়লার বস্তা নিয়ে ও ফেরি করত, মশাই! সকালে ঘুম থেকে ওঠবার আগেই শুনতাম রাস্তা দিয়ে ও হাঁকছে—হে কৈলা-আ; মনে আছে, আমিও ওর কাছে আট আনায় এক মণ কয়লা কিনেছি, আর এখন কি না ও ব্যাটাই চৌধুরীদের বাড়িটার দর দিয়েছে এক লাখ তিরিশ হাজার।

চৌধুরীদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, উনি বললেন ওঁদের পাড়ার সবচেয়ে পুরনো বনেদী বংশ চৌধুরীদের, অবস্থা এখন কিছুটা পড়ে গেছে, তবু বাড়িতে এখনও দুটো গাড়ি।

কেউ বাড়ি বিক্রি করে দেবে শুনলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। যদিও চৌধুরী-দের আমি চিনি না, তবু একটু খারাপই লাগল ওঁদের জন্যে, বললাম—তাই নাকি—সত্যি বলছেন?

—মিথ্যে বলবার কী আছে এর মধ্যে। আর জানেন, ওই যে বাড়িটা কিনতে চাইছে যে যদু-শাউ, ও ব্যাটা এখনও ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে চড়ে—তবেই বুঝুন একবার ব্যাপারখানা।

উনি কী বলতে চাইছেন তা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি, তবু কিছু হয়তো বলতেও যাচ্ছিলাম। কিন্তু আলোচনা আর চালাবার উপায় ছিল না—গাড়ি হাওড়ায় এসে পৌঁছে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে যে একটা স্যুটকেশ আর হোল্ড-অল ছিল সে-দুটোকে কুলির মাথায় চড়িয়ে আমি প্ল্যাটফর্মের বাইরে হাঁটা দিলাম, উনি চললেন ওঁর র‍্যাশন-ব্যাগটা হাতে নিয়ে।

আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল বাস-স্ট্যান্ডের কাছে। একটা বাসের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম—কী করি এখন? আজও ট্রাফিক-জ্যাম লেগে গেছে, হাওড়া স্টেশনের সামনে থেকেই চাপ চাপ গাড়ির স্রোত সেতুর ওপর বেয়ে বেয়ে দু পাশের রাস্তায় যে কত দূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে কে জানে, বুকে হেঁটে হামা দিয়ে চলছে যেন সব কিছু—সঙ্গে মাল না থাকলে হেঁটেই সেতুটা পার হয়ে যেতাম! তখনই ভদ্র-লোক সেখানে এসে দাঁড়ালেন। বল্লেন—আমিও ভাবছিলাম কী করি। আপনার সঙ্গে তো মালপত্তর, আপনার উপায় নেই, আমি বরং হেঁটেই সেতুটা পার হই, দেখি ওদিকে কোথাও গিয়ে যদি ফাঁকা পাওয়া যায়।

বললাম—সে অনেক ভালো, গঙ্গার হাওয়া খেতে খেতে যাবেন।

আর একবার নমস্কার দেওয়া-নেওয়া সেরে আমি বাসের মধ্যে উঠলাম। উনি এগিয়ে গেলেন। তখনই দেখলাম, আবার উনি আমার দিকে ফিরে আসছেন। কাছে এসে বললেন—যা বলেছি, মনে থাকবে তো? দেখবেন, কিছুদিনের মধ্যেই আমার কথাটা ফলে যায় কি না।

আমি বুঝতে পারছিলাম না—কোন কথাটা বলছেন উনি, বললাম, কী ফলে যাওয়ার কথা বলছেন বুঝছি না তো।

—ওই যে বললাম না, কিছুদিনের মধ্যেই সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে? যা সব চলছে! কিন্তু আর বেশিদিন নয়, ওদের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। সেদিন কিন্তু মনে রাখবেন, ট্রেনের কামরায় বসে এক-জন লোক বলেছিল! না ভুলেই যাবেন?

হেসে বললাম—না, আজকের কথাটা মনে থাকবে অনেকদিন, বেশ আড্ডাটা জমেছিল, বুঝতেই পারি নি, দুটো ঘণ্টা কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল।

আরও একবার নমস্কার নেওয়া-দেওয়া হলো। বাস চলতে লাগল—আমি চলতে লাগলাম তার চাকার সঙ্গে গড়িয়ে, ব্রেকের সঙ্গে থেমে, স্টার্টের সঙ্গে ছিটকে আবার শামুকের মত এগিয়ে। খানিকক্ষণ এমনিই চলতে চলতে বাসটা তখন হাওড়া-সেতুর মাঝামাঝি এসে গেছে, দূর থেকে দেখ-লাম—ফুটপাথের গা-ঘেঁষে এক জায়গায় একটা চাপা জটলা। মনে হলো, কিছু যেন ঘটেছে সেখানটায়। বাসটা একটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম, আমাদের সেই ভদ্রলোকটিই ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় তিনি হাতে একটা চটি জুতো ধরে আস্ফালন করছেন, জুতোটা আন্দোলিত হচ্ছে একজন মাথায় গামছা ছেঁড়া গেঞ্জি বুড়োমতো লোকের মুখের সামনে। তার পাশেই ফুটপাথের কোল ঘেঁষে একটা খালি রিক্সা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম—আরে! এ কী কাণ্ড বেধে গেল এখানে? ভদ্রলোকের তো এতক্ষণে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার কথা! কিন্তু এ আবার কিসের মধ্যে জড়িয়ে গেছেন তিনি? জানালা দিয়ে মুখটা বের করে বললাম—আরে, আরে—শুনছেন? ব্যাপারটা কী? ও মশাই!

উনি আমাকে দেখতে পেলেন। হাতে চটিটা একটু নিচু করে আমাকেই বোঝাতে লাগলেন—আরে দেখুন না! এই ব্যাটা রিক্সা-অলা, চোখ নেই ব্যাটা বুড়োর! ফুটপাথের গায়ে চেপে এসে রিক্সাটা একেবারে গায়ের ওপর তুলে দিয়েছে। এখন বলছে কি না—দেখা নেহি। আমি মশাই ফুটপাথের ওপর দিয়ে যাচ্ছি!

কী যে বলা উচিত তা আমি বুঝতে পারছিলাম না, তবু বললাম—চোট কিছু লাগে নি তো?

ওঁর উত্তেজনা যেন একটু বেড়েই গেল—লাগতে আর বাকি কী আছে বলুন! দেখুন তো কী করেছে কাপড়-টার—ব্যাটা শুয়োরকাবাচ্চা বুড্ঢা! বলে ডান পা একটু ভাঁজ করে হাঁটুর কাছের কাপড়টা টেনে এনে তিনি আমায় দেখা-লেন। দেখলাম—রিক্সার চাকার কালিতে

কাপড়টায় বেশ কিছুটা দাগ লেগে গেছে।

উনি বলে যাচ্ছিলেন—এই ব্যাটা ছোটলোকগুলোর এমন লাই বেড়েছে আজকাল—!

আবার উনি রিক্সা-আলার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। শুনলাম উনি বলছেন—শালা বুড়া, ভদ্দরলোকের গায়ের ওপর চলে আতা!

দারুণ উত্তেজনায় তিনি হাঁফাতে লাগলেন।

আমাদের বাসটা সামনে একটু খালি পেয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে গেল। জানালা দিয়ে যথাসম্ভব মাথা ঘুরিয়ে আমি দেখলাম, ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে একটা চটিজুতো-ধরা হাত শাসনের ভঙ্গিতে উদ্যত। ভিড়টা ক্রমশই আমার চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। বাস চলছিল গড়িয়ে গড়িয়ে। সামনে-পিছনে অনেক জ্যাম্।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ একটা চিৎকার করে উঠে আমার বলতে ইচ্ছে হলো—হটাও হটাও সব সামনের জ্যাম্। নয় তো ভেঙে ফেলো। গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দাও। সেতু তো তৈরি হয়েছিল আরও একটু আগে পৌঁছনোর জন্যে।

দেখুন! পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে...

টিনোপাল সবচেয়ে সাদা ধবধবে করে

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাল শেষবার ধোয়ার সময় দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়—এমন সাদা শুধু টিনোপালেই সম্ভব। আপনার শার্ট, শাড়ী, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব ধবধবে।

আর, তার খরচ? কাপড়পিছু এক পয়সারও কম। টিনোপাল কিনুন—রেগুলার প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিম্বা "এক বারতির জন্যে এক প্যাকেট"

® টিনোপাল—জে আর গায়গী এস এ, বাল, সুইজারল্যাণ্ড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

সুহৃদ গায়গী লিঃ, পোঃ আঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ২০ বি. আর.

Shilpi SGT-1A/69 Beng

অন্য গ্রাম অন্য দেশ

সমীর মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

॥ চার ॥

আমরা বুঝেছিলাম রুষ্টিবাবুদের গ্রামে আপাতত আমরা 'সেল্টার' পাবো না।

এমনিতেই অনিমেষকে নিয়ে সেদিন গ্রামের ভেতরে বিষাক্ত আবহাওয়া এতোদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে যে, ওখানকার কোন চায়ের দোকানে পর্যন্ত আমরা মুখ খুলতে পারি নি, প্রত্যেকেই মুখে কিছু না বললেও যেন আমাদের ঠিক সহ্য করতে পারছে না চোখমুখের ভাবটা এমনই। যেন এই সব কলেজের ছেলেদের খালি নজর ছোটো জাতের বৌ-ঝিদের ওপর। এই করতেই আমরা কলেজে আসি সুতরাং এখানে সুবিধে হবে না। কাছাকাছি অন্য কোন গ্রাম দেখতে হবে। আমরা এইভাবেই এক-একটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়বো। তারপর আস্তে আস্তে এই আসল গ্রামটাকে সেণ্টার করে এর চারপাশে আন্দোলনগুলোকে ঘনিয়ে তুলে তারপর একদিন এখানেও...'ওঃ, দেখুন তো, আপনার একটু চা খাওয়া দরকার, সেটাও ভুলে মেরে দিয়েচি।'

হঠাৎ অমিয় মুহূর্তে অতিথিকে আপ্যায়ন করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। ও বুঝলো এই গল্পটা শোনানো জরুরী বটে কিন্তু চা খাওয়াটাও কম জরুরী নয়।

আমি বাধা দিলাম। ঐ ধরণের ভদ্রতাবোধ আমার নেই। আমার তখন একটু চায়ের দরকারই ছিল। অমিয় উঠলে ওর ঘরটার দিকে আমার নজর গেল, অন্য অন্য ঘরের মতই সাধারণ, শ্রীহীন চেহারা কিন্তু একপাশে বিরাট এক গুরুদেবের ফটো। ফটোটা খুব জীবন্ত ভংগিতে তোলা। ফটোর পায়ের তলায় টাটকা বেলপাতা, সিঁদুর চিহ্ন।

অমিয় চা নিয়ে এসে আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে মৃদু হেসে বলল, 'মা করেন ওসব। আমরা তো সব এক্ষুণি বদলাতে পারি নি। এসব জিনিষ বদলাবো বললেই চট করে বদলাতে পারা যায় না।' আমি চায়ের কাপে চুমুক দিলাম।

'সিঁদুরমাখানো ফুল, বেলপাতা আর এই সব গুরুদেব, এঁরা আরো কিছুকাল থাকবেন, এমন কি বিপ্লবের পরেও বেশ কিছুকাল।'

'আপনি বলছিলেন আসল গ্রামটাকে সেণ্টার করে এর চারপাশে আন্দোলন-গুলোকে', বলে...খেইটা ধরিয়ে দিলাম।

অমিয় বলল, 'হ্যাঁ। আমরা প্রতী-ক্ষায় থাকতাম। খোঁজ রাখতাম কোথায়, কোন্ গ্রামে এই জমিদারের দুর্বলতা। হাজার হাজার বিঘে জমির এঁরা মালিক, স্বনামে, বেনামে, সে যে কতো বিঘে জমি তার আর লেখাজোখা নেই। যেখানে-সেখানে 'পকেট' করলেই তো আর হবে না। এদের চর আছে নানারকমের। রাতের বেলা এঁদের লোকজন যেখানে এতোটুকু গন্ধ পায় সেখানে শুঁকে শুঁকে বেড়ায়। আজ কোথায় কোন্ গ্রামে কারা সভা করে গেল, সেই সভায় কোন্ গ্রামের কোন্ কোন্ লোক গিয়েছিলো, গ্রামের চায়ের দোকানে কে কি কথা বলছে, বাইরের থেকে কোন লোক ওস্-কাতে আসছে কি না, গ্রামের মধ্যে বসে জমি নিয়ে কারা কারা ঘোঁট পাকাচ্ছে, এই সব খবর একবারে টাটকা টাটকা জমিদারের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে দস্তুরমত ট্রেনড্ বাহিনী আছে, ওপর থেকে দেখলে আপনি বুঝবেন না, ধরতে পারবেন না ওঁদের। আমরা অনেকদিন এসব অঞ্চলে আছি, দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়েছি, কতকটা ওঁদের আমরা চিনতে পারি।

প্রতুল একটা সেণ্টার পেয়ে গেল। সাত-আটটা গ্রাম ছাড়িয়ে ধুবলিতে। ব্যাপারটা কি। এদেরই গ্রামের একটা দুলের ছেলের সংগে জমিদারবাড়ির ছোট তরফের এক ছেলের একটু ভাবসাব, একই স্কুলে পড়ে বলে।

দোষের মধ্যে জমিদারবাড়ির বড় হলঘরটার মধ্যে ঢুকে, চমৎকার কাজকরা দামী একখানা কোচের ওপর ছেলেটা বসে পড়েছিলো। সেটা দেখতে পায় বনমালী কাঠালি, জমিদারবাড়ির কিষেণ। সে লাগিয়ে দেয় গিন্নীমাকে। ব্যস, তার পরেই দুলে ছেলেটার কান পাকড়ে দারোয়ানের প্রচণ্ড এক চড়। ছোটলোকের ছেলের এতোখানি স্পর্ধা! ছেলেটা মুখ-থুবড়ে পড়ে যায় নিচে, মোজেইকের মেঝেতে বিছানো মখমলের মত নরম, সবুজ আর লালে মেশানো কাশ্মীরী কার্পেটের ওপর।

অবশ্য পরে ওকে ক্ষীরখণ্ড খেতে দেওয়া হয়।

'চড়টা বুঝলাম, কিন্তু ক্ষীরখণ্ড বুঝলাম না।' বলে আমি অমিয়র দিকে তাকালাম।

'এরাই হচ্ছে খাঁটি সামন্ত। নিজের অধিকার সম্বন্ধে এরা ভীষণ খুঁতখুঁতে। এতোটুকু এদিক-ওদিক হলে এদের মান যায়। বাচ্চা ছেলেকে চড় মেরে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, আমি জমিদার। আমি এ সমস্ত বেয়াদপি একেবারে সহ্য করি না, আমার ছেলের বন্ধু বলেও না, বাচ্চা, অজ্ঞান বলেও না। এখানে আমার সোজা হিসেব। তোমার যে ঐ কোচে বসার সাহস, কে বলতে পারে ওই সাহস একদিন বাড়তে বাড়তে কোথায় যেতে পারে! আপনি হয়তো ভাবছেন বাড়া-বাড়ি। কিন্তু এটা মোটেই বাড়াবাড়ি নয়। আমি আপনাকে ডজন ডজন এরকম উদাহরণ দোব। আর ক্ষীরখণ্ড সেটার মধ্যেও আছে জমিদারী আভিজাত্য, এই আভিজাত্যটা অবশ্য খুবই গোলমেলে বস্তু। মারটা যেমন সরল ব্যাপার এটা তেমন নয়। এর মধ্যে অনেক জিনিষ তালগোল পাকিয়ে একসংগে মিশে আছে। আপনি হাসছেন?

না। না। আপনি বলে যান।

প্রতুল তো একটা ইস্যু পেয়ে গেল। এবং যেখানে ব্যবস্থা করার সেখানে ব্যবস্থা করলো। এখান থেকে চোদ্দ-পনেরোটা গ্রাম দূরে আমারও একটা সুযোগ জুটে গেল। আমি দুধালি গ্রামে কিষাণদের মধ্যে জায়গা পেলাম। আমার চেহারাটা দেখছেন তো! তখন এর থেকে অনেক ভালো ছিলো। আর গায়ের রংখানির দিকে একবার চেয়ে দেখুন। কিরকম বুঝছেন?

হেসে বললাম, একবারে পাকা রং। ঝামা দিয়ে ঘসলেও উঠবে না।

ঠিক বলেছেন। গায়ের রংটা মনে

রাখবেন। সময়ে কাজ দেবে। প্রথম যেদিন ওখানে খেতে বসলাম, সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। একটা ভাঙা থালাতে এই এতো ক'টা ভাত তা'ও দু'দিনের বাসি। গন্ধে পেটের ভাত উঠে আসে। গলায় আঙুল দিয়ে হড়হড় করে বমি করে পেট থেকে ঐসব ভাত বের করে দিতে ইচ্ছে করে, এর ওপর আবার অপরূপ পাটশাক, একটু সেধকরা, হলুদ ছুঁইয়েছে কি ছোঁয়ায় নি। ব্যস, মশলা বলতে, আনাজ বলতে ঐটুকু, একবারে সাহেবিখানা দিশিমতে, বিশুদ্ধ প্রোটিন, তাই খাচ্ছি, খেতেই হবে, সামনে জ্বলছে একটা ডিব্রী, তার একটা মাত্র দীর্ঘ লাল শিখা, আর আশেপাশে দু'-দশটা কুঁড়ি থেকে বাউরীরা উঠে এসেছে, ছেলে, বৌ, মরদেরা। ওরা অবাক চোখে 'বাবু'র খাওয়া দেখছে। কেউ কেউ মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খিলখিল করে হাসছে। কেউ কপাল চাপড়াচ্ছে। হাই মা, দ্যাগ দিনি কি কপাল, দুধের ছেইলেটা খেতে লারছে গো। এটু মাছ নাই, ত্যাল নাই, দুধের পারা বাছাটি, আমার খায় কি করে গো. একজন তো হুমড়ি খেয়ে বলল. হাঁ গ বাবু। ইসব কুনোদিন খেয়েছিস, চোখে দেখেছিস, তোরা তো বাবু রে। তোরা সোনা খাস। উপো (রুপো) খাস। হাঁ গ বাবু।

বাবু নয়। বল 'কমরেড'।

সেটা কি বটে? কমরেড কুহার নাম?

না। কমরেড মানে বন্ধু, সাভাত। আমরা সবাই সবাইকার সাভাত।

আমি কি করে তোর সাভাত হবো রে। আমার যে বয়েস তিনকুড়ি বটে। গলার চামড়া ঝুলে গেইছে।

বয়েসে যথেষ্ট প্রবীণ। ঘাস-ওপড়ানো জমির মত এবড়ো-খেবড়ো মুখ। চোখের তারায় তবু কাস্তের ঝিলিক। কিন্তু এই মুহূর্তে সেখানে কেমন অসহায়তা। সত্যি, এটা একটা সমস্যা বটে। তিন কুড়ি পার করে দেওয়া প্রবীণ ব্যক্তিটির আমি কি করে বন্ধু হবো?

না, না। তুই কি করে আমাদের সাভাত হবি রে। না। না।

অন্ধকারের মধ্যে আর একজন নড়ে-চড়ে বসলো। তার বয়েস বেশি নয়। ডিবরী থেকে সোজা উঁচু দিকে যে একটিমাত্র শিখা উঠেছিলো তার লালচে আলোয় দেখলাম লোকটির দু'টি চোখ কিরকম হিংস্র হয়ে উঠেছে।

বাবুদিগে আমি চিনি। মুখে মদু। বুকের ভিতরে জিলিপির প্যাঁচ। না। না। সে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে প্রবল-ভাবে আমাকে অস্বীকার করলো, না। না। তুই তো বাবু। তুই কি করে আমাদের বন্ধু হবি। ধুর। বাবু কখুনো সাভাত হয়?

আমি কোন জবাব দিলাম না। আমার হাতের মুঠোর মধ্যে তখনো দু'-দিনের টকেখাওয়া বাসি ভাত। সেটা দেখতে দেখতে কাঁকরের মত শক্ত হয়ে উঠলো। ভীষণ গম্ভীর হয়ে মুখ নিচু করে তখনো যেটুকু পাতে ছিলো সেটুকু খেতে লাগলাম। সত্যি কথাই তো লোকটা বলেছে। এই দু'দিনের বাসি ভাত, টকে গেছে, যা চাট্টি মুখের ভেতরে যাচ্ছে তাতেই গা এমন পাক দিয়ে উঠছে যেন এক্ষুণি বমি হয়ে যাবে, এই ভাত ওরা পেলে এরকমটা হত কি? প্রথমত ভাত দু'বেলা জোটানো এদের পক্ষে বিলাসিতা। তাতে আবার গরম গরম ভাত, সে সব এঁদের কাছে সময়-বিশেষে স্বপ্ন। বছরের এই সময়টা এই রকমই নাকি যায়। কাজ-কর্ম নেই। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা। এখানে বড় বড় বাগান নেই যে মাটি কুপিয়ে মজুরী পাবে। কাছাকাছি গঞ্জ বা বাজার নেই যে বন-বাবাড়, আঁদার-পাঁদার ঘুঁড়ে দু'-চারটে বুনো ওল কি মানকচু কি কলাপাতা বা ঐ জাতীয় কিছু বেঁধেবুধে গঞ্জে বা বাজারে গিয়ে বসবে, বিকেলবেলা চ্যাটাই বুনবে বা ঝুড়ি তৈরি করবে, এই সময়টা বড় মারাত্মক। রান্তে ইচ্ছেই করে না। যদি বা ধার-কর্জ করে একটু চাল জোগাড় হল তারপর কোথা রে একটু গোবর, কোথা রে একটু খড়কুটো, কোথা রে জ্বালানি—এসব আর ভালো লাগে না। এই তখন একদিন রান্না হল তো তিনদিন হল না, ধুর, ওসব কে করে, কিছুই ভালো লাগে না, সামান্য কথায় আগুন ছিটকে যায়, কার যে কখন মাথায় খুন চাপে কেউ জানে না, দুধের বাছা ফেলে দু' বিয়ানী মা অন্ধকারে কার শিস শুনে বেরিয়ে পড়ে, কার ঝিয়ারী, গায়ে একটু মাংস আছে, চোখ দু'টো টানা টানা, টলে টলে এই সেদিনো জল আনতে যেত, তাকে ধান ভানতে দেখলে ভিরমি খেত যুবকেরা, হাতের বাঁশি উধাও মাঠে বাত ভোর আপনমনে ঘুরতো, দ্যাখরে কাণ্ড সেও ছুটছে ডিব্রী হাতে 'নাইন'-এ দাঁড়াতে, চোলাই মদ আর কালো চালের কারবারে ভিড় ক্রমশ বাড়িয়ে ফেলছে।

আমি কি করে এদের বন্ধু হবো? আমার তো কিছুই এদের সংগে মেলে না।

বাবু, আগ করলি নাকি? মুখখানা ওরকম হল কেন তোর. হাঁ রা?

না রে। রাগ করি নি। আমি হাসলাম ক্লিষ্ট হাসি।

তোরা ঠিক কথাই বলেছিস। তবে আমি চেষ্টা তো করতে পারি। তোদের বন্ধু হওয়া কি সোজা কথা? এমনি এমনি হবে? মন খারাপ নিয়ে আস্তে আস্তে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালাম।

সমস্ত গ্রাম নিঃসাড় যেন ঘুমোচ্ছে। কতো আর রাত হবে? সাতটা কি আটটা। এর মধ্যে মানুষের নড়াচড়া সব শেষ হয়ে গেল। কিছুই করবার নেই বলে সবাই এতো তাড়াতাড়ি নিঃঝুম হয়ে যায়। ঘুম, এক অদ্ভুত ধরণের ঘুম পেয়েছে এখানকার মানুষদের।

শুধু একবার এরা জাগে। এরা চেনে জমি। যাকে এরা বলে ভুঁই। আর চেনে ধান। যাকে বলে 'জেবন'। শুধু একবার এদের সে চেহারা দেখা যায়। এই কাস্তে দিয়ে হু হু করে চারকাঠা ধান কেটে ফেলছে। এই 'এ'টিয়ে' নিচ্ছে। এই আলের ওপর দিয়ে দুলে দুলে ভারে ভারে শস্য নিয়ে আসছে। এই 'পালা' দিচ্ছে। জাগন্ত মানুষের সে এক অদ্ভুত মূর্তি। কাকে বলে জাগা সমস্ত শরীর নিয়ে সে সময় এরা বুঝিয়ে দেয়। তাও নিজের জমির ধান নয়। পরের জমির।

কালো কালো, গিঁঠ পাকানো, শিরা-বহুল শরীরটার প্রকাণ্ড কাঠামো ঘাম তেলে চকচক করে। হাতের কাস্তে রোদের ছটায় চমকায়। যার বয়েসের গাছ-পাথর নেই, এখন আর কব্জির সে জোর নেই, ভালো করে শিরদাঁড়া খাড়া করে চলতে পারে না, এমন সব মানুষও এই সময় কোনরকমে হেঁচড়াতে হেঁচ-ড়াতে ক্ষেতের কাছাকাছি আসে, তার উৎসাহ আবার সকলের চেয়ে বেশি, একটা নিমগাছের ছায়ার তলা থেকে সে সমানে গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, কি র‍্যা সুবল, ওটা কি কাটা হচ্ছে নাকি রে? হাঁ রে ষাঁড়ের মত গতরটাই করেছিস, আমি হলি আট পণ ধান এতোক্ষণ কাটা হয়ে গেছে, গায়ে জোর পাবি কি করে? খালি ফুড়ুক ফুড়ুক বিড়ি খাবি, তোদের আর দোষ কি. আমাদের সময় এ সব ছেলো নি, আমরা নিয়ে আসতাম 'চ্যায়না', সে এমন কায়দায় পাকানো যে আগুন জ্বলবে ধিকিধিকি চোফর দিন, নিভবে না, ওই খানিক কাটছি আর খানিক তামুক ধরিয়ে লিয়ে ভক্ ভক্ ধোঁয়া ছাড়ছি যেন রেল ইঞ্জিন, আর সে সব ইঞ্জিনও নাই গা, এখন সব তারের ইঞ্জিন (ইলেকট্রিক ইঞ্জিন), ছোটে কিন্তু ধোঁয়া ছাড়ে না. ভালো লাগে না বাপু! নে, নে, আরেকটু চালিয়ে নে বাবা। গতরকে বিরাম দিবি নি। গতরের নাম আদর মণি। আদর একবার পেলে সে ব্যাটা ভারি ছোঁকা। মাথায় উঠবে। হাঁ রা, গুপী, বুঝলি সিবার......

গুপীর সে কথায় কান নেই, গুপী তখন হেঁই হেঁই করে কাস্তে চালাচ্ছে; আর ভারী মোটা গলায় গান ধরেছে,—ঝাঁপ দিব যমুনার জলে, গলে ছুরির দিব বলে, ও ললিতা, কুথা হে নবীন বংশীধারী... এ গানের সুর ভেসে যাচ্ছে অন্য ক্ষেতে, সেখান থেকেও ভেসে আসছে কেঠো কেঠো গলায়, 'আরে বলেছিলি গো, আমরা বনাই শালার ভাত গো খাব...'

মেয়েরা কোমরে আঁটোসাঁটো করে শাড়ি পরে পাটায় নানা ছাঁদে ধান ঝাড়ছে, মুখে, গালে পড়ছে কুটো, যতো পড়ছে ততো খলখল করে হাসছে, বিরক্তও হচ্ছে, ট্যারাবাঁকা বাংলায় বলছে, অ মা, ইটা ত' ভারি খালভরা আমায় ছাড়তে লারছে, আর একজন ফোড়ন কাটছে, তোর লয়নে উয়ার লয়ন খানি বিঁধেছে গ'।

ঢেঁকিতে 'পাড়' দিচ্ছে মেয়েরা 'ধাপুর ধুপুর' শব্দে, রাতে বাউরী-পাড়ায় ঢোল বাজছে, খঞ্জনী বাজছে; লোচনদাসের কেষ্ট ধামালী হচ্ছে, 'তুমি যে-সই বল মোরে, গোরার সংগে আছো, একথা বলিতে মুখে লাজ নাহি বাসো...'।

বাবুদের, ভদ্দরলোকদের পাড়ায় যাত্রাগানের রিহার্সাল হচ্ছে, দোকানপাট এতো রাতেও জমে উঠেছে, তাসে-পাশায় মত্ত, বেহুঁশ, ধানে, গানে, নেশায় মেশানো মেয়ে-মদ্দের সে এক ভারি আশ্চর্য জাগন্ত-রূপ।

তখনি তো ইছল-পিছল মাটি দিয়ে ঘাটে যে যায় জল আনতে তার সাধের কলসী ভাঙে। বনের পথে কাঠকুড়োনি একলা মেয়েকে পেয়ে কালা চতুরালী করে। ইমির-ঝিমির তারা-করা রাতে কোন বজ্জাত বাঁশীতে দেয় তান; ফুলের মালা বাসি হলে দারুণ কান্নায় কারুর বুক ভেসে যায়, যৌবনের বিষম স্রোতে কলসী ভেসে যায়, বন্ধু যদি সুজন হত তবে কলসী ধরে দিত, এই গান-হয়।

এখন কিন্তু সব স্তব্ধ। গাঢ়, জমাট অন্ধকারে দিক-দিগন্ত ঢাকা আকাশের দূরে প্রান্তে কয়েকটি তারা জ্বলছে দপ-দপ করে। খানিকক্ষণ ওদিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলাম। এ মাটি কি জাগবে? এ মরা মাটি কি জাগবে? আমি কি পারবো 'শিব শিব' বলে তারে ঘা দিতে যাতে মরা চামড়াও কাড়বে 'বিয়াল্লিশ রা'? পারবো? আমি অবাক হয়ে সেদিন মাটিকে জিগ্যেস করেছিলাম, মাটি, মাটি, মাটি, কে তোমাকে তৈরি করেছিলো?

আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝলাম যেখান থেকেই আমি যা কিছু করি না কেন আমাকে এখান থেকেই আরম্ভ করতে হবে। কিছু কিছু বই আমি পড়েছি আগে। আমার গর্ব ছিল আমার বন্ধুরা যখন সস্তা ডিটেকটিভ বই পড়ে, যৌন-সাহিত্য গোগ্রাসে গেলে, নোংরা চটচটে ইয়ারকীর মধ্যে ভনভনে মাছির মত জড়িয়ে যায়, আমি তখন এই সব বড় বড় পণ্ডিতের লেখা ভারী ভারী বই-এর মধ্যে খুঁজি ইতিহাসের অনিবার্য, অমোঘ সেই নির্দেশ যা একদিন মোড় ফিরিয়ে দেবে। সেদিন যতো বিজ্ঞের ভাবই করি না কেন, সেদিন বুঝি নি; আজ এই অন্ধকার, স্তব্ধ রাত্রে কেমন করে সব বুঝতে পারছি। এসেছিলাম কলেজে। কলেজটাকে বদলাতে চেয়েছিলাম। কলেজটাকে বদলাতে গিয়ে দেখলাম মানুষের সংগে না মিশলে উপায় নেই। এখন দেখছি মানুষের সংগে মিশতে গেলে মিশতে হবে জমির সংগে। এখান থেকেই আরম্ভ করতে হবে। মাটি, মাটি, মাটি, কে তোমাকে এমন করে তৈরি করলো? গভীর বিস্ময়ে গাঢ় অন্ধকারে, স্তব্ধ, তারা-ভরা সেই রাতে মাটিকে আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম।

দু-চারদিন পর ওদের আমি বললাম।

ওরা বলল, তুই পারবি কেনে? ভদ্দর লোক।

নিকুচি করেছে তোর ভদ্দর লোকের। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তোদের সংগে আমাকে নে। আমি ধান পুঁতবো।

তুই তো বেরাহ্মণ। বাবুরা ঠিক তোকে শুদ্ধকে চিনে ফেলবে।

বলবি কেন বেরাহ্মণ? বলবি আমাদের কুটুম এই তালপুর থেকে এয়েচে।

হাঁ, সিটা হয়। বেশ তোর যাখন মন বলচে ত্যাখন চ কেনে। এ তোর বসে বসে বই পড়া লয় রে, ভারি জোয়ান মদ্দর কাজ। শিকে লিতে পারবি তবে তুর যে কষ্ট হবে, সিটা আমরা কেমন করে সইবো? তুর কাতিপারা চেহারা, ও যে মট করে ভেঙে যাবে। তুর বাপ-মাকে আমরা কি বুলবো?

আমার চোখে তখন আগুন জ্বলছে। অনিমেষের অপমান আমার চোখের সব জল একবারে শুষে নিয়েছিলো। আমার তখন বাপ ছিলো না, মা ছিলো না, ভাই ছিলো না। আমি যে মনে-মনে অনিমেষকে কথা দিয়েছি, আবার যখন তুই ফিরে আসবি অনিমেষ তখন তুই দেখবি সব অন্যরকম হয়ে গেছে, আমরা সবাই অন্যরকম হয়ে গেছি, মানুষ আর সে মানুষ নেই, অনেক বদলে গেছে, এখানেও মজুরেরা মাটি তৈরি করছে, তুই আবার আসিস..., আমি এ সব ভুলি নি। ভুলতে পারি না। বুকের মধ্যে এসব কথা রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে। এ কথা যে একবারের জন্যেও ভুলবে সে বেইমান। আমি বেইমান হতে পারি না। অতো নীচ আমি নই।

মিথ্যে করেই ওদের বললাম, আমার বাপ, মা মরে গেছে।

ওরা যেন এরকম একটা জবাবেই প্রত্যাশা করছিলো। এইরকমই ভেবে-ছিলো। বলার সংগে সংগেই একসংগে যেন ডুকরে কেঁদে উঠলো, তাই হবে রে, তাই হবে। এখুনো ভালো করে মোচ হয় নি। শেয়ানা হয় নি। ও কেনে এই বন-বাদাড়ে মরতে এসবে?

মরতে আমি আসি নি। আমি এসেছি বাঁচতে।

আমি কঠিন চোখে ওদের দিকে তাকালাম। ওদের যে ভিড়টা তখনো পর্যন্ত আমাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, সেটা একটু টোল খেয়ে গেল, একটা ঢেউ হঠাৎ ছলাৎ করে কূল থেকে লাফিয়ে উঠলো, কে যেন বলল, উয়ার চোক দুটি দেখ। বাপো রে, কেমুন ধকো ধকো জ্বলছে হে।

আমি ওদের দেখাদেখি একদিন ক্ষেতে নেবে পড়লাম। কিছুই জানতাম না। সব একে একে জানলাম। ওরাই শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলো। তাও কি পারি তেমন। যেটুকু যা না পারতাম ওরাই ঠিক করে দিতো। জোতদারের কাছেও তখন ধরা পড়ি নি। আমার চেহারার কথা আপনাকে আগে বলেছি মনে রাখতে। এমন বার্নিস করা, মাজা, কালো রং, এ যে দেখেছে সেই মজেছে, জোতদারের তো আমাকে খুব পছন্দ, একবার শুধু কিষাণদের জিগ্যেস করে-ছিলো, এ কে বটে, তোদের কোন কুটুম-টুটুম নাকি? ওরা হেসে ঘাড় নেড়েছিলো।

এই রং-এর গুণেই সেদিন বীজ বুনেছি, মাটি চষেছি, আমার হাত দিয়ে চারাগাছ মাথায় বেড়েছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার মত এক-একদিন হাজির হয়েছি কলেজে। মুখে একরাশ দাড়ি, গায়ের জামা-কাপড় সে আর কহতব্য নয়, কাঁধের হ্যান্ডলুমের ব্যাগটি শতচ্ছিন্ন, কেউ জানতো না আমি কোথায় আছি। দু-একবার জিগ্যেস করেও আমার কাছে যখন কোন উত্তর পায় নি তখন বুঝেছে কোন গূঢ় কারণে কাউকে কিছু হদিশ দেওয়া [illegible] চলে না. আর আমার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, মেয়েদের সঙ্গে আমা-দের তেমন কথাবার্তা জমতো না, তবু হঠাৎ হঠাৎ এসে যখন এদের চোখে পড়ে যেতাম, ওরা এ ওকে আঙুল দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করতো। ভাবখানা এই, কলেজে পড়তে এসেও আমি যে কলেজে আসছি

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনায় অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

না, বই পড়ছি না, পরীক্ষাগুলো দিচ্ছি না, এসব যেন ঠিক করছি, তার বদলে আমি আসছি মাসে একবার, কোথাও যেন গুপ্ত হয়ে দেশের কাজ করছি এই ভালো। আমার ছেঁড়া জামা, কাপড়ের দিকে, আমার এই অযত্নবর্ধিত দাড়ির দিকেও, আপনি হাসবেন না, ওরা খানিকটা মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকতো, যেন ওরা যা হতে চায় অথচ হতে কোনদিন পারবে না। তারই একটা রূপ ধরে ওদের সামনে আমি যে ঘুরছি-ফিরছি এতেই এদের গর্ব। এমন কি প্রফেসররাও আমাদের অদৃশ্য হাতে পিঠ চাপড়ে দিতেন, যেন কানে কানে বলতেন, পুশ অন, পুশ অন, কেন না ক্লাস করতাম না। কাউকে কিছু জানিয়েও যেতাম না, অথচ দেখতাম পার্সেন্টেজ ঠিক আছে। এমন কি, কতো বড়ো সৌভাগ্য আমার, আমার মাইনেও ঠিক ঠিক তারিখে জমা পড়তো। আমি কিছুতেই ধরতে পারি নি এ কোন্ প্রফেসরের কাজ, কেউ মুখ খোলেন নি। সত্যি বলছি সে সময় এ ধরণের পড়াশুনোর যে কোন মানে নেই এ-ধারণা প্রায় হাড়ে মজ্জায় ঢুকে গিয়েছিলো। আমার এখানে আসা মানে সংগঠন গড়ে তোলা, তার বেশি কিছু নয়, অথচ এতো করে কলেজ ছাড়তে চাইলেও দেখতাম কলেজ আমাকে ছাড়তে চাইছে না, বড়শিতে গেঁথে রেখেছে।

লড়াইয়ের ছকটা আমার মাথায় ক্রমে ক্রমে একটা আকার নিচ্ছিলো। কলেজে, ছোটখাটো আন্দোলন লেগেই ছিলো। চীফ ক্যান্টিন নিয়ে, কমনরুম নিয়ে। এগুলো কেন হয় না ছাত্ররা তা জানতে চাইতো। প্রিন্সিপ্যাল আগের মত অতো হুংকার ছাড়তে পারতেন না। কেন না, দশ বারো মাইল দূরে দূরে-হলেও পাশাপাশি অনেকগুলো কলেজে তখন দক্ষযজ্ঞ অবস্থা। প্রেসিডেন্সী কলেজে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ হচ্ছে, ছাত্রদের নিয়ে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে, আমি এই অবস্থারই সুযোগ নিলাম। ছাত্রদের এক-একটা স্কোয়ার্ডকে মাঝে মাঝে রশ্মিবাবুর দুর্গের মত বিরাট প্রাসাদের দিকে পাঠাতাম। ছাত্র-ছাত্রীরা ওখানে ওঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ওঁর পদত্যাগ চাইতো, চীফ ক্যান্টিন করে দাও, কমনরুম গড়ে দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও, এই সব শ্লোগান। গ্রামে যখনই ওঁরা ছোটখাটো উপদ্রব করতেন সে সব খোঁজ রেখে ছাত্রদের এক-একটা জাঠার মুখ গ্রামের দিকে ঘুরিয়ে দিতাম। কখনো কোন গ্রাম্য আটচালার সামনে দাঁড়িয়ে, কখনো মেটে রাস্তায় যেতে যেতে কখনো কোন খোলা মাঠে চোঙা নিয়ে স্ট্রীট কর্নারের ব্যবস্থা করতাম। গাঁয়ের লোকেরা এতে ঠিক যাকে বলে সাড়া দেওয়া তা দিতো না বটে, কিন্তু আগে যেমন উপদ্রব করতো, পেছন পেছন যেত টিটকিরি কিংবা শিস দিতে দিতে, কখনো কখনো কুকুর লেলিয়ে গ্রামের বাইরে আমাদের রেখে আসতো, এখন দেখলাম এসব করছে না। বলা বাহুল্য, এইসব মিছিলে বা স্ট্রীট কর্নার মিটিং-এ আমি থাকতাম না। কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেলাম।

দুপুরের দিকে 'জল' খেতে সকলের সঙ্গে গিয়েছি মাঠের ধারে গাছের তলায় যেখানে জোতদারের মেয়ে আমাদের মুড়ি দিতো প্রতিদিন। মেয়েটা আমাকে খুটিয়ে খুটিয়ে লক্ষ্য করতো। বোধহয় আমার ঘটির জল ঢক ঢক করে গলায় ঢালার ভঙ্গির মধ্যে, মুড়ি কাঁউ কাঁউ করে চিবোনোর মধ্যে কোথাও যে একটা মোটা রকম পার্থক্য আছে সেটা ধরে ফেলেও ধরতে পারছে না কেন, এই রকম একটা উৎকণ্ঠা তার চোখে মুখে আমি স্পষ্ট দেখতাম। তাই ঘুণাক্ষরেও আমি সেই সময় কোন কথা বলতাম না। ভীষণ গম্ভীর এরকম একটা ভান করতাম। সবাইকে বলেও দিয়েছিলাম কেউ যেন আমার সঙ্গে কোন কথা সে সময় না বলে। জোতদারের মেয়ে দু-একবার কথা বলতে এসেছে, আমি খুব গম্ভীর হয়ে হুঁ আর হাঁ করে কথা বলায় যে আগ্রহ আমার খুবই কম এটা বুঝিয়ে দিয়েছি। এই চলছিলো। সেদিন হয়েছে কি, হঠাৎ মেয়েটার পায়ে আমার পা ঠেকে গেল আর অভ্যেসবশত মুখ দিয়ে আমার বেরিয়ে গেল, সরি! বলেই আমি জিভ কেটে ফেলেছি, পলকে মেয়েটার চোখ ওপরে উঠে গেল, বুকটা উত্তেজনায় কেঁপে উঠলো, সে কি রকম রহস্যময় গলায় ফ্যাসফ্যাস করে বললে, এই তুমি এই কথাটা জানলে কি করে?

কোন্‌টা বলছেন গো?

এটা ত' ইংরেজী কথা। আমি ছ' কেলাস পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি। আমার কাছে চালাকি খাটবে না বটে।

শুনে শুনে শিখেছি।

বোধহয় কথাটা ওর বিশ্বাস হল না। ইংরেজী কথা বলার জন্যে বোধহয় নয়। আজকাল ত' গ্রামে অনেকে-এরকম টুকরো টুকরো শব্দ জানে। কিন্তু বলার ঐ বিশেষ ভঙ্গিটি, বলে যে ভুল করে ফেলেছি মারাত্মক আর সেই ভুলের জন্যেই যে জিভ কাটলাম, সম্ভবত এটাই মেয়েটার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

রাত্রে বাউরীদের পুরনো আস্তানায় ঢুকতে যাচ্ছি, এই প্রথম ওদের মধ্যে এক ধরণের সচেতনতা লক্ষ্য করলাম, ওরা বলল, না, তুই আজ বিপিনের ঘরে থাকিস না। জোতদারের লোক আসবে মন গাইছে। তুই উদিক পানে চলে যা। লক্ষা সামতালের ঘর। সব বলা আছে। ওরা যা বলেছিলো ঠিক তাই, রাত দশটা নাগাদ জোতদারের কিছু লোক আমার খোঁজে এলো বিপিনের ঘরে। আমাকে পেলো না। মুখখিস্তি করতে করতে চলে গেল। ওদের শাসিয়ে গেল যাবার সময়, সুমন্দি এলে তাকে বলিস সে যে কে আমরা তো জানতে পেরেছি। ওকে বলিস কলেজ ফলেজ গরম করতেন করুক, এই গাঁ গিরস্তি গরম করতে এলে 'অক্ত' ছুটবে। সাবোধান।

ওদিকে, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে চাষীদের নিয়ে ছোটখাটো অভ্যুত্থান হচ্ছে। বুঝলাম, প্রস্তুলেরা রেডি হয়েছে। একদিন এই সব কিষাণদের নিয়ে ছোটোখাটো একটা সম্মেলন হয়ে গেল একবারে জমিদার বাড়ির নাকের ডগায়। সম্মেলন ভাঙার পর কিষাণেরা মাঠের পথে ফিরতে ফিরতে রশ্মিবাবুর জমির আলু লুঠ করে। এসব ত' কারুর প্রোগ্রামের মধ্যে থাকে না। আবার এসব খুব একটা বাধাও দেওয়া যায় না। ওরা ওদের অনেকদিনের জমা করে রাখা ক্রোধ প্রকাশ করছে এইভাবে। সকলের প্রকাশের ভাবটা তো একই রকম হতে পারে না। কিন্তু তার ফলটা ফলল। আমরা চলে গেলাম। আমি কি একটা কাজে কলেজেই থেকে গেলাম। কলেজের হোস্টেলে। দু-একদিন বাদে জানতে পারলাম, জমিদার ওঁর বান্দী লেঠেল পাঠিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করেছে কিষাণদের। কিষাণরা সব আলু ফেরত দিয়েছে। কান মলেছে। নাকে খৎ দিয়েছে। বলেছে এসব অনিষ্টের গোড়া নাকি আমি। একথা আমি বিশ্বাস করি নি। কেন না, সেদিন আমাকে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে ওদের যে সচেতনতা আমি দেখেছি তাতে অবিশ্বাস করি কি করে। এ সবই শত্রুপক্ষের রটনা। যাই হোক, আমার গাঁয়ে গিয়ে খোঁজ নেবার কোন উপায় নেই। অন্য অন্য ছাত্রের মতই, মাথায় ওয়ারেন্ট ঝুলছে। তাই নিয়েই ভালো ছেলের মত ক্লাস করে যাচ্ছি, মুগ্ধ ছাত্রের মত প্রফেসরের লেকচার শুনে যাচ্ছি। আমার যা কাজ করবার ছিলো প্রাথমিক স্তর হিসেবে সে কাজ আমার শেষ হয়েছে। আমরা এটা বুঝতে পেরেছি সুনিশ্চিত যদি এখুনি কলেজে বড় রকম আন্দোলন করি আর সেই আন্দোলনের ঢেউকে যদি টেনে নিয়ে যেতে চাই রশ্মিবাবুদের প্রাসাদের দিকে তাহলে অন্তত গ্রাম থেকে সাহায্য যদিও নাও পাই তবু পেছন থেকে কেউ আক্রমণ করবে না, আপাতত এতটুকু হলেই যথেষ্ট। তারপর এলো অবিস্মরণীয় সেই ঘটনা।

(চলবে)

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এদেশে

পিলাপিলি

ইউজিন আয়োনেস্কোর 'দি লেশন' নাটকটির একটি ভাবানুবাদ এবার সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার কাছে তুলে ধরব। কিন্তু তার আগে ইংলন্ডের সানডে অবজারভার পত্রিকার বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক কেনেথ টাইনানের এ্যাবসার্ড প্লেজ সম্বন্ধে কিছুটা মন্তব্য উদ্ধৃত করবো। টাইনান লিখেছেন (১৯৫৬-৫৭)ঃ

"ইওরোপের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটক রচয়িতারা যেন দুই দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়ে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন—এঁদের মধ্যে অল্প-স্বল্প কোল্ডওয়ারও চলেছে। একদল সম্পূর্ণ-ভাবে বামপন্থী—তাঁরা সমাজের গাঠনিক পরিবর্তন করে জনগণের জীবনধারার চেহারাটা পাল্টিয়ে দিতে চান, চান সমাজ থেকে শোষকশ্রেণীর অপসারণ, চান জনগণের সঙ্গে মিশতে। তাদের জাগিয়ে তুলতে, তাদের জীবনের দুঃখকষ্ট দারিদ্র্য দূর করতে। এঁদের নাটকে মানুষের সামাজিক এবং রাজনীতিক পরিবেশের একটা বিশেষ স্থান থাকে—এঁরা আশা-বাদী নাট্যকার। বিগত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর থেকে এই শ্রেণীর নাট্যকারদের প্রধান দুই নেতৃস্থানীয় লেখক হলেন সার্ত্রে এবং ব্রেশট।

"এঁদের বিরুদ্ধবাদী দল হলেন এ্যানারকিক্—এঁরা নৈরাশ্যবাদী। সমাজের গাঠনিক পরিবর্তন এবং জনগণের জীবনে তার প্রতিক্রিয়ায় এঁরা বিশ্বাসী নন্—রাজনীতিক পরিবেশের ওপরও এঁরা গুরুত্ব দিতে চান না। এ-জাতীয় লেখক concentrates on exploring individnal malaise in a world where communication between human beings has become (it contends) a virtual impossibility.

এঁদের নায়ক স্যামুয়েল বেকেট এবং ইউজিন আয়োনেস্কো। আয়োনেস্কো আবার সার্ত্রে এবং ব্রেশট সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, as a pair of ephemeral journalist."

ব্রেশটের 'সেজুয়ানের মহৎ নারী' অনুবাদ আমি বসুমতী সাপ্তাহিকে দিয়েছিলাম। আয়োনেস্কোর 'দি লেশন' নাটকটির অনুবাদ পড়ে পাঠকরা নিজেরা ব্রেশট এবং আয়োনে-স্কোর তুলনামূলক সমালোচনা করে বুঝতে পারবেন কোন্ শ্রেণীর নাট্যকারেরা আসলে ephemeral! আমার নিজের তো মনে হয় এ্যাবসার্ড নাটকগুলো এক-মাত্র উপভোগ করতে পারেন যে কোন দেশের সফিশ্টিকেটেড ইন্টেলিজেন্টশিয়া।

আর একটা কথা—সাঙ্কেতিক নাটকের মত এ্যাবসার্ড নাটকেও দুটি অর্থ দেবার প্রচেষ্টা করা হয়। এর একটি হল সাধারণ অর্থ—অর্থাৎ যা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, অন্যটি গুপ্ত অর্থ—অর্থাৎ যা অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের মানসপটে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। প্রথমটির নাম বাচ্যার্থ দ্বিতীয়টি প্রতীয়মান অর্থ অভিধাশক্তির দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তারই নাম মুখ্যার্থ। আর ব্যঞ্জনাশক্তির মাধ্যমে যে প্রতীয়মান অর্থকে লাভ করা যায় তাই হল ব্যঙ্গার্থ।

সাঙ্কেতিক নাটকে মুখ্যার্থের দিকটাও যুক্তি দ্বারা রচিত—আর প্রতীয়-মান অর্থের দিকটা তো অত্যন্ত গভীর এবং জমাট। এ্যাবসার্ড নাটকে মুখ্যার্থ বলে যদি কিছু থাকেও—তার মূলে যুক্তি বলে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। আর ব্যঙ্গার্থও মনে তেমন কোন গভীর রেখাপাত করতে পারে না।

ব্রেশট ডায়লগের সময় (১৯৬৮ সালে) পূর্ব বার্লিনে একজন নাট্য-সমালোচক আমাকে বলেছিলেন ক্ষয়িষ্ণু সমাজ থেকেই এ্যাবসার্ড প্লে-রাইটসদের জন্ম। যে দেশে এঁদের দল-পাকাতে দেওয়া হবে, সে দেশে অল্প সময়ের ভেতরই জনজীবন থেকে প্রাণবন্ত বলিষ্ঠতা অন্তর্হিত হবে।

ইউজিন আয়োনেস্কোর

দি লেশ্‌ন্

চরিত্রলিপি ঃ

অধ্যাপকঃ বয়স পঞ্চাশ এবং ষাটের মধ্যে।

ছাত্রীঃ বয়স আঠারো বছর।

পরিচারিকাঃ বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের ভেতর।

প্যারীতে ১৯৫১ খৃস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী প্রথম তেয়াত্র দ্যু পশে প্রোডিউসড্ হয়।

লন্ডনে ১৯৫৫ খৃস্টাব্দের ৯ই মার্চ প্রথম আর্টস থিয়েটারে পিটার হল কর্তৃক প্রোডিউসড্ হয়।

দৃশ্যঃ বৃদ্ধ অধ্যাপকের স্টাডি রুম—এই ঘরটিই আবার তাঁর ডাইনিং রুম। স্টেজের বাঁদিকে ভেতরে যাবার সিঁড়ি। পেছনে, ডানদিকে আর একটি দরজা—সেখান দিয়ে করিডরে যাওয়া যায়।

পেছনে, কিছুটা বাঁদিক ঘেঁষে একটা জানালা—তাতে সাধারণ পর্দা টাঙানো, জানালার বাইরের চৌকাঠে ছোট ছোট ফুলের টব।

দূরে কতকগুলো ছোট ছোট বাড়ির লাল রঙের ছাদ দেখা যাচ্ছে—দেখা যাচ্ছে—ছোট শহরের কিছুটা। আকাশের রঙ নীলচে ধরণের ধূসর। ডানদিকে একটি সাধারণ ড্রেসার। ঘরের মাঝখানে টেবিল—তার

তিনদিকে 'চেয়ার—বইভর্তি' কয়েকটি শেলফ্।

[কার্টেন উঠলে অল্প সময়ের জন্য স্টেজ খালি থাকবে—বাইরের দরজায় ঘণ্টাধ্বনি হবে। মঞ্চের বাইরে থেকে পরিচারিকার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।]

কণ্ঠস্বরঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি শুনতে পেয়েছি।

[বোঝা যাবে সে দৌড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। এবার সে স্টেজে ঢুকবে। ভাল স্বাস্থ্য, মুখে লালচে আভা, মাথায় চাষীদের টুপি। দম্‌কা হাওয়ার মত সে ডানদিকের দরজা দিয়ে ঢুকবে—আওয়াজ করে দরজা বন্ধ করবে, এ্যাপ্রনে হাত মুছতে থাকবে—আবার ঘণ্টাধ্বনি শুনে দৌড়িয়ে বাঁদিকের দরজার দিকে যাবে।]

পরিচারিকা—হয়েছে, হয়েছে, আমি আসছি।

[দরজা খুলবে। ছাত্রী ঢুকবে—পরনে ধূসর রঙের এ্যাপ্রন, গলায় ছোট সাদা কলার, হাতে ব্রীফ্ কেস্।]

পরিচারিকা—গুড্ মর্নিং, ম্যাদ্‌মোয়াজেল।

ছাত্রী—গুড্ মর্নিং। অধ্যাপক বাড়িতে আছেন?

পরিচারিকা—আপনি কি পড়তে এসেছেন?

ছাত্রী—ঠিক ধরেছ।

পরিচারিকা—উনি আপনার জন্যই বসে আছেন। বসুন, আমি ও'কে গিয়ে বলছি।

ছাত্রী—ধন্যবাদ।

[টেবিলের কাছে—দর্শকদের মুখোমুখি হয়ে বসবে। তার পেছনের ডানদিকের দরজা দিয়ে যেতে যেতে পরিচারিকা গলা উঠিয়ে বলবে—]

পরিচারিকা—অধ্যাপক নিচে নেমে আসুন। আপনার ছাত্রী এসে গেছেন।

[অধ্যাপকের তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর শোনা যাবেঃ]

কণ্ঠস্বরঃ ধন্যবাদ, আমি আসছি......দু' মিনিটের ভেতর আসছি.....

[পরিচারিকা চলে গেছে। ছাত্রীটি ভাল মেয়ের মত বসে থাকবে—তার জানুর ওপর ব্রীফ্ কেস্‌টা থাকবে। দু'একবার সারা ঘর, ফার্নিচার এবং সিলিং-এর ওপর চোখ বুলিয়ে নেবে। ব্রীফ্ কেস্ থেকে একটা নোটবই বের করে পাতা ওল্টাতে থাকবে—একটা পাতার ওপর কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবে। মনে হবে সে যেন নোট্‌স থেকে শেষবারের মত তার লেশন্‌টা তৈরি করে নিচ্ছে। ছাত্রীটিকে দেখলে মনে হয় সে বেশ নম্র, ভালভাবে লালিত-পালিত, প্রাণবন্ত, চঞ্চল এবং আনন্দোচ্ছল ধরণের—মুখে মধুর হাসি। নাটকের গতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সব বিষয়ে তার প্রাণবন্ততা কমে আসবে—সে যেন মুষড়ে যেতে থাকবে। আনন্দ এবং উজ্জ্বলতার জায়গায় এসে দেখা দেবে হতাশা এবং বিষণ্ণতার ভাব। শুরুতে সে থাকবে প্রাণবেগে উদ্দীপ্ত—কিন্তু ক্রমশ যেন বেশি ক্লান্ত এবং নিদ্রালু হয়ে পড়বে। নাটকের শেষের দিকে তার মুখভাব দেখে বোঝা যাবে সে স্নায়ুদৌর্বল্যে ভুগছে। এ ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে তার কথা বলার ভঙ্গিতে, তার জিভ্ যেন মোটা হয়ে উঠবে, অনেক কষ্টে তার মনের পর্দায় কথা ভেসে উঠবে—সে কথাকে ব্যক্ত করতে যেন যন্ত্রণায় তার জিভ জড়িয়ে আসবেঃ তাকে দেখে মনে হবে সে যেন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে—মাথার ব্যায়রামের ফলে তার বাক্‌শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। শুরুতে সে ছিল সম্পূর্ণ স্বমতাবলম্বী এবং স্বেচ্ছাচারী, ক্রমে ক্রমে অধ্যাপকের হাতে পড়ে সে হয়ে পড়বে নিষ্ক্রিয়, প্রাণহীন বস্তুর মত, জড়, নিস্তেজ। এর ফলে অধ্যাপকের সর্বশেষ অঙ্গভঙ্গির সময় ছাত্রীর ভেতর কোন রি-এ্যাকশন দেখা যাবে না। মননশক্তি রহিত হবার ফলে তার ভেতর প্রতিরতী ক্রিয়ারও (রিফ্লেক্সেস্) পরিস্ফুটন হবে না। ভাবভঙ্গিহীন মুখাকৃতি থেকে শুধু তার চোখ দুটিতে ফুটে উঠবে অবর্ণনীয় মানসিক আঘাতপ্রাপ্তি এবং নিদারুণ ভীতির ভাব। তার ভেতরের এই পরিবর্তনটা অভিনয়ের সময় অন্যের অলক্ষ্যে অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঘটবে।

অধ্যাপক ঢুকবেন। ছোটখাট বৃদ্ধ—সাদা ছুঁচোলো দাড়ি। চোখে 'পেঁসনে', মাথায় কালো ক্যাপ, পরনে স্কুলমাস্টারের লম্বা কালো গাউন, কালো ট্রাউজারস্, কালো সু, গলায় সাদা শক্ত কলার এবং কালো টাই। অত্যন্ত বিনীত ধরণের, বেশ লাজুক, অতিনম্রতার জন্য কণ্ঠস্বরও মৃদু, সব বিষয়েই নির্ভুল, অধ্যাপনা ছাড়া জীবনে আর কিছু জানেন না। অধ্যাপক ক্রমাগত হাতের পাতাগুলো ঘষতে থাকবেন। মাঝে মাঝে দৃষ্টিভঙ্গিতে অস্থিরতা এবং কামনা-পীড়িতের ভাব ফুটে উঠবে—সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভাবটা ঝেড়ে ফেলবেন—তারপরেই চোখ দুটি জ্বলজ্বল করতে থাকবে। নাটকের গতির সঙ্গে তার বিনম্র ভাবটা ধীরে ধীরে এবং দর্শকদের অলক্ষ্যে মিলিয়ে যাবে; ক্রমে তার চোখ দুটি ধিকি-ধিকি করে জ্বলতে জ্বলতে কামনার আগুনে ছাত্রীটিকে যেন গ্রাস করে ফেলতে চাইবেঃ যিনি প্রথমটায় ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিরোধী, সেই অধ্যাপকই পরে উত্তেজিত, আক্রমণে উদ্যত, ছাত্রীকে সম্পূর্ণ নিজের করতলগত করবার জন্য নরপিশাচে পরিণত হবেন।]

অধ্যাপক—গুড্ মর্নিং, গুড্ মর্নিং...... তুমি বোধ হয়......এর্......আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয়......এর্...... নতুন ছাত্রী?

ছাত্রী—[বেশ সহজ এবং প্রাণবন্তভাবে ঘুরে বসবে—দেখেই বোঝা যাবে সে যৌবনমদে মত্তা; উঠে দাঁড়িয়ে অধ্যাপকের দিকে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে দেবে।] হ্যাঁ, স্যার। গুড্ মর্নিং, স্যার। আমি ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়েছি—দেরি করি নি।

অধ্যাপক—খুবই ভাল করেছ। ধন্যবাদ, কিন্তু তাড়াহুড়ো না করলেই পারতে, বুঝলে। তোমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখবার জন্য কিভাবে ক্ষমা চাইব বুঝতে পারছি না......আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম—বুঝলে, ঠিক প্রস্তুত হচ্ছি......এর্......তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি......আশা করি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে......

ছাত্রী—ওকথা বলবেন না স্যার। আপনার কোন অপরাধ হয় নি স্যার।

অধ্যাপক—আমার দোষ স্বীকার করছি...... বাড়ি খুঁজে পেতে তোমার অসুবিধা হয় নি তো?

ছাত্রী—একটুও না......তাছাড়া আমি এখানে খোঁজ করে নিয়েছিলাম। এ জায়গার সবাই আপনাকে জানে।

অধ্যাপক—তা বটে। এ শহরে আমি তিরিশ বছর ধরে আছি। তুমি বোধ হয় বেশিদিন এখানে আস নি? কেমন লাগে এ জায়গাটা?

ছাত্রী—তা মন্দ নয়। শহরটি ভালই, বেশ সুন্দর, পার্কটা বেশ চমৎকার, মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলটা, একজন বিশপ আছেন, চমৎকার কয়েকটা দোকান আছে, রাস্তাঘাটও সুন্দর......

অধ্যাপক—ঠিক বলেছ......খুব খাঁটি কথা বলেছ। কিন্তু তবুও কি জান, আমি পারলে অন্য কোনও শহরে থাকতাম। যেমন ধর পারী, বা বোর্দোয়া।

ছাত্রী—আপনি কি স্যার বোর্দোয়া জায়গাটা পছন্দ করেন?

অধ্যাপক—ঠিক বলতে পারি না। আসল কথা—জানি না।

ছাত্রী—পারী সম্বন্ধে জানেন তো?

অধ্যাপক—বোর্দোয়ার মত......এর্...... ও-জায়গাটার বিষয়েও কোন জ্ঞান নেই। সে যাই হোক, বল দেখি পারী হচ্ছে প্রধান শহর......কোন দেশের...... এর......?

ছাত্রী—পারী হচ্ছে প্রধান শহর...... ফ্রান্সের?

অধ্যাপক—ঠিক বলেছ। ব্রেভো! চমৎকার! ভারি সুন্দর উত্তর দিয়েছ! আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। নিজের দেশের ভৌগোলিক জ্ঞান আঙুলের ডগায় ডগায় ঘুরছে। আর সব প্রধান শহরগুলোর নাম কর দেখি।

ছাত্রী—[illegible] নামগুলো জন্য [illegible] উচ্চারণ করতে পারি নি স্যার। লেখাটা খুব সহজও নয়, বেশ শক্ত।

অধ্যাপক—আস্তে আস্তে হয়ে যাবে...... নিরাশ হয়ো না......শোন......অর্থাৎ বলায়......সামান্য ধৈর্য থাকলে...... ধীরে ধীরে সব হয়ে যায়......নিজেই দেখবে হয়ে যাবে......মনোমুগ্ধকর আবহাওয়া হয়েছে আজকাল......যা বলছিলাম, অবশ্য না-ও হতে পারে... এর্......কিন্তু কেনই বা হবে না? যাই হোক ধৈর্য ধরাটা তো খারাপ কাজ নয়......আর সেটাই বড় কথা...... এর্......এর্......বৃষ্টি তো পড়ছে না......এমন কি তুষারপাতও হচ্ছে না।

ছাত্রী—গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি বা তুষারপাত হলেই আশ্চর্য হতাম।

অধ্যাপক—ক্ষমা কর ম্যাদমোয়াজেল, আমিও ঠিক তাই বলতে যাচ্ছিলাম... কিন্তু ক্রমশ তুমি বুঝতে শিখবে প্রত্যেক অবস্থার জন্যই আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার।

ছাত্রী—হ্যাঁ, স্যার। সেটাই তো স্বাভাবিক।

অধ্যাপক—ম্যাদমোয়াজেল, আমাদের এই পৃথিবীতে কেউ কোন বিষয়েই নিশ্চিত হতে পারে না।

ছাত্রী—শীতকালে তুষারপাত হয়। উইন্টার হচ্ছে চারটি ঋতুর ভেতর একটি। অন্য তিনটি হচ্ছে......এর্......স্প্রি...

অধ্যাপক—ঠিকই বলছিলে!

ছাত্রী—স্প্রিং......তারপর সামার এবং... এর্......

অধ্যাপক—বলো, বলো—আরম্ভটা অটো-মোবিলের মত।

ছাত্রী—হ্যাঁ, হ্যাঁ! অটাম্......

অধ্যাপক—ঠিক হয়েছে। ভাল উত্তর দিয়েছ। সত্যিই চমৎকার। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি তুমি খুব ভাল ছাত্রী হবে। উত্তরোত্তর তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। তুমি বুদ্ধিমতী, চারদিকের সব খোঁজ-খবর রাখ, আর স্মৃতিশক্তি আছে।

ছাত্রী—ঋতুগুলো সম্পর্কে আমি সব জানি, কি বলেন স্যার?

অধ্যাপক—তা জান বৈকি! ......প্রায় সব-কিছুই জান। সময়ে আরও জানবে। এখনও কিছু খারাপ জান বলছি না। তবে এমন একদিন আসবে যখন সব জেনে ফেলবে—ঋতুগুলো সম্বন্ধে—চোখ বুজে সব বলে দিতে পারবে—আমার মত।

ছাত্রী—সেটা খুবই শক্ত হবে।

অধ্যাপক—মোটেই না—একটু খাটতে হবে। মনে একটু সদিচ্ছা থাকলেই হল। তুমি নিজেই দেখবে কেমন সহজে সব শিখে ফেলছ—আমি এ বিষয় তোমাকে প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিতে পারি।

ছাত্রী—হলেই ভাল স্যার। আমার জ্ঞান অর্জন করবার অদম্য স্পৃহা আছে। আমার মা-বাবাও খুব চান যে আমি পড়াশুনো চালিয়ে যাই—তাঁদের ইচ্ছা আমি কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হই। তাঁদের বিশ্বাস আজকালকার দিনে অল্প সাধারণ-শিক্ষা নিয়ে বেশিদূর এগোনো যায় না।

অধ্যাপক—তোমার মা-বাবার ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভুল। নিশ্চয় পড়াশুনো চালিয়ে যাবে—এটাই সব থেকে বেশি দরকার। আজকের দিনের জীবন ভয়াবহরূপে জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছাত্রী—যা বলেছেন। সবকিছুই যেন গোলমেলে হয়ে গেছে। আমার ভাগ্য ভাল যে আমার মা-বাবা দরিদ্র নন। আমাকে সাহায্য করবার ক্ষমতা তাঁদের আছে—সুতরাং বড় বড় ডিগ্রী পরীক্ষা দেবার আমার অসুবিধা নেই।

অধ্যাপক—তোমার কি ইন্টারভিউ দেবার জন্য আবেদন করবার ইচ্ছে আছে......

ছাত্রী—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য আমি কাজ শুরু করতে চাই—তিন সপ্তাহের ভেতরই বোধহয় করতে পারবো।

অধ্যাপক—তোমার অবশ্যই স্কুল লীভিং সার্টিফিকেট আছে?

ছাত্রী—হ্যাঁ স্যার। আর্টস, সায়েন্স দুই বিষয়েই।

অধ্যাপক—দেখছি বয়স অনুসারে বেশ ভালভাবেই তুমি নিজেকে গড়ে তুলেছ। কোন্ বিষয়ে ডক্টরেট হবার জন্য পড়াশুনা করতে চাও? মেটি-রিয়াল সায়েন্স না নর্মাল ফিলসফি?

ছাত্রী—আমার মা-বাবার ইচ্ছা আমি সব-গুলো ডক্টরেট সম্বন্ধে পড়াশুনা করি—অবশ্য আপনি যদি মনে করেন এত অল্প সময়ে সেটা সম্ভব।

অধ্যাপক—সব ডক্টরেট সম্পর্কেই পড়তে চাও?......তুমি খুবই সাহসী মেয়ে। আমি তোমাকে আমার আন্তরিক সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। বেশ আমরা চেষ্টা করবো—তোমাকে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবো। [illegible] এখনই—এই অল্প বয়সেই—তুমি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছ।

ছাত্রী—আপনার কৃপায়......

অধ্যাপক—বেশ, বেশ, সবই তো একরকম ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের সময় নষ্ট করবার মত সময় হাতে নেই। এখন বোঝহয় আমাদের কাজ শুরু করা দরকার।

ছাত্রী—আমি সেজন্যই উদ্গ্রীব হয়ে আছি।

অধ্যাপক—তাহলে দয়া করে ঐ চেয়ারটায় বস......ঐ যে ঐখানে যে চেয়ারটা আছে......যদি তোমার আপত্তি না থাকে ম্যাদমোয়াজেল তাহলে তোমার উল্টো দিকের এই চেয়ারটায় আমি বসবো।

ছাত্রী—নিশ্চয় স্যার। অবশ্যই বসবেন বৈকি!

অধ্যাপক—ধন্যবাদ ম্যাদমোয়াজেল।

[টেবিলের বিপরীত দুটি চেয়ারে বসলেন অধ্যাপক এবং ছাত্রী—দর্শকদের দিক থেকে তাঁদের প্রোফাইল দেখা যাবে।]

অধ্যাপক—তোমার পাঠ্যপুস্তক এবং নোট বই সঙ্গে করে এনেছ তো?

(ছাত্রী ওগুলো ব্রীফ কেস থেকে বের করে—)

ছাত্রী—হ্যাঁ, স্যার। এনেছি বৈকি স্যার। যা দরকার সবই আমি এনেছি।

অধ্যাপক—চমৎকার। সত্যিই চমৎকার ম্যাদমোয়াজেল। তাহলে, তোমার আপত্তি না থাকলে......আমরা...... শুরু করতে পারি?

ছাত্রী—হ্যাঁ, স্যার। আমি আপনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছি।

অধ্যাপক—আমার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছ? (চোখ চিকচিক করে উঠল। এই ভাবটা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে—) আমিই তোমার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি ম্যাদমোয়াজেল, তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি বল।

ছাত্রী—আজ্ঞে......সত্যি......স্যার......

অধ্যাপক—বেশ, বেশ, তাহলে, তুমি যদি এর্......আমরা অর্থাৎ আমি...... তুমি যা শিখেছ সে বিষয়ে একটা ছোট্ট পরীক্ষা দিয়ে শুরু করলে, এবং তা থেকেই আমার ধারণা হবে কিভাবে আমরা কাজ করবো......বেশ, বেশ। "ঋতুরা" সম্বন্ধে তোমার উপলব্ধি কি ধরণের?

ছাত্রী—একটু অস্পষ্ট...এবং গোলমেলে।

অধ্যাপক—চমৎকার। আচ্ছা, ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা যাবে। [ক্রমশ]

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন
অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০,। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। তেজ

স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-স্যাপ ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।
Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

রংঢং

দিশেহারা "ইয়ং"

নভেম্বর মাসে কলকাতায় 'ইয়ং জার্মান' ছবির এক উৎসব হয়ে গেছে। পশ্চিম জার্মানীর তরুণ পরিচালকরা তাঁদের ছবিকে চিহ্নিত করেছেন 'ইয়ং জার্মান' নামে। ছবিগুলি যাঁরা দেখেছেন তাঁদের একাংশ দর্শক নিশ্চয়ই এই ছবির তাৎপর্যটি ধরতে পেরেছেন। ধরতে যে পেরেছেন তা বোঝা গেছে হলের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের বাকি দিনগুলোর টিকেট বিক্রি করে দেওয়া দেখে। অনেকে সপরিবারে দেখার জন্য টিকেট কিনেছিলেন। দু'একটা ছবি দেখার পর ভাই বা বোনস্থানীয় কাউকে পাশে রেখে দেখার মত মনের অবস্থা কারো ছিল না। অনেকে প্রশ্ন করেছেন 'ব্লু ফিল্ম' নামে নিষিদ্ধ ছবিগুলি এর চেয়ে খারাপ কি কারণে? সেরকম ছবি নিয়ে একটা উৎসব করলে হয় না? তাতে সদস্যসংখ্যা আরো বাড়তে পারে। কারণ দেশে নিম্নরুচির মানুষের অভাব নেই।

এই 'ইয়ং জার্মান' ছবিগুলি দেখাবার জন্য ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটির নাকি বেশ কয়েক হাজার টাকা হাতে থেকে যাবে। আরো শোনা গেছিল পশ্চিম জার্মান দূতাবাস সম্পূর্ণ ব্যয় নিজেরা বহন করবে বলে প্রস্তাব দিয়েছিল এবং তাঁদের আগ্রহও ছিল বেশি। সেটা স্বাভাবিক, নিজের দেশের জিনিষকে দেখাতে সকলেই আগ্রহী থাকে। ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটির প্রেসিডেন্ট শ্রীসত্যজিৎ রায়। তিনি এই উৎসব উদ্বোধন করেছেন। 'ইয়ং জার্মান' ছবির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তাঁর বক্তৃতায়। আমার জানা নেই বক্তৃতার আগে তিনি ছবিগুলি দেখেছিলেন কি না। দেখা স্বাভাবিক! কারণ বার্লিনে তাঁর যাতায়াত আছে। একটা কথা ফিল্ম সোসাইটি মহলে শোনা যায়; কথাটা নেহাৎ রটনা হতে পারে। ফিল্ম সোসাইটির ছবি সেন্সর করার ব্যাপারে তাঁর ওপর নাকি দায়িত্ব রয়েছে। তিনি নাকি পূর্ব জার্মান আর সোভিয়েট ছবির ছাড়পত্রের ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গি দেখান, পশ্চিম জার্মানীর ব্যাপারে সে তুলনায় একটু বেশি উদার। সম্ভবত এই উদারতার দরুণ পশ্চিম জার্মানীর 'ইয়ং' চিহ্নিত ছবিগুলি নিয়ে দশ-এগারটি ফিল্ম সোসাইটি এই উৎসবে মত্ত হয়েছিল।

'ইয়ং' কথাটার মধ্যে তরুণ তাজা প্রাণের সম্পর্ক রয়েছে; কথাটা প্রচলিত রীতি-নীতিকে অতিক্রম করে যাবার প্রতীক। কিন্তু সাতটি 'ইয়ং' জার্মান ছবির মধ্যে 'ওয়াইল্ড রাইডার' ও 'সাইন অব লাইফ' ছাড়া অন্য ছবিগুলি ঘটা করে দেখাবার কোন সার্থকতা ছিল বলে মনে হয় না। যদিও ছবিগুলিতে যুবকদের অস্থিরতা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে কিন্তু যৌনতার আবেগই যেন মুখ্য হয়ে উঠেছে। শেষ দিনের ছবিটিতে অকারণে বাথটাবের মধ্যে নগ্ন নারীকে শয়ন অবস্থায় দেখাবার এবং নগ্ন পুরুষকে বাথটাবের মধ্যে যাবার দৃশ্যটি দেখাবার কি যে সার্থকতা ছিল বোঝা গেল না। ছবির ফ্রেমিংয়ের দিকটা অত্যন্ত কুৎসিত। গ্রাফিক শিল্পের তাৎপর্য যদি সৃষ্টি করতে পারত তা হলেও একটা কথা ছিল। এই কি 'ইয়ং' কথাটার তাৎপর্য? না, পশ্চিম জার্মানীর তরুণেরা যারা অস্থিরতায় ভুগছে এবং যে তরুণ পরিচালকরা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চায় তাদের সৃষ্টির আবেগকে যৌনতার পথে পরিচালিত করে মনের আগুনকে নিভিয়ে দেবার ব্যবস্থা? ইওরোপ আমেরিকায় শিল্প ও সাহিত্যে নতুনত্বের নামে অপসংস্কৃতির এক বিকার চলেছে। এই বিকৃত সংস্কৃতি প্রচারে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উৎসাহ বড় বেশি। আমাদের দেশেও প্রতিক্রিয়াশীলরা এ সব ছবি আর সাহিত্য নিয়ে মেতে উঠেছে।

ফিল্ম সোসাইটিগুলি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল জানতাম। উন্নত রুচির দর্শক সৃষ্টি এবং দেশে ভাল ছবি নির্মাণ এবং ছবিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার ব্যাপারে ফিল্ম সোসাইটির ভূমিকা থাকে। কিন্তু ফিল্ম ক্লাব, সোসাইটি ইত্যাদির নামে অনেক সোসাইটির জন্ম হলেও আদর্শগত উন্নতি যে তেমন এগোয় নি, তার প্রমাণ এই 'ইয়ং' জার্মান ছবি দেখাবার জন্য তাঁদের অতি উৎসাহ। সময় থাকতে ফিল্ম সোসাইটিগুলির সাবধান হওয়া ভাল। —সুজন

সমর চৌধুরী পরিচালিত 'নন্দ ডাকাত' বাংলা ছবিতে দেখা যাবে চাঁদ ওসমানিকে।

নাটকের কথা

গর্কির 'মা'

ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ডাইরেক্টরেট রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে গত ২৫শে নভেম্বর স্টার মঞ্চে ম্যাক্সিম গর্কির 'মা' অভিনীত হয়েছে। এই নাটক অভিনয় হয়েছে ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ শ্রী এম· এ· এইচ্ মাসুদ। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পরিবহনমন্ত্রী মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রীসুকোমল সেন।

এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র পেয়ে

যথেষ্ট কৌতূহল বোধ করেছিলাম। বাৎসরিক অনুষ্ঠানে যখন আই· জি· শ্রীমাসুদ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন এবং দর্শকদের মধ্যে যখন পদস্থ পুলিশ অফিসাররা বসেছিলেন তখন আমার মনে পড়ছিল অনেক বছর আগের একটি চিত্র। ত্রিশ দশকের কথা। বহরমপুরে বন্দীশিবিরে কয়েক শ' বিপ্লবী বন্দী রয়েছেন। পাঠান সিপাহীদের নিয়ে ক্যাম্পের কমাণ্ডেণ্ট এবং ডেপুটি কমাণ্ডেণ্ট প্রতি মাসে একবার করে বন্দীদের সেলগুলি এবং চারপাশের জায়গা তল্লাসী করে। এরকম এক নিয়মমাফিক তল্লাসীর সময় এক হাবিলদার মেজর পেয়ে গেলেন ম্যাক্সিম গর্কির 'মা'। তিনি চিৎকার করে বললেন 'মাদার—ম্যাক্সিমাম গর্কি'। ম্যাক্সিমকে 'ম্যাক্সিমাম' বলার সঙ্গে সঙ্গে বন্দীরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। ডেপুটি কমাণ্ডেট গিরিজা দত্ত (অভিনেতা উৎপল দত্তের বাবা) ছুটে এসে ছোঁ মেরে নেবার মত বইটি নিয়ে নিলেন। যাঁর টেবিলে বইটি

ওয়েস্টবেঙ্গল পুলিশ ডিরেক্টরেট এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যগণ অভিনীত গর্কির 'মা' নাটকের একটি দৃশ্য।

পশ্চিম জার্মানীর চলচ্চিত্র অভিনেত্রী আন্দ্রে রো

পাওয়া গেছিল 'মাদার' রাখার জন্য তাঁকে শাস্তিভোগ করতে হয়েছিল। গর্কির 'মাদার' সরকারিভাবে নিষিদ্ধ না হলেও সে সময় নিষিদ্ধ বইয়ের মত গণ্য হত। কারণ গোয়েন্দা বিভাগের খবর ছিল বিপ্লবীরা 'মা' পড়িয়ে ছেলে-মেয়েদের রিক্রুট করেন।

আর আজ? সেই 'মাদার' অভিনয় করছেন পুলিশ ডাইরেক্টরেটের কর্মচারীরা। সেদিন একজন ডি· এস· পি র‍্যাঙ্কের আই· বি· অফিসার একজন বিপ্লবীকে শাস্তি দিয়েছিল 'মাদার' রাখার জন্য। আজ আই· জি· স্বয়ং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন, পদস্থ অফিসাররা সপরিবারে 'মা'-র নাট্যরূপের অভিনয় দেখছেন। ইংরেজ শাসনের পরেও বাইশ বছর কেটে গেছে কিন্তু সময়ের গতি ছিল বড় ধীর। ইংরেজের গন্ধ পুলিশের গা থেকে যেন ছাড়ছিল না। কিন্তু দু'-এক বছরের মধ্যে যেন একটা পরিবর্তনের হাওয়া এসেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে এই হাওয়া দ্রুত বইতে শুরু করেছে। সত্যিই সময় যে পাল্টে গেছে তার লক্ষণ পুলিশ ডাইরেক্টরেটের কর্মীদের 'মা' অভিনয়।

পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত 'মাদার'-কে নাট্যরূপ দিয়েছেন ছয়জন নাট্যকার। সারা বছর এই ছয়টি নাটক শহরে ও গ্রামে অভিনয় হচ্ছে। গর্কি জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে অসংখ্য রজনী 'মা'-র অভিনয় হয়েছে। গর্কির নাট্যরূপদাতাদের মধ্যে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। পুলিশ ডাইরেক্টরেট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যরূপটি অভিনয় করেছেন। অভিনয় সম্পর্কে

বিস্তারিত আলোচনা করছি না, কারণ দিপিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ যথার্থ সার্থক নয়। অভিনেতারা সকলেই নিতান্ত সখের অভিনেতা। সুতরাং তাঁদের কাছে আমরা বেশি কি আর আশা করতে পারি। তা সত্ত্বেও অনেকেই প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। অবশ্য পরিচালনা যথার্থ হলে আরো কৃতিত্ব আশা করা যেত। নাটকের দৃশ্য রচনার ব্যাপারে আরও সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। পুরুষ-চরিত্রের তুলনায় স্ত্রী-ভূমিকাগুলিতে আরো বেশি আশা করা যেত। কারণ একজন অফিসকর্মী ছাড়া বাকি তিনজনই পেশাদার অভিনেত্রী। অথচ এই তিনজনই অফিসকর্মী নৃপেন্দ্র চ্যাটার্জীর তুলনায় আশানুরূপ অভিনয় করেন নি। মা'র ভূমিকায় চিত্রিতা মণ্ডল—মা চরিত্রের মাধ্যমে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও তার বিপ্লবী তাৎপর্য ধরতে পারেন নি। এই চরিত্রে বাংলা দেশে প্রথম রূপদান করেছিলেন মলিনা দেবী। তাঁর অভিনয় আজো আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। সে স্মৃতি মনে হলে চিত্রিতা মণ্ডলের মা অনেক দুর্বল হয়েছে। মারিয়া চরিত্রে দীপালি ঘোষ একেবারে ব্যর্থ। এই চরিত্রের জন্য তাঁকে নির্বাচন করা ঠিক হয় নি। মজুরে বউয়ের চরিত্রটি দীপালি দাস একরকম গ্রহণযোগ্য করেছেন। সর্বাধিক প্রশংসার দাবি রাখেন সাশার চরিত্রে নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'মাদার'-এর মূল ধ্বনি এবং সাশার বিপ্লবী প্রত্যয় তাঁর অভিনয়ে ফুটে উঠেছে। নাটকে সঙ্গীতের কাজ প্রশংসনীয়। নাটকটি সমাগত দর্শকরা উৎসাহ নিয়ে উপভোগ করেছেন। আমরা উদ্যোক্তাদের ও নাটকে অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানাই।

স্টুডিও খবর

ফাঁকি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'ফাঁকি'র চিত্ররূপ দেবেন পরিচালক সাংবাদিক রূপু চক্রবর্তী। চিত্রনাট্য রচনা করবেন পরিচালক নিজেই। সম্পূর্ণ আউটডোরে তোলা এ ছবির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় থাকবেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও অরবিন্দ সেন। সুরকার বিলায়েত হুসেন খাঁর সুরে কণ্ঠদান করবেন কিশোরকুমার (রবীন্দ্রসংগীত)।

পশ্চিম জার্মানীর টেলিভিশনে শিশু বিভাগে আট বছরের ছেলে অ্যাক্সেল কর্ন বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। অপর আকর্ষণ হচ্ছে 'ভেরিও সেন্টার'। এই তেকোণা জিনিসটিতে আছে একটি রঙিন টি-ভি সেট, একটি রেডিও ও একটি টেপ রেকর্ডার আর মাথায় বসানো আছে ফনোগ্রাফ।

কয়েকজন নবাগত শিল্পীদের নিয়ে এ ছবির কাজ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বিলাসপুর আউটডোরে শুরু হবে।

রবি ফিল্ম-এর সুরিন্দর সিং ও বীরেন্দ্র বর্মা ছবিটির প্রযোজনা করবেন।

সংবাদ কণা

কলকাতায় লেনিনগ্রাদ অপেরা ও ব্যালে দল

রেংগুন থেকে ৩২ জন সদস্যের একটি সোভিয়েট ব্যালে দল কলকাতা এসে পৌঁচেছে। লেনিনগ্রাদের মালি অকাদেমি অপেরা ও ব্যালে থিয়েটার এসেম্বল নামে এরা পরিচিত। ভারত সরকার ও সোভিয়েট সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী অনুযায়ী এই সফরের ব্যবস্থা হয়েছে।

এই দলের নেতৃত্ব করছেন উক্ত থিয়েটারের প্রধান নৃত্য-রচয়িতা আই· ভি· বেল্‌স্কী। এই দলে ২৩ জন নারী ও ৯ জন পুরুষ শিল্পী রয়েছেন। পশ্চিমবংগ সরকারের কর্মকর্তাগণ ও পশ্চিমবংগ সরকারের লোকরঞ্জনী শাখার শিল্পিগণ এবং কলকাতার সোভিয়েট দূতস্থানের সাংস্কৃতিক শাখার প্রধান ভাইস কনসাল এ· এস· পারাস্তায়েভ সোভিয়েট শিল্পী দলকে দমদম বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান।

এই শহরে এক সপ্তাহকাল অবস্থানের সময় লেনিনগ্রাদ ব্যালে এসেম্বল ২৯ নভেম্বর থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সদনে ৪টি অনুষ্ঠান করবেন। চাইকভ্‌স্কী ভার্তুনি, লিয়াদেভ, শোপা, দাচাতুরিয়ান প্রমুখ সুরকারদের রচনা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকবে। পশ্চিমবংগ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের দ্বারা এই অনুষ্ঠানটি সংগঠিত। এই দলের সদস্যগণ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, উদয়শংকর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন। পশ্চিমবংগ সরকার ও পশ্চিমবংগের ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক সমিতি বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্বর্ধনা জানাবেন।

কলকাতা ছাড়াও এই লেনিনগ্রাদ ব্যালে দলটি মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, বোম্বাই ও দিল্লী যাবেন।

দলটি ৪ঠা ডিসেম্বর কলকাতা থেকে মাদ্রাজ যাবেন।

মালি অকাদেমিক অপেরা ও ব্যালে সম্পর্কে

লেনিনগ্রাদে ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মালি অপেরা ভবন এবং ১৯৩০-এর মধ্যে তা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। ১৯৩২ সালে এই অপেরার প্রথম ব্যালে দল গঠিত হয় ও বিশিষ্ট নৃত্যরচয়িতা

সংগীতশিল্পী ললিতা ধরচৌধুরী, সম্প্রতি দু'টি আধুনিক গান রেকর্ড করেছেন। 'আবীর রাঙানো' ছবিতে প্লে ব্যাক গেয়েছেন।

ফিওদোর লোপুখোভ তার ভার নেন। প্রথম যে ব্যালেটি মঞ্চস্থ হয় তা একটি কমেডি "হার্লেকুইনেড", দ্রিগোর সুরের সংগে এর নৃত্যরচিত হয়।

লোপুকোভের ধারার আরও বিকাশ ঘটে নৃত্য-রচয়িতা লিওনিদ এম· লাভ্রোভস্কির হাতে। ১৯৩৬ সালে তিনি প্রযোজনা করেন "ফাদেত্তা" ব্যালে। পরে বোরিস ফেন্তারের অধিনায়কত্বে মালি ব্যালে সম্প্রদায়ের আরও উন্নতি হয়। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যালেগুলির মধ্যে ছিল ১৯৪৬ সালে প্রদর্শিত "দি অ্যালেজড্ সুইটর" ও ১৯৪৯ সালে "ইয়ুথ" ব্যালে। সুরকার মিখাইল চুলকাই এতে সুর দেন। এই উভয় ব্যালেই রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করে।

১৯৫০ সালে মালি ব্যালে উন্নত মান ও মৌলিকত্বের গুণে বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করে। নৃত্যরচয়িতা ইগর বেলস্কির পরিচালনায় সম্প্রতিকালে মালি সম্প্রদায় অনেকগুলি প্রশংসনীয় ব্যালে প্রদর্শন করেন। এর মধ্যে আছে সুরকার শোসতাকোভিচের সুর-সম্বলিত "দি ইয়ং লেডি এ্যান্ড দি হুলিগান", প্রোকোফিয়েভের সুর-সম্বলিত "ক্লাসিক্যাল সিম্ফনি", শ্চেদ্রিনের সুর-সম্বলিত "হাঞ্চব্যাক হর্স" ও "দি থ্রি মাস্কেটিয়ার্স"।

১৯৬৪ সালে মালি ব্যালে দলের

৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উৎসব হয়। এ উপলক্ষে সোভিয়েট সরকারী মালি অপেরা ও ব্যালে দলকে অকাদেমিক থিয়েটারের সম্মানে ভূষিত করেন।

মুলাটো

রঙ্গশ্রী নাট্য সংস্থার আগামী নাটক মুলাটো। আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের নিগ্রো নারীর গর্ভে শ্বেতকায় ক্ষেত-মালিকদের ঔরসজাত মুলাটো অর্থাৎ বর্ণসংকর, নিগ্রো নর-নারীর দাস জীবন ও দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামের মর্মস্পর্শী কাহিনী নিয়ে রচিত নিগ্রো নাট্যকার ল্যাংস্টন হিউজেসের নাটক মুলাটো ব্রডওয়ে মঞ্চে ও পৃথিবীর অনেক দেশে বহু অভিনীত ও প্রভূত অভিনন্দিত হয়েছে। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এই নাটকের বঙ্গানুবাদ করেছেন রমেন লাহিড়ী। তাঁরই নির্দেশনায় মুলাটো নিয়মিত অভিনয় করতে উদ্যোগী হয়েছেন রঙ্গশ্রী নাট্য সংস্থা। মুখ্য নারী চরিত্রে কোরা'র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রেণু ঘোষ।

শ্রীচৈতন্য

প্রখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর সম্মানার্থে ভারতীয় শিল্পী-পরিষদের নৃত্যনাট্য 'শ্রীচৈতন্য' আগামী ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় মহাজাতি সদনে অভিনীত হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর।

'শর্মিলা' নাটকের দ্বিশততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব

আগামী ১৩ই ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় স্টার থিয়েটারে 'শর্মিলা' নাটকের দ্বিশততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র মহোদয় সভাপতি ও সুপরিচিতা কথা-শিল্পী শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী মহোদয়া প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন।

স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র মহাশয়, নাট্যকার-পরিচালক-শিল্পী ও মঞ্চের অন্যান্য কর্মীদের পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা করেছেন।

মুক্ত ইওরোপ

সোভিয়েট চিত্র নির্মাতারা এখন গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, গণতান্ত্রিক জার্মান, যুগোশ্লাভিয়া, ইটালি, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাংগেরি ও রুমানিয়ার কলা-কুশলীদের সহযোগিতায় "মুক্ত ইওরোপ" নামে এক বিরাট চলচ্চিত্র তোলার হাত দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ১৯৪৩-১৯৪৫-এর কালপর্যায় ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এই বিরাট চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে।

এই চলচ্চিত্রটির নির্মাতাদের প্রায় সকলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়েছিলেন। প্রধান পরিচালক ইউরি ওজেরভ ছিলেন একজন মেজর, চিত্রনাট্যকার ইউরি বোন্দারেভ ও ওস্কার কুরগানোভ, প্রধান আলোকচিত্রশিল্পী ইগর স্লাবনেভিচ ও অন্যান্যরা সকলেই সেনাবাহিনীতে ছিলেন।

বিশ্বযুদ্ধের বহুতর ঘটনা নিয়ে তোলা এই ছবির দৃশ্যাবলীও সারা পৃথিবী জুড়ে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইওরোপের ভাগ্য-নির্ধারণকারী সমস্ত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নেতার চরিত্র চিত্রনাট্যে থাকছে। সোভিয়েট সেনাবাহিনীর সমস্ত প্রধান সেনাধ্যক্ষ মার্শাল জুভব, রকোসোভস্কি, ভ্যাসিলেভস্কি—এঁদের চরিত্র রূপায়িত হবে। সোভিয়েট সেনানীমণ্ডলীর সর্বপ্রধান সেনাধ্যক্ষ জেনেরালিসিমো স্তালিনের ভূমিকায় রূপ দিচ্ছেন খ্যাতনামা জর্জীয় চরিত্রাভিনেতা সেগেই জাকারিয়াদজে।

বিখ্যাত অভিনেতা অরসন ওয়েলস রূপ দিচ্ছেন উইনস্টন চার্চিল ও পল স্কফিল্ড রূপ দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চরিত্রে।

হিটলারের ভূমিকায় গণতান্ত্রিক জার্মানির ফ্রিটজ কিয়েটজ ও মুসোলিনির ভূমিকায় ইটালির মঞ্চাভিনেতা ইভো গাররানি রূপ দিচ্ছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়েছিলেন এমন বহু উপদেষ্টা ছবিটি তোলায় সহযোগিতা করছেন।

লেনিন শতবার্ষিকীতে

সুধী দর্শকবৃন্দের অনুরোধে

সর্বহারার মুক্তি সংগ্রামের ভাবমূর্তি

অমর ঘোষ পরিচালিত

শম্ভু বাগ রচিত

"লেনিন"

নাম ভূমিকায় শান্তিগোপাল

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে ৫৫-৭১২১

৯ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬॥টায়

"হিটলার"

১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬॥টায়

খেলা ধুলা

অনিয়ম

দিল্লীর তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ শেষ হয়ে গেল। এবার কলকাতার পালা। আর মাত্র এক সপ্তাহ, তারপরই কলকাতায় আরম্ভ হবে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ। ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন উদ্যান আবার আনন্দ-হাসি-গানে মেতে উঠবে। জমজম করবে অঙ্গন-প্রাঙ্গণ। ক্রিকেটরসিকরা এখন তাই টিকিটের আশায় হত্যে দিয়ে ঘুরছেন। কিন্তু টিকিট জুটবে আর ক'জনের ভাগ্যে? ভাগ্যবানরা অনেক সাধ্যসাধনার পর হয়তো পাবেন মাঠে ঢোকার অধিকার। কিন্তু তার জন্যে তাঁদের যা কাঠ-খড় পোড়াতে হবে সে কথা বোধহয় উল্লেখ না করাই বাঞ্ছনীয়। ভুক্তভোগী মাত্রেরই সে অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু ইডেন উদ্যানে দর্শকদের এবার যে অভিজ্ঞতা হবে তা বোধহয় কল্পনাও করা যায় না। সত্যিকথা বলতে কি দর্শকদের দুর্দমনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়তে হবে। ডিসেম্বরের কলকাতা এমন কিছু আর শীতের সহর নয়—বিশেষ করে ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকটা। রোদে তখন বেশিক্ষণ দাঁড়ানোই যায় না। গা জ্বালা করে। চোখ-মুখ তেতে, পুড়ে সে এক একশেষ কাণ্ড হয়। কিন্তু সি এ বি কর্তৃপক্ষ এবার ঠিক করেছেন যে দর্শক-আসনে কোন রকম আচ্ছাদন থাকবে না। অর্থাৎ সকাল দশটা থেকে চারটে-সাড়ে চারটে পর্যন্ত একভাবে ঠায় রোদ্দুরের মধ্যে বসে থাকতে হবে দর্শকদের। নিরীহ দর্শকদের ওপর অত্যাচার ছাড়া এ তো আর কিছু নয়। অথচ এর পেছনে তেমন কোন জোরাল যুক্তিই নেই। পাছে দর্শকরা ক্ষেপে মাঠে আগুন লাগাতে যান আর চটের আচ্ছাদনের ওপর তাঁদের আগে নজর পড়ে, তাই আগে-ভাগে কাজ গুছোতে মাঠে আচ্ছাদনের ব্যবস্থাটাই তুলে দিচ্ছেন তাঁরা।

অর্থাৎ ওঁরা ধরে নিয়েছেন যে, মাঠে গোলমাল হবেই। কিম্বা তার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে! আশ্চর্য! কেন গোলমাল হয়, কি করলে এই গোলমাল বন্ধ করা যায় সে সব কথা চিন্তা না করে দর্শকদের অহেতুক কষ্ট দেবার জন্যে আগে-ভাগে মাঠ থেকে আচ্ছাদন সরিয়ে দিয়ে কি যে লাভ হবে কে জানে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যান ক্রিকেট খেলা দেখতে। এঁদের মধ্যে অনেকেরই সারাদিন রোদ্দুরে থাকার ধকল সইবার ক্ষমতা নেই। ফলে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মাঠে কিম্বা মাঠের বাইরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে সি এ বি-ই তো সেই জন্যে দায়ী হবেন। সুস্থ করে তোলার দায়িত্বটাও তো তাঁদের ওপরই বর্তাবে। যাই হোক ও প্রসংগ থাক। আমরা চাই মাঠের দর্শক-আসনগুলো অন্য বছরের মতো আচ্ছাদন দেওয়া হোক। স্যানিটারীর নাম-কাওয়াস্তে কাজের জন্যে যদি এক লাখ টাকা আর সীট নম্বর মারার জন্যে যদি পনেরো হাজার টাকা খরচ হতে পারে, তখন না হয় আর কিছু টাকা খরচ করে দর্শকদের মাথার ওপর চটের আচ্ছাদনটাও দেওয়া হলো। —শান্তিপ্রিয়

ক্রিকেটের খবর

বোম্বাই-এর প্রথম টেস্টে আট উইকেটে হেরে যাবার পর কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় খেলোয়াড়রা দিতে পেরেছেন উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয়। ভারত ব্যাটিং, বোলিং এমন কি ফিল্ডিং-এও সমানে সমানভাবে পাল্লা দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার সংগে।

শুধুমাত্র প্রথম টেস্টে শতরানই করেন নি, বিশ্বনাথের ব্যাটিং বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিল সকলকে।

॥ অশোক মানকাদ ॥

অনেকদিন পরে ভারত সত্যি-সত্যিই খুঁজে পেলো একজন সত্যিকারের ওপনিং ব্যাটসম্যানকে।

জীবনের প্রথম টেস্টে কেউ যে ঐ ধরণের মনমাতানো ব্যাটিং করতে পারে তা বোধহয় কেউ ভাবতেও পারেন নি। কানপুর টেস্টের চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনে বিশ্বনাথের হাতের ব্যাট ঘুরেছিল এ্যারোপ্লেনের প্রপেলারের মতো। আর তারই আঘাতে বলগুলো বারবার বুলেট-বেগে ছুটে গিয়েছিল বাউণ্ডারীর দিকে।

তাই অতি অপ্রত্যাশিতভাবেই কানপুর টেস্টের কোন মীমাংসা হয় নি। অথচ ঠিক এমনটি তো হবার কথা ছিল না। কানপুরের পিচ এতোদিন ছিল স্পিন বোলারদের অনুকূলে। কিন্তু পুরো পাঁচদিন খেলা জিইয়ে রাখার জন্যে ওখান ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ পিচের চেহারাই পুরোপুরিভাবে বদলে দিয়েছিলেন। তাই ক্রিকেটরসিকদের হতাশ করে পঞ্চম

॥ চ্যাপেল ॥

দিল্লীর তৃতীয় টেস্টে চ্যাপেলের সেঞ্চুরীই অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ইনিংসে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

দিনে পিচের অবস্থা থেকে গেলো প্রথম দিনের মতোই।

দ্বিতীয় টেস্টে তাই কোন মীমাংসা হলো না। অথচ ক্রিকেট খেলাকে জীবন্ত করতে আজ সব থেকে আগে স্পোর্টিং পিচ তৈরি করা দরকার। ইডেন উদ্যানের পিচ আগে যেমন ছিল সেই রকম পিচ চাই—যে পিচে ফাস্ট বোলার, স্পিনার এমন কি ব্যাটসম্যানরাও স্বচ্ছন্দবোধ করবেন। পিচে প্রাণ থাকলে তবেই তো খেলা জমে উঠবে।

কিন্তু টাকার দিকে নজর দেওয়ায় সকলেই চাইছেন এখন পুরো পাঁচদিন খেলা চালিয়ে যেতে। তাই পিচও তৈরি হচ্ছে সেইরকমভাবে। খেলাও আর উঠছে না জমে। তা নইলে একথা কি কেউ ভাবতেও পারেন যে কানপুর টেস্টের পাঁচ দিনের একটি দিনেও স্পিন বোলাররা পিচ থেকে পেলেন না এতটুকুও সাহায্য।

॥ টেবার ॥

প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং-এর শেষ হাল ধরেছিলেন।

সাপ্তাহিক বসুমতীর

বিশেষ ক্রিকেট সংখ্যা

কলকাতায় ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ আরম্ভ হবার পূর্ব মুহূর্তে রেখা লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে এই বিশেষ ক্রিকেট সংখ্যাটি।

অসংখ্য ছবি রেকর্ডে ভরা সংখ্যাটি ক্রিকেটরসিকদের কাছে হয়ে উঠবে অমূল্য।

লেখকসূচীতে আছেন বাংলাদেশের দিকপাল সাহিত্যিক এবং ক্রীড়া-সাংবাদিকগণ।

ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের নয়নাভিরাম আলোকচিত্র এই সংখ্যার একটি বাড়তি আকর্ষণ।

ঃ সাহিত্যিকদের মধ্যে লিখছেন ঃ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, লীলা মজুমদার, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ।

ঃ ক্রীড়া-সাংবাদিকদের মধ্যে আছেন ঃ

অজয় বসু, আরবি, কমল ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এ ছাড়া, থাকছে স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল, গারফিল্ড সোবার্স প্রমুখের চোখে ভারতীয় ক্রিকেটের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ রূপটি।

যাই হোক কানপুরের পর এখন আরম্ভ হয়েছে দিল্লী টেস্ট। এ লেখা যখন ছাপা হয়ে বেরুবে তখন দিল্লীর তৃতীয় টেস্ট ম্যাচও শেষ হয়ে যাবে। তাই ও বিষয়ে এখন কিছু না লেখাই সংগত। দিল্লী টেস্টে ভারতের খেলোয়াড়রা কেমন খেলেন সেইটাই এখন দেখার বিষয়।

তবে আশার কথা ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা, বিশেষ করে নবাগতরা অনেক বেশি আস্থার সংগে খেলছেন। ওঁরা যদি এইরকমভাবে খেলতে পারেন তাহলে ভারত অন্তত কিছুদিনের মতো নিশ্চিন্ত।

কিন্তু ভয় হচ্ছে বিশ্বনাথকে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে জীবনের প্রথম টেস্টে যাঁরা শতরান করার গৌরব অর্জন করেছেন, পরবর্তীকালে তাঁরা ধরতে গেলে একদম সুবিধেই করতে পারেন নি। লালা অমরনাথ, দীপক সোধন, কৃপাল সিং, আব্বাস আলী বেগ আর হনুমন্ত সিং সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য।

তাই আমরা আশা করবো যে বিশ্বনাথ এই ট্রাডিশান ভেঙে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হবেন। কারণ বিশ্বনাথের মধ্যে যে সম্ভাবনা কানপুরে প্রতিভাত হয়েছে তা যেন কিছুতেই নষ্ট না হয়।

জীবনের প্রথম টেস্টে যাঁরা শতরান করেছেন তাঁদের নাম নিচে দেওয়া হলো।

ভারতের পক্ষে : অমরনাথ (১১৮), দীপক সোধন (১১০), কৃপাল সিং (১০০*), আব্বাস আলী বেগ (১১২), হনুমন্ত সিং (১০৫), বিশ্বনাথ (১৩৭)।

ইংলন্ডের পক্ষে : গ্রেস (১৫২), রণজিৎ সিংজী (১৫৪*), পি ওয়ারনার (১৩২*), আর ফস্টার (২৮৭), জি গান (১১৯), পাতৌদির নবাব (১০২), বি ভ্যালেনটাইন (১৩৬), পি গিব (১০৬), এস গ্রিফিথ (১৪০), পি মে (১৩৮), সি মিলটন (১০৪*), হ্যামশায়ার।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : সি ব্যানারম্যান (১৬৫*), এইচ গ্রাহাম (১০৭), আর ডাফ (১০৪), আর হার্টিগান (১১৬), এইচ কলিনস (১০৪), ডাব্লিউ পনসফোর্ড (১১০), এ জ্যাকসন (১৬৪), জে বার্কে (১০১*), কে ওয়ালটারস (১৫৫)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : জি হ্যাডলে (১৭৬), এ জেস্টিমুম (১১২), বি পেয়ারুডিউ (১১৫), ও স্মিথ (১০৪), সি হান্ট (১৪২)।

নিউজিল্যান্ডের পক্ষে : জে মিলস (১১৭) ও বি টেলর (১০৫)।

পাকিস্তানের পক্ষে : কে আবদুল্লা (১৬৬)।

পরিচীয়তে

কানপুরে টেস্টের পঞ্চম দিনে বিশ্বনাথ সেঞ্চুরী করলেন। তাঁকে নিয়েই মেতে উঠলেন সকলে। তাঁরই জয়গানে সকলেই মুখর তখন। কিন্তু অপরিসীম ধৈর্য আর আন্তরিকতার সঙ্গে যিনি ধীরে ধীরে বিশ্বনাথকে সেঞ্চুরীর পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন সেই সোলকারকেও অবশ্য কেউই ভোলেন নি। কেউই অস্বীকার করেন নি বিশ্বনাথের সেঞ্চুরীর পেছনে সোলকারের অবদানের কথা।

একনাথ সোলকার মারকুটে খেলোয়াড়। যতক্ষণ তিনি উইকেটে থাকেন ততক্ষণই তিনি শুধু রান তুলতে চান। অথচ সেদিন সোলকার ছিলেন মাটি কামড়ে। নিজে না খেলে বারবার তিনি সুযোগ দিচ্ছিলেন বিশ্বনাথকে। সোলকারের সেদিনের খেলা ছিল আত্মবিশ্বাস আর স্বার্থত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত।

বোম্বাই-এর একুশ বছরের অলরাউণ্ডার সোলকার এর মধ্যেই ভারতীয় একাদশে নিজের স্থানটা পাকা করে নিয়েছেন। সোলকার বাঁ হাতে ব্যাট করেন আবার বলও করেন। সোলকারের ফিল্ডিংও অনেকের চেয়ে ভালো।

ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেট খেললেও, সোলকার মোটামুটিভাবে লাইম লাইটে এসে যান ১৯৬৪ সালে। তখন তাঁর বয়েস মাত্র পনেরো। ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের পক্ষে খেলার সুযোগ পেলেন তিনি। সেবার ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের সঙ্গে গেলেন সিংহলে। তারপর খেললেন লন্ডন স্কুল দলের বিরুদ্ধে।

ততোদিনে মোটামুটিভাবে নাম করে ফেলেছেন তরুণ অলরাউন্ডার একনাথ সোলকার। ১৯৬৫ সালে তাই তাঁর ওপরই পড়লো বোম্বাই স্কুল দলের পরিচালনার ভার।

তখনো বোম্বাই দল বলতে ভারতীয় টেস্ট দলকেই বোঝাতো। কলকাতা যেমন ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান, বোম্বাই তেমনি ক্রিকেট খেলার। তবু রনজি ট্রফির খেলায় বোম্বাই দলের পক্ষে খেলার সুযোগ পেয়ে গেলেন একনাথ সোলকার। এ সেই ১৯৬৬ সালের কথা। সোলকারের বয়েস তখন মাত্র সতেরো। সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির খেলায় আত্মপ্রকাশ করলেন সোলকার। সেই খেলায় সোলকার লাভ করেছিলেন ৬টি উইকেট মাত্র ৩৮ রানের বিনিময়ে।

সেই শুরু। তারপর থেকে সোলকার ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছেন। ভারতীয় দলের যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সাধনায় সোলকার ভারতীয় দলে নিজের স্থানটি মোটামুটিভাবে পাকা করে নিয়েছেন।

এ পর্যন্ত রনজি ট্রফির খেলায় সোলকার লাভ করেছেন ৩৯টি উইকেট। আর গত বছর দলীপ ট্রফির খেলায় নর্থ জোনের বিরুদ্ধে ১৪৫ রান করে সোলকার ব্যাটিং-এ তাঁর অসামান্য নৈপুণ্যের কথা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। আমরা চাই সোলকার আরো ভালো খেলুন, সোলকারের ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

॥ জয়দেব মুখার্জী ॥

সেই একই ধরণের খেলা আজো খেলছেন জয়দীপ মুখার্জী।

টেনিসের খবর

কলকাতার সাউথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত বে-সরকারী দ্বিতীয় টেনিস টেস্টে স্পেন ৩—২ খেলায় ভারতকে হারিয়ে দিয়েছে। এক সময়ের বল বয় আজ বিশ্বের সেরা ট্রফি উইম্বেলেডন চ্যাম্পিয়ান ম্যানুয়েল সান্তানা অনবদ্য ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে হারিয়ে দিয়েছেন ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান প্রেমজিৎলাল আর জয়দীপ মুখার্জীকে। ডাবলসের খেলাতেও সান্তানা আর আরিলা পরাজিত করেছেন জয়দীপ আর প্রেমজিৎলালকে। রিভার্স সিঙ্গলসের দুটি খেলায় ভারতের জয়দীপ মুখার্জী আর প্রেমজিৎলাল সরাসরি পরাজিত করেছিলেন স্পেনের লুইস আরিলাকে।

সত্যি কথা বলতে কি খেলাগুলো একেবারেই মামুলী ধরণের হয়েছিল। কোন সময়ই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারেন নি খেলোয়াড়রা। তবে সান্তানার মার্জিত এবং অত্যন্ত উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছিল।

অপ্রত্যাশিত নয়

মাণিক ঘোষাল

অবশেষে ওরা ফিরলো।

ওদের জন্য ফুলের মালা নিয়ে কেউ অপেক্ষা করে নি। বিমানবন্দরে অতি পরিচিত সেই উদ্‌গ্রীব জনতা ওদের স্বাগত জানাতে জোটে নি।

খবরের কাগজেও ওদের কথা লেখা হয় নি।

নিঃশব্দে ওরা কখন এসেছে কিংবা তারপর ওরা কিভাবে বাড়ি ফিরে গেলো তাও জানি না। কিন্তু কেন? এরকম হওয়ার কারণ কি?

কারণ ওরা ফিরেছে পরাজয়ের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে। সারা ভারতের সম্মান ওরা মরক্কোয় বিকিয়ে দিয়ে এসেছে।

প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী আটটি দলের মধ্যে ওরা সর্বনিম্ন স্থান দখল করে আমাদের হাস্যাস্পদ করেছে।

কিন্তু আমি শুধু ওদের দোষ দিই না। এর কারণ খুঁজতে গেলে আরও ভেতরে যেতে হবে।

কোচ হিসাবে মনোনীত জার্নাল সিং-এর যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার প্রথমেই সংশয়। জার্নাল সিং কি পাশ করা কোচ? কিংবা কোচ হিসাবে জার্নাল তাঁর যোগ্যতা ইতিপূর্বে কোথাও দেখিয়েছেন কি? হতে পারে জার্নাল সিং একজন ভালো খেলোয়াড়। একথা সবাই জানে এবং মানে।

কিন্তু ভালো খেলোয়াড় হলেই যে ভালো কোচ হওয়া যায় এমন কোন কথা নেই। যেমন ভালো ছাত্র মাত্রই ভালো শিক্ষক হয় না।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে তবে যোগ্য ব্যক্তি কে? অমল দত্ত? কিম্বা অন্য কেউ?

আমি কিছুই বলব না। তবে অমল দত্ত সম্বন্ধে এটুকু বলতে পারি যে, তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি জগাখিচুড়ি মার্কা টিম তৈরির জন্য কখনই কোচিং-এর দায়িত্ব নেবেন না।

শুধু অমল দত্ত কেন? আমার বিশ্বাস যে কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কোচই অমল দত্তর মত বলবেন, "একাত্তর সালের জন্য চাই এখন থেকে প্রস্তুতি।"

দল গঠনেও কিছু লোকের স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে বলে বোঝা যায়। বাংলা দলের সার্থক অধিনায়ক শান্ত মিত্রর বাদ পড়া অযৌক্তিক। দু'নং গোলরক্ষক হিসেবে মুস্তাফা কিংবা অপেক্ষাকৃত তরুণ কানাই সরকার অথবা শ্যামল বসুর দাবি উপেক্ষিত দেখে বিস্মিত হতে হয়।

সারা টিমে মাত্র তিনটি বাঙালী ছেলে। বলাই দে, ভবানী রায় এবং প্রণব গাঙ্গুলী। তাও প্রথম দিন পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রণবের বদলে কে এস রাজু নামে একজনকে আউটে খেলানো হলো।

দ্বিতীয় দিনে বর্মার বিরুদ্ধে প্রণব খেললেও সেই রাজুকে লেফটব্যাকে খেলতে দেখা গেলো। এবং কাগজ পড়ে যতদূর জানি রাজুর ফাউলের সূত্রেই পেনাল্টি থেকে সেদিনের ছ'গোলের প্রথম গোলের সূচনা হয়।

আশ্চর্য! এমন খেলোয়াড় যিনি একবার আউট আবার ব্যাক উভয় স্থানেই সমান পারদর্শী তাঁর কথা আগে একবারও শুনি নি।

দল গঠনে এবার যে বাংলার বাইরের স্বার্থ রাখা হয়েছে তা তো স্পষ্টই বোঝা গেছে (জার্নাল সিং কোচ বলেই হয়তো!)

যদিও এ'দের জায়গায় অন্যরা যেতেন তবে খেলার ফলাফল কি অন্যরকম হতো? মোটেই না? এমন আশা নিশ্চয়ই কেউ করেন না। কারণ খেলোয়াড়ের অভাব ছিল না। ঘাটতি ছিল তাঁদের সামর্থ্যের। আর তাই যতদিন না এই সামর্থ্য বাড়ছে ততদিন বিদেশে টিম পাঠিয়ে লাভ নেই।

আর যদি তা না করা হয় অর্থাৎ গতানুগতিক পথেই যদি চলে, তবে ফলাফল আরও হতাশাজনক হবে। বর্মা আবার আমাদের ছ'গোল দেবে (চাই কি আরও বেশি হতে পারে)! এতটুকু দেশ থাইল্যান্ড ভারতকে আরও সহজে হারাবে কিংবা ইন্দোনেশিয়া এগারজনকে গুনে গুনে বল জালে ঠেলবে (ভাগ্য ভালো এবার ইন্দোনেশিয়ার সাথে আমাদের খেলা পড়ে নি!) আর আমাদের অযোগ্য খেলোয়াড়রা ফাঁকতালে বিদেশ ভ্রমণ সারবে।

এতেও কি আমাদের শিক্ষা হবে না? আর কতোকাল আমরা এইভাবে মুখ বুজে থাকবো......!

শুভ্রাংশুশেখর পাত্র (ডুমুরিয়া, পাথরা, মেদিনীপুর)

উত্তর—ক্রিকেট খেলার পীচ তৈরি এক-একজন এক-একরকমভাবে করেন। তাঁদের কাছে এটা একান্তই গোপনীয়। কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তাই পীচ তৈরির বিশেষ প্রণালী তো প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

দুলাল মুখার্জী (কাঁথি, মেদিনীপুর)

প্রশ্ন—ভারতীয় ক্রিকেটের স্থান বিশ্বের মধ্যে আর কোথায়?

উত্তর—বোধ হয় নিউট্রালজোনে, না হয়তো নো ম্যানস ল্যাণ্ডে।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাই-গুড়ি)

প্রশ্ন—ব্যাটসম্যান একটি বল মারলেন, বলটা মাটির ওপর দিয়ে গিয়ে লাগল অপর প্রান্তের উইকেটে। তারপর মাটিতে পড়ার আগে বলটা লুফে নিলেন একজন ফিল্ডার। ব্যাটসম্যান কি এ ক্ষেত্রে আউট হবে

উত্তর—নিশ্চয়ই হবে।

উত্তম সরকার ও পীযূষ পাল (ধূপ-গুড়ি, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন—ভারতীয় দলের কোন খেলোয়াড় কি এবার মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার হ্যাটট্রিক করেছেন?

উত্তর—অবাক করলেন।

ভারত যে এবার কোন দলকে তিনটে গোলই দিতে পারে নি। শুধুই গোল খেয়েছে।

অশোককুমার মল্লিক (বেলদা, মেদিনী-পুর)

উত্তর—এ বছরের ফুটবল মরশুম তো মোটামুটিভাবে শেষ হয়ে গেল। এখন তো আর কিছুই করার নেই। আপনি সামনের মরশুম শুরু হওয়ার আগে লিখবেন। আশা করি তখন যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।

শঙ্কর মজুমদার (বিদ্যানিকেতন হাই স্কুল, গৌহাটি-১২)

প্রশ্ন—অতীতের নামকরা খেলোয়াড় কে দত্তর ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তর—আমিও তো ঠিক বলতে পারব না। আপনি বরঞ্চ ক্লাবের ঠিকানায় চিঠি লিখে দেখতে পারেন।

অসিত সরকার (ইন্দা রিক্রিয়েশন ক্লাব, ইন্দা)

উত্তর—আপনার চিঠির ভাষামত এবারও আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না। (অবশ্য জানা থাকা সত্ত্বেও) তবে জুলে রিমে কাপের খেলা নিয়ে একটা লেখা প্রকাশ করার কথা আছে। যদি সেই লেখাটা ছাপা হয় তাহলে আপনার সব প্রশ্নের উত্তর সেখানেই পাবেন।

প্রশান্ত বসু (কল্যাণী ভবন, ইয়ং রোড, আসানসোল)

উত্তর—পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্য করে লেখা আপনার চিঠির কিছু অংশ তুলে দিলাম, "এখন আমার প্রশ্ন হলো যে বোম্বাই-এ প্রথম টেস্টের নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে সকলে ক্যাচ আউট হলেন, এটা কি একটা বিশ্ব রেকর্ড?"

উপেন্দ্রনাথ সমাদ্দার (নেতাজী কলোনী, কলকাতা-৫০)

উত্তর—দেখলে তো প্রশ্ন করতে কিছু লাগে না। তুমি যতো খুশি প্রশ্ন করো।

গল্প হলেও সত্যি

ভিক্টর ট্রাম্পার অস্ট্রেলিয়ার একজন নামকরা ক্রিকেটার ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

১৯০২-৩ সালের ক্রিকেট মরশুম। খেলা হচ্ছিল সিডনীর রেডফ্রেন ওভাল মাঠে। খেলাছিলেন ভিক্টর ট্রাম্পার। হঠাৎ একটা বল পেয়ে তিনি পা বাড়িয়ে উঁচু করে মারলেন। বলটা গিয়ে লাগলো মাঠের পাশের বাড়ির কাঁচের জানলায়। জানলা ভেঙে গেলো। আজও সেই বাড়ির ঐ জানলাটি ভাঙা অবস্থায় আছে। মেরামত করা হয় নি। ভাঙা জানলাটি যে ভিক্টর ট্রাম্পারের স্মৃতিচিহ্ন। সেদিনের খেলায় ট্রাম্পার করেছিলেন ১৬৫ মিনিটে ৩৩৫ রান। এই ৩৩৫ রানের মধ্যে তিনি ২২টি ওভার বাউণ্ডারী আর ঊনত্রিশটি বাউণ্ডারী মেরেছিলেন। এই ৩৩৫ রান সংগ্রহ করার পথে ট্রাম্পার ছয়বার বল এমন অজানা জায়গায় পাঠিয়েছিলেন—যেখান থেকে ফিল্ডম্যানেরা বল খুঁজে আনতে পারেন নি। ফলে ঐ ইনিংসে সাতটি বলের প্রয়োজন হয়েছিল।

—পরিতোষ নাগ
বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি

অরিন্দম দাশগুপ্ত (ডাংগালপাড়া, সিউড়ী, বীরভূম)

উত্তর—আপনার চিঠিটা এত দেরিতে পেলাম যে, যখন আর কিছুই করার ছিল না। আপনারা কিছু মনে করবেন না। আপনাদের কোন কাজে লাগতে পারলে জানাবেন।

রামনাথ ঘোষ ও নারায়ণ সাহা (বিদ্যা-সাগর কলোনী)

উত্তর : কলকাতার বাইরের অনেকগুলি দলই আই· এফ· এ শীল্ড লাভ করেছে। কলকাতার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলা যেতে পারে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কালকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

বেদান্তসার ঃ

শ্রীমদ্ পরমহংস সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত ; ধর্মশাস্ত্র প্রচার-বৃতী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত (সুবোধিনী-টীকা সমং)। বেদের এই অংশেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বৃহ্মবিদ্যার দিব্যজ্যোতিঃ বিবস্বিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

মানসোল্লাস ঃ

বশিষ্ঠানন্দ পুরী (অনুবাদ)।

মূল্য—২-০০ টাকা।

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ঃ

ভারতীতীর্থ বিরচিত। সুপণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ অনূদিত। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১ম—৪-০০ এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ মূল্য—প্রতি খণ্ড—৩-০০ টাকা।

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা ঃ

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত। মূল্য—১ম খণ্ড—৫-৫০ টাকা। ৩য় খণ্ড ৪-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র ঃ

শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, বৃহ্মসংহিতা, অষ্টাবক্র-সংহিতা, ষটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত যোগরহস্যম্, পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগ গ্রন্থের সমাবেশ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্মরণ ঃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত অমিয় নিস্যন্দিনী বাণী ভক্তপ্রবর উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ। বোর্ড বাঁধাই মূল্য—২-৫০ টাকা।

পবন-বিজয়-স্বরোদয় ঃ

বায়ু জয়ই যোগের শ্রেষ্ঠ সাধনা। অলৌকিক সত্য নির্দেশক যোগক্রিয়ার গ্রন্থ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি ঃ

(ত্রিবেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও সর্বতন্ত্র হইতে সঙ্কলিত। সংবর্ধিত সংশোধিত ও সুসংস্কৃত সংস্করণ)।

বহু আয়াস ও অধ্যবসায় আহৃত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে মুদ্রিত আর্য সৎকর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যপূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থশাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও স্বল্পমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। দীক্ষা প্রকরণ, নিত্যকৃত্য প্রকরণ, পূজা প্রকরণ, ধ্যানাদি প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, বৃত প্রকরণ, যাত্রা প্রকরণ, আসন ও মুদ্রা প্রকরণ-সমন্বিত মূল বিষয়-সমূহে ৮৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড। মূল্য—১০-০০ টাকা।

হিন্দুধর্ম পরিচয় ঃ

ধর্মশাস্ত্রবিশারদ শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

আত্মানুসন্ধান ঃ

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষাল প্রণীত। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নর-নারীর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। মূল্য—২-৫০ পয়সা।

পুরশ্চরণ রসোল্লাস ঃ

(দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ)। মূল্য—৩-০০ টাকা।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যম্ ঃ

যোগীপ্রবর মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বিরচিতম্। মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসমন্বিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য ঃ

শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম, শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যম শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্যম, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যম। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

5 DEC 1969

সে কি! তুমি এখনও ব্যবহার করনি?
কিন্তু কুক্‌মী না হলে আমার রাঁধতে মন চায় না
কুক্‌মী
গুঁড়া মশলা
স্বাদে গন্ধে বিশুদ্ধতায়
এর তুলনা হয় না!
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড
পোস্তা • কলিকাতা-৭
মিল - কাশীপুর

সাপ্তাহিক বসুমতী

কলকাতায় রাষ্ট্রপতি

মুখ্যমন্ত্রীর অনশনভঙ্গের পর যুক্তফ্রন্টের অচলাবস্থার অবসানে বিভিন্ন মহলে তৎপরতা

বর্ষ ঃ ২৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ | OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA | 74 Year, No. 24, 11th Dec., 196

শীতে
প্রতিদিন
বোরোলীন
ব্যবহার করুন
আপনার শুষ্ক ও বিদীর্ণ ত্বকের অস্বস্তি দূর করবে
এই অ্যান্টিসেপটিক সুরভিত ক্রীম।
বোরোলীন হাউস কলিকাতা-৩

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৪৭৫
আজকের মানুষ		১৪৭৬
বঙ্গদর্শন		১৪৭৭
ভারতদর্শন		১৪৭৯
আন্তর্জাতিক		১৪৮২
সপ্তাহের বোকা	— কৃত্তিবাস ওঝা	১৪৮৪
চাঁদ-সংবাদ	— বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	১৪৮৬
দহন (গল্প)	— খায়রুল বাসার	১৪৯০
রঙ্গজগৎ		১৪৯৪
ক্রিকেটের আনন্দ	— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১৪৯৮
লং ফিল্ড	— লীলা মজুমদার	১৫০২
ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ	— আরবি	১৫০৬
ক্রিকেট টেস্টের পাঁচ দিন : কলকাতায়	— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫০৯
সর্বকালের সেরা	— অজয় বসু	১৫১০

যে কোন
গয়না
আর
আ স ল
গ্র হ র ত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান
ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এ. সরকার এণ্ড সন্স
৮১/১এ রাসবিহারী এভিন্যু

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ফিরোজ-শার আগে ও পরে	শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫১৩
ক্রিকেট মাঠে	বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১৫১৬
খেলোয়াড়দের কাছাকাছি	শতরূপা মজুমদার	১৫১৭
এক নজরে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া	...	১৫২০
ট্রাভিসন ভাণ্ডক বিশ্বনাথ	মাণিক ঘোষাল	১৫২১
অন্তর্মুখী ভদ্রলোক	অরুণ চট্টোপাধ্যায়	১৫২২
'অ' দলের খেলোয়াড় পরিচিতি	সন্তোষকুমার শীল	১৫২৬
মাঠে কে কোথায় দাঁড়ায়	...	১৫২৯
নতুন আবিষ্কার অশোক মানকাদ	...	১৫৩০
রেকর্ডস-এর পাতা থেকে	...	১৫৩১
ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া টেস্ট খেলার ফলাফল	...	১৫৩৪

ক্রীড়া-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান

খ্যাতনামা ক্রীড়া সাংবাদিক

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ক্রিকেট খেলার আইন কানুন

(পরিমার্জিত সংস্করণ) দাম—চার টাকা

এখন শুধু ক্রিকেট আর ক্রিকেট। সেই ক্রিকেট খেলা বুঝতে হলে, ক্রিকেট খেলা জানতে হলে কিম্বা ক্রিকেট খেলা শিখতে হলে এই বইটা পড়তেই হবে। অজস্র ছবি, আর স্কেচে ভরা গল্প-উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয় এই বইটি। নিছক আইনের নয়, বইটি সকলেরই ভালো লাগার মতো।

চিরঞ্জীবের

বিশ্ব ফুটবল (৩·০০)

বিশ্বের সেরা ফুটবলারদের জানতে হলে এই বইটি পড়তে হবে

ভারতীয় ফুটবল (৩·০০)

বিশ্বের সেরা ফুটবলারদের কথা জানতে হলে পরিবেশন করেছেন লেখক

ব্রাবোর্ন থেকে ইডেনে (২·০০)

এত অল্প দামে ক্রিকেটের ওপর এর চেয়ে ভালো বই আর কখনো প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

খেলার রাজা ফুটবল (৫·০০)

এই বইটি সম্পূর্ণ নতুন ঢং-এ লেখা। পড়তে শুরু করলে শেষ না করে থামা যাবে না। আর সমস্ত ফুটবল জগতটাই এসে যাবে পাঠকের হাতের মুঠোর মধ্যে।

জ্ঞানতীর্থ ঃ ১নং বিধান সরণী, কলকাতা-১২

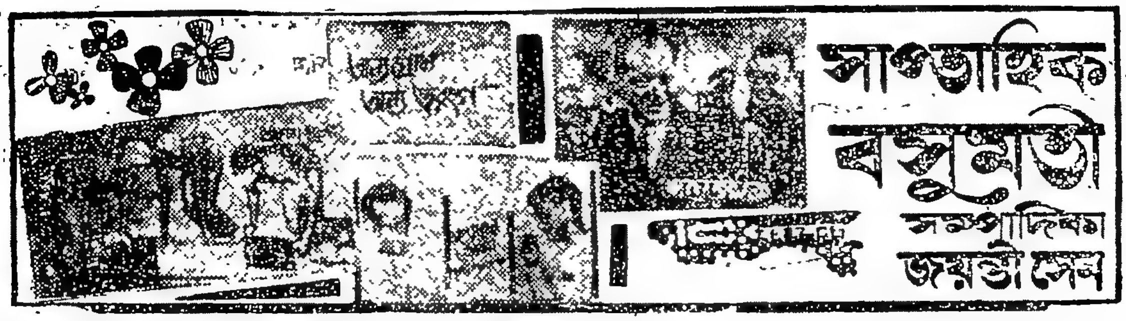

৭৪ বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

PRICE : 30 Paise
Thursday, 11th December, 1969

'কলকাতার সমস্যা জাতীয় সমস্যা'—রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি গত সপ্তাহে কলকাতায় এলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর এই তাঁর প্রথম কলকাতায় আগমন। তাঁর কলকাতায় আগমন নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছিলেন। শ্রীগিরির পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ দীর্ঘকালের। পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার সমস্যা সম্পর্কে তিনি বহুকাল ধরে খবরাখবর রেখে আসছেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করার সময় তিনি এই পশ্চিমবঙ্গেই ছিলেন। কলকাতার মতো মেট্রোপলিটান শহরের শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় রাখার ফলে শ্রীগিরি কলকাতার সমস্যাবলী সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য।

রাজভবনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে রাষ্ট্রপতি প্রথমেই একথা বলেছেন যে, কলকাতার সমস্যা জাতীয় সমস্যা। ঐ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে এই অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে যে, (১) কলকাতাকে শুধু বাংলার শহর বলে বিচার করলে ভুল হবে, ভারতের শহর বলে বিচার করতে হবে, (২) কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের মেয়র ও ডেপুটি মেয়রকে দিল্লীতে যেতে হবে এবং সেখানে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি-দাওয়া পেশ করতে হবে, (৩) মেয়র ও ডেপুটি মেয়র দিল্লীতে গেলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেবেন, (৪) আগামী ১৩ই ডিসেম্বর রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান রাজ্যপাল সম্মেলনে কলকাতার সমস্যার কথা তুললে রাষ্ট্রপতিও দেখবেন তিনি কতদূর কি করতে পারেন।

পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরিকে যে সভায় সম্বর্ধনা জানানো হয়, সেখানেও তিনি প্রায় উপরি-উক্ত কথাগুলিই বলেন। তবে মেয়র শ্রীসুর পঠিত মানপত্রের উত্তরে তিনি নিজেকে জনতার লোক বলে সোচ্চারে ঘোষণা করতে গর্ব অনুভব করেন।

কলকাতার মতো বিরাট শহরে বিরাট বিরাট অভ্রংলিহ প্রাসাদ দেখে চমকে যেতে হয়। ঐ বাড়ির বাসিন্দারা নিশ্চয়ই দরিদ্র জনগণ নয়। কলকাতার সাধারণ মানুষের প্রথম দাবি মাথা গোঁজবার ঠাঁই। কিন্তু কলকাতার ফুটপাতে বাস করে অসংখ্য মানুষ। শ্রমিকদরদী নেতা শ্রীগিরি একথা ভালোভাবেই জানেন যে, বস্তি অঞ্চলগুলিতে আজ যারা বাস করছে, তাদের প্রায় সকলেই শ্রমিক। দুর্ভাগ্যের কথা কলকাতার বস্তিগুলির কোনো উন্নতিসাধন আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। এক-একটি ঋতুতে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হয় সর্বপ্রথম বস্তি অঞ্চলগুলিতেই। তারপর মহামারী আকারে তা গ্রাস করে কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলের মানুষগুলিকে। বাড়ির সমস্যা মেটানোর জন্য কলকাতায় সরকারী অর্থে কিছু বাড়ি তৈরি হয়েছে, কিন্তু সমুদ্রের তুলনায় তা গোষ্পদ। আমাদের মনে হয় এদিকেই সরকারের উচিত সর্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া এবং যে বৃহত্তর কলকাতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা অবিলম্বে কার্যকর করা। বৃহত্তর কলকাতার পরিকল্পনাকে সার্থক করতে হলে চাই সুষ্ঠু যানবাহনের ব্যবস্থা। কিন্তু যুগ-যুগ ধরে আশ্বাস দিয়েও কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতার বুকে যানবাহনের সুব্যবস্থা করে তুলতে পারেন নি। কলকাতায় যে ক'টি হাসপাতাল আছে প্রয়োজনের তুলনায় তা একেবারেই নগণ্য। সহস্র সহস্র শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মুখ দেখতে পায় না। নিয়মিতভাবে রোগ বীজাণুনাশক ওষুধ বণ্টনের কোনো আয়োজন নেই। মাছি ও মশা কলকাতায় এখন অবাধ রাজত্ব চালাচ্ছে এবং অলিগলি-রাজপথের অনতিদূরেই জঞ্জালস্তূপ থেকে রোগবীজাণু এনে ঘরে ঘরে রোগ ছড়াচ্ছে। পার্কগুলি তো শিকেয় ঝুলছে। ফুটবল খেলার স্টেডিয়াম আর হবে বলে মনে হয় না। বর্ষায় কলকাতা ডুবুডুবু, গ্রীষ্মেও রাজপথ ও ফুটপাত ব্যবহারের অযোগ্য এবং সব ঋতুতেই নিদারুণ জলকষ্ট। তাছাড়া আজো হাওড়ায় দ্বিতীয় ব্রিজের কাজ শুরু হয় নি। এমনই পরিহাসের কথা, শ্মশানেও মৃতব্যক্তিকে লাইন দিতে হয়!

মাত্র ক'টি সমস্যার কথাই আমরা বললাম। বহু সমস্যার মধ্যে এই সব সমস্যা সমাধানের দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু কে কার কথা শোনে? কেন্দ্রীয় সরকার মাঝে মাঝে কলকাতার সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা বললেও অর্থ দেবার বেলায় একেবারে শক্ত গিঁট করে বসে থাকেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ ধরণের ব্যবহারের অন্যতম কারণ হয়তো এই ছিল যে, দু' যুগ ধরে যাঁরা পৌর প্রতিষ্ঠানের শাসনে ছিলেন তাঁরা দলীয় স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত ছিলেন। শহরবাসীদের সুখ-সুবিধার পরিবর্তে তাঁরা যদি সত্যই কিছু করতেন, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার কখনোই নির্বিকার থাকতে পারতেন না। কারণ পশ্চিমবঙ্গ কোনো অংশে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থকোষ কম স্ফীত করে নি।

রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি পৌরপিতাদের কাছে আবেদন করেছেন, একবার নির্বাচিত হওয়ার পর কে কোন্ দলের সেকথা ভুলে গিয়ে তাঁদের সকলকে একাত্ম হয়ে পৌরসমস্যা সমাধানে মন দিতে হবে।

রাষ্ট্রপতির ঐ উক্তি সমর্থনযোগ্য। পৌরপিতারা যদি শহরবাসীদের সমস্যাকে একযোগে তুলে ধরেন তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতার উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্যের কথা, একশ্রেণীর নেতা আজকাল কলকাতার সমস্যা ছেড়ে অন্য বিষয় নিয়ে যেভাবে চেঁচামেচি শুরু করেছেন, তাতে কলকাতাকে নিয়ে দিল্লীর অমূলক আশংকা জাগলে তাতে ক্ষতি হবে কার?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

মাই লাই গ্রামে অনুষ্ঠিত বর্বরতার কারণে গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এখন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে।

গত বছরের ১৬ই মার্চ তারিখে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মাই লাই গ্রামের ওপর মার্কিন ডিভিসনের একাদশ পদাতিক ব্রিগেডের 'সি' কোম্পানীর জনা ৩০ সৈন্য হেলিকপ্টারযোগে অবতরণ করে। নামার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অসামরিক ভিয়েৎনামীদের বাড়িতে বোমা মেরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং যখন বাসিন্দারা—নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা—প্রাণের তাগিদে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন তাদের ওপর অবিরাম গুলীবর্ষণ করা হয়। আবার কখনো বা ভিয়েৎনামীদের এক-একটা জায়গায় জড়ো করে তাদের ওপর গুলী চালানো হয়। এমনি করে একদিনেই সেদিন ১০৯ জন থেকে ৫৬৭ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ঘটনাগুলো যে শুধু মাই লাই গ্রামের বেঁচে-থাকা অধিবাসীরা বলেছে তাই নয়, মার্কিন প্রত্যক্ষদর্শী সৈন্যরা, প্রেস ফটোগ্রাফার সাংবাদিকরাও ফাঁস করে দিয়েছেন। যার ফলে মার্কিন কর্তৃপক্ষের পক্ষে ঘটনাটা আর চেপে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। মার্কিন সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ওই সি কোম্পানীর নেতা লেফটেনান্ট উইলিয়াম লজ ক্যালি জুনিয়রকে অন্তত ১০৯ জন ভিয়েৎনামী বেসামরিক লোককে হত্যা করার অভিযোগে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

আজ থেকে ২৬ বছর আগে মিয়ামিতে ক্যালির জন্ম হয়। তার লালচে বাদামী চুলের কারণে ছোটবেলায় বন্ধুরা তাকে 'রাস্টি' বলে ডাকতো এবং বড় হয়েও সে রাস্টি হিসাবেই বেশি পরিচিত ছিল। লেখাপড়ায় ভাল ফল না করলেও ক্যালিকে সবাই বিনয়ী ও পরোপকারী বলে জানতো। তার ছোট্ট দেহের জন্যে স্কুলের খেলাধুলোয়ও সে নাম করতে পারে নি। মিয়ামি স্কুল ছেড়ে সে জর্জিয়া মিলিটারী একাডেমিতে এল দু বছরের জন্যে, কিন্তু আবার মিয়ামি

ক্যালি

ফিরে গিয়ে গ্র্যাজুয়েট হল। তার প্রিয় বিষয় ছিল রাজনীতি, সরকার এবং ব্রিটিশ ইতিহাস। এখানে তার জনপ্রিয়তা খুব বেড়ে যায়, কারণ বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় সে নিয়মিত অংশ নিত।

হাই স্কুল ছাড়ার পর থেকেই ক্যালির জীবনটা অন্য রকম হতে থাকে। তার বাবার ব্যবসা ভাল চলছিল না, হাই স্কুলে সে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারতো বটে। কিন্তু সে সৌভাগ্য তার বেশিদিন হয় নি। পাম বীচ জুনিয়র কলেজ থেকে সে বেরোলো—তবে খ্যাতি নিয়ে নয়। কলেজ ছেড়ে সে প্রথমে একটা হোটেলে ঘণ্টাবাদকের, তার পরে একটা রেস্তোরাঁয় ডিশ ধোবার কাজ নিল। পরে সে রেলের একটা কাজ নিয়ে উন্নতি করলো এবং সপ্তাহে তিনশো ডলার করে কামাতে থাকলো। তার মা মারা যাবার আগে সে কিছুদিন বীমা ব্যবসায়ীদের হয়ে আলোকচিত্রীর কাজ করেছিল। ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি ক্যালি সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়।

ক্যালি অভিযুক্ত হয়েছে শুনে তার বন্ধু-বান্ধব এবং যারা তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতো তাদের অনেকেই বিস্মিত হয়েছে। কারণ তারা জানতো ক্যালি একটা চমৎকার ছেলে, যে পরের জন্যে সর্বস্ব দিতে পারে। ক্যালি সৈনিকজীবনকে পেশা হিসেবেই নিতে চেয়েছিল। বছরখানেকের ভিয়েৎনাম মিশনের পরেও সে এখানে কাজ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সে গত বড়দিনের ছুটিতে—মাই লাই নৃশংসতার ন' মাস বাদে—ক্লাস্টারসমেত ব্রোঞ্জ তারকা এবং অন্য সম্মানসূচক পুরস্কার নিয়ে দেশে ফিরেছিল।

এ-অভিযোগ শোনার জন্য ক্যালি যেন প্রস্তুত ছিল না, তাই সে খুবই ঘাবড়ে গিয়েছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে তারই সহকর্মীদের অভিযোগ এই যে, সে মাই লাই গ্রামে সহকর্মীদের ডেকে বলতো—জানো নিশ্চয়ই এদের (অসামরিক নিরস্ত্র লোকদের) কী করতে হবে। কিন্তু সহকর্মীকে ইতস্তত করতে দেখে নিজেই গুলী চালাতে শুরু করেছিল এবং নিষ্ঠুরভাবে দলে দলে নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করেছিল।

সামরিক আদালতে ক্যালি নিশ্চয়ই আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করবে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারবে কি?

বঙ্গদর্শন

মুখ্যমন্ত্রীর অনশন শেষ হল। গত সপ্তাহের বঙ্গদর্শনে আমরা লিখেছিলাম, "মুখ্যমন্ত্রীর সত্যাগ্রহই আমাদের বিবেচ্য, কেন না সাধারণ দলনেতার চেয়ে তাঁর পার্থক্য অনেক। তাঁর কণ্ঠস্বরকে দলীয় নেতার চাতুর্যপূর্ণ সংলাপের কিছুটা উর্ধে সঙ্গতভাবেই স্থান দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। সব কথা ছেড়ে দিলেও, এমন কি মুখ্যমন্ত্রীর অনশন-সত্যাগ্রহ করা উচিত নয়, একথা মেনে নিলেও, যে কারণগুলি তাঁকে এই পথে ঠেলে এনেছে, সেগুলিকে তো সব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

ওই একই প্রসঙ্গে আমরা লিখেছিলাম যে, "যা বাস্তব তা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি দপ্তর আর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দলের জমিদারী, তা ওই দলের নেতাদের নির্দেশে চলে। এমতাবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী কি করতে পারেন? মন্ত্রিসভার তিনি সভাপতি, কিন্তু কার্যত কোন যৌথ দায়িত্ব মন্ত্রিসভার নেই। প্রত্যেকটি মন্ত্রী যেন এক-একটি ঘুড়ি হয়ে উড়ছেন, যার লাটাই দলের নেতার হাতে, তিনি কখনো সুতো ছাড়ছেন, কখনো তা গুটোচ্ছেন, কখনো অন্য ঘুড়িকে কাটার জন্য প্যাঁচ কষছেন। মুখ্যমন্ত্রী কি করতে পারেন?" এই শোচনীয় অবস্থায় তিনটি রাস্তা তাঁর সামনে খোলা ছিল। প্রথমটি হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত সকল মন্ত্রীকে মেনে চলতে বাধ্য করা, যা একদলীয় শাসনে সম্ভব, কিন্তু বহুদলীয় ব্যবস্থায় অচল। দ্বিতীয় পথ যা তিনি নিতে পারতেন, তা হচ্ছে এই যে, তাঁকে সরকার ও ফ্রন্ট ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হত, কিন্তু সেটা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হত না। অতএব তিনি তৃতীয় পথ, অর্থাৎ সত্যাগ্রহের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অনশনান্তিক ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "গত নির্বাচনে জনগণ আমাদের সরকার গঠন করতে পাঠিয়েছিল। সরকারও গঠিত হল। কিন্তু দুঃখের কথা, শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশে ফ্রন্ট সরকার কাজ করল না। শুরু হল শরিকী সংঘর্ষ, হানাহানি। গ্রামে গ্রামে জ্বলে উঠল অশান্তির আগুন। এটাই কি যুক্তফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য ছিল? এর জন্যই কি জনগণ আমাদের ভোট দিয়েছিলেন? যাদের হাতে সরকার, তারা নিজেরাই যদি অশান্তিতে লিপ্ত হয় তাহলে দেশের মঙ্গল কোথায়?"

মুখ্যমন্ত্রীর অনশন-সত্যাগ্রহ সর্বাংশে না হলেও বহুলাংশে যে সফল হয়েছে এ-কথা বলা যায় এবং তা সার্থক হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী অনশন করেছিলেন বলেই। মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে বাংলা কংগ্রেস দলগতভাবে অনশন করলে তার প্রভাব এভাবে অনুভব করা যেত না। ভিন্নমত পোষণকারীরা এই সত্যাগ্রহকে তামাসা বলে ঘোষণা করেছিলেন; কিন্তু ব্যাপারটা যে তামাসা দাঁড়ায় নি, এ কথাটা আজ অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ অনশনব্রতী মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে গেছেন, নীরবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এসেছেন, সকলেই যে মুখ্যমন্ত্রীর সত্যাগ্রহ সমর্থন করবার জন্য গেছেন তা নয়, কিন্তু ব্যাপারটাকে কেউই লঘু করে দেখেন নি।

রাজনৈতিক দলগুলিও এই অনশনের ফলে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে, দু-একটি দল ছাড়া প্রত্যেকেই মুখ্যমন্ত্রীর অনশনকে প্রকারান্তরে সমর্থন জানিয়েছেন। এবং মুখ্যমন্ত্রীর এই অনশন তাঁর একান্ত বিরোধী দলকেও ভাবিয়ে তুলেছে। প্রত্যেকেই উপলব্ধি করছেন যে, একটা কিছু করা দরকার, যাতে আগামী ক'টা বছর মিলেমিশে কাজ করা যায়। ঐক্য-প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অনশনের এইটাই হল নীট ফল। এই অনশন বিভিন্ন শরিক দলকে অনেকটা কাছাকাছি এনে ফেলেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

কালো মেঘ কাটছে

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের অনশন ভঙ্গ করার পর যুক্তফ্রন্টের অচলাবস্থার অবসান যাতে হয় সেইজন্য বিভিন্ন মহল থেকে তৎপরতা শুরু হয়েছে। বুধবার রাত্রে অনেক মন্ত্রীর বাসভবনে রাজ্যের নয়জন যুক্তফ্রন্ট নেতা শ্রীসুশীল ধাড়াকে নিয়ে এক বৈঠকে বসেন। লোকসেবক সঙ্ঘের শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত ও শ্রীঅরুণ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সমস্যা সমাধানের আলোচনা করেন। শ্রীমাখন পাল বুধবার রাত থেকেই কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করেন। এ ছাড়া নির্দল ব্যক্তি হিসাবে শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর অনশনভঙ্গের পর বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকমণ্ডলীর প্রস্তাবের অপেক্ষাকৃত নরম সুর, রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরির উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর হাত মিলিয়ে দেওয়া প্রভৃতি ঘটনার ফলে যুক্তফ্রন্টের ভাগ্যাকাশের জমাট মেঘ একটু একটু করে হাল্কা হতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি পশ্চিমবঙ্গের সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনায় শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসুকে আপোষে সব বিরোধ মিটিয়ে মিলেমিশে কাজ করবার অনুরোধ জানিয়েছেন। বুধবার কলকাতায় এসে শ্রীগিরি রাজভবনে শ্রীমুখোপাধ্যায় ও শ্রীবসুকে পশ্চিমবঙ্গে সরকার সুষ্ঠুভাবে চালনায় তাঁর আন্তরিক ইচ্ছার কথা জানান। তিনি বলেন, আপনারা দুজনেই দেশভক্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের মঙ্গলকামী, আমি চাই আপনারা মিলেমিশে ভালভাবে কাজ করবেন। এই আলোচনাকালে শেষ কথা হল দুটি, দুজনেই বলেছেন—হ্যাঁ একসঙ্গে চলতে তো হবে। এ ছাড়া শ্রীগিরি জানিয়েছেন যে, প্রয়োজন হলে তিনি তাঁদের মধ্যস্থ হতে রাজী আছেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি সঠিক উপলব্ধি করেছেন যে, অজয়-জ্যোতির পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপরেই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

ঘটনাচক্র এখন কোন দিকে যাবে, তা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা এই মুহূর্তে

কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয় এবং কোন কিছুই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তবে আমাদের পক্ষে এটাই আশা করা ভাল যে, অতঃপর যুক্তফ্রন্টের শরিকেরা মিলেমিশে চলবেন। বৃহস্পতিবার একটি সাংবাদিক সম্মেলনে উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন, রাষ্ট্রপতির শাসনও বিকল্প সরকার বর্তমান অবস্থায় এর কোনটিই সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট ভিন্ন কোন উপায় নেই। পক্ষান্তরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন প্রশাসনিক সংকট সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে দেব না। কাজেই অনাবশ্যক আর জল ঘোলা না করে আপোষে পারস্পরিক বিরোধের বিষয়গুলি মিটিয়ে নিন, যুক্তফ্রন্টের সমস্ত শরিকদলের নিকটই আমাদের এই অনুরোধ। এই প্রসঙ্গে শ্রীসুশীল ধাড়াকেও আমরা অনুরোধ করছি যে, মুখ্যমন্ত্রীর অনশনের দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য যতটা সিদ্ধ হয়েছে, তার যে নৈতিক প্রভাবটা দেশের ওপর পড়েছে, বেশি বাড়াবাড়ি করে সেটুকু পণ্ড করবেন না। সময় মত থামতে জানাও দরকার।

কলকাতায় রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি হবার পর গত ৩রা ডিসেম্বর তারিখে শ্রীবরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি প্রথম কলকাতায় এলেন। মোট দু' দিনের সফরে রাষ্ট্রপতি তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ যথেষ্ট পরিমাণে রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রীগিরি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোতি বসুর মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনতে প্রথমে মধ্যস্থতার প্রস্তাব ও পরে রাজভবনে দুজনকে এক জায়গায় করে মিলেমিশে সরকার পরিচালনার অনুরোধ করেন। শ্রীগিরির আগ্রহেই শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় রাজভবনে থাকতে থাকতেই শ্রীজ্যোতি বসুকে ডেকে পাঠানো হয়। শ্রীগিরি শুধু বিরোধ মীমাংসা করার কথা নয়, উভয়কেই দিল্লীতে যাবার অনুরোধও জানিয়ে গেছেন।

বুধবার অপরাহ্ণ সাড়ে চারটের রাজভবনে ভারতীয় সংস্কৃতি ভবন কর্তৃক আয়োজিত সাক্ষাৎকারে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে একটি আলোচনায় মিলিত হন। জাতীয় সংহতি ও ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংহতি রক্ষা ও ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে প্রতিনিধিবৃন্দকে আশ্বাস দেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর প্রথম কলকাতা সফরে এসেই শ্রী ভি ভি গিরি ঘোষণা করেছেন, "কলকাতার সমস্যা জাতীয় সমস্যা। দিল্লী গিয়ে আপনারা দাবি জোরদার করে তুলুন, আমি তা সমর্থন করব।" কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর এবং ডেপুটি মেয়র শ্রীমণি সান্যাল বুধবার রাজভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কলকাতার সমস্যাবলীর প্রতিকারের দাবি নিয়ে দেখা করেছিলেন, এবং তাঁরা রাষ্ট্রপতির কাছে কলকাতা পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি তাঁদের বক্তব্য অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনেছেন এবং কলকাতার সমস্যা যে একটি সর্বভারতীয় ও জাতীয় সমস্যার অন্তর্গত সেকথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন। স্বয়ং ভারতের রাষ্ট্রপতির মুখ থেকে এই বক্তব্য উচ্চারিত হওয়ার নিশ্চয়ই একটি পৃথক গুরুত্ব ও মূল্য আছে।

তাঁর কলকাতাবাসের দ্বিতীয় দিনে অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের ৫০তম সাধারণ বার্ষিক সভায় রাষ্ট্রপতি দেশের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। শিল্পে এক অবিচ্ছিন্ন শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি একটি সাতদফা ফরমুলায় উল্লেখ করে বলেন, যে, অধিক উৎপাদনের লভ্যাংশ মালিক ও শ্রমিকের ভাগাভাগি করে নেওয়া উচিত। উভয় পক্ষকে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা ও বিশ্বাস রাখতে হবে। শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ না করে মালিক পক্ষকে তাঁদের কাছে সহযোগিতা চাইতে হবে। সংস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে এবং সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকেরা কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সে সম্পর্কে মালিকদের শ্রমিক পক্ষকে মাঝে মাঝে ভালভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা উচিত। ব্যক্তিগত ব্যাপারে শ্রমিক ও মালিকের মাঝে মাঝে বৈঠক করা উচিত। ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে রাষ্ট্রপতি বলেন যে, এর ফলে এক সুস্থ আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি ছিলেন ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা। তাঁর বক্তব্য একান্তই মামুলী বা গতানুগতিক মনে করলে ভুল হবে। তিনি খোলাখুলি মালিকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "কয়েকটি বিষয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে একমত, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে নই। যে সকল বিষয়ে আমি একমত নই, আমার নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী আমার নিজের ধারণাগুলিকেই সেক্ষেত্রে যথার্থ বলে মনে করি।"

কলকাতা পৌরসভার তরফ থেকে রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরিকে বিশেষ সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ডক মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। পৌরসভা প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় শ্রীগিরি বলেছেন, "আমাদের সংবিধানে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার, বিশেষ করে বাঁচার এবং কাজ করার অধিকারের কথা উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের বাইশ বছর পরেও এই আদর্শগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা হয় নি।"

'জনদরদী নেতা' হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে সম্বোধন করে মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর বলেন, "আপনি নিজেই বহুবার ঘোষণা করেছেন আপনি বিত্তহীনের দলে। জনতার মানুষ আপনি। জনতা আপনার কাছে ন্যায় বিচার পাবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে। শিল্প-সাহিত্যে ও মানবমুক্তির চিন্তায় এই মহানগরীর মানুষ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থাভাবে দীর্ঘকাল ধরে সরকারী অসহযোগিতায় এবং ক্ষমতাসীন দলের ব্যর্থতার ফলে এই মহানগরীর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। নানাবিধ অপপ্রচার এই মহানগরীর সম্বন্ধে বাইরে বিরূপ চিত্র তুলে ধরেছে। একজন সংবেদনশীল মানুষ ও রাষ্ট্রপতিরূপে আপনার কাছে আমাদের নিবেদন এই যে, আপনি নিজে এই মহানগরীর সমস্যাবলী পর্যালোচনা করে এর প্রতিকারের জন্য অগ্রণী হোন।" (৬-১২-৬৯)

সবিনয় নিবেদন

স্থানাভাববশত এ সংখ্যায় শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ঐতিহাসিক নিবন্ধ 'সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ', অনন্ত সিংহের বিপ্লবী-যুগের স্মৃতিকথা 'অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়', হরপ্রসাদ মিত্রের 'সাহিত্য জিজ্ঞাসা', 'বই বাছাই', বাংলা বইয়ের মেলা', সমীর মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্টাজ 'অন্য গ্রাম অন্য তরংগ' সুশীল জানার উপন্যাস 'সাগর সঙ্গমে', 'অগ্নিবর্ণ'-এর 'তিমিরপ্রান্ত ডুয়াস', সুনীল ঘোষের 'স্বাস্থ্য বিভাগের প্রমোশন রহস্য', শিলাজির রঙ্গমঞ্চ—'ওদেশে এবং এদেশে', 'গ্রন্থমেলা', 'পাঠকমন' প্রভৃতি রচনা প্রকাশ করা গেল না—এর জন্যে আমরা দুঃখিত। আগামী সংখ্যায় রচনাসমূহ যথারীতি প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদিকা

ভারতদর্শন

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে লঙ্কাকাণ্ড

হ্যাঁ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি ডিপার্টমেন্টাল অফিস পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছেন ছাত্ররা। মেয়েদের হস্টেলের সামনে একটা মোটর গাড়িতে আগুনও দেওয়া হয়েছে। কেন? ইতিহাসদপ্তরের জনৈক গাড়িচালক জনৈকা ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছে, এই অভিযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সেই ড্রাইভারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। সুতরাং লঙ্কাকাণ্ড।

আইন ও শৃঙ্খলা এবং তৎসহ জনৈকা ছাত্রীর ড্রাইভার কর্তৃক শ্লীলতাহানির প্রশ্ন। তবুও সংবাদটি কি আপনাদের নজরে এসেছে পাঁচ তারিখে? আসে নি। আসবে কি করে? পশ্চিম বঙ্গাল কাগজের সব পাতা জুড়ে বসেছে, নিউজ এডিটর জায়গা সঙ্কুলান করবেন কোথায়? আমি তো কলকাতার একটা বাঙলা দৈনিক (দৈনিক বসুমতী নয়) আতিপাতি খুঁজলাম; ৫।১২ তারিখে ঐ সংবাদ পেলাম না। জানি না, এলাহাবাদে যা ঘটল তা নিয়ে সংসদে জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র কিংবা অন্য অনেকে প্রশ্নবানের আঘাতে চ্যবন সাহেবের শান্তি বিঘ্নিত করবেন কি না। জানি না, এ নিয়ে সত্যাগ্রহ-টহের গ্রাসে পড়বে কি না উত্তরপ্রদেশ। তবে কমলাপতি ত্রিপাঠী দিল্লী গেছেন রাষ্ট্রপতিকে বলে কয়ে যদি সি বি গুপ্তকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে নিজে অথবা ইন্দিরাপন্থী নিজ দলকে মসনদাসীন করতে পারেন তার চেষ্টায়। মন্ত্রিসভা ভাঙার পক্ষে নারীর লাঞ্ছনা এবং আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন মস্ত হাতিয়ার। ঐ এক যুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মবীরকে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ত্রিপাঠীর হাতে উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্যে তথাপিও ঐ অস্ত্র ব্যবহৃত হবে বলে আমি সন্দেহ প্রকাশ করি না। যা পশ্চিমবঙ্গে শোভা পায়, অন্যত্র তা বেমানান।

পশ্চিমবঙ্গ চিরকালই ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে এসেছে। 'আজ যা বাংলা ভাবে, তামাম ভারত ভাববে তা অন্যদিন', এ কথা অবাঙালী নেতারই অনশ্বর উক্তি। তাই পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ দলবদ্ধ মন্ত্রিসভার বদলেই তা যতটা গুরুত্ব পাবে, অন্যত্র তা দিলে চলবে কেন? তাহলে গুজরাট তো আমেদাবাদের প্রশ্নেই টসকে যেত। আসামে কৃষকদের মেরে ধান অধিকারের (লক্ষা- টাউন—নির্মিলটারির হস্তক্ষেপ) প্রশ্নেও তো কিছু হতে পারত। দিল্লীর কামেস্ক প্রি কিংবা সাম্প্রদায়িকজনিত বিশৃঙ্খলার জবাবে সেন্টারে থরহরি কম্প হতে পারত। 'ভারতের ইয়েনান' শ্রীকাকুলাম নিয়ে কী না হতে পারত! রাজস্থানের ডাকাতদের শায়েস্তা করতে না পারার জন্য কত মন্ত্রিসভা ডিগবাজি খেতে পারত। তদানীন্তন পাতিল সাহেবের রেলগাড়ি যে দৈনিক ডিগবাজিতে রেকর্ড ব্রেক করেছিল, তাতে কারও কারও টনক নড়তে পারত। মানবহিতৈষী অনেকে না খেয়ে আত্মপীড়নও করতে পারতেন। মোরারজী সাহেবের অর্থনৈতিক হচপচে কত লক্ষ মানুষ রুজি-রোজগার খুইয়ে পথে বসেছিলেন, তাতে মোরারজী সাহেবের পথে-বসার কারণ ঘটতে পারত। কিন্তু সে সমস্ত কিছু হয় নি। সম্প্রতি মোরারজী-পাতিল আউট হয়ে গেছেন, অন্তর্দলীয় ক্ষমতা দখলের চক্রে কাটা পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে ধর্মবীরের আমলে খুন-রাহাজানির যে ফিরিস্তি বের হয়েছে তাতে বিজয় ব্যানার্জির চাবির ঝনৎকার শোনার আগেই ধর্মবীরকে ব্যাগ এ্যান্ড ব্যাগেজ হাতে ধরিয়ে বিদায় করা যেতে পারত। কিন্তু সে সব কিছুই হয় নি। তাহলে মোদ্দা কথা কী দাঁড়াচ্ছে? মোদ্দা বাত এই যে, 'সব ঝুটা হায়'। দেশ জুড়ে মানবদরদের বন্যা যে-ই ডাকান না কেন, তিনিও 'ঝুটা চিজ'। তিনি কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন দলীয় স্বার্থ মনে রেখে। জনগণের ধনপ্রাণ নিয়ে কারও এতটুকু মাথাব্যথা নেই।

'ভারতদর্শন' যবে থেকে লেখা হচ্ছে তখন থেকেই একটিমাত্র কথা বলবার চেষ্টা হয়েছে, তা হল, ভারত মহাসাগরের জল পলিটিক্সের বিষে নীল হয়ে গেছে, জনসাধারণ মুখে ফেনা তুলে মরছেন আর দলীয় নেতারা সমুদ্র মন্থন করে গরলটি সাধারণের মৃৎপাত্রে তুলে দিয়ে নিজেরা স্বর্ণপাত্রে অমৃত পান করে চলেছেন। এই নির্লজ্জ অবস্থাটাকে বার বার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার চেষ্টা 'ভারতদর্শনের'। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা হয় অন্ধ, নয় চোখে ঠুলি পরে বসে আছি। কিন্তু দুঃখ সেটাও নয়, দুঃখ হল, ঠুলি না হয় নেতাদের চোখে, সাধারণেও তাই বলে ঠুলি পরবেন কেন? ভারতবর্ষ তো আর ইডেন উদ্যান নয় যে, যে কোন কোম্পানী বিনা পয়সায় কাগজের রঙিন চশমা বিলি করলেই আদেখলের মতো সকলেই তা ধারণ করবেন। অথচ সেটাই হচ্ছে। মিছিমিছিই 'ভারতদর্শন' লেখা।

জনপ্রতিনিধিদের শৃঙ্খলাবোধ

আসলে ল' এন্ড অর্ডার কথাটা আজকাল কেবলমাত্র গায়ের জোরকেই বোঝায় এবং যেক্ষেত্রে মাথা গুণতির প্রশ্ন সেখানে বোঝায় দলের জোরকে। দেশে প্রকৃত ল' এন্ড অর্ডার আনতে হলে এম-পি, এম-এল-এ'দের মধ্যেই সেটা সর্বাগ্রে আনতে হয়। কিন্তু কে আনবেন? হাজার চাবন সাহেবের লগুড় কিংবা সহস্র অজয় মুখার্জির সত্যাগ্রহও তা আনতে অক্ষম। এই যে ত্রিশ বছর ধরে দলের ভোটে জেতা নেতারা যে নাম নিয়ে ফ্রন্টে গেছেন তাতে সিংহরাও গায়কোয়াড় ইন্দিরা গান্ধী-ক্যাম্পে নয়া ডিজর্ডার সৃষ্টি করে অর্গোনাইজেশন (সিন্ডিকেট) কংগ্রেসে ঢুকে পড়লেন, সেই যে রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা

একটি ঘোষণা

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীর 'খেলোয়াড়ি দুর্যোগ' আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে।

সদস্যরা বিকাকানের হাতে পসরামাত্রে পরিণত হয়েছিলেন এবং এখনও সিন্ডিকেট ও ইন্ডিকেট-এ হরদম জোর চেয়ারদের বিশৃঙ্খলার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে, আর ফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কিংবা গুজরাট-উত্তরপ্রদেশের মতো কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায়ও ধাক্কাধাক্কি এবং গলাধাক্কার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাচ্ছে, তাকে ঠান্ডা করবেন কে। মহাজনের পথে ইতরজন গমন করবেন এটা স্বাভাবিক, আর সেই ইতরজনের স্বার্থান্ধ ধাক্কাধাক্কিতে কিছু বিশৃঙ্খলা ইতি-উতি হবেও। কিন্তু তা নিয়ে গলাবাজি করবেন এমন সাধুপুরুষ ভূভারতে কে আছেন? যিনি আছেন, তিনি নিজের ও স্বদলের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন কি, হমলোগ সব সাচ্চা হায়! জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র, দিল্লীর কেন্দ্রীয় এস-এস-পি নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে ভিরমি খাচ্ছেন। কিন্তু স্বার্থের প্রশ্নে ও'রা যে শৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আসছেন এমন নজির কোথায় খুঁজে পাব? সিন্ডিকেটীরা গায়কোয়াড়ের প্রত্যাবর্তনে পুলকিত। লম্বা লম্বা ফিরিস্তি বের হচ্ছে। অন্যদিকে তাঁদেরই তারকেশ্বরী গান্ধী-সরকারকে বিব্রত করার জন্য 'রাজন্য-ভাতা বরবাদ কর' বলে চীৎকার করছেন। অর্থাৎ কর তো দেখি রাজন্য-ভাতার বিলোপ, ক্ষমতাটা দেখব—এই মনোভাব। রাজন্যবর্গও জানেন, সিন্ডিকেট শুধু পাল্টা শিবির ঘায়েল করবার জন্য মাঝে মাঝে চিৎকার-চাপাটি করছেন, কিন্তু ক্ষমতায় বসলে রাজন্য-ভাতা বিলোপ তো দূরের কথা তাঁরা নয়া রাজা-মহারাজার জন্ম দেবেন। তাই গান্ধী-ক্যাম্পটা রাজারা নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল বলে মেনে নিতে পারেন নি।

সুখে থাকার শৃঙ্খলা

অতএব রাজারা এখন দল পাকিয়ে এককাট্টা হওয়ার জন্য উৎসুক। রাজা এম-পি'রা এবার কেন্দ্রে একটি এক-মুঠো দল গঠন করে সিন্ডিকেট-ইন্ডিকেট গ্রুপের ওপর স্বীয় স্বার্থের টানা-পোড়েন শুরু করবেন বলে সংবাদ। ও'দের মোটা ভাতাটি বজায় রাখতে হবে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী বলছেন, ঐ ভাতা বিলোপ করা হবেই, তাতে যাই হোক। সংসদে যেরকম বিশৃঙ্খলা তাতে অনেকেই ভয় পাচ্ছেন, মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে কি না।

অহিংস সংসদ

ওদিকে উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের প্রশ্ন নিয়ে নয়া দ্বেষ-বিদ্বেষেরও সৃষ্টি হয়েছে। পি-এস-পি, এস-এস-পি, বি-কে-ডি (এ'রা গান্ধী গ্রুপের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশে মন্ত্রিসভা পাততে যাচ্ছেন) সিন্ডিকেট কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ আর স্বতন্ত্র গাঁটছড়া বাঁধছেন। ও'দের হিংসে, শ্রীমতী গান্ধী নাকি দুই কম্যুনিস্ট দলকে নিয়ে উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে একটি চক্র তৈরি করেছেন। ও'রা তাই নির্বাচন বয়কট করবেন।

ওদিকে নিজলিঙ্গাপ্পা এখনও তাঁর সাসপেন্ড করার ক্ষমতাব প্রভূত ব্যবহার করে যাচ্ছেন।

'মা হিংসী'—ভারতের সেই অনন্যসাধারণ বাণী গঙ্গার জলে বিসর্জিত। শৃঙ্খলা কোথাও নেই, না দলে, না নেতাদের মধ্যে, না সাধারণের মনে। সুতরাং কে কাকে দুষবেন? ভারতমাতা স্বয়ং লাঞ্ছিতা।

—৫।১২।৬৯

বন্ধুর পথ—

যে মুখখানির দিকে সবাই তাকিয়ে আছে তিনিই বলবেন

কারণটা ঃ

হেজলীন স্নো

হেজলীন স্নো-র মোলায়েম হাল্কা পরশ সেরা বিউটি ক্রীমেরই মতন।
আপনার মুখখানিকে দিব্যি সুন্দর নিটোল লাবণ্যে ভ'রে দেয়।
অপরূপ তরুণ কোমল কান্তিতে আপনার মুখখানি নির্মল হয়ে ওঠে।
ছোটোখাটো দাগ অতি স্বচ্ছন্দে ঢাকা পড়ে যায়···আপনার মুখে
ফুটে ওঠে এক স্নিগ্ধ কমনীয় আভা।
আজই আপনার হেজলীন স্নো-র সঙ্গে পরিচয় হোক দিনের পর দিন
সে পরিচয়ের সার্থকতা আপনার মুখখানিকে সুন্দর হ'তে সুন্দর
সুন্দর ক'রে তুলবে।

হেজলীন স্নো-তরুণের স্বপ্নমাখানো স্বাভাবিক কান্তির উৎস

দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাই লাই গ্রামের নৃশংস গণহত্যার কয়েকটি নিদর্শন

ভিয়েতনামঃ

মাই লাই গ্রামের নৃশংস গণহত্যার সংবাদে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নাৎসী জার্মানদের হাতে ইহুদীদের বর্বর হত্যার পর এতবড় নির্মম গণহত্যার সংবাদ আর পাওয়া যায় নি। নিকৃষ্টতম যুদ্ধাপরাধের সমগোত্রীয় এই গণহত্যা।

১৯৬৮ সালের মে মাসে এই ঘটনা ঘটে। বিশ মাস এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ গোপন রাখা হয়েছিল। যারা এই হত্যা-লীলায় অংশ গ্রহণ করেছিল, সেইসব মার্কিনী সৈন্যরাই আজ এই কাহিনী ফাঁস করে দিয়েছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে পিংকভিল এলাকার এক ক্ষুদ্র গ্রাম মাই লাই। ভিয়েত-নামে অবস্থিত মার্কিন সৈন্যবাহিনীর ১১তম ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত অ্যামেরিকান ডিভিশনের চার্লি কোম্পানীর সৈন্যরা মে মাসের একদিন এই গ্রামটি ঘিরে ফেলে এবং বেপরোয়া মেশিন গান, অটোমেটিক গান প্রভৃতির সাহায্যে কয়েক শত বেসামরিক লোককে হত্যা করে—এদের মধ্যে অধিকাংশই নিরপরাধ শিশু ও নারী। যুদ্ধ বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এদের সামান্যমাত্র যোগাযোগ ছিল না। এদের সঙ্গে কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। উন্মত্ত মার্কিন সৈন্যরা গ্রামের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং সব মানুষকে হত্যা করে। এক উইলিয়াম লজ ক্যালে একাই ১০৯ জনকে হত্যা করেছে।

হত্যালীলার তাণ্ডবে কি নৃশংস ও বর্বর কাণ্ড হয়েছে তার কিছু বিবরণ হত্যাকর্মে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের জবানিতে পাওয়া গেছে।

চার্লি কোম্পানীর এস-পি-৫ জে রবার্টস একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেনঃ

"চারদিকে মৃতদেহ, বাড়িঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে। এর মধ্যে ১৩ বছরের একটি মেয়েকে অসহায়ভাবে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। কজন মার্কিন সৈন্য জড়িয়ে ধরল মেয়েটিকে। একজন তার পরনের জামা ছিঁড়ে ফেলল, আর একজন খুলে ফেলল তার পাজামার দড়ি। তারা চীৎকার করে বলতে লাগলঃ আমরা দেখতে চাই 'এ কি দিয়ে তৈরি'। একজন বললঃ তুমি আমাদের রক্ষিতা। মেয়েটির মা ছুটে এল মেয়েকে বাঁচাতে। একজন সৈন্য মাকে লাথি মেরে ফেলে দিল, আর একজন তার মুখ বুট দিয়ে মাড়িয়ে দিল।"

রিচার্ড পেণ্ডেলটন বলছেনঃ

"১৫টি মৃতদেহের মধ্যে একটি বাচ্চা ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারপাশে আর কেউ নেই। ছেলেটির পরনে একটি সার্ট। মার্কিন সৈন্যদের নজরে পড়ামাত্র মেশিনগানের গুলীতে তারা ছেলেটিকে মেরে ফেলল।"

এই রকম সব ঘটনা, এই সব বীভৎস বর্বর কাণ্ডের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্বের অন্যান্য দেশে তো বটেই, খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সর্বত্র ধিক্কার করা হচ্ছে মার্কিন যুদ্ধবাজদের। প্রশ্ন উঠেছেঃ এই কি মার্কিন সভ্যতার পরিচয়?

রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষাসচিব মেলভিন লেয়ার্ড পর্যন্ত মাই লাই হত্যার নিন্দা না করে পারেন নি। তাঁরা সবাই "স্তম্ভিত"। নিক্সন এই হত্যার বিচারের ব্যবস্থা করে-ছেন। উইলিয়াম লজ ক্যালে, কোম্পানীর সার্জেণ্ট মেডিনা প্রভৃতির বিচার হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলঃ অপরাধী কি কেবল এই কজন সৈন্য? এরা তো ওপরওলাদের হুকুমে কাজ করেছে। আর কেবল মাই লাই বা সং মাই গ্রামের ঘটনা নয়, এরকম গণহত্যা এর আগেও কং হো রিন, ক্যান খো, থাং বিন প্রভৃতি গ্রামে হয়েছে এবং হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ, নারী-শিশুকে হত্যা করা হয়েছে।

ভিয়েতনামে মার্কিন বর্বরতার এই রূপ।

আজ যদি বিচার করতে হয়, তবে সমগ্র মার্কিন প্রশাসনের বিরুদ্ধেই বিচার করতে হবে। প্রতিকারও একটিইঃ সকল মার্কিন সৈন্যের বিনাসর্তে ভিয়েত-নাম ত্যাগ।

পাকিস্তানঃ

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ও চীফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইয়াহিয়া খাঁ ঘোষণা করেছেন, আগামী বছর ৫ই অক্টোবর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। 'এক মানুষ, এক ভোট' এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হবে।

নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে 'জাতীয় পরিষদ' গঠিত হবে, সেই পরিষদের কাজ হবে পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা। সংবিধান রচনার পর জাতীয় পরিষদ ভেঙে দিয়ে সংবিধানের ভিত্তিতে দেশে নতুন নির্বাচন, আইনসভা গঠন, প্রভৃতি হবে। ১২০ দিনের মধ্যে এই সংবিধান রচনা করতে হবে। যদি এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় পরিষদ সংবিধান প্রণয়ন করতে না পারে, তাহলে এই পরিষদ ভেঙে দিয়ে নতুন পরিষদ গঠন করা হবে। ইয়াহিয়া খাঁ বলেছেন, পাকিস্তানে সংসদী গণতন্ত্র ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা হবে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের পর গঠিত গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

যদি সত্যি ৫ই অক্টোবর পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হয়, তাহলে এই হবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এর আগে পূর্ব পাকিস্তানে একবারের জন্য সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল। কিন্তু এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ দলের ভরাডুবি ও যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্য দেখে করাচী-রাওয়ালপিণ্ডির কর্তারা আর ভুলেও সাধারণ নির্বাচনের কথা মুখে আনেন নি। আয়ুব খাঁর একনায়কতন্ত্রী শাসনে 'বুনিয়াদী গণতন্ত্রে'র যে নির্বাচন, তা আসলে নির্বাচনই নয়।

ইয়াহিয়া খাঁ ২৮শে নভেম্বর এক রেডিও ভাষণে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটির কথা ঘোষণা করেন।

নির্বাচনের ব্যাপারে ইয়াহিয়া খাঁর ঘোষণায় পাকিস্তানীরা খুব খুশি। এই সঙ্গে ইয়াহিয়া খাঁ আর একটি যে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন, তাতে তারা আরও খুশি। ইয়াহিয়া খাঁ বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট প্রথা ভেঙে দেওয়া হবে—তার জায়গায় আবার পূর্বের মত সিন্ধু, পাঞ্জাব, বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এই চারটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা হবে। পৃথক প্রদেশের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন চলছে।

মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ইয়াহিয়া খাঁ যখন আয়ুব খাঁকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন, তখনই তিনি বলেছিলেন, যথাশীঘ্র সম্ভব দেশে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি আবার সেনাবাহিনীর কাজে ফিরে যাবেন। তখন কিন্তু বিশেষ কেউ ইয়াহিয়া খাঁর কথায় গুরুত্ব দেন নি। সামরিক একনায়কেরা ক্ষমতা দখলের পর এমন কথা বলেই থাকেন। পরে তাঁরা একথা সম্পূর্ণ ভুলে যান এবং জবরদস্ত সামরিক একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। আর তাছাড়া পাকিস্তানে বহুবার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কখনও তা পালন করা হয় নি।

তবে নির্বাচন অনুষ্ঠান কিংবা সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি অথবা এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেহাৎ ইয়াহিয়া খাঁর ভালমানুষীর জন্য হয় নি। পাকিস্তানের উভয় প্রান্তে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে যে শক্তিশালী গণ-আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তার ফলেই এই দাবি আদায় সম্ভব হল।

নেদারল্যাণ্ডস্‌ঃ

কমন মার্কেটভুক্ত ছ'টি রাষ্ট্রের প্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল দু'দিন ধরে, ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর, হেগ শহরে।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি জর্জ পম্পিদু, পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যান্ডট এবং ইতালী, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্‌ ও লাক্সেমবার্গের প্রধানমন্ত্রীরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

এবারও নেদারল্যাণ্ডস্‌ ও পশ্চিম জার্মানী বিশেষভাবে চাপ দিয়েছে; বৃটেনের কমন মার্কেটভুক্তির জন্য। দীর্ঘদিন ধরে বৃটেন চেষ্টা করছে কমন মার্কেটে প্রবেশের জন্য। অন্য সকলের মত থাকলেও ফ্রান্সের ঘোরতর আপত্তি এ ব্যাপারে। এবারও ফ্রান্সের খুব একটা মত হয় নি। তবু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আগামী বছরের মাঝামাঝি কমন মার্কেটে প্রবেশের প্রশ্নে বৃটেনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা হবে।

কমন মার্কেটের দেশগুলির মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য স্থির করার প্রশ্নে সদস্যদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে। বর্তমানে যে ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে ফ্রান্সেরই লাভ বেশি হচ্ছে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পশ্চিম জার্মানী। কিন্তু মূল্য পরিবর্তনের জন্য পশ্চিম জার্মানীর দাবি ফ্রান্স মানতে রাজী হয় নি।

হেগ সম্মেলনে যোগদানকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মনে খোলাখুলি প্রশ্ন দেখা দিয়েছেঃ কমন মার্কেটকে টিকিয়ে রাখা যাবে তো? পশ্চিম য়ুরোপের দেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য বারো বৎসর পূর্বে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এই কয় বৎসরে খুব একটা সহযোগিতা গড়ে ওঠে নি। বরং অনেক ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝি বেড়েছে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতার পাশাপাশি রাজনৈতিক সহযোগিতার জন্য পশ্চিম য়ুরোপীয় য়ুনিয়ন, পার্লামেন্টারী য়ুনিয়ন, প্রভৃতি যে-সব সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে সেখানেও উৎসাহের অভাব দেখা যাচ্ছে।

এক সময় ছিল যখন সোভিয়েটের দিক থেকে পশ্চিম য়ুরোপ আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। তাই সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সর্বক্ষেত্রে পশ্চিম য়ুরোপের সংহতিসাধনের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আজ আর বিশেষ কেউ মনে করে না, সোভিয়েট য়ুনিয়ন বা তার সহযোগী কমিউনিস্ট রাষ্ট্র তাদের আক্রমণ করবে। তাই সংহতি প্রচেষ্টার উৎসাহ কমছে। তাছাড়া, পূর্ব য়ুরোপের বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশের সঙ্গে পশ্চিম য়ুরোপের দেশগুলির ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়ছে।

(৭-১২-৬৯)

শিশুদের উপযোগী বিখ্যাত বাংলা অনুবাদ

সাহিত্যম্‌		
পোপো	— বারজার	৪·০০
সাদা হাঁস	— থারবার	৩·০০
শান্তিযোদ্ধা মার্টিন লুথার কিং	— এড্‌ ক্লেটন	২·২৫
আদিম অরণ্য ধূসর মন	— চারল্‌স স	২·০০
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির		
অ্যাডভেঞ্চার্‌স অব হাকলবেরি ফিন	— মারকটোয়েন	৫·০০
গল্প শোন	— অ্যালডেন	২·৫০
হেনরি ফোর্ড	— নাইহার্ট	২·৫০
স্টুয়ার্ট লিট্‌ল	— ই, বি, হোয়াইট	২·৫০
এশিয়া পাবলিশিং কোং		
যাদু মানেই মজা	— বেকার	২·৫০
বাপীর গল্প	— ডে	৩·০০
নির্জন প্রান্তরে	— আই ফারট	৩·৫০
আমেরিকার কাহিনী (তিন খণ্ড)	— জনসন (প্রতি খণ্ড)	২·৫০
লোহার ঘোড়া চালালো যারা	— ম্যাক্‌ কল	২·৫০
আবিষ্কারের অভিযানে	— র‍্যাল্‌ফ ইল্যাপ	৫·০০
শরীরটাকে গড়ে তোল	— এ্যাস্টোন্যাসী ও বার	৪·০০
হোমশিখা প্রকাশনী		
সেই বালক ভানমার	— জিন গুল্‌ড	১·০০
ভমুদের সংগ্রাম	— রোলভাগ	১·০০
উপকথার নায়ক এ্যান্ডি বারনেট	— স্টুয়ারড্‌ হোয়াইট	১·০০
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং		
টিপ্‌ সকলিন	— জোসেফ মিয়াগার	৪·০০
মহাকাশ অভিযান	— নেওয়েল	২·০০

নানা বিষয়ে আরো অনেক বই ঃ পুস্তক বিক্রেতাদের উচ্চ কমিশন
তালিকা চেয়ে পাঠান ঃ আজই অর্ডার দিন

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ঃ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ঃ কলি-১২

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

গত সপ্তাহটি গেছে রাজ্য রাজনীতির এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহ। গত সপ্তাহে রাজ্যের এককালের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল পাকাপাকি হাঁড়ি ভাগ করে দু' ঘরে সংসার করতে শুরু করেছে। কংগ্রেস ভবনে এক তরফের সংসার চলছে আর এক তরফ নতুন সংসার পেতেছে হাজি মহম্মদ মহসীন স্কোয়ারে। একইভাবে হাঁড়ি ভাগ হয়েছে আজকের পশ্চিমবঙ্গের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি যুক্তফ্রন্টের। যুক্তফ্রন্টের নিজস্ব কোন বাড়ি বা সংসার নেই। তাঁদের সংসার বসে দরকার মত এখানে-সেখানে, কিন্তু তাঁরাও হাঁড়ি ভাগ করে বসে ছিলেন শহীদ মিনার আর কার্জন পার্কে। হিসাব-নিকাশ যেমন চলছে দুই কংগ্রেসের শক্তির, তেমনি হিসাব-নিকাশ হচ্ছে যুক্তফ্রন্টের দুই শিবিরের। এর মধ্যে আবার হয়ে গেল টালিগঞ্জ আর রায়নার নির্বাচন—সেখানেও হয়ে গেল শক্তির বিচার।

কংগ্রেস নিয়ে আজ আর কারও বেশি মাথাব্যথা নেই—কংগ্রেস ভবন ও মহসীন স্কোয়ারের বাড়িতে কখন কি ঘটছে তা নিয়ে বড় কেউ চিন্তিত নয়—কারণ কংগ্রেসের কোন ঘটনাই আজকের রাজ্য রাজনীতির সাগরে বড় বেশি তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারবে না। মানুষের চিন্তা-ভাবনা আর মাথাব্যথা যদি কিছু থাকে, তবে সেটা হল যুক্তফ্রন্ট নিয়ে, কারণ যুক্তফ্রন্ট হল সরকারী দল।

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে দুই প্রধান মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি আর বাংলা কংগ্রেস ময়দানে নেমেছে জনগণের কাছে। দুই পক্ষেরই লক্ষ্য বাহ্যত এক বলে বলা হচ্ছে—সেই লক্ষ্য হল যুক্তফ্রন্টকে শক্তিশালী করে যুক্তফ্রন্টের সরকারকে রক্ষা করা। আবার দু'জনের বিরুদ্ধে দু'জনের অভিযোগও কিন্তু এক। বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সি-পি-এম'এর অভিযোগ হল বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে চায়, তাই অনশনের পথ নিয়েছে। সি-পি-এম'এর বিরুদ্ধে বাংলা কংগ্রেসের অভিযোগও প্রায় এক—সি-পি-এম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভাঙতে চায়, তাই হিংসার পথে দেশকে জাহান্নমে নিয়ে যাচ্ছে। দুজনেই চলে এলেন জনগণের দরবারে। বাংলাদেশে জনগণের দরবার বরাবরই বসে এসপ্লানেড এলাকার মনুমেন্ট ও কার্জন পার্ক ঘিরে। সেই ১৯৪৮ সালে 'কালা কানুন' পাশ হবার সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত জনমত যাচাইয়ের যখনই প্রশ্ন এসেছে, তখন তার পরীক্ষার জন্য সকলে এসেছেন এই এসপ্লানেড এলাকায়। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে খাদ্য আন্দোলন যার চরম রূপ প্রতিফলিত হয় ১৯৫৯ সালে, যখন ৮০ জন মানুষ প্রাণ দেয় খাদ্য আন্দোলনে। এমন কি এই সেদিন যখন রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করে দিল, তখন আজকের যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সহ নেতৃবর্গ এসেছিলেন এসপ্লানেডে জনগণের দরবারে এবং গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনের নামে আইন অমান্য আন্দোলন করে কারাবরণ করেছিলেন। ৪৫ হাজার মানুষ জেলে গেল, প্রাণ দিল ১৮ জন ব্যক্তি। আজ আবার সেই জনমতের দরবার—দরবারে দাঁড়িয়েছেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল ধাড়া। ২৯শে নভেম্বর ও ২রা ডিসেম্বর শহীদ মিনারে সভা করে জনমতের কাছে বিচার চাইলেন শ্রীদাশগুপ্ত ও শ্রীবসু। কার্জন পার্কে অনশন করে বিচার চাইলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল ধাড়া। কিন্তু জনগণ কি রায় দিলেন? আদালতের রায় মেনে নেওয়াই হল আসামী আর ফরিয়াদী উভয়ের একান্ত কর্তব্য। আদালত অবমাননার অধিকার কারও নেই—তাই একটু বিচার করে দেখা যাক জন-আদালত কি রায় দিয়েছেন।

বাংলা কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করল হিংসা ও হিংস্রতা অবসানের লক্ষ্য ঘোষণা করে। ১লা ডিসেম্বর আন্দোলন শুরু। ২৯শে নভেম্বর ময়দানে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি সভা আহ্বান করল। কিন্তু ২৯শে ময়দানের সভা সি-পি-এম দলের ঐতিহ্যমত হল না, সভায় জনসমাবেশ সি-পি-এম দলের অন্য সভার তুলনামত ভাল হল না। ১লা তারিখে বাংলা কংগ্রেসের অনশন মণ্ডপে অনশন শুরু হল। কার্জন পার্কে অনশন থেকে কয়েক শত গজ দূরে আবার সভা ডাকা হল সি-পি-এম দলের। আগের বারের সভায় শুধু শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন, এবার সেই আকর্ষণ বৃদ্ধি করে বক্তা হিসাবে শ্রীজ্যোতি বসুকেও রাখা হল। এদিকে কার্জন পার্কে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় অনশনে বসেছেন—যে অনশন সম্পর্কে বলা হয়েছে জোতদার আর কায়েমী স্বার্থের স্বার্থ পুষ্টির আন্দোলন—কার্জন পার্কে চিড়িয়াখানা বসেছে ইত্যাদি বহু কথা বলা হল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কার্জন পার্কে যুক্তফ্রন্ট ভাঙার চক্রান্ত দেখতে বা চিড়িয়াখানা দেখতে মানুষের ভিড় বেশি। আর যুক্তফ্রন্ট ভাঙার চক্রান্ত দেখতে তাঁরাই সব এলেন, যাঁরা যুক্তফ্রন্ট গড়েছেন সেই সাধারণ মানুষের দল—জাতি নেই, ধর্ম নেই, পেশা নেই, সকলেই এলেন, অভূতপূর্ব ভক্তিতে অনশনব্রতী মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। তবে হ্যাঁ, আরও কিছু লোক এসেছিল, যাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বললেন—বাঁদরের দল। তারা ১লা ও ২রা দু'দিন ধরে অনশনব্রতীদের মুখ ভেঙচাল, ঢিল ছুঁড়ল, জুতো ছুঁড়ল, মাইকের তার কাটল, ইট মেরে মাথা ফাটাল, কারও মুখে প্রস্রাব করতে গেল, কারও পেটে ঘুঁষি মারল, মুখ্যমন্ত্রীর সামনে গিয়ে থুতু ফেলল, আরও কত কি? পুলিশ তাদের লাঠি-পেটা করল, তাড়া করল, ধরল মারল। কিন্তু দেখা গেল এইসব পরিস্থিতি মোকাবিলা করেও সহস্র সহস্র মানুষ অনশন মণ্ডপে এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করল। এই বাঁদরের দলকে শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার আগেই বলেছেন—এরা যুক্তফ্রন্টের শত্রু, ওরা তাঁদের দলের কেউ নয়। কিন্তু শ্রীকোঙার যদিও বললেন, তাঁদের দলের কেউ নয়, কিন্তু পুলিশ যাদের ধরল তাদের লাল রুমালও পাওয়া গেল, ধরা পড়ে লাল রুমাল গলায় বেঁধে পুলিশের পা ধরে কাঁদতেও দেখা গেল। আবার পুলিশের লাঠিতে আহত হবার পর একজনকে ময়দানে সি-পি-এম'এর সভা-মঞ্চেও তোলা হল। ২রা তারিখে কার্জন পার্কে যখন হাজার হাজার মানুষ পুলিশের লাঠি আর বাঁদরের দলের ঢিল অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে থেকে অবিচল

আছেন, তখন একই সময় শহীদ মিনারে সভা বসল রাজ্যের সি-পি-এম দলের সব-চেয়ে আকর্ষণীয় দুই নেতার শ্রীজ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্তের উপস্থিতিতে। কিন্তু অন্য কোন কথা না বললেও এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়—ময়দানে শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত অপেক্ষা কার্জন পার্কে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় অনেক বেশি মানুষকে তাঁদের শিবিরে পেয়েছিলেন। তাই জনতার আদালত শহীদানেডে রায় দিল তারা কোন্‌দিকে বেশি।

এই সময় রাজ্যে কিন্তু আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ রায় ঘোষণা হয়ে গেছে। সেই রায় হল রাজ্যের দুটি উপ-নির্বাচন। যে উপ-নির্বাচনে সি-পি-এম প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়িয়ে যুক্তফ্রন্টের কোন পরোয়া না করেই জনগণের রায় নিতে নেমেছিলেন। নির্বাচনে সি-পি-এম'এর প্রধান বক্তব্য ছিল তাদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উঠেছে, তারই বিচার হোক এই নির্বাচনে। এই কথা সত্য সি-পি-এম পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। জনগণের রায় নিঃসন্দেহে সি-পি-এম দলের নীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই নির্বাচনে সি-পি-এম নেমেছিল শুধুই একটা অহঙ্কারকে পুঁজি করে—সেটা হল আমরা একাই জনমতের রায় নেব, সেইখানে কোন ভাগীদার চাই না। এই ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য ছিল খুবই স্পষ্ট। শুধু শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারই যে একা বলেছিলেন—অন্য দল নয়, আমরা একাই নির্বাচনী-যুদ্ধ চালাব। এমন কি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক মঞ্চে সভা করব না, তা নয়। সি-পি-এম কলকাতা জেলার নেতা শ্রীসুধাংশু পালিত এই বক্তব্য আরও স্পষ্ট করে সি-পি-আই'এর কলকাতা জেলার নেতা শ্রীনন্দ ভট্টাচার্যকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীনন্দ ভট্টাচার্য চিঠি লিখলেন শ্রীপালিতকে যে, টালিগঞ্জ নির্বাচন নিয়ে কলকাতায় জেলা যুক্ত-ফ্রন্টের সভা ডাকা হোক। কিন্তু শ্রীপালিত স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, যুক্ত-ফ্রন্টের সভায় সি-পি-আই শিক্ষামন্ত্রী সম্পর্কে যে নোট দিয়েছিল, তারপর তাদের নিয়ে সভা করা বা কাজ করা কংগ্রেসকেই সহায়তা করা হবে। শ্রীনন্দ ভট্টাচার্য এর পরও আবার চিঠি দিয়ে-ছিলেন, কিন্তু ফল কিছু হয় নি। সি-পি-এম একাই লড়ে গেল এবং একা লড়েই জয়লাভ করল। অতএব বিচারে সি-পি-এম তার স্বপক্ষে জনমতের এই রায় পেয়ে নিশ্চয়ই এই কথা বলতে পারে—এই অহঙ্কার তাদের প্রাপ্য।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে কিছু অন্য কথা বলারও আছে। সত্যিই কি টালিগঞ্জ ও রায়নার নির্বাচনী সাফল্য খুব একটা ভাল রায় দিয়ে সি-পি-এম'এর পক্ষে কথা বলেছে? এই সম্পর্কে আমার মনে হয়, কোন আত্ম-সন্তুষ্টির ভাব পোষণ করা সম্ভব নয়। প্রথম কথা এই নির্বাচন যখন হল, তখন কংগ্রেস বলে কোন সংগঠন নেই। একটা মৃত শায়িত শবের সঙ্গে লড়াই হল তাজা, জোয়ান, প্রাণবন্ত কম্যুনিস্ট পার্টির। এই নির্বাচনের সময়েই কংগ্রেস ভাঙল। দু টুকরো হয়ে কংগ্রেসের কর্মীরা ছন্নছাড়া হল। অভিভাবকহীন হল। মাঠে-ময়দানে কংগ্রেসের কথা বলার কেউ ছিল না, সাহস করে কংগ্রেসকে ভোট দিতে যাওয়াও কারও পক্ষে সাধারণ কাজ ছিল না। কংগ্রেস সভা করতে পারে নি, কংগ্রেস নির্বাচনী অফিস করতে পারে নি, বুথ অফিস করা তো দূরের কথা, এমন কি সর্বত্র পোলিং এজেন্ট দিতে পারে নি। তবু লড়াই হল, কংগ্রেস টালিগঞ্জে ভোট পেল বারো হাজার, রায়নায় প্রায় কুড়ি হাজার। এই বারো হাজার আর কুড়ি হাজার ভোট অর্থাৎ মোট ভোটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ও দুই-তৃতীয়াংশ ভোট কংগ্রেসের ভোট নয়—এই দুই ভোটই হল মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নীতির বিরোধী ভোট। কারণ আগেই বলেছি কংগ্রেস বলে কোন সংগঠনের অস্তিত্ব নির্বাচনে ছিল না। শুধু তাই নয়, হিসাব করে যদি জনমতের যাচাই হয়, তবে আরও একটু বেশি করেই জন-মতের রায়টা হিসাব করা হোক না। যেমন রায়নায় কি রায় পেয়েছেন সি-পি-এম প্রার্থী। কতটা অগ্রগতির সূচনা দেখা যাবে এই রায়ে। রায়নায় ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট পড়েছিল ২৫৯৭৫, মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট পড়েছিল ৩০২৫৪, আর এই উপনির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট পড়েছে ২৮৫৩১। শুধু তাই নয়, মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস ভোট পেয়েছিল যেখানে ১৭৭৬৬, উপ-নির্বাচনে ভোট পেয়েছে ১৯৯৮২। রায়নায় নির্বাচন হল কোন্‌ সময়ে, যখন রায়না থেকে মাত্র সামান্য দূরে বড়শূলে সারা ভারত কৃষক সম্মেলন হয়ে গেছে—যে বড়শূলের পরিবেশগত প্রভাব রায়নায় পড়েছিল খুব বেশি আর রায়নার শতকরা একশো জন ভোটারই হল কৃষক, অথচ কংগ্রেসের ভোট এখানে বেড়ে গেল। কাজেই এটাও জনমতের একটা বিচার, চোখ খুলে সেই বিচারের রায়ও নিশ্চয়ই অনুভব করবেন। কার্জন পার্কে সহস্র সহস্র মানুষের আগমন আর নির্বাচনে মৃত কংগ্রেসের ভোট বৃদ্ধি—দুটোই একটু হিসাব করে দেখতে হবে বই কি। চোখ বন্ধ করে থাকা তো সঠিক রাজনীতির লক্ষণ নয়—এই কথা নিশ্চয়ই সকলে মনে রাখেন, সি-পি-এমও নিশ্চয়ই এই সত্য বিশ্বাস করেন।

ঠিক ছিল ৫ই ডিসেম্বর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যাবেন তমলুক শহরে সভা করতে। তমলুক অজয় মুখার্জির নির্বাচনকেন্দ্র। আর সেইদিনই তমলুক শহরে হরতাল ডাকা হল—এমন হরতাল যে, শহরে কোন গাড়ি যেতে পারবে না, কোন সভা হতে পারবে না। শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর তমলুক যাত্রা বাতিল করলেন, সভা হল না। হ্যাঁ, এটাও একটা জন-মত বই কি, যে জনমতে খুঁই বাধাট এড়াতে শ্রীদাশগুপ্ত তমলুকে জোর করে সভা করার কথা ভাবলেন না, হরতালকে সহজভাবে মেনে নিলেন।

—৬ই ডিসেম্বর '৬৯

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী

বিদ্যাপতির সমগ্র পদ

মূল্য : চার টাকা

জ্ঞানদাসের সমগ্র পদ

মূল্য : দুই টাকা

গোবিন্দদাসের সমগ্র পদ

মূল্য : দুই টাকা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সান্যাল এণ্ড কোং

বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

চাঁদ-সংবাদ

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ৩ ॥

প্রথম চাঁদে অবতরণকারী আর্মস্ট্রং বলেছিলেন,—চাঁদের বুকে আমার ছোট্ট একটি পদক্ষেপ মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে বিরাট একটি পদক্ষেপ বিশেষ।

কিন্তু বেঁটেখাটো ধরণের মানুষ কনরাড অন্য কথা বললেন। তিনি রসিকতা করলেন এই বলে যে,—আর্মস্ট্রং-এর মতো লম্বা মানুষের পক্ষে পদক্ষেপটি ছোট সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মতো বেঁটে মানুষের পক্ষে তা বেশ বড়।

কনরাড-এর কথায় হাসির জোয়ার বইল পৃথিবীতে: কিন্তু সন্দেহ-সংশয় সব ধুয়েমুছে গেল না। কারণ, প্রথম দিকে কনরাড-এর পদক্ষেপ ছিল অতি অনিশ্চিত। মনে হচ্ছিল, যেন সামনের দিকে অস্বাভাবিকরকম নুয়ে পড়েছেন তিনি।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কনরাড অবিশ্যি নিজেকে সামলে নিলেন। রসিকতা করে বীনকে বললেন,—ধুলো, রাশি রাশি ধুলো চারিদিকে! ওতে আবার ডুবে না যাই!

কনরাড-এর এই রসিকতা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কারণ, এই দশকের গোড়ার দিকেও অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল, যে কোনো রকম মহাকাশযান বা মহাকাশচারী চাঁদের ধুলোর মধ্যে ডুবে যাবে। যানটিকে বা মহাকাশচারীটিকে হাজার চেষ্টাতেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অনেকে আবার বলতেন, মহাকাশযান যখন চাঁদের পিঠে নেমে আসবে তখন তা থেকে স্থির তড়িৎ-শক্তির আকর্ষণে প্রচুর ধুলো উড়বে চাঁদের দেশে: এবং সেই ধুলোর ঝড় মহাকাশযানটিকে একেবারে ঢেকে ফেলবে। তখন কিছুতেই আর সে চাঁদের মাটি থেকে উঠে আসতে পারবে না।

তাছাড়া কোনো কোনো বিজ্ঞানী এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন যে, মহাকাশযানের বা পৃথিবীর আবহমণ্ডলের প্রথম সংস্পর্শে এসে চাঁদের পাথরগুলো হয় আপনা থেকেই জ্বলে উঠবে, আর না হয় মারাত্মক ধরণের বিস্ফোরণ সৃষ্টি করবে।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল, বিস্ফোরণ তো ওরা সৃষ্টি করেই না, আবার ধুলো উড়িয়ে আগন্তুককে সমাধিও দেয় না: দেখা গেল, ঠিক আর্মস্ট্রং আর অলড্রিন-এর মতোই কনরাডও দিব্যি হাঁটছেন চাঁদের দেশে।

—দ্যাখ তো! আমি কেমন চমৎকারভাবে হাঁটছি, বীনকে একবার জানিয়ে দিলেন কনরাড। এবং জানাবার একটু পরেই চট করে পাথর কুড়িয়ে নিয়ে স্পেস-স্যুটের পকেটে রাখলেন। কারণ, প্রতি মুহূর্তেই তাঁর ভয়, যদি হঠাৎ করে অভিযান বাতিল হয়ে যায়! তাড়াহুড়ো করে তাঁকে গিয়ে চান্দ্রযানে ঢুকতে হয়, তবে চাঁদের 'ঝঞ্ঝাসাগর'-এর অন্তত এই একটি পাথর তো সঙ্গে রইল!

এদিকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কনরাড সার্ভেয়ার-৩-কে দেখতে পেলেন। কাছেই একটি খাদের মধ্যে ছিল সেটা। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাস থেকেই ছিল। দীর্ঘ এই আড়াই বছরের গোড়ার দিকে ওই মহাকাশযানটি অজস্র ছবি পাঠিয়েছে পৃথিবীতে। পৃথিবীর মানুষকে বহু তথ্য সরবরাহ করেছে।

কনরাড এবার সার্ভেয়ার-৩-এর দিকে একটু এগিয়ে গেলেন। হিউসটনকে বললেন,—পুরনো বন্ধুটি আমার খুব কাছেই। ৬ শত ফুটের বেশি দূরে নেই সে।

এতক্ষণে আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। বীন এবার চান্দ্রযান থেকে নামলেন।

কিন্তু নামবার মুহূর্তে হঠাৎ যা হ'ল, এককথায় তাকে নাটকীয়ই বলা যায়। বীন হঠাৎ কবি হয়ে উঠলেন। সামনেকার একটি পাথরকুচির দিকে তাকিয়ে বললেন,—মানুষের শাসের ছোঁয়া পাবে বলে চার শত কোটি বছর ধরে

সেই কাশি ?

গ্লাইকোডিন এর

প্রভাবে

পালিয়ে বেঁচেছে!

কি ? আপনি বিশ্বাস করবেন কি, যে এই কিছুক্ষণ আগেও কষ্টদায়ক কাশিতে উনি নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন। উনি গ্লাইকোডিন খেলেন। গ্লাইকোডিন খেতেই ওঁর কাশি খুব অল্প সময়ে সম্পূর্ণ নিরাময় হ'ল।

কাশি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে গ্লাইকোডিন এর বাড়া আর কোন ওষুধ নেই

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত গ্লাইকোডিন এর ফর্মুলা সব আক্রান্ত অংশ থেকে কাশিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ আরাম দেয়।

- মস্তিষ্কে—কাশির হামলা নিয়ন্ত্রণ করে।
- গলায়—খসখসে ভাব থামায় ও জমাট শ্লেষ্মা দূর করে।
- বুকে—চেপে ধরা পেশিগুলিতে আরাম পাওয়া যায় ও শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ করে তোলে।
- ফুসফুসে—শ্লেষ্মাকে পাতলা কোরে বার কোরে দেয় ও কাশিকে দূরে তাড়ায়।

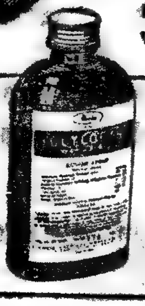

গ্লাইকোডিন

টার্প বসাকা

Alembic

কাশির জন্য বিশ্বস্ত, সর্বাধিক বিক্রীত গার্হস্থ্য চিকিৎসা

...rest/659b/ACW/bn

প্রতীক্ষা করছ তুমি। তোমার এই প্রতীক্ষা আজ সফল হল।

বলা বাহুল্য, বীন-এর এই কথা শুনে আমাদের মতো মানুষরা অর্থাৎ যাঁরা বিশ্বাস করেন বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিত্বের বিরোধ নেই, সেই ধরণের মানুষরা খুশি হলেন খুবই। কিন্তু কনরাড কিছুতেই যেন খুশি নন। সহযাত্রীকে নিয়ে সার্ভেয়ার-৩-এর কাছে না যাওয়া অবধি কোনোমতেই যেন শান্তি নেই তাঁর।

এদিকে সহযাত্রীটিও এগিয়ে আসেন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি। আধ ঘণ্টা বাদেই তিনি কনরাড-এর সঙ্গে যোগ দেন। এবং তারপর দুজনে মিলে চন্দ্রযানের অন্যদিকে যান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা উত্তোলন করেন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি চালু করেন।

চাঁদের অদ্ভুত-আশ্চর্য পরিবেশে দাঁড়িয়ে ওঁরা দুজনেই আনন্দে অধীর এবার। কারণ, এখন অবধি ওঁরা করণীয় সব কিছুই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেছেন। পাথর কুড়িয়েছেন নানা রকম। কুড়োবার আগে এবং পরে পাথরগুলো যে সব জায়গায় ছিল, তাদের ছবি তুলেছেন।

কিন্তু তবু কিছুতেই যেন মন মানে না ওঁদের। মন চায় চাঁদের বুকে আরও খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াতে।

ওদিকে হিউসটন থেকে কড়া হুকুম ভেসে আসে,—চাঁদে নেমেছ, অনেকক্ষণ। চার ঘণ্টা প্রায়। এবার চন্দ্রযানে ঢুকে বিশ্রাম নাও গে।

—আরও দুটি পাথর কুড়িয়ে নি. চাঁদের দেশ থেকে কনরাড-এর মিনতিভরা কণ্ঠ ভেসে আসে।

বীন বলেন,—অক্সিজেন প্রচুর মজুত আছে এখনও। আমাদের পিঠে ওদের যে আধার দুটি আছে, তাদের দৌলতে আরও দু-তিন ঘণ্টা আমরা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারি।

—না, ঘোরাঘুরি আর নয়।—কড়া নির্দেশ দেন হিউসটন,—এখনই চান্দ্রযানে ঢুকে পড়। তারপর ঘুমিয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ, খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সার্ভেয়ার-৩-এর দিকে যাবে।

—বেশ, তাই যাচ্ছি। চান্দ্রযানে ফিরছি এবার, ধমক খাওয়া শিশুর মতো কনরাড বলে ওঠেন। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই খবর আসে, হ্যাঁ, ওঁরা ফিরেছেন ঠিক।

পরদিন। ২০শে নভেম্বর, ভারতীয় সময় সকাল ৯—৩১ মিনিট। অ্যাপোলো-১২-র দুঃসাহসী দুই অভিযাত্রীর দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক অভিযান শুরু হল। চান্দ্রযান থেকে আবার নেমে এলেন ওঁরা। আবার চাঁদের মাটিতে পা দিলেন।

কনরাড এগিয়ে এলেন প্রথমে। হিউসটনকে বললেন,—আমি আবার চাঁদের মাটিতে।

৯ মিনিট পরে বীনও নেমে এলেন ওখানে। কনরাড-এর সঙ্গে মিলিত হলেন।

বীন চান্দ্রযানের চারপাশের মাটির চমৎকার বর্ণনা দিলেন এবার। বললেন, —ঠিক যেন চষা ক্ষেতের মতো, হাল্কা ধূসর এর রঙ।

কিন্তু তবু রঙের বাহার দেখে চোখ জুড়োবার অবকাশ তখন কই। তখনও অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে। তাই দুজনে এগিয়ে চলেন আবার। আবার মাটি ও পাথর কুড়িয়ে নেন। ব্যাগ ভর্তি করেন।

খানিকক্ষণ চলে এইরকম; এবং তারপর ওঁরা দুজন দুদিকে এগোন। বীন যান পশ্চিমদিকে একটা খাদ বরাবর; আর কনরাড গতকাল রেখে-আসা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে।

ওদিকে হিউসটন-এর হুকুম,—কনরাড, একটা পাথর গড়িয়ে দাও। খাদের গায়ে ঢালু জায়গা দেখে গড়িয়ে দাও ওটা। আমরা চাঁদে-বসানো সিসমোমিটার যন্ত্রটির ক্ষমতা পরখ করবো।

—বেশ, করুন পরখ,—বলেই কনরাড একটি পাথর গড়িয়ে দিলেন।

ওদিকে হিউসটন থেকে নির্দেশ আসে আবার,—কাল যেখানে যন্ত্রপাতি রেখেছ সেখানটা আর একবার ভালো করে দেখে এসো।

—দেখতেই তো যাচ্ছি, বলেন কনরাড; এবং ধীর ও শান্ত পদক্ষেপে তিনি যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে এগোন।

ওদিকে চাঁদের আকাশে সূর্য মাত্র কয়েক ডিগ্রি ওপরে। ঝঞ্ঝাসাগরের প্রশস্ত

দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥

রন্ধনশিল্পে অভিজ্ঞা
পারুল সেনগুপ্তের

দেশদেশের জলখাবার

এই নিদারুণ খাদ্য সমস্যার দিনে সস্তায় মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য তৈয়ারীর এমন অভিনব সংগ্রহ ইতিপূর্বে বাঙলায় ছিল না বললেই হয়। বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক রন্ধন-প্রক্রিয়ার বহুবিধ প্রকরণ এই গ্রন্থে আছে। প্রবীণা ও নবীনাদের পক্ষে অপরিহার্য বইটির ভূমিকা সুলেখিকা আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন—"দেশদেশের জলখাবার বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। শুধু নবীনা গৃহিণীরাই নয়, প্রবীণা জননী, ভগিনী, গৃহিণীরাও এর থেকে পরম উপকৃত হবেন। শ্রীমতী সেনগুপ্ত যে উৎসাহে, যে পরিশ্রমে ও যে নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে 'জলখাবার শিল্পের' বহুবিচিত্র পদ্ধতি সংগ্রহ করে সেগুলি অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ ক'রে সহজ সরল ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিয়েছেন তা বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।"

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !! মূল্য : ছয় টাকা

বসুমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

প্রান্তর জুড়ে আশ্চর্য রোদ। আর খানিকটা মাত্র দূরে চান্দ্রযানের দীর্ঘ প্রসারিত ছায়া।

এই ছায়াকে পেছনে ফেলে কনরাড পথ চলেন। চাঁদের দেশের অদ্ভুত পথ। ধুলো তার এখানে-সেখানে, গর্ত যত্রতত্র।

ওদিকে বীন ঘুরে বেড়াচ্ছেন অন্যদিকে। ক্যামেরা দিয়ে ছোটবড় পাহাড়ের ছবি তুলছেন। তাঁর পায়ের তলায় জল-বায়ু আর গাছপালাহীন রুক্ষ, নির্মম, উদাসী চাঁদ; আর মাথার ওপরে পীচের মতো গাঢ় কালো কুচকুচে আকাশ।...... নক্ষত্র অনেক সে আকাশে। গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দেওয়া একরাশ সোনা যেন।

হ্যাঁ, সোনা ওপরে; আর নিচে মৃত্যুপুরী। চাঁদের দেশটাকে কখনও বা অদ্ভুত সুন্দর মনে হয় বীন-এর। আবার কখনও মনে হয় মৃত্যুপুরী। মনে হয়, চার শত কোটি বছর ধরে মহামৃত্যুর সাধনা করছে সে। জীবনের সব রকম ছোঁয়া বাঁচিয়ে সে যেন নৈঃশব্দের বন্দনা করছে।

সত্যি, মহা-বন্দনায় রত যেন সে। সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে পৃথিবীকে সেলাম জানাতে জানাতে আদ্যিকাল থেকেই সে নির্বাক ও রহস্যময়।

ওই রহস্যপুরীতে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন বীন; এবং তারপর এসে কনরাড-এর সঙ্গে যোগ দিলেন। দুজনেরই পোষাক তখন ধূলিধূসরিত।...কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই কারও। চাঁদের মায়ায় ওঁরা তখন মশগুল।

আবার এগোচ্ছেন ওঁরা। এবড়োখেবড়ো চাঁদের প্রান্তর ধরে খুশিমনে হাঁটছেন।

হাঁটতে হাঁটতে একবার ওঁরা ছোট একটি খাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। হিউসটনকে বললেন,—সামনেই আমাদের খাদ। মাটি এখানে বেশ পিছল।

হিউসটন থেকে নির্দেশ এল সঙ্গে সঙ্গেই, হুঁশিয়ার!

—হুঁশিয়ার তো বটেই! সাবধানেই তো চলছি আমরা!—কনরাড ও বীন জানিয়ে দিলেন।

—বেশ, বেশ! চলো!—হিউসটনের সম্মতি মিললো।

এদিকে চলতে চলতে দীর্ঘ ২ ঘণ্টা ৭ মিনিট সময় পেরিয়ে যায়। হিউসটনের বিজ্ঞানীরা আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। হুকুম দেন আবার—শোন পথে সার্ভেয়ার-৩-এর কাছে যাবে, ঠিক করো।

চট করে কোনো জবাব আসে না। কারণ, কনরাড ও বীন তখন ওঁদের ধারে-কাছের এলাকাটা দেখে নিতে ব্যস্ত।

কিন্তু হিউসটনের বিজ্ঞানীদের ব্যস্ততা আরও বুঝি বেশি।

—এক মিনিট বিশ্রাম করে ভেবেচিন্তে এগোও,—বলেন ওঁরা।

—এগোচ্ছি!—নভশ্চরদের কণ্ঠস্বর আবার ভেসে আসে পৃথিবীতে। আবার ওঁরা চাঁদের দেশে পথ চলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সার্ভেয়ার-৩-এর কাছাকাছি পৌঁছন।

আশ্চর্য, আশ্চর্য ওই সার্ভেয়ার। আজ থেকে আড়াই বছর আগে চাঁদের দেশের এক গহ্বরে মন্থর-অবতরণ করেছিল সে; এবং এখনও সে ঠিক তেমনি আছে।

নভশ্চররা সার্ভেয়ার থেকে কয়েকটি যন্ত্রপাতি তুলে নিলেন। আর সেই সঙ্গে নিলেন তার টেলিভিশন-ক্যামেরাটিও।

বিজ্ঞানীরা এদের নিয়ে ধীরে-সুস্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। দেখবেন, অন্য একটি জ্যোতিষ্কে দীর্ঘকাল ধরে পড়ে-থাকা পার্থিব জিনিসের ওপর বিশ্বজগৎ কী ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ হবে খুবই। কারণ এর আগে ঠিক এ ধরণের সুযোগ মানুষের জীবনে আর কখনও আসে নি। পৃথিবীর ধাতব পদার্থ চাঁদের বায়ুহীন আকাশের নিচে কেমন করে টিকে থাকে, তা জানা যায় নি আজ অবধি। যদি এই রহস্য জানা যায়, তবে ভবিষ্যতে চাঁদে বা সৌরলোকের অন্যান্য গ্রহে-উপগ্রহে মানব-মহল্লা গড়ে তোলার কাজ সহজ হবে।

কনরাড ও বীন জানেন এসব কথা। তাই সার্ভেয়ার-৩ থেকে যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে সাবধানেই ওঁরা চান্দ্রযানের দিকে এগোন।

এগোতে কষ্ট হয় না বিশেষ। চাঁদের হাল্কা অভিকর্ষের মধ্যে স্বচ্ছন্দেই ওঁরা চলেন।

একবার এই স্বাচ্ছন্দ্যের কথা পৃথিবীকে জানিয়েও দেন ওঁরা। বলেন, —বেশ আনন্দেই হাঁটছি।

আনন্দ ওদিকে হিউসটনেও। ২০শে নভেম্বর ভারতের অপরাহ্নে দুই চান্দ্র-পথিক যখন চান্দ্রযানে গিয়ে বসলেন, হিউসটনেও তখন খুশির জোয়ার।

ভারতীয় সময় রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে হিউসটন নভশ্চরদের শুধোল,—সব প্রস্তুত তো?

—হ্যাঁ, প্রস্তুত, নভশ্চররা জানিয়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ।

হিউসটন বললো,—মাত্র ১০ মিনিট আর। রকেট জ্বালিয়ে দাও তারপর।

জ্বালানো হল। ভারতীয় সময় রাত ৭টা ৫৫ মিনিটে চাঁদের মাটি ছেড়ে উঠল চান্দ্রযান। প্রথমে ধীরে ধীরে উঠল, তারপর জোরে। প্রথম মিনিটে ওঠার জোর তৃতীয় মিনিটের দ্বিগুণ।

নিচে পড়ে রইল চাঁদের দেশ। পড়ে রইল 'প্রশান্তসাগর'। মানুষের পদচিহ্ন আঁকা রইল সেখানে। পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে না খেতে পেয়ে মরবে কত লোক! মরবে যুদ্ধে-বিগ্রহে! কিন্তু তাতে কী! পৃথিবীর মানুষ বুকে তাল ঠুকে তো বলতে পারবে, আমরা খেতে পাই নে বটে, কিন্তু চাঁদে যাই। পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছি আমরা? কিন্তু তাতে কী! চাঁদে তো আমাদের পদচিহ্ন আঁকা রইল।

॥ সমাপ্ত ॥

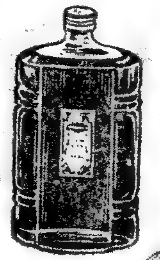

কেশ প্রসাধনের শ্রেষ্ঠ উপকরণ

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

এই অতুলনীয় সুগন্ধি কেশ তৈল চুলের গোড়া সতেজ ও পরিপুষ্ট রাখে, কেশগুচ্ছকে ঘন, সুদীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল করে তোলে এবং চুল পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই

কানপুর • দিল্লী

রোকেয়া অমনই মরুক। গায়ে হাত দেওয়া দূরে থাক, কাছাকাছিও ঘেঁষার উপায় নেই। অমনি ফোঁস করে উঠবে, বলি কি ভেবেছ তুমি? রোজা রাখতে দেবে না আমাকে? রসিকতা করে বলা যায় হয়তো, না, দেব না। কিন্তু তার আগেই আর এক অস্ত্র ছেড়ে বসবে, নিজে তো বেদ্বীন বেজাত। নামাজ নেই, রোজা নেই, কি যে ভেবেছ কে জানে!

শেষের কথা কটা রাগেরই। পারলে বাধহয় রোকেয়া তার ছায়া পর্যন্ত মাড়াত না। মোসলেমকে নিরীহভাবে বলতে হল শেষ পর্যন্ত, ক'টা রোজা হল বল দিকিন? গোটা পাঁচেক বোধ হয়। ভাবছি, কাল থেকে কলকাতায়ই থেকে যাই না কেন, রোজা কেটে গেলে ঘরে আসব?

ভুরু কোঁচকায় রোকেয়া। মোসলেম ভেবেই পায় না, এই ভয়ঙ্করী ভ্রূ-ভঙ্গিতে তার নতুন কি করণীয় থাকতে পারে। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এ এক নতুন সমস্যা, তিন বছরের মধ্যে ইতিপূর্বে আর দেখা দেয় নি। গত বছর কাঁচ প্রসব হয়েছিল, রোকেয়া রোজা রাখে নি। তার আগের বছর রোজা রাখার কথা হয়তো ভাবারই অবকাশ পায় নি, সময়টা এমনই ছিল। থাক গে, অতীত ভুলে থাকাই ভাল। কিন্ত এ বছর ব্যাপারটা তার

আগেভাগে ভাবা উচিত ছিল। বাড়িতে ঢোকা অবধি চলেছে, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। তখনও খানিকটা বেলা ছিল। আশা ছিল, এফতারের পরে ফাঁড়া কেটে যাবে। ওরে বাবা! এফতারের সময় রোকেয়া তাকে না-হক খানিকটা সরবত খাওয়ালে, এমন কি আদা-কুঁচি সহ এক-মুঠো ভিজে ছোলাও। তারপর ধরে দিলে নুন-তেল মেশানো এক কাঁসি মুড়ি।

—রোজা তো রাখা হয় নি বাপের। তা হক, এফতারি বাইরে বাইরে যাই কি করে?

এ পর্যন্ত মোটামুটি আশা-ব্যঞ্জক। কিন্তু মুড়ি খেয়ে তেল হাতটা মুছবে

বলে রোকেয়ার আঁচলে হাত দিতেই ও তিড়িং লাফ মেরে সরে দাঁড়ালো। সেই থেকেই ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অধিকন্তু দফায় দফায় জ্ঞান-দান।

রাত্রে বিছানায় শুতে এসে কাঁচকে মাঝখানে শোয়ালো। মোসলেম কোন মন্তব্য করল না, ঠিক আছে, সকালটাই হোক তো আগে। সটান ফিরে যাবে কলকাতায়, কাউকে কিছুটি না বলে। কোন মানে হয় এসবের। রোকেয়া কি তাকে ভালবাসে এতটুকু! ভালবাসলে এমন নিষ্ঠুরী হয়ে যায়! গোটা একটা সপ্তাহ পর সে বাড়ি ফিরল, আর তার অন্তরের সকল আশাকে ও কি না এমন নিষ্ঠুরভাবে দু-হাত দিয়ে চেপে রুদ্ধ করে রাখবে, যেহেতু ও রোজা রেখেছে। ভাল বাবা, তুমি তোমার রোজা নিয়ে থাক। ভাল কাজ, নেকির কাজ, পরকালের কাজ। বাধা দেওয়ার কিছু নেই। যা প্রাণ চায়, তাই কর। আমি বে-দ্বীন বেজাত, আমি মরে যাই। কাছে থাকলেই না বিপদ!

শুয়ে শুয়ে এমন করেই ভাবছিল। রোকেয়া কাঁচের গায়ে পাতলা কাঁথাটা টেনে দিয়ে বাঁ কনুই-এ ওপর-অঙ্গের ভর রেখে বললে, রাগ করেছো, হ্যাঁ গা?

—রাগ কোরো না, মিনতির সঙ্গে বললে রোকেয়া, রোজা ক'টা রাখতেই দাও। তুমিও রাখলে ভাল হত। তবে রাখতে যখন পারছই না, অন্তত আমি রাখি। আর কি আমাদের হৈ হৈ করে কাটাবার দিন আছে?

ভাল জ্বালাতন! কে যেন ওনাকে রোজা না রাখতে সাধাসাধি করছে!

—তাতই তো, রাখ না, মুখে অবশ্য এর বেশি কিছু বলতে পারল না।

রোকেয়া বলল, আইবুড়ো বেলায় দু-চারটের বেশি রাখি নি। বাবু রাখতে দিত না। এখন তো আর বাবার হুকুম খাটবে না। এখন তোমার হুকুমের আমল। ফরজ রোজায় অবশ্য তোমার হুকুমের দরকার নেই।

তবে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। আর ঘ্যানর-ঘ্যানর, প্যানর-প্যানর করা কেন। রাগের জ্বালায় মোসলেম পাশ ফিরে শুতে গেল, রোকেয়া কাঁচির ওপর দিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে তার গায়ে হাত রাখল। বলল, তুমি তো অবুঝ না, তুমি আমাকে কেনই বা বাধা দেবে?

লিনটাস-S. 64-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

এ যে রাতমত তত্ত্বজ্ঞান! মোসলেমের হাসি পেল। ক্লিষ্ট হেসে বলল, অন্তত আমাকে নিদ যেতে দাও তো।

—সেই ভাল। রোকেয়ার গলার স্বর শুনে মনে হল, যেন সে এটাই চাইছিল। বিশেষ উৎসাহিত ভঙ্গিতে আবার বলল, আমি তোমার মাথায় হাত বুলোই, তুমি নিদ যাও। এ্যাঁ!

বাঃ খাসা বুদ্ধি তো!

যাক গে, কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই! যা ঝঞ্ঝাট আজ রাতটুকুই তো। তারপর কাল সকালেই ভোঁ ভোঁ। কেয়া, তোমার রোজা রাখায় কেউ আর বিঘ্ন করবে না। মজবুত ইমানে তুমি রোজা রাখ। অগাধ নেকির হকদার হও। আমি তার বখরা চাই না।

সে পাশ ফিরে রোকেয়ার দিকে পিঠ করে শুলো। রোকেয়া আরও যেন একটু কাছে সরে এসে সত্যি সত্যি তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। একবার ভাবল মোসলেম, হাতটা সরিয়ে দেয়। কিন্তু সেটা খুব বাজে ব্যাপার হয়ে যাবে। মুখে মিনমিন করে বলল, থাক, তুমি নিদ যাও। কাঁচ আবার উঠে পড়বে।

রোকেয়া মৃদুস্বরে মিঠে করে বলল, এই তো ভাল লোক হয়ে গেছ। তুমি যে আমার সোনা।

'সোনা' কথাটাকে রোকেয়া উচ্চারণ করল টেনে টেনে, যেমন করে বরাবর বলে। তা ভিন্ন নেই হয়তো, মোসলেমের চোখ ভিজে উঠল। আজ রাত বৈ তো নয়। কাল সকালে—। বাস্তবিক সে আপাতত অবাঞ্ছিত। সে কাছে থাকলে রোকেয়া যদি মনে করে ওর রোজা রাখায় বিঘ্ন হবে এবং নেকি বরবাদ হয়ে যাবে এবং গুনা হবে, তার এখানে না থাকাই উচিত। কলকাতার বাসায় অবশ্য প্রায় সবাই রোজা রেখেছে, শুধু সে আর কাদের ছাড়া। দিনের বেলায় বাসায় রান্না বন্ধ। মুসলিম হোটেলও বন্ধ থাকে। তা হোক, ব্যবস্থা যা হয় একটা হয়ে যাবে, যেমন এ-ক'দিন হোল রেস্টুরেন্টে রেস্টুরেন্টে খেয়ে।

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে রোকেয়া বলল, কষ্ট হবে তোমার, হ্যাঁ গা?

দূরোর ছাই। রোকেয়ার হাতকে সে সরিয়েই দিল মৃদু ঝাঁকুনি মেরে। যথাসম্ভব সভ্য-ভব্য গলায় বলল, কষ্ট হবে কেন? এবারে নিদ যাও তুমি। আমিও নিদ যাই।

রোকেয়া আর কথা বাড়ালো না, কিন্তু তার মাথায় হাত বুলিয়ে যেতে লাগল। এক সময় তার মনে হয়েছিল, রোকেয়ার হাতের পরশ যথারীতি উষ্ণ, কোমল, সুন্দর।

রাত্রে সে স্বপ্ন দেখছিল, একটা বিরাট যেন মেলা বসেছে কোথাও। লোকে-লোকারণ্য। দোকানপাট নজরে পড়ে নি অবশ্য, তবে জমায়েত মেলারই মত চঞ্চল, চলমান। সে আর রোকেয়া একসঙ্গে হাঁটছে সেই ভিড়ের মধ্য দিয়ে। রোকেয়া যেন পদ্যে পড়া কেয়াপাতার দোলো। ভারি খুশি খুশি, চলন-লীলায় লীলাময়ী। সে বলল, চল কেয়া, ভিড় ছেড়ে পালাই। রোকেয়াও বলল, চল। অথচ নিরিবিলির সন্ধানে যত তারা এগোয়, ভিড় যেন ততই বেড়ে যায়। এর পরে সে হঠাৎ দেখল, রোকেয়া তার পাশে নেই। কোথায় গেল? সে চীৎকার করছে না, কিন্তু ভয়ঙ্কর খুঁজছে। যত খোঁজাখুঁজি করছে, ভিড় তত ভারী হয়ে উঠছে। কোথায় গেল রোকেয়া? কোথায় গেল? সে ভয় পেয়ে এবারে চেঁচিয়ে উঠল, কেয়া, কোথা তুমি? কেয়া, কেয়া, কে—এ—য়া—আ—আ —।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল মোসলেম। বুকের ধড়ফড়ানিটা একটু কমতে তার হাসি পেল। রোকেয়া ঘুমে অচেতন। ওর ঘুমটা কোন কালেই তেমন সাবধানী নয়। খুব অগোছালো। মাথা বুক কোমর পা এবং বেশভূষা ছন্দহীন অবসাদে ছড়িয়ে-মড়িয়ে আছে। রোকেয়া কি একটু রোগা হয়ে গেছে! তাই মনে হয় যেন। কণ্ঠার হাড় একটু বেশি প্রকট। ব্লাউজের হাতা ঈষৎ যেন ঢিলে ঢিলে। রোকেয়ার মুখে অবশ্য রুগ্নতার বা ক্লিষ্টতার ছাপ নেই। কিন্তু মুখটাই তো আর সব নয় মানুষের। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত্রে কখন উঠে রোকেয়া সেহরী করেছে, জানা নেই। সকালে ফজরের নামাজ পড়ে এসে তাকে ডেকে তুলল, আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে। অভ্যাসমত মোসলেম তাকে বুকে টেনে নিল। রোকেয়া প্রথমে বাধা দেয় নি। পরে ধীরে-সুস্থে তার বাঁধন ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, চা খাবে কি? না, নাস্তা করে দোব আগে?

মোসলেম ব্যতস্থ হয়ে বলল, না, কিছু খাব না এখন। তার মনে পড়ে গেল আজই তার কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা। আলস্যবশত এখুনিই অবশ্য বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না।

—নাস্তাই করে আনি, কেমন? শুয়ে থাক, বলে রোকেয়া বেরিয়ে গেল। একটু পরেই আবার কাঁচকে কোলে নিয়ে ঘুরে এসে বলল, কই ওঠ, কই গো?

মোসলেম উঠে বসল।

—কাল থেকে কাঁচকে তুমি একবারও কোলে নাও নি। বাব্বা, কী যে রেগে আছ! ঠোঁট ফুলিয়ে বলল রোকেয়া। কাঁচকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, জানিস কাঁচ, তোর বাপ রেগে টং হয়ে আছে, রোজা রেখেছি বলে।

ও আলতো করে কাঁচর মুখে একটা চুমু খেল, থান্টামোটা দেখেছো! মোসলেমের গা জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটু লজ্জাও হল। কি বলে একে? কাঁচর প্রতি ঈর্ষা? হঠাৎ একটা কর্তব্যজ্ঞানের উদয় হল তার মনে। গম্ভীরভাবে বলল, খুব তো ফরজ আদায় করা হচ্ছে। কাঁচ তোমার পিতোন্নো দুধও খাচ্ছে তো। যাক, সে উদাসভাবে শেষ করল।

—ই—ই—স্, ভারি যে দরদ ছেলের বাপের। কচি বুঝি শুধু আমারই দুধ খায়। এক বছরের ছেলে রে বাবা, ভাত খাচ্ছে, গাই-দুধ খাচ্ছে। আমারটা খায় নেশার মতন, তাও ছাড়িয়ে দোব ভাবছি।

ও, সে ব্যবস্থাও পাকা! সে হাত বাড়ালো কাঁচকে কোলে নেবে বলে।

—থাক থাক, ঢের হয়েছে, বলে গোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো রোকেয়া। চলেই গেল। যাবার সময় বলে গেল, মুখ ধুয়ে ফেল, নাস্তা আনছি।

রোকেয়াটা ছেলেমানুষ। মোসলেমের নতুন কাক বিষয়ক প্রবাদটা মনে পড়ে গেল।

কলকাতায় ফিরে যাবার কথা ওঠাতেই রোকেয়া গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, যা ভাল বোঝ কর। তুমি তো আর গোঁয়ার গোবিন্দ অবুঝ নও যে আমাকে সাত কাহন কথা বলে বোঝাতে হবে।

খোঁচাটা গুরুতর। তদবধি মোসলেম কলকাতা যাবার তোড়জোড় মুলতুবী রেখেছে। বাড়িতে রোজা রেখেছে বড়রা প্রায় সকলেই, এমন কি বোন মোমেনা-ও। বোধহয় পনেরোয় পা দিয়েছে মোমেনা। বাপ বারণ করছে কি না, এ তথ্য জানা হয় নি। যতদূর মনে হয় বাপ ও-কারবারে নেই, কাউকে রোজা রাখতেও বলবে না ভাঙতেও বলবে না। তাকে বরাবরই বলে এসেছে, কি, রোজা রাখ নি? বলবে আর মুচকি মুচকি হাসবে। মা বলে, বড় কাঁচর দ্বারা রোজা হবে নি। মাগো, যে দুষ্টু ছেলে, দশ বছর বয়েস পর্যন্ত মাথার কাছে খাবার না রাখলে ভোরের বেলা দাপা করত। বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে খাবার না পেলে হাঁড়ি-কুড়ি দূর করে টেনে ফেলে দিত। ওই ছেলে রোজা রাখবে!

অবশ্য দাদী বলেছে অন্য কথা।

—রাখবে নি যাবে কুথা? কান টানলেই মাথা আসে। এবারে বিবি রোজদার, বড় কাঁচ রোজা না রেখে যাবে কুথা? হ্যাঁ, বলতে পার ই-বছর লয়, উ-বছরে।

বিবিরই জয়-জয়কার। বেশ দেখাই যাক, ক'টি রোজা রাখে শেষ পর্যন্ত, সবে তো আজ ছ'টি। এখনও চব্বিশটি বাকি। নিজেই বলেছে, এখন আর বাবুর হুকুমের আমল নয়, তার হুকুমের আমল। ঠিক

আছে। এই আশায় যে আছ, আমি হুকুম দেব রোজা রাখতে ও-বাড়ে বাঁদি। তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল। এতসব ভাবতে তার মনে বেশ একটু আমোদ হল। খুরশেদকে বলল, চ' রে—জাল ফেলতে যাই। দেখি কি মাছ পাড়ে। ছোট ভাইকে কথাটা সে বলল অনেক উঁচু গলায়। রোকেয়া যেন শুনতে পায় স্পষ্টাস্পষ্টি।

যথেষ্ট শীত পড়ে গেছে। জাল ফেলা কষ্টকর। খুরশেদ নেহাৎই ছেলেমানুষ। তার পক্ষে হাত লাগিয়ে সাহায্য করা একেবারেই অসম্ভব। খিড়কির এই পুকুরটাও জঙ্গুলে। দুদিকে বাঁশঝাড়, একদিকে হিজলের বন। আলোর অভাবে সদাই কালো কুচ্ছিত। দাদীটা খিড়কির নম্বর ওয়ান। কথাটা বলেছে ভারি চালাকি করে। রোকেয়া অবিশ্যি নামাজ-টামাজ পড়ে। ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত লেখাপড়া করে ছাইভস্ম যা কিছু শিখেছিল, এক বর্ণও আর মগজে নেই। কিন্তু নমাজ যা শিখেছিল, সেটিতে খুব পোক্ত। নামাজ-রোজা সম্পর্কে সে ভালমন্দ কিছুই ভেবে দেখে নি কোন কালে। ইস্কুলে সংস্কৃত নিয়ে পড়েছে, বাপ ভালমন্দ কিছুই বলে নি। ভালভাবে পাশ করে ইস্কুল ছেড়ে কলকাতায় কলেজে পড়ার জিদ ধরেছিল। বাপ রাজী হয়ে গেছল। হোস্টেলে থেকে চার বছর পড়েছে। সওদাগরী অফিসে চাকরি জুটিয়েছে। বাপ সাড়ম্বরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। বাপের জগতে জমি আছে জমা আছে, চাষ আছে বান আছে, গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগী, উকুন-পুকুর, আগান-বাগান আছে আর আছে নামাজ রোজা, কোরাণ-শরীফ পাঠ, মিস্কিন খাওয়ানো, মিলাদ-মহফিল। সে-জগতে প্রবেশ করার আগ্রহ তার কোনকালে হয় নি।

সেই জগতেই রোকেয়ার বসবাস! এতদিনে বোধহয় ভিতরে প্রবেশেরও হক্ এসে গেছে। তেমন কোন পরিবর্তন সে দেখে নি ওর মধ্যে। কলকাতার জীবনের বিপুল গতিবেগের অন্তর্লীন ক্লান্তি এই আপাত-অখাদ্য জগতের একটি জীবন্ত নারীর সান্নিধ্যে সবটা দূর হয়ে যায়। খিড়কীর এই কালো-কুচ্ছিত পুকুরটাও তখন—মানস সরোবর বা ঐ জাতীয় কোন অমৃত-সরোবরে রূপান্তর লাভ করে। কিন্তু এর বেশি কিছু ভাবা তার পক্ষে ক্লেশকর। এর আগে একেবারেই ভাবে নি, এখন ভাবতে সে রীতিমত বিস্ময়বোধ করছে।

একেই বলে বরাত। জাল অর্ধেক টানা হতেই বুঝতে পারল, খুব বড়-সড় মাছ একটা আটকেছে। অকারণে চেঁচামেচি লাগিয়ে দিল। খুরশেদ তো সঙ্গেই আছে। মোমেনা ছুটে এল, মা বেরিয়ে এল এবং কাঁচিকে কোলে করে রোকেয়াও। সের পাঁচেক ওজনের বিরাট এক কাতলা, শিকারের মত শিকার। সোরগোল করতে করতে সকলে ধরে চলে গেল, রোকেয়া দাঁড়িয়ে রইল। পালানের দূরে বলল, এতক্ষণ পানি ঘাঁটছ, ঠাণ্ডা লাগবে নি?

আসলেম বিজয়ী বীরের ভঙ্গিতে হাসল তার দিকে তাকিয়ে। বলল, মুড়োটা কিন্তু আমার। এবং এ-বেলায়ই চাই। ও-বেলা চলে যাব কি না।

মাছ ধরে চান করে এসে বই পড়তে পড়তে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙলো রোকেয়ার ডাকে। উঠে দেখল ভাত আনা হয়ে গেছে, মধ্যমণি কাতলার আধখানা মুড়ো।

—কী গো, মন খারাপ হয়ে গেল, মাছের আধা দেখে? রোকেয়া ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করল। বলল, মা গোটাটাই দিতে চেয়েছিল। বলে, ছেলে আমার সখ করে নিজে হাতে ধরেছে। আমি জোর করে দু' ভাগ করলাম। ও-বেলা বাপের জন্যে অর্ধেক রেখে দিয়েছি।

সে প্রসন্ন হয়ে বলল, খুব ভাল করেছো। তারপর মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসল।

রোকেয়া বলল, মাছ কে রেঁধেছে বল দিকিন?

—কে আবার, তুমি! ভাত মাখতে মাখতে আসলেম জবাব দিল।

—কী করে জানলে?

—আমি জানি না বুঝি! তুমিই তো রাঁধ। আমি দেখলেই চিনতে পারি।

কথাটা সত্যি, সে বাড়িতে এলে রোকেয়াই রাঁধে। সবটা না হলেও, যে কটা তরকারি রাঁধে তা চেনা যায়। রোকেয়ার রান্নার হাতও খুব ভাল।

—তুমি একা খাও, আমি একটু আসি?

—কেন?

—কাঁচি নিদ যায় নি। মায়েরও হাতে কাজ। তাকে নিদ দিয়ে আসি।

একটা পিত্তেল-খুশি খোলে গেল আমার। মোসলেম হাসতে হাসতে বলল, বল না কেন, নোলায় পানি সরছে, বসে থাকা দায়।

—ধেৎ, বলতে আছে অমন করে। তুমি খাও, দেখি কাঁচিকে বরং এখানেই নিয়ে আসি। রোকেয়া চলে গেল।

মোসলেম খেতে খেতে অনুভব করল, কথাটা বলা ঠিক হয় নি। বাড়িতে এলে কখনও-সখনও তারা একসাথে খায়। রোকেয়ার প্রবল আপত্তি। প্রথম প্রথম খিল বেড়া লাগাতে হত। শ্বশুরকে-সম্মান দেয়ে দাদী একদিন ভয়টা ভেঙে দিয়েছে। —সে কি লো, তোর তো ভাগ্যের কথা, ভাতারের সাথে খাওয়া তো সুন্নত। মোসলেম আসলে মনের কাছে স্বীকারেই খাসমুনা, এই যা। খুঁটিয়ে আন্তরিকতার প্রমাণস্বরূপ যে একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছিল, রোকেয়া-প্রসাদাৎ এটুকুও অজ্ঞাত নেই তার।

জাল ফেলায় তার তেমন নেশা নেই, মাঝে মাঝে ফেলে এই পর্যন্ত। আজ ফেলল স্রেফ জেদের বসেই মুড়ো খাবে বলল, তাও জেদের বসে। কিন্তু কেন? কাজলা-কুচ্ছিত বাঁশবনে হিজলবনে ঘেরা পুকুরটাকে মনে পড়ে গেল, গত রাত্রে স্বপ্ন দেখে উঠে পড়ে রোকেয়াকে যে-ভঙ্গিতে দেখেছিল তা মনে পড়ে গেল। রোজা রেখেছে রোকেয়া, কে জানে সব কটাই রাখতে পারবে কি না। অথচ নিজের হাতে পরিপাটী করে মাছের মুড়ো রেঁধে তার সামনে তুলে দিয়েছে তিন বছর ধরে চেনা-চেনা হাসিমুখে। এমন আনন্দের ভোজ তো তাদের একসাথেই খাওয়ার কথা। প্রগাঢ় বিষণ্ণতার সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ভাতের গ্রাস মুখে না তুলে। তারপর ঘাড় হেঁট করে আনমনে খেতে লাগল, মাছের মুড়োটায় হাত না দিয়ে।

রোকেয়া কাঁচিকে কোলে নিয়ে ফিরে আসতে আসতে তার খাওয়া প্রায় হয়ে গেছল। রোকেয়া মাছের মুড়োর হাল দেখে হৈ-চৈ করে উঠল।

—কী হল, খেলে না কেন? লক্ষ্মীটি। রাগ করেছো?

—না।

—তবে?

—ও-বেলা খাব।

—কেন?

—একসঙ্গে দুজনে মিলে।

—ধেৎ।

—হ্যাঁ।

রোকেয়া কিছু বলল না। মোসলেম দেখল, ওর নাকের ডগা ফুলে ফুলে উঠছে। ঠোঁট সামান্য নড়ছে। ও বোকার মত কাঁচির মাথায় একটা চুমু খেলো। অস্ফুটস্বরে বলল, তুমি ভারি অসভ্য।

মোসলেম সস্নেহে হাসতে হাসতে বলল, এবং বে-দীন, বেজাত।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

২৮৫, টাকা মূল্যের বিশ্ববিখ্যাত

ন্যাশনাল ডিল্যুক্স ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার মাসিক ১০, টাকা কি স্তি তে লউন।

প্রত্যেক গ্রামে এবং শহরে পাঠানো যায়। আবেদন করুন:

IMPEX INDIA (W.B.C.)
P. B. 1045, Delhi-6

চুক্তি বানচালের চক্রান্ত

বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পে সংকট পুরনো জটিল রোগের মত হয়ে উঠেছে। অনেক আন্দোলন, অনেক আলোচনা, চুক্তি ইত্যাদি হয়েছে কিন্তু এই শিল্পকে কিছুতেই রোগমুক্ত করা যাচ্ছে না। শিল্পকে বাঁচাবার জন্য অনশন ধর্মঘট থেকে কর্মী ধর্মঘট পর্যন্ত অনেক কিছুই হয়েছে কিন্তু ফল তেমন কিছু হয় নি। সর্বশেষ চিকিৎসক যুক্তফ্রন্ট সরকার। তথ্যমন্ত্রী শিল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে দিয়েছিলেন যে, সেন্সর তারিখ অনুযায়ী ছবি মুক্তি পাবে। এই ব্যবস্থা হাউসের মালিকরা মেনে নিয়েছিল। তখন সকলে মনে করেছিল যাক এবার বাঁচা গেল। ছবির মুক্তির পথও নিরাপদ হল, এবার অন্য সমস্যার দিকে নজর দেওয়া যাবে। কিন্তু তিনমাস না যেতেই সেই একই অবস্থা। হাউসের মালিকরা চুক্তি মানবে না, বলছে না, কিন্তু ছবির প্রয়োজনা সময়ের তারিখে প্রযোজকের সঙ্গে পুরনো চুক্তি দেখিয়ে সেন্সর তারিখকে পেছনে ফেলার চেষ্টা করছে। ফলে হাউসের পছন্দমত ছবিকে মুক্তি দেবার পথটা তারা যথারীতি খোলা রাখছে। প্রকারান্তরে সেন্সর তারিখ অনুযায়ী ছবি মুক্তি দেবার চুক্তি বানচাল হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি মিনার বিজলী ছবিঘরের সঙ্গে 'মেঘ ও রৌদ্র' মুক্তি দেবার ব্যাপার নিয়ে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে—এই বিরোধের মূলে হাউস মালিকদের চুক্তিভঙ্গের মনোভাব।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। প্রত্যেক সিনেমায় বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার সরকারী নির্দেশ ছিল এবং এ ব্যাপারেও সরকারের সঙ্গে হাউস মালিকদের কথা হয়েছিল। কিন্তু সিনেমা মালিকরা এই নির্দেশের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে দেরি করে নি। প্রত্যেক সিনেমায় বাংলা ছবি দেখানো দূরে থাক, বাংলা ছবির সিনেমাগুলিতে হিন্দী ছবি দেখাতে শুরু করেছে। ভারতী, পূরবী, উজ্জলা, ইন্দিরা প্রভৃতি সিনেমায় হিন্দী ছবি দেখানোর ফলে বাংলা ছবির রিলিজ চেন আরো ছোট হয়ে গেল। গত কয়েক বছরে কমতে কমতে তিনটি রিলিজ চেনে এসে ঠেকেছিল, সেক্ষেত্রে এখন রিলিজ চেন দুটির বেশি বলা যায় না। সেন্সর তারিখ অনুযায়ী চুক্তি এবং বাংলা ছবি প্রদর্শনের কথা স্বীকার করেও সিনেমা মালিকরা সাবোটাজের এমন সুন্দর কৌশল অবলম্বন করেছে যে, বাংলা ছবি মুক্তির জন্য সিনেমার সংখ্যা কমে গেল, আর হিন্দী ছবি দেখাবার সিনেমা আরো বেড়ে গেল। সেন্সর তারিখ অনুযায়ী ছবি মুক্তি পেলে সিনেমাগুলিতে কালো টাকার আদান-প্রদান কমবে, অর্থাৎ ঘুষ দিয়ে ছবির মুক্তি পেতে হবে না বলে যাঁরা মনে করেছিলেন, তাঁরা হতাশ হয়েছেন। কারণ কালো টাকার লেন-দেন ঠিকই চলছে। হিন্দী ছবির ক্ষেত্র প্রসারের জন্য এই জোরজুলুম আরো বেড়েছে।

এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় বাঙালী প্রযোজকরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। স্টুডিওগুলিতে কাজ কমে গেছে। টেকনিশিয়ানরা বেকার হয়ে যাচ্ছেন। মাঝারি পর্যায়ের শিল্পীদের কাজ নেই। ছোট শিল্পীদের কথাও বলার নয়। অভিনয়ের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই যাঁদের স্বার্থে কুলোচ্ছে তাঁরা যাত্রার দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু যাত্রাদলে কত শিল্পীর সংকুলান হতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গে যখন চলচ্চিত্র-শিল্পে সংকট এত তীব্র হয়ে উঠেছে তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশনের ভূমিকা কি—তা লক্ষ্য করার মত। এই প্রতিষ্ঠানে হাউস মালিক থেকে প্রযোজক —সকলে সহাবস্থান করছেন। কিন্তু শিল্পকে বাঁচাবার জন্য এঁদের ভূমিকা চোখে পড়ে না কেন? তার কারণ চলচ্চিত্র-শিল্পের একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা এই প্রতিষ্ঠানকে দখল করে আছে। যারা সিনেমার মালিক তারাই পরিবেশক ●

'অপরিচিত' ছবির নায়িকা অপর্ণা সেন 'এখানে পিঞ্জর' ছবিতে অভিনয় করছেন

প্রযোজক হয়েছে। সুতরাং সরকারী নির্দেশ ও চুক্তিকে নস্যাৎ করার কলা-কৌশল এদের আয়ত্তের মধ্যে।

চলচ্চিত্র-শিল্পের একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা সরকার, চলচ্চিত্রকর্মী ইউনিয়ন এবং স্টুডিও কর্মীদের সমিতির সঙ্গে চমৎকার প্রহসন অভিনয় করছে। চুক্তিতে স্বীকৃত—কিন্তু চুক্তি মানছে না। এই পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্র-শিল্পের নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে। অবিলম্বে এবং শক্ত হাতে যদি এর প্রতিকার করা না যায় তবে শিল্পের অবস্থা আরো খারাপ হবে। এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন জানি না। সরকার যদি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্পের বিপদ আরো বাড়বে। —সুজন

দিল্লীতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

গত ৫ই ডিসেম্বর দিল্লীতে চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন হয়েছে। এই উৎসবে ৩৪টি দেশ অংশ গ্রহণ করেছে। আগের তিনটি উৎসবের তুলনায় এই সংখ্যা বেশি এবং এবারের উৎসব প্রতিযোগিতামূলক। বিশিষ্ট অতিথির সংখ্যাও এবার বেশি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী ও পরিচালকরা উপস্থিত হয়েছেন। দিল্লীর বিহোন ভবন ও মবলঙ্কার অডিটোরিয়ামে উৎসব হচ্ছে। এই সঙ্গে নয়টি সিনেমায় উৎসবের ১৪টি প্রতিযোগিতামূলক ছবি দেখান হচ্ছে।

এই উৎসব সম্পর্কে বিস্তারিত খবর কলকাতার পত্রিকা অফিসগুলিতে আসে নি। দিল্লীর পত্র-পত্রিকা দেখে খবর সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এদিক থেকে উৎসব পরিচালক দপ্তরের ভূমিকা খুবই দুর্বল। এই উৎসবের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। দিল্লীতে প্রদর্শিত ছবিগুলির কয়েকটি কলকাতাতে দেখান হবে।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক উৎসবে যে ছবিগুলি এসেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোভিয়েতের 'আনা কারেনিনা', 'আনফরগেটেবল' এবং আরো কয়েকটি ছবি। ইতালীর ভিসকন্টির 'দি ড্যামড', সিংহলের 'গোলু হাডাওয়ানা', চেকোশ্লোভাকিয়ার 'ফ্যানি ওল্ড ম্যান', পোল্যান্ডের 'রেড এন্ড গোল্ড', আমেরিকার 'দি স্টেয়ার কেস' প্রভৃতি।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক উৎসবের বিচারকগণের মধ্যে রয়েছেন: ড: জের্জি তোরেপলিৎস (পোল্যান্ড), আলেকজান্দার ঝার্কি (সোভিয়েত), জন রাসেল টেলর (বৃটেন), নেলসন পেরারা ডস সনটোস (ব্রাজিল), রাজকাপুর ও আর, কে, নারায়ণ (ভারত)।

আমন্ত্রিতদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন সুইডেনের বার্গম্যানের ছবির নায়িকা ইনগ্রিড থুলিন, সোভিয়েতের তামারা মাকারোভা, ইরিনা কোরোতস্কোভা, সের্গেই গেরাসিমভ, লাতিন আমেরিকার জোয়ে নিলসন, ডেনমার্কের বার্ট হানস্মী প্রমুখ।

চিত্র আলোচনা

অপরিচিত

নসিত দত্ত পরিচালিত 'অপরিচিত' মুক্তিলাভ করেছে। সমরেশ বসু রচিত কাহিনী এই ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন।

ছবির কাহিনী তৈরি হয়েছে সুনীতাকে কেন্দ্র করে। সুনীতা এক সুন্দরী মেয়ে। শহরের ধনী প্রিয়নাথ দাসের আশ্রিতা। পারমিট আর কনট্রাক্ট যোগাড়ের জন্য সে সুনীতাকে ব্যবহার করে আর তাকে ভোগ করে। হঠাৎ তার খেয়াল হল সে নির্বাচন প্রার্থী হবে। সে-ব্যাপারে বদনামের হাত থেকে বাঁচবার জন্য নিজের সেক্রেটারীকে রাজী করায় টাকার বিনিময়ে সুনীতাকে বিয়ে করতে, আর সুনীতাকে তার জন্য দেড় লাখ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর মধ্যে এসে পড়ে রঞ্জন নামে এক ধনীর ছেলে, যে গুণ্ডা নামে পরিচিত। সুনীতাকে পাবার জন্য তার তীব্র বাসনা, কিন্তু সুনীতার মনের খবর সে রাখে না। যখন সুনীতাকে নিয়ে প্রিয়নাথ আর রঞ্জনের মধ্যে টানাটানি, দরকষাকষি চলছে সে সময় মাঝখানে এসে পড়ে সুজিত। সুজিত স্নায়বিক রোগের চিকিৎসালয় থেকে সদ্য মুক্তি পেয়ে এসেছে। জীবনের কোন জটিলতার কথা সে জানে না। মানুষকে সে মানুষ বলেই জানে। হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থের লালসা তার নেই।

সুনীতা দেখল এই মানুষটি ভিন্ন জাতের। আর নিজের জীবনের আরনায় দেখল সে একটা পণ্যদ্রব্যের মত। তার দেহ নিয়ে কেনা-বেচা চলেছে, যার বেশি টাকা সেই তাকে ভোগ করবে। তার নিজস্ব সত্তা নেই, ভালবাসা নেই, হৃদয় নেই। সাজানো পুতুলের মত তার জীবন। সে এই জীবন থেকে মুক্তি চাইল। সুজিতকে সে বিয়ে করতে চাইল। সুজিত রাজী হল—এক অসহায়া নারীকে মুক্ত করার চিন্তায়। কিন্তু সুজিতকে আর একজন যে ভালবাসে সে-কথা সুজিতের অজানা নয়।

কিন্তু রঞ্জন সুনীতাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে। সুজিতের কল্যাণ কামনায় সুনীতা রঞ্জনের কাছে আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু মনের দিক থেকে পারে না, তাই বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে উঠে পালিয়ে যায়। তবু নিস্তার নেই, রঞ্জন সেখানেও উপস্থিত হয়। রঞ্জনের ঈর্ষা আর কামনার আগুনে সুনীতার মৃত্যু ঘটে, আর সুজিত তথাকথিত সভ্য সমাজের চেহারা দেখে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এই ছবিতে বর্তমান সমাজব্যবস্থা এবং ধনীদের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ রয়েছে। এই সমাজের সংবাদপত্র মালিক থেকে 'বিশিষ্ট' ব্যক্তিদের মুখোস খুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। প্রিয়নাথের মত ভদ্র 'বিশিষ্ট ব্যক্তি', তার সেক্রেটারী শিবেনের মত কাপুরুষ 'ভদ্র সন্তান' আর বীরেন্দ্রের মত বিবেকহীন অর্থলোভী সংবাদপত্র মালিক সমাজের ওপরের স্তরের চিত্রটি প্রকাশ করেছে। যারা এখনো সমগ্র সমাজের ন্যায়-নীতির কর্তা হয়ে আছে। তারই পাশে রয়েছে সুজিতের মত এক সাধারণ মানুষ। এই জটিল সমাজে যারা

ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতীক।

বেঁচে থাকার অযোগ্য হয়েছে। ওপরের স্তরের সমাজের লোভ লালসার বলি সুনীতার মত মেয়েরা কেবল নয়, সাধারণ মানুষ। ছবির এই বক্তব্য সরলভাবে মোটা দাগে বলা হয়েছে। উচ্চস্তরে এই কথাগুলি বলতে যাওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রশ্ন উঠেছে। শেষের অংশে কাহিনী অনর্থক ঘুরপাক খেয়ে দৈর্ঘ্য বাড়ানো ছাড়া বিশেষ কাজের কিছু হয় নি। সুনীতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ের দৃশ্যতে যেখানে কাহিনী শেষ হয়ে যায় সেখানে রঞ্জনের পরিণতি দৃশ্য দেখানো অপ্রয়োজনীয়। সুজিতের মানসিক অবস্থার কথা বহু আগে বলার সুযোগ পাওয়া গেছে। এ-কারণে ছবিটি প্রথম দিকে যেরকম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে শেষের দিকে সে তুলনায় পারে নি। প্রথম দিকের বক্তব্যের সামঞ্জস্যও থাকে না। সুসম্পাদিত হলে আরো রস সৃষ্টি করতে পারত।

অভিনয়ে সুনীতার চরিত্রে অপর্ণা সেনকে মানায় নি। এখনো তাঁর মধ্যে কিশোরীসুলভ ভাব রয়ে গেছে বলে এরূপ পোড়-খাওয়া একটা নারী-চরিত্রে তাঁকে উপযুক্ত মনে হয় না। উৎপল দত্তের অভিনয়ে অভিনয়ের কৃত্রিমতা চোখে পড়ে। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সংযত এবং স্বাভাবিক। সন্ধ্যা রায় অভিনীত এক সরল তরুণীকে দর্শকদের ভাল লাগবে। দুটি চরিত্র নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে উত্তমকুমারের রঞ্জন আর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুজিত। দুই বিপরীত-ধর্মী চরিত্রে দুজনে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন ভবানী চৌধুরী, তরুণকুমার, বিকাশ রায়, দিলীপ রায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সঙ্গীত পরিচালনায় রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রশংসনীয়। দু'-একটি গান যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

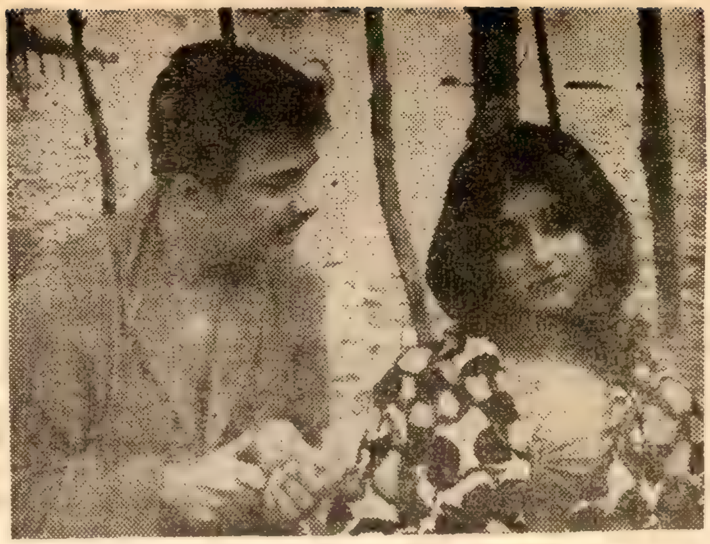

সলিল দত্ত পরিচালিত 'অপরিচিত' ছবির একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন

স্টুডিও খবর

শাস্তি

রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের চিত্ররূপ দিচ্ছেন স্বদেশ সরকার। ছায়ালিপি নামে এক সংস্থা এই ছবির প্রযোজনা করছে। সম্প্রতি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ছবিটি দেখে প্রশংসা করেছেন বলে জানা গেল। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চ্যাটার্জী, গীতা দে, কালী ব্যানার্জী, দিলীপ রায়, অজিতেশ ব্যানার্জী, জ্ঞানেশ মুখার্জী, ও প্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ।

সংবাদ কণা

হাওড়ায় আধুনিক নাট্যমঞ্চ

হাওড়ার সালখিয়া অঞ্চলে নবপ্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র সদনে এক নতুন প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করা হয়েছে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, দর্শকদের বসার ব্যবস্থা, আলো ও পাখার ব্যবস্থা, শিল্পীদের মেক-আপ রুম ইত্যাদিতে এই প্রেক্ষাগৃহ সম্পূর্ণ আধুনিক। পাঁচ শ' দর্শকের বসবার ব্যবস্থা আছে; প্রয়োজনে আরো কিছু আসন যোগ করা যাবে। হাওড়া শহরে এরূপ একটি প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করা নাটকের দলগুলির পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। হাওড়া নর্থ ক্লাব বহু অর্থব্যয় এই প্রয়োজন মিটিয়েছেন। হাওড়া নর্থ ক্লাবের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানা গেল—এই প্রেক্ষাগৃহ নাটকের দলগুলিকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। তাঁরা চান কলকাতা ও হাওড়ার প্রখ্যাত দলগুলি এই মঞ্চে অভিনয় করুন। এই মঞ্চে অভিনয় করতে হলে ২৪ নম্বর সুবার্বন পার্ক রোড (হাওড়া) রবীন্দ্র সদনের দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

সদ্য প্রকাশিত হইল !
বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ
সায়ন মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত
বেদান্ত-গ্রন্থ
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ
বেদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ
অনুবাদক
পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ
১ম খণ্ড মূল্য চার টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

ক্রিকেটের আনন্দ

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

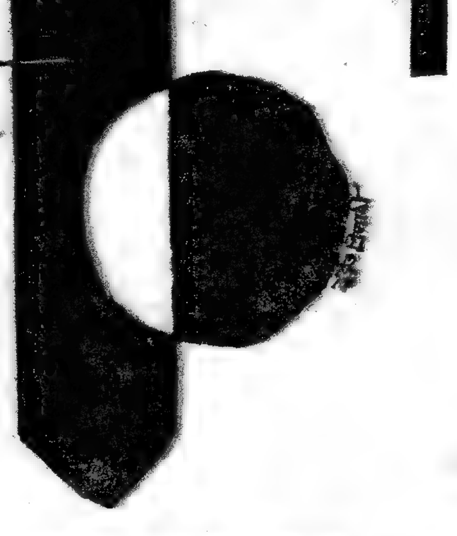

আপনি করেছ যাহা, তোমাতে সাজছে তাহা। মর্তজীবনে ও বুঝি একমাত্র ক্রিকেটের খেলায়ই খাটে। একমাত্র ক্রিকেটই বুঝি সবরকম ঘটন-অঘটনের বাজিকর। মরা নদী এক নিমেষে ভরিয়ে দিতে পারে আবার ভরা নদী এক নিশ্বাসে দিতে পারে শুকিয়ে। আমীরকে ফকির করতে পারে আবার যার পুঁজিপাটা নেই তাকে গোলদার করে বসাতে পারে গদিতে!

নইলে, বলো, কে ভাবতে পেরেছিল এক দিনে সতেরোটা উইকেট পড়ে যাবে। তার মধ্যে দশটাই দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়ার। অর্থাৎ কি না এক দিনেই তার ভবলীলার অবসান।

এরই নাম ক্রিকেট। পাটাউডি বোম্বাই টেস্টে ৯৫ করে আর পাঁচ করতে পারে না, অশোক মানকড় দিল্লি টেস্টে ৯৭এ পৌঁছে মাত্র তিনটি রানের জন্যে তার প্রথম সেঞ্চুরি থেকে বঞ্চিত হয়। আর ওয়াদেকার ৯১ করে বাকি ন রান মাঠে রেখে টি-এর আগেই ঘরে ফেরে। পাটাউডি আর মানকড় না হয় আউট হয়েছিল, পাটাউডি গ্লিসনের বলে গাৰ্থার হাতে আর মানকড় ম্যালেটের বলে ওয়াল্টার্সের হাতে, কিন্তু ওয়াদেকার তো আউট হয়নি—খেলার পাঁজিতে তখনো পুরো এক দিন বাকি, আর তার ব্যাটে তখনো রানের সুপ্রবাহার। তবু সে বাকি ৯ রান করার সুযোগ পেল না। তার পার্টনার বিশ্বনাথ ৪৪ করে নট-আউট। এমনি তো হতে পারত বিশ্বনাথকে ৯ রান কম দিয়ে সে রান কটি ওয়াদেকারের হিসেবে জমা করে দিয়েছে! তাতে বিশ্বনাথের কোনো ক্ষতি হত না, ভারতেরও না, কিন্তু ওয়াদেকার শতমার হতে পারত। শতমার বৈদ্যের বিশেষণ নয়, ক্রিকেটারের বিশেষণ।

একটা সেঞ্চুরিই তো ক্রিকেটারের পুণ্যবিজয়ের কৈলাসশৃঙ্গ। কিন্তু ক্রিকেট এমনি নির্মম, যাকে অন্ন দেওয়া উচিত তাকে দারিদ্র্যে রাখবে আর যার একহাতেই দিব্যি হেসে-খেলে চলে যায় তার ঘরে দুশো তিনশো চারশোও ঢেলে দিতে কসুর করে না। কই তৃষ্ণার্তের রিক্ত অঞ্জলি ভরে দেবে, তা না, নদী শ্যামলী মাঠেই শস্যের পসরা নিয়ে চলেছে।

বিশ্বনাথের নাম নতুন শুনছি। নতুনই তো শুনব, তার বয়স মোটে কুড়ি। কিন্তু এখন তার কীর্তি দেখে বলতে হবে মহীশূরের মহাশূর। আর তাকে ভম্বনাথ কে বলবে। সত্যি সে এখন বিশ্বনাথ। পরাক্রান্ত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই সে শতমার।

কিন্তু দেখ ক্রিকেটের রসিকতা, প্রথম ইনিংসে কনোলির বলে আনাড়ির মত খোঁচা মারতে গিয়ে রেডপাথের হাতে আউট হল গোল্লা করে। এই বিশ্বনাথ! তিন ছুঁড়িতেই পুরো শেষ!

বোরদে, সারদেশাই ও সুর্তিকে বসিয়ে নেওয়া হয়েছে তিন তরুণকে—গায়েকোয়াড়, সোলকার আর বিশ্বনাথ। গায়েকোয়াড় অপয়া ১৩-তে গেছে, সোলকার তো রীতিমত চুয়াল্লিশ। ভারতের কেউ শূন্য করেনি, সুব্রত গুহও নয়। বেদী তো ১—নট-আউট। একমাত্র শূন্য বিশ্বনাথ। একমাত্র তারই কপালে আগুন।

সেই বিশ্বনাথ দ্বিতীয় ইনিংসে একশো সাঁইত্রিশ! কে বলবে সে আনাড়ি, সে ভয়খোকো, কপোতহৃদয়! যাকে মনে হয়েছিল দুর্বল ও দরিদ্র, যার থলিতে একটা নয়া পয়সাও জোটেনি, দেখা গেল সেই রাজরাজেশ্বর, তার হাতে রানের অশেষ ভাণ্ডার। কোনো মার তীরের মত, বুলেটের মত, কোনোটা বিদ্যুৎঝলস, কোনোটা ঝঙ্কার, কোনোটা বা বেহালার উপর ছড় বুলোনো। দৃপ্ত মার, দীপ্ত মার, চণ্ড মার, সূক্ষ্ম মার। কোনোটা আবার একটি অমল কবিতা।

ক্রিকেটই দুঃসাধ্যসাধনের বুনিয়াদ। কিছুতেই নিঃস্ব মনে করা নয়, হতাশ হওয়া নয়, অপমানে অস্বীকারে টলে পড়া নয়—ক্রিকেটই তো এই দৈবমন্ত্রের উদ্গাতা। ক্রিকেটই তো নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মেরুদণ্ড সিধে করে বিশ্বকে বশীভূত করতে সাহস জোগায়। ক্রিকেটই তো শেখায় নিজের অধিকারের শেষ সীমাকে স্পর্শ করতে। ক্রিকেট যেমন বীর্যবান করে তেমনি আবার মধুর করে। আর আসলে বীর্যই তো মাধুর্য।

ক্রিকেট বিশ্বনাথকে সব সুবিধে পাইয়ে দিয়েছিল। দিয়েছিল পর্যাপ্ত সময়, দিয়েছিল মনের মত খেলুড়ে সহচর। সে সোলকার—একনাথ সোলকার। একনাথ বিশ্বনাথের যোগ্য সহচর হবে তা আর বিচিত্র কী। একনাথ দুর্গরক্ষা করছে আর বিশ্বনাথ চালিয়েছে আক্রমণ। ক্রিকেটই তো শেখায় একের জন্যে অন্যের স্বার্থত্যাগ করা—খেটে মরা, ছুটে মরা, ঠুকে-ঠুকে টিকে থাকা।

একনাথ টিকেছিল বলেই বিশ্বনাথ হতে পারল শতমার।

এ পর্যন্ত এ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে তিনজন সেঞ্চুরি করেছে—স্ট্যাকপোল, শেহান আর চ্যাপেল—যথাক্রমে বোম্বাইয়ে, কানপুরে আর দিল্লিতে। কিন্তু আমাদের পক্ষে ঐ একজন—বিশ্বনাথ।

এখন চিন্তার কথা পরবর্তী আর কোনো টেস্টে কি সে আর শতদল ফোটাতে পারবে? চিন্তার কারণ এই জন্যে যে ভারতের পক্ষে এ পর্যন্ত যারাই প্রথম অবতরণে সেঞ্চুরি করেছে তারাই পরে আর কোনো টেস্টেই তিনসংখ্যার নাগাল পায় নি। একবারের বাদশাহি তো একবারেই ইতি।

অমরনাথ ১৯৩৩এ প্রথম টেস্টে বোম্বাইয়ে সেই যে ১১৮ করেছিল, তার পর ২৩টে টেস্ট খেলেও তার কাছাকাছি যেতে পারে নি। তার পরবর্তী সর্বোচ্চ রান, ৬২, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে, ১৯৪৮এ, দিল্লিতে। দীপক শোধনকে মনে পড়ে? কলকাতার টেস্টে ১৯৫২তে প্রথম আবির্ভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১১০ করে মাতিয়ে দিয়েছিল। তারপর আরো দুটো টেস্টে সে খেলেছে, সর্বোচ্চ রান ৪৫, পোর্ট অব স্পেনে, ১৯৫৩তে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। কৃপাল সিংও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৫তে প্রথম টেস্টে ১০০, এবং নট-আউট, কিন্তু পরে আরো চৌদ্দটা টেস্টে খেলেও ৬৩-র বেশি এগোতে পারে নি। মনে করুন আব্বাস আলি বেগের কথা। ১৯৫৯এ সে ইংল্যান্ডে পড়ছে, ভারতীয় টেস্ট টিমে সে অন্তর্ভুক্ত হল আর ম্যাঞ্চেস্টারে প্রথম টেস্টে নেমেই ১১২ করে মিনারের চূড়া স্পর্শ করল—তখন তার বয়েস বিশ্বনাথের চেয়েও কম—তারপর আরো ৯টা টেস্টে খেলেছে, সর্বোচ্চ সিঁড়ি ভাঙতে পেরেছে ৫৮, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৫৯-৬০-এ, বোম্বাইয়ে। তারপরে ষষ্ঠ বীর হনুমন্ত সিং—ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে নেমেই ১০৫ করল, তারপর আরো ১৪টা টেস্ট সে খেলেছে—১৯৬৪তে মাদ্রাজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৯৪এ উঠে ধরি-ধরি করেও শততমকে ধরতে পারে নি।

আমরা যেমন ঐতিহ্যমানা দেশ, বিশ্বনাথের জন্যে ভয় হয়। সেও কি এই একবারের দলে নাম লেখাবে? সে কি হবে সপ্তম 'একবারী'? না কি আরো দুই টেস্টে এই বছরেই তার ব্যাটে আরো দুই শতাভিষার জন্ম হবে?

অম্বর রায়ের কথা ভাবছি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে সেও প্রথম নেমেছিল এ বছর। আর নেমেই তার সে কী জয়জয়ন্ত মার! বাউন্ডারির পর বাউন্ডারি—কিন্তু এমনি দুর্বিপাক, ৪৮ রান করেই সে স্তব্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয় ইনিংসে দুই। প্রথম আবির্ভাবে না হোক, আশা করেছিলাম দ্বিতীয়ে অদ্বিতীয় হবে। দ্বিতীয় টেস্টে শূন্য আর চার। দ্বিতীয়ে না হোক, তৃতীয়ে হবে। তৃতীয় টেস্ট দিল্লিতে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। তৃতীয় টেস্টে আবার শূন্য।

'পাটাউডির কথা বলবে না?' স্বপ্না জিজ্ঞেস করল।

সে তো আগে থেকেই ক্যাপটেন। সে যেন সমুদ্রের জল—এক কলসী তুললেই বা কী, ঢাললেই বা কী। বোম্বাইয়ে সে ৯৫ আর শূন্য। কানপুরে ৩৮ আর শূন্য। দিল্লিতে এক ইনিংস খেলা হয়েছিল, সেখানেও মহাশূন্য।

'তার কারণ হয়তো তার চোখ ছিল অন্যদিকে।' স্বপ্না টিপ্পনী কাটল।

এ হতেই পারে না। ব্যাটসম্যানের চোখ শুধু বলের দিকে।

'মনশ্চক্ষু?'

আনন্দের দিকে। জয়ের আনন্দ। দেখছ না বোম্বাইয়ে হেরে, কানপুরে ড্র করে, জিতল এসে দিল্লিতেই।

'সে জেতাল কোথায়? সে তো আনন্দে গোল্লা করল। জেতাল ওয়াদে-

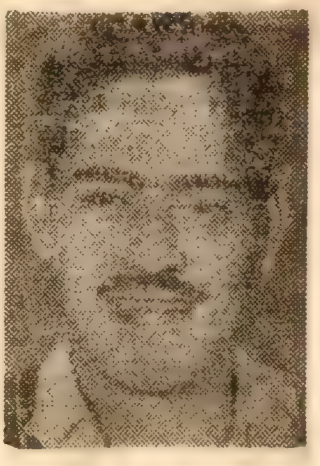

॥ চন্দ্রশেখর ॥

কার আর বিশ্বনাথ—মার-মার শব্দে রানের বান ডাকাল—কোটালের বান।'

জয়, টিমের জয়, আর টিমের জয় মানেই ক্যাপটেনের জয়।

কিন্তু ওদের ক্যাপটেন লরিকে দেখেছ? ওদের দিল্লিতে দ্বিতীয় ইনিংসে চ্যাপেল শূন্য, ওয়াল্টার্স যার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বিশ্ব রেকর্ড—প্রথম ইনিংসে ২৪২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৩—সেও শূন্য। রেডপাথ ৪—যেই আসছে সেই শম্ভায় কেটে পড়ছে, উইকেটে ৯২—দশম উইকেটেও লরি পড়ল না, পড়ল একাদশ নম্বর, কনোলি—অল আউট ১০৭, আর লরি প্রথম নম্বর এসে থেকে গেল শেষ পর্যন্ত—৪৯, নট-আউট। একেই বলে ক্যাপটেনের খেলা, যেমন তীক্ষ্ম ধৈর্য তেমনি প্রশান্ত দৃঢ়তা। ওর যে নাম দিয়েছে 'ক্যানটার লরি', তা অনেক অর্থেই উপযুক্ত।

'কিন্তু তার উঁচু নাক কেমন নিচু হল!' স্বপ্না বললে, 'বলেছিল সব খেলাই আমরা জিতব। যদি টসে জিতি তিন দিনে খেলা খতম করব আর যদি টসে হারি বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করব। দিল্লির টেস্টে তো টসে জিতেছিল লরি—কই, কী হল, সাত-সাত উইকেটে হেরে গেল। তাও একদিন হাতে রেখে। চতুর্থ দিনে ইন্ডিয়া যখন খেলছে কিংবা আগের দিনে, রেস্ট দিনে, বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করল না কেন?'

'কে বলে করেনি?' হাসলাম : 'মনে মনে করেছে। কিন্তু সব প্রার্থনাই কি আর পূর্ণ হয়?'

'প্রার্থনা না হাতি।'

'কখনো কখনো হাতির জন্যে প্রার্থনা। ব্যাটটা যেন হাতির পায়ের মত চওড়া হয়, সব বল যেন মাঝখান দিয়ে ঠেকাতে পারে। হল্ বা গ্রিফিথের বা লারউড বা লিন্ডওয়ালের বলের সম্মুখীন হতে ব্যাটসম্যান দুরু দুরু বুকে কী প্রার্থনা করে একবার শুনে এসো। ক্যাচ তুলে দিয়ে ব্যাটসম্যান প্রার্থনা করছে, ঠাকুর, এ ক্যাচ যেন ড্রপ করে। ছক্কা তুলে দিয়ে প্রার্থনা করছে, এ মার যেন দড়ি পার হয়ে যায়। নাস্তিকতা শুধু একটা মুখের কথা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিপদের মুখে একবার পড় তখন বুঝি তোমার মন কী আওড়ায়!'

'একটা বৈজ্ঞানিক খেলায় এ সব কী অলৌকিক কথা!' স্বপ্না বিরক্ত হল।

'যেখানে টস দিয়ে সুরু সেখানে আর বিজ্ঞান কোথায়? এ যেন লটারি করে রাজস্ব আদায়। সমস্তই অনিশ্চয়ের বিস্ময় দিয়ে ভরা। ভাবতেও পার না, একটা দুরূহ ক্যাচ স্বপ্নের মত ধরে ফেলল আর একটা নিটোল কোমল ক্যাচ ফেলে দিল দুঃস্বপ্নের মত। যেমন ধরো চ্যাপেল, ওয়াল্টার্স, বেঙ্কটরাঘবন, সোলকার, আবার যেমন ফেলে দিল ম্যালেট, আবার চ্যাপেল, ওয়াদেকার, পাটাউডি।'

'কিন্তু যাই বলো আসল জয়ের কারিগর বেদী আর প্রসন্ন।'

'নিশ্চয়।' সায় দিলাম : 'পুরস্কারের বেদী দৃঢ় করে নির্মাণ করলেই দৈব প্রসন্ন হন।'

ভারতের খেলোয়াড়গণ

॥ পাতৌদি ॥

॥ ওয়াদেকার ॥

॥ বেদী ॥

॥ বিশ্বনাথ ॥

॥ ভেঙ্কটরাঘবন ॥

॥ প্রসন্ন ॥

ভারতের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিষেণ সিং বেদীকে বিয়ের পর নববধূ অস্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ্ক-কর্মী গ্লেনিথ জিল মিলসের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

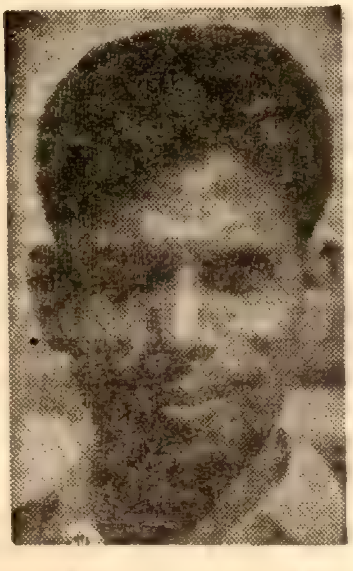

॥ সুব্রত গুহ ॥

॥ সোলকার ॥

॥ অম্বর রায় ॥

লং ফিল্ড

লীলা মজুমদার

সেকালের আমাদের বাড়ির লোকদের ভারতীয় ক্রিকেটের ওপর কেমন একটা স্বত্বাধিকারের ভাব ছিল। কে না জানত আমাদের বড় জ্যাঠামশাই অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় ভারতীয় ক্রিকেটের জনক? এখন অবিশ্যি মাঝে মাঝে অন্য রকম কথাও শুনি। তাছাড়া বড় জ্যাঠামশায়ের লম্বা দাড়ি, মজবুত চেহারার সঙ্গে—বিশেষ করে যখন হাতে ব্যাট আর পায়ে প্যাড্ থাকত—বিলিতি ক্রিকেটের স্বনামধন্য ডব্লু জি গ্রেসের চেহারার কোনো তফাৎ থাকত না। অবিশ্যি ডব্লু জি-র গায়ের রঙ ফর্সা ছিল আর তা হবে না-ই বা কেন, হাজার হোক সায়েব তো। তবু একশোবার বলতে হবে যে, বড় জ্যাঠামশাই-ও কিছু কম যেতেন না; গায়ের রঙ আর কি এমন বড় জিনিস? তাছাড়া ফটোতে রঙের-ও কোনো তফাৎ থাকত না। এমন কি আমি একেকটা ছবি দেখেছিলাম যাতে ডব্লু জি-র রঙ, টাউন ক্লাবের টেন্টের সামনে তোলা জ্যাঠামশাইয়ের ফটোর রঙ থেকে বেশ একটু কালোই। সে যাক না, রঙ নিয়ে কি কেউ ধুয়ে খাবে?

মোট কথা ক্রিকেটকে আমরা তখন একটা পারিবারিক স্নেহের চোখে দেখতাম। বছরটা হয় তো ১৯২০ বা ১৯২১ হবে। বাবা সবে আসামের পাহাড় থেকে বদলী হয়ে কলকাতায় এসেছেন। অবিশ্যি সেখানেও আমরা ক্রিকেটের আবহাওয়া থেকে বঞ্চিত ছিলাম না। বাবা ক্রিকেট ক্লাবে খেলতেন, সেন্ট এডমান্ডস স্কুলের ছেলেদের কোচিং দিতেন। আমাদের খাবার ঘরের তাকের ওপরে বাবার বোলিং-এর জন্য পাওয়া রুপোর মস্ত কাপ শোভা পেত। ক্রিকেট আমাদের ঘরের জিনিস নয় তো কি? দুধের দাঁত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটের পিচ্ যে বাইশ গজ লম্বা আর লং ফিল্ড-ই বা কি আর কভার পয়েন্ট-ই বা কি, এসব বলতে না পারলে বাবা বেজায় রেগে যেতেন।

কলকাতায় যখন এলাম আমার বয়স তখন এগারো পেরিয়েছে। এখানে এসেও ক্রিকেট সম্বন্ধেই পুরনো মতগুলোকে বদলাবার কোনো কারণ পেলাম না। বরং বাড়ির সকলের এমন দারুণ উৎসাহ দেখে ধারণাগুলো আরো দৃঢ়বদ্ধ হল। বাড়ির পুরুষমানুষ মাত্রই হয় খেলে, না হয় স্কোর রাখে, নয় মন দিয়ে দেখে আর খুঁৎ ধরে। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের পরিবারে যত তর্ক ও ঝগড়া দেখেছি—তাও খুব কম দেখি নি—তার মধ্যে তিক্ততমগুলি হল ক্রিকেট খেলা বিষয়ক। সাধারণত যাঁরা কখনো গলা তুলে কথা বলাকে অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করতেন, তাঁরাও ক্রিকেট সম্পর্কে এমনি চেঁচাতেন যে, কানে তালা লাগার জোগাড় ছিল। আমরা, মেয়েরা, এ তর্কে কখনো যোগ দিতাম না।

আমাদের পরিবারের মধ্যে থেকেই দিব্যি একটা বলশালী "ক্রিকেট—এগারো" তৈরি করে, বেশ কিছু এগ্রো রাখা যেত। বড় জ্যাঠামশাইয়ের কথা তো বলেইছি। মেজজ্যাঠা হলেন উপেন্দ্রকিশোর, তিনি আমাদের ছোটবেলাতেই পরলোকে যান, তবে শুনেছি খেলাধুলো করতেন না। তারপর ছিলেন মুক্তিদারঞ্জন, সব রকম খেলা, শারীরিক ব্যায়াম আর মাছ-ধরায় ওস্তাদ। তার পর ছোট জ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জন। দাদাদের মতো তাঁর দাড়ি না থাকলেও, তেজ এতটুকু কম ছিল না। যেমনি খেলায় উৎসাহ, তেমনি ছোটদের জন্য বই লেখাতে আগ্রহ। তিনিও খুব ভালো ক্রিকেট খেলতেন। তারপর সবার ছোট হলেন বাবা। এক-একজন এক-একটি বাঘা খেলোয়াড় ছিলেন।

তাঁদের ছেলেদের মধ্যে অনেকে তো বটেই, আত্মীয়-স্বজনদেরও ক্রিকেটের নেশা ধরে যেত। যেমন আমাদের একটু দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই বেচু দত্তরায়, যার আলাদা করে পরিচয় দেবার কোনো দরকার নেই, এমনিতেই সে স্বনামধন্য। সুন্দর জ্যাঠার ছেলেরা শৈলজারঞ্জন, হৈমজারঞ্জন ও নীরজারঞ্জন তিনজনেই অতি দক্ষ খেলোয়াড় ছিলেন। নীরজা এখন নেই।

আমার সোনাপিসিমার দুই ছেলে গণেশ আর কার্তিক ক্রিকেটের মাঠে একবার নামলে, তাদের রূপ আর গুণ দেখে দর্শকরা হাঁ হয়ে যেত। গণেশ কার্তিকের ছোট, বাপি বোসও কিছু কম যেত না। তবে হ্যাঁ, জ্যাঠামশাইদের বলতে শুনতাম যে, ছেলেরা সবাই ব্যাটিং বোলিং-এ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে বটে, তবে ফিল্ডিং এখনো কাঁচা। দাঁড়াবার কায়দা জানে না, বল ফেলে দেয়। বড় জ্যাঠামশাই যেই দেখতেন সাহেবরা সকালে ব্যাটিং করবে আর আমাদের দল লাঞ্চের পরে, অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। বেশ জোরে জোরে তাদের কানে কানে বলতেন 'বেশি খাবি না, খবরদার বেশি গিলবি না।' এ সব তো গেল খেলার কথা। এর অন্য দিকটা হল খেলা দেখার কথা। আজকাল বললে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না যে, পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে ক্রিকেট খেলা দেখার ওপর কলকাতার লোকদের এতটুকু ঝোঁক ছিল না। মুষ্টিমেয় খ্যাপা ধরণের মানুষ ছাড়া সারাদিন রোদে পুড়ে বল পেটানো দেখতে কম লোকেরই ধৈর্য ছিল। খেলা বুঝত-ও খুব অল্প লোকেই।

বলা বাহুল্য, ঐ মুষ্টিমেয়র মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা। তখন তিন চার দিন ধরে ক্রিকেট খেলার রেওয়াজ ছিল না। বেশির ভাগ খেলাই হত এক দিনের জন্য, রবিবারে বা ছুটির দিনে। কাজেই আপিস কামাই বা কলেজ পালানোর কথা তেমন উঠত না। অবিশ্যি এ-ও আমি নিশ্চয় বলতে পারি, এমনিতেই স্কুল-কলেজ ফাঁকি দিলে বাবা-জ্যাঠারা যতই রাগুন না কেন, ক্রিকেট দেখতে যদি কেউ ক্লাস পালাত, তাকে তখনি অম্লানবদনে ক্ষমা করতেন।

তখন মেয়েরা বিশেষ খেলা দেখত না। তাই বলে আমরা যে কখনো দেখি নি, তা-ও নয়। অনেকবার দেখেছি। বালিগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবে খেলা দেখা হত বাইরে থেকে, সোনাপিসিমার সঙ্গে, তাঁর গাড়িতে বসে। সোনাপিসিমা ছিলেন বিখ্যাত এইচ্ বোস পারফিউমারের স্ত্রী। তখনকার বেশির ভাগ গাড়ির-ই হুড্ নামানো যেত আর পিসিমা তাঁর দাদাদের আর ছেলেদের চেয়ে একবিন্দু কম খ্যাপা ছিলেন না। ছেলেরা ক্যাচ্ ফেললে বেজায় চটে যেতেন।

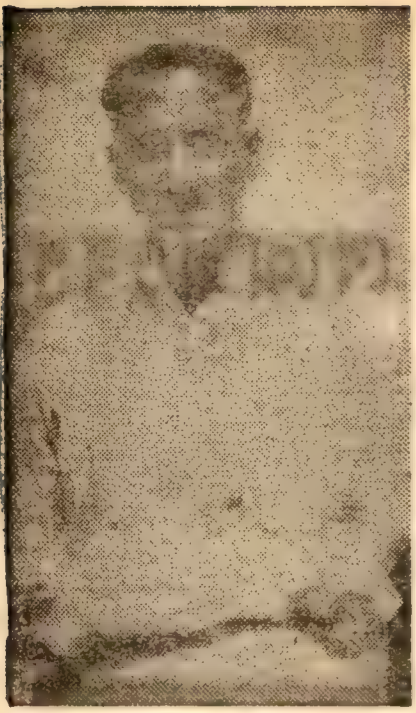

॥ সি কে নাইডু ॥
নাইডুর আগেও ভারতীয় ক্রিকেটে স্মরণীয় চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু নাইডুকেই আমরা বলি ভারতীয় ক্রিকেটের জনক।

মার্কাস স্কোয়ারেও চেয়ারে বসে খেলা দেখেছি, তবে সে আরো বছর চারেক বাদে, হয়তো ১৯২৩ কি ১৯২৪ সালে হবে। বড় জ্যাঠামশাই তখন আর নেই। বাপি দারুণ বল পেটায়, ওভার-বাউন্ডারি করে। বল গিয়ে লোকের বাড়িতে পড়ে, জানলার কাচ ভাঙে, বচসা হয়।

সব চেয়ে ভালো মনে পড়ে ইডেন গার্ডেনসে খেলা দেখার কথা। বাবাকে কিছু বলার সাহস ছিল না, কাজেই ছোট জ্যাঠামশাই অর্থাৎ কুলদারঞ্জন আমাদের একমাত্র সহায় ও অবলম্বন। ছোট জ্যাঠামশাই নিজের ছেলেকে ও ভাইপো-ভাগ্নেদের বেজায় বকতেন, কিন্তু মেয়েরা বা ভাইঝিরা বা ভাগ্নীরা আবদার করলেও, গলে জল হয়ে যেতেন। তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ আমরা কখনো ছাড়তাম না।

প্রত্যেক খেলার দিন বেলা সাড়ে আটটার মধ্যে ছোট জ্যাঠা আমাদের ভবানীপুরের বাসাবাড়িতে এসে হাজির হতেন। তারপর দুই ভাই একসঙ্গে মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে, পান মুখে দিয়ে, সারাদিনের মতো অদৃশ্য হয়ে যেতেন। ভাত খাওয়াটাও এক ব্যাপার ছিল। থালায় ভাত হত আতপ চালের ও নেলোরেম। ছোট জ্যাঠার শেষ চালের ভাত থালায় পড়লে ঠং করে বাজত তাই। ফিরতেন সেই সন্ধ্যায়। তখন ভগবানের দেওয়া কালো রঙের ওপর ঝলমলানো কালির মতো মুখে কপালে আরেক পোঁচ পড়ে থাকত।

একবার আমাদের ইডেন গার্ডেনসে খেলা দেখাতে ছোট জ্যাঠামশাইকে রাজী করানো হল। 'আমরা' মানে তাঁর নিজের দুই মেয়ে, সোনাপিসিমার এক মেয়ে, সেজ জ্যাঠার এক মেয়ে আর আমার দিদি আর আমি। তখনো বড় জ্যাঠামশাই ছিলেন, হয়তো ১৯২২ সাল হবে।

বাবা বিরক্ত হয়ে আগে-ভাগেই চলে গেলেন। যথাসময়ে একটা খোলা 'ল্যান্ডো' গাড়ি নিয়ে, ছোট জ্যাঠামশাই আমাদের তুলতে এলেন। সেকালে এই সব ঘোড়ায় টানা গাড়ি খুব জনপ্রিয় ছিল। একেকটা গাড়িও যেমন খাসা হত, ঘোড়াও তেমনি তেজী ও সুন্দর হত। আমার যতদূর মনে পড়ে সেদিনের ঐ ঘোড়ার গাড়ির মতো গাড়ি আমি কখনো দেখি নি। তবে খানিকটা আমার মনের কল্পনাও হতে পারে।

মোট কথা, পাশাপাশি বসে ইডেন গার্ডেনসে পৌঁছলাম। সে আরেক ইডেন গার্ডেন। সেখানে গাছপালা, লতাগুল্ম, ফুলের বাহার ছিল। পুকুরে ভালো কাপড়-চোপড় পরে বড়লোকরা ও সাহেব-মেমরা নৌ-বিহার করত। ব্যান্ড-স্ট্যান্ডে সন্ধ্যাবেলায় ব্যান্ড বাজত। কিন্তু দর্শকদের জন্য স্ট্যান্ড বা গ্যালারি ছিল না; ঘাসের ওপর বসে বা ক্লাবের চেয়ারে বসে লোকে খেলা দেখত। চেঁচামেচি, খাবার বিক্রির বালাই ছিল না। একটা গভীর শান্তি বিরাজ করত, শুধু মাঝে মাঝে খট-খট বা হাউজ দ্যাট ইত্যাদি ক্রিকেটীয় শব্দ শোনা যেত। মন ভরে যেত। সারা দিনটা কোথা দিয়ে কেটে যেত বোঝা যেত না।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে আসতেই, প্যাভিলিয়ন থেকে মোটামতো এক হাসিখুশি সাহেব এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। শুনলাম তিনি বার্কমায়ার সাহেব। আমাদের জন্য বেতের চেয়ার বের করে দেওয়া হল। বার্কমায়ার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন পানীয়-টানীয় কিছু চাই কি না। আমরা কিছু বলবার আগেই বড় জ্যাঠামশাই বেরিয়ে এসে একটু উদ্বিগ্নভাবে বললেন, 'ইয়েস—তবে কথা কিছু নয়।' বার্কমায়ার একটা চোখ বন্ধ করে হাসলেন।

ঐ দিনটার কথা কখনো ভুলব না। যতদূর মনে হয় ইডেন গার্ডেনসের ক্রিকেট

॥ অমর সিং ॥
হাতে বল নিয়ে বলটির কানে কানে কি কথা যে বলতেন তা তিনিই জানেন।

ওদের তখন ক্যালকাটা ক্লাবের তত্ত্বাবধানে ছিল, প্যাভিলিয়নটিও ওদের। সেখানে কিছু সাহেব-মেম বসে খেলা দেখছিল। তবে আমরা সেদিকে যাই নি। বিকেলে আমাদের জন্য ট্রে করে চা স্যান্ডুইচ, কেক এসেছিল। বাবা একবারো এ-মুখো হন নি। কখন কিভাবে বাড়ি গেলেন তাও টের পাই নি। তাতে ছোট জ্যাঠামশাই খুশি বই অখুশি ছিলেন না। বাবার কড়া মেজাজের সামনে তিনি বোধ হয় একটু অস্বস্তি বোধ করতেন।

খেলার পর পিসিমার গাড়ি করে বাড়ি ফিরেছিলাম। ছোট জ্যাঠামশাইয়ের কাছে যে-সব শত শত ঋণে আবদ্ধ আছি, তার মধ্যে এও একটি। ছোটখাটো মানুষটি ছিলেন, কায়দাদুরস্ত সাজ-পোষাক, ইংরিজিতে যাকে বলে 'ড্যাপার', বুকের পাশে ক্ষুদে একটি ফুল গোঁজা, হাতে ঘড়ি, এক-কথায় অতুলনীয়। একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। খেলা দেখার সময় একজন হাসিখুশি মালি এটা-ওটা নানান সরঞ্জাম এগিয়ে দিচ্ছিল। ছোট জ্যাঠামশাই বললেন, 'ওকে ভালো করে লক্ষ্য করিস। ও হল এই ক্লাবের মালি। গত সপ্তাহে নানা কারণে ক্যালকাটার লোক কম পড়াতে, প্যাড পরিয়ে, ব্যাট হাতে দিয়ে, ওকে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্যাটা একটুকু ঘাবড়ায় নি, দেখতে দেখতে বল পিটিয়ে পঁয়তাল্লিশ রান, অর্থাৎ সেদিনের মতো ওদের হাইয়েস্ট স্কোর করে, ক্লাবকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে দিল।' ক্রিকেট এখন একটা শখ, তখন ছিল নেশা।

অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়গণ

॥ বিল লরি ॥

॥ চ্যাপেল ॥

॥ ওয়ালটারস ॥

॥ স্টাকপোল ॥

॥ ম্যাকেঞ্জি ॥

॥ কনোলী ॥

॥ ফ্রিম্যান ॥

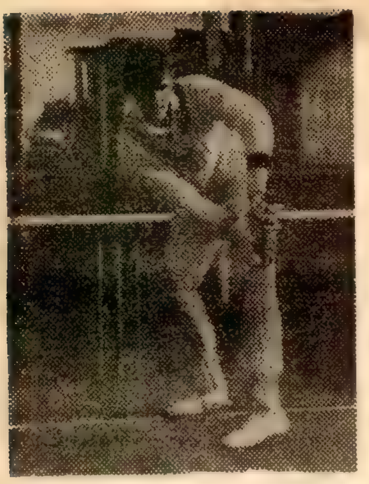

শিহান

ট্যাবর

রেডপাথ

গ্লিসন

ম্যালেট

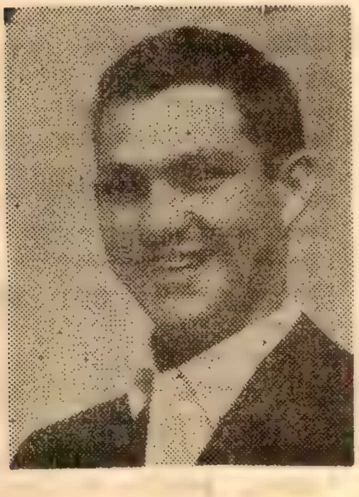

আরভিন

জর্ডন

ম্যায়ন

ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ

আরবি

দুনিয়ার আর কোথাও দেখি নি" মন্তব্য করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক রিচি বেনো। ভারতে ক্রিকেট টেস্টের দিনগুলোকে হয় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে, কলকাতা টেস্টে বিক্রির জন্য দু'লাখ টিকেট ছাড়লেও তা ফুরিয়ে উড়ে যাবে।

ক্রিকেট ভারতে এসেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটি মূল্য কথন রাজ্য হিসেবে। বৃটিশ সামন্তসমাজের অবকাশ-বিনোদনের এই ব্যবস্থার উপাদানটি ভারতের মাটিতে শিকড় গাড়তে অনেক সময় লেগেছিল। এদেশে সাম্রাজ্যবাদের পাহারাদার ছিল যারা, সেই সব সামন্ত-রাজার ছেলে-ভাইপোরা ইংরেজ রেসি-ডেন্টের অভিভাবকত্বে ও ইংরেজ অভিভাবক-শিক্ষকের নির্দেশে আচারে ব্যবহারে রুচিতে কর্মে ও অবকাশ-বিনোদনে নকল ইংরেজ হবার আগ্রহে নিবিড় মনঃসংযোগে ক্রিকেট খেলা শেখে—যার সুফল রঞ্জি, দলীপ সিংজী ও পতৌদীর নবাব (বড়)—ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ক্রিকেটের দীক্ষা ও শিক্ষা নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এবং ইংল্যাণ্ডের হয়ে যাঁরা সারা জীবন ক্রিকেট খেলেছেন। অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড অভিযোগ করে পতৌদীর নবাবকে ১৯৪৬ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় দলের অধি-নায়ক করেছিলেন মার্চেন্টের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে। কিন্তু মজা করার বিষয় যে, রঞ্জি মাঝে মাঝে দেশেতে এসে ভারতের মাটিতে খা-ও বা খেলেছিলেন, দলীপ বা পতৌদীর নবাব (বড়) আদপেই এদেশে খেলেন নি।

সামন্তরাজ পরিবারের বাইরে ভার-তের প্রজাসাধারণ যারা প্রথম যুগে ক্রিকেট খেলাকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল, তারা হল রাজানুগত্যে, গাত্রবর্ণে, পোশাকে ও জীবনযাত্রায় প্রায় ইংরেজ পার্শী সম্প্রদায়।

তারপর ধীরে ধীরে নিজের গুণে ক্রিকেট ভারতের সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে এবং অতি সাধারণ সমাজে অনুপ্রবেশ করলো এবং এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই দেখা গেল যে, ভারতের মাটিতে পাকাপাকি শিকড় গেড়ে খেলাটি ভারতীয় জীবনের অঙ্গবিশেষে পরিণত হয়েছে, ভারতীয় মনীষার বাহন হয়ে উঠেছে।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে ভারত থেকে তাড়াবার জন্য প্রবল আন্দোলন যখন চলেছে, সেই আন্দোলনকারীরা কিন্তু ক্রিকেটকে তাড়াবার কথা স্বপ্নেও রাজী ছিল না। স্বাধীন ভারতের পক্ষে কমনওয়েলথ বর্জন নিঃশেষে মুছে ফেলবার দাবি করেছে যে রাজনৈতিক দল, তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কোন কোন ব্যক্তির প্রবল ক্রিকেটানুরাগ এমন প্রকট যে, কমনওয়েলথ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পরিধি থেকে বহিষ্কার অনিবার্য। সে খেয়াল থাকলে তাঁরা ভারতের কমনওয়েলথে থাকার বিরোধিতা করতেন কি না সন্দেহ।

কেন এমনটি ঘটেছে? কারণ ক্রিকেট শুধু রাজার খেলা নয়, ক্রিকেট খেলার রাজাও বটে। ক্রিকেট তো খেলা নয়, একান্তভাবে হেলা-খেলা। রোদে পিঠ দিয়ে বসে চীনেবাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে পার্কের ক্রিকেট দেখে আমরা বাল্যে ও কৈশোরে যে আনন্দ পেয়েছি—আজো যে সুর বেজেছে প্রাণের তন্ত্রীতে তাকেই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বাণী-রূপ দিয়েছেন—রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ঘাসের (পরিবর্তিত) গন্ধে মেলেছে মায়া, তারা নেশা ধরিয়েছে, বলছে ছুটি।

ক্রিকেট শুধু খেলা নয়, মেলা। খেলে এত আনন্দ অন্য কোন খেলাতেই পাওয়া যায় না। তা ছাড়া দীর্ঘ সময়ব্যাপী খেলাটি পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় অগ্রসর হয় বলেই খেলোয়াড়দের চরিত্র স্বরূপের অনবদ্য মাধ্যম এই ক্রিকেট। সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটে আমরা দেখেছি চূড়ান্ত ঔদ্ধত্য, আবার আজকের একান্তভাবে বেণিয়া ইংরেজের ক্রিকেটে কী সূক্ষ্ম হিসেবী মনোবৃত্তির প্রকাশ! ভারতীয় ক্রিকেটে এককালে দেখেছি দেউলিয়া নবাবীপনা, আরো দেখেছি জয়লাভের প্রয়াসে তেড়ে গিয়ে মারবার অহিংস অনীহা, তার চেয়ে ওরা মারতে এলে পিঠ পেতে দেওয়া—মারতে মারতে ওরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, আমরা পরাজয় এড়াবো। পরাজয় আমরা চাই না, তা বলে বিজিগীষায়ও আমরা উন্মুখ নই। বস্তুত—জাতীয় চরিত্র পদে পদে প্রকাশ পায় যে ক্রিকেটে, সেই ক্রিকেট খেলার চেয়েও মহত্তর ও উন্নততর কিছু নিঃসন্দেহে।

ক্রিকেট জীবনদর্শন। এই আছে এই নেই—জীবনটা যেন একেবারে পদ্মপত্রে জল। চুটিয়ে মারছো, বোলার ও ফিল্ডিং হয়রান; তা বলে পরের বলেই যে আউট হবে না তার কোন স্থিরতা নেই। কতবড় রথী-মহারথীই হও না তুমি, একটি ভুলের খেসারত হিসেবে তোমাকে তখনি বিদায় নিতে হবে, আজেবাজে একটা বলে বোকা হয়ে যেতে পারে, তারই নাম ক্রিকেট। শেকসপীয়ার কথিত জীবনদর্শন—দেয়ার ইজ এ টাইড ইন দি অ্যাফেয়ার্স অব ম্যান—ক্রিকেটে পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য। যখন জীবনস্রোত তোমার অনুকূল, কেউ তোমায় কিছু করতে পারছে না—দোহাত্তা মেরে ছাতু করছো ওদের, ফিল্ডিং-এর লোহার বেড়া ছত্র-খান করে দিচ্ছ, হয়তো দু' উইকেটে ২৫০ উঠে গেছে। তার পরই সবার অজান্তে জীবনস্রোত প্রতিকূলে বইলো। কী যে হল, যে আসে সেই ব্যাট হাতে ফিরে যায়। ৩০০ না পুরতেই ইনিংস শেষ।

জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে একাত্ম, কোথায় পাবে এমন আরেকটি খেলা? তাছাড়া এককালে যা ছিল নিষ্কর্মা ও ধনী সামন্তসমাজের বিলাস, আজ তার ওপর ভিত্তি করে চলছে হাজার হাজার অতি-সাধারণ মানুষের জীবিকা।

এত গুণ আছে বলেই না ক্রিকেট নামক বৃটিশ বৃক্ষটি আজ ক্যারিবিয়ানের মুক্ত-জীবনের স্বাদ পাওয়া নিগ্রোসমাজে নিজস্বতার স্বকীয় বলিষ্ঠ প্রাণবন্ততায় বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে, অজন্তার শিল্প-মাধুর্যে ও ভরতনাট্যমের ছন্দোময় লীলায়িত গতিতে মণ্ডিত হয়েছে ভারতের মাটিতে।

কিন্তু তবু ভয় ও সংশয় প্রকট, ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আজকের এই অবসরবিহীন অর্থের যুগে যখন বুর্জোয়া অবসরে জীবনের অনেক কিছু মূল্যবোধকে বোতল করতে বদ্ধ-পরিকর, ক্রিকেটের পক্ষে সেখানে আত্ম-রক্ষা কোনমতেই সম্ভব নয় বলেই আমার আশঙ্কা। ভালো জিনিষ হলেই তা মরবে না, নিজগুণে টিকে থাকবে—ইতিহাসের সাক্ষ্য এমন ধারণা সমর্থন করে না।

দীপ্ত জীবনবোধের আলোকে উদ্ভাসিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, বিধান-কর্তা স্বনামধন্য রোমান সভ্যতা, আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধির জ্ঞান-নেত্রমণ্ডিত ঔপনিষদিক আর্য সভ্যতা,

মন্দাক্রান্তা তালে জীবনতরী প্রবাহিত কালিদাসের কাল—সব কালস্রোতে লোপ পেয়ে গেছে—ইতিহাসকারদের নিদানমত বর্বরতার দুর্ধর্ষ আক্রমণে। আধুনিক বাংলার উদারচেতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জমিদার সমাজ, উনিশ শতকের আলোকোজ্জ্বল যুগ—কিছুই থাকে নি।

থাকে নি, কারণ নতুন যুগের দাবি ও মূল্যবোধের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় নি। কৃষ্ণপদতলে দলিতফণা চির অবনত কালীয় নাগের মত সারা দুনিয়ার শূদ্রকুল মাথা উঁচু করে [illegible] বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে [illegible] করিয়া গড়িতে চায়। আসলে সব সমাজ ভেঙেছে ও লোপ পেয়েছে নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে, যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ওদের কোন চেতনাই ছিল না। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা মরেছে মানুষের চূড়ান্ত স্বাধীনতার সঙ্গে ক্রীতদাসপ্রথার অন্তর্দ্বন্দ্বে। রোমান সভ্যতা মরেছে নাগরিকদের অবাধ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের অন্তর্দ্বন্দ্বে। ভারতীয় সভ্যতা মরেছে উদার মানবতাবোধের সঙ্গে বিরাট শূদ্রসমাজকে মানবেতর জ্ঞান করার অন্তর্দ্বন্দ্বে। বাংলার জমিদারী সভ্যতা মরেছে চাষীদের শোষণ সম্পর্কে চেতনার অভাবের পাপে, উনিশ-শতকী সংস্কৃতি মরেছে, মগজের আভিজাত্যে কায়িক শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিতির ফলে।

ক্রিকেটও মরবে মূলত এই কর্মময়তার যুগে নিষ্কর্মতাকে প্রশ্রয় দেবার অপরাধে। ক্রিকেট ব্যক্তি, ছোট গোষ্ঠীর বা স্থানীয় সংস্থার বাগান আলো করে ফুল হয়ে ফুটে থাকবে নিশ্চয়ই। কারণ নিজ নিজ বাগানের চাষ করে তাকে সযত্নে সাজিয়েগুছিয়ে রাখবার আনন্দে কিছু জীবনরসিক লোক মেতে থাকবেই।

কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, যাকে বলা হয় টেস্ট ম্যাচ—তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। প্রথমত পরজাতি অসহিষ্ণু আক্রমণাত্মক জাতীয়তার ঠাঁই নেই আজকের শ্রেণী-সচেতন দুনিয়ায়। অথচ টেস্ট খেলার সারাটা সীরিজ জুড়ে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদ ক্রিকেটের মত পবিত্র নিষ্পাপ সুন্দরীকে পাশবিকভাবে ধর্ষণ করে। খেলার নীতি ও দর্শন, বিধি ও বিধান, রূপরসসৌন্দর্য সব জাহান্নমে যাক—আমার দেশের দল যদি জেতে। এই উগ্র জাতীয়তাবাদ নিয়ে খেলার মাঠে মারমুখী দর্শক—তা বোম্বাই-এর সম্পন্নতম সি. সি. আই সদস্যদের সমাজ হোক বা একান্ত নিম্নবিত্ত প্রাকার বহির্ভূত ক্রিকেট-শ্রোতাসমাজ—যাই হোক না কেন,—জীবনের প্রতিপদে তারা কিন্তু জাতীয় স্বার্থ পদদলিত করছে নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে, নিজের স্বার্থে, দলীয়, উপদলীয় বা গোষ্ঠীস্বার্থে। অথচ টেস্ট খেলার পাঁচদিন তাদের দেশপ্রীতি—মাই কান্ট্রি গুড অর ব্যাড—উদ্বেল হয়ে ওঠে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ধাক্কা সামলিয়ে বাঁচা কোন কিছুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

ভুয়ো দেশপ্রেমের যূপকাষ্ঠে পড়ে ক্রিকেটের প্রাণসত্তা বলি হয়ে গেছে। পরাজিত অধিনায়ক ও খেলোয়াড়বৃন্দের প্রতি জনতার প্রবল ধিক্কার—পরাজয় এড়ানোর খেলার প্রেরণা জাগায়। পরাজয়ের ঝুঁকি নিয়ে জয়লাভের প্রয়াসে যে খেলা প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়, সে ধরণের খেলা আজকের টেস্ট ক্রিকেটে বিলুপ্তপ্রায়। তাই ক্রিকেটের প্রকৃত রস টেস্টের মাঠে পাওয়া যায় না, তা ক্রিকেট সাহিত্যিকের কল্পনাবিলাস হয়ে ছাপা অক্ষরে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে থাকে, উইজডেনের পাতায় নথীবদ্ধ রেকর্ড হয়ে থাকে। দর্শকরা যা প্রত্যক্ষ করে, আসলে তা পত্রযোগে দাবা খেলার আত্মিক জ্ঞাতি ছাড়া আর কিছু নয়। ফ্রাঙ্ক ওরেল এই উগ্র জাতীয়তাবাদের কবল থেকে ক্রিকেটের প্রাণরসকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, ব্যক্তিস্বচ্ছ মনীষায় সাময়িকভাবে কিছুটা সার্থক হয়েছিলেন। কিন্তু যুগের বর্বরাক্রমণ তাঁর জীবদ্দশায় সাময়িকভাবে প্রতিহত হলেও তাঁর মৃত্যুর পর আবার হুড়মুড় করে নেমে এসেছে ক্রিকেটকে ধ্বংস করতে।

টেস্ট ক্রিকেটের মূল কথা অবকাশ, যারা পাঁচদিন ধরে খেলে ও বারো মাস তালিম নেয় তাদের তো বটেই, যারা পাঁচ দিন ধরে খেলা দেখে তাদেরও। যাদের জীবিকার জন্য কিছু না করলেও চলে, এমন পরভুক্ সমাজ ছাড়া পাঁচদিন বসে টেস্ট খেলা দেখবে কারা? অথচ বর্তমান শ্রমজীবী যুগে নিষ্কর্মা সমাজকে কোতল না হলেও বাতিল করার দাবি এবং ব্যবস্থা দুনিয়ার সর্বত্র। সে সমাজ বাদ দিয়েও এদেশে টেস্ট ক্রিকেটে অসংখ্য লোকসমাগম ঘটে। তারা সবাই খেটে খাওয়া মানুষ, আসে ফাঁকি দিয়ে কাজ কামাই করে।

ভারতে অনুষ্ঠিত পাঁচটি টেস্টের ২৫টি দিন কেউ কোথায় কোন কাজ করে না। অফিসে অফিসে, কারখানায় কারখানায়, সরকারের প্রতিটি দফতরে, স্কুলে-কলেজে—যারা খেলার ক্ষেত্রে হাজির নয়, তাদের সবাই বেতারযন্ত্রের চারপাশে জড়ো হয়ে ধারাবিবরণী শুনছে। বড়ো সাহেব শুনছেন তাঁর টেবিলে, অধীনস্থরা কাজ না করে সেখানে ভিড় করলে কি আর বলবেন তাদের। এমনি করে মেজ সাহেব, ছোট সাহেব, ফোরম্যান, ওভারশীয়ার, বড় বাবু, বড় জমাদার, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক সবাই শুনছে, চারপাশে অধীনস্থরাও জমায়েত। যাঁদের হাতের কাছে ট্রানজিস্টার নেই তাঁরা কয়েক মিনিট বাদে বাদে ফোন ডায়াল করছেন ২৩০১৪১—"টেস্টের লেটেস্ট স্কোর কি?" এতে কি আর কাজে মন বসে?

একটুও না খেলে শুধু পড়লে ছেলে ভোঁদা মেরে যায়, আর কোন কাজ না করে দেশের সব লোক তিন মাসে পঁচিশ দিন শুধু খেলার খবর শুনলে কি হয়? দেশটাই জাহান্নমে যায়। পঁচিশ দিন সবাই হাত গুটিয়ে ও মন-কান খাড়া করে শুধু খেলা দেখলে ও শুনলে, দেশের যে পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতি—অন্যভাবে তা করলে দেশদ্রোহিতার অপরাধে তার কঠোরতম শাস্তি হয়। কিন্তু ট্রানজিস্টারে মন ও কান লাগিয়ে নিজের দেশের ক্রিকেট টেস্ট জয়ের আশা-নিরাশায় মশগুল হয়ে লক্ষ লক্ষ লোক দেশপ্রীতির বাহাদুরি নেয়। টেস্ট ক্রিকেটের অন্তর্দ্বন্দ্বের এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি প্রয়োজন!

ক্রিকেট খেলার মূলে চাই ধৈর্য—কি খেলোয়াড়ের, কি দর্শকের। খেলোয়াড় এতটুকু অধৈর্য হলে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফেরা, অধৈর্য দর্শকের উত্তেজিত দাবিতে বিব্রত খেলোয়াড়ও ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া সাদা জামা পরা ভদ্রলোক যেভাবে ক্রিকেট আইনের সিদ্ধান্ত দেবেন, সেটি নির্বিবাদে মেনে চলার নাম চারিত্রিক বা ক্রিকেটী চরিত্র।

অথচ আজকের দুনিয়ায় সর্বশ্রেণীর মানুষ উগ্রভাবে অধৈর্য। ভাববো না, বিচার করবো না, এই মুহূর্তে যা মনে হবে তাই দাবি করবো এবং সে দাবি সঙ্গে সঙ্গে পূরণ না হলে লণ্ডভণ্ড করবো, একজন শুরু করতে পারলে, পিছনে বিরাট বাহিনী জুটতে মুহূর্তকাল লাগে না।

আর আইন, বিচার, সিদ্ধান্ত? এখন সব কিছু জনতা। আইন বিচার সিদ্ধান্ত জনতার পছন্দমত না হলে. সঙ্গে সঙ্গে সহিংস আইন-অমান্য বিক্ষোভ ও দাঙ্গা। যতক্ষণ ক্রিকেট আম্পায়ার যান্ত্রিক না হচ্ছে, ততক্ষণ মানবিক ভুলের আশঙ্কা থাকবেই। আর চোখের পলকে যে সিদ্ধান্ত দিতে হয়, তা ভুল বুঝলেই পালটানোর বিপদ ও ঝুঁকি অনেক। কিন্তু ভুল হয়েছে বুঝেও যেখানে মেনে নেওয়া ক্রিকেটের নীতি, সেখানে মানসিক

১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারীতে ইডেনে লঙ্কাকাণ্ড শুরু হবার মুহূর্তে। নিরীহ দর্শক সতীশ রায়কে মেরে দর্শকদের উত্তেজিত করেছিল পুলিশ। চারটি ছবিতে সেই প্রহারের এবং তার পরের দৃশ্যগুলো চিরকালের মত তুলে রেখেছেন ফটোগ্রাফার শ্রীঅলোক মিত্র।

বিকারেও ভুল অনুমান বা কল্পনা করে নিয়ে বিচারকের রক্ত বা মুণ্ড বা দুই-ই দাবি করাতে আজকের দিনের জনতার প্রবল প্রবণতা—এবং ক্রিকেট দর্শক এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়।

ক্রিকেটের খাস জন্মভূমি ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কমে আসছে তার প্রমাণ মিলেছে বিগত ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট সীরিজের সংবাদ চিত্রগুলিতে শূন্য আসনের সারি থেকে। অস্ট্রেলিয়াতেও প্রধান টেস্ট ক্রিকেটার আজ আর জাতীয় বীর হিসেবে জনমনোমন্দিরের রত্নবেদীতে আসীন নয়।

ক্রিকেটের উগ্র জনপ্রিয়তা ভারতে, পাকিস্তানে ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজে প্রবল। কারণ এই তিনটি দেশই তাদের মানসিক দৈন্যের প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় শ্বেতাঙ্গদের খেলা ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয়লাভকে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ উপায় বলে জ্ঞান করে। এ জাতীয় মানসিক দৈন্য দীর্ঘকাল পরাধীন ও নিজ কৃষ্ণাংগদের জন্য শ্বেতাংগগণ কর্তৃক হেয় বিবেচিত হবার প্রতিক্রিয়াজাত মানসিক বিকার বিশেষ—কোন সুস্থ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

রাজা মুখার্জী

ক্রিকেটের মত প্রকৃত সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ ঘরের বাগানে, পাড়ার বাগানে চাষ কর, তাকে প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনা সৃষ্টির কেন্দ্র করে তুললে, তা কুৎসিত হয়ে উঠবে। পাড়ায়, ক্লাবে, স্বদেশে ক্রিকেট এখনও সুন্দর—উত্তেজিত দর্শকবিহীন খেলোয়াড়দের আনন্দের খেলা।

কিন্তু আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার নামে উগ্রজাতীয়তাবাদের মুখোসধারী প্রকৃত দেশদ্রোহিতার উত্তেজনা জাগায় ও তা সমর্থন করে। এই অসুস্থতা কতদিন চলতে পারে?

টেস্ট ক্রিকেটে সমর্পিত মনপ্রাণ লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী টেস্ট ক্রিকেটের অন্ধকার ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য আমাকে শাপ দিন ক্ষতি নেই, যেন কোরাস কান্না শুরু না করেন, কারণ ক্রিকেটের মৃত্যুর অনেক আগেই তাঁদের ক্রিকেট-নেশা ছুটে যাবে।

ক্রিকেট খেলার পাঁচ দিন: কলকাতায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রিকেট মানেই শীতের নরম রোদ, কমলালেবু আর কেকের দিন, গড়ের মাঠের এখানে-ওখানে বল পেটানোর শব্দ, আর সেই শান্ত, নির্জন—শহর থেকে দূরে টালা পার্কে বড়ো ম্যাচের আয়োজন। ক'জন আর পাগল হত ক্রিকেটের জন্য? বাঙালীর মন-প্রাণ পড়ে থাকত ফুটবলে—সেই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-মোহামেডান—সেই উতরোল জনতা, তখনো হেওয়ার্ড কোম্পানীর কাঠের গ্যালারি, তখনো একালের মতো গাছের ডালে নাচতে গিয়ে দু'-চারজনের ভূতলে পতন—মধ্যে মধ্যে মাউন্টেড পুলিশের আবির্ভাব—হাতাহাতি।

ইতিহাস ভুল হচ্ছে কি না বলতে পারি না—কিন্তু ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার এই কোটালের বান ডেকেছে বোধ হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। অল্প বয়সে যে মফস্বল শহরে আমার দিন কেটেছে, সেখানে উত্তর বাংলার এক নামকরা ফুট-বল প্রতিযোগিতা ছিলঃ 'নরনারায়ণ শীল্ড।' সে খেলা দেখবার জন্যে আমরা পাগল হয়ে থাকতুম—কত নামকরা প্লেয়ারকে খেলতে দেখেছি 'নরনারায়ণে'—সামাদ, মোনা দত্ত, বড়ো নূর মহম্মদ, শরৎ সিং—মনে নেই, আরো কে কে। ক্রিকেট তখনও ছিল—কোনো উত্তেজনা ছিল না। মালকোঁচা করে ধুতি পরে—মাথায় ফেল্ট হ্যাট চাপিয়ে দুপুরের রোদে কিছু ভদ্র-সন্তান অবশ্যই ক্রিকেট খেলতেন, কিন্তু আমাদের পুরোনো টেনিস বল আর কেরোসিন কাঠের ব্যাটের খেলার সঙ্গে তার বিশেষ কোনো তফাৎ ছিল না।

এখন ক্রিকেটের ভরা কোটাল। পাঁচদিন খেলার আম-জনতা ইস্টবেঙ্গল-মোহন-বাগান-মোহামেডানের ভিড় কোথায় ছাপিয়ে যায়। একখানা টিকিটের জন্যে যে প্রাণান্ত সাধনা শুরু হয়, তাতে করে যে-কোনো একটা ভালো চাকরি বাগিয়ে নেওয়া চলে। পাড়ার যুবকেরা টিকেটের খোঁজে ধাবমান, অফিসের করণিকরা উদ্-ভ্রান্ত, বড়ো সায়েবেরা টেলিফোনে ক্রিকেটের জন্যে তদ্বির করছেন, অধ্যাপক পড়াতে পড়াতে অন্যমনস্ক—কে যেন একখানা সীজন-টিকেট জোগাড় করে দেবে বলেছে; আর যাঁরা টিকেটের ব্যবস্থা করতে পারেন—তাঁরা সাময়িকভাবে নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

এখন ক্রিকেট। কলকাতার আকাশে-বাতাসে ক্রিকেট। কর্তার অফিসের ভাত যোগান দিয়ে, মোজা রিপু করে, কালী-ঘাটে পুজো দিয়ে আর ছেলেমেয়ে মানুষ করে যে গৃহিনী খাটের ঘরে পৌঁচেছেন, এর পরে তিনিও এসে দাঁড়াবেন রেডিয়োর সামনে।

'কত রান হল রে? কেমন খেলছে বিশ্বনাথ?'

পাঁচদিন কলকাতা ডুবে থাকবে ক্রিকেটে। বিশ্রামের দিনটিও বাদ যাবে না। চলবে সমালোচনা, তর্ক, সেপক্যু-লেশান, বাজী ধরা। বিদগ্ধ বুদ্ধিমানেরা এই ফাঁকে মাটকা পেতবেন। ক্রিকেটের নেশায় আর শীতের আমেজে ক'দিন বুঁদ হয়ে থাকবে কলকাতা। কেরানীরা অফিস পালাবেন, ছাত্রেরা ক্লেশ নীতি নেবে—শিক্ষকদের জরুরি ছুটির দরকার পড়বে, নিমতলা-কেওড়াতলায় মড়া পোড়াতে গিয়েও কেউ কেউ ট্র্যানজিস্টর খুলবেন—পানের দোকানের উৎসুক জনতার সামনে দাঁড়িয়ে পড়বে কৌতূহলী ঠেলাওলা, জানতে চাইবেঃ 'কেত্না রান হুয়া?'

ঠিক কথা—রেডিয়ো—ক'জন আর মাঠে গিয়ে খেলা দেখবে, টিকেট পাওয়ার সৌভাগ্য কতজনের হবে আর? রেডিয়োতেই লোকে ক্রিকেট শুনবে—দেখবে বললেও অন্যায় হয় না। রেডিয়োতেই তারা স্কোয়ার-লেগে বাউ-ন্ডারী দেখতে পাবে, স্লিপে ক্যাচ উঠতে দেখবে, ইয়র্কার বলে স্ট্যাম্প উড়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করবে—বল করবার আগে ম্যালেট কিংবা প্রসন্ন ট্রাউজারে বল ঘষে 'এয়ার শাইন' আনতে চাইছেন তা-ও ঘটবে তাদের চোখের সামনেই।

যদি রেডিয়োতে ক্রিকেটের 'রিলে' না থাকত—কী হত তা হলে?

আমার সন্দেহ হয়, তা হলে ক্রিকেটের এই জনপ্রিয়তা আসত না—কিছুতেই না। আসলে, বেতার-ভাষ্যকারেরাই দেশ জুড়ে এই ক্রিকেট-ফিভার ছড়িয়ে দিয়েছেন।

খেলা যেমনই হোক, এই ভাষ্যকারেরা একটি দুর্লভ শক্তির অধিকারী। তাঁদের বিবরণ শুনতে শুনতে ঘরের মধ্যে বসে আমাদের শিহরণ জাগে, মনে হয় যে-কোনো বলে, যে-কোনো স্ট্রোকে একটা রোমাঞ্চকর কিছু ঘটে যেতে পারে—ঘটে যাচ্ছে। সেরকম যে ঘটে না তা-ও নয়। কিন্তু রোমাঞ্চকর ইডেন উদ্যানে সমারূঢ় হয়ে দু'-একবার ক্রিকেট-ম্যাচ আমিও তো দেখেছি। দুর্দান্ত 'তেজা' খেলা হোয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেই স্বর্ণযুগ—সেই ওরেল-উইক্স্-ওয়ালকটের মাঠ-কাঁপানো মার—সেই ব্যাটে-বলে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ!)—দশ মিনিট পরে হয়তো এক

[শেষাংশ ১৫১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সর্বকালের সেরা?

অজয় বসু

কৃষ্ণনগরের জাহাঙ্গীর আলমের ক্রিকেটে অনুরাগ খাঁটি। নানান খেলাধুলা সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ আছে। তবে ক্রিকেট সম্পর্কেই তিনি বোধহয় বেশি আগ্রহী। জাহাঙ্গীরকে আমি চাক্ষুষ দেখি নি। তবে পত্রযোগে আমি এবং তিনি আলাপচারী। পরস্পরের বন্ধু। অনুমান করতে পারি যে, জাহাঙ্গীর একজন ছাত্র। ছাত্রসুলভ মনোভাবেই তিনি খেলাধুলা প্রসঙ্গে নানান তথ্য জানতে চান।

মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন তোলেন যার জবাব জানাতে পুঁথি-পত্তর ঘেঁটেও হিমসিম খেতে হয়। আর তাঁর সব প্রশ্নের জবাব যে বইয়ের পাতায় ধরাও থাকে তাও নয়। এই যেমন, ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি ক্রিকেট দল গঠন করে দেবেন:

জাহাঙ্গীর মাথা খাটিয়ে এই যে প্রশ্নটি খুঁজে বার করেছেন, তার উত্তরের সন্ধান পেতে আমি কোন্ বইয়ের পাতা ওল্টাবো? এমন প্রশ্নের জবাব কোনো কেতাবেই লেখা নেই। তবে ওঁর প্রশ্নে বুদ্ধির ছাপ রয়েছে। এবং প্রশ্নটিও যাঁদের তাঁদের মধ্যে আগের আমলের যে মজাদার বলে দস্তুরমতো মগজ খাটিয়েই আমি একটি দল খাড়া করে জাহাঙ্গীরের প্রশ্নের জবাব খুঁজতে চেষ্টা করছি।

জানি, এ চেষ্টায় স্মৃতি ও শ্রুতি মন্থন করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। গত চল্লিশ বছরে ভারতের বিভিন্ন মাঠে যেসব নামী খেলোয়াড়দের স্বচক্ষে দেখেছি তাঁদের দিকে আজ আবার নতুন করে দৃষ্টি দিতে হবে। ক্রিকেটে পরিণত জ্ঞান আছে সব খেলোয়াড়ের কথা শুনেছি, সে কথাতেও আর একবার কান পাততে হবে। এবং পত্র-পত্রিকায় দিকপাল ভারতীয় ক্রিকেটারদের যে প্রশস্তি প্রকাশিত হয়েছে, তার মূল্যায়নেও সনিষ্ঠ থাকতে হবে।

তবু ভয় হয়, সর্বকালের সেরা ভারতীয় ক্রিকেট দলকে বেছে নেবার সাধু চেষ্টায় বিতর্ক এড়াতে পারবো কি। মতে মতে সর্বক্ষেত্রে মিল দেখা দেবে না। তবে সান্ত্বনা শুধু এইটুকুই যে, সর্বসম্মত দল নির্বাচন করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। ভারত-নিউজিল্যান্ড বা ভারত-অস্ট্রেলিয়ার এ পর্যায়ের খেলায় বিজয় মার্চেন্টের নেতৃত্বে নির্বাচকমণ্ডলী মোটামুটি সন্তোষজনক পদ্ধতিতেই তাঁদের কাজ সারছেন। তাঁরা জাতীয় দলে নতুন রক্ত আমদানীর মহৎ চেষ্টায় হাত দিয়েছেন। তবু তাঁদের কার্যকলাপ ঘিরে তীক্ষ্ণ সমালোচনার শর একেবারে অপ্রযুক্ত নয়। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত এক ক্রীড়া সাপ্তাহিকে গুণী ক্রিকেটার বিজয় মার্চেন্টের প্রতি কটাক্ষ করে বলা হয়েছে, কোন্ বিবেচনাবোধে নির্বাচকমণ্ডলী দিলীপ সারদেশাই, রুসি সুর্তি, চান্দু বোরদেকে দল থেকে ছেঁটে রাখছেন?

ওই ক্রীড়া সাপ্তাহিকের বিশেষ প্রতিনিধিকে কি করে বোঝানো যায় যে, নতুন খেলোয়াড়ের প্রকাশের পথ পরিষ্কার রাখায় মন থাকলে, পুরনোর মোহ ত্যাগ করতেই হয়! সারদেশাই যদি কানপুর টেস্টে খেলতে পেতেন তাহলে ভারতীয় ক্রিকেট অশোক মানকাদকে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে আবিষ্কার করতে পারতো কি? বোরদে, সুর্তিকে যদি আবার সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হোতো তাহলে বিশ্বনাথ ও সোলকারের প্রতিষ্ঠার পথ সহজ হোতো না।

কোনো নির্বাচকমণ্ডলীই কোনো দিনই সমস্ত পক্ষকে খুশি করতে পারেন না, তা তাঁদের চিন্তাধারা যতোই পবিচ্ছন্ন হোক না কেন। নির্বাচকদের অনেক ঝুঁকি নিয়েই তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাঁরা যতোই ঝুঁকি নেন, ততোই তাঁদের কর্মরীতি ও নীতি ঘিরে বিতর্কের ঝড় ওঠে। এই ঝড়কে আমল দিতে গেলে নির্বাচন করা যায় না, নির্বাচকমণ্ডলীর অস্তিত্বকে শূন্যে বিলিয়ে দিতে হয়।

অতএব আমারও আশঙ্কার বিশেষ কোনো কারণ নেই। জাহাঙ্গীর আলমের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে আমি যদি উত্তপ্ত বিতর্কে হাত পুড়িয়ে ফেলি, তাতেই বা কি যায় আসে! বিতর্কের আঁচ জ্বালা ধরিয়ে দিলেও, নিজের কাজের কৈফিয়ৎ হিসেবে সেই পুরনো উপলব্ধিকেই স্মরণ করবো যে, কোনো

॥ স্মরণীয় সাক্ষাৎকার ॥
বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে আছেন দলীপ সিংজী, ডন ব্রাডম্যান ও লালা অমরনাথ

নির্বাচকই কোনোকালে সমস্ত পক্ষকে সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। বিজয় মার্চেণ্টও নন। স্বয়ং স্যার ডন ব্র্যাডম্যানও নন।

কাকে ফেলি এবং কাকে রাখি? সর্বকালের মূল্যায়নের কাজে কোন্ কাল থেকে ঝাড়াই-বাছাইয়ে হাত দিই তাও এক সমস্যা। টেস্ট ক্রিকেটের আগের আমলের খতিয়ানও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ তখনকার ইতিহাস বলতে বিশেষ কিছুই নেই। তাছাড়া সেকালে ভারতীয় ক্রিকেটারদের জাত আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কষ্টিপাথরে বড় একটা যাচাই হয় নি। তাই যে-কালে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় দলের যাত্রা শুরু হয়েছে সেই কাল ও উত্তরকাল মিলিয়ে যদি বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা যায় তাহলে সমস্যা সমাধানের সূত্র মেলে।

সর্বকালের সেরা ভারতীয় দল গঠনে এই সূত্রটিকে ধরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। যদিও প্রাক্ টেস্ট যুগে এমন অনেক খেলোয়াড়ের কথা শুনেছি, যাঁদের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। যথা ১৯১১ সালের ইংলণ্ড সফরকারী দলের ন্যাটা স্পিন বোলার বালু, শুধু নিজের বাহুবলেই যিনি সেবার ইংলণ্ডে শতাধিক

যাদের নিয়ে দল গড়তে হলে সবার আগে যোগ্যতম অধিনায়ককে মনোনীত করা এবং ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং ও উইকেটরক্ষণে সর্বশক্তি নিয়োগ করা গেল কি না, অথবা সব বিভাগ মিলিয়ে দলের ভারসাম্য বজায় রইলো কি না তার দিকেও নজর রাখা চাই। কোনো দিকে ফাঁক থাকবে না এমন একটি মনোমতো দল গড়তে হলে জন পাঁচ-ছয় ব্যাটসম্যান, দুজন ফাস্ট বোলার, দুজন স্পিন বোলার এবং একজন উপযুক্ত উইকেটরক্ষককে বেছে বার করতে হয়।

ভারতের যোগ্যতম অধিনায়ক কে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজায় এতোটুকু ঝামেলা নেই। কারণ, সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, ওই আসনটি যাঁর জন্যে নির্দিষ্ট তিনি হচ্ছেন সি কে নাইডু—একমেবাদ্বিতীয়ম। সেরা পেস বোলার জুটি? এখানেও দ্বিধা নেই—মহম্মদ নিসার ও অমর সিং। ১৯৩২ সালের এক যুগ আগে যদি টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের আবির্ভাব ঘটতো তাহলে সেরা পেস বোলারের স্বীকৃতি পেতে রামজী, চন্দ্রানা হয়তো জোরদার দাবি রাখতে পারতেন।

স্পিন জুটি বাছাইয়েও বিশেষ সমস্যা

ছেন বা সমস্ত খাটিয়ে, আক্রমণ ও বাহুকে সক্রিয় রেখে ভিনু মানকাদ দীর্ঘদিন যে সম্মানের কীর্তিধারা ধরে রেখেছিলেন, ক্রিকেটের অন্য দুনিয়াতেও তার তুলনা খুব বেশি মিলবে কি? গুপ্তে আর ভিনু যদি ইংলণ্ড বা অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমার অভিমতের সমর্থন অন্যত্র জোরালো অভিমত হাতের কাছেই পাওয়া যেতো।

সেরা পাকা উইকেটরক্ষণের দায়িত্ব কার হাতে ছেড়ে রাখা যায় তো নির্বাচনের কাজ কিন্তু খুব সহজ নয়। আগের আমলের ম্যাণ্ডলে, হিন্দেলকার এবং পরবর্তী কালের জমানে, ইঞ্জিনীয়াররা এই পদের দাবিদার। এঁদের মধ্যে প্রথম দুজন টেস্ট খেলেছেন নামমাত্র এবং উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হিসেবে ফারুক ইঞ্জিনীয়ারই সর্বোত্তম। কিন্তু সেরা দলে আমি ব্যাটসম্যান-উইকেটরক্ষককে জায়গা দেওয়ার পক্ষপাতী নই। উইকেটরক্ষার কাজ বিশেষজ্ঞদেরই সাজে। ও-কাজে যিনি বিশেষজ্ঞ তাঁকে পছন্দ করাই নিরাপদ। কারণ ব্যাটসম্যান-উইকেটরক্ষক রান করলেও করতে পারেন। কিন্তু উইকেটরক্ষণে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে গেলে স্পিনের ব্যাটসম্যানেরা

॥ মহা মিলনের বেলা ॥

বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে আছেন বিজয় হাজারে, লালা অমরনাথ, পাতৌদির নবাব (বড়) ডি জি ও সি কে নাইডু

উইকেট পেয়েছিলেন। অথবা অপরাজেয় ফাস্ট বোলার রামজী, ম্যাটিং উইকেটে যাঁর সামনে দাঁড়াতে ইংলণ্ডের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদেরও বুক কাঁপতো। তাছাড়া ডঃ কাঙ্গা, কর্নেল মিস্ত্রী, ফাস্ট বোলার চন্দ্রানা, ন্যাটা স্পিনার ওয়ার্ডেনেরা ছিলেন জাত ক্রিকেটার হিসেবে অবিস্মরণীয়। কিন্তু ওঁরা বড় একটা টেস্ট ক্রিকেট খেলেন নি এবং প্রথম শ্রেণীর আসরে বিদেশী দল বা বিদেশী খেলোয়াড়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশও তেমন পান নি। কাজেই ওঁদের এড়িয়ে এই শতকের তিন দশক থেকেই হিসাব-নিকাশের পালা শুরু করা ভাল। যেহেতু টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের আবির্ভাব ওই লগ্নেই।

নেই। কারণ আগেই বলেছি প্রাক্ প্রথম মহাযুদ্ধের আমলের বালুকে (পুরো নাম বালু বাবাজী পালোয়ঙ্কার) আমি ছেড়ে রাখতে চাই। তাঁকে বাদ রাখলে স্পিনার জুটি হিসেবে যাদের নাম সবার আগে এসে পড়ে, তাঁরা হলেন ভিনু মানকাদ ও সুভাষ গুপ্তে। ওঁদের আগে-পরে অথবা সমসাময়িককালে সি এস নাইডু, আমীর এলাহী, সিন্ধে, গোলাম আমেদ, প্রসন্নরা সময় সময় অনেক কীর্তি গড়লেও, ভিনু মানকাদ বা সুভাষ গুপ্তেকে ছাড়িয়ে যাবার সামর্থ্য ওঁদের কারুরই নেই বা ছিল না।

কব্জী ঘুরিয়ে লেগ স্পিন ও গুগলি বল করার সুক্ষ্ম কাজে যে দক্ষতা দেখিয়ে-

যে কতো রান তুলে ফেলতে পারেন তার হিসেবটা নিয়ে রাখা দরকার। আমার মনে হয়, নিছক একজন উইকেটরক্ষক হিসেবেই যদি হিন্দেলকারকে এই দলে জায়গা দেওয়া হয় তাহলে নির্বাচন কাজে বে-হিসেবের পরিচয় রাখা হয় না। হিন্দেলকার হাত-পা ছুঁড়ে বা সশব্দে গলা ফাটিয়ে নিজেকে জাহির করতেন না। তবে প্রায় নিঃশব্দেই তিনি তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে গেছেন।

এবার ব্যাটসম্যানদের কথা হোক। ইনিংসের গোড়াপত্তনে আমার মনোনীত জুটি হলেন বিজয় মার্চেণ্ট ও মুস্তাক আলি। বে-হিসেবী, বেপরোয়া এবং

অনিশ্চিত বলে অতি সতর্ক যাঁরা, তাঁরা মুস্তাককে পছন্দ না করলেও তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায় যে, এমন বে-হিসেবী ও অনিশ্চিত হয়েও মুস্তাক টেস্ট ক্রিকেটে গোড়াপত্তন করতে এসেই একাধিক সেঞ্চুরী করেছেন। ১৯৩৬ সালে ওয়াজির আলির মতো পরিণত ও প্রতিষ্ঠিত ওপেনারকে সরিয়ে দিয়েই মুস্তাক আলি দলের প্রথম উইকেটে নিজের জায়গা কায়েম করে নিয়েছিলেন। ওপেনার হিসেবে কথা উঠলে না ভেবে-চিন্তে হয়তো কেউ কেউ পঙ্কজ রায় বা নরি কণ্ট্রাকটরকে মুস্তাক আলির চেয়ে নির্ভরশীল বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের জেনে রাখা দরকরার টেস্টে পঙ্কজের ব্যাটিংয়ের গড় হিসেব হলো ইনিংস পিছু ৩২·৫৪। মুস্তাকের ৩২·২১। কতোটুকু আর তফাৎ? আর কণ্ট্রাকটরের গড় ৩১·৫৮। তাছাড়া মুস্তাককে বাদ দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দল তার আবেগময় চরিত্র, তার স্বকীয়তা ও তার পরিচ্ছন্ন স্টাইল, কোনো কিছুই বজায় রাখতে পারবে না। বিনা মুস্তাকে সেরা ভারতীয় দলও তার ক্রিকেটী গ্ল্যামার হারিয়ে বসবে।

তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে সেরা দলের পক্ষে কে খেলতে আসবেন? লালা অমরনাথ না মনসুর পাতৌদি? প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই চড়া গলার বিতর্কে চারপাশ কল্লোলিত হবেই, বুঝতে পারছি। কিন্তু উত্তপ্ত বিতর্ক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করে না বলেই শান্ত মেজাজে বিষয়টির ফয়সালার চেষ্টা করা যাক।

ভরা যৌবনে ব্যাট হাতে যাঁরা লালা অমরনাথকে জার্ডিনের দলের বিপক্ষে বোম্বাই টেস্টে, বে-সরকারী টেস্টে লর্ড টেনিসের দলের বিপক্ষে ইডেনে দেখেছেন (আমিও সেই প্রত্যক্ষদর্শীদের দলেই) তাঁদের মনে অমরনাথের ভাবমূর্তি এখনও আবেগে টলমল করছে। ব্যাটের ঘায়ে বিপক্ষকে বিধ্বস্ত করার এমন অনুপ্রাণিত মূর্তি, বিশেষত বোম্বাই টেস্টের, ভারতের মাঠে কদাচিৎ দেখা গিয়েছে। তাছাড়া ১৯৪৭ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে লালার ঝলমলে ব্যাট সে-দেশের দর্শকসাধারণ ও বিদগ্ধমণ্ডলীকেও মুগ্ধ করেছিল। স্বয়ং স্যার ব্র্যাডম্যানও অমরনাথ সম্পর্কে বলেছেন 'ব্রিলিয়্যাণ্ট রান গেটার!'

অমরনাথের ব্রিলিয়্যান্স ক্রিকেটের সম্পদ। উদ্ধত তেজ এবং ঢলঢল লাবণ্য, দুটি বিপরীতধর্মী গুণের প্রকাশে তাঁর ব্যাটিং অবিস্মরণীয়। কিন্ত কেন জানি না, লালা অমরনাথ যেন টেস্ট ক্রিকেটের বাইরেই স্বমহিমায় প্রকাশিত হতে পেরেছেন। টেস্ট ক্রিকেটে পারেন নি। ১৯৩৩-৩৪ মরশুমে বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই অমরনাথ সেঞ্চুরি করেন। তারপর নয়-নয় করে আরও তেইশটি টেস্ট খেলায় সুযোগ পান। কিন্তু পরের সুযোগে কোনোদিনই তিনি আর সেঞ্চুরি করতে পারেন নি।

১৯৪৭ সালে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট ম্যাচের বাইরে লালা অমরনাথ প্রথম শ্রেণীর খেলায় রান করেছিলেন দলের সবার চেয়ে বেশি—১১৬২, গড়ে ইনিংস পিছু ৫৮·১০। কিন্তু সেবারই টেস্টে এই 'ব্রিলিয়্যাণ্ট রান গেটার'-এর সংগ্রহ দশ ইনিংসে মাত্র ১৪০, গড়ে ইনিংস পিছু চোদ্দটি। প্রায় বিশ বছরের ফাঁকে মোট চব্বিশটি টেস্টের চল্লিশটি ইনিংসে অমরনাথ রান করেছেন ৮৭৮ (তাও জীবনের প্রথম টেস্টে সংগৃহীত ১১৮ রান ধরেই), ২৪·৩৮।

পরিসংখ্যানের এই হিসেবই বলে দেয় যে, লালা অমরনাথ অন্যত্র অন্য জাতের ব্যাটসম্যান। কিন্তু টেস্ট খেলার আসরে ব্যাটসম্যান হিসেবে অনুল্লেখ্য। সেরা ভারতীয় দলটিকে যদি অন্য কোনো বাছাই দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়, তাহলে লালা অমরনাথের বদলে মনসুর পাতৌদিকেই আমি বেশি পছন্দ করবো। আর সেই অনুষ্ঠান যদি প্রীতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রদর্শনী ক্রিকেট হয় তাহলে মনসুরকে ফেলে লালা অমরনাথকেই বেছে নেবো। মনসুর অমরনাথের চেয়ে টেস্টে অনেক বেশি রান ও সেঞ্চুরি করেছেন এবং তিনিও যে একজন ব্রিলিয়্যাণ্ট ব্যাটসম্যান ১৯৬৭-৬৮-তে অস্ট্রেলিয়া পরিক্রমায় তারও প্রমাণ রেখে এসেছেন। লালার মতো অতোটা না হলেও মনসুর চটকদার এবং টেস্টে আরও নির্ভরশীল।

অমরনাথ বোলার হিসেবেও গুণী। কিন্তু যে দলে অমর সিং, নিসার, মানকাদ, গুপ্তেরা (দরকারে সি কে নাইডুও অফ্-স্পিনের ফাঁদ বিছোতে পারবেন) রয়েছেন সে-দলে বাড়তি একজন বোলার রাখার বিশেষ দরকার আছে কি? টেস্ট মাঠের বাইরে প্রদর্শনী ক্রিকেট, রনজি ট্রফি বা বিদেশের প্রথম শ্রেণীর আসরে লালা ব্যাট হাতে বুক চিতিয়ে প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়েছেন। কিন্তু টেস্টে নয়। সেখানে মনসুর বহুবার অনমনীয় লড়িয়ে মেজাজের স্বাক্ষর রেখেছেন।

যে-অনমনীয়তার প্রতীক হলেন বিজয় হাজারে। তাঁকে বাদ দিয়ে সেরা পর্যায়ের কোনো দল গঠনের চিন্তা মনেই আনা যায় না। নির্বাচিত সেরা দলে তিনি থাকবেনই থাকবেন। ক্রিকেটের পরম গৌরব অনিশ্চয়তা। যদি কোনো মুহূর্তে বাছাই দলটি সেই অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখে গিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে হাজারে ছাড়া কেই বা পরিত্রাণকর্তার মহান ভূমিকা নিতে পারবেন? বাত্যা-বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গ উত্তরণে হাজারেই তো বিজয় মার্চেণ্টের মতো ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে পারের কড়ি।

দশজনকে বেছে নিয়েছি। বাকী একজন ব্যাটসম্যান দরকার, যিনি ইনিংসের মাঝামাঝি খেলতে আসবেন। কে তিনি মঞ্জরেকার, পলি উম্রিগড়, না চান্দু বোরদে? বিজয় হাজারে থাকতে মঞ্জরেকারকে দরকার কি? আমার পছন্দ পলি উম্রিগড়কেই। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এযাবৎ একমাত্র তিনিই টেস্টে সাড়ে তিন হাজারের ওপর (৩৬৩১) রান করতে পেরেছেন এবং ১৯৫২ সালে না পারুন, ১৯৬২-তে এসে পোর্ট অব স্পেনে হল, স্টেয়ার্স, সোবার্স, গিবসের উদ্ধত ও চতুর আক্রমণকে পোষ মানাতে তিনি যে ব্যক্তিত্বের পরিচয় রেখেছেন তার স্মৃতিও মন থেকে মুছে যাবার নয়। তাছাড়া সেরা দলে সেরা পর্যায়ের ফিল্ডসম্যানও থাকা চাই। সি কে নাইডু, নিসারের পাশে স্লিপে দাঁড়াবার সময় পলি উম্রিগড় ছাড়া আর কাকেই বা তেমনি মানানসই বলে মনে হবে?

এগারোটি নামের উল্লেখ রেখেছি। এবার কে কখন খেলতে নামবেন, ক্রমপর্যায় অনুসারে তার তালিকা সাজিয়ে দিই:

বিজয় মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলি, মনসুর পাতৌদি, সি কে নাইডু (অধিনায়ক), বিজয় হাজারে, পলি উম্রিগড়, ভিনু মানকাদ, অমর সিং, হিন্দেলকার (উইকেটরক্ষক), মহম্মদ নিসার ও সুভাষ গুপ্তে।

আমার নির্বাচনের নমুনা দেখে প্রশ্নকর্তা জাহাঙ্গীর খুশি হবেন কি-না জানি না। জাহাঙ্গীর এ-যুগের ছেলে। নিজের কালের সম্পর্কে তাঁর যদি দুর্বলতা থাকে তাহলে তিনি প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, আমি বুঝি ফেলে-আসা কালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছি।

যদি ওঠে তাহলেও বলি, এ-প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। একালের অনেককে যদি সর্বকালের সেরা ভারতীয় দলে ঠাঁই না দিয়ে থাকি তাহলে বুঝতে হবে যে কালের মন যোগাতে আমার মন সায় দেয় নি। আমি বলতে পারি না, চাইও না যে, হাজারো সুযোগ-সুবিধে হাতে পেয়েও একালের ভারতীয় ক্রিকেটাররা ব্যক্তিগত দক্ষতা ও যোগ্যতায় পূর্বসূরীদের ডিঙিয়ে যেতে পেরেছেন। দু'-একজন অবশ্য ব্যতিক্রম। একালের সুযোগ-সুবিধে যদি বিগতকালের ভারতীয় ক্রিকেটাররা পেতেন তাহলে তাঁরা কোথায় উঠে দাঁড়াতে পারতেন, সেকথাটিও যেন একাল ভেবে দেখার চেষ্টা করে।

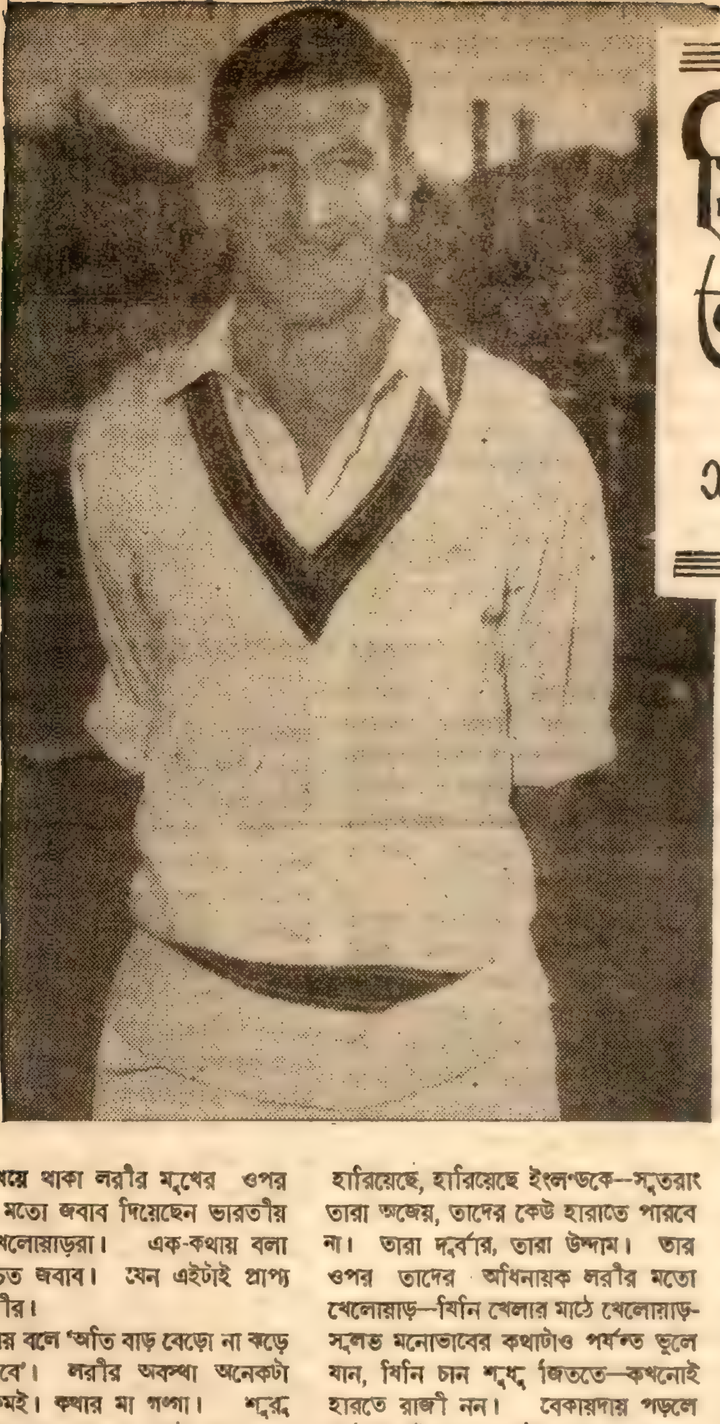

ফিরোজ-শার আগে ও পরে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখিয়ে থাকা লরীর মুখের ওপর জবাবের মতো জবাব দিয়েছেন ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা। এক-কথায় বলা যায় উচিত জবাব। যেন এইটাই প্রাপ্য ছিল লরীর।

কথায় বলে 'অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে'। লরীর অবস্থা অনেকটা সেই রকমই। কথার মা গঙ্গা। শুরু করলে হুড় হুড় করে বয়েই চলে, যেন থামতেই জানে না। তা না হ'লে ভারতের মাটিতে পা দিতে না দিতে ঐ রকমভাবে বাত্‌ফাট্টাই শুরু হয়! আশ্চর্য —গর্বে আর আত্ম অহংকারে শালীনতার সীমাটা পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেলেন ওঁরা। ভদ্রতার আবরণটুকু যেন ইচ্ছে করেই ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। যেন ভারতের কোটি কোটি জনতার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে অতি দর্পে বুক চাপড়িয়ে বললেন—আমিই সেই লরী, একথা বলার অধিকার আমার আছে। প্রত্যেকটা খেলাতেই আমরা জিতবো!

অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়েছে, হারিয়েছে ইংলণ্ডকে—সুতরাং তারা অজেয়, তাদের কেউ হারাতে পারবে না। তারা দুর্বার, তারা উদ্দাম। তার ওপর তাদের অধিনায়ক লরীর মতো খেলোয়াড়—যিনি খেলার মাঠে খেলোয়াড়-সুলভ মনোভাবের কথাটাও পর্যন্ত ভুলে যান, যিনি চান শুধু জিততে—কখনোই হারতে রাজী নন। বেকায়দায় পড়লে তাই শালীনতার কথাটা পর্যন্ত বেমালুম ভুলে যেতে পারেন তিনি। সেই লরীই কথায় কথায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রচারে বক্তব্যের ফোয়ারা ছোটালেন।

তার ওপর বোম্বাই-এর প্রথম টেস্টে জিতে ভাবলেন যে তাঁর সাত খুন মাপ—তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন, যা খুশি তাই বলতে পারেন। খেলার মাঠই যেন তাঁকে সে অধিকার দিয়ে বসে আছে।

পাতৌদির কথামতো দ্বিতীয় টেস্ট থেকে জোর দেওয়া হলো নতুন খেলোয়াড়দের ওপর। হাতে হাতে ফললো সুফল। লরীর বে-সরকারী বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান অস্ট্রেলিয়া দলের সংগে ব্যাটে, বলে আর ফিল্ডিং-এ সমানভাবে পাল্লা দিলেন ভারতের তরুণ খেলোয়াড়রা।

জীবনের প্রথম টেস্টে বিশ্বনাথ তো সেঞ্চুরীই করে বসলেন। তাঁর সেই খেলা, সেই উদ্দাম গতির, দুর্বার আক্রমণী মনোভাবের কাছে হার মানলো লরীর সমস্ত চাতুর্য। বিশ্বনাথের সেঞ্চুরী, সোলকারের আত্মবিশ্বাসী খেলা, অশোক মানকাদের মনোরম ভঙ্গিমা ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাসকে যেন কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিলো। দিল্লী টেস্টের আগে ভারতীয় দলটি ছিল আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর।

তাই দিল্লী গিয়েই লরী যখন জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'টসে জিতলে আমরা জিতবো আর হারলে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা জানাবো।' তখন বলতে নেই একটু যেন অবাকই হয়েছিলাম আমরা। আমাদের মনের মধ্যের মনটা যেন বার বার বলে উঠছিল, 'এতো অহংকার ভালো নয়।' আমরা তো জানি যে, 'অতি দর্পে হত লঙ্কা'। আর এ তো ছাই ক্রিকেট রণাঙ্গনের অসহিষ্ণু যোদ্ধা বিল লরী। সুতরাং...।

সুতরাং সেই টসেও জিতলেন লরী। কিন্তু ভারতীয় আক্রমণের ছোবলে কাবু হয়ে এলো দলের ব্যাটিং শক্তি। নেহাৎ চ্যাপেল সেঞ্চুরীটা করেছিলেন তাই। তবু টসে জিতে লরীর অস্ট্রেলিয়া তিন শ' রানও করতে পারলো না। ভারতের কোটি কোটি ক্রিকেটরসিকের মনে তখন একটাই ইচ্ছা—ভালো খেলুক ভারত, প্রাণ দিয়ে লড়ে যান ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা। কিন্তু তৃতীয় দিনের সকালে পিচের ওপর বল ঘুরতে লাগলো লাট্টুর মতো। ম্যালেট আর গ্লিসন যেন হঠাৎ ভীষণ হয়ে উঠলেন। অনেক রানে পিছিয়ে থেকে ভারত শেষ করলো তার প্রথম ইনিংস।

কিন্তু পিচকে তখন চিনে ফেলেছেন

বসুমতীর বই মানেই

সদ্য প্রকাশিত! নূতন সংস্করণ!
বেদব্যাস বিরচিত

মহাভারত

কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক সরল গদ্যে অনুবাদঃ ১ম ১৬ টাকা ২য় ১০ টাকা ৩য় ১০ টাকা ৪র্থ ৬ টাকা ৫ম ৬ টাকা। বড় টাইপে মূল্যবান কাগজে ছাপা।

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের

বৃহৎ তন্ত্রসার

১ম খণ্ড পনেরো টাকা
২য় খণ্ড দশ টাকা
(বহু চক্র ও যন্ত্রের চিত্র সহ)

স্তবকবচমালা

প্রতিটি দেবদেবীর স্তোত্র, মন্ত্র ও কবচের একত্রে প্রামাণ্য গ্রন্থ।
পৃষ্ঠা ২০৯ ॥ আট টাকা

শ্রীমদ্ভাগবদগীতা মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত ॥ নয় টাকা

গীতা গ্রন্থাবলী পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার। মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। পাঁচ টাকা

ছান্দোগ্য উপনিষদ / ছয় টাকা

যোগশাস্ত্র / পাঁচ টাকা

পবন-বিজয়-স্বরোদয় / তিন টাকা

শ্রীশ্রীগুরু শাস্ত্র / তিন টাকা

ব্রহ্মবাদ প্রদীপিকা / তিন টাকা

পুরশ্চরণ রহস্য / তিন টাকা

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য / দুই টাকা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত / আট টাকা

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ / ছয় টাকা

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত / ছয় টাকা

গৌরাঙ্গবলী / তিন টাকা

মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলী
১ম ৬ টাকা ২য় ৬ টাকা ৩য় ৮ টাকা

বিদ্যাসুন্দরের গ্রন্থাবলী/পাঁচ টাকা

ক্যাটালগের জন্য লিখুন। মফঃস্বল ও অন্যান্য সহরের পুস্তকবিক্রেতাদের জন্য কমিশন শতকরা কুড়ি টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
১৬৬, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

পাঠাইলে শতকরা পনেরো টাকা কমিশন

পাতৌদি। তাই সুব্রত আর গোডদারকে দিয়ে নাম-কা-ওয়াস্তে নতুন বলে বোলিং করিয়ে বল তুলে দিলেন বেদী আর প্রসন্নর হাতে। পাতৌদির মনে ভয় ছিল, চতুর্থ ইনিংস ব্যাট করতে হবে ভারতকে। তার ওপর অস্ট্রেলিয়াও আছে অনেক রানে এগিয়ে। তাই ডিফেন্স আর এ্যাটাকের সিদ্ধান্ত নিয়ে আক্রমণ শুরু করলেন।

প্রসন্ন আর বেদীর হাত থেকে ছাড়া পাবার পর পিচের ওপর আছাড় খেয়ে বলগুলো সাপের ছোবলের মতো এঁকে-বেঁকে ধেয়ে চলেছে ব্যাটসম্যানের দিকে। অস্ট্রেলিয়ার নামী ব্যাটসম্যানরা তখন চোখে সরষের ফুল দেখছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তখন তাদের 'শুধু আসা আর যাওয়া—শুধু স্রোতে ভাসা......।'

ভেসেই গেলো শেষ পর্যন্ত। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেলো মাত্র ১০৭ রানের মধ্যে।

সুযোগ এলো ভারতের জেতার। নিরেস্ট-পা-বোটলার তৃতীয় দিনের বিকেল আর চতুর্থ দিনের সকালটা ছিল আশা-নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান। শুরুতেই ইঞ্জিনিয়ার আউট। নাইট ওয়াচম্যান হিসেবে এলেন বেদী। কিন্তু পর দিন সকালেই আশোক মানকাদ ফিরে গেলেন।

কিন্তু বেদী আর ওয়াদেকার খেলার ধারা দিলেন পাল্টে। লাঞ্চের একটু আগে বেদী আউট হলেও বিশ্বনাথ এসে সারলেন বাকী কাজটুকু। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর বিশ্বনাথ আর ওয়াদেকারের হাতের ব্যাট ঘুরলো এ্যারোপ্লেনের প্রপেলারের মতো। রানের পর রান, বাউন্ডারীর পর বাউন্ডারী।

নরীর অভাব অস্ট্রেলিয়া দ্রুত এগিয়ে চললো পরাজয়ের পথে। তারপর ম্যাকেঞ্জির বলে এক রান নিলেন ওয়াদেকার। দুদলের রান সংখ্যা হলো সমান সমান। শেষ বলে প্রয়োজনীয় রানটা নিয়ে নিলেন বিশ্বনাথ। ভারত সাত উইকেটে হারিয়ে দিলো অস্ট্রেলিয়াকে.....!

তারপর? তারপর কথা ছিল ভারতকে হারাবার পর নরী তাঁর এক বন্ধুর সংগে যাবেন মাছ ধরতে। কিন্তু হারার জায়গায় জিতে গেলো ভারত। বন্ধু তাই জানতেন মাছ ধরা হবে না। অস্ট্রেলিয়া জিতলে তবেই মাছ ধরার কথা।

কিন্তু নরী এসে হাজির। মাছ ধরতেই হবে। যেতেও হলো তাই। অন্যদের মাছ ধরাটা হতো। নরীর অস্ট্রেলিয়ান ম্যানেজার বেনট সাহেব ক্ষমা চাইলেন পাতৌদির কাছে, তার ওপর পরাজয়—সেই লজ্জার কি? তবে কি নরীরও লজ্জা আছে?

[১৫০৯ পৃষ্ঠার পর]

রানের একটি হিসেবী দৌড়—একবার ঠুক, আর একবার ঠাক। দেখতে দেখতে মাথা ধরে যাচ্ছে, বিরক্তিতে ঝিমুনি আসছে, একটি সান গ্ল্যাসপরা মহিলা কার্ডিগান-বুননরতা আর একজনের সঙ্গে বিশ্রম্ভ সম্ভাষণ করছেন, অধৈর্য বালক-বৃন্দ মধ্যে মধ্যে চেঁচিয়ে উঠছে। সেই অতীব মন্থর, অতি নিরুত্তেজ খেলার রেডিয়ো-কমেন্টারী চলছে সতেজে—স্বরের ওঠা-নামার, ভাব-বৈচিত্র্যে। ঘরে বসে কিংবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাঁরা ভাষ্য শুনেছেন, তাঁদের উত্তেজনায় কিন্তু ভাটা পড়ছে না—তাঁরা মনশ্চক্ষে একটা জবর রোমহর্ষক খেলা দেখছেন। রান নাই হল, একটা দুর্ধর্ষ খেলা তো চলছে।

ক্রিকেটের মাঠে যাঁরা ট্রানজিস্টার বয়ে নিয়ে যান—তাঁরা নিঃসন্দেহে আনবুক্কের ফল খেয়েছেন। সামনের খেলা দেখে বিরক্তিতে যখন হাই উঠছে, তখন কানের কাছে রেডিয়ো খুলে দিলেই হল। তৎক্ষণাৎ ম্যাজিক! জমেছে—দারুণ জমেছে: এ গুড লেংথ বল—পুশড টুওয়ার্ডস সিলি মিড অন—নীটলি কালেক্টেড বাই—, রিটার্নড টু দা বোলার—

টেস্ট ম্যাচের পাঁচদিন কলকাতার স্নায়ুকে সজীব-শিহরিত করে কে রাখবে? না—টেস্ট ম্যাচ নয়, রেডিয়ো। আমার নিশ্চিত ধারণা—যদি কখনো কোনো মিরাকলবশত (মিরাকল ছাড়া আর কোনো উপায়ে সম্ভব নয়) কলকাতায় এমন একটা স্টেডিয়াম গড়ে ওঠে—যেখানে যে-কেউ জায়গা পেতে পারেন আর টেস্ট ম্যাচের বেতার-ভাষ্য যদি বন্ধ করে দেওয়া যায়, তা হলে অচিরে ক্রিকেটের দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। রেডিয়ো-প্রমুখাৎ যাঁরা ক্রিকেট-বিশারদ (অর্থাৎ শতকরা নব্বই জন) ধীরে ধীরে তাঁরা ম্রিয়মাণ হয়ে যাবেন—ট্রানজিস্টর না নিয়ে খেলা ক্রিকেট দেখতে গিয়ে দিন কয়েকের মধ্যেই লোকের অরুচি ধরে যাবে। তখন আবার ইতিহাসের প্রত্যাবর্তন—রিপীটস ইট-সেলফ—মাথায় টুপি পরে জনকয়েক ভদ্র-সন্তান প্রায় ফাঁকা মাঠে বল পেটাপেটি করবেন।

আচ্ছা—একটা এক্সপেরিমেন্ট করলে কেমন হয়? আদৌ কোনো ক্রিকেট-ম্যাচেরই দরকার নেই। বেতার-ভাষ্যকারেরা পাঁচদিনের স্ক্রীপট তৈরি করে—একটা কাল্পনিক খেলা রিলে করে চলুন—স্বরের বৈচিত্র্য—ভাবের পরিবর্তনে—অভিনেতার নৈপুণ্যে এই রকম রোমাঞ্চকর পরিবেশ গড়ে তুলুন তাঁরা।

তাতে কী হবে?

টেস্ট ম্যাচ ছাড়াই—পাঁচটা দিন কলকাতা টেস্ট-ম্যাচের বিবরণে শিহরিত, রোমাঞ্চিত, আলোড়িত হতে থাকবে।

স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু ক্রিকেট খেলা যতোদিন থাকবে, ক্রিকেটের মধ্যে ততোদিন বেঁচে থাকবেন স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল। বাঁদিকের ছবিতে স্যার ফ্রাঙ্ককে দেখা যাচ্ছে ইডেন উদ্যানে মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে আর নিচের ছবিতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক টেড ডেক্সটারের সংগে।

ক্রিকেট মাঠে

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

স্বদেশী আন্দোলনের ঠিক পূর্বে লর্ড কার্জন ও ফুলারের রাজত্বকালে যখন নব-জাগ্রত ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার স্পৃহা দমনের জন্য বৃটিশ শাসনকর্তাগণ সচেষ্ট হয়ে ওঠেন,—ঐ সময় দেশনেতাগণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাংলার জমিদার বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনে অগ্রসর হন। ইংরাজগণ ভারতীয়দিগকে সম্পূর্ণ শাসনাধীনে রাখবার জন্য তাঁদের একান্ত বাধ্য-অনুগত ও পোষ্য জাতিদিগকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিতেন; ফিরিঙ্গীগণ এই পোষ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দেশের সকল কার্যক্ষেত্রেই এদের সঙ্গে ভারতীয়দের ঠোকাঠুকি লাগত। খেলার ক্ষেত্রে এই ঠোকাঠুকির ফলেই বাবার (ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী) তীব্র জা তী য় তা বো ধ উদ্দীপিত হয় ও তাঁর স্বদেশী যুগের বৈপ্লবিক জীবনের প্রথম প্রেরণা তিনি খেলার মাঠ থেকেই লাভ করেছিলেন। কিছুকাল পরেই স্বদেশী আন্দোলন জমে ওঠে; ঐ সময় একবার সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজ টীমের কাছে টাউন ক্লাবের ক্রিকেট দল হার মানতে বাধ্য হয়। খেলার শেষে নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ সারদারঞ্জনকে বললেন: "স্যার আজকের খেলায় আপনি আমাকে ক্যাপটেনের ভূমিকা নিতে বললেন,—কিন্তু ফিরিঙ্গী ছোকরাদের কাছে এই-ভাবে হার স্বীকার করা আমার সহ্যের বাইরে। আমরা বাঙালী হলেও আত্মমর্যাদা আমাদেরও আছে। আমি এমন টীম করতে চাই—যা কলকাতার ফিরিঙ্গী ক্লাবগুলি কেন, খাঁটি বিলাতি সাহেবদের ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবও হারাতে পারবে না।" সারদারঞ্জনের উপদেশ ছিল, ধীরে ধীরে বাঙালী খেলোয়াড়দের গড়ে তোলা হোক। কিন্তু নাটোরের মহারাজার সংকল্প অটল রইল। ইনি বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা বাজেট ধরে নাটোর ক্রিকেট টীম গঠিত করলেন। বালীগঞ্জের একটি মাঠে একটি অতি মনোরম নাটোর প্যাভেলিয়নও নির্মাণ করলেন। কিন্তু তিনি দুর্বলচিত্ত ভেতো বাঙালীদের বিশেষ স্থান তাঁর টীমে দিলেন না এবং অধিকাংশ খেলোয়াড় বোম্বাই থেকে কলকাতায় আমদানি করলেন। এই টীমের খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎকৃষ্ট ক্রীড়া-কৌশল দেখাবার জন্য উত্তম পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থাও ছিল। মহারাজার হাত থেকে স্বর্গীয় বিখ্যাত ব্যাট্স্ম্যান ভিটাল্ একবার শতাধিক রান সংগ্রহের জন্য একটি সোনার ঘড়ি উপহার পেয়েছিলেন। নাটোরের মহারাজা দশ বৎসরের অধিককাল তাঁর ক্রিকেট ক্লাবের জন্য ও খেলোয়াড়দের পিছনে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে কুণ্ঠিত হন নি। ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম ইংলণ্ড সফরের সময় জামনগরের কুমার বিশ্ববিখ্যাত ব্যাট্স্ম্যান রণজিৎ সিংজী ভারতীয় দলের প্রধান নির্বাচক ছিলেন। এই দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই মহারাজা নাটোরের ক্রিকেট একাদশের তালিকাভুক্ত। এঁদের মধ্যে ভারতের শ্রেষ্ঠ ন্যাটা বোলার বালু, উইকেটকীপার সোভানী, ব্যাট্স্ম্যান জয়রাম, ওয়ার্ডেন, সালমুদ্দিন, বাজানা প্রভৃতির নাম ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। নাটোরের একাদশের হাতে কলকাতার বিখ্যাত বিলিতি ক্লাবদেরও প্রায়ই হার স্বীকার করতে হয়েছে। এই ক্লাবেরই নাজির হোসেন একজন দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় ছিলেন এবং ইডেন উদ্যানে এক ওভারে সর্বাধিক রান করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ইনি সেই ওভারে তিনটি ওভার বাউণ্ডারী ও তিনটি বাউণ্ডারী মেরে রান তোলেন। কর্নেল সি. কে. নাইডু ছাড়া তাঁর মত সাবলীল হিটার আমি অন্য কোনো ব্যাট্স্ম্যানকে দেখি নি। তাঁর শারীরিক দৈর্ঘ্যও নাইডুর তুল্য ছিল। তিনি পীচের কাছে দৌড়িয়ে এসে উঁচু বা নিচু হিট করতেন এবং তাঁর খেলা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুত বোলার হিসাবে যথেষ্ট মারাত্মক ছিলেন।

নাটোরের স্বর্গীয় মহারাজা পশ্চিম ভারতীয় খেলোয়াড়দের কলকাতায় প্রতি শীতকালে আনিয়ে বহু বৎসর ধরে অতীব সাফল্যের সঙ্গে নাটোর ক্লাব চালিয়ে গিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বাবার আদর্শ ছিল অন্যরূপ; তিনি টাউন ক্লাবে বাঙালী যুবকদিগকে ক্রিকেটে পারদর্শী করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন ছিলেন সকলেরই গুরুস্থানীয় ও সব মত-বিরোধের ঊর্ধ্বে। নাটোরের মহারাজা যখন তাঁর ক্রিকেট দল গঠন করলেন, তখন বাবা মহারাজা কুচবিহারের ক্রিকেট দলের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হন; তা ছাড়া টাউন ক্লাব তো তাঁর ঘরের জিনিষ। এই ক্লাবে কখনো কখনো পশ্চিম ভারতীয় ক্রিকেটারদের খেলতে ডাকলেও অধিকাংশ ম্যাচেই তিনি বাঙালীদের নিয়ে ক্লাবের নেতারূপে খেলতেন। যখন তাঁর সহযোগিগণ এরিয়ান্স, মোহনবাগান, স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রভৃতি দল গঠনের জন্য টাউন ক্লাবের খেলার সক্রিয় অংশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, তখন ময়মনসিংহের মহারাজা স্বর্গীয় শশীকান্ত আচার্য ও অন্যান্য পূর্ববঙ্গের জমিদারদের নিয়ে টাউন ক্লাবের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে উদ্যোগী হন। তিনি কয়েক বৎসর একাই এই ক্লাবের সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ ও ক্রিকেট দলের ক্যাপটেন—এই ত্রিবিধ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স ও টাউন ক্লাবেই কাটত। কোনো উদীয়মান প্রতিভাশালী বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড় যুবক তাঁর নজরে পড়লে তিনি তাকে হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সে চাকরি দিতেন। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় ভুবন ব্যানার্জী ও যোগেন ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা বাবার হাতেই তৈরি ব্যাট্স্ম্যান; হিন্দুস্থান অফিস থেকে প্রত্যহ অপরাহ্ণে টাউন ক্লাবে গিয়ে দু-তিন ঘণ্টা ধরে বাবা সেখানকার সবাইকে ক্রিকেট শিক্ষা দিতেন। ক্রিকেট শিক্ষক হিসাবে অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন, এরিয়ান্সের দুখীরামবাবুর ন্যায় বাবারও যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। এঁরা তিনজনেই খেলোয়াড় হিসাবে সেরূপ খ্যাতি অর্জন না করলেও, শিক্ষক হিসাবে এঁদের তুলনা আজও মেলে কি না সন্দেহ।

খেলোয়াড়দের কাছাকাছি

শতরূপা মজুমদার

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

অনেকদিন আগের কথা। কতই বা বয়স হবে আমার তখন, বড় জোর তেরো। হঠাৎ একদিন দেখি দেশময় সে এক সাংঘাতিক উত্তেজনা। কানপুরে টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছে ভারত। অভূতপূর্ব ঘটনা, ক্রিকেট সম্বন্ধে সেই প্রথম আমি কেমন যেন একটা উত্তেজনা বোধ করলাম। বিশেষ কিছু মনে নেই সেই মরশুমের কথা। শুধু অনুভব করেছিলাম ক্রিকেট নামে ভারী সুন্দর খেলা আছে একটা। রিচি বেনোর টীম চলে গেল দেশ থেকে, কিন্তু রেখে গেল আমার মনে তার রেশ।

পরের শীতকালে এল পাকিস্তান, এবার গোড়া থেকেই আমার খুব উৎসাহ। রেডিও খুলে মন দিয়ে রিলে শুনি, কিন্তু বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বুঝি না। হলে কি হবে, ক্রিকেটের নেশা ধরতে তো আর সময় লাগে না। এই সময়ে প্রথম টেস্ট টীমের দ্বাদশ ব্যক্তি জয়সীমার একটা ছবি চোখে পড়ে। বেশ ভালো লাগলো। সেই সংগে মনে ধরলো আর এক নেশা। খেলোয়াড়দের ছবি জমানোর নেশা। জোগাড় করলাম দুটো দলেরই সকলের ছবি। তবে আমার আদর্শ বলতে প্রথম থেকেই জয়সীমা, তাছাড়া উঠতি ব্যাটস্‌ম্যান তখনও প্রচুর নাম করল এই সিরিজেই। অত ভাল মারকুটে খেলোয়াড় খুব কম দেখেছি।

কিন্তু শুধু ছবি দেখলেই তো হবে না। খেলাটাকে বুঝতেও হবে তো। সিলি মিড অন-ই বা কি ওভার দি উইকেট বল করা কি জিনিষ কিছুই জানি না। আট বছরের ছোট্ট ভাইটারও দেখি মহা উৎসাহ। দিদিকেই ধরে নিয়েছে মহা পণ্ডিত বলে, কেবল প্রশ্ন করে নানা রকম, জবাব দিতে পারি না সব সময়। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে 'খেলার রাজা ক্রিকেট' আর মজার খেলা ক্রিকেট জোগাড় করলাম। আর অন্য সব পত্র-পত্রিকা তো আছেই। লেখাপড়া শিকেয় উঠল। প্রচুর পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় মাসখানেকের মধ্যেই ক্রিকেটের যা কিছু জানবার জেনে ফেললাম।

দিল্লী টেস্ট দেখে মন-প্রাণ কানায় কানায় ভরে গেল। এত সুন্দর খেলা। সত্যিই এ যে খেলার রাজা। এর পাশে হকি, ফুটবল—মাগো! খেলা শেষ করে ফজল মহম্মদরা পাকিস্তানে চলে গেলেন। ক্রিকেট আমার মজ্জাগত হয়ে গেছে, ক্রিকেটের নেশা যাকে একবার পেয়ে বসেছে সেই জানে এ কী বস্তু। পৃথিবীতে তো এই একমাত্র খেলা যার একটা নিজস্ব সাহিত্য আছে। সে সাহিত্যে ডুব দিয়ে দেখি—এ যে এক স্বপ্নখনি। যে বয়সটা সব মেয়েদের লুকিয়ে বড়দের বই পড়ে কাটে, আমার কাটল উইসডেন, নেভিল, কার্ডাস আর শঙ্করীপ্রসাদ বসুর বই পড়ে। এবং ক্রিকেটের এ্যালবাম বানিয়ে। আর বিকেলটা কাটত বিনয় মুখোপাধ্যায়ের বই দেখে হাতে-কলমে খেলা শিখে। পরে আমি আর আমার এক বান্ধবী ভিজি-কে চিঠি লিখি—মেয়েদের ক্রিকেট শেখার সুযোগ দেওয়া হোক। ভিজির উৎসাহ ছিল খুবই। কিন্তু ওঁর আকস্মিক মৃত্যুতে ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়।

ইতিমধ্যে চুপিচুপি একদিন জয়সীমাকে একটা চিঠি লিখে ফেললাম। ভাবিই নি যে উত্তর পাব। সত্যি বলতে কি, আমার চিঠিটায় জয়সীমার এত প্রশংসা করা ছিল যে, ও উত্তর না দিয়ে পারে নি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম একপাতার চিঠিটা পেয়ে। বন্ধুমহলে হৈ-চৈ। সেই থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে গড়ে উঠল ভারী মিষ্টি একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ডেক্সটারের এর ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে খেলতে জয়সীমা এল দিল্লীতে, আলাপ আরও গাঢ় হল ফোনের মাধ্যমে। নানানরকম ঘরোয়া গল্প হয়। সুযোগ পেলেই জয়সীমা জ্ঞান দেয় মন দিয়ে লেখাপড়া কর। আমার আর এক বান্ধবী ফার্স্ট ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করায় উমরিগড়ের কাছ থেকে ফাউনটেন পেন উপহার পেয়েছিল।

জয়সীমার সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপের সুযোগ হল কিছুদিন পরেই। একটা এন· ডি· এ ম্যাচ খেলতে এসেছিল। যথারীতি ফোন করাতে আমন্ত্রণ জানাল প্যাভিলিয়নে এসে দেখা করার। দুই বান্ধবীর সঙ্গে গেলাম। দেখা হল সকলেরই সঙ্গে—জয়সীমা, ইঞ্জিনিয়ার, বোরদে প্রমুখ। স্কার্ট পরা ছোট ছোট ফ্যানদের পেয়ে মহা আনন্দ ওদের। পেছনে লাগল খুব। মেয়েরা কি-ই বা বোঝে ক্রিকেটের? রেগে গেলাম—যা খুশি প্রশ্ন কর, জবাব দেব। ওমা, সত্যি সত্যিই নানান প্রশ্ন করল। ক্রিকেটের আইন-কানুন সম্বন্ধে, রেকর্ডস্‌ বিষয়ক। বলতে এখনও গর্ববোধ করি, তিনজনে আমরা সব কটার উত্তর দিতে পেরেছিলাম। খুশি হয়ে আমাদের চকোলেট খেতে দিল জয়।

পরের বছর কলেজে ঢুকে আলাপ হল ডলি বোসের সঙ্গে। পাঁচ মিনিটের আলাপেই বুঝলাম এতোদিনে মনের মত সাথী পেলাম একজন, ক্রিকেট বলতে আমার মতই পাগল। মাইক স্মিথের দল এল ১৯৬৩-৬৪ সালে। জয়সীমাকে জিজ্ঞেস করলাম—"কি হল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে?" বলল, "দুঃখের কথা তোলা কেন আবার? পুট ইট ডাউন টু ব্যাড ওয়েদার।" আমি নতুন কলেজের গল্প করি, ও বলে ওর বোনের কথা, নতুন বিয়ে হয়েছে!

ডলির হিরো তখন বোরদে, ওকে ফোন করতেই বললে—"ফোনে আর কাঁহাতক কথা বলা যায়। চলে এসো হোটেলে।" সৌভাগ্যবশত আমাদের কলেজের কাছেই ওদের হোটেল, ক্লাশ কাট মেরে গেলাম। প্রথম প্রশ্ন বোরদের—"ক্লাশ ছিল না?"—ডলি বলে—"ও ব্যাপারটাকে সব সময়ই

উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদীয় দাঁতের মাজন
দেব দশন
হাসিতে মুক্তো ঝরাবে
দেব কেমিক্যাল কোং কলি-৩২

ম্যানেজ করা যায়।" কফি খেতে বলল, কিন্তু উত্তেজনার চোটে কি আর খিদে আছে আমাদের? ঘাড় নাড়লাম। ক্রিকেট সংক্রান্ত আলোচনা হল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ বোরদে বলল—"তোমাদের দিল্লী বিশ্রী।" আমরা আবার দিল্লী সম্বন্ধে বড় ভাবপ্রবণ—চটে গিয়ে বললাম, "তার মানে?"

"কিছু করার নেই, কাল পর পর শুধু দুটো সিনেমাই দেখেছি।"

"তোমার পুণা আরও বাজে।"

"কখনো না, এসে দেখে যাও। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম"—দুষ্টুমীভরা চোখে হেসে বলে বোরদে, "বাট আই মাদার মে টেক ইট আদারওয়াইজ।"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি দুজনেই। ডলি আচমকা অন্য প্রসঙ্গে এসে বলল—"লুক হিয়ার, ইট ইজ নট ফেয়ার", অবাক হয়ে বোরদে বলে—"হোয়াট ইজ নট ফেয়ার?" "এই ওয়েস্ট জোন কেবলই জিতে।" "কেন জিতবে না বল—ডলি। টেস্ট প্লেয়ারে তোমাদের কোনো কৃতিত্ব

টেস্ট খেলা চলার সময় কোন এক উৎফুল্ল মুহূর্তে বিল লরী ও ডগ ওয়ালটারসকে একত্রে দেখা যাচ্ছে।

॥ সিম্পসন ॥

এর আগেরবার অস্ট্রেলিয়া যখন ভারত সফরে এসেছিল তখন সেই অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ছিলেন ববি সিম্পসন।

নেই", বোরদে আহত মুখ করে বলে,—"আমরা যে সারা বছর কষ্ট করে প্র্যাকটিস করি সেটা কি কিছু না?" আমরা ওর উত্তরটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না।

একটু পরেই মঞ্জরেকার ভেতরের ঘর থেকে বেরোল, প্রাথমিক আলাপের পর ডলি বোরদেকে বলল—"তোমরা এক সঙ্গে থাকো বোধহয়।" উত্তর দিল মঞ্জরেকার—"ইয়েস আনফরচুনেটলি"। বোরদে বলল —"সেম হিয়ার", আমাদের হাসতে দেখে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে মঞ্জরেকার বলল, "ইউ নো দি ওয়ে হি গোজ অন স্কোরিং —আমার ঘুমই হয় না।" বোরদে বলল—"ইনডিড! ইট সুড ফল অন ইয়োরস লাইক সুইট মিউজিক!"

মিউজিক বলাতেই বোধহয় বোরদের মনে হল ওর একটা ট্রানজিস্টার আছে, ঘর থেকে এনে আমাদের দেখিয়ে সগর্বে বলল, "নতুন কিনেছি, কলকাতা থেকে।" কিন্তু বাজাতে গিয়ে আর বাজে না। মঞ্জরেকার একটু হেসে বলল—"আই টোল্ড ইউ চান্দু, ইউ সুড নট হ্যাভ বাট এ সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ওয়ান।" বোরদে রেগে গিয়ে বলে—"ইট ইজ সাপোসড টু বি নিউ।" আমরা হেসে বলি—"বাজবে কি করে, স্টুডিয়ো বন্ধ যে" আশ্বস্ত হয়ে বোরদে বলে, "জানি আমার ট্রানজিস্টারে গণ্ডগোল নেই।"

এমন সময়ে রঙ্গমঞ্চে নাদকার্নীর আবির্ভাব, অসম্ভব ভদ্র। চেহারাতেই বোঝা যায়। কথাবার্তা কিন্তু কাকা-সুলভ। অটোগ্রাফ খাতায় লেখে,—ইট ওয়াজ নাইস মিটিং ইউ। কথায় কথায় যে কতক্ষণ কেটে গিয়েছিল বুঝতেই পারি নি, ঘড়ির দিকে নজর পড়তে চমকে উঠে পড়ি, যে। টলের গেট অবধি তিনজনে পেঁছে দিল। আমরা তখন আনন্দে গর্বে হাওয়ায় ভাসছি। আমাদের ষোলো বছরের জীবনে এমন রোমাঞ্চকর দিন আর কখনো আসে নি।

এ ছাড়া আরও অনেকবার দেখা হয়েছে এদের সঙ্গে। বিশেষ করে দলীপ ট্রফি খেলার সময়ে এরা খুবই হাল্কাভাবে থাকে। টেস্ট ম্যাচের একটা আলাদা গুরুত্ব আছে তো। একটা ম্যাচে হিম্মত-সিংজীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, রণজিৎ-সিংজীদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। দুরানীর খেলোয়াড় জীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে এঁর অনেক অবদান আছে। তাঁর কাছে জানতে পারলাম দুরানীর বৌ হিন্দু। জাহাজে আলাপ ওদের। খুব সুখী ওরা। এখন তো একটি ছেলেও হয়েছে। হনুমন্ত সিংয়ের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল, খুব

ছটফটে চঞ্চল ছেলেমানুষ ছেলে। অবশ্য ধরতে গেলে ও দিল্লীরই ছেলে। এখানেই পড়ত।

মাইক স্মিথের টীমের সঙ্গে কানপুরে যে টেস্ট ম্যাচ হয় সেটা দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। খেলাটা মোটের ওপর মন্দ হয় নি। যদিও সেই ড্র। কিন্তু অবাক হয়ে দেখেছিলাম ওখানের দর্শকদের অভদ্র ব্যবহার। সত্যি কোনদিন যদি খেলোয়াড়েরা ওখানে খেলতে না চায় আপত্তি করার কিছু থাকে না। কেউ একবার বাউন্ডারী লাইনে ফিল্ডিং করতে গেলে হল, সকলে পেয়ারা ছুঁড়ে মারবে, আর কাঁচা পেয়ারা অত জোরে অঙ্গে লাগে বই কি। জয়সীমা একবার রেগে গিয়ে উল্টে একটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, আর যায় কোথায়, মুহূর্তের মধ্যে হাজারটা পেয়ারা ওর ওপরে গিয়ে পড়ল, বেচারা পালাবার পথ পায় না। এদিক দিয়ে ব্যারিংটন খুব মজা করেছিল। একটা পেয়ারা নিয়ে খেয়ে অম্লানবদনে বলত—আর একটা দাও। রাতারাতি পপুলার হয়ে গেল।

এই ম্যাচেই একটা মজার ঘটনা মনে আছে। ইংলেন্ড খুব পেটাচ্ছে। আমাদের ফিল্ডাররা কিছুই করতে পারছে না। পাতাউদি আমাদের সামনেই বাউন্ডারী লাইনে দাঁড়িয়েছিল—পেয়ারা বর্ষণ উপেক্ষা করেই। আমার মামা এদিক থেকে চেঁচিয়ে বলল—"পাতাউদি ফিল্ডিং ডিক্লেয়ার কর দো", ও হেসে চলে গেল।

এ সব ঘটনার পর কেটে গেছে অনেক দিন। লেখাপড়া শেষ করে অফিস নিয়ে নানান ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি, যদিও ক্রিকেট প্রীতির অভাব ঘটে নি। ক্রিকেটের মাধ্যমে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি ও পাচ্ছি। মিশতে পেরেছি দেশী-বিদেশী কতজনের সঙ্গে। খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সব সময় ভদ্র, সংযত, শিষ্ট ব্যবহার পেয়েছি। একবার জয়সীমা বলেছিল, 'মেয়েদের সঙ্গে কেন খারাপ ব্যবহার করব? আমাদের বাড়ি কি মা-বোনেরা নেই?' তাই আজকাল ওদের নামে যে নানারকম নিন্দে শোনা যায় তা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্তই হয়ে পড়ে।

ভারত:
১ম ইনিংস — ১৫২
২য় ইনিংস — ২৯১

১১৯ রানে

অস্ট্রেলিয়া:
১ম ইনিংস — ২১৯
২য় ইনিংস — ১০৫

কানপুর টেস্টে ভারত বিজয়ী

প্যাটেল ও উমরিগরের বোলিংয়ে বিপর্যয়

প্রথম পরাজয়

ভারত পর্যটনকারী অস্ট্রেলিয়ান দল এই বৎসর নিজের দেশে ইংলণ্ডকে ৫টি টেস্টের মধ্যে চারটিতে পরাজিত করার পর পাকিস্তান ও ভারত সফরে বাহির হয়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া দুইটি টেস্টে বিজয়ী হয়। ভারতে এ পর্যন্ত তাহারা দুইটি টেস্ট খেলিয়াছে। প্রথমটিতে এক ইনিংসে বিজয়ী হইলেও কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের নিকট তাহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহাই তাহাদের প্রথম পরাজয়।

☆☆ বিজয়-অভিযানের সারথি ও রথী ☆☆

(বাঁদিক থেকে) (১) অধিনায়ক রামচাঁদ। (২) জেসু প্যাটেল। দুই ইনিংসে মোট ১২৪ রানের বিনিময়ে ১৪টি অস্ট্রেলীয় উইকেট দখল করিয়াছেন। (৩) পলি উমরিগর। দ্বিতীয় ইনিংসে মোট ২৭ রানের বিনিময়ে ৪টি অস্ট্রেলীয় উইকেট দখল করিয়াছেন। (৪) নরী কন্ট্রাক্টর। দুই ইনিংসে ভারতীয় দল যে মোট ৪৪৩ রান সংগ্রহ করে, তাহার প্রায় এক-চতুর্থাংশই (৯৮ রান) আসিয়াছে নরী কন্ট্রাক্টরের ব্যাট হইতে।

॥ অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম হারানোর স্মরণীয় স্মৃতি ॥

এক নজরে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

টেস্ট খেলার সম্পূর্ণ ফলাফল

সাল	খেলার স্থান	অস্ট্রেলিয়ার রান (১ম ও ২য় ইনিংস)	ভারতের রান (১ম ও ২য় ইনিংস)	কে জিতলো
১৯৪৭-৪৮	ব্রিসবেন	৮ উই: ৩৮২	৫৮ ও ৯৮	অস্ট্রেলিয়া ২২৬ রানে জয়ী
১৯৪৭-৪৮	সিডনী	১০৭	১৮৮ ও ৭ উই: ৬১	ড্র
১৯৪৭-৪৮	মেলবোর্ন	৩৯৪ ও ৪ উই: ২৫৫	৯ উই: ২৯১ ও ১২৫	অস্ট্রেলিয়া ২৩৩ রানে জয়ী
১৯৪৭-৪৮	এডিলেড	৬৭৪	৩৮১ ও ২৭৭	অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১৬ রানে জয়ী
১৯৪৭-৪৮	মেলবোর্ন	৮ উই: ৫৭৫	৩৩১ ও ৬৭	অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ১৭৭ রানে জয়ী
১৯৫৬	মাদ্রাজ	৩১৯	১৬১ ও ১৫৩	অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ৫ রানে জয়ী
১৯৫৬	বোম্বাই	৭ উই: ৫২৩	২৫১ ও ৫ উই: ২৫০	ড্র
১৯৫৬	কলকাতা	১৭৭ ও ৯ উই: ১৮৯	১৩৬ ও ১৩৬	অস্ট্রেলিয়া ৯৪ রানে জয়ী
১৯৫৯-৬০	দিল্লী	৪৬৮	১৩৫ ও ২০৬	অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ১২৭ রানে জয়ী
১৯৫৯-৬০	কানপুর	২১৯ ও ১০৫	১৫২ ও ২৯১	ভারত ১১৯ রানে জয়ী
১৯৫৯-৬০	বোম্বাই	৮ উই: ৩৮৭ ও ১ উই: ৩৪	২৮৯ ও ৫ উই: ২২৬	ড্র
১৯৫৯-৬০	মাদ্রাজ	৩৪২	১৪৯ ও ১৩৮	অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ৫৫ রানে জয়ী
১৯৫৯-৬০	কলকাতা	৩৩১ ও ২ উই: ১২১	১৯৪ ও ৩৩৯	ড্র
১৯৬৪	মাদ্রাজ	২১১ ও ৩৯৭	২৭৬ ও ১৯৩	অস্ট্রেলিয়া ১৩৯ রানে জয়ী
১৯৬৪	বোম্বাই	৯ উই: ৩২০ ও ৮ উই: ২৭৪	৩৪১ ও ৮ উই: ২৫৬	ভারত ২ উই: জয়ী
১৯৬৪	কলকাতা	১৭৪ ও ১ উই: ১৪৩	২৩৫	ড্র
১৯৬৭-৬৮	এডিলেড	৩৩৫ ও ৩৬৯	৩০৭ ও ২৫১	অস্ট্রেলিয়া ১৪৬ রানে জয়ী
১৯৬৭-৬৮	মেলবোর্ন	৫২৯	১৭৩ ও ৩৫২	অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ৪ রানে জয়ী
১৯৬৭-৬৮	ব্রিসবেন	৩৭৯ ও ২৯৪	২৭৯ ও ৩৫৫	অস্ট্রেলিয়া ৪৯ রানে জয়ী
১৯৬৭-৬৮	সিডনী	৩১৭ ও ২৯২	২৬৮ ও ১৯৭	অস্ট্রেলিয়া ১৪৪ রানে জয়ী
১৯৬৯	বোম্বাই	৩৪৫ ও ২ উই: ৬৭	২৭১ ও ১৩৭	অস্ট্রেলিয়া ৮ উই: জয়ী
১৯৬৯	কানপুর	৩৪৮ ও বিনা উই: ৯৫	৩২০ ও ৭ উই: ৩১৭	ড্র
১৯৬৯	দিল্লী	২৯৬ ও ১০৭	২২৩ ও ৩ উই: ১৮১	ভারত ৭ উই: জয়ী
১৯৬৯	কলকাতা	— — —	—	— — —
১৯৬৯	মাদ্রাজ	— — —	—	— — —

ট্রাডিসন ভাঙুক বিশ্বনাথ

মানিক ঘোষাল

কানপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় ভারতের বিশ্বনাথ শতরানের গন্ডী ডিঙিয়ে টেস্টের আঙিনায় প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরী করার তালিকায় বিশ্বের ৩৫তম খেলোয়াড় হিসাবে নিজের নাম খোদাই করলেন।

ইতিপূর্বে ইংলন্ডের ১২ জন, অস্ট্রেলিয়ার ৯ জন, ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ উভয়েরই ৫ জন। নিউজিল্যান্ডের ২ জন এবং পাকিস্তানের ১ জন করে খেলোয়াড় টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই শতরান করার অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিশ্বনাথের পূর্বে ভারতের আর যে পাঁচজন খেলোয়াড় এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন তাঁরা হলেন লালা অমরনাথ, (বোম্বাই-এ, ইংলন্ডের বিরুদ্ধে), দীপক সোধন (কলকাতায়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে), কৃপাল সিং (হায়দ্রাবাদে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে), আব্বাস আলি বেগ (ম্যাঞ্চেস্টারে, ইংলন্ডের বিরুদ্ধে) এবং হনুমন্ত সিং (দিল্লীতে, ইংলন্ডের বিরুদ্ধে)। কিন্তু নিয়তির কি নির্মম পরিহাস!

এর আগের পাঁচজন খেলোয়াড়ই কিন্তু টেস্ট জীবনে আর দ্বিতীয় সেঞ্চুরীর মুখ দেখতে পান নি। যেন একটা ট্রাডিসন চলে আসছে!

কিংবা বলা যেতে পারে একটা অলক্ষ্য অভিশাপের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে ওরা সবাই!

১৯৩৩-৩৪ সালে বোম্বাই-এ ইংলন্ডের বিপক্ষে লালা অমরনাথ টেস্টের শুরুতে ১১৮ রান করে প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। এর পর আরও ২৩টি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েও অমরনাথ দ্বিতীয়বার শতরানের কোঠায় পৌঁছতে পারেন নি। ১৯৪৮ সালে দিল্লীতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৬২ রানই তাঁর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান।

অমরনাথের পরে ১৯৫২ সালে কলকাতায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীপক সোধন ১১০ রান করে প্রচুর হৈ-চৈ তুলে অনেক আশার ফুলঝুরি জাগিয়েছিলেন। কিন্তু আর মাত্র দু'টি টেস্ট খেলার পর তিনি নিঃশেষ হয়ে যান।

এর পর একশো রান দূরে যাক পঞ্চাশ রান-ও আর করতে পারেন নি তিনি। ১৯৫৩ সালে পোর্ট অফ স্পেনে ভারতের পক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৪৫ রান করেই তাঁকে খুশি থাকতে হয়েছে।

মাদ্রাজের অলরাউন্ডার কৃপাল সিং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫৫-৫৬ সালে হায়দ্রাবাদে ১০০ রান করে অপরাজিত থেকে ভারতের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসাবে এ-সম্মান লাভ করেন। ওই বছরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ব্রাবোর্নে ৬৩ রানই কৃপালের এর পরে সবচেয়ে বড়-সড়ো রান। কৃপাল সিং মোট টেস্টে খেলেছেন ১৪টি।

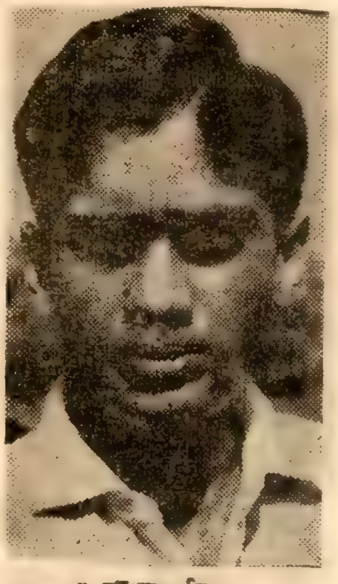

॥ হনুমন্ত সিং ॥
জীবনের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরী করেছিলেন।
কিন্তু তারপর......

১৯৫৯ ম্যাঞ্চেস্টার মাঠে আব্বাস আলি বেগ ১১২ রান করে টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরী করেন। কিন্তু সফরকারী ভারতীয় দলের তিনি নির্বাচিত খেলোয়াড় ছিলেন না। দলের প্রয়োজনে জরুরী ডাক দিয়ে তাঁকে খেলানো হলে তিনি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। কিন্তু তিনিও সেই ট্রাডিসন ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারলেন না। এর পর বেগ আরও ৯টি টেস্ট খেললেও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বোম্বাই টেস্টে (১৯৫৯-৬০) ৫৮ রানই তাঁর উল্লেখযোগ্য স্কোর।

দিল্লীতে মাইক স্মিথ পরিচালিত ইংলন্ড দলের বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম টেস্টে শতরান করে (১০৫) হনুমন্ত সিং অনেক প্রত্যাশা জাগিয়েছিলেন। একবার ১৯৬৪ সালে মাদ্রাজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরীর কাছাকাছিও (৯৪) এসেছিলেন। কিন্তু ব্যস ওই পর্যন্তই! ১৪টি টেস্ট খেলে হনুমন্তও হারিয়ে যেতে সময় নিলেন না।

এবার বিশ্বনাথের পালা। বিশ্বনাথ কি পারবেন সেই ট্রাডিসন ভাঙতে? বিশ্বনাথ কি সফল হবেন না সেই অভিশাপের বোঝাটাকে এক পাশে সরিয়ে নিজেকে নতুন আলোকে প্রকাশ করতে?

সারা দেশ সাগ্রহে অপেক্ষা করছে বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে। বিশ্বনাথ সফল হোক। পূর্বসূরীদের মতো ওঁর প্রথম সেঞ্চুরী যেন শেষ না হয়। সারা ভারতের ৫২ কোটি শুভার্থী মানুষের শুভ কামনা রয়েছে ওঁর জন্য।

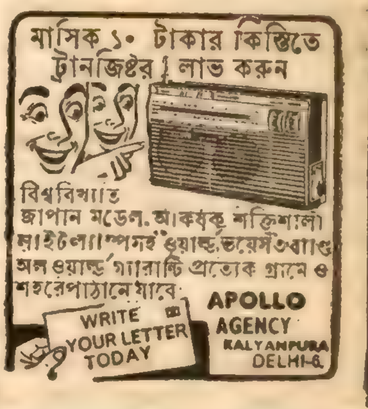

অসুখী ভদ্রলোক

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক ক্রিকেটের সর্বজনস্বীকৃত জনক ডব্লিউ জি. গ্রেস খেলতে নেমেছেন। মাঠ-ঠাসা দর্শক অধীর আগ্রহে গ্রেসের নয়নাভিরাম খেলা দেখতে অপেক্ষা করছে। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি উইকেটে এলেন, কিন্তু প্রথম বলেই আউট! সরব মাঠে নেমে এল মধ্যরাত্তের নিস্তব্ধতা।

গ্রেস এগিয়ে গেলেন আম্পায়ারের দিকে, প্রায় ধমকের সুরে বললেন, 'কি হে মশায়, এতগুলো লোক কি আপনার বাহাদুরী দেখতে এসেছে, না আমার খেলা দেখতে এসেছে?'

তারপর আস্তে বেল তুলে বললেন, 'নাও শুরু করো। ওটা ছিল ট্রায়াল বল!'

গ্রেস ছিলেন একজন কমপ্লিট ক্রিকেটার, ঠাট্টা করে তিনি একটি অতিবড় সত্য কথা বলেছিলেন সেদিন। কেউ আম্পায়ারের খেলা দেখতে আসে না মাঠে, আসে ব্যাটে-বলে-লড়াই উপভোগ করতে।

তাই আম্পায়ারদের বিপদ। পান থেকে চুন খসবার জো নেই। শত নির্ভুল সিদ্ধান্ত তিনি দিন না কেন, তার সমালোচনা অবধারিত। তিনি কখনও প্রশংসা পান না। বরাত জোর কেউ কেউ বলেন, 'আম্পায়ার এই আউটের আবেদন নাকচ করে তার কর্তব্য পালন করেছে—এই যা!' বেচারা ভদ্রলোক! মুহূর্তের মধ্যেই তাকে সিদ্ধান্ত জানাতে হয়। আউট কিম্বা নট আউট। বাই রান কিম্বা ব্যাটসম্যানের ব্যাট থেকে ঝরে পড়েছে রানটি, তাও। অথচ তা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়, 'হ্যাঁ ওই আউটটি ঠিক ছিল।' কিম্বা কেউ বলছেন, 'ওটি মোটেই এল বি ডব্লিউ ছিল না।'

ক্রিকেট-মক্কা লর্ডসের ঘটনার কথাই ধরা যাক। মিডলসেক্স বনাম হ্যাম্পশায়ারের খেলায় মিডলসেক্সের ব্যাটসম্যান এনথোভেন রান নিতে দৌড়তে গিয়ে মাঝ উইকেটে বোলার নিউম্যানের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে কোনমতে তৎপশ্চাৎ পপাত ধরণীতলে! এবং ফলস্বরূপ ক্রিজে পৌঁছনোর আগেই রান আউট।

—'হাউজ দ্যাট?' সমস্বরে গগন-বিদারী চিৎকার। না, আউট নয়। মাঠ সুদ্ধ সবাই অবাক-বিস্ময়ে দেখলো, আম্পায়ার চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন যার অর্থ এনথোভেন আউট হন নি।

হ্যাম্পশায়ারের অধিনায়ক লর্ড টেনিসন রেগে আগুন। জলজ্যান্ত আউট কি না নাকচ করা? বলা বাহুল্য, তিনি

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার

এম সি সি-র দরবারে ধর্না দিলেন। এক সপ্তাহ পর আম্পায়ার রীভস হাজির হলেন কমিটির সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য। রীভস বললেন, 'স্যার, এনথোভেনের কোন দোষ নেই। নিউম্যানের সঙ্গে যে ধাক্কা লেগেছে তাতে ওর দোষ ছিল না। তাই ওকে আউট দেওয়া যায় না।'

কমিটির চেয়ারম্যান লর্ড হক চুপ করে রইলেন। তাঁকে ভাবতে দেখে হঠাৎ রীভস পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তো একজন খেলোয়াড়। আইন-কানুনেও অভিজ্ঞ। আপনিই বলুন না স্যার, এ অবস্থায় আপনি কি সিদ্ধান্ত নিতেন?'

লর্ড হক এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েকটি ঢোক গিলে লর্ড হক কিছু বলি বলি করেও বলতে পারছেন না।

রীভস খুশি হয়ে বললেন, 'আপনি তো স্যার সাত দিন সময় পেয়েছিলেন, আর আমি এক সেকেন্ড!'

এরকম আউটের ঘটনা টেস্ট-ক্রিকেটেও ঘটেছিল। ১৯৫১ সালে বিশ্ববন্দিত ক্রিকেটার লেন হাটনের প্রতি আম্পায়ারের নির্দেশ আসে, 'তুমি আউট।' ক্রিকেটের 'রুল-বুকে' লেখা আছে যে, ফিল্ডারের পথরোধ করার জন্য (obstructing the field) ব্যাটসম্যান আউট হবেন। সেবারের ইংলন্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে টেস্ট খেলায় দেওয়া এই আউটটি টেস্ট-ইতিহাসে প্রথম।

তাই বলছিলাম আম্পায়ার হলেন হতভাগ্য ভদ্রলোক। প্রশংসা জোটে কদাচিৎ, বিরূপ সমালোচনায় তিনি সদা-সর্বদা তিতিবিরক্ত। অথচ তাঁর অনুমোদনের অভাব ঘটলে খেলায় অঘটন ঘটবেই।

একশোটি ক্ষেত্রে এই সদা সতর্ক ভদ্রলোক নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও সর্বমনোরঞ্জনে তিনি ব্যর্থ, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি এল বি ডব্লিউ আউট, নিজস্ব রানের কোঠায় একটি 'ডাক' থেকেই যায়!

দর্শককুল এবং খেলোয়াড়রা সকলেই আশুতোষ নন। একটি অঙ্গুলি-উত্তোলনের ওপর নির্ভর করে একটি দলের জয়-পরাজয়ের, আশা-নিরাশার প্রশ্ন। তিনি অপরিহার্য, তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। অথচ থেকে যান অ-প্রিয়। বোলার কিম্বা ব্যাটসম্যানের কৃতিত্বের নজীর স্কোর বোর্ড এবং অগণিত ক্রিকেট-পাগল-রসিকের মনের মণি-কোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের কথা কেউ মনে রাখেন না। একদিন স্কোরবুকের পাতায় তাঁর স্বাক্ষর ঝাপসা হয়ে যায়।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, রান-

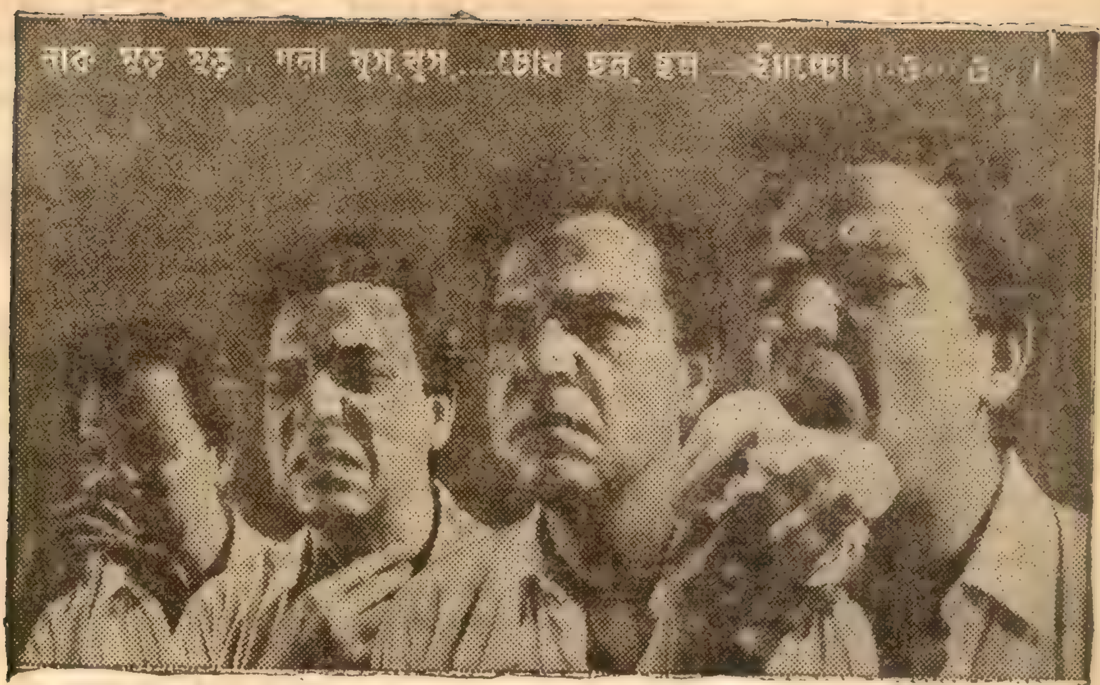

এইরে—সর্দি লাগল!

এবার গা ম্যাজম্যাজ করবে, নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হবে, গলাব্যথা করবে,—তারপর সর্দি বসলেই মুস্কিল!

এক্ষুনি ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন! বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না!

সবে সর্দি লেগেছে! এখনই এর একটা ব্যবস্থা করুন!
তা না হলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান্ ভোগান্তি—নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি—অযথা কষ্ট ভোগ করতে হবে।
সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, তাহলে কোনও কষ্ট পেতে হয় না—বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।
আর একটা কথা! ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায় যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,—যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।
খুবই সহজ কাজ। তেতো বড়িও গিলতে হবে না, বিচ্ছিরি মিক্সচারও খেতে হবে না।

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,—সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে—

১)
বাইরে থেকে গায়ে

২)
ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে
২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ করে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব—নাকে, গলায় বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

শ্যাম-যদু-মধুদের ডেকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে আম্পায়ার করা হয় না, বলা হয় না, 'নে ৬টি ইটের টুকরো নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়!'

অবশ্য কোন সতর্ক পাঠক বলতে পারেন, 'কেন মশায়, আপনি ১৯২১ সালের ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের খবর রাখেন না?'

ইংলন্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ৪৫ টেস্ট খেলার সময় এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যা টেস্ট-ইতিহাসে অভূতপূর্ব, অনন্য। ১৭৪৪ সালে ক্রিকেট প্রথম নিয়মাবলী প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে মাঝে মধ্যে নিয়ম পাল্টেছে, নতুন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়েছে। তাই আম্পায়ার হয়েছো, সব আইন-কানুন জেনে মাঠে নামো।

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের কথায় ফিরে আসা যাক। তখন ৩ দিনের টেস্ট খেলা হত। সময় না বেঁধে দিলে কবে যে শেষ হবে তা কে বলতে পারে? ১৯১২ সালে ইংলন্ডের ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলায় কোন সময়ের মাপকাঠি বেঁধে দেওয়া হয় নি। শেষ না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলবে—এমন নিয়ম চালু হয়েছিল সেই টেস্ট ম্যাচে প্রথম। ১৯৩৮-৩৯ সালের ইংলন্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের একটি খেলায় ১০ দিন খেলা চলার পর চা-পানের বিরতির সময় 'খেলা ড্র' ঘোষণা করা হয়েছিল! সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ম্যাচের অনন্য নজীর হয়ে রইল সেটি।

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট ছিল ৩ দিনের, অথচ প্রথম দিন বৃষ্টির জন্য নিষ্ফলা হল। রইল বাকী ২ দিন। সুতরাং ম্যাচ ড্র হবার পথে বাঁক নিল। তাই ইংলন্ড-অধিনায়ক লর্ড টেনিসন ৬ উইকেট হাতে থাকতেই ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। অস্ট্রেলিয়া প্রমাদ গুনল। আলো কমে এসেছে।

মুস্কিল আসান করলেন তাঁদের ক্রিকেট-আইন-গুলে-খাওয়া উইকেটরক্ষক কার্টার। তিনি লর্ড টেনিসনকে করালেন কট বিহাইন্ড।

তাঁর দলের অধিনায়ক আর্মস্ট্রংকে গিয়ে বললেন, 'দু দিনের ম্যাচে সাড়ে চারটার পর 'ডিক্লেয়ার' আইনসিদ্ধ নয়।'

ইংলন্ড-দলপতি তখন সদলবলে ফিল্ডিং করতে নামবেন। সেজন্যে প্রস্তুতি চলছে। টেনিসনকে আর্মস্ট্রং বললেন সেই আইনের কথা।

টেনিসন নট নড়ন-চড়ন। চালাকী নাকি? কে বলেছে এ কথা?

অগত্যা আইনের বইয়ের পাতা খোলা হ'ল। দেখা গেল কার্টারই ঠিক। 'ডিক্লেয়ার' বিধিবহির্ভূত হবে এ অবস্থায়।

নিরুপায় টেনিসন ব্যাট করার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হলেন।

ওদিকে বেচারী আম্পায়ার ভদ্রলোক দুটির অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত। দর্শকাসনে তুলকালাম কাণ্ড। তারা দূরে থেকে ভাবছে, বুঝি খেলা ভণ্ডুল হলো। তাই তারা অস্থির, উদ্দাম। শেষ পর্যন্ত আম্পায়ার ইংলন্ড-দলপতিকে নিয়ে দর্শকদের কাছে গিয়ে বিস্তারিত ঘটনা জানানোর পর তারা শান্ত হলো। খেলা শুরু হ'ল আবার।

বল হাতে দাঁড়ালেন আর্মস্ট্রং। তাঁর সেই ওভারের প্রথম বল 'অতিভারি'র সঙ্গে সঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার মাঠে ইতিহাস সৃষ্টি হল।

গোলমালের মধ্যে কেউই খেয়াল করেন নি (আম্পায়ারও নন) যে, ডিক্লেয়ার করার আগে শেষ ওভার বল করেছিলেন যে আর্মস্ট্রং, তিনিই পুনরায় খেলা শুরু হলে বল করলেন আর এক ওভার—এর সহজ অর্থ: তিনি একই ইনিংসে পর পর দু' ওভার বল দিলেন, যা টেস্ট-ক্রিকেট-ইতিহাসে বিরল ঘটনা—এবং আইন বিরুদ্ধও।

সকলে ভুলে গেলেন, কিন্তু আম্পায়ারের ভুল হলে অঘটন ঘটবেই (অবশ্য নিছক ভুলের কথা অবান্তর, মানুষমাত্রে ভুল হতে পারে। বলছিলাম খুঁটিনাটি আইন-কানুনের কথা)। আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি নিজেই একজন জীবন্ত 'রুল-বুক'।

এই ভদ্রলোককে সজাগ সব সময় থাকতেই হয়, নইলে বিপত্তি ঘটতে আর কতক্ষণ।

ক্রিকেট তো ঘটনাবহুল খেলা। প্রতি খেলায়, প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন রেকর্ড, নতুন ইতিহাস রচনার উজ্জ্বল সম্ভাবনা এর বৈশিষ্ট্য।

আম্পায়ার কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে পরে যদি বুঝতে পারেন সেটা ঠিক নয়, তা'হলে তাঁর মনঃকষ্ট হয়েই থাকে। আহা, বিনাদোষে ভদ্রলোক আউট হলেন! কিম্বা তাঁর জন্যই বোলারটি আর একটি উইকেট পেলেন না! তখন আর তাঁর কিছুই করার থাকে না। এ যে দেবাদিদেব মহাদেবের মুখোনিঃসৃত বাণী যা বললেন, তাই ঠিক। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্!

এক বিবেচক আম্পায়ারের সন্ধান মিলেছিল ইংলন্ডে। খেলার শেষে তিনি চায়ের আসরে গল্পগুজব করার সময় জানালেন যে, ওয়ারউইকশায়ারের নর্মান চারটি রান পান নি। তাঁর ব্যাটের স্পর্শ-পাওয়া বলটি বাউন্ডারী অতিক্রম করেছিল। কিন্তু আম্পায়ার 'বাই' রান দিয়েছেন। দলের ৪ রান হল. কিন্তু নিজস্ব রানের রেকর্ডে ৪ রান ঘাটতি রয়ে গেল।

না, যোগ্য প্রাপককে বঞ্চিত করা কেন? আম্পায়ার ভদ্রলোক স্কোরারের দরবারে হাজির, বললেন, 'ওহে ৪ রান 'বাই' কমাও। নর্মানের রানের সঙ্গে চার যোগ করে দাও।'

ক্রিকেট খেলা ভদ্রজন-মাথার খেলা। এখানে উচ্ছ্বাসের স্থান নেই। কি হয়েছে বা হয় নি তা মাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখলেই বিপদ।

এক তরুণ ব্যাটসম্যানের ভাগ্যে ট্রাজেডি দেখা দিয়েছিল। প্যাভিলিয়নে আনন্দের আতিশয্যে বলেই ফেললো, 'আজ বরাত জোরে বেঁচে গেছি। দিনের শেষ বলটি প্যাডে লেগেছিল, আবেদন করলে নিশ্চয়ই এল বি ডাবলিউ হতাম।'

কথাগুলি শুনলেন 'ফাদার অব দি ক্রিকেট' ডাবলিউ জি গ্রেস। তাঁর ঋষিতুল্য মুখে প্রশান্তিতে ভরে উঠল। ছোকরা ব্যাটসম্যান সেই মধুর আহ্লাদিত মুখে মুচকি হাসি বুঝতে পারে নি।

পরদিন খেলা আরম্ভ হবে। ফিল্ডাররা দাঁড়িয়ে পড়লেন, দুই ব্যাটসম্যান, দুই আম্পায়ার আর বোলার প্রস্তুত।

বল করার আগেই গ্রেস ক্রিকেটের সেই চিরন্তন আবেদন করে বসলেন, 'হাউ ইজ দ্যাট?'

তখন আইনের এত কচকচি ছিল না। —'হ্যাঁ, তুমি আউট।' আম্পায়ার ভদ্রলোক এক আঙুল তুলে আউটের নির্দেশ দিলেন।

ওপর দিকে আঙুল তুললেই সব সময় আউট না হতে পারে। ল্যাঙ্কাশায়ার টীমে এক ব্যাটসম্যান রান নিতে দৌড়চ্ছেন, এমন সময় বোলার এল বি ডাব্লিউর আবেদন করলেন, 'হাউজ দ্যাট?'.

আম্পায়ার হাত তুললেন।

ব্যাটসম্যান অবাক। তিনি আম্পায়ারকে বললেন, 'কি করে আউট হলাম? আমি তো এল বি ডাব্লিউ হই নি!'

আম্পায়ার মুচকি হেসে বললেন, 'আমি বাই রানের নির্দেশ দিচ্ছি।'

এই ভদ্রলোক নিঃসঙ্গ নিয়ামক। ডন ব্রাডম্যান সদাশয় ভদ্রলোক। আম্পায়ার সম্পর্কে তাঁর মতামত স্পোর্টসম্যান-লাইক-স্পিরিট-বিভূষিত: 'আম্পায়ারের মতের সঙ্গে ব্যাটসম্যান বা বোলারের মতের মিল নাও হতে পারে; কিন্তু তাঁর মত কখনও বদলানো সম্ভব নয়। আম্পায়ার ইচ্ছে করে কোন অন্যায় করেছেন বা পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছে—এমন ঘটনা আমি কখনও কোন প্রথম শ্রেণীর খেলায় দেখি নি।'

ব্রাডম্যান তাঁর বই-এ আরো লিখে-

-এন, 'যখন কোন ব্যাটসম্যানকে আউট দেওয়া হয় তখন সেটা ভুল হোক বা ঠিক হোক অবনত মস্তকে তা তার মেনে নেওয়া উচিত। যদি কোন খেলোয়াড় ক্রিজে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করেন বা দেখাতে চান যে, তিনি সন্তুষ্ট হন নি, তবে তাঁর মধ্যে এক চরম অখেলোয়াড়ী মনোভাবের প্রকাশ দেখা যাবে।'

স্যার জ্যাক হব্‌সও একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। ওভালে অস্ট্রেলিয়া খেলতে নেমেছে। স্যার জ্যাক হব্‌স ব্যাট হাতে নেমেছেন। গ্রেগরীর তৃতীয় বল সকলের অগোচরে বেল ফেলে দিল। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কলিন্স ছাড়া আর কারো নজরে পড়ল না ব্যাপারটি। তিনি নিয়মমত আবেদন করলেন, 'হাউ ইজ দ্যাট।' আম্পায়ার তো দেখেন নি যে বেল পড়ে গেছে, তাই তিনি আবেদন নাকচ করে দিলেন।

স্যার হব্‌স অবলীলাক্রমেই উইকেটে অটুট থাকতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মনে-প্রাণে ক্রিকেট-চরিত্র মিলে-মিশে একাকার যে! তাঁর মনে খটকা লাগতেই কলিন্সকে বললেন, 'ব্যাপার কি হে?'

কলিন্সের কথায় ব্যাপারটি বুঝলেন তিনি। মাটিতে পড়ে-থাকা বেলের দিকে তাকিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যাট কাঁধে তুলে চললেন প্যাভিলিয়নের দিকে। আম্পায়ারের সঙ্গে তাঁর ছিল নির্ভেজাল সহযোগিতার মনোভাব।

আর একটি ঘটনা। মিডলসেক্সের অধিনায়ক ওয়াল্টার রবিন্স লেগ ব্রেক বল এগিয়ে মারতে গিয়ে ফস্‌কে গেলেন। স্ট্যাম্পড আউট অবধারিত। কোন দিকে না তাকিয়ে প্যাভিলিয়নের দিকে ছুট। অথচ উইকেটরক্ষক বেশ একটু দেরি করে স্টাম্পড করেছিলেন তাঁকে। রবিন্স তৎপর হলে আউট না-ও হতে পারতেন। সেদিকে ওয়াল্টারের ভ্রূক্ষেপ নেই। আম্পায়ার ভদ্রলোক খুশি হয়েছিলেন নিশ্চয়ই সেদিন ও'র ব্যবহারে।

ব্রাডম্যান যে-কথা বলেছেন যে, ক্রিজে দাঁড়িয়ে দেরি করতে নেই, তাতে আম্পায়ারের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করা হয়, সে-ধরণের নজীর টেস্ট ক্রিকেটেও বিরল নয়। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুর্নাম রয়েছে। ১৯৬০ সালে ভারত সফরে এসেছিল পাকিস্তান। ওদেব ব্যবহারে আম্পায়াররা এত বিরক্ত এবং বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন যে, কর্তৃপক্ষ মহলে তাঁদের বহুবার অভিযোগ পেশ করতে হয়েছিল। ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের প্রথম টেস্টে অধিনায়ক ফজল মামুদ হলেন 'কট বিহাইন্ড' আর এল বি ডবিউ হলেন মুস্তাক মহম্মদ। আম্পায়ার স্পষ্ট রায় জানিয়ে দিলেন। কিন্তু খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড় ফজল মামুদ এবং মুস্তাক মহম্মদ বিস্ময়ে আম্পায়ারের দিকে ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করে আম্পায়ারের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ জানালেন। নাদকার্নী 'কট বিহাইন্ড' হন নি, আম্পায়ার এই রায় দিলেন। মামুদ হোসেন লেগ আম্পায়ারের কাছে, যা ক্রিকেট-রীতি-বিরুদ্ধ। এমন নানা ঘটনার মধ্যে সে-যাত্রা ও'রা আম্পায়ারের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' জানিয়ে গেলেন, উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় আম্পায়ারিং সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব গড়ে তোলা। দিস্ ইজ নট ক্রিকেট!

এবার ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে প্রখ্যাত আম্পায়ার শম্ভু পান ভেঙ্কটরাঘবনকে আউট দেওয়ার পর তুলকালাম কাণ্ড বেধেছিল। স্টেডিয়ামের একটি কোণ থেকে দর্শকরা হৈ-চৈ করে উঠেছিল। ওখান থেকে তাঁরাই যেন ভালো বুঝতে পারছেন কে আউট, কে আউট নন।

মহম্মদ নিসার

অস্ট্রেলিয়ার নিজের ঘরেই অনেক আম্পায়ার বেশ মজার কাণ্ড করেছিলেন। তিনি কয়েকজনকে পর পর আউট দেওয়ার পর মাঠের একধার থেকে গোলমাল, হৈ-চৈ শোনা গেল। হঠাৎ সেখানে আম্পায়ার ভদ্রলোককে দেখা গেল। সকলে অবাক। ব্যাপার কি, মাঠে না দাঁড়িয়ে এখানে কেন? খেলা দেখতে হয় তো আম্পায়ারিং করেও দেখা যায়!

কেউ কেউ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে মশায়, এখানে এলেন বড়?'

আম্পায়ার ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বললেন, 'কি জানি, আমি ভাবলাম এখান থেকেই বুঝি ভালোভাবে আম্পায়ারিং করা যাবে, মনে হয় এখান থেকেই ভালো বোঝা যাচ্ছে কে আউট, কে আউট নয়।'

মুখের ওপরই জবাব বটে। কিন্তু আজকাল তেমন জবাব দিতে যাওয়া বিপদ। যা পারো বাপু যথাস্থানে দাঁড়িয়েই করে যাও। আইন থেকে এদিক-ওদিক যাওয়ার তোমার উপায় নেই। ভারবাহী কিন্তু ফলভোগী নন তিনি। শত গরম হোক বোলারের সোয়েটার টুপি নিয়ে দাঁড়াও, কিন্তু নিজের পরা 'আলখাল্লা পোষাক' তোমার কৌলীন্য দিয়েছে, অস্বস্তি হলেও খোলা নিষেধ। আইন মনে রেখে প্রতিটি বল, তার 'অ্যাকসন' নিরীক্ষণ করে যাওয়াই তো তোমার কাজ হে!

ভিক্টোরিয়া বনাম নিউ সাউথ ওয়েলসের খেলায় তুমি নিরুপায় ছিলে ভায়া। উইকেট ভাঙল, তবু তাঁকে বলতে হল, 'নট আউট'।

কেউ যদি সে মুহূর্তে মাঠে ঢুকতেন তবে তাঁর মনে হত অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে তিনি খেলা দেখছেন। তিনি দেখতেন, দুটি উইকেট এবং তার ওপর একটি বেল।

অবশ্য আরো একটু লক্ষ্য করলে তাঁর নজরে পড়তো, মিডল স্ট্যাম্প ছিটকে পড়ে আছে! ওহো, ওটি তাহলে বোল্ড আউট?

না। বেল তখনো উইকেটের ওপর অক্ষত। আইনের বইয়ে স্পষ্ট লেখা আছে, বেল না পড়লে আউট দেওয়া চলবে না। তাহলে একটি বেলই বা কেন? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই তো দুটি বেলের প্রবর্তন হয়ে গেছে!

না মশায়, আপনি একটু ভুল করলেন। তিনটি উইকেট এবং দুটি বেলই ছিল। দুটি বেলের মাঝখানের ভার্নিশ গলে দুটি বেল জুড়ে গেল! তাই মিডল স্ট্যাম্প ছিটকে গেলেও বেল দুটি অক্ষত রইলো!

আম্পায়ার ভদ্রলোক আর কি করেন। তিনি বললেন, 'নট আউট'। এবং তা ক্রিকেট-আইনের খাতিরেই!

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন
অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০,। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।
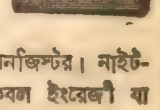
Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

দু'দলের খেলোয়াড় পরিচিতি

সন্তোষকুমার শীল

অস্ট্রেলিয়া

ডব্লিউ এম লরী : ভিক্টোরিয়ার ন্যাটা ওপিনিং ব্যাটসম্যান। বয়েস ৩২। এ পর্যন্ত ৫৩টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। গড়ে ইনিংস প্রতি ৪৭·১৩ রানের হিসেবে করেছেন মোট ৪,৪৭৮ রান। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় সিম্পসনের কাছ থেকে তিনি নেন দলের অধিনায়কত্বের ভার। এ পর্যন্ত তিনি ভারতের বিরুদ্ধে ৩টি, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ৪টি এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৫টি টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলের পরিচালনা করেছেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে সোবার্সের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে হারিয়ে লরীর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি লাভ করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালে ব্রিজটাউন টেস্টে প্রথম উইকেটে লরী আর সিম্পসন একত্রে করেছিলেন ৩৮২ রান।

আই এম চ্যাপেল : সাউথ অস্ট্রেলিয়া দলের পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ও লেগ ব্রেক বোলার। বয়েস ২৫। এ পর্যন্ত ২২টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করে গড়ে ইনিংস প্রতি ৩৮·৬ রানের হিসেবে করেছেন মোট ১৩৫১ রান। ১৯৬৮ সালে অস্ট্রেলিয়া দলের ইংলণ্ড সফরে চ্যাপেল সব থেকে বেশি রান সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি সেবার করেছিলেন ১২৯৫ রান। আর ১৯৬৮-৬৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অস্ট্রেলিয়ার সফরের সময় চ্যাপেল ৩টি সেঞ্চুরী সহ করে-ছিলেন ১৪৭৬ রান। বোলার হিসেবেও চ্যাপেল মোটামুটি-ভাবে সাফল্য লাভ করেছেন। এ পর্যন্ত তিনি দখল করেছেন ৪৬টি উইকেট গড়ে যার হিসেব দাঁড়ায় ৪৮·৮০ রান।

কে ডি ওয়ালটারস : নিউ সাউথ ওয়েলস-এর নিপুণ এবং মারকুটে ব্যাটসম্যান। বয়েস ২৩। এ পর্যন্ত ১৬টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করে সংগ্রহ করেছেন ১,৭০৬ রান। সৈনিক-জীবন যাপনের জন্যে এবং আহত থাকায় ওয়ালটারস টেস্ট জগতের বাইরে ছিলেন। ১৯৬৫-৬৬ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ১৫৫ ও দ্বিতীয় টেস্টে ১১৫ রান করে সেই টেস্ট মরশুমে করেছিলেন ৪১০ রান। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ালটারস দু' ইনিংস খেলে করেছিলেন ২৫৪ রান—গড়ে ১২৭ ইনিংস প্রতি। ১৯৬৮-৬৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে গড়ে ইনিংস প্রতি ১১৬·৫০ রানের হিসেবে করেছিলেন ৬৯৯ রান। ঐ বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চম টেস্টে দু' ইনিংসে ওয়ালটারস করেছিলেন যথাক্রমে ২৪২ ও ১০৩ রান।

জি ডি ম্যাকেঞ্জি : ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার সেরা ফাস্ট বোলার। বয়েস ২৭। এ পর্যন্ত ৪১টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করে দখল করেছেন ২১৭টি উইকেট—গড়ে উইকেট প্রতি ২৮·৯৫ রান। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে আর মাত্র দু'জন ওঁর চেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন—রিচি বেনো ২৪৮টি ও রে লিণ্ড-ওয়াল ২২৮টি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে গত মরশুমে ম্যাকেঞ্জি ৩০টি উইকেটই দখল করেন যার গড় হিসেব ২৫·২৬।

এ এন কনোলী : ভিক্টোরিয়ার মিডিয়াম পেস বোলার। বয়েস ২৯। শুধু নতুন বলে নয়, কনোলী পুরনো বলেও মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারেন। এ পর্যন্ত ১৯টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করে সংগ্রহ করেছেন ৬৪টি উইকেট—যার গড় হিসেব উইকেট প্রতি ৩১·২৩ রান। ১৯৬৮-৬৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে কনোলী ২০টি উইকেট দখল করেছিলেন গড়ে ৩১·৭৫ রানের হিসেবে।

এইচ বি টাবার : নিউ সাউথ ওয়েলসের নির্ভরযোগ্য উইকেট-রক্ষক। বয়েস ২৮। এ পর্যন্ত ৭টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করে ২৮ জনকে ফিরিয়ে দেবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ১৯৬৮ সালে দলের দু' নম্বর উইকেটরক্ষক হিসেবে ইংলণ্ড ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টে জারমানের জায়গায় খেলতে নেমে টাবার ৬ জনকে আউট করেছিলেন আর দু' ইনিংস মিলে করেছিলেন ১২৬ রান।

আই আর রেডপাথ : ভিক্টোরিয়ার নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। বয়েস ২৭। এ পর্যন্ত ২৮টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করে করে-ছেন মোট ১,৬২৩ রান। কখনো কখনো লরীর সংগে দলের ব্যাটিং-এর গোড়াপত্তনও করেন। ১৯৬৮ সালে ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় রেডপাথ চারটি সেঞ্চুরী সহ করেছিলেন ১৪৭৪ রান গড়ে ৩৭·২০। শুধু মারকুটে ব্যাটসম্যান হিসেবেই নন, উইকেটের কাছে নিপুণ ফিল্ডার হিসেবেও রেডপাথ পরিচিত।

কে আর স্টাকপোল : ভিক্টোরিয়ার ডানহাতি ব্যাটসম্যান। এখন ইনিংস সূচনাকারী ব্যাটসম্যান। বয়েস ২৭। এ পর্যন্ত ১২টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করে স্টাকপোল করেছেন ৫৭১ রান—যার গড় হিসেব ইনিংস প্রতি ৩০·০৫। ১৯৬৮-৬৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের সময় থেকে স্টাকপোল ওপিনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

ই ডবলিউ ফ্রিম্যান : সাউথ অস্ট্রেলিয়ার অলরাউণ্ডার। বয়েস ২৪। ১৯৬৮ সালে ইংলণ্ড ভ্রমণ করেছিলেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ চারটি টেস্টে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। গড়ে ইনিংস প্রতি ৩০ রানের হিসেবে তিনি ১৩টি উইকেট দখল করেছিলেন। মারকুটে ব্যাটসম্যান হিসেবেও খ্যাতি আছে। এ পর্যন্ত ৮টি টেস্টে সংগ্রহ করেছেন ২৬৩ রান।

জে ডবলিউ গ্লিসন : নিউ সাউথ ওয়েলস-এর স্পিন বোলার। বয়েস ৩০। এ পর্যন্ত ১৪টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করে দখল করেছেন ৪৭টি উইকেট—গড় উইকেট প্রতি ৩২·৪২ রান। ১৯৬৮ সালে ইংলণ্ড ভ্রমণে ৫৮টি উইকেট পেয়ে-ছিলেন আর ১৯৬৮-৬৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ২৬টি টেস্ট উইকেট লাভ করেছিলেন।

এ এ ম্যালেট : সাউথ অস্ট্রেলিয়ার অফ ব্রেক বোলার। বয়েস ২৪। দুটো টেস্টে ৬টি উইকেট লাভ করেছেন গড়ে যার হিসেব ৪১·৮২ রান। ১৯৬৮ সালে ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় গড়ে উইকেট প্রতি ২৮·৩৬ রানের হেসেবে দখল করে-ছিলেন ৪৪টি উইকেট।

এ পি শিহান : ভিক্টোরিয়ার তরুণ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। বয়েস ২২। এ পর্যন্ত ১৪টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করে সংগ্রহ করেছেন ৭৯১ রান যার গড় হিসেব দাঁড়ায় ৩৫·৯৫। অস্ট্রেলিয়া দলের সর্বকনিষ্ঠ এই খেলোয়াড়টির ওপর অনেকেই বিশেষভাবে আস্থাবান। ১৯৬৬-৬৭ সালে তিনি নিউজিল্যাণ্ড ও ১৯৬৮ সালে ইংলণ্ড ভ্রমণ করেন।

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সাধনা বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান।
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
সচেতন আধুনিকারা তাই
এর প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
রূপসাধনার অপরিহার্য্য
অতি আধুনিক অবদান।
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

টেস্ট আবির্ভাবে তিনি করেছিলেন ৮৮ রান। ভারতের বিরুদ্ধে এই মরশুমেই তিনি করেছেন তাঁর জীবনের প্রথম সেঞ্চুরী।

ভারত

(এই মরশুমে নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার খেলাগুলো ধরা হয় নি।)

পাতৌদির নবাব : হায়দ্রাবাদের ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও নিখুঁত ফিল্ডসম্যান। জন্ম—১৯৪১ সালের ৫ই জানুয়ারী। ৩১টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করেছেন : ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬১ সালে ৩টি, ১৯৬৪ সালে ৫টি ও ১৯৬৭ সালে ৩টি; ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালে ৩টি ও ১৯৬৬ সালে ৩টি; অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬৪ সালে ৩টি ও ১৯৬৭ সালে ৩টি; নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালে ৪টি ১৯৬৮ সালে ৪টি টেস্টে খেলেছেন। টেস্ট খেলায় সর্বোচ্চ রান ২০৩ (অপঃ) ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দিল্লী টেস্টে ১৯৬৫ সালে। এ পর্যন্ত টেস্ট খেলায় ৬টি সেঞ্চুরী করেছেন। ১৯৬২ সালে ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণের সময় কনট্রাক্টর আহত হলে পাতৌদির ওপর পড়ে ভারতীয় দল পরিচালনার ভার। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক। সব থেকে কম বয়সে পাতৌদি টেস্ট দলের অধিনায়ক হবার রেকর্ড করেছেন।

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার : বম্বের ডানহাতি ওপেনিং ব্যাটসম্যান এবং ভারতের এক নম্বর উইকেটরক্ষক। জন্ম—১৯৩৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী। ২৩টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬১ সালে ৪টি ও ১৯৬৭ সালে ৩টি; ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালে ৩টি ও ১৯৬৬ সালে ১টি; নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালে ৪টি ও ১৯৬৮ সালে ৪টি ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালে ৪টি টেস্ট খেলেছেন। টেস্ট খেলায় সর্বোচ্চ রান —১০৯, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে ১৯৬৬-৬৭ সালে। এ পর্যন্ত টেস্ট খেলায় উইকেটের পেছনে ৩৫টি ক্যাচ লুফেছেন এবং ৮ জনকে স্টাম্প আউট করেছেন।

অজিত ওয়াদেকার : বম্বের বাঁহাতি ব্যাটসম্যান এবং ভারতীয় তিন নম্বর খেলোয়াড়। জন্ম—১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল। ১৩টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালে ২টি; ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালে ৩টি; অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালে ৪টি ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে ৪টি টেস্ট খেলেছেন। সর্বোচ্চ রান—১৪৩, নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে ওয়েলিংটন টেস্টে। টেস্ট খেলায় এ পর্যন্ত মাত্র ১টি সেঞ্চুরী করেছেন।

অশোক মানকাদ : বম্বের ডানহাতি এবং ভারতের ওপনিং ব্যাটসম্যান। বয়স ২৪। এই মরশুমে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান। অফ ব্রেক বলও করতে পারেন। রনজি ট্রফিতে দু'টি সেঞ্চুরী করেছেন। দলীপ ট্রফিতে ওয়েস্ট জোনের পক্ষে খেলেছেন। টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দিল্লী টেস্টে ৯৭ রান তাঁর সর্বোচ্চ।

জি· আর বিশ্বনাথ : মহীশূরের ডানহাতি মারকুটে ব্যাটসম্যান ও লেগ ব্রেক বোলার। বয়স ২১। ১৯৬৭ সালে রনজি ট্রফির প্রথম খেলাতেই মহীশূরের পক্ষে ২৩০ রান করেছিলেন অন্ধ্রের বিরুদ্ধে। দলীপ ট্রফিতে সাউথ জোনের নিয়মিত খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে নেমেই দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৮ রান করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

একনাথ সোলকার : বম্বের ন্যাটা অলরাউণ্ডার। বয়স ২১। ১৯৬৫ সালে বম্বে স্কুল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন। ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় হিসেবে সিংহল ভ্রমণ করেছেন ও লণ্ডন স্কুল রয়েস দলের বিরুদ্ধে খেলেছেন। রনজি এবং দলীপ ট্রফির খেলায় ব্যাটে-বলে খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন।

অম্বর রায় : বাংলার ন্যাটা ব্যাটসম্যান। জন্ম ১৯৪৬ সালের ৫ই মে। এই মরশুমে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম সরকারী টেস্টে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেলেও এর আগে সিংহলের বিরুদ্ধে আমেদাবাদের বেসরকারী টেস্টে খেলেছেন। রনজি ট্রফিতে বাংলা দলের এবং দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫৯-৬০ সাল থেকে রনজি ট্রফির খেলায় অংশ গ্রহণ করছেন।

ই· এ· এস প্রসন্ন : মহীশূরের ডানহাতি অফ ব্রেক বোলার। জন্ম—১৯৪০ সালের ২২শে মে। ১৪টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করেছেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬১ সালে ১টি ও ১৯৬৭ সালে ৩টি; ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালে ১টি ও ১৯৬৬ সালে ১টি; অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালে ৪টি ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে ৪টি টেস্ট খেলেছেন। ভিনু মানকাদ ও সুভাষ গুপ্তের পর তৃতীয় ভারতীয় বোলার হিসেবে প্রসন্ন শত উইকেট লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এই মরশুমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে।

বি. এস. বেদী : দিল্লীর বাঁহাতি স্পিন বোলার। জন্ম—১৯৪৬ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর। বলের ফ্লাইট সুন্দর। এই মরশুমের আগে ১১টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালে ২টি, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালে ৩টি; অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালে ২টি ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে ৪টি টেস্ট খেলেছেন। এ মরশুমের আগে ৩৪টি উইকেট দখল করেছেন যার গড় হিসেব হলো ৩১·২০।

সুব্রত গুহ : বাংলার মিডিয়াম পেস বোলার। জন্ম—১৯৪৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী। ইন এবং আউট—দু' রকম সুইংই খুব ভালোভাবে করতে পারেন। ১৯৬৭ সালে ভারতীয় দলের সংগে ইংলণ্ড সফরে গিয়ে আহত হবার জন্যে ১টার বেশি টেস্ট খেলতে পারেন নি।

এস· ভেঙ্কটরাঘবন : মাদ্রাজের ডানহাতি অফ ব্রেক বোলার। জন্ম—১৯৪৫ সালের ২১শে এপ্রিল। এই মরশুমের আগে ৭টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালে ৪টি; ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালে ২টি ও ১৯৬৭ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১টি টেস্ট খেলেছেন। টেস্ট খেলায় সব থেকে ভালো এ্যাভারেজ—১৯৬৫ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দিল্লী টেস্টে ৭২ রানের বিনিময়ে ৮টি উইকেট দখল।

বি· এস চন্দ্রশেখর : মহীশূরের ডান হাতের লেগ ব্রেক বোলার। জন্ম—১৯৪৫ সালের ১৭ই জুন। ১৬টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করেছেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৪ সালে ৪টি ও ১৯৬৭ সালে ৩টি; অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬৪ সালে ২টি ও ১৯৬৭ সালে ২টি; নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালে ২টি; ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালে ৩টি টেস্ট খেলেছেন। শ্রেষ্ঠ বোলিং—১৯৬৬ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে বোম্বাই টেস্টে ১৫৭ রানে ৭টি উইকেট লাভ।

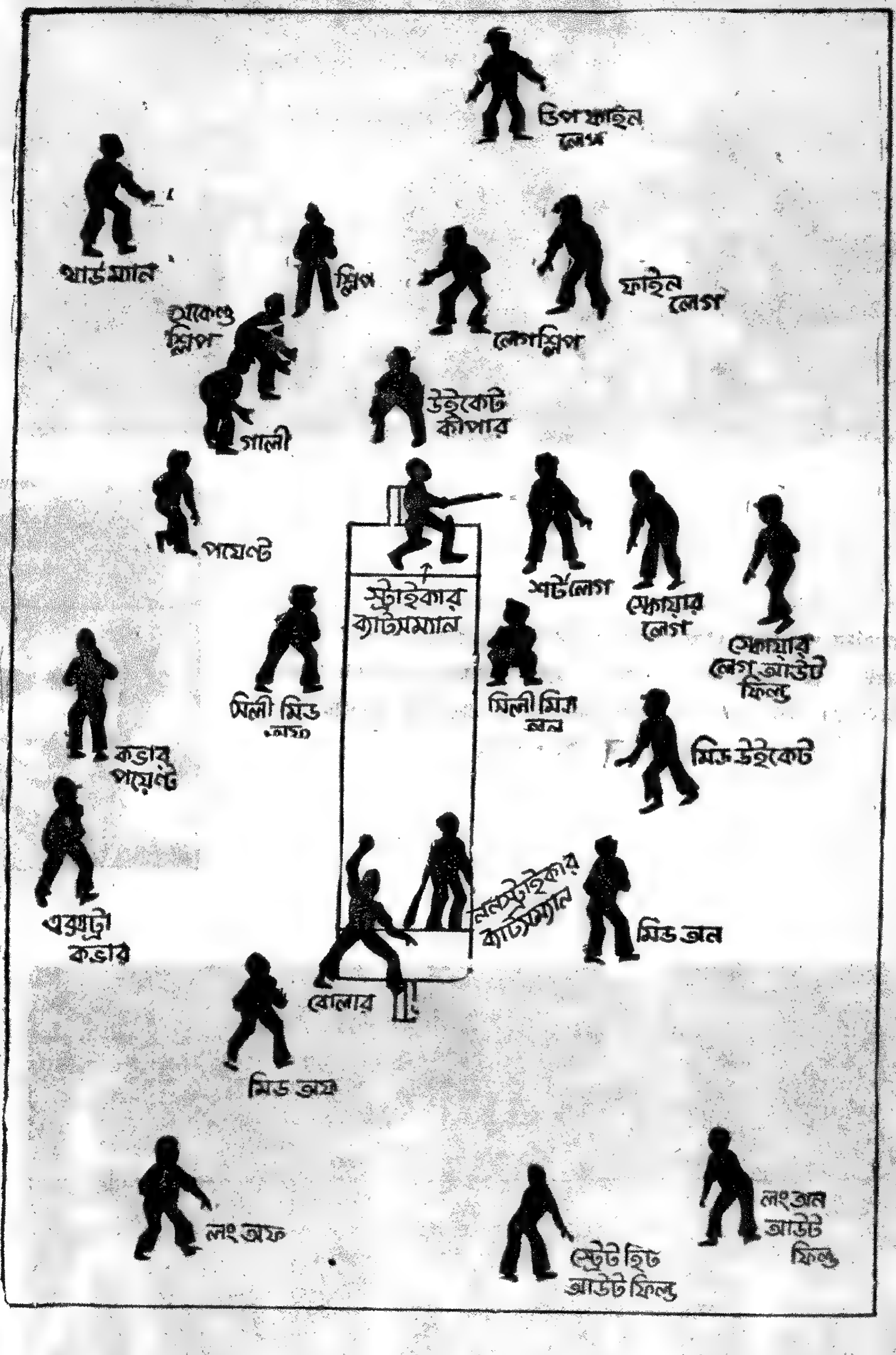
ডিপ ফাইন লেগ
থার্ডম্যান
স্লিপ
ফাইন লেগ
সেকেণ্ড স্লিপ
লেগস্লিপ
উইকেট কীপার
গালী
পয়েন্ট
স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান
শর্টলেগ
স্কোয়ার লেগ
স্কোয়ার লেগ আউট ফিল্ড
সিলী মিড অফ
সিলী মিড অন
কভার পয়েন্ট
মিড উইকেট
এক্সট্রা কভার
ননস্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান
মিড অন
বোলার
মিড অফ
লং অফ
স্ট্রেট হিট আউট ফিল্ড
লং অন আউট ফিল্ড

মাঠে কে কোথায় দাঁড়ায়

অনেকদিন পরে ভারত খুঁজে পেয়েছে একজন সত্যিকারের ভাল ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যানকে। ভিনু মানকাদের ছেলে অশোক মানকাদ ভারতের নতুন এবং সার্থক আবিষ্কার। দ্বিতীয় ফিরোজ শা কোটলায় অশোক মানকাদকে দর্শনীয় দুটি শট মারতে দেখা যাচ্ছে।

রেকর্ডস-এর পাতা থেকে

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

দুই দলের অধিনায়কগণ

সাল		অস্ট্রেঃ অধিনায়ক		ভারতের অধিনায়ক
১৯৪৭-৪৮	—	ডন ব্রাডম্যান	—	লালা অমরনাথ
১৯৫৬	—	জনসন ও লিণ্ডওয়াল	—	পলি উমরিগড়
১৯৫৯	—	রিচি বেনো	—	রামচাঁদ
১৯৬৪	—	সিম্পসন	—	পাতৌদির নবাব
১৯৬৭-৬৮	—	সিম্পসন ও লরী	—	বোরদে ও পাতৌদি
১৯৬৯	—	লরী	—	পাতৌদি

॥ জয়সীমা ॥
তরুনদের আগমনে হয়তো এবার সরে যেতে হবে টেস্ট জগৎ থেকে।

॥ রুসি সুর্তি ॥
শেষ পর্যন্ত সুর্তিকে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যেতে হলো।

ব্যক্তিগত শতরান

ভারতের পক্ষে

১০৮	—	নরী কণ্ট্রাক্টর	— বম্বের তৃতীয় টেস্ট	১৯৫৯
১১৬ ও ১৪৫	—	বিজয় হাজারে	— এডিলেডের চতুর্থ টেস্ট	১৯৪৭-৪৮
১০১	—	জয়সীমা	— ব্রিসবেনের তৃতীয় টেস্ট	১৯৬৭-৬৮
১১৬	—	ভিনু মানকাদ	— মেলবোর্নের তৃতীয় টেস্ট	১৯৪৭-৪৮
১১১	—	ভিনু মানকাদ	— মেলবোর্নের পঞ্চম টেস্ট	১৯৪৭-৪৮
১২৩	—	ডি জি ফাদকার	— এডিলেডের চতুর্থ টেস্ট	১৯৪৭-৪৮
১০৯	—	জি এস রামচাঁদ	— বম্বের দ্বিতীয় টেস্ট	১৯৫৬
১২৮*	—	পাতৌদি	— মাদ্রাজের প্রথম টেস্ট	১৯৬৪
১৩৭	—	জি আর বিশ্বনাথ	— কানপুরের দ্বিতীয় টেস্ট	১৯৬৯

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে

১১২	—	এস জি বার্নস	— এডিলেডের চতুর্থ টেস্ট	১৯৪৭
২০১	—	ব্রাডম্যান	— এডিলেডের চতুর্থ টেস্ট	১৯৪৭
১৮৫	—	ব্রাডম্যান	— ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট	১৯৪৭
১৩২ ও ১২৭*	—	ব্রাডম্যান	— মেলবোর্নের তৃতীয় টেস্ট	১৯৪৭
১৬১	—	জে ডব্লিউ বার্কে	— বম্বের দ্বিতীয় টেস্ট	১৯৫৬
১৫১	—	চ্যাপেল	— মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্ট	১৯৬৭-৬৮
১০৮	—	কাউপার	— এডিলেডের প্রথম টেস্ট	১৯৬৭-৬৮
১৬৫	—	কাউপার	— সিডনীর চতুর্থ টেস্ট	১৯৬৭-৬৮
১০১	—	ফ্লাভেল	— মাদ্রাজের চতুর্থ টেস্ট	১৯৫৯
১৫৩	—	নীল হার্ভে	— মেলবোর্নের পঞ্চম টেস্ট	১৯৪৭
১১৪	—	নীল হার্ভে	— দিল্লীর প্রথম টেস্ট	১৯৫৯
১৪০	—	নীল হার্ভে	— বম্বের দ্বিতীয় টেস্ট	১৯৫৬
১০২	—	নীল হার্ভে	— বম্বের তৃতীয় টেস্ট	১৯৫৯
১৯৮*	—	এ এল হ্যাসেট	— এডিলেডের চতুর্থ টেস্ট	১৯৪৭
১০০	—	লরী	— মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্ট	১৯৬৭-৬৮
১০০*	—	এ আর মরিস	— মেলবোর্নের তৃতীয় টেস্ট	১৯৪৭
১৬৩	—	নর্মান ও'নীল	— বম্বের তৃতীয় টেস্ট	১৯৫৯
১১৩	—	নর্মান ও'নীল	— কলকাতার পঞ্চম টেস্ট	১৯৫৯
১০৩	—	সিম্পসন	— এডিলেডের প্রথম টেস্ট	১৯৬৭-৬৮
১০৯	—	সিম্পসন	— মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্ট	১৯৬৭-৬৮
১০৩	—	স্টাকপোল	— বম্বের প্রথম টেস্ট	১৯৬৯
১১৪	—	শিহান	— কানপুরের দ্বিতীয় টেস্ট	১৯৬৯
১৩৮	—	চ্যাপেল	— দিল্লীর তৃতীয় টেস্ট	১৯৬৯

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান

ভারত — ৩৮১ রান — চতুর্থ টেস্ট—এডিলেড — ১৯৪৭
অস্ট্রেলিয়া — ৬৭৪ রান — চতুর্থ টেস্ট—এডিলেড — ১৯৪৭

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান

ভারত — ৫৮ রান — প্রথম টেস্ট—ব্রিসবেন — ১৯৪৭
অস্ট্রেলিয়া — ১০৫ রান — দ্বিতীয় টেস্ট—কানপুর — ১৯৫৯

এক মরশুমে সবথেকে বেশি রান

ভারতের পক্ষে — ৪৩৮ রান গড়ে ইনিংস প্রতি ৪৩'৮০—কণ্ট্রাক্টর ১৯৫৯
অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে — ৭১৫ রান গড়ে ইনিংস প্রতি ১৭৮'৭৫—ব্রাডম্যান ১৯৪৭

এক মরশুমে সবথেকে বেশি উইকেট

ভারতের পক্ষে —২৫টি গড়ে ২৭'৪৪ রানে প্রতিটি—প্রসন্ন—৪টি টেস্টের ৭টি ইনিংসে—১৯৬৭-৬৮

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে —২৯টি গড়ে ১৫'১৭ রানে প্রতিটি—ডেভিডসন—৫টি টেস্টের ১০টি ইনিংসে—১৯৫৯

২৯টি গড়ে ১৯'৫৮ রানে প্রতিটি—রিচি বেনো—৫টি টেস্টের ১০টি ইনিংসে—১৯৫৯

একটি টেস্টে সবথেকে বেশি উইকেট

ভারতের পক্ষে —১৪টি উইকেট ১২৪ রানে—জসু প্যাটেল—কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে—১৯৫৯

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে —১২টি উইকেট ১২৪ রানে—ডেভিডসন কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে—১৯৫৯

এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি উইকেট

ভারতের পক্ষে—

৯টি উইকেট ৬৯ রানে—জসু প্যাটেল—কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে ১৯৫৯

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে—

৭টি উইকেট ৩৮ রানে—রে লিণ্ডওয়াল—এডিলেডের চতুর্থ টেস্টে ১৯৪৭
৭টি উইকেট ৭২ রানে—রিচি বেনো—মাদ্রাজের প্রথম টেস্টে ১৯৫৬
৭টি উইকেট ৪৩ রানে— রে লিণ্ডওয়াল — মাদ্রাজের প্রথম টেস্টে ১৯৫৬
৭টি উইকেট ৯৩ রানে — ডেভিডসন — কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে ১৯৫৯
৭টি উইকেট ৬৬ রানে — ম্যাকেঞ্জি — মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্টে ১৯৬৭-৬৮

॥ নারদেশাই ॥
নারদেশাই কি আর টেস্ট খেলার সুযোগ পাবেন না?

॥ আবিদ আলি ॥
আবিদ আলির বয়েস কম তবু তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছে আজ

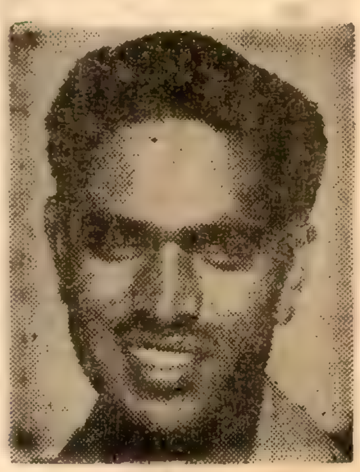

॥ বোরদে ॥
টেস্ট খেলোয়াড় হিসেবে বোরদের জীবন বোধহয় শেষ হয়ে এলো।

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

॥ আব্বাস আলী বেগ ॥
আজ আবার নতুন করে বেগের কথা মনে পড়ছে সকলের।

॥ শ্যামসুন্দর মিত্র ॥
যখন সত্যিকারের খেলার মতো খেলতেন তখন হয়েছিলেন উপেক্ষিত।

॥ দিলীপ দোসী ॥
দিলীপ দোসীর ওপর অনেকেই আস্থা রাখেন।

ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরের

মরশুম খতিয়ান ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৭-৬৮

১৯৪৭ সাল —প্রথম শ্রেণীর ১৪টি খেলা : ভারত ২টিতে জেতে, ৭টিতে হারে ও ৫টি ড্র করে। ১০০০-এর ওপর রান করেন ঐ মরশুমে লালা অমরনাথ (১,১৬২) ও বিজয় হাজারে (১,০৫৬)

—ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করেন অমরনাথ ২২৮* ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে

—একটি খেলার দু'টি ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন হাজারে এডিলেডের চতুর্থ টেস্টে

—সবচেয়ে বেশি উইকেট পান ভিনু মানকাদ (৬১টি)

—হ্যাটট্রিক করেন সি আর রঙ্গচারী তাসমানিয়ার বিরুদ্ধে

১৯৬৭-৬৮ সাল—প্রথম শ্রেণীর ১৭টি খেলা : ভারত ৪টিতে জেতে ৬টিতে হারে ও ৫টি ড্র করে এবং ২টি খেলা পরিত্যক্ত হয়।

অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফরের মরশুম খতিয়ান

১৯৫৬ সাল—৩টি মাত্র টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করে। তার মধ্যে ২টিতে জেতে ও একটি খেলা শেষ করে অমীমাংসিতভাবে।

১৯৫৯ সাল—৭টি খেলার মধ্যে জেতে ২টিতে, ১টিতে হারে আর ৪টি খেলা শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে।

নর্মান ও'নীল (২৮৪) সর্বোচ্চ রান করেন সভাপতি একাদশের বিরুদ্ধে আমেদাবাদে।

—রিচি বেনো (৩১টি) সবচেয়ে বেশি উইকেট দখল করেন।

১৯৬৪ সাল—মাত্র ৩টি টেস্ট ম্যাচে অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে ১টি জেতে, ১টিতে হারে ও ১টি টেস্ট শেষ করে অমীমাংসিতভাবে।

টেস্ট ক্রিকেটে ভারত

	খেলা	জয়	পরা	ড্র	টাই
ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে	৩৭	৩	১৮	১৬	০
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে	২৩	৩	১৪	৬	০
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে	২৩	০	১২	১১	০
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে	১৫	২	১	১২	০
নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে	১৬	৭	২	৭	০
	১১৪	১৫	৪৭	৫২	০

টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে	২০৩	৮০	৬৬	৫৭	০
সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে	৪৯	২৯	৭	১৩	০
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে	৩০	১৭	৬	৬	১
নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে	১	১	০	০	০
ভারতের বিরুদ্ধে	২৩	১৪	৩	৬	০
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে	৬	২	১	৩	০
	৩১২	১৪৩	৮৩	৮৫	১

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

টেস্ট খেলার ফলাফল—১৯৪৭-৬৯

॥ ১৯৪৭-৪৮ সাল ঃ অস্ট্রেলিয়ায় খেলা ঃ ভারত ৪টি টেস্টে পরাজিত, একটি খেলা ড্র ॥

১ম টেস্ট ঃ ব্রিসবেন ঃ নভেম্বর ২৮ ও ২৯, ডিসেম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ ঃ অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ২২৬ রানে জয়ী।

অস্ট্রেলিয়া ৮ উইঃ ৩৮২ ডিঃ (ব্রাডম্যান ১৮৫, মিলার ৫৮, হ্যাসেট ৪৮, মরিস ৪৭, অমরনাথ ৮৪ রানে ৪টি ও ভিনু মানকাদ ১১৩ রানে ৩টি উইকেট পান)।

ভারত ৫৮ (ই আর টোসাক ৫ রানে ২টি উইঃ) ও ৯৮ (টোসাক ২৯ রানে ৬টি উইকেট পান)।

২য় টেস্ট ঃ সিডনী ঃ ডিসেম্বর ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ই ঃ খেলা অমীমাংসিত

ভারত ১৮৮ (ফাদকার ৫১, কিশানচাঁদ ৪৪, সি ম্যাককুল ৭১ রানে ৩টি উইঃ) ও ৭ উইঃ ৬১ (জনস্টন ১৫ রানে ৩টি উইকেট)। অস্ট্রেলিয়া ১০৭ (হাজারে ২৯ রানে ৪টি ও ফাদকার ১৪ রানে ৩টি উইঃ) (বৃষ্টির জন্যে খেলা বন্ধ হয়ে যায়)।

৩য় টেস্ট ঃ মেলবোর্ন ঃ জানুয়ারী ১, ২, ৩ ও ৫ ঃ অস্ট্রেলিয়া ২৩৩ রানে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া ৩৯৪ (ব্রাডম্যান ১৩২, মরিস ৪৫, হ্যাসেট ৮০; অমরনাথ ৭৮ রানে ৪টি ও ভিনু মানকাদ ১৩৫ রানে ৪টি উইঃ) ও ৪ উইঃ ২৫৫ ডিঃ (মরিস ১০০ (অপঃ), ব্রাডম্যান ১২৭ (অপঃ) অমরনাথ ৫২ রানে ৩টি উইঃ)। ভারত ৯ উইঃ ২৯১ ডিঃ (ভিনু মানকাদ ১১৬, ফাদকার ৫৫ (অপঃ) জনসন ৫৯ রানে ৪টি উইঃ) ও ১২৫ জনস্টন ৪৪ রানে ৪টি ও জনসন ৩৫ রানে ৪টি উইকেট)।

৪র্থ টেস্ট ঃ এডিলেড ঃ জানুয়ারী ২৩, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮ ঃ অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ১৬ রানে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া ৬৭৪ (বার্নস ১১২) ব্রাডম্যান ২০১, হ্যাসেট ১৯৮ (অপঃ) মিলার ৬৭; সি রঙ্গচারী ১৪১ রানে ৪টি উইঃ)। ভারত ৩৮১ (হাজারে ১১৬, ফাদকার ১২৩, মানকাদ ৪৯, অমরনাথ ৪৬, জনসন ৬৪ রানে ৪টি উইঃ) ও ২৭৭ (হাজারে ১৪৫, হিমু অধিকারী ৫১; লিণ্ডওয়াল ৩৮ রানে ৭টি উইঃ)।

৫ম টেস্ট ঃ মেলবোর্ন ঃ ফেব্রুয়ারী ৬, ৭, ৯ ও ১০ ঃ অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ১৭৭ রানে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া ৮ উইঃ ৫৭৫ ডিঃ (ব্রাউন ৯৯, ব্রাডম্যান ৫৭ (অবসৃত), হার্ভে ১৫৩, লক্সটন ৮০)। ; ভারত ৩৩১ (ভিনু মানকাদ ১১১, হাজারে ৭৪, ফাদকার ৫৬ (অপঃ); ডি রিং ১০৩ রানে ৩টি ও জনসন ৬৬ রানে ৩টি উইকেট পান।) ও ৬৭ (জনসন ৮ রানে ৩টি ও রিং ১৭ রানে ৩টি উইঃ)।

॥ ১৯৫৬ সাল ঃ ভারতে খেলা ঃ ভারত দু'টি টেস্টে পরাজিত, একটি খেলা ড্র ॥

১ম টেস্ট ঃ মাদ্রাজ ঃ অক্টোবর ১৯, ২০, ২১ ও ২৩ ঃ অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ৫ রানে জয়ী

ভারত ১৬১ (মঞ্জরেকার ৪১, পি ক্রফোর্ড ৩২ রানে ৩টি ও বেনো ৭২ রানে ৭টি উইঃ) ও ১৫৩ (লিণ্ডওয়াল ৪৩ রানে ৭টি উইঃ)। অস্ট্রেলিয়া ৩১৯ (ক্রেগ ৪০, জনসন ৭৩, গুপ্তে ৮৯ রানে ৩টি ও ভিনু মানকাদ ৯০ রানে ৪টি উইকেট পান)।

২য় টেস্ট ঃ বম্বে ঃ অক্টোবর ২৬, ২৭, ২৮, ৩০ ও ৩১ ঃ খেলা অমীমাংসিত

ভারত ২৫১ (মঞ্জরেকার ৫৫, রামচাঁদ ১০৯, ক্রফোর্ড ২৮ রানে ৩টি ও ম্যাকাই ২৭ রানে ৩টি উইঃ) ও ৫ উইঃ ২৫০ (পি রায় ৭৮, উমরিগড় ৭৮)। অস্ট্রেলিয়া ৭ উইঃ ৫২৩ ডিঃ (বার্কে ১৬১, হার্ভে ১৪০, বার্জ ৮৩, লিণ্ডওয়াল ৪৮ (অপঃ); গুপ্তে ১১৫ রানে ৩টি উইঃ)।

৩য় টেস্ট : কলকাতা : নভেম্বর ২, ৩, ৪ ও ৬ই : অস্ট্রেলিয়া ৯৪ রানে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া ১৭৭ (বার্জ ৫৮, গোলাম আমেদ ৪৯ রানে ৭টি উইঃ) ও ৯ উইঃ ১৮৯ ডিঃ (হার্ভে ৬৯, গোলাম আমেদ ৮১ রানে ৩টি ও ভিনু মানকাদ ৪৯ রানে ৪টি উইঃ)। ভারত ১৩৬ (লিণ্ডওয়াল ৩২ রানে ৩টি ও বেনো ৫২ রানে ৬টি উইঃ) ও ১৩৬ (বেনো ৫৩ রানে ৫টি ও বার্কে ৩৭ রানে ৪টি উইকেট পান।

॥ ১৯৫৯-৬০ সাল ঃ ভারতে খেলা ঃ ভারত একটিতে জেতে, দুটিতে হারে ও দুটি ড্র করে ॥

১ম টেস্ট : দিল্লী : ডিসেম্বর ১২, ১৩, ১৪ ও ১৬ই : অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ১২৭ রানে জয়ী

ভারত ১৩৫ (কন্ট্রাক্টর ৪১; ডেভিডসন ৩০ রানে ৩টি, বেনো শূন্য রানে ৩টি উইঃ) ও ২০৬ (পি রায় ৯৯; ক্লাইন ৪২ রানে ৪টি, বেনো ৭৬ রানে ৫টি)। অস্ট্রেলিয়া ৪৬৮ (ফ্যাভেল ৪০, হার্ভে ১১৪, ম্যাকাই ৭৮, গ্রাউট ৪২ ও মেকিফ ৪৫ (অপঃ), উমরিগড় ৪৯ রানে ৪টি উইঃ)।

২য় টেস্ট : কানপুরে ডিসেম্বর ১৯, ২০, ২১, ২৩ ও ২৪শে : ভারত ১১৯ রানে জয়ী

ভারত ১৫২ (ডেভিডসন ৩১ রানে ৫টি ও রিচি বেনো ৬২ রানে ৪টি উইঃ) ও ২৯১ (কণ্ট্রাক্টর ৭৪, বোরদে ৪৪, কেনী ৫১, নাদকার্নী ৪৬; ডেভিডসন ৯৩ রানে ৭টি উইঃ)। অস্ট্রেলিয়া ২১৯ (ম্যাকডোনাল্ড ৫৩, হার্ভে ৫১, ডেভিডসন ৪১; প্যাটেল ৬৯ রানে ৯টি উইঃ) ও ১০৫ (প্যাটেল ৫৫ রানে ৫টি ও উমরিগড় ২৭ রানে ৪টি উইঃ)।

৩য় টেস্ট : বম্বে : জানুয়ারী ১, ২, ৩, ৫ ও ৬ই : খেলা অমীমাংসিত

ভারত ২৮৯ (কণ্ট্রাক্টর ১০৮, বেগ ৫০; ডেভিডসন ৬২ রানে ৪টি, মেকিফ ৭৯ রানে ৪টি উইঃ) ও ৫ উইঃ ২২৬ (পি রায় ৫৭, কণ্ট্রাক্টর ৪৩, বেগ ৫৮, কেনী ৫৫ (অপঃ) মেকিফ ৬৭ রানে ৩টি উইঃ)। অস্ট্রেলিয়া ৮ উইঃ ৩৮৭ (হার্ভে ১০২, ও'নীল ১৬৩, নাদকার্নী ১০৫ রানে ৬টি) ও ১ উইঃ ৩৪ রান।

৪র্থ টেস্ট : মাদ্রাজ : জানুয়ারী ১৩, ১৪, ১৬, ১৭ ও ১৮ই : অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ৫৫ রানে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া ৩৪২ (ফ্যাভেল ১০১, ও'নীল ৪০, ম্যাকাই ৮৯, দেশাই ৯৩ রানে ৪টি ও নাদকার্নী ৭৫ রানে ৩টি উইঃ)। ভারত ১৪৯ (কুন্দরন ৭১; ডেভিডসন ৩৬ রানে ৩টি ও বেনো ৪৩ রানে ৫টি উইঃ)। ও ১৩৮ (কণ্ট্রাক্টর ৪১; বেনো ৪৩ রানে ৩টি উইঃ)।

৫ম টেস্ট : কলকাতা : জানুয়ারী ২৩, ২৪, ২৫, ২৭ ও ২৮শে : খেলা অমীমাংসিত

ভারত ১৯৪ (গোপীনাথ ৩৯; ডেভিডসন ৩৭ রানে ৩টি, বেনো ৫৯ রানে ৩টি উইঃ) ও ৩৩৯ (কেনী ৬২, বোরদে ৫০; জয়সীমা ৭৪; বেনো ১০৩ রানে ৪টি উইঃ)। অস্ট্রেলিয়া ৩৩১ (গ্রাউট ৫০, ও'নীল ১১৩, বার্জ ৬০, কেনী ১১১ রানে ৪টি, প্যাটেল ১০৪ রানে ৩টি ও বোরদে ২৩ রানে ৩টি উইঃ) ও ২ উইঃ ১২১ (ফ্যাভেল ৬২ (অপঃ)।

॥ ১৯৬৪ সাল ঃ ভারতে খেলা ঃ ভারতের একটিতে জয়, একটিতে পরাজয় ও একটি ড্র ॥

১ম টেস্ট : মাদ্রাজ : অক্টোবর ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ই : অস্ট্রেলিয়া ১৩৯ রানে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া ২১১ (লরী ৬২, ও'নীল ৪০; কৃপাল সিং ৪৩ রানে ৩টি ও নাদকার্নী ৩১ রানে ৫টি উইঃ) ও ৩৯৭ (লরী ৪১, সিম্পসন ৭৭, বার্জ ৬০, ভিভার্স ৭৪, নাদকার্নী ৯১ রানে ৬টি উইঃ)। ভারত ২৭৬ (পাতৌদি ১২৮ (অপঃ), বোরদে ৪৯; ম্যাকেঞ্জি ৫৮ রানে ৬টি) ও ১৯৩ (মঞ্জরেকার ৪০, হনুমন্ত সিং ৯৪; ম্যাকেঞ্জি ৩৩ রানে ৪টি উইঃ)।

২য় : টেস্ট : বম্বে : অক্টোবর ১০, ১১, ১৩, ১৪ ও ১৫ই : ভারত ২ উইঃ জয়ী

অস্ট্রেলিয়া ৩২০ (বার্জ ৮০, জারম্যান ৭৮, ভিভার্স ৬৭; চন্দ্রশেখর ৫০ রানে ৪টি উইঃ) ও ২৭৪ (লরী ৬৮, বুথ ৭৪, কাউপার ৮১; চন্দ্রশেখর ৭৩ রানে ৪টি ও নাদকার্নী ৩৩ রানে ৪টি উইঃ)। ভারত ৩৪১ (জয়সীমা ৬৬, মঞ্জরেকার ৫৯, পতৌদি ৮৬; কনোলী ৬৬ রানে ৩ উইঃ; ভিভার্স ৬৮ রানে ৪টি উইঃ) ও ৮ উইকেটে ২৫৬ (সারদেশাই ৫৬, পতৌদি ৫৩, কনোলী ২৪ রানে ৩টি উইঃ)।

৩য় টেস্ট : কলকাতা : অক্টোবর ১৭, ১৮, ২০, ২১ ও ২২শে : খেলা অমীমাংসিত

অস্ট্রেলিয়া ১৭৪ (সিম্পসন ৬৭, লরী ৫০; সুতি ৩৮ রানে ৩টি ও ডুরানী ৭৩ রানে ৬টি) ও ১ উই: ১৪৩ (সিম্পসন ৭১ ও লরী ৪৭ (অপ:)। ভারত ২৩৫ (সারদেশাই ৪২, জয়সীমা ৫৭, বোরদে ৬৮ (অপ:); ভিভার্স ৮১ রানে ৩টি ও সিম্পসন ৪৫ রানে ৪টি উই:)।

॥ ১৯৬৭-৬৮ সাল : খেলা অস্ট্রেলিয়ায় : ভারত চারটি টেস্টেই পরাজিত ॥

১ম টেস্ট : এডিলেড : ডিসেম্বর ২৩, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮শে : অস্ট্রেলিয়া ১৪৬ রানে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া ৩৩৫ (সিম্পসন ৫৫, লরী ৪২, শিহান ৮১, কাউপার ৯২; আবিদ আলী ৫৫ রানে ৬টি ও প্রসন্ন ৬০ রানে ৩টি উই:) ও ৩৬৯ (সিম্পসন ১০৩, কাউপার ১০৮; সুতি ৭৪ রানে ৫টি উই:)। ভারত ৩০৭ (ইঞ্জিনিয়ার ৮৯, বোরদে ৬৯, সুতি ৭০, কনোলী ৫৪ রানে ৪টি উই:) ও ২৫১ (সুতি ৫৩, সুব্রহ্মনিয়াম ৭৫; রেনবার্গ ৩৯ রানে ৫টি উই:)।

২য় টেস্ট : মেলবোর্ন : ডিসেম্বর ৩০শে, জানুয়ারী ১, ২ ও ৩রা : অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ৪ রানে জয়ী

ভারত ১৭৩ (পাতৌদি ৭৫; ম্যাকেঞ্জি ৬৬ রানে ৭টি উই:) ও ৩৫২ (ইঞ্জিনিয়ার ৪২, ওয়াদেকার ৯৯, সুতি ৪৩, পতৌদি ৮৫; ম্যাকেঞ্জি ৮৫ রানে ৩টি ও সিম্পসন ৪৪ রানে ৩টি উই:)। অস্ট্রেলিয়া ৫২৯ (লরী ১০০, সিম্পসন ১০৯, চ্যাপেল ১৫১, জারম্যান ৬৫; সুতি ১৫০ রানে ৩টি ও প্রসন্ন ১৪১ রানে ৬টি উই:)।

৩য় টেস্ট : ব্রিসবেন : জানুয়ারী ১৯, ২০, ২২, ২৩ ও ২৪শে : অস্ট্রেলিয়া ৩৯ রানে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া ৩৭৯ (লরী ৬৪, রেডপাথ ৪১, কাউপার ৫১, শিহান ৫৮, ওয়ালটার্স ৯৩, সুতি ১০২ রানে ৩টি উই:) ও ২৯৪ (লরী ৪৫, রেডপাথ ৭৯, ওয়ালটার্স ৬২ (অপ:); প্রসন্ন ১০৪ রানে ৫টি উই:)। ভারত ২৭৯ (সুতি ৫২, পাতৌদি ৭৪, জয়সীমা ৭৪; ক্রিম্যান ৫৬ রানে ৩টি ও কাউপার ৩১ রানে ৩টি উই:) ও ৩৫৫ (জয়সীমা ১০১, বোরদে ৬৩, পাতৌদি ৪৮, সুতি ৬৪; কাউপার ১০৪ রানে ৪টি ও গ্লিসন ৫০ রানে ৩টি উই:)

৪র্থ টেস্ট : সিডনী : জানুয়ারী ২৬, ২৭, ২৯, ৩০ ও ৩১শে : অস্ট্রেলিয়া ১৪৪ রানে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া ৩১৭ (লরী ৬৬, শিহান ৭২, ওয়ালটার্স ৯৪ (অপ:); প্রসন্ন ৬২ রানে ৩টি উই:) ও ২৯২ (লরী ৫২, কাউপার ১৬৩; প্রসন্ন ৯৬ রানে ৪টি উই:)। ভারত ২৬৮ (আবিদ আলী ৭৮, ওয়াদেকার ৪৯, পাতৌদি ৫১; সিম্পসন ৩৮ রানে ৩টি ও ক্রিম্যান ৮৬ রানে ৪টি উই:) ও ১৯৭ (আবিদ আলী ৮১; কাউপার ৪৯ রানে ৪টি ও সিম্পসন ৫৯ রানে ৫টি উই:)।

॥ ১৯৬৯ সাল : খেলা ভারতে ॥

১ম টেস্ট : বম্বে : নভেম্বর ৪, ৫, ৭, ৮ ও ৯ই : অস্ট্রেলিয়া ৮ উই: জয়ী

ভারত ২৭১ (পাতৌদি ৯৫, অশোক মানকাদ ৭৪, সারদেশাই ২০; ম্যাকেঞ্জি ৬৯ রানে ৫টি, গ্লিসন ৫২ রানে ৩টি ও কনোলী ৫৫ রানে ২টি উই:) ও ১৩৭ (ওয়াদেকার ৪৬, ইঞ্জিনিয়ার ২৮; গ্লিসন ৫৬ রানে ৪টি, কনোলী ২০ রানে ৩টি ও ম্যালেট ২২ রানে ২টি উই:); অস্ট্রেলিয়া ৩৪৫ (স্টাকপোল ১০৩, রেডপাথ ৭৪, ওয়ালটার্স ৪৮; প্রসন্ন ১২১ রানে ৫টি, বেদী ৭৪ রানে ৩টি ও ভেঙ্কটরাঘবন ৬৭ রানে ২টি) ও ২ উই: ৬৭ (চ্যাপেল ৩১ (অপ:) ও ওয়ালটার্স ২২ (অপ:)।

২য় টেস্ট : কানপুর : নভেম্বর ১৫, ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০শে : খেলা অমীমাংসিত

ভারত ৩২০ (ইঞ্জিনিয়ার ৭৭, অশোক মানকাদ ৬৪, সোলকার ৪৪; কনোলী ৯১ রানে ৪টি ও ম্যালেট ৫৮ রানে ৩ উই:) ও ৭ উই: ৩১৭ (বিশ্বনাথ ১৩৭, অশোক মানকাদ ৬৮, সোলকার ৩৫; ম্যাকেঞ্জি ৬৩ রানে ৩টি ও কনোলী ৬৯ রানে ২টি উই:)। অস্ট্রেলিয়া ৩৪৮ (শিহান ১১৪, ওয়ালটার্স ৫৩; স্টাকপোল ৪০; ভেঙ্কটরাঘবন ৭৬ রানে ৩টি, সুব্রত গুহ ৫৫ রানে ২টি ও প্রসন্ন ৭১ রানে ২টি উই:) ও কোন উই: না হারিয়ে ৯৫ (লরী ৫৬ (অপ:) ও স্টাকপোল ৩৭ (অপ:)।

৩য় টেস্ট : দিল্লী : নভেম্বর ২৮, ২৯, ৩০ ও ডিসেম্বর ১ ও ২রা : ভারত সাত উইকেটে জয়ী

অস্ট্রেলিয়া ২৯৬ (চ্যাপেল ১৩৮, স্টাকপোল ৬১, টাবর ৪৬, বেদী ৭১ রানে ৪টি ও প্রসন্ন ১১১ রানে ৪টি উই:) ও ১০৭ (লরী (অপ:) ৪১, বেদী ৩৭ রানে ৫টি ও প্রসন্ন ৪২ রানে ৫টি উই:)। ভারত ২২৩ (মানকাদ ৯৭, ইঞ্জিনিয়ার ৩৮; ম্যালেট ৬৪ রানে ৬টি উই:) ও ৩ উইকেটে ১৮১ (ওয়াদেকার (অপ:) ৯১, বিশ্বনাথ (অপ:) ৪৪, বেদী ২০; ম্যালেট ৬২ রানে ২টি উই:)।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

।। গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ।।

লিদাস গ্রন্থাবলী--- ১ম ৬-০০
লিদাস গ্রন্থাবলী--- ২য় ৬-০০
লিদাস গ্রন্থাবলী--- ৩য় ৮-০০
কেল গ্রন্থাবলী--- ১ম ৪-৫০
কেল গ্রন্থাবলী ২য় ৩-৫০
ম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস) ১ম ৩-০০
" " ২য় "
" " ৩য় "
ম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য) ১ম ৩-০০
" " ২য় ৩-০০
" " ৩য় ৩-০০
জেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী---১ম ৬-০০
" " ২য় ৬-০০
" " ৩য় ৮-০০
লোক্য গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
বন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী--- ১ম ৪-০০
বন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী--- ২য় ৪-০০
মেন্দ্র গ্রন্থাবলী--- ৩-৫০
নিক গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
নিক গ্রন্থাবলী--- ২য় ৩-০০
মোদর গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-৩০
" " ২য় ৪-০০
মোদর গ্রন্থাবলী--- ৪র্থ ৪-০০
লাল গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
তিলাল গ্রন্থাবলী--- ২য় ৪-০০
তিলাল গ্রন্থাবলী--- ৩য় ৪-০০
গেশ গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-০০
গেশ গ্রন্থাবলী--- ২য় ৩-০০
হারীলাল গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
লাল গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
ন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
প্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী--- ৫-০০
গ্রন্থাবলী--- ২য় ৩-০০
গ্রন্থাবলী--- ৩য় ৩-০০
ন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:---৪-০০

দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী---২য় ৪-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী--- ৩-৫০
বিভতিভূষণ মুখো: গ্রন্থাবলী--- ৪-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী--- ৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী--- ১ম ৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী--- ২য় ৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:---১ম ৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:---২য় ৩-৫০
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী--- ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ১ম ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ৩য় ৪-০০
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী--- ৪র্থ ৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী--- ৪-০০
" " " ---২য় ৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী--- ৬-০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী--- ৩-৫০
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী--- ৪-০০
শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:---২য় ভাগ ৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:---৩য় ৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:---৫ম ৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী--- ৫-০০
কথাসরিৎসাগর---১ম ভাগ ৪-০০
" ---২য় ৪-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী---
১ম, ২য়, ৩য়---প্রতি খণ্ড ৪-০০
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে
৮ম খণ্ড---প্রতি খণ্ড--- ৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী---২য় ৪-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী--- ৪-০০
বিলাতী গুপ্তকথা---২য় ভাগ ৫-০০
অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী---২য় ৩-০০
" " " ---৩য় ৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী--- ৩-০০
নবীন সেনের গ্রন্থাবলী--- ৭-০০

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস
---২য় ভাগ ৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থা:---১ম ১০-০০
অরুণ বহ্নি--- ৪-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী--- ৪-৫০
জ্যোতিষ রত্নাকর--- ৩-৫০
পরলোক--- ৪-৫০
পরলোক রহস্য--- ২-২৫
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব--- ৪-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়--- ১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা--- ৩-০০
ভারত প্রতিভা--- ৫-০০
প্রতাপাদিত্য--- ৩-০০
সাধক কমলাকান্ত--- ২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার--- ৩-০০
নানার মা--- ৩-০০
জালিয়াৎ ক্লাইভ--- ৩-০০
বিক্রমাদিত্য--- ৩-০০
বিসমার্ক--- ২-০০
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী---৩-০০
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত--- ২-০০
মাধবীকঙ্কণ--- ২-০০
শিবরাম গ্রন্থাবলী--- ৪-০০
বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ---১ম ৪-০০

যৌন-মনোদর্পণ

৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ ৪-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া ৪-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ত-
কালিকত্বের ব্যাপারসমূহ ৪-৫০
আশাপূর্ণা দেবী গ্রন্থাবলী---১ম ৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী---২য় ৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী--- ৮-০০
ANANDAMATH ৪-০০
(শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)
DAVID HARE ৪-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ।। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

Thursday, 11th December, 1969 SAPTAHIK BASUMATI Regd. No. C 71
Price : 30 Paise Gram : "BASUMATI" Phone : 34—7771, 72, 73, 74

13 DEC 1969
CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY